৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

দশম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ

১৩২৯

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

দশম বর্ষ—প্রথম খণ্ড, আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩২৯

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

অগ্নি-পরীক্ষা (গল্প)—শ্রীনিশিকান্ত সেন ... ৫৩৮
অনিমন্ত্রিত (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ... ৬৯১
অন্ন (কবিতা)—শ্রীকপিঞ্জল ... ৬৫৩
অপূর্ব্ব অধ্যাপনা (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর ৯৩৫
অমূল তরু (উপন্যাস)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫৯, ৭১৭, ৮১৭
অলক্ষণ (গল্প)—শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯০৫
অসমাপ্ত (গল্প)—শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী বি-এ ... ৩৯৬
অসীম (উপন্যাস)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ১৬, ১৮৭, ৪৬২
অস্কার ওয়াইল্ড্ বিরচিত সালমে (নাটিকা)—শ্রীসুরেন্দ্র কুমার ৯০৯
অস্ত-রহস্য (কবিতা)—শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ... ৫৫১
আঁখির অত্যাচার (গবেষণা)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ৬৩৮
আওরংজীবের সাতারা-অবরোধ (ইতিহাস) অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার এম-এ, পি-আর-এস, আই-ই-এস ১
আজগুবি কাহিনী (গল্প)—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস্-সি ২৮৩
আতস-বাজী (শিল্প)—শ্রীবিজনবিহারী সান্ন্যাল ৭০১
আন্দামান (ভ্রমণ)—শ্রীফণিভূষণ মজুমদার ১৯৩, ৩৪৬, ৫০৩
আমদানি-বাণিজ্য (শিল্প-বাণিজ্য)—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ই-এস ... ৩৬
আমাদের নাট্যশাস্ত্র (শাস্ত্র কথা)—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ ৩৭০, ৬৬১, ৮০৮
আলোক-তৃষ্ণা (গল্প)—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস্‌সি ৮৬৬
আশা-পথে (গল্প)—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী .. ৭০৪
আশ্চর্য্য কাষ্ঠ (বিজ্ঞান)—শ্রীবৈদ্যনাথ মিত্র ৭৫২
আসামী (গল্প)—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ ... ৪০৯
ইঙ্গিত (শিল্প)—শ্রীবিশ্বকর্ম্মা ১৪১, ৩০১, ৪৫৮, ৭৭৪, ৯৫২
ইন্দিরা দেবী (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ... ৯০৭
ইলিশ মাছ (গল্প)—শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম এ, বি-এল ৪৯৯
উদ্ভটসাগর—কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ ৩৯৫, ৭০৯
উন্মনা (কবিতা)—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ... ৪৬৮
উরাঁওদের কথা (জাতিতত্ত্ব)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ ৮৩২
উনপঞ্চাশী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৩৮
ওঝাজীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (গল্প)—রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর ... ১১৭
ওরাঁওদের—ধানগাড়ি ও খলিহান পূজা এবং নুঁওয়াখানি—(জাতিতত্ত্ব)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ ৬৯৬
কফিন (বিজ্ঞান)—শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত বি-এস্‌সি ... ২২৬
কয়েদী (কাহিনী)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ ... ১৫৮
কল্যার কথা (শিল্প)—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ .. ৩২১
কলেজস্কোয়ার সন্তরণ-সমিতি ৪৪৯
কল্পনা (কবিতা)—মহারাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় ৬১১
কাজরী (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ ২৭৪
কাঠের বাক্স (গল্প)—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি-এল ... ৭৯৩
কার্য্যের সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা (বিজ্ঞান)—শ্রীসরসীলাল সরকার এম-এ, এল-এম-এস ৯১
কাশীতে বাঙ্গালী—অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ... ৮৯০
কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র এল-এজি ... ৭৮১
কোস্‌নে কথা (কবিতা)—শ্রীবীরকুমার বধ-রচয়িত্রী ৫৩৪
কৌতুকাঙ্কন—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৮৭২
খৃষ্টীয় ভক্তিবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (ধর্ম্মতত্ত্ব)—অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ... ৩৮৩
খোকার প্রশ্ন (গল্প)—শ্রীবিহঙ্গবালা দাসী ... ৪৯২
গরীব (গল্প)—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ... ৫৫১
চক্র (কবিতা (শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ... ৯২৯
চয়ন ৩১৩, ৪৩৬
চরণামৃত (গল্প)—শ্রী অমূল্যধন ঘোষ ... ৬২০
চাওয়া (কবিতা)—শ্রীসুনীতি দেবী ... ৬৬৮
চাষা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ... ৫৬৯
চিত্রশালা ... ১৪৫, ২৮৯, ৪৪১, ৫৯৩, ৭৬১, ৯২১
ছবির খেয়াল (গল্প)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ... ৮৯৯
জগতে রসায়ন-শাস্ত্রের স্থান (বিজ্ঞান)—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-এ-সি ... ৩৮২
জাতি-বিজ্ঞান (বিজ্ঞান)—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ২৭৫
জামাই (গাথা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৬০১
জার্ম্মাণ চোখে জাপানী (ইতিহাস)—অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ ... ৫৩৫
ঝরা পাতা (গল্প)—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ ... ৫১৮
তুর্কিস্থানে প্রোথিত প্রাচীন পুঁথি (প্রত্নতত্ত্ব)—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-এ-সি ... ৪৭
তুলসীদাসজীর তত্ত্বজ্ঞান-শিক্ষা (তত্ত্বকথা)—শ্রীসীতেশচন্দ্র সান্ন্যাল ২২১
তৃপ্তি (কবিতা)—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ... ৯৫০
দাবী (কবিতা)—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ... ১১৬
দিল্লী-সাম্রাজ্যের পতন-কাহিনী (সমালোচনা) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৪২
দুঃখাবসান (গল্প)—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ৭৬
দু-কূলহারা (কবিতা)—শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী ... ৮
দুর্লভ (কবিতা)—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ... ৫৫৯
দেখনহাসি (কবিতা)—শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮১
দেনা-পাওনা (উপন্যাস)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৯, ৩০৭, ৬১৬, ৭৯৭
দেবতা ও ভক্ত (কবিতা)—শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী ... ৭৬০
ধর্ম্মতত্ত্ব—শ্রীঅনন্তকুমার সান্ন্যাল তত্ত্বনিধি, সাংখ্যবেদান্তরত্ন ৮৩০
নব দাম্পত্য আলাপ (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৩২৮

নবযুগ—নারী-সমস্যা (মাতৃমঙ্গল)—শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ ৮৪৮
নায়েব মহাশয় (উপন্যাস)—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ৩৯, ২৪৪, ৩৫৭, ৪৯৫, ৬৮৫ ৮৪৪
নারীর অধিকারের কথা (মাতৃমঙ্গল)—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮৫৩
নারীর কথার আর এক দিক (মাতৃমঙ্গল)—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ ... ৩৬২
নারীর স্থান কোথায় (মাতৃমঙ্গল)—শ্রীতমাললতা বসু ৫৬৩
নিখিল-প্রবাহ (বৈদেশিকী)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ১২০, ২৫২, ৪২৫, ৫৭০, ৭৩৯, ৯৩৬
নির্দ্দোষ (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ... ৪৫
নিশানা (কবিতা)—শ্রীকামিনী রায় বি-এ ... ৭৯২
নেসাখোরের অভিধান (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ .. ১০২
পয়লা আষাঢ় (গল্প)—শ্রীগোপাল হালদার ... ২৫৭
পরাজিত জার্ম্মাণী (ইতিহাস)—অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ ২২৭, ৪০০
পরিবর্ত্ত (গল্প)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ... ৩৮৭
পল্লী-প্রান্তে (কবিতা)—শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৪২৪
পল্লী-শ্রী—শ্রীরণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪০৪
পাট বনাম তুলা (কৃষিতত্ত্ব)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এস্‌সি ৮৩৯
পাষাণ (গল্প)—শ্রীনিশিকান্ত সেন ... ১৪
পুনর্মিলন (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ... ৬৭৪
পুস্তক-পরিচয়—সম্পাদক ... ৪৭৮, ৭৮৯
পূজার চাটনী—শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬০৭
পূজারী (গল্প)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ... ৬০৬
প্রকাশ (কবিতা)—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ... ৫৮৮
ফিল্টার বা জল শোধন করিবার উপায় (স্বাস্থ্যবিজ্ঞান)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস ২২৯
ভারত-চিত্রচর্চ্চা (কলা-শিল্প)—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই ৪৮১
ভারতেতিহাসের একটী লুপ্ত অধ্যায় (ইতিহাস)—শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল ১৬৮
ভাব ও বুদ্ধি (বিজ্ঞান)—শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল ... ৯৮
ভাষার কাহিনী (সাহিত্য)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ ৮২২
মধুসূদনের স্বদেশ ও স্বভাষানুরাগ—কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ৩৭৮
মহাপ্রয়াণ (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ৯০০
মহীশূর-ভ্রমণ (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই ৬৪, ৮৬০
মাঙ্গালোর (ভ্রমণ)—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি-এল ... ৫৪৩
মাতাল (গল্প)—শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ ... ৫৮৬
মাতৃস্তন্য (মাতৃ-মঙ্গল)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ... ৪১০
মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র (দর্শন)—অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ ৮০১
মার্কিন মুলুক (ভ্রমণ)—শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার এম-এস্‌সি ২৬৬, ৬৭৫
মিথিলা—জনকপুর (ভ্রমণ)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ ৫২২
মুকুল (গল্প)—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু ... ৭৫৩
মেঘ (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল ... ৩৬১
মেয়েদের জাগা (মাতৃ-মঙ্গল)—শ্রীমতী সত্যবালা দেবী ২১১
যযাতি—দেবযানী (নাটিকা)—শ্রীযামিনী রায় বি-এ ... ৫৯০
য়ুরোপে (ভ্রমণ)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ১৮১, ৩৩৩, ৬২৬, ৮৮১
রংয়ের কথা (বিজ্ঞান)—শ্রীবিমলাংশু প্রকাশ রায় ... ৭০০
রঙ্গচিত্র—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস .. ৪১৭
রজনীগন্ধা (কবিতা)—মহারাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় ৯০৮
রবার ও তাহার প্রস্তুত-প্রণালী (শিল্প)—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-এ-সি ৬৯৮
রসস্য নিবেদনম্ (দর্শন)—শ্রীযামিনীকান্ত সেন বি-এল ... ৬৪১
রূপকথার সৃষ্টি (আলোচনা)—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ ... ৪৬
রোগশয্যায় (কবিতা)—শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ ... ৭১৬
ল্যাজ ও ল্যাজুড়—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন ... ৬০৯
বঙ্গের ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ (ইতিহাস)—অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ ২১
বনচাঁড়ালের করচা (নক্সা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ... ৫২০
বন্যার গতি (গল্প)—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ ... ৯১৫
বন্যা-চিত্র ... ৯২১
বরেন্দ্র-স্মৃতি (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ৬০৮
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ (দর্শন)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ৮৫৬
বহুরূপী গাছ—শ্রীপিয়েমডি ... ৫৮৮
বাঙ্গালীর ধনলিপ্সা (বাণিজ্য)—শ্রীহরিহর শেঠ ... ৩৭৬
বাদলের ব্যথা (কবিতা)—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ... ২১০
বিজিতা (উপন্যাস)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৫৭, ১৭৫, ৩৩৯, ৫২৭, ৬৬৯, ৮২৫
বিজ্ঞান ও কল্পনা (বিজ্ঞান)—ডাক্তার শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পিএইচ-ডি, আই-ই-এস ৭২৯
বিজ্ঞান ও দর্শন (বিজ্ঞান)—ডাক্তার শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পিএইচ-ডি, আই-ই-এস ... ৯০১
বিপর্য্যয় (উপন্যাস)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল ৯, ১৬৩, ৩২৯, ৪৮৮, ৬৫৪, ৮০৫
বিয়ের পদ্য (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ ৪১৬
বিরজা (গল্প)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু ০২৯
বিশ্ব-ভারতী—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল ১৫৩, ২৯৭, ৪৬৯
বীরবলের পত্র ... ৪৩৯
বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা (মাতৃ-মঙ্গল)—শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি ৮৫, ২১৬, ৫৬৪, ৭৬৯
বেদ ও বিজ্ঞান (দর্শন)—অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ৪১৯, ৭২৩
বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-পরীক্ষা (বিজ্ঞান)—শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় এম-এ .. ৮৩৫
'বৈদিক রহস্য' প্রবন্ধের প্রতিবাদ—শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ, বেদান্তভূষণ ৩৭৫
বৈদিক রহস্য (শাস্ত্র-কথা)—শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৫০, ৬৯২
বৈশেষিক দর্শন (দর্শন)—অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ১৬১
ব্যবসায়ের কথা—শ্রীহরিহর শেঠ .. ৮৯৪
ব্রহ্মদেশে পদব্রজে ভূ-প্রদক্ষিণকারী মিঃ মার্টিনি (জীবন-কথা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু ৭৭৯
ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান (ভূগোল)—শ্রীসত্যভূষণ সেন ৪৫৩
শশিনাথ (সমালোচনা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৯৭২
শিক্ষা-প্রসঙ্গে (মাতৃমঙ্গল)—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ৬৭৭

শিব (মাতৃমঙ্গল)—শ্রীসত্যবালা দেবী … ৮২
শুভ বিবাহ (গল্প)—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল … ৫৪৬
শেষ সাধ (গল্প)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি ২০৫
শোক-সংবাদ ১৬০, ৩২০, ৬৩৭, ৭৯৬, ৯৫৬
শ্রীমন্তের প্রতি সুশীলা (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ … ৭২২
৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কবিতা)—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ৩০৬
সত্যেন্দ্র-স্মৃতি—শ্রীঅমলচন্দ্র হোম .. ৪৩৬
সন্তরণ-প্রতিযোগিতা ৯৫০
সমর্পণ (কবিতা)—শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮৮
সম্পাদকের বৈঠক ৩১৭, ৯৩৪
সাইকেলে কলিকাতা হইতে কাশী ৯৫১
"সাজাহানে"র গান (স্বরলিপি) শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা ১০৩,৪৫০,৯৩০
সাময়িকী—সম্পাদক … ১৩৪, ৯৫৭
সাহিত্য-সংবাদ ১৬০, ৩২০, ৪৮০, ৬৪০, ৮০০, ৯৬০
সীবনাঞ্জলি (শিল্প)—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় … ৬৬৬
সুখ-দুঃখ (গল্প)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি … ৭৩৩
সুখ-পাখী (কবিতা)—শ্রীনিশিকান্ত সেন … ৩৬৯
সুমেধা (গল্প)—শ্রীরমলা বসু … ২৩১
সেকাল (গল্প)—শ্রীদেববালা দেবী … ৮৮
স্মরণে (কবিতা)—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ … ৩৮৬
স্বাগত (কবিতা)—শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় … ৬০৮
হাম-দরদী (গল্প)—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি-এ … ৬৩৪
হার-জিত (গল্প)—শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ১০১
হুকুম রদ (কবিতা)—শ্রীকমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ … ৫৫০

চিত্র-সূচি

আষাঢ়—১৩২৯

আজাম শাহের মুদ্রা .. ২২
আজাম শাহের মুদ্রা … ২৪
ভাতুরিয়ার মানচিত্র … ২৫
মহীশূর রাজ-প্রাসাদে প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত চিত্র … ৬৫
জগন্মোহন প্রাসাদ হইতে চরমণ্ডী পাহাড়ের দৃশ্য ৬৭
বাঙ্গালোর—লালবাগ ৬৯
মহীশূর নগর সান্নিধ্যে প্রস্তরময় পবিত্র বৃষ-মূর্ত্তি … ৬১
বাঙ্গালোর—ইউনাইটেড সার্ব্বিস ক্লাব ৭০
রান্নাঘরে কল চৌবাচ্চা … ১২১
হাতা বেড়ীর আলনা ১২১
তেতলায় কয়লা তোলা … ১২১
উনানের তেলকালি তোলা … ১২২
চুলো সাফ করা ১২২
গরম জলে ঘটি-বাটি ধোয়া ১২২
হ্যাতা রাখা … ১২২
হাঁড়ি-কুঁড়ির শিকে … ১২২
বাসন ধোয়া কল .. ১২২
গরম জিনিস জুড়োনা … ১২৩
বিলিতি বেড়ী … ১২৩
কাঠের জ্বালে রান্না … ১২৩
ভাজা ভাজবার কায়দা … ১২৩
কেরোসিনের চুলো … ১২৪
রাঁধুনীর চৌকি ১২৪
ময়দা মাখা কল … ১২৪
আলু ছাড়ানো কল … ১২৪
নেবু নিংড়ানো চিম্টে … ১২৫
কয়লার উনান … ১২৫
গাড়ীতে আগুন পোয়ানো … ১২৫
ছাই ঝাড়া … ১২৫
গ্যাসের উনান … ১২৬
জঞ্জাল ফেলা .. ১২৬
বাজারের ঝুড়ি … ১২৬
নিতাত কেট্‌লি .. ১২৬
রুটি ভাজা … ১১৭
ইলেকট্রিক উনান … ১২৭
জঞ্জাল তোলা … ১২৭
মাখন তোলা … ১২৮
রুটি ভাজা . ৮২১
সেলাইয়ের কল … ১২৯
কাপড় কাচা কল … ১২৯
কাপড় থুপে নেওয়া … ১২৯
কাপড় ধোয়া … ১২৯
কাপড় ইস্ত্রি করা … ১৩০
লেস ইস্ত্রি করা ১৩০
কলার ইস্ত্রি করা ১৩০
ইলেকট্রিক ইস্ত্রি ১৩১
ছেলে নেওয়া ধামা … ১৩১
বিদেশে নে যাবার কাচা-কল … ১৩১
ছেলে রাখা বগ্‌লী … ১৩২
ছেলেদের গাড়ী বিছানা … ১৩২
ইস্ত্রি করা কল … ১৩২
গাড়ীর দোলনা … ১৩২
ঝুল ঝাড়া … ১৩৩
ছেলে ঘুম পাড়ানো বাজনা … ১৩৩
৺রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর সি-আই-ই … ১৬০

পৃষ্ঠাব্যাপী একবর্ণ চিত্র

নীরব সন্ধ্যা … ১৪৬
বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার পার্শ্বচরগণ … ১৪৭
বিজাপুর … ১৪৮
'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধার বনে' … ১৪৯
উপল কাহিনী … ১৫০

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ... ১৫১

পৃষ্ঠাব্যাপী দ্বিবর্ণ চিত্র

স্নেহের বোঝা ১৪৫
ঘুমন্ত সৌন্দর্য্য ... ১৫২

বহুবর্ণ চিত্র

১। কাল ও ক্ষণ ২। সমস্যা

শ্রাবণ—১৩২৯

ষ্টুয়ার্ট সাউণ্ডে 'মহারাজা' জাহাজ ... ১৯৩
কালু দ্বীপের দৃশ্য ... ১৯৩
কালু'র মাচান-গৃহ ... ১৯৪
কালু'র আবাস-গৃহাবলী ... ১৯৪
পাহাড় হইতে কালু'র দৃশ্য ... ১৯৫
অষ্টিন সাগরশাখাস্থ এগ দ্বীপ ১৯৫
আভেস দ্বীপ ১৯৬
অষ্টিন সাগর-শাখার মোটর-বোট .. ১৯৬
বেস ক্যাম্পের দৃশ্য ... ১৯৭
বেস ক্যাম্পের ট্রাম লাইন ... ১৯৭
কুলীদিগের কুটীর ১৯৮
বনের মধ্যে কুলীনিবাস .. ১৯৮
বনের মধ্যে আশ্রয়স্থল ... ১৯৯
পানীয় জলের বাঁধ ... ১৯৯
কার্য্যে নিযুক্ত হাতী ... ২০০
ডিপোয় হাতী ... ২০০
কালু'র কাঠের ডিপো ... ২০১
ক্যাম্পের ডিপো ... ২০১
বনের মধ্যে ক্ষুদ্র নদী ... ২০২
স্রোতের অভিমুখে হাতী ... ২০২
জলস্রোতে হাতী ... ২০৩
কাঠ বোঝাই .. ২০৩
কালু'তে মাল খালাস ও রপ্তানী ... ২০৪
হাতী চালান ... ২০৪
জোয়ারের সময় মানগ্রেভের দৃশ্য .. ২০৫
মানগ্রেভে ট্রাম লাইন ২ ৫
সাউণ্ড দ্বীপের উপকূল ও জেটি (পশ্চিম দিক) ... ২০৬
সাউণ্ড দ্বীপের উপকূল ও জেটি (পূর্ব্ব দিক) ... ২০৬
সমুদ্রতীরে কুলীকুটীর ও ক্রীড়াস্থান ... ২০৭
জঙ্গলীদের মাছ ধরা ... ২০৭
বনের মধ্যে আন্দামানীদের গৃহ ... ২০৭
আন্দামানবাসী ... ২০৮
আন্দামানী নৌকায় আগমন ... ২০৮
সমুদ্রতীরে নৌকা উত্তোলন ... ২০৯
টুঙ্গলীদিগের নৌ-চালনা ... ২০৯
পরলোকগত উইলিয়াম আর্ভিন ... ১৪৩
ঘর-ধোয়া ব্রুশ ... ২৫২
আর্শি-মোছা কল ... ২৫২
কাপড় নিংড়ানো ... ২৫৩
ঘর-ধোয়া ঝাঁটা ... ২৫৩
ঘর-মোছা কল ... ২৫৩
জুতো পালিশ ... ২৫৩
জুতো ব্রুশ ... ২৫৪
ঘড়ির আলমারি ... ২৫৪
টেলিফোঁর ওঠা-নামা ২৫৪
ইলেকট্রিক নখকাটা কল ২৫৫
চুলবাঁধা আয়না ২৫৫
টুপিতে ডিম সিদ্ধ করা ... ২৫৫
কাপড় শুকানো কল ... ২৫৫
হিসেব রাখা কল .. ২৫৬
হাতে নখ কাটা ... ২৫৬
মাছের আঁশ ছাড়ানো ... ২৫৬
নুন মরীচের ঝাড়া ... ২৫৬
নুন মরীচের ঝাড়া ... ২৫৭
নিধরা হাঁড়ি ... ২৫৭
ছুরিকাঁটা একসঙ্গে .. ২৫৭
কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী ইথাকা জলপ্রপাত ... ২৬৭
কেয়ুগা হ্রদ ও রেণুটক পার্ক ... ২৬৮
ইথাকা হাইস্কুল ... ২৬৮
ইথাকার প্রাচীনতম গির্জ্জা ... ২৬৯
ম্যাক্‌গ্র হল—কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় ... ২৭০
বসন্তে সেন্ট্রাল এভিনিউ – কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় ... ২৭০
কেয়ুগা হ্রদ ... ২৭১
কাস্কাডিল হ্রদের উপরিস্থ সেতু ... ২৭২
রেণুটক পার্ক—কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় ... ২৭৩

দ্বিবর্ণ-চিত্র

চিন্তা ... ২৮৯
কর্ব্বাইন্‌স্‌ কোভ আন্দামান ... ২৯০
বিরহ-বিধুরা ... ২৯৫
লেডি অফ্‌ শালট্‌ (প্রিয়তমের উদ্দেশে) ২৯৬
চুম্বন-মদিরা ... ২৯১
পাষাণ ঘেরা সাগর-তীর ... ২৯২
মৃত্যুবাসরে রোমিও ও জুলিয়েট ... ২৯৩
নৃত্যশীল গণেশ মূর্ত্তি ২৯৪
৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত .. ৩০৬
৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ... ৩২০

বহুবর্ণ চিত্র

১। বন্দিনী বাসন্তী ২। মহাশ্বেতা

ভাদ্র ১৩২৯

কালু জেটি ... ৩৪৭
জঙ্গলী বালকগণের নৃত্য-শিক্ষা ... ৩৪৮
জঙ্গলীদের নৃত্যের পূর্ব্বে মাটী মাখা ... ৩৪৯
অর্কিড দ্বীপে ওলাউঠা রোগী-নিবাস ... ৩৫০
টুঙ্গলী রমণী ... ৩৫১
টুঙ্গলী নৃত্য ... ৩৫১
কার্লিউ হাসপাতাল ও পোষ্ট আফিস ... ৩৫৩
বেস ক্যাম্পের জেটি ৩৫৩
রেলের লাইন পাতা ... ৩৫৪
কার্লিউতে গুদাম নির্ম্মাণ ... ৩৫৪
ফোয়া (ভাসমান) ... ৩৫৫
জঙ্গল পরিষ্কারের পর (বেস ক্যাম্প) ... ৩৬০
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ গুহ ৪০৪
বলুন দেখি, কোন্‌টি সুরেন্দ্রবাবু ? .. ৪১৪
[illegible]

অন্তঃপুরে / হারেমে ... ৪০৬
বাগানে ... ৪০৬
একাকী ... ৪০৭
বলুন ত কে ? ... ৪০৭
সুরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার কন্যাদ্বয় ... ৪০৭
খেলাধুলা ... ৪০৮
সুরেন্দ্রবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করুন ... ৪০৮
একটা মেয়ে ছ'টা ডিম ... ৪১৭
মধুলোভে বঁধু চায় চড়িবারে গাছে ... ৪১৮
ঈপস্উইচের তোরণদ্বার ... ৪২৫
'মার্শেড্ সহরের ফটক ... ৪২৫
রক্ত দারু গাছের গুঁড়ি ৪২৫
ফুলগাছের ঘড়ি ... ৪২৬
ফুলের ছাতা ... ৪২৬
কাপড়ছাড়া ঘর ... ৪২৬
ঘোড়া বা গরুর জলপানের ফোয়ারা ... ৪২৭
অতিথিশালা ... ৪২৭
ট্যাক্সিডাকা কল ... ৪২৭
ছোট পোল ... ৪২৭
আদালত ... ৪২৮
রাজপথে জলস্রোত ... ৪২৮
পথে বিশ্রাম, স্নান ও রন্ধনাদির স্থান ... ৪২৮
পুলিশ কর্ত্তৃক গাড়ীর গতিবিধি নির্দ্দেশ ... ৪২৮
গলির মোড়ে আয়না আঁটা বিপদের নিশান ... ৪২৮
পাখীর বাসা ৪২৯
কোম্পানীর বাগান ... ৪২৯
গাড়ীর গতি নিরূপক বিজ্ঞাপন ... ৪২৯
বাজাখানা ... ৪২৯
ডবল বাঁধ ... ৪২৯
বাজাখানা (ঘেরা) ... ৪৩০
চড়ক-প্রদীপ ... ৪৩০
হাসপাতাল ... ৪৩০
স্নানের ঘেরা টোপ ... ৪৩১
ময়লাফেলা আধার ... ৪৩১
বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসব-ঘর ... ৪৩১
ইস্কুল ... ৪৩১
রাজপথে বাহারি আলো ... ৪৩২
পথশ্রান্তদের বসিবার আসন ... ৪৩২
বড় রাস্তার চৌমাথায় বসিয়া রাত্রে বই পড়া ... ৪৩২
থিয়েটার ... ৪৩৩
দূর ও দিক্ নির্দ্দেশক চিহ্ন ... ৪৩৩
সহরের বহির্দ্বারে পুলিশের ঘাঁটি ... ৪৩৩
আড্ডাবাড়ী ... ৪৩৩
হোটেল ... ৪৩৪
ভাড়াগাড়ী ও মোটর দাঁড়াবার স্থান ... ৪৩৪
কলের সাহায্যে গাড়ীর গতিবিধি নির্দ্দেশ . ৪৩৪
রাস্তায় জল দেবার মুখনল ... ৪৩৪
অগ্নি-সেনা আহ্বান করিবার বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ... ৪৩৪
শতবার্ষিক স্মৃতিস্তম্ভ .. ৪৩৫
রাস্তার নূতন রকমের বাহারি আলো ... ৪৩৫
রাস্তার নূতন রকমের বাহারি আলো ... ৪৩৫
উদ্বেগ এবং আশঙ্কা ... ৪৪৮
বারাণসী হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয় ... ৪৪৫
পল্লীবালা ... ৪৪৫
প্রসাধন ... ৪৪৫
কলেজ স্কোয়ার সন্তরণ-সমিতি ... ৪৪৯

দ্বিবর্ণ চিত্র

দুঃখিনীর সম্বল ৪৪১ ভরা-ভাদ্র ৪৪৭

বহুবর্ণ চিত্র ।

১। শ্রী ও সীতারাম ২। শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা।

আশ্বিন—১৩২৯

রস দ্বীপ—এবার্ডিন হইতে সাধারণ দৃশ্য ... ৫০৩
সাম্পানে মৃতদেহ – দূর হইতে ... ৫০৪
সাম্পানে মৃতদেহ – নিকটে ... ৫০৪
রস দ্বীপের গির্জ্জা ... ৫০৫
চ্যাটাম ও হ্যাডোর মধ্যবর্ত্তী সেতু ... ৫০৫
ফেরী ষ্টীমার ডোরিস ... ৫০৬
রস দ্বীপের বাজার ও রাস্তা ... ৫০৬
সেলুলার জেলের প্রধান ফটক ... ৫০৭
রস দ্বীপ হইতে দ্বীপের সাধারণ দৃশ্য ... ৫০৭
এবার্ডিনের বাজার ... ৫০৮
গোরস্থান – এবার্ডিন ... ৫০৮
ফিনিক্স উপসাগর – কারখানা ... ৫০৯
কারখানা – ফিনিক্স বে ... ৫০৯
ডক – ফিনিক্স বে ... ৫১০
ফিনিক্স বে ... ৫১০
বেম্ ফ্লাট – একটী রাজপথ .. ৫১১
কয়েদীরা ট্রোলি চালাইতে উদ্যত ... ৫১১
ট্রোলি ... ৫১২
ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মজুমদার ... ৫১২
রিক্সা-চালক কয়েদী ... ৫১৩
কয়েদীরা পাথর ভাঙ্গিতেছে ... ৫১৩
রাস্তা মেরামতে নিযুক্ত কয়েদী ... ৫১৪
কুলী-কয়েদী ... ৫১৪
ডাক্তারের বাঙ্গলো ... ৫১৫
কার্ব্বাইন কোভ ... ৫১৫
কার্ব্বাইন কোভ ... ৫১৬
সেলুলার জেল ... ৫১৬
কার্নিউ দ্বীপে শান্তি-উৎসব ... ৫১৭
কেরোসিন সিঞ্চনে পেনামা ম্যালেরিয়া-মুক্ত ... ৫৬৫
ম্যালেরিয়া-বাহিনী মশক দেওয়ালে বসিয়াছে ... ৫৬৮
তিব্বতের মানচিত্র ... ৫৭০
দালাই লামার মোহরাঙ্কিত তিব্বত প্রদেশের ছাড়পত্র ... ৫৭১
ক্ষেমের শাসনকর্ত্তা, তাঁহার পত্নী ও নকিব ... ৫৭২
নাট্যাভিনয় ... ৫৭২
বাতাঙের প্রধান পুরোহিত ও তদীয় অনুচরবর্গ ... ৫৭২
বাতাঙ সহরের পথ ... ৫৭২
গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য ... ৫৭৩
জালার শাসনকর্ত্তার কন্যা ও জামাতা ... ৫৭৩
'গার্টক' মঠ ও লামাশারী ... ৫৭৪
শ্রোতৃবৃন্দ ... ৫৭৫

ইয়ঙ্কৌন'এর নুনের কারখানার অসংখ্য মাচা ... ৫৭৫
তিব্বতের পার্ব্বত্য গ্রাম ... ৫৭৫
যাযাবর দলের আস্তানা ... ৫৭৬
পথের ধারে জড় করা মন্ত্রখোদিত প্রস্তর খণ্ড ... ৫৭৭
মন্ত্রাঙ্কিত পতাকা-পরিবেষ্টিত সাধুর সমাধিভূমি ... ৫৭৭
বৌদ্ধ চৈত্য ... ৫৭৮
মেকং নদীর উপরি কাঠের বাঁধা তিব্বতী সেতু ... ৫৭৮
বাতাঙের বৃহত্তম প্রস্তর-স্তূপ ... ৫৭৮
বিবাহ-সভা ... ৫৭৯
ধান মাড়াই ... ৫৭৯
শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীরা ... ৫৭৯
মন্ত্রাঙ্কিত পতাকাবলী ... ৫৮০
শত্রুনিপাত কটাহ ... ৫৮০
সিদ্ধ কবচ ... ৫৮১
মৈত্রেয় মূর্ত্তি ... ৫৮১
অতিকায় চায়ের কেটলি ... ৫৮১
তিব্বতীয় অভিবাদন (মাথায় হাত দিয়া) ... ৫৮২
তিব্বতীয় অভিবাদন (জিভ বাহির করিয়া) ... ৫৮২
দেবগিরি ... ৫৮২
প্রাচীর তীর্থ ... ৫৮৩
শবযাত্রী ... ৫৮৪
কালচক্র ... ৫৮৪
পর্ব্বত-পূজা ... ৫৮৪
পশ্চিম তিব্বতের মহিলা ... ৫৮৫
বহুরূপী গাছের পাতা ... ৫৮৯
বহুরূপী গাছ ... ৫৮৯
শোকাশ্রু ... ৫৯৫
পল্লী-পথে ... ৫৯৬
জলকে চল্ ... ৫৯৭
পল্লী-ঘাটে ... ৫৯৮
ব্যাঘ্রাচার্য্য ... ৬০৯
কাণ্ডারু ... ৬০৯
Dr. W. C. Dassero L. M. B. S. (America) ... ৬১০
R. D. Bosa, K. C. B. ... ৬১১
ব্রাদার তমসুক ভূষণ জোয়াদ্দার F. T. S. ... ৬১২
শ্রীমৎ চতুরানন্দ স্বামী ... ৬১৩
মির্জ্জা বাবুল হোসেন, মালিক-ই-ফটক্ ... ৬১৪
বিবাহিতের সাক্কার ল্যাজুড় ... ৬১৫
মতিলাল ঘোষ ... ৬৩৭
বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ... ৬৩৭

দ্বিবর্ণ চিত্র

বিষাদিনী ৫৯৩ আলো ও ছায়া ৫৯৯

বহুবর্ণ চিত্র

১। "নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে— সাজিয়ে এনেছি ডালা"
২। সন্ধিক্ষণ—দিবা ও রাত্রি
৩। বিদায়-বিহ্বলা

কার্ত্তিক—১৩২৯

কৃষি-শিক্ষাগার—ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ... ৬৭৫
ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ... ৬৭৬
প্রবেশ-পথ ও প্রাঙ্গণ—ওহাও বিশ্ববিদ্যালয় ... ৬৭৭
ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙ্গালয় ... ৬৭৭
প্রবেশ দ্বার—ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ... ৬৭৮
ওহাও বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিস ঘর ... ৬৭৮
ব্যায়াম-গৃহ—ওহাও বিশ্ববিদ্যালয় ... ৬৭৯
মূক ও বধির বিদ্যালয় কলম্বাস (ওহাও) ... ৬৭৯
ফুটবল ক্রীড়া—১ ... ৬৮১
ফুটবল ক্রীড়া—২ ... ৬৮১
ফুটবল ক্রীড়া—৩ ... ৬৮১
নৈশবিদ্যালয়—বার্কলি ... ৬৮৩
ছেলেদের খেলিবার মাঠ ... ৬৮৩
আপেল-প্রদর্শনী—ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ... ৬৮৪
তিব্বতের শ্রীশ্রীদালাইলামা ... ৭৩৯
মৃতের সংকার ... ৭৪০
নরকপালমালা ... ৭৪০
চিত্রিত খুলির পানপাত্র ... ৭৪০
তিব্বতীয় উষ্ণীষ ... ৭৪০
ধূপদান ... ৭৪০
নরকপাল-নির্ম্মিত ডমরু ... ৭৪১
নারীর নিত্যব্যবহার্য্য অলঙ্কার ... ৭৪১
পাহাড়ের পথে ... ৭৪১
পর্ব্বত-মূলে রচিত প্রস্তর-স্তূপ ... ৭৪১
দার্জের শাসনকর্ত্তা, তাঁর পত্নীদ্বয় ও অন্যান্য পরিবার ... ৭৪২
ভারবাহী চমরীদল ... ৭৪২
'লিটাং' লামাশারীর গ্রন্থাগার ... ৭৪২
মধ্য-তিব্বতের মহিলা ... ৭৪৩
লামাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য ঘণ্টা ও বজ্রপাশ ... ৭৪৪
অশ্বারোহী দস্যুসর্দ্দার ... ৭৪৪
বস্ত্র বায়ুধ্বজা ... ৭৪৪
জপমন্ত্র ও জপমালা হস্তে তিব্বতী সাধু ... ৭৪৫
জাতকের নাটকাভিনয় ... ৭৪৫
বাতাঙের চালা বাঁধা শস্যক্ষেত্র ... ৭৪৫
অশীতিপর বৃদ্ধ তিব্বতী ... ৭৪৬
সুসজ্জিতা সম্ভ্রান্ত তিব্বতী মহিলা ... ৭৪৬
তিব্বতী গৃহ ... ৭৪৬
দস্যুদল ... ৭৪৭
ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা ... ৭৪৭
ক্ষিতি-মরুতোৎসব ... ৭৪৮
ভৌতিক নৃত্য ... ৭৪৮
শব-সংকার বেদী ... ৭৪৯
প্রলয়ঙ্করের প্রতিকৃতি ... ৭৪৯
মুখোস-পরিহিত রহস্যময় অভিনয় ... ৭৫০
ডাঃ শেল্টন ... ৭৫১
নর-অস্থি-নির্ম্মিত ভেরী ... ৭৫১
মন্ত্রাঙ্কিত পতাকা ... ৭৫১
ওঁ মণিপদ্মে হুঁ ... ৭৫২
হরপার্ব্বতী ... ৭৬৩
প্লাবিত পল্লী ... ৭৬৪
পথ-প্রান্ত ... ৭৬৫
বর্ষার পথ ... ৭৬৬
'হুমমুখী' ঢেঁকি ... ৭৭৭
ঢেঁকির সম্মুখ ভাগ ... ৭৭৮
ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী পরিবার—মধ্যে মিঃ মার্টিনি ... ৭৭৯
মিঃ মার্টিনির নিজ হস্তাক্ষর ... ৭৮১

শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস ... ৭৮২
বাঁকুড়া প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বার ... ৭৮৩
বাঁকুড়া প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বার (স্বাস্থ্য-বিভাগ) ... ৭৮৩
বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে অনুরোধ করিতেছেন ৭৮৪
বাঁকুড়া প্রদর্শনীতে সমবায়ের শক্তি বুঝাইবার চিত্র ৭৮৫
ফরিদপুর ...শিল্প মৃতপ্রায় হইয়াছে ... ৭৮৫
ফরিদপুর-প্রদর্শনীতে কলের লাঙ্গল ... ৭৮৬
ফরিদপুর-প্রদর্শনীতে...বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ... ৭৮৭

দ্বিবর্ণ চিত্র

আনমন। ৭৬১ বাঙালী ক্লাব—করাচী ৭৬৭

বহুবর্ণ চিত্র

১। চাতক ২। মন্দির-সোপানে

অগ্রহায়ণ—১৩২৯

ষড়যন্ত্র ! ... ৮৭২
গা ভিজ্‌লো না ! ... ৮৭৩
মাণিক জোড় ! ... ৮৭৩
কোথায় পেলে ? ... ৮৭৩
নিকামা দোস্ত ! ... ৮৭৪
ক্ষেপ লো না কি ? ... ৮৭৪
যে কথা পুরাণে নেই ! ... ৮৭৪
তৃষ্ণার্ত্ত ! ... ৮৭৪
ফরাসী ডাক টিকিট ! ... ৮৭৫
খোকাদের বায়না ! ... ৮৭৫
নিছক সহানুভূতি ! ... ৮৭৫
কথার খেলাপ ! ... ৮৭৬
শাসন-চক্র ! ... ৮৭৬
দেবীর সন্তোষ ! ... ৮৭৭
জাগরণ ... ৮৭৭
একহাত খেলা ... ৮৭৭
জয় হোক বাবা, কিছু ভিক্ষে দাও ! ... ৮৭৭
ছদ্মবেশ বদলাও ! ... ৮৭৮
আমদানীর বিপদ ! ... ৮৭৮
শিখণ্ডী ! ... ৮৭৮
চাবুকের মাহাত্ম্য ... ৮৭৮
প্রলোভন ! ... ৮৭৯
নিষ্ঠুর সত্য ! ... ৮৭৯
শান্তির বধ ! ... ৮৭৯
রিফর্ম্ম ! ... ৮৮০
আমাদের কি লাভ ! ... ৮৮০
ত্যাগের উপদেশ ! ... ৮৮১
বগুড়া সান্তাহার রেলপথে আদমদীঘি ও নসরতপুরের মধ্যে তিনপোয়া মাইল পথ জলমগ্ন ... ৯২১
আদমদীঘির পশ্চিমদিকে একমাইল ভগ্ন রেল পথ ... ৯২২
বগুড়া-জেলার কুসুম্বি গ্রামে ধ্বংস-লীলা ... ৯২২
বগুড়া চৈউনপারে ধ্বংস-লীলা ... ৯২৩
বগুড়া তালদোপা গ্রামে ধ্বংসের চিত্র ... ৯২৩
নসরতপুরে ব্রাহ্মণ জমিদারের গৃহের ভগ্নদশা ... ৯২৪
একজন জমিদারের গৃহ ভূমিসাৎ ...
গৃহপালিত পশুগণের মৃতদেহ শকুনী ভক্ষণ করিতেছে ... ৯২৫
ভালোরা গ্রামবাসীদের অস্থায়ী বাসস্থান ... ৯২৫
চৈতন গ্রামের সাহায্য-প্রার্থিনী অধিবাসিনীগণ ... ৯২৬
নসরতপুরের অধিবাসীরা সাহায্য লইতে আসিয়াছে ... ৯২৬
অনশনক্লিষ্ট গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণ ও বস্ত্রহীন শিশুগণ ... ৯২৭
বেঙ্গল রিলিফ কমিটির স্বেচ্ছাকর্ম্মিগণ সান্তাহারে বস্ত্র বিতরণ করিতেছে ... ৯২৭
একখানি রেলগাড়ী বেঙ্গল রিলিফ কমিটির মেডিক্যাল ক্যাম্পে পরিণত হইয়াছে ... ৯২৮
বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির স্বেচ্ছাকর্ম্মী চিকিৎসকগণ ... ৯২৮
বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি—সান্তাহার ... ৯২৯
লীজ্ যাগু ... ৯৩৭
থাবুনা ... ৯৩৭
...গ্রের তরুণী রূপসী ... ৯৩৭
নৃত্য-স্বয়ম্বর ... ৯৩৭
পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকগণের নৃত্যোপাসনা ... ৯৩৮
শিশুদের ধর্ম্ম-শিক্ষা ... ৯৩৮
হাব্‌সি তাঁতি ... ৯৩৮
বীর-প্রসবিনী হাড়ার রমণী ... ৯৩৯
চারণ কবির দল ... ৯৩৯
সামান্ত লোক ... ৯৪০
ঢেঁকি কোটা ... ৯৪০
রাজ-প্রাসাদে বিরাট ভোজ-উৎসব ... ৯৪১
হাব্‌সিদের পোষাক ... ৯৪১
হাব্‌সির পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকগণ ... ৯৪২
হাব্‌সিদের গীর্জ্জা বা উপাসনা-মন্দির ... ৯৪২
জোদীতু ... ৯৪৩
হাব্‌সি রমণী ... ৯৪৪
আসামী ও ফরিয়াদী ... ৯৪৪
গাল্লা-রমণী ... ৯৪৪
ক্রুশোৎসব ... ৯৪৫
গোপনে আহার ... ৯৪৫
ছেলের গলায় মাদুলী ... ৯৪৫
খৃষ্টীয় বারুণী উৎসব ... ৯৪৫
হাব্‌সী নরনারীর জনতা ... ৯৪৬
হাব্‌সী ক্রীতদাসী ... ৯৪৬
ফুজাইউজী রমণী ... ৯৪৬
হাব্‌সী নিগ্রোর দল ... ৯৪৬
হাব্‌সী সৈনিক ... ৯৪৭
দীক্ষা উৎসব ... ৯৪৭
একজন সামান্ত হাব্‌সী সর্দ্দার ... ৯৪৭
কেশরী বিক্রম ... ৯৪৮
সিংহজয়ী-পুরুষ-বিনাশী বীর ... ৯৪৮
আবিসিনিয়ার মানচিত্র ... ৯৪৯
শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ... ৯৫০
সাইকেল-আরোহীবৃন্দ ... ৯৫১
৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ... ৯৫৩
৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ... ৯৫৩

বহুবর্ণ চিত্র

১। ...ওমর খৈয়াম ২। কৈশোর ...

কাল ও ক্ষণ

শিল্পী — শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

Bharatvarsha Ptg. Works.

Blocks by Bharatvarsha Halftone Works.

ভারতবর্ষ

আষাঢ়, ১৩২৯

প্রথম খণ্ড] দশম বর্ষ [প্রথম সংখ্যা

আওরংজীবের সাতারা-অবরোধ *

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ, পি-আর-এস্, আই-ই-এস্]

সম্রাট্ আওরংজীবের জীবনের শেষ আট বৎসর মহা-[রাষ্ট্রে]র দুর্গ অবরোধ করিতে কাটিয়া যায়। এ কাজের অন্ত [হই]ল না, ফললাভ হয় নাই; এত সময় অর্থ ও সৈন্যগণের [জী]বন ব্যয় করিয়া শেষে কিছুই হাতে আসিল না, শুধু [বা]দশাহ্ নিজ জীবন নষ্ট করিলেন, মুঘল-সৈন্য ক্লান্ত ভীত [হ্রা]সপ্রাপ্ত হইল, রাজকোষ শূন্য, সাম্রাজ্য চূর্ণ হইল।

এই সব দুর্গ-অবরোধই এই আট বৎসরের বাদ্শাহী-[দর]বারের ইতিহাস; আর সব অবরোধগুলির কাহিনী প্রায় [এক] প্রকার। ইহার মধ্যে যে-কোন একটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে, অপরগুলির ইতিহাস পড়া আবশ্যক হয় না।

সাতারা-অবরোধে আওরংজীবের সাড়ে চারিমাস কাল, বা ঠিক ১৩৪ দিন, (৮ ডিসেম্বর ১৬৯৯ হইতে ২১ এপ্রিল ১৭০০ পর্য্যন্ত) লাগিয়াছিল। এই কয়মাসের দরবারের দৈনিক সংবাদপূর্ণ-পত্র ("আখবারাৎ-ই-দরবার-ই-মুয়ালা"*)

---

* গত জানুয়ারীতে দিল্লীতে রেকর্ড কমিসনের অধিবেশনে পঠিত। ইহাতে গড়খাই শব্দ trench অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে,—দুর্গ-পরিখা অর্থে নহে।

গোলা ছোঁড়া হয়; কিন্তু তাতে দুইজন মজুরের মৃত্যু ছাড়া মুঘলদের আর কোন ক্ষতি হয় নাই। মুঘলেরা এই উঁচু যায়গার উপর 'কড়ক্ বিজ্‌লী' * নামে একটা বড় কামান বসাইয়া সাতারা-দুর্গের বুরুজের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল; হাউই ছুঁড়িয়া দুর্গে ফেলিতে লাগিল। কিন্তু বাদশাহী গোলন্দাজদের লক্ষ্য ঠিক ছিল না; তাই কামান হইতে উদ্গীর্ণ পাথরের গোলা অনেকবার লক্ষ্যস্থলে না পড়িয়া, কুমার আজম্ শাহ্‌র শয়নের তাঁবুর নিকট পড়িয়াছিল! সম্রাট্ দেখিলেন কুমারের নিরাপদের জন্য কামানটা স্থানান্তরে সরান প্রয়োজন; কিন্তু কামান বসাইবার জন্য উঁচু যায়গা না পাওয়ায় হুকুম দিলেন, যেন অধিকতর সাবধানে কামান দাগা হয়! (২৯শে জানুয়ারী)। দুইদিন পরে কুমার আজমের শিবির-সীমার মধ্যে দুর্গ হইতে নিক্ষিপ্ত আ-ফাটা একটা বোমা পাওয়া গেল; সম্রাট্ ইহা পরীক্ষা করিয়া নিজ গোলন্দাজ-বিভাগকে ঠিক এই ধরণের বোমা তৈয়ার করিতে বলিলেন।

কিন্তু চারিদিক ভালরূপে অবরুদ্ধ না হওয়ায়, শত্রুরা দুর্গে যাতায়াত করিতে পারিত। পড়লীর দিকে, অর্থাৎ পশ্চিম দিকটায়, তেমন কড়া পাহারা ছিল না; তাই কুমার আজমের সতর্কতার উপর সম্রাটের সন্দেহ জন্মিল। বাহির হইতে নূতন সৈন্য ও খাদ্য দুর্গমধ্যে ঢুকিতেছে, কুমার নিশ্চয়ই এসব দেখিয়াও দেখিতেছেন না, এরূপ কথা উঠিল। এদিক্‌টা আরও সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবার জন্য পড়লীর নিকট এক থানা বসিল; থানার চারিধার গাছের ডালপালা, কাঁটাগাছ দিয়া বেড়া (খার্‌-বন্দী) দিয়া ঘেরা হইল (১৩ই ডিসেম্বর)। ৬ই জানুয়ারী সম্রাট্ শুনিলেন, শত্রুরা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া, রুহুল্লা খাঁর গড়খাই অতিক্রম করিয়া, কুমার আজমের শিবিরের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রের এক ঝরণা হইতে দুর্গমধ্যে জল লইয়া যায়। তাঁহার আদেশে ১৩ই তারিখে কুমারের একদল সেনা সেই ঝরণাটা আটক করিল।

অবরুদ্ধ শত্রু-সৈন্যেরা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া প্রায়ই মুঘলদের অতর্কিত আক্রমণ করিত। ১১ই ডিসেম্বর তাহারা মুমিন্ খাঁর গড়খাই-এর উপর আসিয়া পড়িল। কিন্তু মুমিন্ খাঁ সজাগ সতর্ক ছিলেন;—তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। পাঁচ দিন পরে মধ্যরাত্রে শত্রুরা এই স্থানটা পুনরায় আক্রমণ করিল। মুমিন্ খাঁ, সম্ভাজী দাফ্‌লের পুত্র ও অন্যান্য সকলে কাষ্ঠ-প্রাচীরের (কাঠগড়ার) নিকট দাঁড়াইয়া, বিশেষ বিক্রমের সহিত একঘণ্টা যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের অনেক লোকক্ষয় হয়; যাহারা প্রাণে বাঁচিল, তাহারা রাত্রের অন্ধকারে সরিয়া পড়িল। মুঘলপক্ষে মুমিন্ খাঁ শত্রুনিক্ষিপ্ত একখানা পাথরে আঘাত পাইয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গীদের অনেকেও আহত হইয়াছিল। *

মারাঠারা বিপুল আয়োজনে মুঘলদের উপর ১লা এপ্রিল চড়াও করিবার মতলব আঁটিল। রাত্রে একদল শত্রুসৈন্য পড়লী হইতে সাতারা-দুর্গের সৈন্যগণকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে আসিতেছিল; কিন্তু রুহুল্লা ও ফৎহ্-উল্লা মধ্যপথে বাধা দেওয়ায়, তাহারা অনেক লোকজন ক্ষয় করিয়া পলায়ন করে। পরদিন বেলা দুইটার সময় ৩০০ শত্রুসৈন্য সাতারা হইতে বাহির হইয়া বিশেষ বিক্রমের সহিত ফৎহ্-উল্লার গড়খাই-এর উপর পতিত হয়, এবং দু'একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত কাজ্‌ওয়া † ভাঙ্গিয়া ফেলে। কিন্তু অবশেষে পলাইয়া আত্ম-রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। খাঁ শত্রুনিক্ষিপ্ত একখানা পাথরে আহত হইয়াছিলেন। শত্রুপক্ষের পাঁচজন মরিয়াছিল।

কিন্তু দুর্গের বাহিরের মারাঠা-সৈন্যদল (Field armies) মুঘলদের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছিল; প্রকৃতপক্ষে তাহারা সম্রাট্-শিবির ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছিল। বিনা

---

* আমার পুঁথিতে ভ্রমক্রমে 'কড়ক আলি' লেখা আছে।

* ১৭ই ডিসেম্বর তক্ত রওয়াঁয় (খোলা পালকীর মত সিংহাসনে) বসিয়া সম্রাট্ তরবিয়ৎ খাঁর, গড়খাই-এর পিছনে তাঁহার জন্য পাতা, তাঁবুর দিকে গেলেন। তাঁবুতে না ঢুকিয়া তিনি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের তলদেশে নামিয়া, দূরবীণের সাহায্যে সাতারা-দুর্গ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শত্রুরা গোলা ছুঁড়িল। গোলা তাঁহার আশপাশে আসিয়া পড়িতে লাগিল—পুত্র আজম্ হটিয়া আসিবার জন্য জিদ করিলেন—তথাপি আওরংজীব্ অবিচলচিত্তে সেখানে ঘণ্টাখানেক দাঁড়াইয়া রহিলেন। শিবিরাবাসে যখন ফিরিলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর।

† কাজ্‌ওয়া অর্থাৎ উটের পিঠের হাওদা। এগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত ও চতুষ্কোণ। ইহার চারিদিকে কাঠের আবরণ বা প্রাচীর থাকাতে ইহার মধ্যে লুক্কায়িত সৈন্যের গায়ে শত্রু-পক্ষের তীর ও গুলি লাগিত না। আর, দুইপাশে এই কাজ্‌ওয়া সারি করিয়া দিয়া মধ্য দিয়া নিরাপদে মাটি কাটিয়া গড়খাই (trenches) প্রস্তুত করা হইত।

রক্ষীতে সম্রাট্‌পক্ষের কেহ ঘোড়া-গরুর খাদ্যান্বেষণে বাহির হইতে পারিত না। উচ্চপদস্থ প্রধানেরা পালাক্রমে এই সব আহারান্বেষী-সৈন্যের নেতা হইয়া বাহির হইতেন।

শত্রুর উপদ্রবে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে শস্য বা ঘোড়া-গরুর খাদ্য সরবরাহের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—ইহাই সম্রাট্‌-শিবিরের সর্ব্বপ্রধান বিপদ হইয়াছিল। ব্যবসায়ী শস্য-বাহকদের (বঞ্জারা) গরু, এমন কি সরকারী হাতী-উঠও শিবিরের চৌহদ্দী অতিক্রম করিলেই শত্রুরা সেগুলি হস্তগত করিয়া সরিয়া পড়িত।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তরবিয়ৎ খাঁ দুর্গের ১৩ গজ দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত গড়খাই করাইলেন, এবং তথায়, দুর্গের ঠিক সাম্‌নে, ২৪ গজ উঁচু এক দম্‌দমা (raised battery) গাঁথিয়া তুলিলেন। 'এই কার্য্যে তাঁহার এত কাঠ লাগিয়াছিল যে, সাতারার ৩০।৪০ ক্রোশ পথের মধ্যে কোন গাছ-পালার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।' (মাসির, ৪১৪)। দম্‌দমার চারিদিকে শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র হইতে বাঁচাইতে পারে, এরূপ দেওয়াল গড়িবার জন্য, বাজার হইতে আট হাজার খালি থলে লইয়া, বালি ভরিয়া, সাজান হইল। দম্‌দমা গড়িবার কাঠ বহিয়া আনিবার জন্য ৩০০ গরু নিযুক্ত হইল।

শত্রুরা ইহা ধ্বংস করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে তাহারা ইহার উপর অজস্র পাথর বর্ষণ করিতে লাগিল; ইহার ফলে একজন হত, চারিজন আহত এবং চারিদিকে আবরণ-যুক্ত তিনটি উঠের হাওদা ধ্বংস হইয়া যায়। সম্রাট্‌ হুকুম দিলেন,—'দম্‌দমা বাঁচান চাই। সরকারী তোষাখানা ও পোদ্দারদের শূন্য থলি পাথর-বালিতে ভরিয়া, খাড়া করিয়া দেওয়ালের কাজ চালাও।'

দুর্গমধ্যস্থ শত্রুর অবিরাম পাথর-নিক্ষেপের ফলে তরবিয়ৎ খাঁ দেখিলেন, আর মাটি কাটিয়া অধিক দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব; তিনি তখন দুর্গ-প্রাচীর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার জন্য এক সুড়ঙ্গ-পথ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী বনজঙ্গল হইতে কাঠ আনিতে হইবে; গোলন্দাজ-বিভাগের মুশ্‌রিফ—কুঞ্জমনের উপর এই কার্য্যের ভার পড়িল। রক্ষীর সাহায্যে তিনি দুই হাজার উঠ লইয়া অবিলম্বে বাহির হইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন।

খোঁড়া মাটি ও পাথর দিয়া সুড়ঙ্গের দুপাশে দেওয়াল তুলিয়া, আঁকাবাঁকা পথ নির্ম্মিত হইলে, মাথার উপর মই-এর সিঁড়ির মত, তক্তা বিছান হইল।* 'এই কাঠমঞ্চ তৈয়ার করিতে হাজার উঠের হাওদা, নিকটবর্ত্তী সমতলভূমি হইতে আনীত কাঠ, বস্তা বস্তা সোন (flax), এমন কি টাকায় ৪ গজ দামের সুতার কাপড় লাগান হইয়াছিল।' [মাসির ৪১৫ পৃঃ]। সুড়ঙ্গপথ এরূপভাবে নির্ম্মিত হইল যে, দুর্গ হইতে শত্রু সৈন্য গোলা ছুঁড়িলেও তাহা কাঠমঞ্চ ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ২৪ গজ পাথুরে মাটি কাটিয়া সুড়ঙ্গ দুর্গপাদমূলে পৌঁছান হইল। কিন্তু এই সমস্ত আয়োজন দুর্গ জয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল না। তবে মুঘলদের পক্ষে একটা লাভ হইয়াছিল,—তাহারা দম্‌দমার উপরে কামান তুলিয়া বসাইতে পারিয়াছিল। ইহার ফলে শত্রুরা আর দুর্গপ্রাচীরের উপর হইতে বন্দুক ছুঁড়িতে পারিত না;—দেওয়ালের পিছনে মুখ লুকাইয়া, পাথর ছুঁড়িত। ৩রা এপ্রিল দম্‌দমাকে বাড়াইয়া দুর্গ প্রাকারের সমান উঁচু করা হইল।

মুঘলেরা একবার মই-এর সাহায্যে দুর্গপ্রাচীর লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই। তাহারা 'দুর্গদখলে সিদ্ধহস্ত' দুই হাজার মাব্‌লে পদাতিক-সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিল। সাতারা দুর্গ বলে অধিকার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তিন বৎসরের মাহিনা—এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা—তাহাদের অগ্রিম দেওয়া হইয়াছিল। দুর্গ-আক্রমণের জন্য মই, চামড়ার থলি প্রভৃতি সংগ্রহ করা হইল। ২৩শে জানুয়ারী প্রভাতের একঘণ্টা পূর্ব্বে মাব্‌লেরা দুর্গ-প্রাকারে মই লাগাইয়া ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিল। ঠিক এই সময়ে অন্য একটি দুর্গ হইতে ...শত মারাঠা-পদাতিক-সৈন্য সাতারার সৈন্যগণকে সাহায্য করিবার জন্য আসিতেছিল। সম্রাট্‌-সৈন্যদের দেওয়াল লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া, তাহারা চীৎকার করিয়া দুর্গের সেনাসান্ত্রীদের জাগাইয়া দিল। ব্যর্থকাম মাব্‌লেরা তখন নবাগত মারাঠা-সৈন্যদলকে সবেগে আক্রমণ করিয়া, তাহাদের পাঁচজনকে

* এগুলি দিশী নৌকার পাটাতন, অথবা শব-বহনের বাঁশের মাচার মত। ২৫শে ডিসেম্বরের সংবাদ-পত্রে লেখা আছে:—"সম্রাট্‌ একখানি পাটাতন পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—'ইহাতে কাজ হইবে না। এক হাত চওড়া ও ৫ গজ লম্বা কতকগুলি নূতন পাটাতন প্রস্তুত কর'।"

মারিল—১৪জনকে বন্দী করিল। কিছুদিন পূর্ব্বে একদল মুঘল-সৈন্য চন্দন-বন্দন দুর্গের নিম্নে, রাস্তার পাশে লুকাইয়া থাকিয়া তিনজন শত্রুকে বন্দী করিয়াছিল। তাহাদের, এবং এই রাত্রে ধৃত ১৪জন মারাঠা-সম্বন্ধে সম্রাট্ হুকুম দিলেন,—'সবকয়জন বন্দীকে কৃষ্ণানদীর বক্ষে লইয়া গিয়া কাটিয়া ফেল।' এই বন্দীদের মধ্যে একটি বালক ছিল। কাজীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি জবাব দিলেন, কুরাণের বিধিমতে তাহারও প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। বন্দীরা সকলেই তলোয়ারের মুখে প্রাণ দিল। কেবল বাঁচিয়াছিল চন্দন-বন্দন দুর্গের কিলাদারের পুত্র। পুত্রের প্রাণরক্ষা করিলে দুর্গপতি সম্রাট্-সৈন্যের হাতে দুর্গ ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

হমীদ-উদ্দীন্ খাঁর 'আহ্কাম-ই-আলমগীরী' গ্রন্থে (*Anecdotes of Aurangzib*) ঐ ঘটনারই এইরূপ বিবরণ আছে :—

"সাতারা-অবরোধের সময়, পবিত্র রমজান মাসে, একদল শত্রু হঠাৎ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সম্রাট্ সৈন্য অক্রমণ করে। তাহাদের মধ্যে চারিজন মুসলমান ও ছয়জন হিন্দু বন্দী হয়। সম্রাট্ দরবারের কাজী মুহম্মদ আক্রমকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মুফ্তিগণের সাহায্যে বন্দীদের কিরূপ সাজা হওয়া উচিত, তাঁহা স্থির করিয়া বলিবেন। ধর্ম্মশাস্ত্র উল্টাইয়া কাজী সম্রাট্কে লিখিয়া জানাইলেন যে, বন্দী কাফেরগণ মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহারা মুক্তি পাইতে পারে; আর মুসলমান-বন্দীদের তিন বৎসর কারাবাস হওয়া উচিত।

"এই পত্রের একপাশে শাহান্শাহ্ লিখিলেন,—'হনফি মতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিচার সমীচীন নহে; রাজ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব নষ্ট না হয়, এজন্য এই মোকদ্দমার অন্যরূপ বিচার হওয়া উচিত। আমরা গোঁড়া শীয়া-মতাবলম্বী নই যে, এক গ্রামে একটি মাত্র গাছ, একথা মানিয়া লইব [অর্থাৎ কেবল একটি মাত্র সিদ্ধান্তই আমাদের অবলম্বনীয় হইবে।] খোদাকে ধন্যবাদ! সুন্নীদের চারি মত; তাহার প্রত্যেকটিই সময় কাল অনুযায়ী সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

"সম্রাটের এই মন্তব্য পড়িয়া কাজী ও মুফ্তিগণ নূতন সিদ্ধান্ত করিয়া সম্রাট্কে জানাইলেন,—'ফৎওয়া-ই-আলমগীরী মতে আমরা স্থির করিয়াছি যে, যুদ্ধে বন্দী হিন্দু-মুসলমানদের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, যেন তাহাদের শাস্তি দেখিয়া অন্যান্য শত্রুরা সাবধান হয়।' তখন সম্রাট্ মন্তব্য লিখিলেন,—'আমি ইহাতে সম্মতি দিলাম। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বিদ্রোহীদের বধ করা হউক, তাহাদের ছিন্নমুণ্ড না দেখিয়া আমি রোজা খুলিব না।' মুহরর্‌ম খাঁ, কোতোয়াল সরবরাহ্ খাঁর সাহায্যে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বন্দীদের মস্তক ছিন্ন করিয়া আনিয়া, দরবারে সম্রাটের সাম্‌নে হাজির করিল।"

তরবিয়তের দিক হইতে দুর্গ-আক্রমণ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহার দুর্নাম হইবে। সম্রাট্ হুকুম দিলেন, রুহুল্লা খাঁর নেতৃত্বে দুর্গদ্বারের দিক হইতে অপর একটি গড়খাই করা হউক। একমাস পরিশ্রমের পর সুড়ঙ্গ দুর্গের পাদমূলস্থ মাটির দেওয়াল (রেউনী) স্পর্শ করিল। ইতিমধ্যে তরবিয়ৎ খাঁও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না,—পূর্ব্ব সুনাম লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ শ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্গের পাষাণ-সাজান প্রাচীরে (সং চিন্) একটি গর্ত্ত করিলেন,—গর্ত্ত অবশেষে ৪ গজ×১০ গজ আকার ধারণ করিল। 'দুর্গস্থ শত্রুর এবং সম্রাট্-সৈন্যের মধ্যে শুধু এক গজ প্রশস্ত একটা পাতলা দেওয়াল ব্যবধান ছিল। সম্রাট্-সৈন্য দেওয়ালের গর্ত্তের নিকট সজাগ সতর্ক অবস্থায় রহিল। কিন্তু কোন পক্ষই আড়ালের ব্যবধান অতিক্রম করিতে সাহস করিল না। শেষে মুঘলেরা সাব্যস্ত করিল যে, গর্ত্তে বারুদ ভরিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া, দেওয়ালের খানিকটা উড়াইয়া দিবে, আর হুড়মুড় করিয়া দুর্গের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে। [মাসির, ৪১৬ পৃঃ]

সুড়ঙ্গের অগ্রভাগে যেখানে উহা দুর্গ স্পর্শ করিয়াছে, সেখানে, একটি বারুদ-ঘর (mine) প্রস্তুত হইয়া গেল (২৭ মার্চ্চ)। তারপর পলিতাদ্বারা এই বারুদ-প্রকোষ্ঠের সহিত বাহিরে তরবিয়ৎ খাঁর সুড়ঙ্গ-মুখের যোগ রাখা হইল। বারুদ-ঘরে আগুন দিবার পূর্ব্বে সম্রাট্ দমদমা আরও এক গজ উঁচু করিয়া তুলিতে বলিলেন। দমদমা ও বারুদ-প্রকোষ্ঠ সম্রাটের আদেশে বারম্বার পরীক্ষা করা হইল; কাজেই দুর্গ-আক্রমণে বিলম্ব ঘটিল।

অবশেষে বারুদ-ঘরে আগুন দিবার আদেশ হইল। ১৩ই এপ্রিল ভোরবেলা ভীমরবে প্রথম বারুদ-প্রকোষ্ঠ

ফাটিয়া, দুর্গের খানিকটা কাঁচা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দিল। দুর্গমধ্যে সেই দেওয়ালের নিকট শত্রুরা অনেকে অবস্থান করিতেছিল—ভাঙ্গা দেওয়াল তাহাদের উপর পড়িয়া অনেকের মৃত্যু ঘটাইল। গ্রাণ্ট্ ডফ্ যে মারাঠী-বিবরণের সাহায্যে নিজ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে লেখা আছে, দেউড়ীর নীচে পড়িয়া, দুর্গের হাবিলদার প্রাগ্‌জী প্রভুর জীবন্ত গোর হইবার উপক্রম হইয়াছিল—শেষে মাটি খুঁড়িয়া তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় বাহির করা হয়। কিন্তু ফার্সী ইতিহাস এ সম্বন্ধে নীরব।

দ্বিতীয় বারুদ-ঘর ফাটিয়া মুঘলদের ভয়ানক ক্ষতি করিল। দশগজ উঁচু ও ২০ গজ লম্বা দুর্গের একটা পাকা বুরুজ উড়িয়া গেল বটে, কিন্তু সম্রাটের আদেশে আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড় করিয়া দুর্গে ঢুকিবার জন্য যে-সব মুঘল-সৈন্য বুরুজের ঠিক নীচে ঠেসাঠেসিভাবে অপেক্ষা করিতেছিল, ভাঙ্গা বুরুজের পাথর ও মাটি দুর্গের মধ্যে না পড়িয়া, একেবারে সবেগে তাহাদের উপর পড়িল। ফলে সম্রাটের বহু অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ, খাস্‌চৌকী (body-guards), আফগান্, গখ্‌খর, কর্ণাটকী ও অন্যান্য সৈন্য মরিল; যাহারা গর্ত্তে লুকাইয়াছিল, তাহাদের গোর হইল; অনেকে হস্তপদ ছিন্ন হইয়া ভীমবেগে আকাশমার্গে উৎক্ষিপ্ত হইল। প্রায় দুই হাজার বীর মুঘল, রাজপুত, এবং চারপাঁচ শত মাব্‌লে সৈন্য বিনষ্ট হইল। দ্বিতীয় বারুদ-ঘরের পলিতায় আগুন দিবার সময় এই সমস্ত সৈন্যদের সরিয়া আসিবার জন্য কোনরূপ হুকুম না দেওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মুঘল-পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু দুর্গ-প্রবেশের পথ সুগম হইল। সম্রাটের জনকয়েক বীর পদাতিক সৈন্য, বিশেষতঃ বাজী দাফ্‌লে * (বিজাপুর জেলায় জাঠ নামক জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা, সম্ভাজী দাফ্‌লের পুত্র), দুর্গ-প্রাচীরের উপর চড়িয়া চেঁচাইয়া ডাকিতে লাগিল,—'এস, এস—শত্রুদের কেহই এখানে নাই!' কিন্তু কেহই তাহাদের সহযাত্রী হইল না। দুর্গপ্রাচীর-পতনের সময় গড়্খাই-এ অবস্থিত যে সব মুঘল-সৈন্য প্রাণে বাঁচিয়াছিল, ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া তাহাদের নড়িবার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং বাজী দাফ্‌লে ও তাঁহার সঙ্গী সৈন্যেরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না—অবশেষে শত্রুর হাতে প্রাণ হারাইল; কারণ মুঘলদের দুর্ঘটনা দেখিয়া, সাহস পাইয়া, মারাঠারা দুর্গপ্রাচীরের ভাঙ্গা অংশের নিকট সবেগে ধাবিত হইয়া, মুঘলদের যাহাকে পাইল, কাটিয়া কুচি কুচি করিল। কিছুক্ষণের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে তীর ও বন্দুকের গুলি চালাচালি হইল। শত্রুরা দৃঢ়ভাবে বুরুজের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া,—মুখ্‌লিস্ খাঁ, তরবিয়ৎ খাঁ হমীদ্-উদ্দীন্ ও অন্যান্য যে কেহ দুর্গমধ্যে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের হটাইয়া দিল।

যে সব মুঘল-সৈন্য পাথর চাপা পড়িয়াছিল, তাহাদের অনেকের আত্মীয়-বন্ধুরা দুর্ঘটনার স্থলে উপস্থিত হইয়া, মৃতদেহ বা আহত লোকজনকে সরাইয়া, নিজেদের বাসায় লইয়া গেল। স্বজাতীয় সঙ্গীদের অনেককে হারাইয়া মাব্‌লে-সৈন্যেরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিল; 'মাটি ও পাথরের স্তূপের নীচে' হইতে সঙ্গীদের মৃতদেহ উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহারা রাত্রিকালে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেই আবৃত-পথে আগুন ধরাইয়া, হিন্দুমতে মৃতদেহের সৎকার করিল! বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত কাষ্ঠনক্গুলি সাতদিন ধরিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। (মাসির, ৪১৯)

এই সময়ে মারাঠাদের রাজা, রাজারামের মৃত্যু হয়। তাঁহার পাঁচ বছরের পুত্র শিবাজীকে প্রধানগণ পিতৃসিংহাসনে বসাইলেন, কিন্তু এই বালক-রাজাও বসন্তরোগে খেলুনায় মারা গেলেন। সম্রাট্ আওরংজীব্ মার্চ্চমাসে দুইজনেরই মৃত্যু-সংবাদ শুনিতে পাইলেন। মারাঠা-রাজের প্রধান মন্ত্রী পরশুরাম এক্ষণে সম্রাট্-পক্ষে যোগদান করিলেন। এই সংবাদে সাতারা দুর্গের কিলাদার সুভানজী হতাশ হইয়া পড়িলেন। হইবারই কথা। কারণ, তরবিয়ৎ খাঁ দুর্গ-প্রাচীরের ৭০ গজ ধ্বংস করিয়াছে; ফৎহ্-উল্লার গড়্খাই দুর্গের প্রধান-তোরণের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে—তাঁহার কামান দুর্গের উপর মুহুর্মুহু গোলা বর্ষণ করিতেছে; শাহ্‌জাদা আজমের শিবির-সীমার পিছনে একটা ছোট পাহাড়ের উপর হইতে 'মুল্‌ক্-অব্‌ৎ' নামক মুঘলদের প্রকাণ্ড কামান গোলা উদ্গীরণ করিয়া দুর্গমধ্যস্থ ঘরবাড়ী ধ্বংস করিয়া দিতেছে; দুর্গ-প্রাচীরের ভগ্নাংশ চাপা পড়িয়া মারাঠা-পক্ষের চারিশত লোক মরিয়াছে। মারাঠা-সেনাপতিদের

---

* সরকারী ইতিহাস মাসির-ই-আলমগীরীতে ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু এই বীরের নাম দেওয়া হয় নাই। বাজী দাফ্‌লের নাম আমি তাঁহার বংশধর, বর্ত্তমান জাঠ ষ্টেটের সর্দ্দার বাহাদুরের লিখিত পত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি।

যাইবার সময় সরযূ একটা ছেলেমানুষী করিয়া বসিল। সে স্বামীর বাক্স গুছাইয়া দিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ সে গুছানোর উপর সম্পূর্ণ আস্থা না রাখিয়া, একবার নিজে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে গেল। হঠাৎ সে আবিষ্কার করিল যে, সরযূর ৭।৮ শ' টাকা দামের গোটছড়া বাক্সে রহিয়াছে। ইন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "এ কি! এ গোট এ বাক্সে রেখে দিয়েছো, আর ভুলে গেছো। নেও, নিয়ে যাও।"

সরযূ লজ্জারক্ত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল; কিছু বলিল না, গহনাও লইল না।

বাক্স আরও নাড়া দিতে, ইন্দ্রনাথ একটুকরো কাগজ দেখিতে পাইল। সে কাগজখানা লইয়া পড়িতে লাগিল দেখিয়া, সরযূ দু' হাতে মুখ ঢাকিয়া, ছুটিয়া রান্নাঘরে একেবারে শাশুড়ীর কাছে পলাইল।

ইন্দ্রনাথ পড়িল, "ঠাকুর জামাইয়ের চিকিৎসার জন্য যদি দরকার হয়, তবে তুমি আমার গোটছড়া বিক্রী কোরো। গোট আমি প'রতে ভালবাসি না। তা'ছাড়া, আমার ঢের গয়না আছে। ইতি, তোমার সরু।"

চিঠিখানা পড়িতে-পড়িতে ইন্দ্রনাথের দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কি সুন্দর, কি মধুর, কি প্রেমময় তার সরযূর হৃদয়! ঘরের দুয়ারের কাছে চাঁড়ালদের মেয়ে বেঞ্চী দাঁড়াইয়া ছিল; ইন্দ্র তাহাকে দিয়া সরযূকে ডাকিয়া পাঠাইল।

বেঞ্চী মেয়েটার একেবারে আক্কেল নাই। সটান তার শাশুড়ীর সামনে গিয়া সে সরযূকে বলিয়া বসিল, ইন্দ্র ডাকিতেছে। কি লজ্জা! লজ্জায় রাঙিয়া মুখ গুঁজিয়া সরযূ একাগ্র মনে মাছ বাছিতে লাগিল। শাশুড়ী বলিলেন, "যাও মা, শীগগির যাও, তার না জানি কোন জিনিসের দরকার হয়েছে।" সরযূর মুখখানা প্রায় টকটকে জবা ফুলের মত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইল। নিজের ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া আর তার পা উঠিতে চাহিল না। যে কাজ সে করিয়া বসিয়াছে, তাহা তাহার পক্ষে অতিমাত্র সাহসের কাজ হইয়াছে—খুব জ্যাঠামী দেখাইয়াছে;—স্বামী এজন্য তাহাকে বকিতে পারেন। কিম্বা, এইটাই তার বেশী ভয়,—এই কথা লইয়া তাহাকে ঠাট্টা করিতে পারেন,—চাই কি সবাইকে বলিয়া দিতে পারেন। সেই জন্য তার স্বামীর সম্মুখীন হইতে তার বড় লজ্জা, বড় ভয় করিতেছিল। অনেক কষ্টে সে মুখখানা শুকনো করিয়া, নতদৃষ্টি হইয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল।

ইন্দ্রনাথ সেই ভরা দিনের বেলা, তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, আবেগভরে চুম্বন করিয়া ফেলিল। ভাগ্যে কেউ সেদিকে ছিল না,—না হইলে সরযূর যে কি উপায় হইত, বলা যায় না;—হয় তো লজ্জায় তাহাকে বিষ খাইয়া মরিতে হইত—কেন না, শুধু লজ্জায় কেউ সত্য-সত্যই মরিয়া গিয়াছে, এমন কথা ইতিহাসে শোনা যায় না।

কিন্তু গোটছড়া ইন্দ্র কিছুতেই লইল না। সে আদরে, প্রশংসায় সরযূকে ভরিয়া দিল; কিন্তু তাহার গহনা সে কিছুতেই নিতে পারে না বলিল। তা'ছাড়া, তার দরকারও নাই। এ টাকায় যদি নিতান্তই না কুলায়, তবে ইন্দ্র টাকা ধার করিয়া দিবে, পরে রোজগার করিয়া শোধ করিবে। অমলের কাছে বলিলেই সে টাকা পাইবে।

সরযূ বুকের ভিতর বড় ব্যথা পাইল। সে শেষে বলিয়াই বসিল, "আমি কি অমলের চেয়েও পর? সে দিতে পারে, আমি কি দিতে পারি না টাকা?"

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তা নয় পাগলি, তা' নয়। অমলের কাছ থেকে তো আর আমি একেবারে টাকাটা নেব না,—ধার নেব। তা'ছাড়া, ধার বরং শোধ হয়, কিন্তু গহনা গেলে গহনা হওয়া কঠিন।"

"নাই বা হ'ল! পোয়াটেক সোণার বোঝা বইলে আমার কি-ই বা ভাগ্যি বাড়বে?"

ইন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত সরযূকে বুঝাইতে পারিল না। নিজেও বুঝিল না যে তার এত ঘোর আপত্তির হেতুটাই বা কি। অমলের কাছে যদি ধার করিতে হয়, তবে না হয় স্ত্রীর কাছেই ধার করিল! তাতে ক্ষতিটা কি? কিন্তু তার সমস্ত হৃদয় সরযূর এই নিঃস্বার্থ দান গ্রহণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। শেষে সে বলিল, "নিতান্ত দরকার হয়, না হয় তোমার সেভিংস্ ব্যাঙ্কে যে ৫০০৲ টাকা আছে, তাই দিওখন। এটা রাখ, লক্ষ্মী!"

তার পর পড়াশুনা সম্বন্ধে যথারীতি উপদেশের পর, নিত্য পত্র লিখিবার জন্য বারবার মাথার দিব্য দিয়া, আদরের, সোহাগের, অশ্রুর, হাসির স্রোত বহাইয়া বিদায়

পর্ব্ব সমাধা হইল। ইন্দ্র মনোর শ্বশুরালয় হইয়া জামাইকে লইয়া কলিকাতায় চলিল। সরযূরও দুই-তিন দিন বাদে পিত্রালয়ে ফিরিবার কথা।

ইন্দ্রনাথ ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সে ভিন্ন-ভিন্ন বাবদে যে সব স্কলারশিপ পাইল, তাহা যোগ করিয়া মাসে-মাসে চল্লিশ টাকা দাঁড়াইল। ইহাতে সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। অন্ততঃ, এই চল্লিশটা টাকা মাসে-মাসে সে ভগিনীপতির চিকিৎসায় খরচ করিতে পারিবে ভাবিয়া একটু আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু চিকিৎসকদের কথা শুনিয়া তার মুখ শুকাইয়া গেল। প্রায় মাসখানেক নানা চিকিৎসক দেখাইয়া সাব্যস্ত হইল যে ব্যারাম যক্ষ্মা। চিকিৎসার যে ব্যবস্থা তাঁহারা করিলেন, তাহাতে ঔষধপথ্যাদির মূল্য ও দর্শনী বাবদে যে টাকা খরচ হইবে তাহা কোথা হইতে জুটাইবে, তাই ভাবিয়া সে অস্থির হইল। তারপর রোগীকে অবিলম্বে পশ্চিমে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার কথা;—সে টাকা কোথা হইতে আসিবে?

মনো তার সমস্ত গহনা দাদার হাতে দিয়া দিয়াছিল। সেগুলি বেচিতে ইন্দ্রের মন সরিল না। টাকা ধার করিবার তার একমাত্র ভরসাস্থল ছিল অমল। ইন্দ্রনাথ কলিকাতায় পৌঁছিবার দিন দুই পরেই সে বিলাত চলিয়া গিয়াছে। তার বাপ-মা-বোন সবশুদ্ধ গিয়াছে,—তার পিতা তাহার এবং অনীতার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিবেন। সুতরাং সেখানে কোনও আশাই নাই।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, চেষ্টা-চরিত্র করিয়া, সে একজন সাহেবকে বাঙ্গলা পড়াইবার মাষ্টারী জোগাড় করিল,—বেতন ৫০৲ টাকা। ইহাতে তাহাকে খাটিতে হইত ভয়ানক; কিন্তু যাই হউক, ইহাতে উপস্থিত অর্থ-চিন্তা হইতে সে মুক্তি পাইল।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন তার নামে এক হাজার টাকা ইনসিওর-ডাকে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রেরক তাহার বড় শালা। ভিতরে চিঠি,—সরযূর একখানা এবং তার শালার একখানা।

সরযূ বড়-লোকের মেয়ে। তাহার বাপ নাই, কিন্তু সে দাদার বড় আদরের বোন। সে লিখিয়াছে যে, বাপের বাড়ী যাইয়া সে দাদাকে দিয়া গোটটা বিক্রী করাইতে চেষ্টা করে। দাদা বলিলেন, 'গোট বেচিতে হইবে না, আমি টাকা ধার দিব।' বলিয়া তিনি এক হাজার টাকা সরযূকে বিনা সুদে ধার দিয়াছেন; সেই টাকা সে পাঠাইল।

বড় শালা হেমেন্দ্র লিখিয়াছেন, "শ্বশুরবাড়ী হইতে বধূ ছাড়া অন্য দান গ্রহণ করা ভয়ানক অন্যায়। সুতরাং তোমাকে আমি হাজার টাকা ধার ছাড়া অন্য কোনও রকমে দিতে পারি না। আশা করি, তুমিও এই নীতির অনুসরণ করিয়া, এই টাকা তোমার ভগ্নীকে ধার দিবে। টাকা ধার দেওয়া সম্বন্ধে আমার কেবল একটা সর্ত্ত আছে। তুমি যে পর্য্যন্ত তোমার ভগ্নীপতির নিকট হইতে এই টাকা ফেরত না পাও, সে পর্য্যন্ত আমি তোমার কাছে এ টাকার এক কপর্দ্দকও লইব না।"

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ইন্দ্র উত্তর লিখিল, "কি বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিব জানি না। আমার ভগ্নীপতি যদি রক্ষা পায়, তবে সে আপনারই দয়ায়। আমার একটি ভিক্ষা আছে—এটা আপনি আমাকে সত্য-সত্যই ঋণ দিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লইবেন। আমি নিজেকে কিম্বা আপনার ভগ্নীকে কোনও কষ্ট না দিয়া, বা কোনও রকমে বঞ্চিত না করিয়াও, একদিন আপনার সব টাকা শোধ করিতে পারিব, ভরসা করি। আমার সে আশায় আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।"

হেমেন্দ্র এ চিঠির কোনও জবাব দিলেন না। সরযূ লিখিল, তিনি সরযূকে কতকগুলি গালি দিয়াছেন; এবং তার গোটটা লইয়া বলিয়াছেন, এটা বাঁধা রহিল। তার মানে এই যে, পাছে তাঁহাকে না জানাইয়া সরযূ আবার এটা বিক্রয় করিবার চেষ্টা ক'রে, সেই জন্য সেটা নিজের কাছে রাখিলেন।

(৭)

মনোরমা বিধবা হইল। ইন্দ্রনাথ তাহার স্বামীর জন্য যাহা কিছু করিবার, করিয়াছিল। তিন মাস তাহাকে পশ্চিমে রাখিয়াছিল। কিছুদিন সবাই আশা করিয়াছিল যে, বুঝি-বা সে রক্ষা পাইবে। কিন্তু সকলের আশা বিফল করিয়া, সে হঠাৎ একদিন ইন্দ্রনাথকে দায়মুক্ত করিয়া গেল। মনোরমা এক মাসের ছেলে কোলে করিয়া, দাদার পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ইন্দ্র মনোরমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিল। মনোরমা তার বড় আদরের বোন! তার জীবনের সব সুখ-স্বচ্ছন্দতা এমনি করিয়া মিলাইয়া যাইতে, সে মর্ম্মাহত হইল। নিজে সুখ-সম্ভোগ করিতে এখন আর তার আকাঙ্ক্ষা হইত না। সরযূকে বুকে করিতে তার মনের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিত;—হায়, মনোরমার এ সুখ কপালে নাই! মনোরমার সাদা কাপড় ও শূন্য হাত দু'খানি দেখিলেই তাহার চোখে জল আসিত। বাড়ীর ভিতর সে হাসিতে সাহস করিত না,—পাছে হাসির শব্দে মনোরমার বুকে আঘাত লাগে।

সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। দিন-রাত মনোরমার কথা ভাবিতে লাগিল। কিসে হতভাগিনী জীবনে কিছুমাত্র সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারে, সর্ব্বদা তার এই চিন্তা হইল। সে মনোরমার জন্য বাছিয়া-বাছিয়া বই কিনিয়া পাঠাইত। তার জন্য নানা রকম সেলাইয়ের প্যাটার্ণ-বই কিনিয়া, তার আগাগোড়া বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া, তাহাকে পাঠাইয়া দিত। বড়-বড় চিঠি লিখিয়া তাকে বুঝাইত, শিখাইত। মনোরমাকে জীবনে যথাসম্ভব সুখী করিবার জন্য, সে তার সমস্ত অবসর নিযুক্ত করিল।

মনোরমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে-করিতে, তার একবার মনে হইল, মনোরমার পুনরায় বিবাহের কথা। বিধবা বিবাহের কথা সে অনেক দিন আলোচনা করিয়াছে। সে বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিল; কিন্তু সাধারণ লোকের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র ভাবে। পুরুষের পত্নী-বিয়োগের পর দারান্তর গ্রহণ সে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত; বিধবার বেলায়ও সে সেই নীতিতে বিবাহের সমর্থন করিত না। কিন্তু যদি নারী স্বামী-স্ত্রীর চিরকালের পবিত্র সম্বন্ধের মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, তবে কেবল বৈধব্যের বাহ্য আড়ম্বর করিবার জন্য তাহাদিগকে পীড়ন করিবার অধিকার সমাজের নাই,—এ কথা সে স্বীকার করিত। এমন নারীর বিবাহ করিবার অধিকার থাকা উচিত; এবং এই অধিকার থাকিলেই, প্রকৃত সাধ্বী বিধবার ত্যাগের গৌরব আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—ইহা তাহার বিশ্বাস ছিল। পুনর্ব্বিবাহিত বিধবা যে তার নারীত্ব আদর্শ হইতে অনেকটা হীনা, এ কথা সে অন্তরের সহিত অনুভব করিত।

মনোরমার দিকে চাহিয়া, তাহার এ মতের মধ্যে অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল। মনোরমা ছেলের মা হইয়াছে সত্য—কিন্তু সে মাত্র এই চৌদ্দ গিয়া পোনেরোয় পা দিয়াছে। অতটুকু মেয়ে—এ বয়সে অনীতা নাচিয়া-কুঁদিয়া বেড়াইতেছে—ঐটুকু মেয়ে যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিবে, আর ইন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লইয়া সম্ভোগ-সাগরে হাবুডুবু খাইবে, এ কথা ভাবিতে তাহার বড় বেদনা বোধ হইল। তাহার মনে হইল যে, এই সব বাল-বিধবাদের অন্ততঃ বিবাহ হওয়া উচিত।

কিন্তু মনোর যে ছেলে হইয়াছে। সে যদি বিবাহ করে, তবে তার ছেলের কি উপায় হইবে? David Copperfield-এর কথা তাহার মনে হইল। সে আবার ভাবিল, আচ্ছা, নিজে তো মনোর ছেলের ভার লইতে পারে! কিন্তু তাহা তাহার পছন্দ হইল না। মায়ের কোল ছাড়া হইয়া যে ছেলে মানুষ হয়, তার জীবনের একটা দিকে মস্ত ফাঁক থাকিয়া যায় বলিয়া ইন্দ্রের বিশ্বাস। শেষ পর্য্যন্ত ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল যে, ছেলেটা যখন হইয়াছে তখন মনোর আর বিবাহের কথা কল্পনা করা চলে না। এখন শুধু ছেলেটাকে দিয়াই মনোর জীবন সার্থক করিতে হইবে। তার মনে হইল, জীবনে সার্থকতার আরও দুই-একটা পথ আছে। ব্রহ্মচারিণী হইয়া ভগবানের সেবায় জীবন নিযুক্ত করিতে পারিলে, নারী-জীবন সার্থক হইতে পারে। তা'ছাড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারাও তো মনোর জীবনের গতি ফিরিয়া যাইতে পারে! এখানে একটা যে কত বড় আনন্দের খনি নিহিত আছে, তাহার সন্ধান ইন্দ্রনাথ খুব ভাল করিয়াই পাইয়াছে। এই দুই দিক দিয়া মনোর জীবন সার্থক করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এই স্থির করিয়া সে ছুটিতে দেশে ফিরিল।

সে দেখিল, সমস্ত বাড়ীটার উপর একটা বিষাদের গভীর ছায়া পড়িয়া গিয়াছে। মা তাঁ'র হাতের সমস্ত গহনা খুলিয়া, কেবলমাত্র শাঁখা ও সিন্দুর সম্বল করিয়াছেন। দেখা-দেখি, সরযূও তাই করিয়াছে—সে কিছুতেই গহনা পরিতে চায় না,—কেহ পরিতে বলিলে সে কাঁদে। খাওয়া-দাওয়ার ভিতর মাছের পরিমাণ যথাসম্ভব কম করা হইয়াছে; আর আনন্দ-অনুষ্ঠান সব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যেদিন ইন্দ্র বাড়ী আসিল, সেদিন একাদশী। ইন্দ্র আসিয়া দেখিল, মা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন; মলিন বেশে সরযূ তাঁর পায়ের কাছে বসিয়া আছে। ইন্দ্র আসিয়া মায়ের কোলের কাছে বসিয়া বলিল, "ওঠ মা!"

মা চোখ মুছিয়া বলিলেন, "উঠবো কি বাবা, ওই দুধের

মেয়েটা আমার চোখের সামনে নির্জ্জলা উপবাস ক'রবে, আর আমি পোড়ারমুখী উঠে গিয়ে কতকগুলি গিলবো কি ব'ল্চো।"

মনো ততক্ষণে স্নান, শিবপূজা সারিয়া; ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তার মুখ-চোখের ভিতর একটা অনৈসর্গিক শান্তি, একটা কিসের যেন দীপ্তি দেখিয়া ইন্দ্র মুগ্ধ হইল।

মা তখন উঠিয়া বলিলেন, "মনো, লক্ষ্মী মা আমার, একটু কিছু খা! তুই ছেলের মা, তোর কি নির্জ্জলা উপোস পোষায়?"

মনো নতমুখে একটু হাসিয়া বলিল, "মার ওই এক কথা! এতদিন যে ক'রলাম, তাতে কি কোনও দিন আমার একটু কষ্ট হ'য়েছে মা?"

ইন্দ্রের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। সরযূ আঁচল দিয়া চোখ মুছিল। ইন্দ্র বলিল, "মনো, তুই কি মাকেও মেরে ফেল্‌বি না কি? এমনি করে মা ক'দিন বাঁচবেন, বল দেখি?"

মনো বলিল, "মা, তুমি মিথ্যে আমার জন্য দুঃখ কর। আমার যা কপাল পুড়বার তা তো' পুড়েছে। মাসের মধ্যে দুটো' দিন উপোস—সে কি আবার একটা কষ্ট? এর জন্য তোমরা মিছামিছি কষ্ট করে' আমাকে আর দুঃখ দিও না। ওঠো, খাও গে মা।"

ইন্দ্রনাথ গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল। বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া তার মন ভীষণ আলোড়িত হইয়া উঠিল।

একদিন মায়ের সঙ্গে বসিয়া সে পরামর্শ করিল। মা বলিলেন, "দেখ্‌ বাবা, কি ক'রতে পারিস কর। ওর যদি বিয়ে দিতে পারিস, দে।"

ইন্দ্র বলিল, "সে হয় না মা। ছেলে নিয়ে বিয়ে হ'লে সুখ হ'বে না। তা'ছাড়া, ওর যে বিয়েতে কোনও দিন মত হ'বে, তা তো মনে হয় না।" তার পর সে বলিল, মনোকে লেখাপড়া শিখান দরকার। এখন কলিকাতায় গিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইলে, সে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া বাহির হইতে পারিবে। তার পর সে জীবনে একটা করিবার মত কিছু পাইবে।

মা, বাপ ও ইন্দ্র মিলিয়া পরামর্শ করিলেন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর স্থির হইল যে, তাহাই কর্ত্তব্য,—ইন্দ্র মনোকে লইয়া গিয়া কলিকাতার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবে। মনোরমাকে বলিলে সে বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই বলিল, "না দাদা, সে সব হবে না। আমার যে নানান লেঠা। বোর্ডিংএ আচার-নিয়ম কিছুই হ'বে না,—পূজা-অর্চ্চনা করা হ'বে না। তা'ছাড়া, খোকা"—

ইন্দ্র বলিল, "খোকাকে মা রাখবেন। তার জন্য চিন্তা কি?"

মনোর মন ইহাতে সরিল না।

শেষে অনেক গবেষণার পর স্থির হইল যে, ইন্দ্রের মা-বাপ সবশুদ্ধ কলিকাতায় গিয়া বাসা করিয়া, কিছুদিন থাকিবেন। যদি পোষায়, তবে সেই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী হইবে। ইন্দ্র চিঠি লিখিয়া হাটখোলার দিকে গঙ্গার ধারে একখানা বাড়ী ভাড়া করিল। ছুটীর পর সে সবাইকে লইয়া কলিকাতায় আসিল। মনো স্কুলে ভর্ত্তি হইল।

সরযূকেও মনোর সঙ্গে স্কুলে পাঠাইতে তার বড় ইচ্ছা হইল। কিন্তু সরযূ তাহাকে কিছুতেই সে কথা মায়ের কাছে পাড়িতে দিল না। একদিন মনোই কথাটা পাড়িল। কিন্তু ইন্দ্রের পিতা বধূকে স্কুলে পাঠাইবার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বিধবা মেয়ের যেন স্কুল ছাড়া গতি নাই; তাই বলিয়া ঘরের বউটিও যে স্কুলে যাইবে, এতটা তিনি এখনও বরদাস্ত করিতে শেখেন নাই। (ক্রমশঃ)

পাষাণ

[শ্রীনিশিকান্ত সেন]

লোকে বলে, বিশ্বশিল্পীর নিজের হাতে গড়া সে মূর্ত্তি অতি অপূর্ব্ব। শিল্পী তাঁর গড়ার আনন্দে এমনি বিভোর হয়ে পড়েছিলেন যে, তার যে আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন।

নদীতীরে শ্যামল তৃণতলে শ্বেতপাথরে গড়া সেই মূর্ত্তি। অটুট অশেষ যৌবনশ্রী তার দেহে, অনুপম তার ভঙ্গি। বসন্তের হাওয়া উতলা হয়ে ওঠে তার কেশে ক্রীড়া করবার জন্যে, বনের ভ্রমর চঞ্চল হয় অধরপুটে মধু আহরণের লোভে, কিন্তু আহত হয়ে কেঁদে চলে যায়।—হায়রে হায়, এ যে সৌন্দর্য্যের মায়া-কানন, মরুভূমির মরীচিকা—শুধু আঘাত, শুধু ছলনা!

কেউ তার বুকে বাসা বাঁধলে না, কেউ তাকে আপন ব'লে প্রেমের পুষ্পচন্দনে পূজো করলে না। পাষাণ-প্রতিমা তার নয়নের স্থির সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি, হাতের ইঙ্গিত, আর ঠোঁটের ভঙ্গিতে যেন বলতে লাগল, এ দুনিয়ায় এমন কি কেউ প্রেমিক নেই, যে, প্রাণ দিয়ে এই পাষাণে প্রাণের উৎস জাগিয়ে তোলে, মরুভূমে মলয়-মরুৎ বইয়ে দেয়?

কেউ তার ডাকে সাড়া দিলে না। সাড়া দিলে শুধু বিদেশের এক তরুণ ক্ষ্যাপা কবি। শরতের এক সোনার প্রভাতে শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে ঐ পথে সে কোথায় কিসের সন্ধানে যাচ্ছিল। যেতে যেতে পা-দুটি তার হঠাৎ থেমে গেল। সে অবাক হয়ে দেখলে, শ্বেত শতদলে পড়েছে আকাশের রক্তকমলের রাঙা আভা। কবি দেখলে, দূরে থেকে কাছে এসে, বসে দাঁড়িয়ে—শতরূপে শতধার। দে'খে দে'খে দে'খে কিছুতে তার দেখার নেশা ছুটল না।

কে একজন তাকে বল্লে, "হাঁ হে বিদেশী পথিক, তুমি কি দেখ্‌চ অমন অবাক হয়ে! ও যে প্রাণহীন পাষাণ।"

ক্ষ্যাপা কবি বল্লে, "যার চোখ নেই, তার কাছেই এ পাষাণ; যাঁর চোখ আছে, তাঁর কাছে এ প্রাণের অমৃতপ্রস্রবণ—কোমলতার পারিজাত পরশ।"

দুল্‌ল, পাষাণীর কর্ণে ফুলের দুল, কণ্ঠে ফুলের মালা, কোমরে ফুলের চন্দ্রহার। নিত্য নূতন গান; নূতন ভাব, নূতন ভাষা, নূতন ছন্দের বন্দনাগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। কবি পাষাণীর নিস্পন্দ ভাষাহীন মুখের পানে চায়, আর ছন্দ তার লীলায়িত, কথা তার অবারিত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সে ভাবে, এ স্বর্গের দেবী। দেবীর কথা হয় ইঙ্গিতে। সে ইঙ্গিতে ভাব হচ্ছে অনন্ত, কথা অফুরন্ত। আর যারা সাধারণ মানবী, তারা কথা কয় ভাষার গণ্ডিতে। কতটুকুই বা সে গণ্ডি, আর কতই বা সে কথা! তাতে কি আর সঙ্গীত-তরঙ্গের বৈচিত্র্য জাগে!

বস্তুতঃ কবির গান ছিল, তারই অন্তরের প্রেমের মতো বিচিত্র ও উন্মাদক। সুরের পরশ লোকের চিত্তে বসন্তের ফুল ফুটিয়ে সবুজ পাতার সরস কাঁপন জাগিয়ে দিত। দেশ-বিদেশের কত লোক তার গানে আকৃষ্ট হয়ে আসত; প্রিয়ার মনোরঞ্জনের জন্যে কত গান তারা শুনে শুনে কণ্ঠস্থ করে নিয়ে যেত। কিন্তু তারা যখন দেখত যে, কবি পাষাণীর কানে কানে কথা কইচে, পাষাণীর পাষাণ-দেহ স্পর্শ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পলকহারা আকুল চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবছে, তখন তাদের মুখের হাসি চেপে রাখা দায় হত। বল্‌ত—ক্ষ্যাপা, সত্য সত্যই বদ্ধপাগল ওটা; তা নইলে আর পাষাণকে মানুষের আসনে বসিয়ে পূজো করে!

কবি তাদের কথায় কর্ণপাতও করত না; ভাব্‌ত,—ওরা মূর্খ, ওরা অন্ধ, ওরা বধির—সৌন্দর্য্য-স্বর্গলোকের অভিশপ্ত জীব—কবির প্রেমপূজারতির নিগূঢ় মর্ম্ম ওরা কি বুঝ্‌বে?

ক্ষ্যাপা কবি ভুলে গেল, কোথা হতে এসেছিল, কোথায় যাচ্ছিল কিসের প্রয়োজনে; ঊর্ণনাভের মতো আপনার অন্তরস্থ রসের সূত্রে—আনন্দে প্রেমে ভাবে এক অপূর্ব্ব কল্পজাল সৃষ্টি করে ভাবলে, এ স্বর্গ—দেবীর নিজের হাতের রচা এ স্বর্গে, আমি মনের সুখে অনন্তকাল বাস করব।

কিন্তু আত্মীয়স্বজন তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তারা নানা স্থান ঘুরে অবশেষে এই নদীর কূলে তার উদ্দেশ পেলে। তখন বসন্তের ফুলে কবির সাজি ভর্ত্তি; মনের সুখে সে তার মোহনমালা রচনা কচ্ছে।

আত্মীয়েরা বল্‌লে, "ঘরে চল। সবাই তোমার জন্যে ভাবছে, আর তুমি এখানে বসে এ কি ছেলেখেলা কচ্ছ?"

কবি অপরিচিতের দৃষ্টিতে তাদের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "ছেলেখেলাই আমি করব—আমি ছেলেখেলাই করতে চাই, চিরকাল এই নদীর কূলে বসে, এম্‌নি ছেলে-মানুষ হয়ে।"

আত্মীয়েরা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার মন কেমন করে না—ঘরের জন্যে?"

কবি অসমাপ্ত মালাসুদ্ধ ডানহাতখানি তুলে পাষাণীকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "ঐ আমার ঘর, আপনজন—যা কিছু সব।" ব'লে আবার মালা-রচনায় মনোনিবেশ করলে।

বিরক্ত হয়ে আত্মীয়েরা বল্‌লে, "তোমাকে অপদেবতায় পেয়েছে। নদীকিনারে জঙ্গলের ধারে এই যে পাষাণের মূর্ত্তি, অপদেবতা এসে একে আশ্রয় করেছে। আর তার পূজোর জন্যে তোমার মতো অর্ব্বাচীনের ডাক পড়েছে। তোমার ভালমন্দ তোমার আর এখন বুঝে ওঠবার উপায় নেই। আমরা তোমার আত্মীয়স্বজন, তোমার ভালমন্দের জন্যে দায়ী। এই অপদেবতার হাত থেকে তোমাকে আমরা উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাব।"

কবি কথা কইলে না। বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার তার অবসর ছিল না।

আত্মীয়েরা রেগে উঠে কবির হাতের মালা ধরে টান মারলে। কি শক্ত তার হাতের মুঠি, আর কি শক্ত সে মালার সুতো! মালা ছিঁড়িল না, মুঠি থেকে খুলেও এল না! তারা একটু আশ্চর্য্য হল, কিন্তু মালায় তাদের প্রয়োজন ছিল না,—প্রয়োজন ছিল, কবিকে। কবিকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার জন্য তখন টানা-হেঁচড়া সুরু হল। কিন্তু কেউ তাকে এক পা-ও নড়াতে পারিলে না।

উত্তেজিত আত্মীয়েরা আরও লোক সংগ্রহ করে এনে হুকুম দিলে, "ভাঙো—ভেঙে চুরমার করো এই পাষাণের মূর্ত্তি। এই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া।"

কবি ছুটে গিয়ে পাষাণীকে দু-হাতে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার ব্যগ্র ব্যাকুল আলিঙ্গনও নিঃশেষে পাষাণীকে আড়াল করতে পারলে না। লোকেরা প্রথমে কবিকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু যখন দেখ্‌লে যে, সে অসম্ভব, তার হাত দু'খানি টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌লেও পাষাণীর কবল থেকে তাকে উদ্ধার করা যাবে না, তখন তারা তার উপরে বল প্রকাশ না ক'রে মূর্ত্তির অনাবৃত মস্তকে আঘাত করলে। লোহার মুগুরের ঘা। আগুন ঠিক্‌রে ঠন্ ঠন্ ঝন্ ঝন্ ক'রে একটা সাড়া উঠ্‌ল। নিরুপায় কবি পাষাণীর পাষাণ মুখের দিকে চেয়ে কি দেখলে; কি বুঝ্‌লে কে জানে, কিন্তু তার মুখের সমস্ত আলো নিবে গেল।

সেই মুহূর্ত্তে আত্মীয়েরা তটস্থ হয়ে দেখলে, মুখে তার রক্ত—ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে। মুগুর তো কবিকে স্পর্শ করেনি, তবে তার বুক চূর্ণ হয় কেন, কেউ কিছু বুঝতে পারলে না। ঘাতকের হাতের মুগুর হাত থেকে খসে পড়ে গেল।

কবির বাহুবন্ধন তখনো শিথিল হয় নি! আত্মীয়েরা ধ'রে নামাতে গিয়ে দ্যাখে, যেন পাষাণ! কবি পাষাণের মতোই শক্ত, নিথর, আর সাদা হয়ে গেছে! পাষাণের পাশ থেকে মুক্ত করতে পারে, বুঝি এত বড় শক্তি দুনিয়ায় নেই। ভাব্‌লে, দেহে নিশ্চয় অপদেবতার ভর হয়েছে। সবাই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

নদীতীরের তৃণতলে এখনো সেই পাষাণী তেম্‌নি অপরূপ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে একলা নেই। আর একটি পাষাণমূর্ত্তি তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে স্থির করুণ নেত্রে তার মুখ নিরীক্ষণ করছে। লোকে বলে, এ সেই প্রেমিক কবি, যে পাষাণীর প্রেমে মজে পাষাণ হয়ে গিয়েছিল

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

চতুঃসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া ক্ষুদ্রকায় হরনারায়ণ রায় একখানা বৃহৎ পালঙ্কের এককোণে আত্মহারা হইয়া যুগপৎ ধূমপান ও নিদ্রাসুখ লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সহসা গুরুকায়া গৃহিণীর গুরুভার-বাহক পদদ্বয়ের শব্দে তাঁহার নিমীলিত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত হইল। গৃহিণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, ঘুমাইলে নাকি?" হরনারায়ণ কহিলেন, "কেন?" "আর একটা নূতন খবর; সরস্বতী ফিরিয়াছে।" "আর নবীন?" "তাহার কোন সংবাদ নাই।" "বলে কি?" "অনেক রকমই বলে—কতটা সাচ্চা, কতটা ঝুটা, জহুরী ভিন্ন চিনিবার উপায় নাই। ডাকিয়া আনিব নাকি?"

হরনারায়ণ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সরস্বতী আসিয়া প্রণাম করিল এবং নানাছন্দে বিনাইয়া নবীনের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানাইল। নবীন যে কোথায় গেল, এবং দুর্গা ঠাকুরাণী কোথায় গেলেন, সে সংবাদ সে দিতে পারিল না। তখন হরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরস্বতী, নূতন খবর শুনিয়াছ?" সরস্বতী অতি বিনীত ভাবে কহিল, "না হুজুর, এই মাত্র দেশে এসেছি।" "তোমাদের ছোট-রায়ের যে বিবাহ; বরকর্ত্তা ভটচায—তোমাদের বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর।" সরস্বতী কহিল, "বটে!" ধূর্ত্তা বৈষ্ণবী নিজের অভিমত ব্যক্ত করিল না দেখিয়া হরনারায়ণ স্বয়ং প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কহিলেন, "দেখ সরস্বতী, মেয়ে আর বৌ যদি এতদিন ডাকাতের হাতে থাকিত, তাহা হইলে হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার যত বড়ই পণ্ডিত লোক হউক না কেন, নিশ্চিন্ত মনে সুতীর মোহনায় বসিয়া অসীমের বিবাহের ব্যবস্থা করিতে পারিত না। যেমন করিয়া হউক দুর্গা আর সুদর্শনের বৌ নবীনের হাতছাড়া হইয়া তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে; আর না হয় নবীন টাকা খাইয়া তাহাদের সঙ্গে ভিড়িয়াছে। সরস্বতী, তুমি একবার সংবাদটা আনিতে পার?" সরস্বতী বৈষ্ণবী জীবন-সংগ্রামে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দূরদর্শিনী হইয়াছিল; সে হরনারায়ণের প্রশ্নে বহুদূর হইতে টাকার গন্ধ পাইল এবং তৎক্ষণাৎ সাবধান হইয়া গেল। সে কহিল, "হুজুর, বড় কষ্টের পথ, আমরা দুঃখী মানুষ, তাই সহ্য করিতে পারি। আর যে রকম দেশ-কাল পড়িয়াছে, খরচে কুলায় না।" রাজনীতিজ্ঞ হর-নারায়ণ বুঝিলেন যে সরস্বতী অর্থের কথা বলিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "সেজন্য চিন্তা করিও না বৈষ্ণবী, খরচপত্র যাহা লাগে, সমস্তই আমার; আর ঠিক খবর আনিবার বকশিশ নগদ একশত টাকা।" টাকার কথা শুনিয়া সরস্বতীর প্রেমশূন্য শুষ্ক হৃদয় তৎক্ষণাৎ বিগলিত হইল। সে কহিল, "হুজুরের হুকুম কি ঠেলিতে পারি? কবে যাইতে হইবে?" "আজিকার দিনটা কাটাইয়া কাল সকালে একখানা ছোট পানসী লইয়া রওনা হইবে। গহনার নৌকায় গেলে অনেকদিন লাগিবে।" সরস্বতী হুকুম পাইয়া উঠিল। গৃহিণী টাকা দিবার জন্য তাহার সহিত কক্ষের বাহিরে আসিলেন।

কক্ষের বাহিরে আসিয়া গৃহিণী বৈষ্ণবীকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। বৃহৎ অট্টালিকা পদভরে কম্পিত করিয়া রায়-গৃহিণী দুই তিনটা বড় দালান পার হইয়া গেলেন; সরস্বতীও ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গৃহিণী অবশেষে অট্টালিকার আর এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরস্বতীকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন। বৈষ্ণবী তখন দুয়ারে দাঁড়াইয়াই ইতস্ততঃ করিতেছিল, কারণ গৃহিণীর কলেবর সে ক্ষুদ্র গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহাতে আর একজন মনুষ্যের স্থান সঙ্কুলান হইবে কি না, সরস্বতী তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। গৃহিণী আদেশ করিলে সরস্বতী গৃহে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। সে প্রবেশ করিলে গৃহিণী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। হরনারায়ণের পত্নী তাঁহার গজশুণ্ডবৎ দক্ষিণ হস্তখানি ক্ষুদ্রকায়া বৈষ্ণবীর স্কন্ধে ন্যস্ত

করিয়া কহিলেন, "দেখ্ বৈষ্ণবী দিদি, আমার একটা উপকার করিবি?" সরস্বতী রায়-গৃহিণীর হস্তের গুরুভার এবং বিনয়ে, যথোচিত অবনত হইয়া কহিল, "সে কি মা, উপকার করিব কি মা, আমি আপনার নিমকের চাকর, আপনার খাইয়া মানুষ –" রায়-গৃহিণী বাক্-যুদ্ধে নূতন নহেন; তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ্ সরস্বতী, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যদি করিয়া আসিতে পারিস, তাহা হইলে আমার এই গলার হার তোর গলায় ঝুলাইয়া দিব।" গজ-শৃঙ্খলবৎ পুষ্ট হার দেখিয়া দরিদ্রা বৈষ্ণবীর মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কেন পারিব না মা, নিশ্চয়ই পারিব; যদি মানুষের সাধ্য হয়, তাহা হইলে সরস্বতী নিশ্চয় আপনার হুকুম তামিল করিয়া আসিবে।" গৃহিণী তুষ্টা হইয়া হাসিলেন, সরস্বতী সশরীরে স্বর্গে গেল। তখন গৃহিণী কহিলেন, "দেখ্, ছোট রায় দেবর বটে, কিন্তু চিরদিন সতীনের মত ব্যবহার করিয়া গেছে। যতদিন ছিল, ততদিন এমন দিন যায় নাই যেদিন আমার চোখের জল ফেলিতে হয় নাই। বাপের বাড়ীর খোঁটা বড় বেশী বাজে সরস্বতী, সুতরাং সে কথা আর ভাবিতে পারিতেছি না। এইবার ছোট রায় বিবাহ করিয়াছে, তাহাকে জব্দ করিবার উপায় হইয়াছে। নূতন বৌ মানুষ কেমন, তাহার মতি-গতি বুদ্ধি-সুদ্ধি কেমন, বুঝিয়া দুর্গার কাহিনীটা যদি তাহার নিকট লাগাইয়া আসিতে পারিস, তাহা হইলে যদি কোন দিন হাড়ের জ্বালা মিটে! কেমন করিয়া লাগাইবি, সে ভার তোর। যদি পারিস, তাহা হইলে আমাকে যেমন চিরদিন বেড়া আগুনে পুড়াইয়া মারিয়াছে, তেমনই বেড়া আগুন জ্বালিয়া দিয়া আসিবি বুঝিলি সরস্বতী? এমন আগুন জ্বালিয়া আসিবি, তাহা যেন চিতার আগুনে না মিশিলে না নিবিয়া যায়। বুঝিলি ত?" সরস্বতী কহিল, "যতদূর সাধ্য করিব মা। তবে সে ত বিয়ের কনে, সে কি এত কথা তলাইয়া বুঝিতে পারিবে?" "একদিনে না পারে, দুমাস-ছমাসে ত পারিবে; না হয় আর একবার যাইবি, তখন তার পথ-খরচ আমি দিব।" গৃহিণী তখন বাক্স খুলিয়া সরস্বতীকে পথ-খরচ বাবদ এক এক করিয়া পঞ্চাশ টাকা গণিয়া দিলেন; সরস্বতী প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

পথে আসিতে আসিতে সরস্বতী ভাবিতে লাগিল যে হরনারায়ণ রায় সহসা এত মুক্তহস্ত হইলেন কেন? নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোনও গূঢ় তত্ত্ব আছে। তাহা না হইলে ধনহীন ক্ষমতাশূন্য ভ্রাতার সন্ধানের জন্য হরনারায়ণ রাশি রাশি অর্থব্যয় করিবেন কেন? তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৈষ্ণবী বুঝিল যে, ক্ষমতাশালী হরনারায়ণকে তুষ্ট রাখিতে পারিলে তাহাকে আর ভবিষ্যতে অর্থের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। সহসা তাহার স্মরণ হইল যে হরনারায়ণ নবীনকে সন্দেহ করিয়াছেন; এই সন্দেহটা যদি সে কোন গতিকে বাড়াইয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে ধূর্ত্ত নবীন নাপিত আর কখনও তাহার লাভের অংশ লইতে পারিবে না। মুরশিদাবাদে ফিরিবার পূর্ব্বে নবীনের উপরে সরস্বতীর ক্রোধ দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিতেছিল; কারণ তাহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, যে লাভের ন্যায্য অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য নবীন শিকার লইয়া পাটনা হইতে মুরশিদাবাদ পলাইয়াছে। সে যখন দেশে ফিরিয়া শুনিল যে, নবীন তখনও ফিরে নাই, তখন তাহার সন্দেহ দূর হইল বটে, কিন্তু ক্রোধ গেল না। সরস্বতী দীর্ঘ প্রবাস হইতে ফিরিয়া গৃহ-মার্জ্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ঠিক সেই সময়ে হরিনারায়ণ স্নানার্থ ভাগীরথীর দীর্ঘ শুষ্ক বেলা পার হইয়া জলে প্রবেশ করিতেছিলেন। একখানা বৃহৎ গহনার নৌকা সেই সময়ে তীরে লাগিল। তাহাতে একজন আরোহী বসিয়া ছিল। সে হরিনারায়ণকে দেখিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। হরিনারায়ণ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অপরাপর আরোহী নৌকা হইতে নামিয়া গ্রামে গেল, কিন্তু সে ব্যক্তি নামিল না; অসুস্থতার ভাণ করিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া শয়ন করিল। হরিনারায়ণ স্নানান্তে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিলে সে দূর হইতে তাঁহার অনুসরণ করিল।

পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

"ও কে?"

প্রশ্ন শুনিয়া দুর্গা ও বড়বধূ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ কোন উত্তর না পাইয়া নববধূ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে, ও অমন করিয়া চাহিয়া থাকে কেন?" চমক ভাঙ্গিয়া দুর্গা ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিলেন; সে চাহনি কিন্তু নববধূর নিকট গোপন রহিল না। তখন দুর্গা জিজ্ঞাসা

করিলেন, "ও কেমন করিয়া চায়, ভাই, তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব; ও কাহার দিকে চায়?" শৈল কহিল, "কেন, ওঁর দিকে! তোমরা যেন কিছু জান না? মাগী যেন হাঁ করিয়া গিলিতে আসে; আমি সব বুঝিতে পারি গো সব বুঝিতে পারি।" শেষের কথা শুনিয়া দুর্গা হাসিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া বধূ কহিলেন, "হাসিস কেন ভাই, ওর গায়ে জ্বালা ধরিয়াছে, তাই বলিতেছে।" এই সময়ে শৈল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "মাগী আর কত দিন থাকিবে? দাঁড়াও, আমি বাবাকে বলিয়া উহাকে এখনই বিদায় করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে ক্রোধভরে অলঙ্কারের ঝঙ্কার দিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। তখন দুর্গা হাসিতে হাসিতে গৃহতলে লুটাইয়া পড়িলেন। বড়বধূ বহুকষ্টে হাসি দমন করিয়া কহিলেন, "হাসিস না ভাই, হয়ত এখনই ফিরিয়া আসিবে।" দুর্গা কহিলেন, "আসুক, আমি আর হাসি চাপিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দাদার হইল ভাল!" "ঠাকুরপোর উপযুক্ত গুরুমহাশয় জুটিয়াছে। এখন হইতেই এত শাসন! আমি ত বিবাহের পরে দুই তিন বৎসর অপর লোকের কাছে স্বামীর নাম মুখে আনিতে পারি নাই।" "তুমি আসিয়াছিলে কত বড়টি, আর শৈলর যে বুড়া বয়সে বিবাহ হইল?" "হউক গে ভাই, এখন হইতে অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।"

এই সময়ে দূরে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইয়া উভয়ে অন্য কথা পাড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন দাসী আসিয়া কহিল, "মা ঠাকরুণ, কর্ত্তা ডাকচেন।" বধূ ও ননন্দা সদরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দেখিলেন যে, হরিনারায়ণ এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন; বুড়া বৈষ্ণব তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছে। হরিনারায়ণ তাহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, "মা, বিষম বিপদে পড়িয়া তোমাদের ডাকিয়াছি। মণিয়া কোনমতে এস্থান হইতে যাইতে চাহে না। বাবাজী দেশে ফিরিতে চাহে, কিন্তু মণিয়া তাহার সহিত যাইতে রাজী নয়। আমি তাহাকে লোকজন দিয়া পাটনায় পাঠাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সে দেশেও ফিরিতে চাহে না।" পিতার কথা শুনিয়া দুর্গা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, আমরাও মণিয়াকে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি।" বধূ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন; তাহা লক্ষ্য না করিয়া হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিপদ মা?" "নূতন বৌ বলে যে মণিয়া নাকি দিনরাত্রি দাদার দিকে চাহিয়া থাকে। সে তাহার বাপের কাছে নালিস করিতে গিয়াছে।" দুর্গার কথা শুনিয়া হরিনারায়ণ ঈষৎ হাসিলেন এবং কহিলেন, "দেখ মা, এই বিষয়ে তোমাদের একটু সাহায্যের প্রয়োজন, মণিয়াকে কোনমতে এখান হইতে সরাইতে হইবে।" দুর্গা কহিলেন, "বাবা, মণিয়া কোন্ সময়ে কি মেজাজে থাকে, তাহা বলা যায় না। যখন তাহার মেজাজ ভাল থাকে, তখন বুঝাইয়া বলিলে হয়ত আমার কথা শুনিতে পারে; কিন্তু অন্য সময়ে তাহাকে রাজী করা আমার সাধ্যাতীত। তবে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

দুর্গা ও বড়বধূ উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে ত্রিবিক্রম আসিয়া হরিনারায়ণকে কহিলেন, "দেখ হরি, তুমি যে কাগজপত্রগুলার কথা কহিতেছিলে, সেগুলা একবার দেখিলে ভাল হয় না? রায়জীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে; এখন সে বাদশাহের নিকট যাইতে চাহে, আর তাহাকে সত্বর যাইতেও হইবে। আমি মনে করিতেছি যে, তোমাকে লইয়া মুরশিদাবাদে যাইব।" হরিনারায়ণ কহিলেন, "কাগজপত্র সঙ্গেই আছে, এখনই আনিতেছি; কিন্তু আমরা যদি মুরশিদাবাদে যাই, তাহা হইলে দুর্গা আর বৌমাকে কোথায় রাখিয়া যাইব?" পশ্চাৎ হইতে বামাকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "তাহারা ত এইখানেই থাকিবে।" হরিনারায়ণ ফিরিয়া দেখিলেন সতী দাঁড়াইয়া আছে। ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন আসিলে?" "এইমাত্র। একবার ঘাটে গিয়াছিলাম, পথে শুনিলাম একজন লোক নাকি আমাদের সকলের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। লোকটাকেও দেখিয়া আসিলাম, সে তিনু ময়রার দোকানে বাসা লইয়াছে।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "বটে! হরি, তুমি কাগজপত্র বাহির কর, আমি একবার ঘুরিয়া আসি। সতী, তুমি আমার সঙ্গে এস।"

পতি-পত্নী পথে বাহির হইলে স্বামীর সঙ্গে অবগুণ্ঠনশূন্যা সতীকে দেখিয়া গ্রামের লোকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল; সতী তাহা শুনিয়াও শুনিল না। গ্রাম-সীমায় আসিয়া সতী কহিল, "আমাকে সে ডাকিতেছে।" ত্রিবিক্রম হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ডাকিতেছে সতী?" "যে ডাকে, যে কথা কহে; তাহাকে ত কোনদিন দেখি নাই!" "সে তোমাকে কোথায় ডাকিতেছে?" "ঐ শ্মশানের দিকে।"

"চল, আমিও আসিতেছি।" উভয়ে বিটপিচ্ছায়াচ্ছন্ন নদীতীর অবলম্বন করিয়া শ্মশানে পৌঁছিলেন। তীরে একটা অতি প্রাচীন তিন্তিড়ীবৃক্ষ ঝড়ের দিন গঙ্গালাভ করিয়াছিল, তাহার বৃহৎ কাণ্ডটা উচ্চ তীর হইতে নদীগর্ভে সিক্ত সৈকত পর্য্যন্ত একটা প্রশস্ত সেতুর মত পড়িয়া ছিল। ত্রিবিক্রম সেই স্থানে পৌঁছিলে বৃক্ষশাখায় শৃগালের রব শ্রুত হইল। শুনিবামাত্র ত্রিবিক্রম স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন নিকটস্থ একটা অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে একজন মনুষ্য ভূমিতে পতিত হইয়া উভয়কে অভিবাদন করিল।

দূর হইতে আর একজন মানুষ পতি-পত্নীর অনুসরণ করিয়া শ্মশান পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সে এই নবাগত ব্যক্তিকে বৃক্ষ হইতে পড়িতে দেখিয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সে শব্দ শুনিয়া ত্রিবিক্রম হাসিলেন। নবাগত ব্যক্তি কালীপ্রসাদ। সে একটা বৃহৎ রূপার বাক্স সতীর হস্তে দিয়া কহিল, "মা, মা তোমাকে দিয়াছেন, তুমি পরিও।" সতী বিস্মিতা হইয়া পেটীকা খুলিয়া দেখিল, তাহা রজত-নির্ম্মিত হীরক ও মুক্তাখচিত অলঙ্কারপূর্ণ। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়দেশে গৃহস্থের কন্যা সে জাতীয় অলঙ্কার কখন দেখিতেও পাইত না। সতী গৃহস্থের কন্যা; রত্নালঙ্কারের চাকচিক্যে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "এগুলি আমি কি করিব?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "কেন, পরিবে।" "লোকে নিন্দা করিবে যে?" "কেন নিন্দা করিবে, আমি দিয়াছি, তুমি পরিবে, ইহাতে দোষ কি?" "আমাদের গ্রামে এ রকম অলঙ্কার কাহারও নাই।" "সতী, আমরা যেখানে যাইব, সেখানে তোমার মত স্ত্রীলোক সকলেই এই অলঙ্কার পরে।" স্বামী কহিলেন, কাজেই ভক্তিমতী পত্নী তাহা আদেশ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

তখন সতীর হুঁস হইল, যে অলঙ্কার আনিয়াছে সে ত নাই! তখন সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "যে আনিল সে কোথায় গেল?" "ত্রিবিক্রম কহিলেন, "সে ভৃত্য, কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে, আবশ্যক হইলে আবার তাহার সাক্ষাৎ পাইবে। চল, ফিরিয়া যাই।" যে ব্যক্তি কালীপ্রসাদকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে যেখানে পড়িয়াছিল, সেখানে গিয়া ত্রিবিক্রম সতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতী, এই কি আমাদের সন্ধান লইতেছিল?" সতী কহিল, "হাঁ।" "তুমি গ্রামে ফিরিয়া যাও, আমি পরে আসিব।" সতী পরম নিশ্চিন্ত মনে বহুমূল্য অলঙ্কার লইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল।

মূর্চ্ছিত ব্যক্তির শিয়রে একটা বৃক্ষকাণ্ডের উপরে ত্রিবিক্রম উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ব্যক্তি চক্ষু মেলিয়া চাহিল এবং ত্রিবিক্রমকে দেখিয়া ভয়ে পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিল। ত্রিবিক্রম হাসিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

"মণিয়া।" "হুজুর?" "আমাকে হুজুর বলিয়া ডাকিতেছ কেন?" "জনাব, আপনি আমীর, খোদা আপনাকে বুলন্দ করিয়াছেন। আমি গরীব, পেটের দায়ে মজুরী করিয়া খাই, আমি আপনাকে হুজুর বলিব না ত কে বলিবে?"

গ্রামসীমায় একটা অশ্বত্থ বহুদূর পর্য্যন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া সুদীর্ঘকাল আধিপত্য করিতেছিল। তাহার নিম্নে মুসলমানদিগের অনেকগুলা কবর ছিল; অশ্বত্থের অনুগ্রহে বাকীগুলা বৃক্ষকবলিত হইয়া, মাত্র একটা তখনও বিদ্যমান ছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অসীম ও সুদর্শন তাহার উপর বসিয়া ছিলেন। কবরের নিম্নে গৈরিক-বসনা মণিয়া শ্যামল শষ্প-শয্যায় আসন-গ্রহণ করিয়াছিল।

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঈজী, তুমি এদিকে আসিলে কেন?" মণিয়া হাসিয়া কহিল, "দোহাই ধর্ম্মের ওস্তাদ, কস্‌বীর যদি ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মের দোহাই; বেশ্যার যদি ঈশ্বরের নাম-গ্রহণের অধিকার থাকে, তাহা হইলে হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের খোদার দোহাই, আমি ইচ্ছা করিয়া জানিয়া এ পথে আসি নাই।" অসীম কহিলেন, "মণিয়া, দাদা হয়ত তোমার কথা অবিশ্বাস করিতেছে, কিন্তু আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি নাই।"

মণিয়া। জনাবের আমার উপর চিরদিন মেহেরবাণী।

অসীম। আবার জনাব?

ম। ব্যক্তিগত অবস্থার পার্থক্য কি ভুলিতে আছে জনাব?

সুদর্শন। দেখ বাঈজী, কথাটা বলিতে আমার বড়ই সঙ্কোচ হইতেছে; তুমি এখন এখানে আসিয়া আমাকে—না, কর্ত্তাকে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছ।

ম। ওস্তাদ, সত্যকথা বলিতে কি, আমি তোমার জন্যই এখানে আসিয়াছি।

স্থ। ওরে ছোট বায়, বেটী বলে কি! আবার যে সুর ধরিয়াছে?

অ। দাদা, তুমি থাম। মণিয়া তোমাকে নাচাইতেছে, আর তুমি বানরের মত নাচিতেছ। ভয় নাই, তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। মণিয়া?

ম। হুজুর?

অ। আবার?

ম। এমন গোস্তাফী কি আমি করিতে পারি হুজুর?

অ। ভাল, তোমার যাহা ইচ্ছা বল।

ম। হুকুম করুন।

অ। তুমি এখন কোথায় যাইবে?

ম। যেদিকে দু'চোখ যায়।

অ। কাহার সঙ্গে যাইবে?

ম। এই আস্‌মান, তারা, চাঁদ, গাছ, পালা, চিড়িয়া। আমার মত অবস্থার লোকের সঙ্গীর অভাব কি জনাব?

অ। মণিয়া, তুমি যুবতী, অসামান্যা রূপসী, এই ঘোর দুর্দ্দিনে সঙ্গিহীনা অবস্থায় তোমার কি একা পথ চলা উচিত?

ম। হুজুর, অলঙ্কার পোষাক খুলিয়া ফেলা যায়, কিন্তু রূপ ত মুখোসের মত খুলিয়া ফেলা যায় না। দুনিয়ার হাওয়ার সঙ্গে মনের হাওয়াও বদ্‌লাইয়া যায়; কিন্তু চেহারা যিনি দিয়াছেন, তিনি না বদ্‌লাইলে আর কেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

অ। মণিয়া, আমি কি তোমাকে সে কথা বলিতেছি?

ম। হুজুর, হুকুমে সব হয়, কিন্তু মন বশ হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বাদশাহের বেগম গোলামের দিকে নজর করিত না।

অ। মণিয়া, আমি কি তোমাকে হুকুম করিতেছি?

ম। হুজুর, সকল সময়ে জবান দুরস্ত থাকে না। তুমি আমাকে জিহ্বাটা বশে রাখিতে দিবে না। মানুষের মন উড়া পাখীর মত, তাহাকে ধরিয়া রাখা বড় কঠিন। যে মন ধরিতে যায়, তাহার উপরদিকে নজর থাকে বলিয়া কত বিপদে পড়ে। জলে পড়ে, গর্ত্তে পড়ে, হোঁচট খায়, কারণ সে ত নিজে পথ দেখিয়া চলে না, উড়া পাখীর পিছন পিছন ধাওয়া করে।

অ। তোমার সহিত কথায় পারিয়া উঠিব না। মণিয়া, আমি মিনতি করি, তুমি ফিরিয়া যাও।

ম। জনাবের বেগম বাঁদীর উপর নারাজ হইয়াছেন এ কথা বাঁদীর কাণে পৌছিয়াছে। খোদাবন্দ, বন্দা-নওয়াজ, আমরা কসবী জাতি, মজুরী করিয়া খাই, আমরা কি কখনও উঁচু নজর করিতে পারি? হুজুর হুকুম করিতেছেন, অবশ্য ফিরিয়া যাইব—তবে কোথায় ফিরিয়া যাইব, তাহা বলিতে পারি না।

অ। সে কি কথা মণিয়া, আমার ফিরিয়া যাও বলার অর্থ, পিতার নিকট ফিরিয়া যাও।

ম। বলিয়াছি ত জনাব, মন উড়া-পাখী, বেগম সাহেবা বাঁদীর উপর নারাজ হইয়াছেন, বাঁদী বুলন্দ্ আখ্‌তারের নজরের অন্তরে যাইতেছে।

অ। মণিয়া, আবার বলি তুমি পাটনায় ফিরিয়া যাও।

ম। যো হুকুম খোদাবন্দ!

অ। রহস্য রাখ।

ম। তোবা তোবা, জনাবের সহিত রহস্য করিব?

অ। মণিয়া, আমি মিনতি করি, তুমি পাটনায় ফিরিয়া যাও।

ম। সে কি কথা মেহেরবান্, মোগলের রাজ্যে আমীর কি কখনও পথের কুকুরের নিকট মিনতি করে? পাটনার পথে আমীর চলিয়া যায়, দীন, অনাথ ভিখারী কুকুরের ন্যায় পদাঘাত লাভ করিয়া পলায়ন করে। দুঃখী-দরিদ্র যখন অন্নের অভাবে হাহাকার করে, তখন আমীরের ঘরে মদিরা ও সঙ্গীতের স্রোতে আনন্দ বহিয়া যায়। জনাব, তুমি সেই আমীর, আর আমি সেই ভিখারী। আমার নিকট মিনতি করা কি তোমার সাজে জনাব? তুমি হুকুম করিয়াছ, আমি তামিল করিবার চেষ্টা করিব।

সহসা অসীমের গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। মণিয়া তাহা দেখিয়া লম্ফ দিয়া উঠিল এবং উভয় হস্তে অসীমের পদদ্বয় আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কাঁদিতেছ! আমার দুনিয়ার দৌলৎ, তুমি কাঁদিতেছ কেন! তোমার কিসের দুঃখ বল? তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। আমি এখনই পাটনায় ফিরিয়া যাইতেছি। তুমি কাঁদিও না; তুমি চোখের জল মুছিয়া একবার হাস, আমি তোমার হাসি-মুখ দেখিয়া চলিয়া যাই।"

অসীম চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "মণিয়া, তুমি যাইতে চাহিতেছিলে না বলিয়া আমার চোখে জল আসে নাই। তুমি কি ছিলে, কি অবস্থায় ছিলে, আর আমার দোষে কি হইয়াছ, তাহাই ভাবিয়া চোখে জল আসিয়াছিল।" মণিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অসীমের নিকট হইতে দূরে গিয়া কহিল, "মনে করিও না যে, তোমার জন্য আমার অবস্থাহীন হইয়াছে, আমি আজ তোমার জন্য কত উচ্চ, তা কি তুমি জান? দিলের, তুমি ভাবিতেছ আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি—শাটিন মখমলের পেশোয়াজ না পরিয়া, হীরা মুক্তার অলঙ্কার না পরিয়া, এই গেরুয়া কাপড় পরিয়া বেড়াইতেছি বলিয়া মনে করিও না যে, মণিয়া ছোট হইয়াছে। লোকের চোখে এ বেশ হীন দেখাইতে পারে; কিন্তু তুমি জান না দিলের, এ বেশে আমি আমার কাছে কত উচ্চ। এখন আমি আমার। এখন পথের কুকুরের মত ডাকিলেই আমাকে লোকের কাছে যাইতে হয় না। যাহাকে মনে মনে ঘৃণা করি, অর্থের জন্য তাহার সঙ্গে হাসি-মুখে কথা কহিতে হয় না;—সে যে কত বড় সুখ, কত উচ্চতা, তাহা বেশ্যা ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারে না। জনাব, মণিয়া তওয়াইফ চলিল। তুমি আমীর হইয়া, বাদশাহের প্রিয় হইয়া এই দুনিয়ার বন্ধুর পথে অক্ষত চরণে চলিয়া যাইও। বেশ্যাকন্যা বেশ্যার ছায়াও কখনও দ্বিতীয়বার ইচ্ছা করিয়া তোমার ঐ পবিত্র দেহ স্পর্শ করিবে না।"

সহসা সেই তরুচ্ছায়াশীতল গ্রাম-সীমা মুখরিত করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "ছি মা, এই কি তোমার সংযম?" সকলে ফিরিয়া দেখিলেন কবরের অদূরে হরিনারায়ণ দাঁড়াইয়া আছেন।　　(ক্রমশঃ)

বঙ্গের ইলিয়াস-শাহী সুলতানগণ *

গিয়াসুদ্দিন আজাম শাহ

[অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ]

পূর্ব্ব প্রস্তাবে গিয়াসুদ্দিন আজাম শাহের সিংহাসনারোহণ বৎসর ৭৯৫ হিজরী বলিয়া ধরা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, সেকন্দর শাহের ফিরোজাবাদে মুদ্রিত যে সকল মুদ্রা আমরা বর্ত্তমানে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাই, তাহাদের মধ্যে ৭৯১ হিজরীর মুদ্রাই সর্ব্বশেষ মুদ্রা। এদিকে ফিরোজাবাদে মুদ্রিত আজাম শাহের যে সকল মুদ্রা পাই, তাহাদের মধ্যে ৭৯৫ হিজরীর মুদ্রাই সর্ব্বপ্রথম। এ অবস্থায় সেকন্দরের মৃত্যু ও আজামের রাজ্য-প্রাপ্তি যে এই দুই বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ব্যাপার ৭৯৫ হিজরীতে হইয়াছিল বলিয়া ধরিবার কারণ এই:—রিয়াজ-উস্ সালাতিনে আজাম শাহের রাজ্যকাল সাত বৎসর কয়েক মাস বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রিয়াজের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, অন্য এক বিবরণী-মতে আজাম শাহ ১৬ বৎসর ৫ মাস ও তিন দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমি বারংবার দেখিয়াছি যে, রিয়াজের এই দ্বিতীয় বিবরণের তারিখই সত্যের কাছে যায়,—রিয়াজের নিজের তারিখ একেবারেই ভুল। বর্ত্তমান আবিষ্কার হইতে আমরা জানি যে, আজাম শাহের রাজত্ব ৮১৩ হিজরী পর্য্যন্ত পাইয়াছিল। ৭৯৫ হিজরীর শেষভাগে তাঁহার সিংহাসনারোহণ ধরিলে, এবং ৮১৩ হিজরীর প্রথমে তাঁহার রাজ্যাবসান ধরিলে, তাঁহার রাজত্বকালের পরিমাণ ১৭ বৎসর কয়েক মাস হয়। এবং রিয়াজের ২য় বিবরণের মাত্র ১ বৎসরের সংশোধন লাগে। কিন্তু এখানে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভবিষ্য আবিষ্কারে আজাম শাহের এই সিংহাসনারোহণের বৎসর ৭৯৫ হিজরী বলিয়া নির্দ্ধারণ না-ও টিকিতে পারে। ৭৯১ হইতে ৭৯৫এর মধ্যে অন্য কোন বৎসরে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রমাণীকৃত হইতে পারে।

রিয়াজে আজাম শাহের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া বুঝা যায় যে, আজাম শাহ উদার-হৃদয়, দিল-খোলোসা, সদানন্দ প্রকৃতির লোক ছিলেন। অর্থাৎ রাজা

* বঙ্গে সুলতানী আমল।৹ পঞ্চম প্রস্তাব।

যেমনটি হইলে লোকে তাঁহাদের নামে বিক্রমাদিত্যের মত বা হারুণ-অল-রশিদের মত নানা অলৌকিক বা অদ্ভুত গল্প রচনা করিয়া ফেলে, এবং তাহা মুখে-মুখে প্রচার করিয়া আনন্দ পায়, গিয়াসুদ্দিন আজাম শাহও ছোট আকারে তেমনটিই ছিলেন। রিয়াজের গ্রন্থকার গিয়াসুদ্দিনের সম্বন্ধে দুইটি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

আজাম শাহ একবার কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়েন। জীবনের আর যখন কোন আশা রহিল না, তখন শেষ স্নান করাইবার জন্য সুলতানের হেরেম হইতে তিনটি তরুণীকে আহ্বান করা হইল। ইহাদের নাম সারোয়া, গুল ও লাল। ইহারা সযত্নে সুলতানকে স্নান করাইল। সকলেই শেষের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু সুলতান সেবারের মত রক্ষা পাইয়া গেলেন। তিনি ধীরে-ধীরে আরোগ্যলাভ করিয়া উঠিলেন; এবং ঐ তরুণীত্রয়কে মঙ্গলময়ী বলিয়া বিশেষ অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। হেরেমের অন্যান্য যুবতীগণ উহাদের সৌভাগ্যে ভারী চটিয়া গেল। তাহারা ঐ তরুণীত্রয়কে ঐ স্নান করান ব্যাপার লইয়া নানা রকম হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল। একদিন সুলতান যখন স্ফূর্ত্তি-মনে আছেন, তখন সঙ্গিনীদের উপহাস আর সহিতে না পারিয়া, ঐ তরুণীত্রয় সুলতানের নিকট নালিশ করিল। সুলতান স্ফূর্ত্তির ঝোঁকে কবিতায় বলিয়া উঠিলেন—

শুন সাকি, সখী সারোয়া গুলের
লালের কাহিনী এই!

ঝোঁকের মাথায় কবিতা রচনা করিয়া ফেলিয়া, সুলতানের বোধ হয় বাল্মীকি মুনির মত মনে হইয়াছিল,—'আহা! এ কি দিব্য বাণী আমার মুখ দিয়া বাহির হইল!' তিনি দেশের সমস্ত কবিকে ইহার পাদ-পূরণ করিতে আহ্বান করিলেন। তাহারা নিশ্চয়ই চেষ্টা করিয়াছিল, এবং পদ জোগাইয়াছিলও বোধ হয় বিস্তর। কিন্তু বাঙ্গালা কবিগণের পদে সুলতানের মন উঠিল না। তিনি ঠিক করিলেন, এই দিব্য সুলতানী কবিতার পাদ-পূরণের জন্য তিনি উহা পারস্যদেশের সিরাজ-বাসী বিখ্যাত কবি হাফিজের নিকট পাঠাইবেন। নবাবী খেয়াল! অমনি সুলতানী কবিতার পদ লইয়া ও সঙ্গে বহু ধনরত্ন লইয়া ছুটিল দূত পারস্যে! হাফিজ পাইবামাত্র পাদ-পূরণ করিয়া দিলেন,—

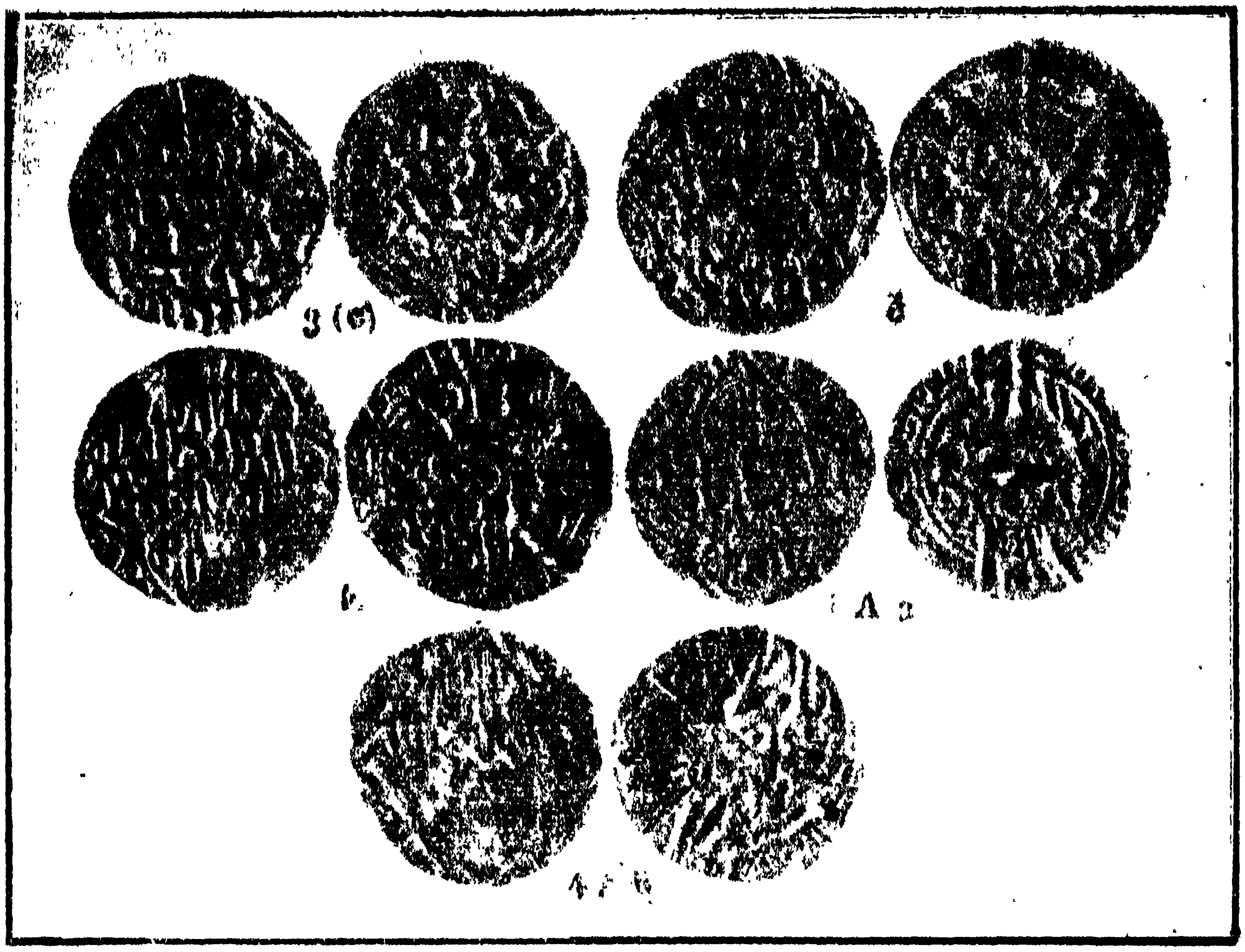

আজাম শাহের মুদ্রা

গিয়াসুদ্দিনের রচনা :—

শুন সাকি, সখী সারোয়া, গুলের,

লালের কাহিনী এই ;

হাফিজের রচনা :—

এই সে কাহিনী তরুণী তিনের,

গোসল্ করাল যেই ।

হাফিজ এই কবিতারই অনুসরণে একটি গজল রচনা করিয়া গিয়াসুদ্দিনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহার চারি ছত্রের ভাবার্থ এই :—

পারস্য হ'তে চলিল বঙ্গে জমাট অমিয়-সার ;

হিন্দের তোতারা পিয়ে তাহা, মধু ছড়াইবে অনিবার।

হাফিজ চিত্ত কাঁদিয়া নিত্য গিয়াস পিয়াসে ধায়,

বাসনা তাহার কবিতার বেশে যদি বা তাঁহারে পায় !

এইরূপে গোসল-কারিণীদের কলঙ্ক ঘুচিয়া গেল।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন ও কাজীর গল্প বালক-পাঠ্য বহু পুস্তকেও স্থান পাইয়াছে ; কাজেই এইখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই।

৮১৩ হিজরী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াসুদ্দিন পরলোকে গমন করেন। সোণারগাঁতে মার্ব্বেল পাথরের তৈয়ারী একটি কবর আছে। জনপ্রবাদ, ইহাই গিয়াসুদ্দিনের কবর। কবরে কোন খোদিত-লিপি নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে উহার মেরামত হইয়াছে। গিয়াসুদ্দিনের কবরের কিছু পূর্ব্বে একটি উচ্চ চত্বরে আরও কয়েকটি কবর আছে। স্থানীয় প্রবাদমতে এইগুলিও কোন-কোন বঙ্গীয় সুলতানের কবর। এইস্থানের কিছু পশ্চিমেই বিখ্যাত পাঁচপীরের দরগা।

বর্ত্তমান আবিষ্কারে গিয়াসুদ্দিনের ৭২টি মুদ্রা আছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের তালিকায় তাঁহার ২২টি মুদ্রা বর্ণিত আছে। ১৯১৫ সালের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ৪৮৫ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত কর্ণেল নেভিল খুলনা জেলায় প্রাপ্ত গিয়াসুদ্দিনের ৪২টি মুদ্রার পরিচয় দিয়াছেন। টমাসের পুস্তকেও গিয়াসুদ্দিনের কয়েক শ্রেণীর মুদ্রার পরিচয় আছে। ইহা ছাড়া, এখানে-সেখানে গিয়াসুদ্দিনের আরও কতক-কতক মুদ্রার পরিচয় বাহির হইয়াছে।

বর্ত্তমান আবিষ্কারের ৭২টি মুদ্রার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

I. ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের A নমুনার মুদ্রা এগারটি। ইহাদের মধ্যে চারিটির সন পরিষ্কার ৮১১ হিজরী। একটি ৮১২ হিজরীর। অবশিষ্টগুলির মধ্যে দুইটির সন ও টাঁকশালের নাম একেবারেই কাটিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট চারিটির তারিখও অস্পষ্ট ; কিন্তু উহাদের মধ্যে তিনটি ৮১১ হিজরীর ও একটি ৮১২ হিজরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। নিম্নে তিনটি মুদ্রা বিশেষভাবে বর্ণিত হইল।

(a) ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ৬৫ নং মুদ্রার মত। ওজন ১৬৩'৯ গ্রেন। বেধ ১'২৮ ইঞ্চি। কিন্তু ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মুদ্রাটির বর্ণনায় ভুল আছে ; ভাওপীঠের কিনারায় যে লিপি আছে, তাহা একদম পড়া হয় নাই। লিপিগুলি এই :—

উপরের বাম কিনারায়,—আল্‌মুইদ্

নীচের „ „ ,—বে তা

„ দক্ষিণ „ ,—ইদ

উপরের „ „ ,—আল্-রহমন

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ৬৫ নং মুদ্রার উল্টা পীঠের সন যে ৮১২ হিজরী পড়িতে হইবে,—৭৯০ হিজরী বলিয়া সন যে পড়া হইয়াছে তাহা যে ভুল, ইহা পূর্ব্ব প্রস্তাবেই দেখাইয়াছি।

বর্ত্তমান মুদ্রাটির তারিখ ৮১১ হিজরী। টাঁকশালের নাম শুধু ফিরোজাবাদ না লিখিয়া আল্-ফিরোজাবাদ লিখিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মুদ্রাটিতেও টাঁকশালের নাম আল্-ফিরোজাবাদই লিখিত আছে ; কিন্তু পড়া হইয়াছে শুধুই ফিরোজাবাদ।

এই শ্রেণীর মুদ্রাগুলিতে লিপিকারের একটি কেরদানী লক্ষ্যের যোগ্য। উল্টা পীঠের "মুলকহ্" শব্দের শেষে 'হ্' অক্ষরটিকে টানিয়া-বুনিয়া এক অদ্ভুত আকৃতিতে পরিণত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ 'আল্‌ইসলাম' শব্দটির "আল-ইসলা" পর্য্যন্ত অংশটি একটানে লিখিতে হইলে যে আকারে লেখা হয়, এই "মুল্‌কহ্" শব্দের শেষের শুধু 'হ্'টিকেও ঠিক সেই আকৃতি দেওয়া হইয়াছে। "সনত্" শব্দের 'ত্' টিকেও 'হ্' এর আকৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই বিশেষত্ব-গুলির উল্লেখ এইজন্য আবশ্যক যে, বোধ হয় এইগুলি ধরিতে না পারিয়াই ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মুদ্রাটি এমন ভুল পড়া হইয়াছে।

(b) এই মুদ্রাটি উপরে বর্ণিত (a) মুদ্রাটিরই মত ; তবে

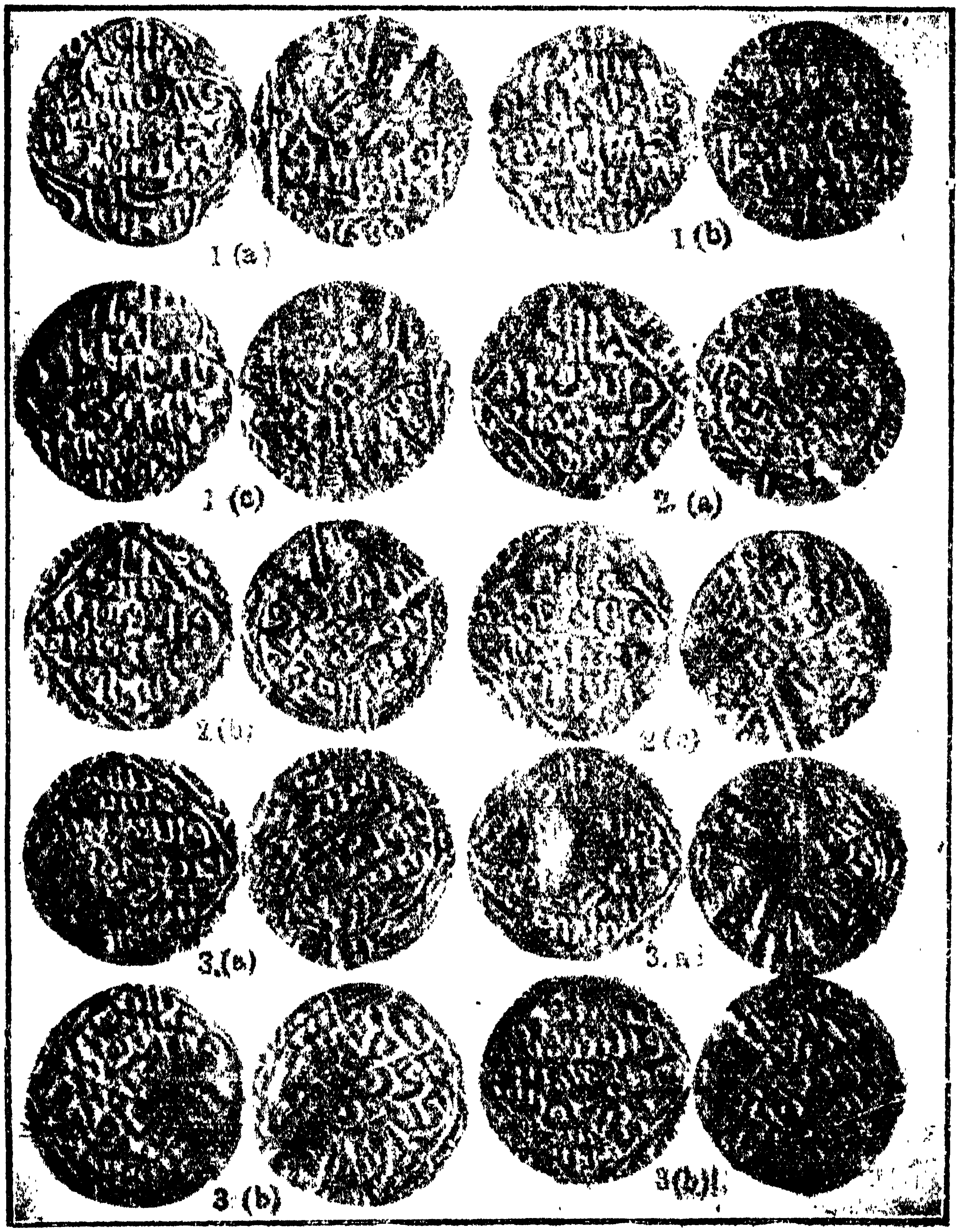

আজাম শাহের মুদ্রা

তারিখ ৮১২ হিজরী। ওজন ১৬০.১ গ্রেণ। বেধ ১.২০ ইঞ্চি।

(*c*) উপরের (*a*)-রই মত; কিন্তু ভাওপীঠে সেকন্দর শাহের নাম কেরদানী করিয়া উপরে-নীচে উঠাইয়া নামাইয়া তৃতীয় ছত্রেই শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই মুদ্রাটি উপরের (*a*) ও (*b*) হইতে ভিন্ন ছাঁচে তৈয়ারী। অক্ষরগুলি ছোট ছোট ও সূক্ষ্মাগ্র। আরও দুইটি মুদ্রা এই নমুনায় আছে; কাজেই মোট, ১১টির মধ্যে তিনটি এই নমুনার, বাকী আটটি (*a*) ও (*b*) র মত। এই (*c*) মুদ্রাটির ওজন ১৬৫.৩ গ্রেন্ এবং বেধ ১.১৬ ইঞ্চি।

2. ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের 'B' নমুনার ১৫টি মুদ্রা। কয়েকটির কারিগরি অতি চমৎকার; কিন্তু কয়েকটি আবার যাচ্ছেতাই। নিম্নে ইহাদের কয়েকটির বিশেষ বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

(*a*) ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ৬৭ নং মুদ্রার মত। ওজন ১৬১.৫ গ্রেণ। বেধ ১.১৫ ইঞ্চি। কারি-

গরি চমৎকার। তারিখ ৭৯৬ হিজরী। টাঁকশাল ফিরোজাবাদ।

(*b*) উপরে বর্ণিত (*a*)-রই মত ; কিন্তু কারিগরি ভাল নহে। ওজন ১৬০·২ গ্রেণ। বেধ ১·১৫ ইঞ্চি। টাঁকশাল ফিরোজাবাদ।

তারিখ পরিষ্কার—"আহাদি ও জুমান মাইয়াত" = ৮০১ হিজরী।

(*c*) উপরের (*b*)-রই মত। ওজন ১৫৫·৬ গ্রেণ। বেধ ১·২০ ইঞ্চি, কিন্তু মুদ্রাটি কতকটা ডিম্বাকৃতি, তাই চেপ্টা-

লিপি বৃহত্তর চতুর্দ্দশ নক্সার অভ্যন্তরে। লিপিতে তিন পুরুষের নাম, অর্থাৎ আজামশাহ ইবন সেকন্দর শাহ ইবন ইলিয়াস শাহ, এইরূপ লিখিত আছে। ওজন ১৬৩·৩ গ্রেণ। বেধ ১·১৭—১·২৪ ইঞ্চি। টাঁকশাল ফিরোজাবাদ। তারিখ অতি পরিষ্কার, ৮০৫ হিজরী।

(*a*) উপরের অনুরূপ আর একটি মুদ্রা। ওজন ১৬০ গ্রেণ। বেধ ১·১৬—১·১৯ ইঞ্চি। টাঁকশাল ফিরোজাবাদ। তারিখ ৮০৫ হিজরী।

(*b*) উপরের (*a*)-র মত আর একটি মুদ্রা। কিন্তু তারিখ

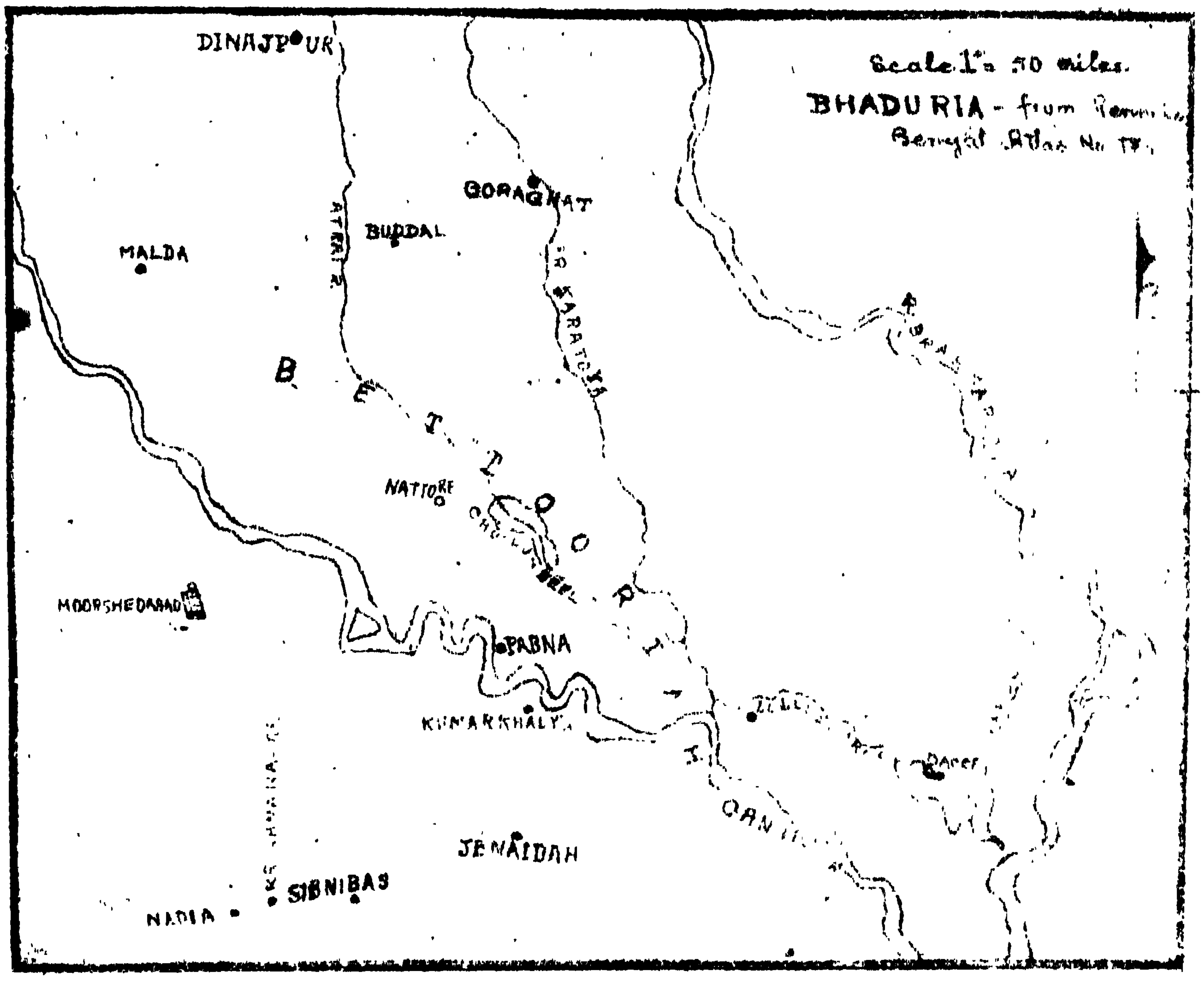

ভাতুড়িয়ার মানচিত্র
(রেণেলের ৯ম সংখ্যক মানচিত্র হইতে গৃহীত)

দিকের বেধ মোটে ১·১২ ইঞ্চি। টাঁকশালে কাটিয়া গিয়াছে। তারিখ খুব সম্ভব ৮০৩ হিজরী।

শতকের ৮০০ খুব পরিষ্কার, কিন্তু এককটি পরিষ্কার নহে।

অবশিষ্ট মুদ্রাগুলির সন ও টাঁকশাল প্রায়ই কাটিয়া গিয়াছে। কতকগুলির বেধ মোটে ১·০৬ ইঞ্চি।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের *b* নমুনার ২৮টি মুদ্রা। ইহাদের মধ্যে নিম্নের কয়টির বিশেষ বর্ণনা দেওয়া গেল।

(*a*) উপরের ২(*a*) মুদ্রাটির মত ; কিন্তু ভাওপীঠের

অতি পরিষ্কার—৮০৬ হিজরী। টাঁকশাল ফিরোজাবাদ। ওজন ১৬০·১ গ্রেণ। বেধ ১·১৮ ইঞ্চি।

(*d*) ৮০৬ হিজরীর আর একটি মুদ্রা। কিন্তু টাঁকশালের নাম কাটিয়া গিয়াছে। ওজন ১৬৩·২ গ্রেণ। বেধ ১·১৪ ইঞ্চি।

(*c*) তারিখ ৮০৭ হিজরী। এককের অঙ্কটি একটু অস্পষ্ট। সবা = ৭ শব্দের আয়েন্। অক্ষরটি একটি পোদ্দারের পরখচিহ্নে মাটি হইয়াছে। টাঁকশাল ফিরোজাবাদ। ওজন ১৫২.৫ গ্রেণ। বেধ ১·০৮—১·১৫ ইঞ্চি।

(*d*) তারিখ ৮১০ হিজরী, আশার ও জুমান মাইয়াত ৮১০ হিঃ। ওজন ১৬১·৭ গ্রেণ। বেধ ১·২২—১·১৫ ইঞ্চি।

4. নূতন নমুনার মুদ্রা। ওজন ১৫৫·৮ গ্রেণ। বেধ, ১·১৬—১·১৮ ইঞ্চি। ভাওপীঠ:—A নমুনার মত গোলাকৃতি দলযুক্ত চতুর্দ্দল নক্সার অভ্যন্তরে।

লিপি:—

গিয়াস-উদ্দনিয়া

ও উদ্দিন আবুলমুজঃফর

আজাম শাহ বিন সেকন্দর শাহ।

আস সুলতান।

কিনারার লিপি:—

বামোর্দ্ধ—(নষ্ট হইয়া গিয়াছে)

বামনিম্ন—বতাইদ্

দক্ষিণনিম্ন—(নষ্ট হইয়া গিয়াছে)

দক্ষিণোর্দ্ধ—সাল্মনান্।

উল্টাপীঠ:—

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের B নমুনার মত বৃত্তাভ্যন্তরে। টাঁকশালের নাম কাটিয়া গিয়াছে। তারিখটি খুব সম্ভবতঃ তিসা ও ছমান মাইয়াত-৮০৯ হিজরী। এককের অঙ্ক বেশ পরিষ্কার, কিন্তু শতক পোদ্দারের পরখ চিহ্নে বিকৃত।

ঐ নমুনারই ভিন্ন আকৃতি A—তিনটি মুদ্রা। কর্ণেল নেভিল বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের খণ্ডে ৪৮৫ পৃষ্ঠায় শেষ প্যারায় এই রকমের মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিস্তৃত বর্ণনা দেন নাই। এই মুদ্রাগুলি আমাদের ৪নং নমুনারই ভিন্নতর আকৃতি বলিয়া ধরিতে হইবে। এইগুলি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের নমুনার ভিন্নতর আকৃতি নহে।

(*a*) ওজন ১৬১·৬ গ্রেণ। বেধ ১·১৪ ইঞ্চি। তারিখ ৮১৩ হিজরী। টাঁকশাল সাতগাঁ।

ভাওপীঠ চতুর্দ্দল পদ্মাভ্যন্তরে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের জালালুদ্দিনের ৯৬ নং মুদ্রার নক্সা তুলনীয়। লিপি উপরে বর্ণিত ৪ নম্বরের অনুরূপ। কিনারার লিপিগুলি বেশ আছে।

বামোর্দ্ধ—আলমুইদ্

বামনিম্ন—বেতাইদ্

দক্ষিণনিম্ন—আল মুলুক

দক্ষিণোর্দ্ধ—আল মনান্

উল্টাপীঠ:—উপরে বর্ণিত ৪ নম্বরের মত। কিনারার লিপি:—জরব হজহ্ আস্ সিক্কত ফি আরছত সাতগানও সনত ছলছ্ ও আশার ও ছমান মাইয়াত। অর্থাৎ এই মুদ্রাটি সাতগাঁ বিভাগে তিন ও দশ ও আটশত সনে মুদ্রিত হইয়াছিল।

(*b*) ভিন্ন ছাঁচে তৈয়ারী। চতুর্দ্দল পদ্মের দলগুলি সুসম্পাদিত নহে। ওজন ১৬৩·৪ গ্রেণ। বেধ ১·১৮ ইঞ্চি। উল্টাপীঠের কিনারার লিপি কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু টাঁকশাল খুব সম্ভব সাতগাঁও। তারিখের এককে তিন ছিল বলিয়া ধরা যায়।

5. ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের নমুনার ছয়টি মুদ্রা। সবগুলিরই তারিখ ও টাঁকশালের নাম কাটিয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম তালিকায় এই মুদ্রাগুলির ভাওপীঠে "শাহ" শব্দটি তৃতীয় ছত্রের প্রথমে পড়া হইয়াছে। কিন্তু ছবির সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে উহা পরের লাইনের প্রথমে পঠিত হওয়া উচিত। উল্টাপীঠের লিপির তৃতীয় লাইনের শেষে "ইমিন" বলিয়া যে শব্দটি পড়া হইয়াছে, বর্ত্তমান মুদ্রাগুলি হইতে দেখা যায় যে, তাহা প্রকৃতপক্ষে "আলমনান্"।

6. ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের নমুনার চারিটি মুদ্রা। মাত্র একটিতে টাঁকশালের নাম পড়া যায়। কিন্তু 'জন্নতাবাদ' বলিয়া ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম তালিকায় যে টাঁকশালের নাম পড়া হইয়াছে, তাহা আমার নিকট 'চাটগানও' অর্থাৎ চাটগাঁ বলিয়া বোধ হয়। আরও পরিষ্কার এবং অক্ষত মুদ্রা না পাইলে এই টাঁকশালের নামটি প্রকৃত পক্ষে কি তাহার মীমাংসা সম্ভবপর নহে।

7. চারিটি মুদ্রার টাঁকশাল ও তারিখ নাই। এগুলি কর্ণেল নেভিল কর্তৃক বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১৯১৫ সনের পত্রিকার ৪৮৬ পৃষ্ঠায় শেষ প্যারায় বর্ণিত মুদ্রার অনুরূপ।

উপরে বর্ণিত মুদ্রাসমূহ আলোচনা করিয়া পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, আজাম শাহ ৮১৩ হিজরী পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। চীন হইতে তাঁহার নিকটে ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে ৮১১ হিজরীতে দূত আসিয়াছিল; এবং তাঁহার প্রতিদূত ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে ৮১২ হিজরীতে যাইয়া চীনের রাজসভায় পৌছিয়াছিল।

রিয়াজ-প্রণেতা আজাম শাহের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি অত্যা-

বশ্যক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রিয়াজ লিখিয়াছেন যে, আজাম শাহ ভাতুরিয়ার জমীদার রাজা গণেশের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। এইখানেই প্রশ্ন উঠে যে, ভাতুরিয়া কোথায় ছিল এবং ভাতুরিয়ার জমীদার রাজা গণেশই বা কে ছিলেন? ৮১৩ হিজরীর পরবর্ত্তী ৭—৮ বছরে বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রধান কীর্ত্তিমান পুরুষ এই রাজা গণেশ। এই রাজা গণেশের ব্যক্তিত্ব নির্ণয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে; মীমাংসায় কেহ এখনও পৌছিয়াছেন বলিয়া জানি না। রাজা গণেশের ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের মূল সূত্র হওয়া উচিত রিয়াজের উক্তি যে, তিনি ভাতুরিয়ার রাজা ছিলেন। ভাতুরিয়া স্বপ্ন নহে, মায়াও নহে;—ভাতুরিয়া একটি বিখ্যাত ভৌগোলিক বিভাগ,—উহাকে উড়াইয়া দিবার কোন উপায় নাই।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় বেভারিজ সাহেব রাজা গণেশ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, আইন-ই-আকবরিতেও ভাতুরিয়ার উল্লেখ আছে। রেনেল ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার বিখ্যাত বাঙ্গালার মানচিত্র প্রচারিত করেন, তখনও ভাতুরিয়া প্রকাণ্ড ভৌগোলিক বিভাগ। সঙ্গীয় ভাতুরিয়ার মানচিত্র রেনেলের মানচিত্র হইতে নকল করিয়া দেওয়া হইল। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, পাবনা ও রাজসাহী জেলার প্রায় সমস্তটা ভাতুরিয়ার অন্তর্গত ছিল,—রঙ্গপুর হইতে ঢাকাজেলা পর্য্যন্ত ভাতুরিয়ার বিস্তার ছিল। এখন ভাতুরিয়ার বিস্তার সঙ্কুচিত হইয়াছে; কিন্তু ভাতুরিয়া এখনও লুপ্ত হয় নাই। পাবনা জেলার কেন্দ্রে এখনও ভাতুরিয়া পরগণা বিদ্যমান। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে রোহিলা পটি বেণীপটি ইত্যাদির উদ্ভব ভাতুরিয়ার জমীদারদের ইতিহাসের সহিত জড়িত।

সৌভাগ্যক্রমে ভাতুরিয়ার জমীদারদের কাহিনী উত্তমরূপেই সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় তাঁহার অমূল্য 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে' ভাতুরিয়ার জমীদারীর উত্থান ও পতনের কাহিনী বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু লাইব্রেরীতে বসিয়া ইতিহাস রচনা করিতে চেষ্টা করিয়া আমরা যে, দেশের মর্ম্ম-কথা কিছুই জানিতে পারিতেছি না, দুর্গাচন্দ্রবাবুর বিবরণ পড়িয়া কেবলি এই কথা মনে হইতে থাকে। ভাতুরিয়ার জমীদারগণ এক সময় বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সকলের অপেক্ষা প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহাদের বহু কীর্ত্তি-কাহিনী দেশের মধ্যে উপকথার মত মুখে মুখে ছড়াইয়া আছে। দুর্গাচন্দ্রবাবু এইরূপ অনেক কাহিনী জড়াইয়া তাঁহার গ্রন্থে ভাতুরিয়ার জমীদারদের ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই এই বিবরণ পড়িয়া উঠিয়া বুঝিবেন যে, দুর্গাচন্দ্রবাবুর বিবরণে গালগল্প থাকিতে পারে; কিন্তু এই বিস্তৃত বিবরণের আগাগোড়াই কাল্পনিক হইতে পারে না। শত দেড়েক বছর মাত্র ভাতুরিয়ার পতন হইয়াছে;—এখনও ভাতুরিয়ার জমীদারদের প্রদত্ত দলিল-পত্র পাবনা রাজসাহী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। দুর্গাচন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, সম্রাট শাহজাহান ভাতুরিয়ার জমীদার উপেন্দ্র নারায়ণকে মালবের শাসনকর্ত্তা করিয়া ফারমান দিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং সেই ফারমান এখনও বিদ্যমান আছে। এইরূপ অনেক বাদশাহী দলিলপত্রের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। দুর্গাচন্দ্রবাবু বাঁচিয়া থাকিতে-থাকিতে, তাঁহার সাহায্যে এই সকল দলিল-পত্রের ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সাধারণ্যে প্রচারিত করা সহজসাধ্য। পাবনা-বগুড়া অঞ্চলে এমন উদ্যোগী কি কেহ নাই, যিনি অগ্রসর হইয়া এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন?

পূর্ব্বে (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২৮, ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা) সান্যাল মহাশয়ের প্রদত্ত ভাতুরিয়ার বিবরণ কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাতুরিয়ার প্রকৃত নাম ছিল "ভাদুড়িয়া" বা ভাদুড়ী-রাজ্য। ইলিয়াস শাহ ফিরোজশাহের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে কিরূপে দামনাশের সান্যাল ও ভাজনীর ভাদুড়ী বংশকে নিজের পক্ষভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং ভাদুড়ীদের চলন-বিলের উত্তরে, ও সান্যালদের চলন বিলের দক্ষিণে জায়গীর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। ভাদুড়ীদের রাজধানী সাতগড়া চলন বিলের উত্তরাংশ এক দ্বীপের উপর অবস্থিত ছিল। সান্যালদের রাজধানী ছিল সাঁতোড়ে,—বাড়ল নদীর তীরে।

ইলিয়াস শাহ একবার সোণারগাঁর নিকটস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ-জাতীয়া সুন্দরী যুবতী বিধবা দেখিয়া, তাহাকে হরণ করিয়া স্বীয় অবরোধে লইয়া আসেন। ইলিয়াস শাহের হিন্দু অমাত্যেরা সুলতানের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে, সুলতান বলিলেন,—এমন সুন্দর ফুলটি বনে ফুটিয়া বনেই শুকাইবে, ইহা ঠিক নহে। এই জন্যই

তিনি সেই সুন্দরী বিধবাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি তাঁহার হিন্দু অমাত্যদিগের মধ্যে একজনকে এই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেহই যখন সম্মত হইল না, তখন তিনি নিজেই এই রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন; এবং তাহার নাম ফুলমতী বেগম রাখিলেন। *

ইলিয়াস শাহ ফুলমতীর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। মৃত্যুকালে তিনি ফুলমতীর পুত্র মৈজুদ্দিনকে সুলতান নির্ব্বাচিত করিয়া গেলেন। মৈজুদ্দিন অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া সাঁতোড়ের জমীদার সত্যদেবের পুত্র কংসরাম মৈজুদ্দিনের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। এদিকে ইলিয়াসের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মৈজুদ্দিনের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইল। সাঁতোড়ের কংসরাম ও ভাদুড়িয়ার মধু খাঁ মৈজুদ্দিনের পক্ষ হইয়া লড়িলেন। ইলিয়াসের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদ্ধে নিহত হইল, এবং মৈজুদ্দিন সেকন্দর শাহ নাম ধারণ করিয়া দৃঢ়তর হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। কংসরাম তাঁহার অভিভাবকরূপে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেকন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজের হাতে রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

সেকন্দরের দুই রাণী ছিল। প্রথম রাণীর গর্ভে তাঁহার গিয়াসুদ্দিন নামে এক পুত্র এবং দ্বিতীয় রাণীর গর্ভে তাঁহার ১৮ জন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। বিমাতার ষড়যন্ত্রে গিয়াসুদ্দিন বিদ্রোহী হইলেন এবং বিদ্রোহী পুত্রের সহিত যুদ্ধে সুলতান সেকন্দর প্রাণ হারাইলেন। গিয়াসুদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; কিন্তু তিনি ভাদুড়ীদের চক্রান্তে প্রাণ হারাইলেন। ভাদুড়ীরা তাঁহার পুত্র সৈফুদ্দিনকে সিংহাসনে বসাইলেন। সৈফুদ্দিন সুলতান হইলেন; কিন্তু ভাদুড়িয়ার জমীদার গণেশ নারায়ণ তখন বাঙ্গালার প্রকৃত রাজা ছিলেন। সৈফুদ্দিন অকর্ম্মণ্য ও বিলাসী ছিলেন। তাঁহারও দুই রাণী ছিল। তাঁহার ছোট রাণীর পুত্র নসেরিত তাঁহার বড় রাণীর পুত্র আজিম অপেক্ষা বয়সে বড় ছিল। আজিম নিজেকে সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী মনে করিতেন; এবং বিমাতাকে পিতার উপপত্নী বলিয়া গণ্য করিতেন। গণেশ নারায়ণ আজিমের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু মুসলমান আমীরেরা নসেরিতের পক্ষ সমর্থন করিতেন। এই সময় সাঁতোড়ের জমীদার ছিলেন অবনীনাথ। তিনি গণেশ-পুত্র যদুনারায়ণের সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; এবং ভাদুড়ী ও সান্যাল জমীদারদের মধ্যে তখন প্রীতি ছিল।

সৈফুদ্দিনের মৃত্যুর পর নসেরিত মুসলমান আমীরগণের সাহায্যে রাজধানী দখল করিয়া শামসুদ্দিন বা শিহাবুদ্দিন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। আজিমও এদিকে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং সাঁতোড় ও ভাদুড়িয়ার জমীদারদের সাহায্য চাহিলেন। গণেশ সৈন্য লইয়া উত্তরদিকের পথ দিয়া আজিমের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু রাজধানী দখলে বিফল-মনোরথ হইয়া আজিমকে দক্ষিণ দিকে হটিয়া যাইয়া গণেশের সহিত মিলিতে চেষ্টা করিতে বলিলেন। কিন্তু গণেশের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই নসেরিত যাইয়া আজিমের উপর পড়িলেন এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন।

এদিকে গণেশ দ্রুত কুচ করিয়া সৈন্য লইয়া গৌড়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং অনায়াসেই অরক্ষিত গৌড় ও পাণ্ডুয়া দখল করিয়া বসিলেন। বিজয়ী নসেরিত এই বার্ত্তা পাইবামাত্র গণেশকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে নসেরিত হত হইলেন।

এইরূপে নসেরিতের মৃত্যুতে বাঙ্গালার সিংহাসন উত্তরাধিকারী-শূন্য হইয়া পড়িল। আজিমের আশমানতারা নামে এক কন্যা ছিল; কিন্তু মুসলমানী আইনে কন্যাতে সিংহাসনের উত্তরাধিকার বর্ত্তে না। এইরূপে গণেশ নারায়ণ বাঙ্গালার শূন্য সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে যদুনারায়ণ রাজা হইলেন, কিন্তু তিনি আজিমের কন্যা আশমানতারাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। যদুর পুত্র অনুপ নারায়ণ ভাদুড়িয়ার জমীদার হইয়াছিলেন। ভাদুড়িয়ার পরবর্ত্তী ইতিহাসের সহিত আর বর্ত্তমান নিবন্ধের কোন সংশ্রব নাই। কিন্তু দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

* এই ফুলমতীর কাহিনী দুর্গাচন্দ্রবাবু কোথায় পাইলেন, জানি না। কিন্তু এই ঘটনা সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। বজ্রযোগিনী ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণার বিখ্যাত গ্রাম। তথায় এখনও ফুলমতীর দীঘি নামে প্রকাণ্ড একটী প্রাচীন সরোবর বিদ্যমান। বজ্রযোগিনী গ্রামে যে এখনও ফুলমতীর দীঘি আছে, এই খবর দুর্গাচন্দ্র বাবু জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

ভাদুড়িয়ার প্রচণ্ড খাঁ শাহজাহান-পুত্র দারা কর্ত্তৃক রোহিল-খণ্ডের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন; এবং দেশে ফিরিলে তাঁহাকে লইয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে রোহিলা পটির উদ্ভব হয়। ভাদুড়িয়ার শেষ জমীদার রূপেন্দ্রনারায়ণের পিতা উপেন্দ্রনারায়ণ শাহজাহান কর্ত্তৃক মালবের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। এই নিয়োগ-ফার্ম্মান না কি এখনও বর্ত্তমান আছে। নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাম-জীবনের কৌশলে ভাদুড়িয়া ও সাঁতোড় এই দুই প্রাচীন জমীদার বংশেরই পতন হয়। ভাদুড়িয়ার শেষ জমীদার রূপ খাঁ বা রূপেন্দ্রনারায়ণ বহুদিন পর্য্যন্ত রামজীবনের সহিত লড়িয়া অবশেষে নিজ রাজধানী সাতগড়ায় অসিহস্তে যুদ্ধ করিতে-করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের আত্রাই ষ্টেশনের ছয় মাইল পূর্ব্বে সাতগড়ার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।

এই গেল দুর্গাচন্দ্রবাবুর সঙ্কলিত বিবরণের সংক্ষিপ্তসার। ভাদুড়িয়া, সাঁতোড়, সাতগড়া, রোহিলাপটি, বেণীপটি, একটাও অলীক নহে। ভাদুড়িয়ার ভাদুড়ীদের এবং সাঁতোড়ের সান্যাল-দের স্থান-ভ্রষ্ট আত্মীয়-স্বজন সারা দেশময় ছড়াইয়া আছেন। বিক্রমপুর মূলচরের সান্যালেরা সাঁতোড়বংশীয়। নাটোরের জমীদারী এখনও অব্যাহত ভাবে বর্ত্তমান। নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ পণ্ডিত, সাহিত্যরসজ্ঞ, প্রাচীন সাহিত্যিক ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁহাদের পরিবারের কাগজপত্রে দেশের অনেক ইতিহাস লুকাইয়া আছে। রামজীবনের সাঁতোড় ও ভাদুড়িয়া দখল সত্য কি না, তাহার উত্তর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ নিজেও দিতে পারেন। পাবনা-রাজসাহী সাঁতোড় ও ভাদুড়িয়ার কাহিনীতে এখনও ভরিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। তথাপি লাইব্রেরীতে বসিয়াই যদি আমরা ইতিহাস রচনা করিতে চেষ্টা করি এবং সেই দুশ্চেষ্টায় রাজা গণেশ কে ছিলেন, তাহার পরিচয় খুঁজিয়া না পাই, তবে অমন 'বৈজ্ঞানিক' ইতিহাস ভাগীরথীর জলে ভাসাইয়া দেওয়াই তাহার একমাত্র সদ্গতি।

বিরজা

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

(১)

সম্মুখে মৃত্যুর ভৈরবী ছবি, পশ্চাতে স্মৃতির অস্পষ্ট ছায়া! ধনকুবের ধনেশ রায় রোগ-শয্যায় পড়িয়া ভাবিতেছিলেন, যদি গোড়া থেকে আর একবার সুরু করবার সুযোগ পেতাম! এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভুল-ভ্রান্তিগুলো এড়াতে পারতাম! কিন্তু তাতেই বা কি হত? হয় ত এক ভুল হতে আর এক ভ্রান্তিতে গিয়ে পড়তাম। দৃষ্টি যার অন্ধ, সামনে যার অন্ধকার, সে কেমন করে সাম্‌নে পা ফেলে চল্‌বে? কোন্ অন্ধকার থেকে এসেছি তাও অজ্ঞাত, কোন্ অন্ধকারে যাব তাও জানি না। সবই অন্ধকার! যেখানে যাচ্ছি, সেখানে আরও অন্ধকার! হঠাৎ এক ঝলক চাঁদের আলো গলা-রূপার মত বিছানায় ছড়াইয়া পড়িল। ধনেশ সচকিতে চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে নারিকেল-কুঞ্জের আড়াল থেকে যেন আবীর মেখে চাঁদ উঠছে—সেদিন পূর্ণিমা। সেই অখণ্ড মণ্ডল বিধু রোগীর চোখের উপর যেন সুধা বর্ষণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন এক ঝলক মধু তাঁহার কাণেও ঢালিয়া দিল। ধনেশ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, স্বরতরঙ্গে সুধার বন্যা বহাইয়া কে গাইতে গাইতে যাইতেছে—

"আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে—
যথায় দিবা নিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে!"

ধনেশ উত্তেজনায় উঠিয়া বসিলেন। ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এমন দেশ কি আছে, যেখানে স্মৃতির জ্বালা নাই, কেবল আনন্দ? কোথায় সে নগর? কে আমায় তার পথ বলে দেবে? 'যাই চল' বল্‌লেই ত আর যাওয়া যায় না!"

নৈরাশ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধনেশের অবসন্ন শরীর শয্যায়

লুটাইয়া পড়িল। মুখে বলিলেন, হাম্বাগ। কিন্তু তাঁহার মন কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, কোথায় পথ, কোথায় পথ? অল্পক্ষণ পরে তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীবিলাস শয্যাপার্শ্বে আসিয়া শুনিল, ধনেশ আবল্যের ভরে বিড়বিড় করিয়া বলিতেছেন—"যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।"

বলিতে বলিতে যেন সেই ঘোর অন্ধকারের চাপে হাঁপাইয়া উঠিলেন। ধনেশ চক্ষু মেলিলেন এবং কিছুক্ষণ অনিশ্চিত ভাবে আগন্তুকের মুখ চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বিলু?"

"নিশ্চয়! কিন্তু ব্যাপারখানা কি? পাড়ি দেবার মতলব করছ নাকি? খামকা এ সখ কেন?"

"আমার রোগ কি জান?"

"নিশ্চয়! লিউকিমিয়া লিউকোসাইথিমিয়া, এনিমিয়া, এমনি অনেক মিঁয়া জুটেছেন। কিন্তু কোন মিঁয়াই ঘাল করতে পারবেন না। যেহেতু, ডাক্তারেরা এখনও হাল ছাড়েন নি।"

"ডাক্তারের কথা ছেড়ে দাও। যতক্ষণ আমার লোহার সিন্দুকে মাল থাকবে, ততক্ষণ ওরা হাল ছাড়বে না।"

এই সময় আবার গান উঠিল, 'যাই চল সেই নগরে।'

ধনেশ জিজ্ঞাসিলেন, "শুনছ? তুমি ত অনেক সন্ধানে ফের, এ নগরের কিছু খবর রাখ?"

"নিশ্চয়!—'আমার বাড়ীর কাছে আর্শী নগর, এক পড়শি বসত করে।' ও সব পরকালের কথা ছেড়ে দাও, এখন যা বল্‌তে এসেছি, বলি। আমার জানা একটী সাহিত্যিক, তোমার জীবনী লিখবেন মনে করেছেন। বোধ হয়, তাঁরও বিশ্বাস, তুমি এবার পাড়ি দিচ্ছ।"

"তোমারই কি বিশ্বাস হয় আমি বাঁচব?"

"নিশ্চয়।"

"ধন্যবাদ! কিন্তু আমার জীবনী লিখে কি হবে? কিছু লাভ আছে কি?"

"নিশ্চয়! এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাবে। লেখক কিছু পয়সা পাবেন, আর লোক-শিক্ষা হবে।"

"লোক-শিক্ষা? কেন? আমি, জর্জ্ ওয়াশিংটন, না, ম্যাজিনী?"

"নিশ্চয়! তুমি তাঁদের চেয়েও বড়। তুমি বাংলার রথস্‌চাইল্ড্‌। কি করে তুমি এত টাকা উপার্জ্জন করলে; তোমার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, মতি, গতি কি রকম? তুমি কি দিয়ে ভাত খাও, কখন শোও, কখন উঠ? তুমি মিষ্টি বেশী ভালবাস, কি টক? তোমার হাই তোল্‌বার, হাঁচবার, কাশবার, একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে কি না? তুমি বাঁ-পাশ ফিরে শোও, কি ডান-পাশ চেপে ঘুমোও? তোমার মাথাটা আগে জন্মেছে কি পা'দুটো? চেক্ লেখবার সময় আড় করে কলম ধর, কি সিধে? ভেবে কাজ কর, কি কাজ করবার পরে ভাব? কি রকম স্বপ্ন দেখ—এই সব প্রশ্ন করে তিনি আমাকে একটা লিষ্ট দিয়েছেন—"

"পুড়িয়ে ফেল।"

"নিশ্চয়! কিন্তু যারা টাকা চায়, অথচ খাটতে চায় না, তারা তোমার সম্বন্ধে এ সব দুরুহ বিষয়ের মীমাংসা না করে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারছে না।"

"ভাবলেই পারে, মা লক্ষ্মীর কৃপা।"

"নিশ্চয়! কিন্তু ওটা ফাঁকা আওয়াজ। তোমার ওপরই বা কৃপা হয় কেন, আর যারা সাধ্য সাধনা করছে, তারাই বা পায় না কেন? তারাও মানুষ, তুমিও মানুষ। তাই তারা তোমার ভেতরের চেহারাটা দেখতে চায়।"

"ভেতরের চেহারা! কেমন করে তা জানা যাবে? তা কি যায়?"

"নিশ্চয়! যাঁরা সুক্ষ্মদর্শী, মানব-চরিত্রের রহস্য বুঝেন, তাঁরা তোমার আহার, ব্যবহার আচরণ থেকে সব ঠিক করে নিতে পারেন।"

"হরি বল! মানুষ কি সহজে আত্ম-প্রকাশ করে! তার ভেতরকার যা ঢাক্‌বার জন্যে সে সর্ব্বদা সতর্ক হয়ে থাকে। কি জান, ভায়া, প্রতি মানুষেরই একটা আদর্শ আছে। যে যেমনটী হতে ইচ্ছা করে, লোকের কাছে সে তেমনটী দেখায়। এই মিথ্যার ভাণ করতে করতে ক্রমে সে আপনার সত্য-স্বরূপকে ভুলে যায়। সংসারে এই খেলাই চল্‌ছে। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনায় যখন এই মিথ্যার স্তম্ভ ফেটে নৃসিংহমূর্ত্তি বেরিয়ে পড়ে, তখন সে আপনা আপনি স্তম্ভিত হয়ে যায়!"

কয়েকটা কথা এক সঙ্গে বলিয়া ধনেশ নির্জীব হইয়া পড়িলেন। বিলু তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে করিতে বলিল, "নিশ্চয়! কিন্তু কাজ কি, ভাই, সে নৃসিংহমূর্ত্তি প্রকাশ

করে? মিথ্যার স্তম্ভটা কেন খাড়াই থাক না। মিথ্যাই যখন চল্‌ছে—”

“না, ভাই, তা হয় না! সংসারে মিথ্যা চলে বটে, কিন্তু সত্যই থাকে! সেই সত্যকে ঢাকবার জন্য মিথ্যার এই যে প্রাণপণ চেষ্টা, দিন রাত লড়াই চলছে, তুমি কি মনে কর, তা অমনি অমনি যায়? কোন ফল হয় না? প্রকৃতি কড়ায়-গণ্ডায় তার শোধ নিয়ে দণ্ড দেন্! নইলে আজ আমি নিরক্তে বেলে মাছের মত পড়ে কেন?”

শ্রীবিলাস বিস্মিত হইয়া বলিল, “নিশ্চয়! কিন্তু তুমি পড়ে কেন?”

“আশ্চর্য্য হয়ো না! তুমি আমার বাল্যবন্ধু, রোজ আমায় দেখছ; আমার ভিতরের চেহারা তোমারই চোখে কখন পড়ে নি, তা তোমার জীবনী-লেখক কি আঁকবেন? শোন! আগে একটু জল দাও, আজ আমার সেই লুকানো মূর্ত্তি তোমাকে দেখাব।”

বিলু জল দিতে দিতে বলিল, “নিশ্চয়! কিন্তু মাপ কর ভাই, আর সে নৃসিংহমূর্ত্তি বার করে কাজ নাই! আমি তোমায় যা দেখছি, তাইতেই খুসী আছি।”

জল পান করিয়া কিছু সুস্থ হইয়া ধনেশ বলিলেন, “না! আজ ক’দিন ধরে আমার মনে হয়েছে, তোমাকে ঠকিয়ে আমি তোমার স্নেহ নিচ্ছি। জীবনে অনেকের অনেক করেছি; কিন্তু অকারণ স্নেহ, যদি কোথাও পেয়ে থাকি, সে তোমার কাছে।”

শ্রীবিলাস ব্যস্ত হইয়া বলিল, “নিশ্চয়! কিন্তু ভাই, তুমি তার জন্যে কেন এত উতলা হচ্ছ? আমার কথা তুমি কি জান না? এমন কি অন্যায় তুমি করতে পারো, যার আমার কাছে মাপ নেই?”

“তা জানি। আমার সব অন্যায় তুমি মাপ করবে, তাও জানি। আর জানি বলেই আমার এত অনুতাপ হচ্ছে।”

“নিশ্চয়! কিন্তু দরকার কি অনুতাপে! আমি জানতেও চাই নি, শুনতেও চাইনি। শোন, এই অসুখে তোমার কল্পনা বিকৃত হয়েছে, তুমি তিলকে তাল দেখছ। এখন এ সব আলোচনায় কাজ কি ভাই? তুমি ভাল হয়ে ওঠ—”

“ভাল হই, সে ত ভাল কথা! কিন্তু মন না মতি, আজ বল্‌তে চাচ্ছি, কাল হয় ত আবার লুকুতে ইচ্ছা হবে।”

“নিশ্চয়! কিন্তু তা হয় হবে। এখন তুমি একটু জিরোও। অনেক কথা কয়েছ!”

“আচ্ছা, একটু জিরিয়েই বল্‌ছি। সব কথাগুলোও মনে মনে একটু গুছিয়ে নি।”

বাহিরে চাঁদের আলো আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘরের কোণে সবুজ আবরণের ভিতর মিটমিট করিয়া একটা বাতি জ্বলিতেছে; আর একটা ক্লক্ ঘড়ি অবিরাম শব্দ করিতেছে—টিক্ টিক্ টিক্! ধনেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, “কলেজ থেকে বেরিয়ে মনে করেছিলাম, বে-থা করব না, পড়া-শুনা নিয়েই থাকব, বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন, আমি একলা মানুষ, রাজার হালে চলে যাবে।”

“নিশ্চয়! তোমাকে বে’ করতে রাজি করবার জন্য তোমার বোন্ আমাকে বিস্তর অনুরোধ করেছিলেন।”

“হাঁ, নলিনীর অনুরোধে তুমিও আমাকে কম ব্যতিবস্ত করে তোল নি। তোমাদের কথা তখন শুনলেই ভাল করতাম, কিন্তু জান ত ভাই, আমি চিরদিনই একবগ্গা। তখন মনে করেছিলাম, নারীর আকর্ষণ আমার নাই, খামকা একটা আপদ জোটান কেন? আপদ যে আপনি এসে জুটবে, তখন ভাবিনি।”

“নিশ্চয়! কিন্তু আপনি এসে জুটবে কেন বলছ? বিরজাকে ত আপনি পছন্দ করে বিয়ে করে এনেছ।”

“বিরজা নয়, যার কথা বলছি, সে যথার্থই আপদ।”

“নিশ্চয়! কিন্তু কে সে?”

“সে—সে! তার বেশী আর জানার দরকার নাই। যখন সে তার রূপ, যৌবন, রুক্ষকেশ, মলিন বেশ, দর দর অশ্রু, কাতর প্রার্থনা আর একটা ছয় সাত মাসের শিশু নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন রাত প্রায় এগারটা। আমি ‘লনে’র উপর বকুলতলায় সেই বেঞ্চখানায় বসে আছি —এমন ফুটফুটে নয়, কাক্‌ডিমে জ্যোৎস্না। আমি ভাব্‌ছিলাম, এমন ফুরফুরে বাতাস, ফুলের গন্ধ, চারিদিকে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি, এ সকলের চেয়ে নারীর আকর্ষণ কিসে বেশী! আমার সে ভাবনাকে বিদ্রূপ করে হঠাৎ যেন

বসন্তের বাতাস, বকুলের গন্ধ, চাঁদের আলো মূর্ত্তিমতী হয়ে আমার চোখের উপর ফুটে উঠ্‌ল—”

“নিশ্চয়! কিন্তু এত কবিত্ব তোমার ভিতর ছিল?”

“আমিই তা জান্‌তাম্‌ না, ভাই। সহসা তার নিঃশব্দ আগমনে আমি একটু চমকে উঠ্‌লাম। মনে আছে ত কমটের পজিটিভ্‌ ফিলজফি (ধ্রুবদর্শন) নিয়ে তখন আমরা কি রকম মেতেছিলাম?”

“নিশ্চয়! সাতপুরুষের পূজ বন্ধ করে দেওয়া গেল। পাঁটাখোর ঠাকুরের পরিবর্ত্তে কম্‌টের উপাস্য প্রতিমা পটে আঁকিয়ে প্রতিষ্ঠা করবার পরামর্শ হল। সে সময় তোমাদের পুরুতের টিকি-নাড়া কি ভোলবার?”

“শিশুকোলে সেই যুবতীকে দেখে আমার মনে হল, মানব-ধর্ম্মের উপাসক কম্‌টের সেই উপাস্য প্রতিমা ত আমার সামনে দাঁড়িয়ে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার বুকটা যেন ভরে উঠ্‌ল। আমি নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। একটু পরে যেন সমস্ত স্তব্ধ প্রকৃতির মুখে ভাষা দিয়ে সে বল্‌লে, ‘বাবু আমার এই ছেলেটীকে বাচান!’ বলে শিশুকে আমার পায়ের তলায় শুইয়ে দিলে। আমি ছেলেটীকে কোলে তুলে নিতেই উৰ্দ্ধমুখে একবার ভগবানের নামোচ্চারণ করে সেও হঠাৎ আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল—”

“নিশ্চয়! কিন্তু মারা গেল?”

“না। অনেক শুশ্রূষার পর একটু গরম দুধ খাওয়াতে যখন তার কথা ফুট্‌ল, তখন পরিচয় শুন্‌লাম, কিছুদিন হল স্বামী মারা গিয়েছে। কেউ নেই। থাক্‌বার ভেতর এক খুড়তুতো ভাই, সে ঠাঁই দেয় না। দুদিন খাওয়া হয়নি। ভগবান শিশুর জন্য তার বুকে যে আহার রেখেছিলেন, তাও শুকিয়ে উঠেছে!”

“নিশ্চয়! আহা-হা! তুমি তাকে অন্দরে মাসীমার কাছে পাঠিয়ে দিলে?”

“না, একে যুবতী, তায় সুন্দরী, সাহস হল না। বিশেষ মাসীমা তখন শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন।”

“নিশ্চয়! কিন্তু তা হলই বা! ভয় কিসের?”

“ভয়—আমার নয়, তার কলঙ্কের ভয়।”

“নিশ্চয়! তবে নগদ বিদায় করলে বুঝি?”

“না, সঙ্গে করে তার বাড়ী নিয়ে গেলাম!”

“নিশ্চয়! নিশ্চয়! তার পর?”

“তার পর যতটুকু সাহায্য সে আবশ্যক মনে করে স্বেচ্ছায় নিলে, ততটুকু বন্দোবস্ত করে দিলাম। মাঝে মাঝে খবর নিতে যাই। ক্রমে রোজ যাওয়া সুরু হল।”

“নিশ্চয়! তার পর কম্‌টের দেবী বুঝি তোমার কণ্ঠে মালা পরালেন?”

“না, বুকে জ্বালা ধরালেন। শোন! এমনি সাত আট মাস কেটে গেল। তার মাসিক খরচের টাকা আমি নিজে হাতে করে দিতাম। একদিন সেই টাকা দিতে গেলে আগেকার মত হাত পেতে নিলে না, বল্‌লে, ‘আপনার চাউনীতে আমার গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। আপনার সাহায্য আমার বিষ মনে হচ্ছে।’”

“নিশ্চয়? তুমি কিছু বল্‌লে না?”

“কম্‌টে যে চেষ্ট্‌ ম্যারেজের কথা বলেছেন, সেই দেহ-সম্বন্ধহীন পবিত্র বিবাহের কথা তুলে বোঝালাম, আমাকে বিবাহ করে শুধু তোমাকে আর তোমার ছেলেটীকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার অধিকারটুকু আমায় দাও—”

“নিশ্চয়! তাতে কি বল্‌লে?”

“বল্‌লে, ‘বাবু, আপনাকে আমি দেবতা বলেই জানি, সে সিংহাসন থেকে মাটীর ওপর নেমে এসে আমায় ব্যথা দেবেন না’।”

“নিশ্চয়! তার পর?”

“তার পর আর তার দেখা পাইনি।”

“নিশ্চয়! তবে ত চুকে-বুকে গেছে।”

“কৈ গেছে? এখনও সে তেমনি আমার বুক জুড়ে বসে রয়েছে!”

“নিশ্চয়! কিন্তু তবে বে করলে কেন?”

“তার ওপর রাগে—অভিমানে; আপনার ওপর ঘৃণায়! সে লুকাবার পর ক্ষেপে যাব বলে মনে হয়েছিল। দিনে দশবার ছুটে তার বাড়ী যেতাম, চারিদিকে ঘুরে বেড়াতাম। একদিন ভাবলাম, যে আমায় মাটীর পুতুলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল, তার জন্য এত কেন? কিন্তু কি করি—মানুষের একটা নেশা চাই, নইলে দিন কাটে না—পড়াশুনায় মন বসে না। ভাবলাম, টাকার নেশা বড় নেশা—”

“নিশ্চয়।”

“রোজগারের ফন্দি করতে লাগ্‌লাম। একেবারে

মরিয়া হয়ে স্পেকুলেশন্ সুরু করলাম। দুহাতে রোজগার করি, দশ হাতে বিলাই। কেন জান? সে যেখানে থাক্, আমার সুখ্যাতি শুন্‌তে পাবে বলে। বুঝবে, যে তাকে চেয়েছিল, সে একটা মানুষের মত মানুষ।"

"নিশ্চয়! কিন্তু তাতে লাভ কি?"

"লাভ লোকসান খতায় কে? এমনি করে রোজগারের নেশায় দিনটা বেশ কেটে যায়, কিন্তু রাত্তির আর কাটে না। একটা সঙ্গ চাই। বিবাহ করলাম।"

"নিশ্চয়! কিন্তু ভাল করনি। তার চেয়ে জুয়াখেলায় মন দিলে ভাল হত। সেও একটা পেল্লায় নেশা।"

ধনেশ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "জুয়াই ত খেলেছি, কিন্তু একটা প্রাণ নিয়ে।"

"নিশ্চয়! তোমার স্ত্রীকে এ সব কথা বলেছ?

"না। অনেকবার বলি-বলি করে বল্‌তে পারি নি।"

"নিশ্চয়! না জেনে যদি সে সুখে থাকে—"

"ক্ষেপেছ! প্রাণহীন মাটীর পুতুল নিয়ে কে সুখী হয়! তাকে হারাণোর চেয়ে এইটেই আমার বড় দুঃখ, খামকা খেয়ালের ওপর একটা অমূল্য জীবন মাটি করে দিলাম!"

(২)

বিলু বাতাস করিতেছিল। মাসীমা পথ্য দিতে আসিলে ধনেশ জিজ্ঞাসিলেন, "মাসিমা, বৌ কি করছে?"

"বৌ'এর আর কাজ কি, বাছা, সেই রাধাকৃষ্ণের পট নিয়ে বসে আছেন। রকম রকম মালা গাঁথা হচ্ছে, রকম রকম সাজগোজ।"

"হাঁ, মাসিমা, সেদিন যে বিলুকে দিয়ে কাপড়-গয়না আনিয়ে দিলাম, তা পরেছিল?"

"ওমা, পরে না আবার! সেই দিনই পরেছে! বৌ-মা ত ঐসব নিয়েই আছেন।"

"মাসিমা, তুমি রাগ কোর না।"

"আমার রাগ কি, বাছা? তবে তোমার এই নিদেন ব্যায়রাম! কাল বিধুঠাকুরঝি এসে কেঁটিয়ে কেঁটিয়ে কত বলে গেল।"

"মাসিমা, ও যদি ঐতে ভাল থাকে কার কি ক্ষতি?"

মাসিমার মুখ বিকৃত হইল। তিনি প্রসঙ্গ পাল্‌টাইয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আজ কেমন আছ, বাবা?"

"ভাল আর কৈ, মাসিমা?"

"ডাক্তারেরা হাওয়া বদল করবার কথা বল্‌ছে না?"

ধনেশ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "হাওয়া বদল? হাঁ, তা করতে হবে বৈ কি!"

"কোথায় যাবে মনে করেছ?"

উত্তরে ধনেশ একটুমাত্র হাসিলেন।

মাসিমা পথ্য পান করাইয়া চলিয়া গেলেন। রোগী প্রশ্ন করিল, "বিলু, ম'লে কোথায় যায় বল্‌তে পার?"

"নিশ্চয়! কিন্তু না মলে ত জানা যায় না।"

"যেখানেই যাই, দিন রাত এই যে মন পুড়্‌ছে, এর হাত থেকে ত এড়াব?"

"নিশ্চয়! কিন্তু মন যদি সঙ্গে যায়?"

ধনেশ চকিত হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ! মন সঙ্গে যায়! না বিলু, তা হতে পারে না! সৃষ্টিকর্ত্তা যদি কেউ থাকেন, তিনি এমন নিষ্ঠুর হতে পারেন না।"

"নিশ্চয়! কিন্তু তার প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ! বুঝেই দেখ না, আমি ত আর এই নূতন জন্মাইনি! কতবার জন্মেছি, কতবার মরেছি। আর-জন্মে কি অবস্থা ছিল, জানি না। কিন্তু এ জন্মে বাবা যতদিন ছিলেন, সে বাইশ তেইশ বছর ত বেশ শান্তিতেই ছিলাম। কোন যন্ত্রণা ছিল না।"

"নিশ্চয়! কিন্তু তবু এল ত!"

"সেই ত আরও আশ্চর্য্য! ছিল না, আমি ডেকেও আনি নি, তবু এল! কিছুই বোঝ্‌বার যো নেই! আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই, ভাবনা আসে; আমি সুখী হতে চাই, কে হতে দেয় না! কিছুই জানা যায় না! ঘোর অন্ধকার! এই অন্ধকারে জীব জোনাকীর মত একবার জ্বল্‌ছে, একবার নিব্‌ছে! অতি ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু সেইটুকুর ভিতর কত তাপ, কত দুঃখ, কত অশান্তি!"

"নিশ্চয়! কিন্তু তবু সুখ শান্তি বলে জিনিস আছে, নইলে তার জন্যে মানুষ ঘোরে কেন?"

"ঐ ঘোরাই সার! আলেয়ার আলো—লোভ দেখিয়ে ঘুরিয়ে মারে! বিলু, যদি এমন একটা লোক বার করতে পার, যে বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পারে, আমি সুখী, তাকে আমার সমস্ত বিষয় লিখে দিতে রাজি আছি! না, না, ও-দু'টো একেবারেই ভুয়ো! জীবনে দুঃখই সার, দুঃখই সত্য!"

"নিশ্চয়! কিন্তু দুঃখের যে দরকার! না পোড়ালে সোণা খাঁটি হয় না।"

"খাঁটি সোণাই ত ছিলাম, ভাই! তাতে খাদ মিশিয়ে মাটী করে, আবার পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি করবার দরকার? তা হলে বলতে হয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল দুঃখ দেওয়া! এ ত দানবের কল্পনা।"

"নিশ্চয়! তাই মনে হয়। কিন্তু আমি একখানি বইএ যেমন পড়েছি, তোমাকে তাই বলতে পারি। ফুলের গন্ধের মত মানব-জীবনের চরম বিকাশ—প্রেম! যে গুণের জন্য মানুষ—মানুষ, সে গুণ যে ঈশ্বরে নাই, তা কল্পনা করা যায় না।"

"বেশ ত! মেনে নিলাম, তিনি খুব প্রেমময়! কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য কিছু ত বুঝতে পারা যায় না। জিজ্ঞাসা করলে তুমি সেই পুরাণো পড়া আওড়াবে—প্রেম-ময়ের লীলা!"

"নিশ্চয়! কিন্তু প্রেমলীলা ত আপনা আপনি উপভোগ হয় না, প্রেম দেবার একটা পাত্র চাই, খেল্‌তে গেলে একজন খেলুড়ী দরকার! এই জন্য সৃষ্টির প্রয়োজন!"

"তাই বা কৈ খেল্‌ছেন, বিলু? এ যে গৈবী খেলা। অলক্ষ্যে থেকে এমন এক এক চাল চাল্‌ছেন যে—অস্থির; একেবারে বাজী মাৎ! খেলতে চান, সাম্‌না-সাম্‌নি এসে খেলুন না। লুকিয়ে আছেন কেন? এর ত মানে বোঝা যায় না।"

"নিশ্চয়! কিন্তু তিনি লুকিয়ে আছেন, আমরা তাঁকে খুঁজ্‌ব বলে। ভালবাসায় এমনি একটা লুকোচুরি আছে। মনে হয়, আমাকে খুঁজে নিক্‌!"

"বিলু, তবে সেও কি লুকিয়ে ছিল, আমি তাকে খুঁজ্‌ব বলে? কিন্তু এত খুঁজ্‌লাম, দেখা ত পেলাম না। এও কি তাঁর খেলা?"

"নিশ্চয়! এই নৈরাশ্যে যদি একবার তাঁর পানে ফিরে চায়। দুঃখ না পেলে কে তাঁকে খুঁজ্‌ত? এমনি নিরাশ হয়েই ত বিল্বমঙ্গল ভগবান্‌কে লাভ করেছিল!"

"বড় সাধ হয়। ভালবাস্‌ব বলে, বিবাহ করেছিলাম! পারলাম না। যদি এমন কেউ থাকে, তাকে আমার এই বুকভরা ভালবাসা দিতে পারি—"

"নিশ্চয়! পারবে, পারবে, পারবে!"

"কিন্তু আর সময় কোথা? মরণ-কালে হরিনাম—"

"নিশ্চয়! কিন্তু মরণ-কাল তোমায় কে বল্‌লে? নিশ্চয় নয়।"

কিন্তু বিলুর এই আশ্বাস-বাক্য সত্ত্বেও ধনেশের পীড়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মাসিমা সাশ্রুনয়নে বিরজাকে বলিলেন, "বৌমা, আমার একটি কথা রাখবে, বাছা?"

"কি, মাসিমা?"

"বাছা, এ-কালের ছেলে-মেয়েরা এখন কিছুই মানে না। এত বারণ করলেম, শুন্‌লে না, তোমার শ্বশুর মারা যাবার পর, সাত-পুরুষের পূজা ধনেশ তুলে দিলে! এই বাড়ীর এই উঠানে লক্ষ বলি হয়েছে। কিসে কি হয়, কে বল্‌তে পারে! শুন্‌তে পাই, ধনেশের রক্ত দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে! হয় ত দেবী বিমুখ হয়েছেন। বাছা, তুমি শাক্ত বংশের মেয়ে, শাক্ত কুলের বউ, কৃষ্ণকালী এক, কিন্তু তবু যে মূর্ত্তি যার ইষ্ট। আমার একটি কথা শোন, তুমি কায়-মনে মানত কর, মাকে খপ্পর ভরে রক্ত দেব! দেখ, বাছা, তাতে যদি কিছু হয়। নইলে কপাল ত পুড়েইছে!"

মাসীমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বিরজা কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "কাঁদ কেন, মাসিমা? তাই দেব, আমি মানত করলেম।" বলিয়া বিরজা যুক্তকরে দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিল।

কিন্তু বিরজার সে নীরব প্রার্থনা যে অন্তর্য্যামী দেবীর শ্রুতিগোচর হইল, তাহার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। ধনেশের জীবন-দীপ ক্রমেই ক্ষীণ, ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। মাসীমা ক্ষণে ক্ষণে সশঙ্ক নয়নে বিরজার সীমন্ত-সিন্দূর পানে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বধূর কপাল আলো করিয়া উজ্জ্বল তারকার ন্যায় আয়তি-চিহ্ন জ্বলিতেছে! মাসীমা চোখের জল সম্বরণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আ মরি-মরি!, এমন কপাল কি পুড়্‌বে! কে জানে, মায়ের মনে কি আছে! অপরাধ ত কম নয়! মা, অজ্ঞান বালকের অপরাধ ক্ষমা কর, মা!

ক্রমে ধনেশের ইন্দ্রতুল্য গৃহের আবহাওয়া যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। হেথা হোথা চুপে চুপে কথা, চোখে চোখে ইঙ্গিত! ঝটিকার পূর্ব্বে স্বভাব যেমন থম্ থম্

করে, সুমস্ত বাড়ীখানা তেমনি যেন এক অলক্ষ্য আবির্ভাবে গম্ গম্ করিতে লাগিল।

শ্রীবিলাস বিল্বমঙ্গল পড়িতেছিল, ধনেশ নিমীলিত নেত্রে নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিলেন। নিঃশব্দ পদে ডাক্তার আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলে ধনেশ ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার, আমি ছেলেমানুষ নই! এখনও তুমি বল্‌তে চাও, আশা আছে?"

ডাক্তার দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আছে!"

"এখনও উপায় আছে?"

"আছে! সেই উপায় কর্‌ব বলেই আজ আমি একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।"

"কি উপায়?"

"রক্ত-সঞ্চার। আমি লোক সঙ্গে করে এনেছি। এই কাজের কাজী একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকও এসেছেন!"

"না, না, যার-তার রক্ত আমি নেব না।"

"নিশ্চয়! যার তার রক্ত দরকার কি?" বলিয়া শ্রীবিলাস জামার আস্তিন গুটাইয়া হাত বাড়াইয়া দিল।

ডাক্তার বিশেষজ্ঞকে ভিতরে আনাইয়া গরম জলে অস্ত্র ও সঞ্চালন-যন্ত্র প্রভৃতি ধৌত করিয়া বলিল, "কিন্তু একটু বেশী পরিমাণ রক্ত চাই। আমি একজন জোয়ালো লোক এনেছিলুম।"

"নিশ্চয়! তোমার যতটা দরকার নাও।"

বিশেষজ্ঞ বিলুকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "দুর্ব্বল বোধ হলেই ইঙ্গিত করবেন" বলিয়া শ্রীবিলাসকে রুগ্ন-শয্যায় শয়ন করাইয়া তাহার হাতে অস্ত্র-প্রয়োগ করিবার উপক্রম করিতেই একটা নারী দ্রুতপদে আসিয়া কহিল, "ডাক্তার-বাবু, এ অধিকার আমার!"

"নিশ্চয়!" বলিয়া শ্রীবিলাস উঠিল। ধনেশ পত্নীর দীপ্তিমান মুখমণ্ডল দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "তোমার?"

দিব্যজ্যোতিরুদ্ভাসিত দুই চক্ষু স্বামীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া বিরজা বলিল, "কার তবে?"

"কিন্তু কি অধিকারে আমি তা নেব? তোমাকে আমি কি দিয়েছি?"

"তুমি আমাকে ভালবাস্‌বার অধিকার দিয়েছ। সেই অধিকারেই আমি দেব। যদি আমাকে বিমুখ কর, আমি তোমার পায় নিশ্চয় আজ প্রাণ-বিসর্জ্জন করব। ডাক্তার বাবু, দেরী করবেন না"

বিশেষজ্ঞ বিরজাকে পরীক্ষা করিয়া ধনেশের পার্শ্বে শয়ন করাইলেন! অতঃপর উভয়ের বাহুতে অস্ত্রাঘাতান্তে নল দ্বারা সংযোজন করিয়া দিলেন। ধীরে ধীরে শোণিত সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বিরজার মুখে কোনরূপ আশঙ্কাসূচক পরিবর্ত্তনের আভাস লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত গৃহ-চিকিৎসক তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়াছিল। কিন্তু সে পুলক-প্রফুল্ল মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ভিন্ন আর কিছুরই আভাস পাওয়া গেল না।

ডাক্তার বিরজার বাহুমুক্ত করিয়া দিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেই সে অপর হস্তে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"আরও নিন, আরও নিন, আমার শরীরের সব রক্ত নিন।"

"আর দরকার নাই, মা! এর পর আপনি ভারি কাহিল হয়ে পড়বেন।"

বিরজা একটু হাসিল মাত্র। অমিয়-পূর্ণ স্বরে ধনেশ ডাকিলেন, "বিরজা!"

"উঁ! আজ আমাদের সত্যি বিয়ে।"

ডাক্তার বিরজাকে যথারীতি মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল, "উঠুন, মা!"

কিন্তু বধূ তাহার বাঞ্ছিত শয্যা ত্যাগ করিল না।

আমদানি-বাণিজ্য

[শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ্-আর-ই-এস্]

সকলেই জানেন যে বিদেশ হইতে এদেশে কোটী-কোটী টাকার দ্রব্য আমদানি হইতেছে। কিরূপে আমদানি হয়, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বিদেশ হইতে মাল আনাইতে হইলে তিন ব্যক্তি বা সঙ্ঘের সাহচর্য্যের প্রয়োজন—আমদানিকারক (Importer), রপ্তানিকারক (Exporter) ও ব্যাঙ্ক। এদেশে যিনি মাল আনাইবেন, তিনি আমদানিকারক; বিদেশ হইতে যিনি মাল পাঠাইবেন, তিনি রপ্তানিকারক; এবং আমদানি ও রপ্তানিকারকগণের মাঝখানে থাকিয়া যে ব্যক্তি বা সঙ্ঘ এই ব্যবসা সম্ভবপর করিবে, তাহা ব্যাঙ্ক।

আমাদের দৃষ্টান্তে যে ব্যক্তি, সঙ্ঘ বা ব্যাঙ্কের নাম থাকিবে, তাহা সমস্তই কাল্পনিক।

কলিকাতার ব্যবসায়ী ধিনুরাম গোয়েনকা লণ্ডন হইতে কিছু লোহার জিনিস আমদানি করিতে চায়। তাহার সহিত লণ্ডনের আয়রণ কোম্পানীর এ সম্বন্ধে কিছু লেখালিখি হইয়া গিয়াছে। উভয়ের পরিচয় হয় প্রথম খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া। পরে আয়রণ কোম্পানী ধিনুরাম গোয়েনকাকে আপনাদের দ্রব্য-তালিকাও পাঠাইয়াছিল। ধিনুরাম গোয়েনকা আয়রণ কোম্পানীকে ৫০০০ পাউণ্ডের লোহার নানাবিধ দ্রব্য পাঠাইতে লিখিয়াছিল। কিন্তু তাহারা জবাব দিয়াছে যে, ভাল ধার-পত্র (Letter of Credit) না পাইলে তাহারা মাল পাঠাইতে পারে না; কারণ, ধিনুরাম গোয়েনকার উপরে হুণ্ডী কাটিলে, লণ্ডনের কোন ব্যাঙ্ক তাহা কিনিতে চাহিবে না। তবে নগদ ৫০০০ পাউণ্ড পাঠাইলে, তাহারা মাল পাঠাইতে পারে।

এবার ধিনুরাম গোয়েনকা তাহার ব্যাঙ্কার্স কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট গেল। এই ব্যাঙ্কের সহিত তাহার অনেক দিনের পরিচয়; কিন্তু ইহাদের সাহায্যে সে কখনও বিলাতী মাল আমদানি করে নাই। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মক্কেল ধিনুরাম গোয়েনকাকে বেশ জানেন। তিনি তাহার হইয়া ধার-পত্র ছাড়িতে (Letter of Credit open করিতে) রাজি হইলেন। ম্যানেজার ধার-পত্র সম্পর্কে ৫০০০ পাউণ্ডের জন্য শতকরা ২০ টাকা হিসাবে জমা চাহিলেন। ধিনুরাম তাহাতে রাজি হইল এবং ১৫৲ টাকা হিসাবে এক পাউণ্ডের দর করিয়া ১৫০০০৲ টাকা জমা দিল। যতদিন পর্য্যন্ত ধিনুরামের উপর ৫০০০ পাউণ্ডের হুণ্ডী বা বিল শোধ হইয়া না যায়, ততদিন ব্যাঙ্ক বিনা সুদে এই টাকা ধরিয়া রাখিবে, এই সর্ত্ত হইল।

ধিনুরাম কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ককে নিম্নলিখিত 'ক্ষমতাপত্র' (Letter of Authority) প্রদান করিল—

১লা জানুয়ারী ১৯২১।

ম্যানেজার,

কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

কলিকাতা।

আমি এতদ্বারা আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, লণ্ডনের আয়রণ কোম্পানী আগামী ৩০শে জুন ১৯২১ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে-ভাড়া-চুকাইয়া-দেওয়া (Freight Prepaid) লৌহদ্রব্য রপ্তানি সম্পর্কে মোট ৫০০০ পাউণ্ডের যে হুণ্ডী বা বিল আমার উপর কাটিবে, তাহা আপনারা কিনিয়া লইবেন। এই বিলের সহিত সম্পূর্ণ সেট জাহাজী কাপ্তেনের রসিদ (Full sets of Bill of Lading) থাকিবে এবং অন্যান্য আবশ্যক জাহাজী দলিল থাকা চাই। মাল রীতিমত ইনসিওর করিয়া সেই পলিসি এই বিলের সহিত থাকা চাই। বিল এখানে পৌঁছিলে, দৃষ্টের নব্বই দিন পরে (Ninety days after sight) আমি উহা পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম। যে দিন আমি বিলের টাকা পরিশোধ করিব, সে দিনের এক্স্‌চেঞ্জের দাম অনুযায়ী আমি মূল্য দিব। ইহা ব্যতীত যে দিন আমার নামের এই বিল লণ্ডনে আপনাদের ব্যাঙ্ক কিনিয়া লইবে, সেই দিন হইতে আমার পরিশোধের অর্থ যে দিন লণ্ডনে পৌঁছিবে, সেই দিন পর্য্যন্ত বিলের পরিমিত অর্থের উপরে বিলের উপরে লিখিত শতকরা হিসাবে সুদ দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।

(স্বাক্ষর) ধিনুরাম গোয়েনকা।

উপরিউক্ত ক্ষমতাপত্রের উপরে আট আনার ষ্ট্যাম্প

লাগাইয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া ব্যাঙ্ক উহাকে আইনসঙ্গত দলিলে পরিণত করিয়া লইল।

ধিনুরাম তাহার ব্যাঙ্কের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াই লণ্ডনে আয়রণ কোম্পানীকে সমস্ত লিখিয়া পাঠাইল।

কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ধিনুরামের নিকট হইতে এইরূপ ক্ষমতা-পত্র ও টাকা জমা পাইয়া, তাহাদের লণ্ডন শাখাকে নিম্নলিখিত চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। অধিকাংশ সময়ই এরূপ স্থলে টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়।

"আয়রণ কোম্পানী, লণ্ডন, কলিকাতার ধিনুরাম গোয়েনকার উপরে লৌহদ্রব্য রপ্তানি সম্পর্কে মোট ৫০০০ পাউণ্ডের বিল কাটিবে। এই বিলের সহিত ভাড়া-চুকাইয়া-দেওয়া সম্পূর্ণ সেট্ জাহাজের কাপ্তেনের রসিদ, ইন্‌সিওরেন্স পলিসি ইত্যাদি সকল জাহাজী দলিল থাকিবে। এই ধার-পত্র অনুযায়ী মাল পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে জুন ১৯২১। ইহার পরে আর কোন বিল গ্রাহ্য হইবে না। এই বিল আমাদের হিসাবে কিনিয়া এখানে পাঠাইতে হইবে। বিলখানি দৃষ্টির নব্বই দিন পরে পরিশোধনীয় হইবে এবং গ্রহণের পরে দলিল ছাড়িয়া দিতে হইবে।" উপরিউক্ত চিঠি পাইয়া, কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখা আয়রণ কোম্পানীকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিল।

লণ্ডন।

২৫শে জানুয়ারী ১৯২১।

মেসার্স আয়রণ কোম্পানী।

লণ্ডন।

আমাদের কলিকাতা আপিসের নির্দেশ মত জানাইতেছি যে, আপনারা কলিকাতার মিষ্টার ধিনুরাম গোয়েনকার উপরে লৌহ রপ্তানি সম্পর্কে আগামী ৩০শে জুন ১৯২১ পর্য্যন্ত মোট পাঁচ হাজার পাউণ্ডের বিল কাটিলে, আমরা তাহা কিনিয়া লইব। এই বিলের সহিত ভাড়া-চুকাইয়া-দেওয়া সম্পূর্ণ সেট জাহাজের কাপ্তেনের রসিদ, ইন্‌সিওরেন্স পলিসি ও অন্যান্য জাহাজী দলিল থাকা চাই। ৩০শে জুন ১৯২১ তারিখের পর এই ধার-পত্রানুযায়ী কোন বিল গৃহীত হইবে না। বিলখানি, দৃষ্টির নব্বই দিন পরে পরিশোধনীয়, এই মর্ম্মে কাটিতে হইবে।

(স্বাক্ষর) জে, হার্টগ্,

ম্যানেজার।

কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এই ধার-পত্র বা Letter of Credit পাইয়া, আয়রণ কোম্পানী এবার বিল বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইল; ও রপ্তানির বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে তাহাদের নিকট ধিনুরাম গোয়েনকার চিঠিও আসিয়া পৌছিয়াছিল।

আয়রণ কোম্পানী নির্দেশমত নানা রূপ লোহার জিনিস প্যাক করিয়া, "আরব" নামক কলিকাতা যাত্রী জাহাজে তুলিয়া, প্রেরিত জিনিসের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া জাহাজের কাপ্তেনের নিকট হইতে রসিদ্ আদায় করিল। সমস্ত মাল এক ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে বীমা করিয়া পলিসি আদায় করিল। খরচের হিসাব দেখাইয়া একটা দ্রব্য ও মূল্য-তালিকা (Invoice) তৈয়ার করিল। এই সকল দলিলেরই কয়েক 'সেট্' হইল। আয়রণ কোম্পানীর মোট ৫০০০ পাউণ্ড পাওনা হইয়াছিল। এই ৫০০০ পাউণ্ডের একখানি বিল তৈয়ার করিয়া তাহা আইন অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া রেজিষ্ট্রী করিল। এই বিলখানি দুই সেট হইল। পূর্ব্বে যে সকল দলিলের কথা বলিলাম, অর্থাৎ জাহাজী কাপ্তেনের রসিদ, (Bill of Lading Full sets), ইন্‌সিওরেন্স পলিসি (Insurance Policy Full sets) দ্রব্য ও মূল্য-তালিকা (Invoice Full sets) বিলের (Bill of Exchange) সহিত গাঁথিয়া, ব্যাঙ্কের লিখিত ধার-পত্র (Letter of Credit) লইয়া আয়রণ কোম্পানীর লোক কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইল।

বিল খানি এইরূপ

Bill No. 202 D/A

Exchange for £5000 London

12th March 1921

Ninety days after sight pay this First of Exchange (and Second of the same tenor and date not paid) to the order of Messrs Commercial Bank Ld. £5000 Sterling payable at their drawing rate for Demand Drafts on London with interest at 8% per annum added thereto from date hereof to approximate due date of arrival of the remittance in London, value received.

To,
Mr. Dhinuram Goenka Iron & Company
Calacutta (Sd) J. Martin
Manager.

কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক আপনাদের ধারপত্র বা Letter Creditএর সহিত বিল ও সমস্ত জাহাজী দলিল মিলাইয়া দেখিয়া, আয়রণ কোম্পানীর নিকট হইতে ৫০০০ পাউণ্ডে সমস্ত দলিলগুলি কিনিয়া লইল। আয়রণ কোম্পানী কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ককে পাওনাদার (Payee) করিয়াই বিল কাটিয়াছিল; ও জাহাজী কাপ্তেনের রসিদ (Bills of Lading) উক্ত ব্যাঙ্কের নামেই লিখিয়া দিয়াছিল (Endorsed in their favour)। সুতরাং এখন ব্যাঙ্ক কার্য্যতঃ সর্ব্ববিষয়ে রপ্তানি দ্রব্যের মালিক হইয়া পড়িল। ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক আয়রণ কোম্পানীর নিকট হইতে Letter of Hypothecation লিখাইয়া লইয়াছিল। ব্যাঙ্ক বিলের উপর D/A ছাপ মারিয়া রাখিল।

১২ই মার্চ্চ তারিখে ব্যাঙ্ক আয়রণ কোম্পানীর নিকট হইতে বিল কিনিয়া লইয়া, পরবর্ত্তী মেলেই এক সেট্ বিল এক সেট্ অন্যান্য জাহাজী দলিল সহ কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল। দ্রুতগতি ডাক জাহাজে বোম্বে হইয়া প্রথম সেট বিল ৩১শে মার্চ্চ কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের কলিকাতা আপিসে আসিয়া পৌছিল। সেই দিনই আইন অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প (Foreign Bill Stamp) লাগাইয়া পরদিন ১লা এপ্রেল ধিনুরাম গোয়েনকার নিকট বিল গৃহীত হইবার জন্য (For Acceptance) প্রেরিত হইল। বিলখানি D/A বিল অর্থাৎ গৃহীত হইলেই দলিল ছাড়িয়া দেওয়ার সর্ত্তে কাটা হইয়াছিল; সুতরাং ধিনুরাম গোয়েনকা বিলখানিতে নিজ নাম সহি করিয়া, দলিলগুলি খুলিয়া রাখিল। ব্যাঙ্ক বিলখানি ফিরাইয়া লইয়া তাহার উপর যে দিন বিলের টাকা পরিশোধ কর্ত্তব্য (Due date) সেই তারিখ লিখিয়া রাখিল। বিলখানি দৃষ্টির নব্বই দিন পরে পরিশোধের কথা; সুতরাং ২৯শে জুন উহার পরিশোধের দিন। কিন্তু ইহাতে তিন দিন যোগ করিতে হয়; ইহা হইতেছে Three days of Grace। এই তিন দিন যোগ করিয়া পরিশোধের তারিখ পড়িল ২রা জুলাই।

এ দিকে অন্য একখানি মন্দগতি মাল-জাহাজে সিংহল ঘুরিয়া মাল কলিকাতা বন্দরে আসিয়া পৌছিয়াছে। জাহাজী কাপ্তেনের রসিদ ব্যাঙ্ক ধিনুরামের নামে লিখিয়া দিয়াছিল; তাহার সাহায্যে ধিনুরাম মাল খালাস করিয়া লইল। পূর্ব্ব হইতেই ক্রেতা ঠিক হইয়াছিল; মাল-জাহাজ হইতে নামিতে-নামিতেই বিক্রয় হইয়া গেল। পরিশোধের তারিখের (Due dateএর) পূর্ব্বেই মাল বিক্রয় করিয়া ধিনুরাম প্রচুর অর্থ পাইল।

ব্যাঙ্ক ২রা জুলাই ধিনুরামের গৃহীত বিল তাহাদের পাওনার তালিকার (memo) সহিত পরিশোধের জন্য ধিনুরামের গদীতে উপস্থাপিত করিল (Presented for payment)।

ব্যাঙ্কের পাওনা হইয়াছিল :—

বিলের পরিমিত অর্থ	পাউণ্ড ৫০০০—০—০
১২।৩।২১ হইতে ৩১।৭।২১ ১৪১ দিনের শতকরা ৮৲ হিসাবে সুদ	১৫৪—১০—৫
	মোট পাউণ্ড ৫১৫৪—১০—৫

এক্সচেঞ্জের দর প্রতি টাকায় ১ শিলিং ৩$\frac{৩}{২}$ পেন্স

পাউণ্ড ৫১৫৪—১০—৫	৮০১৫৪।৵৯
জমার টাকা	— ১৫০০০৲
মোট পাওনা টাকা	৬৫৯৫৪।৵৯

ধিনুরাম ৬৫৯৫৪।৵৯ দিয়া বিলখানি ফিরাইয়া লইল। এ যাত্রা এইখানেই এই লোহা আমদানি সম্পর্কে ধিনুরামের সহিত তাহার ব্যাঙ্কের কারবার শেষ।

আমরা একখানি বিলাতী হুণ্ডী বা Bill of Exchange এর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত দেখিলাম। সমস্ত ব্যবসাটাই একটা ধার বা বিশ্বাসের উপর চলিয়াছে। এত বড় একটা ব্যাপার একখানি Letter of Credit বা ধার-পত্রকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য মূলে এই ধার-পত্রের জন্য ধিনুরামকে ১৫০০০৲ জমা রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সমস্ত ব্যবসা প্রায় ৮০০০০৲ টাকার। যে দিন ব্যাঙ্ক লণ্ডনে আয়রণ কোম্পানীর নিকট হইতে বিল কিনিয়া লইল, সেদিন Bill of Exchangeএর সহিত জাহাজী দলিলগুলিও দেখিয়া লইয়াছিল—এই দলিলগুলিই চালানী দ্রব্যের নিদর্শন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আয়রণ কোম্পানী যে টাকা পাইল, তাহা ধারে; কারণ, তখন পর্য্যন্ত চালানী মাল ক্রেতার হস্তগত হয় নাই।

ব্যাঙ্ক সমস্ত টাকাটা আয়রণ কোম্পানীকে ধার দিয়াছিল মাত্র। আবার যে দিন ধিমুরাম "গ্রহণ করিলাম" (Accepted) লিখিয়া সহি করিয়া Bill of Exchange-এর অঙ্গ হইতে জাহাজী দলিলগুলি খুলিয়া লইয়াছিল, সে দিন ব্যাঙ্ক কেবল মাত্র ১৫০০০৲ টাকার জমাতেই প্রায় তাহার পাঁচগুণ মূল্যের মাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। ব্যাঙ্ক বিলের উপরিস্থিত ধিমুরামের সহির উপর ভরসা করিয়াই এত টাকার মাল ছাড়িয়া দিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এইটাই হইতেছে ব্যবসায়ের Cradit বা ধার। এই ধারের উপরেই বর্ত্তমান কালের সমস্ত ব্যবসা গড়িয়া উঠিয়াছে ও চলিতেছে। যখন এই ধারের রজ্জু ছিঁড়িয়া যাইবার মত হয়, বা ছিঁড়িতে চাহে, তখনই বাণিজ্যে বিপ্লব বা Crisis হয়। তখন সকলেই নগদ বেচিতে চাহে,—কেহ বাকী দিতে চাহে না। ফলে, এই দাঁড়ায় যে ব্যবসার কণ্ঠরোধ হইতে থাকে। বর্ত্তমান কালের ব্যবসা ও বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থাই হইতেছে ধার দেওয়ার ও পাওয়ার মত অবস্থা। Crisis ব্যবসার অস্বাভাবিক অবস্থা। যখন সাময়িক অবিশ্বাস বা ভয় চলিয়া যায়, তখন Crisis থাকে না; আবার স্বাভাবিক ধারের অবস্থা ফিরিয়া আসে।

আমরা ধার-পত্রের উল্লেখ করিয়াছি। এই ধার-পত্র আছে বলিয়াই Bill of Exchange বা বিলাতী হুণ্ডী কাটা সম্ভব। এবং এই বিলাতী হুণ্ডী কাটা সম্ভব বলিয়াই, বৈদেশিক বাণিজ্য চলা সম্ভব। ব্যাঙ্ক বর্ত্তমান কালের এই বিরাট বাণিজ্য ব্যাপারে রপ্তানিকারক (Exporter) ও আমদানিকারকের (Importer) মাঝখানে দাঁড়াইয়া, উভয়ের সহযোগিতায় সাহায্য করিতেছে। বিলাতী উপমার তর্জ্জমা করিয়া বলিতে হয়, ব্যাঙ্ক শিল্প ও বাণিজ্যের কলে তৈল যোগাইয়া উভয়কে চালাইতেছে। এই তৈল হইতেছে Credit বা ধারের তৈল। আপনার বিপুল অর্থভাণ্ড হইতে ব্যাঙ্ক এই তৈল যোগাইতেছে। যে দেশের ব্যাঙ্ক বেশী পরিমাণে তৈল যোগাইতে সমর্থ হইয়াছে, সেই দেশের শিল্প ও বাণিজ্য অধিক পরিমাণে লাভবান ও উন্নত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও জার্ম্মেণীর ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করে। যে পর্য্যন্ত না দেশে ভাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততদিন শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

নায়েব মহাশয়।

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুচিবাড়িয়া কান্সারণের সুযোগ্য পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল মহাশয় কেবল পেস্কারী কার্য্যেই সুযোগ্য ছিলেন না,—দীর্ঘকাল কুঠীতে চাকরী করায়, ব্রাহ্মণ হইলেও, তিনি অনেকটা ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন; ক্ষত্রিয়-স্বভাব-সুলভ রজোগুণ তাঁহার প্রকৃতিতে পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছিল। রজোগুণের প্রভাবে নিদ্রা-ঘোরেও তিনি মধ্যে-মধ্যে 'ধর, মার, কাট্,' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। কুঠীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকেই অশ্বারোহণে সুনিপুণ ছিলেন। আমরা যে কালের কাহিনী এই উপন্যাসে বিবৃত করিতেছি, তাহার পর ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে; বাঙ্গালী সমাজের সকল স্তরেই এই ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরে ধর্ম্ম-কর্ম্মের, আচার-ব্যবহারের, এমন কি রুচির পর্য্যন্ত যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, রিপ্ ভ্যান্ উইংক্লের মত কোন লোক বহুবর্ষব্যাপী নিদ্রার অবসানে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া যদি তাহা লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হইত। এখন স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হইলে কুঠীর নিম্নতম কর্ম্মচারীরাও দ্বিচক্রের সহায়তা গ্রহণ করে, তাহারা এখন ঘোড়া পুষিবার ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে অসম্মত। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কুঠীর ছোট বড় অধিকাংশ কর্ম্মচারীরই এক-একটি ঘোড়া থাকিত। পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাবু অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন? এতদ্ভিন্ন তিনি লাঠী, সড়কী,

তলোয়ার খেলায় এরূপ কৌশলের পরিচয় দিতেন যে, আট-দশজন বলবান ও সুদক্ষ লাঠিয়াল লাঠি খেলা উপলক্ষে যুগপৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিত না!

সুতরাং পেস্কার বাবু যখন বেগবান, তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া ম্যানেজার সাহেবের উদ্ধারের জন্য একাকী দূরবর্ত্তী কুঠীতে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহার অধীন কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁহাকে দুই-একজন অস্ত্রধারী বরকন্দাজ সঙ্গে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাদের প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। পথে কেহই তাঁহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল না। তাঁহার প্রেরিত লাঠিয়ালেরা নীলকুঠীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, পেস্কার বাবু কুঠীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং ঘর্ম্মাক্ত অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ কামরা-ঘরে গিয়া ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ম্যানেজার মিঃ হাম্‌ফ্রি প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, একাকী কামরার ভিতর পায়চারি করিতেছিলেন। নায়েব বাবুকে লাঠিয়াল পাঠাইবার জন্য আদেশ করিবার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে; কিন্তু লাঠিয়ালদের সাক্ষাৎ নাই,—কোন সংবাদ পর্য্যন্ত নাই! নায়েবের প্রতি তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় পেস্কার বাবু একাকী তাঁহার সম্মুখে গিয়া অভিবাদন করিবামাত্র, সাহেব ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; কর্কশ স্বরে বলিলেন, "তুমি কি আমাকে রূপ দেখাইতে আসিয়াছ? শত-শত প্রজা ক্ষেপিয়া 'মারমুখো' হইয়া আছে; তুমি একাকী কিরূপে তাহাদের বাধা দিবে? আমি তোমাকে এখানে আসিতে হুকুম দিই নাই,—তবে কাহার হুকুমে আসিয়াছ? সেই 'শুয়ার কা বাচ্চা' নায়েব কি বন্দোবস্ত করিয়াছে? আমার বিপদের সংবাদ পাইয়াও সে কিরূপে নিশ্চিন্ত আছে?"

হাম্‌ফ্রি সাহেবের অশিষ্টতায় পেস্কার বাবুও গরম হইয়া উঠিলেন; কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া, সংযত স্বরে বলিলেন, "সেই ভদ্রসন্তানকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া আপনার কোন লাভ হইবে না সাহেব! নায়েবের সাধ্যও নাই যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া এখানে পাঠায়। নিরুপায় হইয়া নায়েব আমার সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিল; এই জন্যই আমি লাঠিয়াল ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এখান হইতে আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আমি না আসিলে আপনার উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হইত না; অথচ আপনি মনে করিতেছেন আমি, আপনাকে রূপ দেখাইতে আসিয়াছি! উন্মত্তপ্রায় শত-শত প্রজা পাকা বাঁশের বড়-বড় লাঠী লইয়া যদি আপনাকে আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে আপনাকে তাহাদের লাঠী হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে গিয়া বুক পাতিতে পারে, লাঠী চালাইয়া তাহাদের লাঠী ফিরাইতে পারে, আপনার আমলাদের মধ্যে একা এই সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেল ভিন্ন দ্বিতীয় লোক নাই। এই জন্যই আমি ঘোড়ায় চড়িয়া আগে আসিয়াছি; আমার লাঠিয়ালেরা শীঘ্রই এখানে আসিয়া জমিবে। যদি আমার এখানে হাজির হওয়া আপনার বিবেচনায় অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া থাকে, আপনি বলুন, আমি চলিয়া যাই। আপনার জীবন-রক্ষার জন্য আমার জীবন বিপন্ন করিবার আবশ্যক নাই।"

পেস্কারের কথা শেষ হইতে না হইতে, কুড়ি-পঁচিশজন লাঠিয়াল তৈলপক্ব, গাঁটবিশিষ্ট স্থূল ও সুদীর্ঘ লাঠী ঘাড়ে লইয়া কুঠীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; এবং মিলিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। লাঠিয়ালগুলিকে দেখিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেব কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; এবং কান্‌সারণের বাঙ্গালায় প্রত্যাগমনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। পেস্কার বাবু তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, তিনি মিষ্ট কথায় তাঁহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহার কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে পেস্কার বাবুর উপদেশ শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

পেস্কার বাবু সাহেবকে তাঁহার উপদেশ-প্রার্থী হইতে দেখিয়া মনে-মনে বলিলেন, "ঠেলায় প'ড়ে ঢেলায় সেলাম! এখন পথে এসো বাবা!"—তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "হুজুর, আপনার উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনাকে উপদেশ দিব, এমন গোস্তাকী আমার নাই। তবে আপনি যখন আমার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তখন আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা ভাল মনে হইতেছে, তাহা বলিতেছি শুনুন। প্রজারা দল বাঁধিয়া আপনাকে আক্রমণ করিবে, এইরূপ জনরব প্রচারিত হইয়াছে।

এই জনরবের মূলে কোন সত্য আছে কি না, বলা যায় না। কিন্তু সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এই জনরবে আপনি ভয় পাইয়াছেন,—আপনার কোন ব্যবহারে কেহই যেন ইহা বুঝিতে না পারে। আপনি এখান হইতে পাল্কীতে যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকিলে, সে ইচ্ছা ত্যাগ করুন। যে টম্‌টমে আপনি এখানে আসিয়াছিলেন, এবং যেরূপ বেগে টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আসিয়াছিলেন, সেই টম্‌টমে সেইরূপ বেগেই আপনাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি ঘোড়ায় চড়িয়া, আপনার টম্‌টমের অদূরে থাকিয়া, আপনার অনুসরণ করিব। যে মুহূর্ত্তে আপনার গতিরোধের চেষ্টা হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া আক্রমণে বাধা দান করিব। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ঘাঁটীতে সাহসী ও বলবান লাঠিয়ালেরা আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছে। কেহ আপনার একটি কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না—এজন্য আমি আমার মাথা জামিন রাখিলাম।

হামফ্রি সাহেব পেস্কার বাবুর পরামর্শ ই গ্রহণ করিলেন। তিনি যে টম্‌টমে নীলকুঠীতে পুরন্দর দেওয়ানের হত্যা-কাণ্ডের তদন্তে আসিয়াছিলেন,—রহস্য ভেদে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া, সেই টম্‌টমেই 'কান্‌সারণে' প্রত্যাগমন করিলেন। সশস্ত্র পেস্কার অশ্বারোহণে, টম্‌টমের কয়েক গজ মাত্র দূরে থাকিয়া, তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার সময় সাহেব লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক ঘাঁটীতে সুদীর্ঘ লগুড়ধারী লাটিয়ালেরা আততায়ীর আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। তাঁহার গন্তব্য পথ সুরক্ষিত করিবার জন্য পেস্কারবাবুর সুবন্দোবস্ত ও কার্য্যতৎপরতার পরিচয় পাইয়া, সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি নিরাপদে 'কান্‌সারণে'র বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলে, নায়েব মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নায়েব মহাশয় স্বয়ং তাঁহার আদেশ পালনের কোন ব্যবস্থা করেন নাই, এবং তাঁহার সাংঘাতিক বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তাঁহার 'জান ও মান' রক্ষার ভার গ্রহণে উদাসীন ছিলেন—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি নায়েব মহাশয়কে যে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিলেন,—যাহার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান বা মনুষ্যত্ব আছে, সে তাহা সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু এই সকল 'কান্‌সারণের' অধিকাংশ নায়েব-দেওয়ানেরই জানা আছে—'পেটে খেলে, পিঠে সয়!'—নিজের নাম সহি করিতে যাহার কলম ভাঙ্গে, সে যদি কুঠীর চাকরীর দৌলতে ছোট্টা সদরালার 'ব্যাতো-নের' সমান উপার্জ্জন করিয়া, রাজভোগে উদর পূর্ণ করিতে পায়, তাহা হইলে সে দুর্ব্বাক্য ত সামান্য কথা,—পিঠে চাবুক পর্য্যন্ত সহিতে প্রস্তুত! সুতরাং ইহাদের মূলমন্ত্র—

"বকো আর ঝকো, কাণে গুঁজেছি তুলো;
মার আর ধর, পিঠে বেঁধেছি কুলো।"

ম্যানেজার সাহেবের তিরস্কারের বহর দেখিয়া নায়েব মহাশয়ের ধারণা হইল, পেস্কার যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যথাযোগ্য রূপে সম্পন্ন না হওয়াতেই সাহেবের এত রাগ! যে সকল লাঠিয়াল সাহেবকে ক্ষিপ্ত-প্রায় প্রজাপুঞ্জের কবল হইতে রক্ষা করিতে গিয়াছিল, তাহারা সমবেত বিদ্রোহী প্রজাবর্গ অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প হওয়ায়, সাহেব হয় ত কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম লাভ করিয়া আসিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ পেস্কার ভায়ার পিঠেও দুই-এক ঘা পড়িয়াছে। নায়েব মহাশয় সাহেবের কটূক্তি নির্ব্বিকার চিত্তে পরিপাক করিতে করিতে স্থির করিয়া ফেলিলেন—সাহেবের পিঠের সাদা চামড়ার উপর কয়টি "কাল-শিরা" চাষার করচালিত বংশলোচনের মহিমা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে—সাহেব পরদিন 'গোসলখানা' হইতে বাহির হইবার সময়, সর্দ্দার খানসামা এব্রাহিম মিঞাকে তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে বলিবেন। কিন্তু আপাততঃ তিনি সাহেবের ক্রোধ ও বিরক্তি দূর করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, "হুজুর আমাদের মা-বাপ। আমাদিগকে গরু, শুয়োর, গাধা, উল্লুক প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে পারেন; কারণ, পেস্কার বাবুর সরফরাজিতে নির্ভর করা আমার পক্ষে বড়ই নির্ব্বোধের কাজ হইয়াছে! সেই চীনা মুরগীর আণ্ডা চুরীর ব্যাপার লইয়া হুজুরের সঙ্গে পেস্কার বাবুর মনোমালিন্য চলিতেছিল তাহা জানিতাম; কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তিনি সেই কথা মনে রাখিয়া, এই সুযোগে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা ধারণা করিতে পারি নাই। সেই মতলবেই, তিনি আমাকে হুজুরের আদেশ পালনে উদ্যত দেখিয়া, হুজুরের রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি আমার হাতে-পায়ে ধরিয়া যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা

দেখিয়া, আমি অগত্যা তাঁহার উপর সকল ভার দিলাম; এবং পাছে কোন ক্রটি হয় এই আশঙ্কায়, তাঁহাকেও হুজুরের কাছে পাঠাইলাম। এখন দেখিতেছি, তাঁহার ধাপ্পা-বাজিতে ভুলিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি! আমার নিজের কাণ মলিতে ইচ্ছা হইতেছে।”

মিঃ হাম্ফ্রি নায়েবকে পেস্কারের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইতে দেখিয়া, ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, “নায়েবী কার্য্যের তুমি সম্পূর্ণ অযোগ্য! আমি তোমার উপর যে কার্য্যের ভার দিয়াছিলাম, তাহা নির্ব্বাহ করা তোমার অসাধ্য বুঝিয়া, তুমি পেস্কার বাবুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলে,—তাহার হাতে, পায়ে ধরিয়া তাহাকে রাজী করিয়াছিলে। অথচ তুমি নির্লজ্জের মত পেস্কারের বিরুদ্ধে আমার কাছে ‘চুক্‌লামি’ করিতেছ! পেস্কার আমাকে জব্দ করিবার দুরভিসন্ধিতে তোমার নিকট হইতে এই ভার গ্রহণ করিয়াছিল, এতবড় মিথ্যা কথা বলিতে তোমার লজ্জা হইল না? তুমি আশা করিয়াছিলে—তুমি নিজেকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিয়া তোমার অযোগ্যতা চাপা দিয়া রাখিবে! আমি তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা ক্ষমা করিতে পারিতাম; কিন্তু তোমার শয়তানী ক্ষমার অযোগ্য। তুমি নিজে যে কাজের অনুপযুক্ত, দায়ে পড়িয়া সেই কাজের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া, শেষে তাহার অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে না,—তাহাকে কপট ও নিমকহারাম বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেও সঙ্কুচিত হইলে না! তোমার এই শয়তানী আমি কখন ক্ষমা করিব না। তুমি বুড়া হইয়াছ, তাহার উপর নায়েবের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছ; তোমার বয়সের ও পদের খাতিরে আমি তোমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিলাম না। নতুবা, তোমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, তোমায় গাধার পিঠে উল্টা করিয়া চড়াইয়া, গ্রাম ঘুরাইয়া আনিতাম।—পেস্কার আমার রক্ষার ভার লইয়াছিল,—এই জন্য আমার মানসম্ভ্রম ও প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। নির্লজ্জ বৃদ্ধ, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।”

নায়েব মহাশয় সাহেবকে সেলাম করিয়া, তৎক্ষণাৎ দরজার বাহিরে গিয়া জুতা পায়ে দিতে লাগিলেন। তাহার পর সেরেস্তায় আসিয়া বলিলেন, “বুঝেছ রসরাজ! পেস্কারকে সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম, এ জন্যে সাহেবের ভারি গোসা! বল্লে, তুমি নায়েব, আমার মান-সম্ভ্রমের জন্যে তুমিই দায়ী,—পেস্কার কে, যে, তাকে লেঠেল সঙ্গে দিয়ে আমাকে রক্ষা করতে পাঠাও? ইহাতে না কি সাহেবের অপমান হয়েছে! সাহেব মুখ থাকতে নাকে ভাত খেতে রাজী নয়। পেস্কার যে যখন-তখন সকল কাজেই সর্দ্দারী করবেন, তা আর হচ্ছে না।”

ম্যানেজার সাহেবের নিকট তিরস্কৃত হইয়া নায়েব মহাশয় আমলাদের নিকট যতই বাহাদুরী করুন, আমলারা দুই-এক দিনেই বুঝিতে পারিল, সাহেব তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া, অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করিতেছেন! প্রজারা সাহেবকে প্রহার করিবে বলিয়া যে জনরব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহার অনুসন্ধানের ভার পেস্কারের উপর প্রদত্ত হইল। সাহেব নায়েবকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের পেস্কার-বাৎসল্যের পরিচয় পাইয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলেও, প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, “নায়েবের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা সাজে না। সাহেবের সাহস কি—আমাকে গোয়েন্দাগিরি করিতে হুকুম করে! পেস্কারের ত আর মান-অপমান জ্ঞান নাই। গোয়েন্দাগিরি ত ‘তুচ্ছ’ কথা,—সাহেব যদি বলে ‘পেস্কার, আমার পায়ে সাবান মাখাও’—পেস্কার তখনই—, হাজার হোক ব্রাহ্মণের ছেলে, তার ‘কুচ্ছো’ না করাই ভাল, কি বল হরচন্দোর?

কিন্তু নায়েব মহাশয় যতই ম্যানেজার সাহেবের চক্ষুঃশূল হইতে লাগিলেন, তিনি ততই অধিক পরিমাণে পেস্কারের কুৎসা-প্রচারে মনঃসংযোগ করিলেন। পেস্কার সকল কথাই শুনিতে পাইতেন; কিন্তু তিনি কোন দিনই বৃদ্ধ নায়েবকে অসম্মানজনক কোন কথা বলিয়া, তাঁহার গৌরব বা পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিলেন না। ‘কান্‌সারণে’র যে সকল আমলা স্বার্থানুরোধে এতদিন নায়েবের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে—নায়েবকে ক্ষমতাচ্যুত ও স্বপদে সাক্ষী-গোপাল রূপে অবস্থিত দেখিয়া, তাহারা পেস্কারেরই মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশ্বাসী মিত্র মনে করিয়া নায়েব তাহাদিগকে যে কথাটি বলিতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ পেস্কারের কর্ণ-গোচর হইত! পেস্কার হাসিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন।

পেস্কার গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া তাহাদের নিকটও নানা সূত্রে জানিতে পারিলেন, ম্যানেজার সাহেবকে প্রজারা

খুন করিবে বলিয়া যে জনরব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অমূলক বাজে কথা-মাত্র। কতকগুলি দুষ্ট লোক সাহেবকে ভয় দেখাইবার জন্যই এই মিথ্যা জনরবের সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু সেরূপ কোন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইল না।

ম্যানেজার সাহেব এই সংবাদে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু পেস্কার তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিলেন না। তিনি ম্যানেজার সাহেবের উপর কতকটা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন বুঝিয়া, ক্রমে সাহেবকে মুঠার ভিতর পুরিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, নানা উপায়ে তাঁহার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পেস্কার বাবু একদিন কথা-প্রসঙ্গে ম্যানেজার সাহেবকে বলিলেন, "যথাসাধ্য তদন্ত করিয়া যদিও আমার বিশ্বাস হইয়াছে—প্রজারা এ পর্য্যন্ত হুজুরের বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিতে সাহসী হয় নাই বটে,—কিন্তু আমি কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি—প্রজাদের ক্রমেই স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের জমীদার সরকারের পক্ষে ইহা বড় মঙ্গলের কথা বলিয়া ধারণা হইতেছে না।"

সাহেব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ওয়েল পেস্কার! এ তুমি খুব খাঁটি কথা বলিয়াছ। আমাদের হাড়-ভাঙ্গা নীল-কুঠীর দেওয়ান পুরন্দর বাবুকে 'কোতল' করিয়া প্রজা লোকের সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলে নীলের কাজ-কর্ম্মও অত্যন্ত মন্দা চলিতেছে। ইহার প্রতিকার না করিলে, আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বের মত এ অঞ্চল হইতে এই লাভের ব্যবসায়টি একদম উঠিয়া যাইবে। তুমি কোন উপায় স্থির করিতে পার?

পেস্কার বলিলেন, "আপনার নায়েব বাগচী মোশাই থাকিতে আমাকে উপায় স্থির করিতে বলা, আর মুখ থাকিতে নাকে ভাত খাইতে বলা সমান কথা! এ বিষয়ে নায়েব বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করুন।"

সাহেব টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া সরোষে বলিলেন, "ডাম্ নায়েব! সে শুয়ারকে দিয়া কোন্ কাজ আদায় হইবার আশা নাই। আমি তাহাকে বিশ্বাস করি না। তুমি অবিলম্বে একটা উপায় স্থির কর। এরূপ ব্যবস্থা কর, যেন আগেকার মনে ষোলআনা জমীতে নীলের চাষ হয়। হাড়-ভাঙ্গা কুঠীর এলাকার যে প্রজা নীল বুনতে আপত্তি করিবে, তাহাকে কুঠীতে ধরিয়া লইয়া গিয়া, 'রিকাবদলে' সায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা কর।"

পেস্কার বলিলেন, "হুজুর, পারি সবই। তবে কি না, গবর্মেণ্টের আইন-কানুন বড় খারাপ। বিশেষতঃ হাড়-ভাঙ্গা অঞ্চলের প্রজারা একজোট হইয়া, যা ইচ্ছা তাই করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতবড় দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান পুরন্দর ভাদুড়ী—প্রজারা তাহাকে রাতারাতি খুন করিয়া লাশ ভাসাইয়া দিল! তিন জেলার পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ একত্র জুটিয়া, আকাশ-পাতাল চসিয়া ফেলিয়াও, খুনের কোন কিনারা করিতে পারিল না। না সাহেব, কতকগুলা প্রজাকে আইনের জাঁতায় ফেলিয়া পিষিতে না পারিলে, কেবল 'রেকাবদল' কি 'শামচাঁদে'র ভয় দেখাইয়া নীলের কাজে উন্নতি করিবার আশা নাই।"

সাহেব বলিলেন, "পেস্কার, আমি জানি, তোমার মাথা খুব পরিষ্কার; নেটিভদের মধ্যে তোমার মত 'ক্লেবর' লোক আমি কম দেখিয়াছি! তুমি হাড়-ভাঙ্গা পরগণার কতকগুলা মাথালো-মাথালো বজ্জাৎ প্রজাকে আইনের জাঁতায় ফেলিয়া গুঁড়া করিবার ব্যবস্থা কর; আমি তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

অতঃপর দুই-তিন দিন সাহেবের খাস-কামরার দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া, ম্যানেজার সাহেবের সহিত পেস্কার বাবুর পরামর্শ চলিল। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে একদিন শুনিতে পাওয়া গেল, যে সকল প্রজা ষড়যন্ত্র করিয়া দেওয়ান পুরন্দর বাবুকে খুন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ধরা পড়িয়াছে! সুদক্ষ পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিল, এবং মহকুমার হাকিমের এজলাসে তাহাদের অপরাধের প্রাথমিক বিচার আরম্ভ হইল। মহকুমার হাকিম তাহাদিগকে অপরাধী স্থির করিয়া দায়রা-সোপর্দ্দ করিলেন।

শুনিতে পাওয়া যায়, দশচক্রে 'ভগবান'কে ভূত হইতে হইয়াছিল। মুচিবাড়িয়া কান্সারণের সুদক্ষ পেস্কার ও তাঁহার সুযোগ্য সহযোগিগণের চক্রে হাড়-ভাঙ্গা পরগণার অভিযুক্ত মাতব্বর প্রজারা পুরন্দর দেওয়ানের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল বলিয়াই আদালতে সপ্রমাণ হইয়া গেল! হতভাগ্য ভগবানের দল ফাঁসীতে ঝুলিয়া ভূত হইতে পারিল না বটে, কিন্তু জেলে গিয়া ঘানি টানিতে লাগিল। পেস্কার বাবুর কার্য্য-নৈপুণ্যে হাড়-ভাঙ্গা পরগণার প্রজারা আর মাথা

ওলিতে সাহস করিল না; নীলের আবাদ পূর্ব্ববৎ সবেগে চলিতে লাগিল।

কিন্তু নায়েব বাগচী বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "ছি, ছি,—ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া কি এতদূর অধর্ম্মের কাজ করিতে আছে? সাহেবকে খুসী করিবার জন্য কতকগুলা মিথ্যা সাক্ষী জুটাইয়া, কয়েকটা, নিরপরাধ নিরীহ প্রজাকে জেলে পুরিল! ভগবান আছেন, এখনও দিনরাত্রি হইতেছে। এই মহাপাপের ফল ভোগ করিতেই হইবে।"

নায়েব মহাশয়ের এই মন্তব্য পেস্কার বাবুর কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। পেস্কার বাবু এতদিন পর্য্যন্ত ম্যানেজার সাহেবের নিকট নায়েবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই; তিনি জানিতেন, উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা বাঙ্গালী উপরওয়ালার মত 'কাণ-পাতলা' নহেন। তাঁহারা কাহারও বিরুদ্ধে লাগানি-ভাঙ্গানী শুনিলে বিরক্ত হন; এবং যাহারা "ঠকামী" করে, তাহাদিগকে ঘৃণাই করেন। এইজন্য পেস্কার ক্রমাগত কার্য্য-নৈপুণ্যে ম্যানেজার সাহেবকে খুসী রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি সাহেবের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহী মহল শাসনের জন্য মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে কতকগুলি নিরপরাধ নিরীহ প্রজাকে জেলে পুরিলেন—তাঁহার 'উপরওয়ালা' নায়েবও যখন এইরূপ মন্তব্য প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল। তিনি ম্যানেজার সাহেবকে বলিলেন, "সাহেব, বাঙ্গাল বাগচী নায়েব থাকিতে, তোমার কাছে আমার চাকরী করা পোষাইবে না। আমি তোমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি,—আর তোমার 'কান্‌সারণে'র সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী—তোমার নায়েব সকলকে বলিয়া বেড়াইতেছে, আমি মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করিয়া, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিরপরাধ নিরীহ প্রজাকে জেলে পুরিলাম! নায়েব এ কথা বলিলে, কে ইহা অবিশ্বাস করিবে?"

পেস্কারের কথা শুনিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেব ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আরদালীকে ডাকিয়া, 'নিমক হারাম' নায়েবের 'কাণ্ পাকড়্‌কে' তাঁহার নিকট হাজির করিতে হুকুম দিলেন; এবং এক গাছি চাবুক লইয়া নায়েবের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সাহেবের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া পেস্কার ভীত হইলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না সাহেব, ঐ কাজটি করিও না। বুড়া মানুষ, ব্রাহ্মণ, তাহার উপর তোমার অধীন সকল কর্ম্মচারীর প্রধান আমলা। তুমি নায়েবকে বেত মারিয়াছ—এ সংবাদ প্রচারিত হইলে তোমার দুর্নামের সীমা থাকিবে না। তোমার অধীন সকল আমলাই ইহাতে অপমান বোধ করিবে। নায়েবকে গালাগালি দাও,—জরিমানা করিতে চাও, তাহার জরিমানা কর,—বুড়া ব্রাহ্মণকে বেত মারিও না।"

হাম্‌ফ্রি সাহেব বেত্র আস্ফালন করিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "দেখ পেস্কার, আমি জমীদারী শাসন করিতে আসিয়াছি। স্বার্থরক্ষার জন্য আমি কোন কাজ করিতেই কুণ্ঠিত নহি। তুমি ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ তোমার নিকট সম্মানের পাত্র হইতে পারে। কিন্তু নিমকহারামী করিলে ব্রাহ্মণ ও ডোম উভয়েই আমার নিকট সমান শাস্তি পাইবে। ব্রাহ্মণই হোক, আর হাড়ী-মুচীই হোক, কালা আদমী আমাদের নিকট সব সমান! আমার নায়েব ও আমার সামান্য একজন খিদ্‌মৎগার—আমি এ উভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ দেখি না। যে ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া আমাদের স্বার্থরক্ষা করিবে, বিনা-প্রতিবাদে আমার প্রত্যেক আদেশ পালন করিবে—সে যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবে, তাহার পদোন্নতি হইবে। যে নিমকহারামী করিবে, আমাদের স্বার্থরক্ষায় অবহেলা করিবে,—কুকুরের মত সে বেত খাইবে। স্মরণ রাখিও, আমরা এদেশে টাকা কুড়াইতে আসিয়াছি,—খয়রাৎ করিতে আসি নাই।"

হাম্‌ফ্রি সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইয়াছে—এমন সময় আরদালী নায়েবের সেরেস্তা হইতে তাঁহার খাস-কামরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "নায়েব বাবু সেরেস্তায় নাই,—তিনি বাসায় চলিয়া গিয়াছেন হুজুর!"

আরদালী নায়েব মহাশয়ের অনুগত লোক। সাহেব নায়েবের কর্ণাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে খাসকামরায় হাজির করিবার আদেশ করিলেও, আরদালী আমলা-সেরেস্তায় উপস্থিত হইয়া, নায়েব মহাশয়ের কাণে কাণে সাহেবের সাধু সঙ্কল্পের কথা বলিয়া দিল। নায়েব অসুখের ভান করিয়া তৎক্ষণাৎ আফিস ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত বাসা হইতে বাহির হইলেন না; ম্যানেজার সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ দেহে জমীদারী কার্য্য পরিচালনে তিনি সম্পূর্ণ অসমর্থ, এই

কারণ প্রদর্শন করিয়া, নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের নিকট পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিলেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব অবিলম্বে তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া, এই বিড়ম্বনা-পূর্ণ চাকরী হইতে তাঁহাকে নিস্কৃতি দান করিলেন। সাহেব হাসিতে-হাসিতে পেস্কার বাবুকে বলিলেন, "বাগচী চাবুকের ভয়েই চাকরী ছাড়িয়া পলাইল। সে সহজে চাকরী না ছাড়িলে, আমি তাহাকে ডিস্‌মিস্ করিতাম।"

কার্য্য-দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্ন্যাল সেই দিনই মুচিবাড়িয়া 'কান্‌সারণে'র নায়েব পদে উন্নীত হইলেন। ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের এই সুবিচারে 'কান্‌সারণে'র সকল আমলা এক বাক্যে তাঁহার গুণগ্রাহিতার প্রশংসা করিতে লাগিল। পেস্কার পদোন্নতিতে উৎফুল্ল হইয়া, যে রাত্রে 'কান্‌সারণে'র সমস্ত কর্ম্মচারী ও পরিচারক-বর্গকে পোলাও কালিয়া এবং নানা প্রকার মিষ্টান্নে পরিতৃপ্ত করিলেন, সেই রাত্রেই অবজ্ঞাত বৃদ্ধ নায়েব বাগচী মহাশয় তাঁহার সহযোগিবর্গের নীরব উপেক্ষা ও ভাগ্য দেবতার কঠোর পরিহাসরাশিকে তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের অযোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, বিদীর্ণ হৃদয়ে নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনুকূল বায়ু-প্রবাহে স্ফীত-পাল নৌকা যখন তাঁহার পিতৃপিতামহের স্নেহস্মৃতি-বিজড়িত, শস্য-শ্যামলা পূর্ব্ববঙ্গের এক প্রান্তে অবস্থিত, 'পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা' ক্ষুদ্র গ্রামখানি লক্ষ্য করিয়া তরতর নাদে ছুটিয়া চলিল, তখন তিনি একবার অপমানলাঞ্ছিত মস্তক উর্দ্ধে তুলিয়া, তাঁহার দীর্ঘ কালের কর্ম্মক্ষেত্র মুচিবাড়িয়ার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিলেন; কিন্তু নিবিড় নৈশ অন্ধকারে তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল। দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়ন প্রান্ত হইতে বিশীর্ণ গণ্ডে ঝরিয়া পড়িল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইলেন।

নির্দ্দোষ

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

জজের কেরাণী গজের মতন
টলে টলে চলে আব্দারে,
বুকে নাহি ভয়, ধীরে কথা কয়—
চৌকশ সে যে সব ধারে।
ডুবেছে সে হায় মদের নেশায়,
পশেছে সে বিষ অন্তরে;
যাহা কিছু পায় দুহাতে উড়ায়
খেয়াল সাগরে সন্তরে।
এ হেন গিরিশ হলো ডিস্‌মিস
মলিনতা নাহি মূর্ত্তিতে,
প্রফুল্ল চিতে শিষ দিতে দিতে
চলে গেল মহা স্ফূর্ত্তিতে।
আপনি বিকায় লালসার পায়
কে তাহারে আর সম্বরে,
সবল-পক্ষ কপোত উড়িল
আজি অনন্ত অম্বরে।

গলে হাড়মাল, পিঠে বাঘছাল,
শিরে জটাজুট বিন্যাসি,
বেড়ায় সে আজি বহুরূপী সাজি,
সাজিয়া বাউল সন্ন্যাসী।
ভাবনা ত আর ছিল না তাহার
সদাই ফিরিত রঙ্গেতে,
জুয়ার আড্ডা শৌণ্ডিকালয়
ভ্রমণকারীর সঙ্গেতে।

* * *

বরষের পর বরষ কেটেছে,
ডাক্তারী করি স্বগ্রামে,
দেশেতে এবার দারুণ মড়ক
লেগেছে প্রথম অগ্রাণে।
রোগী দেখে ভাই ঘরে ফিরে যাই,
মেঘ জমিয়াছে ঘোর করি,—

হা'ঘরে যুবতী আসিয়া দাঁড়ালো
সজল নয়নে করজুড়ি ;
বলে 'ডাক্তার, চল্ মোর সাথ্
এই নে যাবার টঙ্কা নে'
বলিয়া সুমুখে খুলিয়া রাখিল
হাতের রূপার কঙ্কণে।
'চাহি না টঙ্কা' বলি চলিলাম
ভ্রমণকারীর আড্ডাতে,
দেখি স্বামী তার করে ছট্‌ফট্
চটের উপর খট্টাতে।
সহসা দেখি এ কাহার মুরতি,
পাণ্ডু বদন সস্মিত,
এ যে চেনা মুখ—সেই সে গিরিশ,
দেখিয়া হইনু বিস্মিত।
চোখে এলো জল, সকলি বিকল,
মরে যাই ঘৃণা লজ্জাতে;
মুমূর্ষু প্রাণ করে আন্‌চান
পড়িয়া মলিন শয্যাতে।
বলে, 'জল দাও, তল্‌পি সাজাও,
চলে যেতে হবে কোন্ দূরে,—
সময় নাহিক, টিকিট কিনেছি,—
টিকিট কিনেছি বন্ধুরে।
আমার নিকট পুতনা ধরণী
স্তনে এসেছিল বিষ নিয়ে,
দেহটা আমার থাক কোলে তার
আমি চলে যাব শিস্ দিয়ে।'
করে জোড় কর, চাহে সকাতর ;
পড়ে ধীরে আঁখি-নীর খসি,
শেষ কথা তার, 'ধর্ম্মাবতার,
হুজুর, আসামী নির্দ্দোষী।'

বিবিধ-প্রসঙ্গ

রূপকথার সৃষ্টি

[শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ]

রূপকথা ও নানারূপ প্রবাদমূলক গল্প-সৃষ্টির ইতিহাস বিশেষ ভাবে ভাবিবার ও আলোচনা করিবার বিষয়। কত বর্ষ, কত যুগযুগান্তর হইতে এইগুলি চলিয়া আসিতেছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমানে আমরা শুনিতেছি, অতীতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শুনিয়াছেন, ভবিষ্যতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে তাহারাও শুনিবে। এমনই করিয়া এই গল্পগুলি জগতের শৈশবাবস্থা হইতে চলিয়া আসিতেছে ; এবং প্রলয়ের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্যান্ত বর্ত্তমান থাকিবে। কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এই গল্পগুলির ধারাও বদলাইয়াছে সত্য ; কিন্তু তবু যে ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন নাই। ইহার মূল ভাবার্থ হইতেছে আনন্দ দান।

রূপকথার প্রধান শ্রোতা শিশুগণ। ইহার প্রকৃত রস গ্রহণ করে তাহারাই। তাহাদের তরুণ প্রাণে এগুলি এমন বিস্ময়কর ভাবের সৃজন করে যে, তাহারা মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণকে ইহা এতদূর আনন্দ দান করে না, কারণ, তাহারা সংসারের নানা ভাবের সহিত সুপরিচিত হইয়া জ্ঞানী হইয়া উঠে ; তাহাদের মনের গতি সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন আকার ধারণ করে ; এবং এইজন্যই তাহারা এই অবাস্তব অদ্ভুত গল্পগুলি মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে না। ভূত-পেত্নীর গল্প, মেঘমালা বা কাঞ্চনমালার উপকথা, শেয়াল-পণ্ডিতের কাহিনী, প্রভৃতি শিশুগণের কল্পনাকে এমন ভাবে উদ্বোধিত করিয়া থাকে যে, তাহারা ইহাকে একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারে না ; এবং এইজন্যই তাহারা আনন্দ পায়।

শৈশবাবস্থায় কোনও জিনিসকে ঠিক বাস্তব রূপে চেনা যায় না ; শিশু তাহা অন্য ভাবে দেখিয়া থাকে। চন্দ্র কিংবা সূর্য্যকে তাহারা উপগ্রহ বা গ্রহ হিসাবে দেখে না। সূর্য্য মেঘাবৃত হইয়া ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইলে, তাহারা তখন ছড়া কাটিয়া বলে—

সূর্য্য মামা, সূর্য্য মামা, রোদ কর, রোদ কর।
তোর ভাগনে শীতে মল, রোদ কর, রোদ কর ;

তখন সূর্য্যকে মাতুল হিসাবেই তাহারা দেখিয়া থাকে ; এবং নিজেকে সূর্য্যের ভাগনের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আনন্দ পায়। এর বেশী সে কিছু কল্পনা করিতে পারে না। চন্দ্রকে তাহারা চরকাকাটা বুড়ির আবাসস্থল

বলিয়াই মনে করে,—কোনও ক্রমেই পৃথিবীর চারিদিকে নিয়ত ভ্রমণ-কারী উপগ্রহ মনে করে না। যখন জননী চাঁদকে ডাকিয়া বলেন...

আয় চাঁদ, আয় চাঁদ, আয়, আয়, আয়রে।
খোকার কপালে মোর টিপ দিয়ে যারে।

তখন শিশু ভাবে, চাঁদ বোধ হয় সত্যই তাহার কপালে আদর করিয়া টিপ দিয়া যাইবে ; এবং এই আশাতেই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। পক্ষী-রাজের গল্প শুনিয়া শিশু কখনই তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয় না ; এবং শেয়াল পণ্ডিতের নানা চতুরতার কথা গল্পে শুনিয়া, তাহাকে ঠিক পশু বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। শিশু নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে বলিয়াই, রূপকথা শুনিতে এত আনন্দ পায়।

রূপকথার সৃষ্টিই জগতের শিশুগণকে আনন্দ দান করিবার জন্য ; এবং ইহার স্রষ্টা শিশু-জগৎ। পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় প্রথমে যখন মানুষ চিন্তা করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে রূপকথা ও নানা প্রবাদের সৃষ্টি। কিন্তু সেগুলি এখন আমাদের নিকট রূপকথা বা প্রবাদমূলক গল্প বলিয়া মনে হইলেও, তাহাদের নিকট বাস্তব বলিয়াই প্রতীয়মান হইত ; এবং সেগুলিকে তাহারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিত।

আদিম অবস্থায় মানব প্রথমতঃ দেহরক্ষার জন্য কাজ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই তাহারা বুঝিল, শরীর রক্ষা করাই যথেষ্ট নহে—সঙ্গে-সঙ্গে মনের খোরাকও জোগাইতে হইবে। মনুষ্য জাতিকে প্রথম চিন্তা করিতে শিখাইল—চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য। সে তাহার চারিদিকে দেখিল, স্থির, ধীর, সমুন্নত, ধূম্রবর্ণ পাহাড়, প্রশস্ত শ্যামল ক্ষেত্র, তরুশূন্য বিস্তৃত বালুকারাশি, তটপ্লাবিনী ছোট-বড় নদ-নদী। সে শুনিল বিভিন্ন জাতীয় পক্ষীর প্রাণোন্মাদকারী কাকলী ; নানাবিধ জন্তুর অবিরাম শব্দ ; মেঘের গর্জ্জন, বজ্রের নিনাদ। সমুদ্রের বিপুল ধ্বনি, নদনদীর কুলুকুলু তান, বৃক্ষপত্রের ধীর, মধুর, মর্ম্মর শব্দ। সে অনুভব করিল—বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের তাপ, চন্দ্রের অমল-ধবল কিরণ-সম্পাত, ফুলের কমনীয়তা। সে আরও দেখিল—প্রতিদিন সূর্য্য উদিত হইয়া, তাহার প্রখর জ্যোতিঃতে সমস্ত জগৎ পরিপ্লাবিত করিয়া, সন্ধ্যার সময় অস্ত যায় ; রাত্রে চন্দ্র মন্দ কিরণে সমস্ত ধরণীকে সিক্ত করে। অগণিত নক্ষত্র আকাশে লক্ষ দীপ জ্বালিয়া বসিয়া থাকে। এই সমস্ত দেখিয়া তাহার মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিল—এ সবের অর্থ কি ? ইহারা আসিল কোথা হইতে ? আমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছি ? এই প্রশ্ন মনে জাগিলেই, ইহার মীমাংসার জন্য প্রাণে আকুলতা জন্মিল। এইখানেই মনুষ্যজাতির চিন্তার সূত্রপাত।

মানুষ দেখিল, সে চলিতে-ফিরিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা তাহার নিজের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নিজের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা তাহাকে সকল কাজে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। প্রকৃতির রাজ্যেও দেখিতে পাইল, কেহ চুপ করিয়া নাই। নদী আপন মনে প্রবাহিত হইতেছে, গাছের পাতা নড়িতেছে, ভূমিকম্পে পৃথিবী কাঁপিতেছে ; আকাশে মেঘ এধার-ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; সূর্য্য, চন্দ্র কেহই স্থির হইয়া নাই। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাহার ধারণা হইল—সকল জিনিসেরই প্রাণ ও ইচ্ছাশক্তি আছে ; এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্রই, তাহারা নিজেদের মনের মত গল্প রচনা করিয়া, তাহাই একান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল।

এই সমস্ত গল্পের সৃষ্টি নানা জাতি নানা ভাবে করিয়াছে। কারণ, প্রত্যেকের কল্পনার ধারা তো আর এক নয় ! তাই এখনও একই জিনিসের অনেক রূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

আদিম কাল হইতে যে সমস্ত প্রবাদমূলক গল্প চলিয়া আসিতেছে—রূপকথা প্রভৃতি তাহা হইতেই উদ্ভূত। কেমন করিয়া গল্পগুলি নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহা বলা কঠিন। কিন্তু, মানুষের কল্পনাশক্তি যখন একবার জাগরূক হইয়া উঠে, যখন সে দেখে কল্পনার আনন্দ কত অসীম—তখন সে কল্পনাশক্তিকে নানা ভাবে না খেলাইয়া থাকিতে পারে না। এই কল্পনার খেলা হইতেই নানারূপ গল্প ও রূপকথার আবির্ভাব।

কল্পনার সুখ সেই পর্য্যন্তই, যতক্ষণ ইহাকে বাস্তব ভাবেই দেখা যায়। তখনই মনে হয়, ইহা শুধু মাত্র কল্পনা,—ইহার মধ্যে প্রকৃত কিছুই নাই ;—তখনই অনেকটা আনন্দ দূর হইয়া যায়। প্রথমেই বলিয়াছি—রূপকথা শিশুদের জন্য সৃষ্ট। কারণ, তাহারা এ গুলিকে ঠিক কাল্পনিক বলিয়া মনে করিতে পারে না ; এই জন্যই তাহারা অত আনন্দ পায়। জগতের শৈশবাবস্থায় মানুষ যখন তাহার কল্পনাশক্তিকে প্রথম জাগাইয়া, আদি গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিল—তখনও সে ইহাকে কাল্পনিক বলিয়া মনে করে নাই—তাই সে আনন্দ পাইয়াছিল। এই আনন্দের আস্বাদ পাইয়াই মানুষ এ পর্য্যন্ত নানা গল্প ও রূপকথার সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে।

তুর্কীস্থানে প্রোথিত প্রাচীন পুঁথি

[শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্-বি, এ-সি]

পৃথিবীর মধ্যে মধ্য-এসিয়ার মতন আশ্চর্য্যজনক স্থান বোধ হয় আর নাই ; কারণ, প্রথমতঃ, ইহা মনুষ্যজাতির আদিম বাসস্থান ; দ্বিতীয়তঃ, জগতের সভ্যতা এই স্থান হইতেই প্রথমে প্রচারিত হয়। প্রায় দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই স্থানে শত-শত রাজ্যের স্থাপনা ও ধ্বংস হইল। পূর্ব্ব-তুর্কীস্থানে তৎকালীন সকল সভ্য জাতিরই রাজ্য-স্থাপনা দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় একে-একে ভারতবর্ষীয়, তোখারীয় (Tocharians), হূণ, সাইথিয়ান, ইরাণীয়, তিব্বত, তুর্কী, কীরগেজ (Kirgez) এবং মোগল জাতির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। চীন পরিব্রাজক হুয়েন্‌ৎ স্যাং (Hiuen-tsang) ৫২৯ খৃঃ যখন ভারতবর্ষে তীর্থ পর্য্যটনে আগমন করেন, সেই সময়ে তিনি ঐ মধ্য-এসিয়ার পথ দিয়াই আসিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি তুর্ফান (Turfan) রাজ্যের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন ;

দিয়া গমন করেন। খোটানদেশের পূর্ব্ব সীমানা হইতেই মধ্য-এসিয়ার বিশাল মরুভূমি আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল আর সে প্রাচীন খোটান রাজ্যের চিহ্নমাত্রও নাই; ইহাও মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কারণ, বহুকালব্যাপী বায়ু সঞ্চালিত মরুভূমির বালুকায় এই দেশ চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহারই সন্নিকটে পুরাকালীন তোখারা রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহাও কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে তোখারা হইতে খোটান রাজ্যই বিশেষ উন্নত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল দেশের প্রধান ধর্ম্ম ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্ম। এই তুর্কীস্থানের মঠে-মঠে এক সময় সহস্র-সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। ইঁহারা প্রায়ই সর্ব্বাস্তীবাদী ছিলেন; কেবল যরগণ্ড ও খোটানের বৌদ্ধেরা ছিলেন মহাযানবাদী। চীন পরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে কেবল ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুরই সাদৃশ্য ছিল না; প্রত্যেক জাতিরই পোষাক-পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহার, ভাষা এবং বর্ণ সকলই বিভিন্ন ছিল। এই সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খণ্ড-জাতিদের একীভূত করিয়া তুর্কীর উইগুর জাতির (Uigurs) সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা এখনও পর্য্যন্ত ঐ জাতি বলিয়া পরিচিত। এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের পাশাপাশি ক্রমে-ক্রমে খৃষ্টান এবং মেনেসের ধর্ম্ম ও (Nestorian Christianity and Manicheism) প্রচারিত হইতে থাকে। কিন্তু এই সকল ধর্ম্মের কিয়ৎকাল পর হইতেই ঐ সকল স্থানে আর একটি প্রবল ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে থাকে; ইহাই ইস্‌লাম ধর্ম্ম। খাসগর রাজ্যেই সর্ব্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম্ম প্রচলিত হয়; এবং ঐ স্থানেই সর্ব্বপ্রথম ইসলাম রাজ্য স্থাপিত হয়। ইহার সহিত যুদ্ধে অপরাপর ধর্ম্মগুলি আত্মরক্ষা করিতে পারিল না; এবং ক্রমে-ক্রমে ১৪শ শতাব্দীতে সমগ্র তুর্কীস্থানই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত তুর্কীস্থানও কিন্তু ১৭৫৮ খৃঃ চীন করতলগত হইয়াছিল।

এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, এই তুর্কীস্থানের পূর্ব্ব অঞ্চল হইতেই সম্প্রতি মৃত্তিকা খনন করিতে-করিতে, হাজার-হাজার, রকমের বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সকল বহির্গত হইতেছে। ১৮৯০ খৃঃ দুইজন তুর্কী মধ্য-এসিয়ার কোনও স্থান খনন করিতে-করিতে একখানি বৃক্ষত্বকের উপর হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত হয়। ঐ খানি তাহারা তৎকালীন ইংরাজ রেসিডেন্ট Lieutenant Bower সাহেবকে বিক্রয় করে। Bower সাহেব ঐ পুঁথিখানি কলিকাতার Asiatic Societyতে প্রেরণ করেন। এই পুঁথিখানির বিষয়ে তৎকালীন Asiatic Societyর সেক্রেটারী Dr. Hoernle সাহেব একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহার সাফল্য দেখিয়া নানা দেশ হইতে দলে-দলে লোক আসিয়া ঐ সকল দেশের মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমাদিগের ভারতবর্ষে যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনখানি খৃঃ ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার নহে। এই কারণে পাশ্চাত্য জাতিরা বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথিগুলি খুবই আধুনিক। কিন্তু Bower সাহেব কর্ত্তৃক প্রাপ্ত পুঁথিখানির তারিখ অনুমান খৃঃ ৫ম শতাব্দী হইবে। ইহা "গুপ্ত" অক্ষরে লিখিত। ইহার পরেই রুষ ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল দেশ হইতে আরও কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিলেন। ইহার অনেকগুলিই Petrograd ও কলিকাতায় সংরক্ষিত আছে।

এই সকল ব্যাপারের দুই বৎসর পরেই, অর্থাৎ ১৮৯২ খৃঃ Dutrenil de Rhins নামক জনৈক ফরাসী পর্য্যটক তিনখানি পুঁথির আবিষ্কার করেন। এ পুঁথিগুলির সবই খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত; কিন্তু ভিতরকার বিষয় প্রায় পালি "ধম্মপদ" গ্রন্থেরই নকল মাত্র এবং ভাষাটা প্রাকৃত। ইহার তারিখ অনুমান খৃঃ ২য় শতাব্দী। ১৯০১খৃঃ Sir Aurel Stein অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই সময়ে তুরস্কের লোকেরা প্রতারণা করিবার জন্য অনেকগুলি জাল পুস্তক হস্তে লিখিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই জুয়াচুরী Stein সাহেবই ধরিয়া ফেলেন। Stein সাহেবের সফলতা দেখিয়া জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট ১৯০২ খৃঃ Gruawedel এবং Huth নামক দুইজন জার্ম্মাণ পণ্ডিতকে তুর্ফান দেশে প্রেরণ করেন। ১৯০৪-১৯০৭ খৃঃ মধ্যে ঐ স্থানে অনেকগুলি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। ইহা দেখিয়া Stein সাহেব পুনরায় ঐ দেশে গমন করেন; এবং ১৯০৬ ১৯০৮ খৃঃ মধ্যে তুন হুয়াং (Tun-huang) নামক স্থানে একটি আশ্চর্য্য বস্তুর আবিষ্কার করেন। তিনি মৃত্তিকা খনন করাইতে-করাইতে চীন দেশের বহু পুরাতন একটি প্রাচীর প্রাপ্ত হন। এই প্রাচীরটির বিষয় জগতের প্রায় সকলেই বিস্মৃত হইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত হূণ জাতির তাড়না হইতে আপনাদের রক্ষা করিবার জন্যই চীন জাতি ঐ প্রাচীর তৈয়ার করিয়াছিল। Stein সাহেব ঐ স্থানে আসিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশের একজন "তাও" পুরোহিত তুনহুয়াং বা সহস্রবুদ্ধের মন্দিরে একটি গুহার ভিতর দেখেন যে, তাহার চারিদিক প্রাচীর দিয়া গাঁথা রহিয়াছে। উহা ভাঙ্গিয়া ফেলার পর দেখেন যে, তাহার মধ্যে এক বিশাল পুস্তকাগার। সেই সময় Stein সাহেব যত পারিলেন, তত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। Pelliot নামক জনৈক ফরাসী ছাত্রও সেই সময় ঐখানে ছিলেন; এবং অনেকগুলি পুঁথি তিনিও সংগ্রহ করিয়া লন। জাপান হইতেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ আসিয়া কতক পুঁথি লইয়া যান। কেবল মাত্র ঐ সকল পুঁথিই যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। অনেক রকমের মুদ্রা-যন্ত্র বা ছাপাইবার "ব্লক"ও পাওয়া গিয়াছিল। পুঁথিগুলি যতরকম সামগ্রীর উপর লেখা যায়, সেই সকল সামগ্রীতেই লিখিত; যেমন তালপত্র, বৃক্ষত্বক, কাষ্ঠফলক, বংশখণ্ড, চর্ম্ম, রেশম ও কাগজ। ঐগুলি প্রায় ১২।১৪ রকম ভাষায় লিখিত; এবং এমন সকল ভাষায় লিখিত যে, সে সকল ভাষার অস্তিত্বও কেহ এ যাবৎ জ্ঞাত ছিলেন না। এই সকল পুঁথির মধ্যে কতকগুলি "ব্রাহ্মী" অক্ষরে লিখিত; কিন্তু ভাষা সংস্কৃত নহে। উহা যে আর্য্য ভাষা, তাহার প্রমাণ Sieg এবং Siegling সাহেবেরা প্রদর্শন করিয়াছেন। আজকাল প্রমাণ হইয়াছে যে, উহা "তোখারীয়" ভাষা। Pelliot এবং Sylvain Levi সাহেবও তাহাই বলেন। ইহার অনেকগুলি আমাদের দেশের সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের নকল মাত্র; এবং ইহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের পুস্তক, নাটক, আয়ুর্ব্বেদ

ও ভেষজ সংক্রান্ত পুস্তকই অধিক। বৌদ্ধ-ধর্মের পুঁথিগুলি সবই সর্ব্বাস্তীবাদী-মতাবলম্বী।•

এরূপ আর একটি নূতন ভাষা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহা Staiel-Holstein এবং Konow সাহেব দ্বারা পঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সকল পুঁথিতে যে সকল তারিখ লেখা আছে, তাহার কোনও মীমাংসা এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। আর এই ভাষায় লিখিত যে সকল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা সবই প্রায় মহাযান-পন্থাবলম্বী। F. W. K. Muller সাহেব তুর্ফানে প্রাপ্ত কতকগুলি চিঠিপত্রাদি হইতে অপর একটি ভাষার আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহাই পহ্লবী ভাষা। মধ্য-পারস্য দেশের ইহাই প্রাচীন ভাষা। মেনস ধর্ম্মপুস্তকগুলি প্রায় এই ভাষায় লিখিত। পারসীদিগের ধর্ম্মপুস্তক "আবেস্তাও" এই ভাষায় লিখিত। মেনস (Manes) ধর্ম্ম এক সময় প্রায় সমগ্র পূর্ব্ব-এসিয়া হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। মেনস স্বয়ং বুদ্ধদেবকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার ধর্ম্মপুস্তকে প্রায়ই বৌদ্ধ ভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার পুঁথিগুলি বেশ রং করা এবং অনেক চিত্রে সুশোভিত; ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার উপর ইরান দেশের চিত্রকলার বিশেষ প্রভাব ছিল। প্রোথিত যতগুলি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই লণ্ডন, অক্সফোর্ড, প্যারী, বার্লিন পেট্রোগ্রাড, কলিকাতা, পিকিং এবং টোকিও সহরের যাদুঘরে ও পুস্তকাগারে সংরক্ষিত আছে। কেবল যে পুঁথিই আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নহে। অনেক প্রাচীন ভগ্ন স্তূপের অংশ, প্রাচীরের অংশ এবং অন্যান্য বস্তুও আবিষ্কৃত হইয়া ঐ সকল সহরে সংরক্ষিত আছে।

অপর আর একটি ভাষা আবিষ্কৃত হইয়াছে। Andreas সাহেব বলেন যে, তাহা উত্তর-পশ্চিম পারস্য দেশের প্রাচীন ভাষা। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন, ক্যাল্ডি-ওপহ্লবী (Chaldeo Pahlavi)। আর একটি ভাষা পাওয়া গিয়াছে,—ইহার সহিত আধুনিক উইগুর ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহার নামকরণ হইয়াছে "শোঘদী" (Soghdiau dialect)। এই ভাষাই বোধ হয় সমগ্র পারস্য দেশের চলিত-কথিত ভাষা ছিল; এবং পহ্লবী ভাষা ছিল লিখিত ভাষা। উত্তর-খণ্ডে যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষা সিরিয়া দেশের ভাষা। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষাও ঐ শোঘদী ও পহ্লবী। ঐ সকল স্থানের মধ্যে যে সকল বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় অনেকগুলিই শোঘদী ভাষায় লিখিত। ইহাতে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, শোঘদী ভাষাতেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিত। ঐ ভাষাই প্রাচীন ইরাণ দেশের সমরখণ্ড ও ফরঘনা দেশ পর্য্যন্ত এবং তুর্কীস্থান, মোঙ্গোলিয়া, ও চীন দেশের কয়দংশ অবধি খৃঃ ১ম শতাব্দী হইতে ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিত ভাষা ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। Stein সাহেব একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ পাইয়াছেন; তাহার ভাষা সিংগাঙ্গু (Singangu)। জুডো-পারস্য দেশের কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, যাহার ভাষা হীব্রু (Hebrew)। এ পুঁথিগুলি প্রায় ১০০ হিব্রীয়াতে লিখিত বলিয়া অনুমান করা যায়। খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে লিখিত কতকগুলি প্রাচীন তুর্কীদিগেরও পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পুঁথির অধিকাংশই Le Coq, Stonner, Radloff, Thomsen, এবং Muller সাহেব সম্পাদিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সকল প্রাচীন পুঁথির ভাষাও যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি ইহার ভিতরকার গল্প ও ভাবও আশ্চর্য্য। আবার কতকগুলি Estraugelo, Uigurian, এবং রুণ (Rune) অক্ষরে লিখিত। খৃষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত পুঁথি খুব অল্প সংখ্যকই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আধুনিক যুগের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুঁথিই অধিক সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ অনেকগুলি পুঁথিতে আমাদের ভারতবর্ষের অনেক গল্প লিখিত রহিয়াছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, তুর্ফানে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন পুঁথির মধ্যে মহাভারতের গল্প লেখা আছে; যথা, ভীমের সহিত হিড়িম্ব রাক্ষসের যুদ্ধ, রাজকুমারীদের স্বয়ম্বর বর্ণনা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া নীতিকথা, ধর্ম্মকথা, পাপপুণ্যের কথা, রতিশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ভেষজগ্রন্থ, স্বপ্নতত্ত্ব, নাটক, কাব্য, কবিতা, স্তোত্র, গল্প প্রভৃতি শত-শত বিষয়ের পুঁথি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পূর্ব্ব-এসিয়ার তৎকালীন সকল সভ্য জাতিরই কোনও না কোনও রূপ পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ সকলই ঐ একই তুর্কীস্থানের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রুণ, তিব্বত, এবং মোঙ্গোলিয় ভাষারও কতকগুলি পুঁথির আবিষ্কার হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় খরোষ্ঠী (Kharoshti) অক্ষরে কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় লিখিত যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমাদিগের পক্ষে কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়। এগুলি প্রায় সবই চর্ম্মের এবং কাষ্ঠফলকের উপর লিখিত; তারিখ অনুমান খৃঃ ৩য় শতাব্দী। ইহাতে বেশ ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালীন গন্ধর্ব্বদেশের লোক খোটানের চীনেদের সহিত সম্পূর্ণ রূপেই মেলামেশা করিয়া বসবাস করিত। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অসংখ্য বৌদ্ধ পুঁথির মধ্যে কতকগুলি পুঁথি Sylvain Levi, Finot এবং de la Valle Poussin সাহেবরা উদ্ধার করিয়া একত্র করিয়াছেন। Pischel সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, সংস্কৃত বৌদ্ধ পুঁথিগুলি আদৌ পালি ভাষা হইতে অনুবাদিত নহে; উহা সম্পূর্ণ মৌলিক। মাতৃচেতা এবং অশ্বঘোষই ঐ সকল সংস্কৃত পুঁথির মধ্যে কতকগুলির প্রণেতা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইৎসিং (I-tsing) নামক জনৈক চীন পণ্ডিত বলেন যে, খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এমন কোনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন না, যিনি ঐ মাতৃচেতার রচিত দুইটি বুদ্ধ স্তোত্র রোজ রোজ না আবৃত্তি করিতেন, তা তিনি—যে কোনও মতাবলম্বীই হউন না কেন। ইঁহাদের রচিত পুস্তক পরিচয়ে এ যাবৎ কেবল চীন ও তিব্বত-দেশের পুস্তকের নকল মাত্র পাওয়া যাইত। কিন্তু সম্প্রতি বার্লিন সহরে তাঁহাদের রচিত মূল পুস্তকগুলির বোধ হয় দশ আনা ভাগের উদ্ধার হইয়াছে। এই

অশ্বঘোষের ন্যায় মহাকবি বোধ হয় অতি অল্পই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'বুদ্ধচরিত' এবং 'সুন্দরানন্দ' নামক দুইখানি মহাকাব্যের কিয়দংশ মূল সংস্কৃত তুর্কীস্থানের ভগ্নস্তূপ হইতে পাওয়া গিয়াছে। আরও কতকগুলি নাটক ও স্তোত্রের অংশও পাওয়া গিয়াছে। এগুলি সবই তালপত্রের উপর ব্রাহ্মী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কেবল নাটকগুলির স্ত্রী-চরিত্র ও নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের ভাষা প্রাকৃত। শকুন্তলা নাটকে যেরূপ হাস্যরসিক পেটুক বিদূষকের চরিত্র আছে, এগুলিতেও ঠিক তদ্রূপই আছে। ইহাতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, ভারতবর্ষে খৃঃ ১ম শতাব্দীতে নাট্যকলা সম্পূর্ণরূপেই সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছিল। কবি কালিদাসের পূর্ব্বে আর একজন কবি আমাদের দেশে ছিলেন, তাঁহার নাম ভাস! এই ভাসের রচিত নাটক সম্প্রতি দাক্ষিণাত্যে শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে অধুনা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, মহাকবি কালিদাস খৃঃ ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন।

তুর্কীস্থানে লুপ্ত পুঁথি সকলের উদ্ধার হওয়াতে, জগতের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বলিবার নয়। ইহার সম্পূর্ণ মীমাংসা হইতে বহু বৎসর কাটিয়া যাইবে। ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুষ, ইংরাজ, জাপানী এবং অন্যান্য দেশের মহাপণ্ডিতেরা এই সকল পুস্তকের ব্যাখ্যা এবং টীকাদি প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন। ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের সম্পূর্ণ ভাবে এ বিষয় মনঃসংযোগ করা একান্ত আবশ্যক। এই সকল পুঁথি হইতে ঐতিহাসিক ভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয় সুচারুরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। ইহাতে আরও প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, বুদ্ধদেবের মুখ-নিঃসৃত ভাষা পালি ভাষা নাও হইতে পারে। এখনও ইহা মীমাংসা-সাপেক্ষ।

বৈদিক রহস্য

[শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন]

১। (বেদ ভগবদ্বাণী নহে)

মুসলমানের কোরাণ, খৃষ্টানের বাইবেল ও হিন্দুর বেদ জগন্মান্য মহা ধর্ম্মগ্রন্থ। সুতরাং প্রত্যেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-সন্তানেরই ইহা জানা কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদিগের বেদ সকল প্রকৃত পক্ষে জিনিষটা কি। মুসলমান বলেন, "কোরাণ খোদাকা কালাম"—খৃষ্টান বলেন যে—Bible is the word of God. বাইবেল ঈশ্বরবাণী, এবং হিন্দুরাও বলিয়া থাকেন যে—বেদো হরের্বাক্। কল্কিপুরাণ।

কিন্তু সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিদান ও নিয়ন্তা যখন একই ভূমা মহেশ্বর যিনি একটী ক্ষুদ্র ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটা সূর্য্যদ্বারা জগতের অন্ধকার দূর করিতে এবং আলোক ও উত্তাপ দানের কার্য্য চালাইতে সমর্থ, সেই অনন্ত-শক্তি মহান্ পরমেশ্বর কেন চারিখানি বেদ, দুইখানি বাইবেল এবং একখানি কোরাণ লিখিতে যাইয়া এত কার্য্য-বাহুল্য ঘটাইবেন? এতগুলি গ্রন্থের প্রণয়ন ও মুদ্রণাদিতে ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় অল্প হইবার নহে। কই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, গারো, কুকি, হাজং এবং কাফ্রী প্রভৃতির জন্য ত ভগবান্ পৃথক্-পৃথক্ সূর্য্যের নির্ম্মাণ করেন নাই? কেন একই ভগবানের কোরাণ, বাইবেল ও বেদে এত বিষয়গত শত শত পার্থক্য এবং বৈষম্য সংঘটিত হইল?

তোমরা কি বলিতে চাহ যে, পরমেশ্বর তাঁহার প্রথম যৌবন সময়ে সামবেদ রচনা করিলেন; যখন তাঁহার বন্ধুবর্গ উহাতে নানা ভুল-ভ্রান্তি এবং মুদ্রণ দোষ দেখিতে পাইলেন; তখন ঈশ্বর লজ্জিত হইয়া যৌবনের পরিপক্কাবস্থায় ঋগ্বেদ রচনা করেন। উহাতেও ভ্রম-প্রমাদ দেখা গেলে প্রৌঢ়াবস্থায় যজুর্ব্বেদ রচনা করেন। উহাও একবারে নির্ভুল না হওয়ায়, তিনি অথর্ব্ববেদ রচনা করেন। উহাও নির্ভুল না হওয়ায়, তিনি বাইবেল রচনা করেন। উহাও একেবারে প্রমাদশূন্য না হওয়ায়, তিনি সর্ব্বশেষে এই ১৩১০ বৎসর যাবৎ কোরাণের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোরাণ নির্ভুল এবং প্রমাদ পরিশূন্য?

হে ভ্রাতৃগণ! মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় বলিতেন ও লিখিয়া গিয়াছেন যে, বেদই প্রকৃত ঈশ্বর-বাণী,—কোরাণ ও বাইবেল ঝুটা। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বর কেন মুসলমান ও খৃষ্টানকে প্রকৃত ধর্ম্ম-গ্রন্থ বেদ না দিয়া বঞ্চিত করিলেন? হিন্দুরা পরমেশ্বরকে এমন কি রসগোল্লা খাওয়াইয়াছিলেন যে, তিনি মুসলমান ও খৃষ্টানকে বেদ দিলেন না? মুসলমান ও খৃষ্টান এদেশে শুভাগমন না করিলে কি তাঁহারা আমাদিগের বেদের নাম শ্রবণ করিতেও সমর্থ হইতেন?

যদি বাইবেলই যথার্থ ঈশ্বরবাণী হয়, তাহা হইলে ভগবান্ কেন হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ইহার আস্বাদনে বঞ্চিত রাখিলেন? যদি খৃষ্টানগণ পরম দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া মিশর, আরব, মেসোপটেমিয়া ও এই মরুময় মহানরক ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের পবিত্র পদধূলি দান না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কি কখনও বাইবেলের নাম-গন্ধও জানিতে পারিতাম? যদি কোরাণই প্রকৃত খোদার বাণী হয়, তাহা হইলে কেন হিন্দু ও খৃষ্টান উহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিলেন? অনন্ত-শক্তি মহান্ ঈশ্বর যদি তাঁহার বাণীময় গ্রন্থাবলী সূর্য্যের কোমরে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিতেন, তাহা হইলে, সূর্য্যটা যেমন ঘুরিয়া বেড়াইত, অমনি জগতের সকল লোক খোদাই অক্ষরে লেখা খোদার বাণী বেদ বা বাইবেল বা কোরাণ পাঠ করিয়া আপন-আপন ধর্ম্ম-কর্ম্ম ঠিক করিয়া লইত,—জগতে আর হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বলিয়া কোনও পৃথক্-পৃথক্ সম্প্রদায় থাকিত না। জগৎটা কি আনন্দের হইত! মুসলমান হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ গড়াইতেন না; খৃষ্টানও মসজিদ ও মন্দির দেখিয়া নাসিকাগ্র কুঞ্চিত করিতেন না। হে ভ্রাতৃগণ! হিন্দুর পরমেশ্বর সংস্কৃতজ্ঞ, বাইবেলের গড হিব্রু ও গ্রীক-

ভাষাবিৎ এবং কোরাণের খোদা আরবী ভাষায় লায়েক ছিলেন। তোমরা কি ইহাই ভাবিতে চাহ ?

হে ভ্রাতৃগণ! পরমেশ্বর কি তাঁহার সরকারী ছাপাখানায় বেদ বাইবেল ছাপাইয়া তাঁহার স্পেশিয়াল পিওন দ্বারা উহা ব্রহ্মার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন? না, তিনি ভারতবর্ষ ও পেলেষ্টাইনে হিন্দু ঋষি ও খৃষ্টান পাত্রীগণের মনে সময়ে-সময়ে প্রত্যাদেশ করিয়া পৃথিবীতে বেদ ও বাইবেলের আমদানী ঘটাইয়াছিলেন?

থিওজফিষ্ট হুগের একদল বক্তা বারবার বলিতেছিলেন যে,—"ভগবানের নিকট হইতে সময়ে-সময়ে সমাগত জ্ঞান-স্রোতই বেদ"। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে কেন ন্যায়বান্ ভগবান্ খৃষ্টান ও মুসলমানকে সে জ্ঞান-স্রোতের খবর পাইতেও দিলেন না? যদি হিন্দুরা এতই খোদাপ্রস্ত ও খোদাপ্রিয় বটেন, তাহা হইলে কেন সেই হিন্দুগণ যার-তার পদানত, পদবিদলিত ও পাদাহত হইতেছেন?

হে ভ্রাতৃগণ! দেখ, প্রসবের পূর্ব্বে খড়দহের মা গোসাঞী এবং পঞ্চম জর্জ্জের মাতৃঠাকুরাণীর স্তনে যেমন দুগ্ধসঞ্চার হইয়া থাকে, তদ্রূপ গারো, কুকী, হাজঙ্গ, এসকুইম, ও কাফ্রীদিগের নারীগণের স্তনেও দুগ্ধের সঞ্চার হইয়া থাকে। তবে পক্ষপাত-পরিশূন্য ন্যায়বান্ ভগবান্ কেন এই সকল অনার্য্য জাতিকে না দিলেন বাইবেল, না দিলেন কোরাণ, না দিলেন বেদ, বা না দিলেন সেই খোদাই জ্ঞান-স্রোতঃ। ফলতঃ হে ভ্রাতৃগণ! কি বাইবেল, কি বেদ, ইহার একখানা গ্রন্থও খোদার জিনিস নহে, মানুষেরা আপন-আপন বুদ্ধিবলে, আপন-আপন ধর্ম্ম গ্রন্থ লিখিয়া উহার সম্মান বাড়াইবার জন্যই বলিয়াছেন যে, বেদ ও বাইবেল খোদার কলম। যদি ভগবানের নিকট হইতেই জ্ঞান-স্রোতঃ আসিবে, তাহা হইলে জগতের একজন লোকও কি পূর্ণ পাপী থাকিত? ফলতঃ, জ্ঞান মানুষের স্বোপার্জ্জিত বেদ ও বাইবেলও স্বোপার্জ্জিত।

এখন সাহেবরাও বলিতেছেন যে, রেডিয়ম ধাতুর অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টি অন্যূন দশ কোটী বৎসর যাবৎ হইয়াছে। আমাদিগের হিন্দুর গণনামতে পৃথিবীর বয়ঃক্রম প্রায় পঁচিশ কোটি বৎসর। সুতরাং মনুষ্য সৃষ্টির বয়ঃক্রম অন্ততঃ পাঁচ সাত কোটী বৎসর হইবে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা বলি, আমাদিগের বেদের বয়ঃক্রম দুই লক্ষ বৎসর, সাহেবেরা তাঁহাদিগের বাইবেলের প্রাচীনত্ব রক্ষার জন্য বলিয়া থাকেন (যাহাতে তান্ত্রিক যুগের প্রতিমা পূজার নিষেধ বর্ত্তমান!!) যে বেদের বয়স খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০০ হইতে ১৫০০ বৎসর, আর মুষার বাইবেলের বয়স ৩৯০০ বৎসর, কোরাণের বয়স ৩৫১ বৎসর। তাহা হইলে বাইবেলের পূর্ব্ব মহাযুগের মানব-মণ্ডলী খোদাই গ্রন্থের অভাবে যে নরহত্যা, ব্যভিচার, গরু চুরি ও বৈষ্ণব নিন্দা করিয়া নরকে গেল, তাহার জন্য দায়ী কে? যে ভগবান্ সকলের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে স্তনে দুগ্ধ দান করিলেন, সেই দূরদর্শী ভগবান্ মনুষ্য-সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই কেন বেদ, বাইবেল, বা কোরাণ পাঠাইয়া দেন না? ফলতঃ হে ভ্রাতৃগণ, কি বেদ বা কি বাইবেল, ইহার একখানা গ্রন্থও ভগবৎ-প্রণীত নহে, উহারা মনুষ্য-প্রণীত; এবং বেদ যে তিনযুগ ধরিয়া নর, নারী ও শূদ্র, শূদ্রাদ্বারা প্রণীত হইয়াছে, ইহার অমোঘ প্রমাণাবলী উক্ত বেদমধ্যেই বিদ্যমান। তবে খৃষ্টানরা তাঁহাদিগের বাইবেলে নানা ভুল-ভ্রান্তি (পৃথিবীর সৃষ্টি ছয় হাজার বৎসর, পরমেশ্বর আদমের সহিত কথা বলিতেন, তাঁহার নিরাকার অঙ্গুলি দিয়া পাথরে বাইবেল লিখিয়া মোজেসকে দিতেন) ও হিংসা দ্বেষের (চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষুঃ এবং দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত ইত্যাদি) নানা বাজে কথা থাকা সত্ত্বেও উক্ত বাইবেলকে ভগবানের বাণী বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ যে হিন্দুরা বেদ চক্ষেও দেখেন নাই, বেদ গোল কি চেপ্টা তাহাও অবগত নহেন, শ্রুতিজ্ঞান যাঁহাদিগের শ্রৌত মাত্র, তাঁহারাও অন্ধভক্তিবশতঃ আপনাদিগের বেদকে ঈশ্বরবাণী বলিতে লোল-জিহ্ব।

শ্রুতি কি? বেদ কি? শ্রুতি ও বেদে তফাত কি? উপনিষৎ আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহকে কেন শ্রুতি বলে? উহারাও স্বয়ং বেদ, না উহারা স্বতন্ত্র বস্তু? বেদ মনুষ্য-প্রণীত হইলে উহাদিগের বয়স কত? কোন্ বেদ আদিম? বেদচতুষ্টয় একমাত্র ভারতীয় সম্পৎ, না উহারা পৃথক্ পৃথক্ সময়ে পৃথক্ স্থানে উৎপন্ন? এক বেদ কাটিয়া চারি বেদ করা হইয়াছে, না চারি বেদ চারি স্বতন্ত্র বস্তু,—আমরা একে-একে এই সকল বৈদিক রহস্যের সমুদ্ভেদ করিব।

শ্রুতি কি? বেদকে শ্রুতি বলে কেন? শ্রুতিকে বেদ বলিবারই বা কারণ কি? যেহেতু যখন আদিস্বর্গ ক্ষো বা মঙ্গলিয়াতে প্রথম ভাষার সৃষ্টি হইয়া লোকের মনে কবিত্বের উন্মেষ হয়, অথচ যখন ঐ সময়ে পৃথিবীর কোনও স্থানেই অক্ষরের সৃষ্টি এবং লিখন-পঠনের প্রচলন হইয়াছিল না, তখন বেদমন্ত্র সকল রচিত হইয়া শ্রুত হইত, সকলে উহা শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন, তখনই বেদমন্ত্র সকল শ্রুতি-নামের বিষয়ীভূত হয়। শ্রূয়তে ইতি শ্রুতিঃ।

মিমীহি শ্লোক মাস্যে—। ১৪।৩৮।১ম

অয়ং দেবায় জন্মনে, স্তোমো বিপ্রেভি রাসয়া অকারি। ১।২০।১ম

তোমরা মুখে-মুখে শ্লোক রচনা কর। বিপ্রগণ ঋভুগণের গুণবলে দেবত্ব লাভ বিষয়ে মুখে-মুখে স্তোত্র-মন্ত্র সকল রচনা করিয়াছেন।

তবে রামায়ণে কেন এমন বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদি কবি বাল্মীকির শোক হইতে রচিত পদ্য শ্লোক নামে সংসূচিত হয়? বাল্মীকির প্রকৃত রামায়ণ আর ইহ জগতে নাই। কীটদষ্ট মূল রামায়ণের কীটদষ্ট অংশ (বটকাণ্ডাত্মক) কোনও রিপুকারকর্ত্তৃক নূতন রচিত হয়। তিনি এই সংবাদ দিয়াছেন। "যঃ শৃণোতি ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতং।" বস্তুতঃ রামায়ণের বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বেই পদ্য শ্লোক নাম ধারণ করে। অবশ্য মহর্ষি বাল্মীকি ভারতের লৌকিক সংস্কৃতের আদি কবি। কিন্তু ভারতের ঋগ্বেদে যে সকল বৈদিক সংস্কৃতময় শ্লোক বা মন্ত্র আছে—তৎসমুদায় বাল্মীকির পূর্ব্বপিতামহ ভারতীয় কবিগণ দ্বারা বৈদিক সংস্কৃতে বিরচিত। সুতরাং বাল্মীকি জগতের আদি কবি নহেন। ভারতেরও আদি কবি ছিলেন না।

ইহা বর্ত্তমান রামায়ণের রিপুকার কবিবিশেষের প্রমাদবিশেষ। অার মহামহোপাধ্যায় বৈদ্য বোপদেব যে আপনার ভাগবতে লিখিয়াছেন যে—

তেনে ব্রহ্ম হৃদা

য আদি কবয়ে

তত্র শ্রীধর স্বামী……………………আদি কবয়ে ব্রহ্মণে।

যে পরমেশ্বর আদি কবি ব্রহ্মাকে মনে মনে ব্রহ্ম বা বেদ বিস্তার করিলেন।

কিন্তু বোপদেবের এই উক্তিও সাধীয়সী নহে। কেন না (একোঽভূৎ নলিনাৎ) পদ্মজন্মা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাও আদি কবি ছিলেন না। যদাহ বায়ুপুরাণং—

বেদাঃ সপ্তর্ষিভিঃ প্রোক্তাঃ

স্মার্ত্তং ধর্ম্মং মনুর্জগৌ।

সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার পিতামহ মরীচিপ্রভৃতি সপ্ত ঋষি সর্ব্বাদৌ বেদ-মন্ত্র সকল বলেন। মনু সর্ব্বাদৌ স্মৃতির ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন।

সুতরাং সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাও আদি কবি হইতেছেন না। অপিচ কেবল ইহাও নহে। বেদমন্ত্রসমূহের পূর্ব্বেই বিশ্বদেবগণ "বিশ্বদেব-নিবিৎ" নামে কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র রচনা করেন। যেমন—

তকাম্নানে নাতি ধীবানঃ।

আস্মাঃ পচত বাহসঃ।

মা বো দেবা অপিশসা

পরিশসা বৃক্ষি।

সুতরাং এই সকল মন্ত্রের ঋষিগণমধ্যে কোনও মহর্ষি আদি কবিপদবাচ্য বটেন।

যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত মন্ত্রসকল লিখিত না হইয়া মুখে মুখে উচ্চারিত ও শ্রুত হইত, সেই সময়েই বেদ-মন্ত্রের নাম "শ্রুতি" হয়। তৎপরে যখন সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার আদেশে বেদমন্ত্রসকল সংগৃহীত ও লিখিত হইয়াছিল, তখনই উক্ত লিখিত শ্রুতি "বেদ" নাম ধারণ করে। বেদ শব্দের বুৎপত্ত্যর্থ কি?

বেত্তি (বিদল জ্ঞানে) জানাতি

পুরাতত্ত্বং অনেন ইতি বেদঃ।

যাহা পাঠ করিলে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগের…ইতিবৃত্ত সকল জানা যায়, তাহারই নাম "বেদ"।

বেদ কি তবে আধ্যাত্মিকবিষয়বহুল ধর্ম্মগ্রন্থ নহে? যাঁহারা কখনও বেদ পাঠ করেন নাই, বেদের নাম কাণে শুনিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ কথা বলিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বেদ নিজে পাঠ করিয়াছেন, যাঁহারা পরের মুখে ঝাল খাইয়া থাকেন না, তাঁহারা কখনই, "বেদসমূহ 'একমাত্র অধ্যাত্মবিষয়বহুল ধর্ম্মগ্রন্থ'—ইহা ভাবিতেও পারেন না। ফলতঃ বেদ সকল—

Ancient History	পুরাতন ইতিহাস
Ancient Geography	পুরাতন ভূগোল
Ancient Literature	পুরাতন সাহিত্য ও
Ancient Bible	পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ

ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন গারোগণ তাহাদের ক্ষেত্রের এক কোণে ধান, এক কোণে মাণ, এক কোণে কলা ও এক কোণে কচু রোপণ করে এবং উহারই এক পাশে তাহাদিগের চাঙ্গ (বংশ নির্ম্মিত উচ্চ গৃহ) থাকে, তদ্রূপ একই বেদে প্রত্নতত্ত্ব ভূগোল, সাহিত্য এবং সেকালের খিচুড়ি ধর্ম্ম কথাও বিদ্যমান। দেখ, ঋগ্‌বেদের একত্র আছে যে—

নাস্মৈ বিদ্যুৎ ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহ মকিরৎ হ্রাদুনিঞ্চ।

ইন্দ্রশ্চ যৎ যুযুধাতে অহিশ্চ উতা পরীভ্যো মঘবা বিজিগ্যে ॥১৩.৩২।১ম

ইন্দ্র ও সর্পবৎ কুরস্বভাব বৃত্রসহ ভারতবর্ষে যুদ্ধ হইতেছিল। বৃত্রাসুর ইন্দ্রের প্রতি যে সকল বৈদ্যুতিক অস্ত্র, তন্যতু বা বিষাক্ত গ্যাস (সম্মোহনাস্ত্র) মিহ (বরুণাস্ত্র, জলকণাস্রোতঃ); বজ্র (কামান বন্দুক) এবং অন্যান্য যে সকল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল; পরন্তু পরিশেষে ইন্দ্রই জয়লাভ করেন।

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণু বিচক্রমে।

পৃথিব্যাঃ; সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১৬। ২২। ১ম।

মরীচিপ্রভৃতি সপ্তর্ষির সপ্তগৃহবিশিষ্ট যে উত্তমা পৃথিবী (৯।১০৮।১ম বা ৯।৫৩ যজুঃ দেখ) বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া হইতে বামন বিষ্ণু স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ সহ ত্রিপাদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই আদি স্বর্গ হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃত্রাসুর-নিপীড়িত ভারতবাসী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ইহা গেল ঐতিহ্য। অতঃপর বেদ হইতে ভূগোল বিবরণ প্রদর্শিত হইতেছে—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ অভীদ্ধাৎ তপসো অধ্যজায়ত।

ততো রাত্রী অজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥১

সমুদ্রাৎ অর্ণবাৎ অধি সংবৎসরো অজায়ত।

অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥২ ১০৯০।১ম

পূর্ব্বে দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যৌ বা স্বঃ এবং পৃথিবী বা ভূঃ (ভারতবর্ষ) ছিল। তৎপর পরমেশ্বরের অত্যুৎকট তপস্যা হইতে উত্তর মহাসাগরগর্ভে ঋতাপরনামা সত্য লোক, রাত্রী লোক ও পশ্চিম মহাসাগরগর্ভে সমুদ্র বা ভুবর্লোক অর্থাৎ তুরুষ্ক, পারস্য ও অপোগস্থান উৎপন্ন হইল। সেই জলপূর্ণ উত্তর মহাসাগরগর্ভে সংবৎসর নামক (মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবেরিয়া) এবং সকলের চক্ষের সামনে সেই বশী পরমেশ্বর উত্তর মহাসাগর গর্ভে অহর্জনপদ ও রাত্রি-জনপদের (মধ্য সাইবেরিয়া) সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বং অকল্পয়ৎ।

দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তরিক্ষ মথো স্বঃ ॥৩।১৯০।১০ম

এইরূপে উত্তর মহা সাগরগর্ভে দিব্ (সংবৎসর বা মহঃ, অহোরাত্র বা তপঃ, ঋতাপরনামা সত্যলোক) ও পশ্চিম সাগরগর্ভে অন্তরীক্ষ বা তুরুষ্ক পারস্য ও অপোগস্থানের উৎপত্তি হইলে পূর্ব্বের স্বঃ বা দ্যৌ (মঙ্গলিয়া) এবং পৃথিবী বা ভূঃ (ভারতবর্ষ) লইয়া ভুবন সংখ্যা চারিটী হইয়াছিল যদাহ বিষ্ণুপুরাণং—

ভূর্ভুবান্ চতুরো লোকান্

পূর্ব্ববৎ সমকল্পয়ৎ ।১৯।৪অ ১অংশ ।

ভূঃ (পৃথিবী বা ভারতবর্ষ পৃথুর রাজ্য বলিয়া ভারতবর্ষের নাম পৃথ্বী বা পৃথিবী)। ভুবঃ (তুরস্ক, পারস্য, অপোগস্থান—মানবের আদি জন্মভূমির অন্তরীক্ষপ্রকরণ দেখ) স্বঃ (স্তো বা মঙ্গলিয়া) ও দিব্ (মহঃ, তপঃ, সত্য বা সংবৎসর, অহোরাত্র ও সত্যলোক) এই চারিটী ভুবনের উৎপত্তি হইয়াছিল। তৎপর সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা আপন ভ্রাতা সূর্য্যকে অহোরাত্র জনপদে এবং পুল্লতাত চন্দ্রকে আনিয়া সংবৎসর লোকের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে আদিস্বর্গে মেরুপর্ব্বতের পাদদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন; তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের স্থায় দিবে নূতন রাজত্ব প্রদান করিলেন। উক্তঞ্চ—বিষ্ণুপুরাণে

নক্ষত্রগ্রহবিপ্রাণাং বীরুধাঞ্চাপ্যশেষতঃ।

সোমং রাজ্যে দধাৎ ব্রহ্মা যজ্ঞানাং তপসামপি ।২।২২অ।২অংশ

সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা আপনার খুল্লতাত চন্দ্রকে নক্ষত্র, গ্রহ-বিপ্রগণ বীরুৎসমূহ যজ্ঞ ও তপস্যার রাজত্বে অভিষিক্ত করিলেন। (নক্ষত্রনামা দেবগণ ও গ্রহনামা দেবগণ গ্রহ)। তথাহি—কৃষ্ণযজুঃ।—

অসৌ আদিত্যঃ অস্মিন্ লোকে আসীৎ

তং দেবাঃ পৃষ্ঠৈঃ পরিগৃহ্য সুবর্গং লোকং অনয়ন্। ৪৫৮পৃ

সূর্য্য প্রথমে আদি স্বর্গে মেরুপর্ব্বত অধঃসানুতে (বায়ুপুরাণ ও সিদ্ধান্ত শিরোমণি দেখ) রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎপর দেবতারা ব্রহ্মার আদেশে তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া ব্রহ্মার নূতন স্বর্গ দিবের অহোরাত্র জনপদে লইয়া যান।

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা

যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ৎ।

ইহা পাঠ করিয়া বেদে অকৃতশ্রম লোকেরা মনে করিয়া থাকেন যে পরমেশ্বর পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কল্পের পর এ কল্পেও পুনবার নূতন চন্দ্র সূর্য্যের সৃষ্টি করিলেন; পরন্তু তাহা নহে। কেন না, একবার সৃষ্টির পর মহাপ্রলয়ে ঐ চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিব্যাদি বিনষ্ট হইয়া নূতন সৃষ্টি হইয়াছে ইহা বেদবিরুদ্ধ। মহামান্য ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন যে—

সকৃৎ দ্যৌ রজায়ত সকৃৎ ভূমি রজায়ত।

পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পর স্তদন্যো নানু জায়তে ।২২।৪৮।৬ম

একবার মাত্র স্বর্গ ভারতবর্ষ ও অন্তরীক্ষের (ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ) উৎপত্তি হইয়াছে, উহাদের বিনাশের পর আর তৎসদৃশ নূতন কোনও ভূ-ভুর্বঃ স্বঃ হয় নাই। অনন্তর শিল্পের কথা বলা যাইতেছে—

বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি।৬।৪৭।৫ম

মাতারা স্ব স্ব পুত্রের জন্ম বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন। তথাহি—

কারুরহং ততো ভিষক্, উপলপ্রক্ষিণী ননা।

নানাধিয়ো বসুযবঃ।৩।১১২।৯ম

আমি নিজে শিল্পী, আমার পিতা ভিষক্, আমার মাতামহী বা ননদ তপ্ত বালুকায় যব ভাজিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, আমরা সকলেই ধনকামী, তজ্জন্য নানাবৃত্তিপরায়ণ। অতঃপর ধর্ম্মের কথা বলা যাইতেছে—

ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি।

যদ্বাহং অভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপে উতানৃতম্ ।২২।২৩।১ম

হে জল আমাতে যে পাপ আছে, তাহা তুমি ধৌত করিয়া দেও, আমি মনে-মনে অন্যের যে অনিষ্ট চিন্তা করিয়াছি, আমি যে অন্যকে শাপ দিয়াছি, আমি যে সকল মিথ্যাচরণ করিয়াছি, তাহা আমা হইতে বহন করিয়া লইয়া যাও।

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা

ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।

যো দেবানাং নামধা এক এব

তং সং প্রশ্নং ভুবনা যন্তি অন্যা ।৩।৮২।১০ম

যে পরমেশ্বর আমাদিগের পিতা, জন্মদাতা, ও বিধানকর্ত্তা, যিনি সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নাম সকল অবগত আছেন, যিনি সকল দেবতার নাম ধারণ করেন, অন্যান্য জনপদ সকলের লোকেরা তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়া থাকেন।

আমরা উপরে ঋগ্‌বেদ হইতে যে সকল মন্ত্র অধ্যাহৃত করিয়াছি, উহা পাঠ করিলেই জানা যায় যে বেদে ইতিহাস, ভূগোল, গৃহকথাময়—সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিক জগতের কথা সকলই বর্ত্তমান। সুতরাং যাহারা বেদ হইতে কেবল নির্জ্জলা আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতে নিত্য সমুৎসুক, তাঁহারা কি এঁড়ে গরু দুহিয়া খাঁটী গো-দুগ্ধ বাহির করিতে লোলুপ নহেন!

ইহা ছাড়া বেদে হিংসা, দ্বেষ, ভ্রান্তি ও প্রমাদ রাশিরাশি রহিয়াছে, যাহা ভ্রান্ত মানুষ ভিন্ন অভ্রান্ত ভগবদ্বাণী হইতে পারে না।

ইন্দ্র ব্রহ্মদ্বিষো জহি। ঋক

হে ইন্দ্র যাহারা আমাদিগের ব্রহ্ম বা বেদে দ্বেষ করে, তুমি বেদ-বিদ্বেষ্টা সেই অসুরগণকে মারিয়া ফেল। তথাহি—

যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষং।

তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নো সো অবীরহা॥

অথর্ব্ব বেদ ১ম খণ্ড ২৭ পৃ।

যদি তুমি আমাদিগের গরু, অশ্ব বা মনুষ্যদিগের হিংসা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সীসার গুলিদ্বারা বিদ্ধ করিব, যাহাতে তুমি আর আমাদিগের পুত্রাদির হিংসা করিতে না পার।

যো অস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। যজুঃ

যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, আমরাও তাহাদিগকে দ্বেষ করিব।

সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্

ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।

অনু দহ সহ মূরান্ ক্রব্যাদো

মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ॥ ৪৬পৃ সামবেদ

হে অগ্নে তুমি চিরকাল হইতেই রাক্ষসদিগকে বাধা দিয়া আসিতেছ। রাক্ষসেরা যেন সংগ্রামে জয়ী হইতে না পারে। তুমি এই ক্রব্যাদ

রাক্ষসগুলিকে দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেল। উহারা যেন দৈব অস্ত্রের হস্ত হইতে মুক্ত না হয়।

যথা নড়ং কশিপুনে স্ত্রিয়ো ভিন্দন্তি অশ্মনা।

এবা ভিনদ্মি তে শেপো অমুষ্যা অধি মুষ্কয়োঃ ॥

২৯১পৃ ২খণ্ড অথর্ব বেদ।

যে প্রকার স্ত্রীলোকেরা প্রস্তরের উপর নল রাখিয়া মুগুর দিয়া ছেঁচিয়া দরমা প্রস্তুত করে, হে শত্রো আমি তদ্রূপ এই প্রস্তরের উপর তোমার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষদ্বয় ছেঁচিয়া তোমাকে বধ করিব।

হে কর্ণহৃদয়বান্ ভ্রাতৃগণ এখন কি তোমরা এই সকল বেদবাক্য ভগবদ্বাক্য বলিয়া মনেও করিতে পার? ভগবান মনু বলিতেছেন যে—

কুধ্যন্তং ন প্রতি ক্রুধ্যেৎ।

আক্রুষ্টং কুশলং বদেৎ।

নারুন্তুদঃ স্যাৎ আর্ত্তোঽপি।

যদি কেহ তোমাকে ক্রোধ করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে প্রতি ক্রোধ করিও না। কেহ গালি দিলেও তাহাকে ক্রোধ না করিয়া মিঠা কথা বলিবে, কেহ ধরিয়া মারিলেও তুমি তাহাকে মারিবে না, অপিচ তাহাকে এমন একটি রূঢ়বাক্যও বলিবে না যাহাতে তাহার প্রাণে আঘাত লাগে।

মানবদেবতা খৃষ্ট ইহা পাঠ করিয়া পেলেষ্টাইনে যাইয়া উপদেশ দান করেন, মানবদেবতা নিত্যানন্দ এই দেবত্ববলেই জগাই-মাধাইয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া উহাঁদিগকে জগদ্বরেণ্য সাধু বানাইয়াছিলেন। কিন্তু যে আদিম যুগে বেদমন্ত্র সকল প্রণীত হয়, তখন লোকের মন তত উদার হইয়াছিল না। তজ্জন্যই বহু প্রাক্তন বেদমন্ত্রে হিংসা, দ্বেষ ও শাত্রব ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য ঐ সকল বেদমন্ত্রকে কেহই ভগবদ্বাণী বলিয়া মনেও করিবেন না। ফলতঃ মনুর সময়েই সকলে অত্যুদার হইয়াছিলেন। মনুর বাক্যই ভগবদ্বাণী।

ইহা ভিন্ন বেদে বিষয়গত ভ্রমপ্রমাদও অল্প নহে। ঋগ্বেদের একত্র বর্ণিত আছে যে—

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিঃ ।১।৪৫।১০ম

. সকলের প্রথমে দিবের উপর অগ্নি প্রজ্বালিত হয়। কিন্তু একথা সত্য নহে। এখানে ঋষির ভ্রম ঘটিয়াছিল। কেন না উক্ত ঋগ্বেদেই আছে যে—

অগ্নিরমৃতো অভবৎ বয়োভিঃ

যদেনং দ্যৌর্জনয়ৎ ।৮।৪৫।১০ম

ইলায়াঃ পুত্রো অজনিষ্ট ।২।২৯।৩ম

অগ্নি আপন মহিমায় অমৃত তুল্য হইয়াছে, যেহেতু ইহাতে দ্যো বা আদি স্বর্গ জন্মাইয়াছে। অগ্নি তজ্জন্য ইলা বা ইলাবৃত বর্ষের পুত্র-স্বরূপ।

পূর্ব্বের মন্ত্রে বলা হইয়াছে, অগ্নি প্রথমে দিবে উৎপন্ন হইয়াছে, এখানে বলা যাইতেছে যে, অগ্নি ইলাবৃত বর্ষ দ্যো বা আদি স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং প্রথম মন্ত্রে কবি ভ্রম করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে। কেননা যখন অথর্ব্বা পুষ্কর দ্বীপ বা আদি স্বর্গে অগ্নির উৎপাদন করেন, তখন সেই অগ্নির দিব্ বা সাইবেরিয়ায় জন্ম হইতে পারে না। তথাহি—

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধি অথর্বা নিরমন্থত।

মূর্দ্ধো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ ১৩।১৬।৬ম

হে অগ্নে মেধাবী অথর্বা ঋষি (সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র) তোমাকে পুষ্কর দ্বীপ বা আদি স্বর্গ ইলাবৃত বর্ষে অরণীসংঘর্ষণদ্বারা উৎপাদন করেন।

দিব্, মহঃ, তপঃ, সত্য, এই ত্রিপিষ্টপ, আর পুষ্কর দ্বীপ দ্যো বা ইলাবৃত বর্ষ সহ অভিন্ন। দ্যো ও দিব্ এক, এ ভ্রম বহু কাল যাবৎ ঘটিয়াছিল। ফলতঃ—এখানে "দিবস্পরি" না হইয়া পাঠ "দ্যোস্পরি" হওয়াই উচিত। সুতরাং এখানে ঋষির ভৌগোলিক প্রমাদ ঘটিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ঋগ্বেদ অন্যত্র বলিতেছেন যে,—

তং উ ষ্টবাম য ইমা জজান

বিশ্বা জাতানি অবরাণি অস্মাৎ ।৬।৮৫।৮ম

তত্র সায়ণঃ—তম্ তমেব ইন্দ্রং বয়ং সংহত্য স্তবাম স্তোত্রং করবাম। য ইন্দ্রঃ ইমা ইমানি, ভূতানি, জজান জনয়ামাস।

যে ইন্দ্র এই বিশ্বের সকল বস্তুর জনয়িতা, আমরা সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার স্তুতি করিব।

কেবল এ মন্ত্রে নহে, বহু মন্ত্রেই ঋষিগণ বরুণ ও ইন্দ্রকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা দুই সহোদর ভ্রাতা। ইঁহারা অসুর-ভয়ে স্বর্গ হইতে পলায়ন করিয়া ভারতে আগমন করেন। এ হেন ইন্দ্র ও বরুণে কি প্রকারে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের আরোপ করা যাইতে পারে? ইহা ভ্রম। অন্যত্র অন্য মন্ত্রে নেম ঋষি বলিতেছেন যে—

প্রসু স্তোমং ভরত বাজয়ন্তঃ

ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।

নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উত্ব আহ

ক ঈং দদর্শকমভিষ্টবাম ॥ ৩।৮৯।৮ম

হে সৈনিকগণ তোমরা কাহার গুণ গান করিতেছ? যদি ইন্দ্র বলিয়া কেহ সত্য সত্যই থাকেন তবে, তাঁহার স্তব করিতে পার। কিন্তু আমি নেম ঋষি বলিতেছি যে ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে ইন্দ্রকে দেখিয়াছে?

এখানে এক মন্ত্র বলিতেছেন যে, ইন্দ্রই পরমেশ্বর, অন্য মন্ত্র বলিতেছেন যে, ইন্দ্র আবার কে? ইন্দ্র নামে কেহ নাই। সুতরাং যদি তোমরা বেদ মন্ত্র সকল ঈশ্বর বাণী বলিয়া দাবি করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমাদিগকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এখানে একত্র পরমেশ্বর বলিতেছেন, আমার নাম ইন্দ্র, অন্যত্র বলিতেছেন যে আমার নাম ইন্দ্র নহে, আমার কোনও অস্তিত্ব নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এখানে নেম ঋষির ভ্রম হইতেছে যে, তিনি সর্ব্বজন-স্বীকৃত ইন্দ্রের অস্তিত্বে সন্দিহান, আর অন্য ঋষির ভ্রম হইতেছে যে, তিনি অদিতিনন্দন ইন্দ্রে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের আরোপ করিতেছিলেন।

কেন? বেদ মন্ত্রে ত আছে যে অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র ও যমপ্রভৃতি

ঈশ্বরের ভিন্ন-ভিন্ন নাম। ঈশ্বর সকল দেবতার নাম ধারণ করেন, ইহাও ত বেদে আছে? আছে; কিন্তু ঐ সকল বেদমন্ত্র পৌরাণিক যুগে পৌরাণিক ভ্রান্তি হইতে বিরচিত। নতুবা উপনিষৎ আক্ষেপ করিয়া বলিতেন না যে—

ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

হে লোক সকল, তোমরা ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া কেন অগ্নি, সূর্য্য ও ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতেছ? ইঁহাদের কেহই ঈশ্বর নহেন। ইঁহারা আমার ঈশ্বরের ভয়ে আপন আপন কার্য্য করিতেছেন।

কেবল ইহাই নহে, ইহা ছাড়া বেদে সংশয়, জিজ্ঞাসা ও ভ্রম প্রমাদ বহু রহিয়াছে, যাহাতে কেহ বেদকে অপৌরুষেয় বা ভগবদ্বাণী বলিতে পারেন না। দেখ, ঋগ্‌বেদে আছে—

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ।
কুত আজাতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্‌ দেবা অস্য বিসর্জনেন
অথা কো বেদ যত আবভূব ॥

কে প্রকৃত সংবাদ জানে, কেই বা ঠিক্ ঠিক্ বলিতে পারে যে, এই সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে আসিল, কিরূপে ইহাদের সৃষ্টি হইল। কেন, দেবতারা ত ত্রিকালজ্ঞ? তাঁহারাও কি তাহা জানেন না? না দেবতারা সৃষ্টির বহুকাল পরে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্বের কিছুই অবগত নহেন। সুতরাং আর কে বলিবে জগৎ কোথা হইতে আসিল।

বেশ জানা গেল যে, ইহা এক অজ্ঞ ব্যক্তির প্রশ্ন মাত্র। এই বাণী ঈশ্বরের হইতে পারে না; কেন না স্বয়ং তিনি কি সৃষ্টিবিষয়ে অনভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারেন? তথাহি—

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭।১২৯।১০ম

এই বিবিধ প্রকার সৃষ্টি কোথা হইতে হইয়াছে? হয় ত কেহ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কেন না—

ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্য্যত্বাৎ

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কার্য্য, সুতরাং ইহাদের একজন কর্ত্তা অবশ্যই আছেন। অমনি ঋষির মনে আসিল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্তশক্তি ভগবানের নিকট একটী বালুকাকণাবিশেষ। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আপনা হইতে হইতে পারিল না; আর অনন্তজ্ঞান, অনন্তশক্তি ভগবান্ কেমন করিয়া আপনা হইতে থাকিলেন বা হইলেন? অতএব বোধ হয় পরমেশ্বর বলিয়া কেহ নাই, প্রকৃতিই জগতের নিদান। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎও তাহাই বলিতেছেন—

স্বভাব মেকে কবয়ো বদন্তি

একদল কবি বলেন যে, স্বভাব বা প্রকৃতিই জগৎকারণ,—পরমেশ্বর বলিয়া স্বতন্ত্র কেহ জগৎকর্ত্তা নাই।

অথবা পরম ব্যোম বা উত্তর কুরুতে আমাদিগের সুকর্ম্মের যে অধ্যক্ষ পরমেষ্ঠী বা সুর জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা আছেন, হয় ত তিনি একথা জানেন; অথবা তিনিই বা সৃষ্টিতত্ত্ব কেমন করিয়া জানিবেন,—যেহেতু তিনিও জগৎ-সৃষ্টির বহুকাল পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাহি—

কো দদর্শ প্রথমং জায়মানং অস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্ত্তি।
ভূম্যাঅসু রসৃক্ আত্মা ক্বিৎস্বিৎকো বিদ্বাংস মুপগাৎ

প্রষ্টু মেতৎ ॥ ৪। ১৬৪। ১ম

কোন্ ব্যক্তি আদি মানব বিরাট্‌কে হইতে দেখিয়াছেন? কেহই নহে। কি আশ্চর্য্য দেখ যে পরমেশ্বরের নিজের অস্থি নাই—তিনি কেমন করিয়া এই অস্থিবিশিষ্ট মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন? আচ্ছা বুঝিলাম যেন এই ভূমির বিকারেই মনুষ্যের প্রাণ, রক্ত, অস্থি ও মাংসাদি হইয়াছে; কিন্তু আত্মা হইল কোথা হইতে? আত্মা ত পার্থিব বস্তুর বিকারে হইতে পারে না। আমি এ বিষয়ে অজ্ঞ; কে আমার হইয়া কোনও বিদ্বানের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করে, মানুষের আত্মা কেমন করিয়া হইয়াছে।

এই মন্ত্র একজন অজ্ঞমনুষ্যপ্রণীত। ইহা স্বয়ং ঈশ্বর-বাণী বা তৎ প্রত্যাদিষ্ট কোনও ঋষিপ্রণীত হইলে তিনি লিখিতেন, ঈশ্বর তিন গ্রেণ হাইড্রোজান ও দুই গ্রেণ নাইট্রোজান দিয়া মানুষের আত্মা বানাইয়াছেন। অতএব অজ্ঞতাপূর্ণ এই সকল মন্ত্র ভগবদ্বাণী হইতে পারে না।

আচ্ছা, তাহা হইলে এই সকল বেদ ও উপনিষদাদি কে রচনা করিল? বেদ যে দেবতাখ্য ব্রাহ্মণগণপ্রণীত, তাহা বেদপাঠেই জানা যায়। বেদে আছে যে—

সূক্তবাকং প্রথম মাদিৎ অগ্নি মাদিৎ হবিরজনয়ন্ত দেবাঃ।
স এষাং যজ্ঞো অভবৎ তনুপাঃ, তং দ্যৌবেদ তং পৃথিবী
তমাপঃ ॥ ৮। ৮৮। ১০ম

দেবতাখ্য ব্রাহ্মণেরা সকলের আদিতে সকলের প্রথমে সূক্তবাক বা বেদমন্ত্র, হবিঃ (গব্য ঘৃত) এবং অগ্নি বা বহ্নির উৎপাদন করিয়াছেন। হিম হইতে দেহরক্ষাকারী সেই অগ্নি উক্ত দেবগণের উপাস্য দেবতা হইলেন। স্বর্গবাসী, ভারতবাসী ও ভুবর্লোকবাসী লোকসকল সেই অগ্নিকে জানেন। তথাহি—

ইনোত পৃচ্ছ জনিমা কবীনাং মনোধৃতঃ সুকৃত স্তক্ষত দ্যাং
ইমা উ তে প্রণ্যো বর্দ্ধমানা মনোবাতা অধ নু

ধর্ম্মণি গ্মন্ ॥ ২। ৩৮। ৩য়

হে প্রভো, তুমি জিজ্ঞাসা কর, কেমন করিয়া দ্যো বা আদি স্বর্গে কবিদিগের মন হইতে কবিতা বা মন্ত্র সকলের জন্ম হইয়াছিল। মন্ত্র সকল সেই কবি দেবগণের মনের বায়ু বা বেগস্বরূপ। তাঁহারা আপন আপন মন হইতে এই সকল শৌভন মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ক্রমে উহাদের সংখ্যাধিক্য ঘটিলে, তৎপর উহারা যজ্ঞে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তথাহি শতপথ ব্রাহ্মণং—

মনো বৈ সমুদ্রঃ মনসো বৈ সমুদ্রাৎ বাচা অভ্র্যা দেবাঃ
ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন্‌॥ ৫।২।৫।২।

দেবতারা মনোরূপ সমুদ্র হইতে খনিত্র দ্বারা খনন করিয়া বেদ মন্ত্র সকল রচনা করিয়াছেন। কে কে? তাহা আমরা আমাদিগের উপোদ্ঘাত প্রকরণে ১৭শ পৃষ্ঠায় সবিশেষ ও সবিস্তার বলিয়াছি।

আচ্ছা বুঝিলাম, বেদ সকল যেন মনুষ্যপ্রণীত। কিন্তু সকলেই বলেন যে, উপনিষৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ড এবং উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এতৎ সমুদায়ই বেদ বা শ্রুতি? মহর্ষি আপস্তম্বও বলিতেছিলেন যে—

মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকো বেদঃ।

মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ সকল উভয়েই বেদ।

হাঁ; আপস্তম্ব প্রভৃতি সকলেরই এই ধারণা যে, বেদ ও ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ। প্রামাণ্য টীকাকার শবর স্বামীও বলিতেছেন যে—

শেষে ব্রাহ্মণ শব্দঃ। ১৩৭ পৃ পূর্ব মীমাংসা।

তত্র শবরস্বামী অথ কিং লক্ষণং ব্রাহ্মণং? মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বেদঃ।

ব্রাহ্মণ কাহাকে কহে? মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়েই বেদ।

হাঁ, শবরস্বামীও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং জৈমিনি এরূপ বলেন নাই। তিনি বলিতেছেন যে—বেদের পরে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। ইহার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে—বেদ ও ব্রাহ্মণ এক বস্তু। ফলতঃ

ব্রাহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানং

ব্রাহ্মণ সকল বেদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। শ্রদ্ধাভাজন রমানাথ সরস্বতী মহাশয় তাঁহার ঋগ্‌বেদের উপক্রমণিকায় ইহা ধরিয়া পাণিনির নাম করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনির মূল সূত্র বা বৃত্তি কিংবা বার্ত্তিকে এই কারিকাটী দেখা যায় না। দেখা না যাউক, ইহা যে গুরু-পরম্পরা শ্রুত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই কারিকাটি আমাদের অধ্যাপক পূজ্যপাদ জগন্নাথ শুকুল শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। তাঁহারও ইহা গুরুমুখে শ্রুত।

বেদঃ লক্ষ্য, ব্রহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানং
ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণোবা।

ফলতঃ, কি উপনিষৎ, কি আরণ্যক, কি ব্রাহ্মণ, এতৎ সমুদায়ই বেদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। বেদের অধ্যাত্মবিষয়ের ব্যাখ্যা গ্রন্থ উপনিষৎ।

উপ ভগবৎসমীপে নিষীদন্তি
উপবিশন্তি অনয়া ইতি উপনিষৎ।

যাহা পাঠ করিলে লোক সকল যেন ভগবানের কাছে যাইয়া উপবেশন করে, তাহাই উপনিষৎ।

আমরা ভাষ্যসমালোচনাপ্রকরণে এ বিষয়ে বহু কথা বলিব; দেখাইব যে, উপনিষৎ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক মূল মন্ত্র নহে, উহারা ব্যাখ্যা গ্রন্থ মাত্র। অবশ্য বৃহদারণ্যক উপনিষৎ মাত্র বলিয়াছেন যে—

অরে বেদা অস্য মহতো
ভূতস্য নিঃশ্বসিতানি।

বেদ সকল যেন ভগবানের নিঃশ্বাসস্বরূপ। কিন্তু বৃহদারণ্যক, পুরাণ ও ইতিহাসাদি গ্রন্থকেও ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। ফলতঃ, ইহা তাঁহার ভক্তিপ্রকাশমাত্র। পরমার্থতঃ জগতের কোনও গ্রন্থই ভগবদ্বাণী নহে ও হইতে পারে না। ভগবান্ গৌতম বলিতেছেন যে—

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।
তৎপ্রামাণ্যং আপ্তপ্রামাণ্যাৎ।

আপ্ত ঋষিগণের উপদেশ বাক্যের নাম শব্দ বা বেদ। গারুড় মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদ যেমন আপ্ত বাক্য, বেদও তদ্রূপ আপ্তবাক্য, তদধিক কিছু নহে। কুসুমাঞ্জলি বলিলেন যে—

বেদঃ পৌরুষেয়ো বেদত্বাৎ আয়ুর্বেদবৎ বেদঃ পৌরুষেয়ঃ
বাক্যত্বাৎ ভারতবৎ বেদবাক্যানি পৌরুষেয়াণি অস্মদাদি বাক্যবৎ।

বেদ সকল মনুষ্যপ্রণীত, অতএব পৌরুষেয়। আয়ুর্বেদ, মহাভারত ও আমাদিগের বাক্য সকলও যেমন পৌরুষেয়, বেদমন্ত্র সকলও তেমনি পৌরুষেয়।

ফলতঃ, কোনও ঋষি কোনও আর্ষ গ্রন্থে বেদকে অপৌরুষেয় বা ভগবদ্বাণী বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। আচার্য্যেরাও বেদকে ভগবৎ প্রণীত বলিয়া অবগত ছিলেন না। কুল্লূকাদি টীকাকারগণ বেদে অকৃতশ্রম ছিলেন; তজ্জন্য তাঁহারাই বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই মত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য।

বিজিতা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৪)

সুলতা একখানি ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িয়া, গভীর মনোযোগের সহিত একখানা নভেল পড়িতেছিল। ঠিক সেই সময়ে দরজা ঠেলিয়া পূর্ণিমা গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পদশব্দে চমকিতা হইয়া, সুলতা বইখানা বন্ধ করিয়া উঠিয়া বসিল।

পূর্ণিমা চেয়ারের একপার্শ্বে বসিয়া বলিল, "আজ কেমন আছ মেজদি? কাল শরীরটা তোমার বড় খারাপ হয়েছিল জানি।"

সুলতা মুখখানা একটু বক্র করিয়া বলিল, "তবু ভাল যে জিজ্ঞাসা করবার একটা মানুষ হ'ল। আমি ঠিক বুঝেছি, কারও কাণে এ কথা গিয়েও যদি থাকে, তবু জিজ্ঞাসা করতে আসবে না।"

পূর্ণিমা বলিল, "তা কেউ আসবে না বটে। এ বাড়ীর ধারাই এমনি। এ তো আর নূতন নয় ভাই মেজদি। কিন্তু আমি যতক্ষণ এখানে থাকব, তোমায় সকল সময়ে দেখব, সেটা জেনে রেখো। আচ্ছা ভাই, সত্যি কথা বল,—কোন দিন তোমায় দেখতে আসতে ভুলেছি আমি?"

সুলতা প্রীতা হইয়া বলিল, "তা আমি জানি ভাই, তুমি কতবার করে আসছ। বাড়ীতে তো আরও ঢের লোক আছে;—মানুষটা বাঁচল কি মরল, কেউ যদি একবার দেখে। আমি বলে তাই আজও এ বাড়ীতে আছি। অন্য মেয়ে হলে কখনো এমন করে বাস করতে পারত না—তা আমি এক কথায় বলে দিচ্ছি।"

পূর্ণিমা কপট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আ আমার পোড়াকপাল,—তা আবার কেউ দেখবে! যেখানে প্রশংসা পাবে, ওরা সেখানেই সেবা করে, কাজ দেখায়। লোকে যে বড়বউ বলতে অজ্ঞান হয় কেন, জানি নে। একবার কপালের জোরে এসে যদি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে কেমন আছ, তাই আমাদের যথেষ্ট। ওই যে সেবার জ্বর হয়ে সাতদিন বিছানায় পড়ে ছিলুম,—দিনের মধ্যে কবার এসেছিল? এক-আধবার হয় তো এসে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে গেলেন, একটু খাইয়ে গেলেন,—এতেই লোকের কাছে নাম কত। কি বল'ব ভাই মেজদি, দেখে-দেখে আমার হাড় পর্য্যন্ত জ্বলে যায়। আমার কিন্তু তেমন লোক পায় নি যে অমনি ভুলে যাব,—অমনি গলে যাব। তোমার মন কেমন তা জানি নে ভাই,—আমার মনটা কিন্তু এই রকম।"

সুলতা একটু গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমাকেও তেমন নরম পায় নি বোন, যে, একটু মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দেবে। আমায় তেমন পায় নি বলেই, সহজে আমার কাছে ঘেঁসতে পারছে না। সে সুবিধে হয় ওই পোড়ামুখো মিন্সেদের কাছে। বড়বউয়ের নামে একটা কথা বলবার যদি যো থাকে। তার কোন কথা কাণে তুলবে না,—উল্টে বকবে, কেন তার নামে মিথ্যে কথা বলি। আমার ঠিক মনে হয়, বড়দি কোনও যাদু জানে। আগে যাদু করা বিশ্বাস করতুম না,—আজ কাল এ সংসারের ভাবগতিক দেখে তাও বিশ্বাস করতে হচ্ছে।"

পূর্ণিমা মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ও-সব একটা কথার কথা ভাই মেজদি। যাদু আবার কি? আমাদের অসুখ-বিসুখ হলে, দেখতে পাও না—যেন ঠেকে সেবা করে। কর্ত্তাদের কারও অসুখ হলে, বুক দিয়ে পড়ে আর এক ভাবে সেবা করে। আবার দেখেছ, খাবার সময় সামনে গিয়ে ওঁর বসা চাই—নইলে মহাভারত যেন অশুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন মেজ ঠাকুর, তেমনি তোমার ঠাকুর-পো। ভাইয়েরই ভাই সব,—কত আর ভাল হবে। সত্যি ভাই মেজদি, এক-এক সময় এই একচোখোমি দেখলে, আমার ইচ্ছে করে, বাপের বাড়ী চলে যাই।"

সুলতা নীরব হইয়া খানিক বইখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। পূর্ণিমা তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, বলিল, "আবার ওই যে এক কাল ছুঁড়ীকে এখানে রেখেছে,—আমি নির্ঘ্যাস বলছি; ওর দ্বারাই আমাদের সংসারটা মাটি হয়ে যাবে।"

উজ্জ্বল চোখ দুটি পূর্ণিমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া সুলতা বলিল, "কি রকম,—কার কথা বলছ?"

পূর্ণিমা বলিল "প্রতিভার কথা।"

সুলতা মাথা দুলাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আমি আর সব বিশ্বাস করতে রাজি আছি সেজবউ, কেবল প্রতিভা হতে আমাদের সংসারের যে কোনও অনিষ্ট হবে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি নে। তার সঙ্গে আমাদের সংসারের সম্বন্ধ কি? সে আজ আছে, কাল চলে যাবে। আর এমনই সরল, এমনই সুন্দর সে,—যে তাকে দেখবে, সেই মুগ্ধ হয়ে যাবে। তার বাইরের চেয়েও মনটা আরও ভাল। আমার মনে হয়, এক পসলা জলে ধোয়া যুঁই ফুলটার মতই সে শুভ্র,—একটু ময়লার রেখা তাতে নেই। দেবতার পায়ে দেবারই উপযুক্ত সে। আমি তো তাই খুব ভালবাসি তাকে। সত্যি কথা বলব তার আর কি। তার ওপরে রাগ কি ঘৃণা আসবে কি করে, তাই ভাবি আমি।"

সুলতার এই সরল সত্য কথাগুলি পূর্ণিমা সহ্য করিতে পারিল না। সে তাই একটু তীব্র কণ্ঠে বলিল, "এখন তো তাই ভাববে বটে; কিন্তু যখন দেখবে, তার দ্বারাতেই আমাদের এ সংসারের কতখানি অনিষ্ট হল, তখন বুঝতে পারবে। যাক ভাই মেজদি, অনর্থক তা হলে সে সব কথা তুলে তোমায় আর বিরক্ত করব না। সত্যিই যখন তাকে ভালবাস তুমি, তখন তার নিন্দেটা তোমার কাছে অসহ্য বলেই ঠেকবে। কাজ কি ভাই, হয় তো তুমি মনে ভাববে, আমার মনটা এত নীচ যে, কাউকেই আমি ভাল বলি নে,—ভাল বলতে পারি নে। সবারই দোষ ধরে বেড়াই। যাই এখন, বিকেলে আর একবার এসে দেখে যাব'খন।"

সে উঠিতেই, সুলতা তাহার হাত ধরিয়া টানিল, "আচ্ছা পাগল তো তুমি ভাই। আমি কি আর তাই-ই বলছি যে, তার দোষ থাকলেও, তা উপেক্ষা করে তাকে ভালবাসব? দোষ দেখতে পাই নি বলেই ভালবেসেছি এতদিন। তোমায় আমি খারাপ ভাবব কেন ভাই? তুমি কখনও আমার ভাল ছাড়া মন্দ কর নি। তুমি চিনিয়ে দাও বলেই তো মানুষ চিনতে পারি আমি। নইলে, ওদের সঙ্গে আমার তত মেলামেশা নেই যে, কাউকে চিনতে পারব। সত্যি, প্রতিভার ব্যাপারটা কি? তোমার কথার ভাবে বুঝাচ্ছে, আমি তাকে এতদিন যা ভেবে এসেছি, সে তা নয়। বল না ভাই সেজবউ, ব্যাপারখানা কি?

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে পূর্ণিমা বলিল, "কাজ কি ভাই একজনের নিন্দে করে। ওটা যথার্থই পাপের কাজ বই কি?"

সুলতা তাহাকে ভাল করিয়া ধরিয়া বসিল, "লোকে পাপ কাজ করতে পারে; আর তা বললেই কি পাপ হয় কখনও ভাই সেজবউ? তুমি বল। যদি পাপ হয়, সেটা আমিই মাথায় তুলে নেব না হয়।"

পূর্ণিমার কুঞ্চিত ভ্রূ দুটী একটু সরল হইয়া আসিল। সে বলিল, "সে আর কি বলব ভাই,—ভাবতে গেলে দোষ ধরাও যায়, আবার না-ও ধরা যায়। তবে কি—পাছে কেউ কোনও কথা বলে, সেই ভয়টা হয় আমাদের। কারণ, আমরা নেহাৎ কাছাকাছি আত্মীয়। ছোট-ঠাকুর-পোর যে দিন-দিন কি রকম ভাব দাঁড়াচ্ছে, বলতে পারি নে। তুমি না কি নেহাৎ সরল মানুষ মেজদি, তাই সংসারের কিছু জানতে পার না। একটু মন দিয়ে যদি লক্ষ্য কর, তা হলে সব বুঝতে পারবে।"

সুলতা গম্ভীর ভাবে মাথা দুলাইয়া বলিল, "ঠিক, আমিও এটা লক্ষ্য করেছি বটে।"

উৎসাহিতা হইয়া পূর্ণিমা বলিল, "এটাও বোধ হয় বুঝতে পেরেছ, কেন এ ভাবান্তর? লম্বা লেকচার ঝাড়া হয়—বিয়ে করব না! দেশের কুপ্রথা উচ্ছেদ করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা কেন,—এর মূলে রয়েছে বিধবার বিয়ে, তা জানছো?

সুলতা সবিস্ময়ে বলিল, "বিধবার বিয়ে?"

পূর্ণিমা বলিল, "তবে আর বলছি কি।"

সুলতা একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল, "অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও, ছোট-ঠাকুরপো প্রতিভাকে বিয়ে করতে চায়,—সেই জন্যেই সে এই সমাজ-সংস্কারের দিকে ঝুঁকেছে,—কেমন?"

পূর্ণিমা বলিল, "তা নইলে আর কি হতে পারে?"

সুলতা বলিল, "এতদিন থেকে হঠাৎ এ প্রমাণটা এল যে তোমার মাথায় সেজবউ,—এর মানে?"

পূর্ণিমা বলিল, কাল সন্ধ্যায় ব্যাপার দেখে। নতুন গাছের বড় গোলাপটি কাউকে দিলে না,—দেওয়া হল প্রতিভাকে। এ সব সাহেবী ভালবাসা কি না,—একটা ফুল দিয়ে তাই জানানো হয়েছে। আবার পঞ্চাশবার সাবধান করে দেছে—যেন ফুল না হারায়। অমিয় যে সেই ফুলটার জন্যে এত মাথা খুঁড়েছিল, তাকে না দিয়ে—রাধাকৃষ্ণকে উচ্ছক না

দিয়ে—দেওয়া হয়েছে তাকে,—এর মানেটা কি? তাকে দিয়ে কি সার্থক হল,—বুঝিয়ে দাও আমায়।"

কথাটা ঠিক মনে ধরিল, তাই সুলতা নীরব হইয়া গেল। যো পাইয়া পূর্ণিমা বলিল, "আবার দেখেছ,—ষোল-সতের বছর বয়েস হয়েছে,—এখনও পরনে শাড়ি, গায়ে গহনা। একাদশীতে যে দিব্যি জলখাবারটি খাচ্ছে,—এতে পিসিমাও একটী কথা বলেন না। মাছ দিয়ে ভাত খেলেই বা দোষটা কি বাপু? তাতে আর বাধে কেন? এতে বাড়ীতে লক্ষ্মী থাকবে কি করে? একাদশীতে বিধবা যে ভিটেয় বসে জল খায়, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বলে, সে ভিটে শিগ্‌গীর উচ্ছন্ন যায়। আমাদেরও তাই হবে, তা দেখা যাচ্ছে।"

অসহিষ্ণু ভাবে সুলতা বলিল, "উনি আসুন আজ, আমি সব কথা তুলব। সত্যিই তো, বাড়ীতে বিধবাতে একাদশীর দিনে জল খায়,—এ তো কখনও শুনি নি। ছেলে-মানুষ বলে চুপ করে ছিলুম। এখন দেখছি, যত চুপ করে থাকব, ওরা ততই বাড়িয়ে তুলবে। এ রকম তো কোনও ক্রমেই ভাল নয়।"

"মেজবউদি, বইখানা পড়া হয়ে থাকে তো দাও আমায়,—এবেলার মধ্যেই পড়ে আবার ফেরৎ দিতে হবে যে!"

শৈলেন এমন ভাবে আসিয়া পড়িল যে, উভয়ের কেহই হঠাৎ আপনাকে সামলাইতে পারিল না। চুরি করিয়া যেন ধরা পড়িয়াছে,—পূর্ণিমার মুখখানা নিমেষে তেমনই বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গেল। সুলতা অত্যন্ত অপ্রস্তত ভাবে হাতের বইখানা খুলিয়া তাহাতে চোখ দিল।

শৈলেন কৌতুকের সহিত হাসিয়া বলিল, "বাঃ, দুটিই যে এক যায়গায়। আজ কিসের পরামর্শ আঁটছ বউদি? এবার বুঝি সত্যি পৃথক হবার বন্দোবস্ত হচ্ছে?"

চোখ উল্টাইয়া সুলতা বিস্মিত সুরে বলিল "পৃথক? কি বলছো ঠাকুরপো?"

শৈলেন হাসি থামাইয়া, মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "না, সত্যি,—তোমাদের এই দুটি অশুভ নক্ষত্রকে এক যায়গায় থাকতে দেখলে, সবারই ভয় লাগে বটে। মনে হয়, আবার হয় তো কি গড়ে তুলছ। সেজবউদিই বেশ মজার লোক—"

মুখখানা পরিষ্কার করিয়া, সহজ ভাবে একটু হাসিয়া পূর্ণিমা বলিল, "তোমাদের কাছে হতে পারি ভাই;—কিসে টের পেলে, সেটা বলবে?"

শৈলেন হাসিল, "বাঃ, তা যেন আর জানা যায় না! রাজাদের একরকম গুপ্তচর থাকে। রাজারা এক যায়গায় বসে থাকে,—গুপ্তচরেরা নানা যায়গায় বেড়ায়, সকলের সঙ্গে মেশে, সব দেখে, শোনে; তার পর ফিরে এসে রাজাকে খবর দেয় যখন, তখনই যুদ্ধটা ভাল করে জেঁকে ওঠে বটে। এই যে এতবড় যুদ্ধটা হল, এতে কত গুপ্তচর যে খেটেছে, তার কি সংখ্যা আছে? যেখানে যা হচ্ছে, সকলের মূল জেনো গুপ্তচর। আর এটাও তার সঙ্গে জেনে নিতে হবে যে, গুপ্তচরেরা অনেক কথা বাড়িয়েও বলে থাকে,—সব সময় ঠিক সত্যটা এসে প্রকাশ হতে পারে না। আমাদের সংসারও ঠিক একটা রাজত্ব বলে ধরে নাও। মেজবউদি এই ঘরটীতে চুপচাপ বসে, আমাদের বাড়ীর, পাড়ার, গ্রামের সব খবরটা জানতে পারেন; এমন কি, প্রতিদিন কার বাড়ীতে কি রান্না হচ্ছে, কয়জন লোক খেলে, সব খবর তিনি পান। এই সব খবরের মধ্যে নিজের বিপক্ষের উপযুক্ত কথা একটা শুনতে পান যদি, আর আঘাতটা যদি বিশেষ ভাবেই গায়ে বাজে, তবে তো কথাই নেই। বীরাঙ্গনা অমনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে, "যুদ্ধং দেহি" বলে নেমে পড়েন। তুমি সে সময়টা নেহাৎ ভালমানুষটীর মত মুখটী বুজিয়ে তফাৎ হতে ব্যাপার দেখ। গুপ্তচরের কাজই হচ্ছে এই,—বিপদের সময় তারা এক ক্রোশ দূরে থাকে। সেজবউদি সেই ধরণের কাজ করেন; তাই বলছি, বেশ মজার লোক।"

পূর্ণিমার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। সে হাসিবার চেষ্টা করিল; তাহাতে কেবল মুখটা অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া গেল। খুব কষ্টে কথা ফুটাইয়া সে বলিল, "তোমাদের ঘরে যখন এসে পড়েছি ঠাকুরপো, তখন তোমরা যা খুশি তা-ই বলতে পারবে। আমাদের মুখ এ রকম যায়গায় চিরকালই বন্ধ থাকে; কারণ, আমরা স্বাধীনতা বেচে এসেছি যে। দেখ, আরও যদি নতুন কোনও কথা বলবার থাকে, বলে নাও। এমন করে আর কাউকে তো বলতে পাবে না।"

পূর্ণিমাকে থামিতে বলিয়া, সুলতা শৈলেনের দিকে ফিরিয়া, ঝাঁজের সুরে বলিল, "সে সব থাক। আমি এই

কথা জিজ্ঞাসা করছি ঠাকুরপো,—তুমি কি আমায় তেমনই দুর্ব্বল, তেমনই হীন বলে ধারণা কর;—অর্থাৎ কেবল পরের দ্বারাই আমি চালিত হই,—আমার নিজের কোনও স্বাধীন শক্তি নেই? তা যদি ভেবে থাক, তবে তোমার সে ধারণা করা খুব বেশী রকমের ভুল করা হয়েছে। তুমি অবশ্য এটা জানতে পার, তোমার মধ্যে যে পরিমাণে শক্তি আছে, আমার মধ্যেও তেমনি আছে। তুমি যখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখ, আমিও তেমনি রাখি। আমি তোমাদের অসভ্য, শিক্ষাদীক্ষাবিহীন, গ্রাম্য স্ত্রীলোক নই—এটা বেশ করে ভেবে দেখো।"

তাহার কথায় গর্ব্বটাই বেশ ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া শৈলেন বেশ আমোদ অনুভব করিল। লোককে জ্বালাইতে পারিলে সে বেশ আমোদ পাইত। লোকে যত রাগিত, সে ততই আরও রাগাইত।

শৈলেন দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল, "যদিও তা নও বউদি,—যদিও তুমি উচ্চশিক্ষিতা, কলকাতার মেয়ে,—তবু তুমি মেয়েমানুষ বই আর কিছু নও মেজবউদি। মেয়েরা হাজারই শিক্ষিতা হোক, তবু তারা মেয়ে,—তাদের জাতির যেটা বিশেষত্ব, সেটা তারা কিছুতেই বিসর্জ্জন দিতে পারে না। আমি স্বীকার করছি, আমার মধ্যে যে শক্তি আছে, সে শক্তি তোমারও আছে। তেমনি তোমার মুখের উপর সেই কথার সঙ্গে-সঙ্গে এও বলছি,—সে শক্তির সদ্ব্যবহার তোমরা করতে পার না;—নিজেরাই ইচ্ছে করে মাটী করে ফেল। মনে করলে তোমরা যেখানে আকাশের মত উঁচু, মহিমময়, অনন্ত অসীম হতে পারতে,—সেখানে তোমরা একেবারে নত, গৌরবহীন, ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ হয়ে যাও। তুমি বউদি যতই শিক্ষিতা বলে গর্ব্ব কর,—যতই অর্থের অহঙ্কার কর,—তবু তোমার যে স্বভাবটাকে ওদের আবরণ দিয়ে ঢাকতে চাও, সে বেরিয়ে পড়বেই। আগুন কখনও যে ছাই ঢাকা থাকে না, তুমি তার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শকুন দেখেছ বউদি? কত উপরে তারা বেড়ায় তা জানো? ওই যে অত উপরে উড়ছে; কিন্তু তাদের নজর কোথায়, তাও বোধ হয় লক্ষ্য করে দেখেছ? যেখানে যে মড়াটাই পড়ুক না কেন, —যত উপরেই থাক,—নজর পড়ে সেই মড়ার ওপরেই। রাগ কোরো না—তোমার স্বভাবটা তোমায় যে দেখিয়ে দিলুম, এতে বরং আমায় দুটো ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তোমার। না:, তোমার মুখ কালো হয়ে এসেছে,—দরকার নেই আর। চটপট দিয়ে দাও বইখানা, আমি সরে পড়ি;—অনর্থক মাথা ঘামিয়ে লাভ কি।"

সুলতা রাগে জ্ঞান হারাইয়াছিল; কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না; কেবল মাত্র সে বলিল, "বটে?"

পূর্ণিমা উঠিয়া পড়িল, "আমি যাই,—কাজ আছে ঢের।"

শৈলেন বলিল, "বিলক্ষণ, তুমি উঠছ যে? বসো সেজ-বউদি,—আমিই সরে যাচ্ছি। অনর্থক এত ব্যস্ত হবার কারণ নেই তোমাদের। কতকগুলো কথা যে বলেছি, তার জন্যে মাপ চাচ্ছি।"

পূর্ণিমা মলিন হাসিয়া বলিল, "আমি আর বসে থেকে কি করব ভাই? আমার কাজ আছে।—দেরী করলে কি চলে? তুমি বরং দুদণ্ড বসে গল্প কর—"

কথাটা শেষ না করিয়াই সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

শৈলেন মুখখানা ভারি অপ্রস্তুতের মত করিয়া বলিল, "কাজটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল মেজবউদি। আমার এ সময়টায় এখানে আসাই অন্যায় হয়ে গ্যাছে। অনেকগুলো কড়া কথাও বলে ফেলেছি। সে জন্যে মাফ চাচ্ছি। তখনই যদি বইখানা ফেলে দিতে আমায়, তা হলে এ অনর্থ ঘটত না। তোমাদের গল্পটাই মাটী করে দিলুম,—তার জন্যে ভারি অনুতপ্ত হচ্ছি।"

সুলতা রাগান্বিত হইয়া বলিল, "বেশী বকিয়ো না ঠাকুর-পো। আমার মাথা বেজায় রকম ধরে গেল তোমার সঙ্গে বকে। এই নাও তোমার বই। আমায় এবার একটু শান্তিতে থাকতে দাও।"

শৈলেন বইখানা বগলে রাখিয়া বেশ শান্ত ভাবেই বলিল, "দেখ বউদি, আমাদের এই অসভ্যা, অশিক্ষিতা, পাড়াগাঁয়ের মেয়েগুলো এত শক্ত উপাদানে তৈরি যে, সমানে সাতদিন যদি লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ঝগড়া করে, তবু তাদের একটু মাথা ধরে না, একটু গলা ভাঙ্গে না, একটু গা পর্য্যন্ত তাদের ব্যথা হয় না। এইটুকুই বিশেষত্ব তাদের। তুমি বোধ হয় মিনিট-পাঁচেক একটু উগ্র মেজাজে উঠেছ,—অমনি তোমার মাথা ধরে উঠেছে। অনেকে বলে—মেয়ে মাত্রেই অবলা, সরলা, কোমলা। আমি এবার হতে এর প্রতিবাদ করব। কেন না, এ বিশেষণগুলো খাটে সহরে শিক্ষিতাদের,—পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতাদের কোনমতেই খাটে না। এরা এক গ্লাস জল

হাতে করে তুলে নিতে হাঁপিয়ে পড়ে না। জীবনের অগস্তি দিনগুলোর মধ্যে কোনও একদিন লোক দেখিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে, তেল জ্বালিয়ে ঘরশুদ্ধ পুড়ে মরে না। যাক, তোমার দুটো ঝি গেল কোথায়? একজন মাথায় ইউ-ডি-কলোন দিক, আর একজন বাতাস করুক না কেন? ডেকে দেব তাদের?"

সে এ কথাগুলা খুব মিষ্ট করিয়া বলিলেও, ইহাতে এত অধিক পরিমাণে ঝাল ছিল যে, তাহা সহজে হজম করা যায় না। সুলতা বিলক্ষণ জ্বলিতেছিল; কিন্তু প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না। সে কেবল মুখ বিকৃত করিল; বলিল, "রক্ষে কর! এমনই কত কথা;—আবার ইউ-ডি-কলোন আর পাখার বাতাস এতে দিলে, আগুনে ঘি পড়ার মত হবে। তোমার হাতে ধরছি ভাই ঠাকুরপো,—আমায় খানিক রেহাই দাও। আমি বেশী বকতে পারি নে, তা তো জানো? কেন আমায় জ্বালাতন করে মারছ?"

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শৈলেন বলিল, "ঠিক কথা। আবার এখনি ফিট হতে পারে যে তোমার—তা যে ভুলে গেছি। না বউদি, এই আমি যাচ্ছি। দেখো, যেন ফিট করে পড়ে থেক না! মেজদা তা হলে আগে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে পৃথক হয়ে যাবে।"

তাড়াতাড়ি সে দরজার কাছ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। মুখটা ফিরাইয়া স্মিত হাসির সহিত বলিল, "যাচ্ছি বউদি, —সেজবউদিকে পাঠিয়ে দেব কি?"

সুলতা আর সহিতে না পারিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর পো—"

শৈলেন মাথা নত করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

(৫)

যোগেন্দ্র বাহিরের ঘরটীতে একা চুপ করিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। বেলা তখন তিনটা মাত্র; সুতরাং বন্ধু-বান্ধব এখনও কেহ আসিয়া জুটে নাই। ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। দুপুরের তীব্র রৌদ্র জানলা-পথে গৃহের মেঝেয় আসিয়া পড়িয়া ঝিক্‌মিক করিতেছিল। বাতাস মুক্ত ভাবে গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

যোগেন্দ্রের মনটা আজ অত্যন্ত ভার। নৃপেন্দ্র যদিও মুখে কিছু বলে নাই, তথাপি যোগেন্দ্রের মনে হইতেছিল, এই-বারে এই সোণার সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলেন, মুখে কেহ কিছু না বলিলেও, হৃদয়ে সকলের ঝড় বহিয়া যাইতেছে। শীঘ্রই এ ঝড় বাহিরে প্রকাশ পাইবে। সংসারের উপর দিয়া এ ঝড় চলিয়া গেলে, সংসারের চিহ্নও থাকিবে না। যোগেন্দ্র এই পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খাটিয়া যাহা দাঁড় করাইতে পারিয়াছেন, তাহা শেষে কেবল ধূলাতেই পর্য্যবসিত হইবে।

তিনি কিছুতেই এ চিন্তাটাকে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে পারিতেছিলেন না। আজ পাঁচ-ছয় বৎসর হইতে তিনি সংসারের সব কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। নৃপেন্দ্রের হাতেই এখন সব ভার পড়িয়াছে। যোগেন্দ্র শুধু দুই বেলা আহার করেন; সমস্ত দিন বন্ধু-বান্ধবের সহিত তাস, পাশা দাবা খেলিয়া কাটান; আর নিয়মিত সময়ে নিজের নেশাটা করেন।

প্রথম বয়সে তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। দিন-রাত্রির মধ্যে একটীবারও তিনি হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইতেন না। সেই সময়ে তাঁহার কোনও বন্ধু তাঁহাকে সামান্য একটু করিয়া মদ খাওয়ার উপদেশ দেন। সেই সময়ে শুধু শ্রান্তিহরণের জন্য তিনি যাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এখন অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি আহার ত্যাগ করিয়া দুই-তিন দিন থাকিতে পারেন; কিন্তু নেশা না করিয়া এক দিনও থাকিতে পারেন না।

পিসীমা প্রথমে ইহাতে খুব আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কাঁদিয়া, হাতে ধরিয়া, তিরস্কার করিয়া যোগেন্দ্রের এ বদ অভ্যাস ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। এখন তিনি হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

যোগেন্দ্র নিয়মিত ভাবে মদ খাইতেন; সেই জন্য কখনও তিনি মাতাল হন নাই; এবং কেহ বুঝিতেও পারিত না যে, তিনি মদ খান।

আজ মনটা বড় ভার বোধ হইতেছিল; শান্তি কিছুতেই পাইতেছিলেন না। সেই জন্য এক গ্লাস মদ ঢালিয়া সবে মাত্র মুখে ঢালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শৈলেন অমিয়র হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল।

তাহাদের দেখিয়াই থতমত খাইয়া, যোগেন্দ্র মদ্যপূর্ণ গ্লাসটা নিজের পিছন দিকে ফেলিয়া দিলেন। শৈলেন তাহা দেখিয়াও দেখিল না। অমিয় কি বলিতে গেল; কিন্তু

শৈলেন তাহাকে এক টিপুনীতে চুপ করাইয়া দিয়া, যোগেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিল, "বড়দা আমায় না কি ডেকেছ ?"

যোগেন্দ্র থতমত ভাবটা একটু সামলাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ডেকেছি বটে। তা' এখনি আসতে বলি নি,—সন্ধ্যের পর, তোমার অবসর মত আসলেই চলত।"

শৈলেন তক্তপোষের এক ধারে বসিয়া বলিল, "সন্ধ্যে-বেলা নানা ঝঞ্ঝাট পড়বে'খন,—তোমার সব বন্ধুরা এসে জুটবে,—তখন কি আর অবকাশ হবে তোমার কথা বলার ? এখন বেশ তুমি একলাই রয়েছ,—বেশ কথা বলতে পারবে-'খন। যা বলবার আছে বল এইবেলা।"

অমিয়ের পানে চাহিয়া যোগেন্দ্র বলিলেন, "কেমন আছিস রে,—জ্বর আসে নি তো ?"

অমিয় মাথা নাড়িয়া জানাইল "না।"

গড়গড়াটা একপাশে সরাইয়া, বেশ সিধা হইয়া বসিয়া, দুই-একবার কাশিয়া, যোগেন্দ্র বলিলেন, "কথাটা যে আমাদেরই সংসার সম্বন্ধে, তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছ ?"

শৈলেন নিজের মাথার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করিতে-করিতে বলিল, "ঠিক বুঝতে পারি নি। কতকটা আন্দাজে বুঝে নিতে হচ্ছে মাত্র।"

গম্ভীর হইয়া যোগেন্দ্র বলিলেন, "তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা পরামর্শ করব বলেই তোমায় ডেকেছি। আমাকে তো জানো—নিজে হতে কোনও বুদ্ধি আমার মাথায় যোগায় না। তাই আমি তোমাদের পরামর্শ চাই। যাক সে সব কথা। আমি এখন যা বলছি, তা শেষ করা যাক। নৃপেন বুঝি কাল সন্ধ্যার ট্রেণে আসবে লিখেছে ?"

শৈলেন উত্তর করিল, "হ্যাঁ।"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "তার আক্কেলখানা দেখেছ একবার ? আমি এতদিন উপেক্ষা করেই আসছি সব ; কিন্তু এখন দেখছি, আর দু-চার দিন উপেক্ষা করলে, গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তোমারও যে আমার দশা হবে, তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। তবে কথাটা হচ্ছে কি, তুমি শিক্ষিত,—যেমন-তেমন 'করে' হোক নিজের যোগাড় করে নিতে পারবে। আমি অশিক্ষিত, মূর্খ ; আর এই বুড়ো বয়সে চার-পাঁচটা প্রাণীর ভরণপোষণ করাও আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।"

শৈলেন উত্তেজিত হইয়া বলিল, "সত্যি যদি সেই দিনই আসে বড়দা, তুমি কি ভাবছ আমি নিজের দিকটাই দেখে যাব কেবল ? এতই কি স্বার্থপর আমি ? তোমার যেমন কর্ত্তব্য ছিল আমাদের ওপরে, আমাদেরও কি তেমনি কর্ত্তব্য নেই ?"

নরম ভাবে যোগেন্দ্র বলিলেন, "অবশ্য আছে ; কিন্তু আজ-কাল সংসারে কয়জনে কর্ত্তব্য পালন করে থাকে শৈলেন ?"

শৈলেন বিজ্ঞ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে কথা খুব সত্যি বড়দা। কিন্তু, তা বলে তুমি কখনও এ কথা ভেব না, আমি তোমাদের গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখে, বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বাবুগিরি করব আর পেট ভরে খাব। আমি নিজে যদি থাকবার মত একখানি ঘর পাই বড়দা, নিশ্চয়ই জেনো সে ঘর তোমারই, আমার নয়। নিজে যদি এক মুঠো খেতে পাই, অমিয়কে সেই পাতে বসিয়ে আমি উপোস করে সে দিনটা কাটিয়ে দেব। আমার ওপরে অবিশ্বাস এনো না—আমায় বিশ্বাস কর। আমি সেই বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র কি না, প্রাণপণে তা দেখাব। অন্যায় আমার দ্বারা কখন হবে না, এ তুমি ঠিক জেনে রাখ বড়দা।"

যোগেন্দ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি অমিয়কে কারও হাতে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চাই। ওর জন্যেই আমার বেশী ভাবনা। তোমার বড়বউদির জন্যে ভাবনা করি নে ; কারণ, সে মেয়েমানুষ, জীবনে স্বামীর ঘর ভিন্ন অন্য লক্ষ্য তার নেই। স্বামী অভাবে গৃহহারা হলে, সে দাস্যবৃত্তি করেও নিজের জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। অমিয়র তা করলে চলবে না। ওর সামনে মহৎ লক্ষ্য, উচ্চ কল্পনা,—তা সফল করাতে'হবে ; কারণ, ওকে দশজনের সামনে পরিচয় দিয়ে দাঁড়াতে হবে। লেখাপড়া খানিক দূরও করা চাই, যাতে ভদ্রভাবে জীবনটা কাটাতে—"

অসহিষ্ণু ভাবে শৈলেন বলিল, "তুমি কি বকছ পাগলের মত ? একেবারে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে জাগলে না কি ? তুমি বেঁচে থাকতে এমন কারও সাহস হতে পারে যে—"

বাধা দিয়া যোগেন্দ্র বলিলেন, "আমার আর কয় দিনই বা বাকি আছে ? আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, আমার দিন সংক্ষেপ হয়ে এসেছে। বড় জোর একটা কি দেড়টা বছর যদি বেঁচে থাকি। মাথার ওপরে মৃত্যুর ভ্রূকুটী নিরন্তর

দেখতে পাচ্ছি। আমার মরণের পরে যা-যা করতে হবে, তাই বলে দিয়ে যাচ্ছি।"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে শৈলেন বলিল, "আমাকে বলবার দরকার দেখছি নে কিছু :—যে শুনতে চায়, বলবেন তাকে। উঠে আয় অমিয়,—এ সব কথা শোনবার জন্যে আমি আসি নি। যে দিন আসবে তা—আসবে; তার জন্যে এখনি মাথা ঘামাবার দরকার দেখছি নে কিছু। উঠে আয় অমিয়, চল, আমার নতুন ফুলগাছগুলো দেখে আসা যাক।"

যোগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "বোস, বোস,—আর বলছি নে ও সব কথা। ভবিষ্যৎটা একটু জানিয়ে দিলুম তোকে। নৃপেন যে এমনই কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে, তা নয়; তবে হতে পারে। আমার মনটা বড় দুর্ব্বল হয়ে উঠেছে। যত রাজ্যের উড়ো কল্পনা এসে মনটাকে আমার জড়িয়ে ধরে পিষে মারছে। এগুলোকে আমি কিছুতেই দূর করতে পারছি নে। যাই হোক, নিশ্চিন্ত হলুম আমি অমিয়র ভাবনা হতে। আর একটা কথা আছে বটে।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "রমেনের কথা বলছি। তার জন্যে একটু না খাটলে, সে তো একেবারেই বয়ে গেল। আমার পাছে মান না থাকে, এই ভয়ে আমি তাকে কোনও কথা বলতে পারছি নে। তোমার সে বিষয়েও কর্ত্তব্য আছে, জানো? কোনও ক্রমে তাকে ফিরাতে পারবে না কি,—দেখ দেখি ভেবে?"

শৈলেন মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "সে আর আমি কি করব বড়দা? আমাদের জন্যে সেজদা কিছু খারাপ হয় নি,—হয়েছে সেজবউদির জন্যে। আমি শুনেছি,—নিজেও বেশ লক্ষ্য করে দেখিছি,—সেজবউদি অত্যন্ত খারাপ শ্রেণীর মেয়ে। নিজের মন্দ ব্যবহারে তিনি সেজদাকে একেবারে অধঃপাতে ফেলেছেন। তিনি যদি মুখখানা একটু ভাল করতেন, তা হলে এ রকম হত না। এখনও যদি ভাল ব্যবহার করেন, ত সেজদাকে ফিরানো যেতে পারে।"

যোগেন্দ্র কেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "তুমি যদি একটু চেষ্টা কর ভাই, তা হলে—"

শৈলেন অতিরিক্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি কি করব?"

যোগেন্দ্র নরম সুরে বলিলেন, "বলছি, যদি তোমার সেজ-বউদিকে কোনও রকমে ভাল করতে পার। আমি ত পারব না,—নচেৎ আমিই করতুম। বড়বউয়ের সঙ্গে তো মোটেই বনে না; তার কথা এক কাণে শোনে, আর এক কাণে বার করে। তুমি ছোট ভাইয়ের মত বুঝাতে পারবে,—ভবিষ্যৎটা যে কি রকম, তা দেখিয়ে দিতে পারবে; সেই জন্যেই তোমায় বলছি। স্বামীকে স্ত্রীর কি ভাবে দেখা উচিত, স্বামী স্ত্রীর কতখানি পূজ্য, সেটা বুঝিয়ে দিতে পারবে না? আমি নানা দিক ভেবে তোমাকে এই কাজের ভারটা দিতে চাই।"

শৈলেন মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "আমি রাজি আছি বড়দা। কিন্তু সেজবউদিকে তুমি চেন না বড়দা। বড়বউদির মত লোকের কথা যে কাণে তুলতে রাজি নয়, সে আবার আমার মত লোকের কথা কাণে নেবে—এটা আমার মনে লাগছে না। মূর্খকে বুঝানো যায়,—পণ্ডিতকে বুঝানো যায় না। সেজবউদি সব জেনে-শুনেও, স্বামীকে এমন অশ্রদ্ধা করে কর্কশ কথা বলেন যে, সেজদা পরিণাম জেনেও মদ খেয়ে মাটীতে গড়াগড়ি দেয়। এদের বুঝানো ভারি শক্ত।"

যোগেন্দ্র হতাশ ভাবে বলিলেন, "ওই তো মুস্কিলের কথা। যাই হোক, চেষ্টা করা উচিত কি না বল। সে আমাদেরই ভাই,—গেলে আমাদেরই যাবে,—পরের যাবে না। জানো কি—মানুষের এমন একটা সময় আসে, যখন একটা সামান্য কথায় তার চৈতন্য ফিরে যায়। তুমি যদি চেষ্টা কর, সে সময়টাকে নিশ্চয়ই ধরতে পারবে তুমি। প্রত্যেক কাজেই যত্ন চাই; যত্ন নইলে কিছু হয় না। এখনও ছেলে-মানুষ তুমি,—সেই জন্যেই সংসারের কিছু বুঝতে পার না। আমার হয়েছে ভারি মুস্কিল; কেন না, নিজে কিছু বলতে পারছি নে। রমেনের যদি ফিরবার উপযুক্ত সময় না হয়ে থাকে, আমি তাকে সে অবস্থায় ফিরাতে গেলে উল্টা ফল হবে। সে এখন আমার মান বাঁচিয়ে যতটা প্রচ্ছন্ন ভাবে চলছে, এর পরে আর তা করবে না; আমার সামনেই সে তার ব্যভিচারিতা প্রকাশ করতে একটুও কুণ্ঠিত হবে না। সেজ-বউমাকে কোন কথা বুঝিয়ে বলতে গেলে, তিনি যদি একটা কথা বলেন, তা হলে বড়র অহঙ্কার নিয়ে আমার ধূলোর সঙ্গে ধূলোই হয়ে যেতে হবে। তোমায় কেউ কথা বললেও তোমার গায়ে লাগতে পারে না; কারণ, তুমি ছোট।

দুটো কেন,—দশটা কথা শুনিয়ে দিতে পারে তোমায় তারা। দেখ, সব দিক বিবেচনা করে যা হয় বল।”

শৈলেন বলিল, “আমি বলছি বড়দা, আমি চেষ্টা করব;—তার পর সফলতা লাভ করব কি না জানি নে।”

যোগেন্দ্র আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, বালিশে আড় হইয়া পড়িয়া, একটা হাই তুলিয়া বলিলেন, “হয়েছে আমার সব কথা, এখন যাও তোমরা। ভোলাকে বলে যেয়ো এক ছিলিম তামাক দিয়ে যেতে।”

অমিয়কে সঙ্গে লইয়া শৈলেন চলিয়া গেল।

মহীশূর-ভ্রমণ

(পঞ্চম প্রস্তাব)

[শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই]

পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, কাল্লমবাডি হইতে আসিয়া, কৃষ্ণস্বামী মহাশয়ের বাটীতে আহার করিয়া, ডাকবাঙ্গলোতে পঁহুছিতে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। আমার ভৃত্য আমার জন্য নিতান্ত চিন্তিত হইয়া বসিয়া ছিল; তাহার ভয় হইয়াছিল, এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব দেশে কোন বিপদে পড়িতে পারি। বিশেষতঃ, বাঙ্গলোটি সহরের বাহিরে, এবং ইহার সন্নিকটে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের বাস। সামান্য আহার করিয়াই শয়ন করিলাম। নিদ্রা যাইবার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আমার ভৃত্যটি বিশেষ ভয় পাইয়া, ছুটিয়া আমার শয্যার নিকট আসিল, এবং আমায় ডাকিল। আমি উৎকণ্ঠিত চিত্তে উঠিয়া বসিলাম; এবং ভয়ের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, শুনিতেছেন না, পার্শ্বের বাথরুম্ হইতে গোঁ-গোঁ শব্দ আসিতেছে,—কাহাকে যেন হত্যা করিতেছে,—সে যাতনায় গোঁ-গোঁ শব্দ করিতেছে? আমি বলিলাম, না, ও কিছুই না; তুমি ঘুমোও গে। সে ত আমার শয্যার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই নড়িবে না; পুনরায় বলিল, ওই শুনুন, ও-ঘরে ভূত আছে শুনিয়াছি;—এ ভূতের শব্দ না হইয়া যায় না। আমিও একটু ভীত হইয়া পড়িলাম; বোধ হইল যেন স্পষ্ট শুনিলাম, কে এক-একবার যাতনাব্যঞ্জক গোঁ-গোঁ শব্দ করিতেছে। যদিও ভূত-প্রেতাদি আমি আদৌ বিশ্বাস করি না, তথাপি, আমার ভয়ের কারণ ভূত নহে বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না। একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ভয়ে আমাকে উৎকণ্ঠিত করিয়া ফেলিল। সেই সময়ের কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার কোন নিকট সম্পর্কীয়া আত্মীয়া আত্মহত্যা করেন,—উৎকণ্ঠার কারণ এই সব নানা চিন্তা। কিন্তু প্রধান কারণ, চোর ও ডাকাতের ভয়। কেন না, বাঙ্গলোটি সহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া বাথরুম্ পরীক্ষা করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল একখানি সার্সির একখানি কাচ ভগ্ন দেখিলাম; বোধ হয় তাহার মধ্য দিয়া বায়ুপ্রবাহ প্রবেশের জন্য ওরূপ শব্দ হইয়াছিল। ভৃত্যটিকে অনেক বুঝাইয়া নিদ্রা যাইতে বলিলাম। সে কিন্তু আমার পার্শ্ব কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। অবশেষে তিরস্কার করিতে, সে অপর শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল। তাহাকে অন্য ঘরে যাইতে হয় নাই; সে আমারই প্রকোষ্ঠের আর এক কোণে শুইয়াছিল। সেই সামান্য দূরে আপন শয্যায় যাইতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। নিদ্রিত হইবার কিছুক্ষণ পরে আমার স্বপ্নাবেশ হইল। স্বপ্নে দেখিলাম, আমার যে আত্মীয়াটি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, তিনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ইঙ্গিতে কি যেন বলিলেন। আমার সহিত তাঁহার কথা কহিবার সম্পর্ক নহে বলিয়া কথা কহিলেন না; কিন্তু বোধ হইল, আপনার একমাত্র বালিকা কন্যার দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া, তাহাকে যত্ন ও তাহার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জীবদ্দশায় তিনি আমায় বিশেষ ভক্তি ও সম্মান করিতেন; এবং তাঁহার কন্যাও আমার বড় আদরের পাত্রী। আমি শোকে অভিভূত হইয়া কি উত্তর দিতে যাইতেছি, এমন সময়ে আমার ভৃত্যটি পুনরায় দৌড়াইয়া আসিল; চীৎকার করিয়া বলিল, “ওই

শুনুন, সত্য কি মিথ্যা।" আমি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করাতে সে বলিল, "ওই পার্শ্বের ঘর হইতে গোঁ-গোঁ শব্দ আসিতেছে শুনুন।" আমি ত তাহাকে লইয়া মহা মুস্কিলে পড়িলাম। আমারও যেন বোধ হইল, পার্শ্বের ঘর হইতে শব্দ আসিতেছিল। সেও আমার পার্শ্ব হইতে কিছুতেই সরিবে না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, আমার কাছেই থাক।" আমার এই ভৃত্যটি মান্দ্রাজ প্রদেশের কাঞ্চীনগরী বা কঞ্জিভেরমে অবস্থান কালে, ভূতের ভয়ে আমাকে এইরূপ বিরক্ত করিয়াছিল।

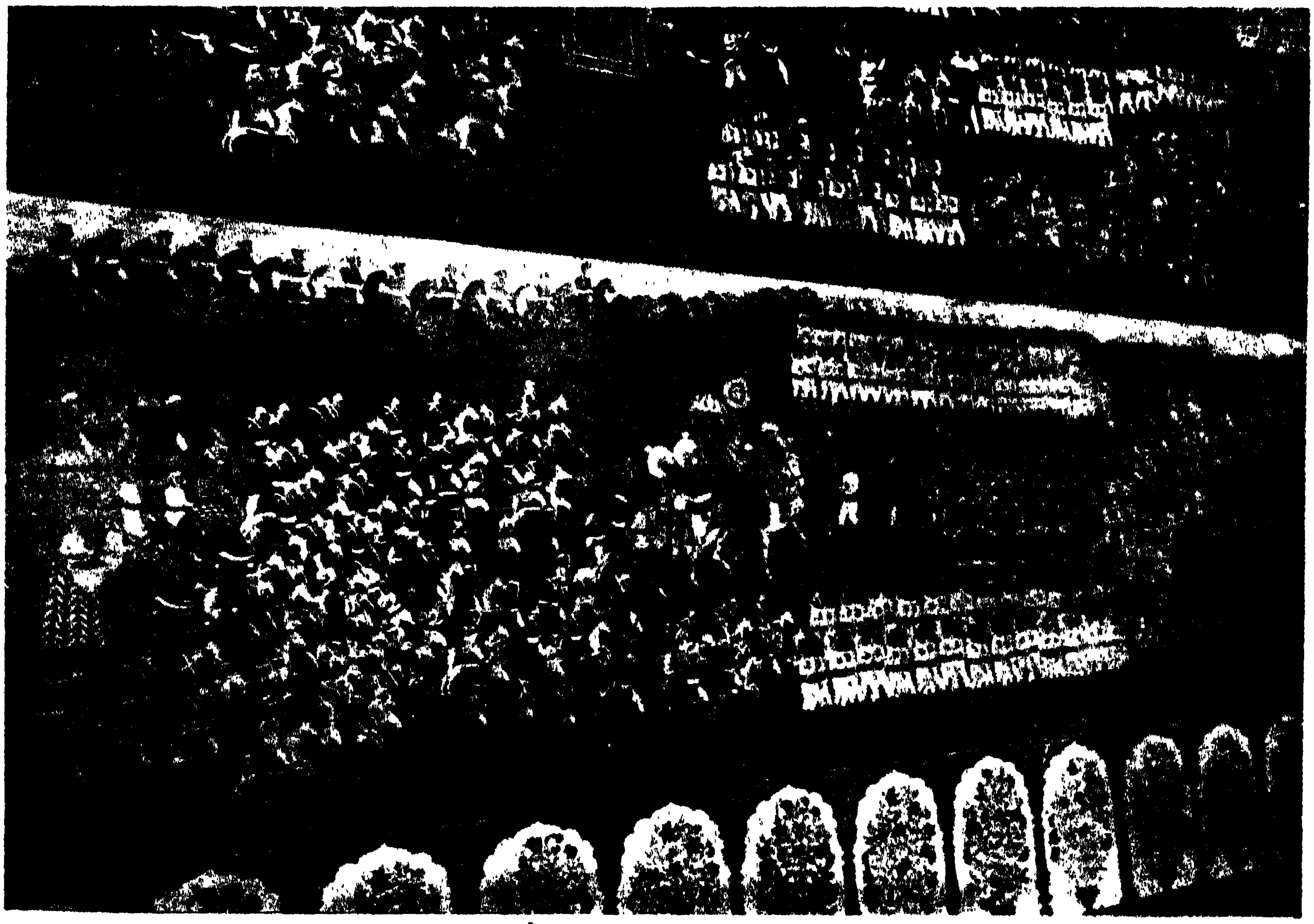

মহীশূর রাজপ্রাসাদে প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত চিত্র

সস্থানে তাহার ভয় পাইবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান ছিল; কন না, যে বাটীতে আমি ছিলাম, তাহা মনুষ্য-মাগম-বর্জ্জিত ও তাহার প্রকোষ্ঠগুলি অন্ধকার; কিন্তু প্রকার প্রশস্ত বাঙ্গলোয় ভয়ের বিশেষ কারণ আমি কিছু দেখি না। যাহা হউক, সে রাত্রে আর নিদ্রা হইল । রাত্রি প্রভাত হইলে, সোমনাথপুরে যাইবার জন্য স্তুত হইতে লাগিলাম। কৃষ্ণস্বামী মহাশয় প্রাতে সিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া, ও তাঁহাকে অভিনন্দন-নমস্কারাদি দ্বারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, সোমনাথপুরে যাত্রা করিলাম।

পূর্ব্ব হইতে "ঝটকা" বন্দোবস্ত করা ছিল। মহীশূর হইতে সোমনাথপুরে যাইবার তিনটি পথ বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে দুইটি পথ বন্নূর গ্রাম হইয়া সোমনাথপুরে গিয়াছে। মহীশূর হইতে বন্নূরে যদি বরাবর সোজা পথে যাইতে হয়, তাহা হইলে পথি মধ্যে একটি নদী অতিক্রম করিতে হয়। এ পথের দৈর্ঘ্য ১৫।। মাইল। কিন্তু নদীটি সে সময়ে দুরতিক্রম্য এবং পথও অতি জঘন্য। এইজন্য স্থির করা হইল, শ্রীরঙ্গপত্তন বা সেরিঙ্গাপটাম (Seringapatam) হইয়া বন্নূর যাওয়া হইবে। এ পথ অতি সুন্দর; এবং এই পথে যাইলে বন্নূরের দূরত্ব ২৬ মাইল। মহীশূর হইতে সেরিঙ্গাপটাম ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। সোমনাথপুরে যাইবার আর একটি পথ শিবসমুদ্রম্ যাইবার পথে অবস্থিত মালবল্লী গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়াছে। ইহা মালবল্লী হইতে ১২ মাইল দূরে। এ পথে যাইতে মহীশূর হইতে ৪৬ মাইল দূরে মাদ্দূর ষ্টেসনে আসিয়া, তথা হইতে শিবসমুদ্রম্ বা মালবল্লীর দিকে যাইতে

হয়। এ পথে আসিলে আমার অভীষ্ট স্থানগুলি, অর্থাৎ শ্রীরঙ্গপত্তন, শ্রবণ বেলগোলা, হালেবিড প্রভৃতি স্থানগুলি দেখা হইবে না আশঙ্কা করিয়া, মহীশূর হইতে সোজাসুজি রওনা হইলাম। ঝটকাওয়ালার সহিত সোমনাথপুর মন্দির দেখাইয়া সেরিঙ্গাপটামে ফিরাইয়া আনিবার ভাড়া ৭ টাকা চুক্তি হইয়াছিল।

সোমনাথপুরে কেন যাইতেছি, তাহা ভাল করিয়া বলা হয় নাই। এখানে হৈসল বল্লাল নরপতিদিগের নির্ম্মিত একটি সুন্দর বিষ্ণুমন্দির আছে। ইহা ভারতীয় স্থাপত্যের চালুক্য শাখান্তর্গত। হৈসল বল্লাল নরপতিদিগের সময়ে এই শাখার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। যিনি এই উন্নতির মূল, তাঁহার নাম স্থপতি জকনাচার্য্য। ইঁহার পুত্র ডঙ্কনাচার্য্যও পিতার ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া, মহীশূর স্থাপত্যের ইতিহাসে অমর হইয়াছেন। এ কথা এ স্থানে বলিয়া রাখি যে, বল্লাল নরপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন ও তাঁহার স্ত্রীর উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা পিতাপুত্রে স্থাপত্যের উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহীশূরস্থ বেলুড় গ্রামের মন্দিরে রাজা, রাজ্ঞী ও স্থপতি জকনাচার্য্যের মূর্ত্তি দেখিয়াছি। সে কথা পরে বলিব। সোমনাথপুরের বিষ্ণুমন্দিরে যে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে, তাহা প্রসন্নচন্দ্র কেশবের; এবং মন্দিরটি জকনাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত রীতির ললামভূত। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে চালুক্য শাখান্তর্গত একটিমাত্র মন্দির দেখিয়াছিলাম। তাহা নিজাম বা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের হোনামকুণ্ডা গ্রামে অবস্থিত। ইহা দেখিতে যাইয়া যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। এত কষ্ট ভোগ করিয়াও চালুক্য রীতির যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আরও অনেকগুলি ও ভিন্নপ্রদেশান্তর্গত চালুক্য মন্দির দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলাম। পূর্ব্বেকার কষ্টের স্মৃতি মন হইতে অপনীত করিয়াছিলাম। উৎসাহ-প্রদীপ্ত মনে সোমনাথপুর মন্দির দেখিবার জন্য মহীশূর হইতে যাত্রা করিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে পথ দিয়া যাত্রা করিলাম, তাহা সেরিঙ্গাপটামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই পথের দুইধারে অশ্বত্থ, বট, নিম্ব প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ সন্নিবিষ্ট হইয়া, পথটিকে ছায়া-স্নিগ্ধ করিয়াছে; বিহঙ্গমকলকাকলি মৃদু-সমীরণ-প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া আমার মনকে এক অব্যক্ত আনন্দে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি আনন্দে বিভোর হইয়া, বিশ্ব-রচয়িতা ও নিয়ন্তা সেই বিরাট পুরুষের উদ্দেশে মৃদু-মৃদু গুঞ্জনে আমার অস্ফুট ও উচ্ছ্বসিত প্রেমকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলাম। এ প্রেমের উন্মাদনায় আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কোন্ কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি যে আমাকে বিশ্বকেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, কাহার অমৃতনিস্যন্দি আহ্বানে আমার মলিন ও চিরচঞ্চল মন যে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির ভাব ধারণ করিল, তাহা ত জানি না। ইহাই কি cosmic emotion? ইহা যাহাই হউক না কেন, আমি পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু শকটচালকের দৌরাত্ম্যে আমার আনন্দের ধারা অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। সে একবার বলে "এগিয়ে বস"; আবার কিছুক্ষণ পরে বলে "একটু পেছিয়ে বস"। তাহার অনুরোধ বা আদেশের কোন নির্দ্দিষ্টতা না দেখিয়া, আমি ত মনে-মনে বিরক্ত হইলাম। কেন না, ব্যবসায় হিসাবে আমাদিগকে গণিত প্রভৃতির আলোচনা করিতে হয়; এবং এই অভ্যাসের ফলে মন সর্ব্বদা একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুসরণ করিবার প্রয়াসী। তাহাকে বলিলাম, ঠিক দেখিয়ে দাও, কোন স্থানে বসিব। সে বুঝিল, আমি বিরক্ত হইয়াছি; এবং সেইজন্য একটু মৃদু হাস্য করিল। আর একটি কারণে মধ্যে-মধ্যে বিরক্তির সঞ্চার হইতেছিল। ইহা পথের ধূলি। যখন ২।১ খানি মটর কার আমাদের বিপরীত দিক হইতে আসিয়া, আমাদের অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, তখন আমরা কেবল ধূলির দ্বারা ধূসরিত হই নাই—ধূলি দ্বারা স্নাত হইয়াছিলাম। গোরজঃ দ্বারা স্নাত হওয়াকে বায়ব্য-স্নান কহে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা যখন বায়ব্য স্নানাদি কয়েকবিধ স্নানের পরিভাষার সঙ্কলন করেন, তখন তাঁহারা নিশ্চয় দিব্যদৃষ্টিতে দেখেন নাই যে, কলিযুগে মোটর কারের আবির্ভাব হইয়া ধূলিকণিকার সৃষ্টি করিবে। তাহা হইলে তাঁহারা ইহারও পরিভাষার রচনা করিতেন, এবং ইহার ঝটিকাস্নান সংজ্ঞা দিতেন।

পথে যাইতে-যাইতে দুই পার্শ্বে সমাধির শ্রেণী দেখিলাম। ইহারা অযত্ন-বিন্যস্ত ও উপেক্ষিত ভাবে রহিয়াছে দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। তাহাদের অধিকাংশই লতা-গুল্মাচ্ছাদিত ও জীর্ণ। পুষ্পমাল্য দ্বারা পুরাতন স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য কখনও যে কেহ এ সব সমাধির নিকটে আইসে, তাহা বোধ হইল না। এ সমস্তই পরিত্যক্ত। হায়দর আলি ও

তৎপুত্র টিপুর রাজত্বকালে সেরিঙ্গাপটাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে অনেক সমৃদ্ধিশালী মুসলমান বাস করিতেন। গ্রামগুলিও মুসলমানপূর্ণ ছিল। সেই জন্য বোধ হয় পথের দুইধারে এত সমাধি-ক্ষেত্র দেখিলাম। ক্রমে আমরা সেরিঙ্গাপটামে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের দক্ষিণে সেরিঙ্গাপটামের দুর্গ অবস্থিত; ও বামে কাবেরী নদী প্রবাহিতা। কাবেরীর তীরেই সেরিঙ্গাপটামের ডাক্-বাঙ্গলো দেখা গেল। এখানে বিশ্রাম না করিয়াই আমরা চলিতে লাগিলাম। ওয়েলেস্‌লি ব্রিজের উপর দিয়া কাবেরী পার হইয়া বন্নুরাভিমুখে যাত্রা করা গেল; বন্নুর এখান হইতে ১৫ মাইল। ১১ মাইল পথ আমরা পূর্ব্বেই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এই ১১ মাইল পথ আসিতে, শকটচালক তাহার অশ্বকে একবারও বিশ্রাম করিতে দেয় নাই। সে বেচারী সমান বেগে আসিয়াছিল। মহীশূর হইতে বন্নুর গ্রাম পর্য্যন্ত ২৬ মাইল পথ আসিতে, অশ্বটি বোধ হয় একবার বা দুইবার সামান্য বিশ্রাম লইয়াছিল। এই কারণে শকট-দণ্ডের সহিত ঘর্ষণের ফলে তাহার গাত্রে বিষম ক্ষত হইয়াছিল। এ প্রকার সহিষ্ণু অশ্ব আমি ভারতের কুত্রাপি দেখি নাই। পঞ্জাবের বা কাশ্মীরের অশ্বও এ প্রকার সহিষ্ণু নহে। ভারতের সীমান্ত প্রদেশীয় (অর্থাৎ পেশোয়ার) অশ্বচালিত শকটে আমি কাশ্মীর যাত্রা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে অশ্ব মহীশূর দেশীয় অশ্ব অপেক্ষা দৃঢ়কায় ও সবল হইলেও এত সহিষ্ণু নহে।

সেরিঙ্গাপটাম হইতে বন্নুর পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে, তাহার প্রথম কয়েক মাইলের অবস্থা বেশ সুন্দর। কিন্তু শেষের দিকের কয়েক মাইল সংস্কারাভাবে বন্ধুর হইয়া পড়িয়াছে। পথের নিকট দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত কাবেরী নদী প্রবাহিত দেখা গেল। তাহার ফেনিল সলিলধারা পথ হইতে নয়ন-গোচর হয়; এবং যেখানে নদী অদৃশ্য হইয়াছে, সেখানে তাহার কলোচ্ছ্বাস তাহার অস্ফুট মর্ম্মগাথার ন্যায় শ্রুতিগোচর হয়। নদীগর্ভস্থিত দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রস্তরে আহত হইয়া জলপ্রবাহে যে ফেণার সৃষ্টি হইতেছে, তাহা বায়ু দ্বারা উৎসারিত হইয়া নদীতটকে বেশ শীতল করিয়া রাখিয়াছে। শুধু নদীতীর কেন, তথা হইতে অনেকটা দূরস্থিত পথ পর্য্যন্ত শীকরসম্পৃক্ত বায়ু দ্বারা বেশ শীতল বোধ হইতেছিল। পথের দুই পার্শ্বস্থিত শ্যামতরঙ্গায়িত প্রশস্ত প্রান্তরে রূপ যেন আর ধরিতেছে না। এখনও বর্ষার শেষ

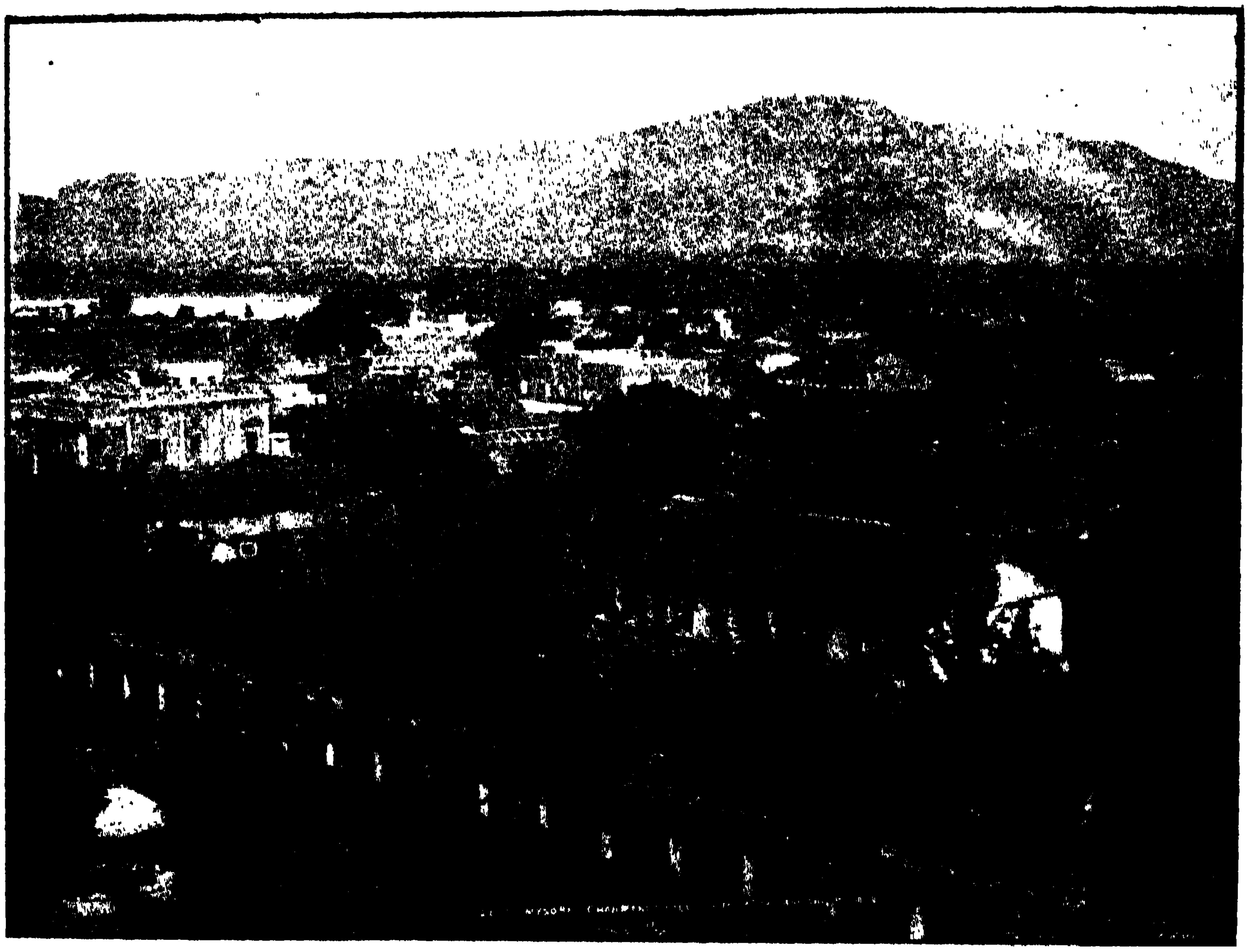

জগন্মোহন প্রাসাদ হইতে চয়মণ্ডী পাহাড়ের দৃশ্য

হয় নাই। এই "সরস করা হরষ ভরা বর্ষায় প্রকৃতির সমস্ত অঙ্গে একটা মাধুর্য্যময়ী লাবণ্যচ্ছটা বিকশিত হইয়াছিল। বহুদূর-বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরের পার্শ্বে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্রামের ছায়াশীতল স্নিগ্ধ পল্লীর উটজাঙ্গনগুলি সুস্থ, সবল কৃষক-বালকের ক্রীড়া-কৌতুকে পূর্ণ; এবং সরল ও উন্মুক্ত-হৃদয়-নিঃসৃত কলহাস্যে মুখরিত। উদ্ভিন্ন-যৌবনা পল্লীবধূরা লজ্জা-রক্তিম মুখে এবং বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্যপূর্ণ নয়নে আমাদের দেখিবার জন্য অঙ্গনের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং অন্য দেশবাসী স্থির করিয়া, আনন্দ ও বিস্ময়পূর্ণ নেত্রের নির্নিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পথের নিকটে ও দূরে অনেকগুলি পুষ্করিণী দেখা গেল। কৃষিকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ বৃষ্টির জল এগুলিতে সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এগুলির দ্বারযুক্ত ফোকর দিয়া ইচ্ছামত জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়; এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী ও তাহার শাখাপ্রশাখা দ্বারা বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে জল লইয়া যাওয়া হয়। এই প্রকারে কৃষিকার্য্যের জন্য পুষ্করিণী হইতে পয়ঃপ্রণালী দিয়া জল লইয়া যাওয়ার নাম Tank Irrigation। দাক্ষিণাত্যে প্রাচীন কাল হইতে irrigation বা জল-সঞ্চালন প্রচলিত। খালের জলও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী দ্বারা চালিত করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রযুক্ত হইত। ইহাকে Canal Irrigation কহে। খ্রীঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে পহ্লব নৃপতিরা irrigation প্রথায় যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন; এই সময়ে ও পরবর্ত্তী সময়ে খনিত অনেক পুষ্করিণী ও খাল এখনও নয়নগোচর হয়। এ হিসাবে দাক্ষিণাত্য আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সে দিনও (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে) টিপু সুলতান কান্নাম্বাডি গ্রামের সন্নিকটে কাবেরীর উপর একটি পুরাতন বাঁধের জীর্ণ-সংস্কার করিয়া, তাহার উচ্চতা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে পাঠকগণকে রাইস্ সম্পাদিত এপিগ্রাফিয়া কর্ণাটিকা (Epigraphia Carnatica, edited by Mr. Rice) গ্রন্থান্তর্গত মহীশূর হইতে প্রাপ্ত ৫৪ নং অনুশাসন পাঠ করিতে বলি। এই উপায়ে টিপু সুলতান অনেক পতিত জমির উদ্ধার সাধন করেন; ও এতদ্দ্বারা রাজস্বের অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি সাধন করেন।

পথে আসিতে-আসিতে দেখিলাম, অনেক ক্ষেত্রের ধান্য সম্প্রতি কাটা হইয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রের ধান্যের চারা ক্ষেত্রান্তরে রোপণ করিবার আয়োজন চলিতেছে। কোন-কোনও ক্ষেত্রের গাছগুলি বেশ বড় হইয়াছে; তবে এখনও পক্কশীর্ষ হয় নাই। আমি কয়েক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, এখানকার কৃষকেরা বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জাঙ্গিয়া পরিধান করিয়া কৃষিকার্য্য করে। এ পদ্ধতি বেশ সুন্দর। ইহাতে আমাদের মত দরিদ্র দেশের অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায়। ইহাদের গাত্র অনাবৃত। পঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে লক্ষ্য করিয়াছি, কৃষকেরা কখন অনাবৃত গাত্রে কৃষি-কার্য্য করে না। আমি তথায় একজনও কৃষকের গাত্র অনাচ্ছাদিত দেখি নাই। পঞ্জাবী হিন্দু ও মুসলমান কৃষকেরা পায়জামা পরিধান করে। ইহা আগুলফ বিস্তৃত। কিন্তু মহীশূর দেশের কৃষকেরা এ হিসাবে শিখ কৃষক বা কুলী মজুরের ন্যায় আজানুলম্বী বা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র জাঙ্গিয়া পরিধান করে। এ দেশের কৃষকদের স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি তাহাদের স্বামী ও পিতা প্রভৃতিকে কৃষিকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করে। প্রায়শঃ দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা কেহ হয় ত ক্ষেত্র হইতে বন্য তৃণ-গুল্ম অপসারিত করিতেছে; বা ক্ষেত্রান্তরে রোপণের জন্য ধান্যের চারা উৎপাটন করিতেছে; বা সেগুলিকে গুচ্ছসংবদ্ধ করিতেছে। কিন্তু পঞ্জাবের সীমান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও কোন ক্ষেত্রে আমি স্ত্রীলোককে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত দেখি নাই। যাইতে-যাইতে দেখা গেল, কৃষিক্ষেত্রগুলি লোকপূর্ণ। একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে, স্মরণ আছে, এত লোক কার্য্য করিতেছে দেখিলাম, যে, বোধ হইতেছিল, যেন লোক আর ধরিতেছে না। কৃষকপত্নী ও কন্যাদিগের নানাবর্ণ-রঞ্জিত বস্ত্রের শোভায় ক্ষেত্রটি বিচিত্র বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে-ক্রমে আমরা বন্নুর গ্রামের নিকটে আসিলাম। ভ্রমক্রমে শকটচালক একটি মন্দিরের ছত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়া বলিল, ইহাই ডাক্-বাঙ্গলো। আমি শকট হইতে অবতরণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, ইহা বাঙ্গলো নহে; ইহা এক মন্দিরান্তর্গত ছত্র বা ধর্ম্মশালা; এবং ইহার নিকটেই পুলিশ আফিস অবস্থিত। শকটচালক জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে বাঙ্গলোয় আসিয়া পঁহুছিল।

বন্নুর বাঙ্গলোর অবস্থানটি বড় সুন্দর। চারিধারে উন্মুক্ত প্রান্তর ও শস্যশ্যামল ক্ষেত্র। দূরে, বহু দূরে পর্ব্বতমালা—পূর্ব্বদিক যেন প্রাচীর দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তখনও সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন নাই।

এ স্থানটি আমার নিকট বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ

হইয়াছিল। আমি মনে-মনে ভাবিতেছিলাম যে, এই স্থানে তপস্যা করিলে বোধ হয় শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ হয়।

আমরা যখন বাঙ্গলোর আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন তাহার সন্নিকটে সাপ্তাহিক বাজার বা হাট বসিয়াছিল। অদ্য রবিবার। প্রত্যেক রবিবারে এখানে হাট বসিয়া থাকে। আমি হাট দেখিতে বাহির হইলাম। ইহাকে কানাড়ী ভাষায় স্যান্ডি বলে। দেখিলাম, কোথাও বস্ত্র প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে; কোথাও বা তরিতরকারি, ধান্য, চাউল প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। কোথাও বা তিলতৈল-ভর্জ্জিত মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে। এই সব বিপণিতে ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্য বহুদূর হইতে ক্রেতা-বিক্রেতারা আসিয়াছে দেখিলাম। শুদ্ধ ক্রেতা-বিক্রেতা নহে, দূর হইতে ভিখারীর দলও ভিক্ষা করিতে আইসে। সমস্ত ভিক্ষুকই দেখিলাম মুসলমান; ভিক্ষা-বৃত্তিতে ইহারা অপমান বোধ করে না। ইহাদের বিশেষ অভিমান ও আত্মসম্মানবোধ আছে দেখিলাম। অন্ধ আতুর ভিন্ন ইহাদের অনেকেই মুসলমান ফকির।

মহীশূর সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বন্নূর গ্রামের একটু প্রসিদ্ধি আছে। ১৭৯৯ অব্দে মালবল্লীর নিকটে জেনারেল হ্যারিস্ (General Harris) কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, টিপু চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ইংরাজ সেনানী কাবেরী উত্তীর্ণ হইয়া, রাজধানী সেরিঙ্গাপটামের নিকট উপস্থিত হইতে না পারে; এবং এই জন্য অশ্ব প্রভৃতি পশুর খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু জেনারেল হ্যারিস্ সোমনাথপুরের অনতিদূরে সোস্‌লির (Sosile) নিকটে কাবেরী উত্তীর্ণ হইলেন। টিপু এই সংবাদ শুনিয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন; এবং প্রধান-প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগকে লইয়া বন্নূর গ্রামে সভার আহ্বান করিলেন। টিপু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এইবার আমরা আমাদের শেষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। আপনাদের অভীষ্ট কি?" তাঁহারা সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আপনার সহিত এ জীবন দান করাই আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প।" সকলেই সজল নয়নে সভা ত্যাগ করিলেন; এবং পরামর্শ-মত টিপু সেরিঙ্গাপটাম রক্ষা

বাঙ্গালোর—লালবাগ

করিবার জন্য, দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। এ যুদ্ধে টিপুর কি শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল, তাহা পরে বিশদ ভাবে বলিব। বস্নুর গ্রামের এই সভাই তাঁহার জীবনের শেষ সভা।

বাঙ্গলোয় আমার আসিবার পূর্ব্বে, মহীশূর রাজ্যের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি বাঙ্গলোর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কক্ষটি দখল করিয়া, সাজ-সরঞ্জামগুলি সমুদায় কক্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া, আপনার ব্যবহারের জন্য লইয়াছিলেন বলিয়া, আমার বিশেষ ক্রোধ হইতেছিল। আমার প্রয়োজনমত দ্রব্যগুলি তাঁহার নিকট হইতে লইলাম। তিনি ইকনমিক বিভাগের একজন কর্ম্মচারী; এবং মহীশূর জেলা সংক্রান্ত ইকনমিক বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। ইনি কার্য্য পরিদর্শনের জন্য ভ্রমণ বা tour করিতেছেন। অপরাহ্ণে নিকটস্থ কোন গ্রামের কার্য্য দেখিতে তিনি চলিয়া গেলেন। শুনা গেল, রাত্রি দশটার সময় ইনি বাঙ্গলো ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। ইহা শুনিয়া আমার আনন্দ হইল। লোকটির সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, ইনি বেশ সজ্জন, মিষ্টভাষী ও অমায়িক। ইঁহার নাম শ্রীনরসিংহ শাস্ত্রী। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ; ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত। কিন্তু মস্তকের মধ্যস্থলে গোষ্পদাকার শিখা রহিয়াছে। রাত্রে বাঙ্গলোর সম্মুখে টেবিল, চেয়ার পাতা গেল; এবং চা ও কফি পান করিতে-করিতে রাষ্ট্রীয় ইকনমিক বিভাগের অনেক বিষয়ের আলোচনা হইল। আমি তাঁহাকে চা দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলাম; এবং তিনি আমাকে কফি খাওয়াইলেন। আমি খাতা ও পেন্সিল লইয়া, তিনি যাহা বলিলেন, সমস্ত লিখিয়া লইতে লাগিলাম। তাহার কিছু-কিছু পাঠকের জানা উচিত মনে করিয়া, নিম্নে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম।

যাহাতে রাজ্যমধ্যে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার হয়, তদ্‌বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ করাই ইকনমিক কনফারেন্সের কার্য্য। এই বিষয়ের জন্য রাজ্যমধ্যে তিনটি কমিটি বা সভা আছে। ইহাদের নাম সেণ্ট্রাল্ কমিটি (Central Committee)। একটিতে শিক্ষা-বিস্তার, দ্বিতীয়টিতে কৃষি-বিস্তার, তৃতীয়টিতে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া সভা আছে; তাহার নাম District Committee বা জেলা কমিটি। ৩০জন করিয়া সভ্য লইয়া প্রত্যেক জেলা কমিটি গঠিত; এবং এগুলি এমন ভাবে গঠিত যে, যেন ইহাতে বেসরকারী বা Non-official সভ্যের সংখ্যা অধিক থাকে। এই সভাগুলির সভাপতি জেলার (Deputy Commissioner) ডেপুটি কমিশনার। ইঁহাদিগকে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যও করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জেলা-কমিটিতে শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি বিষয়ে কোন প্রস্তাব হইলে, তাহা যদি সভ্যদের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহা সেণ্ট্রাল কমিটিতে আলোচনার জন্য প্রেরিত হইবে। তাঁহারা আলোচনা করিয়া, তাঁহাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া, ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে (Standing Committee) প্রেরণ করেন। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে, প্রস্তাবটি মঞ্জুর করা উচিত কি না, এবং যদি উচিত হয় তবে এখনি উচিত কি না, এ বিষয়ে আলোচিত হইয়া মঞ্জুরের জন্য (Executive Sanction) রাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয়। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিই (Standing Committee) প্রকৃত পক্ষে কার্য্যকরী সভা। ইহার সভাপতি স্বয়ং দেওয়ান বাহাদুর; এবং ইহার সেক্রেটারী একজন ডেপুটি কমিশনার। দুইজন রাষ্ট্র-সচিব এই সভার সভ্য।

পূর্ব্বে Economic Conferenceএর কথার উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহা শারদীয়োৎসবের সময় আহূত হয়। ইহার কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই। ইহা কেবল রাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টকে শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহার সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর এবং সহকারী সভাপতি দুইজন রাষ্ট্র-সচিব ও যুবরাজ, অর্থাৎ মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার সম্পাদক ডেপুটি কমিশনার পদবি-যুক্ত একজন রাজ-কর্ম্মচারী। ইনিই Standing Committeeর সম্পাদক। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি ভিন্ন সভ্যদিগের নাম নিম্নে বিবৃত হইল।—

(১) রাজস্ববিভাগীয় কমিশনার বা Revenue Commissioner.

(২) শিল্প সম্বন্ধীয় ডিরেক্টর বা Director of Industries.

(৩) কৃষি সম্বন্ধীয় ডিরেক্টর বা Director of Agriculture.

(৪) রাষ্ট্রীয় শিক্ষার ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল বা Inspector General of Education.

(৫) পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল বা Inspector General of Police.

(৬) বনবিভাগের অধ্যক্ষ বা Conservator of Forests.

(৭) আবগারী কমিশনার বা Excise Commissioner.

(৮) সমস্ত জেলার ডেপুটি কমিশনার।

সরকারী কর্ম্মচারী। এইবার বেসরকারী সভ্যদের নামোল্লেখ করিতেছি।

(১) প্রতিনিধি-সভা বা Representative Assembly কর্তৃক মনোনীত ৮ জন সভ্য।

(২) প্রত্যেক জেলা হইতে মনোনীত ৮ জন সভ্য।

(৩) সেণ্ট্রাল্ কমিটি হইতে মনোনীত ১০ জন সভ্য।

(৪) ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি হইতে মনোনীত ৬জন সভ্য।

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১২ জন বেসরকারী সভ্য।

মহীশূর নগর সান্নিধ্যে প্রস্তরময় পবিত্র বৃষ-মূর্ত্তি

(৯) খনি ও ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ বা Director of Mines and Geology.

(১০) পূর্ত্ত বিভাগের অধ্যক্ষ বা Chief Engineer.

(১১) স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার বা Sanitary Commissioner.

(১২) সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার বা Registrar of Co-operative Credit Societies.

(১৩) রাষ্ট্রীয় চিফ্ সেক্রেটারী বা Chief Secretary.

উপরে যাঁহাদের নামোল্লেখ করা গেল, তাঁহারা সকলেই

ইকনমিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শাস্ত্রী মহাশয় প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পঁহুছিলেও, তাঁহার কথাগুলি যৌবনের তেজঃপূর্ণ। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎসাহ-প্রদীপ্ত ও শরীর দৃঢ়তাব্যঞ্জক। মহীশূর রাজ্যে কৃষি বিষয়ে কি-কি উন্নতি সাধিত করিয়াছেন ও করিবেন, তাহার বর্ণনা করিলেন। ইঁহার সহিত কথা-বার্ত্তায় বুঝিলাম, ইঁহারা সকলেই, মহীশূর রাজ্যকে কি প্রকারে আদর্শ রাজ্যে পরিণত করা যায়, তাহার জন্য ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত। ইনি বাঙ্গলোর বসিয়াই অফিস সংক্রান্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার অধস্তন দুই-একজন

কর্ম্মচারীও আসিয়াছেন। বন্নূর হব্‌লির * সেথ্‌দার বা Revenue Inspector মহাশয়ও আসিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় একটু রাশভারী লোক বলিয়া, সেথ্‌দার মহাশয় ঠিক ইঁহার অধীন না হইলেও, একটু ভয়ে-ভয়ে অদূরে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। ইঁহার নিকটে শুনিলাম, আমার এ স্থানে আসিবার খবর গবর্ণমেণ্ট হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে; এবং টি-নরসিপুর তালুকের আমিনদার † মহাশয় আমার সোমনাথপুর মন্দির দর্শনের সমস্ত সুবিধা ও বন্দোবস্ত করিবেন। সেথ্‌দার মহাশয় কল্য প্রাতে আমাকে লইয়া সোমনাথপুর যাত্রা করিবেন বলিয়া গেলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙ্গলো ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিবার সময় হইয়া আসিল। তিনি ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আমি কর-মর্দ্দনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। প্রথমে যাঁহার উদ্দেশে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল, এখন তাঁহার জন্য মন বিশেষ দুঃখিত হইল।

পরদিন প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া সোমনাথপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পূর্ব্ব রাত্রের কথা মত, আমার প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই সেথ্‌দার মহাশয় দ্বিচক্রযানে আসিয়া পঁহুছিলেন। সোমনাথপুর বন্নূর হইতে ৪ মাইল। শকটে অশ্ব যোজনা করা হইল। শকট-দণ্ডের যে স্থানের সহিত ঘর্ষণে অশ্বের গাত্র ক্ষত হইয়াছিল, তাহা ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হইল। সেথ্‌দার মহাশয়কে ঝট্‌কায় লওয়া গেল। তখন সূর্য্যদেব উঠিয়াছেন। সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল, মৃদুমধুরানিলবীজিত, বিহগকাকলি-মুখরিত প্রভাতে আমরা যাত্রা করিলাম। পথে তখনও তত লোক-সমাগম হয় নাই। ক্রমে অগ্রসর হইতে-হইতে দেখিলাম, কৃষকেরা কৃষি-ক্ষেত্রের দিকে ধীর-মন্থর গতিতে চলিতেছে। পথটি একটু সঙ্কীর্ণ বলিয়া, দুই পার্শ্ব-স্থিত বৃক্ষগুলি পথটিকে একটু অন্ধকারময় করিয়াছে। বৃক্ষ-গুলির বহির্দ্দেশে প্রকৃতির হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখিলাম। পথের গাম্ভীর্য্যাবগুণ্ঠিতা প্রকৃতি যেন প্রান্তরে আসিয়া মিলনোৎসবের দীপ্ত ছবির ন্যায় সঙ্কোচহীন উল্লাস-হাস্যে উজ্জ্বল। এ উজ্জ্বলতায় মুকুলিত যৌবনশ্রীর লাবণ্য ও মধুরিমা নাই। সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে যেমন শ্রাবণের উচ্ছলিত তরঙ্গের উপর শত সূর্য্যের আবির্ভাব হইয়া, এক প্রাণোন্মাদ-কারী সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তেমনি উজ্জ্বলতায় উচ্ছলিত যৌবনশ্রীর মধুর উন্মাদনায় মন-প্রাণ আবিষ্ট করিয়া দেয়। ইহা স্নিগ্ধোজ্জ্বল না হইলেও, ইহাতে যৌবনের মহিমা ও গৌরব প্রকটিত। আমার হৃদয়ে যে একটা বেদনা ও অতৃপ্তির ঐক্যতানিক প্রবাহ বহিতেছিল, তাহা যেন ক্ষণেকের জন্য স্থির, অচঞ্চল ভাব ধারণ করিল। মন যেন সরস হইয়া উঠিল। বিদ্যাপতির ভাব-সম্মিলনাত্মক একটি মধুর পদ মনে আসিল; তাহা গুণ-গুণ করিয়া গাহিতে লাগিলাম। গাহিলাম—"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু

পেখনু পিয় মুখ চন্দা।

জীবন যৌবন সফল করি মাননু

দশদিশ ভেল নিরদন্দা" ইত্যাদি

সেথ্‌দার মহাশয় আমার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন; বোধ হয় ভাবিতেছিলেন, এ পথে ত তাঁহারা নিত্য চলাফেরা করেন; ইহাতে এমন কিছু ত তিনি দেখেন না, যাহাতে আমায় ভাবাবেশে মুগ্ধ করিতে পারে! আর বোধ হয় ভাবিতেছিলেন যে, বাঙ্গালী জাতি ত খুব ভাবপ্রবণ! এ প্রকার ভাবপ্রবণতা লইয়া জাতীয়ত্বের গঠন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

সেথ্‌দার মহাশয়কে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ও কৃষি সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, এক একর (acre) বা তিন বিঘা ৮ ছটাক জমিতে ধান্য, ইক্ষু প্রভৃতির আবাদ করিবার বার্ষিক কর ৬ টাকা হইতে ৮ টাকা। রবিশস্য অর্থাৎ ছোলা প্রভৃতির চাষ করিবার উচ্চ জমির বার্ষিক কর একর প্রতি আট আনা হইতে দেড় টাকা; এবং যে সব জমি উদ্যানের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদের বার্ষিক কর একর প্রতি ৮ টাকা হইতে ১২ টাকা। তিনি বলিলেন, ত্রিশ বৎসর অন্তর এখানে জমির জরিপ বা Settlement Survey হইয়া থাকে। সেথ্‌দার মহাশয় বন্নূর হব্‌লির রাজস্ব-ইন্‌স্‌পেক্টর। এ হব্‌লিটি ২৪ খানি গ্রাম লইয়া গঠিত; এবং ইহার বার্ষিক আয় ৪০ হাজার মুদ্রা। ক্রমে আমরা মন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া পঁহুছিলাম।

* অনেকগুলি হব্‌লি লইয়া তালুক গঠিত; এবং অনেক-গুলি তালুক লইয়া জেলা গঠিত।

† আমিনদার মহাশয়েরা পদে ও গৌরবে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের ন্যায়; ইঁহাদিগকে এই উভয় কর্ম্মই করিতে হয়।

মন্দিরে আসিয়া দেখি, আমাকে সম্মানিত করিবার জন্য ইহার বহিঃ ও অন্তর্দ্বার আম্রপল্লবে সুশোভিত করা হইয়াছে; এবং অনেকগুলি লোক বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহারা আমায় বিশেষ যত্নসহকারে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। সোমনাথপুর টি-নরসিপুর তালুকের অন্তর্গত সোস্‌লি (sosile) হব্‌লীর অধীন। সোস্‌লির সেখ্‌দার মহাশয়, সোমনাথপুর গ্রামের পাটেল বা গ্রামনী মহাশয় ও গ্রামের অন্যান্য লোক আসিয়াছেন। মন্দিরের ভিতরকার কারুকার্য্য যাহাতে সুন্দর রূপে নিরীক্ষণ করিতে পারি, এইজন্য দুইজন লোক মশাল ও তৈল-ভাণ্ড লইয়া উপস্থিত। পাটেল মহাশয়ের কেরাণী মন্দিরের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। কাঞ্চীনগরীর উপকণ্ঠস্থিত কৈলাসনাথ-মন্দির পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমার উক্তির যাথার্থ্য বেশ বুঝা যাইবে। আর এক কথা, এ প্রকার মন্দির বা সৌধ সংস্থান স্থাপত্য-শিল্প কথিত ভদ্রাসন শাখার অন্তর্গত। যাহা হউক, এই ক্ষুদ্র মন্দির-শ্রেণী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, এগুলি অযত্নে রহিয়াছে। সকল কক্ষ মধ্যে দেবমূর্ত্তি নাই; কতক-গুলি বা ভগ্ন। এগুলির মধ্যে সর্প আছে—শুনিলাম। তাঁহারা বলিলেন, সম্প্রতি একটি কক্ষ হইতে বিষধর সর্প বাহির হইয়াছিল। আমি তথাপি বেশ মনোযোগ সহকারে মূর্ত্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া লইলাম।

অঙ্গনের মধ্যস্থ মন্দিরের আকৃতিতে বিশেষ বৈচিত্র্য

বাঙ্গালোর—ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব

বুঝাইবার জন্য বর্ত্তমান। মন্দিরটি প্রসন্নচন্দ্র কেশবের নামে উৎসর্গীকৃত; অর্থাৎ ইহা একটি বিষ্ণু-মন্দির এবং পূর্ব্বদ্বারী। ইহার বাহিরে গরুড়-স্তম্ভ বর্ত্তমান; কিন্তু ইহাতে গরুড় দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড অঙ্গনের (২১০ ফিট × ১৭২ ফিট) মধ্যে অবস্থিত; এবং অঙ্গনের চারি সীমায় সম্মুখে বারাণ্ডাযুক্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মন্দিরের অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী চলিয়াছে। ইহাদিগকে প্রাকার-মণ্ডপ কহে। ইহা দেখিয়া অনেকে চালুক্য স্থাপত্যে জৈন প্রভাবের অস্তিত্ব অনুমান করেন। এ অনুমান অমূলক বলিয়া আমার বোধ হয়; কেন না, পল্লবদিগের পুরাতন মন্দিরেও এ প্রকার ক্ষুদ্র মন্দিরের শ্রেণী দেখিতে বর্ত্তমান। ইহার সংস্থান (Plan) তারকাকৃতি। তারকাকৃতি ভূমিখণ্ডের উপর তারকাকৃতি উপপীঠ; এবং তদুপরি তারকাকৃতি বহির্ভিত্তিযুক্ত মন্দির। উপপীঠটি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, ইহার বহিঃ বর্দ্ধিত কোণাগ্রগুলিকে এক সমবাহু ষড়্‌ভুজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে। একটি অন্তর প্রত্যেক কোণাগ্রে হস্তীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত। উপপীঠটি উচ্চে ৩ ফিট ৫ ইঞ্চি। মন্দিরটির নির্ম্মাণে একটু কৌশল দৃষ্ট হয়। ইহাতে অন্তরালযুক্ত তিনটি গর্ভগৃহ বিদ্যমান এবং তাহারা অর্দ্ধমণ্ডপ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। মন্দিরটি যে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত, তাঁহার গর্ভগৃহ মধ্যে অবস্থিত। ইহাতে বিষ্ণুর নামান্তর কেশবের মূর্ত্তি পূজিত হয়। ইহার

দুই পার্শ্বে যে দুইটি গর্ভগৃহ আছে, তাহাদের একটিতে গোপাল-মূর্ত্তি ও আর একটিতে গোবিন্দ-মূর্ত্তি অবস্থিত। মন্দির-সংস্থানে এই ত্রিত্ব ভাব যে কোথা হইতে আসিল, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। সমস্ত চালুক্য মন্দিরে বা তদন্তর্গত হৈসল-বল্লাল শাখার মন্দিরে এ কৌশল দৃষ্ট হয় না। বিষ্ণু-বর্দ্ধন নরপতি-নির্ম্মিত বেলুড় মন্দিরে তিনটি গর্ভগৃহ নাই ; বা তুঙ্গভদ্রা নদীতীরস্থিত কুরুবত্তী গ্রামস্থিত মনিকার্জ্জুন মন্দিরেও দৃষ্ট হয় না। স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে যে, তিনটি গর্ভগৃহের সংস্থান প্রায়শঃই দৃষ্ট হয় না। এখানে বলিয়া রাখি যে, নিজাম রাজ্যস্থিত হোনামকোণ্ডা গ্রামে তিনটি গর্ভগৃহযুক্ত শিব-মন্দির দেখিয়াছি। বেলারি জেলার পশ্চিমাংশে স্থিত মাগনা গ্রামস্থ বেণুগোপাল স্বামীর মন্দিরেও এই প্রকার তিনটি একত্রাবস্থিত গর্ভগৃহযুক্ত মন্দির দৃষ্ট হয়। সোমনাথপুরের মন্দিরটিতে দীর্ঘ অৰ্দ্ধমণ্ডপ সংযুক্ত হওয়ায়, ইহার আকৃতি বা সংস্থান ঠিক ক্রুশের ন্যায় প্রতীয়মান হয় ; এবং ইহাতে বেশ সৌন্দর্য্য খুলিয়াছে। অৰ্দ্ধ মণ্ডপের ভিতরের তিন দিকে অনুচ্চ বসিবার স্থান বা অলিন্দ আছে। এই অলিন্দের সম্মুখে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যযুক্ত স্তম্ভ রহিয়াছে ; এই স্তম্ভগুলিকে লইয়া অৰ্দ্ধমণ্ডপে স্তম্ভের চারিটি শ্রেণী রহিয়াছে। ভিতর হইতে অৰ্দ্ধমণ্ডপের শীর্ষ-দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। শীর্ষদেশটি ষোড়শ অংশে বিভক্ত ; এবং প্রত্যেক অংশে এক-একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ক্ষোদিত রহিয়াছে। এগুলির শিল্প-শাস্ত্রীয় নাম ভুবনেশ্বরী। মশাল জ্বালিয়া এগুলি দেখিতে হইল ; কেন না, মন্দিরের ভিতর বড়ই অন্ধকারময়। ভুবনেশ্বরীগুলির শিল্পকার্য্য বড়ই মনোরম। এগুলি ক্ষোদিত করিতে যে কত ধৈর্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ ধৈর্য্যের মূলে ভক্তির প্রেরণা না থাকিলে, শিল্পী কখনই কৃতকার্য্য হইতেন না ; পদ্মের প্রত্যেক দলে প্রকৃতির সরসতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভুবনেশ্বরীর মধ্যে যে সর্প ক্ষোদিত হইয়াছে, তাহার শিল্পকার্য্য অতুলনীয়। গর্ভগৃহের ভিতরের ভিত্তিও কারুকার্য্যযুক্ত কুড্যস্তম্ভ বা pilaster দ্বারা শোভিত ; এবং ইহার শীর্ষেও ভুবনেশ্বরী রহিয়াছে। স্থূলতঃ বলিতে গেলে আর্য্যাবর্ত্তীয় মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিতর কোন প্রকার শিল্পকার্য্য দৃষ্ট হয় না ; এ হিসাবে চালুক্য স্থাপত্য আর্য্যাবর্ত্তীয় স্থাপত্য হইতে বিভিন্ন।

মন্দিরের বহির্দৃশ্য ঠিক আর্য্যাবর্ত্তীয় বা Indo-Aryan রীতির মত না হইলেও, উভয়ের মধ্যে বহু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আয়তাকার অংশের উপর শেখরটি দর্শন করিলে, উড়িষ্যা বা বারোলির মন্দিরের কথা স্মরণ হয়। মন্দির-শীর্ষস্থ কলস ও তন্নিম্নে অবস্থিত অংশটি দেখিলে বোধ হয়, আর্য্যাবর্ত্তের কোন মন্দির নিরীক্ষণ করিতেছি। কলস নিম্নস্থ শেখরের যে অংশের কথা বলিলাম, তাহা দেখিলে, উড়িষ্যার মন্দির-শীর্ষস্থ "সিজুপত্র পাখুড়া" * ও তন্নিম্নস্থ অংশকে "কর্পূরী" বলিয়া নিশ্চিতই বোধ হইবে। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে যে আয়তাকার অংশের কথা বলিয়াছি, তাহা আর্য্যাবর্ত্তীয় মন্দিরের সদৃশ নহে। ইহা প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত। উপরের অংশে মন্দিরের প্রতিকৃতি রহিয়াছে ; ইহার নিম্ন অংশ যেন উপরের উপপীঠ স্বরূপ। কয়েকটি মন্দির পরীক্ষা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, উপরের অংশটি দ্বিতীয়ের দ্বিগুণ। আর্য্যাবর্ত্তীয় সাদৃশ্য আর একটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। শেখরের উচ্চতা সাধারণতঃ আয়তাংশের দ্বিগুণ ; এস্থলেও শেখর শেষোক্ত অংশের প্রায় দ্বিগুণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মন্দিরটি তারকাকৃতি উপপীঠের উপর স্থাপিত। ইহার শেখর ও তন্নিম্ন গাত্রের উপর বহিঃবৰ্দ্ধিত কোণ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নগাত্রস্থ কোণগুলির দুই বাহুর উপর বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর নানাবিধ মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে ; পূর্ব্বে যে মন্দির-প্রতিকৃতির কথা বলিয়াছি, এ মূর্ত্তিগুলি সেই প্রতিকৃতিগুলির উপরে অবস্থিত। বিষ্ণু-মূর্ত্তিগুলির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। চতুর্ভুজ হইতে আরম্ভ করিয়া নানায়ুধ-হস্ত অষ্টভুজ বিষ্ণু পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। এগুলি অবশ্য অশাস্ত্রীয় নহে। তবে আমরা আর্য্যাবর্ত্তে এগুলি সচরাচর দর্শন করি না। আমার যৎসামান্য মূর্ত্তি-পরিচয় সংক্রান্ত পুরাণাদি পাঠ করা আছে ; তন্মধ্যে এ সকলের বর্ণনাও দেখি নাই। তবে মূর্ত্তি পরিচয় বিদ্যা লাভ বিশেষ সময় ও পাঠ-সাপেক্ষ ; এইজন্য ভয়ে-ভয়ে বলিতে হয় যে, নিশ্চয়ই এরূপ মূর্ত্তির পরিচয় কোন না কোন পুরাণ বা তৎসদৃশ পুস্তকে মিলিবে। এখানে দেখিলাম যে অষ্টভুজ বিষ্ণুর হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, শঙ্খ ইত্যাদি রহিয়াছে ; এবং

* মৎপ্রণীত "Orissa and Her Remains &c" (Plates II and III) দেখুন।

দুইটি হস্ত বর ও অভয় মুদ্রাব্যঞ্জক। ইহার সহিত মৎস্য পুরাণান্তর্গত * বর্ণনা না মিলিলেও, মনে হয় এ প্রকারের বিষ্ণু মূর্ত্তির বর্ণনা কোন না কোন পুরাণ বা আগমাদি শাস্ত্রে আছে। এ কথাগুলি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মূর্ত্তি-পরিচয়-বিদ্যা আয়ত্ত করা কত কঠিন, তাহার আভাস আমি দ্বিতীয় প্রস্তাবে দিয়াছি।

আর একটি মূর্ত্তি দেখিলাম, যাহা আর কোথাও নয়ন-গোচর করি নাই। ইহা কৃষ্ণের তাণ্ডব-নৃত্য মূর্ত্তি; মূর্ত্তিটী অষ্টভুজবিশিষ্ট এবং হস্তে জপমালা, ঘট, শঙ্খ প্রভৃতি বর্ত্তমান। শিবের তাণ্ডব-নৃত্য মূর্ত্তিই সচরাচর দৃষ্ট হয়; কৃষ্ণের এরূপ মূর্ত্তির বর্ণনা কোন শাস্ত্রে আছে, তাহা ত জ্ঞাত নহি।

মন্দিরের গাত্র-দেশে পার্শ্ব-দেবতা বা দিক্‌পতিদিগের মূর্ত্তি ক্ষোদিত নাই। অগ্নিপুরাণের দিক্‌পতিযাগ নামক অধ্যায়ে যে সকল দিক্‌পতির বর্ণনা ও মন্দির গাত্রে স্থান নির্দ্দেশ আছে, উড়িষ্যার কোন মন্দিরে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, চালুক্য-শাখান্তর্গত কোন মন্দিরেই পার্শ্ব-দেবতা বা দিকপতি নয়নগোচর করি নাই। মন্দির শেখরটি একতল না বলিয়া পঞ্চতল-বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। উপরিস্থিত তলটি নিম্নতল হইতে যেন পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছে। শেখরটি দূর হইতে বৃত্তসূচী বা coneএর ন্যায় প্রতীয়মান হয়; এবং স্থূলতঃ ঠিক আর্য্যাবর্ত্তীয় রীতি অনুসারে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরের আয়তাংশের নিম্নদেশে, উচ্চতায় ৪ ফিট পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রোল্লিখিত বর্ণনাগুলি ক্ষোদিত রহিয়াছে। এগুলি কেবল মাত্র নয়নরঞ্জন নহে, ইহাতে সাধারণের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়। শিল্পের সহিত শিক্ষার সমাবেশ হৈসল বল্লাল নরপতিদিগের একটী বিশেষত্ব। প্রস্তর-ক্ষোদিত এই চিত্রগুলি পরীক্ষা করিলে সে সময়ের আচার ব্যবহারের বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ [illegible]রাধিপতি বংশের সমতল ছাদযুক্ত দ্বিতল বাটী দেখিয়া [illegible]দশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ধনীদিগের বাসগৃহের কল্পনা করা [illegible]ইতে পারে—এ কল্পনাকে বোধ হয় কেহ অলীক বলিতে [illegible]হস করিবেন না। আমি ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্ত হইতে [illegible]ক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে, যদি ভাস্কর্য্য [illegible]ম রূপে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া, তাহা হইতে ভারতীয় আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির ইতিহাস সঙ্কলন করা যায়, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা সফল হইতে পারে। আমাদের দেশীয় রাজন্যবৃন্দ, জমিদার ও সাধারণ লোকে অর্থের যথেষ্ট অপব্যবহার করেন। যদি কোন স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি এ প্রকার ইতিহাস সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া, এতদুদ্দেশ্যে কোন সভা বা সমিতির স্থাপনা করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরা বোধ হয় তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ বোধ করিবে; কেন না, অনেক পুরাতন কীর্ত্তি-কলাপ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

চালুক্য স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে যে আর্য্যাবর্ত্তীয় প্রভাব বর্ত্তমান, সে কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। এ হিসাবে দ্রাবিড়-স্থাপত্য আপনার বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছে। উড়িষ্যার কোণার্ক মন্দিরে বা রাজারাণীর মন্দিরে বা আর্য্যাবর্ত্তীয় অন্যান্য মন্দিরে বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট পুচ্ছ-যুক্ত পক্ষীর যে চিত্র দৃষ্ট হয়, সোমনাথ মন্দিরের গাত্রেও সেই প্রকার চিত্র দেখিয়াছিলাম। লিঙ্গেশ্বর, মুক্তেশ্বর, রাজারাণী, কোণার্ক প্রভৃতি উড়িষ্যার মন্দিরে যে একটিমাত্র কপাট দ্বারা বদ্ধ দ্বারের চিত্র বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়, সোমনাথপুরের মন্দিরেও তাহা দেখিয়াছি। আর্য্যাবর্ত্তীয় মন্দিরগুলিতে যে অর্দ্ধপদ্মের চিত্র দেখা যায়, এখানেও তাহা দেখা গেল। এখানকার মন্দির-শেখরের ভিন্ন-ভিন্ন তলে যে কলসের অবস্থান দেখিলাম, তাহার সহিত মুক্তেশ্বর বা রাজারাণী প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তীয় মন্দিরগুলির সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আমার ত সে সব মন্দিরের কথা স্মরণে আসিল। এখানকার অনেকগুলি চিত্রের উপরে "কীর্ত্তিমুখ" ও "রাহুর মুখের মালা" * দেখিয়া আর্য্যাবর্ত্তের মন্দির ও তাহার উপর গুপ্ত নরপতিদিগের প্রভাবের কথা মনে হইল। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; কিন্তু পাছে পরিভাষা-সঙ্কুল হইয়া সেগুলি সাধারণ পাঠকের দুর্ব্বোধ্য হয়, এই ভয়ে তাহাদের উল্লেখ করিলাম না। এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি, অর্দ্ধমণ্ডপের বহির্ভিত্তির তিনপার্শ্বে সঙ্কীর্ণ অলিন্দ বা বারাণ্ডা রহিয়াছে। এই অলিন্দের সম্মুখে যে ভিত্তি তির্য্যগ্‌ভাবে উঠিয়াছে, তাহা দেখিতে মনোহর; কেন না, তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত ভিত্তিগাত্রের উপর ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলি আলো ও ছায়ার সংমিশ্রণে বেশ সুন্দর দেখায়। এই প্রকারের অলিন্দ

* মৎস্যপুরাণ শ্লোক ৬-৮; অধ্যায় ২৫৮।

* মৎপ্রণীত "Orissa and Her Remains etc." দেখুন।

হোলসল্লাল নরপতিগণ স্থাপিত স্থাপত্যের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। অর্দ্ধমণ্ডপের ভিত্তিগাত্রে বায়ু ও আলোক আসিবার জন্য প্রস্তরের "জালি" রহিয়াছে। এগুলি বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। বহির্ভিত্তিতে "জালির" ব্যবস্থা করা চালুক্য-স্থাপত্যের এক বিশিষ্টতা। গর্ভগৃহের দ্বারদেশের উপর যে প্রস্তরখণ্ড অবস্থিত, তাহার উপর লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি ক্ষোদিত। মন্দিরের যিনি প্রধান দেবতা অর্থাৎ কেশব, তাঁহার গর্ভগৃহের দ্বারের উপর লক্ষ্মীনারায়ণ, এবং পার্শ্বস্থিত মূর্ত্তি দুইটি অর্থাৎ গোপাল ও গোবিন্দ মূর্ত্তির দ্বারের উপর লক্ষ্মী মূর্ত্তি ক্ষোদিত। "অন্তরালের" দ্বারদেশের উপরিস্থিত প্রস্তরে গর্ভগৃহে যে মূর্ত্তি বিরাজিত, তাহাই ক্ষোদিত। আর্য্যাবর্ত্তীয় স্থাপত্যে এ রীতির প্রচলন নাই।

মন্দিরের দ্বারদেশের নিকটস্থ বারাণ্ডায় একখানি প্রশস্ত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে একটি দীর্ঘ অনুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে দেখিলাম। এ অনুশাসনটি পাঠ করিলে মন্দির-নির্ম্মাণের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। ইহাতে অনুপ্রাস ও অতিশয়োক্তির চরম উৎকর্ষ লক্ষিত হয়।

সেখ্দার মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে আমার মন্দির দর্শন ব্যাপার সুচারু রূপে সম্পন্ন হইত না। যে ব্যক্তি আমাকে মন্দিরের ইতিবৃত্ত বা চিত্রাদি বুঝাইয়া দিতেছিলেন, সেখ্দার মহাশয় তাঁহার কথাগুলি আমাকে ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়া দ্বিভাষী বা Interpreter-এর কার্য্য করিতে-ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমার নোট্‌বুকে লিপিবদ্ধ করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, একটি ব্রাহ্মণ কফি ও হালুয়া লইয়া উপস্থিত। বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও সেখ্দার মহাশয়ের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারিলাম না। সুমিষ্ট ও সুবাসিত কফি পান করিয়া ভ্রমণজনিত শ্রান্তি দূর হইল। হালুয়ার একটু পরিচয় আবশ্যক; আমাদের বঙ্গদেশে সুমিষ্ট হালুয়াই প্রচলিত; কিন্তু এ হালুয়া লবণ ও মরিচ মিশ্রিত ও মিষ্টত্ব বর্জ্জিত। ইহাকে স্থানীয় লোকে "উপমা" কহে। বাস্তবিক উপমা এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমার বোধ হইল ইহার উপমা নাই। তাঁহাদের যত্ন, আদর ও আপ্যায়নে আমি নিতান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত বোধ করিয়া-ছিলাম। আহার করিবার সময় দেখি, সেখ্দার মহাশয় ও অন্যান্য লোকেরা সকলে পরস্পরে চুপ-চুপি কথা কহিতেছেন। ইহাতে আমার বিশেষ লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে মন্দিরের প্রত্যেক অঙ্গ, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া মধ্যাহ্নে বন্নুর গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

দুঃখাবসান

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

১

[ছোট-বৌ রমার স্বামী আজ এক বৎসরের উপর বিদেশে গিয়া নিরুদ্দেশ; অনুমান—মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সে কথা রমাকে শোনান হয় নাই; কিন্তু অজ্ঞাত আশঙ্কায় সে ধীরে-ধীরে কৃশ ও মলিন হইয়া, শয্যাশ্রয় করিয়াছে। মন সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছে; ভরসা হয়, হয় ত' তিনি আসিবেন; আবার আশঙ্কার ভারে মন পীড়িত হইয়া উঠে। মেজ-বৌ কমলা রমার অবস্থায় কাতরা এবং সমবেদনাশীলা; জ্যেষ্ঠা শ্যামা উগ্রা এবং বিরূপা।

রমা শয্যায় শায়িতা; কৃশ কিন্তু বিদ্যুৎ-শ্রী; পার্শ্বে কমলা উপবিষ্টা; দিবা শারদ-ষষ্ঠী।]

রমা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) মেজদিদি, বোধ হয় একবচ্ছর হ'য়ে গেল,—তিনি আজও এলেন না! খবরও ত' পাই নি।

কমলা। চিঠি ত' আসে!

রমা। কি জানি কেমন চিঠি আসে। দেখতেও ত' পাই নে! সে চিঠি কি তাঁর হাতের লেখা, মেজদিদি?

ক। ঠাকুরপোরই লেখা সে সব চিঠি রমা। সে সব বড়ঠাকুরের কাছে আসে, তাই তুমি দেখতে পাও না!

র। বুঝতে পারি নে মেজদিদি; সময়-সময় যেন চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে আসে; ভয় করে। মেজদিদি, জানলাগুলো খুলে দেও না ভাই,—বাইরেটা একবার দেখি।

(কমলা জানালা খুলিয়া দিল। অদূরে বড়-বৌএর তিরস্কার ঝঙ্কার শোনা গেল,—রমার উদ্দেশে।)

র। বড়দিদি বক্‌ছেন, না মেজদিদি? আমি কি করব ভাই? আমি ত' উঠ্‌তে চাই,—কাজ করতে চাই,—পারি নে;—কেন যে এমন ক'রে আছি—

ক। তোমার কাজ কর্ত্তে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না,—আস্তে-আস্তে সেরে ওঠো, তা'হলেই হোল।

র। ডাক্তার কি বলে মেজদিদি?

ক। বলে, তুমি সারবে।

র। ও মনে করে বুঝি, আর সকলের মত সারাটাই আমি চাই,—তাই ও কথা বলে! মেজদিদি, এমন ক'রে থেকে কি কেউ সারতে চায়? বুকের ব্যথাটা যখন ওঠে, তখন বলি, মা দুর্গা, আর যেন এ ব্যথা না সারে;—এই চোখ বোজাই যেন শেষ চোখ বোজা হয়। ওমা, আবার সেরে উঠি!

ক। কি যে বলছ, তার ঠিক নেই।

র। মেজদিদি, কি সুন্দর জ্যোৎস্না হ'য়েছে ভাই! একেবারে স্পষ্টও নয়, অন্ধকারও নয়, আমার এই ভাল লাগে মেজদিদি!

(অদূরে ষষ্ঠীর বাজনা বাজিয়া উঠিল।)

র। ও কিসের বাজনা মেজদিদি!

ক। আজ যে ষষ্ঠী বোন্! কাল মা দুর্গা আসবেন।

র। দুর্গা আসবেন? ওমা, এরি মধ্যে একবছর হ'য়ে গেল? কিন্তু তিনি কি আসেন, সত্যি ক'রে আসেন, মেজদিদি?

ক। কেন ভাই?

র। (খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া) কি জানি, বুঝতে পারি নে! আমরা ত' তাঁর মেয়ে,—আমাদের এত দুঃখ দেখেও তিনি কি ক'রে আমোদ ক'ত্তে আস্‌তে পারেন! তাই মনে হয়, ওসব মিথ্যে কথা,—তিনি বোধ হয় আসেন না। এলে কি মেয়েকে না দেখে মা থাক্‌তে পারে!

ক। তিনি ত' সবই দেখছেন রমা!

র। একে বলো দেখা মেজদিদি! এই একবছর কেঁদে-কেঁদে কি ক'রে কাটছে আমার,—দেখ্‌ছেন কি তিনি? মেজদিদি, বুকের ভেতর-বাইরে জুড়ে এই যে রাবণের চিতা জ্বলছে, এ কি তিনি দেখেন! কি জানি, কেমন মা! সব মা তো এমন নয় মেজদিদি!

ক। বলতে নেই ও কথা বোন্।

র। বলতে নেই মেজদিদি? আচ্ছা, কেন বলতে নেই?

ক। রাগ করবেন তিনি!

র। রাগ করবেন? কেন রাগ করবেন মেজদিদি? সত্যি কথা বললে কি তিনি রাগ করেন? আমার মত এত-বড় হতভাগিনী কে আছে মেজদি'দ? তোমরা বলো না বলো, আমার মন বলছে,—আমি এইখানে শুয়ে-শুয়ে অপেক্ষা করছি মরণের,—তাও আসে না। মেয়ের এত দুঃখ,—আর মার আসবার বোধনের বাজনা বেজে উঠ্‌ল! এই মা! অভিমানে আমার চোখ ফেটে জল আস্‌চে—তবু বলব না? বেশ, বলতে নেই ত' বলব না!

ক। তাঁকে কি আমরা তেমন ক'রে ডাকতে পারি বোন্?

র। ডাকতে হবে যাকে, তবে মা আসবে? মা তবে কি হোল মেজদি,—যদি ছেলের মুখ দেখে সে বুঝতে না পারে, তার কি দুঃখ? মা তবে কি হোল,—যদি সে নিজে থেকেই এসে ছেলেকে কোলে তুলে না নেয়! জানি না সে কেমনধারা মা, যে ছেলের ডাকের অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে!

ক। ও সব কি বলছিস বোন, বলতে নেই। ঠাকুর-দেবতা, রাগ করবেন!

র। রাগ আমিও করব; রাগ আমরাও করতে পারি। উঃ! তুমি যদি দেখতে পেতে, কি অভিমানে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! এই মা আমাদের!

ক। (মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) ছিঃ! ওসব কথা মনে করতে নেই! তুমি এখন একটু ঘুমোও বোন্। তিনি সবারই মা—মা'র মত মা! তিনি সবাইকে দেখেন, সবারই দুঃখ ঘোচান্।

র। মেজদিদি, ওই বড়দিদি আবার বকছেন। তুমি যাও মেজদিদি, সকলের খাবারদাবার সময় হোল।

ক। তুমি একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাক,—আমি একটু পরেই আসছি।

[প্রস্থান

২

[পরদিন সপ্তমীর সকাল। রমা একা ঘরে শুইয়া আছে। এমন সময় সমস্ত গৃহ অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত করিয়া দুর্গা দেবীর আবির্ভাব।]

রমা। চোখ-জুড়ানো সবুজ আলোয় ঘর ভ'রে উঠ্‌ল যে! এ কি হোল—বুঝতে পারচি নে ত'! আঃ, এ কি প্রাণ-জুড়ান, চোখ-জুড়ান রং! সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল, নতুন-ফোটা হাজার-হাজার শিউলি-বেলার গন্ধে!

দুর্গা। (রমার পাশে বসিয়া) দেখ্‌ মা, এসেছি!

রমা। তুমি কে মা?

দুর্গা। চিনতে পারচো না আমাকে?

রমা। পারচি বৈ কি, পারচি বোধ হয়। এমন অপূর্ব্ব আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে, এমন গন্ধে মাতিয়ে, অপরূপ তোমাকে দেখেই মনে হ'য়েছে, তুমি মা দুর্গা (বলিয়া রমা পাশ ফিরিয়া শুইল)।

দুর্গা। অভিমান তোর এখনো গেল না! আমার দিকে তাকাবি নে! চেয়ে দেখ মা!

রমা। তুমি বাজনার সঙ্গে আস, আনন্দের সঙ্গে আস, কোলাহল-স্তুতির মধ্যে আস,—আমাদের মত দুঃখীর কাছে কেন আস্‌বে?

দুর্গা। ভুল করেছো মা, ভুল করেছো। আমি আসি দুঃখীর কাছে, আর্ত্তের কাছে, পীড়িতের কাছে! বাজনা বাজিয়ে, স্তুতি-গান গেয়ে কেউ আমাকে পায় না, যদি না সে আমাকে চায়!

রমা। আমার কাছে কেন এলে?

দুর্গা। তুমি যে আমায় ডেকেছ মা! এমন ডাকা ডেকেছ যে, আমার আসন টলে উঠল,—মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

রমা। (বসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া) মাপ ক'রো মা, দুঃখের বশে কত কথাই মনে ক'রেছি, কত কথাই বলেছি। আমার ওপর তোমার রাগ হয় নি মা?

দুর্গা। রাগ হোলে কি তোর কাছে ছুটে আসি? তোর মত এমন অভিমান কটা মেয়ে আমার ওপর করতে পারে?

র। তুমি তোমার পূজোর জায়গা খালি ক'রে এলে?

দু। আমার সত্যিকার পূজোর জায়গা কোনও দিনই খালি হয় না! এইখেনে তুমি আমার পূজোর আসন পেতেছ,—তাই এইখেনেই এলাম।

র। ওদের বাড়ী ওই যে বাজনা বাজছে, পূজোর আয়োজন করেছে—ওখানে ত' তুমি এখন নেই।

দু। আমি এখানেও আছি, ওখানেও আছি,—সব জায়গাতেই আছি! যারা চেয়েছে, তাদের কাছে আছি,—যারা চায় নি, তাদেরও কাছে আছি!

র। তবে তুমি এতদিন আমার কাছে আস নি কেন?

দু। এসেছিলাম বৈ কি! তুমি বুঝতে পার নি। আমি সকালে তোমার কাছে এসেছি, সন্ধ্যায় তোমার কাছে এসেছি, রাত্রে এসেছি! আমি ফুলের গন্ধে এসেছি, জ্যোৎস্নার আলোয় এসেছি। দুঃখে এসেছি। সুখে এসেছি। অশ্রুজলে এসেছি। বুঝতে পার নি মা, বুঝতে পার নি।

র। তবে এত দুঃখ দিলে কেন?

দু। দুঃখ নইলে সুখ কি বোঝা যায় মা? দুঃখ নইলে সুখ-ই যে দুঃখের মত বোধ হয়।

র। অনেক দুঃখ ত দিলে মা, তার পর?

দু। এখনও কি তোমার মন খুসী হয় নি? এখনও কি আনন্দ হ'চ্ছে না?

র। হ'চ্ছে বৈ কি মা, হ'চ্ছে! এত আনন্দ কোনও দিন পাই নি! সমস্ত পৃথিবীটা নতুন আলোয় ভরে গেছে —যতদূর পর্য্যন্ত চোখ যায়, আলো, আলো! আনন্দে বুকের ভেতর কেমন করছে! কিন্তু তুমি ত' আর চিরকাল এখানে থাকবে না,—তাই ভয় হ'চ্ছে।

দু। চিরকাল আছি, চিরকাল থাকব মা! মনের ভেতর খুঁজলেই আমাকে পাবে!

র। আমার এ দুঃখের শেষ কি নেই?

দু। তোমার দুঃখ মা? সে ত' আমারও কম দুঃখ নয়। আজকের এই শিউলি-ফুলের গন্ধ, এই আলো, এরা কি বলছে না যে, তোমার দুঃখ শেষ হ'য়েছে?

র। কেমন ক'রে শেষ হবে মা?

দু। যেমন ক'রে তুমি চেয়েছ—তেমনি করে।

র। আমি ত' জানি নে মা কেমন ক'রে চেয়েছি। আজ তোমার কাছে সব ভুল হ'য়ে যাচ্ছে; সব ভুলে গিয়েছি। কি যে আমি কামনা করেছি, তা মনে পড়ছে

না। বোধ করি এই কথাই ভেবেছি যে, যেমন করেই হোক, আমার এ দুঃখের দিন শেষ হোক!

দু। আমি এখন চল্লাম। তবে এই আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি যে, আজ তোমার সব দুঃখের শেষ হবে। যদি না হয়, ত' জানিবে, আমার সন্ধ্যারতি বৃথা, আমার আসা বৃথা!

[দুর্গার অন্তর্দ্ধান; আলো নিবিয়া গেল।]

র। যাঃ, আলো নিবে গেল; সব অন্ধকার! যেমনি ক'রে এসেছিলে, তেমনিই হঠাৎ চলে গেলে! নাঃ, আর দুঃখ নেই, সমস্ত বুকটা ভরে উঠেছে। এ কি নূতন প্রাপ্তি! সন্ধ্যার সময় যদি এমনি পরিপূর্ণ মন নিয়ে তোমার পায়ে স্থান পাই, ত' বোধ করি তার চেয়ে সুখ কমই আছে!

৩

[কমলা প্রবেশ করিল।]

র। মেজদিদি, আর আমার দুঃখ নেই।

ক। (বসিয়া রমার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে) না বোন, দুঃখ কেন, দুঃখ কিসের? তুমি সেরে উঠবে বোন।

র। (হাসিয়া) তার জন্যে নয় মেজদিদি! আজ মা দুর্গা এসেছিলেন, তিনি সেই কথা বলে গেলেন।

ক। (ভীত হইয়া) কি বলছিস ছোট-বৌ!

র। সত্যি কথা বলছি মেজদিদি। তিনি এসেছিলেন। নতুন টাটকা পাতার সবুজ রং দেখতে পাও নি?

ক। কৈ না!

র। ফুলের গন্ধ পাও নি?

ক। কৈ, হাঁ, পেয়েছিলাম বোধ হয়। সকাল বেলায় যেন পেয়েছিলাম।

র। হাঁ মেজদিদি, সবুজ রংএ বাড়ী আলো ক'রে, হাজার-হাজার ফুলের গন্ধে আমোদ ক'রে তিনি এসেছিলেন।

ক। কি বল্লেন তিনি?

র। বল্লেন, তোমার ডাক আমি শুনেছি, সেই ডাকে আমার আসন ছেড়ে এসেছি!

ক। আর কি বল্লেন?

র। বল্লেন, আজকার দিনে আমার দুঃখ শেষ হবে,—নইলে তাঁর আসা বৃথা, সন্ধ্যারতি বৃথা!

ক। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলি বোন্।

র। ঘুমোই নি মেজদিদি, স্বপ্ন নয়। তিনি বল্লেন, তিনি রোজই আসেন, সুখে আসেন, দুঃখে আসেন, সকালে আসেন, সন্ধ্যায় আসেন,—আমি বুজতে পারি নি! যদি বা অনেক দুঃখে আজ বুঝতে পারলাম, তাকে এমন ক'রে মিথ্যা করে দিও না মেজদিদি!

কমলা চুপ করিয়া রহিল।

রমা। মেজদিদি ভাই! আর আমার দুঃখ থাকবে না! আজ সন্ধ্যার মধ্যেই আমার দুঃখের শেষ হবে! মা নিজে বলে গেছেন! আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তাঁর পায়ে আশ্রয় পাবো মেজদিদি! মনটা আমার এমনি খুসী হয়েছে যে, তোমাকে কি বলবো! মেজদিদি ভাই, আমাকে মাপ করো। আমি যখন থাকবো না, তখন আমার কথা যদি মনে হয়, ত, এ কথাও মনে করো যে, যাবার দিন আমার আর কোনও দুঃখ ছিল না!

(কমলা চোখের জল মুছিল।)

রমা। কাঁদচো মেজদিদি! আমার জন্যে কেঁদো না। মনে করে দেখো, আমার এই অবস্থাটাই কি কাঁদবার মত নয়। এ ত' আমার ঘর নয় মেজদিদি, এ যে কারাগার! এই কারাগারে বন্ধ হ'য়ে, দিন-দিন তিলে-তিলে পোড়ার চেয়ে কি মুক্তি ভাল নয়?

ক। ও—ওই কথাটাই মনে করচো কেন বোন? দুঃখ তো কত রকমে শেষ হ'তে পারে!

র। মেজদিদি, আর আমাকে ঠকিয়ো না। এই এক বছর ধরে এমনি করে ঠকাতে চেয়েছো; আজকের দিনটায় মাপ করো।

(কমলা চোখের জল মুছিল।)

র। কত অপরাধ ক'রেছি, মাপ ক'রো। মেজদিদি, আজ যার বরে আমার দুঃখের দিন শেষ হ'চ্ছে,—চোখের জল ফেলে আর দুঃখ দিও না! মেজদিদি, কতদিন কত রকমে তুমি আমার এই দরিদ্র-জীবনকে সুখী করতে চেয়েছো,—আজকের দিনেও সেই দয়া রাখো।

* * * আমি বুঝতে পারচি মেজদিদি, সন্ধ্যার সময় আমার জীবনের সেই অমূল্য ক্ষণ আসবে, যখন আমার দুঃখের শেষ হবে। সেই সময়টিতে আমার এই ঘরের সব দরজা খুলে দিও,—যেন আমার দৃষ্টি অবাধে ঐ আকাশ-

বাতাসের মত ছুটে যেতে পারে। মেজদিদি, ফুল এনো, বাগানের যত সুগন্ধ সাদা ফুল, আমার মাথায় গায়ে দিও। যাবার আগে যেন তাদের কাছ থেকে তাদের পবিত্রতা চয়ন ক'রে নিয়ে যেতে পারি। আজকে আমার পরম দিন! তোমরা সবাই মাপ ক'রো। ঘুম পাচ্ছে ভাই, আনন্দের আতিশয্যে কত কথাই বললাম!

ক। ঘুমোও বোন, আমি এইখানেই ব'সে রইলাম। (মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।)

৪

(অপর গৃহ। কমলা ও লেডি ডাক্তার)

কমলা। কেমন দেখলেন ওকে?

লে-ডা। কই, কিছু খারাপ দেখলাম না ত,—বরং অন্য দিনের চেয়ে ভালই।

ক। আমার কিন্তু বড় ভয় করছে!

লে। কেন?

ক। ও আজ কি সব বলছিল,—আশ্চর্য্য অদ্ভুত কথা সব!

লে। কি কথা?

ক। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। বলছিল যে, আজ মা দুর্গা ওর কাছে এসেছিলেন; আর তিনি বলে গেছেন, আজ সন্ধ্যার সময় ও-র দুঃখের অবসান হবে।

লে। অসুখে মানুষে অমন নানা-রকম দেখে। বোধ করি উনি ও-সব কথা ভেবেছিলেন। আজ পূজোর দিনে ও-সব কথা ভাবা আশ্চর্য ও নয়।

ক। কিন্তু আমি দেখেছি, অনেক সময় এমনি করে প্রত্যক্ষ-দেখা জিনিস সত্যি হ'য়ে যায়,—তাই ভয় হয়। কেমন দেখলেন, কোনও ভয় নেই ত?

লে। দেখুন, ভয় নেই—এ কথা নিশ্চিত বলা কঠিন। কিন্তু, বিশেষ ভয়ের কিছু দেখলাম না। বরং অবস্থা যেন একটু ভাল ব'লেই বোধ হ'লো।

ক। কি জানি, ওটাও আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না। নেববার আগে প্রদীপ বেশী ক'রে জ্বলে ওঠে,—এ কথাটা মনে রাখবেন। কি জানি, ওর কথা শুনে অবধি আমার মনের ভেতর কেমন করছে! চোখে দেখে ঠাহর করা যায় না,—বিচার ক'রে বোঝা যায় না; কিন্তু দেখা যায় যে, এ সব ব্যাপারের ভেতর অনেকখানি সত্যিও থেকে যায়।

লে। নিজের লোকের অসুখে মনটা খারাপ দিকেই যেতে চায়; নইলে ও ব্যাপারটা এমন কিছু নয়।

ক। ওর, মনে হয়, সন্ধ্যার সময়ই একটা কিছু হবে। দয়া ক'রে আপনি সেই সময়টিতে আসবেন,—ওর কাছে থাকবেন।

লে। বেশ, আমি আসবো। [প্রস্থান

৫

[সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; সপ্তমীর চাঁদ উঠিয়াছে, তাহারই জ্যোৎস্নায় ধরা-পৃষ্ঠ শুভ্র। রমার ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খোলা; স্নিগ্ধ বাতাস আসিতেছে। রমা শুইয়া আছে। কমলা পাশে বসিয়া। লেডি ডাক্তার অদূরে চেয়ারে। বিছানায় সুগন্ধি ফুল ছড়ান।]

র। মেজদিদি, সন্ধ্যা ত হয়ে গেল। বোধ করি এইবার আমার যাবার সময় হ'য়ে এসেছে!

লে। আপনি ত বেশ ভাল আছেন,—ভয় ক'চ্ছেন কেন?

র। ওই কথাতেই ত আমার ভয় হ'চ্ছে! আমার ত এখন ভাল থাকবার সময় নয়! আর ত দেরীও নেই! তবে কি মিথ্যে হোল? না, মার কথা মিথ্যে হবে না! মেজদি ভাই!

ক। কি বোন্!

র। তোদের হ'য়ে থাকি মেজদিদি,—যখন সেই শুভ ক্ষণটি আসবে, তখন যদি দেরী না সয়!

ক। ও কি বলছিস্ বোন্!

র। মিথ্যে হবার নয় মেজদি, মিথ্যে হবার নয়। তোমরা শুনতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনছি যে, আকাশ-বাতাস ভ'রে আমার সেই শুভ-ক্ষণের সেই সুখের বাঁশী বাজতে সুরু ক'রেছে! সকালের সেই মন-ভুলোনো সবুজের আভাষ যেন থেকে-থেকে পাচ্ছি। তেমনি মন-মাতানো হাজার ফুলের গন্ধ যেন মাঝে-মাঝে বাতাসে ভেসে আসছে! মেজদিদি আমার সে সুখের আর নিশ্চয়ই দেরী নেই,—তোমরা যাই বল না কেন।

লে। আপনি চঞ্চল হবেন না।

র। চঞ্চল হবো না এখন? আপনারা বুঝতে পারচেন না। কি একটা অজানা সুরের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে,—আমার বাইরে, আমার বুকের ভেতর,—আমার চারিদিকে। তারা ত আমাকে কিছুতে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। বুঝতে পারছি, আসছে আমার অপরূপ সুখ,—আমার অপূর্ব্ব আনন্দ,—আমার মুক্তি!

ক। চুপ্ ক'রে শুয়ে থাক বোন।

(অদূরে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল।)

র। ওই আরতির বাজনা বেজে উঠ্‌ল! ওই চোখ-জুড়ানো সবুজ আলোয় ঘর ভ'রে গেল। মেজদি এইবার!

(এমন সময় খোলা দুয়ার-পথে রমার স্বামী পরেশের প্রবেশ।)

পরেশ। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না;—কে, মেজবৌ না কি? আমি এলুম মেজবৌ!

ক। (সচকিতে) ঠাকুরপো! তুমি!

প। হাঁ, আমি! উঃ, আসবার কি আর ভরসা ছিল! মেজবৌ, কি অসম্ভব বিপদ—

ক। সে কথা পরে শুনবো ঠাকুরপো! উঃ! আমি কি করি! কি ক'রে জানাবো, কি সুখে ভ'রে উঠ্‌ল সমস্ত বুকের ভেতরটা! ছোট-বৌ, ওঠ্, দেখ্, সত্যিই এসেছে তোর আনন্দ—তোর মুক্তি! মা যখন দেন, তখন এমনি করেই ভরিয়ে দেন। তুমি ব'সো ঠাকুরপো—আমি ব'লে আসি সকলকে—! ছোট-বৌ তুই যদি আমার ছোট না হ'তিস, ত' ঐ পায়ের ধূলোয় আমার সমস্ত মাথাটা ভরিয়ে নিতাম।

দেখন-হাসি

[শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়]

তোর নাম রেখেছি
দেখন হাসি;
সব ভুলানর যাদু জানিস,
তুষ্টি সে তোর অবিনাশী।

ও তোর দিঠির আলোয় কমল ফোটে
মরা গাঙ্গে তুফান ছোটে—
তেপান্তরের পাড়টী ঘেঁসে মিশিয়ে যাওয়া
সুরের রেশে—
ছড়িয়ে পড়ে ও তোর খুসীর
উচ্ছ্বসিত ফেণার রাশি!
সব ভুলানর যাদু জানিস
তুই তুফানী—
দেখন-হাসি।

ও তোর বাঁকা ঠোঁটের সঞ্জীবনী
একশো ফাগুন সন্দীপনী
নগ্ন শীতের আব্রু দিতে ঝুলাস ঝালর
সবুজ পীতে—

ছুটাস উষার কনক-তৃষা
রিক্ততারি তমঃনাশি।
সব কুলানর সব ভুলানর ভেল্কী জানিস
ও তোর নাম রেখেছি দেখন-হাসি।

বিফলতার ধু-ধু পাথার
নেইক আলো, শুধুই আঁধার;
উদ্বেল এই হিয়ার মাঝে যাস বুলিয়ে
সকাল সাঁঝে

ক্ষীরোদ-ছেঁচা ওই পুলকের
শুক্লসোহাগ পৌর্ণমাসী!
তুই উজানী তুই তুফানী—
বড্ডই তোরে ভালোবাসি।

শিব

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

বেদে রুদ্র, পুরাণে শিব,—প্রধানতঃ এইই আখ্যা।—অবশ্য নাম অনন্ত, তাহার সংখ্যা নাই। জয় বাবা বিশ্বনাথ, বম্ ববম্ বম্ শব্দে ভারতের কোন্ প্রদেশে না এখনও শিবভক্ত পূজায়, উৎসবে, নৃত্যে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে? শিব ছাড়া তীর্থ নাই। সন্ন্যাসীর শিব, গৃহীর শিব, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, নারী, স্বজাতি, বিজাতি,—ভূতনাথের কাছে কোনও ভূতই নিবারিত নহে। সকলের সমন্বয় করিতে শিব-ভাব যতটা উন্মাদনা আনে, শিব-জ্ঞান যতটা পথ নির্দ্দেশ করে—হিন্দুর আর কোনও দেবতার উপাসনায় ততখানি নহে।

শুনিয়াছি, ভক্তে না কি শিবকে দেখিয়াছে—শিব-পদে লীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে স্বতন্ত্র যুগের কথা। আজ আমরা বহির্ম্মুখ। বহির্ম্মুখী বৃত্তি দিয়া, খণ্ড বুদ্ধির আয়ত্ত পৌরাণিক উপাখ্যানের শিবকে বুঝিতেছি। মন্দিরায়তন মধ্যে খণ্ড বুদ্ধি (intellect)-প্রসূত ধ্যান-চিত্র প্রস্তরে কুঁদিয়া স্থাপনা করিয়াছি। প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার অনুকরণেই পূজা-উৎসব যাহা কিছু শিবতুষ্টির বিধান পালন করিতেছি। যাহাই হউক—নিশ্চয়ই ইহা নিন্দনীয় নহে। শিব—চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া আছে; তথাপি এই ক্রীড়াবৎ প্রচেষ্টার মধ্যেও শিবাভিলাষ জাতির জীবন-ধারার সঙ্গে এখনও মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই অভিলাষ উগ্রতর হইয়াই হয় তো কোনও দিন ভাবোচ্ছ্বাসের অদম্য আবেগ ক্ষণিকের জন্যও খণ্ডত্বের বুদ্ধি-পটখানিকে সরাইয়া দিতে পারে। তখন, হঠাৎ সেই সিন্ধুর তলে নিমেষের জন্যও ডুবিয়া যে দৈবক্রমে একটী মণি কুড়াইয়া পাইবে,—তাহাকেই ধারণা করিয়া ধ্যানের বিদ্যুৎ-শক্তি প্রবাহে তাহার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতে পারে। অতল সিন্ধুর গর্ভের সমস্ত মণিমালা-নিকেতনের পথ তখনি গম্য হইয়া উঠিতে পারে। হয় ত কেন বলি,—পারে বলিই বা কেন,—তাহাই হইতেছে। জাতি জড়-স্পন্দন-বিধায়িনী, প্রাণময়ী স্তরে যাহার সে ভাব হয়, সে লোক নয়নের অন্তরালে সরিয়া যায়।

জানি তো—ভাঙ্গড় ক্ষ্যাপা। জন্ম নাই, মৃত্যুঞ্জয়; প্রমথানুচর শ্মশানচারী শিব। পূজা উৎসবের অবকাশে ঘরে পুরাণখানি খুলিয়া, কবিতাময়ী ওজস্বিনী বর্ণনায় অমনি কল্পনা মধ্যে হৃদয়-বৃত্তি আর্দ্র হইতে থাকে। যাহার উৎকট বিষয়-মদে চিত্ত কঠিন হইয়া যায় নাই—যে একটু ভাল করিয়াই গণে, তাহার মনঃসন্ধি সকল ক্ষণেকের জন্য শিথিল হইয়া যায়। কল্পনা আরো দূরে—আরো দূরে সরিতে থাকে। তার পর, কল্পনার অতীত নেত্রে—কল্পনা যাহার আভাষ সেখানে আসিয়া, সে স্তব্ধ হইয়া যায়। তার পরের অবস্থা ভাষায় বুঝাইবার নহে। চন্দ্ররশ্মি অবলম্বন করিয়া যদি কোনও তৃষিত চাতকিনী চন্দ্রমামৃত-হ্রদে উপনীত হইতে পারে—তার পর?

স্থির শুদ্ধ নিস্পন্দ যোগাসনাসীন, নয় ত উন্মত্ত দুর্ব্বার উচ্ছ্বাস। মোটের উপর, সর্ব্বত্র শিবের এই দুই মূর্ত্তি দেখিতে পাই। কর্ম্ম, বৃত্তি, ব্যবহার সমস্তের অতীত দেবাদিদেব। মানব-চরিত্রের কোন নিগূঢ় অংশে এই রূপ বিলক্ষিত হইয়া থাকে? দেখিতে হইবে তাহাই; বুঝিতে হইবে শিবকে আমরা তখনি কেবল পাইব। ইহাই শিবদর্শন লাভের সঙ্কেত।

পৌরাণিক ঘটনায় শিব-কীর্ত্তি চারিটি ধ্বংস-লীলার মধ্যেই প্রধানতঃ নিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি যজ্ঞের ধ্বংস করিয়াছেন, ত্রিপুর জয় করিয়াছেন, তিনি হলাহল জীর্ণ করিয়াছেন, তিনি কামকে দগ্ধ করিয়াছেন। জগতে এই চারিটী কীর্ত্তির জন্যই শিব শিব,—শিব ভিন্ন কেহই তাহা পারিত না। আর একটা আছে—গঙ্গা প্রপাতাবতরণের বেগ ধারণ। সুরধুনী স্পর্দ্ধা করিয়া নামিতেছিলেন—আপন পদভরে ধরণীকে পাতালগামিনী করিবেন; শিব তখন আপনার আলুলায়িত জটাজালের মধ্যে তাঁহাকে ধরিতে, সেই জালবদ্ধাবস্থাতেই তিনি সহস্র বৎসর রহিলেন।

উল্লিখিত ভাব এবং ঘটনাবলী অবলম্বনে, সাধারণের উপযোগী করিয়া, শিবলীলা,—ঘটনার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতে-দিতে,—উপাখ্যানাকারে লিপিবদ্ধ করা চলিতে পারে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সে পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে না; সেই জন্য তাহা এখানে লক্ষ্য নহে। ধ্যানের যেটুকু আভাষ জাগ্রত দশাতেও ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছি, সেইটুকুই স্মৃতির ফলক হইতে গুটাইয়া আনিয়া এখানে আমার ধরিবার প্রয়াস।

জগৎ যখন মিথ্যা প্রপঞ্চজাল, তখন শিবের তমোময় রুদ্রমূর্ত্তিই সকলের সার বলিতে হইবে। ব্রহ্মা এই মিথ্যাকে সৃষ্টি করিতেছেন; বিষ্ণু ইহাকেই পালন করিতেছেন;—উভয়েই ত কার্য্যতঃ মিথ্যার সমর্থক। কেবল শিবে ধ্বংস-গুণ আছে বলিয়া, শিব-প্রভাবে সত্যের সহিত এই মিথ্যাময় জগৎ সংলগ্ন রহিয়াছে। সত্য সকলকে উচাইয়া—তাই বোধ হয় শিবও সকলকে উচাইয়া। শিবের নাম দেবাদিদেব মহাদেব। সর্ব্বাপেক্ষা সমুচ্চ লোকের সত্তা শিবের মধ্য দিয়া ব্রহ্মাণ্ডে খেলিয়া যাইতেছে।

বস্তুতঃ কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ত্রিমূর্ত্তির স্বতন্ত্র তিন অস্তিত্ব নাই। একেরেই খণ্ড। আমরা খণ্ড ভাবে বুঝিবার জন্য তিন কল্পনা করিয়া লইয়াছি। তিন নহে এক। কিন্তু এক রূপে একেকে বুঝিবার ক্ষমতা স্বয়ং প্রকৃতিরও নাই। স্বয়ং মহামায়াও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হরের একাঙ্গী ভাব বুঝিতে পারেন না। তিনি যে ত্রিগুণময়ী হইয়া একেকে উপভোগার্থ তিন করিয়া লইয়াছেন। আমরা তাঁহারই প্রজা।

> ন ব্রহ্মা ভবতো ভিন্নঃ ন শম্ভু র্ব্রহ্মণ স্তথা।
> ন চাহং যুবয়ো র্ভিন্নো হ্যভিন্নস্ত্বং সনাতনঃ॥
> কস্তং কোঽহঞ্চ কো ব্রহ্মা মমৈব পরমাত্মনঃ।
> অংশ ত্রয় মিদং ভিন্নং সৃষ্টি স্থিত্যন্ত কারণম্।
> শিরোগ্রীবাদি ভেদেন যথৈকেকস্য ধর্ম্মিণঃ।
> অঙ্গানি মে তথৈকস্য ভাগত্রয় মিদং হর॥

কালিকা পুরাণ ১১শ অং

ভাবার্থ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু সকলেই সেই এক সনাতন। সেই পরমাত্মাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তিন গুণে ত্রিমূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হইতেছেন। দেহের শির, গ্রীবা প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গের মত ইঁহারা পরমাত্মার অঙ্গত্রয়।

ধর্ম্মের চারিটী পাদ। তপস্যা, শৌচ, দান, সত্য। কলিতে প্রথম তিনটী নাই,—শেষটী মাত্র অবশিষ্ট আছে। যাহা সত্য অবশেষে তাহারই জয় হয়, অবশ্য এ কথা আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেও জানি। শাস্ত্রও তাহাই বলিতেছে যে, কলিতে ধর্ম্মের শেষ পদটী, অর্থাৎ সত্য মাত্র থাকিবে;—অপর সমস্তই কলির প্রভাবে বিনষ্ট হইবে। এটা কলিকাল—শিবভক্তের সংখ্যাধিক্যের তাহাও একটা কারণ হইতে পারে। যেহেতু, সত্যই যখন কলিতে একমাত্র ধর্ম্ম, তখন, যে দেবতা সত্যের সহিত জগতের সংস্রবের হেতু, মানবের স্বতঃই তাঁহারই প্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত হওয়া স্বাভাবিক। এই দেবতা প্রলয়ের দেবতা; কিন্তু যাহা সত্য, তাহা প্রলয়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে না। আবার যাহা অসত্য, তাহার না কি প্রলয় স্বরূপেই অবস্থান। বস্তুতঃ, যাহা আমার নাই,—ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্নের মত যাহা অসার ও বিড়ম্বনাময়ী, তাহার মোহ-জাল যত শীঘ্র কাটে, ততই আমার মঙ্গল। কারণ, তত অবিলম্বেই, যাহা আমার, তাহার সন্ধান লইব—তাহাকে আমি লাভ করিতে পারিব,—তত অবিলম্বেই আমি সার্থক হইতে পারিব। রুদ্র অসত্য-প্রলয় শুনিয়া ভীতির কিছুই নাই। দেখা যাইতেছে প্রলয় ঐ শিব অর্থাৎ মঙ্গল,—আরও

গূঢ় ব্যাখ্যায় স্বরূপের প্রকাশ,—অর্থেই পর্য্যবসিত। দেবতার রূপের কথা গেল। তার পর গুণ। সে হইল তমঃ। কিন্তু এ সেই তমঃ নহে, যাহা দক্ষকে প্রাধান্যের উৎকট মদিরা পান করাইয়াছিল। এ তমঃ আমরা অনুভব করিতে পারিব না। যাহা সত্যের আবরণ ঘটায়, তাহা দক্ষের তমঃ, শিবের তমোগুণ তাহা নহে। যে গুণে শিবের রুদ্র রূপ সত্যকে পুনঃ প্রকাশিত করে, তাহারই কথা বলিতেছি।

বুদ্ধির খণ্ডত্বের জন্য এই বলা এবং বোঝায় একটা দোষ থাকিয়া যায়ই। এই আমি বলিতেছি,—শিবের কথা বলিতেছি বলিয়া, আমার মধ্যে এমন একটা কি গোলমাল আসিয়া পড়িতেছে যে, শিবকে অপর দুই দেবতা হইতে অনেকখানি বড় করিয়া তুলিতেছি। এমনটা না করিয়া যে পূর্ণ স্বরূপে শিবের বর্ণনা করিতে পারি না! এমনটা না করিলে শিবকে সত্যই কম করিয়া বুঝিতে হয়! অথচ, শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা—ইঁহাদের মধ্যে ছোট-বড় দূরের কথা—কোনও পার্থক্য পর্য্যন্ত নাই। বিষ্ণুর কথা বুঝিতে গেলে, এমনি আবার বিষ্ণু তখন বুদ্ধির খণ্ডটুকুকে উপ্চাইয়া সকলের বড় হইয়া দেখা দিবেন! ব্রহ্মাকে বুঝিতে গেলে, সে সময়ের মত সেও ঠিক এইরূপই ব্যবস্থা হইবে। একটুকরা জমি—তিন জন মালিক। প্রত্যেকেই ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্যে দখল লইতে আসিয়াছেন। একই সময়ে সকলকে দখল দিতে গেলে, একটা ভাগ-বখরা নির্দ্ধারণ হইয়া যায়। আর এই সীমানা নির্দ্ধারণটাই এ-পারের আদালতে সুব্যবস্থার চরম আদর্শ কি না! তাই স্বধর্ম্ম-পরধর্ম্ম ভেদ পৃথিবীতে ঘুচিবার নহে।

শিবকে দেখা আপনাকে শিবস্বরূপে দেখা। বিষ্ণুকে দেখা আপনাকে বিষ্ণুস্বরূপে দেখা। ব্রহ্মাকে দেখা আপনাকে ব্রহ্মা স্বরূপে দেখা। এই তিন রূপ অবিশ্লেষ্য রূপেই আপনার "অদৃশ্যমশ্রোত্যমগ্রাহ্যম্!"

শিব বিষ্ণু ব্রহ্মা তিন থাকিবেই। সাধকের থাকিবে না সেই ভ্রান্তি, যে, কোনও একজন আমার সর্ব্বস্ব। একই আধারে এই ত্রিমূর্ত্তি তোমার-আমার বুদ্ধির অগোচরেই তোমাকে-আমাকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। কখন কি ভাবে কাহার স্পর্শে পদ্মকোরক দলে-দলে প্রস্ফুটিত হইতেছে, সে জানিবার অবস্থা আসিলে, চমকিয়া উঠিয়া একদিন, সমস্ত তখন নখদর্পণগত—আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিব।

শিব প্রলয়রূপী; কিন্তু আপনাকে শিব স্বরূপে দেখিলে, তখন এই প্রলয়ই যেন আর একটা সৃষ্টি। এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি হইতে আরও নিশ্চিততর ধ্রুবলোকবৎ সে আরও এক বলবত্তর সৃষ্টি—উচ্চতর লোকের বিকাশ। প্রলয় শুনিয়াই আমরা শিহরিতে শিখিয়াছি; কারণ, ঠিক বস্তুটীকে আমরা জানি না। অপরিচিত সম্বন্ধে সন্দেহই আমাদের আশঙ্কার কারণ। আমাদের চক্ষের সম্মুখে যে রূপ প্রকাশিত হইয়া আছে, সেটাকে খুব জানি—সেটা স্থিতি; সেটা সম্বন্ধে একটা সুখই মনে অনুভব করিতেছি। বস্তুতঃ, ভগবানের সকল রূপই সুখকর। স্থিতির মত সৃষ্টিও সুখকর, প্রলয়ও সুখকর। আবার সকল রূপই আমাদের স্বরূপ। তথাপি বিশ্ব বিধানের ইহা ধারাও বটে যে, স্থিতি-রূপই আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিতবৎ হইবে—সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর হইবে। স্থিতি বিষ্ণুর রূপ; আর বিষ্ণু-মায়া দ্বারাই জগৎ-প্রপঞ্চ মণ্ডিত। বিষ্ণু-মায়াতেই দশ দিক আচ্ছন্ন। বিষ্ণু-মায়ার বশেই স্থিতি-ধর্ম্মী হইয়া আমাদের প্রাক্তন।

এই বিষ্ণু-মায়ার স্থানের জন্যই শিব কর্ম্ম, বৃত্তি, ব্যবহার —সমস্তের অতীত। এই জন্যই শিব ধ্যানলীন, স্তব্ধ, নিস্পন্দ, যোগাসনাসীন। যখন জাগেন, তখন উন্মত্ত সাজে তাণ্ডব-নৃত্যে চারিদিক কাঁপাইতে-কাঁপাইতে আসিয়া দেখা দেন। যদি কিছু করেন ত সে ধ্বংস-লীলা,—প্রলয়। তার পর আবার তখনি ধ্যানলীন হইয়া যান।

এই যে আপনার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছি,—যাহাকে বলি প্রাণের ভয়,—ইহাই বিষ্ণু-মায়ার সম্মোহন। প্রতি দেহে যদি সর্ব্বাপেক্ষা বড় বৃত্তি বলিয়া কিছু বুঝি, ত, সে এই প্রাণের ভয়। এই বৃত্তি দ্বারা তাড়িত হইয়া কি না করিতেছি আমরা! দেহে, গেহে, ধনে, উপকরণে, কূটনীতিতে একটু-একটু করিয়া জড়ের জঞ্জাল জড়ো করিতে-করিতে, অবশেষে তাহার হিসাব রাখিতে মাথা ঘুলাইয়া ফেলিয়া, আপনাকেও আমরা একটা জড় বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। এই সময়েই শিব আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা। শিব জড়ের মৃত্যুর কারণ; কিন্তু এই জড় যে আমাদের সত্যকে মারিয়া ফেলে। জড়াসক্তির বিপরীতমুখী যে ভাব, তাহাই শিব। জড়ের নাশ আছে; তাই জড়াসক্তকে প্রতিপদক্ষেপে সাবধান হইয়া কাজ করিতে হয়। জড়ের বিপরীত যে বস্তু, তাহাতে আসক্তির

সময় সাবধান হইবার কিছুই নাই। জড় স্থূল নিয়মের অধীন; জড়াসক্ত তাই হিসাবী। অতএব শিবের কেন যে উন্মত্ত বেশ, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না। তার পর তাণ্ডব নৃত্য—সে কি উন্মত্তের লক্ষণ? হাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু জড়াসক্তির আনন্দ দিন-রাত হারাই-হারাই, পালাই-পালাই করিতেছে। যে আনন্দ ক্ষয়-ব্যয়হীন তাহার Symbol যদি তাণ্ডব নৃত্যে প্রকাশ করি,— কি জানি, তাকে কি বলিতে পার!

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা

[শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি]

এক রাত্রি

পূজাহ্নের কাজ সেরে, আহারান্তে বিশ্রাম ক'রতে যাব, এমন সময় ফোণ বেজে উঠ্‌ল। "আপনি কি ডাক্তার ঘোষালকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দিয়েছেন? এক সঙ্গে এত টাকার চেক ত আপনি দেন না। পুলিশে খবর দিতে যাচ্চি।" উত্তর দিলাম "আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে কিছু না বলা পর্য্যন্ত কিছু ক'রবে না।" ডাক্তার ঘোষালের পূরো নাম এ, এল্‌, ঘোষাল। আমরা ক্লাসে ডাকতাম এলুমিনম্‌ ঘোষাল। এ, এল্‌ (al) রাসায়নিক ভাষায় এলুমিনম্‌ ধাতুর সাঙ্কেতিক নাম। ভাবলাম, এলুমিনম্‌ একেবারে বদলে না গেলে, তার পক্ষে জুয়াচুরি অসম্ভব। আবার ফোণের টিং টিং "আমাদের হোটেলে ডাক্তার ঘোষাল বেজায় ঢলাঢলি আরম্ভ করেছেন,—আপনি শীঘ্র আসুন। বোতল-বোতল স্যাম্পেন পার করচেন আর বিলুচ্চেন। আপনাকে নিয়ে আস্‌তে বল্‌চেন।" এতক্ষণে রহস্যের কুয়াসা কেটে গেল; মদের ঝোঁকে কাজটা করেছে। কিন্তু এলুমিনম্‌ ত সিগারেটটী পর্য্যন্ত ছুঁতো না! উত্তর দিলাম যেমন ক'রে পার, তাকে ধরে বাড়ী পাঠিয়ে দাও,—আমি একটু পরে যাচ্চি।" ঘণ্টা খানেক পরে ঘোষালদের দরজায় আমার মোটর থেমেছে। বাগানে মালী ফুলগাছে জল সেচন করচে; স্নিগ্ধ সুবাসের সঙ্গে ভোম্‌রার গুণ-গুণ গান ভেসে আস্‌চে; জানালায় যথাস্থানে রঙ্গীন পরদা খাটান রয়েছে। আঃ বাচ্‌লাম! সর্ব্বত্রই যেন একটা মধুর শান্তি এবং নিশ্চিন্ত নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে দুটী বালক-বালিকার চাপা হাসির অস্ফুট ধ্বনি আস্‌চে। তারা সিঁড়িতে বসে ছিল; বলে দিল, বাবা কোণের ঘরে। ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখি, এলুমিনম্‌ যাত্রার দলের রাজার মতন জরীর পোষাক পরেছে; আর মাথায় একটা দুর্গাঠাকরুণের মুকুট দড়ি দিয়ে বেঁধেছে। আমি যাবামাত্র বল্‌লে "জই, তুমি শুনে সুখী হবে, আমাকে প্রধান রাজমন্ত্রী বিলাত থেকে তার ক'রে 'কলিকাতার রাজা' (King of Calcutta) উপাধি দিয়েছেন। কারণ, সেই সর্ব্বরোগহর বীজ আবিষ্কার। এমন আবিষ্কার কেউ কখনো করে নি, তাই এই অসাধারণ উপাধি—

ভজহরি—হুজুর! মির্জ্জা সাহেব এসেছেন।

এলুমিনম্‌—চুপ রও শূয়োর! বল্‌ "Your Majesty!" তোকে এখন কে আস্‌তে বল্‌লে? মির্জ্জা সাহেবকে বস্‌তে বল্‌। জই, তোমাকে বল্‌তে ভুলেছি,—আমাকে শূন্য উপাধি দেওয়া হয় নাই; দস্তুর মত সৈন্য ও রণতরী রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য মির্জ্জাকে ডেকেছি; সে আমার ছেলেদের জিমনাষ্টিক মাষ্টার; তাকে আড্‌মিরেল্‌ ও কমাণ্ডার-ইন্‌-চিফ্‌ নিযুক্ত করব। বল্‌ছিলাম ঐ বীজের কথা। তোমরা ত বল, দেহে কোন সংক্রামক রোগ সঞ্চার হ'লে, সেই রোগের বীজাণু লাখে-লাখে ঝাঁকে-ঝাঁকে সমস্ত দেহটা ছেয়ে ফেলে। সেই বীজাণু থেকে বীজ বা ভ্যাক্‌সীন্‌ তৈয়েরী করে যদি দেহে ঢোকান যায়, তা' হলে রক্তের শ্বেত-কণিকাগুলি হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং রাক্ষস প্রকৃতি প্রাপ্ত হ'য়ে ঐ রোগের বীজাণুগুলিকে খেয়ে ফেলে। কিন্তু সব সময় খেতে পারে না; না পারলে ঐ রোগের বীজাণুগুলিই লোকটাকে খেয়ে ফেলে। আমি গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক গাছের আঠা থেকে একপ্রকার বীজ প্রস্তুত করেছি। সেই বীজ মাখন

হ'য়ে, রোগের বীজাণুর গায়ে লেগে যায়। মাখন-মাখান রুটীর মতন ঐ বীজাণুগুলিকে শ্বেতকণিকা কচ্‌কচ্‌ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। তোমাদের এক-এক রোগের এক-এক বীজ। আমার বীজ সর্ব্বরোগহর—কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড্‌, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা,—এক ঢিলে সব পাখী কুপোকাত। কেবল তাই নয়। স্কুল-কলেজের ছেলেদের কতকগুলি সংক্রামক রোগ আছে; যেমন, স্কুলে পা না দিতে-দিতেই চসমা পরা, আর কলেজে পা না দিতে-দিতেই টাকার বাতিক! আমার বীজ চোখে দিলে চসমার লোভ সেরে যায়; আর হাতে দু'এক ফোঁটা দেবামাত্র হাত আর টাকার জন্য প্রসারিত হয় না। কিন্তু আমার আর একটা প্রধান আবিষ্কার মানসিক বীজ। তোমরা বল, খাওয়া-দাওয়া ভাল হ'লে, রোগ তাড়াবার শক্তি (Resisting Power) বাড়ে। আমি বলি ভাল খাওয়ার দরুণ মানসিক স্ফূর্ত্তি বাড়ে; সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে রোগ তাড়াবার শক্তি। কিন্তু মনের স্ফূর্ত্তি বেশি বাড়ে মনের আহার বৃদ্ধিতে। মানুষের মন একঘেয়ে বিষয় ভেবে-ভেবে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। যে ডাক্তার, তার দ্রষ্টব্য বিষয় কেবল রোগী, রোগী, রোগী। যে উকীল, মোকেল আর আইনই কেবল তার মাথায় চড়ে বসে আছে। বেণেদের মাথার ভিতর রাত্রি-দিন কেবল টাকার ঝন্‌ঝনানি, আর মোটর ডাকাতীর বিভীষিকা। এই একঘেয়ে ভাব দূর করে, আমি বিশ্বভাতি (বিশ্বভারতীর চেয়ে বড়) এনে দেব। মনের ভিতর এমন একটা প্রাচ্য-প্রতীচ্য বৈদ্যুতিক-সাত্বিক আলো জেলে দেব, যাতে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়গুলি দৃষ্টিগোচর এবং একেবারে আয়ত্ত হ'য়ে যাবে। গ্যালো, রস্কো, জগদীশ, প্রফুল্ল, আলিক্‌ হাটা কিতাসাট, মোঝার্ট, তানসেন, রাফেল্‌, অবনীন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থ ও আবিষ্কার একত্র করে, চোষণ-যন্ত্র (Sucking Machine) দ্বারা তাহাদের সমুদয় প্রতিভা আকর্ষণ করে, একটা বীজ প্রস্তুত করেছি। সে বীজ যার দেহে যাবে, তার সর্ব্বজ্ঞতাজনক মনকোষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়ে, অজ্ঞতা-কোষগুলি গ্রাস করে ফেল্‌বে। আর একঘেয়ে ভাব থাকবে না। মনের স্ফূর্ত্তি বাড়বে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বরোগনাশক শক্তিও বেড়ে যাবে। এইজন্য একটা প্রকাণ্ড মিউজিয়ম্‌ বা প্রদর্শনী-মন্দির নির্ম্মাণ করব। তার ভিতরে থাকবে সর্ব্বরোগহর বীজ, সর্ব্বজ্ঞতাজনক বীজ, সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ক পুস্তক, সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র, এবং সর্ব্বমনীষিবর্গের প্রস্তর-মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি। এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে পৃথিবীর ঠিক মধ্যবিন্দু যেখানে। সে মন্দির ভূমিকম্পে নড়বে না; কারণ, মধ্যবিন্দুতে বাসুকী আছেন পৃথিবী মাথায় করে। জলে ডুববে না; কারণ, জলের রাজা বরুণ সেখানে ঘেঁস্‌তে পারবেন না; মধ্যবিন্দুর নিকটে এলেই প্রখর সূর্য্যতাপে বাষ্প হয়ে যাবেন। বাজ পড়ে ফাটবে না; কারণ, বাজের রাজা ইন্দ্র সম্প্রতি আমার রোগী। লোকে বলে, তিনি সহস্রলোচন,—সে সব বাজে কথা। চরিত্র-দোষে তাঁর দেহের হাজার জায়গা ফেটে ঘা বেরিয়েছিল,—যাকে চলিত কথায় বলে পারার ঘা। আমার সর্ব্বরোগহর বীজের কথা শুনে তিনি আমার শরণাপন্ন হয়েছেন; সুতরাং বাজের ভয় নাই। রৌদ্রে সে মন্দির তাতবে না; কারণ, মন্দিরের চুড়া প্রস্তুত হবে এভারেষ্ট্‌ পর্ব্বতের তুষারাবৃত শিখর দিয়ে। উড়ো জাহাজের উৎপাতের আশঙ্কায় শঙ্কর ঐ গিরিশিখরটা তুলে এনে আমায় দিয়ে গেছেন। চিকিৎসক মানুষ কি না,—তাই আমার উপর খুব ভক্তি হয়েছে। তুমি বন্ধু বলে, এই গুহ্য কথাগুলি তোমাকে বল্‌চি। দেখো ভাই, যেন এখন প্রকাশ না হয়। আর একটা কথা বলি শোন,—কোন সাহেব কি মেমকে মন্দিরে চাকুরী দেব না। এমন কি, মন্দিরের ত্রিসীমায় আসতে দেব না। ওদের অনেকের দেহে কুৎসিত বিষ আছে। তুমি ত জান, আমি পালিয়ে এডিনবরা চলে যাই। একদিন বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছি। ঝুপ ক'রে বৃষ্টি এসে পড়লো। একটা গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছি। দেখি, ছাতা মাথায় এক যুবতী এসে কাছে দাঁড়াল। খানিক পরে যুবতীটী মৃদু-হাস্যে বিম্বাধর কম্পিত করে বল্লে, "মশাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ভিজবেন? নিকটে আমাদের বাড়ী; চলুন সেখানে, যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে।" যুবতীর অনুরোধ উপেক্ষা করা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ মনে করে, তাদের বাড়ী গেলাম। বৃষ্টিটা আরও ঘনিয়ে এল। যুবতীর সঙ্গে কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে গেল। তার মা সেই রাত্রে সেখানে থাক্‌তে অনুরোধ করলেন; কারণ, দশটার পর ছাত্রাবাসের দরজা বন্ধ হ'য়ে যাবে। কথাটা যুক্তি-সঙ্গত মনে করে, নানাবিধ চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করে, পালঙ্কের শয্যায় শয়ন করা গেল। মধ্য রাত্রে দরজায় আঘাত শুনে, দরজা

খুলে দেখি, সেই যুবতী শয়ন পরিচ্ছদ পরে উপস্থিত। প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, সেই মোহন হাস্য সহকারে সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না ত?" বলেই বিছানায় বসে পড়ল। পরদিন ছাত্রাবাসে আহারের পর চুরোট খাচ্ছি, এমন সময় দেখি, দাসীর হাতে একটা লম্বা বিল্। চা, বিস্কুট, রুটী, মাখন, প্রথম শ্রেণীর ডিনার, ঘর ভাড়া ইত্যাদি বাবদ ২০ পাউণ্ড। টাকার জন্য ভয় হল না; কারণ, বাবা তখনও বেঁচে আছেন; কিন্তু পরে কুৎসিত ঘা দেখেই ভয়ে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল। ঘা ভাল করলে কে জান? ডাক্তার নয়,—একজন হাতুড়ে। যা হোক, তাই থেকে আমি শ্বেতাঙ্গদের সংস্পর্শ "দশহস্তেন" বর্জ্জন করি। তা ভাই, তোমাকে কিন্তু ভাল-ভাল লোক দিতে হবে,—লম্বা মাইনে দেব। মন্দিরে রাখবার জন্য ভাল-ভাল ছবি, মূর্ত্তি, পুস্তক ইত্যাদির ফরমাস দিয়েছি,—এখনই এসে পড়বে।" বল্‌তে-বল্‌তে এলুমিনম্ হাই তুল্‌তে লাগল; চোক বুজে এলো, এবং দু'মিনিট পরে নাসিকাগর্জ্জন শুনে, আমি আস্তে-আস্তে পা টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

লোকটা পণ্ডিত,—তিনটী বিষয়ে এম-এ। বিলাতে খুব ভাল পাশ করেছিল। এখানে পসার খুব ভাল। কিন্তু সাহেব বেশী হাতে নিত না। কেন নিত না, এখন বুঝা গেল। বিসম বিষ গা-ঢাকা দিয়ে, রক্ত-স্রোতে ডুব দিয়ে, লুকিয়ে ছিল,—পোনর বছর পরে মাথায় উঠেছে। সিঁড়িতে নামবার আগেই ঘোষাল-পত্নীর সঙ্গে দেখা। তিনি বল্‌লেন, "ডাক্তার বাবু, কি হবে? কিছুদিন থেকে লক্ষ্য ক'রে আস্‌চি, কথা কইতে-কইতে তাঁর জিভটা জড়িয়ে আসে,—মুখের একটা দিক কেমন কুঁচকে যায়,—চলবার সময় পা কেমন টলে,—কথা শেষ না হতে-হতেই ঘুমিয়ে পড়েন।" বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আবার বল্‌লেন, "ডাক্তার বাবু, আপনি স্বামীর বন্ধু,—আপনাকে বল্‌তে দোষ নাই,—আমার কপাল পুড়েছে; তিনি বোধ হয় আমাকে ভালবাসেন না,—কে একজন সর্ব্ব-বিদ্যা আছে, তার কথাই সর্ব্বদা বলেন।" পতি-প্রাণা পৃথিবীকে আপনার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারেন; কিন্তু কাহাকেও স্বামীর এক কণামাত্রও দিতে পারেন না; সেই কেহ বাস্তবিকই হউন, আর কাল্পনিকই হউন। হাসি চেপে বল্লাম, "মিসেস্ ঘোষাল, এই বিপদের সময় ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হবেন না। সর্ব্ব-বিদ্যা কোন বিম্বোষ্ঠি চারুনেত্রা নহেন, কিন্তু আপনার স্বামীর মানসী মূর্ত্তি মাত্র। তিনি তারই ধ্যানে মগ্ন। কেমন ক'রে মানুষ তাকে পেতে পারে, তারি উপায় আবিষ্কার করবার জন্য ব্যস্ত। আপনি শান্ত হউন। একটু মাথায় গোলযোগ হয়েছে। আশা করি, শীঘ্রই সেরে যাবে।" পোনর বছরের সঞ্চিত লুক্কায়িত বিষের পরিণাম যে এই দুঃসাধ্য মস্তিষ্ক রোগ, তাঁকে এই কথা বলা হল না।

সদর দরজায় এসে দেখি, এক গাড়ী বোঝাই ভাল-ভাল ছবি, আর এক গাড়ী বোঝাই দামী বই;—নামাবার উদ্যোগ হচ্চে। বাধা দিয়ে আমি বললাম, গাড়ী ভাড়া চুকিয়ে দিচ্চি,—জিনিসগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ডাক্তার সাহেবের শরীর অত্যন্ত খারাপ। প্রয়োজন হ'লে পরে খবর দেওয়া যাবে।"

(২)

"ডাক্তার বাবু, আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না। অবস্থা যে ক্রমশঃ খারাপ বোধ হচ্চে।" বল্‌তে-বল্‌তে ঘোষাল-জায়ার দুই চক্ষে শতধারা। ভবিতব্যের জন্য প্রস্তুত করাই প্রয়োজন। সমুদায় কথা বুঝিয়ে বললাম। প্রশান্ত, সংযত চিত্তে অতি সাবধানে সেবার প্রয়োজন; চিত্ত-বিক্ষেপে সেবার ত্রুটী হবে। পাগলের অবস্থা দেখে চক্ষে জল এল। কোথায় গেল সেই সৌন্দর্য্য—সেই মনোমুগ্ধকর হাস্য, সেই রোগী-সেবায় ঐকান্তিকতা? পা দুটি অবশ হয়েছে, ক্যাথিটার শলা দিয়ে প্রস্রাব করাতে, আর পিচকারী দিয়ে বাহ্যে করাতে হয়। আমাকে দেখে বল্লে "ভাগ্যিস্ তুমি এসে পড়েছ,—তোমাকে ডেকে পাঠাবার কথা হচ্চিল। আর একটা আশ্চর্য্য আবিষ্কার করেছি। কাল রাত্রে নূতন রাজাকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্য, দেবলোক থেকে দেবর্ষি নারদ ঢেঁকী চড়ে বীণা বাজাতে-বাজাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর ঢেঁকীটী সজীব। গুহ্য দেশে ইহারই স্পর্শে মানুষ লঘুতা প্রাপ্ত হয়—এই কথাটা মাথায় এসে গেল। তৎক্ষণাৎ তাঁর অনুমতি নিয়ে ঢেঁকীর রক্ত থেকে সীরম প্রস্তুত করে, পার্শ্বস্থিত কুকুরের মলদ্বারে পিচকারী দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলুম। দেবামাত্র কুকুর হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগল। আর উড়ো জাহাজের দরকার হবে না। মানুষ শূন্যে উড়ে যেথানে ইচ্ছা যেতে পারবে। যে থৌতিনেতি জানে, সে এক পাগলা

জলে ঐ সীরম মিশিয়ে, সেই জল মলদ্বার দিয়ে টানবে। আর জল যত উপরে উঠবে, সেও ততই আকাশে উঠতে থাকবে।”

একদিন বৈকালিক রোগী দর্শনে বাহির হব, এমন সময় ফোণ ঘন-ঘন বেজে উঠল। “ডাক্তার ঘোষালকে শীগগির দেখতে আসুন।” গিয়ে দেখি, সব শেষ হয়ে গিয়েছে। একখানা চাকা-দেওয়া কেদারায় বসিয়ে তাকে ছাদের উপর রেখে আসা হয়েছিল। সকলকে বলেছিল, আজ ঢেঁকী-সীরমের বলে সে আকাশে উড়বে। পাগলের খেয়াল বলে কথাটা কেউ গ্রাহ্য করে নাই। কেদারার চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেড়া ছাদের একপ্রান্তে যখন উপস্থিত হ'য়েছে, ঘোষাল-পত্নী দেখলেন, সে তাড়াতাড়ি সাঁতার দিবার মতন দুটা হাত শূন্যে ফেলেছে। ধরতে যাবার পূর্ব্বেই, সমস্ত দেহ সেই তেতলার ছাদ থেকে নীচে পড়ে একেবারে চুরমার।

উজ্জ্বল প্রতিভা, প্রবল জ্ঞান-পিপাসা, অক্লান্ত জনসেবা, অফুরন্ত অকৃত্রিম ভালবাসা, সব ফুরাল। মধ্যাহ্ন আকাশেই উজ্জ্বল রবি অস্তমিত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অদম্য অধ্যবসায় গুণে যে চিকিৎসা-রাজ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল, আজ তার উপর নিষ্ঠুর নিয়তির কি কঠিন আঘাত! এক রাত্রির পদস্খলনের কি ভীষণ পরিণাম!

শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ কর্ণগোচর হবামাত্র রোগী ও আত্মীয়-স্বজন দলে-দলে এসে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মৃত ব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হল। একজন মাড়োয়ারী রোগী বল্ল,

“তুল্‌সী তুম্ যব জগমে আয়ো
জগ হসে তুম্ রোয়।
এইসি কর্‌ণী কর চলো কি
তুম্ হসে জগ রোয়॥

সেকাল

[শ্রীদেববালা দেবী]

জীবনটা ভারগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ, কাল মাসের শেষ দিন,—এবং গণিয়া দেখিলাম, আজ এই সন্ধ্যা হইতে কাল বেলা দশটার মধ্যে ছোট-বড় পাঁচটা রায় লিখিতে হইবে। নির্ব্বিবাদে রামের ধন শ্যামকে দেওয়ার অপবাদ আমাদের চিরদিন আছে। কিন্তু যাঁহারা এই অপবাদ দেন, তাঁহারা জানেন না যে ইহার জন্যও কি গোপন বেদনা এবং গভীর প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। মাস শেষের দু'তিন দিন আগে হইতে মনে হইতে থাকে, যেন এই পৃথিবীর বুক হইতে সমস্ত আনন্দ নিঃশেষে লোপ পাইয়া, একটা ফ্যাকাসে জীর্ণ কঙ্কাল-মূর্ত্তি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

অন্ধকার হইয়া আসিতেছে,—অথচ ছাড়াও যায় না; সুতরাং চাকরকে বলিলাম, “ওরে আলো দে।” আলো দেওয়ার অবকাশটুকুও নষ্ট করা চলে না; সুতরাং দিন শেষের অস্পষ্ট আলোকেও কোনও রকম করিয়া লেখা চলিতে লাগিল।

এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, হয় ত বিঘ্ন উপস্থিত। এ সময়ে অতিথিকেও অপ্রীতিকর মনে হয়; এমন কি, শাস্ত্রমতে যিনি অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাঁহার সঙ্গও মন মুগ্ধ করে না। এ সত্য, যাঁহারা ব্যথার ব্যথী, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন।

যা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাই। বৃদ্ধ সুরেশ বাবু একেবারে সরাসরি ঘরে ঢুকিয়া, আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “ঢের হ'য়েছে ভায়া; প্রাণটাও ওর জন্যে দিতে হবে না কি? চল, একটু বেড়িয়ে আসি গে।”

সুরেশ বাবুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,—আঠার বৎসর মুন্সেফি, ছয় বৎসর সবজজ, এবং দুই বৎসর জজিয়তী করার পর, এই বৎসর-চারেক পেন্সন লইয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয়ই আমার মুরুব্বিস্থানীয়। বয়স এবং অভিজ্ঞতায় যদিও প্রাচীন,—কিন্তু এই ছাব্বিশ বছরের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পরও, কি জানি কেমন করিয়া, মন এখনও তরুণ রাখিয়াছেন। বছর-দশেক ডায়াবেটিস্ হইয়াছে; তাহারই কবল

হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য, প্রতিদিন সন্ধ্যা ও সকালে নিয়মিত ভাবে ভ্রমণ করেন।

তাঁহাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি; সুতরাং লেখনী বন্ধ করিয়া কহিলাম, "কাল মাসের শেষ দিন, দাদা—"

দাদা হাসিয়া বলিলেন, "ভায়া, জীবনে মাসের শেষ দিন অনেকবারই পাবে; কিন্তু স্বাস্থ্য একবার গেলে, আর ফিরে পাবে না। মাসের শেষ দিনগুলোতে এই দারুণ সত্যটা মনে রাখবার চেষ্টা ক'রো।"

সুতরাং আর তর্ক নিষ্প্রয়োজন। বোধ করি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম।

২

রাস্তায় বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। প্রকৃতি একেবারে নিঃশেষে আপনার সৌন্দর্য্য বিলাইয়া দিয়াছেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, এবং দক্ষিণ হইতে জীবন-জুড়ানো বাতাস বহিতেছে।

সুরেশ বাবু কহিলেন "দেখ দিকিনি,—এই সময়ে ঘরের ভেতর বন্ধ হ'য়ে রায় লেখবার সময়! একেবারে আত্মহত্যা!"

আমি কহিলাম, "সে কথা কতকটা ঠিক বটে; কিন্তু উপায় কি?"

সুরেশ বাবু কহিলেন, "দিন-কাল ক্রমশই খারাপ হ'য়ে আসছে, সে কথা ঠিক। এখন না কি তোমাদের কাজের হিসাব করা হয়,—কত কথা দৈনিক লিখেছ তাই গুণে! সে-সব দিনে এ-সব ব্যাপার ছিল না। আমার বিশ্বাস, কাজের মর্ম তাঁরা সেকালে ভাল বুঝতেন। তা' ছাড়া, তখন সরল-বিশ্বাসী, দেব-চরিত্র লোকেরও অভাব ছিল না। চাকুরী সব সময়েই চাকুরী; কিন্তু এই-সব লোকের কাছে কাজ ক'রে' সময়ে-সময়ে দাসত্বের কথাও ভুলে যেতে হ'ত। তুমি বুঝি আমাদের সেই পামার সাহেব জজের কথা জান না?"

আমি বলিলাম, "কই, শুনি নি ত!"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "শোন; একালে একটা শোনবার জিনিস" বলিয়া বলিতে লাগিলেন।

আমি তখন সবে চাকুরীতে পাকা হ'য়ে, একটা সদরে মুন্সেফ হ'য়েছি। সেখানে জজ পামার সাহেব, দুজন সদরআলা, আর আমরা দু'জন মুন্সেফ। সেখানে কাজ ছিল কম, আর রাম-রাজত্ব ছিল,—বিশেষ পামার সাহেবের অধীনে। সাহেব বড়ঘরের ছেলে; দেখ্‌তে যেমন সুশ্রী,—মন তেমনি উদার, সরল।

আমার বেড়ান বাতিকটা বরাবরই আছে;—তখনও ভোরে উঠে অন্ততঃ মাইল দু'তিন না বেড়ালে চলত না। সাহেবও রোজ সকালে বেড়াতেন; এবং দু'জনের দেখা রোজই হোত। কোনও দিন যদি ইচ্ছা ক'রে অন্য পথে যেতাম, ত' তার পর দিন সাহেব অনুযোগ করতেন যে, দেখা হয় নি কেন।

এমন সময় এলো তোমারই মতন মাসের শেষ। কাজ যদিও এমন কিছুই বেশী ছিল না, কিন্তু সে-বার মাসের শেষে কিছু জমে গিয়েছিল। সেই জন্যে দু'তিন দিন সকালে আর বেরোনো হোল না।

তার পর যে দিন সকালে সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'লো, সে দিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, তোমাকে এ কয়দিন সকালে দেখি নি কেন—শরীর ভাল ছিল ত?'

আমি বললাম, 'সাহেব, ধন্যবাদ। ভালই ছিলাম। কিন্তু রায় লেখার জন্যে বেরোতে পারি নি।'

সাহেব তাঁর লাঠির ওপর ভর দিয়ে, আমার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'Sen, don't kill yourself (সেন, এমন ক'রে নিজেকে মেরে ফেলো না)। আমি দেখেছি, তোমরা ভুলে যাও যে, রায় লেখাই জীবনের শেষ নয়। তোমার কাজ এত বেশী, তা' আমাকে বলো নি কেন,—আমি একজন এডিশনালের জন্য লিখতাম।'

এর জবাব দেওয়া শক্ত; কেন না, এ কথা বলা চলে না যে, কাজ কিছুই নেই। আমি অস্পষ্ট ভাবে বলতে গেলাম 'না সাহেব, তেমন—'

সাহেব বললেন, 'গুড্ মর্ণিং। এর ব্যবস্থা করতে হবে।'

৩

সেই দিনই হাইকোর্টে টেলিগ্রাম গেল "My munsifs dying—send additional" (আমার মুন্সেফরা কাজের চোটে মুমূর্ষু—এডিশনাল পাঠান)। হাইকোর্ট তখন কড়াক্রান্তির হিসাব করতেন না; সুতরাং দিন ৫।৭এর মধ্যেই বিজয় বাবু এডিশনাল এসে উপস্থিত হ'লেন।

ঠিক সেই সময়টিতে কাজ আমাদের তেমন বেশী ছিল না, এবং উপরন্তু, এডিশনাল আসায় কাজ একেবারেই কমে গেল।

ছুটোর মধ্যে কাজ শেষ করে আমরা দিনকতক বসে থাকতে লাগলাম। তার পর, আমাদের মধ্যেই কার মাথায় এ বুদ্ধি ঢুকলো মনে নেই,—কিন্তু আমরা সময় কাটাবার এক চমৎকার উপায় বার করলাম। তখন স্বাস্থ্যও ছিল ভাল, জিনিসও ছিল সুপ্রাপ্য ; সুতরাং তোমাদের অনেকেরই মত aqua puraয় (বিশুদ্ধ জলে) আমরা টিফিন সারতাম না। টিফিনের ব্যবস্থা ভালই ছিল ; কিন্তু এবার হোল আরও চমৎকার। ঠিক হোল যে, পালা ক'রে আমরা তিন জনে প্রত্যহ বাড়ী থেকে টিফিন আনবো ; আর ভক্ষকের দলে ভর্ত্তি হলেন আর একজন—জজের সেরেস্তাদার।

ভায়া হে, কি আনন্দেই যে দিনগুলো কেটেছিল! রেষারেষিতে সরঞ্জাম দিন-দিন উন্নতি লাভ ক'রতে লাগলো। এবং নানা প্রকারে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়ের ব্যবস্থা যে রকম হোতে লাগলো, তা বোধ করি কোনও দিন কোন হোটেলেও পাই নি! আজকাল অনেক নব্য আমাদের এই দোষ ধরেন যে, আমরা স্ত্রীকে দিয়ে রাঁধাই, এবং নিজেরা খাই, এবং আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, স্বার্থপর। আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, কোনও রকম ক'রে যদি নব্যদের একদিন আমাদের সেই টিফিনের খাওয়া খাওয়াতে পারতাম, তা' তাঁরা দ্বিতীয়বার এমন কথা উচ্চারণ করতে সাহস করতেন না।

মনের আনন্দে আর ভোজ্যের গুণে, দিনকতকের মধ্যেই আমাদের স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সকাল থেকেই মনে হ'তে থাকতো, কখন সেই ছুটোর সময় আসবে,—যখন সকলে মিলে বসে, খাওয়ার আনন্দের সঙ্গে বন্ধুত্বের আনন্দও উপভোগ করে, অবহেলায় সময় কাটিয়ে দেব।

এমনি করে কিছুদিন যায়। একদিন আমরা খাচ্ছি, এমন সময় আমার আর্দ্দালি ছুটে এসে বল্লে, 'হুজুর, সাহেব তিনজনের এজলাসে এসেছিলেন,—কাউকে না দেখে ফিরে গেলেন।'

সংবাদটা সকলকেই স্তম্ভিত, ক্ষুন্ন ক'রে দিলে। কেমন করে, কোন দিক দিয়ে যে মেঘ ওঠে, বলা কঠিন। ঠিক হোল যে, এ প্রীতি-ভোজ ততদিন বন্ধ থাকবে, যতদিন না সেরেস্তাদার খবর নিয়ে জানতে পারে যে, ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াল।

৪

পরদিন নিরানন্দে সময় কাটতে লাগলো। স্থির করলাম যে, দু'একদিন আর টিফিন করবো না ; অন্ততঃ, যতদিন না সেরেস্তাদার কিছু সংবাদ দেয়। জীবনটা দুর্ব্বহ বোধ হ'তে লাগলো,—ঘড়ির কাঁটাও যেন সরতে চায় না।

বেলা ১টার সময় সেরেস্তাদারের একটা চিঠি পেলাম, "যথা সময়ে টিফিনে উঠ্‌বেন, সাক্ষাতে কথা হবে।"

টিফিন ঘরে গিয়ে দেখলাম রাজ-আয়োজন,—আজ সেরেস্তাদার বাবু নিজে করেছেন। আমরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি ?'

সেরেস্তাদার বললেন, "আজ সকালেই সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কাছে গেলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেরেস্তদার, বলতে পারো, কাল কোন মুন্সেফকেই কেন বেলা দুটো থেকে এজলাসে দেখ্‌তে পাইনি ?"

আমি উত্তর করলাম, 'তাঁরা সবাই খাস-কামরায় ছিলেন।'

সাহেব। 'কেন, খাস-কামরায় তাঁরা অতক্ষণ কি করেন ?'

আমি বল্লাম, 'হুজুর, ওঁরা রোজই খাস-কামরায় পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, মামলায় যে-সব কূট (knotty) প্রশ্নের উদয় হয়, তারই আলোচনা করেন।'

শুনে সাহেবের প্রশান্ত চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি হেসে বল্লেন, 'বটে, ঠিক ত! এখন বুঝতে পারছি, কেন এদের রায় উল্টোতে আমাকে এত কষ্ট পেতে হয়! বল কি, তিনজনের মাথা একদিকে, আর আমি মাত্র একজন!'

কার্য্যের সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা

[শ্রীসরসীলাল সরকার, এম্-এ, এল্-এম্-এস্]

আমরা মনের ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া যাই ; কিন্তু আমাদের মনের গভীর স্তরের ভাবের ইঙ্গিত অনেক স্থলে এই সকল কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া যায়। আমাদের মনের গভীর স্তরের ভাবের স্রোত আমরা নিজেই স্পষ্ট রূপে ধরিতে পারি না। কিন্তু ইহা কখন-কখনও আমাদের কার্য্যে এরূপ একটি ভঙ্গী দেয় যে, সেই ভঙ্গী ধরিয়া, মনস্তত্ত্ববিদেরা অনেক সময়ে মনের গভীর স্তরের ভাবের স্রোতের গতি অনুমান করিতে পারেন। কার্য্যের এই ভঙ্গী কার্য্যকর্ত্তার অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়ে। কার্য্যের এইরূপ ভঙ্গীর দ্বারা ভিতরের মনের অবস্থা কখন-কখনও অনুমান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা প্রায়শঃ সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু যাহারা সংসারে অনেক দেখিয়া-শুনিয়া, মানব-চরিত্র বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণ লোক অপেক্ষা লোকের কার্য্যের ভঙ্গী দেখিয়াই, তাহাদের মনের ভিতরকার কথা অনেক স্থলে বুঝিয়া ফেলিতে পারেন। একটি চলিত কথা আছে যে, লোকদের হাঁটিবার ভঙ্গী দেখিয়া, তাহাদের কোষ্ঠি লেখা যায় ;—অর্থাৎ তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য অনুমান করিয়া লওয়া যায়। এই কথাটি একেবারে নিরর্থক নহে।

মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রের গবেষণা দ্বারা আমাদের মনের গভীর স্তরের ভাবের স্রোতের গতি নিরূপণার্থ কতকগুলি প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রণালীগুলিকে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে psycho-analytical methods বলা হয়। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের এই সকল নবাবিষ্কৃত প্রণালী জানা থাকিলে, অনেক সময় মনের গভীর স্তরের ভাবের স্রোত-গতি বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়। সংসারে অনেক দেখিয়া-শুনিয়া যাহারা মানব-চরিত্র বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণের জন্যে কতকটা এই psycho-analytical methodsই অবলম্বন করেন। অর্থাৎ, তাঁহারা কার্য্যের ভঙ্গীকে সংজ্ঞা ধরিয়া, তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় কোন ভিতরের ভাবের স্রোত এই রূপ সংজ্ঞা দ্বারা সূচিত হইয়াছিল, এইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হয়েন। একটি সংজ্ঞা অর্থাৎ symbol লইয়া, তাহা কোন্ জিনিসের symbol, এইটি বুঝিবার যেমন চেষ্টা

করা যায়, তেমনি কোন একটি কার্য্যের ভঙ্গী লইয়া, তাহা মনের গভীর স্তরের কিরূপ ভাবের স্রোত ইঙ্গিত করিতেছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

মনোবিজ্ঞানের জটিল আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। কার্য্যের সংজ্ঞা জ্ঞাপকতা সম্বন্ধে অনেক বৈদেশিক দৃষ্টান্ত সংগৃহীত আছে। এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য—আমাদের দেশের কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির গভীর মনের মহান ভাব কখন-কখনও তাঁহাদের সাধারণ কার্য্যের মধ্যে ভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিয়া, ঐ সকল কার্য্যের মধ্যে একটি সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহারই কতিপয় দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করা। অবশ্য এই সব দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়া পাঠকেরা মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ব্যাপার সম্বন্ধে কতকটা অনুমান করিতে পারেন।

বৈদেশিক পণ্ডিতেরা কার্য্যের সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা কিরূপ ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য, প্রথমতঃ একটি বৈদেশিক দৃষ্টান্ত, যত দূর স্মরণ আছে, লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

(১) এক জন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ, আর এক জন ভদ্র লোকের সঙ্গে বসিয়া খানা খাইতেছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটি খাইতে-খাইতে তাহার নিজের অবস্থার বিষয় ঐ মনস্তত্ত্ববিদের নিকট গল্প করিতেছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটি বলিতেছিলেন, "আমি একজন রাজদূত (Ambassador) এর অধীনে কেরাণীগিরি চাকরী করিতাম। কিছু দিন পরে এই রাজদূত (Ambassador) ঐখান হইতে বদলী হইয়া চলিয়া যান। তাঁহার স্থলে আর একজন নূতন রাজদূত আসিলেন। এই নূতন লোকটি আসিবার পরই আমি গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি নাই।"

এই ভদ্রলোকটি যখন শেষোক্ত কথা বলিতেছিলেন, তখন চামচে করিয়া খাবার মুখের নিকট খাইবার জন্য তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ খাবার তাঁহার মুখের ভিতর না যাইয়া, তাহার অনবধানতা হেতু দৈবক্রমে তাঁহার মুখের নিকট হইতে পড়িয়া গেল। সেই মনস্তত্ত্ববিদটি তাহার কার্য্যের এই ভঙ্গীটি দেখিয়া, তাহার মধ্যে যে সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা আছে, তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ঐ ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "আপনি দেখা করিলেন না বলিয়া মুখের গ্রাস হারাইলেন।"

সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সেইরূপই ঘটিয়াছিল। আমি নূতন রাজদূতের সঙ্গে দেখা করিলাম না বলিয়া, ঐ রাজদূতটি নূতন একজন লোককে আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সম্ভবতঃ ঐ রাজদূতের সঙ্গে দেখা করিলে চাকরীটি আমারই হইত।"

মনস্তত্ত্ববিদ, ঐ ভদ্রলোকের মুখ হইতে খাবারটি পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, তাহার মনে ঐ কার্য্যের অনুরূপ কিছু ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটি ঐ প্রশ্নের উত্তর যেরূপ ভাবে দিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, মনস্তত্ত্ববিদের অনুমান ঠিকই হইয়াছিল।

(২) যখন ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের বাড়ীতে যাতায়াত করিতাম, তখন একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, তাঁহার বৈঠকখানা-ঘরে যে Clock ঘড়িটি ছিল, সেটি বরাবরই fast চলিত।

একদিন ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে বলিলাম, যে, ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আপনার বিষয়ে কি বলিলেন শুনুন।

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন যে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এরূপ অদ্ভুত লোক যে, তিনি নিজের ideasএর উপর কোনও দাবী রাখেন না। কোন একজন ছাত্র ডাক্তার শীলের সঙ্গে কোন একটি দার্শনিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া,—ডাক্তার শীল ঐ বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা দ্বারা যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সবই শুনিয়া আসিল। ডাক্তার শীলের নিকট হইতে সংগৃহীত কথাগুলি লইয়া, সেই ছাত্রটি নিজের জন্য Calcutta University হইতে Ph. D. ডিগ্রি পাইবার জন্য একটি thesis লিখিয়া ফেলিল। ঐ thesisটি লেখা হইলে, সেইটি সংশোধন করিয়া লইবার জন্য পুনরায় সে ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের নিকট উপস্থিত হইল। ডাঃ শীল মহাশয় যত্নসহকারে সেইটি সংশোধন করিয়া দিলেন। তখন সে thesisটি ছাপাইয়া, ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীলের নিকট গেল, যে, আমার thesisটি Ph. D.এর জন্য submit করিতে চাহিতেছি;—আপনার অভিমত জানাইয়া, আমাকে যদি একটি certificate স্বরূপ কিছু লিখিয়া দেন, তাহা হইলে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। পরিশেষে ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের certificateএর

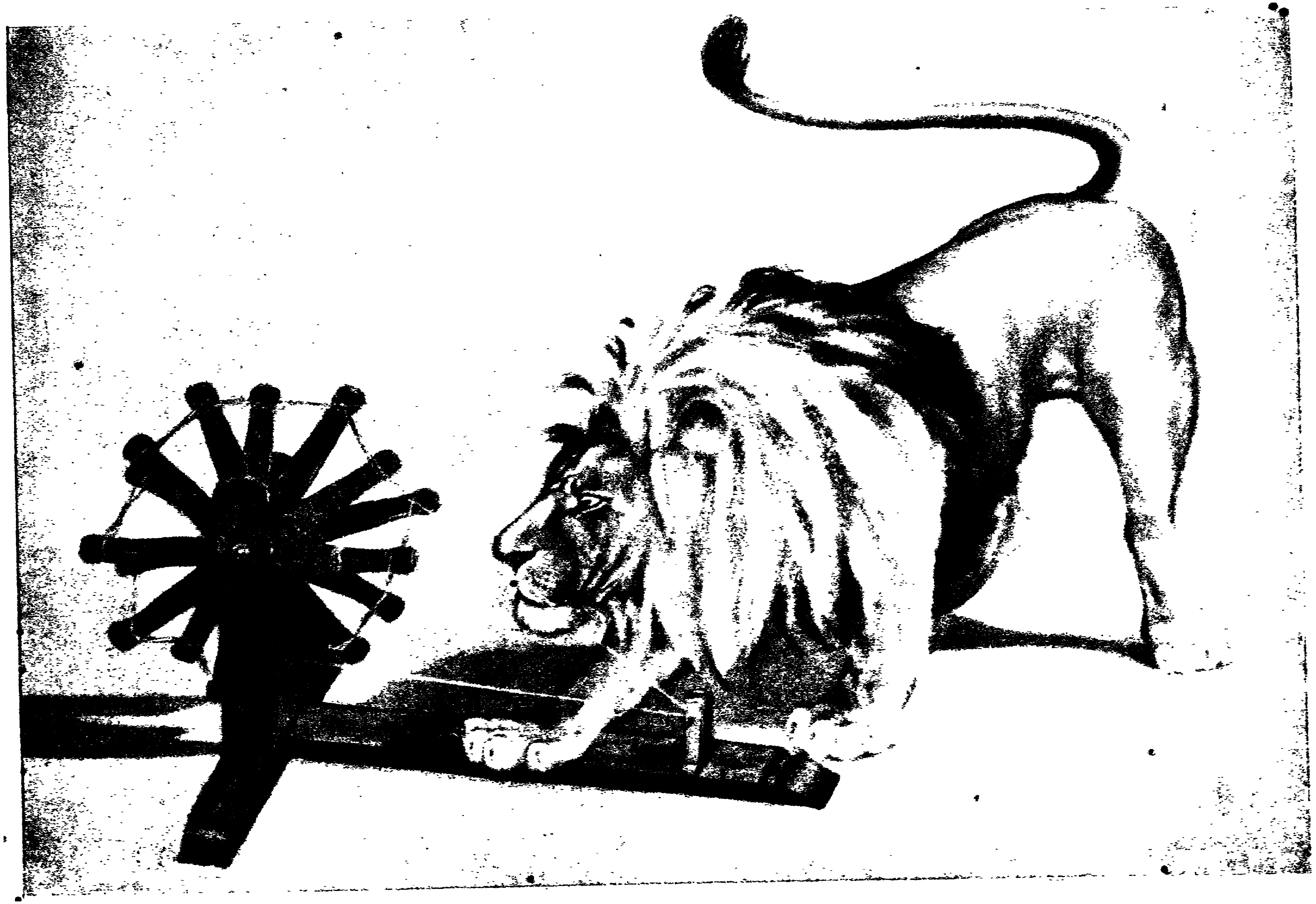

সমস্যা

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

রূপে ঐ ছাত্রটি Ph. D. হইয়া গেল। কিন্তু ঐ thesisএর সহিত ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের যে কোনও সম্বন্ধ আছে, এ কথা প্রকাশ পাইল না।

ডাঃ রবি ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—"ডাঃ শীল বলেন যে, ideaগুলি সর্ব universal। ইহার উপর কাহারও নিজের দাবী রাখা সঙ্গত হয় কি প্রকারে? কিন্তু আমি (রবীন্দ্র বাবু) ঠিক এ মত মানি না। সমুদ্রের জল universal বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমি তাহা হইতে এক কলসী জল নিজের ব্যবহারের জন্য তুলিয়া রাখিব না? মনে করুন, আমার একটি বড় বাড়ী আছে। তাহার ঘরগুলি অভ্যাগতগণকে ছাড়িয়া দিলেও কি ছোট একটি কুটীর নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিতে পারিব না? ইহার ফলে এই হইতেছে যে, ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীলের অগাধ পাণ্ডিত্যের ফলস্বরূপ, তাঁহার স্বলিখিত গভীর গবেষণামূলক কোন উপাদেয় পুস্তক জনসাধারণের জন্য প্রকাশিত হইতেছে না।

আমি ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়কে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপরিউক্ত কথাগুলি বলিয়া বলিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোধ হয় ঠিক কথাই বলিয়াছেন। কোন ছাত্র আপনার ideaতে আপনার সাহায্য লইয়া যতই ভাল করিয়া লিখুক না কেন, আপনার নিজের লেখার মতন হওয়া সম্ভব নহে। আপনি নিজে পুস্তক লিখিয়া আপনার অগাধ পাণ্ডিত্যের ফল পৃথিবীকে দান করেন না কেন?

ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, পুস্তক লিখতে হলে প্রথমতঃ timeএর সঙ্গে-সঙ্গে যেতে হয়; অর্থাৎ যে বিষয়ে পুস্তক লিখিবে, সে বিষয়ে যত গবেষণা হবে, তাঁর সমস্ত খবর রেখে, সেইগুলি পড়ে অধিগত করিতে হয়। তার পর timeএর সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে যদি এগিয়ে যেতে পারা যায়, তাহলেই পৃথিবীর জন্য কিছু বই লেখা সার্থক হয়। কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত timeএর সঙ্গে যাওয়ার চেষ্টাতেই পেরে উঠছি না। যদি এগিয়ে যেতে পারি, তখন ইচ্ছা আছে যে বই লিখব।"

ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া, তাঁহার ঘড়ির সর্ব্বদা fast চলা তাঁহার মনের এই ভাবের সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতার দরুণ হইতে পারে, ইহাই আমার বোধ হইল।

(৩) কবিবর রজনীকান্ত সেন যখন তাঁহার অন্তিমকালে গলায় cancer রোগগ্রস্ত হইয়া, Medical Collegeএর cottage wardএ ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার ঐ শারীরিক ব্যাধির দরুণ যে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু হৃদয়ে ভগবদ্‌-প্রেম থাকিলে, এইরূপ অবস্থায়ও মানসিক শান্তি লাভ করা যায়—আধ্যাত্মিক শক্তির এই অপূর্ব্ব মহিমা তিনি শুধু গান করিয়া শুনান নাই,—নিজের জীবনেও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার ঐ ব্যাধির দরুণ কথা কহিবার শক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐরূপ অবস্থায় একদিন Medical Collegeএর cottage wardএ ঐ কবিবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কবিবর রজনীকান্ত সেন এই সময় কাগজে লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন। তাহার বিবরণ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কবিবরের জীবন-বৃত্তান্তে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিবর রজনীকান্ত অন্যান্য কথার মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা করেন—

"একবার যদি দয়াল কণ্ঠ দিত, তবে আপনার 'রাজা ও রাণী' আপনার কাছে একবার অভিনয় করে দেখাতাম। আমি রাজার অভিনয় করেছি। এমন কাব্য, এমন নাটক কোথায় পাব! রাজার পার্ট আজও অনর্গল মুখস্থ আছে।

"এ রাজ্যেতে যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার;
যত লোহার শৃঙ্খল আছে সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়!" *

কবিবর রজনীকান্ত সেনের এই কবিতা আবৃত্তি সম্বন্ধে সাধারণ লোকে অনেক রকম ধারণা করিতে পারেন। যেমন, কবিবর রজনীকান্তের থিয়েটারে এত সখ ছিল যে, তিনি মরণের দ্বারে আসিয়াও থিয়েটারের কথা, এমন কি, তাঁহার মুখস্থ পার্ট ভুলিতে পারেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, যিনি মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণের অদ্ভুত প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি এই কবিতার আবৃত্তি সাধারণ লোকদিগের মতন সামান্য ভাবে বুঝেন নাই। তিনি, এই কবিতার আবৃত্তির মধ্যে কবিবর রজনীকান্তের গভীর ভাবের সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুর

* রাজা ও রাণী, ২য় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

মহাশয় কবিবর রজনীকান্তকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতাটি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। ঐ পত্র হইতে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটা জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি, মাংস, স্নায়ু, পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও, কোনমতে বন্দী করিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার রাজা ও রাণী নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন

'এ রাজ্যেতে যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার ;
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?"

এই কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারে প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটীর আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না! শরীর হার মানিয়াছে; কিন্তু চিত্তকে তারা পরাভূত করিতে পারে নাই। কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সঙ্গীতকে নিরস্ত করিতে পারে নাই।—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে; কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই।—কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি ও মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নাই, তাহা সে দিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।"

(৪) ছাত্রগণকে লইয়াই সার পি, সি, রায়ের সংসার। এই সংসারের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে, সার পি, সি, রায়ের সত্তার যথার্থ অনুভূতি হয় না। তাঁহার অন্তরঙ্গ ছাত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহানুভব হইলে, অনেক সময়ে তিনি ঐ ছাত্রকে দুই-একটি ঘুষি না মারিয়া থাকিতে পারেন না। এই ঘুষির মধ্যে এই আশীর্ব্বাদ থাকে যে, "হে ছাত্র, তুমি বীর হও; আঘাত করিতে এবং আঘাত সহ্য করিতে শিখ। জড়তা পরিহার কর।" প্রায় বৎসর তিন পূর্ব্বে আমার সহিত সার পি, সি, রায়ের জাতিভেদ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হয়। সার পি, সি, রায় তাঁহার ঘুষির দ্বারাই এই তর্কের শেষ করেন। এই তর্কের বিবরণটি এই প্রবন্ধের বিষয়ের পক্ষে অবান্তর হইলেও, সার পি, সি, রায়ের কথা লিপিবদ্ধ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—পাঠকগণ এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

আমি যখন খুলনায় Civil Surgeon ছিলাম, তখন সার পি, সি, রায় খুলনায় বাগেরহাটে একজন ভদ্রলোকের বাড়ী যাইয়া উঠিয়াছেন জানিয়া, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সার পি, সি, রায় আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সরসী! কি মনে করে?"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে তর্ক করিতে। আপনি যখন Congressএর Social Conferenceএর President হইয়াছিলেন, তখন Caste-systemকে যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে কিছু লাগিয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, আপনার মতন এইরূপ বড় বৈজ্ঞানিকের caste-system প্রথাকে ঐরূপ mob-orator ভাবে আক্রমণ করা আপনার উপযুক্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক ভাবে যদি ইহার discussion করিতেন, criticise করিয়া দোষ দেখাইতেন, তাহা হইলে দুঃখ ছিল না। এই caste-system এতদিন রয়েছে,—ইহার কি একটি biological basis নাই? তাহা না হইলে কি caste-system এতদিন ধরিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে? ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় তো একজন ব্রাহ্ম। তাঁহার নিকট caste-system সম্বন্ধে কথা তোলাতে; তিনি তো আপনার মত আক্রমণ করেন নাই! তিনি বরঞ্চ ইহার defenceএ scientific grounds দেখাইলেন।"

"আচ্ছা, সরসী, এখন বস। সে সব কথা পরে হবে। এখন কেমন আছ বল।" ইত্যাদি বলিয়া ডাঃ রায় তখন উপস্থিত কথা চাপা দিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে ডাঃ রায় বৈকালিক ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তখন তাঁহার ছাত্রদল তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিল। ডাঃ রায় আমার সঙ্গে কথা কহিবেন বলিয়া, ছাত্রদিগকে কিছু দূরে বেড়াইবার জন্য উপদেশ দিলেন।

ডাঃ রায়। দেখ সরসী, আমি যে বাড়ীতে বর্ত্তমানে

উপস্থিত হইয়াছি, ঐটি একটি বারুজীবী ভদ্রলোকের বাড়ী। ওখানে জাতিভেদের কথা তোলাটা দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা হইত না। বাগেরহাটে কলেজ স্থাপন বিষয়ে এই বারুজীবী ভদ্রলোকটিই বোধ হয় সকলের অপেক্ষা বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। বারুজীবী শ্রেণীও তোমাদের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ অপেক্ষা বোধ হয় বেশী সাহায্য করিতেছে। এই পাড়াটি দেখিতেছ, এইটি বারুজীবীদের পাড়া। ইহাদের ঘরগুলি কি পরিষ্কার দেখ। সকলেরই সুপারি, নারিকেল প্রভৃতির বাগান রহিয়াছে। এই সবের দ্বারা ইহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে,—চাকরীর কাঙ্গাল হইয়া বেড়ায় না। আবার ইহাদের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখ। অনেকেই বাগেরহাটে কলেজের কোন না কোন ছাত্রের থাকিবার স্থান, কিম্বা খাদ্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া, তাহাদের শিক্ষালাভের সুবিধা করিয়া দিতেছে। তুমি কি ইহাদের ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের চেয়ে ছোট বলিয়া মনে কর? যাক সে কথা। জাতিভেদ সম্বন্ধে তোমার বৈজ্ঞানিক কি যুক্তি শুনি?

আমি। ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ের সঙ্গে জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা হয়। তাহাতে তিনি কতকগুলি জীবতত্ত্বের পরীক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। যেমন, অতি নিকট আত্মীয়-দের মধ্যে বিবাহ হইয়া বংশ-বৃদ্ধি হইলে, Science of Embryologyর কতকগুলি experimentsএর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহাতে embryoর এক অংশের (chiomosome) বিকাশ (development) ভালরূপ হয় না। অপর পক্ষে, যদি বিবাহের বর-কন্যা নির্ব্বাচনের কোনরূপ গণ্ডী (limitation) না থাকে, তাহা হইলে সে জাতি কোন বিষয়ে বিশেষত্ব লাভ করিয়া, শীঘ্রই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। যদি জীব-বিজ্ঞানের উপরিউক্ত দুইটি নিয়ম সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে জাতি-ভেদে উদ্বাহ-প্রথা সম্বন্ধে একটা গণ্ডী (limitation) স্বতঃই আসিয়া পড়ে।

হিন্দু জাতির মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার, এই জাতির evolutionকে সাহায্য করিবার পক্ষে কতকটা শক্তি ছিল এবং এখনও আছে, এই কথাটি মোটেই ধরা হয় না কেন? অবশ্য বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার মধ্যে অনেক জিনিস রহিয়াছে, যাহা জাতির মধ্যে জড়ত্ব আনিয়া দিতেছে। কিন্তু একটা biological analogy হইতে আমার বোধ হয় যে, এইটি সম্ভবতঃ জাতিভেদ প্রথার দরুণ হইতেছে না,—environmentএর দরুণ হইতেছে। এই দেখুন, শামুক, গুগলী প্রভৃতি জীব নিজেদের খোলার কঠিন আবরণে এবং ঐ আবরণের ভারে অনেকটা জড়ত্ব লাভ করিয়াছে। এই শামুক, গুগলী প্রভৃতি জীব মৎস্য শ্রেণীর জীব সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল। জীব-তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, প্রথমে যখন শামুক, গুগলী প্রভৃতি জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন তাহাদের এই কঠিন বহিরাবরণের বোঝা ছিল না। সম্ভবতঃ তখন তাহারা এই বহিরাবরণের বোঝা হইতে মুক্ত থাকিবার দরুণ, তাহাদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে চলাচল করিবার সামর্থ্য ছিল। তাহার পর যখন পৃথিবীতে মৎস্য শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব হইল, তখন এই পুরাতন জাতির, আপনাদের পৈতৃক প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, বহিরাবরণের বোঝা সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। তাহা না হইলে মৎস্য শ্রেণীস্থ জীবগণের কৃপায় এই শ্রেণীস্থ জীবগণকে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইতে হইত। জাতি-ভেদের মধ্যে যে জড়তা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেকটা এইরূপ বলিয়া বোধ হয়। মুসলমানের আমলে এই জাতির স্বাধীনতা লোপ হইলে, জাতিভেদ প্রথাকে বিশেষ রূপে কঠিন করিয়া, জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও লক্ষ্যের বিষয় যে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষের মধ্যে তিনজন world-renowned genius—সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার জগদীশচন্দ্র বসু এবং আপনি তিনজনই ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বংশ হইতে উদ্ভূত। University পরীক্ষার result দেখুন। যাহারা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে, তাহাদের মধ্যে উচ্চ জাতির বংশধরের সংখ্যা অধিক কি না? এই সকল ঘটনার মধ্যে কি জাতি-ভেদের কোনই প্রভাব নাই? নিম্ন জাতির ছেলেদের পাশের percentage কি উচ্চ জাতির ছেলেদের পাশের percentage অপেক্ষা কম নহে?

ডাঃ রায়। তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর ছেলে এবং তোমাদের উচ্চ শ্রেণীর ছেলেদের মধ্যে কোনও intrinsic difference আছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। অতি নিম্ন শ্রেণীস্থ গরীব নিরক্ষরের বাড়ীতে এমন ছেলে আছে, তাহাকে যদি ভদ্র পোষাক পরাইয়া সভায় লইয়া

আলা যায়, তাহা হইলে তুমি চেহারায়, বুদ্ধিতে, গুণে তাহার সহিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ছেলেদের কোনই প্রভেদ করিতে পারিবে না। তোমাদের উচ্চ শ্রেণীগণের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে বলিয়া, তাহারা ভাল করিয়া পাশ করে,—তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক পাশ করে। তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীগণের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা প্রচলিত হইলে, তাহাদের মধ্যেও এরূপ হইবে।

আমি। সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে ঐ কথা বলাতে, তিনি ঠিক এই উত্তরই দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তিনি আর একটা যুক্তি দিয়াছিলেন—সেটিও ভাবিবার বিষয়। তিনি বলেন যে, বেদের সময়ে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ছিল, তাহা বৌদ্ধযুগে সংমিশ্রিত হইয়া সব খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছিল। তাহার পর আবার নূতন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি জাতি-বিভাগ হইয়াছে। বেদের সময় হইতে যদি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি অন্য জাতির সহিত অসংমিশ্রিত থাকিয়া, তাহাদের জাতিগত পার্থক্য এ কাল পর্য্যন্ত বজায় রাখিত, তাহা হইলে বিভিন্ন জাতির biological characteristics প্রভৃতির উপর তর্ক চলিতে পারিত। কিন্তু সংমিশ্রণের পর আর এরূপ তর্ক চলে না। অবশ্য, এ সব বিষয়ে different sides আছে; তাহা ascertain করা নিতান্ত সহজ নহে—এ কথা আমি মানি।

ডাঃ রায়। যাহা হউক, এই তর্কের সার কথাটি তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। তোমার বংশ বেশ intellectual বংশ। ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের বংশও বেশ intellectual বংশ। তোমার বংশের পুত্র-কন্যার কাহারও সঙ্গে যদি ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের বংশের পুত্র-কন্যা কাহারও বিবাহ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বংশধরের কোন অংশে গুণহীন হইবার সম্ভাবনা আছে কি? কিম্বা ধর, যদি বাঙ্গালী এবং পাঞ্জাবীদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা চলিত হয়, তাহা হইলে কি future generationগুলি degenerated হইবে?

আমি। এ কথার জবাব দেওয়া সহজ নহে। এক পক্ষে দেখুন, Herbert Spencer-এর মতে ভারতবর্ষীয় এবং European জাতির সংমিশ্রণে যে Eurasian জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা এই উভয় জাতির অপেক্ষা degenerate product। অপর পক্ষে, Hugenots অর্থাৎ যে ফরাসীরা Catholic ধর্ম্ম না মানিবার জন্য Englandএ বিতাড়িত হইয়াছিল, সেই ফরাসী এবং ইংরেজের সংমিশ্রণে যে বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল। পূজনীয় বাবু মতিলাল ঘোষ কৌলিন্য প্রথা সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়াছিলেন,—সে কথাটি আমার মনে লাগে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, কৌলিন্য প্রথার উপকারিতা এই যে, ইহার দ্বারা বাহিরের fresh blood আসিয়াছে। কৌলিন্য প্রথার নিয়ম এই যে, কতক সংখ্যা পর্য্যায়ের পর কৌলিন্য প্রথা আপনাপনি ভাঙ্গিয়া যাইবে; তখন আবার বাহির হইতে নূতন বিশিষ্ট লোক লইয়া কৌলিন্য প্রথা আবার আরম্ভ করিতে হইবে। মধ্যে-মধ্যে জাতি কিম্বা শ্রেণীতে এইরূপ বাহির হইতে fresh blood না আনিলে, জাতি কিম্বা শ্রেণী degenerate করে। এই কথাটি জীব-বিজ্ঞান মতে সম্পূর্ণ সত্য। ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীল আমাকে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতি race-extinctএর সহায়তায় জাতিভেদ প্রথা এদেশে প্রচলিত করিয়াছিল; তাহার মধ্যে অনেকটা সারবত্তা ছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ প্রথা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও গবেষণা দ্বারা নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত।

ডাঃ রায়। তোমার দেশ-ভক্তি আছে, এ কথা জানি। দেশ-ভক্তির দিক দিয়াই এই বিষয়টির বিচার করা যাউক। বাঙ্গালা দেশে যখন মুসলমানদের আক্রমণ হইয়াছিল, তখন অতি অল্পসংখ্যক মুসলমানই প্রথমে এ দেশে আসিয়াছিল। কিন্তু দেখ, মুসলমানদের এই দেশে আসিবার পর, হিন্দুদের মধ্যে অনেক জাত দলে-দলে মুসলমান হইতে আরম্ভ করিল। পশ্চিমে যেখানে মুসলমান আক্রমণের প্রভাব এই বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক বেশী ছিল, সেখানকার হিন্দুরাও এই বাঙ্গালা দেশের মতন দলে-দলে মুসলমান হইয়াছিল। ইহার কারণ যে শুধু মুসলমানদের অত্যাচার কিম্বা তাহাদের প্রভুত্ব, এরূপ কথা বলা যায় না। ইহার কারণ এই যে, জাতিভেদ প্রথার দরুণ অনেকের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, তাহারা এই জাত ছাড়িতে পারিলে বাঁচে। যেমন মুসলমানরা আসিয়া পড়িল, অনেক ছোট জাত বড় জাতদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অমনি মুসলমানদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। যে জাতিভেদ এই দেশের মধ্যে এইরূপ একটি disruptive force তৈয়ারি

করিতেছে, তাহাকে কি তুমি ভাল বলিতে পার? নীচের খিলান ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—তাহার উপরে কি কোনও বৈজ্ঞানিক কারিকুরি করিবার অবসর আছে? দেশের বড়-বড় patriotদের কথা একবার শোন। রবি ঠাকুরের প্রধান কথা—জাতিভেদই এই জাতিটাকে উৎসন্ন দিতেছে। D. L. Roy দেশ রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিতে প্রস্তুত। যদি কাহারও পুরুষোচিত patriotism থাকে, তাহা হইলে সে কবি হেমচন্দ্র। তিনি গাহিয়াছেন, "একবার তোরা জাতিভেদ ভুলে মা বলিয়া ডাক।"

ডাঃ রায় অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, স্নেহমিশ্রিত বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন,—

"সরসী, তোমরা কায়স্থ; কিন্তু বোধ হয় তোমরা আমাদের মত শ্রেষ্ঠ কায়স্থ নহ, ছোট কায়স্থ; সেই জন্যই বোধ হয় তোমার জাতের উপর এতটা মায়া!"

তাহার পর পিতা যেমন তাঁহার ছোট পুত্রকে আদর করেন, সেইরূপ কিছু আধ-আধ স্বরে বলিলেন, 'সরসী, তুমি যখন collegeএ পড়িতে, তখন বড় রোগা ছিলে। এখন ত বেশ মোটা হইয়াছ,—দেখি, গায়ে কেমন জোর হইয়াছে।" আমি অমনি বুক ফুলাইয়া ডাঃ রায়ের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। ডাঃ রায় তাঁহার শীর্ণ হাড়-বের-করা হাতের ঘুষির জোর দিয়া আমার গায়ের জোর পরীক্ষা করিলেন। এই ঘুষির মধ্যেও জাতিভেদ সম্বন্ধে উপদেশ ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় লিখিত আছে যে, যখন অর্জ্জুন যুদ্ধ করা না করা সম্বন্ধে শ্রীভগবানের সঙ্গে তর্ক করেন, তখন শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেন, হে অর্জ্জুন, তুমি বেশ লম্বাচওড়া কথা বলিয়া তর্ক আরম্ভ করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার তর্কের কথাগুলি যদি নিজের মনের মধ্যে তলাইয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিবে, তাহা তোমার নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য এবং ক্লৈব্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

যে সব ছাত্র ডাঃ রায়কে অন্তরঙ্গ ভাবে জানে, তাহারা ডাঃ রায়ের এই ঘুষির মর্ম্ম বুঝিতে পারে।

ঘুষিটা কিছু জোরে হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য ডাঃ রায় বলিলেন,—"আহা সরসী, তোমার লাগে নাই ত। কিন্তু কি করিব। যখন এই জাতিভেদের কথা ভাবি, তখন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত রাগে জ্বলে উঠে যে, ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই জাতির উন্নতির পথ কি করে বন্ধ করে গিয়েছে।"

এই প্রবন্ধের মধ্যে কবি-সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতার দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এই প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ হইয়া পড়ায়, এই আলোচনাটি অবসর মত অপর একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

* * * * *

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥

গীতা, ২য় অধ্যায়।

ভাব ও বুদ্ধি

[শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল]

বুদ্ধি মীমাংসা করে। চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-যোগে আমাদিগের যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করিতে হয়। কিন্তু ভাব জন্মিতে মীমাংসা করা আবশ্যক হয় না। বরং অনেক সময় মীমাংসার প্রতিকূলেও ভাব জন্মিতে থাকে।

ভাব ও বুদ্ধি, উভয়েরই প্রকাশ-পথ মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের ক্রিয়া উভয়ের সম্বন্ধেই আবশ্যক হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক পদার্থ কি? অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে, উহা জীব-বস্তুর (১) একটী বিশেষ বিবর্ত্তন। মস্তিষ্ক মধ্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিশেষ-বিশেষ কেন্দ্র আছে। এক কেন্দ্রের সহিত অন্য কেন্দ্র তন্তু দ্বারা সংযুক্ত।

জীব-বস্তুর এক বিশেষ বিবর্ত্তন ত্বগিন্দ্রিয়। উহা জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের আদি। উহা সকল জীবেরই আছে। ঐ ইন্দ্রিয়ের বিকারেই অন্য চারিটী জ্ঞানেন্দ্রিয় জাত হইয়াছে।

মস্তিষ্ক মধ্যে যে সকল স্নায়ু, পেশী, গণ্ড, তন্তু, এবং ডিম্বাকার ও সূক্ষ্মাগ্র কোষ (২) আছে, তাহাও জীব-বস্তুরই বিশেষ-বিশেষ বিকার অথবা বিবর্ত্তনের ফল। এই সকল বিশিষ্ট প্রকার (৩) জীব-জন্তু বিশেষ-বিশেষ কর্ম্ম করে; কিন্তু একে অন্যের কর্ম্ম করে না। এক প্রকার বিবর্ত্তনে দৃষ্টি কেন্দ্র; তাহা দেখার কর্ম্ম করে। অন্য প্রকার বিবর্ত্তনে শ্রবণ কেন্দ্র; তাহা শুনার কর্ম্ম করে। উহার এক প্রকার বৈশিষ্ট্য হইতে মস্তিষ্ক পদার্থের উদ্ধতন স্তরের ধূসরবর্ণ কোষগুলি জাত হইয়াছে। এই কোষগুলি, বিশেষতঃ এই স্থানের সূক্ষ্মাগ্র কোষগুলি, নানাবিধ সদ্বৃত্তির আধার এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-লব্ধ সংস্কার হইতে বুদ্ধি, বিচার ও মীমাংসা উৎপন্ন হয়। সুতরাং যাহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, তাহা বুদ্ধিরও বিষয় নহে, সংস্কারেরও বিষয় নহে। ভাব অপরোক্ষ ভাবে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে জাত হয় না।

একটী গোলাপ পুষ্প চক্ষু দ্বারা দেখিলাম; কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিব কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা? একটী স্বর শুনিলাম; কিন্তু তাহার মিষ্টত্ব অনুভব করিব কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা? দেখিবার ও শুনিবার ইন্দ্রিয় আছে; কিন্তু সৌন্দর্য্য অথবা স্বরের মিষ্টতা অনুভব করিবার ইন্দ্রিয় কোথায়? উহারা উভয়েই ভাব। উহা হইতে আরও ভাব জাত হইতে পারে। সৌন্দর্য্য হইতে কামভাবও জাত হইতে পারে, ধর্ম্মভাবও জাত হইতে পারে। এক ভাব হইতে অন্য ভাব জাত হইলে, প্রথমটীকে মৌলিক এবং অপরটীকে 'জন্য' ভাব বলা যায়।

সৌন্দর্য্য বোধের অথবা সুরের মিষ্টত্ব বোধের কোন বিশেষ কেন্দ্র মস্তিষ্কে নাই। জীব-জন্তুর বিশেষ-বিশেষ বিবর্ত্তনে মস্তিষ্কের নানা অংশ গঠিত হইয়াছে। সে সকল স্থলে জীব-বস্তু বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি মস্তিষ্ক পদার্থে এরূপ স্থান অনেক আছে, যেখানে কোষ-গুচ্ছ বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয় নাই। সে সকল স্থান কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করেও না। তাহারা বোধ হয় নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে। যেমন অতি নিম্নশ্রেণীর জীবদেহে ত্বকের অবিশিষ্ট কোষ, (৪) সকল ইন্দ্রিয়েরই কাজ করে। তেমনই বোধ হয় আমাদিগের মস্তিষ্কের কতিপয় কোষ বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয় নাই; তাই তাহারা একাধিক কর্ম্ম করিয়া থাকে। ত্বগিন্দ্রিয়ের কোষ সকল মানবেও একাধিক কর্ম্ম করে। আমরা সচরাচর ইহাকে স্পর্শেন্দ্রিয় বলি। কিন্তু ত্বক্ শীত, গ্রীষ্ম অনুভব করে,—গুরুত্ব, লঘুত্বও অনুভব করে। এই সকল অনুভব করিবার পৃথক-পৃথক ইন্দ্রিয় মানবেরও জাত হয় নাই।

কোন-কোন মানব এক স্থানে থাকিয়া বহু দূরবর্ত্তী অন্য স্থানের ঘটনাও দেখিতে পারে। যোগবলে নহে; যোগের সাহায্য ব্যতীতও পারে।

এই সকল এবং আরও নানাবিধ কারণে পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, মস্তিষ্ক মধ্যে স্থানে-স্থানে, বিশেষতঃ

(১) Protoplasm.

(২) Pyramidal cells.

(৩) Differentiated.

(৪) Undifferentiated.

ইহার সর্ব্বোচ্চ ভাগে এরূপ বহু কোষ আছে, যাহা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয় নাই; অথবা হইয়া থাকিলেও, সে সকল স্থানে জীব-বস্তু কিরূপ বিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে বুঝিবার উপায় নাই। এ সকল অবিশিষ্ট জীব-বস্তু কি প্রকার, ইহার ক্রিয়াই বা কি, ভবিষ্যতে ইহা কিরূপ বিবর্ত্তন লাভ করিবে, তাহা এক্ষণে কিছুই বলা যায় না। এই বস্তু হইতেই জীবের স্নায়ুকেন্দ্র ও স্নায়ু সকল একাল পর্য্যন্ত জাত হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইহাই আরও অভিনব বিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইবে। (৫)

সম্ভবতঃ এই সকল অবিশিষ্ট কোষ চক্ষুর সাহায্য ব্যতীতও দেখে, কর্ণের সাহায্য ব্যতীতও শুনে।

সৌন্দর্য্য বোধের, সুস্বর বোধের ইন্দ্রিয় নাই। আমার মনে হয়, উহা এই সকল অবিশিষ্ট কোষের কর্ম্ম। এতদুভয় বোধ জীব বিবর্ত্তনের নিমিত্ত আবশ্যক হয় নাই। উহা বিবর্ত্তনের ফল নহে, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ আছে। অথচ এতদুভয় বোধই মানবকে উন্নত ও পবিত্র করিতেছে। উন্নত ও পবিত্র ভাব, প্রধানতঃ মস্তিষ্কের সর্ব্বোচ্চ স্তরের ধূসরবর্ণ কোষগুলির কর্ম্ম। সুতরাং ঐ দুই ভাবও সম্ভবতঃ ঐ স্তরের অবিশিষ্ট কোষের ফল।

ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি বিচার-বুদ্ধির মূল। কিন্তু ভাবের মূল কোথায়? মস্তিষ্ক পদার্থে অনুসন্ধান করিলে বিশেষ ফল লাভের আশা নাই। ভাব যেরূপেই জাত হউক, ভাবের উৎপত্তি ও ক্রিয়া দুর্ব্বোধ্য। যে দৃঢ় সংস্কার ভাব-প্রাবল্যের পশ্চাতে শক্তি যোগাইতেছে, এবং যাহা হইতে ঐ শক্তি কর্ম্মে পরিণত হইতেছে, তাহা মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলিতে খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। যে ভাব বিচার ও মীমাংসার অপেক্ষা করে না, আপন বলে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে, সেই সর্ব্ব-বিজয়ী ভাব দেহ-কোষের মধ্যে নাই। উহা আত্মার শক্তি। এই নিমিত্তই উহা মানব-সমাজের সকল ব্যক্তির আত্মাতেই ঝঙ্কৃত হইবে; কারণ, সকল আত্মাই এক। তখন সকল আত্মাই এক সুরে বাজিয়া উঠিবে। আমরা পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়াছি।

কবি ও ভাবুক বিচার-বিতর্ক না করিয়াই যে সত্য উপলব্ধি করেন, তাহা প্রমাণ করিবার উপায় না থাকিলেও, অনেক সময়ে তাহা জন-সমাজকে আপনা হইতে মাতাইয়া তুলে। বহুজন তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া একতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়। এই হেতু সে শক্তি কাল ক্রমে অদমনীয় হইয়া উঠে; কখনও বা অবিলম্বেই সফলতা প্রাপ্ত হয়। যখন এ শক্তি জগতের কল্যাণজনক হয়, তখন ইহার অনুষ্ঠান স্থায়িত্ব লাভ করে; নচেৎ অস্থায়ী হয়। ইহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং ইহা জয়যুক্ত হইবেই।

যাহা অসত্য, তাহা প্রায়শঃ একটা মোহ উৎপাদন করে। সেই মোহ মানবকে অধর্ম্ম পথে লইয়া যায় এবং জগতের অকল্যাণ সাধন করে। ভাবুক প্রথমাবস্থায় এই মোহ হইতে দূরে থাকিবেন। এই অধর্ম্মের সহিত সহযোগ করা ঐ অবস্থায় সঙ্গত হইবে না। কিন্তু পরে যখন তাঁহার ভাব আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবে, তখন উহা আপনা হইতেই অসত্যকে জয় করিবে। যাহাদিগের চরণে কোটি-কোটি নর-নারী মস্তক অবনত করিতেছে, তাঁহারা এই ভাবেই কর্ম্ম করিয়াছেন। যিনি বলিয়াছিলেন "জেণ্টাইল্স্-দিগের পথে যাইও না, স্যামারিটান্দিগের নগরে প্রবেশ করিও না; কিন্তু ইস্রেল-বংশের পথভ্রষ্ট নিরীহদিগের নিকটে যাও," তিনি যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আজিও সেই মন্ত্রই ধ্বনিত হইতেছে। (৬) অসত্যের, অধর্ম্মের সংস্রব ত্যাগ করা প্রথমাবস্থায় অত্যাবশ্যক। একটী মানব হউক অথবা মানব-সমাজ হউক, এ প্রসঙ্গে একই কথা। প্রথমাবস্থায় একজন সাধক অথবা একটী মানব-সমাজ মোহের পথ, প্রলোভনের পথ, অবশ্য পরিত্যাগ করিবেন। পরে তাহার অথবা তাঁহাদিগের গন্তব্য পথে কিছু দূর অগ্রসর হওয়া দেখিলে, অসত্য আপনি আসিয়া

(৫) This intermediate tissue is, in short, the probable matrix wherein and from which new nerve fibres and new nerve cells are evolved in animals, of whatsoever kind or degree of organization, during their advance in reflex, in instinctive, or in intellectual acquirements. Some such process must take place, pari passu with the acquisition of new knowledge and powers, of all kinds and howsoever acquired.

The Brain as an Organ of Mind p. 39.

(৬) Go not into the way of the Gentiles, and into any City of the Samaritans enter ye not. But go rather to the lost sheep of the house of Israel.

পদানত হইবে; মোহ ও প্রলোভন আপনা হইতে দূরে পলায়ন করিবে। যাহারা প্রলোভন দেয়, যাহারা মোহ উৎপাদন করে, বুদ্ধি তাহাদিগের মধ্যে অগ্রণী। আমরা বলিয়াছি ভাব পথ প্রদর্শক, বুদ্ধি তাহার অনুগত হইয়া উপায় উদ্ভাবন করিবে। ইহার অধিক তাহার কর্ম্ম নহে। আমি দেখিতে চাই,—যদি কেহ আমাকে দেখাইতে পারেন তবে আমি দেখিতে চাই,—জগতের ইতিহাসে কখন কোথায় বিরাট যুগ-প্রবর্ত্তক কর্ম্ম কেবল বুদ্ধির দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে। প্রারব্ধ কোন দিনই সমাজের ইতিহাসে বুদ্ধি-প্রণোদিত হয় না। ইহা ভাবের কর্ম্ম। জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত ভাবের কর্ম্ম। সুতরাং যিনি ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে অতি বিস্তৃত রূপে মঙ্গলময় অভিনব যুগ স্থায়ী ভাবে প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তিনি দ্বিধা-সর্ব্বস্ব বুদ্ধিকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন; প্রারম্ভ সময়ে বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞের দিকে দৃষ্টিপাতও করিবেন না। তাহাদিগের বাধা অথবা পীড়নের কথা মনে স্থানই দিবেন না। শুধু তিনি কেন, যাহারা তাঁহার ভাবে প্রণোদিত, তাঁহাদিগের পন্থাও ইহাই। ক্ষণেকের নিমিত্ত ভাবের সফলতা না দেখিলেও, আপাততঃ নিষ্ফলতা দেখিলেও, তাঁহারা দমিত হইবেন না। কবি সত্যই বলিয়াছেন

"প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্ননিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানা
প্রারব্ধমুত্তমগুণা স্তমিবোদ্বহন্তি॥"

বাধা অথবা পীড়ন উত্তম কর্ম্মীর হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক করে। ও সকল যতই তীব্র হয়, ভাবও ততই তীব্র হয়। এইরূপে অন্য প্রতিকূল ভাব সম্পূর্ণ ডুবিয়া যায় এবং ঈপ্সিত কর্ম্মের ভাব একলক্ষ্য ভাবে পরিণত হয়। তখন সে ভাব অদম্য হইয়া উঠে। সুতরাং বাধা ঈদৃশ কর্ম্মের পোষক।

বুদ্ধি এ স্থলেও পরাজিত হইয়া যায়। যাহা ভূয়োদর্শনের বহির্ভূত, অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের আয়ত্ত নহে, যাহা কেবল একাগ্র ভাবের উত্তেজনা, যাহা মানব-সমাজকে অভিনব পথে আপন বেগে লইয়া যায়, তাহা বুদ্ধির বিষয় নহে; তাহা আত্মার প্রেরণা। সুতরাং বুদ্ধি তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। বুদ্ধি তাহার অনুগত হইয়া সফলতার পন্থা নির্ণয় করিয়া দেয়, ভালই। না দিলেও আসে যায় না। বুদ্ধি ঈদৃশ স্থলে সম্ভব-অসম্ভবের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না; কিন্তু ভাব নিশ্চয় জানে যে, কর্ম্ম সফল হইবেই। ইহাই তাহার শক্তি। বুদ্ধির সহিত সহযোগ করিলে ভাব আপন পথে যাইতে পারে না। দুই শক্তির মাঝামাঝি কোন এক পথে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। বুদ্ধির সহযোগে ভাব এইরূপে পথভ্রষ্ট হইয়া যায়। এই নিমিত্তই বলিয়াছি, প্রথমাবস্থায় একলক্ষ্য ভাব বুদ্ধি ও বিজ্ঞতাকে দূরে রাখিবে। ভাব স্বপথে যাইতে-যাইতে বল সঞ্চয় করিবেই; অর্থাৎ বিস্তৃতি লাভ করিবেই। তখন বিজ্ঞতা এক কোণে নীরবে বসিয়া থাকিবে; অথবা নির্লজ্জের ন্যায় হাত পাতিয়া কর্ম্ম-ফলের অংশ গ্রহণ করিতে আসিবে। বুদ্ধিমানের স্বভাব ভাবুকের জানা থাকা আবশ্যক।

ভাব ও বুদ্ধির প্রভেদ এইখানে। একে আত্মার শক্তি, অন্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংস্কারের মীমাংসা। একের নিশ্চয়তা হইতে অদম্য বেগ জাত হয়; অপরের দ্বিধা-সর্ব্বস্ব ইতস্ততঃ ভাব প্রায়শঃ নিষ্ফলতা আনয়ন করে। একে আপন বেগে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়, অপরে বিরোধী কারণের সহযোগে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। তন্ময় ভাব পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঊর্দ্ধে স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু বুদ্ধি তাহার সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। একাগ্র ভাব অবসাদ জানে না; নৈরাশ্য কি তাহা বুঝে না; পরনির্দ্দিষ্ট বিধানের অনুগত হইতে পারে না। সে আপন পথে কর্ম্ম করিয়া যায়। যে পথে মানব প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে, সেই পথে একলক্ষ্য তন্ময় সাধক বুদ্ধির বাধা জয় করেন। সে পথ মহাত্মা গ্যাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে—"The truest piety seems to me to reside in taking action and not in submissive acquiescence to the routine of nature. (৭)" ইহা জীব-তত্ত্বেরও প্রধান কথা, সমাজ-তত্ত্বেরও প্রধান কথা।

(৭) Galton, The Herbert Spencer Lecture, 1907, page 9.

হার-জিত

[শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ]

'Where man's soul had its meeting place
with the soul of the world ?'
—Sadhana

১

সন্ধ্যায় তখন আকাশটা বেশ ছেয়ে আস্‌চে। সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্রের মূর্ত্তিটাও ক্রমশঃ বিকট ভাব ধারণ করতে লাগল;—রোগী যেমন রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় তিল মাত্র স্থির থাক্‌তে না পেরে ছট্‌ফট্‌ করে সেই রকম। তার অবিরাম ভৈরব হুঙ্কার যেন রোগ-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ। অন্ধকারে জলের উপর বেশী দূর দেখা গেল না। পায়ের উপর প্রকাণ্ড ঢেউগুলো এসে আছাড় খেতে লাগল; আর চোখের সাম্‌নে প্রদোষের ঘনিয়ে-আসা অন্ধকার আর সমুদ্রের ঘোর নীলজল মিশে আকাশটা যেন একটা কাল পর্দ্দা দিয়ে ঢেকে ফেল্লে।

২

আমার মনে পড়ে গেল, অনেকদিন আগে নিজের-চোখে-দেখা এক পুত্রহারা মায়ের বক্ষভেদী আকুল ক্রন্দন আর কাতর শোকোচ্ছ্বাস। সে দিনও এমনি একটা কাল সন্ধ্যায় এক অন্ধকার হৃদয় তার এক-মাত্র পুত্রশোকে অধীর হয়ে, ম্লান ঘরের একটি কোণে আছাড় খাচ্ছিল। সে দিনও এমনি একা; এমনি সন্ধ্যা বেলা।

৩

ভাবতে-ভাবতে অনেক দূর একা চলে এসেচি। পেছন ফিরে দেখি, আসে-পাশে লোকালয়ের নামগন্ধও নেই। একটা অসীম অন্ধকার যেন শিকারীর মত আমাকে তার নিবিড় জালে ছেয়ে ফেলেচে। সব কালো;—পায়ের তলায় কাল বালি, সাম্‌নে সেই কাল জল, পেছনে কাল জঁটিল অন্ধকার; উপরে কাল আবরণ, কাণের ভিতর সমুদ্রের কাল হুঙ্কার। মনে হল, জগৎ আজ তার কাল আর অন্ধকারের বাজারে আমাকে বিকোতে এনেচে;—আমি তার বন্দী।

৪

কিন্তু এ কি! শুধু আমার বাহিরটা নিয়ে তারা ছাড়তে চায় না। আমাকে অষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেও তারা সুখী নয়। তারা ষড়যন্ত্র করে আমার অন্তরে প্রবেশ কর্‌তে চায়! তা ত হয় না। বাহির রাজ্যটার উপর আমার হাত নেই বটে, কিন্তু অন্তরের আমি একা প্রভু। সেখানে যে 'আমি'তে ভরা। সেখানে ত কাল আর অন্ধকারের স্থান নেই। সেখানে সব নির্ম্মল, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ। বাহিরের বিপক্ষে সেইটেই যে আমার গড়।

৫

হঠাৎ চোখ-মুখ-কাণে বালি এসে ছুঁচের মত বিঁধ্‌তে লাগল। চম্‌কে থেমে পড়্‌লুম। সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন আরও ভীষণ হয়ে, জোর বাতাসের গোঁগানির সঙ্গে মিলে যেন আমায় খেতে এল। আমার অন্তরটা চূর্ণ না করে তারা ছাড়্‌বে না। কি বীরত্ব! একা পেয়ে শত্রুকে কি এমনি করে নির্য্যাতন কর্‌তে হয়,—ওদের কি একটু বিবেচনা নেই? না, আমি কখন দেবো না। অসহায়? অন্তরের আমি বাহিরের সহায় চাই না! জোর করে তাই মনকে দৃঢ় করলুম!

৬

উঃ, কি ভয়ানক ঝড়। ফির্‌তে-ফির্‌তে হঠাৎ আমার চোখ্ পড়ল আকাশের দিকে। ওরা কে? দৈত্যের মত জ্বলন্ত গোলার ন্যায় তিনটে চোখ্ নিয়ে, আমার দিকে কট্‌মটিয়ে তাকাচ্ছে কেন? উঃ, কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,—জীবনে এত ক্রূর দৃষ্টি ত—। না—না, ও ত জ্বলন্ত চোখ্ নয়; ও যে চিতা! আজ আমার অন্তরকে এরা এই চিতায় দাহ করবে না কি? দেবো না—আমি কখন দেবো না। সে যে আমার —বড় আমার।

৭

ছুটলুম। দু' হাতে আমার অন্তরের ধনকে রক্ষা কর্‌তে-কর্‌তে ছুটলুম। পদে-পদে ঢেউগুলো এসে পা আঁকড়ে

ধর্‌তে লাগল। বালির ছাঁটে হাত-পা কেটে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌ল।—মনে হল, কে যেন তীক্ষ্ণ বাণ মেরে আমার গতিরোধ করবার চেষ্টা করচে। ঝড় এসে নিষ্ঠুর ভাবে আমায় আঘাত করতে লাগল। এরা আজ আমায় বলে পরাজয় কর্‌বে,—জোর করে দখল নেবে?

৮

তবু চোখ্ বুজে ছুটেচি। বেচারা অন্তর আমার শত্রুর তাড়নায়, দৈত্যের উপদ্রবে জড়সড়। তাকে রক্ষা করতে আজ আমার প্রাণ অবধি পণ করে ছুটেচি। সহসা ঠিক আমার পেছনে কে যেন তীব্র শ্লেষপূর্ণ অট্টহাস্য করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে নিবিড় কালিমা ভেদ করে আকাশে একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন আমায় শাসিয়ে গেল। তখন বিদ্যুতের চমকে চোখ মেলে দেখলুম, একটা কদাকার, ভীষণকায় পুরুষ পাহাড়ের মত আমার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে। ক্ষণিকের জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লুম;—তার পর খুব জোরে বলবার চেষ্টা করলুম, 'দেবো না'। মুখ দিয়ে কথা সর্‌ল কি না জানি না।

৯

মূর্চ্ছা ভাঙ্‌বার পর দেখ্‌লুম, বাহিরের দৈত্যগুলো সব কোথায় উধাও হয়ে গেচে। বাহিরটা যেন বড়ই আপনার মনে হল। সমুদ্রের ছোট-ছোট ঢেউগুলো চাঁদের আলোর সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ের মত লুকোচুরি খেল্‌চে। আমি যেখানে শুয়ে, ঠিক সেইখানে শান্ত ঢেউগুলি 'ফস্‌ফরাসে'র ঝিকিমিকি মালা গেঁথে চলে গেল। সমুদ্র তার স্নিগ্ধ বাতাসে আমার অসাড় দেহে আবার প্রাণসঞ্চার করে দিল।—সমুদ্রের সৈকত কি নরম! আমার ক্লান্ত মাথা তার কোলে আশ্রয় পেয়ে, তার সব ভার ভুলে গেল। উঠ্‌বার চেষ্টা করলুম। তখন মধুর স্নিগ্ধ ভৎর্সনায় কে যেন বল্লে—"ও কি! এখন উঠ্‌বেন না,—আর একটু শান্ত হন।"

১০

এ কি, আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি না কি? তাড়াতাড়ি মুখ তুলে দেখি—জ্যোৎস্নালোকিত সৈকতে যার কোমল অঙ্কে মাথা দিয়ে আমি শুয়ে, সে আমার অনেক দিনের আপনার 'অনামিকা'।

১১

'—অমি, তুমি এখানে?'

'কেন, থাক্‌তে কি নেই। ঝড় আস্‌চে দেখে বাবা, মা, 'বীচ্' থেকে বাড়ী ফিরে গেলেন। আপনি একলা এদিকে এসেচেন দেখে, আপনার খোঁজে বেরিয়ে, এইখানে কুড়িয়ে পেয়েচি। বড় লেগেচে, না?'

সে আমার ক্লান্ত দেহের সমস্ত ক্লান্তি হাতের পরশে সরিয়ে দিল। Flagstaffএ তখনও Danger Signal-এর আলো তিনটা জ্বলচে;—কিন্তু তারা এখন আর জ্বলন্ত গোলা নয়। তারাই তখন আমাদের অন্তর-বাহিরের মিলনের সাক্ষী।

নেসাখোরের অভিধান

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ কবিশেখর]

গাঁজা খেলে 'গেঁজেল' যদি,
মদ খেলে হয় 'মাতাল,'
নস্যি নিলে 'নেশেল', তবে
চাখোরেরা 'চাতাল'।
ফুরুক ফুরুক গুড়ুক তবে
টান্‌লে পরে 'গুরখা' হবে,
চুরুট খেলে 'চোয়ঠা' বুঝি,
গুলি খেলে গুলাল।
খাও যদি ভাই বার্ডসাইটা,
হবে তবে বাদশাহী,
চরস খেলে চৌরস হয়
সন্দেহ তায় আর নাহি।

রাখলে দাড়ি যদি দেড়েল,
তাড়ি খেলে তবে তেড়েল,
চণ্ডু খেলে চণ্ডাল হবে,
অর্থাৎ হবে চাঁড়াল।
সিদ্ধি খেলে সিদ্ধপুরুষ
সিঁধেল বলে কেউ-কেউ;
বিঁড়িখোররা 'বিঁড়েল' হয়ে
করবে বুঝি মেউ-মেউ।
কোকেন খেলে কি বলে ভাই
অভিধানে খুঁজে না পাই,
আফিমখোরের পাই না ক নাম
ভেবে আকাশ-পাতাল॥

"সাজাহানে"র গান *

ষষ্ঠ গীত।

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

পিয়ারা।

তুমি, বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ,
(আমি) পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে;
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—
(কি) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে, চলে' যেতে বাধে চরণে,
এ যে, বিরহে বাজে স্মরণে;
কোথা, যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে,
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

আস্থায়ী।

গমা II { পপা -না না | -নর্সা র্সর্সঃ র্সাঃ | নঃ র্সা নর্সর্রর্সা |
তুমি বাঁধি • য়া •• কিদি য়ে • রে খে ছ •

* "সাজাহানে"র গানের স্বরলিপি 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে, এবং অভিনয়কালে গানগুলি যে সুরে ও তালে গীত হইয়া থাকে, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

৩ ০ ১
| ধণর্সা ণা -ধপমা | মঃ পাঃ মপধণধা | -পা গা মা
হৃংদি এ ০আমি পা রি না০০০০ ০ যে তে

২´ ৩
I পপা -না র্সা | (-নর্সর্রর্সা -ণধপমগমা গমা) } | -নর্সর্রর্সা -ণধপমগমা র্সর্সা |
ছাড়া ০ যে ০০০০ ০০০০০০ 'তুমি' ০০০০ ০০০০০০ এযে

০ ১ ২´
| র্সর্সা -র্গা র্গর্গা | র্গঃ -র্রর্গর্মঃ র্মঃ র্মাঃ I র্গঃ র্গা -র্রঃ র্গা |
বিচি ০ ত্র নি ০০০ গূ ঢ় নি গ ০ ড়

৩ ০ ১
| র্রর্সনা র্সর্সা -া | নঃ র্সাঃ র্রর্সা | র্সর্রজ্ঞা র্রা র্সা I
ম ০০ ধুর ০ কি প্রি য় ০ বা০ ঞ্ছি ছি ত

২´ ৩ ৩
I নঃ র্সাঃ নর্সা | (-নর্সর্রর্সা -ণধপমগমা র্সর্সা) } | -নর্সর্রর্সা -নধপমগমা গমা II
কা রা এ০ ০০০০ ০০০ ০০০ এযে ০০০০ ০০০ ০০ ০ 'তুমি'

অন্তরা।

০ ১ ২´
II পপা -না না | -নর্সঃ র্সর্সা র্সাঃ I নঃ র্সাঃ নর্সর্রর্সা |
বাঁধি ০ য়া ০০ কিদি য়ে রে খে ছ০ ০ ০

৩ ০ ১
| ধণর্সা ণধপমা র্সর্সা | র্সঃ র্সাঃ র্গর্গা | -া র্গর্গা -র্রর্গর্মা I
হৃংদি এ০০ ০ এযে চ লে যেতে ০ বাধে ০ ০০

২´ ৩ ০
I র্মঃ র্মাঃ র্মা | -া -া র্মর্মা | র্মঃ র্মাঃ র্গর্মর্গর্পা |
চ র ণে ০ ০ এযে বি র হে০০ ০

১ ২´ ৩
| -র্মা র্গা৩ র্রর্সনা I র্সর্সঃ র্গাঃ র্রর্গর্মা | -র্গা -র্রর্সনর্সা র্সর্সা |
০ বা জে০ ০ স্ব র ণে ০০ ০ ০০০০ এযে

| স´ঃ সা´ঃ গ´গা | -া ম´প´ধা পা´ I ম´ঃ মা´ঃ মা´-পা
চ লে যেতে ০ বা ০০ ধে চ র ণে

| -া -া ম´মা´ | ম´ঃ মা´ঃ মা´ | -গ´ম´প´মা´ গা´ র´স´না I
০ ০ এযে বি র হে ০ ০ ০ ০ ০বা জে০০

| স´স´ঃ গাঃ র´গ´মা´ | -গা´ -া গ´গা | মা´ -া মমা |
স্ব র ণে০ ০ ০ ০ কোথা যা য় মিলি

| -া ম´ঃ মা´ঃ | গ´গা -পা´ গা´ | গা´ র´স´না সা´ |
০ য়া সে মিল ০ নে র হা০ ০ সে

| ননা সা´ রা´ | স´র´জ্ঞা´ রা´ সা´ I নঃ সা´ঃ নসা´ |
চুম্ ব নে র০০ পা শে হা রা য়ে০

| -নস´র´সা´ ণধপমগমা গমা II II
০০০০ ০০-০০০ ‘তুমি’

এ গানখানি, উল্লিখিত থিয়েটারি-সুর ও তাল ছাড়া, কখন কখন বেহাগ—খাম্বাজ এবং মধ্যমান সুরে তালেও গীত হইতে শোনা যায়।—লেখিকা।

শেষ সাধ

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি টি]

“মা!”

“কি মা?”

“আজ ঠাকুরপোর আসবার দিন না?”

“না মা, আজ তো নয়। সে আজ শুক্রবারের পরের শুক্রবার।”

“আমি ভেবে রেখেছিলাম যে, এই শুক্রবারই বুঝি ইংরিজি গুড্‌ফ্রাইডে। কি আশ্চর্য্যি দেখুন মা—আমরা যতই কেন ভেবে মরি না, যা হবার তা ঠিক সময়ে হবেই। এই দেখুন, মাথা খুঁড়ে মরলেও আজ কিছুতেই গুড্‌ফ্রাইডে হবে না,—ঠাকুরপোও আসবেন না।”

বলিয়া বধূ হেমলতা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ভবসুন্দরীর আর মালা-জপ করা হইল না। মালাগাছটি ভক্তি-ভরে মাথায় স্পর্শ করাইয়া, পার্শ্বস্থিত ঝুলিতে রাখিয়া, ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেই, বর্ষীয়সী বিধবার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আজ পাঁচ বৎসরের উপর হইতে চলিল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু সেই হইতেই পুত্র একপ্রকার উধাও হইয়া আছে। স্বামী যে ক'দিন বাঁচিয়া ছিলেন, সে কটা দিন পুত্র তবু ভয়ে হউক, ভক্তিতে হউক, মাঝে-মাঝে এক-আধবার বাড়ী আসিত। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে পুত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া, বাড়ীর ছায়াও মাড়ায় নাই। সে বাড়ী আসিয়াছিল সেই তাঁহার শ্রাদ্ধের সময়—ঠিক দুই বৎসর হইবে। তাঁহার পুত্র হইয়া সে যে এমন সর্ব্বগুণে গুণময়ী স্ত্রীকে শুধু কালো রংয়ের অপরাধে পরিত্যাগ করিবে, তাহা ভবসুন্দরী কখন ভাবেন নাই। বধূমাতার ভাঙ্গা বুক হইতে যখন দু'একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়ে, তখন শুধু তাহার দুঃখ ভাবিয়া নহে, পুত্রের অকল্যাণের ভয়ে তিনি শিহরিয়া উঠেন। অমন সতী-সাধ্বীকে বিনা দোষে অত মনঃকষ্ট দিলে, ভগবান্ যে সহিবেন না!

সেইখানেই বসিয়া-বসিয়া ভবসুন্দরী এই সব পুরাতন কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিলেন, আর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন,—এমন সময়ে হেমলতা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মা, রান্না তো হয়ে গিয়েছে; আপনি—" বলিয়া, শাশুড়ীর অশ্রুপ্লাবিত মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

নিজের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের কথা অপরে মনে করাইয়া দিলে, সে যেমন 'ওঃ, তাই ত' বলিয়া সেই কাজে তাড়াতাড়ি লাগিয়া যায়, তেমনি শাশুড়ীর চক্ষে বিগলিত অশ্রু দেখিয়া, তাহার আপন হৃদয়ের গুপ্ত কক্ষে সঞ্চিত অশ্রু-ভাণ্ডারের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সেথান হইতে ঝরিয়া কয়ফোঁটা চোখেও আসিয়া পড়িল। চকিতে সে কয়ফোঁটা জল অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মুছিয়া ফেলিয়া, শাশুড়ীর কোলের কাছে বসিয়া পড়িয়া হেমলতা কহিল—"মা, চলুন না; ভাত শুকিয়ে যাবে। কাল অমন একাদশী গেছে!"

"আঃ হতভাগী, শুধু এই পোড়াকপালীর সেবা করতেই জন্মেছিলি" বলিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া, ভবসুন্দরী বধূর কাতর মুখের পানে চাহিলেন।

"আপনি ছিলেন, তাই তো বেঁচে আছি মা! নইলে কি নিয়ে থাক্‌তাম?" বলিয়া হেমলতা দুঃখ ও লজ্জায় শাশুড়ীর কোলে মুখ লুকাইল।

ভবসুন্দরী আহত অতিপ্রিয় পোষা পাখীটির মত বধূকে আরও কোলের কাছে টানিয়া, অন্য দিকে তাহার মন ফিরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "কল্‌কাত্তা থেকে কতদিন খবর আসে নি মা?"

"সেই দু-মাস আগে আপনি যে চিঠি পেয়েছিলেন। তার পর তো আর চিঠি আসে নি।"

"সেই যে তুই একখানা লিখিছিলি, তার কোন জবাব—"

"আমায় তো কখনো লেখে না।"

বলিয়া হেমলতা হঠাৎ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া, ভবসুন্দরীর উরু-বসন অশ্রুসিক্ত করিয়া ফেলিল।

অতর্কিতে আহত স্থান মাড়াইয়া ফেলিয়া, ভবসুন্দরীর সমস্ত অন্তরাত্মা 'আহা, আহা' করিয়া উঠিল। এই কান্নার ভিতর দিয়া যে কত দুঃখ ও লজ্জা গলিয়া পড়িতেছে, তাহা বুঝিয়া, তিনি সজল চক্ষে, পরম স্নেহে হেমলতার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে, মনে-মনে বলিলেন—"কোন্ পাপে তোর এ শাস্তি হ'ল মা?"

(২)

সন্ধ্যার পর সার্কুলার রোডের একটী সুসজ্জিত ভবনে, এক পঞ্চবিংশ বর্ষীয় যুবক এক ষোড়শী ও একটি দশমবর্ষীয় বালকের অধ্যাপনায় রত ছিল। ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীটিই যেন শিক্ষকের নিকট হইতে অধিকতর সাহায্য ও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল।

ছাত্রটিকে বারবার মন দিয়া পড়িতে বলিয়াও শিক্ষকটি অনেকবার নিজেই অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিলেন। মাঝে-মাঝে অধ্যয়নশীলা ছাত্রীটির মুখের পানেও চাহিতেছিলেন। এই চাহিয়া থাকাটা বোধ হয় কিছু অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল; নহিলে বয়স্কা ছাত্রীটি কিছু মনে করিতে পারিত।

অধ্যয়ন অর্দ্ধেক আন্দাজ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে একটি যুবতী একখানি বই হাতে করিয়া আসিয়া বলিল—"মাষ্টার মশায়, এই শ্লোকটার মানেটা একটু বলে দিন না।"

যুবক তাড়াতাড়ি যুবতীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "কি শ্লোক দেখি। সংস্কৃত বুঝি?"

"হ্যাঁ, দেখুন না! গল্পের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক কেন বাপু!" বলিয়া যুবতী বইখানি যুবকের হাতে দিল।

কবিতাটিতে কোন নায়িকা নায়ককে পরকীয়াসক্তির জন্য সাধুভাষায় অনুযোগ করিতেছেন। এই সাধুভাষার অনুযোগটি যুবতীর সমক্ষে সরল বাংলা ভাষায় বর্ণনা করিতে গিয়া, যুবক আপনার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত করিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিয়া অর্থটি না শুনিয়া গেলে আরও অশোভন হইবে, সে জন্য নতমুখে তাহা শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া, যুবতী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ঘরের বাহিরে আসিয়া মনে-মনে ভাবিল—'উনি এবার অনেক দিন আসেন নাই। এবার আসিলেই এই কবিতাটি পড়িতে দিয়া, দু'কথা বেশ শুনাইয়া দিতে হইবে।'

তখনকার সেই রহস্যের সুযোগ ও সুখময় দৃশ্যটি কল্পনা করিয়া যুবতী হাসিয়া ফেলিল। আবেগে ও অনুরাগে তাহার মুখখানি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

যুবতী চলিয়া গেলে, যুবক শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, পুনরায় কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

অন্যদিনের চেয়ে কিছু আগে পড়ানো শেষ করিয়া, যুবক বাহির হইয়া পড়িল। হ্যারিসন রোড্ হইয়া কলেজ ষ্ট্রীটে পড়িয়া, ধীরে-ধীরে সে কলেজ স্কোয়ারের ভিতর প্রবেশ করিল; এবং একটা আচ্ছাদনযুক্ত আসনের উপর বসিয়া পড়িল।

স্কোয়ারের ভিতর স্থানে-স্থানে দু'চারটি করিয়া লোক —প্রায়শঃই যুবক—বসিয়া জটলা করিতেছিল। এধার-ওধার হইতে তাহাদের উচ্চ হাস্য মাঝে-মাঝে শুনা যাইতেছিল। ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে দুইচারিজন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। যুবক বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল—

'কত দিন এই মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া মরিব? যদি বিবাহ না করিতাম, হয় ত কিছু আশা থাকিত। এখন তো কিছুই নাই! আমার বর্ত্তমান মনোভাবের অংশমাত্র যদি মিঃ রায়ের কর্ণগোচর হয়, বা তিনি সন্দেহ করেন, তাহা হইলে তো ওখানকার দুয়ার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আমি যে বিবাহিত, তা ইঁহারা জানেন; এবং আমি যে হৃদয়হীন নহি, তাহা বুঝাইবার জন্যই, বৎসরে অন্ততঃ দু'তিনবার বাড়ী যাইবার নাম করিয়া, অন্যত্র কোথাও কয়েক দিন ঘুরিয়া আসিতে হয়। কোনবার না যাইলে, মিঃ রায় আবার অনুযোগ করিয়া পাঠাইয়া দেন।

'ইহার চেয়ে কি এখানকার সব আশা ছাড়িয়া দিয়া, দেশে ফিরিয়া যাইব? সেখানেও তো সেই স্ত্রী! তাহাকে লইয়া তো ইহার চেয়ে দশগুণ জ্বলিতে হইবে! লোকে স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, লজ্জায় আমার মাথা নুইয়া পড়ে। সুলতার কি সুন্দর রং! কি অপূর্ব্ব মুখ শ্রী! যদি সেই অশুভক্ষণের বিবাহটা একটা স্বপ্ন হইত, তাহা হইলে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও সুলতাকে লাভ করিয়া, কি আনন্দেই না জীবন কাটাইতাম!

'আচ্ছা, সমস্ত কথা যদি মিঃ রায়কে খুলিয়া বলি, তো ফল হয় না কি? যদি প্রকাশ করিয়া বলি যে, 'টিউশনি' আমি অভাবের জন্য করি না,—স্বভাবের জন্য করি! যদি বলি, রামমোহন লাইব্রেরীতে সুলতাকে একদিন দেখিয়া, আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল;—তার পর গাড়ী করিয়া একদিন সুলতাকে উহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম, ঐটিই উহাদের বাড়ী। নম্বরটাও সেদিন দেখিয়া লইয়াছিলাম। তার পর বেঙ্গলীতে প্রাইভেট টিউটরের বিজ্ঞাপন দেখিয়া, দরিদ্রের ছদ্মবেশে এখানে আসিয়া সুলতাদের পড়াইবার ভার লই।

'এ সব জানিলে কি মিঃ রায়ের মনে ভাবান্তর হয় না? আমার পিতা যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমি অতি দুর্ভাগা, গৃহেও আমার স্থান নাই—এসব শুনিলে কি তাঁহার দয়া হইতে পারে না? এই তো প্রভাত বাবু অত বড় ব্যারিষ্টার হইয়াও, তাঁহার সিন্দুর-কৌটায় বিজয়ের এক স্ত্রী সত্বেও, তাহার সহিত সুশীর বিবাহ ঘটাইলেন। মিঃ রায়ের কি ঐরূপ সুমতি হইতে পারে না? কিন্তু তাহার আগে সুলতার মন সম্যক্ ভাবে জানা দরকার। তাহার বয়স ষোল—বুদ্ধি ও স্বাধীন মত সব তো তাহার হইয়াছে। সে যদি—নভেলের মত একেবারে বাপের সম্মুখে না হউক—অন্ততঃ আড়ালেও বলে যে, আমার এক স্ত্রী সত্বেও আমাকে বিবাহ করিতে তাহার আপত্তি নাই, বরং আগ্রহই আছে, তথাপি কি মিঃ রায়ের জ্ঞান হয় না? কি করিব? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব? না কি, যেটুকু আছে, নির্ব্বোধ কুকুরের মত ছায়ার লোভে,—সেটুকুও হারাইব?'

যুবক এইরূপ ভাবিয়া যাইতে লাগিল। সঙ্কল্প স্থির হইল না। এমন সময় একজন ভিখারী, বোধ হয় ঐ আচ্ছাদন-

টির নীচে নিজের রাত্রিকার শয্যা বিছাইবার জন্য আসিয়া, একজন বাবুলোক দেখিয়া ফিরিয়া গেল।

যুবকের তখন জ্ঞান হইল রাত্রি বাড়িয়াছে,—এখন মেসের দিকে যাওয়াই উচিত। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং চারিদিকে একবার চাহিয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের পথ ধরিল। খানিকটা চলিয়া আসিয়া, ঐ ষ্ট্রীটেরই একটা মেসের সম্মুখে আসিয়া, যুবক ভিতর-হইতে-রুদ্ধ দুয়ারের কড়া ধরিয়া খুব জোরে নাড়িতে লাগিল। মিনিট দুই-তিন পরে মেসের ঠাকুর চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। ঝি ও চাকর রাত্রি ১০টার মধ্যে আপনাদের কাজ সারিয়া, আপন-আপন বাসায় চলিয়া গিয়াছে। বামুন বেচারি এখনও অন্যত্র থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া লইতে পারে নাই; তাই বেশী রাত্রে বাবুরা কেহ আসিলে, তাহাকেই দুয়ার খুলিয়া দিতে হয়।

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে বামুন ঠাকুর বলিল—"আপনার ভাত রান্নাঘরেই ঢাকা আছে, খেয়ে যান্।"

"আমার শরীর আজ ভাল নেই ঠাকুর, কিছু খাব না" বলিয়া যুবক বরাবর উপরে উঠিয়া গেল।

দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে তাহারা দু'জনে থাকিত। ঘরের দুয়ারটা ভেজানই ছিল। ধীরে-ধীরে দুয়ার ঠেলিয়া যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া, টেবিলের উপরকার আলোটা বাড়াইয়া দিল। অপর একটা চৌকিতে শয়ান, তাহার অপেক্ষা অধিক বয়সের যুবকটি একটু নড়িয়া-চড়িয়া, চক্ষু ঈষৎ মেলিয়া কহিল—"হীরেন বাবু না কি?"

যুবক একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, একটু রাত হয়ে গেছে আজ।"

"একটু হয়েছে! তা এ আপশোষটুকু রাখলেন কেন আর? রাতটা কাবার করে এলেই পাত্তেন।"

"আজ মাথাটা বড্ড ধরেছিল; তাই গোলদীঘির হাওয়ায় খানিকটা বসেছিলাম।"

"বেশ করেছিলেন—খোলা হাওয়া খুব ভাল জিনিস; কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন, বামুন ঠিক ঘরের মা নয় যে, রাত দুপুর পর্য্যন্ত আপনার জন্য হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে। আর আমি ঠিক আপনার ঘরের—সাধু ভাষাতেই বলি—স্ত্রী নই যে, আপনার আসবার আশায় আলো জেলে দুয়ার খুলে রাত কাটাব।"

যুবকের মন আগে হইতেই বিষণ্ণ ও উৎসাহহীন ছিল। সে আর কোন কথা না বলিয়া, দুয়ার বন্ধ করিয়া শয্যায় আসিল। শয্যার উপরে একখানা খামের চিঠি ছিল; তাহা উঠাইয়া লইয়া, উপরকার হাতের লেখাটা দেখিয়াই, তখনকার মত বালিসের নীচে রাখিয়া দিয়া, শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

যদিই বা তাহাতে কোন শুভসংবাদ থাকে, এই ভাবিয়া যুবক খামখানা আবার বালিসের নীচে হইতে লইয়া খুলিয়া ফেলিল। তাহার আকাঙ্ক্ষিত শুভসংবাদটি কি, তাহা লিখিতে আমারই লজ্জা করিতেছে। সে ভাবিয়াছিল, এমনও তো হইতে পারে যে, তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রী এক্ষণে মৃত্যুশয্যায়; এবং মরিবার আগে সে একবার তাহার শেষ দর্শন মাগিতেছে। মোহ মানুষকে এমনই অমানুষ ও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলে।

সভ্য ও শিক্ষিত যুবক অতখানি সাধু আশা লইয়া, খামের ভিতর হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল:—

"শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

আজ বড় দুঃখে ও যাতনায় তোমাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছি,—অপরাধ ক্ষমা করিও।

আজ দুই বৎসর তুমি দেশ ত্যাগ করিয়াছ। দুই মাস হইল তোমার কোন সংবাদ আমাদের লেখ নাই। আমার কথা ছাড়িয়া দাও,—আমি তোমার পত্র চাহিব কোন লজ্জায়, কি সাহসে? চিঠি লিখিলে তুমি উত্তর দাও না, বিরক্ত হও; চিঠি লিখিতে নিষেধও করিয়াছ; তবু আজ মায়ের জন্য তোমার শান্তি ভঙ্গ করিতেছি।

তোমার জন্য ভাবিয়া-ভাবিয়া মা অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছেন; তাঁহার চোখের জলের বিরাম নাই। কোন-কোন দিন অর্দ্ধেক রাত্রে আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—তোমার চিঠি কি ইহার মধ্যে একখানাও আসে নাই?

আমি কি উত্তর দিব? নিজের অপমান ও দুর্ভাগ্যের দুঃখ চাপা দিয়া, মার দুঃখটাই তখন বড় করিয়া দেখি। কিন্তু মাকে সান্ত্বনা দিবার কোন অবলম্বনই তুমি আমাকে দাও নাই। তবু মাকে বলি—তাঁর তো চিঠি লেখার অভ্যাস তেমন নেই, জানেন মা! তবে কেন এত ভাবেন?

আমি জানি, আমি কালো ও অশিক্ষিতা—সেই দুঃখে

তুমি বিবাগী হইয়াছ। তোমার বিরুদ্ধে ও আমার স্বপক্ষে তো আমার কিছুই বলিবার নাই; কারণ, আমার রূপ ও শিক্ষা কোনটাই নাই—ইহা যে নিদারুণ ভাবেই সত্য!

আমি দোষ করিয়াছি, আমি শাস্তি পাইব। আমার অপরাধের জন্য মাকে কেন সাজা দিতেছ? আমার পূর্ব্ব-জন্মের পাপের ফল মা কেন ভোগ করিবেন?

তাই আমার করযোড়ে প্রার্থনা—মাকে আর কষ্ট দিও না। আমাকে পত্র দিতে বলিবার স্পর্দ্ধা রাখিতেছি না। মাকে মাসে অন্ততঃ একখানি পত্র দিয়া শান্ত করিও। কালোমানুষের দৃষ্টিতে তোমার পত্র তো মলিন হইবে না।

পার তো দয়া করিয়া একবার আসিয়া মাকে দেখা দিও। তোমার আপত্তি হইবে,—এখানে আসিলে আমার পোড়া দেহ তোমার সুন্দর চক্ষে পড়িবে। আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, তুমি যদি মাকে দেখা দিতে বৎসরে অন্ততঃ দুইবার আস, আমি কিছুতেই তোমার সমক্ষে আসিয়া তোমার চক্ষের পীড়া জন্মাইব না। যদি ইহাতেও তোমার বিশ্বাস না হয়,—তুমি যদি অনুমতি দাও,—আমি না হয় ঐ কয়দিনের জন্য আমার দিদির ওখানে গিয়া থাকিব। জান ত, আমার বাপের বাড়ীতে কেহই নাই। থাকিলে, সেখানে গিয়া বৎসরে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তোমাকে নিষ্কণ্টক করিতাম। চিরদিনের জন্য তোমাকে নিষ্কণ্টক করিতে পারিলে বাঁচিতাম;—কিন্তু সেখানে তো হাঁটিয়া যাইবার পথ নাই।

দিনরাত্রি ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমার এই কালো অভিশপ্ত জীবনের সমাপ্তি হউক,—তুমি নিষ্কণ্টক হও। আপনারি জনের সুখের কণ্টক হইয়া থাকা যে কি কষ্ট, যাহার কখন কণ্টক হইবার দুর্ভাগ্য ঘটে নাই, সে তাহা বুঝিবে না।

তোমার কাছে আমার একমাত্র ও শেষ প্রার্থনা,—যদিও অনেক প্রার্থনা করিবার অধিকার লইয়াই আসিয়া-ছিলাম,—মাকে নিয়মিত পত্র দিও; আর একবার আসিয়া মাকে দেখা দিয়া যাইও। মায়ের চোখের জল পড়িলে, তোমার অমঙ্গল-ভয়ে আমার বুক কাঁপিয়া উঠে। মাকে আর কাঁদাইও না। ইতি—

তোমার চরণসেবা-বঞ্চিতা
লৌহলতা।"

পত্রখানি পড়িয়া, যুবক পুনরায় তাহা খামে পুরিয়া, বালিসের নীচে রাখিয়া দিল; এবং আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

এই লৌহলতা নামের একটা ইতিহাস আছে;—কারণ, পত্র-লেখিকার নাম হেমলতা, লৌহলতা নহে। বিবাহের পরদিনই বাড়ী ফিরিলে, যখন স্ত্রীর নামের কথা উঠিয়াছিল, তখন যুবক বলিয়াছিল যে, তাহার স্ত্রীর নাম হেমলতা না হইয়া লৌহলতা হওয়াই উচিত। কত বিচিত্র ও অভিনব আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া, হেমলতা স্বামীর মুখে এই কথাটা সকলের সমক্ষে অনেকবার শুনিয়াছিল। তাই বড় দুঃখেই সে শেষটা স্বামীর কাছে ঐ নামটাই মানিয়া লইয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে, এই যুবকই উপেক্ষিতা হেমলতার স্বামী হীরেন্দ্র। চিঠিখানা শেষ করিতে হেমলতার ম্লান মুখখানা চকিতের জন্য একবার তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। অনাদৃতা হইয়াও সে তাহারই গৃহে তাহারই মায়ের সেবায় আপনাকে সমর্পণ করিয়াছে,—এ কথাটাও মনে পড়িল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হইল, তাহার আগমনের সহিতই কি করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত আশা-ভরসার অবসান হইয়া গিয়াছে,—জীবন মরুভূমি হইয়াছে;—যে জীবন সে না থাকিলে, সুলতার সুরভিশ্বাসে পারিজাত-গন্ধামোদিত নন্দন-কাননে পরিণত হইতে পারিত। সুলতার সুন্দর মুখচ্ছবি তৎক্ষণাৎ হীরেন্দ্রের মনমাঝে ফুটিয়া উঠিল। কুয়াশার মত অনুশোচনার পূর্ব্বাভাসটুকু মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল।

স্ত্রীর মর্ম্মান্তিক পত্রখানি বালিসের নীচে ফেলিয়া রাখিয়া, হীরেন্দ্র সুলতার সুমধুর রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। আর তখনো তাহার স্ত্রী তাহারই গৃহপ্রান্তে, সমস্ত গৃহ-কার্য্যান্তে, আপনার স্বামিস্পর্শশূন্য শয্যায় লুটাইয়া, সকলের অসাক্ষাতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের অশ্রুজলে শয্যা সিক্ত করিতে লাগিল।

(৩)

"বৌমা! ও বৌমা! দেখ বীরেন এসেছে।"

ভবসুন্দরী উদ্বিগ্ন ভাবে ও স্নেহভরে বধূর গায়ে হাত দিয়া বার-দুই-তিন ডাকিলেন।

হেমলতা তাহার আরক্ত চক্ষু মেলিয়া, একবার শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া, পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বীরেন্দ্র অত্যন্ত চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ থেকে এ ভাবটা হয়েছে মা?"

"কাল দুপুরেও তো বেশ জ্ঞান ছিল। বলেছিল 'এ সময়টা জ্বর হ'ল মা! ঠাকুরপো কদ্দিন পরে আসছেন, কোথায় ভাল করে খাওয়াব-দাওয়াব!' আমি বল্লাম—'কালই হয় ত জ্বর ছেড়ে যাবে; তার জন্যে ভাবনা কি? দুটো দিন বাদে তুমিই রেঁধে খাওয়াতে পারবে।'

"বৌমা বল্লেন—'সেই ভাল মা। আবার ঠাকুরপো চলে গেলে যেন জ্বর হয়, তাতে তো আর ক্ষতি নেই।' তার পর সন্ধ্যার সময় জ্বর যেন একটু বেশী এল মনে হ'ল। রাত থেকেই এই রকম অঘোর হয়ে আছেন। সকালেই তাই ডাক্তার আনিয়ে দেখালাম।"

বীরেন্দ্র বলিল—"তুমি মা আর একটু বৌদির কাছে বস; আমি আর একবার ডাক্তারবাবুকে এনে দেখাই" বলিয়া বীরেন্দ্র তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত উভয়ের কথাবার্ত্তার পরদিনই হেমলতা স্বামীকে পত্রখানি লিখিয়াছিল। পত্রখানি গোপনে লিখিয়া ও গোপনে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিবার পর হইতেই, একটা আশঙ্কা ও অপমানের লজ্জায় হেমলতা অভিভূতা হইয়া পড়ে। তার পরেই সে জ্বরে পড়ে।

কনিষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্র ঢাকা কলেজে পড়ে। তাহাকে ভবসুন্দরী একখানি পত্র দিয়াছিলেন যে, তাহার বৌদিদির হঠাৎ বেশী জ্বর হইয়াছে; তাহার গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে আসার যেন অন্যথা না হয়।

ডাক্তার বীরেন্দ্রের সহিত আসিয়া দেখিয়া গেলেন। বলিলেন—"জ্বর খুব বেশী হবার জন্য এমন হয়েছে। Deliriumএর আশঙ্কা আছে। এই mixtureটা আনিয়ে দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন। উপকার হবার সম্ভাবনা। যদি খুব বেশী অস্থির হয়ে পড়েন, আমাকে খবর দেবেন।"

অপরাহ্ণ হইতে হেমলতা ভুল বকিতে লাগিল। একবার তাহার রক্ত চক্ষু মেলিয়া বলিল—"মা, কাল একটু রাত থাকতে তুলে দেবেন। ঠাকুরপোর আসার আগে রান্না-বান্না সব শেষ করে রাখ্‌তে হবে? তরকারি সব কোটা আছে, রাঁধতে আর কত দেরী হবে?"

তার পর আপন মনে যেন চুপি-চুপি বলার মত বলিল—"এই সঙ্গে যদি আর একজন আসিতেন, কেমন হ'ত! দুই ভাইতে বেশ একসঙ্গে এসে দাঁড়াবেন, আমার দশগুণ শক্তি বেড়ে যাবে। তা'হলে দিন-রাত খাটতে পারতাম!"

খানিক পরে হেমলতা আবার বিড়বিড় করিয়া বলিল—"যে কালো আমি—তাই তো আসেন না! কিন্তু আমি তো ইচ্ছে করে কালো হই নি! এতে আমার কি দোষ? আমার কি অসাধ—" কথাটা শেষ হইল না। প্রলাপের মধ্যেও একটা রোদনের আবেগে কথাগুলা হারাইয়া গেল; আর তাহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

মাথার কাছে বসিয়া ভবসুন্দরী নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে পাদচারণা করিতে-করিতে, মায়ের অলক্ষ্যে দুই-একবার অশ্রু মুছিতে লাগিল।

হঠাৎ মায়ের দিকে ফিরিয়া বীরেন্দ্র কহিল—"মা, দাদাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেব?"

মা অশ্রুসিক্ত নয়নে পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—"সে কি আস্‌বে? তা'হলে কি বৌমার আমার এমন দশা হয়!"

আরও খানিক ভাবিয়া বীরেন্দ্র বলিল—"তবে দিই মা, যদি আসেন! কি বল?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন—"তা দাও।" টেলিগ্রাম করা হইল এই বলিয়া—"বৌদিদি মৃত্যুশয্যায়, শীঘ্র আসুন।" উভয়েই উদ্বিগ্ন চিত্তে হীরেন্দ্রের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঔষধের গুণে পরদিনই হেমলতার প্রলাপের ঘোর কাটিয়া গেল। আপনার হাতখানি শাশুড়ীর কোলের উপর রাখিয়া হেমলতা বলিল—"মা, আমি আর বাঁচবো না।"

"ষাট! বাঁচবে না কেন মা! দু'চার দিনেই সেরে উঠ্‌বে।"

"বেঁচে আর কি হবে মা!" বলিয়া লজ্জা ও দুঃখে হেমলতা শাশুড়ীর কোলে মুখ লুকাইল।

ভবসুন্দরী সে কথার আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

খানিক পরে অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া হেমলতা আবার ডাকিল, "মা!"

"কি বল মা!"

হেমলতা যে কথাটা বলিতে চাহিয়াছিল, কি ভাবিয়া বোধ

য় তাহা শেষ করিতে না পারিয়া, শুধু চাহিয়া রহিল ; আর তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা-কয়েক জল গড়াইয়া পড়িল।

ভবসুন্দরী হঠাৎ বলিলেন,—"হীরেনকে একবার দেখ্‌বে মা ?"

হেমলতা আপনাকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

একটু সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে ভবসুন্দরী বলিলেন—হীরেনকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। খুব সম্ভব সে আস্‌ছে !"

বলিয়াই তাঁহার মনে হইল, এতখানি আশ্বাস দিয়া তো ভাল করিলেন না। সে নিষ্ঠুর যদি নাই আসে! আর যদিই বা কেন ? তাহার না আসিবার সম্ভাবনাই যে বেশী। তখন তিনি কি বলিবেন ?

কথাটা হঠাৎ সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া ফেলিলেও, হেমলতার হৃদয়ে তাহা অনেকখানি গিয়াছিল। হয় ত এই আশ্বাসটিই তাহাকে আরোগ্যের দিকে লইয়া যাইতে অনেকটা সহায়তা করিতে লাগিল। ডাক্তার বলিলেন—অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ হইয়াছে। রোগিনীকে যদি সব সময়ে প্রফুল্ল রাখা যায় তো, এ সব ক্ষেত্রে অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

বীরেন্দ্র ভাবিল, যদি দাদা আসেন, তাহা হইলে সব দিকেই ভাল হয়। দুই দিন কাটিয়া গেল, হীরেন্দ্র আসিল না; আসিবে কি না, কোন সংবাদও মিলিল না। মাতা ও পুত্র উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে, হেমলতা মুখে কিছু না বলিলেও, মনে-মনে সর্ব্বক্ষণ স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছে।

বীরেন্দ্র ভারি সুন্দর গান গাহিতে পারিত; হেমলতা তাহার গান শুনিতে বড় ভালবাসিত। সন্ধ্যার পর হেমলতা বলিল—"ঠাকুরপো, সেই গানটা গাও না !"

"কোন্‌টা বৌদিদি ?"

একটু লজ্জিত হইয়া হেমলতা বলিল—"সেই যে তুমি গাও—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বীরেন্দ্র কহিল—

"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে
দেখা তো হ'ত না পরাণ গেলে।—"

কবেকার কোন উপেক্ষিতা নারীর শেষ সার্থক ক্ষণের সুখের মতই করুণ ও মর্ম্মান্তিক আনন্দটুকু তাহার গানের প্রতি অক্ষর হইতে ক্ষরিতে লাগিল; আর হেমলতা চক্ষু মুদিয়া তাহার অন্তর দিয়া যেন সেই আনন্দরসটুকু নিঃশেষে পান করিতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া যে অশ্রুর স্রোত বহিতেছিল, তাহা গোপন করিতেও সে ভুলিয়া গেল।

গান শেষ হইয়া গেল। হেমলতা নির্জ্জীবের মত শয্যায় পড়িয়া রহিল। শুধু মাঝে-মাঝে তাহার চক্ষে যে অশ্রুধারা ঝরিতেছিল, তাহাই তাহার ক্ষীণ দেহমধ্যস্থিত প্রাণটুকুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে বীরেন্দ্র ডাকিল—"বৌদিদি !"

হেমলতা বোধ হয় শুনিতে পাইল না। বীরেন্দ্র পুনরায় ডাকিল।

এবার হেমলতা চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া বলিল—"কি বল্‌ছ ?"

বীরেন্দ্র বলিল—"আমি আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে কল্‌কাতা যাব। দুটো দিন একলা থাকৃতে পার্‌বে না ?"

হেমলতা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কল্‌কাতা কেন ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বীরেন্দ্র বলিল—"দাদা বোধ হয় অন্য ঠিকানায় উ'ঠে গেছেন ; টেলিগ্রাম পান্‌ নাই।"

অতি মৃদু ম্লান হাসিয়া হেমলতা বলিল—"না ঠাকুরপো, সে আমার অদৃষ্টে নেই। তুমি আর কষ্ট করে কেন অপমান হতে যাবে ?"

"না বৌদি, আজ আমি যাব। দাদাকে আস্‌তে হবেই। তোমার জীবন কখন ব্যর্থ হবে না।" বলিয়া নিজের ভাবাতিশয্যে নিজেই লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল।

হেমলতার মনের মধ্যে কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে হেমলতা বলিল—"দেখ ঠাকুরপো, আমি মরে গেলে আমার শ্রাদ্ধ তুমি কোরো। আর শ্রাদ্ধের দিন ঐ কীর্ত্তনটা যেন গাওয়া হয়।"

"কেন ও সব বল্‌ছ, বৌদিদি। তুমি নিশ্চয়ই সেরে উঠ্‌বে।" বলিয়া বীরেন্দ্র অত্যন্ত কাতর দৃষ্টিতে হেমলতার দিকে চাহিল।

"যদি শ্রাদ্ধ করতে হয়, তাই বলে রাখ্‌ছি। সেরে উঠ্‌লে তো শ্রাদ্ধ করতেই হবে না।" বলিয়া হেমলতা একটিবার ম্লান হাসি হাসিয়া, আবার গম্ভীর হইয়া গেল।

ডাক্তারকে সব কথা বলিয়া, বীরেন্দ্র তাঁহার মত চাহিয়াছিল। তিনিও বলিয়াছিলেন—"তাঁহাকে যদি আনিতে পারেন, খুব ভাল হয়। তবে দেরী করবেন না।"

মাকে শুশ্রূষা, ঔষধ, পথ্য সম্বন্ধে সব বুঝাইয়া বলিয়া, বীরেন্দ্র সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে কলিকাতা রওনা হইল।

(৪)

বীরেন্দ্র কলিকাতায় হীরেন্দ্রের মেসে আসিয়া শুনিল, দিন চার-পাঁচ হইল, তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, তাহা মেসের কেহ ঠিক জানে না। তবে বোধ হয় বাড়ী;—কারণ, একদিন তাহারা শুনিয়াছিল যে, তাঁহার বাড়ী হইতে জরুরী তার আসিয়াছে।

বীরেন্দ্র সব শুনিয়া বলিল—"বাড়ী তো যান্ নি তিনি। আমি বরাবর বাড়ী থেকেই আস্‌ছি।"

যে লোকটি হীরেন্দ্রের সহিত একঘরে থাকিত, সে বলিল—"বলেন কি! তবে তো ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হীরেনবাবুর কি দুই স্ত্রী বল্‌তে পারেন? তাই হয় ত দুয়োরাণীকে ফাঁকি দিয়ে, সুয়োরাণীর কাছে হাজির হয়েছেন।"

বীরেন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিল—"আজ্ঞে না, তাঁর এক বিবাহ—আর আমি তাঁর ছোট ভাই।"

"ওঃ, তাই না কি! মাপ করবেন তা' হ'লে" বলিয়া লোকটি একটু হাসিয়া চুপ করিল।

বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"তা' হ'লে দাদা কোথায় গেছেন, এ খবরটা পাবার কোন উপায় নেই?"

লোকটি বলিল—"দেখুন, আপনার দাদাটি—বল্‌তে নেই—একটি গুখু; কারু সঙ্গে বড় একটা বাক্যালাপ তো করেন না।"

পরে একটু ভাবিয়া বলিল—"সার্কুলার রোডে এক জায়গায় তিনি পড়াতে যান; সেখানেই তাঁর যাতায়াত বেশী। সেখানে গেলে বোধ হয় একটা সঠিক সন্ধান পেতে পারেন।"

একটু আলোকের সন্ধান পাইয়া বীরেন্দ্র বলিয়া উঠিল "সে বাড়ীর নম্বরটা কত বল্‌তে পারেন?"

ঠোঁট উল্টাইয়া লোকটি বলিল—"সেটি পাল্লুম না মশায়। সে বাড়ীর নম্বরটা আপনার দাদা শ্রীমুখ দিয়ে কখন উচ্চারণ করেন নি। একবার কি কথায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—'কোথায় পড়াতে যান হীরেন বাবু?' তিনি খুব প্রাঞ্জল ভাষায় তার উত্তর দিয়েছিলেন—'এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে। আমি বল্লুম,—'ওঃ, বুঝলুম। আমি ভেবেছিলুম, বুঝি বা সরকারি রাস্তায় পড়াতে যান।'

"কেউ বাক্‌চাতুরীতে হারিয়ে দেবেন, সেটা সহ্য করতে পারি নে,—তাই সন্ধানে থেকে-থেকে, একদিন ধরে ফেলা গেল, কোথায় পড়াতে যান। বাড়ীটা চিনি; কিন্তু নম্বর তো জানি নে। আপনি বসুন একটু, আমি চট্ করে স্নানাহারটা সেরে নিই। তার পর আপিস যাবার পথে আপনাকে সেই বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে যাব।" বলিয়া লোকটি একটা পুরান শিশি হইতে খানিকটা সরিষার তৈল হাতের তালুতে ঢালিয়া, মাথায় ঘসিতে-ঘসিতে, গামছা ও কাপড় লইয়া কলের উদ্দেশে চলিয়া গেল। বীরেন্দ্র তাহার দাদার চৌকির উপর উদ্বিগ্ন চিত্তে বসিয়া রহিল।

পনের মিনিটের মধ্যে লোকটি পান চিবাইতে-চিবাইতে ভিজা কাপড় হাতে ফিরিয়া আসিল; এবং বারান্দায় কাপড়খানা শুকাইতে দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। চিরুণীর দুই টানে চুলগুলি ফিরাইয়া, জামা ও জুতা পরিয়া লইয়া সে বলিল—"এবার চলুন তাহলে যাওয়া যাক্।"

বীরেন্দ্র বাহিরে আসিতে-আসিতে কহিল—"আমার জন্য আজ আপনাকে বড় তাড়াতাড়ি কত্তে হল।"

দুয়ারে একটা তালা লাগাইয়া সে বলিল—"ক্ষেপেছেন আপনি। সে পাত্তোরই আমি নই। রোজই এই গতিক। মার্চেন্ট আফিসে ঢুকে পর্য্যন্ত কি আর সকালে খাওয়া আছে—এ কেবল বসা মাত্র। খাওয়া যায় রাত্রে কিঞ্চিৎ। চলুন, আমার হাজরি আবার ৯৷৷০ টার মধ্যে।"

তখন দু'জনে বাহির হইয়া পড়িল। ভদ্রলোকটি বীরেন্দ্রকে মিঃ রায়ের বাড়ী দেখাইয়া দিয়া, সেখান হইতে ট্রাম ধরিল। বীরেন্দ্র ধীরে-ধীরে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীটির গেটের ভিতর প্রবেশ করিল।

একটি ছোট ছেলে শুভ্র পাজামা ও কামিজ পরিয়া, খালি পায়ে সম্মুখের বারান্দায় খেলিতেছিল। বীরেন্দ্রকে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—বাবার সঙ্গে, দিদির সঙ্গে, না আমার সঙ্গে?"

বীরেন্দ্র ছেলেটির সরলতা দেখিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল—"তোমার সঙ্গে।"

"সত্যি! আসুন তা'হলে, চলুন আমাদের পড়বার ঘরে।" বলিয়া বালক বীরেন্দ্রকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া চলিল।

পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া বীরেন্দ্র বলিল—"খোকা—" আর কিছু বলিবার আগেই, বালক বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"খোকা আমি কেন হতে গেলুম! যান্, আপনি কিচ্ছু জানেন না। খোকা বাড়ীর ভেতর দুধ খাচ্ছে। আমি যে সমীর!"

বীরেন্দ্র আপনার অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া কহিল—"আচ্ছা সমীর, এখানে হীরেনবাবু বলে তোমাদের কেউ পড়ান? তিনি কোথায় গেলেন জান?"

সমীর খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল—"এঃ, আপনি একেবারে কিচ্ছু জানেন না। আমাদের মাষ্টার মশাই তো পড়ান। তিনি কোথায় গেলেন, আমি এখুনি আপনাকে বলে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে আসুন তো বাবার কাছে।"

বলিয়া সমীর বীরেন্দ্রকে লইয়া দ্বিতলের বারান্দায় একটি ঘরের সম্মুখে লইয়া গেল।

"জানেন, এটা হচ্ছে বাবার আপিস-ঘর; এখানে যেন গোলমাল করবেন না।" বলিয়া বালক উঁকি মারিয়া দেখিল, মিঃ রায় একটা মোটা বই লইয়া পড়িতেছেন।

বালক এবারে একটু বিপদে পড়িল। পড়িবার সময়ে পিতাকে বিরক্ত করায় নিষেধ আছে; কিন্তু সেই নিষেধ বজায় রাখিতে গিয়া, নিজের সম্ভ্রম যে নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই বালক সাহসে ভর করিয়া কহিল—"বাবা, আপনি কাজ যদি এখন না করেন, একটা কথা শুনবেন?"

মিঃ রায় বই হইতে মুখ তুলিয়া হাসি-মুখে বলিলেন—"আমি কাজ করতে-করতেই সমীরবাবুর কথা শুনতে পারব। কি কথা?"

সমীর তখন আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—"দেখুন বাবা, ইনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মাষ্টার মশায়ের খোঁজ কচ্ছেন।"

সঙ্গে একটি তরুণ যুবককে দেখিয়া মিঃ রায় বলিলেন—"এস। তুমি হীরেন বাবুর খোঁজে এসেছ? কোত্থেকে আসছ?"

বীরেন্দ্র সবিনয়ে বলিল—"আমি আসছি ফরিদপুর থেকে। আমি তাঁর ছোট ভাই।"

মিঃ রায়। ওঃ, বেশ, বেশ! কিন্তু হীরেনবাবু তো ক'দিন হ'ল বাড়ী রওনা হয়েছিল।

বীরেন্দ্র। বাড়ী! আমি যে বরাবর বাড়ী থেকে তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি। বৌদির ভারি অসুখ—আর দাদা দু'বছর বাড়ী যান্ নি।

মিঃ রায়। দু'বছর বাড়ী যান নি! প্রত্যেক বড় ছুটির সময় তিনি বাড়ী যাব ব'লে যান! তা'হলে কোথায় যান? তুমি ঠিক জান, এবারও তিনি বাড়ী যান নি?

বীরেন্দ্র। হাঁ। আমি কাল সন্ধ্যায় বাড়ী থেকে বার হয়ে, আজ সকালে এখানে এসে পৌঁচেছি।

মিঃ রায়। আশ্চর্য্য তো! তিনি তো দিন পাঁচেক আগে বার হয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর অসুখের খবর জানতে পেরে, আমিই তো আরও তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলুম।

বীরেন্দ্র। তা'হলে কোথায় তাঁর সন্ধান পাব? আর বাড়ী গিয়েই বা কি বলব? আমি যে বেরিয়েছিলাম, দাদাকে নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে।

কথা-কয়টা বলিয়া বীরেন্দ্র নিকটস্থ একখানি চেয়ারে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল। গৃহে প্রতীক্ষমানা মাতা ও ভ্রাতৃ-জায়ার কথা ভাবিয়া তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

মিঃ রায়ের ছেলেটির জন্য দুঃখ হইল। কিন্তু চট্ করিয়া কোন সান্ত্বনার কথা তাহাকে বলিতে পারিলেন না।

একটু পরে বীরেন্দ্র উঠিয়া নমস্কার করিল—"আমি তা'হলে এখন যাই। যদি দাদা ফিরে আসেন, দয়া করে তাঁকে একবার বাড়ী যেতে বলবেন।" বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইতে উদ্যত হইল।

মিঃ রায় বীরেন্দ্রকে বাধা দিয়া বলিলেন—"না—না, এখনি যাওয়া হতে পারে না। স্নান করে চাটি খেয়ে নিয়ে তবে যাবে।"

বীরেন্দ্র অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিল—"তাঁরা যে বাড়ীতে পথ চেয়ে বসে আছেন। দাদাকে নিয়ে যেতে পাল্লে, বৌদির প্রাণ রক্ষা হ'ত। তাও পারলাম না। আমার গলা দিয়ে এখন ভাত নামবে না।"

মিঃ রায় নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া, সমীরের সঙ্গে তাহাকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে সে অনুরোধ মত কোন রকমে স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া, নিতান্ত বিষণ্ণ চিত্তে দুপুরের ট্রেণ ধরিবার জন্য বাহির হইল।

অনেক রাত্রে যখন বীরেন্দ্র শঙ্কিত ও কম্পিত হৃদয়ে বাড়ী পৌঁছিল, হেমলতা তখনও জাগিয়া ছিল। ম্লান আলোকে বীরেন্দ্রের ছলছল চক্ষু ও শুষ্ক মুখভাব দেখিয়া, ফলাফল বুঝিতে হেমলতার বাকি রহিল না। তাহার বুক একেবারে দমিয়া গেল। তবু সে ম্লান হাসিয়া কহিল—"তোমাকে তো তখনি বলেছিলাম ঠাকুরপো! এত কষ্ট করে কেন দুঃখ পেতে গেলে?"

"দাদা তোমার অসুখের খবর পাবার আগে, কি কাজে কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথায় চলে গেছেন; তাই তাঁর দেখা পেলাম না।" মিথ্যাটা বলিয়াও বীরেন্দ্র বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

হেমলতা আর কিছু না বলিয়া, চক্ষু মুদিয়া নির্জ্জীবের মত শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।

(৫)

যে দিন বীরেন্দ্র ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল, তাহার এক সপ্তাহ পরে এক সন্ধ্যায় হীরেন্দ্র একটা বিষয়ে দৃঢ়-মনোরথ হইয়া মিঃ রায়ের বাড়ী প্রবেশ করিল।

এখানকার অধ্যাপনা, বিশেষ করিয়া সুলতাকে পড়ানো, তাহার পক্ষে মজ্জাগত নেশার মত হইয়া গিয়াছিল। এ কয়দিন রঙিন ফেণিলোচ্ছল মদিরার মত সুলতার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া, সে শতগুণ তীব্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া ব্যগ্র হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কয়দিনের বিরহে সে কবিদের ভাষায় সুলতার জন্য একখানি পত্র লিখিয়া আনিয়াছে। তাহাতে সে তাহার মনোভাব, অবস্থা, সুলতার প্রতি তাহার সর্ব্বগ্রাসী অনুরাগ, তাহার দোষ-গুণ, সমস্ত অকপটে ব্যক্ত করিয়া জানিতে চাহিয়াছে, সুলতার হৃদয়ে তাহার জন্য একটুও প্রীতি-স্নিগ্ধ স্থান আছে কি না। সেই সযত্নে ও অতি যত্নে লেখা পত্রখানি ডাকে দিতে তাহার সাহস হয় নাই; কারণ, সে জানিত, যে সমস্ত পত্র আসে, মিঃ রায়ের নিকট আসিয়া, তবে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। এ কয়দিন সে বর্দ্ধমানে তাহার এক বন্ধুর বাড়ী, তারকেশ্বর, ইত্যাদি দুই-একটা জায়গায় কাটাইয়া দিয়াছে। আজ সে স্থির করিয়া আসিয়াছে যে, পড়াইয়া যাইবার সময়ে পত্রখানি সুলতার হাতে দিয়া যাইবে; এবং তাহাকে বলিয়া দিবে যে, পত্রখানা যেন সে লুকাইয়া একবার মন দিয়া পড়িয়া দেখে।

হীরেন্দ্র আসিয়া মিঃ রায়ের ঘরে প্রথমে দর্শন দিল। মিঃ রায়ের মুখভাব একটু কঠিন হইয়া আসিল। আপন ভাবে বিভোর হীরেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

মিঃ রায় তাহাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার স্ত্রী কেমন আছেন? বাড়ী থেকে কখন আসছেন?"

হীরেন্দ্র একটু ঢোঁক গিলিয়া বলিল—"একটু ভাল। এইমাত্র কল্‌কাতা এসে পৌঁছেছি।"

"বাড়ীতে তা'হলে কদিন ছিলেন?"

"দিন দশেক হবে।"

"আচ্ছা, আপনি পড়্‌বার ঘরে গিয়ে বসুন,—আমি খবর পাঠাচ্ছি।" বলিয়া মিঃ রায় কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করলেন।

হীরেন্দ্র পড়িবার ঘরে আসিয়া দেখিল, সেখানে কেহ নাই।

সুলতা কখন আসিবে এই চিন্তায় যখন সে বিভোর, এমন সময়ে একটি ভৃত্য আসিয়া খামে-মোড়া একখানি পত্র তাহাকে দিয়া গেল।

একটু আশ্চর্য্যান্বিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া হীরেন্দ্র খামখানি খুলিয়া দেখিল, তাহার ভিতর একখানি পত্র ও একশত টাকার একখানি নোট রহিয়াছে। একটু ভীত হইয়া সে পত্রখানি লইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"হীরেন্দ্রবাবু, আপনি যাওয়ার পাঁচ দিন পরে আপনার ছোট ভাই আপনাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি সব শুনিয়াছি। যিনি আপনার মা ও স্ত্রীর প্রতি এতটা হৃদয়হীন হইতে পারেন, তাঁহার উপর আমার পুত্র-কন্যার শিক্ষার ভার দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। এই মাসের ও আগামী মাসের বেতন এই সঙ্গে দিলাম।

আপনাকে স্নেহ করিতাম; সেজন্য আপনাকে বলিতেছি, যদি আপনি সত্যকার মঙ্গল চাহেন, তো এখনই দেশে ফিরিয়া যান। এতদিন যাহাদিগকে আঘাত ও অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও যত্নবান্ হইয়া, আপনার এতদিনকার আচরিত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

এখানকার আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিবেন না। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার

আমারও আর সুবিধা হইল না; কারণ, মিথ্যাভাষণকে ঘৃণা করিয়া, আপনার সহিত শ্রদ্ধা-সহকারে কথা কহা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। ইতি

হিতকামী

মৃত্যুঞ্জয় রায়।"

সুলতার উদ্দেশে লিখিত পত্রখানা বুকের কাছটা ছুঁইয়া রহিয়াছে। এখন আর সে পত্র তাহাকে দেওয়া না দেওয়া উভয়ই সমান। নোট সহিত মিঃ রায়ের পত্রখানা পকেটে ফেলিয়া হীরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং ধীরে-ধীরে মিঃ রায়ের অট্টালিকা ত্যাগ করিল।

বাহিরে আসিয়া হীরেন্দ্র ভাবিল—এখন সে কোথায় যাইবে? মেসেও হয় ত এইরূপ সমাদরই তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আর কলিকাতায় থাকিয়াই বা সে কি করিবে? যে অবলম্বন ধরিয়া এতদিন এখানে ছিল, তাহা তো আজ চিরদিনের মত হারাইয়া বসিয়াছে।

হীরেন্দ্রের মনে হইল, ভালবাসার স্থান হইতে প্রত্যাখ্যানটা কি মর্ম্মান্তিক। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, তাহার স্ত্রীকে সে যে ভাবে প্রত্যাখ্যান ও অনাদর করিয়া আসিয়াছে, তাহা কি ইহার চেয়ে অনেক তীব্র নহে? যে অপমান সে আজ লাভ করিয়াছে, এই বৎসর কয়েক ধরিয়া তাহার চেয়ে ঢের বেশী অপমান সে আর একজনকে সকলের সমক্ষে করিয়া আসিতেছে।

একবার ভাবিল—তাহা হইলে কি সত্য-সত্যই এতদিন পরে বাড়ী ফিরিবে? তাহার স্ত্রীর শেষ চিঠিখানির কথা মনে হইল; টেলিগ্রামের কথা ভাবিল। সে চিঠিতে তো অভিমান ছাড়া রাগের কোন কথা ছিল না। টেলিগ্রামখানাতেও তো শেষ আহ্বানই ছিল। কিন্তু দেশে গেলে তো সুলতাকে আর দেখিতে পাইবে না। এখানে থাকিলে আসাবধি ঐ পথ দিয়া চলিতে-চলিতে, অন্ততঃ দু'একদিনও তা তাহাকে দেখিতে পাইবে!

এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিতে-ভাবিতে হীরেন্দ্র মেসের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। নীচে কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া, সে বরাবর নিজের ঘরটায় আসিয়া, আপনার শয্যায় শুইয়া পড়িল।

ঘরের সেই ভদ্রলোকটি তখন অন্য কাহারও ঘরে ছিলেন। একটু পরে ঘরে আসিয়া, হীরেন্দ্রকে শয্যায় শয়ান দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ কি! বঁধু যে! অসময়ে প্রকাশ কেন? তার পর মাঝে-মাঝে কোথায় ডুব মারেন বলুন তো! বাড়ী যান নি, সে খবর পেয়েছি।"

আরও দুই-চারটি কথা বলিতে, হীরেন্দ্র বলিল—"শরীর বড়ই অসুস্থ শিশিরবাবু। একটু ঘুমুতে দিন।"

শিশিরবাবু 'আহা মরে যাই' গোছের কি একটা বলিয়া চুপ করিল।

সারারাত্রি ভাবিয়া হীরেন্দ্র স্থির করিল, সে দেশেই ফিরিবে। সুলতাকে না দেখিতে পাইলে, কলিকাতা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিবে। চারিদিককার বিদ্রূপ ও অপমান—সেও সে সহিতে পারিবে না। দেশে গেলে অন্ততঃ সমাদরের অভাবটা হইবে না; এবং সেখানে তাহার প্রত্যাগমনটা তাহার স্ত্রী পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবে।

সকালে উঠিয়া হীরেন্দ্রের মন আরও খারাপ হইয়া গেল। সমস্ত প্রভাতটা এই সব বিদ্রূপকারী কঠোর পুরুষগুলার মধ্যে কাটাইতে হইবে! যে চা প্রতি প্রভাতে পাঠের টেবিলের উপর সুলতার পরিবেশনে ও আবির্ভাবে অপূর্ব্ব শ্রী লাভ করিত, সেই চা মেসের এই কোলাহলের মধ্যে পান করিতে তাহার মন সরিল না। সকালটা অতি কষ্টে কাটাইয়া, দুপুরে অন্য যে সব কাজ ছিল তাহা মিটাইয়া, রাত্রির ট্রেণে হীরেন্দ্র কলিকাতার বাস উঠাইয়া দেশের দিকে যাত্রা করিল।

পরদিন অনুমান বেলা নয়টার সময় সে বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল। দীর্ঘকাল পরে আজ এতদিনকার আকাশ-কুসুম চয়নের চেষ্টায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া সে যে বাড়ী ফিরিতেছে, ইহার অপমানটুকু নিরাশার দুঃখের চেয়ে তাহাকে কম পীড়া দিতেছিল না।

সমস্ত বাড়ীটার বহির্দৃশ্য তাহার কাছে নূতন মনে হইতে লাগিল। সম্মুখভাগে পাল খাটান দেখিয়া সে অনেকখানি বিস্মিত হইয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে কীর্ত্তনের সুর বাড়ীর ভিতর হইতে তাহার কাণে প্রবেশ করিল।

হীরেন্দ্র একটু ত্বরিত-পদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তখন প্রাঙ্গণে একটা বড় আচ্ছাদনের নীচে বীরেন্দ্র বসিয়া, শুভ্র থান ও শুভ্র উত্তরীয় পরিয়া, ম্লানমুখে মুণ্ডিত-মস্তকে মাতৃহীন সন্তানের মতই মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়ার শ্রাদ্ধের মন্ত্র পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিতেছিল। কাহার শ্রাদ্ধ,

বুঝিতে হীরেন্দ্রের বিলম্ব হইল না। কারণ, সম্মুখেরই একটা কক্ষে বসিয়া, তাহার মাতা এই অকালমৃতা, বুঝি পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তরা পুত্রবধূর শ্রাদ্ধক্রিয়া সজলনেত্রে দেখিতে-দেখিতে, দীর্ঘকাল পরে গৃহাগত পুত্রকে লক্ষ্য করিবামাত্র ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শ্রাদ্ধের মন্ত্র কিছুক্ষণের জন্য অনুচ্চারিত রহিল।

যাঁহার ক্ষীণ প্রাণটুকু নিষ্ঠুর স্বামীর আগমনের ব্যর্থ আশার কঠোর আঘাতে তিলে-তিলে নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারই শ্রাদ্ধবাসরে অবশেষে ভ্রাতাকে সমাগত দেখিয়া, সেই পরলোকগতা, দুঃখ-ভিন্ন-হৃদয়া, সাধ্বী ভ্রাতৃজায়ার ব্যর্থ জীবন মনে পড়ায়, বীরেন্দ্রের দুটি চক্ষে অশ্রুধারা ছুটিল।

হেমলতার শেষ সাধ অনুসারে প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে কীর্ত্তনীয়ারা বিনাইয়া-বিনাইয়া গাহিতে লাগিল—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে ;
দেখা তো হ'ত না পরাণ গেলে।
এতেক সহিল অবোলা বলে ;
পাষাণ হইলে যেত যে গলে।
দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল ;
মথুরাপুরীতে ছিলে তো ভাল।
সে সব দুঃখ কিছু না গণি
তোমার কুশলে কুশল মানি।

* * *

দাবী

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

তুমি কেন পাও লাজ
'বউ' বোলে ডাক্‌লে ?
তুমি কেন যাও স'রে
আর কেউ থাক্‌লে ?
তুমি কেন স্মরি' শুধু
অন্তরযামীকে
ভাবনা ক' মনে-মনে
হৃদয়ের স্বামীকে ?

তোমাকেই চিরকাল
হবে ঘর ক'র্‌তে ;
তোমাকেই হবে হাল
চিরদিন ধ'র্‌তে।
তুমি নুয়ে প'ড়ো না ক'
সঙ্কোচে, সরমে ;
মাঝি যদি থাকে ঠিক,
ভয় নাই চরমে।

তুমি তো ভিখারী নহ,
ভ্রূকুটিতে টল্‌বে—
পথের তো ধূলা নহ,
সকলে যে দ'ল্‌বে।
তুমি শুধু চুপ্‌ ক'রে
থেকো না ক' দাঁড়িয়ে ;
যেও শ্লেষ, অবহেলা
পা'র তলে মাড়িয়ে।

তোমার যা দাবী, তুমি
ছেড়ে কেন রইবে ?
বলে তাহা নিতে হবে—
দেবে না তো দৈবে !
পথ ছেড়ে দেবে না যে,
পথ তারে ছাড়বে ;
ভয়ে দূরে থেক' না ক'
জয়ে যশ বাড়্‌বে।

ওঝাজীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

[রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর]

শ্রীযুক্ত দিবাকর ওঝার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এখনও বাহির হয় নাই। তাঁহার কারণ যে, তিনি বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ। হিন্দী ভাষায় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সরস হয় না। অন্ততঃ ওঝাজীর তাহাই মত। সুতরাং অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিলাম।

অন্যান্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে ওঝাজীর বৃত্তান্ত একটু তফাৎ। ওঝাজী সন্ধ্যার সময় সিদ্ধি পান করিয়া, স্বীয় গৃহের এক কোণে বসিয়াই ভ্রমণ করেন। তাঁহার মতে এইরূপ ভ্রমণই মনুষ্যত্ববর্দ্ধক, অথচ কোন খরচ-পত্রের দরকার নাই। তবে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, দিবাকর ওঝা পূর্ব্বকালে বহু দেশ পর্যটন করিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই স্মৃতি-মন্দিরের সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া মধ্যে-মধ্যে বাহির করেন।

ওঝাজীর মতে, কেবল এই জন্মে নহে, পূর্ব্ব-জন্মেও আমরা ভ্রমণ করিয়াছি ; সেই অভ্যাস বশতঃ আবার চেষ্টা হয়। সৃষ্টিই ভ্রমণের জন্য। যেখানে ভ্রমণ করা যায়, তাহার নাম 'দেশ', গতির নাম 'পথ', এবং একটার পর আর একটা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মনে পড়িলে, তাহার নাম 'কাল'।

মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করাই, ওঝাজীর মতে, ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। হস্ত-পদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া মনের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। কেবল কথা দ্বারাই প্রবেশ করা সম্ভব। কথা তিন প্রকার—

১। খুব মিষ্ট কথা, যেমন গান।
২। মিঠা-কড়া, যেমন বক্তৃতা।
৩। খুব কড়া, যেমন গালাগালি
চীৎকার প্রভৃতি।

মনের দ্বার দুইটি। সদর ও খিড়কি। খিড়কি-দ্বার [দি]য়া দেবগণ প্রবেশ করেন। সেটা খুব সাবধানে রুদ্ধ [ক]রিয়া রাখাই প্রথা ; কারণ, অনবধানতা বশতঃ ভূতপ্রেতও [প্র]বেশ করিতে পারে। সদর দ্বার মানবের জন্য অবারিত। [ত]াহার সম্মুখে বসিয়া আদান-প্রদান কর্ম্মের নাম 'খোসগল্প'। [সি]দ্ধি পান করিলে সেই গল্প জমাট বাঁধে এবং সকলের প্রিয় [হয়]। খোসগল্পের মধ্যে ভ্রমণ-বৃত্তান্তই শ্রেষ্ঠ।

একটা মানুষের মন অন্য মানুষের মনের নিকট আসিলেই কথা জুড়িয়া দেয়। যাহাতে কথা কহা যায়, তাহার নাম ভাষা। উভয়ের ভাষা এক হইলে, দ্বার খুলিয়া যায়। ভাষা এক না হইলে, ঘাত-প্রতিঘাত হইতে থাকে।

খোসগল্প আরম্ভ হইলে আনন্দ উছলিয়া উঠে। যথা—

প্রশ্ন। মহাশয়ের নিবাস ?
উত্তর। আপনার মনের মধ্যে।
প্রশ্ন। আপনার গন্তব্য স্থান ?
উত্তর। মহাশয়ের মনের মধ্যে।
প্রশ্ন। মহাশয়ের কর্ম্মস্থল ?
উত্তর। আপনার মনের মধ্যে।

এত ব্যগ্রতা সত্ত্বে মনের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখা সুকঠিন !

মনের দ্বারে যে বসিয়া থাকে, তাহার নাম 'আত্মা'। সকলেই জানেন যে, আত্মা মনের পিঞ্জরে আবদ্ধ। তবে একজনের আত্মা অন্য জনের আত্মাকে চিনিয়া লইতে পারে ; কারণ, সকল আত্মারই চেহারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মত। আত্মা কোনো স্কুল কিংবা কলেজে গিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারে না ; পিঞ্জরে বসিয়া মুদিত নয়নে নিজের ভাষা নিজেই সৃষ্টি করে। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, সকল আত্মার ভাষাই এক ; অথচ মনের প্রাকৃতিক ভাষা সেই ভাষাকে এতদূর প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, কাবুলি বাদামের ন্যায় শক্ত হইয়া পড়ে।

এক-একটা ভাষা পর্ব্বতের ন্যায় কঠিন। তাহা ভাঙ্গিতে গেলে, অন্য ভাষার বারিধারা তাহার উপর সেচন করিতে হয়। কিছুদিন পরেই পর্ব্বত বৃক্ষের আকার ধারণ করে। প্রস্তর শ্যামল তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। এইরূপে নবজীবনোদ্গমে ভাষার যে সুরম্য পরিবর্ত্তন হয়, তাহার নাম 'মেজাজ্ সরিফ্'।

বারি-সেচনের নাম 'প্রেম' কিংবা প্রীতি। ইহার প্রথম সোপান বর্ণপরিচয়। আত্মার ভাষার গতি স্বরবর্ণ লইয়া। 'মন' কেবল ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যক্ত করে। এক ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণ অন্য ভাষার ব্যঞ্জনের সহিত মিশিতে পারে না।

দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সুতরাং স্বরবর্ণ তাহার সঙ্গে মিশিয়া ভ্রমণের পথ সুগম করিয়া দেয়। খোসগল্পের মধ্যে স্বরবর্ণের ভাগই অধিক!

মধুঋতু। দিবাকর ওঝা রেলগাড়ী আরোহণ পূর্ব্বক গয়াধামে পিতৃ-পিণ্ড প্রদানার্থ তস্‌রিফ্‌ লইয়া যাইতেছেন। নির্ম্মল আস্‌মান। মর্দ্দমলয়াকীর্ণ থার্ড ক্লাস। যাত্রীর অতিশয় ভিড়। ক্রমে কামরার মধ্যে বত্রিশজন আরোহী দাঁড়াইয়া গেল; যেন বত্রিশপাটি দন্ত। সকলেই গলদ্দঘর্ম্ম, অথচ আনন্দের অভাব নাই। এই খোস্‌নোমা ভিড়ের মধ্যে একজন আরোহী (স্ত্রীলোক) ওঝাজীর ঘটি হস্তগত করিয়া স্বীয় ব্যাগের মধ্যে স্থাপন করিলেন; এবং তৎপরিবর্ত্তে একটা বদ্‌না লইয়া ওঝাজীর হস্তে দিলেন।

ওঝা। কাজটা বেতরিবৎ হইতেছে।

স্ত্রীলোক। আপনি খাপ্পা হইবেন না; আমি বিরহিনী। My need is greater than thine; একটা ঘটির নিতান্ত দরকার।

ওঝা। আপনার নাম?

স্ত্রীলোক। Jane প্রেকউন্নিসা চৌধরাণী।

ওঝা। পিতার নাম।

স্ত্রীলোক। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ওঝা। পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে। আপনি?

স্ত্রীলোক। আমি, স্বামীর শ্রাদ্ধ করিতে—

ওঝা। অনেকটা similar case দেখছি!

স্ত্রীলোক। যারা পর্দানশীন, তারা পিতৃশ্রাদ্ধ করে। আমার মামার বাড়ীর সকলে পর্দানশীন। আমি স্বাধীন স্ত্রীলোক।

একজন যাত্রী, তাহার গাত্রে নামাবলী, সে বলিয়া উঠিল 'বেঁচে থাক' বাবা—'

ওঝা। ব্যাপারখানা কি?

যাত্রী। ভয়ানক ছারপোকা এই বেঞ্চের মধ্যে!

বত্রিশজন আরোহী সশঙ্কিত ভাবে দণ্ডায়মান! যাহাদের বসিবার ইচ্ছা ছিল, তাহারাও বসিল না। কারণ, ছারপোকা নিতান্ত কষ্টদায়ক জানোয়ার!

যাত্রী। এমন করিয়া কতদূর?

অন্য। কতদিন?

আর একজন। জগতই মহাতীর্থ। কোথায় কার গন্তব্য স্থান who knows? এবং আমাদের হলত্‌ কি হবে তাহা মনে করিলে দরশৎ উপস্থিত হয়!

ইহা বলিতে-বলিতে তাহার চক্ষু কোটরে বসিয়া গেল। একটি বালক চীৎকার করিয়া বলিল 'মামার বোধ হয় ভিরমি লাগ্‌বে, আপনারা দেখুন।'

দেখিবার পূর্ব্বেই 'দিমি' লাগিয়া গেল।

স্ত্রীলোকটি ডাকিয়া বলিল, 'পানি পাঁড়ে, জল্‌দি আও।'

দুই-চারি ঘটি জল মাথায় ঢালিবার পর, জগতের মহাতীর্থযাত্রী মহাশয় বিনীত স্বরে ধন্যবাদ দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ওঝা। আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

স্ত্রীলোক। আপনি কবি?

যাত্রী। আমি কবিও না, গন্তব্য স্থানও নাই। আমি ডোমিসাইল্‌ড্‌ বাঙ্গালী। একটা চাকুরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

নামাবলী-পরিহিত যাত্রী দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া বলিল, 'আপনার কোনো ভাবনা নাই,—আপনার জন্য আমি চাকুরি ছাড়িয়া দিব। আমার মনিব চামড়ার ব্যবসা করেন; আমি হিসাব লিখি। মুশাহরা প্রায় পঞ্চাশ টাকা।'

মহাতীর্থযাত্রী। কিসের হিসাব?

নামাবলী। গরুমারার হিসাব। উপরন্তু, প্রত্যেক চামড়ায় চারি আনা লাভ।

মহাতীর্থযাত্রী। এটা নিষ্ঠুর কাজ।

স্ত্রীলোক। মোটেই না। গোবধ না করিলে চর্ম্ম হয় না। চর্ম্ম নহিলে জুতা হয় না। জুতা নহিলে পেটা হয় না। জুতা পেটা নহিলে জ্ঞানের উদয় হয় না। জ্ঞান নহিলে দয়ার উদ্রেক হয় না। সুতরাং নিষ্ঠুরতা হইতে দয়ার উৎপত্তি। 'মাতৃজঠরাৎ সন্তানো এব চ'।

ওঝাজী। ঠিক, এখন অনুমতি হইলে আমি গয়া ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেণে চলিয়া যাই।

স্ত্রীলোক। ব্যস্ত হবেন না। আমিও গয়াযাত্রী।

তিন-চারিজন যাত্রী বলিয়া বসিল—'আমরাও গদাধরের পাদপদ্ম দেখ্‌তে যাচ্ছি।'

স্ত্রীলোক। তবে মোট মাথায় লউন।

সকলে পরস্পরের মোট সমান ওজনে বিভক্ত করিয়া

কেহ হস্তে, কেহ বা মস্তকে স্থাপন করিয়া, ব্রাঞ্চ লাইনের পথে অগ্রসর হইলেন।

(৩)

অন্যান্য যাত্রী অপেক্ষা গয়াযাত্রীর অবস্থা একটু Tragic রকমের। তাহারা বিষাদের ভার স্কন্ধে বহন করিয়া পিণ্ড দিতে যায়। এবং এই ভাব গয়ালি পাণ্ডা চট্ করিয়া বুঝিয়া লয়।

গদাধর পাণ্ডা 'ডোমিসাইলড্' বাঙ্গালীদিগের পাণ্ডা। ওঝাজী বন্ধুগণকে লইয়া তাহারই শরণাগত হইলেন।

স্ত্রীবন্ধু জেন লুৎফউন্নিসা চৌধুরাণী প্রথমে মস্তক-মুণ্ডনের প্রস্তাবনা করিলেন। পাণ্ডাজী বলিলেন যে, স্বামীর শ্রাদ্ধে সে প্রথা প্রচলিত নাই। তবে—

'আপনি হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত?'

জেন। নিশ্চয়।

পাণ্ডা। আপনার স্বামীর নাম?

জেন। এখনও আমার বিবাহ হয় নাই; ভাবী স্বামীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধটা করিয়া রাখিতেছি। ইহা শাস্ত্রসঙ্গত কি?

পাণ্ডা। নিশ্চয়। জন্মিবার পূর্ব্বেও অনেকে পিতামাতার পিণ্ডদান করিয়া ঋণমুক্ত হইয়াছে।

ওঝাজী। ঠিক বুঝা গেল না।

পাণ্ডাজী। ইহার জন্য শাস্ত্র ভাল করিয়া জানা উচিত। আমরা পূর্ব্বজন্ম ও পরলোক মানিয়া থাকি। মনে করুন, রাম নামক কোন ভদ্রলোক যদি আমাকে আসিয়া বলে, পাণ্ডাজি, আমি এজন্মের পিতা শ্যাম, এবং পরজন্মের ভাবী পিতা (তাহার নাম এখনও জানা নাই—কিন্তু 'যথানাম' বলা চলিতে পারে) উভয়ের শ্রাদ্ধ একেবারে সারিয়া লইতে চাহি'; তবে এক খরচেই উভয় ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে। কখনো-কখনো এমন হয় যে, পূর্ব্বজন্মের পিতা যদুর শ্রাদ্ধ বাকি পড়িয়া আছে। সেস্থলে আমরা Extrapeer charge করি।

জেন। কিন্তু স্ত্রী পিণ্ডের অধিকারী কতদূর?

পাণ্ডাজী। যতদূর খুসি। পুত্রের জন্য ভার্য্যা এবং পিতৃর জন্য পুত্র, সত্য বটে। কিন্তু পুত্রের যদি পিণ্ড দিতে প্রবৃত্তি না হয়, তবে পুত্রের মাতা, স্বামীর মুক্তির উদ্দেশ্যে পালন করিবার অধিকারিণী। তাহার মন্ত্র 'আর্য্যপুত্রের' উদ্দেশে। এ সম্বন্ধে consultation fees এক টাকা দিতে হয়।

এই প্রকার কথোপকথন অনেকক্ষণ চলিতে লাগিল। ইত্যবসরে জগতের মহাতীর্থযাত্রী একপুরিয়া কুইনাইন সেবন করিয়া কবিতা লিখিতেছিলেন; তাহা শেষ হইলে, সকলকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন—

প্রথম প্রণয়।

শীতের প্রকোপে দেহ করে থরথর,
নদী গিরি কুঞ্জবন
কম্পান্বিত ঘন ঘন
বকুল বৃক্ষের তলে দ্বিপ্রহরে জ্বর!
সারারাত্রি অগ্নিদাহ
লুকোনো বেদনা,
প্রথম প্রণয় জাত
মরম যাতনা।

২

নিমীলিত আঁখি মেলি দেখিল উষায়
ঘর্ম্ম দিয়া জ্বর ছাড়ি দূরেতে পলায়।
সে কহিল কাঁদি—
'আগে যদি দিতে পরিচয়'
হইতাম তোমারি নিশ্চয়।

ওঝাজী। বেশ হয়েছে।

জেন। আপনি কিসের পুরিয়া খেয়েছিলেন?

মহাতীর্থযাত্রী। ডোমিসাইলড্ হবার পূর্ব্বে আমার ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল,—অভ্যাসবশতঃ এখনও কুইনাইন খাই।

জেন। সেই জন্য কবিতাও কম্পজ্বরের মত দাঁড়িয়েছে। যাহা হউক, জ্বরের সঙ্গে নায়িকার পলায়ন আপনার পক্ষে নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা বল্‌তে হবে। নচেৎ কবিতা বেড়ে যেত।

নামাবলী-পরিবৃত যাত্রী বলিলেন যে, এই রকম একটা কবিতা হাফেজে কিংবা কবি-কঙ্কণের চণ্ডীতে পাঠ করেছি,—ঠিক মনে নাই কোন্‌টায়।

ওঝা। আপনি পার্শ্য ভাষা জানেন?

নামাবলী। নিশ্চয়। প্রথমে, জজের কোর্টে সেরেস্তাদার হবার জন্য পার্শি শিখেছিলুম; এবং একটা

খোস্‌গল্প তৈয়ারি করিয়া জজ সাহেবকে শুনিয়েছিলুম। কেবল স্ত্রী-বিয়োগ হয়ে চাকুরি গ্রহণ করি নাই।

জেন। সেই খোসগল্পের আভাস আমরা একটু পাইতে পারি কি ?

নামাবলী। যতদূর মনে আছে খানিকটা বলি—

মহম্মদপ্রমুখ মক্কাসহরে এক মোসম্মাত্‌ ছিলেন। তাঁহার নাম ময়নাবিবি। যত মুসাফের মক্কায় যাইতেন, তাহার মধ্যে কাহারো মৌত (death) হইলে, ময়নাবিবি মস্‌জিদের পার্শ্বে গিয়া মুখে মসলন্দ ঢাকিয়া দিতেন। এইরূপে তাহাদের মুক্তি হইত।

একদিন একজন মৌলবি একটি মুন্সেফের সহিত মুরগী ক্রয় করিতে হাটে আসেন। মসজিদ্‌ হইতে এক মাইল দূরে সেই হাট। হাটের মধ্যে একজন মুরীদ (গুরু) মুরশীদের (শিষ্যের) সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া, মুন্সেফের দিকে তাকাইয়া বলিলেন যে, আপনার ধর্ম্মাধিকরণে আমার একটা মোকদ্দমা আছে,—তাহা এই মুয়ন্নসের (স্ত্রী) বিরুদ্ধে! আমার মোক্তার নাই; কিন্তু ধর্ম্ম মুজরিমগণের (অপরাধী) বিচার করেন। কথাটা এই যে, ঐ মোসম্মাত্‌ আমার মুরশিদের সহিত মোলাকাত পূর্ব্বক মুচকিয়া হাসিয়াছিল; তাহাতে আমার মস্তক গরম হইয়া গেল। আমি বলিলাম, 'রে মোসম্মাত, তুমি এখনই দূর হইয়া মদীনায় চলিয়া যাও।'

মোসম্মাত বলিল 'আপনার মেহেরবানি দেখিয়া বোধ হয় যে, আপনি কোন মখতবে পাঠ করেন নাই। অতএব মস্তক মুণ্ডন করিয়া মোবলগ দুই টাকা মুসাফের দরবেশ-গণকে দান করুন।

আমি তাহার উত্তর দিতেছিলাম; কিন্তু সে অপেক্ষা না করিয়া, আমার মুখে চপেটাঘাত করিয়া চলিয়া যায়।

জেন। আর বেশী বলিবার দরকার নাই। আমার বোধ হয় মুসলমানী ভাষায় আপনার ন্যায় অনুপ্রাস-দক্ষ সাহিত্যিক খুব বিরল। আমি শীঘ্রই সুফি জলালুদ্দিনের গ্রন্থের ইংরাজী তরজমা করিব। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে যোগদান করিতে পারেন।

নিখিল প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

ঘর-কন্নার কথা।

প্রথমেই দেখা যাক্‌ রাঁধা-বাড়ার ব্যাপারটা। আজ-কালের বৌ-ঝিয়েরা শুনতে পাই, রান্না-ঘরের নাম শুনলেই ভয় পান। অনেক বাড়ীর অবস্থা এমন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, একদিন বামুন না এলে, সকালবেলাটা হয় ত মেয়েরা কোনও রকমে হিমসিম খেয়ে ভাতে-ভাতটা নামিয়ে দেন,—ওবেলা আর পেরে ওঠেন না; কাযে-কাযেই রাত্রে বাবুদের দোকান থেকে পাঁওরুটি বা লুচি-তরকারী কিনে এনে অনাহারের হাত এড়াতে হয়। কিন্তু মজা এইটুকু যে, যে বিলিতি সভ্যতার আদর্শে আমাদের মেয়েছেলেরা আজকাল আলমারীর বিবি হ'য়ে উঠছেন, তাঁদের দেশের অধিকাংশ ভদ্র-ঘরের মেয়েরাই রাঁধা-বাড়া থেকে সুরু করে, ঝি, চাকর, ধোপা, ধাঙড়ের কায পর্য্যন্ত বেশ প্রসন্ন মনে স্ব-ইচ্ছায় নিজেরাই সম্পন্ন করে থাকেন। তবে তফাৎ এইটুকু যে, তাঁরা বুদ্ধি খাটিয়ে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান আর কল-কব্জার সাহায্য নিয়ে, তাঁদের ঘরকন্নার কায এত হাল্কা করে ফেলেছেন যে, সংসারের কিছু করতে হ'লে, তাঁদের আর আমাদের মেয়েছেলেদের মত হিমসিম খেতে হয় না। তা'ছাড়া, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা নিজেদের ঘর-সংসারের কায সব শেষ করে ফেলেন যে, সব দিক বজায় রেখেও, বিকেলে টেনিস খেলা, সন্ধ্যে বেলা বেড়ানো, একটু গান-বাজনা করা, বইপড়া, বায়োস্কোপ দেখা, থিয়েটারে যাওয়া—এ সবেরও তাঁরা যথেষ্ট সময় পান। আমাদের ঘরের গিন্নীদের মতন সংসারের কাযে এমন ভাবে তাঁরা জড়িয়ে হাতা-জোবড়া হ'ন না যে, একেবারে মরবার অবকাশ বা নিঃশ্বাস ফেলবার সময়টুকু পর্য্যন্ত থাকবে না! এক ত' কয়লার উনুনের বালাই সে দেশে এক রকম নেই ব'ললেই হয়,—অধিকাংশ বাড়ীতে হয়

রান্নাঘরে কল-চৌবাচ্ছা

ইলেক্‌ট্রিক, নয় গ্যাসের চুলো। যাঁদের তা জোটে না, তাঁরা অন্ততঃ তেলের (কেরোসিন বা পেট্রোল) 'ষ্টোভ' ব্যবহার করেন। আর নেহাৎ যাঁদের কয়লার উনুনেই কারবার করতে হয়, তাঁরা এমন বন্দোবস্ত করে নেন যে, সেজন্য তাঁদের একটুও অসুবিধে ভোগ ক'রতে হয় না। যাঁদের তেতলায় রান্নাঘর, তাঁদের রাঁধবার জলের ঘড়া ব'য়ে-ব'য়ে তেতলায় টান্‌তে হয় না,—রান্নাঘরের ভেতরেই একটি কল-চৌবাচ্ছা করিয়া নেন। উনুনের কয়লা আনিয়ে রান্নাঘরের পাশে বা ছাতের কোণে ঢালিয়ে রেখে সেখানটা নোংরা করেন না। সেই একতলায় সিঁড়ির নিচের, কিম্বা অন্য কোনও সুবিধে মত জায়গায় রাখিয়ে দেন। উনুন ধরাবার জন্যে কয়লার দরকার হ'লে, মনে কর্বেন না যেন যে, তাঁরা প্রতিবার তেতলা থেকে এক-তলায় নেমে এসে, কয়লার ঝুড়ি মাথায় করে আবার তেতলায় গিয়ে ওঠেন। তেতলার রান্নাঘর থেকে নীচের কয়লার ঘরের সঙ্গে কপি-কলের যোগ থাকে। যখনই কয়লার দরকার হয়, তাঁরা তেতলা থেকেই কপি-কল টেনে কয়লা তুলে নেন। উনুনে আগুন প'ড়লে, সকালে-বিকেলে ধোঁয়ার চোটে বাড়ীশুদ্ধ লোককে অস্থির হয়ে উঠ্‌তে হয়

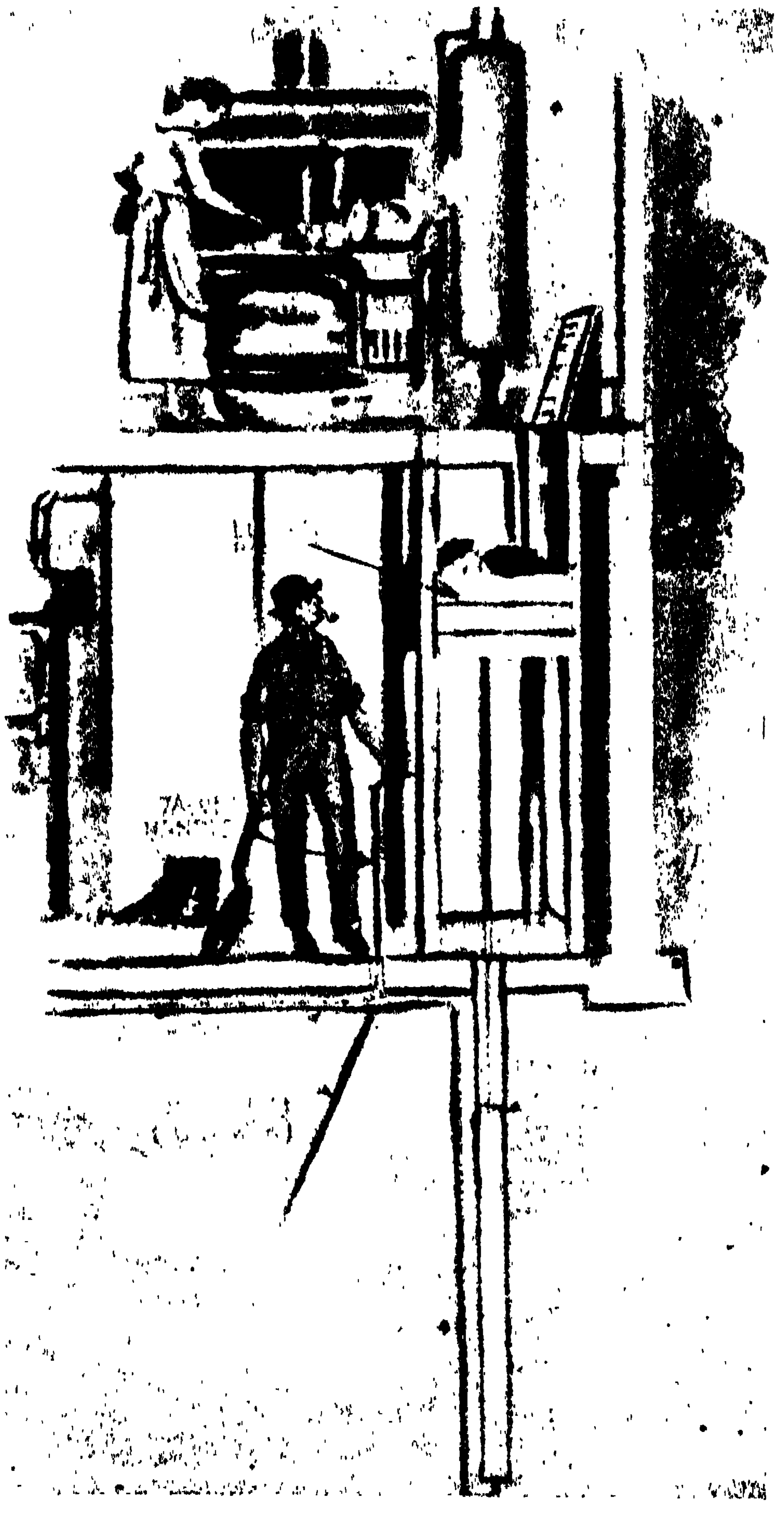

তেতলায় কয়লা তোলা

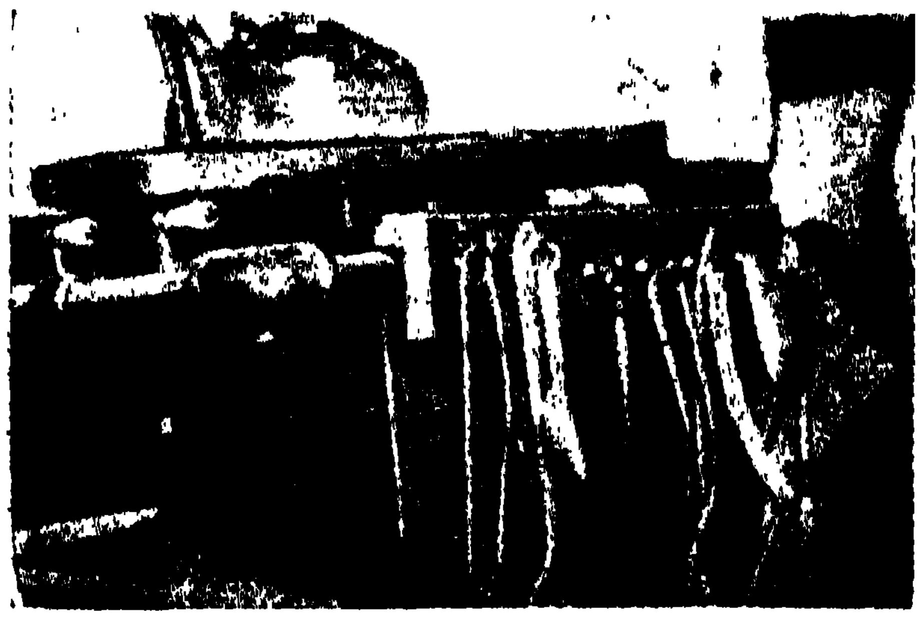

হাতা বেড়ীর আল্‌না

না; উনুনটি ঘিরে তার মাথার ওপোর দিয়ে একটি চিমনীর মত নল গাঁথিয়ে রাখেন, উনুনের সমস্ত ধোঁয়া সেই নল বেয়ে ওপোরে উঠে আকাশে মিলিয়ে যায়। রান্না-বান্না চুকে গেলে, উনুনটি ঝেড়ে একটি 'ছাই-ফেলায়' রেখে দেওয়া হয়। চাকরে যখন সেটা রাস্তায় খালি করে দিয়ে আসতে যায়, তখন বেশ করে নেড়ে-চেড়ে নেয়; কারণ, ঐ ছাই-

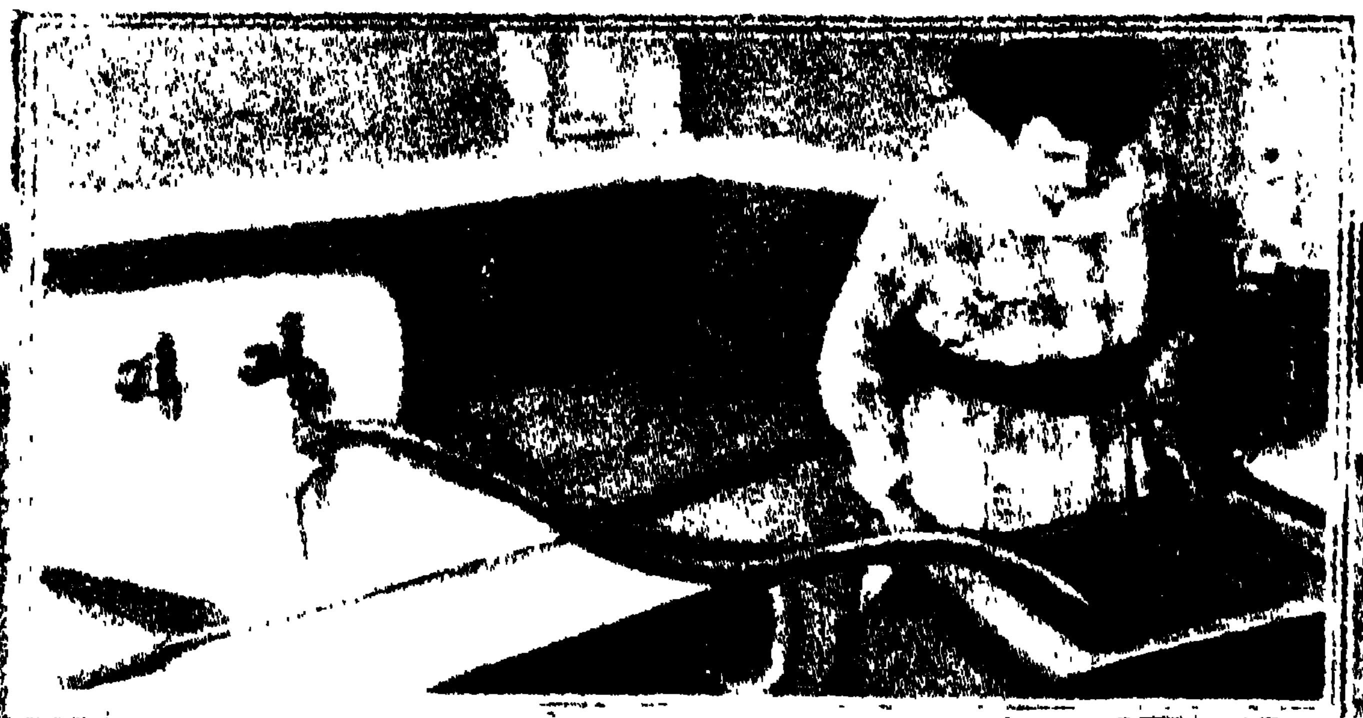

চুলো সাফ করা

উনানের তেলকালি তোলা

গরম জলে ঘটিবাটি ধোয়া

ন্যাতা রাখা

হাঁড়ি কুড়ির শিকে

বাসন ধোয়া কল

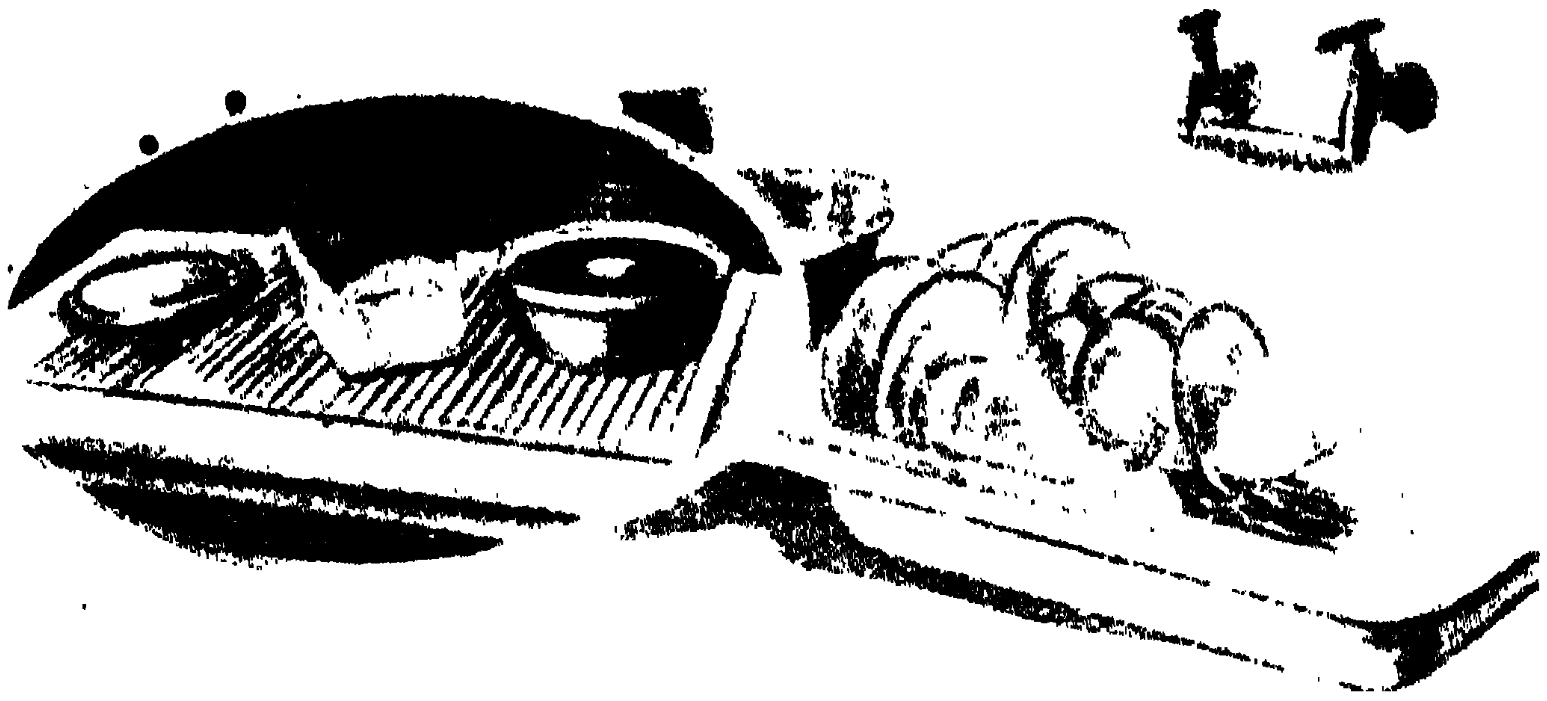

গরম জিনিস জুড়োনো

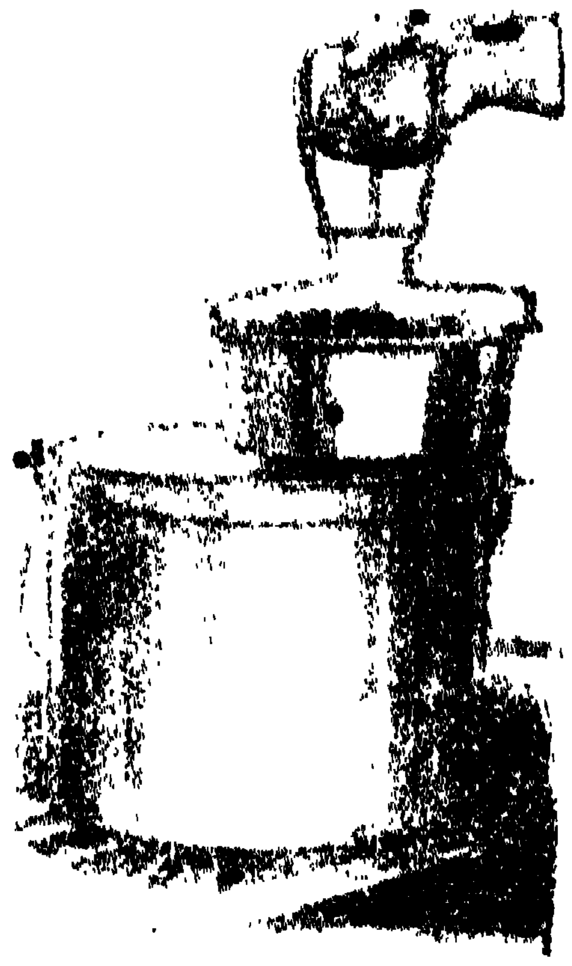

বিলিতি বেড়ী

কাঠের থালে রান্না

ভাজা ভাজবার কায়দা

কেলার মধ্যে এমন কায়দা করা আছে যে, নাড়লে-চাড়লেই ছাই আলাদা হয়ে যাবে, আর আধপোড়া কয়লাগুলি ভেতরে থাকবে। হাতা, বেড়ী, খুন্তি, ঝাঁঝরী, চামচে, ডাল-ঘোঁটা চিম্‌টে, বাঁড়াশী, ছিঁচ্‌কে—এগুলো সদা-সর্ব্বদা হাতের কাছে পাবার জন্যে, তাঁরা বুদ্ধি করে, হেঁসেল-ঘরের দেয়ালে, উনুনের ধারে, একটা কাঠের ওপোর পেরেক মেরে, তাইতে সেগুলো ঝুলিয়ে রেখে দেন। রাঁধতে-রাঁধতে কখন সেগুলো মেঝের উপর নামিয়ে রেখে ধুলো-কাদা মাখান না! রান্নাঘরে জায়গা অল্প হ'লে, বাসনকোসন, হাঁড়ি-কুড়িগুলো সব

কেরোসিনের চুলো

রাঁধুনীর চৌকি

ময়দা মাখা কল

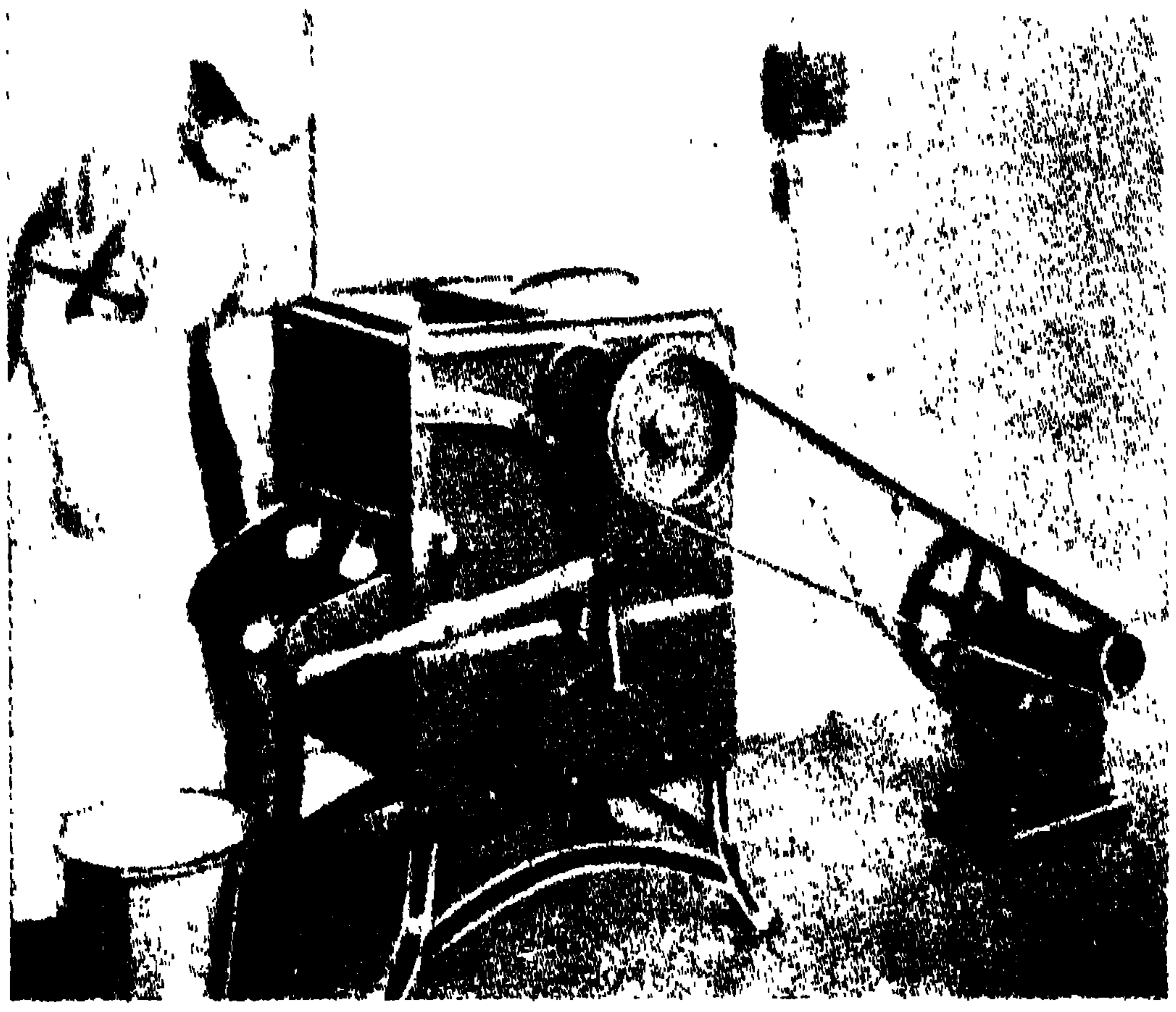

আলু ছাড়ানো কল

মেঝেয় না ছড়িয়ে রেখে, শিকেয় টাঙিয়ে রেখে দেন। রাঁধুনীর হাত-মোছা কিম্বা হাঁড়ি, কড়া, থালা, বাটী প্রভৃতি সাফ্ করা ন্যাতা-কানিগুলি পর্য্যন্ত কেচে পরিষ্কার ক'রে দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখেন। লোহার উনুনটি রোজই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখেন। তেলকালি ধরে গেলে, আগুনের শীষের আঁচ দিয়ে তাকে পুড়িয়ে সাফ্ ক'রে ফেলেন। ঘটি-বাটিগুলো ব্যবহার কর্ব্বার আগে রোজ গরম জলে ধুয়ে নেন। ওদের দেশে বাসনমাজা

কল বেরিয়েছে; সুতরাং বাসন ধোবার জন্যে আর ঝিয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। আর ক'লের সাহায্যে বাসন ধোয়া হয় ব'লে, গিন্নীদেরও হাতে-পায়ে হাজা ধরবার বা জল ঘেঁটে অসুখ কর্বার ভয় থাকে না।

নেবু নিংড়ানো চিম্‌টে

এই বাসন-ধোয়া কলে থালা-বাটি-রেকাবগুলো গুছিয়ে দেবার জন্যে যে ট্রে-খানা ব্যবহার হয়—সেখানা খাদ্‌রি-কাটা আর তলা-ফাঁক বলে, কোনও গরম জিনিস চট্ ক'রে

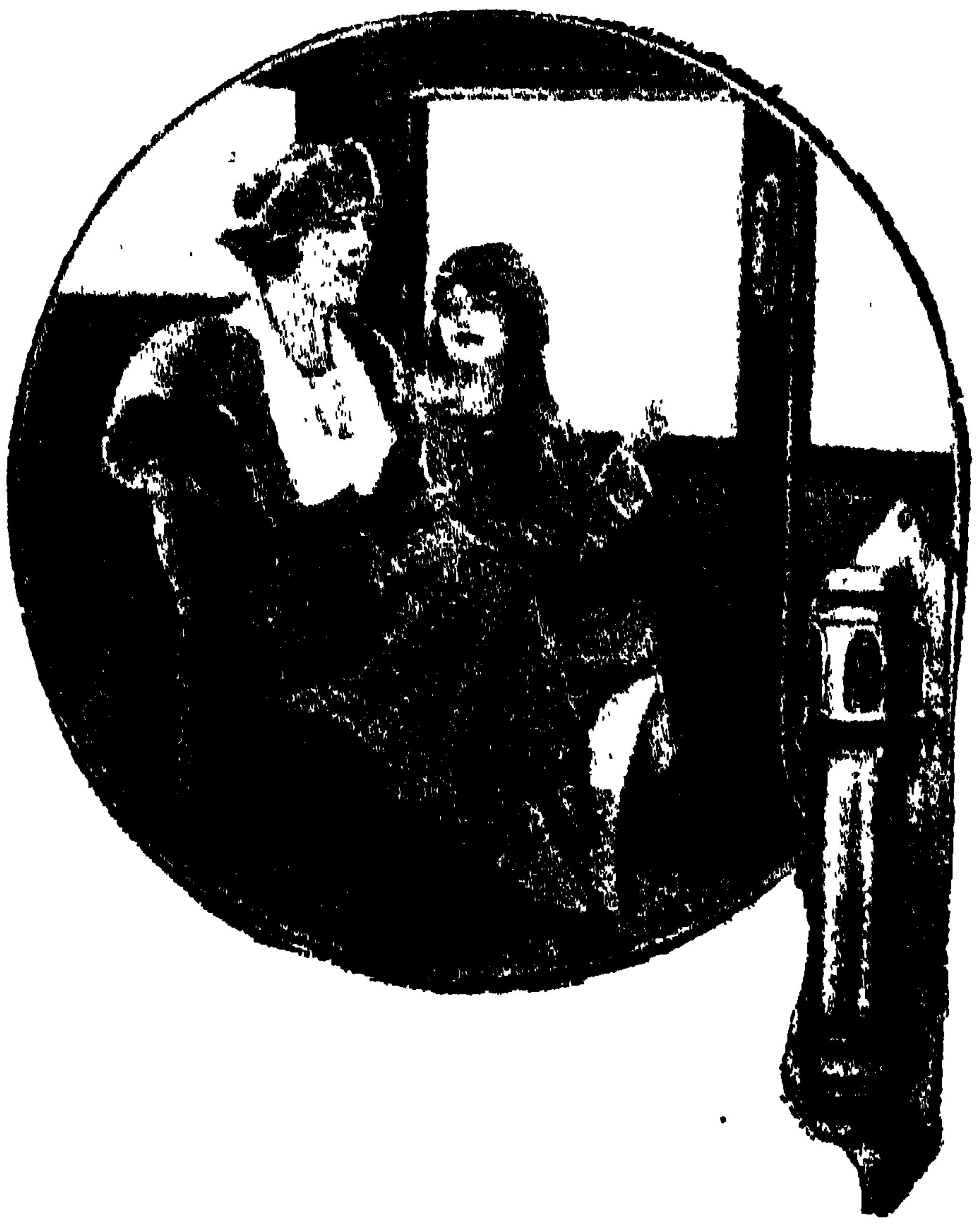
গাড়ীতে আগুন পোয়ানো

জুড়িয়ে নেবার দরকার হ'লে, তার ওপোর চড়িয়ে দিলেই শিগ্‌গীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

এ দেশের মত বিলেতেও পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা কাঠের জালে রান্না করে; কিন্তু ওর ভেতরেও তাদের একটু নূতনত্ব আছে। একই আঁচে ভাত রাঁধা আর মাছ ভাজা দুই চল্‌তে পারে, এমন ধারা লোহার আকা তারা ব্যবহার করে; মাটির উনুন গড়ে নেয় না। আমাদের মেয়েরা ভাজা ভাজবার সময় ঝাঁঝ্‌রী ব্যবহার করেন। লুচি-কচুরী ভেজে

কয়লার উনান

তুলে নিয়ে, তার গা থেকে ঘী, তেল ঝরিয়ে নেবার জন্যে ঝাঁঝ্‌রী-খানা কড়ার গায়ে দু'চারবার ঝেড়ে নিয়ে, তার পর পাশের ঝুড়িতে ফেলে দেন। প্রতিবার এই রকম ঝাঁঝ্‌রী

ছাই ঝাড়া

ঝাড়তে কতক্ষণ যে খোলা কামাই যায়, আর বৃথায় ঘী তেল পোড়ে, সেটা যদি কোনও কৃপণ গিন্নী হিসেব ক'রে দেখেন, তা'হলে আপশোষ করবেন। ওরা সে হিসেবটা করে দেখেছে বলেই, ভাজা ভাজ্‌বার সময় নিতান্ত ঝাঁঝ্‌রী না

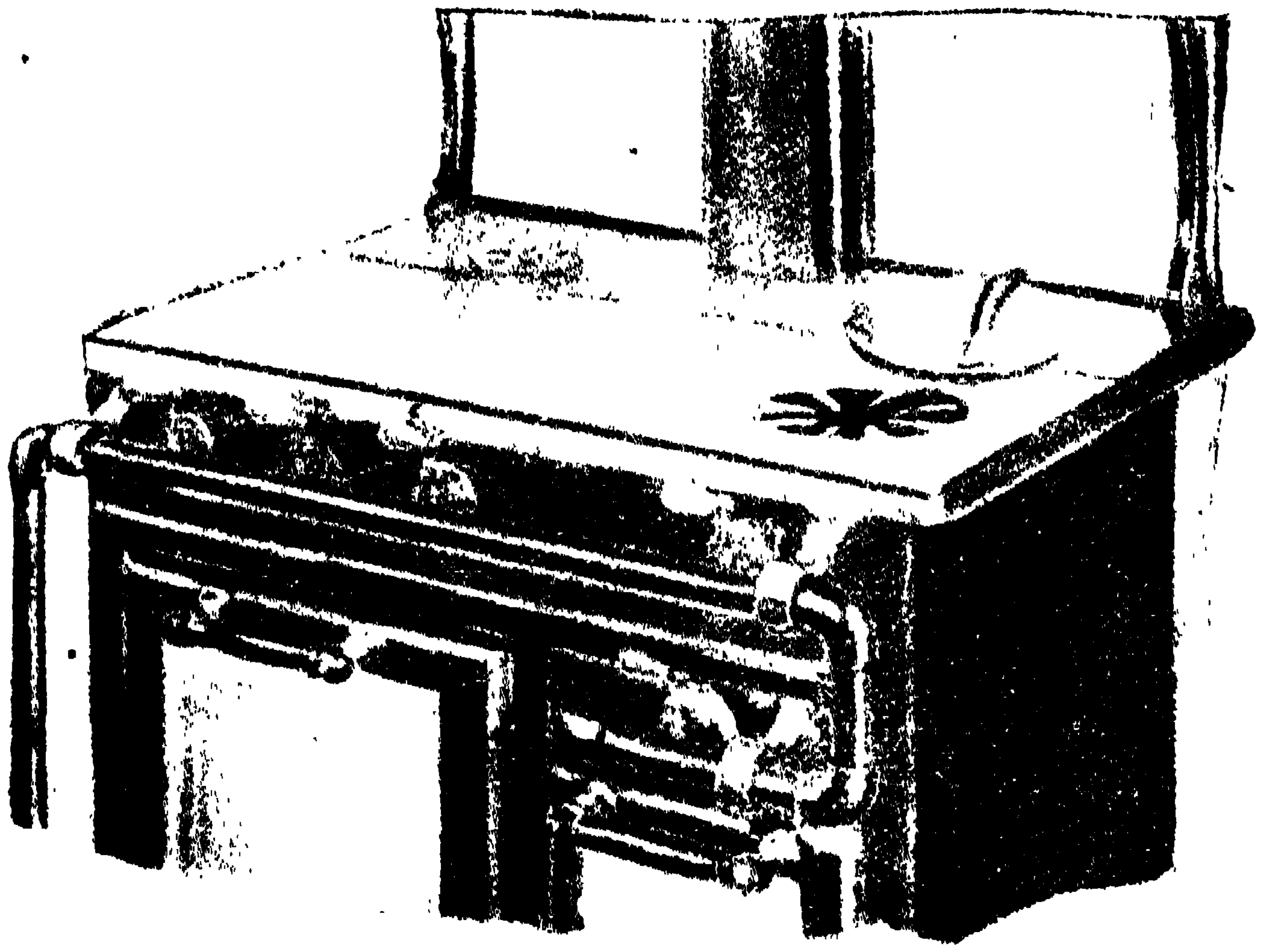

গ্যাসের উনান

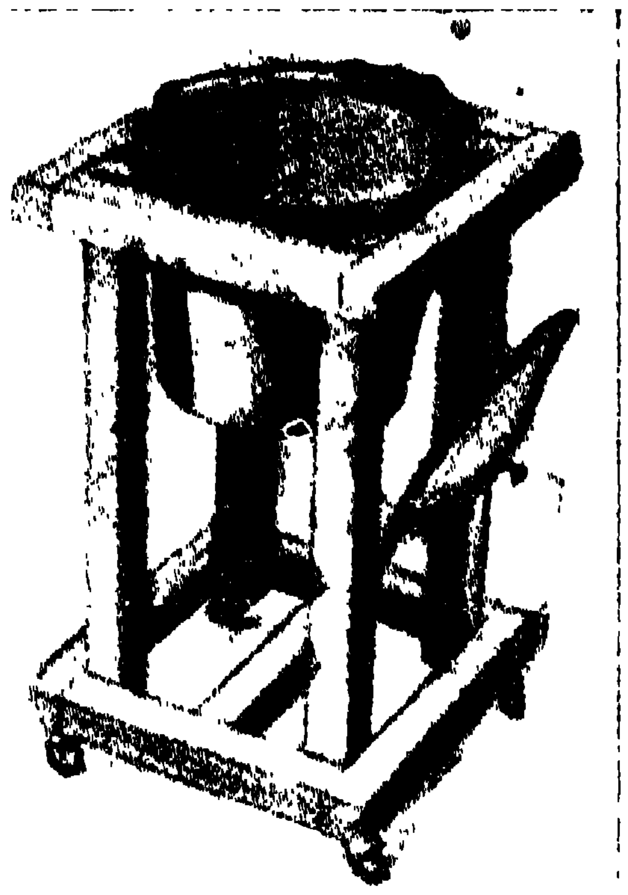

জঞ্জাল-ফেলা

বাজারের ঝুড়ি

নিতাত কেট্‌লি

হয় কাঁটা ব্যবহার করা সত্ত্বেও, খোলার ওপোর একটা তারের জাল্‌তিও ঝুলিয়ে রাখে। জিনিসটা ভেজে কাঁটায় গেঁথে তুলে নিয়েই, সেই তারের জাল্‌তির ওপর রেখে দিয়ে, আবার আর একটা ভাজ্‌তে সুরু করে,—খোলা কামাই দেয় না। ততক্ষণে, আগের ভাজির গা থেকে ঘী তেল যা কিছু সব ঝরে তারের জাল্‌তি গ'লে আবার রাঁধুনীর খোলায় গিয়েই জড় হয়। আমাদের মেয়েরা যে বেড়ী ব্যবহার করেন, তা' দিয়ে ছোট-বড় সব হাঁড়ী ধরা যায় বটে, কিন্তু একটু ভারি। ওদের বেড়ীটা হাল্‌কা; আর দেখ্‌তেও ভালো'। তা'ছাড়া, ওদের বেড়ী স্প্রাংয়ের বলে, হাঁড়ী বোক্‌নো

বেশ শক্ত করে ধরা যায়। কিন্তু আমাদের বেড়ী স্প্রীংয়ের নয় বলে, অনেক সময় হড়্‌কে যায়। তবে আমাদের বেড়ীর আর একটা গুণ আছে যে, তার পেছনটা দিয়ে সাঁড়াশীর কায হ'তে পারে,—ওদেরটা দিয়ে তা হবার যো নেই; পাছে বেড়ী তেতে উঠে হাতে আঁচ লাগে, তাই ওদের বেড়ীতে একটা কাঠের হাতোল আঁটা আছে। আমাদের বেড়িতে ওসব হাঙ্গামার দরকার হয় না; কারণ আমরা হাঁড়ির পাশের দিক থেকে বেড়ী ব্যবহার করি; কাযেই আঁচ লাগবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ওদের হাঁড়ীর ওপর থেকে

রুটি-ভাজা (ইলেক্‌ট্রিক টোষ্টার)

বেড়ী ব্যবহার করতে হয়, কাযেই আঁচ লাগবার সম্ভাবনা একটু বেশি।

রাঁধুনীর সুবিধের জন্যে, ঘরের যেখানে যখন ইচ্ছে টেনে নিয়ে যাওয়া চলবে বলে, খুরোয় চাকা লাগান এক রকম চৌকি ওরা রান্না-ঘরে ব্যবহার করে। এই চৌকির ডান দিকের হাতলের কাছে একখানি ছোট্ট কোণ-মারা তক্তা টেবিলের মত আঁটা আছে। তার তলায় আবার একটি টানা দেরাজ থাকে। রাঁধুনী এই চৌকিতে বসে' পাশের হাতোল-টেবিলের ওপর কিছু রেখে স্বচ্ছন্দে কায করতে পারে। রাঁধুনীর দরকারি টুক্‌টাক জিনিসপত্র ঐ টানা দেরাজটায় বেশ রাখা চল্‌বে। ওদের দেশে শীত বেশি বলে' প্রায় সব বাড়ীতেই আগুন পোয়াবার ব্যবস্থা আছে। যাদের বাড়ী কেরোসিনের চুলো ব্যবহৃত হয়, তাদের আর আগুন পোয়াবার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করতে হয় না,—রান্নাবান্নার পর সেই কেরোসিনের চুলোটিকে তুলে এনে, শোবার ঘরে কিম্বা বস্‌বার ঘরে পেতে রেখে,

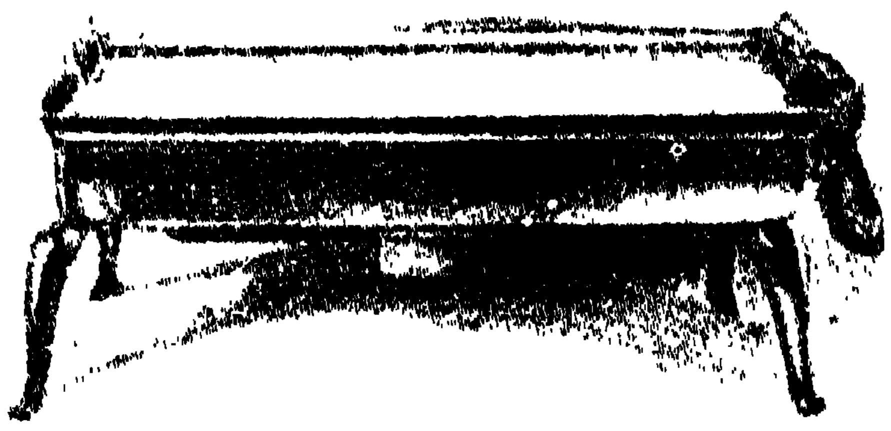

ইলেক্‌ট্রিক উনান

একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে এসে তার পাশে বসে, আগুন পোয়াতে-পোয়াতে বেশ কাঁথা শেলাই করা, বা পশম বোনা চলতে পারে। গাড়ী চড়ে কোথাও যাবার সময় বড্ড শীত বোধ হলে, চাই কি ওটা গাড়ীতেও তুলে নিয়ে আগুন পোয়াতে-পোয়াতে যাওয়া চলে। ময়দা মাখবার সুবিধের জন্যে ওদের দেশের মেয়েরা ময়দা-মাখা কল কিনে এনে

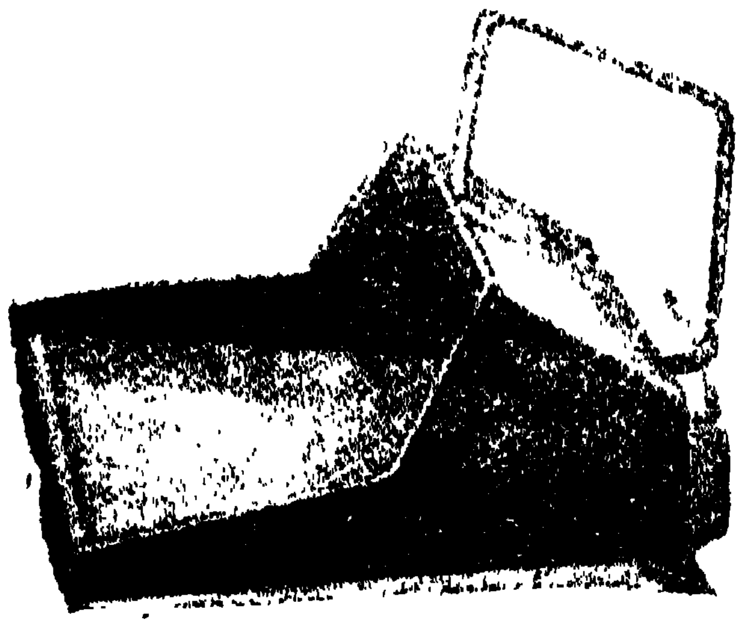

জঞ্জাল তোলা

ব্যবহার করে। যাদের বাড়ী পরিবার বেশি,—রোজ ৫।৭ সের ময়দার কারবার করতে হয়,—তাদের কিন্তু নিরুপায় হ'য়ে দিনের পর দিন সেই যত্তির ময়দা নিজেদেরই মেখে বেলে দিতে হয়। তাঁরা যদি এই ময়দা-মাখা কলের আশ্রয় নেন, তা'হলে তাঁদের অনেক পরিশ্রম লাঘব হ'য়ে যায়। বাড়ীতে একটা কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভোজের আয়োজন হ'লে, পাড়ার মেয়েছেলেদের খোসামোদ ক'রে নিয়ে এসে

কুটনো কুটিয়ে নিতে হয়। একমণ, দেড়মণ আলু-পটোল ছাড়াতে-ছাড়াতেই তাঁদের অনেক সময় রাত তিনটে বেজে যায়। ওদের কিন্তু সে রকম ক্ষেত্রে কারুরই সাহায্য দরকার হয় না। ওরা একটা আলু-ছাড়ানো কল নিয়ে এসে কাজ চালিয়ে দেয়। ঐ কলে এক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় চার মণ আলুকে বেশ করে ধুয়ে ছাড়িয়ে আবার ধুয়ে পরিষ্কার করে

মাখন তোলা

দিতে পারে। ওরা কোনও কিছু আহার্য্য বস্তুতে নেবু নিংড়ে খাবার জন্যে, সমস্ত হাতখানায় নেবু চটকে মাখামাখি করে না। নেবু নিংড়ে খাবার জন্যে ওরা একরকম সোন্নার মত ছোট চিমটে ব্যবহার করে। তার মাঝখানে একটা শলার মত কাঁটা থাকে; আধখানা করে চেরা নেবু সেই কাঁটায় গেঁথে নিয়ে, চিমটের চাপ দিলেই নেবুর সমস্ত রসটুকু নিঃশেষে পাতে এসে পড়ে।

কেট্‌লী থেকে গরম জল কিম্বা চা ঢালবার সময়, ফস্ ক'রে ঢাক্‌নাটা খুলে গিয়ে, অনেক সময় হাতে ভারি তাত লাগে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে একরকম 'নিতাত-কেট্‌লি' তৈরি হয়েছে। ঐ কেট্‌লীর হাতোলটা ঠিক কেট্‌লীর গায়ে না বসিয়ে একটু মাথার দিকে ঘেঁসে বসানো হয়েছে; আর হাতোলের সাম্‌নে ঠিক তরোয়ালের বাঁটের মত একটা "মুষ্টি-বর্ম্ম" আঁটা আছে। এই মুষ্টি-বর্ম্ম থাকার দরুণ, কেট্‌লীর ঢাক্‌না খুলে গেলেও, হাতে তাত লাগবার ভয় থাকে না।

ও দেশের মেয়েরা নিজেরাই গিয়ে দেখে-শুনে বাজার-হাট করে নিয়ে আসে,—ঝি-চাকর বা সরকার মশা'য়ের ওপর নির্ভর করে থাকে না। কিন্তু বাজারের ঝুড়ী ভারি হয়ে গেলে ব'য়ে আনতে কষ্ট হয় বলে' ওরা একরকম চাকাওয়ালা

রুটিভাজা (স্পিরীট ল্যাম্প)

বাজারের ঝুড়ি ব্যবহার করে। এ ঝুড়ি যতই ভারি হোক্, চাকা থাকার দরুণ রাস্তা দিয়ে বেশ গড়গড় করে সহজেই টেনে আনা যায়।

বাড়ীতে রুটির সঙ্গে ব্যবহার করবার জন্যে ওরা ঘরেই দুধ থেকে মাখন তোলে। এই মাখন তুল্‌তে যাতে কোনও কষ্ট না হয়, এই জন্যে এক রকম নতুন ধরণের মাখন-তোলা কল বেরিয়েছে। রান্নাঘর কিম্বা ভাঁড়ার ঘরের দেয়ালে এই কলটি খাটিয়ে নিতে হয়। টাট্‌কা দুধ কিম্বা বাসি দুধ থেকে এই কলে দু' এক মিনিটের মধ্যেই মাখন তোলা যায়।

রুটির টোষ্ট তৈরি করে দেবার জন্যে এখন আর গিন্নীদের কোনও কষ্ট পেতে হয় না। ইলেক্‌ট্রিক্ রুটি ভাজার সরঞ্জাম কেনা থাক্‌লে, যখন ইচ্ছে তাঁরা বৈঠকখানায় কি শোবার ঘরে বসেও রুটির টোষ্ট তৈরি ক'রে দিতে পারেন। যাঁদের বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক্ নেই, তাঁরা স্পিরীট ষ্টোভে রুটিভাজা সরঞ্জাম লাগিয়ে নিলে, যখন ইচ্ছে তৈরি করে দিতে পার্ব্বেন।

ঘরে ঝাঁট দেবার পর, হাত দিয়ে বা খ্যাংরা দিয়ে জঞ্জাল তুলে ফেল্‌তে বড় অসুবিধে হয়,—সবটুকু একেবারে নিঃশেষে

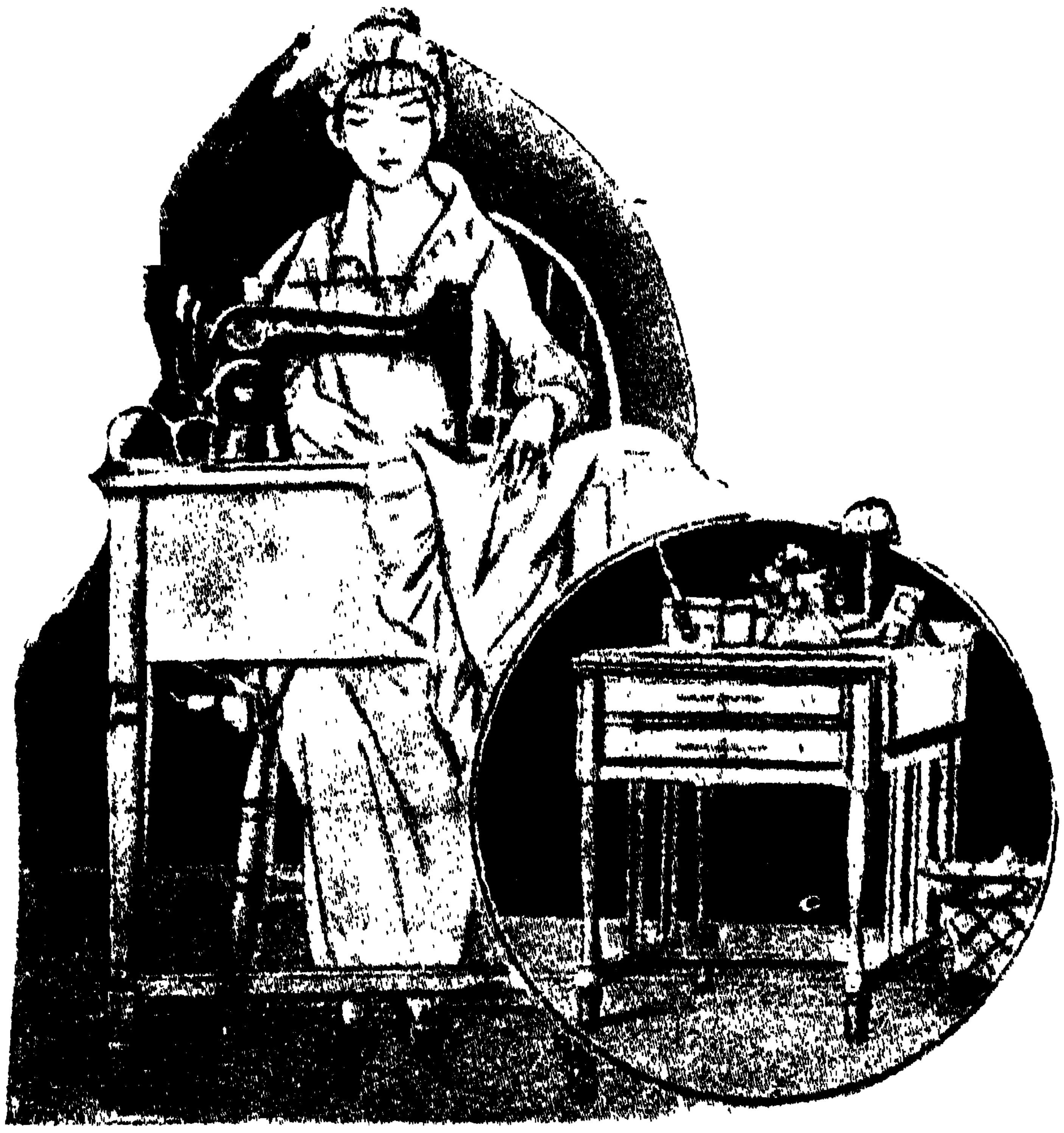

সেলাইয়ের কল

কাপড় কাচা কল

কাপড় খুপে নেওয়া

কাপড় ধোয়া

কাপড় ইস্ত্রি করা

লেশ ইস্ত্রি করা

কলার ইস্ত্রি করা

ওঠে না। এই জন্যে ওরা একরকম 'জঞ্জাল তোলা' ব্যবহার করে; তাতে ঘরের সব জঞ্জাল একেবারে ঝেঁটিয়ে তুলে ফেলা যায়। কুটনোর খোসা, শালপাতা, কাগজের ঠোঙা, পাত-কুড়োনা এঁটো—এসব ওরা যেখানে-সেখানে ফেলে ঘর-বাড়ী নোংরা ক'রে রাখে না। প্রত্যেক ঘরের বাইরে একটি করে 'জঞ্জাল-ফেলা' পেতে রাখে। যা' কিছু আবর্জ্জনা সব তাইতে ফেলে' ঢাকা দিয়ে রাখা হয়। সকালে মেথর এসে ঢেলে নিয়ে যায়।

ইলেকট্রিক ইস্ত্রি

ছেলে-নেওয়া ধামা

বিদেশে নে যাবার কাচা-কল

ভেতরে পরবার জামা-জোড়া, ছেলেদের পোষাক সমস্তই তারা অনেকে ঘরে সেলাই ক'রে তৈরি করে নেয়। এ জন্যে অনেকের বাড়ীতেই সেলাইয়ের কল আছে। আজকাল আবার সেলাইয়ের কলের টেবিলটি এমন ভাবে করা হয়েছে যে, যখন সেলাইয়ের দরকার নেই, তখন কলটি টেবিলের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে, টেবিলটি লেখাপড়া বা অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করা চল্‌তে পারে। কাপড়-চোপড় কাচা, ইস্ত্রি করা—এ সবও তারা নিজের হাতে ঘরেই করে নেয়; ধোপার হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। এই কাপড় কাচ্‌বার আর ইস্ত্রি কর্‌বার অনেক রকমের কল বেরিয়েছে; এই জন্যে কাপড় কাচ্‌বার যে পরিশ্রম, সেটুকু ষোল আনাই প্রায় লাঘব হয়ে গেছে। ইস্ত্রি করা এখন ইলেক্‌ট্রিকে

ছেলে-রাখা বগ্‌লী

ছেলেদের গাড়ী বিছানা

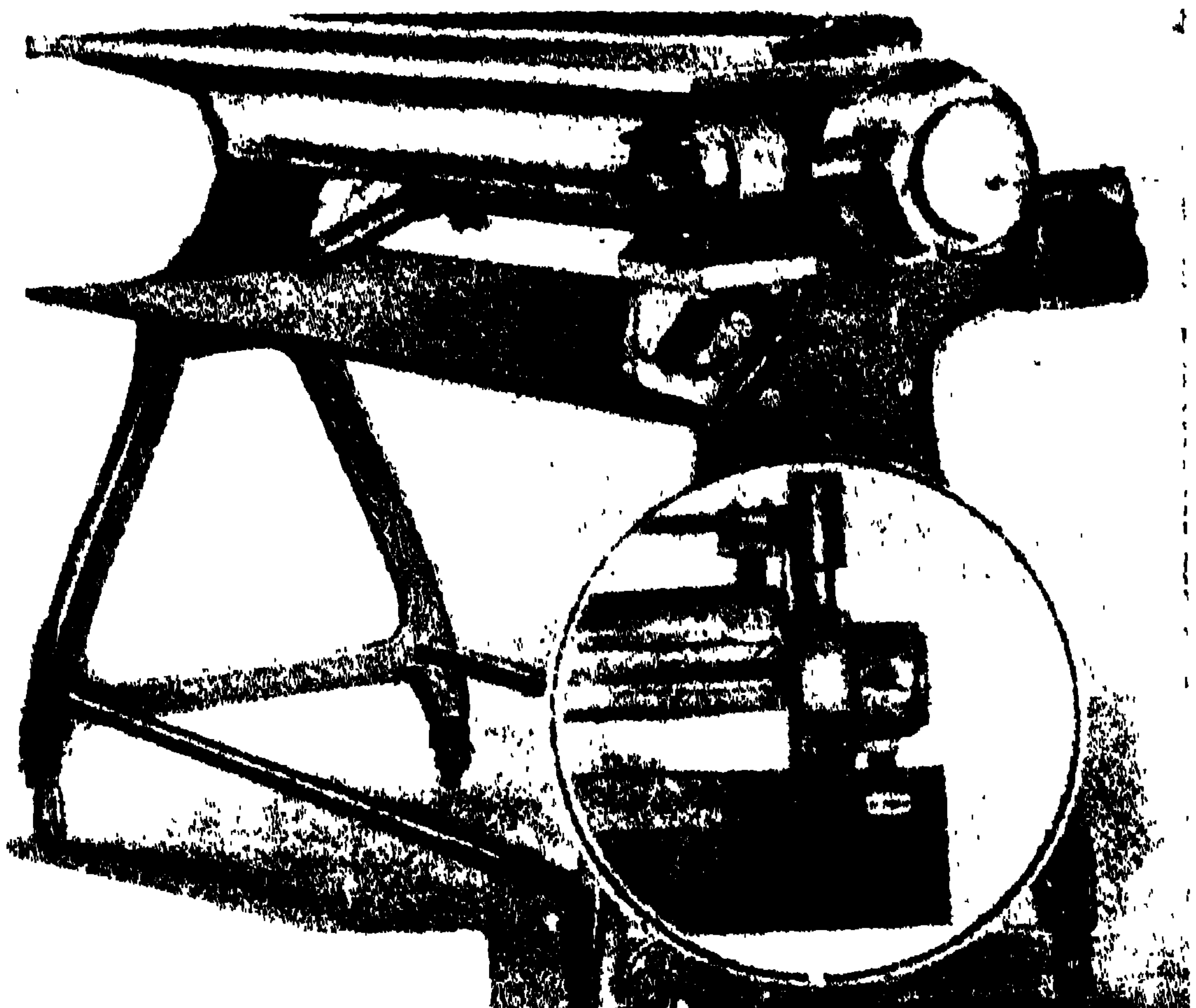

ইস্ত্রি-করা কল

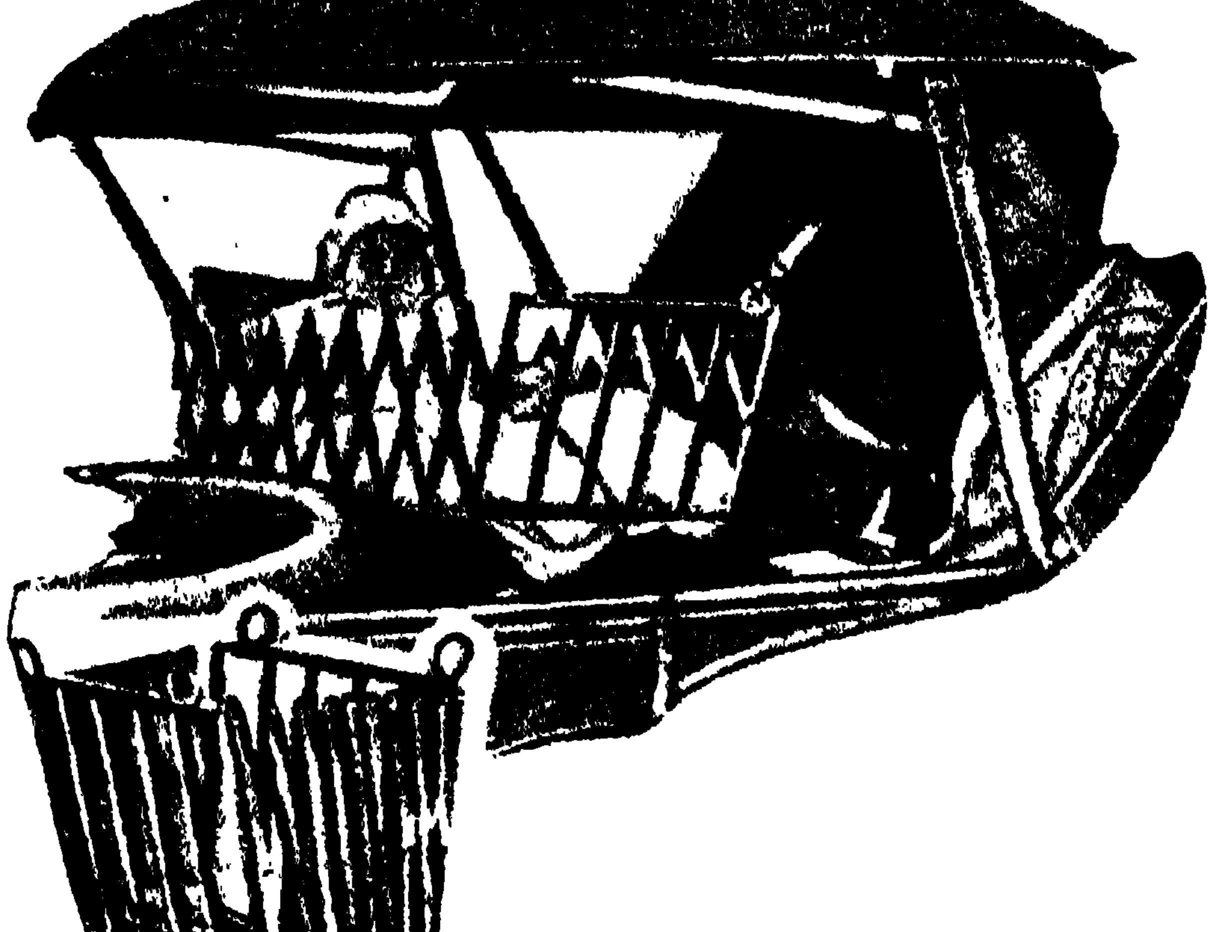

গাড়ীর দোল্‌না

হচ্ছে। চক্ষের নিমেষে বাড়ীশুদ্ধ লোকের জামা-কাপড় আজকাল অনায়াসে 'ইস্ত্রি' করে নেওয়া যায়। নতুন যে ইলেক্‌ট্রিক 'ইস্ত্রি' বেরিয়েছে, তাতে আনাড়ী লোকেও কাপড় ইস্ত্রি ক'রে নিতে পার্ব্বে; কারণ, এই ইস্ত্রি যতক্ষণ ইচ্ছে কাপড়ের ওপোর চেপে ধরে থাকলেও, কাপড়ে আঁচের দাগ ধরে যাবার ভয় নেই। সঙ্গে ক'রে বিদেশে নিয়ে যাবার উপযোগী একরকম ছোট কাপড়-কাচা কল বেরিয়েছে; সেটা স্নানের টবে ফেলে, কি জলের কলের সঙ্গে লাগিয়ে নিয়ে, বেশ কায করা যায়।

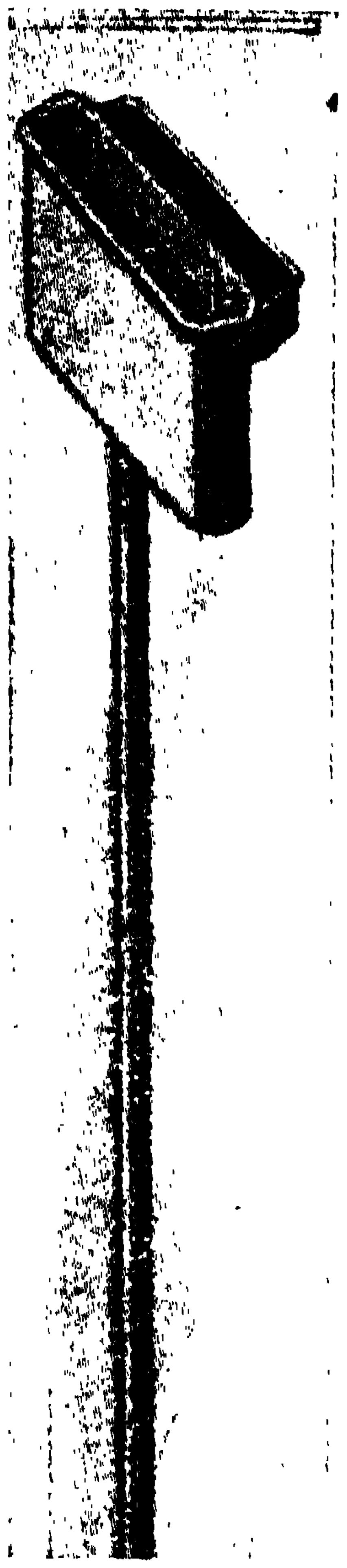

ঝুল ঝাড়া

এর একটা মস্ত সুবিধে এই যে, কড়ি কাঠের ঝুল এসে ঝাড়ুনীর গা-মাথা ভরিয়ে দেয় না। সমস্ত ওপরের ঐ খোলটির ভেতর জড় হয়।

কচি ছেলে থাক্‌লে তাকে কোলে করে নিয়ে কাযকর্ম্ম করবার বড় অসুবিধে হয় বলে, তারা অনেকেই এক-একটা ছেলে-নেওয়া ধামা কিনে রাখে। যে ছেলে এখনও বসতে শেখে নি, তাকেও এই ধামায় করে কাছে রেখে সব কায করে নেওয়া যায়। এঘর থেকে ওঘরে যাবার সময় ছেলেকে ধামা থেকে বার করে নিয়ে যেতে হয় না। ফুলের সাজির মত ধামায় একটা হাতোল আছে; সেইটি ধরে, ছেলে শুদ্ধ ধামাটি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে, যেখানে খুসি যাওয়া যায়। কচি ছেলে নিয়ে মোটর গাড়ী চড়ে অনেক দূর যেতে হ'লে, মা'কে ঠায় ছেলে কোলে করে থাক্‌তে হয় না। ছেলে ঘুমুলেই তাকে গাড়ী-বিছানায় শুইয়ে নিয়ে যাওয়া চলে। ছেলে জেগে থাক্‌লে, তাকে ছেলে-রাখা বগলীর ভেতর পুরে রেখে, মা বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে, আরামে গাড়ী চড়ে যেতে পারেন। এই বগলীর ভেতর ছেলে রাখলে, ছেলের আর গাড়ী থেকে ঠিক্‌রে পড়বার ভয় থাকে না। বগলীর ভেতরের বাঁধুনিতে ছেলেকে বেশ শক্ত ক'রে ধরে রাখে। ছেলে ভোলাবার

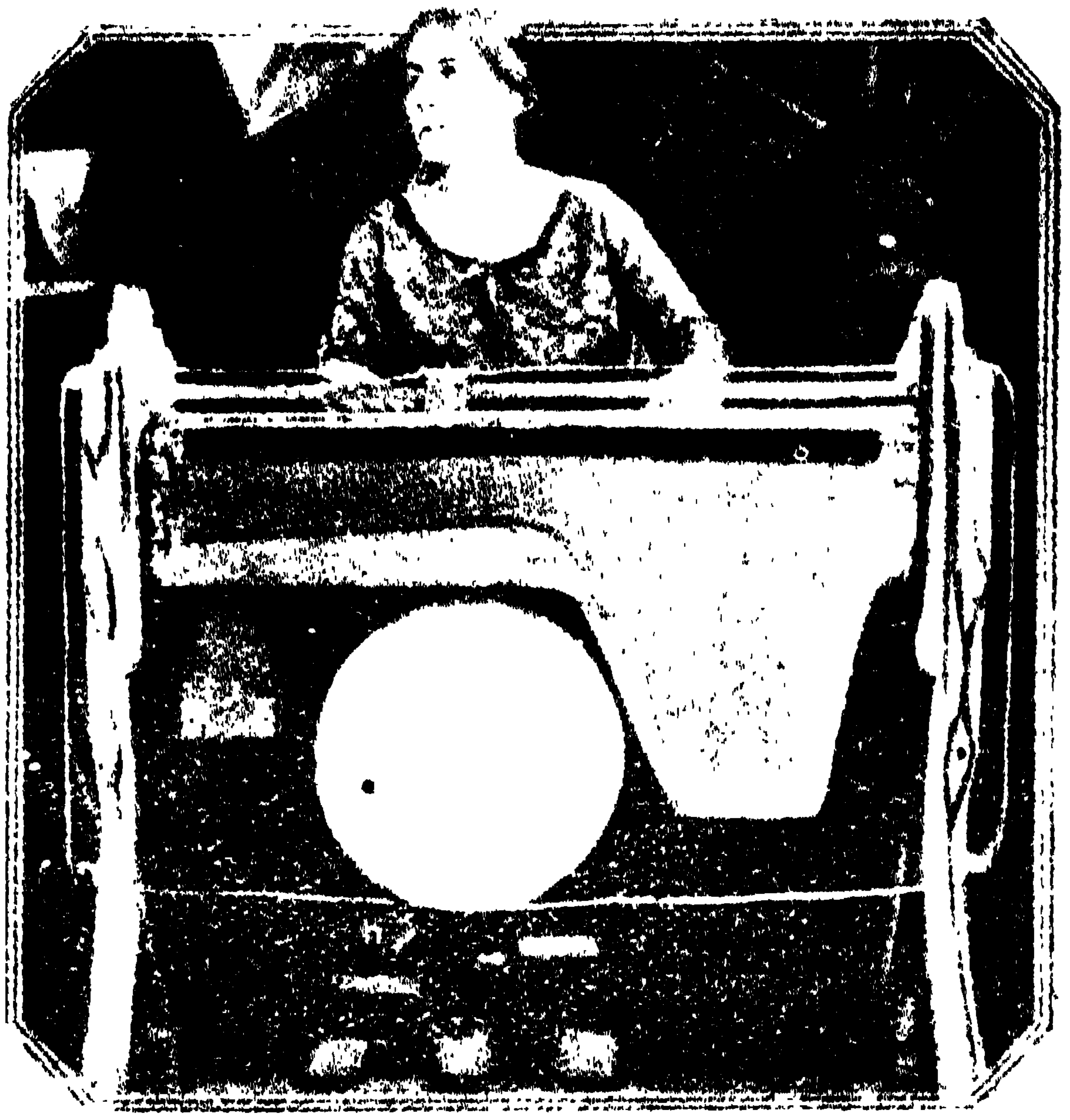

ছেলে ঘুম পাড়ানো বাজনা

জন্যে অনেকে গাড়ীতে এক-একটা ছেলেদের দোলনাও ঝুলিয়ে রাখেন। গাড়ী চলবার সময় দোল্‌নাটি গাড়ীর ঝাঁকুনিতে আপনিই দুল্‌তে থাকে; আর ছেলে অমনি সব কান্না ভুলে, একমুখ হেসে খুসি হ'য়ে ওঠে! বাড়ীতে ছেলেকে ঘুম পাড়াবার জন্যে ঘণ্টাখানেক বসে কোলে করে নিয়ে, দোল দিয়ে, গান গেয়ে, ছড়া কেটে সারা হ'তে হয় না। ছেলে-ঘুম-পাড়ানো একরকম বাজনা বেরিয়েছে,—ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, তার কাছে বসে সেই বাজনা বাজালেই ছেলেরা আপনি ঘুমিয়ে পড়ে।

সাময়িকী

'ভারতবর্ষ'

এই আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষ' দশম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। নয় বৎসর পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলাল এই 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু, ভগবানের অলঙ্ঘ্য বিধানে তিনি ইহার প্রথম সংখ্যাও দেখিতে পাইলেন না; প্রথম সংখ্যার প্রথম ফর্ম্মা সম্পাদন করিয়াই তিনি অকস্মাৎ পরলোকগত হইলেন;—'এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি' তাঁহার এই সাধ পূর্ণ করিতে তাঁহার বিলম্ব সহিল না;—মাতৃভক্ত সন্তান মায়ের কোলে চলিয়া গেলেন। আমাদের দুর্ব্বল স্কন্ধে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদনের ভার পড়িল। বার্ষিক ছয় টাকা মূল্যের বৃহদাকার মাসিক পত্র এই বাঙ্গালা দেশে কিছুতেই চলিতে পারে না বলিয়া অনেকেই ভয় দেখাইতে লাগিলেন; উপযুক্ত কর্ণধার দ্বিজেন্দ্রলালের অকস্মাৎ পরলোকগমনে এই ভয় আরও বৃদ্ধি হইল। অধুনা পরলোকগত বন্ধুবর প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের একান্ত উৎসাহ আমাদিগকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করিল; আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। তাহার পর, এই সুদীর্ঘ নয় বৎসর এই অযোগ্য সম্পাদক একাকী দ্বিজেন্দ্রলালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ইহাকে দশম বর্ষে উপস্থিত করিল। ভাল হউক আর মন্দ হউক, দ্বিজেন্দ্রলালের বড় সাধের 'ভারতবর্ষ' আজ দশম বর্ষে পদার্পণ করিল; তাহার জন্য এই দীন সম্পাদকের অপেক্ষা আর কাহারও অধিক আনন্দ হইতে পারে না। আজ এই আনন্দ উপভোগের জন্য সর্ব্বাগ্রে বিশ্ব-নিয়ন্তার চরণে প্রণাম করিতেছি। তাহার পর যে সমস্ত লেখক-লেখিকা, চিত্রকর 'ভারতবর্ষে'র সাধনার সহায় হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যে সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা ইহাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতেছি; এবং সর্ব্ব শেষে, যে দ্বিজেন্দ্রলালের অলোকসামান্য প্রতিভা আমার পথ-প্রদর্শক, তাঁহার পরলোকগত দিব্যাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক, এই দ্বাধিক ষষ্টি বর্ষীয় বৃদ্ধ সম্পাদক, শ্রীভগবানের কৃপা এবং বঙ্গের সাহিত্যিকমণ্ডলী ও পাঠক-পাঠিকাগণের অসীম অনুকম্পাকে একমাত্র পথের সম্বল করিয়া, দশম বর্ষে 'ভারতবর্ষে'র সেবায় প্রবৃত্ত হইল।

দেশের কথা

এই সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে একটা নূতন ভাবের বন্যা বইতে আরম্ভ করেছে। কারও সাধ্য নেই যে এই প্রবাহকে রোধ করে;—যিনি চেষ্টা করতে যাবেন, তাঁকেই বিফল-মনোরথ হ'তে হবে। যে কারণেই হোক, দেশের মধ্যে, দশের মধ্যে একটা গভীর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করতে পারবেন না। আর এটা যে কেবল শিক্ষিত শ্রেণীতেই আবদ্ধ, সে কথাও এখন আর কারও বল্‌বার পথ নেই; জনসাধারণও এতে প্রাণের সঙ্গে সাড়া দিয়েছে। সকলেই চান—'স্বরাজ'। স্বরাজ শব্দটার অর্থ নিয়ে নানা মতভেদ থাক্‌তে পারে—আছেও; কিন্তু, জিনিসটির স্বরূপ যাই হোক, সবাই যে স্বরাজ চান, এ কথা খুব ঠিক;—নরমবাদীও চান, গরমবাদীও চান, অত্যুগ্রবাদীও চান। এই চাইবার, এই পাবার রকমটা নিয়েই যত গোল, যত মতান্তর,—এবং বল্‌তে দুঃখও হয়—যত মনান্তর। কেউ চান কিস্তিবন্দী ক'রে, কেউ চান এখনই সবটা। কেউ চান বিধি-সঙ্গত আন্দোলন, আবেদন করে; অর্থাৎ constitutional agitation করে; কেউ চান অহিংসা অপ্রতিযোগিতা করে; কেউ চান বৃটিশ ছত্রতলে থেকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন, অর্থাৎ Colonial Self Government within the Empire; আবার কেউ চান একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, অর্থাৎ Complete Independence। সকল কথাগুলোরই ইংরাজী তর্জ্জমা দিতে হচ্ছে,—দুর্ভাগ্য কম নয়! মহামান্য ভারত-সম্রাটও স্বরাজ দিতে চেয়েছেন; তবে রয়ে-সয়ে; এবং তারই নমুনা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড বিধান (Reform)। যাঁরা নরমপন্থী (Moderate), তাঁরা এই প্রথম কিস্তীতেই

সন্তুষ্ট; কারণ, একেই তাঁরা স্বরাজের সূচনা বলে অভিনন্দন করেছেন—তা এর যত ত্রুটী-ই থাক না। গরম দল বলেন, ও রিফর্ম কিছুই না,—ওর কিম্মত এক দামড়িও না,—ও ছেলে-ভুলান মোয়া; ও আমরা চাই না। কর নন-কো-অপারেশন, কর বিলাতী কাপড় বয়কট, চালাও চরকা, পর খদ্দর—আর কর আইন অমান্য; কিন্তু গান্ধী মহারাজের আদেশ—অহিংস হও, non-violent হও—স্বরাজ আসিবেই। এই আইন অমান্য ব্যাপার নিয়েই অনর্থ বেধে গেল। আইন অমান্য করলে আর রাজশক্তির রইল কি? এতটা প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না। চালাও ধর্ষণ—আরম্ভ কর repression। তখন চারিদিকে—নগরে, সহরে, গ্রামে ধর-পাকড় আরম্ভ হোলো—ধর্ষণ সুরু হোলো। অসহযোগীর দল 'গান্ধী মহারাজ কি জয়' বলে সমস্ত পীড়ন সহ্য করে, বিনা বাক্য-ব্যয়ে, দলে-দলে হাসতে-হাসতে জেলে যেতে লাগল—এখনও যাচ্ছে। জেলের নাম তারা দিল "স্বরাজ-আশ্রম!" মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বৃদ্ধ মতিলাল, লালা লজপৎ থেকে আরম্ভ করে, বারো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলে পর্য্যন্ত স্বরাজ-আশ্রমের অতিথি হলেন,—কেউ ছয় দিনের জন্য, কেউ ছ' মাসের জন্য। আর যিনি এই বিপুল ব্যাপারের অধিনায়ক, সেই সর্ব্বত্যাগী, দেশহিত-এতে উৎসর্গীকৃত-জীবন, সেই মহাত্মা গান্ধী ছয় বৎসরের জন্য স্বরাজ-আশ্রমের অতিথি হইলেন। জেলে যাবার সময় তিনি বলে গেলেন—দেখ, এখনও তোমরা অহিংসা-মন্ত্র মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পার নাই; সুতরাং আইন অমান্য কাজটা ছেড়ে দেও। চরকা চালাও, খদ্দর পর। আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালও বহুদিন পূর্ব্বে ঐ কথাই আর এক সুরে বলেছিলেন "আবার তোরা মানুষ হ।" গান্ধী মহারাজও তাই ব'লে গেছেন—চরকা কাট, খদ্দর পর, স্বাবলম্বী হও, সত্যব্রত হও—ওরে 'আগে তোরা মানুষ হ।' এই সার কথা। লোককে মানুষ করতে হবে; সহযোগী, অসহযোগী—সবাইকে এই ব্রত নিতে হবে। এতে মতান্তর নেই, মনান্তরের সম্ভাবনাও নেই, রাজরোষের কথাও নেই। আর থাকলেই বা কি? আমরা মানুষ হব—এ চেষ্টা থেকে কেউ আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে না, কাহারও সে অধিকার নাই। এই এখনকার কাজ; এই মহাত্মার আদেশ। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে প্রতীচ্য জিজ্ঞাসা করেছে, 'ভারতের বাণী কৈ?' আমরা তার উত্তর দিচ্ছি—"ভারতের বাণী,—'হে বিশ্ববাসী, তোরা মানুষ হ।'"

বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি

বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত নবাব সার সামশুল হুদা মহাশয়। তিনি নামেই সভাপতি ছিলেন, কাজ অতি অল্প দিনই করতে পেরেছিলেন; শরীর অসুস্থ থাকার জন্য দেড় বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক কাল ছুটীতেই কাটাতে হয়েছিল। তাই তিনি একেবারে বিদায় নিলেন। তাঁর অনুপস্থিতি কালে এত দিন পর্য্যন্ত ডেপুটী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ই কাজ চালাইয়া আসিতেছিলেন; কাজও বেশ চলেছিল। তাই সকলে মনে করেছিলেন, রায় মহাশয় যখন এতদিন বেগার দিলেন, তখন হয় ত এই চার-হাজারী পদটা তাঁরই হবে। কেহ-কেহ বা আরও দুই-একজন ভাগ্যবান বাঙ্গালীর নাম এঁচে রেখেছিলেন; খবরের কাগজেও একটু-আধটুকু লেখালেখি হয়েছিল। তবে এটা সবাই নিশ্চিত জান্‌তেন যে, এ পদটা বাঙ্গালীই পাবেন। কিন্তু, এখন দেখা গেল, নূতন গবর্ণর এ পদের জন্য খাস বিলাত থেকে লোক আমদানী করলেন। যিনি নিযুক্ত হলেন, তিনি বিলাতী আমদানী হলেও, এ দেশের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আছে;—এই বাঙ্গালা দেশেই তাঁর জন্ম। তিনি ভারতহিতৈষী সিবিলিয়ানপ্রবর সার হেনরী কটন মহোদয়ের পুত্র এইচ, ই, এ, কটন (Mr. H. E. A. Cotton)। তাঁর বাপ যখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন ১৮৬৮ সালে তিনি মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পর বিলাতে গিয়ে, লেখা-পড়া শিখে, ব্যারিষ্টারী পাশ করে, এ দেশে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রায় ১২ বৎসর ব্যারিষ্টারী করেন; আট-নয় বৎসর কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনরীও করেন। পরে বিলাতে গিয়েও অনেক দিন আমাদের কংগ্রেসের বিলাতী মুখপত্র 'ইণ্ডিয়া' কাগজের সম্পাদকতা করেন। গবর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড লিটন তাঁকেই এনে ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি পদে বসান স্থির করেছেন। সভার কাজ কেমন চল্‌বে না চল্‌বে, তা নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা নয়,—ও-সব বড়-বড় কাজ 'আপ সে চলে গা'; আমরা ভাবছি কি, এমন চার-

হাজারী মনসবদারীটা বাঙ্গালীর হাত ফস্কে গেল! রিফর্ম্মে তা হ'লে আর হোলো কি?

ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি

'ভারতবর্ষে'র আয়ের অপেক্ষা ব্যয় অনেক বেশী হয়েছে, ক্রমেই ধার বাড়ছে। এটা না কি সুলক্ষণ নয়। তাই ব্যয়সংক্ষেপ করবার জন্য এক কমিটি বসেছে। ভারতের আয়-ব্যয় বিষয়ে ওয়াকিবহাল শ্রীযুক্ত ইঞ্চকেপ মহোদয় এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি আগামী শীতকালে এদেশে এসে, সরেজমিনে তদন্ত করে, ব্যয়-সঙ্কোচের ব্যবস্থা করবেন। এর যে কি দরকার, তা ত আমরা মোটেই বুঝতে পারছি নে। এই ত এবারে বজেটে কয়েক কোটী টাকা অকুলান হোলো; তা তোলবার জন্য এক পয়সার পোষ্টকার্ড দু-পয়সা হোলো, দু-পয়সার টিকিট চার পয়সা হোলো, রেলের মাসুল বাড়ল, আরও হরেক রকম ট্যাক্স বাড়ল। তাতেও না কুলায় আরও ট্যাক্স্ বাড়াও না; আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে, খোস্-মেজাজে বহাল তবিয়তে ট্যাক্স আদায় দিতে থাকিব। কিন্তু, ব্যয় কিছুতেই কমাইও না। শুনিতেছি, এক শত কুড়ি কোটী টাকার মধ্যে বাষট্টি কোটী না কি সমর-বিভাগেই ব্যয় হয়; ইহার সঙ্কোচ সাধন প্রয়োজন। আমরা বলি, মোটেই নয়। ওদিকের ব্যয় যে আরও বাড়াইবার প্রয়োজন, এ কথা ত জঙ্গীলাট বাহাদুর সরকারী মজলিশে স্পষ্টই বলিয়াছেন। সীমান্তের অবস্থা ত সকলে বোঝে না,—জানেও না; আফগানের লাঠীর বহর ত কেহ ভাবে না। গিরি-সঙ্কটের মধ্য দিয়া রেলপথ বিস্তার না করিলেই যে নয়; তার পর যে সকল ভদ্রলোকের ছেলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এ দেশে জান দিতে আসিয়াছে, তাহাদের দুই প্রান্ত এক হয় না (two ends meet করে না), এ কথাও ত ভাবিতে হয়। সুতরাং ও বিভাগের ৬২ কোটী ত কমানো যায়-ই না, বাড়াবারই দরকার। তাহার পর নন-কো-অপারেশন যে ভাবে মাথা তুলিতেছে, সে মাথায় বাড়ি দেওয়ার জন্যও অতিরিক্ত সৈন্য-সমাবেশের প্রয়োজন। ঐ ৬২ কোটীকে আগামী বৎসরে আশি কোটী করিতেই হইবে। আর এ দিকের যে সমস্ত ব্যয় এখন হইতেছে, বলিতে গেলে, তাই বা এমন বেশী কি? পাঁচ হাজার ছয়-হাজারে কি পদমর্য্যাদা রক্ষা হয়? এক পয়সায় অক্রূর সংবাদ গান শোনা যায় না। রিফর্ম্ম চাও, স্বরাজ চাও; পয়সা খরচ করিতে চাও না, একি রকম কথা। ব্যয় সঙ্কোচ করিলে কার্য্যকুশলতা কমিয়া যাইবে; তাহা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। তিন টাকা ট্যাক্সের বদলে তের টাকা ট্যাক্স দিব; দুই বেলার বদলে এক বেলা খাইতেছি; না হয়, সে এক বেলাও খাওয়া ছাড়িয়া দিব; আয়ের পথ একেবারে সুগম করিয়া দিয়া, সচিব-বৃন্দের জয়গান করিতে-করিতে স্বরাজ-ধামে চলিয়া যাইব।

বাঙ্গালীর সম্মান

য়ুরোপের জেনোয়া (Genoa) সহরে একটা বৈঠক হইয়াছিল। মহা আড়ম্বরে বিপুল সমারোহে প্রায় একমাস কাল বৈঠকের কাজ চলিয়াছিল। সব দেশের বড় মন্ত্রী, প্রতিনিধি বৈঠকে আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জ্জ মহোদয় সকলের সঙ্গে একটা রফা নিষ্পত্তির জন্য খুব লড়িয়াছিলেন;—যাহাতে কোন প্রকার রক্তারক্তি না হইয়া, আপোষে সব গোল মিটিয়া যায়, দেনা-পাওনার বুঝ হয়, সে পক্ষে চেষ্টারও ত্রুটী হয় নাই। কথাবার্ত্তাও এক রকম ঠিকই হইয়া গিয়াছে, বিধি-ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছে; সুতরাং কাজ যে হয় নাই, তাহা বলা যায় না। সামান্য একটু কাজ বাকী আছে, সেটা আর জেনোয়ায় মিটিল না। অর্থাৎ, ইনি বলেন আমি, এ সর্ত্তে রাজী নই; উনি বলেন, আমি ও কথা স্বীকার করিব না, এই যা সামান্য গোল। ইহার জন্য আবার হেগ সহরে (Hague) কমিটি বসিবে। লয়েড জর্জ্জ মহোদয় বলিতেছেন, ভয় নাই, সব ঠিক করিয়া ফেলিব। তাহাই হউক। এদিকে আবার জেনেভা—জেনোয়া নহে—সহরে আর একটা নূতন রকমের বৈঠক বসিবে। সে বৈঠকের নাম International Intellectual Co opertion Committee। এমন বেজায় অনুপ্রাস-খচিত কমিটীর নামের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া বিষম বিভ্রাট; তবে অনুবাদটা এই রকম একটু হইবে, যথা—আন্তর্জাতিক মনীষা সহযোগ কমিটি। মোদ্দা কথাটা বোধ হয় এই,—একটা কমিটি

বসিবে, তাহার উদ্দেশ্য নিখিল বিশ্বের মনীষিবৃন্দের সহযোগিতা,—অর্থাৎ আধুনিক সভ্য জগতের মহা মনীষি-বর্গের প্রজ্ঞা-সমন্বয়ের ব্যবস্থা। সাধু উদ্দেশ্য! এই কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন দশ জন। তাঁহাদের কয়েক-জনের (সকলের নহে) নাম করিতেছি; আপনারা তাহাতেই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। (১) অধ্যাপক গিলবার্ট মারে (Professor Gilbert Murray—England), (২) এম, বারোসোঁ (M. Beroson—Norway), (৩) ম্যাডাম কুরি (Madam Curie—France), (৪) হেন আইনষ্টাইন (Hen Einstein—Germany), আর (৫) শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (Dr. Banerji, Minto Professor of Political Economy, Calcutta University)। এই পাঁচজনের নাম শুনিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একটা বিরাট বিশ্ব-ভারতী সম্মেলন। যাঁহারা ইংরাজী ভাষার সহিত পরিচিত, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত চারিজন মনীষীর নাম অবশ্যই জানেন—একেবারে চারি দিক্‌পাল; আর প্রমথ বাবু ত আমাদের ঘরের লোক। এমন মনীষা-সম্মেলনে ভারতবর্ষ হইতে আমাদের প্রমথ বাবুকে সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া, বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালীকে আসন প্রদান করিয়া, অনুষ্ঠাতৃবর্গ বাঙ্গালীর সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, প্রমথবাবু এই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দকেরা কি বলেন?

মুদ্রাযন্ত্র আইন।

এতদিন যে মুদ্রাযন্ত্র আইন (Press Act) প্রচলিত ছিল, তাহা উঠিয়া গেল। এই নূতন আইনে, কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত করিতে গেলে, আর টাকা জমা দিতে হইবে না। এতদিন কোন কাগজে আপত্তিজনক কিছু প্রকাশিত হইলে, মুদ্রাকর (Printer) ও প্রেসের মালিককে লইয়া টানাটানি করা হইত; প্রকৃত দায়িত্ব যাহার, সেই সম্পাদকের খোঁজই পাওয়া যাইত না; দুই-একখানি ব্যতীত আর কোন সংবাদপত্রেই সম্পাদকের নাম থাকিত না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, কাহাকেও সম্পাদক বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াও প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে; দণ্ড পাইয়াছে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরপরাধ—গো-বেচারী প্রিণ্টার। এখন আর তাহা চলিবে না; এখন প্রত্যেক কাগজে প্রতিদিন সম্পাদকের নাম ছাপিয়া দিতে হইবে; প্রিণ্টার বা প্রেসের মালিকের বা কাগজের স্বত্বাধিকারীর কোন দায়িত্ব থাকিবে না; সমস্ত দায়িত্ব সম্পাদকের। এখন আর সম্পাদক মহাশয়গণের গা-ঢাকা দেওয়ার পথ রহিল না। এই নূতন আইনের একটি কথা কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ডাক-বিভাগের কোন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যদি কোন কাগজে কোন আপত্তির কিছু দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি সেই সংখ্যা কাগজের ডাকে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। এ ব্যাপারটা কেমন হইল? এত বড় একটা অধিকার ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের উপর দেওয়া কি সঙ্গত হইল? আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, ডাকবিভাগে বিচক্ষণ, শিক্ষিত ব্যক্তি নাই; কিন্তু, সকল কর্ম্মচারীই ত শিক্ষিত ও বিচক্ষণ নহেন। একটা দৃষ্টান্তই দিই। মনে করুন, একখানি দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে কলিকাতার বিডনস্কোয়ার পোষ্ট-অফিসে ডাকে দেওয়া হয়। সেখানকার পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের উপর ঐ পত্রিকা পরিদর্শনের ভার পড়িল; অথবা হয় ত ঐ পত্রিকা পড়িয়া দেখিবার জন্য ঐ পোষ্ট-অফিসে একজন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। তিনি পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া যখন হুকুম দিবেন, তখনই কি পত্রিকা ডাকে চালান হইতে পারিবে? এ ত অসম্ভব ব্যাপার। তাহার পর, এমন বিপুল প্রতিভাসম্পন্ন, সবজান্তা, আইনে অভিজ্ঞ মহারথই বা কোথায় মিলিবে? যিনি কোন একখানি সংবাদপত্রের উপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়াই তাহার সম্বন্ধে এমন ভীষণ ফয়তা দিতে পারেন, এমন লোক ত সহজে মিলে না। ইহাতে অনেক গোলযোগ, অনেক অসুবিধা হইবে। এই বিষয়ের দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সূতা ও কাপড়ের আমদানী-রপ্তানী।

এদেশে সূতা ও কার্পাসজাত দ্রব্যাদির আমদানী-রপ্তানীর সরকারী বিবরণ কোন দৈনিক সহযোগীর পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক-পাঠিকাগণ এই বিবরণ পাঠ করিলেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন:—

ভারতে কার্পাস-সূতা আমদানীর শতকরা ৭০ ভাগ

ইংলণ্ড হইতে আর ২০ ভাগ জাপান হইতে আসে। গত ৮ বৎসর যাবৎ জাপানের সূতা ও কাপড় অনেক বেশী আসিতেছে। কার্পাস-সূতা-জাত দ্রব্য (কাপড়-চোপড়) আমদানীর শতকরা ৯০ ভাগ ইংলণ্ড, ৫ ভাগ জাপান ও অপর ভাগ মার্কিণ, হলণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে আইসে। ১৯১৪—১৫ হইতে ১৯১৯—২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সূতার আমদানী হ্রাস পাইতেছিল বটে; কিন্তু গত বৎসরে খুব বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৫ বৎসরের গড় বাদ দিয়াও আমদানী শতকরা ৭৫ ভাগ বাড়িয়াছে। নিম্নলিখিত আমদানীর হিসাবেই অনেক বুঝা যাইবে।—

বৎসর	সূতা আমদানী (এক পাউণ্ড—অৰ্দ্ধসের) লক্ষ পাউণ্ড
১৯১৪—১৫	৪২০
১৯১৫—১৬	৪০০
১৯১৬—১৭	২৯০
১৯১৭—১৮	১৯০
১৯১৮—১৯	৩৮০
১৯১৯—২০	১৫০
১৯২০—২১	৪৭০
১৯২১—২২	৫৭০

আমদানী সূতার ১০লক্ষ পাউণ্ড পুনরায় ভারতের বাহিরে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ভারতীয় কল ও তাঁতে বেশী পরিমাণে কাপড় প্রস্তুত হওয়া এই অধিকতর আমদানীর কারণ। আর এই ভাবে কাপড় অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হওয়াতেই বিদেশাগত বস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে।

১৯১৫—১৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বৎসরে ২২০ কোটী গজ কাপড় বিদেশ হইতে আসিত। কিন্তু বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে কাপড়ের আমদানী খুব কম হইয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাবেই উহা দেখা যাইবে: —

বৎসর	লক্ষ গজ
১৯১৪—১৫	২,৪৪৫০
১৯১৫—১৬	২,১৪৮০
১৯১৬—১৭	১,৯৩৩০
১৯১৭—১৮	১,৫৫৫০
১৯১৮—১৯	১,১২১০
১৯১৯—২০	১,০৮০০
১৯২০—২১	১,৫০৯০
১৯২১—২২	১,০৮৯০

সাধারণতঃ প্রতি বৎসর আমদানী বস্ত্রের ৭৪০ লক্ষ গজ পুনরায় বিদেশে রপ্তানী হয়।

বস্ত্র আমদানীর পরিমাণ হ্রাস হইলেও, আমদানী বস্ত্রের মূল্য পূর্ব্ব হইতে প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাবে ইহা দৃষ্ট হইবে: —

বৎসর	সূতার সের	দাম টাকা	কাপড়ের গজ	দাম টাকা
১৯১৫—১৬	১০	১৬	৮৬	১৬
১৯১৬—১৭	৭৷৷০	"	৬৪	"
১৯১৭—১৮	৩৷৷০	"	৪৭	"
১৯১৮—১৯	৩৸০	"	৩৫	"
১৯১৯—২০	২	"	২১	"
১৯২০—২১	১৸০	"	১৮	"
১৯২১—২২	২৷৷০	"	২৬	"

সূতার আবশ্যক বেশী হওয়ায় ১৯২০—২১ সনে দাম খুব বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ১৯২১—২২ সনে হঠাৎ কমিয়া যায়। আর হঠাৎ সূতার মূল্য হ্রাস হইবার কারণ চরকার প্রচার। কাজেই দেখা যাইতেছে, বৃটীশ কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে ভারতীয় চরকা নিতান্ত অক্ষম হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ এখন পর্য্যন্ত এই কার্য্যে বড় বেশী কিছুই করে নাই —অন্যান্য প্রদেশের চেষ্টাতেই এতদূর হইয়াছে।

১৯১৫—২০ পর্য্যন্ত বস্ত্রের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু ১৯২১—২২ উহা হঠাৎ হ্রাস পাইয়াছে

১৯১৪ হইতে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে কত টাকার কার্পাসজাত দ্রব্য আমদানী হইতেছে, তাহার একটি বিবরণ তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে: —

বৎসর	দাম		
১৯১৪—১৫	৩২৬০	লক্ষ	টাকা
১৯১৫—১৬	২৮৭০	"	"
১৯১৬—১৭	৩৫১০	"	"
১৯১৭—১৮	৩৭৬০	"	"
১৯১৮—১৯	৪০৩০	"	"
১৯১৯—২০	৫৯৭০	"	"
১৯২০—২১	১০৩৮০	"	"
১৯২১—২২	৬০৩০		

দেনা-পাওনা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(১৬)

চৈত্রের সংক্রান্তি নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল,—'শিব-শম্ভুর' গাজন উৎসবে কোথাও কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটিলনা। দর্শকের দল ঘরে ফিরিল, দোকানিরা দোকান ভাঙিতে প্রবৃত্ত হইল, বাতাসে তেলে-ভাজা খাবারের গন্ধ ফিকা হইয়া আসিল, এবং গেরুয়াধারীরাও চীৎকার ছাড়িয়া গৃহকর্ম্মে মন দিবার প্রয়োজন অনুভব করিল;—চিরদিনের অভ্যস্ত সুরে চারিদিকের আব-হাওয়ায় সুখদুঃখের আবার সেই পরিচিত স্রোত দেখা দিল, কেবল চণ্ডীগড়ের ভৈরবীর দেহের মধ্যে কি যে রোগ প্রবেশ করিল তাহার সে চেহারা আর ফিরিয়া আসিলনা—কি একপ্রকার ভয়ে ভয়ে মনটা যেন তাহার অহর্নিশি সচকিত হইয়াই রহিল। উৎসবের কয়টা দিন যে নির্ব্বিঘ্নে কাটাই সম্ভব এ আশা ষোড়শীর ছিল, কারণ, দেবতার ক্রোধোদ্রেকের দায়িত্ব আর যে কেহ মাথায় করিতে চাহুক জনার্দ্দন চাহিবেনা সে নিশ্চিত জানিত। কিন্তু এইবার।

তবুও দিনগুলা এমনি নিঃশব্দে কাটিতে লাগিল যেন আর কোন হাঙ্গামা নাই, সমস্ত মিটিয়া গেছে। কিন্তু সত্য-সত্যই মিটিয়া যে কিছু যায় নাই, অলক্ষ্যে গোপনে কঠিন কিছু একটা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে এ আশঙ্কা শুধু ষোড়শীর নহে, মনে মনে প্রায় সকলেরই ছিল। সেই মাঠ সংক্রান্ত সমস্ত কৃষকদের কাছে আজ সে সম্বাদ পাঠাইয়া দিয়াছিল। কথা ছিল তাহারা দেবীর সন্ধ্যা আরতির পরে মন্দির প্রাঙ্গনে জমা হইবে, কিন্তু আরতি শেষ হইয়া গেল, রাত্রি আটটা ছাড়াইয়া নয়টা এবং নয়টা ছাড়াইয়া দশটা বাজিতে চলিল কিন্তু কাহারও দেখা নাই। প্রণাম করিতে যাহারা নিত্য আসে প্রসাদ লইয়া একে একে তাহারা প্রস্থান করিল, পূজারী অন্তর্হিত হইল, এবং মন্দিরের ভৃত্য দুয়ার রুদ্ধ করিবার অনুমতি চাহিল। আর অপেক্ষা করিয়াও ফল নাই, এবং কি একটা ঘটিয়াছে তাহাতেও ভুল নাই, কিন্তু ঠিক কি তাহা জানিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিল। এমনি সময়ে ধীরে ধীরে সাগর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে একাকী দেখিয়া ষোড়শী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, এত দেরি যে সাগর? কিন্তু আর কেউ ত আসেনি? এরা কি তবে খবর পায়নি বাবা?

সাগর কহিল, পেয়েছে বই কি মা। আমি নিজে গিয়ে সকলের ঘরে ঘরে তোমার ইচ্ছে জানিয়ে এসেচি।

ষোড়শী শঙ্কিত হইয়া কহিল, তবে?

সাগর বলিল, আজ বোধকরি কেউ আর সময় করে উঠ্‌তে পারলেনা। হুজুরের কাছারি বাড়ীতে ষোলআনার পঞ্চাইতি ছিল, তা এইমাত্র সাঙ্গ হল। পঞ্চু, অনাথ, রামময়, নবকুমার, অক্ষয় মাইতি, মায় আমাদের বুড়ো বিপিন খুড়ো পর্য্যন্ত তার সা-জোয়ান ব্যাটাদের নিয়ে। কেউ বাদ যায়নি মা, আমিও একটা বাতাপি নেবুগাছের তলায় দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ষোড়শী কহিল, ভাল করিস্‌নি, সাগর, কেউ দেখে ফেল্‌লে—

সাগর হাসিয়া বলিল, একা যাইনি মা, ইনি সঙ্গে ছিলেন,—এই বলিয়া সে বাঁ হাতের সুদীর্ঘ বংশদণ্ডখানি সস্নেহে সসম্ভ্রমে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিল।

ষোড়শী কহিল; কিন্তু এইখানে হবার যে কথা ছিল?

সাগর কহিল, কথাও ছিল, হুজুরের ভোজপুরীগুলোর ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু বাঙালীরা কেউ রাজী হলেননা। তাঁরা ত এ দিক্‌কার মানুষ,—আমাদের খুড়ো-ভাইপোকে তাঁরা চেনেন।

ষোড়শী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সভায় পরামর্শ কি স্থির হল?

সাগর কহিল তা' সব ভাল। এই মঙ্গলেই মেয়েটার অভিষেক শেষ হবে। তবে তোমারও ভাবনা নেই,—কাশীবাসের বাবদে প্রার্থনা জানালে শ খানেক টাকা পেতে পারবে।

ষোড়শী কহিল, প্রার্থনা জানাতে হবে কার কাছে?

সাগর বলিল, বোধহয় হুজুরের কাছেই।

ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, আর সকলের? যাদের জমি-জমা সব গেল তাদের?

সাগর বলিল, ভয় নেই মা, চিরকাল ধরে যা হয়ে আস্‌চে মা তা থেকে তারাও বাদ যাবেনা। এই যে সেদিন পাঁচ হাজারের নজর দেওয়া'হল তার খতের কাগজগুলো ত রায় মহাশয়ের সিন্দুক ছাড়া আর কোথাও যায়গা পায়নি,—নইলে, তিনি একটা হুকুম দিতে না-দিতে ভিড় করে আজ সকলে যাবই বা কেন?

ষোড়শী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, আর তোদের?

সাগর কহিল, আমাদের খুড়ো-ভাইপোর? একটু হাসিয়া বলিল, সে ব্যবস্থাও তিনি করেছেন, সাত সাতটা দিন কিছু আর চুপ করে বসে ছিলেননা। পাকা লোক, দারোগা-পুলিশ মুঠোর মধ্যে, কোশ দশেকের মধ্যে কোথাও একটা ডাকাতি হতে যা দেরি। জান ত মা, বছর দুই করে একবার খেটে এসেচি, এবার দশবছরের মত একেবারে নিশ্চিন্ত। খুড়োর গঙ্গালাভ তার মধ্যেই হবে, তবে, আমার বয়সটা এখনও কম, হয়ত আর একবার দেশের মুখ দেখ্‌তেও পাবো। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ষোড়শী ভয় পাইয়া কহিল, হারে, একি তোরা সত্যি বলে মনে করিস্?

সাগর বলিল, মনে করি? এ তো চোখের ওপর স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি মা। জেলের বাইরে আমাদের রাখ্‌তে পারে এ সাধ্যি আর কারও নেই। বেশি নয়, দুমাস একমাস দেরি, হয়ত নিজের চোখেই দেখে যেতে পারবে মা।

ষোড়শী কহিল, আর যারা আজ ওখানে গেছে, তাদের?

সাগর বলিল, তাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও মন্দ। জেলের মধ্যে খেতে দেয়, যাহোক্ আমরা দুটো খেতে পাবো, কিন্তু এরা তাও পাবেনা। নালিশগুলো সব ডিক্রি হতে যা বিলম্ব, তার পরে রায়মশায়ের নিজ জোতে জন খেটে দু মুটো জোটে ভাল, না হয় আসামের চা বাগান ত আছেই। কেন মা, তোমারই কি মনে পড়েনা ওই বেনের-ডাঙাটায় আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাউরির বসতি ছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায়? কতক গেল কয়লা খুঁড়্‌তে, কতক গেল চালান হয়ে চা বাগানে। কিন্তু, আমি দেখেচি ছেলে-বেলায় তাদের জমি-জমা, হাল-বলদ। দু মুটো ধানের সংস্থান তাদের সবাইয়ের ছিল। আজ তাদের অর্দ্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্দ্ধেক রায়মশায়ের।

ষোড়শী স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিল। এই সেদিন যাহারা দল বাঁধিয়া তাহার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছিল, আজ তাহারা প্রবলের চোখের ইঙ্গিতে তাহারি বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে একত্র হইয়াছে, সেদিনের সমস্ত সঙ্কল্প তাহাদের কোথায় ভাসিয়া গেল। যে প্রবল, যে ধনবান, যে ধর্ম্ম-জ্ঞান বিরহিত তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিবার কোন পথ দুর্ব্বলের নাই। কোথাও ইহার নালিশ চলেনা ইহার বিচার করিবার কেহ নাই,—ভগবান কান দেন না, সংসারে চিরদিন ইহা অবারিত চলিয়া আসিতেছে। এই যে আজ এতগুলি লোক গিয়া একটিমাত্র প্রবলের পদতলে তাহাদের বিবেক, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব সমস্ত উজাড় করিয়া দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, ইহার লজ্জা, ইহার দৈন্য ইহার ব্যথা যত বড়ই হোক, যতদূর দেখা যায়, এই দুঃখীদের কোনমতে একটুখানি বাঁচিয়া থাকিতে এই ক্ষুদ্র কৌশলটুকু ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই ত চোখে পড়েনা! যে অন্যায় এতগুলি মানুষকে একমুহূর্ত্তে এমন পশু করিয়া দিল তাহাকে প্রতিহত করিবার শক্তি এতবড় বিশ্ব বিধানে কই? এই যে সাগর সর্দ্দার সেদিন পীড়িতের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল দুর্ব্বলের এতবড় স্পর্দ্ধার সহস্র গুণ বড় দণ্ড তাহার তোলা আছে,—অব্যাহতির কোন পথ নাই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সাগর, এ সব তুই শুন্‌লি কার মুখে?

সাগর কহিল, স্বয়ং হুজুরের মুখে।

"তাহলে এ সকল তাঁরই মৎলব?"

সাগর চিন্তা করিয়া কহিল, কি জানি মা, কিন্তু মনে হয় রায়মশায়ও আছেন।

ষোড়শী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আচ্ছা সাগর, তুই বল্‌তে পারিস্ জমিদার আমার প্রতি অত্যাচার করেননা কেন? আমি ত ভাঙা কুড়েয় একলা থাকি, ইচ্ছে করলেই ত পারেন?

সাগর হাসিল, কহিল, কে তোমাকে বল্‌লে মা তুমি একলা থাকো? মা, আমাদের নিজের পরিচয় নিজে দিতে নেই গুরুর নিষেধ আছে,—বলিতে বলিতে সহসা তাহার বলিষ্ঠ দক্ষিণ হাতের পাঁচটা আঙুল লাঠির গায়ে যেন

ইস্পাতের সাঁড়াসির মত চাপিয়া বসিল, কহিল, যার ভয়ে চণ্ডীর মন্দিরে না বসে ষোলআনা বস্‌তে গেল আজ এক-কড়ির কাছারি বাড়ীতে তারই ভয়ে কেউ তোমার ত্রিসীমানায় ঘেঁসেনা। হরিহর সর্দ্দারের ভাইপো সাগরের নাম দশ-বিশ ক্রোশের লোকে জানে, তোমার উপর অত্যাচার করবার মানুষ ত মা, পঞ্চাশখানা গ্রামে কেউ খুঁজে পাবেনা।

ষোড়শীর দুই চক্ষু অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, সাগর, এ কি সত্যি?

সাগর হেঁট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হাতের লাঠিটা ষোড়শীর পায়ের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশ ত মা, সেই আশীর্ব্বাদই কর না যেন কথা আমার মিথ্যে না হয়।

ষোড়শীর চোখের দৃষ্টি একবার একটুখানি কোমল হইয়াই আবার তেম্‌নি জ্বলিতে লাগিল, কহিল, আচ্ছা, সাগর আমি ত শুনেচি তোদের প্রাণের ভয় করতে নেই?

সাগর সহাস্যে কহিল, মিথ্যে শুনেচ তাও ত আমি বল্‌চিনে মা।

ষোড়শী কহিল, কেবল প্রাণ দিতেই পারিস্ আর নিতে পারিস্‌নে?

সাগর কহিল, একটা হুকুম দিয়ে আজ রাত্রেই কেন যাচাই করনা মা? এই বলিয়া সে ষোড়শীর মুখের উপর দুই চোখ মেলিয়া ধরিতে ষোড়শী বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। তাহার চাহনি একপলকে বদ্‌লাইয়া গেছে। সেই স্বাভাবিক দীপ্তি নাই, সে তেজ নাই, সে কোমলতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে—নিষ্প্রভ, সঙ্কুচিত, গভীর দৃষ্টি—এ যেন আর সে সাগর নয়, এ যেন আর কেহ। সাগর কথা কহিল। কণ্ঠস্বর শান্ত, কঠিন, অত্যন্ত ভারি। কহিল, রাত বেশি হয়নি—ঢের সময় আছে। মা চণ্ডীর কপাট তাই এখনো খোলা আছে, মা, আমি তোমার হুকুম শুন্‌তে পেয়েচি। বেশ, তাই হবে মা, পাপের শেষ করে দেব—কাল সকালেই শুন্‌তে পাবে, তোমার সাগর সর্দ্দার মিছে অহঙ্কার করে যায়নি। তাহার পিতৃপিতামহের হাতের সুদীর্ঘ লাঠিখানা তখনও ষোড়শীর পায়ের কাছে পড়িয়া ছিল, হেঁট হইয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ষোড়শী কথা কহিতে গেল, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, নিষেধ করিতে চাহিল কণ্ঠে স্বর ফুটিলনা, ভূমিকম্পের সমুদ্রের মত অকস্মাৎ সমস্ত বুক জুড়িয়া দোলা উঠিল, এবং নিমিষের জন্য সাগরের এই একান্ত অপরিচিত ঘাতকের মূর্ত্তি তাহার চোখের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সাগর কি যেন একটা কহিল কিন্তু বুঝিতে পারিলনা, কেবল এইটুকু মাত্র উপলব্ধি করিল যে সে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতেছে।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

প্যাকিং বাক্স

প্যাকিং বাক্স আজকাল বাজারে খুব দরকার হয়। মাল বুঝিয়া প্যাকিং বাক্স নানা রকম হইতে পারে। বড়-বড় জিনিস কিম্বা ছোট-ছোট অনেক জিনিস এক সঙ্গে কোথাও চালান দিতে হইলে, বড়-বড় প্যাকিং বাক্স দরকার হয়। এই প্যাকিং বাক্স সাধারণতঃ গেঁয়ো কাঠ ও দেবদারু কাঠের হইয়া থাকে। বিলাতী যে সব মাল বাক্সবন্দী হইয়া এদেশে আসে, সেই মাল বাক্স হইতে বাহির করিয়া লইবার পর, সেই বাক্স আবার অন্য মাল স্থানান্তরে পাঠাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অথবা ঐ বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহার তক্তা লইয়া অন্য আকারের প্যাকিং বাক্স তৈয়ার করা হয়। মুর্গিহাটায় অনেকে এই রকম বাক্স তৈয়ার করিয়া থাকে।

গেঁয়ো কাঠের বাক্স তৈয়ার করিতে হইলে, আরও একটু বেশী আয়োজন দরকার হয়। কলিকাতার পূর্ব্ব প্রান্তে খালের ধারে গেঁয়ো কাঠের প্যাকিং বাক্স তৈয়ার করিবার কল হইয়াছে। গেঁয়ো গাছের গুঁড়িগুলি বড়-বড় নৌকায় করিয়া নারিকেলডাঙ্গার খালে আসিয়া উপস্থিত হইলে, গুঁড়িগুলি ডাঙ্গায় তুলিয়া কলে লইয়া যাওয়া হয়। কলে চাকা করাত আছে; ষ্টীম ইঞ্জিন, অয়েল ইঞ্জিন বা

ইলেক্‌ট্রিক্ মোটরের সাহায্যে এই চাকা করাত ঘোরানো হয়৮—ঐ করাতে গুঁড়িগুলি চেরাই হইয়া, তাহা হইতে তক্তা প্রস্তুত হয়। তক্তাগুলি আধ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি অবধি পুরু হইয়া থাকে। সেই তক্তা নির্দ্দিষ্ট আকারে কাটিয়া লইয়া পেরেক মারিয়া বাক্স তৈয়ার হয়। কাপড়-কাচা সাবান, কেরোসিনের টীন বা অন্যান্য মাল এই বাক্সবন্দী হইয়া স্থানান্তরে চালান যায়।

গায়ে মাখিবার সাবান, কেশ তৈল, পেটেণ্ট ঔষধ ও অন্যান্য সৌখিন জিনিস রাখিবার জন্য পেষ্টবোর্ড বা কার্ড-বোর্ডের বাক্স তৈয়ার হয়। ইহা সাধারণতঃ কলেই হইয়া থাকে। বিবিধ আকারের শক্তি-চালিত কলের 'পাঞ্চে'র সাহায্যে কার্ডবোর্ড কাটিয়া লইয়া, মুড়িয়া, ছাপানো বা চিত্রিত লেবেল আঁটিয়া এই সব বাক্স তৈয়ার হয়। ইহার বিস্তৃত কারবার আছে, এবং এই কারবারের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে এখনও অনেক লোকের অন্ন সংস্থানের সুযোগ রহিয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এক ড্রাম, আধ ড্রাম শিশিগুলি কাঠের কৌটার মধ্যে রাখা হয়। এই কৌটাগুলি প্রায় কাঠ কোঁদাই করিয়া তৈয়ার হয়। কোঁদায়ের কাজ হাতেও হইতে পারে, কলেও হইতে পারে। কাঠ ছাড়া, কার্ড-বোর্ডেরও এই ধরণের কৌটা তৈয়ার হইতে পারে।

কবিরাজী ও ডাক্তারি ঔষধের বটিকা, ট্যাবলেট বা চূর্ণ রাখিবার জন্যও ছোট ছোট গোল কাঠের কৌটা ব্যবহৃত হয়। সেগুলিও কোঁদাই করিয়া তৈয়ার করা হয়।

ছোট-ছোট জিনিস ডাকে পাঠাইবার জন্য, দামী চুরুট প্রভৃতি জিনিস প্যাক করিবার জন্য, খুব পাতলা কাঠের ছোট-ছোট প্যাকিং বাক্সের দরকার হয়। বাজারে ইহার বেশ চাহিদা আছে। পূর্ব্বে যে চাকা করাতের কথা বলিয়াছি, সেই রকম ছোট চাকা করাত হাতে বা শক্তিতে চালিত করিয়া, পাতলা করিয়া কাঠ চিরিয়া লইয়া, এই রকম প্যাকিং বাক্স তৈয়ার করিতে হয়। আপাততঃ এই ধরণের যে সব প্যাকিং বাক্স বাজারে পাওয়া যায়, তাহা, আমার মনে হয়, বিদেশ হইতে আসে। এখানে কেহ ঐ ভাবে পাতলা করিয়া কাঠ চিরিয়া লইয়া প্যাকিং বাক্স তৈয়ার করেন কি না, তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই। তাহা হইলেও, আরও অনেকে এই কাজ করিতে পারেন।

প্যাকিংয়ের জন্য টীনেরও ছোট-ছোট বাক্স ব্যবহার করা যায়। ছাপার কালি প্রভৃতি যে সব তরল জিনিস এখন এ দেশে তৈয়ার হইতেছে, তাহা প্রায় টীনের কৌটাতেই রাখা হয়। অবশ্য এই সব জিনিস বেশী পরিমাণে একে-বারে প্যাক করিতে হইলে, লোহার বা দস্তার কলাই করা লোহার টব বা ড্রামও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঘৃত, তৈল প্রভৃতিও টীনের কৌটায় বা ক্যানেস্তারায় প্যাক করা হয়। এ সমস্ত কাজ প্রায় কলে হয়; অন্ততঃ, এরূপ টীনের ক্যানেস্তারা তৈয়ার করিবার কল আছে।

আসামে চায়ের পাতা বেশী পরিমাণে প্যাক করিবার জন্য পাতলা কাঠের প্যাকিং বাক্স তৈয়ার করা হয়। আর এক পাউণ্ড, আধ পাউণ্ড বা সিকি পাউণ্ডের জন্য টীনের কৌটা ব্যবহৃত হয়। আসামে চা-বাগানের কাছে অনেক জঙ্গল আছে, এবং কাছেই খুব খরস্রোতা নদীও আছে। সেই নদীর স্রোত হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন পূর্ব্বক চাকা করাত চালানো হয়। সেই চাকা করাতের সাহায্যে জঙ্গলের গাছের গুঁড়ি হইতে তক্তা চেরাই হয়। সেই তক্তা আবার আরও পাতলা করিয়া কাটিয়া প্যাকিং বাক্স তৈয়ার করা হয়।

শিল্প দ্রব্য তৈয়ার করা যেমন একটা ব্যবসা, সেই শিল্প দ্রব্য প্যাক করিবার জন্য প্যাকিং বাক্স তৈয়ার করাও তেমনি অপর একটা ব্যবসা; এবং এটাও নেহাত ছোটখাট ব্যবসা নয়। যাঁহারা শিল্প দ্রব্য তৈয়ার করেন, তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক প্যাকিংয়ের বন্দোবস্তও নিজেদের কারখানাতেই করিয়া লন। বড়-বড় কলকারখানায় প্রায়ই এজন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকে। অনেকে আবার প্যাকিং বাক্স তৈয়ার করিবার হাঙ্গামা নিজেরা পোহাইতে চান না। তাঁহারা প্যাকিং বাক্স তৈয়ার করিবার জন্য অন্য লোককে কণ্ট্রাক্ট দিয়া থাকেন। আর যাঁহারা কোন শিল্প দ্রব্য নিজেরা তৈয়ার করেন না,—বাজার হইতে কিনিয়া ব্যবসা করেন, তাঁহারা নিজেরা ত প্যাকিংয়ের বাক্স তৈয়ার করিবার হাঙ্গামা পোহাইতে চাহিবেনই না। সুতরাং অন্য লোকের শুধু নানা রকমের প্যাকিং বাক্স তৈয়ার করিবার সুযোগ আছে। সেই জন্যই আজ আমি এই বিষয়টির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহাও একটা লাভের ব্যবসা। প্যাকিং বাক্স কত রকমের

হইতে পারে তাহা দেখিলেন ত। ইহার মধ্যে যাঁহার যেটি পছন্দ হয়, তিনি সেইটী গ্রহণ করিতে পারেন। একটী বা একাধিক রকমের প্যাকিং বাক্স তৈয়ার করিবার কাজ আরম্ভ করিলে, অনেকেই চাকুরীর অপেক্ষা নিশ্চয়ই বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

কোঁদাই করিয়া প্যাকিং কৌটা তৈয়ার করিবার কাজ যিনি লইবেন, তিনি আরও অনেক কাজ ঐ সঙ্গে করিতে পারিবেন। প্যাকিং ছাড়া, গৃহস্থালীর সৌখিন জিনিসপত্র রাখিবার জন্য কোঁদাই করা কৌটার দরকার হইতে পারে। ভাবিয়া-ভাবিয়া, মাথা খাটাইয়া, সুদৃশ্য কৌটা ও তাহার ঢাকনী তৈয়ার করিয়া, তাহাকে সুরঞ্জিত করিয়া বাজারে বাহির করিলে, লোকের চোখে লাগিলেই পড়িতে পাইবে না, হুহু করিয়া বিক্রয় হইয়া যাইবে। দেখিতে যদি সুদৃশ্য হয়, এবং যদি বেশ ব্যবহারোপযোগী হয়, তাহা হইলে অনেকে আগ্রহের সহিত এই সব জিনিস কিনিতে পারেন। প্রয়োজন না থাকিলেও, শুধু কেবল ঘর সাজাইবার জন্যও অনেকে ইহা পছন্দ করিতে পারেন। তত্ত্ব-তাবাসের জন্য, বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে চা, পান প্রভৃতি serve করিবার জন্য সোণা, রূপা, পিতল, এবং নানারঙে সুচিত্রিত লোহার ট্রে প্রভৃতি অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। জাপানী বার্ণিস করা, কিম্বা, রঙ্গীন গালার দ্বারা পুরু করিয়া রং ধরানো কাঠের ট্রেও বিলক্ষণ আদৃত হইতে পারে। রঙের উপর লতা, পাতা, ফুল, ফুলের তোড়া, ফুলের সাজি বা জীবজন্তুর চিত্র মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিলে নিশ্চয়ই খরিদদার জুটিবে, এবং জিনিসগুলির বিলক্ষণ আদরও হইবে। এই বাক্স তৈয়ার করার সম্বন্ধে পরে আরও একবার ইঙ্গিত করিবার প্রয়োজন হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

কচ্ছপের খোলা

ভারতের সর্ব্বত্র নদ, নদী, খাল, বিল, জলা, পুকুর, প্রভৃতি জলাশয়ে, বিশেষতঃ পুরাতন মজিয়া-যাওয়া জলাশয়ে, ছোট-বড় নানা আকারের ও নানা প্রকারের কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। কচ্ছপের মাংস ও ডিম্ব অনেকে ভক্ষণ করেন। কিন্তু তাহার খোলাটা প্রায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ এই খোলায় নানা রকম শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। কলিকাতার অনেক বাজারে মৎস্য, মাংসের ন্যায় কচ্ছপও আমদানী হয়। কচ্ছপের মাংসগুলি লোকে কিনিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাঁধিয়া খায়। আর খরিদদারের অভাবে বিক্রেতা খোলাগুলি বাজারের জঞ্জালের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। এই এমন দরকারী ও মূল্যবান জিনিসটি এমন ভাবে নষ্ট হইতে দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হয়।

কচ্ছপের খোলা ভয়ানক শক্ত জিনিস। উহাতে পালিশ অতি চমৎকার খোলে। কচ্ছপের খোলা হইতে কি-কি জিনিস তৈয়ারী হইতে পারে তাহা জানেন কি? ইয়োরোপে জাপানে, আমেরিকায় উহা হইতে চিরুণী, ছুরি ও ক্ষুরের বাঁট, চশ্‌মার ফ্রেম, ছুঁচ রাখিবার কৌটা, বিবিদের মাথার কাঁটা, নস্যাধার, মূল্যবান প্রস্তর ও রত্ন রাখিবার কৌটা প্রভৃতি জিনিস তৈয়ার হয়। আরও অনেক জিনিস কচ্ছপের খোলা হইতে তৈয়ার হইতে পারে, যে সকল জিনিসের নাম আমার এখন মনে পড়িতেছে না। মোট কথা, হাতীর দাঁত, গরু-মহিষের শিং, বড়-বড় জীবজন্তুর হাড় প্রভৃতি হইতে যে সকল শিল্প দ্রব্য তৈয়ার হয়, তাহার অধিকাংশই কচ্ছপের খোলা হইতে তৈয়ার হইতে পারে। উহা ব্যবহার করিতে-করিতে উহার গুণাগুণ ও প্রকৃতির সহিত সম্যক পরিচয় হইলে, উহা হইতে আরও অনেক নূতন নূতন জিনিসও তৈয়ার করা যাইতে পারিবে।

কচ্ছপের খোলাকে কাজে লাগাইতে হইলে কি কি চাই, কি রকম উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইবে, তাহার একটু-আধটু আভাষ দিবার চেষ্টা করিতেছি।

যে শিল্প দ্রব্য তৈয়ার করিতে হইবে, তাহার আকার যে রকম হইবে, সেই আকারে কচ্ছপের খোলাটিকে কাটিয়া লইবার জন্য প্রথমেই একটী fret saw চাই। এই fret saw এখন কলিকাতায় খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে উহার মূল্য চৌদ্দ পনের টাকা ছিল। চৌদ্দ টাকায় আমি একটী কিনিয়াও ছিলাম। এখন উহা বোধ হয় ৩০।৩৫ টাকার কমে পাওয়া যাইবে না। কলিকাতায় যে সকল সাহেবদের দোকানে যন্ত্র-তন্ত্র বিক্রীত হয়, সেখানে এই যন্ত্রটি পাওয়া যাইবে। চাঁদনীর বাজারেও পাওয়া যাইতে পারে। ইহা পায়ে চালাইতে হয়। জিনিসটি তেমন ভারী নয়,—যেখানে ইচ্ছা সহজেই লইয়া যাইতে পারা যায়। বড় বাজার মনোহর দাসের চকে যেখানে লোহা লক্কড়ের জিনিস বিক্রী হয়, সেখানেও সম্ভবতঃ ইহা পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যবহার করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। যেখানে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে, সেখানে দুই-চারি মিনিট ইহার কাজ দেখিলেই শেখা যাইতে পারিবে। পরে ধীরে-ধীরে অভ্যাস করিয়া লইতে হইবে। এই যন্ত্রে সূতার মত সরু করাত, লম্বায় ৮।১০ ইঞ্চি থাকে। তদ্দ্বারা পাতলা কাঠের, ধাতুর বা অন্য রকমের অনেক জিনিসই যে কোন আকারে কাটা যাইতে পারে।

Fret-saw দ্বারা অবশ্য মোটামুটি রকমের কাটা হইবে। তারপর ধারগুলি সূক্ষ্ম file (উকা) অথবা ধারালো ছুরি দ্বারা চাঁচিয়া লইয়া, মনের মত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা কাঠের অক্ষর খোদাই করেন, কিম্বা বক্স-উডের উপর ছবি কাটেন, তাঁহারা যে সব বাটালী ও যন্ত্র ব্যবহার করেন, সেই সব যন্ত্রের সাহায্যে কচ্ছপের খোলার উপর নানা রকম চিত্র খোদাই করা যাইতে পারে। এই কাজটি করিতে হইলে চিত্রাঙ্কন ও খোদাই-বিদ্যা মোটামুটি রকমের জানা থাকা দরকার, কিম্বা কোন খোদাইকারক অথবা এনগ্রেভারকে দিয়াও এই কাজটি করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। কারণ, এই কচ্ছপের খোলার উপর অতি সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্য ছবি খোদাই করা যায়। সুতরাং ছবি খারাপ হইলে, জিনিসটি একেবারে মাটী। কচ্ছপের খোলা খুব কঠিন হইলেও, উহা পাতলা জিনিস। কাজেই ছবির রেখাগুলি বেশী গভীর হওয়া উচিত নহে—তাহা হইলে উহা মজবুত কম হইবে। ছবি খোদাই করিবার আগে আর একটী কাজ করিতে হইবে। কচ্ছপের খোলার উপরিভাগ মসৃণ ও সমতল নহে। সেই জন্য উকার সাহায্যে কিম্বা ঝুম্‌ক পাথরের (pumice stone) গুঁড়ার সঙ্গে জল মিশাইয়া কাদার মত করিয়া একখানি ন্যাকড়ার সাহায্যে ঘষিয়া মসৃণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। খোদাই হইয়া গেলে, রুজ দ্বারা (rouge) এক টুকরা নরম ন্যাকড়ার সাহায্যে ঘষিয়া পালিস করিতে হইবে। অবশেষে এক টুকরা রেশমী কাপড় বা মখমলের দ্বারা উত্তমরূপে ঘষিয়া ফেলিলে বেশ চক্‌চকে দেখাইবে। কিন্তু কচ্ছপের খোলার জিনিস পালিস করিবার ইহাই একমাত্র উপায় নহে। প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন রকমে পালিস করিতে হয়। যদি গোটা খোলাটা দিয়াই কোন কিছু তৈয়ার করিতে হয়, তাহা হইলে পালিসের একটু বিশেষত্ব আছে। কারণ, কচ্ছপের গোটা খোলাটা কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। সুতরাং সমগ্র খোলা পালিস করিবার সময় খুব ধীরে ধীরে সতর্কতার সহিত পালিস করা দরকার; বেশী জোর দিলে খণ্ডগুলি খসিয়া গিয়া আলাদা হইয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায় প্রথমে গরম জল ও সাবানের গুঁড়া দিয়া খোলাটিকে ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে। পরে উহার বন্ধুরতা একখণ্ড ভাঙ্গা কাচের ধারালো প্রান্ত দিয়া চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে, এক পাঁইট জলে আধ আউন্স গন্ধক দ্রাবক মিশাইয়া, সেই গন্ধক দ্রাবকের জল দিয়া আর একবার ধুইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। গন্ধক দ্রাবক দিয়া ধুইলে উহাকে বার কয়েক পরিষ্কার জল দিয়া উত্তম রূপে ধুইয়া লইতে হইবে,—যেন গন্ধক দ্রাবকের গন্ধমাত্রও উহাতে লাগিয়া থাকিতে না পারে। কাচ দিয়া চাঁচিবার পর প্রথমে মোটা, তার পর মাঝারি, এবং সর্ব্বশেষে সূক্ষ্ম শিরিশ কাগজ দিয়া মাজিয়া ফেলিতে হইবে। তার পর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ঝুম্‌ক পাথর বা pumice stone এর চূর্ণ দিয়া একবার মাজিতে হইবে। শেষকালে stannous oxide or putty চূর্ণে পাতলা শূকরের চর্ব্বি মিশাইয়া তাহার দ্বারা পালিস করিতে হইবে। একখানি নরম ন্যাকড়া দিয়া এই জিনিসটি কচ্ছপের খোলার উপর ঘষিতে থাকিলে, ক্রমে-ক্রমে উজ্জ্বল পালিস বাহির হইতে থাকিবে। ক্রমে বিনা তেলে, শুষ্ক চূর্ণ দিয়া ঘষিলে পালিস করা সম্পূর্ণ হইবে। পালিস যত ভাল অর্থাৎ উজ্জ্বল ও মসৃণ হইবে, ইহা দেখিতে তত সুদৃশ্য হইবে এবং ইহার দামও তত বাড়িয়া যাইবে।

যাঁহারা কচ্ছপের খোলার তৈয়ারি চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়ান, তাঁহারা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন, ব্যবহার করিতে-করিতে উহার উজ্জ্বলতা কমিয়া যাইতেছে। উহার নূতন অবস্থার উজ্জ্বলতা আবার ফিরাইয়া আনিতে হইলে, তিসির তৈলে আঙ্গুল ডুবাইয়া সেই আঙ্গুল দিয়া উহার উপর ঘষিলে চিরুণীর ঔজ্জ্বল্য আবার ফিরিয়া আসতে পারে। তেল যত কম ব্যবহার করিতে পারেন, ততই ভাল। চিরুণীর উপর নক্সা কাটা থাকিলে, নক্সার রেখাগুলির মধ্যে আঙ্গুল চলিবে না; তখন একটা ব্রুস ব্যবহার করিতে হইবে। তার পর হাতের চেটো দিয়া তেলটুকু মুছিয়া লইলেই হইল।

কচ্ছপের খোলায় বাষ্পের তাপ লাগাইলে, উহা খুব নরম হইয়া যায়। কচ্ছপের খোলার তৈয়ারী কোন জিনিস ভাঙ্গিয়া গেলে,—জিনিসটা যদি খুব দামী হয়,—তবে তাহা আবার জুড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। ভাঙ্গা মুখ দুইটা পরস্পরের সঙ্গে আটকাইয়া বাঁধিয়া রাখিয়া, তাহার উপর আর একখানি পাতলা খোলা রাখিয়া গরম জলের বাষ্প লাগাইলে উহা খুব নরম হইয়া যাইবে। তখন প্রবল চাপ দিলে ভাঙ্গা মুখ দুইটী ও তাহার উপরের তালিটি একসঙ্গে জুড়িয়া যাইবে। পরে উহাকে চাঁচিয়া ছুলিয়া পালিস করিয়া আবার অনেকটা নূতনের মত করা যাইতে পারিবে।

আমাদের দেশে কচ্ছপের খোলার একমাত্র ব্যবহার দেখিতে পাই মুচিদের বাড়ীতে,—বিশেষতঃ চীনা মুচি। অথচ ইহা হইতে কত জিনিসই না তৈয়ার হইতে পারে। কেবল মাত্র আমাদের অবহেলায়,—ইহার ব্যবহার সম্যক প্রকারে জানা না থাকায়,—এমন একটী দামী শিল্পের উপকরণ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমি এখানে কেবল মাত্র ইঙ্গিত করিয়া রাখিলাম। যাঁহারা ইহাকে কাজে লাগাইতে যাইবেন, তাঁহারা নিজেরা বুদ্ধি খাটাইয়া, মাথা খেলাইয়া অনেক রকম জিনিসই তৈয়ার করিতে পারিবেন। একটী নূতন শিল্পের এমন একটা চমৎকার উপকরণ কিন্তু প্রথম-প্রথম বিনা মূল্যেই সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে; এবং ইহাকে পণ্যে পরিণত করিতে কেবল মাত্র মজুরী পড়িবে। পরে ইহাকে খুব দরকারী জিনিস বলিয়া বুঝিতে পারিলে, জেলেরা ইহার মাংস বিক্রয় করিবার পর, খোলা ফেলিয়া না দিয়া, শুকাইয়া রাখিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে। তখন ইহার একটা বাজার দরও দাঁড়াইয়া যাইবে।

স্নেহের বোঝা

শিল্পী—ডিক্সি

শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী
মহাশয়ের শিল্প-সংগ্রহ হইতে।

নীরব সন্ধ্যা

(শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে)

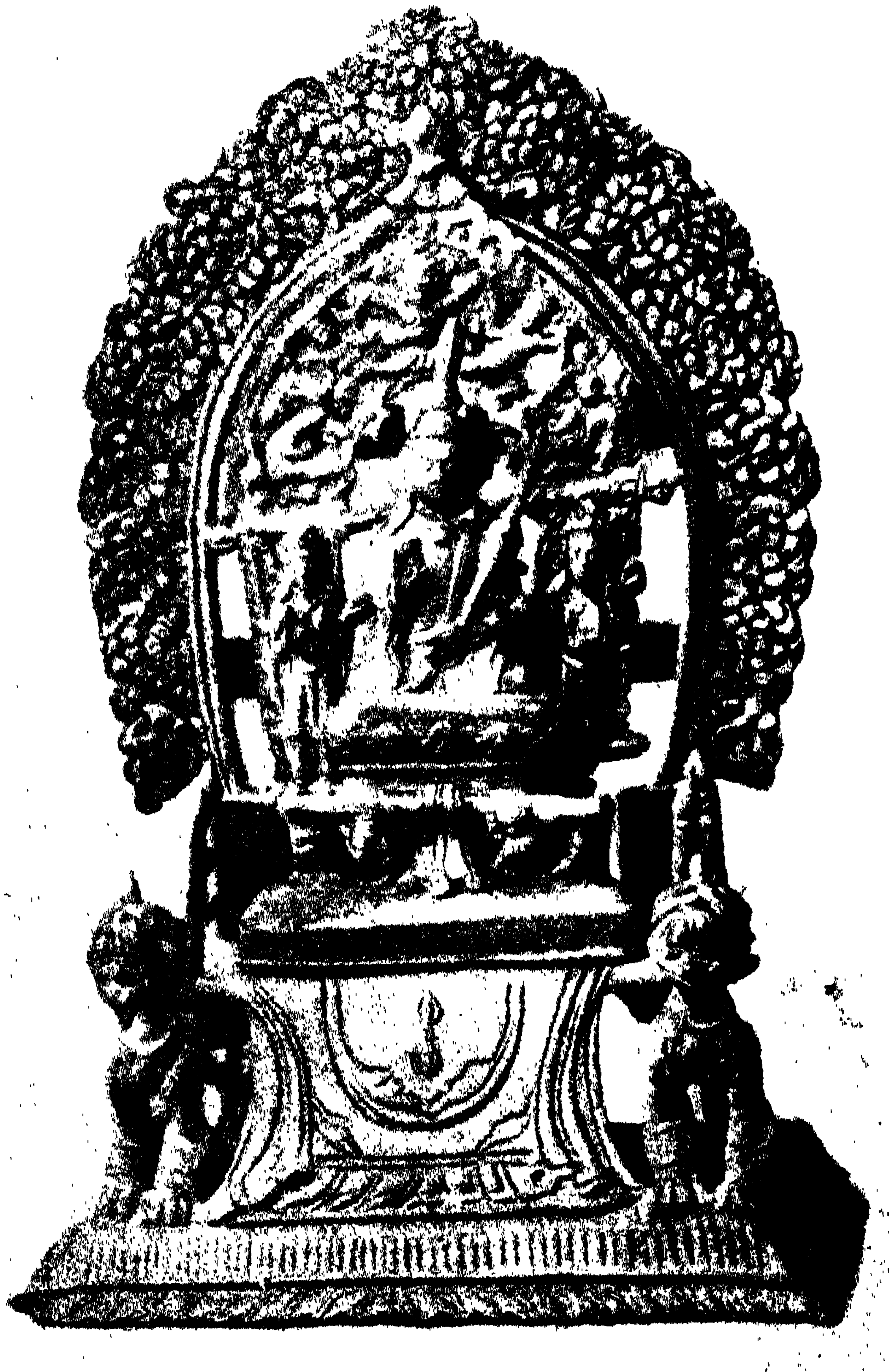

বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার পার্শ্বচরগণ

(নেপালে প্রাপ্ত একটী পুরাতন ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি হইতে)

যে সিংহাসনে মূর্ত্তি স্থাপিত তাহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর)

(কলিকাতা সার্ভে অব ইণ্ডিয়া আফিসের গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

বিজাপুর

"কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে—
রজনীগন্ধার বনে।" রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—ম্যাগনন্

(শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী
মহাশয়ের শিল্প-সংগ্রহ হইতে)

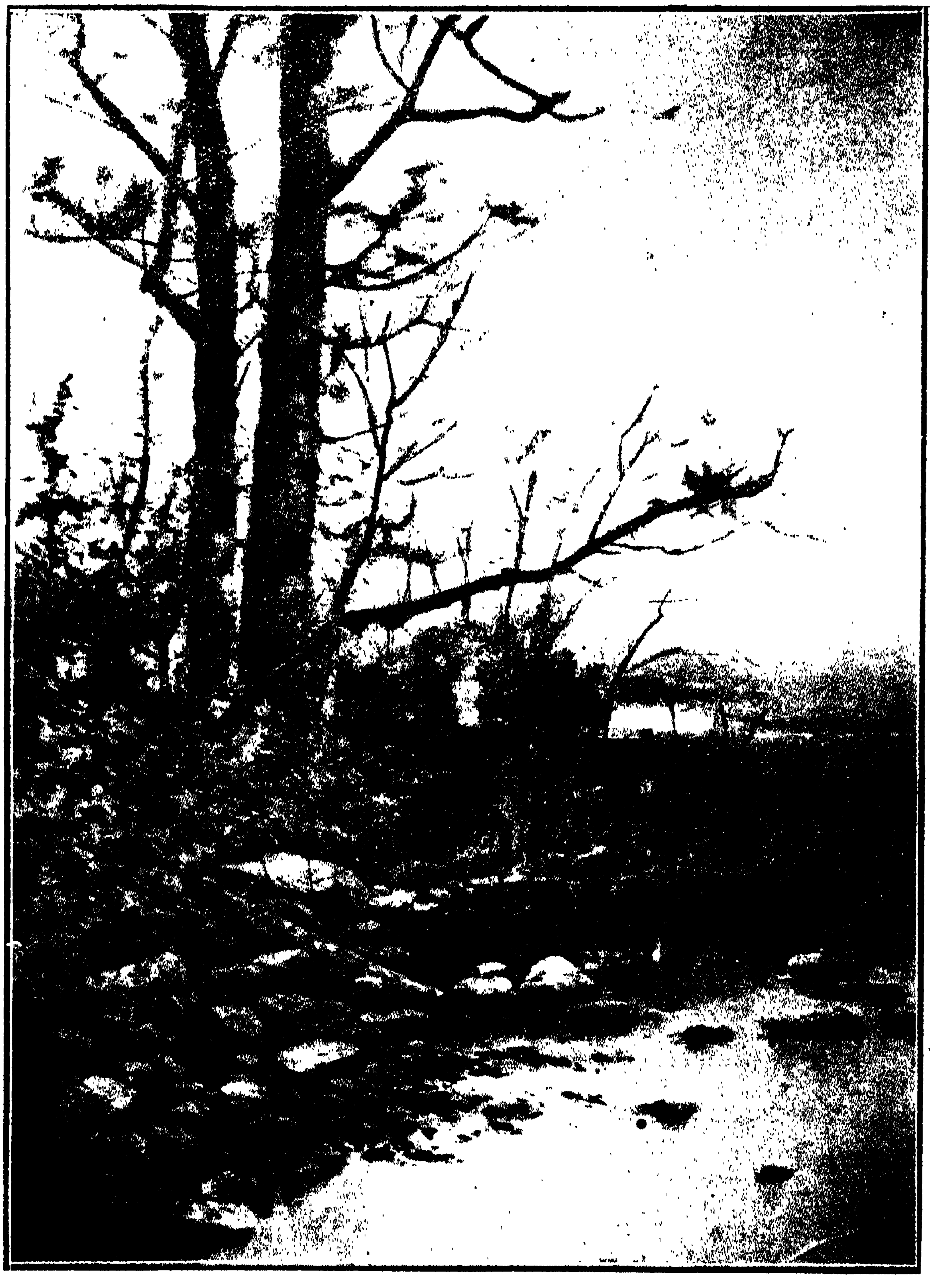

উপল-কাহিনী

চিত্রাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

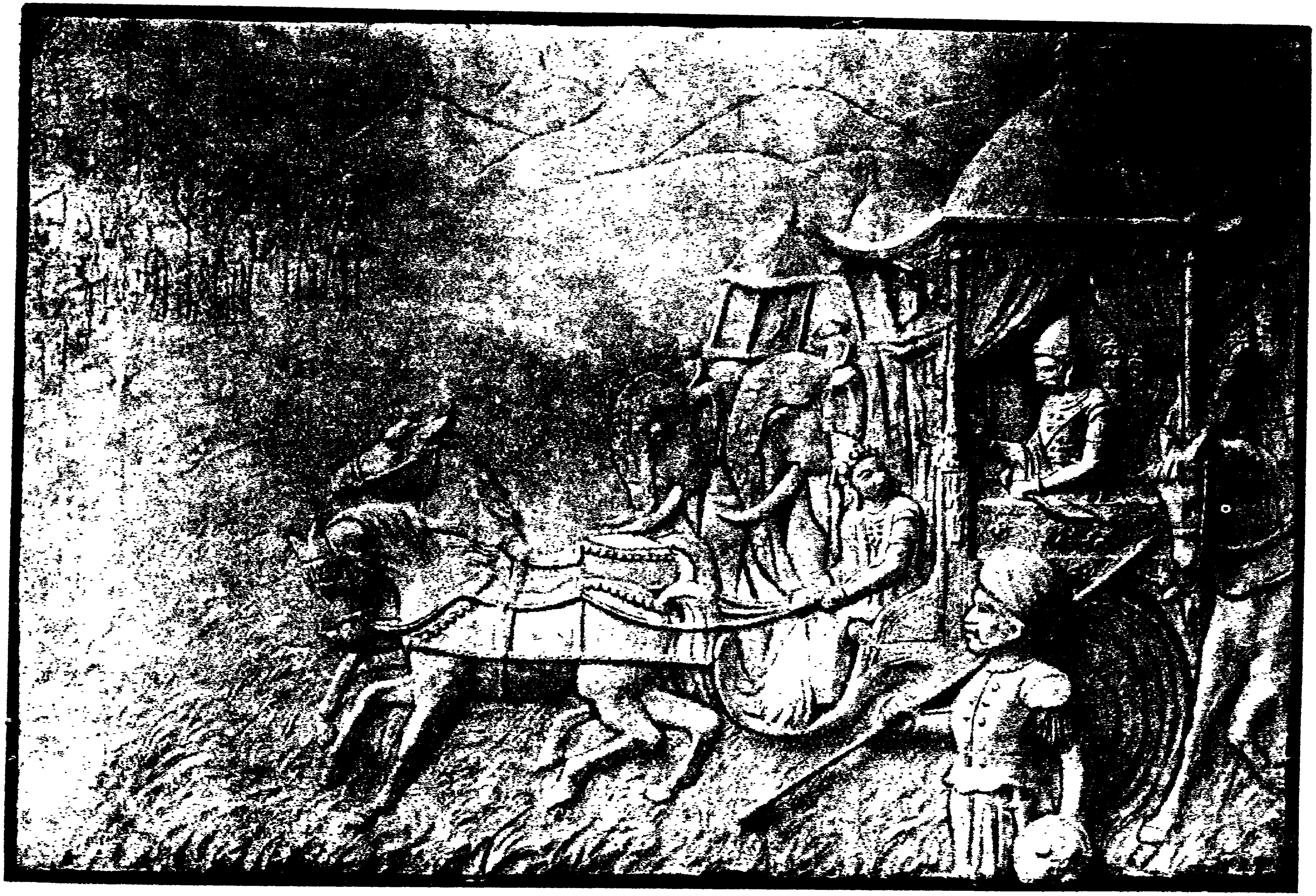

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

(ভাস্কর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিকের ভাস্কর্য্য-শিল্প হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ)

ঘুমন্ত সৌন্দর্য্য

শিল্পী—মট্‌লুডেন্

(শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী
মহাশয়ের শিল্প-সংগ্রহ হইতে)

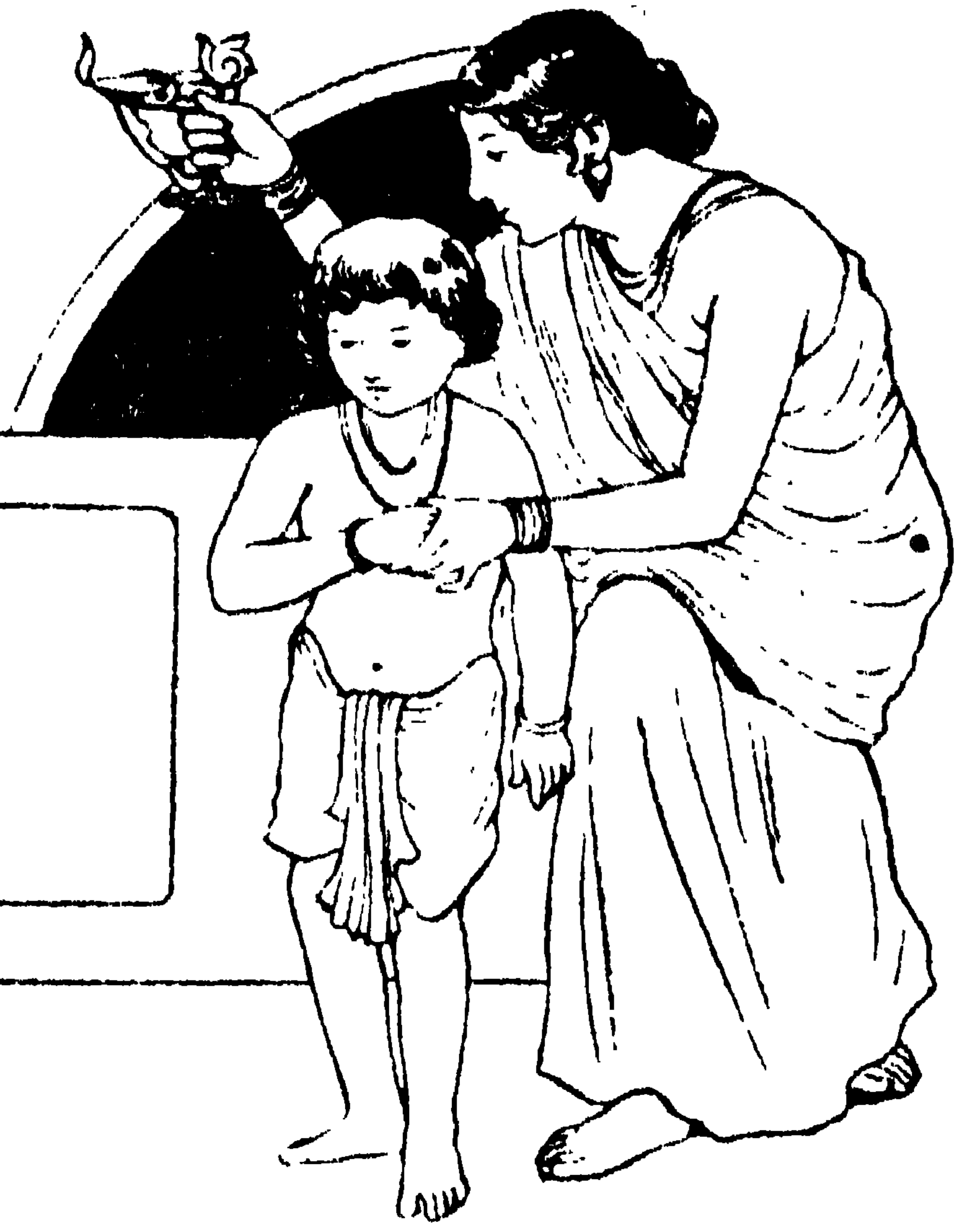

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]

উপন্যাস

গত মাসে 'সমালোচনা ও সমালোচক' প্রবন্ধে উপন্যাস সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিয়াছি। এক্ষণে মেঁাপাসার প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উপন্যাস সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল জ্ঞাতব্য কথা আছে, তাহার একটু আলোচনা করিব।

বিশ্লেষণাত্মক (analytic) বা ভাবগত (Idealistic) ঔপন্যাসিকেরা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন ;—তাহার প্রসার ও ভাব-ধারার বিকাশ দেখাইতে চান। কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া মানব কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিতেই তাঁহারা ব্যগ্র। কার্য্যের তাঁহারা বড় একটা ধার ধারেন না। কার্য্যকে তাঁহারা তাহার ন্যায্য দাবী দিতে প্রস্তুত ন'ন। এই শ্রেণীর কথা-সাহিত্যিকেরা, দার্শনিক পণ্ডিতেরা যেরূপ মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া থাকেন, সেইরূপ ভাবে উপন্যাস লিখিয়া থাকেন। কার্য্যের কারণ বাহির করিতে ইঁহারা সচেষ্ট। মানব স্বার্থ, অনুভূতি বা সহজ-জ্ঞানে যে ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার কথাই ইঁহারা আলোচনা করেন। ভাবের সংঘর্ষে যে ভাব বা অনুভূতি জন্মলাভ করে, তাহারই প্রেরণায় মানব কার্য্য করিয়া থাকে—ইহাই এ শ্রেণীর লেখকদের মূলমন্ত্র। বিরুদ্ধ ভাবের ভিতর দিয়া চরিত্রের বিকাশ দেখাইতে ইঁহারা ব্যস্ত ; কিন্তু অনেক স্থলে ইঁহারা কল্পনাকে (Imagination) বাস্তব বা পরীক্ষিত সত্য বলিয়া ধরিয়া ল'ন।

বস্তুগত ঔপন্যাসিকেরা এ পথ ধরিয়া চলেন না। মানবের ইচ্ছা বা ভাবের সহিত ইঁহাদের বড় একটা সংস্রব নাই। ইঁহারা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ব্যাপার ও ঘটনাগুলি ধরিয়া দেন। ইঁহাদের মতে মনোবিজ্ঞানের নিয়মগুলি উপন্যাসের ভিতর প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকাই বাঞ্ছনীয় ; বাস্তবিক এগুলি ঘটনার ভিতরই লুক্কায়িত থাকে (Psychology ought to be concealed in a book, as it is concealed in reality beneath the facts of existence.)।

এ শ্রেণীর উপন্যাস আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া আমাদিগকে আকৃষ্ট করে।

মানসিক অবস্থার যথাযথ বর্ণনা না করিয়া, বস্তুগত কথা-সাহিত্যিকেরা, মানসিক ভাব যে অবস্থায় নিঃসন্দেহে লইয়া যায়, তাহারই বর্ণনা করিতে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হন। ইঁহাদের অঙ্কিত চরিত্র ও তাহার কার্য্য তাহার প্রকৃতির অনুরূপ। ইঁহারা মনোবিজ্ঞানকে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত না করিয়া লুক্কায়িত রাখেন। মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে ইঁহাদের চরিত্র অঙ্কিত সত্য ; কিন্তু ইঁহারা মনোবিজ্ঞানকে পুস্তকের প্রাণ না ধরিয়া, মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর উপন্যাস রচনা করিয়া থাকেন। আমাদের দেহের অস্থিগুলি যেমন আমাদের অলক্ষ্যে থাকিয়া দেহের গঠন-কার্য্যে সহায়তা করে, মানসিক অবস্থাগুলিও সেইরূপ চরিত্রের বিকাশ-সাধনে সহায়তা করে।

চিত্রকর যেমন তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে শারীর-যন্ত্রের অংশগুলি প্রদর্শন করেন না, ঔপন্যাসিকেরও তেমনই মানসিক ভাব-গুলির বর্ণনা করা উচিত নয়।

মোঁপাসার মতে এই শ্রেণীর উপন্যাসের বিশেষত্ব হইতেছে সরলতা ও সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা; কারণ, আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, আমাদের সংঘর্ষে যে সকল লোক সদাসর্ব্বদা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা তাহাদের কার্য্যের কথাই আমাদের নিকট উত্থাপিত করে, তাহাদের মনোগত ভাব বা অভিপ্রায় (motives of action) ব্যক্ত করে না।

দ্বিতীয়তঃ, যদ্যপি আমরা পরিপ্রেক্ষণ ফলে কোন অবস্থায় মানব কোন ভাবের প্রেরণায় কার্য্য করে বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই কি সকল অবস্থায় কিরূপ ভাবে তাহার মনোভাব বিকশিত হইবে তাহা বুঝিতে পারিব, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি? আমরা ঐরূপ অবস্থায় পড়িলে কি করি তাহা আমরা বলিতে পারি; কিন্তু অপরে কি করিবে, বা করে, তাহা কি আমরা যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতে পারি? এ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, সকল মানবের সহজ-জ্ঞান সমান নয়, কার্য্য করিবার ইচ্ছাশক্তিও সমান নয়, আবার ইন্দ্রিয়-গ্রামের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাও সকলে একরূপ ভাবে করে না; কারণ, সকলের সকল ইন্দ্রিয় সমান ভাবে কার্য্যকর হয় না। সকল মানবের রক্ত মাংসও সমান নয়। এরূপ ক্ষেত্রে পার্থক্য যে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভাবের বর্ণনা করিতে যাওয়া বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অনেক সময়েই দেখা যায়, ভাবের বর্ণনা লেখকের ভাবের অনুরূপ।

মানুষ যতদূরই ভাব-বর্জ্জিত হউক, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে যতদূরই তাহার আগ্রহ থাকুক, এ কথা সত্য যে এরূপ প্রকৃতির মানুষ,—কামুক প্রকৃতির লোকের, যাহার বাসনা সামান্য কারণে চঞ্চল হইয়া উঠে, যে ব্যক্তি কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সকল প্রকার পাপকে অবহেলাক্রমে আলিঙ্গন করিতে পারে তাহার চরিত্রের—মনোগত ভাবের—অন্তরের বাসনার, যথাযথ বর্ণনা করিতে পারে না। লেখক তাঁহার জীবনের ঘটনার বিবৃতি করিতে পারেন সত্য, কিন্তু অন্তঃসলিলা ভাব-ফল্গুর উৎস লোকলোচনের সমক্ষে উৎসারিত করিয়া দিতে কখনই পারেন না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় যে, যে ঔপন্যাসিক কেবল মাত্র ভাব-বিশ্লেষণ লইয়া নাড়া-চাড়া করেন, তিনি অবস্থা-বিশেষে পড়িলে আপনি কি করিয়া থাকেন তাহার চিত্রই অঙ্কিত করেন। তাঁহার কল্পিত চরিত্রগুলি বাস্তবিকই তাঁহার নিজের চরিত্র। আমরাই নিজে কখনও নৃপতির, কখনও ঘাতকের, কখনও সাধুর, কখনও হত্যাকারীর, কখনও জুয়াচোরের, কখনও যুবতীর, কখনও প্রেমিকার ভূমিকা লইয়া উপন্যাসের ভিতর বাহির হই। যখনই কোনও সমস্যার সমাধান আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখনই আমরা মনে মনে এই প্রশ্নই উত্থাপিত করি, আমি যদি সাধু হইতাম, বা জুয়াচোর হইতাম, রাজা বা পারিষদ ইত্যাদি হইতাম, তাহা হইলে কি করিতাম? কি ভাবে আমি চিন্তা করিতাম, কি ভাবে আমি কার্য্য করিতাম? আমার চিন্তা ও কার্য্যকে আমি স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন চরিত্রের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া থাকি। আর এ কথাটাও মনে রাখিতে হইবে, আমাদের সংসারের জ্ঞান আমরা ইন্দ্রিয়-দ্বার সাহায্যে লাভ করিয়া থাকি। এইরূপে প্রাপ্ত জ্ঞান কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই জ্ঞান ও আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা এমন শত শত চরিত্র অঙ্কিত করি, যাহাদের মনোগত ভাব ও কার্য্যের বিষয় আমরা কিছুই জানি না। আমরা নিজের মতানুসারে তাহাদের চরিত্রে আমাদের চরিত্রের দোষগুণ চাপাইয়া থাকি। তাহা হইলে আমরা কি বলিতে পারি না যে, মনস্তত্ত্ববিদ্ ঔপন্যাসিক অঙ্কিত চরিত্রের ভিতর আপনাকেই প্রকাশ করিয়া থাকেন—আপনার ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। কলাকুশলী লেখক লেখার গুণে এই "আপনাকে" লুক্কায়িত রাখেন। তাঁহার ছদ্মবেশ যাহাতে কেহ ধরিতে না পারে, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন।

মোঁপাসা ভাব-বিশ্লেষণাত্মক ঔপন্যাসিকের উপর যে সুবিচার করিয়াছেন, তাহা আমাদের মনে হয় না। সম্প্রতি "Ingenious Voices" নামক প্রবন্ধাবলীর ভিতর English Novel সম্বন্ধে যে প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে, তাহা Indian Daily News পত্রিকা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। এই প্রবন্ধের লেখকও কতকটা মোঁপাসার মতাবলম্বী।

তিনি ভাব-বিশ্লেষণাত্মক (Psychological Novels) উপন্যাস সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আজকাল মনোবিজ্ঞানসম্মত উপন্যাসের বহুল প্রচলন হইয়াছে; কিন্তু এগুলিতে গল্পের সরলতা ও প্রাণ দার্শনিক ব্যাখ্যার চাপে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দার্শনিক রথ-চক্রের ঘর্ঘরে কথা-সাহিত্য-নির্ঝরিণীর অব্যক্ত মৃদু-মধুর ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা মানব-মনের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন। লেখক মহাশয় ৮ শিলিং ৬ পেন্স দর্শনী লইয়া সাধারণকে তাঁহার অস্ত্রাগারে এই অস্ত্রোপচার দেখিবার জন্য প্রবেশ করিতে দেন; এবং কাগজের পুত্তলিকার উপর তিনি অস্ত্র চালাইতে থাকেন, দর্শকেরা স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার হস্তের ক্ষিপ্রতা দেখিতে থাকে। এ দৃশ্য বীভৎস! মানবের চিন্তা ও কার্য্যকে তিনি নূতন খাতে চালাইতে চান। তাহার অতৃপ্ত রক্ত-পিপাসা মানব-মনের গোপন দ্বারটা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত। মানব অবস্থার জালে আবদ্ধ। আমাদের প্রকৃত সত্তা, আমাদের মনঃ প্রাণ চতুষ্পার্শের লোকদিগের নিকট হইতে লুক্কায়িত থাকে। এই গোপন প্রাণগুলির তথ্য বাহির করিবার জন্য মনস্তত্ত্ববিদ্ ঔপন্যাসিকেরা ব্যগ্র। তাঁহারা, 'কেমন' করিয়া মানুষ কোন এক ভাবে কার্য্য করিল, তাহাই বুঝাইতে ব্যস্ত; কিন্তু দুঃখের বিষয় 'কেন' মানুষ ঐ ভাবে কার্য্য করিল, তাহা বুঝাইতে চান না। ক্ষত দেখিবার জন্য মানব-মনে তাঁহারা শলাকা চালাইয়া দেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত ক্ষতের নিকট তাঁহাদের শলাকা পৌঁছায় না। ভাবের উৎস তাঁহারা বাহির করিতে পারেন না। কাগজে কলমে তাঁহাদের শক্তি বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু সত্য বর্ণনা করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আদৌ দেখা যায় না। সংসারের জীব তাঁহাদিগকে প্রতিপদে ভ্রান্ত করিয়া দেয়। পথে বাহির হইলে যে ভিক্ষুকের সহিত এ শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের প্রথম দর্শন হয়, সে তাঁহাকে মিথ্যা ভাষণে বঞ্চিত করে—মিথ্যা করিয়া জীবনের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া সহমর্ম্মিতা লাভ করিবার চেষ্টা করে; কোম্পানির কাগজের দালালের আফিসে প্রবেশ করিলেই, দালালেরা তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া থাকে। ফলে সর্ব্বত্রই লেখক মহাশয় প্রতারিত হইতে থাকেন। উপন্যাসখানিও তাঁহার অস্বাস্থ্যকর দুর্ব্বল কল্পনা-প্রসূত হইয়া পড়ে, এবং তাঁহার ভাব-বিশ্লেষণাত্মক প্রেমগল্পসমূহও সত্যের পরিপন্থী না হইয়া কাল্পনিক হইয়া পড়ে। পুস্তকের ভিতর মানবের ভাবসমূহকে গ্রন্থী দিয়া একত্র করা কত সহজ! ভাব-বিশ্লেষণকারী প্রকৃত গল্প-লেখক হইতে পারেন না।

এই সকল লেখক আপনাদের ধূম-বিলেপিত দর্পণ সাহায্যে মানবের চরিত্র দর্শন করেন বলিয়া, যথাযথ ভাবে চরিত্র দর্শন করিতে পারেন না; সুতরাং যথাযথ বর্ণনাও করিতে পারেন না। এই দর্পণ সাহায্যে দেখিয়া তাঁহারা দূরদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন না; তাঁহাদের দৃষ্টির বাহিরে যে সমস্ত ভাব বিরাজ করে, তাহার পরিচয় তাঁহারা পান না; আবার যে সকল ভাবের তাঁহারা সাক্ষাৎ পান, সেগুলিরও সম্যক্ পরিচয় তাঁহারা পান না; কারণ ধূম্রের ভিতর দিয়া কোন পদার্থের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না।

মোঁপাসার বক্তব্য একটু অবহিত ভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, মনোবিজ্ঞানের চিন্তানুসন্ধান প্রণালীর ভিতর অন্তর্দর্শন প্রণালীর দোষগুলি তিনি বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন,—বহির্দর্শন-প্রণালীর দোষগুলি তিনি আদৌ দেখেন নাই। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রদিগকে এ কথাটা বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে, এই দুইটী প্রণালীর সম্মিলনের ফলে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সম্ভবপর, এবং মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ। সকলে আমার এই কথাটা যাহাতে ভালরূপে বুঝিতে পারেন, তাহার জন্য দুই চারিটী কথা বলিতে চাই। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমি যে কেবল বাহিরের সংবাদ পাইয়া থাকি তাহা নয়; আমার মনের ভিতর বাহিরের বিষয়গুলি যে অনুভূতি ও ভাবের উদ্রেক করে, তাহার সংবাদও রাখিয়া থাকি। শুধু যে আমার মনের কথা আমি জানিতে পারি তাহা নয়; অপরের মনের কথাও জানিতে পারি। কিন্তু এই জানিবার পন্থা দুইটী বিভিন্ন। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আমার মনের বিষয় জানিতে পারি; কিন্তু অপরের মন জানিতে হইলে, বহির্দর্শন আবশ্যক। অপরের মনের ভাবের ভাষা বুঝিতে পারা যায় তাঁহার দেহের লক্ষণ বিশেষ (Expression) দেখিয়া। চিত্তের ভাব-প্রবাহ বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা যে বুঝিতে পারা যায়, তাহা আজকাল একরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত। হর্ষ, বিষাদ,

ক্রোধ; বিরক্তি প্রভৃতি অনুভূতির প্রত্যেকের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি দৈহিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্ত্তনগুলি দেখিয়া আমরা বিশেষ-বিশেষ ভাবের উদয় যে হইয়াছে, তাহা অনুমান সাহায্যে বলিতে পারি। অবশ্য এই দুই প্রণালীর অনুসন্ধান নিরপেক্ষ ভাবে করিতে হইবে। কোনরূপ পূর্ব্ব-ধারণা বা সংস্কার লইয়া পরচিত্ত অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, ভ্রান্তিতে পতিত হইতেই হইবে। এই নিরপেক্ষতার অভাবে অনেক সময়ে আমরা অপরকে ভুল বুঝিয়া থাকি। আর অনেক সময় আমরা অতিমাত্রায় আমাদের পক্ষপাতী বলিয়া আমাদের নিজেদের দোষগুণ ঠিকমত ধরিতে পারি না। এ সকল ক্ষেত্রে 'আমিত্ব'—'অহংজ্ঞান' বা 'অহঙ্কার' (Egoism—Self-Consciousness) যে ফুটিয়া উঠিবে তাহা আর বিচিত্র কি? এই অহংজ্ঞান-পরিচালিত—এই আমিত্বের প্রসার-ফলে সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাই না, এবং ভ্রান্ত ধারণা ও মত পোষণ করিয়া থাকি। ধীর ভাবে মনোযোগের সহিত, আমাদের মনের ভিতর যে সমস্ত ভাবের লহর উঠিয়া থাকে, সেগুলির সন্ধান লইতে হইবে। অন্তর্দ্দর্শনের অন্তরায়গুলি মোঁপাসা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া, সে বিষয়ে আমরা আর হস্তক্ষেপ করিলাম না। এক্ষণে বহির্দ্দর্শনের অন্তরায় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তখনই বাহিরে সে ভাবের ছাপ পড়িয়া যায়। ভাবের অভিব্যক্তি শরীরে, ভাষায়, চিত্রে, স্থাপত্যে, সুকুমার কলায়, কর্ম্মে, প্রস্তরে বা মুদ্রায় পড়িতে পারে। আর এই ছাপ দেখিয়া আমরা মূল মানসিক ভাবের অনুসন্ধান করিয়া লই। এই সকল অভিব্যঞ্জনা দ্বারা আমরা অপরের মন পরীক্ষা করিতে পারি। অবশ্য এই সকল বাহ্য-লক্ষণ যদি কৃত্রিম হয়, তাহা হইলে আমাদের অনুমান ঠিক হয় না। আমরা নিজের মন দিয়াই পরের মন বুঝিতে চেষ্টা করি। ভাবের অনুমান করিতে গিয়া অনেক সময় আমাদিগকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কল্পনা অবাধ গতিতে অসংযত ভাবে চলিলে, আমাদিগকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যায়। আবার ইন্দ্রিয় দ্বারাই আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়েরা যে অনেক সময় আমাদিগকে প্রবঞ্চিত করে, তাহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। তাহা হইলে দেখা গেল কল্পনা, ইন্দ্রিয়-প্রবঞ্চনা ও সংস্কার বহির্দ্দর্শনের অন্তরায়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, বস্তুগত ঔপন্যাসিকেরা অনেক সময়ে যে ঘটনার বিবৃতি করেন, তাহাও ভ্রমশূন্য নহে; কারণ ঘটনাও ত ইন্দ্রিয় সাহায্যে দেখা হইয়া থাকে।

দোষ উভয় প্রণালীরই আছে। অন্তর্দ্দর্শন-ফলে সার্ব্বজনিক মনোবিষয়ক সত্য অবধারিত হইতে পারে না। বহু মনের পরীক্ষা না হইলে, বিজ্ঞান-সম্মত সাধারণ নিয়ম বাহির হইতে পারে না। তাই বহির্দ্দর্শন প্রণালীর সাহায্য লইতে হইবে। উভয় প্রণালীর সম্মিলিত কার্য্য দ্বারাই সত্যে উপনীত হইতে পারা যায়।

মানসিক সত্য নির্দ্ধারণ জন্য যে প্রকৃষ্ট পন্থা বিবৃত হইল, আমাদের মনে হয় এই পন্থা অবলম্বন করিলে, উপন্যাস সম্বন্ধে আর ভ্রান্ত মত পোষণ করিতে হইবে না। কথাটা একটু বিশদ করিয়া বলি। যতদিন না ভাবগত ও বস্তুগত এই দুই মত সম্মিলিত হইয়া উপন্যাস লিখিত হইবে, ততদিন উপন্যাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না। সে দিন গিয়াছে যে দিন আমরা কোন গতিকে সময় অতিবাহিত করিবার জন্য রেলওয়ে বা ষ্টিমারে যাত্রাকালে একখানি উপন্যাস লইয়া পড়িতে বসিতাম। শুধু আমোদ দিবার জন্য এখন উপন্যাস লিখিত ও পঠিত হইতেছে না। উপন্যাস কেবলমাত্র কাল্পনিক ঘটনা লইয়া কতকগুলি মিথ্যার সৃষ্টি করে না। সেদিন শ্রদ্ধাস্পদ ভারতবর্ষ-সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ীতে বসিয়া সাহিত্যালোচনার সময়, তিনি ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্র ভায়াকে বলিলেন, 'ভায়া, তোমরা যেমন সত্যের জন্য মাথা খুঁড়িতেছ, একটা কথা সত্য কি না তাহার জন্য কত যত্ন, কত কষ্ট স্বীকার করিতেছ, কিন্তু দেখ আমাদের সত্যের জন্য সে ভাবনা নাই;—আমরা একটা কেন শত-সহস্র মিথ্যার পসরা লইয়া বাজারে উপস্থিত হই।' জলধরদাদার উক্তির তখনই প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু তাঁহার সহাস্য বদন দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিলাম, এটা তাঁহার প্রাণের কথা নয়। এ বিষয়ে আমার যাহা ধারণা, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিব। ঘটনা বা চরিত্রের বিবৃতি যাহাই উপন্যাসের লক্ষ্য হউক না কেন, উপন্যাস জাতীয় জীবনের মুকুর। ঔপন্যাসিক সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই করুন, ঘটনার বিবৃতিই করুন, আর চরিত্র-সৃষ্টিই করুন, তাঁহার পুস্তকের বা তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের ফলশ্রুতি আছেই আছে।

ছোট গল্প ও উপন্যাসের পার্থক্য এই খানে। ছোট গল্পের ফলশ্রুতি নাই। ছোট গল্প সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করে। সদ্য-প্রস্ফুটিত ছোট গল্প-কুসুমের সৌরভে আমাদের প্রাণ পুলকিত হয়। কোন একটি বিষয় বা কোন একটি ভাবের বিকাশ দেখাইয়া ছোট গল্প ক্ষান্ত হয়। ছোট গল্প হইতে কোনরূপ শিক্ষা আমরা পাই না। মনীষী H. G. Wells এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "A short story is, or should be, a simple thing; it aims at producing one single vivid effect; it has to seize the attention at the outset and never relaxing, gather it together more and more until the climax is reached." বস্তুগত ঔপন্যাসিকেরা চেষ্টা করিয়াও ফলশ্রুতি না দিয়া থাকিতে পারেন না। অবশ্য তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া যে দেন, তাহা নহে—তাঁহারা চান নিরপেক্ষ ভাবে চরিত্র বর্ণনা করিতে; কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র হইতে আমরা কোন না কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র আমাদের নিকট আদর্শ উপস্থাপিত করে; আমাদের মনে নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়। H. G. Wells ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন, 'Even if the novelist attempts or affects to be impartial he still cannot prevent his characters setting examples; he still cannot avoid, as people say, putting ideas into readers' heads.'

ঔপন্যাসিকের মিথ্যা কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করা উচিত নয়। এই বিংশ শতাব্দীতে যে সকল সমস্যা উঠিতেছে, তাহাদের সমাধান করাই ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য। ঔপন্যাসিক সামাজিক সমস্যার সমাধান করিবার জন্য মধ্যস্থ হইবেন। কেবল প্রশ্ন উত্থাপিত করা তাঁহার কার্য্য নয়। বিচার-বুদ্ধি বলে সে প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া তাঁহারই উচিত। তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া আমরা শুনিতে চাই। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আইন ও ধর্ম্মমত বিষয়ক সমস্যাগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। আর সর্ব্বোপরি এই জগৎজোড়া অন্নচিন্তার সমাধান কি ভাবে করিতে পারা যায়, তাহারও চেষ্টা তাঁহাকেই করিতে হইবে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের ভিতর এই সকল সমস্যার সমাধান-চেষ্টা আমরা দেখিতে চাই। আর দেখিতে চাই আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টি—যাহার চরিত্র দেখিয়া আমরা আপন-আপন চরিত্র সংশোধন করিব—আমরা মানুষ হইব। পাপের উপর যাহাতে আমাদের ঘৃণা আসে—ধর্ম্মের দিকে যাহাতে আমরা আকৃষ্ট হই, এরূপ চরিত্র অঙ্কিত করাই ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য। অবশ্য শ্লীলতার বাহিরে যাইলে চলিবে না। শ্লীলতা ও অশ্লীলতার ভিতর যে ব্যবধানটুকু আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আর তাঁহাকেই বলিব কলাবিদ্, যিনি এই পার্থক্য সকল সময়ে বজায় রাখিতে পারেন। বাস্তবতার দোহাই দিয়া অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করা কোন মতেই সমীচীন নয়। যাঁহারা আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি করা ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য নয় বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা H. G. Wellsএর আর একছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাই। তাঁহার মত বস্তুগত-পথাবলম্বী বলিতেছেন, "But the novelist is going to be the most potent of artists, because he is going to present conduct, discuss conduct, analyse conduct, suggest conduct, illuminate it through and through." কিন্তু ঔপন্যাসিকের একটা কথা মনে রাখা উচিত—আদর্শ সৃষ্টি করিবার প্রলোভনে তিনি চরিত্রকে এমন ভাবে অতিরঞ্জিত করিবেন না, যাহাতে ঐ চরিত্রকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। মূল কথা হইতেছে, মানুষকে দোষে-গুণে মানুষ করিয়া অঙ্কিত করিতে হইবে—'অতি মানুষ' করিলে চলিবে না। সর্ব্বোপরি ঔপন্যাসিকের উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করা উচিত নয়। তিনি আলোচনা করিবেন, তাঁহার মতের যাথার্থ্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। সমাজের দোষগুলি সমালোচকের ন্যায় দেখাইয়া দিবেন। তাই বলিতেছিলাম, দুই মত মিলিত হইয়া উপন্যাস লিখিলে, তবে জগতের উপকার সাধিত হইবে। চাই আমরা বর্ণনা—চাই আমরা চরিত্র—কাল্পনিক বর্ণনা বা কাল্পনিক চরিত্র; চাই না। চাই সত্য-বর্ণনা—সত্যকার রক্ত মাংসের চরিত্র; কিন্তু তাই বলিয়া সত্য-বর্ণনের অজুহাতে অশ্লীল বর্ণনা চাহি না। চাই সেই বর্ণনা যাহা সমাজের স্বাস্থ্যকে অটুট রাখিবে—মনের অবসাদ দূর করিয়া বল আনয়ন করিবে। দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা কয়েকজন লেখকের মুখে আমরা সময়ে-সময়ে শুনিয়া থাকি, উপন্যাস উপন্যাস—ধর্ম্মগ্রন্থ বা চারিত্রিক নয়। কথাটা ঠিক নয়।

তরলমতি বালক বা যুবকদের বা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের হস্তে যদি ঐ শ্রেণীর উপন্যাস পড়িবার সম্ভাবনা না থাকিত তাহা হইলে কথাটা তুলিতাম না। উপন্যাসের বর্ণিত বিষয়কে যাহারা কাল্পনিক বলিয়া জানে, তাহাদের এরূপ চিত্র দেখিলে কোনরূপ ক্ষতিই হইবে না। পরমহংসদেব বলিতেন, 'মনটাকে মাখন করে রাখ, জলের উপর ভাস্‌বে, দুধ থাক্‌লে জলের সঙ্গে মিশে যাবে।' আমরাও বলি, তরলমতিদিগকে এই সকল চিত্র বিপথে লইয়া সমাজ-বন্ধন শিথিল করিয়া দিবে—এখনও যাহাদের চরিত্র গঠিত হয় নাই, সংসারের জলরাশির ভিতর মনকে যাহারা মাখন করিয়া জলের উপর ভাসাইয়া রাখিতে পারে নাই, তাহারা জলের সহিত মিশিয়া আপনার অস্তিত্ব হারাইবে—সমাজের অকল্যাণ করিবে। এই শ্রেণীর উপন্যাসিকদিগের নিকট করজোড়ে নিবেদন করি, সমাজের দিকে চাহিয়া তাঁহারা এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হউন; কারণ ভারতবর্ষে এখনও সেদিন আসে নাই, যেদিন উপন্যাস কেবলমাত্র শিক্ষিত লোকদিগের হস্তে বিরাজ করিবে, যেদিন শিক্ষিত নরনারী মনস্তত্ত্বের ও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া এগুলির আলোচনা করিবে, ও রস পান করিয়া ধন্য হইবে। এখন উপন্যাস ও কথা-সাহিত্য অধিকাংশ স্থলে অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত তরলমতি যুবক-যুবতীদের দ্বারা পঠিত হইয়া থাকে। অনর্থক তাহাদের জীবনে চাঞ্চল্য আনয়ন করা কোন মতেই উচিত নয়। পাপের প্রতি যাহাতে আস্থা আসিতে পারে, এরূপ চিত্র তাহাদের নিকট ধরাও কর্ত্তব্য নয়।

কয়েদী

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ]

(কাহিনী)

কে বলে দেবতা আছেন স্বর্গে—দয়াময় ভগবান,
যদি কেহ থাকে বিশ্ব-বিধাতা কঠিন তাহার প্রাণ!
মানবের হাসি অশ্রু লইয়া আঁকে সে খেলার ছবি,
নিজ-সান্ত্বনা লাগি মিছা তাঁ'রে বিভু সাজিয়েছে কবি!
মানবের প্রাণ, ধূলার সমান,—খেলে নিয়ে ছিমিমিনি,
শিশু সম অবিকার অবিচারে ভাঙা-গড়া বিকিকিনি!
কি করেছি পাপ,—পাকা ধানে কা'র দিয়েছি বা কবে মই,
শিষ্ট-পালন ব্রত যদি তাঁর, আমি কেন এত সই?
দীন অতি আমি,—মানুষ তবুও, অসহ আমারো আছে,
তবে কেন মোরে শার্দ্দূল-সম শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে?
দেবতা যদি গো করায় সকলি,—নর শুধু ছায়া তা'র,
সর্ব্বজ্ঞ সেই,—বুঝিল না কি এ হৃদয়ের গুরুভার?

সে দিনের কথা মনে হ'লে আজি গায়ে যেন আসে জ্বর,
আষাঢ়ের ঘন কাল জটা হ'তে জল ঝরে ঝরঝর;—
দেবতা যেন গো হয়েছে ক্রুদ্ধ—গগন গেছে বা গলি,
কালী হ'ল ধরা হেরি' নিজ বুকে শ্যাম-সন্তান-বলি।

সাত দিন ধরি' অবিরল জল,—ক্ষেতগুলি গেল ভাসি,
সারা বরষের আশার স্বপন বিদ্রূপে উঠে হাসি!
কত না কাঁদিনু দেবতার পায়ে—মানত করিনু কত,
হাতে পায়ে ধরি' সাধিয়া আনিনু গুণী ছিল দেশে যত!
মিথ্যা সকলি,—নয়নানন্দ ডুবি' গেল শিশু শ্যাম;
বুঝিনু তখনি, দুর্ব্বল বলি বিধি ও মোদের বাম!
সম্মুখে হেরি' জমাট আঁধার,—চারিভিতে হাহাকার;
সারাটী বরষ খেতে হ'বে বায়ু, আয়োজন শেষ তা'র!
ছেলে মেয়ে দুটী ভুগিতেছে জ্বরে আজি পুরা আট দিন,
তাদের পথ্য, মোদের খাদ্য চালিয়েছি করি ঋণ!
দীন মোরা চাষা,—তবু ত মোদের স্নেহ নহে কিছু কম,—
নিরুপায় তাই চিকিৎসা ভার লইল আপনি যম!

এতদিন তবু দিয়েছি পথ্য—পারি নাই কাল থেকে,—
হায়! হায়! যেন কেউ কোন দিন হেন দায়ে নাহি ঠেকে!
তিন দিন হ'তে দম্পতি মোরা জল বিনা খাই নাই,
চালে নাহি খড়—জল ভরা ঘর,—দাঁড়াবার নাই ঠাঁই!

শুষ্ক একটু ছিল এক ধারে,—কোন মতে মাথা গুঁজি',
কাঁপিতেছে সেথা দীনের দুলাল, রোগে শীতে চোখ বুজি।
নীড়হীন পাখী সম জলে ভিজি মোরা কাঁপি' আশপাশে,
পলকে-পলকে কাঁপিছে সে ঘর পবনের ভীম শ্বাসে!
মেঘে কভু হয় শুচেরি বৃষ্টি,—শিলা কভু বাজ হানে,
কি করিব,—তবু বাহিরিনু, যদি কিছু মিলে কোনখানে!
ব্যর্থ প্রয়াস,—জলভরা চোখে ফিরিনু শূন্য করে,
হেথা সবাকার ক্ষুধার জ্বালায় মুখে নাহি কথা সরে!

দুপুর না হ'তে পার অনাহারে,—মোর এই আঁখি আগে,
অতি যাতনায় প্রাণের পুত্র শেষের বিদায় মাগে!
কুসুম-লতিকা কন্যাটী মোর বাড়া'য়ে দিয়েছে কর,
এখনি মৃত্যু যেন গো তাহারে তুলিবে আপন ঘর!
এমন সময়—কি কহিব আর?—ক্ষণেক থেমেছে জল,
উঠানে সহসা লাঠি হাতে যত হাঁকিল পাইক দল;
পাল্কীর মাঝে হেরিয়া নায়েবে কাঁপিয়া উঠিনু ত্রাসে;
মুছিয়া অশ্রু সভয়ে দাঁড়া'নু করযোড়ে তা'র পাশে।
প্রণমি তাহারে,—"কি হুকুম" বলি রহিনু আনত মুখ,
দীন চাষা আমি, কে করিবে দয়া যদিও জ্বলিছে বুক।
কহিলা নায়েব,—"ওরে বেটা পাজী করিতে হ'বে না ছল,
শোধ দিতে দেনা চোখে নামে ভরা শত আষাঢ়ের জল!"

আমি ত পড়িনু আকাশ হইতে,—কহিনু চরণ ধরি',
"দীনের মা বাপ,—কি লাভ তোমার দীনের পরাণ হরি?
অনেক জনার ঋণী বটে আমি, তব নাহি ধারি কভু,
শুধেছি খাজনা,—মাথট দেইনি তাই কি রেগেছ প্রভু?
দয়া করে হের অনাহারে মোর মরেছে পুত্র ঘরে,
কঙ্কালসার কন্যা আমার,—এত বেলা বুঝি মরে!
পিতা মোর তুমি কর ক্ষমা মোরে হেরি এ বিপদ ঘোর";—
না শুনিল বাণী,—হুঙ্কারি কহে, "পাজী বদ্‌মাস চোর!
এক শত টাকা করেছিলি ধার,—মেয়াদ হয়েছে পার,
নিলাম ডাকিয়ে কিনেছি সকলি—জমিজমা ঘর-দ্বার।
এই বেলা একে একে খালি হাতে মানে মানে যাও ছাড়ি,
নতুবা লাঠিতে ভেঙে দেব মাথা,—উপাড়ি ফেলিব দাড়ি!"

হইনু অবাক—শয়তান বুঝি আছিল ভদ্রলোক?
'হায় ভগবান!"—সরিল না বাণী,—জলে ভরা দু'টী চোখ!
কহিলা নায়েব,—"ভণ্ড বেটার ছলনা সহে না আর,
জিনিষ-পত্র করিয়া বাহির ভাঙ্‌ তোরা ঘর-দ্বার!"
[illegible] দু'জন লাঠি ফেলি কাঁধে উল্লাসে চলে রুখি,'
বাহির করিল যা' ছিল আমার অবহেলে ঘরে ঢুকি!
[illegible] একটী,—ছেঁড়া কাঁথা আর মাদুর মাটীর হাঁড়ি,—
[illegible] ছিল এই শুধু মোর,—তা'রি লাগি কাড়াকাড়ি!

রুষিয়া নায়েব কহিলা তখন "আর কি কিছুই নাই,
হাভাতে বেটার পোড়াইলে ঘর মিলে না একটু ছাই!"

কহিলাম আমি,—"দুর্দ্দশা মোর হের প্রভু আঁখি দিয়ে,
মাথটের ক্ষুধা মিটাও এবার আমার রক্ত পিয়ে!"
সুধাল নায়েব ফিরি,—"কিছু আর নাহি কি উহার ঘরে?"
কহিল পাইক—"আছে এক কাঁথা মরা ছেলেটীর পরে,
রূপার হাঁসুলি আছে একখানি ওরি পত্নীর গলে;"
"আনিলি না কেন?"—রুষিলা নায়েব—পাইক কাঁদিয়া বলে,
"ক্ষমহ মোদের,—মোদেরো যে আছে পত্নী পুত্র মেয়ে,
চাক্‌রীর লাগি' এমন কর্ম্ম করি না ধর্ম্ম খেয়ে!"
দেবতার জ্যোতিঃ দেখিনু সেদিন মানুষের মুখ পরে,
পাইক-চরণে নোওাইনু শির গভীর শ্রদ্ধা ভরে।
"শিখা'ব তো'দের,"—গর্জ্জি নায়েব চলিল আপনি ছুটি,—
সহিতে নারিনু আর,—পাশে ছিল একটী বাঁশের খুঁটী,
কি জানি কেমনে তুলিয়া নিমেষে হানিনু নায়েব শিরে,—
ফাটি' গেল শির,—পড়ি গেল ভূমে,—ছুটিল শোণিত তীরে!
অবশ অচল রহিনু দাঁড়া'য়ে নাহি জানি কতক্ষণ,
জ্ঞান হ'লে মোর দেখিনু সেথায় নাহি কোন লোকজন;
নায়েব তখনো পদমূলে মোর জ্ঞানহীন আছে শুয়ে,—
কি করিনু আজি?—এ কালী কেমনে ফেলি গো
ঠাকুর ধুয়ে?
শোণিতে, মাংসে গঠিত এ দেহ,—অজ্ঞান তাহে আমি,
সহিতে পারি না এ ভীম আঘাত জানিতে তুমি ত স্বামী।
তবে কেন হরি তুলিলে জাগা'য়ে বুকের পশুরে মোর,
ব্যথাহারী না কি নাম,—ব্যথা দিয়ে তবে কেন সুখ তোর?

পারি না ভাবিতে নিবিড় আঁধার ঘিরে দক্ষিণ বামে,
"কি করিবে ভাবি?"—কহিলা পত্নী,—"নায়েবের নিজ ধামে
সাবধানে তা'রে রাখি' চল যাই দূর দিগন্ত পারে,"—
কহিলাম আমি,—"অভাগার সনে ডুবিবি কি পারাবারে?"
হেনকালে কা'রা পিছু হ'তে মোরে মাথায় মারিল লাঠি,
ঘুরিল অবনী,—চীৎকার করি উল্টি' লইনু মাটী।

* * * * *

মেলি আঁখি যবে চাহিনু আবার তখন হাজত ঘরে,
বিস্ময় মানি' উঠিতে যাইয়া পড়িনু ভূমির পরে!
পরদিন মোর হইল বিচার—দস্যু আমি যে খুনী,
ডাকাতি করিতে হেরেছে অনেকে আদালতে গিয়ে শুনি!
দাড়ি নাড়ি দিল উকীলের পাল সকলি প্রমাণ করি,
দু'টি বছরের তরে কারাগারে মোরে রাখি' দিল ভরি।
দীন চাষী আমি,—কন্যাপত্নীর কে দিবে খবর ভাই,
হয় ত বা তা'রা প্রাণ দিয়ে পুরায়েছে মাথটের খাঁই!

শোক-সংবাদ

৺রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর সি-আই-ই

আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে সুপ্রসিদ্ধ জননেতা রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের লোকান্তর গমনের সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। বৈকুণ্ঠ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং লোকহিতকর কার্য্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ৫০ বৎসরের ও অধিক কাল তিনি অতি যোগ্যতার সহিত ওকালতী ব্যবসায় পরিচালন করেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বহরমপুরে তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যালিটির (সর্ব্বপ্রথম বেসরকারী) চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য প্রভৃতি উচ্চপদ অলঙ্কৃত করেন, এবং কলিকাতায় কংগ্রেসের গত অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে কার্য্য করেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে প্রথমে রায় বাহাদুর এবং পরে সি-আই-ই উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৯২২ সালের ৩ই মে তারিখে ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, সি-আই-ই

সাহিত্য-সংবাদ

'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত সুবৃহৎ উপন্যাস "ইমানদার" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৩॥০।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল প্রণীত নূতন সামাজিক অপূর্ব্ব উপন্যাস "শশিনাথ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২॥০।

আট আনা সংস্করণের ৭৬ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন প্রণীত "আকাশ কুসুম" প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস প্রণীত "মানের পাহাড়" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত "চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ (ব্রজলীলা)" ৪১খানি ত্রিবর্ণ চিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইল; মূল্য ৪৲।

রবি বাবুর মুক্তধারা বাহির হইয়াছে; মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ঠাকুর প্রণীত "সংসারের খেলা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৸০।

শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাস প্রণীত বিদ্যালয়ে অভিনয়ের উপযুক্ত নাটক "উতঙ্ক" প্রকাশিত হইল; মূল্য ॥০।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণাত "জীবনের ভ্রম" প্রকাশিত হইল; মূল্য ৵০।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "চীনা সভ্যতার অ আ ক খ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।০।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

মহাশ্বেতা

(বাণভট্ট-বিরচিত—কাদম্বরী)

শিল্পী—শ্রীরামেশ্বর প্রসাদ

Blocks by
BHARATVARSHA HALFTONE WORKS

Emerald Ptg. Works

শ্রাবণ, ১৩২৯

প্রথম খণ্ড] দশম বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

বৈশেষিক দর্শন

কাল ও দিক্

[অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

(২)

যাহা জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব ব্যবহারের হেতু, তাহার নাম কাল। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে জন্মিয়াছে, তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলা হয়, আর যে পরবর্ত্তী কালে জন্মিয়াছে, তাহাকে কনিষ্ঠ বলা হয়। কাল এক হইলেও উপাধি-ভেদে ক্ষণ, দণ্ড, মুহূর্ত্ত দিন, মাস, বৎসর প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জন্যই বরদরাজ মতান্তরে কালের লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন,—"একস্মিন্ দেশে একস্য ভাবাভাবস্থাপকঃ কাল ইতি কেচিৎ।"—(তার্কিকরক্ষা; ১৩৮ পৃঃ) রাম, তাহার নিজের বাড়ীতে কখনও থাকে, কখনও থাকে না, এই থাকা ও না থাকা-ব্যবহারের হেতু কাল। কালের পাঁচটী গুণ,—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ।

যে দ্রব্য, দূরত্ব নৈকট্য ব্যবহারের হেতু, তাহার নাম দিক্। দিক্ এক হইলেও শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধির উদ্দেশ্য তাহার পূর্ব্ব পশ্চিমাদি নানা সংজ্ঞা করা হইয়াছে। বেদে আছে, 'ন প্রতীচীশিরাঃ শয়ীত'; স্মৃতিকার বলিয়াছেন, 'আয়ুষ্মান্ প্রাঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে'; লোক-ব্যবহারেও বলা হইয়া থাকে, 'দক্ষিণ দিকে যাও।' যে দিকে প্রথম সূর্য্যোদয় হয়, তাহা পূর্ব্ব, তাহার বিপরীত দিক্ পশ্চিম; সুমেরু পর্ব্বতের সন্নিহিত দিক্ উত্তর, তাহার বিপরীত দিক্ দক্ষিণ। কালের ন্যায় দিকেরও পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী গুণ।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, তাঁহার 'ফেলোশিপের লেক্‌চারে' বলিয়াছেন, "কাল ও দিক্ পদার্থ প্রকৃত পক্ষে পঞ্চভূতের অতিরিক্ত বলিয়া কণাদের অভিপ্রেত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রকৃত পক্ষে কাল ও দিক্ আকাশ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।" (১১৮—১৯ পৃঃ) 'কাল ও দিক্ যে বস্তুগত্যা আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে,—সূত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায় বর্ণনা করিবার আরও বিশিষ্ট হেতু আছে'—এই কথা বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় উপসংহারে যে প্রধান যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, মহর্ষি কণাদ, শব্দের অধিকরণ রূপে আকাশের আনুমানিকী সিদ্ধির প্রসঙ্গে—"কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ" (২।১।২৪), "কার্য্যান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ" (২।১।২৫) এই দুইটি সূত্রে শব্দ যে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর গুণ হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তার পর "পরত্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নাত্মগুণো ন মনোগুণঃ" (২।১।২৬) এই সূত্রে মহর্ষি দেখাইয়াছেন যে, শব্দ আত্মা ও মনের গুণও হইতে পারে না। এই পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন করিয়াই সূত্রকার বলিয়াছেন,—"পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য" (২।১।২৭)। "অর্থাৎ শব্দ যখন পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মনের গুণ হইতে পারিতেছে না, তখন পারিশেষ্য প্রযুক্তই উহা আকাশের গুণ হইয়াছে। এতদ্দারা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, কাল ও দিক্ আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে। তাহা হইলে শব্দ কেন কাল ও দিকের গুণ হইতে পারে না, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া সূত্রকারের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল।"

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে আমাদের বক্তব্য এই যে, শব্দ যে দিক্ ও কালের গুণ হইতে পারে না, তাহা "পরত্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নাত্মগুণো ন মনোগুণঃ" এই সূত্রেই সূচিত হইয়াছে। শব্দ যে মনের গুণ নহে, সূত্রকার তাহার হেতু দেখাইয়াছেন—'প্রত্যক্ষত্বাৎ', অর্থাৎ শব্দের যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাহা মনের গুণ হইতে পারে না। কারণ, মনের কোনও গুণেরই প্রত্যক্ষ হয় না। এখন এই 'প্রত্যক্ষত্ব' হেতু দ্বারা শব্দ যে দিক্ কালের গুণ নহে, তাহাও সিদ্ধ হয়; কেন না, দিক্ কালেরও সমস্ত গুণ অতীন্দ্রিয়। "উপস্কারে" শঙ্করমিশ্র স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"নাত্মমনসোর্গুণ ইতি সমাসে কর্ত্তব্যে যদসমাসকরণং তেন তুল্যন্যায়তয়া প্রত্যক্ষত্বাদিত্যনেনৈব হেতুনা দিক্কালয়োরপি গুণত্বং শব্দস্য প্রতিষিদ্ধমিতি সূচিতম্।"

"বিবৃতি"তে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননও লিখিয়াছেন,—

"মনঃ পদং দিক্কালয়োরপ্যুপলক্ষকং তথা চ শব্দো ন দিক্কালমনসাং গুণঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ রূপাদিবদিতি ব্যতিরেকে কালপরিমাণাদিবদিত্যনুমান প্রকারঃ।"

সূত্রের স্বভাবই এই যে, তাহা অল্পাক্ষরে অধিক ভাব প্রকাশ করে; কাজেই এ ক্ষেত্রে দিক্ ও কালের স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও সূত্রকারের ন্যূনতা হইয়াছে বলা যায় না। সূত্রে স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেই যদি বিপরীত সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে রূপাদি শব্দ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি গুণ যে বৈশেষিক-শাস্ত্রসম্মত, এ কথাও বলা যায় না। কারণ, সূত্রে কেবল সতেরটি গুণেরই উল্লেখ আছে। বরদরাজ "তার্কিকরক্ষায়" লিখিয়াছেন,—

চতুর্ব্বিংশতিরুদ্দিষ্টা গুণাঃ কণভূজা স্বয়ম্।
রূপাদ্যাঃ শব্দপর্য্যন্তাঃ— ——— ———॥"

"তদুক্তম্। রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণা ইতি। (বৈশেষিকসূত্র, ১।১।৬) চ শব্দেন গুরুত্বদ্রবত্বস্নেহসংস্কারধর্ম্মাধর্ম্মশব্দাঃ সংগৃহীতাঃ। ততশ্চ কণ্ঠোক্তাঃ সপ্তদশ চশব্দসমুচ্চিতাঃ সপ্তেতি গুণাশ্চতুর্ব্বিংশতিঃ।"— (১৪১—৪২ পৃঃ)

মহর্ষি কণাদ, সূত্রে রূপাদি প্রযত্নান্ত সতেরটী গুণের উল্লেখ করিলেও, যেমন সমুচ্চায়ক চ শব্দের দ্বারা অবশিষ্ট গুরুত্বাদি শব্দ পর্য্যন্ত সাতটী গুণের সংগ্রহ হইয়াছে, সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও উপলক্ষক মনঃ পদের দ্বারা দিক্ কালের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহাও অবাধে বলা যাইতে পারে। বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য শব্দ যে দিক্, কাল ও মনের গুণ নহে, তাহা একোক্তিতেই বলিয়াছেন,—

"শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বাদ্ বৈশেষিকগুণভাবাচ্চ ন দিক্কাল মনসাম্।" (৫৮ পৃঃ)

রঘুনাথ শিরোমণির মতে দিক্ ও কাল পৃথক্ দ্রব্য নহে, তাহা ঈশ্বরেরই স্বরূপ। তিনি "পদার্থতত্ত্বনিরূপণে" লিখিয়াছেন—"দিক্কালৌ নেশ্বরাদতিরিচ্যেতে, প্রাচ্যাং ঘট ইদানীং ঘট ইত্যাদি ব্যবহারস্তু ঈশ্বরাত্মকবিভুবিষয়কত্বেনৈবোপপত্তেঃ।" শিরোমণি যে আকাশকেও ঈশ্বরের স্বরূপ বলেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

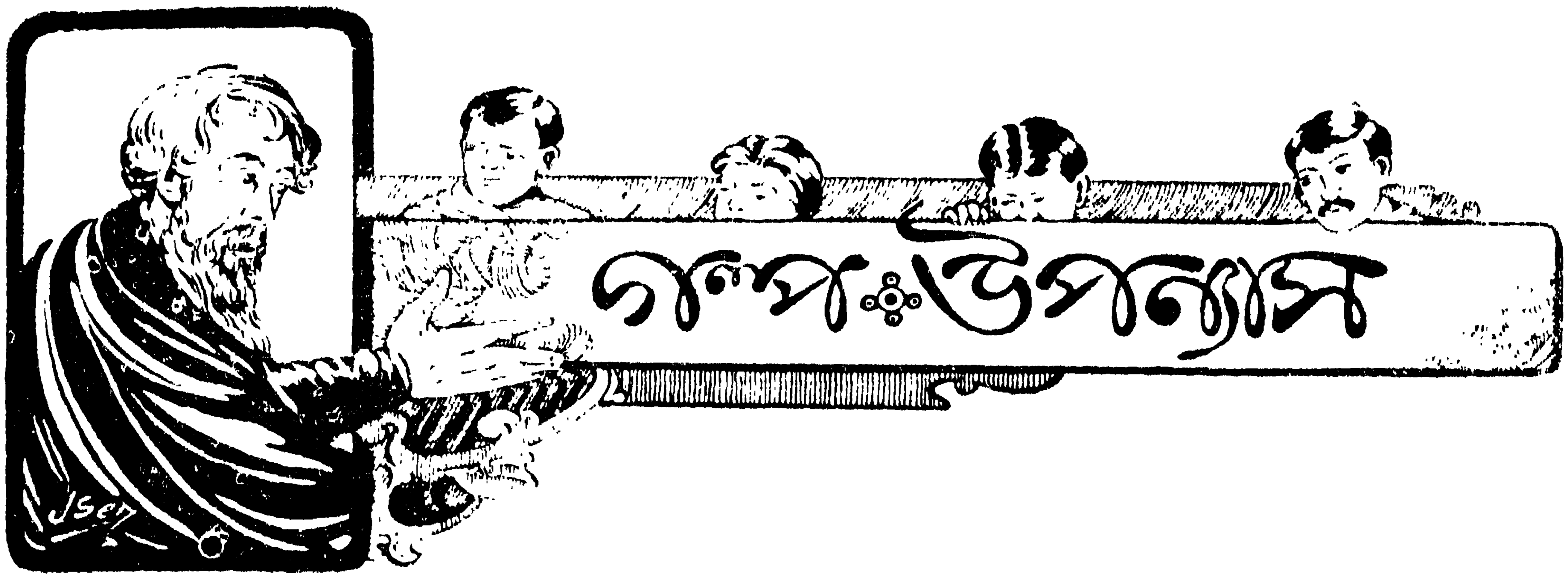

বিপর্য্যয়

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল]

(৮)

ইহার পর চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথ বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাশ হইয়াছে। বিলাত যাইবার জন্য তাহাকে ষ্টেট স্কলারশিপ দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। তাহার পিতা তাহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। সরযূ মুখখানা ভার করিল; আর তার ছোট্ট মেয়েটাকে কোলের ভিতর এমন চাপিয়া ধরিল যে, ইন্দ্রের আর সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে সাহস হইল না।

এখন ইন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার—২৫০৲ টাকা মাহিনা পায়। তার বাপ-মা দেশে ফিরিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। মনো এবার ম্যাট্রিকুলেশন দিবে। তার ছেলেকে সে নিজেই পড়াইয়া দ্বিতীয় ভাগ শেষ করাইয়াছে। সরযূর দুটি মেয়েকেও সে-ই বেশীর ভাগ লালনপালন করে।

ছোট্ট একখানা বাড়ী তাহারা ভাড়া করিয়াছে; কিন্তু বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উপরে দুটি ঘর,—একটি মনোরমার, আর একটি সরযূর। মনোরমার ঘরের আসবাবের মধ্যে একখানা তক্তাপোষ, একটি টেবিল ও একখানি চেয়ার, আর তার স্বামীর একখানা ফটোগ্রাফ। তার নীচেই সাজান তার পূজার সরঞ্জাম। ঘরখানি ঝকঝকে নির্ম্মল,—বিছানার চাদরখানি সর্ব্বদাই ধপধপে সাদা। সরযূর ঘরে সজ্জার অন্ত নাই। মনোর ছেলে এবং সরযূর বড় মেয়ের উৎপাতে ঘরটায় খুব বেশী পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা অসম্ভব। তবু সরযূ ও মনোরমা দুজনেই সর্ব্বদা ঘর ঝাড়া-পোঁছা, পরিষ্কার করায় লাগিয়াই আছে। পিছনে একটা ছাদ আছে,—তারই এক কোণে মনোরমার জন্য একটা ছোট্ট উনান আছে।

রান্না করে একটি বামনী। সরযূ প্রায় মনোরমার জন্য জন্য রান্না করে। না হইলে মনো কেবল ভাতেভাত ছাড়া কিছুই খায় না,—আর কিছু রাঁধিবার তার সময় হয় না।

ইন্দ্রনাথ জীবনের সম্বন্ধে যতসব আদর্শ এতদিন গড়িয়া তুলিয়াছিল, এখন নির্ব্বিবাদে সেগুলি সে কাজে খাটাইতে লাগিল। সে টেবিলে বসিয়া স্ত্রীর সঙ্গেই খাইত; এবং খাওয়ার বাসনপত্র, টেবিল-ক্লথ প্রভৃতি সব যাতে সর্ব্বদা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, সে বিষয়ে তার খর দৃষ্টি ছিল। রাঁধুনীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইত; আর যতদূর সম্ভব সাহেবী কায়দা-কানুনে সমুদায় কার্য্য হইত।

কিন্তু একটা বিষয়ে সে কিছুই সুবিধা করিতে পারিল না; সরযূকে লেখাপড়া সে শিখাইতে পারিল না। তার

এবং মনোরমার সমবেত চেষ্টায় যখন কিছুই হইল না, তখন সে একজন মাষ্টার রাখিবার চেষ্টা করিল। সরযূ তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইল না। তার পর সাত দিন সে বিপুল চেষ্টায় পড়া তৈয়ার করিল। কিন্তু গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম করিয়া, তিনটি ছেলেকে আগলাইয়া পড়াশুনা যে বেশীদূর অগ্রসর হইল না তাহা বলাই বাহুল্য।

অমল কেম্ব্রিজে বেশ প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়াছে। তাহার বাপ-মা দু'জনেই মারা গিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁ'দের প্রকাণ্ড বাড়ীতে এখন লোকের মধ্যে সে আর অনীতা। অনীতাও কেম্ব্রিজে দুই বৎসর পড়িয়া আসিয়াছে; আর সঙ্গীতে উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ হইয়া আসিয়াছে। সে নার্সিং বিদ্যায়ও বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ প্রথমে অমলের সঙ্গে দেখাশুনা করিতে ভরসা করে নাই। কিন্তু অমল আসিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। এবং তাহাকে না দেখা করার জন্য বেশ একটু গঞ্জনা দিয়াছিল। তাদের পুরাতন বন্ধুত্ব মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

দুই পরিবারে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া উঠিল। অনীতা ও মনোরমার মধ্যে ভয়ানক ভাব হইয়া গেল। সরযূর কিন্তু অনীতাকে, কি জানি কেন, বেশী ভাল লাগিত না। সে যেন বড় বেশী ফর্‌ফর্‌ করে; বেটা ছেলেদের কাছে লজ্জা-সরমের ধার ধারে না; আর তা' ছাড়া, তার মুখের ভাবটা যেন কেমন খারাপ রকমের, ইত্যাদি কথা তার মনে হইত। কিন্তু এ সব কথা কারও কাছে বলিবার তার উপায় ছিল না; কেন না, মনোরমা ও তার দাদা অনীতা বলিতে অজ্ঞান। তার রাগের আর একটু গুপ্ত কারণ ছিল। অনীতা গায়ে পড়িয়া তাহার শিক্ষার ভার লইয়াছিল। সে সরযূকে গান ও সেলাই শিখাইতে চেষ্টা করিত; লেখা-পড়াও শিখাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। লেখাপড়ায় সে সরযূকে মোটে ভিড়াইতে পারে নাই; কেন না, সরযূ তার গভীর অজ্ঞতা লইয়া এই মহাপণ্ডিত সমবয়সী মেয়েটার কাছে ঘেঁসিতে একেবারেই নারাজ। সেলাই সে কতকটা শিখিত; গানও একটু একটু শিখিয়াছিল; কিন্তু এসব বিষয়েও অনীতার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার কাছে তার নিজেকে এত খাটো মনে হইত যে, তার বড় রাগ হইত। অনীতা যে তাহাকে গায়ে পড়িয়া শিখাইতে আসিতেছে, ইহাতে সে তাহার অহঙ্কারেরই পরিচয় পাইত।

কেন এমন হইত, তাহা বলা কঠিন। এক একজন লোককে দেখিলেই আমাদের তার উপর গোড়া হইতে একটা অকারণ বিদ্বেষ জন্মিয়া যায়; অনীতার প্রতি সরযূর বিদ্বেষ সেই জাতীয়। তার পর তার স্বামী ও ননদিনী অনীতাকে লইয়া যতই বাড়াবাড়ি করিত, ততই তার বিদ্বেষ বাড়িয়া চলিত। কিন্তু সরযূ কথায় বা কাজে কোনও দিন এ বিদ্বেষ প্রকাশ করে নাই।

মনোরমা অনীতাকে পাইয়া একেবারে ধন্য হইয়া গেল। সে শিষ্যারূপে ও বন্ধুরূপে তার একান্ত পদানত হইয়া গেল। অনীতাও মনোরমাকে তার সমস্ত বিদ্যা শিখাইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। স্কুলে সে গাহিতে বাজাইতে শিখিতেছিল; অনীতা তার সে শিক্ষা খুব দ্রুততার সহিত সম্পূর্ণ করিয়া দিল। সেলাই, নার্সিং, আশু-শুশ্রূষা (first aid) প্রভৃতি নারীদিগের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে মনোরমা তার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর এত শিখিয়া ফেলিল যে, অনীতা নিজেই অবাক্ হইয়া গেল।

(৩)

ইন্দ্র সময় পাইলেই অমলদের বাড়ী যাইত। যতক্ষণ সে অমলদের বাড়ীতে থাকিত, ততক্ষণ সে একটা অপূর্ব্ব শান্ত আনন্দ উপভোগ করিত। বাড়ীটা এত শান্ত, এত স্নিগ্ধ, ইহার প্রত্যেকটি ছোটখাট জিনিস এমন নয়নাভিরাম! যে দিকে চাহিত, তাহার মন স্নিগ্ধ হইয়া যাইত। সঙ্গে-সঙ্গে একটা দারুণ বিরক্তি বোধ হইত যে, তার নিজের বাড়ীতে এই শান্তি ও এই স্নিগ্ধতা নাই। অবশ্য অমলের টাকা-পয়সা, চাকর-বাকর সবই অনেক বেশী; তবু কেবল টাকা-পয়সা ছাড়া আরও একটা জিনিস এ সবের ভিতর আছে, যেটা তার নিজের বাড়ীতে মোটেই নাই। ইহারা স্বভাবতঃ এমন গোছাল, এমন ছিমছাম ও ফিট ফাট, যে, দীনতম কুটীরে যাইয়াও তাহারা ঠিক এমনি পরিচ্ছন্ন ও শান্তিময় গৃহ সৃষ্টি করিতে পারে।

এ বাড়ীর সব আসবাবপত্রের, বাগানের, ছবির,—সব জিনিসের শোভার উপর দিয়া মাথা তুলিয়া আছে দুটি খাঁটি মানুষ,—অমল ও অনীতা। ইহাদিগকে দেখিলে চক্ষু

জুড়ায়। সদাসর্ব্বদা ইহারা ঠিক যেন নিপুণ ভাস্করের খোদাই-করা অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, বা নিপুণ শিল্পীর অঙ্কিত অপূর্ব্ব একখানি চিত্র। ইন্দ্রনাথ যখনই ইহাদিগকে দেখিত, তখনই যেন ইহারা সদ্যঃস্নাত, শান্তিস্মিত, হাস্য-সমুজ্জ্বল দেবদেবীর মত তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইত। তাদের কথায় মধু ক্ষরিত হইত; তাদের সহৃদয়তায় প্রাণ একটা অপরূপ আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হইত।

এখান হইতে বাড়ী ফিরিলে ইন্দ্রের মনে হইত, সে আবু-হোসেনের মত বাদশাই হারাইয়া তার জীর্ণ কুটীরে ফিরিয়া চলিয়াছে। বাড়ীতে আসিয়া সে তুলনায় যে সমালোচনা করিত, তাহাতে তাহার কিছুই ভাল লাগিত না। অনেক পয়সা খরচ করিয়া সুন্দর আসবাব কিনিয়া সে ঘর সাজাইয়াছিল। সে সব যেন তার চক্ষে তুচ্ছ, কুৎসিত হইয়া ভাসিয়া উঠিত। সে বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখিবার জন্য অনেক যত্ন করিত। কিন্তু তবু ঘর-দুয়ার যেন অত্যন্ত কুবিন্যস্ত ও মলাময় বলিয়া তার মনে হইত। অনীতার উজ্জ্বল মুখের কাছে সরযূর মুখ যেন অত্যন্ত সাধারণ বলিয়া মনে হইত। এমন কি, তার যে নিখুঁত সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে পাগল হইয়া গিয়াছিল, তাও যেন অপটু পটুয়ার আঁকা, ভাবশূন্য ছবির মত মনে হইত। বাড়ীর ভিতর তার একমাত্র প্রীতির আকর ছিল মনোরমা—সে যেন অনীতার একটা উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি। অনীতার হাতে সে অনীতারই মত হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া ইন্দ্রনাথ বড় আনন্দ লাভ করিত।

অনীতার সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করিলে, সরযূ বেচারা যে হারিয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সে লেখাপড়া জানে না; গান সামান্য কিছু শিখিয়াছে মাত্র। কথাবার্ত্তা অনীতার মত সে কোথা হইতে কহিবে? অথচ ইন্দ্রনাথ এই সমালোচনা দিন-রাত করিত। প্রথম সে যখন অনীতাকে দেখিয়াছিল, তখনও সে এমনি সমালোচনা করিত; কিন্তু তাহাতে সরযূ এতটা খেলো হইয়া যাইত না; তার ভিতর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সরযূকে অনীতার মত করিয়া গড়িয়া তোলা। এখন সে সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছে। এখনকার সমালোচনায় কেবলই সে সরযূর দোষ ও ত্রুটিগুলি খুঁটিয়া-খুঁটিয়া দেখিয়া, নিজেকে পীড়ন করিত মাত্র।

এক-এক সময় তার মনে হইত যে, এমন করিয়া সরযূর কথা ভাবিয়া সে সরযূর প্রতি অন্যায় করিতেছে। তখন সে অতিরিক্ত সোহাগ দিয়া সরযূকে ভাসাইয়া দিত। সরল-হৃদয়া সরযূ তাহাতে চরিতার্থতায় ভরিয়া যাইত। কিন্তু কর্ত্তব্য-জ্ঞান দিয়া সে তার মনটাকে যতই ফিরাইয়া রাখুক না কেন, প্রায়ই অনবধানতার অবসরে মন ছুটিয়া গিয়া, কত সব অসম্ভব কল্পনা করিত, তাহা বলিবার নহে। তার মনে হইত যে, সে যদি বাল্যে বিবাহ না করিত, তবে আজ সে অনীতার মত—চাই কি অনীতাকেই—সহধর্ম্মিণী রূপে পাইতে পারিত। তাহা হইলে তার জীবন কত ভিন্ন রকমের, কত মনোরম হইতে পারিত। অমলের সংসারের যে সৌম্য শান্তি ও সৌষ্ঠব দেখিয়া সে আজ মুগ্ধ, তার চেয়ে তার ঘরের সুখ সৌভাগ্য বেশী বই কম হইত না। অনীতাকে তাহার পত্নী রূপে কল্পনা করিয়া, সে কত যে আকাশ-কুসুম রচনা করিয়া ফেলিত, তাহা বলিবার নহে। অবশ্য তৎক্ষণাৎ কল্পনার উপর কর্ত্তব্যের বল্গার টান পড়িয়া যাইত।

ক্রমে তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উৎপীড়ন কমিয়া আসিল। এমন কল্পনায় বিশেষ কিছু দোষ আছে, এ কথা সে স্বীকার করিত না। সরযূর প্রতি কোনও রকম কর্ত্তব্যহানি না করিয়া, সে যদি নিতান্তই অনীতাকে দূর হইতে মনে-মনে পূজা করে, তবে তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? আর এর মধ্যে অপরাধই বা কি? একটা সুন্দর ফুল দেখিলে লোকে তাহা বারবার দেখিবার জন্য লুব্ধ হইয়া যায়। তাহাতে যদি দোষ না থাকে, তবে একটা সুন্দরী নারীকে দেখিয়া যদি তৃপ্ত হও, বা তার চরিত্রগুণে যদি মুগ্ধ হও, তাহাতেই বা কি হানি? মুগ্ধ হওয়া না হওয়া তোমার হাত নয়; প্রকৃতি আপনি এ টান মনের গোড়ায় বসাইয়া দেয়—সে টান অস্বীকার করিবে কেন? সুতরাং অনীতার প্রতি তার চিত্ত যদি আকৃষ্ট হইয়াই পড়ে, তবে সেটা দোষের কিছুই নয়,—এইরূপ যুক্তি করিয়া ইন্দ্রনাথ শেষে তার মনটা অনীতার উপর উধাও করিয়া ছাড়িয়া দিল।

ইহাতে দোষ ঘটিতে পারে, সে কথা সে জানিত। যদি তাহার কার্য্যে বা কথায় সে ঘুণাক্ষরেও তাহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বসে, যদি সরযূর প্রতি সে বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্য-ত্রুটি করে—তাহাকে যদি সে কম ভালবাসে বা কম যত্ন করে, তাহা হইলে সে সত্য-সত্যই ধর্ম্মে পতিত হইবে। যদি সে কোনও প্রকারে অনীতার কাছে মনের কথা প্রকাশ

করিয়া ফেলে, তবে অমলের বন্ধুত্ব ও আতিথ্যের অবমাননা করা হইবে। কিন্তু সে ভাবিল যে, এ সব বিষয়ে সে খুব মনোযোগ করিয়া, এ বিপত্তি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে। সরযূর প্রতি তার আদর-যত্ন বরং বাড়িয়া গেল। আর অনীতার প্রতি সে এতটা অধিক সম্ভ্রম প্রকাশ করিতে লাগিল যে, একদিন অনীতা হাসিয়া বলিয়া ফেলিল, "ইন্দ্রদা, আপনি যে আমাকে সত্য-সত্যই একটা এলিজাবেথান লেডী ক'রে তুলছেন দেখি। আমি আপনাদের সেই ছোট্ট অনীতা, সে কথা ভুলে যাচ্ছেন!"

ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিল, "তুমি এখন এত বড় হ'য়ে পড়েছ,—আর কি তোমাকে সেই ছোটটি মনে ক'রবার জো আছে?"

কথাটায় অনীতার মুখখানা এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকার হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে সে তার শান্ত, স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, "আপনি বুঝি আর বড় হন নি?"

"বয়সে বড় হ'য়েছি বই কি! কিন্তু জগতের ছোট-বড়র যে আসল মাপকাটি, তার ওজনে তুমি বেড়ে চলেছ জিওমেট্রিকাল প্রোগ্রেশনে; আর আমি খুব আস্তে-আস্তে এরিথমেটিক্যাল প্রোগ্রেশনে হয় তো বাড়ছি।"

অনীতা বলিল, "সে মাপকাটিটা আপনার বোধ করি দেখা নেই। থাকলেও মাপ ক'রতে আপনি খুব বেশী ভুল ক'রেছেন। তা' বড়লোকদের স্বভাবই এই যে, নিজের ওজনটা তাঁরা ভাল করে' বোঝেন না।"

(১০)

মনোরমা যে ঠিক সেই আগের মনোরমা নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার ব্রহ্মচর্য্য এখনো আছে; তবে বৌদিদির উৎপীড়নে সে ভাল-ভাল জিনিস না খাইয়া পারে না। সরযূ নিজের হাতে রাঁধিয়া তাকে প্রায় নানা রকম ভাল-ভাল জিনিস খাওয়ায়; আর, গঙ্গাতীরের দোহাই দিয়া তাহার আরও যে দুই-চারিটা নিয়ম ভঙ্গ না করায় তাহা নহে। সে ঠিক আগের মতই সাদা কাপড় পরে; কিন্তু ব্লাউজ ও পেটিকোট তাহাকে পরিতে হয়; আর, পোষাক-পরিচ্ছদে বেশ পরিপাটী হইতে হয়। স্কুলের পড়া করিয়া, গাড়ী আসিবার পূর্ব্বে মনের মত করিয়া পূজা করা তার ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু শনি-রবিবারে সে মনের আশা মিটাইয়া পূজা করে। স্বামীর ফটোগ্রাফখানাকে সে নিত্য পূজা করে,—ইহাতে কোনও দিনই তাহার ত্রুটি হয় না।

কিন্তু পড়িয়া শুনিয়া এবং ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া, মেয়েদের কর্ত্তব্য, তাহাদের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে অনেকগুলি অত্যন্ত আধুনিক সংস্কার তাহার মনের ভিতর শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছিল। অনীতা তাহার এই সকল মতামত আরও দৃঢ় করিয়া দিয়াছিল। তা ছাড়া, জাতিভেদ যে বিধিনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা, মানুষকে স্পর্শ করিলে যে অপবিত্র হইতে হয়, এই সব কথা সে বিশ্বাস করিত না।

তাই সে যখন-তখন অনীতাকে তার ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া বসাইত। এ সব অনাচার সরযূর কেমন-কেমন ঠেকিত। তাই সে একদিন মনোরমাকে বলিল, "ঠাকুর-ঝি, তুমি অনীতাকে নিয়ে ওঘরে বসাও, সেটা কি ভাল। ওঘরে তোমার পূজোর সাজ আছে—তোমার শিব আছেন।"

মনোরমা হাসিয়া বলিল, "তাতে কি ভাই? ভগবানের কি জাতবিচার আছে না কি?"

"শোন কথা! জাত তবে ক'রলে কে। হাড়ি, ডোম, মুচি, বাগ্দী—এরা তবে ঠাকুর-ঘরে গেলেই তো পারে।"

"আমি তো যাবার কোনও বাধা দেখি না। তারাও তো এই ঠাকুরকেই নিজের ঘরে ডেকে পূজা করে। ঠাকুর কি আমাদের ঘরেই আসেন, তাদের ঘরে যান না?"

"কি সব কথা তুই বলিস ঠাকুর-ঝি? তাদের ঘরে ঠাকুরের পূজো করা, আর বামুনের ঘরে ঠাকুর পূজো এক হ'লো? তাই যদি হ'বে, তবে ঋষিরা এত সব ব্যবস্থা করে' গেলেন কেন?"

"কেন ক'রেছেন সে তাঁরাই জানেন। আমি বুঝি, এক ভগবান সব মানুষ গড়েছেন,—সবার ডাকে তিনি সাড়া দেন। জান বৌদি, স্কুলে আমরা পড়ার আগে উপাসনা ক'রতাম—কলেজে এখন তা' হয় না। মাঝে-মাঝে আচার্য্য সুকুমার বাবু এসে আমাদের সঙ্গে উপাসনা ক'রতেন। তাঁর সঙ্গে উপাসনা ক'রতে ব'সে আমার সত্যিই মনে হ'ত, ভগবান যেন আমাদের আশেপাশে,—আমাদের মনের ভিতরটা এসে বিরাজ ক'রছেন। সুকুমারবাবুর উপাসনার ভিতর এমন একটা ব্যগ্রতা ছিল যে, ভগবান তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারতেন না। সত্যি কথা ব'লতে কি,—আজ ৮৯ বছর শিব-পূজা ক'রছি,—কালে-ভদ্রে এক-আধ দিন

ছাড়া কখনও আমি ভগবানকে এত কাছে পেয়েছি ব'লে মনে পড়ে না।"

"কি জানি ভাই, আমরা অত ভগবানের দেখা পাইও না, জানিও না। চিরদিন বাপ-পিতামহের ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ে আসছি, এই বুঝি। কিন্তু তাও বলি, যদি ভগবানকে শুধু শুধু অমনি ডাকলে পাওয়া যায়, তবে আর পাথরের শিব নিয়ে তোমার রোজ এত পূজা-অর্চ্চারই বা দরকার কি?"

কথাটা কোনও দিন মনোরমার মনে হয় নাই। মতের সঙ্গে জীবনের সমন্বয় সব সময় আমরা করি না;—মুখে-মুখে যে সব মত আমরা ফস্‌ফস্‌ করিয়া বলিয়া যাই, সবগুলি সব সময়ে জীবনের ভিতর খাটাইয়া দেখি না। তাই মনের ভিতর সারা জীবন ভরিয়া ঝুড়ি-ঝুড়ি পরস্পর-বিরুদ্ধ মত ও যুক্তির বোঝা বহিয়া, দিব্য নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইয়া দিই। মনোরমার মনে ঠিক এমনি কতকগুলি বিরুদ্ধ মত ও ক্রিয়া পরতে-পরতে আলগা ভাবে মনের ভিতর শোয়ান ছিল। এই কথায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিয়া, সেগুলির ভিতর ভয়ানক তোলপাড় লাগিয়া গেল। মনোরমা ভাবিতে লাগিল।

তার মনে হইল যে, তার পূজানুষ্ঠানের ভিতর যে সব সংস্কৃত মন্ত্র সে আওড়াইয়া যায়, তার অনেকগুলির মধ্যেই কোনও সার্থকতা নাই; সে সব অনুষ্ঠান করে, তার অনেকগুলিই ছেলেখেলার মত একটা মন ভুলান অনুষ্ঠান মাত্র। বারবার কুশীতে করিয়া একই জল টাটে ঢালিয়া "এতৎপাদ্যং" "ইদমাচমনীয়ং" বলিয়া ঠাকুরের সম্বর্দ্ধনার সঙ্গে পুতুল সাজাইয়া তাহাদিগকে সাজান, খাওয়ান প্রভৃতি তাহার শৈশবের অনুষ্ঠানের কোনও প্রকৃতিগত প্রভেদ নাই। ঠাকুরকে একটা সংস্কৃত বুলি আওড়াইয়া ডাকিলে যে তিনি ঐ পাথরের মধ্যে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন, এবং তার নিবেদিত পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্প ও নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, এ কথা সে মনের সহিত বিশ্বাস করে না। কাজেই তার এ পূজানুষ্ঠান একটা বাহ্যিক অসত্য আড়ম্বর মাত্র। যে সত্য-সত্য এ সব কথা বিশ্বাস করিতে পারে, তার এই প্রতীকোপাসনার সার্থকতা থাকিতে পারে; কিন্তু যার বিশ্বাস নাই, তার পক্ষে এ আড়ম্বর নিতান্ত মিথ্যা অভিনয়।

এমনি করিয়া ক্রমে সে তার সমস্ত জীবনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিতে লাগিল। ইহাতে সে যে সব কথা অনুভব করিল, তাহাতে তার বড় ভয় হইল। তার মনে হইল, তার সমস্ত জীবনটাই একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামী। সে যে শোকের পরিচ্ছদ সর্ব্বদা ধারণ করিয়া থাকে, সে শোকের শান্ত ছায়া কি তার মনের ভিতর সে এখন খুব বেশী দেখিতে পায়? দারুণ দুঃখের সহিত সে স্বীকার করিল যে, তা ঠিক নয়। তার বর্ত্তমান জীবনের আনন্দের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে সেই অতীত শোক সমাধি লাভ করিয়াছে। স্বামীকে সে যে একেবারে স্মরণ করে না, এমন নহে; কিন্তু সে স্মৃতিতে তার যেমন ভাবোচ্ছ্বাস হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়, তেমন কিছুই হয় না। তার স্বামীর চিত্র-পূজাও যে প্রায়ই শিব-পূজার মতই নিরর্থক আড়ম্বর মাত্র, এই কথা ভাবিয়া সে মর্ম্মে মরিয়া গেল।

তার মনে হইল যে, সে প্রকৃত পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। রামী, শ্যামী, পাঁচি প্রভৃতি বিধবার মত সেও কেবল বৈধব্যের খোলসটাই বজায় রাখিয়াছে,—মনে-মনে সে খাঁটি বিধবা নয়। সে যদি স্বামীকে হারাইয়া সত্য-সত্যই সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসিত, যদি রাজরাণী হইতে হঠাৎ ভিখারিণী হইত, তবে তার নিত্য দুঃখের আহুতি দিয়া তার পাতিব্রত্যের বহ্নি সতত জাগ্রত রাখিতে পারিত। কিন্তু স্বামীকে হারাইয়া সে শুধু স্বামীর প্রেম ছাড়া সত্য-সত্য আর কিছুই হারায় নাই। তার দাদা তাঁর অপরিমেয় স্নেহ দিয়া তার সকল অভাব, সকল শূন্যতা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। সাংসারিক হিসাবে এমন স্বচ্ছলতা সে পতিগৃহে কোনও দিন পায় নাই,—পাইতে পারিতও না। তার পর স্কুলে ও স্কুলের বাহিরে সে এমন একটা বিচিত্র মনোহর জগতের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে যে, তার আনন্দের ধারার ভিতর বসিয়া তার দুঃখের সত্তা বোধ করাই প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজ তার মনে হইল যে, এ সবই ভুল হইয়াছে। মনে হইল, তার এমন করিয়া সুখকে বরণ করিয়া লওয়া অন্যায় হইয়াছে। তার উচিত ছিল, স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে কেবল পাড়ওয়ালা কাপড় আর চুড়ি-বালা না ছাড়িয়া, সংসারের সব সুখ-স্বচ্ছন্দতা দূরে রাখিয়া, দারিদ্র্য, দুঃখ ও কঠোরতাকে বরণ করিয়া, স্বামীর অভাবটা নিরন্তর মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করা। স্বামী হারাইয়া হতভাগিনী সে জীর্ণ কুটীরের ক্লিষ্ট দৈন্যের ভিতর বসিয়া না থাকিয়া, আজ এমন সুখের আগারে বাস করিতেছে, বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য্যে অপরিসীম আনন্দ

উপভোগ করিতেছে! আর দিনের পর দিন সে জ্ঞান-সমুদ্রের ভিতর ডুব দিয়া যে উজ্জ্বল রত্ন আহরণ করিয়া আনন্দে ভাসিতেছে, তাতে তার কি অধিকার আছে। হায়! তার স্বামী যখন তাকে বুকে টানিয়া আদর করিয়াছে, তার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া মনোর সুখ সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখন কি সে ভাবিয়াছিল যে, তাহার মৃত্যুতে মনোরমা কিছুমাত্র ক্ষতি বোধ করিবে? জানিলে সে কি তেমনি করিয়া নিজেকে স্ত্রীর কাছে নিঃশেষে বিলাইয়া দিত?

মনোরমা নিজেকে ভয়ানক ধিক্কার দিতে লাগিল। সে স্থির করিল, এই ভণ্ডামী তাহার ছাড়িতে হইবে। সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে তার পূর্ব্বের নিষ্ঠার সহিত ব্রতী হইয়া, তার জীবনকে আগাগোড়া সত্য করিয়া গড়িয়া তুলিবে।

সরযূর কথার কোনও জবাব সে দেয় নাই। সরযূ বুঝিয়াছিল যে, তার কথার সত্য-সত্যই কোনও জবাব নাই। তাই সে বিজয়-গর্ব্বে বলিয়াছিল, "মনে আছে ঠাকুরঝি, তুমি একদিন তোমার দাদাকে ব'লেছিলে, আমাকে বিবি বানাতে! এখন তুমিই বিবি হ'লে,—আর আমি যে সরি, সেই সরিই র'য়ে গেলাম।"

কথাটা মনোরমার বুকের ভিতর শেলের মত গিয়া বিঁধিল। এ কথায় তার মনে হইল, সে কোথা হইতে আজ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। সে সারাদিন গম্ভীর হইয়া ভাবিতে লাগিল। রাত্রে খোকাকে তক্তাপোষের উপর ঘুম পাড়াইয়া, নিজে স্বামীর ফটোগ্রাফখানার তলায় শিরুপাধান হইয়া ভূমিশয্যায় গড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। এ দিকে সে গুরুদেবকে চিঠি লিখিল, যেন তিনি একবার অবশ্য-অবশ্য তাকে দেখা দিয়া উপদেশ দেন।

সরযূ তার সমস্ত কথা জানিল না; কিন্তু দেখিতে পাইল যে, সেই কথার পর হইতে মনোরমা ভয়ানক বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে; আর তার ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা ভয়ানক বাড়াইয়া তুলিয়াছে। সে বুঝিল, মনোরমা তার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে। অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে সে মনোকে বলিল, "ঠাকুর-ঝি, আমার ভারি দোষ হ'য়েছে ভাই, আমার উপর রাগ করো না।"

মনোরমা হাসিয়া বৌদিদির হাত ধরিয়া বলিল, "আ মর, তুমি কি পাগল হ'লে বৌদি!"

সরযূ বলিল, "আমি ভাই মূর্খ মানুষ,—আমি ওসব বড় বড় কথা কিই বা বুঝি!"

মনোরমা বাধা দিয়া বলিল, "ছি বৌদি, কি যে বল তার ঠিক নেই। তোমার কথায় আমি রাগ করি নি বৌদিদি,—তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছ। তুমি আমার গুরু।"

ক্রমশঃ।

ভারতেতিহাসের একটি লুপ্ত অধ্যায়

[শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল]

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে ভারতবাসী যখন অহিংসা-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল,—রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্ম-নীতিতে মন দিয়াছিল,—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল করিয়া, প্রব্রজ্যার পথে দাঁড়াইয়াছিল, এবং ক্ষাত্র-ধর্ম্ম ছাড়িয়া ভিক্ষু-ধর্ম্ম বরণ করিয়া লইয়াছিল, সেই সময় হইতে তাহারা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। তাই যবন, শক ও হূণের আক্রমণে ভারত-ভূমি সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং তাহা দমন করিবার জন্য আবার ভারতবাসী ক্ষাত্র-শক্তি অবলম্বন করিয়াও ছিল। কিন্তু বহুকাল হইতে যে শক্তি অন্য দিকে ধাবিত হইয়াছিল, তাহা আর সম্পূর্ণ রূপে ফিরিয়া আসে নাই। কোন কোন সময়ে সহসা অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার ন্যায় তাহা দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতের ক্ষাত্র শক্তির যে বিশেষ অভাব ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের এইরূপ অবস্থার সময়ে আরবের নব ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইল। সেই ধর্ম্মোন্মাদে মত্ত হইয়া মুসলমানগণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। ভারতের বক্ষেও তাঁহাদের শোণিত ক্রীড়া চলিতে লাগিল। মহম্মদ কাশীম হইতে সবক্তজীন ও সুলতান মামুদ পর্য্যন্ত সেই রক্তপাতের অভিনয় বিশেষ

ভাবেই চলিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর দেবমন্দির, হিন্দুর দেববিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইতে লাগিল। ভারতের নির্ব্বাপিত ক্ষাত্র-শক্তি আর সেরূপ ভাবে জ্বলিয়া উঠিল না। মুসলমান বাহিনী পূর্ব্বে বারাণসী ও দক্ষিণে সোমনাথ পর্য্যন্ত প্লাবিত হইল। লুণ্ঠনের পর লুণ্ঠন, রক্তপাতের পর রক্তপাত করিতে-করিতে সুলতান মামুদ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাহার পর কিন্তু সহসা এ বেগের নিবৃত্তি ঘটিল। ভারতের পশ্চিম ভাগে লাহোর প্রভৃতি অধিকৃত স্থানের নিকট ভিন্ন মুসলমান বাহিনী আর অগ্রসর হইতে পারিল না। মহম্মদ ঘোরীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের মধ্যভাগে আর মুসলমান পতাকা উড্ডীয়মান হয় নাই। কেন যে মুসলমান বিজয় আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, সে সম্বন্ধে সাধারণ ইতিহাস নীরব। ভারতেতিহাসের এই লুপ্ত অধ্যায়টি কোন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তাঁহার ইতিহাসে স্থান দেন নাই। ইহা যে বেশ একটি রহস্যময় ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা ভারতেতিহাসের সেই লুপ্ত অধ্যায়টির কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি। ভারতের ক্ষাত্রশক্তি প্রজ্বলিত হওয়ার তাহা যে একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যে সময়ে সুলতান মামুদ গজনীর মসনদে উপবিষ্ট ছিলেন, সে সময়ে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে মজঃফর খাঁ নামে এক জন মুসলমান-প্রধান অবস্থিতি করিতেছিলেন। হিন্দু রাজগণ তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আক্রমণ করায়, তাঁহার লোকজন গজনীতে উপস্থিত হইয়া সুলতান মামুদের সাহায্য প্রার্থনা করে। মামুদ তাঁহার ভগিনীপতি সালার সাহুকে বহুসংখ্যক সৈন্য সহ ৪০১ হিজরী বা ১০১১ খৃঃ অব্দে হিন্দুস্থানে পাঠাইয়া দেন। সালার সাহু আজমীরে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় তিনি মজঃফর খাঁর সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুদিগকে পরাজিত করেন। হিন্দুরা কনোজের রাজা অজয়পাল বা জয়পালের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। মামুদ এই বিজয়-বার্ত্তা শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হন, এবং অজয়পালকে দমন করার অভিলাষ প্রকাশ করেন। সালার সাহুর আজমীরে অবস্থান কালে ৪০৫ হিজরী বা ১০১৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার পুত্র সালার মাসুদ ভূমিষ্ঠ হন। মামুদ ভাগিনেয়ের জন্ম-সংবাদে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন, এবং ভগিনীপতি ও ভাগিনেয়কে ভারতবর্ষের রাজত্ব প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। তাহার পর সুলতান মামুদ নিজ বাহিনী লইয়া হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইলে, সালার সাহু ও মজঃফর খাঁ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কনোজ আক্রমণে গমন করেন। অজয়পাল কনোজ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান। সে যাত্রা মামুদ মথুরা লুণ্ঠনও করিয়াছিলেন। মামুদ গজনীতে ফিরিয়া গেলে, সালার সাহু অজয়পালের সহিত সন্ধি করিয়া, তাঁহাকে কর প্রদান করিতে বাধ্য করেন।

সালার মাসুদ ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন; এবং ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল। মাসুদের বার বৎসর বয়সের সময় তিনি রাওলের রাজাকে পরাজিত করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাহার পর তিনি পিতা-মাতার সহিত গজনীতে উপস্থিত হন। কিছুদিন পরে সালার সাহু হিন্দুস্থানে ফিরিয়া গেলে, মাসুদ সুলতান মামুদের সহিত সোমনাথ আক্রমণে গমন করেন। মামুদ সোমনাথের মূর্ত্তি গজনীতে লইয়া আসেন, এবং তথাকার মসজিদের দ্বারে ফেলিয়া রাখেন। হিন্দুরা বহু অর্থের বিনিময়ে মূর্ত্তি প্রার্থনা করিলে, সুলতান মামুদের উজীর খাজা হাসেন মৈমন্দী মূর্ত্তি ফিরাইয়া দিতে সম্মত হন; কিন্তু মাসুদের পরামর্শে সুলতান মামুদ উজীরের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। মাসুদ মূর্ত্তির নাসিকা ও কর্ণ ভাঙ্গিয়া তাহা চূর্ণ করিয়া, পানের সহিত হিন্দুদিগকে চর্ব্বণ করাইয়াছিলেন। (১) তাহার পর সোমনাথের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চারি খণ্ড করা হইয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া মাসুদ ও উজীরের মধ্যে অত্যন্ত মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমেই মনোবিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। সুলতান মামুদের পরামর্শ ক্রমে মাসুদ তখন গজনী পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা করেন।

সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইয়া সালার মাসুদ তাঁহার কোন-কোন সেনাপতিকে অনেক অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত নদীর পরপারে অর্জ্জুন রায়ের রাজ্য লুণ্ঠনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। অর্জ্জুন রায় পূর্ব্ব হইতেই পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মুসলমান সেনাপতিরা তাঁহার গৃহাদি ভূমিসাৎ করিয়া বহু সুবর্ণ-মুদ্রা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া, আবার

(১) মুসলমান লেখকেরা সোমনাথকে বিগ্রহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সোমনাথ পঞ্চমুখযুক্ত শিবলিঙ্গ। স্কন্দ পুরাণে তাহাই দেখা যায়।

উত্তর না দিয়া, মালিক নেক্‌দিলকে তাঁহার বক্তব্য জানাইবার জন্য লোকজন সহ রাজাদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সৈন্য সংখ্যা নির্ণয় করাই মাসুদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

নেক্‌দিল রাজাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে, তাঁহার প্রভু এই কথা বলিতেছেন যে, তিনি এ প্রদেশে শিকার খেলার জন্য আসিয়াছেন। এ প্রদেশ অরণ্যময়। যদি আপনারা তাঁহার সর্ত্তে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি শান্তভাবে এ প্রদেশ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিতে পারেন। রাজারা তাহাতে উত্তর দিলেন, আমরা একবার যুদ্ধ না করিয়া কোনরূপ সন্ধির প্রস্তাব করিতে পারি না। তোমরা বলপূর্ব্বক এ প্রদেশে আসিয়াছ। যুদ্ধে একপক্ষ পরাজিত না হইলে, কোনরূপ সন্ধি হইতে পারে না। রাজাদের মধ্যে সকলেই আপনাপন ইচ্ছামত কথা বলিতে লাগিলেন। রাজাদের কেহই নেতা নাই ও সকলেই স্ব স্ব প্রধান দেখিয়া, নেক্‌দিল মাসুদের নিকট চলিয়া আসিলেন। মাসুদ তখন আপনার আমীরগণকে সমবেত করিয়া, যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলের পরামর্শে তাঁহারাই প্রথমে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিবেন স্থির হইল।

মাসুদ সৈফউদ্দীনকে অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের সহিত দিয়া, নিজে মধ্যভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য আমীরগণ পার্শ্বে ও পশ্চাতে রহিলেন। সমবেত রাজারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ চলিল। হিন্দুগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দুই জন রাজা হত হইলেন। মুসলমানেরা অনেকদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া লুণ্ঠনাদি করিয়া ফিরিয়া আসিল। মাসুদ অনেক দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যকুণ্ডের তীরে একটি মহুয়া বৃক্ষের তলে কিছু ক্ষণ বিশ্রাম করেন। সেই স্থানটি তাঁহার প্রিয় বোধ হওয়ায়, তিনি মিয়াঁ রজবকে তথায় একটি বাগান করিবার আদেশ দিয়া, ভরৌচে ফিরিয়া যান। কয়েক দিনের মধ্যে মিয়াঁ রজব সূর্য্যকুণ্ডের নিকটস্থ বৃক্ষগুলি উৎপাটিত ও ভূমি সমতল করিয়া ফেলিলেন, একমাত্র সেই মহুয়া বৃক্ষটি রহিল। রজব মাসুদের নিকট সংবাদ পাঠাইলে, মাসুদ ভরৌচ হইতে আসিয়া তথায় একটি বাগানের সূচনা করিলেন। মহুয়া বৃক্ষটির তলে একটি বেদী নির্ম্মাণেরও আদেশ দিলেন।

মাসুদের পরাক্রম দেখিয়া হিন্দুখো হইতে রায় যোগীদাস অনেক উপঢৌকন সহ তাঁহার দূত গোবিন্দদাসকে মাসুদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মাসুদ উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজা যদি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য তাঁহারই অধিকারে থাকিবে। অন্যান্য অনেক রাজাও মাসুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা বিরুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা আবার সমবেত হইয়া, নিকটবর্ত্তী সকল রাজাকেই তাঁহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সকলেই আপনাদের সম্মতি জানাইলেন। সাভুনের সহরদেব (সুহৃদ্দল ?) (৬) এবং বাল্লুনার হরদেব অনেক সৈন্য লইয়া

(৬) রাজা সহরদেবের প্রকৃত নাম, তাঁহার নিবাস এবং তিনি কি জাতি ছিলেন, তাহা স্থির করা কঠিন। কনিংহাম তাঁহাকে Supridal (সম্ভবতঃ সুহৃদ্দল) ও অশোকপুরের রাজা বলিতেছেন। অশোকপুরের বর্ত্তমান নাম হাতিলা। হাতিলা সালার মাসুদের ভগিনী অথবা ভাগিনেয়ের নাম হইয়াছে বলিয়া কথিত। অশোকনাথ মহাদেবের নামে এই স্থানের নাম অশোকপুর হয়। সেখানে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা কনিংহাম উল্লেখ করিয়াছেন; সেই প্রসঙ্গে তিনি রাজা সুহৃদ্দলের কথাও লিখিয়াছেন। কনিংহাম বলিতেছেন,—'As the cut stem of the pipal shows 849 annual rings, the tree must have been planted in A D. 1013, during the reign of Mahmud of Ghazni. This indeed, is about the date of the temple itself, which is said to have been built by Suhri dal, Raja of Asokpur, and the antagonist of Sayid Salar. The Raja is also called Suhal-dhar, Sohil-dal and Sohil-deo, and is variously said to have been a Tharu, Bhar, a Kalahansa, or a Bois Rajput. The majority, however, is in favour of his having been a Tharu. The Mound with the Mahwa tree is called Raja Suhil dol-ka Khalanga, or Sohil-dal's seat. His city of Asokpur is said to have extended to Domariyadih, 2 kos to the north, and to Sureyadih, half a kos to the south of the temple. At both of these places there are old brick covered mound, in which several hundreds of coins have been lately found. * * Tradition gives the genealogy of the Rajas of Gonda as follows.

A D. 900—1. Moradhaj or Mayuradhwaja
925—2. Hansdhaj or Hansadhwaja
950—3. Makardhaj or Makaradhwaja
975—4. Sudhanawadhaj
1000—5. Suhridaldhaj, contemporary of Mahmud. I give this as it may, perhaps, be of use in fixing the age of other Princes and their works (Archæological Survey of India, Vol. I).

রাজাদের সহিত যোগদান করিলেন; এবং তাঁহাদিগকে বিষাক্ত পঞ্চ সূক্ষ্ম-মুখ কন্দুক ও বোম প্রস্তুত করার জন্য উপদেশ দিলেন। পাঁচ হাজার কন্দুক ও অনেক বোম প্রস্তুত হইতে লাগিল।

দুই মাসের মধ্যে আয়োজন শেষ হইলে, রাজারা বহু সৈন্য লইয়া কাশালা নদীর তীরে (বর্ত্তমান কাউরিয়ালা?) শিবির সন্নিবেশ করিলেন। রাজারা মাসুদকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। তাঁহাকে তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছেন। মাসুদ তাহার উত্তরে জানাইলেন যে, তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই, এবং এখনও প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। সকল দেশই খোদার,—তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্পত্তি দিবেন। তখন উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে লাগিল। সকলের পরামর্শ ক্রমে মাসুদ অগ্রেই আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে হিন্দুগণ অগ্রসর হইলে, মাসুদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন। মৃত্তিকায় প্রোথিত সূক্ষ্ম মুখ কন্দুকে অশ্বের পদ বিদ্ধ, এবং বোমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আহত হওয়ায়, মুসলমান সৈন্যগণ ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। তথাপি তাহারা প্রবল বেগে অগ্রসর হইল। হিন্দুরা রণ ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। মুসলমান আমীরগণ হিন্দু শিবির লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে মাসুদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সৈন্য বিনষ্ট হইয়া গেল। মাসুদের সৈন্যগণ কাশালা নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।

মাসুদ সূর্য্যকুণ্ডের নিকটে মহুয়া বৃক্ষের তলস্থ বেদীতে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সে স্থান তাঁহার অতি প্রিয় জানিয়া, মিয়াঁ রজব বালার্ক দেবের মূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করিলে, মাসুদ কালে সেখানে সত্য ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে বলিয়া উত্তর দিলেন। কিছুদিন পরে মিয়াঁ রজবের মৃত্যু ঘটে। মাসুদ সে জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। আবার হিন্দু রাজগণ যুদ্ধের জন্য সমবেত হইলে, মাসুদ আমীরদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মাসুদের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া রণ-ক্রীড়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মাসুদ ভরোচের উপকণ্ঠে সৈন্য-সজ্জা করিয়া, ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি সূর্য্যকুণ্ডের নিকটস্থ সেই মহুয়া বৃক্ষতলে আসিয়া সৈন্যদিগকে সজ্জিত করিতে লাগিলেন। তাহার পর উভয় পক্ষেই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। কিন্তু বিজয় লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ আশ্রয় করিলেন, তাহা বুঝা যায় নাই। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে আবার যুদ্ধ বাধিল। মুসলমান আমীরগণ একে একে জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন। সালার সৈফউদ্দীন রণ-ভূমির ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। মুসলমান সৈন্য প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল। মাসুদ মৃতদেহগুলি সূর্য্যকুণ্ডে ও তাহার নিকটস্থ গর্ত্তাদিতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। মৃতদেহে সূর্য্যকুণ্ড প্রায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাসুদ আপনার বৈকালিক নমাজাদি শেষ করিয়া, আবার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া হিন্দুরা ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহরদেব ও হরদেব অন্যান্য কয়েকজন রাজার সহিত নূতন সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ক্রমাগত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সহসা একটি বাণ আসিয়া মাসুদের বাহুতে বিদ্ধ হইল। তিনি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে-করিতে অশ্ব হইতে ভূতলে নামিলেন। সেকেন্দর দেওয়ানী ও অন্যান্য ভৃত্য তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া মহুয়া বৃক্ষের তলায় লইয়া গেল, এবং খাটের উপর শোয়াইয়া দিল। সেকেন্দর দেওয়ানী তাঁহার মস্তক কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। মাসুদ একবারমাত্র চক্ষুরুন্মীলন করিয়া, চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সেকেন্দর দেওয়ানী অনেক বাণের আঘাত সহ্য করিয়া, শেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। এইরূপে ইসলাম ধর্ম্মের প্রবল অনুরাগী সৈয়দ সালার মাসুদ উনবিংশ বর্ষ বয়সে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া এ জগৎ হইতে বিদায় লইলেন। (৭) তাঁহার দেহ ভরোচে সমাহিত করা হয়। মাসুদের সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুসলমানগণ ভরোচে গমন করিয়া থাকেন। ফিরোজ-

(৭) মীরাতী মাসুদী প্রণেতা বলেন যে, তিনি জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন যে, সালার মাসুদ নিহত হওয়ার পর সেই রাত্রেই তাঁহার প্রেতাত্মা সহরদেবকে দেখা দিয়া, তাঁহাকে নিহত করার জন্য তিরস্কার করেন। সহরদেব পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন। এ সংবাদ কত দূর সত্য, বলা যায় না।

সাহ তোগলক ভরৌচে গিয়া সালার মাসুদের সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৮)

সালার মাসুদ ৪২৪ হিজরীর ১৪ই রজব বা ১০৩৩ খৃঃ অব্দের ১৪ই জুন জীবন বিসর্জ্জন দেন। ইহার পূর্ব্বে সুলতান মামুদ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র মহম্মদ পরে প্রথম মাসুদ গজনীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। মাসুদের রাজত্বকালেই সালার মাসুদের দেহত্যাগ ঘটে। মাসুদের ভারতীয় সেনাপতি আমেদ নিয়াল্তিজীন্ এই সময়ে ১০৩৩ খৃঃ অব্দে নিজ সৈন্য লইয়া বারাণসী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, কাশীবক্ষে প্রথম মুসলমান পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরে আর কোন মুসলমান সৈন্য মধ্য ভারতে উপস্থিত হয় নাই। পশ্চিম ভারতে গজনীর অধিকৃত লাহোরের নিকট ভিন্ন মুসলমানগণ আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। মাসুদের মৃত্যুর পর আজমীরের মজঃফর খাঁও মৃত্যুমুখে পতিত হন। হিন্দুরা তাঁহার বংশধরদিগকে আজমীর হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়। প্রায় দুইশত বৎসর মুসলমানেরা ভারতবর্ষে বিশেষ কোনরূপ অত্যাচার করিতে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া, কুতবুদ্দীনকে ভারতের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সেই অবধি ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। (৯) সুলতান মামুদের লুণ্ঠনে, দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির ভঙ্গে, হিন্দুগণের প্রাণে যে দারুণ জ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল,

(৮) Imperial Gazetteer ও Gazetteer of the Province of Oudh এর মতে বালার্কদেবের মন্দিরের স্থানেই মাসুদের সমাধি নির্ম্মিত হয়। কিন্তু তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। ভরৌচ হইতে সূর্য্যকুণ্ড যে দূরে ছিল, তাহা মীরাতী মাসুদী হইতে বেশ বুঝা যায়; এবং মীরাতী মাসুদীতে এ কথা লিখিত নাই যে, সূর্য্য-মন্দিরের স্থানেই মাসুদ সমাহিত হইয়াছিলেন। বরং তখনও পর্য্যন্ত সূর্য্য-মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। ভরৌচে মাসুদের পরিবারবর্গ ছিলেন। সূর্য্যকুণ্ড হইতে তাঁহাকে ভরৌচে লইয়া গিয়াই সমাহিত করা হয়। ভরৌচ হইতে সূর্য্যকুণ্ড যে দূরবর্ত্তী, মীরাতী মাসুদী হইতে তাহা যেরূপ জানা যায়, সেইরূপ আইন আকবরীতেও ভরৌচ ও সূর্য্যকুণ্ড সুবা আউধের দুইটি পৃথক স্থান বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা গ্লাডউইনের আইন আকবরী হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"Biratch is a large city, delightfully situated amongst a number of gardens, upon the banks of the river Sy (Sai). Sultan Massaood and Rajeb Sillar are both buried here. The common people of Hindoostan, who are Mahommedans, hold them in great veneration, making pilgrimages to them from great distances, going together in large bodies, and carrying banners of cloth of gold. Sultan Massaood was a relation of Mahmmood Guznevy. Rajeb Sillar, the father of Sultan Feerooz, King of Delhi, gained renown by his austere life and martyrdom. Near this city is a village called Dugown, which, for a great length of time, has had a mint for copper coinage. Soorej Koond is a place of religious worship, whither numbers of people resort from far." আইন আকবরী হইতে ভরৌচ ও সূর্য্যকুণ্ড দুইটি পৃথক স্থান বলিয়া বেশ বুঝা যায়; এবং সে সময় পর্য্যন্ত সূর্য্যকুণ্ডের অস্তিত্ব ছিল। মীরাতী মাসুদী প্রণেতা আবদার রহমান চিস্তিও জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক; তাঁহার সময়েও সূর্য্যকুণ্ড বর্ত্তমান থাকিতে পারে। Dowsan অশোকপুরেই সূর্য্যকুণ্ড ছিল বলিতে চাহেন। তিনি কনিংহামের উল্লিখিত অশোকপুরের মহুয়া বৃক্ষের কথা বলিয়াছেন; এবং তাহার নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীকে সূর্য্যকুণ্ড বলেন। এই মহুয়া বৃক্ষ মাসুদের সময়ের মহুয়া বৃক্ষ কি না, বলা যায় না। তবে অশোকপুরে সূর্য্যকুণ্ড থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু ভরৌচ হইতে হাতিশা বা অশোকপুর প্রায় ৪৯ মাইল দূরে অবস্থিত। তাহা হইলেও মাসুদ ভরৌচ হইতে যখন দূরবর্ত্তী স্থানে সূর্য্যকুণ্ডে যাইতেন, তখন অশোকপুরে সূর্য্যকুণ্ড থাকা একেবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ফিরোজশাহ যে মাসুদের সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তারিখি ফিরোজশাহী হইতে জানা যায়। ফিরোজশাহ মাসুদের সমাধির প্রাচীরের কতকাংশ ও কোন-কোন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মাসুদের মৃত্যুর দুইশত বৎসর পরে তাঁহার সমাধি নির্ম্মিত হয়।

(৯) "After the death of Masud Muzaffar Khan died also. The unbelievers, drove his descendants from Ajmir, and re established their idols; and idolatry again reigned over the land of India. Things remained in this state for 200 years.............. After some years, Sultan Muizzuddin, otherwise called Shahabuddin Ghori, made a second expedition from Ghazni; slew Pithaura before Delhi, and placing Kutbu-d-din Aibak on the throne of Delhi, returned himself to Ghazni....... ....Since that time no unbeliever has ruled in the land of India". (Mir-ati Masudi, Elliot's History of India, Vol. II, Appendix, Note G.)

এই জ্বালা নিবারণ করিবার জন্যই হিন্দু রাজগণ আপনাদের সমবেত শক্তি সমবেত করিয়া অযোধ্যা প্রদেশে এক অভিনব ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছিলেন। পশ্চিম ভারত তখন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল; মধ্য ভারতে তখনও ক্ষাত্র-শক্তি একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাবে তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িলেও, একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাই হিন্দু রাজগণ আপনাপন শক্তি প্রকাশ করিয়া, সালার মাসুদের ভীষণ আক্রমণে বাধা দিয়াছিলেন; এবং অবশেষে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। সালার মাসুদের মৃত্যু হইতে মহম্মদ ঘোরীর সময় পর্য্যন্ত দুই শতাব্দী মুসলমানগণ যে ভারতাক্রমণে নিরস্ত হইয়াছিলেন,—হিন্দুগণের জাগরণই তাহার প্রধান কারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতেতিহাসের এই উজ্জ্বল অধ্যায়টি একেবারেই লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ এই লুপ্ত অধ্যায়টির উদ্ধারে যত্নবান্ হইলে, যার পর নাই সুখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। (১০)।

(১০) একমাত্র মীরাতী মাসুদী নামক গ্রন্থে সালার মাসুদের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। যদিও গ্রন্থকার প্রাচীন গ্রন্থাদির সাহায্যে ও স্থানীয় প্রবাদ অবলম্বন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তথাপি তিনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক হওয়ায়, তাঁহার গ্রন্থে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য আছে, তাহা বলা যায় না। তবে হিন্দু রাজগণ কর্তৃক সালার মাসুদের পরাজয়, রণক্ষেত্রে তাঁহার জীবন বিসর্জ্জন এবং তাহার পর মহম্মদ ঘোরীর সময় পর্য্যন্ত মধ্যভারতে মুসলমান আক্রমণের নিবৃত্তি যে ঐতিহাসিক সত্য, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ব্যাপারের জন্য এই আক্রমণের নিবৃত্তি ঘটিয়াছিল, আমরা তাহার প্রকৃত ইতিহাস পাইবার ইচ্ছা করি।

বিজিতা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

রমেন্দ্র শনিবারে বাড়ী আসিত, রবিবার থাকিয়া সোমবারে আবার কলিকাতায় চলিয়া যাইত।

শৈলেন কথাটা বড় মিথ্যা বলে নাই। স্ত্রী হইতেই সে অধঃপাতে গিয়াছিল। বাড়ীর সকলেই ইহা জানিত। রমা পূর্ণিমাকে অনেক বুঝাইয়া নরম করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ণিমা অবিচলিতা।

রমেন্দ্রের হৃদয় যখন ভাবের তুফানে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই ভাব ব্যক্ত করিতে সে ছুটিয়া গিয়াছিল পূর্ণিমার কাছে। বড় কল্পনাপ্রবণ ছিল সে,—ভাবিয়াছিল, এবার তাহার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবে,—তাহার স্বপ্ন সত্য হইবে। কিন্তু আশা তাহার ভাঙ্গিয়া গেল,—পূর্ণিমা তাহার হৃদয়ে বড় আঘাত দিল। স্ত্রীর সহিত প্রথম আলাপেই সে বুঝিতে পারিল, সে যাহা চাহিয়াছিল, এ তাহা নহে। সে কণ্ঠে সুধা পান করিতে চাহিয়াছিল; গরল উঠিয়া তাহাকে জর্জ্জর করিয়া তুলিল।

নিদারুণ ব্যথায় সে লুটাইয়া পড়িল। সেই আঘাতেই তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, আর সে উঠিতে পারিবে না; কিন্তু আবার সে উঠিতে পারিল। লাভের মধ্যে এই হইল, তাহার মনুষ্যত্ব একেবারে সে হারাইয়া ফেলিল। পত্নীর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াই সে অধঃপতনের পথে নামিয়া গেল। পূর্ণিমা স্বামীকে নিজের দোষে পঙ্কিলতার মাঝে বিসর্জ্জন দিল।

সে বড় গর্ব্বিতা ছিল,—সেই গর্ব্বই তাহার সর্ব্বনাশের মূল কারণ। একবার দোষ করিয়াছিল সে, তাহার পরে যদি সে স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িত, ক্ষমা প্রার্থনা করিত,—সকল গোলমাল মিটিয়া যাইত। রমেন্দ্র এই মুহূর্ত্তটীর জন্য অপেক্ষাও করিয়াছিল। যখন দেখিল, সে আসিল না, ক্ষমা চাহিল না,—তখন স্ত্রীকে একেবারেই মন হইতে সে তাড়াইয়া দিল।

সে নিজের চরিত্র হারাইলেও, দাদাকে সে ভয় করিত, ভালবাসিত। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিত সে অমিয়কে। শুধু তাহারই জন্য সে বাড়ী আসিত,—নচেৎ আসিবার কোনই দরকার তাহার ছিল না।

সে নিজে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে তাহার

নিজেরই চলিত,—বাড়ীতে সাহায্য করিবার কখনও প্রয়োজন হয় নাই। আর যখনি সে বাড়ী আসিত, অমিয়ের জন্য কিছু না কিছু লইয়া আসিত।

পূর্ণ চার বৎসর এইরূপে কাটিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোনও বিবাদ আছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। সামনা-সামনি দুই-চারিটা নেহাৎ আবশ্যক প্রশ্নোত্তর চলিলেও, তাহার মধ্যে ঘৃণার ভাবটাই বর্ত্তমান ছিল।

অমিয়ের উপর স্বামীর টান দেখিয়া পূর্ণিমা জ্বলিয়া যাইত,—সুষমার প্রতি স্বামীর ভক্তি তাহার বক্ষে ছোরা বসাইত। মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারিত সে কেবল মেজ বউয়ের কাছে। এত বড় বাড়ীটার মধ্যে একমাত্র মেজ বউই তাহাকে সহানুভূতি দেখাইত।

রাত নয়টার ট্রেণে রমেন্দ্র বাড়ী আসিল। গত সপ্তাহে সে কলিকাতা যাইবার সময় অমিয়ের কাছে প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে একখানা ট্রাইসাইকেল আনিয়া দিবে। প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করিয়াছে। অমিয় তখন পড়া শেষ করিয়া সবেমাত্র শুইতে গিয়াছিল,—ট্রাইসাইকেল আসিয়াছে শুনিবামাত্র সে লাফাইয়া নীচে আসিল।

বাড়ীর সামনেই খোলা মাঠ। রাত্রিটাও বেশ জ্যোৎস্না-মাখা। সেই রাত্রেই রমেন্দ্র তাহাকে সাইকেলে উঠাইয়া, সেই মাঠে বেড়াইতে লাগিল। অমিয় তাহার চিরবাঞ্ছিত এই সাইকেলটা পাইয়া, কাকাবাবুর প্রতি যে কতদূর কৃতজ্ঞ হইল, তাহা বলা যায় না।

পূর্ণিমা উপরে নিজের গৃহের মুক্ত বাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জ্বলন্ত চক্ষে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। খানিক দাঁড়াইয়া সে সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত যখন এগারটা, তখন রমেন্দ্র ভেজানো দরজা ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। একটু আগে পূর্ণিমার বেশ এক ঘুম হইয়া গিয়াছিল,—এখন সে জাগিয়াই ছিল; তথাপি উঠিল না, বা নড়িল না; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল। তাহার মনে একটু ক্ষীণ আশার রেখা জাগিতেছিল, রমেন্দ্র তাহাকে ডাকিবে।

কিন্তু তাহার আশা সফল হইল না। রমেন্দ্র একবার কপট নিদ্রাভিভূতা পত্নীর পানে তাকাইল মাত্র। ঘৃণা তাহার মুখে কতকগুলি রেখা চিত্রিত করিয়া দিল। দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, আলো কমাইয়া, সে নিজের বিছানায় নীরবে শুইয়া পড়িল।

পূর্ণিমা দেখিল,—অভিমানে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দেয়ালের ঘড়িতে ঢংঢং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। আর তো চুপ করিয়া থাকা চলে না। বলিবার মত অনেকগুলি কথা আছে। এবার রমেন্দ্রকে কালই কলিকাতায় ফিরিতে হইবে,—এখন দুই মাস আসিতে পারিবে না,—পূর্ণিমা তাহা জানিত। কথা যাহা ছিল, তাহা আজই বলা চাই; কারণ, এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না।

দুই-একটা হাই তুলিয়া, সদ্য নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সে উঠিয়া বসিল। রমেন্দ্র তখনও ঘুমায় নাই; স্ত্রীর ব্যাপারখানা দেখিবার জন্য সে-ই এখন নিদ্রিতের ভানে পড়িয়া রহিল। পূর্ণিমা আলোটা বাড়াইয়া দিল; স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কি বলিবে, কেমন করিয়া ডাকিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। নিজেকে এমন করিয়া অবনত করিতে তাহাকে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু উপায় নাই যে। মেজদির সঙ্গে পরামর্শ হইয়াছে,—মেজদি মেজ ঠাকুরের ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে এখন নিজের স্বামীকে দলে টানিতে পারিলে বাঁচে। কায়দায় পড়িয়া আজ তাহাকে অতিরিক্ত নীচু হইতে হইয়াছে যে।

স্বামীর কাছে স্ত্রীর যতখানি অধিকার পাওয়া সম্ভব, সে তাহা হারাইয়াছে বলিয়াই অতিরিক্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। একবার সে মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "শুনছো—একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।" রমেন্দ্র শুনিয়া গেল বটে, কিন্তু জাগ্রতের কোনও লক্ষণ দেখাইল না। পূর্ণিমা স্থাণুর ন্যায় আবার খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। অভিমান তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু স্বার্থচিন্তা যে সকলের আগে। সেই চিন্তা আসিয়া অভিমানকে দূরে তাড়াইয়া দিল।

পূর্ণিমা আবার ডাকিল "ওঠো, আমার একটা কথা শোন।"

এবার রমেন্দ্র চক্ষু চাহিল। সামনেই দেয়ালে আলোটা জ্বলিতেছিল বড় উজ্জ্বল ভাবে। সেইদিকে চাহিয়া বিরক্ত ভাবে রমেন বলিয়া উঠিল, "কি আপদ! আলোটা কমিয়ে দিলুম, আবার বাড়ালে যে! একটু ঘুমবার যো নেই?"

পূর্ণিমার গায়ে কথাটা বড় বাজিল; কিন্তু এখন দর্প

করিবার সময় নাই। নরম সুরে সে বলিল, "আমিই বাড়িয়ে দিয়েছি; তোমার একটা কথা বলব বলে ডেকেছি।"

রমেন্দ্র উঠিয়া বসিল। একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "মাইরি, এমন কপাল আমার? সত্যি-সত্যি এত রাত্রে আমায় ডাকছো তুমি? আমার কপাল এতকাল পরে হঠাৎ এত সুপ্রসন্ন হল যে পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; তবুও নীরবে সে এই ব্যঙ্গোক্তি সহিয়া গেল। কারণ, আজ সে নিজের স্বার্থে আসিয়াছে।

রমেন্দ্র পত্নীর নীরবতা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যা খুসি তোমার বল্‌তে পারো,—আমার কোনও আপত্তি নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার মানে কিছু নেই। আমি কাণ পেতেই তো আছি। কতকগুলো কড়া কথা শুনাবে তো?"

পূর্ণিমা আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিয়া উঠিল, "তুমি কেবল কড়া কথাই শুনেছ আমার কাছে?"

রমেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না, বড় সুন্দর ব্যবহার করেছ তুমি,—যাতে প্রাণ আমার একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গ্যাছে। কোন্ দিন তুমি সদ্ব্যবহার করেছ পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমা একটু থামিয়া বলিল, "তুমি যদি সৎ হতে, নিশ্চয়ই সদ্ব্যবহার পেতে আমার কাছ হতে। ভক্তি-ভালবাসা যে নিতে চায়, তাকে ঠিক তেমনি আধার করে নিজেকে গড়ে নিতে হয়।"

রমেন্দ্র ভাল হইয়া বসিল; তীব্র নেত্রে পূর্ণিমার পানে চাহিয়া বলিল, "ঠিক কথা। এইবারই যথার্থ কথা বলেছ বটে যে, ভক্তি-ভালবাসা যে নিতে চায়, তাকে নিজেকে তেমনি আধার করে গড়ে তুলতে হয়। কথাটা সত্যি তো? আচ্ছা, যদি তাই হয় পূর্ণিমা, তুমিও তো তেমনি করে নিজকে গড়ে তুলতে পারতে। যখন প্রাণভরা আশা নিয়ে তোমার পাশে ছুটে গেলুম, কি পেলুম তার পরিবর্ত্তে? বজ্রাঘাত নয় কি? মনে কর একবার সে দিনকার রাতটা, যে দিন এমনই শুভ্র চাঁদের আলোয় সারা বিশ্বখানা স্নাত। সেই পাপিয়া-কোকিলা-গীতি-মুখরিত রাতে, আমি আমার অমল-ধবল প্রাণখানা তোমায় উৎসর্গ করতে গেছলুম। তোমার কাছে আমার কতকালের সঞ্চিত বাসনা ব্যক্ত করতে গেছলুম। বল দেখি, কি করে ফিরিয়ে দিলে আমায়, —কি আঘাত দিলে আমার প্রাণে, যাতে আমার চক্ষের সামনে তেমন শোভাময়ী, তেমনি আলোকোজ্জ্বল রজনীটি নিমেষে গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেল; আমার কল্পনা ভেঙ্গে গেল। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে পড়লুম। মনে পড়ে কি পূর্ণিমা—না ভুলে গ্যাছ? তুমি ভুলতে পেরেছ পূর্ণিমা—কিন্তু আমি ভুলি নি। আমার বুকে সে দাগ চিরতরেই আঁকা রয়েছে।"

পূর্ণিমা নীরব। রমেন্দ্র আবার বলিল, "আমায় পিশাচ রূপে পরিবর্ত্তিত করেছ তুমিই। নিজের দোষের কথা কিছু না মনে করে, এখন আমায় এসেছ শাসন করতে? তার আগে তোমার বোঝা উচিত ছিল।"

পূর্ণিমা নীরবে স্বামীর কথা শুনিয়া গেল। তাহার পর ধীরে-ধীরে বলিল, "যা হয়ে গ্যাছে, তার আর হাত নেই। আমি তোমায় বকতে আসিনি,—একটা কথা বলব বলে এসেছি।"

নরম ভাবে রমেন্দ্র বলিল, "কি কথা বলতে চাও?"

পূর্ণিমা বলিল, "মেজদি দিন কয়েকের মধ্যে পৃথক হয়ে যাবেন। বট্‌ঠাকুর সব বিষয় ভাগ করে দেবেন। তুমি কি বলতে চাও এতে?"

রমেন্দ্র ভ্রূ টানিয়া বলিল, "তোমারও বোধ হয় খুব ইচ্ছে আছে পৃথক হবার জন্যে?"

পূর্ণিমা একটু অনিচ্ছার সঙ্গে বলিল, "আমার ইচ্ছে নিয়ে তো কোনও কাজ হবে না। তুমি তো আমায় দেখতেই পারো না,—আমার ইচ্ছে কি তুমি নেবে? তুমি যা ভাল বিবেচনা করবে তাই হবে। আমার মত যদি নিতে চাও, তবে বলি, এই সময়ে নিজের যা, তা বুঝে নেওয়া উচিত। এর পরে সব হারাবে। চাকরীই তখন একমাত্র সম্বল হবে, তা জেনে রেখো।"

রমেন্দ্রের চোখ একবার জ্বলিয়া উঠিল। তখনই সে দৃষ্টি নরম করিয়া বলিল, "তোমার ইচ্ছা বুঝলুম। আমার কি মত, তাই এখন জানতে চাও তুমি? আচ্ছা, বল দেখি, এ সব অর্থ কার উপার্জ্জিত? তুমি জানো নিশ্চয়ই—তোমার স্বামীর উপার্জ্জিত একটা পয়সাও আজও এ সংসারে আসে নি। এ সমস্তই দাদা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কলকাতার পথে-পথে বেড়িয়ে সঞ্চয় করেছেন। তাঁরই এ সব; তিনি যে আমাদের দয়া করে খেতে-পরতে দিচ্ছেন, লেখা-পড়া শিখিয়েছেন, সে তাঁরই মহত্ত্ব। এখন আমাদের চাকরী

করে-দিয়েছেন,—বের করে দিলেই পারেন বাড়ী হতে। তাঁর এতটা করবার মানে কি? তিনি তবু আমাদের সব এক জায়গায় রাখতে চান কেন? এতে তাঁর যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে,—তবু তিনি সে ক্ষতি সহ্য করছেন কেন? আমি তোমায় কতক চিনেছিলুম পূর্ণিমা,—আজ খুব ভাল করেই চিনলুম। মেজ বউদি আলাদা হতে চান, হতে পারেন,—তুমি আলাদা হতে পারবে না। আজীবন তোমায় বড় বউদির দাসী হয়েই কাটাতে হবে। কারণ, আমি কিছুতেই পৃথক হব না। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি বাপের বাড়ী চলে যেতে পারো,—এখানকার সম্পর্ক একেবারে উঠিয়ে দিয়ে।"

বড় বউয়ের দাসী স্বরূপ থাকিতে হইবে, এই কথাটা শুনিয়াই পূর্ণিমা রাগে জ্ঞান হারাইয়াছিল। তাই রাগত সুরেই বলিল "তোমার ইচ্ছে না হয়, পৃথক হ'য়ো না। কিন্তু এটা মনে রেখো, আমি কখনই বড়দির সেবা করতে পারব না।"

শান্ত ভাবে রমেন্দ্র বলিল, "কেন, মাথা কাটা যাবে তাতে? বড় অপমান হবে বুঝি তাতে?"

পূর্ণিমা ঠোটের উপর ঠোট চাপিয়া শক্ত উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই।"

রমেন্দ্র বলিল, "বড় বউয়ের জিনিস তা'হলে এখনও খাও পরো কি করে? আমায় যে পৃথক হবার পরামর্শ দিতে এসেছ,—কি নিয়ে পৃথক হবে, শুনি। কি নিয়ে আমি পৃথক হব? বাপের অর্থ নয় যে সমান ভাগে চার ভাইয়ে ধর্ম্মানুসারে পাব। এ বড়দার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি। তিনি আমায় এক পয়সা না দিয়ে, যদি গলাধাক্কা দিয়ে এ বাড়ী হতে তাড়ান, তাতেও কারও একটা কথা বলবার অধিকার নেই। আর বড় বউদির সেবার কথা বলছো? তোমরা কে কয়বার তাঁহার কাজ করে দাও,—তাঁর একটু সেবা কর বল দেখি? তিনি নিজেই যে লক্ষ্মী,—নিজেই সকলের সেবা করে বেড়াচ্চেন। এ পর্য্যন্ত—তাঁর যখন জ্বর হয়—কখনও তো দেখি নি, তুমি তাঁর একটু মাথাটা টিপে দিয়েছ।"

পূর্ণিমা উচ্ছ্বসিত রাগের সহিত বলিল "না—তা করব কেন,—বড়দি যে যাদু জানে। কি মন্ত্রে সে সব বশ করেছে তা জানি নে। মেজদি ঠিক কথাই বলেছে যে—"

বাধা দিয়া ক্রুদ্ধ ভাবে রমেন্দ্র বলিল, "সাবধান, পূর্ণিমা। মাতৃরূপা বড় বউদির নিন্দে কোরো না আমার কাছে। জেনো, তিনি আমাদের মা। এটা বুঝো—যেমন ব্যবহার করবে, তেমনি ব্যবহার পাবে। তুমি যে আমার স্ত্রী,—তুমি আমায় নিজের করতে পারলে না শুধু তোমার মন্দ ব্যবহারে। আর কিছু বলবার আছে তোমার?"

পূর্ণিমা মাথা নাড়িল। ধীরে-ধীরে সে আবার নিজ স্থানে ফিরিয়া গেল। রমেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। একবার স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল, "পার তো আলোটা নিভিয়ে দাও দয়া করে।"

পূর্ণিমা গুম হইয়া বসিয়া রহিল, নড়িল না।

(৭)

নৃপেন যে দিন বাড়ী ফিরিল, সেই দিনই মেজবউ সুলতা প্রস্তাব করিল, "আমি আর এ সংসারে থাকবো না।"

নৃপেন তখন মহা আরামে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া, একটা সিগারেট টানিতে-টানিতে, একখানা মজার উপন্যাস পড়িতেছিল। স্ত্রীর কথা শুনিয়া মহা বিস্ময়ে সে বই হইতে চোখ উঠাইল, "ব্যাপারখানা কি তোমার?"

সুলতা গম্ভীর ভাবে বলিল, "ব্যাপার কিছুই না। তুমি কি ইচ্ছা কর, আমাকে এত কথা শুনেও এখানে পড়ে থাকতে হবে? তোমার ভাই আমাকে যা না তাই বলে যাবে কেন বল দেখি?"

নৃপেন বলিল, "কে? শৈলেন?"

সুলতা বলিল, "হ্যাঁ।

নৃপেন হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"আঃ, সেটার কথা ছেড়ে দাও। বদ্ধ পাগল সেটা; একটু বুদ্ধি যদি থাকত, তবে—"

সুলতা মুখখানা রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "কি তবে? তার বুদ্ধি নেই, তোমারই যত বুদ্ধি আছে—না? তুমি যদি বুদ্ধিমান হতে, তবে এত কষ্ট কেন আমার? লোকের কথাই বা সইতে হবে কেন আমায়? বাড়ীর গিন্নি যিনি, তিনি তো দু' চোখ দিয়ে আমায় দেখতে পারেন না। তোমরা পুরুষ,—সামনে আদর দেখলেই গলে যাও একেবারে; মনে ভাব, বউদি বড় ভাল। ও যে ভিজে বিড়াল, তা তো জান না। সেয়ানা চালাক যাকে বলে, ও তাই। মনে অথচ

জিলিপির প্যাঁচ,—মুখে কেমন মধু ঢালে। আমরা অমন মুখে মধু মনে গরল রাখতে পারি নে বলেই না আমাদের এই দুর্দ্দশা? বউদি বলতে গলে যেয়ো না,—একটু ভেবে দেখ। সংসারে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, তা বলছি।"

নৃপেন চুপ করিয়া পত্নীর এই দীর্ঘ লেকচার শুনিয়া গেল। সে আর সকলের কথা বিশ্বাস করিতে রাজি আছে, কেবল বউদির কথা বিশ্বাস করিতে এখনও রাজি নয়। তিনি যে মনে গরল রাখিয়া মুখে মধু বর্ষণ করিবেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব।

সুলতা বলিল "আর ওই যে প্রতিভা ছুঁড়ি রয়েছে, ওটি বড় গিন্নির ভগ্নদূত। যেখানে যেটি হবে, আর কারও চোখে না পড়লেও, ঠিক ওর চোখে পড়ে যাবেই। আর অমনি সঙ্গে-সঙ্গে তা বড় গিন্নির দরবারে পেস হয়ে যাবে। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের মত গম্ভীর ভাবে অমনি মাথাটা নাড়বেন। সেজবউ যা বলে, তা একটুও মিছে না। ওই ছুঁড়িই যত অকল্যাণের গোড়া। ও এসে পর্য্যন্ত—"

বাধা দিয়া অধীর ভাবে নৃপেন বলিল, "আহা, আবার তাকে জড়াচ্ছো কেন? ছেলেমানুষ,—সামনে যা দেখে, সেটা গিয়ে বড় বউদির কাছে বলে আসে। বড় অভাগিনী সে,—তাকে কোনও ব্যাপারে টেনে এনো না।"

সুলতা ক্রুদ্ধ ভাবে বলিল, "ছেলেমানুষ? যোল সতের বছর বয়েস হয়েছে,—ছেলে মানুষ কিসে? ও বড় গিন্নির চেলা,—অনেক কাল আগেই ও মেয়ে পেকে গ্যাছে। ছেলেমানুষি ওর মধ্যে একটুও নেই। তোমরা বোকার জাত যে,—দেখবে উপরটা,—ভেতরটা ত দেখ না। বারবার বলচি মানুষ চিনতে শেখো,—কাউকে বিশ্বাস কোর না,—ওতে নিজেই ঠকবে। আমার কথা কেয়ার করা হয় না, যেন আমি মানুষই নই। দেখ, স্পষ্ট কথা বলছি তোমায়,—আমি এক সংসারে এই সব গণ্ডগোল, ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে কিছুতেই বাস করতে পারব না। হয় আমায় পৃথক করে দাও, নয় বাপের বাড়ী একেবারে পাঠিয়ে দাও।"

নৃপেন মাথা চুলকাইতে লাগিল। সে রমেন্দ্র নহে। স্ত্রীকে সে যেমন অত্যন্ত ভালবাসিত, ভয়ও তেমনি করিত। সুলতা মুখ অন্ধকার করিলে, বিশ্বজগৎ তাহার চোখে অন্ধকার হইয়া আসিত। এখন সে করিবে কি, বলিবে কি—ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

সুলতা তাহার স্তম্ভিত মুখখানার পানে চাহিয়া বলিল, "হাঁ করে ভাবছ কি? আমার কথা কেয়ার হয় না,—সামান্য দাসী শ্রেণীর লোক পেয়েছ আমায়? আমি কি তোমাদের অসভ্য গ্রাম্য স্ত্রীলোক যে, অবজ্ঞা করলে তাও আদর করে মাথায় তুলে নেব?"

নৃপেন স্তম্ভিত ভাবটা দূর করিয়া দিয়া বলিল, "তোমার কথা কোন দিন না শুনি সু? যখনি যা বলছ, তখনি তাই করছি। বললে, কতকগুলো সেয়ার তোমার নামে করে দিতে,—আমি তাই করলুম। বড়দাকে না জানিয়ে তোমার নামে—"

উদ্ধত ভাবে সুলতা বলিল, "তবে তো বড্ড কাজই করেছ। কেন করেছ তুমি,—কেন সেয়ার কিনেছ? কেন আলাদা ব্যবসা করতে গেছ? তোমার বড়দার কাছে লুকোবার দরকার তো নেই কিছু। দাওগে সব তোমার বড়দাকে ফিরিয়ে। তোমার দান এক পয়সা আমি চাই নে।"

অত্যন্ত রাগের সহিত উঠিয়া, ড্রয়ার খুলিয়া কয়েকখানা কাগজপত্র নৃপেনের সামনে ছুড়িয়া ফেলিয়া, দুপদাপ করিয়া সে সেজবউয়ের কাছে চলিয়া গেল। হতভাগ্য নৃপেন স্তম্ভিত হইয়া তাহার গমন পথ পানে শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার পর পতিত কাগজপত্রগুলার পানে চাহিল।

সে যে কতদূর জুয়াচুরি করিয়াছে,—এখনও করিতেছে, তাহা সুলতা বুঝিল না,—তাহা সুলতা জানিল না। মেয়েরা এমনই অবুঝ বটে। তাহারা নিজেদের দিকটাই দেখিয়া যায়,—নিজের জিনিসই কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লয়। পরে যে কতখানি দিল, তাহা তাহারা চাহিয়া দেখে না। নৃপেন তাহার জন্য না করিয়াছে কি? দেবতার তুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণের তুল্য ছোট ভাই দুটি,—তাহাদের প্রবঞ্চনা করিয়াছে,—আজও করিয়া আসিয়াছে। সুলতার জন্য নিত্য তাহাকে মিথ্যা লইয়া কারবার করিতে হইতেছে। সুলতা ইহা বুঝিল না,—সুলতা তাহার পানে একবার চাহিল না। নিদারুণ অভিমানে নৃপেনের বুকটা দগ্ধ হইতে লাগিল।

কিন্তু না, সে বড় তেজস্বিনী। সত্যই সে পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে পারে। এ সব কথা যদি শ্বশুরালয়ে যায়, তাহা হইলে সে আর সেখানে মুখ দেখাইতে পারিবে না। অথচ এই শ্বশুরবাড়ী লইয়াই তাহার কাজ।

জ্যেষ্ঠ শ্যালক চন্দ্রনাথ ব্যবসার ব্যাপারে তা

বল। আজও ভবানীপুর হইতে আসিবার সময় তাহার শাশুড়ী তাহাকে বারবার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, সুলতা বড় অভিমানিনী,—কোনও মতে তাহার সেই অভিমানে যেন আঘাত না দেওয়া হয়।

আর সে চলিয়া গেলে নৃপেন বাঁচে কি করিয়া? যখন যেখান হইতে সে বাড়ী আসে, হৃদয়টা তখন তাহার বড় উৎফুল্ল হইয়া উঠে,—বাড়ী গিয়াই সে তাহার হৃদয়ানন্দ-দায়িনীকে দেখিবে। সুলতার কথা তাহার হৃদয় শীতল করিয়া দিবে। সে চলিয়া গেলে নৃপেনের উপায় কি হইবে?

তাহার কথামতই কাজ করিতে হইবে। দাদা একটু দুঃখ করিবেন বই তো নয়। ছোট ভাইয়েরা রাগ করিবে; কিন্তু তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। ভাই-ভাই কখনও এক থাকিতে পারে না। একটা মূল হইতে বহু কাণ্ড উৎপন্ন হয়,—সবগুলিই পৃথক হইয়া যায়,—এক থাকে না। ভাইয়েরাও তেমনি পৃথক হইয়া যাইবে—এক কখনই থাকিবে না। দু'দিন আগে আর দুদিন পিছে, এই মাত্র।

নৃপেন অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিল। এ কথাটা বড়দার সামনে কি করিয়া তোলা যায়? বড়দা যখন মুখখানা অন্ধকার করিয়া ব্যাকুল চোখে চাহিবেন, তখন সে তাহা দেখিবে কি করিয়া? না জানাইলেও তো উপায় নাই; কিন্তু বলা যায় কি করিয়া?

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে একখানা পত্র লিখিতে বসিল। অনেক কষ্টে তাহাতে মনের ভাবটা সে ফুটাইয়া তুলিল। পত্রখানা সামনে পড়িয়া রহিল,—সে দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

কখন যে সুলতা আসিয়া, পিছনে দাঁড়াইয়া পত্রখানা পাঠ করিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। তীব্র কণ্ঠে সুলতা বলিল "এ কি, এ পত্র কাকে লেখা হচ্ছে?"

চমকিয়া নৃপেন পিছন ফিরিল। স্ত্রীর চোখে যে আগুন সে জ্বলিতে দেখিল, সেরূপ আগুন সে কখনও দেখে নাই। স্বামীর পত্র দেখিয়া সুলতা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, কাপুরুষ স্বামী নিজের মুখে কোনও কথা দাদাকে বলিতে ভয় পায়,—তাই পত্র লিখিয়া প্রকাশ করিতে চায়। স্বামীর এই কাপুরুষতা দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছিল। আপনার অন্তরের ক্রোধ সে আর কোন মতে চাপা দিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

অপরাধীর মতই নৃপেন মাথা হেঁট করিল। সুলতা পত্রখানা তুলিয়া লইয়া, তাহা শতখণ্ড করিয়া স্বামীর গাত্রে ফেলিয়া দিয়া দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে যে কি বলব, তা ভেবে পাচ্ছি নে। পত্র লিখতে যাচ্ছিলে কাকে?"

নৃপেন চুপ করিয়া রহিল।

সুলতা আদেশের সুরে বলিল, "চুপ করে থাকলে চলবে না,—উত্তর দাও বলছি।"

নৃপেন মুখ তুলিল "দাদাকে।"

সুলতা ক্রোধাগুনটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া শান্ত ভাবে বলিল, "কিসের জন্যে?"

নৃপেন স্পষ্ট উত্তর করিল "তোমার জন্যে।"

"আমার জন্যে?" ঘৃণায় সুলতার মুখখানা বীভৎস হইয়া উঠিল, "আমার জন্যে তুমি এগুচ্ছো? তা যদি হয়, তবে নিজের মুখে বলতে পারছ না? পত্র লিখে জানাতে চাচ্ছো? ছিঃ, তোমায় আর বলব কি,—তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই নে আর। যদি আমার উপযুক্ত স্বামী হতে পার, তবে মুখ দেখিও,—নচেৎ নয়।"

সে ফিরিতেছিল,—আর্ত্ত কণ্ঠে নৃপেন ডাকিল, "সুলতা—সু—" সুলতা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কেন ডাকছো?"

নৃপেন অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিল, "আমি কাপুরুষ নই, তার প্রমাণ তোমায় দেব। বড়দাকে আমি নিজের মুখে স্পষ্ট বলব। কিন্তু কি কথা নিয়ে এ কথা তুলব? কি কারণ আমি দেখাব? একটা কিছু দেখানো চাই তো।"

সুলতা গম্ভীর মুখে বলিল, "কারণের অভাব নেই।"

নৃপেন বলিল "আজকের মত মাপ কর আমায়। সাতটা দিন সুলতা—সাতটা দিন অপেক্ষা কর। এর মধ্যে যদি সব না করতে পারি,—তুমি ভবানীপুরে চলে যেয়ো;—জন্মের মতই তোমাকে বিদায় করে দেব আমি। কিন্তু এই সাতটা দিন, পারবে না কি সুলতা—পারবে না কি দেরী করতে?"

সুলতা গম্ভীর ভাবে বলিল, "বেশ, সাতটা দিন দেখতে আমি রাজি আছি।"

বিবাদটা এখানেই মিটিয়া গেল।

রমেন্দ্র মাতাল, বদমাইস,—কিন্তু তাহার হৃদয় আছে, তাহার জ্ঞান আছে। নৃপেন্দ্র বুদ্ধিমান; কিন্তু তাহার ভাল-মন্দ জ্ঞান ছিল না। স্ত্রীকে সে জগতের উপরে স্থান

দিয়াছে। শুধু তাহার প্রশ্রয়েই যে সুলতা বড় বেশী দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোক কাদা মাত্র; তাহার হৃদয়ে যে ভাব সঞ্চারিত করা যায়, যে ভাবে তাহাকে গড়িয়া তুলা যায়, সেও নিজকে সেই ভাবে চালনা করে। তাহারা স্বভাবতঃ কলহপ্রিয়া; কিন্তু ইহার প্রতিবিধানের ভার স্বামীর উপর অর্পিত। এক সংসারে বাস করিতে অনেকেই প্রথমে রাজি হয় না, তাহাদের সে বক্র পথ হইতে ফিরাইয়া, সোজা পথে চালিত করা স্বামীর কার্য্য। স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে দেবী বা দানবী মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। নৃপেন দৃঢ় ছিল না, বড় হালকা প্রকৃতির ছিল বলিয়াই, সুলতা অতটা মাথা তুলিতে পারিয়াছিল। স্বামীকে পর্য্যন্ত সে দমনে রাখিয়াছিল। নৃপেন নিজের মর্য্যাদা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

য়ুরোপে

পারিস, মে ১৯২২

[শ্রীদিলীপকুমার রায়]

বার্লিনে অনেকগুলি রুষ বন্ধু ও বান্ধবী লাভ করার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। রুষ সাহিত্য পড়ে' আমার রুষজাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা জন্মেছিল, এঁদের সঙ্গে মিশে আমার সে শ্রদ্ধা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। বর্ত্তমানে প্রায় দুই লক্ষ রুষ বার্লিনে বসবাস কচ্ছেন; তাঁদের মধ্যে দু'দশজনের সঙ্গে আমি সহজেই একটু নিকট সংস্পর্শে আস্‌তে পেরেছিলাম। আমি যত জাতির সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত মিশেছি, তার মধ্যে রুষদের মত এমন হৃদয়বান্‌, কলা ও সাহিত্য-অনুরাগী ও চিত্তাকর্ষক জাতি দেখি নি। তা ছাড়া, আমার পরিচিত অনেক রুষ বন্ধুর মধ্যে বাস্তবিকই একটা বিশিষ্ট আত্ম-বিশ্লেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলাম, যেটা হৃদয়ের আন্তরিকতা ও শক্তিমত্তার সূচনা করে থাকে। (১) ফরাসী জাতির সঙ্গে মিশ্‌লে যেমন স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, তাদের বর্ত্তমান অনুদারতা ও নীচতা জাতীয় বৃদ্ধত্বের পরিণাম,—যে প্রবীণতা নূতনের আবাহনে মুখ ফেরায় (অবশ্য আমি Rolland মহোদয় প্রমুখ দু'চারজন মহাত্মাকে ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করেই এ কথা বল্‌ছি), যে প্রবীণতা বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয়ের কল্পনায় সাড়া দেয় না,—তেম্‌নি পক্ষান্তরে, রুষ জাতির সঙ্গে সংস্পর্শে এলে, তাদের চারিত্রে মানুষে ও জগতে lively interestএর মনোজ্ঞ পরশ পেয়ে মনটা খুসি হয়ে ওঠে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে রুষ জাতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখ্‌বার ইচ্ছা নিয়ে কলম ধরা গেছে; তবে একটু সাবধান-বাক্য বোধ হয় এ স্থলে বলে রাখা মন্দ নয়, ও সেটা এই যে, এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে হয় ত একটু বেশীমাত্রায় ভুল থাকা অসম্ভব না-ও হতে পারে। তার কারণ এই যে, এ যাবৎ আমরা য়ুরোপে ইংরাজেতর অন্য কোনও জাতির সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে পরিচয় লাভ করার বড় বেশী চেষ্টা করি নি বলে, আমি এ বিষয়ে অপরের অনুরূপ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখার বড় বেশী সুযোগ পাই নি। তবে আমার যে দু'চারজন বন্ধুকে আমি আমার রুষ বন্ধু ও বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি, তাঁদের মতামতের সঙ্গে মূল বিষয়ে আমার বেশী মতদ্বৈধ হয় নি।

এরা এখন তরুণ জাতি। বোধ হয় সেইজন্যই সামাজিক formalityর কাষ্ঠবন্ধনে এরা অপরাপর জাতির মত ততটা ধরা দেবার সময় পায় নি,—সহজেই হৃদয়টিকে প্রকাশ কর্ত্তে কুণ্ঠা বোধ করে না। রাশিয়ান মেয়েরাও মধুর-প্রকৃতি ও বুদ্ধিমতী। এদের বেশভূষায় ফরাসী রমণীর chic নেই; কিন্তু

(১) "The Slav nature, or at any rate the Russian nature, the Russian nature as it shows itself in the Russian novels, seems marked by an extreme sensitiveness, a consciousness most quick and acute both for what the man's self is experiencing, and also for what others in contact with him are thinking and feeling"—Matthew Arnold, Essay on Count Tolstoy. আমার মনে হয়, আর্ণল্ড মহোদয়ের এ সিদ্ধান্ত খুব সত্য।

এদের সহজ ভাবের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। তা ছাড়া, মেয়েরা যে অপরিচিত ও তার-ওপর বিদেশীর সহিত ব্যবহারে এত শীঘ্র এতটা সহজ ও সরল হতে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না। আমি যে কয়জন রুশ পুরুষ ও নারীর সঙ্গে একটু আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাতে দেখ্‌লাম যে, শুধু সঙ্গীত নয়, রুশ সাহিত্যও এঁরা প্রায় সকলেই বেশ ভাল রকম জানেন, ও তা হতে সত্য-সত্যই রস পান। এর ফলে এঁদের হৃদয়ে একটা সূক্ষ্ম দিকের বিকাশ হয়ে থাকে, যেটা কলার চর্চ্চায় সচরাচর হয়ে থাকে। হৃদয়ের এই সূক্ষ্ম দিকের বিকাশ একটা গভীর গুণ নয় বটে, কিন্তু বড় মনোজ্ঞ গুণ। আমি রুশ সাহিত্য সম্বন্ধে এঁদের সঙ্গে আলাপ করে ভারি একটা তৃপ্তি পেতাম; এবং রুশ চরিত্র-চিত্রণে বিরাট্ রুশ সাহিত্যিকদের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় এঁদের চরিত্রের মধ্য দিয়ে আরও বেশী করে পেতাম বলে, সে তুলনায় বেশ রস পেতাম। Matthew Arnold মহোদয় টল্‌ষ্টয়ের "আনা করেনিনা" উপন্যাস সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, (২) তা প্রায় সব বিখ্যাত রুশ কলাবিদ্‌গণের চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধেও সম ভাবে খাটে।

রাশিয়ান জাতিকে যে মহামতি ঋষি সবচেয়ে গভীর ভাবে অনুভব করেছিলেন, ও বুঝেছিলেন, তিনি তাঁর একখানি বিখ্যাত উপন্যাসের নায়িকাকে দিয়ে এক স্থলে বলিয়েছেন, "O you Russians! you have got hearts of gold." (৩) সাধারণ ভাবে এ কথায় সায় দেবার মতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হলেও, এদের স্বভাবের একটা জন্মগত মাধুর্য্য, ও সহজেই বিদেশীর প্রতি খুব প্রীতির ভাব পোষণ করা থেকে বুঝ্‌তে পারি যে, এ উক্তিটি সম্ভবতঃ উৎসাহী স্বদেশভক্তের অত্যুক্তি নয়। বৎসরাধিক পূর্ব্বে পোলাণ্ডের জন্য যখন ইংলণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উপক্রম করেছিল বল্‌লেই চলে, তখন ওয়েল্‌স মহোদয় যা লিখেছিলেন, তার ভাবার্থমাত্র মনে আছে; তা এই:—"আমি আশা করি, রাশিয়ান জাতি তাদের বর্ত্তমান দুঃখ দৈন্য কাটিয়ে আবার উঠ্‌বে; কারণ, ভবিষ্যৎ য়ুরোপকে তারাই পুনর্গঠন কর্ব্বে, ও সত্যের আলোক দেখাবে।" বোধ হয় খুব কম লোকেই জানেন যে, রাশিয়ান জাতি শুধু সঙ্গীতে, সাহিত্যে ও নৃত্যে নয়—অভিনয়েও জগতের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে আসীন। আমি সম্প্রতি এখানে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ দলের অভিনয় দেখে, ভাষা না জানা সত্ত্বেও, যত মুগ্ধ হয়েছি, অন্য কোনও অভিনয় দর্শনে তত মুগ্ধ হই নি। এদের অভিনয় এত উচ্চশ্রেণীর যে, রাশিয়ান ভাষাভিজ্ঞ জার্ম্মাণ দর্শকও এ থিয়েটারে বড় কম যেতেন না। তবে এ সম্বন্ধে পরে লেখার ইচ্ছা আছে বলে, এখন রাশিয়ান জাতি সম্বন্ধেই আমার মতামত আবদ্ধ রাখা ভাল। এ ক্ষেত্রে কেবল একটা একটু অবান্তর প্রসঙ্গের উল্লেখ করার লোভ সংবরণ কর্তে পাচ্ছি না। এই ভ্রাম্যমান অভিনেতৃ-দলের regisseur (রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পরিদর্শক) একজন ভারতীয়। এঁর সম্বন্ধে পরে লিখবার ইচ্ছা রইল। এখন কেবল এই কথাটুকু আমার দেশবাসীকে জানাতে চাই যে, এই নানা ভাষাবিৎ, শিক্ষিত ও গভীরচিত্ত ভদ্রলোক বাংলার কোনও বিচারপতির সন্তান হওয়া সত্ত্বেও, এবং ব্যারিষ্টার হতে আসা সত্ত্বেও রুশ-সাহিত্য পড়তে রাশিয়ায় দুই বৎসর ছিলেন; ও নিজে নিতান্ত artistic প্রকৃতির লোক হওয়ার দরুণ, অভিনয়-কলার চর্চ্চাতেই জীবন দিয়াছেন। শীঘ্রই দেশে ফিরে, দেশের অভিনয়-প্রণালীর পুনর্গঠনে সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত কর্বেন। এঁর জীবন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক; এবং এ রকম spirit of adventure আমাদের দেশবাসীর মধ্যে দেখ্‌লে, আনন্দে বুক দশ হাত হয়ে ওঠে। এঁর কাছেও রুষজাতির সম্বন্ধে যা-যা তথ্য পেলাম, তাতে রাশিয়ানদের প্রতি আমার উচ্চ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। তবে আবার বক্তব্যে ফিরে আসা যাক্।

রাশিয়ান জাতি ললিতকলানুরাগী বলেই যে তাদের আমার এত ভাল লেগেছে তা নয় (কারণ ললিত কলানুরাগ মানব-হৃদয়ের বিকাশের একটা দিক্ মাত্র; এবং একটা বড় দিক্ হ'লেও, সর্ব্বোচ্চ দিক্ নয়); রাশিয়ান জাতিকে আমার এত ভাল লেগেছে এই জন্য যে, এরা মানব-হৃদয়ের উচ্চতম ও গভীরতম গুণের দাম বোঝে। তা ছাড়া, এদের হৃদয় একটা বিশ্বজনীন সহানুভূতির রসে উর্ব্বর। মনে হয় মহাত্মা টল্‌ষ্টয়ের কথা, যিনি সমগ্র য়ুরোপ পরিভ্রমণ করে বুঝেছিলেন

(২) "A piece of life it is. The author has not invented and combined it, he has seen it."

(৩) Dostoievski—Injury and Insult, নায়িকা Natasha বল্‌ছেন।

যে, রুষ কৃষকই সব চেয়ে খাঁটি খৃষ্ট-শিষ্য। এতবড় একটা জাতি যে কেন বর্ত্তমান অরুন্তুদ যন্ত্রণার কবলে পড়ে শ্বাসরোধের অবস্থায় পৌঁছেছে, তা বুঝে ওঠা কঠিন,—যখন অন্য সব টাকা-আনা-পাই-বুঝদার জাতিরা দিব্য সুখে আছে দেখা যায়। বর্ত্তমান রুসিয়ার দৈনিক জীবনের কষ্ট ও তার ওপর নিষ্ঠুর নিয়তি-প্রেরিত দুর্ভিক্ষের যাতনা শুধু সংবাদপত্রে পড়ে নয়,—আমার রুষ বন্ধুদের কাছে যা শুনলাম, তা লিখে শেষ করা কঠিন। উদাহরণতঃ এটা একটা অবিসংবাদিত সত্য যে. এমন ঘটনা রুষদেশে অনেক স্থলে ঘটেছে, যে ক্ষেত্রে জননী ক্ষুধার তাড়নায় সন্তানের মাংসে ক্ষুধা-নিবৃত্তি কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন। সমগ্র রুষদেশের বর্ত্তমান দৈনিক জীবনযাত্রার যে কষ্টের কাহিনী শু'ন, তাতে মনে পড়ে সেই ফরাসী মানব-প্রেমিকের কথা, যিনি মানুষের বিরাট্ দুঃখ দেখে বহুদিন পূর্ব্বে বলেছিলেন—"On pardonne le Dieu xulement parce qu'il n'existe point" অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরকে ক্ষমা কর্ত্তে পারি কেবল এই কারণে যে তিনি নেই। (৪)

কিন্তু এত কষ্ট সত্বেও, এমন রুষ বোধ হয় কমই আছে যে অনুক্ষণ দেশে ফির্ত্তে না চায়। Tchekovএর "তিন ভগ্নী" নাটক যিনি পড়েছেন, তিনি দেখতে পাবেন, জন্মভূমির প্রতি আত্মহারা অনুরাগ রুষজাতির মনে কি রকম বদ্ধমূল। ১৯২০ সালে সুইজরলাণ্ডে এক হোটেলে একটি রুষ মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, যুদ্ধের সময়ে রুষ গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত তাঁর এক নিহিলিষ্ট বন্ধু সুইজরলাণ্ডে সর্ব্বদা ঘরের কোণে একটি রুষদেশের গাছ সযত্নে টবে রক্ষা কর্ত্তেন; ও তার দিকে চেয়ে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা পেতেন। এমন হৃদয়স্পর্শী কাহিনী নিতান্তই রুষজাতি, ও ভারতীয় সুলভ। "আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি" এ ডাকে বোধ হয় অন্য কোনও matter of fact জাতি তত সাড়া দিতে পারে না। পক্ষান্তরে মনে পড়ে আমার পরিচিত এক ইংরাজ ছাত্রের কথা। তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসবাস করবার মাসখানেক আগে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, দেশে তিনি আর ফির্ব্বেন কি না। তাতে তিনি নিতান্ত সহজ ভাবে উত্তর দেন, "না।" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আর কখনও ইংলণ্ডে ফির্ব্বে না ভেবে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?" তিনি বলেন, "প্রথমটা একটু কষ্ট হবে; কিন্তু সেখানে জীবন-সংগ্রাম এতটা কঠিন নয়; কাজে-কাজেই দেশে ফেরার কথা কিছুদিন বাদে বড়-একটা মনে হবে না।" এটা হচ্চে ঔপনিবেশিক জাতির মনোগত ভাব।

এই সূত্রে আমার মনে হয় যে, ভারতীয় ও রুষ জাতির মধ্যে একটা সহজ মিল আছে। সেদিন আমার এক রুষ বন্ধু আমাকে একটি মাসিকী দেখালেন। তাতে দেখলাম যে, কৈশরলিং (ইনি বর্ত্তমান জগতের একজন খ্যাতনামা জার্ম্মাণ দার্শনিক সাহিত্যিক) ভারত ও রুষিয়ার এই দৃশ্যতঃ সাদৃশ্য সম্বন্ধে লিখেছেন। উদ্ধৃতাংশটি হাতের কাছে নেই; তাই সেটির ভাবার্থটুকুই দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা এই যে, রুষ ও ভারতীয় কৃষক যে একছাঁচে ঢালা, তা তাদের প্রার্থনার ভঙ্গীতে, তাদের বিশ্বাসের গভীরতায় ও এমন কি তাদের কুসংস্কারের সমতায়ও ফুটে ওঠে। সব কথাগুলি মনে নেই,—তবে মাত্র এইটুকুও উদ্ধৃত কর্ব্বার লোভ সংবরণ কর্ত্তে পারলাম না এই কারণে যে, কৈশরলিং মহোদয়ের ভারত ও রুষ দুই দেশেরই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকার দরুণ, তাঁর এ উক্তির একটু মূল্য আছে বলে আমার মনে হয়। আমার ভারতীয় বন্ধুর—যিনি রুষ দেশে তিন বছর ছিলেন—কাছ থেকেও এদের সম্বন্ধে যা শুনলাম, তাতে এই সাদৃশ্য সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমর্থনই হয়। যথা, অতিথি বাড়ী এলে এরা কিছু না খাইয়ে তাকে ছাড়ে না, এমন কি দুর্ভিক্ষের সময়েও নিজের রুটির একখণ্ড এরা অতিথিকে দিতে কার্পণ্য করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা' ছাড়া, ভারতীয়েরা সচরাচর একটু বেশী সেণ্টিমেণ্টাল ও স্নেহপ্রবণ,—রুষজাতিও তাই। টলষ্টয় ও ডোষ্টয়েভস্কির উপন্যাসে রুষজাতির এই দুই চরিত্র লক্ষণের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। এখানে (পারিসে) এসে আমার বার্লিনের দুই-একজন রুষ বন্ধুর কাছে যা চিঠি পেয়েছিলাম, তার সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌মের মধ্যেও অনেকটা ভারতীয় সুর বাজে। তা' ছাড়া যখন দেখি যে, রুষদের সঙ্গে আমার নিজের ও আমার অনেকগুলি ভারতীয় বন্ধুর ভারি

(৪) আমার কাছে যিনি এই উক্তিটি ফরাসীভাষায় উদ্ধৃত করেন, তিনি বলেছিলেন যে, বোধ হয় তিনি Voltaire এর লেখায় এ উক্তিটি পেয়েছিলেন এবং তা যে অবিকল উদ্ধৃত কথাগুলি, সেটাও তিনি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারেন না।

চট্‌ করে বনে যায়, তখন এসব বিভিন্ন "দৈনিক সত্যের" (অর্থাৎ fact এর) যোগাযোগে বোধ হয় এ সাধারণ সত্যে (অর্থাৎ truth এ) পৌছন যেতে পারে যে, রুশিয়ার ও ভারতের মনোজগতের এ সাদৃশ্যের রটনা একান্ত ভিত্তিহীন না হ'তেও পারে।

এ কথা সর্ব্বজনসম্মত যে, শিক্ষিত রুষের মত নানা-ভাষাবিৎ জাতি জগতে আর নেই। আমি নিজের সামান্য অভিজ্ঞতাতেই ত দেখি যে, প্রায় প্রত্যেক রুষ ছাত্র ও ছাত্রীই অন্ততঃ তিন-চারিটি য়ুরোপীয় ভাষায় বেশ সুন্দর কথাবার্ত্তা চালাতে পারেন। অনেকে ৬।৭ টা ভাষাও জানেন। এঁরা কেউই পণ্ডিত নন—সাধারণ ছাত্র মাত্র। রুষদেশে না কি ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকেই মাতৃভাষা ছাড়া দু' তিনটি ভাষা শিখান হয়। এই সূত্রে আমার মনে হয়েছিল যে, একটু উচ্চশিক্ষা যাঁরা পেতে চান (যাঁরা বিদেশীর সঙ্গে মিশতে চান তাঁদের ত কথাই নেই) তাঁদের আমাদের দেশে ছেলেবেলা থেকে ইংরাজী ছাড়া অন্ততঃ আর একটা ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত। নইলে য়ুরোপকে ইংরাজ-লেখক ও ইংরাজী-অনুবাদের দূরবীণ দিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড়ই একদেশদর্শী হয়ে পড়তে হয়। অবশ্য অনেকগুলো বিদেশী ভাষা শিখ্‌তে যাওয়াতে অনেক সময়ে লাভের চেয়ে যে ক্ষতিই বেশী হবার একটা আশঙ্কা আছে, তা আমি মানি; কারণ, এরূপ স্থলে অনেক সময়ে ভাষাশিক্ষাটা মনের সম্পদ অর্জ্জনের সহায়ক স্বরূপে গণ্য না হয়ে, তরল আত্মপ্রসাদের অপিচ ফক্‌রায়ণ-গর্ব্বের খোরাক যোগায়। য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রথম অবস্থায় রুষ জাতির এই ফক্‌রায়ণ-গর্ব্ব ও বিজ্ঞন্মন্যত্বে আহত হয়েই Tolstoy তাঁর Confessions এ একস্থলে লিখেছিলেন যে "যে culture মানুষকে সাধারণ্য থেকে পৃথক করার সহায়তা করে, ও শেষে তাকে পাঁচজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন কর্ব্বার চেষ্টা করে সে culture সর্ব্বতোভাবে হেয় ও পরিত্যজ্য।" তবে যদি প্রথম থেকে এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করা যায়, তবে এমন আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নয় যে, মানুষ ক্রমেই শিক্ষার দ্বারা মনের গভীরতাই উত্তরোত্তর বাড়াতে পার্ব্বে, যদিও তথাকথিত উচ্চ শিক্ষার প্রথম অবস্থায় তার লোক-দেখানোর দিকটা একটু চিত্তাকর্ষণ কর্ব্বেই। তবে এই অহঙ্কারের সুরার প্রতিষেধ—তাকে দূর হতে নমস্কার করে বিদায় নেওয়া নয়; এ সুরার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধ—তার আস্বাদ জেনে তাকে জয় করা। ভাষাশিক্ষা যে একটা চরম উদ্দেশ্য নয়, তা যে শুধু বিদেশী সাহিত্য ও বিশ্বমানবের মনের একটু নিকট-পরিচয়-লাভ-রূপ মহৎ উদ্দেশ্যের একটা উপায় মাত্র, এ সত্যটি যদি সর্ব্বদা আমাদের স্বতঃই অহঙ্কারপ্রবণ মনের সাম্‌নে ধরে রাখার সতর্ক চেষ্টা থাকে, তবে এর শেষ ফল যে গভীরতাই দাঁড়াবে, এ বিশ্বাস আমার খুবই হয়। তাই আমার মনে হয় যে, ইংরাজী ছাড়াও অন্ততঃ আর একটা ভাষা আমাদের দেশে বাল্যকাল হ'তে শিক্ষা করাটা মোটের উপর প্রশস্তই হবে।

একটি রাশিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু বিশেষ করেই আলাপ হয়েছে। ইনি অবিবাহিত, বয়স্ক, এবং সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা ও অভিনয়-কলার একজন মস্ত অনুরাগী। ফরাসী জার্ম্মাণ ও ইংরাজী বিশুদ্ধ না বল্‌লেও, বেশ দ্রুত বল্‌তে পারেন; এবং এই তিন সাহিত্যেরই নানারকম বই পড়েন। ইনি যে বইয়ের সত্য আদর জানেন, তা এঁর ঘরে ঢুক্‌লেই এঁর বইয়ের আদর দেখে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ ইনি বইগুলিকে আমাদের দেশের ও এ দেশের অনেক fashionable মহাত্মার মতন show case এ দেখাবার জন্য সাজিয়ে রাখেন না; পড়েন বলে' তা বিশৃঙ্খল ভাবে ঘরময় ছড়িয়ে রাখেন। ইনি চিত্রকলার নবতম মাসিকীর গ্রাহক এবং তাতে যে সত্যসত্যই রস পান, তা এঁর কথাবার্ত্তায় বেশ ফুটে ওঠে। এঁর এ সব বিষয়ে বেশ একটা উদার ভাব আছে। ইনি বলেন, "আমাদের একটা ধারণা আছে যে আর্ট প্রকৃতিকে অনুসরণ কর্ব্বে,—এটা মস্ত ভুল। মানুষের সৃষ্টি অহরহ নূতন-নূতন দিক্‌ খুঁজে বেড়াচ্ছে;—তাই মানুষের সৌন্দর্য্য-স্পৃহার অভিব্যক্তি কোনও বাঁধা নিয়মে ধরা দিতেই পারে না। আর্ট সম্বন্ধে মানুষের সাময়িক মতকেই চিরন্তন মনে করাটা হাস্যকর। এবং সব সময়েই কোনও নূতন সৃষ্টি প্রচলিত ফ্যাশানের অনুবর্ত্তিগণ কর্ত্তৃক উপহসিত হয়ে থাকে। যেমন, Rennaisance এর আগে চিত্রকরেরা প্রকৃতির চিত্রকরদের বল্‌ত 'apers of nature'। পক্ষান্তরে, এখন অনেকে চিত্রবিদ্যার প্রকৃতি থেকে দূরে চলে যাওয়াকে বলে অস্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, এঁরা দুজনেই ভুল। যদি স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে বলে "Rhythmus" অর্থাৎ মিল দেখাতে পারেন, তাহ'লেই হ'ল,

তাঁর কাছে তার চেয়ে বেশী আমাদের কোনও দাবী দাওয়া নেই।" তার পর ইনি আমাকে অনেকগুলি বর্ত্তমান ভাস্কর্য্যের ও রূপরেখার ছবি দেখালেন; ও তার সৌন্দর্য্য বেশ সুন্দর ভাবে বোঝাবার চেষ্টা কর্লেন,—যদিও সব আমি বুঝ্‌তে পার্লাম না, কারণ, এ বিষয়ে আমি মোটেই ভাবি নি। বর্ত্তমান ভাস্কর্য্য ভারী অদ্ভুত। একটা মানুষ। তার মাথাটা বোঝা যাচ্ছে না, মাথা না অন্য কিছু,—পা দুটো বিভিন্ন রকমের এবং আরও নানারকম অসঙ্গতিদোষ—অর্থাৎ অবশ্য আমার অনভ্যস্ত চোখে। তবে অনেকগুলি লোক একটি চিত্রে একত্র নৃত্য কর্চ্ছে—সেটা আমার বেশ লাগল। চিত্রটি নানারকম লম্বা-লম্বা, সোজা ও বক্র মূর্ত্তিতে ভরা, —মানুষের সঙ্গে যার কোনই সাদৃশ্য নেই; কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়া দেখ্‌লে মনে হয় যেন, লক্ষ-লক্ষ লোক একত্র রুদ্র তালে মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য কর্চ্ছে। এ সব অবশ্য আমার নিতান্তই অজ্ঞের মত সমালোচনা; তবে এইটুকু মাত্র আমি ধর্ত্তে পার্লাম যে, এর মধ্যে কোথায় সত্য-সত্যই একটা Rhythmus বা সুর আছে,—যদিও আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলে তা ধর্ত্তে-ছুঁতে পাচ্ছি না,—একটু আভাস পাচ্ছি মাত্র। এখন মনে হয় Rodinএর বিখ্যাত ভাস্কর্য্যের কথা, যা দেখে আমার ভাল লাগে নি; কারণ, তখন কেউ আমাকে, তার প্রাণটা কোথায়, তা বোঝাবার চেষ্টা করে নি। তবে এখন তার মধ্যে একটু mysticism রূপ মলয়ের পরশ আছে বলে মনে উদয় হ'ল। আমার এই রুষ বন্ধুটি ইঞ্জিনিয়ার হয়েও যে কেমন করে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে এত খবর রাখেন, তা ভেবে একটু আশ্চর্য্য না হয়েই পার্লাম না। • ইনি ব্যক্তিগত ভাবে বেশ চমৎকার লোক। মুখে বেশ একটা পবিত্রতার ও refinementএর ছায়া ফুট হয়ে আছে। আমাকে প্রায়ই ভাল ভাল কন্‌সার্ট ও অপেরায় যেতে বলেন। অনেক সময়ে একত্রই যাওয়া যায়, ও ইনি আমাকে নানান্ বিষয় বুঝিয়ে দেন। কোনও গভীর বন্ধুত্বের সম্ভাবনা না থাকলেও, একটা সহজ ও সত্য প্রীতির বন্ধন পাওয়া গেছে। তাই এ লোকটিকে বেশ ভাল লাগে। ছোটখাট বিষয়ে রুষ জাতি যে কতটা আতিথেয়, তা এঁর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হ'তেই বুঝ্‌তে পার্লাম। সময়ে ও অসময়েও এঁর ওখানে গেলেই মাঝে-মাঝে চা বা চকোলেটের কাপ এনে ধর্ত্তেন যেটা কোনও য়ুরোপীয়ই কর্ব্বে না। অসময়ে চা খাওয়ানো! এত বড় নিয়মহীনতা! এই লোকাচারের পূজাকে বিদ্রূপ করে Strindburg এক স্থলে বেশ লিখেছেন। ধনী ভদ্রলোকর আহার্য্য-পরিদর্শক (butler) তাঁকে বল্‌ছেন যে, অসময়ে আহারার্থ খাওয়ার টেবিলের কাছে আসাও নিয়ম-বিরুদ্ধ। ধনী ভদ্রলোক মহা ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লেন "Who forbids me in my own house?" বাট্‌লার মহাশয় শান্ত ভাবে উত্তর কর্লেন "Your Grace! I stand above the servants, above me stands your Grace, but above us all stands conventionality. Its laws are perpetual." (Lucky Pehr—Strindburg)

রাশিয়ানেরা আমাদের মতই এ সব বিষয়ে সময়ের বাঁধাধরা নিয়ম গ্রাহ্য করে না। কেম্ব্রিজে এক রুষ-আমেরিকান প্রফেসরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, রাশিয়াতে তাঁর পিতার টেবিলে আহারের সময় প্রায় প্রত্যহই অনাহূত অতিথি দু'চারজন এসে উপস্থিত হ'ত, এজন্য তাঁর মাতার দুশ্চিন্তার সীমা থাকত না। এরূপ ঘটনা যে রুষদেশে প্রায়ই হয়, তা আমি অন্য অনেকের কাছেও শুন্‌লাম।

এগুলো অবশ্য আমি অবিমিশ্র ভাল বল্‌ছি না; আমি কেবল রাশিয়ান জাতির এই সহজ হৃদ্যতার মনোজ্ঞ দিক্‌টা দেখাচ্ছি মাত্র।

রাশিয়ান জাতির মধ্যে আর্ট জিনিসটি যে কতটা মজ্জাগত হয়ে পড়েছে, তার প্রমাণ সেদিন তাদের একটা "নীল-পাখী" (Blau Vogel) নামক Cabaret (কাবারে)এ পেলাম। আমার এই রাশিয়ান বন্ধুটি আমাকে ও তাঁর এক চিত্রকর বন্ধুকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই কাবারে বস্তুটি কি, তা একটু বিস্তারিত ভাবে লেখা মন্দ নয়; কারণ, অনুরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে নেই; এবং বোধ হয় আমাদের দেশে খুব কম লোকেই এ জিনিসটির সম্বন্ধে কিছু জানেন। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব ফরাসী-দেশে হলেও, জার্ম্মাণীতে এটি খুব লোকপ্রিয়। আমি ইতি-পূর্ব্বে দুটি জার্ম্মাণ "কাবারে"তে গিয়েছিলাম। এরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান আমি জার্ম্মাণীতে আস্‌বার আগে দেখি নি। নানান্ রকম চেয়ার ও মাঝে-মাঝে ছোট-বড় গোল, লম্বা, নানান্

আকারের টেবিল। সাম্‌নে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট রঙ্গমঞ্চ। সেখানে নানান্ রকম সঙ্গীত, হাস্যকর নক্সা, নৃত্য প্রভৃতি গীত ও অভিনীত হয়। এদিকে দর্শকেরা পানাহার কর্ত্তে-কর্ত্তে অভিনয় উপভোগ করেন। বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের একটি অজানা পথ এরা এ উপায়ে খুঁজে বার করেছে মন্দ নয়। উদ্দেশ্য এই যে, দর্শকেরা at home মনে কর্‌বে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে নৃত্য-গীতও উপভোগ কর্‌বে। নট নটী ও দর্শকের মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য ব্যবধানের অস্তিত্ব যাতে কেউই না বোধ করে, সে জন্য প্রত্যেক দৃশ্য-চিত্রের শেষে অধ্যক্ষ ভদ্রলোক এসে, দর্শকদের লক্ষ্য করে নানান্ মজার বিশ্রম্ভালাপ করেন। সবই যেন তর্‌তর্ করে চলেছে। তবে জার্ম্মাণ কাবারে ছুটিতে মাত্র দুই-একটি নক্‌সা আমার ভাল লেগেছিল। কারণ, জার্ম্মাণ কাবারে-গুলিতে আর্টের বড় গন্ধ থাকে না,—থাকে ভাঁড়ামির বাড়াবাড়ি, ও গানা যন্ত্র-সঙ্গতের আর্ত্তনাদ। জার্ম্মাণ "কাবারে"গুলির অধ্যক্ষগণ যাকে বলে playing to the galleryর পক্ষপাতী; কারণ, তাতেই দর্শক বেশী হয়। তা'ছাড়া, এই সব জার্ম্মাণ অধ্যক্ষ বেশভূষার উদ্ভাবনীতে ফ্রান্সকে টুটিয়ে অনুকরণ করেছেন। দৃষ্টান্তত:, নর্ত্তকিগণ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ এতই জাহির কর্ত্তে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন (দোষ অবশ্য তাদের নয়) যে, তাতে নৃত্যের মধ্যে প্রকৃত আর্টের চেয়ে সুলভ উত্তেজনায় আহুতি দেবার চেষ্টাই বেশী স্ফুট হয়ে ওঠে। পুলিশের আইনকে একটু চোখ ঠেরে চল্‌তে হয়; কিন্তু অনাবরণ স্পৃহা এঁরা ভারী স্বচ্ছ রকমের ঠুলির সাহায্যে চরিতার্থ করেন; অর্থাৎ সে ঠুলি না থাক্‌লে, ফল বোধ হয় অপেক্ষাকৃত খারাপ না হয়ে ভালই হত। নগ্নতার মধ্যে একটা বিশুদ্ধতা আছে, যা সাধক শিল্পীর চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে এক মুহূর্ত্তেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই পবিত্রতা দেয়—যথার্থ আর্ট। কিন্তু মানব-সৃষ্ট আবরণের পাশাপাশি অর্দ্ধনগ্নতা আমাদের মনের মধ্যে একটা কৌতূহলের উদ্রেক করিয়ে দিয়ে, তাকে কলুষিত করে তোলে। এটা আমি অনুভব করেছিলাম বলেই এত কথা লিখ্‌ছি। আমার এক পরিচিত ভারতীয় ভদ্রলোক একদিন এরূপ নৃত্যকে অম্লান বদনে আর্ট বলে সমর্থন কর্ত্তে চেষ্টা করেছিলেন। আমি মনে-মনে একটু হেসেছিলাম। আমরা লোকমতের ভয়ে কত সময়েই না অর্দ্ধসত্য ও কপটতার, আত্মপ্রতারণার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে থাকি? যাঁরা এরূপ নৃত্য দেখ্‌তে যান, তাঁদের সঙ্গে আমার বিবাদ নেই, যদি তাঁরা স্বীকার করেন যে, তাঁরা আর্টের জন্য সেখানে যান নি, গিয়েছিলেন সুলভ সাধারণ উত্তেজনার আংশিক চরিতার্থতা সাধন কর্ত্তে। তবে যার যা নাম, তাকে সেই নাম দিলেই ত গোল চুকে যায়! পুরুষের মধ্যে নারীদেহের দর্শন-স্পর্শনরূপ লালসার এটা যে একটা আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র, তা স্বীকার করে নিলেই আমি এ শ্রেণীর দর্শকদের বিপক্ষে সব অভিযোগ প্রত্যাহার কর্ত্তে রাজী। আমি কেবল আর্টের দোহাই দিয়ে শ্যাম ও কুল দুই-ই বজায়-রাখা-রূপ আত্মপ্রবঞ্চনার বিরোধী। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে, "The proof of the pudding lies in the eating"—নগ্নতার কোথায় আর্ট ও কোথায় লালসার ইন্ধন-উপাদান, তার পরখ—মনের উপর তার প্রতিক্রিয়ায়। মনে পড়ে Venus de Milo বা Amour et Psyche প্রভৃতি নগ্ন ভাস্কর্য্যের কথা; মনে পড়ে অন্যান্য শত-শত চিত্রে তুলিকা-কবির নগ্নদেহের মধ্য দিয়ে মনের পবিত্রতাকে স্ফুট করে তোলার আকাঙ্ক্ষা—যা মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়—নগ্নচিত্রণের কোথায় আর্ট ও কোথায় গ্রাম্যতা। Matthew Arnold মহোদয় কবিতার প্রবুদ্ধ উপভোগ সম্বন্ধে যে কথা লিখেছেন, সে কথা এ সম্পর্কে চিত্রশিল্পের উপভোগ সম্বন্ধেও সমান খাটে। তিনি লিখ্‌ছেন:—"Indeed there can be no more useful help for discovering what poetry belongs to the class of the truly excellent, and can therefore do us most good, than to have in one's mind lines and expressions of the great masters and to apply them as a touchstone to other poetry." (৫) চিত্রশিল্পেও সত্য ও সুন্দরতম শিল্পের আদর্শ যদি আমরা অনুরূপভাবে চোখের সাম্‌নে ধরে রাখ্‌তে চেষ্টা করি, তা'হলে সেই কষ্টিপাথরে আর্টের নামে গ্রাম্যতার ছায়াপাতের খাদও ধরা পড়ে যাবেই যাবে। সত্য ও সুন্দর শিল্পের উপাসকের সৌন্দর্য্যানুভূতি শুধু যে মানব-সৃষ্ট নগ্নতার কলুষতাকে ছাপিয়ে ওঠে তাই নয়, তা আমাদের আর্টে realismএর সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি অর্জ্জন কর্ব্বার পক্ষেও বিশেষ সহায়তা করে।

(৫) Essays in Criticism:—the Study of Poetry.

আমার যে বন্ধুবর জার্ম্মাণ কাবারেগুলির অর্দ্ধনগ্ন গ্রাম্য নৃত্যকে আর্টের দোহাই দিয়ে সমর্থন কর্ব্বার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি, এই নৃত্য দর্শনে মনে যে গ্লানির উদয় হয়, তাকে চোখ ঠেরেছিলেন, এই মাত্র। অন্ততঃ আমি যে একটি জার্ম্মাণ কাবারের অর্দ্ধনগ্নতার বিজ্ঞাপনে মনে গ্লানি নিয়ে ফিরেছিলাম, এ কথা অস্বীকার কর্ত্তে পারি না। কিন্তু যা বল্‌ছিলাম—রাশিয়ান কাবারের কথা।

এই রাশিয়ান কাবারেটিতে এই গ্রাম্য কলুষতার ছায়াপাতও হয় নি। এখানে যে নৃত্য দেখেছিলাম, তার প্রতি ভঙ্গীতে যে ঝঙ্কার, তার প্রতি ভাবে যে সৌষ্ঠব, তার প্রতি বিন্যাসে যে লাবণ্য—তা এক সত্য কলার উপাসকই দেহের গতির ছটায় প্রকাশ কর্ত্তে পারে। বস্তুতঃ, নৃত্য যে এতটা আনন্দ দিতে পারে, তা রুশ নৃত্যকলার কাছে প্রথম শিখ্‌লাম। সম্ভ্রমে মাথা হেঁট কর্ত্তে হয়েছিল মনে আছে। রুষ নৃত্য দেখ্‌বার পূর্ব্বে বিলাতী বল্‌ প্রভৃতির গ্রাম্য জড়াজড়ির দৃশ্যে শুধু নিজের মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা ছাড়া, অন্য কোনও সত্যকার আনন্দ না পেয়ে, মনে হ'ত যে, নৃত্যকে আর্ট বলাটা একটা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়! কিন্তু রুষ নৃত্য দেখে আমার একদিনে অনেকদিন ধরে গড়ে তোলা মত পরিহার কর্ত্তে হ'ল। য়ুরোপে সকলেই একযোগে স্বীকার করেন যে, নৃত্যকলায় রাশিয়ান জাতি জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে মনে হচ্ছিল যে, একটা জাতি যখন বড় হয়, তখন তার বিকাশের ছটা সর্ব্বতোমুখীই হয়ে থাকে; আমরাও যখন গৌরবের শিখরে অবস্থিত ছিলাম, তখন আমাদের প্রতিভা শুধু দর্শনে ও সাহিত্যে নয়,—ভাস্কর্য্যে, ধর্ম্মে, চিত্রবিদ্যায়, সঙ্গীতে ও নৃত্যে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেছিল। ফ্রান্স, ইতালী ও জার্ম্মাণীর সম্বন্ধে ভূতকালে এ কথা খেটেছিল। এখন বোধ হয় রুষ জাতির সভ্যতার ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করার সময় এসেছে। তার উদাহরণ আমরা পাই রুশ মনের আন্তরিকতায়, তেজস্বিতায়, বিকাশোন্মুখতায়; তার প্রমাণ আমরা পাই রুশ জাতির সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে ও নৃত্যে; তার আভাস আমরা পাই রুশ জাতির আদর্শবাদিত্বে পরদুঃখ-কাতরতায় ও বিশ্বমানবের প্রতি সহানুভূতিতে।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ]

সপ্তদপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

"নবীন, তোমার চেতনা ফিরিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; সুতরাং চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া কোন ফল নাই।" নবীন তৎক্ষণাৎ অতি বিনীত, শান্ত, শিষ্ট ভক্তের ন্যায় উঠিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, করযোড়ে দাঁড়াইল। ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবীন, আজি আবার আমার পিছু লইয়াছিলে কেন?" নবীন উত্তর দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার শুষ্ক কণ্ঠতালু ও জিহ্বা সে উত্তর উচ্চারণ করিল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "পরামাণিক, বস,—অত ভয় পাইতেছ কেন? আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।" সাহস পাইয়া নবীন অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তখন ত্রিবিক্রম কহিলেন, "পুরস্কারের লোভে আসিয়াছিলে;—তুমি জান যে, তোমার মত শত-সহস্র নবীন আসিলেও আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না?" নবীন ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "না—না।" "তবে কি জন্য আমার পিছু লইয়াছ?" নবীন নিরুত্তর। তাহা দেখিয়া ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "পরামাণিক, মনে করিয়াছ, চুপ করিয়া থাকিলে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে?" নবীন দাসের দুষ্ট বুদ্ধি তখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সে ভাবিতেছিল যে, দিনের বেলায় কখনই জলে আগুন লাগিবে না। আর যদিই বা লাগে, কবুল জবানবন্দি পরে দিব। যতক্ষণ বেগতিক না দেখি ততক্ষণ চুপ করিয়াই থাকি। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "মনে করিয়াছ দিনের বেলা, কেমন? ঐ দেখ, জল বাড়িয়া উঠিল।"

দেখিতে-দেখিতে নবীন শুষ্ক ভূমিতে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইল, নদীর জল সহসা কাঁপিয়া উঠিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। তখন ত্রিবিক্রম কহিলেন, "ঐ দেখ, একটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর।" বলিবামাত্র নবীন তার স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কারণ, সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ত্রিবিক্রমের পরিবর্তে একটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। ভয়বিহ্বল নবীন দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

যখন তাহার দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন সে দেখিল যে, সে প্রথমবারে যে শুষ্ক ভূমিতে পড়িয়া ছিল, এখনও সেইখানেই পড়িয়া আছে; আর দূরে ত্রিবিক্রম শুষ্ক কাণ্ডের উপরে বসিয়া আছেন। তাহাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "কি নবীন, কেমন আছ?" নবীন দুইবার আছাড় খাইয়া শরীরে ব্যথা পাইয়াছিল; সে ধীরে-ধীরে উঠিয়া ত্রিবিক্রমের উভয় পদ জড়াইয়া ধরিল। ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এইবার বিশ্বাস হইয়াছে?" নবীন অতি বিনীত ভাবে কহিল, "আজ্ঞে।" "সকল কথা কবুল করিবে?" "আজ্ঞে, নিশ্চয় করিব। প্রাণের তুল্য পদার্থ নাই। এখন ঠাকুর রাখিলে বাঁচি, মারিলে মরি।" "তুমি কে?" "আমি সুবার কানুনগোই হরনারায়ণ রায়ের গোয়েন্দা।" "আমার পিছু লইয়াছ কেন?" "আপনার পিছু লই নাই,—আপনার সহিত যে স্ত্রীলোকটি ছিলেন, তাঁহার পিছু লইয়াছিলাম।" "কেন, সে কি তোমার কোন ক্ষতি করিয়াছে?" "না। তবে তাঁহাকে কাল হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের সহিত একত্র দেখিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম যে, তাঁহার নিকট বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরের সংবাদ পাইব।" "তুমি কি হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের সংবাদ চাহ?" "কানুনগোই তাঁহারই সন্ধানে আমাকে মুরশিদাবাদ হইতে কাশী পাঠাইয়াছিলেন।" "কেন?" "হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার কানুনগোইএর বিষম শত্রু। তাঁহাকে জব্দ করিতে না পারিলে, হরনারায়ণ রায়ের বিস্তর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।" "তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে হরিনারায়ণ এই গ্রামে আছেন?" "তিনি গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন,—আমি নৌকা হইতে তাঁহাকে দেখিয়া নামিয়া পড়িয়াছি।" "এখন কি করিবে?" "ঠাকুর যাহা হুকুম করিবেন!" "আর আমি যদি কোন হুকুম না করি?" "তাহা হইলে যেমন করিয়া পারি, কানুনগোইএর ছোট ভাই অসীম রায় মহাশয়কে বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরের কাছ-ছাড়া করিব।" "তাহার পর?" "যেমন করিয়া পারি, বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরকে দূরে সরাইয়া দিব।" "যদি সে না সরিতে চাহে?" "জোর করিব।" "তাহার সহিত কি জোরে পারিবে?" "ছলে, বলে, কৌশলে যেমন করিয়া পারি। কানুনগোইএর হুকুম আছে যে, আবশ্যক হইলে—" "ব্রহ্মহত্যা করিবে?" "তাহাতেও আপত্তি নাই।" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "নবীন, হরনারায়ণ আমার বাল্যবন্ধু। বাল্যকালে ঢাকায় হরনারায়ণ রায়, হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার আর আমি একত্র খেলিয়া বেড়াইয়াছি। কানুনগোই হইয়া হরনারায়ণের তাহা হইলে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। দেখ নবীন, তুমি যখন আমার হাতে পড়িয়াছ, তখন তুমি হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি মুরশিদাবাদে ফিরিয়া যাও। হরনারায়ণকে আমি একখানা পত্র দিতেছি,—তাহা দিলেই তোমার সমস্ত দোষ মাফ্ হইয়া যাইবে। তুমি এখনই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাও,—এখানে থাকিলে দুই দণ্ডের মধ্যে পাগল হইয়া যাইবে। এখন আমার সহিত এস,—আমি পত্র দিতেছি, তাহা লইয়া এখনই যাত্রা কর।"

ত্রিবিক্রম ও নবীন গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে নবীনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দূর হইতে দুর্গা ও বড়বধূ শিহরিয়া উঠিলেন। হরিনারায়ণ তখনও চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি নবীনকে দেখিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু ত্রিবিক্রমের ইঙ্গিতানুসারে পুনরায় উপবেশন করিলেন। ত্রিবিক্রম কাগজ কলম লইয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিলেন; এবং তাহা মোহর করিয়া নবীনের হস্তে দিলেন। নবীন প্রণাম করিয়া উঠিল। ত্রিবিক্রম বিদ্যালঙ্কারকে কহিলেন, "ওহে হরি, হরুকে জানাইলাম যে, আমি আবার সংসারী হইয়াছি; এবং সত্বর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" হরিনারায়ণ উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিলেন।

ত্রিবিক্রম চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অসীম সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব দূরে সরিয়া গেল।

এমন সময়ে অসীমের শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিনারায়ণ তাঁহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। তিনি আসিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, মেয়েটা কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির করিতেছে; আপনি যাহা হয় একটা ব্যবস্থা না করিলে, আমাকে ত আর ঘরে তিষ্ঠিতে দেয় না। সে বলে, ঐ বৈষ্ণবের সঙ্গে কে একটা রূপসী মেয়ে আসিয়াছে,—সে না কি দিন-রাত্রি হাঁ করিয়া বাবাজীর দিকে চাহিয়া থাকে; বাবাজীরও না কি ভাবগতিক ভাল নহে।" হরিনারায়ণ বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিলেন, "সত্য না কি? তবে কি জানেন মিত্র মহাশয়, অসীম তেমন পাত্র নয়। কিন্তু আপনার কন্যা যদি কাতর হইয়া পড়েন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমাকে দু'কথা বলিতে হইবে। দেখুন, এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের পরামর্শে চলা উচিত নহে। আপনি যদি নূতন বধূমাতাকে দুই-এক দিন স্থির করিয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে আমি অসীমের নিকট কোন কথা না বলিয়া মাগীটাকে সরাইয়া দিতেছি।" মিত্রজা কহিলেন, "দেখুন, বাবাজীবন এক প্রকার দয়া করিয়া আমার জাতিরক্ষা করিয়াছে। মাত্র দুই-তিন দিন বিবাহ হইয়াছে,—ইহার মধ্যে কোন কথা বলিতে আমার ভরসা হয় না। তবে কি জানেন,—শৈল আমার নয়নের মণি, আমাদের একমাত্র সন্তান। তাহার চোখে জল দেখিলে, বড়ই অস্থির হইয়া পড়ি।" "তা বটেই ত, তা বটেই ত। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিত্রজা মহাশয়,—আমি যেমন করিয়া পারি, মাগীটাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।" মিত্রজা সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন। ত্রিবিক্রম এতক্ষণ একমনে কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তিনি মাথা তুলিয়া কহিলেন, "হরি, বৃথা চেষ্টা! এই নববধূ সংসার-যাত্রায় প্রতিপদে স্বামীকে নাগপাশে বন্ধন করিবে। মণিয়া উপলক্ষ মাত্র,—তুমি কিছুই করিতে পারিবে না।" হরিনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ইহাই যদি অদৃষ্টের লিখন, তাহা হইলে আমি আর কি করিব? কিন্তু একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? তুমি কাগজপত্র দেখ, আমি আসিতেছি।"

অষ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

মণিয়া অসীমের পদদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া আসিল। অসীম ও সুদর্শন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,—অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন মণিয়া কহিল, "বাপজান, আমি আপনার উপদেশ ভুলি নাই,—সংযম-ব্রত পরিত্যাগ করি নাই। এক মুহূর্ত্ত দেবতার চোখে জল দেখিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। খোদার কসম বলিতেছি বাপজান, আমি ইচ্ছা করিয়া এ দেশে আসি নাই।" হরিনারায়ণ কহিলেন, "অসীম, তুমি কি কাঁদিতেছিলে?" অসীম কহিলেন, "স্পষ্ট কাঁদি নাই বটে, তবে মণিয়ার অবস্থা দেখিয়া চোখে জল আসিয়াছিল।"

হরিনারায়ণ। মা, এই সামান্য কারণে আত্মহারা হইলে তোমার ব্রত ত রক্ষা হইবে না! তোমার ব্রত অতি কঠিন। তুমি যদি সত্যই অসীম রায়কে দেবতার মত ভক্তি কর, তাহা হইলে চিত্ত আরও কঠিন করিতে হইবে।

মণিয়া। আরও কঠিন কেমন করিয়া করিব?

হরি। দেখ মা, মানুষের মন মানুষ যেমন করিয়া গড়িয়া তুলিবে, মন সেইরূপ আকার ধরিবে। তুমি যদি চেষ্টা কর, তাহা হইলে অসীমের চোখের জল কেন, একদিন অসীমকে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিলেও, স্বচ্ছন্দে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে পারিবে।

ম। সে বড় কঠিন কাজ বাপজান।

হরি। কি করিবে মা! আমার ভগবান ও তোমার খোদা তোমার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডাইবার শক্তি কি মানুষের আছে? কেন যে বিধাতা জীবনের প্রথমে তোমার প্রতি এরূপ বিরূপ হইয়াছেন, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? যিনি মানুষের অদৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনি তোমাদের অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন; আমার যাহা ভাল মনে হয়, তাহাই বলিতেছি মাত্র। দেখ মা, যদি তোমার প্রিয় ব্যক্তির মঙ্গল চাহ, তাহা হইলে তাহার ছায়াও স্পর্শ করিও না। তাহাকে যে পথে যাইতে দেখিবে, তাহার বিপরীত পথে যাইও। ইচ্ছা করিয়া তাহাকে দেখিও না, তাহার কথা কাণে তুলিও না, তাহার রূপ মনে আনিও না।

ম। বাপজান, সকল কাজ পারিব,—কেবল শেষেরটি পারিব না।

হরি। যদি চেষ্টা কর, ক্রমে পারিবে।

ম। তবে চেষ্টা করিব। এখন কি করিব বলুন?

হরি। প্রভাতে পাটনায় ফিরিয়া যাও।

ম। আমি এখনই চলিয়া যাইব মনে করিতেছিলাম।

হরি। সন্ধ্যা হইয়াছে মা, এখন চলিয়া গেলে লোকে নানা কথা কহিবে। এখন গিয়া কাজ নাই,—আমি প্রভাতে তোমাকে লোক দিয়া পাঠাইয়া দিব।

ম। পিতা যদি গৃহে স্থান না দেন, তাহা হইলে কি করিব?

হ। পাটনা সহরে তোমার স্থানের অভাব হইবে না।

ম। বাপজান, সে কথা কতদূর সত্য হইবে, তাহা বলিতে পারি না। পাটনা সহরে মণিয়া বাঈজীর স্থানের অভাব হইবে না বটে, কিন্তু ভিখারিণী মণিয়াকে কেহ স্থান দিবে কি না সন্দেহ।

হ। দেখ মা, যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই জীবের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাঁহার চরণে মতি থাকিলে, তোমার আশ্রয়ের অভাব হইবে না। তুমি এখন গৃহে চল,—আমি তোমার পাটনা-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।

সকলে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ত্রিবিক্রম তখনও চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া প্রদীপের আলোকে কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ছিল। তিনি হরিনারায়ণকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হরি, অদৃষ্ট-চক্রের গতিরোধ করিতে পারিলে?" হরিনারায়ণ হাসিয়া কহিলেন, "এ আবার কি নূতন ফাঁকীর সৃষ্টি করিতেছ?" "ফাঁকী আমার নহে, তোমার, ভট্চায। অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, কিছুতে কিছু হয় না। চক্রীর ইচ্ছা ভিন্ন চক্রের গতিরোধ হয় না। দেখ, এই গ্রামে তুমি যখন নৌকায় সম্পন্ন গৃহস্থের মত কাশী চলিয়াছিলে, তখন আমি অর্দ্ধনির্ব্বাপিত চিতাগ্নিতে কদর্য্য অন্ন পাক করিয়া দেহপাত করিয়াছি। আর সেই আমি—দেখ, দিব্য অঙ্গরাগ, বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া ঘোর সংসারী হইয়াছি,—এখনও বৎসর ফিরে নাই। তুমি কি মনে কর, আমি চেষ্টা করি নাই? ঝড় আসিতেছে, নৌকা ডুবিবে জানিয়াই নৌকায় উঠিয়াছি। ইচ্ছা ছিল মরিব; কিন্তু চক্রীর ইচ্ছা অন্যরূপ। তোমার চোখের সম্মুখে নৌকা ডুবিল; কিন্তু আমি ত মরিলাম না!" এই সময়ে বৃদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলিয়াছ বাবা। বৃন্দাবন ছাড়িয়া দেশে ফিরিলাম, মনে ভাবিলাম যে, সাধের গোপালটিকে উপযুক্ত হস্তে না দিয়া মরিতে পারিব না; কিন্তু গোপালের ইচ্ছা অন্যরূপ। দেশে ত ফিরিলাম না,—কেবল ভবচক্রে ঘুরিয়া মরিলাম।" হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবাজী, দেশে ফিরিবে না ত কোথায় যাইবে?" "দেশে আর ফিরি কৈ ঠাকুর! মন বলিতেছে, গোপালের ইচ্ছা—যে পথে আসিয়াছি, সেই পথেই যাইতে হইবে।" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "জ্ঞানানন্দ, বুড়া বয়সে মনের সুরটা অনেকটা গোপালের সঙ্গে মিলাইয়া আনিয়াছ দেখিতেছি!" বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ছি, ছি, অমন কথা মুখে আনিও না, ঠাকুর! আমি হীন, মহাপাপী, আমার ক্ষমতা কি?" সহসা ত্রিবিক্রমের নেত্রে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। তিনি কহিলেন, "জ্ঞানানন্দ, তুমি ঠিক পথেই চলিয়াছ। আমি এত চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না। কেন যে মহামায়া আমাকে আবার সংসারে ফিরাইয়া আনিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।" "পারিবে বাবা, পারিবে,—অধিক বিলম্ব নাই। মাতা পুত্রকে দিয়া ভক্তের সেবা করিতেছেন; তোমার মত সাধককে বিপথে চলিতে দিয়া মা কখনও কি স্থির থাকিতে পারেন?"

এই সময়ে হরিনারায়ণ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, তোমরা কি বলিতে আরম্ভ করিলে, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "এ যাত্রায় বোধ হয় আর বুঝিলে না।" বৈষ্ণব কহিল, "সে কি কথা ঠাকুর! সংসারের বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া বাপ আমার যাহা বুঝিয়াছে, ইহাই চরম কথা। দুই-এক দিনের মধ্যে চোখের পরদা পড়িয়া যাইবে; তখন দেখিবে, বন্ধুতে বন্ধুতে অধিক প্রভেদ নাই।" হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন পরমার্থের কথা ছাড়িয়া, বিষয়ের কথা বল। কাগজপত্র দেখিলে?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "দেখিলাম,—সমস্তই ঠিক আছে।" "অসীম ও ভূপেন্দ্র সমস্ত বিষয়-আশয় হরের নামে লিখিয়া দিয়াছে।" "তাহাতে ক্ষতি নাই। দান-পত্রে দান-বিক্রয়ের অধিকার নাই,—সমস্তই দেবোত্তর; ইহারা তিন ভাই সেবাইৎ মাত্র। আমি ভাবিতেছি, দুই-এক দিনের মধ্যেই মুরশিদাবাদ যাত্রা করিব; অসীম ও সুদর্শন স্থলপথে এলাহাবাদ যাইবে। জ্ঞানানন্দ চলিতে পারিবে না; সুতরাং তাহাকে নৌকায় যাইতে হইবে; আর আমরা মুরশিদাবাদ যাইব—কেমন কথা?" "উত্তম কথা।

বধূমাতা আর দুর্গাকে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে রাখিয়া যাইব?" "ভয় নাই,—নবীন দাস আর ডাকাতী করিতে সাহস করিবে না। এখানে সতী রহিল, কালীপ্রসাদ রহিল; সুতরাং নবীন দাস সুতী গ্রামের ত্রিসীমানায় আর পদার্পণ করিবে না।" "আমার কিন্তু কেবল মনে হইতেছে,—আবার একটা অমঙ্গল ঘনাইয়া আসিতেছে।" "অমঙ্গল অতি নিকট; কিন্তু তাহা তোমার বংশকে স্পর্শ করিবে না।"

ত্রিবিক্রম গাত্রোত্থান করিলেন; সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ জ্ঞানানন্দও উঠিল। হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় চলিলে?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "সমস্ত দিন বসিয়া আছি,—একটু গ্রামে বেড়াইয়া আসি।" উভয়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহ ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন। গ্রাম-সীমা ত্যাগ করিয়া উভয়ে নদী-তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিলেন। কিয়দ্দূর চলিতে-চলিতে ত্রিবিক্রম দূরে গঙ্গাবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহা দেখিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্ঞানানন্দ, মাতৃদর্শনে যাইবে?" বৃদ্ধ কহিল, "ঠাকুর যেখানে যাইবেন, আমিও সেইখানেই যাইব।" ক্ষুদ্র নৌকায় কালীপ্রসাদ বসিয়া ছিল; উভয়ে আরোহণ করিলে সে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

একোনাশীতিতম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। নিবিড় বন। বনমধ্যে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ; তাহার চারিদিকে বিস্তৃত উদ্যান। সেই উদ্যানে আম্র-পনসের ঘন বেষ্টনীর মধ্যে শত শত পুষ্প-বৃক্ষ। অন্ধকারে বেল, যূঁই, চামেলীর গন্ধে চরিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। বনপথ অবলম্বন করিয়া তিনজন মনুষ্য সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল; এবং উদ্যান পার হইয়া অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উপস্থিত হইল। এক কালে এই স্থানে বোধ হয় কোন ধনীর আবাস ছিল; কারণ, স্থানে-স্থানে বহুমূল্য কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরশিলা দেখা যাইতেছিল। মনুষ্যত্রয় ধ্বংসাবশেষের এক ভাগ পার হইয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল; এবং তাহাদিগের মধ্যে একজন তাহার সঙ্গীদ্বয়কে সেইখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে সে একটা প্রদীপ লইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন দেখা গেল যে সে কালীপ্রসাদ, এবং তাহার সঙ্গীদ্বয় ত্রিবিক্রম ও জ্ঞানানন্দ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা শব চারিদিকে পূতিগন্ধ বিকীরণ করিতেছিল; এবং অদূরে অনেকগুলা শৃগাল দাঁড়াইয়া ছিল। কালীপ্রসাদ আসিয়া কহিল, "ঠাকুর, দুয়ার কি খুলিব?" বৃদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া উঠিল, "বাবা, শীঘ্র দুয়ার খোল; নতুবা বুড়া মরিবে। গন্ধে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "দুয়ার খোল।" কালীপ্রসাদ চলিয়া গেল; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "প্রভু, দুয়ার ত খুলিতে পারিলাম না,—বোধ হইতেছে কে যেন ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "পাগল হইয়াছ কালীপ্রসাদ! মন্দিরের দুয়ার কে ভিতর হইতে বন্ধ করিবে?" "তাহা ত বলিতে পারি না ঠাকুর; কিন্তু দুয়ার বন্ধ—কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না।" কালীপ্রসাদের কথা শুনিয়া ত্রিবিক্রম চিন্তিত হইলেন; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "প্রসাদ, কি হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি জ্ঞানানন্দকে লইয়া উদ্যানে ফিরিয়া যাও। যাইবার পূর্ব্বে, যদি দ্বিতীয় প্রদীপ থাকে, তাহা আমাকে দিয়া যাও।"

কালীপ্রসাদ আর একটি প্রদীপ জ্বালিয়া ত্রিবিক্রমের হস্তে দিল; এবং স্বয়ং জ্ঞানানন্দকে লইয়া ধ্বংসাবশেষের বাহিরে চলিয়া গেল। ত্রিবিক্রম প্রদীপ লইয়া অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে চলিলেন। সেই অংশ অত্যন্ত জীর্ণ হইলেও, তাহার নিম্নতল তখনও ভূমিসাৎ হয় নাই। তাহা প্রস্তর-নির্ম্মিত; এবং তাহার চারিদিকে খর্ব্বাকার স্থূল প্রস্তর-স্তম্ভের উপরে সঙ্কীর্ণ অলিন্দ। অলিন্দের একপার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। ত্রিবিক্রম তাহা উন্মোচন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না। তিনি তখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, ধ্বংস-স্তূপ বাহিয়া অলিন্দের উপরে উঠিলেন; এবং একখানা দীর্ঘ প্রস্তর অবলম্বন করিয়া একটা অন্ধকার গহ্বরে নামিয়া গেলেন। গহ্বরটা অতি বৃহৎ। বোধ হয় এককালে ইহা অট্টালিকার নিম্নতলে একটা প্রশস্ত কক্ষ ছিল। ধ্বংসের পরে ইহার চারিদিকের প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিছুকাল পরে ছাদের এক অংশ পড়িয়া যাওয়ায়, পুনরায় এই কক্ষে আলোক প্রবেশ করিয়াছিল। ত্রিবিক্রম কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ রাখিলেন; এবং উভয় হস্তে গৃহতলের একখানা প্রস্তর উঠাইলেন। সেই প্রস্তরের নিম্নে সোপানশ্রেণী দেখা গেল।

ত্রিবিক্রম প্রদীপ লইয়া নামিয়া গেলেন। কিয়দ্দূর গিয়া তিনি আলোক দেখিতে পাইলেন ; এবং অল্পক্ষণ পরেই একটী ক্ষুদ্র পাষাণ-নির্ম্মিত কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কক্ষটী মন্দির ; তাহাতে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলিতেছে। কক্ষের একপার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি বেদী ; এবং তাহার উপরে সিন্দূর-লিপ্ত, রক্তবস্ত্রাবৃত প্রস্তরপিণ্ড। বেদীর সম্মুখে একখানা আসন ও পূজার সজ্জা প্রস্তুত। পুষ্পপাত্রে রাশিরাশি গন্ধ-পুষ্প ও রক্তজবা। তাহার পার্শ্বে হোমকুণ্ডে রাশিরাশি সুসজ্জিত কাষ্ঠ। ত্রিবিক্রম কক্ষে প্রবেশ করিয়া, স্তম্ভিত হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র কক্ষ বহু প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত এবং তাহার একমাত্র দ্বার রুদ্ধ। ত্রিবিক্রম জানিতেন যে, ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ-পথ অপরের অবিদিত, সুতরাং কে কোন্ পথে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। বহুক্ষণ পরে তিনি মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া কালীপ্রসাদকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। অবিলম্বে কালীপ্রসাদ জ্ঞানানন্দকে লইয়া আসিল ; এবং আসিয়াই মন্দিরে দীপমালা ও পূজার সজ্জা দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালীপ্রসাদ, এ কি ব্যাপার ?" শিষ্য কহিল, "প্রভু, আমি প্রভাতে পূজা শেষ করিয়া অলঙ্কার লইয়া গিয়াছিলাম,—আমি ত কিছুই জানি না।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "কে পূজার সাজ করিয়া গেল ? তুমি কি আহার করিয়াছ ?" শিষ্য কহিল, "না।" "তবে তুমি আচমন করিয়া তাম্রকুণ্ড লইয়া বস।"

ত্রিবিক্রম একে-একে মন্দিরের সমস্ত প্রদীপ নিবাইয়া অদূরে উপবেশন করিলেন। কালীপ্রসাদ তাম্রকুণ্ড লইয়া উপবেশন করিল, এবং মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ণ একদণ্ড পরে কালীপ্রসাদ কহিল, "প্রভু, আমার শক্তি রুদ্ধ। কোনও প্রবলতর শক্তি আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে,—আমার মাথা ঘুরিতেছে।" শিষ্যের কথা শুনিয়া ত্রিবিক্রম ব্যস্ত হইয়া চকমকী ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন, এবং দেখিলেন যে, কালীপ্রসাদ আসনের উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাম্রকুণ্ডের জল কালীপ্রসাদের মুখে সিঞ্চন করিতে-করিতে তাহার চেতনা ফিরিল। তাহাকে প্রদীপ লইয়া বাহিরে যাইতে আদেশ করিয়া, ত্রিবিক্রম জ্ঞানানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্ঞানানন্দ, পূর্ব্বের কথা স্মরণ আছে ?" বৃদ্ধ কহিল "আছে।" ত্রিবিক্রম আসনে উপবেশন করিয়া প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিলেন ; এবং বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্ঞানানন্দ, কি দেখিতেছ ?" উত্তর হইল, "ধূম।"

ক্রমে ধীরে-ধীরে তাম্রকুণ্ডের গঙ্গাজল জ্বলিয়া উঠিল,—ধূমে মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া গেল। জ্ঞানানন্দ দেখিল, ধূমের মধ্যে উজ্জ্বল নীল আলোক ; তাহাতে এক অতিবৃদ্ধা রমণী দাঁড়াইয়া আছে। বৈষ্ণবের মুখে বিবরণ শুনিয়া ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃদ্ধা কি বলিতেছে শুনিতে পাইতেছ ?" জ্ঞানানন্দ কহিল, "না।" দেখিতে-দেখিতে নীল আলোকের মধ্যস্থিত বৃদ্ধা অদৃশ্য হইল, এবং তাহার পরিবর্ত্তে আলোক-মধ্যে একখানা নৌকা দেখা দিল। নৌকা চলিতেছে। প্রশস্ত নদীবক্ষ ; তাহাতে বহু নৌকা। দুই একখানা নৌকায় কামান বসান রহিয়াছে। ক্ষুদ্র নৌকা ক্রমশঃ এক প্রশস্ত ঘাটে গিয়া লাগিল। বৃদ্ধ দেখিল, নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া ত্রিবিক্রম ঘাটের উপরে উঠিলেন। সেখানে একজন চোপদার তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে তাঁহাকে লইয়া নদীতীরস্থিত এক প্রশস্ত উদ্যানে প্রবেশ করিল। সহসা নীল আলোক নিবিয়া গেল, ধূম অদৃশ্য হইল, দূরে পদশব্দ শ্রুত হইল। ত্রিবিক্রম ক্রুদ্ধ হইয়া ডাকিলেন, "কালীপ্রসাদ!" এক গৈরিকবসনা প্রৌঢ়া প্রদীপ-হস্তে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কালীপ্রসাদ বাহিরে আছে,—সে এখানে আসিতে পারিবে না। যাহা দেখিলেন, তাহা ঘটিলে আবার আসিবেন, ইহাই মাতার আদেশ।" ভৈরবী এই বলিয়া একে-একে মন্দিরের সমস্ত প্রদীপ জ্বালিয়া দিল, এবং সুড়ঙ্গ-পথে প্রস্থান করিল। তাহার কথা শুনিয়া ত্রিবিক্রম ও জ্ঞানানন্দ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ভৈরবী প্রস্থান করিবার অর্দ্ধদণ্ড পরে তাঁহারা তিনজনে ধ্বংসাবশেষের চারিদিকে সন্ধান করিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন ত্রিবিক্রম দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কালীপ্রসাদকে কহিলেন, "পুত্র, মাতার আদেশ,—আমি মুরশিদাবাদ চলিলাম। আগামী অমাবস্যায় কিরীটেশ্বরীতে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।" তখন অন্ধকারে বনপথ অবলম্বন করিয়া কালীপ্রসাদ ত্রিবিক্রম ও জ্ঞানানন্দ নদীতীরে চলিলেন। কালীপ্রসাদ তাঁহাদিগকে গ্রাম-সীমায় পৌছাইয়া দিয়া, নৌকা লইয়া দক্ষিণে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

আন্দামান

[শ্রীফণিভূষণ মজুমদার]

বিদেশ-ভ্রমণের সখ আমার বরাবরই আছে। তবে অবস্থা-বিশেষে ব্যবস্থা না হইলে, উহা যে ভাল নহে, ইহাও বুঝি। তবুও এই সখটী আমার পূরামাত্রায় আছে বলিয়াই হউক, কিম্বা কপাল ভাল বলিয়াই হউক,—যেমন দেখিতেছি, ভগবান আমার ইচ্ছা আস্তে-আস্তে সকল দিক্ সামলাইয়াই পূরণ করিতেছেন। বোধ হয় শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে অনেক দিন বাস করাতেই, তাঁহার কৃপায় শ্রীশ্রীভগবান মহাপ্রভু আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছেন। তাহা না হইলে, স্কুলে পাঠ্যাবস্থাতে তিনি আমাকে হরিদ্বার,হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, কাশী, গয়া ইত্যাদি তীর্থ দর্শন করার সুযোগ দিতেন না। যাক্ ও সমস্ত বাজে কথা।

আন্দামানের বিষয় লিখিতে যাইতেছি বলিয়া যেন কেহ অনুমান না করেন যে, আমি বিচারে দোষী প্রমাণিত হইয়া জজের আদেশে তথায় প্রেরিত হইয়াছিলাম। সেইজন্য আগেই বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি তথায় চাকুরী উপলক্ষে গিয়াছিলাম। এখানে একটি কথা বলিতে খুবই ইচ্ছা হইতেছে যে, একদিন আমি, আমার মেজদা ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত ষ্টীমারে করিয়া Botanical Gardensএ বেড়াইতে যাইতেছিলাম। তেলকলঘাটে পৌঁছিলে মেজদা "মহারাজা" জাহাজ দেখাইয়া বলিলেন যে, এই জাহাজই কয়েদী লইয়া পোর্ট ব্লেয়ারে যাতায়াত করে। তখন আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম যে, তাহা হইলে এই জাহাজই আমার উপযুক্ত জাহাজ; এবং ইহাতেই বোধ হয় আমার সমুদ্রে বেড়ানর সখ মিটিবে। তখন ঠাট্টা করিয়া যাহা বলিয়াছিলাম,

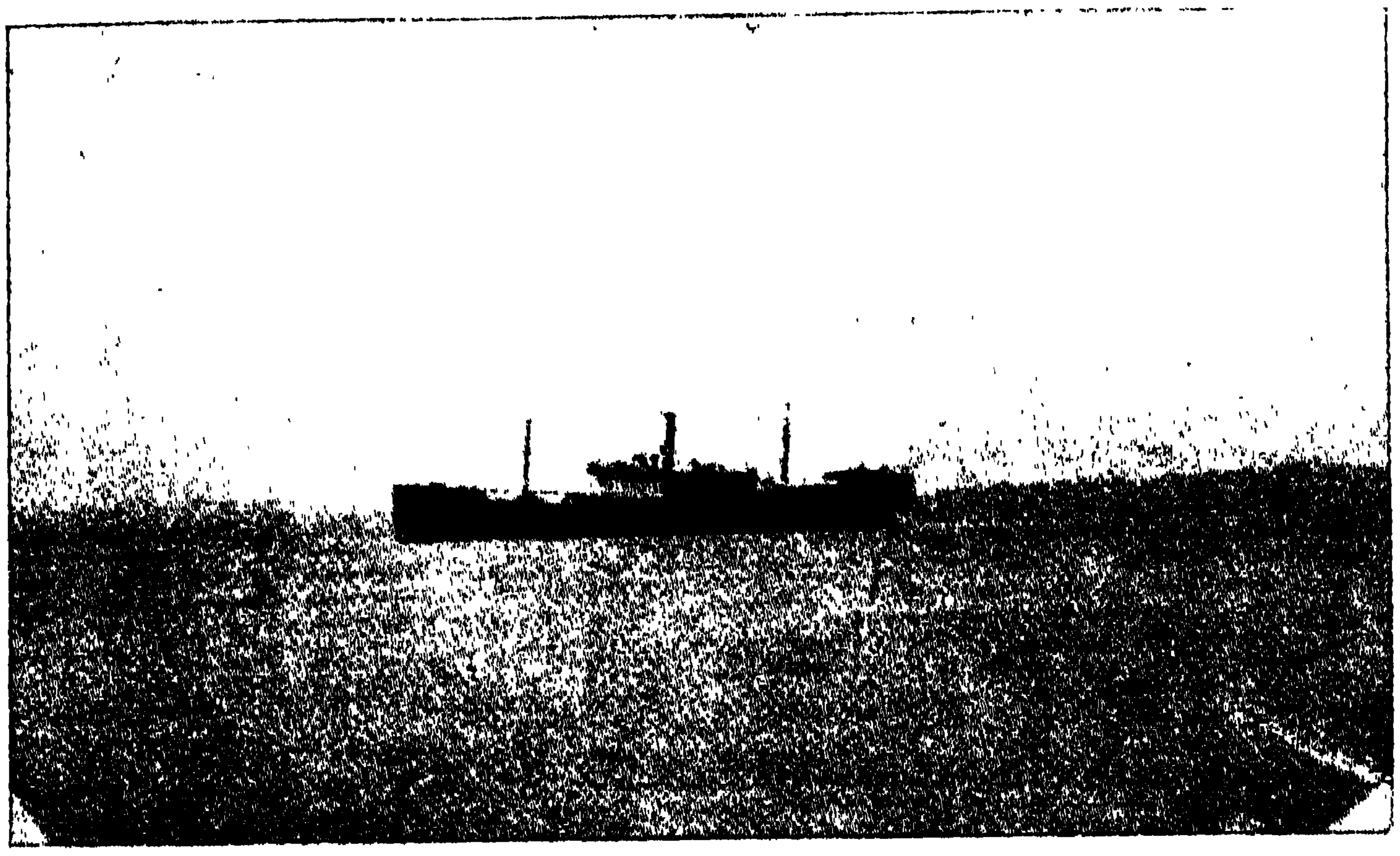

ষ্টুয়াট-সাউণ্ডে 'মহারাজা' জাহাজ

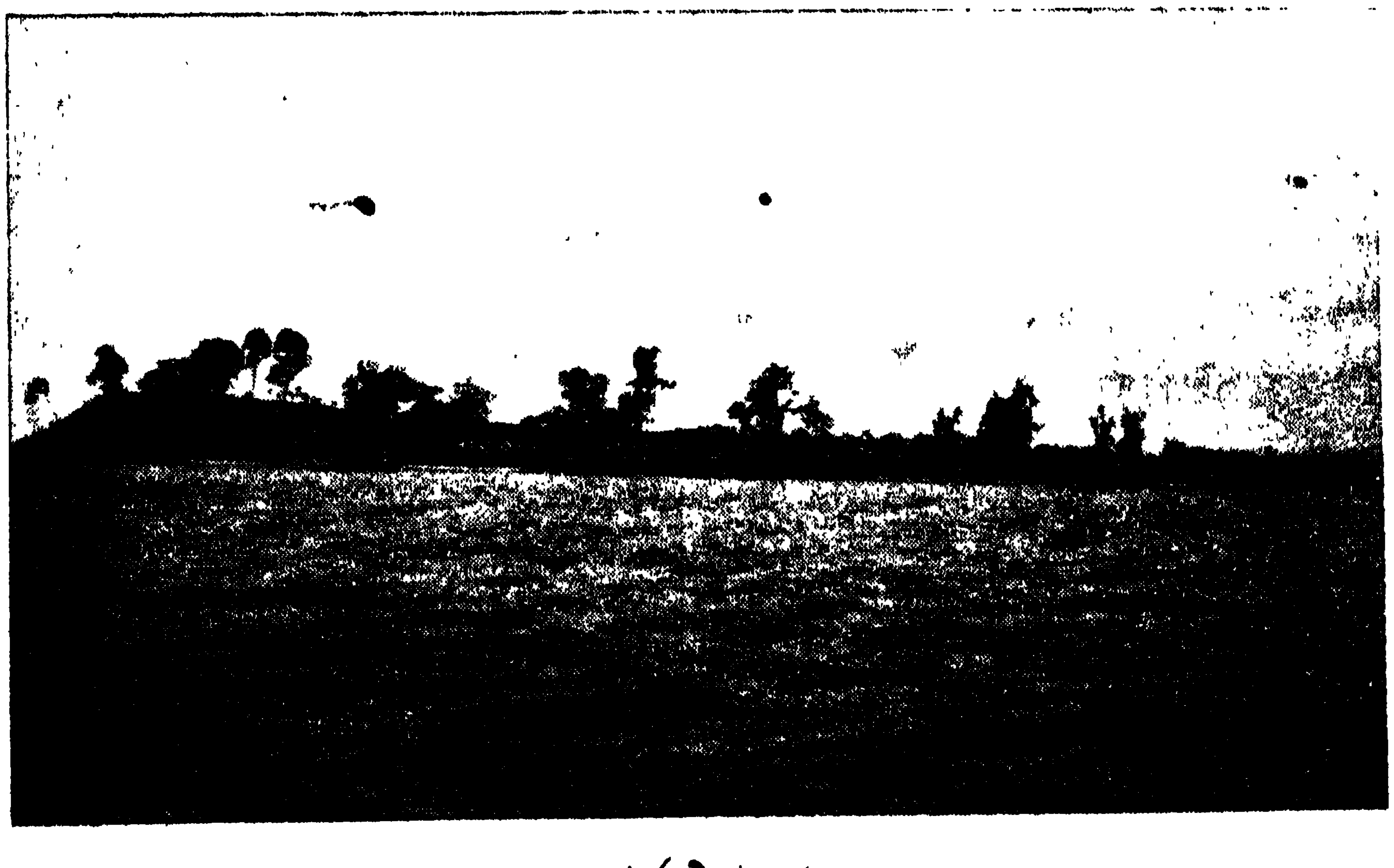

কালু´ দ্বীপের দৃশ্য

উহা যে ৭।৮ মাসের মধ্যে সত্য-সত্যই ফলিবে, তাহা কে জানিত?

দ্বারভাঙ্গাতে চাকরী করিতেছিলাম,—হঠাৎ তার আসিল যে, আমাকে বেশ মোটা মাহিয়ানায় উত্তর আন্দামান

বিভাগের চিকিৎসা কার্য্যের ভার দিতে উহারা প্রস্তুত আছে। লোভ সামলান আমার মত ২২ বৎসরের যুবকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইল। সুতরাং দ্বারভাঙ্গার চাকুরীতে

কালুর মাচান-গৃহ

ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সময় এত কম ছিল যে, কাহারও সহিত দেখা করিয়াও আসিতে পারি নাই।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রায় ৪টার সময় সেই পূর্ব্বপরিচিত "মহারাজাতেই" উঠিলাম; এবং খুব ভোরে উহা আমাদিগকে লইয়া গঙ্গাবক্ষে ভাসিল। গঙ্গায় যতক্ষণ ছিলাম, উহার বায়োস্কোপের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল দুই ধারের দৃশ্য দেখিতে বেশ ভাল লাগিতেছিল। জাহাজ জলের অভাবে দুই-এক স্থানে কিছুক্ষণ করিয়া নোঙ্গর করিয়া, পুনরায় চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ক্রমশঃ জমী অদৃশ্য হইতে লাগিল; এবং সন্ধ্যার মধ্যেই আর কোন কূল-কিনারা দেখা গেল না। গঙ্গার জল ক্রমেই যেন বেশী লোণা হইতে লাগিল। জেমস্ পয়েণ্ট চোরাবালীতে যে একখানি জাহাজ ডুবিয়াছে, উহার মাস্তুল দুটী এখনও বেশ দেখা যায়। রাত্রি প্রায় ১২টা ১টার সময় আমরা 'পাইলট' দেখিয়াছিলাম। রাত্রে গঙ্গার মাঝে বয়ার উপরে বাতীগুলি একবার জ্বলিতেছে ও একবার নিবিতেছে—দেখিতে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

সকালে ঘুম হইতে উঠিবার সময় বুঝিতে পারিলাম যে, জাহাজ বেশ দুলিতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখি যে, চারিধারেই নীল জল এবং তাহার উপরে আমাদের জাহাজখানি ছোট একখণ্ড ভেলার ন্যায় ভাসিতে-ভাসিতে চলিয়াছে। বেলা ৯টার সময় ঢেউ যেন খুব বেশী হইতে লাগিল এবং জাহাজ খুব দুলিতে লাগিল। যত যাত্রী ও কুলী ছিল, সকলেই খুব বমি করিয়াছিল। অনেকেই ঝড়ের আশঙ্কা করিয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শেষ পর্য্যন্ত ঝড় পাওয়া যায় নাই। তবে এত বেশী ঢেউ ছিল যে, অনেকে কাবু হইয়াছিল। কামরায় থাকা একেবারে অসম্ভব হইয়াছিল। প্রায় সময়ই

কালুর আবাসগৃহাবলী

আমি ও আমার সঙ্গী আর একজন রেঙ্গুন-যাত্রী ডাক্তার—দুইজনে ডেকে বসিয়াই দিন কাটাইতাম। জাহাজখানি ছোট এবং সুবন্দোবস্তের অনেক অভাব ছিল। কেবলমাত্র

খাইবার ও শুইবার সময়ে ভিতরে যাইতাম ; নতুবা পায়ত-পক্ষে বাহিরে থাকিতাম।

সকালে সূর্য্যোদয়, বিকালে উড্ডীয়মান মৎস্য, সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের দৃশ্য ও রাত্রে বাড়বানলের খেলা, এই সমস্ত দেখিয়া একরূপ বেশ মনের আনন্দে দিন কাটাই-তাম। রাত্রে জাহাজের সামনে বসিয়া যখন তাহার জল কাটিয়া অগ্রসর হওয়ার দৃশ্য দেখিতাম, তখন মনে হইত,যেন জাহাজখানি আগুন কাটিয়া-কাটিয়া অগ্রসর হইতেছে।

পাহাড় হইতে কালুর দৃশ্য

দিয়া, রেঙ্গুন হইয়া পোর্ট ব্লেয়ার আসিবে, তখন মনটি বেশ দমিয়া গেল, কারণ, প্রথমেই রেঙ্গুন ও সঙ্গে-সঙ্গে পোর্ট ব্লেয়ার দুই স্থানই দেখিবার পথে বাধা পড়িল ; কারণ, আমার কর্ম্মস্থল উত্তর আন্দামানে আমাকে নামাইয়া দিবে। যাহা হউক, কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলাম, যখন একজন সাহেব (পরে বুঝিলাম, তিনিই North Andamansএর বড় সাহেব) আমাকে বলিলেন যে, আমার ইচ্ছামত আমি Port Blairএ যাতা-য়াত করিতে পারিব ;

অষ্টিন সাগরশাখায় এগ দ্বীপ

আমরা রেঙ্গুন হইয়া যাইবার যাত্রী হইয়াছিলাম ; কিন্তু তৎপরদিন যখন শুনিলাম যে, জাহাজে অনেক কুলী থাকাতে, উহা প্রথমে উত্তর আন্দামানে কুলীদের নামাইয়া তথা হইতে নিয়মিত ভাবে উত্তর আন্দামানে ষ্টীমার যাতায়াত করিয়া থাকে। ভগবানের কৃপায় পরে রেঙ্গুন সহরটীও বেশ ভাল করিয়া বিনা খরচায় দেখিবার

সুযোগ পাইয়াছিলাম; এবং তখন খুবই আহ্লাদ হইয়াছিল।

জাহাজ ক্রমাগত চলার পর ১৯শে তারিখে সকালে আমরা কোকোদ্বীপ দেখিতে পাই। এই কয়েকদিন কেবল কাল জল ভিন্ন চারি ধারে আর কিছুই দেখি নাই। উহা দেখিয়া মনে-মনে কেবল 'কালাপানি' নামের সার্থকতাই ভাবিয়াছিলাম। ক্রমে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখান হইতেই আন্দামান আরম্ভ হইয়াছে। দূর হইতে কেবল উঁচু পর্ব্বতশ্রেণীই দেখিতে পাইলাম। অবশেষে প্রায় ২॥০টার সময় আমরা আন্দামানের সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু পাহাড় (স্যাডল্ পীক্) দেখিতে পাইলাম। পরিশেষে প্রায় সাড়ে চারিটার সময় আমরা পাহাড়গুলির খুব নিকটে আসিয়া আস্তে-আস্তে পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। দুইধারে পাহাড় ও ছোট-ছোট কতকগুলি সুন্দর দ্বীপ ছাড়াইয়া প্রায় ২০ মিনিটের মধ্যেই জাহাজ ('ষ্টুয়ার্ট সাউণ্ডে) নোঙর করিল। দুই পাশেই পাহাড়। যেখানে নোঙর করিল, সে স্থানটী, যদি কেহ চিল্কা হ্রদ দেখিয়া থাকেন, তবে ঠিক সেই স্থানের মত। জাহাজ হইতে কিছু দূরে ছোট একটি সবে-মাত্র জঙ্গল-কাটিয়া-পরিষ্কৃত দ্বীপ দেখিতে পাইলাম। উহার ছোট পাহাড়টীর উপর এবং অল্প পরিমাণ সমতল ভূমিতে কতকগুলি মাচানের উপর তালপাতার ছাউনি দেওয়া কাঠের ঘর দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম, ওখানেই আমাকে থাকিতে হইবে; উহাই আপাততঃ আমাদের হেড কোয়ার্টার্স, উহারই নাম কালু দ্বীপ। ওই ছোট দ্বীপটি দেখিয়া মনে দুঃখ হইল যে, শেষে কি এই ছোট কারাগারে বন্দী হইলাম। যাহা হউক, আমার সঙ্গীর নিকট হইতে বিদায়

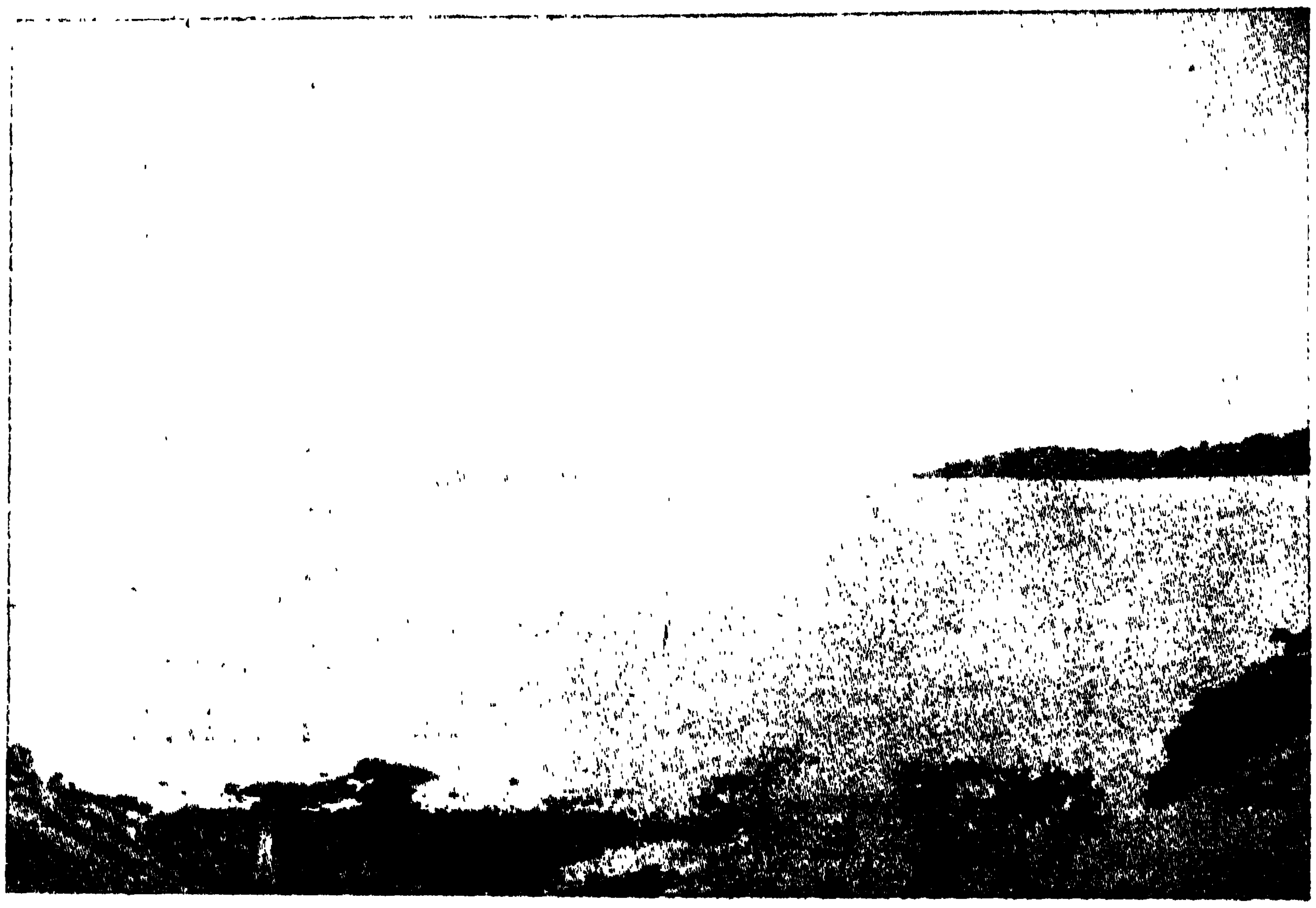

আভেস দ্বীপ

অষ্টিন সাগর-শাখায় মোটর-বোট

বেস ক্যাম্পের দৃশ্য

লইয়া লঞ্চে নামিয়া আসিলাম; এবং দ্বীপে নামিয়া, কম্পাউণ্ডারের সহিত প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই ওই দ্বীপ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া আমার মাচানের ঘরে আমার নিজের জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধান করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইলাম। কম্পাউণ্ডার সমস্তই বন্দোবস্ত করিল। সে মালাবার দেশের লোক এবং ভূতপূর্ব্ব কয়েদী রেহাই হওয়ার পর পোর্ট-ব্লেয়ারে বিবাহ করাতে এখানে চাকুরী করিতে আসিয়াছে।

এখানে অনেকগুলি বেশ সুন্দর-সুন্দর ছোট দ্বীপ আছে। উহাদের নামও বেশ সুন্দর। যেখানে খুব অর্কিড

বেস ক্যাম্পের ট্রাম লাইন

যায় উহার নাম অর্কিড দ্বীপ। আমাদের দ্বীপে অনেক পাখী থাকিত; সেই জন্য উহার নাম কার্লু আমাদের দ্বীপের খুব নিকটে ডিম্বাকৃতি বেশ সুন্দর একটি ছোট দ্বীপ আছে; উহার নাম (ডিম্ব দ্বীপ) কিছুদূরে আরও একটী ছোট দ্বীপ আছে। উহার নাম আভেস দ্বীপ। এই দুইটী দ্বীপে একটু বালির চর থাকাতে, বেড়াইবার ও বনভোজনের পক্ষে বড়ই সুন্দর। অন্যান্য সমস্ত স্থানে ম্যানগ্রোভ থাকাতে, সন্ধ্যার সময় মশার উপদ্রব এত বেশী হয় যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পালাইতে হয়। এক-একটী মশা যেন এক-একটী চড়াই পাখী। এই দুইটী স্থানে ম্যানগ্রোভ কম থাকাতে মশার উপদ্রব একটু কম। সেই জন্যই আমাদের পক্ষে এই দু'টী দ্বীপ ভাল ছিল।

মধ্য ও উত্তর আন্দামানের মধ্যে একটি প্রণালী আছে; তাহার নাম অষ্টিন প্রণালী। Austin Strait আমাদের Curlew Island হইতে কম গভীর বলিয়া, বড়-বড় জাহাজ কিম্বা ষ্টীমার এখান দিয়া যাইতে পারে না। ইহা এত ঘুরিয়া-ঘুরিয়া গিয়াছে এবং এত অপ্রশস্ত যে, ছোট লঞ্চ ও মোটর বোট ভিন্ন অন্য কিছুই যাইতে পারে না। উহার ভিতর দিয়া যখন বেড়াইতে যাইতাম, তখন দুই ধারে

উঁচু পাহাড় ও ঘন জঙ্গল দেখিয়া মনে হইত, যেন লছমন-ঝোলায় গঙ্গা পার হইতেছি।

উত্তর আন্দামান, তখন সবেমাত্র পরিষ্কার করিয়া, জঙ্গলের কাঠ চালান দিয়া সঙ্গে-সঙ্গে স্থানটীকে বাসোপযোগী করিবার প্রস্তাব চলিতেছিল। সেই জন্যই উহারা Curlew দ্বীপকে Head Quarters করিয়া, এদিক-ওদিক কাজের ঠিক করিতেছিল। Curlew হইতে ৫ মাইল দূরে Base Camp হইতে মধ্য আন্দামান পর্য্যন্ত বরাবর গাড়ী চালাইবার জন্য ট্রাম লাইনও প্রস্তুত হইতেছিল। এখনও ইহা বন-বিভাগের সম্পূর্ণ অধীন; এবং অন্য কোন আফিস সেখানে নাই। এখানকার কাজের জন্য বর্ম্মা, রাঁচী ও চট্টগ্রাম হইতে চুক্তিবদ্ধ করিয়া মজুরদের লইয়া আসা হয়। যেখানে-যেখানে কাজ করা হইবে, সেইখানে কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, উহাদের বাসোপযোগী সামান্য উঁচু মাচানের উপর তালপাতার ঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। এদিককার মাটী সেঁৎসেঁতে বলিয়াই মাটী হইতে কিছু উঁচু করিয়া এদিকে সমস্ত ঘর প্রস্তুত করা হয়। এমন

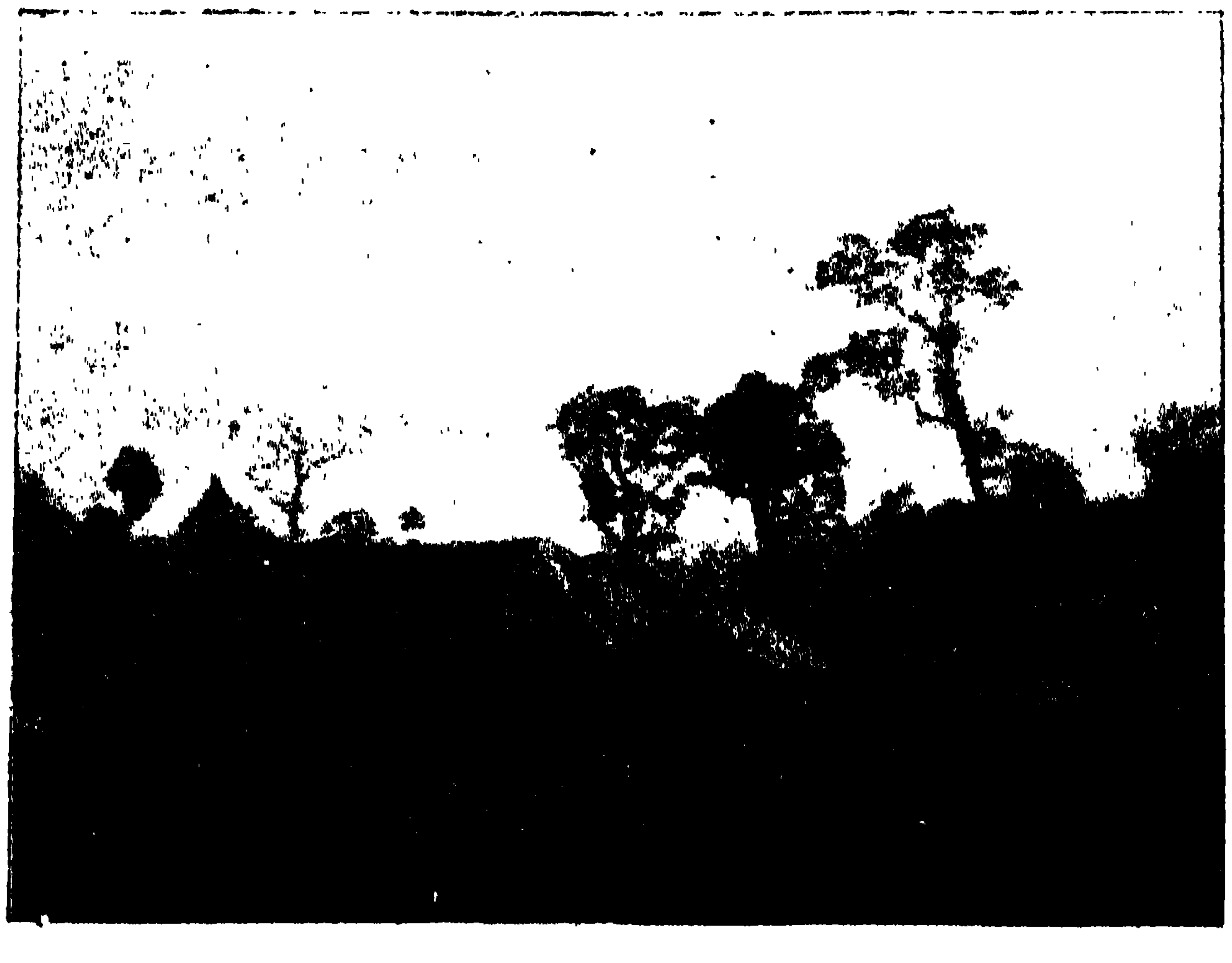

.বনের মধ্যে কুলী-নিবাস

স্থানে ইহাদের ঘর প্রস্তুত হয় যে, সেখানে খাবার জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেখানকার কাজ শেষ হইলে, তথা হইতে অন্য স্থানে উহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। সুতরাং এই উত্তর আন্দামান প্রকৃত পক্ষে ফ্রী সেটেলমেণ্ট; এবং কোন কয়েদী এখানে নাই। তবে যদি কোন কয়েদী রেহাই পাইয়া, দেশে না যাইয়া,

কুলীদিগের কুটীর

এখানে কাজ বা চাষবাস করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে চাষ-বাসের অনুমতি দেওয়া হয়। এখানে উহারা ফ্রী সেটলারদের মত থাকে। জঙ্গলের কাঠ ও চৌপাল ইত্যাদি টানিয়া জলে ভেলা বাঁধিবার জন্য ফেলা ইত্যাদি কাজের জন্য হাতী ও মহিষ আমদানী করিয়া রাখা হইয়াছে।

জঙ্গল এত ঘন যে উহার ভিতরে কম্পাস ও একখানি দা না লইয়া যাওয়া খুবই কষ্টকর। দা লইয়া রাস্তা কাটিয়া, ও কম্পাস দিয়া দিক ঠিক রাখিয়া, যে সমস্ত বড়-বড় ও মূল্যবান বৃক্ষ কাটিতে হইবে, উহাতে নম্বর দিয়া আসার পর কুলীগণ উহা কাটিয়া রাখে। পরে উহা দরকার অনুযায়ী বিভক্ত করিয়া, হাতী কিম্বা মহিষ দিয়া টানিয়া তথাকার ডিপোতে লইয়া আসা হয়। তথায় পুনরায় দরকার অনুযায়ী চৌপাল ইত্যাদি করিয়া বেড়া বাঁধা হইলে লঞ্চ উহা টানিয়া Head Quarters এর ডিপোতে লইয়া আসে। তথায় উহা জমা করিয়া, নম্বর ইত্যাদি সমস্ত মিলাইয়া,

জাহাজে চালান করা হয়; অথবা পোর্ট-ব্লেয়ারে বন বিভাগীয় করাতের কলের কারখানায় পাঠান হয়। তথা হইতে অন্যান্য স্থানে চালান যায়। যদি কোন জঙ্গলে ছোট-

বনের মধ্যে আশ্রমস্থল

ছোট নদীর মত নালা থাকে, তবে কাঠ টানিয়া উহাতে ছাড়িয়া দিলে আপনা হইতেই সেখানকার র‍্যাফ্‌টিং ডিপোয় আসে। যে কাঠগুলি জলে ডুবিয়া যায়, উহার সহিত বেড়াওয়ালাগণ ভাসান কাঠ বাঁধিয়া দেয়। যে হাতী যত টন্ টানিতে পারে, উহাকে তত টনই টানিতে দেওয়া হয়। দু'একটা হাতী খুব বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সহিত কাজ করিয়া থাকে।

সেখানকার জঙ্গলে অনেক প্রকার মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়; যথা কোকো, পাদাউক, বম্বুই, পাইলাম, চুগলাম, যুই, গুরিয়ান ইত্যাদি। মার্ব্বেল কখন-কখনও পাওয়া যায়; কিন্তু খুবই কম। সমুদ্রের কিনারা হইতে প্রায় আধ মাইল পর্য্যন্ত ম্যানগ্রোভ থাকে। উহা খুব উঁচু, সোজা একরূপ অমর বৃক্ষ। জলা ভূমিতে উহাদের জন্ম; জঙ্গলের ভিতরে উহা দেখা যায় না। ইহাতে জ্বালানী কাঠ ও থাম খুব ভাল হয়। বন বিভাগের যতগুলি ষ্টীম লঞ্চ আছে, উহা সমস্তই এই গাছের সাহায্যেই চলে; কয়লার আগুন অপেক্ষা ইহা কোন অংশেই কম নহে। এই বৃক্ষ-সমন্বিত জলাভূমি পার হওয়া বড়ই কষ্টকর; এবং এখানে যত মশা ও জোঁকের বাসস্থান। প্রায় সকলকেই হাঁটু পর্য্যন্ত কার্ব্বলিক তৈল মালিশ করিয়া যাইতে হইত। কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা সমস্ত সময়েই সেখানে সমান; কারণ, সমুদ্রের জোয়ারের জল সর্ব্বদাই ওই স্থানগুলিকে ভিজা রাখে।

জঙ্গলে অনেক প্রকার সুন্দর-সুন্দর পাখীও আছে; কিন্তু তাহাদিগকে বাহিরে কোথাও চালান দেওয়ার হুকুম নাই। অনেকেই সেখানে পায়রা প্রভৃতি পাখী ও শূকর শিকার করিয়া থাকে। শূকরগুলি আদৌ বিপজ্জনক নহে; একটু তাড়া পাইলেই, কিম্বা মানুষ দেখিলেই পলাইয়া যায়। এদিককার জঙ্গলে হিংস্র জন্তু একেবারেই নাই, এমন কি শৃগালও নাই; এই জন্যই এই জঙ্গল একেবারেই বিপজ্জনক নহে। মাঝে-মাঝে কাজ করিতে গিয়া, অনেকে জঙ্গলে সঙ্গীহারা হইয়া রাস্তা ভুলিয়া তিন-চারি দিন পড়িয়া থাকে।

জঙ্গলে মানুষের আহারোপযোগী ফল-মূলের গাছ না

পানীয় জলের বাঁধ

থাকারই মত। কখন-কখনও দু'এক প্রকারের টক্ ফল পাওয়া যায়। তবে বর্ম্মা ও রাঁচী কুলীদের অখাদ্য কিছুই নাই। উহারা মাঝে-মাঝে অনেক প্রকার মূল ফল ইত্যাদি

খুঁজিয়া আনিয়া খাইত—সে সকলের নাম অনেকেরই অজ্ঞাত। ইহাদের কখনও কোথাও খাবার অভাব হয় না; কারণ, কাক, ইন্দুর, সাপ, বিড়াল, বিছা ইত্যাদি সমস্ত জীবজন্তুই ইহাদের খাদ্য।

জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলী পান ও সুপারী, ধূপ ও মধু বেশ পাওয়া যায়। পানের স্বাদ ভাল নয় এবং সুপারী ছোট ছোট লম্বা ফলের মত। উহার খোসা ছাড়াইয়া খাইতে হয়—এবং খাইতে অনেকটা খুব শক্ত নারিকেলের টুকরার মত। সেখানে জঙ্গলী পানের মত আর এক-প্রকার পাতা পাওয়া যায়। উহা একবার চিবাইলে, জিহ্বা এত জ্বলে ও ফুলিয়া যায় যে, তাহা বলা যায় না। এরূপ দু'জন রোগী আমার নিকট আসিয়াছিল; কিন্তু সুখের বিষয় যে, জলুনি ২।৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনা-আপনিই ভাল হইয়া যায়। প্রায় সকল কুলীই সেখান হইতে দেশে ফিরিবার সময় এক-একটী করিয়া ঢোলক ও কিছু ভাল বেত লইয়া আসে। খুব ভাল-ভাল বেত জঙ্গলে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, অনেকে পিপাসার সময় বেতের গাছ কাটিয়া উহা হইতে বিন্দু-বিন্দু জল সংগ্রহ করিয়া পান করে।

কার্য্যে নিযুক্ত হাতী

সেখানে বর্ষাকালে জোঁক, সাপ, বিছা ও গ্রীষ্মকালে এঁটুলী খুব দেখা যায়। জোঁকে যদিও বেশী কষ্ট দেয় না, তবুও দেখা গিয়াছে যে জোঁকের দংশন-স্থানে পাচড়ার মত ঘা হইয়া যায়। বড়ই বিরক্তিকর। এমন সমস্ত স্থানে উহা লাগে, এবং এমন শক্ত ভাবে লাগিয়া থাকে যে, শীঘ্র নিস্তার পাওয়া কঠিন। এমন কি সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন তৈল মালিস করিয়া স্নান করিলেও উহা যায় না। অনেকবার ইহাদের জ্বালায় এমন অসুবিধা ভোগ করিয়াছি যে, তাহা বলা অসম্ভব। নাকে কাণে চোখের পাতা ইত্যাদি স্থানে লাগিলে বড়ই কষ্টকর হয়। শরীরের কোন স্থানে এঁটুলী লাগিয়া কিছুদিন থাকার পর যখন

ডিপোর হাতী

সেই স্থানে বেদনা ও কষ্ট অনুভব হয়, তখনই উহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়া সাঁড়াশী দিয়া তুলিয়া ফেলা হয়। সাপ প্রায়ই ছোট-ছোট ও অনেক রকমের দেখা যায়; কিন্তু বেশীর ভাগই তত বিষাক্ত নহে। মাঝে-মাঝে খুব বিষাক্ত ও বড়-বড় সাপও দেখা যায়। সাউণ্ড দ্বীপ নামক স্থানটি যখন হেড কোয়ার্টাস করিবার জন্য পরিষ্কার করিয়া ঘর প্রস্তুত করা হইতেছিল, তখন খুব বড়-বড় সাপ সেখানে দেখা গিয়াছিল। এখনও সেখানে মাঝে-মাঝে বড়-বড় সাপ দেখা যায়।

কালুর কাঠের ডিপো

সাপের চেয়েও এদিকে তেঁতুলে-বিছা বোধ হয় বেশী বিষাক্ত। কাঁকড়া-বিছা খুব কম ও ছোট-ছোট দেখা যায়। কিন্তু তেঁতুলে-বিছার মত এত বড় ও ভয়ানক বোধ হয় আর কোথাও নাই। বর্ষা-কালে ঘরের ছাদে কিম্বা উঠানে উহা প্রায়ই পাওয়া যায়। উহা দেখিতে যেমন বিশ্রী, কামড়াইলেও তেমনিই কষ্টকর। একবার কামড়াইলে উহার জ্বালা ২৪ ঘণ্টা এত বেশী থাকে যে, অনেক সময় লোকে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কামড়ানর স্থানে এমন ক্ষত হয়, এবং উহা এত শীঘ্র বাড়িয়া যায় যে, অনেক সময় হয় ত সেই অঙ্গ বাদ দিবার প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের একজন ডাক্তার ডাক্তারী কাগজে এক প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। আমার নিকটে প্রায় ১০।১২টী এই-রূপ রোগী আসিয়াছিল। উহাদের যন্ত্রণার কথা আমার এখনও মনে হয়। সৌভাগ্যক্রমে উহারা প্রায় ১০।১২ দিনের মধ্যেই ভাল হইয়া গিয়াছিল। একবার এই তেঁতুলে-বিছা ছাত হইতে পড়িয়া একটি ৫।৬ মাসের ছোট শিশুর কাণে কামড়াইয়াছিল। ঘা ক্রমেই সমস্ত কাণ জুড়িয়া যাইতেছিল বলিয়া, এবং ঔষধ অভাবে, উহাকে পোর্ট ব্লেয়ার হাসপাতালে পাঠাইয়াছিলাম। সেখানে প্রায় দেড়মাস থাকিয়া ভাল হইয়া আসার পরেও কাণ একটু বিকৃত হইয়াছিল। জানি না, এতদিনে উহা পুনরায় ঠিক হইয়াছে কি না। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের পক্ষে চিকিৎসার অসুবিধা হইলে, উহা প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে। অনেকেই অনেক প্রকার টোটকা ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু প্রায় কিছুই হয় না। দু'একটী ঔষধে উহার যন্ত্রণা ক্ষণিকের জন্য লাঘব হইয়া থাকে মাত্র।

ক্যাম্পের ডিপো

এই বিছাগুলি প্রায়ই জোড়ায় থাকে। একটিকে মারিলে

সেখানে আর একটির জন্য সাবধানে থাকিতে হয়। একদিন প্রায় সন্ধ্যা ৫টার সময় আমরা সাউথ দ্বীপে বড় সাহেবের বাড়ীতে একটা সভায় যাইয়া, তাঁহার ঘরের নিকটে একটি বেশ বড় ৮।০ ইঞ্চি এবং সেখান হইতে আরও

বনের মধ্যে ক্ষুদ্র নদী

প্রায় ৫।৭ হাত দূরে আর একটি ৭ ইঞ্চি লম্বা বিছা ধরিয়া একটি বোতলে পূরিয়া সভার স্থানে জানালার উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম; মনে করিয়াছিলাম যে, আমরা হয় ত উহার জোড়াই ধরিয়াছি; কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা পরে সেই বোতলের নিকটে প্রায় সেই দুটার মতই আর দুইটি বিছা দেখিতে পাইয়া, উহাদিগকেও সেই বোতলে পূরিয়া ফেলিলাম। এ সমস্ত বিষয়ে বেশী লেখার প্রয়োজন বোধ করি না। উহাদের লইয়া ভাল করিয়া দেখিলে অনেক বিষয়ে নিশ্চয়ই শেখা যায়। কোন একটি কারণে আমি একবার প্রায় ৯ ইঞ্চি পরিমাণের একটি বিছাকে খুব চটাইয়া ২।৩বার একটি বেশ বড় বিড়ালের পেটে কামড়াইতে দিয়াছিলাম। বিড়ালটি প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই মরিয়া গিয়াছিল। কতকগুলি বর্ম্মিজ এই বিছা ঘীতে ভাজিয়া খাইত।

স্রোতের অভিমুখে হাতী

এবারে ওখানকার আদিম অধিবাসীদের বিষয় ও তাহাদের রীতি-নীতি, তাহাদের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। ছবিতে উহাদের চেহারার অনেকটা আভাষ পাইবেন; সুতরাং চেহারা বর্ণনা করিবার দরকার দেখি না। তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহাদের আকার ছোট ও খুব কাল; এবং মাথার চুল ছোট করিয়া কাফ্রীদের মত ছাঁটা।

যেগুলির ছবি দেখিতেছেন, ইহারা আমাদের সহিত মিলিয়া থাকে; এবং ইহারা খুব কার্য্যক্ষম, বিশ্বাসী ও সরল প্রকৃতির লোক। অন্য এক-প্রকার জঙ্গলী আছে—উহাদিগকে "জরোয়া" বলা হয়। উহারা পোর্ট ব্লেয়ারের উইম্বারলীগঞ্জ নামক স্থানের ওদিকে থাকে এবং ওই দিকেই বেশী উপদ্রব করে। প্রায়ই গ্রীষ্মকালে যখন জঙ্গলে জলের অভাব হয়, তখনই উহারা ওদিকে আসে; এবং মানুষ গরু ইত্যাদি যাহা দেখিতে পায়, তাহাই তাহাদের বিষাক্ত তীর দিয়া দূর হইতে অব্যর্থ লক্ষ্যে মারিয়া ফেলে। উহাদের চক্ষে একবার পড়িলে নিস্তার পাওয়া খুবই কঠিন। উহারা বন্দুকের শব্দ কিম্বা ষ্টিমারের বাঁশী শুনিলে

খুবই ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়। ওদিকে কয়েদীগণকে যখন জঙ্গলে কাজ করাইতে লইয়া যাওয়া হয়, তখন সামনে, পিছনে ও দুই পাশে বন্দুক লইয়া সিপাই থাকে; এবং মাঝে-

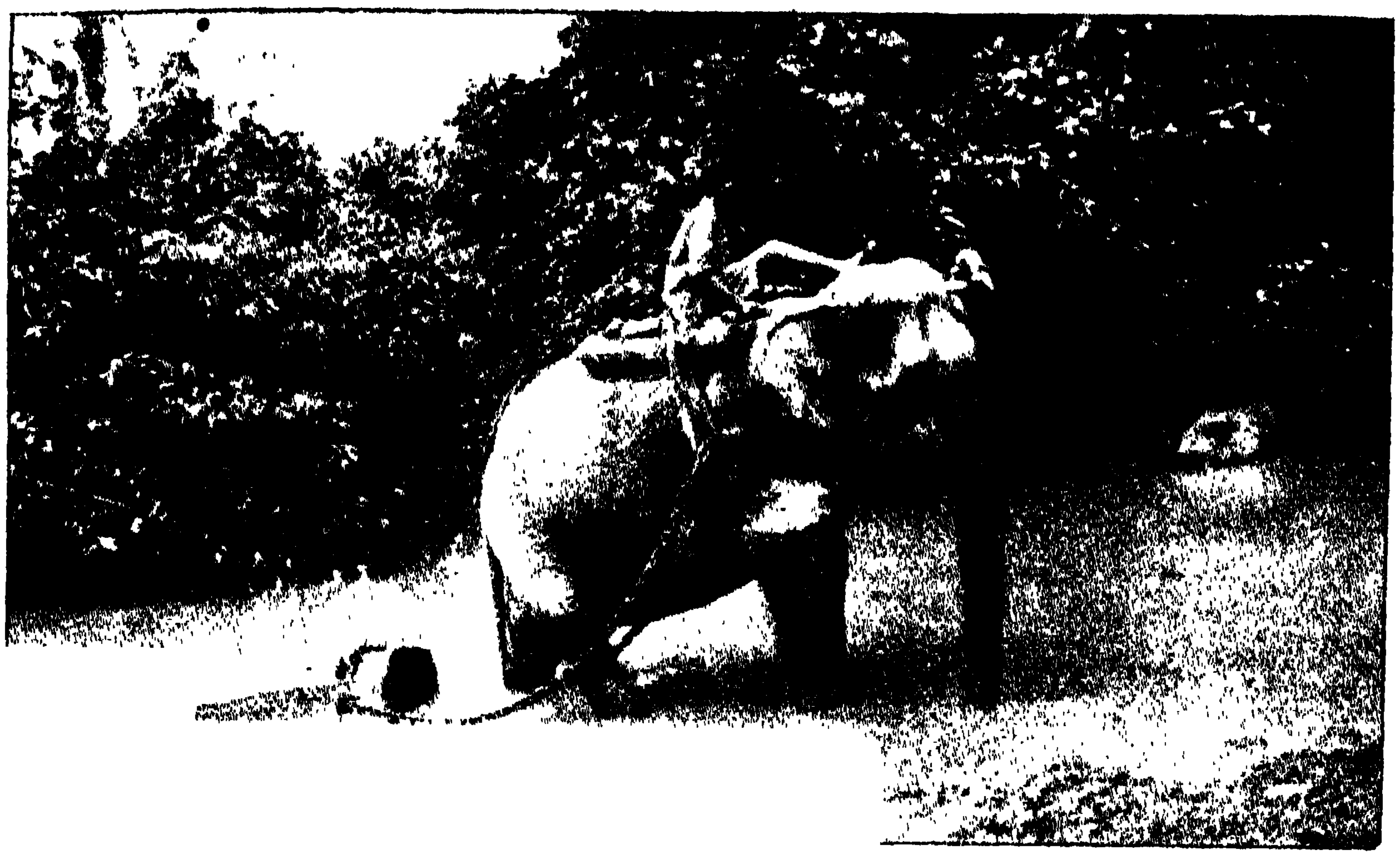

জলস্রোতে হাতী

মাঝে ফাঁকা আওয়াজ করা হইয়া থাকে। মাঝে-মাঝে উহারা নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের গরু, বাছুর ও মানুষ মারিয়া ফেলিয়া থাকে। উহারা যে তীর ধনুক ব্যবহার করে, তাহা দুই কাঠে প্রস্তুত। ধনুকের আকার ছবিতেই দেখিতে পাইতেছেন। উহারা প্রায়ই ধনুকটী পায়ে ধরিয়া গাছের আড়ালে থাকিয়া তীর ছুঁড়ে।

আমাদের বিভাগের জঙ্গলের বড় সাহেব একবার ইহাদিগকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরিবার জন্য অভিযানে গিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গী আর একজন সাহেব তাদের তালপাতার ঘর খুঁজিয়া বাহির করিয়া, রাত্রে যখন উহারা সকলে ঘুমাইবে তখন উহাদের তীরগুলি হাত করিয়া উহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ধরিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য সাহেবটী উহারা ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া চুপি-চুপি যাইয়া উহাদের তীরগুলি হাত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দৈবক্রমে তাহাদের একজন জাগিয়া উঠে এবং তখনই এক তীর সেই সাহেবের পেটে বসাইয়া দিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়াতে, সকলেই পলাইয়া যায়। ইতিমধ্যে পুলিস ও বড় সাহেব আসিয়া, মাত্র একজন বৃদ্ধাকে ধরিতে পারিয়াছিল। অন্য সাহেবটীর মৃত্যু হইল। ধৃত জঙ্গলীকে পোর্ট ব্লেয়ারে রাখা হইয়াছিল। উহাকে না কি ভাল-ভাল খাদ্য দেওয়া হইলে ফেলিয়া দিত, কেবল মাছ, শূকর ইত্যাদি পোড়াইয়া দিলে খাইত। উহারাও সম্পূর্ণ উলঙ্গ জাতি।

এই "জরোয়া"গণ সংখ্যায় বেশী নহে এবং উহাদিগকে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে সমূলে ধ্বংস করিতে পারেন। উহাদের হাত হইতে সকলকে রক্ষা করিবার জন্য উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার একটা প্রস্তাবও হইয়াছিল বলিয়া আমি একবার শুনিয়াছিলাম। কিন্তু কতকগুলি কয়েদী সেই সময় পলাইয়া গিয়া সৈন্য ও গ্রামবাসীদের উপর অনেক রকমে উপদ্রব করাতে, সে প্রস্তাব স্থগিত রাখা

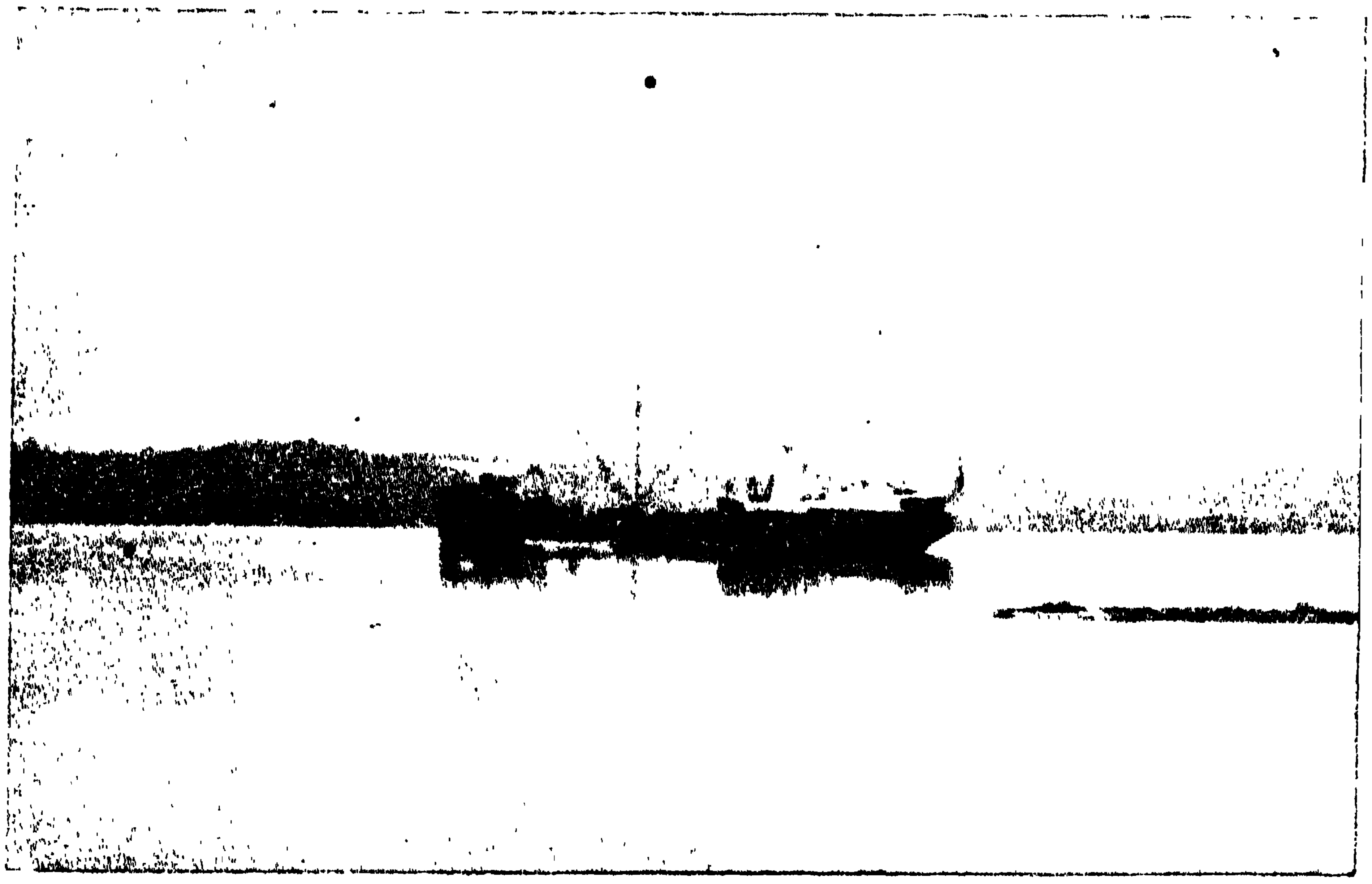

কাঠ বোঝাই

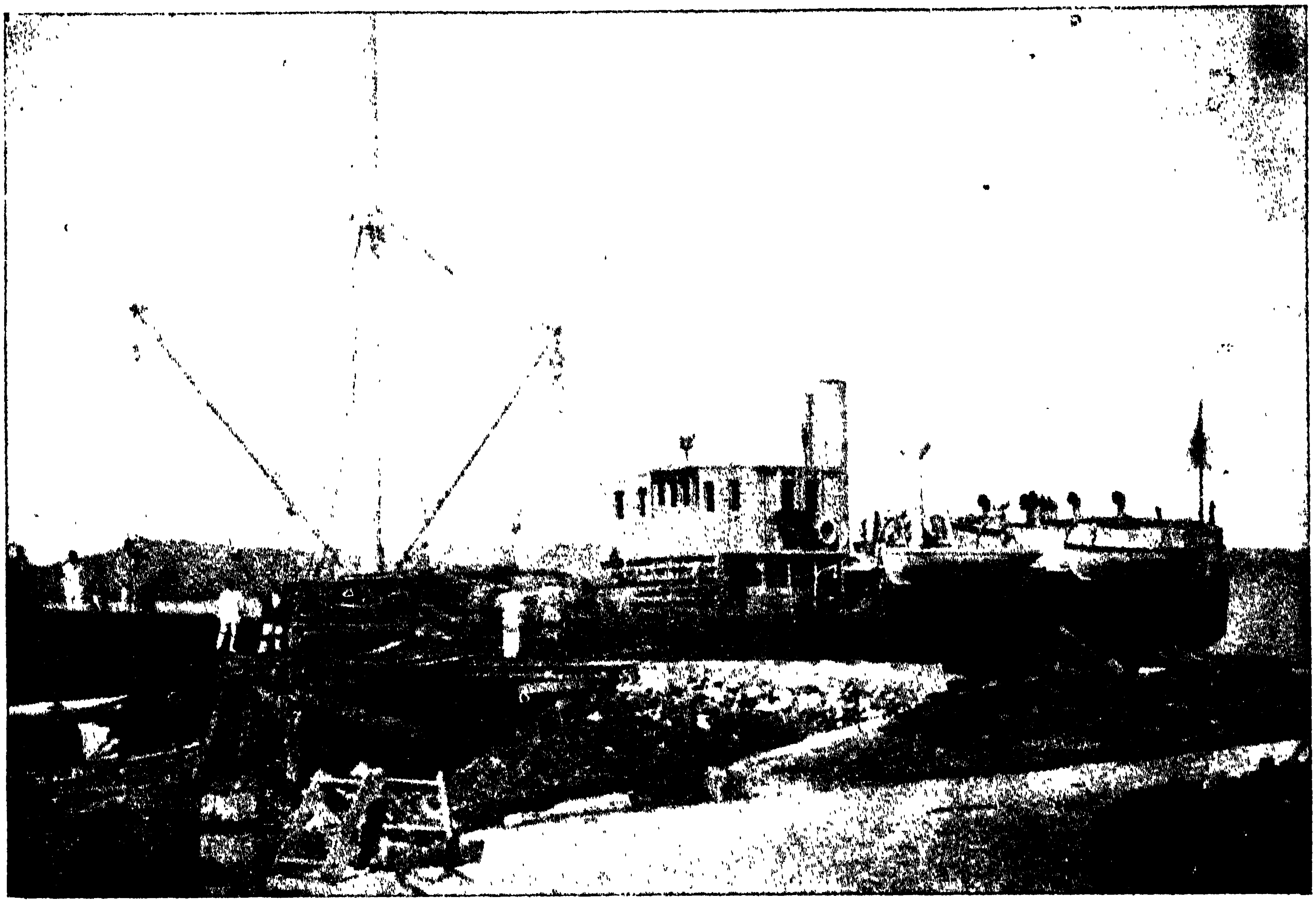

কাল্‌ৃতে মাল খালাস ও রপ্তানী

হয়। "জরোয়া"গণ জঙ্গলে আছে বলিয়াই অনেক কয়েদী জঙ্গলে পলাইয়া যাইতে সাহস করে না। উহারাই জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের কাজ করে; নতুবা অনেক কয়েদীই জঙ্গলে পলাইয়া যাইত।

শুনা যায় যে, অনেক কাল পূর্ব্বে কতকগুলি কয়েদী পলাইয়া গিয়া "জরোয়া"দের সহিত মেশে; এবং উহারাই নাকি ধরা পড়িবার ভয়ে তাহাদিগকে লোক দেখিলেই মারিয়া ফেলিতে উপদেশ দেয়। সেই হইতেই উহারা এরূপ করিয়া আসিতেছে। পলাতক কয়েদীরাই নাকি "জরোয়া"দিগকে লোহার তীর বানাইতেও শিখাইয়াছে। ইহাও শুনা যায় যে, উহারা কয়েদী মারিলে, কয়েদীর লোহার গলাবন্ধ ও যেখানে যাহা কিছু লোহা পাওয়া যায়, তাহা লইয়া পলায়ন করে। যে সমস্ত জংলী আমাদের সহিত মিশিয়াছে, তাহারাও ইহাদিগকে খুব ভয় করে। "জরোয়া"গণ অন্য জাতীয় জংলীদিগকে দেখিলেও মারিতে ছাড়ে না। এইজন্য জংলীরা "জরোয়া"দের যাতায়াতের পথ দিয়া যাইতেও সাহস করে না; এবং উহাদের পায়ের দাগ দেখিলেই ইহারা চিনিতে পারে।

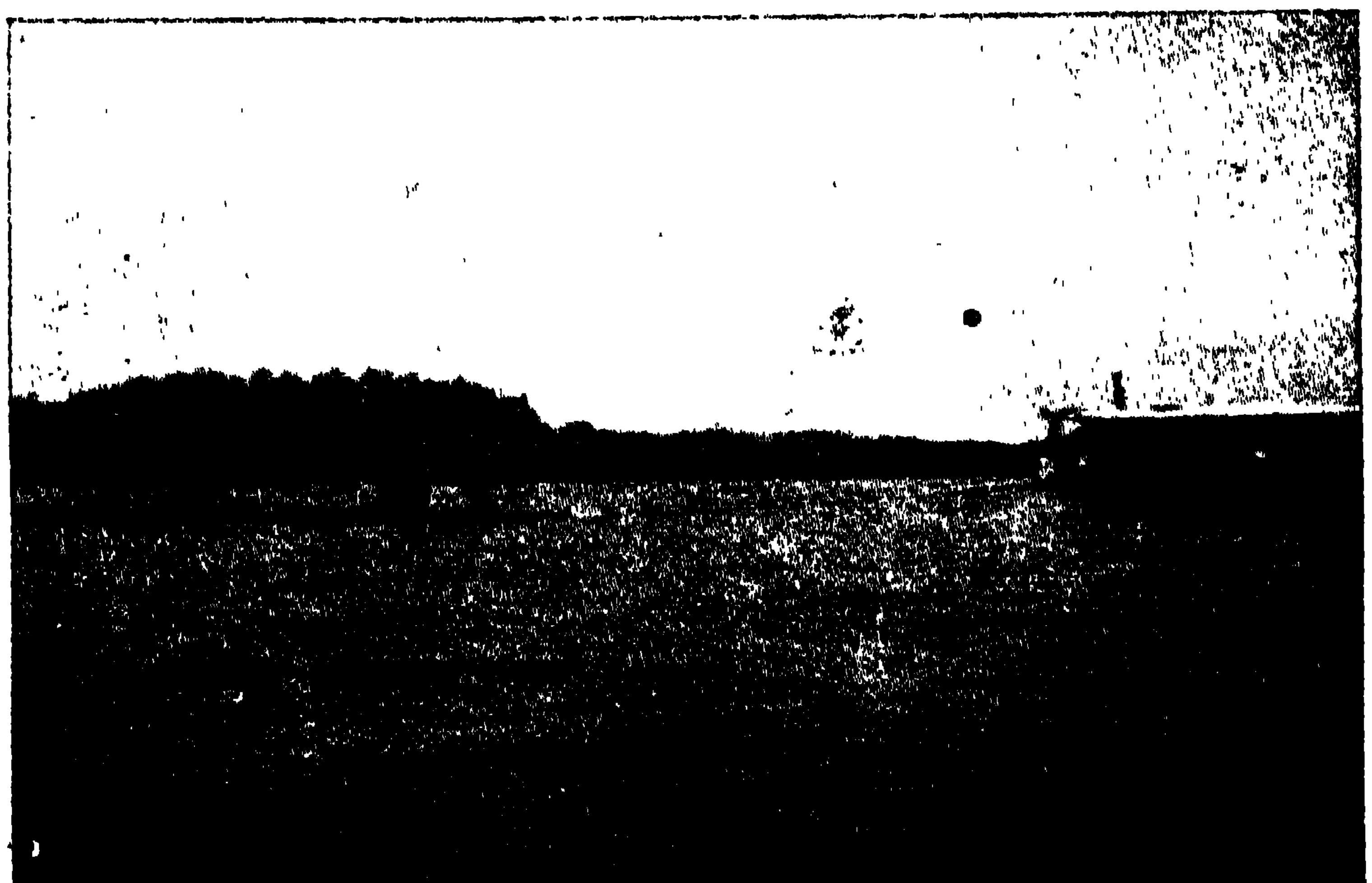

হাতী চালান

এবারে আমাদের বন্ধু আন্দামানীদের বিষয়ে কিছু লিখিব। ইহারা প্রায় অনেকেই হিন্দী কথা বলিতে ও বুঝিতে পারে। ইহারা কয়েক দলে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দলে ১০ হইতে ২০ জন করিয়া মেয়ে-পুরুষে থাকে। প্রত্যেক দলের একজন সর্দার থাকে; উহাকেই "রাজা" বলা হয়। রাজার কথা সকলে খুব মানিয়া চলে এবং রাজা সকলের কাজ ভাগ করিয়া দেয়। মেয়েরা কতক ঘরে থাকিয়া রান্না, খাওয়া ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে; কতক পাতা সেলাই, ঝুড়ী প্রস্তুত ইত্যাদি করিয়া থাকে; এবং কেহ-কেহ হয় ত আপন-আপন স্বামীর সহিত কাজে যাইয়া থাকে। পুরুষগণ কেহ কুকুর, তীর, ধনুক লইয়া শূকর শিকারে, কেহ মাছ ধরিতে যায়। কেহ ডুঙ্গী প্রস্তুত করে, কেহ জঙ্গলে মধু, ধূপ, কড়ি, শাঁক কিম্বা কচ্ছপের খোলা জোগাড় করিতে যাইয়া থাকে। কখন কখনও সকলেই বাহির হইয়া যায় এবং জঙ্গলেই খাওয়া-দাওয়া করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া আসে। এই সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করিবার জন্য সরকার হইতে উহারা রসদ, চা, চিনি, শুখা ইত্যাদি পাইয়া থাকে। সরকার

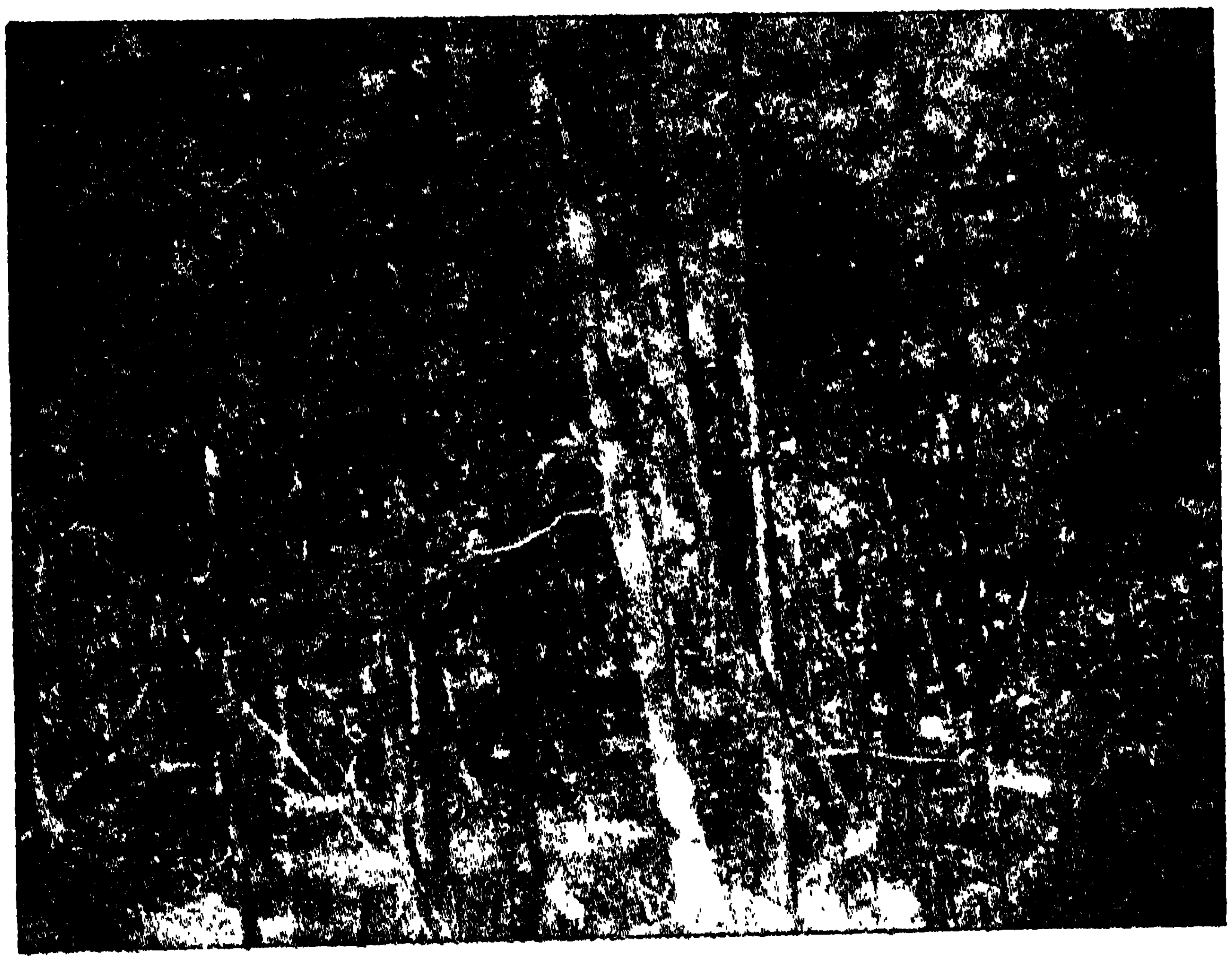
জোয়ারের সময় মানগ্রোভের দৃশ্য

মানগ্রোভে ট্রাম লাইন

ইহাদের নিকট হইতে মধু, কচ্ছপের খোলা সমুদ্রের অনেকপ্রকার শামুক যেমন লুড়ো, নটিলেস ইত্যাদি লইয়া, উহা হইতে নানাপ্রকার জিনিস প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয়

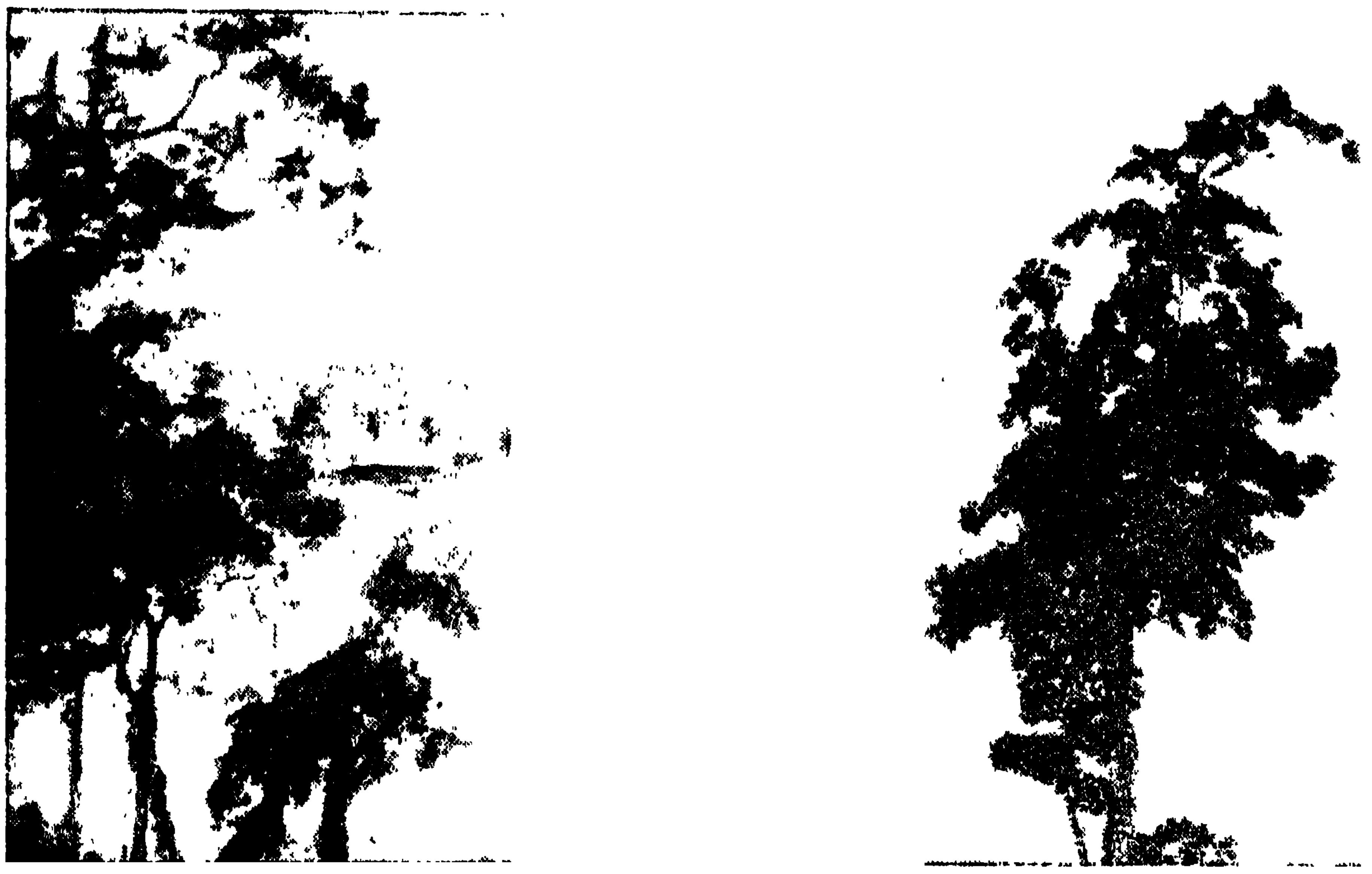

সাউণ্ড দ্বীপের উপকূল ও জেটি (পশ্চিম দিক)

করিয়া থাকেন। যাহারা লোকালয়ের নিকটে থাকে, তাহারা প্রায়ই, কখনও বা প্রত্যহই, কিছু কিছু জিনিস, যেমন মাছ, কড়ি ইত্যাদি, লইয়া আসিয়া তাহার বিনিময়ে চাউল, চা, চিনি, তামাকের পাতা লইয়া যাইয়া থাকে। উহাদের নিকট হইতে জিনিসপত্র লওয়া খুবই সহজ। যে প্রথমে উহাদিগকে চা, তামাক ইত্যাদি দিবে, তাহাকেই সমস্ত দিয়া দেয়। যাহার জন্য উহা আনিতেছিল, যে উহাকে আনিতে বলিয়াছিল, এবং যাহাকে দিবে বলিয়াছিল, তাহা তখনই সমস্ত ভুলিয়া যাইবে। তবে যেখানে একটু আফিং পাইবার আশা আছে, সেখানকার কথা তাহারা কখনই ভুলিবে না। আফিংএর নেশার ইহারা এত বেশী বশীভূত হইয়াছে

সাউণ্ড দ্বীপের উপকূল ও জেটি (পূর্ব্ব দিক)

যে, উহাই তাহাদের সমস্ত ভুলাইয়া দেয়। আফিংএর জন্য উহারা স্ত্রী-পুরুষ মান ও ইজ্জৎ দুইই দিয়া থাকে এবং সেই জন্যই উহাদের মধ্যেও Venereal diseases দেখা যায়।

শূকর, মাছ, শুক্তি, ঝিনুক ইত্যাদি উহাদের প্রধান খাদ্য। দু'একপ্রকার লতাও সমুদ্রের জলে সিদ্ধ করিয়া তাহারা খাইয়া থাকে। মাছ, মাংস সমস্ত পোড়াইয়া খাইয়া থাকে। এখনও রান্নার বিষয় উহারা কিছুই জানে না বলিলেই হয়। চা, চাউল ইত্যাদি যাহা লইয়া যায়, উহাও কোনপ্রকারে সিদ্ধ করিয়াই খাইয়া থাকে। উহাদের বাসস্থান একস্থানে নির্দ্দিষ্ট নহে। সমুদ্রের কিনারায় তালপাতার ছোট ছাউনি করিয়া বাস করে। সেখানকার কাজ হইয়া গেলে, পুনরায় অন্য স্থানে যায়। রাস্তায় কোথাও খাওয়া-দাওয়া কিম্বা থাকিবার দরকার হইলে, নিকটস্থ যে কোন দ্বীপে ডুঙ্গী লাগাইয়া আগুন জ্বালাইয়া সেখানেই রাত্রি কাটাইয়া দেয়। উহাদের সর্ব্বাঙ্গে কাচ দিয়া একটু-একটু করিয়া কাটা আছে ; উহাই উহাদিগকে ঠাণ্ডা ও মশার কামড় হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। উহাদের জিনিসপত্রের মধ্যে তীর, ধনুক ছাড়া লোকের দেওয়া দু'একখানি মগ বা ভাঙ্গা বাসন—তাহা সমস্তই

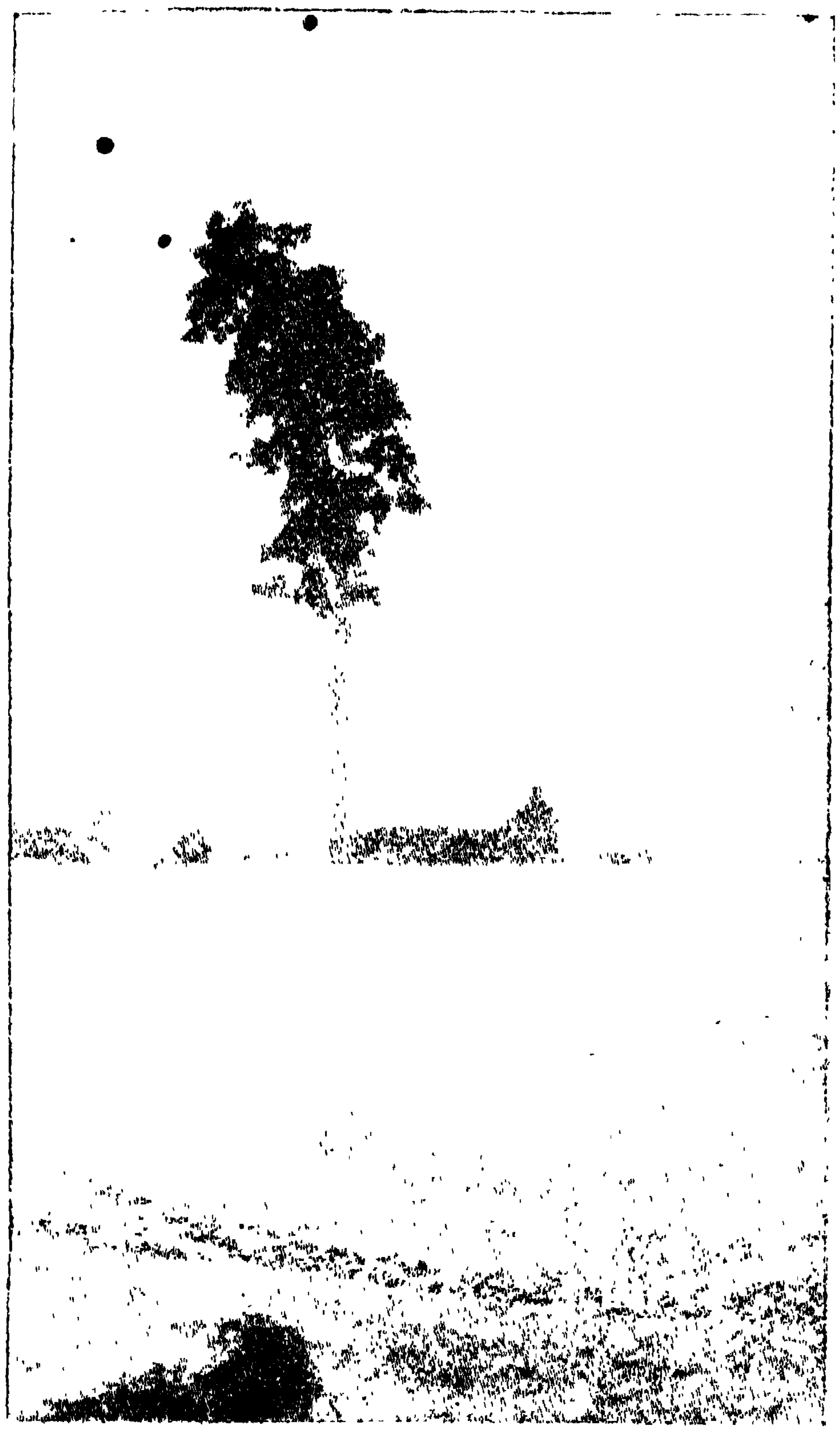

সমুদ্রতীরে কুলীকুটীর ও ক্রীড়াস্থান

টুঙ্গজীদের মাছ-ধরা

বনের মধ্যে আন্দামানীদের গৃহ

উহাদের ছোট ঝুড়ীতেই থাকে। ছেলেমেয়েগুলিকে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া কুকুরগুলি সঙ্গে লইয়া ডুঙ্গীতে উঠিলেই হইল। পুনরায় যেখানে গেল, সেখানে ওইরূপ ছাউনি করিয়া লইতে বেশীক্ষণ লাগে না। জঙ্গলের সমস্ত স্থানই উহাদের জানা আছে; এবং কোথায় জল ও পাতা পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই উহারা জানে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলিও বেশ সাহসী এবং জঙ্গলের ও জলের পোকা বলিলেই হয়।

জঙ্গলীদের মাছ শিকার, নৌকা বাওয়া, তীর ছোঁড়া, জলে সাঁতার ও ডুব দেওয়া এবং নাচ দেখিতে বড়ই আমোদজনক। মাছ শিকার করে তীর-ধনুক লইয়া। ডুঙ্গীর উপর শিকারী তীর ধনুক লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে; এবং আর একজন পিছনে বসিয়া শিকারীর অঙ্গুলি-সঙ্কেত মত এদিক-ওদিক আস্তে-আস্তে ডুঙ্গী চালায় বা থামায়। শিকারী মাছ দেখিতে পাইলেই, জলে তীর ছোঁড়ে। উহা ঠিক মাছের গায়ে গিয়া লাগে এবং কিছুক্ষণ পরে মাছটী ভাসিয়া উঠে। কখন-কখনও তীর মারিয়াই জলে লাফাইয়া পড়িয়া তীরবিদ্ধ মৎস্যটীকে তুলিয়া আনিতেও দেখিয়াছি। যেখানে জল বেশী নাই ও বালু আছে, সেখানে একটু হাঁটুজলে গিয়া সেখান হইতে তীর দিয়া মাছ মারিয়াও থাকে। ছবিতে উহা বেশ দেখিতে পাইবেন। একখণ্ড গোল কাঠের

আন্দামানবাসী

ভিতরটা হইতে গোল করিয়া কাটিয়া লইয়া উহারা উহাদের ডুঙ্গী প্রস্তুত করে; ও উহার ভার ঠিক রাখিবার জন্য একদিকে একখান কাঠের সহিত ছোট-ছোট কাঠ দিয়া বাঁধিয়া দেয়; দেখিলে যেন মনে হয় যেন উহাদের মাছ ধরিবার জাল উহার সহিত লাগান আছে। ইহাতে উহারা বড়-বড় ঢেউকেও অগ্রাহ্য করিয়া খুব শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারে। উহাদের মেয়ে ও পুরুষ দুইই সমান ভাবে জাল চালাইতে পারে। তবে সাধারণতঃ পুরুষই খুব ভাল ও শীঘ্র চালাইয়া থাকে। যদি ইহাদিগকে নৌকাও দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাও এত সুন্দর ভাবে চালায়, ও এত লম্বা-লম্বা টান দেয় যে, মনে হয় যেন নৌকা পাইলে চলিতেছে। অনেকবার উহাদের লইয়া আমি নৌকায় গিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে, আমাদের লোকেরা যে সময়ের মধ্যে

আন্দামানী নৌকায় আগমন

সমুদ্রতীরে নৌকা উত্তোলন

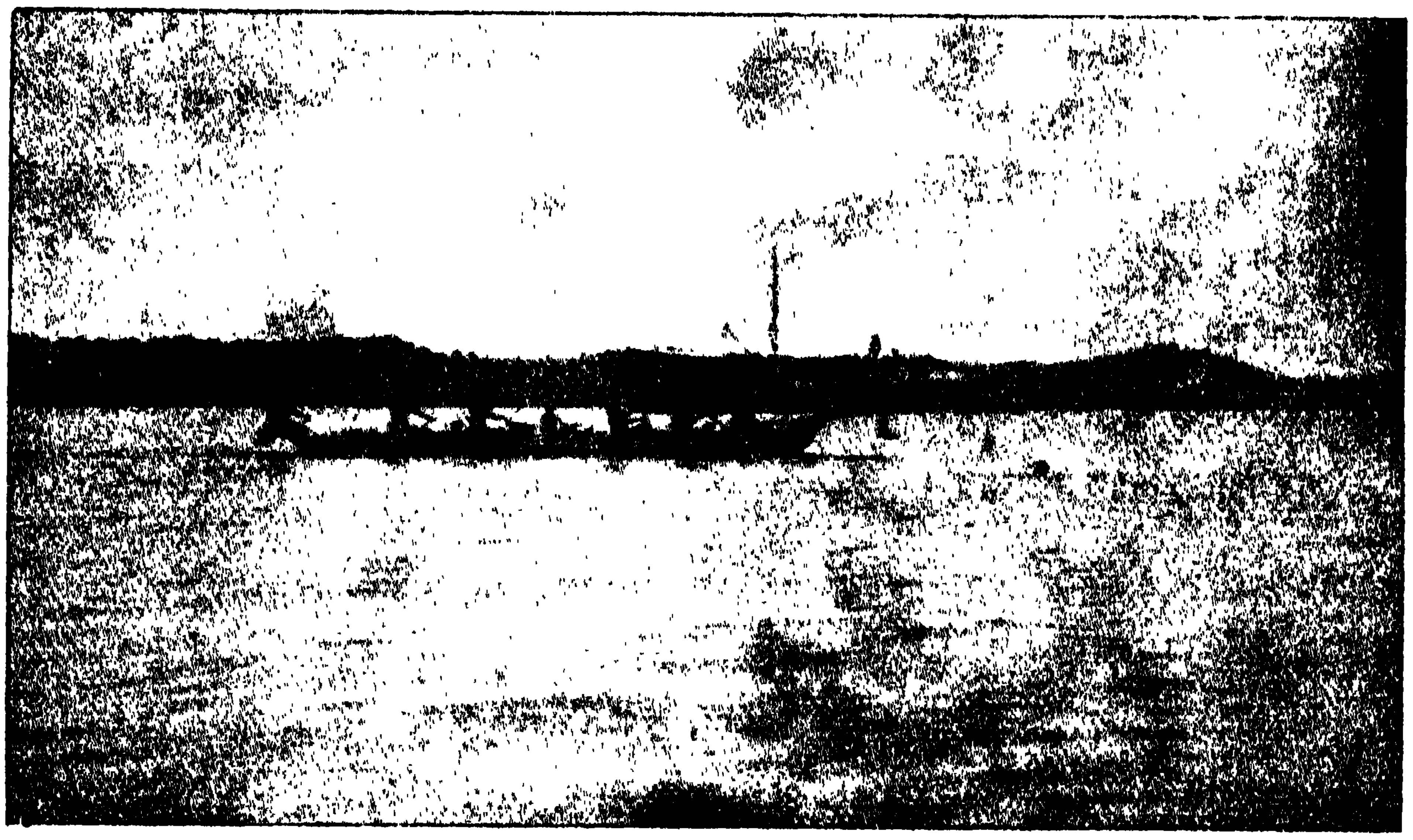

টুঙ্গলীদিগের নৌ-চালনা

পৌঁছিত উহারা তাহার অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যেই পৌঁছিয়াছে। ইহারা তাহাদের কুকুরগুলি জঙ্গলে ছাড়িয়া দিলে, কুকুরগুলি এদিক-ওদিক ঘুরিয়া শূকর দেখিলে ঘিরিয়া ফেলিয়া চীৎকার করে, এবং ওই শব্দের অনুসরণ করিয়া উহারা গিয়া তীর দিয়া শূকরকে মারিয়া ফেলে। তীর ছুঁড়িতে উহারাও খুব মজবুত। অনেক সময় উহাদিগকে বড় গাছের মাথায় সরু একখানি ডাল বিদ্ধ করিতে বলায় তাহাতেও বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

বাদলের ব্যথা

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

বুকের জমাট ব্যথা বিষাদের তপ্ত-শ্বাসে
আঁখি-কোণে হইয়া তরল,
পড়িল ঝরিয়া যার তোমারি স্বাগত-পথ
করি বঁধু কোমল সরল ;
আজি দীর্ঘ বিরহের তিমির রজনী-শেষে
ফিরি পুনঃ আলয়ে তোমার,
নিমেষের দরশনে করিলে বঞ্চিত তারে
চমৎকার ! অতি চমৎকার !

* * * *

ওই নীল নয়নের মৃদুল ময়ূখ যার
উজলিল বিজন শরণ ;
মরণেরে এতদিন বরেনি যে অনুরাগে,
ওই মুখ করিয়া স্মরণ ;
যে তৃষিত চাতকের দহন-কাতর-কণ্ঠ
এতদিন বহি' আশা-ভার
তোমারি স্নেহের ধারা ধ্যান করি কাটাইল,
খুব তারে দিলে পুরস্কার !

* * * *

তোমারি অমৃত-লিপি বহু অধ্যয়ন পরে
রবীন্দ্রের গীতিকাব্য সম,
বার বার ধরি বুকে হৃদয়ের রস' ক্ষুধা
মেটে নাই যার বিন্দুতম ;
রাঙা হাতে লেখা তার ছিল ভাঙা কথাগুলি
বিচ্ছেদের আয়ুর্ব্বেদ যার,
সে আজি যাচিয়া ফিরে কৃপার প্রসাদ তব,
ছত্র দুই লিখন তোমার !

* * * *

তোমারি প্রেমের লাগি যে করিল অবহেলা
হাসি-মুখে শত পরিহাস,
তোমারি ক্ষেমের লাগি যে ডাকিল দেবতারে
প্রার্থনায় ভরিয়া আকাশ ;
তার কোটি আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুল বাসনারাশি
যে আগ্রহে হইল চঞ্চল,
সে কি সখি, মর্ম্মে তব আঁকে নাই কোন দাগ,
প্রণয়ের কোন কৌতূহল !

* * * *

জীবনের সব আলো, ভুবনের সব সুখ,
ওগো তুমি নাও, মোর নাও,
একবার এসে শুধু, ভালো মোরে বেসে শুধু,
চাও তুমি, মুখ পানে চাও।
করি স্নিগ্ধ, জ্বালা-ভার—এস' প্রেম-বরষার,
হে আমার আকুল প্লাবন,
সংযমের বাঁধ টুটি' অন্তর-বাহির ভরি
আজি প্রিয়ে ! জাগুক্ শ্রাবণ।

মেয়েদের জাগা

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

আজি যে যুগ-মানবটি জাগিয়া উঠিয়াছেন, যাহার রথ-ঘর্ঘর ঐ বুঝি দিগন্তে বাজিয়া উঠিল, তাঁহার যাত্রায় সাথী হইবে কে? ভগবৎ-প্রেরণা ফুকারিতেছে, এস—এস,—মনুষ্য স্বভাবের চিরন্তন সন্দেহ, সংশয়, ভয়কে গত দিনের যুদ্ধে ব্যবহৃত অসি-ঘাত-বিদীর্ণ বর্ম্মাবরণের মত নামাইয়া রাখিয়া,—এস, ছুটিয়া এস। কোন চির-রহস্যময় অন্ধকার কুহর হইতে মুহুর্মুহু উঠিতেছে এই আহ্বান-ধ্বনি!—যাহাদের প্রাণ তাজা, কাঁচা, সরস, যাহারা এক কথায় ধরিয়া ফেলিয়াছে,—আমরাও ত এই দু'দিন হইল মাত্র অমনি কোন অন্ধকার ভেদিয়া, চির-রহস্যের জঠর ছিঁড়িয়া, অজ্ঞাত অব্যক্তের মধ্য হইতে এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যে ডাকিতেছে, তাহাকে চিনি নাই বলিয়া ডাককে অবিশ্বাস করিব কেন? ডাক আমার মর্ম্মের পাথর যথেষ্ট গলাইয়াছে। আর আমার বিবেচনার কিছু নাই! তাই, আজ সেনাপতির তূর্যাধ্বনি যেন তাহাদের কাণের কাছে বাজিয়া উঠিয়াছে। সন্দেহ, ভয়, সংশয় তাহারা সবেমাত্র জগতের কাছে শিখিতেছিল,—সে পাঠ আর লইল না। চারিদিকে দৃক্পাত-শূন্য তাহারা নূতন একটা থাকের মানুষ দাঁড়াইয়া গেল। বিশ্বময় ইহারাই যুগ-মানবের মানস-সন্তান,—তাঁহার যাত্রায় যাত্রী।

তাহাদের কেহ বা বলিতেছে—নিজস্ব বলিয়া মানুষের কোনও সম্পত্তি রাখিব না। স্বার্থের চিন্তাকে কোনও মতেই virtue বলা চলে না। যতক্ষণ নিজের অস্তিত্বটুকু কিংবা বিলাসটুকুর জন্য মানুষ স্বার্থ-সংগ্রামে অন্যের কথা ভুলিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, ততক্ষণ না হয়, কি উৎকট বিষ ইহার অভ্যন্তরে সঞ্চিত, তাহা আমরা দেখিতে পাই না! কিন্তু, যখন পুরুষানুক্রমিক সঞ্চয়ের ফলে এক-একটা অভিজাতের নিকট জাতির এক-একটা অঙ্গের প্রাণ পুঞ্জীভূত হইয়া যক্ষের মুখ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যায়, তখন কে না বলিবে,—একটা কুঞ্চিত কুণ্ডলীকৃত গ্রন্থিকে কাটিয়া ফেলিয়া দিলে যদি একটা অঙ্গ পঙ্গুত্ব হইতে রক্ষা পায়,—অস্ত্রোপচারে দোষ দেখি না। বদ্ধ রক্তস্রোত প্রবাহিত করিবার মতই উহার সঞ্চয়ের নাড়ী কাটিয়া দাও। আবার কেহ বা বলিতেছে—ক্ষমতা কাহারও আপনার করিয়া জমিতে দিতে পারিব না। দুষ্টের দমনের জন্য যে ক্ষমতার ভাণ্ডার সমাজের উপর রাখিয়া দিতে হয়, কোনও আবরণই তাহার উপর চাপাইতে পারিবে না,—তাহাকে লোক-চলাচল-পথস্থিত ঘটিকা-যন্ত্রের মত সকলেরই ন্যায্য ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়া দাও। এমনি কতশত কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া নূতন-নূতন চরিত্র এক-একটা মতবাদের পশ্চাতে সহস্রে সহস্রে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। মানুষ প্রচলিত পদ্ধতিকে পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়া একটা পরিবর্ত্তন, একটা সমন্বয়, একটা সংস্কারের জন্য মরিয়া হইয়া উঠিতেছে।—আসল কথা, মানুষ স্থানে-স্থানে আপনাদের

ওকালতি পাশ করিতেছে, অথবা আমাদের ভাল খাওয়াও, পরাও, গর্ভে সন্তান ধারণ সম্বন্ধে একটু স্বাধীনতা দাও বলিয়া কাতর অথবা সনির্ব্বন্ধ অনুযোগ আরম্ভ করিয়াছে—ইহাও আমার কাছে যথেষ্ট নহে। ইহাই তাহাদের জাগরণের লক্ষণ,—কখনই এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কে বলিতে পারে? ইহার মধ্যে আত্মপ্রতারণা আছে, পর-প্রকটিত সম্মোহন আছে, হয় ত বা জাগরণের ঠিক উল্টা ব্যাপারটিই আছে। হইতে পারে, আপনাদের মুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে, ঐ মানসিক অল্পশিক্ষিতা, স্বাধীন চিন্তায় অনভ্যস্তা, ফ্যাসান নামক উপদেবতার পূজারিণী ছাত্রীর দল ভাল করিয়া আপন-আপন কণ্ঠে পদে শিকল আপনারাই জড়াইয়া লইতেছে। হয় ত আপনা-আপনিই তাহারা শান্তির সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে;—ঘোমটার ঘেরাটোপের পরিবর্ত্তে সতর্ক প্রহরাপর দৃষ্টির কাছে নিজের দৃষ্টিকে খাটো করা, মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিজন-গঠিত সংসারের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাণের গণ্ডী বিস্তৃত করিয়া জেনানার পরিসর সেই পর্য্যন্ত বাড়াইয়া লওয়া—এমনি ভাবে দাসত্বের মূল ভঙ্গী বজায় রাখিয়া, দাসত্বকে সুখসেব্য করিয়া দেড়কাঠা কারাগারের পরিবর্ত্তে দেড় বিঘা কারাগারে যাওয়াই স্বাধীনতা। আর পরিবর্ত্তনটুকু চাহিবার মত বুদ্ধিই জাগরণ।

কোন্ অবস্থার উল্লেখ করিয়া এ কথা বলিতেছি, তাহা আরও সুস্পষ্ট ভাবে চক্ষের সম্মুখে ধরিতে গেলে, আমাদের বর্ত্তমান জীবন-যাত্রা-প্রণালীর বিশদভাবে রূঢ় সমালোচনা করিতে হয়। কিন্তু কি হইবে করিয়া? বুঝিয়াও উড়াইয়া দিয়া যায়, এমন লোকের সংখ্যাই যে অধিক, তাহা অবশ্যই জানি। অল্প সংখ্যক লোকের জন্য লিখিত হইলেও এ লেখায় আমার আনন্দ আছে!

আমি জাগরণ তাহাকেই বলি, যে অবস্থায় মেয়েদের চিন্তায় এতখানি স্বাধীনতা আসিবে যে, আত্মানুভূতির মত করিয়া সত্যই ততখানি তন্দ্রা ছুটিয়া যাইবে তাহাদের। যুগ-মানবের জাগরণে এই যে বিশ্বময় personalityর বাণ ডাকিয়াছে,—মানুষকে যাহা খাটো করে তাহাকে লাথি দিয়া গুঁড়া করিবার জন্য মানুষ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে,—এক-একটা জাতি এক হইয়া ক্ষেপিয়া দাঁড়াইতেছে,—এই স্পন্দন তাহাদেরও প্রাণের তন্ত্রীজাল ব্যাপিয়া নামিয়া আসিবে। মানুষ জাগিয়া উঠিবে তাহাদেরও মধ্যে। সেই মানুষকে তাহারা খাটো হইতে দিবে না;—সমাজ, গৃহধর্ম্ম—সর্ব্বত্রই সেই মানুষের জয় অপ্রতিহত করিয়া তুলিবে।

বর্ত্তমান সমাজ-তন্ত্রের মনস্তত্বে এখনও স্ত্রী-স্বাধীনতা বস্তুটা বরদাস্ত হয় না। মেয়েদের ভুলাইবার জন্যই তাহার ধ্বংসাত্মক একটা নাম উচ্চারিত হইয়াছে ও হইয়া থাকে। ঐ ধ্বনির কুহকেই, উপরে যেমন জাগরিতা নারীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের শ্রেণী গজাইয়া উঠিয়াছে। কথার মধ্য দিয়া আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা চাহি না। আমি চাই ভাব জাগাইয়া তুলিতে;—যুগ-মানবের যে আহ্বান বিশ্বের নাড়ীকে স্পন্দিত করিতেছে, তাহারই রিনিনি ঝিনিনি ঝঙ্কার মেয়েদের হৃৎপিণ্ডের রক্ততালের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে। তাহারা আত্মস্থ হউক;—তাহাদের স্বাধীনতা, দুর্গতিমোচন তাহাদেরই মধ্য হইতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। আমি জানি, উঁচু হইতে নীচের দিকে চাহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। মেয়ে যদি আপনার স্বভাবগত নির্দ্দেশে উঁচু না হয়, অ মেয়ে কোনও মহাত্মার মাথা নীচু করিয়া উঁচু হইতে তাহাদের সেখানে তোলা বিড়ম্বনা। মেয়েদেরও সেই আবেদন হস্তে করিয়া থাকা বিড়ম্বনা।

অবশ্য মেয়ে ও পুরুষ উভয়ের মধ্যের এই কুজ্ঝটিকা-টুকু পূর্ব্বযুগের ধ্বংসাবশেষ। যুগ-মানবের এলাকায় এমন কোনও কুজ্ঝটিকা নাই। সেখানে এ কথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, সমস্ত ভারতবর্ষটা ইংরাজের অধীন—এই একটা বাঁধন আছে। ইহার মধ্যে মেয়ে আবার পুরুষের অধীন এমন কোনও পাকাপাকি বাঁধন নাই।

যে সমস্ত মেয়ে মাতৃজাতির উন্নতি, অভাব, অভিযোগ সম্বন্ধে বর্ত্তমান বাঙ্গালী মাসিক-সাহিত্যে লেখনী পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের লেখাই আমি আদ্যোপান্ত নিবিষ্ট মনে পাঠ করিয়া আসিতেছি। কি ভরসা পাইয়াছি তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে, সে হিসাব দিতে হইলে নির্ব্বাক হইব। লেখাগুলি সম্বন্ধে মোট ধারণা লাভ করিয়াছি,—বাবুদের ছাত্রী তাঁহারা—তাঁহাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ছাঁচে আন্দোলন-বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন। সমাজকে গবর্ণমেণ্টের মত একটা Symbol ধরিয়া লওয়াটা কি যুক্তি, বুঝিতে পারি না। যে ভাবে Bureaucracy সত্য, সমাজ সে ভাবে সত্য দাঁড়ায় কি? সূক্ষ্মভাবে নিরপেক্ষ বিচার করিলে,

সমাজ বলিতে যাহা এখন দাঁড়াইয়াছে তাহার সহিত উহার কোনও মতেই সাদৃশ্য হয় না। Bureaucracy'র অনুরূপ অমন সঙ্ঘবিশেষের সদম্ভ জবরদস্তি নির্লজ্জ আত্মচরিতার্থতা সুচতুর প্রতিষ্ঠারক্ষা সমাজ নামে কোনখানে দাঁড়াইয়া আমাদের চাপ দিতেছে? সমাজ বলিতে, হায় সমাজ, অধঃপতিত সমাজ, বলিয়া অথবা স্থানবিশেষে হে সমাজ-রাজ বলিয়াও আমরা প্রবন্ধে ভাবোচ্ছ্বাস ব্যবহার করিয়া থাকি সত্য, কিন্তু সমাজের সকল অত্যাচার অন্তর্জগতেই। বাহিরে সমাজ বলিতে যাহা আছে, তাহা আমাদেরই আপনাদের জড়তা, উদাসীনতা, নির্জীবতার প্রেতবৎ ছায়ামূর্ত্তি। সমাজের ভয় ভূতের ভয়; কিন্তু Bureaucracy-ভীতি একটু নখ ও দাঁতওয়ালা জন্তুর আঁচড়-কামড়ের ভয়।

অবশ্য অনেক লেখিকা একেবারে সরাসরি পুরুষদের নাম করিয়াই মহামান্য পাঠ লিখিয়া আর্জ্জি পেশ অথবা প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহাদের কিছু বলিবার নাই। কর্ত্তারা প্রতিদিন অমনি কত আর্জ্জি কত জায়গায় পেশ করিয়া ভগ্ন-মনোরথ,—ক্ষুণ্ণ মনের ব্যথা মনে চাপিতেছেন। তবুও, মাসিক পত্রিকায় নিজেদের উপর ঐ হুজুর সম্বোধন দেখিয়া একটু যদি Vanity চরিতার্থ করিতে পারেন, মন প্রফুল্ল হইবে। খানিকটা কাটিবে ভাল।

মোটের উপর পুরুধালী শিক্ষা-দীক্ষাময়ী নারীত্বের উন্নতি-প্রয়াসী নারীর সপাদুকা অথবা সলক্তক চরণ-কমলে এইটুকু নিবেদন করি—

ওগো সুচরিতে, যদি জাগিতে চাও, সত্যই জাগো। ছেলেবেলার খেলাঘর হইতে অনেক খেলা খেলিয়াছ;—এ বুড়া বয়সের ঢঙ স্বামী পুত্র অথবা নাতির হাত ধরিয়া জাগাজাগি খেলার আর প্রয়োজন নাই। আপনার ও সংসারের অভাব-অসন্তোষে মিন্সেকে গালাগাল—সে তোমাদের দিদিশাশুড়ীর শাশুড়ীরাও ও কাজে অভ্যস্তা ছিলেন। ছাপার কাগজে সভ্যভব্য ভাবে ঐ একই অনুযোগে না হয় মিন্সের জাতিকেই তোমরা সুর মিহি ও চড়া করিয়া ঝালাইয়া লইলে! সেই একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি বই নূতন কিছুই হইল না! বুঝিয়া বল, তাঁহারা ঘুমন্ত ও তোমরা জাগন্ত—এই প্রমাণ প্রয়োগেই সাব্যস্ত হয় কি না? যদি জাগন্ত হও, শোনাও, কই, কই তোমার অন্তরের শক্তিময়ী সিংহবাহিনী গর্জ্জন করিতেছেন। যদি জাগিলে, শক্তিকে জাগাইলে কই? পুরুষের অনুকরণে তোমরাও বুদ্ধিমতী হইবে, ভগবান তাহা চাহেন না। নারী, প্রাণময়ী জাতির প্রাণকে তোমরা আবিলতামুক্ত কর,—ভগবানের ইহাই আকিঞ্চন।

ভগবানের বড় অসম্ভব আব্দার, না? এত-বড় বিরাট সুপ্ত অজগরের কঙ্কালের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যুগ-যুগ ব্যাপিয়া আবিলতার পর্ব্বত প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে। তুমি দীনা, ক্ষীণা, সরলা, দুর্ব্বলা;—তোমার মধ্যে কি সিন্ধুর কলোচ্ছ্বাস থাকিতে পারে? অথবা দাবানলের দিগন্তদাহী নিঃশ্বাসজ্বালা ধূমায়িত দেখিয়াছেন তিনি তোমার কাছে। তাঁহার আকিঞ্চন—জাতির প্রাণকে আবিলতা-মুক্ত করিতে হইবে! অসম্ভব, হইবে না,—তুমিই ত সাহায্যার্থিনী, তোমার আবার কর্ম্ম-প্রেরণা কোথায়? পুরুষে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিলে কর্ম্মভার লইতে পার,—শিক্ষা দিলে শিক্ষামত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পার। কেমন, ইহাই ত মনের কথা তোমাদের?

হায় সম্মোহন! অয়ি মুগ্ধা জাতি! প্রকৃতির অন্তরের কথা তা নয়। যদি দেখিতে চাও, প্রকৃতির অগাধ জলতলে তোমারই প্রতিবিম্বখানি একবার দেখাইব তোমায়—তাহারই আমন্ত্রণে এত বাক্যব্যয়।

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা

[ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি]

মধুরেণ সমাপয়েৎ

সত্যপ্রিয়। ডাক্তারবাবু, আপনার কথা শুনে আমার আজ চোখ খুলে গেল। দায়িত্বহীন বন্ধুদের কথায় নাচা, ও গুরুজনের বাক্য অবহেলা করার ফল আজ স্বচক্ষে দেখ্‌ছি। নির্দোষ সরলা বালিকা ও ক্ষুদ্র শিশুর দেহ বিষে জর্জ্জরিত করেছি। আমিও কি সোয়াস্তিতে আছি? সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, আহারে অরুচি, রাত্রে অনিদ্রা। কত ওষুধ খাচ্ছি, কিছুতেই কিছু হচ্চে না। বাহিরে দেখ্‌তে ফুলবাবুটি, ভিতর ফাঁপা। মা যখন কুসঙ্গের দোষ দেখিয়ে সাবধান করেছিলেন,—চোখ রাঙ্গিয়ে তাঁকে কতই শাসিয়েছিলাম, আর তাঁর বুক চোখের জলে ভাসিয়েছিলাম। আজ সেই অতীতের দৃশ্য তীক্ষ্ণ ছুরী হ'য়ে অন্তরটাকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রছে। আজকাল আমাদের এমন শিক্ষা হয়েছে যে, পাপ-পুণ্যের কথা শুনলে হো-হো ক'রে হাসি। "পাপ কি আবার? পাপ ত relative term! আমার পক্ষে যা পাপ, তোমার পক্ষে তা পুণ্য হ'তে পারে। আজ যাহা পাপ, কাল তাহা পুণ্য।" "মা বাপে কি বুঝেন, আমিই আমার ভালমন্দ বুঝি।" ইত্যাদি যুক্তির কাল্পনিক বর্ম্মে দেহ মন আচ্ছাদিত ক'রে মনে করি, এ দেহ মন অচ্ছেদ্য, অভেদ্য। তাই আজ শতকরা ৭৫জন ছাত্রের দেহ ভগ্ন মন্দির এবং মন শুষ্ক মরুভূমি মাত্র। এই মন্দির সযত্নে রক্ষা করে' পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ্‌লে, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যে শুভাশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়, সে কথাটা আমরা ভুলে গিয়েছি। পিতামাতা গুরুজনের বাহিরের আবরণটা কঠিন বোধ হলেও, অন্তরটা যে প্রেম-কোমল ও মধুময়, এ কথাটা সব সময়ে মাথায় আসে না। তাই স্বার্থপর বসন্তের কোকিলদের ডাকে ভুলে, আমোদে মেতে যাই। কই তারা এখন? এই যে আমার পতিব্রতা স্ত্রী ও স্বর্গের কুসুমসম পুত্রটী রোগে ভুগ্‌ছে, আমি য ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্চি, কই, তারা এসে কি আমার দুঃখের ভাগ নিচ্চে? যা হোক, শিক্ষা ঢের হয়েছে, ডাক্তার বাবু। আপনি দয়া ক'রে আমাদের তিনটী প্রাণীর চিকিৎসার ভার নিন। আর আমাদের মতন বিপথগামী যুবকদের ডেকে সাবধান ক'রে দিন।

ডাক্তারবাবু সত্যপ্রিয়কে আশ্বস্ত করিয়া তিন মাস ধরিয়া সকলের চিকিৎসা করিলেন। কলিকাতা হইতে সপ্তাহান্তে আসিয়া প্রসূতির শিরার অভ্যন্তরে ঔষধ ইঞ্জেক্‌ট্ করিয়া চলিয়া যাইবেন।

চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণ। জামাতা কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইয়াছেন। আজ তিনি সুন্দর, সুস্থ, সবল গোপাল দেখিয়া আনন্দিত। স্ত্রীরই বা কত আদর। "ওগো, অত দেরিতে খেলে চল্‌বে কেন? তোমার দুধ হ'লে ত খোকা দুধ পাবে। শরীর দেবমন্দির,—যত্নে রক্ষা করতে হয়। তুমি ছিলে এক, বিবাহের পর হ'লে দুই; এখন যে তিন হয়েছ। তোমার অস্তিত্বের উপর তিনজনের অস্তিত্ব নির্ভর করচে। গায়ে ঠাণ্ডা লাগিও না। এই দেখ, গরম জামা এনেছি।"

দ্বিতীয়বার পাণিপীড়ন-প্রয়াসী স্বামী নির্জ্জনে যাহা বলিয়াছিলেন, আনন্দাশ্রু প্লাবিত বালিকা স্ত্রী দুই মিনিট না যাইতে যাইতে আমাকে তৎসমুদায় জানাইল। "হাতের লোহা অক্ষয় হউক, আমার মাথায় যত চুল তোমার ছেলের তত বৎসর পরমায়ু হউক"—এই আশীর্ব্বাদ করিয়া পরদিন আমি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এবার আর গো-দোলায় দুলিতে হয় নাই।

মুক্তামালা

(১)

চণ্ডীপুরের প্রকাণ্ড জমিদার-বাড়ীর তিনটী মহল। অন্দরমহলে কেহ চীৎকার করিয়া মরিলেও, বৈঠকখানায় বাবুদের শান্তিভঙ্গের কোন সম্ভাবনা নাই। মাঝখানে গগনস্পর্শী রাসমন্দির দেখিয়া শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরশ্রেণী মনে

পড়িল। এই রাজ-প্রাসাদের বহির্ব্বাটীর বারান্দায় বসিয়া বাবুরা সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছেন ; আর নারী-জন্ম গ্রহণ অপরাধে একটি গর্ভিণী অন্দরমহলের নিম্নতলে একটি অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়া, পেটের যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে। যুবতীর তপ্তকাঞ্চন অঙ্গে মলিন বস্ত্রখণ্ড আরও মলিন দেখাইতেছে। মেয়েলী হিসাবে তাহার দশ মাসের গর্ভ ; কিন্তু প্রকৃত হিসাবে আট মাস। জামাইবাবু শনিবারে আসিয়া রবিবারে চলিয়া গিয়াছেন। সোমবার হইতে প্রসূতির তলপেটে অসহনীয় যন্ত্রণা ; প্রস্রাবে জ্বালা ও পূঁয। পেট কন্‌কন্‌ করিতেছে দেখিয়া, আমাকে তাড়াতাড়ি কলিকাতা হইতে লইয়া আসা হইয়াছে। বৈদ্যবাটী হইতে ডাক্তার আসিয়া পিচকারী দ্বারা ধাতুরোগের বীজ ও অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর যন্ত্রণার অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। ডাক্তার বড়কর্ত্তাকে বলিলেন, তাঁহার জামাতারও চিকিৎসার প্রয়োজন। জামাতার নাম নন্দদুলাল। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া বি এ পড়েন। খরচ যোগান জমিদার শ্বশুর। সুতরাং একলা একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন।

(২)

"কি হে নন্দদুলাল! ব্যাপার কি? ইব্‌সেনের নভেল্ এক নিশ্বাসে পড়ে ফেল্‌,—আজ দেখ্‌ছি, যেখানকার পাত-চিহ্ন, সেখানেই পড়ে আছে। তুমি হাঁ ক'রে আকাশের চাঁদ পানে তাকিয়ে আছ। গোল-দীঘিতে সান্ধ্যভ্রমণের জন্য ডাক্‌তে এসে দেখি, কিসের ধ্যানে একেবারে তন্ময়। হুঁসই নাই। কাজেই ফিরে গেলাম। এ ভাবনা পুরণো স্ত্রীর জন্য হতে পারে না। এ নবীন প্রেমোচ্ছ্বাস না হয়ে যায় না। আমার কাছে ভাঁড়াচ্চ কেন ভাই? ব্যাপার কি বল দেখি।"

"ভাই বিনোদ, তোমাকে অনেক দিন ধরে একটা কথা বল্‌ব ভেবেছি, কিন্তু বলা হয় নাই—"

"বলি বলি আর বলা হল না এই ত প্রেমের লক্ষণ। রোগের পরিচয়টা ঠিক হয়েছে বাবা। আর যাও কোথা? এবার লজ্জার কপাটটা খুলে, হৃদয়ের ভাব-রত্নগুলি দেখিয়ে দাও দেখি।"

নন্দ। আচ্ছা ভাই, ঐ সামনের বাড়ীর খ্রীষ্টানদের জান? তাদের মেয়ের নাম লতিকা,—লটি বলে ডাকে। সে যখন আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু দুটি ঘুরিয়ে, একটি কুকুর কোলে করে আদর ক'রে কথা কয়, তখন কেবল চেয়ে থাকিতে ইচ্ছা হয়। আর চলে গেলে সমস্তক্ষণ তারই কথা ভাবি—"

বিনোদ। আর বল্‌তে ইচ্ছা হয়—

কেন না হইনু আমি সাধের কুকুর রে,
ও পরাণপ্রিয়া?
কিবা দিবা কিবা রাতি, হইতাম তব সাথী,
ঘুরিতাম সাথে সাথে ল্যাজ নাচাইয়া॥
অথবা সোহাগানলে, ক্রীম্ হইতাম গ'লে,
রাখিতে ভরিয়া শিশি পরম যতনে।
কভু লগ্ন গণ্ড-পরে, কভু লগ্ন বিম্বাধরে,—
পড়িতাম আমি কভু ও রাঙ্গা চরণে॥"

তাই নয় কি?

নন্দ। ঠাট্টা রাখ ভাই, আমি কিন্তু পাগল হ'য়ে যাব। বাল্যকালে মা বাপ ধরে-বেঁধে বিয়ে দিয়েছে, প্রেমের ধার ধারি নাই। এখন ভাই বাস্তবিক লব্ধ হয়েছে। প্রেমের কি মহিমময়ী মূর্ত্তি! আমাকে পাগল করে দিয়েছে। এখন উপায় কি?

বিনোদ। উপায় অতি সহজ। এরা প্রতি রবিবার কোন্ গির্জ্জায় যায়, তার সন্ধান নেও। হ্যাট্‌, কোট, নেকটাই পরে' তোফা সাঁহেবটি সেজে, একখানা বাইবেল হাতে ক'রে, ওরা যেখানে বসে তার কাছে বস্‌বে, আর যতক্ষণ উপাসনা হবে, চোখ বুজে হাত যোড় ক'রে থাকবে। ভগবানের কৃপায় গানে সিদ্ধ হয়েছ, তাদের সঙ্গে গান জুড়ে দেবে। মাসখানেক এই ব্রত পালন কর দেখি, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবেই হবে।

(৩)

"লটি, আমাদের পাশে বসে প্রতি রবিবার যে ছেলেটি উপাসনা করে, তাকে দেখেছিস্? যেমন রূপ, তেমন গুণ। একালের ছেলেদের ত এমন প্রেম দেখা যায় না। আমার বড় ইচ্ছে করে, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমি সব খোঁজ-খবর নিয়েছি। জমিদারের ছেলে, বি-এ ক্লাসে পড়ে, এখনও বিয়ে হয় নাই। আমাদের ঠিক সামনের বাড়ীতেই থাকে। কাল বিকালে চায়ের নিমন্ত্রণ করি, কি বলিস?"

লতিকা। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর বাবা,—আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন?

রেভারেণ্ড মিঃ কার্ফর্মা এবং তাঁহার কন্যা লতিকার মধ্যে কাল এই আলাপ হইয়াছে। আজ শনিবার। একটার সময় কলেজের ছুটী। নন্দদুলাল ফিটফাট সাহেব সাজিয়া, আলবার্ট ফ্যাশনে তেড়ি বাগাইয়া, আরসীতে ঘন-ঘন মুখ দেখিতেছে,—বেশটা কিছুতেই পছন্দসই হইতেছে না। এসেন্সের ভাণ্ডার ওজাড় করিয়া আনিয়া রুমালে, কোটে মাখান হইতেছে। সোণার চেনে আট্‌কান রিষ্ট ওয়াচের দিকে ঘন-ঘন নজর। "আঃ! ঘড়িটা কি বন্ধ হয়ে গেল না কি? এখনও কি পাঁচটা বাজে নাই?" পাঁচটার এক মিনিট থাকিতে নন্দদুলাল কার্ফর্মাদের দরোয়ানের নিকট কার্ড দিল। "আসুন, আসুন" বলিতে-বলিতে মিঃ কার্ফর্মা অগ্রসর হইয়া, নন্দদুলালের করমর্দ্দন করিলে, ড্রয়িং রুমে আসিয়া নন্দদুলাল দেখিল, লতিকা বসিয়া একখানা বই পড়িতেছে। নন্দদুলালের বুক দুরু-দুরু কাঁপিতে লাগিল। পুত্রীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া পিতা বলিলেন, "লটি, ইনি খৃষ্টের একজন পরম ভক্ত। ওনার নিকট তোমার কিছুমাত্র সঙ্কোচের কারণ নাই। যে রকম নিষ্ঠা,—নিশ্চয়ই উনি সদাপ্রভুর চিহ্নিত লোক।" এক প্রকার ঈষৎ হাস্য লতিকার ওষ্ঠের মধ্যস্থল কম্পিত করিয়া দুই দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইহাকে বলে "ইণ্ডিয়া রবার হাস্য।" অনেক কষ্টে শিখিতে হয়। ইহাতে কেবল সম্মুখের মুক্তাপাঁতির কিয়দংশ মাত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া না কি যুবকদের চিত্ত হরণ করে।

লতিকা। (ইংরাজী মিহি সুরে) আমাদের ইন্‌ভিটেশন্ গ্রহণ কোরবার জন্য দৈন্যবাদ। আপনি বি-এ পড়েন? অনরে কি নেচেন?

নন্দ। বাঙ্গলা লিটারেচার।

লতি। লিটরেচর খুব ভাল বিষয়; কিন্তু বেঙ্গলী লিটরেচর তেমন ধনী (রিচ) কি? বাংলা ত what's called dead language সেংস্কৃটের রূপান্তর মাত্রো। সেংস্কৃটের প্রোধান কবি ত কেলিঠাস্? তাঁর সেক্সপীয়ারের ন্যায় what's called—character painting (চরিত্রো চিট্রো) কোরবার শক্তি আছে কি? তা যা হোক, আপনার সোঙ্গে পরিচয় কোরত্তে বড় আহ্লাদিত হয়েছি।

লতিকা আপনার লোকের সঙ্গে স্বাভাবিক বাঙ্গালী সুরেই কথা বলে; কিন্তু নব-পরিচিত 'ভদ্রলোক কিম্বা অন্য স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে কথা কহিবার সময় তাহার এই পোষাকী ও কৃত্রিম সুর ও ভাষা। মিঃ কার্ফর্মা দেখিলেন, নন্দ সেই ভাষা ও সুরের চোটে অস্থির। তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিয়া, লতিকাকে গান গাহিতে বলিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতার সুর তুলিবার অনুপযুক্ত মনে করিয়া যেমন ভারতের কণ্ঠ চিরকাল চাপিয়া রাখা হয়, তদ্রূপ নিজ কণ্ঠ যথাসাধ্য চাপিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে লতিকা গান করিল; এবং নন্দকে একটা গান শুনাইতে অনুরোধ করিল। কিন্নর-বিনিন্দিত কণ্ঠে নন্দ-দুলাল যখন গাহিতেছিল—

কি যে তুমি আমার
বলিতে কি পারি?
বুঝাতে চাই যদি
বচনে যে হারি॥
দরশে পুলক ঝরে,
পরশে অঙ্গ শিহরে,
শ্রবণে উঠে অন্তরে
পিক ঝঙ্কারি॥
ফুটে ফুল নানা জাতি,
গুঞ্জরে ভ্রমর মাতি,
জ্যোছনা হাসি ভাসে রাতি,
ও রূপ নেহারি।
কোথায় রাখি তোমারে,
স্থান নাহি এ সংসারে,
পেতেছি হৃদি মাঝারে,
আসন তোমারি॥" *

তখন সমস্ত ঘরময় "তুমি আমার" কথাগুলি সুর-তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। মিঃ এবং মিস্ কার্ফর্মা ঘন কর-তালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিলেন; এবং বিনোদ রাস্তায় দাঁড়াইয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "পূর্ব্বরাগ পালাটা বেশ জমালে দেখছি!"

* ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

(৪)

কার্ফর্মা-ভবনে এক মাস যাতায়াত করিয়া নন্দ ভাবিতেছে, লতিকা তাহার গান বাজনারই প্রশংসা করিতেছে; কিন্তু ভালবাসার লক্ষণ কোথায়? বরং দুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক বোসকে দেখিয়া লতিকার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তরাগ-রঞ্জিত হইয়াছিল; এবং চক্ষু দুটীতে ভাব সাঁতার খেলিতেছিল। অধ্যাপকের সঙ্গে লতিকার বাগ্দান এক প্রকার স্থির। অভিমানে কার্ফর্মা-ভবনে নন্দদুলালের যাতায়াত যত কমিতে লাগিল, কুস্থানে রাত্রিবাসের মাত্রা তত বাড়িয়া উঠিল। বাড়ীর ও শ্বশুরবাড়ীর চিঠি-পত্র পাওয়া আছে,—কোন উত্তর নাই। স্ত্রী লিখিয়াছে, দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে যে, একখানা চিঠিরও উত্তর নাই। নন্দ ভাবিল, বাস্তবিক, সরলা, পতিপ্রাণা বালিকার অপরাধ কি? তাহাকে তৃপ্ত করিতে হইলে ত প্রবঞ্চনা, তোষামোদ কিম্বা অর্থের প্রয়োজন নাই। অভিমান-প্রতিহিংসা জর্জ্জরিত, শ্রান্ত-ক্লান্ত নন্দের হৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল। সেই দিন বিকালের গাড়ীতেই সে শ্বশুরবাড়ী গিয়া, সকলের আদর-আপ্যায়নে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল। কিন্তু একদিনের বেশি সেখানে মন টিকিল না। "বোস কার্ফর্মাদের জব্দ করিতে হইবে। আমার ত সবই রহিল —সরলা সুন্দরী স্ত্রী, স্নেহ-প্রবণ শ্বশুর শাশুড়ী,—সবই ত আছে। উহাদের সংসার ছারখার করিতে হইবে।"

নন্দ পরদিন কলিকাতায় ফিরিয়া, নরকে অনেকক্ষণ আমোদ-প্রমোদ করিয়া যখন বাড়ী ফিরিল,—কার্ফর্মাদের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠ করিয়া জানিল, পরশ্ব লতিকার জন্মদিন। বিছানায় শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছে, এমন সময় বিনোদ একটী লোক সঙ্গে করিয়া আসিয়া ডাকিল, "নন্দ।" নন্দ ত্রস্তে উঠিয়া দেখিল, বিনোদের হাতে একটী অলঙ্কারের বাক্স। তাহার ভিতর হইতে একগাছা অতি সুন্দর মুক্তা-মালা দেখাইয়া বিনোদ বলিল, "ভাই, আমার এই পরিচিত লোকটী বড়ই বিপদে পড়েছে। তার এখনি একশ' টাকার প্রয়োজন, তাই তোমার নিকট এই বহুমূল্য সুন্দর মুক্তা-মালা মাটির দরে বিক্রি করতে এসেছে। তোমার স্ত্রীর গলায় খুব মানাবে।" নন্দ ঐ দুসমন চেহারার লোকটার মুখের দিকে তাকাইল। লোকটা কেমন অপ্রতিভ হইল। মুক্তামালার প্রকৃত মূল্য এক হাজারের কম নয়। চোরাই মাল বলিয়া সন্দেহ করিলেও, মনে-মনে একটী ফন্দি আঁটিয়া, নন্দ জিনিসটা একশত টাকা দিয়া ক্রয় করিল।

(৫)

"লটি, লটি, শীগগির এসে দেখ, বোস তোকে কি সুন্দর মুক্তার মালা প্রেজেন্ট করেছে। কেমন সুন্দর কাড স্বহস্তে লিখেছে 'প্রেমানুগত সুধীর'।" আজ লতিকার জন্মদিন। সুন্দর পুষ্পলতা ও উজ্জ্বল বিদ্যুৎ আলোকে গৃহটী নন্দন-কাননে পরিণত। দু'দিন পরে বাগ্দান ক্রিয়া। অনেক আত্মীয়-স্বজন নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। সকলেই লতিকার যোগ্য বর লাভে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। লতিকার ব্রীড়াহর্ষ-মিশ্রিত অপাঙ্গ-দৃষ্টি অধ্যাপক সুধীর বোসের অন্তরে আনন্দের ঢেউ তুলিতেছে। টেবিলে কে একখানা খবরের কাগজ রাখিয়া গিয়াছে। একজন বৃদ্ধা তাঁহার কন্যাকে বলিলেন "লীলা, আজ কাগজ পড়া হয় নাই; হেড লাইনগুলি পড় ত।"

লীলা পড়িল—

"ঢাকায় চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র
ছেলেদের দলে দলে কলেজ ত্যাগ
মনোমোহন থিয়েটারে অদ্ভুত মুক্তামালা চুরি।"

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "মুক্তামালা চুরির কথাটা পড় তো।"

লীলা। পরশ্ব রাত্রে মনোমোহন থিয়েটারের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বেদানা অভিনয়ান্তে গাড়ীতে উঠিয়া বাড়ী যাইতে-ছিল। তাহার হাতে ছিল একটা গহনার বাক্স। সে রাত্রে বেদানা একগাছা অতি সুন্দর মুক্তামালা পরিয়া নূরজাহান সাজিয়াছিল। সেই মুক্তামালা খুলিয়া বাক্সে রাখিয়া, দর্শক-বৃন্দের ভিড় ঠেলিয়া যখন গাড়ীতে উঠিল, তাহার হাতে তখন বাক্স নাই। তখনি গাড়ী হইতে নামিয়া যখন বাক্স খুঁজিতে লাগিল—"চোর চোর" বলিয়া একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। একজন বলিল, "মাগীটা কি বোকা,—নিজের এত দামী হার পরবার কি দরকার ছিল?" থিয়েটারের এক জন লোক বলিল "এর মাঝে-মাঝে কেমন ঐ হার পরবার খেয়াল চাপে।" ফোন্ পাইয়া যখন পুলিশ ইন্স্পেক্টার আসিলেন, বেদানা মুক্তাহারের বর্ণনা করিয়া বলিল, এই হার সহজেই সেনাক্ত করা যাইবে। রাজা——তাহাকে

উপহার দিয়াছিলেন। বোড়ের জায়গায় একটা সোণার হরতনের টেক্কা নীলকান্ত মণি গঠিত সাপ-জড়িত। সাপের চক্ষুতে হীরা জ্বলিতেছে। অদ্ভুত কারুকার্য্য—প্রেমাধার হৃদয়ে সর্পের অধিষ্ঠান শিল্পীর কৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছে। হরতনের টেক্কা ফাঁপা! স্প্রিং টিপিয়া খুলিলে, ভিতরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সুন্দর অক্ষরে লেখা "হৃদয় বেদনার ঔষধ বেদানা।"

মুক্তামালার বর্ণনা শুনিতে-শুনিতে, লতিকা বেগুনের বন্ধুদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল; এবং মুক্তামালা খুলিয়া দেখিল, সেই সাপ-জড়ান হরতনের টেক্কা এবং টেক্কার ভিতরে বেদানার নাম। খাস কামরায় ফিরিয়া আসিলে, লতিকার বন্ধুরা লক্ষ্য করিল, তাহার গলা হারশূন্য এবং মুখ রক্তশূন্য।

"লটি, তোর কি অসুখ করেছে?"

এই প্রশ্ন বারম্বার শুনিয়া, লতিকা তাড়াতাড়ি শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল; এবং বলিয়া পাঠাইল, তাহার অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে,—কেহ যেন তাহাকে বিরক্ত না করে। লতিকার এই অকস্মাৎ তিরোভাব এবং অধ্যাপক বোসের ভীতিবিহ্বল মুখ দেখিয়া, নন্দদুলালের জঠরানল দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দীয়তাং দীয়তাং শব্দে সে খানসামা-দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

(৬)

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, লতিকা মুক্তামালা লইয়া বেদানার বাড়ী উপস্থিত। তাহার চেহারা দেখিয়া, বেদানা বলিল, "এত অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনি এই অভাগিনীর গৃহে পদার্পণ করেছেন কেন?" সহানুভূতির কথা শুনিয়া সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। লতিকার চক্ষে শতধারা, হস্তে মুক্তাহার। আজ আর কৃত্রিম সুর নাই। লতিকা বলিল "আপনি অভাগিনীই হউন, আর যাই হউন, আজ আপনি আমার প্রাণদায়িনী হয়ে পুণ্য ও সৌভাগ্য সঞ্চয় করুন। একজন আত্মীয় আমাকে আপনার এই মুক্তামালা উপহার দিয়েছেন। তাকে যদি আপনি জেলে দেন, আমি আত্মহত্যা করব।" এই বলিয়া লতিকা বেদানার পা জড়াইয়া ধরিল। "কি কর, কি কর" বলিয়া বেদানা লতিকাকে তুলিয়া ধরিল; এবং করুণার্দ্র স্বরে বলিল, "বোন, আমরা চরিত্রহীনা বটে, কিন্তু হৃদয়হীনা নই। তা ছাড়া, একজনকে জেলে দিয়ে আমার লাভ কি?" এই বলিয়া লতিকার সাক্ষাতেই পুলিস ইন্‌স্পেক্টারকে লিখিয়া পাঠাইল, "আপনারা মুক্তামালা সম্বন্ধে আর অনুসন্ধান করিবেন না।"

লতিকা যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, নন্দ শুনিতে পাইল, মিঃ কার্ফর্মা চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "সে রাস্কেল্ এলে, তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব। এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমার মেয়েকে একটা চোরাই মাল উপহার!"

লতিকা। চুপ কর বাবা, চুপ কর। সোরগোল ক'রে লাভ কি? কখন কার কি মতি হয়, কেউ বলতে পারে কি?

সেই দিন বিকালে নন্দগোপাল দেখিল, মিঃ কার্ফর্মা কন্যাকে লইয়া দার্জিলিং যাত্রা করিলেন। চিন্তার তরঙ্গ একটার পর আর একটা আসিয়া তাহার অন্তরে আঘাত করিতে লাগিল। "কৌশলে কার্ফর্মা-পরিবারে প্রবেশ লাভ করিয়াছি। আত্মীয়তা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, এমন সময় অধ্যাপক বোস কোথা হইতে আসিয়া মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল। অশান্তির জ্বালা জুড়াইবার জন্য নরকে ডুবিলাম! শান্তি ত পাইলাম না। প্রতিহিংসা শতফণা বিস্তার করিয়া গরল উদ্গীরণ করিল। সেই গরলে কার্ফর্মা-পরিবার জর্জ্জরিত; আমার জ্বালা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত। শান্তি কোথায়? অধ্যাপক বোসের প্রণয়লিপি ডাকপিয়নকে ঘুস দিয়া আদায় করিয়া, তাহার লেখা অনুকরণ করিয়াছিলাম। কেন করিয়াছিলাম জানি না; কিন্তু এই অনুকরণ যখন কাজে লাগিল,—একটা পরিবার পুড়িয়া ছারখার হইল। কেন? তাহারা ত আমার কোন অনিষ্ট করে নাই; আমিই ত তাদের মেয়েটীর সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর সেই পতিপ্রাণা গ্রাম্য বালিকারই বা কি অপরাধ? তাহাকে পায়ে ঠেলিলাম,—কুচরিত্রের বিষে তাহার দেহ জর্জ্জরিত করিলাম। এই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? সেই পুণ্যবতী পতিব্রতার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিব,—তাহাতে যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

ধীরে-ধীরে উঠিয়া নন্দ ঘড়ী দেখিল এবং সন্ধ্যার ট্রেণে শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিল।

(৭)

জরুরী তারযোগে চণ্ডীপুরের ঘোষেরা আমাকে ডাকিয়াছেন। আমি মফস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়াই চণ্ডীপুর রওয়ানা হইলাম। দু'দিন পূর্ব্বে নন্দের স্ত্রী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। ছেলেটী কার্ত্তিকের মতন; কিন্তু চক্ষু দুটী লাল,—পূঁযে ভরিয়া গিয়াছে,—টানিয়া খোলা যায় না। দাই সময়-মত কষ্টিক লোশন দিয়া চক্ষু ধোয়াইলে, এই বিপদ হইত না। ডাক্তার বলিলেন, চক্ষুর অবস্থা ভাল নয়। প্রসূতির ভয়ানক জ্বর ও পেটে বেদনা। ডাক্তার বলিলেন, সেপ্‌টিক্ জ্বর। পূর্ব্বরোগ সম্পূর্ণ সারে নাই। সেই বিষের দরুণ এই সেপ্‌টিক্ জ্বর।

প্রসূতির পেটে এণ্টিফ্লজিষ্টীনের পুল্‌টিস্ লাগাইতেছি, এমন সময় নন্দদুলাল আসিয়া স্ত্রীর কাছে বসিল। তাহার কেশ রুক্ষ, রক্তবর্ণ চক্ষু দুটী কোটরগত, যেন কতকাল স্নান-আহার করে নাই। আমাকে দেখিয়া কি মনে হইল জানি না;—আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "মা, শুনেছি, আপনি অতি পুণ্যবতী ও বিদুষী। আপনার কাছে এই পতিব্রতার সম্মুখে আজ আমি পাপ স্বীকার করব। শুনেছি, পাপ স্বীকার করলে পাপের জ্বালা না কি কমে যায়। আমাকে বাধা দেবেন না। আমার বড়ই কষ্ট হচ্চে।" এই বলিয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল, এবং স্ত্রীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। এত যাতনার মধ্যেই স্ত্রী মধুমাখা স্বরে বলিল, "ছি—ছি, ও কি কথা, আমার কাছে তোমার আবার অপরাধ কি? আর ক্ষমার কথাই বা কেন?" তবে ঐ খৃষ্টান মেয়েটার যাতে ভাল হয় তাই কর।" আমি বলিলাম, "নন্দ, যা হবার তা হয়েছে; এখন ক্ষমা করবার মালিক ভগবান,—তাঁকে সব কথা জানাও। আর ঐ যে মেয়েটী, প্রতারণা ক'রে যার সর্ব্বনাশ ক'রতে গিয়াছিলে, এবং প্রতিহিংসার আগুনে যাকে পুড়িয়েছ, এবং নিজেও পুড়চ, সেই মেয়েটিকে সব খুলে চিঠি লেখ। তাদের ভাঙ্গা সংসার আবার যোড়া লেগে যাক। এই সরলা পতিব্রতার কথাও বলি। এত ত যাতনা; কিন্তু তোমার জন্য ভাবনার বিরাম নাই। একে আর কষ্ট দিও না। ভগবানের কৃপায় সে রোগ মুক্ত হোক; আর বাড়ীতে থেকে তুমিও চিকিৎসা করাও। এ যে ভয়ানক রোগ,—ছাড়িয়াও ছাড়ে না।"

নন্দদুলাল শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া চিকিৎসা করাইতেছে। এক মাস পরে একদিন হাসিতে-হাসিতে একখানা সংবাদপত্র হাতে লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িয়া শুনাইল।

"পারিবারিক ঘটনা—রেঙ্গুনের মিঃ কার্ফর্মার কন্যা মিস্ লতিকা কার্ফর্মার সহিত অধ্যাপক সুধীর বসুর শুভ বিবাহ ব্যাপটিষ্ট মিশন চার্চ্চে ১১ই ডিসেম্বর শনিবারে সম্পন্ন হইয়াছে।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

তুলসীদাসজীর তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা

[শ্রীসীতেশচন্দ্র সান্যাল]

শিষ্য একদিন তাঁহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কে সন্তি সন্তোঽখিল বীতরাগা অপাস্তমোহা শিবতত্ত্বনিষ্ঠা। ১।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের মণিরত্নমালা।

সাধু কে? সাধু কাহাকে বলে?

গুরুদেব বলিলেন—সমস্ত বিষয়ে * যিনি বীতরাগ হইয়াছেন, যিনি মোহশূন্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই সাধু।

শিষ্য আর একদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কো গুরুরধিগত-তত্ত্বঃ সততম। ২।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের প্রশ্নোত্তর রত্নমালিকা।

গুরু কে?

গুরুদেব বলিলেন—যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা শিষ্যের হিতসাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই প্রকৃত গুরুপদের প্রতিপাদ্য।

* শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয়।

শিষ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং দুর্লভং সদ্গুরুরস্তি লোকে সৎসঙ্গতির্ব্রহ্ম বিচারণাচ। ২৮।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের মণিরত্নমালা।

দুর্লভ কি?

গুরুদেব বলিলেন—সংসারে সদ্গুরু, সাধুসঙ্গ ও ব্রহ্মবিচারণা সুদুর্লভ।

দীর্ঘকাল সাধুসঙ্গ হইলে ত কথাই নাই,—ক্ষণকালও কাহারো ভাগ্যে যদি সাধুসঙ্গ ঘটে, তবে সে সংসার-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই; কেন না কেবল সাধুসঙ্গই যে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ।

ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা। ৪।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর।

সংসার বলিতে জন্ম ও মৃত্যু। সংসারী ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যুর অধীন, বিষয়ের অধীন, মোহাচ্ছন্ন, জ্ঞানহীন। যিনি যে বিষয়ের অধিকারী, সেই বিষয় বা পদার্থ লাভ করিতে হইলে, তাঁহারই কাছে যাওয়া কর্ত্তব্য,—অনধিকারীর নিকট নয়। জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সদবস্তু লাভ করিতে হইলে, তত্ত্বজ্ঞের নিকট, সদ্গুরুর নিকট যাওয়া কর্ত্তব্য,—সংসারী ব্যক্তির নিকটে নয়। কিন্তু সদ্গুরু ও সাধুসঙ্গ সংসারে সুদুর্লভ।

সুদুর্লভ হইলেও, সৌভাগ্যক্রমে তুলসীদাসজীর পক্ষে সুলভ হইয়াছিল।

১৫৮৯ সম্বতে অভুক্তমূল নক্ষত্রে তুলসীদাসজী জন্মগ্রহণ করেন। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে পিতার অনিষ্ট আশঙ্কা থাকে। সুতরাং তুলসীদাসের জনক-জননী অনিষ্টের আশঙ্কায় শিশু তুলসীকে পরিত্যাগ করেন। সৌভাগ্যক্রমে একটী সাধু শিশুকে আশ্রয় দেন। এই সাধুর নিকট তুলসীদাস পরে অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিয়া তাঁহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া তুলসীদাসজী অদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শ্রীরামচন্দ্রময় দেখিতেন, অনুভব করিতেন, সেই সুদুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যা—"ব্রহ্মবিচারণা" তুলসীদাসজী লাভ করিয়াছিলেন "অখিলবীতরাগ আপস্তমোহা শিবতত্ত্বনিষ্ঠঃ", অধিগততত্ত্বঃ শিষ্য-হিতায়োদ্যতঃ" এই সাধু—গুরুদেবের সমীপে।

তুলসীদাসজী স্বয়ং বলিয়াছেন—

বিনু সৎসঙ্গ ন হরিকথা তেহি বিনু মোহা ন ভাগ।
মোহ গয়ে বিনু রামপদ হোয় দৃঢ় অনুরাগ ॥ ৮৫ ॥

উত্তরাকাণ্ড।

সৎসঙ্গ ব্যতীত হরিকথা শোনা ঘটে না; হরিকথা ব্যতীত মোহ দূর হয় না, মোহ দূর না হইলে শ্রীরামপদে দৃঢ় অনুরাগ জন্মে না।

শ্রীরামচন্দ্রই তুলসীদাসজীর ব্রহ্ম। তাহার প্রমাণ তুলসীদাসজীর স্বীয় উক্তি।

জড় চেতন জগজীব যে, সকল, রামময় জানি।
বন্দৌ সবকে পদকমল, সদা যোরি যুগপাণি ॥ ১০ ॥

বালকাণ্ড।

সিয়ারামময় সব যুগ জানি।
করৌ প্রণাম যোরি যুগপাণি ॥

বালকাণ্ড।

জড় চেতন যাবতীয় বিশ্বজীবকে আমি শ্রীরামচন্দ্রময় জানি। অতএব যুক্তকরে সদা সকলেরই বন্দনা করি।

নিখিল জগৎ সীতারামময় জানি। করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।

ধ্যান ন পাবহিঁ যাহি মুনি, নেতি নেতি কহ বেদ।
কৃপাসিন্ধু সোই কপিন্ সো, করত অনেক বিনোদ ॥ ৭৩ ॥

লঙ্কাকাণ্ড।

যাঁহাকে মুনিগণ ধ্যানে আনিতে পারেন না, যাঁহার বিষয়ে বেদের উক্তি "নেতি, নেতি,, (ইহা না, ইহা না), সেই কৃপাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র কপিগণসহ কত আনন্দই করিতেছেন!

শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা বর্ণনায় তুলসীদাসজী বালকাণ্ডে একটী অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়াছেন। একদিন শিশু রামকে ঘুম পাড়াইয়া মাতা কৌশল্যা দেবী ইষ্ট পূজা করিতে বসেন। পূজা সমাপনান্তে তিনি রন্ধনশালায় গিয়াছেন। রন্ধনশালায় কৌশল্যা দেবী শিশুকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া ভাবিলেন—"এ কি? এই মাত্র দেখিয়া আসিলাম, বালক ঘুমাইতেছে। এখানে কখন, কেমন করিয়া আসিল?" কৌশল্যা দেবী শয়ন-কক্ষে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন, বালক নিদ্রিত। কৌশল্যা দেবী পুনরায় রন্ধনশালায় গিয়া বালককে পুনরায় সেখানে দেখিয়া ভীতা, চমকিতা হইলেন। একই সময়ে, একই বালককে, পৃথক-পৃথক গৃহে দেখিয়া মা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। মা চিন্তাকুল হইলেন; মার মন সন্তানের অমঙ্গল গণিল। মার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, কাঁদিয়া উঠিল। তখন মৃদু হাসি হাসিয়া—

দিখাওয়া মাতহি নিজ, অদ্ভুত রূপ অখণ্ড।
রোম রোম প্রতি লাগে, কোটি কোটি ব্রহ্মণ্ড ॥

নিজের অদ্ভুত, অখণ্ড রূপ, যাহার লোমে লোমে কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, মাতাকে সেই রূপ বালক দেখাইলেন।

কৌশল্যা যব বোলন যাই।
ঠুমকি ঠুমকি প্রভু চলহিঁ পরাই।
নিগম নেতি শিব অন্ত ন পাওআ।
তহি ধরৈ জননী হঠি বাওআ ॥

বালকাণ্ড—২২৭, ২২৮।

তখন কৌশল্যা দেবী যতই কথা কহিতে যাইতেছেন, প্রভু ঠুমকি-ঠুমকি ততই পলায়ন করিতেছেন। নিগম, নেতি নেতি,

শঙ্কর যাঁহার অন্ত পান নাই, তাঁহাকে ধরিবার জন্য জননী ধাবমানা !

ব্যাপক ব্রহ্ম নিরঞ্জন, নিগুর্ণ বিগত বিনোদ।
সো-অজ, প্রেম ভক্তি বশ, কৌশল্যা-কী গোদ ॥

বালকাণ্ড। ২২৪।

নিগুর্ণ, ব্যাপক, নিরঞ্জন, অজ, প্রেম ভক্তির অধীন ব্রহ্ম, ঐ দেখ, কৌশল্যার ক্রোড়ে !

এই প্রকার অনুভূতির উক্তি বিস্তর আছে।

কিন্তু কেবল কি সাধু গুরুর প্রভাবেই তুলসীদাসজীর ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মদর্শন লাভ হইয়াছিল ?

সাধু-সঙ্গ করিলে বৈরাগ্য আসে, চিত্ত শুদ্ধ, স্থির আসক্তিশূন্য ও কামনাশূন্য হয়।

বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্। ৩৭।
পাতঞ্জল। সমাধিপাদঃ।

কিন্তু তুলসীদাসজীর চিত্তকে আসক্তিশূন্য ও বাসনাশূন্য, শুদ্ধ ও নির্ম্মল করিবার প্রধান ও একমাত্র সহায় কে? তুলসীদাসজীর চিত্ত আসক্তিশূন্য ও বাসনাশূন্য, শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইতেছে কি না, বারবার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কে ? তুলসীদাসজী ক্রমে-ক্রমে মোহশূন্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতেছেন কি না, তৎপ্রতি সতত প্রখর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন কে? তুলসীদাসজীর জীবনী আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, তাঁহার আসক্তি, মোহমায়া নাশের মূলে দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহার জায়া রত্নাবলী দেবী

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিশু তুলসীদাসকে তাঁহার পিতা-মাতা ত্যাগ করিলে, জনৈক সাধু শিশুকে আশ্রয় দেন। কিছুকাল পরে এই সাধুই তুলসীদাসকে তাঁহার পিতামাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। যথাকালে তুলসীদাসজী দারপরিগ্রহ করেন। স্ত্রীর নাম রত্নাবলী। রত্নাবলী রূপে-গুণে অসামান্যা—অধিকন্তু রামভক্ত। রত্নাবলীর পিতাও রামভক্ত। তুলসীদাসজী রত্নাবলীর প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত হইয়া পড়েন। পত্নীর প্রতি প্রেম ও আসক্তি ক্রমে এতদূর দৃঢ় ও গাঢ় হইল যে, তিনি এক মুহূর্ত্তও রত্নাবলীর অদর্শন বা বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন না।

একবার স্বামীর অনুমতি লইয়া পত্নী শিবিকারোহণে পিতৃগৃহে যান। পত্নী চলিয়া গেলে, পতি কেবল গৃহ নয়, যেন সংসার শূন্য দেখিলেন। তিনি আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলেন না। পদব্রজে শ্বশুরালয় অভিমুখে ছুটিলেন। পত্নীর শিবিকা তাঁহার পিতৃভবনে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, পতি শ্বশুরালয়ে যাইয়া উপস্থিত। পত্নী তাঁহাকে দেখিয়া প্রেম-উপহাস বচনে বলিলেন—

লাজ ন লাগত আপুকি দৌড়ে আয় হো সাথ।
ধিক্ ধিক্ এয়সে প্রেমকী, ক্যা কহুঁ ময় নাথ ॥
অস্থিচর্ম্মময় দেহ মম, তাসোঁ যেয়সী প্রীত।
তৈসী যো শ্রীরাম মহঁ, হোত ন তৌ ভবভীত ॥

তুমি সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়িয়া আসিলে, প্রিয়তম ? তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না ? কি আর বলিব নাথ ! ধিক, শতধিক এমন প্রেমকে ! অস্থিচর্ম্মময় আমার এই দেহের উপর তোমার যত প্রেম, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তোমার তত প্রেম থাকিলে ভব-ভয় থাকিত না।

পত্নীর মধুর ভৎর্সনায় পতির আত্মগ্লানি হইল, চৈতন্য হইল। যে জ্ঞান-বহ্নি সংসার-ভস্মে এতদিন আচ্ছাদিত ছিল, পত্নীর সুস্নিগ্ধ বচন-সমীরণ পাইয়া তাহা ধিকি-ধিকি জ্বলিয়া উঠিল। তুলসীদাসজী রত্নাবলীর দিকে আর চাহিলেন না, গৃহেও ফিরিলেন না। একেবারে চলিয়া গেলেন কাশীধামে। সেখানে যাইয়া ৺বিশ্বনাথের আরাধনা আরম্ভ করিলেন।

বিনতী কিয় বিশ্বেশ্বর পাহী।
রামভক্তি দিজৈ মোহি কাহী ॥

"শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তি হউক, হে বিশ্বনাথ, তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা। হে প্রভো ! নিয়ত মুমূর্ষু জীবের কর্ণ-বিবরে তারক-ব্রহ্ম নাম ঢালিয়া দিয়া তাহার মুক্তির বিধান করিয়া থাক। হে বিশ্বনাথ ! সেই তারক-ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তি জন্মাইয়া দাও।" আরাধনায় ৺বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইলেন। প্রসন্ন হইয়া তিনি তুলসীদাসকে বলিলেন "হরিভক্ত হরের অতি প্রিয়। ভোলা যে নামে ভুলিয়া আছে, তুমিও সেই নামের ভিক্ষুক ! বল তুলসীদাস, তুমি কখনও কাশী ত্যাগ করিবে না ?" তুলসী বলিলেন—"হে কাশীনাথ ! হে দয়াময় দীনবন্ধো, শিব শম্ভো ! দয়া করিয়া তুমি যাহাকে তোমার পুণ্য পবিত্র কাশীধামে স্থান দাও, সেই ভাগ্যবান কাশীতে বাস করিতে পায়। আমার কাশী বাস করা, সে ত, দয়াময়, তোমারই দয়া, আর আমার ভাগ্য।" ৺কাশীনাথ তুষ্ট, প্রীত হইলেন।

কাশীতে এক বদরী-বৃক্ষ-শাখায় এক প্রেত বাস করিত। একদিন এই প্রেত তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি চাও ?" তুলসী বলিলেন—"তোমার পরিচয় না পাইলে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।" প্রেত নিজের পরিচয় দিলে, তুলসী বলিলেন,—"আমি রাম দর্শন ভিন্ন আর কিছুই চাই না। রাম দর্শনের কোন উপায় তোমার জানা থাকিলে আমায় বল।" প্রেত বলিল—"যেখানে রামায়ণ-কথা হইয়া থাকে, সেই-খানে সকলের পশ্চাতে একটী অতি দুঃখী, দরিদ্র, দীন-হীন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে। রামায়ণ-কথা শেষ হইলে, সকল শ্রোতা চলিয়া গেলে, শেষে সেই ব্যক্তি উঠিয়া মন্দগতিতে চলিয়া যায়। সেই ব্যক্তি পবন-কুমার রামভক্ত হনুমান। তাঁহারই সাহায্যে তোমার শ্রীরাম দর্শন ঘটিবে।"

পরের দিন রামায়ণ-কথা শেষ হইয়াছে। শ্রোতৃমণ্ডলী ক্রমে ক্রমে স্ব-স্ব গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বশেষে পবন-নন্দন ধীরে-ধীরে যাইতে-ছেন। এমন সময়ে তুলসীদাস যাইয়া হনুমানের চরণ-তলে পতিত হইলেন। "ছুঁইয়ো না, ছুঁইয়ো না, আমায় ছাড়িয়া দাও"—হনুমান বলিলেন। তুলসীদাস কিছুতেই চরণ ছাড়িলেন না। "শ্রীরাম দর্শন না পাইলে কিছুতেই তোমার চরণ ছাড়িতেছি না। বহু ভাগ্যে তোমার

চরণ পাইয়াছি। আমার অভীষ্ট সিদ্ধির তুমিই একমাত্র উপায়।" শ্রীরামভক্ত মারুতী তুষ্ট হইয়া তুলসীদাসকে নিজ রূপ দেখাইলেন ; এবং শ্রীরাম দর্শন জন্ম তাঁহাকে চিত্রকূটে যাইতে বলিলেন। তুলসীদাস নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ৺বিশ্বনাথ দর্শন করিতে গেলেন। তার পর চিত্রকূটে যাইয়া তুলসী একটী শিলার উপরে বসিলেন। শ্রীরাম দর্শন জন্ম তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল, চিত্ত তন্ময়। সেই সময়ে পীতবসন, সুন্দর-তনু দুইটী কুমার তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে তুলসীর সামনে দিয়া মৃগয়ায় চলিয়া গেলেন। পবন-সুত তখন তুলসীদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাম দর্শন হইল কি ? যে কুমার-যুগল এইমাত্র অশ্ব-পৃষ্ঠে চলিয়া গেলেন, তাঁহারাই রাম-লক্ষ্মণ।" তুলসীদাস বলিলেন—"হায়, হায়, তাঁহারাই রাম-লক্ষ্মণ ? আমার নয়ন ভাল করিয়া তাঁহাদের দেখিতে পাইল না—নয়নের তৃপ্তি হইল না ; অভিলাষ পূর্ণ হইল না।"

"অবৈ ন পুর ভই অভিলাষা।"

পর দিবস প্রত্যুষে তুলসীদাস চিত্রকূটের ঘাটে স্নান করিয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে দুইটী কুমার সেখানে আসিয়া তুলসীদাসকে বলিলেন—

কহেও দেউ চন্দন মোহি বাবা।
তুলসীদাস তব সহজহি গাবা ॥
চন্দন দেহু চরচি অঙ্গ মাহী।
রাম-লক্ষ্মণ তুম হোকী নাহী ॥

"বাবা, আমাদের চন্দন মাখাইয়া দাও।" তুলসী বলিলেন—"বাবা, তোমাদের অঙ্গে চন্দন মাখাইয়া দিতেছি,—আগে বল, তোমরা রাম-লক্ষ্মণ দুইটী ভাই কি না।"

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—

বালক কহে সাধু জগ জেতে।
রাম লক্ষ্মণ কী মূরতি তে তে ॥

জগতের সাধুজন এই যুগল মূর্ত্তিকে রাম লক্ষ্মণের মূর্ত্তি বলিয়া থাকেন।

ধন্য, তুলসীদাসজী মহারাজ, ধন্য! তোমার ঐ এক কথা—"রাম-লক্ষ্মণ তুম হোকী নাহী"—এবং তদুত্তরে বালকের উক্তি—"রাম-লক্ষ্মণ কী মূরতি তে তে"—শ্রুতির—"নেতি নেতি" বাক্যে মধুর মিলন ঘটাইয়া দিল; অবাঙ্‌মনসগোচর অব্যক্ত ব্রহ্মকে জগতের সমক্ষে ব্যক্ত, প্রকটিত করিয়া দিল ; অন্ধ, অভক্ত, অবিশ্বাসী জনের চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দিল। বলিহারি ভক্তি, বলিহারি ভক্ত কর্ত্তৃক ভগবানের পরীক্ষা, বলিহারী ভক্তের নিকট ভগবানের আত্ম-পরিচয় প্রদান, আত্ম-সমর্পণ !

দর্শন পাইয়া তুলসীদাসজী যে দোহা গাহিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা প্রতি হিন্দুস্থানী নর-নারী—প্রতি হিন্দুস্থানীর পোষা তোতা পাখীর কলকণ্ঠ হইতে উদ্গীত হইতেছে—যাবৎ জগতে রামভক্ত হিন্দুস্থানী নর-নারী থাকিবে, তাবৎ সেই অমৃতগাথা তাহাদের মুখ হইতে মুখরিত হইতে থাকিবে।

চিত্রকূটকে ঘাট মেঁ ভৈ সাধুন কী ভীর।
তুলসীদাস চন্দন ঘিসে, তিলক করে রঘুবীর ॥

চিত্রকূটের ঘাটে সাধু সমাগম হইল। তুলসীদাস চন্দন ঘষিলেন, আর রঘুবীরকে তিলক দিলেন।

তার পর একদিন—

রথ সওআর প্রভু চারিহু ভাই।
করত পবনসুত পদ সেবকাই—
তুলসীদাস তব আরতি সাজা।
লখয়ো নয়নভরি রঘুকুল রাজা ॥
দৈ পরদক্ষিণ বিহ্বল ভয়উ।
রঘুপতিকরপঙ্কজ শির দয়উ ॥
য়হি বিধি প্রগট দরস তব পায়ো।
অওরনকো নহিঁ ভেদ লেখায়ো ॥

প্রভু চারি ভাই রথে বসিয়া আছেন। পবন কুমার পদ সেবা করিতেছেন। তুলসীদাস আরতি সাজাইয়া রঘুকুল-রাজাকে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিলেন। ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে প্রদক্ষিণ করিয়া রঘুপতি-করপঙ্কজে মস্তক নত করিলেন। এই প্রকারে তুলসীদাস প্রকট দর্শন পাইলেন, অপর কেহ তাহা পান নাই।*

* প্রথমে নারদ মুনির ভাগ্যে এই প্রকার রূপ-দর্শন ঘটে। একদিন গোলোকে বিষ্ণুর ইচ্ছা হইল চারি-অংশে প্রকাশ হইতে।

গোলোকে বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর।

* * * *

নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলী।
বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী ॥
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হইলা নারায়ণ ॥
লক্ষ্মী মূর্ত্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে।
স্বর্ণ ছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে ॥
চামর ঢুলান তাঁরে ভরত শত্রুঘ্ন।
যোড়হাতে স্তব করে পবন নন্দন ॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
হেন কালে চলিলা নারদ মুনিবর ॥
বীণা যন্ত্র হাতে করি হরি গুণ গান।
উত্তরিল গিয়া মুনি প্রভু বিদ্যমান ॥

যাঁহাকে পাইলে আর কিছু প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য থাকে না, আজ তাঁহাকে পাইয়া তুলসীদাস সংসার ছাড়িলেন, সন্ন্যাসী হইলেন, রামনামে মজিলেন।

সন্ন্যাসী হইবার পর তুলসীদাসজী একদিন তাঁহার পত্নীর একখানি পত্র পাইলেন। পত্নী লিখিতেছেন—

কটিকী খীনী কনকসী রহত সখিন সঙ্গ কোই।
মোহি ফাটে কি ডর নহি, অনত তটে ডর হোই॥

সখিগণসহ কনকবরণী, ক্ষীণকটি আমি বাস করিতেছি। আমার বুক ফাটে ফাটুক, তাহাতে ভয় নাই; ভয়, পাছে তুমি অন্য রমণীর প্রেমে পড়।

তুলসীদাসজী উত্তর দিলেন—

কটে এক রঘুনাথ সঙ্গ, বান্ধি জটা শির কেশ।
হম তো চাখা প্রেমরস, পত্নীকে উপদেশ॥

মাথায় জটা বান্ধিয়া একমাত্র রঘুনাথের সঙ্গেই আমি দিন কাটাইতেছি। পত্নীর উপদেশে আমি প্রেমরসের আস্বাদন পাইয়াছি।

পত্র পাইয়া পত্নী আশ্বস্ত হইলেন; আর প্রাণ ভরিয়া উদ্দেশে পতির চরণবন্দনা করিলেন। সন্ন্যাসী হইবার পর পত্নীর নিকট পতির এই প্রথম পরীক্ষা।

তার পর বহু বর্ষ কাটিয়া গেল। তুলসীদাসজী এখন বৃদ্ধ। তাঁহার জীবন এখন রামময়। অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ, সমস্তই রামময়। পিতা, মাতা, জায়া, গৃহ, ধন, সম্পত্তি—সমস্তই মন হইতে এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। অন্তরে, বাহিরে, মনে, মুখে কেবল রাম। তিনি যেখানেই যান, আর যেখানেই অবস্থান করুন, রাম তাঁহার অগ্রে, রাম তাঁহার পশ্চাতে, রাম তাঁহার পার্শ্বে, রাম তাঁহার সঙ্গে, রাম তাঁহার ঊর্দ্ধে, রাম তাঁহার অধে।

নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া একদিন দৈবাৎ তুলসীদাসজী আপনার শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুকাল পূর্ব্বে বিরহ-কাতর তরুণ তুলসীদাস যেখানে আসিয়া পত্নীর উপদেশে প্রেমরসের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, তপস্বী তুলসীদাসজী দৈবাৎ আজ সেই শ্বশুরালয়ে পুনরাগত। রত্নাবলী এখন বৃদ্ধা। তিনি এখন তাঁহার পিতৃ-ভবনে বাস করিতেছেন। পতি-পত্নী কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছেন না। রত্নাবলী অতিথি-সৎকার করিতেছেন। অতিথি বৈষ্ণব—স্বহস্তে রান্ধিবেন। রান্ধিবার দ্রব্যাদি রত্নাবলী আয়োজন করিয়া দিলেন। দুই-এক কথার স্বর রত্নাবলী বুঝিতে পারিলেন, চিনিতে পারিলেন—অতিথি তাঁহার ইহকাল ও পরকালের পরম আরাধ্য দেব। রত্নাবলী ধৈর্য্য ধরিলেন, আত্ম-গোপন করিলেন; আর আরম্ভ করিয়া দিলেন পতির পরীক্ষা।

রত্নাবলী—মরিচ আনিয়া দিব কি?

তুলসীদাসজী—না থাক, আমার ঝুলিতেই আছে।

র— একটু ঝাল আনিয়া দিব কি?

তু— না, তাহাও আমার ঝুলিতে আছে।

র— একটু কর্পূর দেই?

তু— না, তাহাও আমার ঝুলিতে আছে।

পরে রত্নাবলী অতিথির চরণসেবা করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতিথি নিষেধ করিলেন। রত্নাবলী ক্ষুণ্ণ হইলেন। তখন তিনি অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্রশ্ন— আপনি কি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না?

উত্তর— না।

প্রঃ— আপনি এখন কাহার বাড়ীতে আছেন বলিতে পারেন কি?

উঃ— না।

প্রঃ— এই স্থানের নাম কি, জানেন?

উঃ— না।

রত্নাবলী দেখিলেন পূর্ব্বের কোন কথাই স্বামীর এখন মনে হইতেছে না। তখন তিনি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন; এবং স্বামীসঙ্গ প্রার্থনা করিলেন। পত্নীর নিকট পতির এই দ্বিতীয়বার পরীক্ষা। পতি সঙ্কটে পড়িলেন। রামসঙ্গ ছাড়িয়া পত্নীসঙ্গ ধরিবেন, না, পত্নীসঙ্গ উপেক্ষা করিয়া রামসঙ্গ লইয়াই থাকিবেন। একসঙ্গে পরস্পর-বিরুদ্ধ দুই সঙ্গ ধরিয়া থাকা অসম্ভব।

যহাঁ রাম তহাঁ নহি কাম যহাঁ কাম তহাঁ নহি রাম।
রবি রজনী দোনো নহি বসে এক ঠাম॥

যেখানে রাম সেখানে কাম থাকিতে পারে না; আর যেখানে কাম সেখানে রাম থাকিতে পারেন না। রবি ও রজনী দুই একসঙ্গে বাস করিতে পারে না।

তুলসীদাসজী অবিলম্বে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন—পত্নীর প্রার্থনায় অসম্মতি জানাইলেন। পত্নী হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া বলিলেন—

খরিয়া খরী কপূর লোঁ উচিত ন পিয় তিয়ত্যাগ।
কৈ খরিয়া মোহি মেলিকৈ অচল করৌ অনুরাগ॥

যখন তোমার ঝুলিতে খরী হইতে কর্পূর পর্য্যন্ত নানা দ্রব্য স্থান পাইল, তখন প্রিয়তম তোমার স্ত্রীকে তোমার ত্যাগ করা উচিত হইতেছে না। হয় আমাকেও তোমার ঝুলির মধ্যে একটু স্থান দাও, নয় সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভগবানে অচল অনুরাগী হও।

এ কি? এ নূতন আলোক আমায় আজ কে দেখাইয়া দিল? আমার চিত্তের মলিনতা আজ কে মুছাইয়া দিল? কে বলে তুলসীদাস জ্ঞানী? কে বলে তুলসীদাস ভক্ত? কে বলে তুলসীদাসের জীবন রামময়? ঝুলি থাকিতে তুলসীদাস বৈরাগী, সন্ন্যাসী? রত্নাবলী, তোমার নিকট আজ আমি আবার জ্ঞান পাইলাম, আমার চৈতন্য হইল,

---

রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে।
বদন তিতিল তাঁর নয়নের নীরে॥
হেন রূপ কেন ধরিলেন নারায়ণ।
ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

চক্ষু ফুটিল। তুমি অতি উচ্চে, আমি অতি নিম্নে। তুমি যেখানে গিয়াছ, রত্নাবলী, আমি আজিও সেখানে যাইতে পারি নাই। কেন যাইতে পারি নাই, বুঝিতাম না। ঝুলি—আসক্তির এই শেষ বস্তু টুলিটী ত্যাগ করিব; রত্নাবলী,—তোমায় তাহার মধ্যে ভরিব না। দ্বিজবর! নারায়ণ! গ্রহণ কর দাস তুলসীর এই ঝুলি। এই বলিয়া সেই একটা মাত্র সম্বল ঝুলিটী সমীপবর্ত্তী একটা ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিয়া, তুলসীদাসজী রাম নাম গাইতে গাইতে, ধ্যান করিতে করিতে, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিন পর অর্থাৎ—

সম্বত ষোলহ শয় অশী, অসিবরণাকে তীর।
শাবণ শুক্লা সপ্তমী, তুলসী তজয়ো শরীর;

১৬৮০ সম্বতে শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষে সপ্তমী তিথিতে কাশীধামে অসিতীরে তুলসী তনু ত্যাগ করেন।

কফিন্ (Caffeine)

[শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত বি-এস্‌সি]

নেশাকে আমরা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি; সুরাযুক্ত (alcoholic) এবং সুরাশূন্য (non-alcoholic)। মদ প্রথমোক্ত বিভাগে, আর চা, কফি, কোকো প্রভৃতি দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে। মদের মধ্যে সাধারণত Ethyl alcohol [$C_2H_5(OH)$] বলিয়া একটা পদার্থ থাকে; এই জন্যই মদ উত্তেজক। কারণ, Ethyl alcohol অতি সহজে এবং অতি দ্রুত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল এবং কারবন্-ডায়ক্সাইড্ (carbon dioxide) গ্যাসে পরিণত হয় [$C_2H_5(OH)+3O_2=3H_2O+2CO_2$]। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়; এবং এই তাপ শরীরের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া অবসাদগ্রস্ত শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করে। শরীরের মধ্যে এই রাসায়নিক ক্রিয়ার বিশেষত্ব এই যে কারবন্ ডায়ক্সাইড্ প্রস্রাবের একটা অংশ, —কাজেই উত্তাপটা অন্য কাজে বড় বেশী ব্যয়িত হয় না; এবং ইহার অধিকাংশই শরীরকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয়।

চা, কোকো প্রভৃতি দ্বিতীয় ধরণের উত্তেজক পানীয়। ইহাদের মধ্যে কফিন্ (Caffeine) বা থিয়োব্রোমিন্ (Theobromine) বলিয়া একরকম পদার্থ আছে। ইহাদের গঠন-প্রণালী প্রায় প্রস্রাবস্থ ইউরিক্ এসিডের (uric acid) মত। শরীরের মধ্যে যাইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে ইহারা সহজেই ইউরিক্ এসিডে পরিণত হয়; এবং এই রাসায়নিক ক্রিয়াজনিত উত্তাপের অতি অল্পই অন্য কাজে ব্যয়িত হয়। তাহার ফলে অতি সহজেই চা, কফি প্রভৃতি শরীরকে উত্তেজিত করিতে পারে। তবে অতিরিক্ত চা পান হেতু লোকে যে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভোগে, তাহার কারণ, তাহারা চা পান বিষয়ে অজ্ঞ। কফিন ভিন্ন চাতে ট্যানিন্ বলিয়া আর একটা জিনিস আছে। অনেকক্ষণ গরম জলে চা ভিজাইয়া রাখিলে, কফিনের পর এই ট্যানিন্ বহির্গত হইতে থাকে। ট্যানিন্ পরিপাক শক্তি কমাইয়া দেয়; কাজেই ডিস্‌পেপসিয়া আসে। শুধু যদি কফিন্‌টুকু পান করা যায়, তবে ডিসপেপ্‌সিয়া আসিতে পারে না। গরম জলে চা ভিজাইলে, প্রথম তিন চার মিনিটে যে আরক বাহিরে আসে, তাহাতেই কফিন্ থাকে; পরে ট্যানিন্ আসিতে থাকে। সুতরাং চা তৈরী করিতে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক।

কফিন্ একটা আল্‌কলয়েড্ (alkaloid); আল্‌কলয়েডের বিশেষত্ব—ইহার মধ্যে নাইট্রোজেন ও একটা গাছড়া এসিড (plant acid) আছে। কফিনের এসিডের নাম বোহিক্ এসিড (Boheic)। খাস আলকলয়েডের গঠন প্রণালী

$$CO\left\{\begin{matrix} NCH_3.CO.C.NCH_3 \\ \| \\ NCH_3.—C—N \end{matrix}\right\}CH$$

ইহা হইতে ইউরিক এসিডে যাওয়া এক ধাপ মাত্র। কাজেই ইউরিক এসিডে যাইতে আল্‌কলয়েডের অধিক শক্তির দরকার হয় না। এবং আল্‌কলয়েড্ হইতে ইউরিক এসিডের মধ্যে রাসায়নিক পরিক্রিয়াজনিত উত্তাপটার অধিকাংশই শরীরকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয়। এজন্যই চা, কফি প্রভৃতি অতি সহজেই শরীরকে গরম করে। কফিন্ হইতে ইউরিক এসিডে যাইতে হইলে মাঝে আর একটা পদার্থ সৃষ্ট হয়; তাহার নাম Theobromine (থিয়োব্রোমিন)। কোকোর মধ্যে এই জিনিসটা আছে; এজন্য কোকোও একটা উত্তেজক পানীয়।

আসল কফিন্ দেখিতে পেঁজাতুলার মত সাদা, মসৃণ রেশমের সূঁচের মত। ডাক্তারগণ সাধারণতঃ সাইট্রেট করিয়া ইহাকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কফিনও আজকাল খুব তৈরী হইতেছে। যে সমস্ত চা পানের উপযোগী নয়, কফিন প্রস্তুত করিতে তাহাই ব্যবহৃত হয়। চায়ের পাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া কফিন ও ট্যানিন আলাদা করিয়া লওয়া হয়,—বেশী করিয়া লেড এসিটেটের (lead acetate) জল ঐ গরম জলে দিলে পরে লেড ট্যানেটের তলানী নীচে পড়ে। ফিল্টার করিয়া সেই সলিউসনের মধ্য দিয়া Sulphuretted hydrogen প্রবেশ করান হয়। তাহাতে বাকী লেড এসিটেট্, সলফাইডের তলানী হইয়া পড়ে। পুনর্ব্বার ফিল্টার করিয়া সেই সলিউসন অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে, সূঁচের মত কফিনের ক্রীষ্টাল পাওয়া যায়।

বেশী পরিমাণে কফিন প্রস্তুত করিতে হইলে, সাধারণতঃ এই নিয়ম ব্যবহৃত হয় না। চায়ের পাতাকে গুঁড়া করিয়া, তাহার সহিত ম্যাগনেসিয়া (magnesia) মিশ্রিত করা হয়; এবং পরে ফুটন্ত ক্লোরোফর্ম্ম সাহায্যে কফিন আলাদা করিয়া লওয়া হয়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় চূণ, ক্যালসিয়াম ট্যানেটের তলানী হইয়া পড়ে; এবং এইরূপে ট্যানিন্ তাড়ান হয়। রং ফিরাইবার জন্য সলিউসনকে বারংবার হাড়ের কয়লার মধ্য দিয়া চুয়াইয়া লওয়া হয়। তখন সাদা রেশমের মত কফিনের ক্রীষ্টাল পাওয়া যায়।

কফিনের বিশুদ্ধিতা নির্ণয় করিতে হইলে, কয়েকটা পরীক্ষা করিতে হয়। যথা—

(১) কফিন বিশুদ্ধ জলে সম্পূর্ণ দ্রবণীয় ও লিট্‌মাস্‌ কাগজের (Litmus paper) কোন পরিবর্ত্তন করে না।

(২) মায়ার, কি ওয়াগ্‌নারের সলিউশনে ইহার তলানী পাওয়া যায় না (অন্য আল্‌কলয়েড্‌ হইতে কফিনের স্বাতন্ত্র্য)।

(৩) ২৩৪—২৩৬ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্‌ টেম্পারেচারে ইহা গলিতে আরম্ভ করে।

(৪) বিশোষণে ইহার মাত্র সাত শতাংশ নষ্ট হয়।

(৫) সল্‌ফিউরিক কি নাইট্রিক্‌ এসিডে ইহা রং না বদলাইয়া গলিয়া যায়।

(৬) ২৩৬ ডিগ্রির উপরে উত্তাপ দিলে ইহা সম্পূর্ণ উবিয়া যায় এবং কোন তলানী থাকে না।

কফিন সাধারণতঃ উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়। এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় কফিনযুক্ত গাছড়া খুব জন্মে, এসিয়াতে চায়ের চাষ খুব আছে; আর ভারতবর্ষ ত কফিনের ডিপো চায়ের জন্মভূমি। বোটানিষ্টদের Camellia Thea আর আমাদের চা একই জিনিস, ইহাতে ২ হইতে ৪ শতাংশ কফিন আছে। ভারতবর্ষীয় চা ভিন্ন আফ্রিকাতে আর এক রকম চা পাওয়া যায়। ইহাকে কেহ বা 'আফ্রিকান টি' কেহ বা 'এবিসিনিয়ান্‌ টি' বলিয়া অভিহিত করে। সেখানকার অধিবাসিগণ ইহাকে 'খাট্', 'কাপ্তা', তেহাৎ প্রভৃতি নাম দিয়াছে। এই চায়ের মধ্যের আলকলয়েড্‌ কফিন্‌ নয়, কোকেনের মত ক্যাট্রিন্‌ (Katrine) বলিয়া একটা পদার্থ আছে। ক্যাট্রিনের জন্যই এই চা একটা উত্তেজক পানীয়। এই দেশের অধিবাসিগণ চা চিবাইয়া অথবা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া পান করে। তবে ভারতীয় চা হইতে এই চা নিকৃষ্ট।

পানীয় হিসাবে চায়ের পরই কফি আসে। কফিয়ল (Caffeol) উৎপন্ন করার জন্য 'কাফি আরেবিকার' ফল ভাজিয়া লওয়া হয়। ইহাতে ১ হইতে ২ শতাংশ কফিন্‌ কমিয়া যায়। Caffea arabicaর ফলে শুধু যে কফিন আছে এমন নয়, ইহার পাতাতেও কফিন আছে। মালয় দ্বীপবাসিগণ এই পাতা হইতেই তাহাদের পানীয় প্রস্তুত করে। আর এক রকম গাছড়া আছে,—তাহার নাম পলিনিয়া কুপানা (Paullinia Cupana (অথবা পলিনিয়া সরবিলিস্‌ (Paullinia Sorbilis)। ইহার বীচি গুঁড়া করিয়া একরকম লেই প্রস্তুত করা হয় এবং তাহা শুকাইয়া নানা আকারে বাজারে বিক্রীত হয়। কফির গুঁড়া আবার ডাক্তারেরা, মাথাধরা প্রভৃতি অসুখে ব্যবহার করেন। আমাদের দেশে দাক্ষিণাত্যে অনেকে কফি ব্যবহার করিয়া থাকে।

কোকোর মধ্যে থিয়োব্রোমিন বলিয়া একটা পদার্থ আছে। এই থিয়োব্রোমিনের জন্যই কোকো একটা স্ফূর্ত্তিদায়ক পানীয়। ইহা ভিন্ন কোকোর মধ্যে একরকম তৈলাক্ত খাদ্য আছে; এজন্য চা, কফি প্রভৃতি হইতে কোকো পানীয় হিসাবে ও খাদ্য হিসাবে উৎকৃষ্ট। ইহা শরীরকে যেমন উৎফুল্ল করে, তেমনি পুষ্টও করে। এতগুলি গুণ চা কি কফির মধ্যে নাই।

চায়ের ব্যবসায় আজকাল এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, বৎসর-বৎসর কত টাকা পৃথিবীতে এজন্য ব্যয়িত হইতেছে, তাহার ধারণা করাও সুকঠিন। ক্রমশঃই এই কফিন পৃথিবীর সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইতেছে—রাজা-মহারাজের প্রাসাদ হইতে সামান্য দীন দরিদ্র কুলীমজুরের কুটীরে পর্য্যন্ত একপেয়ালা চা সমভাবে বিরাজ করিতেছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে এই ব্যবসায়ে কত লোক প্রতিপালিত হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। কঠোর কর্ম্মক্লান্ত অলস দেহে, কি দারুণ শীতে অবসাদগ্রস্ত শরীরে এক পেয়ালা চা কিরূপ আরামজনক ও স্ফূর্ত্তিদায়ক, তাহা চা-খোর লোকে সহজেই বুঝিতে পারেন। আর যখন ডাল-ভাতের মত চা'ও আমাদের নিত্য সামগ্রীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন চা'র বিষয় কিছু বলা বোধ হয় আমাদের অপ্রাসঙ্গিক হইল না।

পরাজিত জার্ম্মাণি

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্‌-এ]

(১)

জার্ম্মাণিকে এখনো তাহার পুরানা শত্রুরা বিশ্বাস করিতেছেন না। অনেক সময়েই ইহাঁরা খোলাখুলি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন যে, জার্ম্মাণরা ভার্সাই সন্ধির সর্ত্ত মানিয়া চলিতেছে না।

ভার্সাইয়ের বিধানে জার্ম্মাণিকে যুদ্ধ-সামগ্রী এবং লড়াইয়ের সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ারি করিবার কারখানাগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। সেই হুকুম না কি জার্ম্মাণরা আজও পুরাপুরি তামিল করে নাই। এমন কি শুনা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণরা অস্ত্র-শস্ত্রের ফ্যাক্টরিগুলাকে কৌশলে এক সহর হইতে আর এক সহরে সরাইয়া ফেলিতেছে। অধিকন্তু অনেক মামুলি ফ্যাক্টরিতে না কি আজকাল লড়াইয়ের যন্ত্র-পাতিই তৈয়ারি হইতেছে।

ওয়াশিংটনের বিশ্ব-মেলায় ফরাসী মন্ত্রী ব্রিয়াঁ স্পষ্ট ভাবেই এই সকল সন্দেহ রটাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, বার্লিনের কাগজে-কাগজে পড়িতেছি, ইংরেজ ও ফরাসী সমর-বিভাগের কর্ত্তারা আজ জার্ম্মাণির অমুক সহরের অমুক কারখানায় খানাতল্লাসি করিল; কাল আর এক সহরে যাইয়া ফ্যাক্টরির উপর তদারক বসাইল; ইত্যাদি।

খানাতল্লাসির কায়দাও বিচিত্র। কোনো ফ্যাক্টরির দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দেখা হইতেছে, তাহার ভিতর কোনো মাল লুকানো আছে কি না। হার্সর্গ অঞ্চলের কোনো ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করিয়া জার্ম্মাণির ইংরেজ প্রভুরা বিনা বাক্যব্যয়ে কতকগুলা বড়-বড় কাচের আলোক-যন্ত্র হাতুড়ি পিটাইয়া চুরমার করিয়া দিতেছে। কর্ত্তাদের মত :—"এই সকল বৃহদাকার আসবাব বড়-বড় মানোয়ারি জাহাজে কাজে

লাগে। জার্ম্মাণির ত আজকাল রণতরী নাই। এই যন্ত্রগুলা জার্ম্মাণিতে আজও রহিয়াছে কেন?

এই ধরণের সরকারী খানাতল্লাসি চলিতেছে হরদম। মিউনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টকে একবার জবাবদিহি হইতে হইয়াছে। তাঁহার আফিসে আসিয়া উপস্থিত ইংরেজ-ফরাসী কর্ম্মচারীর কৈফিয়ৎ তলব:—"তোমার অধীনস্থ কলেজের ছাত্রেরা আজকাল অত্যধিক অনুশীলন-সমিতি গড়িয়া তুলিতেছে কেন? ব্যাভেরিয়ার লোকেরা গোপনে পণ্টন তৈয়ারি করিতেছে বুঝি?" বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা-পত্র, ছাত্রদের নাম ধাম ইত্যাদি লইয়া তোলাপাড়া চলিতেছে। ছোকরাদের ক্লাবের উপর বিজেতাদের নজর কড়া।

(২)

সরকারী খানাতল্লাসির উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া জার্ম্মাণ মজুরেরা আত্মরক্ষার এক নূতন পথ ধরিয়াছে। কিছুদিন হইল সুইটসার্ল্যাণ্ডের জেনেভা নগরে আন্তর্জাতিক মজুর-কংগ্রেস বসিয়াছিল। জার্ম্মাণি হইতেও প্রতিনিধি গিয়াছিল। তাহাদের অনুরোধে ইয়োরামেরিকার মজুর-প্রতিনিধিরা জার্ম্মাণির ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছে।

ব্যাভেরিয়ার বিভিন্ন সহরে এই সকল বিদেশী মজুরেরা কারখানা দেখিয়া বেড়াইতেছে। কলকব্জা, লোহা-লক্কর ইত্যাদির পরীক্ষা চলিতেছে। যুদ্ধের সময়ে যে সকল কারখানায় লড়াইয়ের আসবাব তৈয়ারি হইত, সেই সকল কারখানাই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

পরীক্ষক মহাশয়েরা বুঝিতেছেন,—অথবা তাঁহাদিগকে বুঝানো হইতেছে যে, ভার্সাই সন্ধির সর্ত্ত সকল বেশ সৎরূপেই মানিয়া চলা হইতেছে। পুরাণ লড়াইয়ের ফ্যাক্টরিগুলাকে ভাঙ্গিয়া শান্তির কারখানায় পরিণত করা হইয়াছে। আর, এই পুনর্গঠিত ফ্যাক্টরিতে লড়াইয়ের মাল একরত্তিও তৈয়ারি হয় না।

বিদেশী মজুররা দেখিয়া-শুনিয়া খুসী। জার্ম্মাণ মজুররা বলিতেছে:—"আমাদের ফ্যাক্টরিগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ফরাসী ও ইংরেজ সমর-নায়কেরা এত লালায়িত কেন জান ভায়া? শিল্প বাণিজ্যের বাজারে জার্ম্মাণিকে খুঁটা করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই বিজেতেরা এই বে-আইনি চালাইতেছে। ইহারা জানে যে, জার্ম্মাণিতে লড়াইয়ের মাল আজকাল একদম তৈয়ারি হয় না। তথাপি গায়ের জোরে একটা সন্দেহ রটাইয়া—একটা যে সে অছিলা দেখাইয়া, ইহারা আমাদের শিল্প কেন্দ্রগুলাকে গুঁড়া করিয়া দিতে চায়।"

(৩)

বোলশেভিকদের ধন-সাম্য মত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে কবে, তাহা কেহই জানে না। কিন্তু জার্ম্মাণির মজুর-সম্প্রদায় এখনই, অর্থাৎ "বুর্জোয়া" ধনী মহাজনদের আমলেই—অনেক আর্থিক অধিকার ভোগ করিতেছে।

১৯১৮ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে সমগ্র জার্ম্মাণির মজুর ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় একত্র মিলিয়া এক পরিষৎ গঠন করিয়াছেন। সেই পরিষৎ পরিশ্রম-সংক্রান্ত সকল নিয়ম জারি করিয়া থাকেন।

এই পরিশ্রম-পরিষদের বিধানে শ্রমীদের এক্তিয়ার ধনীদের এক্তিয়ারেরই সমান। প্রত্যেক ফ্যাক্টরির কাজ এক-একটা সমিতির অধীনে পরিচালিত হয়। সেই সকল সমিতিতে মজুর এবং ধনী উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকে;—গুণ্তিতে তাহারা সমানও বটে। মজুরের ভোট-সংখ্যা ধনীদের ভোট-সংখ্যারই সমান। কাজেই বলা যাইতে পারে,—পরাজিত জার্ম্মাণির আবহাওয়ায় ইতোমধ্যেই "মজুর-স্বরাজ" অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

পরিশ্রম-পরিষদের প্রবর্ত্তিত মজুর স্বরাজগুলা জার্ম্মাণ রিপাব্লিক কর্ত্তৃক আইন-সঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সমগ্র জার্ম্মাণির জন্য এক বিপুল পরিষৎ স্থাপিত হইল। এই "ফেডার‍্যাল" বা সর্ব্ব-জার্ম্মাণ পরিষদেও মজুরের ক্ষমতা ধনীদের ক্ষমতার সমান। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য,—আর্থিক জীবনের কোনো বিভাগই এই ফেডার‍্যাল পরিশ্রম স্বরাজ হইতে বাদ পড়ে নাই।

(৪)

জার্ম্মাণির সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই কেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ দেখিতেছি। ছোট ছোট দল একত্র হইয়া বড়-বড় দল গড়িতেছে। পল্লী-স্বাতন্ত্র্যের স্থানে "ফেডার‍্যাল" বা সর্ব্ব-জার্ম্মাণ ঐক্য প্রবর্ত্তিত হইতেছে। লড়াইয়ে হারিবার পর জার্ম্মাণরা এইদিকে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছে।

জার্ম্মাণিতে যতগুলা বড়-বড় শিল্প-কারখানা আছে, সবগুলি মিলিয়া এক বিশাল "ফার্ব্বাণ্ড" (verband) গড়িয়াছে। এই ফার্ব্বাণ্ডের কর্ত্তা বা সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, জার্ম্মাণির কোন্ কারখানায় কত খরচে কোন্ মাল তৈয়ারি হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। সমগ্র জার্ম্মাণির শিল্প-শক্তি এক্ষণে এক ভাবে, এক দায়িত্বে পরিচালিত হইতেছে। "রাইখ্‌স্ ফার্ব্বাণ্ড ডার ডয়চেন ইণ্ডুষ্ট্রি" (Reichs verband der deutschen Industrie) প্রতিষ্ঠানটাকে এক শিল্প সাম্রাজ্য বিবেচনা করা চলে।

এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ক্রোমার সাহেব সেদিন বলিতে-ছিলেন:—"ইংল্যাণ্ড জার্ম্মাণিতে বিলাতী মাল বেচিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন। এই জন্যই জার্ম্মাণদের সঙ্গে হাম-বদ্দি দেখাইতে ইংরেজেরা এত লালায়িত।"

মজুরদলের কেন্দ্রীকরণ জার্ম্মাণ-সমাজে খুব প্রবল। জার্ম্মাণিতে যতগুলি "ইউনিয়ন" বা মজুর-সমিতি আছে, অত নাই দুনিয়ার আর কোনো দেশে। সকলগুলি এক নিয়মের অধীন কাজ করেও।

কেন্দ্রীকরণ দেখিতেছি ছাপাখানার শিল্পে। জার্ম্মাণির ভিন্ন-ভিন্ন সহরে ছাপাখানার কলকব্জা যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার জন্য বহু জগৎ-প্রসিদ্ধ ফ্যাক্টরি আছে। সেই সকল ফ্যাক্টরি এক সঙ্গে মিলিয়া বৎসর খানেক হইল এক বিপুলায়তন অ্যাসোসিয়েশন গঠন করিয়াছে। পরস্পর আড়া-আড়ি অনেকটা কমিতেছে,—বিদেশে ছাপাখানার বাজারে

বন্দিনী-রমণী

Block by
Emerald Ptg. Works.   Bharatvarsha Halftone Works.

বিলাতি ও মার্কিণ মালের সঙ্গে টক্কর দিবার পক্ষে এইরূপ কেন্দ্রীকরণে জার্ম্মাণির অনেক লাভ হইতেছে।

জার্ম্মাণির অনেক বড়-বড় গ্রন্থ-প্রকাশক এবং পুস্তক-বিক্রেতা আজকাল ঐক্যবদ্ধ "ট্রাষ্ট" গড়িবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এমন কি, বৈজ্ঞানিক পরিষৎ, সাহিত্য-সভা ইত্যাদি বিদ্যার কর্ম্মকেন্দ্রেও দেখিতেছি, অনেকগুলা পরস্পর স্বাধীন ছোটখাটো সঙ্ঘের স্থানে নিখিল-জার্ম্মাণী-ব্যাপী বিরাট পরিষৎ গড়িয়া উঠিতেছে। জার্ম্মাণির "প্রাচ্যতত্ত্ব"বিদেরাও এই দিকে গোটা জার্ম্মাণির পণ্ডিত সম্প্রদায়কে একসূত্রে গাঁথিয়াছেন।

(৫)

জার্ম্মাণিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা আলোচিত হইতেছে। সোশ্যালিষ্ট মহলে "গান্ধি আন্দোলন" লইয়া বক্তৃতাদি চলিতেছে। ভারতীয় বক্তার ডাক পড়িয়াছে।

জার্ম্মাণ ভাষায় বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা দুই-একজন ভারতবাসীর আছে দেখিতেছি। ত্রিবাঙ্কুরের চম্পাক রাম পিল্লে জার্ম্মাণ মহলে সুপরিচিত ভারতীয় জার্ম্মাণ বক্তা। জহুর খৈরি এবং সত্তর খৈরি নামক দুই ভারতীয় মুসলমান যুবক বার্লিনের "প্রাচ্য বক্তৃতাভবনে" মুসলমান মহিলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম টাগেব্লাট কাগজে বাহির হইয়াছে।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রিভাট ডোৎসেণ্ট" (Privatdocent) অর্থাৎ সহকারী অধ্যাপক—জার্ম্মাণ যুবা—ফোন্ গ্লাজেনাপ "ডয়চে আল্‌গেমায়নেৎসাইটুং" দৈনিকে বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ভারতীয় নারী-মজুরদের মহলে ধর্ম্মঘট ও হরতাল কেমন চলিতেছে, সেই সম্বন্ধেও এই কাগজে এক বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে। লেখিকা এক জার্ম্মাণ মহিলা।

জার্ম্মাণির কোথাও নৈরাশ্য বা দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই না। আগামী জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯২২) পুরানা শত্রুদিগকে অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদ সোনার মার্ক লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহাতেও জার্ম্মাণ মহাজনেরা অথবা গবর্মেণ্ট কিছুমাত্র ভীত নন ; বরং সর্ব্বত্রই শিল্পকারখানার মালিকেরা এই রাষ্ট্রীয় দেনা শোধ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন।

ক্রোড়পতি হিউগো ষ্টিন্নেস্ এবং হ্বাল্টার রাটেনাও,—এই দুইজনে জার্ম্মাণিকে বিজেতাদের বাজারে-বাজারে জাহির করিয়া বেড়াইতেছেন। "রাইখস্ ফার্ব্বাণ্ডের" সভাপতি বিশরও বিদেশী ব্যবসায়ী মহলে জার্ম্মাণির সপক্ষে সহানুভূতি টানিয়া আনিতেছেন। রিপাব্লিকের মন্ত্রী বিট্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক নামজাদা লোকই হাটে-বাজারে গলা ফাটাইয়া বক্তৃতা করিতেছেন :—

"ওগো পৃথিবীর নরনারী, শোনো-শোনো তোমরা সকলে। জার্ম্মাণি লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের সকল টাকাই সুদে-আসলে সমঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছে। আমাদের প্রতিজ্ঞায় অবিশ্বাস করিও না।"

(৬)

ন্যাশন্যালিষ্ট অর্থাৎ সমরপন্থী (এবং কাইজার-ভক্ত অথবা রাজতন্ত্রী) জার্ম্মাণরা অবশ্য প্রাণে-প্রাণে বর্ত্তমান বিট্‌ গবর্মেণ্টকে ঘৃণা করেন। বিট্‌ গবর্মেণ্টের দুর্ব্বলতায় ইঁহারা যারপরনাই মর্ম্মাহত। ইঁহারা এত সহজে ইংল্যাণ্ডের আর ফ্রান্সের সকল আবদারেই "যো হুকুম" বলিতে রাজি নন।

রাইখ্‌স্টাগের (পার্লামেণ্টের) বক্তৃতায় ন্যাশন্যালিষ্ট দলের উপর মেজাজ গরম করিয়া বিট্‌ বলিতেছেন :—"জার্ম্মাণির কোনো কোনো ন্যাশন্যালিষ্ট কাগজে দেশের আর্থিক দুরবস্থার কথার প্রচার করা হইতেছে। ইহা নেহাৎ ভুল। আমাদের অবস্থা কিছু কাহিল বটে ; কিন্তু বিচলিত অথবা হতাশ হইবার কোনো কারণ নাই। লণ্ডনের ব্যাঙ্কার মহলে জার্ম্মাণির জন্য টাকা ধার লইবার আয়োজন চলিতেছে।" লণ্ডনের টাকার বাজার যাচাই করিবার জন্য ষ্টিন্নেস্ বাহাল আছেন।

প্যারিসের ল্যুমানিতে বোল্‌শেভিকপন্থী কমিউনিষ্ট দলের কাগজ। জার্ম্মাণির তারিফ করিয়া সম্পাদক লিখিতেছেন,—'ফরাসিরা বেকুব। জার্ম্মাণিকে লড়াইয়ে হারাইয়া ফ্রান্স ভাবিয়াছিল জার্ম্মাণির বাজারগুলা তাহার দখলে আসিবে। অথচ ফল হইল উল্টা। ফ্রান্সেই আজকাল ফ্যাক্টরির দুয়ার বন্ধ। কিন্তু জার্ম্মাণি নব তেজে স্বদেশী আন্দোলন চালাইতেছে। ইতালী, স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা এবং বল্কান অঞ্চলে জার্ম্মাণ মাল হুড় করিয়া প্রবেশ করিতেছে। এমন কি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম এবং ইংল্যাণ্ডের বাজারেও জার্ম্মাণ মালই বিক্রী হইতেছে।"

এই অবস্থার আলোচনা করিয়া "ল্যুমানিতে" বলিতেছেন :—"জার্ম্মাণরা এত ফুর্ত্তিবাজ উঠিল কি করিয়া? জার্ম্মাণ মার্ক নেহাৎ শস্তা। এই জন্য বিদেশীরা জার্ম্মাণিতে সওদা করিতে ঝুঁকিয়াছে। এ কথা সত্য। কিন্তু ইহাই জার্ম্মাণির রপ্তানি বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। পোল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রিয়ার মুদ্রাও যারপরনাই শস্তা। অথচ পোল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রিয়ার লোকেরা শিল্পে ও বাণিজ্যে জার্ম্মাণদের সমান অগ্রসর নয়। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, জগতে মাথা তুলিতে হইলে নানা সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক। সেই সকল সদ্‌গুণের প্রভাবে জার্ম্মাণরা লড়াইয়ের পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সেই সকল সদ্‌গুণের জোরেই আজ জার্ম্মাণি লড়াইয়ে হারিয়াও বিজেতাদিগকে হঠাইতে চলিল।"

ফিল্টার বা জল শোধন করিবার উপায়

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস]

বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতা

আজকাল পল্লীগ্রামে প্রায় সকল স্থলেই জলকষ্ট ; বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রায় কোন স্থানেই পাওয়া যায় না বলিলেও চলে। অনেক গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেখানে একটী মাত্র ছোট ডোবা আছে ; তাহাতে হয়

ত গ্রীষ্মকালে খুব সামান্য মাত্র পঙ্কিল জল থাকে ; লোকে তাহাতেই স্নান, শৌচ, কাপড় কাচা ইত্যাদি সকল কার্য্য করিতেছে ; আবার সেই জলই পান করিতেছে। এরূপ জল পান করা একেবারেই উচিত নহে। যে সকল স্থানে ভাল পুষ্করিণী আছে, তাহার জলও পরীক্ষা করিলে, পানের অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ইহার কারণ এই যে, মাটী হইতে বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া, এবং মাটীর নিম্নস্থ জলের সহিতও নানাপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য ও রোগের বীজাণু সকল পুষ্করিণীর জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দূষিত করে। এই সকল বিষাক্ত দ্রব্য ও বীজাণু জলের সহিত এরূপ ভাবে সংমিশ্রিত থাকে যে, খালি চক্ষে তাহাদিগকে দেখা যায় না ; কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তাহাদিগের বিদ্যমানতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এরূপ দূষিত জল পান করিয়া পল্লীগ্রামের শত-শত লোক উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি নানা প্রকার রোগগ্রস্ত হইতেছে ; এবং অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এই সকল রোগের আক্রমণ হইতে ত্রাণ পাইবার প্রধান ও সহজ উপায় বিশুদ্ধ জল পান করা।

বিশুদ্ধ জল পাইবার উপায়

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, পল্লীগ্রামে যেখানে জলের কল নাই, সেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল কিরূপে পাওয়া যাইবে? কিন্তু তাঁহাদিগের এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এবং অল্প খরচে আপনাপন পরিবারের আবশ্যক জল শোধন করিয়া লইতে পারেন।

জলে ফট্‌কিরি অথবা নিম্মলী কশ ঘসিয়া দিলে, জলের ভাসমান পদার্থ সকল থিতাইয়া নীচে পড়িয়া, জল পরিষ্কৃত দেখায়। কিন্তু তাহাতে জলের সহিত সংমিশ্রিত পদার্থ অথবা রোগের বীজাণু সকল দূরীভূত হয় না। জল থিতাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া, পরে অগ্নির উত্তাপে উত্তম রূপে সিদ্ধ করিয়া, পুনরায় ছাঁকিয়া লইলে, দূষিত পদার্থ সকল দূরীভূত হইয়া জল বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু তাহাতে জল বিস্বাদ হয়, এবং তাহা পরিশ্রম-সাপেক্ষ বলিয়া কেহই তাহা করে না। বালির মধ্য দিয়া শোধন করিয়া লওয়াই বিশুদ্ধ জল পাইবার প্রকৃষ্ট উপায়। ইহাতে জল সমস্ত দোষ বর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হয়, এবং সুমিষ্ট থাকে। অনেকে কলসীর মধ্যে বালি দিয়া জল শোধন করিয়া লন ; কিন্তু তাহাতে খুব অল্প পরিমাণে জল পাওয়া যায়, ইহাতে সমস্ত পরিবারবর্গের পানীয় জলের সঙ্কুলান হয় না। প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ-নিজ বাড়ীতে যদি একটী করিয়া পাক ফিল্টার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিবারবর্গের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব হয় না। ইহাতে খরচও বেশী পড়ে না। এক-একটী পরিবারে প্রতি বৎসর ডাক্তার ও ঔষধ পথ্যাদিতে যে খরচ হয়, তাহা একবার খরচ করিলেই, বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইবার একটী স্থায়ী উপকরণ বা ফিল্টার তৈয়ারী হইতে পারে ; অথচ তাহাতে প্রতি বৎসরের ডাক্তার ও ঔষধ-পথ্যাদির খরচ অনেক কমিয়া যায় ; অধিকন্তু পরিবারস্থ লোকেরা সুস্থ ও সবল দেহে এবং মনের স্ফূর্ত্তিতে থাকিতে পারেন।

বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইবার খরচ

নিম্নে একটী ফিল্টারের বিবরণ দেওয়া হইল। এই মাপের একটী ফিল্টার তৈয়ারী করিতে আন্দাজ ৫০৲ টাকা খরচ হইবে ; এবং ইহাতে সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে ৫০।৬০ কলসী বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাইবে। যদি ইহা অপেক্ষা অধিক জলের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ফিল্টারটী লম্বায় ও চওড়ায় সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করিতে হইবে ; কিন্তু উচ্চতার বৃদ্ধি হইবে না।

ফিল্টার তৈয়ারীর বিবরণ

প্রথমে দেড় ফুট উচ্চ একটী মাটীর ঢিপী করিয়া উত্তমরূপে জল দিয়া পিটাইয়া লইতে হইবে। তাহার উপরে ভিতরসারা তিন ফিট চওড়া ও পাঁচ ফিট লম্বা এবং তলদেশ হইতে ৪'—৩" চার ফিট তিন ইঞ্চি উচ্চ একটী পাকা চৌবাচ্চা গাঁথাইয়া, তাহার মধ্যে একটী ৫" পাঁচ ইঞ্চি চওড়া পাকা দেওয়াল দিয়া একটী অংশ তিন ফিট লম্বা এবং অপরটী ১॥০ দেড় ফিট এই রূপ দুইটী অংশে বিভক্ত করিতে হইবে। বড় অংশের শেষ দেওয়াল হইতে ছোট অংশের শেষ দেওয়াল পর্য্যন্ত তলদেশ ঈষৎ ঢালু হইবে ; মধ্যের দেওয়ালের নিম্নভাগে একটী ছোট ছিদ্র রাখিয়া, দুই অংশে সংযোগ রাখিতে হইবে এবং দ্বিতীয় অংশটীর বহির্ভাগের গায়ে জল লইবার জন্য তলদেশ হইতে ১" এক ইঞ্চি উচ্চে একটী পাইপ লাগাইতে হইবে। তাহার মুখে একটী ষ্টপ্ বেল ও একটী কল লাগাইতে হইবে। এই চৌবাচ্চার প্রথম অংশটীতে জল ফিল্টার হইবে ; এবং দ্বিতীয় অংশটীতে বিশুদ্ধ জল জমিয়া থাকিবে। ফিল্টার অংশটীর কোন একটী দেওয়ালের উপর ৩" তিন ইঞ্চি গভীর ও ১॥০" দেড় ইঞ্চি চওড়া একটী ছিদ্র থাকিবে। ইহা হইতে অতিরিক্ত অপরিষ্কার জল অসাবধানতায় ভরা হইলে বাহিরে পড়িয়া যাইবে—বিশুদ্ধ জলের চৌবাচ্চায় যাইবে না। প্রথম অর্থাৎ ফিল্টার অংশটীর তলদেশে প্রথমে একপ্রস্থ ইট গায়ে-গায়ে বিছাইয়া তাহার উপরে ॥০" আধ ইঞ্চি মাপের ছোট ছোট ঝামা খোয়া কিম্বা নুড়ি তিন ইঞ্চি পুরু করিয়া বিছাইবে। পরে তাহার উপরে মোটা বালি তিন ইঞ্চি পুরু করিয়া বিছাইয়া সর্ব্বোপরি ১'—৯" একফুট নয় ইঞ্চি পুরা করিয়া নদীর সরু বালি বিছাইবে। খোয়া অথবা বালির প্রত্যেক স্তর চৌরস করিয়া বিছাইতে হইবে। এইরূপ করিলেই ফিল্টার তৈয়ারী হইবে। এক্ষণে ফিল্টারের উপরে জল ঢালিলে, সেই জল বালির মধ্য দিয়া ধীরে-ধীরে চুঁয়ে মধ্যের দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া চৌবাচ্চার ছোট অংশে গিয়া জমিবে। এই জল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইবে ; এবং ইহা পান করিলে নানা প্রকার রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকা যাইবে।

ফিল্টার অংশটীতে আবশ্যক মত জল রাখিলে, বিশুদ্ধ জলের কোন অভাব হইবে না। ফিল্টারের উপর জল ঢালিবার সময় উপরের বালি সরিয়া যাইতে পারে। ফিল্টারের উপরে এক স্থানে কতকগুলি বড়-বড় ঝামা খোয়া রাখিয়া, তাহার উপর জল ঢালিলে আর এইরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

জল বিশুদ্ধ করিবার প্রণালী

প্রথমে কলটী পুরা খুলিয়া দিবে। পরে ষ্টপ্ বেলটী সামান্ত খুলিবে ২।৩ পাক মাত্র। ইহার পর ১টী গজ লইয়া ফিল্টারের দেওয়ালের উপর হইতে জলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত একটি মাপ লইবে; এবং ঘড়ি দেখিয়া সময়টী মনে রাখিবে। ১৫ মিনিট পরে এই মাপটী পুনরায় লইলে দেখা যাইবে যে, মাপটী বড় হইয়াছে; অর্থাৎ ফিল্টারের জল কমিয়া গিয়াছে। এই কম যদি ১৫ মিনিট পরে ¼'' সিকি ইঞ্চি মাত্র হয়, তাহা হইলে জানা গেল যে, এক ঘন্টায় ফিল্টারের জল ১'' এক ইঞ্চি কমিয়া যাইবে; অর্থাৎ ১'' এক ইঞ্চি পরিমাণ জল ফিল্টার হইতেছে। এইরূপ ১৫ মিনিটে ॥০'' অর্দ্ধ ইঞ্চি জল কমিয়া গেলে, ঘণ্টায় ২'' দুই ইঞ্চি পরিমাণ জল ফিল্টার হইতেছে জানা গেল। বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতা মত ষ্টপ বেলটী কম বা বেশী খুলিলে, সেই পরিমাণে জল পাওয়া যাইবে। কিন্তু ঘণ্টায় ফিল্টার হইতে ৪'' চারি ইঞ্চির অধিক জল কমিতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়; তাহা হইলে জল বিশুদ্ধ হইবে না। মাঝে-মাঝে ফিল্টারের উপরে যে ময়লা সব পড়িবে তাহা চাঁচিয়া ফেলা আবশ্যক। সরুবালি পুনঃ-পুনঃ চাঁচিয়া ফেলিবার দরুণ বালির গভীরতা কমিয়া গেলে, পুনরায় সরুবালি দিয়া উহা পূরণ করিবে। যখন দেখা যাইবে যে, ফিল্টারের জল এবং দ্বিতীয় অংশের জলের উচ্চতার পার্থক্য ১০'' দশ ইঞ্চির উপর হইয়াছে, তখন ঐ সব চাঁচিয়া ফেলা আবশ্যক হইবে। প্রত্যেক বার ময়লা সব চাঁচিয়া ফেলিতে ।০'' সিকি ইঞ্চি পরিমাণ সরু বালি কমিয়া যাইবে। এইরূপ বারোবার চাঁচিয়া ফেলার পর পুনরায় নদীর সরু বালি ৩'' তিন ইঞ্চি দিয়া সরু বালির উচ্চতা পূরণ করিবে। চাঁচিবার পূর্ব্বে ফিল্টারের জল বালির কিছু নিম্নে করিয়া লইতে হইবে পরে লোহার পাতের ছিলনা দিয়া ময়লা সব ছিলিয়া ফেলিয়া দিবে। চাঁচা শেষ হইলে ফিল্টারে জল ভরিবে ও ঘণ্টায় ॥০'' অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ বিশুদ্ধ জল ৩ তিন ঘণ্টা কল দিয়া বাহির হইয়া যাইতে দিবে। এই তিন ঘণ্টা অপচয়ের পর আর জল অপচয় হইতে দিবে না,—ব্যবহার করিবে। দিনের মধ্যে দুইবার ফিল্টারের জল কমিয়া যাইবার পরিমাণ দেখা আবশ্যক। আর রাত্রে যদি জলের আবশ্যক না হয়, কলটী বন্ধ রাখিলে দেখিবার আবশ্যক হইবে না।

সতর্কতা

চৌবাচ্চার ছোট অংশে যে বিশুদ্ধ জল থাকিবে, তাহাতে কেহ কোন রূপে হস্ত দিবে না, বা কোন দ্রব্য ডুবাইবে না; এবং তাহার উপরে একখণ্ড কাষ্ঠ দিয়া উত্তমরূপে ঢাকা দিয়া রাখিবে; নতুবা সেই জল দূষিত হইয়া যাইতে পারে। বিশুদ্ধ জলের আবশ্যক হইলে, চৌবাচ্চার গায়ে পাইপের মুখে যে কল লাগান থাকিবে, সেই কল খুলিয়া তাহার নিম্নে একটী কলসী বা অপর কোন পাত্র বসাইয়া জল লইতে হইবে।

সুমেধা

[শ্রীরমলা বসু]

শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ, মন্দির-সংলগ্ন কাননের সমস্ত গাছ-পালার ওপর তার রূপালী আলো ছড়িয়ে দিয়ে, বসন্তের স্পর্শকে যেন দ্বিগুণ মনোহর ক'রে দিচ্ছিল। মাঝখানের ছোট সরু পথখানা সেই আলোতে যেন একখানা ঘুমন্ত নদীর আঁকা-বাঁকা রেখার মত দেখা যাচ্ছিল। চন্দ্রালোক-দীপ্ত মন্দির-সোপানে বসে ভগবান বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর দলের সাথে বিদায় নিচ্ছিলেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে, সূর্য্যদেবের নব জাগরণের পূর্ব্বেই, তিনি কয়েকটী বিশিষ্ট শিষ্য সঙ্গে নিয়ে শ্রাবস্তী নগর ত্যাগ ক'রে বহুদূর-পথে যাত্রা করবেন। বৎসরাবধি কাল এঁদের মধ্যে বাস ক'রে তাঁর অতুল করুণা ও বুদ্ধত্বের অংশ অযাচিত ভাবে অজস্র পরিমাণে চারি দিকে বিতরণ ক'রে গিয়েছেন, এই নগর-প্রান্তস্থিত কানন-সংলগ্ন মন্দিরে অবস্থান ক'রে; আজ তারই শেষ রজনী ও বিদায় অভিনয়।

একে-একে নত মস্তকে বাষ্পরুদ্ধ নয়নে, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর দল, প্রভুর চরণ-তলে শেষবারকার মত, তাদের বৈরাগ্য-নিবেদিত জীবনে শান্তি-আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করছিল। প্রভুর আসন্ন প্রস্থানে যে গভীর বিষাদের মেঘ তাদের মন ছেয়ে ফেলতে চাইছিল, তা দূর করবার চেষ্টা করছিল, কারণ, তারা নির্ব্বাণ পথের পথিক,—কিছুতেই যে তাদের বিচলিত হতে নেই। কিন্তু তবু যে স্নেহপাশবদ্ধ মানুষেরই মন তাদের, তাই আসন্ন বিদায়-ছায়া-মলিন নয়ন-কোণে, অশ্রুরেখা শত চেষ্টাতেও এক-একবার বাহির হয়ে আসতে চাইছিল!

প্রভু তাঁর মুখের সেই প্রশান্ত দীপ্ত হাসিখানিতে স্বর্গের

জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত ক'রে, একে-একে পরম স্নেহে প্রত্যেকের ললাটে আশীর্ব্বাদ-হস্ত স্পর্শ ক'রে, কোন না কোন সাধন-পথের গূঢ় ব্যাখ্যা বর্ণনা ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন—কাউকে বা মায়াময় সংসারের অনিত্যতা, কাউকে বা নির্ব্বাণ পথের শ্রেষ্ঠ উপায়।

একে-একে সবাই যখন সরে গেল,—সবার পেছনে ভিক্ষুণীদের মাঝে তরুণীতমা, সুমেধা, ধীরে-ধীরে প্রভুর পায়ের কাছে নত মস্তকে এসে দাঁড়িয়ে রইল,—যেন তাঁর মুখ-নিঃসৃত একটী অমূল্য বাণীও হেলায় সে হারিয়ে না ফেলে, প্রত্যেকটী যেন হৃদয়-পটে অঙ্কিত ক'রে—চির জীবনের পাথেয় ক'রে সংগ্রহ ক'রে রেখে দিতে পারে; তার যে তা বড়ই প্রয়োজন,—সারা পথ যে তার সমুখে এখনও পড়ে আছে!

প্রভু তাঁর পদ্ম-হস্তখানি সুমেধার মাথার ওপর রেখে বল্লেন, "সুমেধা, সংসারের কিছুর ওপরই বাসনা না রাখবার চেষ্টা করিও; কারণ, জগতে বাসনাই দুঃখের মূল।"

সুমেধা নত মস্তকে সে বাণী শ্রবণ করেও, ধীরে ধীরে সঙ্কোচ-জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "এর বেশী আর কি কিছু শোনবার নেই আমার প্রভু? প্রভুর চরণতলে বসে আরো অমূল্য তত্ত্ব, এ ক্ষণিক সংসারের পথ-নির্দ্দেশ করে নেবার জন্যে শোনবার যে সাধ ছিল প্রভু! আজ যে শেষবারকার মত এ মহা সুযোগ জীবনে আমার!"

করুণা-বিগলিত কণ্ঠে প্রভু বুদ্ধ কহিলেন, "সুমেধা, আগে এই নিজের মন প্রাণ দিয়ে বুঝতে ও জানতে শেখ, তার পর—"

"তার পর—তার পর জীবনের আরো গভীর তত্ত্ব জানবার জন্যে প্রভুর চরণের দাসী, যেখানে প্রভু থাকবেন, সেখানে উপস্থিত হবার অনুমতি কি পেতে পারে?"

"যদি দরকার থাকে—"

"প্রভু, দরকার থাকবে না কি? গুরু তুমি, প্রভু তুমি,—চির-আশ্রয়, চির-সম্বল, জীবন-পথে চির-উপদেষ্টা যে তুমি ভগবন্!"

"সুমেধা, কারুর ওপর নির্ভর করতে যেও না এ সংসারে। এ ক্ষণিক সংসার চির-নিত্য, চির-চঞ্চল জান না কি? তাই, শুধু নিজের ওপর দাঁড়াতে শেখ। আর যে বাণী শিখেছ তাই শুধু তোমার জীবন-পথের প্রদর্শক হোক।"

"তবু প্রভু, যখন এ প্রভুদত্ত বাণী হৃদয় দিয়ে অনুভব করে জীবনের মর্ম্মে তা শিক্ষালাভ করতে পারব, তখন আর একবার যে প্রভুর পাদপদ্ম দর্শনের বাসনা থাকবে।"

"সুমেধা, আবার বলি, সংসারের কিছুর ওপরই বাসনা না রাখবার প্রয়াস করিও। আশীর্ব্বাদ করি, সাধন-পথে নির্ব্বাণের দিকে দিন দিন অগ্রসর হও।"

তার পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে প্রভু গৌতম তাঁর শিষ্য-ক'টী সঙ্গে নিয়ে শ্রাবস্তীনগর ত্যাগ ক'রে উত্তরাঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন।

শুধু দুটী ছোট কথা! আর কিছু নয়! অনেক দিনের অনেকবারের শোনা দুটী কথা, আর কত আশাই না মনে-মনে পোষণ ক'রে, প্রভুর চরণের নিবেদিতা দাসী সুমেধা তাঁর শেষ উপদেশের গভীর তত্ত্ব মর্ম্মে-মর্ম্মে গেঁথে রেখে, তার জীবনের খেয়াপারের কড়ি ক'রে নেবার জন্যে, মন-প্রাণ একান্ত ভক্তি-সংযত ক'রে, সবার শেষে অপেক্ষা ক'রে বসেছিল, প্রভুর চরণ-প্রান্তে মাথা লুটিয়ে দিয়ে—যেন সেই শত-শত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বিদায়ের পালা শেষ হয়ে গেলে, শেষের শেষ মুহূর্ত্তগুলির শেষ অবকাশটুকু পর্য্যন্ত, নিজে একান্ত বিশেষ ক'রে ভোগ করতে পারবে বলে—তাঁর মুখ-নিঃসৃত শেষ অমৃত-বাণীতে!

কিন্তু হায়, কত জনকে তো কত গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথাই না বলে গেলেন; কিন্তু তার বেলাই শুধু কত দিনের শোনা,—সবার মুখের নিতান্ত সামান্য বুলিটুকু শুধু! মুক্তির সাধন-পথে সে যে সংসারের সব বাসনা, সব বন্ধন দূরে ফেলে এসে, আশ্রমের এ নিভৃত শান্তির মাঝে প্রভুর পাদপদ্মে একেবারে আত্ম-নিবেদনই করে দিয়েছে। তবু নির্ম্মুক্ত সাধন-পথে একটুও কি অগ্রসর হয় নি সে! সংসারের সব বন্ধন তো ফেলে পালিয়ে এসেছে সে এখানে। এর মধ্যে বাসনার গন্ধ কই, বুঝতে সে তো পারছে না! তবে তাকে আরো কিছু দিয়ে গেলেন না কেন প্রভু? ক্ষোভে ও অভিমানে মন যেন তার ক্রমশই ভরে আসতে লাগল।

কিন্তু তার মনে একি হোল! দিবারাত্রি যে অন্য চিন্তা তার মনে আর স্থান পেল না, শুধু সে ছোট কথা দুটীকে, যা অনেকবার শ্রুত, নিতান্ত সাধারণ গূঢ়-অর্থ-শূন্য বলেই মনে হয়েছিল, সেই কথা কয়টীই যেন অহরহ তার মনের

গারের আনাচে-কানাচে উঁকি মারতে লাগল,—যেন কত দিনের বিস্মৃত, বন্ধ করা দুয়ার জানালাগুলো খুলে দিয়ে!

সে ছিল শ্রাবস্তীনগরের এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর বিখ্যাতা সুন্দরী কন্যা। যৌবনের প্রথম সঞ্চারেই সখীসহ পিতার প্রাসাদ-সংলগ্ন অশোক-কাননে ভ্রমণ করবার সময়, তরুণ বণিক শ্রীমন্তের সহিত সাক্ষাতের পর পরস্পরে পরিচয় ও উভয়ের মধ্যে গোপন-প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। শ্রীমন্ত গিয়া তার পিতার নিকট তার করপ্রার্থী হলেও, তাহার অপেক্ষা ধনে-মানে শ্রেষ্ঠ জয়ন্ত নামক বণিকের আবেদনই সংসারের যশো-লিপ্সু তার বশীভূত পিতা সমর্থন করেন। কিন্তু শ্রীমন্তের প্রতিই সুমেধার সমধিক অনুরাগ জানতে পেরে, তাকে অপসরণ করবার মানসে, নগর-রক্ষী মন্ত্রীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, তৎকালীন দুর্দ্দান্ত দস্যু অঙ্গারককে পরাজয় করবার জন্যে তাহাকে প্রেরণ করেন। তাহাতেই সে প্রাণ হারায়, এরকম রাষ্ট্র হয়। তখন জয়ন্ত গিয়ে দস্যুদলকে পরাজিত করে অঙ্গারককে ধৃত করে আনে। শোকে, দুঃখে উন্মত্ত হয়ে প্রিয়ের পবিত্র স্মৃতিচর্চ্চায় চির-জীবন কুমারী-ব্রত ধারণ করবার সংকল্পই সে করে; কিন্তু পিতার অক্লান্ত তাড়নে, মাতার নিশিদিনের অনুযোগ-অশ্রুতে কেমন করে ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে, শেষে এই সংসার-শ্মশানে প্রবেশ করতে হয়েছিল।······সবই যে একে-একে মনে পড়ে যেতে লাগল।......সেখানেও স্বামী কর্ত্তৃক আদর ও যত্ন তার অল্পদিনই স্থায়ী হয়েছিল। যদিও তার রূপের মোহে উন্মত্ত হয়ে, নানা প্রতারণা অবলম্বন করেই জয়ন্ত তাকে বিবাহ করেছিল, কিন্তু রূপের নেশা যতই তার সে প্রথম উত্তেজনার পর কমে আসতে লাগল, এবং তার সংসার-শ্মশান-বৈরাগ্য-প্রবণা স্ত্রীর কাছ থেকে সে উন্মাদনাকে চির-নবীন ও সতেজ করে রাখবার মত যখন সে তার কাছ থেকে কিছুই আর পেলে না, তখন ক্রমশঃ সুমেধার প্রতি তার মনটা বিতৃষ্ণ হয়ে এল। তাই কিছুদিন পরে আর একটা বিবাহ করে সে আবার নূতন করে সংসার পেতে বসল। যদিও পূর্ব্ববৎ স্ত্রীভাবেই সুমেধা তার গৃহেই রয়ে গেল, তবু তার প্রতিদিনকার প্রেমের ছলনার দায় থেকে উদ্ধার পেয়ে, স্বামীর এ অবহেলাটুকুতে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেই বাঁচল। স্বামীর প্রতি একটা উদাসীনতা-পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাব নিয়ে দিন তার কেটে যেত লাগল।

তার পর তার স্তব্ধ, ধূমাচ্ছন্ন অথচ স্থির ভাগ্য-গগনে মহা ঝটিকার মত যেদিন মৃতকল্প দস্যু অঙ্গারক এসে দেখা দিল, সেদিন থেকে যেন প্রতিদিনের ঘটনাগুলি ও মনের বিকারগুলি একে-একে আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল,—তাদের হিন্দোলে মনকে নানা ভাবে বিচলিত করে তুলল। এ কি হোল, এ কি হোল তার? মনে হতে লাগল, এ কি করে গেলে প্রভু তার তুমি? উপরের জল যে স্থির হয়ে, নির্ম্মল হয়ে দাঁড়িয়ে আসছিল—তাকে নাড়া দিয়ে এ কি পঙ্ক টেনে বার করে আনলে ফের তলা থেকে,—আর তাতে যখন কোন আবিলতা, কোন চঞ্চলতা দেখা যাচ্ছিল না?

তাঁর সূক্ষ্ম মনশ্চর দৃষ্টি দিয়ে বুঝি-বা তার উপরে উপশমিত দৃষ্ট হলেও ভিতরের চাপা দেওয়া মনোব্যাধির অস্তিত্বের সমস্ত লক্ষণ বুঝতে পেরে, তাই বুঝি তাঁর এ কয়টী কথার ছলে তাকেই জয় করবার গূঢ় ইঙ্গিত করে গেছেন—তা না হলে বুঝি-বা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পথ দিয়ে নির্ব্বিচার মুক্তিরাজ্যে যাবার উপায় নেই তার?

তাই তো! তা আজ প্রভুর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত শান্ত সংযত মনের ভাব হারিয়ে ফেলে, এ কি দুর্দ্দমনীয় চঞ্চলতার স্রোতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে?

দস্যুর সেই পুনরাগমনের ঘটনাটী যেন প্রত্যক্ষ ছবির মত মনের মধ্যে এক দৃশ্যের পর আর এক দৃশ্যে মূল নাটিকার অভিনয় আকারে ফুটে উঠতে লাগল।

মনে পড়ে গেল সেই রাত্রের কথা, যেদিন নিদ্রার বশে নিজেকে আনবার বৃথা চেষ্টা ক'রে, জ্যোৎস্না পরিপ্লাবিত উন্মুক্ত আকাশের তলে, তার ইন্দ্রজালভূয়িষ্ঠ ছায়ার রাজ্যে বসে-বসে মন তার, পারিপার্শ্বিক সমস্ত সংসার হতে বহুদূরে চলে গিয়েছিল – মৃত অবধারিত শ্রীমন্তের স্মৃতিতে তন্ময় হয়ে ডুবে গিয়ে। সমস্ত অন্তর মথিত করে জ্যোৎস্নার সে ছায়া-লোকের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণের ব্যাকুল ক্রন্দন যেন নৈশ বায়ুতে কেঁপে-কেঁপে সেই অদৃশ্য ব্যোমলোকে উত্থিত হচ্ছিল, "ওগো, দেখা দাও,– একটীবার তোমার অশরীরী সত্তায় দেহের সব মোহ, সব ভ্রান্তি নিয়ে দেখা দাও! একটী-বার আমার এ স্থূল চক্ষুর সামনে মায়া রাজ্য সৃষ্টি ক'রে এসে তেমনি করে দাঁড়াও প্রিয়।"

বাহিরের তাড়নায় হোক, আর যে কারণেই হোক, অগ্নি-সাক্ষ্য ক'রে যখন স্বামীকে জীবনের মত বরণ ক'রে নিয়েছিল,—হাজার অনিচ্ছায় হোক, তবু বাহিরের স্ত্রীর যা কর্ত্তব্য ও দেয়, নিশ্চল পাষাণ-পুত্তলিকার মত, যন্ত্রচালিত হয়ে, তা সে ক'রে এসেছিল ও ক'রে যাবে স্থির করেছিল; কারণ, সংসার যে তার কাছে মহাশ্মশানেরই মত;—ভিতরটা তাই তার পাথরের মত হয়ে গিয়েছিল! জীবনে মৃত্যুকে বরণ ক'রে তাই যেন মরণে সে জীবন লাভের আশায় বসেছিল। কিন্তু এক-একবার এমনি রাতেই, তার বিনিদ্র রজনীর মুহূর্ত্তগুলির মাঝে, বিশ্ব-প্রকৃতির আত্মহারা তন্ময়তার সাথে, সেও নিজের ভেতরের সঞ্চিত স্মৃতিতে ডুব দিয়ে কখন-কখন বা এমন ক'রেই—নিজেকে হারিয়ে ফেলতো, একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার স্রোতে—একটীবার, একটীবার আবার তার মর চক্ষু,—তার দৃষ্টির আদরে, সে চিরপ্রিয় মৃতজনের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে দিতে চাইত।

হঠাৎ মুখ তুলে প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রকাণ্ড মহীরুহের ছায়ার সাথে-সাথে এক অস্পষ্ট মনুষ্য-ছায়ারও সম্মিলন দেখে সে শিহরে উঠল। তার পর চোখ তুলে চেয়ে যা দেখল, তা দেখে তার তখনকার মনের গতির অনুযায়ী একটুও ভাবতে দ্বিধা বোধ হোল না যে, ক্রমেই অশরীরী রাজ্যেরই কোন এক অতিথি—সে অতিথি আর কেউ নয়—তার বিবাহের পূর্ব্বেই তার স্বামীর হস্তে নিহত মৃত দস্যু অঙ্গারক—তারই প্রিয়ের হন্তারক!......আজ প্রাণ যে তার জীবন-মৃত্যুর সব বাঁধ ভেঙ্গে ফেলে দিতে চেয়েছিল প্রাণের দারুণ আকাঙ্ক্ষায়। তার ফলে আজ কি তুমি এসে দেখা দিলে,—তার জীবনের প্রথম সুখের হন্তারক—তার এই চন্দ্রালোকের স্বপ্নও ভেঙ্গে দিয়ে, হরণ করতে?

এমন সময় সে মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হয়ে এসে বল্লে "শ্রেষ্ঠিকন্যা, ভয় পেও না। যদিও এ গভীর রাতে এ দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর লঙ্ঘন করতে দেখে তুমি অত্যন্তই আশ্চর্য্য হয়ে থাকবে; কিন্তু জেনো, আমি তোমার মিত্র ভাবেই এসেছি,—শত্রু ভাবে নয়। আর, আমি আজ আমার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তোমার সহায়তা লাভের জন্যেই এসেছি।"

আকস্মিক, নানা ভাবের আতিশয্যে বিমূঢ় হয়ে শেষে সুমেধা প্রাণ পণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করে বল্লে, "তুমি—তুমি দস্যু অঙ্গারক নও? তুমি—তুমি আমার সহায়তা চাও? কেন, কিসের জন্যে?" হঠাৎ এতক্ষণে তার জ্ঞান হোল, সশরীরে এ দস্যু অঙ্গারকই—তার ছায়া-মূর্ত্তি নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য, দুরন্ত দস্যুকে এমন ভাবে একা গভীর রাত্রে নিজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, আর তার ভয় হোল না। শুধু মনে পড়ে গেল, এরি হস্তে তার প্রিয় শ্রীমন্ত জীবন হারিয়েছে—তা না হলে আজ সে......দারুণ ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে নিল!

চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোকেও দস্যু তার মুখের ভাব যেন অনুভব করতে পারল। এক-পা এক-পা ক'রে সরে এসে, তার বিশাল বপু নত করল সুমেধার পায়ের কাছে; যে মাথা হয় তো তার সিদ্ধিদাত্রী রণকালী ভিন্ন আর কারুর নিকট ও ভাবে নত হয় নি। দীপ্ত অথচ অনুতাপ-দগ্ধ স্বরে বল্লে,—"তার আগে তোমার কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করবার আছে বটে। কিন্তু তুমি যা মনে ভাবছ,—তার জন্যে নয় শ্রেষ্ঠিকন্যা! কারণ, শ্রীমন্ত জীবিত ও অক্ষত শরীরে উজ্জয়িনীতে বসবাস করছে, এ সংবাদটুকু যথার্থ বলে আমি জানি। কিন্তু তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার কাছে যা অন্য অপরাধ করেছি, তা শুনে, তার জন্যে যা প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষমা বিধান করবে তুমি, আমি তা মাথায় তুলে নেব।"

শ্রীমন্ত জীবিত! এক মুহূর্ত্তে এক বিপুল হর্ষের স্রোতে সুমেধার সমস্ত শরীর যেন শিথিল হয়ে এলো। আর মাথার রক্ত-কণিকাগুলিও যেন ধমনী ছিন্ন ক'রে বাহির হয়ে আসতে চাইল। সে বেগ সামলাতে, নিজেকে ফের প্রকৃতিস্থ ক'রে তুলতে, তার কিছুক্ষণ সময় লাগল। কিন্তু সে অভাবনীয় আনন্দের সংবাদে সে বিচার করতে ভুলে গেল, দূর উজ্জয়িনী নিবাসী শ্রীমন্ত জয়ন্তের পরিণীতা সুমেধার নিকট মৃতাপেক্ষা অধিক নিকটে নয়। তখন তার শুধু এই মনে হতে লাগল, যে, সে বেঁচে আছে! একই আকাশের তলে একই বায়ু সেও নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করছে,—একই চন্দ্র-সূর্য্যের আলো সেও উপভোগ করে,—সে যত দূর হতে হোক না কেন! তবু তো এই প্রাণময় পৃথিবীর উষ্ণ শোণিত-প্রবাহ তারি মত প্রতি ধমনীতে অনুভব ক'রেই—মৃত্যুর শীতল অপরিবর্ত্তন-শীল আবরণে চিরদিনের জন্যে তার বিরহী দৃষ্টি-পথ হতে অপসারিত হয়ে যায় নি তো। জীবন হাজার দুঃখের মূল

হোলেও যে তা গতিশীল,—তাই তো সে একেবারে আশার অতীত হয়ে যায় না। 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—' যে মানুষকে ছাড়ে না, তা সে সুদূর ভবিষ্যতের ক্রোড়ে যত অস্পষ্ট ভাবেই হোক না কেন! আর কিছু না হোক, একটুখানি শুধু চোখের দেখার আশাও তো কম নয়!

হর্ষের বিহ্বলতায় যেন সে সমস্ত শরীরের শক্তি হারিয়ে ফেলছিল, এমন সময় কোন অজ্ঞাত অপরাধে তারই নিকট, অঙ্গারকের দ্বিতীয়বার ক্ষমা প্রার্থনায়,-সে একটু বিস্ময়-কৌতূহলাবিষ্ট হয়েই তার দিকে চাইল। তখন দস্যু তার অপরাধের কাহিনী বিবৃত ক'রে বলতে লাগল—"মনে পড়ে, সেই পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী, শ্রেষ্ঠিকন্যা? এমনই এক প্রাচীর-ঘেরা ছাদের ওপর স্তব্ধ ভাবে তুমি বসেছিলে,—যেবার প্রথম তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আর আজ এই দ্বিতীয়বার মনে পড়ে, সে সময় নগরে রটে গিয়েছিল,—দস্যু অঙ্গারকের দলকে দমন করিতে গিয়ে শ্রীমন্ত প্রাণ হারায়, আর জয়ন্ত তখন দস্যু দলকে নিহত ক'রে-দস্যুদলপতিকে বন্দী ক'রে ধরে নিয়ে আসে? কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। শ্রীমন্তই আমার সে দলকে পরাজিত ক'রে আমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে আসছিল। পথিমধ্যে যখন সে বিশ্রাম করছিল, সেই সময় জয়ন্ত গিয়ে তার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন ক'রে, কৌশলে আমাকে সে স্থান হতে অপসারিত ক'রে, নগরে নিয়ে আসে। শ্রীমন্ত বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা কিছুই বুঝতে পারে নি। সে মনে করল দস্যু বুঝি তারই শিথিলতার দোষে পলায়ন করেছে। তোমার পিতা ও নগররক্ষক মন্ত্রীর কাছে সে প্রতিশ্রুত ছিল, দস্যুদলপতি অঙ্গারককে ধরে নিয়ে আসবে। প্রথম প্রতিশ্রুতিতে সফলকাম হলেও, দ্বিতীয়টী পালন করতে পারল না জ্ঞানে লজ্জিত হয়ে, সে তার সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল। ইত্যবসরে জয়ন্ত আমাকে বন্দী অবস্থায় নগরে এনে রটিয়ে দেয় যে, দস্যুদলকে পরাজিত ক'রে সেই আমাকে ধরে এনেছে; এবং আমাকে ধরতে গিয়ে শ্রীমন্ত নিহত হয়েছে।

পূর্ব্ব হতেই ধনবান ও সম্ভ্রান্ত বংশের ব'লে জয়ন্তের দিকেই তোমার পিতার বেশী পক্ষপাতিত্ব ছিল। এখন তার এ হেন কৃতিত্বে তাকে পতিত্বে বরণ করবার জন্যে তিনি তোমাকে নির্যাতন পর্য্যন্ত করতে লাগলেন,—তা তো তোমার মনেই আছে।

তোমার তখনকার ও এখনকার সকল তত্ত্বই সংগ্রহ ক'রে তবে আমি তোমার নিকট এসেছি। স্বামী কর্তৃক আদর যত্নও যে তোমার স্বল্পদিনস্থায়ী হয়েছিল, একাকিনী বৈরাগিনী ভাবেই তোমায় সংসারে দিন অতিবাহিত করতে হয়, সে সংবাদও আমি জানি। আর এও বুঝি, তোমার কাছে তাহা কিছুমাত্র দুঃখজনক নহে।" এই বলে দস্যু সুমেধার দিকে দৃষ্টিপাত করল। কিন্তু শ্রীমন্তের আকস্মিক জীবিত অবস্থার সংবাদে তখনও সে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, তখন পর্য্যন্ত একটী কথা কইবার পর্য্যন্ত যেন তার শক্তি ছিল না। কোন রকমে দেহের শিথিল গ্রন্থিগুলি সংযত করে রেখেছিল,—যদিও মনে হচ্ছিল, পৃথিবী তাকে কোন্ শূন্য-লোকে উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে, শনৈঃ শনৈঃ তার পায়ের নীচে থেকে সরে পালাচ্ছেন।

শুধু বিমূঢ়ের মত সে অঙ্গারকের মুখের কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল, যদিও তার পরে বর্ণিত অংশগুলি দুই তিনবার করে দস্যুকে বিবৃত করে বলতে হচ্ছিল, তাকে হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্যে। দস্যু তবুও বলে চল্ল "শুনেছিলাম জয়ন্ত কর্তৃক শ্রীমন্তের নিধন-বৃত্তান্ত তুমি না কি প্রথমে বিশ্বাস করতে চাও নি—বিশিষ্ট প্রমাণ বিনা। সেইখানেই আমাকে তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমার মুখ থেকেই সে প্রমাণ পেয়ে, তুমি শোকে মুহ্যমান হয়ে, সংসারের প্রতি সব আসক্তি হারিয়ে ফেল। সে আমায় রণকালীর নামে শপথ করে তোমার কাছে বলতে বলেছিল যে, শ্রীমন্তকে নিজ হস্তে আমি বধ করেছি। আমাকেও হয় তো তুমি বিশ্বাস করতে না—নরঘাতী দস্যুকে না বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। তাই আমি তোমার সামনে আমার সেই সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খল ভঙ্গ করে বলেছিলাম তোমাকে, যদি আমি সত্যি কথা বলে থাকি, তা'হলে আমার সততায় পুরস্কার স্বরূপ অনায়াসে এই মানুষের অসাধ্য কর্ম্ম করতে পারব।—তাই সে প্রমাণের পর তোমার আর কথা অবিশ্বাস করবার হেতু রইল না। কিন্তু আসলে পূর্ব্ব হতেই শৃঙ্খলের জোড়ের মুখগুলি অস্ত্র দ্বারা জয়ন্ত কর্ত্তিত করে রেখেছিল। তারপর আমি পলায়ন করতেও সক্ষম হই—তা তো তোমার মনেই আছে।"

বিমূঢ়ের মত স্তব্ধ হয়েই সুমেধা দস্যুর কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল। এতক্ষণ পরে অতি কষ্টে যেন লুপ্ত কণ্ঠস্বর

পুনরুদ্ধার করে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আমাকে—আমাকে প্রতারণা করে তোমার কি লাভ ছিল দস্যু ?" "যখন প্রথম জয়ন্ত আমাকে এখানে নিয়ে এলো,—নিভৃতে নিয়ে গিয়ে সে আমাকে জানাল যে, তার এই উদ্দেশ্যটা সফল করাতে পারলে, অর্থাৎ তোমা দ্বারা শ্রীমন্তের নিশ্চিত মৃত্যু প্রত্যয় করাতে পারলে—সে তার পুরস্কার স্বরূপ আমাকে সত্যি-সত্যি পলায়ন করবার সুযোগ দেবে। তাই তার কথামত এই নির্দ্ধারিত ছিল যে শৃঙ্খল ভেঙ্গে আমি পালাবার চেষ্টা করবার সময় শুধু লোক-দেখানো সে আমায় ধরবার চেষ্টা করবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার স্বাধীনতায় আর হাত দেবে না। বনচর দস্যুর কাছে তার স্বাধীনতার তুল্য সংসারে আর কিছু বেশী প্রেয় নয়, শ্রেষ্ঠিকন্যা! জয়ন্তকে বিশ্বাস করেই আমি এসেছিলুম। কিন্তু তোমার সম্মুখ থেকে পলায়ন ক'রে, প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে, সম্মুখের নদী-তীরস্থ কাননের মধ্যে যখন আমি এসে পড়লাম, তখনই আমি জানতে পারলাম যে কি রকম বিশ্বাসঘাতকতা সে আমার সঙ্গে করেছে! তার উদ্দেশ্য আমা দ্বারা সাধিত ক'রে নিয়ে, আমাকে মৃত করবার খ্যাতিটুকুর লোভ থেকেও সে বঞ্চিত করতে চায় নি, আপনাকে!

তাই তার আদেশ মত আমাকে পুনর্ধৃত করবার জন্যে এক নৌকা-ভরা সশস্ত্র প্রহরী সেখানে পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করছিল। এইখানেই আমার ইষ্টদেবতার বর আমায় রক্ষা করেছিল বটে। তাই এক অমানুষিক বলে আমার হাতের সেই এক লৌহ শৃঙ্খলের ছিন্ন অংশ দিয়ে, আর কোন অস্ত্রের অভাবেও তাদের সবগুলিকেই মেরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলাম। তার পর সে নৌকাখানা আমার বড় কাজে লেগেছিল। নদীর উত্তর মুখ দিয়ে সেই নৌকায় বরাবর অনেক দূরে পালিয়ে যাই। জয়ন্ত অবশ্য রটনা করে দিয়েছিল যে, আমাকে মৃত ক'রে তখনই নিহত করে; ও আমার মুণ্ডের বদলে এক রক্তাক্ত মৃত প্রহরীর ছিন্ন মস্তক আমার ব'লে প্রচার ক'রে দিয়েছিল। তখন প্রাণের ভয়ে এক অমানুষিক বলে এতগুলি লোকের সঙ্গে একা যুদ্ধ ক'রে জয়ী হয়েছিলাম বটে,—কিন্তু দেহ আমার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। সে ক্ষত আরাম হতে এক বৎসরেরও অধিক কাল কেটে গিয়েছিল। তার পর আমার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দলকে পুনর্গঠিত ক'রে তুলতে এতদিন সময় লেগেছিল। সে আর কিছুর জন্যে নয়,—শুধু তোমার বিশ্বাসঘাতক স্বামী জয়ন্তের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে; আর এর জন্যে সহায়তা চাই জয়ন্ত পত্নী সুমেধারই!"

এতক্ষণ সুমেধা দস্যুমুখ-নিঃসৃত শ্রীমন্তের জীবিতাবস্থা, জয়ন্তের প্রতারণা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা ইত্যাদি ঘটনাবলী একের পর এক শুনতে-শুনতে, নানা ভাব-বিপর্য্যয়ে স্তম্ভিত হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। দস্যুর শেষ কথায় হঠাৎ তার চমক ভেঙ্গে মনে পড়ে গেল,—নরঘাতী নীচ দস্যুর সঙ্গে আজ সে এ কি বিষয় নিয়ে, এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতিয়ে অনায়াসে এমন কথাবার্ত্তা কইছে! সে নিজে যেন অতি জঘন্য ভাবে প্রতারিত হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু তার জীবনের দুঃখের স্মৃতি কি আজ তাকে এত নীচে নামিয়ে এনেছে। ছিঃ! সমস্ত অন্তর তার যুগপৎ নিজের প্রতি ভয়ে ও ঘৃণায় শিহরে উঠল! দস্যু বরাবর তার মুখের সব ভাব-বিপর্য্যয়গুলিই লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছিল। সে তবু অবিচলিত স্থির কণ্ঠে তার গল্পের উপসংহার ক'রে গেল—"এই তো হোল আমার কথা। কিন্তু শ্রীমন্ত যখন দস্যুদল দমন ক'রে দস্যুপতিকে বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় এমন ক'রে হারিয়ে, তাকে ধরবার বৃথা চেষ্টা ক'রে, অবশেষে—কিছুদিন পরে, ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে দেশে প্রত্যাগমন করল, তখন তার একমাত্র ভরসা ও নির্ভর রইল, তার প্রিয়া সুমেধার অতুল অটুট প্রেমে। কিন্তু যখন সে এসে শুনল ও দেখল যে, কয়েকদিন হোল তার সে স্থান জয়ন্ত অধিকার করেছে, তখন সুমেধার এ আকস্মিক মনঃ পরিবর্ত্তনে ও প্রণয়ের বিশ্বাস-ঘাতকতায় তার এতই আঘাত লাগল যে, এর ভেতরে জয়ন্তের কোন প্রতারণা ও শঠতা সে উপলব্ধি করতেই পারল না। সে তখন থেকেই শ্রাবস্তীনগর ত্যাগ করে দূর উজ্জয়িনীতে গিয়ে বসবাস করতে লাগল।"—এই কথাক'টা বলে দস্যু নীরব রইল। সে বুঝি বুঝতে পেরেছিল, তার প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণার বিষ, সুমেধার মনে আর কোন্ তীব্র হলাহলের সৃষ্টি করলে কেটে যেতে পারে! তাই সেই দিক থেকেই অজানিত ভাবে সে তার মনকে উত্যক্ত ক'রে, তার ফলাফলের জন্যে প্রশান্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল। খুব অধিকক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হোল না।

এতদিন সুমেধা মৃতকল্প দস্যু অঙ্গারককেই তার জীবনের

সুখ নাশের প্রধান হেতু বলে' ভেবে এসেছিল। সে ভুল যখন তার কেটে গেল, আর তার মুখে জানতে পারল, এর প্রধান কারণ হচ্ছে তার স্বামীরই জঘন্য প্রতারণা,—যার ফলে শ্রীমন্ত ফিরে এসে তার প্রেমে সন্দেহ ক'রে, তারই বিশ্বাস-ঘাতকতায় বিশ্বাস ক'রে, দারুণ মনের গ্লানিতে, না জানি কি তীব্র যাতনাই ভোগ করেছিল—সে তার মনোভাব পরিবর্তন ক'রে অনায়াসে অন্যের পরিণীতা হওয়ায়—না জানি সে তাকে কি অস্থিরচিত্তা, লঘুমতি রমণীই না ভেবে গিয়েছিল,—যে শুধু প্রেম নিয়ে দুদিন খেলার অভিনয় করেছিল! আর এর ভিতরকার আসল তত্ত্ব জানবার ও জানাবার উপায়ও যে রাখে নি জয়ন্ত, তার নীচ চাতুরীতে।—এ কথা সে দস্যুর মুখ থেকে জেনে যতই হৃদয়ঙ্গম করতে লাগল, ততই তার এতদিনের মনগড়া স্বামীর প্রতি একটা কঠিন নিশ্চল উদাসীন ভাবের পরিবর্তে দারুণ ঘৃণা ও প্রতিহিংসায় তার মন ভরে উঠতে লাগল। দস্যু দাঁড়িয়ে নীরবে তার এ পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল—তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির মুহূর্তের অপেক্ষায়!

তার পর যখন সে দেখল, এবার তার অনুকূল সময় এসেছে, তখন সে তার উদ্দেশ্য সুমেধার কাছে খুলে ব'লে তার সহায়তা প্রার্থনা করলে। সুমেধা তার মনোবৃত্তির তাড়নে তখন এমনই আত্মহারা যে, সে ভুলে গেল, তার প্রিয় শ্রীমন্তের রক্তে দস্যুর হাত কলঙ্কিত না হলেও, অন্য শত শত নরনারীর রক্তে কলুষিত-হস্ত এ নিষ্ঠুর নীচ দস্যু বই অন্য কেহ নয়। আর তার স্বামী জয়ন্ত যতই প্রতারণা ক'রে তার জীবনের সুখ নাশ ক'রে থাকুক,—সে শুধু তারই প্রেমে উন্মত্ত হয়ে তাকে লাভ করবার জন্যে। সেই স্বামীর অন্তঃপুরে বিশ্বস্ত পুরজন হয়ে থেকে, সে তারই অমঙ্গলের ষড়যন্ত্রের চেষ্টায় প্রত্যক্ষ ভাবে রত হতে চল্ল!

এতক্ষণে চন্দ্র প্রায় পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছেন। তরুণী ঊষার অতি ক্ষীণ লজ্জারুণ হাসির রেখা অস্পষ্ট ভাবে অতি কোমল নীল ও গোলাপী আভায় মুক্তা-মালার স্নিগ্ধ দেহ বর্ণের ন্যায় আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। দস্যু হৃষ্টচিত্তে, সফলকাম হয়ে, আর এক সপ্তাহ পরে সুমেধার নিকট তার উদ্দেশ্য সংক্রান্ত সবিশেষ সংবাদ জানাবার বিষয় স্থির ক'রে, তার বিশাল ভীমদেহের মত দেহ নিয়ে সেই অতি উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে নীচের কালো বনানী মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে এক সপ্তাহ ধরে সুমেধার মনের মধ্যে কত যে অচিন্তনীয় মনোবৃত্তি, ঠিক সুমুপ্ত হিংস্র পশুর মতই হঠাৎ জাগরিত হয়ে, তাদের তীব্র তাড়নায় তার মনকে নিপীড়িত করতে লাগল, তার স্থিরতা নেই। তার মনের মধ্যে তাদের প্রবল অস্তিত্ব এমন ভাবে সে কোন দিনও স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। স্বভাব কোমল মন তার দুঃখে ও বিপর্যায় অবস্থায় পড়ে শুধু আরো ম্রিয়মাণ ও সহিষ্ণুই হয়ে উঠেছিল—একটা ঔদাসীন্য ও অবহেলার ভাব নিয়ে সংসারের এ মহা শ্মশানের প্রতি। দস্যু আজ এ কি তুফান তার হৃদয়ে বহিয়ে দিয়ে গেল, এর তোড় সহ্য করবে কি করে?

এম্নি করেই তার মনের নতুন প্রবৃত্তিগুলির সাথে পরিচয়ে ও দস্যুর অপেক্ষায়, তাহা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত আবশ্যক তত্ত্ব সংগ্রহ করে, এক সপ্তাহ পরে সে সেই প্রকাণ্ড ছাদের নিভৃত কোণটায় অপেক্ষা ক'রে বসেছিল। শরীর মন যেন এ এক সপ্তাহব্যাপী অন্তর্বিপ্লবে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এ একটি সপ্তাহের মধ্যে এমন কি সে তার প্রিয়ের স্মৃতি থেকেও দূরে সরে গিয়েছিল। তার অন্তরাত্মা যেন ক্রমে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, মৃত দয়িতের অশরীরী আত্মাকে যত নিবিড় ক'রে কাছে পাওয়া যায়—জীবিত শ্রীমন্ত যে তার স্থূল দেহ নিয়ে, সংসারের স্থূল দেখা ও কালের মাপকাটীতে তার চেয়ে অনেক দূরে অপসৃত! অথবা সে প্রিয় মধুর স্মৃতিটুকু তার এখনকার এ দারুণ হলাহলপূর্ণ মনের হাওয়ার নিকট আসতে পারছিলও না—যতক্ষণ তা এমনি উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ থাকবে।

চন্দ্রের কণাও ততক্ষণে শেষ হয়ে এসেছিল—অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার ক্রমশঃ তাই ঘিরে আসছিল, তার মনটাকেও ঠিক সেই রকম আচ্ছন্ন করে; নৈশবায়ুর দুরন্ত প্রতিধ্বনি যেন ক্ষণে-ক্ষণে কেঁপে-কেঁপে তার বুকের মধ্যেও বেজে উঠছিল। এক-এক সময় অধীর ভাবে সে পদচারণা করে আবার স্বস্থানে ফিরে আসছিল। মনে হচ্ছিল আর বেশীক্ষণ দস্যুর বিলম্ব হলে, সে তার শপথ রাখতে পারবে না,—বুকের মধ্যে থেকে একটা চীৎকার বাহির হয়ে পড়ে,—এখুনি তাকে দূরে পালিয়ে যেতে হবে। এমন সময় দেখল, দস্যুর প্রকাণ্ড দেহ নিঃশব্দে অবলীলাক্রমে প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে,

তার কাছে নত মস্তকে এসে দাঁড়াল। যদি চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোকও সেদিন থাকত, এবং তার মন এতটা বিচলিত অবস্থায় না থাকত, তবে সে দস্যুর মুখের ও চোখের অদ্ভুত ভাবে অবাক্ হয়ে যেত। কিন্তু সুমেধা তা অন্ধকারে ও উদ্বিগ্ন চিত্তে কিছুই লক্ষ্য করতে পারল না। সে দস্যুকে নিকটে আসতে দেখেই, উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বল্ল "অঙ্গারক, তোমার এতো বিলম্ব হোল যে? রাত যে দ্বিতীয় প্রহর অতীত হতে চল্ল, কখন তোমার কার্য্য সিদ্ধি হবে? এখানে আমার কথা শুনতে-শুনতেই যে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।"

দস্যু এসে আস্তে-আস্তে সুমেধার পায়ের কাছে উপবেশন করল ও তেমি ধীরে ভাবে বল্লে "শ্রেষ্ঠিকন্যা, আমার যে সে কথা জানবার আর প্রয়োজন নেই।"—সুমেধা দস্যুর মুখ ও চোখের ভাব লক্ষ্য না করতে পারলেও, তার কণ্ঠস্বরে ও ততোঽধিক তার কথার ভাবে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কিন্তু সে, সে ভাব সম্বরণ করে, একটু অধীর ও রূঢ় ভাবেই প্রশ্ন করল "এর অর্থ কি? আমা দ্বারা অনর্থক এতগুলি অপ্রিয় কার্য্য সিদ্ধি করিয়ে নিয়ে, আর তোমার তাতে প্রয়োজন নেই মানে কি? আমার সহায়তা বিনা যদি তোমার কার্য্যসিদ্ধি হোতই, তবে আমাকে এর মধ্যে টানবার দরকার ছিল কি? তা'ছাড়া ভিতরের খবর তুমি জানলে কি ক'রে? জানলেও, ভুল জেনেছ। কারণ, জয়ন্ত তার দলবল নিয়ে আজ রাত্রি তিন প্রহরের সময় নগরের উত্তর দ্বার দিয়ে ত্রিহুতের বনের মধ্যে দিয়ে ক্রমে পশ্চিম দিকে যাত্রা করবে। সেই অন্ধকার উপত্যকার মধ্যেই তোমার কার্য্য সিদ্ধির খুব সুবিধা ছিল। কিন্তু এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর—এর মধ্যে তুমি সে কার্য্য সিদ্ধ করলেই বা কি ক'রে, আর—সে খবর সঠিক জেনে থাকলে, তোমার দলবল সহ ত্রিহুতের উপত্যকার ঘন অন্ধকারে অপেক্ষা না ক'রে, এ রকম নিষ্কর্ম্ম, অলস ভাবে আমার নিকটেই বা বসে আছ কি ক'রে?

দস্যু সুমেধার এ অধৈর্য্যপূর্ণ তীব্র অনুযোগের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না ক'রে, ধীর, শান্ত ভাবে শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করল। তার পর সে তার জলদগম্ভীর স্বরে বিশ্বের করুণা মাখিয়ে যেন বলতে লাগল, "সুমেধা, যথার্থই যে আমার সে সংবাদে আর প্রয়োজন নেই। জয়ন্তের অমঙ্গল যে আমি আর কামনা করি না সুমেধা। সে নিশ্চিন্তে যেখান থেকে ইচ্ছা, স্বকার্য্য সাধন করবার জন্যে যাত্রা করতে পারে;—দস্যু অঙ্গারকের দল আর তাতে হস্তক্ষেপ করবে না।"

সুমেধা অবাক্ হয়ে এখনো দস্যুর এই মতি-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিল। কিন্তু যতই সে তার প্রশান্ত ভাবের পরিচয় পাচ্ছিল, ততই যেন অত্যন্ত অধীর ও উগ্র হয়ে উঠছিল। তার সদ্য-জাগ্রত, উন্মত্ত পশু-প্রবৃত্তিগুলি যেন প্রথমে উত্যক্ত হয়ে, তার পর এমন ভাবে বাধা পেয়ে, আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বার হয়ে আসতে চাইছিল। তাই সে দস্যুকে যা মনে এলো তাই বলে তিরস্কার করল;—শঠ, প্রবঞ্চক, কাপুরুষ, দুর্ব্বল, জয়ন্তের নিকট অর্থলোভে বিক্রীত হয়ে প্রতিহিংসা পালনে অসমর্থ, ইত্যাদি অনেক রূঢ় ও অপ্রিয় কথাই বল্লে। তার মনে হতে লাগল, কোন রকমে এ দানবের পশু-প্রবৃত্তিগুলিকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবেই; কেন না, সে যে নিজে তাদের তাড়নে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

তার মনে হোতে লাগল, এম্নি করে অসহায় ভাবে দুর্দ্দান্ত দস্যুর অপমান করলে পর, ক্রোধের বশে সে তাকে যদি আক্রমণ বা বধ করে, তাও যেন বাঞ্ছনীয়,—এমনই তখন তার মনের অবস্থা।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সমস্ত তিরস্কার, সমস্ত অপমান পূর্ব্বাপেক্ষা আরো প্রশান্ত ভাবে সহ্য করে, কণ্ঠস্বরে আরো যেন কোমলতা মিশিয়ে সে উত্তর করল, "সুমেধা, এখন ভাল করেই বুঝতে পারছি,—ক্রোধ, হিংসা, অপ্রেম, নিষ্ঠুরতা মানুষকে পশুর মত করে কি বিনাশের পথেই না তাকে নিয়ে যেতে পারে,—যে হিংসা স্বভাব-কোমলা বিশ্বের করুণা-রূপিনী নারীর মনকেও এমনি বিকৃত করতে পারে। কিন্তু তুমি দস্যু অঙ্গারক সম্বন্ধে যা বল্লে, তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। তাই তা শুনলে তার ক্রোধ হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু হয় তো হোত; কারণ, মানুষের স্বভাবই যে তাই,—যতক্ষণ সে এ সবার বন্ধন হতে মুক্ত হতে না পারে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, দস্যু অঙ্গারক তো আর নেই;—তাই তার প্রতিহিংসা-বৃত্তিরও বিনাশ হয়ে গেছে। এখন যে সে শুনেছে ও শিখেছে, প্রভুর মুখের বাণী—"অহিংসা পরম ধর্ম্ম, সর্ব্ব জীবে দয়া।"

সুমেধা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে অঙ্গারকের কথা শ্রবণ করছিল। এ কি সেই এক সপ্তাহ পূর্ব্বেকার উদ্ধত, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপ্রিয় দস্যু? কি পরশমণি স্পর্শে এতো অল্প কালের মধ্যে তার এ

অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সম্ভব হোল! বিস্ময়ে ও কৌতূহলে তার নিজের মনের সব বিষময় জ্বালাগুলোও যেন উপশম হয়ে আসছিল। তবু নিজের সে কৌতূহল চেপে রেখে, একটু তীব্র শ্লেষের সঙ্গেই সে জিজ্ঞেস করল, "কে তোমার সে নতুন প্রভু, শুনতে পারি কি?"

দস্যু বল্ল, "শ্রেষ্ঠিকন্যা, তাঁর নাম কি তুমি এ পর্য্যন্ত শোন নি? তবে শোন—তিনি যে পরম করুণা-নিধান প্রভু বুদ্ধ ভগবান্,—যাঁর অমৃতময় সঞ্জীবনী মন্ত্রে দস্যু অঙ্গারক নতুন জীবন লাভ ক'রে, তাঁর চরণের দাসানুদাস ভিক্ষু অঙ্গারক হয়েছে। তাঁর সংসর্গে যে গভীর অন্ধকারেও আলো ফুটে ওঠে,—মত্ত হস্তী এক নিমেষের মধ্যে শান্ত ভাব ধারণ করে। জীবের দশা দেখে তিনি যে সর্ব্বত্যাগী হয়ে, সাধন-বলে বুদ্ধত্ব লাভ ক'রে, জীবের পরিত্রাণ ও মুক্তির জন্য দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

সুমেধার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর ক্রমশঃ তার সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি শান্ত ভাব ধারণ করছিল। উদ্‌গ্রীব হয়ে সে অঙ্গারকের কথা শ্রবণ করছিল। তাই সে অপেক্ষাকৃত ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "অঙ্গারক, এ অদ্ভুত পুরুষের দর্শন তুমি কোথায় পেলে, আর কি করে তোমায় তিনি এমন বশে আনলেন?"

অঙ্গারক বল্ল, "আচ্ছা, তবে তোমায় সব কথা বলি শোন। তোমার কাছ থেকে সেদিন উদ্দেশ্য সিদ্ধি ক'রে, প্রতিহিংসার অনল তোমার মনের মধ্যে বেশ করে জ্বালিয়ে, জয়ন্তের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ ক'রে, কাননের এক প্রান্তে একটা উচ্চভূমিতে আমি বিচরণ করছিলাম। তখন নতুন উষার আগমনে সমস্ত জগতে একটা প্রাণের হিল্লোল পড়ে গেছে। অদূরে নিম্নভূমিতে কৃষকেরা তাদের দৈনিক কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। চারিদিকেই আলোর মেলা। শুধু আমার পশ্চাতের বন-খণ্ডেই রজনীর অন্ধকার পুঞ্জীভূত,—যেন আমার মসীলিপ্ত গত জীবনটার একটা নিদর্শনের মত। আমার ভয়ে, জান তো, কেউ সে বনে দিনের বেলাও সদলে প্রবেশ করতে পারে না।—এমন সময় দেখলাম, একজন পথিক বরাবর মাঠের ভিতরের রাস্তা বেয়ে, সেই বনখণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছে। পথের মধ্যে দেখলাম, মাঝে-মাঝে দু'একজন আমার সে বনখণ্ডের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করে, বোধ হয় আমার সম্বন্ধেই সতর্ক ক'রে দিয়ে, তাকে আসতে নিবৃত্ত করছিল। কিন্তু দেখলাম, পথিক তেমি প্রশান্ত ভাবে অগ্রসর হয়ে আসতে লাগল।

পথিপার্শ্বস্থিত লোকদের একটা সম্ভ্রম-জড়িত অভিবাদনের ভাব দেখে হঠাৎ আমার মনে হোল, এ বোধ হয় সেই বুদ্ধ ভগবান, যাঁর কথা আমি কিছুদিন থেকে লোক-মুখে শুনে আসছি; আর যাঁর নাম নগরে এতো খ্যাত হয়ে উঠছিল যে, আমি শুনেছিলাম নগরের অনেক সমৃদ্ধ লোক বহু মহামূল্য অর্ঘ্য-সম্ভার নিয়ে তাঁর চরণ-পূজা করতে যান,—যখন প্রতি সন্ধ্যায় তিনি তাঁর দলের লোক পরিবৃত হয়ে, মন্দির সম্মুখস্থ কানন তলে বসে তাঁর বাণীর প্রচার করেন। কিছুদিন থেকে আমার মনে একটা অভিসন্ধিও খেলছিল যে, হঠাৎ একদিন তদবস্থায় তাঁদের ধৃত করে সমস্ত লুণ্ঠন করে আনব। কিন্তু কি জানি কেন, কার্য্যতঃ তখনও তা করি নি।

পথিক অধিকতর নিকটবর্ত্তী হলে, লোক-মুখে শ্রুত বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর আকৃতি যেন মিলে গেল মনে হোল। লোক দ্বারা আমার সম্বন্ধে সতর্কিত হয়েও, তা উপেক্ষা করে এমন প্রশান্ত ভাবে, তাঁকে চলে আসতে দেখে, আমার কৌতূহল, বিস্ময় ও ক্রমশঃ ক্রোধও উপস্থিত হোল। মনে হোল, 'দাঁড়াও ঠাকুর, তোমার প্রশান্তি ও সাহস এবার বার করছি।'—এই ভেবে তাঁকে লক্ষ্য করে এক অব্যর্থ বাণ ছুঁড়লাম। কিন্তু সেটা তাঁর পাশ দিয়ে গিয়ে, একটা বৃক্ষ-কাণ্ডে বিঁধে রইল। পথিক তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে কিন্তু বরাবর অগ্রসরই হয়ে আসতে লাগলেন। তখন আর একটা বাণ খুব ভাল করে লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। কিন্তু আশ্চর্য্য! সেটাও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়ে, একেবারে ব্যর্থ হোল! তখন সত্যি আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—আজ আমার হোল কি! উড়ন্ত বাজ পক্ষীকেও লক্ষ্য করে যে আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নি কখন! তখন রাগ করে তীর ধনুক ফেলে দিয়ে একটা কুঠার হাতে তাঁর দিকে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরতে গেলাম, কিন্তু আমার পা যেন কেঁপে উঠল,—নড়তে চাইল না। তখন মনে হোল, নিশ্চয় বুঝি বা এর মধ্যে কোন দৈব শক্তি আছে, নইলে এ রকম কেন হচ্ছে? তখন আমার মনে কেমন ভয়ের সঞ্চার হোল। আমি আমার কুঠারটা দূরে ফেলে দিয়ে, চীৎকার করে বল্লাম, "ও ঠাকুর, ও ঠাকুর, তুমি কে বলে যাও—আর তোমার গতি একটু সম্বরণ করে, আমায় তোমার কাছে

আসতে দাও।" পথিক মুখ তুলে আমার দিকে স্মিত হাস্যে চেয়ে বল্লেন, "আমি তো স্থির, শান্ত ভাবেই রয়েছি। তুমিই তোমার চঞ্চল গতি পরিত্যাগ করবার চেষ্টা ক'রো।"

আমি তো অবাক্ হয়ে গেলাম! এ কি রকম কথা বলেন তিনি! এইখানে এই আমি চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আর তিনি ক্রমাগত হেঁটে আসছেন; কিন্তু বলেন কি না, তিনিই স্থির ভাবে আছেন, আর আমি চঞ্চল, গতিশীল!—যাক, ততক্ষণে আমার চলার শক্তি ফের ফিরে পেয়ে, আস্তে-আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে, তাঁর পায়ের তলে পড়ে বল্লাম, "তুমি কে, আর এর মানে কি—আমায় বলতেই হবে।" তাতে তিনি হেসে বল্লেন "দেখ অঙ্গারক, জগতের কারুর প্রতি হিংসা, ক্রোধ বা অপ্রেম নেই আমার; জগতের কিছুতে আসক্তিও নেই আমার। আর তাই মন আমার সর্ব্বদাই প্রশান্ত, স্থির, ধীর। আর তোমার মন আজ লোভে, কাল ক্রোধে, কখন হিংসায়, কখন প্রতিহিংসায় সর্ব্বদাই উদ্বেলিত, অশান্ত, অস্থির।" আমি তাঁর অদ্ভুত কথা শুনতে-শুনতে ক্রমশঃই বিস্মিত, মুগ্ধ ও তন্ময় হয়ে যাচ্ছিলাম। সেই থেকে ভগবান বুদ্ধের আশ্রয়ে আমার জীবন নতুন হয়ে গড়ে উঠেছে। এ কয় দিনের মধ্যে তাঁর অতুল করুণার বলে জানতে শিখেছি, সংসারে প্রবৃত্তি ও আসক্তির পাশই মানুষকে বেঁধে রেখে সর্ব্বদা তাকে দুঃখ দেয়। তার নিজের মনেই তার স্বর্গ ও নরক সৃষ্ট হয়। মানুষ নিজের কর্ম্মফলেই নিজের নিজের দশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে চায়, যে সাধন করে, সে ইচ্ছা করলে নির্ব্বাণ ও মুক্তির পথ পাবেই পায়,—হাজার পাপী আর দুঃখী হোক না সে। জগৎকে দুঃখের পাশ থেকে মুক্ত করবার জন্যেই এবং তা শেখাবার জন্যেই ভগবান্ বুদ্ধ অবতীর্ণ।"

মরুভূমির মাঝখানে হঠাৎ জল-সঞ্চারে আকণ্ঠ পূরে তৃষ্ণার্ত্তের জল পানের মত, সুমেধা অঙ্গারকের প্রত্যেক কথা শুনছিল। শেষ হলে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়, অঙ্গারক?"

"সেই বনের অপর পারেই একটা পুরাতন মন্দিরে এখন তিনি বাস করছেন। তাঁর চারিদিকে অনেক ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও শিষ্যের দল এরই মধ্যে গঠিত হয়ে উঠছে,—তাঁর সঞ্জীবনী বাণীতে জীবনে নতুন রস সংগ্রহ ক'রে। সেদিন তোমায় আমার প্রতিহিংসার পথের সঙ্গিনী করবার চেষ্টা করেছিলাম সুমেধা,—সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে প্রথমেই তাই আমার এ অমৃত-তত্ত্বের ভাগ দেবার জন্যে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তা না হলে আর আসবার প্রয়োজন তো ছিল না। প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করবার চেষ্টা ক'রে দেখো একবার সুমেধা। আজ তবে আমি বিদায় হই।" এই বলে অঙ্গারক চলে গেল।

তারই কিছুদিন পরে, সংসার-ক্লান্তা সুমেধা, সঙ্গ কামনা ক'রে ও তাঁর অমৃতময় বাণীতে সিক্ত হবার জন্যে, তাঁর গঠিত ভিক্ষুণীদের দলে প্রবেশ করল। সংসার থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে সে যখন সেই শান্ত-চিত্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন ক্রমশঃ তার মন এমন একটা শান্তির রসে ডুবে যেতে লাগল যে, ক্রমে-ক্রমে সে উন্মাদনায় শ্রীমন্তের ছবি তার মনের মধ্যে অস্পষ্টতর হয়ে উঠল। কিন্তু প্রভু বুদ্ধের বিদায়-দিনের সেই কথা কয়টার মধ্যে নতুন করে একে-একে তার অতীত জীবনের সব দৃশ্য ও ঘটনা যেমন জেগে উঠতে লাগল, তেমি তারই সাথে-সাথে দুর্দমনীয় বাসনার স্রোতে তাকে উদ্ভ্রান্ত করে তুল্ল,—তার প্রিয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আকুল ক'রে।

এতদিনে তাই সে বুঝতে পারল, সে তো নিজের চিত্তকে জানতে, বুঝতে ও দমন করতে শেখে নি; সে শুধু তার চিত্তবৃত্তিগুলি ও সংসারের অশান্তিগুলি, ধর্ম্ম শান্তি সাধনের মধ্যে ভুলে থাকতে চেয়েছিল,—প্রভু বুদ্ধের সঙ্গের উপর নির্ভর করে,—নিয়ত তাঁর আশার বাণী শ্রবণ করে। এখন সে বুঝতে পারল, সে আশার বাণী প্রতিদিন নতুন নতুন ভাবে সিক্ত করে, যতদিন তার জীবনের পথ সরস করে রেখেছিল, ততদিন তার চিত্তটাকে যথেষ্ট শান্তি-রস দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যা সেই জীবনের প্রতিদিনের সম্বল, অমনি আবার সেই প্রবৃত্তিও অশান্তির স্রোতে মন তার হাবুডুবু খেতে লাগল। মঠের স্নিগ্ধ শান্ত বৈরাগ্যের হাওয়া তার ক্লিষ্ট মনকে কিছুতেই আর সুস্থির করে তুলতে পারল না।

সে যখন ভিক্ষুণীদের আশ্রমে এসে তাদের ব্রত গ্রহণ করে, সেই সময় তার বাল্যসখী জয়শ্রীও তার স্বামীর মৃত্যুর পর শোকে পাগল হয়ে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়। তখন থেকে সে ঠিক তাদের বাল্যকালের মতই তার বাল্য-সহচরীর পাশে পাশে ছায়ার মত তার অনুগমন করতে লাগল।

এরকম মন নিয়ে এ ধর্ম্মাশ্রমে থাকাও আর সঙ্গত মনে হল না। তাই সুমেধা তার মনের ভাব অকপটে জয়শ্রীর কাছে খুলে বল্লে। জয়শ্রী তার জীবনের এ অধ্যায়ের কথা বেশ ভাল করেই জানত; কারণ, তারই সাথে অশোক-কাননে বিচরণ করতে-করতে প্রথম তার শ্রীমন্তের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়।

জয়শ্রী অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ ঠিক করল যে, তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে ভিক্ষু অঙ্গারকই তার সখীর এ ইতিবৃত্ত সবই জানে। তাকে যদি কোন রকমে রাজী করিয়ে একবার উজ্জয়িনীতে শ্রীমন্তের সংবাদের জন্যে পাঠান যায়, তা'হলে আপাততঃ সখীর মনের চাঞ্চল্য একটু শান্ত হয়। তার পর যা বিধেয় হয়, তা করা যাবে। তাই সে নিভৃতে অঙ্গারককে ডেকে একদিন এ প্রস্তাব করল। আশ্চর্য্য, অঙ্গারক ভিক্ষু-সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ এ কর্ম্মে কিছুমাত্র আপত্তি না ক'রে তখনই উজ্জয়িনী যাবার জন্য প্রস্তুত হোল। কিন্তু নিজে সে কিছুই বল্লে না বা কোন প্রশ্ন করল না। শুধু তার ভিক্ষার ঝুলিটী স্কন্ধে তুলে নিয়ে সেই দিনই প্রস্থান করল।

তার পর দীর্ঘ চার মাস আশার ও নিরাশার হিল্লোলে শরীর-মন অবসন্ন ও পীড়িত ক'রে তুলে, সুমেধা অঙ্গারকের পথ চেয়ে বসে রইল। মন তার বুঝতে পারত, এ সবই মায়ার খেলা,—এর বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত না করতে পারলে, মুক্তি নেই, মুক্তি নেই। তবু এ বাসনার ঘোর কাটতে চাইত না,—আশার আশায় পথ চেয়ে থাকত।

তার পর একদিন হেমন্তের সোণালী প্রভাতে মাঠের দোসারি-দেওয়া ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে তার দীর্ঘ ছায়া ফেলে অঙ্গারককে আসতে দেখা গেল। উৎসুক প্রতীক্ষায় নিঃশ্বাস রোধ করে ভিক্ষুণী সুমেধা তার ক্ষীণ দেহখানি অতি কষ্টে পর্ণ-শয্যা থেকে তুলে এনে, দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াল। জয়শ্রীও হাতের কাজ ফেলে পাশে এসে দাঁড়াল। তার পর ভিক্ষু এসে, তার ঝুলিখানি নামিয়ে রেখে, বিশ্রাম না করেই বলতে লাগল, শ্রীমন্তকে সে কি ভাবে দেখে এসেছে। সে এখন সে নগরের একজন বিখ্যাত ধনী বণিক,—সংসারের সাধারণ লোকের মত তার জীবন,ধন,জন, বিলাস, ভোগ, ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ; গৃহসংসার পেতেও সে বসেছে। নগরে তার মত ভোগ-বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী লোক খুব কমই আছে—এই বলে অঙ্গারক তার ভিক্ষার ঝুলিটা আবার স্কন্ধে তুলে নিয়ে যাত্রার উদ্যোগ করল। তা দেখে জয়শ্রী তাকে জিজ্ঞাসা করল, তাদের ফেলে এত শীঘ্র সে কোথায় আবার যাচ্ছে। অঙ্গারক বল্লে "দেখ জয়শ্রী, সুমেধার জীবনে দুইবার আমি বড় ক্ষতি করতে যাই। তাই তার কাছে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যা কিছু দণ্ড তার জন্যে মাথায় তুলে নেব স্বীকার করেছিলাম। ভিক্ষু-সম্প্রদায়-বিগর্হিত এই কাজ তাই আমি মাথায় তুলে নিয়েছিলাম বিনা বাক্য-ব্যয়ে। এখন আমি যে শপথমুক্ত হয়েছি। তাই আমার এখানকার কাজও ফুরিয়েছে। আজ আমি আবার আমার প্রভুর চরণানুসরণে তাঁরই চরণ দর্শনাভিলাষে উত্তর দিকে যাত্রা করছি।—সুমেধার প্রতি আমার শেষ অনুরোধ, তার প্রতি প্রভুর শেষ বাণী যেন সে ভাল করে বুঝতে শেখে—তবেই এ সংসারে তার পরিত্রাণ।" এই বলে সে বিদায় নিল।

এদিকে অঙ্গারকের মুখে শ্রীমন্তের কাহিনী শুনে, কি জানি কি রকমে সুমেধার আশালুব্ধ মন একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়ল। সে গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়ল। হয় ত বা তার আশাভ্রান্ত মন এক-এক সময় এই মনে করে উৎফুল্ল হয়ে উঠত,—তার অগাধ অটুট প্রেমে তারই স্মৃতি লক্ষ্য করে শ্রীমন্ত বুঝি বা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, সংসারে রিক্ত সন্ন্যাসী হয়ে। কিন্তু এমনও যদি হয়, তা'হলেও আর কি তার জীবনে সুমেধার স্থান হতে পারে?—না তো! আবার এক-এক সময় মনে হোত, তাকে প্রণয়ে বিশ্বাস-ঘাতিনী ভেবে হয় তো স্মৃতি-পথ থেকেও তার নামটা শ্রীমন্ত ঘৃণায় মুছে ফেলে দিয়েছে। এরকম কত কথাই মনে হোত। কিন্তু যেদিন সত্যি করে সে জানতে পারল, সাধারণ সংসারের লোকের মতই শ্রীমন্তের জীবন পরিপূর্ণ, তখন কেন জানি না', তার মন একেবারে রক্তাক্ত হয়ে, ছিন্ন হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

যখন জয়শ্রী তার অক্লান্ত সেবায় সখীর শয্যাপার্শ্ব ভরিয়ে দিত, তখন মাঝে-মাঝে সে তার আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে নিজের মনেই তাকে বলতে শুনত—"বুঝেছি, বুঝেছি প্রভু, এবার কেন আমায় বলেছিলে, 'বাসনাই দুঃখের মূল'।

দিল্লী-সাম্রাজ্যের পতন-কাহিনী*

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

অনেক দিন হইতে মোগল-সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের একখানি প্রামাণিক ইতিহাসের একান্ত অভাব ছিল। Keene, Owen—এমনি আরও অনেকে এদিকে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কেহই যথেষ্ট পরিশ্রম করেন নাই—মূল উপাদানের সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করেন নাই। সুখের বিষয়, এতদিনে আমাদের সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে;—একখানি প্রামাণিক ইতিহাস আমরা পাইয়াছি।

'মানুষীর ভ্রমণ-কাহিনীর' সম্পাদক ও অনুবাদক উইলিয়াম্ আর্ভিনের নাম ইতিহাস-পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। যুক্তপ্রদেশের ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে তিনি এদেশে অনেকদিন ছিলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি শুধু হাকিমী করিয়াই সময় কাটান নাই—সেকালের সিবিলিয়ান্গণের মত বিশেষ আগ্রহে ফার্সী ভাষা আয়ত্ত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ—ফার্সী পুঁথি পড়ায় দক্ষতালাভ করেন। মোগল-ইতিহাস-সংক্রান্ত হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় মুদ্রিত ও 'লিথো' পুস্তকাদি ছাড়া, বহু দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত ফার্সী পুঁথি, সরকারী-চিঠিপত্রও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পেন্‌সন্ লইয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় আর্ভিনের বয়স ৪৮ বৎসর। তিনি আশা করিয়াছিলেন, সুস্থশরীরে দীর্ঘ অবসরকাল এদেশের ইতিহাস-সেবায় উৎসর্গ করিবেন। হাতে ছিল প্রচুর ফার্সী-উপাদান; তা'ছাড়া বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় দখলের ফলে ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ ও ফরাসীদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেকর্ডস্ এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকগণের ভারত হইতে লিখিত পত্রাবলী পড়িবারও তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল; তাই তিনি মোগল-রাজত্বের অধঃপতনের একখানি সুসম্পূর্ণ প্রামাণিক ইতিহাস—*Later Mughals* নাম দিয়া প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করেন।

আওরংজীবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) হইতে, ইংরেজ কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার (১৮০৩) পর্য্যন্ত—সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসই আর্ভিনের লিখিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইতিহাস-রচনায় তাঁহার যত্ন ও সতর্কতার অন্ত ছিল না।—প্রচুর তথ্যের সন্নিবেশ করিয়া, প্রত্যেক খুঁটিনাটির প্রতি নজর রাখিয়া, সত্যাসত্যের বিচারে অজস্র সময় দিয়া, তিনি রচনাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। এ বিষয়ে তিনি জর্ম্মান্-পণ্ডিতদের অপেক্ষাও বেশি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই জন্যই ৯৬ বৎসরের ইতিহাস লিখিতে গিয়া, জীবদ্দশায় তিনি মাত্র ৩১ বৎসরের (১৭০৭ হইতে ১৭৩৮—অর্থাৎ নাদির শাহের ভারতাক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) ঘটনা লিখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় (১৭১২-১৭১৯-এর ঘটনা) কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে *Later Mughals* এর বেশির ভাগই অপ্রকাশিত ছিল—ইহার খসড়া আর্ভিনের কন্যা অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। তিনি আর্ভিনের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখাগুলি সম্পাদন করিয়া, সম্প্রতি *Later Mughals* নাম দিয়া বড় বড় দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। আর্ভিনের লেখার মধ্যে যে সকল ফাঁক ও ছাড় ছিল, তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইয়াছে; প্রমাণগুলি যাচাই করিয়া ও ভুল সংশোধন করিয়া দিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া সম্পাদকীয় বহু পাদটীকা, এবং স্থলবিশেষে আর্ভিনের বহু অজ্ঞাত নূতন তথ্য [যেমন মারাঠী-উপকরণ] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পুস্তকের একটু পরিচয় লইলেই বক্তব্যগুলি বেশ পরিস্ফুট হইবে। প্রথম্ খণ্ডে আছে:—গ্রন্থকারের একখানি সুন্দর চিত্র; সম্পাদকের লেখা—আর্ভিনের সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী, তাঁহার গ্রন্থগুলির সমালোচনা এবং বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত রচনাগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা। তাহার পর, আর্ভিনের

* *Later Mughals* by William Irvine, ed. and continued by Prof. Jadunath Sarkar, M.A., I.E.S., 2 vols. Rs 8/- each. Published by M. C. Sarkar & Sons. 90/2A Harrison Road, Calcutta.

লেখা—আওরংজীবের পুত্র বহাদুর শাহ্‌র (১৭০৭) রাজ্যারম্ভ হইতে মুহম্মদ্‌ শাহ্‌র রাজ্যাভিষেক (১৭১৯) এবং সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়—হুসেন আলি ও আব্‌দুল্লার চরম প্রাধান্য-লাভের ইতিহাস।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে,—মুহম্মদ্‌ শাহ্‌র সিংহাসন-গ্রহণ হইতে নাদির শাহ্‌র ভারতাক্রমণ পর্য্যন্ত ইতিহাস।

আর্ভিনের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি এপ্রিল ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পর আর অগ্রসর হয় নাই। ইহার কয়েক মাস পরেই নাদির শাহ্‌র দিল্লী-অধিকার, এবং মোগল-সাম্রাজ্যের প্রকৃত যবনিকা-পতন। আর্ভিন্‌ এই ঘটনার কোন বিবরণই রাখিয়া যান নাই। অধ্যাপক মহাশয় দেখিলেন, আর্ভিন্‌ যে পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেইখানে থামিলে গ্রন্থখানি শেষাঙ্ক-হীন নাটকের মত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই তিনি অনেক ফার্সী ও মারাঠী-উপাদানের সাহায্যে নাদি-রের এক সুদীর্ঘ কাহিনী (৭৩ পৃঃ) যোগ করিয়া দিলেন। সোনায় সোহাগা হইল। নাদিরের ভারত-আক্রমণের এমন বিস্তৃত মৌলিক তথ্যপূর্ণ ইতিহাস আর কোন ভাষায় নাই, অথচ প্রত্যেক ঘটনাই সত্য,—সমসাময়িক প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত।

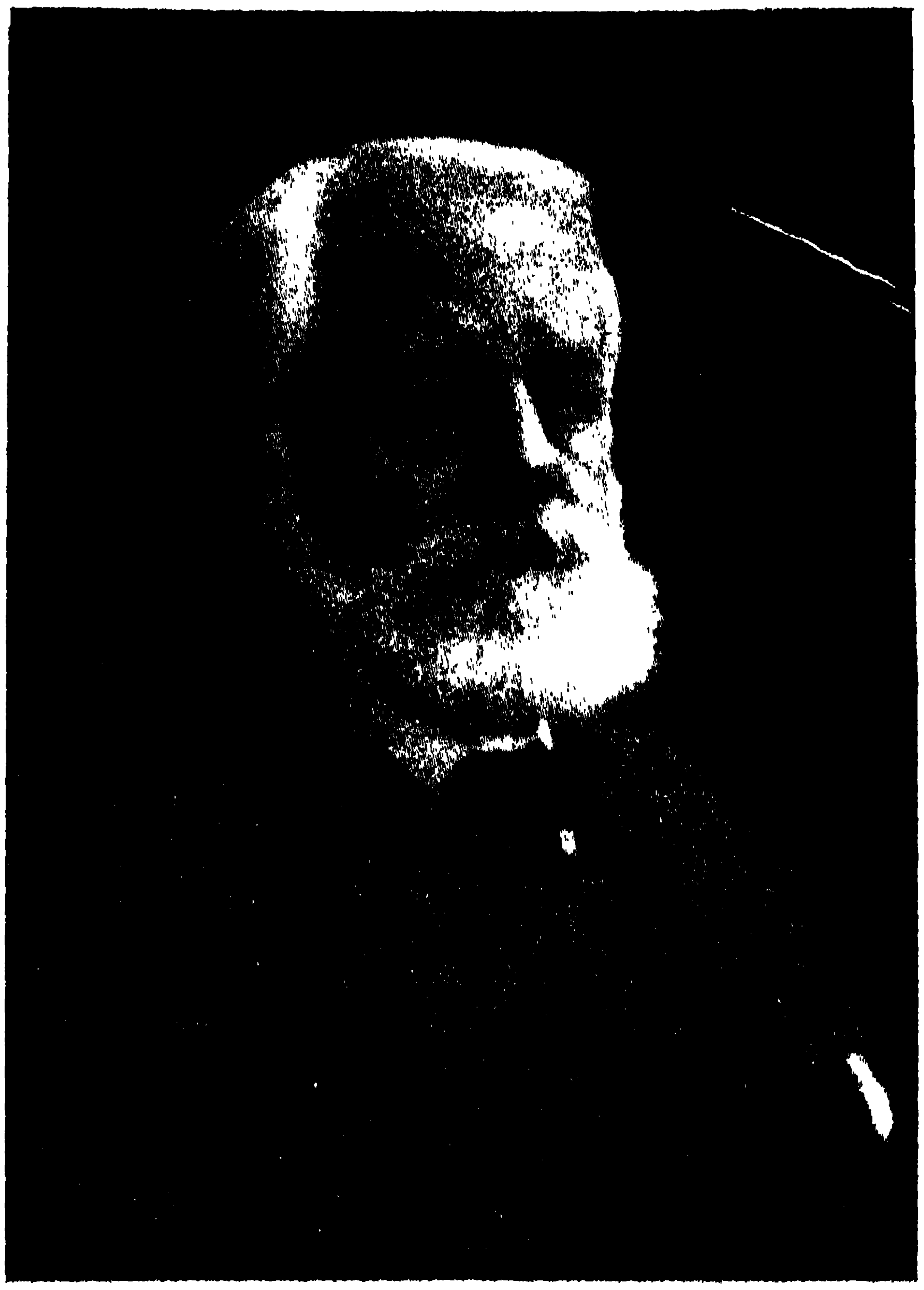

পরলোকগত উইলিয়াম আর্ভিন

শুধু ঘটনা সংযোজনাতেই অধ্যাপক সরকারের কৃতিত্ব নহে, ইতিহাসের যেটি সব শেষের কথা—যাহা বলা না হইলে ইতিহাসের অনেক কথাই বলা হয় না, তাহাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। ঘটনাগুলিকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন এবং কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ-নির্ণয়, সত্যাসত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া রায় প্রকাশ করিয়াছেন। শেষাংশে তাঁহার এই ঐতিহাসিক দার্শনিকতা (philosophy of history) যে গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তিনি লিখিতেছেন :—

"নাদির শাহ্‌র অভিযান মোগল-সাম্রাজ্যকে লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া গেল। কিন্তু ইহা দিল্লী-সাম্রাজ্যের অবনতির কারণ নহে—ঐ অবনতিরই একটা প্রধান নিদর্শনমাত্র। যাহা পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে, পারসীক-বিজেতা সেই ঘটনাকে জগতের সমক্ষে দেখাইয়া দিলেন,—যে মোহের বশে লোকে সাজ-সজ্জায়-ভূষিত এক শবকে জীবিত পালোয়ান্‌ বলিয়া মনে করিত, সেই মোহ তিনি ভাঙ্গিয়া দিলেন। কেন এমন হইল? কিরূপে আক্‌বর ও শাহ্‌জহান্‌, মানসিংহ ও মীরজুম্লার কীর্ত্তি এমনভাবে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল? আওরংজীবের জীবদ্দশায় সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বলিয়া যে সাম্রাজ্যের এত খ্যাতি, তাঁহার মৃত্যুর ৩১ বৎসর পরে কেন সেই বিশাল সাম্রাজ্য একেবারে ভূমি-সাৎ হইয়া পড়িল?"

এই 'কেন'র উত্তর অধ্যাপক সরকার গ্রন্থের শেষ তিন অধ্যায়ে বেশ গুছাইয়া দিয়াছেন। কর্ণালের যুদ্ধ ও নাদিরের জয়লাভের কারণ এত বিশদ্‌ ও যুক্তিযুক্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা যেন ঘটনাগুলি স্বচক্ষে দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়।

আর্ভিন্‌ তাঁহার গ্রন্থে শুধু দিল্লীর মোগল-সম্রাটদেরই ইতিহাস লিখিয়া যান নাই,—তাঁহার আলোচ্য সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে-সকল জাতি ও সম্প্রদায়

বর্তমান ছিল,—যেমন শিখ, মারাঠা, বুন্দেলা, জাঠ ও রোহিলা, তাহাদেরও ইতিহাস—উৎপত্তি হইতে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—দিয়াছেন। গুজরাট, মালব এবং বুন্দেলখণ্ডে মারাঠাদের ক্রিয়াকলাপের কথা একমাত্র গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থেই অল্পস্বল্প আছে—বিস্তৃত বিবরণ কোথাও নাই। এই সব ব্যাপারে যাহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের লেখা রোজনামচা ও আত্মকাহিনীর সাহায্যে এই ঘটনাগুলির মৌলিক বিস্তৃত বিবরণ এতদিন পরে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখক ও সম্পাদকের পরিশ্রমের গুরুত্ব বিশেষভাবে বুঝা যায়—পুস্তকে প্রদত্ত পাদটীকা ও সঠিক প্রমাণগুলি হইতে। ভাবী ঐতিহাসিকগণের নিকট এগুলি অমূল্য; কারণ ইহার সাহায্যে উল্লিখিত যে-কোন বিষয়ে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল।

লেখার দোষে অনেক সময় ইতিহাস অপাঠ্য হইয়া উঠে। কিন্তু আর্ভিন্‌কে এ দোষে দোষী করা যায় না। তাঁহার বর্ণনা-কৌশল অপূর্ব্ব। খ্যাতনামা মারাঠী-ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সর্দ্দেসাই লিখিয়াছেন,—'ইহা পড়িতে আরব্য-উপন্যাসের মতই মনোহর।' কথাটা অতিরঞ্জিত নহে। সমসাময়িক দলিল-দস্তাবেজ, রোজনামচা, চিঠিপত্র ও কবিতাদির সাহায্যে লিখিত আর্ভিনের *Later Mughals* সত্যসত্যই উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন আকবর ও আওরংজীবের গঠিত বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসলীলা আমাদের চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিতেছে—আমরা যেন সেই যুগেরই লোক—এই বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। বস্তুতঃ ইতিহাস রচনায় আর্ভিনের কৃতিত্ব অতুলনীয়। সূক্ষ্মদর্শন, মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবত্তা এবং লিপিকুশলতা তাঁহার রচনাকে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

আর্ভিনের ইতিহাস রচনার আদর্শ যে কত উচ্চ ছিল, তাঁহারই কয়েকটি কথা হইতে তাহার পরিচয় দিয়া বক্তব্য শেষ করিব:—

"A historian ought to know *everything* and though that is an impossibility, he should never despise any branch of learning to which he has access."

অর্থাৎ,—'ঐতিহাসিকের সব শাস্ত্র সব বিদ্যা জানা উচিত; কিন্তু তাহা ত আর সম্ভবপর নয়, তাই জ্ঞানরাজ্যের যে-কোন বিভাগই তিনি আয়ত্ত করিবার সুযোগ পান—আয়ত্ত করিবেন—কোনমতেই অবহেলা করিবেন না।'

নায়েব মহাশয়

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুদীর্ঘকাল প্রাণপণ যত্নে কর্ত্তব্য পালনের পুরস্কার স্বরূপ অযোগ্যতার অপমান মাথায় লইয়া, বাগ্‌চী নায়েব চোখের জল মুছিতে-মুছিতে তাঁহার বাস-পল্লীতে প্রস্থান করিলে, পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের অসুন্দর ব্যবহারে হাম্‌ফ্রি সাহেব পূর্ব্বে যতই অসন্তুষ্ট থাকুন, তাঁহার যোগ্যতা সাহেব কিরূপে অস্বীকার করিবেন? এ দেশের সাহেব মনিবদের এই একটি চরিত্রগত বিশেষত্ব যে—তাঁহারা অধীন কর্ম্মচারীদের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইলে, ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও তাহাদের যোগ্যতার সমাদর করিতে কুণ্ঠিত হন না। এমন কি, কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে 'লাগানি ভাঙ্গানি' করিলেও সে কথা কাণে তুলেন না। এই জন্য এই স্বদেশী যুগেও যে সকল দেশীয় রাজকর্ম্মচারী স্বরাজের পক্ষপাতী, এবং পরোক্ষ ভাবে নিরুপদ্রব অসহযোগের সমর্থন করিয়া থাকেন—তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, এদেশী উপরওয়ালা অপেক্ষা সাহেব উপরওয়ালা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও প্রার্থনীয়। আমাদের একজন সরল-প্রকৃতি মুন্সেফ বন্ধু একদিন প্রসঙ্গ

ক্রমে বলিতেছিলেন, "মুন্সেফী করিতেছি; রায় লিখিতে-লিখিতে বহুমূত্র হইয়া পেন্সন্ লইবার পূর্ব্বে যদি না মরি—তাহা হইলে সবজজ হইব, এমন কি, জেলা-জজ হইবারও আশা দুরাশা নহে। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া এখন এই রূপই মনে হয়। কিন্তু জজিয়তী যতই প্রার্থনীয় হউক, এ কথা অবিসংবাদিত রূপে সত্য যে, আমরা মুন্সেফেরা 'মুন্সেফ-জজের' তাঁবেদারী করা অপেক্ষা সিভিলিয়ান ইংরাজ জজের তাঁবেদারী করা শতগুণ অধিক শ্লাঘ্য ও প্রার্থনীয় মনে করি।" যে সকল মুন্সেফ 'অম্বল' ও বহুমূত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে-করিতে কর্ম্মজীবনের গৌরবপূর্ণ সায়াহ্নে 'জেলা জজের' মসনদে স্থাপিত হইয়া দাসত্বের সার্থকতা অনুভব করিতেছেন—তাঁহারাও যখন মুন্সেফ ছিলেন, তখন বোধ হয় ইংরাজ জজের তাঁবেদারীরই পক্ষপাতী ছিলেন; এবং আমাদের কোন ডেপুটী বন্ধুর মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বোধ হয় অসঙ্কোচে বলিবেন—যে সকল 'বাবু' ডেপুটী নিজের বা বিধাতা-পুরুষের কলমের জোরে নবনির্ম্মোক ধারণ পূর্ব্বক 'মিষ্টার" রূপে জেলার বিধাতা-পুরুষ হন, তাঁহাদের তাঁবেদারী—'শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ!'—উচ্চপদস্থ স্বদেশীয়-গণের প্রতি এই বিরাগের কারণ আমাদের অজ্ঞাত।

যাহা হউক, হামফ্রি সাহেব নূতন নায়েবের কার্য্যদক্ষতা-গুণে পূর্ব্বের বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করিয়া ক্রমেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। একে-একে অনেকগুলি গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া সাহেব দেখিলেন—সেই সকল কার্য্যে নায়েব যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তখন তিনি নায়েবকে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মনে করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরও কান্সারণের কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে তাঁহাকে নানা প্রকার সদুপদেশ দান করিয়া, কাজ-কর্ম্মের সুব্যবস্থা করিলেন। তিনি সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন, চরই রাজার চক্ষু-কর্ণ; এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই গুপ্তচর নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। প্রজার মনের ভাব ও গতিবিধি লক্ষ্য না করিলে, এরূপ বৃহৎ জমীদারীর কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ, কে শত্রু ও কে মিত্র, ইহা স্থির করিতে না পারিলে, পদে-পদে ঠকিবার আশঙ্কা আছে। ম্যানেজার সাহেব নায়েবের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া, সরকারের ব্যয়ে কয়েকজন গুপ্তচর নিয়োগের আদেশ প্রদান করিলেন। নায়েব মহাশয় তাঁহার অনুগত ও আশ্রিত কয়েকটি লোককে এই পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহারা যে জমীদার-সরকারের বেতনভোগী গুপ্তচর, এ কথা ম্যানেজার সাহেব ও নায়েব মহাশয় ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারিল না। কিছু দিন পরে নায়েব মহাশয়ের মনে হইল, এই সকল গুপ্তচর যদি স্বার্থের অনুরোধে তাঁহার নিকট প্রকৃত সংবাদ গোপন করে, তাহা হইলে তাঁহার গুপ্তচর নিয়োগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং তিনি ম্যানেজার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, গুপ্তচরগণের দ্বারা সংগৃহীত সংবাদ সত্য কি না পরীক্ষার জন্য চরের উপর চর নিযুক্ত করিলেন; তাহারা সকলেই তাঁহার একান্ত বিশ্বাসভাজন ও অনুগৃহীত ব্যক্তি।

নূতন নায়েব মহাশয় এই সকল গুপ্তচরের সাহায্যে কান্সারণের সকল মহালের প্রত্যেক জ্ঞাতব্য সংবাদ প্রত্যহ নিয়মিত রূপে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন,—জমীদারী-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল।

জমীদারী সেরেস্তায় এই নূতন বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইবার কিছুদিন পরে, নায়েব মহাশয় গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পাইলেন, তাঁহার অধীন কয়েকটি কর্ম্মচারী তাঁহার অপ্রতিহত উন্নতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহাকে ম্যানেজার সাহেবের নিকট অপদস্থ করিবার জন্য আর একটি নূতন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে! নায়েব মহাশয় প্রথমে স্থির করিলেন—তিনি বুদ্ধিকৌশলে তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া, সাহেবের নিকট নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবেন; এবং তাহারা কিরূপ পরশ্রীকাতর, মিথ্যাবাদী ও কুচক্রী, ম্যানেজার সাহেবের 'চোখে আঙ্গুল দিয়া' তাহা দেখাইয়া দিবেন। তাহা হইলে সাহেব তাহাদের স্বভাব-চরিত্রের পরিচয় পাইবেন। সুতরাং তাহারা ভবিষ্যতে তাঁহার অনিষ্ট-চেষ্টা করিলেও, কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। কিন্তু অনেক চিন্তার পর তিনি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন; এবং 'দুষ্ট এঁড়ের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' এই নীতির অনুসরণ করিয়া, তাহাদিগকে 'হাতে না মারিয়া ভাতে মারাই' কর্ত্তব্য মনে করিলেন। যাহারা কুঠীতে চাকরী করে, তাহাদের পদে-পদে পদস্খলন অনিবার্য্য। তাহাদের কার্য্যে কোন-না-কোন ত্রুটি থাকিবেই। নায়েব তাহাদের প্রতি সদয় থাকিলে, এই সকল ত্রুটি ও গলদের কথা সাহেবের কাণে উঠে না,—তাহাদের বিপন্ন হইবারও আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু নায়েব

প্রতিকূল হইলে, তাহাদের সামান্য ত্রুটিও শাখা-পল্লব-সমন্বিত হইয়া, ম্যানেজার সাহেবের কর্ণগোচর হয়। তখন সে বেচারারা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যতই চেষ্টা করুক, তাহাদের আবেদন, নিবেদন, কৈফিয়ৎ—সকলই অরণ্যে রোদনের মত নিষ্ফল হয়। যে কয়েকজন আমলা নায়েব মহাশয়কে অপদস্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল, নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন; এবং তাহাদের অপরাধগুলি নানা কৌশলে এরূপ গুরুতর করিয়া তুলিলেন যে, তাহাদের নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় রহিল না। নায়েবকে ফাঁদে ফেলিতে গিয়া, নিজের ফাঁদে তাহারা এমন ভাবে জড়াইয়া পড়িল যে, আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া, অবশেষে তাহারা নায়েব মহাশয়েরই শরণাপন্ন হইল!

নায়েব মহাশয় মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামাইয়া বলিলেন, "বাপু হে, অপকর্ম্ম কে না করে? সাহেব-সরকারের চাকরী করিতে আসিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সাজিলে চলে না। কিন্তু, কুকর্ম্ম করিয়া তাহা ঢাকিতে জানা চাই। সে শক্তি না থাকে, প্রথমে সরল ভাবে আমার কাছে সকল কথা প্রকাশ করিলেই পারিতে। আমি তোমাদের অহিত কামনা করি না। সময় থাকিতে সকল কথা খোলসা করিয়া বলিলে, আমি তোমাদের সকল অপরাধ ঢাকিয়া লইতে পারিতাম। এখন হাত হইতে তীর বাহির হইয়া গিয়াছে,—এখন আমার কাছে কাঁদাকাটি করিতেছ,—এখন আমি কি করিতে পারি? যা'হোক, সাহেব এবার যাহাতে তোমাদের মাফ করেন—সেজন্য চেষ্টা করিব; কিন্তু কোন ফল হইবে কি না বলিতে পারি না।"—নায়েব মহাশয়ের চেষ্টা নিষ্ফল হইবার নহে; এক সপ্তাহ মধ্যেই তাহারা পদচ্যুত হইল।—নায়েব মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "দাদার গাছে দাদ চুল্‌কাইতে গেলে, এই রকম ফলই হইয়া থাকে! এখন ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া বাস কর। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালকে ঘাঁটাইলে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।"

নায়েব মহাশয়ের বিরুদ্ধাচরণের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, আর কেহই মাথা তুলিতে সাহস করিল না; কানসারণের ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীই তাঁহার বশীভূত হইয়া, নতশিরে তাঁহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিতে লাগিল। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে, ম্যানেজার সাহেবকে খুসী রাখা কঠিন হইবে না বুঝিয়া, কর্ম্মচারীরা সাহেব অপেক্ষা তাঁহারই অধিক খাতির করিতে লাগিল। তিনিও নানা কৌশলে ম্যানেজার সাহেবকে এরূপ বশীভূত করিলেন যে, সুবিস্তীর্ণ কান্‌সারণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। নায়েবের সহিত পরামর্শ না করিয়া, ম্যানেজার সাহেব কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, "সান্যাল মশায় কি তোড়েই নায়েবী কচ্চে! মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের ম্যানেজারই ত সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেল। ম্যানেজার সাহেব ত নাম সহি করিয়াই খালাস!—নায়েব বছর দুয়েকের মধ্যে দশহাজার টাকা মুনফার সম্পত্তি করে কি না দেখতেই পাবে।"

বস্তুতঃ নায়েব মহাশয়ের যেরূপ সুযোগ ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে, সাধারণের এই দৈববাণী যে নিষ্ফল হইত, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ, যৌথ কারবারের 'সেয়ার' বা সম্পত্তির প্রতি নায়েব মহাশয়ের তেমন লক্ষ্য ছিল না; কিন্তু বাগানের প্রতি তাঁহার আসক্তির পরিচয়ে সকলকেই বিস্মিত হইতে হইত! তাঁহার সুবিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে যদি তিনি কাহারও উৎকৃষ্ট বাগান দেখিতে পাইতেন, বা সেইরূপ বাগানের সন্ধান পাইতেন, তাহা হইলে তিনি ছলে-বলে কৌশলে তাহা আত্মসাৎ না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। বাগান ত দূরের কথা—যদি কেহ তাঁহাকে সংবাদ দিত "অমুক গ্রামে, অমুক লোকের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বিঘা জমী দেখিয়া আসিলাম, হাঁ,—বাগানের মত জমী বটে! সেখানে যদি একটি বাগান হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রের নন্দন-কাননকেও লজ্জা পাইতে হয়। কিন্তু জমীটা হস্তগত করা কঠিন; তাহা অমুক চক্রবর্ত্তীর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি।" জমীটা দেখিয়া নায়েব মহাশয়ের মনে ধরিলে আর রক্ষা নাই;—ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তরও তিনি যে উপায়ে হউক হস্তগত করিয়া, অগণ্য অর্থব্যয়ে সেখানে বাগান আরম্ভ করিবেন। অনেক নিরক্ষর অকর্ম্মণ্য বেকার লোক নায়েব মহাশয়ের এই অদ্ভুত বাতিকের সমর্থন করিয়া, সপরিবারে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই ভাবে তিনি যে কত বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই! বিভিন্ন বাগানের পর্য্যবেক্ষণ, বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে উৎকৃষ্ট কলম সংগ্রহ, বাগানের নক্সা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার অনুগত ও

প্রসাদ-প্রার্থী বহু লোক সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিত। বাগান প্রস্তুত সম্বন্ধে তাঁহার খেয়ালের সমর্থন করিয়া, অনেকেই অতি সহজে স্বার্থসিদ্ধি করিত।

নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবকে মুঠার ভিতর পুরিয়া, জমীদারী শাসনে এরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিলেন যে, মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের ধনী-নির্ধন সকল প্রজাকেই সর্ব্বদা সভয়ে কাল-যাপন করিতে হইত। পূর্ব্বতন ম্যানেজার ও নায়েবগণের আমলে প্রজারা জমীদারের অস্তিত্ব এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল;—যথা-সময়ে খাজনা যোগাইতে পারিলে, কাহাকেও প্রায়ই কোন ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল নায়েবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, সকল প্রজাকেই, কখন কি হয়—এই চিন্তায় ব্যাকুল থাকিতে হইত। সান্যাল নায়েব তাঁহার শাসন-মহিমা প্রচারের জন্য অবস্থাপন্ন, ভদ্রবংশীয়, এবং জন-সাধারণের সম্মানভাজন প্রজাবর্গকে যে কোন ছলে পাইক চালসানা পাঠাইয়া কান্‌সারণের কাছারীতে ধরিয়া লইয়া যাইতেন; এমন কি, প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথ দিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবার সময়, নায়েবের ইঙ্গিতে ও উৎসাহে অশ্রাব্য ও অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়া হইত। অনেকেই অকারণে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইত! ম্যানেজার সাহেবের নিকট প্রায় কেহই নায়েবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে সাহসী হইত না; কারণ, অভিযোগ করিলে সাহেব তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। নায়েবের অত্যাচারের কথা দৈবাৎ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেন, ও বলিতেন, "উট্টম হইয়াছে,—সাণ্ডেল নায়েব নায়েবের ঠিক উপযুক্ট পাট; যেমন কুকুর, সেইরূপ মুগুর হইয়াছে। এরূপ না হইলে কি বজ্জাট প্রজা লোক ডুরষ্ট হয়? জুটা না খাইলে যে সকল বজ্জাট শায়েষ্টা না হয়—টাহারা জুটা খাইবে না ট কি রসগোল্লা খাইবে?"—সাহেবের এই প্রকার মন্তব্য শুনিয়াও তাহারা সুবিচারের আশায় তাঁহার শরণাগত হইত, নায়েব মহাশয় তাহাদিগকে শ্রীমচাঁদের রসাস্বাদনে কৃতার্থ করিতেন! সুতরাং দেখিয়া শুনিয়া আর কেহ নায়েবের পৈশাচিক ব্যবহারের প্রতিবাদ করিত না। যে সকল প্রজার অবস্থা সচ্ছল, এবং নায়েবের এই প্রকার অত্যাচারে যাঁহাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইত, তাঁহারা 'স্থান-ত্যাগেন দুর্জ্জন'-সহবাস পরিহার করিতেন,—আজন্মের আশ্রয় পল্লী-ভবন ত্যাগ করিয়া কোন সহরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কলিকাতায় তখন যে দুই তিনখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র ছিল, তাহাতেও নায়েবের অত্যাচার সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনা করিতে সাহস করিত না; কারণ, সকলেই জানিত, নায়েবের অত্যাচারের কোন প্রমাণই পাওয়া যাইবে না; নায়েব 'ডিফামেসন্' করিলে কাগজওয়ালাদের নাকের জলে চোখের জলে এক হইবে! বিশেষতঃ, পুলিশের জমাদার, দারোগারা জানিত, নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেলের মত অতিথি-বৎসল, মুক্তহস্ত, উদার প্রকৃতির মহাশয় ব্যক্তি মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের এলাকার মধ্যে দ্বিতীয় নাই! সুতরাং মুচি-বাড়িয়ার এলাকার মধ্যে যে সকল ভদ্রলোক মাতব্বর ও প্রধান বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারা নায়েবের যথেচ্ছাচারের অনুমোদন করিত; কারণ ন্যায়ের সমর্থন অপেক্ষা নায়েবের কৃপাকটাক্ষ তাহারা অনেক অধিক মূল্যবান মনে করিত। অত্যাচার-জর্জ্জরিত, আত্মশক্তিতে প্রত্যয়হীন, অপমান ও লাঞ্ছনায় নিত্য অভ্যস্ত প্রজাগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই পীড়নের বিরুদ্ধে সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিবে—সে শিক্ষা ও সাহস তখনও সমাজের কোন স্তরেই লক্ষিত হয় নাই।—এই ত্রিশ বৎসর পরে সে কালের কথা স্মরণ হইলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়! মনে হয়, এ কি সেই দেশ? এই নবযুগের নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত, নবজাগ্রত, আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল, অবৈধ অত্যাচারে খড়্গহস্ত, একতাবদ্ধ ঐ কৃষক যুবকেরা কি তাহাদেরই বংশধর? সমাজের নিম্নতম স্তরে নবজীবনের যে স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর অবসান-কালে কে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিল?

কিন্তু নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল উচ্চ শিক্ষিত ও রাজনীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হইলেও, শাসন-নীতি সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রজাগণের মধ্যে এক দলের প্রতি তিনি কথঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া, অর্থাৎ মাথালো-মাথালো জনকতক লোককে দুই-এক মুঠা উচ্ছিষ্ট দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিয়া, অবশিষ্ট প্রজাবর্গকে পদদলিত করিবার অনিন্দ্য-সুন্দর নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রজাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া, উভয় দলকে শাসন করা রাজনীতিসম্মত,—দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই জন্যই মুচিবাড়িয়া এলাকার মাতব্বর ও প্রধানেরা তাঁহার যথেচ্ছাচারের

অনুমোদন করিত; অনেকে নানা ভাবে তাঁহাকে সাহায্যও করিত। ইহাদিগকে হাতে রাখিবার জন্যই, তিনি ইহাদের ভিতর হইতে বাছিয়া-বাছিয়া অনেককে কান্সারণের তহশিলদার, মুহুরী প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নায়েবের সহায়তায় ও উৎসাহে তাহারা জাল, প্রতারণা প্রভৃতি কোন কার্য্যেই কুণ্ঠা বোধ করিত না। তাহারা প্রজা-সাধারণের সর্ব্বনাশ সাধনে সর্ব্বদাই তাঁহাকে সাহায্য করিত। ইহারা শত মুখে নায়েবের প্রশংসা করিত; এবং প্রজারাই সকল অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টিকর্ত্তা,—এ কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিত।

আর একটি বিষয়েও নায়েবের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। নায়েব মহাশয় জানিতেন, প্রজারা সুশিক্ষিত হইলে তাহাদের চোখ-কাণ ফুটিবে; তাহারা তাহাদের ষোল আনা অধিকারের দাবী করিবে; এবং প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে, জমীদারের যথেচ্ছাচারের শক্তি খর্ব্ব হইবে। এজন্য তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন,—তাঁহার এলাকার মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত হইবে না। হাম্‌ফ্রি সাহেব ইংরাজ,—তিনি উচ্চ-শিক্ষিত না হইলেও, শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ও অনুরাগ থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু স্বার্থানুরোধে তাঁহার জন্মগত সংস্কার ত্যাগেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি তাঁহার এলাকা মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধী হইলেন। কোন প্রজার সন্তান-সন্ততি বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া মনুষ্য-পদবাচ্য হয়, নায়েবেরও এরূপ ইচ্ছা না থাকায়, মুচিবাড়িয়া কান্সারণের এলাকা হইতে মা সরস্বতীকে বেত্রাঘাতে বিতাড়িত করা হইল! যে সকল লোকের অবস্থা সচ্ছল, তাহারা বিভিন্ন স্থানে পুত্রাদি পাঠাইয়া, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; অতি অল্প লোকই এই গুরু ভার বহনে সমর্থ হইল। অধিকাংশ প্রজাই দরিদ্র কৃষিজীবী। একেই তাহারা সুশিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিত না, তাহার উপর দূরবর্ত্তী সহরে ছেলে পাঠাইয়া, তাহাদের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা সাধ্যাতীত বলিয়া, তাহারা সন্তান-সন্ততিগণকে মূর্খ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইল। এমন কি পল্লীগ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাও তাহাদের পক্ষে দুর্লভ হইয়া উঠিল! একদিন এই এলাকার কোন সম্রান্ত ব্যক্তি নায়েব মহাশয়কে বলিলেন, "আপনারা প্রজাদের মা-বাপ,—তাহাদের ছেলেরা লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে আপনাদের এত আপত্তি কেন?"—নায়েব মহাশয় বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "চাষার ছেলেরা লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ, হয়, না, অমানুষই হয়? কেতাবের দু'পাতা উল্টাইলেই তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া যায়। জুতা জামা না হইলে তখন তাহাদের মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে না। চাষার ছেলে লাঙ্গল ঠেলিতে, কুমোরের ছেলে মাটী ঘাঁটিতে, কামারের ছেলে লোহা ঠেঙ্গাইতে লজ্জা বোধ করে,—বাপদাদাকে ক্ষেতের কৃষাণ বলিয়া পরিচিত করে! ঘোষের পো না পারে গরু চরাইতে, না পারে মুহুরীগিরি করিতে। লাভের মধ্যে গরীবের ছেলেকে 'ঘোড়ারোগে' ধরে,—আর তাহারা দিন-দিন অসন্তুষ্ট হইয়া, বাপ-মাকে দূরের কথা—দেব, দ্বিজ ও রাজাকে পর্য্যন্ত অসম্মান করিতে শেখে! আমাদের এলাকার মধ্যে আমরা এ রোগের বীজ ছড়াইব না।"

বস্তুতঃ, ম্যানেজার ও নায়েবের সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ায়, অধিকাংশ প্রজাই মূর্খ হইয়া রহিল। যে দুইচারিজন ভদ্র-লোকের ছেলে কোন রকমে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিল, তাহারা কান্সারণের সামান্য-সামান্য চাকরী লাভ করায়, মূর্খ জন-সাধারণের নিকট এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে'বৎ বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। এই বিদ্বানেরা মূর্খ পল্লী-বাসীদের ঘৃণা করিতে লাগিল। এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য নায়েবের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া, নানা ভাবে তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয়ের দানশীলতা, বিশেষতঃ তাঁহার অন্নদানে ঘটার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সান্যাল মহাশয় নানা কৌশলে ও কার্য্যদক্ষতা-গুণে পেস্কারী হইতে নায়েবী পদে বাহাল হইলে, কাম্যফল লাভ করিয়া পরের দুঃখ মোচনের জন্য আর তাঁহার আগ্রহ রহিল না! যত দিন তিনি পেস্কার ছিলেন, ততদিন দয়া, দাক্ষিণ্য ও প্রভাব, প্রতিপত্তি দ্বারা বাগচী নায়েবকে ঢাকিয়া ও চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এখন আর সেরূপ চেষ্টার আবশ্যকতা নাই; সুতরাং এখন তিনি বিনা স্বার্থে কাহারও কোন উপকার করিতেন না।

স্বার্থানুরোধে নায়েব মহাশয় এখনও কয়েকটি আমলাকে তাঁহার বাসায় দু'বেলা খাইতে দিতেন। তাহারা বিনাব্যয়ে

এরকম মন নিয়ে এ ধর্ম্মাশ্রমে থাকাও আর সঙ্গত মনে হল না। তাই সুমেধা তার মনের ভাব অকপটে জয়শ্রীর কাছে খুলে বল্লে। জয়শ্রী তার জীবনের এ অধ্যায়ের কথা বেশ ভাল করেই জানত; কারণ, তারই সাথে অশোক-কাননে বিচরণ করতে-করতে প্রথম তার শ্রীমন্তের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়।

জয়শ্রী অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ ঠিক করল যে, তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে ভিক্ষু অঙ্গারকই তার সখীর এ ইতিবৃত্ত সবই জানে। তাকে যদি কোন রকমে রাজী করিয়ে একবার উজ্জয়িনীতে শ্রীমন্তের সংবাদের জন্যে পাঠান যায়, তা'হলে আপাততঃ সখীর মনের চাঞ্চল্য একটু শান্ত হয়। তার পর যা বিধেয় হয়, তা করা যাবে। তাই সে নিভৃতে অঙ্গারককে ডেকে একদিন এ প্রস্তাব করল। আশ্চর্য্য, অঙ্গারক ভিক্ষু-সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ এ কর্ম্মে কিছুমাত্র আপত্তি না ক'রে তখনই উজ্জয়িনী যাবার জন্য প্রস্তুত হোল। কিন্তু নিজে সে কিছুই বল্লে না বা কোন প্রশ্ন করল না। শুধু তার ভিক্ষার ঝুলিটা স্কন্ধে তুলে নিয়ে সেই দিনই প্রস্থান করল।

তার পর দীর্ঘ চার মাস আশার ও নিরাশার হিল্লোলে শরীর-মন অবসন্ন ও পীড়িত ক'রে তুলে, সুমেধা অঙ্গারকের পথ চেয়ে বসে রইল। মন তার বুঝতে পারত, এ সবই মায়ার খেলা,—এর বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত না করতে পারলে, মুক্তি নেই, মুক্তি নেই। তবু এ বাসনার ঘোর কাটতে চাইত না,—আশার আশায় পথ চেয়ে থাকত।

তার পর একদিন হেমন্তের সোণালী প্রভাতে মাঠের দোসারি-দেওয়া ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে তার দীর্ঘ ছায়া ফেলে অঙ্গারককে আসতে দেখা গেল। উৎসুক প্রতীক্ষায় নিঃশ্বাস রোধ করে ভিক্ষুণী সুমেধা তার ক্ষীণ দেহখানি অতি কষ্টে পর্ণ-শয্যা থেকে তুলে এনে, দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াল। জয়শ্রীও হাতের কাজ ফেলে পাশে এসে দাঁড়াল। তার পর ভিক্ষু এসে, তার ঝুলিখানি নামিয়ে রেখে, বিশ্রাম না করেই বলতে লাগল, শ্রীমন্তকে সে কি ভাবে দেখে এসেছে। সে এখন সে নগরের একজন বিখ্যাত ধনী বণিক,—সংসারের সাধারণ লোকের মত তার জীবন,ধন,জন, বিলাস, ভোগ, ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ; গৃহসংসার পেতেও সে বসেছে। নগরে তার মত ভোগ-বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী লোক খুব কমই আছে—এই বলে অঙ্গারক তার ভিক্ষার ঝুলিটা আবার স্কন্ধে তুলে নিয়ে যাত্রার উদ্যোগ করল। তা দেখে জয়শ্রী তাকে জিজ্ঞাসা করল, তাদের ফেলে এত শীঘ্র সে কোথায় আবার যাচ্ছে। অঙ্গারক বল্লে "দেখ জয়শ্রী, সুমেধার জীবনে দুইবার আমি বড় ক্ষতি করতে যাই। তাই তার কাছে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যা কিছু দণ্ড তার জন্যে মাথায় তুলে নেব স্বীকার করেছিলাম। ভিক্ষু-সম্প্রদায়-বিগর্হিত এই কাজ তাই আমি মাথায় তুলে নিয়েছিলাম বিনা বাক্য-ব্যয়ে। এখন আমি যে শপথমুক্ত হয়েছি। তাই আমার এখানকার কাজও ফুরিয়েছে। আজ আমি আবার আমার প্রভুর চরণানুসরণে তাঁরই চরণ দর্শনাভিলাষে উত্তর দিকে যাত্রা করছি।—সুমেধার প্রতি আমার শেষ অনুরোধ, তার প্রতি প্রভুর শেষ বাণী যেন সে ভাল করে বুঝতে শেখে—তবেই এ সংসারে তার পরিত্রাণ।" এই বলে সে বিদায় নিল।

এদিকে অঙ্গারকের মুখে শ্রীমন্তের কাহিনী শুনে, কি জানি কি রকমে সুমেধার আশালুব্ধ মন একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়ল। সে গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়ল। হয় ত বা তার আশাভ্রান্ত মন এক-এক সময় এই মনে করে উৎফুল্ল হয়ে উঠত,—তার অগাধ অটুট প্রেমে তারই স্মৃতি লক্ষ্য করে শ্রীমন্ত বুঝি বা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, সংসারে রিক্ত সন্ন্যাসী হয়ে। কিন্তু এমনও যদি হয়, তা'হলেও আর কি তার জীবনে সুমেধার স্থান হতে পারে?—না তো! আবার এক-এক সময় মনে হোত, তাকে প্রণয়ে বিশ্বাস-ঘাতিনী ভেবে হয় তো স্মৃতি-পথ থেকেও তার নামটা শ্রীমন্ত ঘৃণায় মুছে ফেলে দিয়েছে। এরকম কত কথাই মনে হোত। কিন্তু যেদিন সত্যি করে সে জানতে পারল, সাধারণ সংসারের লোকের মতই শ্রীমন্তের জীবন পরিপূর্ণ, তখন কেন জানি না, তার মন একেবারে রক্তাক্ত হয়ে, ছিন্ন হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

যখন জয়শ্রী তার অক্লান্ত সেবায় সখীর শয্যাপার্শ্ব ভরিয়ে দিত, তখন মাঝে-মাঝে সে তার আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে নিজের মনেই তাকে বলতে শুনত,—"বুঝেছি, বুঝেছি প্রভু, এবার কেন আমায় বলেছিলে, 'বাসনাই দুঃখের মূল'।

দিল্লী-সাম্রাজ্যের পতন-কাহিনী*

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

অনেক দিন হইতে মোগল-সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের একখানি প্রামাণিক ইতিহাসের একান্ত অভাব ছিল। Keene, Owen—এমনি আরও অনেকে এদিকে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কেহই যথেষ্ট পরিশ্রম করেন নাই—মূল উপাদানের সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করেন নাই। সুখের বিষয়, এতদিনে আমাদের সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে;—একখানি প্রামাণিক ইতিহাস আমরা পাইয়াছি।

'মানুষীর ভ্রমণ-কাহিনীর' সম্পাদক ও অনুবাদক উইলিয়াম্ আর্ভিনের নাম ইতিহাস-পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। যুক্তপ্রদেশের ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে তিনি এদেশে অনেকদিন ছিলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি শুধু হাকিমী করিয়াই সময় কাটান নাই—সেকালের সিবিলিয়ান্‌গণের মত বিশেষ আগ্রহে ফার্সী ভাষা আয়ত্ত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ—ফার্সী পুঁথি পড়ায় দক্ষতালাভ করেন। মোগল-ইতিহাস-সংক্রান্ত হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় মুদ্রিত ও 'লিথো' পুস্তকাদি ছাড়া, বহু দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত ফার্সী পুঁথি, সরকারী-চিঠিপত্রও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পেন্‌সন্ লইয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় আর্ভিনের বয়স ৪৮ বৎসর। তিনি আশা করিয়াছিলেন, সুস্থশরীরে দীর্ঘ অবসরকাল এদেশের ইতিহাস-সেবায় উৎসর্গ করিবেন। হাতে ছিল প্রচুর ফার্সী-উপাদান; তা'ছাড়া বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় দখলের ফলে ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ ও ফরাসীদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেকর্ডস্ এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকগণের ভারত হইতে লিখিত পত্রাবলী পড়িবারও তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল; তাই তিনি মোগল-রাজত্বের অধঃপতনের একখানি সুসম্পূর্ণ প্রামাণিক ইতিহাস—*Later Mughals* নাম দিয়া প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করেন।

আওরংজীবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) হইতে, ইংরেজ কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার (১৮০৩) পর্য্যন্ত—সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসই আর্ভিনের লিখিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইতিহাস-রচনায় তাঁহার যত্ন ও সতর্কতার অন্ত ছিল না।—প্রচুর তথ্যের সন্নিবেশ করিয়া, প্রত্যেক খুঁটিনাটির প্রতি নজর রাখিয়া, সত্যাসত্যের বিচারে অজস্র সময় দিয়া, তিনি রচনাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। এ বিষয়ে তিনি জর্ম্মান্-পণ্ডিতদের অপেক্ষাও বেশি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই জন্যই ৯৬ বৎসরের ইতিহাস লিখিতে গিয়া, জীবদ্দশায় তিনি মাত্র ৩১ বৎসরের (১৭০৭ হইতে ১৭৩৮—অর্থাৎ নাদির শাহের ভারতাক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) ঘটনা লিখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় (১৭১২-১৭১৯-এর ঘটনা) কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে *Later Mughals* এর বেশির ভাগই অপ্রকাশিত ছিল—ইহার খসড়া আর্ভিনের কন্যা অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। তিনি আর্ভিনের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখাগুলি সম্পাদন করিয়া, সম্প্রতি *Later Mughals* নাম দিয়া বড় বড় দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। আর্ভিনের লেখার মধ্যে যে সকল ফাঁক ও ছাড় ছিল, তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইয়াছে; প্রমাণগুলি যাচাই করিয়া ও ভুল সংশোধন করিয়া দিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া সম্পাদকীয় বহু পাদটীকা, এবং স্থলবিশেষে আর্ভিনের বহু অজ্ঞাত নূতন তথ্য [যেমন মারাঠী-উপকরণ] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পুস্তকের একটু পরিচয় লইলেই বক্তব্যগুলি বেশ পরিস্ফুট হইবে। প্রথম খণ্ডে আছে:—গ্রন্থকারের একখানি সুন্দর চিত্র; সম্পাদকের লেখা—আর্ভিনের সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী, তাঁহার গ্রন্থগুলির সমালোচনা এবং বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত রচনাগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা। তাহার পর, আর্ভিনের

* *Later Mughals* by William Irvine, ed. and continued by Prof. Jadunath Sarkar, M.A., I.E.S., 2 vols. Rs 8 - each. Published by M. C. Sarkar & Sons, 90/2A Harrison Road, Calcutta.

লেখা—আওরংজীবের পুত্র বহাদুর শাহ্‌র (১৭০৭) রাজ্যারম্ভ হইতে মুহম্মদ্‌ শাহ্‌র রাজ্যাভিষেক (১৭১৯) এবং সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়—হুসেন আলি ও আব্‌দুল্লার চরম প্রাধান্য-লাভের ইতিহাস।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে,—মুহম্মদ্‌ শাহ্‌র সিংহাসন-গ্রহণ হইতে নাদির শাহ্‌র ভারতাক্রমণ পর্য্যন্ত ইতিহাস।

আর্ভিনের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি এপ্রিল ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পর আর অগ্রসর হয় নাই। ইহার কয়েক মাস পরেই নাদির শাহ্‌র দিল্লী-অধিকার, এবং মোগল-সাম্রাজ্যের প্রকৃত যবনিকা-পতন। আর্ভিন্‌ এই ঘটনার কোন বিবরণই রাখিয়া যান নাই। অধ্যাপক মহাশয় দেখিলেন, আর্ভিন্‌ যে পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেইখানে থামিলে গ্রন্থখানি শেষাঙ্কহীন নাটকের মত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই তিনি অনেক ফার্সী ও মারাঠী-উপাদানের সাহায্যে নাদিরের এক সুদীর্ঘ কাহিনী (৭৩ পৃঃ) যোগ করিয়া দিলেন। সোনায় সোহাগা হইল। নাদিরের ভারত-আক্রমণের এমন বিস্তৃত মৌলিক তথ্যপূর্ণ ইতিহাস আর কোন ভাষায় নাই, অথচ প্রত্যেক ঘটনাই সত্য,—সমসাময়িক প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত।

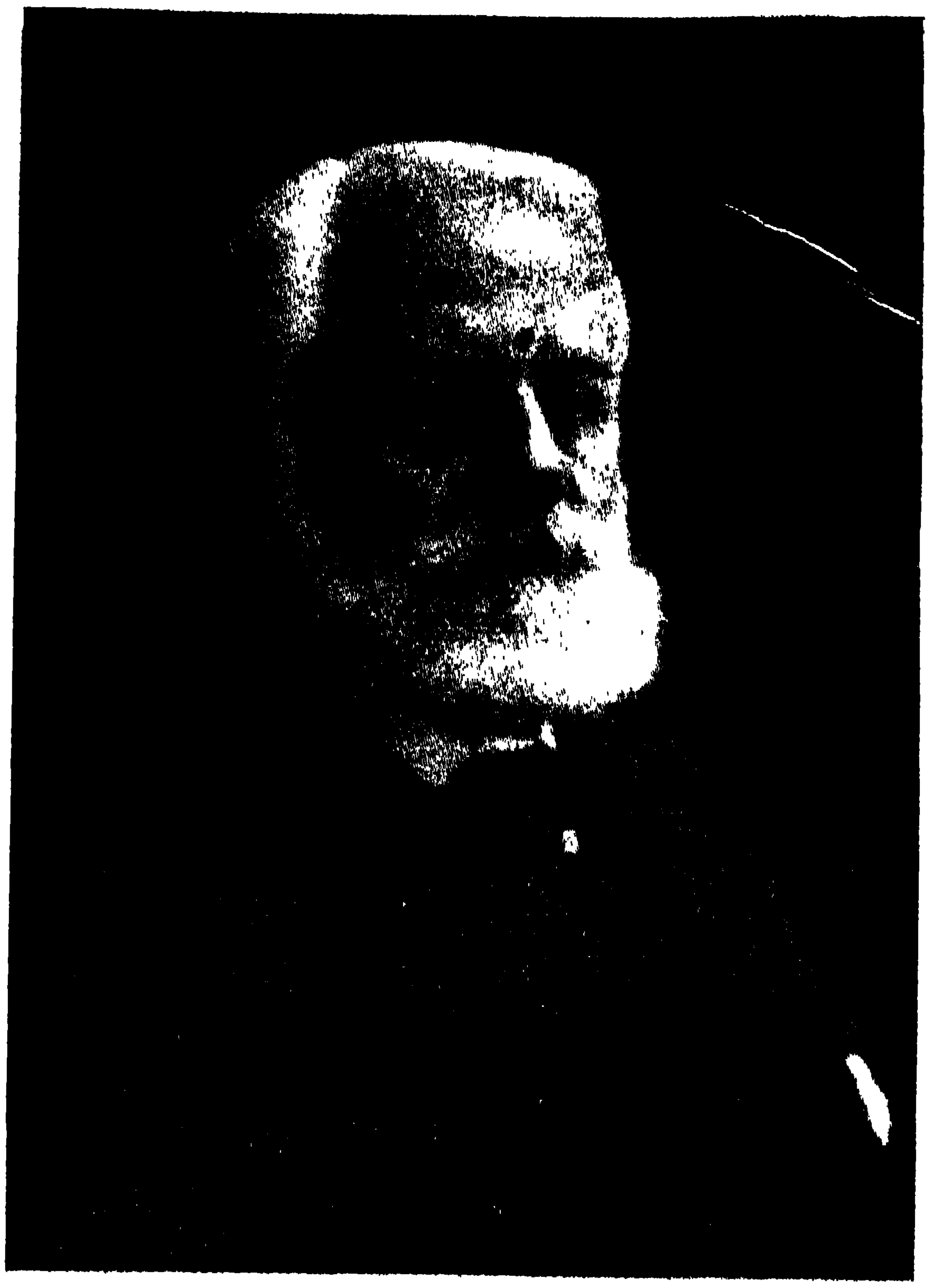

পরলোকগত উইলিয়াম আর্ভিন

শুধু ঘটনা সংযোজনাতেই অধ্যাপক সরকারের কৃতিত্ব নহে, ইতিহাসের যেটি সব শেষের কথা—যাহা বলা না হইলে ইতিহাসের অনেক কথাই বলা হয় না, তাহাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। ঘটনাগুলিকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন এবং কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ-নির্ণয়, সত্যাসত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া রায় প্রকাশ করিয়াছেন। শেষাংশে তাঁহার এই ঐতিহাসিক দার্শনিকতা (philosophy of history) যে গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তিনি লিখিতেছেন :—

"নাদির শাহ্‌র অভিযান মোগল-সাম্রাজ্যকে লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া গেল। কিন্তু ইহা দিল্লী-সাম্রাজ্যের অবনতির কারণ নহে—ঐ অবনতিরই একটা প্রধান নিদর্শনমাত্র। যাহা পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে, পারসীক-বিজেতা সেই ঘটনাকে জগতের সমক্ষে দেখাইয়া দিলেন,—যে মোহের বশে লোকে সাজ সজ্জায়-ভূষিত এক শবকে জীবিত পালোয়ান্‌ বলিয়া মনে করিত, সেই মোহ তিনি ভাঙ্গিয়া দিলেন। কেন এমন হইল? কিরূপে আক্‌বর ও শাহ্‌জহান্‌, মানসিংহ ও মীরজুম্লার কীর্ত্তি এমনভাবে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল? আওরংজীবের জীবদ্দশায় সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বলিয়া যে সাম্রাজ্যের এত খ্যাতি, তাঁহার মৃত্যুর ৩১ বৎসর পরে কেন সেই বিশাল সাম্রাজ্য একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া পড়িল?"

এই 'কেন'র উত্তর অধ্যাপক সরকার গ্রন্থের শেষ তিন অধ্যায়ে বেশ গুছাইয়া দিয়াছেন। কর্ণালের যুদ্ধ ও নাদিরের জয়লাভের কারণ এত বিশদ্‌ ও যুক্তিযুক্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা যেন ঘটনাগুলি স্বচক্ষে দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়।

আর্ভিন্‌ তাঁহার গ্রন্থে শুধু দিল্লীর মোগল-সম্রাট্‌দেরই ইতিহাস লিখিয়া যান নাই,—তাঁহার আলোচ্য সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে-সকল জাতি ও সম্প্রদায়

বর্ত্তমান ছিল,—যেমন শিখ, মারাঠা, বুন্দেলা, জাঠ ও রোহিলা, তাহাদেরও ইতিহাস—উৎপত্তি হইতে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—দিয়াছেন। গুজরাট, মালব এবং বুন্দেলখণ্ডে মারাঠাদের ক্রিয়াকলাপের কথা একমাত্র গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থেই অল্পস্বল্প আছে—বিস্তৃত বিবরণ কোথাও নাই। এই সব ব্যাপারে যাহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের লেখা রোজনামচা ও আত্মকাহিনীর সাহায্যে এই ঘটনাগুলির মৌলিক বিস্তৃত বিবরণ এতদিন পরে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখক ও সম্পাদকের পরিশ্রমের গুরুত্ব বিশেষভাবে বুঝা যায়—পুস্তকে প্রদত্ত পাদটীকা ও সঠিক প্রমাণগুলি হইতে। ভাবী ঐতিহাসিকগণের নিকট এগুলি অমূল্য; কারণ ইহার সাহায্যে উল্লিখিত যে-কোন বিষয়ে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল।

লেখার দোষে অনেক সময় ইতিহাস অপাঠ্য হইয়া উঠে। কিন্তু আর্ভিন্‌কে এ দোষে দোষী করা যায় না। তাঁহার বর্ণনা কৌশল অপূর্ব্ব। খ্যাতনামা মারাঠী-ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সর্দ্দেসাই লিখিয়াছেন,—'ইহা পড়িতে আরব্য-উপন্যাসের মতই মনোহর।' কথাটা অতিরঞ্জিত নহে। সমসাময়িক দলিল-দস্তাবেজ, রোজনামচা, চিঠিপত্র ও কবিতাদির সাহায্যে লিখিত আর্ভিনের *Later Mughals* সত্যসত্যই উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন আকবর ও আওরংজীবের গঠিত বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসলীলা আমাদের চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিতেছে—আমরা যেন সেই যুগেরই লোক—এই বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। বস্তুতঃ ইতিহাস-রচনায় আর্ভিনের কৃতিত্ব অতুলনীয়। সূক্ষ্মদর্শন, মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবত্তা এবং লিপিকুশলতা তাঁহার রচনাকে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

আর্ভিনের ইতিহাস রচনার আদর্শ যে কত উচ্চ ছিল, তাঁহারই কয়েকটি কথা হইতে তাহার পরিচয় দিয়া বক্তব্য শেষ করিব :—

"A historian ought to know *everything* and though that is an impossibility, he should never despise any branch of learning to which he has access."

অর্থাৎ,—'ঐতিহাসিকের সব শাস্ত্র সব বিদ্যা জানা উচিত; কিন্তু তাহা ত আর সম্ভবপর নয়, তাই জ্ঞানরাজ্যের যে-কোন বিভাগই তিনি আয়ত্ত করিবার সুযোগ পান—আয়ত্ত করিবেন—কোনমতেই অবহেলা করিবেন না।'

নায়েব মহাশয়

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুদীর্ঘকাল প্রাণপণ যত্নে কর্ত্তব্য পালনের পুরস্কার স্বরূপ অযোগ্যতার অপমান মাথায় লইয়া, বাগ্‌চী নায়েব চোখের জল মুছিতে-মুছিতে তাঁহার বাস-পল্লীতে প্রস্থান করিলে, পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের অসুন্দর ব্যবহারে হাম্‌ফ্রি সাহেব পূর্ব্বে যতই অসন্তুষ্ট থাকুন, তাঁহার যোগ্যতা সাহেব কিরূপে অস্বীকার করিবেন? এ দেশের সাহেব মনিবদের এই একটি চরিত্রগত বিশেষত্ব যে—তাঁহারা অধীন কর্ম্মচারীদের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইলে, ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও তাহাদের যোগ্যতার সমাদর করিতে কুণ্ঠিত হন না। এমন কি, কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে 'লাগানি ভাঙ্গানি' করিলেও সে কথা কাণে তুলেন না। এই জন্য এই স্বদেশী যুগেও যে সকল দেশীয় রাজকর্ম্মচারী স্বরাজের পক্ষপাতী, এবং পরোক্ষ ভাবে নিরুপদ্রব অসহযোগের সমর্থন করিয়া থাকেন—তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, এদেশী উপরওয়ালা অপেক্ষা সাহেব উপরওয়ালা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও প্রার্থনীয়। আমাদের একজন সরল-প্রকৃতি মুন্সেফ বন্ধু একদিন প্রসঙ্গ

ক্রমে বলিতেছিলেন, "মুন্সেফী করিতেছি; রায় লিখিতে-লিখিতে বহুমূত্র হইয়া পেন্সন্ লইবার পূর্ব্বে যদি না মরি—তাহা হইলে সবজজ হইব, এমন কি, জেলা-জজ হইবারও আশা দুরাশা নহে। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া এখন এই রূপই মনে হয়। কিন্তু জজিয়তী যতই প্রার্থনীয় হউক, এ কথা অবিসংবাদিত রূপে সত্য যে, আমরা মুন্সেফেরা 'মুন্সেফ-জজের' তাঁবেদারী করা অপেক্ষা সিভিলিয়ান ইংরাজ জজের তাঁবেদারী করা শতগুণ অধিক শ্লাঘ্য ও প্রার্থনীয় মনে করি।" যে সকল মুন্সেফ 'অম্বল' ও বহুমূত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে-করিতে কর্ম্মজীবনের গৌরবপূর্ণ সায়াহ্নে 'জেলা জজের' মসনদে স্থাপিত হইয়া দাসত্বের সার্থকতা অনুভব করিতেছেন—তাঁহারাও যখন মুন্সেফ ছিলেন, তখন বোধ হয় ইংরাজ জজের তাঁবেদারীরই পক্ষপাতী ছিলেন; এবং আমাদের কোন ডেপুটী বন্ধুর মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বোধ হয় অসঙ্কোচে বলিবেন—যে সকল 'বাবু' ডেপুটী নিজের বা বিধাতা-পুরুষের কলমের জোরে নবনির্ম্মোক ধারণ পূর্ব্বক 'মিষ্টার" রূপে জেলার বিধাতা-পুরুষ হন, তাঁহাদের তাঁবেদারী—'শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ!'—উচ্চপদস্থ স্বদেশীয়গণের প্রতি এই বিরাগের কারণ আমাদের অজ্ঞাত।

যাহা হউক, হাম্ফ্রি সাহেব নূতন নায়েবের কার্য্যদক্ষতা-গুণে পূর্ব্বের বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করিয়া ক্রমেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। একে-একে অনেকগুলি গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া সাহেব দেখিলেন—সেই সকল কার্য্যে নায়েব যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তখন তিনি নায়েবকে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মনে করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরও কান্সারণের কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে তাঁহাকে নানা প্রকার সদুপদেশ দান করিয়া, কাজ-কর্ম্মের সুব্যবস্থা করিলেন। তিনি সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন, চরই রাজার চক্ষু-কর্ণ; এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই গুপ্তচর নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। প্রজার মনের ভাব ও গতিবিধি লক্ষ্য না করিলে, এরূপ বৃহৎ জমীদারীর কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ, কে শত্রু ও কে মিত্র, ইহা স্থির করিতে না পারিলে, পদে-পদে ঠকিবার আশঙ্কা আছে। ম্যানেজার সাহেব নায়েবের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া, সরকারের ব্যয়ে কয়েকজন গুপ্তচর নিয়োগের আদেশ প্রদান করিলেন। নায়েব মহাশয় তাঁহার অনুগত ও আশ্রিত কয়েকটি লোককে এই পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহারা যে জমীদার-সরকারের বেতনভোগী গুপ্তচর, এ কথা ম্যানেজার সাহেব ও নায়েব মহাশয় ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারিল না। কিছু দিন পরে নায়েব মহাশয়ের মনে হইল, এই সকল গুপ্তচর যদি স্বার্থের অনুরোধে তাঁহার নিকট প্রকৃত সংবাদ গোপন করে, তাহা হইলে তাঁহার গুপ্তচর নিয়োগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং তিনি ম্যানেজার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, গুপ্তচরগণের দ্বারা সংগৃহীত সংবাদ সত্য কি না পরীক্ষার জন্য চরের উপর চর নিযুক্ত করিলেন; তাহারা সকলেই তাঁহার একান্ত বিশ্বাসভাজন ও অনুগৃহীত ব্যক্তি।

নূতন নায়েব মহাশয় এই সকল গুপ্তচরের সাহায্যে কান্সারণের সকল মহালের প্রত্যেক জ্ঞাতব্য সংবাদ প্রত্যহ নিয়মিত রূপে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন,—জমীদারী-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল।

জমীদারী সেরেস্তায় এই নূতন বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইবার কিছুদিন পরে, নায়েব মহাশয় গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পাইলেন, তাঁহার অধীন কয়েকটি কর্ম্মচারী তাঁহার অপ্রতিহত উন্নতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহাকে ম্যানেজার সাহেবের নিকট অপদস্থ করিবার জন্য আর একটি নূতন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে! নায়েব মহাশয় প্রথমে স্থির করিলেন—তিনি বুদ্ধিকৌশলে তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া, সাহেবের নিকট নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবেন; এবং তাহারা কিরূপ পরশ্রীকাতর, মিথ্যাবাদী ও কুচক্রী, ম্যানেজার সাহেবের 'চোখে আঙ্গুল দিয়া' তাহা দেখাইয়া দিবেন। তাহা হইলে সাহেব তাহাদের স্বভাব-চরিত্রের পরিচয় পাইবেন। সুতরাং তাহারা ভবিষ্যতে তাঁহার অনিষ্ট-চেষ্টা করিলেও, কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। কিন্তু অনেক চিন্তার পর তিনি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন; এবং 'দুষ্ট এঁড়ের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' এই নীতির অনুসরণ করিয়া, তাহাদিগকে 'হাতে না মারিয়া ভাতে মারাই' কর্ত্তব্য মনে করিলেন। যাহারা কুঠীতে চাকরী করে, তাহাদের পদে-পদে পদস্খলন অনিবার্য্য। তাহাদের কার্য্যে কোন-না-কোন ত্রুটি থাকিবেই। নায়েব তাহাদের প্রতি সদয় থাকিলে, এই সকল ত্রুটি ও গলদের কথা সাহেবের কাণে উঠে না,—তাহাদের বিপন্ন হইবারও আশঙ্কা থাকে না।" কিন্তু নায়েব

প্রতিকূল হইলে, তাহাদের সামান্য ত্রুটিও শাখা-পল্লব-সমন্বিত হইয়া, ম্যানেজার সাহেবের কর্ণগোচর হয়। তখন সে বেচারারা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যতই চেষ্টা করুক, তাহাদের আবেদন, নিবেদন, কৈফিয়ৎ—সকলই অরণ্যে রোদনের মত নিষ্ফল হয়। যে কয়েকজন আমলা নায়েব মহাশয়কে অপদস্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল, নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন; এবং তাহাদের অপরাধগুলি নানা কৌশলে এরূপ গুরুতর করিয়া তুলিলেন যে, তাহাদের নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় রহিল না। নায়েবকে ফাঁদে ফেলিতে গিয়া, নিজের ফাঁদে তাহারা এমন ভাবে জড়াইয়া পড়িল যে, আত্ম-রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া, অবশেষে তাহারা নায়েব মহাশয়েরই শরণাপন্ন হইল!

নায়েব মহাশয় মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামাইয়া বলিলেন, "বাপু হে, অপকর্ম্ম কে না করে? সাহেব-সরকারের চাকরী করিতে আসিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সাজিলে চলে না। কিন্তু, কুকর্ম্ম করিয়া তাহা ঢাকিতে জানা চাই। সে শক্তি না থাকে, প্রথমে সরল ভাবে আমার কাছে সকল কথা প্রকাশ করিলেই পারিতে। আমি তোমাদের অহিত কামনা করি না। সময় থাকিতে সকল কথা খোলসা করিয়া বলিলে, আমি তোমাদের সকল অপরাধ ঢাকিয়া লইতে পারিতাম। এখন হাত হইতে তীর বাহির হইয়া গিয়াছে,—এখন আমার কাছে কাঁদাকাটি করিতেছ,—এখন আমি কি করিতে পারি? যা'হোক, সাহেব এবার যাহাতে তোমাদের মাফ করেন—সেজন্য চেষ্টা করিব; কিন্তু কোন ফল হইবে কি না বলিতে পারি না।"—নায়েব মহাশয়ের চেষ্টা নিষ্ফল হইবার নহে; এক সপ্তাহ মধ্যেই তাহারা পদচ্যুত হইল।—নায়েব মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "মাদার গাছে দাদ চুল্‌কাইতে গেলে, এই রকম ফলই হইয়া থাকে! এখন ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া বাস কর। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালকে ঘাঁটাইলে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।"

নায়েব মহাশয়ের বিরুদ্ধাচরণের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, আর কেহই মাথা তুলিতে সাহস করিল না; কানসারণের ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীই তাঁহার বশীভূত হইয়া, নতশিরে তাঁহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিতে লাগিল। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে, ম্যানেজার সাহেবকে খুসী রাখা কঠিন হইবে না বুঝিয়া, কর্ম্মচারীরা সাহেব অপেক্ষা তাঁহারই অধিক খাতির করিতে লাগিল। তিনিও নানা কৌশলে ম্যানেজার সাহেবকে এরূপ বশীভূত করিলেন যে, সুবিস্তীর্ণ কান্‌সারণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। নায়েবের সহিত পরামর্শ না করিয়া, ম্যানেজার সাহেব কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, "সান্যাল মশায় কি তোড়েই নায়েবী কচ্চে! মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের ম্যানেজারই ত সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেল। ম্যানেজার সাহেব ত নাম সহি করিয়াই খালাস!—নায়েব বছর চয়েকের মধ্যে দশহাজার টাকা মুনফার সম্পত্তি করে কি না দেখতেই পাবে।"

বস্তুতঃ নায়েব মহাশয়ের যেরূপ সুযোগ ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে, সাধারণের এই দৈববাণী যে নিষ্ফল হইত, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ, যৌথ কারবারের 'সেয়ার' বা সম্পত্তির প্রতি নায়েব মহাশয়ের তেমন লক্ষ্য ছিল না; কিন্তু বাগানের প্রতি তাঁহার আসক্তির পরিচয়ে সকলকেই বিস্মিত হইতে হইত! তাঁহার সুবিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে যদি তিনি কাহারও উৎকৃষ্ট বাগান দেখিতে পাইতেন, বা সেইরূপ বাগানের সন্ধান পাইতেন, তাহা হইলে তিনি ছলে-বলে কৌশলে তাহা আত্মসাৎ না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। বাগান ত দূরের কথা—যদি কেহ তাঁহাকে সংবাদ দিত "অমুক গ্রামে, অমুক লোকের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বিঘা জমী দেখিয়া আসিলাম, হাঁ,—বাগানের মত জমী বটে! সেখানে যদি একটি বাগান হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রের নন্দন-কাননকেও লজ্জা পাইতে হয়। কিন্তু জমীটা হস্তগত করা কঠিন; তাহা অমুক চক্রবর্ত্তীর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি।" জমীটা দেখিয়া নায়েব মহাশয়ের মনে ধরিলে আর রক্ষা নাই;—ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তরও তিনি যে উপায়ে হউক হস্তগত করিয়া, অগণ্য অর্থব্যয়ে সেখানে বাগান আরম্ভ করিবেন। অনেক নিরক্ষর অকর্ম্মণ্য বেকার লোক নায়েব মহাশয়ের এই অদ্ভুত বাতিকের সমর্থন করিয়া, সপরিবারে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই ভাবে তিনি যে কত বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই! বিভিন্ন বাগানের পর্য্যবেক্ষণ, বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে উৎকৃষ্ট কলম সংগ্রহ, বাগানের নক্সা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার অনুগত ও

প্রসাদ-প্রার্থী বহু লোক সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিত। বাগান প্রস্তুত সম্বন্ধে তাঁহার খেয়ালের সমর্থন করিয়া, অনেকেই অতি সহজে স্বার্থসিদ্ধি করিত।

নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবকে মুঠার ভিতর পুরিয়া, জমীদারী শাসনে এরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিলেন যে, মুচিবাড়িয়া কান্দারণের ধনী-নির্ধন সকল প্রজাকেই সর্ব্বদা সভয়ে কাল-যাপন করিতে হইত। পূর্ব্ববর্ত্তন ম্যানেজার ও নায়েবগণের আমলে প্রজারা জমাদারের অস্তিত্ব এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল;—যথা-সময়ে খাজনা যোগাইতে পারিলে, কাহাকেও প্রায়ই কোন ঝঞ্চাট সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল নায়েবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, সকল প্রজাকেই, কখন কি হয়—এই চিন্তায় ব্যাকুল থাকিতে হইত। সান্যাল নায়েব তাঁহার শাসন মহিমা প্রচারের জন্য অবস্থাপন্ন, ভদ্রবংশীয়, এবং জন-সাধারণের সম্মানভাজন প্রজাবর্গকে যে কোন ছলে পাইক তালসানা পাঠাইয়া কান্দারণের কাছারীতে ধরিয়া লইয়া যাইতেন; এমন কি, প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথ দিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবার সময়, নায়েবের ইঙ্গিতে ও উৎসাহে অশ্রাব্য ও অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়া হইত। অনেকেই অকারণে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইত! ম্যানেজার সাহেবের নিকট প্রায় কেহই নায়েবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে সাহসী হইত না; কারণ, অভিযোগ করিলে সাহেব তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। নায়েবের অত্যাচারের কথা দৈবাৎ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেন, ও বলিতেন, "উট্টম হইয়াছে,—সাণ্ডেল নায়েব নায়েবের ঠিক উপযুক্ত পাট্র; যেমন কুকুর, সেইরূপ মুগুর হইয়াছে। এরূপ না হইলে কি বজ্জাট প্রজা লোক ডুরষ্ট হয়? জুটা না খাইলে যে সকল বজ্জাট শায়েস্টা না হয়—টাহারা জুটা খাইবে না ট কি রসগোল্লা খাইবে?"—সাহেবের এই প্রকার মন্তব্য শুনিয়াও তাহারা সুবিচারের আশায় তাঁহার শরণাগত হইত, নায়েব মহাশয় তাহাদিগকে শ্যামচাঁদের রসাস্বাদনে কৃতার্থ করিতেন! সুতরাং দেখিয়া শুনিয়া আর কেহ নায়েবের পৈশাচিক ব্যবহারের প্রতিবাদ করিত না। যে সকল প্রজার অবস্থা সচ্ছল, এবং নায়েবের এই প্রকার অত্যাচারে যাঁহাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইত, তাঁহারা 'স্থান-ত্যাগেন দুর্জ্জন'-সহবাস পরিহার করিতেন,—আজন্মের আশ্রয় পল্লী-ভবন ত্যাগ করিয়া কোন সহরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কলিকাতায় তখন যে দুই-তিনখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র ছিল, তাহাতেও নায়েবের অত্যাচার সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনা করিতে সাহস করিত না; কারণ, সকলেই জানিত, নায়েবের অত্যাচারের কোন প্রমাণই পাওয়া যাইবে না; নায়েব 'ডিফামেসন্' করিলে কাগজওয়ালাদের নাকের জলে চোখের জলে এক হইবে! বিশেষতঃ, পুলিশের জমাদার, দারোগারা জানিত, নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেলের মত অতিথি-বৎসল, মুক্তহস্ত, উদার প্রকৃতির মহাশয় ব্যক্তি মুচিবাড়িয়া কান্দারণের এলাকার মধ্যে দ্বিতীয় নাই! সুতরাং মুচি-বাড়িয়ার এলাকার মধ্যে যে সকল ভদ্রলোক মাতব্বর ও প্রধান বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারা নায়েবের যথেচ্ছাচারের অনুমোদন করিত; কারণ ন্যায়ের সমর্থন অপেক্ষা নায়েবের কৃপাকটাক্ষ তাহারা অনেক অধিক মূল্যবান মনে করিত। অত্যাচার-জর্জ্জরিত, আত্মশক্তিতে প্রত্যয়হীন, অপমান ও লাঞ্ছনায় নিত্য অভ্যস্ত প্রজাগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই পীড়নের বিরুদ্ধে সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিবে—সে শিক্ষা ও সাহস তখনও সমাজের কোন স্তরেই লক্ষিত হয় নাই।—এই ত্রিশ বৎসর পরে সে কালের কথা স্মরণ হইলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়! মনে হয়, এ কি সেই দেশ? এই নবযুগের নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত, নবজাগ্রত, আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল, অবৈধ অত্যাচারে খড়্গহস্ত, একতাবদ্ধ ঐ কৃষক যুবকেরা কি তাহাদেরই বংশধর? সমাজের নিম্নতম স্তরে নবজীবনের যে স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসান-কালে কে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিল?

কিন্তু নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল উচ্চ শিক্ষিত ও রাজনীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হইলেও, শাসন-নীতি সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রজাগণের মধ্যে এক দলের প্রতি তিনি কথঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া, অর্থাৎ মাথালো-মাথালো জনকতক লোককে দুই-এক মুঠা উচ্ছিষ্ট দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিয়া, অবশিষ্ট প্রজাবর্গকে পদদলিত করিবার অনিন্দ্য-সুন্দর নীতি অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া, উভয় দলকে শাসন করা রাজনীতিসম্মত,—দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই জন্যই মুচিবাড়িয়া এলাকার মাতব্বর ও প্রধানেরা তাঁহার 'যথেচ্ছাচারের

অনুমোদন করিত ; অনেকে নানা ভাবে তাঁহাকে সাহায্যও করিত। ইহাদিগকে হাতে রাখিবার জন্যই, তিনি ইহাদের ভিতর হইতে বাছিয়া-বাছিয়া অনেককে কান্‌সারণের তহশিলদার, মুহুরী প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নায়েবের সহায়তায় ও উৎসাহে তাহারা জাল, প্রতারণা প্রভৃতি কোন কার্য্যেই কুণ্ঠা বোধ করিত না। তাহারা প্রজা-সাধারণের সর্ব্বনাশ সাধনে সর্ব্বদাই তাঁহাকে সাহায্য করিত। ইহারা শত মুখে নায়েবের প্রশংসা করিত ; এবং প্রজারাই সকল অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টিকর্ত্তা,—এ কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিত।

আর একটি বিষয়েও নায়েবের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। নায়েব মহাশয় জানিতেন, প্রজারা সুশিক্ষিত হইলে তাহাদের চোখ-কাণ ফুটিবে ; তাহারা তাহাদের ষোল আনা অধিকারের দাবী করিবে ; এবং প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে, জমীদারের যথেচ্ছাচারের শক্তি খর্ব্ব হইবে। এজন্য তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন, —তাঁহার এলাকার মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত হইবে না। হাম্‌ফ্রি সাহেব ইংরাজ,—তিনি উচ্চ-শিক্ষিত না হইলেও, শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ও অনুরাগ থাকাই স্বাভাবিক ; কিন্তু স্বার্থানুরোধে তাঁহার জন্মগত সংস্কার ত্যাগেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি তাঁহার এলাকা মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধী হইলেন। কোন প্রজার সন্তান-সন্ততি বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া মনুষ্য-পদবাচ্য হয়, নায়েবেরও এরূপ ইচ্ছা না থাকায়, মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের এলাকা হইতে মা সরস্বতীকে বেত্রাঘাতে বিতাড়িত করা হইল! যে সকল লোকের অবস্থা সচ্ছল, তাহারা বিভিন্ন স্থানে পুত্রাদি পাঠাইয়া, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ; অতি অল্প লোকই এই গুরু ভার বহনে সমর্থ হইল। অধিকাংশ প্রজাই দরিদ্র কৃষিজীবী। একেই তাহারা সুশিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিত না, তাহার উপর দূরবর্ত্তী সহরে ছেলে পাঠাইয়া, তাহাদের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা সাধ্যাতীত বলিয়া, তাহারা সন্তান-সন্ততিগণকে মূর্খ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইল। এমন কি পল্লীগ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাও তাহাদের পক্ষে দুর্লভ হইয়া উঠিল! একদিন এই এলাকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নায়েব মহাশয়কে বলিলেন, "আপনারা প্রজাদের মা-বাপ,—তাহাদের ছেলেরা লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে আপনাদের এত আপত্তি কেন?"—নায়েব মহাশয় বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "চাষার ছেলেরা লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ, হয়, না, অমানুষই হয়? কেতাবের দু'পাতা উল্টাইলেই তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া যায়। জুতা জামা না হইলে তখন তাহাদের মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে না। চাষার ছেলে লাঙ্গল ঠেলিতে, কুমোরের ছেলে মাটী ঘাঁটিতে, কামারের ছেলে লোহা ঠেঙ্গাইতে লজ্জা বোধ করে,—বাপদাদাকে ক্ষেতের কৃষাণ বলিয়া পরিচিত করে! ঘোষের পো না পারে গরু চরাইতে, না পারে মুহুরীগিরি করিতে। লাভের মধ্যে গরীবের ছেলেকে 'ঘোড়ারোগে' ধরে,—আর তাহারা দিন-দিন অসন্তুষ্ট হইয়া, বাপ-মাকে দূরের কথা—দেব, দ্বিজ ও রাজাকে পর্য্যন্ত অসম্মান করিতে শেখে! আমাদের এলাকার মধ্যে আমরা এ রোগের বীজ ছড়াইব না।"

বস্তুতঃ, ম্যানেজার ও নায়েবের সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ায়, অধিকাংশ প্রজাই মূর্খ হইয়া রহিল। যে দুইচারিজন ভদ্র-লোকের ছেলে কোন রকমে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিল, তাহারা কান্‌সারণের সামান্য-সামান্য চাকরী লাভ করায়, মূর্খ জন-সাধারণের নিকট এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে'বৎ বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। এই বিদ্বানেরা মূর্খ পল্লী-বাসীদের ঘৃণা করিতে লাগিল। এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য নায়েবের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া, নানা ভাবে তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয়ের দানশীলতা, বিশেষতঃ তাঁহার অন্নদানে ঘটার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সান্যাল মহাশয় নানা কৌশলে ও কার্য্যদক্ষতা-গুণে পেস্কারী হইতে নায়েবী পদে বাহাল হইলে, কাম্যফল লাভ করিয়া পরের দুঃখ মোচনের জন্য আর তাঁহার আগ্রহ রহিল না! যত দিন তিনি পেস্কার ছিলেন, ততদিন দয়া, দাক্ষিণ্য ও প্রভাব, প্রতিপত্তি দ্বারা বাগচী নায়েবকে ঢাকিয়া ও চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এখন আর সেরূপ চেষ্টার আবশ্যকতা নাই ; সুতরাং এখন তিনি বিনা স্বার্থে কাহারও কোন উপকার করিতেন না।

স্বার্থানুরোধে নায়েব মহাশয় এখনও কয়েকটি আমলাকে তাঁহার বাসায় দু'বেলা খাইতে দিতেন। তাহারা বিনাব্যয়ে

দু'বেলা খাইতে পাইয়া, ক্রীতদাসের ন্যায় তাঁহার সকল আদেশ পালন করিত, এবং প্রাণপণে তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত। তাঁহার স্বার্থের অনুরোধে তাহারা কোন অন্যায় কর্ম্মে কুণ্ঠিত হইত না। যে সকল আমলা নায়েব মহাশয়ের অন্নে উদর পূর্ণ করিত, তাহাদের মধ্যে শ্রীনাথ আমিনের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীনাথ কার্য্য-তৎপরতা-গুণে নায়েব মহাশয়ের যেরূপ অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াছিল, তাঁহার আশ্রিত জীবগুলির মধ্যে আর কেহই সেরূপ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীনাথও অকৃতজ্ঞ ছিল না। আমিনী উপলক্ষে কান্সারণের এলাকাস্থিত অনেক জমি তাহাকে পরিদর্শন করিতে হইত;—তাহাকে অন্যের অধিকারভুক্ত জমী-জমার সংস্পর্শে আসিতে হইত; এবং জমী বন্দোবস্তের ভারও প্রত্যক্ষতঃ তাহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাহার যেটুকু ক্ষমতা ছিল, নায়েব মহাশয়ের স্বার্থপরতার জন্য সে সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় করিত। সে আমিনী কার্য্যের ব্যপদেশে কাহারও ভাল বাগান, বা বাগানের উপযোগী উৎকৃষ্ট জমীর সংশ্রবে আসিলে, সেই বাগান বা জমী জালিয়াতী, প্রবঞ্চনা বা কৌশলের সাহায্যে নায়েব মহাশয়কে লওয়াইয়া দিত! দু'বেলা দু'মুঠা অন্ন দান করিয়া, নায়েব মহাশয় শ্রীনাথ আমিনের ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীনাথের মত আশ্রিত জীবদের ক্ষুন্নিবারণ করিয়া নায়েব মহাশয়ের পুণ্য হোক না হোক,—নৈপুণ্যের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যাইত! যদি কেহ নায়েব মহাশয়ের লাঙ্গুল তৈল-চর্চ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার আশ্রিত-বাৎসল্যের প্রশংসা করিয়া বলিত, "পূর্ব্বজন্মে আপনি শ্রীনাথের বাপ ছিলেন,—বেচারা আপনার দয়াতেই তরিয়া গেল; আপনি তাহার জন্য যাহা করিয়াছেন,—এখনও করিতেছেন,—ছেলের জন্য বাপও ততদূর করে না! আপনার উদারতা ও দয়া দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গিয়া বলাবলি করি—আপনার মত পরোপকারী সাধু পুরুষ ভূ-ভারতে যদি লাখের মধ্যে একজনও থাকিত, তাহা হইলে কলিযুগের বদলে এতদিন সত্যযুগ দেখা দিত!"—নায়েব মহাশয় এই প্রশংসা-বাক্য শ্রবণে লজ্জিত হইয়া, উভয় কর্ণবিবরে উভয় হস্তের তর্জ্জনী স্থাপন পূর্ব্বক বলিতেন, "আত্মপ্রশংসা শ্রবণ মহাপাপ! গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে,—আমার আশ্রিত! আমাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে; উহার মুখের দিকে না চাহিলে, আমি কি ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারিতাম?"

শ্রীনাথ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। তেমন লেখাপড়া জানিত না। কিন্তু সে তাহার বিদ্যার অভাব বুদ্ধির সাহায্যে পোষাইয়া লইয়াছিল। চাকরীর চেষ্টায় নানা স্থানে ঘুরিয়া, অবশেষে নায়েব মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর সহোদর বটুক ভাদুড়ীকে মুরুব্বি ধরে; এবং তাহার নিকট হইতে সুপারিশ-পত্র লইয়া নায়েব মহাশয়ের আশ্রয়প্রার্থী হয়। সহধর্ম্মিণীর সহোদরের অনুরোধ-পত্র এই কলিযুগে কদাচিৎ ব্যর্থ হইয়া থাকে,—নায়েব মহাশয়ও গুরুর গুরুতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না,—শ্রীনাথকে বাসায় রাখিয়া মেঠো আমিনের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন; এবং সুযোগ বুঝিয়া ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবকে ধরিয়া আমিনী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

নায়েব মহাশয়ের অসাধারণ অভ্যুদয় দর্শনে যে সকল আমলা ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সদর আমিন রসরাজ বিশ্বাস তাহাদের অন্যতম—এ কথা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। নায়েব মহাশয় যখন পেস্কার ছিলেন, তখন হইতেই রসরাজপ্রমুখ আমলাগণের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। তিনি নায়েব হইবার পরও তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে নিবৃত্ত হয় নাই। নায়েব মহাশয় গুপ্তচরের মুখে এই ষড়যন্ত্রের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কৌশলে যে কয়েকজন আমলাকে পদচ্যুত করেন, তাহাদের দলে রসরাজ বিশ্বাসও ছিল। যাঁহার সুপারিশে রসরাজ সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারই সুপারিশে তাহার চাকরী গেল! নায়েব মহাশয়ের তখন অপ্রতিহত প্রতাপ,—ম্যানেজার সাহেব তাঁহাকে দক্ষিণ হস্ত মনে করিতেন। রসরাজ পদচ্যুত হইলে, তাঁহার সুপারিশে শ্রীনাথ বিশ্বাস সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইল। নায়েব মহাশয় তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন যে কয়েকটি আমলাকে পদচ্যুত করেন, তাঁহার একান্ত অনুগত ও আশ্রিত পোষ্যেরাই তাহাদের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। যে কয়েকটি চাকরী খালি হইয়াছিল, তন্মধ্যে সদর আমিনের পদ দায়িত্বে ও গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইজন্য নায়েব মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুগত শ্রীনাথ বিশ্বাসকেই এই পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ

রসরাজের অধীনে আমিনী করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল ; সুতরাং তাহাকে সদর আমিনের পদে নিযুক্ত করিতে ম্যানেজার সাহেবের আপত্তি হইল না।—কিন্তু পূর্ব্ব কথা সাহেবের মনে ছিল। তিনি নায়েবের সুপারিশে শ্রীনাথকে সদর আমিনের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় হাসিতে-হাসিতে নায়েব মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "ওয়েল নায়েব, টোমার নিমকের খাটির না করিয়া এক কুকুর টোমাকে ডংসন করিটে উড্যাট হোইয়াছিল,—টহাকে ডূর করিয়া, আর একটা কুকুরকে আডর ডিয়া তোমার মষ্টকে টুলিয়া লইটেছ ! এ নয়া কুট্টা, টোমার নিমকের খাটির রাখিবে কি ? টোমার ডেশের টামান্ আড্‌মি নিমকহারাম। ছোটা বড়া বিল্‌কুল্ আড্‌মি এক এক মীর্জাফার !"—নায়েবও সাহেবের রসিকতায় গৌরব অনুভব করিয়া বলিলেন, "তা না হইলে আজ, সাহেব ! তোমরা কোথায় থাকিতে ? স্বজাতির সঙ্গেই আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করি, তোমাদের সঙ্গে নয়।"—হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবের কথায় অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া বলিলেন, "ঠিক বাৎ নায়েব ! ইহা কুকুর জাটিরই স্বটস্ম—characteristic !"—নায়েব জানিতেন, 'পেটে খেলে পিঠে সয়'—সুতরাং স্বজাতির এত বড় উদার প্রশংসা তিনি নিঃশব্দে পরিপাক করিলেন ! নায়েব উত্তম পোষ মানিয়াছে দেখিয়া সাহেবও বড় সন্তুষ্ট হইলেন ; কারণ এই নায়েবই পেস্কারী করিবার সময় মুরগীর ডিম চুরির বদ্‌নাম শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাঁহাকে কাম্‌ড়াইতেই গিয়াছিল ! এই সামান্য অভিযোগ যাহার অসহ্য হইয়াছিল, সে সমগ্র জাতির অপমানজনক এত বড় কটূক্তি কি করিয়া এত সহজে পরিপাক করিল, ভাবিয়া সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন। তাহার পর মনে-মনে বলিলেন, 'যে হতভাগ্যেরা স্বজাতির অপমানে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, তাহাদের অন্তরে দেশাত্মবোধের বিকাশ হইতে এখনও বহু বিলম্ব ! তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। যাহারা কেরাণী-গিরি করিতে গিয়া মাথা নাড়ে, তাহারাই ডেপুটী-গিরি পাইলে প্রসন্ন মনে গাল পাতিয়া দিবে। ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ভরসার কথা বটে।"

শ্রীনাথ আমিন নায়েবের আশ্রিত ও অনুগৃহীত বলিয়া, কান্‌সারণের পদস্থ আমলাগণ তাহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতেন ; সুতরাং সে সদর আমিনের পদে উন্নীত হওয়ায়, সকল আমলাই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল ; এমন কি, যে সকল আমলার উৎসাহে ও পরামর্শে রসরাজ আমিন নায়েবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া পদচ্যুত হইয়াছিল—তাহারাও নায়েবকে খুসী করিবার জন্য শ্রীনাথের পদোন্নতিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল !

পূর্ব্বে আমিনী চাকরী পল্লী-অঞ্চলের ভদ্রসমাজ তেমন শ্রদ্ধা বা সম্মানের চক্ষে দেখিতেন না ; কারণ, সারাবছর রৌদ্রে বৃষ্টিতে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ও জমীর দখল লইয়া কতকগুলা 'ছোটলোকে'র সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়া দেহপাত করিতে না পারিলে, কেহ এই চাকরী বজায় রাখিতে পারিত না। ভদ্র-সমাজে আদালতের পেয়াদা ও জমীদার-সরকারের আমিন সমান অবজ্ঞার পাত্র ছিল। শ্রীনাথ সদর আমিনের পদে উন্নীত হইলে ও বিশিষ্ট আমলাদের বৈঠকে স্থান পাইলে আমিনী কার্য্যের প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা বিদূরিত হইল ; অনেকেরই ধারণা হইল,—আমিনী তেমন হীন নহে,—ইহাতে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

এই সময় ভুবন বাবু ও গোলোক বাবু মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের অন্তর্ভুক্ত নীলকুঠীতে দেওয়ানী করিতেন। ইঁহারা সহোদর ভ্রাতা। গোলোক বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জ্যোৎস্না। সবজজ বা ডিপুটীরা রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী উমেদার পুত্র বা জামাতাকে ডেপুটী বা মুন্সেফ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন ; পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের পুত্র দারোগাগিরি লাভেরই চেষ্টা করে। সেরেস্তাদারের মূর্খ ছেলে আদালতে শিক্ষা-নবিসী আরম্ভ করে। জ্যোৎস্নার বাবা ও জ্যাঠা যখন দেখিলেন, জ্যোৎস্নার আর মানুষ হইবার আশা নাই, তখন তাঁহারা তাহাকে কান্‌সারণের ভিতর প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু নায়েব মহাশয়কে মুরুব্বি ধরিয়াও চাকুরীর কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহারা জ্যোৎস্নাকে শ্রীনাথ আমিনের অধীনে 'তায়েদ্‌নবীশ' (এপ্রেন্টিস্) করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু ইহাতে একটা অসুবিধা হইল। শ্রীনাথ দরিদ্রের সন্তান,—নায়েবের অনুগ্রহে তাঁহার বাসায় দু'বেলা খাইতে পাইত। আমিনী লাভ করিলেও তাহার অবস্থা তখনও এতদূর সচ্ছল হয় নাই যে, স্বতন্ত্র বাসা করিয়া ভদ্র-ভাবে থাকে, বা শ্রমলাঘবের জন্য একটা ঘোড়া রাখে। একাল

হইলে শ্রীনাথ কিস্তীবন্দীতে একখানা বাইক্ কিনিত; কিন্তু ঘোড়া পুষিতে হইলে তাহার দানা চাই, একজন সহিস চাই, তাহার উপর একখানি ঘরও চাই। যাহার শয়নং যত্রতত্র, তাহার ঘোড়ার আস্তাবল নির্ম্মাণ বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং 'কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ' তাহার কাছেও ঘেঁসিতে পারে নাই! সে নামে শ্রীনাথ হইলেও লক্ষ্মীছাড়ার মত সমস্ত দিন পদব্রজে মাঠে-মাঠে ঘুরিয়া চাকরী বজায় রাখিত। কিন্তু তাহার অধীন শিক্ষানবীস জ্যোৎস্না নীলকুঠীর দেওয়ানের পুত্র। সে কোন্ দুঃখে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া পদব্রজে আমিনের পশ্চাতে মাঠে-মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইবে? সে ঘোড়ায় চড়িয়া শ্রীনাথের সঙ্গে আমিনী শিখিয়া বেড়াইত। শ্রীনাথের ঘোড়া নাই দেখিয়া, জ্যোৎস্না তাহাকে নিজের পিছনে তুলিয়া লইত; এবং দুইজনে একঘোড়ার পিঠে আমিনী করিতে যাইত। দুইজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে এক ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া, অনেকেরই পরিহাসের লোভ অসংবরণীয় হইয়া উঠিত; কিন্তু কান্সারণের আমলাদের কোন অসঙ্গত কাজ দেখিয়া, প্রকাশ্যে তাহার আলোচনা করিবে—কাহারও সেরূপ সাহস ছিল না,—উপহাস-বিদ্রূপ ত দূরের কথা!

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল নায়েবী পদে উন্নীত হইয়া সকল বিষয়েই যে ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সকলের ধারণা হইল, তিনিই এই কান্সারণের 'ছোট ম্যানেজার'।—তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে; ম্যানেজার সাহেবের নিকট কোন বিষয়ের জন্য দরখাস্ত করা বাহুল্য মাত্র! নায়েবকে লঙ্ঘন করিয়া কেহ কোন দরবারে ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, নায়েব তাহার কাজ পণ্ড করিয়া দিতেন; সুতরাং কেহই কোন বিষয়ে ম্যানেজার সাহেবের সাহায্য-প্রার্থী হইত না।

হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবের প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন;—তাঁহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। কিন্তু তিনি নায়েবের শক্তির পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; সুতরাং প্রকাশ্য ভাবে নায়েবের অপমান করিতে তাঁহার সাহস হইল না; এমন কি তিনি নায়েবের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিলেন না। কিন্তু তিনিই কর্ত্তা,—নায়েব তাঁহার হুকুমের চাকর মাত্র,—ইহা প্রতিপন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বয়ং সকল বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। যে সকল বিষয়ে নায়েবের সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক, সেই সকল গুরুতর বিষয়েও তিনি নায়েবকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, হুকুম জারি করিতে লাগিলেন।

মুচিবাড়িয়া কান্সারণের সুবিস্তীর্ণ এলাকামধ্যে ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল, এ পরিচয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। তিনিই একাধারে পুলিস সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ! গুরুতর ফৌজদারী মামলা, যাহা বিচারের জন্য দায়রা আদালত ও হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যাইতে পারিত, এবং যে সকল অপরাধের বিচারে হস্তক্ষেপ করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার অপদস্থ হইবার আশঙ্কা ছিল, সেই সকল মামলা ব্যতীত এলাকার সমস্ত মামলার বিচারই তিনি স্বয়ং করিতেন; পুলিশ তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনাবশ্যক মনে করিত। তাঁহার পিনালকোডে দুই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল,—বেত ও জরিমানা। সাহেবের সময়ের অভাব হইলে, ছোটখাট বিচারের ভার নায়েবের হস্তে অর্পিত হইত। 'ফাইল' ভারি হইলে, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট যেমন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদের 'ফাইলে' মামলা পাঠাইয়া কার্য্যভার লঘু করেন, হাম্‌ফ্রি সাহেবও নায়েবের সাহায্যে তাহাই করিতেন। কিন্তু তিনি নায়েবের প্রভুত্বে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার এই ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন; সকল মামলার বিচার স্বয়ং করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য অপরাধীদের পৃষ্ঠে তাঁহার বিচারের মহিমা পরিস্ফুট হইতে লাগিল! নায়েবকে অপদস্থ করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া অপরাধিগণকে এরূপ প্রচণ্ড বেগে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন যে, অনেকের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের চিহ্ন চিরস্থায়ী হইয়া রহিল; জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে দাগ মিলাইল না! এইভাবে বেত্রাহত হইয়া অনেকেই নায়েবের শরণাপন্ন হইল; কিন্তু বেতের আপিল নাই, বিশেষতঃ তিনি সাহেবের তাঁবেদার মাত্র; তিনি তাহাদিগকে কোন প্রকার আশা-ভরসা দিতে পারিলেন না; কিন্তু ম্যানেজার সাহেবের অবজ্ঞাভাজন হইয়া ক্রোধে ও বিরাগে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। নায়েব প্রকাশ্যে সাহেবের ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ করিবেন না বটে, কিন্তু মনে মনে বলিলেন, যদি তোমার স্পর্দ্ধা ও পিটুনীর প্রতিফল দিতে না পারি—তাহা হইলে আমি ব্রাহ্মণই নহি! দেখি তুমি কেমন ম্যানেজার, আর

আমি কেমন নায়েব! ঘুঘু দেখিয়াছ, ফাঁদ দেখিতে পাইবে।”

নায়েব বিন্দুমাত্র বাহ্যিক চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া সাহেবকে সমুচিত শিক্ষা দানের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় সুচতুর ফন্দীবাজ লোককে আশানুরূপ সুযোগের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইল না। শীঘ্রই এমন সুযোগ আসিল যে, হাম্ফ্রি সাহেবের নাকের জলে চোখের জলে এক হইয়া গেল! তাহার চোটে তিনি নায়েবের সহিত আপোষ করিবার পথ পাইলেন না।

নিখিল-প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

(২)

ঘরকরণার কথা—

সাহেবদের মেয়েরা ঘর-দোর রোজ সাফ্ করে, ঝেড়ে মুছে, তক্তকে, ঝক্মকে করে রেখে দেয়। ঘর ঝাড়া, ঘর ধোয়া, ঘর মোছা, দোর, জানালা পরিষ্কার করা, সার্শির কাঁচ সাফ্ করে রাখা, কড়িকাঠের ঝুল ঝেড়ে রাখা—এ সবই তারা কলের সাহায্যে করে। কাযেই তাদের খাটুনি কম হয়, আর

ঘর ধোয়া ব্রুশ

[এই ব্রুশের মাথায় জল পূর্ণ টিনের খোল আঁটা থাকে, একটি বোতাম টিপলেই আপনি ব্রুশের মুখে জল আসে।]

কাযও শিগ্‌গীর সুসম্পন্ন হয়। বাবুদের জুতো ব্রুশ করবারও এখন খুব সুবিধে হয়েছে। একরকম জুতো-ব্রুশ বেরিয়েছে, তার সঙ্গে জুতোর কালির টিনও আঁটা আছে। জুতোয় আর আলাদা ক'রে কালি লাগাবার দরকার হয় না,—একটি বোতাম টিপে ধরে, সেই ব্রুশটি জুতোর ওপর ঘস্‌লেই জুতোয় আপনি কালি মাখানো হ'য়ে যায়; অথচ হাতে এক ফোঁটাও কালি লাগে না। তার পর জুতোকে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো লাশে চড়িয়ে দিয়ে, একখানা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে বেশ করে ঘসে নিলেই, চমৎকার পালিশ হয়ে যায়; ঘাড় হেঁট করে বসে, আধ ঘণ্টা ধরে আর ব্রুশ ঘসে-ঘসে চক্‌চকে করতে হয় না।

সার্শি মোছা কল

বাড়ীর কায কর্ব্বার জন্যে যাতে বেশিবার ওপর-নীচে দৌড়াদৌড়ি করতে না হয়, সেদিকে ওদের খুব লক্ষ্য থাকে। একতলার জন্যে যা কিছু তৈজসপত্র, আস্‌বাব সরঞ্জাম, সমস্ত একতলাতেই গুছিয়ে রাখা হয়। দোতলার যা কিছু দরকার, সব দোতলাতেই থাকে। একতলার

কাপড় নিংড়ানো

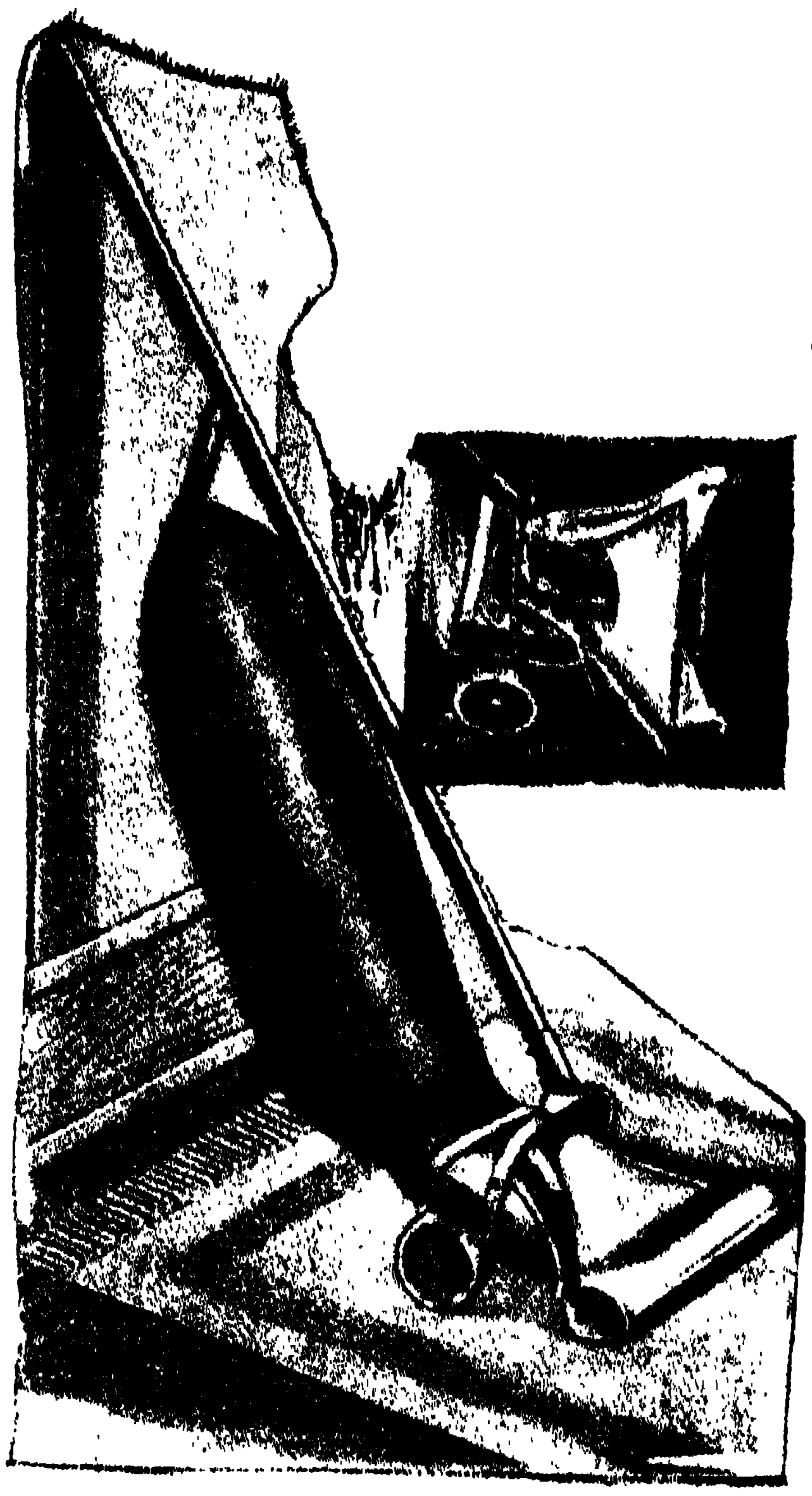

ঘর ঝাড়া ঝাঁটা।

[এই ঝাঁটায় ধুলো ঝেড়ে সাফ করে নেওয়া যায়, মাথায় একটুও ধুলো লাগে না। তার কারণ ধুলো ঝাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ধুলোগুলি হুড় হুড় করে ঝাঁটার গায়ে আঁটা একটি থলের ভিতর গিয়ে জড় হয়।]

ঘর মোছা কল

[এর সঙ্গে বাতাস ভরা একটি রবারের ব্যাগ আছে, ঘর মোছার সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যাগের বাতাস টিপে দিলে ঘর খানি তখনি শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে যায়।]

জুতো পলিশ

জিনিস দোতলায় নিয়ে যাওয়া হয় না; দোতলারও কিছু একতলায় আসে না। কেবল বাড়ীর টেলিফোঁটিকে, খরচা বাঁচাবার জন্যে, একতলা দোতলা দু'যায়গাতেই ব্যবহার করা হয়। এই জন্যে টেলিফোঁটিকে তারা সিঁড়ির ধারে কপি-কলে খাটিয়ে রাখে। একতলায় থাকবার সময়

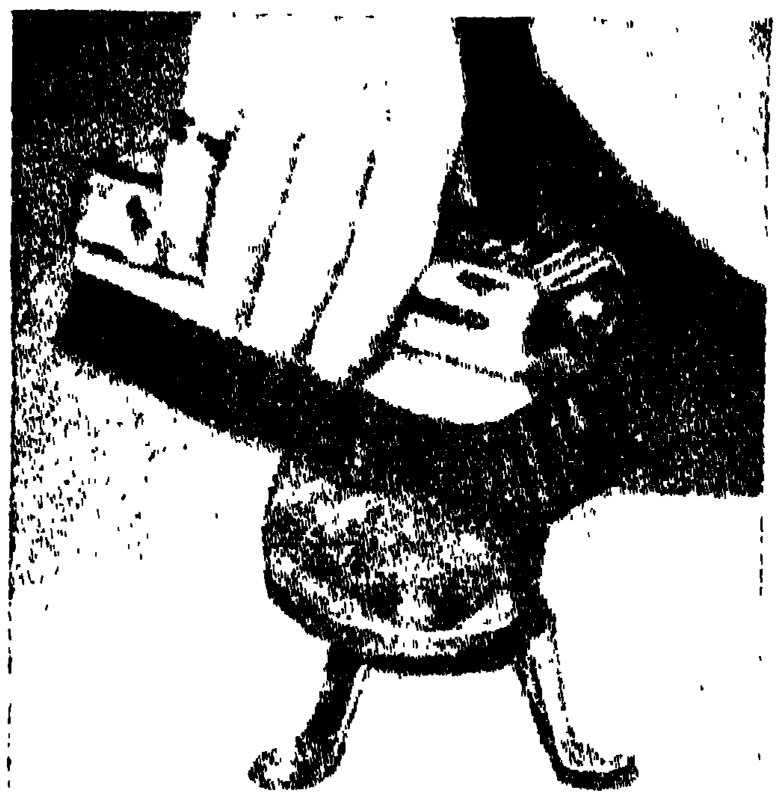

জুতো ব্রুশ

যখন দরকার হয় টেনে নামিয়ে নিয়ে ব্যবহার করে; আবার দোতলায় থাক্‌বার সময় দরকার হ'লে টেনে তুলে নিয়ে ব্যবহার করে।

ওদের অধিকাংশ লোকের বাড়ীর সিঁড়িই কাঠের তৈরি।

সিঁড়ির আলমারি

অমন বড়-বড় চওড়া কাঠের সিঁড়িগুলো বেকার দাঁড়িয়ে কেবল যে লোক-ওঠা-নামার সাহায্য ক'রবে,—সিঁড়ির কাছ থেকে এইটুকু মাত্র কায পেয়ে তারা খুসি হ'তে পারলে না। তারা শেষে বুদ্ধি করে, সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে-ধাপে এক-একটা টানা দেরাজ বসিয়ে নিয়ে, সিঁড়িটার কাছ থেকে সিঁড়ির কায ছাড়া উপরন্তু আলমারীর কাযও আদায় করে নিচ্ছে!

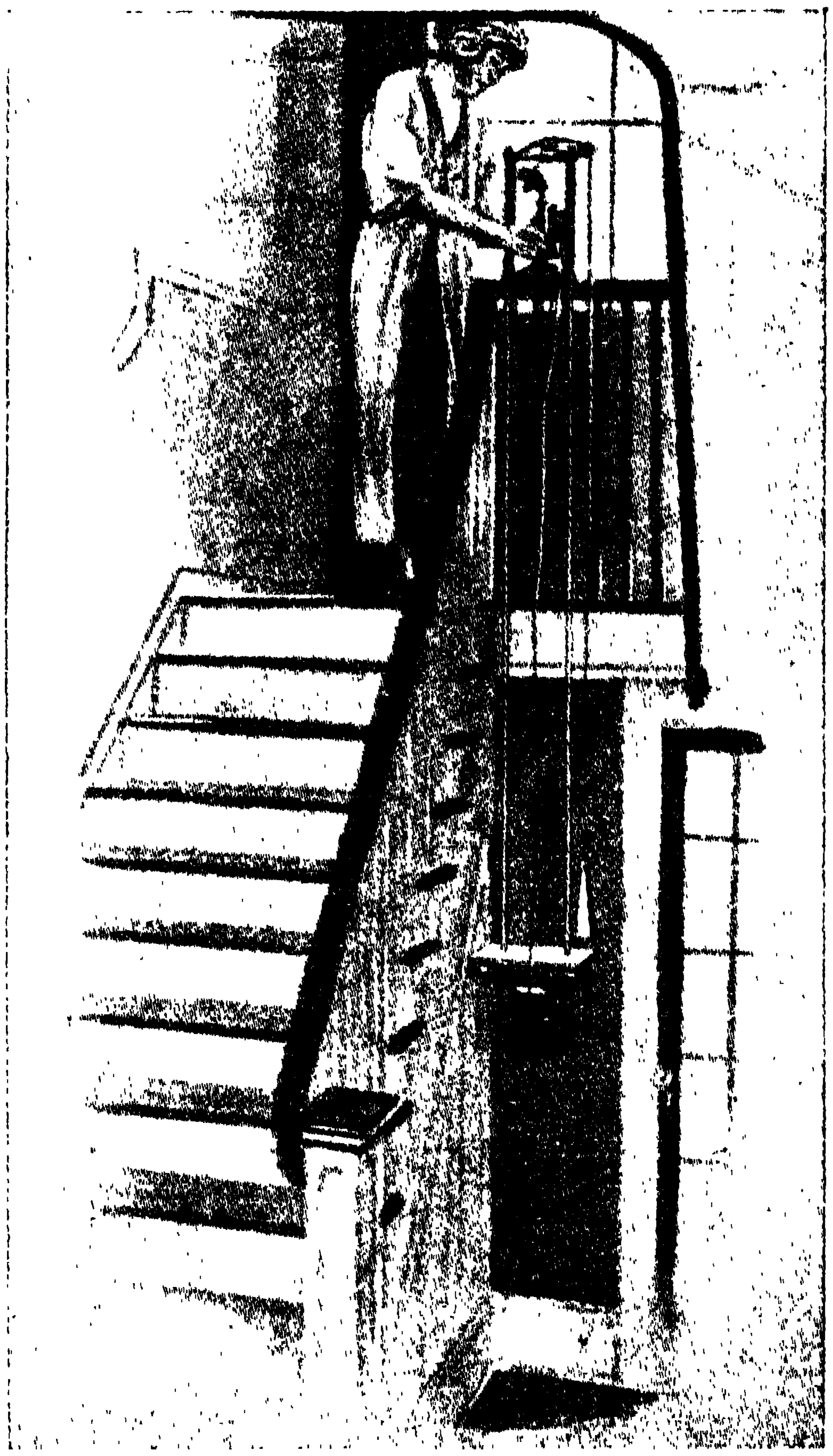

টেলিফোঁর ওঠা-নামা

ওদের মেয়েরা টেবিল-আয়নার সাম্‌নে বসে চুল বাঁধে। এতাবৎ কাল চুল বাঁধবার টেবিল-আয়না কেবল চুল বাঁধবার কাযেই ব্যবহার হয়ে আস্‌ছিল,—সে টেবিলখানা বাড়ীর আর অন্য কোনও কাযে লাগ্‌তো না। আজকাল সেই চুলবাঁধা টেবিল-আয়না এমন কায়দায় তৈরি হচ্ছে যে, সে টেবিলটা সব রকম কাযেই লাগ্‌তে পারে। চুল বাঁধবার সময় কেবল তার মাঝখানের ঢাক্‌নাটা টেনে

ইলেক্‌ট্রিক নখকাটা কল

টুপিতে ডিম সিদ্ধ করা

[এই টুপি আগুন-তাতে পোড়ে না ; আর এতে জল রাখাও চলে।]

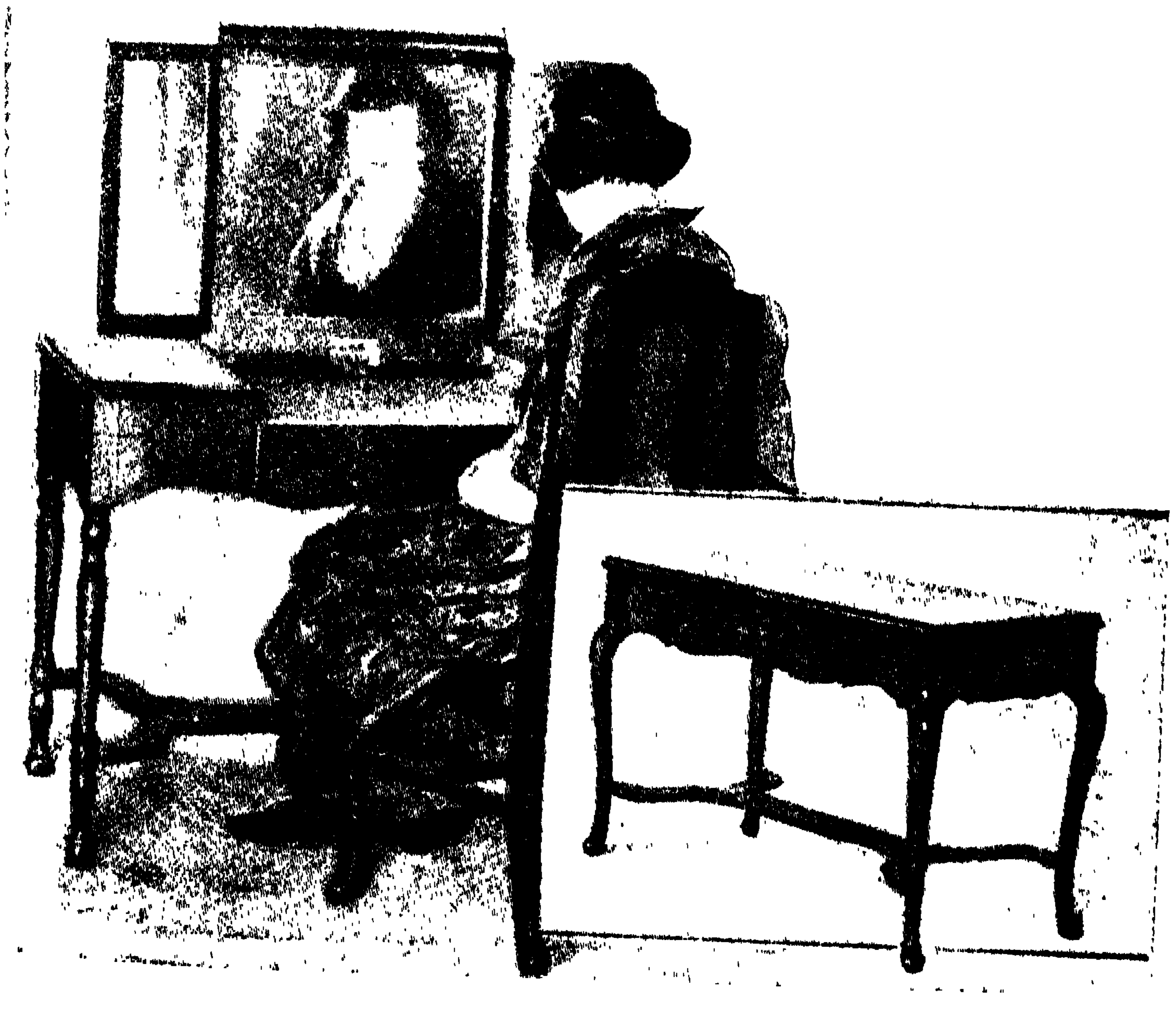

চুলবাঁধা আয়না

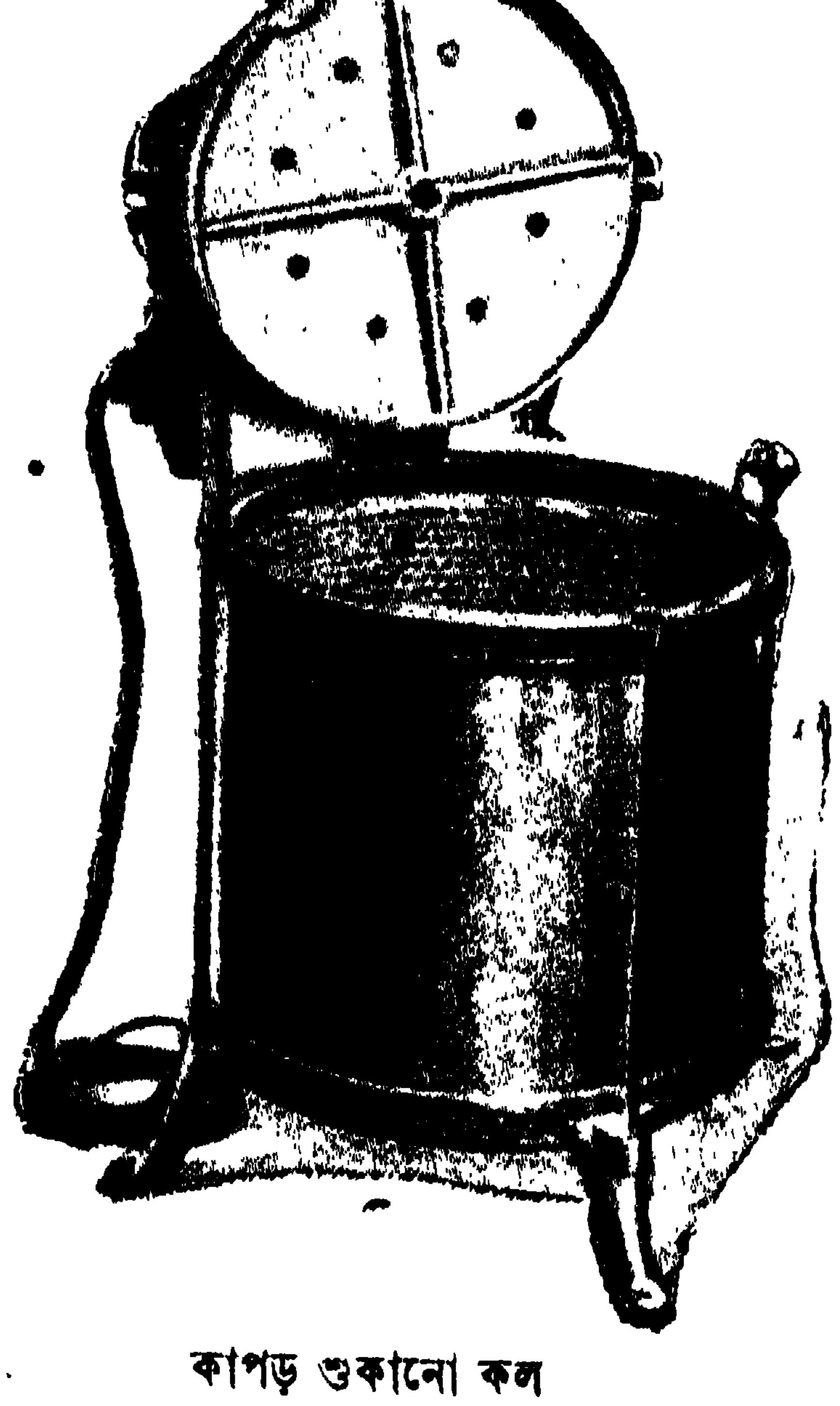

কাপড় শুকানো কল

...দিলেই, ঢাক্‌নার উল্টো পিঠে আঁটা আয়নাখানি ...বেরিয়ে পড়ে। আর টেবিলের মাঝখানের সেই খোলের ...র গিন্নীর চুল বাঁধবার সমস্ত সরঞ্জাম বেশ রাখা চলে। ...কাটা, নখচাঁচা, এসবের জন্যে ওদের মেয়েরা নাপ্‌তিনীর ...পেক্ষিণী হয়ে থাকে না,—নিজেরাই ওটা সেরে নেয়। ...গে ওদের হাতেই নখ কাট্‌তে হোতো ; আজকাল ইলেক্‌ট্রিক্ নখকাটা কল উঠ্‌তে, ওদের ভারি সুবিধে হ'য়েছে। নখকাটা, নখচাঁচা, নখ পালিশ করা—সব চক্ষের নিমেষে হয়ে যাচ্ছে।

মাছ কোটা, মাছের আঁশ ছাড়ানো, এ সবের জন্যে ওদের যে হাঙ্গাম পোয়াতে হয়, তার কাছে আমাদের আঁশ-বঁটি লক্ষ গুণে ভাল। ওরা মাছটাকে একটা

আঁকড়ায় আট্‌কে টেনে ধরে, একটা আঁশ-চাঁচা দিয়ে ঘসে-ঘসে অনেক কষ্টে মাছের আঁশ ছাড়ায়। তার পর গোটা মাছটাকে আগে সিদ্ধ ক'রে নিয়ে, পরে ছুরি দিয়ে কেটে ভাগ করে। খাবার জন্যে ছুরি-কাঁটা এখন আর আলাদা-

হিসেব রাখা কল

আলাদা দু'খানা ব্যবহার ক'রতে হয় না; আজকাল এক-খানাতেই একসঙ্গে খানিকটা ছুরি খানিকটা কাঁটা ধরণের এক রকম কাঁটা-চাকু প্রচলিত হয়েছে।

বর্ষার দিন কাপড় শুখোবার বড় অসুবিধে হয়। প্রথমতঃ

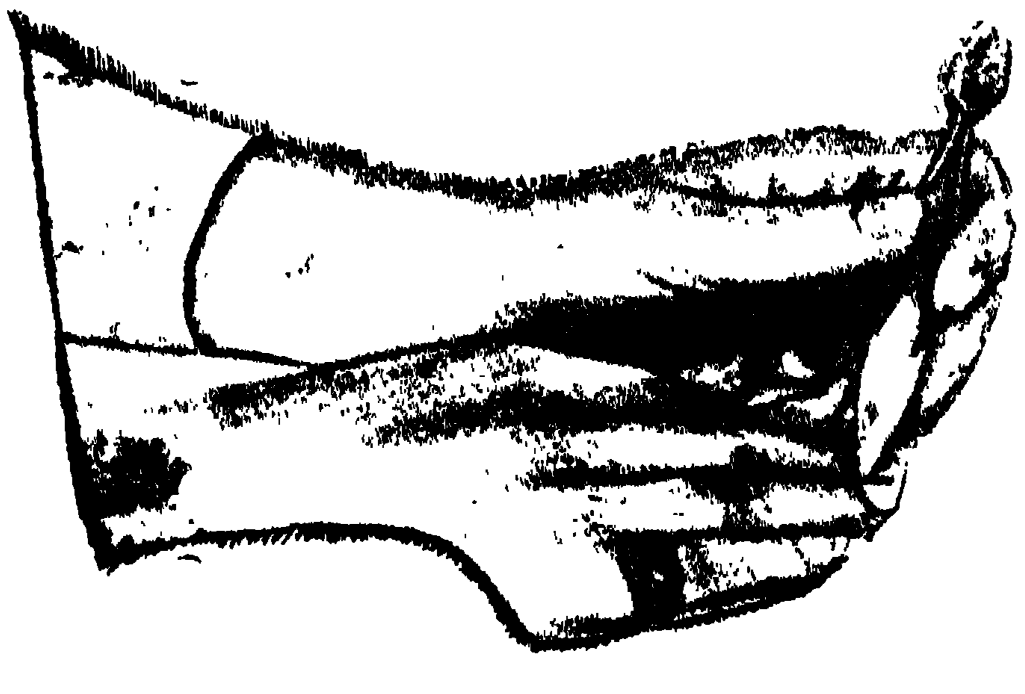

হাতে নখ কাটা

রোদ ওঠে না; দ্বিতীয়তঃ বৃষ্টির জন্যে বাইরে হাওয়ায় মেলে দেবারও জো থাকে না। ওরা'সে রকম দিনে ইলেক্‌ট্রিকের কাপড় শুখোনো কলে কাপড়-চোপড় শুকিয়ে নেয়। এই কলের ভেতর ভিজে কাপড় ফেলে দিলে, কলটি বন্‌বন্‌ ক'রে ঘুরতে-ঘুরতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাপড় নিংড়ে শুখিয়ে খট্‌খটে করে ছেড়ে দেয়।

ও দেশের লোকেরা এখনও পাঁচ রকমের আনাজ এনে তরকারি রেঁধে খেতে শেখে নি;—তরিতরকারি যা, প্রায় সিদ্ধ করেই খায়। সেইজন্যে নুন, মরীচ, রাই এগুলো

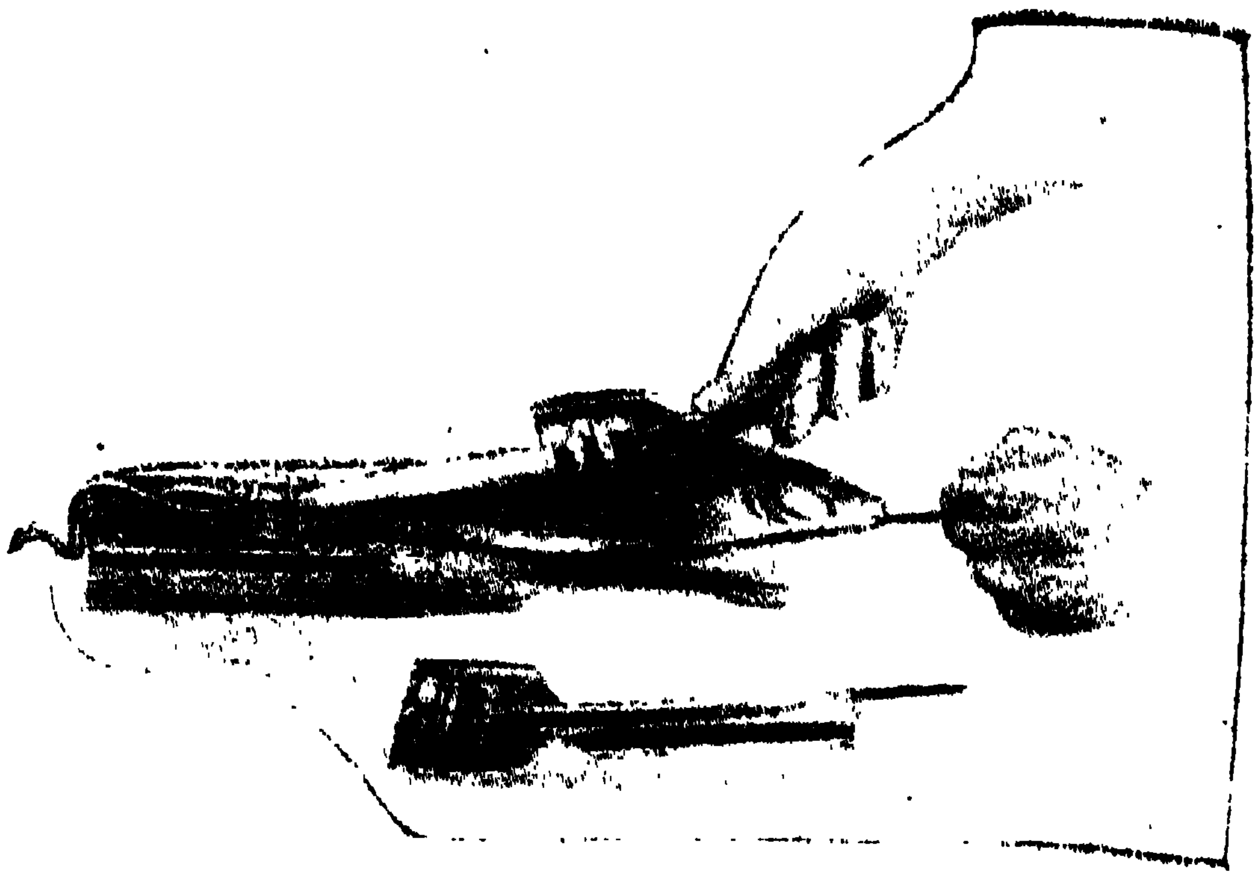

মাছের আঁশ ছাড়ানো

ওদের খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখ্‌তেই হয়। ডিমসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, কপিসিদ্ধ, বর্ব্বটি, কড়াইসুঁটি—এ সব খাবার সময় ওদের নুন-মরীচ মাখিয়ে খেতে হয়। ছুরি-কাঁটায় খাওয়া অভ্যাস। চাম্‌চে ক'রে নুন-মরীচ ঠিক আন্দাজ মত দেওয়ার সুবিধে হয় না; এই জন্য ওরা খাবার টেবিলের ওপর এক-একটি নুন-মরীচের ঝাড়া রেখে দেয়। মরীচ গুঁড়িয়ে নুনের সঙ্গে মিশিয়ে, একটি কাঁচের টিউবের ভিতর

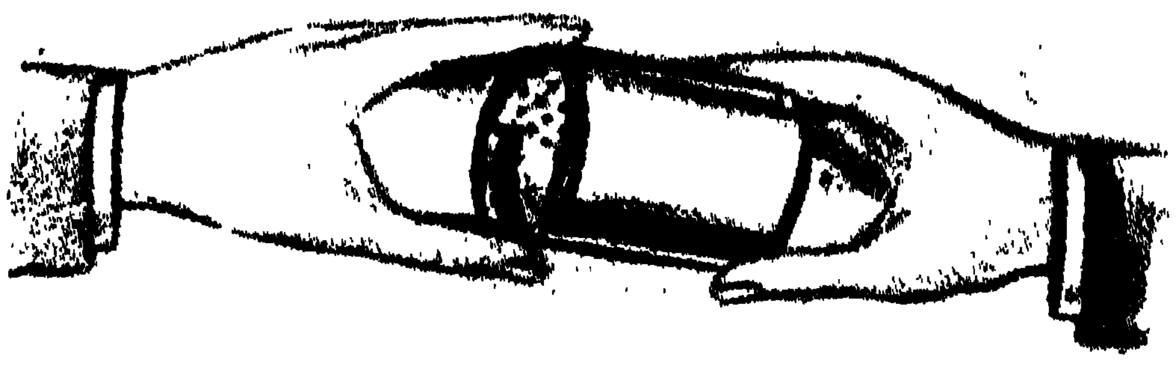

নুন মরীচের ঝাড়া

পূরে মুখে একটা টিনের ছিপি এঁটে দেয়। এই টিনের ছিপির গায়ে ছোট-ছোট ফুটো করা আছে। কাঁচের টিউবটি উল্টো করে ধরে, ডিমসিদ্ধ বা আলুসিদ্ধের উপর আস্তে-আস্তে ঝেড়ে নিলেই, তোফা নুন-মরীচ মাখা হয়ে যাবে। ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভ থাক্‌লে, যখন ইচ্ছে আলু কি ডিম সিদ্ধ করে নেওয়াও চলে। রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে বাড়ীর আরও পাঁচটা কাজ

করে ফেল্‌তে পারবে বলে, ওরা এক রকম 'নিধরা' হাঁড়ি ব্যবহার ক'রে। এ হাঁড়ি মাটির নয়,—মাটির হাঁড়ি ওরা মোটেই ব্যবহার করে না। 'নিধরা' হাঁড়ি এ্যালুমিনিয়মের তৈরি। এতে ডাল, ভাত, কি তরকারী চড়িয়ে দিয়ে, ইচ্ছে

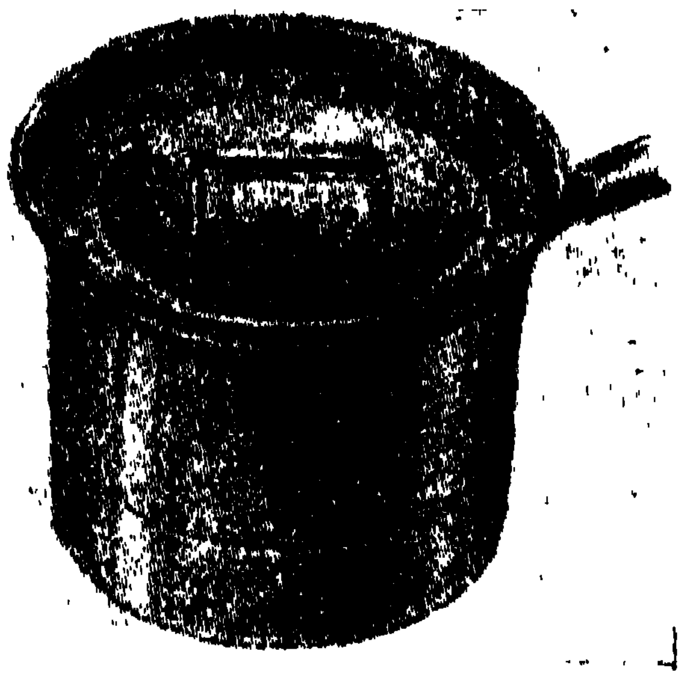

নিধরা হাঁড়ি

নুন মরিচের ঝারা

করলে এক ঘুম দিয়েও নেওয়া চ'লে। কারণ, এ হাঁড়িতে কিছুতেই রান্না ধরে যাবার ভয় নেই। এমন কায়দা ক'রে হাঁড়িটে তৈরি করেছে যে, হাঁড়ির জল যতই ফুটুক্, কখনও নিঃশেষে মরবে না।

চিঠি-পত্র লেখা, হিসেব রাখা—এ সবের জন্যে কালি-কলমের ব্যবহার ওদেশে প্রায় উঠে আসছে। এখন ঘরে ঘরে যেমন লেখার কল হয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে হিসেব রাখা কলও হচ্ছে। কর্ত্তা-গিন্নী, ছেলে, মেয়ে, যাদের যখন দরকার হচ্ছে, তারা সেই ক'লে লম্বা হিসেব কিম্বা দশ-পাতা চিঠি হ'লেও দশ মিনিটেই লিখে শেষ ক'রে ফেল্‌ছে! বিশেষ, ওদেশের যারা সাহিত্যিক বা গ্রন্থকার, তাদের ভারী সুবিধে হয়েছে। তাদের আর পাণ্ডুলিপি হাতে লিখ্‌তে-লিখ্‌তে সারা হ'তে হয় না। বাংলা লেখার একটা ভাল

ছুরি কাঁটা একসঙ্গে।

কল বেরুলে, এদেশের অনেক সাহিত্যিকও বেঁচে যায়। বাংলা হিসেব রাখা কল হ'লে, এ দেশের অনেক কারবারি লোকেরও সুবিধে হয়।

(Popular Science & Popular Mechanics)

পয়লা আষাঢ়

[শ্রীগোপাল হালদার]

আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার আড্ডায় আমরা এই পয়লা আষাঢ়ের উৎসবটা সমাপ্ত করতুম মন্দাক্রান্তার লীলা চঞ্চল গতির ভিতরে। সংস্কৃতে যে আমরা সবাই খুব পটু ছিলুম তা নয়,—তরুণ হৃদয়ের অনির্দ্দেশ আকুলি-বিকুলিটাও আমাদের অনেক আগেই গৃহ-কোণের এক একটি অঞ্চলের প্রান্তে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল;—তবু কত কালের মৃত কবির সেই পরম আদরের দিনটিকে আমরা শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারতুম না। তাই, আমরা পয়লা আষাঢ়ের সন্ধ্যাটিকে 'মেঘদূতের' কবির কণ্ঠে অভিনন্দন করতুম।

ভবেশ তখন গলাটা শাণিয়ে মেঘদূতখানা নিয়ে বসেছে,—এমনি সময়ে বঙ্কিম ঘরে ঢুকেই বললে, "ওহে, দাঁড়াও।"

ভবেশ বিরক্ত হয়ে—"মাটি করলে! গোড়াতেই একটা বাধা" বলে মুখ তুলে চাইল।

"আজ আর মেঘদূত নয়; তার চেয়ে এই পয়লা আষাঢ়ের সন্ধ্যার জন্য নতুন একটা কিছু এনেছি।"

"কিন্তু মেঘদূত ছাড়া কি 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসটা' ব্যর্থ করব না কি?"

"ব্যর্থ হবে না হে। এ কাহিনীটির ভিতরে কালিদাসের কবি-কণ্ঠের সাড়া পাবে না সত্য,—কিন্তু তেমনি একটা ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস পাবে। তবে এটাতে শিপ্রার তীর নেই, অলকাপুরী নেই; তার কারণ, এর ঘটনাস্থল হচ্ছে কলকাতা, আর এর কাল বর্ত্তমান।"

"সংক্ষেপে, সেই উজ্জয়িনী ও অলকা ছেড়ে আসতে বলছ কলকাতার ধূলির ও ধোঁয়ার রাজত্বে।"

"সেটা ঠিক। কিন্তু ঘটনাটা সত্য। এই আষাঢ়-সন্ধ্যায় একদিন সেকাল ছেড়ে একালে ফিরে এলে, আমাদের আড্ডায় নতুনত্ব দেখা দিবে।"

সংস্কৃত আমাদের অনেকেরই বুঝতে কষ্ট হ'ত;—অনেকটা তারই জন্য, আর অনেকটা একটা সত্যিকার কাহিনী শুনবার আশায়,—আমরা বঙ্কিমের গল্প শুনতে রাজি হলুম। ভবেশ চটে গিয়ে, আমাদের মডার্ণ কালের দিঙনাগাচার্য্য আখ্যা দিয়ে, চুপ করে গোঁ ধরে বসল।

বঙ্কিম পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে বললে, "আমার বন্ধু নীরেন্দ্রকে তোমরা জানো একটা ছিট-গ্রস্ত প্রফেসর বলে। তোমরা দেখেছ, কাব্য ও কবিতার সে সমস্ত জীবনটা ধরে স্তুতি করে এল; অথচ লোক-সমাজে তার বে-রসিক নাম বেড়েই যাচ্ছে। তার কারণ, যে তরলতা আমাদের পাঁচজনার কাছে রসিকতা নামে বাহবা পায়, নীরেন্দ্রের সুগভীর সাধনার নীচে তা কবে তলিয়ে গেছে! আমাদের আড্ডায় সে একদিন এসেছিল; কিন্তু তোমরা দেখেছ, কেমন বিশ্রী ঠেকেছিল তার বোবার মত মুখ বুজে থাকাটা। তবু যে আমি তার সঙ্গ ছাড়তে পারি নি, তার কারণ, আমি তার কলেজ-জীবনের বন্ধু,—আর তাই বেশ জানতুম, আজকের এই স্বল্পভাষী গম্ভীর-প্রকৃতির কাব্য-কীটটি চিরদিন এমনি ছিল না;—তার উজ্জ্বল হাসি-তরঙ্গের নীচে তলিয়ে না যেত এমন লোক আমার চোখে পড়ে নি। কলেজের অধ্যাপনা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে—এ কথা আমি অনেক দিন বলেছি;—শুনে সে শুধু মৃদু হাসত।

তার আশে-পাশে যে সব লোক ঘুরে বেড়াত, তাদের বেশীর ভাগই তার সাহিত্যের ছাত্র। বন্ধুদের মধ্যে আমিই শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে আছি। আমার ধৈর্য্য তাকে জয় করেছে;—তার আগল দেওয়া হৃদয়-দুয়ারটার ফাঁকে মাঝে-মাঝে আমার দৃষ্টি-নিক্ষেপের অবসর জুটেছে,—সেও আমায় দিয়েছে।

আজ সকালে স্নান করতে যাওয়ার মুখেই একটা চিঠি এসে পৌঁছাল। নীরেন্দ্র লিখেছে, বিকালে একটু বেলা থাকতেই আমি যেন তার ওখানে চা খেতে যাই। সমস্ত কাজের অন্তরালেও আমার তার কথাটা মনে জাগছিল। তাই বেশ সকাল করেই কোর্ট থেকে ফিরে তার বাড়ী গেলুম। দেখলুম, নীরেন্দ্র আমার অপেক্ষায় দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হ'ল, অনেক কাল পরে যেন তার মুখে সেই পুরোনো সরসতার অনেকটা আজ ফিরে এসেছে। তার কথা-বার্ত্তার ভিতর দিয়েও যেন আজ একটা ফূর্ত্তির সুর বাজছে। আমি মনে-মনে বেশ একটু আরাম পেলুম।

নীরেন্দ্র আমাকে ধরেই তার পড়বার ঘরে নিয়ে গেল। জীবনে তার একমাত্র passion হয়ে উঠেছিল পড়া আর বই; তবু আমি তার বই-এর সংখ্যা দেখে চমকে গেলুম। কথাটা তুলতে না তুলতেই সে বাধা দিয়ে বলল, 'তোমাকে আমার বই দেখাবার জন্য ডাকি নি।'

'তা হয় ত ডাক নি। কিন্তু বই-ই যখন দেখছি, তখন তার কথাটা বলাই স্বাভাবিক।'

'সে তুমি আর একদিন এসে বেশ ধীরে-সুস্থে বিবেচনা করে বোলো। কিন্তু, আপাততঃ আমার আর একটুকু দরকারী কাজ ঠেকেছে।'—বলে, ড্রয়ার থেকে এই কাগজের তাড়া বের করে বললে, 'শোন, এটা একটা গল্প। এ তোমার না শুনলেও চলত, কিন্তু আমার চলত না। কেন না, একজন অন্ততঃ লোক চাই, যার কাছে হৃদয়াবেগগুলো কিছু না কিছু ঢেলে দেওয়া যায়। তুমি, ইচ্ছা হলে, এটা যাকে খুসী তাকে বলতে পার; কিন্তু আমার সে সুবিধা নেই, সে সৌভাগ্যও নেই।'

এই কথা বলে নীরেন্দ্র আমাকে চা-এর পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে, প্লেটে করে খানকত লুচি ও কিছু মিষ্টি সাজিয়ে বলল, 'তুমি খেতে থাক;—আমার চেয়ে দেখবার মত

অবসর আর থাক্‌বে না।'—তার পর তার কাহিনী চলল। আমারই একজন বন্ধুর জীবনের বলে হোক্‌, আর সত্য-সত্যই এর অন্তরের নিজস্ব সৌন্দর্য্যে হোক্‌,—এ কাহিনী আমায় এমনি মুগ্ধ করেছে যে, আজকের সন্ধ্যায় তোমাদের তা না শোনাতে পারলে আমার নিস্তার নেই।'

বঙ্কিম পড়তে লাগল;—আজ সাত বছর পরে ক্রমাগত হানা-হানি রণারণির পরে মনে হচ্ছে, শান্তির মোহানায় এসে পৌচেছি। আজ বিশ্বাস হচ্ছে, এই সাত বছর যে ছোট একটু ঘটনার জের টেনেছে, তাকে আমি সত্যিকার দৃষ্টিতে দেখতে পারব। তাই এমনি করে একটা গোপন গুহার ওপর থেকে কুয়াসার পর্দ্দাটা সরিয়ে নিতে সাহসী হচ্ছি।

মফস্বল কলেজের চাকুরিটি ছেড়ে যে আমি কলকাতায় এলুম,তার কারণ, কলকাতায় খুঁজলে পরে মনের মত একটা মনোজগতের আবহাওয়া পাওয়া যায়; কিন্তু মফস্বলে অনেক স্থানেই তা মেলা ভার। এই মহানগরীকে আমি বারবার প্রণাম করি; আমি জানি, সে আমার শরীর মনে কতখানি ঘুন ধরিয়েছে; কিন্তু তার বাইরেও আমি শান্তি পাই নি।

যে বাড়ীটাতে উঠলুম, সৌভাগ্যক্রমে তার খান-তিন বাড়ী পরেই পাওয়া গেল একটী চেনা লোককে।—সে অশোক। সরকারী কাজে তার বাবা কয়েক বছর আমাদের ওই পূর্ব্ব-বাংলার সহরটাতে ছিলেন; এবং আমাদের পাশের বাড়ীতেই ছিলেন। অশোক পড়ত আমার দুটো ক্লাস ওপরে;—কিন্তু তাতে আমাদের অবাধ মেলামেশার কোনো দিন অসুবিধা হয় নি। তার বাবা ভগবতীবাবু তখন পেন্‌সন্‌ নিয়ে কলকাতায় ছিলেন; আর অশোক তখন হাই-কোর্টে যাওয়া-আসা করছিল,—অদূর ভবিষ্যতে মুন্সেফ হবার আশায়।

অশোকের সাথে দেখা হতেই, সে আমায় বাড়ী নিয়ে গিয়ে, তার মা ও বাবার সামনে হাজির করলে।—এমন কি, সে ছেড়ে দেওয়ার সময় বার-বার আফশোষ করলে যে, তার স্ত্রী এখন বাপের বাড়ীতে,—নইলে সে শুভ কার্য্যটুকুও বাদ যেত না। পরে অবশ্য সে কর্ম্মটুকু যত শীঘ্র সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তার পূর্ব্বেই তার মা ও বাবা আমাকে একেবারে আপনার করে নিয়েছিলেন। আমার এই বিদেশে অসহায়,—কেন না আমি অবিবাহিত,—জীবনটা তাঁদের যেমনি উদ্রেক করেছিল দয়া, তেমনি উদ্রেক করেছিল স্নেহ। ও-দুটি জিনিস দিয়ে তাঁরা একেবারে আমায় টেনে নিলেন।

ভগবতী বাবুর পরিবারে বছর-দুই আগে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল;—সে যখন তাঁর মেয়ে অণিমা বিধবা হয়। অণিমাকে আমরা দেখেছিলুম, বছর দশ-বারোর একটি চঞ্চল, সুন্দর, বালিকা,—চঞ্চল কিন্তু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি। আর সেদিন তাকে দেখলুম, বিশ বছরের এক শোক-তপ্ত বিধবা,—যার স্ফুটন্ত যৌবন বিষাদের বাতাসে ঝরে পড়ে গেছে।

অশোকের কাছে শুনলুম, অণিমা যখন স্বামী-হারা হয়ে ফিরে আসে, তখন ভগবতী বাবু তাকে আবার বিয়ে দেবার জন্য ইচ্ছা করছিলেন। তিনি বিয়ে প্রায় ঠিক করেছিলেন-ও। সমস্ত যখন প্রায় ঠিক, তখন তিনি অণিমাকে ডাকালেন তার মতামত শুনতে। নত-শিরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, সে অশ্রু-টল-টল আঁখি দুটি তুলে শুধু দৃঢ় স্বরে বললে, 'না'। সে 'না' ফিরলো না। ভগবতী বাবু হার মান্‌লেন। তার পর থেকে অণিমা তার বাবার কাছে সংস্কৃত শিখতে সুরু করে দিলে। এখন তার কাজ হচ্ছে, দুপুরে ও রাত্রে বাবাকে গীতা ও রামায়ণ পড়ে শোনানো, আর দিনের বাকী সময়টুকু ইংরাজি শেখায় ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে কাটানো।

অণিমার সাথে আমার কথাবার্ত্তা চল্‌ত মন্দ নয়; কিন্তু তা একটু ঘনিয়ে উঠ্‌ল এমনি করে।—

অশোকের ঘরে বসে আমাদের তর্ক চল্‌ছিল।—এমনি সময়ে সে ঘরে ঢুকল। একটু চমকিত হয়ে সে অশোককে বল্‌লে, "আর একটা নতুন কিছু বই দাও, দাদা।"

"কি বই দোব, বল। আচ্ছা, এই যে প্রফেসর আছে,—বল ত একখানা বই-এর নাম।"

আমি বেশ একটু লজ্জিত হলুম।

"সত্যি বলছি হে, কি বই পড়তে বলব, বল।"

"তুমিই একটা ঠিক কর।"

"আমি পারলে আর তোমায় বলছি কেন?"

বেচারী অণিমা দেখছিল, মাঝখান থেকে তার কথাটা মাঠে মারা যাচ্ছে।

"যা হোক্‌, ভালো দেখে একখানা বই ঠিক করে দিন আপনারা" বলে সে আমার দিকে তাকাল।

অগত্যা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হল, "আচ্ছা, আপনি Pilgrim's Progress পড়েছেন ?"

"ওকে-ও আপনি !" বলে অশোক সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি অপ্রতিভ হয়ে 'হাঁ' 'না' করতে লাগলুম। এমন সময় অণিমা বল্লে, "না, Pilgrim's Progress আমি পড়ি নি।"

"তা' হলে ওটা পড়ুন না ? কি বল অশোক ?"

"নিশ্চয়ই" ! বলে অশোক বললে, "সাধে কি বলেছিলুম হে প্রফেসর ! ওটা তোমারই জুরিসডিক্শন্।"

তার পর থেকে অণিমা একেবারে আমাকেই ধরে বসত। সাহিত্যে আমার যতই রুচি থাকুক, সদুপদেশ-ভরা সাহিত্যের খোঁজ আমি কমই রাখতুম। In Imitation of Christ ও Bibleএর গুটিকয় Psalm ছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের আর কোনো গুরু-গম্ভীর কথাই আমায় বড় বেশী আনন্দ দিতে পারে নি। কাজেই অল্প ক'দিন যেতে না যেতেই আমায় মুস্কিলে পড়তে হল। নিত্য-নতুন ধর্ম্ম-কাহিনীর খোঁজ না পেয়ে, আমি একদিন অণিমাকে Les Miserablesখানা পড়তে বললুম। সে শুনেছিল, ওখানা উপন্যাস। উপন্যাস সে পড়তে চায় না জেনে আমি বললুম, "দেখ, নাটক বা নবেলের মধ্যে যে শুধুই কতকগুলো অকেজো গল্প থাকে, তা নয়। অনেক নবেল আছে, যদিও সেগুলো প্রধানতঃ নবেলই, তবু নীতি-কথায়ও তাদের জুড়ি মেলে না। Les Miserables তেমনি একখানা বই ;—একটা সুন্দর অথচ বৃহৎ আদর্শের বাণী ওর বুক ছাপিয়ে উঠেছে।"

অনেক কথায় সে নবেল পড়তে স্বীকার হল। Les Miserables নিয়ে সেদিন সে প্রস্থান করলে। আজ পর্য্যন্ত এমন লোক আমার চোখে পড়ে নি—সংক্ষিপ্ত অনুবাদের ভিতর দিয়েও ফরাসী সাহিত্যের অমর উপন্যাস-খানি যাকে মাতিয়ে না দিয়েছে। নবেল পাঠে অণিমার যতই না বিতৃষ্ণা থাক, তাকে স্বীকার করতেই হল, ভারি কথার বহরে যে সব নীতি-কথা লোক-সমাজে আদর পায়, তাদের চেয়ে এই নবেলখানার সুর কোনো নীচু সপ্তকে বাঁধা নয়। এবার তাকে আর একখানা বই দিলুম,—বোধ হয় Quo Vadis.

এই রূপে ধীরে-ধীরে কখন্‌যে সে নবেলের একজন ভক্ত হয়ে দাঁড়াল, তা আমার-ও নজরে পড়ে নি, তার-ও খেয়াল হয় নি। তখন নবেল আর বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ রইল না,—কোনো একটা মরালের খোঁজে সে নবেলের দিকে ধেয়ে যেত না। অতীতের ও বর্ত্তমানের, দেশী ও বিদেশী সমস্ত নবেলই তখন অণিমা একমনে পড়তে সুরু করলে।

ইতিমধ্যে আমারও কখন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিকালের দিকে আমি প্রায় প্রতিদিনই অশোকদের বাড়ীতে অণিমার পড়ার অজুহাতে গিয়ে হাজির হতুম। নবেল পড়াটা কঠিন নয় ; কিন্তু বিদেশী ও স্বদেশী কবিদের কবিতা বোঝা সব সময় সহজ নয়। তাই অণিমাকে আমার বিকালের দিকে একটু Shakespeare, Shelley Browning, ও রবীন্দ্রনাথ আদির চর্চ্চায় সাহায্য করতে হ'ত। তাই, আমার বিকালবেলা তাদের বাড়ীতে না গেলেই চলত না। আমাদের আলোচনায় মাঝে মাঝে অশোক এসে জুটে পড়ত,—তাতে তর্কটার জোর বাধত বেশী। আমার সহযোগী বন্ধুর দল বলত যে, বিকালের দিকে না সিনেমায়, না ময়দানে, কোথাও আমাকে আর দেখা যায় না।

একদিন ভগবতীবাবু আমাদের বল্লেন, "দেখ, তোমরা কেবল বিদেশের রত্নই খুঁজলে। আমাদের দেশী সংস্কৃত জিনিসগুলো যাচাই করে দেখলে হত না ?"

কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যে আমার কম অনুরাগ ছিল না। আমি বললুম, "তা ঠিক। কিন্তু অণিমা ত শুনেছি গীতা রামায়ণ আদি অনেক সংস্কৃত বই-ই পড়েছে।"

"তা' ছাড়াও ত ঢের সংস্কৃত বই আছে—সেগুলো তোমরা ওকে পড়তে সাহায্য করো না ?"

"সংস্কৃত সাহিত্যের ধর্ম্ম ও নীতি-কথার আড়ম্বর আমি পড়ি নে,—পড়্‌তে আমার ভালো লাগে না। একমাত্র কালিদাসের মত জন-কয় কবি আমার পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পেরেছে। তাঁদের কিছু-কিছু পড়তে আমি সাহায্য করতে পারি।"

ভগবতীবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা, কালিদাস তুমি পড়াতে চাও পড়াও। আমি দেখি, দুপুরে আরগুলো নিয়ে ওকে পড়াতে পারি কি না।"

সেদিন থেকে সুরু হল সংস্কৃতের পালা।

ইতিমধ্যে একদিন অশোকের স্ত্রী সরোজ এল। তার বয়স বছর আঠারো। অনেক আবেদন, নিবেদন, ও সলজ্জ হাসির ভিতর দিয়ে তার সাথে-ও আমার পরিচয় জমে উঠ্‌ল। বিকালে গৃহকর্ম্মের অন্তরালে সময় পেলেই সে এসে আমাদের সাথে জুটত। সে সাহিত্যালোচনায় বড় বেশী যে রসদ যোগাত তা নয়; তবে সে থাক্‌লে, রহস্যালাপে, আলোচনাটি কালেজি হত না,—বেশ একটু মধুর রসে ভিজে উঠ্‌ত। আমার পঁচিশ বছরের অবিবাহিত জীবনটার পিছনে যে রোমান্স কোথায় আছে, তা খুঁজে বের করতে সে যতই উদ্‌গ্রীব হত, আমি ততই তাকে বিঁধে মারতুম হাসির রঙ্গে। মোটের উপর, সন্ধ্যাগুলো রাঙা হয়ে উঠ্‌ত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অণিমা শকুন্তলা পড়ছিল। আমরা দুজন ছাড়া সে ঘরে আর কেউ ছিল না। পঞ্চমাঙ্ক পড়া হচ্ছিল; আমি হঠাৎ বলে ফেল্‌লুম, "আমার মনে হয়, মানুষের স্বভাবই এই—প্রিয়জনকে দু'দিন না দেখলেই ভুলতে চাওয়া, আবার সে ভুলের জন্য কেঁদে খুন হওয়া।"

অণিমার সাথে যে মানুষের জীবনের এই দিকটা নিয়ে তর্ক চলে না, তা আমি জান্‌তুম; আর এই কথাটি যে সাক্ষাৎ-সূত্রে শকুন্তলার আখ্যায়িকার সাথে জড়িত নয়, তাও আমি স্বীকার করি। কিন্তু মানব মন যে অদেখা অলি-গলির ভিতর দিয়ে যাতায়াত করছে, লজিক্‌ তার সমস্ত বিধি নিয়ম নিয়েও তার সন্ধান পায় না। কাজেই, কথাটা ফস্‌ করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

অণিমা একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "এই মানুষের স্বভাব?"

আমি কথা ফিরাতে পারলুম না।—"আমার ত সেই রূপই মনে হয়।"

কিছুক্ষণ মুখ নুইয়ে থেকে সে ধীরে-ধীরে বললে, "হয় ত তাই। আমার নিজের-ও একদিন মনে হয়েছিল যে, হৃদয়ের ভাবের ধারাটা এক মুখেই চলে। আজ মনে হচ্ছে, সে চলে দুদিপাকে।"

আমি জিজ্ঞাসু ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।—"আমার স্বামীর ফটোখানি আমি আগে-আগে স্নানের পর প্রতিদিনই দেখতুম। সেদিন হঠাৎ একটা কথা আমায় সে ফটোখানির বিষয়ে সচেতন করে তুললে। তোরঙ্গটা খুলতেই দেখলুম,—ক'দিন ধরে কিসের তাড়ায় আমার তা দেখবার আগ্রহটা কমে এসেছিল,—ফটোখানি অনেকগুলো নবেলের তলায় ঠাঁই নিয়েছে।"

অণিমার সেদিনকার অকপট কথাগুলো আমাকে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র করে রাখল। সেই প্রথমবার আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার দুর্ভাগ্যের ভারটাকে একবার অনুভব্‌ করতে চাইলুম। একজন হিন্দু নারী, বিধবা;—তার সম্মুখে রয়েছে তার প্রচণ্ড যৌবন,—বিশাল প্রতপ্ত মরুভূমির মত;—তার চোখের সামনে জাগছে তারই বয়স্কা শত-শত রমণীর জীবনের বর্ণোজ্জ্বল ছবিটা,—ভগবান যার ওপর কোনো অভিশাপের মসী-রেখাই টেনে দেন নি। আর সে? তার জীবনে নামিয়া আসিয়াছে, এক নিষ্ঠুর অকাল-সন্ধ্যা!

বড় একটা আদর্শ মানুষকে টানতে পারে, আমি মানি; কিন্তু সে টান চিরদিন বজায় থাকে না। সে আদর্শকে সে দেখে সম্ভ্রমের চোখে,—শ্রদ্ধায় অবনত শিরে। কিন্তু প্রতিদিনকার তুচ্ছতম জিনিসেরই প্রতি মানুষের আসল টান। তাকে দেখে সে ভালোবাসার চোখে,—বিমুগ্ধের দৃষ্টিতে। বড়কে মানুষ গ্রহণ করে বুদ্ধি দিয়ে,—আর ছোটকে প্রাণ দিয়ে।

পরদিন থেকে আমি আমার সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিলুম, তার অশান্ত চিত্তে একটু শান্তি সেচনের আশায়। আমার সমস্ত চপলতা, সমস্ত হাসি-রঙ্গ হঠাৎ উপ্‌ছে গেল; তার স্থলে অণিমা পেলে একটা করুণ ক্রন্দন,—একটু আন্তরিক সহমর্ম্মিতা। আমি দেখেছি, শোকাচ্ছন্ন হৃদয় দরদী প্রাণকে চিনে ফেলে,—সে যতই মৌন হোক্‌ না। আমাকে অণিমা তেমনি গ্রহণ করলে। সরোজ বার-বার নাড়া দিয়ে দেখলে আমার হাসির উৎসের মুখে কোথায় পাথর-চাপা পড়েছে; অশোক বার-বার ঠোকর দিয়ে দেখলে, তা শতগুণ করে ফিরিয়ে দিতে আমার আর আগ্রহ নেই। এমন একটা জাগ্রত বেদনাতুর হৃদয়কে দেখেও যে তারা দেখত না, এতে আমি যেমনি হতুম দুঃখিত, তেমনি হতুম রুষ্ট। একটি প্রাণের কথা ভাবতে বসে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আর দুটি প্রাণ তখনো তরুণ, তখনো সবুজ।

একদিন হঠাৎ আমার হাতে একখানা ফটো দিয়ে অণিমা বললে, "এই দেখুন, আমার স্বামীর ফটো।"

আমি দেখছিলুম, বছর বাইশের একটি তরুণ যুবক,—বেতের চেয়ারে বসে, একটা পায়ের ওপর একটা পা তুলে;

পাশেই একগাছি ছড়ি ও হাতে একখানা বই। তার গায়ে ঢোলা হাতার পাঞ্জাবী ও একখানা শাদা চাদর। বেশ দেখতে। আমি আনমনে দেখছিলুম, এমন সময় অণিমা বললে, "দেখুন ত, এরূপ কোনো চেহারা আপনার মনে আসে কি না?"

আমি আশ্চর্য্য হলেম, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারলুম না।

"এঁর পোষাক-পরিচ্ছদের কোনো কায়দার সাথে ও কি আপনাদের কায়দা মেলে না?"

আমি লক্ষ্য করে বললুম, "একমাত্র চাদর জড়ানোর ধরণটি, আর পাঞ্জাবী ও চশমা—এ তিনটির সাথে একটু মিল দেখা যায়।"

অণিমা অন্য দিকে চোখ রেখেই বললে, "মানুষ তার নিজের চেহারা ঠিক্ বুঝে উঠতে পারে না। আমার নিজের ফটো দেখলে বোধ হয় আমিও নিজেকে চিনতে পারতুম না।"

আমি তার মুখের দিকে তাকালুম; কিন্তু সে মুখ ফিরাল না,—দেখাল, যেন এ একটা অতি সাধারণ মন্তব্য। মাথাটা নুইয়ে আমি কিছুক্ষণ তার অর্থ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করলুম। কিছুই ঠিক্ পাওয়া গেল না। চোখ তুলতেই দেখলুম, সে আমার মুখের উপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিটি মেলে বসে আছে।

পরদিন সমস্তটা দিন আমি ভাবলুম। বিকালের দিকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলুম, "আমার শরীর ভালো নেই; আজ যেতে পারব না।" সন্ধ্যা যেতে না যেতেই অশোক এসে হাজির;—"কি হে, ব্যাপার কি? কি অসুখটা বল দেখি, শুনি; বাড়ী ফিরতেই ত অণি বললে তোমার অসুখ।"

"না, তেমন কিছু নয়। এই কেমন একটু জ্বর জ্বর।"

"তা স্নান-ও ত করেছ; আর তোমার চাকরই ত অণির কাছে স্বীকার করেছে, তুমি আজ কলেজে গিয়েছিলে।"

"দুপুরের দিকেই শরীরটে খারাপ বোধ হল। প্রথম দুটো ঘণ্টামাত্র আজ ক্লাস ছিল। তাতে কোনো কষ্ট হয় নি।"

অশোক আর বেশী তাড়া দিলে না। আমি বাচলুম। ঘণ্টা-খানেক গল্প করে সে সকাল-সকাল বিদায় নিলে। বলে গেল, কাল কেমন থাকি যেন অতি অবশ্য জানাই। অথচ, সত্য-সত্যই সে যখন আমাকে না-যাওয়ার জন্য বেশী তাড়া দিল না, তখন বুকের ভিতর কোন জায়গায় যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম।

পরদিনই আমি অশোকদের বাসায় আবার গেলুম। প্রথম-প্রথম কেমন যেন একটু দ্বিধা নিয়ে যেতুম; কিন্তু আলাপের ভিতর দিয়ে তা শীঘ্রই ধুয়ে-মুছে গেল।

পল্লী আষাঢ়। সেদিনকার কথা আর আমি ভুলব না। ঘটনাক্রমে কালিদাসের মেঘদূত নিয়েই তখন আমাদের আলোচনা চল্‌ছিল। সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে বাদল নামল। ঘরের ভিতর কতক্ষণ বন্ধ থেকে ছট্‌ফট্ করে, আমি শেষটায় বেরিয়ে পড়লুম।

অণিমাদের বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না। অশোক ও ভগবতী বাবু দুজনেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অণিমা আমাকে ভিজে-ভিজে ঘরে ঢুকতে দেখে, চমকিত ও হৃষ্ট হয়ে উঠল। আমি স্পষ্ট দেখলুম, তার চোখের কোণে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। আমার নিজের চোখ-ও বোধ হয় তাতে সাড়া দিয়েছিল।

"এক পেয়ালা চা আনছি এখনি" বলে সে উঠে দাঁড়াল। আমি বাধা দিয়ে বলতে গেলুম, চা আমি খেয়ে এসেছি,—তবু সে চলে গেল।

মিনিট দশ পরে সে যখন চা নিয়ে ঘরে ঢুকল, তখন আমি বেশ দেখতে পেলুম, তার সমস্ত মুখ আগুনের আভায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এই অনাবশ্যক কষ্টের জন্য আমার কেমন একটু লজ্জা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনটা বেশ একটু আনন্দে দোলা খেলে।

চায়ের পেয়ালা শেষ করে আমরা মেঘদূত নিয়ে বসলুম। আমরা পড়ছিলুম, বিরহ-বিধুর অন্তরের সে আকুল ক্রন্দন,—সে উজ্জয়িনীর বাতায়নবর্ত্তিনী পুরাঙ্গনাদের কথা,—সে অলকাপুরীর বেদনা-মথিত হৃদয়ের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস! আমার মানস-চক্ষে ফুটে উঠ্‌ছিল, সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই প্রসাধন,—সেই বিলাস-রচনা! আমরা দেখছিলুম, সেই 'কুরুবকের মালা', সেই বঙ্কিম-চাহনি, সেই সলীল-গতি! মন্দাক্রান্তার তালে-তালে হৃদয় নেচে উঠ্‌ছিল। দুনিয়ার বুকে থেকে সমস্ত মুছে গিয়ে শুধু ফুটে উঠ্‌ছিল সেই অনন্ত কালের প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি।—তাদের প্রতীক্ষার সেই দুরু-দুরু হিয়া,—তাদের মিলনের সেই থর-থরি দেহলতা,—তাদের বিরহের সেই সেই টল্-টল্ আঁখি!

পড়তে-পড়তে কি একটা অস্পষ্ট অভাবে আমার বুক ছাপিয়ে উঠ্‌ছিল।—আমার ব্যথাতুর স্বর কাঁদছে,—আমার কম্পমান হাত শিউরে উঠছে,—আমার ঝাপসা চোখে সবই অস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে। ওগো সেদিনকার মেঘভার! সেদিনকার বারি-ঝর-ঝর সঙ্গীত! সেদিনকার নিবিড় সন্ধ্যা! কেন তোমরা আমায় টেনেছিলে সেদিন?—

আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

"থামো" বলে কে একটা আকুল সুরে আমার মুখের কাছ থেকে বইখানাকে টান্ মেরে ফেলে দিয়ে হাতখানা চেপে ধরলে। আমার মুখ,—আমার সেই কোন্ অদেখা দুঃখের ব্যথায় বিধুর মুখ তুলে আমি দেখলুম, অণিমা আমার হাতখানাকে সজোরে ধরেছে! তার সমস্ত শরীর আমার হাতখানার উপর ঝুঁকে পড়েছে,—তার সমস্ত দেহ কাঁপছে,—চোখ দুটি অশ্রু-সায়রে পদ্মের মত ফুটে উঠছে!

"শোন, আজকের সন্ধ্যায় তোমাকে একটা কথা না বলেই আমি সোয়াস্তি পাচ্ছি না,—খুন করে ফেললেও আর কোনো দিন একে আবিষ্কার করতে পারবে না,—কোথা দিয়ে তুমি আমার মনের গোপন-বেদীটি জুড়ে বসেছ। বোধ হয়, তুমি অনেকটা আমার স্বামীর মতই দেখতে বলে।"

আজ আমি ঠিক বলতে পারি, তার স্বামীর চেহারার সাথে আমার চেহারার কোথাও মিল নেই,—এক কণাও না। কিন্তু আমার তখন এ কথা বিচার করার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। অপরিসীম বিস্ময়ে আমি অবাক্ হয়ে গেলুম,—একবারে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম। আমার সম্বিৎ যখন ফিরে এল, তখন আমি শুধু ছোট একটি কথা বলতে পারলুম, "সে কি?"

"হাঁ, তাই," বলে সে দৃঢ় স্বরে কহিতে লাগল, "একদিন অসহ্য ঔৎসুক্যে ও কথাটারই ইঙ্গিত করেছিলুম; কিন্তু সেদিনই দেখেছিলুম, তোমার দুর্নিবার দ্বিধা। এ কথাটাকে আমি সে দিন থেকে শাসিয়ে, তাড়িয়ে, ঝেঁটিয়ে মনের কোণ থেকে ঝেড়ে-মুছে ফেলতে চেয়েছিলুম। কিন্তু, দেখেছি যে কথা ভুলতে চাওয়া যায়, সে কথা ভোলাই সবচেয়ে অসম্ভব। তার বদলে নিদারুণ বিধি আমার মন থেকে ধীরে-ধীরে সরিয়ে নিয়ে গেছে তারই স্মৃতির সে গন্ধটুকু,—যেটুকুকে বুকে করে আমি আমার দুস্তর জীবনটাকেও সগর্ব্বে পাড়ি দিতে বুক বেঁধেছিলুম।"

আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। আমি যদি এর নিরপেক্ষ শ্রোতা হতুম, হয় ত গম্ভীর ভাবে বলতে পারতুম, 'খুবই স্বাভাবিক,' হয় ত মনে-মনে আমার তখনকার সৌভাগ্যকে ঈর্ষাও করতুম। আর আমি যদি বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতুম, হয় ত এ কাহিনী শুনে বেশ উল্লসিত হতুম,—নেচে উঠতুম,—আমার এতদিনের বন্ধ হৃদয়-কপাট খুলে দিতুম। কিন্তু আমি তখন ছিলুম স্তম্ভিত,—ইংরেজিতে যাকে বলে stunned.

অণিমা আবার সুরু করলে, "তুমি ভাবছ, কি বলছে এ? দেবীর আবার মানবতার ওপর লোভ কেন?—কিন্তু জেনো, আমি তোমার কাছে কোনো কিছুর প্রার্থী নই,—কোনো কিছু চেয়ে আমি তোমায় বিব্রত করব না,—শুধু আজকের এই ক্ষণিকের জন্য চাই এইটুকু,—অনন্ত-জীবন যার স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রাখব,—শুধু এইটুকু,—"

—ধীরে ধীরে একটু-একটু করে আমার হাতখানাকে সে তুলে নিলে,—আমি কোনো বাধা দিলুম না। তার পর অল্পে-অল্পে নুয়ে পড়ে, অতি কোমল অঙ্গুলিতে একটির পর একটি করে আমার পাঁচটি আঙ্গুল তুলে নিয়ে, অতি আদরের, অতি সঙ্কোচের, অতি মধুর পুলক-ভরা সুকোমল পরশটুকু বুলিয়ে দিলে। কি ব্যথাতুর, কি মদিরাময়, কি সশঙ্ক, সঙ্কোচ সুন্দর সেই স্পর্শটুকু! মনে হোলো, সে আমার শিরায় নিমেষ মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে। আমার সমস্ত চিন্তা মুহূর্ত্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল,—আমি আপাদ মস্তক জ্বলে উঠ্‌লুম।

"এইটুকু" বলে সে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। খপ করে তার হাতখানা ধরে ফেলে, আমিও দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললুম, "দাঁড়াও।"

মুখ তুলে আমার চোখের উপর দৃষ্টি রেখে সে দাঁড়াল।—

"আমার কথাটাও তবে শুনে যাও। জানা ও অজানা ভাবে আমি তোমার চারিদিকের আবহাওয়াকে ছাড়িয়ে, কবে তার অন্তঃপুরের রাণীকেও যে ভালবেসে ফেলেছি,—সে কথা তেমন করে নজর করার কারণ আজকের আগে আমার ঘটে নি। কিন্তু আজ যদি হঠাৎ তোমার অন্তরের আবরণ খসে পড়ল, তবে আমারই আবরণ শুধু দম্ভ-ভরে অটুট রেখে লাভ কি?"

আমার চোখের অসম্ভব দীপ্তি বোধ হয় তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সে চোখ নামিয়ে নিলে। আমি দেখলুম, আবেশে তার সমস্ত মুখে একটা নিদ্রার স্নিগ্ধ শ্যাম ছায়া ঘনিয়ে উঠ্‌ছে।

আমি হাত ছেড়ে, গলার ওপর একখানা হাত রেখে, ধীরে-ধীরে বললুম, "শুধু চাই, একটা—"

বিদ্যুতের মত সে ত্বরিত-পদে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে গেল। মুখ ফুটে বেরুল শুধু একটা আকুল মিনতি, "না,—না,—না।" আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখ্‌ছিলুম, তার শঙ্কা-জড়িত বেদনা মুখের দীপ্তিকে কণা-মাত্রও নিবাতে পারে নি।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার চেতনা হল। আমি বাড়ী যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামলুম। নাম্‌তেই অশোকের মায়ের সাথে দেখা হল। তিনি বল্লেন, "এত সকালেই চললে আজ?"

আমি অন্যমনস্ক ভাবে শুধু বল্লুম, "হুঁ।"

"অশোক ত আজ জলের জন্য এখনো ফিরলে না। তাই তোমাদের গল্প জমল না বুঝি?"

"বাড়ীতেও একটু তাড়া আছে।"

"একটু সবুর কর, জলটা থামুক।"

"কালকের পড়াটা একটু শক্ত। আজই তৈরী করে রাখতে হবে।"

আর একটু পীড়াপীড়ির পর আমি চলে এলুম।

যদি বলি, সেদিনকার সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমোই নি, তা হলে অল্পই বলা হবে।—আমি বিছানায় শুলুম না পর্য্যন্ত। টেবিলের ওপর ভর দিয়ে, হাত দুটোর ভিতর মাথাটা রেখে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ারে বসে রইলুম। এই মাথাটার ভিতরে হাজার রকমের ভাবনা এসে উঁকি-ঝুঁকি মারলে; তারা সবগুলিই বিদ্রোহী, অসংযত, বিশৃঙ্খল। হঠাৎ একটা ভাবনাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য মাথা তুলতেই নজরে পড়ল, টেবিলের ওপর ব্রাউনিংএর কবিতার বইখানা। আমার শত অবসর ও শত উৎসবের প্রিয় সাথী, ওগো কবি! আজ আমায় লক্ষ ভাবনার নাগপাশ থেকে মুক্তি দাও।

পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ল, The Statue and the Bust.—পড়লুম। একবার, দুবার, তিনবার। হে নিষ্ঠুর কবি! এ কি পরিহাস আমার সাথে? তোমার কবিতামৃত উপছে গিয়ে, চিন্তার কালকূটই কি আমার ভাগ্যে জুটল? নৈরাশ্যে আমি বইখানাকে ছুঁড়ে ফেলে, স্থির হয়ে বস্‌তে চাইলুম। কিন্তু আবার ফিরে কুড়িয়ে নিয়ে, সেই কবিতাটিই পড়লুম। কখন ভোরের আকাশ রাঙা হয়ে উঠছিল, জানি নে,—পাখীর ডাকে আমার চৈতন্য হল। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে, আমি কাল্‌কের-পরা-জামা-গায়েই সাম্‌নের একটা স্কোয়ারে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়লুম। বাসায় ফিরে এসে দেখলুম, গরম জল চাপিয়ে চাকরটা সবিস্ময়ে পথ চেপে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। চ খেতে-খেতে বললুম, "দেখ্‌ আমার শরীরটা আজ ভালো নেই। কাল রাত্রিতে ঘুম হয় নি। কলেজের বেলা হলে এ চিঠিখানা কলেজে দিয়ে আসিস্‌। বলিস্‌, আমি আজ কলেজ যাব না।"

সমস্ত দিন বিছানায় শুয়ে রইলুম। যত কবির যত গল্প উপন্যাস আমার ঘরে ছিল,—একখানা-একখানা করে তুলে নিলুম, আর ফেলে দিলুম। আমার মন বসল না। আবার ব্রাউনিং খুললুম। অন্যান্য কবিতাগুলো একটির পর একটি পড়তে গেলুম; কিন্তু আজ বহুবারের-পড়া সে কবিতা আমি বুঝতে পারলুম না। বিকাল যতই এগুতে লাগল, অতিষ্ঠতা ততই বাড়ল। একটু বেলা পড়তেই, আমি জোর করে একটা স্কোয়ারে হাওয়া খেতে যাওয়া ঠিক করলুম। দুপাক ঘুরতে-না-ঘুরতেই মনে হল, বড় বেশী লোক। কোথায় যাব, আবার ভাবতে লাগলুম। সিনেমায়? বিশ্রী সেই ছেলে-মানুষি রোমান্স। ইডেন গার্ডেনে?—সেখানেও বড় বেশী লোক। ময়দানে?—বড় বেশী দূর এখান থেকে। কোথায় যাওয়া যায়? যে কথাটা সর্ব্বাগ্রে জেগেছিল, তাকেই চেয়েছিলুম এড়াতে। অবশেষে সেইটেই ধীরে-ধীরে এসে উদয় হল। না, কালকের পরে আর আজকে যাওয়া চলে না। কিন্তু·····তেমন abrupt কিছু বলে ঠেকবে না ত অশোক প্রভৃতির কাছে? তার চেয়ে যাওয়া যাক প্রতিদিনের মত। অবিশ্যি যত শীঘ্র পারি উঠে পড়ব।

একেবারে সরা-সর অণিমাদের পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। দেখলুম, অণিমা বই কোলে করে বসে আছে। একটু বিপন্ন হয়ে যতদূর সম্ভব গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বললুম "অশোক কোথা?"

"বাড়ী নেই।"

সে কথা শুনবার আগেই কখন আমি বসে পড়েছিলুম। তখন-তখনই উঠতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকল। আমি একটা জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে রইলুম। অণিমা কিছুই বলল না, বই-এর ওপর চোখ দুটি রেখে চুপ করে বসে রইল।

দু' হাত মাত্র ব্যবধান! তবু আমরা কেউ নড়্লুম না,—কেউ একটি ছোট কথাও বললুম না। দুজনে দুদিকে চেয়ে বসে রইলুম। আমাদের দৃষ্টি পর্য্যন্ত মিলল না। অথচ দুজনেই বুঝলুম, দৃষ্টি আমাদের যতই না পরস্পরকে এড়িয়ে চলুক, হৃদয় আমাদের সমতালে নাচছে,—দুজনেরই অস্ফুট বেদনা একই ভাষাহীন সুরে গাঁথা। কথা কইলুম না,—তার নিঃশ্বাসটুকুর পর্য্যন্ত আঘ্রাণ পেলুম না,—তবু আমার হৃদয় অপার আনন্দে ভরে উঠ্‌ল। মনে হল, এই ভালো, এই ভালো।

কোথা দিয়ে বিকাল নিঃশেষ হয়েছিল দেখি নি। সন্ধ্যার আঁধার জমে উঠ্‌ছিল। পূবের একটা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরটাকে একটু আলোকিত করে তুলল। তবু আমাদের হুঁশ হল না। বিকালের বেড়ানোর পালা সেরে ফিরতে, হঠাৎ ভগবতী বাবুর গলা শোনা গেল, "তাই ত রে, এ ঘরটাতে আজ যে এখনো আলো দেওয়া হয় নি।"

দ্রুতপদে অণিমা ঘর ছেড়ে বাহির হয়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তেই ভগবতী বাবুর ডাক শোনা গেল, "কিরে, আজ যে ঘরে আলো দিস্ নি? পড়ছিস্ নে যে? নীরেন আসে নি বুঝি?"

"এখনই আলো নিয়ে আসছি, বাবা," বলে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালাতে বেরিয়ে গেল। সে আলো নিয়ে ঘরে ফিরবার একটু পরেই, ভগবতী বাবু-ও ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, "হ্যাঁলো, আজ যে আমায় দুপুরে গীতা পড়ে শোনালি নে?—এই যে, নীরেন! কখন এলে?"

আমি হাসি টেনে বললুম, "এই, একমিনিট-ও হয় নি।"

আমার হাসি তাঁর চোখে ধরা পড়ে গেল। "সে কি! তোমার মুখ বড় শুক্‌নো-শুক্‌নো দেখাচ্ছে যে? কোনো অসুখ-বিসুখ করে নি ত?"

"সে কথা বল্‌তেই ত আজ এসেছি। আমার শরীরটা কল্‌কাতা এসে অবধিই ভালো নেই,—রাত্রিতে-রাত্রিতে একটু-একটু জ্বর-ও হয়। ডাক্তার বললেন, একটু চেঞ্জে যেতে। তাই এসেছি সবার সাথে দেখা করতে।"

উৎকণ্ঠিতচিত্তে বৃদ্ধ আমায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি জানালুম, কালই যাচ্ছি, আপাততঃ একমাসের ছুটীতে পুরী। অণিমা আমার মুখের দিকে ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাল। আমি শুধু শাদা চোখ দুটি দিয়ে অনায়াস দৃষ্টিতে তার জবাব দিলুম। একটু পরেই আমি বললুম, "তা হলে এখন আমি উঠি। কালই যাব, সমস্ত গুছিয়ে নিতে হবে।"

অণিমা বল্লে, "কিন্তু,দাদার সাথে দেখা করে গেলে না?"

"কাল তাকে আমার ওখানে যেতে বলো," বলে আমি বাড়ীর আর সবার সাথে দেখা করতে গেলুম। অশোকের মা বললেন, "কাল দুপুরের দিকে একবার না হয় এসো, বাবা।" আমি দেখলুম, অণিমার চোখে মিনতি ফুটে উঠেছে।

"সময় পেলে আসব," বলে আমি নমস্কার করে বিদায় নিলুম। তাঁরা দুয়ার পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে আমায় বিদায় দিলেন। রাস্তার একটা গ্যাস-পোষ্টের অস্পষ্ট আলোকে-ও আমি দেখতে পেলুম, অণিমার চোখ দুটি তেমনি আমার ওপর তখনো বদ্ধ রয়েছে। আমি ঠিক্ জানি, সে চোখে যেমনি ছিল বেদনা, তেমনি ছিল তাকে জয় করবার একটা দৃঢ় সঙ্কল্প। একটু পরেই যে চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিল, হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে বান ডেকেছিল, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস; কেন না আমার পুরুষের দৃঢ় হৃদয়টাই তখন টলে গলে যাচ্ছিল।

কলেজে বলে-কয়ে একমাসের ছুটী নিলুম। সন্ধ্যা-বেলা পুরী এক্সপ্রেস্ ধরবার জন্যে যখন গাড়ীতে অশোকদের বাসা পেরিয়ে যাচ্ছিলুম, তখন জানি নে, কেমন করে আমার বুভুক্ষু চোখ দুটোকে একেবারে দোতলার বারান্দায় চালিয়ে দিলুম;—জানি নে কেন, গাড়ী থেকে মুখ বার করে গাড়োয়ানকে তাড়াতাড়ি চালাবার হুকুম দিয়ে, সেই বারান্দার দিকেই একভাবে চেয়ে রইলুম। সে কি সেই ম্লান আঁধারে দণ্ডায়মানা নিভৃত নারীমূর্ত্তির কাছে বিদায় মেগে?—তবে বিকালে একবার সে বাড়ীতে গেলেই ত হ'ত?

একমাসের ছুটী তিনমাসে বাড়িয়েও আর কলকাতায় ফিরলুম না। বাংলার বাহিরে একটা কলেজে আমি চাকুরী নিয়ে চলে গেলুম। কিন্তু শান্তি আমি পেলুম না। সেই পয়লা আষাঢ়ের একটা সন্ধ্যা!—তারই ছায়া আমার পিছনে পিছনে এ ক'বছর ধরে দিবা-নিশি ঘুরেছে। জীবনে আর আমি মেঘদূত ছুঁই নি। আমি হাজার বারের উপর The Statue and the Bust পড়েছি।—কিন্তু, কোনো

কূল-কিনারা পাই নি। আমার জীবনের যত কিছু অনাবশ্যক আনন্দ-উল্লাস ছিল, কবে তা ধীরে-ধীরে ঝরে গেল; আমার বিরস চিন্তাক্লিষ্ট মুখ কত বন্ধুদের ব্যথিত বিরক্ত করে তুলল; আমার অবিবাহিত এ জীবন কত জনের ব্যঙ্গের, সন্দেহের, কৃপার বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

সাত বছরের ভাবনার শেষে মনে হচ্ছে একটা সত্যের খোঁজ আমি পেয়েছি। তাই আমি আজ এ কথা সকলকে জানাতে চাই।—আমার সন্দেহের সমাধান হয়েছে। সেদিনকার ত্যাগের মধ্যে আমার ছিল না কিছু মাত্র দ্বিধা, কিছুমাত্র ভীরুতা, কিছুমাত্র মিথ্যাচার। আমি আজ বুঝেছি, আমি তাকে ছেড়েছি নিবিড়তর করে পাওয়ার জন্য। চিরজীবনের জন্য আমাদের জীবন গাঁথা হলে, হয় ত কবে সংসারের ঘূর্ণী বায়ুতে পড়ে আমরা দুজন দুজনার কাছ থেকে ছিট্‌কে যেতুম; হয় ত তার মন্থনে আমাদের ভাগ্যে উঠত গরল; হয় ত আমাদের এই অদেখা হৃদয়ের বাঁধন হয়ে উঠত ফাঁসির দড়ি।—আজও সেদিনকার শুভ-মুহূর্ত্তটির কথা মনে পড়তেই, আমার আঙ্গুল পাঁচটি গর্ব্বে, সোহাগে, আনন্দে নেচে ওঠে,—আমার সমস্ত বাহু স্ফুরিত হয়, আমার সমস্ত মন একটি অতি মধুর, অতি তীব্র, অথচ অতি সুন্দর আনন্দে ভিজে উঠে। কিন্তু সেই পুণ্যক্ষণের জের টানবার লালসায় যদি আমি বসে থাক্‌তুম, তবে সেই অতি-বাঞ্ছিত, চির-সুকুমার স্পর্শটি হয়ে উঠত তুচ্ছ, মামুলি, মধুহীন।

The Statue and the Bust খুব ভালো। কিন্তু তারও চেয়ে ভালো The Last Ride Together—সেই 'জীবনে যত পূজা হল না সারা'র গান। অলকাপুরীর যক্ষকে আমি জানি নে; হয় ত অভিশাপ-শেষে কুবেরের ধন আগলাতেই তার সময় যেত। কিন্তু শিপ্রার তীরের সেই বেদনাতুর হৃদয় আমার ঢের বেশী প্রিয়, আমার ঢের বেশী আপনার। তাকেই আমি করি প্রণতি।

— বঙ্কিম মুখ তুলে আমাদের দিকে চাইল।

মার্কিন মুলুক

[শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার, এম-এস্‌সি]

দশম পরিচ্ছেদ

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়

"কেয়ুগার নীরে ঢেউয়ের হার,
ঝল্‌মল্ করে নীলিমা তার।
মহীয়সী মাতা মহিমময়ী,
নিজ গৌরবে বাজিছে অই!

(কোরস্)

"জননীর গুণ গাওরে সবে,
মিলিত ললিত কলিত রবে।
তোমারে প্রণমি জননী তুমি,
নমি কর্ণেল পুণ্যভূমি!" *

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবামাত্রই উদ্ধৃত সঙ্গীতের ধ্বনি আগন্তুকের কর্ণে প্রবেশ করে। নিউইয়র্ক প্রদেশের ইথাকা (Ithaca) নগরীর পাহাড়ের চূড়ায় কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়ের পাদদেশে কেয়ুগা (Cayuga) হ্রদের সুনীল জলরাশি। সুইজার্‌ল্যাণ্ডের (Switzerland) রমণীয় দৃশ্যের অনুরূপ এই হ্রদ ও পাহাড়ের সম্মিলন হেতু কর্ণেল আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য সুপরিচিত। যুক্তরাজ্যে হার্ভার্ড, ইয়েল্, কর্ণেল, প্রিন্স্‌টন্, কলাম্বিয়া, সিকাগো, লিলান্‌ষ্টান্‌ফোর্ড্, জন্‌স্ হপ্‌কিন্‌স্ প্রভৃতি কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এইগুলির মধ্যে কর্ণেল কৃষি, চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারিং, পশু-চিকিৎসা ও সৌধশিল্প (Architecture) শিক্ষাদানের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। কৃষি ও পশু-চিকিৎসার কলেজ দুইটী নিউইয়র্ক ষ্টেটের অর্থে পরিচালিত। যুক্তরাজ্যে নিউইয়র্ক প্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা অথ

---

* এই পরিচ্ছেদের সঙ্গীতগুলি শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম্-এ কর্ত্তৃক অনুদিত।

বলে বলীয়ান্। কাজেই কর্ণেলের কৃষি-বিদ্যালয় আমেরিকার কৃষিবিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে।

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রী-পুরুষ উভয় রকমের ছাত্রই প্রবেশ লাভ করিতে পারে। আমি যখন কর্ণেলে ছিলাম, তখন ছাত্রীর সংখ্যা ছিল শতকরা দশটী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজগুলিতে চারি বৎসরে Bachelor এর অর্থাৎ প্রথম ডিগ্রী প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী ইথাকা জলপ্রপাত

চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদিগকে ফ্রেসম্যান্ (Freshman), সফোমোর্ (Sophomore), জুনিয়ার (Junior) ও সিনিয়ার্ (Senior) নামে অভিহিত করা হয়। একজন ছাত্র প্রথমে কাঁচা ফ্রেস্‌ম্যান্ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া, পরে একেবারে পাকা সিনিয়ারে পরিণত হইতে, তাহার কি-কি ক্রমিক উন্নতি হয়, তাহা ছেলেদের নিম্নলিখিত ক্লাশের সঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে :—

ক্লাশের সঙ্গীত।

(১)

প্রথম বরষে কাঁচা ছেলে সব বসিয়া নয়ন নীচু,
মার কোল ছাড়ি সবে আসিয়াছে, জানে না শোনে না কিছু।
দুধের গন্ধ আজো আছে মুখে—কি দুখের কথা হায়!—
কর্ণেল হ'তে তাড়া খেয়ে যাবে!—সে সব কি সহা যায়?

(কোরস্)

এক দুই তিন চার ডাক পড়ে যবে
গুরু মশায়ের সুরে তাল দাও সবে।
পড় দিবানিশি বসি, চোখ যদি জ্বলে
জ্বলুক, এ পাঠাগারে ফাঁকি নাহি চলে।

(২)

দ্বিতীয় বরষে শিখিয়াছে ওরা মোলায়েম
চাল বেশ,
ছেলে মানুষের সে আনাড়িপানা হইয়াছে
এবে শেষ।
ইয়ারের দলে মিশিয়া বেড়ায় সারাটী সহরময়,
মেয়ে ইস্কুলে কিছু ঘন ঘন গতাগতি এবে হয়।

(৩)

তৃতীয় বরষে 'জুনিয়ার' ওরা পাইপের
ধোঁয়া ছাড়ে;
দুই এক ঢোঁক সুরাসহযোগে মগজের
তেজ বাড়ে।
কোথা কোথা চলে ফূর্ত্তি আড্ডা, রাখে
ওরা সব খোঁজ,
সব সময়ের সদ্ব্যবহার করে সাবধানে রোজ।

(৪)

আমরা তো ভাই পাকা মুরুব্বি 'সিনিয়ার্' নাম ধরি,
কখনো কেলাশ—কখনো গেলাশ যখন যা খুসি করি।
থিয়েটারে যাই, বুনিয়াদি চালে হই না কখনো ছোট,
লেখা পড়া সে তো হয়ে এল শেষ—এইবার বাড়ী ছোট।

যে সকল ছাত্র লেখাপড়ায় কোনরূপ মনোযোগ প্রদর্শন

কেয়ুগা হ্রদ ও রেণ্টক পার্ক

ইথাকা হাই স্কুল

করে না, অধিকাংশ পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয় না, তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করা হয়। ঐরূপে বিতাড়িত হওয়াকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চল্‌তি ভাষায় "busted" হওয়া বলে। বিতাড়িত ছাত্রের মনোভাব-জ্ঞাপক একটী সুপ্রচলিত সঙ্গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল। সঙ্গীতে যে ডেভিড্ ফ্লেচারের (David Fletcher) নামের উল্লেখ আছে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ; আর যে ঘণ্টার ধ্বনির কথা আছে, তাহা লাইব্রেরীর চূড়ায় তালমান সহকারে যে ঘণ্টা বাজিতে থাকে, তাহারই মর্ম্মস্পর্শী আহ্বান।

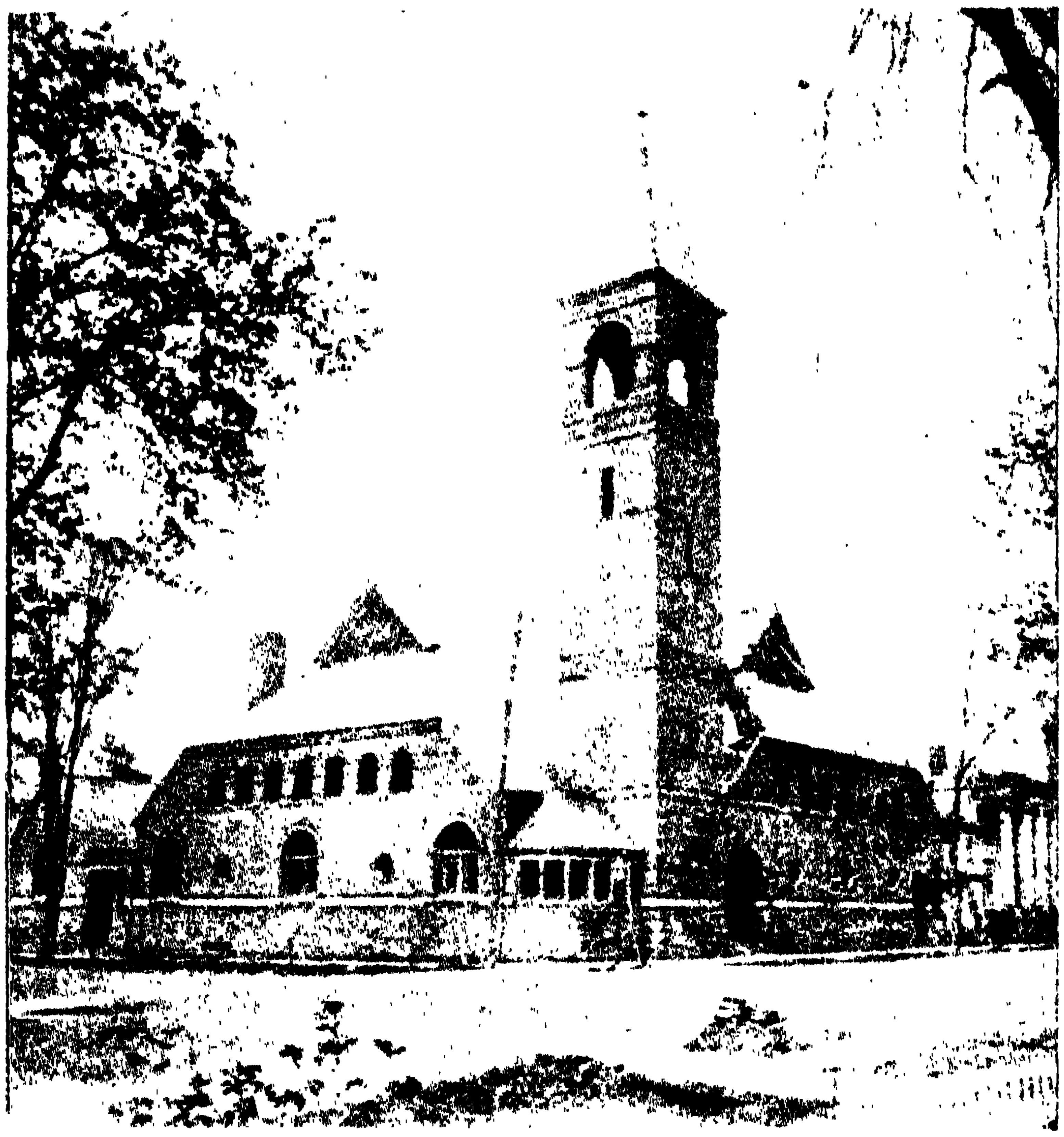

ইথাকার প্রাচীনতম গির্জ্জা

বিতাড়িতের সঙ্গীত (Bustonian chorus)।

আর হেথা আমি থাকিতে পারি না, থাকার আদেশ নাই।
ডেভিড ফ্লেচার্ করেছে প্রচার, বিতাড়িত আমি তাই।
এ হত দগ্ধ পরাণে আজিকে কি দারুণ ব্যথা বাজে!
আর রহিব না এই সুবিশাল জ্ঞান-মন্দির মাঝে।

কত ভালবাসি এই বিদ্যালয়, এই কর্ণেলের ভূমি,
অই শুনা যায় ঘণ্টার ধ্বনি, ডাকে যেন "এস তুমি।"
নিউ ইংলণ্ডে যাব, যেথা পিতা চেয়ে আছে আশা-পথ
কেয়ুগার তীর, গৃহ-প্রাঙ্গণ, হেথা রবে মনোরথ।

আদেশ এসেছে—কঠিন আদেশ, সব ছেড়ে যেতে হবে,
অবুঝ হৃদয় গত সুখস্মৃতি তবু আঁকাড়িয়া রবে।
কর্ণেল ছাড়ি দূরে পড়ি রব, শুনিব না জয়রোল,
কি দারুণ কথা—কেমন সে হবে!—প্রাণ করে উতরোল।

হেথা কর্ত্তারা কর্ত্তরিকাতে ছেলের সংখ্যা ছাঁটে
"ডেভি'র হুকুম বজ্রে কত যে অভাগার মাথা ফাটে।
বিদায়, বিদায়! যাই, নিরুপায়, প্রাণ শুধু আজি কয়,
এমন নিঠুর আদেশ দিল যে তার যেন ভাল হয়!

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কয়টী কলেজ আছে, তাহার তালিকা, এবং আমি যখন কর্ণেলে ছিলাম তখনকার, অর্থাৎ ১৯০৫-৬ সনের ছাত্র-সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলেজ		ছাত্রসংখ্যা
গ্রাজুয়েট বিভাগ	…	২০৯
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কলেজ	…	৬৯৩
আইনের কলেজ	…	২২১
চিকিৎসা বিদ্যালয়	…	৩৬৯
প্রাদেশিক কৃষিবিদ্যালয়	…	২২৩
প্রাদেশিক পশুচিকিৎসা বিদ্যালয়	…	৮৭
সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ	…	৪১৮
মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ	…	১,০৮৬
নিয়মিত ছাত্রের মোট সংখ্যা	…	৩,৩৮৬
১৯০৫ সালের গ্রীষ্মকালের কোর্স (Course)	…	৬১৯
১৯০৫ সালের শীতকালের কৃষি-বিষয়ক সংক্ষিপ্ত কোস	…	১৬৯
মোট ছাত্র সংখ্যা	…	৪,১৭৪

অধ্যাপক, সহকারী-অধ্যাপক, লেক্‌চারার্ (Lecturer), ইন্‌ষ্ট্রাক্‌টার (Instructor), সহকারী কর্ম্মচারী, প্রবাসী লেক্‌চারার্ প্রভৃতির সংখ্যা ছিল মোট ৪৯৯। এতদ্ভিন্ন লাইব্রেরীর জন্য ১৯ জন ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য ২৮ জন কর্ম্মচারীও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ২৭ জন ধর্ম্মযাজক ও রবিবারে ও বিবিধ উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভজনালয়ে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

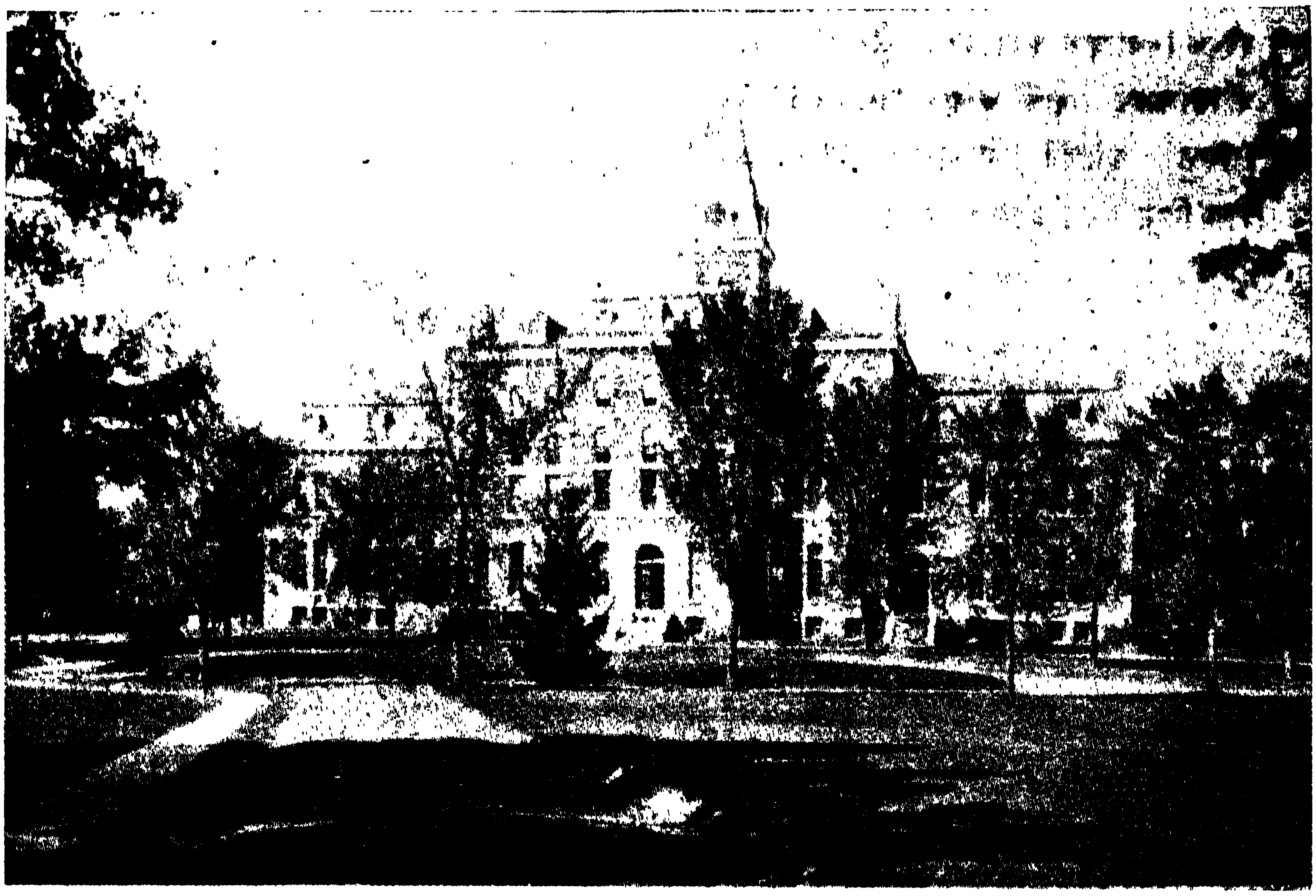

ম্যাক্‌গ্র হল—কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়

বসন্তে সেণ্ট্রাল এভিনিউ—কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র ও শিক্ষক-সংখ্যা বৎসর-বৎসরই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১৯১০-১১ সনে মোট ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৫,৬২৪। নিয়মিত ছাত্রের সংখ্যা ৪,৪১২ ও শিক্ষকের সংখ্যা ৬৫২। যখন আমরা হিসাব করিয়া দেখি যে, প্রত্যেক ৭টী নিয়মিত ছাত্রের জন্য এক-একটি শিক্ষক, আর প্রত্যেক শিক্ষকই নিজ-নিজ বিষয়ে এক-একজন বিশেষবিৎ, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত, এবং বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ গড়িয়া তুলিবার জন্য কিরূপ সুযোগ রহিয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

(৬) ক্ষেত্রজাত শস্য, ক্ষেত্র-পরিচালন (Farm Management) ও উষ্ণপ্রধান দেশের কৃষি।

(৭) কৃষির বিভিন্ন প্রক্রিয়া।

(৮) উদ্ভিদের ক্রমবিবর্তন।

(৯) পরীক্ষামূলক কৃষিতত্ত্ব (Experimental Agronomy)।

(১০) প্রাকৃতিক পদার্থনিচয় পর্য্যবেক্ষণে পুস্তকের সাহায্য বিনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীব, জন্তু, বৃক্ষলতাদির প্রকৃতি ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ (Nature Study)।

কেয়ুগা হ্রদ

এক-একটি বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার বিষয়গুলি অনেক শাখাতে বিভক্ত। যেমন নিম্নলিখিত শাখাগুলি কৃষি-কলেজের অন্তর্ভুক্ত।

(১) কৃষিরসায়ন। এই শাখায় গব্য দ্রব্যের রসায়ন ও কৃষিদ্রব্যজাতের বিশ্লেষণ সম্বন্ধেও শিক্ষাদান করা হয়।

(২) কীট-তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব।

(৩) উদ্ভিদের প্রাণতত্ত্ব।

(৪) উদ্ভিদের রোগনির্ণয়।

(৫) চাষোপযোগী বিভিন্ন মৃত্তিকা।

(১১) ফলফুলের চাষ।

(১২) গোমেষাদি পশুপালন।

(১৩) কুক্কুট-হংস প্রভৃতি পক্ষীপালন।

(১৪) গব্যবিজ্ঞান।

(১৫) কৃষি সংক্রান্ত পূর্ত্তবিদ্যা ও স্থপতিবিজ্ঞান।

(১৬) কৃষিসংক্রান্ত অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব।

(১৭) কৃষিশিল্প।

(১৮) গৃহসংক্রান্ত অর্থনীতি।

ইত্যাদি।

ঐ প্রত্যেকটি শাখার আবার বিভাগ আছে। এক-একজন বিশেষবিৎ পণ্ডিত এক-একটি বিভাগে শিক্ষাদান করেন। ছাত্রগণ নিজের ইচ্ছামত বিভিন্ন বিভাগ মনোনীত করিয়া, ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট পড়িয়া, যে কোন বিভাগে পারদর্শী হইতে পারে। কথাটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। কীটতত্ত্ব শিক্ষার জন্য বিংশতিটি বিভিন্ন বিভাগের ক্লাশ আছে। ঐ সকল ক্লাশে কীট-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিংশতিটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলফুলের চাষ সম্বন্ধে চতুর্দ্দশটি বিভাগ আছে। কীটতত্ত্ব ও ফলফুলের চাষ সম্বন্ধে যতগুলি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার সকলগুলিতেই ছাত্রেরা যোগদান করিতে বাধ্য নহে। যাহার যে-যে বিভাগে ইচ্ছা, সে সেই-সেই বিভাগে যোগদান করিয়া থাকে। তবে যাহারা কীটতত্ত্ব বা ফলফুলের চাষ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইতে চাহে, তাহাদের কীটতত্ত্ব বা ফল-ফুলের চাষ সম্পর্কীয় সবগুলি বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া সবগুলি বিষয়ই আয়ত্ত করিতে হইবে। ফলফুলের চাষ সম্বন্ধে যে চতুর্দ্দশটি বিভাগ আছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেইগুলি নিম্নে বিবৃত হইল :—

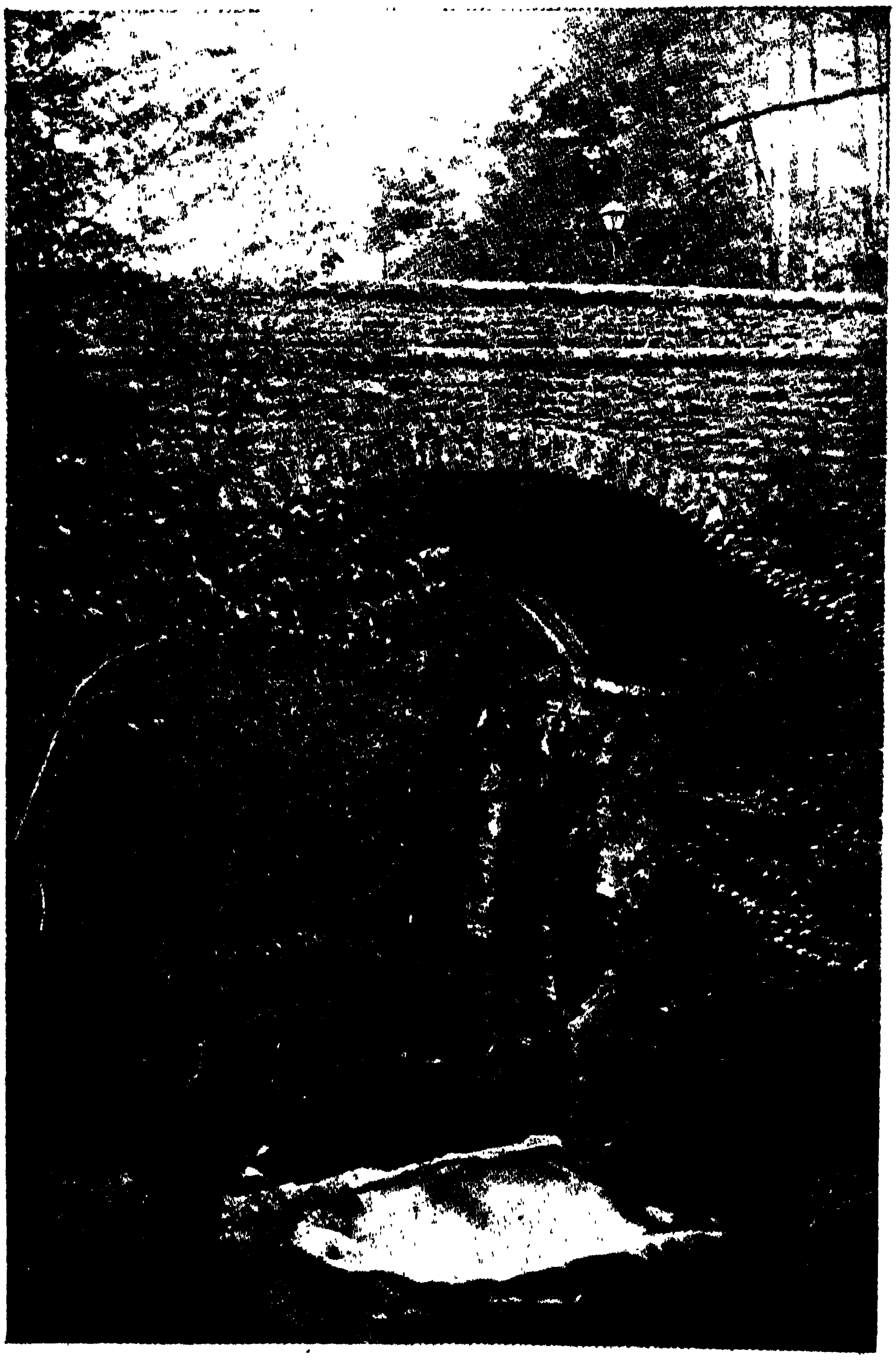

কাস্কাডিলা হ্রদের উপরিস্থ সেতু

(১) ও (২) ফলের চাষ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা। বীজ ও কলম হইতে ও অন্যান্য উপায়ে কি প্রকারে বিভিন্ন রকমের ফলের গাছ উৎপন্ন হয়, ঐ সকল গাছের প্রথম অবস্থায় কি-কি যত্ন দরকার, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ক্লাশ আছে। (৩) ফলের চাষ সম্বন্ধে হাতে-হেতেরে শিক্ষা, অর্থাৎ কত হাত দূরে-দূরে চারা গাছ রোপণ করিতে হয়, কি-কি সার ব্যবহার করিতে হয়, কি প্রকারে ফল বাছাই করিয়া প্যাক্ করিতে হয়, ইত্যাদি।

(৪) পোকা নিবারণের জন্য বৃক্ষে ঔষধ প্রয়োগ।

(৫) বৃক্ষাবাস (Green house) নির্ম্মাণ ও পরিচালন।

(৬) শাক সব্জীর চাষ।

(৭) বৃক্ষাবাস সম্বন্ধে হাতে-হেতেরে শিক্ষা।

(৮) ফলের শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা।

(৯) ফলফুলের চাষ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুকরণে উদ্যান-রচনা সম্বন্ধে সাহিত্য আলোচনা।

(১০) উদ্ভিদের উন্নয়ন (Plant breeding)।

(১১) ফলফুলের চাষ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ভাষায় যে সকল সাময়িক পুস্তক ও সংবাদপত্র আছে, তাহার আলোচনা।

(১২) ফলফুলের চাষ সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় যে সকল সাময়িক পুস্তক ও সংবাদপত্র আছে, তাহার আলোচনা।

(১৩) ফলফুলের চাষ সম্বন্ধে গবেষণা—গ্র্যাজুয়েট ও উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য।

(১৪) গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পাঠ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা। গ্র্যাজুয়েট্ ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শাখায় এই রকম বিভিন্ন বিভাগ আছে। যাহারা এম্-এ অথবা এম্-এস্‌সি উপাধি-প্রার্থী, তাহাদিগকে একটি প্রধান (Major) ও অপর একটি (Minor) শাখায় পরীক্ষা দিতে হয়; এবং পিএইচ্ ডি উপাধি প্রার্থী ছাত্রদিগকে একটি প্রধান ও অপর দুইটি শাখায় পরীক্ষা দিতে হয়। ঐ সকল বিষয়ে পরীক্ষার্থীদিগকে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধও লিখিতে হয়। এম্-এ ও এম্-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে টাইপ্‌রাইট্ করাইয়া ও বাঁধাইয়া মাত্র এক-একটি প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে রাখিতে হয়; কিন্তু পিএইচ্ ডি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ প্রধান বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধের পঞ্চাশখানি ছাপান কপি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিতে বাধ্য।

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে ১৯১০-১১ সনে পুস্তকের সংখ্যা ছিল চারি লক্ষ ও পুস্তিকার সংখ্যা ষাট হাজার। প্রতি বৎসরই সহস্র-সহস্র পুস্তক ক্রীত হইয়া থাকে। উপহার স্বরূপেও অনেক পুস্তক পাওয়া যায়। কাজেই পুস্তকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতার ইম্পিরিয়েল্ লাইব্রেরীই বর্তমানে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পুস্তকাগার। ১৯১৮ সনে ঐ লাইব্রেরীর মোট পুস্তকের সংখ্যা ছিল দুইলক্ষ দশ হাজার মাত্র। ইম্পিরিয়েল্ লাইব্রেরীর সহিত পুস্তকের সংখ্যা বিষয়ে তুলনা করিলেই বুঝা যায় যে, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী কত বৃহৎ।

কর্ণেল লাইব্রেরীর পাঠাগারে (Reading Room) একসঙ্গে দুইশত বিংশতিজন পাঠকের অধ্যয়ন করিবার সুবন্দোবস্ত আছে। বৈদ্যুতিক আলো, দোয়াত, কলম প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই সুশৃঙ্খলা। লাইব্রেরী রবিবার দিন বন্ধ থাকে। শনিবার দিন সকালে ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত, এবং অন্যান্য দিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০-৪৫ খোলা থাকে। পাঠাগারের চারিদিকের দেওয়ালের গায়ে সর্ব্বদা পাঠের জন্য ৮০০০ পুস্তক রক্ষিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই যখন ইচ্ছা তখন ঐ সকল পুস্তক থাক হইতে নিজেরাই গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু অন্য পুস্তক পাইতে হইলে, লাইব্রেরীর কর্ম্মচারীদিগের

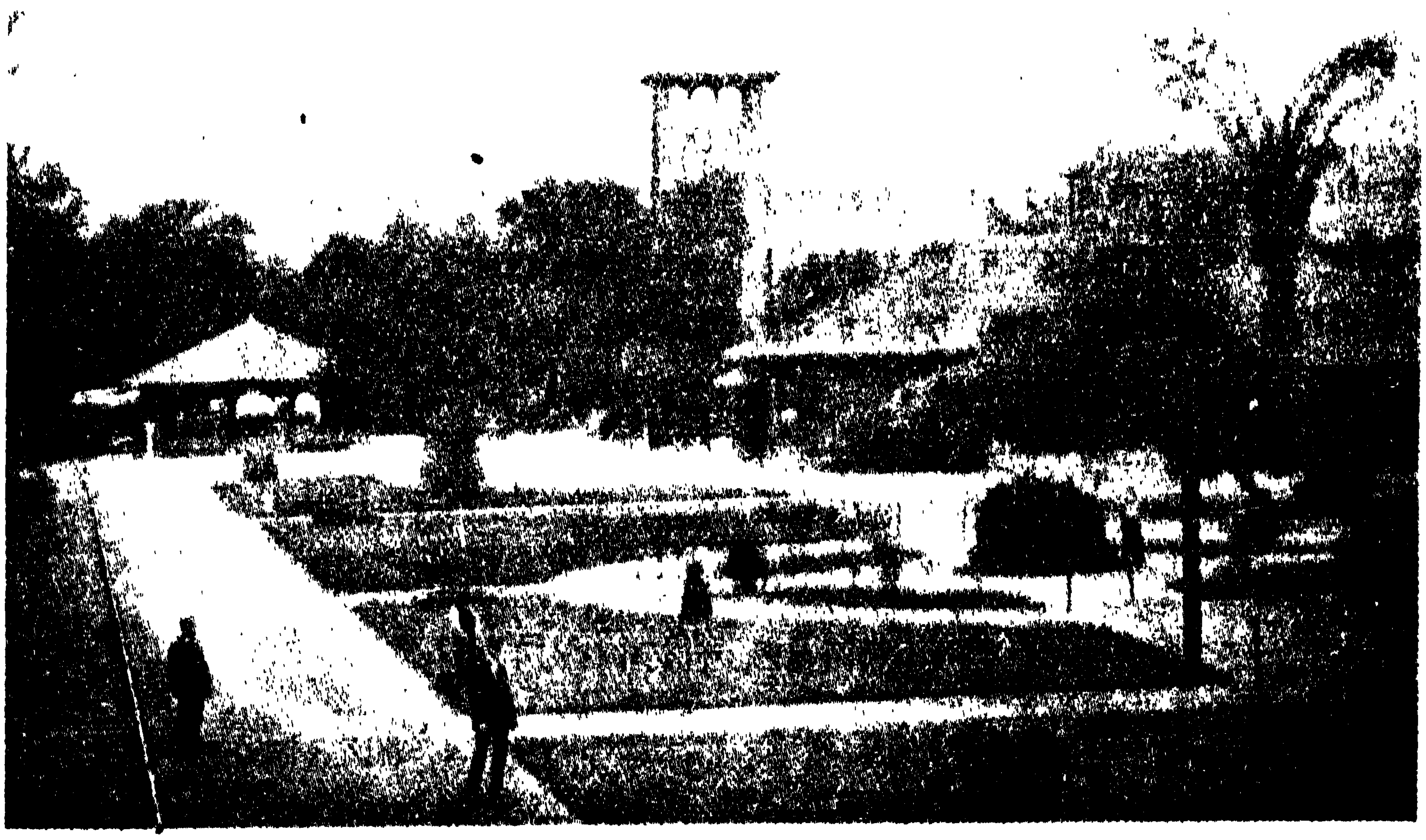

ডেণ্ট্ক পার্ক - কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়

চাহিতে হয়। পাঠাগারেই কার্ডে লিখিত পুস্তকের তালিকা রক্ষিত আছে। পাঠকেরা যখন-তখন ঐ তালিকা হইতে পুস্তকের নম্বর সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। নম্বরটী লাইব্রেরীর কোন কর্ম্মচারীকে দিলেই, সে অবিলম্বে পুস্তক-খানি আনিয়া দেয়। কার্ডে লিখিত তালিকা সুবিধার জন্য দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগে গ্রন্থকারগণের নাম বর্ণানুক্রমে এক-একটী কার্ডে লিখিত থাকে। এক-একজন গ্রন্থকার কি-কি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার নামের কার্ডে পাওয়া যায়। অপর ভাগে বিষয় অনুসারে বর্ণানুক্রমে পুস্তকগুলির নাম কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রত্যেক পুস্তকের কার্ডে গ্রন্থকারের নাম, মুদ্রাঙ্কনের তারিখ, কত সংস্করণ প্রভৃতি আবশ্যক তথ্যসমূহও পাওয়া যায়। কার্ডগুলি কাঠের খোপের ভিতর একটীর পর একটী যথাস্থানে সজ্জিত থাকে। পুস্তকাগারে ক্যাটেলগ না ছাপাইয়া এই প্রণালীতে গ্রন্থের তালিকা রাখিবার সুবিধা এই যে, নূতন যেসকল পুস্তক লাইব্রেরীতে আসে, সেইগুলির নাম পুস্তকাকারে মুদ্রিত তালিকায় সন্নিবিষ্ট করার কোন সুবিধা নাই; কিন্তু কার্ড-ক্যাটেলগের প্রথায় সেই সকল পুস্তকের নাম নূতন কার্ডে লিখিয়া কাঠের খোপের ভিতর যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে।

আমেরিকায় লাইব্রেরীগুলিতে, লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউ-জিয়মে, সর্ব্বত্রই কার্ড-ক্যাটেলগের প্রচলন দেখিয়াই, আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতার ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে যখন কোনও নূতন পুস্তকের নাম ক্যাটেলগে খুঁজিয়া পাইতাম না, তখন কার্ড-ক্যাটেলগের বড়ই অভাব বোধ করিতাম। ঐ লাইব্রেরীর Suggestor's Book অর্থাৎ ইঙ্গিত-পুস্তকে কার্ড-ক্যাটেলগ্ প্রথা অবলম্বনের জন্য নোট্ লিখিয়াছিলাম। লাইব্রেরীর কর্ম্মচারীদিগের সহিত ঐ বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলাম। একজন বলিলেন যে, কার্ড-ক্যাটেলগ্ রাখিবার জন্য অনেক স্থানের প্রয়োজন। তাঁহার কথা শুনিয়া মনে-মনে হাসিলাম; কারণ, যে লাইব্রেরীতে লক্ষাধিক পুস্তকের স্থান সঙ্কুলন হইয়াছে, সেখানে কি না কার্ডে লিখিত পুস্তকের তালিকা রাখিবার স্থানাভাব! পরে ইম্পিরিয়েল্ লাইব্রেরীতেও কার্ড-ক্যাটেলগ অবলম্বিত হইয়াছে দেখিয়া, অবশ্যই আনন্দিত হইলাম।

কাজরী

[শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর, বি-এ]

শাঙন-গগনে ঘন ঘেরি এল সই,
ঝিন্‌ঝিন্ ঝিন্‌ঝিন্ ঝিঁঝিঁ ডাকে অই।
ময়ূর চাতক চখা পাপিয়া বোলে,
চম্পা চামেলি নীপ বয়ান খোলে।
দোল সাজে সেজে যত যুবতী দোলে;
যূথীবালা মুঠি-মুঠি ছড়াইছে খই।
ঝুরঝুর ঝুরঝুর ফুলঝুরি অই॥

বুলবুল কুঞ্জে মুহু গুল বাগানে
কমল কেতকী বেলা গন্ধ হানে,
মল্লারে উল্লাসে কাজরী গানে,
শোনো শোনো করতালি তাথেই তাথেই।
কিন্ কিন্ কঙ্কণে তাল বাজে অই।

ঝিম্‌ঝিম্ ঝিম্‌ঝিম্ বাদর ঝরে,
ঝুনঝুন মঞ্জীরে নগর ভরে,
এস আসমানী-রঙা দুকূল পরে'
কেমনে এমন দিনে গৃহকোণে রই।
গুন্ গুন্ ভৃঙ্গেরা ডাকে ডাকে অই॥

জাতি-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ]

(৮)

পৃথিবীতে অনেক জাতি দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন, এক এক জাতির এক এক বিশেষ বর্ণ আছে। বর্ণানুসারে জাতি সকলকে তিনটী কি চারিটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। সাধারণতঃ ককেসীয়, মোঙ্গোলীয়, নিগ্রো ও আমেরিকান, চারি বর্ণের এই চারি জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। ককেসীয় জাতিরা শ্বেতবর্ণের। লাপ্‌ল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, (ইয়ুরোপের) তুর্কীস্তান ও হঙ্গারীর কোন-কোন অঞ্চল ছাড়া প্রায় সমস্ত ইয়ুরোপে ককেসীয় জাতির বাস; এতদ্ব্যতীত আশিয়ার তুর্কীস্তান, আরব, পারস্য, আফগানিস্তান, ভারতের উত্তরাঞ্চল, ইয়ুরোপীয় উপনিবেশ, আমেরিকা, আফ্রিকা, আশিয়া, নিউজিল্যাণ্ড্ প্রভৃতি অঞ্চলেও বহুসংখ্যক ককেসীয় জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

মোঙ্গোলীয় জাতীয় মনুষ্যেরা পীতবর্ণ-বিশিষ্ট। ইহারা চীন-সাম্রাজ্য, তিব্বত, জাপান, সাইবেরিয়া, বর্ম্মা, ভারতবর্ষের কোন-কোন অঞ্চল, লাপল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, হঙ্গারী ও ইয়ুরোপের তুর্কীস্তানের কোন কোন অঞ্চল ও গ্রীনল্যাণ্ডের অধিবাসী। আমেরিকানরা লোহিত জাতি। গ্রীনল্যাণ্ড্ ও আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তরে কতিপয় অঞ্চল ব্যতীত আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্র ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

নিগ্রোরা কৃষ্ণবর্ণ জাতি। আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলে ইহারা বাস করে।

কেহ-কেহ আদিম অষ্ট্রেলিয়ান জাতিকে এতদতিরিক্ত এক বিশেষ জাতি বলিয়া গণ্য করেন। কেহ-কেহ আবার অনুমান করেন যে, মলয়-জাতীয় মনুষ্যেরা (Malayan) শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণাতিরিক্ত কোন বিশেষ বর্ণ-বিশিষ্ট। তাহারা পিঙ্গলবর্ণ-বিশিষ্ট জাতি বলিয়া উক্ত হয়। ইহারা মলয়দ্বীপপুঞ্জ, মলয় উপদ্বীপ ও মাডাগাস্কারের অধিবাসী।

কেহ-কেহ অনুমান করেন যে, বানর-জাতীয় কোন প্‌ যে মানব জাতির পূর্ব্বপুরুষ, ইহা যেমন জোর ক‌ যায় না, সেইরূপ সকল জাতীয় মনুষ্য যে

এ কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। তাঁহাদের মতে বিভিন্ন মানব-বংশ, বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু সকল মানবজাতি যে এক সাধারণ বংশ-সম্ভূত, তাহা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, এক জাতীয় জীবের, সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় জীবের সহিত জাতি-সঙ্কর উৎপাদন করা যায় না। যদি কখন সম্ভব হয়, তাহা হইলে, সেরূপ সঙ্কর-জাতীয় জীবের বংশোৎপাদন ক্ষমতা থাকে না। উদাহরণ-স্বরূপ অশ্ব ও গর্দ্দভে যে সঙ্কর উৎপন্ন হয়, তাহার বংশোৎপাদন ক্ষমতা মোটেই থাকে না। এই কারণে গর্দ্দভ আকৃতিতে অশ্বের প্রায় সমতুল্য হইলেও, অশ্ব ও গর্দ্দভকে সমজাতীয় বলা যায় না। বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন বর্ণের মানুষ যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় হইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করা অসম্ভব হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া সকল স্থলে সম্ভব ও অনেক স্থলে মঙ্গলকর হইতে দেখা যায়; সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সকল দেশের সকল মনুষ্যই এক জাতীয়, একই মূল বংশ হইতে সকল দেশের সকল মনুষ্যই হইয়াছে।

যদি সকল মনুষ্যকে এক জাতীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন অঞ্চলের মনুষ্যের বর্ণ-বিভিন্নতার কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। অনেকে অনুমান করেন, জলবায়ুর প্রভাবই বর্ণের একমাত্র কারণ। শীতপ্রধান দেশে বর্ণ ফরসাই হয়, আর উষ্ণ অঞ্চলে বর্ণ কাল হইতেই দেখা যায়। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, শীত-প্রধান অঞ্চলের লোকেরাই ধবধবে ফরসা হয়, আবার ইহারাই উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে গিয়া কাল হইয়া পড়ে। কাজেই আমাদের ইহাই মনে হইতে পারে যে, জলবায়ু অনুসারেই বর্ণ হইয়া থাকে। ইয়ুরোপের সকল জায়গার জলবায়ু সমান নয়। কোন কোন জায়গা ঠাণ্ডা, কোন কোন জায়গা গরম। আবার কোনও কোনও জায়গা বেশী গরমও নয়, বেশী ঠাণ্ডাও নয়। ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল উক্ত দেশের উত্তরাঞ্চল অপেক্ষা উষ্ণ। উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের অপেক্ষা ফরসা। জর্ম্মাণী আরও ঠাণ্ডা দেশ, জর্ম্মাণীর অধিবাসীরা ফ্রান্সের অধিবাসী-দিগের অপেক্ষা ফরসা। এইরূপে দেখা যায় যে, ইয়ুরোপের যে প্রদেশ যত ঠাণ্ডা, সেই প্রদেশের অধিবাসীরা তত ফরসা। পক্ষান্তরে ইয়ুরোপের যে প্রদেশ যত উষ্ণ, সেই প্রদেশের অধিবাসীরা তত ময়লা। ইতালি ও স্পেনের অধিবাসীরা ফ্রান্সের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা ময়লা, এবং উক্ত দেশদ্বয়ের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা, দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা ফরসা। শুধু তাহাই নয়, আফ্রিকা ও পূর্ব্ব ভারত-দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী বর্ণ ও উক্ত মতটীর যাথার্থ্য প্রতিপাদনের অনুকূল। এই সকল তথ্যের দ্বারা মোটামুটী সাধারণ সিদ্ধান্ত এই হইতে পারে যে, বর্ণের কৃষ্ণত্ব জলবায়ুর উষ্ণত্বের সহিত সম্পর্কিত; এবং ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু, মানব শরীরের বিভিন্ন বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে।

কিন্তু উক্ত মতের বিরুদ্ধবাদীরা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়া উক্ত মত খণ্ডন করিতে পারেন। অত্যন্ত শীতপ্রধান অঞ্চলেও মলিনবর্ণ মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, আবার উষ্ণ অঞ্চলেও গৌরবর্ণ মনুষ্য বাস করে। একই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট বিভিন্ন মানব-জাতি, নানা প্রকার জলবায়ুর অধীনে থাকিয়াও আপনাদিগের স্বাভাবিক বর্ণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে, ইহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আবার অনেক জাতি পরস্পর বর্ণগত পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে, ইহাও দেখা যায়।

১। ইয়ুরোপ, আশিয়া ও আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা শীতল প্রদেশ সমূহে, এমন অনেক জাতীয় মানুষ আছে, যাহাদের বর্ণ কাল। লাপল্যাণ্ডবাসীদিগের চুল খাট, কাল ও কর্কশ; তাহাদের গায়ের রং ময়লা, তারামণ্ডলও (iris) কাল। শুনা যায় গ্রীনল্যাণ্ডবাসীরা ক্ষুদ্রকায়, তাহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ; তাহাদের গায়ের রং কৃষ্ণধূসর, মুখ পিঙ্গল বা জল-পাইয়ের বর্ণবিশিষ্ট; তাহাদের চুলের রং কয়লার মত কাল। (Crantz's History of Greenland)

আশিয়ার উত্তরাঞ্চলবাসী সাময়ডিস্ ও আরও অনেক জাতি বর্ণসম্বন্ধে লাপল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডবাসীদিগের সদৃশ। দক্ষিণ আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানদিগের সম্বন্ধে Humboldt যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই তথ্যেরই দৃঢ়তা সম্পাদন করে। দক্ষিণ আমেরিকার (torridzone) উষ্ণমণ্ডলস্থ উপত্যকা সকল অত্যন্ত উষ্ণাঞ্চল, কিন্তু Andesএর

Cordillera নামক সমতল ক্ষেত্র, ও দক্ষিণ নিরক্ষান্তর হইতে ৪৫ ডিগ্রি নিম্নে Chonos দ্বীপপুঞ্জ সমধিক শীতল। উত্তাপ বিষয়ে ইয়ুরোপের উত্তরাঞ্চল হইতে দক্ষিণাঞ্চলের যতটা প্রভেদ, দক্ষিণ আমেরিকার Cordillera ও Chonos দ্বীপপুঞ্জ হইতে উক্তদেশের উষ্ণমণ্ডলস্থ উপত্যকা সকলের প্রায় ততটা প্রভেদ; অথচ কি Cordillera ও Chonos দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী, কি উষ্ণমণ্ডলস্থ উপত্যকা সকলের অধিবাসী, সকলেরই বর্ণ তাম্রবৎ লোহিত। (Political Essay on the kingdom of New Spain). তিনি একথাও বলেন যে, পর্ব্বতনিবাসী আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা বস্ত্রাবৃত থাকে; কিন্তু তাহাদের শরীরের যে সকল অংশ আবৃত থাকে, সেই সকল অংশের, ও অনাবৃত অংশের বর্ণের পার্থক্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। Tiera del Fuego পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত হিমপ্রধানদেশ, কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদিগের শরীর ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ।

উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে গৌরাঙ্গ অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায়। Ulloa বলেন, Carthagena অপেক্ষা Guayaquil উষ্ণতর, এবং তিনি দেখিয়াছেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণতম দিনে পারী নগরে যতটা উত্তাপ হয়, Carthagenaর স্বাভাবিক উত্তাপ তদপেক্ষা অধিক। অথচ Guayaquil-এর অধিবাসীরা মলিনবর্ণ নহে। বস্তুতঃ তাহাদের রং এত ফরসা এবং তাহারা এত সুন্দর আকৃতি-বিশিষ্ট যে তাহাদিগকে, সমস্ত Quito ও Peru প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী বলা যাইতে পারে। Humboldt-বর্ণিত বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, Guinaর অরণ্য মধ্যে, বিশেষতঃ অরিনকো নদীর উৎপত্তিমূলের নিকটে কতিপয় শ্বেতকায় জাতি বাস করে। আকৃতিতে তাহারা ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত কখন মিলিত হয় নাই। ইহাদের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট। Boroaর অধিবাসীরাও শ্বেতকায়। এমন কি আফ্রিকাতেও সকল স্থলে জলবায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির সহিত শরীর-বর্ণের কৃষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় না। পৃথিবীর এই অঞ্চলে যে অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ জাতিও বাস করে, আরব-দেশীয় ভ্রমণকারী ইবনে হকল্ খৃষ্টীয় দশম শতকে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ও পরবর্ত্তী ভ্রমণকারীরাও পরে তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

সকল প্রকার জলবায়ুর প্রভাবের অধীন সুবৃহৎ ভূখণ্ডে একই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট মানব সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমেরিকা মহাদেশের দৃষ্টান্তে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দৃষ্ট হয়। এস্‌কুইমো জাতি ছাড়া এই মহাদেশের সকল স্থলের সকল অধিবাসীরই বর্ণ তাম্র-লোহিত; ইহাদের সকলেরই কেশ দীর্ঘ, সরল ও কৃষ্ণবর্ণ। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনে অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্তও তদনুরূপ। এই দ্বীপের সর্ব্বত্র, এমন কি অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলেও, অধিবাসীদিগের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। তাহাদের চুলও নিগ্রোজাতির চুলের ন্যায় কুঞ্চিত।

একই প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থায়, এবং একই জাতীয় মানুষের মধ্যে বর্ণ-বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ ও প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, লাপল্যাণ্ডের অধিবাসীরা প্রায় একই অক্ষান্তরে বাস করে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের গাত্রবর্ণের, এবং চক্ষু ও কেশ-বর্ণের সবিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ডালামাটিয়ার অধিবাসী Morlach-দিগের মধ্যে বর্ণ ও আকৃতিগত পার্থক্য খুবই দৃষ্ট হয়। Kotar এর অধিবাসীরা এবং Seigu এবং Knin-এর সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসীরা সুন্দর নীল চক্ষু-বিশিষ্ট, তাহাদের মুখ-মণ্ডল প্রশস্ত, এবং চেপ্টা। কিন্তু যাহারা Duare এবং Vergorazএ বাস করে, তাহাদের চুল কাল; মুখমণ্ডল লম্বা, গায়ের রং (tawny) আপীত পিঙ্গল এবং কলেবর সমুন্নত। M. Sauchez তাতার অধ্যুসিত এবং রুসের দক্ষিণ দিকৃস্থ প্রদেশ-সমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে ইয়ুরোপের অধিবাসীর ন্যায় শ্বেতকায়-বিশিষ্ট একটী জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায় যে, উক্ত জাতির শরীর-বর্ণ ধবধবে সাদা অথচ তাহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসী কাফ্রিদের বর্ণ লৌহ ধূসর, হটেন্‌টট্‌দিগের বর্ণ পীত। Sibreর মতে মাডাগাস্কার দ্বীপে ইয়ুরোপের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা ময়লা নয় এরূপ ফিকে জলপাই বর্ণ হইতে অত্যন্ত মলিন বর্ণ পর্য্যন্ত সকল প্রকার বর্ণাভা-যুক্ত মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু গাত্রবর্ণ কেন, কেশ সম্বন্ধেও, উক্ত দ্বীপে, অনেক প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। যাহাদের বর্ণ কিছু পরিষ্কার, তাহাদের চুল কাল ও

সোজা, কিন্তু যাহাদের বর্ণ ময়লা, তাহাদের কেশ ছোট ও কোঁকড়ান।

ফিলিপাইনদ্বীপে জলপাই-বর্ণের মলয় (Malayan) জাতিও আছে, আবার এমন সকল অধিবাসীও আছে যাহারা বর্ণ ও আকৃতিতে নিগ্রোদিগের ন্যায়। যব-দ্বীপে দুই প্রকারের অধিবাসী দৃষ্ট হয়, তাহাদের আকৃতি ও বর্ণে ক্রমান্বয়ে হিন্দু ও মলয়-ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মলাক্কাদিগের অনেকে আবার অপেক্ষাকৃত কম কাল। যাহারা অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট তাহাদের কেশ পশমের ন্যায় এবং তাহারা অভ্যন্তরস্থ পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করে। এই সকল দ্বীপের উপকূলে অপর এক জাতীয় লোক বাস করে, তাহাদের গাত্র বর্ণ পীতাভ পিঙ্গল (Swarthy) ও চুল লম্বা ও কোঁকড়ান। ফরমোজা দ্বীপের আভ্যন্তরিক পার্ব্বত্য অঞ্চলে পিঙ্গলবর্ণ, কুঞ্চিতকেশ ও প্রশস্তমুখ অধিবাসিবৃন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। চীনেরা ঐ দ্বীপের উপকূল সকল অধিকার করিয়া আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সকলে যে সকল অধিবাসী দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একটী শ্রেণী অপেক্ষাকৃত ফরসা, আর একটী শ্রেণী অপেক্ষাকৃত ময়লা। অপেক্ষাকৃত মলিনকায়-বিশিষ্টদিগের কেশ পশমী ও কুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমোক্ত শ্রেণী, ওটাহাইট, এবং সোসাইটী দ্বীপ, মার্কুইসাস্, ফ্রেণ্ড্‌লী দ্বীপ, ঈষ্টার দ্বীপ এবং নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী; দ্বিতীয় শ্রেণী, নিউ কালিডোনিয়া, টনা, নিউ হিব্রিডিস্ ও মালিকোর অধিবাসী। এই সকল দ্বীপের অন্যান্যসাপেক্ষ অবস্থান ও অক্ষান্তর হিসাবে প্রতিপন্ন হয় যে, শুধু যে শীতলতর প্রদেশে অপেক্ষাকৃত মলিনকায় জাতি বাস করে, তাহা নয়, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষান্তরে একই প্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট জাতি বাস করিতে পারে।

অত্যন্ত উষ্ণাঞ্চলে যে বর্ণ মলিন হইয়া যায়, একথা অস্বীকার করা যায় না। ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, সুবিশুদ্ধ বর্ণ-বিশিষ্ট শীতপ্রধান অঞ্চলের ইয়ুরোপীয় জাতি উষ্ণাঞ্চলে গিয়া বিমলিনকায় হইয়া পড়ে। তবে স্বাভাবিক সুবিশুদ্ধ বর্ণবিশিষ্ট ককেসীয় জাতি দেশ-বিশেষের জলবায়ুর প্রভাবে বিমলিনকায় হইলেও, অপর জাতীয় মানবের ঐ একই প্রকার জলবায়ুর প্রভাবে যে বর্ণ হয়, সেই উভয় বর্ণের মধ্যে বিশেষরূপ প্রভেদ থাকিয়া যায়; অর্থাৎ দেশ-বিশেষের জলবায়ুর প্রভাবে ককেসীয় জাতির বর্ণের মলিনত্ব ঘটিতে পারে, কিন্তু সমপরিমাণ মলিনত্বযুক্ত অপর জাতি হইতে, বর্ণ-বিশেষজ্ঞ প্রথমোক্ত জাতিটীকে চিনিয়া লইতে পারে।

ককেসীয় জাতীয় মানবের ফরসা সন্তান হয়। সকল জাতির বর্ণ এক নহে; জন্মকালে শিশুরা বিশেষ-বিশেষ জাতি-বর্ণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। Ulloa বলেন, Guayaquilএ স্পেনজাতীয় শিশু অত্যন্ত ফরসা বর্ণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। West Indiesএর ব্যাপারও এরূপ। Long তাঁহার জেমেকার ইতিহাসে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, শ্বেত পিতামাতা হইতে ইংল্যাণ্ডে যেমন সুন্দর ও স্বচ্ছকলেবর শিশুর জন্ম হয়, জেমেকায়ও ঠিক তদ্রূপ হইতে দেখা যায়। কিন্তু মুর, আরব প্রভৃতি যে সকল ককেসীয় জাতি বহুকাল ধরিয়া উষ্ণ প্রদেশে বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথা বলা যাইতে পারে না। অথচ জন্মকালে ঐ সকল জাতির সন্তানেরা শীতপ্রধান দেশের ইয়ুরোপীয় শিশুর ন্যায় ফরসা থাকে। Russel বলেন, আলিপোর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশ সমূহের অধিবাসীরা স্বভাবতঃ গৌরবর্ণ, এবং ঐ সকল স্থলের পদস্থ স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত যত্ন সহকারে তাহাদের স্বাভাবিক গৌরবর্ণ রক্ষা করিয়া থাকে। Shaw বলেন, মুরদিগের সন্তানেরা অতিশয় গৌরবর্ণ। Poiretও ঐ মতটী সমর্থন করেন। তিনি বলেন, মুরেরা স্বভাবতঃ কৃষ্ণকায় নয়, তাহারা গৌরবর্ণ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। যদি তাহারা সূর্য্যোত্তাপে দেহকে উন্মুক্ত না রাখে, তাহা হইলে আজীবন গৌরবর্ণ রক্ষা করিতে পারে।

ককেসীয় জাতি স্বভাবতঃ বিশুদ্ধবর্ণ। উষ্ণ প্রদেশে তাহাদের বর্ণ মলিন হইয়া যায়; কিন্তু উষ্ণাঞ্চলবাসী ককেসীয়রাও যত্ন সহকারে তাহাদের স্বাভাবিক বিশুদ্ধ বর্ণ রক্ষা করিতে পারে। যদি তাহারা জলবায়ুর প্রভাবে দেহকে উন্মুক্ত না রাখে, তাহা হইলে উষ্ণাঞ্চলেও তাহারা তাহাদের গৌর কান্তি বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু নিগ্রো-জাতি শত চেষ্টায়ও তাহাদের বর্ণের কৃষ্ণত্ব দূর করিতে পারে না। ইয়ুরোপীয়রা, আফ্রিকা, East Indies বা দক্ষিণ আমেরিকা, যেখানেই বসতি স্থাপন করুক না, সর্ব্বত্রই

তাহাদের বর্ণ সমান থাকে, তবে উষ্ণ প্রদেশের জলবায়ুর প্রভাব-বশতঃ বর্ণটা কিছু মলিন হইতে পারে। তাহারা ঐ সকল দেশের অধিবাসীদিগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, জলপাই বা তাম্রবর্ণ-বিশিষ্ট হয় না। তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণটা কেবল মাত্র কিঞ্চিৎ আপীত পিঙ্গল আভাযুক্ত হয়।

নিগ্রোরা West Indies বা আমেরিকায় বাস করিয়া ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদিগের ন্যায় তাম্রবর্ণ-বিশিষ্ট হয় না। তবে জলবায়ুর অপেক্ষাকৃত মৃদুতা-বশতঃ তাহাদের বর্ণের কৃষ্ণত্বের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া থাকে। আমেরিকায়, কি ইয়ুরোপীয়, কি নিগ্রো, কি Red-Indian সকল জাতীয় শিশুই লোহিতাভ বর্ণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু কিছুকাল পরে নিগ্রো-শিশুরা তাহাদের পিতৃমাতৃবর্ণে রঞ্জিত হয়; Indian শিশুরা তাম্রবর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, কিন্তু ইয়ুরোপীয় শিশুরা হয় গৌরবর্ণই থাকিয়া যায়, না হয় প্রখর সূর্য্যোত্তাপের প্রভাববশতঃ আপিঙ্গল বর্ণাভা প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিগ্রোদের ন্যায় কালও হয় না, Indian-দিগের ন্যায় তাম্রলোহিত বর্ণযুক্তও হয় না। কানাডা বা আমেরিকার উত্তর অঞ্চল সকলের জলবায়ু ইয়ুরোপের উত্তরাঞ্চলের জলবায়ুর সমান; সুতরাং ঐ সকল অঞ্চলে যে সকল ইয়ুরোপীয় বাস করে, তাহাদের বর্ণ বিশুদ্ধই থাকিয়া যায়, কিন্তু ঐ সকল অঞ্চলের Indianরাও তামলোহিতবর্ণ রক্ষা করে।

মোঙ্গোলিয় জাতীয়রা সুতীব্র শীতপ্রধান লাপল্যাণ্ড ও আশিয়ার উত্তরাঞ্চলেই বাস করুক, মৃদু তাপবিশিষ্ট আশিয়ার মধ্যাঞ্চলেই বসতি স্থাপন করুক, অথবা চীনের দক্ষিণাংশের উষ্ণাঞ্চলেই বাস করুক, সর্ব্বত্রই তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণ রক্ষা করিয়া থাকে। উষ্ণাঞ্চলেও তাহাদিগকে কৃষ্ণকায় হইতে দেখা যায় না।

বর্ণগত বিশেষত্বের সহিত আকৃতিগত বিশেষত্বের এমন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে যে মোঙ্গোলীয় জাতির জলপাই বর্ণের সহিত মলয়-জাতির আকৃতি সংযুক্ত হইতে দেখা যায় না; পক্ষান্তরে মলয়-জাতির পিঙ্গল বর্ণের সহিত মোঙ্গোলীয় জাতির আকৃতি-সংযোগও দৃষ্ট হয় না। ইথিয়পীয়-জাতির কৃষ্ণবর্ণ ও আমেরিকান জাতির লোহিত বর্ণ তাহাদের স্ব-স্ব জাতীয় আকৃতির সহিতই সংযুক্ত থাকে। এই সকল ব্যাপারে মনে হইতে পারে, বিভিন্ন মৌলিক জাতি, বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া, আপন আপন মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

মনুষ্যের চর্ম্মত্বক্ Epidermis ও Cutis নামক দুই স্তরে বিভক্ত। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে Malpighi সাহেব Epidermis ও Cutis-এর মধ্যবর্ত্তী Epidermis-এর একটী কোমল অংশস্তর আবিষ্কার করেন। তিনি এই অংশস্তরটীকে rete mucosom নামে অভিহিত করেন, ও এতন্মধ্যে এক প্রকার রস সঞ্চিত দেখেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, এই রসই নিগ্রোজাতির শরীরস্থ কৃষ্ণবর্ণ উৎপাদন করে। পরীক্ষা দ্বারা ইহাও জানা গিয়াছে যে বিভিন্ন জাতির শরীরস্থ এই রস বিভিন্ন বর্ণের; সুতরাং বিভিন্ন মৌলিক জাতি যে বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া, আপন আপন মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে, আপাততঃ তাহাই মনে হইতে পারে।

চুলের বর্ণের সহিত গাত্রবর্ণের সম্পর্ক আছে। গাত্রচর্ম্ম যে পরিমাণে পাতলা ও ফরসা হয়, চুল সেই পরিমাণে কোমল, সূক্ষ্ম ও সাদা হয়।

টিউটন-জাতীয় মনুষ্যেরা সমধিক শ্বেতকায়। উহাদের কেশও সুবিমল স্বচ্ছ। কেল্টিক-জাতীয় মনুষ্যেরা তত ফরসা নহে, ইহাদের কেশও টিউটন-জাতীয় মনুষ্যের কেশ অপেক্ষা কৃষ্ণতর। টিউটনদিগের অপেক্ষা কেল্ট-দিগের কেশের কুঞ্চন প্রবণতা অল্প। কেশের বর্ণের গাত্র-বর্ণের সহিত সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু কেশের কুঞ্চন-প্রবণতার সহিত গাত্রবর্ণের সম্পর্ক ততটা বলিয়া বোধ হয় না। পিঙ্গল-বর্ণবিশিষ্ট এমন অনেক কেল্ট-জাতীয় লোক দেখা গিয়াছে, যাহাদের কেশ কুঞ্চিত, কিন্তু মোঙ্গোলীয় ও আমেরিকান জাতীয় লোকেরা আরও অধিক ময়লা হইলেও তাহাদের কেশ লম্বা ও সোজা। দক্ষিণ-সাগর-দ্বীপপুঞ্জে যে সকল মলয়-(Malay) জাতীয় লোক বাস করে, তাহাদের মধ্যে অনেকের কেশ কোমল ও কুঞ্চিত বলিয়া শুনা যায়। অক্ষিবর্ণেরও গাত্রবর্ণের সহিত বিশেষ সম্পর্ক আছে। অধ্যাপক Sommering বলেন যে, নিগ্রোজাতির চক্ষের শ্বেতাংশটা ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় সমুজ্জ্বল শ্বেত নয়; তাহা পাণ্ডু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় পীতাভ-পিঙ্গল। সাধারণ নিগ্রোজাতির (iris) তারামণ্ডলের বর্ণ ঘোর কাল, কিন্তু কঙ্গো নিগ্রোদের তারামণ্ডল নীলাভ বলিয়া শুনা যায়।

টিউটন-জাতির গাত্রবর্ণ বিমল ধবল, কিন্তু তাহাদের বিশেষত্ব চক্ষুর নীলত্বে। ফিনল্যাণ্ডবাসীরা অপেক্ষাকৃত ময়লা, লাপল্যাণ্ডবাসীরা আরও ময়লা। ফিনদিগের তারামণ্ডল (iris) পিঙ্গলবর্ণ, এবং লাপল্যাণ্ডবাসীদিগের তাহা কৃষ্ণবর্ণ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাত্রবর্ণের যেমন পরিবর্ত্তন ঘটে, অক্ষিবর্ণেরও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে। সদ্যোজাত জর্ম্মাণ-শিশুর চক্ষু সাধারণতঃ নীল ও কেশ সুবিমল হয়, কিন্তু বড় হইয়া তাহার গায়ের রং যত ময়লা হইতে থাকে, তাহার চক্ষু ও কেশের বর্ণ অপেক্ষাকৃত তত কাল হইতে থাকে। শুধু জর্ম্মাণ বলিয়া নয়, অন্যান্য জাতির পক্ষেও এ বিষয়ে এই নিয়ম।

বিভিন্ন জাতীয় পিতা মাতা হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে সচরাচর তাহার পিতামাতার বর্ণের মধ্যবর্ত্তী বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঘোর কৃষ্ণ কাফ্রি ও অমল ধবল ইয়ুরোপীয়ের পরস্পর সঙ্গমজাত সন্তান যদি উপর্য্যুপরি চারি পুরুষ ধরিয়া ইয়ুরোপীয়দের সহিত বিবাহ করিতে থাকে, তাহা হইলে তৎফলে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণ অমল ধবলই হয়। পক্ষান্তরে সে যদি পুরুষানুক্রমে কাফ্রি বিবাহ করে, তাহা হইলে চারি পুরুষ অন্তরে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার বর্ণ কাফ্রিজাতির বর্ণের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণ হইবে। শুধু যে গাত্রবর্ণের এই রূপে পরিবর্ত্তন হয় তাহা নহে, কেশেরও প্রকৃতি ও বর্ণ বদলাইয়া যায়; তবে কখন-কখন উক্ত প্রকারের ইয়ুরোপীয় বর্ণ-প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে কাফ্রিজাতি-সুলভ পশমী কেশ থাকিয়া যায়। আবার অনেকস্থলে এমনও ঘটে যে, উক্ত প্রকারের ঘটনায় সন্তান, পিতা-মাতার বর্ণের মধ্যবর্ত্তী বর্ণ অর্জ্জন না করিয়া কেবলমাত্র তদুভয়ের একতরের সম্পূর্ণ বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু দুই তিন পুরুষ পরে আবার বর্ণ পাল্‌টাইয়া লইতেও পারে। এক ইংরেজের ঔরসে এক কাফ্রি রমণীর গর্ভে যমজ উৎপন্ন হইয়াছিল। যমজের মধ্যে একটী শিশু হুবহু কাফ্রি ও আর একটী সম্পূর্ণ ইয়ুরোপীয় আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক কাফ্রির ঔরসে এক ইংরেজ রমণীর গর্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, ফল-স্বরূপ সন্তানটী মসী-কৃষ্ণবর্ণ উপঢৌকন পাইয়াছিল। আর একটী ঘটনা এই যে, একজন কাফ্রি, এক শ্বেতকায় মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিল। তৎফলে মহিলাটীর গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল। কন্যাটী আকৃতি ও বর্ণে মাতারই সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিল, তবে বিশেষের মধ্যে এই যে তাহার দক্ষিণ নিতম্ব ও উরুদেশ পিতৃবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল।

এই সকল ব্যাপার আলোচনা করিলে, এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, এবং জাতিগত বিশেষত্ব বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই জাতি-গত বিশেষত্বের বিলোপ সাধন করিতে পারি না।

কিন্তু আজকাল নৃতত্ত্বজ্ঞদিগের অনুমান যে, বর্ত্তমান কালে মানব-সাধারণের মধ্যে বিভিন্ন জাতিগত বিশেষত্ব যতই পরিস্ফুট থাকুক না কেন, প্রাথমিক মানবে তাহা আদৌ পরিস্ফুট ছিল না। প্রাথমিক অবস্থায় সকল মানবই এক জাতীয় ছিল। তাঁহারা গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এমন এক সময় ছিল, যখন মানব-জাতি, এখনকার মত, পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল না। পৃথিবীর সকল জাতীয় মানবের পূর্ব্বপুরুষেরা পৃথিবীর বিশেষ কোন এক অঞ্চলে, একই প্রকার জলবায়ুর প্রভাবের অধীনে উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু মানব-জাতির সাধারণ জন্মস্থান সম্বন্ধে, পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে, এখনও মতভেদ দৃষ্ট হয়। তবে সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত এই যে, পারস্য হইতে আরম্ভ করিয়া, তিব্বত ও সাইবিরিয়ার মধ্য দিয়া মানচুরিয়া পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত মালভূমির কোন অঞ্চলে, মায়োসিন যুগের শেষভাগে অথবা প্লায়োসিন যুগের প্রারম্ভ-কালে, সম্ভবতঃ মানব-জাতির প্রথম বিকাশ হয়। এইরূপ কোন এক অঞ্চলই যে মানব জাতির প্রথম বিকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী, নৃতত্ত্বজ্ঞগণ এই ধারণাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন।

নৃতত্ত্বজ্ঞদিগের অনুমান, প্লায়োসিন যুগের আদি মানবের শরীর লোমে আবৃত ছিল। তাহার মাথায় যে চুল ছিল, তাহার বর্ণ ছিল (russet brown) আলোহিত পিঙ্গল, গাত্রচর্ম্ম হরিদ্রাভ পিঙ্গল (yellowish brown)। কাফ্রিদের বর্ণ ঘোর কাল, কিন্তু বুষম্যান শ্রেণীর কাফ্রিদের বর্ণ কিঞ্চিৎ পীতাভ। অন্যান্য কতকগুলি কাফ্রিজাতীয় মানুষের গাত্রবর্ণের পীত-প্রবণতা দৃষ্ট হয়। মোঙ্গোলীয় জাতীয় মনুষ্যেরা পীতবর্ণবিশিষ্ট। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট জাতির বর্ণের পীত-প্রবণতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু পীতবর্ণবিশিষ্ট জাতিকে

কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায় না। আফ্রিকান ও অষ্ট্রেলিয়ান জাতীয় শিশুর জন্মকালে গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ পিঙ্গল হইতে দেখা যায়। বড় হইয়া তাহারা কাল হইয়া পড়ে। ইহাতে অনুমান হয়, কাফ্রিদের কাল রং মানুষের স্বাভাবিক রং নহে। অত্যন্ত উষ্ণ অঞ্চলে থাকে বলিয়া উহারা কাল হয়। হরিদ্রাভ পিঙ্গল বর্ণই মানুষের স্বাভাবিক বর্ণ। মানুষের বর্ণের উপর আলোকরশ্মির একটা প্রভাব আছে। যে অনুপাতে সূর্য্যরশ্মি মানুষের ত্বগাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, তদভ্যন্তরস্থ বর্ণোৎপাদক রসের সংস্পর্শে আসে, সেই অনুপাতে মানুষের শরীরের বর্ণ কাল হয়। সূর্য্যরশ্মির পরিমাণের হ্রাসবশতঃ গাত্রবর্ণ শ্বেত হয়। সেই কারণে শীতপ্রধান অঞ্চলে শ্বেতকায় মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

জার্ম্মাণী ও স্কাণ্ডিনেভিয়ার অধিবাসীদিগের গাত্র চর্ম্ম শ্বেত, তাহাদিগের চক্ষু নীল ও কেশ নির্ম্মল। ইহার কারণ এই যে, তাহারা বৎসরের মধ্যে মোটে ১২৫০ হইতে ১৫০০ ঘণ্টা কাল সূর্য্য-কিরণ উপভোগ করিতে পায়। টিউটনিক জাতীয় মনুষ্যেরা মধ্য প্লাইষ্টোসিন যুগ হইতে পৃথিবীর যে অঞ্চলে বাস করিয়া আসিতেছে, সে অঞ্চল কৃষ্ণবর্ণোৎপাদনের উপযোগী উত্তাপ হইতে বঞ্চিত। আলোক-রশ্মি সঞ্চিত হইয়া উত্তাপ উৎপন্ন হয়। সঞ্চিত আলোক-রশ্মি হইতে উৎপন্ন উত্তাপ যত প্রখর হইবে, ততই তাহার গাত্র চর্ম্মে কৃষ্ণবর্ণ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং যে প্রদেশ যত উষ্ণ, সাধারণতঃ সেই প্রদেশের অধিবাসীরা তত ময়লা।

মনুষ্য-শরীরে বর্ণের উপকরণ সঞ্চিত আছে, সূর্য্য-রশ্মির সাহায্যে সেই উপকরণের দ্বারা মনুষ্য-শরীরে বর্ণ প্রতিফলিত হয়, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু জাতি-গঠন সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে ঐ উপকরণ সকল শরীরে একই রূপ ছিল। প্রাথমিক মানবজাতির মধ্যে জাতিগত বিশেষত্ব পরিস্ফুট ছিল না বটে, কিন্তু ইহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতিগঠনের স্বাভাবিক প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে জাতিগঠন সম্পন্ন হইয়া গেলে, বিভিন্ন জাতির বিশেষত্ব-সূচক বর্ণ ও দৈহিক গঠন স্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হইতে পারে না। সে বিষয়ের আলোচনার জন্য পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিত হইবে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, প্লায়োসিন যুগের শেষ ভাগ হইতে, বিভিন্ন প্রকারের জাতিগত বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হয়, এবং প্লাইষ্টোসিন যুগের মধ্যেই, বিভিন্ন জাতি-গঠন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। জাতিগঠন-কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর, জাতি-সমূহের পরস্পর বর্ণ-পার্থক্য স্থায়ী হইয়া জাতিগত বিশেষত্বরূপে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং এখন বর্ণ-গত বিশেষত্ব ধরিয়া জাতি-নির্ণয় করিতে যাওয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

তবে বর্ণানুসারে জাতিভেদ বিনির্ণয়ের এক প্রধান অসুবিধা এই যে, সকল জায়গার লোকের অথবা সকলের বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান একরূপ নয়। এক জনের কাছে যাহা সাদা, আর এক জনের কাছে তাহা কাল বলিয়া অনুমিত হয়। আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সাদায় ও কালয় সেই সম্বন্ধ। আলোকের অভাব হইলে, তবে অন্ধকার হয়, সেইরূপ সাদার সম্পূর্ণ অভাবে কাল হয়। সকল বর্ণের মধ্যেই সাদার অস্তিত্ব আছে। যখন সাদার অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন আর কোন বর্ণই থাকে না। সকল বর্ণের বিলোপ হইলে তবে কাল'র উৎপত্তি হয়। কোথায় আলোর অবসান হইয়া অন্ধকার আরম্ভ হইল, তাহা বুঝা যেমন কঠিন, সাদার সম্পূর্ণ বিলোপে কাল'র উৎপত্তিস্থল নিরূপণ করাও তদ্রূপ কঠিন। অন্ধকার ও আলোকের মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য কিছুই নাই, এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা বেগ গত। আকাশ-তরঙ্গের গতিই আলোক। আলোক বলিয়া অন্য নূতন কিছুই নাই। সেইরূপ কাল ও সাদার মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য নাই। আমাদের সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুসারে কাল ও সাদার মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে হইবে। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির একটা সাধারণ সীমা থাকিলেও, অনেক কারণে, সকলের ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমান নয়। দেখা যায় অনেক কারণে উত্তাপ ও বর্ণ সম্বন্ধে অসমান অনুভূতি হয়। তন্মধ্যে একটি কারণ অভ্যাস। ইংলণ্ড বা জার্ম্মাণীর অধিবাসী ফরাসী দেশে গমন করিলে তাহার গরম বোধ হয়, কিন্তু ভারতবাসী ফরাসী দেশে গিয়া শীত বোধ করে। ইংলণ্ড বা জার্ম্মাণীর অধিবাসী, ফরাসী দেশের অধিবাসীকে বিমলিন-কায় দেখে, কিন্তু ভারতবাসী তাহার বর্ণকে সুবিশুদ্ধ মনে

করে। মানুষের স্বভাব এই যে, আপনার আদর্শে জগৎকে দেখিয়া থাকে। সকল অবস্থায়, সকল সময়ে, সকল ব্যক্তি, উত্তাপ ও বর্ণ সম্বন্ধে একই রূপ ধারণায় উপনীত হইতে পারে না। উত্তাপ সম্বন্ধে আদর্শ ধারণায় উপনীত হইতে হইলে, আমাদিগকে যেরূপ তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ বর্ণ সম্বন্ধে আদর্শ ধারণায় উপনীত হইতে হইলে colour scale ব্যবহার করিতে হয়।

একটী মানুষ হইতে আর একটা মানুষের সর্ব্বতোভাবে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। একরকম দুইটী মানুষ আমরা দেখি না। আকৃতিতে, বর্ণে ও ভাবে মনুষ্যেরা সকলেই আপন আপন বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলে। কিন্তু তথাপি জাতিগত বিশেষত্ব বলিয়া একটা কিছু আছে। মানুষ দল না বাঁধিয়া থাকিতে পারে না, তাই জাতির সৃষ্টি হইয়া পড়ে। আমাদের শাস্ত্রের বলে 'অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বে'; ইহার অর্থ এরূপ করা যাইতে পারে,—প্রথমে সবই অব্যক্ত ছিল, সেই অব্যক্ত হইতে জগতের প্রকাশ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জগতের প্রত্যেক পরমাণু এখন যেমন আছে, সৃষ্টির পূর্ব্বেও তদ্রূপ ছিল। একটী কম বা একটী বেশী ছিল না, কিন্তু সব ঘুমাইয়া ছিল। তাহারা একটী একটী করিয়া জাগিতে আরম্ভ করিল, আর সৃষ্টির প্রকাশ হইল। কিন্তু নিদ্রা ও জাগরণের তাৎপর্য্য কি? ঘুমাইয়া পড়া কাহাকে বলে? জাগিয়া উঠাই বা কি? প্রত্যেক পরমাণুর আপন আপন বিশেষত্ব আছে; বিশেষত্বগুলি যখন সে হারাইয়া ফেলে, তখনই সে ঘুমায়। বিশেষত্ব সকলের পুনঃ প্রকাশই তাহার জাগরণ। বিশেষত্বগুলি সে কোথায় হারাইয়া ফেলে? হারাইয়া ফেলিলে তাহার অবস্থা কি হয়? বিশেষত্বই বস্তুর বস্তুত্ব। বিশেষত্বহীন হইলে বস্তুর আর কিছুই থাকে না। এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে সকলই বিলীন হইয়া যায়। তখন আর বস্তুকে চিনিতে পারা যায় না। বস্তু যখন জাগে, আপন আপন বিশেষত্ব লইয়া পুনরুত্থিত হয়।

প্রত্যেক জীবের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব আছে। তাহাকে তাহার ব্যক্তিত্বও বলা যাইতে পারে। প্রলয়-কালে জীব তাহার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে; সৃষ্টিকালে আবার সে তাহার ব্যক্তিত্ব সংগ্রহ করিয়া উত্থিত হয়।

প্লায়োসিন-যুগে যখন আদিম মানুষের আবির্ভাব হয়, সে তখন তাহার সমস্ত বিশেষত্ব সংগ্রহ করে নাই। তখন তাহার যে অবস্থা, তাহাকে সহজ অবস্থা বলা যায়। ক্রমশঃ যতই সে তাহার আপন বিশেষত্ব সকল সংগ্রহ করিতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব ফুটিতে লাগিল।

বস্তুর স্বভাব এই যে, সে গোড়া হইতে দল বাঁধিবার জন্য ব্যস্ত হয়। ইহাই জাতি-গঠনের মূল কারণ। দল বাঁধার অর্থ পরস্পর আদান-প্রদান। এই আদান-প্রদান হইতে হইতেই ক্রমশঃ জাতির গঠন হয়। যদি আদান-প্রদান না হইত, জাতি-গঠন হইতে পারিত না। সকলেই পরস্পর স্বতন্ত্র থাকিত।

জীব তাহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মসাগরে হারাইয়া ফেলিয়া, আপনহারা হয়, কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্বের উপাদান অপর জীবের সহিত আদান-প্রদান করিয়া জাতি গঠন করিতে পারে।

প্রত্যেক মানুষের আকৃতিগত ও বর্ণগত বিশেষত্ব আছে, কিন্তু সে অপর মানুষের সহিত তাহা মিশাইয়া দল বাঁধিবার চেষ্টা করে। তাই আমরা যে কোন জাতির মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির আকৃতিগত ও বর্ণগত বিশেষত্ব যেমন দেখিতে পাই, তেমনি কতকগুলি জাতির মধ্যে প্রত্যেক জাতির জাতীয় আকৃতি ও বর্ণগত বিশেষত্বও দেখিয়া থাকি।

আজগুবি কাহিনী

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি-এস্‌সি]

(ক)

চার নম্বর হ্যারিসন রোডের চৌতলার চারিটি কক্ষে যে বন্ধু-চতুষ্টয় থাকিত, তন্মধ্যে বিকল ছিল বৈজ্ঞানিক, পটল প্রত্ন-তাত্ত্বিক, অটল আর্টিষ্ট এবং পেলব কবি ও প্রেমিক। চারিজনের প্রকৃতি স্বতন্ত্র ধরণের হইলেও, মনের মিল ছিল যথেষ্ট; এবং চাঁদা-করা খরচে চা পান করিতে-করিতে প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় স্ব স্ব প্রকৃতি-সিদ্ধ আলোচনা বেশ সুশৃঙ্খলেই চলিত।

বিকল চায়ের কেট্‌লী ষ্টোভে চড়াইয়া, নাবাইবার পূর্ব্বে থার্মোমিটার দ্বারা পরীক্ষা করিত—টগবগায়মান জল ঠিক ২১২ ডিগ্রী ফারেণহাইট হইয়াছে কি না (কারণ, চায়ের বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট উক্ত আছে যে, ফুটন্ত জল ছাড়া ভাল চা তৈয়ারী হয় না), এবং ঘড়ি ধরিয়া অন্যূন পাঁচ মিনিট কাল তাহাতে চা ভিজাইয়া রাখিত। ততক্ষণ পটল আলোচনা করিত, চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারতবর্ষে চায়ের আবাদ ছিল কি না; না থাকিলে, তাঁহার হেলেনকে বিবাহ করা সার্থক হয় নাই,—অথবা এইরূপই একটা কিছু। অটল পেন্সিল লইয়া ষ্টোভের উত্তাপে বিকলের রক্তিম মুখের লালিমা কাগজে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিত, দাড়ির বনান্তরালে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অধিকাংশ আবৃত হয় বলিয়াই, স্ত্রীলোকের মুখে দাড়ি-গোঁফের ব্যবস্থা নাই; এবং এ হিসাবে ভগবান দস্তুর-মত আর্টিষ্ট। আর পেলব ম্লান মুখে জানাইত, শুধু চুড়ির মিঠে আওয়াজের অভাবে অমন চায়ের সরঞ্জামই বৃথা; কারণ, আহারের সময় রিনিঝিনি, টুংটাং শব্দ ছাড়া appetite বাড়ে না। কিন্তু ভোজনের সময় সকলে এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িত;—তখন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া সবাই হইত ঔদরিক।

বিকল ছিল বাড কোম্পানীর কেমিষ্ট; পটল মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের curator; অটল চিত্রকর এবং পেলব মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। সাহেবের দোকানে কাজ করিয়া বিকলের রুচি হইয়াছিল তদনুরূপ। ফলে, তাহার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি,—ছড়ি, ঘড়ি, জুতা, ছাতা, লেবেল-আঁটা ও দাম করা এবং বাঁধান খাতায় তাহার chronological লিষ্ট। দেয়ালের এক ধারে থার্মোমিটার, অন্য ধারে ব্যারোমিটার; তন্নিম্নে স্পষ্ট করিয়া লেখা, "Handle with care"। তা ছাড়া, হাতে-লেখা বহুবিধ বিজ্ঞাপন; যথা—"ঘরে থু থু ফেলা নিষিদ্ধ; কারণ, থুথুতে বেসিলাস্ থাকে"; "জোরে কাশিলে জীবনীশক্তি হ্রাস পায়"; "নৃত্যে ও নৃত্যানুরূপ উল্লম্ফনে রক্তের সুচারুরূপে চলাচল হয়" ইত্যাদি। সে ঘরে থাকিলে, দ্বারে আঁটা থাকে 'in', বাহির হইলে 'out'। কিন্তু কাজের ভিড়ে অধিকাংশ সময় উল্টা নিদর্শনই বিজ্ঞাপিত হইত। সে চাকরের আনীত মাছ মাংস ও খাবারের chemical test করিত এবং Hydrometer দ্বারা দুগ্ধের specific weight নির্ণয় করিয়া, গোয়ালার সহিত আইনসঙ্গত মধুর সম্পর্ক দাঁড় করাইত।

পটল আগ্রা, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, মুন্সীগঞ্জ হইতে রাশিকৃত শিলা সংগ্রহ করিয়া, তাহা হইতে লিপি উদ্ধারের চেষ্টা করিত; এবং একদা কাশীমিত্রের ঘাট হইতে একটা সুবৃহৎ প্রস্তর-ফলক বহিয়া আনিয়া, তাহাতে শাহ আলমের উর্দ্দু নিদর্শন পাইয়া, উত্তেজনায় সিঁড়িতে পা ফস্কাইয়া পড়িয়া গিয়া, সম্মুখের দুটি দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। পরে প্রমাণিত হইয়াছিল, উহা চিৎপুরের আতর-বিক্রেতা শাহ আলমের ভগ্ন গেটের সাইনবোর্ড!

অটল ঘরে বসিয়া-বসিয়া নানা চিত্র আঁকিত—রাজপথের পথিকের, গাড়ীর, ঘোড়ার, আকাশের মেঘের, সুন্দরীর অবগুণ্ঠনের; কিন্তু কোন্‌টা পথিক, কোন্‌টা ঘোড়া বোঝা যাইত না, যদি তাহার নীচে লেখা না থাকিত; এবং দর্শক তাহা বুঝিতে যত অপারগ হইত, তাহার আনন্দের মাত্রা ততই বাড়িত;—কারণ, বোঝা না যাওয়াটাই না কি আর্টের mysticism!

পেলব পূর্ব্বে এক সওদাগর-আফিসে মুচ্ছুদ্দি ছিল; এবং কাব্যের নেশায় ডুবিয়া, মাসের ভিতর পঁচিশ দিন অনাহারে আফিস করিত; এবং হিসাবের খাতায় আনমনে কবিতা লিখিয়া, বড়বাবুর গালি খাইয়া আহারের অভাব মিটাইত।

তৎপরে সুইডেনের গোশকট-চালকের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া মাসিক পত্রিকার পরিচালনা সুরু করিয়াছে। তাহার মাথায় কবির মত লম্বা কোঁক্‌ড়ান চুল,—চোখে ফ্রেমহীন চস্‌মা। সে মেয়েদের অনুকরণে ধীরে ও মিহি সুরে কথা কহিত; এবং স্ত্রী-জাতির প্রতি অতিরিক্ত সম্ভ্রমবশতঃ, মেসের মাটি-ওয়ালি ও রজকিনীকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিত। আহার ও শয়নের সময়ও তাহার কাছে খাতা পেন্সিল থাকিত,—কখন যে কাব্য মর্ম্ম-দুয়ারের কড়া নাড়িবে, তাহা মানুষের অজ্ঞাত।

(খ)

কিন্তু মাসের শেষে খরচ খতাইয়া দেখা গেল, মাথা-পিছু চল্লিশ টাকা করিয়া খরচ পড়িয়াছে। পটল সন্দিগ্ধচিত্তে হিসাব খতাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, বিকল বলিল, "মনের স্বাচ্ছন্দ্যে ক্ষুধা-বৃদ্ধি বিজ্ঞানসম্মত"; এবং থার্ম্মোমিটার দ্বারা পাকস্থলীর অবস্থা বুঝাইতে যাইয়া, বার-দুই ওয়াক্‌ করিয়া ক্ষান্ত হইল। অটল দুঃখিত ভাবে জানাইল যে, ওয়াকের সহিত পাকস্থলীটা নির্গত হইলে, অন্তর্জগতের একটা অভিনব চিত্র আঁকা যাইত। পেলব অর্দ্ধ-নিমিলীত নেত্রে কহিল, "হয় ত দেখা যেত, সেখানে হাজার গোলাপ ফুটে আছে।"

পটল বলিল, "কুম্ভকর্ণের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল থাকায়, তার হজম-শক্তি অসাধারণ ছিল; কিন্তু তার মৃত্যুর পর, তার পাকস্থলীটা মিউজিয়মে রাখার বুদ্ধি কোনও রাক্ষসের মাথায় আসে নি। আমাদের পাকস্থলীর বর্ত্তমান অবস্থা কুম্ভকর্ণের অনুরূপ; এবং তা থেকে কুম্ভকর্ণের পাকস্থলী সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা চল্‌তে পারে।"

এমন সময় পেলব চিরুণী দ্বারা তাহার রাশিকৃত চুল দুভাগে চিরিয়া, চাদরখানি দক্ষিণ হস্তের নীচে দিয়া বাম কাঁধের উপর এলাইয়া দিল। বিকল ব্যারোমিটার দেখিয়া কহিল "ঝড় আসন্ন।"

তিড়িং করিয়া দুলাকে নীচে নাবিয়া পেলব কহিল, "কবির নেশা অভিসারিকার চেয়ে মারাত্মক। আজ মাসের শেষ; আগামী মাসের কাগজ বিলি কর্ত্তে হবে যে।"

অটল পেন্সিল তুলিয়া কহিল, "ওহে, শিল্প হিসাবে তোমার গমন-ভঙ্গীটুকু মনোরম। ওপরে উঠে আর একটা লাফ দাও,—ছুটো আঁচড়ে ঠিক করে নি।"

পটল বলিল, "শিলের সঙ্গে প্রস্তর-বৃষ্টি হলে কুড়িয়ে এনো। তা থেকে স্বর্গের বিবরণ উদ্ধার করা যাবে।"

ততক্ষণে পেলব অন্তর্ধান করিল। বিকল Dynamics খুলিয়া অঙ্ক কষিয়া বলিল "সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে নির্ঘাৎ ভিজতে হবে।" বাদলের রূপ কবিতায় ফুটাইবার লোভে পেলব তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

(গ)

মাতৃবিয়োগের অজুহাতে ক'মাস পূর্ব্বে বাসার ভৃত্য ভুতুয়া ছুটি লইয়াছিল। পুনরায় সেই দোহাই দিয়া সে ছুটির আবেদন করায়, বিকল তাহা না-মঞ্জুর করিয়া কহিল, "এক ব্যক্তির দু'বার মৃত্যু সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।"

ভুতুয়া নিরুপায় হইয়া জানাইল, তাদের জাতে ওরূপ হয়। বিকল রাগিয়া বলিল—"সমস্ত মানবজাতির দৈহিক কলকব্জা অনুরূপ,—কাজেই জাতিভেদে মৃত্যুপ্রণালী বিভিন্ন হওয়া অসম্ভব।"

পেলব কহিল, "হয় ত ভাষায় অধিকার না থাকায়, সে মনের ভাব ইচ্ছানুরূপ ব্যক্ত কর্ত্তে পারে নি।"

পটল বলিল,—"যথার্থ কথা। ক্ষত্রিয়ের ও কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহের প্রমাণ আছে। হয় ত ওর বাপ ক্ষত্রিয় বা কুলীন ব্রাহ্মণ।"

ভুতুয়া মাথা নাড়িল, এবং তাহার ছুটি মঞ্জুর হইল। অনুসন্ধান করিয়া চাকর জুটাইবার মত উদ্যোগ ইহাদের ছিল না। পাচক-ঠাকুর একটি ঝি লইয়া আসিল,—নাম তার পাঞ্চালী,—বয়স কাঁচা। বিকল বন্ধুদের সমঝাইয়া দিল যে, পুরুষ ও রমণী বিভিন্ন তড়িৎ সম্পন্ন, কাজেই উভয়ের মধ্যে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবধান না থাকিলে, বজ্রোৎপাদনের সম্ভাবনা। শুনিয়া তাহারা খুব সন্তর্পণে চলিতে লাগিল; এবং ভুতুয়ার প্রত্যাবর্ত্তনের দিন গণিতে লাগিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে তাহারা বুঝিতে পারিল, পাঞ্চালীতে যে তড়িৎ আছে, তাহা স্নিগ্ধ, এবং সাধারণ রমণী হইতে কম মারাত্মক।

ব্যবধান রাখিতে যাইয়া, অনভ্যস্ত হস্তে নিজেদের কর্ম্ম নিজেরা করিয়া, এই কয়দিনে তাহারা বেশ হয়রাণ হইয়া পড়িতেছিল। এইবার স্থির করিল, প্রাতে ও সন্ধ্যায়

তাহারা যখন ছাদে পায়চারি করে, সেই সময় পাঞ্চালী তাহাদের ঘর গুছাইবে।

পাঞ্চালীর কাজকর্ম্মে বেশ সুরুচির পরিচয় পাওয়া গেল; এবং চায়ের মজ্‌লিশে একদিন তাহারা পরস্পরের নিকট তাহা স্বীকার করিল।

পাঞ্চালী আসিবার পর তাহারা আহারের স্থান মুক্ত ছাদে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল কারণ, ক্ষুদ্র পাকশালাটিতে বিভিন্ন তড়িতের সংঘর্ষের আশঙ্কা প্রবল। তাহারা ছাদে আহারে বসিবার পূর্ব্বেই, ঠাঁই করিয়া দিয়া পাঞ্চালী দূরে সরিয়া যাইত। আজ দেখা গেল, পাঞ্চালী যে স্থানে দাঁড়াইয়া, তাহা দৃষ্টিসীমার ভিতর এবং সেখানে সুপ্রচুর জ্যোৎস্না। সকলে মাথা গুঁজিয়া আহার করিতে লাগিল; কিন্তু হঠাৎ কণ্ঠদেশে মাছের কাঁটা বিঁধিয়া যাওয়ায়, অটল ঘন-ঘন কাশিতে লাগিল, এবং বিকল মাথা না তুলিয়াই বলিল, "রক্তের চলাচলে ব্যাঘাত হলে অমন হয়,—এ ক্ষেত্রে গলায় হাত রগড়ে রক্তস্রোত স্বাভাবিক করে দিতে হয়।"

অটল তদ্রূপ করিবার জন্য ঘাড় তুলিতেই দেখিল, অদূরে রজত-জ্যোৎস্না-সমুদ্রের মাঝে নীলাম্বরা রম্ভা বা তিলোত্তমা! সে তুলিকার খোঁজে মেঝ হাত্‌ড়াইতে যাইয়া গ্লাসটা উল্টাইয়া ফেলিল।

বিকল তাহাকে টিপিয়া বলিল—"opposite kinds of electricity attract। চোখে চোখে চেয়েছিলে বুঝি? Battery যে ঐখানেই।" এবং চোখ বুজিয়া নিম্নস্বরে কহিল, "ভাই সব, অবিলম্বে মুদিত চক্ষে খেয়ে ওঠ,—নৈলে বজ্রাগ্নি অবশ্যম্ভাবী।"

(ঘ)

যথাসময়ে অটল ও পেলবের ক্ষুধামান্দ্য হইল; এবং তাহারা এই রোগের প্রকৃত কারণ ও ঔষধ চট্‌ করিয়া বুঝিয়া লইল। দুজনেই বুঝিল, অন্তরের আহার সৌন্দর্য্য, এবং তাহার অভাবেই এ রোগের সৃষ্টি। তখন ঔষধ নির্ব্বাচন কঠিন হইল না। অটল ধরিয়া লইল পাঞ্চালীকে মটো রূপে এবং পেলব মানসী রূপে! সহসা পাঞ্চালীর সহিত তাহাদের ব্যবধানের সীমারেখা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল; এবং পাঞ্চালী তাহা টের পাইয়া, তাহার রূপের বাতিটি উস্কাইয়া দিল। পাঞ্চালী মোটের উপর সুন্দরী ছিল; এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া, অটল আঁকিল নানাবিধ চিত্র, এবং পেলব হৃদয়ঢালা কাব্য!

বেলা এগারটার পূর্ব্বেই বিকল ও পটল কর্ম্মস্থলে যাইত। অটল ও পেলবের কোনও নির্দ্ধারিত সময় ছিল না। পাঞ্চালীর চিত্রটির জন্য নূতন রংয়ের প্রয়োজন বোধ করায় অটলও বারটার পূর্ব্বে বাহির হইল। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া নিরিবিলি পাঞ্চালীর চিত্রটী বেশ আঁকিতে পারিবে, তাহার এ ভরসা ছিল। তাড়াতাড়িতে সে ঘরে চাবি দিতে ভুলিয়া গেল।

পেলব রহিয়া গেল; এবং খালি বাড়ীতে তাহার মাথাটা হঠাৎ চন্‌ চন্‌ করিয়া উঠায়, মাথায় সুগন্ধি তৈল মাখিয়া সে স্নান করিতে চলিল। পথে পাঞ্চালীর সহিত চোখোচোখি হইতেই, সে ঘোম্‌টা টানিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল; এবং ঘোমটার ফাঁকে তাহার দন্তরুচিকৌমুদী দেখিয়া, পেলব অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। পাচক-ঠাকুরের সদুপদেশে সে বেশ কর্ত্তব্যপরায়ণা হইয়াছিল; সে জলের টবটা এইদিকে টানিয়া আনিল। "আহা আপনি কেন" বলিয়া পেলব হাত বাড়াইয়া জলের টব ধরিতে যাইয়া, পাঞ্চালীর হাত ধরিয়া ফেলিল; এবং তৎক্ষণাৎ শিহরিয়া, জলচৌকী ভাবিয়া যে স্থানটায় বসিয়া পড়িল, সেখানে তাহা ছিল না; ফলে, উল্টাইয়া পড়িল। পাঞ্চালী 'আহা-আহা' করায়, তাহার মনে হইল, অমন একটি বীণাঝঙ্কারের খাতিরে সহস্রবার আছাড় খাওয়াও বাঞ্ছনীয়।

পাচকের হঠাৎ মাথা ধরিয়াছিল। পাঞ্চালী ভাত বাড়িয়া আনিবার উদ্যোগ করায় পেবল খুব প্রসন্ন ও পুলকিত হইল। এককৌটা পাউডার ও একশিশি এসেন্স নিমেষে খরচ হইয়া গেল; এবং আসনে বসিয়া তাহার মনে হইল, আজ নিখিলের যত কাব্য তাহাকে ঘিরিয়া!

পাঞ্চালী নিকটে দাঁড়াইয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল; এবং তাহার আগুল্‌ফ্‌লম্বিত চুলের গুচ্ছ উড়িয়া গায়ে পড়ায়, পেলবের মনে হইল, জগতের সমস্ত কাব্য চুলের গোছার আড়ালে লুকাইয়া থাকে; কাজেই সে মাছের ঝোলে সন্দেশ মাখিয়া ফেলিল।

পাঞ্চালী ঘাড় অন্যদিকে ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "রান্না ভাল হয় নি বুঝি? খাবার আনব?"

পেলব খামিয়া বলিল "না,—না, বাইরের আহার শুধু

দেহের সঙ্গে আত্মাটাকে জড়িত রাখবার জন্য। কবি অন্তরের আহারের প্রয়াসী।"

বীণানিক্কন শোনা গেল "আপনি বুঝি কবি?"

পেলব গদগদকণ্ঠে বলিল, "আমার লেখা পড়েছেন? আচ্ছা, কোন্ কবিতাটি আপনার বেশী ভাল লেগেছে—মানসী না অভিসারিকা?"

পাঙ্কালী অপাঙ্গে চাহিয়া বলিল, "কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার কথা বল্‌ব? আপনার যে সবই সুন্দর। কিন্তু দুপুরে আপনারা দোরে চাবী দিয়ে বেরোন,—পড়্‌বার সুযোগ তেমন পাই না ত। ঐটুকুই নিরিবিলি সময়।"

পেলব বলিল, "তাও ত বটে। আচ্ছা, আমার মাসিক পত্রিকা দেখেছেন? ও দেখেন নি! চমৎকার! একেবারে প্রথম শ্রেণীর। তার বয়স এই তিনমাস; কিন্তু এর ভেতর গ্রাহক এক হাজারের কম নয়।"

পাঙ্কালী বলিল "সত্যি না কি? বেশ আয় দাঁড়ায়?"

পেলব বলিল "নিশ্চয়। তিন টাকা করে হাজারের দাম ধরুন তিন হাজার টাকা। খরচা বাদে দু হাজার লাভ ত থাক্‌বেই। এত অল্প সময়ে এত নাম কোনও মাসিকেরই হয় নি। আপনি কি লিখ্‌তে পারেন?"

পাঙ্কালী মৃদু হাসিয়া বলিল, "না। তবে পড়তে ভালবাসি।"

পেলব বলিল, "আমি আপনাকে লেখিকা তৈরী কর্ব। আমরা মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পারি, কার ভেতর প্রতিভা আছে।"

পাঙ্কালী মাথা দুলাইয়া বলিল, "বাপ রে, ঝি কি না লেখিকা।"

পেলব সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "কেন হতে পার্ব্বে না? এ দেশ ছাড়া আর সব দেশে হয়। গোবরে কি পদ্ম ফোটে না? আর আমি বেশ জানি, আপনি বড় ঘরের মেয়ে,—অবস্থা-বিপর্য্যয়ে—"

পাঙ্কালী বলিল "থাক সে সব কথা। চাবী, অবশ্য আপত্তি না থাক্‌লে, আমায় দিন,—নিরিবিলি পড়ব। আপনার কবিতাগুলো মুখস্থ কর্ত্তে ইচ্ছা হয়।"

"এই নিন" বলিয়া পেলব চাবী তাহার হস্তে দিল; এবং মৃদু হাসিয়া আবৃত্তি করিল, "কাব্য-কুটীরে প্রবেশিতে চাই জাতি-যূথিকার মালা।"

পাঙ্কালী বলিল, "এ পোড়া দেশে ফুল কিন্‌তে হয়। কাছে বাগান থাক্‌লে, আপনার ঘরটি ফুলে ভরে তুল্‌তেম। যান্ না, কিছু ফুল কিনে আনুন, মালা আর তোড়ায় ঘরটি আপনার উপযুক্ত করে তুলি।"

পেলব প্রায় নাচিয়া কহিল, "একেবারে কবির হৃদয় আপনার। আমি এখুনি যাচ্ছি।" সে চাবীটা চাহিয়া লইয়া বাক্স খুলিল; এবং নোটের তাড়া হইতে একখানি দশ টাকার নোট লইয়া চাবীটা পাঙ্কালীকে প্রত্যর্পণ করিল। তৎপরে বেশ-ভূষা করিয়া পাঙ্কালীর পানে উজ্জ্বল নেত্রে চাহিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পাঙ্কালী কিছুক্ষণ দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর চাপা গলায় পাচককে ডাকিল, "অ নন্দ ঠাকুর,—বলি অ রাঁধুই বামুন—"

পাচক-ঠাকুর দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "কি গো ঝি, জালের কদ্দুর?"

পাঙ্কালী ভঙ্গিমা সহকারে বলিল, "শুধু গুটিয়ে নেওয়া বাকী। দেখ ত কটা ঘর খোলা। দিব্বি সব মন-ভোলা বাবু পেয়েছ।"

নন্দঠাকুর বলিল, "তাই ত তোকে এনেছি। তুই ত ঝিগিরি কর্ত্তে রাজি হোস নি। এখন?"

পাঙ্কালী পেলবের বাক্স খুলিতে-খুলিতে বলিল, "চটপট কর। বেচারা আমাকে একটি বিদুষী ঠাউরেছে। গো-বেচারা মানুষ! তুমি ততক্ষণ ও-ঘরগুলো দেখে এসো, বুঝলে? আর চম্পট দেবার আগে কবি আর চিত্রকরের ঝগড়ার বন্দোবস্ত করে যাব,—তাতে বেশ গুছিয়ে সরা যাবে।"

(৬)

কিছুক্ষণ পরে পাঙ্কালীর চিত্রে রং ফলাইবার উপযোগী বর্ণের সরঞ্জাম সহ অটল ফিরিল; এবং নিজের ঘরে যাইবার পথে পেলবের দুয়ারের সম্মুখে ছবিখানি লুটাইতে দেখিয়া, পেলব তাহা সরাইয়াছে মনে করিয়া, রাগিয়া টং হইল। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাবিয়া লইল, ইহা শুধু তাহার মটোকে অপমান করা; এবং নিজের দুয়ারের কাছে পাঙ্কালীর উদ্দেশে লিখিত পেলবের একটি কবিতা পাইয়া, সে তাহাতে ফাউণ্টেন পেনের কালী ঢালিয়া দিয়া, পেলবের মানসীর অপমান

করিল; এবং তাহার নীচে "প্রতিশোধ" লিখিয়া, পেলবের দেরাজের কাছে রাখিয়া আসিল।

এমন সময় একরাশি ফুল লইয়া পেলব ফিরিয়া আসিল; এবং তাহার কাব্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া, হঠাৎ আগুন হইয়া, চীৎকার করিল "কাব্যের অপমান! অ-কবি অ-মানুষ—"

মুখ ভ্যাংচাইয়া অটল বলিল—"আর আর্টের অপমান! অনার্টিষ্ট, অনাচারী—"

পেলব বলিল—"আমি তোমার সম্বন্ধে শাণিত কবিতা লিখে পত্রিকায় ছাপব।"

অটল বলিল—"আমি তোমার নারকীয় চিত্র এঁকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখব।"

বিকল ও পটল আসিয়া জিজ্ঞাসিল, "ব্যাপার কি?" অটল ও পেলব লম্ফ দিয়া এম্পিথিয়েটারে দ্বন্দ্ব যোদ্ধাদের ভঙ্গিমায় পরস্পরের সম্মুখীন হইল, এবং রাগের আধিক্যে পরস্পরের প্রতি যে উক্তি করিল, প্রথমটা তাহার অর্থ বোঝা গেল না।

বিকল বলিল—"টেম্পারেচারের আধিক্যে মস্তিষ্ক বিকার। এখুনি দার্জ্জিলিং বা সিমলায় হাওয়া পরিবর্ত্তনে যাওয়া দরকার।"

পেলব চীৎকার করিল "সুধিবৃন্দ, আমার কবিতার অপমান!"

অটল চেঁচাইল—"মশাইগণ, আমার ছবি বে-ইজ্জত!"

পটল বলিল—"কবিতা ও চিত্র দুই-ই স্ত্রী-জাতীয়। কাজেই এ অপমানের প্রায়শ্চিত্ত কঠোর। স্ত্রী জাতির প্রতি অপমানের প্রায়শ্চিত্ত এ দেশ বহুদিন ধরে কচ্ছে,—তবু শেষ হয় নি।"

পেলব আস্ফালন করিল "আমার মানসী—"

অটল লম্ফ দিল "আমার মটো—"

বিকল বলিল—"বিস্তারিত রূপে বিবৃত না হলে, এ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত করা চলে না।"

পেলব ও অটল ব্যাপার বিস্তৃত ভাবে কহিলে, বিকল মাথায় হাত দিয়া কহিল—"Electricity! এবং ফলে বজ্রাঘাত ও মৃত্যু।"

পটল বলিল—"শুম্ভ-নিশুম্ভের পতনের কারণ এইরূপ।"

বিকল বলিল—"উত্তেজিত স্নায়ুতে চায়ের কার্য্যকারিতা অত্যাশ্চর্য্য। অনেক হোমিওপ্যাথ যেমন প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে সালফর নির্ব্বাচন করে, এও সেই রকম। চায়ের পর এদের anti electric solution প্রয়োগ করা চলবে।"

চায়ের জন্য প্রথমে পাচক, তৎপরে ঝির খোঁজ করিয়া দেখা গেল, দুজনেই অনুপস্থিত। তখন তাহারা নিজেরাই রান্নাঘর হইতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। উত্তেজনায় অটল ও পেলবের কাপড়-চোপড় ছাড়া হয় নাই। তাহারা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করিল; এবং পরক্ষণেই প্রায় এক সঙ্গে গলা ছাড়িয়া করুণ বিলাপ করিয়া উঠিল।

বিকল ও পটল ছুটিয়া গেলে, অটল বলিল—"হায়, হায়! আমার এপলো, ডায়েনা—"

পেলব কাঁদিয়া কহিল—"অহো-হো আমার রূপোর ফুলদানী, এস্রাজ, হারমোনিয়াম—"

বিকল ও পটল সমস্বরে জিজ্ঞাসিল "চুরি না কি?"

অটল বলিল—"ওগো আমার ক্যামেরাটা।"

পেলব ফুকারিয়া উঠিল—"আমার সোণার দোয়াত, নোটের তাড়া—"

পটল চিন্তা করিয়া কহিল, "বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মিশর দেশে এবম্বিধ চুরি হয়েছিল,—চোর নিশ্চয় তাদের বংশোদ্ভূত।"

বিকল বলিল—"Prevention is better than cure। প্রথম অবস্থা অতীত, কাজেই দ্বিতীয় অবস্থার শরণ নিতে হয়। থানায় এখুনি টেলিফোঁ করা উচিত; কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ গৃহে টেলিফোঁর বন্দোবস্ত নেই। এ জন্য বিনা তারে টেলিফোঁর ব্যবস্থা সকলের জানা কর্ত্তব্য। ডক্টর বোস বৈদ্যুতিক স্পন্দন থেকে—"

পটল বলিল—"কিন্তু ঘটনাটা শিলাতে লিপিবদ্ধ করে পাঠালে, থানাদারের বেশী impressive হবার কথা।"

অটল দুঃখ করিয়া কহিল,—"আহা, ক্যামেরাটা ঘরে fit করা থাকলে, নিশ্চয় তাতে চোরের ফটো উঠত; এবং তদন্তের সুবিধা হত।"

বিকল ঘরের মেঝে পরীক্ষা করিয়া প্রসন্ন চিত্তে কহিল—"দেখ, চোর আমার বিজ্ঞানের সম্মান রেখেছে,—ঘরে পথ্য ফেলে নি এবং জুতোর চিহ্ন বিদ্যমান।"

পেলব আক্ষেপ করিয়া কহিল,—"আগে জানলে 'চুরি করা পাপ', 'অপরের দ্রব্য না বলে কয়ে নিলে চুরি হয়' এ সব লিখে রাখতেম।"

চা পান করিয়া সকলে থানার দিকে রওনা হইল। পেলব এজাহার লিখিল কবিতায়, ওজস্বিনী ভাষায়; এবং অটল আঁকিল কক্ষের নক্সা।

সকলে একটা গলির ভিতর দিয়া পাড়ি দিবার সময়, সহসা একটা খোলার ঘরের দ্বারে দৃষ্টি পড়ায় অটল লাফাইয়া উঠিল, "আমার মটো।" পেলব লম্ফ দিল "আমার মানসী।"

সকলে দেখিল, পাঞ্চালী সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। অটল এক লম্ফে আগু হইয়া বলিল "পাঞ্চালি, আমি অটলচন্দ্র,—অটলবাবু।"

পেলব তাহার অঞ্চল প্রায় ধরিয়া বলিল—"এবং আমি পেলব,—পুষ্প-পেলব।"

পাঞ্চালী গ্রীবাভঙ্গী করিয়া কহিল—"কৈ, আপনাদের চিনি বলে বোধ হচ্ছে না ত।"

অটল ও পেলব চক্ষুতারকা কপালে তুলিয়া কহিল—

"চেন্‌ না আমাদের! ঐ যে মির্জ্জাপুরের বাড়ী, ঐ যে গো 'যেখানে—"

পাঞ্চালী দাঁতে হাসি চাপিয়া মাথা দুলাইয়া বলিল—"না বাবু, মির্জ্জাপুরের দিকে কস্মিন্‌ কালে আমি পা বাড়াই নি।"

অটল ও পেলব কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

পটল বলিল—"লব-কুশের চেহারায় এইরূপ সৌসাদৃশ্য ছিল। আকৃতির সাদৃশ্য বিস্ময়জনক নয়।"

অটল মলিন মুখে বলিল—"চুরি গেছে ক্ষতি নেই,—কিন্তু আমার মটো যে হারিয়ে গেল! তা—তা, মটো ছাড়া নিখুঁত ছবি হয় না কি না,—তুমি না হয় এই—"

পেলব হাত কচ্‌লাইয়া বলিল—"আর মানসী ছাড়া খাঁটী কাব্য জন্মে না,—তা আপনি না হয় আমার সঙ্গে চলুন।"

পাঞ্চালী বলিল—"মাত্রা বুঝি বেশী হয়েছে বাবু! ভালোয়-ভালোয় এই বেলা সরে পড়ুন নৈলে পুলিশ ডাক্‌ব।"

বিকল বলিল—"অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক উত্তর। যথেষ্ট বিদ্যুতের পরিচায়ক।"

পটল বলিল—"নিশ্চয় এ রাজপুত, মারহাট্টা বা আবর রমণী। তাদের দাঁতের সঙ্গে এর দাঁত পরীক্ষা কর্লে ঠিক বোঝা যায়।"

অটল আগু হইয়া বলিল "না গেলে অন্ততঃ ঠোঁট, কপোল, ভ্রু এ সবের একটা মাপ নিতে চাই। তাতে নিখুঁত চিত্রের পরিমাপ পাওয়া যাবে।"

পেলব হাত বাড়াইয়া কহিল—"আপনার কেশগুচ্ছ পেলে কাব্য রচনা চলে,—রমণীর চিকুরে নিখিলের কাব্য।"

পাঞ্চালী ভয় পাইয়া "চোর, চোর" চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং পাচক ঠাকুর বংশদণ্ড হস্তে রঙ্গভূমে দেখা দিল। তখন বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, আর্টিষ্ট ও প্রেমিক প্রায়ান্ধকার রাস্তা দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে মুক্তকচ্ছ অবস্থায় ছুটিতে লাগিল।

মেসে ফিরিয়া একটু দম্‌ ধরিবার পর বিকল বলিল "Power houseএর ঢের খরচ বেঁচে যায় যদি সেখানে dynamoর বদলে স্ত্রীলোক রাখা যায়, কারণ স্ত্রীলোকের তড়িৎ তীব্র ও শক্তিশালী।"

পটল বলিল "আমাদের "শূর্পনখা বা হিড়িম্বার শোণিত এর শিরায় আছে, কিন্তু লক্ষ্মণ বা বৃকোদরের শক্তি আমাদের নেই, থাক্‌লে পরাজিত হতেম না।"

বিকল বলিল "আমাদের আহার্য্য বস্তুতে তড়িতের পরিমাণ কম। সমুদ্রে অনেক মাছ আছে, যাতে তড়িৎ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। সে সব আহার কর্লে শক্তি বর্দ্ধিত হয়।" পটল বলিল "রামায়ণ মহাভারতের যুগে নিশ্চয় এ দেশে কড্‌ মাছের তৈল অত্যধিক ব্যবহৃত হত।"

অটল ও পেলব মুখ শ্রাবণের আকাশের মত করিয়া বসিয়া ছিল। বিকল তাহাদের পানে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমাদের দীর্ঘকাল বৈদ্যুতিক চিকিৎসাধীন থাকা দরকার। Frenzy রয়ে থাকায়, তোমাদের দৈহিক তড়িতের সাথে মানসিক তড়িৎও কমে গেছে। ফলে তোমরা দুয়ারে চাবী দিতেও ভুলে যাও, এবং তাই চোরের এ উপদ্রব। দেখ, আমার ঘরে ডবল তালা, তা সত্বেও, চোর ধরবার ট্রাপের (trap) জন্য আমেরিকায় লিখ্‌ব ভাবছি।"

পটল বলিল "Frenzy জিনিসটাই খারাপ। সাগর মন্থন থেকে পদ্মিনীর ইতিহাস তার প্রমাণ।"

বিকল বলিল, "হাজার-একবার। ওরা কণ্ঠে বীণা শোনে; কিন্তু তা বেশী hitchএর বায়ুকম্পন মাত্র। ওরা বর্ণে মাধুরী দেখে; কিন্তু তা সূর্য্যের সপ্তবর্ণের কোনও একটার প্রতিফলন। এ শুধু বিজ্ঞান না জানার ফল।"

পটল বলিল "এবং প্রত্নতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার পরিণাম।"

বিকল একটু ভাবিয়া কহিল, "কল্পনা একটা উৎকট ব্যাধি, এবং এর বীজাণু স্পর্শাক্রমক না হলেও, যক্ষার চেয়ে কম মারাত্মক নয়। এ বীজাণুর প্রধান কার্য্যকারিতা মস্তিষ্কে; এবং অল্প দিন মধ্যে মস্তিষ্ক ঘুণেধরা বাঁশের চেয়েও অন্তঃসারশূন্য করে; এবং মস্তিষ্ক-বিকৃতির অত্যধিক সম্ভাবনা। শেষদশায় কল্পনাপ্রিয় কোনও ব্যক্তি তাই অনুতাপ করে বলেছেন,

"The lover, the philosopher, and the poet,
Are by imagination all compact.—"

পটল বলিল, "অত্যন্ত খাঁটি কথা। একটু বদ্‌লে এর শিলালিপি তৈরী কর্ত্তে হবে।

"The lover, the artist, and the poet,
Are by imagination all compact.—"

বিকল বলিল "আমি জার্ম্মানী থেকে একটা Nerve cell আনিয়ে এই বীজাণু নয়ে experiment কর্ব্ব। দেহে যথেষ্ট বিদ্যুৎ থাক্‌লে, এ সব ব্যাধি সহজেই সেরে যায় —এ কথা প্রমাণিত কর্ব্ব।"

যন্ত্রটা না আসা অবধি বিকল অটল ও পেলবের জন্য আতপ তণ্ডুল, কাঁচকলা, মাগুর মাছ ও কড্‌লিভারের ব্যবস্থা করিল।

অটল ও পেলবের প্রতিবাদ করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। তাহারা সম্প্রতি এ ব্যবস্থাই মানিয়া লইল; এবং গোপনে সংবাদপত্রে চাকুরীর বিজ্ঞাপন দিয়া আসিল।

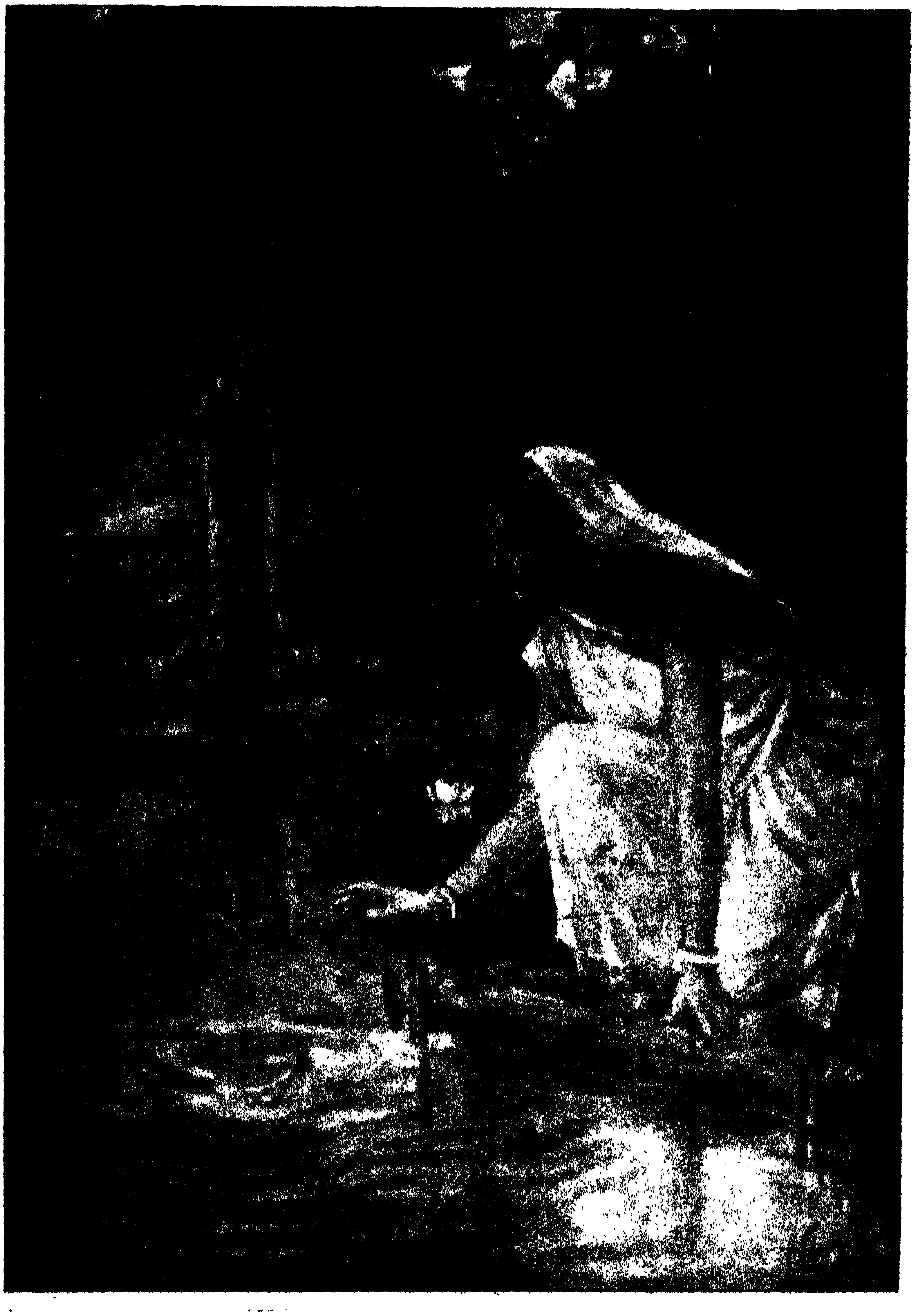

চিন্তা

পোড়া শোল মাছের পলায়ন]

শিল্পী - শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার

কর্ব্বাইন্‌স কোভ—আন্দামান

চুম্বন-মদিরা

শিল্পী—ডি, ময়তমি।

[শ্রীযুত তারকব্রহ্ম চৌধুরী ও শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের শিল্পসংগ্রহ হইতে]

পাষাণ-ঘেরা সাগর-তীর

[চিত্রাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু—]

মৃত্যুবাসরে রোমিও ও জুলিয়েট

শিল্পী—এ, ওপেনহাম।

[শ্রীযুত তারকব্রহ্ম চৌধুরী ও শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী
মহাশয়ের শিল্প-সংগ্রহ হইতে]

নৃত্যশীল গণেশ মূর্ত্তি

[সার্ভে অব ইণ্ডিয়া আফিসের টেকনিক্যাল আর্ট সিরিজ, ১৯০৭; ৬নং প্লেট হইতে সংগৃহীত]

[নেপাল হইতে প্রাপ্ত পিত্তল-নির্ম্মিত বেদীর উপর মূর্ত্তি স্থাপিত, ইহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর]

বিরহ-বিধুরা

[চিত্র-শিল্পী—শ্রীযুক্ত অজিতকুমার সেন মহাশয়ের শিল্প-সংগ্রহ হইতে]

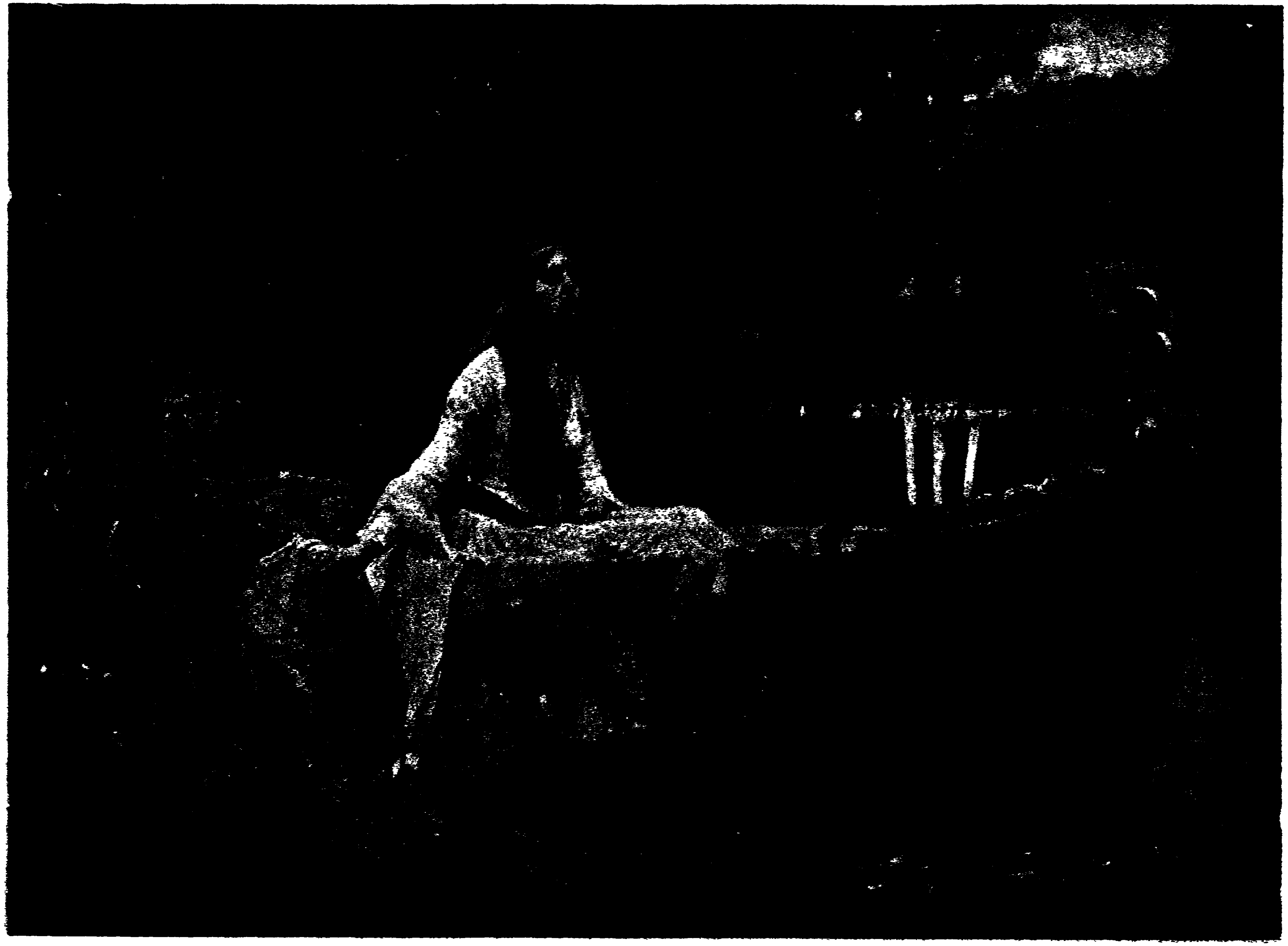

লেডি অফ্ শ্যালট্ (প্রিয়তমের উদ্দেশে)

[শ্রীযুত তারকব্রহ্ম চৌধুরী ও শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী
মহাশয়ের শিল্প-সংগ্রহ হইতে]

শিল্পী - জে, ডি, বহু, ওয়াটার হাউস্ আর, এ

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]

উপন্যাস (২)

আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত কথা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বুঝিতে পারিলাম, আমি উপন্যাস সম্বন্ধে গত দুই মাসে যাহা বলিতে চাহিয়াছি, তাহা আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল; এবং তাঁহাদের কথামত এবারও আমি উপন্যাস সম্বন্ধে কয়েকজন বড় বড় ঔপন্যাসিকের মত আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য আরও পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব।

মনীষিগণের শক্তির বিচার করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাহার উপর তাঁহাদের উদ্ভাবনী শক্তির বিশ্লেষণ-কার্য্য আরও কঠিন ব্যাপার। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে সে শক্তি দর্শনশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়; বিশ্বসংসারকে প্রকৃত ভাবে দেখাই মনীষীদের কার্য্য; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই প্রেক্ষণ-কার্য্য বা দৃষ্ট বিষয়ের যথাযথ বর্ণন কার্য্যে তাঁহাদের শক্তি সর্ব্বতোভাবে ব্যয়িত হইয়া যায় না। অভিজ্ঞতার বলে তাঁহারা আদর্শ নরনারী সৃষ্টি করিয়া থাকেন। চিত্রকর যেমন 'মডেল' সম্মুখে রাখিয়া চিত্র অঙ্কিত করেন, কিন্তু সে চিত্র মডেলের অনুরূপ নকল নয়; তেমনি কথা-সাহিত্যিকদের সৃষ্ট নরনারী পরিদৃশ্যমান নরনারীর ছায়া-চিত্র বা ফটোগ্রাফ নয়। র‍্যাফেলের 'ম্যাডোনা'-মূর্ত্তি বা হিন্দুর জগদম্বা বা যশোদা মূর্ত্তি মাতার মূর্ত্তভাব। কথা-সাহিত্যিকদের সৃষ্ট নরনারীও সেইরূপ মূর্ত্তভাব। শক্তির তারতম্যানুসারে এই মূর্ত্তভাব কখনও কালোচিত হইয়া থাকে, আবার কখনও কালের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া সকল কালের জন্য ব্যক্ত হইয়া আনন্দ দান করিয়া থাকে। সাধারণ মানুষের শক্তি ও মনীষার পার্থক্য এইখানেই। সাধারণ মানুষ সংসারকে ব্যষ্টিভাবে দেখিতে জানে না। আর মনীষীরা সেই ভাবেই দেখিয়া থাকেন। সাধারণ লোকেরা আপনার স্বার্থের দিক হইতে, আর মনীষীরা অসীমের দিক হইতে—পরার্থপরতার দিক হইতে—সংসারকে দেখিয়া থাকেন। তাই শক্তিধর মনীষা-সৃষ্ট নরনারী আদর্শ নরনারী, সকল সময়োপযোগী, আর সাধারণ শক্তিসম্পন্ন লেখকের সৃষ্ট নরনারী কালোপযোগী। যে কথাটা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি সেটা আর ও একবার বলি, শেষোক্ত শ্রেণীর লেখকেরা নকলনবীশ পটুয়া মাত্র; আর প্রথম শ্রেণীর লেখকেরা শক্তিমান কলাবিৎ (Artist)।

সেই ঔপন্যাসিককেই আমরা বড় বলিয়া মানিয়া লইব, যাঁহার সৃষ্ট আদর্শ নর-নারী ভাবের দ্যোতনা করিয়া দিবে—হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের লহর তুলিয়া দিবে। ভাবের কষ্টি-পাথরে যাচাই না করিয়া আমরা কোন ঔপন্যাসিককেই বড় বলিয়া স্বীকার করিব না। তাঁহাদের অঙ্কিত মূর্ত্তভাব গুলি সমাজের মঙ্গলকামী যাহাতে হয়, তাহার দিকে ও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে সাহিত্য মানবতার

ইতিহাস—পশু-প্রকৃতি মানবকে দেবত্বে পরিণত করাই সাহিত্যের অন্যতম কর্ত্তব্য। সমাজ-সংস্থিতির ভিত্তিকে দৃঢ় রাখিতে সাহিত্যই একমাত্র সহায়।

জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সামাজিক আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানগুলি একরূপ নয়। জাতীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া—অতীত পারম্পর্য্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—জাতীয়-সাহিত্য গঠিত করিতে হইবে। জাতীয়-সাহিত্য গঠনে কথা-সাহিত্যিকদের কৃতিত্ব বড় কম নয়।

এইবার আমরা ঔপন্যাসিকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করিব। সে দিন গিয়াছে, যে দিন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধূয়া ধরিয়া আমরা বলিতাম Art is for art কলা, কলার জন্য। কলার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। গল্প বা উপন্যাসের উদ্দেশ্য জানিবার কোনরূপ প্রয়োজনই নাই। কেবল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হইয়াছে কি না দেখিতে হইবে। আবার এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য-লেখকেরা এই সৌন্দর্য্যকে নগ্ন সৌন্দর্য্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, কুৎসিত নগ্ন সৌন্দর্য্যের চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন। ঋষি টলষ্টয় এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাঁহার অনবদ্য সুন্দর What is Art পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ ভায়া ১৩২০ সালে তাঁহার মালদহ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে এ কথাটা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন (ভারতবর্ষ ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৯৬০ পৃষ্ঠা)। তারপর অনেকে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ফরাসী কথা-সাহিত্যে প্রথিতযশঃ জোলা তাঁহার Down fall পুস্তকের উপক্রমণিকায় কি বলিতেছেন একবার অবহিত ভাবে শুনুন, "আমার উপন্যাসগুলি কেবল মাত্র আনন্দ দান করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই। সেগুলির ভিতর একটা বড় উদ্দেশ্য আছে (higher aim)। গত শতকে নাটকই ভাব-প্রকাশের প্রকৃষ্টতম উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। আমার মনে হয় এ ধারণা ভ্রান্ত ধারণা। গীতি-কবিতা ও উপন্যাস যেরূপ সহজে ও সরলভাবে মনোগত ভাব বুঝাইতে পারে, সাহিত্যে আর কিছুই সেরূপ পারে না। এই কারণেই আমি উপন্যাসের ভিতর দিয়া আমার বক্তব্যগুলি পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছি। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যে সকল সমস্যা উদয় হয়, সেই সকলের সমাধান করিবার চেষ্টা আমি উপন্যাসের ভিতর দিয়াই করিয়াছি। আমার বিশ্বাস এইরূপ না করিলে আমি অন্যভাবে প্রবন্ধাকারে ঐ সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতাম। গত শতকে সাহিত্যের আসরে কথা-সাহিত্যের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা আজ আর নাই। কথা-সাহিত্য এখন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহা কাহিনী ও গ্রাম্য-গীতির সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত ছিল। তখন সময় অতিবাহিত করিবার জন্যই লোকে কথা-সাহিত্য পাঠ করিত। আজ উপন্যাসের ভিতর সকল সমস্যাই দেখিতে পাওয়া যায়, অন্ততঃ থাকিতে পারে। আমার ধারণা এই সমস্যা-সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় উপন্যাস সাহায্যে হইতে পারে, বলিয়া আমি ঔপন্যাসিকের আসন গ্রহণ করিয়াছি। কোনও কোন বিষয়ে জগতের চিন্তাধারার মধ্যে আমারও কিছু দিবার আছে বলিয়া উপন্যাসের সাহায্যে আমি তাহা দিতে চাই।" আর এই কথার অনুরূপ কথাও আমরা গতবারে লিখিয়াছি যে, ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্রের ভিতর বিংশ শতাব্দীতে যে সকল সমস্যা উঠিয়াছে বা উঠিতেছে তাহাদের সমাধান চেষ্টা দেখিতে চাই। এই সকল সমস্যা ছাড়িয়া কেবল চরিত্র-সৃষ্টি করিলে, ঔপন্যাসিকদের দায়িত্ব শেষ হইবে না। ঔপন্যাসিক শুধু স্রষ্টা নয়—তিনি বিচারক। সমস্যাগুলির দোষগুণ সকল দিক হইতে বিচার করিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।

অধুনা জনকয়েক ইংরেজ ঔপন্যাসিকের মধ্যে এ বিষয়ে একটু আলোচনা হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাঁহাদের বক্তব্যের সারাংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম। Miss Cicely Hamilton বলেন, কলার দিক হইতে দেখিলে আধুনিক উপন্যাস প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখনকার উপন্যাস পুস্তিকার (tract) মত। মনোগত ভাব বুঝাইবার সহজ পন্থা উপন্যাস সাহায্যে হইতে পারে সত্য, কিন্তু কলার অবনতির সহিত উপন্যাস এমন সাধারণ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সেখানে দাঁড়াইয়া আর ইহা উচ্চভাব প্রকাশ করিতে পারে না। Miss Sheila Kaye-Smith এর ধারণাও এইরূপ। John Galsworthy ও Miss Clemence Dane এ মত সমর্থন করেন না। John Galsworthy বলেন, "সাহিত্যের

নানা দিক দিয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা আমি করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে আমার ধারণা উপন্যাসের ভিতর দিয়া সহজে যেরূপ ভাব ব্যক্ত করা যায়, সাহিত্যের কোন বিভাগের সাহায্যে তদ্রূপ পারা যায় না। সাধারণ লোকেও উপন্যাসের ভিতর দিয়া বেশ সহজে বুঝিতে পারে। অবশ্য ভাল উপন্যাস লেখা, সহজসাধ্য ব্যাপার নয়—খুব শক্ত। উপন্যাসের ভিতর দিয়া শিক্ষা ও আনন্দ, সমাজ যেরূপ সহজে পাইয়া থাকে, সাহিত্যের অপর কোন বিভাগ হইতে ততটা পায় না। নাটক বা কাব্য হইতেও তাহা তত সহজে পাওয়া যায় না। শ্রমজীবীদের জীবন আলোচনা করিয়া আমি এই বক্তব্যে উপনীত হইয়াছি। প্রথমতঃ সহজ উপায়ে কল্পনার অভিব্যক্তি দেখাইতে উপন্যাস যেরূপ পারে, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ততটা পারে না। দ্বিতীয়তঃ শ্রমজীবীরা উপন্যাস হইতে সহজে শিক্ষা লাভ করিয়া আপন আপন চরিত্র গঠন করিতে পারে।" বাস্তবিক কল্পনার বিকাশ-সাধন না হইলে সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। কোন ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমে কল্পনার সাহায্য লওয়া আবশ্যক। কল্পনা-বলে প্রথমে আমরা কারণটীকে ধরিয়া লইয়া, দেখিতে চেষ্টা করি কার্য্য উৎপাদন করিবার শক্তি তাহার আছে কি না, যদি প্রমাণিত হয় সর্ব্ব স্থানে তাহার ঐ কার্য্য উৎপাদন করিবার শক্তি আছে, তাহা হইলে কল্পনাবলে ধৃত কারণটীকে আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। এ কথাটাও কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, কল্পনার উদ্দামগতি ভাল নয়। কল্পনাকে বিচার শক্তি বলে সুনিয়ন্ত্রিত করা উচিত। আর উপন্যাস সাহায্যে যখন এই কল্পনার বিকাশ সাধিত হয়, তখন Galsworthyর সহিত আমরাও বলিতে চাই উপন্যাস ভাবপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র।

Miss Clemence Dane, Miss Cicely Hamiltonএর প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, উপন্যাস মুমূর্ষু অবস্থায় আসে নাই, আসিতে পারে না, কারণ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য গল্পের প্রতি আস্থা নরনারীর কোন দিনই হ্রাস হয় নাই। 'অডেসি'র চাপমান কৃত অনুবাদ আকারে গল্প না হইলেও প্রকৃতিতে গল্প। এখনও পর্য্যন্ত ইহা মানুষকে আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে। "আরব্য রজনী" উপন্যাসের সমষ্টি মাত্র। ভাল রূপে গল্প লিখিবার শক্তি না থাকায় ইংরাজী সাহিত্যে বহুদিন উৎকৃষ্ট উপন্যাস বাহির হয় নাই, কিন্তু গত ২০ বৎসরের ভিতর অনেকগুলি রত্ন এই শ্রেণীতে প্রসূত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বজন সমাদৃত ছয়খানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল "Mr Polly" "Kim" "The Captives," "The Real Charlotte," "The Tower of Oblivion" "The Man of Property". "The Rescue" উপন্যাস প্রকাশিত হইবার কয় দিনের মধ্যে এমন সুন্দর সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে?

Miss Cicely Hamilton যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। ইংরাজী উপন্যাসের গতি একটু মন্দা হইয়াছে সত্য; কিন্তু, য়ুরোপীয় অন্যান্য জাতির উপন্যাস পাঠ করিলে কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য নয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বরং তাঁহার প্রতিপাদ্য যাহা, তাহার বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চভাব প্রকাশ করিতে ও নানাবিধ সমস্যার সমাধান করিতে উপন্যাস সাহায্যে যত সহজে পারা যায়, সেরূপ সমাধান প্রবন্ধ লিখিয়া তত সহজে হৃদয়গ্রাহী করা যায় না। প্রবন্ধের বর্ণিতব্য বিষয়গুলি সকল সময়ে মানব মনে চিরস্থায়ী রেখা পাত করিতে পারে না, কিন্তু উপন্যাসের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বেষ্টনীর ভিতর দিয়া ও নূতন নূতন চরিত্রের সাহচর্য্যে যে সকল তথাকথিত অবান্তর বিষয়ের অবতারণা হইয়া থাকে সেগুলি আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়। মনীষার বর্ণনভঙ্গী গুণে সেগুলি আমাদিগকে আনন্দ ও শিক্ষাদান করিয়া থাকে। তরলমতি অসহিষ্ণু পাঠকের নিকট এগুলির মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু চিন্তাশীল পাঠকদিগের নিকট এই সকলের মূল্য অত্যন্ত অধিক। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র গল্পাংশ বাদ দিয়াও যদি কোন চিন্তাশীল পাঠক আলোচিত বিষয়গুলি সম্যক্ ভাবে পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার যে জ্ঞানের ভাণ্ডার বর্দ্ধিত হইবে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

তাই পূর্ব্বেও যাহা বলিয়াছি, আবার তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলি, উপন্যাসের ভিতর দিয়া চাই আমরা সকল রকম সমস্যার সমাধান। ঐ সকল সমস্যার সমাধান যিনি যে ভাবে করিতে পারেন, তিনি সেই ভাবেই করুন। লেখকের স্বাধীনতার উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার

ক্ষমতা নাই সত্য, কিন্তু লেখক মহাশয়দের কাছে আমাদেরও একটা অনুযোগ আছে, যেন তাঁহারা সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমাজের মঙ্গলের যাহা অনুকূল হইবে সেইরূপ চিত্র অঙ্কিত করেন; আর ঔপন্যাসিকের এইরূপ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এ সম্বন্ধে সম্প্রতি Evening Standard পত্রিকায় ধর্ম্মযাজক Dean Inge ঔপন্যাসিক দিগের নিকট অনুরোধ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা ২৩শে জুন তারিখের Indian Daily News পত্রিকা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন; নিম্নে আমরা তাহার সারাংশের অনুবাদ করিয়া দিলাম। "ভীষণ যুদ্ধের পরিণতি ফলে দেশের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বিশদভাবে বলিতে হইবে না। যে সকল কথা-সাহিত্যিক সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এক্ষণে এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা উচিত যাহাতে নর-নারীর চরিত্র উন্নত হয়—সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। সমাজ জীবনে বোধ হয় এরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তা আর কখনও এত অধিক পরিমাণে অনুভূত হয় নাই। এখন সাধারণ মানবের মনকে সত্যের দিকে, ন্যায়ের দিকে, মহতী ধারণার দিকে, নির্ম্মল ও সুন্দর ভাবের দিকে লইয়া যাওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

সপ্তদশ শতকে গৃহ-বিবাদের (Civil War) পর; ও শত বৎসর পূর্ব্বে নেপোলিয়নের যুদ্ধের অবসানে লম্পট-দিগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এবার ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। ইহার ফলে দেশ যে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে তাহা কি আর কাহাকেও অধিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে। রাস্তায়, ঘাটে, পথে, যে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা রোধ করিবার শক্তি আমার বিশ্বাস কেবল মাত্র সাহিত্যিকদিগেরই আছে। পবিত্র ও উচ্চ ভাব এই ব্যভিচারকে দমন করিতে পারে। (A pure and elevated tone in popular literature would do much to diminish the evil and bring it to an early end.)

এই স্রোতে গা ভাসান দিয়া সাহিত্যিকদিগের কোন মতেই সাধারণ রুচির অনুকূলে লেখনী ধারণ করা উচিত নয়, কারণ এই বিকৃত রুচি বহুদিন চলিতে পারে না।"

ধর্ম্মযাজক মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "আমাদের দেশের কথা-সাহিত্যিকেরা ফরাসী ও রুশ দেশের সাহিত্যিকদিগের অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের অঙ্কিত চরিত্রে নীচতা ও অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। বাস্তবতার ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দোহাই দিয়া এগুলি অবাধে তাঁহারা চালাইতে চান। অনেকে আবার বলিতে চান, এই সকল চিত্রের বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। আমাদের নিকট এইগুলি মানসিক বিকৃত অবস্থার ফল (It has been supposed that these studies of morbid conditions have a scientific value) কিন্তু প্রথমে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে বিজ্ঞান (science) ও কলার (art) মধ্যে পার্থক্য আছে; এবং উভয়ে এক নিয়ম বশে চলে না।

বিজ্ঞানের চক্ষুতে কোন জিনিসই কুৎসিৎ নয়। স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য উভয়ের মধ্যে সত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তারের দুইটী জিনিসই জানা চাই; কিন্তু কলার সম্বন্ধে এ নিয়ম চলিতে পারে না। উচ্চ ভাবাদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রিত করা, বা ব্যাখ্যা করাই আর্টের উদ্দেশ্য (Art is an interpretation of life in terms of higher values) নৈতিক অস্বাস্থ্যের চিত্র বা দুর্নীতির ব্যাখ্যান কথা-সাহিত্যে কখনও কখন যে আবশ্যক হয় না তাহা বলি না, কিন্তু উভয় শ্রেণীর বর্ণন-ভঙ্গীর পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে।" বাস্তবিক কথাটা খুব সত্য; ততটুকু দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে আমরা রাজী আছি, যতটুকুতে পাপের প্রতি ঘৃণা আসে। অস্বাস্থ্যের চিত্র দেখিয়া স্বাস্থ্যের দিকে যাহাতে আমরা অগ্রসর হই, সেরূপ চিত্র আমরা দেখিতে চাই। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা'। উপদংশের বিষময় ফলের কথা বৃদ্ধ ডাক্তার সুন্দরী মোহন যেমন সুন্দর ভাবে বর্ণন করিতেছেন তাহা হইতে কি শিক্ষাই না পাওয়া যায়। সংস্কৃতে এম-এ পাশ ছাত্র আপনার দোষে বংশ-পরম্পরা রক্ষিত হইতেছে না তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে না চাহিলেও, ডাক্তার বাবু যে ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আবার অন্য একটী চিত্রে ক্ষণিক মোহের ফলে ইংরাজ রমণীর সহিত একবারমাত্র সঙ্গম-দোষে একটী বহুদর্শী ডাক্তারের জীবন অকালে উন্মাদ রোগে যে নষ্ট হইয়া গেল

সে চিত্রেও অশ্লীলতা নাই—আছে সত্য। বর্ণন-ভঙ্গীগুণে ইহা সকলেরই নিকট আদৃত হইবে। অবশ্য বিজ্ঞানের পুস্তকে এ সকল বিষয় স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মনে রাখিতে হইবে উপন্যাসের ভিতর দিয়া মানসিক রোগনির্ণয় চলিতে পারে না। (Fiction is a most unsuitable medium for the scientific study of mental pathology) ডাক্তারের পুস্তকাগারে রোগনির্ণায়ক পুস্তকে প্রকৃত পরীক্ষিত রোগীর বিষয়ই লিখিত থাকে। কাল্পনিক রোগের দৃষ্টান্ত বৈজ্ঞানিক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আর গল্প পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে রোগের ও রোগীর বিকৃত দৃষ্টান্ত সকল দেখিতে পাওয়া যায়। আর এ কথাটাও মনে রাখা উচিত, বৈজ্ঞানিক ডাক্তারী পুস্তকে যাহা শোভা পায়, উপন্যাসে সর্ব্বত্র তাহা শোভা পায় না।

কোনও কোন প্রথিতযশঃ কথা-সাহিত্যিক অশ্লীল না হইয়াও নরনারীর এরূপ জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করেন যাহাতে তাহারা নীচতার প্রতিমূর্ত্তি ও ইহকাল-সর্ব্বস্ব বলিয়া প্রতিভাত হয়। সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্বের চিত্র কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের আবিষ্কৃত মানব-চরিত্রে প্রশংসা করিবার মত আমরা কিছুই পাই না।”

ধর্ম্মযাজক মহাশয় তাঁহার দেশীয় ঔপন্যাসিকদিগের নিকট যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা খুবই সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডে যাহা ঘটিয়াছে, অনুকরণ-স্পৃহা বলবতী বলিয়া আমাদের দেশের ঔপন্যাসিকেরাও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ফল উভয় দেশেই এইরূপ হইয়াছে। তাই আমরা পূর্ব্বেও ঔপন্যাসিকদের নিকট করযোড়ে নিবেদন করিয়াছিলাম, আর আজিও আমাদের ক্ষীণকণ্ঠ ধর্ম্মযাজকের কণ্ঠের সহিত মিলিত করিয়া বলিতেছি, যা কিছু সৎ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সমাজের কল্যাণকর তাহার চিত্রই তাঁহারা অঙ্কিত করুন, আমরা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করি—তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ বচন শ্রবণ করিয়া শিক্ষালাভ করি। যে সকল সমস্যা সমাজে উঠিতেছে তাহার যথাযথ বিচার করিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া দিন। সমস্ত বঙ্গদেশ অবিসংবাদে মস্তক নত করিয়া সে সকল অভিমত গ্রহণ করিয়া ধন্য হউক।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

জেলী (Jelly)

এবার আমের ফলন খুব বেশী হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে যে অনুমান করিয়াছিলাম, সে অনুমান মিথ্যা করিয়া দিয়া, এবার এত বেশী পরিমাণে আম ফলিয়াছে যে, মূল্যাধিক্যবশতঃ অন্য-অন্যবার সাধারণতঃ যাহারা আম খাইতে পায় না, এবার তাহারা পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া আম খাইয়াও ফুরাইয়া উঠিতে পারিতেছেনা। কাজেই উদ্বৃত্ত ফসল কিছু-কিছু পচিয়া নষ্ট হইতেছে। অবশ্য আমের ব্যবসায়ীরা সব পচা আমই ফেলিয়া দিতেছে না—কিছু-কিছু পচা আমের রস দিয়া, তেঁতুল ও গুড় সহযোগে আমসত্ব তৈয়ার করিয়া রাখিতেছে—আম ফুরাইলেও তাহারা আমসত্ব বেচিতে পারিবে; তাহা সত্ত্বেও অনেক আম এবার নষ্ট হইয়া গেল।

এইরূপে যখন কোন ফসল উদ্বৃত্ত হয়, তখন বিবিধ প্রকারে তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল উপায়ের মধ্যে জেলী একটী উপায়। কাঁচা আম হইতে যেমন চাটনী প্রস্তুত হয়, তেমনি জেলিও প্রস্তুত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমের ফলন সব বছর সমান হয় না। জেলীই বলুন, আর চাটনীই বলুন, পাকা আমের কাছে কেহ নয়। আমের ফলন বুঝিয়া, বাজারের অবস্থা আন্দাজ করিয়া, যদি দেখা যায় অনেক আম উদ্বৃত্ত হইতে পারে, তবেই কাঁচা আম হইতে কিছু জেলী ও কিছু চাটনী তৈয়ার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য,—অসময়ে অনেক কাজে লাগিবে।

জেলী জিনিসটা কিন্তু এমনি যে, দুইবার একই রকমের

জিনিস হয় না। দুই হাতে দুই রকম জিনিস, কিম্বা একই হাতে দুইবারে দুই রকম জিনিস হইয়া যাইবেই ;—প্রায়ই দুই হাতে সমান জিনিস, কিম্বা একই হাতে ভিন্ন-ভিন্ন দফায় সমান জিনিস হয় না।

আমার ছেলে-মেয়েরা প্রায়ই কোন না কোন ফলের জেলী প্রস্তুত করে ; এবং প্রায় তাহা ভালই হয়। এবার তাহারা আম ও জামের জেলী তৈয়ার করিয়াছিল, দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এবার সব তাহারা নিজেরাই খাইয়া ফেলিয়াছে—আমাকে একটুও দেয় নাই। তাহার কারণ বোধ হয়, এবার ভাল হয় নাই। কিন্তু আমার দুইটী স্নেহ-পাত্রী আত্মীয়া আমাকে যে আম ও জামের জেলী দিয়াছিলেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছিল। অথচ, জেলী প্রস্তুত করিবার প্রণালী একই, এবং সে খুব সহজ প্রণালী। সেই জন্যই বলিতেছি, দুই হাতে সমান জিনিস হয় না,—একই হাতেও কি' বারই সমান জিনিস হয় না। এই কারণে, জেলী প্রস্তুত করা খুব সহজ হইলেও খুব সাবধানে প্রস্তুত করিতে হয়। নচেৎ খারাপ হইয়া গিয়া সব লোকসান হইতে পারে।

আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের রসে জেলী প্রস্তুত হয়। প্রায় অধিকাংশ অম্লরসবিশিষ্ট ফলই জেলী প্রস্তুত করিবার উপযোগী। ভাল রকম করিয়া তৈয়ার করিতে পারিলে, ইহা আমসত্ত্বের ন্যায় কিছু দিন রাখা যাইতে পারে ; এবং ইহা খুব উপাদেয় খাদ্যও বটে।

উৎকৃষ্ট জেলীর লক্ষণ। জেলী উত্তমরূপে তৈয়ার করিতে পারিলে, তাহা স্বচ্ছ, কুল্পী বরফের মত জমান ; তাহা কঠিনও নয়, তরলও নয়, অথচ রবারের মত কোমল। ঠিক মত তৈয়ার না হইলে জেলী হয় ত জমে না। তাল পাটালী যেমন তালের সঙ্গে চুণের সংমিশ্রণে জমিয়া যায়,—কোমল-কঠিন ভাব ধারণ করে,—জেলীও সেইরূপ হইবে। না হইলে, অর্থাৎ তরল থাকিলে, ভাল হইল না। জেলীর আর এক প্রকার দোষ এই হয় যে, উহা মিছরীর মত শক্ত হইয়া দানা বাঁধিয়া যায়। এরূপ হইলেও জেলী খারাপ হইল মনে করিতে হইবে।

ফলের দোষেও জেলী খারাপ হইতে পারে ; রাঁধিবার দোষেও জেলী খারাপ হয়। দীর্ঘ-কালের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত না হইলে, জেলী প্রস্তুত করা শক্ত। জেলী ভাল বা মন্দ হইবার অপর কারণও থাকিতে পারে।

অনেক ফলের মধ্যে পেক্‌টিন (Pectin) নামক একটী পদার্থ থাকে। এই জিনিসটি কতকটা জিলেটিনের মত। ইহাই জেলীর প্রধান উপাদান। চিনির সহিত এই পেক্‌টিনের রাসায়নিক মিলনের ফলেই জেলী তৈয়ার হয়। যে সকল ফলে এই পেক্‌টিন জিনিসটি বেশী পরিমাণে থাকে, তাহাই জেলীর উপযুক্ত ফল। আম, জাম, পেয়ারা, পীচ প্রভৃতি এই কারণে জেলীর উপযুক্ত। আপেল টোকো হইলে, তাহা হইতে বেশ জেলী হইতে পারে। কিন্তু মিষ্ট হইলে, অন্য ফলের রস না মিশাইলে ভাল জেলী হয় না। বর্ষাকালে কিম্বা বর্ষার অব্যবহিত পরে, ফলে জলীয় অংশ বেশী থাকায়, জেলী ভাল জমে না। ফলে ধূলা-বালি মিশ্রিত থাকিলে, তাহা যথাসম্ভব অল্প জলে খুব শীঘ্র ধুইয়া লওয়া আবশ্যক। নচেৎ ফলগুলি বেশী জল টানিয়া লইয়া অতিরিক্ত মাত্রায় রসিয়া যাইবে—জেলী জমাট বাঁধিবে না। যে সকল ফলে রস কম, যাহা নিংড়াইয়া রস বাহির করা কঠিন, সেই রকম ফল কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া নরম করিয়া লইলে রস বাহির হইবে। সেই রসের সঙ্গে চিনি মিশাইয়া জ্বাল দিয়া জেলী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই রকম ফলের জেলী প্রস্তুত করিতে হইলে, যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় ; এবং ইহাতে কিছু দক্ষতা আবশ্যক। সরস ফল ঠিক সময়ে সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহাতে জেলীর উপযুক্ত রস স্বতঃই পাওয়া যায়। বর্ষাকালে, কিম্বা অন্য ঋতুতে বৃষ্টির পর সংগ্রহ করিলে, তাহাতে জলের মাত্রা বেশী হয়। একটু বেশীক্ষণ সিদ্ধ করিয়া এই অতিরিক্ত জল উড়াইয়া দিতে হয়। মোটের উপর, ফলের রসে যে পরিমাণ পেক্‌টিন থাকা সম্ভব, তাহা অনুমান করিয়া লইতে হয় ; এবং তাহার অনুপাতে চিনি মিশাইতে হয়। জেলী তৈয়ার করিতে-করিতে একটু অভিজ্ঞতা না জন্মিলে, অনুমান প্রায় ঠিক হয় না ; কাজেই, পেক্‌টিন ও চিনির অনুপাত ঠিক করা কঠিন হইয়া পড়ে। জেলীও সুতরাং ভাল না হইতে পারে। চিনি কম হইলে জমিবে না ; বেশী হইলে দানা বাঁধিবে। ফল বেশী মিষ্ট হইলে, চিনির পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে ফলে মিষ্ট রস বেশী পরিমাণে সঞ্চিত হয়। সূর্য্যের তাপ ও কিরণ বেশী পরিমাণে পাইলে ফলে স্বভাবতঃই একটু বেশী মিষ্ট রস জমে। অন্যথা তত মিষ্ট হয় না। এইটী বিচার করিয়া চিনির পরিমাণ স্থির করা

চাই। যে সকল ফল জলে সিদ্ধ করিয়া রস বাহির করিতে হইবে, তাহাদের ৮ সের ফলে ৪ সের জল দিয়া এমন ভাবে সিদ্ধ করিতে হইবে, যেন সিদ্ধ-করা ফল হইতে তিন সের রস পাওয়া যায়। রসের পরিমাণ বেশী হইলে, আরও একটু বেশী সিদ্ধ করিয়া তিন সের থাকিতে নামাইতে হইবে। রস উত্তম রূপে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। জেলী প্রস্তুত করিতে, নির্ম্মল রসটুকু মাত্র চাই—একটুও খিঁচ থাকিবে না। চটকানো ফল ছাঁকিবার কাপড়ে ঢালিয়া দিবার পর, যে রস আপনি ঝরিয়া পড়িবে, সেইটুকুই আবশ্যক। নচেৎ বেশী রস পাইবার লোভে কাপড়টি নিঙড়াইয়া লইলে যাহা বাহির হইবে, তাহাতে জেলী পরিষ্কার হইবে না। দরকার মত রস ঝরাইয়া লইবার পর কাপড়ে ফলের যে অংশ থাকিবে, তাহা লোকসান হইবে না—অন্য কাজে লাগিতে পারে; যেমন মার্ম্মালেড (marmalade)। অথবা উহা হইতে একটু নিরেস জেলীও তৈয়ার হইতে পারিবে।

জেলী দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখিতে হইলে, কাচপাত্রে রাখা ভাল। এই কাচের শিশির মুখ চওড়া হওয়া চাই। এবং তাহাকে sterilize করিয়া লওয়া আবশ্যক। উহার ঢাকনীও বায়ু-রোধক ভাবের দেওয়া দরকার। নচেৎ sterilize করা বৃথা হইবে—কয়েক দিনের মধ্যে হয় জেলী পচিয়া যাইবে, না হয় শুকাইয়া গিয়া উহা আর জেলী থাকিবে না।

মারমালেড (marmalade)

জেলীর জন্য রস ছাঁকিয়া লইবার পর, ফলের যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতে marmalade প্রস্তুত হইবে। আবার, রস বাহির না করিয়াও সমস্ত ফলটা হইতেও মারমালেড তৈয়ার হইতে পারে। তবে বীজ ও খোসা অবশ্যই বাদ দিতে হইবে। বড় ফল হইলে খোসা ছাড়াইয়া বীজ বাদ দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইতে হয়।

আপেলের জেলী

৫ সের আপেল ৫ বোতল কোয়ার্ট জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। জল মরিয়া যাইবে, এবং ঐ জল শোষণ করিয়া আপেলগুলি সিদ্ধ হইবে। সেই আপেল-সিদ্ধ নিঙড়াইয়া যে রস বাহির হইবে,তাহার প্রতি পাঁইটের সঙ্গে আধ সের মাত্রায় চিনি ও দুইটী করিয়া পাতি লেবুর রস মিশাইতে হইবে। আপেলের খোসা ছাড়াইতে হয় না। কেবল একখানি শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উত্তম রূপে ঘষিয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে। তার পর খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া মাঝখানকার শক্ত খোসা, অর্থাৎ বীজের উপরকার কঠিন আবরণ বাদ দিয়া, মৃদু জ্বালে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিতে হইবে। জ্বাল যেন বেশী না হয়; আর সিদ্ধ করিবার সময় নাড়া-চাড়া করিবার দরকার নাই। আপেল নরম হইলে জ্বাল বন্ধ করিতে হইবে। বেশী জ্বাল দিয়া আপেলগুলিকে যেন গলাইয়া ফেলা না হয়। ঐ আপেল ছাঁকিয়া রস বাহির করিতে হইবে। একবারের ছাঁকায় যদি রস সম্পূর্ণ নিম্মল না হয়, তবে আর একবার ছাঁকিয়া লওয়া যাইতে পারে। তার পর পূর্ব্বোক্ত অনুপাতে চিনি ও লেবুর রস মিশাইয়া আবার মৃদু জ্বালে চড়ান। জেলী ঠিক হইল কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, এক চামচ তুলিয়া লইয়া একটা ঠাণ্ডা পাথরের থালায় বা চীনামাটীর প্লেটে রাখিতে হইবে। যদি উহা তৎক্ষণাৎ জমিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জেলী প্রস্তুত হইয়াছে। তখন জ্বাল বন্ধ করিয়া গরম থাকিতে-থাকিতে sterilize-করা কাচের চওড়া-মুখ শিশিতে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিতে হইবে। ছাঁকিবার পর যে আপেলের অংশ বাকী থাকিবে, তাহার সহিত পরিমাণমত চিনি মিশাইয়া এবং একটু আদা বা ডালচিনি যোগ করিয়া জাম (jam) তৈয়ার করা যাইতে পারিবে।

জামের জেলী।

জাম, কিস্‌মিস, মনাক্কা, বঁইচ, করমচা, ট্যাপারি, শুষ্ক আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের জেলী প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রায় একই প্রকার। কিস্‌মিস খানিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে ফুলিয়া উঠিবে। সেই কিস্‌মিসের খোসা ছাড়াইয়া ও বোঁটা বাদ দিয়া তাহাকে একটি পাত্রে রাখুন। কতকগুলি কিস্‌মিস একটা কাঠের হাতা বা চাম্‌চে করিয়া থেঁতো করিয়া দিন। পরে মৃদু জ্বাল দিন। অল্প গরম হইলে, কাঠের হাতায় করিয়া নাড়িতে থাকুন। কিস্‌মিসগুলি বেশ উত্তপ্ত হইলে সমস্ত কিস্‌মিস হাতায় করিয়া থেঁতো করিয়া দিন। পরে ছাঁকিয়া লউন। যে কাপড়ে ছাঁকিবেন, সেই কাপড়ের ভিতর দিয়া যে রস আপনি ঝরিয়া পড়িবে, সেই রসটুকু মাত্র লইবেন। কাপড়ের ভিতর কিস্‌মিসের বাকী

যে শাঁস থাকিবে, তাহাতে জাম কিম্বা মারমালেড হইবে। অথবা, সমস্ত রস ঝরিয়া যাইবার পর, বাকীটা আর একটা পাত্রে নিঙড়াইয়া লইলে কিছু নীরেস কোয়ালিটির জেলীও হইতে পারে। প্রত্যেক পাইট রসের সহিত দেড়পোয়া হিসাবে মিহি সাদা চিনি লইয়া রসে চিনি গলাইয়া ফেলুন। দরকার হইলে চিনির পরিমাণ একটু কম কিম্বা বেশী করা যাইতে পারে। তারপর আগুনে চড়াইয়া দিন। ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া নাড়িয়া দিন। পরে আবার একবার ফুটাইয়া নামাইয়া আর একবার নাড়িয়া দিন। আরও একবার ফুটাইয়া নামাইবার পর তৃতীয় বার নাড়িয়া দিলে, জিনিসটি তৈয়ার হইয়া আসিবে। আর একটি পাত্রে গরম জলের মধ্যে শিশি বসাইয়া রাখিয়া sterilize করিয়া লইতে হইবে। শিশি গরম থাকিতে থাকিতে গরম-গরম জেলী তাহাতে পূরিয়া, ঢাকা দিয়া, শিশিগুলি জানালায় রৌদ্রে দিন। কিন্তু সাবধান, যেন ধূলি উড়িয়া আসিয়া জেলীতে না পড়ে। জামের জেলীও ঠিক এই প্রণালীতে বেশ খানিকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া রস বাহির করিয়া চিনির রসে পাক করিয়া তৈয়ার হইবে। জামের দুই দিক কাটিয়া ভাল করিয়া জলে ধুইয়া সস্-প্যানে সামান্য একটু জল দিয়া তাহা উনুনে চড়াইতে হয়। যখন জাম বেশ সুসিদ্ধ হইয়া তাহা হইতে রস বাহির হইয়া পড়িবে, তখন তাহা নামাইয়া কাপড়ে ঢালিয়া ফেলিতে হইবে; জল ফেলিবার জন্য ছানা বাঁধিবার মত করিয়া জামশুদ্ধ কাপড়টি খানিকক্ষণ বাঁধিয়া রাখিলে আরো কিছু রস বাহির হইতে পারে। তৎপর যে পরিমাণ রস প্রায় সেই পরিমাণ চিনি লইয়া দুইটি একসঙ্গে বহুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। যখন সেই চিনি-মিশ্রিত রস জ্বাল দিতে দিতে আঠা আঠা হইবে, তখন তাহা নামাইয়া ফেলিবে। রসটি যেন অতিরিক্ত ঘন না হয়। পরীক্ষার নিমিত্ত জ্বাল দিতে দিতে মাঝে মাঝে অল্প রস নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া দেখিতে হইবে জমাট বাঁধিতেছে কিনা। ঘন কম হইলে পরে জমাট বাঁধিবেনা, আবার বেশী ঘন রস হইলে জেলী বেশী শক্ত হইবে। রস ঠিক মত হইলে নামাইয়া পরিমাণ মত লেবুর রস দিয়া তাহা নাড়িয়া নাড়িয়া ঠাণ্ডা করিয়া তবে কাঁচের শিশিতে ঢালিবে। Horlickএর বড় শিশির এক শিশি পরিমাণ জেলীতে রসাল ২টি লেবু দিলেই হইবে। জাম সিদ্ধ করিবার সময় কিম্বা রস চিনি দিয়া জ্বাল দিবার সময় কাঠের হাতা দিয়া নাড়িতে হইবে। লোহার হাতায় নাড়িলে কলঙ্ক উঠিতে পারে। টেঁপারিতে চিনি মিশাইবার পূর্ব্বে আর গরম করিতে হইবে না। টেঁপারিগুলি একটা মোটা কাপড়ে রাখিয়া নিঙড়াইয়া রস বাহির করিতে হইবে। সেই রসের সঙ্গে চিনি মিশাইয়া জেলী প্রস্তুত করিতে হইবে।

কলিকাতার বাজারে টেঁপারির জেলী পাওয়া যায়, তাহাতে খোসা ও বীচি দুইই থাকে। কিন্তু তাহা কেবল মালে বাড়াইয়া, খরিদ্দারকে ঠকাইবার জন্য; বীচি ও খোসা বাদ না দিলে জেলী ভাল হয় না, খাইতেও বিরক্তি বোধ হয়। পাকিবার পূর্ব্বে ডাঁসানো লীচুর রস বাহির করিয়া লইয়াও জেলী তৈয়ার করা যায়। টোকো আঙ্গুরের জেলী অতি সুন্দর; প্রস্তুত-প্রণালী কিসমিস, জাম প্রভৃতির ন্যায়।

মা লক্ষ্মীরা প্রায় জেলী তৈয়ার করিতে জানেন; সুতরাং আমার বেশী বলা বাহুল্য। ইয়োরোপীয় ধরণের খাদ্য এখন অনেকের মুখে ভাল লাগে; সুতরাং ইহাদের ব্যবসায় একটু-আধটু চলিতে পারে, এইরূপ অনুমান করিয়াই আমি কেবল সামান্য ইঙ্গিত করিলাম। আমাদের দেশে ফল ত নানা রকমই জন্মে। চেষ্টা করিলে বোধ হয় তাহাদের নূতন নূতন ব্যবহার উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করা যাইতে পারে। তাহা হইলে দুই-চারিটা নূতন ব্যবসায়ের পথও খুলিয়া যাইতে পারে।

দেশী হোটেল।

সেদিন 'ইংলিশম্যান' দুঃখ করিতেছিলেন যে, সাহেবেরা কোন কাজে কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে আসিলে, তাঁহাদের ক্ষুধা পাইলে তাঁহারা খাইতে পান না। এমন কি, এক কাপ চা, কিম্বা কিছু জলযোগের দরকার হইলেও, তাঁহাদিগকে চৌরঙ্গীতে ফিরিয়া যাইতে হয়। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের আতিথেয়তা চিরপ্রসিদ্ধ। সহরে বড়রাস্তার ত কথাই নাই,—অনেক ছোট-ছোট গলির ভিতরও অনেক হোটেল, রেষ্টোরাঁ, চা-খানা, খাবারের দোকান রহিয়াছে; অথচ, কোন ইয়োরোপীয় এদিকে আসিয়া অর্থব্যয় করিয়াও খাইতে পান না, ইহা কি কম দুঃখের কথা? কিন্তু কেন বলুন দেখি? সাহেবদের খাইতে না পাইবার কারণ কি?

'ইংলিশম্যান' তাহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, দেশী হোটেলে সাহেবদের রসনার উপযোগী খাদ্য মিলে না। অবশ্য সাহেবরা যে সকল মাংসঘটিত খাদ্য খান, যথা স্যাণ্ডউইচ, হাম, বেকন প্রভৃতি—তাহার সকলগুলি এ অঞ্চলে মিলিতে না পারে; হোটেলে চপ, কাটলেট, পাঁউরুটী, বিস্কুট, কেক ত পাওয়া যায়। তবু সাহেবদের কেন অনাহারে ফিরিয়া যাইতে হয়? আমার মনে হয়, জাতি যাইবার ভয়ে সাহেবরা দেশী হোটেলে খাইতে আসিতে ভরসা করেন না। নচেৎ তাঁহাদের লাঞ্চ খাইবার জন্য দু'চার কাপ চা কিম্বা দু'একখানা পাঁউরুটী, কেক, বিস্কুট, অথবা দু'এক-খানা চাপ কাটলেট এ অঞ্চলে অনায়াসে মিলিতে পারে। 'ইংলিশম্যান' কিন্তু তাহা বলেন না। তাঁহারা অন্য একটা কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং সেটাও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সে কারণটা এই যে, দেশী হোটেলে খাইতে তাঁহাদের রুচি হয় না;—দেশী হোটেলগুলা বড় নোংরা, অপরিষ্কার,—সেখানে খাইতে যাইতে ঘৃণা বোধ হয়। বস্তুতঃ এ আপত্তিটা ঠিক। আমাদের দেশী হোটেলের সেরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা, তাহাতে কোন ভদ্র ইয়োরোপীয়ই এখানে খাইতে আসিতে পারেন না। সেই জন্য, আমি মনে করি, যখন দিন-দিন নূতন হোটেল প্রতিষ্ঠিত হইতেছেই, তখন ভাল করিয়াই সেগুলা চালানো হউক—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে যথোচিত দৃষ্টি রাখা হউক।

উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ হোটেলই হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শুচিতা, শুদ্ধতা, পবিত্রতা হিন্দুদিগের ধর্ম্মের অঙ্গ; অথচ, তাঁহারা এত অপরিষ্কার থাকেন কেন, ইহাই ভাবিয়া পাওয়া যায় না! যে কোন দেশী হোটেলেই যাওয়া যাউক, সেখানকার ব্যবস্থা দেখিয়া ঘৃণা বোধ না হইয়া যায় না। যে বাড়ীতে বা ঘরে হোটেলটি স্থাপিত, সে বাড়ীতে হয় ত বিশ বৎসরের মধ্যে রাজমিস্ত্রীর পদধূলি পড়ে না। ঘরের কোণে কতকালের আবর্জ্জনা সঞ্চিত। ঘরের দেওয়ালে থু থু, সিকনী, গয়ের, পানের পিচের দাগ। কড়ির নীচে ও কোণে মাকড়সার জাল, ঝুল, রন্ধনশালার ধূম। ঘরে আলো, বাতাস আসে না; পাখার বন্দোবস্তও প্রায় থাকে না। টেবিল চেয়ার প্রায়ই ভাঙ্গা—মান্ধাতার আমলের। অয়েলক্লথ শত-ছিন্ন, নোংরা, ময়লা এবং বহুকালের পুরাতন। হোটেল স্থাপনের সময় সেই যে অয়েলক্লথখানি কেনা হইয়াছিল—বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা আর বদলানো হয় না। বাসনগুলার চেহারা দেখিলেও খাইতে শ্রদ্ধা-ভক্তি হয় না। চীনামাটীর বাসন খুব কমই দেখা যায়; অধিকাংশ স্থলেই এনামেলের বাসন—চটা-ওঠা। সকলের শেষে, যাহারা serve করে, তাহাদের কথা। তাহাদের চেহারা অবশ্য বিধাতার দান—ইচ্ছা হইলেও তাহা বদলানো চলে না। কিন্তু তাহাদের শত-ছিন্ন, ময়লা, ধূলি-ধূসরিত, কালি-ঝুলি-মাখা বস্ত্র ও জামা দেখিলেই হরিভক্তি উড়িয়া যায়। এমন অবস্থায় কোন ইয়োরোপীয় আমাদের এ অঞ্চলের কোন হোটেলে খাইতে আসিতে সাহস করিতে পারেন কি? অথচ, যদি সাহেব খরিদদার পাইবার সম্ভাবনা বা আশা থাকে, তবে সেটা না পাওয়া ব্যবসায়ের হিসাবে লোকসান ত বটেই—নিন্দার কথাও বটে। কোন দেশীয় লোকে সাহেবদের হোটেলে খাইতে গেলে, দেশীয় খরিদদার বলিয়া সাহেবেরা কিছু তাঁহাদের ফিরাইয়া দেন না। তবে সাহেব খরিদদার পাইলে, ব্যবসায় করিতে বসিয়া আমরাই বা ছাড়িয়া দিব কেন? আমার মনে হয়, সাহেবী রুচির যে সব দেশী ভদ্রলোক সাহেবী হোটেলে খানা খাইতে যান, তাঁহারা যদি দেশী হোটেলে সাহেবী খানা পান, হোটেলটি যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়,—যাহারা serve করে, সেই খানসামারা যদি সভ্য, বিনীত, ভদ্র হয়, এবং তাহাদের বেশভূষা যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সাহেবী হোটেলে না গিয়া দেশী হোটেলগুলিকেই patronize করিতে পারেন। সাহেবদেঁষা বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের এই একটা বড় রকমের ব্যবসায় ফাঁদিবার সুযোগ রহিয়াছে। সাহেবী ধরণে এ অঞ্চলে হোটেল খুলিয়া, যদি 'ইংলিশম্যান'-সম্পাদক মহাশয়ের মত দু'চারজন ইংরেজ ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এক-আধ দিন লাঞ্চ বা ডিনার দিয়া, দেশী হোটেলের ইয়োরোপীয় কায়দাকানুন প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে সাহেবদের আর দেশী হোটেলে খাইতে আপত্তি থাকিবে না, এবং ইংলিশ-ম্যানেরও বোধ হয় দুঃখ ঘুচিবে। চাই কি, দেশী হোটেলে খাইতে আসিয়া, আমাদের পোলাও-কালিয়ার কিম্বা সন্দেশ-রসগোল্লার স্বাদ একবার পাইলে, সাহেবেরা দেশী 'খানা'র একেবারে গোঁড়া ভক্ত হইয়া উঠিতে পারেন। মোট কথা, সাহেবদের রুচি ও শুচিতার দিকে লক্ষ্য রাখিলে, বোধ হয় সাহেব খরিদদারের অভাব হইবে না। তবে গোড়াতেই খুব বাহ্য-আড়ম্বর চাই—সব পরিষ্কার, চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে হওয়া চাই। বস্তুতঃ, কার্য্য-সূত্রে আজকাল অনেক সাহেবকে সর্ব্বদা উত্তরাঞ্চলে আসিতে হয় এবং তাঁহাদের ক্ষুধা পাওয়াও অস্বাভাবিক নহে। তবে কেন ভাল দেশী হোটেল পাইলে, তাঁহারা খাইতে আপত্তি করিবেন?

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[পরলোকগমন— শনিবার, ১০ই আষাঢ়, ১৩২৯—রাত্রি দুই ঘটিকা]

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সে যে এনেছিল চাঁদের কিরণ
পৌণ-মাসীর রাতে ;
সে যে ভেসেছিল কোকিল-কূজন
স্নিগ্ধ মলয় বাতে ;
সে যে ফুটেছিল কুন্দ-কুসুম
পৌষে তপন করে ;
সে যে লুটেছিল সুধার সাগর
বক্ষোবেলার 'পরে।

নিবিড় নীরদে জ্যোৎস্না ঢাকিল
তিমিরে মগন ধরা ;
পিক'কলতান হইল নীরব ;—
বসন্ত, ব্যথাভরা

শুকাইল চারু কুন্দ-কুসুম
পাপ্‌ড়ি খসিল ঝরি' ;
হৃদয়-পুলিন করি মরুভূমি
সিন্ধু পড়িল সরি' !

সে যে চ'লে গেল স্বপনের মত
আঁখি পাল'টিতে হায় !
সে যে গ'লে গেল চকিতে চমকি
বিদ্যুৎ-শিখা-প্রায় !
মৃগনাভি সম ভরিল গন্ধে ;
সৌরভ-স্মৃতি রাখি'—
সে যে মিলাইল জোনাকীর মত
ডানায় আলোক ঢাকি !

সে কি বোঝে নাই—কতগুলা প্রাণ
ক'রে গেল সে যে ছাই !
সে কি খোঁজে নাই যাবার সময়
ছিল যারা মুখ' চাই !
বাঁধিল না তার এত প্রেমডোর
ছিঁড়িতে এমন ক'রে ?
কাঁদিল না প্রাণ এ সুখের নীড়
ত্যজিতে ঘুমের ঘোরে ?

সে যে এসেছিল স্বর্গ-পথিক
সহসা মরতে, ভুলি' ;
সে যে এনেছিল কল্প-লোকের
আনন্দ-বাণীগুলি !
সে কি বুঝাইল এত মমতার
মানব-পরাণ, হায় !
ভঙ্গুর কত,— বুদ্বুদ-সম
ফুৎকারে উড়ি' যায় !

যে মহামহিম বিশ্ব পাবন
ভাস্বর রবি-করে
ঝলকি' উঠিল অলোক আলোক
বাণীর কমল-সরে—
সে করিল তার কিরণের ধারা
আকুল কণ্ঠে পান ;
আপন দীপ্তি তবু কভু তার
সে শিখা করেনি ম্লান !

অমর ছন্দে দেশমাতৃকার
বন্দন-মধু-শ্লোকে,
গাহিতে-গাহিতে অক্ষয় স্তব
আজি সে অমৃত-লোকে,
কোন্ মায়ারথে উতরিল দ্রুত
দুর্লভ-বীণা হ'তে—
শুধু ছায়াপথে ঢালি আলো তার
অপূর্ব্ব রস স্রোতে !

দেনা-পাওনা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

[১৭]

ষোড়শীর যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন সাগর চলিয়া গেছে।

মন্দিরের ভৃত্য ডাকিয়া কহিল, মা, এইবার দোর বন্ধ করি ?

কর, বলিয়া সে চাবির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেবেলা হইতে জীবনটা তাহার যথেষ্ট সুখেরও নয়, নিছক আরামেও দিন কাটে নাই ; বিশেষ করিয়া যে অশুভ মুহূর্ত্তে বীজগ্রামের নূতন জমিদার চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন হইতে উপদ্রবের ঘূর্ণা হাওয়া তাহাকে অনুক্ষণ ঘেরিয়া নিরন্তর অশান্ত, চঞ্চল ও বিশ্রামবিহীন করিয়া রাখিয়াছে। তবুও সে সকল সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের ন্যায়, আজ যেখানে সাগর সর্দ্দার তাহাকে এইমাত্র নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইল। অথচ, যথার্থই সে যে এতবড় ভয়ঙ্কর কিছু একটা এই রাত্রির মধ্যে করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা এম্নি অসম্ভব যে ষোড়শী বিশ্বাস করিলনা। অথবা, এ আশঙ্কাও তাহার মনের মধ্যে সত্যসত্যই স্থান পাইলনা যে, যে-লোক হত্যা, রক্তপাত ও হিংসার সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও আয়োজনে পরিবৃত হইয়া অহর্নিশি বাস করে, পাপ তাহার যত বড়ই হোক, কেবলমাত্র সাগরের লাঠির জোরেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তথাপি দৈব বলিয়া যে শক্তির কাছে সকল অঘটনই হার মানে, তাহারই ভয়ে বুকের মধ্যে তাহার মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মন্দির-দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া ভৃত্য চাবির গোছা হাতে আনিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাত অনেক হয়েছে, মা, সঙ্গে যেতে হবে কি ?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া অন্যমনস্কের মত প্রশ্ন করিল, কোথায় বলাই ?

তোমাকে পৌঁছে দিতে মা।

পৌঁছে দিতে ? না :—বলিয়া ষোড়শী ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। প্রত্যহের মত এই পথটুকুর মধ্যেও অতিসতর্কতা আজ তাহার ভালই লাগিলনা। রাত্রি প্রগাঢ় অন্ধকার, কিন্তু এ কয়দিনের ন্যায় ঝাপ্সা মেঘের আচ্ছাদন আজ ছিলনা। স্বচ্ছ, নির্ম্মল,—কৃষ্ণাদ্বাদশীর কালো আকাশ এইমাত্র যেন কোন্ অদৃশ্য পারাবারে স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে, তাহার আর্দ্র গা-মাথায় এখনো যেন জল মাখানো রহিয়াছে। মন্দির হইতে ষোড়শীর কুটীরখানির ব্যবধান যৎসামান্য ; এই আঁকা-বাঁকা পায়ে-হাঁটা ধূসর পদ রেখাটির উপরে একটি স্নিগ্ধ আলোক অসংখ্য নক্ষত্রলোক হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে ; তাহারই উপর দিয়া সে নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার ঘরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শেষ চৈত্রের এই কয়টা দিন গ্রামে জন-মজুর মিলেনা,

তথাপি তাহার অনুগত ভক্ত প্রজারা আঙ্গিনার চারিদিকে শক্ত করিয়া বাঁশের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছে এবং জীর্ণ কুটীরের কিছু কিছু সংস্কার করিয়া তাহারি গায়ে একখানি ছোট চালা রাঁধিবার জন্য তৈরি করিয়া দিয়াছে। পুরাতন অর্গল নূতন হইয়াছে, এবং দেয়ালের গায়ে ফাটা ও গর্ত্ত যত ছিল, বুজাইয়া নিকিয়া মুছিয়া ঘরটিকে অনেকটা বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। তালা খুলিয়া ষোড়শী এই ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং আলো জ্বালিয়া সেইখানেই মাটির উপরে বসিয়া পড়িল। প্রতিদিনের ন্যায় আজিও তাহার অনেক কাজ বাকি ছিল। রাত্রে রান্নার হাঙ্গামা তাহার ছিল না বটে; দেবীর প্রসাদ যাহা কিছু আঁচলে বাঁধিয়া সঙ্গে আনিত, তাহাতেই চলিয়া যাইত, কিন্তু আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মগুলি সে সর্ব্বসমক্ষে মন্দিরে না করিয়া নির্জ্জন গৃহের মধ্যেই সম্পন্ন করিত, তাহার পরে অনেক রাত্রি জাগিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিত। এ সকল তাহার প্রতিদিনের নিয়ম; তাই প্রতিদিনের মত আজও তাহার মনের মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম্মের তাগিদ উঠিতে লাগিল, কিন্তু পা দুটা কোনমতেই আজ খাড়া হইতে চাহিলনা; এবং যে দরজা উন্মুক্ত রহিল, উঠি-উঠি করিয়াও তাহাকে সে বন্ধ না করিয়া তেমনি জড়ের মত স্থির হইয়া প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া রহিল।

সে সাগরের কথা ভাবিতেছিল। মন্দিরের অনতিদূর-বর্ত্তী ভূমিজ পল্লীর এই দুঃস্থ ও দুরন্ত লোকগুলিকে সে শিশুকাল হইতেই ভালবাসিত, এবং বড় হইয়া ইহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার চিহ্ন যতই বেশী করিয়া তাহার চোখে পড়িতে লাগিল ততই স্নেহ তাহার সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের ন্যায় দৃঢ় ও গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সে দেখিল চণ্ডীগড়ের ইহারাই একপ্রকার আদিম অধিবাসী, এবং একদিন সকলেই ইহারা গৃহস্থ কৃষক ছিল; কিন্তু আজ অধিকাংশই ভূমিহীন,—পরের ক্ষেত্রে মজুরী করিয়া বহুদুঃখে দিনপাত করে। সমস্ত জমিজমা হয় জনার্দ্দন, না হয় জমিদারের কর্ম্মচারী স্বনামে বেনামে গিলিয়া খাইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ভৈরবীদের আমলে দেবীর অনেক জমি মন্দিরের নিজ জোতে ছিল, তাঁহাদের যথেচ্ছামত সেগুলি প্রতিবৎসর ভাগে বিলি হইত, এবং এই উপলক্ষে প্রজায় প্রজায় দাঙ্গা হাঙ্গামার অবধি থাকিত না; অথচ, লাভ কিছুই ছিলনা। তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্তের অভাবে প্রাপ্য অংশের কিছু বা প্রজারা লুটিয়া খাইত, এবং অবশিষ্ট আদায় যদি বা হইত অপব্যয়েই নিঃশেষ হইত। এই সকল ভূমিই সে ভূমিহীন ভূমিজ প্রজা-দিগকে বছর ছয় সাত পূর্ব্বে ফকির সাহেবের নির্দ্দেশ মতে নির্দ্দিষ্ট হারে বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। জনার্দ্দন রায় ও এককড়ি নন্দীর সহিত তাহার বিবাদের সূত্রপাতও তখন হইতে। এবং সেই কলহই পরবর্ত্তী কালে নানা অজুহাতে নানা তুচ্ছ কাজে আজ এই আকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাগর ও হরিহর সর্দ্দার তখন জেল খাটিতেছিল; খালাস পাইয়া তাহারা মন্দিরে ষোড়শীর কাছে আসিয়া একদিন হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। কহিল, মা, আমরা খুড়ো-ভাইপোয়েই কি কেবল কূল কিনারা পাবোনা, শুধু ভেসে-ভেসে বেড়াব?

ষোড়শী রাগ করিয়া কহিল, তোরা ভাসতে যাবি কেন হরিহর—জেলের অমন সব বাড়ীঘর হয়েছে তবে কিসের জন্যে?

সাগর নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া মাথা উঁচু করিয়া রহিল; কিন্তু বুড়া হরিহর তেমনি জোড়হাতে কহিল, মা, আমরা তোমার কুপুত্র বলে তুমিও কি কুমাতা হবে? আমাদেরও একটা পথ করে দাও।

ষোড়শী একটু নরম হইয়া কহিল, তোমার কথাগুলি ত ভাল হরিহর, তা' ছাড়া তুমি বুড়ো হয়েও গেছ, কিন্তু তোমার ভাইপোটি ত অহঙ্কারে মুখ ফিরিয়ে রইল, দোষটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করলেনা।—ও কি কখনো শান্ত হতে পারবে?

হরিহর নিজের সর্ব্বাঙ্গে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বুড়ো হয়ে গেছি, না মা? চুলগুলোও সব পেকে গেছে,—এই বলিয়া সে মুচকিয়া একটু হাসিতেই সাগরের সমস্ত মুখ শান্ত হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে, খুড়া-ভাইপোর চোখে চোখে নিঃশব্দে বোধ হয় এই কথাই হইয়া গেল যে, এই ভাল। তোমার ওই প্রাচীন বাহু দুটির শক্তির কোন সংবাদ যে রাখেনা, তাহার কাছে এমনি সহাস্যে সবিনয়ে স্বীকার করাই সবচেয়ে শোভন।

বুড়া কহিল, অহঙ্কার নয় মা, অভিমান। ওটুকু ও পারে করতে,—সাগর কখনো ডাকাতি করেনা।

ষোড়শী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ও কি তবে বিনাদোষে শাস্তি ভোগ করলে? যা সবাই জানে, তা সত্যি নয়—

এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও হরিহর? তাহার অবিশ্বাসের কণ্ঠস্বর অকারণে অত্যন্ত কঠোর হইয়া বাজিল। তথাপি বুড়া হরিহর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভাইপো সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বাধা দিল। কহিল, কি হবে মা, তোমার সে কথা শুনে? তোমরা ভদ্র-লোকেরা ত আমাদের ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করতে পারবেনা! ভদ্র-লোকেরা যখন আমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে সেও সত্যি, পাওনার দাবীতে আবার যখন জেলে দিলে সেও তেম্‌নি সত্য সাক্ষীর জোরে। জজ সাহেবের আদালত থেকে মা চণ্ডীর মন্দির পর্য্যন্ত ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করবার ত কেউ নেই মা! চল, ছোট খুড়ো, আমরা ঘরে যাই। এই বলিয়া সে চট্‌ করিয়া হেঁট হইয়া ভৈরবীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া প্রস্থান করিল। হরিহর নিজেও প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিয়া সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, রাগ কোরোনা মা, ও ব্যাটা ঐ রকম গোঁয়ার, ও কথা কারু সইতে পারেনা। বলিয়া সেও ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুগমন করিল।

হৌক ইহারা অন্ত্যজ, হৌক ইহারা দস্যু; যতক্ষণ দেখা গেল ষোড়শী স্তব্ধ বিস্ময়ে এই হীনবীর্য্য, অবমানিত, অধঃপতিত বাঙ্‌লা দেশের এই দুটি সুস্থ, নির্ভীক ও পরম শক্তিমান পুরুষদিগের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতেই ষোড়শী সাগরকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, তোদের কাছে বাবা, কাল আমি অন্যায় করেছি। বিঘে দশ পনর জমি আমার এখনো আছে, তোরা খুড়ো-ভাইপোতে তাই ভাগ করে নে। মায়ের খাজনা তোরা যা' খুসি দিস্‌, কিন্তু অসৎ পথে আর কখনো পা দিবিনে এই আমার একমাত্র সর্ত্ত।

সেই অবধি সাগর ও হরিহর তাহার ক্রীতদাস। তাহার সকল কর্ম্মে সকল সম্পদে তাহারা ছায়ার মত অনুসরণ করিয়াছে, সকল বিপদে বুক দিয়া রক্ষা করিয়াছে। এই যে ভাঙ্গা কুটীর, এই যে সঙ্গীবিহীন বিপদাপন্ন জীবন, তবু যে কেহ তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার দুঃসাহস করেনা, সে যে কিসের ভয়ে এ কথা ত তাহার অবিদিত নাই। তথাপি, সেই সাগরের যে মূর্ত্তি আজ সে চোখে দেখিয়া আসিল তাহাতে ভরসা করিবার, বিশ্বাস করিবার আর তাহার কিছুই রহিল না। সে ডাকাতি করে কিনা বলা কঠিন; কিন্তু প্রয়োজন বোধ করিলে ইহার অসাধ্য কিছু নাই,—তাহার সমস্ত আয়োজন ও উপকরণ আজও তেমনি সজীব আছে,—এবং মুহূর্ত্তের আহ্বানে তাহারা আজও তেম্‌নি সাজিয়া দাঁড়াইতে পারে, এ সংশয় আর ত ঠেকাইয়া রাখা যায়না।

ছেঁড়া একখানা কাগজের টুকরা একপাশে পড়িয়া ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে হাতে তুলিয়া লইতেই তাহার প্রদীপের আলোক চোখে পড়িল, হৈমর চিঠির জবাবে সেদিন যে চিঠিখানা সে লিখিয়াও ভাল হইলনা ভাবিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আর একখানা লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, ইহা তাহারই অংশ। অনেক রাত্রি জাগিয়া দীর্ঘ পত্র যখন শেষ হয় তখন একবার যেন সন্দেহ হইয়াছিল এত কথা না লিখিলেই হইত,—পরের কাছে আপনাকে এমন করিয়া ব্যক্ত করা হয়ত কিছুতেই ঠিক হইলনা, কিন্তু নিদ্রাহীন সেই গভীর রাত্রে ঠিক করিবার ধৈর্য্যও আর তাহার ছিলনা। কিন্তু পরদিন ডাকে ফেলিয়া দিতে যখন পাঠাইল, তখন না পড়িয়াই পাঠাইয়া দিল,—তাহার ভয় হইল পাছে ইহাও সে ছিঁড়িয়া ফেলে—পাছে আজও তাহার হৈমকে উত্তর দেওয়া ঘটিয়া না উঠে। এ কয়দিন যাহা ভুলিয়াছিল, আজ একে একে সেই চিঠির কথা-গুলাই মনে পড়িয়া তাহার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল,—ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহার নির্য্যাতনের কাহিনীটুকু কেহ ভুল বুঝিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই হৈম ও তাহার স্বামীকে মনে পড়িলেই মন যেন তাহার কেমন বিবশ হইয়া আসিত। ইহাদের শৃঙ্খলিত জীবন-যাত্রার ধারার সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় নাই, তবুও কেমন করিয়া যে স্বপ্ন রচিয়া উঠিত, কেমন করিয়া যে কাজের চিন্তা তাহার এলোমেলো কল্পনায় পর্য্যবসিত হইত, কখনো হৈম কখনো নির্ম্মলের সূত্র ধরিয়া কি করিয়া যে ইহাই একসময়ে সমস্ত সংযমের বেড়া ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ লজ্জায় ফাটিয়া পড়িত, তাহা সে নিজেই ভাবিয়া পাইত না। অথচ নিজের মনের এই মোহাবিষ্ট লক্ষ্যহীন গতিকে সে চিনিত, ভয় করিত, লজ্জা করিত, এবং সকল শক্তি দিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিত। সেই উতলা আবেগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পত্রখণ্ড খানা খানা করিয়া ফেলিয়া দিয়া শক্ত হইয়া বসিল। মনে মনে দৃঢ়বলে কহিল, কিসের জন্য হৈমদের আমি এত কথা বলিতে গেলাম! কোন্‌ সাহায্য তাহাদের কাছে আমি ভিক্ষা করিয়া লইব? কিসের জন্য লইব? দেবীর ভৈরবীপদের মধ্যে কি আছে যে, এমন করিয়া

আঁকড়াইয়া থাকিব? যে কেহ নিক্‌না, কি আমার আসিয়া যায়? ইহারা সবাই ত চোর ডাকাত। যাহার যত শক্তি সে তত বড়ই দস্যু। সুবিধা ও সামর্থ্য মত অপরের গলা টিপিয়া কাড়িয়া লওয়াই ইহাদের কাজ। এই ত সংসার, এই ত সমাজ, এই ত মানুষের ব্যবসা! পীড়িত ও পীড়কের মাঝখানে ব্যবধান কতটুকু যে অহর্নিশি এমন ভয়ে ভয়ে আছি! কিসের জন্য আমার এতবড় মাথাব্যথা! কিসের জন্য এতবড় বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছি! এই ভৈরবীর আসন ত্যাগ করা কিসের জন্য এতবড় কঠিন! মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল এ কাজ তাহার পক্ষে একেবারেই কঠিন নয়, কাল সকালেই সে এককড়ি ও জনার্দ্দন রায়কে লিখিয়া পাঠাইয়া ভৈরবীর সকল দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে ফিরাইয়া দিতে পারে, কোথাও কোন টান্, কোন ব্যথা তাহার বাজিবেনা।

ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের কুলুঙ্গিতে তাহার কালি কলম ও কাগজ থাকিত; পাড়িয়া লইয়া এই চিঠিখানা তখনই লিখিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হইল। তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া ফেলিয়া সহসা তাহার লেখনী রুদ্ধ হইল। সর্দ্দার ও সাগরকে মনে পড়িল,—পৃথিবীজোড়া কাড়াকাড়ি ও দস্যুপনার মাঝখানে কেবল এই দুটি দস্যুই আজও তাহাকে ত্যাগ করে নাই। সহসা নিজের কথা মনে পড়িয়া মনে হইল, তার পরে? দাঁড়াইবার কোথাও স্থান নাই,—সবাই ত্যাগ করিয়াছে। কালও যাহারা তাহাকে ঘেরিয়াছিল, আজ তাহারা শাসনের ভয়ে জমিদারের গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাহারই বিরুদ্ধে পঞ্চাইতি করিয়া আসিয়াছে। অথচ, সে বেশি দিনের কথা নয় ইহাদিগকেই,—কিন্তু থাক সে কথা। এই অত্যন্ত ছোটদের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ নাই। এককড়ি, জনার্দ্দন, শিরোমণি, তাহার পিতা তারাদাস, আর এই জমিদার,—পুরানো ও নূতন অনেক কথা,—কিন্তু সেও থাক্; এ আলোচনাতেও আজ আর কাজ নাই। তাহার ফকির সাহেবকে মনে পড়িল। তিনি যে কি ভাবিয়া এমন করিয়া অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন তাহার জানা নাই; কাহাকেও তিনি কোন হেতু, কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিয়া যান নাই! ইতিপূর্ব্বেও তিনি এম্‌নি নিঃশব্দে চলিয়া গেছেন; স্নেহ দিয়া, ভক্তি দিয়া সসম্ভ্রমে বিদায় দিবার কোন অবসর কাহাকেও দেন নাই,—হয়ত ইহাই তাঁহার প্রস্থানের পদ্ধতি। তবুও কেমন করিয়া যেন ষোড়শীর মনের মধ্যে ব্যথা একটা বিঁধিয়াই ছিল, তাঁহার এই যাওয়াটাকে কোনক্রমেই সে তাঁহার অভ্যাস বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছিলনা। তিনি মাঝে মাঝে তাহার কথার প্রত্যুত্তরে বলিতেন, মা, আমি নিজের সঙ্গেই সম্বন্ধ ছেদ ক'রতে চাই, লোকের সঙ্গে নয়। তাই, লোকালয়ের মায়া কাটাতে পারিনে,—মানুষের মাঝখানে বাস করতেই ভালবাসি। তুমিও তোমার দেহটাকে যখন দেবতাকেই দিয়েছ, তখন সেই কথাটাই সকলের আগে মনে রেখো। কোন ছলে নিজের বলে যেন ভুল না হয়। দেবতার সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে আত্মবঞ্চনার চেয়ে বরঞ্চ দেবতাকে ছাড়াও ভাল। আজ এই বঞ্চনাই ত তাহাকে জালের মত জড়াইয়া ধরিতেছে। আজ যদি তিনি থাকিতেন! একবার যদি সে তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিতে পারিত! বহুপূর্ব্বে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, মা, যখন আমাকে তোমার যথার্থ প্রয়োজন হবে, সত্য সত্যই ডাক্‌বে, যেখানেই থাকি আমি তখনি এসে দাঁড়াব। আজ ত তার সেই প্রয়োজন!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বাহিরে হইতে ডাক আসিল, একবার ভিতরে আস্‌তে পারি কি?

ষোড়শীর বিক্ষিপ্ত দিক্‌ভ্রান্ত চিত্ত চক্ষের পলকে সচেতন হইয়া পরক্ষণেই আবার যেন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এতবড় অলৌকিক বিস্ময় সহসা যেন সে সহিতে পারিলনা।

আমি আস্‌তে পারি কি?

আসুন, বলিয়া ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুদিত চক্ষে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আগন্তুকের পদতলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কম্পিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল ফকির সাহেব নহেন, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী। চক্ষে আর পলক পড়িল না,—চোখের পাতাদুটো পর্য্যন্ত যেন পাষাণ হইয়া গেল। গৃহের দীপশিখা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এমন করিয়া যে-মানুষ এক নিমিষে পাথর হইয়া গেল, তাহাকে চিনিবার মত আলো ছিল। সুতরাং এই অদ্ভুত ও অকারণ উচ্ছ্বসিত ভক্তির উপলক্ষ যে সত্যই সে নয় আর কেহ, তাহা অনুভব করিয়া তাহার ভয় ভাঙিল। গম্ভীর মুখে

কহিল, এরূপ পতিভক্তি কলিকালে দুর্ল্লভ। আমার পাদ্য-অর্ঘ্য আসনাদি কই?

ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার এই হতভাগ্য জীবনে সে অনেককে দেখিয়াছে। সে জনার্দ্দনকে দেখিয়াছে, সে এককড়ি নন্দীকে দেখিয়াছে, সে তাহার আপনার পিতাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরূপে দেখিয়াছে; কিন্তু মানুষের পাষণ্ডতা যে এতদূরে উঠিতে পারে, এ কথা উপলব্ধি করিয়া তাহার ধাক্কা সাম্‌লাইতে তাহার সময় লাগিল। জীবানন্দ এদিক ওদিক চাহিয়া বাঁশের আলনা হইতে কম্বলের আসনখানি পাড়িয়া লইল; পাতিতে গিয়া খোলা দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, খিল্‌টা একেবারে দিয়েই বসিনে কেন? তোমার সাগর চাঁদটি শুনেচি নাকি আমাকে তেমন ভালবাসে না। কাছাকাছি কোথাও আছেন নিশ্চয়,—এসে পড়লে হয়ত বা কিছু মনেই করবে। ছোটলোক বইত নয়। বলিয়া সে এইবার একটু হাসিল। ষোড়শীর গা কাঁপিয়া উঠিল। সে নিশ্চয় বুঝিল লোকটা একাকী আসে নাই, তাহার লোকজন নিকটেই লুকাইয়া আছে, এবং সম্ভবতঃ এই সুযোগই সে প্রত্যহ প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ ভীষণ কিছু একটা করিতে পারে,—হত্যা করাও অসম্ভব নয়। এবং এই উদ্বেগ কণ্ঠস্বরে সে সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারিল না। কহিল, আপনি এখানে এসেছেন কেন?

জীবানন্দ কহিল, তোমাকে দেখ্‌তে। একটু ভয় পেয়েচ বোধ হচ্চে,—পাবারই কথা। কিন্তু তাই বলে চেঁচিয়োনা। সঙ্গে গাদা পিস্তল আছে, তোমার ডাকাতের দল শুধু মারাই পড়বে, আর বিশেষ কিছু করতে পারবেনা। এই বলিয়া সে পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া পুনশ্চ পকেটেই রাখিয়া দিয়া কহিল, কিন্তু দোরটা বন্ধ করে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হওয়াই যাক্‌না। এই বলিয়া সে ষোড়শীর মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল, এবং অগ্রসর হইয়া দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া দিল, যাহার গৃহ তাহার অনুমতির অপেক্ষা মাত্র করিলনা।

ষোড়শীর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একবার কথা কহিতে গিয়া তাহার কণ্ঠে বাধিল, তার পরে স্বর যখন ফুটিল, তখন সেই স্বর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, কহিল, সাগর নেই—

জীবানন্দ বলিল, নেই? ব্যাটা গেল কোথায়?

ষোড়শী কহিল, আপনারা জানেন বলেই ত—

জীবানন্দ কহিল, জানি বলে? কিন্তু আপনারা কারা? আমি ত বাপ্পও জানতামনা।

ষোড়শী বলিল, নিরাশ্রয় বলেই ত লোক নিয়ে আমাকে মারতে এসেছেন। কিন্তু আপনার কি করেচি আমি?

জীবানন্দ কহিল, লোক নিয়ে মারতে এসেচি! তোমাকে? মাইরি না। বরঞ্চ মন কেমন করছিল বলে দেখ্‌তে এসেচি।

ষোড়শী আর কথা কহিলনা। তাহার চোখে জল আসিতেছিল, এই কদর্য্য উপহাসে তাহা একেবারে শুকাইয়া গেল। এবং সেই শুষ্ক চক্ষু ভূমিতলে নিবদ্ধ করিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; এবং অদূরে বসিয়া আর একজন তাহারই আনত মুখের প্রতি লুব্ধ, তৃষিত দৃষ্টি স্থির করিয়া তাহারি মত চুপ করিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

কল্পনা

[মহারাজ-কুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়]

হে দেবি, কমলাসনা! তোমার চরণতলে
যে কমলদলে,
উদাস নয়ন মেলি, চেয়ে থাকে দিগন্তের পানে—
তারি মাঝখানে,
নিতান্ত সঙ্কোচে লাজে
যে তরল-গীত ধারা, অমৃত-নির্ঝর সম বাজে,
তাহারি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে
অশ্রু-ধৌত-সমুজ্জ্বল, মোহন সঙ্গীতে,
আমার হিয়ার মাঝে হে কমল-পাণি!
কি-বেদনা বাজি উঠে, তুমি জান, আমি নাহি জানি

শরতের কনক প্রভাতে,
নিতান্ত পাগলপারা বসন্তের রাতে,
বরষার হিয়া-ভরা সরস প্লাবনে—
আমার এ কম্প-হারা সব দেহ-মনে,
কিসের পুলক-ব্যথা, বাজে কার বাণী ?
তুমি সব জান—হায়, আমি নাহি জানি !
তুমি জান মেঘের ওই কাঞ্চন-কেতনে
কাহার নামটি লেখা ; প্রভঞ্জন-স্বনে -
কাহার বিজয় ভেরী নির্ঘোষিছে কথা,
বিদগ্ধ মরুর-বুকে কার নীরবতা !

প্রকৃতির পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য্যের সাথে
শরতের পরিপূর্ণ চাঁদিনীর রাতে,
মল্লিকা, মালতী আর মন্থর সমীরে,
কিসের গোপন কথা হয় ধীরে ধীরে—
তুমি সব জান দেবী, আমি নাহি জানি ;
তবুও কিসের লাগি দোলে হিয়াখানি,
যবে দূর সাগরের অবোধ উচ্ছ্বাসে,
নিদ্রোত্থিত প্রভাতের কলকণ্ঠভাষে—
উল্লাসে উছলি উঠি জয় নাম গান
অম্বরে ছড়ায়ে পড়ে—সহস্র পরাণ !
সন্ধ্যার সুনিবিড়, শান্তিময়ী ছায়া,
অরণ্যের অপরূপ অন্ধকার কায়া—
কাহার মোহন স্পর্শে উঠে সঞ্জীবিয়া,
কিছু নাহি জানি—তবু দুলে ওঠে হিয়া !

অঙ্গহীন অনঙ্গের অঙ্গারের রাশ,
রতির অন্তরচারী বিয়োগের ভাষ,
কবি-কণ্ঠে শুনি শুধু কেঁদে উঠে হিয়া ;
তুমি জান কে কাঁদায়, কি বেদনা দিয়া।
হে দেবি, কল্যাণময়ি, তুমি জান মোর,
নয়নের লোর—

কোন গুপ্ত উৎস হতে উৎসারিয়া উঠে,
কাহার দহন লাগি, অন্তরের আরক্তিম পদ্ম-কলি ফুটে।
কাহার বিরাট্-গাথা, শিহরিয়া তুলে মোর স্পন্দমান হিয়া
কোন্ সে দুরন্ত আসি বারে বারে ফিরে যায়, অশ্রু-অর্ঘ্য নিয়া।
কাহার বক্ষের মাঝে লুকান রয়েছে সুধা, হে চিত্ত-চারিণি !
তুমি জানিয়াছ সব, তুমি দেখিয়াছ সব, আমি তো পারি নি !

হায় দেবি ! নাহি বুঝি কোন খেদ নাই,
শুধু যদি পাই—
তোমার চরণ-তলে বসিবার স্থান,
পুঞ্জীভূত পদ্ম সনে, মৃদু কম্পমান।
সন্ধ্যার সলজ্জ বায়,
অন্ধকার ছায়,
আকাশের তারা যবে
শুধু চেয়ে রবে
নিতান্ত বিশ্বাস ভরে
ধরণীর পরে ;
দিগন্তের বুকে যবে, নিশার চাঁদের
ফুটিয়া উঠিবে স্বপ্ন, মোহন ছাঁদের,

নীরবে বসিয়া রব ও চরণ-তলে।
মনের কলঙ্ক যত, প্রতি দণ্ডে, পলে
ধৌত করি দিবে মোর নয়ন-আসার,
গুঞ্জরি উঠিবে বীণা-স্বর্ণময় তার।
তার পরে যদি কভু মাতঙ্গের দলে
চরণে দলিয়া পদ্ম দূরে যায় চ'লে,
তোমার বক্ষের পরে ফেলি শেষ শ্বাস,
হে মোর কল্পনাময়ি ! মহাশূন্যে মিলাইবে
জীবনের সুদীর্ঘ প্রয়াস।

ইংরাজী-শেখা

[বীরবল]

যা মনে ভেবেছিলুম, তাই হয়েছে। স্কুলে বাঙলার চল হ'লে, বাঙালীরা আর যে ইংরেজি শিখবে না, এ কথা আবার উঠেছে। জন কতক উকিল কৌঁসুলি ও কাউন্‌সিলারকে এ নিয়ে গুজুগুজু করতে আমি স্বকর্ণে শুনেছি। অতএব তাঁদের ভয় ভাঙ্গাবার চেষ্টা করা যাক।

ইংরেজি যে আমাদের শেখা আবশ্যক এবং অতি আবশ্যক,—শুধু কর্ম্ম-মার্গে নয়, জ্ঞান-মার্গেও সে ভাষার যে আমাদের নিত্য-নিয়মিত প্রয়োজন আছে, সে কথা আমি সম্পূর্ণ মানি।

তবে জানতে চাই যে, ইংরাজি শেখার মানে কি ? ও ভাষা পড়্‌তে শেখা, না বল্‌তে শেখা, না লিখ্‌তে শেখা ?

যে লোক নিজের ভাষা ভাল করে জানে, আর যার মন কতকটা সায়েস্তা হয়েছে, অর্থাৎ যার মনে শিক্ষা লাভ করবার শক্তি জন্মেছে, সে যে-কোনও আর্য্য ভাষা বছর খানেকে এতটা আয়ত্ত করতে পারে যে, তাতে তার বই পড়ার কাজ মোটামুটি চ'লে যায়।

বিশেষ করে আর্য্য ভাষার নাম করবার কারণ এই যে, আর্য্য জাতীয় সকল ভাষারই গড়ন এক। বাংলা ইংরাজি—ফরাসী জার্ম্মাণ এ সকল ভাষার ব্যাকরণের গোড়ায় মিল আছে। আসল তফাৎ অভিধানে।

তার পর, আমার বিশ্বাস যে চীনে জাপানি ভাষাও দরকার হ'লে এক বছরে না হোক দুবছরে অনেকটা দখল করা যায়। অন্ততঃ এ কথা ঠিক যে চীনে শেখবার জন্ত বাঙলা ভোলা আবশ্যক নয়।

সুতরাং ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বভাষা শিখলে, আমাদের ছেলেরা আঠারো বছর বয়সে যে ইংরেজি শিখ্‌তে পারবে না, এ হচ্ছে সেই সব বৃদ্ধের কথা, যাঁরা মনে বালক।

তার পর ইউনিভারসিটি ত ইংরেজিকে স্কুল থেকে একেবারে বার করে দিচ্ছে না, তার ব্যাখ্যা ও পরীক্ষাই শুধু বাঙলায় হবে। এটা বড় বেশী বদল নয়।

আমাদের মত বাঙলা-নবিশদের দাবী অবশ্য এর চাইতে ঢের বেশী। আমরা চাই—ইতিহাস ভূগোল গণিত, ইত্যাদি সবই বাঙলার পুরো দখলে আসে ; আর ইংরেজি শুধু স্কুলে দ্বিতীয় ভাষারূপে বিরাজ করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলাকে যেটুকু অধিকার দিয়েছেন, তাই যে আমরা হালের মতন শিরোধার্য্য করছি, তার কারণ, আমরা জানি যে, বাঙলা ওখানে ছুঁচ হয়ে ঢুকলেও, ফাল হয়ে বেরবে। ও হচ্ছে আমাদের মনের বেনো জল।

(২)

তার পর যেটুকু ইংরেজি আমাদের পেটের দায়ে বলা দরকার, সেটুকু আয়ত্ত করতে মানুষের বড় বেশী সময় লাগে না। এ দেশে যে সম্প্রদায় কথা বেচে খান, অর্থাৎ উকিল সম্প্রদায়—তাঁদের অবশ্য ইংরাজি ভাষাটা মুখস্থ থাকা চাই। ওকালতির কাজ কিন্তু ভাঙ্গাচোরা ইংরাজিতে দিব্যি চলে যায়। আদালতে আইন ব্যবসায়ীদের বাহাজের দিকে একটু মন দিলেই দেখা যায় যে, তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের ইংরাজি একদম বে-পরোয়া,—সে ভাষা ইংরাজের ব্যাকরণও মানে না, অভিধানও মানে না। অথচ সেই ইংরাজির কৃপায় বহু লোক বহু অর্থ উপার্জ্জন করেছেন। আসল কথা কি জানেন, আদালতে খাঁটি ইংরাজি বলবার প্রয়োজন নেই ; খাঁটি আইন বললেই টাকা করা যায়। তার পর ইংরেজের আদালতে ঐ আইন বলাও অতি সোজা ; কেন না সে ক্ষেত্রে নিজে কিছু বল্‌তে হয় না, শুধু বই খুলে reading

পড়তে হয়, কেন না ইংরেজের আইন হচ্ছে নজির। তারপর আদালতে যে ভাষা বলতে হয়, সে ভাষা কেউ স্কুল কলেজে শেখে না,—শেখে ঐ আদালতেই। আইনের ভাষাও একটা পরিভাষা। তাই এ ভয় নেই যে, স্কুলে বাঙলা ঢুকলে, বাঙালী আর আদালতে ঢুকতে পারবে না। আর তা ছাড়া কালের গতিকে বাঙলা একদিন আদালতেরও ভাষা হতে পারে।

(৩)

বাকী থাকল আমাদের সব পলিটিক্যাল সভা সমিতি। ইংরাজরা ভয় পেয়েছেন যে, বাঙলার দৌরাত্ম্যে শেষটা কংগ্রেস না মারা যায়। আর কংগ্রেস যদি মারা যায় ত আমাদের এত সাধের স্বরাজের কি হবে? যাঁরা কস্মিন কালে কংগ্রেসের ছায়া মাড়ান নি, এমন সব বাঙালীরও দেখতে পাচ্ছি বাঙলার ভয়ে কংগ্রেসের উপর হঠাৎ মায়া পড়ে গিয়েছে। তাঁদের আশ্বস্ত করবার জন্য বলছি যে, বাঙলায় ইতিমধ্যে, এত বস্তা-বস্তা ইংরাজি বিদ্যে বাঙালীর মনে গুদামজাত করা হয়েছে যে, ইংরাজি পড়া এ দেশে একদম বন্ধ হয়ে গেলেও, আরও তিরিশ বৎসর কংগ্রেসে বক্তৃতা করবার জন্য বাঙালী-বক্তার অভাব হবে না। আশা করি তিরিশ বৎসর পরে আমরা স্বরাজ পাব—তখন অবশ্য কংগ্রেস বজায় রাখবার আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। আর স্বরাজ যদি তখনও না পাই, ত সবাই বুঝবে যে ইংরেজি বকে আর কোন ফল নেই; আর তা বুঝিবামাত্র দেশী লোকে স্বভাবতেই স্বরাজের কথা কইবে।

(৪)

ইংরাজি লিখতে হয় এক সরকারী কর্ম্মচারীদের, আর এক সংবাদ পত্রের সম্পাদকদের।

নিম্ন কর্ম্মচারীদের অর্থাৎ কেরাণীদের ত ইংরেজি নিজে লিখতে হয় না, পরের লেখা নকল করতে হয়। ও বেচারারা ত এক রকম রক্তমাংসের type-writing machine। কেরাণীগিরির জন্য ইংরাজিভাষায় পারদর্শী হবার প্রয়োজন নেই—ও ভাষার অক্ষর-পরিচয় থাকলেই নকলের কাজ ছাপাখানার মত অবলীলাক্রমে চলে যায়।

তার পর, দেশী হাকিমদের ভিতর এমন লোকের অভাব নেই, যাঁরা নির্ভুল ইংরাজিতে দু'পাতা চিঠি লিখতে পারেন না; কিন্তু বিশ পাতা রায় কিম্বা দু'শ পাতা রিপোর্ট অক্লেশে লেখেন। কারণ, ঐ রায় রিপোর্টের জন্য স্বতন্ত্র ভাষা আছে,—যা স্কুল কলেজে কেউ শেখে না, সকলেই ঐ কর্ম্মক্ষেত্রেই শেখে। সুতরাং স্কুলের প্রশ্ন-পত্রের ইংরাজিতে জবাব না লিখলে আমাদের ছেলেরা যে সওদাগরের ও সরকারের চাকরী করতে পারবে না,—সে ভয় কারও পাবার দরকার নেই।

তার পর, ইংরাজি ভাষায় সংবাদপত্র লেখবার জন্যও আশৈশব ও-ভাষায় কলম চালাবার দরকার নেই। এই কলকাতা সহরে বাঙালীর লেখা তিনখানা দৈনিক কাগজ আছে; আর সে সব কাগজের যা কিছু মূল্য আছে, সে তাদের ভাষার খাতিরে নয়। Bengalee লেখেন ইংরাজির পারিভাষিক আর মুখস্থবুলি। আর Servant যে কেন ইংরাজি লেখেন তা Servantই জানেন। বাকী থাকল এক "অমৃতবাজার"। কাগজখানি যে এতকাল এত সুপাঠ্য ছিল, তার একমাত্র কারণ, অমৃতবাজার কস্মিনকালেও ইংরাজের ইংরাজি লিখতে চেষ্টা করে নি,—চিরদিনই খাঁটি বাঙলার কথায় কথায় ইংরাজি অনুবাদ করে গেছে।

অতএব স্কুলে বাঙলা ঢোকার ফলে, ভবিষ্যতে আমাদের ওকালতিও মারা যাবে না, সরকারী চাকরীও মারা যাবে না, এডিটারিও মারা যাবে না।

আর ইংরাজি না জেনেও, ইংরাজি ভাষায় যে কি রকম চমৎকার কবিতা লেখা যায় তার প্রমাণ, বিখ্যাত বরানগর poetএর Englishman কাগজে প্রকাশিত কবিতাবলী। অতএব এটা নিশ্চিত, ভবিষ্যতে আমাদের হাত থেকে ইংরাজি কাব্যও বেরবে। ইংরাজি ভাষা শিক্ষার নামই যে শিক্ষা, আর চিরজীবন পরের ভাষা কণ্ঠস্থ করাই যে আমাদের পক্ষে পরম পুরুষার্থ, যাঁদের এ মত, তাঁদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, এবার মরে তাঁরা যেন বিলাতে জন্ম গ্রহণ করেন।

(শেষ)

বীরবলের পত্র

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলুম যে, ইউনিভার্সিটির পরমায়ু ফুরিয়েছে। ও ব্যাপার আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে, টাকার অভাবে।

ইউনিভারসিটির ব্যয় না কি বেশীর ভাগ অপব্যয়। তাই আমাদের Education Minister ইউনিভারসিটিকে টাকা আর জলে ফেলতে দেবেন না। আর যদি কিছু কিঞ্চিৎ দেন ত সে টাকার কানদেগে (ear marked) করে দেবেন। ইউনিভারসিটি ও কানমলা টাকা নেবেন না। আর টাকা না হলে গভর্ণমেণ্টও চলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলে না, কংগ্রেসও চলে না, কিছুই চলে না, সুতরাং ইউনিভারসিটিও চলবে না।

আমাদের Education Minister ইউনিভারসিটির উপর কোনরূপ violent হস্তক্ষেপ করতে চান না, শুধু non-co operation করতে চান। হাতে মারা প্রহার, কিন্তু ভাতে মারা আহার, এ মত দেখছি উপরে উঠে গিয়েছে।

অবশ্য ইউনিভারসিটি চুপ করে নেই। তার কথা এই—

"আমার খরচ ব্যয় কি অপব্যয়, তা তুমি বুঝবে কি? ব্যয় ও অপব্যয়ের প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে, স্থূলদৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। তার পর একের মতে যা ব্যয়, অপরের মতে তা অপব্যয় হতে পারে। আমার মতে ministerদের যে মাইনে দেওয়া হয়, তার ষোল আনাই অপব্যয়। সে যাই হোক্, আমার কোন্ ব্যয়টা সদ্ব্যয়, আর কোন্টি অপব্যয়, সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে বাধ্য নই। আমি যে রকম ভাল বুঝি, সেই রকম খরচ করবার অধিকার আইনতঃ আমার আছে।

হিসেব তুমি দেখতে পারো, কিন্তু তার উপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা তোমার নেই—ইউনিভারসিটি হচ্ছে 'স্বরাট্'।

এর উত্তরে Minister মহাশয় বলেন :—

"তোমার স্বরাজ্য আমার সাম্রাজ্যের ভিতর। আর তা যদি না মানতে চাও ত মেনো না,—একটি পয়সাও পাবে না। রাখো তোমার আইন। আমার হাতে টাকার থলি, আর তোমার হাতে ভিক্ষের ঝুলি; অতএব কে কার অধীন, তা সবাই জানে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা-সচিবের এ লড়াই হচ্ছে মনের সঙ্গে ধনের লড়াই। অতএব ধনেরই জয় হবে। ইউনিভারসিটি হচ্ছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ,—বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের কাছে ভিক্ষা না পেলে, তার কপালে উপবাস ঘটবে; আর তার ফল মৃত্যু।

অতএব এটা নিশ্চিত যে, রিফরম কাউনসিলের প্রথম এবং প্রধান কীর্ত্তি হবে, ইউনিভারসিটি ভাঙ্গা। লোকমত এ কার্য্যের সহায় হবে; কেন না, এ হচ্ছে ভাঙ্গার যুগ,—তাই একটা ভাঙ্গা হচ্ছে দেখলেই, লোকে খুসি হবে। ও বিদ্যালয় বন্ধ করবার পর, তার লোকজন ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে কি করা যায়, সেটাই হচ্ছে আপাততঃ আসল ভাবনার কথা।

আমি এ বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করছি, আশা করি বাঙলার বিদ্বজ্জন সমাজ আমার আরজি বিনা বিচারে ডিস্‌মিস্ করবেন না। এ সব প্রস্তাব অনেক ভেবে চিন্তে করা হয়েছে।

(২)

(১) ইউনিভারসিটি বন্ধ হলে অধ্যাপকের কি গতি হবে? আমার পরামর্শ যদি নেন ত, গণিতের অধ্যাপকেরা বড়বাজারে চলে যান মাড়োয়ারীর খাতা লিখতে; কেমিষ্ট্রির অধ্যাপকেরা পেটেণ্ট ঔষধ বানান—ওতে দু-পয়সা আছে; physicsএর অধ্যাপকেরা বিজলী বাতী, বিজলী পাখার মিস্ত্রি হোন; আর সাহিত্যের অধ্যাপকেরা আট আনা সিরিজের বই লিখুন; আর তাও যদি না পারেন ত খবরের কাগজ লিখুন। বাকী থাকল এক দর্শনের অধ্যাপক। তাঁরা সকল কর্ম্মের বার; অতএব তাঁরা চরকা নিয়ে বসে যান—তাহ'লে তাঁদের হাতে ঐ চরকার ভিতর থেকে বেদান্ত-সূত্র বেরবে।

(২) ছাত্রদের পথ সব দিকেই খোলা! তাদের কতক পাঠানো হোক টোলে, কতক জেলে, কতক পাঠশালায়, কতক পশুশালায়, কতক হাটে, আর কতক মাঠে। হট্টে গোল করবার জন্য, আর মাঠে গুলি-ডাণ্ডা খেলবার জন্য।

(৩) লাবরেটারির যন্ত্রপাতি সব যাদুঘরে পাঠান হোক। মৃত বিজ্ঞানের কঙ্কাল স্বরূপ সেখানে সে সব কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা হবে। এতে দু-দলের উপকার হবে—এক জনগণের, আর এক প্রত্নতাত্ত্বিকদের। জনগণ ঐসব ত্রিভঙ্গ বিভঙ্গ অপরূপ বস্তু হাঁ করে দেখে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হবে। তারা চিনতে পারবে যে, ও সব হচ্ছে রূপকথার দেশের রাজকন্যার যাদুর যন্ত্র-তন্ত্র, আর ওরই ভিতর মানুষের জিওন-কাঠি মারণ-কাঠি দুই লুকোনো আছে। অপর পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঐ সব কঙ্কালের ভিতর থেকে, বৈজ্ঞানিক যুগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সব উদ্ধার করবেন, এবং তার জন্য সরকারের কাছ থেকে মোটা মাইনে পাবেন।

(৪) বইগুলো নিয়েই পড়েছি মুস্কিলে। ও অনাসৃষ্টির কোথাও জায়গা হবে না,—এমন কি পাগলা গারদেও নয়। অতএব পুরাকালে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর যেরূপ সৎকার করা হয়েছিল, ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীরও তদ্রূপ হওয়া উচিত। তবে আমি ব্রাহ্মণ সন্তান বলে পাঁজিপুথির অগ্নি সৎকারের বিরুদ্ধে আমার একটা নৈসর্গিক কুসংস্কার আছে। তাই ও প্রস্তাব আমি মুখে আনব না। তবে তা করবার লোকের অভাব হবে না। বিদ্যাদাহের মুরদাফরাস দেশে ঢের মিলবে।

(৫) Senate Houseকে, মাধববাবুর বাজারের অন্তর্ভুক্ত করা হোক! ইউনিভারসিটি উক্ত বাজারকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। তাতে সরকারের অগাধ টাকা ব্যয় হত, অথচ এক পয়সাও আয় হত না। আর আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হলে, সরকারের এক পয়সাও ব্যয় হবে না, উল্টে ঢের টাকা আয় হবে। আমার বিশ্বাস, ও ঘরের যে ভাড়া পাওয়া যাবে তার থেকে একটি নূতন minister অর্থাৎ fish market ministerএর মাইনে দেওয়া যাবে।

(৬) আমার শেষ প্রস্তাব এই যে ইউনিভারসিটি কলেজে একটি নতুন পুলিসকোর্ট বসানো হোক। এ বিষয়ে নজীর আছে। ডফ্ সাহেবের কলেজ ইতিপূর্ব্বে জোড়াবাগান পুলিশ কোর্টে পরিণত হয়েছে। এই নজীর অনুসারে, ইউনিভারসিটি কলেজকে, গোলদীঘির পুলিস-কোর্টে রূপান্তরিত করা হোক। গোলদীঘির ধারে যে একটা পুলিস-কোর্ট থাকা দরকার, এ কথা বোধ হয় কোন মিনিষ্টারই অস্বীকার করবেন না।

আশা করি, Reform Council আমার উক্ত প্রস্তাব সব গ্রাহ্য করিবেন। ইতি (বিজলী)

শিক্ষা-সমস্যা

পত্রান্তরে প্রকাশ, এবার পাঁচ হাজার ছাত্র কলিকাতা সহরের সরকারী এবং বে-সরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহার ভিতর কেবল মাত্র পাঁচশত ছাত্রেরই প্রবেশানুমতি পাইবার সম্ভাবনা। অবশিষ্ট সাড়ে চারি হাজার ছাত্র করিবেন কি? যাইবেন কোথায়?

কেবল এই সাড়ে চারি হাজার ছাত্রই নহেন, মেট্রিকুলেশন, আই-এ, আই-এসসি, বি-এ এবং বি-এসসি প্রভৃতিতেও সহস্র সহস্র ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইবেন। এই সব ছাত্রেরই বা পরিণাম কিরূপ হইবে?

পরিণাম-দর্শিগণের পক্ষে এই সকল ছাত্রের পরিণাম চিন্তা করা

বিশেষরূপ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজী বিস্তায় পাশের একটা বাজার-দর বাজারে উঠিয়াছিল। সেই দরের প্রলোভনে অনেকেই প্রলুব্ধ হইয়া যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতেন; জজ, ম্যাজিষ্টর, উকীল, ডাক্তার, প্রভৃতির পেশার লোভে অনেকেই আপন সন্তানগণকে লায়েক করিয়া তুলিতেন। ফলে, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যা-বাহুল্যে পাশের দর ক্রমেই নামিয়া পড়িতে লাগিল; এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, যে,—বি-এ এম-এ পাশ করিয়া পঁচিশ-ত্রিশ টাকার চাকরী জোটানোও মহা দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে হয় ত পৈতৃক ভিটা বা ধান জমি বাঁধা দিয়া বা বিক্রয় করিয়াও ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইলেন;—সেই ছেলে শেষে কলিকাতায় একটা প্রাইভেট টিউশানির জন্যও মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিয়াও সিদ্ধকাম হইতেছে না। ডাক্তার উকীলও গণ্ডায় গণ্ডায় ভেরেণ্ডা ভাজিয়া বেড়াইতেছেন। বি এর দর বিয়ের বাজারে যাহা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও ক্রমে কিছু কিছু করিয়া কমিয়া আসিতেছে; অন্ততঃ প্রথম প্রথম পাশের দর যতটা ছিল, আর ততটা দেখা যাইতেছে না। অর্থাৎ ইংরেজী পাশ করিয়াও অনেকেরই উদরান্নের সংস্থান করাও অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সঙ্কট মোচনের উপায় কি?

এই শিক্ষার স্রোত বঙ্গে কিরূপ প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে,—গত বৎসরের সরকারী শিক্ষা রিপোর্ট হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গত সালে অর্থাৎ ১৯২০-২১ সালে বঙ্গে সরকারী এবং বে-সরকারী বিস্তালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৫৩ হাজার ৯ শত ৬৮টা; গত পূর্ব্ব বৎসর ছিল ৫২ হাজার ৮ শত ৭৯টা; সুতরাং গত বৎসর ইহার সংখ্যা বাড়িয়াছিল ১ হাজার ৮৯টা; গত বৎসর সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়াছিল; হইয়াছিল ৫১ হাজার ৯ শত ৯৮টা; বে-সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল; হইয়াছিল ১ হাজার ৯শত ৭৪টা। সরকারী বিদ্যালয়সমূহের ভিতর গত বৎসর ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছিল ৫১টী কলেজ, ৯০৯ হাই স্কুল, ১৮৩৩ মধ্য স্কুল, ৪৭,৭৭২ প্রাইমারী এবং ১৪৩০ স্পেশাল স্কুল। ছাত্রসংখ্যা গত বৎসর কিছু কমিয়াছিল; গত পূর্ব্ব বৎসর ছিল ১৯ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯ শত ৯ জন; গত বৎসর হইয়াছিল ১৯ লক্ষ ৪৫ হাজার ১ শত ৪৫ জন। সরকারী বিদ্যালয়সমূহে গত পূর্ব্ব বৎসর ছাত্র ছিল ১৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫ শত ৯৯ জন; গত বৎসর হইয়াছিল ১৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫ শত ১০ জন। বে-সরকারী বিস্তালয়-সমূহে গত বৎসর ছাত্র ছিল ৬৭ হাজার ৩ শত ১০ জন। গত বৎসর হইয়াছিল ৫৬ হাজার ৬ শত ৩৫ জন। এ বৎসর এই ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের বিশেষ হেতু—অসহযোগ আন্দোলন। কার্য্যকরী শিক্ষার অপ্রাচুর্য্য বশতঃ অনেক ছাত্রই যে আধুনিক সকল শিক্ষার প্রতি ক্রমেই বীতরাগ হইয়া পড়িতেছেন,—ইহাও ক্রমেই স্পষ্টীভূত হইয়া আসিতেছে। গবরমেণ্টও ইহা উপলব্ধি করিতেছেন। সেইজন্যই রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে, এ সম্বন্ধে গবরমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় আলোচনা-বিবেচনা করিতেছেন। এই আলোচনা-বিবেচনার ফল কিরূপ ফলিবে, তাহা এখন বলা যায় না; শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে এ নাগাদ কমিটি-কমিশন আলোচনা-বিবেচনা অনেকরূপই হইয়াছে;—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুফল কতটুকু ফলিয়াছে?

এদেশের লোককে এই যে শিক্ষাদান, এই শিক্ষাদানে গত বৎসর ব্যয় পড়িয়াছে কিরূপ, সেটাও শুনাইয়া রাখি। গত বৎসর বঙ্গে শিক্ষা-বাবদে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৩ কোটি ৯ লক্ষ ২২ হাজার ৩ শত ৭৭ টাকা; ইহার পূর্ব্ব বৎসর ব্যয় হইয়াছিল ৩ কোটি ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৮ শত ৯২ টাকা। সুতরাং গত বৎসর এ বাবদে ব্যয় গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইহার ভিতর জেলা এবং মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে যথাক্রমে ১৪ লক্ষ ৯ হাজার ৪ শত ২২ টাকা এবং ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৯ শত ৮৮ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪ শত ৮৪ টাকা দেওয়া হইয়াছিল; আর ছাত্রদত্ত বেতন হইতে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫১ টাকা এবং অন্যান্য বাবদে পাওয়া গিয়াছিল ৪৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৪ শত ৩২ টাকা। বলা বাহুল্য, কেবল যে ইংরেজী শিক্ষা প্রদানের জন্যই এই ব্যয়, তাহা নহে। ইহার ভিতর প্রাইমারি প্রভৃতি শিক্ষার ব্যয়ও আছে। তবে শিক্ষার কথা তুলিতে হইলে, ইদানীং ইংরেজী শিক্ষার প্রাবল্যের কথাটাই আগে আসিয়া পড়ে। (বঙ্গবাসী)

নারীশিক্ষা-সমিতি

দুঃস্থা নারী ও বিধবাদের জন্য

বাংলাদেশে বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপিত হয়। বালিকাদের জন্য বিস্তালয় স্থাপন, এই-সব বিস্তালয়ের জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা, মাতাদিগকে শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা শিখাইবার বন্দোবস্ত করা, এবং অসহায়া বিধবা ও অন্য নিঃস্ব স্ত্রীলোকদিগকে উপার্জ্জনক্ষম মত শিক্ষা দিবার জন্য আশ্রম ও শিক্ষালয় স্থাপন, এই সমিতির উদ্দেশ্য। এ পর্য্যন্ত সমিতি দশটি নূতন স্কুল স্থাপন এবং একটি পুরাতন স্কুলকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চারিটি কলিকাতায়, এবং বাকীগুলি চব্বিশপরগণা ও হুগলী জেলায় স্থিত। সাড়ে ছয় শতের উপর ছাত্রী এই সব স্কুলে শিক্ষা পাইতেছে। সমিতি কলিকাতার ব্রাহ্মশিক্ষালয়ে প্রসূতি ও শিশুর কল্যাণ সাধন বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদিগের দ্বারা সচিত্র বক্তৃতা দেওয়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে চুনীলাল বসু, বামনদাস মুখোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, নিবারণচন্দ্র মিত্র, ও তেজেন্দ্রনাথ রায় ডাক্তার মহাশয়েরা বারটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এই প্রকার শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আহীরীটোলা, ভবানীপুরে আরো দুটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ব্রাহ্ম বালিকা-শিক্ষালয়ে দুঃস্থা মহিলাদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার নিমিত্ত কোন-কোন শিল্প শিখাইবার উপযোগী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সেখানে আপাততঃ চরকায় সূতা কাটা, হাতের তাঁতে কাপড় বোনা, সেলাইয়ের কাজ, এবং মোরব্বা, জেলী ও চাটনী তৈয়ার করিতে শিখান হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চব্বিশ-পরগণা

হাওড়া ও নদীয়া জেলায় সমিতি অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। যে-যে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইবে, তথাকার স্কুল তত্রত্য বালিকা ও মহিলাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ-সাধন চেষ্টার কেন্দ্র হয়, সমিতির এইরূপ ইচ্ছা। গ্রামের লোকেরাই স্থানীয় স্কুল কমিটির অধিকাংশ সভ্য মনোনীত হন।

সমিতি দুঃস্থা নারীদের, বিশেষতঃ বিধবাদের, সাধারণ শিক্ষা ও অর্থকর শিল্প আদি শিক্ষার জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম অনুসারে ইহার নাম রাখা হইয়াছে—

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন

এই বাণী-ভবনের কিছু বিবরণ গত মাসের প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে ইহাও লেখা হইয়াছে, যে, শ্রীমতী হরিমতি দত্ত ইহার জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই দানশীলা মহিলা কলিকাতা ইটালী বেনিয়াপুকুর নিবাসী ৺পরাণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্নী। তিনি কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তাঁহার স্বামীর নামে একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; এবং দুটি রোগীর শয্যার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। তদ্ভিন্ন এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে (বেলগেছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে) দশহাজার টাকা দিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশ মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহাশয়া নারীশিক্ষা-সমিতির ও বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের সম্পাদিকা। সমিতির ও বাণী-ভবনের কার্য্যের জন্য বিস্তর টাকার প্রয়োজন। বাণী-ভবনের জন্য জমী বা বাড়ী ক্রয় করিতে হইবে; এবং কেবল জমী কিনিলে সমুদায় ঘর বাড়ী, ও জমী সহিত বাড়ী কিনিলে বাড়ীও কিছু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। টাকাকড়ি সম্পাদিকার নামে ১০৫ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দান সাদরে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

"প্রবাসী"।

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১। এক সের তুলায় কতটুকু সুতা তৈয়ার হয়? এবং কতটুকু সুতায় একখানা প্রমাণ কাপড় প্রস্তুত হয়?

২। আমে পোকা হয় কেন? তাহা নিবারণের উপায় কি?

৩। (মাথার) উকুন মরে (অথচ চুল উঠে না) ইহার কোন ঔষধ আছে কি? শ্রীপ্রিয়বালা ঘোষ।

৪। কার্পাস তুলার গাছ কি প্রকার মাটিতে রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়?

৫। আমের আঁটি হইতে কি প্রকারে ক্ষার প্রস্তুত হয়?

শ্রীফোয়ারারাণী রায়।

৬। হুসঙ্গের কোনও ইতিহাস আছে কি না? থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়?

৭। হস্তিদন্তের কোনও জিনিস ভাঙ্গিয়া গেলে জুড়িবার উপায় কি? শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী।

৮। জাপান হইতে কোন্ কোন্ শিল্প শিক্ষা করা যাইতে পারে? প্রত্যেক প্রকার শিল্প শিখিতে কত সময় লাগে? জাপানের কোন্ কোন্ সহরে কি কি শিল্প শিক্ষা করা যায়?

৯। চীনের কোন্ কোন্ সহরে কি কি শিল্প শিখিতে পারা যায়? চীনা মাটির প্রস্তুত জিনিসপত্র চীনের কোন সহরে তৈয়ারী হয়?

১০। জাপানে সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে মাসিক খরচ কত পড়ে? আমেরিকা প্রভৃতির ন্যায় জাপানে নিজ-নিজ জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকা যায় কি না?

১১। জাপান হইতে কি কি শিল্প শিখিয়া আসিলে, আমাদের দেশে লাভবান হওয়া যায়? শ্রীঅমূল্যকুমার সেন গুপ্ত।

১২। পৌষমাসের সংক্রান্তি দিবসে বহু গৃহস্থ-কন্যা কলাগাছের ছোট ডিঙ্গিতে বা সোলার নৌকায় (যাহা ঐ দিবসে বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়) জোড়া সিম, জোড়া ফুল, পঞ্চশস্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য রাখিয়া তাহার পূজা করেন। তৎপরে সন্ধ্যার সময় পুকুর বা নদীতে উহা ভাসাইয়া দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ ইহাকে সোয়া দোয়া পূজা বলে।

(ক) এই পূজার তাৎপর্য্য কি?

(খ) ভারতের সর্ব্বত্রই এই পূজা হয় কি না?

(গ) বাংলায় কত দিন হইতে এই পূজার প্রচলন হইয়াছে?

(ঘ) বাংলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্র—সকল জাতির মধ্যে এই পূজার প্রচলন আছে কি না? শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মল্লিক।

১৩। লোক-প্রবাদ শোনা যায় যে, সত্য যুগ যাইবার পরে দ্বাপর যুগ আসিবার কথা ছিল। ইহার শাস্ত্রগত কিম্বা পৌরাণিক প্রমাণ পাওয়া যায় কি না? যদি পাওয়া যায় তবে দ্বাপরের আবির্ভাব না হইয়া ত্রেতার আবির্ভাব হইল কেন? শ্রীঅক্ষয়কুমার কুণ্ডু

১৪। এতদঞ্চলে ডালিম বা বেদানার গাছ খুবই বিরল। যদিও কোনও গৃহস্থের বাড়ী ২।১টী গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ফল প্রায়ই পাওয়া যায় না। শতকরা ৭৫টী ছোট থাকিতেই ঝরিয়া পড়িয়া যায়; এবং পরে যাহা ২।৪টী থাকে, তাহাও পোকাতে নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহার কোনও প্রতিকার কেহ করিতে পারেন কি?

১৫। যমজ সন্তানের একজনের কোনও অসুখ হইলে অন্যটীরও ঠিক সেই অসুখ হয় কেন? শ্রীস্নেহলতা দেবী

১৬। হুগলী জেলার বৈদ্যবাটীর নিকট "নিমাই তীর্থ" ঘাটের উৎপত্তি বিবরণ কি?

১৭। শনি মঙ্গলবারে বাঁশ ও কলাগাছ কাটিতে নাই এবং রবিবার বাঁশের জন্মদিন বলিয়া কথিত ইহার মূল কি?

১৮। হিন্দু সধবা স্ত্রীলোকের হস্তে লৌহ এবং মস্তকে সিন্দুর ধারণ প্রথা কোন সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে এবং কারণ কি?

১৯। অশৌচ অবস্থায় লৌহ সঙ্গে রাখিতে হয় এবং লৌহের ভূতভয় নিবারণের ক্ষমতা আছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ইহার হেতু কি? শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ।

২০। উত্তর-বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ বিশেষতঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অবিবাহিতা কন্যা বা অনুপনীত পুত্রের স্পৃষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করেন না। তাহার কারণ কি? উহা দেশাচার কি শাস্ত্রাচার? পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণগণ এই নিয়ম মানিয়া চলেন না; এমন কি, তাঁহারা পুত্র কন্যাদি লইয়া একপাত্রে ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রীসারদাপ্রসাদ লাহিড়ী।

২১। তেলা-পোকা বা আরসুলার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বলিয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য।

২২। মহাকবি কালিদাস কোন সময়ে কোন দেশে ও কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন? কোন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়? তাঁহার পিতা-মাতার নাম কি?

২৪। যে শুভঙ্করের "আর্য্যা" সর্ব্বত্র সমাদৃত ও প্রত্যেক পাঠশালায় পঠিত হয়, সেই শুভঙ্করের জন্মস্থান কোথায়? খৃষ্টীয় কত শতাব্দীতে জন্ম ও মৃত্যু? কোন জাতি? তাঁহার পিতা ও মাতার নাম কি? শুভঙ্করই কি প্রকৃত নাম?

শ্রীঅশ্বিনীকুমার কাব্যতীর্থ।

উত্তর

সন ১৩২৯ সালের বৈশাখের ভারতবর্ষের ৮৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

বনবিষ্ণুপুরের ইতিহাস সন ১৩২৪ সাল আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষে "কল্পতরু" নাম দিয়া শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিশদভাবে বাহির করিয়াছেন। মদনমোহনের বর্গি আক্রমণের সময়ে "দলমর্দ্দন" (অপভ্রংশ "দলমাদল") কামান দাগা বিবরণ কতদূর সত্য, তাহাও ইতিহাসটি পড়িলে বেশ বিশ্বাস হয়।

আরও একখানি পুস্তক "History of the Bishnupur Raj" নাম দিয়া ওই বিষ্ণুপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত অভয়চরণ মল্লিক, এম-এ, মহাশয় ইংরাজিতে বাহির করিয়াছেন। তাহাতেও অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়; এবং এই পুস্তকে প্রকাশিত মন্দির-গাত্রের শিল্পেরপ্রতিকৃতিগুলি অতি মনোমুগ্ধকর।—

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার।

সন ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষের ৮৫নং প্রশ্নের উত্তর :—

ডাবের জল অনেক দিন ধরিয়া গাত্রে মাখিলে বসন্তের দাগ মিলাইয়া যায়।

৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর :—

জামির রসে দাগযুক্ত স্থানটি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া কাচিলে পর আলকাতরা উঠিয়া যায়।

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার।

বিষ্ণুপুরের ইতিহাস আছে ইংরাজিতে। বইটীর নাম হ'চ্চে History of the Bishnupur Raj লেখক হ'চ্চেন শ্রীঅভয়প্রসাদ মল্লিক। লেখকের ঠিকানা—বিষ্ণুপুর পোঃ জেলা বাকুড়া। ইংরাজিতে Annals of the Bankura district এও বিষ্ণুপুরের ইতিহাস আছে। প্রণেতার নাম জানিনা। Bengal Secretarial Book depotএ পাওয়া যায়। শুনিয়াছি বাংলাতে একটা ইতিহাস ছিল। অনেক সন্ধান করিয়াও পাই নাই। শ্রীঅশ্রুবিল দত্ত।

৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর। ডাবের জল দিয়া মুখ ধুইলে বসন্তের দাগ মুছিয়া যায়। শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়।

৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর। তেল লাগাইলে কাপড় হইতে আলকাতরার দাগ উঠিয়া যায়। শ্রীশান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসবিতা দেবী।

৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর। বসন্তের ক্ষত যদি বেশী গভীর না হয় তা হইলে ডাবের জলে নিত্য ৪।৫ বার মুখ ধুইয়া ফেলিলে মাস খানেকের মধ্যে অনেকটা কমিয়া যায়। কাঁচা দুধের ফেনাও মুখে মাখিলে বিশেষ দর্শে। কিন্তু খুব গভীর দাগ অর্থাৎ বেশী রকম গর্ত্ত মুছিয়া ফেলিবার উপায় বলিতে পারি না। শ্রীবাণী দেবী।

৮২ নং প্রশ্নের উত্তর। পিতার মৃত্যু হইলে পুত্রকে দক্ষিণ মুখে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই কারণেই পিতা বর্ত্তমানে পুত্রকে দক্ষিণ মুখ হইয়া ভোজন করিতে নাই।

সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র গ্রহণের সময় বাতাসে একরকম 'ব্যাসিলি'র উৎপত্তি হয়। উহা শরীরের পক্ষে খুব অনিষ্টকারী। সেইজন্য গ্রহণের সময় কেহ আহার করেন না, পাছে উহা খাদ্য দ্রব্যের সহিত আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। গ্রহণ হইয়া গেলে মাটীর পাত্র হইলে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং কোনও ধাতু-নির্ম্মিত পাত্র হইলে ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া তাহাতে আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

শ্রীশান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীউমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ মাসের সম্পাদকের বৈঠকের ৯১ নং প্রশ্নের উত্তরে Viten Puduncularis সম্বন্ধে British Medical Journal এর ৫ই ফেব্রুয়ারির (১৯২১) সংখ্যায় একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীরা ঐ গাছের পাতা চা'র মত জ্বরের সময় খায়। রাঁচির Civil Surgeon Vaughan নিজে পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছেন উহাতে Black winter feverও সারে। ইহার বাঙ্গালা

নাম বরুণা বা গোদা। চট্টগ্রাম ও বিহারে ঐ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতালেরা উহাকে Krawra বলিয়া অভিহিত করে। উহা সাধারণতঃ জঙ্গলেই জন্মে। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।

বৈশাখের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত তারকেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন যে উত্তর মুখে খাওয়া সকলেরই পক্ষে সকল সময়েই নিষিদ্ধ এবং প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন

আয়ুষ্মান্ প্রাঙ্মুখো ভুংক্তে যশস্বী দক্ষিনামুখঃ

শ্রিয়ঃ প্রত্যঙ্মুখো ভুংক্তে, ঋণং ? ভুংক্তেত্যুদঙ্মুখঃ।

এ শ্লোক তিনি কোথায় পাই লেন ? মনুসংহিতায় ভোজন সম্বন্ধে এইরূপ একটী শ্লোক আছে কিন্তু তাহার পাঠ অন্যরূপ

আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুংক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখং।

শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুংক্তে ঋতং ভুংক্তে হ্যুদঙ্মুখঃ॥

মনুসংহিতা ২,৫২।

কুল্লুকভট্ট টীকায় লিখিয়াছেন ঋতং—সত্যং তৎফলমিচ্ছন্ মেধাতিথি লিখিয়াছেন ঋতং সতং যজ্ঞশ্চ তৎফলং বা স্বর্গঃ ঋনং নহে ঋতং। সুতরাং স্বর্গ কামী ব্যক্তির উত্তর মুখে খাওয়া উচিত।

৮২ নং শাস্ত্রীয় প্রশ্ন।

অমাম্নানং গয়াশ্রাদ্ধং দক্ষিণামুখ ভোজনম্

ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ কৃতে চ পিতৃহাভবেৎ।

সুতরাং পিতৃমান্ ব্যক্তির দক্ষিণ মুখে ভোজন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি পাওয়া যায় নোদঙ্মুখঃ অন্নমাদীৎ (চরক সংহিতা সূত্রস্থান ৮।) নাদ্যাদুদঙ্মুখো নীতং বিধিরেষঃ সনাতনঃ। (আদিত্যপুরাণ ১৭।১৭) তাই বোধ হয় পুত্রবান ব্যক্তিরা উত্তর মুখে ভোজন করেন না। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিশ্র।

(জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) ৮৫ নং প্রশ্নের উত্তরে কাপড়ে আলকাতরা লাগিলে, সেই দাগ উঠাইবার জন্য আমরুলের পাতা কতকগুলি লইয়া (জল না লাগাইয়া) দাগের উপর ৫।৭ মিনিট ঘসিলে যেমন দাগই হউক না কেন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইবে। (যদি দাগ বহু পুরাতন হয় তাহা হইলে অবশ্য দেরী হইবে) পরে সাবান দিয়া ধুইয়া দেখিতে হইবে। শ্রীতারাপদ দাস।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু মহাশয়ের ৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল। আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশ করিলে অনুগৃহীত হইবে।

শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কার্য্যে প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্রই যে পিণ্ডের অধিকারী অন্য পুত্রাদি নহে, একথা প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্গত নহে। কারণ শাস্ত্রে আছে :—

"শ্রাদ্ধেন প্রজয়া চৈব পিতৃণামণৃনো ভবেৎ"

এই বচনের দ্বারা সন্তান মাত্রের দ্বারাই পিতৃলোকের ঋণ মুক্ত হইয়া থাকে। তবে যে লোকে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই পিণ্ডের অধিকার একথা বলে তাহা প্রেত-ক্রিয়ার জন্য ; অর্থাৎ আদ্য একোদ্দিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার। এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে দুই চারিটী প্রয়োজনীয় কথা বুঝিবার সুবিধার জন্য বলা আবশ্যক মনে করি।

মানুষ, মরিবার অব্যবহিত পর হইতেই, আতিবাহিক দেহ ধারণ করে।

"তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকং ইত্যাদি।"

তৎক্ষণাৎ = মৃত্যুক্ষণাৎ

সে অবস্থায় আত্মিক নিরাশ্রয় অবস্থায় বাতাসের আগে আগে চলিয়া থাকে। তদপর মৃতাশৌচের মধ্যে পূরক-পিণ্ডাদি প্রদান করিলে তদ্দ্বারা আতিবাহিক শরীরের নিবৃত্তি হইয়া প্রেত শরীর ধারণ করে। "শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন" ইত্যাদি বচনের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়া থাকে। (শুদ্ধিতত্ত্বে)

তাহার পর সপিণ্ডীকরনান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধের দ্বারা প্রেতদেহ বিমুক্ত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে স্বর্গনরকাদিরূপ ফলভোগ করে :—

"ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ইত্যাদি।" (শুদ্ধিতত্ত্বে)

শাস্ত্রে দেখা যায়—

"সপিণ্ডীকরণান্তানি যানি শ্রাদ্ধানি ষোড়শ,

পৃথক নৈব সুতাঃ কুর্য্যুঃ পৃথক দ্রব্যা অপি ক্বচিৎ।"

(ইতি—তিথিতত্ত্বে)

সুতরাং সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যেই বর্ত্তমান প্রথম পুত্রের অধিকার দেখা যাইতেছে কিন্তু সাংবৎসরিক প্রভৃতি শ্রাদ্ধে সকল পুত্রেরই তুল্য অধিকার কারণ :—

"বিভক্তা অবিভক্তা বা কুর্য্যুঃ শ্রাদ্ধমদৈবিকং

মঘাসু চ ততোহন্যত্র নাধিকারঃ পৃথক বিনা।"

(ইতি—তিথিতত্ত্বে)

অদৈবিকং—সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধং ইত্যর্থঃ—এই বচনের দ্বারা বুঝা গেল বিভক্তই হউক—অথবা অবিভক্তই হউক—ভ্রাতৃগণ সকলেই সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে পারে। তবে ক্রিয়া বিশেষে অধিকারী ভেদ আছে। যথা কখনও বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ পুত্রই অধিকারী, কখনও সকলেই তুল্য অধিকারী। তবে যে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শাস্ত্রকারের বিশেষভাবে অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার কারণ এইরূপ বলিয়া বোধ হয়। মনু বলিয়াছেন :—

"ইতরান কামজান বিদুঃ।"

ইতরান্ জ্যেষ্ঠাতিরিক্ত পুত্রান ইত্যর্থঃ

জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতিরেকে অন্য পুত্রগণ কামজ। কারণ—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা

পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্।" •

এবং—

পিতৃণাং অনৃনশ্চৈব ইত্যাদি

বচনের দ্বারা বুঝা যাইতেছে একটী পুত্র জন্মাইলেই তাহার দ্বারাই পিতৃলোকের ঋণমুক্ত এবং শ্রাদ্ধাদি হইতে পারে। সুতরাং পুনরায় পুত্র উৎপাদন অনাবশ্যক। ইহা দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্তুতিবাদ হইতেছে। তবে যে লোক বহু পুত্র কামনা করে তাহার কারণ—

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।

যজেৎ বা অশ্বমেধেন নীলম্বা বৃষমুৎসৃজেৎ।"

(ইতি আহ্নিকতত্ত্বে)

বহু পুত্র মঙ্গলজনক তাহার কারণ যদি—তন্মধ্যে একটীও সৎ হয় বা জীবিত থাকে তাহা হইলে পিতৃলোকের পিণ্ডাদি দানের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই।—এ সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিতে গেলে বহু সময় আবশ্যক। এ বিষয়ে তিথিতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব আহ্নিকতত্ত্ব ইত্যাদি সমালোচনা করিলেই সংশয় দূরীভূত হইবে।

শ্রীঅনন্তকুমার সান্যাল তত্ত্বনিধি, সাংখ্য বেদান্তরত্ন।
নারায়ণগঞ্জ।

ডাবের জল দিয়া মুখ ধুইলে বসন্তের দাগ উঠিয়া যায়।

শ্রীপ্রমীলাবালা নাগ চৌধুরী

শোক-সংবাদ

[৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়]

সর্ব্বপূজ্য, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় আর ইহ জগতে নাই; বারাণসী ধামে বিশ্বনাথের নাম করিতে করিতে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-প্রবর, মহানুভব, পরোপকারে মুক্তহস্ত মুকুন্দদেব মহাশয় পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। পিতার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পুত্র পিতারই ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া পুণ্যভূমি কাশীক্ষেত্রে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়? মুকুন্দদেব বহুদিন ডেপুটীগিরি করিয়া অবশেষে অবসর বৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনি অলস-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষ জীবন অনলস ভাবে ধর্ম্মালোচন দেশের ও দশের সেবা, বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যু হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান চরিত্রবান, জ্ঞানবান মহাত্মার যে এসময়ে আমাদের মধ্যে অবস্থানের বিশেষ প্রয়োজন। তাই তাঁহার পরলোক গমনে আমরা শোকার্ত্ত হইয়াছি। বিশ্বনাথ তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

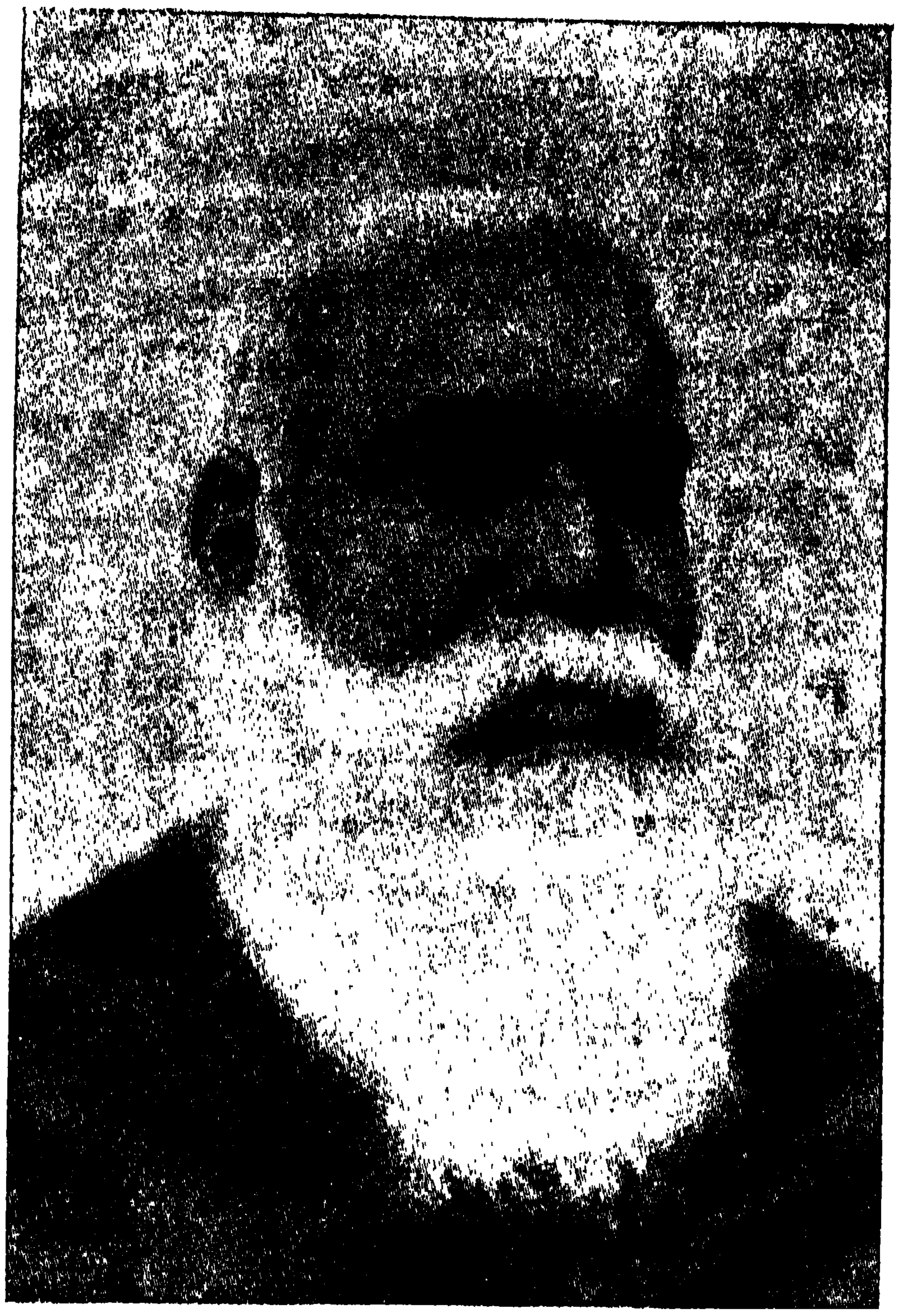

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-সংবাদ

ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গ আমাদের সুকবি শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণকে "কবিশেখর" উপাধি দিয়াছেন।

ষ্টারথিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক—'নবাবী আমল' প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১॥•

শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় প্রণীত "ধ্বংশের শেষে"—প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১॥•

মহাত্মা গান্ধী প্রণীত আরোগ্য দিগ্দর্শনের বঙ্গানুবাদ শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইল মূল্য ॥৴•

কুমার অনাথ কৃষ্ণ দেব প্রণীত গয়াতীর্থ ও বরাবর পাহাড় প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন উপন্যাস নূতন সন্ন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১॥•,

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কালের খেলা প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৸• ।

॥• সংস্করণের ৭৭ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত বরপণ প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১॥•।

ভিক্ষু সুদর্শনের "আত্মোৎসর্গ" যন্ত্রস্থ হইয়াছে, এবং পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে। 'আত্মোৎসর্গের' মূলমন্ত্র দ্বিজেন্দ্রলালের সেই গান—

(বীণা) পারো যদি জাগো তবে, বেজে ওঠো উচ্চরবে,
(আজ) নূতন সুরে গায়িতে হবে, আমি সঙ্গে ধরি তান।
(ছেড়ে) লোক লজ্জা, সমাজ ভয়—যাতে এজাত আবার মানুষ হয়,
(এম্নি) গায়িতে পারি দয়াময়—কর এই বরদান।

এই নবীন লেখকের "সপ্তসমুদ্র" নামে গল্পের বইও যন্ত্রস্থ হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষে প্রকাশিত "রক্ত বনাম জল" নামক গল্প ও অন্য ছয়টী অপ্রকাশিত গল্প থাকিবে।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর প্রণীত ছেলেদের 'সাথী' বহুচিত্র-শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ছয় আনা মাত্র।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

শিশুর হাসটি, জননীর চুমা—দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীযুত বিশ্বপতি রায় চৌধুরী মহাশয়ের শিল্প সংগ্রহ হইতে]

[Blocks by—BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

ভারতবর্ষ

ভাদ্র, ১৩২৯

প্রথম খণ্ড] দশম বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

কলার কথা

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এ]

কিছুকাল থেকে এদেশে যে দু'টি আর্টের খুব বেশি চর্চ্চা হচ্ছে, যথা—বাগ্মিতা ও রণসঙ্গীত। বলা বাহুল্য, ও দুই-ই পেডাগগিক্‌সের জাত-বোন। সবাই জানেন, এই শেষোক্ত বিদ্যাটির কার্য্য হচ্ছে শেক্সপীয়ারকে জোড়-Lamb-এর মধ্যে দিয়ে বিন্দু-বিন্দু চুঁইয়ে এনে কচি পাকস্থলীর জন্যে পথ্য বানানো। "পরের পণ্যে গুরথা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়" শিল্প-হিসাবে নিজের পরিচয় নিজেই দিচ্ছে, এ কথা বললে আশা করি কেউ হঠাৎ চটে যাবেন না। কেননা, "প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে"-ও কেবল পটুতর workmanship-এরই মাত্র পরিচয় দিচ্ছে; এবং "কিসের শোক করিস্ ভাই, আবার তোরা মানুষ হ" স্পষ্টতঃই একটা সান্ত্বনা এবং একটা উদ্দীপনা মাত্র। অবশ্য উদ্দীপনা ও উন্মাদনা খুবই ভাল জিনিস, এসম্বন্ধে অন্য সংশয় করে কার সাধ্য? কিন্তু কেবল রাষ্ট্র নয়, ললিত-কলার ক্ষেত্রেও (?) ফলাফল দিয়েই ও-দুই জিনিসের দর কসা হ'য়ে থাকে। "দিন আগত ঐ"-এর চেয়ে বোধ করি "রাত্রি প্রভাতিল" শ্রেষ্ঠ হবে, কেননা, প্রথমটা নিঃসন্দেহ একটা রাজনৈতিক দীপক এবং সেই হিসাবে সকল জাতির নীতিমূলক (Didactic) শিল্পের সগোত্র। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটি জয়গান, এবং আমরা এক্ষুণি দেখব,

সমস্ত বিশ্বভুবন যদি আনন্দ থেকে নিঃসারিত হয়ে থাকে, চৌষট্টি কলার মধ্যে অনেকগুলির গোড়াপত্তন হয়েছে জয়ে।

প্রাচীন মতে মানুষের যা কিছু 'কাজের কাজ' তা-ই আর্ট ;—যে ক'রেই হোক, লোকহিত করতেই হবে। কথাটার মূলগত ধাতুটারই মানে 'চাষ করা',—মতান্তরে 'জোড়া দেওয়া।' এই অনুসারে স্নান করে গান গাওয়ার চাইতে পরের দাড়ি কামিয়ে জুতো সেলাইএ বসে যাওয়া ঢের বেশি আর্টিস্টিক্।

অর্ব্বাচীন মতে, ও একটা খেয়াল-বিশেষ। কুড়ুলের বাঁটটা একটু বাঁকা করা গেল ; তাঁবুর ভিতরে হাঁড়িকুঁড়ি লাঠি পাথরগুলিকে আরো নানা ভিন্ন রকম পর্য্যায়ে সাজান' যেত, কিন্তু বিশেষ একরকম ভঙ্গীতে রাখা হয়েছে, ভাল দেখ্‌তে হবে বলে ;—এই দুই-এরই কোনো গুরুতর বা লঘুতর দরকার ছিল না।

পূর্ব্ববঙ্গে কথায় বলে, "খেলাইলে খেলাইলাম, না খেলাইলে নাই।" মানে হচ্ছে যে, খেলা হচ্ছে সেই জাতীয় কাজ, বা অকাজ, যার জন্য শারীরিক বা নৈতিক কোনো-রকম বাধাবাধকতা নাই। মানুষের উপরে দু'টি তাগিদ আছে ;—এক হচ্ছে, তার ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতির—সেইগুলির দাবী তাকে মেটাতেই হবে—না মিটিয়ে তার চারা নাই। আর হচ্ছে, তার কর্ত্তব্যবোধের তাগিদ—সেখানকার দাবীরও জোর কম নয় ; এটা করা উচিত, ওটা করা উচিত, সদা সত্য কহিবে, গুরুজনের কথা মান্য করিবে, দেশের জন্য প্রাণদান করা কর্ত্তব্য, আত্মার জন্য স্ত্রীপুত্র ছাড়া সঙ্গত। আত্মবোধের দিকে অত্যধিক মনোযোগ সভ্যতার পক্ষে কিপ্রকার সহায়ক, সে দেখবার জন্য দূরে যাবার আবশ্যক আছে কি ? আচার, দেহাত্মবোধের চরম দশা বা সভ্যতার রক্ষার পক্ষে কতটা অনুকূল, তার জন্যও ইতিহাসের গ্রন্থ না খুললেও হয় ত সংপ্রতি চল্‌তে পারে। চারুশিল্প হচ্ছে মানবাত্মার সেই উদার ক্রীড়াক্ষেত্র, যেখানে সে একদিকে ঐকান্তিক প্রাণ-চেষ্টা অপর দিকে শুদ্ধমাত্র পুণ্যতৃষ্ণার দোটানা থেকে ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছাড়চে ; এবং যুগে যুগে তার সভ্যতা বর্ব্বরতায় প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কট থেকে বেঁচে যাচ্ছে। যথাসম্ভব ব্যাপক করে যদি দেখি,—মানুষ যেখানেই প্রকৃতির উপর আপনার ইচ্ছার প্রয়োগ করেছে, সেইখানে তার শিল্পের সূত্রপাত। সে মাটী খুঁড়ল, খাল কাটল, গাছ কাটল, সাঁকো বানা'ল, নৌকা গড়ল—যেমন যেমন ছিল, এখানকারটা ওখানে নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে তার বদল ঘটাল। 'ইহা এইরূপ হয়, ইহা এইরূপ আছে'—এই হ'ল বিজ্ঞান ; 'একে এই রকম করো'—এই হচ্ছে শিল্প।

মানুষ কি নেচার-এর অন্তর্গত ? তা হলে তার সমুদয় ক্রিয়াকলাপও প্রকৃতিরই কার্য্য। নিসর্গের নিয়মের বাহিরে যাবার মানুষের ক্ষমতা হয় কি ? প্রকৃতির নিয়মেরই অনুযায়ী গঠিত যন্ত্রপাতি প্রকৃতির নিয়মেরই আনুকূল্য ক'রে, সময়ের সংক্ষেপ ক'রে মানুষ আপনার শিল্পে প্রকৃতির কার্য্যই সাধন করে না কি ? এই একটা প্রশ্ন।

সে কথা যাই হোক্, একটা অন্ততঃ জায়গা আছে যেখানে নেচার আর আর্ট বিসংবাদী। ভোজের রাত্রে যখনই যে অতিথি এসে পড়চে, তাকেই সমান স্মিতমুখে একই রকম আহ্লাদ দেখিয়ে, একই বাগবিন্যাসে প্রত্যুদ্‌গমন করা হচ্ছে, তখন লোকে বলে ও একটা আর্ট, ও অনেকবার হয়েছে। যেটার পেছনে বহুৎ রিহার্সাল আছে, সে শিষ্টাচার হিসাবে নিকৃষ্ট (কেন না কৃত্রিম) হতে পারে ; কিন্তু সেই কারণেই ওটা খুব ভাল কলা, (অবশ্য যদি না অটোমেটিক্ হয়ে দাঁড়ায়),—কেন না ঠিক্ ছলনা করা ওর উদ্দেশ্য না হলেও, simulate করা নিশ্চয়ই ; এবং সত্য দেওয়া নয়, কিন্তু semblance—কি না প্রতিমা দেওয়াই আর্টের কার্য্য। অভিধান ঘেঁটেও দেখা গেল, কলা কথাটার অপর অর্থ 'কপট।' চাতক পাখীর গানকে কবি তার "unpremeditated art" বলেছেন—বলা বাহুল্য, কথাটা একে ত একটা oxymoron, দ্বিতীয়তঃ, পাখীর কাকলি আর ভদ্রমহোদয়গণের স্বাগত সম্ভাষণ (এই যে, ভাল আছেন, —আসুন আসুন, ভারি খুসি হলাম), একটা সহজ সংস্কার থেকে স্বতঃ-উদ্গীর্ণ। কাপড় বোনা যদি আর্ট হয়, তবে মাকড়সার জাল বোনা আর্ট নয় কেন ? কাপড়ের পক্ষে যেমন সেই তন্তুবায়ই যথার্থ আর্টিস্ট, যে প্রথম ডিজাইন্ দিয়েছিল ; ঊর্ণনাভের জাল এবং পাখীর গানের সম্পর্কে তেম্‌নি সেই "প্রথম আদি শক্তি"কে বরং আর্টিস্ট ধরা যায়, যে "ফুলের চক্ষে ভরিয়া দেয় সুগন্ধ।" তা হলে দেখতে পাই, আবার ঘুরে এসে বিরোধটুকু উড়ে যায়। কারণ কি, যে শক্তি কোকিলের সারা-বচ্ছরের কর্কশ আওয়াজকে শেষ মাঘের এক রাত্রে পঞ্চমতানে পরিবর্ত্তিত করে থাকে,

আষাঢ়ের এক পসলায় সহসা গর্ত্তশায়িনী দর্দ্দুরীদের অপূর্ব্ব 'জামদানী' সাড়ী পরিয়ে দেয়, সেই যদি সারা দিবসের ঝি-চাকর-মর্দ্দিনীদের কণ্ঠে অকস্মাৎ সন্ধ্যা-বাতির সঙ্গে সঙ্গে তরল সঙ্গীত ও অপরূপ কাব্যকথা দান করে, তবে ভোজদায়িনীদের সমুদয় ছলাকলা ত প্রাকৃতিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়; এবং সেই মুহূর্ত্তে আমাদের বক্ষ্যমাণ বিতর্কটিরও আর point থাকে না।

এই বল্‌তেই আর্টের লক্ষণ-ত্রিতয়ে এসে পড়া যায়। রবিবাবুর কবিতায় দেখা যায়, কেবলি, আমার এ হল, আমার ও হল, আমার আশ্চর্য্য ভাল লাগল, আমার ভীষণ বেদনা হল, ইত্যাদি। একরকম করে দেখলে দেখা যায়, সমস্ত সৃষ্টিই বস্তুতঃ লীরিক্‌। আমার পাঁঠা আমি লেজেই কাটব,—আমার কুড়ুলের গায়ে আমি কচুপাতা আঁকব,—আমারই খুসির নিমিত্তে। কিন্তু কথা আছে। সেটা অন্যেরও ভাল লেগে যায়—অন্ততঃ যখন লাগে, তখন সেটা আর্ট। অর্থাৎ আমার খুসিটা অন্যেতে সঞ্চারিত করতে পারি।—সরোবরে মরালীর পাশে মরালের প্রিলিমিনারি গ্রীবা-নাচানো সকলেই দেখেছেন—ও হয় ত একটা বেদনার সংক্রামণ-প্রয়াস। কাণ্ড এই যে, এই সংক্রামণ চেষ্টায়ই সমুদয় সমাজ-সৃষ্টিরই গোড়া-পত্তন।

কিন্তু কাম-মোহিতদের লাস্য-লীলাটাকে কেউ ললিত-কলা বলে না, কিন্তু যাত্রায় অভিমন্যু-উত্তরা'র জকড়া-মকড়ি সামাজিকবর্গের উপভোগ্য। কেন?—রমানাথ উকিল যে কথায়-কথায় টেবিল চাপড়াত, আর I beg to submit বল্‌ত, আর পথে চল্‌তে বাঁ হাতখানাকে আগা-গোড়া খামাখা কাঠের মত আড়ষ্ট ও ঋজু করে রাখত, এবং ছাতাটাকে, ভীম যে রকম করে' গদা রাখে, সেই রকম করে কাঁধে রাখত, এ সকল ঘটনা সে আজও করে; কিন্তু কেরিকেচারিস্‌টএর নকলের পূর্ব্বে ও-সকল কোনো দিন লক্ষ্যই করা যায় নি। একই আড্ডায় একই ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে বরিশাল, চাটগাঁ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বিক্রমপুরের কথা হুবহু বলে যাচ্ছে, এ ঘটনাটাকে যে আমরা দুনা উপভোগ করি, তার একমাত্র কারণ এই, যে, অতগুলো জেলার সবগুলি কিছু ভাঁড়টির জন্মস্থান বা বাসভূমি হতে পারে না। অর্থাৎ, যেমন নাটকে প্রেমরঙ্গগুলি অভিনেতার নিজের অনুভূতি থেকে প্রচোদিত নয়, কিন্তু তাকে মনের একটা চরম চেষ্টার দ্বারায় প্রেমিকের চিত্তের মধ্যে নিজেকে অন্তরিত করতে হয়েছে, তেমনি, ব্যক্তিবিশেষের অঙ্গ-ভঙ্গী বা অন্যান্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তার যে অন্তর-নিবাসী অতীত মানুষটির ছাপ আছে, কিংবা, বিভিন্ন জেলার দেশ-ভাষার সুর-বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই-সেই জেলার খাল-বিল নদী-পাহাড়ের উপরে নিরন্তর প্রবহমান মানব জীবনের যে অশ্রুত-সঙ্গীতটির রাগিনীর রেশ আছে,—মিমিক্রিতে, ব্যঙ্গ্যকারীকে প্রথমে একটা পরম সহানুভূতির সঙ্গে তার মধ্যে সেঁধোতে হয়েছিল, এবং, শেষে, তার সেইখান থেকে হাটের হল্লায় নামা'র পর যখন অন্যের পেটের নাড়ী-ভুড়ি ছিঁড়ে যেতে লাগল, ঠিক্‌ সেই সময়েই হয় ত সে আপনার গভীর তলে কি-এক হাহাকার বহন করচে। ঠিক্‌ যে সময়ে আসরের সমজদারের গায়ে পুলক-রোমাঞ্চের সঙ্গে শিরার স্পন্দনের বেগ-বৃদ্ধি ঘটচে, ঠিক্‌ সেই সময়ে হয় ত উত্তরার ললাটের উপর অভিমন্যুর চিরায়মান চুম্বনটি তুহিনের চেয়ে উষ্ণ নয়।

দ্বিতীয়তঃ, সুরত-ক্রিয়ার উপর অনেক মহাজনের পদাবলী শুনতে পাওয়া যায়,—কিন্তু ঐ ব্যাপারটি ঠিক্‌ "পুত্রার্থে" কৃত না হলেও—সবাই জানেন, কবিতার খোসা ছাড়ালে, ঐ হচ্ছে ও-অনুষ্ঠানের মৌলিক মৎলব।—গদ্‌-এ বলে, যা শিব, তাই সুন্দর—অর্থাৎ, যা কাজে লাগে তাই ভাল দেখতে হয়। রাস্‌কিন্‌ বলিয়া না দিলেও আমরাও বোধ করি দেখতে পারি, যে, ময়দানের কুচকাওয়াজের সৈন্যদলের চাইতে রণযাত্রী সেনা, জাঁক-জমকের সখের নৌবহরের চাইতে মাল বোঝাই বাণিজ্য-নৌকা সুন্দর। ঘরের মধ্যে যে 'খুঁটি'টার কোনো কাজ নাই, কেবল একটা অতিরিক্ত ঠেকো'র মতো আছে,—তাকে সরাই, কেন না অনাবশ্যক বলে'ই সে বিশ্রী। দরকারেরই তাড়নায় ষোড়শীর লাবণ্য কূল ছাপায়, আর পলাশ দিকে-দিকে আগুন 'জ্বালায়'। শরীরের মধ্যে যে অঙ্গটা 'বাহুল্য', যেমন একবিংশ অঙ্গুলি, সে কদর্য্য।—এসব আছে।—কিন্তু, সৌন্দর্য্য যে আবার "প্রয়োজনের বাড়া,"—অর্থাৎ, ওটা একটা 'ফাও'।—যেটা দরকারী, সেটা সুন্দর;—কিন্তু সেটা সুন্দর না ঠেক্‌লেও কাজ আট্‌কায় না। ঠেকে কেন? এই হচ্ছে প্রশ্ন।

প্রশ্নটা ভুলে'ই দার্শনিকের জন্যে রেখে দিয়ে, আমরা

তৎক্ষণ দেখি, যে, আর্ট হচ্ছে—একটা অ-দরকারের লীলা।

বাংলা মাসিকের দার্শনিক প্রবন্ধের ভাষায় বল্‌তে গেলে, এই যে বিরাট জড়বিশ্ব, এ বাইরে বিস্তৃত; এ পাঁচটি দুয়ার দিয়ে মানুষের চৈতন্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে' ফের যখন নোতুন সৃষ্টি হয়ে বেরোল, তখন সে এক নবতর জগৎ; সে কেবলমাত্র তার মডেল্‌এর অনুকৃতি নয়, না জানি মডেল্‌কেও ছাড়ায় সৌন্দর্য্যে, ইত্যাদি। কিন্তু এই পঞ্চ দরজার মধ্যে তিন-তিনটিই আর্টের আঙিনার দিকে ভেজানো কেন, সেইটির উপরে একটু গবেষণা করলে হয় না?

এত সূক্ষ্ম, এবং এত বিচিত্র, এবং এত অধিক সংখ্যার অনুভূতি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা আসে, যে, অপর কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তা আসে না। রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে ঘট কিংবা পটের উপরে একটা অরূপ সুন্দরানুভূতিকে স্থায়ী আশ্রয় দিতে পারি। কিন্তু গন্ধের উপরে গন্ধের পোঁচ ফলিয়ে কোনো অগন্ধকে চিরবন্দী করতে পারি নে। কিন্তু সুরও ত গন্ধেরই মতো বাতাসে মিলিয়ে যায়! সুরের সঙ্গে সুর গেঁথে কি কলাবতের শিল্প সৃষ্ট হয় নি? হাঁ। কিন্তু তাকে যদিও জমাট করে 'ধরে' রাখতে পারি নে, একটি গানকে যতবার খুসি, যেখানে খুসি পুনরাবৃত্তি করা চলে বলে' অস্থায়িত্ব-এর ক্ষতিপূরণ হয়েছে। কিন্তু, পোলাউ মিষ্টান্ন সরবৎও ফরমায়েশমত যতবার খুসি বানান যেতে পারে; তবু স্বাদের আর্ট নেই কেন? তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, রসনেন্দ্রিয়টি কায়া পোষণ সম্পর্কে এত মুখ্যত বিনিয়োজিত যে, প্রয়োজনের চেহারাটি এখানে নিতান্ত গন্তের মতো নগ্ন ও স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আছে। অনেকে শুনে থাকবেন যে, আস্বাদ ব্যাপারে অর্দ্ধেক হচ্ছে নাসিকারই কার্য্য। দণ্ডায়মান হবার পূর্ব্বে এ ইন্দ্রিয়টি কায়া-রক্ষার কার্য্যে অধুনা-বিস্মৃত আরো নানান্ রকমেই মানুষের এক প্রধান সহায় ছিল। খাড়া হয়ে অবধি মানুষের সে সব দায় চুকে যেতেই এই ইন্দ্রিয়টিই সংপ্রতি দরকারের কবল থেকে সব চেয়ে বেশী মুক্তি পেয়েছে;—পেতেই আমরা দেখতে পাই, হাজার মানুষের মধ্যে সূক্ষ্মতম এবং বিচিত্রতম সব উপলব্ধি যাদের ভাগ্যে ঘটেছে, তাঁরা ঘ্রাণবিলাসী, কিনা ঘ্রাণেন্দ্রিয়-প্রধান—।

"বসনগন্ধ বরণ করেছি বসন্ত সমীরে"

"বাতাস আসে, হে মহারাজ,
গন্ধ তোমার মেখে"

"আকাশ ওঠে ভরে' ভরে'
চষা মাটির গন্ধে"

"মনে হয় ত পাব খুঁজি—
ফুলের ভাষা যদি বুঝি—
যে পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে।"

ফুলের ভাষার সবখানিই চক্ষুর দ্বারা পঠনীয় কি?

সে যাই হোক্। বর্ষা-মধ্যাহ্নে হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব বলে'ও একটা কথা আছে। কিন্তু ও-রকম সীধা অনুভবেই আর্ট মারা যায়। শিল্পের চাই একটা দুস্তর ফাঁক অনুভাবক আর অনুভাবিতের মধ্যে,—আর চাই একটা মিডিয়ম্। বুকোবুকি হয়ে গেলে ভাষা আর বাক্ ত বাহুল্য। সুদূর বা ঘনিষ্ঠ, যোগাযোগের যতগুলি পন্থা আছে তার মধ্যে গলাধঃকরণকে বাদ দিয়ে আর গুলির মধ্যে যেটা সবচেয়ে সুনিবিড়, সেটা হচ্ছে স্পর্শ। "পরশখানি দিয়ো"; এই হচ্ছে তৃষ্ণার শেষ কাম্য। কিন্তু যদিও, শুন্‌তে পাই, হাতে হাত রেখে 'টিপাটিপি-'র ভাষায় জন্মান্ধমূকবধিরের সঙ্গে যুদ্ধের খবরের আলোচনা সম্ভবপর হয়েছে—চুম্বন, অলকদাম-মধ্যে অঙ্গুলি-সঞ্চালন, পৃষ্ঠ সংবাহন প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে একটা কোনো কলা'র উদ্ভব হল না কেন? জবাব হয়ে গেছে।

অপিচ। ভোর না হতে, ভাঁটায় জল নেমে যেতেই, ছেলে বুড়ো স্ত্রীলোকে মিলি দলে-দলে, মেঘনার খাড়ী পেরিয়ে হেঁটে ওপারে চলে যাওয়া, অকস্মাদাগত জোয়ারে কখনো-কখনো বিপৎ-পাত-সত্ত্বেও,—নাচ যদি একটা আর্ট হয়, তবে এটা কি?—ও একটা ক্রীড়া। একটু অবধান করলেই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, যে, সবুজ চরের এই "বিনা প্রয়োজনের ডাকে"র পশ্চাতে, চৌরাশী-লক্ষ যোনি ভ্রমণের যাত্রা-পথের সুরুর দিকে, একটা ভয়ঙ্কর দরকারের, চাই-কি জঠরজ্বালারই তাড়না আছে।—"পৃথিবী যখন সবে সমুদ্রস্নান থেকে উঠে-ছিলেন, আমি তখন গাছ হয়ে জন্মেছিলুম—সে গাছকে যে বাংলা সাপ্তাহিকের চিত্র-শিল্পী গজিকা-তরু বলে' সনাক্ত করেছিলেন, সে ত—

"Within living memory.

There is a pleasure in the pathless, woods,

There is rapture on the lonely shore."

কিন্তু জঙ্গলে, পাহাড়ে, সমুদ্র-বেলায় এই যে উল্লাস, এ আজ শুধু একটা লীলারস,—কিন্তু যে কালে জলের মধ্যে বাড়ী করে মাছ ধরে খেতে হত, সে কালে খাড়ীর excursion আজকের মতো অহৈতুক ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল ক্রীড়ায় দ্বন্দ্ব এবং কাজেকাজেই হারজিৎ আছে, জীবন-যুদ্ধের সে একটা অনুকৃতি, অপিচ সে অ-দরকারের লীলা। কিন্তু নাটকে মোগল জিতবে, পাঠান হারবে, জানাই আছে, বলে' দর্শকের কৌতূহলের বেগটা মোটেই লড়াইয়ের ফলাফলের উপরে কেন্দ্রিত নয়, কিন্তু representationই সেখানে আসল লক্ষ্য। পক্ষান্তরে, জীবনের মধ্যগত যে একটা চির চঞ্চল 'কি-জানি-কি-হবে' জীবনকে তার বিশিষ্ট স্বাদুতা দান করেছে,—খেলার মাঠে কৃত্রিম ঘটনা সংস্থানের-মধ্যেও সেই অ-দৃষ্ট অনিশ্চয়টি সর্ব্বক্ষণ দোদুল্যমান বলে' ক্রীড়াটা বরং more of life than of art.

এতক্ষণ, তা হলে নাচগান ছবি ও নাটককে আর্ট বলে' ধরে নিয়ে, আরও যখন যেটা এসে পড়েছে, এদের দিয়ে নিরিখ করা গেল। কিন্তু, কাল আসলে নিরবধি নয়—অতএব এবারে সোজা বক্তব্যের বক্ষঃস্থলে নেমে আসা যাক্।

নাচ যদিও চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যই, আসলে ওটা একটা কর্ণের 'বিষয়'। সে কেবল সঙ্গীতের সহচর নয়, সঙ্গীতের সামিল-ই। নিটোল একখানি দেহ নড়চে-চড়চে; অতএব নৃত্য, আপাততঃ মূর্ত্তি-শিল্পেরই সদৃশ, কিন্তু আসলে ও হচ্ছে গীতের 'দেশ-'ভাষায় অনুবাদ। আদৌ নাচ হচ্ছে গানের সঙ্গে তাল-রাখা, এবং তাল হচ্ছে সমান সমান ফাঁক রেখে রেখে একটা শব্দের পুনরাবৃত্তি। তাল তা হলে একটা কালের ব্যাপার, আর কাল কাণের ব্যাপার। ব্যাঘ্র-বিজয়ী আদিম শিকারীর করতালি সহকৃত হেঁই-হুঁই এবং উল্লম্ফন থেকে অনায়াসে সমুদয় গন্ধর্ব্ব-বিদ্যার বিবর্ত্তন টানা যেতে পারে।

আর, রঙ্গমঞ্চ, একদিকে যেমন, নাচে গানে ছবিতে আবৃত্তিতে, চক্ষু কর্ণের একটা সাময়িক পুনর্ম্মিলনের ক্ষেত্র; তেম্নি, আবার, রাজ্যের যত শিল্পী—এই, কুম্ভকার থেকে কংসবণিক্, সূত্রধর থেকে রজ্জুনির্ম্মাতা—সময়ে সবাই'র জন্য এক 'অখণ্ড রঙ্গভবন।'

এই যেমন নাট্যে, তেম্নি, স্থাপত্যে দেখতে পাই, দৃশ্য (কিনা 'দেশীয়') শিল্পগুলি, নেবুলা'র মধ্যে এই টেবল-ল্যাম্প্‌টা, আর ঐ টানা-পাংখা'টার ন্যায়, প্রলীন হয়ে তাল-পাকিয়ে আছে।—আদিতে, প্রতিবেশীর আর আব্‌হাওয়ার খামখেয়ালী থেকে আত্মরক্ষার জন্যে, দরকারেই, এ শিল্পের সূত্রপাত।—তার পর, যে-বাঘকে মেরেছি, তার চেহারাটি গুহার গায়ে ক্ষোদাই-ই করি, কি এঁকেই রাখি, সে আমার খুসি; আর, জয়ের চিহ্নকে স্থায়িত্ব অর্পণ করবার ফেস্‌ণটা খুব-বেশি obsolete-ও নয়,—প্রমাণ, কন্‌বোকেস্‌ণ্ পোষাকে বঙ্গবীরের আলোকচিত্র।

ক্ষোদাইটাই স্পষ্টতর হয়ে কাঠামোর উপরে প্রতিমার মতো যদি দাঁড়ায়, এখনো ঘনত্বটা তত পরিস্ফুট হয় নি,—সম্মুখভাগই প্রধান, সম্মুখ ভাগই দ্রষ্টব্য,—এখনো ইচ্ছা করলে মূর্ত্তিকে একবার প্রদক্ষিণ করে' আসতে পারা যায় না; তারপর গহ্বর গাত্র থেকে মূর্ত্তিকে আল্‌গা করেই গড়া যায়, কিন্তু এখনো দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর সম্মুখই প্রধান, ঘনত্বের প্রতি এখনো মনোযোগ পড়ে নাই; তারপরেই,—সুগোল মনুষ্যশরীরের পরিপূর্ণ প্রতিকৃতি। এই ভাস্কর্য্য।

তিনটে ডাইমেন্‌সান্ নিয়ে কাজ করতে পেল বলে,'—ভাস্কর মনুষ্যের দেহকে তার চারি পার্শ্ব থেকে ছিন্ন করে', দেহের মধ্যে সুন্দরের যে প্রকাশ আছে তাকেই একান্ত সাধনার বস্তু করে', তার যে অস্থিসংস্থানের সৌষ্ঠব, তার যে মাংসপেশীর দৃঢ়তা—এই সব নিয়েই লেগে রইল। ও-ধারে, ক্ষোদাই থেকে থার্ড ডাইমেনসান্‌কে বিলকুল বিদায় দিয়ে, চিত্রশিল্পী তক্ষণের স্পষ্টতা হারাল; কিন্তু একদিকে যেমন অস্পষ্ট অনির্দ্দেশ্য ঝাপ্সা'র দেশে, যেমন হাসি অশ্রু'র ব্যাপারে, তার ক্ষতিপূরণ হয়, তেম্নি মনুষ্যদেহকে তার প্রতিবেশের মধ্যে পুনঃ সংস্থাপন করতে পেয়ে তার জিৎ হল—যেমন ল্যাণ্ড্‌সকেপে। সেখান থেকেই—ক্রমে—লোকালয়-সংশ্লেষলেশহীন মহাসমুদ্রের সূর্য্যাস্তকেও রেখা-বন্ধনে বন্দী করা তার পক্ষে অসাধ্য হল না,—এবং রঞ্জিত মেঘের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় সঙ্গীতের মীড় কে রেখে গেছে, তাকেও ইসারায় পটের উপরে ফলানো অসম্ভব হয় নি। উন্নত বক্ষটী বগল থেকে কত দূরে রয়েছে,

নিতম্ব-ই পেছনে, কি জঘন-ই সম্মুখে, এ সব দেখতে ভাস্করের কোনো-ই লেঠা নাই, তৃতীয় ভূমিকা হাতে আছে বলে'। আর তা হাতে নেই বলে-ই, জিনিসপত্রের আপেক্ষিক সংস্থিতি আর দূরত্বকে, কত রকম করে' আলোছায়ার ইঙ্গিতে, বর্ণকের ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হল পটুয়াকে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে পারি, যে, Cinema পর্দার উপরেও তিনটে ডাইমেন্‌শান্‌এরই খেলা হচ্ছে,—তৃতীয়টার জায়গা চতুর্থটিতে জুড়েছে। ঘনত্বহীন এক সমতল surface ও কাল,—এই নিয়েই জীবন-চিত্র।

দেশ থেকে এক মিনিটে কালে চলে' আস্‌তেই আমরা এমন একটা রাজ্যে এসে পড়্‌লাম, যেখানে কেবল ইসারায় আর ধ্বনিতেই কাজ চল্‌চে। এ একটা "বাঙ্‌ময় জগৎ"—(ত্রিবেদী'র কথা)। এখানে, কিসে যে কি হয়, বলা খুব শক্ত না হলে-ও, কি জন্যে যে কোন্‌ আওয়াজে কি বোঝাবে—সে সবই একটা সঙ্কেতের কারবার। চিত্রে মূর্ত্তিতে প্রকৃতির প্রতিরূপ পাই, এমন কি, মন্দিরের স্তম্ভগুলি বোধ করি গাছের গুঁড়ির নকল, ছাদ বোধ করি বনস্পতির উর্দ্ধ বিস্তৃত নিবিড় শাখাপল্লবছত্রের অনুকরণ, aisle বোধ করি avenue? কিন্তু 'করুণ লাচারি' কিসের নকল? কোথায়ই বা সেই জোরালো অনুবীক্ষণ, যা—দিয়ে "অয়ি আসমবৃত্তে" এই হরফ ক'টা'র মধ্যে কোনো শ্লথবসনা'র ফটো decipher করতে পারি? তথাপি চিত্রকে যে 'মূক কাব্য', তথা কবিতাকে 'শব্দিত চিত্র' বলা হয়, তার সার্থকতা এইখানে যে, প্রথমতঃ, উভয়েই বস্তুর প্রতিরূপ দিচ্ছে, যদিও একটির মালমসলার বিশেষ প্রকৃতির দরুণ প্রতিকৃতিটি হুবহু ও স্পষ্ট; আর অপরটি যা দেয়, তা ধ্বনির association দ্বারা উদ্রিক্ত একটা ভাবছবি মাত্র। এবং দ্বিতীয়তঃ, কবিতা যদিও চোখ দিয়েই পড়ি, আসলে মনে মনে উচ্চারণ পূর্ব্বক মনঃকর্ণে শ্রবণ করে থাকি, তাই প্রকৃত প্রস্তাবে ওটা 'দৃশ্য' নয়, কিন্তু একটা 'শ্রাব্য-শিল্প'। কিন্তু আবার কাব্যের মালমসলা যে শব্দ, চিত্রের মালমসলা রেখাবর্ণাদির সঙ্গে তুলনায় তার যা ত্রুটী, যাকে এক কথায় বায়বীয়তা দোষ বল্‌তে পারি, তা'ই আবার আর এক দিকে এক বিশেষ সুবিধা ও গুণের কারণ হয়ে পড়েছে। রাবণের দীর্ঘ বিলাপকে কোন্‌ পটে কি রঙে রঞ্জিত করা যেত? ছবি তোল্‌বার এই অমূর্ত্ত উপকরণের, এই শব্দের,—কল্যাণেই না গত নিশির লাটদরবারের প্রহরব্যাপী তর্কাতর্কিকেও নিশিভোরের দৈনিকের পটে সুচিত্রিত দেখতে পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। নিশ্চয়ই চিত্র-লেখার (Hieroglyphic) দ্বারা দার্শনিক গবেষণা হয়ে উঠত না।—অথচ কথার দ্বারা কি রকম ছবি আঁকা যেতে পারে, সে দেখার জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শকুন্তলাখানা, আর কি রকম এমারত তোলা যেতে পারে, তার জন্য মহাভারত-খানা (কাশীদাসের হলে-ও চলবে) খুললেই যথেষ্ট। যতবার ভাবি, এ বিস্ময় আর যায় না, যে, মহাভারত-টা কি একটা বই-এর নাম; না একটা মহাদেশের নাম; না একখানি যোজনব্যাপী হর্ম্যের নাম, যগযুগান্ত কোটী নরনারী যার মধ্যে আত্মার বিশ্রাম খুঁজেছে। বিবিধ বিশদতাকে যথাযথ স্থানে বিন্যাস পূর্ব্বক একটি বৃহৎ পরিকল্পনার মধ্যে বিধৃত করে, গ্রথিত করে, যে একটি পরম ঐক্য একটা প্রাসাদের কেন্দ্রের মধ্যে বিরাজ করে, মহাভারত-এর মতো বিরাট্‌ ব্যাপারের মধ্যে পুনরায় তারই সাক্ষাৎ পাই। কোনো এক আগামী জন্মান্তরের আশার মতো, ইউরোপের মধ্যযুগীয় যে বড়-বড় গির্জ্জাগুলির গুজব আমাদের কাণে এসে পৌছয়, বর্ত্তমান সমালোচক এখানকার এক রোমান ক্যাথলিক ভজনালয় থেকে তার এক আভাস সংগ্রহ করেছে। চকে'ই মূর্ত্তি চোখে পড়ে। মহাভারতে প্রবেশ করতেই উত্তুঙ্গ শৈলের মতো অনমনীয় দৃঢ়গ্রীব, যে একটি মূর্ত্তি সমুদয় মনকে আপন অটলতায় অভিভূত করবে, সেই ভীষণমূর্ত্তির মধ্যে কোনো গ্রীক্‌-প্রভাব আবিষ্কার করা যে সুসাধ্য হবে না, তার অন্যতম কারণ এই, যে, ওটা কোনো পাথরের মূর্ত্তিই নয় আসলে;—বাঙ্‌ময় মন্দিরের মধ্যে এক বাণীময় প্রতিমা।

কিন্তু একবার একজন পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন বল্‌ছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে অযোধ্যার বর্ণনা আর লঙ্কার বর্ণনা একই রচনাকে নগরীটার নাম বদলে' দু'জায়গায় খাটানর মতো; —মানে, কোনো বিশেষত্ব নেই। তার মানে বোধ হয় প্রথমতঃ এই যে, জগৎটা একটা মায়া—অতএব 'দেশ' (যেমন প্রচলিত অর্থে, তেমি দার্শনিক অর্থে) একটা লক্ষ্য করবার বিষয়ই নয়। দ্বিতীয়তঃ, যেমন একজন আর্ট-ক্রিটিক কিছুকাল হল নির্দ্দেশ করেছেন, perspectiveএর অভাবে এই 'দেশ'-বোধের ত্রুটীরই

পরিচয় দেয়। শিশু যে আঁকশী দিয়ে চাঁদ পাড়তে চায়, তা এই জন্যই, যে, তার কাছে চালকুমড়ো এবং চাঁদ প্রায় একই সমতলে ঝুলচে। সভ্যতারও শিশুকালে আমরা সেই জন্যই চিত্রশিল্পের পারকেক্‌ষাণ আশা করি নে; বস্তুতঃ এ আর্টটি প্রায় শেষের দিকে এসে থাকে, যখন মানুষের সব বিচিত্র, জটিল ও সূক্ষ্ম ভাবকে আর মোটা মোটা থাম, আর জাঁদরেল-গোছ পুত্তলিকায় রূপ দান করতে অক্ষম হয়।—অন্ততঃ বোধ করি হেগেল এই রকম বলেন।—একটা সহরের বর্ণনা আসলে কথা দিয়ে তার ছবি আঁকা।

সকল রকম প্রয়োজন, সকল রকম অনুকৃতি থেকে সম্যক্ বিনির্ম্মুক্ত যে-আর-একটি আর্ট, যে শুদ্ধ ধ্বনির দ্বারা হৃদয়ের এমন সব তন্ত্রীকে ঘা দিতে পারে, মানব তার বুদ্ধির দ্বারা কদাচিৎ যা ছুঁয়ে মাত্র যেতে পারে, সে হচ্ছে সঙ্গীত।

কিন্তু, ঠিক্ এই জায়গাটাতেই প্রবীণ লোকদিগকে আমরা বিরক্ত করি। সেদিন একজন ব্যবহারজীবী বর্ত্তমান সমালোচককে 'Dilettante' এই আখ্যা দান করেন। কথাটা নিতান্ত যে অলীক, তা নয়। আমরা কেউ বা পাটের দালাল, কেউ বা ইস্কুলের মাষ্টার। বিদ্যার বড় বড় পাঠগুলি থেকে সুদূরে এই নারিকেলের বনে 'নাগরালি' ছাড়া আর কি-ই বা আমরা করতে পারতাম। কিন্তু, তাও বলি, পল্লবগ্রাহিতা আর যে ক্ষেত্রেই ক্ষমনীয় হোক্, সঙ্গীতের ব্যাপারে অব্যবসায়ীর হস্তক্ষেপ একটা উপদ্রবেরই সামিল।—সবাই জানেন, আমরা জন্ম-দার্শনিক এবং জন্ম বক্তা। এবং বিলাত থেকে নাটক আসবার পূর্ব্বে, এবং ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের পূর্ব্বে,—ইতিমধ্যে কীর্ত্তন এবং যাত্রার সঙ্গে আর যে তৃতীয় একটি ব্যাপার এদেশে আর্টের নাম রক্ষা করছিল, তা হচ্ছে কথকতা।—যে জন্যেই হোক্ বক্তৃতাতেই আমাদের দেশের জিনিয়াস্ বিশেষ করে' আত্মপ্রকাশ করেছে।—বক্তার বিশেষ সুযোগ এই, যে, তার কাছ থেকে অনুপ্রবেশ নয়, কিন্তু ঠোকর মাত্র পেলেই সবাই খুসি।

বাগ্মিতা, (Eloquence) আলাদা জিনিস, ডেমস্থিনিস্ থেকে পাল পর্য্যন্ত যার সেবা করে এসেছেন; আর এই এদেশের এতগুলি উকিল মোক্তার তার দৌলতে টিঁকে আছেন; সে ব্যাপারের উপর বেশি কিছু বক্তব্য থাকলে, এখানে সুখের ব্যাপার হত। কিন্তু, শাস্ত্র বলছেন, মা ক্রুয়াৎ—

উপসংহারে যা বক্তব্য, তা এই, যে, "বোলো না"-ই বোধ করি মানবাত্মার শেষ কথা। বিবেকানন্দের গানে আছে, "নাহি চন্দ্র নাহি সূর্য্য নাহি নক্ষত্র-মণ্ডল।" "Do not make for thyself a graven image"—এ কেবল সুলতান মামুদের আদেশ নয়—এ বোধ করি সেই চন্দ্রতারকবিদ্যুদগ্নিবর্জ্জিত রাজ্যেরই এক নির্ব্বাক্ ঘোষণা —"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" যে রাজ্যের সীমানা থেকে বাক্যেরা ফিরে এল—(বাটালি আর তুলি'র ত কথাই নাই) —সে এক নিশীথ রাজ্য, যেখানে সমস্ত অস্তিত্বের এক আদি ও অন্ত-জুড়ানো নিরবশেষ পর্য্যবসান ঘটেছে;— ভারতবর্ষ একবার তাকেই 'নাস্তি'র রঙে' মৃত্যুর রঙে কালী করে' দেখিয়েছে—আর-বার অনির্ব্বচনীয়কে শূন্য-থেকে সুনীলতায় বনিয়ে এনে নব নবীন মেঘমালার রঙ্ দিয়ে, অথবা আরো পার্থিব করে' নোতুন দূর্ব্বার শ্যামলতা দিয়ে, বল্‌তে চেয়েছে। পরক্ষণেই 'রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য' ইত্যাদি বলে সেই দুশ্চেষ্টার জন্যেই ক্ষমা চেয়েছে।

এইখানেই এমন এক জায়গায় এসে পড়ি, যেখানে মানুষের ধৃষ্টতার আর সীমা নেই—যেখানে 'গান দিয়ে' সে 'চরণ' ছোঁবে—এই তার "আকিঞ্চন"। এই এক ট্রান্-সেণ্ডেণ্টাল প্রদেশ, যেখানে মানুষের মনীষা তার সৃজনীশক্তির অঙ্গরাগ প্রাচুর্য্যে ও ধারণাশক্তির আকাশপ্রতিম বিশালতায়, প্রকৃতিরই সঙ্গে টক্কর দিতে স্পর্দ্ধাবান্; এবং সে এক জায়গায় এমন কি দেশকালকেও অতিক্রম করে যেখানে আপনারই সংবিদ্-এর মধ্যে, (বিবেকানন্দের গানের আর এক চরণ যদি তুলি), সমুদয় সৃষ্টিই "ডোবে ভাসে ডোবে পুনঃ, অহং স্রোতে নিরন্তর।"—অতএব, এ কথা খুব ঠিক যে, মানুষের যে কলাসৃষ্টি, সে জগৎ-সৃষ্টির চেয়ে ন্যূন নয়, হয় ত বা তার চেয়ে বড়ও বা হবে। কারণ কি, সমস্ত জড়ের মধ্যে যে একটা চৈতন্য-প্রাপ্তির বেদনা আপনাকে ফুলে-ফুলে চিত্রিত, মেঘে-মেঘে রঙীন, ঝটিকায় গর্জ্জিত, এবং জান্তবিকতায় ক্ষুৎ-কাম-তাড়িত করেছে দেখতে পাই, জড়ের সেই দূর-যাত্রা আজ পর্য্যন্ত মানুষের করোটীর মধ্যে তার কাম্যতীর্থকে পেয়েছে। মানুষের মগজ হচ্ছে জড়ের চৈতন্য হবার প্রয়াসের শেষ ফল; সেই মগজের

মধ্যে এই বাহিরের সৃষ্টিখানি আজ "রচিয়া তুলিছে বিচিত্রতর বাণী"। বিশ্বমিত্রের এই নব-সৃষ্টির সম্বন্ধে কথা বলবার পূর্ব্বে দু'বার ভাবতে হয়।

পূর্ব্বে যে abstraction-এর রাজ্যের কথা বলা হল, তা বিশেষ করে' সাহিত্যের জগৎ। এবং সাহিত্য হচ্ছে সেই মহাসমুদ্র, যার ঠিক্ কেনারাতে পৌছে' লক্ষ্যহীন অপরাহ্ণের অলস পায়চারি নিমেষেই ক্ষান্ত। *

* নোয়াখালি সবুজ-সঙ্ঘে কথিত।

নব দাম্পত্য-আলাপ

(রঙ্গ কবিতা)

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

চির-পুরাতন অথচ নূতন একটি কাহিনী আজি —
চাপিয়া রাখিতে পারি নে আর তো, হৃদয়ে উঠিছে বাজি'।
আজিকে নেহাৎ বলিয়া ফেলিব, যা থাকে বরাতে মোর ;
নব-দম্পতি, মাপ কোরো মোরে,—বলো না কো 'জোচ্চোর'!

কথাটা এমন বেশী কিছু নহে, নূতন জামাই কেহ
আসিল সহরে প্রিয়া-দরশনে ছাড়িয়া আপন গেহ।
বিবাহের পরে সরমে আলাপ হয় নি হবার মত,
ক'টা দিন পরে আসিল জামাই মনে-মনে ভাবি' কত!
বাড়ীর সবাই বরিল জামাই, বধূও আপনা-হারা,
বড় সুন্দর ছিল সে যামিনী, ঝরে চন্দ্রিকা-ধারা!
আহারের পরে অতি সমাদরে শালা-শালীদের লয়ে,
হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটালো হাসিমাখা কথা কয়ে।
দেখিতে-দেখিতে রাত হোল ঢের, আসর ভাঙ্গে না দেখি',
নূতন জামাই করে আইঢাই, বধূও ভাবিল—এ কি!
নাছোড়্বান্দা শালা ও শালীরা সঙ্গ ছাড়ে না তার,
নব-দম্পতি অধীর হইয়া উপায় করিল বা'র।
ফন্দী আঁটিয়া জামাই প্রথমে টেঁকুর তুলিল জোরে,—
সেই সাথে-সাথে চাপা সুরে 'বৌ' ডাকিল প্রেমের তোড়ে।
কেহ কিছু ছাই বুঝিতে পারে না, নব বধূ বোঝে সবই ;
যুবা-যুবতীরা জানে মনো ভাষা, মনে আঁকে কত ছবি!
প্রেমের কাহিনী প্রেম আছে যার সে-ই তো বুঝিতে পারে,
বাজে অন্তরে অন্তর-কথা, বিহ্বল করে তারে।
টেঁকুরের সাথে 'বৌ' ডাক শুনে বধূ কল্‌তলা গিয়ে,
হাঁচির সঙ্গে 'যাচ্ছি' বলিল নাকে অঞ্চল দিয়ে।
বড়দিদি তার, বুঝিয়া ব্যাপার আসিল জামাই যেথা,
কহিল সবারে "যাও, শুতে যাও, এখনো বসিয়া হেথা!"
ছোট ভাই বোন উঠিল যেমন, জামাই হাসিল মনে ;
বড়দিদি শুধু হাসিয়া বলিল—"পড়েছিলে জ্বালাতনে!"
মুচ্‌কি হাসিয়া জামাই বলিল—"এমন কিছুই নয়!"
হাত নেড়ে দিদি হেসে-হেসে বলে—"বোঝা গেছে অভিনয়।"
জামাই বেজায় লজ্জিত হলো,—বড়দিদি এলো চলি ;'
তরুণ গোঁফের আড়ালে তড়িৎ ওঠে একা চঞ্চলি'!
তার পরে হায়, কি যে হয়েছিল সব গেছি বিস্মরি' ;
অতএব তবে সুতরাং—কথা এইখানে শেষ করি।

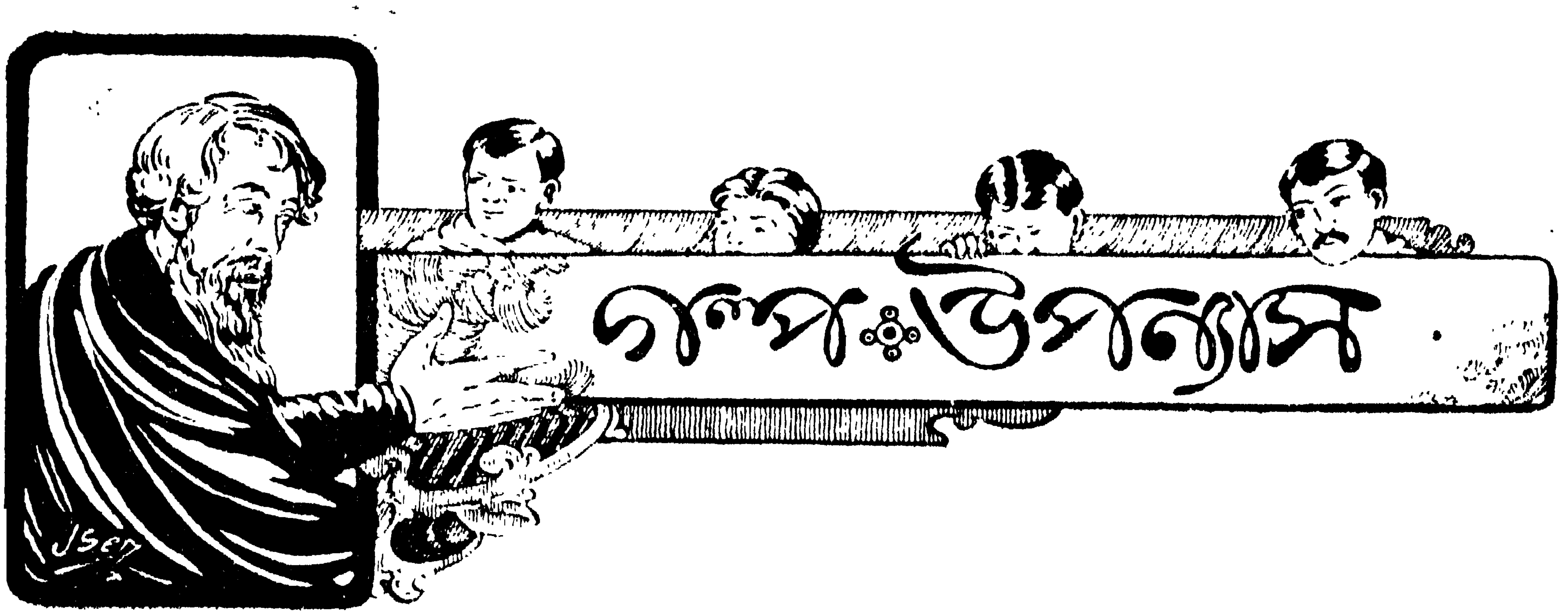

বিপর্য্যয়

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি এল্]

(১১)

ইহার পর যেদিন অমল ও অনীতা আসিল, সেদিন মনোরমা অনীতাকে চট্ করিয়া টানিয়া লইয়া আপনার ঘরে গেল না। নীচের একটা ঘর ড্রইং রুমের গোছ করিয়া ইন্দ্রনাথ সাজাইয়াছিল,—সেইখানেই সে শান্তভাবে বসিয়া পড়িল।

অনেক চেষ্টা করিয়াও ইন্দ্রনাথ সরযূর লজ্জা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিতে পারে নাই। অনেক কষ্টে তাহাকে অমলের কাছে বাহির করিল বটে; কিন্তু সে যতক্ষণ তার কাছে থাকিত, ততক্ষণ একটা দারুণ অশান্তি বোধ করিত। অমল তার সঙ্গে অনেক হাসি-তামাসা করিত; কিন্তু সে 'হাঁ' 'না'র বেশী কোনও কথা প্রায় বলিতে পারিত না,—কথাগুলি যেন তার গলায় আট্কাইয়া পড়িত। তাই অমলেরা আসিলেই সে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া, তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ছুটিয়া যাইত; তার আধঘণ্টা-খানেকের মধ্যে সে টেবিলের উপর রাশখানেক খাবার, চা প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করিত। আজও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না।

অনীতা মনোরমার রকম-সকম দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "মনো ভাই, তোমার কি অসুখ করেছে?"

মনোরমা একটু শান্ত হাসি হাসিয়া বলিল "না"। অনীতা একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি তোমার দিকে stare করছি দেখে রাগ করো না ভাই; কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার একটা কি হ'য়েছে। চল, তোমার ঘরে যাই,—আমাকে তোমার ব'লতেই হ'বে।"

মনোরমা বলিল, "না ভাই, এখানেই বসি,—এঁদের কথাটা শুনি একটু।"

অমল ও ইন্দ্র এই অল্প অবসরের মধ্যেই তাদের একটা তর্ক জুড়িয়া বসিয়াছিল। এটা তাদের বন্ধুত্বের একটা বিশেষত্ব। তারা সর্ব্বদাই তর্ক করিত,—নানা রকম ছোট-বড় বিষয় লইয়া তর্ক করাই ছিল তাদের বন্ধুত্বের বিশিষ্ট প্রকাশ।

আজ কথাটা উঠিয়াছিল স্বামী-স্ত্রীর অধিকার লইয়া। ইন্দ্র বলিতেছিল, "তুমি drudgery বল কাকে? স্ত্রী স্বামী-পুত্র-কন্যার সেবা ক'রবে—স্বাভাবিক নারীর মনে সেটা একটা আনন্দ—drudgery নয়!"

অমল বলিল, "দেখ, ওই কাব্য জিনিসটা আমি মোটে বুঝি না,—ওটাকে স্বীকার ক'রতেও চাই না। একটা দারুণ অসত্য ও অন্যায়কে একটা কাব্যের পোষাক পরিয়ে এনে দাঁড় করালেই যে সেটাকে সত্য ও ধর্ম্ম বলে' আমি মেনে নেব, এ কথা মনে'করো না।"

ই। এর মধ্যে কাব্য কোথায়! এ যে একেবারে ছাঁকা গন্ধ—fact। মানুষ কিসে সুখ পায় বা না পায়, তা তো যুক্তির ওজনে ঠিক করা যায় না,—তার এক মাত্র প্রমাণ অনুভূতি। অনুভূতির দিক দিয়ে দেখলে দেখতে পাবে যে, সেবা করে', বিশেষতঃ, স্বামী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি নিকট-আত্মীয়ের সেবা ক'রে যে আনন্দ লোকে পায়, সেটা একটা প্রকাণ্ড সত্য।

অ। আনন্দ তো অনেক জিনিসেই পাওয়া যায়। Russiaর serfদের যখন মুক্ত ক'রে দিলে, তখন তা'দের মধ্যে একটা ভয়ানক চেচামেচী লেগে গেল। দাসত্বের মধ্যে যে একটা দায়িত্বশূন্য আরাম আছে, সেটা হারিয়ে তারা বড়ই অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিল। আমাদের মা-লক্ষ্মীদের আমরা ঠিক সেই দাসত্বের ভিতর এমন করে নিবিষ্ট করে রেখেছি যে, তাতেই তাঁরা আনন্দ বোধ করেন। কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ জগতের বাহিরে যে মুক্ত বাতাসের একটা প্রকাণ্ড আনন্দ র'য়েছে, সেটা যে তাঁরা জানতেই পারেন না, এটা কি একটা কম নিষ্ঠুরতা! এঁদের এই আনন্দ-বোধটাই আমার কাছে জীবনের সব-চেয়ে নিষ্ঠুর tragedy ব'লে মনে হয়।

ই। আমি তো তাদের সে মুক্তবাতাস ও আলোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত ক'রতে বলছি না। মেয়েদের শিক্ষা দেও, স্বাধীনতা দেও,—কিন্তু এ কথা যেন তারা ভুলে না যায় যে, তাদের কর্ম্মের প্রধান ক্ষেত্র ঘরের ভিতর।

অমল এ কথা মানিয়া লইতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। পুরুষ ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র যে স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র হইবেই, এ কথা সে মানে না। বর্ত্তমান সমাজে সেটা অনেকটা স্বতন্ত্র, ঠিক; কিন্তু তার হেতু সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক, স্বাভাবিক নয়। যে প্রভেদটা আছে, সেটাও ক্রমে দূর হইয়া যাইবে। এখনই অনেকগুলি ভাগচিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার স্ত্রীজাতি ক্রমেই বেশী পরিমাণে পুরুষের সব রকম কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে, যখন পুরুষ ও নারী সম্পূর্ণ এক অধিকার এবং সম্পূর্ণ সাম্য লাভ করিবে। তখন ইন্দ্রনাথের যুক্তিগুলি লোকে হয় তো পুরাতত্ত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া, কৌতূহল সহকারে পাঠ করিবে—যেমন আমরা আজকাল দাসত্বপ্রথার সপক্ষ-যুক্তি পাঠ করিয়া থাকি।

তর্ক ক্রমশঃ বিষয়ান্তরে গিয়া পৌঁছিল। একটা বিষয়ে ইন্দ্র ও অমলের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য দেখা গেল। দুজনেই স্বীকার করিল যে, স্বামী ও স্ত্রীর ভিতর সমত্ব থাকা উচিত। পরস্পরের মধ্যে অধিকারের তারতম্য থাকা সঙ্গত নহে। স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ সমানে-সমানে ভালবাসার সম্বন্ধ হওয়া উচিত।

অনীতা এখন কথা কহিল। সে বলিল, "আচ্ছা দাদা, এটা তোমাদের একটা fallacy হ'চ্ছে না কি? পুরুষ ও নারী সমান হওয়া উচিত,—তাদের অধিকারে কোনও তারতম্য থাকা উচিত নয়, সেটা ঠিক। কিন্তু, তার মানে এ নয় যে, কোনও পুরুষই কোনও নারীর চেয়ে বড় হ'তে পারে না। পুরুষে-পুরুষে, নারীতে-নারীতে প্রকৃতিগত বৈষম্য যেমন থাকবেই।"

অমল। সে তো ঠিক কথা।

অনীতা। তা' যদি হয়, তবে এমন একজন পুরুষ যদি থাকে, যে স্বভাবতঃ একজন নারীর চেয়ে সব হিসাবেই বড়, আর সেই পুরুষের যদি সেই স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে সে পুরুষের স্ত্রীকে পরিচালন করবার যে স্বাভাবিক অধিকার, সেটা থাকবে না কেন? কারণ, এ অধিকারটা স্বামীর ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত—শক্তির উপর নয়।

ইন্দ্র। এ কথা ঠিক। কিন্তু আমি বলি যে, এ রকম বিয়ে হওয়াই উচিত নয়। যেখানে স্ত্রী স্বভাবতঃ স্বামীর তুল্য নয়, সেখানে বিবাহ হ'লে একটা আধিপত্যের ভাব এসে প'ড়বেই। ঠিক নিছক ভালবাসার সম্বন্ধ এমন মিলন হ'লে হ'তে পারে না। বিয়ে ঠিক সমানে-সমানে হ'লেই, তবে সম্বন্ধটা আদর্শ ভালবাসার সম্বন্ধ হ'তে পারে; তবেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সমান শ্রদ্ধা ক'রতে পারে।

অনীতা। তাই কি ঠিক? আমার মনে হয়, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ঠিক সেইখানেই হওয়া উচিত, যেখানে স্ত্রী স্বামীকে সত্য-সত্য নিজের চেয়ে বড় ব'লে জেনে, তার কাছে নির্ভরের সহিত আত্মসমর্পণ ক'রতে পারে। এই রকম আত্মসমর্পণেই নারী প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে থাকে।

ইন্দ্র। তুমি যদি এ কথা বল অনীতা, তবে আমি নাচার। কারণ, মেয়েদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে আমার চেয়ে তোমার

জ্ঞান অবশ্যই বেশী। কিন্তু পুরুষের দিক থেকে আমি এই কথা ব'লতে পারি যে, এই রকম নির্ভরের সম্পর্কে পুরুষ কখনও সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ ক'রতে পারে না। স্ত্রীর কাছে স্বামী স্বভাবতঃ সব বিষয়ে যে রকমের sympathy চায়, তা' এমন নির্ভরের সম্বন্ধে জন্মায় না।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে নানা খাদ্য-সম্ভার লইয়া বামনী ও সরযূর প্রবেশ! সরযূ কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল। শুনিয়া তার সমস্ত মুখ রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ ভয়ানক বিব্রত হইয়া পড়িল। সদা-সপ্রতিভ অমল পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সরযূ তাড়াতাড়ি চায়ের ট্রেটা নামাইয়া দিয়া, মনোরমার কাছে গিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, তুমি চা' টা দেও, আমি একটু আসি।" বলিয়া সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তার বুক ঠেলিয়া যে কান্নাটা উঠিতেছিল, সেটাকে সে কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

সরযূ তাড়াতাড়ি বাথরুমে দুয়ার বন্ধ করিয়া খুব এক চোট কাঁদিল। এত দিন সে যে কথাটা নিজের মনের ভিতর বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিতেছিল না, সেই কথাটা আজ তার স্বামীর নিজের মুখে শুনিয়া, তার সমস্ত হৃদয় চুরমার হইয়া গেল। তার স্বামী তার কাছে যাহা আশা করেন, সে যে তা' দিতে পারে না, স্বামী তাহাকে যাহা হইতে বলেন, সে যে তাহা হইতে পারে না,—এই ভাবিয়া সে কাঁদিল। স্বামীর উপর তার কোনও অভিমান হইল না; তার কেবল নিজের উপর রাগ হইল। সে কেন এত অযোগ্য, এত অক্ষম হইল। তার স্বামীর মন সে কেন আনন্দে ভরিয়া দিতে পারিল না? স্বামীর পায়ে কাঁটাটি তুলিতে সে হেলায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, আর সেই না কি তাঁর বুকের ভিতর এমন কাঁটা হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। স্বামীর প্রাণের ভিতর যে কি গভীর নিরাশা, দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতায় যে অপরিসীম অবাচ্য দুঃখ নিয়ত পীড়া দিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে সে হৃদয়ঙ্গম করিল। তাই তার নিজেকে চাবুক মারিতে ইচ্ছা করিল।

(১২)

এই যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, ইহাতে সে ঘরে একটা অনৈসর্গিক নীরবতা আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল। এদিকে মনোরমা একটু বিশেষ ভাবে বিব্রত হইয়া পড়িল। বৌদিদি তো আতিথ্যের ভার তাহার উপর দিয়া গেল; কিন্তু এই সব আবার ছুঁইতে তার আজ প্রবৃত্তি হইল না। এ সব যে কেবল মাছের ঘরে রান্না হইয়াছে তাহা নহে,—ইহার ভিতর মাছের কচুরী, কেক, স্যাণ্ডউইচ প্রভৃতি খাদ্য আছে! অথচ, বৌদি যখন পলায়ন করিল, তখন তার এ সব না দিয়া কি উপায় আছে।

সৌভাগ্যক্রমে মনোরমার এ বিপন্ন ভাব লক্ষ্য করিবার মত অবস্থা কাহারও ছিল না। অন্যমনস্ক ভাবে ইন্দ্রনাথ নিজেই চা ঢালিতে আরম্ভ করিল। অনীতা অগ্রসর হইয়া তাহাকে সাহায্য করিল। এই প্রকারে মনোরমার সহায়তা ছাড়াই তারা চা-পান ব্যাপার সমাধা করিল।

এই আড়ষ্টতা কাটাইবার জন্য অমল বলিয়া উঠিল, "By God! মিসেস ইন্দির একটি jewel."

ইন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "সম্ভব; কিন্তু rather uncut."

অমল বলিয়া উঠিল, "পাপিষ্ঠ! এই সব খাবার খেতে-খেতে এমন অসত্য কথা বলিস্! ফের বলবি তো এই ডেভিলটা দিয়ে তোকে smother ক'রবো।" বলিয়া সে সত্য-সত্যই একটা গোটা ডেভিল ইন্দ্রের মুখের ভিতর গুঁজিয়া দিতে গেল। পরে বলিল, "তোমার স্ত্রীর মত রাঁধুনী দ্বাপর যুগের পর আর হ'য়েছে বলে তো মনে পড়ে না।"

তার পর সে উঠিয়া পড়িল। মনোরমাকে বলিল, "দেখ তো, তোমার বৌদি কোথায় পালালেন! চল, আমরা তাঁকে টেনে বের করিগে।" বলিয়া মনোরমাকে ঠেলিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

অনেক ডাকাডাকির পর সরযূ মুখ-চোখ ধুইয়া আসিয়া হাজির হইল। অমল তাহার সকল সঙ্কোচ ভাসাইয়া দিয়া, তাহাকে টানিয়া ড্রইং রুমে আনিয়া বসাইল। তার পর তার চিরাভ্যস্ত রসিকতার দ্বারা সে সরযূর মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিল। বিশেষভাবে সে, সরযূর যে সব বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব, সেই সব কথা লইয়া এমন নিপুণভাবে তাহার প্রশংসা করিল যে, সরযূর আত্মাদর তাহাতে অনেকটা পরিতৃপ্ত হইল।

অনীতাও দাদার সঙ্গে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিল। সে প্রসঙ্গক্রমে, যেন সম্পূর্ণ নিরভিসন্ধি ভাবে বৌদি'র একটা

সেলাইয়ের ভারী সুখ্যাতি করিল; এবং সেটা আনাইয়া সবাইকে দেখাইল। এই সব কথাবার্ত্তায় সরযূর মনের কালি তখনকার মত অনেকটা কাটিয়া গেল। অমল ধরিয়া বসিল, বউদি'কে একটা গান গাহিতেই হইবে। সরযূ কিছুতেই সম্মত হইল না। শেষে সবার অনেক পীড়াপীড়িতে অতি মৃদুস্বরে একটা গান গাহিল,—অনীতা এস্‌রাজ লইয়া তার সঙ্গে সঙ্গত করিল।

গানটা বাস্তবিকই অতি সুন্দর হইল। অত্যন্ত সাদামাটা তার সুর—ওস্তাদী কোনও ভঙ্গীই তাহাতে নাই; কিন্তু তার ভিতর এমন একটা সরল সৌন্দর্য্য ছিল, যাহা শিশুর হাস্যের মত চিত্তহারী। ইন্দ্র শুনিয়া চমৎকৃত হইল। সে সরযূর মুখে অনেক দিন গান শুনে নাই,—শুনিতে ইচ্ছা হয় নাই। আজ অনেক দিনের পর এ গানটা তার বড় মিষ্ট লাগিল—গলার আওয়াজটাও ঠিক তাদের প্রথম পরিচয়ে যেমন মিষ্ট লাগিয়াছিল, তেমনি মিষ্ট লাগিল।

অমল খুব উচ্চকণ্ঠে সুখ্যাতি করিয়া উঠিল।

ইন্দ্র বলিল, "এ বাহাদুরীটা কার,—তোমার, না তোমার গুরুর?" বলিয়া অনীতার দিকে চাহিল।

আবার সরযূর বুকের ভিতর একটা খোঁচা লাগিল।

অনীতা বলিল, "এ গান আমি শেখাই নি।"

প্রকাশ পাইল যে, মনোরমার কাছে সরযূ এ গানটা শিখিয়াছে।

তখন অমল ও অনীতা মনোরমাকে ধরিয়া পড়িল। মনোরমা আজ কিছুতেই গান গাহিতে রাজী হইল না। শেষে অনীতা তার ভুবনমোহিনী স্বরলহরী ঢালিয়া সবার কাণের ভিতর অমৃত ছড়াইয়া দিল। একটার পর আর একটা, এমনি করিয়া অনীতা ৭।৮টা গান গাহিল। সকলে তন্ময় হইয়া শুনিল। ইন্দ্রনাথ চক্ষু-কর্ণ অনীতার উপর স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিল।

গান শেষ হইলে যখন অমলেরা বিদায় হইয়া গেল, তখন মনোরমা বিষাদ-ক্লিষ্ট অন্তরে আপনার ঘরে চলিয়া গেল। আজিকার এই মজলিসে তার অন্তরটা যেন একেবারে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া দিল। তার মনে হইল যে, এই সব আনন্দ-মিলনে যোগ দান করা তার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা। সে বিধবা, ব্রহ্মচারিণী। এই যে হাস্য-কোলাহল, জগতের এই যে ছাপিয়া ওঠা আনন্দের প্রস্রবণ,—ইহার ভিতর তার স্থান কোথায়? সে কেন এ সব ছাড়িয়া আসিতে পারিল না। সে এতক্ষণ যে সত্য-সত্যই একটা আনন্দ বোধ করিতেছিল, অনেকবার যে সে হাসিয়াছে, তাই মনে হইতেই তার আরও মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইল।

ভাবিতে-ভাবিতে ঘরে গিয়া সে দেখিতে পাইল যে, খোকা এবং বড়খুকী দুজনে মিলিয়া তার ঘরখানা তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। অনেকগুলি জিনিস ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, সারা ঘরময় ছেঁড়া কাগজ ছড়াইয়া, হাতে-মুখে কালি মাখিয়া তারা মূর্ত্তিমতী অপরিচ্ছন্নতার মত তার ফিটফাট ঘরখানিতে অধিষ্ঠান করিতেছে। সে গৃহসংস্কার করিয়া, ছেলে-মেয়ে দুটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, তাহাদের লইয়া গল্প বলিতে বসিল।

এদিকে সরযূকে একলা পাইয়া ইন্দ্রনাথ তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইল। সরযূ একটা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আঃ, বুড়াবয়সে ঠেকার দেখ না!"

ইন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, চুপি-চুপি তুমি এত বিদ্যে শিখে ফেলেছ, আর আমাকে জানাও নি!"

"আ মরি! আমার আবার বিদ্যে!"

"তার মানে,—তুমি বেণাবনে মুক্তো ছড়াতে চাও না! তোমার যা কিছু জহরত আছে, সব অমলের মত জহরীর জন্য—আমার মত আনাড়ীকে কিছু দিতে ইচ্ছা কর না!"

হায়, ব্যর্থ প্রশংসা! সরযূর মনের ভিতর বিশ্বাসের গোড়াটা এমন ভয়ানক নড়িয়া গিয়াছিল যে, এ জলসেকে তাহা পুনরুজ্জীবিত হইল না। ইন্দ্র তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহার উপর অজস্র সোহাগ ঢালিয়া দিল। সরযূ তাহা সম্ভোগ করিল;—ইন্দ্রের প্রত্যেকটি কথা, তার প্রতি অঙ্গের স্পর্শ যে তার কাছে অমৃতের মত। কিন্তু তাহাতে সে তৃপ্ত হইয়া গেল না। সব কথাগুলির তলায় যে একটা মস্ত বড় ফাঁক আছে, এ কথা সে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। তাই তার মনের মেঘ কাটিল না।

(ক্রমশঃ)

য়ুরোপে

[শ্রীদিলীপকুমার রায়]

(২)

একজন রুষ ভদ্রলোকের সঙ্গে বার্লিনে একটু ভালরকম আলাপ-পরিচয়, এমন কি, বন্ধুত্ব হয়েছিল বলা যেতে পারে—যেটা আমার য়ুরোপ-জীবনের একটা মস্ত লাভ বলে চিরকাল গণ্য হবে। ঘনিষ্ঠতার পরিমাণ যে অনেক সময়েই কালের অনুপাতের ওপর নির্ভর করে না, এ ক্ষেত্রে তার আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। পরিণত বয়সে খুব অল্প দিনের মধ্যে কোনও লোককে এত ভাল লাগাটা বোধ হয় সকলের জীবনেই এক-আধবার ঘটে; কিন্তু যখন ঘটে, তখন তার দাম একটু বেশী করে না দিয়েই গত্যন্তর নেই; যেহেতু বয়সের ও মনের একটা বিশিষ্ট ধারার পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে, ক্রমেই এই বিশেষ করে ভাল লাগাটা বিরল হ'তে বিরলতর হ'তে থাকে দেখা যায়। ছেলেবেলায় বোধ হয় সকলেরই সর্ব্বজনপ্রিয় হবার একটা উচ্চাশা থাকে। কিন্তু বয়সের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই যেমন একদিকে তার হাস্যকর অসম্ভাব্যতা স্ফুট হয়ে ওঠে, তেম্‌নি অপর দিকে তার কাম্যত্ব সম্বন্ধেও সংশয় আসে। এবং এই সংশয়ের দরুণ, জগতের অধিকাংশের কাছেই উপর-উপর প্রশংসা পাওয়ার অসম্ভাব্যতা তখন মনে বেশী বেদনা দিতে পারে না। তখন তার পরিবর্ত্তে মনে এই ধারণাটা যেন অনেকটা নিরুৎসব ভাবে স্থায়ী হয় যে, আমরা কেউই বহু দিন ধরে বহুর বাস্তব সংস্পর্শের জন্য ব্যগ্র থাক্‌তে পারি না। মিশবার জন্য জনকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুমাত্রই যথেষ্ট। বিদেশে এসে বোধ হয় প্রথম-প্রথম সকলেরই বিস্তর বন্ধুলাভের ইচ্ছা হয়। কিন্তু যখন জগতের বৈচিত্র্যের দরুণ অধিকাংশ পথিকের সঙ্গেই মনের কোনও বিশেষ মিল খুঁজে না পেয়ে, এই তরুণ আকাঙ্ক্ষা গুম্‌রে-গুম্‌রে নিবে যাবার উপক্রম হয়, তখন যে দুই-এক ক্ষেত্রে এই মনের মিলের একটা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে বন্ধুত্ব-বন্ধন স্থাপন কর্ব্বার সুযোগ ঘটে, সে কতিপয় ক্ষেত্রে এই বরদ সুযোগের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ও সত্য বন্ধুত্বের অনির্দ্দেশ্য মাধুর্য্যের পরশে সমস্ত মন কানায়-কানায় ভরে ওঠে।

তা'ছাড়া, বিদেশে বিদেশী বন্ধুলাভের মধ্যে একটা বিশিষ্ট তৃপ্তির আস্বাদ আছে; কারণ, তার মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে যেটা দেশবাসীর সঙ্গে বন্ধুত্বের মধ্যে নেই। আমি স্বদেশবাসীর বন্ধুত্বকে তুলনায় খাটো কর্ত্তে প্রয়াসী নই (কারণ, বন্ধুত্ব হচ্ছে সর্ব্বদাই "A gift of life which one bestows standing and which one should receive on bended knees"(১) তা কি স্বদেশে, কি বিদেশে); আমি শুধু বিদেশে বন্ধুত্বের সম্বন্ধে যা-যা মনে অনুভব করেছি, তাই লিখে যাচ্ছি মাত্র। সম্পূর্ণ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে গড়ে ওঠা সত্ত্বেও, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বরূপ যে একটা ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যার ওপর এই বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে, এই আবিষ্কারই—কারণ, এ সম্ভাবনা বইয়ে পড়ে থাক্‌লেও, এটা যখন সর্ব্বপ্রথম অনুভব করি, তখন এতে আবিষ্কারের আনন্দ থাকেই থাকে—বোধ হয় বিদেশীর সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনবত্বের মূল। তবে দুঃখ এই যে, বিদেশে বন্ধুলাভের মধ্যে যেন একটা অভিনবত্বের উপাদান আছে, তেম্‌নি অপর দিকে একটা ব্যথার রেশও বাজে। সেটা হচ্ছে এই যে, জীবনে হয় ত এ সব বন্ধুদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেখা না হওয়ার চিন্তার মধ্যেও কোথায় যেন একটা মাধুর্য্যের অনুরণনের পরশ পাওয়া যায়। কবি সত্যই গেয়েছেন, "Our sweetest songs are those which tell of saddest thoughts"(২) তবে যে কোনও গভীর আনন্দেরই সম্পদটা যখন স্থায়ী, তখন এই তৃপ্তির কিরণ ক্ষণপ্রভ হলেও বরদ, সন্দেহ নেই। সুতরাং ছোটবড় অসংখ্য ব্যথায় পরিপূর্ণ আমাদের ধরণীতে এই ক্ষুদ্র অথচ স্থায়ী বরের জন্য স্বতঃই মনে একটা কৃতজ্ঞতা আসে।

(১) D'bumenzio—Honeyneckle

(২) Shelley—Sky-lark

এখন আমার রুষ বন্ধুর প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্‌।

মহাপ্রাণ রোলাঁ মহোদয় ব্যতীত এ রকম আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ অথচ আদর্শবাদী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি য়ুরোপে এসে অবধি সংস্পর্শে আসি নি। কোনও উচ্চ আদর্শের জন্য যাঁরা বাস্তব জীবনে কিছু স্বার্থত্যাগ করে থাকেন, তাঁদের চরিত্রে একটা অনির্দ্দেশ্য মাধুর্য্য থাকেই থাকে—এটা আমি আমার স্বল্প অভিজ্ঞতার গণ্ডীর ভিতরেই বরাবর দেখে এসেছি। এঁর বিচিত্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা মুক্ত সাগর-বায়ুর পরশ ছিল; এঁর প্রাণ-খোলা অবাধ হাসির মধ্যে একটা আকর্ষণী অনুরণন ছিল; এঁর শান্তোজ্জ্বল দৃষ্টির মধ্যে মানুষের জগৎজোড়া দুঃখে একটা অস্থির বেদনা ছিল;—যা এঁর সঙ্গে প্রথম দুই-এক দিনের আলাপেই আমার ভারি ভাল লেগেছিল। পরে আমার অন্য এক রুষ বন্ধুর ও বান্ধবীর কাছে এঁদের পরিবারের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনলাম, যা বাস্তবিকই অসাধারণ। এঁর পিতার নাম Tchertkoff। তিনি টল্‌ষ্টয়ের সবচেয়ে প্রিয়তম বন্ধু বলে রাশিয়াতে পরিচিত। তিনি সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্বাধীন মত প্রচার করার দরুণ, রাশিয়া দেশ থেকে জার কর্তৃক নির্ব্বাসিত হয়ে, সপুত্র ইংলণ্ডে দশ-পনের বৎসর ছিলেন। তার পর একটি সাধারণ amnesty-র সময় রাশিয়ায় ফিরে আসার অনুমতি পান। টল্‌ষ্টয়ের জীবনের শেষভাগে যখন সে মহাপ্রাণ ঋষি স্বপরিবারে সহানুভূতি পেতেন না, যখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে পাগল বলে সন্দেহ কত্ত, যখন তাঁর অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজনই তাঁর মহান্ conflict of ideals-কে অবজ্ঞার চক্ষে দেখ্‌ত, তখন তিনি এঁর পিতার সঙ্গে অনেক সময়েই একত্র কাটাতেন; কারণ, মহৎ হৃদয় Tchertkoff বন্ধুর মহত্ত্ব ও ব্যথা বুঝতেন।

টল্‌ষ্টয়ের সঙ্গে একত্রে এঁর পিতার ছবি দেখ্‌লাম।

টল্‌ষ্টয়কে আমার বন্ধুবরও ব্যক্তিগত ভাবে জান্‌তেন। এবং টল্‌ষ্টয়ের সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে হৃদয়গ্রাহী ছোটখাট ঘটনা এঁর কাছে শুন্‌তাম, যা তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায় না। উদাহরণতঃ, ইনি বল্লেন যে, একদিন টল্‌ষ্টয় তাঁদের বাড়ীতে এসে দেখেন যে, তাঁর পিতার পরিচারক তাঁদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসেছে। তখন সে দৃশ্য টল্‌ষ্টয়ের হৃদয়কে এত স্পর্শ করে যে, তিনি টেবিলে মাথা রেখে কেঁদেছিলেন, কারণ তিনি প্রভু ও ভৃত্যের সামাজিক ব্যবধান ঘোর অন্যায় বলে প্রচার করা সত্ত্বেও, তাঁর গৃহে তাঁর অভিজাতকুলোদ্ভবা স্ত্রী কোনও মতেই ভৃত্যের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে সম্মত হ'ন নি। আমার বন্ধুবরের উপর টল্‌ষ্টয়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিকট সংস্পর্শ যে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল, এটা নিশ্চিত হ'লেও, এ কথা বলা যায় না যে, এঁর আদর্শবাদের জন্য ইনি টল্‌ষ্টয়ের কাছে সর্ব্বতোভাবে ঋণী। কারণ, এঁর মধ্যে যদি আদর্শবাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা না থাক্‌ত, তাহ'লে ইনি কখনই শুদ্ধ টল্‌ষ্টয়ের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে জীবন-পথে এতটা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পার্‌তেন না। একই দৃষ্টান্ত, একই ব্যক্তিত্ব, একই ঘটনা কোনও অজ্ঞাত কারণে দুইজন লোককে অনেক সময়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে পরিচালিত কর্‌তে পারে, এটা সংসারে এত বেশী দেখা যায় যে, একে কোনও মতেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আসল জিনিসটা হচ্ছে অন্তরের গঠন-প্রকৃতি। তবে বাল্যের পারিপার্শ্বিক যে আমাদের প্রকৃতির উপর সবচেয়ে গভীর ছাপ অঙ্কিত করে, এটাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার কর্‌তেই হয়। মহামতি Tchertkoff চিরকালই দানশীল, মহাপ্রাণ লোক। এবং আমার আর এক রুষ বন্ধু আমার কাছে গল্প কর্‌লেন যে, Tchertkoff মহোদয় নিজ সম্পত্তির কতক অংশ বিলিয়ে দিয়েছেন। এ সব মহদ্দৃষ্টান্তের যোগাযোগে আমার এই বন্ধুবরের আবাল্য idealism-এর প্রবণতা খুব গভীর হয়ে ওঠে। ইনি নিজে অভিজাতকুলোদ্ভব হলেও আভিজাত্যের উপর বিতৃষ্ণা এঁর এতই প্রবল যে, ইনি ইচ্ছা করে অভিজাত বংশে বিবাহ করেন নি। এঁর স্ত্রী (যাঁর সঙ্গেও এখানে আলাপ হ'ল, এবং যিনি খুব শিক্ষিতা না হ'লেও মধুর প্রকৃতির লোক) রুষ কৃষক ঘরের কন্যা; বিমাতার তাড়নায় কষ্ট পেতেন এবং রোজ মাঠে ১২।১৪ ঘণ্টা করে কাজ করে উপার্জ্জন কর্‌তেন মাত্র ২৫ কোপেক (=ছয় আনা, যুদ্ধের পূর্ব্বে)। উচ্চ আদর্শের বশে বিবাহ করার স্পৃহনীয়ত্ব সম্বন্ধে হয় ত মতভেদ থাক্‌তে পারে; কিন্তু যে লোক একটা আদর্শের বশে আভিজাত্যকুলোদ্ভব হয়েও শিক্ষিতা ও চিত্তাকর্ষিণী সামাজিক তরুণী ছেড়ে অশিক্ষিতা কৃষক-কন্যাকে বিবাহ কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'ন—বিশেষতঃ য়ুরোপে, যেখানে বরং মনোনীত কর্‌বার জন্য পাত্রীর অভাব নেই—তাঁর মনের দৃঢ়তা ও স্ব-বিশ্বাসে আস্থার কাছে সম্ভ্রমে মাথা হেঁট কর্‌তেই

হয়। ইনি সেদিন রুষিয়ার অভুক্ত কৃষকদের জন্য ধান্যবীজ প্রভৃতি নানান্ জিনিস ক্রয় কর্ত্তে বার্লিনে এসেছিলেন; এবং ধনীর সন্তান হয়েও, স্বেচ্ছায় প্রাসাদ ত্যাগ করে, কো-অপারেটিভ সোসাইটির একজন সভ্যরূপে রুষিয়ার গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়ান। এঁর কাছে রুষিয়ার কৃষক জীবনের সম্বন্ধে অনেক কথা শুন্‌লাম। ইনি বলেন যে টল্‌ষ্টয়, ডোষ্টায়েভস্কি প্রভৃতি রুষ কৃষককে একটু বেশী idealise করে ভুল করে বসেছেন; কারণ, তিনি আবাল্য স্বেচ্ছায় তাদের সঙ্গে খুব নিকট সংস্পর্শে এসে যেমন তাদের মধ্যে স্বাভাবিক হৃদয়ের কোমলতা দেখতে পেয়েছেন, তেম্‌নি ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা প্রভৃতিও লক্ষ্য করেছেন। এঁর নিজের রাজনীতিক মতামত টল্‌ষ্টয়ের অনুরূপ। তবে আমি, তিনি "টল্‌ষ্টয়ান" কি না জিজ্ঞাসা করাতে, ইনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, টল্‌ষ্টয়ের মত এত উদার ও অসাম্প্রদায়িক যে, তাঁর মতামতের সঙ্গে যার সহানুভূতি আছে, তাকে "টল্‌ষ্টয়ান" আখ্যায় অভিহিত করে, তাকে একটা সঙ্কীর্ণ নামের গণ্ডীতে ফেলে দেওয়া ঠিক নয়। ইনি মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের খুব খবর রাখেন; তবে বলেন যে, যে মুহূর্ত্তে এ আন্দোলনের মধ্যে রক্তপাতের আমদানী হবে, সে মুহূর্ত্তে তিনি এ আন্দোলনের সঙ্গে সহানুভূতি কর্ত্তে পার্‌বেন না। পাশব বলের সাহায্যে মানুষ চিরকাল অবনতই হয়; এবং কোনও ক্ষেত্রেই তা সমর্থন করা যেতে পারে না—এই এঁর মত।

যে স্থলে একজন লোকের প্রাণনাশে পঞ্চাশজন নির্দ্দোষ লোকের প্রাণ বাঁচান যেতে পারে, সে স্থলে তাঁর কর্ত্তব্য কি, জিজ্ঞাসা করাতে, ইনি উত্তর দেন যে, সে স্থলেও তার প্রাণবধ করা অকর্ত্তব্য; কারণ মন্দ কাজ দিয়ে মন্দ কাজের প্রতিষেধ হয় না। আমি এঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, অনেক স্থলে হিংসার দ্বারা মানুষের হিত ইতিহাসে সাধিত হয়েছে, একথা আপনি মানেন কি না। ইনি উত্তর দেন, না। হত্যার কাজ চিরকালই মানব-হিতের ওজরেই সাধিত হয়ে থাকে; কিন্তু তাতে কোনও স্থায়ী ফললাভ সম্ভব নয়। ইনি আরও বলেন যে, বর্ত্তমান বল্‌শেভিকদের রাজত্বে তিনি মানব-হিতের নামে এত নিষ্ঠুরতা সাধিত হ'তে দেখেছেন যে, তাতে তাঁর পূর্ব্বেকার বিশ্বাস দৃঢ়তরই হয়েছে। ইনি বলেন, পাশব বলের সাহায্যে যে দুঃখ-কষ্টের নিরাকরণ হয়, তা অত্যন্ত সাময়িক ও দৃশ্যতঃ,—বাস্তব নয়। একদল উৎপীড়কের বদলে অন্য একদল এসে বুকে চেপে বসে, এই মাত্র। তা ছাড়া, ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের চরিত্রের যে মহান্ ক্ষতি হয়, তা ত হয়ই। ইনি বলেন, "হয় ত কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দ্দোষিকে অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচাতে আমি নিজে অত্যাচারীর প্রাণনাশ কর্ত্তে পারি; কিন্তু তা যে আমার দুর্ব্বলতার জন্য, এ কথা আমি স্বীকার করে অনুতাপ কর্ত্তে বাধ্য।" ইনি কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেন না। বল্‌শেভিকদের সঙ্গে এঁর সহানুভূতি না থাক্‌লেও, ইনি সে রাজতন্ত্রের লোকদের অশন-বসনের জন্য সাহায্য কর্ত্তে শুধু যে প্রস্তুত তাই নয়,—ইনি একান্তে সেই সেবার কাজেই নিরত। ইনি বলেন, "আমার অনেক রাশিয়ান বন্ধু এখানে আছেন, যাঁরা বল্‌শেভিক গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হওয়ার দরুণ, এখন নিরন্ন রাশিয়ান নরনারীর জন্য বিন্দুমাত্রও ব্যথা অনুভব করেন না। তাঁদের মনোভাব এই যে, যদি বল্‌শেভিক গভর্মেণ্টের মূলোচ্ছেদ কর্ত্তে না পারা যায়, তবে তার অধীনস্থ সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হ'লেও, তাদের বাঁচাবার জন্য একটি অঙ্গুলীও উত্থাপন করা অনুচিত।" ইনি বলেন "এরূপ মত অত্যন্ত হেয়, সন্দেহ নেই। যদি আমি কোনও গৃহ দগ্ধ হ'তে দেখি, তা হ'লে সে গৃহে ধার্ম্মিক আছে না পাপী বাস করে, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমার তখনকার প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, আগুন নিবাবার চেষ্টা করা। রাশিয়ার আজ সেই অবস্থা। আজ বিস্তর রুস-দেশবাসীর গৃহ দহ্যমান; এখন কোন্ গভর্মেণ্ট তাদের শাসন কর্চ্ছে, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার সময় নেই। এখন আমাদের সর্ব্বাগ্রে দেখ্‌তে হবে, কেমন করে লক্ষ-লক্ষ নিরন্ন রুষ নরনারী মৃত্যু-মুখ হ'তে রক্ষা পায়।" কথাটা আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। এ রকম নানা তর্ক-বিতর্কে, এঁর মধ্যে যে একটা সমাহিত, শান্ত, নম্র সত্য-দর্শনের পরিচয় পেতাম, সেটা বাস্তবিকই একটা মস্ত জিনিস। তা ছাড়া, এঁর মধ্যে একটা মুক্ত উদারতা, একটা উজ্জ্বল বিশ্বাস, একটা গভীর সহানুভূতি, মানুষের দুঃখ-কষ্টে একটা স্থায়ী শান্ত ম্লানিমা পাশাপাশি ছিল, যেটা আমার কাছে অত্যন্ত ভাল লাগ্‌ত। ইনি আশৈশব নিরামিষাশী—অহিংসা-নীতির বশবর্ত্তী হয়ে। আজকাল দিনে একবার মাত্র আহার করেন। রাত্রে মাত্র সামান্য পনীর ও এক কাপ চা খান। বিজ্ঞানের চর্চ্চার বিস্তার হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে ইনি

সন্দিগ্ধচিত্ত। ইনি টল্‌ষ্টয়ের মতের সমর্থন করেন (৩) যে, বর্ত্তমান সভ্যতার যে গরব আমরা করি, সে সূক্ষ্ম আনন্দের আস্বাদ পাই আমরা মোটে শতকরা পাঁচজন বা তার চেয়েও কম লোক। তা যদি হয়, তবে এ সভ্যতার বিস্তারে লাভের চেয়ে লোকসান বেশী কি না, তা আমাদের ভেবে দেখ্‌বার সময় এসেছে। সংসারে দৈবাৎ আমরা যে কয়জন এই শতকরা পাঁচজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করি, সেই ক'জনই কেবল বড়াই করি যে, "আমাদের সভ্যতা, হেন, তেন,—আমরা নিয়তই উন্নতিশীল,—প্রকৃতির জয়ে মানুষের অক্ষুরন্ত শক্তির বিকাশ সাধন কর্চ্ছি, ইত্যাদি।" কিন্তু তা যে এই শতকরা ৯৫ জনের খরচে, যারা এ প্রকৃতির বিন্দুবিসর্গেরও খবর রাখে না,—তা আমরা দৈনিক অভ্যাসের বশে ও কল্পনার প্রভাবে ভুলে বেশ আত্মপ্রসাদ ভোগ কর্ত্তে থাকি। কাজে-কাজেই এর ফলে শুধু যে সাধারণ মানব উন্নত হয় না তাই নয়, যে শতকরা পাঁচজন উন্নত ও সভ্য হয়েছেন বলে গরব করেন, তাঁদের মধ্যেও সত্যকার হৃদয়ের অনুভূতির বিকাশের চেয়ে আত্মপ্রবঞ্চনাই বেশী প্রশ্রয় লাভ করে। এই ব'লে ইনি রাশিয়ার দৈন্যপীড়িত, ক্ষুধার্ত্ত, দৈহিক পরিশ্রমে ক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী বিবৃত কর্ল্লেন; এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভ্যরূপে তাদের সাহায্য দেওয়ার সূত্রে তাদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, তার নানারূপ সূক্ষ্ম বর্ণনা কর্ল্লেন। ঋষি টল্‌ষ্টয় বিরাট্ মানবের দুঃখ-কষ্ট তাঁর অসাধারণ করুণার সাহায্যে বুঝেছিলেন; এবং তিনি যে অল্পসংখ্যক আদর্শবাদীকে আমাদের সহানুভূতির অভাব ও কল্পনার দৈন্য সম্বন্ধে চোখ খুলে দিতে সহায়তা করেছিলেন, ইনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

এঁর কাছে রাশিয়ার আদর্শবাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও দু'চারজন মহাত্মার কথা শুনলাম। ইনি Sergei Popoff বলে একজন সাধুর গল্প কর্লেন। Popoff ছিলেন একজন uncompromising idealist; এবং অনেক তথাকথিত বিজ্ঞ practicalist হয় ত এঁর জীবনের কাহিনী শুনে এঁকে এক কথায় পাগল বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন; কিন্তু যেহেতু আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে এমন লোক অনেক আছেন; যাঁরা এঁর idealismএর সামনে ভক্তিতে মাথা হেঁট কর্ত্তে কুণ্ঠিত হবেন না, সেহেতু আমি এঁর জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে যা শুনেছি, সেই বিষয়ে দু'চারটি কথা লিখ্‌ব।

ইনি ছিলেন একজন মানব-প্রেমিক, বিলাস-পরিপন্থী, পরিশ্রমী লোক। ইনি রাশিয়ার অনেক লোকের জীবনের উপর, তাঁর আমরণ অসাধারণ uncompromising আদর্শ-বাদের দ্বারা খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অনেক লোক সন্দেহাকুল হ'লে, এঁর কাছে উপদেশ নিতে আস্‌ত। ইনি স্বনির্ম্মিত খড়ের কুটীরে বাস কর্ত্তেন। নিজের তৈরি সামান্য পরিধেয় পরিধান কর্ত্তেন। নিরামিষাশী, চিরকুমার, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। এবং বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হওয়া সত্ত্বেও টল্‌ষ্টয়ের মতানুসারে চাষ করে জীবিকা নির্ব্বাহ কর্ত্তেন। ইনি কোনও ধনীর প্রাসাদে কখনও প্রবেশ কর্ত্তেন না; এবং জারের সময়েও, বারবার উৎপীড়িত হয়েও pass-port ব্যবহার করেন নি। ইনি বল্‌তেন "pass-port আবার কি? তার দরকার কি? আমি মানুষ—ঈশ্বরের সন্তান;—সেই আমার পরিচয়।" গত মহাযুদ্ধের সময় এঁকে লোকে জোর করে সৈন্যদলভুক্ত কর্ব্বার চেষ্টা করে। ইনি recruiting campএ গিয়ে, সৈন্যদের বল্লেন, "ভাই সব, তোমরা কার প্ররোচনায় পড়ে আমার জার্ম্মাণ ভাইদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কর্চ্ছ?" ফলে, ইনি বৎসরাধিককাল কারারুদ্ধ হন; কিন্তু কারামুক্ত হয়েই, ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায়ও, আবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। ফলে, আবার কারারুদ্ধ হন। গরীব-দুঃখী তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি কর্ত্ত ও ভালবাস্‌ত; এবং তাঁর উপদেশকে অনেকটা অভ্রান্ত বলে মনে কর্ত্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও (আমার বন্ধুবর বল্লেন), এঁর মধ্যে যে দীনতা ছিল, সেটা অসাধারণ। কারণ, অনুরূপ অন্য দুই-এক ক্ষেত্রে দুই-একজন আদর্শবাদী প্রচারকের অহঙ্কার জন্মেছিল; কিন্তু এঁর মনে অহঙ্কারের লেশও কখনও শিকড় গাঁথে নি। টল্‌ষ্টয়, নিজের পিতা, ও এই সব লোকের দৈনিক দৃষ্টান্ত থেকে যে আমার বন্ধুবর খুব লাভ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। ইনি সস্ত্রীক একখানি ফটো আমাকে উপহার দেন। তাতে যা লিখেছিলেন, তাতে তাঁর চরিত্রের একটা দিক বেশ স্ফুট হয়ে ওঠে বলে, তা উদ্ধৃত কর্ব্বার লোভ সংবরণ কর্ত্তে পার্লাম না। "Real freedom is achieved not by changing the outward forms

* End of the Age—Tolstoy.

of one's life but by liberating the inner spirit." ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এঁর মনোভাব অত্যন্ত উদার। এমন কি, ইনি ইহুদীদের প্রতিও বিদ্বেষ পোষণ করেন না। এ কথাটা হয় ত আমাদের দেশে নিতান্তই সহজ ও বোধগম্য মনে হতে না পারে; তাই এ সম্বন্ধে দু-চারটে কথা লেখা মন্দ নয়।

য়ুরোপে খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার সময় থেকে, ইহুদী-বিদ্বেষ খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে বরাবর বদ্ধমূল। এমন কি, অন্যথা নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ লোকও Jew নামে একটু নাসিকা-কুঞ্চন করাটা কর্ত্তব্য বলে মনে করেন দেখেছি। আগে ইহুদীর বিরুদ্ধে আক্রোশটা ছিল ধর্ম্মগত; এখন সেটা দাঁড়িয়েছে জাতিগত (racial)। খ্রীষ্টীয়ানদের অভিযোগ এই যে, ইহুদীরা সঙ্কীর্ণমনা, কাপুরুষ, স্বার্থপর ইত্যাদি ইত্যাদি। খ্রীষ্টীয়ানগণ বলেন যে, উচ্চতম আদর্শে ইহুদীর মন কখনও সাড়া দেয় না; কারণ তারা বোঝে কেবল অর্থ, ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বজাতীয়ের শ্রীবৃদ্ধি। এখনও সমগ্র য়ুরোপেই ইহুদীর বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ ও ঘৃণা বর্ত্তমান। কেবল আগে সেটা লোকে স্বাধীন ভাবে প্রকাশ কর্ত্ত; আজ-কাল সেটা একটু সাবধানে প্রকাশ করে। খ্রীষ্টীয়ানদের মনের নিভৃত প্রদেশে এই ধারণা প্রায় বদ্ধমূল যে, Shylock এর মত চরিত্র ইহুদীদের পক্ষে প্রায় typical বল্লেই চলে; এবং খ্রীষ্টীয়ানেরা কোনও কালেই এত নীচে নামতে পারে না। সমাজে ইহুদীর বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যঙ্গ্যাত্মক গল্প লোকে খুবই উপভোগ করে।

আমি খ্রীষ্টীয়ানদের এই মতগুলির মোটেই সমর্থন করি না। আমি সর্ব্বত্রই যথেষ্ট ইহুদীর সঙ্গে মিশেছি; শুধু পুরুষের সঙ্গে নয়,—ইহুদী রমণীর সঙ্গেও একটু কাছ থেকে মিশেছি। আমি তাদের মধ্যে কোনও বদ্ধমূল নীচতা বা সাধারণ অসাধুতা দেখতে পাই নি। ইহুদী জাতির প্রতি খ্রীষ্টীয়ানদের ব্যবহার আমি সভ্য য়ুরোপের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক বলে মনে করি। ইহুদী জাতি যে কতবার খ্রীষ্টীয়ানদের হাতে সপরিবারে নিহত হয়েছে, তার সংখ্যা নেই;—ছোটখাট সামাজিক নির্যাতনের ত কথাই নেই। পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ানরা pogrom নামক উৎসবে মাঝে-মাঝেই ইহুদী ছেলেমেয়ে ও রমণীকে দলে-দলে হত্যা কর্ত্ত। কারণ?—কারণ তারা হচ্ছে অভিশপ্ত জাতি। এখন আমোদটা তত দূর না গড়ালেও, সে বিদ্বেষ খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে শতকরা বোধ হয় ৯০ জনের মনে গ্রথিত। তাদের অপরাধ?—না, তারা নিজেদের সাহায্য করে ও য়ুরোপীয় culture তাদের মনে সাড়া তোলে না (কারণ এখন বিধর্ম্মী বলে তাদের নির্যাতন করার নৈতিকতার সম্বন্ধে য়ুরোপ একটু সন্দিগ্ধ-চিত্ত হয়ে পড়েছে। তাই অন্য অভিযোগ আনা দরকার। যেহেতু কথায় আছে যে, কুকুরকে যদি ফাঁসি দিতে হয়, তবে তাকে bad name দেওয়া দরকার)। অথচ এ সব খ্রীষ্টীয়ানরা ভুলে যান যে, জগৎ ইহুদী জাতির কাছে কত ঋণী। (উদার Rolland মহোদয় তাঁর Jean Christophe-এর একস্থলে বিস্তৃত ভাবে লিখেছেন, যে জগৎ বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার জন্য ইহুদী জাতির কাছে কতখানি ঋণী, এবং তারা না থাকলে এ সভ্যতায় কতবড় একটা gap থেকে যেত।) য়ুরোপীয় organisation ও ঐহিক ধনবৃদ্ধির জন্য ইহুদীর প্রতিভা ও শ্রমশীলতার ঋণ অবিসংবাদিত। কিন্তু তা' ছাড়াও, চিন্তা-জগতের বিকাশে স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট থেকে আরম্ভ করে Socialism এ Marx, Engel প্রমুখ ইহুদীগণ, দর্শনে Spinoza, Bergson প্রমুখ মহারথী, সঙ্গীতে Chopin, Mendel, Sohn প্রমুখ মনস্বী, বিজ্ঞানে Einstein, রণবিদ্যায় Trotsky ইত্যাদি, প্রাচ্য-বিদ্যায় Levy প্রভৃতি আরও বিস্তর নাম করা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কারণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ এতই অসার যে, একে অবজ্ঞার চক্ষে দেখাই ভাল। তা' ছাড়া, ইহুদীদের মধ্যে বড়লোক আছে, এ কথা প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়; আমি বলতে চাই শুধু এই কথা যে, আমার ও আমার অনেকগুলি বন্ধুর অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সাধারণ ইহুদী নরনারীর মধ্যে উদারতা, আতিথেয়তা, সততা বা স্নেহশীলতা খ্রীষ্টীয়ানদের চেয়ে অণু-পরিমাণেও কম নয়। তবে খ্রীষ্টশিষ্যগণ দ্বারা যুগযুগব্যাপী হত্যা ও নির্যাতনের অভিনয়ের ফলে বর্ত্তমানে যদি ইহুদী জাতি একটু রক্ষণশীল হয়ে পড়ে থাকে, ও খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠে থাকে, তবে তাতে অন্ততঃ আমাদের চক্ষে লোমহর্ষক বা বিসদৃশ কিছু থাকতে পারে না, যদিও মানুষের বিশ্বজনীন লাভের দিক দিয়ে এ বিশ্বাসটা নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয়। ইহুদী কৃপণ ও নীচমনা,—এ ধারণা আমিও আমার স্বদেশীয়দের মধ্যেও অনেক সময় লক্ষ্য করেছি। তাঁদের যুক্তিও

কম বালসুলভ নয় কি ?—না, দুই-একবার ইহুদীরা তাঁদের ঠকিয়েছে। অতএব সব ইহুদীই প্রবঞ্চক। বিখ্যাত খ্রীষ্টিয়ান রুষ লেখক Gorky মহোদয় খ্রীষ্টিয়ানদের দ্বারা ইহুদীদের বিপক্ষে আরোপিত অসাধুতার অভিযোগে লিখেছেন যে, যখন কোন খ্রীষ্টিয়ান চুরি করে, তখন খৃষ্ট-শিষ্যগণ বলেন, "অমুক, অর্থাৎ Tom, Dick বা Harry চুরি কর্ল"। কিন্তু যখন কোনও ইহুদী চুরি করে, তখন এই উদার, নিরপেক্ষ খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায় বলেন, "ওই Jewটা চুরি কর্ল।" খ্রীষ্টিয়ানদের ইহুদীদের বিপক্ষে অধিকাংশ অভিযোগকেই এরূপ অসার প্রতিপন্ন করা মোটেই শক্ত নয়; কারণ, এ সব অভিযোগের পনর-আনার উৎপত্তি সুখ-মনোভাব থেকে। তবে এ চেষ্টার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না; কারণ, খ্রীষ্টিয়ানদের কুসংস্কারে আমাদের সময় দেওয়ার কোনও দরকার দেখি না। আমি এ বিষয়ে ধৈর্য্য ধরে এতটা লিখতে প্রবৃত্ত হতাম না, যদি না আমার অনেক দেশীয় বন্ধুদের মধ্যেও খ্রীষ্টিয়ানদের এ সঙ্কীর্ণ ধারণা ধীরে-ধীরে প্রবেশ কর্ত্তে না দেখতাম। আমার বোধ হয় নির্বিচারে অপরের sweeping generalisation মেনে নেওয়াটা আমাদের দাস-মনোভাবেরই অভিব্যক্তি মাত্র,—যা আমাদের স্বাধীনভাবে ভাবতে বাধা দিয়ে থাকে, ও যার ফলে আমরা অজ্ঞাতসারে মনে করে থাকি যে, Jew বলে নাসিকা কুঞ্চন কর্লেই, আমরা মানুষ হিসেবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের অবিসংবাদিত পরিচয় দিতে সমর্থ হব। আমার কোন-কোনও বন্ধু আমাকে স্পষ্টই বলতেন যে, আমি ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ভুল কর্চ্ছি; যেহেতু আমার বার্লিনে অনেকগুলি ইহুদী বন্ধু লাভ হয়েছিল ও অনেক ইহুদী পরিবারে যাতায়াত ছিল। এখানেও কতিপয় ইহুদী প্রফেসরের আতিথেয়তা আমার ভারি ভাল লাগত। এদের মধ্যে একজনের বাড়ীতে আমি ১৫ দিন আতিথ্য স্বীকার করেছিলাম;—অথচ, তিনি আমার কাছ থেকে এক পয়সাও গ্রহণ করেন নি।

সে যাই হোক্, ইহুদীদের বিরুদ্ধে এই বিস্তীর্ণ বিদ্বেষ যে আমার বন্ধুবরের মনে শিকড় গাঁথতে পারে নি, এটা তাঁর হৃদয়ের উদারতার অন্যতম পরিচয়। তিনি আমাকে বল্তেন যে, অনেক সময়ে তিনি ইহুদীদের ওপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন; কারণ, দৈনিক জীবনে practical বুদ্ধি তাদের এত বেশী যে, তারা এমন অনেক ক্ষেত্রে সহজে কার্য্যোদ্ধার করে নেয়, যা তাঁর কাছে অত্যন্ত কঠিন বলে প্রতীয়মান হত। কিন্তু তিনি নিজেকে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে, এ অযৌক্তিক রাগ মন হতে দূর কর্ত্তে কৃতকার্য্য হয়েছেন। মাসাধিক আগে ইনি আমাকে মস্কো থেকে একটি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন। তাতে এক স্থলে লিখেছিলেন, "I think that if one believes that this same Divine spirit dwells in all of us, then he can not say that his religion is the only one and best of all, but he must be tolerant to all religions and faiths."

এই সূত্রে মনে হচ্ছিল যে, আমাদের দেশে অনেকে এক কথায় য়ুরোপ ও ভারতের যে তুলনামূলক সমালোচনা করেন, তার মধ্যে কতটা অসারতার উপাদান থাকে। এমন কি, মহান্ মানব-প্রেমিক ৺স্বামী বিবেকানন্দও এই ভুলের হাত হতে নিষ্কৃতি পান নি। তিনি পরমহংসদেব, পাহাড়ীবাবা প্রমুখ দু'চারজন অলোকসাধারণ মহাপুরুষের সংস্রবে এসে, ও ভারতকে অনেকটা নিজের অন্তরে দেখে, এই ভুল সিদ্ধান্ত করে বসেন যে, ভারতীয়েরা মূলতঃ আধ্যাত্মিক ও য়ুরোপ মূলতঃ বস্তুবাদী। অবশ্য, আমি মানি, তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন প্রধানতঃ আমেরিকান ও ইংরাজের চরিত্র থেকে, যারা হয় ত সত্য-সত্যই একটু বেশী বস্তুবাদী। কিন্তু, তাই বলে আমি এ কথা হঠাৎ স্বীকার করে নিতে রাজী নই যে, সমগ্র প্রতীচ্যের বিকাশের ধারাই বস্তুবাদের দিকে চলেছে এবং আমাদের মনের বিকাশের ধারা মূলতঃ আধ্যাত্মিকতার রূপ গ্রহণ করেছে। দেশে আমার মনে এই রকম ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু এখানে এসে শুধু রোলাঁ, রাসেল, নানসেন, লেনিন প্রমুখ অভ্রভেদী আদর্শবাদীর ক্ষেত্রে নয়, জনসাধারণের মধ্যেও এমন অনেকগুলি আদর্শবাদীর সাক্ষাৎ-সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম, যাঁরা ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই সবচেয়ে বড় করে দেখেন না। কাজে-কাজেই স্বামী বিবেকানন্দের মতন অসাধারণ লোকও যে এ বিষয়ে একটু ভুল মত প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, এ কথা আমি বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে প্রকাশ কর্ত্তে বাধ্য। য়ুরোপের বিকাশের ধারার মধ্যে দুইটি বস্তুবাদ খুবই পরিস্ফুট;—প্রথমতঃ, প্রকৃতিকে বশে আনার চেষ্টা;

দ্বিতীয়তঃ, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানর প্রযত্ন। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, বর্ত্তমান য়ুরোপে এই দুইটি মূল বস্তুবাদ সত্বেও প্রেমিক ও আধ্যাত্মিক-প্রবণতাবান্ লোকে শুধু যে টল্‌ষ্টয়, ডোষ্টয়েভস্কি, রোলাঁ, রাসেল, নান্‌সেন প্রমুখ কীর্ত্তিমান্ লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা নয়,—সাধারণের মধ্যেও মেলে। এ কথা আমি অবশ্য স্বীকার করি যে, এরূপ লোকের সংখ্যা এখানে খুব কম; সঙ্গে-সঙ্গে বল্‌তে চাই যে আমাদের দেশেও তাই। আর আমাদের দেশে এরূপ লোকের সংখ্যা শতকরা য়ুরোপের চেয়ে ঢের বেশী—এমন কথা প্রমাণ করা যখন এক রকম অসম্ভব, তখন এরূপ মতের অভিব্যক্তিতে স্বামীজির মতন অসাধারণ লোকও দেশভক্তি নামক সুলভ চরিত্র-ত্রুটির কবলে পড়েছিলেন, এ সন্দেহ মনে আসা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতার কি পরিমাণে সামঞ্জস্য সাধন কর্ত্তে হবে, সে বিরাট্ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা কর্ত্তে আমি এখানে বসি নি। আমি শুধু বল্‌তে চাই এই কথা যে, আমাদের দেশে যে এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁরা আমাদের আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে য়ুরোপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন কর্ব্বার চেষ্টা করে সুলভ হাততালি নিতে ব্যগ্র হয়ে থাকেন, তাঁদের সে চেষ্টা যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা য়ুরোপের choice spiritsদের সংস্রবে আস্‌বার সৌভাগ্য পেলে এক মুহূর্ত্তেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

য়ুরোপের অনেক দোষ আছে; কিন্তু তাই বলে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, য়ুরোপের কাছ থেকে আমাদের শেখ্‌বারও ঢের আছে; এবং সেটা শিখ্‌তে হ'লে, শুধু য়ুরোপের ভুল ভ্রান্তি দেখিয়ে নিজের গৌরব বাড়ানর সুলভ চেষ্টায় বিশেষ ফলোদয় হবে না;—সেটা শিখ্‌তে হ'লে আন্তরিক ভাবে য়ুরোপকে বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্ত্তে হবে।

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ঠিক্ সত্যের পরশ পেয়েছেন, যখন তিনি উচ্চকণ্ঠে আমাদের দেশের বর্ত্তমান রক্ষাশীলতার স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে প্রচার কর্ব্বার চেষ্টা করেছেন যে, আজ-কালকার দিনে কুণো হয়ে নিজের-নিজের ঘরে বসে, সনাতনত্বকে আগলে রক্ষা করার চেষ্টার দিন আর নেই। এখন জগতের মানুষ জগতের মানুষকে জান্‌বার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে; এবং তাতেই আমাদের মুক্তি মিল্‌বে। তাই প্রতীচ্যের নিকট পরিচয় লাভটা আমি কাম্য বলে মনে করি; এবং ভারতকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাটাই যাঁরা জাতীয় মুক্তির একমাত্র উপায় বলে প্রচার করে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে একমত হ'তে পারি না।

বিজিতা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৮)

পরামর্শদাত্রী পূর্ণিমার পরামর্শে সুলতা একটা বিবাদের ছুতা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু সুষমার মধ্যে এমন কোনও খুঁত পাওয়া যায় না, যাহা উপলক্ষ করিয়া বেশ একটা ঝগড়া বাধাইয়া পৃথক হওয়া যায়।

মেজবউ কোনও দিনই নীচে আসে না,—আজ হঠাৎ সে যখন রন্ধন গৃহের সম্মুখের হলটাতে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলেই যেন কেমন থতমত খাইয়া গেল।

ছেলেরা তখন স্কুলে যাইবে,—তাড়াতাড়ি খাইতে বসিয়াছে। গরম-গরম ভাত, ডাল ও একখানা করিয়া মাছ-ভাজা সকলের পাতে দেওয়া হইয়াছে। প্রতিভা অমিয়কে খাওয়াইয়া দিতেছিল; কারণ, আজ সে বড় বায়না ধরিয়াছিল, ছোট মাসীর হাতে খাইবে। পিসীমা দরজার কাছে বসিয়া মালাজপ করিতেছিলেন ও প্রসন্ন নেত্রে ছেলেদের আহার দেখিতেছিলেন। সুষমা সকলের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। পূর্ণিমা দুধের বাটী ও চিনি লইয়া কাছে বসিয়া ছিল।

মেজবউকে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, পিসীমা হাঁ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। মালাজপ করা তখনকার মত তাঁহার স্থগিত হইয়া গেল।

সুলতা চকিত দৃষ্টি-নিক্ষেপে একবার সকলের ভাবটা দেখিয়া লইল। পিসীমার স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "ব্যাপারখানা কি? এত গোলমাল, এত

কথাবার্ত্তা আমি আসাতেই সব চুপ হয়ে গেল। এর মানে তো কিছুই বুঝতে পারলুম না আমি।”

প্রতিভা মাছের কাঁটা বাছিয়া অমিয়ের মুখে দিতে-দিতে একটু হাসিয়া বলিল, “গোলমাল হচ্ছিল বটে মেজদি,—কিন্তু কথাবার্ত্তা কোন রকমের তো—”

ধমক দিয়া সুলতা বলিলেন, “তুই চুপ কর ছুঁড়ি! তোকে কে কথা বলবার জন্যে ডাকতে আসছে বল দেখি? সব তাইতেই উপর-পড়া হয়ে তোর কথা বলা চাই-ই। যা আমি দেখতে পারিনে, তাই করবে এরা। যাতে-তাতে আমায় জ্বালাতন করা, রাগিয়ে তোলাই এদের উদ্দেশ্য, তা আর আমি বুঝি নে?”

তাড়া খাইয়া প্রতিভা চুপ করিয়া গেল। তাহার আরক্তিম মুখখানার পানে চাহিয়া সুষমা মিষ্ট স্বরে বলিলেন, “আহা, ওকে কেন ভাই মেজবউ? ও তো ঠিক কথা বলছিল। অমন কর্কশ কথা ওকে বোলো না,—বড় কষ্ট পায়।”

জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল; দীপ্তভাবে সুলতা বলিল “জানি গো, জানি; ওকে কোনও কথা বললে তোমার গায়ে অত বাজে কেন? কষ্ট পাওয়া আবার কি? কে বলছে ওকে কথা বলতে? সব তাতেই গায়ে জ্বালা ধরে কি না, তাই অমনি কথা বলতে আসে। তুই বিধবা মানুষ, তফাৎ থাক্। তাতে যে বয়েস তোর,—সব তাতে মাথা ঘামাতে আসা কেন? মরণ আর কি! দেখে-দেখে গা আমার জ্বলে যায়। আচ্ছা দিদি, তোমারই বা কি আক্কেল! হলই বা তোমার বোন, তা বলে ভয় করে তো কথা বলব না। বিধবার আচার-ব্যবহার তো সবাই দেখছে; সবাই যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তুমি সেটা দিব্যি সয়ে যেতে পার,—আমরা তো তা পারিনে,—বিশেষ যখন আমাদেরই বাড়ীতে আমাদেরই একজন হয়ে আছে।”

সুষমা ধীর স্বরে বলিলেন “কে কি বলেছে ভাই?”

সুলতা বলিল, “বলবে কি তোমার কাণের কাছে এসে? ওই যে বুড়া পিসীমা বসে আছেন,—কোন্ আক্কেলে সব জেনে-শুনেও ওই বিধবা ছুঁড়িকে একাদশীর দিনে জল খেতে দেন? পরনে শাড়ি, গা-ভরা গহনা, মুখভরা পান, এ সবেরই বা দরকারটা কি? বিধবা যে, সে বিধবার মতই থাকবে। সধবার মতই চলবে যদি, তবে দিয়ে দাও না আর একটা বিয়ে। ঘরে রেখে এ রকম ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়ার চেয়ে আবার বিয়ে দেওয়া লাখোগুণে ভাল। এই যে বিধবাতে মাছ বেছে খাওয়াচ্ছে, এটা কি রকম দেখাচ্ছে বল দেখি। ওই তো পিসীমাই রয়েছেন—বলুন না উনিই—”

প্রতিভা নতমুখে বসিয়া ছিল, আস্তে-আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। যখন সে চলিয়া গেল, তখন তাহার রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখখানার উপরে সুষমার দৃষ্টি নিপতিত হইল। কোন মতে তিনি দীর্ঘশ্বাসটাকে প্রশমিত করিয়া রাখিতে পারিলেন না।

পিসীমার চোখে সেটা এড়াইল না। প্রতিভাকে বড়বউ যে কতখানি ভালবাসিতেন, তাহা তিনি জানিতেন। রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন “মেজ বউ মা!—”

কথাটায় তীব্রতা খুবই বেশী ছিল, সন্দেহ নাই। সুলতা ফিরিয়া সুষমার পানে তাকাইল, “বড্ড লেগেছে না কি দিদি? আমি জানি, সত্যি কথা বললে কোনও দোষ হয় না।”

সুষমা মলিন মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া বলিলেন, “হাঁ, সে কথা সত্যি। তবে সময়-বিশেষে বললেই ভাল হতো ভাই মেজবউ। যে বাস্তবিক অভাগিনী, তার সামনে অভাগিনী বললে বড্ড গায়ে বাজে তার। তোমার যা বলবার আছে, আড়ালে আমায় বললেই, আমি তার প্রতিবিধান করতে পারতুম।”

সগর্ব্বে সুলতা বলিল, “উঃ, কেন অত ভয়ে বলতে যাব আমি? আমি কারও খাই, না পরি, যে, অতটা ভয় করতে যাব?”

কথাটা আজ এই প্রথম সুলতার মুখে বাহির হইল। সুষমা নীরব হইয়া গেলেন। পিসীমা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। মেজবউয়ের স্পর্দ্ধাজনক অনেক কথা তিনি অনেক দিন সহ্য করিয়াছেন,—আজ এ কথা তিনি কোন মতে সহ্য করিতে পারিলেন না। যোগেন্দ্রের কথাটা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। নৃপেন যে স্ত্রীর কথা শুনিয়া ভ্রাতার সহিত পৃথক হইতে চায়, এ কথাটা মনে হইতেই মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার মালাজপ আর হইল না। মালা বামহস্তে রাখিয়া, দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া, কাংস্য কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “কি বললে গা মেজ বউ-মা,—তুমি

কারও খাও না, পর না, এই কথাটা বলতে এসেছ? বলি, এ জ্ঞান কতদিন হ'তে হয়েছে, নৃপকেই বা কয়দিন হতে শেখাচ্ছো? কলকাতার মেয়েগুলোই কি এমনি পাজি? আমি বেশ জানি, জা দেওর নিয়ে ওরা কখনই ঘর করতে পারে না,—সোণার সংসার ওরা ছারখার করে দেয়। শ্বশুরবাড়ী পা দিয়েই আগে নিজের জিনিস ঠিক করে নেয়। যোগেনকে তখনই পষ্ট-পষ্ট করে বলেছিলুম, কোনও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে নিয়ে আয়, কোনও ঝঞ্ঝাট থাকবে না। তারা শিক্ষিতার গর্ব্ব রাখে না, বুকের পাটাও এতদূর হয় না। আমার কথা না শোনার ফলই এই। আ ছি, ছি, ছি! কোথায় যাব আমি। যত দেখছি, তত আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। যোগেন কোথা, ডাক্ দেখি তাকে,—শুনে যাক্ তার বড় আদরের মেজ বউ-মার কথাগুলো একবার! বড় সাধ করে যে কলকাতার শিক্ষিতা মেয়ে আনতে গেছল, দেখে যাক্—কেমন সাধ মিটেছে তার।"

সুলতা বিবাদ-বিসম্বাদে তত পারদর্শিনী ছিল না। পিসীমার মুখের দৌড় শুনিয়া সে চমকাইয়া গিয়াছিল। মনে অনেকগুলা কঠোর কথা আসিয়াছিল; কিন্তু সেগুলা মুখে প্রকাশ করিতে সে অসমর্থা। রাগে সে কেবল থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। মুখখানা তাহার এত লাল হইয়া উঠিয়াছিল যে, হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়।

পূর্ণিমা ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া, দুধ ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল—"চল দিদি, তোমার ঘরে চল। এখনি ফিট হ'য়ে পড়বে'খন।"

সুষমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ফিট তো হয়েইছে ভাই সেজবউ। 'হতে পারে' কথাটা খাটল না তোমার।"

বাস্তবিকই সুলতা তখন পূর্ণিমার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সুষমা—পার্শ্বে যে পাখাখানা কেবল মাত্র উনানে বাতাস দিবার জন্যই পড়িয়া ছিল, সেইখানা কুড়াইয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। পূর্ণিমা জলের ঘটিটা টানিয়া লইয়া, জল লইয়া সুলতার মুখে-চোখে দিতে লাগিল। পিসীমার মালাজপ অনেক আগেই স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি এখন নাসা কুঞ্চিত করিয়া, মুখে স্পষ্ট ঘৃণার ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া, সানুনাসিক সুরে বলিলেন, "সব নেকামো। ভদ্দরলোকের ঘরে এ রকম ফিট হয়, তা কখনো জানি'নে বাপু। খিষ্টেনদের কাছে থেকে, খিষ্টেন রোগটাকে আচ্ছা করে আয়ত্তে এনেছে যা'হোক। ঢের-ঢের মেয়ে দেখেছি,—এমন মেয়ে কক্ষনো দেখি নি।"

কথাটা সমাপ্ত করিয়া, আর একবার ঘৃণার দৃষ্টিতে মেজবউয়ের পানে চাহিয়া, তিনি বাহির হইয়া গেলেন। গৃহমধ্যে তখন রীতিমত গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছে।

নৃপেন তখন দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিতেছিল। সম্মুখেই বর্দ্ধিতরোষা পিসীমাকে বিড়-বিড় করিয়া বকিতে দেখিয়া ও রন্ধনগৃহে কোলাহল শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে পিসীমা?"

পিসীমা চকিতে কুঞ্চিত মুখখানা সরল করিয়া বলিলেন, "আর কি হবে বাছা? মেজ বউ-মা রান্নাঘরে গিয়ে অনর্থক একটা গোল বাধিয়ে—"

ব্যস্ত হইয়া নৃপেন বলিল "থামলে কেন? তার পরে কি হল, তাড়াতাড়ি করে বলে ফেল না কেন বাপু?"

তাহার কণ্ঠস্বরটা বিলক্ষণ তীব্র ছিল। তাই পিসীমা ভাল করিয়া তাহার মুখপানে চাহিলেন। অবহেলার সুরে বলিলেন, "কি আবার হবে? যা হয় তাঁর—তাই হয়েছে। ঝগড়া করলেন, লোককে যা না বলবার তাই বল্লেন, আবার উল্টে ফিট করে একাকার কাণ্ড বাধিয়ে বসেছেন। বাপ রে—এমন বউও তুই পেয়েছিস বাবা, নিজেরও হাড়মাস কালী, আমাদেরও—"

নৃপেন কঠোর ভাবে বলিয়া উঠিল, "তা তোমরা সবাই মিলে একটা লোকের পেছনে লেগে থাকলেই বা চলে কি করে? আমার শুনতে তো কিছুই বাকি নেই। ও একটু মুখরা বটে, তা সত্যি কথাই বলে,—মিথ্যে কথা বলে কারও কাণ ভারী করতে যায় না। তোমাদের গায়ে সত্যিটা বাজে বড্ড শক্ত হয়ে,—কাজেই তোমরা সবাই মিলে এখন ওকে দূর করবার চেষ্টায় আছ। নাঃ, সত্যি কথাই সে,—এমন অত্যাচার করলে কাঁহাতক মানুষ বাস করতে পারে? মানুষ তো,—গণ্ডারের চামড়া দিয়ে ভগবান কিছু অন্তরটা তার মুড়ে দেন নি।"

কথাটা বলিয়াই সে রন্ধন-গৃহের দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইল। পিছনে পিসীমার নেত্র দুটি যে কেবল অগ্নিই উদ্গীরণ করিতে লাগিল, তাহা সে চাহিয়াও দেখিল না।

তখন সুলতার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। সুষমা তখনও তাহাকে বাতাস দিতেছিলেন,—পূর্ণিমা মুখ, মাথা মুছাইয়া দিতেছিল।

নৃপেন কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "ব্যাপারখানা কি? আচ্ছা মেজবউ, আমি না তোমায় হাজারবার বারণ করেছি, যখন ফিটের ব্যারাম আছে, তখন যেয়ো না রান্নাঘরে ধোঁয়ার মধ্যে। কথা আমার মোটেই কেয়ার করতে চাও না তুমি? ইঃ, এই ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে আর ফিট হবে না। এসো আমার হাত ধরে।"

সুষমা বলিলেন, "আমি নিয়ে যাচ্ছি ঠাকুরপো।"

নৃপেন গম্ভীরভাবে বলিল, "আর গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে আসতে হবে না। এসো বলছি মেজবউ।"

সুলতা স্বামীর হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। পূর্ণিমা মুখখানা অত্যন্ত অন্ধকার করিয়া নিজের স্থানে গিয়া বসিল। হাতা দিয়া বাটীর দুধ নাড়িতে-নাড়িতে গম্ভীর মুখে বলিল, "যাই বল বড়দি ভাই, মেজঠাকুরের যদি একটু বুদ্ধি থাকে। তোমরা যে এত করলে,—তা একটু তাঁর নজরে পড়ল না।"

সুষমা একটীও কথা বলিলেন না; কিন্তু মুখেই তাঁহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন বেদনা ফুটিয়া উঠিতেছিল। কর্ত্তব্য-বোধে ছেলেদের না খাওয়াইয়া তিনি চলিয়া যাইতে পারিলেন না।

(৯)

যোগেন্দ্র বাহিরের গৃহে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। সংসারের অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল দেখিয়া, তিনি কোন মতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। একবার ভাবিতেছিলেন, সংসার হইতে চিরকালের জন্য সরিয়া যান;—যে সংসারে এত কলহ-বিবাদ, সেখানে থাকিতে নাই। আবার ভাবিতেছিলেন, তিনি থাকিতেই এত বিবাদ,—চলিয়া গেলে আরও কত কি হইবে, তাহার ঠিক কি? তিনি কিছুতেই ইহার মীমাংসা করিতে পারিতেছিলেন না।

সকালের মধুর রৌদ্র সামনের মেঝেয় পড়িয়া ঝলমল করিতেছিল। মাঝে মাঝে শীতের শীতল বাতাস ঝরঝর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছিল। কাল রাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল;—মাঠ, ঘাট, পথ সব এখনও আর্দ্র—স্থানে-স্থানে জল জমিয়া আছে। নীলাকাশের গায়ে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘগুলি বায়ুভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছিল।

নৃপেন্দ্র ধীরে-ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। যোগেন্দ্র তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন, সে কিছু বলিতে আসিয়াছে। সে যাহা বলিবে, তাহা তিনি আগেই বুঝিলেন। শুধু বলিলেন, "এসো।"

নৃপেন্দ্র একবার ভ্রাতার মুখের পানে তাকাইল। বহুকাল পরে সে আজ ভাইয়ের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। যখন সে সরল ছিল,—মনে যতদিন কোনও কু-অভিসন্ধি ছিল না,—সে ততদিন অসঙ্কোচে যোগেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়াছে। তাহার পর যখন তাহার মনে অন্য ভাব জাগিয়া উঠিল, স্ত্রীর কথা বিশেষভাবেই কাণে লইল, এবং স্ত্রীর নামে আলাদা করিয়া কারবার ফাঁদিয়া বসিল, তখন হইতে সে আর যোগেন্দ্রের সম্মুখে আসিতে পারিত না। এতদিন সে আড়ালে থাকিয়া বেশ কাটাইয়া দিয়াছে,—আজ সুলতার ধাক্কায় সে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে যে অপরিমিত স্নেহের মধ্যে বাস করিয়াও ব্যাঘ্রের তুল্য হিংস্র-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যোগেন্দ্র আজও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

নৃপেন্দ্র তক্তপোষের এক ধারে বসিল। যোগেন্দ্র তাহার মুখপানে চাহিয়া আছেন দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি মুখখানা নত করিয়া ফেলিল। যে-যে কথা সে বলিবে বলিয়া মনে গাঁথিয়া আনিয়াছিল, তাহা যে সে প্রকাশ করিতে পারিবে, সে ভরসা খুব কমই রহিল।

সে যে কথা বলিবে বলিয়া আসিয়াছে, তাহা যোগেন্দ্র আগেই পিসীমার মুখে শুনিয়াছেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আসিতেছিল,—অতি সন্তর্পণে তাহা তিনি চাপিয়া ফেলিলেন।

দুই ভাইয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ নানা বিষয়ের আলোচনা চলিল। কতবার বলি-বলি করিয়াও নৃপেন্দ্র নিজের কথাটা জ্যেষ্ঠের কাছে বলিতে পারিল না। কে যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। সুলতার রক্তবর্ণ মুখখানা মনে পড়িয়া গেল;—সে বেচারী যে কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

যোগেন্দ্র নিজেই তাহাকে সে অবকাশ দিলেন। ভাইয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেন কি বলতে এসেছ আমায়। কথাটা যে কি, তাও আমি জানি। এই পারিবারিক বিবাদের কথা বলতে এসেছ তো?"

নৃপেন্দ্রের মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি জুতার শিথিল ফিতা আঁটিয়া দিতে-দিতে অস্পষ্ট স্বরে কি বলিল, ভাল বুঝা গেল না।

যোগেন্দ্র সে দিকে মনোযোগ না দিয়া, নিজের মনেই খানিক আলবোলার নলটা টানিয়া, গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আমি যে কি করব, তা ভেবে ঠিক করতে পারছি নে কিছু। আমার মনে হচ্ছে, লক্ষ্মী এবার এ বাড়ী ছেড়ে যাবেন। নচেৎ প্রতিদিনই এ রকম ছোটলোকের মত ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে কেন আমাদের বাড়ীতে? বউমাদের গলার স্বরও দিন-দিন এত বেড়ে উঠেছে যে, আমার কাণে পর্য্যন্ত এসে বাজে। লোকের কাছে মুখ দেখাতেও যেন লজ্জা বোধ হয় আমার।"

নৃপেন্দ্র সেইভাবেই ফিতা বাঁধিতে-বাঁধিতে একটুখানি মুখ তুলিয়া বলিল, "সে তো সত্যি কথাই বটে। কিন্তু হয় যে কেন, সেইটেই না ভেবে দেখা দরকার।"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "সে কথা ঠিক। কিন্তু দেখে-শুনেও তো লাভ হয় না কিছু। কাকে সামলাতে যাই বল। নদীর যে ধারটা ভাঙছে, তার একটা জায়গা ধরে বসে থাকলেও, সে ধার ভেঙ্গে পড়বেই। অনর্থক কেবল পণ্ডশ্রম বই তো নয়। কাকে কি বলব,—কাকে বুঝাব। একজনকে যদি বুঝিয়ে কথা বলতে যাই, সে অমনি ফোঁস করে উঠে দোষ দেবে অন্যের! এতে আমিই বা কি করব বল? আর মেয়েছেলেদের ওসব ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে আমার যাওয়াটাই বা কেমন দেখায়? কি বলতে কি বলে ফেলব,—তাতে তারাও রেগে উঠবে,—পাড়ার লোকেও নিন্দে করবে। এই সব ভেবেই ভার দিলুম পিসীমার উপরে। তা তিনিও দেখছি হার মেনে গেছেন।"

নৃপেন একটু ঝাঁজের সুরে বলিল, "তিনিও তো দলে মিশে গ্যাছেন দেখছি। মেয়েদের স্বভাবই ওই,—হাজার বুদ্ধিমতী হোক,—বুড়ো হোক, ঝগড়া পেলে কিছুতেই নিজেদের সামলে রাখতে পারে না। আপনি যখন এসব কথাই তুললেন দাদা, তখন আমার যা কথা আছে, তা সব বলে ফেলি।"

হৃদয়ের মধ্যে কি এক অনিশ্চিত আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল; বিবর্ণমুখে যোগেন্দ্র বলিলেন, "তোমার কি কথা?"

নৃপেন বেশ সহজ সুরেই বলিল, "আমার কথা বেশী কিছু নয়। আপনি যা বলছেন, সেটা যে ঠিকই, তা আমিও স্বীকার করছি। এটাও তেমনি ঠিক—সব কথা কিছু আপনি এসে আপনার গায়ে বাজে না; একজন অবশ্য এসে বলে দেয়। এটাতে কিছু পার্সালিটী আছে, অর্থাৎ কি না—"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "তোমার ইংরাজি বুকনিগুলো ছেড়ে দাও নৃপেন। অবশ্য তুমি এটা জানো, আমি ইংরাজি জানি নে।"

একটু লজ্জিতভাবে নৃপেন সে কথা মানিয়া লইল। বলিল "পার্সালিটী মানে পক্ষপাতিত্ব। আমি দেখাচ্ছি, কেন আমি এ কথা বলছি। আপনি যদি দুই পক্ষেরই কথা শুনতেন—"

বাধা দিয়া উষ্ণ ভাবে যোগেন্দ্র বলিলেন, "তুমি বলতে চাও যে, আধুনিক শিক্ষিতা ভাদ্রবধূরা এসে ভাসুরের সামনে নিজেদের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করবে?"

মুখখানা লাল করিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "আমি শুধু ভাদ্রবধূদের কথা বলি নি।"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "তাই তো বলছ তুমি। বাড়ীতে বিবাদ যা কিছু হচ্ছে, সে তো বউদের নিয়েই হচ্ছে। পাড়ার লোকে কেউ তো বাড়ী এসে ঝগড়া করে না।"

নৃপেন্দ্র উষ্ণভাবে বলিল,—"আপনি সব না শুনেই আগে হতে চটে উঠছেন কেন? ধরলুম, বউদের মধ্যেই ঝগড়াটা হয়,—পর কেউ আসে না। কিন্তু এটাও তো দেখতে হবে কেন সে ঝগড়া হয়? বাড়ীশুদ্ধ সবাই যদি একটা লোকের পেছনে লাগে, সে কি স্থির হয়ে থাকতে পারে? আপনি যে নিরীহ ভাল মানুষ,—আমরা সবাই যদি আপনার পেছনে লাগি, আপনি কতক্ষণ এমন নিরীহ ভাবে থাকতে পারেন,—আমাদের সব অত্যাচার সইতে পারেন, বলুন দেখি? বাধ্য হয়ে আপনাকে মাথা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতেই হবে। এমনি তো সবারই। গর্ত্তের সাপের গায়ে খোঁচা মারলেই সে ফোঁস করে কামড়াতে আসে। তার জ্বালায় লোকে তখন পাগল হয়ে যায়। বাড়ীর সবাই মিলে সেই একটা লোককে যে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ফণা ধরতে শিখিয়েছেন,—এখন সে কামড়াবে না কেন? তাতে আপনিই বা কি করবেন,—আমিই বা কি করব?"

এক নিঃশ্বাসে নৃপেন এই কথাগুলা বলিয়া ফেলিয়া হাঁপাইয়া উঠিল। ইহার প্রধান কারণ, সে কখনও দাদার সম্মুখে মুখ তুলিয়া কথা কহে নাই। আজ সেই দাদার সামনে

নিজের স্ত্রীর নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যদিও বুকটা কাঁপিতেছিল, কিন্তু সম্মুখের লোহার আবরণটা কতক খসাইতে পারিয়া সে যেন একটু শান্তি পাইল। আজ কয়দিন ধরিয়া চারিদিকে ঘুরিয়াও সে কথা কহিতে পারে নাই।

যোগেন্দ্র বলিলেন "একজন কে? মেজ বউ-মা কি?"

নৃপেন মৃদুকণ্ঠে বলিল "হাঁ।"

যোগেন্দ্র খানিক স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। ব্যাপারটা যে কতখানি গড়াইয়াছে, তাহা তিনি তাহার কথাতেই বেশ বুঝিতে পারিলেন। যে নৃপেন তাঁহার সম্মুখে কখনও মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে নাই, সে আজ নিজের স্ত্রীর নির্দোষিতা তাঁহাকে জানাইতে আসিয়াছে। কতদূর স্ত্রৈণ সে,—কতদূর অধঃপতন হইয়াছে তাহার!

যোগেন্দ্র ধীরে-ধীরে বলিলেন, "বুঝেছি সব। যাই হোক, তাঁরই শুধু কথা নয়,—সকল বউয়ের সব কথাই আমার কাণে আসে। আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলব না,—বলবার ইচ্ছেও নেই আমার। কারণ, আমি তাঁদের ভাসুর। আমি তোমাকে বলছি, রমেনকেও বলব, তোমরাই বউমাদের ঠাণ্ডা কর। যদি দরকার বোধ কর, আমায় বললে আমিও তাঁদের কাছে বলব। আমাকে যেন ঝগড়া-বিবাদের কোনও কথা শুনতে না হয়, এইটুকুই চাই।"

নৃপেন্দ্র হাতের কাছে যে কাগজখানা পড়িয়াছিল সেইখানা নাড়িতে-নাড়িতে গম্ভীর মুখে বলিল "আমিও তাই বলছি। আমি দেখছি এ গোলমাল থামানো আমার সাধ্যাতীত। বউদের কিছুদিন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যাক। ততদিনে আমাদের এ-দিককার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। তখন আনলেই চলবে, কি বলেন?"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া যোগেন্দ্র বলিলেন, "ব্যবস্থা কথাটার মানে?"

নৃপেন একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, তিনি ব্যাকুল নেত্রে তাঁহারই পানে চাহিয়া আছেন। তাড়াতাড়ি সে চোখ নামাইয়া বলিল, "দেখুন দাদা, রাগ করবেন না। আমি দেখছি, যখন এ বাড়ীতে ঝগড়া ঢুকেছে একবার,—এ আর কিছুতেই যাবে না। দিন-দিন এ ঝগড়া বাড়বে বই কমবে না। এতে নিজেদের মনও খারাপ হয়ে যায়,—পাড়ার লোকেও যাচ্ছে-তাই নিন্দে করে। এই সব দেখে-শুনে আমার বড্ড ঘৃণা হয়ে গেছে। আমি লোকের নিন্দে আর এই সব ঝগড়ার হাত হতে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই আলাদা হতে চাই। আর সত্যই দেখুন, ওর জন্যেই যত ঝগড়া-বিবাদ! অবশ্য দোষ গুণ আমি কারও দিচ্ছি নে। কিন্তু অশান্তিটে ভোগ করতে হচ্ছে তো সকলকেই সমান ভাবে। আপনি যে আমার হাতে একেবারে সংসার ছেড়ে দিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে বাস করছেন,—তবু আপনি আবার এত ভাবছেন কেন? এতেই বুঝুন, আপনাকে এই পারিবারিক ঝগড়া কতখানি কাবু করে ফেলেছে। এর চেয়ে কতখানি বেশী কাবু করতে পেরেছে আমাদের। আমি সেই সব ভেবে আর লোক-নিন্দে হতে পরিত্রাণ পাবার জন্যে—"

বাধা দিয়া অধীর ভাবে যোগেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "পৃথক হতে চাও তো? এই স্পষ্ট কথা—কেমন?"

সঙ্কুচিত হইয়া মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে নৃপেন্দ্র বলিল, "সত্যিই তাই। কেন না, সংসারে এত অশান্তি ভোগ করার চেয়ে, একেবারে এ বিষবৃক্ষের গোড়া ছেঁটে ফেলা ভাল। রমেনকে বললে, সেও এই কথা বলবে। আর আপনি ভেবে দেখুন বড়দা, আজ যেন বউয়ে-বউয়ে ঝগড়া চলছে,—পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে স্বামীর কাছে লাগিয়ে মন ভার করে দিচ্ছে। আপনিই সত্যি কথা বলুন বড়দা, রোজ যদি কাণের কাছে কেউ ঘ্যান ঘ্যান করে, মানুষে কত আর না শুনে পারে। আর এমনি করতে-করতে তারা যে ভাইয়ের বিপক্ষে ভাইয়ের কাছে লাগাবে না, এমন কি কথা হতে পারে? এই জন্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলতেন, বাপ-মা মরে যাওয়া মাত্র ছেলেদের পৃথক হওয়া ভাল। সে কথা সত্যি। কেন না, এতে তাদের প্রণয়টা আগের মতই থেকে যায়,—কারও কথা শুনে কাণ ভারি করতে হয় না। আমারও মত এক রকম তাই। কেন না, দেখুন—"

ঘৃণার সুরে যোগেন্দ্র বলিলেন, "ঢের দেখেছি বাবু। আমায় আর তোমার দেখাতে আসতে হবে না। দৃষ্টান্ত-গুলো অনুকরণ কর, তা হলেই ভাল। আসল কথা তোমার এই যে, তুমি পৃথক হতে চাও। বেশ, ভাল কথাই। এই আসছে রবিবারে সকলকে ডাকিয়ে এনে ঠিক করে ফেলা যাবে,—তার জন্যে অনর্থক মাথা ঘামানোর কোনও দরকার দেখি নে। রমেনেরও কি এই মত?"

নৃপেন থতমত খাইয়া, একটু থামিয়া বলিল, "সেও তো

এই কথাই বলে। তাকে না হয় একবার জিজ্ঞাসা করে—"

বাধা দিয়া যোগেন্দ্র বলিলেন "কিছু দরকার নেই তার। তাকে জিজ্ঞাসা করে কি ফল হবে। তার কথা সব তোমার মুখেই তো শুনলুম,—ব্যস, সব ফুরিয়ে গেল। এ কথাটা এতদিন স্পষ্ট বললেই ভাল ছিল। আমি বেশ জানছি, বেশ বুঝতে পারছি,—এই কথাটা বলবার জন্যই তুমি আজ কয়দিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছ। এই সাদাসিদে সত্য কথাটা বলতে কিসের যে এত সঙ্কোচ, তা আমি বুঝতে পারি নে। যার যা বলবার দরকার, স্পষ্ট বলে যাবে তা। আমি যে তোমাদের মাননীয়, আমি যে তোমাদের হাতে করে মানুষ করেছি,—ভুলে যাও সে সব কথা। কারণ, তোমরা আজ-কালকার ছেলে,—তোমরা সঙ্কুচিত হবে কেন? এ শতাব্দীতে কেউ মাথা নোয়াতে জন্মায় নি, মাথা তুলতে জন্মেছে। আমাকে সম্মান দেখাবার কারণ কিছুই দেখছি নে। আমি কি, আমায় কি বলে ধারণা কর,—যাতে তোমাদের উঁচু মাথা নত করতে হবে আমার কাছে? সামান্য একটা সাধারণ মানুষ বই আর কিছুই নই আমি। থাক গে সে সব কথা। আর মাঝে তিনটে দিন আছে বই তো নয়। এ তিনটে দিনের জন্যে বউমাদের বাপের বাড়ী পাঠাবার কোনও দরকার দেখছিনে। আর এ তিনটে দিন ঝগড়া-বিবাদ করতেও নিষেধ করে দিয়ো; কেন না—"

এতক্ষণ নৃপেন চুপ করিয়া যোগেন্দ্রের কথা শুনিতে-ছিল, হৃদয়ে লজ্জা অনুভব করিতেছিল। এই শেষের কথাটা শুনিবামাত্র সে দীপ্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আপনি বুঝি শুনেছেন, আমি তাকে ঝগড়া করতে শিখিয়ে দিই?"

ধীরে যোগেন্দ্র বলিলেন, "না,—এত বড় জ্বলন্ত সত্য কথাটা কেউ আমার কাছে বলতে সাহস করে নি। আমাকে সবাই জানে,—এও জানে, ভাইয়েরা আমার কি। জগতে কে এমন আছে, যে সাহস করে সেই ভাইদের বিরুদ্ধে কোনও কথা আমার কাছে বলতে সাহস করবে? যাক্, আজই রমেনকে একখানা পত্র লিখে দাও আসতে। রবিবারে তার উপস্থিত থাকা চাই-ই। এর পরে যে সে বলবে তার অংশ কম হল, সেটা আমি কোনও রকমে পছন্দ করি নে। যার যা, সে তা নিজে ঠিক করে নিক,—ব্যস, আমি খালাস হয়ে যাই সব দায় হতে।"

তিনি একটা আড়ামোড়া দিয়া গড়্গড়ার নলটা তুলিয়া লইয়া আবার দুই টান দিলেন। তাহার পর নৃপেনের পানে চাহিয়া বলিলেন "এখনও বসে আছ যে,—আরও কোনও কথা আছে না কি?"

নৃপেন মাথা নাড়িয়া বলিল "না।"

তাড়াতাড়ি সে গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যোগেন্দ্র একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

"কি হচ্ছে যে যোগেন, দু'পাড় খেলা জমবে কি?" বলিতে-বলিতে দাবাখেলার প্রধান সঙ্গী রসিক চক্রবর্ত্তী একটা খেলো হুঁকা (তাহাতে গুটি দুই কড়ি বাঁধা, উদর একটা নারিকেলের মত, সর্ব্ব সুদ্ধ লম্বে সেটি দেড় বিঘত হইবে) হস্তে দেখা দিলেন।

অকস্মাৎ এই বন্ধুটির আগমনে যোগেন্দ্র জ্বলিয়া উঠিলেন; মুখখানা বিশেষ অপ্রসন্ন করিয়া বলিলেন, "আজ শরীর ভাল নেই,—খেলা-টেলা আসবে না।"

বৃদ্ধ রসিক চক্রবর্ত্তী নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন।

এই সংসার! হায়, কে বলে এখানে ভাই ভাইয়ের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত? নৃপেন অনায়াসে ভুলিয়া গেল,—কে তাহাদের মানুষ করিল, কে তাহাদের উন্নত করিবার জন্য নিজে কুলীর কাজ পর্য্যন্ত করিয়াছিল? কত বাদলের বৃষ্টিধারা মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে,—কত প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজে মাথা, দেহ ঝলসিয়া গেছে,—তাহা উহারা কি জানে? কত লোকের তাড়না, প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছে। তখন মান-অপমান জ্ঞান ছিল না; সৎপথে থাকিয়া ভাই তিনটীকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি কত না আয়াস সহ্য করিয়াছেন। ক্রমে, তাঁহার কষ্টে ভগবানের আসন টলিল,—তিনি নিজের আশা পূর্ণ করিতে পারিলেন। আজ তিনি লক্ষপতি,—আজ তাঁহার সৌধ গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান,—আজ তাঁহার কারবার বম্বে দিল্লি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সুপরিচিত। আজ তাঁহার ভাইয়েরাই একটু কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। তাহারা একবার ভাবিয়াও দেখে না, কি করিয়া অবস্থা উন্নত হইল। দাদা তাহাদের সুখী করিবার জন্য কি-না করিয়াছেন।

সে সব জানিত একজন, আর জানেন পিসীমা। কিন্তু তিনিও যাহা না জানেন, সে তাহাও সব জানিত। জগতে

সেই ছিল তাঁহার সুখ-দুঃখের প্রকৃত সহচারিণী। সে শুধু কষ্টের অংশ লইতে আসিয়াছিল, সুখের বার্ত্তা যে মুহূর্ত্তে আসিয়া চারিদিক উদ্বেলিত করিয়া তুলিল,—সে তখন মহা-নিদ্রায় অভিভূত হইল।

পূর্ব্ব পত্নীর কথা মনে হইতে, যোগেন্দ্রের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

আজ সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। একজন আছে,—সেও কি এ দুঃসময়ে তাঁহাকে ত্যাগ করিবে?

সুসমার অপরিসীম ভালবাসা-ভক্তির কথা মনে হইল। না, এই যে তাঁহার আশ্রয় আছে—এই জুড়াইবার জায়গা। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

আন্দামান

[শ্রীফণিভূষণ মজুমদার]

২

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আন্দামানবাসীদের চুল ছোট করিয়া ছাঁটা; এবং মধ্যভাগে প্রায় সকলেরই এক ইঞ্চি পরিমাণ প্রশস্ত করিয়া সিঁথির ন্যায় কাঁচি দিয়া কামান। সাঁতার কিম্বা ডুব দিয়া যখন উহারা উঠে, তখন উহাদের চুল ভেজে না; যেন water-proof। ডুব দিয়া ছোট-ছোট জিনিষ জল হইতে তোলাও উহাদের বাহাদুরী। গত শান্তি-উৎসবের সময় ওখানে যে সমস্ত খেলাধুলার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে উহাদের জন্যও কিছু কিছু ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পাঁচ টাকার দু'আনি লইয়া কার্বিঁড দ্বীপের জেটি হইতে প্রায় ১৫ ফিট গভীর জলে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহারা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ৪।৫টী দু'আনি ছাড়া সমস্তই লইয়া আসিয়া, তখনই চা, চিনি ইত্যাদি ক্রয় করিল। একবার একজন শিকারে যাইতে, তাহার বন্দুকটী নৌকা হইতে সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। সৌভাগ্য-ক্রমে তাহার সহিত জঙ্গলী থাকাতে, উহা সে তখনই উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল। তবে খুব বেশী গভীর জলে পড়িলে উহারা পারে না; এবং তাহাতে বিপদেরও সম্ভাবনা। কারণ, হাঙ্গর ওদিকে খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ধূপের মশাল প্রস্তুত করিয়া ইহারা রাত্রে জঙ্গলে ব্যবহার করে। ইহাদের সঙ্গে আজকাল প্রায়ই আগুন কিম্বা দিয়াশলাই থাকে; এবং যখন থাকে না, তখন ইহারা তুলার ন্যায় একপ্রকার গাছের ছাল লইয়া, বাঁশে-বাঁশে খুব জোরে ঘর্ষণ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া লয়। উহারা শূকরের হাড় সুন্দর করিয়া কাটিয়া লইয়া তামাক খাওয়ার পাইপ রূপে ব্যবহার করে।

ইহারা অনেকেই এখনও টাকা পয়সা ও ওজন ইত্যাদির বিষয় কিছুই জানে না। দু' একজন একটু জানে মাত্র, তাহাও সমস্তই ভুল জানে। এই কারণে সেখানকার দোকান-দারগণ ও অন্যান্য সকলে তাহাদের বেশ ঠকাইয়া লয়। ইহাদের নিকট হইতে কেহ যদি কোন জিনিষ লইয়া মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন হয় ত "আট আনা" অথবা "দশ টাকা" এইরূপ যাহা মনে আসিবে তাহাই বলিয়া দিবে; অথচ, দু' চারিটী পয়সা ভুল করিয়া গণিয়া উহার কথামত মূল্য বলিয়া দিলেই, সন্তুষ্ট হইয়া লইয়া তখনই দোকানে গিয়া অসম্ভব মত জিনিষ চাহিয়া বসিবে। তাহার নিকট কখনও হয় ত চার পয়সা, কখনও হয় ত আট আনা যাহা থাকে, সমস্তই দোকানদারকে দিয়া, উহাদের যাহা-যাহা দরকার সমস্তই খেয়াল মত ওজনের চাহিয়া বসিবে। দোকান-দারও কিছু-কিছু দিয়া, তাহাদের কথামত ওজন বলিয়া দিয়া, জিনিষ দিয়া থাকে। কখন-কখনও হয় ত কেহ জঙ্গলীদের নিকট হইতে জিনিষ লইয়া, তাহাদিগকে দু' এক সের করিয়া জিনিষ দিতে দোকানদারকে চিঠি দিয়া থাকে—সেখানেও দোকানদার কিছু-কিছু জিনিষ দিয়া বেশ লাভ করিয়া থাকে। জিনিষের পরিমাণ এই সমস্ত কারণে উহারা এখনও একেবারেই বুঝে না। অনেকবার অনেকে মণি-অর্ডারের স্বীকৃতি-পত্র উহাদিগকে আড়াই টাকার নোট

বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া, অনেক জিনিষ লইয়াছে; কিম্বা এক টুকরা কাগজে যা-তা লিখিয়া দিয়াও জিনিষ লইয়া থাকে। টাকা, আনি ইত্যাদি অপেক্ষা পয়সা পরিমাণে বেশী বলিয়া পয়সাই উহারা বেশী পছন্দ করে। গণিতে কিম্বা হিসাব রাখিতে উহারা আদৌ জানে না। পয়সা না দিয়া একটু-একটু করিয়া চা, চিনি ইত্যাদি দিলেই উহারা সন্তুষ্ট। তবে যাহারা আফিম্ ক্রয় করিতে চায়, তখন হয় আফিম্ নতুবা পয়সা চাহিয়া থাকে! উহারা অল্পেই সন্তুষ্ট; এবং প্রয়োজন হইলে পুনরায় চাহিবে, ইহাই বোঝে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উহাদের এক-এক দল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে। যদি একদলের বাসায় অন্য একদলের আগমন ও দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে প্রথমে মেয়েরা মেয়েদের ও পুরুষরা পুরুষদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা কাল চীৎকার করিয়া কাঁদিবে, এবং পরে সকলে নাচ গান ও খাওয়া-দাওয়া করিবে।

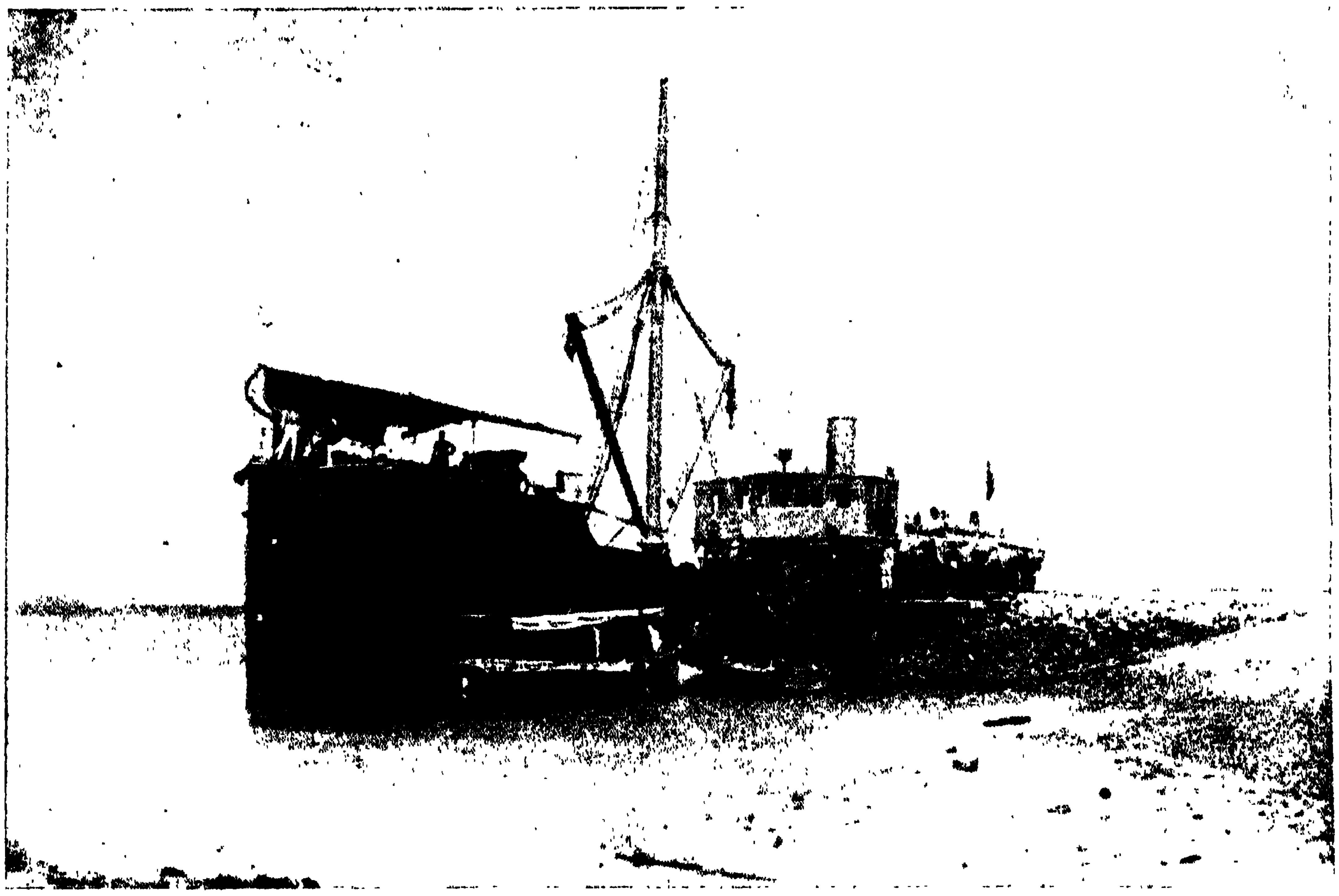

কার্বু জেটি (ভাটার সময়)

ইহাদের নাচ দেখিতে বড়ই আমোদজনক। মেয়েরা সকলে একসঙ্গে পা মেলিয়া বসিবে; পুরুষেরাও সেইখানে অথবা অন্য ধারে বসিয়া থাকে। প্রথমে একজন পুরুষ অথবা মেয়ে এক লাইন গাইবে। তখন যে নাচিবে, সেই পুরুষ অথবা মেয়ে উঠিয়া দুই হাতে দুই মুঠি গাছের পাতা লইয়া নাচিতে থাকে। সেই পুরুষটীর গাওয়া হইলে, মেয়েরা ও অন্যান্য পুরুষেরা গাইবে; সঙ্গে-সঙ্গে কোল ও হাত চাপড়াইয়া তাল দিতে থাকিবে; এবং যে নাচিতেছিল, সে তখন প্রায় ১০ হাত দৌড়াইয়া গিয়া পুনরায় নাচিতে থাকিবে। আবার এক পদ গাওয়া হইলে, সে পুনরায় সেই ১০ হাত দৌড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া নাচিবে। এইরূপ কিছুক্ষণ পরে, আর একজন পুরুষ অথবা মেয়ে উঠিয়া, দুইজনে বিপরীত দিকে থাকিয়া, ওইরূপ দশ হাতের মধ্যে নাচিতে থাকিবে। একজন এক দিকে যাইবে, অন্যজন অন্য দিকে যাইবে—এইরূপ। প্রায়ই একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে এইরূপই নাচিয়া থাকে। যাহারা নাচিবে, তাহারা গাইবে না। তবে মাঝে-মাঝে দু' একজন গাহিয়া থাকে। ওই দুইজনের নৃত্য শেষ হইলে, উহারা বসে ও অন্য দুইজন ওঠে। এইরূপে জোড়ায় জোড়ায় নৃত্য শেষ হইলে, উহারা খাওয়া-দাওয়া করে। কখন-কখনও একসঙ্গে ৫।৬ জনকেও নাচিতে দেখা যায়। দুই মুঠায় কিছু পাতা ধরিয়া, হাত দুখানি সামনে সমানভাবে বাড়াইয়া দিয়া, তালের সহিত পা উঠাইয়া মাটিতে ফেলিলেই নৃত্য হইল। নৃত্যের পা উঠান ও নামান দেখিলে ঠিক মনে হয়, যেন একজন লোক একই স্থানে পা ফেলিয়া দৌড়াইতেছে। নাচ সকলে সকল সময়ে করে না। যাহাদের মধ্যে কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহারা প্রায় দু' এক মাস (তাহাদের সময় মত) নৃত্য করে না। পরদিন অভ্যাগতদের বিদায়ের সময়ও পুনরায় কিছুক্ষণ ধরিয়া গলা জড়াইয়া কান্নাকাটি হয়। এ সময়ে মেয়েরাই বেশী কাঁদে—পুরুষরা প্রায়ই কাঁদে না। মাঝে-

মাঝে উহাদের এমন এক সময় আসে, যখন উহারা অনেকে এক স্থানে মিলিত হইয়া, সমস্ত গায়ে একপ্রকার লাল মাটী মাখিয়া, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত নাচ-গান ও খাওয়া-দাওয়া করিয়া থাকে। মেয়ে-পুরুষে রাজী হইলে—শিকার করা, নাচ-গান ও খাওয়া-দাওয়া হইলেই ইহাদের বিবাহ হইল। স্বামী মরিয়া গেলে, মেয়েরা ইচ্ছামত পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। এ বিষয়ে উহাদের বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম আছে কি না, ঠিক

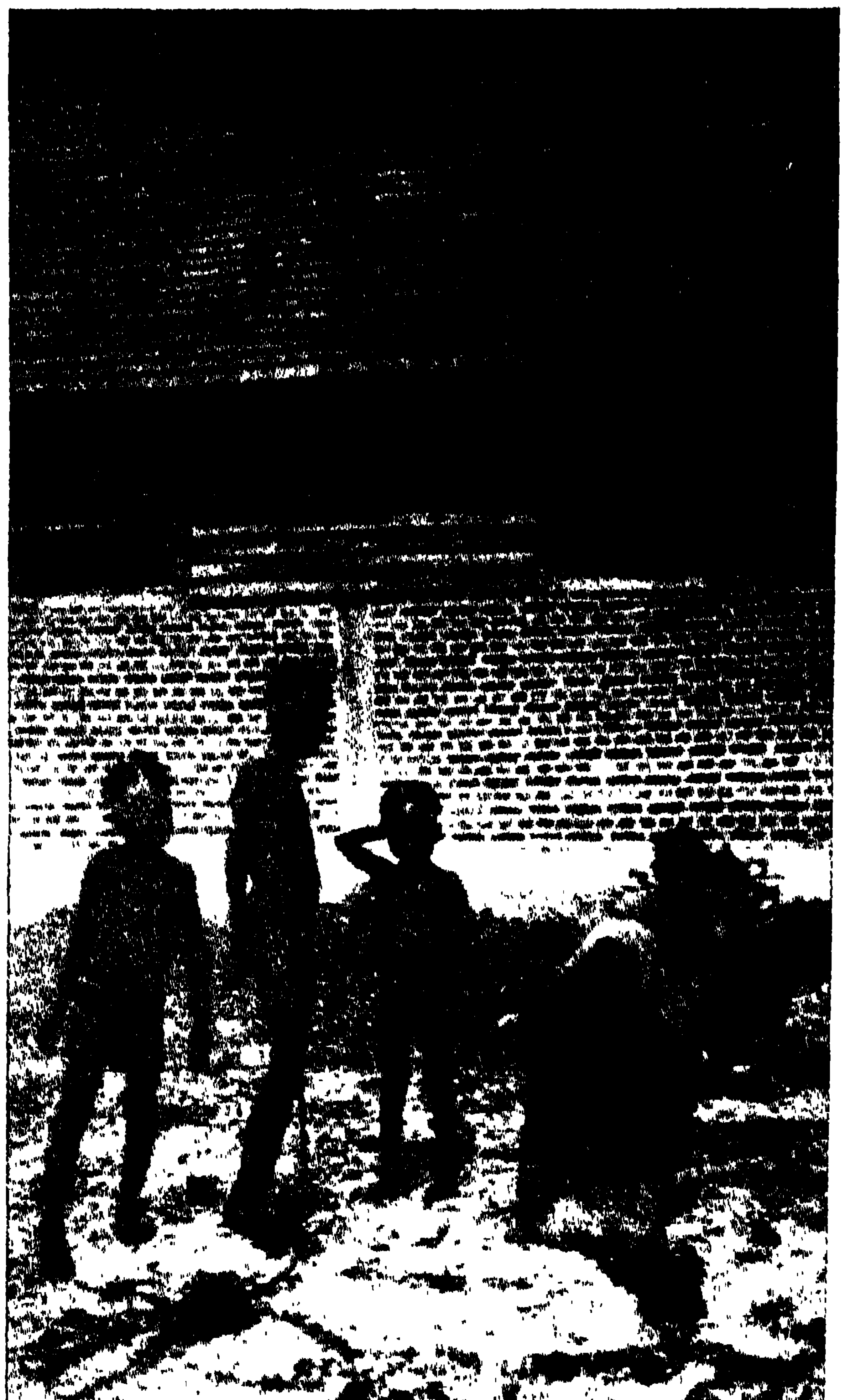

জঙ্গলী বালকগণের নৃত্য শিক্ষা

জানিতে পারি নাই। শুনিয়াছি বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে নাই। তবে স্ত্রী মরিয়া গেলে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

ইহাদের কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে, তখনই তাহাকে পাতায় মুড়িয়া নিকটস্থ জঙ্গলের একস্থানে কবর দিতে লইয়া যাওয়া হয়। অনেকেই ক্রন্দন করিতে-করিতে সঙ্গে যায় ও কবর দিয়া চলিয়া আসে। পরে উহাদের নিয়ম অনুযায়ী কয়েক মাস (প্রায় ৬ মাস) পরে উহারা সেই স্থানে গমন করে; এবং উহাদের "রাজা" মৃতের গুণকীর্ত্তন করিয়া গান করে। মৃতব্যক্তি কিরূপ লোক ছিল,—তাহার সাহস, তীর ছুঁড়িবার ক্ষমতা ইত্যাদি কিরূপ ছিল, তাহা গান করিয়া বর্ণনা করিবার পর, সকলে সেই কবর খুঁড়িয়া তাহার হাড় ও মাথাটী লইয়া উহা মৃতের নিকট-আত্মীয়ের গলায় পরাইয়া দেয়। সে তখন হইতে আজীবন, অথবা যতদিন উহা নষ্ট হইয়া বা ভাঙ্গিয়া না যায়, ততদিন গলায় ধারণ করিয়া রাখে। অন্যান্য হাড়গুলি কাটিয়া মালার মত করিয়া হাতে-পায়ে পরিয়া থাকে। শুনিয়াছি যে, এই মাথা ধারণ করিবার জন্য উহাদের কতকগুলি নিয়ম আছে; এবং কে ধারণ করিবে, তাহা রাজা ঠিক করিয়া দিয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে, মেয়েরাই বেশীর ভাগ উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। পুরুষদের মধ্যে প্রায়ই রাজার গলায় একটী দেখা যায়। উহা হয় তাহার মৃত পিতার, অথবা মাতার হইয়া থাকে। রাণীও মাঝে মাঝে রাজার গলা হইতে উহা লইয়া নিজের গলায় পরিয়া থাকে। এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি সঠিক খবর জোগাড় করিতে পারি নাই। কবর খুঁড়িয়া মৃতদেহের মস্তক, শুনিয়াছি, সকলের তোলা হয় না। লোক ও স্থান-বিশেষেই উহা তোলা হইয়া থাকে। দু'একজন জঙ্গলীকে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, মৃতদেহ কবরস্থ না করিতে পারিলে, একটু উঁচু গাছের ডালের উপর মাচানের মত করিয়া রাখিয়া দিয়া চলিয়া আসা হয়। আমার মনে হয়, কবরস্থ করার ব্যাপারই সত্য এবং সাধারণতঃ হইয়া থাকে; তাহা দেখিতেও পাওয়া যায়।

জঙ্গলীদের কোন সাময়িক নাচের পূর্ব্বে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে মাটী মাখার সে ছবিখানি দিলাম, উহা একটু ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, মধ্যে একজন মেয়ের (রাণীর) হাতে একটি মড়ার মাথা আছে। উহা সর্ব্বদাই তাহার স্বামীর গলায় থাকিত; কিন্তু সেদিন উহা রাণী রাখিয়াছে। বোধ হয় রাজা সেদিন শিকারে ব্যস্ত ছিল বলিয়াই উহা রাণীর নিকট রাখিতে দিয়াছিল। ছবিতে রাজাকেও দেখিতে পাইবেন। ছবি তুলিবার সময় সে সবেমাত্র শিকার হইতে তাহার সঙ্গীদের সহিত ফিরিয়াছে। মেয়েরাই সাধারণতঃ মাটী বেশী মাখে। পুরুষদের মধ্যে রাজা বেশী মাখিয়া থাকে।

জঙ্গলীদের মধ্যে ভূতের ভয় খুব বেশী আছে। যে সমস্ত

স্থানে মড়া পোতা হয়—সেস্থানে উহারা পারত-পক্ষে যায় না; কিম্বা তথায় বাসও করে না। আমাদের কার্লিড দ্বীপের নিকটে অর্কিড দ্বীপ নামক যে দ্বীপটীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে পূর্ব্বে জঙ্গলীগণ থাকিত। কিন্তু কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক রোগে অনেক লোকের মৃত্যু হওয়াতে, ওই দ্বীপটী সেগ্রিগেসন ক্যাম্প ও কবর-স্থান রূপে ব্যবহার করা হয়। জঙ্গলীগণ ফিরিয়া আসিয়া, যখনই ঐ স্থান কবর রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে জানিতে পারিয়াছিল, তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। একটি বড় কথা একটি ছোট কথাতেই উহারা শেষ করে। যখন উহারা কথা বলে, তখন উহার টান ও সুরগুলি শুনিতে বড়ই আমোদজনক। "ফুরাইয়া গিয়াছে—আর নাই", উহাদের ভাষায় "তাই পো-বি"। ডাকিবার সময় "কু-রো" (অর্থাৎ এদিকে আইস) বলে, শূকরকে "রুগো", নৌকা চালানকে "রো-অ", নিতম্বকে, "মিতাই", গুহ্যদ্বারকে "আঁরাচিল" ইত্যাদি বলিয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, যখন উহাদের ভাষা শিখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন উহাদের কাজ পড়াতে আমাদের ক্যাম্প হইতে সকলে চলিয়া যায়। পরে

জঙ্গলীদের নৃত্যের পূর্ব্বে মাটী মাখা

তাহার এখনও আর সেখানে বাস করে না। তাহাদের বিশ্বাস যে, ভূতে "সিটী" মারে এবং ভুলাইয়া ভুল পথে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলে। "আলেয়া"কেও উহারা খুব ভয় করে। জঙ্গলীদের মধ্যে এমনও প্রথা আছে যে, শুনা যায়, উহারা ভূত তাড়াইতে এবং ভূতের সাহায্যে চোর ধরিতে পারে। এ সম্বন্ধে উহাদের নিকট অনেক গল্প শুনা যায়; এবং যদি কাহারও তীর-ধনুক কখনও চুরি যায়, তবে উহারা না কি ঐরূপ ভাবেই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া থাকে।

উহাদের ভাষা বুঝা বড়ই কঠিন। কখন-কখনও এক-যদিও আসিয়াছিল, তখন শিখিবার সুবিধা পাই নাই; কারণ, যে হিন্দুস্থানী কথা খুব ভাল জানিত ও বুঝিত, এবং যে শিখাইতে বেশ পটু ছিল, সে আসে নাই। প্রায়ই জলের জানোয়ারের নামে উহাদের নাম রাখা হইয়া থাকে। পুরুষদের নাম, যথা, "লেপে" "চাকৃবে" "বোয়া" ইত্যাদি; এবং মেয়েদের নাম "ইল্‌ফ" "মারু" ইত্যাদি।

ইহাদের পোষাকের বিষয় লিখিবার বোধ হয় বিশেষ দরকার নাই। কারণ, পুরুষেরা একেবারে উলঙ্গ থাকিত। তবে আজকাল ছোট এক টুকরা নেঙট ব্যবহার করে।

মেয়েরা লজ্জা নিবারণার্থ, বা সৌন্দর্য্যের জন্যই হউক, একটি পাতা 'ব্যবহার করে মাত্র। ছবিতেই এই বিষয়ে ভাল বুঝিতে পারিবেন। মেয়েরা গলায়, পায়ে ও হাতে 'পাথরের ফুলের (Corals) একপ্রকার মালা, চুড়ি বা হারের মত করিয়া পরিয়া থাকে। অসুখ-বিসুখ হইলে ইহারা নানা-প্রকার পাতা, মূল ও মাটী ব্যবহার করে। আজকাল কখন-কখনও কেহ-কেহ সরকারী ঔষধালয়ে ঔষধ লইতে আসিয়া থাকে।

ইহারা ইহাদের পুত্র কন্যা-স্ত্রী ইত্যাদি সকলকে খুব ভালবাসে। এ বিষয়ে আমি তিনটী ঘটনা জানি। একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। একদিন একজন পুরুষ আমার নিকট আসিয়া, তাহার স্ত্রীর জন্য জ্বর ও সর্দ্দি-কাশীর ঔষধ চাহিল। ইহাদের ঔষধ চাওয়ার ব্যাপার জানিতাম বলিয়া তাহার সহিত তাহার স্ত্রীকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, তাহার স্ত্রীর ডবল নিউমোনিয়া, এবং তখন প্রায় শেষাবস্থা; বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না। সে আমার সহিত ঔষধ লইতে আসিয়া, কাঁদিয়া বারেবারেই বলিতে লাগিল যে, তাহার স্ত্রীর কষ্টের লাঘব করিয়া কথা বলিবার শক্তি পুনরায় ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে আরোগ্য করিয়া দিন। তাহার স্ত্রী যে হঠাৎ এরূপ হইয়া যাইবে, তাহা সে আদৌ ভাবে নাই। তাহার দুঃখ ও কষ্ট দেখিয়া আমি তাহার স্ত্রীকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনিতে বলিলাম। তাহারা হাসপাতাল হইতে প্রায় ১০০ গজ দূরে সমুদ্রের কিনারায় নিজেদের কুঁড়েতে ছিল; এবং সে বারে বারে তাহাকে সেখানেই চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া সেখানেই তাহার জন্য যতদূর সম্ভব সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, একজন ওয়ার্ড কুলীকে তাহার পাহারায় রাখিয়া দিলাম। রাত্রেও একবার দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন তাহার স্বামীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও তাহার অন্যান্য সঙ্গীদের যত্ন ও চেষ্টা দেখিয়া আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রায় ভোর ৫টার সময় তাহার মৃত্যু হইলে, সকলে কাঁদিয়া-কাটিয়া মৃতদেহ কবর দিতে লইয়া গেল। কিন্তু তাহার স্বামী তাহার সহিত গেল না। সজল নয়নে সে একবার তাহার স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কিছুই না বলিয়া, মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া আমার ঘরে বসিয়া রহিল। তাহাকে চা রুটী দিলাম—সে খাইল না। সে তাহার স্ত্রীকে কত ভালবাসিত, এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে কিরূপ ভালবাসিত, তাহারই বিষয়ে একবার মাত্র দু'একটি কথা বলিয়া, খুব শান্ত, ধীর ও অবিচলিত ভাবে বলিল—"আমি কবর দিতে যাই নাই,—কারণ, আমিও কাল উহার পাশেই শুইব;—উহাকে ছাড়িয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।" খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তৎপরদিন সকাল ছয়টার সময় সেও মারা গেল। সে সমস্ত রাত্রি তাহার স্ত্রীর শয়ন-স্থানে শুইয়া তার স্ত্রীকে ডাকিয়াছিল; কেবল তাহারই কথা বলিয়া কাঁদিয়াছিল; এবং তাহার সঙ্গীদের অনুরোধ করিয়াছিল যে, যদি সে মারা যায়, তবে তাহাকেও তার স্ত্রীর পাশেই যেন কবর দেওয়া হয়। তাহার সুন্দর বলিষ্ঠ দেহে রোগের কোন লক্ষণ কিম্বা আত্মহত্যার কোন চিহ্নও ছিল না। বলা বাহুল্য যে, তাহার সঙ্গিগণ তাহার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সেইদিনই সকলে সে স্থানে "শয়তানের" ভয় হইয়াছে মনে করিয়া অন্যস্থানে উঠিয়া গেল।

অরাকড দ্বীপে ওলাউঠা রোগীর বাসস্থান

মূল ক্যাম্প হইতে প্রায় এক মাইল দূরে জঙ্গলে কাজের জন্য প্রায় দুইশত কুলীর থাকিবার মত এক ক্যাম্প করা হয়। কিন্তু জঙ্গলীরা ওদিকে শয়তানের স্থান বলিয়া যাইত না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সেখানে অত-গুলি ঘরের মধ্যে কেবল মাত্র একখানি ঘরেই যত উপদ্রব

ছিল। সেই ঘরে প্রায় ৮০ জন কুলী বাস করিত; কিন্তু কেহই সেখানে স্থির থাকিতে পারিত না। কোন দিন হয় ত সকলেই একসঙ্গে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিত; কিম্বা সকলেই একসঙ্গে ধাক্কা খাইয়া মাচান হইতে পড়িয়া যাইত; এই প্রকার উপদ্রব রোজই রাত্রে হইতে লাগিল। ঘরটার চারিধার খোলা,—বেড়া ছিল না,—এবং অন্যান্য ঘর হইতে উহার সমস্তই দেখা যায়। ওই ঘরখানি ছাড়া অন্য কোন ঘরে কোন উপদ্রব নাই। পরিশেষে কুলীগণ ভীত হইয়া অন্য ঘরে থাকিল। উহারা খুবই সত্যবাদী কুলী,—উহাদের কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না। উহারাও সমস্ত ভাল করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া অবশেষে ভূতের ঘর বলিয়াই সাব্যস্ত করে। এক দিন একজন ওই ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, উহার নীচের মাটী খুঁজিয়া দেখিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে অনেকের সামনে কোথা হইতে স্পষ্ট কথায় ভোর বেলা তাহার বিছানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কে যেন উহা করিতে সাবধান করিয়া দিয়াছিল বলিয়া সে উহা করে নাই। দিনের বেলা সে ঘরে প্রায়ই কোন উপদ্রব হয় না,—সন্ধ্যার পর হইতে সেই ঘরে আর কেহ থাকিতে পারে না। সে ঘরে এখন আর কেহ থাকে না। জানি না, এতদিনে ঘরখানির কি হইয়াছে।

এবারে, আমাদের নর্থ আন্দামানের বিষয় কিছু লিখিব। আমি যখন সেখানে যাই, তখন সেই বিভাগ সবেমাত্র খোলা হইয়াছে; তিনজন সাহেব ছাড়া, আমিই একমাত্র বাঙ্গালী ছিলাম। প্রায়ই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা মাছ ধরিতে মোটর বোটে করিয়া এদিক-ওদিক যাইতাম। মাছ ধরা সেখানে এক আমোদ ছিল। কিনারা হইতে কিছু সাডাইন গাছ ধরিয়া টোপ বা চারের জন্য লইয়া যাওয়া হইত। ডোরের সহিত সেই চার গাঁথিয়া দিয়া জলে ছাড়িয়া দিয়া মোটর চালান হইত। ডোরের শেষে Swible থাকাতে চারটী এত জোরে ও সুন্দর ভাবে ঘুরিত যে, বড়-বড় মৎস্য টোপ খাওয়ামাত্রই কাঁটায় আট্‌কাইয়া যাইত; তখন খুব জোরে লাইনে টান পড়িত। তখনই মোটর দাঁড় করাইয়া, লাইন ঢিলা দিয়া খেলাইয়া, মাছ তুলিয়া ফেলা হইত। যদি খুব বড় মাছ হইত ও লাইনে না কুলাইত, তাহা হইলে লাইনের সহিত টীনের একটা বয়া বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিয়া, পরে টানিয়া আনিয়া মাছ তোলা হইত। চার অভাবে, সাদা

টুঙ্গলী রমণী

কাপড়ের টুকরা অথবা একটী চামচ দ্বারাও মাছ ধরা যাইতে পারে। মাছও অনেক প্রকার ও বেশ বড়-বড়,—কোকারি, সুরমাই, ভেটকী, চীতল ইত্যাদি সেখানে পাওয়া যায়। পাথর অথবা খাঁড়ির মত স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। ঢালু লাইনে কোকারি, সুরমাই, ইত্যাদি বড়-বড় মাছ বেশী পাওয়া যায়। স্থান বুঝিয়া পাথরের

নিকট নোঙর করিয়াও মাছ ধরা যায়; এবং উহাতে প্রায়ই অনেক প্রকার ছোট কীটও পাওয়া যায়—মাঝে-মাঝে বড়ও পাওয়া যায়। খুব বড়-বড় গোবরা মাছও পাওয়া যায়। কিন্তু উহারা চার খাইয়া, প্রায়ই কাঁটা সমেত পাথরের নীচে বসিয়া যায়। সেজন্য উহাদের তুলিতে হইলে ধৈর্য্য ও সাবধানতার দরকার হয়। হাঙর মাছ ওদিকে খুব বেশী এবং মাঝে-মাঝে তাহাও পাওয়া যায়। হাঙরকে এদিকে "বদমায়েস" মাছ বলিয়া থাকে। উহাদের গায়ের চামড়া খুব শক্ত ও গায়ে বিশ্রী গন্ধ। উহাদের দাঁত তলোয়ারের মত ধারাল। উহারা প্রায়ই দলে থাকে; এবং উহারা যেদিকে থাকে বা ঘুরিয়া বেড়ায়, সেদিকে অন্য মাছ পাওয়া যায় না। উহাদের ধরিতে হইলে খুব মজবুত কাঁটা ও লাইন থাকা চাই; এবং চালাকীও জানা চাই। কারণ, উহারা চার খাইয়া যেমন বুঝিতে পারে যে কাঁটায় আট্‌কাইয়াছে, তখন তীরের মত লাইনের দিকে ছুটিয়া আসে; এবং উপর হইতে তার থাকিলেও কাটিয়া পলাইয়া যায়। এক-একটী বদমায়েসের পেট হইতে ৫।৭টী করিয়া তার-শুদ্ধ কাঁটাও পাওয়া গিয়াছে। মাছ ধরিতে গিয়া যদি দু'একটী বদমায়েস পাওয়া যাইত, তবে সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতাম। ঢালু লাইনেও মাঝে-মাঝে বদমায়েস পাওয়া যায়। ইহারা খুব বড়-বড় হয়; এবং একজন মানুষকে স্বচ্ছন্দে ইহারা গিলিয়া খাইতে পারে। পোর্ট ব্লেয়ারে আসিবার সময় রস দ্বীপের জেটির নিকট খুব বড় এক হাঙরকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি যে, সেখানে আলাদা বন্দোবস্ত ও কাঁটা লাইন প্রস্তুত করাইয়া, প্রায় আট শত পাউণ্ড ওজনের এক হাঙর তুলিয়া গুলি করিয়া মারা হইয়াছিল। উহাদের কাটিলে উহাদের পেটের মধ্যে বাচ্চা পাওয়া যায়। ওদিকে কথিত আছে যে, সন্তানবতী মাতার দুগ্ধ কম হইলে, ইহার মাংস খাইলে দুধ বেশী হয়—এবং ইহা হইতে খুব ভাল সার হয়। ইহার মাংস ওদিকে কেহই খায় না। কেবল মান্দ্রাজী, বর্ম্মা, ও রাঁচীর কুলীরা খাইয়া থাকে। উহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, মাংস খাইতে বেশ অম্ল। অনেক সময়ে মাছ খেলাইয়া তুলিতে-তুলিতে, বদমায়েস মাছ উহার মাথাটী রাখিয়া সমস্ত খাইয়া পলায়ন করে। কখনও বা সমস্ত মাছটী গিলিতে গিয়া নিজেও আট্‌কাইয়া পড়ে।

টুঙ্গনী নৃত্য

আমাদের ওখান হইতে কিছুদূরে এক স্থানে পাহাড়ের মাঝখানে নৌকা নোঙর করিয়া আমরা মাছ ধরিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এত মাছ ছিল যে, ডোর ফেলিবামাত্র মাছ পাওয়া গিয়াছিল; এবং মাছ তোলা অপেক্ষা তাহাকে খুলিয়া লইয়া চার লাগাইতেই বরং দেরী হইতেছিল। এইজন্য আমরা একই লাইনে কাঁটার ৩।৪ ইঞ্চি উপরে তিনটী কাঁটা বাঁধিয়া

ধরিতে লাগিয়াছিলাম। তখন একই বারে তিনটী করিয়া মাছ ধরিতে লাগিলাম। যখন উহা উঠে, তখন উহাদের রকমারী রং দেখিয়া, ঠিক যেন একটী ফুলদানি উঠিতেছে বলিয়া

কার্ণিউ হাসপাতাল ও পোষ্ট আফিস

মনে হইতে লাগিল। আমরা সেদিন আধঘণ্টায় তিনজনে ৭২টা মাছ ধরিয়াছিলাম। লাল প্রবাল মাছ গোবরাই বেশী পাইয়াছিলাম। দু'টী বেশ বড়, অন্যান্যগুলি প্রত্যেকটী একসের ওজনের ছিল। গোবরা মাছ উঠিবার সময়, এতবড় হাঁ করিয়া নিরীহ গোবেচারীর মত ত্রিভঙ্গমুরারী বেশে ওঠে যে, দেখিতে বড়ই ভাল লাগে। শরীর অপেক্ষা মুখের হাঁ-টী তাহাদের ডবল বলিলেই হয়। কোকারী, লাল মাছ, ভেটকী এবং সুরমাই—এই মাছগুলিরই স্বাদ খুব ভাল। অন্যান্য মাছগুলিও খাইতে মন্দ নহে। খুব বড় মাছের স্বাদ তত ভাল হয় না। আমি সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ৬৫ পাউণ্ডের কোকারী পাইয়াছিলাম; এবং সেখানকার আর একজন সাহেব ১১২ পাউণ্ডের পাইয়াছিল। আমরা মাঝে-মাঝে তৈল লবণ ইত্যাদি লইয়া মাছ মারিতে গিয়া, কোন একস্থানে নামিয়া, মাছ ভাজিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া ঘরে ফিরিতাম। মাছ শিকারই সেখানকার সর্ব্বাপেক্ষা আমোদ। পোর্ট ব্লেয়ার হইতে অনেকেই মাছ শিকার করিতে ওদিকে আসিয়া থাকে। শঙ্কর, ড্রাগন্‌স, খড়্গা মৎস্য, ইত্যাদি অনেক প্রকার মাছ ওদিকে পাওয়া যায়। জঙ্গলীগণ প্রায়ই ওই সমস্ত শিকার করিয়া, তাহাদের লেজ, দাঁত ইত্যাদি লইয়া আসিত। কুকুর-মুখো, শূকর-মুখো ইত্যাদি অনেক প্রকার মাছও পাওয়া যায়। Mermaidsও না কি কখন-কখনও দেখা যায়। আমি একবার শীতকালে বেশ বড় একটা মানুষের মত দেখিতে একপ্রকার মাছ দেখিয়াছিলাম। অবশ্যই বইতে ছাপা মৎস্যনারীর মত দেখিতে আদৌ নহে। তাহার ডানাদুটী বেশ বড় ও মুখের দিকটা অনেকটা মানুষের মত ছিল। বেশ ভাল করিয়া পুনরায় দেখিবার আশায় ওদিকে অনেকবার গিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় আর কখনও দেখিতে পাই নাই। জঙ্গলীদের নিকট শুনিয়াছি যে, উহা খুব বড় ও দেখিতে অনেকটা মানুষের মত; এবং শীতকালে স্থান-বিশেষে উহাদিগকে দেখা যায়।

এষ্টিন প্রণালী ছাড়া, ওদিকে প্রায় সমস্ত স্থানে জল

বেস ক্যাম্পের জেটি

বেশ গভীর; এবং পাহাড়ের কিনারা পর্য্যন্ত বড়-বড় জাহাজ দাঁড়াইতে পারে। বালু যেখানে আছে, তাহার নিকটেই স্নান করিতে হয়। দূরে গেলে হাঙরের ভয় আছে। ওদিকে বড়

সুন্দর-সুন্দর প্রবাল, শঙ্খ ইত্যাদি পাওয়া যায়। চারিধারে পাহাড় ও জল বেশ গভীর বলিয়া ল্যাঞ্চ ইত্যাদি এদিক-ওদিক অনেক স্থানে ঝড়-তুফানেও যাতায়াত করিতে পারে।

রেলের লাইন পাতা (বেস ক্যাম্প)

কথিত আছে যে, এমডেন এইদিকেই নিশ্চিন্ত মনে লুকাইয়া ছিল ; কারণ কয়েদীদের উপনিবেশ বলিয়া অন্যান্য জাহাজের এদিক দিয়া যাতায়াত ছিল না। স্থানে-স্থানে প্রবাল, শঙ্খ ইত্যাদি সুন্দর-সুন্দর সামুদ্রিক পদার্থ এত অধিক পাওয়া যায় যে, তাহা বলা যায় না। একবার ঝড়ে আমি নৌকাতে অনেক দূর ভাসিয়া গিয়াছিলাম ; এবং সেখানে পাথরে ধাক্কা লাগিয়া নৌকা বেশ জখম হয়। কোন রকমে নৌকা ঠিক করিয়া লইয়া কিনারা দিয়া দাঁড় টানিয়া যাইতেছিলাম। সেই স্থানে এমন সুন্দর-সুন্দর ও নানা প্রকার রংএর এত প্রবাল ও শঙ্খ ইত্যাদি ছিল যে, বিপদের কথা ভুলিয়াও সে-গুলি কুড়াইয়া লইবার লোভ সামলাইতে পারি নাই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বিপদের খবর পাইয়া ল্যাঞ্চ আমাদের লইতে আসিয়াছিল। পরে অনেকবার ওদিকে প্রবাল কুড়াইতে যাইতাম। শীতকালে ওদিকের কতকগুলি ছোট-ছোট দ্বীপের বালুকার মধ্যে জায়গা বুঝিয়া খুঁড়িতে পারিলে, অনেক কচ্ছপের ডিম পাওয়া যায়। জঙ্গলীগণ মাঝে-মাঝে অনেক লইয়া আসিত।

আমরা মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট দ্বীপে বালুর চর দেখিয়া বনভোজন করিতে যাইতাম। সেখানে মাছ ধরিয়া, পাখী শিকার করিয়া, খাওয়া-দাওয়া করিয়া, আমোদ-আহ্লাদ করিতাম। কখন-কখনও সঙ্গে চা ইত্যাদি লইয়া জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে নৌকাতে অনেক দূর বেড়াইতে যাইতাম। এইরূপে কোনরকমে আমোদে-আহ্লাদে দিন কাটাইয়া বিদেশের কষ্ট দূর করিতাম। প্রায় এক বৎসর পরে মধ্য আন্দামানে একজন বাঙ্গালী পশু-চিকিৎসক আসেন। তিনি প্রায়ই এদিকে হাতী ও গরু দেখিতে আসিতেন। তাঁহাকে মাঝে-মাঝে সঙ্গীরূপে পাইয়া খুবই আনন্দ হইত। তিনি বেশ ভদ্রলোক ও সজ্জন। ঢাকায় তাঁহার বাড়ী। সম্প্রতি তিনি স্ত্রী-পুত্র লইয়া তথায় গিয়াছেন। তাঁহার আসিবার প্রায় ছয় মাস পরে আর একজন বাঙ্গালী রেঞ্জার তথায় সপরিবারে আসেন। অনেক দিন পরে তাঁহার স্ত্রীর হাতের রান্না খাইয়া কি যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার স্ত্রী আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন ; এবং তাঁহার মাতৃস্নেহে আমার বিদেশের কষ্ট লাঘব হইয়াছিল। তাঁহারা এখনও সেখানেই আছেন।

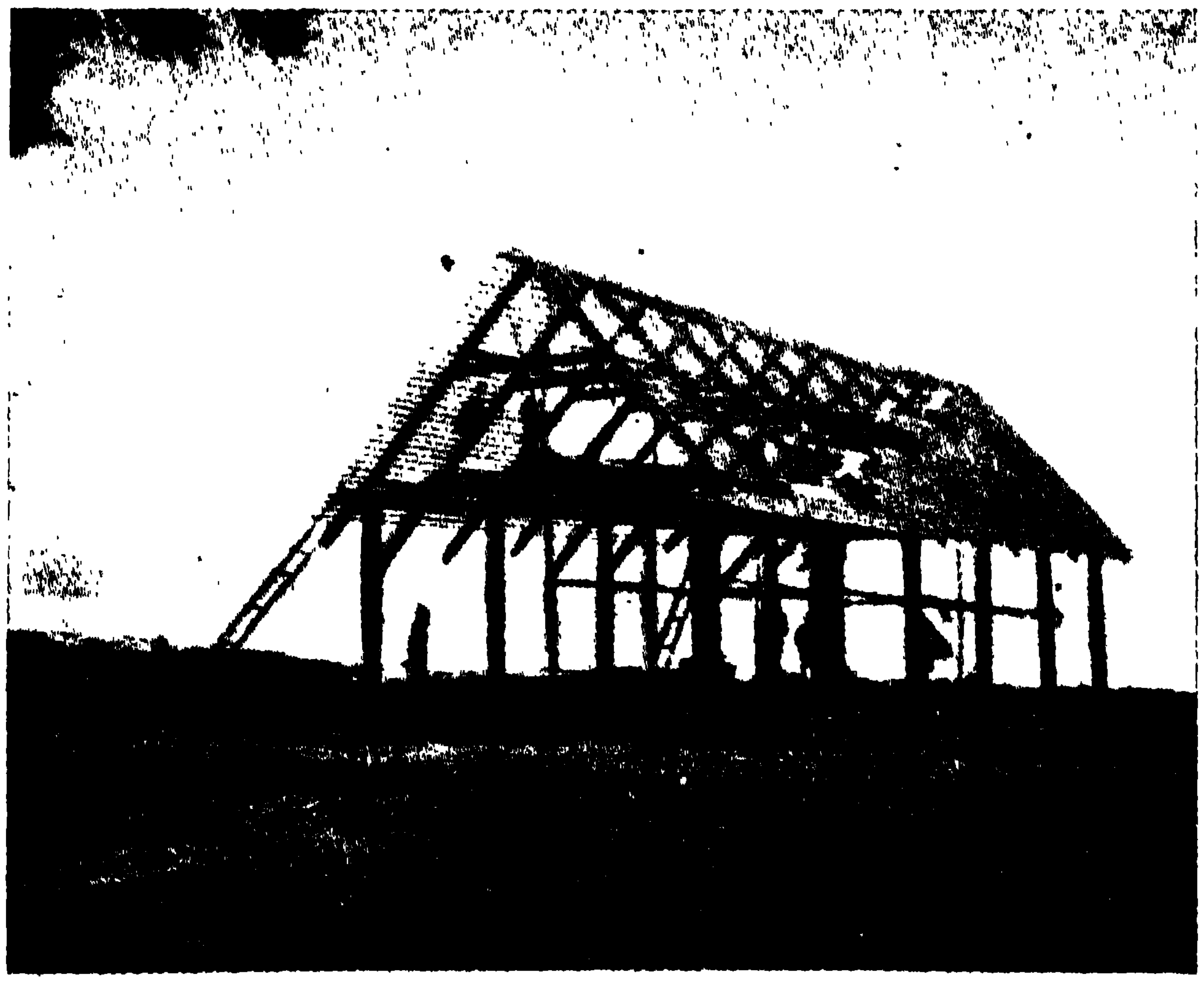

কালিউতে গুদাম-নির্ম্মাণ

নর্থ আন্দামান তখন সবেমাত্র পরিষ্কার করিতে আরম্ভ হইয়াছিল ; এবং Base Camp এ চাষবাসের উপযোগী একটু স্থান হইয়াছিল। এখন উহা খালাসপ্রাপ্ত কয়েদী-

দিগকে চাষবাস করিতে দেওয়া হইয়াছে। উহারা সরকারী কাজ ও চাষবাস দুই-ই করিয়া থাকে; এবং আপন-আপন পরিবার লইয়া থাকে। আপাততঃ সেখানে কিছু ধান ও ভুট্টার চাষ হইয়া থাকে। সেইখানে শাক-সবজীর জন্য সরকারী বাগানও করা হইয়াছে। কালিউ দ্বীপেও আমরা বাগিচা করিয়া শাক-সবজী লাগাইয়া লইতাম। আন্দামানের মাটীতে নারিকেল, পেঁপে, কলা ও তরমুজ খুব ভাল ও বড়-বড় হইয়া থাকে। এই সকল ফল খুব সুস্বাদুও হয়। আমাদের চাউল ইত্যাদি প্রায় সমস্ত খাদ্যই পোর্ট ব্লেয়ারের কমিশেরিয়েট ডিপার্টমেন্ট হইতে আসিত। সেখান হইতে প্রতি সপ্তাহে একবার ষ্টীমার এদিকে আসিত। এমনও মাঝে-মাঝে হইয়াছে যে, হয় ত ঝড় বা অন্যান্য কারণে জাহাজ আসিতে বিলম্ব হইল, অথচ এদিকে আমাদের খাদ্যও শেষ হইয়াছে। তখন অগত্যা হাতীর ধান সিদ্ধ করিয়া, কিম্বা পেঁপে, কলা ইত্যাদি খাইয়াই জাহাজ না আসা পর্য্যন্ত চালাইতে হইত। গুদাম বড় না থাকাতে, এরূপ কষ্ট দু'একবার আমাদের সহ্য করিতে হইয়াছে। যাহা হউক এখন সমস্ত বন্দোবস্ত হওয়াতে খুবই সুবিধা হইয়াছে। অন্যান্য সমস্ত ক্যাম্পের কুলীগণ সপ্তাহে একবার করিয়া আসিয়া, তাহাদের এক সপ্তাহের মত আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া যাইত। আমাদের ওই ছোট দ্বীপে দু' একটী দোকানও ছিল। সকলের জিনিষপত্র লওয়া হইয়া গেলে, উহাদিগকে ল্যাঞ্চ অথবা মোটর-বোটএ করিয়া আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া হইত। সপ্তাহে সেই দিনই উহারা উহাদের অন্যান্য ক্যাম্পের বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিত।

এদিকে প্রায় আট মাস বর্ষা থাকে। আবহাওয়া বেশ গরম। যে সমস্ত ক্যাম্প সমুদ্রের কিনারায় অবস্থিত, সেগুলিতে হাওয়া খুব লাগিলেও, সূর্য্যের তাপও খুব আছে। শীতকালে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে শীত নাই; কিন্তু প্রধান ক্যাম্প ইত্যাদি পাহাড়ের মধ্যস্থিত ক্যাম্পগুলিতে শীত মন্দ নহে। এই সমস্ত ক্যাম্পের জল-বায়ু অনেকটা বাঙ্গলা দেশের পাড়াগাঁয়ের মত। এদিকে বৃষ্টি আমাদের দেশের মত অনেকক্ষণ স্থায়ী নহে। খুব অন্ধকার হইয়া আসিয়া হয় ত ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই পুনরায় পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ে যখন আমাদের মাচানের

ফোয়া (ভাসমান)

ঘরগুলি দুলিতে থাকে, তখন খুবই ভয় হয়। অনেক সময় বড়-বড় বৃক্ষগুলি ঝড়ে পড়িয়া যায়। এজন্য বেশ সাবধানে থাকিতে হইত। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার বড় জোয়ারে কিনারার ঘরগুলির খুব নিকট পর্য্যন্ত জল আসিয়া থাকে।

মাঝে-মাঝে রেঙ্গুন ইত্যাদি স্থান হইতে অনেক

জিনিষ আমাদের এদিকে ভাসিয়া আসিত। একবার একখানি বর্ম্মাদের "ফোয়া" একখানি ভেলাতে ভাসিয়া আসিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাইয়া, উহা লইয়া আসি। উহার ভিতরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, হাঁড়ী, কলসী, টাকা, পয়সা, বাসন ইত্যাদি পূজার সমস্ত উপকরণ ছিল। যাহারা পূজা করিয়াছিল, তাহাদের নাম ও একখানি পত্র উহাতে পাওয়া গিয়াছিল; উহাতে লেখা ছিল যে, যিনি এই ফোয়া পাইবেন, তিনি যেন তাহাদিগকে খবর দেন। আমরা সেখানে টেলিগ্রাফে খবর দিয়াছিলাম। ঐ ফোয়া লইয়া বর্ম্মীগণ সেখানেই প্রতিষ্ঠা করিয়া খুব ধূমধাম করিয়া পূজা করিয়াছিল। পূজার সমস্ত উপকরণই উহাতে ছিল; সুতরাং তাহাদিগকে বেশী কষ্ট করিতে হয় নাই। সেই ফোয়াটীর একখানি ছবিও এখানে দিলাম।

জঙ্গল পরিষ্কারের পর (বেস ক্যাম্প)

হুকুম রদ

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

১

দৈববাণী অতি নিদারুণ!
বলেছে হইবে ধ্বংস নৃপতির এই বংশ,
জ্বলে অভিশাপের আগুন।
সবই গেছে, হা অদৃষ্ট! এক পুত্র অবশিষ্ট,
তাও হায় রোগ-শয্যাশায়ী,—
হবে না হুকুম রদ, বলিতেছে সভাসদ—
নাহি, আর কোনো আশা নাহি।

২

ক্রন্দন উঠেছে চারি পাশে;
জ্যোতিষী হইয়া ক্ষুণ্ণ, হেরিয়াছে সাত শূন্য,—
মৃত্যু ওই ঘনাইয়া আসে।
দুঃখময় রাজপুরে অভাগিনী মাথা খুঁড়ে,
কাঁদি-কাঁদি পাগলিনী মাতা—
উড়ে যাই, ভাবে রাণী, জিয়াই অমৃত আনি,
দেব-লোকে জানাইয়া ব্যথা।

৩

পথ দিয়া ক্ষেপা বলি যায়—
'একমুঠি খুদ্ দিয়া কে যাবি রে সুধা নিয়া,—
মোর সুধা মৃতেরে জিয়ায়।'
রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বাস, সবে করে উপহাস,—
শিশুগণ ধায় পাছে-পাছে;
কে শুনিবে তার কথা, সৃষ্টি-ছাড়া বাতুলতা,-
পথে রাণী দাঁড়াইয়া আছে।

৪

তনয়ের তরে লাজ নাহি,—
ক্ষেপারে প্রণাম করি দাঁড়াইল কর যুড়ি—
ক্ষেপা কয়, 'খুদ কই মায়ি?'
খুদ লয়ে দিল ছাই, রমণী লইয়া তাই
মাথাইল সন্তানের গায়।
সবে বলে, পাগলিনি, অমৃত বিলান যিনি
খুদ সে কি চাহিয়া বেড়ায়?

৫

এ কি সুধা ক্ষেপা গেল দিয়া!
যে তনয় মৃতপ্রায়, নয়ন মেলিল হায়,
পান করি বিভূতি অমিয়া!
ভিষক্ পায় না কুল, নিদান চরক ভুল,
ক্ষেপায় বচন হ'ল খাঁটী;
জ্যোতিষী নির্ব্বোধবৎ, সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মত—
পরাশর একেবারে মাটী।

৬

সবে, হায়, বলাবলি করে—
অভিশাপ ব্রাহ্মণের—এত যে গ্রহের ফের,
বুঝিনে, কাটিল কার বরে।
সার্ব্বভৌম স্বপ্ন-মাঝ শুনিতে পেলেন আজ,—
কহে এক অশরীরি বাণী—
'প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী, মোহ-ভরে ক্ষেপা তুমি বলো যারে-
মোরা তারে সাধু বলে মানি।

৭

বাক্য মনে নাহি ব্যভিচার,—
জীবনে অসত্য কথা কহে নি সে, জান কি তা,
সত্যবাক্ পুণ্যবাক্ তার।
মোহময় হ'ক ধরা, ভক্ত-হৃদি সত্যে গড়া—
তার কথা ব্যর্থ করে কে?
তাহার সার্থক সব, কিছু নাহি অসম্ভব,
সত্য তাই, যা বলিবে সে।'

নায়েব মহাশয়

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুচিবাড়িয়া কান্সারণের প্রবল-প্রতাপ ম্যানেজার হামফ্রি সাহেবের নিকট কালা আদমীর জাতি-বিচার ছিল না। তিনি সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতে নিম্নতম স্তরের মুচি-মেথর-মুর্দ্দাফরাস পর্য্যন্ত সকলকে একই সাধারণ জাতি বা পর্য্যায়ভুক্ত মনে করিতেন!—তাঁহার ন্যায় 'জিঙ্গো' ভাবাপন্ন যে সকল ইংরাজ মনে করেন, তাঁহাদের ভোগ-লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই দয়াল প্রভু এই সুখস্থানের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের 'কাঠ কাটিবার ও জল বহিবার' অভিলাষেই এদেশের নখদন্তহীন অপদার্থগুলা বংশ-বিস্তার করিতেছে, তাঁহাদের সকলেরই এদেশবাসি-গণের প্রতি সমদৃষ্টি,—উচ্চ-নীচ-ভেদজ্ঞান নাই। এদেশের সকল বর্ণের লোক তাঁহাদের ধারণায় এক বিশাল সাধারণ জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই জাতির নাম 'নিগার!'

এই জাতীয় একটি লোক—যদিও তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—বৈশাখ মাসের একদিন মধ্যাহ্ন-কালে মুচিবাড়িয়া কান্সারণের কাছারীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন-গ্রামবাসী;—কন্যাদায়ে বিব্রত হইয়া, এই দায় হইতে উদ্ধার লাভের আশায়, তিনি ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি নানা গ্রামে ঘুরিয়া, এবং অনেক 'মহতের' দ্বারস্থ হইয়াও আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে উপস্থিত হইয়া, কাহার নিকট শুনিতে পান যে, মুচিবাড়িয়া কান্সারণের নায়েব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল অতি মহাশয় ব্যক্তি,—বিপন্নের প্রতি মুক্তহস্ত; কন্যাদায়গ্রস্ত কোন-কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া আশাতীত সাহায্য লাভ করিয়া-ছেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, 'মোটা রকম' সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।—এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হৃদয়ে কাছারীর পাশ দিয়া নায়েব মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন। বৈশাখের মধ্যাহ্নে সূর্য্যদেব মধ্যাকাশ হইতে অগ্নিধারা বর্ষণ করিয়া যেন চরাচর দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পথের ধূলা এতই উত্তপ্ত হইয়াছিল যে, তাহার উপর ধান ফেলিয়া দিলে খৈ হইয়া যায়! দীর্ঘ পথ ভ্রমণে ব্রাহ্মণ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর,—পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক। প্রখর মধ্যাহ্ন-রৌদ্র হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য তিনি তাঁহার জীর্ণ ছাতাটি মাথায় দিয়া, মন্থর গতিতে নায়েব মহাশয়ের বাসার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।

হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহার কামরায় চেয়ারে বসিয়া, টানা-পাখার হাওয়া খাইতে-খাইতে, বাতায়ন-পথে কাছারীর 'হাতা'র দিকে হঠাৎ দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, কে একজন ছাতা মাথায় দিয়া যাইতেছে!—অনেক চা-কর, নীলকর সাহেবদিগের মত হাম্‌ফ্রি সাহেবেরও ছত্রাতঙ্ক রোগ ছিল। বিদেশী ব্রাহ্মণ জানিতেন না যে, সাহেবের কাছারীর হাতা দিয়া তাঁহাকে ছাতা খুলিয়া যাইতে দেখিলে সাহেব ক্ষিপ্ত হইয়া কামড়াইতে আসিবে। এ কথা জানা থাকিলে, তিনি ছাতা মাথায় দিয়া দূরের কথা, খালি মাথা লইয়াও এই দ্বিপদ-শ্বাপদ সঙ্কুল স্থানে পদার্পণ করিতে সাহসী হইতেন না। হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহার হাতায় 'নিগারে'র মাথায় ছাতা দেখিয়াই ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তিনি সক্রোধ হুঙ্কার দিলেন, "কৈ হ্যায় রে!"

'হুজুর' বলিয়া আর্দ্দালী এব্রাহিম তাঁহার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। সাহেব হুকুম দিলেন, "ঐ ছাতাওয়ালা উল্লুকো পাকড় লাও।"

এব্রাহিম মনে-মনে বলিল, "এই গরমে বেটা ক্ষেপেছে,—এখনই অনর্থ বাধাবে!' কিন্তু সে হুজুরের আদেশের অন্যথাচরণে সাহসী হইল না, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া সাহেবের বারান্দায় উপস্থিত করিল। সাহেবের ভয়ে ব্রাহ্মণ অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে লাগিলেন; এবং অজ্ঞাত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সাহেব সে প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া অপরাধের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মাবতার অপরাধীর কাতরতায় দয়ার্দ্র হইয়া অপরাধ ক্ষমা করিবেন,—নিরপেক্ষ বিচার বিতরণে কুণ্ঠিত হইবেন, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। তিনিই ফরিয়াদী, তিনিই বিচারক। বিচারে ব্রাহ্মণের প্রতি কুড়ি ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ হইল! ডোম আসিলেই ধর্ম্মাবতারের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবে। ব্রাহ্মণকে আটক রাখা হইল। তিনি আতঙ্কে অভিভূত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। পিপাসায় তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইল; কিন্তু তাঁহাকে পিপাসা নিবারণেরও সুযোগ দেওয়া হইল না! সাহেব বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "আগে পিঠ ভরিয়া বেত খা, তাহার পর পেট ভরিয়া জল খাইলে অধিক মিষ্ট লাগিবে।"—সাহেবের মিষ্ট কথায় ঠাকুরের প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল!

নায়েব মহাশয় ইদানীং ম্যানেজার সাহেবের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন না,—নিজের কর্ত্তব্য কাজটুকু শেষ করিয়া 'দিনগত পাপক্ষয়' করিতেন। সাহেবও কোন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না, নিজের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্যই সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, নায়েব কোন কার্য্যের সমর্থন করিলে, সাহেব উল্টা আদেশ দিতেন। সাহেবের মেজাজ বুঝিয়া নায়েবও উল্টা পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহার উপকার করিবার ইচ্ছা হইত, তাহার অনিষ্ট করিয়া বসিতেন। সাহেব নায়েবের কার্য্য-পদ্ধতি উল্টাইয়া দিয়া, নায়েবের ইচ্ছাই পূর্ণ করিতেন।

সুতরাং ছাতি মাথায় দেওয়ার অপরাধে ব্রাহ্মণের প্রতি বেত্রাঘাতের আদেশ হইয়াছে শুনিয়া, নায়েবের একবার ইচ্ছা হইল সাহেবকে বলেন, "ও কি করিয়াছ সাহেব! মোটে কুড়ি ঘা বেত এত বড় গুরুতর অপরাধের দণ্ড! তুমি পঞ্চাশ ঘা বেতের হুকুম দাও;—বেত খাইয়া বেচারা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, পুষ্পক-রথে স্বর্গে চলিয়া যাক। বিশ ঘা বেতের কথা শুনিলে লোকে তোমাকে নির্ব্বোধ মনে করিবে। গুরু পাপে এত লঘু দণ্ড দিলে সুবিচারের ব্যাঘাত হয়।"—কিন্তু সাহেবের সহিত এরূপ রসিকতা করিতে নায়েবের প্রবৃত্তি হইল না;—তিনি তাড়াতাড়ি কাছারীতে আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট সকল কথা শুনিলেন; তাহার পর সাহেবের খাস কামরায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, "সাহেব, আমার একজন স্বজাতি আমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিল; শুনিলাম, তাহার প্রতি কুড়ি ঘা বেতের আদেশ দিয়াছ!"

সাহেব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হাঁ, দিয়াছি। অপরাধ করিলে তোমার স্বজাতির আর আমার সহিস ঝড়ু সর্দ্দারের স্বজাতির ভিন্ন রকম বিচার হইবে,—এরূপ প্রত্যাশা করিও না। আমার নিকট ঐ ব্রাহ্মণ ও ঐ বুনো, উভয়েই সমান। গলার সুতার কোন বিশেষ সম্মান আমি স্বীকার করি না, ইহা কি জান না?"

নায়েব বলিলেন, "উহার অপরাধ ত ছাতা মাথায় দিয়া কাছারীর হাতার মধ্যে আসা?"

সাহেব বলিলেন, "হাঁ, এই অপরাধেই উহার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। এইরূপ বেয়াদপি গুরুতর অপরাধ।"

নায়েব বলিলেন, "ভিন্ন গ্রামের লোক,—না জানিয়া রৌদ্রে ছাতা মাথায় দিয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, উহাকে ক্ষমা কর, সাহেব!"

সাহেব বলিলেন, "না জানিয়া অপরাধ করিলেও দণ্ড ভোগ করিতে হয়। আমার হুকুম কখন ফেরে না। তুমি আমাকে বিরক্ত করিও না। তুমি যথেষ্ট ওকালতি করিয়াছ,—এখন তোমার সেরেস্তার কাজে যাও।"

ব্রাহ্মণকে কুড়ি বেত মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বেত্রাঘাতে ছট্‌ফট্‌ করিতে-করিতে ব্রাহ্মণ কোন কোন হিন্দু আমলার নিকট পানীয় জল চাহিলেন; কিন্তু ম্যানেজার সাহেবের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে কেহ তাঁহাকে জলবিন্দু দিতেও সাহস করিল না!—ইহা অত্যুক্তি নহে।

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এ রাজ্যে কি রাজা নাই?—মানুষ পর্য্যন্ত নাই! ভগবান, এই অত্যাচারের বিচার কর।"

অতি কষ্টে গ্রামান্তরে গিয়া ব্রাহ্মণ এক ঘটি জল পান করিলেন। বেত্রাঘাতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার উত্থান-শক্তি রহিল না। নায়েব নিস্ফল আক্রোশে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের প্রজা যদু মণ্ডল তাহার জমীজমা সংক্রান্ত একটা দরকারে নায়েব মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে সাহেবের নিকট পাঠাইলেন।

সাহেব স্বার্থানুরোধে যদু মণ্ডলের কিছু অনিষ্টই করিয়াছিলেন,—সে তাহারই প্রতিকার প্রার্থনায় সাহেবের নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু সাহেব তাহার আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া, দেওয়ানী করিতে বলিলেন। যদু মণ্ডল বলবান ও উদ্ধত প্রকৃতির চাষী গৃহস্থ। সাহেবের ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "সাহেব, তুমি জমীদার, আমি গরীব প্রজা। গরীবের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইলে,—আমার নালিশে কাণ দিলে না!—এখন বলিতেছ, আদালত কর। যদি 'আদালত করিতেই' পারিতাম, তাহা হইলে কি তোমার কাছে দরবার করিতে আসিতাম? গরীব বলিয়া গলায় ছুরি দিও না, সাহেব!"

সাহেব অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "যাও—যাও, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোস্তাকি করিও না। বিরক্ত করিলে বেত খাইবে।"

যদু মণ্ডল বুক ফুলাইয়া, সাহেবের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "ন্যায্য কথা বলিলেই বেত খাইব? এ কি লুঠের মাহাল সাহেব! তুমি অন্যায় করিবে,—আমরা গরীব প্রজা; চোখে আঙ্গুল দিয়া অন্যায় দেখাইয়া দিলে, বলিবে, 'আদালত কর, বিরক্ত করিলে বেত খাইবে!—'তোমার গায়ে জোর আছে, তুমি বেত মারিতে পার; তোমার বেতের ভয়ে আমি কি ন্যায্য পাওনা ছাড়িয়া দিব, সাহেব?"

যদু মণ্ডলের কথায় সাহেব অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিসকে ডাকিয়া, তাহার নিতম্বদেশে দশ ঘা বেত মারিতে আদেশ করিলেন!

সাহেবের এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। যদু বেত খাইয়া কৃতার্থ হইল।

যদু মণ্ডল বেত্রাঘাত-স্ফীত নিতম্বের বেদনার উপর হাত বুলাইতে-বুলাইতে প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু এই অন্যায় অত্যাচারে সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সেইদিন গভীর রাত্রে যদু মণ্ডল নায়েবের বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার আক্ষেপ শুনিয়া নায়েব বলিলেন, "তুমি বাপু, সুবিচার প্রার্থনায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলে,—সাহেব তোমাকে চাবকাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে! তোমরা যদি মুখ বুজিয়া চাবুক হজম কর, তাহা হইলে আমার আর কি বলিবার আছে?"

যদু মণ্ডল বলিল, "আপনি কর্ত্তা, আমাদের মা-বাপ; আমাদের মান-ইজ্জত সবই আপনার হাতে। সাহেব আর কখন আমাদের গায়ে হাত তুলিতে সাহস না করে, তার কোন উপায় কি আপনি বলিয়া দিতে পারেন না?"

নায়েব বলিলেন, "তোমাদের ভাল-মন্দ তোমরা বুঝিবে। সাহেব আমার মনিব,—তাঁহার বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কোন রকম সাহায্য করিতে পারিব না। তবে তোমরা সাহেবকে যদি একটু 'শিক্ষে' দিতে পার—তাহা হইলে এই বেত-মারা রোগটা হয় ত আরাম হইতেও পারে। ঠিক দাওয়াই না পড়িলে, কোন রোগই আরাম হয় না যদু! সে জন্য আমার কাছে আসা বৃথা।"

"প্রেন্নাম কর্ত্তা! এবার আমরা তবে দাওয়াইয়েরই যোগাড় করি।"—বলিয়া যদু মণ্ডল নায়েবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। বেত্রাহত যদু যে শীঘ্রই যথাযোগ্য

'দাওয়াই' প্রয়োগ করিবে, এ বিষয়ে নায়েব মহাশয় নিঃসন্দেহ হইলেন।

যদুও সেই দিন হইতে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। উক্ত ঘটনার তিন চারি দিন পরে মিঃ হাম্‌ফ্রি সুমধুর প্রাতঃ-সমীরণ সেবনের উদ্দেশ্যে, মিসেস্ হাম্‌ফ্রিকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার বহুমূল্য সুদৃশ্য টম্‌টমে নদীতীরে যাত্রা করিলেন। গ্রীষ্মকাল; নদীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সেই সঙ্কীর্ণ-কায়া নদীতে তখন স্রোত ছিল না। স্থানে-স্থানে জল এত অল্প যে, সেই সকল স্থান দিয়া বালকেও হাঁটিয়া নদীপার হইতে পারিত। শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদে কোন-কোন স্থান সমাচ্ছন্ন,—জল দেখিতে পাওয়া যায় না। নদীর উভয় তীর জঙ্গলাবৃত,—নানা জাতীয় তরু ও গুল্মের প্রাচুর্য্যে নদীকূল বহুদূর পর্য্যন্ত দুর্গম। উভয় তীরের প্রান্ত-বাহিনী নদীর গতি অত্যন্ত বক্র,—বাঁকের এক সীমা হইতে অন্য সীমা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নদী ব্যতীত বহুদূর-ব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে অন্য জলাশয়ের একান্ত অভাববশতঃ, জলকষ্ট দূর করিবার জন্য নদীর ধারে-ধারে অনেক লোক বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। কতকগুলি চাষী গৃহস্থ লইয়া এক-একখানি ক্ষুদ্র পল্লী স্থাপিত হইয়াছে। পল্লীগুলি বিক্ষিপ্ত,—পরস্পরের সহিত সংশ্রবহীন। দুইখানি পল্লীর ব্যবধানে সুপ্রশস্ত প্রান্তর—ধানের ক্ষেত।

হাম্‌ফ্রি সাহেবের টম্‌টম্ নদীতীরবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে-চলিতে, ঐরূপ একটি কৃষক-পল্লী অতিক্রম করিয়া নির্জ্জন প্রান্তরে প্রবেশ করিল। এমন সময় যদু মণ্ডল প্রান্তর সন্নিহিত একটি গুল্মের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া এক লম্ফে হাম্‌ফ্রি সাহেবের টম্‌টমের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার হাতে পাকা বাঁশের তৈলপক্ক সুদীর্ঘ লাঠী। যদু, সাহেব ও মেমসাহেবের প্রতি দৃকপাত মাত্র না করিয়া, তাহার লাঠি দুই হাতে বাগাইয়া ধরিয়া টম্‌টমের ঘোড়ার মুখে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল! এই কাণ্ড এতই অল্প সময়ে ঘটিল যে, সাহেব সতর্কতাবলম্বনের সুযোগ পাইলেন না। বিশেষতঃ তিনি তখন নিরস্ত্র। বেগবান, তেজস্বী অশ্ব এই প্রচণ্ড আঘাতে প্রপীড়িত হইয়া, ভয়ে সম্মুখের দুই পা উর্দ্ধে তুলিয়া, পশ্চাতের পদদ্বয়ে দণ্ডায়মান হইল। তাহার পর গাড়ীর 'হল্‌কা' হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টায় পথ ছাড়িয়া পথিপার্শ্বস্থ ঢালু জমীতে লাফাইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই সাহেব ও মেমসাহেব টম্‌টম হইতে উল্টাইয়া পড়িয়া ধরাশায়ী হইলেন। ঘোড়া সেই অবস্থায় খালি টম্‌টম টানিয়া লইয়া নক্ষত্র-বেগে সাহেবের বাঙ্গলোর দিকে ধাবিত হইল! সাহেব ও মেমসাহেব কঠিন মৃত্তিকায় সবেগে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় আহত হইলেন। আতঙ্কে ও আঘাতে মেমসাহেবের চেতনা বিলুপ্ত হইল। হাম্‌ফ্রি সাহেবের মাথার চামড়া ফাটিয়া রক্তের স্রোত বহিল; এবং তাহা তাঁহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিয়া পরিচ্ছদ সিক্ত করিল!

আমাদের দেশের অশিক্ষিত কৃষিজীবী প্রজার দল স্বভাবতঃ নিতান্ত নিরীহ,—প্রবলের শত অত্যাচার তাহারা নীরবে সহ্য করে। সহজে তাহারা উত্তেজিত হয় না,—'নসিবের লেখা' বলিয়া,—নিরাশ্রয়, নিরুপায় স্ত্রী-পুত্রাদির মুখের দিকে চাহিয়া, চড়, কিল, ঘুসি, চাবুক, পদাঘাত অবনত মস্তকে পরিপাক করে। কিন্তু যদি দৈবাৎ একবার তাহাদের ধৈর্য্যের বন্ধন শিথিল হয়, একবার তাহারা ক্ষেপিয়া যায়—তাহা হইলে তখন তাহারা 'মরিয়া' হইয়া উঠে। স্ত্রী-পুত্রের মুখ ভুলিয়া যায়, ভবিষ্যৎ দণ্ডের বিভীষিকা তাহাদিগকে সংযত করিতে পারে না। প্রতিহিংসার বিষে তাহারা এরূপ জর্জ্জরিত হইয়া উঠে যে, তখন কোন অপকর্ম্মেই তাহারা কুণ্ঠিত হয় না! তাহারা পিশাচের ন্যায় ক্রূর,, ভীষণ নিষ্ঠুর প্রকৃতি লাভ করে; তাহাদের মাথায় 'খুন চাপে।'—সাহেব ও মেমসাহেবের এই রূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও যদু মণ্ডলের অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল না। সে বিপন্ন, আহত হাম্‌ফ্রি সাহেবকে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করিল। তাহার আহ্বানে তাহার দুইজন সহযোগী অদূরবর্ত্তী আর একটি ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া, সাহেবকে দুই-চারিটা কিল-চড় মারিল। তাহার পর তাঁহাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করিবার জন্য, তাঁহার দুই পা ধরিয়া, সেই চষা জমির উপর দিয়া হড়-হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। সাহেব প্রাণভয়ে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মেমসাহেবও সংজ্ঞালাভ করিয়া, হাউ-মাউ শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। কি শোচনীয় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!

তাঁহাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়াই হউক; আর দৈবক্রমেই হউক, জনাব সেখ নামক সাহেব-সরকারের প্রজা সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র যদু মণ্ডল

ও তাহার সহযোগিদ্বয়, সাহেবকে নদীকূলে ফেলিয়া রাখিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।—জনাব সাহেবকে তুলিয়া বসাইল। তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, সে তাঁহাকে ও মেমসাহেবকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বাঙ্গলোয় রাখিয়া আসিল।—ঘোড়া, টম্‌টমখানি জখম করিয়া, আরোহীহীন টম্‌টম-সহ পূর্ব্বেই কাছারী-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সাহেব ও মেমসাহেবকে টম্‌টমে না দেখিয়া, কাছারীর আমলা ও পরিচারকবর্গ গভীর গবেষণায় কাছারী সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। ইত্যবসরে রক্তাক্ত কলেবর সাহেব ও ধূলিধূসরিত মেমসাহেবকে স্খলিত-পদে কাছারী-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নিদারুণ আতঙ্কে সকলের হাত-পা পেটের ভিতর প্রবেশ করিল; তাহারা স্ব-স্ব চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, বিস্ফারিত নেত্রে ভয় ও বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

মেঘ

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল]

ধ্বনি ডম্বরু অম্বর-পথে
 এস, এস, এস—এস মেঘ!
ঈশানের নিঃশ্বাসের সমান
 ওই বাতাসের বাড়ে বেগ।
অশ্বত্থের আর্ত্ত-নিনাদ,
 তীব্র বিলাপ তটিনীর,—
ছাপি সমস্ত এস বাজাইয়া
 তব ডম্বরু গম্ভীর।

এস, এস, এস বর্ষা-জলদ,
 কান্ত স্নিগ্ধ, শ্যামকায়!
বিধুরা ধরণী অধীর পরাণে,
 প্রিয়তম, তোমারেই চায়!
নিদাঘ-অন্তে আলস-লুলিতা
 এলায়ে পড়েছে—মন্থর
তোমারি আকুল আহ্বান-গানে,
 বিহ্বল সারা অন্তর।

বরষার মেঘ, বরষার মেঘ
 ভরিয়া ভরসা বক্ষে—
লাগাইয়া দাও স্নেহ কজ্জল
 দিগ্‌বালাদের চক্ষে।
পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে সারা
 মাখাইয়া দাও মায়া-ঘোর;
শতেক স্বপন জাগাইয়া দাও—
 ঝরাইয়া দাও—স্নেহ-লোর।

আষাঢ়ের মেঘ এস, এস, এস
 আশার স্বপ্ন-সহচর!
ভাসাইয়া দাও মধুর স্মৃতির
 প্লাবনে মানস-সরোবর।
আমার অতীত অলকা—তোমার
 ছায়া ও আলোকে গড়ে দাও;
ও মায়া-মোহন সুখের বেদনে
 শূন্য হৃদয় ভরে দাও।

নারীর কথার আর এক দিক

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ]

নারী আজ জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়া, সভ্য জগতে একটা আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী, চিন্তাশীল, ভবিষ্য দ্রষ্টা অনেকেই আনন্দের সহিত এই জাগরণকে অগ্রসর হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কেহ-কেহ বা, ইহা হইতে সমাজ-বিপ্লব সূচিত হইতেছে মনে করিয়া, ভীত হইয়া উঠিতেছেন। আশঙ্কাটা পুরুষ-মহলেই বিশেষ রূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে;—এই জন্যই তাঁহারা বেশী করিয়া চেঁচামেচি করিতেছেন।

বিদেশের কথা ছাড়িয়া দেই—ধরণীর একটুখানি কোণ জুড়িয়া আমাদের এই শ্যামা বঙ্গভূমিতেই নারী আজ চিন্তিত হইয়া উঠিতেছেন, আপনাদের অবস্থা ভাবিয়া; এবং তাহা লইয়া তিনি মাসিকপত্রাদিতে আলোচনা পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

সম্প্রতি যে লেখিকার লেখা লইয়া পুরুষ-মহলে বিশেষ রকম ভয় ও ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহাতে আমাতে সই পাতানো চলে; কারণ, তাঁহার নাম আমার নামের সহিত এক। ইহার জন্য তাঁহার লেখার সমালোচনা করিতে গিয়া, কেহ-কেহ আমাকেই তীব্র ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।

দেশের বর্ত্তমান বিধি-শাস্ত্র, আচার-নিয়ম যে আমাদের উন্নতির পথের অনুকূল নহে, এবং পুরুষই যে অধিকাংশ স্থলে এই সমস্ত অন্যায় বিধির প্রবর্ত্তক, সে বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইয়াও, তাঁহার মতই পুরুষকে আমাদের অধঃপতনের একমাত্র বা মূল কারণ বলিতে পারি না। এই-খানেই তাঁহার সহিত আমার মতের অনৈক্য আছে; এবং এই কারণেই পুরুষ জাতির প্রতি তাঁহার মতই আমি গভীর বিদ্বেষ বা বিরাগের ভাব পোষণ করিতে পারি না।

কোনও একজন বিদেশীয় পুরুষের লেখায় পড়িয়াছিলাম যে, নারী মাত্রেই আপনার জাতিকে অত্যন্ত ভালবাসে, এবং তাহার বিষয়ে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হইয়া আলোচনা করে। এ কথা কতদূর সত্য তাহা জানি না; তবে আমাদের সংসারের নিত্যকার ব্যবহারের মধ্যে এই কথাটা সত্য হইয়া যে প্রকাশ পায় না, ইহা ঠিক। তবে নারী-মঙ্গল-কামী যে একদল লোকের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে নারী যাহারা, তাঁহারা যে সত্য-সত্যই সমগ্র প্রাণ দিয়া আপনার জাতিটিকে ভালবাসিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এবং এই ভালবাসা নিজেকে সতেজ ও জীবন্ত রাখিবার উপাদান সংগ্রহ করিতেছে; এই চিন্তা হইতেই, যে সমাজ আমাদিগকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে, আমাদিগের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করিতেছে; এবং এই কারণেই, আমাদের যে ভালবাসা প্রাপ্য হইয়াও মাপে কম হইয়াছে, তাহাকে পূরণ করিয়া দিতে হইবে আমাদিগকেই।

সমাজ আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে সত্য, কিন্তু অত্যাচার করিল কেন? এমন তো দিন ছিল, যখন সে অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশের নব্যপন্থীরা যখন নর-নারীর সমান অধিকার লইয়া মাতিয়া উঠেন, তখন তো অনেক প্রাচীন-পন্থীকে শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া অনেক শ্লোকামৃত উঠাইতে দেখি, যাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পুরাকালে সাম্যই ছিল সমাজের মূল ভিত্তি।

অবস্থার বৈগুণ্যে বা নিজের কর্ম্ম-দোষে নারী আপনার সমান অধিকার হারাইয়া বসিল। যখন বৈষম্যের সৃজন হইল, তখন তাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয়োজনকে বাধা দিবার জন্যে নারী যে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, এমনতর প্রমাণ ইতিহাস আমাদিগকে দেয় না।

বৈষম্যটা যে অমঙ্গলের হেতু, ইহা নারী বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই সন্দেহ হয়। কারণ, আজিকার দিনে সে যখন বুঝিয়াছে, তখন দেশে-দেশে সে যে ভীষণ আন্দোলন তুলিয়াছে, তাহার দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, বলের অভাব-হেতু সাম্য হারাইলে নারী এতদিন নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিত না। যে হাতুড়ির ঘায়ে সে দোকানের দরজা-জানালা ভাঙ্গিয়াছে, তাহারই ঘায়ে সে সাজান সংসারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিত—তবু আপনার সন্ততিকে অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা করিত।

সকল পতিকেই দেবতা না ভাবিয়া অধিকাংশেরই দেবত্বের উপর সন্দেহ করিলে (যেমন সখী তাঁহার কোন একটা প্রবন্ধে করিয়াছেন) যে সকল পুরুষ চঞ্চল হইয়া উঠেন, তাঁহারা যদি আমার কথায় নারীর বুদ্ধির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন, সেই জন্যই বলিয়া রাখিতেছি,—পুরুষও ইহা বুঝেন নাই যে, বৈষম্য, কালে তাঁহার এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশের অকল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। তবে পুরুষের অবিবেচনা বা অদূরদর্শিতার কথা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নহে বলিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার প্রতি আমি বিরক্ত বা বিদ্বিষ্ট নহি—তাঁহাকে আমার প্রতি অবিচারের মূল কারণ বলিয়াও আমি মানি না; কাজেই তাঁহাকেই তীব্র ভাবে আক্রমণ করিলে আমার নারী-মঙ্গলের কার্য্য সফল হইয়া উঠিবে, এমন ভরসাও আমার নাই। আমার পথ চলার শক্তি আমার মধ্যেই সঞ্চয় করিতে হইবে—অপরের সহায়তায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিব না বলিয়া বিশ্বাস হয়। তাই পুরুষের নিকট হইতে বেশী প্রত্যাশাও করিতে চাহি না। তিনি যদি নিজেকে দেবতা বলিয়া মানাইতে চাহেন, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আমার জাতিটিকেও এই সঙ্গে দেবী বলিয়া মানিতে থাকেন। সমষ্টি-গত ভাবে তাঁহার এবং আমার আখ্যা ভিন্ন হওয়াটাতেই আমার ভীষণ আপত্তি আছে। যদি কোনও পত্নী-(individual wife) বিশেষ পতির নিকট দেবীর সম্মান না পাইয়াও দেবতাজ্ঞানে পতির পূজা করিতে চাহেন, তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার পক্ষপাতিনী আমার আপত্তি করিবার কারণ নাই; কিন্তু সমাজ যে বিবাহিতা নারী-মাত্রকেই তাহার পতিকে দেবতা বলাইবে,—ইহা আমি সমাজের দিক হইতে অন্যায় বলিয়াই মনে করিব এবং করি ও।

সখী আমার বিবাহিতা হিন্দুনারী হইয়া যে এতটা জোরের সহিত কোনও-কোনও পতির দেবত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আজ শুধু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিক হইতেই যুগধর্ম্মের বিকাশ দেখিয়া, অন্তর আমার আনন্দিত হইয়া উঠিতেছে।

যাক্, আসল কথা হইতে অবান্তরে অনেক দূরে আসিয়া পড়িতেছি। হারানো সাম্যকে পুনঃ প্রাপ্ত হইতে গেলে নারীর দিক হইতে প্রবল প্রচেষ্টা চাই। কিন্তু এই প্রচেষ্টাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইলে, ভাবিতে হইবে, কেন নারী ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখে নাই।

স্বয়ম্ভুব মনুর দুই সন্তানের মধ্যে নারীই প্রথম ভাবিয়া দেখিয়াছিল কল্যকার খাদ্য-সংস্থানের কথা। সেই জন্যই সে খাদ্যকে অগ্নি বা তাপ সংযোগে সংস্কৃত করিয়া পচন নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল;—আজিকার খাদ্য আগামী দিনেও ব্যবহার করার উপযোগী করিয়াছিল। দেহ-সজ্জাকে অনিত্যতার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য বস্ত্র-বয়ন ও নির্ম্মাণের দিকে মনোযোগ দিয়াছিল সে-ই। দৃষ্টি যাহার দূর-প্রসারিত, সে কেন বৈষম্যের এই নূতন নিয়মকে আপনার অন্তর্দৃষ্টির কষ্টি-পাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লয় নাই,—ইহাই তো আজ জিজ্ঞাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহার মূলে পুরুষের আত্মসুখ-লিপ্সা থাকিতে পারে না। তাহাই যদি হইত, তো, নারী এত সহজে আপনার অধিকার ছাড়িয়া দিয়া, এমন নিশ্চিন্তভাবে এতদিন থাকিতে পারিত না।

মন-বিশিষ্টা হইয়াও নারী প্রথমতঃ জনয়িত্রী। সভ্য কি অসভ্য জগতে, ধরণীর যেথানেই হউক না কেন, ছোট বড় সকল নারীই এই জন্মগত মাতৃ-মনের পরিচয় নানা রূপেই মানব-সমাজের নিকট আবহমান কাল হইতে দিয়া আসিতেছেন; জীব-ধাত্রীর এই জীব-সৃষ্টি করিবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা, তাহাই, আমার মনে হয়, নারী-প্রকৃতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—বর্ত্তমান বৈষম্যকে সৃজন করিয়াছিল। আপনারই দেহের রক্ত-মাংস দিয়া আপনার বা আপনার প্রিয়জনের অনুরূপ এই যে একটী নূতন জীব-সৃষ্টি, ইহাতে যে কি আনন্দ, তাহা জননী ছাড়া, যাঁহারা মনের সাহায্যে শিল্প বা আর্টের জগতে কিছু একটা সৃজন করিয়াছেন, তাঁহারাও কিছুটা বুঝিতে পারিবেন। মৃত্যু-যন্ত্রণার মত অসহ্য ব্যথা ভোগ করিয়া নারী যাহাকে জন্ম দিল—নিজের জীবন সংরক্ষার জন্য সে নারীরই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিল বহুদিন। নিজের দেহের অভ্যন্তরে, চোখে না দেখিয়া, নারী তাহাকে তিল-তিল করিয়া বহুদিন ধরিয়া তো রচনা করিলই। তাহার পর তাহাকে পুষ্ট, পূর্ণাবয়ব, শক্তিমান করিয়া তুলিতে প্রয়োজন হইল নারীরই বক্ষ-রসধারা। সৃজন-কার্য্য তাহার চলিল অনেক দিন ধরিয়াই। আর সৃষ্টি তাহার প্রতিদিন দেহ-মনের নব-নব রূপের উন্মেষে তাহার চিত্তকে আনন্দে-বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল। কোন ভাস্করের পাথর কুঁদিয়া কলালক্ষ্মীর রূপকে বিকশিত করিবার, কোন কবির ভাবের রাশিকে ভাষায় ছন্দে লীলায়িত করিবার, কোন শিল্পীর মানস-প্রতিমাকে বর্ণে রেখায় ফুটাইয়া তুলিবার সময় মনে আসে বহির্জগতে আপনার পদ এবং স্থানের কথা। নয়নে তাহার স্বপ্নাবেশ,—অন্তরে তাহার বিপুল সুখ,—তাহাকে মত্ত করিয়া রাখে;—তাহার দিক্-বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। নারীর হইয়াছিল তাই। উত্তরাধিকার সূত্রে এই বিপুল সুখের চিন্তাটা নারী দিয়া গেল তাহার পরবর্ত্তী বংশীয়াদিগের চেতনায়। তাই, উত্তর কালের নারী-জাতি, সুপ্ত চৈতন্যের রাজ্যের প্রায়-অজানিত এই সুখ-সম্ভাবনার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত তাহার জীব-ধাত্রী হইবার সহজ ইচ্ছাকে (maternal instinct) তাহার বিবেচনা-বুদ্ধির (intelligence or rationality) উপর জয়লাভ করিতে দিয়াছিল।

শারীর-তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, সন্তানের জন্ম জননীর জন্য লইয়া আসে,—অসহ্য বেদনা ও সৃষ্টির আনন্দ; এবং তাহার পর এই বেদনা ও আনন্দ হইতে উদ্ভূত এক বিপুল অবসাদ—যাহা তাহার শরীর-মন উভয়কেই কতকটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অবসন্ন দেহ-মন লইয়া নারী আপনার অধিকারের দাবী রক্ষা করিবার দিকে যত্নবতী হয় নাই। বরং সে অলস ভাবাবিষ্ট হইয়া অনেক-খানিই পুরুষের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছিল। রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি পুরুষের মধ্যে সহজ,—তাহার দেহের গঠনও ঐ কার্য্যের উপযোগী। তাহার উপর, তাহার যে প্রিয়া তাহারই অনুরূপ একটী ক্ষুদ্র অসহায় জীবকে গঠন করিয়া তাহাকে উপহার দিল, সেই প্রিয়ার ব্যথা-ক্লান্ত দেহখানির সকল ক্লান্তি অপনোদন করিবার জন্য উৎসুক সে—প্রিয়ার অনেক কর্ত্তব্যই আপনা হইতে পালন করিয়া দিল—প্রেমের খাতিরে। প্রেম-প্রণোদিত হইয়াই পুরুষের এই সাহায্য নারী হাসিমুখে গ্রহণ করিল; আর এই গ্রহণ দ্বারা প্রণয়াস্পদকেও পরিতৃপ্ত করিল দেখিয়া আপনিও তৃপ্ত হইল। তাই যখন সন্তান-জনম-জনিত শরীরের এই অবশ্যম্ভাবী গ্লানি কালে দূর হইয়া গেল, তখন সে পুরুষের মনে ব্যথা দিবার ভয়ে আপনার অধিকার পুনঃ গ্রহণ করিল না।

প্রিয়ার এই কর্ত্তব্য-বিমুখতাকে প্রশ্রয় দিল পুরুষও বটে; কারণ, নারীকে দুর্ব্বল ভাবিয়া, তাহার কর্ত্তব্য করিয়া দিতে পুরুষ একটা প্রবল আনন্দ লাভ করিতেছিল। তাহা ছাড়া, শক্তির প্রকাশ দেখাইয়া নারী-চিত্ত জয় করিবার ইচ্ছা যে পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক। ফল হইল এই যে, শেষে পুরুষ নারীকে বাস্তবিকই দুর্ব্বলা বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল; এবং নারীর দিক হইতেও শক্তির অব্যবহারের দরুণ শক্তিতে মরিচা ধরিয়া গেল। এমন করিয়াই কালে, যাহা পুরুষের সময়-বিশেষে পালনীয় ছিল, তাহা নিত্য-করণীয় হইয়া উঠিল।

মানুষের চিন্তা ও কল্পনা, মানুষের বুদ্ধি ও কার্য্যকরী শক্তি—মানুষ শুধু আপনার দেহ-মনের সৌষ্ঠব ও উন্নতি

সম্পাদন-কল্পে প্রয়োগ করে না,—ক্ষণিক সুখকে স্থায়ী করিবার জন্যও করে; এবং এই সুখ-লিপ্সা তাহাকে অনেক সময়ে ধ্বংসের মুখে লইয়া যায়। তাহার চিন্তা ও কল্পনা-শক্তি আছে বলিয়াই, বিবেচনা-বুদ্ধিকে সে যখন সহজ-বুদ্ধির করতলগত করিয়া দেয়,তখন ফল হয় মারাত্মক;—যাহাদিগকে আমরা "রিপু" বলি, তাহাদিগের জন্ম হয়। এখানেও নারী যখন আপনার সহজ-বুদ্ধিকে বড় করিয়া তুলিল, অথচ চিন্তাকে হারাইল না,—তখনই একদল নারীর সৃষ্টি হইল, যাহারা হইল, না মাতা, না জায়া, না ভগ্নী, না কন্যা;—আর কিনিয়া লইল আপনাদিগের জন্য ভুবনের কলঙ্ক। সহকর্ম্মিণী, সহধর্ম্মিণীর স্থান ছাড়িয়া দিয়া নারী আপনাকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিল; মাধবীলতার শ্যামলতা স্বর্ণলতার উজ্জ্বলতায় পরিণত হইল বটে, কিন্তু সে চাহিয়া দেখিল না যে, সহকার-তরুর জীবনরস শোষণ করিয়াই কান্তি তাহার পুষ্ট হয়!

স্ত্রীকে শুধু স্ত্রীরূপে পাওয়ার অভিলাষকে এতটুকু দমন না করিয়া, অত্যুগ্র আগ্রহে পুরুষও স্বর্ণলতিকাকে প্রশ্রয় দিল। তাহার পরই সে সকল নারীকেই বিলাসের সামগ্রী বলিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল; এবং শাস্ত্রে, সংহিতায় তাহার উপর হীনতার আরোপ করিয়া শ্লোকের বন্যা ছুটাইয়া দিল। নারী-চিত্ত জয় করার যে গর্ব্ব, তাহাকে আপনার ইচ্ছাধীন রাখিতে যে সুখ, তাহাকেই পৌরুষ বলিয়া মানিয়া লইয়া, সুখকে স্থায়ী করিবার আকাঙ্ক্ষায়, সে খানিকটা বুদ্ধি খরচ করিয়া, বিধি-নিয়ম রচনা করিয়া ফেলিল।

আপনার অলসতাকে প্রশ্রয় দিতে-দিতে নারীও নিজেকে শক্তিহীনা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার উপর এই নূতন শ্রেণীর নারীর উদ্ভবে সে লজ্জায় সরমে মরিয়া গিয়া, আপনাকে ছোট করিয়াই দেখিতে লাগিল। সুতরাং সে এই সকল বিধি-নিয়মের প্রতিবাদ করিল না। নব সৃষ্টির লজ্জাহীনা সর্ব্বনাশী রূপ যে নারীর প্রকৃত স্বরূপ নহে,—বিকৃত রূপান্তর, তাহা তখন তাহার শঙ্কাচ্ছন্ন চিত্তের নিকট প্রতিভাত হইল না। কাজেই সে ভয়াতুর হৃদয়ে মানিয়া লইল যে, ধ্বংসের বীজ সংসার-ক্ষেত্রে সে-ই বপন করিয়া দেয়। সেই জন্যই তাহার এই রূপান্তরের প্রতি যে অশ্রদ্ধা, অসম্মান পুরুষের ভাষায়, কাজে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল, তাহার কলঙ্ক নিজের হাতে সে আপনার অঙ্গে লেপিয়া দিল; এবং আপনার পায়ের বেড়ি নির্ম্মাণের সহায়তা আপনার অজ্ঞাতসারে আপনিই করিয়া দিল।

এমনি করিয়াই, না বুঝিয়া, সমগ্র নারী-জাতিটা গেল ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইয়া। কাল-গহ্বর যখন পায়ের কাছে অন্ধকার হা মেলিয়া দেখা দিল, তখন তাহার চেতনা আসিল যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাই পুরুষ দিল নারীর দোষ; আর অপর পুরুষকে ডাকিয়া বলিল, "সাবধান! মুক্তি যদি চাও তো কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কর।" আর নারীকে বলিল, "তোমায় লইয়া যাত্রা-পথে কেমন করিয়া যাই,—কাজ যে আমার তাহা হইলে হয় না; তুমি যে পদে-পদে বাধা হইয়া দাঁড়াও!" আর নারীও পুরুষকে বলিল, "আমাকে সর্ব্বনাশী রূপে সাজাইলে তো তুমি! তোমার দৃষ্টিই তো লোভাতুর।" এবং কন্যাকে ডাকিয়া শিখাইয়া দিল, "ওরে, পুরুষ জাতিটা বাঘের মত ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—কেমন করিয়া আমাদের তাহাদের কবলে আনিয়া মরণেরও অধিক প্রাণহীন করিয়া দিবে! তুই সাবধান!"

দ্বন্দ্ব এমন করিয়া চলিয়া আসিতেছিল,—হঠাৎ পুরুষ এক দিন কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নারী, তুমি জাগো তোমার প্রকৃত স্বরূপটী লইয়া,—যে রূপে তুমি পিতৃ-পিতামহের কালে প্রকাশিত ছিলে,—একাধারে মাতা, কন্যা, জায়া।" আর নারীও সত্যের দিকে চোখ চাহিয়া দেখিল, বিকৃত রূপের কলঙ্ক, অপমান তাহার নারীত্বকে স্পর্শ করে না; এবং সেই জন্যই সে দেখিল যে, যে সকল অধিকার সে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ খোয়াইয়া বসিয়াছিল, তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার বড় প্রয়োজন; নহিলে তাহার নারীত্বের প্রকৃত রূপ ফুটিয়া ওঠে না। তাই সে আজ প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছে,—জীবন-ক্ষেত্রে সাম্য আনিয়া পুরুষের সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণী হইবার; এবং সংগ্রাম করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, যে কলঙ্কের বোঝা তাহার ঘাড়ে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাহার নহে; এবং তাহার একেলার ত নিশ্চয়ই নহে।

সত্য আজও সংস্কার ও প্রথার কুহেলীতে আচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া, নরনারী উভয়েরই মধ্যে বিশ্বাস ও বিবাদ বিসংবাদ চলিতেছে; দ্বন্দ্ব-সন্দেহের অবসান হয় নাই। কিন্তু চিন্তা-আলোচনার দখিণা বাতাসে বসন্তের আগমনের আশ্বাস আনিতেছে। তাই আশা হয় যে, নূতন যুগের সত্য সূর্য্য মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশে দীপ্ত তেজে বুঝি এই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সীবনাঞ্জলি

[শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়]

তৃতীয় পর্য্যায়

জামার-মাপ—লম্বা, ছাতি, কোমর, পুট, পুটহাতা, সেস্ত, গলা, মোহুরী, মোহোড়া, সেকম, ঠিকদরাজ, (পেণ্ট লম্বা) পাছা, হাঁটুবেড়—সচরাচর এই মাপগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লম্বা মাপ ;—লম্বা অর্থে জামার ঝুল। প্রথমতঃ জামার মাপ লইতে হইলে, কাঁধে যে একখানি মোটা শিরা আছে, সেই শিরাকে লক্ষ্য রাখিয়া, গলার গোড়ায় ফিতা রাখিয়া প্রত্যেক জামার লম্বা মাপ লইতে হয়। মোটামুটী কয়েকটী জামার মাপ এইখানে উল্লেখ করিলাম। অধিকাংশ সময়ে জামার মাপ গ্রাহকের পছন্দ অনুযায়ী লইতে হয়।

ফতুয়া মাপ—গলার গোড়ায় ফিতা রাখিয়া, নাভির ৬" ইঞ্চি নিচে নিলেই লম্বা মাপ লওয়া হইল।

পাঞ্জাবী মাপ—গলার গোড়ায় ফিতা রাখিয়া, হাঁটুর ১" ইঞ্চি নীচে পাঞ্জাবী লম্বা মাপ লওয়া হয়।

সার্ট লম্বা মাপ—গলার গোড়ায় ফিতা রাখিয়া, হাঁটুর ২" ইঞ্চি উপরে সার্ট লম্বা মাপ লওয়া হয়।

বাঙ্গলা কোট লম্বা—গলার গোড়ায় পেছনের দিকে মেরুদণ্ডের ও গলার অস্থির সংযোগ-স্থলে ফিতা রাখিয়া, ডান হাত ঝুলাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মাথা পর্য্যন্ত ফিতা যতদূর পড়িবে, তত ইঞ্চি হইল কোটের লম্বা। পার্শিকোটের লম্বা হাঁটুর ২" ইঞ্চি উপরে লইতে হয়। নানা জাতীয় কোট আছে ; তাহা পর-পর কোটের চিত্রের সঙ্গে বুঝান হইবে।

ছাতির মাপ—প্রথমতঃ মাপের ফিতার দ্বারা বুকের (মাইয়ের) উপর দিয়া ফিতাখানি বুকের চারিধার ঘুরাইয়া লইতে হইবে। বাম হাতের তর্জ্জনী আঙ্গুলটী ফিতার নীচে রাখিয়া, ডান হাতের দ্বারা ফিতাখানি বুকের চারিধার ঘুরাইয়া আনিয়া, বাম হাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ফিতা (Tape) খানি সংযোগ করিবে। সে সংযোগস্থলে যত ইঞ্চি হইবে, তাহাই ছাতির মাপ হইল।

কোমরের মাপ—নাভির ১" ইঞ্চি উপরে ফিতাখানি রাখিয়া, ছাতির মাপের মত ফিতাকে হাতে রাখিয়া, সংযোগ-স্থলে যত ইঞ্চি হইবে, তাহাই কোমরের মাপ।

পুট মাপ—পেছন দিকে কাঁদুড়ি অর্থাৎ বাম ও ডান হাতের সংযোগস্থল (শরীরের সহিত হাতের সংযোগ যেখানে) এই দুইটী স্থলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বাম হাতের সংযোগ-স্থলে প্রথম ইঞ্চি রাখিয়া, ডান হাতের সংযোগ-স্থলে আনিয়া যত ইঞ্চি হইবে, তার অর্দ্ধেক পুটের মাপ। আর হয় মেরুদণ্ডের ও গলার সংযোগস্থল হইতে কাঁদুড়ি (ডান হাতের সংযোগস্থল) পর্য্যন্ত পুট মাপ।

পুটহাতা মাপ—পুটের মাপ যেরূপ লওয়া হইয়াছে, সেই অবস্থায় ফিতা রাখিয়া ফিতাকে বরাবর ডান হাতের কব্জি পর্য্যন্ত বা কব্জির ১" ইঞ্চি নীচে পর্য্যন্ত আনিলে যত মাপ হইবে, তাই পুটহাতা মাপ নেওয়া হইল।

সেস্ত মাপ—গলা ও মেরুদণ্ডের সংযোগস্থলে ফিতা রাখিয়া কোমরের মাপ অবধি ফিতার যত ইঞ্চি হইবে, তাই সেস্ত মাপ হইল।

গলার মাপ—মাপের ফিতাকে বাম হাতের তর্জ্জনীর উপর রাখিয়া, ডান হাতের দ্বারা গলার চারিধার ঘুরাইয়া আনিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া সংযোগস্থলে যত ইঞ্চি হইবে, তাই গলার মাপ। এইটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে, গলা ও শরীরের সংযোগস্থলে ফিতার দ্বারা মাপ লইতে হইবে।

মোহুরী মাপ—সচরাচর হাতের কব্জির চারিধার ঘুরাইয়া লওয়ার নাম মোহুরী। প্যাণ্টের মোহুরী মাপ লইবার সময়, পায়ের গোড়ালির কিছু উপরে পায়ের যে গাঁট আছে, ঐ স্থানে ফিতাকে চারিধার ঘুরাইয়া লইয়া গ্রাহকের পছন্দমত ফাঁক রাখিয়া যত ইঞ্চি হইবে, তাই পায়ের মোহুরী মাপ বলিয়া পরিগণিত হয়।

মোহোড়ার মাপ—বগল ও কাঁদুড়ির চারিধার ঘুরাইয়া ফিতার দ্বারা মাপ লওয়ার নামই মোহোড়া। মোহোড়ার

মাপ না লইলেও কাজ চলে। ছাতির মাপের অর্দ্ধেক লইয়া, তার সঙ্গে ১" ইঞ্চি যোগ দিয়া যত হইবে তাই মোহোড়া মাপ। যথা—ছাতি ৩২" ইঞ্চি তার অর্দ্ধেক ১৬" +১" ইঞ্চি=১৭" ইঞ্চি রাখিলে ঠিক মোহোড়া মাপ হইল।

সেকম্ মাপ—প্যাণ্ট জাতীয় জামায় সেকমের মাপ লইতে হইলে, প্রথমতঃ দুই পায়ের সংযোগস্থলে প্রথম ইঞ্চি রাখিয়া, পায়ের ভিতর অংশে বরাবর সোজা ভাবে নীচের দিকে আনিয়া, পায়ের গাঁটের অংশ পর্য্যন্ত যত ইঞ্চি হইবে, তাই প্যাণ্টের (full pant) এর মাপ লওয়া হইল। হাপ প্যাণ্ট (half pant) এর মাপ হাঁটুর ১" ইঞ্চি উপরে লইতে হয়। ব্রিচেস্‌াদির (Breeches) মাপ প্যাণ্টের মাপ লইতে হইলে, (full pant) এর মত সেকম মাপ লইতে হয়।

ঠিক দরাজ মাপ—প্যাণ্টের (Pant এর) ঠিকদরাজই প্যাণ্টের লম্বা বলিয়া পরিগণিত হয়। ঠিকদরাজের মাপ লইবার সময় প্রথমতঃ ফিতাখানি বাম হাতের উপর রাখিয়া প্রথম ইঞ্চি নাভির ৩" ইঞ্চি উপরে ধরিয়া, গ্রাহকের পছন্দ মত ততদূর লম্বা দেওয়া দরকার, তাহাই ঠিকদরাজ মাপ। সচরাচর প্যাণ্টের লম্বা মাপ পায়ের গাঁট (পায়ের কব্জি) পর্য্যন্ত লওয়া হয়। হাপ প্যাণ্টের মাপ লইতে হইলে, হাঁটুর ১" ইঞ্চি উপরে লইলেই ঠিকদরাজ মাপ লওয়া হইল।

পাছার মাপ—নাভির ৬" ইঞ্চি নীচে পাছার মাপ লইতে হয়। পাছার চারিধারে ফিতাকে ঘুরাইয়া ফিতার উপর দিক দিয়া বাম হাতের তর্জ্জনীর ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মাপের ফিতা (Tape)কে ধরিয়া ডান হাতের দ্বারা ঘুরাইয়া—আনিয়া সংযোগস্থলে যত ইঞ্চি মাপ, তাই পাছার মাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

হাঁটু-বেড় মাপ—প্যাণ্ট (full pant)এর হাঁটুর মাপ লইবার সময় বাম হাতে ফিতা রাখিয়া, ডান হাতের চারিটা আঙ্গুল আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া যত ইঞ্চি হইবে, তাই হাঁটুর বেড় মাপ লওয়া হইল। কিন্তু ব্রিচেস্ এর (Breeches) মাপ লইবার সময় হাঁটুর টাইট মাপ লইতে হয়।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

আমাদের দেশে নারী-জাতির মেয়েলী শিক্ষা ও পরুষ শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা চল্‌ছে। কোন্ রকমের শিক্ষা নারীর নারীত্ব বা কোমলতা বজায় রাখ্‌তে পারবে, তাই আলোচনার বিষয়।

মানুষ (পুরুষ) জন্মের পর থেকেই তাঁর মানবত্বের অধিকার পান। তাঁর জন্ম থেকেই পুত্রের অধিকারের সঙ্গে মানুষের অধিকার, ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে মানুষের, ক্রমে স্বামিত্বের সঙ্গে মানুষের, শেষ পিতৃত্বের সঙ্গেও মানুষের অধিকার তাঁর বড় অধিকার,—মহৎ বস্তু হয়ে থাকে। তাঁর হৃদয়ে যে সব কোমল গুণ থাকে তা',—যে সব কঠোর পরুষ গুণ থাকে তা'ও,—মনুষ্যত্বের মাপকাঠি দিয়েই বিচার করা হয়,—পিতৃত্বের, স্বামিত্বের, ভ্রাতৃত্বের, পুত্রত্বের অধিকার দিয়ে হয় না। তাঁর ধর্ম্ম, চিন্তাশীলতা, প্রতিভা, বুদ্ধি, কর্ম্মপটুতা —সবই স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে। যদি ও-সব গুণ না থাকে, তা'হলেও তাঁকে, মানুষের অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত করবে না। এমন কি, যদি চপল, দুর্ব্বল, উচ্ছৃঙ্খল হ'ন, তাহলেও কেউ অধিকারচ্যুত করবে না। মানুষ জন্মান তাঁর বিপুল স্বাধীনতার বিচরণের ক্ষেত্রে, যেখানে কোনো পুত্রত্ব, কোনো স্বামিত্ব, কোনো পিতৃত্ব তাঁকে তাঁর অধিকার-ভ্রষ্ট, স্বাধীনতাচ্যুত,—নিষ্পেষিত করতে পারে না। বাল্যকাল থেকেই মার স্নেহে, বোনের আদরে তাঁর মনের সব বৃত্তিগুলি বিকশিত হতে থাকে। বড় হয়ে, স্ত্রীর প্রশ্রয়ে, কন্যার ভক্তিতে,—যা কিছু ভাল হবার, সব ফুটে ওঠে। সমাজের কাছেও তাঁর প্রশ্রয় পাওয়ার অন্ত নেই —যত ভুল, যত দোষ, যত ত্রুটী, সবই সমাজ (পুরুষ ?) সস্নেহে উপেক্ষা করে চলেছেন। সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত, কর্ম্মী অজস্র; মানব-সমাজের অর্দ্ধেক জাতকেই সে কর্ম্মী করে রেখে দিয়েছে। ঐ কর্ম্মীর পারিশ্রমিক তার মানুষ

হিসেবে দিতে হয় না। বলদৃপ্ত কণ্ঠে, রক্ত চক্ষে সে এদের কাছ থেকে কর্ত্তব্যের সবটুকু কেড়ে নেয়। কাজেই প্রকৃতির দুলাল মানুষ তাঁর সমস্ত অধিকার, মানব জন্মের যা কিছু সবই ভোগ করেন, ত্যাগ করেন। তাঁর ভোগেও মহিমা আছে, ত্যাগেও মহিমা আছে। কর্ত্তব্য তাঁর কাছে কঠোর খুব কমই হয়; কেন না, অবাধ স্বাধীনতা আছে। অধিকার তাঁর কাছে তুচ্ছ, কেন না, হারাবার ভয় তাঁর কোনো দিন নেই। সমাজ যদি বা কখনো তাঁকে ত্যাগ করেন, স্নেহ কোনো দিন তাঁকে ত্যাগ করে না। কাজেই জীবনের সবচেয়ে বড় সহায় তাঁকে বড় একটা হারাতে হয় না।

এই মনুষ্যত্বের মাঝ দিয়েই মানুষ ঋষি কবি, সাধক, জ্ঞানী, গুণী হয়ে ওঠেন;—আবার বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, তাও হন। মানবত্বের যা কিছু সত্য, যা কিছু বাস্তব,—সবই তাঁর অবাধে ফুটে ওঠে; কোনো সমাজপতির কাছে তাঁকে তাঁর জ্ঞানলিপ্সার, ধর্ম্মানুসন্ধিৎসার, কবিকল্পনার কৈফিয়ৎ দিতে হয় না,—তাঁর জন্মগত মানবত্বের অধিকার আছে। বিদ্যার্জ্জনে তাঁকে বাধা দেবার কেউ নেই,—শিক্ষা তাঁর সহজে লাভ হতে পারে। জীবনযাত্রায় তাঁকে কারুর মুখাপেক্ষা করতে হয় না। কর্ত্তব্য তাঁর আছে, মানি; কিন্তু সে, তাঁর কর্ত্তব্যের বোঝা নয়, আনন্দের;—যে বোঝা তিনি ইচ্ছে করলেই ফেলে দিতে পারেন,—সমাজ তাঁকে সে অধিকার দিয়ে রেখেছেন। তিনি যেটুকু বোঝা বহন করেন, তার চেয়ে ঢের বেশী দুঃখের বোঝা বহন করান। সকল তাতেই তাঁর মানুষের অধিকার পূরো আছে। কেউ তাঁকে কোনো বিষয়ে সহজে বঞ্চিত করতে পারে না।

এই যে মানুষের অধিকার, এ কি মানবীরা জন্মের আগে, জন্মের সঙ্গে, জন্মের পরে, মৃত্যুর পরেও পান? জন্মের আগে কোনো স্বজনেরই কন্যাকাঙ্ক্ষা থাকে না; কারণ কন্যা কন্যাই, সে মানুষ নয়। জন্মের পর, প্রথমে কন্যা—তখনি, কিম্বা পরে ভগিনী। শিশুকাল থেকেই কন্যা আদরে, প্রশ্রয়ে, স্নেহে সকল বিষয়েরই অধিকারে পুত্রের কাছে খর্ব্ব। অনেক পিতামাতাই ঐ অধিকারহীনতা, সামাজিক উপেক্ষা, খর্ব্বতা, স্নেহে প্রশ্রয়ে আদরে ঢেকে রাখতে চান; অর্থে মিটাতে চা'ন। কিন্তু যা অপ্রাপ্য, তা অপ্রাপ্যই রয়ে যায়। এর পরে পত্নীত্বের অধিকার খুব বড় না হোক, মাঝারি করে ধরা হয়। তাতেই বা মানুষের, মানবীত্বের অধিকার কোথায়? স্বামীর সহৃদয়তা, স্নেহ-ভালবাসা পেলে নারীত্বের কতকটা সার্থকতা হয় মানি; কিন্তু তাতে মনুষ্যত্বের অধিকার কোথায়? আপনাকে অর্পণ করে যে ভালবাসা, যে মনুষ্যত্বের বিকাশ, সে নিজত্বই যে নারীত্বের মধ্যে নাই। আর ঐ যে সহৃদয়তা, মমতা,—ওটা যেখানে নেই, সেখানে কি অধিকার নারীত্বের আছে? যে উৎপীড়িত মনুষ্যত্ব অত্যাচারের প্রতিকার করতে পারে না অধিকার নেই বলে, তাকে কি করে সহিষ্ণুতা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে? সমাজে যাঁরা পরোক্ষে, সমক্ষে নির্যাতিতা হচ্ছেন কারণে অকারণে;—কবে, কোন্ যুগে, কোন্ বিশৃঙ্খল সমাজে, যে আদর্শ গড়া হয়েছিল একদিন তাঁদের জন্যে, আজও যাঁদের সেই আদর্শেরই মাপকাটিতে বিচার করা হয়;—মানবজাতির অর্দ্ধাংশ আজ নবযুগে যে সুবিধা, যে স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী, বাকি অর্দ্ধাংশ তার সঙ্গে-সঙ্গে শুধু তার উচ্ছিষ্ট-কণা ভোগ করতে পান,—কোনো মনুষ্যত্বের অধিকারে তার অংশ নিতে পারেন না। এ কি সত্যই নারীজাতির অধিকারহীনতা নয়? দুটো বড় অধিকার নারীদের আছে বলা হয়; তার মধ্যে একটী মাতৃত্বের। তারই বা সম্মান, অধিকার কতখানি? ওটা কি একটী মন-ভোলানো কথা নয়? মাতৃত্বের লাঞ্ছনা, অবমাননার ত অভাব নেই। স্বামিত্বের কি পিতৃত্বের অধিকারই যেমন মানুষের অধিকার নয়,—স্বামীর কর্ত্তব্যই মানুষের কর্ত্তব্য, বা পিতার কর্ত্তব্যই মানুষের কর্ত্তব্য নয়—তেমনি কি পত্নীত্ব বা মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই নারীর সব কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল,—সব অধিকার পাওয়া হয়ে গেল?

কোন্ পুরাকালে, কোন্ আদি-জননী আপনাদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করে নিয়েছিলেন, কিম্বা পুরুষকে সস্নেহ-প্রশ্রয়ে উপেক্ষা করেছিলেন, তখন তাঁদের সমাজের গড়ন কেমন ছিল? বাস্তবিক, নারীরা অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন কি না, আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন কি না, তার কোন ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর আজও যে নরনারীর মধ্যে অধিকারের আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে, সেও তখন থেকেই রয়েছে—মেনে নেবার দরকার করে না। তখনকার সভ্যতার সহিত এখনকার সভ্যতার অশেষ প্রভেদ

হয়ে গেছে। যখন সেটা উভয়তঃ সুবিধামূলক নীতিতে গড়া হয়েছিল, এখন হয় ত সেই উভয়তঃ সুবিধামূলকতা নেই। সমাজ ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে মানুষ ব্যস্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু যা ভাঙ্গবার, তা' যোড়া থাকে না,—তার সুফল কুফল উত্তর পুরুষে দেখতে পাওয়া যায়। ভাঙ্গবার সময়ে স্তূপাকার আবর্জ্জনা থেকে যায় বলে' তার গঠন চোখে পড়ে না। আমাদের এখন যে সমাজ গড়ে উঠছে, তার প্রতি মানুষে স্বনির্ভরতা ফুটে ওঠা চাই, নরনারী নির্ব্বিশেষে। নরনারী সহযাত্রী হয়ে পাশাপাশি চলবেন; নারীর স্থান পিছনে বা পায়ের কাছে হবে না। নারীর আদর্শ, কাজ, চিন্তা, আশা, কল্পনা যে পুরুষের সঙ্গে মিলবে, তার কোনো মানে নেই। তাঁর প্রতিভা নিজের ক্ষেত্রেই জাগবে, পুরুষের নির্দ্দেশে নয়।

এই জাগরণের জন্যে যে শিক্ষার দরকার, সে শিক্ষা প্রথমেই কি আত্মনিভরতা শেখাবে না—যে আত্মনিভরতা নারীত্বকে মনুষ্যত্বের অধিকার দেবে?

কিন্তু এই স্বনির্ভর হতে চাওয়ার মানেই অনেকটা বিদ্রোহ। নারীদের বহুদিনের আনুগত্য, অজ্ঞাত কাল থেকে নির্ভরতা, পুরুষের মুখাপেক্ষিতা, ইহার হঠাৎ পরিবর্ত্তন নরনারী উভয়েই প্রথমটা সহ্য করতে পারবেন না,—সমাজ সহ্য করবে না। কিন্তু মানুষের অধিকার মানুষ চাইবে, এ অধিকার তাকে দিতে হবেই,—কোনো সমাজে কোনো মানুষ, কোনো নারী,—কেউ নারীকে ঐ অধিকারে বঞ্চিত করতে পারবেন না।

এই অধিকার লাভের জন্যই সেই পরুষ শিক্ষা পাওয়া দরকার (অবশ্য আমি শিক্ষার পরুষতা, নম্রতা মানি না) যা' নারীত্বকে আত্মনির্ভরতা, স্বপ্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস-সম্পন্ন করবে। মানুষ হতে পারা একটা অপরাধ নয়। মনুষ্যত্ব যাতে আছে, তা' মানুষের অন্তর থেকে প্রেম, স্নেহ মুছে ফেলবে,—নারী প্রকৃতিকে চপল করে দেবে,—সমগ্র নারী-প্রকৃতি এত চঞ্চল, এ বিশ্বাস আমার নেই। পরুষ শিক্ষার দ্বারা উৎপীড়িত মনুষ্যত্ব নিজের প্রতি নির্ভর করতে পারবে শুধু; তার সঙ্গে যদি কেউ আশঙ্কা করেন, কোন কুফল আসতে পারে,—তবে তা না হয় আসবে। সেই কুফল কি নির্জ্জীব জীবনে সহিষ্ণুতার মধ্যেও আসে না?

যে নতুন আলো,—নবযুগের যে আদর্শ নারীদের চোখে এসে পড়ছে—সে কি বিধাতার বর নয়? এই জাগরণের মধ্যে কি আমরা একটা বেদনা, একটা আনন্দ অনুভব করছি নে? আমাদের অন্তর নতুন পুরানোর দ্বন্দ্বে, আশায়, ভয়ে উঠেছে, কিন্তু তবু আমরা এ বিশ্বাস রাখি যে, আমরা অন্যায়, ভুল করছি নে। প্রবলের অত্যাচার, দুর্ব্বলের সহিষ্ণুতা দুয়েরি প্রতিকার দরকার। অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করবার যুগ আর নেই; মানুষকে মানুষের অধিকার দিতে হবে। মানুষের বিচার আদর্শ দিয়ে করা হবে না, মানব-চরিত্রের অধিকার দিয়ে করতে হবে। এই শিক্ষাতে মাতৃত্বের এতটুকু আদর্শও ক্ষুণ্ণ হবে না বলেই আমার মনে হয়।

সুখ-পাখী

[শ্রীনিশিকান্ত সেন]

মধুর হচ্ছে ধরার পরে নববর্ষ-আগমন,
মধুর হাস্য মধু-মাসের দেখ্‌লে ভোলে দু'নয়ন।
আঙুর পাকা ফলের সেরা রসটি তাহার সুমধুর,
তাহার চেয়ে অতি মধুর হচ্ছে প্রেমের কোমল সুর।
বাবর, তোমার তিয়াস মিটাও; চপল প্রাণের সুখ-পাখী
পালায় যদি, ফির্‌বে না হায়,—হবে তোমার সব ফাঁকি।

(বাদ্‌শা বাবরের কবিতা হইতে

আমাদের নাট্যশাস্ত্র

[শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ]

(১)

আমাদের দেশে একটী প্রবচন প্রচলিত আছে যে, 'চেনা বামুণের পৈতার প্রয়োজন হয় না।' আমাদের নাট্যশাস্ত্র বহুদিনের পরিচিত একটী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তবে তাহার আবার পরিচয়ের আবশ্যক কি? আবশ্যক আছে। বাঙ্গালী যে একদিন শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন বীর সামরিক জাতি ছিল, তাহার রণ-কুঞ্জরের ঘটা যে একদিন দিনশোভাকে পর্য্যন্ত শ্যামায়মান করিয়া রাখিত, তাহার নৌবাটের হাঁহারবে যে একদিন বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস কম্পিত হইত, ইহাও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটী অতিশয় পরিচিত গৌরবের অবস্থা। সে অবস্থা যে কোন দিন ছিল, এখন নানা তত্ত্বের আলোচনা করিয়া, বাঙ্গালীকেই সেই কথা বুঝাইতে হয়। এখনও এমন অনেক বাঙ্গালী আছেন, যাহারা সে কথা বুঝিলেও, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবার সাহস হারাইয়াছেন! সুতরাং পরিচিত ব্রাহ্মণের পৈতা সকল অবস্থায় প্রয়োজনীয় না হইতে পারে,—কিন্তু কোন-কোন অবস্থায় উহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে জাতি নিজের অতীত সৌভাগ্যকে যত অধিক বিস্মৃত হইয়াছে, তাহার পক্ষে সেই প্রয়োজনের মাত্রা তত অধিক। জাপান তাহার সামুরাই রাজবংশের পূজা করে; আর আমরা আমাদের পাল ও সেন ভূপালদিগের কাহিনীকে অনেকাংশে উপকথা মনে করি! সুতরাং আমাদের দেশেই চেনা বামুণের পৈতার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।

ধর্ম্মের ইতিহাসে ভারতবর্ষ তাহার গগনচুম্বী নগাধিরাজের ন্যায় বৃহৎ ও বিরাট;—ধনৈশ্বর্য্যের ইতিহাসে ভারত তাহারই চরণচুম্বী সুনীল সাগরের ন্যায় রত্নাকর; সভ্যতা ও জ্ঞানের ইতিহাসে সে তাহার কোনাকের তটলেহী দিবসের প্রথম রবিকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল;—কাব্যে, নাটকে, চিত্রে, শিল্পে সে তাহারই তপোবনের ন্যায় পবিত্র, কুঞ্জকাননের ন্যায় সুন্দর। অভিনয়-কৌশলে তাহার স্থান কোথায়, তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার জন্য আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমি রঙ্গালয় ভালবাসি বটে,—কিন্তু রঙ্গপীঠে অবতীর্ণ হইবার সাহস বা শক্তি, কিছুই আমার নাই। সুতরাং অনধিকারীর মুখে, অযোগ্যের মুখে যোগ্যের পরিচয় গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার আশা করিলে, নিরাশই হইবার সম্ভাবনা।

সে দিন আর বাঙ্গালার নাই, যখন বাঙ্গালার রাজনগরীতে ও সুবিখ্যাত কার্ত্তিকেয় মন্দিরে ভরত-নির্দ্দিষ্ট রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, বাঙ্গালীকে জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই দান করিত; যখন কাশ্মীরের ছদ্মবেশী রাজকুমার করতোয়া-তটে গৌড়ের প্রাচীন রাজধানীর রাজপথে ভ্রমণ করিতে-করিতে কার্ত্তিকেয় মন্দিরের কলা-সৌষ্ঠব-সম্পন্না অভিনেত্রী কমলার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলেন, কমলা বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতা সামান্যা "বারাঙ্গনা" নহে—তাহার গৃহ সুসজ্জিত, প্রকোষ্ঠে স্বর্ণ-সিংহাসন, প্রকোষ্ঠান্তরে সুবর্ণঘট্টা। কমলা অভিনেত্রী বটে, কিন্তু সুপণ্ডিতা—সংস্কৃত ভাষায় কথা কহে। বাঙ্গালার এমন দিন ছিল, যখন বিশেষ-বিশেষ ঘটনাকে স্মরণীয় করিবার জন্য, দেশের কবিগণ নাটক রচনা করিতেন; এবং বাঙ্গালার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ পরম আগ্রহে সেই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া, রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত সকলের চিত্ত-বিনোদন করিতেন। সেই দেশেই কিছুকাল পূর্ব্বে শুনিতে হইয়াছে যে, অভিনয়-কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য আদর্শের সন্ধানে আমাদিগকে দেশান্তরে যাইতে হইবে,—এ দেশে আদর্শ নাই! যে দিন এ কথা শুনিয়াছিলাম, সে দিন ক্ষুব্ধ-চিত্তে দেশেই আদর্শের সন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সুযোগের অভাবে সে অনুসন্ধান-কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারি নাই বটে; কিন্তু যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিলাম তাহাতেই বুঝিয়াছি, যোগ্য ব্যক্তি এ ব্রত গ্রহণ করিলে, তাঁহার চেষ্টা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে।

সভ্যতার পুণ্যালোকোদ্ভাসিত মহাকালের যাত্রাপথে যে জাতি যত অধিক অগ্রসর হয়, তাহার রুচি ততই অধিক পরিমার্জ্জিত হইবার অবকাশ পায়; তাহারই হৃদয়ে শিল্প-

সৌন্দর্য্য-বোধ এবং ললিতকলার প্রতি অনুরাগ নবোদ্ভিন্ন কমলবৎ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। সেই জাতিই তখন বাণীর পূজায় আপন শক্তি, সম্পদ, সাধনা—সমস্তই অকাতরে নিয়োগ করিয়া ধন্য হয়। এই মহাপূজার যজ্ঞবেদীর উপর অজন্তা বা ইলোরার চারু-কারু, সাগর-তরঙ্গ-বিধৌত বেলা-ভূমে গগনচুম্বী তপন-মন্দির, শ্রীরঙ্গম্ বা কুমারিকার উন্নত-শীর্ষ বিস্ময়কর দেবায়তন—তাজমহল বা সেকেন্দ্রা-জয়স্তম্ভ বা বিজয়-মন্দির—শোভায়, সম্পদে, চিত্রে, তক্ষণে, গম্বুজে, মিনারে, চূড়ায়, চক্রে সজ্জিত হইয়া, যুগধর্ম্মের প্রাণ স্পন্দনের অলোকসামান্য সাক্ষ্যরূপে জগতের সম্মুখে উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান হয়; এবং বিশ্বের সশ্রদ্ধ ফুল-চন্দনে নিত্য সম্পূজিত হইয়া থাকে। এ পূজা সৌন্দর্য্যের পূজা—ইহা বিশ্ব-দেবতার চরণারবিন্দে বিমুগ্ধ মানবের আত্মনিবেদন।

প্রকৃতির কুঞ্জকানন হইতে মানুষ যেমন প্রস্ফুটিত স্থলকমল যত্নে চয়ন করিয়া, পাষাণের কঠিন বক্ষে স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হয়,—আকাশের তারার হার তুলিয়া চিত্রপটে গ্রথিত করিয়া তুলিকা সার্থক করে,—অপার জলধির তরঙ্গোচ্ছ্বাসকে বর্ণে, ভাবে, গাম্ভীর্য্যে লিখিয়া অসীমকে বুঝিতে,জানিতে ও চিনিতে চেষ্টা করে—সুন্দরকে সেবা করে; —তেমনি সে রঙ্গালয় স্থাপন করিয়া, সেই সুন্দরের আবাহন গায়—যাহা তাহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যোগমগ্ন থাকিয়া, তাহারই জন্য দেবতার আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আনে। রঙ্গপীঠ তাই আত্মজিজ্ঞাসার অন্যতম পাদপীঠ। আত্মপরিচয় লাভের যোগ্য এমন মন্দির আর নাই। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সুধী-সমাজ তাই মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন যে, সুমার্জ্জিত রঙ্গালয়ই সভ্যতার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এই মানদণ্ডে তুলিয়াই কেহ-কেহ বৃদ্ধ ভারতের প্রাচীন সভ্যতার পরিমাণ করিয়া কহিয়াছেন—It is only to nations considerably advanced in refinement that the drama is a favourite entertainment.* রোমে যখন নটগণ সর্ব্বদাই লাঞ্ছিত হইতেন,—স্থবির চীন যখন শুধু নট নহে—তাহার অনাগত ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণের উপর পর্য্যন্ত অভিসম্পাত বর্ষণ করিত,—য়ুরোপ যখন মনে করিত, নাট্য-লীলা সয়তানের রঙ্গ,—তাহার বহু শত বর্ষ পূর্ব্বেই ভারতের ঋষি কহিয়াছেন—"নাট্যবেদস্তু পঞ্চমম্।" রামায়ণের রচনা-কালের তুলনায় দার্শনিক শ্লেগেলের যুগ—এই সেদিনের কথা মাত্র। অনেককে বলিতে শুনি—সে দিন হউক, তথাপি 'সে দিন' রামায়ণের কাল অপেক্ষা বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুসভ্য! সেই তথাকথিত শ্রেষ্ঠ ও সুসভ্য যুগে শ্লেগেল সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, "কোন জাতির মধ্যে শত শত বর্ষ হইতে যাহা কিছু সামাজিক উন্নতি, কলাসম্বন্ধীয় যাহা-কিছু বিদ্যাসম্পদ বহু পরিশ্রমে সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমস্তই দুই-চারি ঘণ্টার মধ্যে নাট্যালয়ে প্রদর্শিত হয়। তাই, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি উচ্চ, কি নীচ—সকল ব্যক্তির পক্ষেই নাট্য-প্রয়োগ চিত্তাকর্ষক; এবং ইহাই সুশিক্ষিত সুসভ্য জাতিমাত্রেরই চিত্ত-বিনোদনের প্রধান উপায়।" শ্লেগেলের এই নাট্য-সমালোচনের শত-শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-নাট্যাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন—

ন তৎ শ্রুতং ন তৎ শিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎ কর্ম্ম যন্নাট্যেঽস্মিন্ ন দৃশ্যতে॥

এমন শ্রুতি নাই, এমন শিল্প নাই, এমন বিদ্যা নাই, এমন কলা নাই, এমন যোগ নাই, এমন কর্ম্ম নাই, যাহা নাট্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে, যে যুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নটের অসম্মানের অবধি ছিল না—সে যুগে ভারতের নট ও নাট্যাচার্য্য লোক-শিক্ষক রূপে পূজা পাইতেন! সুপণ্ডিত হোরেস হিমেন উইল্‌সন সাহেব তাই তাঁহার "The Hindu Theatre" নামক গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন—"The Hindu Actors were never apparently classed with vagabonds or menials and were never reduced to contemplate a badge of servitude as a mark of distinction." এখন দেখা যাউক, নাট্য-বিষয়ে য়ুরোপের অভিজ্ঞতাই বা কত দিনের, এবং ভারতের অভিজ্ঞতাই বা কত দিনের। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। ভারতের কাব্য-নিকুঞ্জে কোকিল-পাপিয়ার কল-তান যখন ক্রমে-ক্রমে নীরব হইতেছিল, ভারত রঙ্গ-গৃহের রবাব-মুরজ-বীণা যখন একে-একে স্তব্ধ হইতেছিল, "সুবর্ণ দেউটী" যখন একে-একে নির্ব্বাপিত হইতেছিল—প্রতীচ্য রঙ্গ-লীলার তখন ঊষা মাত্র! আচার্য্য উইল্‌সন তাই অকপটে বলিয়াছেন—"The nations of Europe possessed no dramatic literature before the

* Robertson's India—Appendix, P325.

14th or 15th century, at which period the Hindu dramà had passed into its decline."

নিজের হাটে পরের রাংএর সজ্জা ক্রয় করিয়া দেবী-প্রতিমাকে ভূষিত করিতে আমরা এতদূরই অভ্যস্ত হইয়াছি যে, নাট্যলীলার আদর্শকে আর দেশে খুঁজিয়া পাই না! যে দেশের বাণী বীণাবাদিনীরূপে পরিকীর্ত্তিতা, যে দেশের নৃত্যকলা নট-নারায়ণের বাল্যলীলা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, সে দেশের রঙ্গ সজ্জার জন্য শুধু পরের পসরার উপর নির্ভর করিলে কেবল যে লজ্জাকেই বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহা নহে! পিতৃ পিতামহের অধুনা-উপেক্ষিত রত্নাধারের সন্ধান না করিয়াই, তনু-রক্ষার নিমিত্ত ভিক্ষাপাত্র করে পরের অনুগ্রহ-দৃষ্টি লাভের জন্য দীন-নেত্রে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিলে, আত্ম-সম্মান ও বংশ-গৌরবকেও একান্ত ক্ষুণ্ণ এবং লাঞ্ছিত করা হয়।

যাঁহারা মনে করেন যাহাই ভারতবর্ষের—যাহাই সেই কানন-বিহারী ফলমূলাহারী জটাবল্কলধারী ঋষিদিগের রচিত, তাহা আর এই সুসভ্য যুগে চলিতে পারে না;—তাহা একান্ত জীর্ণ, নিতান্তই অসমীচীন এবং কতকগুলি কার্য্যকারণ-সম্বন্ধহীন যুক্তিশূন্য, ভিত্তিশূন্য অত্যুক্তি মাত্র। নাট্যের প্রসঙ্গ-মাত্রেই তাঁহাদের মুখে আর্ভিং, বা বিরভূম ট্রি, বা এলেন্ টেরী প্রভৃতির উপদেশাবলীর কথা শুনিতে পাই। ভরত, পরাশর, শিলালি প্রভৃতি এখন বিস্মৃত! যে ভরতের গন্ধর্ব্ববেদ অধুনা দুষ্প্রাপ্য হইলেও, সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রথম পাদপীঠ রূপে সুপরিচিত, তাঁহার নাট্য-শাস্ত্র যে কেন এ যুগে অচল হইবে, তাহার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না। অভিনয়-কৌশলের আদর্শ লাভের জন্য, দার্শনিক বিচারণায় পূর্ণ, মনস্তত্ত্বের আলোচনায় সমুজ্জ্বল নাট্য-শাস্ত্রের সাহায্য লইতে আমরা যে কেন বিমুখ হইব, তাহারও কোন কারণ দেখি না! সে বিরাট গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় দিতে পারি, সে শক্তি আমার নাই। কিন্তু সেই অমূল্য রত্নের পরিচয় লইবার জন্য বাঙ্গালার পণ্ডিত-সমাজকে করযোড়ে অনুরোধ করিতে পারি। সেই গ্রন্থের যে খণ্ডিতাংশ ফরাসী দেশ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, বাঙ্গালার নাট্যামোদী ও সাহিত্যিকগণ যদি উপযুক্ত ব্যাখ্যা সহ উহা বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করেন, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতের একটী জয়স্তম্ভের সন্ধান লাভ করিয়া ধন্য হইবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে অধুনা য়ুরোপীয় বা আমেরিকান্ গ্রন্থাদিতে যে সকল সূত্র প্রচারিত হইতেছে,—ভারতের প্রাচীন নাট্যাচার্য্য ভরত রামায়ণের সমকালেই সে সকল সূত্রের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন!

যে যুগকে আমরা অত্যন্ত সুসভ্য বলিয়া মনে করিতেছি—যে যুগের প্রাণবায়ু গ্রহণ করিয়া আমরা ভাবিতেছি ধন্য হইলাম—কৃতকৃতার্থ হইলাম, সে যুগেও এমন একখানি গ্রন্থ আছে কি না জানি না, যাহাতে রঙ্গালয় নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া অভিনয় করিবার কৌশলগুলি পর্য্যন্ত সূত্রের আকারে গ্রথিত হইয়াছে! ভরতের নাট্য-শাস্ত্র যতই কেন প্রাচীন হউক না, উহা সেইরূপ একখানি গ্রন্থ। দেশে নাট্যাভিনয় বহুলরূপে প্রচারিত না থাকিলে, এরূপ বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে না। তখনই code রচনা করিবার প্রয়োজন হয়, যখন তাহার দ্বারা বহুলোকের জীবন-যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশ রক্ষা করিবার প্রয়োজন ঘটে। সেইরূপ, তখনই অভিনয় কৌশলাদির code রচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, যখন ভারতে রঙ্গালয়ের অভাব ছিল না,—যখন ভারতবাসী জানিত যে, রঙ্গালয় শুধু রঙ্গের নিলয় নহে,—লোক-শিক্ষার আলয়—যখন তাহারা বুঝিত যে, এই নাট্যে "ধর্ম্ম প্রবৃত্তির ধর্ম্ম, কামীর কাম, দুর্ব্বিনীতের নিগ্রহ, ধনাভিমানীর উৎসাহ, অবোধের বিবোধ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, রাজার বিলাস ও দুঃখার্ত্তের স্থৈর্য্য প্রভৃতি নানা অবস্থার নানা ভাব গ্রথিত রহিয়াছে। উত্তম, অধম এবং মধ্যম এই ত্রিবিধ চরিত্রেরই কার্য্য, চিন্তা, ধ্যানের আদর্শ ইহাতে বর্ত্তমান আছে। সেকালে লোক-শিক্ষার মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়া যাঁহারা নটের দায়িত্ব শিরে লইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই শিক্ষার যজ্ঞভূমিকে সুমার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন, কাব্যই সেই বিরাট যজ্ঞের বেদ, কবি তাহার ঋক্-প্রণেতা, নাট্যাচার্য্য পুরোহিত এবং কুশীলবগণ তন্ত্রধারক।

মন্ত্র যতক্ষণ মন্ত্র থাকে, সকলে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না;—কারণ, সমাজ শুধু বিবুধমণ্ডলীর সঙ্ঘ নহে, পণ্ডিতের সভা নহে, যোগীর কাননাশ্রম নহে। যোগী, ভোগী, পণ্ডিত, মুর্খ, ধার্ম্মিক, পাষণ্ড উহা সকলের মেলা। তাই

শিক্ষার মন্ত্রকে প্রাণ দিয়া, মূর্ত্তি দিয়া—তাহাকে সুবেশ পরাইয়া নিজের পরিচিত জনের ন্যায় রঙ্গালয়ে উপস্থিত করিতে হয়। মানুষের জীবন-যাত্রার সহিত যাহার এত নিকট সম্বন্ধ, তাহার পাদপীঠ শ্লথবিন্যস্ত হইলে, তাহা কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে; সে মন্দিরে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহা পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, ভ্রাতা-ভগ্নী একত্রে বসিয়া সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া থাকে। সুতরাং সে মন্ত্রের প্রাণ যদি নীতির ও রুচির হোমবারিস্পর্শে পবিত্র না হয়, তাহা হইলে তাহা সমাজকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যায়। ভারতবর্ষের নটগুরু ভরত তাই ঘোষণা করিয়াছিলেন—

……তথা লজ্জাকরং তু যৎ,
এবম্বিধং ভবেৎ যদ্‌যৎ তত্তৎ রঙ্গে ন কারয়েৎ।

"হিতোপদেশ জননের" জন্যই নাটকের প্রয়োজন—নাট্য "চতুর্ব্বর্গদ"। যে ভূখণ্ডের Turkey Trot নামক নৃত্য-লীলাকে আইন করিয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে, নতুবা সমাজের শীলতা রক্ষা ঘটে না—সেই ভূখণ্ড হইতে আদর্শ লইয়া আমরা ভারতের নাট্যশালার সংস্কার সাধন করিতেছি! ইহা অপেক্ষা আর অধিক বিড়ম্বনা কি হইতে পারে?

য়ুরোপীয় নট একালে কহিতেছেন "The actor ought to seize all occasions of observing nature":—প্রকৃতির বিরাটগ্রন্থ পাঠ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলে সুদক্ষ অভিনেতা হইবার উপায় নাই। এ কথা আমরা যে আজ য়ুরোপীয় নাট্যশালা হইতে শিখিতেছি, তাহা নহে। ভরতঋষি বাল্মীকির যুগে বলিয়া গিয়াছেন,— "লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতৎ ভবিষ্যতি।"—লোক স্বভাবের অনুসরণই সৌষ্ঠবসম্পন্ন বিশুদ্ধ অভিনয় বলিয়া নটগুরু অভিনেতাকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করেন নাই। লোকে ত অনেক কুকার্য্য করিয়া থাকে;—তাই কি সে সকলই রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হইবে? না। কেন?

পিতৃ পুত্র স্নুষা শ্বশ্রূ দৃশ্যং যস্মাত্তু নাটকম্।
তস্মাদেতানি সর্ব্বাণি বর্জনীয়ানি যত্নতঃ॥

হিন্দু নাট্যশাস্ত্রের এই শৃঙ্খল যে কেবল নটদিগকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহা নহে,—কবিকেও নিরঙ্কুশ হইতে দেয় নাই। নাট্যাচার্য্যের আসন কবিরও উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাব্য হীনাঙ্গ হইলে নাট্যাচার্য্য তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতেন। কেন? না—

অঙ্গহীনো নরো যদ্বৎ নৈবারম্ভক্ষমো ভবেৎ।
অঙ্গহীনং যদা কাব্যং ন প্রয়োগক্ষমং ভবেৎ॥

অঙ্গহীন কাব্য প্রয়োগক্ষম নহে বলিয়াই নাট্যাচার্য্যকে আবশ্যক মত উহার সংশোধন করিতে হইত। এইরূপ বিধি ছিল বলিয়াই আজ য়ুরোপ সসম্ভ্রমে কহিতে বাধ্য হইয়াছে—"We may observe, however, to the honour of the Hindu drama, that the পরকীয়া or she who is the wife of another person, is never to be made the object of a dramatic intrigue—a prohibition that would have really cooled the imagination and curbed the wit of Dryden and Congreve. আজকাল আমরা সেই গৌরবকে বিস্মৃত হইয়াছি।

কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাব্য সম্বন্ধেও যাহা খাটে, নাটকেও যে তাহাই খাটিবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা: কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

"যেমন জগতে দেখিয়া আসি, কবির রচনামধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে, কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা, সৃষ্টি-চাতুর্য্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম। তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাবসঙ্গত গুণবিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদমাত্র জন্মিয়া থাকে; কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া বর্ণিত হয়।"

এক শ্রেণীর অভিনেতা আছেন, যাঁহারা দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করেন। য়ুরোপের John Lawrence Tool এই প্রথার প্রবর্ত্তক। এখানে অভিনেতা তাঁহার চরম লক্ষ্যকে বিস্মৃত হইয়া, শুধু করতালি লাভকেই অভিনয়ের পরম উদ্দেশ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ এই কুপ্রথায় এমন আচ্ছন্ন হইতেছে যে, এখনই উহার সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। Rev. J. E. Smith "Family Herald" নামক পত্রে একবার লিখিয়াছিলেন "It may be that the actors are led astray by popular applause, to swagger more than they ought to do...The task of an actor is a peculiarly hard one; he bears not only his own faults, but the very faults of his Judges."

ভারতের নাট্যাচার্য্য এই কারণেই কহিয়াছিলেন—

হিতোপদেশ জননং নাট্যমেতন্ময়াকৃতম্।

এই নাট্য তবে কি?

অঙ্গবিক্ষেপ বৈশিষ্ট্যং জন চিত্তানুরঞ্জনম্।
নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা॥

ইহা হইতে বুঝিলাম—চিত্তরঞ্জক অঙ্গ-বিক্ষেপের নর্ত্তন। নর্ত্তন তিন ভাগে বিভক্ত—

"নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ত্রিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।"

এখন দেখা যাউক নাট্য কি।

নাটকাদি কথা দেশ বৃত্তিভাবরসাশ্রয়ম্।
চতুর্দ্ধাভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ॥

দৃশ্যকাব্য ও তদ্গত কথা—দেশ, বৃত্তি, ভাব ও রসাদি চারি প্রকার অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে, তাহাকে নাট্য বলে।

অভিনয় তবে কি?

অভি একটি উপসর্গ, নীঞ্ ধাতু। অভির অর্থ সাম্মুখ্য এবং নীঞ্ ধাতুর অর্থ পাওয়ান। এই উপসর্গ ও ধাতুর যোগে ইহাই বুঝা গেল যে, "প্রয়োগসকল যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সাক্ষাৎকারের ন্যায় দর্শকের সম্মুখে আনীত হয়, সেই প্রক্রিয়ার নাম অভিনয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়—যাহা সম্মুখে আনয়ন করে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—কে আনে? উত্তর—অভিনেতা। কাহার সম্মুখে আনে? শ্রোতার। কি আনে? কতকগুলি ভাব। কিরূপে আনে? কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা।

নাট্যাচার্য্য তাই বলিতেছেন—

নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকং।
লোকবৃত্তানুসরণং নাট্যমেতন্ময়াকৃতং॥

এই নির্দ্দেশের মধ্যে একটা নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল—তাহা লোকবৃত্তানুসরণ। স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থা বিশেষে মানুষের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, শোকে বা হর্ষে বা ক্রোধে যেরূপে তাহার নয়নে জল ঝরে,—সে যেরূপে গর্ব্ব অনুভব করে, যেরূপে শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করে, ঈর্ষ্যায় জ্বলে, হিংসায় ক্ষিপ্ত হয়, ইত্যাদি—ঠিক স্বভাবানুরূপ হাব-ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রোতার সমক্ষে তাহা প্রদর্শন করিলেই শ্রোতা কাব্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন—কবির হৃদয়ে যাহা অস্ফুট ছিল, তাহা পরিস্ফুট হয়। ইহারই নাম অভিনয়।

লোকবৃত্তানুকরণ বা লোক স্বভাবের অনুকরণ কেবল আবৃত্তিতে হয় না। তাহার জন্য বসন চাই, ভূষণ চাই, অঙ্গ-উপাঙ্গাদির উপযুক্ত সঞ্চালন চাই—কণ্ঠলীলা চাই, তন্ময়ত্ব চাই।*

* শালিখা-গোবর্দ্ধন নাট্য-সমাজে পঠিত।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

'বৈদিক রহস্য' প্রবন্ধের প্রতিবাদ

[শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ বেদান্তভূষণ]

"ভারতবর্ষের" আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিত "বেদ ভগবদ্বাণী নহে বা বৈদিক রহস্য" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য ভ্রমাত্মক। তাই বাধ্য হইয়া অতি সংক্ষেপে ভ্রান্তি প্রদর্শনে যত্নবান হইলাম।

বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "থিওজফিষ্ট দলের একদল বক্তা বারবার বলিতেছেন যে, 'ভগবানের নিকট হইতে সময়ে-সময়ে সমাগত জ্ঞান-স্রোতই বেদ।' যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে কেন ন্যায়বান্ ভগবান্ খৃষ্টান্ ও মুসলমানকে সে জ্ঞান-স্রোতের খবর পাইতেও দিলেন না?" ভারতবর্ষ, ৫১ পৃঃ। ১ কঃ। ৮ পং।

ভগবানের নিকট হইতে সময়ে-সময়ে সমাগত জ্ঞান-স্রোতই যদি বেদ হয়, তাহা হইলে খৃষ্টান্ ও মুসলমান সে বেদে অধিকারী হইল না কেন? এই অন্ধ ধারণায় আমাদের লেখক মহাশয় ভগবানের ন্যায়বত্তার উপরেও হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা কি ভ্রমপূর্ণ! "সময়ে সময়ে" মানে বৎসরের মধ্যে ২।৪ বার নহে,—ইহা প্রতি যুগান্তে। সৃষ্টি হইলেই ধ্বংস হয়, এবং ধ্বংস হইলেই পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জন্য এই দুই বস্তু আপেক্ষিক। যখন ধ্বংস হয়, তখন সৃষ্টি বা সংস্কারকে অন্তর্গুপ্ত করিয়া, এই জগদ্ব্যাপার ধ্বংসানুবর্ত্তী হয়। আর যখন পুনঃ সৃষ্টি হয়, তখন সেই পূর্ব্ব সংস্কারকে সঙ্গে করিয়া যথাপূর্ব্বক (field of association)এ, অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। যেমন সুষুপ্তির অবসানে জাগ্রত দশায় জৈবজগতের সুষুপ্তির পূর্ব্বানুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্মভাবাদি পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে, এ দৃষ্টান্তও তদনুরূপ। ইহার প্রমাণস্বরূপে বেদই বলিতেছেন—"যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদি।

লেখক মহাশয়ও স্থানান্তরে এ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমি বারান্তরে ইহার সমাধান করিতে চেষ্টিত হইব।

এই যথাপূর্ব্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মশক্তি মায়াকে বশীভূত করিয়া মায়োপহিত-চৈতন্য সগুণ ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা নামে প্রখ্যাত হন। তখন সেই ব্রহ্মা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বারের ন্যায় বেদার্থ স্মরণ করেন; এবং তাঁহার মানসপুত্র সনক, সনাতন, সনৎকুমার প্রভৃতি আদি পুরুষগণকে বেদার্থ পরিজ্ঞাত করান। তাহার পর হইতেই শ্রবণ-পরম্পরায় বেদ ভারতীয় জনসমাজে সকল কর্ম্মের নিদানরূপে, সকল জ্ঞানের বীজরূপে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং বেদের পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদ স্মৃত হইয়া সমুদ্ভূত হইয়া থাকে বলিয়াই "ইহাকে ভগবানের নিকট হইতে সময়ে-সময়ে সমাগত জ্ঞান-স্রোত" বলা হইয়া থাকে। এইজন্য থিওজফিষ্টগণের বাক্য একবারে অমূলক নহে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদ স্মৃত হয়, ইহার প্রমাণ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতেই প্রথমে উল্লেখযোগ্য।

অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণম্ বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি ইত্যাদি—বৃহদারণ্যক ২। ৪। ১০।

সেই মহদ্ভূত ব্রহ্ম (অব্যক্তের পরবর্ত্তী স্তর) অথবা ব্রহ্মা হইতে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজাত বেদাদি নিখিল শাস্ত্র সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাই প্রতি-প্রলয়ের পর প্রতি সৃষ্টির নিদর্শন।

লেখক মহাশয়ও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন যে, "বেদসকল যেন ভগবানের নিঃশ্বাস স্বরূপ।" ভারতবর্ষ—৫৩,২।১০।

এখানে তিনি "যেন" পদ দিয়াই উৎপ্রেক্ষা বা মিথ্যাব্যঞ্জকতা পরিস্ফুট করিয়াছেন। নিজে বেদকে ভগবানের নিঃশ্বাস বলিয়াও, তিনি মীমাংসা করিতে না পারিয়া, তাহার দুই পংক্তি পরে "ভক্তি-প্রকাশনমাত্র" বলিয়া—দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ "নিঃশ্বাস যেমন বিনা কষ্টে অনর্গল নাসিকা দিয়া বহির্গত হয়, ব্রহ্মা হইতেও বেদাদি নিখিল শাস্ত্র তদ্রূপ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাই সেই ভূমার শক্তি।

তাহার পর তিনি সামবেদকে প্রথমে সৃষ্ট হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বথা অসমীচীন। এই বৃহদারণ্যকের প্রমাণ হইতে ঋগ্বেদের প্রথমোদ্ভূতি প্রমাণিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার উপনিষদ্ দর্শনে অবকাশের অভাব, ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হইতে পারে।

এখন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধের মূল উপজীব্য যে "বেদ পৌরুষেয়" ইহার প্রতিকূলে কয়েকটী মাত্র প্রমাণের উপন্যাস করিয়া এবারের মত নিবৃত্ত হইব।

প্রমাণগুলি এই—

"বেদ অপৌরুষেয়" ইহার অনুকূলে—ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন—

নকাশ্চৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা পিতামহঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥

ইহাতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, প্রতিকল্পে পিতামহ বেদ স্মরণ করেন এবং মনু ধর্ম্মগ্রন্থ স্মরণ করিয়া থাকেন।

মৎস্যপুরাণ—"অস্য বেদস্য সর্ব্বজ্ঞঃ কল্পাদৌ পরমেশ্বরঃ।
ব্যঞ্জকঃ কেবলং বিপ্রা নৈব কর্ত্তা ন সংশয়ঃ॥

হে বিপ্রগণ! বেদবিজ্ঞাতা পরমেশ্বরই প্রতি কল্পের প্রথমে বেদকে অভিব্যক্ত করেন। ইহার স্বতন্ত্র কর্ত্তা কেহ নাই; ইহাতে সংশয়ও আসিতে পারে না।

ভাব এই, বেদ নিত্য-সনাতন,—কেবল প্রলয়ের পর কারণ ব্রহ্মের সহিত বীজরূপে সাময়িক বিলীন থাকে মাত্র। যখন সৃষ্টি পুনঃ সমুদ্ভূত হয়, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় পরমেশ্বর হইতে বেদ ধ্বনিত হইয়া থাকে। এই জন্য পূজ্যপাদ ঋষি সাবধানের সহিত "ব্যঞ্জক" পদ প্রদান করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন।

এই জন্য পুরাণের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া "ব্রহ্ম মুখ নির্গলিত ধর্ম্মজ্ঞাপক শাস্ত্রং বেদঃ" এইরূপে পৌরাণিকগণ নিরূপ করিয়া থাকেন। ন্যায় শাস্ত্রেও পাওয়া যায়, "মীন শরীরাবচ্ছেদেন ভগবদ্বাক্যম্ বেদঃ" বেদান্ত শাস্ত্রাদিতেও "ধর্ম্মব্রহ্ম প্রতিপাদকমপৌরুষেয় বাক্যং বেদঃ" ইত্যাদি।

সুতরাং বেদ যে, অপৌরুষেয়, ইহা ঋষি চিন্তা সিদ্ধান্তিত। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি আছে। আমি বারান্তরে সেগুলির উপন্যাস করিতে চেষ্টা করিব। শত চেষ্টা করিলেও বস্তুর বস্তুত্ব ব্যাহত করিতে পারা যায় না, বস্তু বস্তুই থাকে। সুতরাং বেদের "অপৌরুষেয়ত্ব" আমাকে নূতন করিয়া সংস্থাপিত করিতে হইবে না।

বাঙ্গালীর ধনলিপ্সা।

[শ্রীহরিহর শেঠ]

মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, দিল্লী, কানপুরওয়ালা, প্রভৃতি বাঙ্গলার বাহিরের লোক সকল আমাদের বাঙ্গলায় এসে এখানকার টাকা সিন্দুক পুরে তাদের দেশে নিয়ে যাচ্চে। গাড়ি মোটর চেপে বাবুগিরি ক'রে আমাদেরই বুকের উপর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্চে। সারা কলিকাতাটা কিনে ফেল্‌চে। এই রকম কথা শুধু বাঙ্গলার দু'চারখানা কাগজে নয়,—দেশের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কাহার-কাহারও মুখে, সোজা ভাবেই হৌক আর একটু ঘুরাইয়াই হৌক, আজ-কাল প্রায়ই শুনা যাইতেছে। কথাটা যে ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহাতে ভাল ভাব ত থাকেই না,—বরং একটু বিরাগ-বিদ্বেষের আভাব তা থেকে ফুটে বার হয়। এ থেকে কি ইহাই মনে হয় না যে, তাঁদের মনের ভাব এই যে, আমরা বাঙ্গালী আমাদের দেশে ব'সে হা-হা করে মরচি, আর সুদূর মাড়বার থেকে সামান্য ভাবে এসে তারা যেন আমাদেরই ধন-রত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে।

বড় আশ্চর্য্যের কথা, আজ দশ-বিশ বৎসর নয়, বহু-বহু বৎসর ধরে জার্ম্মাণী, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কারখানাওয়ালা ও ব্যবসায়ীরা এখানে শুধু বড়-বড় কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে নয়, তাদের দেশ থেকেও বিবিধ পণ্য ও বিলাস-দ্রব্যাদি পাঠিয়ে আমাদের সঞ্চিত বা অর্জ্জিত অর্থ যে ভাবে নিয়ে যাচ্ছে ও তদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যে ভয়ানক সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, সে কথা এমন ঈর্ষাপূর্ণ ভাবে কোন সংবাদপত্রে বা বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে আলোচিত হ'তে দেখা যায় না। দেশের চিন্তাশীল মহাত্মাগণ সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্টই ভাবিয়া থাকেন; তাহার মন্দ ফলের কথা গভীর ভাবেই আলোচনা করেন; এবং প্রতিকারের পথও নিজ-নিজ বিবেচনা মত বলিয়া থাকেন। তাহাতে সচরাচর বৈদেশিক বণিকগণের ক্ষমতা ও নিজেদের অক্ষমতার নির্দ্দেশ করিতেই দেখা যায়,—তাঁহাদের অনিষ্টকারী মনে করিলেও, কোনরূপ ঈর্ষা-বিদ্বেষের ভাব তাহাতে থাকে না। এইরূপ বিভিন্ন ভাবে দেখিবার কারণ কি? পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমাদের অপেক্ষা বড়, না রাজা বা রাজ-প্রতিবেশীর জাতি,—এই জন্য ভক্তি বা ভয়? অথবা, বাঙ্গালীর ভারত-বিশ্রুত মনীষার তুলনায়, বহু নিম্নস্থিত অ-বাঙ্গালী, যাঁহারা এখানে ব্যবসা করিতে আসেন, তাঁহাদের এ সাহসিকতা অসহনীয়, অমার্জ্জনীয়? শেষোক্ত সম্প্রদায় আমাদের দেশেরই লোক,—তাঁহাদের অর্জ্জিত ধন আমাদের দেশেই থাকিবে; এবং তাঁহারা প্রধানতঃ উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকেন,—তাঁহারা আমাদের দৃষ্টিতে 'মেড়ো'। আর যাঁহারা অহরহঃ বিদেশী-পণ্য আমদানি করিয়া, নিত্য নব অসার বিলাস-দ্রব্য ব্যবহারের পথ সহজ করিয়া, তদ্দ্বারা আমাদের শুধু দেশের ধন শোষণ করা নহে, আমাদের মনে বিলাস-বাসনা ঢুকাইয়া প্রতিনিয়ত নূতন-নূতন অভাবের সৃষ্টি করিতে শিখাইয়া মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন,—তাঁহাদের হেয় না ভাবিয়া, তাঁহাদের অনুকরণে আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছি। অবশ্য ইহাতে দোষের কিছু নাই। অনুকরণ সকল ক্ষেত্রে অন্যায় কাজ নহে। তাঁহাদের ব্যবসানীতি সত্যই অনেক স্থলে অনুকরণীয়। কিন্তু যাঁহারা আমাদের দেশের লোক, পাশ্চাত্যদের অপেক্ষা যাঁহাদের ধাতু-প্রকৃতির সহিত আমাদের বহু পরিমাণে মিল আছে, অথচ যাঁহাদিগকে অর্থ-সম্বলহীন অবস্থায় আসিয়া উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে আমরা চ'খের সামনে দেখিতেছি, তাঁহাদের দেখিয়া শিখিবার প্রবৃত্তি নাই কেন? উপরন্তু সময়-সময় তাঁহাদের গালি দিতেও কুণ্ঠিত হই না। আমরা শিক্ষায় বড়, পাশ্চাত্য ভাবে অধিকতর অনুপ্রাণিত, বা বুদ্ধিতে বড়—এই প্রকার জাতিগত অভিমানের বশেই কি তাঁহাদের যাহা সদ্গুণ, তাঁহাদের স্বভাবের যাহা অনুকরণীয়, তাহা লইতে আমরা কুণ্ঠিত? মাড়োয়ারি, ভাটিয়ারা বিদেশীয় পণ্যের ব্যবসা করিয়া দেশের ক্ষতি করিতেছে, ইহাই যদি আমাদের বিরাগের কারণ হইত, তাহা হইলেও স্বতন্ত্র কথা ছিল।

অ-বাঙ্গালীর বাঙ্গলা হতে ধন সঞ্চয় করে নিয়ে যাওয়া ব্যাপারটাকে যাঁহারা একটা মস্ত অন্যায় বা অপকর্ম্ম বলেন, বা ঐ ভাবের চীৎকার নিয়ে আছেন,—এ জন্য কি করিতে হইবে, বা এর প্রতিকার কি, বা কি উপায়ে আমরাও উঁহাদের মত অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইব—সে সকল

কথার ইঙ্গিত করিতে তাঁদের বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ এই উপদেশই বর্ত্তমানের একটা বড় সমস্যার সমাধানের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। একের প্রতিভা যেমন অপরের চেষ্টায় চাপা থাকে না;—ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ এবং দৃঢ়তার সহিত যে অগ্রসর হয়, তাহার পথও তেমনি কেহ রোধ করিতে পারে না। জার্ম্মাণী, আমেরিকা, জাপানের বাণিজ্যগত অভ্যুদয়ের পথ রোধ করিবার বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইবার বা তদ্দেশোৎপন্ন দ্রব্যাদি আমদানি বন্ধ করিবার সামর্থ্য, বর্ত্তমানে যেমন জগতের কোন জাতির নাই, সেইরূপ মাড়োয়ারী, কাঁইয়া, ভাটিয়া, বোম্বাইওয়ালা প্রভৃতি ব্যবসায়-প্রধান জাতি সকলের বাণিজ্যিক অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা উপস্থিত বাঙ্গলার অধিবাসীদের আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জয়ী হইতে হইলে, তাহার অস্ত্র—মঞ্চে দাঁড়াইয়া বড় গলায় বক্তৃতা দেওয়া বা সংবাদপত্রের স্তম্ভে বড়-বড় প্রবন্ধ পত্রস্থ করা ত নয়ই,—এমন কি, লাঠি-সোঁটা-তরবারিও নহে। যেমন কাঁটা তুলিতে আর একটী কাঁটারই দরকার হয়, তেমনই এ যুদ্ধ জয়ের জন্য ঐ সব ব্যবসায়ী জাতির ব্যবসা-নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক। উহার প্রথমটি অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা বা আকুলতা; দ্বিতীয়—চেষ্টা ও পরিশ্রম; তৃতীয়, অধ্যবসায় উদ্যম ও উৎসাহ। যদি জাতির মধ্যে পরস্পরের সহিত সাহচর্য্যের ভাব থাকে, বা ব্যক্তিগত ভাবে সাধুতার অভাব না থাকে, তবে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা খুবই বেশী। শুনিতে পাই, জাপান প্রথমে আমাদেরই মত অবাঙ্গালীদের ন্যায় পাশ্চাত্য বণিকদের বাণিজ্যক্ষেত্রে আসন দিতে বিশেষ ভাবে বিমুখ হইয়াছিল; কিন্তু যে দিন তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিল, সেই দিন হইতে শুধু নিরস্ত নহে, তাঁহারা জার্ম্মাণীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। তাহাদের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অতি স্বল্পকাল মধ্যে জাপান আজ কিরূপ সদর্পে জগৎ-সমীপে মাথা তুলিয়া বাণিজ্য-ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

মাড়োয়ারি, ভাটিয়াদের স্বভাবের সমস্তটাই অনুকরণ করিবার কথা আমি বলিতেছি না। যেটুকু তাঁহাদের নিকট হইতে আমাদের গ্রহণ-যোগ্য, তাহাই লইতে বলি। যাহার যাহা কিছু ভাল, তাহা গ্রহণ করিয়া নিজেদের সম্পদশালী হইতে চেষ্টা করায় কোন দোষ ত নাই-ই,—বরং তাহা না করায় ক্ষতি আছে; এবং তাহাতে নিজেদের দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছু প্রকাশ পায় না। আমরা আমাদের নিজেদের দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা লক্ষ্য না করিয়া, পরের দিকে চাহিয়াই চিরদিন মরিতেছি। আমরা চীৎকার করিতে পারি, বাক্যাড়ম্বর দেখাইতে পারি, এবং কখনও বা কাজ দেখে বিমোহিত হয়ে বাহাবা দিতেও পারি। আর কি পারি? এই আমাদের চক্ষের সামনেই আজ হিমালয় অভিযান ব্যাপার সোৎসাহে সাগ্রহে সংঘটিত হইতেছে। আমরা কাগজে নিত্য তাহার বিবরণ পড়িতেছি। দু'দিন পরে হয় ত বায়স্কোপে তাহার ছবি দেখিব। বিবিধ সৌন্দর্য্য, বিচিত্রতা ও সারবত্তার কথা অবগত হইয়া—আমাদের হিমালয় মণিরত্নের আধার বলিয়া দম্ভ করিব। তার পর যখন দেখিব, বুদ্ধিমান বিদেশীয় বণিকগণ সেই সকল মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভার দিনের পর দিন ধরিয়া তাঁহাদের দেশে লইয়া যাইতেছেন, তখন প্রথম-প্রথম চীৎকার করিব, গালাগালি করিব, তারপর চুপ করিব; এই ত আমাদের কাজ। শুনিতে পাই, রাজা রামমোহন রায় অল্প বয়সে একাকী হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত দেহ পার হইয়া তিব্বতে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের জ্ঞান-লালসা চরিতার্থ করা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। তিনিও বাঙ্গালী। দেশে বাঙ্গালী ধনীর অভাব নাই। তবে এমন একটা অভিযান, যাহার পশ্চাতে বহু-বহু লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাতে আমাদের কোন দিন কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না কেন? এখানে নাই কি? মানুষের সম্পদের জন্য যা দরকার, তার অভাব নাই। অভাব কেবল সেই সম্পদ,—দেখে-শুনে বেছে নেওয়া; পরিশ্রম করে সংগ্রহ করে নেবার জন্য যে আকুলতা ও ক্ষমতার দরকার, তাহা। ভারতের অপর সকল অংশের কথা ছাড়িয়া দি,—বাঙ্গালীর কথা বলিতে গেলে, বাঙ্গালীর যে ঠিক সে ক্ষমতার অভাব আছে, ইহাও মনে হয় না; কারণ, এমন কোন বিষয় আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই, যেখানে বাঙ্গালী অগ্রসর হ'য়ে নিষ্ফলতার কালিমা মেখে ফিরে এসেছে। এ শুধু ধনলিপ্সার অভাব। হয় ত এমন দিন ছিল, যখন বাঙ্গালীর এ চিন্তা করবার আগে অন্য অনেক কাজ ছিল। তখন হয় ত অভাবের তাড়নায় বাঙ্গালীকে এতটা বিচলিত করে নাই। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন অভাবও যেমন নিত্য, অভাবের সৃষ্টি করবার ব্যবস্থাও ততোঽধিক।

একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, অভাবের জন্য যতটা দরকার, সে জন্য আমরা অর্থোপার্জ্জনের চিন্তা ও চেষ্টা করিলেও, প্রকৃত ধনবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা কোন দিনই কেহ করি না। ভারতের অন্য কোন্ জাতি সে চেষ্টায় বিভোর হইয়া আছেন কি না, সে কথার আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নহে। আমরা কোন অবস্থাতেই যে কোন দিন প্রায় সে বিষয়ে উদ্যোগী নহি, তাহাই আমার বলিবার কথা। গরীবের ছেলের কথা ছাড়িয়া দি,—তাহারা অধিকাংশ স্থলে স্কুল-কলেজের শিক্ষা শেষ করিবার পূর্ব্বেই, সাংসারিক ভীষণ অভাব-অসচ্ছলতা বিধায় অন্নসংস্থানের জন্য একটা যা-তা উপায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তার পর আর এমন সুযোগ পায় না যে, সে অধিকতর উপার্জ্জন দ্বারা ধন সঞ্চয়ের চিন্তা বা চেষ্টা করিবে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থাও এ দেশে প্রায় তাহাই। তাহারাও তাহাদের অভিভাবকের ইচ্ছানুযায়ী যতটা হয় লেখাপড়া শিখিয়া গ্রাসাচ্ছাদন ও সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অধিকাংশ স্থলেই একটা চাকুরিকেই বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হয়। অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে অন্য কোন পথ আছে, তাহা তাহারা শিক্ষা পায় না; এবং নিজ হইতে যে সে পথ বাহির করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে, সে দিকেও সুযোগের সম্পূর্ণ অভাব। তার পর ধনীর সন্তান নন্দদুলালেরা পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত অর্থের উপর বসিয়া, স্বাধীন ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিবার কথা ভাবিতেই পারেন না। যাহারা সেজন্য বড় কিছু করিল, তাহারা কখন এক-আধবার জমিদারিতে বেড়াইতে যাইল, বা পৈত্রিক ব্যবসাক্ষেত্রে

মাঝে-মাঝে যাইল, এই পর্য্যন্ত। যদি কেহ পৈত্রিক অর্থ সুদে খাটাইয়া বা অন্য উপায়ে, কখন সরকারের লোনের সুদের তুলনায় যদি কিছু বেশি পায় ত যথেষ্ট মনে করিল। সুতরাং কে কোন্ দিন প্রকৃত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিল? গরীব ও মধ্যবিত্তের কথা না ধরিলেও, ধনীর সন্তান পর্য্যন্ত এ কথা একদিনের তরে ভাবিতেও পারিল না যে, চেষ্টা করিলে সে নিজের ক্ষমতায় অতুল ধনের অধিকারী হইতে পারে। যে শিক্ষায় এ কথা ভাবা চলে, সে শিক্ষা কেহই প্রায় পায় না। ব্যবসা শিক্ষার উপযোগী স্কুল কলেজের অভাবই এই ত্রুটীর কারণ, এ মতও কেহ-কেহ পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার ধারণা তাহা নহে। সকল বিষয়ের ন্যায় ব্যবসায়ও যে শিক্ষা করা আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেজন্য প্রকৃত ব্যবসা-শিক্ষার উপযোগী শিক্ষালয় হইলে ভালই হয়। সে শিক্ষার জন্য সময়ক্ষেপ ও ব্যয় উভয়ই, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে সকল শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার তুলনায় অনেক কম। এ বিদ্যার্জ্জনের জন্য বিশেষ শিক্ষকের কাছে ধারাবাহিক ভাবে শিক্ষা না পাইলেও, নিজ-নিজ চেষ্টা, একাগ্রতা ও মনের দৃঢ়তা থাকিলে, অনেকে আপনা হইতে সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়াও সাফল্য লাভ করিতে পারে। যাহাতে বালক ও যুবকদিগের ঐ বিষয়ে ইচ্ছাশক্তি ধাবিত হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ যাহা আজ কাল দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্কুল কলেজের শিক্ষায় উহা লাভ হয় না; বরং তাহাতে বিপরীত হইতে দেখা যায়। আসল কথা, মনোবৃত্তি বিকৃত করিয়া ও-ভাবের যত শিক্ষাই দেওয়া হউক,—তাহাতে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও লাভ হইতে পারে, কিন্তু জাতিগতভাবে তাহাতে ক্ষতি বেশিই হইয়া থাকে। বরং ব্যবসা করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিয়া, একটু সুযোগ ও পথ দেখাইয়া দিতে পারিলে, বিশেষ শিক্ষা ব্যতিরেকেও কেবল আপন-আপন চেষ্টায় যে ফললাভ হয়, তাহা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

মূল কথা, যখন ইচ্ছাই সকল চেষ্টার মূল, তখন প্রথমে আমাদের মনে সেই ইচ্ছার উদ্রেক হওয়া আবশ্যক। কাল কি খাইবে এমন সংস্থান যাহার নাই, একটা বড় রকম ধনলিপ্সা মনোমধ্যে তাহার জাগরূক হওয়ার কথা অনেকে ধারণা করিতেই পারে না। কিন্তু ঠিক ঐরূপ লোকও যে কেবলমাত্র নিজবলে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে, এ কথাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না, এমন জিনিষ জগতে খুব কমই আছে। বাঙ্গালী যুবক পারে না কি? জাতিকে ধন-সম্পদে বলীয়ান করিবার সাধনা আমাদের নাই সুতরাং সে দিকে সফলতাও নাই। সাহেবের অফিসে চাকুরীর জন্য আমাদের সাধনা আছে, তাহাতে সিদ্ধিলাভও যথেষ্ট করিয়াছি।

বর্ত্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় যুবকগণ শিক্ষার জন্য শিক্ষালাভ যতদূর সম্ভব করিতে পারে করুক; কিন্তু সে অবস্থায় অর্থোপার্জ্জনের সহিত তাহার যে বড় সম্বন্ধ নাই, এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। ধনোপার্জ্জনের জন্য ব্যবসায়ের পথ অনেক আছে; চাকুরী সে পথের একটিও নয়। তদ্দ্বারা অন্নসংস্থানের সহায়তা হইলেও, কেহ প্রকৃত ধনবান হইতে পারেন না। শিক্ষিতের পক্ষে ব্যবসা লজ্জার কাজ নহে। যে বিদ্যার প্রভাবে কাহার-কাহারও কাছে ব্যবসা লজ্জার কাজ বলিয়া মনে হয়, সে বিদ্যা, যে দেশ হইতে আমদানি তথায় ব্যবসাদারের সম্মানের অভাব নাই। ইহাতে লাভের জন্য অসাধারণ কিছু করা আবশ্যক হয় না,—কেবল আলস্য, ঔদাস্য পরিহার পূর্ব্বক, অদম্য উৎসাহে ও চেষ্টায় দৃঢ়পণ করিয়া আপনাকে কাজের লোক করিয়া তোলা আবশ্যক। ইহাই প্রকৃত মূলধন। আর মূলধন বলিতে যে অর্থ সাধারণতঃ বুঝায়, তাহা প্রথম নহে।* প্রথমটি হইলে পরেরটি পাওয়া কঠিন নহে। একজন সামান্য কামার কুমোর বা একজন শিশি-বোতল ব্যবসায়ী বা সামান্য ওজন সরকারের আত্মচেষ্টায় ধনকুবের হওয়ার উদাহরণের অভাব নাই। অর্থের যেখানে আবশ্যকতা নাই, সেখানে স্বতন্ত্র কথা। নচেৎ যুবকগণের বড় আদর্শ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই উচিত। আদর্শ ছোট মানেই আকাঙ্ক্ষা অল্প। আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা প্রাপ্তি কখন অধিক হইতে পারে না।

* এ সম্বন্ধে গত জ্যৈষ্ঠের "ভারতবর্ষে" "ব্যবসা ও মূলধন" প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। লেখক।

মধুসূদনের স্বদেশ ও স্বভাষানুরাগ

[কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ]

মধুসূদনের হৃদয় চিরদিনই অকৃত্রিম প্রেম ও স্নেহ বিজড়িত ছিল। তাঁহার স্বদেশানুরাগের কখনও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই; পর্ব্বত-নিঃসৃতা অশ্রান্ত-গামিনী নির্ঝরিণীর নির্ম্মল অনাবিল সলিল-সম্ভারের ন্যায় স্বদেশের প্রতি তাঁহার কবি-হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ আজীবন সমভাবেই প্রবাহিত হইয়াছিল। আমাদের এই শ্যামল-শস্যাঞ্চলা, নদী-মেখলা পারদ-কৌমুদী সমুজ্জ্বলা, চিরকোমলা বঙ্গজননীর স্নেহের কোলেই মধুসূদন ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার মধুময় বাল্যজীবন যাপন করিয়াছিলেন। রক্তরাগ-রঞ্জিত উষার প্রথম কিরণ-সম্পাতে বিকশিত চিরসৌন্দর্য্যশালিনী স্বদেশ-জননীর স্বর্গ-স্নেহ-বিজড়িত মাতৃমুখ তাঁহার নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। সেই শৈশবের অমৃতমাখা পরিতৃপ্তির সুধাস্বাদ ও করুণ স্মৃতি পরবর্ত্তী কালে তাঁহার জ্বালাময় জীবন-মধ্যাহ্নে তিনি একটি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালার প্রভাত-প্রদোষের প্রাণহরা স্নিগ্ধ-বাতাসে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিয়া তিনি স্বাস্থ্য-পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কপোতাক্ষের শ্যামতট-শোভিত আম্রকাননে কোকিলের প্রথম কূজন তাঁহার কর্ণকুহরে গীত-ধারা ঢালিয়াছিল। বিশ্বের অনিন্দ্য-সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা বাঙ্গালার বুকেই তিনি প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন। আর পৌরগৃহের চিরস্মৃতিময়ী পুণ্য-প্রতিমার প্রথম উদ্বোধন তিনি তাঁহার স্বদেশ চণ্ডীমণ্ডপেই প্রথম দেখিয়া, আত্মহারা হইয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার কবি-হৃদয়ে

এই চিরানুরাগ-সঞ্চারিণী মাতৃভূমির স্মৃতি নিবিড় অরণ্যের ঘনবিন্যস্ত বিটপ-বল্লরীর ন্যায় তাঁহার অন্তরতম প্রদেশের সমস্ত স্থানই সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। স্বদেশের প্রত্যেক বস্তুতেই অনন্ত-সাধারণ মমতা, অস্থিমজ্জা-বিজড়িত দেবদুর্লভ ভালবাসা, ঐকান্তিক প্রাণস্পর্শী একাভিমুখী স্নেহ তাঁহার মর্ম্ম-প্রস্রবণ হইতে সহস্রধারে বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। পরজীবনে মধুসূদন বৈদেশিক সমাজে বহুকাল বাস করিয়া, বৈদেশিক আচার-ব্যবহারে, বৈদেশিক ভাবে পূর্ণমাত্রায় অনুপ্রাণিত হইয়াও, তাঁহার স্বদেশের কোন কথাই ভুলিয়া যান নাই,—সেই মর্ম্মস্পর্শী মমতার অণুমাত্রও হারাইয়া ফেলেন নাই। শ্যামকান্তিশোভনা বঙ্গভূমির চিরকরুণ চিত্রখানি তিনি কি গভীর ভাবে নিজের বক্ষে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রত্যেক কবিতার ছত্রে-ছত্রে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক ভাবই তাহার জলন্ত জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার স্বদেশের প্রত্যেক স্মৃতিই তাঁহার হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশে অন্তঃসলিলা ফল্গু-প্রবাহের ন্যায় মৃদু মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। মনে হয়, কবিবক্ষের প্রতি শোণিত-বিন্দু বর্ণে-বর্ণে অক্ষরে-অক্ষরে প্রলিপ্ত হইয়া তাঁহার এই চিরতরুণ স্মৃতিকে বাসন্তী ঊষার কিরণোদ্ভাসিত মিহিরের ন্যায় চিরসমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

মধুসূদনের বয়স যখন সম্ভবতঃ নয়-দশ বৎসর, তখন তিনি তাঁহার জননীর নিকট কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং আরও দুই-চারিখানি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। এখনকার মত সেই মনোহর প্রাচীনকালে এত নাটক-উপন্যাস ছিল না। মাত্র যে কয়েকখানি ছিল, তাহাদের তাদৃশ সমাদরও ছিল না। সে সময়কে প্রাচীন কাব্যের যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীনেরা কাব্য-রূপেই বিভোর ছিলেন ; কাব্যই তাঁহাদের নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ ছিল : কাব্যেই তাঁহাদের চিত্ত তন্ময় হইয়া থাকিত। স্বদেশের সেই চিরসুধামাখা কাব্য-নিকুঞ্জে শৈশবেই মধুসূদনেরও মনোভৃঙ্গ সেই কবিতা-রসের কথঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়াছিল। পরিণত বয়সে যখন তিনি নানা ভাষার য়ুরোপীয় সাহিত্যে আগ্রীব নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন সেই য়ুরোপীয় কাব্যোদ্যানে ভ্রমণ করিতে-করিতে বঙ্গপল্লীর অপরাজিতা মাধবীলতা-মণ্ডিত পরিবেষ্টনীর মধ্যস্থিত কেতকী, চম্পক, গন্ধরাজ, অশোক, মালতী, সেফালী, বেলা, মল্লিকা প্রভৃতি স্বদেশী কুসুমের স্বর্গীয় সৌরভে প্রাণ না জুড়াইয়া থাকিতে পারিতেন না। কি বঙ্গদেশে, কি মান্দ্রাজে, কি ইংলণ্ডে, কি ফ্রান্সদেশে, হিব্রু, গ্রীক, ইংরাজি, লাতিন, ফরাসী, জর্ম্মণ ও ইতালীয় কাব্যাদি অধ্যয়নের সঙ্গে-সঙ্গে সেই রামায়ণ, সেই মহাভারত, সেই চণ্ডী, সেই অন্নদামঙ্গল তাঁহার নিত্যসহচর, নিত্যপাঠ্য ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে স্বদেশের ও ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ গাঢ় হইতে গাঢ়তম হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বাহ্যিক কঠোর বৈদেশিক আবরণ বিদীর্ণ করিয়া সেই অনুরাগ-রশ্মি ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল ; তিনি তাহাকে আর কিছুতেই চাপিয়া লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা কবিতার সূত্র অবলম্বনে স্বদেশের ঘন ছায়াচ্ছন্ন পল্লীর বনপথ ধরিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্যে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া, সেই ভাষায় স্থায়ী কীর্ত্তিলাভ অসম্ভব, ইহা যখন তিনি বুঝিলেন, তখন সেই ভ্রমসঙ্কুল পথ উপযুক্ত সময়ে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি তিনি এতদূর অনুরাগী হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত ইংরেজী লাটিন শিরোবাক্যগুলি (Quotations) অপসারিত করিয়া তৎ-তৎস্থলে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উদ্ধৃত বাক্য সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। ইহা তাঁহার স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি সামান্য অনুরাগের পরিচায়ক নহে। তিনি তাঁহার দেশকে যে কতদূর ভালবাসিতেন, তাহা আমি তাঁহার রচিত ইংরেজি ও বাঙ্গালা কবিতা হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

প্রথম যৌবনে মধুসূদন King Porus—Legend of Old নামক একটি খণ্ড-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেই কবিতার শেষাংশে হৃত-গৌরব, ভারতবর্ষের নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,—

And where art thou, Fair Freedom ! thou,
Once Goddess of Ind's sunny clime!
When glory's halo round her brow
Shone radiant and she rose sublime,
Like her own towering Himalaye,
To kiss the blue clouds thron'd on high !
Clime of the Sun ! how like a dream
How like bright sun-beams on a stream
That melt beneath gray twilight's eye,
That glory hath now flitted by !

মান্দ্রাজে অবস্থানকালে তিনি Captive Ladie নামক যে ইংরাজী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার য়ুরোপীয়া পত্নীকে ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিগাথা উপহার দিয়া, সেই কাব্যের উৎসর্গ-পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

Then come and list thee to the minstrel-lyre,
And Lay of Eld of this my father-land !

'Visions of the Past' নামক খণ্ড-কাব্যের একস্থানে, মধুসূদন অরণ্যানী-সমাচ্ছন্ন, শার্দ্দূল-নিনাদিত, রৌদ্রতপ্ত বঙ্গদেশের বটচ্ছায়া-শীতল চিত্র, মান্দ্রাজ-প্রবাসে স্মরণ করিয়া লিখিতেছেন,—

As when, Bengala ! on thy sultry plains
Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan, slumberous haunt and cool.
Echo in mimic accents 'mong the flocks,
Couch'd there in noon-tide rest and soft repose,
Repeats the deafening and deep-thunder'd roar
Of him, the royal wanderer'of thy woods !

যখন উপরি-উক্ত কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল, তখন ইংরাজ-সহবাসে মধুসূদন বঙ্গসমাজ হইতে বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। চিরতুষার-সমাচ্ছন্ন নিবিড়-নীরদ-পরিবেষ্টিত সুমেরু শিখরে কক্ষভ্রষ্ট তারকার ন্যায়

আপনার অন্তর্নিহিত প্রেমরশ্মি সেই অন্ধকারেই বিকীর্ণ করিতেছিলেন। তখন এই সুদূর-নভোস্থিত তারকার অনাগত রশ্মি তাঁহার স্বজাতীয়-দিগের মধ্যে একজনও দেখিতে পান নাই।

পরে যখন মধুসূদন বঙ্গদেশে প্রত্যাগত হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন, এবং যখন তিনি ব্যারিষ্টার হইবার অভিলাষে ইংলণ্ডে গমনকালে 'বঙ্গভূমির প্রতি' শীর্ষক কবিতায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, তখন সেই কবিতাটিতে তাঁহার স্বদেশের প্রতি হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ হইয়া পড়িল।

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো, তব মন-কোকনদে! ইত্যাদি

এই কবিতাটি পাঠ করিয়া তখন তাঁহার স্বদেশবাসিগণ মধুসূদনের হৃদয়ের মাহাত্ম্য বুঝিয়া লইলেন।

য়ুরোপে থাকিয়াও মধুসূদনের স্বদেশের ও স্ব-ভাষার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। য়ুরোপ প্রবাসকালে তাঁহার কিছুমাত্র অবসর ছিল না। আইন অধ্যয়নে, তিনটি য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষায়, অর্থাভাবে বিপর্য্যস্ত সংসারের ব্যবস্থা কল্পে, তিনি সেখানে শান্ত বিশ্রাম উপভোগ করিতে পান নাই। কিন্তু সেই অশান্তি ও ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁহার স্বদেশী ভাষার অনুশীলনে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি য়ুরোপে যে কয়টি বাঙ্গালা চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটিই তাঁহার গভীর স্বভাষা ও স্বদেশানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমরা সে সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই মধুসূদন স্বরচিত বাঙ্গালা গ্রন্থগুলির উল্লেখ করিয়া সগৌরবে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। স্বদেশের মহাকবিদিগকে অর্থাৎ কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত এবং মহাকবি কালিদাসকে অন্তরের সহিত স্তবস্তুতি করিয়াছেন। লক্ষ কণ্ঠে তাঁহাদিগের রচিত কাব্যগুলির প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার মধ্যভাগ বিদেশীয় সাহিত্যের চর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষা যে রত্নখনিতে পরিপূর্ণ, এ ধারণা তাঁহার পূর্ব্বে ছিল না। পরবর্ত্তী কালে তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এতই অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, উত্তরপাড়ায় একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন 'বাঙ্গালা ভাষা ইতালীয় ভাষা অপেক্ষা অধিক সুমধুর।' বঙ্গভাষাকে তিনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা' সবে অবোধ আমি অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

* * *

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি।
যা ফিরি', অজ্ঞান তুই যা, রে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে॥

ফরাসী দেশে কোন ফরাসী-সুন্দরীকে কবিবর মধুসূদন কিরূপ দেশে তাঁহার জন্ম এবং তিনি যে একজন কবি, সেই পরিচয় অন্তে স্বদেশ-প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া দিতেছেন ;—

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে সুমধুর কলে
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে,
(তুষারে বপিত বাস উর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতোরূপে গলে)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ) হেরি ভীষণ মূরতি ;
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত-কাননে,—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী,
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ সদনে,—
সে দেশে জনম মম! জননী ভারতী,
তেঁই প্রেম-দাস আমি ওলো বরাঙ্গনে!

প্রবাসে বসিয়া মধুসূদন বাঙ্গালার শারদীয় মহোৎসবের কথা বিস্মৃত হন নাই। বাল্যে যখন স্বদেশের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া দুর্গাপ্রতিমা দেখিতেন, সেই নির্ম্মল আনন্দ ও ভক্তি পরবর্ত্তী জীবনে বহু বিড়ম্বনায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাই আশ্বিন-মাস শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন,—

—পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে স্মৃতি,
আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি?

কবির জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ নদের উপরে অবস্থিত। উহা তাঁহার মধুর বাল্য স্মৃতির সহিত চির-বিজড়িত ছিল। ফ্রান্সের নদী 'সিন' তাঁহার এই স্বদেশতটবাহিনী চির-মনোরমা তটিনীকে তাঁহার স্মৃতি-পট হইতে মুছিয়া দিতে পারে নাই। কপোতাক্ষের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগ এই কবিতাটিতে পূর্ণ প্রকটিত।

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে ;
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্র-ধ্বনি) তব কল-কলে
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু-দেশে দেখিয়াছি বহু-নদ-দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে!
আর, কি হে, হ'বে দেখা?—যত দিন যাবে
প্রজারূপে, রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারিরূপ কর তুমি, এ মিনতি,—গা'বো
বঙ্গজ-জনের কাণে, সখে সখারীতে
নাম তা'র, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।

মধুসূদনের জীবনী-লেখক লিখিয়াছেন "স্বদেশের মনোহারিণী মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে চির-জাগরূক ছিল। বাল্যাবস্থায় কোথায় তিনি ক্রীড়া করিতেন, কোথায় বেড়াইতে ভালবাসিতেন, পূর্ব্ববয়সে তাহা তাঁহার সুস্পষ্টরূপ স্মরণ ছিল। * * * বহুকাল মান্দ্রাজ-প্রবাসের পর, একবার সাগরদাঁড়ীতে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না।" আর একদিন কপোতাক্ষের কূলে বেড়াইতে-বেড়াইতে বলিয়াছিলেন, "কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পায়, সেও পরম সুখী।" জননী জন্মভূমির মোহিনীমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীর ভাব অঙ্কিত করিয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে।"

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মধুসূদনের হৃদয় প্রকৃতই বাঙ্গালীর ছিল। বাঙ্গালার করুণ-রস বাঙ্গালী কবির হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় উচ্ছলিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদিও ঘোর বৈদেশিক তমসায় আচ্ছন্ন ছিলেন, কিন্তু বঙ্গ-শারদের জ্যোৎস্না তাঁহার হৃদয়াকাশ প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। 'বঙ্গমিহির' সম্পাদক যথার্থই কবির মৃত্যুর পরে লিখিয়াছিলেন, "ফলতঃ মাইকেল হ্যাটকোটধারী প্রকৃত বাঙ্গালী ছিলেন।" তাহা যদি তিনি না থাকিতেন, আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, তাহা হইলে তিনি 'বিজয়া-দশমী' ও 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা'র ন্যায় কবিতা কখনই লিখিতে পারিতেন না।

শারদীয়া পূজার পরবর্ত্তী পৌর্ণমাসী নিশীথে বঙ্গদেশে কোজাগর লক্ষ্মীপূজার উৎসব হইয়া থাকে। হিমানী কুজ্ঝটিকাময় ফরাসীদেশে বাস করিয়াও মধুসূদনের চিত্তে এই চিত্র চিরাঙ্কিত ছিল। এই কবিতায় কবি লক্ষ্মী দেবীকে বন্দনা করিয়া, বঙ্গদেশে চির-অচলা হইয়া থাকিতে প্রার্থনা করিতেছেন ;

হৃদয় মন্দিরে, দেবি বন্দি' এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙাপদে ;—
থাক বঙ্গ-গৃহে যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ, সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সুতারা আকাশে,
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে।

'ভাষা' নাম্নী কবিতাটী মধুসূদনের বঙ্গভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচায়ক। বঙ্গকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে গণনার যোগ্যই নহে, সে বঙ্গভাষার নিন্দা করে। মধুসূদনের ন্যায় প্রতীচ্য ভাষায় সুপণ্ডিত এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজের মাতৃভাষাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে আদৌ সঙ্কুচিত নহেন। নিজের মাতৃভাষার গৌরবে চির-গৌরব-গত-প্রাণ কবি সংস্কৃতকেও এই কবিতায় নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন।

"O matre pulchra—
Filia pulchrior!"—Hor.

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা!—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরী
ভাষা!—শত ধিক্ তারে। ভুলে সে কি করি'
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী!
রূপহীনা দুহিতা কি, মা যা'র অপ্সরী?—
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কু-ধ্বনি?—
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বসে ফুলেশ্বরী
নলিনী? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।
দেব-যোনি মা তোমার, কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব রস-সুধা কোথা বয়সের হাসে?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান লো যুবতী!
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে
নব ফুল বাক্য-বনে নব মধুমতী!

লক্ষ্মীর কৃপা না হইলে যে মানব-জন্ম ব্যর্থ হইবে, এ কথা কেহ যেন মনে না করেন। বিশেষ সৌভাগ্য না থাকিলে বাগ্দেবীর কৃপা হয় না। চঞ্চলা লক্ষ্মীর কৃপা ক্ষণস্থায়ী। তাই মহাকবি মধুসূদন বলিতেছেন,—

কিন্তু যে কল্পনারূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্ব-ভাষা অঙ্গের শোভা বাড়া'য় আদরে!
কি লাভ সঞ্চরি, কহ রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয়? বাঁধা রমা চির কার ঘরে?

পক্ষান্তরে কবিবর সংস্কৃত ভাষারও পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছেন ;—

সংস্কৃত দেবভাষা মানব মণ্ডলে,—
* * * * *
রাজাশ্রয় আজি তব! উদয় অচলে—
কনক উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের, লো হরষে
নব-আদিত্যের রূপে! পূর্ব্বরূপ ধরি,'
ফোট পুনঃ পূর্ব্ব রূপে, পুনঃ পূর্ব্ব রসে!
এতদিনে প্রভাতিল দুঃখ-বিভাবরী ;
ফোট সদানন্দে হাসি মনের সরসে।

এতদ্ভিন্ন 'ভারতভূমি' 'আমরা' নামক কবিতাদ্বয়ে তাঁহার স্বদেশের জন্য অকপট মর্ম্মব্যথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'সমাপ্তে' নামক কবিতায় তিনি সরস্বতী দেবীর নিকট, ভারতবর্ষের রত্নস্বরূপ 'বঙ্গভূমি' আরও জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া গৌরবান্বিত হউক, এই প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছেন। সেই অমর কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া আমরাও এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম—

বিসর্জ্জিব আজি, মা, গো বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি' !
শুকাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যা'র গন্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিস্মরি'
সংসারের ধর্ম্ম কর্ম্ম ! ডুবিল সে তরী,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্পদিন ! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি ! ডাকিলা যৌবনে ,—
যদিও অধম-পুত্র মা কি ভুলে তা'রে ?
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে !
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে ;—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে।

জগতে রসায়ন-শাস্ত্রের স্থান

[শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-এ-সি]

রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) সম্বন্ধে অনেকের অবজ্ঞা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার শিক্ষা ব্যতীত জগতের যে কোন প্রকার উন্নতি সাধন হইত না, তাহা আমরা অনেক সময়ে ভাবিয়া দেখি না। রাসায়নিক নিয়ম ও প্রক্রিয়া কোথায় যে নাই, তাহা ত দৃষ্টি-গোচর হয় না। অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, আমাদিগের আহার্য্য দ্রব্যাদি হইতে শরীর মধ্যে শোণিত তৈয়ার ও দেহ-গঠন প্রভৃতি সকল ব্যাপারই এই নিয়মের অন্তর্ভূত। বিশ্ব-জগতের মধ্যে বিশ্বকর্ত্তা যে কত বড় রসায়নজ্ঞ তাহা মানব-জ্ঞানের বহির্ভূত। রসায়ন-শাস্ত্র বলিলে ইহাই বুঝায় যে, জগতের ভিতর সকল প্রকার অণু ও পরমাণুতে যে রাসায়নিক আকর্ষণ-শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, যাহার দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন অণুর মিলনে সকল পদার্থেরই বাহ্যিক আকৃতি ও গুণের পরিবর্ত্তন সমাহিত হয়, সেই শক্তি রসায়ন-শাস্ত্রের আধার। জগতে ধ্বংস বলিয়া কোনও ক্রিয়া নাই,—সকলই রূপান্তর মাত্র। পরমাণুর প্রকৃত পরিবর্ত্তন কোথাও সাধিত হয় না। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, পদার্থ-বিজ্ঞানও (Physics) এই শাস্ত্রের অংশ মাত্র। কেবল মাত্র দুই-চারিটি প্রাকৃতিক নিয়ম ছাড়িয়া দিলে, (যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, চলচ্ছক্তি, প্রকৃতির নিয়ম), প্রায় সকল প্রকার প্রজ্ঞানই এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। জীবাণু ও পরমাণু দ্বারা জীবদেহে যে সকল পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হইতেছে, ইহাও এই রসায়ন-শাস্ত্রেরই অন্তর্গত। ভূতত্ত্ববিদ্যা ও ঐ রসায়ন-শাস্ত্রেরই অংশ মাত্র। কৃষি-শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদও ইহার অন্তর্গত। আজকাল যে নানাবিধ পেটেণ্ট ঔষধ পথ্যাদি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা কেবল ঐ শাস্ত্রেরই প্রভাবে। প্রাণী বা অজড় জগতের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাপারটা কেবল রাসায়নিক নিয়মে সম্পাদিত হইতেছে। জীবদেহে এই যে ব্যারামের আবির্ভাব, ইহাও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবাণু দ্বারা সাধিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া মাত্র; এবং ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবহারও ঐরূপ প্রক্রিয়া মাত্র। কেবল একরূপ প্রক্রিয়াকে দমন করিবার নিমিত্ত অন্যরূপ প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ মাত্র। এই শাস্ত্রের দ্বারা যদি ধাতু-পদার্থ প্রভৃতির গুণ আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় জগতে এত অধিক এঞ্জিনীয়ারিং এবং স্থাপত্য-বিদ্যার উন্নতি হইত না। এই নিমিত্তই জামশেদপুরে টাটার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় বৃহৎ রসায়নাগার (laboratory) স্থাপিত হইয়াছে। ইহা না থাকিলে বোধ হয় কোনরূপেই ইস্পাত ও লৌহ-দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা দুরূহ ব্যাপার হইত। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না লৌহ এবং ইস্পাতের ভিতর ভেজাল সামগ্রীর পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় না। কারণ, যে ইস্পাতের দ্বারা রেলের লাইন তৈয়ার হয়, তাহা দ্বারা গৃহ-নির্ম্মাণের কড়ি বরগা প্রভৃতি তৈয়ার হয় না। এই নিমিত্তই রসায়ন-শাস্ত্র এঞ্জিনিয়ারদিগকে বলিয়া দেয় যে, সাবধান! ধাতু বা মৃত্তিকাজাত দ্রব্যাদিতে যদি এই এইরূপ সামগ্রী না থাকে, তাহা হইলে তোমাদের নির্ম্মিত বিশাল অট্টালিকা বা পুল সকল ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইবে। এই শাস্ত্র কৃষকদিগকে বলিয়া দেয় যে, তোমার জমিতে যদি এই-এইরূপ সার না দাও, তাহা হইলে তোমার ফসল ভাল হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে, জীব-জন্তুর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পর মৃত্তিকায় পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাপারটা একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া মাত্র। আপনার ফটো উঠাইয়া দিতেছি—তাহাও আলোক-সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা। আপনার পরিধেয় জুতার চর্ম্ম প্রস্তুত হইতেছে—তাহাও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা। এই রাসায়নিক বিদ্যার দ্বারা কালে হয় ত মানবদিগের মধ্যে যে বংশগত তারতম্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারও কারণ নিরূপিত হইতে পারিবে; এবং মনুষ্যও ইচ্ছানুরূপ গুণসম্পন্ন পুত্রকন্যাদির জন্মদান করিতে সমর্থ হইবে। হয় ত মানব বহুকালাবধি বাঁচিয়া থাকিতেও পারিবে।

এই জ্ঞানের দ্বারা আজি মানব-জাতি প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে সমর্থ হইতেছে। প্রকৃতির প্রস্তুত নানাবিধ বর্ণ, যেমন নীল রং, লাল রং প্রভৃতি বর্ণ এবং বৃক্ষজাত কর্পূর, রবার প্রভৃতি কত

প্রকার বস্তু নকল-রূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ। তবে প্রকৃতির প্রকৃত কল-কৌশল কেহই জ্ঞাত নহে। প্রকৃতি সেই একই বাতাস, জল সূর্য্যতাপ, তাড়িত শক্তি ও মৃত্তিকার সাহায্যে বৃক্ষ-বীজ হইতে ধীরে-ধীরে ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। তাহার নিকট বৃহৎ-বৃহৎ লৌহ-পাত্রাদি বা বদ্ধ কাচ-পাত্রাদিও নাই,—ক্ষারক দ্রব্যের সহিত গলিত করাও নাই,—গন্ধকদ্রবের সহিত ফুটিত করাও নাই,—তাহার নিকট পারদ, সীসা ও সোডিয়াম ধাতু ব্যবহার করাও নাই; অথচ, সেও সেই একই প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে! তাহার প্রক্রিয়ার সহিত মানব প্রক্রিয়ার এত তারতম্য কেন? প্রকৃতি যাহা লক্ষ-লক্ষ বৎসরে সাধন করিতে চাহে, মানব-জ্ঞান তাহা এক মুহূর্ত্তে সম্পন্ন করিতে চাহে। রুষ রসায়নবিৎ পণ্ডিত মেণ্ডেলিফ (Mendelieff) সাহেব যে জগতে তাঁহার Periodic Law প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, বিশ্ব-জগতে সকল প্রকার পরমাণুর গুরুত্ব (atomic weight) জ্ঞাত হইতে পারিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহার গুণও জানা যাইবে। ইহা তিনি জগতে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, জগতে এখনও পর্য্যন্ত অনেক পদার্থের আবিষ্কার হয় নাই; এবং ঐ সকল পদার্থের গুণ এবং স্থান তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, বাস্তবিক তাঁহার কথামত আজি-কালি অনেকগুলি নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। তাঁহার এ নিয়ম জগতে প্রচারিত না হইলে, বোধ হয় মোসিও মাদাম কুরি তাঁহাদের আবিষ্কৃত রেডিয়াম (Radium) পদার্থ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেন কি না সন্দেহ। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, পদার্থের পরমাণুর গুরুত্বের সহিত তাহার অস্থিমজ্জাগত গুণের তারতম্য কেন? তবে কি ইহারা বিশ্ব-জগতে সকলেই একই মূল পদার্থের রূপান্তর মাত্র? ইহার মীমাংসা এখনও পর্য্যন্ত কেহ করিতে সমর্থ হন নাই। মহা-মহা রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ গাছ-পালা, লতা-পাতা, ফল-ফুল প্রভৃতির ভিতর নানা প্রকার বর্ণ উৎপন্ন হওয়ার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন বটে; কিন্তু সামান্য প্রশ্নের নিকট তাঁহারা আজ নত-মস্তক। প্রশ্নটি এই—তুঁতে নীলবর্ণ,—তাহার ভিতর অতি সামান্য পরিমাণ জল-সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য উহার রং ঐরূপ। উত্তাপ দ্বারা ঐ জলটুকু বহিষ্কৃত করিয়া দিলে উহার বর্ণ আর নীল থাকে না,—সম্পূর্ণ শ্বেত হইয়া যায়। কিন্তু জলহীন তুঁতে কেনই বা শ্বেত এবং জলযুক্ত তুঁতে কেনই বা নীল—ইহার উত্তর আজি পর্য্যন্ত কেহই দিতে পারেন নাই। তুঁতে জলে দ্রবীভূত করিলে নীলবর্ণ দেখায়; কিন্তু উহাকে গ্লিসিরিন (glycerine) নামক পদার্থে দ্রবীভূত করিলেই বা সবুজ বর্ণ দেখায় কেন—ইহারও উত্তর আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা যেখানে আলোক দেখি, সেইখানেই উত্তাপও পাই; কিন্তু জোনাকী পোকার আলোকে ত কই উত্তাপ নাই। এরূপ শীতল আলোক-রশ্মি মানব উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে কি? কতশত রাসায়নিক আবিষ্কার দেখিয়া-শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, প্রকৃতির রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অঞ্চলের একপ্রান্ত সবে মাত্র আমরা ধরিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহারই রহস্যোদ্‌ঘাটন রসায়নবিদ্‌গণের কার্য্য।

য়ুরোপে সম্প্রতি যে মহাসমর হইয়া গেল, প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, উহা কেবল মাত্র রাসায়নিক সমর মাত্র। যে দেশের রাসায়নিক বিদ্যা যত অধিক, সেই দেশ তত অধিক পরিমাণে গুলি, বারুদ ও গ্যাস তৈয়ার করিয়াছে। জগতের সকল দেশ অপেক্ষা এক জর্ম্মাণ দেশই এই রসায়ন-শাস্ত্রে অগ্রণী। অজড় রসায়ন-শাস্ত্রে তাহাদের সমকক্ষ আর কোনও দেশ নাই। সকল প্রকার ব্যবহারিক রঙ্গই প্রায় ঐ দেশ হইতে আমদানি হয়। তাহারা ঐ সকল পদার্থ কেবল মাত্র আলকাতরা হইতে তৈয়ার করে। তাহাদের প্রস্তুত প্রণালীও অপর কোনও দেশ জ্ঞাত নহে। উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ঐ দেশ ব্যতীত অপর কোনও দেশে প্রস্তুত হয় না। য়ুরোপে মহাসমরের নিমিত্ত সেই সময় প্রায় সকল দেশই রাসায়নিক পদার্থের অপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন। এই কারণে এক্ষণে সকল জাতিই বুঝিয়াছে যে, রসায়ন-শাস্ত্রে মনোযোগ দান ব্যতীত জগতে পার্থিব উন্নতি করা দুষ্কর। সেই জন্য আজকাল পৃথিবীর সমগ্র জাতির মধ্যেই ইহার চর্চ্চার জন্য একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। আমরা যে এ বিষয়ে কত নিম্নে পড়িয়া আছি, তাহা নির্ণয় হয় না। সেই কারণে এক্ষণে ভারতবাসী ছাত্রদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট মনঃসংযোগ করা একান্ত আবশ্যক। জগতে এক্ষণে রসায়ন-শাস্ত্র সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত এবং যথেষ্ট সমাদৃত। প্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার নিমিত্ত এই শাস্ত্রের চর্চ্চা ও গবেষণা বিশেষ আবশ্যক।

খৃষ্টিয় ভক্তিবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

[অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

অমর কবি চণ্ডিদাস বলিয়াছেন:—

"মরম না জানে ধরম ব্যাখানে
এমন আছয়ে যারা,
কাজ নাহি সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা।"

ভক্তির কথা বলিতে হইলে, প্রকৃত ভক্তের ন্যায় তৃষিত হইয়াই বলিতে হইবে। যীশুর ভক্ত কি বাঙ্গালায় নাই? সাহিত্যের ভিতর দিয়া, যীশু প্রেমে মগ্ন হইয়া, কেহ ত তাঁর কথা বলেন না! এ সময়ে আমাদের মত অপ্রেমিক জন যদি খৃষ্টিয় ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিতে ব্যস্ত হয়, প্রার্থনা করি যাঁদের "বাহিরে দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা" তাঁহারা আমাদের সহায় হউন!

কোন প্রকার ভক্তিবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে, প্রথমেই আরাধ্য দেবতার সহিত সম্বন্ধের কথা আসিয়া পড়ে। পরে উপাসনা-পদ্ধতির মহিমা বুঝিয়া লইতে হয়। পরিশেষে ভক্তের প্রাণে কেমন

করিয়া সাড়া পায়, তাহা জানিতে পারিলে শ্রম সার্থক হয়। কিন্তু সকল সময়েই ইচ্ছা করে, স্বদেশীয় ভক্তিবাদের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিয়া লই। অথচ মনে-মনে বেশ জানি, প্রকৃত ধর্ম্ম মানুষের প্রাণ-স্বরূপ; এবং প্রাণের সঙ্গে প্রাণের তুলনা হয় না। তবে ক্ষুদ্র ব্যক্তির সামান্য বিচারে তারতম্য থাকিয়াই যায়। তাহাও গোপন করিয়া মিথ্যা আত্ম-গরিমার সৃষ্টি করিতে চাহি না। যাহা কিছু নিজের মনে বুঝিয়াছি, অন্যের মধ্যে বলিবার চেষ্টা করিব। সত্য এবং অসত্য ভাবুক জন বাছিয়া লউন!

ভক্তের অন্তরতম ধন পরমেশ্বর যে কেমনতর, তাহা এক মুখে বলা যায় না। তাঁর রূপের অবধি নাই। মানুষের ভাষায় তাঁর নাম অফুরন্ত। প্রেমে গদগদ হইয়া ভক্ত বলেন, তিনি প্রেমময়, তিনি দয়াময়। ভগবান্ ভক্তকে যে কতখানি ভালবাসেন, এমন কি, পাষণ্ডের জন্যও তাঁর কিরূপ ব্যাকুলতা, ভারতবর্ষের ভক্তমণ্ডলী যুগে-যুগে তাহার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হ'ন। আমাদের মনে হয়, মানুষের প্রতি ভগবানের টান ভারতবর্ষীয় ভক্তিবাদের মূল কথা। কিন্তু ভগবানকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিব, সকল দুঃখ-শোক যবের ন্যায় বহন করিব—অথচ যাঁকে ভালবাসি, সেই করুণাময় ঈশ্বরকে চিরকাল ন্যায়বান্ বলিয়া, প্রভু বলিয়া, জীবন-মরণের অধিপতি জানিয়া, তাঁর শাসন-বাক্যের অধীনে থাকিয়া জীবন কাটাইব—এইরূপ ভক্তি, ভয়, বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণের অদ্ভুত সমন্বয় খৃষ্টিয় ভক্তিবাদে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বর ন্যায়বান্। নির্জ্জনে তাঁকে আত্মার সমস্ত অভাব জানাইতে হইবে, স্বজনে তিনি সমস্ত আশা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু খৃষ্টিয় প্রার্থনা ভক্তের নিজস্ব অভাবের কথা হইলে চলিবে না। সমস্ত জগতের সহিত মিলিত হইয়া, সকল জীবের সহিত একাত্ম-বোধে প্রার্থনা করিতে হইবে। "আমাকে দাও" বা "আমাকে রক্ষা কর" এইরূপ প্রার্থনা খৃষ্টিয় ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। "আমাদের দাও" "আমাদের রক্ষা কর" ইহাই খৃষ্টিয় প্রার্থনার প্রধান অঙ্গ। এই কারণে সকলের সহিত মিলিত হইয়া পূজা-পদ্ধতি বা স্বজন-উপাসনা খৃষ্টিয় মণ্ডলীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

অনেকে বলেন, "স্বজন-উপাসনা আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত স্বরূপ। পূজার অঙ্গ যোগ। আমি এবং ঈশ্বর, ইহাই যোগের অবস্থা। অতএব সঙ্গে অন্য কেহ থাকিলে অসুবিধা।" একাত্ম-বোধ না থাকিলে, অপরের সঙ্গ নিশ্চয়ই কষ্টদায়ক। তবে আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, ভগবানের সহিত যোগের অবস্থায় যদি সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে, বা বিরোধ থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ যোগ হইল না। এবং এইরূপ সম্পূর্ণ যোগই যখন ধর্ম্ম-জীবনের পরিণতি, তখন আত্মীয়-বন্ধুদিগের সহিত মিলিত অবস্থায় সাধন-ভজন ধর্ম্ম-পথের পরম সম্পদ।

আর একটি কথা বিজ্ঞানের দিক্ থেকে আমরা বলিতে চাই। মানুষের মনের অবস্থা দ্বিবিধ—subjective (স্বকীয় অনুভবসিদ্ধ) এবং objective (বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয়)। Subjective অবস্থায় আমাদের কতখানি লাভ হয়, তাহা বিবেচ্য। সাধু মহাত্মাদিগের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরের কৃপায়, জগতের হিতার্থ তাঁহারা মঙ্গল চিন্তার আধার স্বরূপ বলিয়া, তাঁহাদের subjective অবস্থায় আমাদের পরম লাভ। কিন্তু পাপী, তাপী মানবের পক্ষে স্বীয় চিন্তার স্রোতে প্রবাহিত হইলে স্মৃতি, কল্পনা এবং ভাব দুষ্ট হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এইরূপে অসত্য আসিয়া পড়ে, এবং পূজার ব্যাঘাত জন্মায়। অতএব ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত যোগের জন্য subjective অবস্থা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ততটা সুবিধাজনক নহে। অন্য দিকে সকলেই অবগত আছেন, সাধারণতঃ objective অবস্থায় মানুষ নিজেকে পুষ্ট করিয়া লয়; subjective অবস্থায় তাহা ভোগ করিয়া থাকে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth) এইরূপ চিন্তা-পদ্ধতির বাস্তব পরিচয় দিতে গিয়া, Tintern Abbeyতে লিখিয়াছেন:—

* * * * These beauteous forms
Through a long absence, have not been to me
As is a landscape to a blind man's eye:
But oft in lonely rooms, and 'mid the din
Of towns and cities, I have owed to them
In hours of weariness, sensations sweet,
Felt in the blood, and felt along the heart."

বেশীদূর উদ্ধৃত করিব না। কবি আর একটু পরেই আভাস দিয়াছেন, কিরূপে প্রগাঢ় objective অবস্থা মানুষকে subjective হইবার পক্ষে সহায়তা করে—যাহাকে তিনি "that blessed and serene mood" বলিয়াছেন। কিন্তু objective অবস্থার সাফল্যের কথা ভুলিলে চলিবে না। তাহা হইলে পৃথিবীকে অস্বীকার করা হইবে; জীবনের সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হইবে না। অতএব পৃথিবীতে থাকিয়া, সংসারের সহিত মিলিত হইয়া, ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইলে স্বজন উপাসনার প্রয়োজনীয়তা আসিয়া পড়ে। কিন্তু কেহ যেন না মনে করেন, খৃষ্টিয় ধর্ম্মজীবনে নির্জ্জন প্রার্থনার সার্থকতা নাই। যীশুর জীবনে দেখিতে পাই, নির্জ্জনেই তাঁর কত কাল কাটিয়াছে; এবং সে সময়েও তিনি সৃষ্টি হইতে পৃথক ছিলেন না।

অনেকের বিশ্বাস, স্বজন-উপাসনা খৃষ্টিয় ধর্ম্মের নিজস্ব অঙ্গ। আমরা অবগত আছি, বৈষ্ণবদিগের একত্র নাম গান পদ্ধতি খৃষ্টিয় প্রণালী হইতে ঋণ লওয়া হইয়াছে এইরূপ মতও কোন কোন পণ্ডিত পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে আমাদের প্রত্যয় জন্মে না। রাধাকৃষ্ণের মিলন দেখিবার জন্য গোপিনীগণ ছুটিয়া আসিতেন,—ইহা অতি প্রাচীন কথা। আমাদের মনে হয়, ইহার মধ্যেই স্বজন-উপাসনার সার সত্য বলা হইয়াছে। ভক্ত ও ভগবানের মিলন দেখিতে পাওয়াই স্বজন-উপাসনার পরম সুবিধা। খৃষ্ট ও পরমেশ্বরের মিলন, বা মণ্ডলীর চিহ্নিত ভক্তদিগের ভগবানের সহিত যুক্ত ভাব নিরীক্ষণ করিতে পাওয়াই স্বজন-উপাসনার শ্রেষ্ঠ লাভ। এস্থলে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের খানিকটা ঐক্য দেখিতে পাই। কিন্তু স্বজন-উপাসনা খৃষ্টিয় ধর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল বলিয়া

আমাদের প্রতীয়মান হয়। কারণ খৃষ্টীয় ভক্তিবাদ এইরূপ পূজা-পদ্ধতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এক্ষণে তাহা বোঝা যাক্।

খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের মুখে শুনিতে পাই, যীশুর ভক্তির অনুশাসনগুলি তিনটি কথায় বলা যাইতে পারে— Faith (বিশ্বাস), Hope (আশা), এবং charity (প্রেম)। তিনটি বিষয়েই ভাবনার অন্ত নাই। আমরা কিন্তু ইহাদের যোগাযোগ বুঝিয়া লইতে চাই। বিশ্বাসই ধর্ম্মজীবনের মূল ভিত্তি। কিন্তু ভগবানের প্রতি বিশ্বাস কোন্ অবস্থায় জন্মায়? যখন মন আশায় পরিপূর্ণ। ভবিষ্যতের জন্য যাঁর আশা নাই, বর্ত্তমানে তাঁর মন বিশ্বাসী হইতে পারে না। ভবিষ্যতের জন্য আশা কাহার প্রাণে উদয় হইবে? যাঁর অন্তর charity বা প্রেমে পরিপূর্ণ। এইখানেই খৃষ্টীয় ভক্তিবাদের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যত দূর নিজের মনে বুঝিয়াছি, charityর মধ্যে দ্বিবিধ ভালবাসার ইঙ্গিত রহিয়াছে,—ভগবৎপ্রেম এবং জীবের প্রতি ভালবাসা। ভগবানকে ভালবাসিলে Hope এবং Faith আসিবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা বলিবেন, ইহা ত arguing in a circle। আমাদের মনে হয়, খৃষ্ট এ কথার উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইবেন। ভগবানের প্রতি যার প্রেম নাই, তাঁর জন্য যুগযুগান্ত ধরিয়া যীশুর মর্ম্মপীড়ার অন্ত নাই। কিন্তু তিনি আশার বাণী শুনাইতে আসিয়াছেন। সেই জন্য যাদের অন্তরে ভগবানের প্রতি ভালবাসা নাই, তাঁদের কাছে যীশুর সত্য-ধর্ম্ম আরও সুন্দর ভাবে প্রকট হইবে। এইখানেই খৃষ্ট-ধর্ম্মের মহিমা। ত্রিতাপে দগ্ধ মানবের প্রতি যীশুর আদেশ,—যদি প্রথমে ভগবান্‌কে ভালবাস্‌তে না পার, তাঁর জীবকে, তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাস, সেবা কর,—তাহা হইলেও তোমার ধর্ম্মজীবন গঠিত হইবে। এবং পরে ভগবানের ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে। বলিয়া রাখি, এত স্পষ্ট করিয়া যীশু এ কথা বলেন নাই। ভক্ত জন বলিতে পারেন না। তবে তাঁর সমগ্র জীবনের ইতিহাস এবং বাইবেলের সমস্ত বাণীগুলির নির্দ্দেশ যথার্থভাবে বুঝিতে গিয়া, আমাদের মনে এইরূপই প্রত্যয় জন্মে। আমরা যদি সত্যকে অন্ধের মধ্যে ধরিতে গিয়া ভক্ত জনের মনে বেদনা দিয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রীচরণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

এখানে কেহ-কেহ বলিবেন, শুধু জীবকে ভালবাসিলেই ভগবানের সান্নিধ্যে কিরূপে পৌঁছিব? তাঁহার প্রেম কিরূপে লাভ করিব? তাঁদের জন্য মথির ২৫ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে:—

"আমি ক্ষুধিত হইলে তোমরা আমাকে আহার দিয়াছ, পিপাসিত হইলে পেয় দ্রব্য দিয়াছ, অতিথি হইলে আশ্রয় দিয়াছ, বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পরাইয়াছ, পীড়িত হইলে আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছ, কারাগারস্থ হইলে আমার নিকট আসিয়াছ। তখন ধার্ম্মিকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিবে, প্রভো, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছি? কিংবা পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছি? কবে বা আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছি? কিংবা বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছি? কবে বা আপনাকে পীড়িত কিংবা কারাগারস্থ দেখিয়া আপনার নিকট গিয়াছি? তখন রাজা প্রত্যুত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিবেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনের প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ।"

খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের এই মর্ম্মস্পর্শী, সৃষ্টির এবং স্রষ্টার গূঢ় সম্বন্ধের উপর জগতের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। যিনি ভগবানকে ভালবাসেন, তিনি ত উদ্ধার হইয়া গিয়াছেন। যিনি ভালবাস্‌তে পারেন নাই,—ভগবানের নাম যাঁর অন্তরে কোন মতেই স্থান পাচ্ছে না, তিনি কোথায় যাবেন? তাঁর স্থান কি কোথাও হবে না? এই সুখের সংসারে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া মানুষ যদি বলেন, ভগবানকে আর আমার প্রয়োজন নাই,—ঈশ্বর কি তাঁকে ছাড়িতে পারেন? সমস্ত জগতের একটি প্রাণীকেও যে তাঁর ছাড়িলে চলিবে না। সৃষ্টির প্রথম নরনারী যেমন স্বর্গীয় উদ্যান হইতে, ভগবৎহীন অবস্থায় নিজেদের বঞ্চিত করে, সংসারের পথে যাত্রা করেছিলেন, আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও যে সেইরূপ দিন বারবার আসিয়া পড়ে, তাহা ত গোপন করিতে পারিব না। ফলে, দুঃখ, পাপ, হত্যা অনিবার্য্য। একটু উন্নতি হয়, যখন নীতি-জ্ঞান জলন্ত হইয়া উঠে,—মুষার দশাজ্ঞা যখন মানিতে আরম্ভ করি। এ সময়েও ঐ নৈতিক অনুশাসনগুলির গতি ভুলিবার নহে। ভারতবর্ষের ধর্ম্মপুস্তকগুলি পাপ হইতে বিরত থাকিতে আদেশ দেন; কারণ, তা' না হইলে আত্মার পবিত্রতা রক্ষা হয় না। আত্মার কল্যাণার্থ পাপ হইতে অব্যাহতির প্রয়োজন। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, মুষা বলেন:— পাপ করিও না। কারণ, পাপ করিলে অন্যের ক্ষতি, জগতের লোকসান।' বলিতে কষ্ট হয়, ভগবানের নাম লওয়া সম্বন্ধেও মুষার বাঁধাবাঁধির অন্ত নাই (Thou shall not take the name of thy Lord in vain)। এ সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে খৃষ্টধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ জীবের প্রতি ভালবাসায় প্রস্ফুটিত হইয়া ভগবৎপ্রেমে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নৈতিক জীবন অভ্যাস হইয়া আসিলে ধর্ম্মজীবনের আভাস যখন মানসনেত্রে দেখিতে পাই, তখন যীশুর ভালবাসা আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। "জীবে দয়া" এবং "নামে রুচি" একাধারে তাঁহার মধ্যে অবিচ্ছেদে দেখিতে পাই। মহাত্মা কেশবচন্দ্র বলিতেছেন:—

Analyse Christ's fundamental theology and you will find in it two parts, essentially distinct from each other. The first is "I in my Father"; the second "Ye in me"………If Christ is one with Divinity, he is one also with humanity. If you believe in the full Christ, in the perfect Christ, you must believe in the double harmony of his nature, harmony with God or communion and harmony with man or community."

এ স্থলে হিন্দুধর্ম্মের কথা মনে হয়। খৃষ্টধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের মিলনের কেন্দ্র দেখাইতে গিয়া, মহাত্মা কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না:—

"Look at this clear triangular figure with the eye of faith, and study its deep mathematics. The apex is the very God Jehovah, the supreme Brahma of the Vedas......From him comes down the Son, in a direct line, an emanation from Divinity. Thus God descends and touches an end of the base of humanity, then running all along the base permeates the world and then by the power of the Holy Ghost drags up degenerated humanity to himself. Divinity coming down to humanity is the Son ; Divinity carrying up humanity to heaven is the Holy Ghost. This is the whole philosophy of salvation. The Father, the Son, the Holy Ghost ; the Creator, the Exemplar and the Sanctifier ; I am, I love, I save ; Force, Wisdom, Holiness ; the True, the Good, the Beautiful ; Sat, Chit, Ananda."

প্রবন্ধ বাড়াইব না। তুলনা করিতে ইচ্ছা করে না ; তথাপি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টীয় ভক্তিবাদের পাশাপাশি বিশ্লেষণ করিতে গেলে, উভয়ের কয়েকটি বিশেষত্ব ভোলা যায় না। খৃষ্টীয় ভালবাসা লাভ করিতে হইলে,—ঈশ্বরে অল্প বিশ্বাস থাকিলেও, জীবকে ভালবাসিতে পারিলে ভগবানে পৌঁছান যায়। খৃষ্টীয় ভক্তিবাদ ঈশ্বর, মানবাত্মা, এবং সংসারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান নহে। খৃষ্ট-ভক্ত সংসারের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরে পৌঁছান। ভারতবর্ষীয় ভক্তগণ সংসারকে দূরে ঠেলিয়া বা উড়াইয়া দিয়া "আমি" এবং "ঈশ্বর" এই দুইএর অস্তিত্ব লইয়া বিভোর হ'ন। ফলে "তিনি আমার" "আমি তাঁর" এই ভাবে শান্তি লাভ করেন।

খৃষ্টীয় ভালবাসা অনেকটা বিস্তীর্ণ। "তুমি আপন প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম কর।" প্রতিবাসীরও বাছ-বিচার নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে বাৎসল্যভাব, সখ্যভাব প্রভৃতির মধ্যে যে কোন ভাবে তন্ময় হইলে উন্নতি লাভ হয়, এবং ক্রমশঃ নিষ্কাম ভাবে শ্রীভগবানকে প্রেম করা যায়।

খৃষ্টানগণ সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন নাই বলিয়া, জগৎ জয় করিতে বাহির হইয়াছেন। অবশ্য জড়বাদ (Materialism) আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা স্বীকার করি। অন্য দিকে ভারতবর্ষীয় ভক্তেরা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া একমাত্র সচ্চিদানন্দে ডুবিয়া আছেন। কিন্তু যাহা কিছু জাগতিক, সে সমস্তই আত্ম-অধিকার-চ্যুত হইয়া গিয়াছে।

স্মরণে

[শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ]

বিনিদ্র নয়নে আজি বর্ষা নেমে আসে—
মনে পড়ে কবে এক সুদূর বাদলে
আনমনে বসেছিলে বাতায়ন-পাশে—
ছন্দে গাঁথা মালাখানি পড়ে ছিল কোলে।

বাহিরে মেঘেতে ঢাকা ধূসর বনানী,
অন্তরে কিসের ব্যথা উঠেছিল জাগি'—
আসন্ন বিরহ-ভয়ে বিষণ্ণ মু'খানি
সে কোন্ ঈপ্সিত, প্রিয়, দয়িতের লাগি !

তোমার অন্তর হতে বেদনাটি নিয়ে
আমারে করিলে পূর্ণ সবটুকু দিয়ে।

পদতলে বসেছিনু ক্ষণেকের তরে,
ব্যর্থ সাধনার স্মৃতি ভরেছিল বুক ;
কুণ্ঠিত পরশ সেই নিরালা বাসরে—
আশা-হত জীবনের একটুকু সুখ।

* * * *

নিশীথ রাতের কোন্ বাদলের ধারা
সুরে উঠেছিল ফুটে, কমকণ্ঠে তব,—
মিলন-স্বপন মাঝে হয়ে দিশেহারা
খুঁজেছিল দয়িতের প্রীতি অভিনব ;—

সেদিন বিরহ শেষে মিলনের রাতি,—
লাজ-আবরণটুকু পড়েছিল খসে,—
হৃদয়-বাসরে তব জ্বলেছিল বাতি,
সে কোন্ অতিথি তরে জেগেছিলে বসে!

হিয়ার গোপন কথা সুরে এল ভাসি
তোমার রূপের মাঝে আপনা বিকাশি।

সুরেতে কি রূপ আছে, দেখিনু সেদিন—
শান্ত দেহ, স্তব্ধ হিয়া, নয়নে আবেশ—
একটি মিলন-স্মৃতি রহিবে নিলীন
পুরানো গানের সুরে—অনন্ত অশেষ।

* * * * *

তুমি তো চাহ নি বন্ধু, বিদায়ের ক্ষণে,
আঁখি-কোণে পড়ে নাই বিষাদের ছায়া,—
একটি সজল স্মৃতি জাগে নি কি মনে,—
আসা-যাওয়া দু'দিনের ক্ষণিকের মায়া?

তুমি তো কহ নি কথা বিদায়ের ক্ষণে—
কম্পিত অধর-কোণে অর্থহীন ভাষা
ফিরে গিয়েছিল মোর ব্যথাভরা মনে;
এসেছিল নিয়ে সে যে বুক-ভরা আশা!

বাসর-রাতের মালা যদি বা শুকায়,
ছিন্ন ডোর কেন রহে তরুণ উষায়!

সবি বৃথা মনে হয়—বৃথা পথ চলা—
শূন্য ঘরে ফিরে যাওয়া বাদলের রাতে;
বলিবার কত কথা হয় নি কো বলা—
লগ্ন বৃথা বহি গেল বিদায়-প্রভাতে!

পরিবর্ত্ত

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কেমন করিয়া সম্ভব হইল—কে জানে! কিন্তু হইল।

সত্যেন্দ্র করিয়াছিল একটি কয়লা-চালানী আফিস। মিরিয়ম ডাইক্স ছিল সেই আফিসের দশ-পনেরোটি কেরাণীর একটি! একটি টাইপিষ্ট! মুখচোরা বেচারা,—না কয় বেশী কথা, না বেশী হাসে একটু,—না কিছু! আর সত্যেন্দ্র ছিল সেই ধরণের পুরুষ একজন, যে সারা জীবনটা স্ত্রী-জাতিকে ভয়, সম্ভ্রম, সমীহ করিয়া আসিয়াছে।

সেই সত্যেন্দ্রই মিরিয়ম ডাইক্সকে ভালোবাসিয়া ফেলিল! শুধু যে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াই ক্ষান্ত হইল তাহা নহে,—বলিয়াও ফেলিল। মিরিয়ম শুনিল; শুনিতে-শুনিতে তাহার গোলাপের মত কপোলটি রক্তবর্ণ ধারণ করিল,—নীল নয়ন-দুটি বার-দুই কাঁপিয়া স্থির হইয়া গেল। মিরিয়ম দুই হাতে একটা পেন্সিল চাপিয়া নীরবে সত্যেন্দ্রের টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—ঘুরিয়া আসিয়া, মিরিয়মের হাতখানি তুলিয়া লইয়া, আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল—মিরিয়ম, প্রিয়তমে মিরিয়ম, আমার অসীম উন্মুখ প্রেম উপেক্ষা করিও না প্রিয়ে,—তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। বল—বল, প্রাণাধিকে, তুমি কি আমায় ভালোবাসিতে পারিবে না?

মিরিয়ম নিঃশব্দ।

সত্যেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিতেছিল। এক মুহূর্ত্ত প্রেমিকের নিকট এক ঘণ্টার সমান বোধ হয়। সত্যেন্দ্র দুই হাতে মিরিয়মের মুখখানি তুলিয়া ধরিল। ধরিতেই কয়েক ফোঁটা জল সত্যেন্দ্রের হাতের উপর ঝরিয়া পড়িল। সত্যেন্দ্র ভয় পাইয়া গেল। ও বাবা! কাঁদে যে!

কিন্তু সে প্রবল ইচ্ছাবেগ সম্বরণ করিতেও পারিতেছিল না। মিরিয়মের সিক্ত মুখের পানে চাহিয়া, ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসিল—মিরিয়ম, এ কি একান্তই দুরাশা?

এ কথায় সেই অশ্রুধৌত চোখেও বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া

উঠিল। মিরিয়ম কোন কথার উত্তর দিল না,—নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যেন্দ্রের বুঝা উচিত ছিল,—যুবতীর চোখে এমন সময়ে অশ্রু কেন? অশ্রু ঝরে কি অমনি-অমনি! সুখে ঝরে, দুঃখে ঝরে! সে যে প্রস্তাব করিয়াছে, সে ত সুখেরই প্রস্তাব,—দুঃখের কি আছে তাহাতে?

কিন্তু অত শত সে বুঝিল না। দেরী দেখিয়া নিরাশায় তাহার হৃদয়টি ভরিয়া যাইতেছিল,—ক্ষণমাত্র বিলম্ব তাহার সহিতেছিল না। সে শুনিয়াছে, এমন অবস্থায় নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলে, বিফলতার সম্ভাবনা অল্প। যেমন মনে হওয়া, অমনি সে তড়াক করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, কাতর, করুণ কণ্ঠে ডাকিল—মিরিয়ম, মিরিয়ম, প্রিয় আমার, ভালোবাসা আমার! কথা কও, বল, বল……

মিরিয়ম একবার কথা কহিল, বলিল—ও হ, দিস্ ইজ সকিং! আমাকে ভাবিতে সময় দিন।

ভাবিতে সময়? মিরিয়ম……

হাঁ, এক সপ্তাহ সময় দিন।

ওঃ! এক সপ্তাহ!...সত্যেন্দ্র সত্যসত্যই হতাশ হইয়া গেল। বলিল—সময় কেন প্রিয়ে! তুমি কি তবে আমায় ভালোবাস না?

বাসি!

তবে?

মিরিয়ম গদগদ কণ্ঠে কহিল, আমাকে মন স্থির করিতে দিন।

সত্যেন্দ্র বলিল—একান্তই সময় চাই?

মিরিয়ম ঘাড় নাড়িল।

বেশ—তাই; আজ শনিবার; আগামী শনিবারের পূর্ব্বেই বলিবে?

বলিব।...মিরিয়ম প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল,—সত্যেন্দ্র আবার তাহার হাতটি ধরিল। বলিল—মিরিয়ম, শনিবারের আশায় রহিলাম। প্রিয়তমে! দেখিও, আমাকে নিরাশা-সাগরে ডুবাইও না যেন!

মিরিয়ম নিঃশব্দে একটি কটাক্ষ করিয়া, কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। সত্যেন্দ্র নিজের চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। মিরিয়ম বলিয়াছে, ভালোবাসে! তবে আর সম্ভবতঃ বিশেষ কোন ভাবনা নাই! যদিও সময় লওয়াটা সত্যেন্দ্রের মনে একটি খট্‌কা তুলিয়াছিল,—কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে মনটি সাফ্ হইয়া গেল। ইংরেজে-বাঙ্গালীতে বিবাহ অনেক হইয়াছে বটে, এখনও হইতেছে;—কিন্তু ভয় প্রথম-প্রথম কাহার না হয়? স্বর্ণ নহে, স্বদেশীয় নহে, স্বজাতীয়ও নহে, স্বধর্মীও নহে;—এমন লোককে বিবাহ করিতে কি অমনি এক কথায় রাজী কেহ হইতে পারে? বেশ ত, মন ঠিক করিয়া লউক না,—সাত দিনে আর কি ক্ষতি হইতেছে? আর এ বিবাহে আপত্তি করিবার কেহ নাই,—কিছু নাই। মিরিয়ম বলিয়াছে যে, আত্মীয়-পরিজন তাহার নাই,—অল্প বয়সেই সে পিতৃমাতৃহীনা;—এক ধর্ম্মযাজক পরিবারের মধ্যেই সে মানুষ হইয়াছিল। কয় বৎসর হইল, তাঁহারাও দেহরক্ষা করিয়াছেন। এখন তাহার অভিভাবক সে স্বয়ং! একটা ক্লাব-হাউসে অনেকগুলি চাকুরে মেয়ের সঙ্গে বাস করে। যা আশীটি টাকা মাহিনা পায়, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট!

মিরিয়ম সটহ্যাণ্ড নোট্ লইতে আসিত। সত্যেন্দ্র ডিক্‌টেসন দিত না;—না দিয়া প্রশ্ন করিয়া, একে-একে এই সব জানিয়া লইয়াছিল।

আফিসে নিয়ম ছিল,—কর্ম্মকারকগণ গৃহে গমনকালে স্বত্বাধিকারীকে শুভ-রাত্রি জ্ঞাপন করিয়া যাইত। সেদিন ছিল শনিবার। তিনটা বাজিতেই, একে-একে বাবুরা সু-সন্ধ্যা করিয়া গেল। সকলের শেষে আসিল, মিরিয়ম!

স্বল্পালোকিত কক্ষে সহসা একঝাড় রজনীগন্ধা ফুলিয়া উঠিল। মিরিয়ম বলিল—শুভ-রাত্রি!

শুভ-রাত্রি! বাড়ী যাইবে ত মিরিয়ম? চলো না আমার সঙ্গে, কারে। নামাইয়া দিয়া যাইব। আমার প্রিয়ার বাসস্থানটি ত দেখা হইবে!

ধন্যবাদ! চল।

সত্যেন্দ্র বেহারাকে ডাকিতে ঘণ্টা বাজাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সপ্তাহ কাটিয়া গেছে,—আজ শনিবার।

সত্যেন্দ্র সকাল-সকাল স্নানাগার সারিয়া, দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশ-বাস সজ্জিত করিয়া লইল। তাহার সপ্তদশ-বর্ষীয়া পত্নী সুবাস নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল; সত্যেন্দ্রের তিলমাত্র অবকাশ নাই যে, তাহার সহিত দাঁড়াইয়া দুইটি কথা কহে, বা একটু আদর করে! আর কি কথাই বা কহিবে? সে

শ্রী ও সীতারাম

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়] [সীতারাম, একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

[Blocks by— BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

Emerald Ptg. Works Calcutta

কি জানে কথা কহিতে? একটা রহস্য বুঝে না,—একটা রসিকতা সহ্য হয় না;—ঘ্যাণ-ঘ্যাণে আর প্যাণ-প্যাণে! সত্যেন্দ্র বরাবর ভাবিত, সে এমন কি অন্যায় করিয়াছে, যাহার জন্য বিধাতা তাহার ভাগ্যে এমন 'স্ত্রী-রত্ন' জুটাইয়া দিলেন। বেশীর ভাগ বাঙ্গালীই বিবাহিত জীবনে সুখী নয়। এই বিংশ শতাব্দীর নব সভ্যতার আলোকে বঙ্গীয় যুবকগণের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে,—গৃহের কোণে স্ত্রীর অধর-সুধায় ও চোখের জলে আর তাহার তৃপ্তি নাই। তাহাতে না আছে এতটুকু বৈচিত্র্য, না আছে সজীবতা! কি সুখে জীবন যাপন করে জানি না,—সত্যেন্দ্র ত মরিয়া হইয়াছে! সেই দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবন! সেই আফিস হইতে আসা,—সেই জল-খাবারের রেকাবী,—সেই খাও-খাও, আমার মাথা খাও—অনেক হইয়াছে, —আর চলে না, চলে না! অসহ্য!

আজ বঙ্গীয় যুবকগণের শরীরে স্বাস্থ্য নাই, দেহে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, কর্ম্মে আগ্রহ নাই,—কেন? সে ঐ স্ত্রী! স্ত্রীর জন্য! স্ত্রীরা কি স্বামীদের তুষ্টির জন্য অনুরূপ হইতে পারে না? তাহারা কি ইহ-পরকালের প্রভুকে সুখী করিতে চাহে না? সত্যেন্দ্র স্বীকার করিত, না, তাহাদের দোষ নাই; কিন্তু সমাজ! সমাজ যে চারিদিকে কাণ খাড়া করিয়া রক্ত চক্ষে চাহিয়া আছে!

পারে যদি কেহ এই সমাজটাকে আমূল তুলিয়া বঙ্গসাগর-গর্ভে নিক্ষেপ করিতে, তবেই,—তবেই আবার দেশে প্রাণ আসিবে, ছেলেরা মানুষ হইবে! নতুবা সব যাইবে। কুব্জ-পৃষ্ঠ অধিকতর কুব্জ,—ন্যুব্জ দেহ আরো ন্যুব্জ হইবে! সত্যেন্দ্র সমাজ সংস্কারক নহে,—সমাজ বাঁচুক বা মরুক, সে চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক উষ্ণ করিবার তাহার প্রয়োজন নাই; নিজের পথ সে বাছিয়া লইয়াছে। তাহাতে যদি তাহার নিন্দা হয়,—হোক; লোকে নিষ্ঠুর বলে,—বলুক। লোকের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিবে, এমন মূর্খ, বর্ব্বর সে নয়।

সত্যেন্দ্র দশ মিনিটের মধ্যেই আফিসে আসিয়া পৌঁছিল। বেহারা হাত হইতে ছড়ি ও টুপি লইয়া, আল্‌নায় ঝুলাইয়া, প্রভুর কামরার পাখা খুলিয়া দিল। সত্যেন্দ্র কোট্-টি খুলিতে-খুলিতে হাজিরা-বহি টানিয়া লইল—সকলেই আসিয়াছে;—আসে নাই—কেবল মিরিয়ম! সব আসা না আসা সমান হইয়া গেল। সত্যেন্দ্র ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ১০-৩৫। পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে সত্যেন্দ্র দেখিল, কখনও ১০-২৫এর পরে মিরিয়ম আসে নাই। ২০, ২১, ২২, কচিৎ ২৫—ইহার বেশী একটি দিনও হয় নাই।

সত্যেন্দ্র চিন্তান্বিত মুখে চেয়ারে বসিল। বেহারা কাচের পিরিচের উপর কাচের গেলাসে কাচের মত বরফ-জল রাখিয়া গেল। সত্যেন্দ্র গেলাস তুলিয়া জল পান করিল বটে,—কিন্তু তাহার জিহ্বায় জলের স্বাদ আজ কিরূপ ঠেকিল, তাহা কি আর বলিতে হইবে! সত্যেন্দ্র সিগারেট ধরাইল; এত প্রিয় যে সামগ্রী, আজ তাহার তাহা ভাল লাগিল না। কিন্তু কি করিবে! সিগারেট ছাড়া আর কিসে মনের ব্যাকুলতার কথঞ্চিৎ শান্তিও দিতে পারে? একটা, দুইটা, তিনটা—পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, শান্তি মিলিল না।

বাহিরে খটা-খট্ টাইপ-কলের শব্দ হইতেছে। থাকিয়া-থাকিয়া টুং টুং করিয়া টেলিফোঁর ঘণ্টা বাজিতেছে। মধ্যে-মধ্যে নিম্নকণ্ঠে বাবুদের গুঞ্জন-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। টেবিলের উপর স্তরে-স্তরে চিঠিপত্র ও কাগজাদি সজ্জিত। সত্যেন্দ্র কিছুতেই মন দিতে পারিতেছে না।

দেখিতে-দেখিতে ঢং ঢং ঢং ঢং করিয়া চারটা বাজিয়া গেল। আর এক ঘণ্টা, তার পরই ত আফিস বন্ধ হইবে। আর কি সে আসিবে? নাঃ, আজিকার দিনই যখন বৃথায় গেল, আসিল না, তখন নিশ্চয় মিরিয়ম আর আসিবে না। আকাশের গায়ে গত সাত দিন ধরিয়া যে সুরম্য হর্ম্ম্য গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, ঐ বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে! ঐ বুঝি তাহার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ম্মূল হইয়া যায়!...

টেলিফোঁর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এক-মিনিট পরেই টেলিফোঁ-বাবু পরদা ঠেলিয়া সত্যেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া ইংরাজীতে কহিল—আপনাকে কেহ খুঁজিতেছেন, মহাশয়!

সত্যেন্দ্র অত্যন্ত বিরক্তভাবে টেলিফোঁর কল তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসিল, কে তুমি!

উত্তর আসিল, আমি মিরিয়ম!

আজ সপ্তাহ শেষ হইল, তুমি ত আসিলে না?

উত্তর হইল—হা হতোস্মি! আমি আসিব! সেই কি রীতি? না, তুমি আসিবে'।

সত্যেন্দ্র জিভ্ কাটিয়া কহিল—আমায় ক্ষমা কর, মিরিয়ম, আমি এখনি যাইতেছি।

বেহারা টুপি ও ছড়ি লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসিল, গাড়ী?

খাড়া—হুজুর!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রিয়া-নিকেতনে পৌঁছিতে, সারাদিনের উৎকণ্ঠা, অবসাদ, চিত্ত গ্লানি বিদূরিত হইয়া গেল। মিরিয়ম অশ্রু-ছলছল চোখে বলিল—আমি কি তোমার উপযুক্ত হইতে পারিব?

সত্যেন্দ্র মিরিয়মের কৃশ দেহটিকে বক্ষে বাঁধিয়া সহর্ষ কণ্ঠে কহিল, ও-কথা বোলো না মিরিয়ম, ও-কথা বোলো না। তুমি আমার উপযুক্ত হইতে পারিবে না? তবে আমার কি ভয় হইতেছে, জান ডিয়ার? আমাকে লইয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে ত? বল,—বল, আমাকে লইয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে?

এ প্রশ্নের উত্তর মিরিয়ম আর মুখে দিতে পারিল না। দুটি চক্ষু দিয়া, কোমল মুখের রেখার ভিতর দিয়া, দুটি সস্নেহ বাহু-পাশ দিয়া এ কথার এবং অনেক কথার উত্তর দিয়া দিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, মিরিয়ম বলিল—আমি শুনিয়াছিলাম, বাঙ্গালী যুবকদের খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। আমার কাছে দু'একখানি ছবি আছে,—বিলাতী ম্যাগাজিনে বাহির হইয়াছিল,—বাঙ্গালা দেশের বর-কনে। তাহাতে বরের মুখে গোঁফের রেখাটিও দেখা দেয় নাই;—আর কনে ত স্কুল গার্ল বলিলেই হয়।

হাাঁ—হ্যাঁ, ঐরূপ আগে হইত বটে, এখন-ও দু'একটা হয়। কিন্তু আগের তুলনায় সে কিছুই নয়। এখন পরিণত বয়সের আগে কেহ বিবাহ করে না।

মিরিয়ম কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিল—তোমার আত্মীয়-স্বজন আছেন,—তুমি তাঁহাদের অনুমতি পাইবে?

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল—বিবাহে অনুমতি? তুমি কি বলিতেছ, প্রাণাধিকে! অনুমতি পাইব না! আর কাহারই বা অনুমতি আবশ্যক? এক বৃদ্ধা মা আছেন,—তিনি আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না।

তবুও মিরিয়মের মুখখানির মলিনতা ঘুচিল না। সে ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বলিল—কিন্তু তিনি কি......কথাটা স শেষ করিতে পারিল না। সত্যেন্দ্র কিন্তু তাহার মনের ভাবটি বুঝিল। বুঝিয়াও জিজ্ঞাসিল—কিন্তু কি বলিতেছিলে?

তিনি কি তোমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না?

রুষ্ট হইবেন কেন? ইংরেজে-বাঙ্গালীতে বিবাহ এই প্রথম নয়,—পূর্ব্বে অনেক হইয়া গেছে। আমারই ছোট-মামা বিলাতে মেম্ বিবাহ করিয়াছিলেন। আমার সে মামী এখনও জীবিত রহিয়াছেন।

তিনি কোথায়? এখানেই আছেন?

না, তাঁহারা থাকেন, লাহোরে। আমার মামা সেখানকার ইঞ্জিনীয়ার।

কিন্তু তিনি বোধ করি বাড়ী আসিতে পারেন না?

সত্যেন্দ্র শিস্ দিয়া উঠিল; বলিল—পূঃ—কেন পারিবেন না? এই ত সেবারও আমাদের বাড়ীতে সস্ত্রীক, সকন্যা তিনমাস থাকিয়া গেলেন।

মিরিয়ম নীরব। যুবতীটি অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে সুদূর ভবিষ্যতের অদৃষ্ট-জগতে উঁকি দিতেছিল,—কথা কহিল না।

সত্যেন্দ্র দুই মিনিট কাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—মিরিয়ম, মিরিয়ম, কেন তুমি এত ভাবিয়া আকুল হইতেছ? আমি তোমাকে ভালোবাসি,—তোমাকে সুখী করিতে কি আমি ত্রুটি করিব প্রিয়ে?

মিরিয়ম তথাপি নীরব, নতমুখ।

সত্যেন্দ্র বলিল—তুমি বুঝি আমাকে ভালোবাস না মিরিয়ম?...নিশ্চয়ই বাস না। বাসিলে কখনই তুমি এত সন্দেহ করিতে না। এই দেখ না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, সেই আমার যথেষ্ট। কে অসন্তুষ্ট হইবে, কে মন্দ বলিবে—কৈ এ সব কথা ত একবারটিও আমার মনে আসিতেছে না! কেন আসিতেছে না, জান? তোমার প্রেমেই আমি সন্তুষ্ট। তুমি যদি আমার মত...

মিরিয়ম সহসা মুখ তুলিয়া, দুইটি পেলব শ্বেত বাহু-বল্লরীর দ্বারা সত্যেন্দ্রকে বক্ষ সন্নিকটে টানিয়া, গদগদ কণ্ঠে কহিল, বোলো না, বোলো না, প্রিয়তম, আর বোলো না!...সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সত্যেন্দ্র জানিত না যে, এইদিনই অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দিতে হয়। মিরিয়ম সে কথা বলিয়া দিল। তখনি উভয়ে হাওয়া-গাড়ী চড়িয়া লালদীঘির সামনে এক বাঙ্গালী জুয়েলার্স-এর দোকান হইতে বহুমূল্য হীরকখচিত অঙ্গুরীয়ক

ক্রয় করিয়া, ইডেন-গার্ডেন্সের কৃত্রিম হ্রদের তীরে একটা নির্জ্জন স্থান দেখিয়া বেঞ্চে বসিল। শত চুম্বনে গণ্ড দু'টি ভরাইয়া দিল। মিরিয়মের শ্বেত গণ্ডে এক-একটি চুম্বন দেয়, আর সত্যেন্দ্র ভাবে এত সুখ জীবনে আর কোন দিনই সে অনুভব করে নাই! শুধু দুই অধর-পুটে এত সুখ, এত সুধা যে উথলিয়া উঠিতে পারে,—সত্যেন্দ্র কবির কাব্যে, ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে পাঠ করিয়াছে বটে,—কিন্তু এই সে প্রত্যক্ষ করিল। এই সে প্রথম বুঝিল,—কবির কল্পনা অলীক, অসত্য নহে; ঔপন্যাসিকের লেখার মধ্যে সত্যতা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে।

রাত্রে এক সঙ্গে খাইতে হয়,—উভয়ে গ্রেট ইষ্টার্ণে ঢুকিল। সত্যেন্দ্র গোটা দুই পেগ্ খাইয়া, একটুখানি খাওয়াইবার অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু মিরিয়ম সাহস করিল না। সে খানিকটা ভার্ম্মুথ পান করিল।

কথাবার্ত্তা বাঙ্গালাতেই হইতেছিল। মিরিয়ম ছেলেবেলায় মিশনরী স্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিল। সত্যেন্দ্র বলিয়াছে, বিবাহের পর তাহাকে স্বয়ং উত্তমরূপে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবে।

সেইখানে বসিয়া কথা কহিতে-কহিতে স্থির হইল যে, আগামী কল্যই মিরিয়ম ক্লাবের বাস উঠাইয়া, কাশীপুরস্থিত সত্যেন্দ্রের উদ্যান-বাটিকায় চলিয়া আসিবে। এবং যতদিন না বিবাহ হয়, সেই স্থানেই বাস করিবে। উদ্যান-বাটিকাটি ভাগীরথীর কূলেই অবস্থিত,—নির্জ্জন এবং অতি মনোরম! সকাল-সন্ধ্যায় নদীর হাওয়া, পাখীর কল-কূজন। এত ট্রামের ঘটা-ঘং শব্দ নাই,—মোটরের ভোঁক্-ভোঁক্ নাই, মোটর-লরীর ধোঁয়া নাই;—শুনিতে-শুনিতে মিরিয়ম প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল—চিরদিন কি সেখানেই বাস করা যায় না প্রিয়তম?

কেন যাইবে না মিরিয়ম! সে ত আজ হইতে তোমারই হইল। যতদিন আমরা বাঙ্গালা দেশে থাকিব, ততদিন সেখানেই থাকা যাইবে। তার পর তোমায় লইয়া ইয়োরোপ ঘুরিতে বাহির হইব।

মিরিয়মের চক্ষু দু'টি মুদিয়া আসিল। এ যে তাহার কল্পনারও অতীত ছিল!

সে রাত্রে যখন উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইল, তখন মিরিয়মের বাসা-বাটির পার্শ্বের গির্জ্জার ঘড়ীতে ঘং ঘং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। গৃহে ফিরিতে সত্যেন্দ্রের ইচ্ছা হইতেছিল না; কিন্তু তখনও আড়াই ঘণ্টা রাত্রি রহিয়াছে,—পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়ানোও অসম্ভব। সত্যেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া দ্বিতলে শয়ন-কক্ষে জামা কাপড় ছাড়িতে লাগিল।

সুবাস মেহগ্নি-খাটে দুগ্ধ শুভ্র শয্যায় গাঢ় নিদ্রামগ্ন। সত্যেন্দ্র বার-দুই স্তিমিত-বীর্য্য জীবটির পানে চাহিয়া, বৈঠকখানায় নামিয়া গিয়া, কৌচে শুইয়া পড়িয়া, মিরিয়মের কথাই ভাবিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সত্যেন্দ্র একটু মুস্কিলে পড়িয়া গেল।

এলাহাবাদ হইতে তাহার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা শ্রীমতী আভাস লিখিয়াছেন, এই ১৭ই শ্রাবণ হিরণের বিবাহ। সুবাসকে আনিতে হিরণ স্বয়ং যাইতেছে। সুবাস যেন অতি অবশ্য আসে। হিরণ কালই সকালে পৌছিবে, এবং সন্ধ্যার ডাক-গাড়িতে তাকে লইয়া পুনঃ যাত্রা করিবে।

সুবাস ত যাইবার আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। তবে সেই-সঙ্গে একটা মুস্কিলও বাধাইয়া ফেলিয়াছে। আজ আর কাল দু'টি দিন সত্যেন্দ্রকে আফিস কামাই না করাইয়া ছাড়িবে না। সত্যেন্দ্র প্রথমটা সম্মত হয় নাই; কিন্তু শেষে সুবাস যখন কাঁদ-কাঁদ স্বরে অনুযোগ করিল যে, আবার কত দিন দেখা হ'বে না, কিছু না—তখন রাজী না হইয়া পারিল না। সারাটা দিন সে অতি কষ্টেই 'এক সঙ্গে' কাটাইল। সময় কি কাটিতে চাহে? সত্যেন্দ্রের মনটি তখন কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে,—মাত্র দেহটা লইয়া কি সময় কাটান যায়! কিন্তু সুবাস ইহাতেই সন্তুষ্ট হইল। বেচারা সারা দিনমান ও রাত্রি অনর্গল গল্প করিয়া গেল। মাঝে-মাঝে এক-আধটা হুঁ হাঁ শুনিয়াই তৃপ্তি পাইল। সত্যেন্দ্র ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িতে, তাহারই একখানা বাহুর উপর মাথাটি রাখিয়া সুবাস নিশি জাগিল।

হিরণ আসিয়া পৌছিতেই, সুবাস সত্যেন্দ্রকে বলিল—সেই যে আমাদের ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ দেখবার কথা আছে, ভালোই হয়েছে। হিরণ এসেছে, ও-ও দেখেনি বল্‌ছে।

সত্যেন্দ্র বলিল—ভালোই ত! আমি গাড়ী রেখে যাচ্ছি, তোমরা দু'জনে দেখে এস।

সুবাস মুখখানা গোমড়া করিয়া বলিল—যেতে চাই-নে, যাও! ওঃ, কি আমার আফিসের টান গো...একটা দিন বই নয়,—তা'ও আবার কতদিন দেখা হবে না, কিছু না...

অগত্যা সত্যেন্দ্রকে রাজী হইতে হইল। ঠিক দশটার সময় আহারাদি শেষ করিয়া তিনজনে গড়ের মাঠের উদ্দেশে যাত্রা করিল। স্মৃতি-সৌধের অমল-ধবল মূর্ত্তি নয়নগোচর হইবামাত্র সুবাস উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল, বাহ্ বাহ্। ভাগ্যে তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছিল, হিরণ, নইলে ত দেখতে পেতে না।

হিরণ লজ্জারুণ মুখে হাসিতে লাগিল। ছবি দেখিতে, প্রত্যেক ছবিটির ইতিহাস শুনিতে-শুনিতে তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়া গেল;—দেড়টার সময় তাহারা আবার মোটরে উঠিল। মধ্য পথে একটা বিলাতী হোটেলে লাঞ্চ খাইয়া, তাহারা যখন গৃহে ফিরিল, তখন পৌনে তিনটা।

সত্যেন্দ্র বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া আফিস যাইতে প্রস্তুত হইয়া, সুবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল—আফিসের কাজ-কর্ম্ম সেরে ষ্টেশনেই দেখা করব'খন।

সুবাস ছড়ি শুদ্ধ হাতটি ধরিয়া বলিল—কেন, বাড়ী আস্তে পারবে না?

সত্যেন্দ্র কহিল—জানি কি! দু'দিন ত আফিস ছাড়া। কাজ-কর্ম্ম যদি বেশী জমে গিয়ে থাকে, সময় না-ও পেতে পারি—তাই বল্‌ছি।

সুবাস হাত ছাড়িয়া দিয়া, নত হইয়া প্রণাম করিল। সত্যেন্দ্র বলিল—এখনি কেন? আবার ত দেখা হ'বে ষ্টেশনে।

আর একবার করব'খন। একটা বেশী পেরণাম করলে ত আর জাত যাবে না—বলিয়া সে মৃদু হাসিল।

আচ্ছা—আসি—বলিয়া সত্যেন্দ্র বিদায় লইতেছে,—সুবাস বলিল—দেখ, যদি পার ত বাড়ীতেই সোজা চলে এস।

আচ্ছা।

সত্যেন্দ্র কথাটা সত্য বলিয়াছিল—রাশীকৃত কাজ জমিয়া গিয়াছে। বিলাতী মেল্-ডে—সে চিঠিগুলির উত্তর না দিলেই নয়। বিলাতের ব্যাঙ্কে কিছু টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আফিসে ঢুকিতেই বড়বাবু মস্ত এক লিষ্ট দাখিল করিয়া বসিলেন। শুনিয়া সত্যেন্দ্র সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। এই সব সারিয়া, ষ্টেশনে উঁহাদের বিদায় দিয়া, কাশীপুর পৌঁছিতে কত রাত্রি যে হইবে, কে জানে!

না-জানি, মিরিয়ম কত ভাবিতেছে! দুই-দুই দিনের অদর্শনে না জানি সে কত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কখন্ গিয়া সেই মলিন অধরে চুম্বন দিয়া, আবার সে মুখখানি আরক্ত করিয়া দিবে,—কখন বক্ষে ধরিয়া অস্থির বক্ষ শান্ত করিবে,—ভাবিতে-ভাবিতে সত্যেন্দ্র চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল।

বড়বাবু খাতা-পত্র হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিতে লাগিলেন—এই সময়ে আবার টাইপিষ্ট ছুঁড়ীটা কামাই করিল! কি করিয়া যে কাজ চালাইতেছি, কি হাঙ্গামাই যে যাইতেছে, তাহা আর কাহাকে বলিব!—

বড়বাবুর উপর একটু রাগ হইল, আবার হাসিও পাইল। রাগ হইল 'ছুঁড়ী' শুনিয়া, আর হাসি পাইল এই ভাবিয়া যে আর সে টাইপিষ্ট নহে, এখন, এখন সে ...

আচ্ছা, কাশীপুরের বাগান বাড়ীটায় যদি টেলিফোঁ সংযুক্ত থাকিত! নাঃ, সারাইতে কণ্ট্রাক্টার লাগান হইয়াছে,—সারান শেষ হইলেই টেলিফোঁ লইতে হইবে। নহিলে আফিসের কয় ঘণ্টা সময় কাটানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে যে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই সেদিন রাত্রি ১টার সময় সেই যে চলিয়া গেছে, কাল সারা দিন-রাত্রি, আজ—এই তিনটা বাজে—ইহার মধ্যে একবারও কি সত্যেন্দ্র সময় পাইল না যে, একটিবার শুধু দেখা দিয়া যায়! কাল কণ্ট্রাক্টার শৈলেন্দ্র বাবুর দ্বারা টেলিফোঁ করাইয়া জানিয়াছিল, সত্যেন্দ্র আফিসেও আসে নাই।

মিরিয়মের ভাবনার অন্ত ছিল না। অসুখ হইল না ত? সেদিন অত রাত্রি পর্য্যন্ত মোটর লাঞ্চে চড়িয়া নদীর হাওয়া লাগাইয়াছে, সর্দ্দি-টর্দ্দি হয় নাই ত!...একটা চাকরও বাড়ী জানে না, যাহাকে পাঠাইয়া সংবাদ লওয়া যায়। এক নিজে আফিসে গিয়া সংবাদ লওয়া—কিন্তু সত্যেন্দ্র যে তাহাকে আফিসে যাইতে বার-বার নিষেধ করিয়া দিয়াছে। তবে উপায়?

বাগান-বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া-বসিয়া মিরিয়ম আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। কেন অমন হইল? মিরিয়ম যে ক্লাবটিতে এত কাল বাস করিত, সেখানে তাহার অনেক-গুলি বন্ধু-বান্ধব জুটিয়াছিল। তন্মধ্যে আবার দু'একটি

অন্তরঙ্গও হইয়া গিয়াছিল। তাহাদেরই একজন মিরিয়মের দুঃসাহসিকতার নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল, এই নেটিভগুলাকে আমার বিশ্বাস হয় না মিরিয়ম। তুই মিঃ মিত্রের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেছিস্ বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, নেটিভ জাতটাই নীচ। তাহারা কথায়-কথায় হাতে চাঁদ ধরিয়া দেয়,—কাজের বেলায় লুকাইয়া পড়ে!—মিরিয়ম ক্লাব ত্যাগ করিবার সময়, অন্তরঙ্গ লুসীর সহিত দেখাটি পর্য্যন্ত করে নাই। যাহাদের দেশে জন্মিয়া, যাহাদের দেশের মাটীর অন্নকণায় শরীর ধারণ করিয়া, যাহাদের অর্থে বাঁচিয়া আছে—তাহাদের নেটিভ বলিয়া ঘৃণা করিতে বা তাহাদের সম্বন্ধে নীচ-ধারণা পোষণ করিতে বাস্তবিক চির-দিনই মিরিয়মের কষ্ট বোধ হইত। আজ না-হয় সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাহার হৃদ্যতা জন্মিয়াছে,—আজ না হয় সত্যেন্দ্রকে সে নিতান্তই আপনার বলিয়া জানিয়াছে; কিন্তু যখন কিছুই জানে নাই, শুনে নাই, তখনও এই শ্যামবর্ণ জাতির প্রতি তাহার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। এমন সরলতা-মণ্ডিত মুখ যাহাদের, এত মিষ্ট যাহাদের কণ্ঠ-স্বর, অনাড়ম্বর বেশ-ভূষায় যাহাদের শান্ত-শ্রী ফুটিয়া থাকে,—তাহাদের সম্বন্ধে একটা উৎকট ধারণা করিয়া লইতে কোন দিনই মিরিয়মের নারী-হৃদয় প্রস্তুত ছিল না, অন্তরঙ্গ লুসীর খাতিরেও না।

তাই আজ তাহার মন তুফানে তরণীখানির মতই টল-মল করিতেছিল। সত্যেন্দ্রের না আসিবার কারণটি কত রকমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে গেল; কোনটাই মনের মত হইল না,—কোনটাতেই অশান্ত চিত্ত শান্ত হইল না।

কণ্ট্রাক্টার শৈলেন্দ্রবাবু মস্ত একটা সোলা হ্যাট পরিয়া মজুর খাটাইতেছিলেন;—মিরিয়ম বেহারা দ্বারা তাঁহাকে সেলাম জানাইল।

শৈলেন্দ্র বাবু ঘরে ঢুকিয়া, টুপিটি খুলিয়া কহিলেন—আজ সকালে মিঃ মিত্রের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি দশটার সময়ই তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া…

মিরিয়ম বাম হস্তে টেবিলের কোণ চাপিয়া ধরিল।

……ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল দেখিতে গিয়াছেন,—দেখা হইল না।

মিরিয়ম পাংশুমুখে জিজ্ঞাসিল—কাকে লইয়া?…আপনি কাহার কথা বলিতেছেন মিঃ কার?

মিঃ মিত্রের কথাই বলিতেছি। কিছু টাকার আমার বিশেষ দরকার পড়িয়াছিল…

মিরিয়ম পার্শ্বস্থিত চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল। অস্ফুট-কণ্ঠে বলিতে লাগিল—মিঃ মিত্র, মিঃ মিত্র! ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল—

শৈলেন্দ্র বাবু বলিলেন—হাঁ। সেইখানেই গিয়াছেন, শুনিলাম।

মিরিয়ম হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—মিঃ—মিঃ কার, আপনি নিশ্চয় জানেন, শুনিতে আপনার ভুল হয় নাই?

না,—না, ভুল হইবে কেন? আমি ঠিকই শুনিয়াছি, তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল দেখিতে গিয়েছেন…

আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, মিঃ কার, আমি—আমি জানিতে চাই যে—যে—তিনি - ঐ মিঃ মিত্র একেলা…

না, তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালক দু'জনকে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বেহারা আমাকে বলিল—বাবু দুইটার সময় ফিরবেন, বলিয়া গিয়াছেন।

মিরিয়ম নিঃশব্দে ফিরিয়া চেয়ারটায় বসিল। আর একটি কথাও সে বলিতে পারিল না। হৃদয়-মধ্যে যে বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, অপর একজন লোকের সামনে তাহা গোপন করিবার জন্য সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল; কিন্তু গোপন ত থাকে না। বুক যে ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে, নিঃশ্বাসের শব্দ যে ক্রমশঃই গভীর হইতেছে,—চক্ষের জল ত আর বাধা মানে না;—মিরিয়ম দক্ষিণ হস্তটি তুলিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল—গুড আফ্‌টার্নুন…

শৈলেন্দ্র বাবু 'গুড আফ্‌টার্নুন', করিলেন বটে, কিন্তু প্রথা-মত তখনি কক্ষ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। মিরিয়মের অশ্রু-সজল মুখের কতকাংশ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল;—তিনি অতি ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন—একটা কথা কি বলিতে পারি মহাশয়া?

না,—না, কোন কথা না—আপনি যান……গুড আফ্‌টার্নুন……

শৈলেন্দ্র বাবু আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, ধীরে-ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্থলে ফিরিলেন।

মিরিয়ম অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। এই বাঙ্গালী! সে'ও এত শঠ, এত প্রবঞ্চক! তাহার কাছেও নারী খেলার সামগ্রী? কেবলমাত্র ভোগের বস্তু? মিরিয়ম যে কত গ্রন্থে এই ধর্ম্মপরায়ণ জাতির সপক্ষে কত কথাই পাঠ করিয়াছে;—সে সকল মিথ্যা? ইহাদের জন্য ত্যাগের আদালতের প্রয়োজন হয় না,—ইহাদের পারিবারিক জীবনের কুৎসা খবরের কাগজে ছাপা হইয়া পৃথিবীময় হৈ-চৈ পড়ে না! মিরিয়ম যে শুনিয়াছিল, ইহাদের দাম্পত্য-জীবনে বিচ্ছেদ নাই, ত্যাগ নাই, বিরহ নাই—মিলন, মিলন—শুধুই মিলন! সে সব মিথ্যা! আর অমন মিথ্যা!

বাহির হইতে মিথ্যা-পরিপূর্ণ ইহাদের সমাজকে সে কি সত্য, কি সুন্দরই না দেখিত! আর মনে হইতে লাগিল—কি ভণ্ড এই জাতিটা! মুখে অসামান্য সরলতার মুখোস পরিয়া কি বীভৎসতাই না গোপন করিয়া রাখিয়াছে—উঃ!

মিরিয়ম হঠাৎ এক সময় দাঁড়াইয়া উঠিল। তখনি আবার নতজানু হইয়া বসিয়া অশ্রুসিক্ত মুখে জগদীশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া, সেই বারান্দাটিতে ফিরিয়া আসিল। শৈলেন্দ্র বাবু তখনও মজুরদের সঙ্গে ঘুরিতেছিলেন। মিরিয়ম তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল—প্লিজ, মিঃ কার, আপনি এখানে কতক্ষণ থাকিবেন?

ঘড়ি দেখিয়া শৈলেন্দ্রবাবু বলিলেন—পাঁচটা পর্য্যন্ত ত বটেই,—একটু দেরীও হইতে পারে।

তবে আপনার কারখানি আমাকে একবার দিবেন?

নিশ্চয়ই!

ধন্যবাদ! আমি পাঁচটার ভিতরেই আসিতেছি।

না আসিতে পারিলেও ক্ষতি নাই; আমার ছোট ভাইও—তিনি আমার সহকারী—আসিয়া পড়িয়াছেন,—আমি তাঁহার কারেই ফিরিতে পারিব।

মিরিয়ম তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া, তাঁহার গাড়ীতে বসিয়া সোফেয়ারকে বলিল—মিঃ মিত্রের বাড়ী!

* * * *

বেহারা দীর্ঘ কুর্ণিশ করিয়া কহিল—তাহার প্রভু গৃহে নাই, আসিতে রাত্রি হইবে।

সুবাস কি একটা কাজে রামলক্ষ্মণকে ডাকিতে আসিয়াছিল;—মিরিয়মকে দেখিয়া বলিল,—সেলাই কলের মেম বুঝি রে! বলে দে' বাবুর সঙ্গে আফিসে দেখা করতে!

মিরিয়ম শান্ত দৃষ্টিতে সুবাসকে দেখিতে-দেখিতে বলিল—বেহারা, ইনি কে আছেন?

বেহারা একগাল হাসিয়া বলিল—মায়িজী!

সুবাস ইংরেজ মেয়েটিকে বাঙ্গলায় কথা বলিতে শুনিয়া কাছে আসিয়া বলিল—তুমি কে গা?

তোমার স্বামীর আফিসের টাইপিষ্ট!···তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

এস,—সুবাস তাহার হাত ধরিয়া নিজ কক্ষে লইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সত্যেন্দ্র কাজ-কর্ম্ম সারিয়া উঠি-উঠি করিতেছে,—চশমা-চোখে বড়বাবু কামরায় ঢুকিয়া বলিলেন—কি রকম ওভার-টাইম দেব, বলুন! সবাই গজ-গজ করছে,—বলে, লোক রয়েছে,—উইদাউট্ নোটিশে (বিনা খবরে) কামাই করবে,—আর আমরা শালারা খেটে-খেটে মরব!

সত্যেন্দ্র বলিল—দিয়ে দিন না, যা হয়!···সে সিগারেট ধরাইল।

বড় বাবু বলিলেন—তা না হয় দিয়ে দিচ্ছি—কিন্তু উইদাউট্ নোটিশে যে এতদিন কামাই করেছে, তাকে রাখবার আর দরকার দেখি-নে!

সত্যেন্দ্র চুরুটকাটি দাঁতে চাপিয়া মনে-মনে ভাবিল, বলিয়া ফেলি যে আফিসে তাহাকে রাখিবার আর কোন দরকারই নাই। না থাক্—আরও কিছু দিন থাক্—অন্ততঃ সুবাস চলিয়া যাক্—তার পর!

বড় বাবু সত্যেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া রোষযুক্ত স্বরে কহিলেন—ও রকম ফচ্‌কে ছুঁড়ী-ফুঁড়ি দিয়ে কাজ চলে না। একদিন নয়—দু'দিন নয়, একেবারে দশ-পনেরো দিন কামাই,—না খবর, না কিছু! আমি কালই তার যায়গায় লোক নিতে চাই;—এমন করে আর কাজ চলে না। কি বলেন? কালই একটা লোকের চেষ্টা করি···

অক্লেশে করতে পারেন!···

বড় বাবু ফিরিতেই সত্যেন্দ্র দেখিল, মিরিয়ম! সত্যেন্দ্র প্রফুল্লিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বেরসিক বৃদ্ধের সাক্ষাতে তাহা প্রকাশ করিল না, মৃদু হাসিল মাত্র।

বড় বাবু মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বলিলেন—

তোমার এই পনেরো দিন কামাই,—আমি বাপু কাজ চালাই কি করে? তাই কি একটা খবর দিয়েছিলে? এমনধারা করলে কাজ কি ক'রে চলে বল। লোক একটা ত দেখতেই হ'বে...

আমি একটি লোক দিতে পারি।

আবার তোমার লোক?

সত্যেন্দ্র বাঙ্গালায় বলিল—উহার সাবষ্টিট্যুট্ উহার লোককেই করা উচিত!

মিরিয়ম নতমুখে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল - এক মিনিট অপেক্ষা করুন, তাহাকে আনিয়া দিতেছি। মিঃ মিত্র, আপনি তাহাকে নিশ্চয়ই নির্ব্বাচন করিবেন।

হাঁ—হাঁ—নিশ্চয়ই...

বড় বাবু বলিতেছিলেন - দাঁড়াও, লোক আসুক, দেখি, টেষ্ট করি...কিন্তু কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিরিয়ম বাহির হইয়া গেল এবং নিমেষমধ্যে এক অবগুণ্ঠিতা নারী সহ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—মিঃ বড় বাবু, আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্য বাহিরে আসিবেন কি?

সত্যেন্দ্রের মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল,—লাফাইয়া উঠিয়া বলিল - কে!!

দেখ—মিঃ মিত্র! চিনিতে পার কি?...সে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

হতভাগা শৈলেন্দ্র বাবু আর সত্যেনের নিকট কোন কাজ আদায় করিতে পারেন নাই। মেসার্স মার্টিন কোং এখন সত্যেন্দ্রের কণ্ট্রাক্টার্স!

উদ্ভট-সাগর

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট-সাগর বি-এ]

(১)

'রাম'-নামের মহিমা কিরূপ, তাহাই কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে নিহিত হইয়াছে :—

মাহাত্ম্যং পরমং তবৈব মহতো হে রাম নাম্নঃ সদা
রাকারং বদতো জনস্য সকলং নির্যাতি পাপং হৃদঃ।
তস্যৈবাররবৎ প্রবেশনভয়াদাস্তে মকারস্তদা
জিহ্বায়াং তব রাম নাম বসতু শ্রীপূর্ণচন্দ্রস্য মে॥

(উদ্ভট-সাগরস্য)

শুন ওহে রামচন্দ্র! করি নিবেদন,
তব 'রাম'-নাম এক অমূল্য রতন!
'রা' আর 'ম' বর্ণ দিয়া কোন্ জন হায়
গড়িল তোমার নাম,—বুঝা নাহি যায়।
'রা' এর কেমন শক্তি, 'ম'এর কেমন,
হে রাম! করুন চিন্তা তব ভক্ত জন।
'রা' বর্ণ টী উচ্চারিলে মুখ খুলে যায়,
হৃদয়ের যত পাপ,—সকলি পলায়।
পাছে সেই পাপগুলা আসি পুনর্ব্বার
নিষ্পাপ হৃদয়খানি করে অধিকার,—
ইহা ভাবি, 'ম' বর্ণ টী হ'য়ে অবহিত
মুখ বন্ধ ক'রে দেয় কপাটের মত।
হেন 'রাম'-নাম, যাহা অমূল্য ধরায়,
বসতি করুক পূর্ণচন্দ্রের জিহ্বায়।

(২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ভক্তের প্রার্থনা :—

আনীতা নটবন্ময়া তব পুরঃ শ্রীকৃষ্ণ যা ভূমিকা
ব্যোমাকাশখখাম্বরাব্ধিবসবস্ত্বং প্রীতয়েঽদ্যাবধি।
প্রীতো যদ্যপি তাঃ সমীক্ষ্য ভগবন্ যদ্ বাঞ্ছিতং দেহি মে
নো চেদ্ ব্রূহি কদাপি মানয় পুনর্মামীদৃশীং ভূমিকাম্॥

এই নিবেদন কৃষ্ণ! শুন হে আমার,
সাজিয়া নটের বেশে সম্মুখে তোমার
আসিনু চুরাশি লক্ষ বার এ সংসারে
কেবল তোমারি শুধু আনন্দের তরে!
করিনু এসব বেশে কত অভিনয়,

ইহাতে তোমার প্রীতি যদি কিছু হয়,
তবে আমি এই ভিক্ষা চাই হে শ্রীহরি!
আমার মনের সাধ দাও পূর্ণ করি'।
ইহাতেও যদি তব না হয় সম্মতি,
তবে তুমি রাখ এই আমার মিনতি,—
এ সংসারে এই বেশে, ওহে দয়াময়!
আর যেন অভিনয় করিতে না হয়!

(৩)

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপ-গোপীগণের কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:—

দোহঃ প্রায়ো ন ভবতি গবাং দোহনস্যেন্ন পাকঃ
ক্ষীরাণাং স্যাৎ স ভবতি যদা দুর্লভং তদ্ দধিত্বম্
দধ্নঃ সিদ্ধৌ ক খলু মথনং মন্থনে কোপযোগ-
শুক্রাদীনামিতি গতিরভূদস্য গোধুগ্গৃহেষু॥

আজ কাল নাহি হয় প্রায় গো-দোহন,
হইলেও অগ্নি-পক্ক না হয় কখন।
অগ্নি-পক্ক হইলেও দধি নাহি হয়,
দধি হইলেও কিন্তু মন্থন না রয়।
মন্থন হ'লেও তক্র নবনীত হায়
প্রস্তুত করিতে আর কেহ নাহি যায়।
তোমা বিনা আজ, ওহে ব্রজ-ধাম-পতি!
গোপ-গোপিকার গৃহে দুগ্ধের দুর্গতি!

অসমাপ্ত

[শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী বি-এ]

সহরের এক ধারে উন্মুক্ত মাঠের উপর ছোট একটি বাড়ী। গরমের দিনে রোজ বিকালে ক্রোটনের-দেয়ালে-ঘেরা 'লনে' তাহাদের চা'র মজলিস্ বসিত। তাহাদের এই মজলিসে সাধারণ সভ্য-শ্রেণীভুক্ত ছিল দুই বোন ও এক ভাই। ভাই রোজ গাউন উড়াইয়া কোর্টে হাজিরা দিত; আর বোন দুটি লম্বা গাড়ীতে করিয়া স্কুলে যাইয়া, বেচারী মেয়েদের অনধ্যয়নের সুখে বাধা জন্মাইত। আর, বিশেষ সভ্যদের ভিতর ছিল, সহরের পরিচিত আত্মীয় ও অর্দ্ধ-আত্মীয় দুই-একটি যুবক। তাহাদের মধ্যে আবার প্রধান ছিল—মণীন্দ্রলাল রায়, প্রফেসার ও গল্প-লেখক।

কেহ-কেহ জানিত, মণীন্দ্রলাল ও বড় বোনের ভিতর পরিচয়টা এককালে একটু বেশী অগ্রসর হইতে চলিয়াছিল; কিন্তু সেটা আবার হঠাৎ থামিয়া গেল। হিতৈষিগণ কেহ কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না; তাহারা নিজেরাও পাইল কি না, কে জানে!' বাহিরের লোকে সেটা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল; এবং তাহারা নিজেরাও সর্ব্বদা সেই চেষ্টাতেই ছিল।

সে দিন জ্যৈষ্ঠের এক অপরাহ্ণে তাহাদের মজলিসে মণীন্দ্রলাল উপস্থিত ছিল। পশ্চিম আকাশ হইতে ভীষণ ঝড় আসিতেছে, দেখা গেল। তাহারা সকলে 'লন' ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া ছোট বসিবার ঘরটিতে ঢুকিল। পুরুষ দুই জন দুইখানি ইজি-চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়িল; দুই বোন তাহাদের সামনে একটা বেতের লম্বা সোফার দুই পাশে বসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝড় ও বৃষ্টি চলিতে লাগিল। চা খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। এখন শুধু গল্পের পালা। দেখিতে-দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া চারিদিক অন্ধকার হইয়া উঠিল। ছোট বোন বলিল, "মণীন্দ্রবাবু, আপনার একটা গল্প বলুন না?"

মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি গল্প বলব? ইংরেজি বই থেকে?"

ছোট বলিল, "না, ইংরেজি নয়। দেখুন, কেমন সুন্দর বাদলার সন্ধ্যা করেছে। এই বাদলার সন্ধ্যার উপযুক্ত একটা গল্প আপনি নিজে তৈরী করে বলুন।"

ভাইও বলিয়া উঠিল, "হঁ্যা, ঠিক,—এই বাদলার সন্ধ্যার উপযুক্ত।" বলিয়াই গুণ-গুণ করিয়া গান ধরিল, "আমার কেমন করে কাটবে ওগো এমন বাদল বেলা।"

"বাদলার সন্ধ্যার উপযুক্ত।" ধীরে-ধীরে কথা কয়টি বলিয়া, মণীন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর,

"আচ্ছা, শুনুন তা হলে" বলিয়া সে তাহার কথা বলিবার স্বাভাবিক সুন্দর ভঙ্গীতে ধীরে-ধীরে আরম্ভ করিল।

সেদিন ঠিক আষাঢ়স্য প্রথম দিবস ছিল না বটে, কিন্তু সেটা আষাঢ়েরই এমন একটা দিন, যার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য বিরহীদের মনের উপর মেঘদূতের আষাঢ়ের সেই প্রথম দিবসের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। সারাদিন বর্ষা-সুন্দরী তাঁর মেঘময় বেণী দিকে-দিকে এলায়ে দিয়েছিলেন; এবং কালিদাসের সেই অমর শ্লোকটি,—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা বৃত্তিচেতঃ,
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনিজনে, কিং পুনর্দূরসংস্থে

যে নিছক কবি-কল্পনা নয়, তারই সত্যতা মানবের মনে-মনে জেগে উঠেছিল। কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনিজনে ও বিরহী সকলেরই মনে একটা বিষণ্ন ভাব বাসা বেঁধেছিল।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা কোন্ অদৃশ্য যাদুকরের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে যেন সমস্ত মেঘ কেটে গিয়ে, জল স্থল ও আকাশ ভরে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর চাঁদ তার অমল-ধবল জ্যোৎস্না-জাল বিকীর্ণ করে হেসে উঠল।

সন্ধ্যাবেলা ষ্টেশন থেকে একটা ট্রেণ ছাড়ে। সে সময় ষ্টেশনে বেড়াতে আসা—সেই ক্ষুদ্র সহরের সান্ধ্যহাওয়াসেবী কতিপয় বাবুর নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির অঙ্গীভূত ছিল। সত্যেন রোজকার মত সেদিন সন্ধ্যায়ও ষ্টেশনে বেড়াতে এসেছিল। ষ্টেশনটি খোলা জায়গায়,—উহার লম্বা প্ল্যাটফর্মে হেঁটে-হেঁটে সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারের ভিতর লোকের চঞ্চলতা দেখতে তাহার ভাল লাগে।

প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেণ দাঁড়িয়ে ছিল। সত্যেন হেঁটে-হেঁটে দ্বিতীয়শ্রেণীর লেডিজ্ কম্পার্টমেন্টের কাছে এসেই, কিঞ্চিৎ অবাক্ হয়ে, হাত তুলে নমস্কার করে, স্মিত মুখে বলে উঠল, "বাঃ রে, আপনি যে!"

মেয়েদের গাড়ী থেকে একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে প্রতি-নমস্কার করে উত্তর করলে, "হাঁ, আমিই বটে।" কিন্তু অত্যন্ত ধীর ও গম্ভীর ভাবে।

সত্যেনের ব্যগ্র-উৎসাহপূর্ণ প্রশ্নের এই হিম-করা গম্ভীর উত্তর শুনে, তার চেহারার কিছু পরিবর্ত্তন হয় কি না লক্ষ্য করবার জন্য, তরুণী একটু তীক্ষ্ণ ভাবে তার মুখের দিকে চাইল। সত্যেন ততক্ষণে গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে; এবং দ্বিতীয়শ্রেণীর বৈদ্যুতিক আলো তার চোখে-মুখে পড়েছে। কিন্তু সে পূর্ণ সপ্রতিভভাবে উত্তর করিল, "কিন্তু তাতে আরও আশ্চর্য্য হচ্ছি বেশী। হঠাৎ আপনার শান্তিময় বোর্ডিং, আর ততোঽধিক সুখের স্কুল-মাষ্টারি ছেড়ে কোথায় চল্লেন? এখন ত কোনো ছুটিও নেই। এমনি নিয়ম-বাঁধা জীবন আপনাদের যে, তার একটুখানি ব্যতিক্রম পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের প্রায় কাছাকাছি!"

তরুণীর নাম ললিতা। সে স্থানীয় মেয়েদের হাই স্কুলের একজন টিচার। ললিতা একটু দূরে বসে ছিল,—উঠে তার কাছে এসে বসে বল্লে, "বক্তৃতা যে খুব দিতে জানেন, তা জানি। কিন্তু তাই বলে তার নমুনা পথে-ঘাটে ছড়ানো উচিত নয়। সেটা অনেক সময় উলুবনে মুক্তা ছড়ানো গোছের হয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে।"

সত্যেন উত্তর করলে, "তাই না কি? তবে ত সেটা আমার আগে জানা উচিত ছিল। যা'হোক, ভবিষ্যতে আপনার এই মূল্যবান উপদেশ মেনে চলব। কিন্তু আমার প্রধান বক্তব্য হচ্ছে, আপনি হঠাৎ কোথায় যাচ্ছেন?"

"কিন্তু সেটা যে আপনিই অপ্রধান করে রাখ্ছেন। প্রধান যা কিছু বক্তব্য,—আপনার সে হচ্ছে বক্তৃতা দেওয়া। সোজা করে কথা বলা ত আপনার কোষ্ঠিতে লেখে নি!"

সত্যেন বললে, "আর আপনার কোষ্ঠিতেই যে সেটা লেখা আছে, তাও ত জানতে বাকী নেই। আমি প্রথমেই যে প্রশ্ন করেছিলাম, তার উত্তর এতক্ষণ কে তাঁড়িয়ে রেখেছে, জিজ্ঞাসা করি? মানুষকে এতও suspensionএ রাখ্তে পারেন!"

ললিতা বল্লে, সে তারই এক মহিলা-বন্ধুর বিয়েতে নিকটবর্ত্তী একটা জায়গায় যাচ্ছে। আজই রাত দশটার সময় বিয়ে। গাড়ীতে অপর পার্শ্বের বার্থে আর একটি মহিলা বসে ছিলেন। তিনি ললিতারই বন্ধু ও সহকর্ম্মী। সত্যেনের সাথে তাঁর আলাপ ছিল না; কিন্তু তিনি যে তাদের আলাপ গম্ভীর ভাবে বসে থেকেও আগ্রহের সহিত শুন্‌ছিলেন, তা অনুমান করতে সত্যেনের চিন্তা খরচ করতে হয় নাই।

সত্যেন বল্লে, "বাঃ, কি চমৎকার সৌভাগ্য আপনাদের,—হিংসা করতে ইচ্ছা করে! বিয়ের নিমন্ত্রণটা সত্যি বড় উপাদেয় জিনিষ; বিশেষতঃ, সেটা যদি নিজের না হয়ে আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবদের হয়; এবং খুব বেশী রাত না জাগতে হয়!"

'ললিতা বল্লে, "চলুন না আপনিও।"

"রবাহূত হয়ে না কি?"

ললিতা হেসে বল্লে, "গেলেনই বা!"

সত্যেন সংক্ষেপে বল্লে, "তা ত বটেই। পুরুষরা মেয়েদের মত অমন হ্যাংলা কি না?"

ললিতা রোষ প্রকাশ করে বল্লে, "মেয়েদের আবার টানা কেন?"

সত্যেন বল্লে, "কেন আবার কি? জানেন না, কবি হেমচন্দ্রের সার্টিফিকেট রয়েছে,—

"খেয়ে যান, নিয়ে যান, আর যান চেয়ে।
হায় হায়, ঐ যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।"

ললিতা বল্লে, "ভারি ত ছড়া কাট্‌তে শিখেছেন। যত দোষ মেয়েদের।"

গাড়ী ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়ল। ললিতা ও সত্যেন উভয়েই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। প্ল্যাটফর্মের উপর দুটি লোক ছোট একটু হাস্যজনক ব্যাপার সৃষ্টি করে তুলেছিল; সত্যেন তাই দেখ্‌ছিল। কিন্তু ললিতা উহা দেখ্‌বার সাথে-সাথে কয়টী মুহূর্ত্তের মধ্যে অনেক জিনিষ দেখে নিল। ললিতা প্রথম লক্ষ্য করলে যে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসাতে জ্যোৎস্নার মাধুরী অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল; সাথে-সাথে প্লাটফর্মের পাশের বাগান থেকে হাসনোহানার মধুর গন্ধটুকু আস্‌ছিল, তা সে হৃদয়-মন দিয়ে উপলব্ধি করে নিল। তার পর তার দৃষ্টি পড়ল সত্যেনের সজ্জার উপর। এ বিষয়ে মেয়েদের দৃষ্টি স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রখর। সত্যেনের হাল-ফ্যাসানের গাটাপাচ্চার ফ্রেমযুক্ত চসমা থেকে আরম্ভ করে, শুভ্র পাঞ্জাবীর উপর সোণার বোতাম ও ঢাকাই উড়ানীর সূক্ষ্ম জরীর পাড় প্রভৃতি খুঁটি-নাটি কোনোটাই তার দৃষ্টি এড়াল না। অথচ সেই মুহূর্ত্তে যদি সত্যেনকে কেউ জিজ্ঞাসা করত, ললিতার ব্লাউজের কি রঙ, তা'হলে সে চোখ বুজে উত্তর দিতে পারত না।

ততক্ষণে হাস্যজনক ব্যাপারটা শেষ হয়ে গিয়েছিল; এবং গাড়ী ছাড়বারও সময় হয়ে এসেছিল! সত্যেন হেসে বল্লে, "বিয়ের নিমন্ত্রণ ত খেতে যাচ্ছেন; কিন্তু জানেন কি, সব চাইতে সংক্রামক রোগ কোন্‌টা?"

ললিতা বুঝতে না পেরে বল্লে, "সে আবার কি? রোগের ভয় দেখাচ্ছেন কেন?"

সত্যেন বল্লে, "কেউ যদি সংক্রামক রোগের কাছে যায়, তাকে কি বন্ধু-বান্ধবদের সাবধান করে দেওয়া উচিত নয়?—জানেন না কি যে, বিবাহ-ব্যাধির মত ছোঁয়াচে-রোগ আর কিছু নেই?"

ললিতা অত-শত না ভেবে হেসে বল্লে, "ওঃ, তাই বলুন। কিন্তু আমার কিছু ভাবনা নেই,—আমার সে-রোগের টীকা দেওয়া আছে।"

সত্যেন তাহাকে জব্দ করবার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলে উঠ্‌ল, "বটে? এতদিন বলেন নি সে কথা! কবে কোথায় টীকা নিলেন?—কে সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিটি?"

ললিতা জব্দ হয়ে বলে উঠ্‌ল, "সে ভাগ্যবান ব্যক্তির এখনো জন্ম হয় নি।"

সত্যেন দুষ্ট হাসি হেসে বল্লে, "তবে কি Esmondএর নায়িকার পুনরভিনয় না কি?"

ললিতা আবার জব্দ হয়ে বলে উঠ্‌ল, "যাঃ, কি যে বলেন, তার ঠিক নেই!"

এমন সময় গাড়ী ছেড়ে দিল। সত্যেন শুভ ইচ্ছা জানাল। ললিতা হেসে তার প্রত্যুত্তর দিল।

গাড়ী ক্ষুদ্র সহরের সীমানা ছেড়ে, শীঘ্রই মুক্ত মাঠ ও গ্রামের ভিতর দিয়ে চলল। ললিতা ঠায় বসে বাইরের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে ছিল; বোধ হয় একান্ত তন্ময় হয়ে প্রকৃতির শোভাই সে দেখ্‌ছিল। তার সঙ্গিনীটি তাকে কিছুক্ষণ চুপ করে নিরীক্ষণ করে, শেষকালে বলে উঠ্‌লেন, "ব্যাপার কি?—ছোঁয়াচে রোগের পূর্ব্ব-লক্ষণ না কি?"

ললিতা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে, তার কাছে সরে এসে বসে বল্লে, "ভারি ত এক পচা ঠাট্টা পেয়েছিস্!"

সঙ্গিনী বললেন, "মোটেই ঠাট্টা নয়। তোর একবারে হুবহু সেই সব লক্ষণ। রক্ষা পেতে চাস্ ত শীগ্‌গিরই কোনো আচার্য্য—বৈদ্যির শরণাপন্ন হ।" তার পর অত্যন্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করে বল্লেন, "আর যদি নির্ভয়ে সত্য কথা বল্‌তে দিস্, তবে এই পাণ্ডুর তারাপুঞ্জের নীচে জ্যোৎস্না-বিধৌত প্রকৃতি-রাণীর এই দিগন্ত-প্রসারিত বিরাট সৌন্দর্য্যের ভিতর, চলন্ত ট্রেণে বসে তোকে ছুঁয়ে শপথ করে বল্‌তে পারি,—সত্যেন বাবু তোকে অত্যন্ত পছন্দ করেন; এবং এ অবস্থায় আমার যা পরামর্শ, তা কবিই বলে রেখেছেন,—

"তুমি তারকায় চেয়ে লক্ষ্য পানে যাবে ধেয়ে
এই শুধু অভিলাষ যার ;
না দেখায়ে আপনারে আর কাঁদায়ো না তারে,
তার পথ কোরো না আঁধার !"

"তোর এই সুদীর্ঘ ছ্যাবলামির পুরস্কার হচ্ছে এই—" বলে ললিতা তার পিঠে গুম্ করে এক কিল বসিয়ে দিলে, এবং পুনরায় বল্‌লে, "ফের যদি বাঁদরামি করবি, ত তোকে হামান-দিস্তায় কুটব।" কিন্তু তার চোখে-মুখে উল্লাসের দীপ্তি ফেটে বের হচ্ছিল।

সঙ্গিনী পিঠে হাত বুলাতে-বুলাতে বল্‌লেন, "কি ডাকাত রে মশায় ! আমি শিকল টানব কিন্তু !"

ললিতা বল্‌লে, "হ্যাঁ, তা হলেই মাঠের মাঝে বেশ একটা scene করতে পারবে।"

সঙ্গিনী বল্‌লেন, "আহা, নিজেরা প্ল্যাট্‌ফর্মে যা scene করে এলেন, তার চাইতে কিছু বেশী হবে না।"

ললিতা বল্‌লে, "তাই বল্ ! আচ্ছা, আর একদিন সুবিধা হলে, তোকে সত্যেন বাবুর সাথে আলাপ করিয়ে দেব !"

সঙ্গিনী ঠোঁট্ বাঁকিয়ে বল্‌লেন, "ইস্ ! আমার ত বয়ে গেছে আলাপ করবার জন্যে।"

এইরূপে ঠাট্টার ভিতর দিয়ে দুই সখীতে যে আলোচনার সূত্রপাত হল, শীঘ্রই তা গম্ভীর আলোচনার বিষয় হয়ে উঠ্‌ল। ললিতা তাঁকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে যে, এ অসম্ভব। যদিই বা সত্যেন তাকে কিছু পছন্দ করে থাকেন, তার মূল্য বিশেষ কিছু নয়। আর ললিতার দিক দিয়ে সে রকম কোনো সেন্টিমেন্টের কণামাত্র তার মনে জাগে নাই ; এবং ভবিষ্যতে জাগাও যে এ ক্ষেত্রে অসম্ভব, তাও সে বুঝতে চেষ্টা করল।

বর্ষা-রাত্রির জ্যোৎস্নার কোমল মাধুরী দুজনকেই পেয়ে বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে আপনা থেকেই দুজনের আলাপ বন্ধ হয়ে এল। মৌন হয়ে বসে তারা প্রকৃতির শোভা দেখ্‌তে লাগল ;—কিন্তু আলাপ চল্‌ছিল নিজের মনে-মনে। এতক্ষণ যা' নিয়ে আলোচনা চল্‌ছিল, ললিতা সেই সব কথাই ভাব্‌ছিল। বাইরে সে দেখ্‌ছিল, মাঠের শাদা জল, তার উপর জ্যোৎস্নার খেলা,—এবং বৃক্ষশ্রেণীর পুঞ্জীভূত কালো অন্ধকার—উহারই পাশে দাঁড়িয়ে যেন এক আশ্চর্য্য বিষাদ-দৃশ্যের সৃষ্টি করে তুলেছিল। রাত্রির অন্ধকারে জীবনের বাস্তবতা হারিয়ে যায়। কর্ম্ম-কোলাহলহীন রাত্রি শুধু মানুষের দুর্ব্বলতার উপর রাজ্য বিস্তার করে বসে,—মানুষকে স্নায়ুহীন করবার তার অসীম ক্ষমতা।

ললিতাও সেদিন রাত্রির, বিশেষতঃ এমন ঐশ্বর্য্যময়ী রাত্রির, নিতান্ত খেলার পুতুল হয়ে পড়ল। সমস্ত বাস্তবতা ভুলে গিয়ে, সত্যেনকে আশ্রয় করেই তার মন কল্পনার এরোপ্লেনে চড়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে এল। এবং এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে তার বন্ধুর নিকট যে স্বীকার-উক্তি করে ফেল্‌লে, তা সে কিছুক্ষণ আগেও এ ভাবে হয় ত ভাবে নি।

বন্ধু বল্‌লেন, "হ্যাঁ আমি জানি, সত্যেনবাবু তোমাকে ভালবাসেন ; এবং তার ফল যে তোমার মনের উপর কিছু ফলবে না, এ অসম্ভব। আর যে সব কারণে তোদের মিলন অসম্ভব মনে করিস্, সে ত কিছু নয়,—সহজেই তা' অতিক্রম করা যায়।"

কিন্তু সে সব কারণ যে পাহাড়ের মতই দুর্লঙ্ঘ্য,—এবং প্রধান কারণ যে ললিতারই মনে প্রকৃত সাড়ার অভাব,—তা এই রাত্রির অন্ধকারে কারো মনে প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিল না।

যথাসময়ে তারা উৎসব-বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। হঠাৎ সেখানকার উজ্জ্বল আলোক ও লোকের ব্যস্ততা ও কোলাহল ললিতার কাছে প্রথমটা কেমন অসোয়াস্তিকর মনে হল। তার কল্পনার সূক্ষ্ম সূত্র যেন হঠাৎ কার পরুষ হস্ত ছিন্ন করে ফেল্‌লে।

বিয়ে হয়ে গেল। নিমন্ত্রিতেরা অনেকে বিদায় নিলেন। শুইতে যাওয়ার আগে ললিতা ও তার বন্ধু বারান্দায় হাঁট্‌ছিলেন। বাইরে শানাই বাজ্‌ছিল। ললিতা বল্‌লে, "তিনি যদি সত্যি আমাকে পেতে চান, আমার কি উচিত হবে তাঁর সে ইচ্ছায় বাধা দেওয়া ?"

বন্ধু কিছু উত্তর করলেন না বটে, কিন্তু তাঁর দুষ্ট মনে কবির একটা লাইন গুণ-গুণ করতে লাগল, "গান শুনে সাধ যায় গান গাহিবারে !"

অনেক রাত্রিতে শুয়েছিল বলে, পরদিন তার ঘুম থেকে উঠতেও অনেক বেলা হল। উঠে দরজা খুলতেই, প্রখর রোদ এসে তার চোখে-মুখে পড়ল। সে চোখে হাত দিয়ে ফিরে এসে আবার বিছানায় বসল। উৎসব-বাড়ীর হাঁক-ডাক সুরু হয়েছিল। দূরে এক পাল কুকুর পূর্ব্বরাত্রির উচ্ছিষ্ট

নিয়ে কোলাহল করছিল। মাঠে কৃষকেরা হাল চষছিল। একটা শব্দায়মান গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে পথ চল্‌ছিল।… সেই পুরাতন বিশ্রী বিদ্‌ঘুটে পৃথিবীটা তো রহিয়াছে,—কিছু-মাত্র তার পরিবর্ত্তন হয় নাই। গত রাত্রিতে ললিতা ভরা পালে যে কল্পনার নৌকায় যাত্রা করেছিল, তা যেন হঠাৎ কোন্ চড়ায় ঠেকে চূর্ণ হয়ে গেল। একটা অজানা বিরক্তিতে তার মন ভরে উঠল। তার পর যখন গতরাত্রির চিন্তা-ধারা তার মনে জেগে উঠল, সে অবাক্ হয়ে ভাব্‌লে, কি আশ্চর্য্য! কি করে সে এ সব অসম্ভব কল্পনার প্রশ্রয় দিয়েছিল! সে যে মিথ্যা, অসম্ভব, হাজারবার অসম্ভব!

সে বাইরে বারান্দায় এল। রোদ খাঁখাঁ করছিল। পৃথিবীর সব কাজ স্বাভাবিক ধারায়ই চল্‌ছিল। বাস্তব পৃথিবী যেন অত্যন্ত রকম চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে রইল। তার বন্ধুকে কি সব কথাই কাল সে বলে ফেলেছে,—মনে হয়ে, লজ্জায় অনুতাপে তার মরে যেতে ইচ্ছা হল।

সামনেই তার সঙ্গিনীকে পেয়ে ললিতা বল্‌লে, "দেখ্, কাল তোকে কত কি বলেছি, কি না বলেছি, তা যদি তুই seriously সত্যি ভেবে নিস্, তা হলে অত্যন্ত ভুল বুঝবি। ও সব অত্যন্ত অসম্ভব কথা। আমার কথা ও-সব একটিও নয়; সবই রাত্রির কারসাজি। এ আমি চিরকাল দেখেছি, মানুষকে দুর্ব্বল, অবাস্তব ও কল্পনাপ্রিয় করতে, রাত্রির মত উৎকট নেশা আর কিছু নেই। ও তখন মানুষকে দিয়ে এমন অনেক মিথ্যা ও ভুল কথা বলায়, দিনের উজ্জ্বল আলোর স্পর্শ যার এক মুহূর্ত্তও সয় না।"

মণীন্দ্র চুপ করিল। ছোট বলিল, "তার পর?"

মণীন্দ্র বলিল, "তার পর আর নেই।"

ভাই বলিল, "সে কি? অর্দ্ধেক পথে গল্প শেষ করা লেখকদের আজ-কাল একটা ফ্যাসান হয়েছে।"

ছোট বলিল, "আপনার গল্প কিন্তু সত্যি অসমাপ্ত রয়ে গেল।"

মণীন্দ্র বলিল, "তা হবে। কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব হয়েছে। মানুষের জীবনে এ রকম দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কত গল্পের সূত্রপাত হয়ে অর্দ্ধপথে থেমে যায়, তার হিসাব কে রাখে। সমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছাবার সৌভাগ্য খুব কম গল্পেরই ঘটে।"

অন্ধকারে বড়র মুখ দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু সে এই সমালোচনায় মোটেই যোগ দিতে পারিল না।

পরাজিত জার্ম্মাণি

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ]

(১)

জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট লণ্ডনের বাজারে ব্যাঙ্কারদের নিকট টাকা কর্জ্জ লইবার চেষ্টায় আছেন। কয়েক দিন হইল বিলাতী মহাজনরা জার্ম্মাণ রিপাব্লিককে জানাইয়াছেন:—"জার্ম্মাণ সরকার যদি জার্ম্মাণ জাতির ধন-সম্পত্তির আসল মালিক হইতেন, তাহা হইলে আমরা জার্ম্মাণিকে টাকা ধার দিতে অগ্রসর হইতাম। কিন্তু জার্ম্মাণ নর-নারীর টাকা-কড়ির আসল মালিক জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট ন'ন। ভার্সাই-য়ের সন্ধির বিধানে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের খাজাঞ্চিখানা প্রকৃতপক্ষে বিজেতা রাষ্ট্রগুলার অধীন; অর্থাৎ বৃটিশ, ফরাসী, বেল্‌জিয়াম, ইতালিয়ান (এবং খানিকটা জাপানীও) গবর্মেণ্ট একত্র জার্ম্মাণ রাজস্বের অনেকটা হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। যত দিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির রাজস্ব এইরূপে পর-হস্তগত থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত ইংরেজ ব্যাঙ্কারের দল জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টকে টাকা ধার দিবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবেন না।"

বুঝা যাইতেছে, ইংরেজ মহাজনরা বৃটিশ গবর্মেণ্টকেই আংশিক ভাবে জার্ম্মাণির বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ বিবেচনা করিতেছেন। ভার্সাই সন্ধির কড়ারগুলা ইংরাজ সরকার যদি খানিকটা নরম করিতে রাজি না হ'ন, তাহা হইলে লণ্ডনের টাকার বাজারে জার্ম্মাণ রিপাব্লিককে বিশ্বাস করা চলিবে না।

ইংরেজ ও ফরাসী সমর-বিভাগের কর্ত্তারা জার্ম্মাণির

ফ্যাক্টরিগুলা যখন-তখন খানাতল্লাসি করিয়া ফিরিতেছেন। রাইখ্‌ষ্টাগের বক্তৃতায় জার্ম্মাণ মন্ত্রী-প্রধান হ্বিট খানা-তল্লাসির অভিযানগুলাকে খাঁটি লুট-পাটের তাণ্ডব রূপে বর্ণনা করিলেন। বহু সংখ্যক বড়-বড় কারখানা কর্ত্তাদের খেয়াল মাফিক ধূলিসাৎ হইতেছে। অগণিত মূল্যবান্ যন্ত্র, হাতিয়ার, কলকব্জা ইত্যাদিও এই সমুদায় শফরের দৌরাত্ম্যে চূরমার হইয়া গিয়াছে।

রাসায়নিক কারখানাগুলার দিকেই ইংরেজ ও ফরাসী সেনাপতিদের নজর বেশী। এই ধরণের লুটের অভিযানের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ রাসায়নিক ফ্যাক্টরির মালিক, কর্ম্মকর্ত্তারা এবং মজুরেরাও উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মাইন দরিয়ার উপর অবস্থিত ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে মজুরদের এক বিরাট সভা বসিয়াছিল। এই সভায় মিত্রশক্তির অত্যাচার-কাহিনী এবং জুলুমের প্রতিবাদ অতি তীব্র ভাষায় করা হইয়াছে। ফ্যাক্টারিগুলার সর্ব্বনাশ হইলে, প্রায় এক লাখ জার্ম্মাণ মজুর বহু দিন ধরিয়া "ভাতে কাপড়ে" মরিবে। ইহাতে ইংল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের সুখী হইবারই কথা ; কেন না, লাখ-লাখ লোক এই দুই দেশে কর্ম্মাভাবে বেকার বসিয়া আছে। অধিকন্তু, এই দুই দেশের ধনী মহাজনরা জার্ম্মাণিকে রাসায়নিক শিল্পে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য, খোঁড়া করিয়া রাখিতে সচেষ্ট। ইহার নাম সামরিক লুট-পাটের "আর্থিক ব্যাখ্যা।" অর্থাৎ লড়াইয়ের পেছনে টাকার ধাক্কা।

(২)

জার্ম্মাণির সাম্রাজ্য-পিপাসা এখনো মিটে নাই। অনেক রাষ্ট্রনায়ক আজও পুরনো জার্ম্মাণ উপনিবেশগুলা ফিরাইয়া পাইবার আশা রাখে। অন্ততঃ পক্ষে এসিয়াকে ইয়োরোপ ও আমেরিকার কব্জায় রাখিবার জন্য বহু জার্ম্মাণ নর-নারী আজও বিশেষ উদ্যোগী।

কিছুদিন হইল ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে জার্ম্মাণরা এক "অবাধ-বাণিজ্য"-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছে। বিলাতী কবডেন-প্রবর্ত্তিত মত অনুসারে ইঁহারা শুল্ক-বিহীন আমদানি-রপ্তানির ব্যবস্থা করিবেন। জার্ম্মাণির প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক লুজো ব্রেণ্টানো এই সঙ্ঘের প্রথম সভায় বলিয়াছেন—"বিদেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য আমদানি না করিলে, জার্ম্মাণ মজুর-চাষীরা স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতে পারিবে না। আবার জার্ম্মাণির কারখানাগুলির জন্যও বিদেশ হইতে কুদ্‌রত্তি (কাঁচা) মাল প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা আবশ্যক। অপর দিকে বিদেশে জার্ম্মাণির শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাড়ানো আমাদের নেহাৎ দরকার। কাজেই যথাসম্ভব বিনা শুল্কে ব্যবসায় চালাইবার ব্যবস্থা করা আমাদের সর্ব্বপ্রধান স্বার্থ বিবেচিত হওয়া উচিত।"

ব্রেণ্টানোর এই যুক্তিতে কিছু নূতনত্ব নাই। কিন্তু তাঁহার পেটের ভিতর কতকগুলা জবর কথা বিরাজ করিতেছে। সেই সমুদায়ের সার মর্ম্ম এই :—অবাধ-বাণিজ্য স্থাপিত হইলে ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান সাদা চামড়াওয়ালা নর-নারীর ভিতর বন্ধুত্ব গজাইতে থাকিবে। এই বন্ধুত্বের আসরে জার্ম্মাণির ডাক পড়া চাই। তাহা না হইলে দুনিয়ার শ্বেতাঙ্গ নর-নারীর প্রভুত্ব বজায় থাকিবে না।

(৩)

বিজেতা গবর্মেণ্টগুলার হুকুম তামিল করিয়া জার্ম্মাণ রিপারিক ডাক-মাশুল বাড়াইয়াছে। রেল ভাড়া, টেলিগ্রাফ টেলিফোনের মাশুল এবং সাধারণ ট্যাক্স বাড়াইয়াছে। মাল আমদানি-রপ্তানির উপর চড়া কর চাপাইয়াছে। চীনের গবর্মেণ্ট যেমন দুনিয়ার প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই অধীনে এবং তত্ত্বাবধানে শাসন-কার্য্য চালাইয়া থাকে, জার্ম্মাণ সরকারকেও অবিকল সেইরূপ পরাধীনতায় ভুগিতে হইতেছে। জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের প্রত্যেক সরকারী বহি, প্রত্যেক হিসাব-নিকাশের খাতা, প্রত্যেক ডায়েরি যে-কোনো মুহূর্ত্তে ইংরেজ বা ফরাসী কর্ম্মচারী তলব করিবার অধিকারী।

জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট আমদানি-রপ্তানির ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বা মাসিক তথ্য-তালিকা ছাপাইয়া থাকে। এই তালিকা পাঠ করিয়া ফরাসী কর্ম্মচারীরা বলিতেছেন :—"জার্ম্মাণ রিপাব্লিক সকল তথ্য সত্য ভাবে প্রকাশ করেন নাই।" জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীদিগকে মিথ্যাবাদী, শঠ ও প্রবঞ্চক বলিয়া ফরাসী কাগজে গালাগালি করা হইতেছে।

ফরাসীরা প্রায়ই বলিয়া থাকে—"জার্ম্মাণরা আছে সুখে ; ফরাসী জাতি কষ্টে দিন কাটাইতেছে।" তাহার উত্তরে জার্ম্মাণ কাগজওয়ালারা বলিতেছেন :—"বার্লিনের বড়-বড় থিয়েটারে, রেষ্টরাণ্টে, কাফেতে, হোটেলে এবং

দোকান-ঘরে যে সকল বিলাসী নর-নারী দেখা যায়, তাহার শতকরা ৭৫ জন বিদেশী। খাঁটি জার্ম্মাণ মধ্যবিত্ত লোক আলু ও রুটিমাত্র খাইয়া কালাতিপাত করে।"

(৪)

ইংরেজের খোসামোদ করা প্রত্যেক জার্ম্মাণ কাগজেরই স্বধর্ম্ম দেখিতেছি। যে-কোনো জার্ম্মাণ সভা-সমিতিতেও ইংরেজকে "হাতে" রাখিবার আন্দোলন দেখিতে পাই। একমাত্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণির নর-নারী আজ-কাল "কায়েন মনসা বাচা" প্রতিহিংসা পুষিতেছে। ইংল্যাণ্ডকে মিত্র বিবেচনা করা জার্ম্মাণ সমাজের প্রায় প্রত্যেক জাতেরই সাধারণ লক্ষণ বলা যাইতে পারে। এমন কি, যে দু-একটা রাষ্ট্রীয় দল ইংরেজ-বিরোধী, তাহাদের ভিতরও অনেক লোক ব্যক্তিগত ভাবে ইংরেজের স্বপক্ষেই মত গড়িয়া তুলিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প।

বস্তুতঃ, যত দিন পর্য্যন্ত রাইন জনপদ বিজেতাদের অধীনে —বিশেষতঃ ফ্রান্সের তাঁবে—থাকিবে, তত দিন জার্ম্মাণরা ইংরেজের পা চাটিয়া কোনো মতে জগতে মাথা খাড়া করিবার চেষ্টা করিবে। ইংল্যাণ্ডের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া জার্ম্মাণির "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" যে ইংল্যাণ্ডের বিশ্ব-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ফোন্ টির্পিট্‌স্ জার্ম্মাণিকে সাধের লড়াই-তরণী উপহার দিয়াছিলেন, যে ইংল্যাণ্ডের অতি-বৃদ্ধি সহিতে না পারিয়া গোটা জার্ম্মাণি একদিন দুনিয়াখানাকে উত্তম-পুত্তম করিবার জন্য নিঃশব্দে এবং সশব্দে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, সেই ইংল্যাণ্ডেরই চরণ-সেবা করিয়া কম-সে-কম পনর বৎসর কাল জার্ম্মাণি জীবন ধারণ করিতে বাধ্য।

দলে-দলে বিলাতের লোক জার্ম্মাণির ভিন্ন-ভিন্ন শহরে আসিতেছে। পর্য্যটকদিগকে জার্ম্মাণ-সমাজের সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। জার্ম্মাণ কাগজে ইংরেজি-সাহিত্য সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা ছাপা হইতেছে। ইংরেজের খাতির যেখানে-সেখানে চোখে পড়ে।

(৫)

বিলাতী ধনবিজ্ঞানবিদেরা অনেকেই জার্ম্মাণির বন্ধু সাজিয়াছেন। জার্ম্মাণিকে পুনরায় দুনিয়ার বাজারে-বাজারে কেনা-বেচা করিবার সুযোগ দিবার জন্য বহু ইংরেজ পণ্ডিত তুমুল আন্দোলন চালাইতেছেন। ইঁহারা জার্ম্মাণ মার্কের দর আন্তর্জাতিক টাকার বাজারে বাড়াইয়া দিতে সচেষ্ট।

হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম শহরে অবাধ-বাণিজ্য-সঙ্ঘের এক সভা বসিয়াছিল। তাহাতে এক ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন— "লড়াইয়ের ক্ষতি-পূরণের বাবদ জার্ম্মাণির নিকট টাকা চাওয়া বেকুবি। ইহাতে জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা দিন-দিন অধোগতির দিকে যাইতেছে।

"মার্কের দর এত কম যে, জার্ম্মাণরা এখন আর বিলাতী মাল খরিদ করিতে পারে না। অতএব লড়াইয়ের দেনা-পাওনা তামাদি বিবেচনা না করিলে দুনিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইবে না।"

এই সকল মত প্রচার করিবার জন্য যাঁহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন—তাঁহাদেরই ভিতর অনেকেই অবাধ-বাণিজ্যপন্থী; অর্থাৎ অবাধ-বাণিজ্য মতের পশ্চাতে কাজ করিতেছে বিলাতী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ। জগতের অধিকাংশ তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত মতগুলা এই ধরণের কোনো না কোনো স্বার্থের দ্বারা গঠিত হয়।

(৬)

বিগত নবেম্বর মাসে ওয়াশিংটন সম্মিলনের সমকালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জার্ম্মাণির সন্ধি কাগজে-কলমে সহি হইয়াছে। দুই দেশে প্রতিনিধি-বিনিময়ের ব্যবস্থা হইতেছে। ১ জানুয়ারি (১৯২২) বার্লিনে বিদেশী রাষ্ট্রদূতেরা জার্ম্মাণ রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট এবার্টের সঙ্গে এক জোটে আসিয়া মোলাকাৎ করিলেন। মুখপাত্র ছিলেন রোমান ক্যাথলিক্ সমাজের কর্ত্তা পোপের প্রতিনিধি।

ফ্রান্সের কান (Cannes) নগরে এক আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসিল। সেখানে জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বরূপ রাটেনা ত হাজির হইবার এক্তিয়ার পাইয়াছেন। অধিকন্তু সাব্যস্ত হইল, ইতালীর জেনোয়া নগরে যে বিপুল আর্থিক সম্মেলন বসিবে, সেই সভায় দরবারী কায়দায় জার্ম্মাণি, এবং অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারি, বুলগেরিয়া, এবং রুশিয়াও নিমন্ত্রিত হইবেন। পরাজিত জার্ম্মাণি আর বেশী দিন জগতে 'এক-ঘরে' থাকিবে না।

জার্ম্মাণিকে জাতে তুলিবার জন্য ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স দায়ে পড়িয়াছেন। ইংল্যাণ্ডে প্রায় আঠারো লাখ মজুর

বেকার বসিয়া আছে। এই মজুরদিগকে বৃটিশ গবর্মেণ্ট প্রতিদিন টাকা সাহায্য করিতে আইনতঃ বাধ্য। এই খরচের পরিমাণ এত বেশী যে, ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ইংল্যাণ্ড জার্ম্মাণির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য যত টাকা পাইবে, তাহাতেও এখনকার এক বৎসরের বেকার-সাহায্যের খরচ উশুল হইবে না।

অপর দিকে ফ্রান্সের দুরবস্থাও অসীম। ফরাসী ফ্যাক্টরিতে যে সমুদায় মাল উৎপন্ন হয়, সেই সমুদায় মাল জার্ম্মাণ না কিনিলে, ফ্রান্সের উদ্ধার নাই। অথচ জার্ম্মাণ মার্ক এত নামিয়া গিয়াছে যে, জার্ম্মাণির পক্ষে ফরাসী মাল খরিদ করা অসাধ্য। কাজেই ফ্রান্সে আর ফ্যাক্টরিতে কাজ চলিতেছে না। ফরাসী মজুরেরা বেকার।

কিন্তু ফ্রান্সে বেকারের সংখ্যা কাগজে-কলমে বেশী দেখা যায় না কেন? ফরাসী-সমাজে বেশী লোকে বেকার থাকিলে শীঘ্রই ফ্রান্সে "গদ্দর" দেখা দিবে। সেই বিপ্লবের ভয়ে ফরাসী-গবর্মেণ্ট দশ লাখ লোককে পল্টনে চাকুরি দিয়া ভরণপোষণ করিতেছেন।

(৭)

জার্ম্মাণির থিয়েটারে-থিয়েটারে সঙ্গীতে" অতীত গৌরব-বাহিনী বাণী" প্রচারিত হইতেছে। যে সকল নাটকে পুরনো জার্ম্মাণ নরনারীর বীরত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, বার্লিন এবং অন্যান্য শহরের রঙ্গালয়ের কর্ম্মকর্ত্তারা প্রায়ই সেই সমুদায়ের পালা সাজাইয়া থাকেন। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি ফুটাইয়া তুলিবার দিকে ম্যানেজারদের লক্ষ্য দেখিতে পাই।

এই প্রকার নাটকে প্রাচীন জার্ম্মাণির বীরপুরুষগণের কীর্ত্তি ও কৃতিত্ব প্রকটিত হয়। আর এক প্রকার নাটকে নেপোলিয়ান ইত্যাদি যথেচ্ছাচারী "সয়তান" নরপতির পতন দেখানো হয়। দাঁতোঁ ইত্যাদি ফরাসী বিপ্লবনায়কগণের জীবনের তারিফ করিবার উদ্দেশ্যে, কতকগুলা অভিনয় চলিতেছে। অধিকন্তু, জার্ম্মাণির মোটা-মোটা ঐতিহাসিক ঘটনাগুলাও রঙ্গমঞ্চে ফুটাইয়া তোলা হইতেছে।

বার্লিনের রাইণহার্ট (Reinhardt) স্থাপিত থিয়েটারের পালাগুলা জার্ম্মাণ সমাজকে অতি গভীর ও সূক্ষ্ম উপদেশ দিয়া থাকে। এই রঙ্গালয়কে আমোদ-প্রমোদের ভবন বিবেচনা না করিয়া, একপ্রকার দর্শন-বিদ্যালয় বা ধর্ম্ম-গৃহ বলা চলে।

এখানে কোনো রাত্রে প্রাচীন গ্রীক নাটক অভিনীত হয়। তাহাতে জার্ম্মাণরা "দৈব", ঐশ্বরিক শক্তি ইত্যাদি অতি-মানব ক্ষমতার সংস্পর্শে আসিতে পায়। বাধা-বিঘ্ন ও বেদনার দরিয়ায় স্নান করিয়া দর্শকমণ্ডলী চিত্ত দৃঢ় করিতে অভ্যস্ত হইতেছে।

গ্যে'টের "ফাউষ্ট" চিরকালই জার্ম্মাণদের আদরের বস্তু। "ফাউষ্টে"র গণ্ডা-গণ্ডা নয়া সংস্করণ যখন-তখন বাহির হইতেছে। আজও জার্ম্মাণ নরনারী গ্যে'টের পালা দেখিয়া মানব-জীবনে "অসৎ" প্রবৃত্তির দাম যাচাই করিয়া লইতেছে।

শক্তি,—সংগ্রামের শক্তি—সুশক্তি—কুশক্তি—এক কথায় শক্তিযোগ যে-যে চরিত্রে পুরামাত্রায় পরিস্ফুট, সেই সব চরিত্র পরাজিত জার্ম্মাণির রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বদাই হাজির হইয়া থাকে। শেক্সপিয়ারের শক্তিধরগণ—লিয়ার, সীজার, ম্যাকবেথ, ক্লিও-পেট্রা ইত্যাদিও—জার্ম্মাণ থিয়েটারে প্রায়ই দেখা দিতেছে।

ইবসেন, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ ইত্যাদি স্কাণ্ডিনাভিয় নাট্যকারের রচনা জার্ম্মাণ-সমাজে খুব চলে। এই সকল রচনায় জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ মানব-চিত্তের স্বাধীনতা এবং সময়ে-সময়ে সমাজবিদ্রোহী ভাবুকতার স্বাদ পাইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, বিদেশী নাট্যকারের রচনাই হউক, অথবা বিদেশী সমাজের চরিত্রাঙ্কনই হউক,—জার্ম্মাণরা সবই জার্ম্মাণ ভাষায় পায়। থিয়েটারে গোটা দুনিয়া আসিয়া হাজির হয়—মায় ভারতের "ঠাকুর" পর্য্যন্ত। সবই আসে অবশ্য খাঁটি আপনার জন ভাবে,—বিদেশী "অতিথি" মাত্র রূপে নয়। জার্ম্মাণরা চিরকালই এই ধরণে "বাহির"কে "ঘরে" ঠাঁই দিয়া আসিতেছে। ইহাতে জার্ম্মাণির স্বদেশী সমাজ ভাঙিয়া যায় নাই,—বরং নিরেট ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া মজবুদই হইয়াছে।

"পল্লী-শ্রী"

[শ্রীরণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

যে শিল্পের বৈজ্ঞানিক উন্নতি দ্বারা আজ আমরা পৃথিবীর সমগ্র সুসভ্য জাতির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, দর্শন করিয়া, আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানকে উদার করিতে পারিতেছি, যে শিল্প জনসাধারণের অন্তঃকরণে দৃঢ় ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহার দর্শন-জনিত আনন্দ উপভোগ দৈনান্দন না হউক, অন্ততঃ সাপ্তাহিক হিসাবে কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে, সে শিল্পের মূল্য যে কত, তাহা বলা বাহুল্য; সে শিল্প যে জনসাধারণের কত আদরের, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশে বায়স্কোপ শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে দুই-একটী কোম্পানীরও সৃষ্টি হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাঁহারা বহু চেষ্টা-যত্ন সত্বেও সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ গুহ মহাশয় সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল আমেরিকায় অবস্থান কালে এই শিল্পের বিষয় অবগত হইয়া, ও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া, প্রাণপণ সাধনার দ্বারা এই নাট্য-কলার শিক্ষাকল্পে যত্নবান হন। তাঁহার অন্তঃকরণে শৈশব হইতেই নাট্য-কলার বীজ প্রচ্ছন্ন ভাবেই ছিল; এক্ষণে উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে-হইতে শেষে পূর্ণ বিকশিত ফল-পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হইয়া সৌরভ বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ তিনি সুদক্ষ অভিনেতা বলিয়া নাট্য-জগতে পরিচিত হইলেন। শুধু অভিনেতা নয়,—তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকল প্রকার উপন্যাস সুন্দর ভাবে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিশ্ব-পরিচিত Light of Asia ইত্যাদি কয়েকখানি পুস্তক তিনি নাটক আকারে পরিবর্ত্তিত করেন। তিনি নিজের মুখে মনের শোক, দুঃখ, লজ্জা, ঘৃণার ভাব পূর্ণ ভাবে প্রকটিত করিতে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন। তখন আমেরিকাস্থ অনেক বড়-বড় ফিলিম্ কোং তাঁহার ভাবের অভিব্যক্তি ও অভিনয়-চাতুর্য্য দেখিয়া, তাঁহার দ্বারা অভিনয় করাইতেন। এই প্রকারে বহু যত্ন সহকারে এই কলার চর্চ্চা করিয়া, তিনি এখন এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। গত ২৫শে আষাঢ় তারিখে

প্রধান অভিনেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ গুহ

বলুন দেখি, কোন্‌টী সুরেন্দ্র বাবু?

ইজিপ্সিয়ান যাত্রীর দল

অন্তঃপুরে (হারেমে)

বাগানে

এই প্রতিভাবান যুবক এই অমূল্য কলা-সম্পদ অর্জ্জন করিয়া নূতন শিল্পে মায়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসিবার পূর্ব্বে

আমেরিকায় তাঁহার শেষ কার্য্য রবীন্দ্রনাথের "চিত্রা" নামক পুস্তকের অভিনয়। সে অভিনয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য মিঃ গুহর দ্বারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। অভিনয়

একাকী

বলুন ত, কে ?

সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার কন্যাদ্বয়

খেলা-ধুলা

এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, তাঁহার কীর্ত্তি আমেরিকার প্রতি সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছিল।

স্বদেশে পদার্পণ করিবার কয়েকদিন পরেই গুহ মহাশয় স্থানীয় কতিপয় অনভিজ্ঞ লোক লইয়া সুশিক্ষা দিয়া তাঁহা-দিগকে উপযুক্ত করিয়া লইয়া, তাঁদেরই দ্বারা "পল্লী-শ্রী" নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তকের অভিনয় বায়োস্কোপ সাহায্যে দেখাইয়াছিলেন। এই বর্ষাকালে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আন্তরিক যত্ন দ্বারা তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। যে দিন বইখানি ওভারটুন হলে অভিনীত হয়, সে দিন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই অভিনয় দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মিঃ গুহর কৃতকার্য্যতায় আন্তরিক ধন্যবাদ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মিঃ গুহর ইচ্ছা যে, তিনি শিশু-পালন, গোরক্ষা-পদ্ধতি, কৃষি ইত্যাদিও বায়োস্কোপ সাহায্যে দেশীয় লোকদিগকে প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষা দিবেন। গুহ মহাশয়ের চরিত্র অতি পবিত্র, সরল ও আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। ভগবানের নিকট আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, যেন গুহ মহাশয় স্বীয় সংকল্পিত কার্য্যে উন্নতি দেখাইয়া, দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করেন।

সুরেন্দ্র বাবুকে খুঁজিয়া বাহির করুন

এতৎসহ যে চিত্রগুলি সন্নিবেশিত হইল, এই চিত্রগুলি, শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয় আমেরিকায় অবস্থান-কালে যে সকল অভিনয় করিয়াছেন, তন্মধ্যস্থিত কয়েকটি দৃশ্য হইতে সংগৃহীত। এই সামান্য কয়েকখানি মাত্র চিত্র হইতে পাঠক মহোদয়গণ গুহ মহাশয়ের কলা-কুশলতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন।

আসামী

[শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ]

(১)

বীরনগরের সাধুচরণ মাঝির পুত্র যাদবের মাঝিগিরিতে হাতে-খড়ি না হইতেই, তাহার পিতা দুখানি ডিঙ্গি ও খান পাঁচ-ছয় বৈঠার বোঝা তাহার মাথায় চাপাইয়া, পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িল। যাইবার সময় শুধু প্রতিবেশী হরিচরণকে বলিয়া গেল—"যেদোটাকে একটু তৈরী করে নিও ভাই—এখন থেকে তুমিই হ'লে ওর অভিভাবক।" তার পর পুত্রকে বলিল—"হরির পায়ের ধূলো মাথায় ক'রে নে যেদো,—আজ থেকে ইনিই তোর শিক্ষাগুরু।"

হরিচরণ কার্য্যতঃ যাদবের অভিভাবকত্ব গ্রহণ না করিলেও, তাহার নৌকা-দুখানির যে অভিভাবক হইয়া বসিল, এ কথা কাহারও অস্বীকার করিবার জো ছিল না। তাহার নিজের জরাজীর্ণ ডিঙ্গিখানি যখন কিছুতেই আর চলিতে পারিতেছিল না—তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে যাদব ও তাহার নৌকা দুখানি হাতে আসিয়া পড়িল। হরিচরণ যাদবকে বুঝাইয়া দিল, তাহার কোনও ভয় নাই—সে খাইয়া-দাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া খেলিয়া বেড়াক; এখনও তার নৌকা বাহিবার বয়স হয় নাই। পাড়া-প্রতিবেশীরা কিন্তু বলাবলি করিত—এ হচ্ছে হরিচরণের ফন্দী। যেদোকে নৌকা বাহিতে শিখাইলে যদি ডিঙ্গি-দুখানি হাতছাড়া হইয়া যায়! তাহারা এ কথা যাদবকে বুঝাইতে চাহিলে সে জিভ কাটিয়া বলিত—"আরে রাম বল! উনি হচ্ছেন—আমার গিয়ে কি বলে—শিক্ষাগুরু। ওঁর বিরুদ্ধে আমি কি কোনও কথা কইতে পারি!" কোনও কিছু শিক্ষা না দিয়াই যে হরিচরণ কি করিয়া যাদবের শিক্ষাগুরু হইল—ইহা তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। আর এই কথা তাহাকে বুঝাইতে গেলেও সে কিছুতেই বুঝিতে চাহিত না।

হরিচরণ যাদবের গুরুপদ গ্রহণ না করিলেও, তাহার নয় বছরের কন্যা ফুলকুমারী ওরফে ফুলী তাহার গুরু হইয়া বসিল। এই ছোট্ট মেয়েটি তাহার এক-পিঠ কালো, ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া যা-কিছু করিতে আজ্ঞা দিত—যেদো অম্লান বদনে তাহাই সম্পন্ন করিত। ফুলীর অভিভাবকত্বে যেদোর দিনগুলি, পরের গাছের ফল চুরি করিয়া, পাখীর ছানা পাড়িয়া, খেলিয়া বেড়াইয়া, জলের মত কাটিয়া যাইতে লাগিল। হরিচরণ এই দুইটী প্রাণীর রকম-সকম দেখিয়া মনে-মনে বোধ করি খুসীই হইয়া উঠিতেছিল; এবং কি করিয়া সাধুচরণের ডিঙ্গি-দুখানি একেবারে হস্তগত করা যাইতে পারে, তাহারও একটা আভাষ এখন হইতেই তাহার মনের কোণে উঁকি মারিতে লাগিল।

(২)

একঘেয়ে খেলায় ফুলীর আর ভাল লাগিতেছিল না—তাই সেদিন যাদবকে বলিল—"আজ একটা মজা করলে হয় না, যেদো দা?"

"কি মজা রে ফুলী?"

"চল না—একবার নৌকো চ'ড়ে বেড়িয়ে আসি। আজ বাবাও বাড়ী নেই। একখানা ডিঙ্গিও ঘাটে আছে। বাবা এলে তো যাওয়া ঘটে উঠ্‌বে না। চল, চট্ করে ফিরে আসবো।"

যাদব বিস্মিত হইয়া বলিল—"তুই বলিস্ কি রে ফুলী—আমি কি নৌকো বাইতে জানি?"

ফুলী মুখে-চোখে হাসির লহর ছুটাইয়া বলিল—"আরে ধ্যেৎ—নৌকো বাইতে জান না, তা হয়েছে কি? নৌকো আপনি-আপনি বেশ হেল্‌তে-দুল্‌তে যাবে—সে ভারি মজা হবে যেদো দা!" তার পর সে ভঙ্গী করিয়া বলিল—"আমি এমনি ক'রে হাল ধরে বস্‌বো—আর তুমি বৈঠে নিয়ে, এই এম্‌নি ক'রে—হেঁইও, হেঁইও;—না, না,—আর দেরী নয়। চল, শীগ্‌গির চল।"

ফুলীর উৎসাহ দেখিয়া যাদব মনে-মনে ভারী খুসী হইয়া বলিল—"আচ্ছা চল,—সন্ধ্যের আগেই ফিরতে হবে কিন্তু।"

ফুলী ঘরের দাওয়া হইতে দুইখানি বৈঠা লইয়া দৌড়াইয়া

নদীর ঘাটে গিয়া নৌকায় চড়িয়া বসিল। যেদোও নৌকার বাঁধন খুলিয়া নৌকায় উঠিল। ঠিক হইল—তাহারা প্রথম উজান বাহিয়া যাইবে—তার পর আসিবার সময় ভাটিতে নৌকা না বাহিয়াই অক্লেশে আসিতে পারিবে। ফুলী একখানি বৈঠা লইয়া নৌকার পিছনে হাল ধরিয়া বসিয়া হুকুম করিল—"এই যেদো দা—এইবার খুব কসে টান্।" যাদব অমনি উৎসাহভরে উজান মারিতে-মারিতে তান তুলিল—"হেঁইও বল রে, আরে হেঁইও বল রে।" কিন্তু নদীর প্রবল স্রোতের বেগে নৌকা কিছুতেই উজান-মুখে আগাইতেছিল না; ওস্তাদ মাঝির হাতে পড়িয়া ডিঙ্গিখানা ঘুরিতে-ঘুরিতে স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল। নৌকাকে ঘুরপাক খাইতে দেখিয়া ফুলী তো ভারি খুসী! সে ভাবিল—তাহারই হাতের কৌশলে নৌকা ঘুরিতে-ঘুরিতে অগ্রসর হইতেছে। সে উল্লসিত হইয়া বলিল—"থাক্, যেদো দা,—তোমাকে আর কষ্ট ক'রে বাইতে হবে না। নৌকা এখন এই দিকেই চলুক—আমি দিব্যি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাব এখন। তার পর ফির্‌বার সময় উজান বেয়ে এলেই চল্‌বে।" যেদো প্রায় মিনিট দশেক ডিঙ্গিখানিকে উজান মুখে লইবার প্রবল চেষ্টা করিয়া হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল;—সেও এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বৈঠা রাখিয়া ফুলীর কাছে আসিয়া বসিল; এবং হাল ধরিবার উপলক্ষে তাহার মুখে-চোখে যে নানা ভঙ্গিমার শ্রী ফুটিয়া উঠিতেছিল—তাহাই মুগ্ধ চক্ষে দেখিতে লাগিল।

কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে যখন দেখা গেল যে, তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, আর দিনের আলোও প্রায় নিভিয়া আসিতেছে—তখন ফুলী বলিল—"যেদো দা এইবার বৈঠা নাও তো—শীগ্‌গির ফেরা যাক। আমি নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছি।" যেদো অমনি উৎসাহভরে বৈঠা লইয়া 'হেঁইও, হেঁইও' আরম্ভ করিয়া দিল। নৌকার মুখ না ফিরাইতেই বৈঠার টান পাইয়া স্রোতের দিকে নৌকা সোঁ-সোঁ করিয়া ছুটিয়া চলিল। ফুলী চেঁচাইয়া মাতব্বরের মত বলিতে লাগিল—"তোমার একটুও বুদ্ধি নেই—নৌকার মুখ না ঘুরাতেই অমনি টান!" অপ্রস্তুত হইয়া যেদো বৈঠা তুলিয়া রাখিল। কিন্তু মিনিট দশেকের প্রবল চেষ্টায়ও যখন নৌকার মুখ ফিরিল না—অনবরত ঘুরপাক খাইতে-খাইতে স্রোতের মুখেই অগ্রসর হইতে লাগিল—তখন ফুলীর মুখ চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। যাদব এইবার উৎসাহ দিয়া বলিল—"তুই সর ফুলী—আমি এখনই সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।" তার পর হাল লইয়া নানা কারসাজি করিয়াও নৌকার ইচ্ছাগতিকে যখন সংযত করিতে পারিল না—তখন হতাশ হইয়া বলিল—"তাই তো, এখন কি করা যায় রে ফুলী?" ফুলীর মুখে-চোখে ভীতির সুস্পষ্ট আভা ফুটিয়া উঠিল—সে আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

অদূরে একজন লোক আর একখানি ছোট নৌকা বাহিতে-বাহিতে এই দুইটি কিশোর-কিশোরীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া হাসিতেছিল। সে তাহার নৌকাখানি আগাইয়া আনিয়া ফুলীদের নৌকার সাথে ভিড়াইয়া বাঁধিয়া বলিল—"নৌকা চালাতে পার না—এদিকে সখ আছে তো খুব! এখন এমনি করে ভাস্‌তে-ভাস্‌তে সমুদ্দুরে পড়্‌গে—তাহ'লে বেশ হবে।" ফুলীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

"আর কাঁদতে হবে না—চল, তোমাদের বাড়ী রেখে আস্‌ছি।" ফুলী আর যেদো খুসী হইয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে শিক্ষিত আগন্তুকের নৌকাচালন-প্রণালী দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় হরিচরণ বাড়ীতে আসিয়া, ফুলী ও যাদবকে দেখিতে না পাইয়া হাঁক-ডাক সুরু করিয়া দিয়াছে—এমন সময় তাহারা সেই লোকটির সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিচরণ বলিল—"কোথায় গিয়েছিলি এই ভরসন্ধ্যে বেলায়?" যেদো ও ফুলী নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু আগন্তকটি একে-একে সব কথা খুলিয়া বলিয়া, পরে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—"আমার নাম শিবরতন—আমি হরিপুরের নবীন মাঝির ছেলে।"

নবীন পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে একজন মাতব্বর মাঝি। তাহার টাকাকড়ি, ধানচালের আড়ত, বড়-বড় পানসী নৌকা অন্যান্য মাঝিদিগের ঈর্ষ্যার জিনিস ছিল। এমন লোকের পুত্র তাহার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছে দেখিয়া সে তাহার অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল; যাদব ও ফুলীর শাস্তির কথা এই অভ্যর্থনার আবেগে চাপা পড়িয়া গেল।

এই ঘটনার পর হইতে শিবরতনের এই বাড়ীতে আনাগোনা এবং হরিচরণের সহিত কি এক বিষয়ে শলা-পরামর্শ অনবরত চলিতে লাগিল। কথাটাও আর বেশীদিন

চাপা থাকিল না; শীগ্‌গিরই প্রকাশ হইয়া পড়িল,—ফুলীর সহিত নবীন মাঝির পুত্রের বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—"হরিচরণের বরাত ভাল, খুব একটা 'দাঁও' মারিয়া লইয়াছে।"

খেলার সাথী ফুলীকে আর একজন এমনই করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইবে—ইহা যাদব আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না। বালক হইলেও সে জানিত—ফুলীর সহিত তাহারই বিবাহ হইবে। হরিচরণও প্রকাশ্যে এ কথা অনেকবারই বলিয়াছে। কিন্তু ঐ লোকটা কোথা হইতে ধূমকেতুর মত আসিয়া, সমস্তই মাটি করিয়া দিল যে! রাগে, অভিমানে যাদব গম্ভীর হইয়া উঠিল।

ফুলী যাদবের এই ভাব-পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। সে তাহাকে গম্ভীর হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যাদব তাহাকে এমনই তাড়া মারিল যে, সে কাঁদিতে-কাঁদিতে পিতার নিকট নালিশ করিতে গেল।—হরিচরণ নালিশের মর্ম্ম শুনিয়া হাসিয়া বলিল—"তুই আর ওর সঙ্গে মিশিস নে—তোর যে শীগ্‌গিরই শিবরতনের সাথে বিয়ে।"

এই প্রলোভনেও ফুলীর ক্রন্দনের বেগ কমিল না—বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সে পা ছড়াইয়া এই বলিয়া কাঁদিতে বসিয়া গেল যে, সে কক্‌নো ঐ 'পুঁতকো' শিবুকে বিবাহ করিবে না, করিবে না, করিবে না।

কিন্তু ফুলীর এই আপত্তি কার্য্যকালে টিকিল না। হরিচরণ শীগ্‌গিরই একটা শুভ দিন দেখিয়া ফুলীকে শিবরতনের হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

ফুলীর বিবাহের কয়েক দিন পরে যেদো হরিচরণকে গম্ভীর ভাবে জানাইল, "আমার নৌকোটৌকো বুঝিয়ে দাও। আমি আর তোমার এখানে থাক্‌ছিনে।" হরিচরণ বিস্মিত হইয়া বলিল—"তুই আবার যাবি কোথায় রে যেদো?"

যাদব রাগিয়া বলিল—"কেন, আমার নিজের বাড়ী কি নাই? তোমার মত এমন জোচ্চোরের বাড়ীতে আর আমি একদণ্ডও থাকছি নে। নৌকোগুলো ফিরিয়ে দেবে তো দাও—নইলে আমি আদালত করবো।"

হরিচরণ বুঝিল—যেদোকে পাড়ার লোক বিগড়াইয়া দিয়াছে। তাহার ভাব দেখিয়া আর নৌকা রাখিবার সাহস তাহার হইল না। সে ক্ষুণ্ণ মনে সব বুঝাইয়া দিয়া পাড়া-প্রতিবেশীকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"আমার সুখ দেখে সব শা'—র মাথায় টনক পড়েছে। আর এ ছোকরাকেও এতদিন ধরে মানুষ করলাম—তার প্রতিফলও বেশ দিল দেখছি। কলিকাল আর কাকে বলে।"

(৩)

বছর চার-পাঁচ পরের কথা বলিতেছি। যাদব এখন পরিপূর্ণ যুবা পুরুষ,—সে ইহার মধ্যে মাঝিগিরিতেও বেশ পাকা হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন নৌকার ভাড়া খাটিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার পর নিজের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক সাজিতে-সাজিতে গান ধরিয়াছে—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতি পারলাম না।"

আমার ভাঙ্গা নায়ের ছেঁড়া দড়ি রে—এ-এ-এ-এ-এ—"
এমন সময় ফুলী আসিয়া ডাকিল—"যেদো দা—।"

যাদবের সুর ভাঁজা শেষ হইল বটে, কিন্তু সে কোনও উত্তর দিল না—সাজা কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিল।

ফুলী হাসিয়া বলিল—"কলকেটা আমার কাছে দাও—আমি ফুঁ দিচ্ছি।" যাদব গম্ভীর হইয়া বলিল—"না থাক্। ও-কাজ আমিই পারবো।" তাহার কথার ভঙ্গী শুনিয়া ফুলী দুঃখিত হইল; তাহার মনে হইল—ছোটবেলায় যাদব অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তাহাকে দিয়া কতবার তামাক সাজাইয়া লইয়াছে—তাহার ফুঁ দেওয়া লইয়া কত রকমে উপহাস করিয়া তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে;—কিন্তু আজ? ফুলী অতি কষ্টে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া সহজ ভাবেই বলিল—"আচ্ছা, এ কাজ না হয় তুমিই পারলে; কিন্তু আর একটা কাজও যে তোমাকে পারতে হয় যেদো দা?"

যাদব হুঁকায় একটা টান দিয়া বলিল—"কি কাজ?"

ফুলী হাসিয়া বলিল—"তোমার ভাঙ্গা 'নাও' আর ছেঁড়া দড়ি যাতে শীগ্‌গির মেরামত হয়, তাই এখন তোমাকে করতে হয় যে?"

উদাসীন ভাবে যাদব বলিল—"পয়সা নাই।"

ফুলী বলিল—"তোমার তো বিশেষ পয়সা লাগবে না ভাই;—যে মেরামত করবে, তারই বাপের কিছু লাগ্‌তে পারে বটে!"

যাদব সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম?"

ফুলী হাসিয়া বলিল "এইবার একটা বিয়ে কর যেদো দা।"

যাদব আরও গম্ভীর হইয়া গেল। ফুলীর বিবাহের পর

যখনই তাহার সাথে দেখা হইয়াছে, সে এই একই অনুরোধ অনেকবার করিয়াছে;—কিন্তু যাদব কোনও উত্তরই দেয় নাই; আজও দিল না।

ফুলী বলিল—"চুপ করে থাকলে চলবে না তো—আজ তোমার কথা নিয়ে তবে আমি যাব।" যাদব তবু কোনও কথা বলিল না—গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে লাগিল।—ফুলী তখন অনুযোগের সুরে বলিল—"যেদো দা, লক্ষ্মীটি, এইবার বিয়ে কর ভাই—কতদিন এম্‌নি ভাবে থাকবে বল তো।"

যেদো উদাস ভাবে বলিল—"যতদিন বেঁচে থাক্‌বো।"

"কিন্তু আমি তোমায় এ ভাবে আর কিছুতেই থাকতে দেবো না।" ফুলীর কথার দৃঢ়তা যাদব লক্ষ্য করিল—তাই বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"কিসের জোরে ফুলী?" ফুলীর মুখ ছাই-বর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ঝাঁঝাল স্বরে বলিয়া উঠিল—"জোর? কিছু না। তুমি আমার কে যে তোমার ওপর জোর চল্‌বে আমার? কিন্তু তোমার জন্য আমাকে যে সকলে এমনি করে ঠেঙাবে—এই বা আমি সহ্য করবো কিসের জন্য, বলতে পার?"

যাদব বিস্মিত হইয়া বলিল—"আমার জন্য তোকে—।" বাধা দিয়া উগ্র স্বরে ফুলী বলিল—"হাঁ। বিশ্বাস না হয় এই দেখ।" এই বলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ফুলী তাহার পিঠের কাপড় অপসারিত করিল। যাদব সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—তাহার সমস্ত পিঠে বিষম প্রহারের গভীর সুস্পষ্ট ক্ষতচিহ্ন। সে শিহরিয়া উঠিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"এ দশা তোর কে করলে রে ফুলী?"

ফুলী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আমার স্বামী! কিন্তু তাঁরই বা দোষ কি যেদো দা? সবাই বল্‌ছে যে তুমি আমারই জন্য এখনও বিয়ে কর নি। তাই ওঁর রাগ হওয়া তো স্বাভাবিক।" তার পর একটু থামিয়া বলিল—"কিন্তু, এর প্রতীকার তো তুমিই করতে পার।" ক্রোধে যাদবের সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; বলিল—"প্রতীকার? হাঁ৷ এর প্রতীকার আমাকেই কর্ত্তে হবে বৈ কি!"

যাদবের মুখের ভাব দেখিয়া ফুলী চমকাইয়া গেল। সে দেখিতে পাইল, প্রতিহিংসার সুস্পষ্ট চিহ্ন তাহার মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে ভীত হইয়া বলিল—"ও সব মার-ধোরের মতলব এঁটো না যেদো দা!"

যাদব বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"তোর স্বামীর ভয়ে না কি?" ফুলী এইবার দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"কার ভয়ে তা জানি নে—কিন্তু ও-সব মতলব ছাড় তুমি।"

যাদব মুখ খিঁচাইয়া বলিল—"তোর উপদেশ তো চাইনি আমি। ফের যদি কথা—।"

ফুলীও দৃপ্ত স্বরে বলিয়া উঠিল—"বেশ। তোমার সঙ্গে যেন আর আমার কোনও দিন কোনও কথা বল্‌তে না হয়। তবে আজ এই কথা জানিয়ে দিচ্ছি—আমার স্বামীর সঙ্গে যেন তুমি লাগতে যেও না—তোমার মঙ্গল হবে না।"

"আমার কিসে মঙ্গল হবে, সে আমি জানি ফুলী,—এ সম্বন্ধে তোর কাছে আমি উপদেশ চাই না তো। ইচ্ছা হয়, তোর স্বামীকে আমার মনের কথা জানিয়ে বলিস্‌—যে হাত দিয়ে তোর ঐ কোমল দেহে সে আঘাত করেছে—সে হাত যত দিন না একেবারে অকর্ম্মণ্য করে দিতে পারি—তত দিন আর আমার শান্তি নাই। তাকে এখন থেকে সাবধান হয়ে থাক্‌তে বলিস্‌।"

ফুলী যাদবের কথায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর সে ঝোঁকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"হাঁ—তাঁকে সাবধান করে দিতে হবে বৈ কি। কিন্তু, তুমিও সাবধানে থেকো যেদো দা।" এই বলিয়া, যাদবের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

যাদব সেই একই স্থানে গুম হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার দুই চোখ দিয়া বড়-বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ-টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এই কথাটা আজ তার মনে খোঁচার মত বিঁধিয়া রহিল যে—সে ফুলীর কাছে তার স্বামী অপেক্ষা কতখানি হীন ও ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে।

(৪)

বীরনগর ও হরিপুরের মধ্য দিয়া যে নদীটি বহিয়া গিয়াছে, তাহারই কোন অংশে মাছ ধরা লইয়া এই দুই গ্রামের জেলেদের মধ্যে অনেকদিন হইতেই রেষারেষি চলিতেছিল; কারণ, এই জলার মালিক বীরনগরের জমীদার কি হরিপুরের জমীদার, তাহার যখন কিছুতেই নিরাকরণ হইল না, তখন দুই গ্রামের জেলেরাই গায়ের জোরে ইহার একটা মীমাংসা করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু গ্রামের নাম বীরনগর হইলেও এই যুদ্ধে তাহারাই ক্রমশঃ পিছাইতে লাগিল;—কেন না

তাহাদের লোক-বল হরিপুর অপেক্ষা হীন ছিল। কয়েক বছর কোনও রকমে যুঝিয়া, আজ দুই বৎসর হইল তাহারা জয়ের গৌরব হরিপুরের মাথায় তুলিয়া দিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

মাঝিদের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধ, তাহারা এই পরাজয়ের কলঙ্ক মাথায় করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইলেও, তরুণের দল এ অপমানের ব্যথা ভুলিতে পারে নাই; এবং সুবিধা বুঝিলে যে আবার তাহারা একহাত লড়িয়া দেখিতে পারে, এ ইচ্ছাও তাহাদের মনে মাঝে-মাঝে উঁকি দিত।

হরিপুরের উপর যাদবের আক্রোশ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেন না তাহার নিজের গ্রাম যে হরিপুরের নিকট ছোট হইয়া গেল, ইহা তো তাহাকে বিঁধিতই,—তাহার উপর ঐ গ্রামেরই শিবরতন তাহার ফুলীকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে যে! শুধু তাই নয়—ফুলীর উপর ঐ পশু অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত নয়। তাহার মাথায় খুন চাপিয়া গেল;—সে কি করিয়া যে হরিপুর গ্রামকে অপদস্থ করিয়া শিবরতনকে শাস্তি দিবে, এখন হইতে তাহারই পন্থা খুঁজিতে লাগিল; এবং কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া ফেলিল।

একদিন যাদব কয়েকজন সঙ্গীর সহিত মস্ত একটি পাকা রুইমাছ লইয়া জমীদার-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, জমীদারবাবুকে প্রণাম করিয়া কহিল—"মাছটি কর্ত্তার সেবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছি।" জমীদারবাবু মাছটির সুডৌল বিপুল অবয়ব দেখিয়া খুসী হইয়া বলিলেন—"কি রে যেদো, তুই আবার মাছ ধরা আরম্ভ করলি কবে থেকে?"

যাদব বলিল—"আজ্ঞে, এই কিছুদিন হ'লো। শুধু নৌকো ভাড়া খাটালেই সংসার চলে না—তাই একটা জালও করেছি।"

জমীদারবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তোর আবার সংসার কিসের রে?"

"আজ্ঞে, সংসার বৈ কি। যতদিন একলা ছিলাম, ততদিন না হয়।"

জমীদারবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সে কি! তুই কি বিয়ে করেছিস্?"

যাদব হাসিয়া বলিল—"না বাবু। শুধু বিয়ে করলেই কি আর সংসার হয়!"

তার পর তাহার সঙ্গীদের দেখাইয়া বলিল—"এদের ভার যে আমি নিয়েছি বাবু—তাই শুধু ভাড়া খেটে আর সংসার চলে না।"

"কেন? ওদের কি বাড়ী-ঘর নাই?"

"তা' থাকবে না কেন? কিন্তু আজকাল ওরা আমার কাছেই থাকে কি না—তাই ওদের খেতেও দিতে হয়।"

জমীদারবাবু বলিলেন—"বেশ—বেশ। কিন্তু এ মাছ কোথাকার রে? ভারি চমৎকার মাছটি কিন্তু!"

যাদব মহা খুসী হইয়া বলিল—"আজ্ঞে, সেই জন্যই তো হুজুরের জন্য নিয়ে আসা। মাছটি ঐ হরিপুরের—কি বলে, সেই জলাটার কি না।"

জমিদারবাবু অবাক্ হইয়া বলিলেন—"সে কি রে—ওরা তোদের মাছ ধরতে দিলে?"

"ধরতে কি আর ইচ্ছা করে দেয় কর্ত্তা—জোর করে আন্‌তে হয়।" তার পর গম্ভীর ভাবে জানাইল—"একটা হুকুম যে দিতে হয় কর্ত্তা!"

"কিসের হুকুম রে?"

"ঐ জলাটা একবার দখল করি! গাঁয়ের অপমান আর সইতে পারি নে।" জলাটা অধিকার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও জমীদার পারিয়া উঠিতেছিলেন না—এ দুঃখ তাঁহারও মনে বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু যাহা একবারে চুকিয়া-বুকিয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া কোনও হাঙ্গামা করিতেও আর ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি বলিলেন—"ও-সব তো মিটে গেছে রে—আর কেন?"

বাবুর ইচ্ছা থাকিলেও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়ে তিনি হুকুম দিতে পারিতেছেন না—তাহা যাদব বুঝিল। তাই সে হাসিয়া বলিল—"তোমার প্রজা আমরা কর্ত্তা,—তাই একটা হুকুম তোমার কাছ থেকে নিতে এসেছি—নইলে যে আমাদের পাপ হবে। তুমি কিছু ভেবো না কর্ত্তা—তোমাকে এর ফ্যাসাদে পড়তে হবে না। যত দোষ-ঘাট আমিই মাথা পেতে নেব। শুধু, তুমি একবার হুকুম দেও,—আশীর্ব্বাদ করো—তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

জমীদারবাবু বলিলেন—"যা ভালো বুঝিস্ কর—কিন্তু আমাকে যেন এর মধ্যে জড়াস্ নে।"

"তা আর তোমাকে বলতে হবে না কর্ত্তা"—এই বলিয়া

একে-একে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া সকলে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

যখন প্রচুর মাছ সমেত সঙ্গীদের লইয়া যাদব বাসায় ফিরিল—তখন রাত প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছে। যাদবের মুখ আজ তৃপ্তির আভায় যেন ঝলমল করিতেছিল। সে মাছগুলি সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া বলিল—"বাড়ী যাবার সময় এই দুটি মাছ জমীদার-বাড়ীতে দিয়ে যাস্ কেষ্ট।"

কেষ্টদের কিন্তু তখনই বাড়ী যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল না। তাহারা প্রতিদিন রাত্রে যাদবের কাছেই থাকে; আজ যাদব কিন্তু তাহাদের এ বাড়ীতে রাখিতে প্রস্তুত নয়। মাছ ধরিতে গিয়া যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এ বাড়ীতে আজ পুলিশের শুভাগমন হইবেই, এ কথা সে জানিত। কারণ, সে যে দলের নেতা এ কথা আর অপ্রকাশ ছিল না। তাই সে সকলকে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়াই ঠিক করিয়াছিল।

কেষ্ট বলিল—"দাঁড়াও দাদা, একটু তামাক খেয়ে নি।" তামাক সাজিয়া তামাক খাইতে বসিয়া তাহাদের মজলিশটি বেশ জমিয়া গেল।

রামচন্দ্র বলিল—"সাবাস্ তোমার লাঠির জোর যেদো দা—এক চোটেই শিবুর হাত চুরমার। ও শালা তো লাঠির বাড়ি খেয়ে জলে পড়ে ভেসে যাচ্ছিল; না পারছিল সাঁতার দিতে—না পারছিল হাত নাড়তে। যেমন বদমায়েস—তেমনি শাস্তি।"

কৃষ্টধন বলিল—"এবার ভারি জব্দ হয়ে গেছে ওরা। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি—হ্যাঁ।"

নবীন হুঁকায় এক 'সুখটান' দিয়া ধূম ছাড়িয়া বলিল—ওরাও কিন্তু মারামারির জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল—ইলে কি করে জান্‌লে যে, আজই গোলমাল হবে?"

রাম বলিল—"ঐ বেটা হরিচরণের কাজ। বেটা ঘরভেদী বিভীষণ—কি করে আমাদের মতলব জান্‌তে পেরে ওদের সাবধান করে দিয়েছিল। ওর জামাই তো আজ ফাকাই পাচ্ছিল—ভাগ্যিস যেদো দা দয়া করে জল থেকে তুলে ফেল্‌লে।

যাদবের এ-সব আলোচনায় আর যোগ দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। সে যে তাহার অপমানের অনেকটা প্রতিশোধ লইতে পারিয়াছে,—সে যে শিবরতনের চেয়ে হীন নয়, ইহাই দেখাইতে পারিয়াছে—ইহাতেই সে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সব চেয়ে তাহার আনন্দ হইতেছিল এই ভাবিয়া যে, যে হাত দিয়া ফুলীর দেহে শিবু আঘাত করিয়াছে—সেই হাত সে একেবারে জখম করিতে পারিয়াছে।

এদিকে যাদবের সঙ্গিগণের আলোচনা তুমুল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, যেদো তাহাদের তাড়া দিয়া বলিল—"এই-বেলা তোরা বাড়ী যা তো।—আমাকে একটু নিশ্চিন্ত হতে দে।" সঙ্গিগণ তাহার ধমক খাইয়া, ক্ষুণ্ণ হইয়া, একে-একে বাড়ী চলিয়া গেল।

যাদব একা-একা অন্ধকারেই চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া ছিল, তাহা তাহার ঠিক ছিল না। হঠাৎ ভীত-ত্রস্ত স্বরে ফুলী আসিয়া ডাকিল—"যেদো দা!"

যাদব চমকাইয়া উঠিল; বলিল—"ফুলী, এত রাত্রে যে?"

ফুলী যাদবের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল—"যেদো দা—পালাও।"

যাদব ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"কেন রে?"

"পুলিশ আস্‌ছে! তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে, এই কথা শুনে আমি ছুটে চলে এসেছি। তুমি পালাও যেদো দা।"

যাদব তাহার পায়ের তলা হইতে ফুলীকে উঠাইয়া বসাইয়া বলিল—"পালাবো কোথায় রে?"

"যেখানে ইচ্ছা তোমার।—কোনও দূরদেশে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকো। তার পর হাঙ্গামা চুকে গেলে আবার ফিরে এসো।"

যাদব সহজ ভাবে বলিল—"তা হয় না রে।"

ফুলী যাদবের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, "হবে না কেন শুনি? তুমি যদি না পালাও, তবে আমিও আর এ বাড়ী ছেড়ে যাব না।"

যাদব হাসিয়া বলিল—"কিন্তু লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি? পুলিশ তো এখানেই আসছে—সঙ্গে তোর স্বামীও—।"

ফুলী বলিল—"স্বামীর যে অবস্থা করেছো,—তাকে দু'মাসের মধ্যে আর শয্যা ছেড়ে উঠ্‌তে হবে না। কিন্তু আর সকলে আস্‌বে বটে।"

"তবে?"

ফুলী স্থির ধীর ভাবে বলিল—"তবে আর কি! তোমাকে

যদি পুলিশ ধরে নিয়ে যায়—আমাকেও নিয়ে যাবে। আমি বল্‌বো—আমিই এ দাঙ্গা বাধাতে তোমাকে বলেছিলাম।"

যাদব বলিল—"তোর ও-কথায় লোকে বিশ্বাস করবে কেন?"

ম্লান হাসিয়া ফুলী বলিল—"বিশ্বাস? বিশ্বাস তো লোক করে বসে আছে। তার উপর, এত রাত্রে তোমার ঘরে আমাকে দেখে লোকে কি বল্‌বে বল তো। এ দেখেও কি লোকে বিশ্বাস করবে না?"

যাদব শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"ফুলী, তুই শীগ্‌গির যা ভাই—তারা যে এসে পড়লো বলে!"

ফুলী বেশ করিয়া সুস্থির হইয়া বসিয়া বলিল—"আসুক,—আমি নড়ছি নে।"

যাদব ব্যাকুল হইয়া বলিল—"ছেলেমানুষী করিস্ নে ফুলী—আমার কথা শোন্।"

ফুলী উত্তেজিত হইয়া বলিল—"ছেলেমানুষী আমার, না তোমার, শুনি? আমারই জন্য এ বিপদ তোমার—এ জেনে-শুনেও কি আমি চুপ করে থাকবো? না—তোমাকে এই বিপদের মুখে ফেলে আমি চলে যাবো?"

যাদব বিস্মিত হইয়া বলিল—"তোর জন্য আমার এ বিপদ!"

বড় মধুর হাসি হাসিয়া ফুলী বলিল—"সে আমি জানি যেদো দা।"

ফুলীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দেখিয়া যাদবের মুখ শুকাইল। সে যদি এ গ্রাম ছাড়িয়া না পালায়, তাহা হইলে ফুলীও যে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না, তাহা সে বুঝিল।—তাই, কি-যেন একটু ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, আমি না হয় পালাচ্ছি।—তা হ'লে তো তুই হরিপুরে ফিরে যাবি?"

ফুলী বলিল—"হাঁ।" যাদব উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফুলীকে বলিল—"চল্, তোকে নদী পার করে দিয়ে, আমি ছোট ডিঙ্গিখানি নিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু, তুই নদী পার হয়ে এলি কি করে রে ফুলী?"

ফুলী হাসিয়া বলিল—"নৌকো বেয়ে। প্রাণের দায়—বোঝ না?"

দুইজনে যখন নদীর ধারে আসিয়া পৌছিল—তখন রাত্রি বোধ হয় দশটা। আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল—একেবারে মেঘাচ্ছন্ন। নক্ষত্রও আর দেখা যাইতেছিল না।

আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া যাদব বলিল—"বড় ঝড় উঠ্‌বে রে ফুলী।"

ফুলী বলিল "উঠুক। এই ঝড়ের গোলমালে তুমি অনেক দূর যেতে পারবে।"

তাহারা দুইজনে নৌকায় চড়িয়া বসিল। ফুলীকে ছইয়ের ভিতর বসিতে বলিয়া, যাদব নৌকা খুলিয়া দিল। নৌকা খুলিতে-না-খুলিতেই তুমুল ঝড় আরম্ভ হইল। যাদব সে দিকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিল—"আচ্ছা ফুলী, তোকে এতক্ষণ বাড়ীতে না দেখে ওরা কিছু বল্‌বে না?"

ফুলী বলিল—"ওরা ঠিক পায় নি বোধ হয়। বাড়ীতে যে মহামারী কাণ্ড আজ! আর ঠিক পেলেই বা কি—কিছু প্রহার দেবে বই তো নয়।"

উত্তর শুনিয়া যাদবের মুখ শুকাইল। কিন্তু তখনই বাতাসের জোরে হা'ল বেঁকিয়া গেল—হা'ল সোজা করিয়া লইয়া বলিল, "বড্ড ঝড় রে আজ—কিছু ঠাওর কর্ত্তে পারছি নে যে!"

এই সময় হঠাৎ এক প্রবল ঢেউ নৌকার ভিতর ঝাঁপা-ইয়া পড়িল। ফুলী ভয় পাইয়া বলিল—"আমার ভয় করছে যেদো দা!"

যাদব তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"ভয় কি রে? আচ্ছা, আমার কাছে এসে বস্।" ফুলী ছই হইতে বাহির হইয়া, যাদবের পায়ের কাছে যাইয়া বসিল।

ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। যাদব ফুলীকে বলিল—"আজ আমার বড্ড গান করতে ইচ্ছা হচ্ছে রে!"

ফুলী ঝড় ও ঢেউয়ের তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে-দেখিতে বলিল—"আচ্ছা, গাও না।"

যাদব গান ধরিল—"মন মাঝি তোর বইঠা নে রে
আমি আর বাইতি পারলাম না।
আমার ভাঙ্গা নায়ের ছেঁড়া দড়ি রে—"

বাধা দিয়া ফুলী বলিল—"ছিঃ, ও গান নয় যেদো দা—আর একটা গান গাও।"

কিন্তু আর গান গাহিবার সময় হইল না। বাতাসের প্রবল ধাক্কায় হালের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। যাদব জলে পড়িতে-পড়িতে ঠিকরাইয়া ফুলীর গায়ের উপর পড়িল। তখনই আর এক ঝাপটায় নৌকা কাত হইয়া পলকের

মধ্যে তলাইয়া গেল। তারপর শুধু ঢেউয়ের তাণ্ডব নৃত্য—আর প্রবল ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ।

পরদিন সকাল-বেলা সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—হরিপুরের চড়ার উপর যাদব ও ফুলীর মৃতদেহ পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। গ্রামের লোক আমোদ পাইয়া একে-একে আসিয়া জটলা করিতে-করিতে নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।—দারোগা সাহেব সংবাদ পাইয়া, ঘটনাস্থলে আসিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"এই তো আমার আসামী দেখ্‌ছি।" তারপর স্বভাবসুলভ স্বরে চৌকিদারদের হুকুম করিলেন—"হারামজাদ ব্যাটারা, হাঁ করে কি দেখছিস্—লাস দুটো এখনই সদরে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।"

বিয়ের পদ্য

[শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ]

বিয়ের পদ্য আমার তবু
লিখতে হবে ভাই,
কারণ,—বর না হলে চলে ; কিন্তু
বিয়ের পদ্য চাই।
বিয়ে বাড়ীর গণ্ডগোলে,
পদ্য কে আর কাণে তোলে ?
প্রায়ই লোকের মন্‌টা করে
কোন্‌টা কখন খাই।
যাদের নিয়ে পদ্য লেখা,—
বর-কনে' দুই জনে,
আপন ভাবেই বিভোর থাকে
কিছুই নাহি শোনে।
কনের বাড়ীর কর্ত্তা সকল,
মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল,
বিয়ের পদ্য তাদের ঘায়ে
নুনের ছিটে তাই।

বরযাত্রি-গণের মতি
শুধুই ভোজন পানে,
দইয়ের হাড়ীর দিকে লোলুপ-
দৃষ্টি কেবল হানে।
কেউ কেউ বা ঝগ্‌ড়া বাধায়,
রাস্তা-খরচ করতে আদায়,—
পদ্য টদ্য কে পড়ে তার
ঠিক-ঠিকানা নাই।
সবাই তবু দিতে গেলে
এক-এক খানা লয় ;
কুশাসনের অভাব হলে
বসাও তাতে হয়।
কেউ বা তাতে জুতা পোঁছে ;
রুমাল করে মুখও মোছে,—
আমি ত ভাই ব্যাভার করি—
যখনি কামাই।

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ-অঙ্কিত]

একটা মেরে ছ'টা ডিম

"মধুলোভে বঁধু চায় চড়িবারে গাছে"

বেদ ও বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

অনেক দিন এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা স্থগিত ছিল; আমরা অনেকেই হয় ত সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি। সংক্ষেপে সে সূত্রটি এই। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, তাহা হইতে সূক্ষ্মতর, এইরূপ খুঁজিতে-খুঁজিতে আমরা সূক্ষ্মতার একটা পরাকাষ্ঠা বাহির করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। বিজ্ঞানও তাহাই করিতেছে। পদার্থের দানার দানা, তার দানা, এইরূপ খুঁজিতে-খুঁজিতে বিজ্ঞান পার্টিকেল, মলিকিউল, এটম, কর্পাস্‌ল, প্রভৃতির মধ্য দিয়া ধীরে-ধীরে যাত্রা করিয়াছে। কোথায় গিয়া যে এ যাত্রার অবসান হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? মলিকিউল, এটম্ প্রভৃতি এই মহাযাত্রার পথে এক-একটা আড্ডা। ইহাদের এক-একটীতে পৌছিয়া বিজ্ঞান কিছুক্ষণের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া লয়। কিন্তু এগুলিকে পাইয়া যে সুস্থির, নিশ্চিত হওয়া চলে না, তাহা বিজ্ঞান খুবই জানে। অণিষ্ঠ বা চরম সূক্ষ্ম জিনিষকে কোন্ কালে যে আমরা ধরিতে পারিব, তাহা জানি না; আদৌ ধরিতে পারিব কি না, তাহাও বলিতে পারিতেছি না। তবে তাহার একটা পরিভাষা করিয়া রাখিতে বাধা নাই। সেই পরিভাষা হইল 'শক্তিবিন্দু'। ইউক্লিডের বিন্দুর ন্যায় ইহা নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় নহে। পক্ষান্তরে, মহৎ হইতে মহত্তর, বিপুল হইতে বিপুলতর খুঁজিতে-খুঁজিতে, আমরা বিপুলতার একটা পরাকাষ্ঠা বাহির করিতে গিয়াছিলাম। একটা ব্যাপক ও একটানা জিনিষ আমরা চাই। এ অন্বেষণেও দেখিতে পাই, নানান্ থাক্ বা সিরিজের ব্যাপার। হাওয়া মোটের উপর ব্যাপক ও একটানা (Continuous) জিনিষ, কিন্তু আবার ঠিক তাহাও নহে। হাওয়া অনেক যায়গাতে নাই। যেখানে আছে, সেখানেও হাওয়ার দানাগুলা ফাঁক-ফাঁক হইয়া আছে। এ সব কথা, বিজ্ঞানের নজির দেখাইয়া, পূর্ব্বেই খোলসা করিয়া বলিয়াছি। জল, মাটি, পাথর ইত্যাদি কেহই ব্যাপক ও একটানা জিনিষ নহে। বিজ্ঞান বলে, ঈথার কতকটা আমাদের আশা মিটাইতে পারে। কিন্তু কতকটা মাত্র,—সর্ব্বথা নহে। ঈথার সর্ব্বথা ব্যাপক ও একটানা জিনিষ হইলে, তাহাতে কম্পনাদি চাঞ্চল্য বা বিক্ষোভ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

কারণ, নাড়িতে গেলেই ঈথারের দানাগুলার ঠাঁই অদল-বদল হওয়া চাই; এবং তাহা হইতে গেলেই, ঈথারের মধ্যেও অবকাশ আসিয়া পড়ে। অতএব যে বিভু (সর্ব্বব্যাপী) ও অখণ্ড পদার্থ আমরা খুঁজিতেছি, বিজ্ঞানের ঈথার ঠিক তাহা নহে। অথচ, সেরূপ বিভু ও অখণ্ড পদার্থের অন্বেষণে ঈথারকে পথের মাঝে একটা আড্ডা মনে করিলে লাভ বই লোকসান নাই,—এটম্ বা কর্‌পাস্‌ল যেরূপ 'শক্তিবিন্দু' অন্বেষণের পথে এক-একটা আড্ডা। ফল কথা, ঈথার ঠিক Continuum in the limit (নিরতিশয় অখণ্ড সামগ্রী) না হইলেও, Continua seriesএর মধ্যে কোনও স্থানে বসিতে পারে,—এটম্‌কে যেমন একটা infinitesimal seriesএর মাঝে ঠাঁই দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্মকথা বিজ্ঞানের দিক্ হইতে বুঝিতে গিয়া, আপনারা এই series বা শ্রেণীর কথা সব সময়ে স্মরণ রাখিবেন। 'ছোট' ও 'বড়' এ কথা দুটার মানে আড়ষ্ট করিয়া লইলে, সবই গোল বাধিয়া যাইবে। ছোটর ছোট, তার ছোট—এই রকমে নামিয়া হয় ত নিরতিশয় ছোটকে ধরিতে পারিব; আবার, বড়র বড়, তার বড়—এইরূপে ক্রমশঃ উঠিয়া হয় ত নিরতিশয় বড়র একটা হদিশ পাইব। কিন্তু উঠিতে-নামিতে পারা চাই, আড়ষ্ট হইয়া এক যায়গাতে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিজ্ঞানের ঈথার কি ছান্দোগ্যের আকাশ? এ প্রশ্ন শুনিলে, হাঁ বা না—এই দুয়ের কোন উত্তর দিতে যাইলেই ঠকিতে হইবে; ছান্দোগ্য-শ্রুতি যে "জ্যায়ান্" ও "পরায়ণ" আকাশের কথা বলিয়াছেন, তাহা বিভু ও অখণ্ড বস্তুর নিরতিশয় মূর্ত্তি বা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী। বিজ্ঞানের ঈথার নীচের কোনও শ্রেণীতে পড়াশুনা করিতেছে; এবং বিজ্ঞান ক্রমশঃ তাহাকে উপরের শ্রেণীতে প্রমোশন দিতেছেন; কিন্তু সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পৌছিতে তার এখনও ঢের বাকি। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের জড় (Elastic solid) ঈথার এখন প্রায় জড়াতীত হইয়া আসিয়াছে। এখনও ভূতশুদ্ধি চলিতেছে। "হংসঃ সোঽহং স্বাহা" বলিয়া কোন্ দিন বা বিজ্ঞান-সাধক এই ঈথারকে চিন্ময় আত্মা বা ব্রহ্মের মধ্যেই না মিশাইয়া দেন! সেই দিন হয় ত ঈথার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে প্রমোশন পাইবে, "জ্যায়ান্" ও "পরায়ণ" হইবে। কিন্তু এখনও তার বিলম্ব অনেক। আপাততঃ, বড়র তরফ্ হইতে এবং ছোটর দিক্ হইতে যে দুইটা শ্রেণী বা series আমরা পাইলাম, সে দুইটাকে আপনারা ভুলিবেন না। ভুলিলে, বেদ ও বিজ্ঞানের বোঝাপড়া চলিবে না। আপনারা যদি বায়না ধরেন যে, এই দণ্ডেই বিজ্ঞানের ঈথার ও বেদের ব্যোমকে মিলাইয়া দিতে হইবে, অথবা বিজ্ঞানের ইলেকট্রণ ও তন্ত্রের শক্তিবিন্দুকে এক করিয়া দিতে হইবে, তবে, অপর যে কেহ সে কাজের ভার লইতে পারেন লউন, আমি অপারগ বলিয়া ইস্তফা দিব। শ্রেণীর (series) কথা এবং পরাকাষ্ঠার (limitএর) কথা পাড়িয়া আমার ব্যাখ্যানটিকে দুর্দ্ধর্ষ করিয়া ফেলিতেছি শুধু এই জন্যই যে, সোজাসুজি, বেদের এইটি, বিজ্ঞানের ঐটি, এই বলিয়া পত্র-পাঠ মিলাইয়া দিতে যাইলে, বড়ই কাঁচা কাজ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। বিজ্ঞানের ঈথার বা কর্‌পাস্‌ল ত নিশ্চিত ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার জিনিষ নহে। এখনই কর্‌পাস্‌ল বা ইলেকট্রণকে লইয়া ভাঙ্গিবার জন্য অনেক বৈজ্ঞানিকের হাত সুড়্‌সুড় করিতেছে। সেদিন জন্‌ষ্টোন্ ষ্টোনি সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। পক্ষান্তরে, লর্ড কেল্‌ভিন ঈথারে সন্দেহ প্রকাশ করিলে চটিতেন; কিন্তু এমন বহু ভদ্র বৈজ্ঞানিক সন্দেহ প্রকাশে ক্রমশঃ উচ্চকণ্ঠ হইতেছেন; এবং তাহার ফলে, লর্ড কেল্‌ভিনের প্রেতাত্মার না হউক, তাঁহার ভ্রাতা স্যার জে, জে টম্‌সনের প্রত্যগাত্মার যে উদ্বেগ জন্মিতেছে, তাহার আর চারা কি আছে বলুন? এ হেন ইলেকট্রণ ও ঈথারের উপর আমার বৈদিক ব্যাখ্যান গড়িয়া তুলিতে আমি একান্ত নারাজ। সেরূপ ব্যাখ্যার ইমারৎ কখনই পাকা হইবে না। সিরিজ ও লিমিট্ ধরিলে আর ভয় নাই। তখন প্রয়োজন-মত নড়চড় করা চলিবে। ঈথার বা ইলেকট্রিসিটিকে "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিব। যাঁর যেরূপ লক্ষণ বা অধিকার, তিনি সেইরূপ ঠাঁই পাইবেন। বিজ্ঞান যেমনটা লক্ষণ বদ্‌লাইবে, আমরাও তেমনটা ঠাঁই বদ্‌লাইয়া দিব। লক্ষ্য বা লিমিট্ কিন্তু ঠিক রাখা চাই। এই সংক্ষিপ্ত সূত্রটি মনে রাখিলে, হালের বিজ্ঞানের ঈথারকে বা ইলেকট্রণকে আমাদের শাস্ত্রের আকাশ বা বিন্দুর 'তটস্থ লক্ষণ' ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিতে আমাদের আর দ্বিধা বোধ হইবে না। স্বরূপ লক্ষণ হয় ত আলাদা। মোটামুটি বোঝাপড়া তটস্থ লক্ষণের দ্বারা চলে ভাল। আমরাও ঈথার, ইলেকট্রণ প্রভৃতির সাহায্যে বোধ হয় বেদের মর্ম্ম রহস্য মোটামুটি বুঝিব ভাল—

অন্ততঃ যায়গায় যায়গায়। এ ব্যাপারে আশা "ফলেন পরিচীয়তে"। অধিক গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন নাই।

এই গেল সংক্ষেপে পূর্ব্বের প্রস্তাবের অনুবৃত্তি। বেদব্যাখ্যায় এইপ্রকার শ্রেণী ও পরাকাষ্ঠার কথা একটা গোড়ার কথা। সকল জিনিষকে ধাপে ধাপে বুঝিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক ধাপে বা অধিকারে দাঁড়াইয়া সেখানকার অভিজ্ঞতার হিসাব পরিমাণ লইতে হইবে। ছান্দোগ্যশ্রুতি এইরূপ ধাপে ধাপে ক্রমশঃ উঠিয়া দেখাকে 'পরোবরীয়ান্' ভাবে দেখা বলিয়াছেন। আগে একদিন সে কথা আমরা শুনাইয়াছি। ছোটকেও এই রীতিতে দেখিতে হইবে, বড়কেও এই রীতিতে দেখিতে হইবে।

বেদ বুঝিতে সুরু করিয়া, আর একটা মস্ত কথা মনে রাখিলে ভাল হয়। অনেকেই মাথায় একটা বদ্ধমূল ধারণা বা মতবাদ (theory) লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে এটা একটা সাধনার প্রবল পরিপন্থী। বৈজ্ঞানিক এই কারণে "মাঝারি মানুষের" দ্বারা পরীক্ষা করাইতে ব্যবস্থা দেন। বৈদিক আলোচনা-কালেও আমাদিগকে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিকের এই ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইবে। অনেক দিন বিলাতী পণ্ডিতদের মাথায় একটি থিওরি ছিল যে, মধ্য আসিয়ায় বা ঐ রকম কোন একটা যায়গায় প্রাচীন আর্য্যজাতি সরল কৃষক হইয়া বাস করিতেন। তারপর দলে-দলে ভাগ হইয়া এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। একদল পঞ্চনদের দেশে আসিয়া পড়েন। ক্রমে অনার্য্য দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত আপনাদের দখলে আনিয়াছেন; এবং সেখানে আপনাদের সভ্যতা ক্রমে-ক্রমে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ঋগ্বেদ তাঁহাদের সভ্যতার কৈশোরাবস্থার পরিচয়। ঋগ্বেদের মন্ত্র-গুলিতে স্থানে-স্থানে যথেষ্ট কবিত্ব আছে; প্রাকৃতিক তথ্যের একটু-আধটু অভিজ্ঞতাও সেগুলির মধ্যে সরল ভাবে অথবা রূপকচ্ছলে বিকশিত দেখিতে পাই। বিশ্বমানবের আত্মার ক্রমোন্নতির একটা অধস্তন ধাপ আমরা সে সকলের মধ্যে স্পষ্টতঃ খুঁজিয়া পাই। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই; আর বেশী প্রত্যাশা করিতে যাইলে আমাদের অন্যায় হইবে। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এই বুলি আমাদের শিখাইতেন; এবং এই বুলি আওড়াইতে আমাদের চিরচঞ্চলা রসনা কখনও আড়ষ্ট হয় নাই। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা তাঁহাদের 'Mid Asiatic theory ক্রমশঃ ছাড়িতে বসিয়াছেন; কিন্তু বেদের সূর্য্য যেমন ঊষার ত্রিংশৎ যোজন পিছু হাঁটিয়া থাকেন, আমরাও সেইরূপ পশ্চিমদেশের ভাব ও চিন্তাগুলির বহু যোজন পিছনে হাঁটিয়া থাকি। সে দেশে যে মতটা হেয় হইবার মতন হইল, আমাদের কাছে হয় ত সে মতটা তখন উপাদেয় হইতে সুরু করিল। এখন শুধু তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানের (Comparative Philology) মসলায় মানবের প্রাচীন ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষগুলি জোড়াতাড়া দিবার প্রয়াস হয় না। এন্থ্রপলজি নামে একটা বিশাল বিদ্যারই সৃষ্টি হইয়াছে কিছু দিন হইতে—এবং এই বিদ্যায় রপ্ত না হইলে কেহ প্রাচীন ইতিহাসের পুনঃ-সংস্কার কার্য্যে হাত দিতে আজকাল ভরসা পায় না। যাহা হউক, আর্য্যদের আদিম গৃহস্থালীর চৌহদ্দি লইয়া এখন গোল পাকাইয়া উঠিলেও, তাঁহাদের পুরাতন সভ্যতাটিকে এখনও কিন্তু বিশ্বমানবের পাঠশালায় হাতে শিশুশিক্ষা দিয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছে। জীবন্মুক্ত জড়ভরত কথা বড়-একটা কহিতেন না, একদিন রাজা রহূগণ তাঁহাকে অন্ত্যজ ভাবিয়া আপনার পাল্‌কি বহাইতে লাগাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীনা বেদবিদ্যা কথা কহিতে ত আসেন নাই; এবং তাঁহার বাণী এখনও বীণার স্বরলহরীর মত কত না ধীরোদাত্ত ছন্দে ঝঙ্কারিত! কিন্তু বেদমাতা সরস্বতীর স্তন্য-সুধার আস্বাদ ভুলিয়া গিয়া আমরা, আর্য্য-সন্তান, ভুলিয়া গিয়াছি সে বাণীর সঙ্কেত, অভিপ্রায় ও তাৎপর্য্য। তাই শ্রুতি শুনিয়াও কই বুঝি না;—যেটুকু বুঝি, সেটুকু মনে হয়, মানবাত্মার শৈশবেরই সরল সঙ্গীত—সুন্দর, কিন্তু ভাব ও ভাষা ও ছন্দ এখনও পুষ্টাঙ্গ ও সবল হয় নাই।

এই ত আমরা সাহেবের হুকুম পাইয়া, অসম্যক্-পরিচিত বেদকে, জড়ভরতের মত বারাণসী নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থান হইতে টানিয়া আনিয়া, আমাদের খেয়ালের পাল্‌কি বহাইতে যুড়িয়া দিয়াছি। বেশ করিয়াছি। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তিনি যে ঠিক আমার খেয়াল-মত পা ফেলিয়া চলিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ। সরল কৃষকের কবিত্বপূর্ণ গান বলিয়া বেশ দশ-বিশ বছর বেদের ব্যাখ্যা চলিতেছিল; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই বিজ্ঞান আমাদের ধারণা-গুলির যে নূতন গড়ন দিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে আমি বেদের ঘাড়ে চাপিয়া আমার থিওরির পাল্‌কি হাঁকাইব কি,

আমাকে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নামিয়া সেই অনাদৃত, উপেক্ষিত প্রাচীনের পদতলে লুটাইয়া পড়িতে হইতেছে; এবং আমার নিখিল জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্য দিয়া তাঁহারই বরণীয় বপু জগতের মুগ্ধ দৃষ্টির সাম্‌নে তুলিয়া ধরিতে আকাঙ্ক্ষা হইতেছে!

বেদে কবিত্ব আছে, রূপক আছে, প্রতীক আছে—কিন্তু বেদ মানব-শিশুর শৈশবের গান নহে। মানব-শিশুর শৈশব অতীতের কোন্ বিলুপ্ত পরিচ্ছেদের সঙ্গে ভূস্তরে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা কে নিরূপণ করিবে? ইজিপ্টের ইতিহাস, ব্যাবিলন আসিরিয়ার ইতিহাস যতটুকু খাঁটি করিয়া জানিতে পারিতেছি, তাহাতেই দশ-বার হাজার বছর পূর্ব্বেকার সভ্যতার চেহারা দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকে না। সে সভ্যতায় প্রবীণতার লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখা দিয়াছে—কত না দীর্ঘায়ত অতীতের পুঞ্জীকৃত অভিজ্ঞতা তাহার পশ্চাতে জাগিয়া রহিয়াছে! যে সভ্যতা পিরামিড্ গড়িয়া তাহার মধ্যে মমি প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়াছিল, সে সভ্যতার দৃষ্টি অধ্যাত্ম-রাজ্যে যতটা প্রসারিত ছিল, জড়ের মর্ম্ম-স্থলেও ততটা প্রবেশ করিয়াছিল; এবং সে দৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা ভাবিয়া দেখিলে হালের বিজ্ঞান-বিদ্যাকেও কতকটা তুলনায় কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করিতে হইবে না কি! আমি আজ ইতিহাস শুনাইতে বসি নাই; তবে স্মরণ রাখিবেন যে, মানব-সমাজের শৈশব, কৈশোর, যৌবন প্রভৃতি দশার কথা অতি সাবধানেই আমাদের কহা উচিত। বহুদূর হইতে দেখিলে হিমাচলকে একটানা একটা প্রাচীরের মত দেখায়; মনে হয় না যে, সেই শ্বেতশীর্ষ প্রাচীরের বিস্তার শত যোজন—কত দিনের চড়াই-উৎড়াই ভাঙ্গিয়া তীর্থ-যাত্রীকে সেই প্রাচীরের মধ্যেই গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, বদরিকাশ্রম, বদরী-নারায়ণ দেখিতে যাইতে হয়! দূরত্ব জিনিষগুলির পরস্পরের ব্যবধান দূর করিয়া দেয়—দেশেও যেরূপ, কালেও সেইরূপ। এখন তাই ঋগ্‌বেদ-সংহিতার মন্ত্রগুলি শুনিয়া মনে ভাবি, মানব-শিশু প্রথম যেন ঊষা দেখিয়া, অরুণোদয় দেখিয়া, বিদ্যুৎ-বিকাশ ও বৃষ্টিপাত ও ঝঞ্ঝাবাত দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে; তাহাদের কারণ কিছু ঠিক না পাইয়া, তাহাদের পিছনে নানা রকমের দেবতা কল্পনা করিতেছে; দেবতা-দিগকে রথে বসাইতেছে; রথে পাঁচ-সাতটা ঘোড়া যুতিয়া দিতেছে; তাঁহাদিগকে সোমরসের বখ্‌রা দিতে চাহিতেছে; তাঁহাদের উদ্দেশে আগুনে ঘি ঢালিতেছে; এবং নানা রকমে তাঁহাদিগকে খোসমেজাজে ও বাহাল তবিয়তে রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইতেছে। ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের animism, spiritism, magic প্রভৃতি। বেশ চটক্‌দার ব্যাখ্যা। তাঁহাদের দেওয়া বেদের বয়ঃক্রম স্বীকার করিয়া লইলেও, দেখিতে পাই না কি, তাহার পূর্ব্বে কত লক্ষ বৎসর মানব প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত, বর্দ্ধিত হইয়াছে,—কত কোটি-কোটিবার ঊষা, অরুণোদয়, বিদ্যুৎ দেখিয়াছে। এমন কি, অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত ভাবে সমাজবদ্ধ জীবনও তার কত সহস্র-সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। বেদের ঋষিগণকে দুগ্ধপোষ্য শিশু মনে করিবার কি কারণ, তা ত খুঁজিয়া পাই না। আমি যে আস্‌বাব, অনুষ্ঠানগুলিকে সভ্যতার অঙ্গ ও লক্ষণ বলিতেছি, সেইগুলিই যে মানবাত্মার প্রবীণতা সূচিত করে,—সেইগুলি বর্ত্তমান থাকিলেই সভ্যতা পূর্ণাঙ্গ, আর তাদের অল্পতা থাকিলেই সভ্যতা অপরিণত—এ কথাটা ভাবিতেছি কোন্ আইন-প্রমাণের বলে? দেবতা মানা সভ্যতা, না, না মানা সভ্যতা? যজ্ঞে মন্ত্র পড়িয়া ঘি ঢালা সভ্যতা, না, ও-সব পাঠ উঠাইয়া দেওয়াই সভ্যতা? সভ্যতারও অভ্যুদয়ের যত দিন না একটা মাপকাটি ঠিক করিতে পারিতেছি, তত দিন, কে আগে কে পিছে, কে বড় কে ছোট, কে গুরু কে লঘু, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে নিরূপণ করার উপায় দেখিতেছি না। তুমি পশ্চিমের পাণ্ডা—নিজের তীর্থটাই মহাতীর্থ ভাবিয়া বসিয়া আছ। তোমার নিজের বর্ত্তমান সভ্যতাটাকেই সকলের সেরা মনে করিতেছ, এবং তাহারই আদর্শে আর সব প্রাচীন অর্ব্বাচীন সভ্যতার হিসাব লইতে পণ করিয়া বসিয়াছ। কিন্তু তোমার অন্ধ স্তাবক ছাড়া আর কে বিনা বিচারে তোমার আদর্শটাকেই মাথায় তুলিয়া লইবে? মানব-সমাজের সুখ মোটের উপর বাড়িল কি কমিল, ইহাই দেখিয়া সভ্যতার উপচয় বা অপচয় স্থির করিব কি? তাহা হইলে বর্ত্তমান সভ্যতারই প্রাধান্য অত বড় গলা করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলা চলে না। অধ্যাপক হক্সলির মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বলিতে গেলে—হালের অপরা-বিদ্যা যতই আস্ফালন করিয়া বেড়াক না কেন, এবং তাহার ইন্দ্রজাল দেখিয়া আমরা যতই বিস্ফারিতাস্য হইয়া থাকি না কেন, Human Prometheusএর হৃৎপিণ্ড যে দুঃখরূপ সনাতন শ্যেনপক্ষী

ছিঁড়িয়া খাইতেছে, তাহাকে আমাদের অপরা-বিদ্যা তাড়াইয়া দিতে পারে নাই। বরং বেদের সেই সর্ব্বভুক অহি বা বৃত্রের মতন তাহার বুভুক্ষাকে উত্তরোত্তর আরও প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি বা কল্যাণ-বুদ্ধি ক্রমশঃ বাড়িতেছে; কাজেই, আমরা ক্রমেই সভ্য হইতেছি,—এ কথা শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব, তাহার ঠিক পাইতেছি না; বিশেষতঃ, সম্প্রতি পৃথিবীব্যাপী যে কুরুক্ষেত্র হইয়া গেল, এবং আবার কাঁচিয়া হইবার উপক্রম করিতেছে, তাহার নির্ম্মিত রক্তনদীগুলির পানে চাহিয়া। মানবের সমাজ-ব্যবস্থার জটিলতা বাড়িলেই সমাজ উন্নত হইল,—হর্ব্বার্ট স্পেন্সারের এ বুলিং আমরা অক্লেশে গলাধঃকরণ করিতে পারিলাম না। জটিলতা ক্রমশঃ গোলোকধাঁধার মত এতই ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে যে, মানবাত্মার প্রকৃত কল্যাণের দিকে চাহিয়া আমাদের সত্যসত্যই মনে হইতেছে—চলিবার একটা সোজাসুজি পথ হইলেই বেশ ভাল হইত। ইয়োরোপ ত তাঁহার কুরুক্ষেত্রটাকে কোন রকমে একটা সন্ধির গোঁজামিল দিয়া ধামাচাপা দিতেছেন; কিন্তু, শুধু তাঁহার নহে,—বিশ্ব-সমাজের মর্ম্মস্থলে আজ যে বল্‌শেভিজমের রুদ্র-তাণ্ডবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, সেই বল্‌শেভিজমের রক্ত-বাহিনী, মানবাত্মার বক্ষের উপর হইতে পাষাণ-চাপের মত এই স্তূপীকৃত জটিল ব্যবস্থার বোঝা সরাইয়া দিয়া, তাহাকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ও তাহার সমাজকে অপেক্ষাকৃত সরল না করিয়া ছাড়িবে কি? শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায় বলা যায় না। তবে মানুষকে আবার "back to the cottage; back to the field" না করিয়া বোধ হয় রুদ্রদেব তাঁহার সংহার-লীলার উপসংহার করিবেন না। অতএব চলিবার পথ সোজা হইলেই ভাল, কি বাঁকা হইলেই ভাল, তাহা সহসা বলিতে যাওয়া চলে না। বেদের মানব-সমাজ অপেক্ষাকৃত সরল বলিয়াই তাহাকে শিশু মনে করিতে হইবে, এবং বর্ত্তমান মানব-সমাজ জটিল বলিয়া তাহাকে প্রবীণ ভাবিতে হইবে,—এ সমাজনীতি আমরা এখনই মানিয়া লইব না। যদি বলি যে, জ্ঞানের বিকাশের হিসাব লইয়া সভ্যতার উন্নতির হিসাব লইব, তাহা হইলেও মুস্কিল বাধে;—জ্ঞান কি, এবং তাহার বিকাশ কি? জ্ঞাতব্য বিষয় ত অনন্ত; এবং সে সকলের যথার্থ জ্ঞানও নানান্ থাকের হইতে পারে। এ মহাসিন্ধুর কোন্‌খানটাতে ডুব দিতে পারিলে, হীরা-মাণিক-মুক্তায় গিয়া হাত দিব,—এমন বিদ্যাকে লাভ করিব যে, তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া, মাতার স্তন-যুগল হইতে ক্ষরিত অমৃত ধারা-দ্বয়ের মত শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ই নিশ্চিন্ত ভাবে পান করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইব? পশ্চিমের বিদ্যা ত শিখাইতেছে অনেক কথা; কিন্তু এত কথার মধ্যে খাঁটি কথা, কেজো কথা—যাহাতে আমার চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, এমন কথা—কতখানি, তাহা নিঃসংশয় রূপে যাচাই করিয়া লইব কোন্ কষ্টি-পাথরে বলুন ত? শুধু বিদ্যার আয়তন দেখিয়াই তাহাকে বরণ করিয়া লইব না,—তার রূপগুণের একটা পরিচয় লইব—ইহার উত্তর সহসা কি দিব, তাহা ত ভাবিয়া পাই না। তাই বলিতেছিলাম, বেদের মধ্যে যে সভ্যতার মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই, তাহাকে মানবাত্মার বালগোপালমূর্ত্তি ভাবিতেই হইবে,—তার কথাবার্ত্তাগুলিকে অমৃতং বাল ভাষিতং" বলিয়া কৌতুক-মিশ্রিত হাস্যের সহিত শুনিতেই হইবে। আমাদের কোলে-কাঁধে উঠিবার বায়না ধরিয়া দিলে, তাহাকে দুটো "গোবিন্দ নাড়ু" দিয়া ভুলাইয়া রাখিতেই হইবে—বর্ণুফ, মক্ষমূলার, বেবর, রোজেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিতদের ফরমাস-মত এমন কাজ আমি ত করিতে নারাজ; আপনারা যিনি পারেন করিবেন। আসল কথা, সমগ্র বৈদিক গবেষণার মূলে গলদ রহিয়াছে; এবং থাকিয়া তাহাকে প্রায় "গলদ্ গোময়"ই করিয়া ফেলিয়াছে। গোড়া হইতেই মাথায় থিওরি করিলাম—ঋগ্‌বেদ-সংহিতা মানব-সমাজের অংশবিশেষের শৈশবের অভিব্যক্তি ও ইতিহাস। শিশুর মুখে বড় কথা কেহ শুনিতে চায় না,—শুনিলে সেটাকে লোকে বলে জ্যাঠামি। বেদ-সংহিতার মুখে জ্যাঠামি শুনিলেও আমরা চটিয়া যাই। স্থানে-স্থানে হাল বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির আভাস বেদের মধ্যে পাইলে, অথবা গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় সেখানে পাইলে, আমরা কিছু বিব্রত হইয়া পড়ি। হয় সেগুলার একটা "সরল" ব্যাখ্যা আমরা আবিষ্কার করিয়া ফেলি, নয় সেগুলাকে পরবর্ত্তী যুগের প্রক্ষিপ্ত মনে করি। এরূপ না করিতে পারিলে আমাদের স্বস্তি-বোধ নাই। কেন না, যেন তেন প্রকারেণ আমাদের বেদমাতাকে যে শিশুর পরিচ্ছদ পরাইয়া রাখিতেই হইবে। সে পরিচ্ছদ পরিয়া মায়ের আমার দম্ আট্‌কাইয়া আসিলে কি হইবে;—পশ্চিমদেশ হইতে ওস্তাদজীর আদেশ পাইয়াছি, সে আদেশ ত প্রাণ থাকিতে

ঠেলা যায় না! যত দিন ঐ পশ্চিমের থিওরি ভূতের মত আমাদের মাথায় চাপিয়া বসিয়া আছে, তত দিন "সরল ব্যাখ্যা"র মোহ আমাদের কাটিবে না। শিশু ভাবিতে গেলে তাকে 'সরল ধারাপাত"ই দেওয়া স্বাভাবিক; নিউটনের প্রিন্‌সিপিয়া অথবা আইন্‌ষ্টাইন্ মিঙ্কব্‌স্কির Four Dimensional calculus শিশুর হাতে তুলিয়া দিতে মতি হয় না। কিন্তু সত্যসত্যই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়—আমাদের বেদ কি শিশু? বেদের মন্ত্রগুলি কি আদিম আর্য্যগণের সরল, সুন্দর সঙ্গীত? উনবিংশ শতাব্দীতে একটা ভয়াবহ দম্ভ আসিয়া পৃথিবীর এই পক্ষবিহীন দ্বিপদগুলিকে "সবজান্তা পুরুষ" বানাইয়া দিয়াছিল; তাহারা নিজের অভিজ্ঞতাটাকেই সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিত; সুতরাং তাহাদের দৃষ্টিতে বেদের ঋষিরা সরল কৃষক ও পশুপালক বই আর কিছু ছিলেন না। কিন্তু এখন মানবের ভাগ্যবিধাতা পৃথিবীর উপর যে নব আলোক ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিতেছেন, তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীর সে আত্মগরিমা বড়ই খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে; নিজেদের অভিজ্ঞতাকে লইয়া গোঁড়ামি পশ্চিমদেশে ক্রমেই কমিতেছে; এমন কি যেমনটা লক্ষণ দেখিতেছি—কোন্ দিন হয় ত নবীন নিজের ঔদ্ধত্যে লজ্জিত হইয়া, নিজেই শিশু হইয়া, সনাতনী বেদমাতার চির-মঙ্গল অঙ্কের অভিমুখেই হাত বাড়াইয়া চলিবে। বলিবে—ওগো গরীয়সি! আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাধন, সম্পদ্ সকলই তোমার পদতলে ছড়াইয়া দিলাম,—তুমি আমায় দেখাইয়া দেও, কাহার কতটুকু দাম ও কদর। যাহা হউক, ভবিষ্যদ্-বাণী করিতে আমি আসরে দাঁড়াই নাই। ফল কথা, বেদ শিশু—ইহা সরাসরি সাব্যস্ত করিয়া লইয়া আমাদের বেদ-ব্যাখ্যানে হাত দিলে চলিবে না। ও থিওরি বাতিল করিয়া দিতে হইবে। পক্ষান্তরে, যে জিনিষটাকে আমরা বেদ বলিয়া দেখিতেছি, শুনিতেছি ও বুঝিতেছি, সে জিনিষটা যে সর্ব্বজ্ঞতার আধার, এমন প্রতিজ্ঞাও আমরা করিয়া বসি নাই। গোড়াতেই বেদ সম্বন্ধেও একটা শ্রেণী বা সিরিজ আমরা ভাবিয়া লইয়াছিলাম। পরমেশ্বরের জ্ঞানে যে বেদ, অথবা পরমেশ্বরের জ্ঞানই যে বেদ, তাহাই পূর্ণ ও চরম বেদ—বেদ ইন্ দি লিমিট্। তাহার নীচে নানান্ থাকের বেদ নানা শাখায় নামিয়া আসিয়াছে। যিনি ইহার যতটুকু দেখিয়াছেন ও যতটুকুর খবর রাখেন, তাঁহার কাছে ততটুকুই বেদ। সে খণ্ডিত বেদকে সর্ব্বজ্ঞতার আধার ভাবিলে এমন সর্ব্বনেশে গোঁড়ামি দেখান হইবে, যে গোঁড়ামির গোড়া আমাদের বেদে-পুরাণে বা দর্শন-মীমাংসায় মিলিবে না। অতএব বলি, এ থিওরি লইয়াও বেদ ঘাঁটিতে গেলে বিড়ম্বনা ও মনস্তাপ। আস্তিক্য অন্ধ হইলে, সে অনেক সময় নাস্তিক্যের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া, তাহারই সঙ্গে "মোহগর্ত্তে" নিপতিত হইয়া মরে।

পল্লী-প্রান্তে

[শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

কতদিন চলিয়াছি পল্লী এই পথে—কে জানে?
যবে যাই এই পথে কত স্মৃতি থাকে সাথে,
সেই হেতু ফিরে চাই দূর পল্লী-পানে!
হাসিতেছে দিনমণি বহিছে মলয়,
কুলু কুলু কুলু তানে তটিনী সাগর পানে
চলিয়াছে ধীরে ধীরে, বিমল হৃদয়।

কত গৃহ, কত মুখ পড়িতেছে মনে—
পরিশ্রান্ত কলেবর স্নেহে, প্রেমে জরজর
কত স্মৃতি, কত ব্যথা জাগে যে পরাণে।
কি এ প্রহেলিকা প্রভু'—জীবনের পথে
ভুলাও বিশ্বের কথা, ভুলাও প্রেমের ব্যথা-
জীবনের পথে মম চল সাথে-সাথে।

নিখিল প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১। সহরের সৌষ্ঠব

য়ুরোপের সহরবাসীরা তাদের নিজেদের সহরগুলিকে সুন্দর ক'রে তোলবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। কিসে দেশ-বিদেশের পর্য্যটকদের চোখে তাদের সহরটি সবচেয়ে ভাল থাকে। কলা-সৌন্দর্য্যের আতিশয্যে নগরের প্রাকৃতিক শোভাকে তারা ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে না। তা ছাড়া, আলো, বাতাস আর পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত ক'রে, তারা সহরের স্বাস্থ্যও যাতে ভাল থাকে—সেদিকেও মনোযোগ

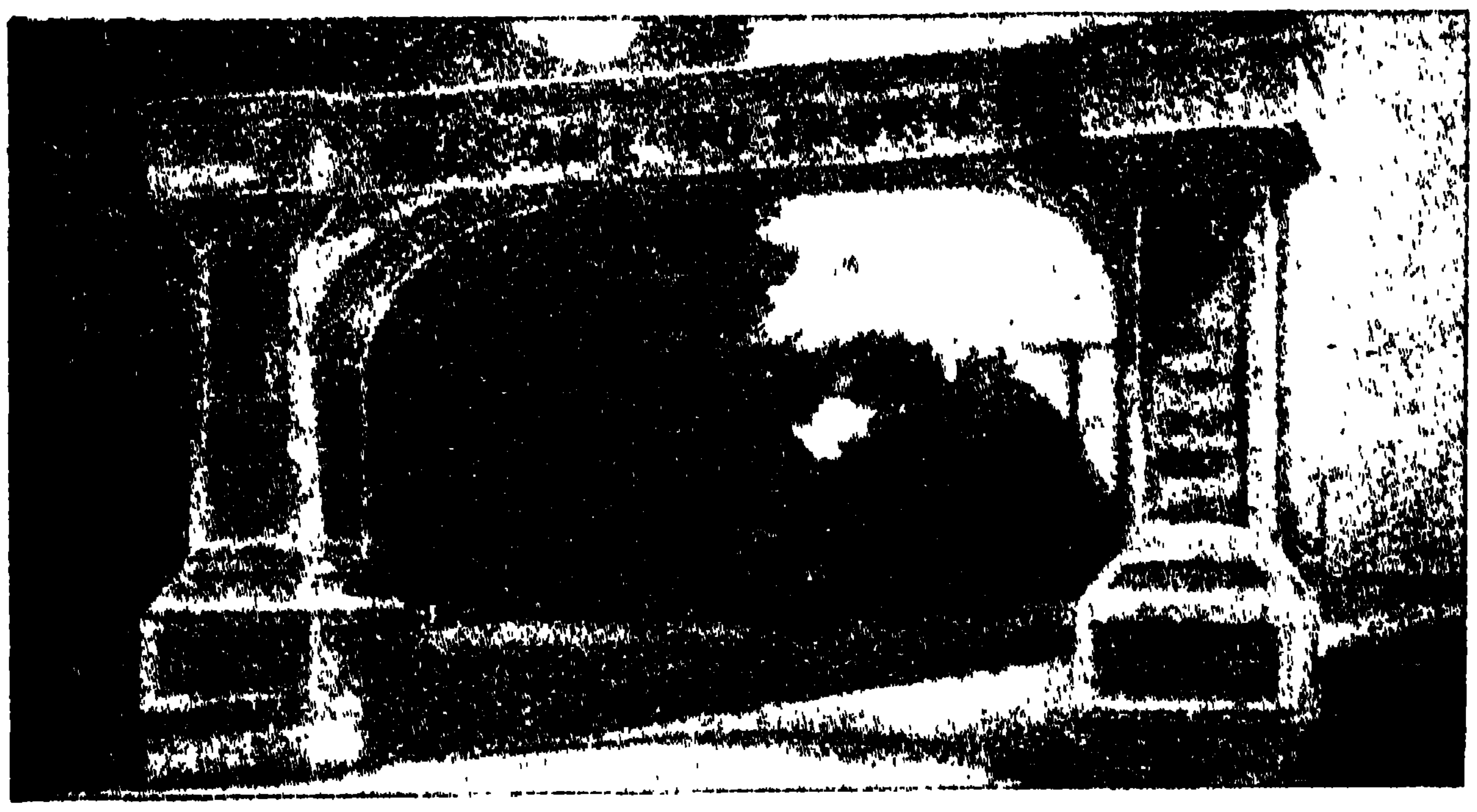

ঈপস্‌উইচের তোরণদ্বার

রক্ত-দারু গাছের গুঁড়ি

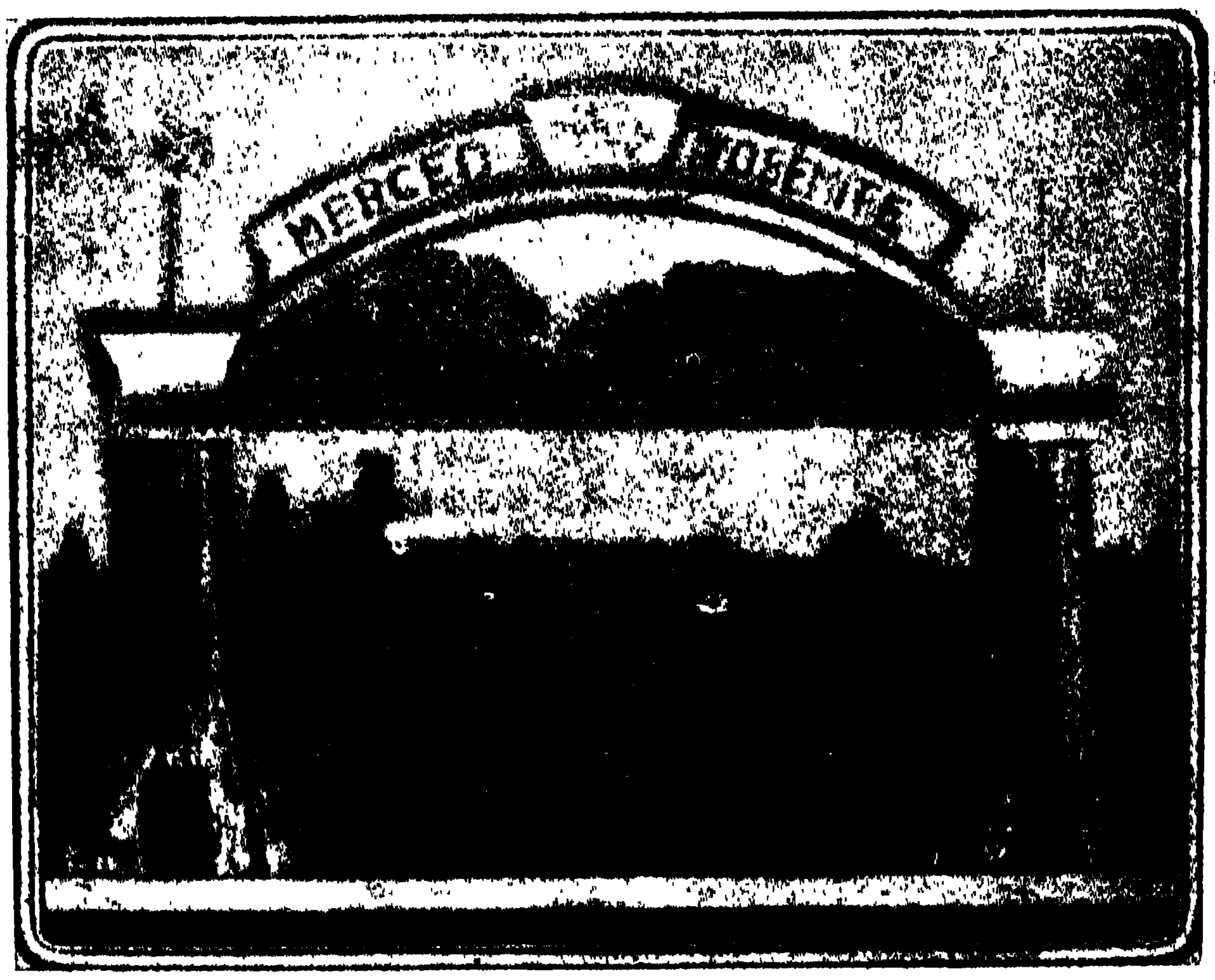

মার্সেড্‌ সহরের ফটক

দেখায়, এই দিকে যেমন তাদের সকলের বিশেষ লক্ষ্য, তেমনি কিসে নাগরিকদের সুখ ও সুবিধে বাড়ে, পথিকদের পথশ্রম দূর হয়, সহরটি কি উপায়ে সহজে সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে পারা যায়, সেদিকেও তাদের প্রখর দৃষ্টি দেয়। আমেরিকা এই কাজে এখন সকলের অগ্রগণ্য হ'য়ে উঠেছে।

আমেরিকার দক্ষিণ ডাকোটা প্রদেশে ঈপ্‌সউইচ নামে যে সহরটি আছে, তারই প্রবেশ-পথে একটি প্রকাণ্ড তোরণ-

ন্দর নির্ম্মাণ করা আছে। এই তোরণ-দ্বার অতিক্রম করে পথিকেরা ঈপ্সউইচ সহরের যে পথে এসে পড়ে, সে রাস্তাটির নাম হ'চ্ছে "পোখরাজ বর্ত্ম"। এই পথটিতে আগা-গোড়া হলদে পাথর বসানো আছে বলে, এর এই নাম দেওয়া হয়েছে। তোরণ-দ্বারের শীর্ষদেশে লেখা আছে, 'স্বাগতম্'—'ঈপ্সউইচে আসতে আজ্ঞা হোক্!' ফটকের দু'পাশের স্তম্ভগাত্রে লেখা আছে, ঈপ্সউইচের কাছাকাছি আর কোন্-কোন্ সহর আছে,—সে সহরগুলি কত দূরে,—তাদের চওড়া। থামের গোড়ায় চার ফিট ক'রে এক-একটা দরজা কাটা আছে। এই সহরটি য়োশেমাইৎ উপত্যকার নীচের ব'লে, তোরণ-শীর্ষে য়োশেমাইৎ উপত্যকার (Yosemite valley) একটি রঙীণ চিত্র উৎকীর্ণ করা আছে। রাত্রে ফটকের উপর যে বিজলী-বাতি জ্বলে, সেটি এমন কায়দায় তৈরি যে, তাই থেকে উষার প্রথম অরুণোদয়ের রক্ত রশ্মি থেকে আরম্ভ ক'রে—ক্রমে গোধূলির স্বর্ণ আভাটুকু পর্য্যন্ত উক্ত উপত্যকায় উৎকীর্ণ চিত্রের উপর প্রতিফলিত হ'য়ে,

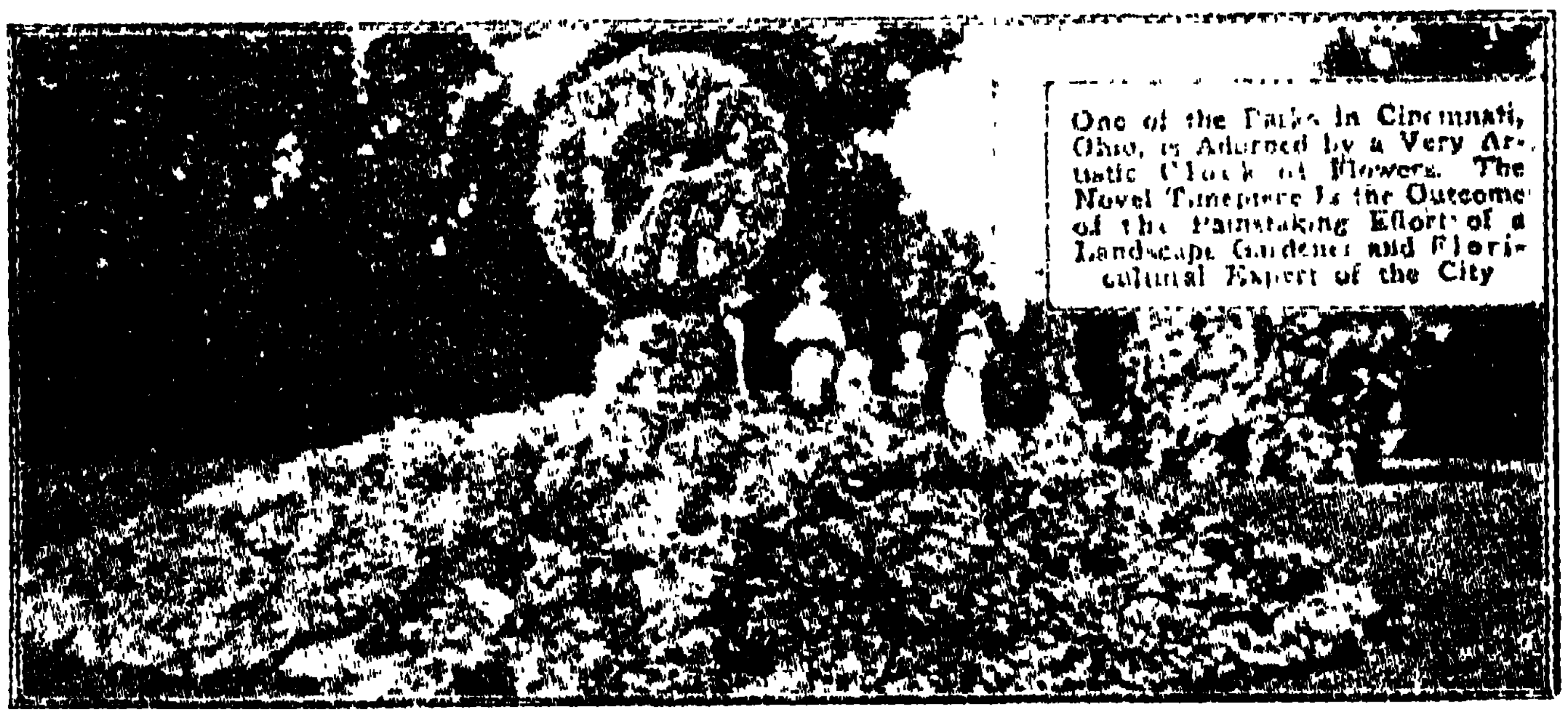

ফুলগাছের ঘড়ী

কাপড়ছাড়া ঘর

ফুলের ছাতা

বিশেষত্ব কি,—আর কোন্-কোন্ পথ দিয়ে গেলে সেখানে সত্বর পৌঁছাতে পারা যায়।

কালিফোর্ণীয়ার মার্সেড সহরেও এই রকমের একটি তোরণ-দ্বার আছে। এই তোরণ-দ্বারের দু'পাশের স্তম্ভ দু'টি শেকোইয়া বৃক্ষের (Sequoia Tree) অনুকরণে নির্ম্মাণ করা হ'য়েছে। শেকোইয়া গাছ এই অঞ্চলের একটা বিশেষত্ব ব'লে, সহরবাসীরা ফটকের দু'পাশের থাম-দু'টি এই গাছেরই কৃত্রিম ছাঁচে গড়িয়ে দিয়েছে। থাম-দু'টি চৌদ্দ ফিট তার-ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিচিত্র শোভা ক্রমান্বয়ে পরিস্ফুট ক'রে তুলবে। তোরণ-চূড়ায় লেখা আছে, 'দ্বারিক নগর' (The Portal City)। চূড়ার দু'পাশে লেখা আছে, 'মার্সেড ও 'য়োশেমাইৎ'।

সহরের ভিতরে বিদেশীদের জন্য যে সব অতিথিশালা বা হোটেল আছে, সেগুলি এমন সুন্দর ভাবে তৈরি যে, দেখ্‌লে ঠিক দেবমন্দির ব'লে মনে হয়। সরকারী আফিস-আদালত-গুলো পর্য্যন্ত এমন সুগঠিত ও সুদৃশ্য যে, তাদের সমাবেশে

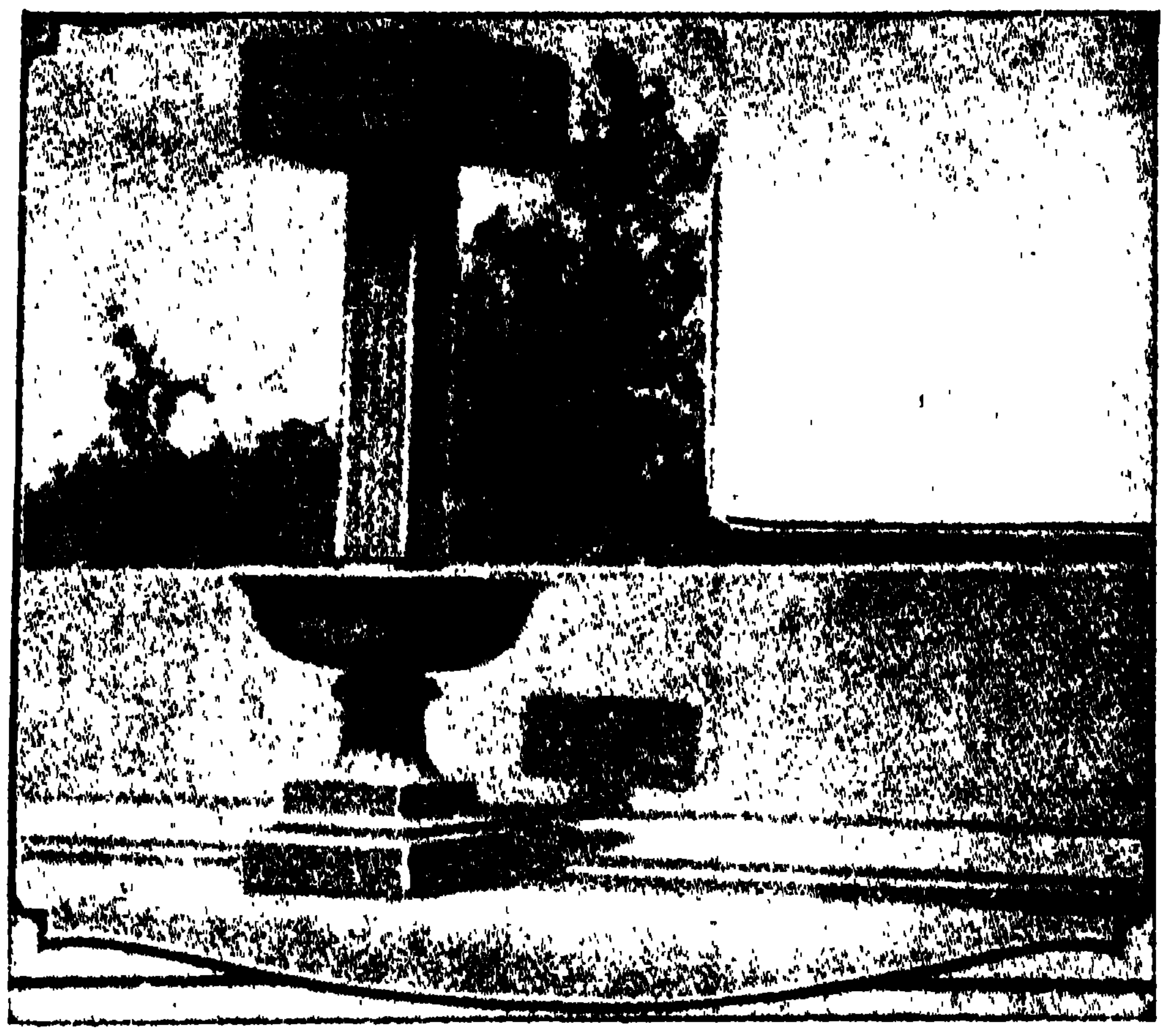

ঘোড়া বা গরুর জলপানের ফোয়ারা (বিপদের নিশানা সংযুক্ত)

ট্যাক্সী-ডাকা কল

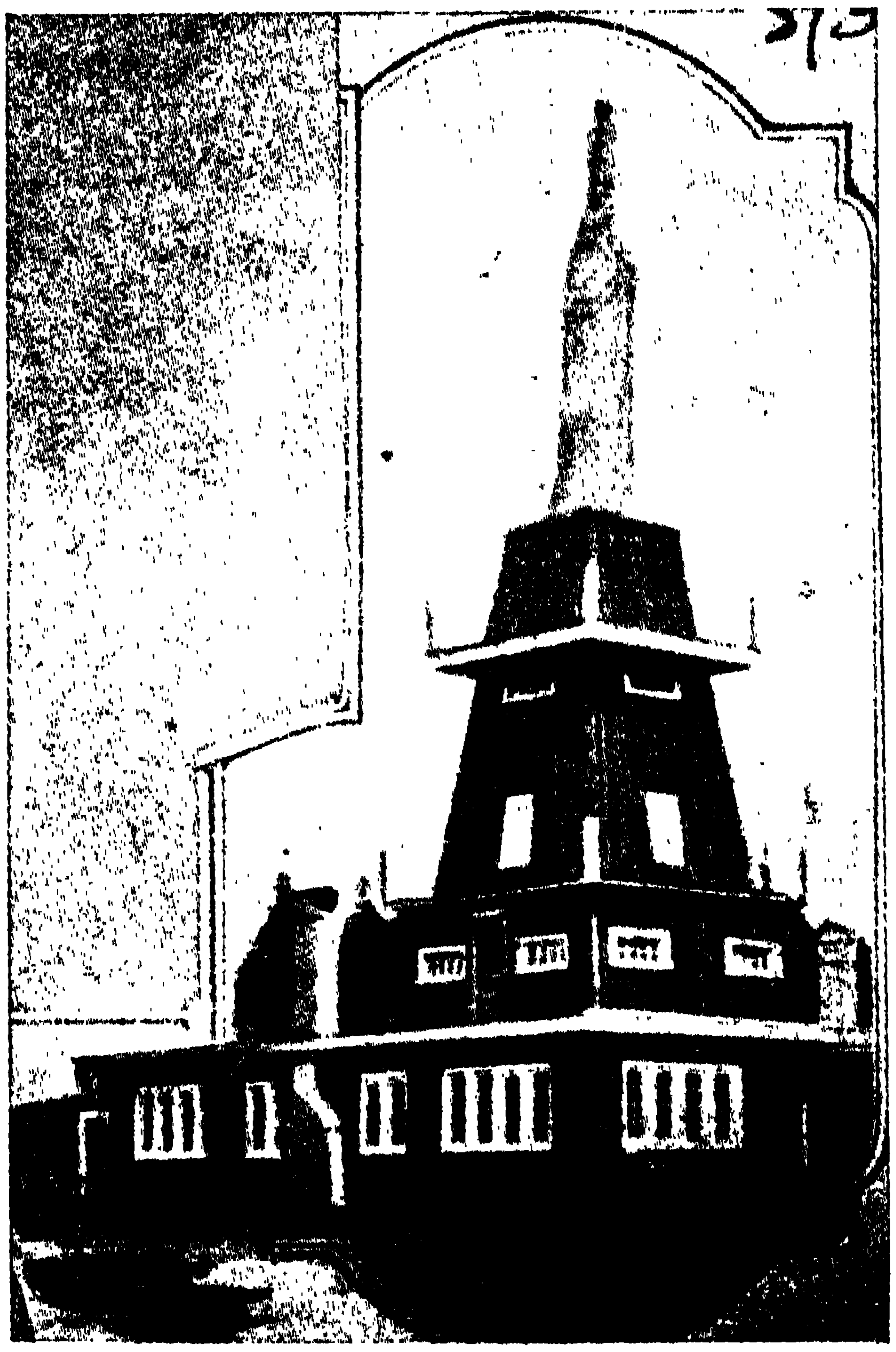

অতিথিশালা

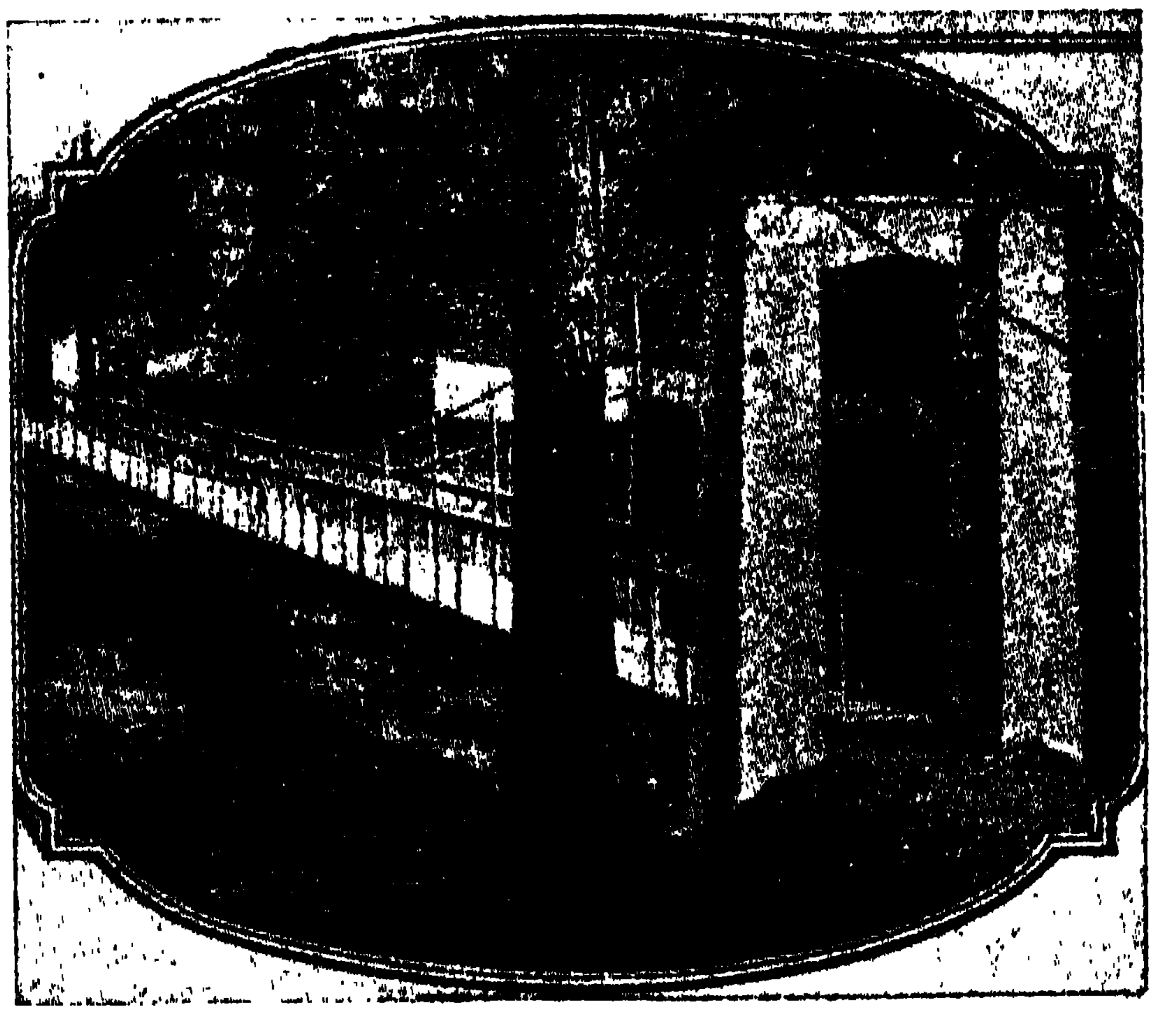

ছোট পোল

সহরের শোভা শতগুণ বেড়ে গেছে। প্রত্যেক সহরেই সাধারণের ব্যবহারের জন্য কোম্পানীর বাগান আছে। এই বাগানগুলি এমন পরিপাটি ক'রে সাজানো যে, ইন্দ্রের নন্দন-কানন বলে মনে হবে। কোথাও ফুলের ঘড়ী, কোথাও ফুলের ছাতি ফুটে রয়েছে দেখে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। বাগানে-বাগানে প্রতিদিন বিকেলে সুমধুর বাজ্না বেজে উঠে উদ্যানচারীদের মুগ্ধ ক'রে তোলে। এই বাজনা বাজাবার জন্য প্রত্যেক বাগানেই রকমারী 'বাজা-খানা' (Band-stand) তৈয়ের করা আছে। সেগুলির বেশ চোখ-জুড়ানো চেহারা! পাখীরা গাছে বাসা বেঁধে পাছে গাছ নোংরা

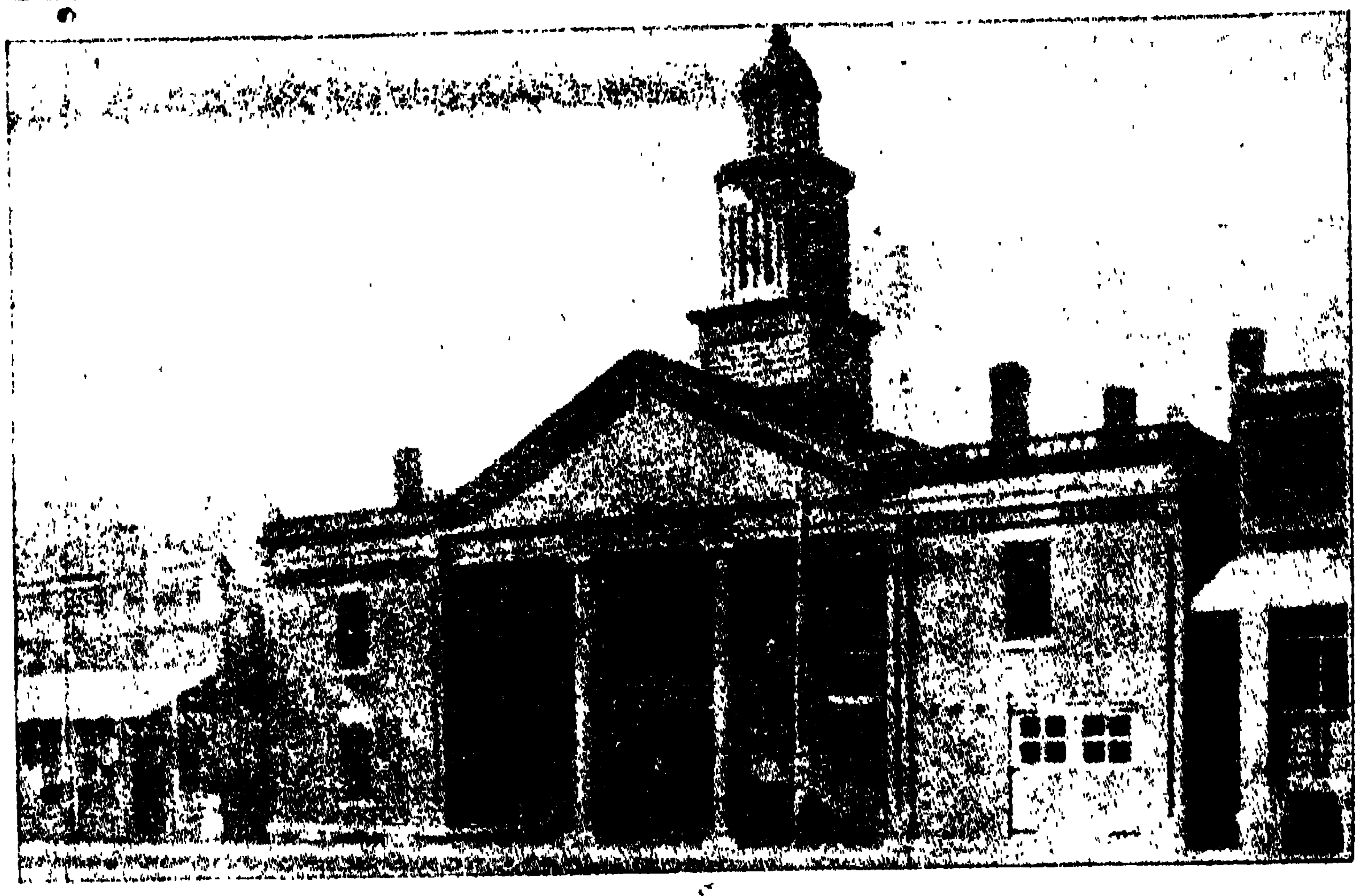

আদালত

রাজপথে জলস্রোত

পথে বিশ্রাম, স্নান ও রন্ধনাদির স্থান

পুলিশ কর্ত্তৃক গাড়ীর গতিবিধি নির্দ্দেশ

গলির মোড়ে আয়না আঁটা বিপদের নিশান।

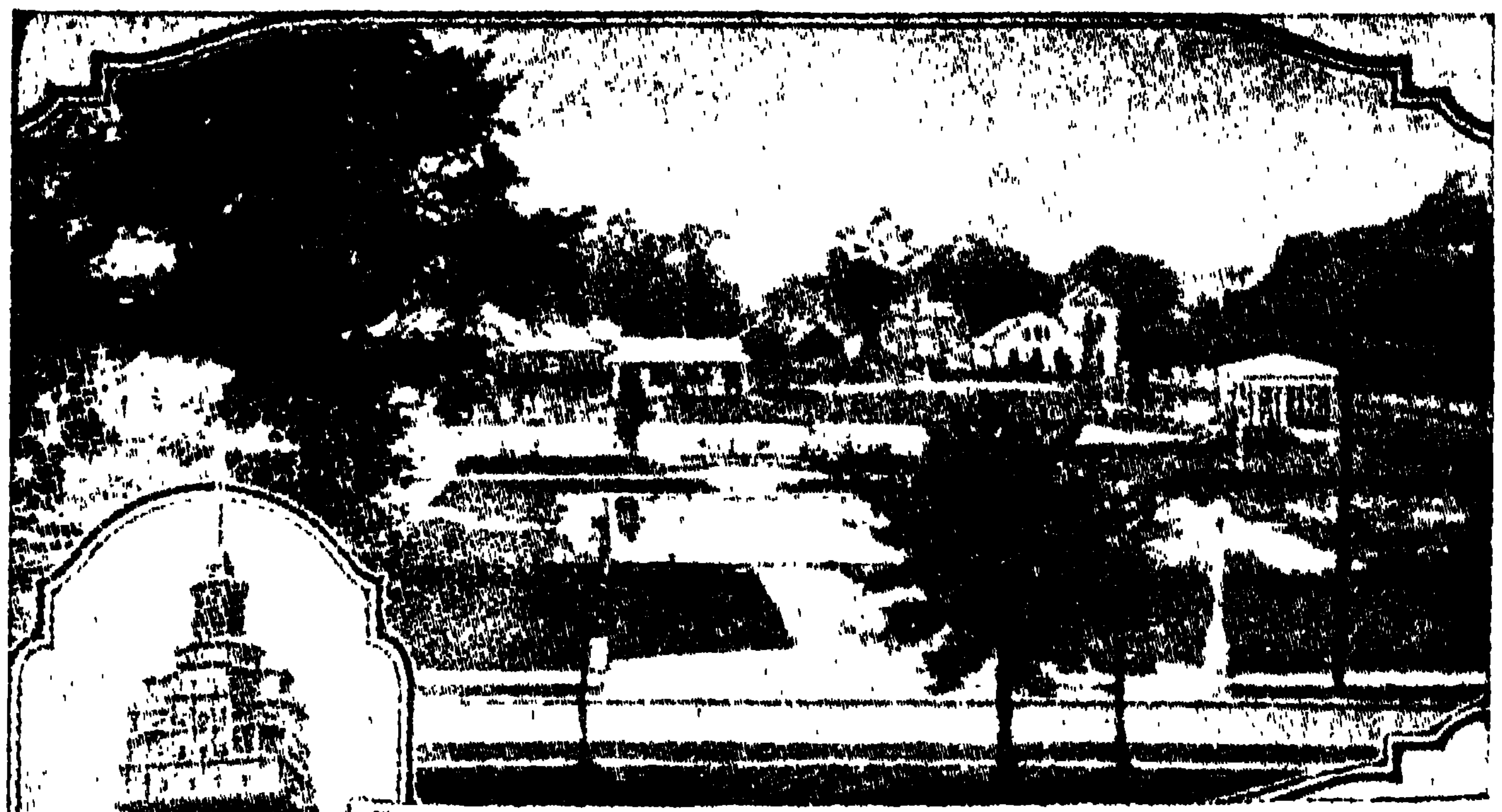

কোম্পানীর বাগান

গাড়ীর গতি-নিরূপক বিজ্ঞাপন

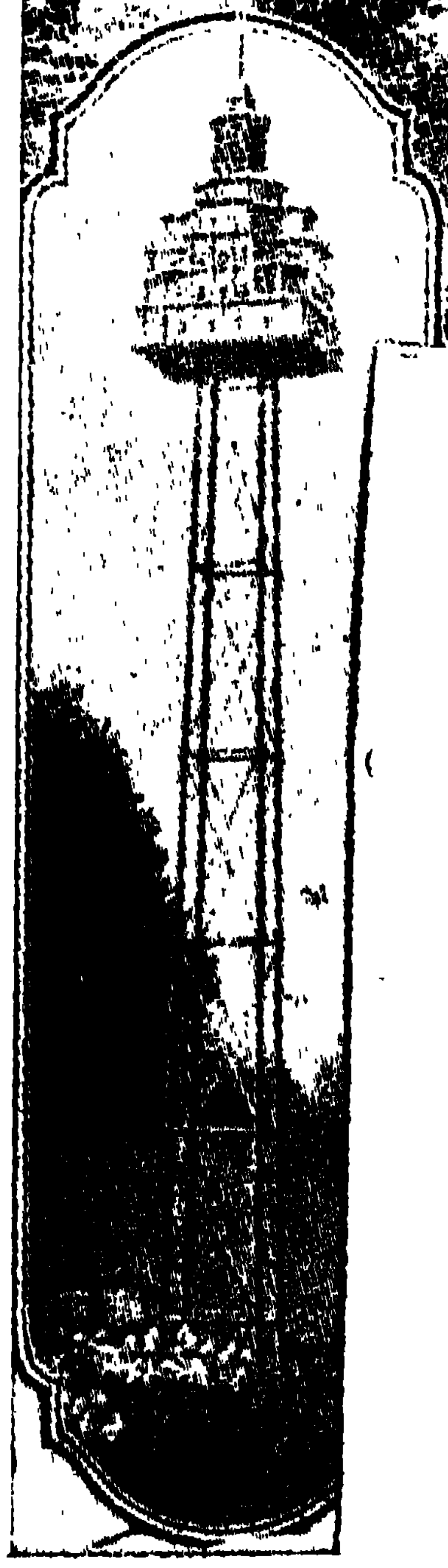

পাখীর বাসা

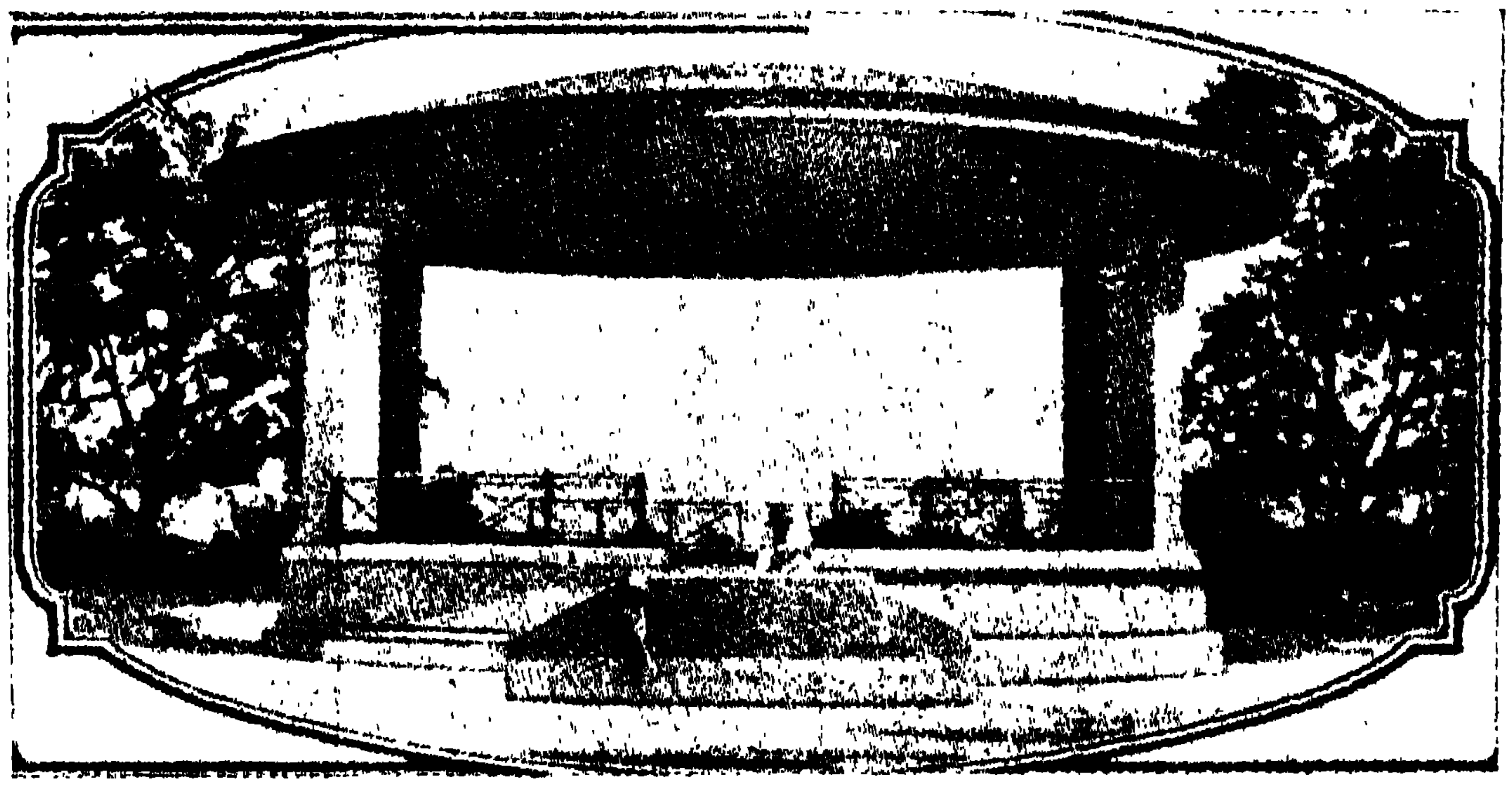

বাজাখানা

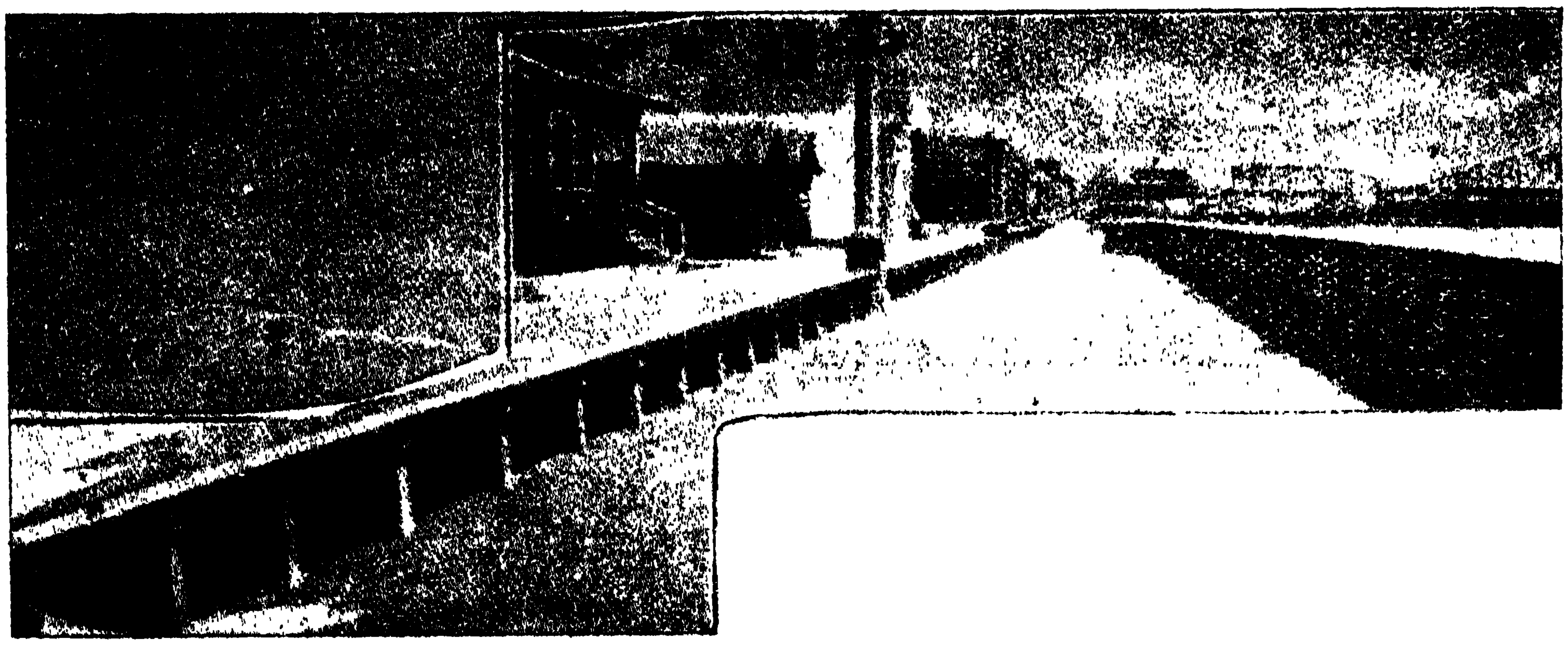

ডবল বাঁধ

করে, এই জন্য বাগানের মধ্যে খুব উঁচু লোহার খোঁটার উপর আশী জোড়া ক'রে পাখী থাকবার মতন এক-একটি বাসা তৈয়ার করা আছে। পাখীর বাসাগুলি দূর থেকে দেখ্‌তে ঠিক্ পুতুলের বাড়ীর মত! বাগানের মধ্যে খেলা-ধূলো করবার জন্যে এক-একটি 'ক্লাব' বা 'আড্ডা-বাড়ী' আছে। সাঁতার কাট্‌বার জন্যে সাঁতাড়ুদের উপযুক্ত ক'রে সাজানো বড় পুকুর কিম্বা ঝিল আছে। সাঁতাড়ুদের কাপড় ছাড়বার ঘরগুলিও বেশ সুদৃশ্য। সন্ধ্যের পর বাগানে বৈদ্যুতিক

আলো জ্বলে ওঠে। এই আলোর মধ্যে বেশ একটু কায়দা করা আছে। একটা মস্ত খোঁটার মাথায় আবার একটা লম্বা ডাণ্ডা এড়োএড়ি ভাবে বাঁধা আছে,—অনেকটা চড়ক-গাছের মত। সেই ডাণ্ডার মুখে আলোটি ঝোলানো থাকে; আর ডাণ্ডাটি চড়ক-গাছের মত ইলেক্‌ট্রিকের বলে ঘোরে ব'লে, ঐ এক-একটি আলোতে বাগানের অনেকটা ক'রে জায়গা আলো ক'রে রাখে। বাগানের ভিতর যে-সব বড়-বড় লোকের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলিকে সর্ব্বদা আট্‌কানো যায় না। নদী পারাপারের জন্যে বেশ চমৎকার পোল তৈরি করা থাকে। নদীর বাঁধ, নদীর পোল, সবই দেখতে সুন্দর ও পরিপাটি। ইলিনয়েস্‌ সহরের শতবার্ষিকী প্রতিষ্ঠান-উৎসবটি চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবার উদ্দেশ্যে, নগর-প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড তোরণ-দ্বার নির্ম্মাণ করা হ'য়েছে। এই দুগ্ধ-ধবল তোরণ-দ্বারের শুভ্রবর্ণ কারুকার্য্য নগরের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি করেছে।

ওয়াশিংটন সহরে, কালিফোর্ণিয়া অঞ্চলের প্রসিদ্ধ রক্ত-

বাজাখান। ঘের)

হাসপাতাল

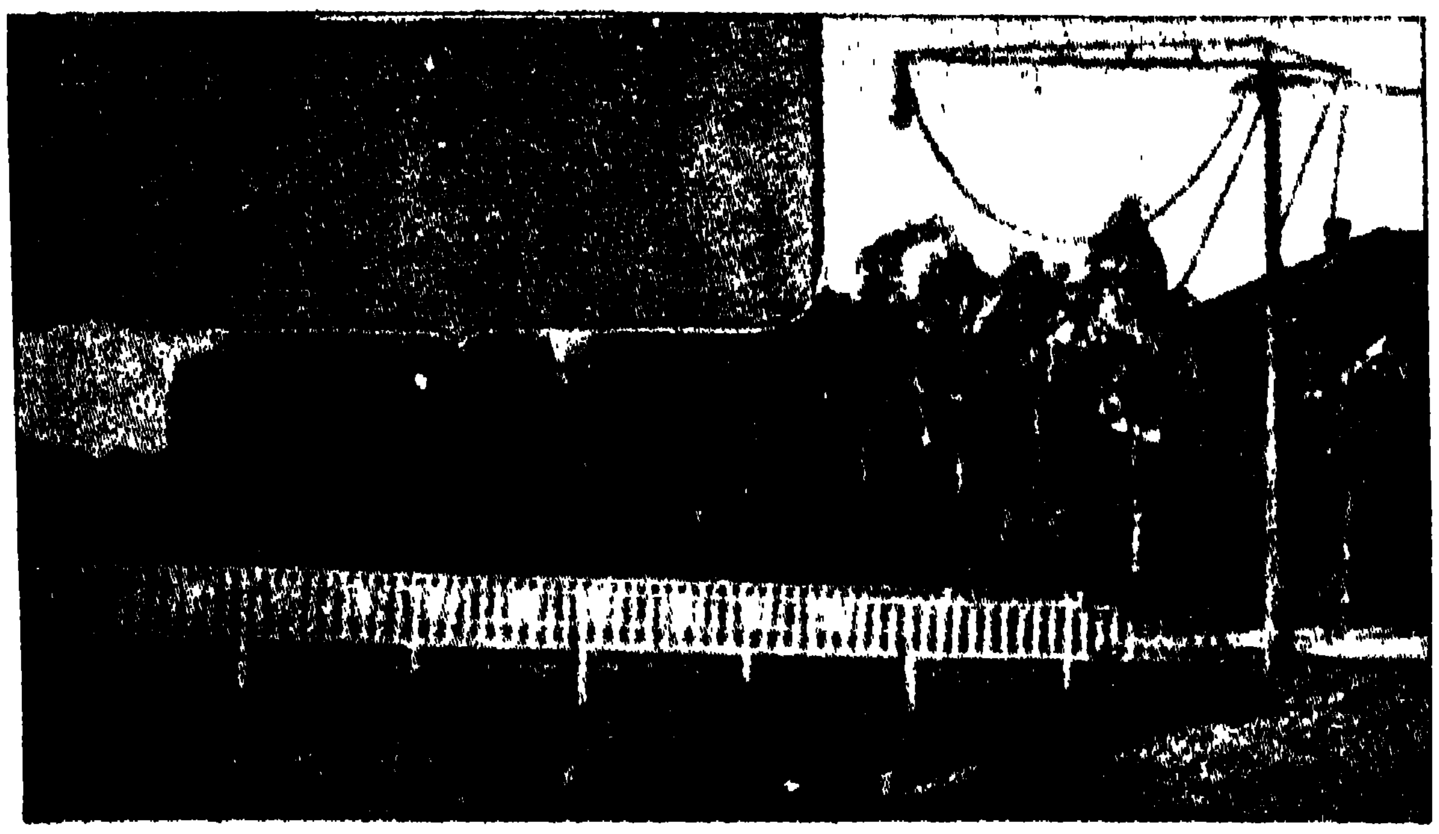

চড়ক-প্রদীপ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্যে তারের জাল দিয়ে ঘিরে রেখে দেয়। সেই তারের ঘেরা-টোপটিও ওরা এমন সুচারু করে গ'ড়ে তোলে, যাতে দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী হয়।

নদীর ধারের সহরগুলির বাহার আরও বেশী। নদীতে বান ডাক্‌লে পাছে সহরের মধ্যে জল ঢকে পড়ে, এই জন্যে নদীর ধারে বাঁধ বাঁধা থাকে। কোন-কোনও নদীর ধারে আবার ডবল বাঁধ দিতে হয়—নইলে জল দারু গাছের একটি প্রকাণ্ড গুঁড়ি নিয়ে এসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই গুঁড়িটার ব্যাসের মাপ তিরিশ ফিটেরও বেশি। এইটি দেখলেই রক্তদারু (Red-Wood Tree) গাছ যে কি রকম মহামহীরুহ, তার কতকটা ধারণা অনেকেরই হবে। তখন আর তার তিন-চারশ' ফিট উঁচু সেই ব্যোমস্পর্শী দৈর্ঘ্যটা অনুমান করে নিতেও কারুর বিশেষ অসুবিধা হবে না। এই রক্তদারু গাছের গুঁড়ির

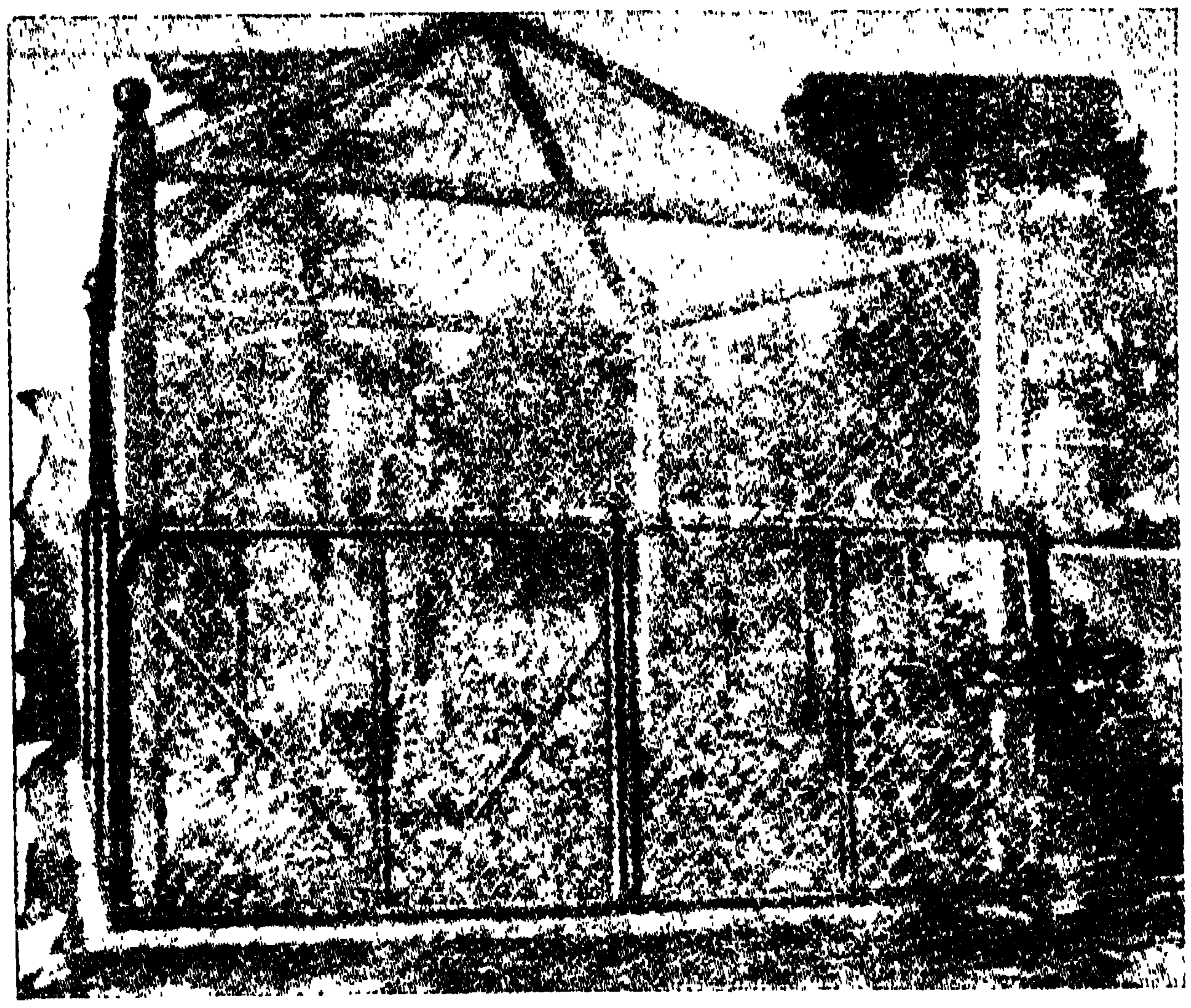

জালের ঘেরা-টোপ

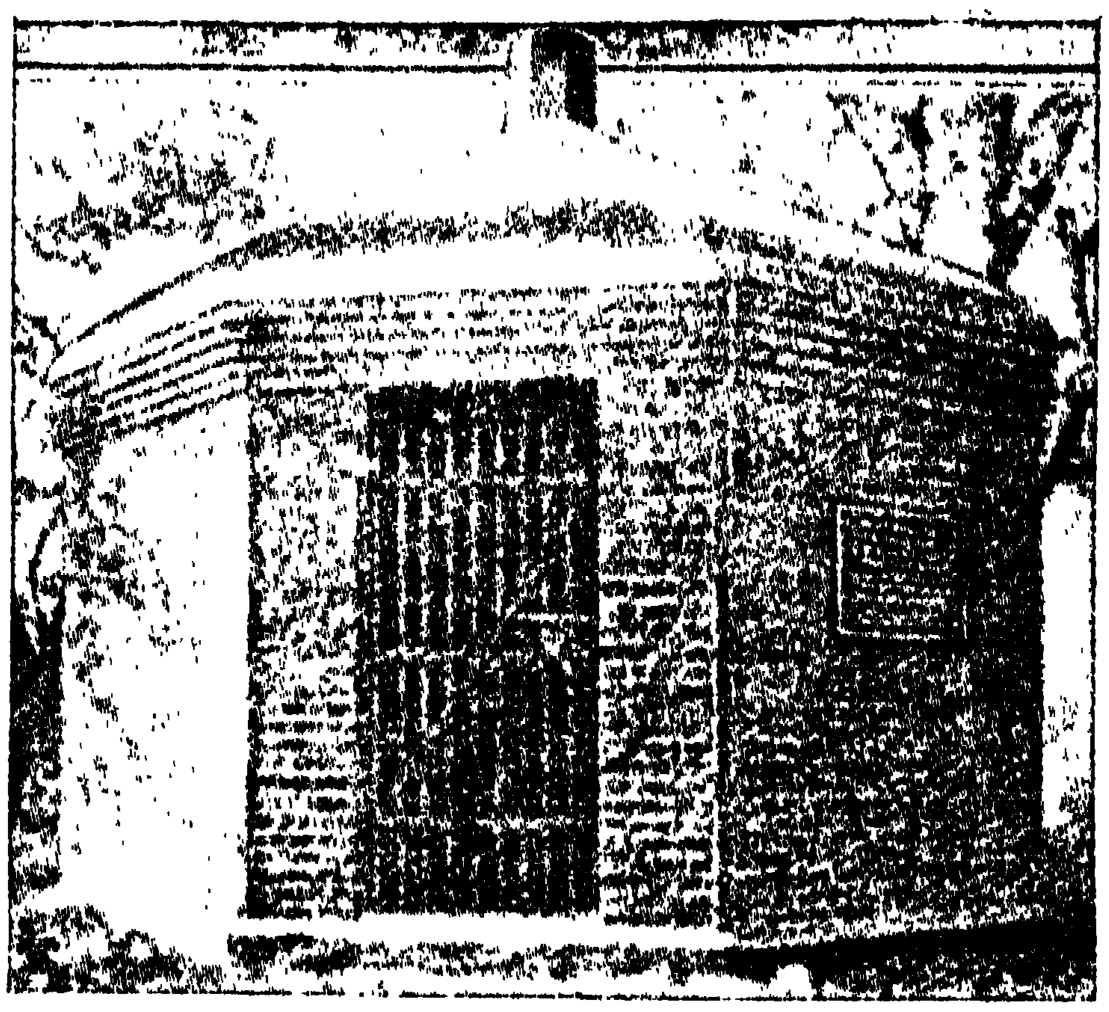

বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসব-ঘর

ময়লা ফেলা আধার

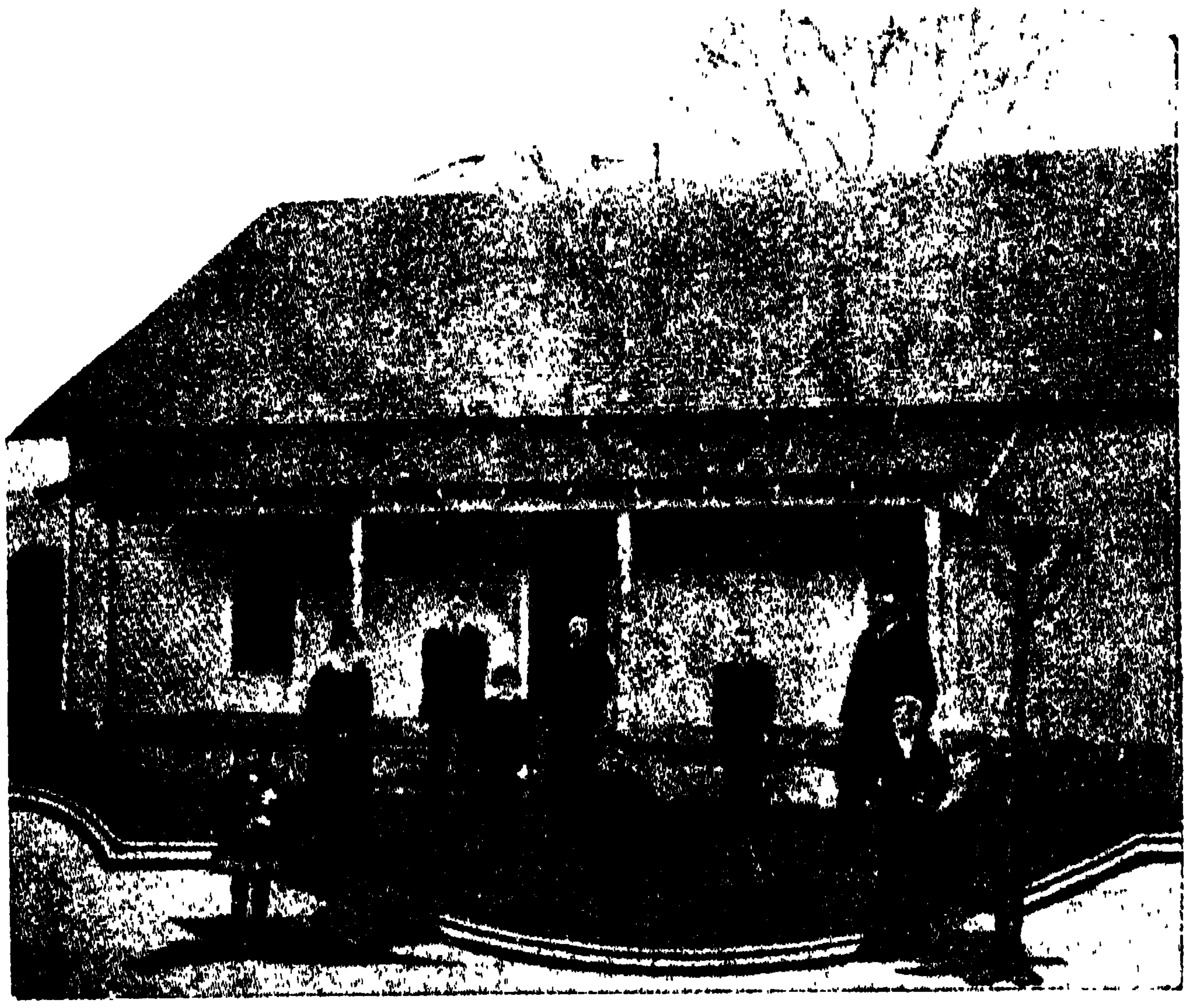

ইস্কুল

মাথার ওপর একটি প্যাগোডা বা ব্রহ্মদেশীয় দেবমন্দির তৈয়ার করা আছে, যাতে গাছের গুঁড়ির মাথাটা একেবারে মুণ্ডিত না দেখায়। মরা-গাছের শুষ্ক বল্কলকে আবৃত করে, পুষ্পিত লতাজাল এমন করে ঘিরে আছে যে, দূর থেকে ঐ গাছের গুঁড়িটিকে ঠিক ফুল-মঞ্চের মত মনোহর দেখায়!

ম্যাক্‌গ্রেগার সহরটি আওয়া প্রদেশের একেবারে পাহাড়ের ধারে। একটু জল-বৃষ্টি হলেই পাহাড় থেকে জল নেমে সহরটি ভাসিয়ে দিয়ে যায় বলে, সহরবাসীরা বুদ্ধি ক'রে সহরের বড়-বড় রাস্তাগুলো একটু ঢাল ক'রে কেটে, পাহাড়ের দিক থেকে ক্রমে গড়ানে ক'রে একেবারে নদী পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে,—আর সমস্ত রাস্তা আগাগোড়া সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। এখন জল-বৃষ্টিতে পাহাড় থেকে ঢল নামলে, জলের স্রোত ঠিক নর্দ্দমার মতন এই সব

রাস্তা দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে চলে এসে, একেবারে নদীতে পড়ে,—সহরটিকে আর ভাসাতে পারে না!

আমাদের এদিকের কোনও সহরে এক সরকারি বাগান ছাড়া পথশ্রান্ত পথিকদের বিশ্রাম করবার আর কোথাও কোনও ব্যবস্থা করা নেই। কিন্তু ও-দেশের অধিকাংশ সহরে সে ব্যবস্থাটি আগে করা থাকে। প্রত্যেক রাস্তার ফুটপথের ধারে পথিকদের বসে বিশ্রাম

চোঙা টাঙানো নয়। ময়লা ফেলবার জন্য করোগেটের পিপের বদলে তারা চুণ কাঁকর আর সিমেণ্ট জমিয়ে রাস্তার ধারে-ধারে চমৎকার চৌবাচ্ছা বানিয়ে রাখে। চৌবাচ্ছার গায়ে লেখা থাকে—'আবর্জ্জনার পাত্রটা পরিষ্কার রাখতে সাহায্য ক'রবেন।' এর মানে এ নয় যে, কেউ তাতে ময়লা ফেলবেন না, কিম্বা ময়লা পড়েছে দেখলেই সাফ ক'রে ফেলবেন! ওখানে নিয়ম হ'চ্ছে, আবর্জ্জনাগুলো

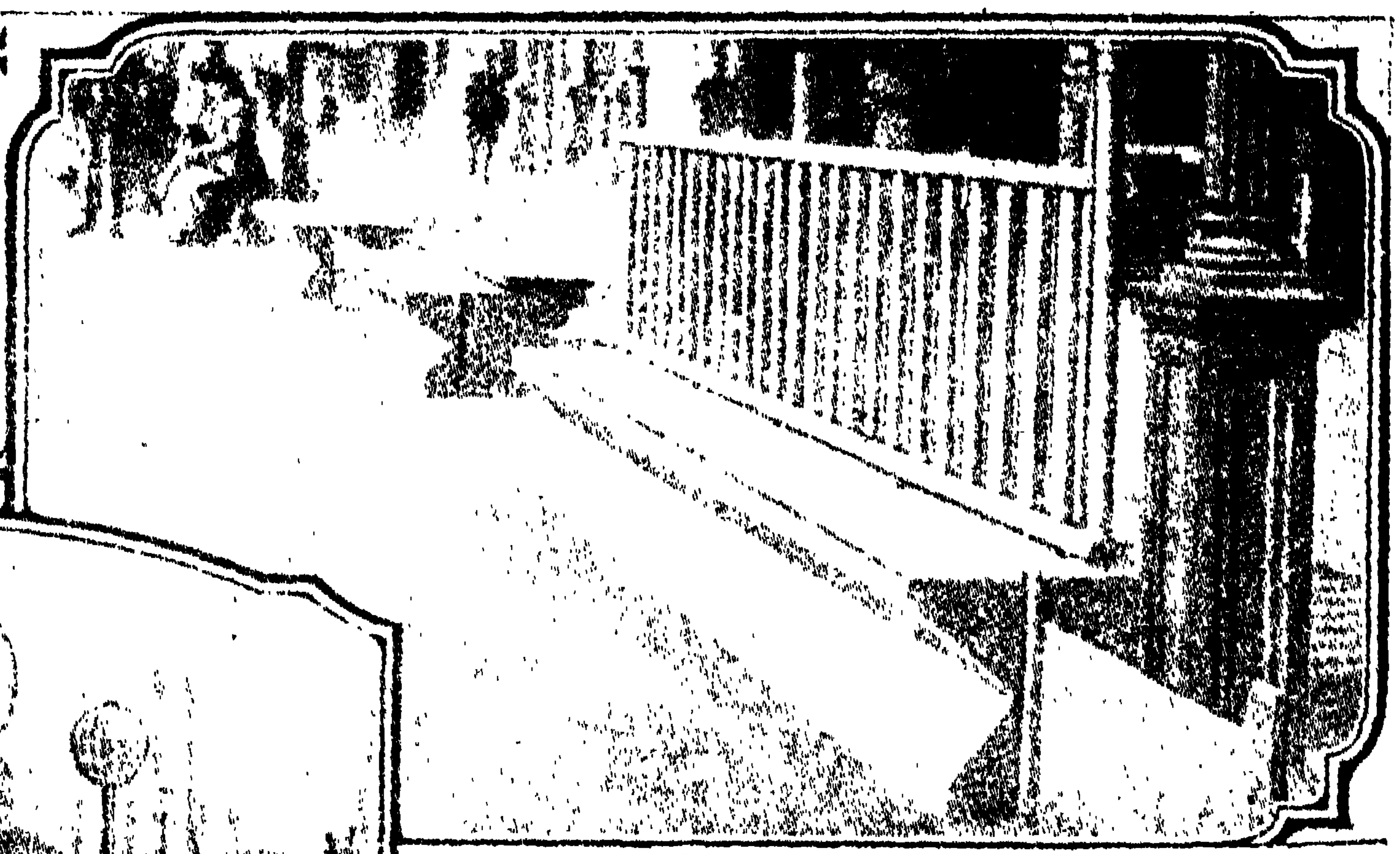

পথশ্রান্তদের বসিবার আসন

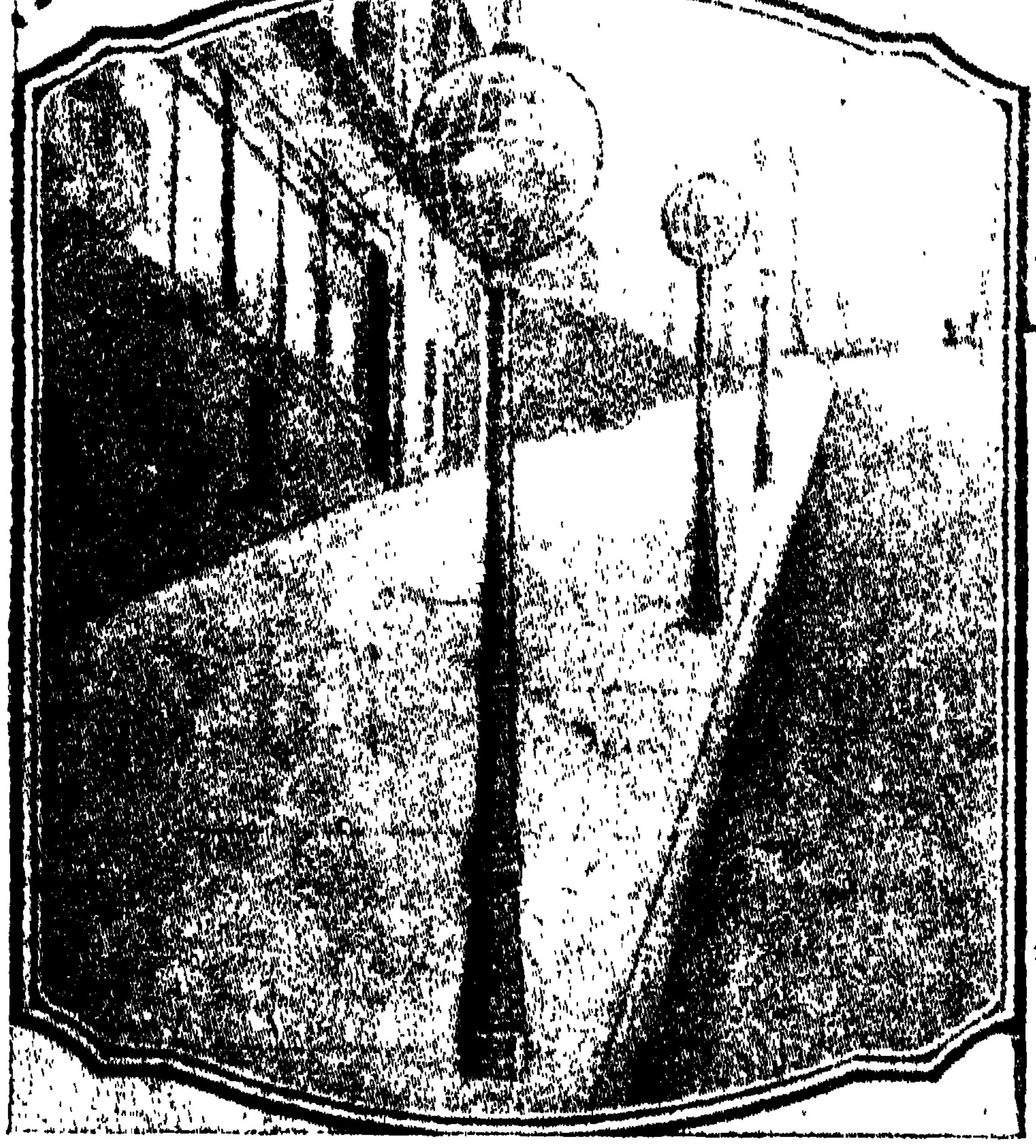

রাজপথে বাহারি আলো

বড় রাস্তার চৌমাথায় বসিয়া রাত্রে বইপড়া

করবার জন্য উচ্চ আসন পাতা আছে। মুখ-হাত ধোবার জন্য কল আছে; এমন কি, রেঁধে-বেড়ে খাবার জন্য স্থানে-স্থানে ইলেকট্রিক উনুনও ফিট করা থাকে। রাত্রে সেখানে ব'সে বইটই পড়বার সুবিধে হবে বলে, আলোর সুব্যবস্থা করা আছে। রাস্তার ধারের গ্যাস বা ইলেকট্রিক আলোর থামগুলির কত রকমের বাহারি গড়ন,—এদেশের মতন সেই সারি-বন্দি এক-ঘেয়ে কাঁচ আর টিনের চারকোণা

পুড়িয়ে ফেলা। এ কাজটা পাড়ার লোকদেরই ক'রতে হয়। মিউনিসিপালিটির লোক এসে কেবল ছাইগুলো তুলে নিয়ে যায়। কোন-কোনও রাস্তায় আবার ময়লা ফেলবার জন্য মাটির ভিতর দিকে খোঁড়া গর্ত্ত করা থাকে,—উপরে লোহার জাল্‌তি ঢাকা দেওয়া। রাস্তার ময়লা, আবর্জ্জনা-গুলো পথিকদের চোখের আড়াল কর্ব্বার জন্যই এই ব্যবস্থা। আমেরিকার সহরগুলোতে মোটর-দুর্ঘটনা এত বেশী ঘটে

যে, সেটা নিবারণ করবার জন্যে ওদের নানা রকম উপায় করতে হয়েছে। প্রথমতঃ রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের মুখে কিছু ব'লতে হয় না, কেবল হাত নেড়ে ইসারায় গাড়ীর গতি-বিধি শাসন করে। এ ব্যবস্থাটা কিছুদিন থেকে এ দেশেরও বড়-বড় কটা সহরে

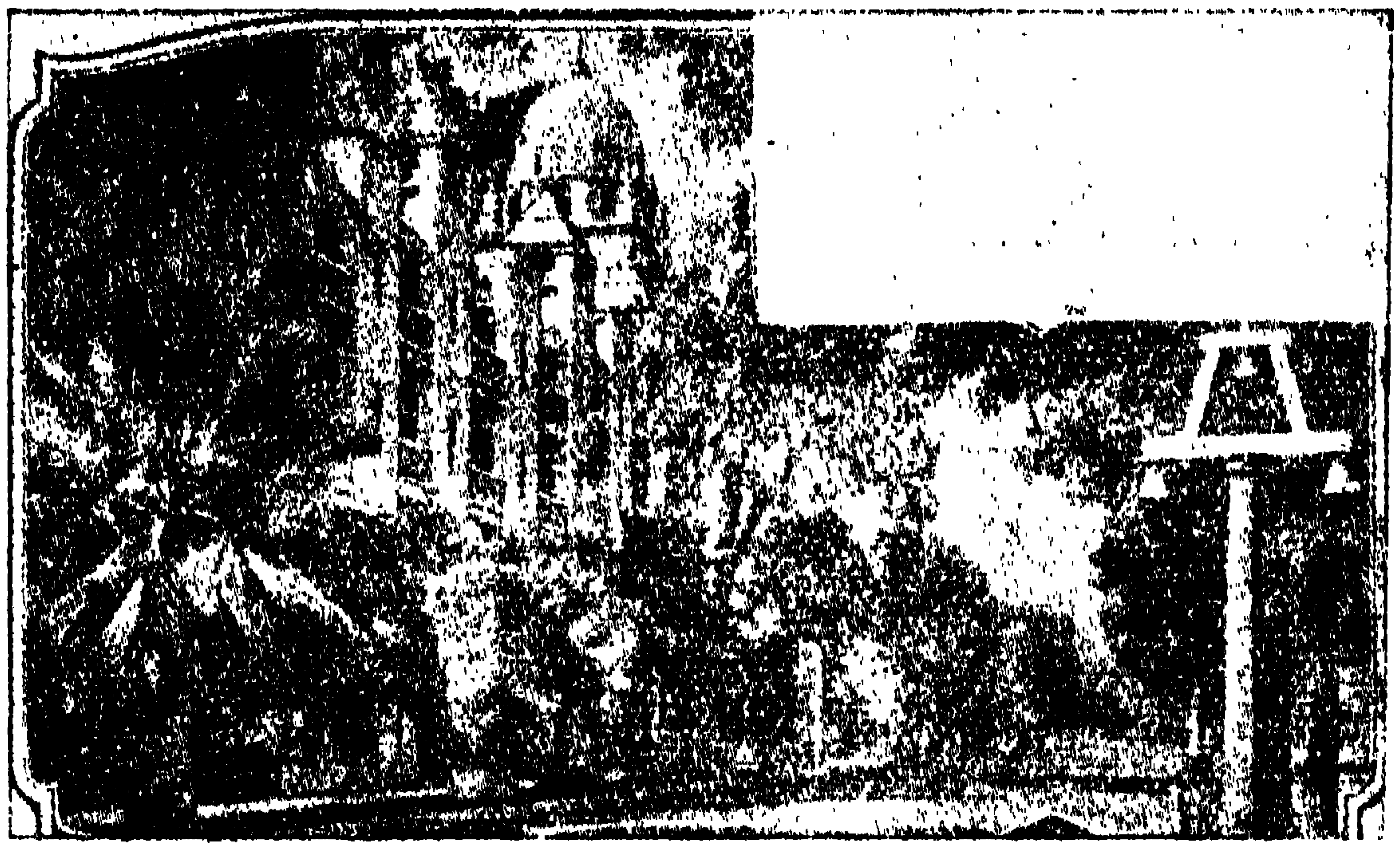

থিয়েটার

সহরের বহির্দ্বারে পুলিশের ঘাঁটি

প্রচলিত হয়েছে। আমেরিকা আবার পুলিশ খরচা বাঁচাবার জন্যে এখন রাস্তায় প্রত্যেক চৌমাথার মাঝখানে পথ-নির্দ্দেশক যন্ত্র বসাতে আরম্ভ ক'রেছে। এই যন্ত্রগুলি আপনি কলে ঘুরে যান-চালককে, পথের কোন্ ধার দিয়ে কি ভাবে যেতে হবে, সেটা জানিয়ে দেয়। গাড়ীর গতি-

"বিপদ" কথাটা লিখে রাখা হয়। আবার গলির ভিতর মোটর বা গাড়ী ঢুকছে কি না, সেটা পথিকদের জানবার সুবিধার জন্যে সেই খোঁটার গায়ে এক-একখানা আয়না আঁটা থাকে। পথিক দূর থেকে সেই আয়নায় গলির মুখে আগমনোন্মুখ গাড়ীর প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়ে সতর্ক হ'তে পারে। আয়নাগুলির আবার এমন কায়দা যে, সম্মুখ-দিকে কিছু প্রতিফলিত হ'লে পশ্চাৎ দিক হ'তেও দেখতে পাওয়া যায়!

অনেক রাস্তায় ফুটপথের ধারে বারাণ্ডার মত রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকে। রেলিংএর ধারে ফুলগাছের বাগান

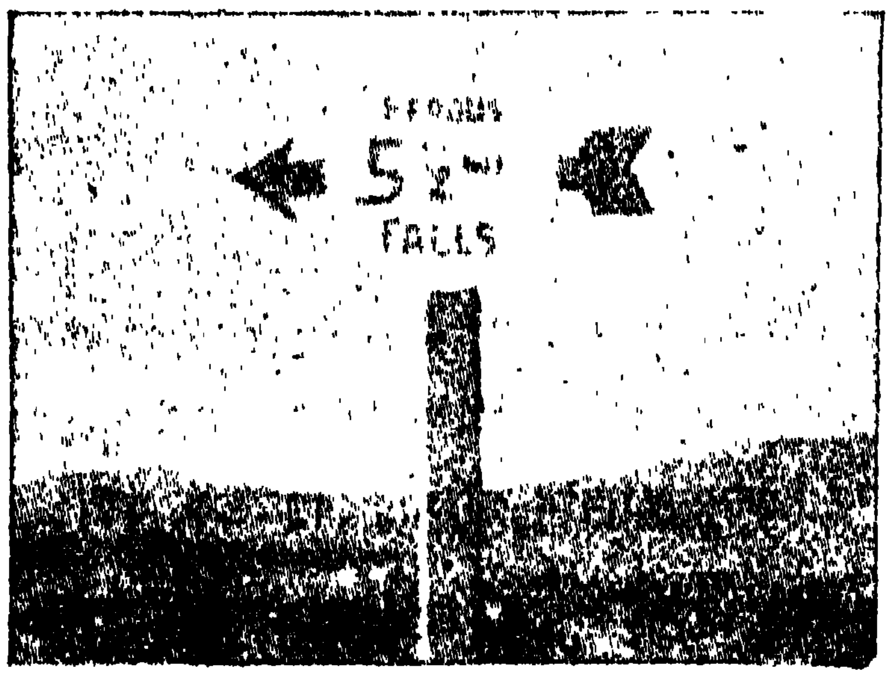

দূর ও দিক্-নির্দ্দেশক চিহ্ন

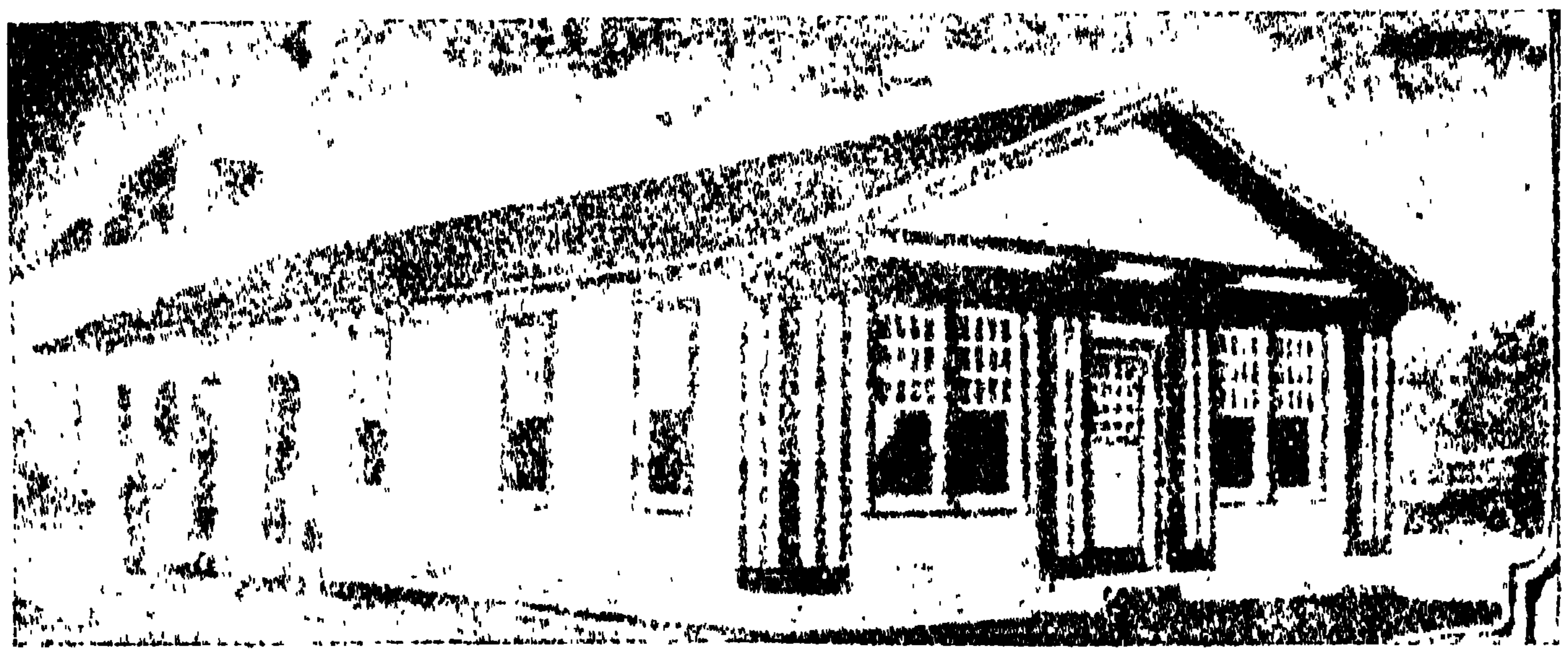

আড্ডাবাড়ী (club)

বেগ কোথায় কমাতে হবে, সেটা জানাবার জন্য পথের ধারে-ধারে বড়-বড় সচিত্র বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে রাখা হয়। গলিতে ঢোক্‌বার মুখে গাড়ী যাতে সাবধানে চালানো হয়, সেটা চালককে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে, গলির মুখে-মুখে এক-একটা খোঁটা পুতে তার মাথার উপর বড়-বড় অক্ষরে

করা। এ রাস্তাগুলির বড় চমৎকার বাহার। রাস্তার ধারে ঘোড়ার জল খাবার জন্য সুন্দর-সুন্দর ফোয়ারা আছে। কোন-কোনও ফোয়ারাটি রাস্তার এমন জায়গায় প'ড়েছে, যেখানে বিপদ-বারণ নিশানাও (Danger Signal) দেওয়া দরকার। তাই সেখানে ফোয়ারার উপরেই সেটি লাগানো

হোটেল

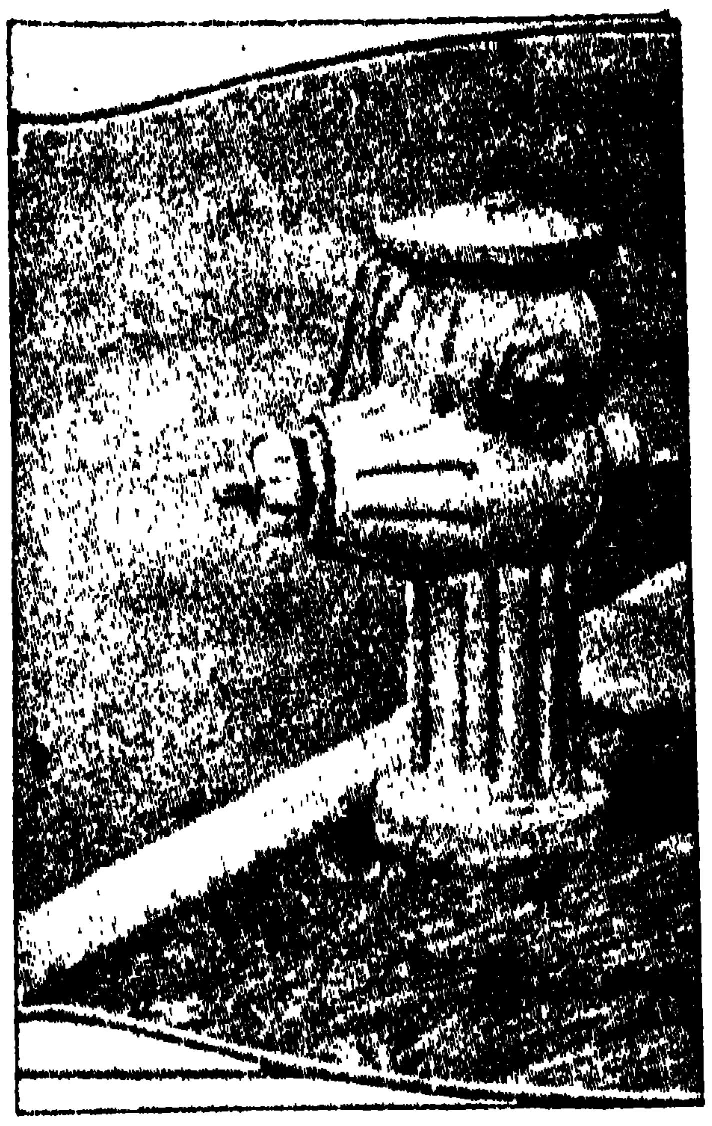

রাস্তায় জল দেবার মুখনল

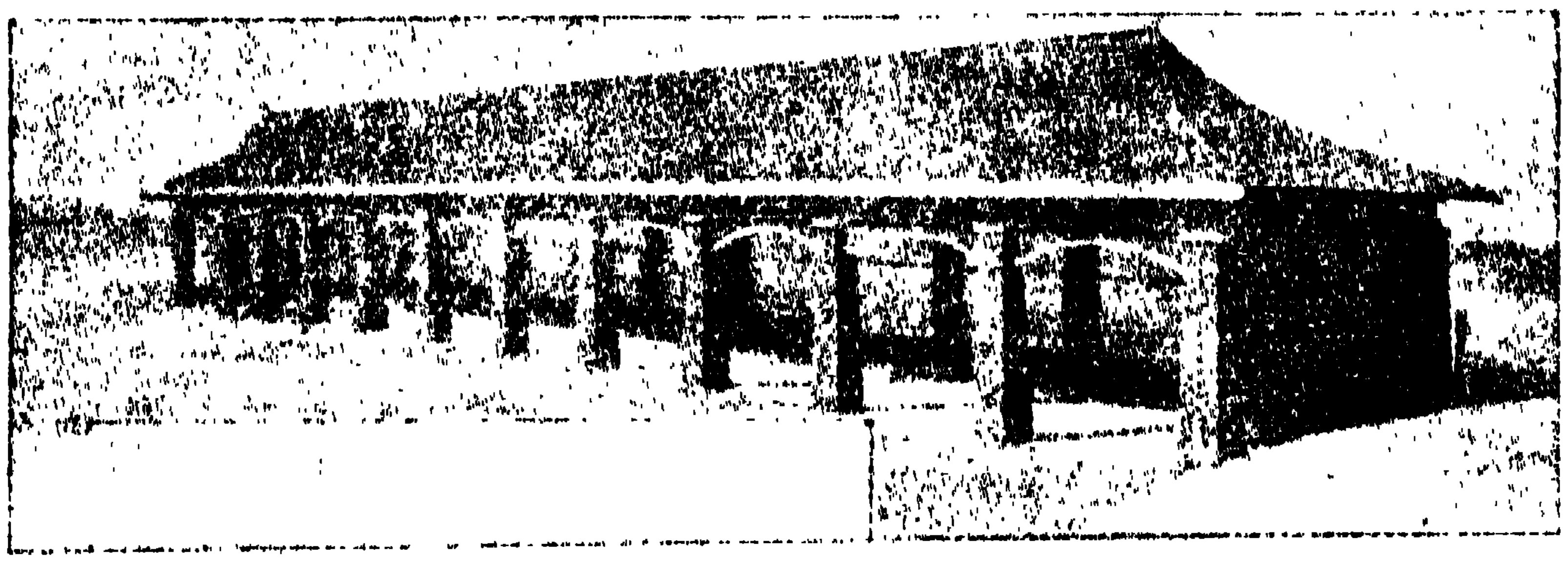

ভাড়াগাড়ী ও মোটর দাঁড়াবার স্থান

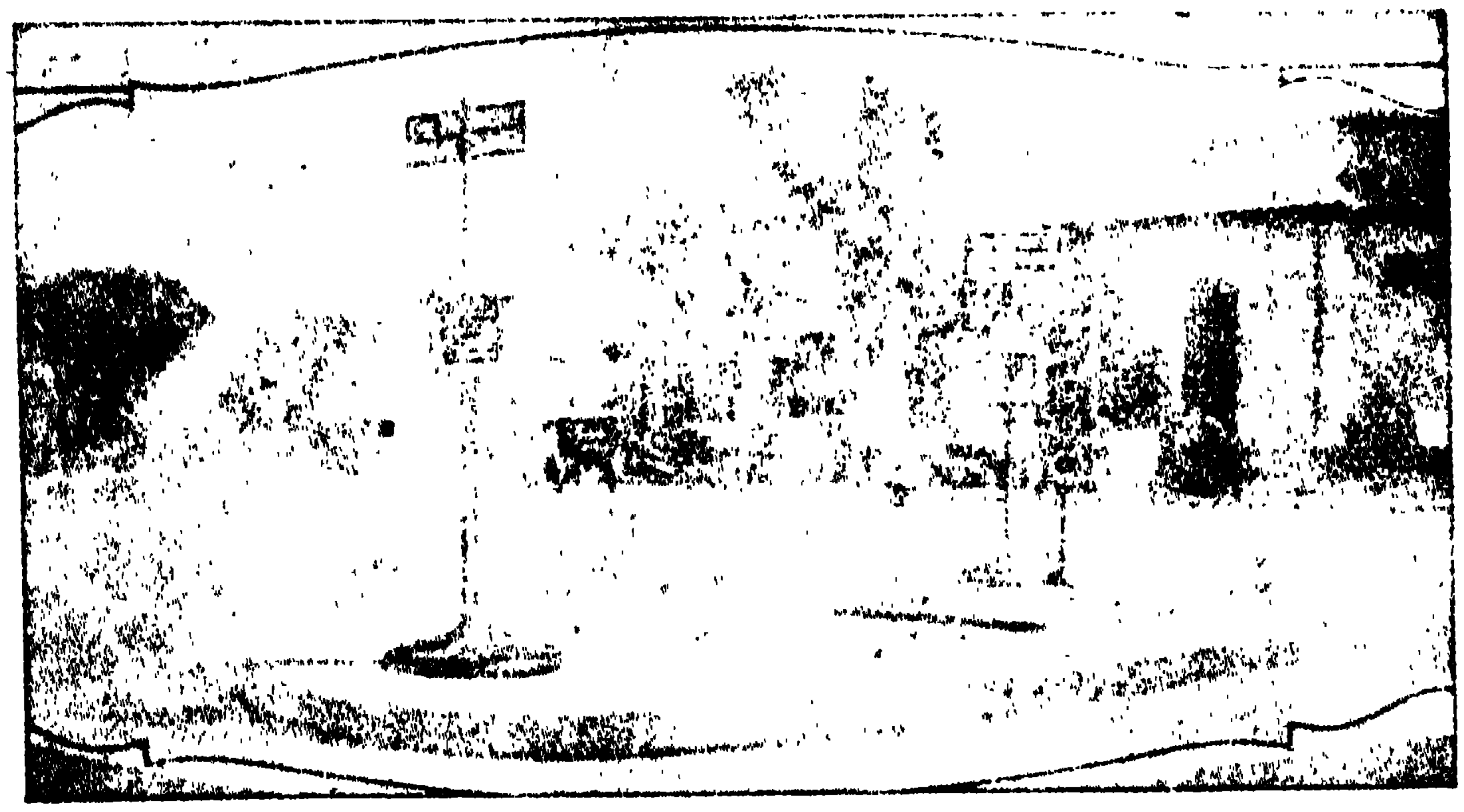

কলের সাহায্যে গাড়ীর গতিবিধি নির্দ্দেশ

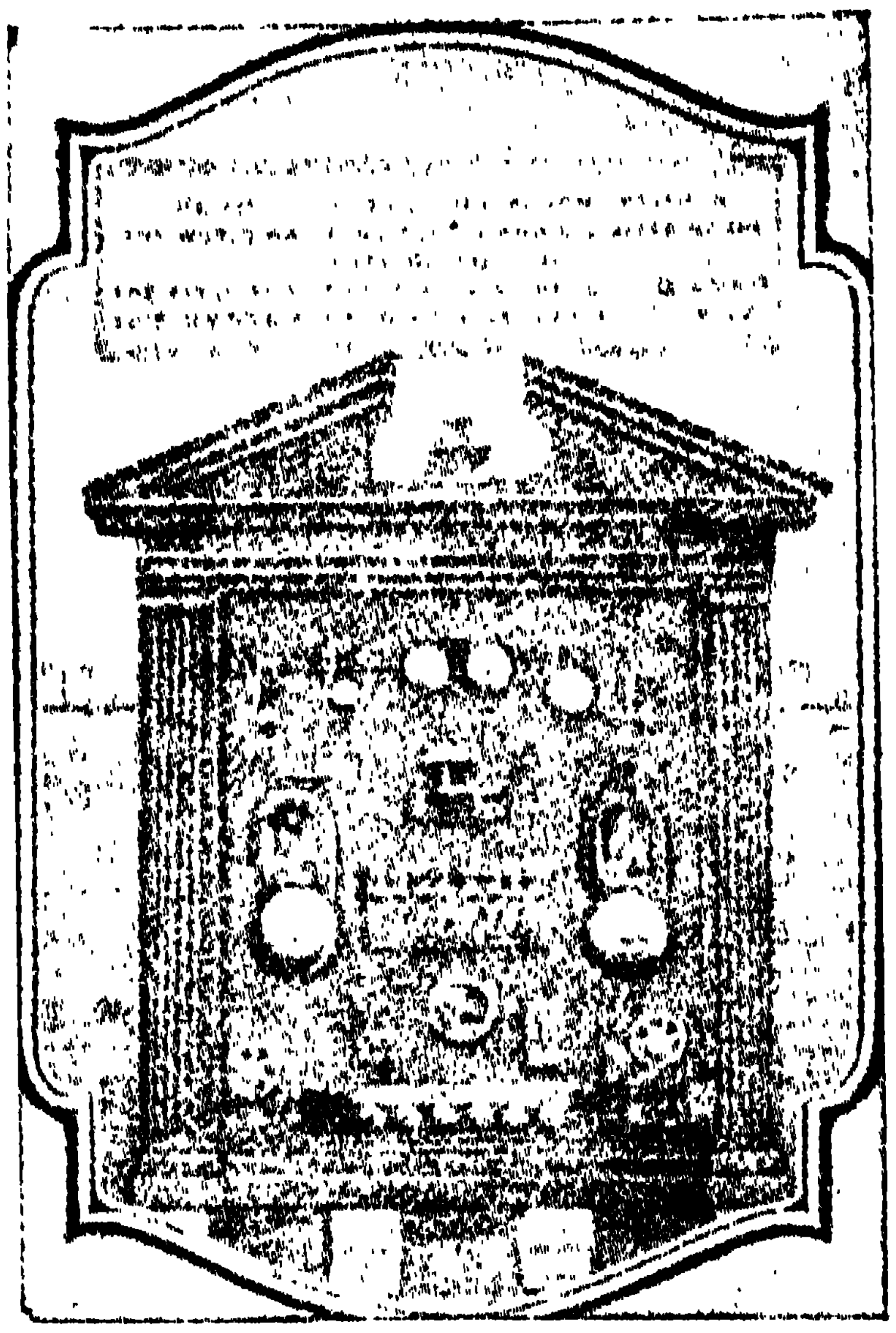

অগ্নি-সেনা আহ্বান করিবার বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

হ'য়েছে। ভাড়াটে গাড়ী বা মোটর দাঁড়াবার জন্যে সহরের স্থানে-স্থানে বেশ চালঢাকা আড্ডা করা আছে ;— আমাদের দেশের মত খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে গাড়ীশুদ্ধ গাড়োয়ানকে রোদে পুড়তে কিম্বা বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না। কোনও সহরের কাছাকাছি কোথাও যদি বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু থাকে, যেমন জলপ্রপাত বা পার্ব্বত্য হ্রদ ইত্যাদি, তা হ'লে ষ্টেশন থেকে সে স্থানটি কত দূরে, আর কোন্ পথ দিয়ে সেখানে যেতে হয়, সেটি বিদেশী ভ্রমণ-কারীদের জানাবার জন্যে সেই পথের প্রত্যেক আধ মাইল অন্তর একটি ক'রে খোঁটা পোতা আছে। সেই খোঁটাগুলির গায়ে এক-একখানি কাষ্ঠফলকে সেই বিশেষ স্থানের নাম ও ক্রম-বর্দ্ধিত মাইলের হিসাব লেখা থাকে। আর এক-একটী তীর, পথিককে যখন যেদিকে বেঁক্‌তে হবে, সেইটি নির্দ্দেশ ক'রে দেবার জন্যে, সেইদিকে মুখ ফিরিয়ে আঁটা থাকে। সহর থেকে বেরিয়ে যাবার যতগুলি পথ থাকে, তার প্রত্যেকটির মুখে একটি ক'রে পুলিশের ঘাঁটি আছে।

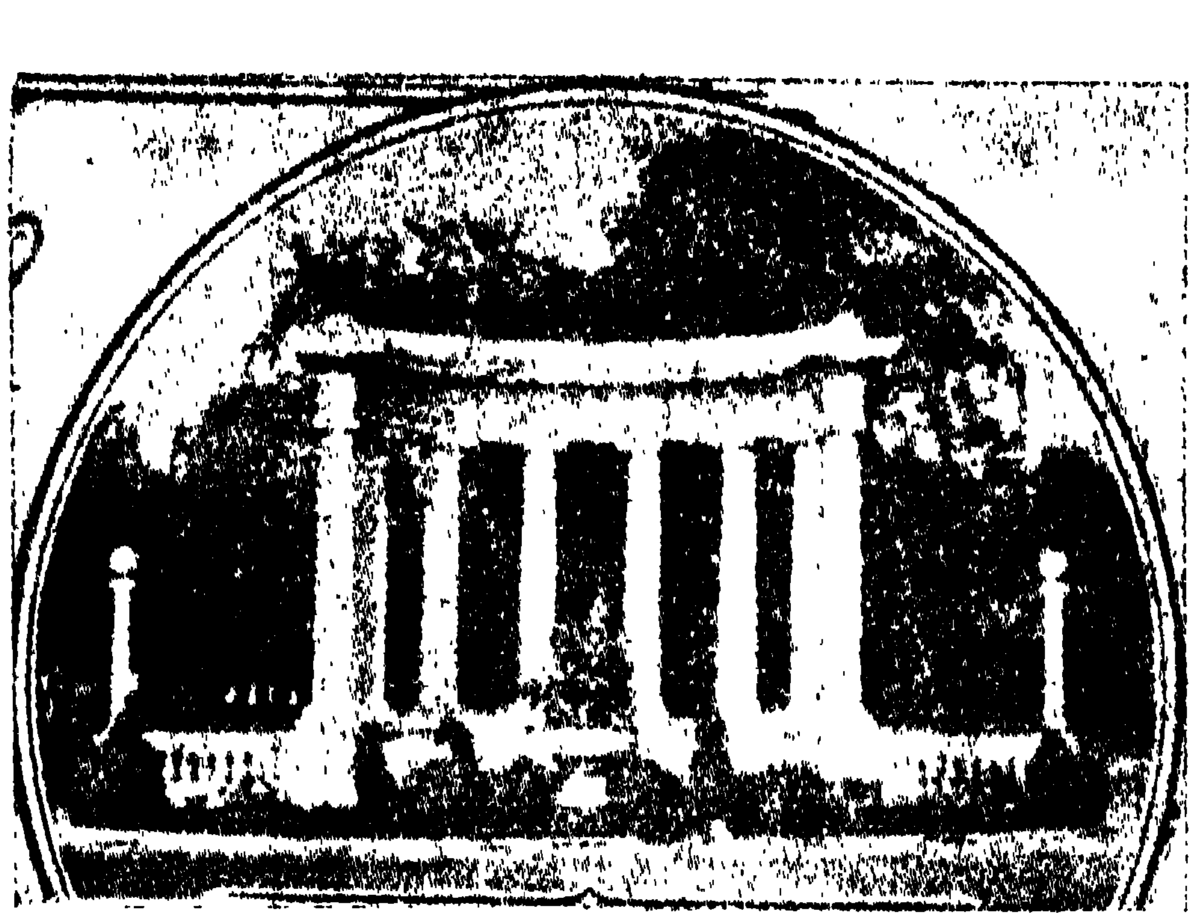

শতবার্ষিক স্মৃতিস্তম্ভ (ইলিনয়েস্ সহরের)

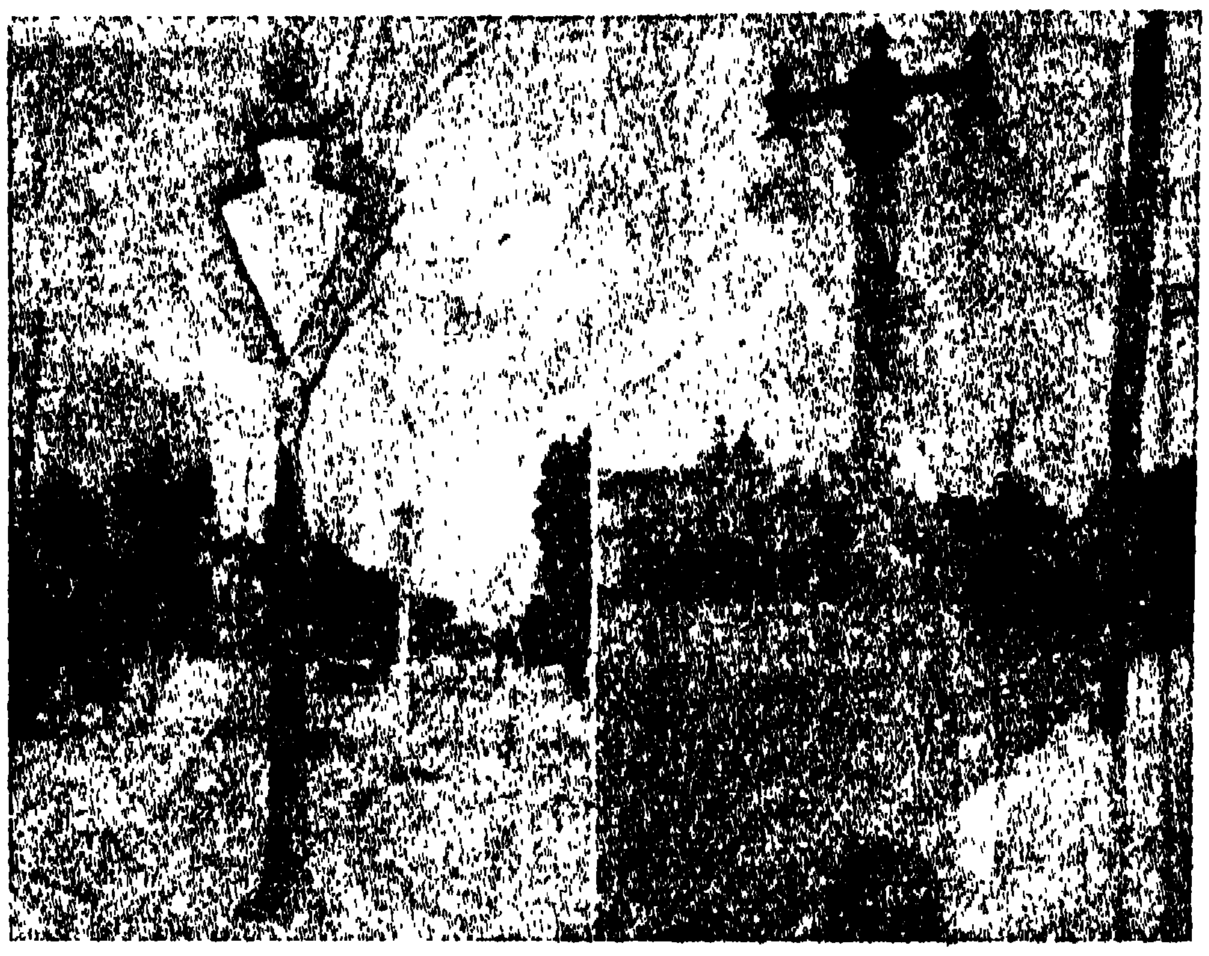

রাস্তায় নূতন রকমের বাহারী আলো

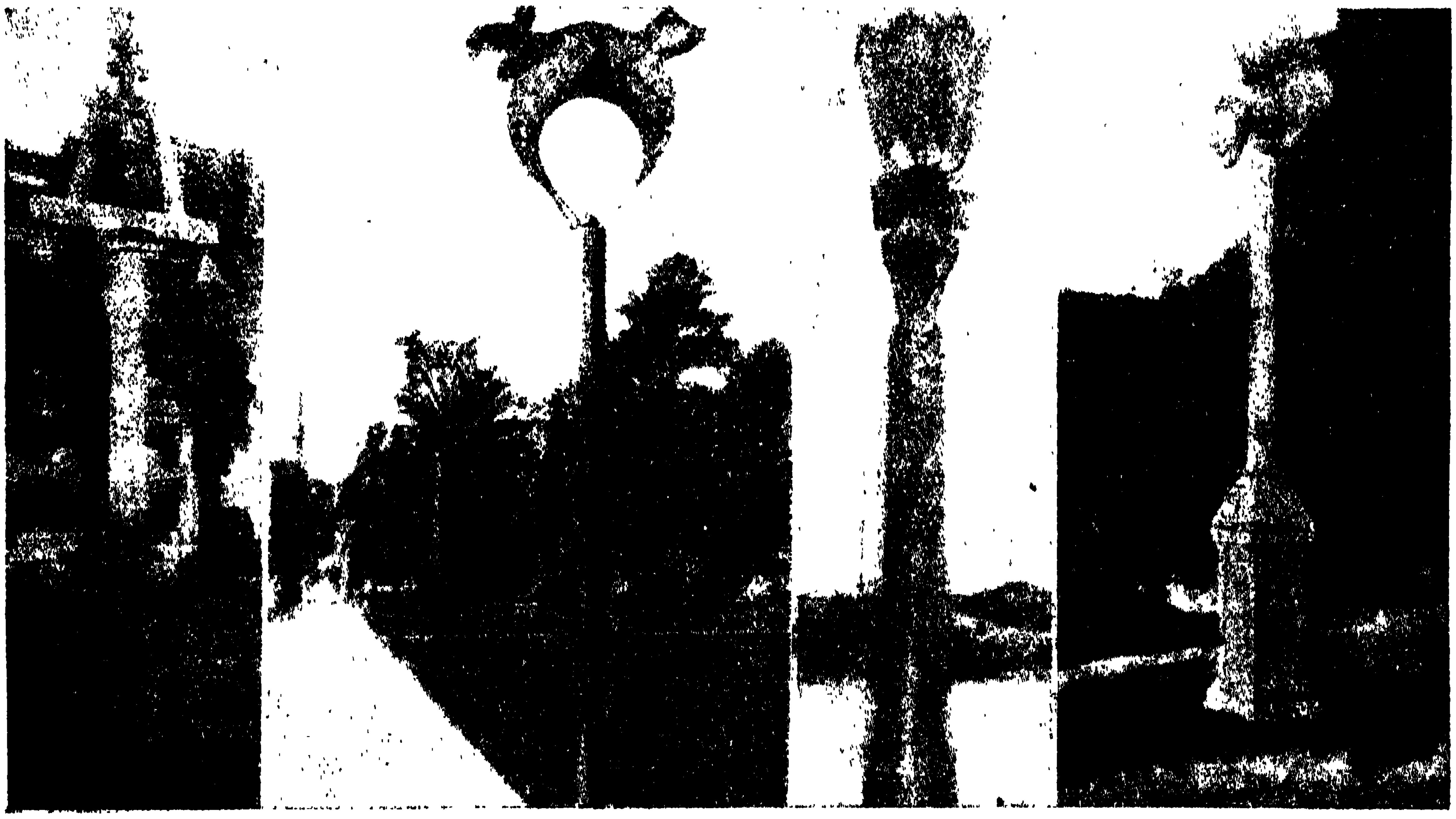

রাস্তায় নূতন রকমের বাহারী আলো

সহরে চুরি ডাকাতি বা খুন করে কেউ চট্ ক'রে সহর ছেড়ে পালাতে পার্ব্বে না। প্রত্যেক ঘাঁটিতে সজাগ প্রহরী খাড়া হ'য়ে দিনরাত সতর্ক পাহারা দিচ্ছে। রাস্তায় জল দেবার জন্যে যে-সব মুখনল (Hydrant) বসানো থাকে, সেগুলি পর্য্যন্ত সুন্দর ও পরিপাটি! কোথাও আগুন লাগ্‌লে তখনি ইলেক্‌ট্রিক্ বেল বা ঘণ্টা বাজিয়ে অগ্নি-সেনাদের (Fire Brigade) ডাক্‌বার জন্যে প্রত্যেক রাস্তায় টেলিফোন ও ইলেক্‌ট্রিক্ বেল বসানো আছে। মোটর ট্যাক্সী ডাক্‌বার দরকার হ'লে রাস্তায়-রাস্তায় 'ট্যাক্সী-ডাকা কল' বসানো আছে; তার মধ্যে একটা আনী দু' আনী কিছু ফেলে দিলেই, তখনই একখানা ট্যাক্সী এসে হাজির হবে। প্রায় প্রত্যেক সহরেই, এমন কি, অনেক গ্রামে পর্য্যন্ত পথে-ঘাটে ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর ব্যবস্থা আছে। এ জন্য সেখানে স্থানে-স্থানে সুগঠিত ছোট-ছোট বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসব-গৃহ (Fower House) নির্ম্মিত আছে। এ ছাড়া সর্ব্বত্র হাসপাতাল, ইস্কুল, লাইব্রেরী, থিয়েটার, হোটেল, ডাক্তারখানা, ক্লাব, ভজনালয় ও ভোজনালয় প্রভৃতি সহর-বাসীর সুখ ও সুবিধাজনক হরেক রকমের ব্যবস্থা করা আছে।

(Popular Mechanics)

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

[শ্রীঅমলচন্দ্র হোম]

কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়া। আমি তখন স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। ১৩১৪ সালের পূজার ছুটি উপলক্ষে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁর একটি ছাত্রকে তার বাবার কাছে বর্ম্মায় পৌঁছিয়ে দেবার পথে কলকাতায় এসে আমাদের বাড়ীতে অতিথি হন। তাঁর পথ-যাত্রার সঙ্গী ছিল একটা বই-ঠাসা বাক্স। কি সব বই সঙ্গে নিয়ে অজিতবাবু বর্ম্মা যাচ্ছেন, তা দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে, একদিন দুপুরবেলা বাক্সটা ঘাঁট্‌তে-ঘাঁট্‌তে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতির নানান্‌ ইংরেজী কেতাবের ভিতর থেকে একখানি পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে ছাপা বাংলা কবিতার বই বের হ'ল—"হোমশিখা"। খুলে দেখলাম, বইখানি সবে বেরিয়েছে, ও রচয়িতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর করকমলে" উপহার দিয়েছেন। পাতা উল্টিয়ে দেখি, একটি কবিতার পাশে নীল পেন্সিলের দাগ দেওয়া রয়েছে। সেই কবিতাটি প্রথম পড়লাম। তখন খুব বেশী বোঝবার বয়স আমার ছিল না; কিন্তু "হোমশিখার" তেজ-দৃপ্ত ছন্দ আমার তরুণ মনকে কি যে একটা নাড়া দিয়েছিল, তা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তার পর একে-একে "হোমশিখার" সবগুলো কবিতাই প'ড়ে ফেল্‌লাম। অজিতবাবু কি জিনিষপত্র কেন্‌বার জন্য বেরিয়েছিলেন;—ফিরে আসতেই, তাঁর কাছ থেকে কবির পরিচয় নিয়ে জান্‌লাম, তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র;—তাঁর ও পরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায়ের অনেক দিনের বন্ধু, ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় শিষ্য। তার দু'দিন পরেই অজিতবাবু বর্ম্মা চলে' গেলেন। এ দু'দিনে বারবার প'ড়ে, "হোমশিখার" বড়-বড় দু'তিনটা কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল দেখে, যাবার সময় অজিতবাবু বইটি আমাকে দিয়ে গেলেন। সেখানি আজও আমার কাছে আছে।

কিন্তু শুধু "হোমশিখা" পেয়ে তৃপ্ত হতে পার্‌লাম না,—মার কাছ থেকে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর একটা টাকা আদায় করে' একখানা "বেণু ও বীণা" কিনে নিয়ে এলাম। কবিতাগুলো ক্রমাগত পড়তাম; আর সারাদিনই আবৃত্তি চল্‌তো গুনগুন করে। মাসিক পত্রিকায় তখন সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা খুব ক্বচিৎ বের হ'ত বোধ হয়। কাজেই, খুব ইচ্ছা কর্‌লেও, তাঁর নতুন কবিতা পড়তে পেতাম না। বছর খানেক কেটে গেল;—একদিন আমার এক সহপাঠীবন্ধুর দাদার কাছে শুন্‌লাম, সত্যেনবাবুর নতুন একখানি কবিতাসংগ্রহ বেরিয়েছে,—জগতের যত শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার অনুবাদ। তখন আমি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ি,—কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা। কবিতার বই কেন্‌বার জন্য টাকা চাইলে যে মা দেবেন, এমন কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং অন্যত্র শরণাপন্ন হতে হল। যা, হোক, "তীর্থ-সলিল" কেনা হল। কি ভাল যে লাগলো—তার বিচিত্র ছন্দের ঝঙ্কার, অদ্ভুত শব্দবিভব, বাংলার বনচ্ছায়ে নিখিলের কবির সঙ্গীত!

সেই তের বছর আগে প্রথম যখন কবিতাগুলি পড়েছিলাম, তখন যেমন সেগুলি সমস্ত মনকে মাতিয়েছিল, আজও তেমনি মাতায়, তার উদ্দীপনায়, তার ব্যঞ্জনায়, তার ঝঙ্কারে।

"তীর্থ সলিল" পড়বার পর থেকেই সত্যেন্দ্রনাথকে দেখবার জন্য আমার মনে ভারী একটি ঔৎসুক্য জন্মায়। কিন্তু দেখবো কি করে? আমি ত তখন স্কুলের ছাত্রমাত্র। কিন্তু দেখা হল কয়েক মাস পরেই। কলেজে ঢুকে যখন বাড়ীর লোকের কাছ থেকে ইচ্ছামত বই কেন্‌বার

স্বাধীনতা ও সুবিধা পাওয়া গেল, তখন হ্যারিসন রোডের চৌমাথায়, এলবার্ট-হলের নীচে পুরানো বইয়ের দোকানে ঘোরাঘুরি সুরু করলাম। এইখানে প্রায়ই দেখ্তাম, একটি ভদ্রলোক,—বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, সাদাসিদা পোষাক, চোখে চশমা,—বই দেখছেন কিম্বা কিনছেন। একদিন দেখ্লাম তিনি মূল ফরাসী ভাষায় মোলেয়ারের এক সেট্ নাটক কিনে মুটের মাথায় চাপাচ্ছেন। আর একদিন দেখ্লাম, Thiersএর History of the French Revolutionএর ক' ভালুম কিন্লেন। আরো একদিন দেখলাম, খালিলের দোকান থেকে পুরানো কয়েকখানা বাঁধানো "Monist" কাগজ ও একটা কি ফার্শী বই কিনে নিয়ে বের হচ্ছেন। এত বিচিত্র বিষয়ে অনুরাগী কে এই লোকটি, জান্বার জন্ম বড় কৌতুহল হ'ল। বইয়ের দোকানে খোঁজ করে নাম জান্তে পার্লাম না,—শুধু খবর পেলাম, দর্জ্জিপাড়ায় থাকেন। মধ্যে-মধ্যে বিকালে দেখতাম, ভদ্রলোকটি গোলদীঘিতে বেড়াচ্ছেন। একদিন দেখলাম তাঁকে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। চারুবাবুর সঙ্গে আমার তখন আলাপ ছিল না, কিন্তু তাঁকে চিন্তাম। তাঁর সঙ্গে দেখে অনুমান করলাম যে, ইনি নিশ্চয়ই কোন সাহিত্যিক। তার পর হঠাৎ যেন কেন মনে হল, ইনিই বোধ হয় সত্যেন দত্ত। জান্বার উপায় ছিল না, সুতরাং জান্তে পার্লাম না; কিন্তু মনে মনে সেদিন থেকে কেমন ধারণা হয়ে গেল যে, ইনিই সত্যেন্দ্রনাথ।

এর কিছুদিন পরে একদিন সকালে বসে পড়ছি, এমন সময় পরলোকগত গিরিশ শর্ম্মা মহাশয় আমাদের বাড়ী এলেন; তাঁর পিছনে-পিছনে দেখি, পুরানো বইয়ের সন্ধানী, চারুবাবুর সঙ্গী, সেই ভদ্রলোকটি। গিরিশবাবু ঘরে ঢুকেই বল্লেন—"অমল, এঁকে চেন? ইনিই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যাঁর কবিতা তোমার মুখে অনেক শুনেছি। আমার সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে,—আজ তোমাদের বাড়ীর সাম্‌নে দেখা হল,—তোমার কাছে তাই ধরে নিয়ে এলাম।" কি আশ্চর্য্য, আমার অনুমান তা হলে একেবারে ঠিক! অভ্যর্থনা করে বসালাম কবিকে। এত শান্ত-স্বভাব, এমন অমায়িক, এত স্বল্প-ভাষী লোক ত বেশী দেখি নি আগে। আমিই বকে যেতে লাগলাম,—তিনি বসে-বসে শুনতে লাগলেন। আমার সেদিন উৎসাহ ও আনন্দের আর অন্ত ছিল না। তাড়াতাড়ি তাঁর বই তিনখানি বের করে, তাঁকে "হোমশিখার" সাম্য-সাম কবিতাটি পড়তে অনুরোধ করলাম। তিনি কিছুতেই পড়তে রাজী হলেন না, অল্প হেসে বল্লেন—"আমার লেখার উপর দিয়েই চুকে গেছে, পড়া আমার আসে না। আপনি পড়ুন, আমি শুনি।" আমার পড়বার দরকার হল না,—মুখস্থ ছিল, আবৃত্তি করলাম। সে এক নূতন অভিজ্ঞতা,—কবির সাম্‌নে তাঁর কবিতার আবৃত্তি। তার আগে বন্ধুবান্ধবের কাছে, বাড়ীতে কতদিন কতবার ঐ কবিতা পড়েছি; কিন্তু সেদিন কণ্ঠে যেমন সুর পেলাম, তেমন আর কোন দিন পাই নি।

এর পরে যাওয়া-আসায় তাঁর সঙ্গে অল্পে-অল্পে আলাপ জম্‌তে সুরু হ'ল। তাঁর বই কিনবার ও পড়বার নেশা দেখে, আমি অবাক্ হয়ে যেতাম। তাঁর ঠাকুরদাদার লাইব্রেরীতে ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন, ভারতবর্ষের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কেতাব সংগ্রহ অনেক ছিল। দর্শনে তাঁর অভিরুচি খুব ছিল না বটে, কিন্তু তাও যে তাঁর পড়া ছিল না এমন নয়। ইতিহাস—দেশের ও বিদেশের—তাঁর মত পড়া খুব অল্প লোকেরই দেখেছি। তার পরে কাব্য ও সাহিত্যের ত কথাই নাই। পুরাণই কি তাঁর কম পড়া ছিল? যখনই কোথাও পৌরাণিক কিছুর উল্লেখ নির্ণয় করতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, তখনই তা কোথায় আছে বলে দিয়েছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যে কেমন ছিল, তা তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা খুব ভাল করেই জানেন। ফরাসী ভাষা জানা থাকাতে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের সকল মহলের চাবি যেন তাঁর মুঠোর ভিতর ছিল। য়ুরোপের নানা দেশের সাহিত্যের যে বিচিত্র সংগ্রহ তাঁর লাইব্রেরীতে স্থান পেয়েছিল, তা দেখ্‌লেই বোঝা যেত, তার পাণ্ডিত্য একাধারে কত ব্যাপক ও গভীর। অথচ একদিনের জন্যও জ্ঞানী বলে তাঁর কোন অভিমান দেখি নি। Pedantry তার চক্ষুশূল ছিল,—ও জিনিষটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না; যেখানে ওর গন্ধ পেতেন সেখান থেকে দূরে থাক্‌তেন।

স্বদেশের প্রতি গভীর প্রীতি সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রের আর-এক বিশেষত্ব ছিল। "কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল" কবিতা থেকে আরম্ভ করে' 'গান্ধিজী' পর্য্যন্ত সমস্ত কবিতার প্রত্যেকটি ছত্রে সে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় রয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তা কাজকর্ম্মের মধ্যে এই প্রেম যে নানা মূর্ত্তিতে ফুটে উঠ্‌ত, তা শুধু তাঁর বন্ধুরাই জানেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল একেবারে সাঁচ্চা,—খুঁটা স্বদেশিকতার মোহ তাঁকে কোন দিন আচ্ছন্ন করতে পারে নি। স্বদেশের বা স্বজাতির ভাল-মন্দ সব-কিছু নির্ব্বিশেষে আঁকড়িয়ে ধরে' তাকে জাতির প্রতি মমত্ববুদ্ধি বলে' ঘোষণা করার মত দুর্ব্বুদ্ধি তাঁর কখনো হয় নি। দেশের নামে কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, বা মনুষ্যত্বকে কোথাও খর্ব্ব করা হচ্ছে দেখ্‌লে, তিনি একেবারে অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌তেন। যেখানে দেশের লোকের অন্যায় বা অত্যাচার দেখেছেন, কাপট্য বা ভণ্ডামির পরিচয় পেয়েছেন, সেখানে নির্ম্মম হয়ে আঘাত করেছেন। আবার বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের হাতে স্বদেশবাসীর লাঞ্ছনা ও নির্যাতনকে ঠিক তেমনি জোরের ও সাহসের সঙ্গে আক্রমণ করে' তিনি তাঁর পৌরুষের পরিচয় দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের মত শান্ত লোক খুব কমই দেখেছি। কিন্তু পাঞ্জাবের ডায়ারী-কাণ্ড তাঁকে কি রকম উত্তেজিত করেছিল, তা আমি জানি। লাহোরে হাণ্টার-কমিটির সাম্‌নে ডায়ার যখন সাক্ষ্য দেয়, তখন আমি "ট্রিবিউন" কাগজে তার একটা বর্ণনা দিয়েছিলাম। সেই বর্ণনাটুকু সঙ্গে দিয়ে তাঁকে আমি একটা চিঠি লিখি। তাতে ২৫,০০০ নিরপরাধ ও নিরস্ত্র লোকের উপর গুলি চালিয়ে তার জন্ম ডায়ারের বাহাদুরী ও কমিটির দেশী সদস্যদের সঙ্গে তার উদ্ধত ব্যবহারের কথা সব ছিল। বর্ণনাটি পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে লিখ্‌লেন :—

একই গতি ; এদিক থেকে ও-দিকে, আর ওদিক থেকে এদিকে যাওয়া-আসাতেই ওর সার্থকতা।

(৩)

এখন আমাদের হাল্ তর্কের দুটো-একটা নমুনা দেওয়া যাক্। "চরকা" অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে চলে কি না, এ নিয়ে একটা মহা তর্ক বেধে গেছে। কিন্তু সে তর্কে, এক তর্ক ছাড়া আর কিছুই অগ্রসর হয় না। জানেনই ত, কোন দিকে অগ্রসর হওয়া পেণ্ডুলামের ধর্ম্ম নয়।

হাতের চরকা কলের চরকার সঙ্গে লড়াই করে জিতবে কি না, সে-সমস্যার মুখের কথায় কেউ সমাধান করতে পারেন না ; কেন না, ও লড়াইয়ের হার-জিত ফলেন পরিচীয়তে। এ যুদ্ধের ফলাফল কেউ গুণে বলে দিতে পারবেন না ; কেন না—সহজ-বুদ্ধিতে মনে হয় হারবে—কিন্তু যিনি বলেন জিতবে—তাঁকে এত "যত্তপিস্তাৎ"—ভাষান্তরে probabilities—নিয়ে গণনা করতে হবে যে, সে-গণনা শূন্যের সঙ্গে শূন্যের যোগ দেওয়ারই সামিল।

এক্ষেত্রে যদি কেউ বলেন যে, চরকার কথা মোটেই অর্থশাস্ত্রের কথা নয়, মোক্ষ-শাস্ত্রের কথা—তাহ'লে বিচারের বিষয় বদলে যায়। "বিজলী" বলেছেন যে, "চরকা" হচ্ছে আমাদের মুক্তির একটা সিম্বল (symbol) এ কথা ষোল আনা সত্য। এখন আমার কথা হচ্ছে এই যে, symbolকে real বলে ধরলে, প্রতীককে বাস্তব জ্ঞান করলে, উল্টো উৎপত্তি হয়। এবং যদি দেখা যায় যে, লোকে তাই করছে—তখন মনের পেণ্ডুলাম আবার দুলতে সুরু করে,—আর—দু-পক্ষের কাছে পালায়-পালায় গিয়ে বলে, "তোমার কথা ঠিক ঠিক ও অঠিক অঠিক।"

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। আপনারা দেখছি—ইংরাজি-শিক্ষার ফলে আমাদের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জন্মেছে কি না, এই নিয়ে ঘোর তর্ক সুরু করেছেন। পূর্ব্বপক্ষ বলছেন, তা জন্মেছে ; উত্তর-পক্ষ বলছেন, তা মরেছে। আমার মনে হয়, ও তর্ক নেহাৎ বাজে। কোন্ শিক্ষার ফলে কোন্ বিশেষ ভাব মানুষের মনে জন্মেছে—এ-জিজ্ঞাসা নিষ্ফল। কেন না শিক্ষার ফলে সমগ্র মন বদলায়,—সে-মনের কোনও একটা বিশেষ ভাব বদলায় না। আইডিয়া অবশ্য আমরা পরের কাছ থেকে নিতে পারি—কিন্তু পুরোনো মন নতুন আইডিয়া আত্মসাৎ যদি করতে না পারে—সে-মনের কাছে ঐ ধার-করা আইডিয়া শুধু মুখের কথা হয়ে থেকে যায়। আর তা নিয়ে তর্ক করা যায়, বক্তৃতা করা যায়, লেখা যায়, তার বেশী আর কিছু করা যায় না। আর যদি আত্মসাৎ করে—তাহলে সেই সঙ্গে সে-মন নতুন হয় ; সুতরাং এক্ষেত্রে আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমাদের মনের কি পরিবর্ত্তন হয়েছে ? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আমরা কেউ দিতে পারব না ; কারণ, সে পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ আমাদের মনের সুপ্ত-চৈতন্যেই হয়েছে,—ব্যক্ত-চৈতন্যে নয়। আমাদের মনের সজ্ঞান অংশ যে কত কম—তার খবর আজকের দিনে সকলেই রাখেন।

তার পর আমাদের মনের কোন্ অংশ বিলেতি, আর কোন্ অংশ দেশী, এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার কোনও অর্থ নেই। মন জিনিষটে হচ্ছে অখণ্ড। তার ভিতর এখন সব খোঁজ নেই, যার একটির ভিতর দেশী ভাব, আর একটির ভিতর বিদেশী ভাব, চাবি দেওয়া থাকে। তার পর যদি কেউ—এমন গুণী থাকেন—যে তিনি আমাদের মনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে পারেন, তাহলেও সেই বিশ্লিষ্ট মানসিক দেশী ও বিদেশী উপাদান আমাদের কোন কাজে লাগবে না। আমাদের পিপাসা পেলে, আমরা আগে দু ঢোক হাইড্রোজেন, পরে এক ঢোক অক্সিজেন খাই নে ; খাই একেবারে এক ঢোক জল। তেমনি আমাদের জীবনের সকল কারবার করতে হবে—আমাদের বর্ত্তমান মিশ্র-মন দিয়েই, কোন কাল্পনিক—শুদ্ধ মন দিয়ে নয়। যে-মন আমাদের আছে, তাই দিয়েই আমরা ভাব্ব, রাগ্ব, কাজ করব। কি করে সে-মন তৈরি হয়েছে, তার ভাবনা ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিকরা ভাববেন—আপনার-আমার তা ভেবে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই।

অবশেষে যে তর্ক আপনারা তুলেছেন, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এক্ষেত্রে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ উভয়ের কথাই যুগপৎ ঠিক ও অঠিক। স্বাধীনতার আইডিয়া যে ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমাদের মনে এসেছে, এ-কথাও যেমন সত্য—আর সে-আইডিয়া যে আমাদের মনে পুরো বসে যায় নি, সে-কথাও তেমনি সত্য। এর প্রমাণ রাজ-নৈতিক স্বাধীনতার কথা যখন আমরা বলি, তখন আমরা গোরা হয়ে উঠি,—আর সামাজিক, নৈতিক, মানসিক স্বাধীনতার কথা শুনলেই আমরা আবার হিন্দু হয়ে পড়ি। এ কথা কি বলা দরকার যে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও সমগ্র মনের আকাঙ্ক্ষা—তার কোনও একটা বিশেষ অংশের আকাঙ্ক্ষা নয়—কারণ মনের কোনও অঙ্গ নেই ; মন ত আর দেহ নয়। আমার আজকের চিঠি দেখছি—শেষটা দর্শনের কোঠায় এসে পড়ল। "যো আপ্ সে আতা উস্‌কে আনে দো" এ উপদেশ অনুসরণ করে আর একটি কথা বলব।

আমাদের অধিকাংশ তর্ক-যুদ্ধ যে শূন্যে তলওয়ার চালানো, তার কারণ, আমরা বেশির ভাগ abstraction নিয়ে তর্ক করি ; অর্থাৎ সেই জিনিষ, যার নাম আছে কিন্তু রূপ নেই। দেশী মনও যেমন একটি abstraction, বিলেতি মনও তেমনি একটি abstraction। অর্থাৎ বস্তুতঃ ও-দুয়ের কোনও সত্তা নেই। "বিজলীর" যে-প্রবন্ধের পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, তার নাম "ভাব ও অভাব"। বলা বাহুল্য, ও দুটিই হচ্ছে নিছক abstraction। যা আছে তা হচ্ছে "স্বভাব"—তার থেকে এক দিকে abstract করে আমরা পাই ভাব, আর অপর দিকে অভাব। কিন্তু যা আছে, তার ভিতর ও-দুয়ের কোনও বিরোধ নেই। দুই মিলে-মিশে আছে। যাকে আমরা Universal বলি, তা concreteএর মধ্যেই আছে ও থাকে ; আর যাকে আমরা concrete বলি, তা Universalএর মধ্যেই আছে ও থাকে। মানুষের বাইরে মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই ; আর মনুষ্যত্ব ছাড়া মানুষ নেই। অতএব দাঁড়াল এই যে, "চাল আক্রা ডাল আক্রা, অথচ আমাদের ঘুড়ি ওড়াতেই হবে"।

এতে কেউ ভয় পাবেন না,—আমরা পরস্পর পরস্পরের ভাবের ঘুড়ি পেঁচ লাগিয়ে কেটে দেব। সুতরাং যার খুসি তিনি চাল ডালের দর নিয়েই পড়ে থাকতে পারেন। (আত্মশক্তি)

দুঃখিনীর সম্বল

শিল্পী—হর্টেন্স রিচার্ড

[শ্রীযুত তারকব্রহ্ম চৌধুরী ও শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী
মহাশয়ের শিল্প-সংগ্রহ হইতে]

উদ্বেগ এবং আশঙ্কা

শিল্পী—ডিমোরেটন

[শ্রীযুত তারকব্রহ্ম চৌধুরী ও শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের শিল্প-সংগ্রহ হইতে]

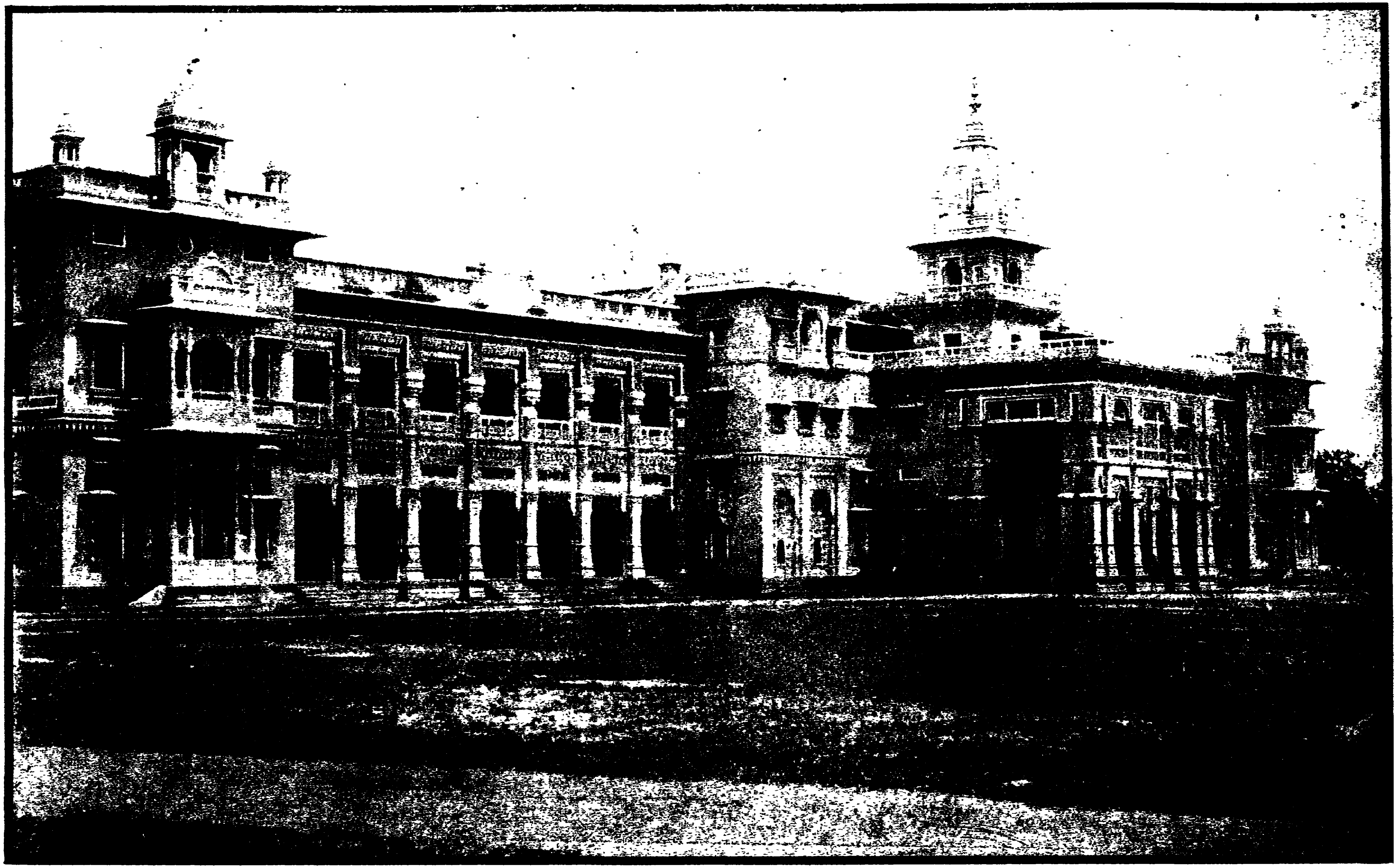

বারাণসী হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়

পল্লীবালা

[শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ সাহা মহাশয়ের আলোক-চিত্র হইতে গৃহীত]

প্রসাধন

[শ্রীমান অজিতকুমার সেনের চিত্রশালা হইতে]

ভরা-ভাদর

শিল্পী এম, ত্রিগারী ।

কলেজ-স্কোয়ার সন্তরণ-সমিতি

মধ্যস্থলে উপবিষ্ট পদব্রজে ভূ-প্রদক্ষিণকারী মিঃ দাশগুপ্ত

"সাজাহানে"র গান *

সপ্তম গীত।

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

মিশ্র ভৈরবী—একতালা।

সজ্জিতা রমণীগণ

বেলা ব'য়ে যায়—
ছোট মোদের পান্সী-তরী, সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল, যূথী দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমী পাইল উড়্ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেল্ছে তরী, দুল্ছে তরী—ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক্, নূতন প্রেমে ভোর;
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর;
বাঁশীর ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠ্ছে ছুটে ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বল্ছে আকাশ সাঁঝের তপনে;—
পূর্ব্বে ঐ বুন্ছে চন্দ্র মধুর স্বপনে;
কচ্ছে' নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায়।

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

	০			১			২´			৩			
II {	া	া	ণা |	সা	জ্ঞা	মা I	পা	-া	-া |	-া	-া	-া }	|
	০	০	বে	লা	ব	য়ে	যা	০	০	০	০	য়	

* "সাজাহানে"র গানের স্বরলিপি 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে, এবং অভিনয়কালে গানগুলি যে সুরে ও তালে গীত হইয়া থাকে, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

০ ১ ২´ ৩
| { পা পা -া | ণা ণা -া I মা -া মা | পা পা -া |
ছো ট • মো দে র্ পা ন্ সী ত রী •

০ ১ ২´ ৩
| জ্ঞা -া জ্ঞা | রা -সা রা | জ্ঞমা -পা রা | জ্ঞা -া -া } |
স ঙ্ গে তে • কে যা৹ • বি আ • য়

০ ১ ২´ ৩
II { া া জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া | মা রা -া |
০ ০ দো লে হা র্ ব কু ল্ যূ থী ০

০ ১ ২´ ৩
| জ্ঞা পা -া | ধা -া ধা I ণা -া -া | -া -া -া I
দি য়ে ০ গাঁ ০ থা সে ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| া া ণণা | ণা ণা ণণা I দা -া দা | দা পা -া I
০ ০ রেশ্ মী পা ইল্ উ ড়্ ছে ম ধু র

০ ১ ২´ ৩
| জ্ঞা মা -া | রা -া রা I জ্ঞা -া -া | -া -া -া } I
ম ধু র্ বা ০ তা সে ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| { র্রা -া র্রা | র্রা জ্ঞা -র্রা I র্সা -া র্সা | ণধা ণা -া I
হে ল্ ছে ত রী • দু ল্ ছে ত৹ রী ০

০ ১ ২´ ৩
I া া দা | দা পা -মমা I মপা -দা পা | মা -া -া } II
• • ভে সে যা চ্ছে দ• • রি য়া • য়

০ ১ ২´ ৩
II { া া জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া | মমা রা -া |
• • যা ত্রী স ব্ নূ ত ন্ প্রে মি ক্

০ ১ ২´ ৩
| জ্ঞা পা -া | র্ধা -া ধা I ণা -া -া | -া -া -া |
ন্ ত ন্ প্রে • মে ভো • ০ ০ ০ র্

০ ১ ২´ ৩
| া া ণা | ণা ণা -া I দা দা -া | দা পা -া |
০ ০ মু খে স ব্ হা সি র্ রে খা ০

০ ১ ২´ ৩
| জ্ঞা মা -া | রা রা -া I জ্ঞা -া -া | -া -া -া } |
চো খে ০ স্ব মে র্ ঘো ০ ০ ০ ০ র্

০ ১ ২´ ৩
|{ র্রা র্রা -া | র্র্রা জ্ঞা -র্রা I র্সা র্সা -া | ণধা ণা -া |
বাঁ শী র্ ধ্ব নি ০ হা সি র্ ধ্ব নি ০

০ ১ ২´ ৩
| া া দদা | দা পা মা I মপা -দা পা | মা -া -া }II
• ০ উঠ্ ছে ছু টে ফো০ ০ য়া বা ০ য়

০ ১ ২´ ৩
II{ া া জ্ঞা | -জ্ঞজ্ঞা জ্ঞা -া I জ্ঞা -া জ্ঞা | মা রা -া |
০ ০ প শ্চি মে ০ জ্ব ল্ ছে আ কা শ্

০ ১ ২´ ৩
| জ্ঞা পা -া | ধা -া ধা I ণা -া -া | -া -া -া |
সাঁ ঝে র্ ত • প নে ০ ০ ০ ০ •

০ ১ ২´ ৩
| া া ণণ | ণা ণা -া I দা -া দা | দা -া পপা |
০ • পূর্ বে ও ই বু ন্ ছে চ ন্ দ্র

০ ১ ২´ ৩
| জ্ঞা মা -া | রা -া রা I জ্ঞা -া -া | -া -া -া } |
ম ধু র্ স্ব • প নে • • ০ ০ •

০			১			২´			৩		•
|{ র্রা	-া	র্রা |	র্রা	জ্ঞা	-র্রা I	র্সা	র্সা	-া |	ণধা	ণা	-া |
ক	র্	ছে	ন	দী	॰	কু	লু	॰	ধ্ব	নি	•
০			১	• •		২´			৩		
| া	া	দা |	দদা	পপা	মমা I	মপা	-দা	পপা |	মা	-া	-া } III
॰	॰	ব	ইছে	মৃ	দু॰	ম॰	॰	ধুর্	বা	॰	য়

গানখানি যে ভাবে রচিত হইয়াছে, সেই ভাবটার ভৈরবী রাগিণীর সহিত সামঞ্জস্য করা যায় না। তাই দিবা ৪র্থ প্রহরের কোন এক রাগিণীতে না গাহিয়া, গানটি দিবা ১ম প্রহরের ঐ রাগিণীতে কেন যে গীত হইয়া থাকে, বুঝিতে পারা গেল না। —লেখিকা।

ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান (১)

[শ্রীসত্যভূষণ সেন]

ব্রহ্মপুত্র ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান নদ। শুধু ভারতবর্ষ কেন,—সমস্ত পৃথিবীর নদ-নদীর হিসাব ধরিলেও ব্রহ্মপুত্র নেহাৎ নগণ্য হইয়া পড়ে না। ভারতবর্ষে ইহার খ্যাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের পুরাণে, ইতিহাসে, কাব্যে, সাহিত্যে, ব্রহ্মপুত্রের উল্লেখ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। ইহারই তীরে নীলপর্ব্বতবাসিনী কামাখ্যাদেবীর মন্দির তীর্থ হিসাবে অদ্বিতীয় স্থান। তীর্থ-হিসাবে ব্রহ্মপুত্রের সলিলে অবগাহন অতি পুণ্য-কার্য্য বলিয়া বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর ব্রহ্মপুত্র-তীরে ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে "পুণ্যপিপাসু" কত শত-সহস্র, লক্ষ-লক্ষ লোক ইহার জলে স্নান করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, তাহার সংখ্যা হয় না। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে এই যে পবিত্র ধারা বহিয়া চলিয়াছে, ইহার মূল কোথায়,—কোথা হইতে এই অজস্র জল-প্রবাহের সরবরাহ হয়?

যাঁহারা ভৌগোলিক তথ্যের ধার ধারেন না, তাঁহারা সাধারণতঃ জানেন যে, ব্রহ্মপুত্র নদ মানস-সরোবর হইতে উদ্ভূত। যাঁহারা পুণ্যকামী, এই বিশ্বাসে তাঁহারা পর্ব্বাদি উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র-স্নানে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই বেশী পরিমাণে অনুভব করেন। যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা মানস-সরোবরের নাম শুনিলে নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা করিবেন, যেন মানস-সরোবর হইতে ব্রহ্মপুত্রের উদ্ভবের কথাই সত্য হয়। কিন্তু তাঁহাদের এই ভ্রান্তি আর রক্ষা পাইতেছে না; বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোচনায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যে, মানস-সরোবরের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের কোন সংশ্রব নাই।

মানস-সরোবর হইতে প্রকৃত পক্ষে কোন্-কোন্ নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা লইয়া চীন দেশে এবং ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও বিস্তর আলোচনা হইয়াছে;—সে অতি বিস্তৃত কাহিনী। চীন-সম্রাট Kang Hi (১৬৬২-১৭২২ খৃষ্টাব্দ) একবার সমস্ত তিব্বত প্রদেশটা জরীপ করিবার জন্য লামাদের নিয়োগ করেন। এই লামারা তিব্বতের পশ্চিম দিকটা বিশেষ যত্নের সহিতই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়; এবং মানস-সরোবরের তীরেও তাঁহারা অনেক দিন কাটাইয়াছিলেন দেখা যায়। তাঁহারা মানস-সরোবরের এ-দিকটার যে বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন (১৭১৭ খৃঃ) তাহা বাস্তবিকই এই প্রদেশের অনেকটা প্রকৃত পরিচয়। মানস-সরোবর হইতে যে সব নদীর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের নাম নাই। লামাদের এই বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিয়া D'Auville এক মানচিত্র প্রকাশ করেন।

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে (মেদিনীপুরে) পঠিত।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যে D'Auvilleএর মানচিত্রই এ প্রদেশের প্রথম প্রামাণিক বিবরণ। বাস্তবিক মানস-সরোবরের ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর মানচিত্র পরবর্ত্তী দেড় শত বৎসরের মধ্যেও প্রস্তুত হয় নাই।

D'Auvilleএর পরে Tieffenthalerএর মানচিত্র (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের পরে)। ইনি Jesuit সম্প্রদায়ের একজন পুরোহিত (Father)। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এ সব বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁহার নাই। মোগল-সম্রাট আকবর যে মানচিত্র তৈয়ার করাইয়াছিলেন (১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে), Tieffenthalerএর মানচিত্র সম্ভবতঃ তাহারই প্রতিলিপি। Tieffenthalerএর বৃত্তান্তে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান মানস-সরোবরে দেখান হইয়াছে। Tieffenthalerএর মানচিত্র এবং তাহার আনুষঙ্গিক বিবরণ প্রচার করেন Auquelil।

Auquelil—D'Auvilleএর মানচিত্র লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাম্পু (Tsangpo) এবং ব্রহ্মপুত্র একই নদ; এবং Tieffenthalerএর সহিত একমত হইয়া তিনি বলেন যে, ইহার উৎপত্তি-স্থান মানস-সরোবরে। মানস-সরোবর হইতে যে কি করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান দেখান হয়, সেটা একটু আশ্চর্য্যের বিষয়; কারণ, মানস-সরোবরের পূর্ব্বতীরে যে মোটে একটী নদীর সহিত তাহার সংযোগ আছে, সে সম্বন্ধে সকলেই একমত। আর সেই নদী যে মানস-সরোবর হইতে বাহির হয় নাই, বরং মানস-সরোবরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও সকলেরই জানা ছিল। কাজেই মনে হয় যে, আকবরের প্রেরিত লোকেরা পরিদর্শনের সময় দেখিয়া গিয়াছিলেন যে একটী নদী আছে; কিন্তু পরে মানচিত্র তৈয়ার করিবার সময় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, নদীর গতি বাস্তবিক কোন্ দিকে ছিল। তার পরে এই নদীকে ব্রহ্মপুত্র মনে করিবার অন্য যে কোন কারণ থাকুক, একটা আনুমানিক কারণ এই হইতে পারে—বিশেষ জরীপ-কর্ত্তারা যদি হিন্দু হইয়া থাকেন—যে, মানস-সরোবর যখন ব্রহ্মার মানস বা ইচ্ছাশক্তি হইতে জাত, (২) তখন ব্রহ্মপুত্র ও (ব্রহ্মার পুত্র) এই হ্রদ হইতে উৎপন্ন না হইয়া যায় না।

ব্রহ্মপুত্রের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ ভারতবর্ষে আসাম এবং বঙ্গদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত, অপরাংশ তিব্বতে। তিব্বতে ইহার নাম সাম্পু (Tsangpo);—পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভি-মুখে ইহার গতি। এই সাম্পুই তিব্বতের প্রধান নদী; ইহারই উপত্যকায় দেশের সভ্যতা এবং কর্ম্ম-প্রচেষ্টার যত প্রধান-প্রধান স্থান। তিব্বতের রাজধানী লাসা (Lhasa উচ্চতা ৯৩৪১ ফিট্) ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত (২৯'৪০' উত্তর অক্ষরেখা, Latitude; ৯১' পূর্ব্ব দ্রাঘিমা Longitude)। দেশের প্রধান পুরুষ দালাই লামা এই নগর হইতেই রাজ্য শাসন করেন। তাসিলামার রাজধানী শিগাজী (Shigatse, উচ্চতা ১২৮৫০ ফিট্) লাসা হইতে প্রায় ১৫০ মাইল পশ্চিমে নদীতীর হইতে অনতিদূরে অবস্থিত (২৯'১৫' উত্তর অক্ষরেখা, ৮৯' পূর্ব্ব দ্রাঘিমা। শিগাজী হইতে প্রায় ৫৫ মাইল পশ্চিমে—উত্তর দিক হইতে একটি নদী আসিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিশিয়াছে। ইহার নাম রাগা-সাম্পু (Raga Tsangpo)—দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩০ মাইল। এই সঙ্গম-স্থল (উচ্চতা ১৩১১৬ ফিট্) হইতে প্রায় ৩৩০ মাইল আরও পশ্চিমে শামসাং (Shamsang) নামক স্থানে আর একটি সঙ্গমস্থল; এই স্থানের উচ্চতা ১৫৪১০ ফিট্। শামসাংএর নীচে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে কতকদূর পর্য্যন্ত এই নদ (ব্রহ্মপুত্র) মারসাং সাম্পু (Martsang Tsangpo) নামে পরিচিত। উত্তর এবং দক্ষিণ দিক হইতে অনেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী মূল সাম্পুতে আসিয়া মিশিয়াছে সত্য; কিন্তু শাম্সাং পর্য্যন্ত সাম্পুই যে মূল প্রবাহ, তাহা অবিসংবাদিত সত্য। শাম্সাং-এর পরে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে এই নদীর মূল প্রবাহ সম্বন্ধে আধুনিক যুগেও অনেক দিন পর্য্যন্ত অনিশ্চয়তা ছিল।

সুবিখ্যাত Col. Montgomerieএর নিয়োগে নয়ান সিং (Nain Singh) নামে একজন ভারতবাসী ১৮৬৫ সালে সাম্পু উপত্যকার পশ্চিমাংশে আসিয়াছিলেন। তিনি শামসাং হইতে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মরিয়ম লা (Marium La) গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, দক্ষিণে যে সকল সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায়, তাহারই মধ্যে কোনও স্থলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান পাওয়া যাইবে।

Thomas Webber নামে এক ব্যক্তি আসিয়াছিলেন ১৮৬৬ সালে। তাঁহার গন্তব্য পথ ছিল নয়ান সিংএর পথের

(২) স্কন্দ পুরাণের উপাখ্যান।

একটু দক্ষিণে সরিয়া; কাজেই তাঁহাকে পথে ব্রহ্মপুত্রের কয়েকটি উৎস অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু, মূল নদীর উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে তিনি নূতন কথা কিছুই বলিতে পারেন নাই।

১৯০৪ সালে Rawling সাহেবের অধীনে যে সরকারী অভিযান প্রেরিত হয়, তাহাদের গন্তব্যস্থল ছিল গারটক (Gartok; পশ্চিম তিব্বতের একটি প্রধান নগর)। এই অভিযানের ফলে উপর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এক অতি চমৎকার মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এই অভিযানও নয়ান সিংএরই পথে মরিয়ম লা (Marium La) গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া মানস-সরোবরের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। কাজেই ব্রহ্মপুত্রের মূল উৎপত্তি-স্থান নয়ান সিংএর মত ইহাদেরও গন্তব্য পথের প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণে পড়িয়া ছিল। এই অভিযানেরই Major Ryderএর মানচিত্রে (১৯০৪ সালে) Chema-Yundungকে ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহ বলিয়া দেখান হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের মূল উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কার করেন—সুপ্রসিদ্ধ সুইডীস পর্য্যটক ডাক্তার স্বেন হেডিন (Dr. Sven Hedin)। তিনি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি শামসাংএ আসিয়া দেখিলেন (জুলাই ৮, ১৯০৭ সাল) যে, Chema-Yundung এবং Kubi Tsangpo নামে দুইটি স্রোতস্বতী একত্র মিশিয়া পূর্ব্ব-কথিত Martsang Tsangpo প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে। এখন এই দুই স্রোতের মধ্যে কোন্‌টি মূল প্রবাহ, তাহা নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে তিনি পরিমাপ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, কোন্ স্রোত হইতে কত পরিমাণ জল আসিয়া Martsang Tsangpoতে পড়ে। তিনি পরিমাণ করিয়া দেখিলেন যে, মূল Martsang Tsangpo জল-প্রবাহের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৫৫৪ ঘনফুট। Chema-Yundungএর ৩৫৩ ঘনফুট। কাজেই Kubi Tsangpo'র প্রবাহের পরিমাণ হয় (১৫৫৪—৩৫৩) ১২০১ ঘনফুট; অর্থাৎ Chema-Yundungএর তিনগুণেরও বেশী। আবার শামসাংএর সঙ্গমস্থল হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে মরিয়ম চু (Marium Chu) নামে আর একটি স্রোত আসিয়া Chema Yundungএ মিশিয়াছে। অর্থাৎ শামসাংএ Chema Yundungএর যে ৩৫৩ ঘনফুট জল-প্রবাহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই দুইটি স্রোতের মিলিত প্রবাহ। কাজেই Chema Yundung এবং Marium Chu—ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে Kubi Tsangpo অনেক বড়। অতএব Kubi Tsangpoই যে মূল প্রবাহ, সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। ইহার উপরে Hedin সাহেব এ তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন যে, সেখানকার স্থানীয় লোকেরা কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংবাদ না রাখিয়াও Kubi Tsangpoকেই Martsangpo'র উপরের প্রবাহ বলিয়া জানে।

Hedin সাহেবের মানচিত্র হইতে দেখা যায় যে, তিনি Shamshang হইতে ঠিক Kubi Tsangpo'র পথে যান নাই। তিনি Chema Yundungএর প্রবাহ ধরিয়া প্রায় ১৫ মাইল গিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া আরও প্রায় ১০ মাইল আসিয়া, Tso-Niti-Kargong নামে একটি ক্ষুদ্র গিরিবর্ত্মে আসিয়া পৌছান। Shamshang হইতে সরল রেখায় ইহার দূরত্ব প্রায় ১২ মাইল। এই গিরিবর্ত্ম যে পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত, সেই পর্ব্বতই একদিকে Kubi এবং অপরদিকে Chema Yundung এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী জলবিভাজক রেখা (Water-Shed)। Tso-Niti-Kargongএর পথ হইতে এই পথই Kubi'র প্রবাহের সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে। এইখানে Kubi'র জল খুবই কর্দ্দমাক্ত; কিন্তু নদীর দক্ষিণ তীরে একটি ক্ষুদ্র হ্রদ (নাম Lhayak) আছে; তাহার জল অতি পরিষ্কার। এ স্থান হইতে চারিদিককার দৃশ্য খুবই চমৎকার। উত্তরে দূরে উচ্চ পর্ব্বতের শ্রেণী-পরম্পরা। সেই সকল পর্ব্বতের গা বাহিয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনেক স্রোতস্বতী নামিয়া আসিয়া Tsangpo'র প্রবাহে মিশিয়াছে। দক্ষিণদিককার দৃশ্য আরও চমকপ্রদ। অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শ্রেণী-পরম্পরা ত আছেই; তার উপরে স্থানবিশেষে তুষারের রাজ্য—যেখান হইতে হিমধারা (glacier) বাহির হইয়া পার্ব্বত্য ভূমির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

দক্ষিণ দিককার এই সব উচ্চতার মধ্যে Ngomodingdingএর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখান হইতে যে হিমধারা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে প্রভূত পরিমাণে

Kubi Tsangpo'র জল সরবরাহ হয়। পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে আর এক পর্ব্বতশ্রেণী Dong-dong; এখান হইতে যে হিমধারা বাহির হইয়াছে, তাহাও Ngomo-ding-dingএর হিমধারার সমানই বড়।

Dong-dongএর উত্তরে Chema-Yunlung-Pu (উচ্চতা ২১৮৫০ ফিট্)। এই পর্ব্বতেই Chema-Yundung নদীর উৎপত্তি। Lhayah হ্রদের নিকট হইতে এই সকল তুষার-পর্ব্বত খুবই নিকটে বলিয়া বোধ হয়;—প্রকৃত পক্ষে দূরত্ব খুব বেশী নয়—১০।১২।১৫ মাইলের মধ্যেই হইবে। Lhayahএর পরে নদীর মধ্যে কয়েকটা চড়া থাকাতে, মূল নদী কয়েকটা শাখাতে বিভক্ত হইয়াছে। কিছু দূর অগ্রসর হইলে (Lhayah হইতে প্রায় ৫।৬ মাইলের মধ্যে) দেখা যায়, Dong-dong হইতে একটি স্রোতস্বতী আসিয়া Kubi'র সহিত (বামতীরে) মিশিয়াছে;—ইহার নাম Dong-dong-chu। একটু পরেই (Kubi'র বামতীরেই) Tse-Chungo-tso নামক ক্ষুদ্র হ্রদ। এখান হইতে উপত্যকা-ভূমির উচ্চতা ক্রমেই বাড়িতেছে। এখানকার ভূমিও নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তরময় নয়,—মাঝে মাঝে ঘাসের আস্তরণও দেখা যায়। অবশেষে নদীর বিস্তৃতি বাড়িতে-বাড়িতে, নদী একটা হ্রদের মত আকার ধারণ করিয়াছে। এ স্থানের উচ্চতা প্রায় ১৫৮৮৩ ফিট্।

এখানে—Kubi'র পশ্চিম তীরে—পূর্ব্বে যে এক প্রকাণ্ড হিমধারা প্রবাহিত ছিল, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে স্থানে-স্থানে ক্ষুদ্র নুড়ি পাথর এবং তৃণ-পুষ্পের সজ্জায় বৎসরে ক্ষণস্থায়ী বসন্তের বাহারও একবার করিয়া ফুটিয়া উঠে। উপত্যকার নিম্নপ্রদেশে জলা-ভূমিতে ঘাসের প্রাচুর্য্য এবং হ্রদের বক্ষে বন্য হংসের কলগীতিও বসন্তের কথাই মনে করাইয়া দেয়। কখন-কখনও বন্য চামরী-যূথের সঙ্গেও দেখা হয়।

Kubi'র পূর্ব্বতীরে একটা অনতি-উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। তাহার উপরে স্থানে-স্থানে তুষার পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্ম ঋতুর উষ্ণতায় তুষাররাশি অনেকটা গলিয়া পড়িতেছে। পর্ব্বতের নিম্নভূমি খুবই সমতল। উপরের পর্ব্বত হইতে একটি স্রোতস্বতী এই সমতল ভূমিতে আসিয়া হ্রদে পরিণত হইয়াছে।

এখানে আসিলে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক পর্য্যন্ত সমস্ত তুষার-পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে নয়টি অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়—অবশ্য যদি মেঘের আবরণে ঢাকিয়া না পড়ে। একযোগে এই সমস্ত পর্ব্বত-শ্রেণীর নাম Kubi-Gangri। এখানে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে ২৭° ডিগ্রি পূর্ব্ব দিকে Ngomo-ding-ding পর্ব্বত, ১১° ডিগ্রি পূর্ব্বে Absi পর্ব্বত। এই দুই পর্ব্বতের মাঝখানে Ngomo-ding-dingএর হিমধারা (Ngomo-ding-ding Glacier)। Absi পর্ব্বতের পশ্চিমে Absi হিমধারা; পশ্চিমে (২৪° পশ্চিমে) Mukchung-Simo পর্ব্বত সমষ্টির সর্ব্বোচ্চ পুচ্ছ। ৫৭° ডিগ্রি পশ্চিমে চারিটি উচ্চ শিখর; ইহাদের মধ্যে দুইটি গম্বুজাকার শুধুই বরফ এবং তুষারের স্তূপ। এ কয়টিই Langta Chen পর্ব্বতের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্ব্বতের বরফ এবং তুষাররাশি হইতে মূল ব্রহ্মপুত্র হিমধারাও (Glacier) প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধি লাভ করে। ৭০°, ৮৩°, এবং ৮৮° ডিগ্রি পশ্চিমে Gave-ting পর্ব্বতের শিখরসমূহ। উত্তরাভিমুখে ৫৫° ডিগ্রি পশ্চিমে Dong-Dong পর্ব্বতের তিনটি শিখর। এখান হইতেই পূর্ব্বোল্লিখিত Dong-Dong Chu স্রোতস্বতী বাহির হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব্ব দিকে Kubi'র উপত্যকা অনেকটা নীচু হইয়া আসিয়াছে। দূরে Chantang পর্ব্বতের শিখাসমূহ চক্রবাল-রেখায় তুষার-রাজ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এখান হইতে চারিদিকে, বিশেষ পশ্চিম-দক্ষিণ হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে দৃশ্য দেখা যায়,—পর্ব্বতের পর পর্ব্বতের শ্রেণী-পরম্পরা, বিভিন্ন আকার এবং আয়তনের পর্ব্বতের শিখরসমূহ—কোনটা গম্বুজাকার, কোনটা স্তম্ভের মত, কোনটা পিরামিডের ন্যায়; পুরাতন হিমধারার পথ-রেখা, বর্ত্তমান হিমধারার প্রবাহ, হিমধারা হইতে উৎপন্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জলস্রোত, বরফ এবং তুষারের বিস্তৃতি—এ সব মিলিয়া যে একটা উচ্ছৃঙ্খল প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, নৈসর্গিক জগতে তাহার উপমা খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

পশ্চিমে Gaveting এবং Langta chen পর্ব্বতের মাঝখানে Gavetingএর দিক হইতে একটা প্রকাণ্ড হিমধারা (Glacier) নামিয়া আসিয়াছে। Dr. Hedin সাহেবের মানচিত্রে ইহাকেই ব্রহ্মপুত্রের হিমধারা (Brahmaputra Glacier) বলিয়া দেখান হইয়াছে।

এই হিমধারা হইতে যে স্রোতস্বতী বাহির হইয়াছে, তাহাই সকলের চেয়ে বড়। সমগ্র Kubi Gangri হইতে অন্যান্য যে সকল স্রোত জন্মলাভ করিয়াছে, ইহার সহিত তাহাদের কাহারও তুলনা হয় না। অতএব ব্রহ্মপুত্র-হিমধারার এই স্রোতস্বতীই Kubi Tsangpoর মূল ধারা। অতএব, এইখানেই ব্রহ্মপুত্র নদের মূল উৎপত্তি-স্থান—সমুদ্র গর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা ১৫৯৬৮ ফিট; অবস্থিতি—৮২'২০´ পূঃ দ্রাঃ ; ৩০'১০´ উঃ অক্ষরেখা।

অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য যে, একটি স্রোতস্বতী বা একটা হিমধারা হইতে ব্রহ্মপুত্রের মত এত বড় একটা নদী পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বে যে সকল পর্ব্বতমালা এবং হিমধারার কথা বলা হইল, তাহাদের অঙ্গ হইতে শত-শত ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বাহির হইয়া সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে উহার পুষ্টিসাধন করিতেছে। পথে Kubi উপত্যকার দুই ধারে যে সকল পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, তাহাদের জলধারাও Kubi Tsangpoকেই সমৃদ্ধ করে। পরে Chema Yundung এবং Marium Chu'র ন্যায় বড় বড় স্রোতধারা আসিয়া ইহার সহিত মিলিয়া, এই Kubi Tsangpoকে ব্রহ্মপুত্র নামে দেশ-দেশান্তরে প্রবাহ যোগাইতে সমর্থ করিতেছে।

মূলতঃ হিমধারা হইতে সাম্‌পুর উৎপত্তি দেখান হইয়াছে। ঐ সকল পর্ব্বতে শীত ঋতুতে যে তুষারপাত হয়, গ্রীষ্মের উষ্ণতায় তাহাই গলিয়া পড়িয়া হিমধারার বরফের সহিত মিলিয়া যে প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তাহাতেই নদী প্রধানতঃ সমৃদ্ধ হয়। বর্ষার জল-প্রবাহ তাহার তুলনায় অনেক কম; কারণ, এসব দেশে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত খুবই অল্প। সামপুরই নিম্ন-প্রবাহে আবার বর্ষার জলধারাই বেশী—সেখানে তুষার এবং বরফের প্রভাব অনেক কম। এই সব কারণে উচ্চতর প্রদেশে ঋতুভেদে নদীতে জলের প্রবাহের যতটা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, নিম্নপ্রদেশে হ্রাসবৃদ্ধির তীক্ষ্ণতা ততটা নয়।

এ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে যে আলোচনা হইল, তাহাতে তিব্বতের সাম্‌পুকেই ভারতবর্ষের ব্রহ্মপুত্রের উপরের প্রবাহ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, এই ধারণা কতটা বিচারসহ। কোন নদীর উৎপত্তি-স্থান অনুসন্ধান করিতে হইলে, সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে, নদীর প্রবাহ ধরিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের বেলায় এ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় নাই; কারণ, আসামের শেষসীমা ডিব্রুগড়ের পরে আবর প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়দের বাধা অতিক্রম করিয়া কেহই আর ঐ দিকে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বিগত আবর অভিযানের পর হইতে কিছু-কিছু চেষ্টা হইতেছে,—এই চেষ্টায় অবশ্য ভৌগোলিকদের অপেক্ষা রাজনীতিকদেরই গরজ বেশী। হিমালয়ের অপর পারে তিব্বতীয়েরা তাহাদের দেশের দ্বার বিদেশীয়দের নিকট রুদ্ধ রাখিতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কাজেই সেদিক হইতেও অনুসন্ধান করিবার কোন সুযোগ হয় নাই। তিব্বতীয়েরাও তাহাদের সাম্পু নদীর শেষ পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞ। তাহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস—তাহাদের মধ্যে এরূপ পুরাণ কাহিনীও প্রচলিত আছে যে, তাহাদের দেশের এই সাম্পু নদী কোনও স্থানে গিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়াছে। সেখানে কতকগুলি অসভ্য লোকের বাস; তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় থাকে এবং বানর ও সরীসৃপ প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করে। এই রকম কিম্বদন্তীও আছে যে, সেই লোকদের মস্তকে শিং আছে এবং তাহাদের মায়েরা নিজ সন্তান চিনে না।

ভৌগোলিকদের মধ্যেও অনেক দিন পর্য্যন্ত খুবই একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, এই সাম্পু ব্রহ্মপুত্র রূপে ভারতবর্ষেই প্রবেশ করিয়াছে, অথবা ইরাবতী নদী হইয়া ব্রহ্মদেশে গিয়া হাজির হইয়াছে।

ইয়োরোপীয় পর্য্যটকেরা অনেকে সাম্পু-প্রবাহের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ওদিকে অসভ্য জাতীয়দের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। Capt. Harman নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার একবার Kintoop নামে একজন তিব্বতীয়কে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। Kintoop তাহার অসামান্য প্রতিভা-বলে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। যখন তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, তখন সে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-মত সাম্‌পুর জলস্রোতে ৫০০ খণ্ড কাঠের টুকরা ছাড়িয়া দিল। এই কাষ্ঠখণ্ডগুলি এক ফুট লম্বা করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ছিল। কথা ছিল যে, এই কাষ্ঠখণ্ডগুলি সাম্‌পুর জলস্রোতে ছাড়িয়া দিয়া ডিব্রুগড়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে অনুসন্ধান রাখিতে হইবে; কারণ,

যদি ব্রহ্মপুত্র আর সাম্পু একই নদী হয়, তবে অন্ততঃ ২।৪টী কাষ্ঠখণ্ড অবশ্যই এই পথে ভাসিয়া আসিবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ Capt. Harman কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারে Frost bite এ মারা পড়েন। কাজেই ডিব্রুগড়ে সেই কাষ্ঠখণ্ডগুলির অনুসন্ধান রাখিবারও কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। Kintoop-এর এই বিবরণ ভারতীয় জরীপ বিভাগের (India Survey Department) রিপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে।

যতদূর জানা যায়,—এ পর্য্যন্ত কেহই সাম্পুর প্রবাহ বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। লর্ড কার্জ্জনের আমলে তিব্বতে যে অভিযান প্রেরিত হয়, তিব্বতে তাঁহাদের কাজ শেষ হইলে প্রস্তাব হইল যে, তাঁহারা এই পথের অনুসন্ধানে বাহির হইবেন। সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক হইয়াছিল; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন না।

এখন পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র এবং সাম্পু একই নদী বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। হয় ত ইহাই প্রকৃত সত্য। কিন্তু সত্য হইলেও, যেটুকু প্রত্যক্ষ ভাবে জানা যায় নাই, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবারও প্রয়োজনীয়তা আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মপুত্র নদী সম্বন্ধে এখনও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।*

* প্রবন্ধ লেখার পরে ডাক্তার হেডিনের (Dr. Sven Hedin) নিকট হইতে এক চিঠি পাইয়াছি। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, সাম্পু এবং ব্রহ্মপুত্র যে একই নদী, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে ('The identity of the Tsangpo with the Brahmaputra is proved beyond doubt.'); কিন্তু এ প্রমাণ কোথায় আছে, তাহা এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

দেশী দেশালাই

দেশালাইটা এদেশে গৃহ-শিল্পে (home industry) পরিণত হইল। ধীরে-ধীরে গ্রামে-গ্রামে এবং মফস্বলের কোন-কোন সহরে দুই-চারিটী করিয়া দেশালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সম্প্রতি মৈমনসিং—নেত্রকোণা হইতে শ্রীমান প্রমোদচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার দেশালাইয়ের নমুনা লইয়া শ্রীবিশ্বকর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। নমুনা দেখিয়া সুখী হইলাম। যদিও এখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, তথাপি, মন্দও হয় নাই। কাজ-চলা গোছের হইয়াছে; ক্রমে আরও সুন্দর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই দেশালাইয়ের যে সকল ত্রুটি আছে, এবং যে-যে উপায়ে তাহার সংশোধন হইতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কিছু আলোচনাও হইল। শ্রীমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট,—ইউনিভার্সিটী ল' কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। তাঁহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের অধিকাংশই উকীল, এবং উপার্জ্জনও মন্দ করেন না। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা, তিনিও উকীল হন। কিন্তু তিনি ল' পড়া ছাড়িয়া দেশালাইয়ের কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁহার দেশালাইয়ের কারখানার নাম "শরৎ কারখানা"। এই কারখানায় ১৫।১৬ জন লোক কাজ করে। মাসে ১৫০ হইতে ২৫০ গ্রোস দেশালাই প্রস্তুত হয়, এবং সমস্তই locally বিক্রয় হইয়া যায়। এক বৎসরে এই কারখানায় ১১০০ টাকা লাভ হইয়াছে। সুতরাং ল' পড়া ছাড়িয়া দেওয়ায় অনুতপ্ত হইবার কারণ ঘটে নাই। তাঁহার মুখে শুনিলাম, মৈমনসিং জেলায় মোট ৬টি এবং পূর্ব্ববঙ্গে আপাততঃ ৪২টি কারখানা গৃহ-শিল্পের হিসাবে চলিতেছে। মুখপাতেই ইহা আশার কথা বটে।

পূর্ব্ববঙ্গের এই ৪২টি এবং কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানের দুই-চারিটি কারখানায় যে পরিমাণ দেশালাই উৎপন্ন হইতেছে, তাহার ফলে, জাপানে প্রস্তুত যে দেশালাই ভারতে আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ কিছু কমিয়াছে

কি না, তাহা এখনও বলা যায় না। তবে একখানি জাপানী সাময়িক পত্রে দেখিতেছিলাম,

"There seems to be no manner of doubt that the Japanese manufacturers are greatly sufferring from the depression of the domestic and export trade and that they stand in immediate need to devise some means to relieve the situation. Owing to the inactivity of export trade, some of the manufacturers have altered their equipment so that goods for domestic consumption may be produced. Since the competition in this direction is also very keen, it seems extremely doubtful whether they can obtain the desired result. The consequence has been that about half the number of the match manufacturers have either completely or partially stopped working; but as such a state of things can hardly continue without causing their bankruptcy the amalgamation of match manufacturers is now under serious consideration."

অর্থাৎ জাপানে দেশালাইয়ের কলকারখানা এবং ঘরে বাইরে জাপানী দেশালাইয়ের ব্যবসায়ের এখন বড় দুঃসময় যাইতেছে। ইহার প্রতিকারের কোন একটা উপায় বাহির না করিতে পারিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। রপ্তানী বাণিজ্য অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় দেশালাইয়ের কলওয়ালারা তাহাদের কারখানার সাজসরঞ্জাম বদলাইয়া, স্বদেশে ব্যবহারের উপযোগী দেশালাই তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্তু তথাপি, এই ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা এত বেশী যে, তাহাদের মতলব সিদ্ধ হওয়া কঠিন। ফলে জাপানের দেশালাইয়ের কলগুলির অর্দ্ধেকের কাজ হয় পূরা রকমে না হয় আংশিক ভাবে বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু বেশী দিন কাজ বন্ধও রাখা যায় না—তাহা হইলে তাহাদের দেউলিয়া হইতে হইবে। এই জন্য তাহারা দল বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

পাঠকেরা স্মরণ রাখিবেন, কোন এক শ্রেণীর পণ্যের শিল্পী বা ব্যবসায়ীদের দলবদ্ধ হওয়া বড় ভয়ানক ব্যাপার। পাঠকদের মধ্যে হয় ত অনেকে বিলাত ও আমেরিকার steel combine, oil combine প্রভৃতি কথাগুলি শুনিয়া থাকিবেন। বড়-বড় ব্যবসায়ীদের এইরূপ ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ঐ একই শ্রেণীর ছোট-ছোট কারবারের পক্ষে যম স্বরূপ। জাপানী দেশালাইয়ের কলওয়ালারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হন, তাহা হইলে বাঙ্গলার শিশু দেশালাই-শিল্পের পক্ষে বড় আশঙ্কার কথা। সুতরাং আমাদিগকে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্ভাবনার কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

বাঙ্গলার ছোট-ছোট দেশালাইয়ের কলগুলির অনেকের কর্তৃপক্ষ শ্রীবিশ্বকর্ম্মার কাছে অভিযোগ করিতেছেন যে, এই বর্ষাকালে তাঁহাদের দেশালাইগুলি বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া damp হইয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকারের উপায় কি—দেশালাই damp proof করিতে হইলে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা অনেকে জানিতে চাহিতেছেন।

দেশালাই নানা কারণে ড্যাম্প হইয়া যাইতে পারে। দেশালাইয়ের মসলাগুলি (chemical) যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা জল আকর্ষণ করিয়া নরম হইতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ মসলাগুলি প্রায় জল টানে না। মসলাগুলির সঙ্গে যে আটা ব্যবহার করা হয়, তাহার মধ্যে কোন-কোনটির জল আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা আছে। যে আটা ঠাণ্ডা জলে তরল করা যায়, যেমন গঁদ, তাহা যতটা জল টানে, যে আটা গরম জলে কিম্বা vapour bath এ তরল করিয়া লইতে হয়, যেমন glue, তাহা ততটা জল টানিতে পারে না। Fine glue ব্যবহার করিলে জল টানিবার আশঙ্কা খুব কম।

কিন্তু জল টানে প্রধানতঃ কাঠ, অর্থাৎ দেশালাইয়ের কাটিগুলি। আপনারা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন, আপনাদের বাড়ীর ঘরের অনেক দরজা, জানালা এই বর্ষাকালে বন্ধ করা এবং খোলা একটু কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে—চৌকাটের সঙ্গে দরজা-জানালার কপাটগুলি এমন আঁটিয়া বসিয়া যায়, যে, তাহা খুলিতে এবং বন্ধ করিতে বিলক্ষণ জোর লাগিতেছে। এইবার একটু আগেকার কথা মনে করিয়া দেখুন। বর্ষার পূর্ব্বে গ্রীষ্ম ও শীতকালে দরজা জানালা বন্ধ করিতে এত কষ্ট হইত না। এখন ভাবিয়া

দেখুন ইহার কারণ কি হইতে পারে। উপরি-উপরি কয়েক দিন বৃষ্টি হইলে—এই বর্ষাকালেই—একরূপ অবস্থা দেখিতে পাইবেন; এবং উপরি-উপরি কয়েক দিন বৃষ্টির অভাব থাকিলে, আর এক রকম অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়—কাঠগুলি জল টানিয়া ফুলিয়া আয়তনে বাড়িয়া যায় বলিয়াই ঐরূপ হয়। কাঠের আসবাব-পত্রেরও (furniture) সময়ে-সময়ে এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। আবার ক্ষেত্র-বিশেষে ঋতু পরিবর্ত্তনের ফলে কাঠের জিনিসের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয়ও না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—সকল ঋতুতেই তাহাদের অবস্থা একই রূপ থাকে। এ ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন না ঘটিবার কারণ কি? সেইটাই আসল আর গুরুতর কথা এবং সেই কথাটা হচ্চে;—কাঠ well seasoned করা। দেশালাইয়ের কাঠের সম্বন্ধেও ঠিক এই অবস্থা ঘটে। দেশলাইয়ের কাটিগুলি খুব ছোট-ছোট বলিয়া ইহা টের পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু অবস্থা যে ঠিক এই রকমই ঘটে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দরজা, জানালা, বা আসবাব-পত্রের কাঠ যতটা season করিয়া লইতে হয়, দেশালাইয়ের কাঠ ততটা season করিয়া লওয়া আবশ্যক না হইলেও,—একেবারে না করাও ভাল নয়; কারণ, তাহাতে ঐ দোষ ঘটে—কাঠ জল আকর্ষণ করিয়া সরস হইয়া উঠে।

এখন দেশালাইয়ের কাঠ কেমন করিয়া season করিতে হইবে? না, উহাকে কয়েক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে; অথবা কাটিগুলিকে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। রেঙ্গুন হইতে যে সেগুন কাঠের চালান কলিকাতায় আসে, তাহা প্রায় জাহাজে বোঝাই হইয়া আসে না। কাঠের গুঁড়ির কতকগুলি করিয়া এক সঙ্গে শিকল কিম্বা মোটা কাছি দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। জাহাজ সেই ভাসমান কাঠগুলিকে কাছি বা শিকলের সাহায্যে টানিয়া লইয়া আসে। ইহাতে season করার কাজ কতকটা হয়। তবে সমুদ্রের নোনা জল ঢুকিয়া কাঠগুলি লবণাক্ত হইয়া উঠিলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। কিন্তু গঙ্গার মিঠা জলে লবণ ধৌত হইয়া অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যায়, এবং দোষও কাটিয়া যায়। প্রমোদবাবু আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, তিনি গারো পাহাড় হইতে নদীতে ভাসাইয়া দেশালাইয়ের কাঠ আমদানী করিবেন। ইহাতে তাঁহার অনেকটা সুবিধা হইবে—season করার কাজ কতকটা আপনা-আপনি হইয়া যাইবে।

এইবার season করার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। জঙ্গল হইতে একটা বড় গাছ কাটিয়া আনিলাম। সেই গাছটার সমস্তটাই কিন্তু কাঠ নহে। জীবজন্তুর দেহে যেমন রক্ত থাকে, উদ্ভিদ দেহে তেমনি রস থাকে। সেই গাছ শুকাইয়া লইলে তাহার জলীয় অংশ মাত্র উড়িয়া যায়, কিন্তু minreal ও অন্যান্য পদার্থ শুষ্ক অবস্থায় থাকিয়া যায়। ইহা দাহ্যও নহে। এই পদার্থগুলির কতকটা জলে দ্রবনীয়। একটা গাছ কাটিয়া শুকাইয়া লইয়া ওজন করিয়া দেখুন। তার পর ঐ শুক্‌না গাছটাকে জলে কিছু দিন ভিজাইয়া রাখিবার পর আবার শুকাইয়া লইয়া ওজন করুন। দেখিবেন, পূর্ব্বের ওজনের সঙ্গে পরের ওজনের তফাৎ হইয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় বারে ওজন কমিয়াছে। অবশ্য এই কম্‌তি বেশী না হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাহা নগণ্যও নহে। গাছটির আয়তন ঠিক আছে—উহার একটীও ডালপালা কাটিয়া লওয়া হয় নাই, অথচ ওজন কমিল,—ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়,—কাঠের ভিতরের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলির মধ্যে যে শুষ্ক রস, যে mineral matter বা জলে দ্রবনীয় অংশ ছিল, তাহা জলের সঙ্গে মিশিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে;—তাই ওজন কমিয়াছে। এই পদার্থগুলি যতক্ষণ কাঠের ভিতর থাকিবে, ততক্ষণ, সরস বায়ু-মণ্ডল হইতে তাহার জল আকর্ষণ করিয়া সরস হইয়া উঠিবার সম্ভাবনাও থাকিবে। দেশালাইকে সম্পূর্ণরূপে damp proof করিতে হইলে, মসলার বিশুদ্ধতা, আটার দ্রবনীয়তা প্রভৃতির সঙ্গে কাঠের জল-আকর্ষণ-প্রবণতার কথাটাও মনে রাখিতে হইবে। এই ভাবে season করা কাঠ ব্যবহার করিলে, দেশালাই damp হইয়া যাইবার আশঙ্কা অনেকটা কমিয়া যাইবে।

বই বাঁধিবার 'কাপড়'।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "পথহারা" নামক যে উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এখন পুস্তকাকারে পাওয়া যায়। বইখানি খদ্দরের কাপড়ে বাঁধা হইয়াছে। খদ্দরের কাপড়ের বাঁধাই যতগুলি

বই দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এই বইখানি বোধ হয় প্রথম; এবং ইহারই প্রদর্শিত পন্থায় অন্য কয়েকখানি বইও খদ্দরে বাঁধা হইয়াছে। বাঁধাই মন্দ হয় নাই। রঙ্গীন খদ্দরে বাঁধানো হইলে বোধ হয় আরও ভাল হইত। এই বইয়ের খদ্দরের বাঁধাই সর্ব্বপ্রথম দেখিয়া আমার যেমন আনন্দ ও কৌতূহল হইয়াছিল, সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটি কথাও আমার মনে উঠিয়াছিল।

খদ্দর কাপড়ে বই বাঁধানো অবশ্যই নূতন ব্যাপার এবং প্রবল স্বদেশানুরাগের পরিচায়ক। ইহাকে যদি আরও একটু সুদৃশ্য করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় কোন ক্ষতি হয় না। বলা বাহুল্য, আমি বই বাঁধিবার সেই দপ্তরীদের সনাতন 'কাপড়ে'র কথাটা তুলিবার জন্যই এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু করিতেছি।

খদ্দর হইতে, মিলের থান হইতে এবং অনেক রকম কাপড় হইতেই বই বাঁধিবার 'কাপড়' প্রস্তুত করা যায়। কাপড়টা একটু ঠাস-বুনানি হইলে খুব ভালই হয়; কিঞ্চিৎ পাতলা হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। তবে নেহাত একেবারে জালের মতন কাপড় হইলে অবশ্য মোটেই ভাল হইবে না। বই বাঁধিবার উপযোগী করিয়া খদ্দর কাপড় তৈয়ার করাইয়া লইতে পারা যায়; এবং মিলের কাপড়ও তৈয়ারী পাওয়া যাইতে পারে। কাপড় সরু বা মোটা সুতার হওয়া না হওয়া আমাদের রুচির উপর নির্ভর করে।

কাপড় ছাড়া আর যে দুই একটা উপকরণ দরকার, তাহা অতি সহজ। ময়দার মাড়, ভাতের মাড়, এবং সকল রকম starchy বা শ্বেতসার যুক্ত পদার্থ এই কাজের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। আর রং। ষ্টার্চ্চ ও রং পরিমাণ মত লইয়া ষ্টার্চ্চ সিদ্ধ করিয়া মাড় তৈয়ার করিয়া লইয়া তাহাতে রং মিশাইয়া কাপড়ের উপর মাখাইতে হয়। তার পর কিঞ্চিৎ শুকাইলে উহা নক্সা-কাটা ছাঁচের মধ্য দিয়া আনিয়া সম্পূর্ণ শুকাইয়া লইলেই বই বাঁধিবার কাপড় হয়।

বিশুদ্ধ ষ্টার্চ্চ অপেক্ষা ময়দা এই কার্য্যের পক্ষে সমধিক উপযোগী। বিশুদ্ধ starch লইলে তাহা শুকাইলে অত্যন্ত খড়্‌খড়ে ও শক্ত হইয়া উঠিবে—কাপড় ভাল হইবে না। ভাতের ফ্যান লইলেও এই অসুবিধা হইবে। তবে ফ্যানের সঙ্গে কিছু ভাতও গলাইয়া তরল করিয়া লইলে মন্দ হইবে না। এরারুট বা শটি জাতীয় বিশুদ্ধ starch ব্যবহার করিলে, তাহার সঙ্গে ময়দা কিম্বা ঐরূপ অন্য কিছু মিশাইয়া লইয়া, উহার খড়্‌খড়ে শক্ত ভাব কমাইয়া, উঁহাকে কিছু কোমল করিতে হইবে।

তার পর রং। ইহাতে aniline রং ভাল চলিবে না। উদ্ভিজ্জ রংই এই কার্য্যের জন্য প্রশস্ত। এ রং খুব পাকা হওয়ার কোন দরকার নাই। কেবল কাল সহকারে রংটি মলিন না হইয়া যায়, এমনই হইলে চলিবে। উদ্ভিজ্জ রং ছাড়া, সুবিধা মত অন্যান্য রং ব্যবহার করা চলিতে পারে।

কিন্তু এই বই বাঁধিবার কাপড় প্রস্তুত করিবার পক্ষে প্রধান মুস্কিলের কথা ইহার কলকব্জা। জিনিসটি অতি সহজ—মালমসলা চির-পরিচিত; প্রস্তুত-প্রণালী একটুও জটিল নয়। কিন্তু ইহার কলকব্জা অনেক, এবং খুব জটিল।

প্রথমে ষ্টার্চ্চ সিদ্ধ করিয়া মাড় বাহির করিবার কল। তাহার সহিত রং উত্তম রূপে মিশাইবার কল। তৃতীয়তঃ কাপড়ে রঙ্গীন মাড় মাখাইবার কল। তার পর বাষ্প বা গরম হাওয়ার তাপে অল্প শুকাইয়া লইয়া নক্সা-কাটা ছাঁচ শুদ্ধ কলের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইবার কল। আর যদি নক্সা-কাটা না হইয়া 'প্লেন' হয়, তাহা হইলে মাড়-মাখানো কাপড় ইস্ত্রি করিবার কল। তার পর সম্পূর্ণ রূপে শুকাইয়া লইবার জন্য সারি-সারি কতকগুলি "সিলিণ্ডার।" অবশেষে 'রোল' করিবার কল। তার পর কাগজ মুড়িয়া প্যাক করিবার কল।

এই এমন সহজ ও সরল জিনিসটি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক শিল্পীর হাতে পড়িয়া কি রকম জটিল হইয়া উঠিয়াছে দেখুন। কিন্তু আমরা যখন হাতে চরকা চালাইয়া সুতা কাটিয়া সেই সুতায় ঠকঠকি তাঁত চালাইয়া খদ্দর প্রস্তুত করিয়া কোটি কোটি টাকা মূলধনের বহু জটিল কলকব্জাময় বড়-বড় মিলের সঙ্গে পাল্লা দিতে সাহস করিতেছি, এবং তাহাতে যে একটু-একটু কৃতকার্য্যও না হইয়াছি, এমন নয়—তখন আমি বলি, আমরা হাতে হেতেরে কাজ করিয়া খদ্দরকে মা বীণাপাণির সেবায় লাগাইতে পারিব না কেন? আপাততঃ আমার মনে হয়, নক্সা-কাটা বই বাঁধিবার কাপড়ে হাত না দিয়া প্লেন' অর্থাৎ শুধু ইস্ত্রি করিয়া মাজাঘষা কাপড় তৈয়ার করিলে, এবং মনের মত করিয়া রং চড়াইয়া লইলে,—খদ্দরে-বাঁধা বইগুলিও আরও অনেকটা সুদৃশ্য হইতে পারিবে। ইহাতে আর একটা সুবিধা এই যে, খদ্দরের roughness অনেকটা দূর হইয়া তাহা সুশ্রী সুন্দর হইয়া উঠিতে পারিবে। আপনারা কি বলেন?

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

অশীতিতম পরিচ্ছেদ

হকিম শহীদ্-উল্লাহ্ খর্ব্বাকার মনুষ্য; তাঁহার যৌবন বহুদিন অতীত হইয়াছে। বাল্যে ও যৌবনে ভাগ্য-লক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎ অতি বিরল হওয়ায় যৌবনান্তে অলক্ষ্মী তাঁহার মুখে একটা চিরস্থায়ী অপ্রসন্নতা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্যই বোধ হয় সুচিকিৎসক হইলেও যে রোগী একবার তাঁহাকে দেখিত, সে দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকট আসিত না। হকিম শহীদ্-উল্লাহের আয় অতি সামান্য ছিল না। কারণ তিনি দিল্লীতে একজন প্রসিদ্ধ হকিমের নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সে অভিমান তিনি কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আয় অল্প এবং ব্যয় অধিক, সুতরাং হকিম সাহেবের অতি কষ্টে দিন গুজরাণ হইত। লোকে বলিত, অর্থাগমের জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে নানাবিধ অসদুপায়ও অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

পাটনা তখন বড় সহর, সুতরাং নগরে হকিমের অভাব ছিল না। ইহাদিগের মধ্যে কেহ ধনী কেহ বা দরিদ্র; কাহারও সুচিকিৎসক সুখ্যাতি ছিল, কাহারও বা ছিল না। লোকে বলিত, অসদুপায়ে অর্থ-উপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি থাকায় শহীদ্-উল্লাহ্ চিকিৎসা ব্যবসায়ে পটু হইয়াও যশোলাভ করিতে পারেন নাই। লোকের কথা সত্য হউক বা না হউক, যাহারা কোনও কারণে প্রকাশ্যে চিকিৎসকের সাহায্য লইতে পারিত না, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই হকিম্ শহীদ্-উল্লাহের নিকট আসিত। এইজন্য হকিম সাহেবের রোগীর সংখ্যা দিবস অপেক্ষা রাত্রিকালেই বৃদ্ধি পাইত।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। গৃহস্থের ঘরে এবং দোকানে বহু আলোক সত্ত্বেও পাটনা নগরীর রাজপথ অন্ধকার। হকিম সাহেবের রোগীরা তীব্র আলোকের পক্ষপাতী ছিল না; সুতরাং তাঁহার গৃহের প্রবেশদ্বার অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারে চারি-পাঁচ জন রোগী লুক্কাইত ছিল। হকিম সাহেবের একমাত্র পরিচারক তাহাদিগকে একে একে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছিল। যাহারা অন্দরে প্রবেশ করিতেছিল, তাহারা আর সে পথে ফিরিতেছিল না। ক্রমে অন্ধকার গৃহদ্বার শূন্য হইয়া আসিল শেষে এক বর্ষিয়সী রমণী অবশিষ্ট ছিল; পরিচারক আসিয়া যখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল, তখন হকিম সাহেবের দুয়ার শূন্য হইল। প্রৌঢ়া যে মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, সেই মুহূর্ত্তে আর একটি বুর্খাবৃতা রমণী দ্রুতপদে অন্ধকার দ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া লুকাইল। পরিচারক ও প্রৌঢ়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলে অন্ধকারের আশ্রয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাদিগের অনুসরণ করিল। তৃতীয় কক্ষে গৃহতলে একটী মলিন শয্যায় হকিম্ শহীদ্-উল্লাহ্ উপবিষ্ট। কক্ষের চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ আধারে হকিম সাহেবের চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সাজ-সরঞ্জাম সজ্জিত। প্রৌঢ়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল; হকিমের মুখের অপ্রসন্নভাব দেখিয়া তাহার কথা কহিতে ভরসা হইল না। হকিম সাহেব ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি রোগীর দিকে না চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেরাম?" প্রৌঢ়া অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "হকিম সাহেব, বেমার আমার নহে, আমার বেটীর।" "বেটী কোথায়?" "আসিতে চাহে না জনাব।" "তবে চিকিৎসা করিব কেমন করিয়া?" "সেইজন্যই ত আপনার নিকট আসিয়াছি। শুনিলাম, পাটনা সহরে এ-রকম রোগের চিকিৎসা আপনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারে না।"

হকিম সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এবং বৃদ্ধাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেটীর বয়স কত?" বৃদ্ধা দূরে ভূমিতে উপবেশন করিয়া কহিল, "বিশ বাইশ হইবে।" "বেমার কি?" "তাহা পাটনা সহরের কোন হকিম বুঝিতে পারিল না; সেইজন্যই ত আপনার নিকট আসিয়াছি! আমি রোগের লক্ষণ বলিয়া যাই; আপনি বুঝিয়া লউন। আমার বেটী তয়ফাওয়ালী; দেখিতে খুব

সুন্দরী। তাহার এই প্রথম বয়স সুতরাং খোদার মর্জ্জিতে বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার হইত। বুড়া বয়সে আমার নসীব ফিরিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ কোথা হইতে কি হইল, বেটী আমার এক কাফেরকে দেখিয়া পাগল হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া অবধি মজুরা করা ছাড়িয়া দিল; পাগলের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল; অনুনয় বিনয় কিছুই শুনিল না। লোকে বলিল দানো পাইয়াছে। রোজা আসিয়া কত মন্ত্র বলিল; ওস্তাদ আসিয়া ঝাড়িল, তাবিজ পরাইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আপনি ছাড়া পাটনা সহরের যত নামজাদা হকিম, সকলকেই ডাকিয়া দেখাইয়াছি; কিন্তু কেহই বলিতে পারে নাই বেরামটা কি? এই একমাস হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, আজি সকালে ফিরিয়া আসিয়াছে। আমি সেইজন্য এখন আপনার নিকট আসিয়াছি।"

হকিম সাহেব হুঁকার নলে মুখ-সংযোগ করিয়া গম্ভীর-ভাবে কহিলেন, "বেরাম কঠিন, ঔষধ অনেকদিন ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা ফল হইবে না।" বৃদ্ধা কাঁদিয়া কহিল, "জনাব, আমি অতি গরীব, হকিম ও রোজাকে পয়সা দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছি। যাহা কিছু ছিল বেচিয়া কিনিয়া এই দুইটা আশ্রফি আনিয়াছি। আরাম হইলে যেমন করিয়া পারি আর দুইটা আশ্রফি আনিয়া দিব।" "দুই আশ্রফি ত এক সপ্তাহের ঔষধের দাম, দুই তিন সপ্তাহ ঔষধ ব্যবহার না করিলে ফল হওয়া কঠিন।" বৃদ্ধা হকিমের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল এবং কহিল, "হুজুর, মা বাপ, আমি গরীব নাচার।" হকিম শহীদ্-উল্লাহ্ মানুষ চিনিতেন। তিনি বুঝিলেন যে দাবী-দাওয়া অধিক করিলে শিকার পলাইবে। তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, দুইটা আশ্রফি আন, এক সপ্তাহ পরে আবার আসিও।" বৃদ্ধা কহিল, "ঔষধ যে খাইতে চাহে না জনাব?" হকিম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহারে অরুচি আছে?" বৃদ্ধা কহিল, "না।" হকিম একটা শ্বেতবর্ণ চূর্ণ লইয়া বৃদ্ধার হস্তে দিলেন এবং কহিলেন, "এই ঔষধটা সুমিষ্ট সরবতের সহিত পান করাইয়া দিও, তাহা হইলে তোমার বেটী দুই তিন দিন অজ্ঞান হইয়া থাকিবে; সেই সময়ে নিত্য প্রভাতে এই দ্বিতীয় ঔষধটা দুগ্ধের সহিত মিলাইয়া পান করাইয়া দিও। দুই তিন দিন পরে জ্ঞান হইলে তোমার বেটী আর ঔষধ পান করিতে আপত্তি করিবে না।" বৃদ্ধা দুইটা সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া ঔষধ লইল এবং পরিচারক আসিয়া তাহাকে অন্য পথে লইয়া গেল। এই সময়ে দ্বিতীয়া রমণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

অভ্যাস মত হকিম শহীদ্-উল্লাহ্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেমার?" রমণী অভিবাদন করিয়া কহিল, "জনাব, আমার বেমার রূপ! রূপ কেমন করিয়া জ্বলিয়া যায় বলিতে পারেন?" বেণুনিন্দিত কণ্ঠরব শুনিয়া হকিম শহীদ্-উল্লাহ্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন; বুর্খার আবরণের মধ্যেও রমণীর সুগঠিত অবয়বগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। হকিম ক্ষুদ্র পাদুকা-সনদ্ধ চরণের দিকে চাহিলেন। কনকবর্ণ সুন্দর ক্ষুদ্র পদদ্বয় দেখিয়া তাঁহার মুখের চিরস্থায়ী অপ্রসন্নতাভাব মুহূর্ত্তের জন্য দূর হইল। হকিম শহীদ্-উল্লাহ্ প্রসন্ন হইয়া রমণীকে কহিলেন, "বস।" রমণী গৃহের অপর প্রান্তে এক জীর্ণ গালিচায় উপবেশন করিলে হকিম কহিলেন, "তোমার কি রাত্রিতে নিদ্রা হয়?" প্রশ্ন শুনিয়া রমণী সহসা বুর্খা দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার রূপে ক্ষুদ্র কক্ষ যেন তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ হকিম তাহার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইতে না পারিয়া, নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণী কহিল, "হজরৎ, আমার রাত্রিতে নিদ্রা হয়, আমার আহারে অরুচি নাই, আমি উন্মাদিনী নহি;—এই রূপ আমার কাল; এই রূপের জন্য আমার সমস্ত সুখ-সম্পদ দূর হইয়াছে। আমার এই রূপ অপরের সুখের ঘরেও দুঃখের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। হকিম সাহেব, আমার রূপ কেমন করিয়া জ্বলিয়া যায়, তাহা বলিয়া দিতে পারেন? শুনিয়াছি আপনি অঘটন ঘটাইতে পারেন, আমার অর্থের অভাব নাই, আপনি যত অর্থ চাহেন আমি দিব। আমার এই অনর্থের মূল রূপ দূর করিয়া দিতে পারেন?" অসৎ-পথাবলম্বী চিকিৎসক হকিম শহীদ্-উল্লাহ্ রমণীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী জীবনে বহুবিধ নর-নারী বৈধ-অবৈধ সহস্র কারণে তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছে; কিন্তু এরূপ অভাবনীয় আবদার অদ্যাবধি কেহ তাঁহার নিকট করে নাই। বৃদ্ধ হকিম কহিলেন, "বেটী, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বহু দিন সংসারে আসিয়াছি, অনেক দেখিয়াছি, হাজার-হাজার রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি; কিন্তু তোমার মত অনুরোধ আজি

পর্য্যন্ত কেহ আমার নিকট করে নাই। রূপ ঈশ্বরের দান, রূপ লাভ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। বেটী, তোমার দেব-দুর্ল্লভ রূপ কেন হারাইতে চাহ মা? মাশুক কি চলিয়া গিয়াছে, না বিবাদ করিয়াছে? প্রথম যৌবনে এই সব সামান্য কারণে বিরাগ আসে বটে, মা! তোমার রূপ জ্বালাইয়া দিতে পারি, কিন্তু একবার জ্বলিয়া গেলে দুনিয়ার সমস্ত হকিম একত্র হইলেও তোমার এই ভুবনমোহিনী রূপ আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না।"

রমণী হাসিল এবং ধীরে-ধীরে কহিল, "জনাব, আমি কসবী; শুধু কসবী নহি, কসবীর বেটী কসবী। আজি দশ বৎসর ধরিয়া এই পাটনা সহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে, আলমগীর বাদশাহের মত আমার রূপ জগজ্জয়ী। রূপের গুণ-ব্যাখ্যান শুনিয়া কর্ণ বধির হইয়াছে। জনাব, বেশ্যার কি মাশুক থাকে? বেশ্যার মাশুক আশরফি। শুনিয়াছি দুই এক জন বেশ্যার মাশুক থাকে; কিন্তু তাহারা তখন আর বেশ্যা থাকে না, তাহারা তখন রমণী হইয়া যায়। এই রূপে জগৎ জয় করিয়াছি, পুরুষ জাতিকে অবহেলায় পদে দলন করিয়াছি; কিন্তু সেই রূপই এখন আমার কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রূপ আমার সদ্‌গতির অন্তরায়, রূপ আমার কুপথ প্রদর্শক। আর কেবল আমার সর্ব্বনাশের কারণ নহে, অনেক গৃহস্থের গৃহদাহের কারণ। জনাব, বেশ্যার রূপ জ্বালাইয়া দিলে দুনিয়ার মঙ্গল হইবে—আল্লাহ্‌ প্রসন্ন হইবেন। কত সতী দুই হাত তুলিয়া আপনাকে দোয়া করিবেন। আর আমি আমার পাপের ধন দিয়া আপনার দুই হাত আশরফিতে ভরিয়া দিব। জনাব, আপনি আমার বাপের বয়সী; মনে বিচার করিয়া দেখুন, যে বেশ্যা স্বেচ্ছায় নিজ রূপ ধ্বংস করিতে চাহে, সে কি কখনও সে রূপ আর ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করে?"

হকিম রমণীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাহা দেখিয়া রমণী তাঁহার পদতলে পাঁচটি সুবর্ণ মুদ্রা ফেলিয়া দিল। সুবর্ণ দেখিয়া শহীদ্-উল্লাহের সুমনোবৃত্তি দূর হইল; তাঁহার মুখের চিরস্থায়ী অপ্রসন্ন ভাব ফিরিয়া আসিল। তিনি কহিলেন, "তোমার রূপ দূর করিতে পারি, কিন্তু যন্ত্রণা পাইবে।" রমণী কহিল, "হজরৎ, আমি অসহ্য নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি। ইহা হইতে অসহ্য যন্ত্রণা আর কিছুই হইতে পারে না।" "সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইবে।" "ক্ষতি নাই।" "মূল্য দশ আশ্‌রফি।" "ঔষধের কার্য্য হইলে আরও দশ আশ্‌রফি দিয়া যাইব।" রমণী আর পাঁচটি আশ্‌রফি ফেলিয়া দিল। হকিম একটা মৃৎভাণ্ডে ঔষধ দিয়া তাহাকে কহিলেন, "ইহা চক্ষু বাঁচাইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিও, ক্ষত হইবে, রূপ জ্বলিয়া যাইবে।" রমণী অভিবাদন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

অন্ধকারময় রাজ-পথে এক ব্যক্তি রমণীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, রমণী তাহা জানিত না। সে রমণীর অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "মা, ঔষধটা আমাকে দাও।" রমণী তাহার অঙ্গস্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া আগন্তুক কহিল, "ভয় নাই মা, আমি যে তোমার সন্তান, আমি জ্ঞানানন্দ।" মণিয়া ঔষধ বৃদ্ধের হস্তে দিয়া আশ্রয়-চ্যুতা লতার ন্যায় বৃদ্ধের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

একাশীতিতম পরিচ্ছেদ

ত্রিবিক্রম যখন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন যে, সতীর আশ্বাস সত্ত্বেও গৃহস্থ পুরুষ মাত্রেই তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়াছেন। ত্রিবিক্রম ও জ্ঞানানন্দ গৃহে প্রবেশ করিলে হরিনারায়ণ ও বিশ্বনাথ সমস্বরে তাঁহাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া উঠিলেন। ত্রিবিক্রম তাহা শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন, "অত উদ্বিগ্ন হইলে চলিবে কেন? আমরা কি শিশু যে অন্ধকারে পথ হারাইয়া যাইব?" হরিনারায়ণ কহিলেন, "সময়ে-সময়ে তুমি শিশুরও অধম। এত রাত্রিতে বৃদ্ধ জ্ঞানানন্দের সহিত কোথায় গিয়াছিলে? অসীম তোমার জন্য সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।" "তবে দিল্লী যাওয়া ঠিক?" "অসীম তাহার শ্বশুরের ব্যবহারে একটু বিরক্তই হইয়াছে!" "হইবারই কথা! আমিও বৈকাল বেলায় চটিয়া গিয়াছিলাম। দিল্লী যাইবার মতলব কখন হইল?" "এই সন্ধ্যাবেলায়। অসীমের শ্বশুর আবার আসিয়াছিল। দেখ ত্রিবিক্রম, দয়াপরবশ হইয়া কুলীনের জাতি রক্ষা করিয়া অসীম বোধ হয় ভাল কাজ করে নাই!" "কাজের ভাল-মন্দ আমরা কি বুঝি ভাই। মনে করি কাজ আমরা করি, কিন্তু যে কাজটা আমি নিজ হাতে করি, তাহার

কারণ কি সত্যসত্যই আমি? এই দেখ না আমার দশা! আমি কেন আবার এই সুতীগ্রামে ফিরিয়া আসিলাম? অসীম কি স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়াছে? শৈলের বিবাহ ত অন্যত্র হইতেছিল, মনে করিয়া দেখ কেন বিবাহ হইল না, কেন ঝড়ে বরের নৌকা ডুবিল, আর সেই ঝড় আমাদের কেনই বা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে অক্ষত দেহে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল?" "তুমি ভাই, এখন সমস্যা রাখ, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। ইহাদিগকে এক স্থানে স্থিত করিতে পারিলে, আমি নিশ্চিন্ত মনে কাশী চলিয়া যাই।" "সাধ্য কি হরি? যাহা মনে করিতেছ, তাহা তোমার সাধ্যাতীত। সে কথা যাক,—অসীম কখন্ দিল্লী যাইতে চাহে?" "সে ত রাত্রিতেই নৌকা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে,—কেবল তুমি ছিলে না বলিয়া এতক্ষণ যাত্রা করিতে পারে নাই।" "তবে আর রাত্রিতে গিয়া কাজ নাই,—কল্য মধ্যাহ্নে যাত্রার প্রশস্ত সময় আছে। অসীমের সঙ্গে-সঙ্গে আমাকেও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিতে হইবে। নৌকাখানা যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে আমাদেরই কাজে লাগিবে।" "এই মাত্র যে বলিলে কাশী যাইবে,—আবার এখন পূর্ব্বদিকে যাইতেছ! কোথায় যাইতেছ স্থির না করিয়া নৌকা ঠিক করা উচিত কি?" "মুখে বলিতেছি যে কাশী যাইব; কিন্তু যাওয়াটা কি আমার ইচ্ছাধীন? দেখ হরি, আজ মনটা বড় খারাপ হইয়া আছে; মনে হইতেছে, যেন আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যেন তাহার জন্য বিশেষ লজ্জিত আছি। ইচ্ছা হইতেছে কাশী চলিয়া যাই; কিন্তু যাইতে পারি কই?"

এমন সময়ে সতী আসিয়া কহিল, "বাবা, বিধি বৈষ্ণবীর বাড়ী পূর্ব্বদেশ হইতে আর এক বৈষ্ণবী আসিয়াছে। এমন সুন্দর গলা, গান শুনিয়া দুইদণ্ড উঠিতে পারি নাই। শৈল আর দিদিরা সেইখানেই আছে।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "তাহা ত থাকিবেই।" "আমি যে কেন চলিয়া আসিলাম, তাহা বলিতে পারি না। মনে হইল, খবরটা বাড়ীতে দিয়া আসা উচিত। তাহারা বলিল যে, এখন আসিবে না।" ত্রিবিক্রম দ্বিতীয়বার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "এখন আসিলে আগুন জ্বলিবে কেমন করিয়া?" হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আপন মনে বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছ,—পাগল হইলে না কি?" "অনেকটা। বলিয়াছি ত ভাই, আজ আমার মাথাটা কেমন করিতেছে।" ত্রিবিক্রম এই বলিয়া শ্বশুরকে কহিলেন, "আমি এখনই মুরশিদাবাদ চলিলাম। সতী রহিল,—আর হরিনারায়ণের কন্যা-পুত্রবধূ রহিল। আমি যদি পত্র লিখিয়া পাঠাই, তাহা হইলে আমার লোকের সহিত উহাদের পাঠাইবেন; কিন্তু সাবধান, যেন কাহারও মুখের কথায় উহাদিগকে সুতীগ্রাম পরিত্যাগ করিতে দিবেন না।" বিশ্বনাথ কহিলেন, "বাপু, তোমার হস্তাক্ষর না পাইলে আমি কি ইহাদের অপরিচিত লোকের সহিত পাঠাইতে পারি? বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও কি তোমার সঙ্গে যাইবেন?" "নিশ্চয়ই।"

হরিনারায়ণ আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া গুছাইতে বসিলেন। ত্রিবিক্রম ফরাসে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, সহসা যেন, তিনি চিররুগ্ন ব্যক্তির মত অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন; তিনি যেন উত্থানশক্তি-রহিত; তাঁহার চিন্তাশক্তি যেন ধীরে-ধীরে অন্তর্হিত হইয়াছে। ত্রিবিক্রম মনে-মনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ মানসিক বল যেন কে হরণ করিয়া লইল। তিনি ধীরে-ধীরে শয্যার উপরে শয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া সকলে মনে করিল যে, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন ধীরে-ধীরে সকলে সরিয়া গেল। ক্রমে ত্রিবিক্রমের বাক্‌শক্তি রহিত হইল, তিনি অর্দ্ধ-চেতনাবস্থায় শয্যার উপরে পড়িয়া রহিলেন।

বায়ু আসিয়া প্রদীপটা নিবাইয়া দিল। সহসা ত্রিবিক্রমের মনে হইল, কে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সে অন্ধকার অপেক্ষাও ঘোরবর্ণ, মনুষ্য অপেক্ষা দীর্ঘাকার;—অথচ সে যেন মনুষ্য নহে। সে যেন কহিল, "আগামী অমাবস্যায় কিরীটেশ্বরীতে নিশীথ রাত্রিতে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।" সে ছায়ামূর্ত্তি চলিয়া গেল; সঙ্গে-সঙ্গে ত্রিবিক্রমের চেতনা বিলুপ্ত হইল। যখন তাঁহার চেতনা ফিরিল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। তাহার অঙ্গস্পর্শে ধীরে-ধীরে তাঁহার অঙ্গে শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। ক্রমে চেতনার সহিত বাক্‌শক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক বল ফিরিয়া আসিল। ত্রিবিক্রম চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, সতী তাঁহার পদসেবা করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতী, তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ?" সতী কহিল, "অনেকক্ষণ। দেখ, আমি একটা

কথা বলিতে আসিয়াছিলাম ; কিন্তু আসিয়া দেখিলাম, তুমি ঘুমাইতেছে—সেই জন্য বসিয়া আছি।” ত্রিবিক্রম উঠিয়া বসিলেন। সতী কহিল, “তোমার সকল অঙ্গ বড় শীতল,—শরীর ভাল আছে ত?” ত্রিবিক্রম ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “আছে। তুমি কি বলিতে আসিয়াছিলে?” সতী কহিল, “রাত্রি অনেক, তুমি ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলে বলিয়া, কেহ তোমাকে ডাকে নাই। নৌকার মাঝি ডাকিতে আসিয়াছে,—সকলে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। দেখ, কে যেন আসিয়া বলিয়া গেল, বিপদ বড় নিকট; আমারও বিপদ, তোমারও বিপদ; কিন্তু সে আশ্বাস দিয়া গেল যে, ভয় নাই; সেইজন্য তোমাকে বলিতে আসিয়াছিলাম।” “দেখ সতী, বিপদ খুব নিকট; কিন্তু কি বিপদ, তাহা আমিও বলিতে পারি না। কে যেন আসিয়া আমার সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া লইয়াছে। দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ। আমার বিপদে তোমারও বিপদ আসিবে। কিন্তু মায়ের কথায় বিশ্বাস রাখিও,—ভয় পাইও না। যদি আমার সন্ধান আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আগামী অমাবস্যায় কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে লোক পাঠাইও। কি হইবে কিছুই বলিতে পারি না।” ত্রিবিক্রম উঠিলেন, এবং আহারান্তে হরিনারায়ণের সহিত শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। নৌকার মাঝি মশাল ধরিয়া নিদ্রামগ্ন গ্রামের পথে তাঁহাদিগের অগ্রে চলিল। কোন গৃহে আলোক আছে, কোন গৃহে বা নাই। গ্রাম-প্রান্তে একখানা ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরে প্রদীপের আলোক দেখা যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া ত্রিবিক্রম হরিনারায়ণকে কহিলেন, “হরি, এই যে আলোক দেখিতেছ, ইহা অতি সামান্য হইলেও, কালে প্রলয়ানলের মত জ্বলিয়া উঠিবে।” হরিনারায়ণ অন্য বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন; তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “এখন তৃতীয় প্রহর রাত্রি,—এখন হেঁয়ালি ছাড়। নৌকায় গিয়া ঘুমাইতে পারিলে বাঁচি।” ত্রিবিক্রম ঈষৎ হাসিলেন।

তাঁহারা অদৃশ্য হইলে, কুটীরের দুয়ার খুলিয়া এক কৃশকায়া প্রৌঢ়া বাহিরে আসিল; এবং কিয়দ্দূর তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। তাঁহাদিগের নৌকা ছাড়িয়া দিলে, সে কুটীরে ফিরিয়া আসিল। তখন কুটীর-মধ্য হইতে দ্বিতীয় রমণী জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় গিয়াছিলে বোন?” প্রথমা কহিল, “একটা মানুষের খবর লইতে।” “ডাকিলে না কেন?” “এখনও যে জালে পড়ে নাই ভাই!” “কবে পড়িবে?” “ঘনাইয়া-ঘনাইয়া কাছে আসিতেছে,—বোধ হয় এড়াইতে পারিবে না।”

দ্ব্যশীতিতম পরিচ্ছেদ।

অগ্রহায়ণ মাস, শীতের প্রারম্ভ। গঙ্গার উত্তর তীরে, সঙ্গমের পরপারে এক আম্রকাননের মধ্যে বৃহৎ শিবির পড়িয়াছে। আম্রবনের বাহিরে পথের উভয় পার্শ্বে বাজার বসিয়াছে। বাজারে খাদ্য দ্রব্য ও পানের দোকানই অধিক। কেবল দুই-একখানি দোকানে বস্ত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় হইতেছে। এলাহাবাদ হইতে নৌকায় করিয়া দলে-দলে লোক আসিতেছে। তাহারা বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পানের দোকানগুলিতে অত্যন্ত জনতা। তাহা ভেদ করিয়া নূতন লোকের পক্ষে যাওয়া অসম্ভব; কারণ, প্রত্যেক পানের দোকানের সম্মুখে একজন যন্ত্রী, না হয় গায়ক বা গায়িকা যন্ত্র বাজাইতেছে অথবা গীত গায়িতেছে।

বাজারের দক্ষিণ সীমায় ঝুসিগ্রামের প্রান্তে একখানি পানের দোকানের সম্মুখে জনতা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছিল। ক্রমে অন্য স্থান হইতে লোক আসিয়া সেই দোকানেই দাঁড়াইতেছিল। ভীড় অসম্ভব বাড়িয়া পথ-চলাচল রোধ হইয়া গেল। সেই দোকানের সম্মুখে একটি সুশ্রী কিন্তু মসীকৃষ্ণবর্ণা বালিকা গায়িতেছিল; আর এক খর্ব্বকায় বুড়া বৈরাগী খঞ্জনী বাজাইয়া সঙ্গৎ করিতেছিল। বালিকা একটি সঙ্গীত শেষ করিয়া থামিল। তখন চারিদিক হইতে শ্রোতাগণ বহু প্রশংসা করিয়া, তাহাকে আর একটি গীত গায়িতে অনুরোধ করিল। সেই সময়ে জনতার প্রান্তে একজন শ্রোতা অপরকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ গায়িকা কে?” দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, “কি জানি?” “নূতন রকমের গায়িকা; কারণ, গান গায়িয়া পয়সা চাহিল না।” “চাহিবে কি,—দুই-একজন টাকা দিতে গিয়াছিল, তাহা লয় নাই, ফিরাইয়া দিয়াছে।” “বুড়াও লয় নাই?” “না, বুড়াও ফিরাইয়া দিয়াছে—এমন কি চাঁদীর টাকা স্পর্শ করে নাই।” “এমন গায়িকা ত দেখি নাই। যদি টাকা লইবে না ত গান গায়িতেছে কেন?” তৃতীয় শ্রোতা কহিল, “উহারা পথ দিয়া যাইতেছিল। পানওয়ালা গান গায়িতে বলিল, তাই গায়িতেছে। সকল দোকানেই একজন গায়ক না হয় একজন বাদক আসর জমাইয়া বসিয়াছে; কিন্তু উহার দোকানে গান-

বাজনা না থাকায়, খরিদদার জুটিতেছিল না। দোকানদার সেই জন্য বুড়া বৈরাগীকে অনুরোধ করিয়াছিল। বুড়ার হুকুমে তাহার শাক্‌রিদ গায়িতেছে।"

এই সময়ে গায়িকা সহসা গায়িয়া উঠিল,—

কাঁহা গেল শ্যামরায়,
বিসরি বংশীবট   শ্যাম যমুনাতট
বিসরি যশোদা মায়।

যাহারা কথা কহিতেছিল, তাহারা থামিয়া গেল।

গায়িকা গায়িতে লাগিল—

বিসরি গোপকুল   ধেনুকুল আকুল
বিসরি শ্রীরাধিকায়।
তুঁহা পদ পেখন   বিরহে অনুক্ষণ
চঞ্চল চরণে ধায়।
বিসরি লাজ ভয়   সময় অসময়
গোপবধূ যমুনায়।

এই সময়ে জনতার প্রান্তে কোলাহল উঠিল,—লোকে চারিদিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। পানওয়ালা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দেখিল যে, একজন দীর্ঘাকার, কৃশকায় মোগলযোদ্ধা পথ হইতে লোক সরাইয়া দিয়া, দ্রুতবেগে তাহার দোকানের দিকে আসিতেছে। গান থামিয়া গেল,—জনতা দূরে সরিয়া গেল। পানওয়ালা বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিল;—সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। মোগল আসিয়া গায়িকার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল; এবং উগ্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "মণিয়া, মণিয়া, কোথায় মণিয়া বাই?" কৃশকায়া, অসীবর্ণা বালিকা অবনত মস্তকে বুড়া বৈরাগীর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। মোগল বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?" বৃদ্ধ কহিল, "হুজুর, আমি হিন্দু ফকীর।" "কোথা হইতে আসিতেছিস্?" "বাঙ্গালা মুলুক হইতে।" "কোথায় যাইবি?" "শ্রীবৃন্দাবন।" "এই বালিকা তোর কে?" "আমার পালিতা কন্যা।"

উত্তর শুনিয়া দীর্ঘাকার মোগলযোদ্ধা যেন সহসা ক্ষুদ্রকায় হইয়া গেল। যে আশা-বলদৃপ্ত হইয়া সে আসিয়াছিল, হতাশ হইয়া সে বলহীন হইয়া পড়িল। দীর্ঘাকার যুবা সহসা যেন জরাবক্র-দেহ বৃদ্ধের ন্যায় নত হইয়া পড়িল; এবং উদ্ধত গতি পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষীণ দুর্ব্বল পাদক্ষেপে চলিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিক হইতে শ্রোতাগণ আসিয়া গায়িকাকে বেষ্টন করিল; এবং তাহাকে পুনর্ব্বার গায়িতে অনুরোধ করিতে লাগিল। পানওয়ালা দোকান হইতে নামিয়া আসিয়া, অতিশয় বিনয়ের সহিত বুড়া বৈরাগীকে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিল। অনিচ্ছা সত্বেও, তাহাদিগের অনুরোধে বাধ্য হইয়া, গায়িকা পুনরায় গায়িতে আরম্ভ করিল:—

পদযুগ রাতুল   দরশন ব্যাকুল
অতি দীন ক্ষীণ কায়।

মোগল তখনও অধিক দূর যায় নাই। গায়িকার কণ্ঠস্বর তাহাকে শত্রুহস্ত-নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় বিদ্ধ করিল। সে পুনরায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। গায়িকা গায়িতে লাগিল:—

আন মনে যমুনে   অতি ধীর গমনে
উদাসী উজানে যায়।

মোগল ফিরিল,—অতি ধীরপদে ফিরিল; এবং জনতার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া দুই-একজন শ্রোতা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল; কিন্তু সে আর অগ্রসর হইল না। গায়িকা গায়িল:—

বিসরি বৃন্দাবন   গোপিনী বিনোদন
কাঁহা গেল শ্যামরায়।

মোগল দেখিল যে গায়িকা স্থির-দৃষ্টি, চাঞ্চল্যবিহীন। তাহার দৃষ্টিতে বারবনিতাসুলভ নৃত্য নাই; অঙ্গভঙ্গিতে লালিত্য আছে, কিন্তু লজ্জাহীনতা নাই। মোগল দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল। গীত শেষ হইলে, গায়িকা ও বৃদ্ধ বৈরাগী অশেষ অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করিয়া, দোকান পরিত্যাগ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে;—অসংখ্য দীপমালার উজ্জ্বল আলোকে বিপণিশ্রেণী দীপ্ত হইয়াছে। বৈরাগী ও বালিকা গ্রামপ্রান্তে এক দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মন্দিরের দুয়ারে উপবেশন করিয়া বৈরাগী বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, দেখিলে ত?" বালিকা অবনত বদনে কহিল, "হাঁ বাপ, দেখিলাম।" "মোগলকে চিনিতে পারিলে?" "পারিলাম। আমারই পুরাতন বন্ধু,—পাটনার বিখ্যাত ধনী ফরীদ খাঁ।" "ইনিই কি তোমার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছেন?" "হাঁ বাপ।" "দেখ মা, হকিমের ঔষধ ব্যবহার করিলে বিষে তোমার

দেহ জর্জ্জরিত হইয়া যাইত অথচ ফল হইত না; সেই জন্য গোপালের আদেশে সে দিন তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম। গোপালের আমার বড় দয়া। সে দয়া যখন অনুভব করিতে শিখিবে, তখন আর পাগলের মত ইচ্ছা করিয়া অনর্থক যন্ত্রণা ভোগ করিতে চাহিবে না।" সহসা মণিয়া বলিয়া উঠিল, "বাপ, আর একবার পরীক্ষা করিতে চাহি। ফরীদ খাঁ হয় ত আমার রূপে অন্ধ হইয়াছিল; সেই জন্য চিনিতে পারিল না। তিনি চিনিতে পারেন কি না, জানিতে চাহি।" "ভাল কথা মা,—এই প্রয়াগেই পরীক্ষা হইবে।"

সেই সময়ে স্কন্ধাবারের একপার্শ্বে এক বৃহৎ তাম্বুতে বাদ্‌শাহ ফর্‌রুকশিয়র একাকী উপবিষ্ট ছিলেন। সম্মুখে একজন আহদী পাহারা দিতেছিল। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত মোগল আহদীকে গিয়া কহিল, "বাদ্‌শাহকে সংবাদ দাও,—বল, ফরীদ খাঁ আসিয়াছে।" আহদী চলিয়া গেল; এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বাদ্‌শাহ আপনাকে তলপ করিয়াছেন।" ফরীদ খাঁ আহদীর সহিত তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং নূতন বাদ্‌শাহকে অভিবাদন করিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। ফর্‌রুকশিয়র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?" ফরীদ খাঁ কহিলেন, "সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ কল্য প্রভাতে দরবারে হাজির হইবেন। যতদূর বুঝিতে পারা গেল, তিনি স্বয়ং বাদ্‌শাহের শরণাগত হইবেন।" ফর্‌রুকশিয়রের মুখ আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আশ্‌রফ খাঁ এবং হোসেন আলি খাঁ যেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দুয়ারে উপস্থিত থাকেন। আমি প্রথম ঘড়িতে দরবারে আসিব।" ফরীদ খাঁ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

উন্মনা

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

আমি আপনারে রেখেছি মিশায়ে
বিপুল ভুবন মাঝে,
সারা হৃদয়ের সুখ দুঃখ আর
সকল দিনের কাজে;—
তবু মিলে না তো ঠাঁই,
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে কেঁদে ফিরে
কে জানে কাহারে চাই!

বনে বনে ফিরে উতল পবন
সারাটি দিবস ধ'রে,
উদ্দাম তার পরশের ভরে
পল্লব পড়ে ঝ'রে;—
কোথা মিলে নাকো ঠাঁই
সারা জগতের সবখানে যায়,
তবু নাই—ঠাঁই নাই!

কত কলহাসি সঙ্গীত-ধ্বনি,
উন্মাদ কত সুর
ভেসে ভেসে আসে—ঘিরে ঘিরে রাখে
তবু যেন বড় দূর;—
মনের গোপন পুরে
পশে না কিছুই, কে রাখিল রুধি
পথহারা মরে ঘুরে!

আলো আসে ভেসে চুমে যায় ভাল
প্রভাত-স্বপন মাঝে,
কার বিরহের অনন্ত ব্যথা
ফুটে তার হাসি মাঝে;—
অধরে মধুর হাসি,
নয়ন ভরিয়া যায় ক্ষণে ক্ষণে
উচ্ছল বারিরাশি।

চঞ্চল ওরে, অকারণ ব্যথা
অকারণ সুখ তব,
কোন্ সে মরমী অন্তরে কবে
করিবে যে অনুভব;—
দ্বন্দ্বের অবসান
হবে কি সেদিন, পাবে কি মুক্তি
অধীর ব্যাকুল প্রাণ!

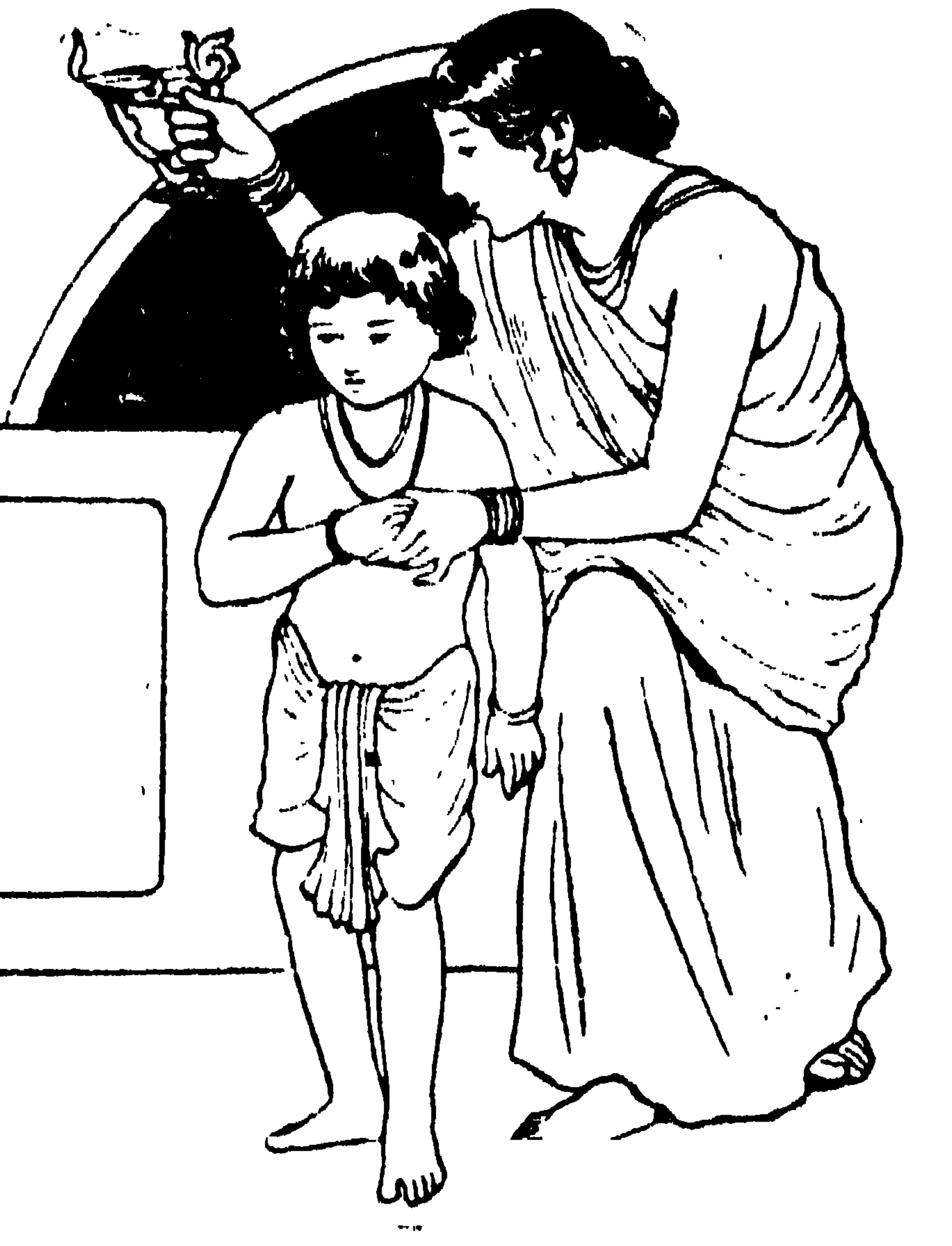

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]

ছোট গল্প

উপন্যাস সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আষাঢ় মাসে প্রসঙ্গক্রমে ছোট গল্প সম্বন্ধে যে দু'একটা কথা বলিয়াছি, তাহা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। আমার একজন শ্রদ্ধেয় ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপক-বন্ধু আমার লিখিত 'ছোট গল্প হইতে কোনরূপ শিক্ষা আমরা পাই না' কথাটায় একটু আপত্তি করিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে আমাকে একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারই অনুরোধে এবার আমি ঐ বিষয়ে একটু আলোচনা করিব। অবশ্য প্রথমেই আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি, কথাটা পাশ্চাত্য দেশের ছোট গল্প সম্বন্ধে যতটা প্রযোজ্য ততটা আমাদের দেশের ছোট গল্পের পক্ষে নয়। মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ 'প্রায়ই' কথাটি ছাপা হয় নাই। 'ছোট গল্প হইতে প্রায়ই কোনরূপ শিক্ষা আমরা পাই না'—এইটাই আমার বক্তব্য।

ছোট গল্প বিদেশীয় আমদানি জিনিস। বাঙ্গলা দেশে মনস্বিনী কথা-সাহিত্য-লেখিকা সাহিত্য-রথী স্বর্ণকুমারী দেবীই বোধ হয় প্রথমে এই বিদেশী জিনিস এদেশে আনেন, তারপর রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ লেখক মহোদয়গণের অমর লেখনীগুণে ছোট গল্পে আর বিদেশীয় চিহ্ন কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, এখন বাঙ্গলার 'ছোট গল্প' বাঙ্গলার নিজস্ব জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অবশ্য একথা এখানে না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, এখনও কোন কোন লেখক মহাশয় বিদেশীয় অনুভূতি ও ভাব দেশী মাল বলিয়া সময়ে সময়ে চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আমি প্রথমে বিদেশীয় ছোট-গল্পের উপর দু'এক কথা বলিব। ফরাসী কথা-সাহিত্য-ধুরন্ধর মোপাসাঁই ছোটগল্প-লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার ছোট গল্প হইতে আমরা যে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার বর্ণন-ভঙ্গী। তিনি সর্ব্বত্র আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করিয়া থাকেন। মনোজ্ঞ করিয়া বলিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহার চিত্রে—তাঁহার ঘটনা-বর্ণনে—তাঁহার লিখন-ভঙ্গীতে মনোহারিত্ব দেদীপ্যমান। তাঁহার বক্তব্য তিনি সরল ভাবে বলিয়া যান। সত্যের দিকে তাঁহার অচলা নিষ্ঠা। সত্যের কোন না কোন একটা দিক তিনি পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে চান। মানবীয় অনুভূতির বর্ণন করিতেই তিনি সিদ্ধ-হস্ত। মানবের কাল্পনিক অনুভূতির বর্ণন তাঁহার ছোট-গল্পে আদৌ নাই। তাঁহার গল্পের ভিতর দিয়া তিনি আমাদের মনে অনুরূপ অনুভূতির উদ্রেক করাইতে চান—আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া চলিয়া যান। তাঁহার গল্পের জনৈক ইংরাজ অনুবাদক বলিয়াছেন,—"His idea is to get an effect, to render at least one side of a truth and to attain to a self-respect through having done

it.' কথাটা খুব ঠিক। বাস্তবিকই তাঁহার গল্প পড়িয়া বোধ হয়, একটা ভাবের লহর তুলিয়া তিনি দূর হইতে দেখিতে চান তাহার কম্পন কতদূরে গিয়া লয় প্রাপ্ত হয়—কোথায় গিয়া তাহার পরিসমাপ্তি হয়। তাঁহার গল্পে একাধারে আমরা কথা-সাহিত্যিকের বর্ণন-ভঙ্গী ও নাট্যকার ও গীতি-কাব্য-রচয়িতার অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতে পাই। সাধারণ পাঠকের নিকট তাঁহার গল্পগুলি প্রায়ই অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। পাঠককে তাহার মনোমতরূপ পরিসমাপ্তি করিয়া লইতে হয়। কলাবিদের কিন্তু এইখানেই কৃতিত্ব। মনীষী H. G. Wells সত্যই বলিয়াছেন, "Short story aims at a single concentrated impression." ছোট গল্পের উদ্দেশ্য কোন একটা অনুভূতি মনে জাগাইয়া তোলা—একটা অবিচ্ছিন্ন ভাব-ধারার উদ্রেক করা। একটা স্থায়ী ভাব মনের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই ছোট গল্পের উদ্দেশ্য। অবান্তর কাহিনীর স্থান ছোট গল্পে নাই। ছোট গল্পে অল্প কথায় মনোগত ভাব পরিস্ফুট করাই কলা কুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। বক্তব্য বিষয় অল্প কথায় পরিস্ফুট করা চাই, এবং এমন ভাবে বলা উচিত যাহাতে একবারে প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত দিতে পারে। এ স্থলে H. G. Wells-এর আর এক ছত্র উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। "A short story should go to its point as a man flies from a pursuing tiger: he pauses not for the daisies in his path; or to note the pretty moss on the tree he climbs for safety." অর্থাৎ—পশ্চাদ্ধাবমান ব্যাঘ্র-ভয়ে ভীত মানুষ যেমন দ্রুতবেগে পলাইতে থাকে, পথের ধারে যে সকল সুন্দর সূর্য্যমুখী ফুটিয়া থাকে, তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিবার তাহার অবকাশ থাকে না, কিংবা আত্মরক্ষার জন্য বৃক্ষের উপর উঠিয়া বসিয়াও বৃক্ষ-গাত্রস্থ মনোরম শৈবাল বা লতার দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ছোট গল্পেও বক্তব্য বিষয় ভিন্ন অন্য অবান্তর কোন কথার স্থান নাই। সে সকল বিষয় যে অসুন্দর, তাহা কেহ বলিবে না; ছোট গল্পে সে সকল শোভন নয়। আর ছোট গল্পের বক্তব্য অল্প কথায় বলা উচিত। ছোট গল্পে লেখকের অনুভূতি বা ব্যক্তিত্ব যাহাতে ফুটিয়া না উঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

কোন এক গল্প-পুস্তকের বা গল্পের সমালোচনায় বোধ হয় সাহিত্য-রথ 'বীরবল' একদিন বলিয়াছেন, ইহা গল্পও নয়, ছোটও নয়। বাস্তবিক ছোট গল্প, ছোট হওয়া চাই। আর গল্পের আর্ট যাহাতে ফুটিয়া উঠে, সেই দিকেও লেখকদিগকে অবহিত হওয়া উচিত।

যে কথা বলিতে বসিয়াছি, তাহা বলিবার পূর্ব্বে অল্প কথায় মোপাসাঁ-প্রমুখ পাশ্চাত্য গল্প-লেখকদিগের গল্প পাঠ করিয়া গল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা ধারণা করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে বলিলাম। বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মোপাসাঁর গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের ভূমিকায় Pol. Nevaux —A Study প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তিনি একজন গায়ক (minstrel) ছিলেন। গায়কের রাগ, দ্বেষ বা সহমর্ম্মিতা গুণ থাকা উচিত নয়। নিন্দা করা বা শিক্ষাদান করাও তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। দু-চারিটী গল্প ভিন্ন কোন গল্পেই তিনি শিক্ষা দান করিবার (moralise) করিবার চেষ্টা করেন নাই। সর্ব্বত্রই তিনি ঘটনাবর্ণন ও ভাবের অভিব্যক্তি দেখাইয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। "Chair-mender" ও "The Minuet"—এই দুই গল্পে প্রথমে শিক্ষামূলক বক্তব্যটী বলিয়া গল্পের আখ্যানভাগ দিয়া ইহা সমর্থন করিয়াছেন। কোন কোন সমালোচক এই দুই গল্প পড়িয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, গল্পের মধ্যে উপদেশ বা শিক্ষা থাকা একান্ত আবশ্যক। এ সম্বন্ধে "Stories from Guy De Maupassant" গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক Ford M. Hueffer মহাশয় লিখিয়াছেন, "a moral proposition is stated at the opening, the story is then told in the shape of an anecdote illustrating the proposition. This seems at first sight a contradiction of the the theory that is at the base of an art of the type of Maupassant. The only thing of value is the concrete fact—the concrete fact is only of value as an 'illustration' of a state of mind, a characteristic in an individual. The fact should be stated first. The moral may or may not be drawn in so

many words. Theoretically it ought not to be, because the first duty of an artist is not to comment and predict—not to moralise." মোপাসাঁকে প্রথমেই উপদেশ দিতে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, তাঁহার আর্টের বিশেষত্ব এখানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার বিশেষত্ব ঘটনা-বর্ণনে; আর ঘটনাগুলি মানসিক ভাবের অভিব্যঞ্জনা-মাত্র—মানবের বিশেষত্বের পরিচায়ক। এইরূপ ঘটনা-বর্ণনই ছোট গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপদেশ বা শিক্ষা ছোট গল্প হইতে পাওয়া যাইতেও পারে, না-ও যাইতে পারে। আর্টের হিসাবে দেখিতে গেলে ছোট গল্পে কোনরূপ শিক্ষা থাকা উচিত নয়, কারণ 'আর্টিষ্ট' বা কলাবিদের প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে টীকা-টীপ্পনী না করিয়া ঘটনার যথাযথ বর্ণন করা। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও তাঁহার বলা উচিত নয়; এবং উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করাও তাহার কার্য্য নয়।

এই লেখক মহাশয়ের মতে এই দুইটী গল্পের উপদেশ মূলক প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থক বচন, প্রকৃত 'morals' বা উপদেশ নয়; ঐগুলি ব্যবহারিক অনুষ্ঠান মাত্র; প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যাহাতে একেবারেই আকৃষ্ট হয় তাহারই একটা পন্থামাত্র (They are technical devices, they strike the notes of the *contes* which follow); অধিকন্তু ঐগুলি বর্ণনকারীর চরিত্রের পোষক নিদর্শনমাত্র (They are 'illustrations' of the narrator's characters). ঋষি টলষ্টয়ের ও রুসিয়ার অন্যান্য গল্প-লেখকদিগের গল্প ভিন্ন অন্য কোন পাশ্চাত্য গল্প-লেখকের গল্পে আমরা বড় বেশী উপদেশ দেখিতে পাই না। এ সম্বন্ধে "The Happy Prince and other Tales" গল্প-প্রণেতা মনীষী অস্কার ওয়াইল্ড-এর মত তাঁহার "The Devoted Friend" গল্প হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিব। গল্পটীর অনুবাদ না করিয়া দিলে বক্তব্য বিষয়টী বুঝিবার সুবিধা হইবে না ভাবিয়া অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

অন্তরঙ্গ-বন্ধু

একটা বৃদ্ধ পানকৌড়ি একদিন দেখিল পুষ্করিণীতে একটা হাঁস তার বাচ্ছাগুলিকে সাঁতার শিখাইতেছে, —শিখাইতেছে কেমন করিয়া মাথা তুলিয়া জলের উপর ভাসিতে হয়।

সে বলিতেছিল, "মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে সমাজে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিবে।" কেমন করিয়া দাঁড়াইতে পারা যায়, তাহাও সে মাঝে-মাঝে দেখাইয়া দিতেছিল। ছানাগুলি মা'র কথায় আদৌ মনোযোগ দিতেছিল না। তারা এত শিশু ছিল যে, সমাজে থাকার উপকারিতাটা কি, তা তারা বুঝিতেই পারিতেছিল না।

এ দৃশ্য দেখিয়া পানকৌড়ি চীৎকার করিয়া বলিল, "অবাধ্য ছেলেদের ডুবে মরাই ঠিক।"

উত্তরে ধাড়ি হাঁস বলিল, "তা নয়, সকল জিনিস শিখতেই সুরু করতে হয়; ছেলেদের শেখাতে গেলে বাপ-মাকে ধৈর্য্যশীল হ'লে চলে না।"

পানকৌড়ি বলিল, "বাপ-মার কি রকম অনুভূতি হয় তা আমি আদৌ জানি না; আমি সংসারের জীব নই। প্রকৃত কথা হচ্ছে, আমি কখনও বিবাহ করি নি, আর বিবাহ করবার মতলবও আমার নাই। ভালবাসা জিনিসটা মন্দ নয়; কিন্তু বন্ধুত্বের স্থান তার চের উচ্চে। সত্য কথা বল্‌তে কি, বিশ্বস্ত বন্ধুর চেয়ে জগতে আর কিছু বড় আদর্শের আছে, তা আমি জানি না।"

একটা ছোট টুন্‌টুনি পুকুরপাড়ের বেতগাছের উপর বসিয়া ঐ সব কথা একমনে শুনিতেছিল। তারপর সে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, বিশ্বস্ত বন্ধুর আদর্শটা আপনার কি, শুনতে পাই না?"

ধাড়ি পাতিহাঁসটাও ঠিক সেই কথাই বলিয়া উঠিল।

পানকৌড়ি চীৎকার করিয়া বলিল, "কি বোকার মতই তোমরা আমায় প্রশ্নটা করলে; আমার যে বিশ্বস্ত বন্ধু, সে আমার একান্ত অনুরক্ত হ'বে।"

পাখাটা একবার ঝটপট করিয়া ছোট টুন্‌টুনি জিজ্ঞাসা করিল, "আর তুমি তার কি করবে?"

পানকৌড়ি বলিল, "তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

টুন্‌টুনি উত্তর করিল, "আচ্ছা এ বিষয়ে আমি একটা গল্প বলি শোন।"

পানকৌড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, গল্পটা কি আমার

সম্বন্ধে? যদি তাই হয়, তবে আমি শুন্‌তে রাজী আছি, কারণ আমি গল্প শুন্‌তে বড় ভালবাসি।"

"হ্যাঁ, তোমার সম্বন্ধে ও-গল্পটা ঠিক খাট্‌বে।"

গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া টুন্‌টুনি গল্পটা বলিতে সুরু করিয়া দিল।

"এক সময়ে হরিহর নামে একজন গো-বেচারা ভদ্রলোক ছিল।"

পানকৌড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি খুব বিখ্যাত লোক ছিল?"

টুন্‌টুনি বলিল—"না, তবে তার অন্তঃকরণটা ছিল খুবই উন্নত; আর কোন বিষয়েই সে বিখ্যাত ছিল না। সে একটা ছোট কুঁড়েঘরে থা'কৃত। আর তার একটা ছোট বাগান ছিল; সেখানে সে রোজই কাজ ক'রত। তার বাগানের মত সুন্দর বাগান সে অঞ্চলে আর ছিল না। নানারূপ সুগন্ধি ফুল তাহার বাগানে সর্ব্বদাই ফুটে থা'কৃত। যে সময়ের যে ফুল, সেই সময়ে সে ফুল দর্শকের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ক'রত। তার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অনুরক্ত বন্ধু ছিল তার মনোরঞ্জন দীর্ঘাঙ্গী।"

"এই দীঘড়ী মশায় যখনই তার বাগানের ধার দিয়ে যেতেন, তখনই সুন্দর সুন্দর ফুল ও রসনাতৃপ্তিকর ফল কোঁচড় বোঝাই করে, না বলে নিয়ে যেতেন; এবং তিনি বল্‌তেন, "প্রকৃত বন্ধু যারা, তাদের সকল জিনিস সকলের উপভোগ্য হওয়া উচিত।" বেচারা হরিহর এই উচ্চ আদর্শের কথা শুনিয়া তার দিকে চাহিয়া সম্মতি জানাইয়া মাথাটা নাড়িত, আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিত।

পাড়াপ্রতিবেশীরা মনোরঞ্জনের ব্যবহারটা ভাল চোখে দেখিত না। তার মরাই ভরা ধান, ছ'টা দুধোলা গাই, একপাল ছাগল ছিল। সে হরিহরকে কোন দিন এক মুঠো ধান বা খাঁটি দুধও ত দেয় না; আর বেচারার ফলফুলগুলো ত অম্লান-বদনে নিয়ে যায়; এ কি রকম ব্যবহার! তারা যখন হরিহরের কাছে কথাগুলো বলিত, সে তখন কেবল একটু মুচ্‌কে হাসিত।

বাগানে সারাদিন সে খাটিত। শীতকাল ছাড়া সব সময় তার বেশ সুখে কাটিত, কারণ বাগানে যে ফলফুল হইত, তা বিক্রী করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার হইত; কিন্তু শীতের সময় তার বড় কষ্টেই দিন কাটিত। ফলফুল না হইবার দরুণ রোজগার তার বন্ধ হইয়া যাইত। সঞ্চয় বলিয়া জিনিসটা সে কোনদিনই করিতে শেখে নাই। তাই এ সময়ে তা'কে প্রায় অনাহারেই থাকিতে হইত। কোন দিন রাত্রিবেলা দুমুঠা ছোলা ও কয়েকটা বাদাম চিবাইয়া সে শুইয়া পড়িত। আর এ সময়ে মনোরঞ্জনের বড় দেখা পাওয়া যাইত না! নির্জ্জনতাও এ সময়ে তাকে বড় কষ্ট দিত।

মনোরঞ্জনের স্ত্রী তাকে অনেকবার বলিত, "যাও না হরিহরের সঙ্গে একবার দেখা করে এস না। তার নিঃসঙ্গ জীবনটা বড় কষ্টেই কাট্‌ছে।"

"না গিন্নী, বোঝ না; মানুষ কষ্টে পড়্‌লে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা উচিত নয়। কষ্টটা একা-একা ভোগ করাই ভাল। আবার বসন্তকাল আসুক, যখন তার বাগান ফলে-ফুলে ভরে যাবে, তখন সে আমাকে সুমিষ্ট রসাল ফল ও সুন্দর সুন্দর ফুল উপহার দিয়ে কত না আনন্দ পাবে।"

"বা! তোমার কি সুন্দর যুক্তি। আচার্য্য মহাশয়ও বোধ হয়, বন্ধুত্ব সম্বন্ধে তোমার মত এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিতে পারেন না।"

বাপ-মার এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া তার ছোট ছেলেটী বলিয়া উঠিল, "কেন হরিহর কি আমাদের বাড়ী আস্‌তে পারে না। সে খেতে পায় না, আমি তাকে আমার খাবারগুলো খেতে দিই, আর খরগোস-ছানাগুলা দেখাই!"

মনোরঞ্জন বলিল, "দূর নির্ব্বোধ! তোকে যে কেন স্কুলে পাঠাচ্ছি তা জানি না; আমার টাকাগুলো সব বরবাদে গেল দেখ্‌ছি। তাকে যদি এখানে আনি, তা হ'লে আমাদের এই স্বচ্ছল অবস্থা দেখে তা'র মনে হিংসা হ'বে। আর হিংসা মানুষের স্বভাবকে একেবারে বিগ্‌ড়ে দেয়। আমি তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তার স্বভাবটা যে বদ্‌লে যায়, এটা আমি দেখ্‌তে চাই না। অধিকন্তু, এখানে এসে আমার গোলা দেখে সে যদি কিছু ধান ধার চায়, তা হলে ত আমি নাচার। ধান আর বন্ধুত্ব দুটো এক জিনিস নয়, এটা ত বুঝ্‌তে পার!"

কথাগুলি শুনিয়া ছোট ছেলের মুখটী লাল হইয়া উঠিল। সে চায়ের বাটীতে মুখ লুকাইল, মনোরঞ্জন বলিল, "আচ্ছা এবার তোমায় মাপ কর্‌লাম।"

আর তার স্ত্রী বাটীতে চা ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে বলিল, "বাঃ! বাঃ! আচার্য্যের বক্তৃতার মতই তোমার বক্তৃতাটা শোনাচ্ছে।"

পানকৌড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "গল্পটা কি শেষ হলো?"

টুন্‌টুনি বলিল, "না এই সুরু হলো।"

"তা' হলে দেখ্‌ছি তুমি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে পার্‌লে না?"

পানকৌড়ি বলিতে লাগিল, "আজকালকার গল্পলেখকেরা শেষ অংশটা আগে বলেন, তারপর ক্রমশঃ আগের অংশটা বল্‌তে থাকেন; আর মাঝখানে যেটা বল্‌বার কথা সেইটা দিয়ে গল্প শেষ করেন। এইটাই হচ্ছে গল্প লিখ্‌বার নূতন রীতি। সেদিন একজন যুবকের সঙ্গে একজন সমালোচক পুকুরের পাড় দিয়ে যেতে যেতে এই কথাটাই বল্‌ছিলেন। যেরূপ গম্ভীর ভাবে অনেকক্ষণ ধরে বল্‌ছিলেন, তাতে আমার বোধ হয় তাঁর কথাটাই ঠিক। আর যখন তাঁর মাথায় টাক ও চোখে নীল রঙের চশ্‌মা রয়েছে, তখন তাঁর কথা ত মিথ্যা হবার নয়। আর যখনই যুবকটী কথা বল্‌ছিল, তখনই তিনি বিজ্ঞের হাসি হেসে কেবলমাত্র বল্‌ছিলেন, "হুঁ"। যাক্ ভাই, মনোরঞ্জনের কথাটাই বল। আমার ভিতর অনেক রকমের অনুভূতিই আছে;—তার বিষয় শুন্‌তে আমার সহানুভূতিও জন্মে গেছে।"

টুন্‌টুনি বলিতে লাগিল, "শীত যেমনি কেটে গেল—বাগানে নব বসন্তের সাড়া পড়্‌লো, গাছগুলো সব ফলে-ফুলে ভরে উঠ্‌লো, তখন মনোরঞ্জন তার স্ত্রীকে বল্‌লো, 'এই বার হরিহরকে একবার দেখ্‌তে যেতে হ'বে'।"

"আঃ! তোমার হৃদয় দেখ্‌ছি দয়ায় ভরপুর! তুমি সব সময় অপরের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাক! বড় ঝুড়িটা নিয়ে যাও; একঝোড়া ফুল আন্‌বে।"

তখন মনোরঞ্জন হরিহরের বাগানে গিয়া তাকে আপ্যায়িত করিয়া বলিল, "কেমন ভাই, ভাল ত?"

কোদালির বাঁটের উপর ভর দিয়া হরিহর একগাল হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ ভাই, ভালই আছি। তুমি ছেলে-পিলে নিয়ে ভাল আছ ত?"

"হ্যাঁ! শীতকালটা কেমন ছিলে?"

"বড় ভাল ছিলাম না। এই কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জান্‌বে। এখন বসন্তকাল এসেছে; ফল-ফুল হতে আরম্ভ হয়েছে। সময়টা ভালই চল্‌ছে।"

"সারা শীতকালটা আমরা তোমার কথাই ভেবেছি,—কি করে তোমার দিন কাট্‌বে।"

"তোমরা বাস্তবিকই আমার বন্ধু। আমি মনে করেছিলাম, আমার কথা একেবারেই ভুলে গেছ।"

"বড়ই দুঃখের বিষয়; এ রকম ভাব্‌বার ত কোন কারণই নাই। বন্ধুত্ব কি কখনও ভোলা যায়? জীবনের কবিত্ব তুমি বোঝ না। বা! বা! ঐ গোলাপগুলি কি সুন্দর!"

"হ্যাঁ, ও গুলি বাস্তবিকই সুন্দর। ও-গুলি জমীদারের মেয়ে নেবেন, বলে পাঠিয়েছেন। আর ও-গুলি বেচে যে টাকা পাব, তা দিয়ে আমি মাল-পত্র নিয়ে যাবার একটা ঠেলাগাড়ী কিন্‌বো।"

"কেন, তোমার না ঠেলাগাড়ী একটা ছিল? তুমি কি সেটা বেচে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ, শীতকালটা আমার বড় টানাটানিতে গেছে। আমার রূপার বোতাম সেট্‌টা, আর রূপার চেন বিক্রী করেও যখন পেটের ভাত জোটাতে পার্‌লাম না, তখন অগত্যা ঠেলা-গাড়ীটাও বেচে ফেলেছি। এখন আবার যে রকম ফল-ফুল হচ্ছে, তাতে শীঘ্রই আবার ঐ সব জিনিষ কিন্‌তে পার্‌বো।"

"হরিহর, ঠেলাগাড়ী তোমাকে আর কিন্‌তে হবে না। আমার যে ভাঙ্গা গাড়ীটা আছে, সেইটেই তোমায় দেব। একটু সারিয়ে নিলেই চল্‌বে। তার একটা দিক্ নষ্ট হয়ে গেছে; আর চাকার ডাঁটিগুলোও কতক ভেঙ্গে গেছে। তা হোক্, আমি তোমায় সেটা দেব। এ দান বদান্যতার পরিচায়ক, আমি জানি। আর লোকেও এরূপ দান করাটা বড় সহজে পারে না। যা'ক্, আমি বুঝি, বন্ধুর জন্য ত্যাগ-স্বীকার করাটাই বড় জিনিষ। আর আমার একটা নূতন ঠেলাগাড়ীও আছে। মনটাকে স্থির করে রেখো, আমি তোমায় ও-ঠেলাগাড়ীটা দেব।"

আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখে হরিহর বলিল, "ওটা তোমার বদান্যতার পরিচায়ক বটে! আর আমার কাঠের তক্তাও আছে, আমি সেরে নিতে পার্‌বো।"

"ওঃ, তোমার তক্তা আছে! ঐ জিনিষটাই ত আমার গোলাঘরের ছাদ তৈরী করতে দরকার হয়ে পড়েছে। ছাদে একটা বড় গর্ত্ত হয়ে পড়েছে। ওটা বুজিয়ে না দিলে জল

প'ড়ে ধানগুলা সব নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা পেড়ে খুব ভাল করেছ। একটা ভাল কাজ থেকে, আর একটা ভাল কাজ কেমন আপনি এসে পড়ে! আমি তোমাকে ঠেলাগাড়ী দিয়েছি, আর তুমি আমাকে ঐ তক্তাগুলি দেবে। অবশ্য দাম খতিয়ে দেখ্‌লে, দেখ্‌তে পাবে আমার ঠেলাগাড়ীর দাম তোমার তক্তার চেয়ে ঢের বেশী। তবে বন্ধুত্বের হিসাবে ও-সব ধর্ত্তব্যই নয়। যাও শীঘ্র নিয়ে এস; আজই আমি গোলাঘর সারতে লেগে যাব।"

"হ্যাঁ, এনে দিচ্ছি" বলিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি তক্তাখানা আনিয়া দিল।

মনোরঞ্জন বলিল, "তক্তাটা ত খুব বড় নয়, আমার কাজে লেগে তোমার জন্যে ত আর কিছু বাকী থাক্‌বে না যে, তুমি ঠেলাগাড়ীটা মেরামত কর্‌বে। যাক্, সে দোষ আমার নয়। আর যখন তোমাকে ঠেলাগাড়ীটা দিয়েছি, তখন তার বদলে আমায় এক ঝুড়ি গোলাপ দিবেই ত।"

বিস্মিত হইয়া হরিহর বলিল, "পুরো এক ঝুড়ি!" কারণ সে জানিত এক ঝুড়ি গোলাপ তাহাকে দিলে, বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য আর বড় বেশী থাকিবে না। রূপার বোতাম সেট্‌টাও আর ক্রয় করা হইবে না।

মনোরঞ্জন বলিল, "আমি যখন তোমাকে আমার ঠেলাগাড়ীটা দিয়েছি, তখন তার বদলে দু'একটা গোলাপ চাই না। আমার ভুল ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু আমার ধারণা এই যে, যেখানে খাঁটি বন্ধুত্ব, সেখানে স্বার্থ থাকতেই পারে না।"

"প্রাণের বন্ধু আমার, তোমার কথা শিরোধার্য্য। বাগানের সব ফুলই তোমায় তুলে এনে দিচ্চি। তোমার আদর-আপ্যায়ন আমায় যতটা আনন্দ দেয়, ততটা আর কিছুতেই দেয় না। নাই বা রূপোর বোতাম সেট্‌টা কিনে আন্‌লাম।" এক দৌড়ে গিয়া হরিহর ঝুড়িটা বোঝাই করিয়া গোলাপ আনিয়া দিল।

শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া দীর্ঘাঙ্গী কাঠের তক্তা ও ফুলের ঝুড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

ঠেলাগাড়ী পাইবার আশায় আশ্বস্ত হইয়া হরিহরও তাহাকে ধন্যবাদ দিল।

পরদিন যখন হরিহর মাচার উপর কামিনী ফুলের ডালগুলি ঠিক করিয়া দিতেছিল, তখন মনোরঞ্জনের গলার স্বর শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, বন্ধুর পৃষ্ঠের উপর ধানের একটা মস্ত বোরা।

দীর্ঘাঙ্গী বলিল, "ভাই, আমার একটু উপকার কর্‌তে হ'বে, এই ধানের বোরাটা বাজারে বেচে আস্‌তে হ'বে।"

"আমার ত ভাই, আজ একটুও ফুরসুৎ নাই, লতাগুলো সব ঠিক করে দিতে হ'বে; গাছগুলোতে জল দিতে হ'বে; গাছের তলায় ছোট ছোট যে আগাছাগুলো হয়েচে, সেগুলোও তুলে ফেল্‌তে হ'বে।"

"আচ্ছা দেখত ভাই, আমি তোমায় ঠেলাগাড়ীটা দিলাম, আর তুমি বন্ধুর এই উপকারটা কর্‌তে পার না!"

"ও-কথা মুখে এনো না। তোমার জন্য জগতে এমন কি কাজ আছে যা আমি করতে পারি না।" কথাটা বলিয়াই ঘর হইতে একটা চাদর আনিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া বোরাটা মাথায় করিয়া বাজারের দিকে চলিল।

সেদিন রৌদ্র খাঁ-খাঁ করিতেছিল। তিন ক্রোশ রাস্তা যাইতে তাহাকে এক জায়গায় বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে বাজারে বেশ চড়াদরে বিক্রয় করিয়া, আবার সেই তিন ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া বাড়ী আসিতে হইল; কারণ সে সময় চোর-ডাকাতের বড় উপদ্রব বাড়িয়াছিল, কোন জায়গায় সে আর বিশ্রাম করিতে বসিতে পারে নাই। শুইবার সময় সে আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "যাক্, আজকের দিনটা বড়ই খাটতে হয়েচে। তবে সুখের বিষয় এই যে, বন্ধু দীর্ঘাঙ্গীর মনোরঞ্জন করতে পেরেছি; আর সে আমায় ঠেলাগাড়ীটা দেবে।"

পরদিন সকালবেলা দীর্ঘাঙ্গী টাকা চাহিতে আসিয়া দেখিল, হরিহর ঘরের মধ্যে তখনও শুইয়া আছে। এটা তার স্বভাব নয়, তা সে বেশ জানিত; তবুও সে বলিল, "যা হোক্ ভাই, তুমি বড় কুঁড়ে। আমি যখন তোমাকে ঠেলাগাড়ীটা দেব, তখন ভেবেছিলাম তুমি খুব কাজ করবে। কুঁড়েমির মত পাপ আর নাই। আর আমি এটা দেখ্‌তে চাই না যে, আমার কোন বন্ধু আলস্য করে দিন কাটায়। স্পষ্ট কথায় বন্ধু রাগ করো না। বন্ধু না হ'লে মুখের উপর এ কথাগুলা বল্‌তাম না। স্পষ্ট কথাই যদি না বল্‌লাম তবে বন্ধু কিসের। যে লোক মিষ্ট কথা ব'লে খোসামোদ করতে পারে, তা'কে আমি বন্ধুই বলি না। কিন্তু যে প্রকৃত বন্ধু, সে খোঁচা না দিয়ে থাকতে পারে না, কারণ ঐ খোঁচা দিলেই বন্ধুর প্রকৃত উপকার করা হয়।"

"তুমি যা বল্লে তা সবই ঠিক, কিন্তু ভাই কাল এত বেশী পরিশ্রম হয়েছে যে, আজ আর উঠ্‌তেই পার্‌ছি না। মনে হচ্ছিল আরও একটু শুয়ে থাকি, আর প্রাণভ'রে পাখীর গান শুনি। পাখীর গান শুন্‌লে আমি ঢের বেশী খাট্‌তে পারি।"

মনোরঞ্জন তার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, "বেশ কথা। মুখহাত ধুয়ে আমার কল-বাড়ীতে যাবে, আর আমার গোলা-ঘরের ছাতটা মেরামত করে দেবে। কেমন ভাই, যাবে ত?"

হরিহরের যাবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, কেননা দুদিন ধরিয়া তার বাগানের গাছগুলিতে জল দেওয়া হয় নাই; কিন্তু দীর্ঘাঙ্গীর কথায় 'না' বলিবার ক্ষমতা তার ছিল না, কারণ সে যে তার প্রকৃত বন্ধু।

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে হরিহর বলিল, "আচ্ছা ভাই, যদি আমি বলি আমি এখন ব্যস্ত আছি, তা হ'লে কি বন্ধুত্বের অমর্য্যাদা করা হ'বে?"

"হ্যাঁ—যাক্‌ সে কথা। আমি যখন তোমাকে ঠেলা-গাড়ীটাই দিচ্ছি, তখন আর কোন কথা বলাই ভাল দেখায় না। তবে তুমি যদি না যেতে চাও, তা'হলে আমাকে গিয়েই মেরামত কর্‌তে হবে।"

"তাও কি হয়!" বলিয়া হরিহর শয্যা ত্যাগ করিয়া, মুখ হাত ধুইয়া গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া ঘর মেরামত করিতে গেল।

সমস্ত দিন কাজ করিয়া যখন কাজটা শেষ হইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। মনোরঞ্জন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, কাজটা হ'ল?"

"হ্যাঁ" বলিয়া হরিহর মই দিয়া নামিয়া আসিল।

মনোরঞ্জন বলিল, "দেখ ভাই, পরের জন্য যখন কাজ করা যায়, তখন যে আনন্দ পাওয়া যায় তার তুলনাই হয় না।"

"তোমার কথা শুন্‌লে বাস্তবিকই প্রাণটা পুলকিত হয়।" কপালের ঘাম মুছিয়া হরিহর বলিতে লাগিল, "কিন্তু ভাই তোমার মত এমন সুন্দর কথা ত আমরা বল্‌তে পারি না।"

"পার্‌বে গো পার্‌বে; কিন্তু একটু যত্ন কর্‌তে হ'বে। এখন তুমি কেবল বন্ধুত্বের বাইরের দিক্‌টাই দেখ্‌চো; একদিন এর সত্যিকারের দিক্‌টাও বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

"আমি কি পার্‌বো ভাই?"

"খুব পার্‌বে। আজকে আমার জন্যে খুব খেটেছ, বিশ্রাম করোগে, কাল্‌কে আমার ছাগলগুলোকে একবার পাহাড়ের উপর চরিয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে।"

হরিহর সম্মত হইল। পরদিন মনোরঞ্জন ছাগলের পাল লইয়া হরিহরের কুঁড়ের সম্মুখে আসিল। হরিহর দ্বিরুক্তি না করিয়া উহাদিগকে চরাইতে লইয়া গেল। সমস্ত দিন সেগুলিকে চরাইয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সে এমন ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল এবং পরদিন সূর্য্যোদয়ের পর শয্যাত্যাগ করিল। কয়দিন বাগানের কোন কাজই সে করে নাই, তাই আজ সর্ব্বাগ্রে বাগানের দিকেই সাগ্রহে ছুটিল। কাজ আরম্ভ করিতে না করিতেই কিন্তু মনোরঞ্জনের ডাক পড়িল। সকল কাজ ছাড়িয়া তার কাজ করিতে হরিহর ছুটিত। অনেক সময় সে ভাবিত, ফল-ফুলের গাছেরা বোধ হয় মনে করে যে, আমি তাহাদের ভুলিয়া গিয়াছি; কিন্তু তাহারা যাহাই মনে করুক, আমি কিন্তু মনোরঞ্জনের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। অধিকন্তু সে আমাকে ঠেলাগাড়ীটা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। ইহা তাহার বদান্যতার পরিচায়ক, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই।

হরিহর মনোরঞ্জনের মনোরঞ্জন করিতে সারাদিন প্রাণপণে খাটিত; সে বন্ধুত্ব বিষয়ক যে-সকল ভাল ভাল নীতিকথা বলিত, সেগুলি টুকিয়া রাখিত এবং রাত্রিতে শুইবার সময় বারংবার পাঠ করিত; কারণ, তাহার ধারণা ছিল, দীর্ঘাঙ্গীর মত জ্ঞানী লোক বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিন দুর্যোগের রাত্রে হরিহরের দরজায় কে যেন আঘাত করিতেছে বলিয়া তাহার মনে হইল; পরক্ষণেই মনে হইল বোধ হয় ঝড়ের গোঁ-গোঁ শব্দ। তারপর দ্বিতীয়বার, আবার তৃতীয়বার সজোরে শব্দ শুনিতে পাইয়া সে মনে করিল, বোধ হয় কোন হতভাগ্য পথিক এই দুর্যোগের রাত্রিতে বিপদে পড়িয়াছে; যাই দরজাটা খুলিয়া দেখি। দরজা খুলিতেই সে দেখিল, লণ্ঠনহাতে মনোরঞ্জন। তার মুখখানা শাদা ফ্যাকাসে। সে বলিল, "ভাই হরিহর, বড় বিপদেই পড়েছি; ঝড়ের সময় মই থেকে পড়ে গিয়ে আমার ছোট ছেলেটার হাড়-গোড় একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে। ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি; কিন্তু ভাই এই দুর্যোগের রাত্রে ছেলেটাকে

ফেলেও অতদূর যেতে মন সর্‌ছে না। আমার বদলে তুমি যদি যাও তাহ'লে বড়ই ভাল হয়। আমি তোমাকে যখন ঠেলাগাড়ীটা দিচ্ছি, তখন তার বদলে আমার একটু উপকার করা উচিত।"

"তা আর বল্‌তে; আমি এখনি যাচ্ছি; কিন্তু ভাই তোমার লণ্ঠনটা আমায় দিতে হবে; একেই ত অন্ধকার রাত্রি, তাতে এই দুর্যোগ, খানায় পড়ে যেতেও পারি।"

"বড়ই দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে, এটা আমার নূতন লণ্ঠন, এটা ত তোমায় ছেড়ে দিতে পার্‌বো না; যদি ভেঙ্গে-চুরে যায়।"

"আচ্ছা থাক্, দিতে হবে না। আমি অম্‌নিই চল্লাম," এই কথা বলিয়াই হরিহর একখানা মোটা চাদর মুড়ি দিয়া ঝড়-বৃষ্টি মাথায় লইয়া ডাক্তারের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

কি ভয়ানক ঝড়ের রাত্রি। এলোমেলো বাতাস ও বৃষ্টির ঝাপ্‌টা ছুঁচের মত হরিহরকে বিঁধিতে লাগিল। কিন্তু সে কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপও করিল না। সাহসী বীরের মত কোথাও একটুও না দাঁড়াইয়া অনবরত তিন ঘণ্টা জলে ভিজিয়া ডাক্তারের বাড়ীর সদর দরজার কাছে আসিয়া কড়া নাড়িতে লাগিল।

ঘরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রে কে কড়া নাড়্‌চে?"

"আমি হরিহর।"

"কি দরকার?"

"মনোরঞ্জন দীর্ঘাঙ্গীর ছোট ছেলে হঠাৎ মই থেকে পা পিছ্‌লে পড়ে গিয়ে বড় জখম হয়ে পড়েছে। এখুনি আপনাকে একবারটী যেতে হবে।"

"তা বেশ, আমি প্রস্তুত হয়ে নি।"

ডাক্তারবাবু সহিসকে শাদা ঘোড়াটা আনিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়ার উপর চড়িয়া ডাক্তার বাবু দীর্ঘাঙ্গীর বাড়ীর দিকে চলিলেন; আর হরিহর সেই অন্ধকার রাত্রিতে আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

ঝমাঝম্ বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; বাতাস শোঁ শোঁ করিয়া বহিতে লাগিল। অন্ধকার এমনি ঘনাইয়া আসিল যে, নিকটের মানুষকেও দেখিতে পাওয়া দুঃসাধ্য হইল। চলিতে চলিতে হরিহর পা-পিছ্‌লাইয়া একটা দহের মধ্যে পড়িয়া গেল। পরদিন রাখাল বালকেরা যখন সেই পথ দিয়া গরু চরাইতেছিল, তখন একটা মৃতদেহ জলে ভাসিতেছে দেখিয়া, কাছে গিয়া দেখিল, তাহাদের পরোপকারী প্রাণের বন্ধু হরিহরের মৃতদেহ ভাসিতেছে। তখন তাহারা তাহাকে কাঁধে করিয়া বাগানবাড়ীতে লইয়া গেল।

গ্রামের যত দুঃখী দরিদ্র ছিল, সকলে তাহার মৃতদেহ সৎকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। মুখাগ্নি কে করিবে, এই লইয়া তাহাদের মধ্যে বচসা চলিতে লাগিল। ইত্যবসরে মনোরঞ্জন আসিয়া বলিল, "হরিহর যখন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তখন ও কাজটা আমিই করব।"

কামার ভায়া বলিল, "হরিহরের অকাল মৃত্যুতে আমাদের সকলেরই বিশেষ ক্ষতি হ'ল।"

মনোরঞ্জন তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া বলিল, "তোমাদের আবার ক্ষতি কি? আমার যা ক্ষতি হয়েছে তা' আর বল্‌বার কথা নয়। আমি আমার পুরানো ঠেলা-গাড়ীটা তাকে এক রকম দিবই বলেছিলাম—আর তাকে দেওয়াই হয়েছে ধরে নাও। এখন আমি সেটাকে নিয়ে করি কি? সারানোও যাবে না, আর বেচ্‌লেও দুপয়সা হবে না। যাক্ আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর্‌চি, আর কোন জিনিস কাউকে দেব না। ত্যাগ স্বীকার করে দান কর্‌লেই, তাকে দেখ্‌ছি লোক্‌সান ভোগ কর্‌তে হয়।"

পানকৌড়ি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ"!

টুনটুনি বলিল, "আমার গল্প শেষ হ'য়ে গেল।"

পানকৌড়ি বলিল, "সে কি! মনোরঞ্জনের কি হ'ল বল্‌লে না ত?

"তা'র যে কি হলো তা' আমিও ঠিক বল্‌তে পার্‌বো না; আর আমি তার বিষয় জান্‌তেও ইচ্ছা করি না।"

পানকৌড়ি গলাটা উঁচু করিয়া বলিল, "তা হ'লে দেখ্‌চি সহানুভূতি বলে জিনিষটা তোমার ভেতর আদৌ নাই।"

টুনটুনি উত্তরে বলিল, "তা' হ'লে তুমি গল্পের ফলশ্রুতিটা ধর্‌তেই পার্‌লে না!"

পানকৌড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

"ফলশ্রুতি—উপদেশ?"

"তুমি কি বল্‌তে চাও, সব গল্পেরই ফলশ্রুতি আছে?"

টুনটুনি বলিল, "নিশ্চয়ই;—গল্প থেকে আমরা কি শিখ্‌লাম তা দেখ্‌তে হবে না?"

পানকৌড়ি খুব রাগিয়া বলিল, "সে কথা গোড়ায় বল নাই কেন? তা হ'লে কি তোমার গল্প মন দিয়ে শুন্‌তাম। সেই সমালোচকের মত আমিও বল্‌তাম "ছোঃ"। থাক্ এখনিই না হয় বল্‌লাম।" তারপর জোর গলায় "ছোঃ" বলিয়া সে জলে ডুব মারিল।

পাতিহাঁসটা তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "পানকৌড়িটাকে তোমার কেমন লাগ্‌ল?"

"ওর অনেক সদ্‌গুণ আছে সত্য, কিন্তু ও আইবুড়; বাপ মার প্রাণ যে কেমন জিনিষ তা ও জানে না। আইবুড়দের দেখ্‌লেই আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে।"

টুন্‌টুনি বলিল, "আমি তাকে শুধু শুধু রাগিয়ে দিয়েছি। ফলশ্রুতি আছে এমন একটা গল্প বলেই আমি যত অনর্থ ডেকে এনেছি।"

"এ ভাবের গল্প বলা বড় বিপজ্জনক তা আমি তোমাকে বলে রাখ্‌লাম" এই বলিয়া পাতিহাঁসটাও জলে সাঁতার কাটিতে লাগিল।

আমিও বলি পাতিহাঁসদের কথাটা খুব ঠিক।

আমার বক্তব্যটা পরিস্ফুট করিবার জন্য অনেকটা কলা-সমালোচকদিগের (art-critics) যুক্তি উদ্ধৃত না করিয়া একজন প্রসিদ্ধ গল্প-লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি; ইহার কারণ এই যে, বক্তব্য বিষয়ে গল্প-লেখক মহাশয়ের মতও এইরূপ। বাস্তবিক কেবলমাত্র আর্টের দিক হইতে দেখিতে গেলে, বলিতে পারা যায়, মানবের যে-কোন অনুভূতির বর্ণন করিয়া আনন্দ দান করাই ছোট গল্পের উদ্দেশ্য। চরিত্র-সৃষ্টি বা আদর্শ চরিত্রের বর্ণন বা ঘটনা-সমবায় ছোট গল্পের উদ্দেশ্য নয়। কেবল রসাস্বাদন, সৌন্দর্য্যানুভূতি ও তৃপ্তিই ছোট গল্প হইতে লাভ করিতে পারা যায়। জগতে যাঁহারা প্রবৃত্তি-মার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দিক হইতে ও তাঁহাদের আর্টের ধারা অনুসারেই কথাটা বলিয়াছি। আর যাঁহারা ভারতবাসীর মত নিবৃত্তি-মার্গে ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের আর্টের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহারা ভোগবিলাসীর ন্যায় কেবলমাত্র রস গ্রহণ করিয়া, সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে চান না—তাঁহারা চান এগুলির সহিত শাশ্বত আনন্দ ও শিক্ষা;—যাহার সাহায্যে চরিত্রের উন্নতি সাধিত হইতে পারে—আনন্দের ভিতর দিয়া সৎ শিক্ষা লাভ হয়। তাই ঋষি টলষ্টয়ের আর্টের ধারণায় আমরা শিক্ষা ও রসকে যুগপৎ দেখিতে পাই। তাঁহার গল্প হইতে আমরা শিক্ষা ও আনন্দ এক সঙ্গেই লাভ করিয়া থাকি। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতীয় গল্পের সহিত রুশিয়ার গল্পের প্রাণের একটা যোগ আছে। উভয় দেশের গল্প বলিবার ভঙ্গী ও ভাব প্রায় একরূপ। জগতের সকল দেশের মর্ম্মবাণী একরূপে ফুটিয়া বাহির হয় না। অলঙ্কার-শাস্ত্রের ভিতর নব রসের কথা দেখিতে পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু বঙ্গ-দেশের গল্পের বিশেষত্ব হইতেছে করুণ রস;- বাঙ্গালার করুণ-কাহিনী, গীতি কাব্যের ন্যায় সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী। রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ সম্পাদক-প্রমুখ গল্প লেখক-দিগের করুণ-রসাত্মক গল্প আমাদিগকে যে আনন্দ দান করিয়া থাকে, সে আনন্দ আমরা ইংরাজী গল্প-লেখক-দিগের নিকট হইতে পাই না। য়ুরোপের ভিতর পাই রুশিয়ার কথা-সাহিত্যিকদিগের নিকট হইতে। বীরত্বের কাহিনী—আত্মম্ভরিতার কথা ইংরাজী গল্পে দেদীপ্যমান;—অহমিকার প্রকোপ দেখিতে যদি ইচ্ছা থাকে তবে যে-কোন ইংরাজী ছোট গল্প-লেখকের লেখা পড়ুন দেখিতে পাইবেন। যদি কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিতে চান, তবে ফরাসী দেশের ছোট গল্প পাঠ করুন। অবশ্য আমি এ কথা বলিতেছি না যে, বাঙ্গালায় করুণ রস ছাড়া আর কোন রস ফুটিয়া উঠে নাই। উঠিয়াছে—রবীন্দ্র-নাথের ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে মানবের নানাবিধ অনুভূতি, নানাবিধ রসাশ্রয় করিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। রসের দিক হইতে—আর্টের দিক হইতে—শিক্ষার দিক হইতে—যে দিক হইতে দেখিবার ইচ্ছা থাকে দেখ, জগতের সাহিত্যে অনবদ্য সুন্দর এমন ছোট গল্প আর কোথাও আছে কি? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত হাস্যরসটা বাঙ্গালা দেশ থেকে বুঝি উঠিয়া যায়। উত্তরে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, উঠিবার নয়—উঠিবে না। ছোট গল্পের ভিতর দিয়া রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বীরবল, যতীন্দ্রমোহন এই রসধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ছোট গল্প-লেখক মহাশয়েরা শিক্ষা দিবার জন্য লিখুন আর নাই লিখুন—কেবলমাত্র রস-সৃষ্টির জন্যই লিখুন, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমরা জানি—আমাদের দীনবন্ধুর মুখে আমরা একদিন শুনিয়া শিখিয়াছি—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতে পার লুকান রতন।"

এই রতন পাইবার চেষ্টায় আমরা ঘুরিয়া থাকি। কথা-সাহিত্যিকদিগের নিকট হইতে রসগ্রহণ আমরা করিব—সঙ্গে সঙ্গে কি শিক্ষা পাইলাম তাহাও দেখিব। আমরা গল্পের লেখকদিগের নিকট কোনও দিনই অনুযোগ করিব না যে, তাঁহারা উপদেশমূলক গল্পই লিখুন—নূতন মহাভারত রচনা করুন বা চারিত্র্যের পুঁথি লিখুন। আমরা চাই প্রকৃত ছোট গল্প।

Flaubert তাঁহার 'Education Sentimental-এ যে-কথা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"Draw life to the life, and your moral will draw itself. If you are rendering a sunset, do not attempt to put in the metaphysical subjective that the sunset raises in you, but catch the sunset and the other things will come to your reader. Every work of art has a profound moral significance, but you must not attempt to impose your own laws upon nature." অর্থাৎ—মানবের চরিত্র, মানবীয় করিয়াই অঙ্কিত কর; ফলশ্রুতি পাঠকেরা আপনারাই বাহির করিয়া লইবে। সূর্য্যাস্তের বর্ণন করিতে হইলে, যথাযথ ভাবে বর্ণন করাই উচিত; শেষ সূর্য্য-কিরণ তোমার মনের ভিতর যে দার্শনিক ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহার কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। ঐ সূর্য্য-কিরণের বর্ণনা পাঠ করিয়া পাঠকের মনের মধ্যে যে ভাব উদয় হইবে, সেইভাব উদয় হইবার সুবিধা দেওয়া উচিত। যেখানেই প্রকৃত 'আর্টের' সন্ধান পাওয়া যায়, সেইখানেই শিখিবার বিষয় কিছু না কিছু আছে-ই। প্রকৃতির উপর কাহারও নিজকৃত আইন জারী করিবার অধিকার নাই।

আর এই যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি কথাসাহিত্যিকদিগের মনে রাখা উচিত। গল্পের ভিতর ইচ্ছা করিয়া উপদেশ ঢুকাইয়া দিতে হইবে না। উপদেশের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গল্প-সুন্দরীকে পীড়িত করিবার অধিকার কাহারও নাই। পাঠকেরা আপনাদিগের শিক্ষা ও সামর্থ্য-মত উপদেশ গ্রহণ করিবেই করিবে। আর এ কথা খুব সত্য, যেখানেই প্রকৃত আর্টের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানেই গভীর সৎশিক্ষা নিহিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

পুস্তক-পরিচয়

খাদ্যকথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য আট আনা।

নরেন্দ্রবাবু বঙ্গভাষায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তিকা ও প্রবন্ধ লিখিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'খাদ্য-কথা' 'স্বাস্থ্য-সমাচার' পুস্তকাবলীর পঞ্চম সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এরূপ সরস, সরল ও সুলিখিত পুস্তিকা বাস্তবিকই বিরল। গ্রন্থকার কোনরূপ 'গভীর গবেষণায়' মধ্যে না যাইয়া, প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণের উপযোগী করিয়া খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। খাদ্যের বিশ্লেষণ-তালিকা গ্রন্থের শেষে দেওয়া সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। খাদ্য সম্বন্ধে লিখিতে বসিলে, সকল গ্রন্থকারই নিজের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট মতের দ্বারা পরিচালিত হন। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে এ দোষ একেবারেই নাই। এই পুস্তক পাঠে অনেকেরই নানা প্রকারের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে। পুস্তিকাতে বাঙ্গালীর খাদ্যের গুণাগুণই বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়াতে, ইহা আমাদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। আমাদের মতে পুস্তিকাখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। আমাদের খাদ্যাদি সম্বন্ধে যেরূপ অজ্ঞতা, তাহাতে এইরূপ পুস্তক সাধারণ স্কুল-পাঠ্য রূপে নির্ব্বাচিত হওয়া বিশেষ মঙ্গলকর, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু।

জীবনের ভ্রম।—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য আট আনা।

বইখানি আমি আগা-গোড়া পড়িয়া দেখিয়াছি। বইখানি ছেলেদের

জন্ত লেখা। জীবনের এক প্রান্তে ইহার নবীন পাঠকগুলি, এবং অপর প্রান্তে এই সপ্ততিপর বৃদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—সুদীর্ঘ জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত সঞ্চিত সত্য তিনি স্নেহের মধ্য দিয়া ছেলেদের উদ্দেশে ঢালিয়া দিয়াছেন। মনে হয় যেন এই জন্তই বইখানিকে তিনি বড় করিবার, জমকালো করিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই; যাহা স্বতঃই সরস, তাহাকে সহজ ও সামান্ত করিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। তবুও এই কয়খানি পাতার মধ্যে মানুষের জানিবার ও শিখিবার কত কথাই না আছে! কামনা করি, যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার এই বয়সেও এতখানি শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদের কাছে তাঁহার উদ্দেশ্য যেন সার্থক হয়।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বয়ম্বরা।—শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত; মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার পঞ্চসপ্ততিতম গ্রন্থ। পল্লী-জীবনের চিত্র-অঙ্কনে বিধুবাবু সিদ্ধহস্ত; তিনি এমন নিপুণ ভাবে গৃহস্থের জীবনের সামান্ত ঘটনাটীও লিপিবদ্ধ করেন যে, পড়িয়া চক্ষুর সম্মুখে সে চিত্র স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'স্বয়ম্বরা'তেও বিধু বাবুর কৃতিত্ব জাজ্বল্যমান। তাঁহার অঙ্কিত গৌরীর চরিত্র অতি সুন্দর; নিপুণ শিল্পীর মত তিনি এই মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। শিবনাথকে লেখক একেবারে মনের মত করিয়া গড়িয়াছেন। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গল্প উপন্তাস অনেকেই লেখেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত বিধুবাবুর মত এমন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কথা অতি কম সৌভাগ্যবান লেখকই বলিয়া থাকেন। এই উপন্তাসখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

আকাশ-কুসুম।—শ্রীনিশিকান্ত সেন প্রণীত; মূল্য আট আনা।

গুরুদাস লাইব্রেরীর আট আনা গ্রন্থমালার ষটসপ্ততিতম গ্রন্থ এই 'আকাশ-কুসুম'। ইহাতে 'আকাশ-কুসুম' 'খেয়া' 'জুজু-বুড়ী' 'সোণার হরিণ' 'হারাণো-পাখী' 'আসার আশায়' ও 'বিনিময়'—এই সাতটী ছোট গল্প আছে। এই ছোট গল্পগুলি যখন বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল, তখন আমরা পরম আগ্রহভরে সেগুলি পড়িয়াছিলাম। এখন একত্র প্রকাশিত হওয়ায় পুনর্ব্বার পড়িলাম। গল্পগুলি এমনই সুন্দর যে, দ্বিতীয়বার পড়িবার সময়ও নূতন গল্প পড়িতেছি বলিয়া মনে হইল। প্রত্যেক গল্পের মধ্যেই লেখকের লিপি-কুশলতা, অন্তদৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই গল্প-সংগ্রহ পড়িয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি; পাঠকগণও আনন্দ লাভ করিবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বরপণ।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত; মূল্য আট আনা।

আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার সপ্তসপ্ততিতম গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুর এই 'বরপণ'। ইহা উপন্তাস নহে, কয়েকটী ছোট গল্পের সংগ্রহ। প্রথম গল্পের নামেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু উপন্তাস লিখিয়াই যশস্বী হইয়াছেন। ছোট গল্পেও যে তাঁহার হাত চলে, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। এ গল্পগুলি সবই নূতন,—পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। বেশ সোজা করিয়া, বিনা আড়ম্বরে সুরেন্দ্রবাবু গল্পগুলি বলিয়া গিয়াছেন। এই সরল সৌন্দর্য্যের জন্তই এই ছোট-গল্প কয়টী পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

শিবাজী।—কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি-এ প্রণীত; মূল্য তিন টাকা।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ঐতিহাসিক মহাকাব্য 'শিবাজী'র দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া গেল। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ প্রকৃত গুণের আদর করিতে শিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় প্রবীণ সাহিত্যিক; তাঁহার পৃথ্বীরাজ, মাইকেলের জীবন-চরিত সর্ব্বজনসমাদৃত। 'শিবাজী'ও নিজগুণে সেই প্রকার সমাদর লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মহাকাব্যের অধিক পরিচয় দিতে হইবে না। তবুও সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"তাঁহার এই কাব্যে অতিমানব কি অলৌকিক কাণ্ডের অবতারণা নাই। ইহা মানুষেরই ভিতরের মানুষটির লীলা-খেলা।" আমরাও এই কথার সমর্থন করি। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা, ছবি ও বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট।

ফুলের ফসল:—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত; মূল্য ॥৵০।

এখানিকে গল্পের বই বা উপন্তাস বলিতে পারি না, যদিও গল্পের আবরণ ইহাতে আছে;—এখানি কৃষি-বিষয়ক গ্রন্থ—এবং আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, কৃষি সম্বন্ধে এমন সুন্দর গ্রন্থ আমরা আর পড়ি নাই। একটা সরল সুন্দর গৃহস্থের জীবন-যাত্রার কাহিনীকে উপলক্ষ করিয়া কৃষিবিষয়ে অভিজ্ঞ দেবেন্দ্রবাবু যে উপদেশ দিয়াছেন, হাতে-কলমে কাজ করিবার যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চোখে আঙ্গুল দিয়া যাহা দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহা অমূল্য। শ্রীযুক্ত সার প্রফুল্লচন্দ্র এই বইখানির মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। বইখানি প্রত্যেক গৃহস্থের

ঘরে, প্রত্যেক কৃষকের কুটীরে থাকা চাই। শুধু থাকিলেই হইবে না—সকলে যদি এই বইয়ের নির্দ্দিষ্ট উপদেশ অনুসারে কাজ করেন, তাহা হইলে আশা করা যায়, আমাদের দেশ আবার সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা হইবে,—আমাদের জীবন-ব্যাপী অনাহার অর্দ্ধাহারের হাহাকার অনেকটা কমিয়া যাইবে।

ঊনপঞ্চাশী:—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য পাঁচ সিকা।

'বিজলী' পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহেই 'ঊনপঞ্চাশী' প্রকাশিত হইয়া থাকে; এবং তাহা পড়িবার জন্য শুধু আমরা কেন, 'বিজলী'র পাঠকমাত্রেই আগ্রহে পথ চাহিয়া থাকেন, এবং প্রতি সংখ্যায় ওস্তাদ লেখকের ঊনপঞ্চাশী পড়িয়া বাহবা দিয়া থাকেন। আর যিনি বোঝেন, তিনি নীরবে চিন্তা করিয়া থাকেন। সেই 'ঊনপঞ্চাশী'র কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া এই বইখানি ছাপা হইয়াছে। লেখক 'বিজলী'তে নাম প্রকাশ না করিলেও, আমরা তাঁহাকে চিনিয়াছিলাম। বই প্রকাশের সময় তিনি ধরা দিয়াছেন,—তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বোমার মামলায় দ্বীপান্তরে যাইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই মনস্বী তেজস্বী লেখককে আমরা জানিতাম। তখন ইনি উদ্দাম ছিলেন। দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার রস বেশ থিতাইয়া গিয়াছে। তাই এই রহস্যময় অথচ প্রাণস্পর্শী ঊনপঞ্চাশী আমরা পাইতেছি। এমন হাসিতে-হাসিতে মর্ম্মকথা বলিতে বোধ হয় এখন তাঁহার মত আর কেহই পারেন না। আমরা যতবার পড়ি, ততবারই নূতন বোধ হয়। এ বইয়েরও যদি আদর না হয়, তাহা হইলে বুঝিব, এই কলির শেষে মৃত-সঞ্জীবনী ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ:—(ব্রজলীলা)—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সঙ্কলিত। মূল্য চারি টাকা।

৪১খানি কৃষ্ণলীলার চিত্রাবলী। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে চিত্র-পরিচয়-সংযুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের এইরূপ আগাগোড়া চিত্রে পরিচয়ের উদ্যম এই নূতন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস "মনের মানুষ" বাহির হইয়াছে; মূল্য ২, টাকা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক গ্রন্থ "ফিরিঙ্গী বণিক" প্রকাশিত হইল; মূল্য ২, টাকা।

শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ প্রণীত "বৈষ্ণব-দর্শনে জীবতত্ত্ব" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ।॰ আনা।

মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গীতিনাট্য "বিদ্যাপতি" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ।৷॰ আনা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর প্রণীত দুইখানি নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি সর্ব্বজন-আদরণীয় 'অভাগী'র দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পূর্ণ নূতন; মূল্য এক টাকা। আর একখানির নাম 'দানপত্র'—মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত নূতন উপন্যাস "সহজিয়া" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।॰ টাকা।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দত্ত প্রণীত "সাধন সমরের" দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২, টাকা।

আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ৭৮ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত "আহুতি" প্রকাশিত হইয়াছে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

Engraved by
Bharatvarsha Ptg. Works. BHARATVARSHA HALFTONE WORKS

ভারতবর্ষ

আশ্বিন, ১৩২৯

প্রথম খণ্ড] দশম বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

ভারত-চিত্রচর্চ্চা

[শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই]

বহু যুগের অবসাদগ্রস্ত আধুনিক বাঙ্গালী শিল্প-সাধকের অনভ্যস্ত হস্ত চিত্রচর্চ্চায় ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া, রেখা এবং লেখা সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার তরুণ তারল্য, অনেকের নিকট তুচ্ছ হইলেও, স্বচ্ছ ;—স্খলন-পতন, কোন কোন স্থলে কিছু কিঞ্চিৎ অশোভন হইলেও, ভাব-বিহ্বল। এখনও তাহার সমালোচনার সময় উপস্থিত হয় নাই। কারণ, এখন তাহার লালন-কাল ;—তাড়ন-কাল এখনও বহু দূরে অবস্থিত। বোধ হয়, এই কারণেই অনেক চিত্র-রসজ্ঞ সুবিজ্ঞ পত্রিকা-সম্পাদক যে কোনও রচনা পত্রস্থ করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন ; এবং রেখাই হউক আর লেখাই হউক, অবলীলাক্রমে অনধিকারচর্চ্চায় প্রশ্রয় লাভ করিতেছে। কালে ইহা হইতে একটি চিত্র-সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিলে, বর্ত্তমান রচনা-প্রয়াস সর্ব্বাংশে ব্যর্থ হইবে না। ব্যর্থ-চেষ্টাই চেষ্টা-সাফল্যের পূর্ব্ব-সূচনা।

অল্পদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর শিক্ষা-সাফল্যের পরিচয় প্রদান করিবার সময় বাঙ্গালী কবি "চতুঃষষ্টিকলার" উল্লেখ করিতেন। প্রমাণ,—"কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।" সে প্রথা ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি কলারও বিকাশ লাভের অবসর নাই। কেন এমন হইল, তাহার ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং তাহারও সমালোচনার সময় উপস্থিত হয় নাই। সে ভার ভবিষ্যতের যোগ্যতর হস্তে ন্যস্ত করিয়া, এখন কেবল

যৎকিঞ্চিৎ অতীত-চর্চ্চার আয়োজন করা যাইতে পারে। তাহার সময় এবং প্রয়োজন তুল্যভাবেই উপস্থিত হইয়াছে।

ভারত-চিত্র সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয় হইলেও, সর্ব্বাংশে যথাযোগ্য তথ্যানুসন্ধানের পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেছে না। তজ্জন্য অনেক বিষয়ে অনেক ভিত্তিহীন অনুমান অনুকূল কল্পনা-প্রবাহে বিচার-নিষ্ঠা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার গতি-সংযমের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

ভারত-চিত্রের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হইয়া না উঠিলে, আমাদের বর্ত্তমান চিত্র-চর্চ্চা ভারত-চিত্র নামে কথিত হইবার পক্ষে কতদূর যোগ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে না। ভারতবর্ষে বসিয়া চিত্র-চর্চ্চা করিলে, ভারত-চিত্র হইবে না। ভারতবর্ষীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া চিত্র-চর্চ্চা করিলেও ভারত-চিত্র হইবে না। ভারত-চিত্রের প্রকৃতিগত অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট লক্ষণই প্রকৃত মান-দণ্ড। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, চিত্র-চর্চ্চা করা অসম্ভব নহে; কিন্তু তাহাকে ভারত-চিত্র বলা অসঙ্গত। তাহাকে ভারত-চিত্র বলিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে,—তাহা বিশুদ্ধ নহে, সঙ্কর। তাহা আভিজাত্যহীন আধুনিক অভ্যুদয়,—অতীত-শৃঙ্খলমুক্ত নবাভিব্যক্ত রচনা-বিলাস। নবাগত বলিয়া তাহা স্বাগত সম্ভাষণ লাভের অনধিকারী না হইলেও, ভারত-চিত্র নামে সমাদর লাভের অধিকারী কিনা, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। কারণ, রীতি-বিরুদ্ধ কলালাপ সুন্দর হইলেও, সহসা মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। তাহাকে দিনে দিনে যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া, মর্য্যাদা লাভ করিতে হয়। তাহা যে পরিমাণে কৌলিন্যহীন, তাহাকে সেই পরিমাণ তার-স্বরে বলিতে হয়,—

"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং তু পৌরুষম্।"

কিন্তু ভারত-চিত্র নামে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, ভারত-চিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণের অনুগত হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। ত্যাগ বা গ্রহণ,—যে পথই অবলম্বিত হউক না কেন,—ভারত-চিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ কিরূপ ছিল, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। নিদর্শনের অভাবে, তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অধিক অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের রচনা-চেষ্টা সে পথে এখনও অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। অজ্ঞের নিন্দা-প্রশংসা তুল্যরূপে মূল্যহীন। ভারত-চিত্রচর্চ্চার আধুনিক চেষ্টা দেশের লোকের নিকট এখনও তাহার অধিক আর কিছু লাভ করিতে পারে নাই। বিদেশের লোকের নিকট যাহা লাভ করিতেছে, তাহা—কৃপা-কটাক্ষ! সে কটাক্ষে কুটিলতা না থাকিলেও, কমনীয়তা বড় সুসংযত।

"যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগাণাং যথাণ্ডজানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।
যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশ স্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ॥"

পর্ব্বতমালার মধ্যে সুমেরু যেমন সর্ব্বলোকবরেণ্য;—অণ্ডজাত জীবগণের মধ্যে গরুড় যেমন সর্ব্বপ্রধান;—নরগণের মধ্যে রাজা যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ;—কলাসমূহের মধ্যে চিত্রকল্পও সেইরূপ।

এই বর্ণনা পাঠ করিলে, বুঝিতে পারা যায়,—পুরাতন ভারতবর্ষে চিত্র কত উচ্চ সমাদর লাভ করিয়াছিল। কেন করিয়াছিল,—নিদর্শনের অভাবে এখন আর তাহার পরিচয় লাভের উপায় নাই। এখন সাহিত্য-নিহিত বর্ণনা, এবং ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনা একমাত্র তথ্যানুসন্ধানের উপায়।

যাহা ছিল, তাহা নাই। যাহা আছে,—সেই অজন্তাগুহা-চিত্রাবলী,—তাহা এখন পাশ্চাত্য সমাজে সমাদর লাভ করায়, তাহাই বিলুপ্ত ভারত-চিত্রের একমাত্র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে; এবং ধীরে—অতি ধীরে—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে,—তাহাই আধুনিক চিত্র-চর্চ্চায় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাহাতে যাহা আছে, তাহা কিন্তু চিত্র নহে,—চিত্রাভাস। তাহা পুরাতন ভারত-চিত্রের অসম্যক্ নিদর্শন;—চিত্র-সাহিত্যদর্পণের "দোষ-পরিচ্ছেদের" অনায়াসলভ্য উদাহরণ। তাহা কেবল বিলাস-ব্যসনমুক্ত যোগযুক্ত অনাসক্ত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিভৃত-নিবাসের ভিত্তি-বিলেপন;—বিচক্ষণ চিত্র-সমালোচকগণের নিকট ভক্তি-ভারাবনত নমস্কার লাভের যোগ্য হইলেও, ভারত-চিত্রোচিত প্রশংসা লাভের অনুপযুক্ত। তাহা একশ্রেণীর "পুস্ত-কর্ম্ম",—তাহার মূল প্রয়োজন অলঙ্করণ। সে প্রয়োজন ভক্তচিত্তকে ঈপ্সিত ভাবের অনুরক্ত করিতে পারিলেই, কৃতকৃতার্থ। তাহাতে যাহা কিছু চিত্র-গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অযত্ন-সম্ভূত,—আকস্মিক,—অলৌকিক। এক সময়ে সকল গৃহেই এইরূপ ভিত্তি-চিত্রের ব্যবস্থা ছিল; কিরূপ গৃহে কোন্ শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত হইবে,

তাহাও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সকল ভিত্তি-চিত্রে কেহ চিত্র-সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা দর্শনের আশা করিত না; ভিত্তি-গাত্র সেরূপ প্রতিভা-প্রকাশের উপযুক্ত স্থান বলিয়াও পরিচিত ছিল না।

"স্থানং প্রমাণং ভূলম্ভো মধুরত্বং বিভক্ততা।
সাদৃশ্যং ক্ষয়বৃদ্ধী চ গুণাষ্টকমিদং স্মৃতম্।
স্থান-হীনং গতরসং শূন্যদৃষ্টিমলীমসং।
চেতনা-রহিতং বা স্যাৎ তদশস্তং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

স্থান-প্রমাণ-ভূলম্ভ-মধুরত্ব-বিভক্ততা-সাদৃশ্য-ক্ষয়-বৃদ্ধি,—এই আটটি পারিভাষিক সংজ্ঞায় চিত্রের আটটি গুণ উল্লিখিত। স্থান-দোষ, রস-দোষ, চিত্র-দোষ; এই সকল দোষদুষ্ট চিত্র অপ্রশস্ত বলিয়া নিন্দিত। এই সকল চিত্র-গুণের এবং চিত্র-দোষের যথাযথ পর্য্যবেক্ষণে যাঁহাদের চক্ষু অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট অজন্তাগুহা-চিত্রাবলী ভারত-চিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিতে অসমর্থ। যাঁহাদের তুলিকাসম্পাতে এই সকল ভিত্তি-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহারা পুরাতন ভারতবর্ষে "চিত্রবিৎ" বলিয়া কথিত হইতে পারিতেন না। তাঁহারা নমস্য; কিন্তু চিত্রে নহে, চরিত্রে। তাঁহাদের ভিত্তিচিত্রও প্রশংসার্হ; কিন্তু কলা-লালিত্যে নহে, বিষয়-মাহাত্ম্যে।

চিত্রবিৎ কে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য সেকালের শাস্ত্রকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন,—সমীরণ-সঞ্চরণে, জলে তরঙ্গ উত্থিত হয়; অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া শিখাবিকাশ করিয়া থাকে; ধূম গগনমণ্ডলে আরোহণ করে; পতাকা আকাশে অঙ্গ বিস্তার করে। যিনি এই সকল গতি-ভঙ্গী যথাযথ-ভাবে চিত্রিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চিত্রবিৎ। সুপ্ত হইলে, মনুষ্যের প্রাণস্পন্দনের চেতনা লুপ্ত হয় না; মৃত হইলেই সে চেতনা লুপ্ত হইয়া যায়;—দেহের সকল অংশ সমান নহে; কোনও অংশ উন্নত, কোনও অংশ অবনত। যিনি এই সকলের পার্থক্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চিত্রবিৎ।" যথা;—

"তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকং
বায়ুগত্যা লিখেৎ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ॥
সুপ্তঞ্চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতং।
নিম্নোন্নত-বিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ॥"

ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—কেবল আকারাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত হইলেই, কেহ চিত্রবিৎ বলিয়া মর্য্যাদালাভ করিতে পারিতেন না।

অ-জীবের গতি ভঙ্গী চিত্রিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু সজীবের স্থিতি-ভঙ্গী চিত্রিত করাও কঠিন। তাহাতে চেতনা-ব্যঞ্জক শিল্প-কৌশল আবশ্যক। সেই চেতনায় মৃতের সঙ্গে জীবিতের পার্থক্য প্রকটিত হয়। তাহাকে আবার এমন ভাবে চিত্রিত করা আবশ্যক যে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়,—যেন স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। সেইরূপ চিত্রই চিত্র,—তাহাই শুভলক্ষণ-সংযুক্ত। যথা,—

"সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।

বিষয়-ভেদে, পদ্ধতি-ভেদে, প্রয়োজন-ভেদে, ভারত-চিত্রে অনেকগুলি বিভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। তথাপি পুরাতন সাহিত্যে চিত্রের মুখ্য প্রতিশব্দ—"আলেখ্য," এবং আলেখ্যের প্রধান বিষয় নায়ক-নায়িকা। বাৎস্যায়ন তাহাকেই মুখ্য ভাবে সূচিত করিয়া গিয়াছেন। টীকাকার যশোধর, তাহাকে বিশদ করিবার জন্য, একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"রূপভেদাঃ প্রমাণাণি ভাব-লাবণ্য-যোজনং।
সাদৃশ্যং বর্ণিকা-ভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥"

যশোধর প্রমাণরূপে এই কারিকার উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন; ইহার ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস স্বীকার করেন নাই। ইহাতে বড় অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, অনেকে অনেক কল্পনা-জল্পনার অবতারণা করিতেছেন। নব্য-বঙ্গের শিল্পাচার্য্য (ঠাকুর) ইহাকে "চিত্রের ষড়ঙ্গ" নাম দিয়া, সুদূর জার্ম্মাণ দেশের একখানি পত্রিকায়, ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া, আলোচনার সূত্রপাত করেন। ভারত-চিত্র সম্বন্ধে পুস্তিকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, কলিকাতা শিল্প-শিক্ষালয়ের প্রধান আচার্য্য পার্সী ব্রাউন্,—শিল্পাচার্য্য ঠাকুরের দোহাই দিয়া,—এই কারিকাকে বাৎস্যায়ন কর্ত্তৃক "কামশাস্ত্রে" উদ্ধৃত বলিয়া, ইহার একটি বিচিত্র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। *

* It is possible that sometime during the pre-Buddhist period the "Sadanga", or "Six Limbs of Indian Painting", were evolved a series of canons

ভারত-শিল্প-সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সে সাহিত্যের পারিভাষিক সংজ্ঞা অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। কোষগ্রন্থের সাহায্যে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় পারিভাষিক সংজ্ঞা-পূর্ণ পুরাতন কারিকার ইংরাজী অনুবাদের চেষ্টা যে সফল হয় নাই, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এই কারিকায় এমন অনেক কথা দ্যোতিত হইয়াছে, যাহা ইংরাজী ভাষায় সুব্যক্ত হইতে পারে না।

ইংরাজী অনুবাদটি ঠাকুর-কৃত বলিয়া উল্লিখিত। বাৎস্যায়নের আবির্ভাব-কালের কথা, এবং বাৎস্যায়ন কর্ত্তৃক "কাম-শাস্ত্রে" এই কারিকা উদ্ধৃত হইবার কথা, কাহার কথা, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সকল কথাই অবলীলাক্রমে লিখিত হইবার অভ্যাস যে ভাবে প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহাতে এরূপ ঐতিহাসিক উক্তি বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে না।

এই কারিকায় চিত্র "ষড়ঙ্গক" বলিয়া উল্লিখিত। তাহাকে "চিত্রের ষড়ঙ্গ" বলিয়া অনুবাদ করায়, কিঞ্চিৎ গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে। ভারত-চিত্র "ষড়ঙ্গক", সুতরাং যে চিত্রে ছয়টি অঙ্গই বর্ত্তমান নাই, তাহা অঙ্গ-হীন; চিত্র নহে,—চিত্রাভাস। অঙ্গগুলির বিশেষ আলোচনা আবশ্যক; অনুবাদে সে প্রয়োজন সর্ব্বথা সিদ্ধ হইতে পারে না।

---

laying down the first principles of Art. Vatsyayaana, who lived during the third century A. D., enumerates this in his Kamasastra (?) having extracted them from still more ancient works. These "Six Limbs" have been translated as follows :—

1. Rupabheda—The Knowledge of appearances.
2. Pramanam—Correct perception, measure, and structure.
3. Bhava—Action of feelings on forms.
4. Lavanya-Yojanam—Infusion of grace, Artistic representation.
5. Sadrisyam—Similitude.
6. Varnika-bhanga—Artistic manner of using the brush and colours. (Tagore).

প্রথম অঙ্গ—রূপভেদ।

ইহা "দৃশ্য-জ্ঞান" নামে অনূদিত হইয়াছে। ইহা "জ্ঞান" নহে, "কর্ম্ম"; এবং "দৃশ্য" অপেক্ষা "অ-দৃশ্যের" সহিত সেই কর্ম্মের নিকটতর সম্বন্ধ। কর্ম্মটি "ভেদ"-সাধন। তাহা "রূপের" ভেদ-সাধন। সুতরাং "রূপ" কি, তাহা জানা আবশ্যক। তাহা একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক একটি "রূপের" আধার। চিত্রে একটি রূপ হইতে আর একটি রূপকে পৃথক্ করিয়া দেখাইবার নাম "রূপ-ভেদ।" তাহা চিত্রগুণ-কীর্ত্তনে "বিভক্ততা" বলিয়া উল্লিখিত। ইহা সাধারণ ভাবে "রেখা-বিন্যাস" বলিয়া কথিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে "রূপ-ভেদের" পদ্ধতি সূচিত হইলেও, "রূপের" অর্থ সুব্যক্ত হয় না। যাহার প্রভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনরূপ ভূষণ-ভূষিত না হইয়াও, বিভূষিতবৎ প্রতিভাত হয়, তাহারই নাম "রূপ।" যথা,—

"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ভাতি তৎ রূপমিতি কথ্যতে॥"

"রূপ" রূপ নহে;—অ-রূপ। তাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ব্যক্ত হয়। যাহা প্রকৃত পক্ষে অনুভূতিগম্য এবং অতীন্দ্রিয়, তাহা এইরূপে দৃষ্টিগম্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য ভারত-চিত্রে "রেখা" রেখা নহে; তাহা "রূপ-রেখা।" তাহার বিশুদ্ধি রক্ষার উপর চিত্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে। চিত্রের ভিন্ন-ভিন্ন অভিব্যক্তি ভিন্ন-ভিন্ন রুচিসম্পন্ন দর্শকের চিত্তবিনোদন করে। আচার্য্যগণ "রেখার" প্রশংসা করিয়া থাকেন;—বিচক্ষণগণ (আলো ও ছায়া প্রদর্শক) "বর্ত্তনার" প্রশংসা করেন;—রমণীগণ ভূষণ-বিন্যাসের অনুরাগিণী;—ইতর জন "বর্ণাঢ্যতার" পক্ষপাতী। যথা,—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ॥"

"রূপ-ভেদ" প্রথম কার্য্য। তাহার পদ্ধতি শিল্প শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। একটি "অনুলোম" এবং আর একটি "প্রতিলোম" পদ্ধতি। মস্তক হইতে রেখা-বিন্যাসের নাম "অনুলোম-পদ্ধতি", পদযুগল হইতে রেখা-বিন্যাসের নাম "প্রতিলোম-পদ্ধতি।" দেবমূর্ত্তির চিত্রাঙ্কনে "অনুলোম-পদ্ধতিই" অবলম্বনীয়। শরীরের সকল অঙ্গকেই রূপ-

ভেদে প্রদর্শিত করিতে হয় না, কারণ সকল অঙ্গ রূপের আধার নহে। যে সকল অঙ্গ রূপের আধার, তাহা পৃথক্ ভাবে প্রদর্শিত না হইলে, "চিত্র দোষ" সংঘটিত হয়। "অবিভক্ততা" সেই সুপরিচিত "চিত্র-দোষ।" এই কারণে ভারত-চিত্রে কোন কোন অঙ্গ ইঙ্গিত মাত্রে ব্যক্ত, কিন্তু কোন কোন অঙ্গ সুনির্দ্দিষ্ট রেখা-বিন্যাসে সুবিভক্ত। ভারত-চিত্রের এই "রূপভেদ"-রীতির যথাযোগ্য বিচারের অভাবে, কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থে ভারত-চিত্র "রেখাত্মক' বলিয়া উল্লিখিত। ভারত-চিত্র "রেখাত্মক" নহে,—"রূপাত্মক।"

দ্বিতীয় অঙ্গ—প্রমাণ।

তাল-হীন সঙ্গীতের ন্যায় মান-হীন চিত্র রস-বোধের অন্তরায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটি পরিমাণ-পার্থক্য বর্ত্তমান। দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থিতি-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, গতি-বিধানের সহায়তা সাধন করে। ইহা বিশুদ্ধানুভূতি, পরিমাণ, এবং গঠন বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। ইহা প্রকৃত পক্ষে রেখা-বিন্যাসকে সুসংযত করিয়া, চিত্র-সৌন্দর্য্য বিকাশিত করে। ইহা অনাবশ্যক শাসন-শৃঙ্খল নহে। ইহাকে অবহেলা করিবার উপায় নাই। কেবল এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম;—তাহা হাস্যরসের অবতারণায় অভিব্যক্ত। কিন্তু সেখানেও সাধারণ পরিমাণের ব্যতিক্রম ঘটিলেও, রসানুগত পরিমাণ অনতিক্রমনীয়। "প্রমাণ" সীমাকে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া, চিত্রকে সুসঙ্গত করে। ইহাতে শিল্পের স্বেচ্ছাচার সংযমিত হয়;—তাহার প্রতিভা-প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না।

তৃতীয় অঙ্গ—ভাব।

ইহা আকারের উপর মনোবৃত্তির ক্রিয়া বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। ভাব 'ক্রিয়া' নহে; অশরীরী চিত্ত-বৃত্তি;—তাহা বিভাব-জনিত শরীরেন্দ্রিয়বর্গের বিকার-বিধায়ক চিত্ত-বৃত্তি। যথা,—

"শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ।
ভাবা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ॥"

পৃথক্ পৃথক্ ভাবের প্রভাবে শরীরেন্দ্রিয়বর্গের পৃথক্ পৃথক্ বিকার সাধিত হয়। ইহা লোকসমাজে নিত্য প্রত্যক্ষীকৃত। মানব-চিত্তবৃত্তি রসানুগত; তদনুসারে "ভাব" নিয়মিত হইয়া থাকে। চক্ষুর আকার-পার্থক্যে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"চাপাকারং ভবেন্নেত্রং মৎস্যোদরমথাপি বা।
নেত্রমুৎপলপত্রাভং পদ্মপত্রনিভং তথা।
শশাকৃতির্মহারাজ! পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

চক্ষুর আকার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত;—চাপাকার, মৎস্যোদর, উৎপলপত্রাভ, পদ্মপত্রনিভ, এবং শশাকৃতি। চাপা-কারের অর্থ—ধনুরাকৃতি। তিব্বতীয় বুদ্ধমূর্ত্তিতে এবং কোন কোন বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিতে এইরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট চক্ষু লক্ষ্য করিয়া ওয়াডেল্ তাহাকে কিউপিডের ধনুর তুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। নেত্রের এরূপ আকারের কারণ কি, তাহার তথ্যানুসন্ধান না করিয়া, তিনি ইহাকে "স্বপ্নাবেশ" বলিয়া উপহাস করিয়া গিয়াছেন। নেত্রের অন্যান্য আকারগুলিও এইভাবে অবিচারে উপেক্ষিত হইতেছে। *

চক্ষু একটি সুপরিচিত শরীরেন্দ্রিয়; ভাবের প্রভাবে তাহার বিকার সাধিত হইয়া থাকে; এবং তদনুসারে তাহার আকার পরিবর্ত্তিত হয়। এই কারণে, সকল অবস্থায় সকল নরনারীর চক্ষুর আকার একরূপ হইতে পারে না। চিত্রসূত্রোক্ত পাঁচ প্রকারের চক্ষু পাঁচটি ভিন্ন-ভিন্ন আকার সূচিত করে; এবং ভিন্ন-ভিন্ন ভাবের প্রভাবে সেই সকল আকার-পার্থক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। যথা,—

"চাপাকারং ভবেন্নেত্রং যোগভূমি-নিরীক্ষণাৎ।
মৎস্যোদরাকৃতিং কার্য্যং নারীণাং কামিনাং তথা॥
নেত্রমুৎপলপত্রাভং নির্ব্বিকারস্য শস্যতে।
ত্রস্তস্য রুদতশ্চৈব পদ্মপত্রনিভং ভবেৎ॥
ক্রুদ্ধস্য বেদনার্ত্তস্য নেত্রং শশাকৃতির্ভবেৎ॥"

যোগ-ভূমি নিরীক্ষণের অভ্যাসে নেত্র ধনুরাকৃতি লাভ করে,—কামিজনের এবং কামিনীগণের নেত্র (লালসাপূর্ণ বলিয়া) মৎস্যোদরাকৃতি;—নির্ব্বিকারচিত্তের নেত্র উৎপল-দল-সদৃশ;—যে ত্রস্ত বা রুদ্যমান, তাহার নেত্র

* The eye of the Buddhas and the more benign Bodhisats is given a dreamy look by representing the upper eyelid as dented at its centre like a Cupid's bow; but I have noticed the same peculiarity in mediæval Indian Buddhist sculptures.—Waddell's Buddhism of Tibet, P. 330.

পদ্মদলের ন্যায়; ক্রুদ্ধের এবং বেদনাগ্রস্তের নেত্র শশকাকৃতি। শরীরেন্দ্রিয়বর্গের এইরূপ বিকার-বিধায়ক চিত্তবৃত্তির নাম "ভাব", তাহা চিত্রের পক্ষে অপরিহার্য্য; তাহার অভাব চিত্র-দোষ।

চতুর্থ অঙ্গ —লাবণ্য-যোজন।

ইহা "সৌন্দর্য্য-সন্নিবেশ" তথা "সুকুমার প্রদর্শন-ক্রিয়া" বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা এরূপ সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যাত হইলে, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম সকলের পক্ষে বোধগম্য হইতে পারে না। ইহা এক শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্য-সাধন। "লাবণ্য"-শব্দের ব্যবহারে তাহা সুস্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। মুক্তা হইতে যেমন একটি তরঙ্গায়মান দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সেইরূপ তরঙ্গায়মান দ্যুতি নিষ্কাষণের নাম "লাবণ্য"-যোজন। "লাবণ্য" একটি পারিভাষিক শব্দ। যথা,—

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে॥"

সকল নরনারীর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতেই অল্পাধিক মাত্রায় একটি তরঙ্গায়িত দ্যুতি ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহাই জীবিতকে মৃত হইতে পৃথক্ করিয়া দেখায়। ইহাকে চিত্রে প্রকাশিত করিবার শিল্প-কৌশলের নাম "লাবণ্য-যোজন।" ইহাতে তরলতা আছে। তাহা "ছায়ার" অর্থাৎ "কান্তির" তরলতা। টীকাকারগণ তাহাকে "তরঙ্গায়মান" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। "লাবণ্য" অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়া ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া যায়। সুতরাং তাহা কেবল ঔজ্জ্বল্য নহে,—চলোর্ম্মিবৎ চলনোন্মুখ। তাহাতেই চিত্র নির্জ্জীব হইয়াও, সজীববৎ প্রতিভাত হয়। স্থিতি-ভঙ্গীর মধ্যে এই রূপ লাবণ্য-গতিভঙ্গী সঞ্চারিত না হইলে, চিত্র "দৌর্ব্বল্য-দোষের" জন্য নিন্দিত হইয়া থাকে। "অবিভক্ততা" অর্থাৎ "রূপ-ভেদের" অভাব একটি চিত্র-দোষ; যে রেখা-বিন্যাস "রূপভেদ" সাধিত করে, তাহা যদি স্থূলতার অবতারণা করে, তবে তাহাও একটি চিত্র-দোষ। তাহার নাম "স্থূলরেখত্ব"। সেইরূপ বর্ণ-সাঙ্কর্য্যও একটি চিত্র-দোষ।' যথা,—

"দৌর্ব্বল্যং স্থূলরেখত্বমবিভক্তত্বমেব চ।
বর্ণানাং সঙ্করশ্চাত্র চিত্র-দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

পঞ্চম অঙ্গ—সাদৃশ্য।

"দৃশ্যের" সহিত তুল্যতার নাম "সাদৃশ্য।" ইহা কেবল "তুল্যতা" বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। তজ্জন্য ইহার প্রকৃত মর্ম্ম সুব্যক্ত হইতে পারে নাই; বরং "আকারানুকরণ" ভারত-চিত্রের একটি অঙ্গ বলিয়া অভিব্যক্ত হইয়া, ভারত-চিত্রের মূল প্রকৃতি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। "দৃশ্য" কি,—তাহা বিবৃত না হইলে, "সাদৃশ্য" কি,—তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রত্যেক বস্তুতে দুইটি বিষয় বর্ত্তমান,—"বস্তুসত্তা" এবং "বস্তু-দৃশ্য"। গো একটি চতুষ্পদ জীব। কিন্তু সকল প্রকার অবস্থানে তাহার পদচতুষ্টয় সমান ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই নাম "দৃশ্য"; এবং তাহার সহিত তুল্যতা সাধনের নাম "সাদৃশ্য।" পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচক রস্কিন্‌ও এই কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন,—সে বস্তুতে যাহা আছে বলিয়া জান, তাহা অঙ্কিত করিও না; যাহা দেখিতে পাও, তাহাই অঙ্কিত কর। "দৃশ্য" দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বাহ্য এবং আন্তর। "দৃশ্য" বাহ্যজগতেই বর্ত্তমান থাকুক, অথবা অন্তর্জ্জগতে কল্পিত হউক, যাহা "দৃশ্য" তাহারই সহিত "সাদৃশ্য" আবশ্যক। পাশ্চাত্য শিল্পে ভাবাত্মক এবং আকারাত্মক নামে যে দুইটি প্রভেদ কল্পিত হইয়া আসিতেছে, ভারত-শিল্পে তাহা অপরিজ্ঞাত। "আকার" ভারত-শিল্পের "অ-বিষয়।" "দৃশ্যই" ভারত-শিল্পের "বিষয়"। দৃশ্য দৃশ্য, তাহা আকার হইতে পৃথক্। আকারের অন্তরালে রূপ, ভাব, লাবণ্য, ও দৃশ্য বর্ত্তমান আছে;—তাহাই ভারত-চিত্রের "বিষয়"; এবং তজ্জন্য ভারত-চিত্র আকারের অনুকরণ নহে;—অনুভূতির অভিব্যক্তি। "সাদৃশ্য" শব্দে ইহাই সূচিত হইয়াছে। "সাদৃশ্য" তুল্যতা নহে, তাহা তুল্যতার হেতু।

ষষ্ঠ অঙ্গ—বর্ণিকা-ভঙ্গ।

ইহার অনুবাদেও প্রকৃত তাৎপর্য্য সুব্যক্ত হয় নাই। ইহা তুলিকার এবং বর্ণের সুকুমার ব্যবহার-ব্যবস্থা বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। "বর্ণিকা"—শব্দ অভিধানে নানার্থে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি অর্থ বর্ণকে অর্থাৎ রঙ্গকে, আর একটি অর্থ তুলিকাকে, অর্থাৎ রঙ্গ লাগাইবার যন্ত্রকে সূচিত করে। "ভঙ্গ"-শব্দের সহিত সমাস-নিবদ্ধ থাকায় "বর্ণিকা"-শব্দ তুলিকাকে সূচিত

করিতে পারে না; রঙ্গকেই সূচিত করে। "ভঙ্গ"-শব্দও ভাঙ্গাকে সূচিত করে না। চিত্র-সাহিত্যে "ভঙ্গ" এবং "ভক্তি" এই দুইটি শব্দ পারিভাষিক সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাগে ভাগে বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করিবার রীতির নাম "ভঙ্গ" অথবা "ভক্তি"। যেখানে যে বর্ণের সমাবেশ আবশ্যক, সেখানে সেই বর্ণের বিন্যাসের নাম "বর্ণিকা-ভঙ্গ"। ইহার ব্যতিক্রমে বর্ণের সঙ্করতা ঘটিয়া থাকে; তাহা একটি সুপরিচিত চিত্র-দোষ। যদিও "তুলিকার" সাহায্যে "বর্ণিকা-ভঙ্গ" সাধিত হইয়া থাকে, তথাপি তুলিকা-ব্যবহারের রীতি-বিশেষ চিত্রের অঙ্গ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কারিকায় যে ছয়টি বিষয় উল্লিখিত, তাহা চিত্রের অঙ্গ; সুতরাং তাহা চিত্র-বস্তু, চিত্রাঙ্কনের বস্তু নহে। ভারতীয় চিত্র-সাহিত্যে দুই শ্রেণীর রচনা দুই নামে পরিচিত হইয়াছিল,—"চিত্র-সূত্র" এবং "চিত্র-কল্প।" "চিত্র-সূত্রে" চিত্রের মূল প্রকৃতি, এবং "চিত্র-কল্পে" চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মূল গ্রন্থের বিলোপ শোচনীয় হইলেও, বিবিধ নিবন্ধে, পুরাণে, তন্ত্রে, এবং সাধারণ সাহিত্যে "চিত্র-সূত্র" এবং "চিত্র-কল্প" উদ্ধৃত হইয়া, অদ্যাপি সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করে নাই। তাহা যথাযোগ্য ভাবে সঙ্কলিত না হইলে, ভারত-চিত্রের প্রকৃতি এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত সংস্কার পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের আলোচনায় ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে, তাহার সংশোধনের পথ পরিষ্কৃত হইবে না। *

কামসূত্র-টীকাকার যশোধর যে কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে অতি পুরাতন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারিকায় ভারত-চিত্রের মূল প্রকৃতি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ভারত-চিত্রের মূলতত্ত্বও অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

স্থান, কাল, চেষ্টা, একই মনুষ্যের "দৃশ্যকে" বিবিধ ভাবে প্রদর্শিত করে, সুতরাং চিত্র সম্পূর্ণরূপে আকারাত্মক হইতে পারে না। তাহা বাহ্য-বস্তুর আকার অবলম্বনে অভিব্যক্ত হইলেও, আকারানু-কৃতি নহে, দৃশ্য-সৃষ্টি। তাহার সহিত অস্থিসংস্থান-বিদ্যার সম্পর্ক বড় অধিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অস্থি অদৃশ্য; তাহার অস্তিত্ব কোন কোন স্থলে ঈষৎ প্রতিভাত হইলেও, দূরবর্ত্তী দর্শনস্থান হইতে অদৃশ্য। সুতরাং তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইতে পারে না। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থি-শিরা-মাংসপেশী প্রভৃতির স্বাভাবিক সংস্থানের জন্য যে সকল নতোন্নত "দৃশ্য" স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এবং দূরবর্ত্তী দর্শন-স্থান হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইত। শিরাগুলি প্রদর্শন করা অনুচিত বলিয়া যে নিষেধ বাক্য প্রচলিত আছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—ভারত-চিত্র কি জন্য অস্থিসংস্থান-বিদ্যার উদাহরণ রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সম্মত হয় নাই!

চিত্রসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সকলের নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে পারে; কিন্তু তাহা কি জন্য মনোরঞ্জন করে, অল্প লোকেই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; এবং আরও অল্প লোকেই তাহা ভাষায় অভিব্যক্ত করিতে পারে। আমাদের দেশে যত অল্প দিনের মধ্যে যতগুলি চিত্রবিদের এবং চিত্র-সমালোচকের আবির্ভাব হইয়াছে, মানব-সমাজের ইতিহাসে তাহা একটি বিস্ময়জনক ব্যাপার। তাঁহারা সকলেই ভারত-চিত্রের অনুরক্ত। সুতরাং ভারত-চিত্রের মর্ম্ম-কথা পুরাতন সাহিত্যে যেখানে যে ভাবে বিবৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের কৃপায় আমরা এত দিনে তাহা সমস্তই অবগত হইতে পারিতাম। এখন পর্য্যন্ত তাহার সূত্রপাতও লক্ষিত হইতেছে না কেন, তাহাও একটি বিস্ময়জনক ব্যাপার।

কলা-সাহিত্যের মধ্যে চিত্র-সাহিত্য সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত কলাজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে। তথাপি বাৎস্যায়ন চতুঃষষ্টি-কলার নামোল্লেখ করিবার সময়ে প্রথমে গীতের, তাহার পর বাদ্যের, তাহার পর নৃত্যের, এবং তাহার পর চিত্রের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন কেন, তাঁহার গ্রন্থে তাহার কারণ উল্লিখিত হয় নাই। পৌরাণিক সাহিত্যে তাহা উল্লিখিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যেই ভারত-চিত্রের মূলতত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। তজ্জন্য ভারত-চিত্র কদাপি উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দান করিতে পারে নাই;—যে কোনরূপ অঙ্কন-প্রয়াসকে চিত্র নামে পরিচিত করিতে পারে নাই;—ভারত-চিত্রে স্বেচ্ছাচার অপরিজ্ঞাত;—অসংকুচিত অন-ধিকারচর্চ্চা প্রশ্রয় লাভে অসমর্থ। ভারত-চিত্রকে সত্য-সত্যই পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব কিনা, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। কিন্তু তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা সম্ভব। বুঝিতে হইলে, ভারত-চিত্রবিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

* সম্প্রতি ইউরোপীয় বিদুষী কুমারী ক্রামরিস্ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-চিত্র সম্বন্ধে যে ভাবে বক্তৃতা করিতেছেন, তাহা অনেক স্থলে ভারত-চিত্রসাহিত্যের বিপরীত সিদ্ধান্তই প্রচারিত করিতেছে।

বিপর্য্যয়

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল]

(১৩)

অমল বলিল, "আমার মনে হয়, ইন্দির তার স্ত্রীকে neglect ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে।"

অনীতা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না—তা নয়। Neglect তিনি কোনও দিনই করেন নি। তাঁর মতন স্ত্রীকে যত্ন ও সমাদর খুব কম লোকে ক'রে থাকে।"

"যত্ন এক কথা, আর ভালবাসা আর এক কথা!"

"তা ঠিক। কিন্তু তিনি ভালও কম বাসেন না। আসল কথাটা এই যে, তিনি বড় disappointed হ'য়েছেন। আর বৌদি সে disappointmentটা টের পেয়ে গেছে।"

"ইন্দিরটা বেকুব! তার disappointed হ'বার কোনও অধিকার নেই। ওর স্ত্রীর মত অমন মেয়ে হাজারে একটা মেলে না! কি বড় ওর হৃদয়টা,—কি তার ভালবাসার গভীরতা!"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু ও-গুলো যে তার আছে। যেটা আছে সেটা খুব কম সময়েই আমাদের নজরে পড়ে। যেটা নেই সেইটাই সব সময়ে আমাদের কাছে খুব বড় হ'য়ে ওঠে।"

"কিন্তু তার স্ত্রীর নেই কি? অমন রূপ বাঙ্গলা দেশে খুব হামেসা দেখা যায় না। রান্নায় সে অতুলনীয়। গান, বাজনা, সেলাই সব জানে। বন্ধু-বান্ধবকে যত্ন ক'রতে, ঘর-সংসার গুছাতে সবই জানে। জানে না কেবল ইংরাজীতে কথা ব'লতে!"

"লেখা-পড়া জানে না, এইটাই যেন আমার মনে হয় ইন্দ্রদার সব চেয়ে বেশী দুঃখ!"

"The madness of the thing! লেখা-পড়ার এতবড় একটা artificial value দাঁড়িয়ে গেছে যে, বলবার নয়। লেখা-পড়াটা হ'ল একটা উপায় মাত্র,—তা'র উদ্দেশ্য হ'ল মানুষ গড়া। অথচ এই foolটা মানুষটার দিকে চেয়ে দেখছে না,—লেখাপড়া, লেখাপড়া করে' অস্থির হ'য়েছে!"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "তোমার কথা শুনলে আমার Alpine Railwayর কথা মনে পড়ে।"

বিস্মিত হইয়া অমল বলিল "কেন?"

"তাতে যেমন একটা উঁচু জায়গা থেকে ছেড়ে দিলে, সেটা ঝোঁকের মাথায় বাধা-বিঘ্ন গ্রাহ্য না করে', হুড়মুড় করে' চলে যায়—তুমিও তেমনি একটা প্রতিপাদ্য ঠিক করে নিলেই তেমনি অন্ধের মত ঝোঁকের মাথায় হুড়-মুড় করে ছোট। পথের মাঝে যে কতগুলো সত্যকে তুমি মাথা মুড়িয়ে রেখে গেলে, তার ঠিকানা নেই।"

"উপমা যত far-fetched এবং যত অসম্পূর্ণ হয়, বোধ

হয় কবিত্বটা ততই পাকা হয়। তা' হ'লে তুই একটা খুব বড় কবি হ'তে পারবি। কিন্তু আমি কোন্ সত্যটা লঙ্ঘন ক'রলাম শুনি।"

"Intellectual companionshipটা লোকের একটা আকাঙ্ক্ষা ক'রবার জিনিষ—এটা অস্বীকার কর তুমি?"

"করি না। কিন্তু দুধ, মাছের ঝোল, ঘোল, অম্বল,—সব কি লোকে এক পাত্রে খায়? জিনিষগুলির আস্বাদ নিতে হ'লে, আল্‌গা-আল্‌গা করে সবগুলোকে খেতে হ'বে। Intellectual companionship, ভাল রান্না, মিষ্টি হৃদয়, সব যে এক ভাণ্ডে পেতে হ'বে, তার কি মানে আছে? স্ত্রীর কাছে যে সব জিনিষ না হ'লে চলে না, তা' যদি পাওয়া যায়, তবে intellectual companionship তো বাইরে ঢের পাওয়া যায়। ইন্দ্রের যে সব বন্ধু আছে, তা'তে সে যে ঠিক এই জিনিষটার জন্যে খুব বুভুক্ষিত হ'য়ে র'য়েছে, এমন তো মনে হয় না।"

"দুধের তেষ্টা কি ঘোলে মেটে দাদা! সবচেয়ে যে সব জিনিষ আমরা ভাল মনে করি, যাকে ভালবাসি, তার—ভিতর আমরা সেই জিনিষ দেখতে চাই। তার ভিতর যা যা প্রত্যাশা করি, তাতে তা দেখ্‌তে না পেয়ে, তা' যদি অন্যের ভিতর দেখতে পাই, তাতে দুঃখ বাড়ে বই কমে না।"

"ভালবাসার এত তত্ত্ব আমি জানি নে বাপু। এবার টম্ এলে তোর এ কথা যাচাই ক'রে নেব।"

টম্ লিওলে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার। অনীতা কেম্ব্রিজে থাকিতে, তার সঙ্গে টমের প্রথম আলাপ হয়। তাহারা উভয়ে এক-সঙ্গে কতকগুলি বিষয় পড়িত। টম্ যখন ভারতবর্ষে আসে, তখন অনীতাদের সঙ্গে এক জাহাজে আসিয়াছিল। জাহাজে তাহাদের রকম-সকম দেখিয়া বাহিরের লোকেরা সবাই অনুমান করিয়াছিল যে, জাহাজখানা ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পর, অনীতার নাম লিওলে হইতে খুব বেশী দেরী হইবে না।

টম্ কলিকাতায় পৌঁছিবার কয়েকদিন পরেই অমলকে এমনি একটা কথা বলিয়াছিল। অমল তাহাকে বলিল, "তিন বছর পরে যদি তুমি এ প্রস্তাব আবার উপস্থিত কর, তবে আমি অনীতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব—, এখন এ সম্বন্ধে তার কাছে কোনও উচ্চবাচ্য করিও না।" অমলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিন বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিবার পর আর ইংরেজের বাচ্ছা লিওলে বাঙ্গালীর মেয়ে বিবাহ করিতে চাহিবে না।

লিওলে কিন্তু আশা ছাড়ে নাই। সে এখনো ঠিক আগেরই মত অনীতার কাছে তার পূজা পৌঁছাইয়া যাইত।

অনীতা টমকে এমন কোনও ভাব কোন দিনই দেখায় নাই যে, সে টমকে ভালবাসে। তবে টমের পূজা পাইয়া যে সে আনন্দলাভ করিত না, এ কথা বলা চলে না। কোন্ নারী এমন আছে যে, একজন উপযুক্ত লোকের প্রেম লাভ করিয়া গর্ব্বিত ও পুলকিত না হয়। টম্ যখন অমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তখন যদি সে অনীতাকে সেই কথা বলিত, তবে অনীতা তাহাকে "না" বলিতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তার পর অনীতার আরও আড়াই বৎসর বয়স বাড়িয়াছে। আড়াই বছরের অভিজ্ঞতায় কিই বা না হয়—বিশেষতঃ জীবনের এই সব মহাসন্ধি-স্থলে! মোটের উপর অনীতা এখন আর টমের পূজায় খুব তৃপ্তি বোধ করে না। দাদার কথায় অনীতা কাজেই খুব খুসী হইতে পারিল না। একটু বাদে সে বলিল, "যাই হ'ক দাদা, এর একটা উপায় তো করতে হ'বে! ওদের সুখের সংসারটা মিছি-মিছি ছারখার হ'য়ে যাবে, আমরা কি তা দাঁড়িয়ে দেখবো?"

অমল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তা তো বটে। কিন্তু ইন্দিরটা হতভাগা! ওকে দিয়ে আমার কোনও আশা নেই!"

অনীতা একটুখানি চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, "দাদা কি যে বলে, তার ঠিক নেই। ইন্দ্র-দা'র মত লোককে দিয়ে যদি তোমার আশা না থাকে, তবে কি আশা আছে সত্যকে দিয়ে!" সত্য অমলের প্রতিবেশী।

"আলবৎ! সত্য হ'ল একটা মদ্দ মানুষ; আর তার স্ত্রীও একটি স্পষ্টভাষিণী মহিলা! তা'দের মনের ভিতর কোনও ছাই-চাপা আগুন নেই। যখন সত্যর গৃহস্থালী-ঘটিত কোনও জিনিষ পছন্দ না হয়, তখন সে আপনার ঘরের ভিতর ঢুকে মুখ ভার করে' বসে' থাকে না;—পষ্টাপষ্টি খোলসা করে তা'র স্ত্রীকে সে কথা বেশ বোঝবার মত করে' বুঝিয়ে দেয়। গিন্নীও সে সম্বন্ধে এবং সত্যর

চরিত্র, সম্বন্ধে মোটের উপর তাঁর যা বক্তব্য, বেশ খোলসা ক'রেই বলে থাকেন। আর বলবার সময় এমন করে' কখনই বলেন না যে, সেটা কেবল সত্যর কানেই ঢোকে, আর কেউ না জানতে পারে। আবশ্যক হ'লে সত্য এ রকম স্থলে তা'র মত প্রতিষ্ঠার জন্যে বাহুবলের আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হয় না। গিন্নীও আঁচড়-কামড় দিয়ে, চাই কি হাতা-বেড়ী দিয়ে, তাঁর ইচ্ছা যথাসম্ভব প্রকাশ করেই বলেন। কিন্তু এমনি একটা বোঝা-পড়ার পর, তাদের মনের ভিতর আর যাই থাকুক, পরস্পরের মনের কথা সম্বন্ধে আর কোনও ভুল ধারণা থাকে না। আর প্রায়ই দেখা যায় যে, এমনি একটা ঘটনার পর তারা মাসখানেক মোটের উপর বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই কাটিয়ে দেয়। এ সব লোকের কোনও লেঠা নেই; আর এদের মধ্যে মধ্যস্থতা ক'রতেও কোন হাঙ্গাম নেই। ঝগড়ার সময় উপস্থিত হ'য়ে দুজনকে টানাটানি করে' ছাড়িয়ে দিলেই হ'ল। কিন্তু ইন্দিরদের স্বামী স্ত্রীর মত sneakদের নিয়ে বিপদ এই যে, এদের কোনও সাহায্য করা যায় না।"

অমল যে ইন্দ্রনাথের ঘাড়ে এই রকম অপ্রশংসার বিশেষণ অকুণ্ঠিত চিত্তে চাপাইতেছিল, তাহাতে অনীতার বড় অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও আপত্তি না করিয়া সে বলিল, "কেন, এস না,—তোমাতে-আমাতে মিলে এক দিন ইন্দ্রদা'কে বুঝিয়ে সাবধান করে দিই।"

অমল লাফাইয়া "ওরে বাপ রে! আমি ও-সবের মধ্যে নেই। তুই ব'লতে চাস্ বলিস। কিন্তু ব'লে রাখছি, এমন ক'রলে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। আর তুই তাকে বলবি কি? বলবি, 'দেখুন, আপনি আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে সুবিচার ক'রছেন না।' সে ব'লবে, 'কিসে দেখলে?' তুই বলবি, 'সে লেখা-পড়া জানে না ব'লে আপনি তাকে অশ্রদ্ধা করেন।' সে ব'লবে, 'কক্ষণও না।' আর তার স্ত্রীকে সাক্ষী মেনে বসবে। স্ত্রী অমনি জিভ্ কেটে ব'লবে, 'রাম বল! ও'র মত আদর কে কবে স্ত্রীকে ক'রেছে।' বস্—তুই বেকুব বনে যাবি,—যেমনকার আগুন, তেমনি থেকে যাবে। ছাই-চাপা আগুনের দোষই তো ওই।—মাঝখান থেকে ওরা স্বামী-স্ত্রী তোর উপর মর্ম্মান্তিক চটে যাবে।"

দাদাকে দলে টানিতে না পারিলেও, অনীতা তার কথায় হাল ছাড়িল না। সে স্থির করিল, সে নিজে একবার চেষ্টা না করিয়া ছাড়িবে না।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় ইন্দ্রনাথ যখন তাহাদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল, অমল তখনও বাড়ী ফিরে নাই। ইন্দ্র অনীতার সঙ্গে খানিকক্ষণ টেনিস্ খেলিয়া লনের এক পাশে বসিয়া অনীতার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। অনীতা ভাবিল এই শুভ সুযোগ। সে এ-কথা ও-কথা কহিয়া, শেষে বলিল, "ইন্দ্র-দা', একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক ব'লবেন?"

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল, "কেন বলবো না?"

"আপনি আমাকে সত্যি-সত্যি ভালবাসেন"—

কথাটায় দু'জনেই ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল; দুজনেরই মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু ম্লানায়মান সন্ধ্যার আলোকে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না।—অনীতা কথাটা সারিয়া লইয়া বলিল—"ঠিক আগের মত—আপনার ছোট বোনটির মত ভালবাসেন?"

অনীতা কেন যে এমন বোকার মত ভুলটা করিল,—এক কথা বলিতে আর এক কথা বলিয়া বসিল, ভাবিয়া পাইল না। নিজের উপর তার ভয়ানক রাগ হইল; কিন্তু যা হউক, বিপদটা যে কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতেই সে স্বস্তি বোধ করিল।

ইন্দ্রনাথের বুকের ভিতর ধড়াস্-ধড়াস্ করিতে লাগিল। সে যথাসম্ভব আত্মদমন করিয়া বলিল, "এ কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'রছো অনীতা?"

"যদি আমাকে সে অধিকার আপনি দেন, যদি সত্যি-সত্যি আমাকে সম্পূর্ণভাবে আপনার লোক ব'লে মনে করেন, তবে আমি আপনাকে একটা কথা ব'লতে চাই।"

অনীতার ব্যগ্রতা ও আবেগে ইন্দ্রনাথের মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে ভয়ে-ভয়ে বলিল, "তুমি ব'লতে পার।"

"আপনি আপনার স্ত্রীর মনের কথা ঠিক বুঝতে পেরেছেন কি না জানি না,—কিন্তু আমার মনে হয় যে, তাঁর মনে একটা খুব বড় কষ্ট আছে। তিনি মনে করেন যে, আপনি তাঁকে সম্পূর্ণ ভালবাসতে পারেন না। আপনি যেমন চান, তিনি ঠিক তেমন নন ব'লে আপনি ঠিক তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন না। আপনার কি তাই মনে হয় না?"

ইন্দ্রনাথ নীরব রহিল। কথাটা ঠিক। কিন্তু তার স্ত্রী

সে কথা মনে করে কি না, সে কথা ইন্দ্র তো জানে না! তা' ছাড়া, সত্য হ'ক মিথ্যা হ'ক, সে কথা ইন্দ্র অনীতাকে কেমন করিয়া বলিতে পারে? এই ভর-সন্ধ্যাবেলায়, নিরিবিলি বসিয়া, একটী সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে এ-সব বিষয়ে বাক্যালাপ করা যে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, এ কথা তাহার মনে হইল।

তার বড়-বড়, উজ্জ্বল চক্ষু দুটি একাগ্র আবেগের সহিত ইন্দ্রনাথের মুখের উপর রাখিয়া অনীতা বলিল, "আমার উপর রাগ ক'রবেন না ইন্দ্র-দা'। কিন্তু আমি মেয়েমানুষ,—মেয়েমানুষের মনের কথা একটু বেশী বুঝি। তিনি এই কথা ভেবে-ভেবে দিন-দিন কি কষ্ট পাচ্ছেন, তা' হয় তো আপনি বুঝতে পারবেন না। কিন্তু আমি বুঝি। আপনি কি তাঁর এ দুঃখ দূর করবেন না?"

ইন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে বলিল, "কেমন করে' ক'রবো বল। আমি তা'র প্রতি কর্ত্তব্যে কোনও দিন অবহেলা ক'রেছি বলে তো মনে হয় না।"

"অবশ্য না। সে আপনি করতে যাবেন কেন? কিন্তু ইন্দ্র-দা' ভালবাসাটা কর্ত্তব্যের চেয়ে আর একটু বেশী;—কর্ত্তব্য ওজন ঠিক রেখে চলে; ভালবাসার স্বভাবই এই যে, দুই কূল ছাপিয়ে আপনাকে বিলিয়ে যায়! আপনি তো তা' জানেন। বৌদিকে আপনি যেমন ভালবেসেছেন, তা' কি আমি শুনি নি? এখনো ঠিক সেই ভাব আছে কি? সে কথা কেবল আপনি আপনার মনকে জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন,—আর আপনার মনই কেবল এর খাঁটি জবাব দিতে পারে।"

ইন্দ্রনাথ মিথ্যা বলিতে কুণ্ঠিত হইল; কিন্তু এ কথার সোজা জবাব না দিয়া সে বলিল, "সে ভাব নাই যদি থাকে, তবে আমি কি ক'রতে পারি? আমায় কি ক'রতে বল তুমি? দিন-রাত কি যেটা নাই তার অভিনয় ক'রতে হ'বে?"

"পাগল! যার সঙ্গে এক দিন দু' দিনের দেখা, তা'কে অভিনয় করে ভুলিয়ে রাখতে পারেন; কিন্তু যে ভালবাসে, তাকে চিরদিনের জন্য কি মেকী জিনিষ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারবেন? অসম্ভব! আমি আপনাকে অভিনয় ক'রতে বলছি না। আপনাকে সত্য-সত্য সেই ভালবাসা ফিরিয়ে আনতে হ'বে—তেমনি করে' বৌদিদিকে আপনার সাধনার সর্ব্বস্ব ক'রতে হ'বে। ব'লতে পারেন, তার এত বড় দাবী কেন? আর দশজন যতটুকুতে খুসী, সে কেন তাতে খুসী থাকবে না? কেন থাকবে? আপনি তাকে রাণীর আসনে একবার যখন বসিয়েছেন, তখন তাকে এক ধাপও নেমে আসতে বললে, তাকে বেদনা পেতেই হ'বে। তা' ছাড়া, এটাও মনে রাখবেন,—যে যত বড় দাতা তার কাছে লোকে তত বড় দানের প্রত্যাশা করে। আপনি হৃদয়-সম্পদে যত বড় ধনী, তত বড় ধনী আর কটা আছে? সেই অতুল ঐশ্বর্য্য আপনি যাকে দু' হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন, সে আজ আপনার কাছে মুষ্টি-ভিক্ষা নিয়ে কি ব'লে ফিরে যাবে?"

ইন্দ্রনাথ নীরব রহিল। অনীতা বলিয়া গেল, "আমাকে মাপ ক'রবেন ইন্দ্র-দা'। বৌদিদির প্রাণের ভিতর যে দাগ লেগেছে, সে যে কত বড় দাগ, সে আমি আমার প্রাণের ভিতর অনুভব ক'রছি। যাকে ভালবাসা যায়, তার কিছু না পেলেও বেঁচে থাকা যায়,—যদি তার শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। কিন্তু সব পেয়েও যদি শ্রদ্ধা হারাম যায়, তবে কিছুই না পাওয়ার সামিল হয়। তাই আপনাকে ব'লছি, তাঁর প্রাণের এ দাগটা আপনার মুছে ফেলতেই হবে। আপনাকে আমি খুব বড় ব'লে জানি ব'লেই ব'লছি। আপনি পারবেন বলেই ব'লছি,—আপনার সেই পুরোনো শ্রদ্ধা ও প্রীতি ফিরিয়ে আনতে হ'বে। আর কেনই বা তা' না পারবেন আপনি? বৌদি কোন্ নারীর চেয়ে হীন? তার মত অতবড় হৃদয় আপনি কটা লেখাপড়া-জানা মেয়েমানুষের মধ্যে দেখতে পাবেন। চৌদ্দ বছরের মেয়ে নন্দাইয়ের চিকিৎসার জন্য গায়ের গয়না খুলে দেয়,—আমাদের খুব বেশী শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে তেমন কটা দেখতে পাবেন? দাদা সে-দিন ব'লছিলেন, শিক্ষাটা একটা উপায় মাত্র। তার উদ্দেশ্য হল মানুষ গড়া। বৌদি লেখাপড়া শেখেন নি সত্য, কিন্তু খাঁটি মানুষ হ'য়ে জন্মেছেন। বৌদির বিরুদ্ধে বলবার একমাত্র এই যে, তিনি লেখাপড়া জানেন না। তাই ব'লে এত বড় একটা খাঁটি মানুষকে আপনি প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা ক'রতে পারবেন না—আপনাকে এত সঙ্কীর্ণচেতা আমি মনে ক'রতে পারি না।"

ইন্দ্রনাথ এতক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়া ছিল। এ কথায় মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, অনীতার চোখে জল। তার

মুখ-চোখ দিয়া একটা উৎসাহের তীব্র জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে! সে যেন আত্মহারা হইয়া তাহার সমস্ত হৃদয় এই বক্তৃতায় ঢালিয়া দিয়াছে।

অনীতা আবার বলিল, "আপনি হয় তো বুঝতেই পারছেন না—আপনি কত বড় সম্পদে বৌদিকে বঞ্চিত ক'রছেন। আপনার মত লোকের ভালবাসা পাওয়া যে কোনও নারীর তপস্যার ফল।—সেই ভালবাসা পেয়ে হারালে, সামান্য নারীর প্রাণ কেমন করে বাঁচবে বলুন। এমন সর্ব্বনাশ ক'রবেন না ইন্দ্র-দা'। এ শুধু বৌদির সর্ব্বনাশ নয়,—আপনারও সর্ব্বনাশ।"

লিগুলের গাড়ীর শব্দ শুনিয়া দুজনে উঠিয়া দাঁড়াইল। ড্রইং রুমের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে অনীতা ইন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া বলিল, "আমার কথা রাখবেন বলুন ইন্দ্র-দা'!"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "আমি চেষ্টা ক'রবো।" অনীতার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তার পর সে বলিল, "দাদা না আসা পর্য্যন্ত আপনি এখানে থাকবেন ইন্দ্র-দা', আমার বিশেষ দরকার আছে।" লিগুলের সঙ্গে একা থাকিতে তার সাহস ছিল না।

(ক্রমশঃ)

খোকার প্রশ্ন

[শ্রীবিহঙ্গবালা দাসী]

খোকা কাঁদতে-কাঁদতে মাকে বল্লে, "ওমা, মা গো, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

মা ভাতের ফেন গালছিল—ধমক দিয়ে, চোখ রাঙ্গিয়ে বল্লে, "আঃ গেল যা, হতভাগা ছেলের খালি ক্ষিদে! যা—এখন দিক্ করিস নে।"

দুষ্ট ছেলে খোকা তা শুনবে কেন? ধমক খেয়ে তার জেদ বেড়ে গেল। সে তার মার আরও কাছে এসে, একেবারে তার গলা আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে, সুর চড়িয়ে দিলে "ও-মা আ-মা-র ক্ষি-দে পে য়ে-এ-এ-ছে।"

"কি জ্বালাতেই পড়েছি গা? পুড়ে মরবো না কি রে বাপু?"

ছেলে তবু ছাড়ে না। শিবানীকে অগত্যা একটু শান্ত হতে হ'ল। কার্য্য সিদ্ধি করতে হ'লে কুকুর বিড়ালটারও তোষামোদ করতে হয়—আর এ ত ছেলে। আদর করে বল্লে, "ছিঃ বাবা, লক্ষ্মীধন আমার, ছেড়ে দাও ত গোপাল।"

এই সাদর সম্ভাষণে গোপাল গলে গিয়ে মাকে মুক্তি দিলে। মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ফেন ফেলে হাত ধুয়ে এসে শিবানী কুটনায় বসলো,—আর খোকা তার পাশে বসে রাজ্যের প্রশ্ন আরম্ভ করে দিলে।

"হ্যাঁ মা, ভাতে কেন ফেন বেরোয় মা?"

মা'র তখন সদুত্তর দিবার অবকাশ নাই—আফিসের রান্না কি না। মা ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে, "বেরোয় আবার কেন—অত খবর তোমায় দিতে পারি নে।"

জেদী খোকার কাছে তবু নিস্তার নাই। সে ধরলে, "না বল। ব-ল্-তে হ-বে তো-মা-কে।"

শিবানী তখন আস্তে-আস্তে বল্লে, "জানি নি।"

খোকার আবার প্রশ্ন, "কেন জান না মা?"

"কেন জানি না, তাও তোকে বল্তে হবে রে?"

অজ্ঞান জননী ছেলের প্রশ্নের কি সদুত্তর দিবে?

খোকার নজর পড়ল কুটনোর দিকে—সে প্রশ্ন করলে "হ্যাঁ মা, আনাজের খোসা ছাড়াতে হয় কেন?"

মা তেমনি স্বরে বল্লে, "জানি নি।"

"না জান না বৈ কি? এবার তোমাকে জানতে হবেই হবে।"

বোকা ছেলে খোকা—সে ত জানে না মার বুদ্ধির দৌড় কত দূর। তাই সে বল্লে, "এবার তোমায় জানতে হবেই হবে।"

শিবানী বিরক্ত হয়ে বল্লে, "কি আপদেই পড়িছি গা। ও সরি, সরি, ওলো ও পোড়ারমুখী মেয়ে—"

নেপথ্য হইতে পোড়ারমুখী মেয়ে উত্তর দিল, "এই যে গো যাচ্ছি। বাবা রে বাবা, খালি-খালি ডাকবে।"

সরলা মহাকালী পাঠশালায় পড়ে। সে তখন নিবিষ্ট-চিত্তে পিঁড়িতে আলপনা আঁকছিল। কাল তাদের আলপনার এগ্‌জামিন। মায়ের ডাক শুনে দৌড়ে এসে গনগন করে বল্‌লে, "কি বল্‌ছো?"

"এতক্ষণে কি বল্‌ছো? ভাইটিকে কি একটু আগলাতে পার না? কি কচ্ছিলে কি?"

"আলপনা দিচ্ছিলুম ত! কাল এগ্‌জামিন যে!"

"আলপনা দিচ্ছিলে! যমের বাড়ী যাও না, তা'হলে আর আমার পয়সা খরচ করতে হয় না। খোকাকে নিয়ে যা শীগ্‌গির।"

খোকা দিদির কাছে গিয়ে আলপনা দেওয়া দেখতে-দেখতে প্রশ্ন করলে, "ও কি করছ দিদি?"

দিদি পুনরায় একাগ্র মনে আলপনা আঁকাছিল। ভায়ের প্রশ্নে আবার তার একাগ্রতা নষ্ট হয়ে গেল। একে ত মায়ের মধুর বাণী তার ব্রহ্মাণ্ডকে শীতল করে নি,—কাজেই সে খোকাকে উত্তর দিলে, "দেখতে পারছ না, কাণা শুকুল?"

কাণা শুকুল বল্‌লে, "দেখতে পাচ্ছি ত। ওতে কি হয়, বল না তুমি।"

"বিয়ে হয়, ঠাকুর-পূজো হয়—আবার কি হবে?"

খোকা আশ্চর্য্য নয়নে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—পিঁড়িতে আলপনা দিলে বিয়ে হয়, ঠাকুর-পূজো হয়! এ কি রকম? খোকার সে কথা মনঃপুত হ'ল না,—কাজেই সে আবার খুঁতখুঁত আরম্ভ করলে।

"কেন রে খোকা, ঘ্যান-ঘ্যান করছিস কেন? কি হয়েছে?" বলে বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বর মালা জপ্‌তে-জপ্‌তে ঘরে ঢুকলো।

খোকা বললে, "এ্যাঁ, এ্যাঁ, এ্যাঁ—আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

এ ক্ষুধা কিসের ক্ষুধা?

সরি খোকার পিঠে ধাঁই করে এক কিল বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "দেখ খোকনা, তুই রাতদিন ঘ্যান-ঘ্যান করিস নি বাপু; রাক্ষসের খালি ক্ষিদে, কিসের এত ক্ষিদে রে?

যজ্ঞেশ্বর হাঁ হাঁ করে উঠল, "আঃ, মারিস কেন সরলা? আয় খোকা আমার কাছে আয়।" বলে আদর করে জেঠা মশায় খোকনকে কোলে তুলে নিলে। ঠাকুর-ঘরে গিয়ে, তার পূজার ফুল থেকে একটি লাল ফুল বেছে নিয়ে, খোকার হাতে দিয়ে বল্‌লে, "এই দেখ্‌ খোকা, কেমন ফুল দেখেছিস্‌।"

খোকার ক্রন্দন-ক্ষুণ্ণ মুখ মুহূর্ত্তে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তার নধর গোলাল হাতখানি বাড়িয়ে, ওই পবিত্র ফুলের মত পবিত্র হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে, মধুমাখা স্বরে বল্‌লে, "দাও ফুল দাও, জেঠামশায়।"

সেই নির্ম্মল অনাবিল পবিত্র হাস্যময় মুখখানির পানে চেয়ে, জেঠামশায় বুঝি খানিক ক্ষণের জন্য তার ঠাকুরকেও ভুলে গেল, বিগলিত কণ্ঠে বল্‌লে, "আর কাঁদবে না ত?"

"না।"

"যা, মাকে দেখিয়ে আয় গিয়ে,—আমি ততক্ষণ পূজো করি, কেমন?"

খোকা সম্মতি-সূচক মাথা নেড়ে, "আচ্ছা" বলে সায় দিয়ে, মায়ের রান্না-ঘরের দিকে দে ছুট।

"অ মা, মা, কেমন ফুল দেখ।"

শিবানীর তখন বেগুন-ভাজা পুড়ে যায়,—উনুনের আঁচ খাই-খাই করছে। আফিসের বেলা হ'ল—ভাত-ভাত করে স্বামী তখন খালি বাড়ীখানা টেনে মাথায় তুলে নাচতে বাকি রেখেছে। তখন কি কারও মেজাজের ঠিক থাকে ছাই! ছেলের এই শিশু-মুখের সুধামাখা কথাগুলো মায়ের গায়ে যেন বিষ ছড়িয়ে দিলে। সে খেঁকি কুকুরের মত ছেলেটাকে তাড়া দিয়ে বলে উঠল, "বেশ, বেশ, যা, যা,—আর ফুল দেখাতে হবে না। ভারি আমার ফুল-আলা রে!"

রামধন চন্দ্র ওদিকে হাঁকিলেন, "ভাত,—ভাত, বলি ওগো, আজ আর ভাত-টাত হবে না নাকি?"

'ওগো' তখন 'রঘো' ডাকাতের প্রণয়িনীর মত প্রিয়-সম্ভাষণে প্রাণপতিকে আপ্যায়িত করে বলে উঠল, "হবে না কেন? ভাজাগুলো সে দিয়ে পুড়ে চুলোর দুয়োরে যায়—ভাত কি ছাই দিয়ে দোব?"—বলে শিবানী ভাতের হাঁড়ির তোলোর মতই মুখখানা সুপ্রসন্ন ক'রে ঠকাস ক'রে এসে স্বামীর কোলের কাছে ভাতের থালাখানা ধরে দিয়ে দমাক দমাক শব্দে পদভরে মেদিনী দুলিয়ে বিংশ শতাব্দীর বীরাঙ্গনা কেরাণী-জায়া রণজয় ঘোষণা করে রান্না-ঘরে চলে গেল।

রামধন চন্দ্র কোন দিকে আর দৃকপাত না করে, কলায়ের দাল মেখে, পোড়া বেগুন-ভাজা চাখনা দিয়ে, সপাসপ ভাতের

গ্রাস তুলিতে লাগল;—সাড়ে নটা বেজে গেছে,—দেরি করলে চলবে না। পাঁচ মিনিটের এদিকে-ওদিকে হলেই 'চিত্তির',—চিত্রগুপ্তের খাতায় এমন আঁক পড়ে যাবে যে, রদ করে কার সাধ্য।

ওদিকে খোকা তখন ফুলের আনন্দে মস্‌গুল। সে নাচতে-নাচতে বাবার কাছে এসে, প্রসন্ন হাস্যে সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর ক'রে বললে, "ও বাবা, কেমন ফুল দেখ।"

হায় রে খোকা! সে যদি জান্‌ত, অধীনতা-পিষ্ট দাসত্ব-ক্লিষ্ট কেরাণী বাবা ফুলের কদর কি বুঝবে, তাহ'লে সে এমন ভুল কখন করত না।

ছেলের ফুলের কথায় রামধন চোখ-দুটোকে ওই লাল ফুলের মতই রাঙা করে—তার পানে কটমট করে চেয়ে বলে উঠল, "ফুল নিয়ে খেলা কিরে বুড়ো বাঁদর? পড়া-শুনো কি একটু করতে নেই? নিয়ে আয় বই।"

শিশিরে-ধোয়া সকালের টাটকা তাজা ফুলকে যেন একটা এলোমেলো ঝটিকার ঝটকা এসে ঝরিয়ে দিয়ে গেল। ছেলে শুকনো মুখে প্রথমভাগখানা নিয়ে বাপের কাছে পড়তে বস্‌ল,—আর পাশে ফুলটি রেখে আড়ে-আড়ে তার পানে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলো। তার ষোলআনা টান রইল ফুলের উপর,—পড়ায় মন বসবে কেন? দেখে বাপ ত আগুন—"নাঃ, ছেলেটার কিছু হবে না। একেবারে গাধা, গাধা"—বলে ধাঁ করে ছেলেটার মাথায় এক চাঁটি কসিয়ে দিয়ে, ডান হাতে জলের গেলাসটা তুলে ঢকঢক করে খানিকটা জল গিলে ফেলে, লাফ মেরে উঠে পড়ল। দিগ্বিজয়ে যেতে হবে যে এখনি!

ত্রেতাযুগে সীতা-উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্তটি যেমন করে সমুদ্র ডিঙোতে লাফ মেরেছিল, খোকনের বাপ রামধনও ঠিক তেমনি করে লাফ মারতে-মারতে সদর দরজা পার হ'ল! বোধ হয় স্বরাজ লাভ করতে!

কোণের ঘরে বোকা কোথা ওত পেতে বসেছিল বাপ বেরিয়ে যেতেই, হুপ করে বেরিয়ে এসে, হিহি হুহু শব্দে হাসি সুরু করে দিলে।

সরলা ভায়ের রঙ্গ দেখে হাসতে-হাসতে বললে, "বোকা দাদা, হাসছিস কেন ভাই?"

বোকা দাদার আরও হাসি,—"হু হু হু, বেশ মজা হয়েছে, খুব মজা—"

"কি মজা বোকা দাদা, বল না ভাই!"

"খোকা যেমন বাবার কাছে—হি হি হি—তেমনি ধাঁই করে হু হু হু—"

সরিও দাদার দেখাদেখি হিহি হুহু করে খানিক হেসে নিলে।

বোকার হাসির মর্ম্ম—তার বাবা সেদিন তার পড়া নিতে ভুলে গেছে, বোকার তালটা খোকার উপর দিয়ে ভারি সস্তায় কেটে গেল—বেশি ত আর খোকার লাগে নি। যদিও তার উপর এত সস্তায় কিস্তি মাত হয় না,—তারই জন্য এই হাসি।

কিন্তু অভিমানী খোকার বেশি না লাগলেও, মায়ের তাড়না, বাপের লাঞ্ছনা, আর ভাই-বোনের হাসাহাসি এই সবগুলিতে মিশিয়ে তার অনুসন্ধিৎসু-ভরা চক্ষু দুটোকে ছলছলিয়ে তুললে। তার সবচেয়ে রাগ হ'ল ওই লাল ফুলটার উপর। ওরই জন্য না তার এত নির্য্যাতন? যে ফুলের সৌন্দর্য্যে সে মুগ্ধ হয়ে, আনন্দ-চঞ্চল ছোট-ছোট পায়ে ছুটোছুটি করে কাকে দেখাবে তা খুঁজে পাচ্ছিল না,—সেই ফুলটিকে সে দু'হাতে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললে। সৌন্দর্য্যের উপর তাণ্ডব নৃত্য হয়ে গেল। আর সেই দিকে চেয়ে-চেয়ে খোকার সদ্য-ফোটা গোলাপের মত টুকটুকে ফুলো-ফুলো টুলটুলে গাল দুটির উপর বড়-বড় দুফোঁটা মুক্তাবিন্দু টলটলিয়ে উঠল।

পূজা শেষ করে জেঠামশায় বাইরে এসে আদর করে ডাকলে, "খোকন।"

খোকার রুদ্ধ অভিমান-অশ্রু ধারায়-ধারায় ঝরে পড়ল।

"কেন বাবা, কাঁদিস কেন রে?"—বলে যজ্ঞেশ্বর সেই যোগীর আরাধ্য ধনকে বুকের উপর তুলে নিলে। খোকা কাঁদতে-কাঁদতে বললে, "জেঠামশায়!"

"কেন রে?"

"ফুল যে ছিঁড়ে ফেলিছি।"

ভাগ্যক্রমে এই বৃদ্ধের বুকে একটু সত্যের আর

একটু মনুষ্যত্বের আমেজ ছিল; তাই সে বললে, "ফেললেই বা বাবা, আবার আমি তোমায় ভাল ফুল দেব, কেমন?"

সান্ত্বনা-বাক্যে খোকা শান্ত হ'ল; কিন্তু প্রশ্ন করলে, "ফুল ছিঁড়লে কি হয় জেঠামশায়?"

এইটুকু ছেলের অনুশোচনা দেখে, এই নিঃসন্তান কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী শুষ্কপ্রাণ, পলিতকেশ বৃদ্ধ অবাক্ হয়ে গেল। সে তার পানে চেয়ে আবার সান্ত্বনার ছলে বললে, "না, কিছু হয় না।"

খোকা তবু এ কথায় ভুললো না। সে চায় অন্যায়ের শাস্তি। জেদের সহিত বললে, "না, হয়। কি হয়, তুমি বল।"

শিবানী রান্নাঘর থেকে শুনতে পেয়ে দাঁতের উপর দাঁত চেপে রুক্ষ কণ্ঠে বললে, "হয় তোমার মাথা, আর আমার মুণ্ডু। এখন গিলবে এস পিণ্ডি।"

খোকার প্রশ্নের আর পাদপূরণ হ'ল না। সে ছলছল চক্ষে মায়ের দেওয়া পিণ্ডি খেয়ে পুষ্ট আর বর্দ্ধিত হতে চলে গেল।

নায়েব মহাশয়

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাহেব ও মেম-সাহেব নিঃশব্দে কামরায় প্রবেশ করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন, আহত স্থান প্রক্ষালন, প্রভৃতি তৎকালোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। খানসামা, খিদমৎগার, বাবুর্চ্চি, বেহারা, আর্দ্দালী, পরিচারকের দল ব্যস্তভাবে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। আমলা বাবুরা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, জনাব সেখকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; এবং দুর্ঘটনার কারণ জানিবার জন্য প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সাহেবের ইঙ্গিতেই হউক, বা সকল কথা সে প্রকাশ করিয়াছে শুনিয়া সাহেব পাছে রাগ করেন ভাবিয়াই হউক, জনাব আলি মিঞা হঠাৎ ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া উঠিল; কোন কথাই ভাঙ্গিল না; মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও-সব বাত মুই কৈতে পারমু না। আপনাগোর বোদি জবর হাক্কে (আকাঙ্ক্ষা) হ'য়ে থাকে তো হুজুরকে পুছ্ ক'রে লেবেন না।" সুতরাং কাহারও কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইল না।

কিন্তু এরূপ গুরুতর কাণ্ডের কথা গোপন থাকে না। জনাব কুঠীর আমলাদের নিকট কোন কথা প্রকাশ না করিলেও, তাহার দলের লোকের নিকট নিজের 'কার্দ্দানী' প্রকাশের এত বড় একটা সুযোগ কি করিয়া ত্যাগ করে? বিশেষতঃ, সাহেবের আর্দ্দালী এব্রাহিম মিঞা তাহার ফুপুতো বহিনের খসম; ছুটির পর এব্রাহিম যখন তাহাকে পরম সমাদরে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, এক সিলিম মিঠে-কড়া তামাক সাজিয়া মহা আগ্রহে সর্ব্বাগ্রেই 'হুঁকে'টা তাহার হাতে দিল ও অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমারই মেহেরবানীতে সাহেব এবার জান নিয়ে উঠে আসতি পেরেছে ভাইজান! মাথাটা ফাটালে কে, জনাব আলি? আরে আমি আর ও-কথা কোনও শা—কে বলতে যাচ্ছিনে।' তখন জনাব আলি 'বোনাই'এর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না,—সে একে একে সকল কথাই এব্রাহিমের নিকট প্রকাশ করিল। তাহার পর আধ ঘণ্টার মধ্যেই কান্সারণের সকল আমলা সাহেবের 'শিক্ষে' লাভের কথা জানিতে পারিল! কিন্তু সাহেবের 'ধনঞ্জয়' লাভের সংবাদে কেহ যে আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা গেল না! কেবল নায়েব মহাশয় আততায়ীর উদ্দেশে প্রবল বেগে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমলারা গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল, "অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ! নায়েব মহাশয়ের কাছে উৎসাহ না পেলে, যদু মণ্ডলের 'ক্ষ্যামোতা' কি—সাহেবের গায়ে হাত তোলে? ইদানীং

সাহেবের সঙ্গে নায়েবের যে রকম মন-কশাকশি চল্‌চে, তাতে একটা কিছু কাণ্ড-কারখানা ঘট্‌বে, এ তো জানাই ছিল।” জমানবীশ বলিল, “আরে ভাই, এখনও চন্দোর-সুয্যি উঠ্‌চে;—সে দিন নিরীহ ব্রাহ্মণকে ধরে যে রকম বেতিয়ে দিলে, তার অভিসম্পাত লাগ্‌বে না? ব্রাহ্মণের শাপ হাতে-হাতে ফলে গেল! বাপধন এখন থেকে ভেবে-চিন্তে চাবুক চালাবেন।” খাজাঞ্জী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “অঙ্গারং শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি—ত্যাগ করে না ভাই, তার কালো রঙ্গ, তা অঙ্গার যতই ধও; কথায় বলে না ‘ইল্লৎ যায় ধুলে, স্বভাব যায় ম’লে?’ বেত মারা স্বভাব কি এক আধ ঘা খেলেই যাবে? সাহেব এবার নায়েবকে তুলো ধোনা না করে ছাড়বে না! আমরা ভাই তফাতে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌বো। চেপে যাও দাদা, এ-সব জাহাজের খবরে আমাদের দরকার নেই!”

আমলারা চাপিয়া গেল। কেবল আমলারাই নয়,—সাহেবও এত বড় কাণ্ড সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না! কিল খাইয়া কিল চুরির এবম্বিধ দৃষ্টান্ত স্থান-বিশেষে দুর্লভ না হইলেও, ম্যানেজার সাহেবের তুষ্ণীম্ভাব দর্শনে নায়েব মহাশয় যেন কিছু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আশা ছিল, সাহেব একটু সুস্থ হইয়াই ‘হা-মা-ক’ আরম্ভ করিবেন, প্রজাপুঞ্জের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ‘দমন নীতি’ চলিবে; সেই সুযোগে তিনি তাঁহার লুপ্ত প্রভাব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সাহেব কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে কোন কথাই বলিলেন না,—তিনিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহেবকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠা হ্রাস হইল না। তাঁহার আশঙ্কা হইল, যদু মণ্ডল তাঁহার ইঙ্গিতেই সাহেবকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়াছে,—সাহেবও হয় ত এরূপ সন্দেহ করিয়াছেন! সাহেবের মনের ভাব জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল,—তিনি ধীর ভাবে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

টমটম হইতে উল্টাইয়া মাটিতে পড়ায়, হামফ্রি সাহেবের মাথার চামড়া কয়েক স্থানে কাটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; কয়েক দিনের মধ্যেই ক্ষত শুষ্ক হইল। সাহেব পূর্ব্ববৎ সেরেস্তার কাযকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কার্য্যোপলক্ষে নায়েবকে প্রত্যহই সাহেবের খাস-কামরায় যাইতে হইত; কিন্তু সাহেব আফিস-সংক্রান্ত কায-কর্ম্মের কথা শেষ করিয়াই তাঁহাকে বিদায় দিতেন। এই ভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্ণ-কালে নায়েব দৈনিক কাযকর্ম্ম শেষ করিয়া সাহেবের খাস-কামরা ত্যাগ করিবেন,—তিনি টেবিল হইতে কাগজপত্রগুলি গুছাইয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়াছেন,—এমন সময় সাহেব বলিলেন, “ওয়েল সাণ্ডেল, শোন, তোমার সঙ্গে আরও দুই-একটা কথা আছে।”—হামফ্রি সাহেব নায়েবকে অধিকাংশ সময় ‘নায়েব’ বলিয়াই সম্বোধন করিতেন; কিন্তু যখন মন প্রফুল্ল থাকিত, কিংবা কোন কঠিন অথবা নীতি-বিগর্হিত কার্য্যে নায়েবের সহায়তা গ্রহণের আবশ্যক হইত, তখনই তিনি ‘নায়েব’ না বলিয়া, তাঁহাকে ঘনিষ্ঠতাসূচক ‘সাণ্ডেল’ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন, নায়েব ইহা জানিতেন। সাহেবের মেজাজ ভাল আছে বুঝিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন; এবং কাগজপত্রগুলি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া, কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিলেন, “হুজুরের কি হুকুম বলুন; হুকুম যতই কঠিন হউক, তা তামিল করিতে এ বান্দা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, কিছুদিন হইতে হুজুর আমাকে যেন আর পূর্ব্বের মত বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। বোধ হয় আমার কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে; কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে হুজুরের হিত চেষ্টাই করিয়া থাকি। হুজুরের জন্য আমি কখন-কখন নিজের জীবনও বিপন্ন করিয়াছি; কিন্তু তাহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হুজুরের কোন উপকার করিয়া সে কথার উল্লেখ নিতান্তই বেয়াদপি। তবে হুজুর আর পূর্ব্বের মত আমার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছেন না—ইহা আমার দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি?”

সাহেব বলিলেন “না সাণ্ডেল, তোমার দুর্ভাগ্য নহে; ইদানীং কিছুদিন অনেক গুরুতর কার্য্যে তোমার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া আমিই ঠকিয়াছি। এখন আমি বুঝিতেছি, এরূপ করা আমার পক্ষে বড়ই অন্যায় হইয়াছে। এই দেখ, তোমার পরামর্শ গ্রহণ না করায়, সে দিন আমাকে একটা কত বড় বিপদে পড়িতে হইল! পূর্ব্বের মত তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিলে, তুমি নিশ্চয়ই এরূপ বিপদ ঘটিতে দিতে না।”

নায়েব উৎকণ্ঠিতভাবে সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন।

যে কি সাহেব তাঁহাকে যদু মণ্ডলের উৎসাহদাতা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন? তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু সাহেবের মুখ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, সাহেব হয় ত সরল ভাবেই এ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলে সাহেব যদু মণ্ডলকে বেত্রাঘাত করিয়া বিদায় দিতেন না; সুতরাং যদু মণ্ডলও তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিত না,—ইহাই বোধ হয় সাহেবের কথার মর্ম্ম।

এইরূপ চিন্তা করিয়া নায়েব বলিলেন, "আপনি মনিব, আমি চাকর,—সর্ব্বদাই আপনার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনি যদি আমার উপর কোন ভার দিতে অনিচ্ছুক হন, কিংবা আমি কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিলে তাহা আমার অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়াই আপনার ধারণা হয়, তাহা হইলে আমার তফাৎ থাকা ভিন্ন আর উপায় কি?"

সাহেব বলিলেন, "দেখ সাণ্ডেল, তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, সেদিন যদু মণ্ডল আমাকে প্রহার করিয়াছে। আমি তাহাকে বেত মারিয়াছিলাম. সে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে। আমি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। একটা নেটিভের হাতে আমি প্রহার লাভ করিয়াছি, ইহা প্রকাশ করা বড়ই লজ্জার কথা! অন্য সাহেবেরা এ কথা শুনিলে কি মনে করিবে? কিন্তু কথাটা আমি গোপন করিলেও, 'শূয়ারকি বাচ্চা' জনাব সেখ তাহা অনেকের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। আমি সেই 'রাস্কেলকে' ধরিয়া আনিয়া চাবকাইয়া দিতাম; কিন্তু কেবল কলঙ্ক প্রচারের ভয়ে এই কার্য্য করি নাই,—বিশেষতঃ বিপদে সে আমায় সাহায্য করিয়াছিল। যাহা হউক, যদু মণ্ডলকে আমি জব্দ করিতে চাই। সেই বদমায়েস্‌কে রীতিমত জব্দ না করিলে প্রজাদের আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইবে; জমিদারী শাসন করা কঠিন হইবে।"

নায়েব কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "যদু মণ্ডল আপনার গায়ে হাত তুলিয়াছিল? উঃ, কি সর্ব্বনাশের কথা! হুজুর আমাকে এতদিন এ কথা বলিলে, তাহার ভিটায় সর্ষে বুনিয়া সেখানে ঘুঘু চরাইতাম। তাহার এত বড় গোস্তাকি যে, সে হুজুরের জমীদারীতে বাস করিয়া হুজুরের গায়ে হাত তোলে! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর, আমি তাহার ভিটায় ঘুঘু চরাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।"

সাহেব বলিলেন, "হাঁ, এতদিন এ বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ না করা অন্যায়ই হইয়াছে! যাহা হউক, এই ভার তোমার হাতেই দিলাম। কিন্তু তুমি কিরূপে সায়েস্তা করিবে? প্রজারা এককাট্টা হইয়াছে; সকল প্রজা যাহাতে একসঙ্গে ক্ষেপিয়া না উঠে, অথচ সেই বজ্জাত জব্দ হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি ত ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। তুমি কি করিবে মনে করিতেছ?"

নায়েব বলিলেন, "আমি একটা উপায় স্থির করিয়া লইব। আপনি আমার উপর যখন ভার দিয়াছেন, তখন আর আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই।"—নায়েব সাহেবকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার খাস-কামরা হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি দরজার বাহিরে জুতা পায়ে দিতে-দিতে মনে-মনে বলিলেন, "এখন পথে এসো, সুমুন্দি! তুমি ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি! আমাকে তুমি 'বাঙ্গাল' নায়েব পেয়েছ কি না? এক মুখে তোমাকে কাম্‌ড়িয়েছি, আর এক মুখে ঝাড়্‌বো। যে কলঙ্ক প্রচারের ভয়ে তুমি গুঁতো খাওয়ার কথা গোপন করেছিলে—সেই কলঙ্ক হাটে-মাঠে সর্ব্বত্র প্রচার না ক'রে আমি কি সহজে ছাড়্‌বো? ব্রাহ্মণকে বেত মেরেছ, সে কি বৃথা হবে?"

নায়েব মহাশয় চিন্তাকুল চিত্তে বাসায় ফিরিলেন। সারা রাত্রি তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না; তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সাহেবের লাঞ্ছনা জনসমাজে প্রচারিত হয়, অথচ যদু মণ্ডলও শাস্তি পায়—ইহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিস্তর চিন্তার পর উপায় স্থির হইল; তিনি ভাবিলেন, "সাহেবকে এখন আমার প্রস্তাবে রাজী করিতে পারিলে হয়!"

পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই নায়েব মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহাদেবের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। একে মহাদেব নায়েব মহাশয়ের 'লায়েক ছেলে', হুগলী কলেজ হইতে তিনবার এল্‌-এ ফেল করিয়া এখন সে পিতার কর্ম্মস্থানে আসিয়া বিষয়-কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতেছে; তাহার উপর সে স্থানীয় দারোগা নলিনী মুস্তফির পরম বন্ধু। সুতরাং উপস্থিত ব্যাপারে মহাদেবের সহযোগিতা অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। দীর্ঘকাল পরামর্শের

পর মহাদেব সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "বাবা, আপনি কিছু ভাব্বেন না,—'পুলিশ কেশ' করাই সবচেয়ে ভাল পথ। আমি নলিনীকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে এমন ঠিক করে নেব যে, আপনাকে কিচ্ছু বেগ পেতে হবে না। পুলিশ যখন হাতে আছে—তখন একটা বজ্জাত চাষাকে জব্দ করব,—তার আবার একটা কথা ?"—পিতার আদেশে মহাদেব দারোগার সহিত দেখা করিতে তৎক্ষণাৎ থানায় চলিল। মামলা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইলে যদু মণ্ডলের ভাগ্যে যাহা হয় হইবে,—ম্যানেজার সাহেবকে যে প্রকাশ্য আদালতে স্বীকার করিতে হইবে, যদু মণ্ডল তাঁহাকে পথে ধরিয়া 'কোঁৎকাইয়া' দিয়াছে, এই সম্ভাবনায় নায়েব মহাশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি স্নানান্তে ভক্তিভরে পূজা শেষ করিয়া, কাণে তুলসীপত্র গুঁজিয়া, সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে কাছারীতে চলিলেন।

ম্যানেজার সাহেব নায়েবেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নায়েব তাঁহার খাস-কামরার দরজার বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া কামরার ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র, সাহেব সাগ্রহে বলিলেন, "ওয়েল সাণ্ডেল ? তুমি কি স্থির করিলে তাহা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি।"

নায়েব সাহেবকে অভিবাদন করিয়া, মুখখানি হাঁড়ির মত গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "সাহেব, কাল রাত্রে আমি চোখ বুজিতে পারি নাই,—সারা রাত্রি সদুপায় চিন্তা করিয়াছি। এ অঞ্চলের প্রজা-সাধারণের মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বে-আইনী জোর জবরদস্তি করা সঙ্গত মনে হয় না। সেই জন্য স্থির করিয়াছি, যদু মণ্ডলকে পুলিশে চালান দিব। জেলে দিয়া কিছু দিন ঘানি টানিলেই রীতিমত জব্দ হইয়া যাইবে,—আর কোন প্রজা মাথা তুলিতে সাহস করিবে না।"

সাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এ তোমার ভাল যুক্তি হয় নাই সাণ্ডেল! যদু মণ্ডলের নামে ফৌজদারী করিলে 'পাব্লিকে' জানিতে পারিবে—একটা ড্যাম নিগার মুচিবাড়িয়া কান্সারণের ম্যানেজারকে পথের মধ্যে ধরিয়া কোঁৎকাইয়া দিয়াছে! ইহাতে আমার ইজ্জৎ বাড়িবে না। না, আমি তোমার এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারে না।"

নায়েব মনে-মনে বলিলেন,"এই বেটা সব মাটী করলে !"—কিন্তু তিনি হাল ছাড়িলেন না। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "সাহেব, আপনি বলিতেছেন কি? দুষ্ট লোককে স্বহস্তে শাস্তি না দিয়া, আইন অনুসারে তাহার শাস্তি বিধান করিলে, মানী লোকের সম্মান কখনই নষ্ট হয় না। বরং ইহাতে আপনার প্রতি লোকের শ্রদ্ধাই বাড়িবে। সকলেই বুঝিবে—আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যাহার মত বিশ-পঁচিশটা লোকের মাথা লইতে পারেন,—স্বয়ং তাহার অত্যাচারের প্রতিফল না দিয়া, বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতে অপমান নাই হুজুর! প্রজারা দিন-দিন কিরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতেছে—তাহারও একটা প্রমাণ গবর্মেণ্টের নথিভুক্ত হইয়া থাকিবে! এ বিষয়ে আপনি অমত করিবেন না, হুজুর!"

সাহেব বলিলেন, "তুমি উত্তম তর্ক করিতে পার, নায়েব! তুমি মোক্তার হইলে পশার করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি জান—মামলার ফলাফল প্রমাণের উপর নির্ভর করে? যদু মণ্ডল আমাকে প্রহার করিয়াছিল—তাহার কোন সাক্ষী নাই। প্রহারের পর সে যখন আর দুই বেটা বদ্‌মাসের সাহায্যে আমাকে নদীর দিকে টানিয়া লইয়া যায়, তখন জনাব দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে আসামীদের ঠিক সনাক্ত করিতে পারিয়াছিল কি না, সে কিরূপ জবানবন্দী দিবে—তাহা বলা যায় না। আমি তাহাকে বা অন্য কোন প্রজাকে বিশ্বাস করি না। যদি উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে আসামীরা খালাস পায়, তাহা হইলে আমার প্যাঁজ-পয়জার দুই-ই হইবে।"

নায়েব বলিলেন, "প্রমাণের অভাবে আসামী খালাস পাইবে, এও কি একটা কথা? ফরিয়াদী ইংরাজ, আসামী একটা কালা আদ্‌মি; কালা আসামীটা সাহেব লোকের গায়ে হাত তুলিয়া ফৌজদারী সোপরদ্দ হইলে, প্রমাণের অভাবে খালাস পাইয়াছে—এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার এদেশে কস্মিন কালেও ঘটিয়াছে কি? এ কি ইংরাজের রাজ্য নয়? জজ ম্যাজিষ্টররা কি ইংরাজ গবর্মেণ্টের চাকর নয়? যদি কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলেও হুজুরের কথা বিশ্বাস করিয়া, আসামীকে শাস্তি দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য। সে যাহাই হউক, সাক্ষীর অভাবে কোন অসুবিধা হইবে না। নলিনী দারোগা আমাদের হাতের লোক,—এ বিষয়ে পুলিশের সাহায্য ষোল আনাই পাওয়া যাইবে। আমিও স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া মামলার তদ্বির করিয়া আসিতেছি। যদু মণ্ডলকে দিয়া ঘানি না টানাইয়া ছাড়িতেছি না।"

সাহেব অবশেষে নায়েবের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। নায়েব মহা উৎসাহে তদ্বির আরম্ভ করিলেন।

যদু মণ্ডল যে পল্লীর নিকট ম্যানেজার সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল, পরদিন প্রভাতে নলিনী দারোগা সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কয়েকজন প্রজা সাহেবের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে। তাহারা বলিল, যদু মণ্ডল সাহেবকে প্রহার করিয়াছে, ইহা তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। দারোগা তাহাদের জবানবন্দী লইয়া এবং ঘটনার স্থান পরীক্ষা করিয়া আসিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেবের জবানবন্দী লইল। অসমঞ্জস বিষয়গুলি গুছাইয়া লইয়া, দারোগা নায়েবকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া আসামী গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিল। কিন্তু ঘটনার দিন হইতেই যদু মণ্ডল ফেরার! তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে দারোগাকে তেমন বেগ পাইতে হইল না; মহকুমার ফৌজদারী আদালতে যদু মণ্ডলের অপরাধের বিচার হইল; তাহার প্রতি ছয় মাসের সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। তাহার সহযোগিদ্বয়কে সাক্ষীরা সনাক্ত করিতে না পারায়, অন্য আসামী দু'জন বিনাদণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিল। ইহাতে নায়েব বাঙ্গালী ডেপুটীর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ম্যানেজার সাহেবের নিকট তাঁহার বিস্তর নিন্দা করিলেন; এবং 'হাজার লেখাপড়া শিখিলেও' বাঙ্গালী কেরাণীগিরি ছাড়া বিচারকের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য নহে,—এ কথা সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিলেন। প্রবল-প্রতাপ ম্যানেজার কালা আদমীর হাতে ধনঞ্জয় লাভ করিয়াছেন,—নেটিভ ডেপুটীর আদালতে হাজির হইয়া এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জায়, অপমানে সাহেবের 'গর্ব্বোন্নত শির' যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল! বিচারকের অজস্র নিন্দা শুনিয়াও তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল না।

ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া মহাষ্টমীর দিন যদু মণ্ডল কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিল। সে তাহার বাসগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া কাহারও সহিত মিশিল না, বা মন খুলিয়া কথা বলিল না। সে যেন 'ধন্দ' হইয়া গিয়াছিল, এতবড় প্রকাণ্ড জোয়ান এই কয় মাসের কারাযন্ত্রণায় জরাজীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে আপন মনে বিড়বিড় করিয়া কি বলিত, কেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। এক-একবার হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া আক্ষেপ করিয়া বলিত, "যার কথায় চুরি করি, সেই বলে চোর?—গাছে তুলে দিয়ে মৈ নিয়ে সরে পড়ল!"—সকলে ইহা অসংলগ্ন প্রলাপ বলিয়াই মনে করিত। নায়েব একদিন এ কথা শুনিয়া বলিলেন, "সাহেবকে মারিয়া অনুতাপ হওয়ায় যদুর মাথা খারাপ হইয়াছে; উহাকে পচা পুকুরে স্নান করাও, আর ব্যাঙের ঝোল খাওয়াও।" কিন্তু কিছুই করিতে হইল না,—কয়েক দিন পরে যদু মণ্ডলকে কেহই গ্রামে দেখিতে পাইল না। তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাহার সন্ধান করিতে পারিল না; সে আজও গেল, কালও গেল! কেহ বলিল, পাগল দেশত্যাগী হইয়াছে; কেহ বলিল, মনের দুঃখে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।—নায়েব মহাশয় বলিলেন, "পাপের ফল হাতে-হাতে ফলিয়াছে। সাহেব রাজা,—সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁর গায়ে হাত তোলা! কুষ্ঠ ব্যাধি হইয়া হাত খসিয়া পড়ে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!" (ক্রমশঃ)

ইলিশ মাছ

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল্]

আমার মত মাছিমারা কেরাণীর জীবনের মস্ত একখানা ইতিহাস না হোক, ছোট্ট একটু পকেট-ডায়েরী যে থাকতে পারে না, এ কথা আমি মানব না। হিন্দুর পর্ব্বদিনগুলি আমার বুক-পকেটের পাঁজিতে সোনালি রঙের কালি দিয়ে ছাপা রয়েছে। বারমাস হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির মাঝে সাহেবের আপিসে যে দিন ছুটি পাওয়া যায়, সে দিন যেন মনে হয় যে, ছেলেবেলার ছুটো-ছুটির মধ্যে ফিরে গিয়েছি। তফাৎ এই যে, তখনকার সমবয়স্ক সহপাঠীর

বদলে এখনকার সংসার-রূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু-উদ্যানে এঞ্জেলদের সঙ্গে মিশতে গেলে, নিজের সুদীর্ঘ বয়েসটিকে গুটিয়ে ফেলতে হয়। বাস্তবিক, ছুটির দিনে যিনি জীর্ণ ফাঁপা আমিত্বকে ভুলে গিয়ে, খোকা-খুকীদের খেলা-ধূলায় যোগদান করতে পারেন, তিনিই প্রৌঢ়-জীবনে ক্ষণেকের তরে, বিমল আনন্দের ভিতর যেটুকু স্বর্গীয় রোমান্স আছে, সেটুকু উপভোগ করবার অধিকারী হন। উইক-এণ্ড্ ছুটিটা কিন্তু আমার পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ। তার কারণ, ছটা দিন কলকেতার মেসে কোনও রকমে কাটিয়ে দিয়ে, প্রতি শনিবার গৃহিণীর একটা না একটা আবদার সহ্য করতে না পারলে, রবিবারের ছুটিটা অনেক সময়ে ট্র্যাজিক হয়ে পড়ে।

আমাদের বাড়ীতে ভাদ্র-সংক্রান্তিতে অরন্ধনের পাট নাই,—যে দিন ইচ্ছা সেটা সেরে নেওয়া যায়। এবারকার ভাদ্র মাসের মাঝা-মাঝি কলকেতায় যখন ইলিশ মাছ খুব সস্তা, গৃহিণী আমাকে সোমবার সকালে কলকেতায় রওনা হবার আগে বল্লেন যে, সামনের শনিবার যদি একটা ইলিশ মাছ আসে, তা হ'লে রবিবার অরন্ধন হ'তে পারে। একে ভেতো বাঙ্গালীর সনাতন পার্ব্বণ, তায় গৃহিণীর উইক-এণ্ড্ হুকুম,—আর সেই সঙ্গে ইলিশ মাছের উপরে আমার চিরকেলে লোভ;—আবার সকলের চেয়ে বিশেষ ব্যবস্থা—বৎসরান্তে ছেলেমেয়েদের ইলিশোৎসব! এতগুলি ব্যাপার একসঙ্গে মিটিয়ে নেবার সুবিধা উপরিহীন টাইপিষ্ট কেরাণীর অদৃষ্টে প্রায় ঘটে না। আমি তথাস্তু ব'লে গৃহিণীর প্রস্তাবে সায় দিলেম।

শনিবার সকালে তাড়াতাড়ি আধসিদ্ধ ডাল-ভাত নাকে-মুখে গুঁজে, মেস্ থেকে বেরিয়ে পড়লেম। আপিসে গিয়ে 'এরিয়ার' কাযগুলি শেষ করব,—আর তিনটের সময় বৌবাজার থেকে একটা বড় ইলিশ মাছ কিনে ট্রেনে চ'ড়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী যাব। আপিসে গিয়ে খুব উৎসাহের সহিত রেমিংটনের চাবিগুলি টিপ্তে লাগলেম। টাইপ-রাইটারের ঝর্ঝর রাগিণী আমার কাণের ভিতর দিয়ে তখন যথার্থই মর্ম্ম স্পর্শ করছিল। চিঠির পর চিঠি হু-হু শব্দে কল থেকে বেরতে লাগল। সাহেব যখন বেলা একটার সময় আমাকে ডাকলেন, আমি লম্বা একটা সেলাম ক'রে চিঠির ঝুড়ি তাঁর সামনে রেখে দিলেম। চিঠিগুলি সই করা শেষ হ'লে, আমি নিজের সিটে ফিরে এসে একটা বিড়ি ধরিয়ে মাত্র গোটা কয়েক টান দিয়েছি, এমন সময় চাপরাশি এক-বোঝা চিঠির মুসাবিদা দিয়ে বল্লে, "বাবু! সাহেব বলেছেন বড় জরুরি কাজ।"

ঘড়িতে তখনও দুটো বাজে নি। তিনটের মধ্যে আমার কায শেষ হয়ে গেল। বড় সাহেব মনসুন্ রেসে চলে গেলেন। বাবুরা তখনও রেস-গাইডে পেনসিলের দাগ দেওয়া ঘোড়ার নাম মুখস্থ করছেন! বড় বাবু তিনটের সময় টালিগঞ্জের দিকে রওনা হ'লেন; কিন্তু যাবার আগে তিনি বড় সাহেবের নাম নিয়ে বল্লে, "ওহে নিমচাঁদ, সোমবারে হাইকোর্টে যে মকদ্দমা আছে, এইটে তার ব্রিফ্। তুমি দু'কপি তৈরী ক'রে চাপরাশির কাছে দিয়ে বাড়ী যাবে।" আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত রাগে কাঁপছিল। কিন্তু বড় বাবু সাহেবের হুকুম শুনানর পরে যখন একখানা পাঁচ টাকার নোট আমার সামনে ফেলে দিয়ে বল্লেন, "এই নাও, সাহেব তোমাকে ওভার-টাইম দিয়েছেন," তখন আমি যেন বোবা হয়ে গেলেম। নগদ টাকার মত মানসিক ব্যাধির এমন আশুফলপ্রদ দ্বিতীয় ঔষধ জগতে নাই।

ব্রিফ্খানি নেড়ে-চেড়ে দেখে বুঝলেম যে, রাত্তির দশটার আগে যদি শেষ হয়, তাহ'লে আমাকে বাহবা দেওয়া যেতে পারে। কি করব ভাবছি, এমন সময় আমাদের গ্রামের যদু বাবু এলেন। তিনি বল্লেন, "নিমচাঁদ! চল না বৌবাজারে যাওয়া যাক্,—দেখে-শুনে ইলিশ মাছ একটা আমাকে কিনে দেবে।" আমি বল্লেম, "যদি আপনি দয়া ক'রে আমার বাড়ীতেও একটা মাছ পৌছে দেন, তাহ'লে কাল অরন্ধন হয়। আমার ত দেখছি আজকে শেষ ট্রেন ছাড়া বাড়ী যাবার উপায় নেই।" যদু বাবু রাজি হ'লে, আমরা দু'জনে ট্রামে চ'ড়ে বৌবাজারে গেলেম। ভিড় ঠেলা-ঠেলি ক'রে আমি এক-জোড়া ইলিশ মাছ কিনলেম। জেলেকে মাছ দুটোর দাম আমিই দিলেম। যদু বাবু একখানা দশ টাকার নোট বার ক'রে আমাকে বল্লেন, তাঁর মাছটার দাম কেটে নিয়ে বাকী টাকা দিতে। কিন্তু আমি তাঁকে আপ্যায়িত করবার জন্যে বল্লেম, "আমার কাছে চেঞ্জ নেই,—দাম কাল আপনি দেবেন।" দুটো মাছ ঠিক এক মাপের। তাই যদু বাবুকে আমি বল্লেম, "একটা মাছ আমার বাড়ীতে দিয়ে খুকীকে যেন বলেন যে, আমি শেষ ট্রেন ফেল হ'লে,

কাল সকালে বাড়ী যাব।" যদু বাবু শিয়ালদহের ষ্টেশনের দিকে চলে গেলেন, আমি আপিসে ফিরে এলেম।

ব্রিফ্ টাইপ করতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। এটর্ণির ব্রিফ্ ত নয়,—যেন মক্কেলের পিতৃশ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গের ব্যবস্থা! আর্জ্জি, জবাব, এফিডেভিট থেকে আরম্ভ ক'রে, যত দলিল, চিঠি, রসিদের নকল, আর দরকারি বে-দরকারি উপদেশ সাক্ষীদের ইতিবৃত্ত, হিসাবের হিসাব, প্রশ্নমালা, এমন কি পক্ষদিগের মধ্যে পূর্ব্বেকার মকদ্দমার যা কিছু সব পর-পর সাজিয়ে গাঁথা। সিনিয়ার ব্যারিষ্টারের দৈনিক ফি: একশ' মোহর; তস্য জুনিয়ার ত্রিশ জি-এম্, তস্য জুনিয়ার পাঁচ মোহর, ইত্যাদি। হাইকোর্টের মামলায় মানুষ যে কেন সর্ব্বস্বান্ত হয়, তা বুঝতে আমার দেরী হ'ল না।

বাড়ী আর সে রাত্তিরে যাওয়া হবে না,—শেষ ট্রেন ধরবার উপায় নেই;—এদিকে মেসের দরজায় চাবি প'ড়েছে। রাতটা কোথায় কাটান যায়,—এই ভাবতে-ভাবতে কলকেতার রাস্তায় গাড়োয়ানহীন গরুর গাড়ীর মত চলতে-চলতে হ্যারিসন রোড ও চিৎপুরের মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ালেম। দূরে একখানা ট্রামগাড়ি দেখা দিল। একজন ট্রাম ইন্‌সপেক্টার চৌমাথায় দাঁড়িয়েছিল, সে বল্লে "এইটা বেল-গেছের শেষ গাড়ী।" আমি সেই গাড়ীতে উঠে ষ্টার থিয়েটারের কাছে গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে নেমে পড়লেম। একটা পানওয়ালার দোকানে ঘড়িতে দেখি যে, রাত তখন সাড়ে এগারটা মাত্র। সেখানে দাঁড়াতে ভয় হ'ল। শুনেছি, কলকেতায় না কি রাত্তিরে পানওয়ালার দোকানের কাছে রাস্তায় কোকেন বিক্রী হয়। পাড়াগেঁয়ে লোকের জামার পকেটে কোকেনের পুরিয়া ফেলে দিয়ে, কোকেনওয়ালারা পাহারাওয়ালাকে ডেকে ধরিয়ে দেয়। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে একটা হোটেলে উঁকি মেরে দেখি যে, দু' একজন লোক টেবিলে ব'সে খাচ্ছে। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। হিন্দুস্থানী ময়রার দোকানে বাদাম-তেলে ভাজা ডালপুরি খাব না,—চাটের দোকানের হাঁসের-ডিম-সিদ্ধও খাওয়া হবে না। দু'পয়সার সাড়ে বত্রিশ ভাজা, আর একপয়সার চীনের বাদাম খেয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব স্থির করলেম। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে যখন বত্রিশটি দাঁতের সাহায্যে সাড়ে বত্রিশ ভাজা খাচ্চি, আর ভাবছি যে থিয়েটার দেখে রাতটা কাটাব কি না, তখন একজন লোক একটা চাটের দোকান থেকে বেরিয়ে চেঁচাতে লাগল, "আট আনার টিকিট চার আনায় যায়!" আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "কি রকম?" সে বল্লে, সে সন্ধ্যা থেকে অভিনয় দেখে বেরিয়ে এসেছে, আর যাবে না, আমি যদি চার আনা দি, তাহ'লে বাকী রাতটা অন্য পালাগুলি দেখতে পাই। মন্দ নয়! চার আনা দিয়ে তার টিকিটখানা কিনে ষ্টার থিয়েটারের ভিতরে গ্যালারীতে বসলেম।

তখন কনসার্ট বাজছে,—এইবার নূতন একটা পালা আরম্ভ হবে। বাজনা থামলে ড্রপটা গুটিয়ে উঠে গেল। আমি ভাবলেম, একজন বিখ্যাত গল্পলেখক যে লিখেছিলেন, খানিকটা মানব-জীবনের উপর যবনিকা টেনে দেবার পর আবার বাকীটার খাতিরে সেটার উদ্‌ঘাটন হয়ে থাকে, তা কৈ সে রকম ত কিছুই হ'ল না! এ যে একটা পালার পরে আর একটা সম্পূর্ণ নূতন পালা! যা হ'ক, তখন আর আমার গল্পওয়ালাদের ষ্টেজ-জোড়া ভুল ধ'রে আনন্দ প্রকাশ করবার সময় ছিল না। কতকগুলি ছোট ছোট মেয়ে নাচ-গান আরম্ভ ক'রে দেছে। তাদের নাচ-গান থামবার মুখে একটা বিকট 'এনকোর' শব্দে আমি চমকে উঠলেম। আর সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারীর গন্ধ আমার নাকে ঢুকে, বমি হবার মত হ'ল। বরফ দেওয়া লেমনেড নিয়ে একটা লোক পাশে দরজার নিকট দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাত থেকে আমি গ্লাশটি নিয়ে চুমুক দিয়ে খেতে খেতে শরীরের অসুস্থতা ক'মে গেল।

চার আনাই লোকসান। আমি মদের গন্ধ থেকে বেরিয়ে, বাইরে বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়লেম। যাহ'ক তবু দূরে থেকে আওয়াজ শুনে গ্রামোফনের নেশা চরিতার্থ করতে পারব ত! রাতটাও ত কোন রকমে কেটে যাবে! সামান্য একটু মদের গন্ধে আমার মাথার ভিতরটা বোধ হয় উত্তেজিত হয়েছিল। নানান রকম কথা পাকিয়ে-পাকিয়ে আমার মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। গত বৎসর যখন খুলনায় দুর্ভিক্ষে লক্ষ লোক না খেতে না পরতে পেয়ে পশুর মত কষ্ট পাচ্ছিল, তখনও ত বাবুরা কেহ-কেহ মধু পান ক'রে থিয়েটার দেখতেন! ধন্য বাঙ্গালী! একটা অঙ্কের অভিনয় বুঝি শেষ হয়ে গেল। আবার কনসার্ট বাজছে। অদৃষ্টে না থাকলে, জগন্নাথের মন্দিরে ঢুকেও যাত্রীবিশেষ ঠাকুর দর্শন করতে পায় না। আমার আজ তাই হয়েছে। থিয়েটারে এসেও "ভীষ্ম" নাটকের অভিনয় দেখতে পেলেম না।

উঃ, সত্যব্রতের কি আদর্শই বেদব্যাস এঁকেছিলেন! আমার মাথার ভিতর তখনও মদের বাষ্প ঘুলাচ্ছিল। গত বৎসর ঠিক এই সময়ে বাঙ্গালা খবরের কাগজে "ফরাসী কোম্পানীর ব্রাণ্ডী"র বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ল। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ছেলেরা যখন স্কুল কলেজ ছেড়ে কলকেতার স্কোয়ারগুলিতে রোজ বিকেলবেলা জমা হয়ে নন-কো-অপারেশন সভায় নেতাদের লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনে "বন্দে মাতরম্" শব্দে আকাশ ফাটিয়ে দিত, মফস্বলে মেথর মুর্দ্দাফরাশেরা যখন মদ ছেড়ে দিয়ে নেতাদের সঙ্গে কোলাকুলি করছে, সেই সময়েই ত দেখেছি—বাঙ্গালা দৈনিক পত্রের এক পৃষ্ঠে নন-কো-অপারেশনের অনুকূলে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ, আর অপর পিঠে বড়-বড় টাইপে বিলাতী মদের বিজ্ঞাপন। ইহার মধ্যে একটা খুব মজার কথা আছে। যে বোকা ছেলেগুলো স্কুল ছেড়ে দিয়ে, স্বদেশী কর্ম্মকর্ত্তাদের পিছনে ভেড়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল,—আহা! তাদের হাত দিয়েই মদের ও বিদেশী জিনিষের বিজ্ঞাপনে ভরা হাজার-হাজার বাঙ্গালা দৈনিক পত্র বিক্রি হচ্ছিল! মুখসপরা অসত্যবাদী স্বার্থপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর পিঠে ভগবানের চাবুক কবে পড়বে?

আমি বোধ হয় খুব উত্তেজিত হয়েছিলেম,—তাই শেষ কয়টি কথা চেঁচিয়ে উচ্চারণ করেছিলেম। আমার পাশ দিয়ে একজন অচেনা লোক যাচ্ছিল। সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে, আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। আমার তখন চমক ভাঙ্গল। রাত্তির প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,—আর এখানে থেকে মিছে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। পা-পা ক'রে হাঁটতে সুরু করলেম। ভোরের হাওয়া লেগে আমার মাথাটা ঠাণ্ডা হ'ল। আমি যখন শিয়ালদহের ষ্টেশনে গেলেম, তখনও অন্ধকারের ঘোর কাটে নি। অনেকক্ষণ প্লাটফরমে অপেক্ষা করবার পর, রবিবারের ফাষ্ট ট্রেন ছাড়ল। আমি যথাসময়ে আমাদের গ্রামের ষ্টেশনে নামলেম।

বাড়ীতে গিয়ে দেখি, গৃহিণীর চোখ দুটি শুকিয়ে গেছে,—মুখখানি কাঁদ-কাঁদ, যেন সমস্ত রাত্তির ঘুম হয় নি। আমি প্রথমটা হতভম্বের মত হয়ে গেলেম। নিজেকে তখনি সামলে নিয়ে বল্লেম, "কাজের ঠেঁপায় প'ড়ে কাল রাত্তিরে শেষ ট্রেন ধরতে পারি নি,—ও-পাড়ার যদু বাবুর হাতে তাই মাছ কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম।" "মাছ কোথায়? আর যদু বাবুই বা কোথায়? ছেলেমেয়েগুলো পর্য্যন্ত না খেয়ে, ভেবে-ভেবে আধমরা হয়ে গেছে,—এই শেষ রাত্তিরে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে।" গৃহিণীর কথা শুনে আমি অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেম। প্রথমটা যদু বাবুর উদ্দেশে গালাগালি করলেম। তার পর মনে হ'ল, হয় ত যদু বাবুর কোন বিপদ হয়ে থাকতে পারে। আচ্ছা, কি হয়েছে দেখাই যাক্ না।

যদু বাবুর বাড়ীতে গিয়ে খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর, বাবু উপর থেকে নেমে এলেন। যদু বাবু হাল ফ্যাশনের চোস্ত ভদ্রলোক। কোঁচান কাপড়, ইস্তিরি-করা সার্ট, আর ফুল-স্লিপারের উপর সিল্কের মোজা না চড়িয়ে উপর থেকে নীচে নামেন না। আমার মত চেনা-শুনা আগন্তুককেও তাই অত ডাকাডাকি করতে হয়েছিল। আমি বল্লেম, "কি মশাই, ব্যাপার কি বলুন ত?" যদু বাবু দেঁতো হাসির আড়াল থেকে বল্লেন, "ওহে ভায়া, কাল ত ট্রেনে বড়ই বেকুব ব'নে গিয়েছিলেম। ট্রেন থেমে নামবার সময় দেখি যে, বেঞ্চের নীচে একজোড়া ইলিশ মাছের বদলে একটা মাত্র মাছ রয়েছে। আমার বোধ হয় মাঝের কোন ষ্টেশনে আমাদের গাড়ীর কোন প্যাসেঞ্জার তোমার মাছটি নিয়ে স'রে পড়েছিল।" যদু বাবুর কথা শুনে আমার রাগটা নিবে গেল। আমি হাসি চেপে রাখতে পারলেম না। এক ঝলক হেসে নিয়ে বল্লেম, "প্যাসেঞ্জারটি বোধ হয় ভদ্রনামধারী বাঙ্গালী চোর। নইলে দুটো এক রকম ইলিশ মাছের ভেতর থেকে কি ক'রে আমার মাছটি চিনে নিয়ে স'রে পড়ল? অপর কারো এত বুদ্ধি হ'তে পারে না।" "হবে, হবে,—আশ্চর্য্য নয়!" আমি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বাড়ীর দিকে ফিরেছি,—চার-পাঁচ কদম মাত্র গিয়েছি,—এমন সময় দেখি যদু বাবুর ছোট ছেলে নাচতে-নাচতে আসছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলেম, "কিরে পটলা, কেমন ইলিশ মাছ খেলি?" যদু বাবু পটলার উত্তরটা চাপা দেবার মতলবে পিছন থেকে গলা-চেরা স্বরে বলতে লাগলেন,—"ওরে পটলা, হতভাগা, কাপড়-জামা না প'রে কোথায় মরতে গিয়েছিলি,—শিগ্‌গির আয়, নইলে মেরে খুন করব।" পটলচন্দ্র বাপের কথায় কর্ণপাত না ক'রে আমার প্রশ্নের উত্তরে বল্লেন,—

"ভুটো! ভুটো ইশ্ মাশ্! টিনটে ডিম! হো হো!! আমি চাল খানা খাব!!" আমি যদু বাবুর দিকে একটি মাত্র মারাত্মক দৃষ্টি-বাণ হাসির টঙ্কারের সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে প্রস্থান করলেম। পরক্ষণেই ঝণাৎ ক'রে যদু বাবুর সদর দরজা বন্ধ হ'ল,—আর পটলার পিঠে চপেটাঘাতের আওয়াজের সঙ্গে তার কান্না পাড়াকে কাঁপিয়ে তুল্লে। এবারকার নিরামিষ অরন্ধনের কথা জীবনে আমি ভুলতে পারব না।

আন্দামান

[শ্রীফণিভূষণ মজুমদার]

একদিন খবর পাইলাম যে, সাউণ্ড দ্বীপের ওধারে সমুদ্রের কিনারায় একখানি বেশ বড় "সামপানে" একজনের মৃতদেহ আসিয়া লাগিয়াছে। পুলিশ লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া যতদূর দেখিলাম, বুঝিলাম যে, কোন হতভাগ্য মৎস্যজীবী মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছিল। ঝড়ে সমুদ্রে পড়িয়া দিক হারাইয়া, উহারা দুইজনেই বড় সাম্পানে উঠিয়া, পাইল চড়াইয়া দিয়া চলিতে থাকে। শীঘ্র কূল-কিনারা পাওয়ার আশায় উহারা দুইটী পাইল চড়াইয়াছিল। বড় জোয়ারে

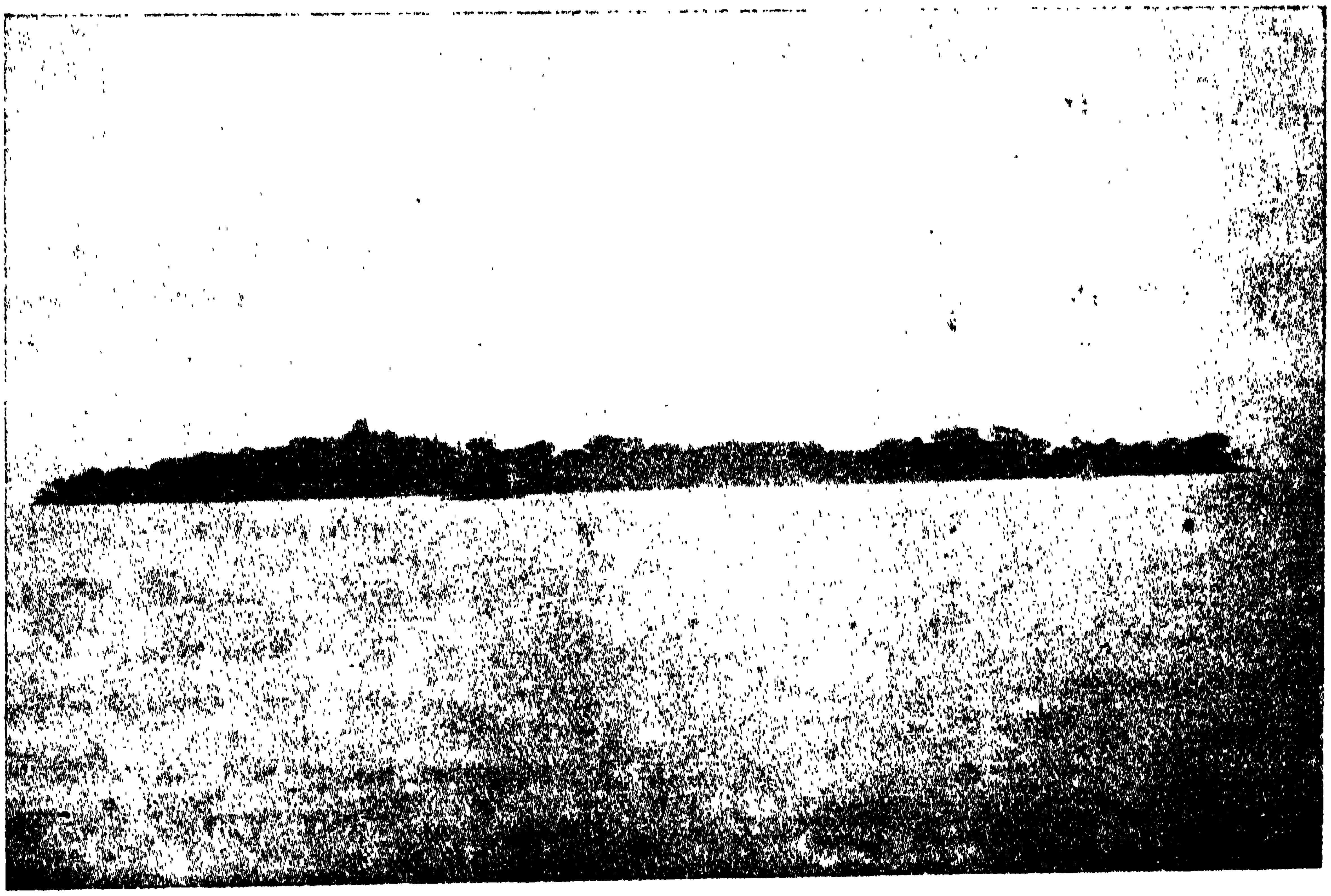

রসদ্বীপ—এবাডিন হইতে সাধারণ দৃশ্য

মৎস্য ধরিতে গিয়া, ঝড়ে সমুদ্রে পড়িয়া, অনাহারে ও তৃষ্ণায় জীবনলীলা শেষ করিয়াছে। নৌকা হইতে একটু দূরে জঙ্গলের কাছেই আর একজনের হাড় দেখিয়া ও চারিধারে খুঁজিয়া দেখিয়া যতদূর বুঝা গেল তাহা এইরূপ। নৌকার License উহাদের নৌকায় ছোট খোপে পাওয়া গিয়াছিল। উহারা দুইজনে পিছনে একটী ছোট ডিঙ্গী লইয়া উহা কিনারায় পাথরের ধাক্কা না খাইয়া, একেবারে জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া আটকাইয়া যায়। উহাদের মধ্যে একজন উত্থানশক্তি রহিত হইয়া নৌকাতেই শুইয়া ছিল; এবং অন্য একজন কিনারা পাওয়াতে হয় ত আশ্রয় ও জলের আশায় নৌকা হইতে নামিয়া জঙ্গলের উদ্দেশে যাইতেছিল; কিন্তু একটু দূরে গিয়াই বেচারী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়া

জীবনলীলা শেষ করে। তাহার সঙ্গী সেই নৌকাতেই জন্মের মত নিদ্রা গেল। উহাদের ফতুয়ার পকেট ও নৌকার খোপের মধ্য হইতে চিঠিপত্র ও নাম দেখিয়া মনে হইল, উহাদের চাটগাঁ জেলায় বাড়ী। সম্প্রতি উহাদের একজন আত্মীয় বসরা হইতে আসিয়া, উহাদের মাতা-পুত্রের খবর লইয়া যে একখানি পত্র দিয়াছিল, তাহাও উহাদের কাছেই পাওয়া গিয়াছিল। উহাদের নৌকা হইতে ওই চিঠির সহিত সযত্নে রক্ষিত প্রায় ৩৬৲ পাওয়া গিয়াছিল। সেই সমস্ত উহাদের বোটের Licenseএর ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শুনিয়াছি, সেই সময়ে যে সাহেব জঙ্গলীদের রসদ দিতে ওইদিকে যাইতেছিল, সে ওখান হইতে প্রায় ১০ ঘণ্টার রাস্তা দূরে ঐরূপ ঝড়ে বিপদগ্রস্ত দুইজন লোককে রক্ষা করিয়াছিল। লোক দুইটা জীবিত ছিল; এবং সাহেবের ষ্টীমার দেখিতে পাইয়া, কোন রকমে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। উহাদের সঙ্গে খাদ্য ও জল হয় ত বেশী পরিমাণে ছিল; সৌভাগ্যক্রমে তাহারা বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। এই দুইজন হতভাগ্যের সেইখানেই বালুর ধারে কবর দেওয়া হইল। সেই সাম্পান্ ও মৃতদেহের দু'খানি ছাব দিলাম।

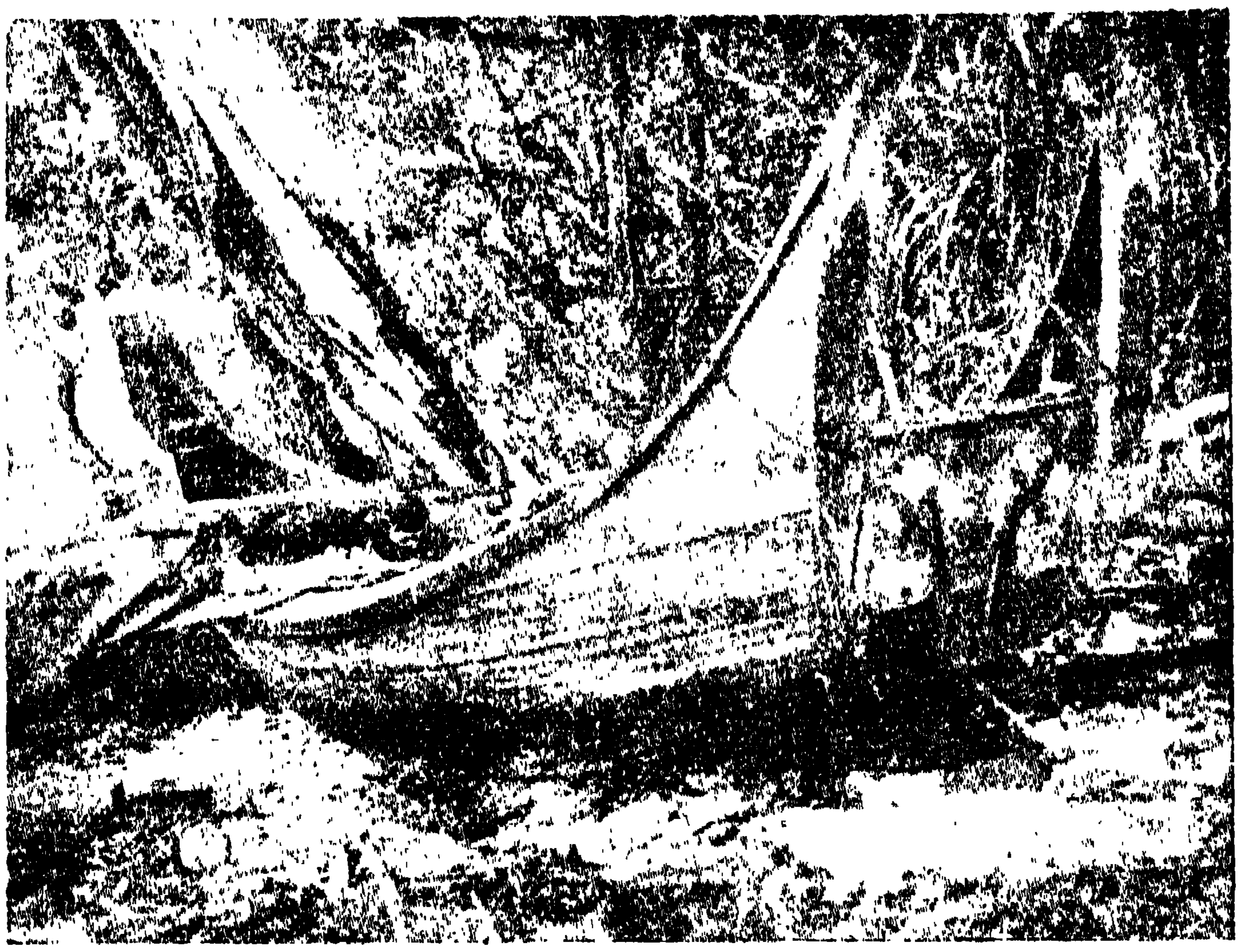

সাম্পানে মৃতদেহ—দূর হইতে

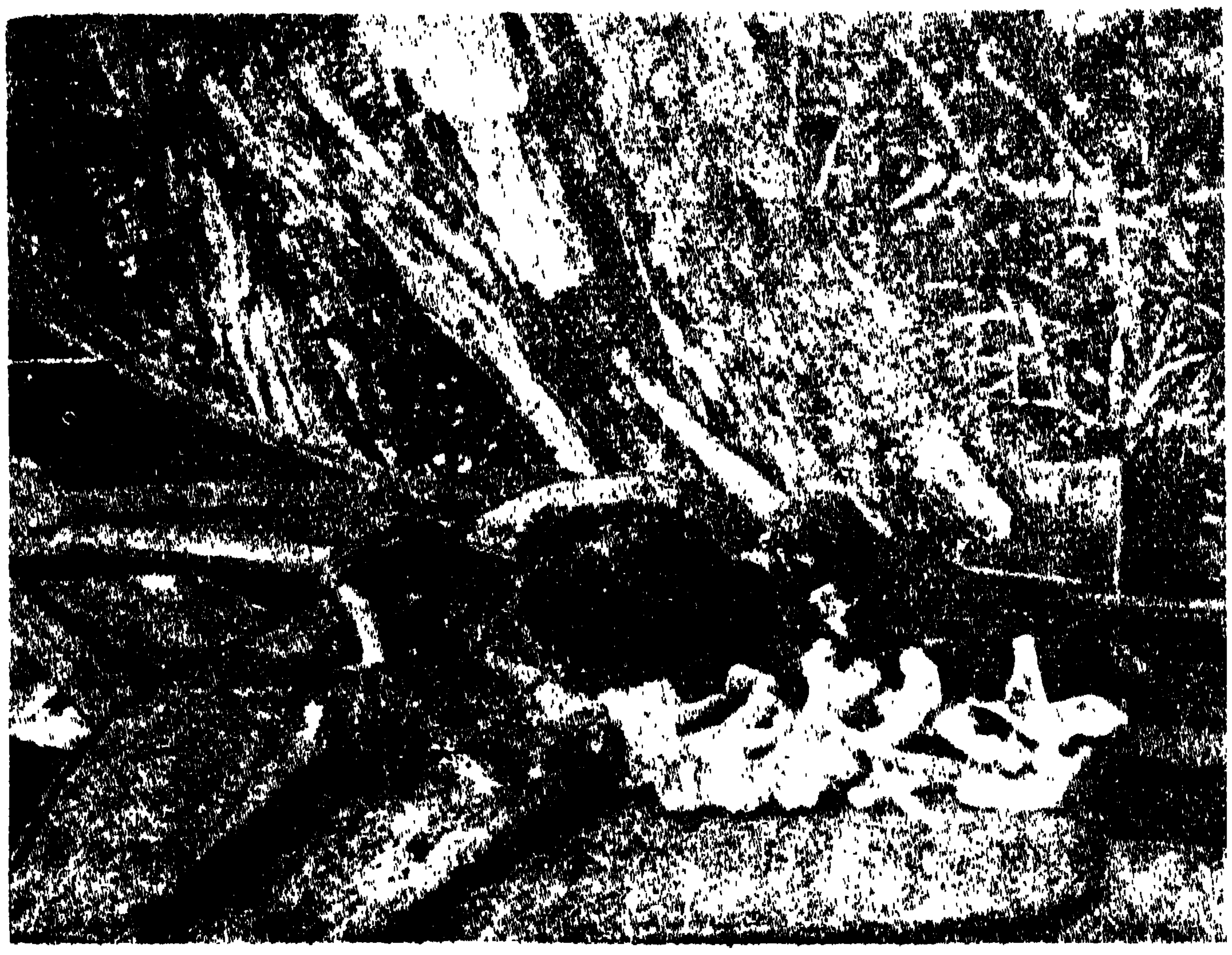

সাম্পানে মৃতদেহ—নিকটে

পোর্ট ব্লেয়ার ও নর্থ আন্দামানের মাঝামাঝি মধ্য আন্দামান অবস্থিত।—উক্ত দুইটী স্থান ষ্টীমারে প্রায় ৬ ঘণ্টার রাস্তা। এখানেও কেবল মাত্র বন-বিভাগ কাজ করিতেছে। এখানে কয়েদী ধার লইয়াও কাজ করা হইতেছে। এখান হইতেও ট্রামলাইন সুরু করা হইয়াছে। এই ট্রামলাইন পূর্ব্ববর্ণিত বেস ক্যাম্পের বা প্রধান আড্ডার সহিত মিলিত করা হইবে। ইহা নির্ম্মিত হইয়া গেলে অনেক সুবিধাও হইবে। লাইনের ধারে-ধারে সুবিধা মত স্থান পরিষ্কার করাইয়া গ্রাম বসাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। তাহা হইলে স্থানগুলি আবাদও হইবে এবং কাজ করিবার লোকও পাওয়া যাইবে। এখানকার হেড কোয়াটার্স আপাততঃ Bomlongta। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে পাহাড়ের মধ্যে "গনানালার" ধারে অবস্থিত। রঙ্গাট, লং আইল্যাণ্ড এবং অন্যান্য কতকগুলি স্থানে কাজ হইতেছে। লং আইল্যাণ্ড সমুদ্রের ধারে অবস্থিত ও বেশ সুন্দর একটী

দ্বীপ। এই দ্বীপে দু' একজন অফিসার থাকেন। এদিকে পোর্ট ব্লেয়ার হইতে সপ্তাহে দুইবার করিয়া জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে। কারণ, এখান হইতে বেশী কাঠ চালান যাইয়া থাকে। এখানে একটী হাসপাতাল আছে। দু'

রস দ্বীপের গির্জ্জা

তিনজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকও আছেন—অবশ্য সকলেই চাকুরী উপলক্ষে।

এইবারে পোর্ট ব্লেয়ারের বিষয় কিছু লিখিয়া আমি আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এখানকার বিষয় পূর্ব্বেই বারীন বাবু লিখিয়াছেন; সুতরাং আমি বেশী কিছু লিখিব না। এখানকার হেড কোয়ার্টার রস দ্বীপে অবস্থিত। এখানে চীফ কমিশনার থাকেন।

রস দ্বীপ। ইহা একটী ছোট দ্বীপ। এখানে চীফ কমিশনার, বড় হাসপাতাল, খাজাঞ্চীখানা, রসদ-আপিস, সেটেল্‌মেণ্ট ক্লাব, সাঁতার ঘর, ডাকঘর, পাঁউরুটীর কারখানা, বরফের কল ইত্যাদি আছে। এই দ্বীপটীর চারিধারে বেড়াইবার জন্য সমুদ্রের কিনারা দিয়া সুন্দর রাস্তা আছে। এমডেনের ভয়ে যেখানে-যেখানে কামান বসান হইয়াছিল, তাহা এখনও দেখা যায়। এখানে সমুদ্রের কিনারায় প্রায়ই সন্ধ্যার সময় ব্যাণ্ড বাজিয়া থাকে। এখান হইতে প্রতিদিন বেলা ১২ টা ও রাত্রি ৮ টার সময় তোপ পড়িয়া থাকে। এখান হইতে অন্যান্য সমস্ত স্থানে নিয়মিত ভাবে ফেরী ষ্টীমার যাতায়াত করিয়া থাকে। অনেক ঘরে, রাস্তায় ও বাজারে বিদ্যুতের আলো আছে। কতকগুলি দোকানও এখানে আছে। এই দ্বীপটী প্রধান দ্বীপ হইতে প্রায় দেড়

চ্যাটাম ও হাডোর মধ্যবর্ত্তী সেতু

মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখান হইতে অন্যান্য সমস্ত স্থানে ও আফিসে টেলিফোঁ আছে।

এবার্ডিন:—ইহাই পোর্ট ব্লেয়ারের মধ্যে "বড় সহর"। এখানকার লোকেরা অন্যান্য গ্রামের বা বস্তির লোকদিগকে "জঙ্গলী টাপুর" লোক বলিয়া থাকে। যে কয়েক ঘর দোকানদার

ও মহাজন আছে, তাহারা এইখানেই থাকে। সেলুলার জেল, স্কুল, পুলিশ হাসপাতাল, ডেপুটী কমিশনার ইত্যাদি সকলেই এদিকে থাকেন। স্কুলটী এখন হাই স্কুল হইয়াছে, এবং ছাত্র-সংখ্যাও মন্দ হয় নাই। বাজারের চৌমাথায় একটী ঘড়ি-শোভিত চাঁদনী চক প্রস্তুত হইয়াছে। ফুটবল হকি ইত্যাদি খেলিবার জন্য বেশ বড় মাঠ আছে। মোটের উপর ইহা দেখিতে বেশ সুন্দর ছোট-খাট সহরের মত। ইহা প্রধান দ্বীপে অবস্থিত এবং এখান হইতে অন্যান্য স্থানে যাইবার জন্য রাস্তা আছে। রাস্তাগুলি বেশ সুন্দর এবং উঁচু-নীচু ভাবে গিয়াছে। উহার পাশে-পাশে আলো আছে। কিন্তু এদিকে বিজলীবাতী নাই। এখান হইতে কিছু দক্ষিণে সাউথ-পয়েন্ট। সেখানে মেয়ে জেলখানা ও বেতার টেলিগ্রাফের বাড়ী আছে। একটী ছোট-খাট নালা ঘুরিয়া-

রস দ্বীপের বাজার ও রাস্তা

ফিরিয়া অনেক দূর হইতে আসিয়া এখানে সমুদ্রে পড়িয়াছে। এদিকেও কয়েকটা বস্তি আছে।

ফিনিক্স উপসাগর। ইহা এবাডিনের কিছু পশ্চিমে অবস্থিত। হাঁটিয়া যাইতে প্রায় ১০।১৫ মিনিট লাগে। কয়েকটা বস্তি মাত্র আছে। এখানে ডাক ও ওয়ার্ক-সপ বা কারখানা আছে। জাহাজ ও লঞ্চ ইত্যাদি সমস্ত এখানে

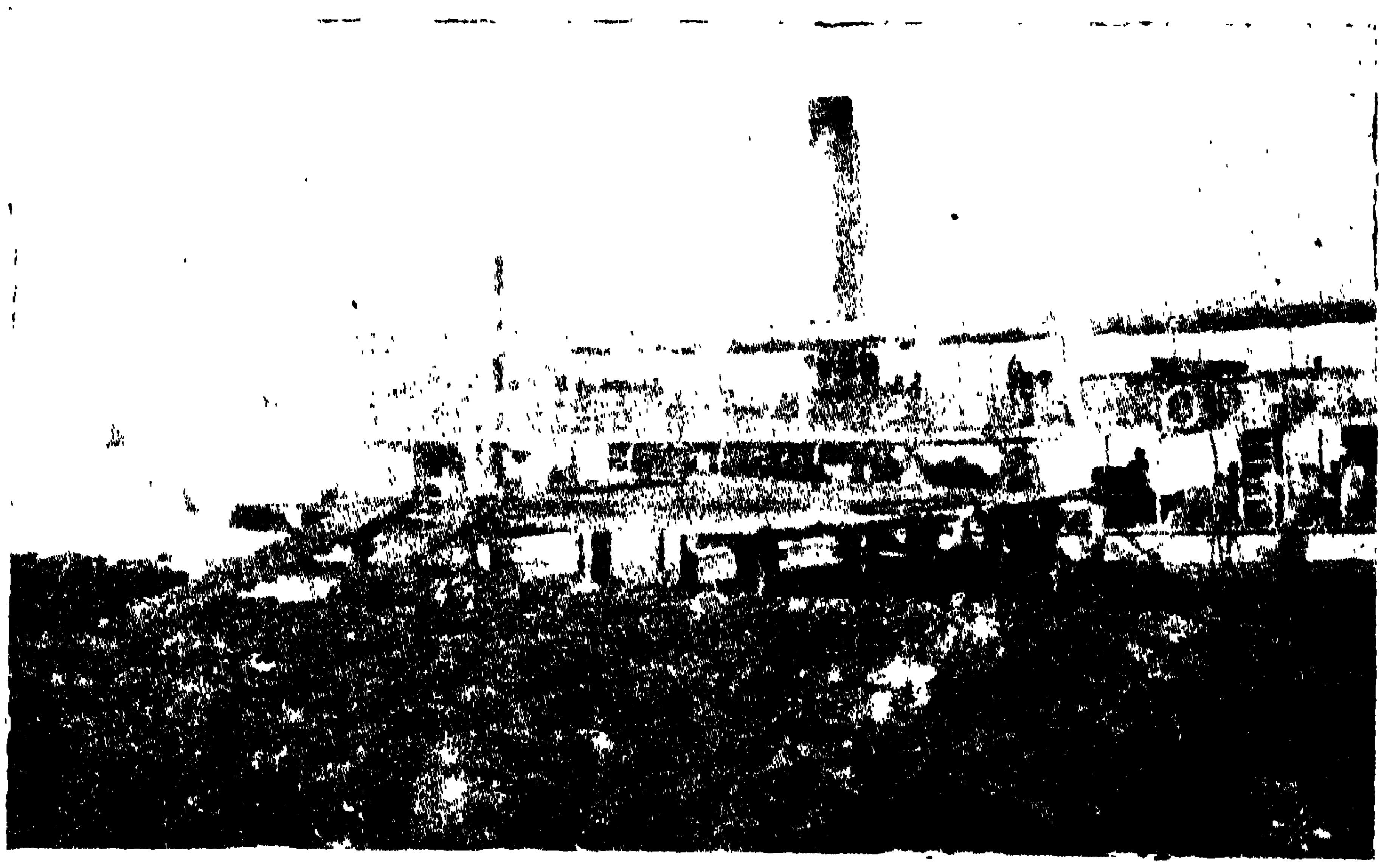

ফেরী ষ্টীমার ডোরিস

মেরামত হইয়া থাকে। একটি ছোট-খাট হইলেও দেখিতে মন্দ নহে।

চ্যাথাম দ্বীপ। বেশ ছোট একটী দ্বীপ। এখানে কেবল বন-বিভাগের কাজ হয়। এখানে বনবিভাগের প্রধান কর্মচারী থাকেন। এখানে বেশ বড় একটী করাতের কল আছে। এই কলে দরকারমত কাঠ কাটিয়া অন্যান্য স্থানে চালান দেওয়া হয়। এই দ্বীপটী হ্যাডোর সহিত একটী সেতুর দ্বারা সংযুক্ত। এদিককার খরচের জন্য যাহা দরকার তাহা রাখিয়া, বাকী সমস্ত কাঠ প্রায় কলিকাতায় মার্টিন কোম্পানীর এবং বিলাতে হার্ডয়ার্ড ব্রাদার্সের নিকটে চালান দেওয়া হয়।

হ্যাডো। ইহা এবার্ডিন হইতে প্রায় দু' মাইল পশ্চিমে। এখানে কারামুক্ত লোক ও কয়েদীদের জন্য একটী হাস-

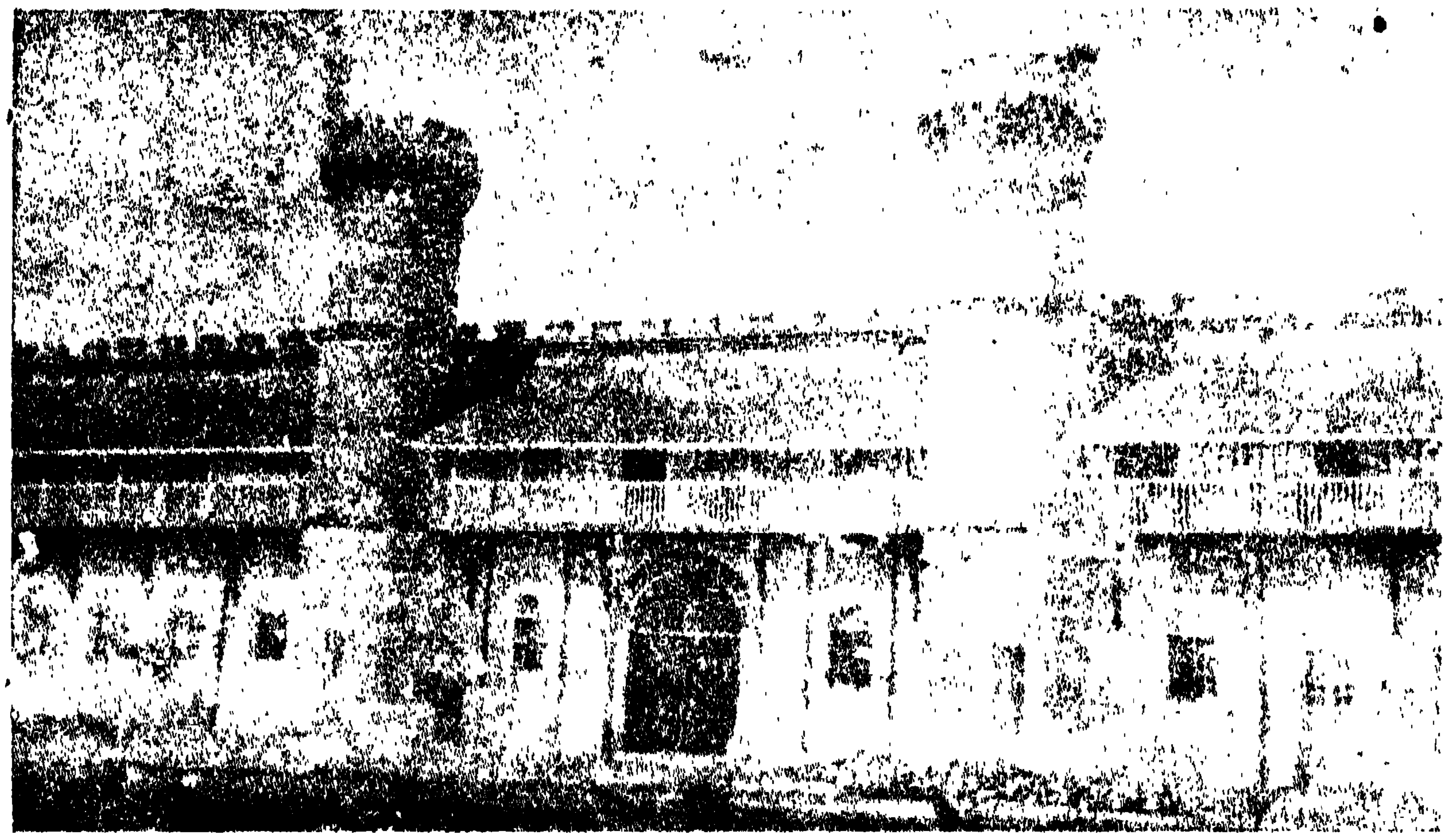

সেলুলার জেলের প্রধান ফটক

পাতাল আছে। হাসপাতালটী বেশ বড়। এখানে পাগল ও যক্ষ্মা রোগীদের ওয়ার্ড আছে। ইহা একটী জেলা। এক জন ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার এখানে আছেন। বনবিভাগের কাঠের ডিপো ইহারই জেটীর নিকট। ইহার বন্দরের চারিধারে পাহাড় থাকাতে, খুব ঝড়েও কোন গোলমাল হয় না; এবং জলও বেশ গভীর বলিয়া, এখনেই বড় বড় জাহাজ নোঙর করিয়া থাকে। পোর্ট ব্লেয়ারের হেড কোয়ার্টার্স এই ডিষ্ট্রিক্টে স্থানান্তরিত করিবার কথা হইতেছে। ইহাও প্রধান দ্বীপে অবস্থিত। এখানে একটী বেশ বড় সরকারী বাগিচা আছে।

ভাইপার আইল্যাণ্ড বা সর্পদ্বীপ। এখানে পূর্ব্বে ভাইপার জাতীয় সর্প থাকিত বলিয়া, উহার নাম সর্পদ্বীপ হইয়াছে। চারিধারে পাহাড়ের মাঝখানে এই মাঝারী গোছের দ্বীপ। ইহাও একটী ডিষ্ট্রিক্ট। এখান হইতে আশে-পাশের দু'একটী গ্রামে খেয়া নৌকা যাতায়াত করে। এখানে বে-সরকারী কারখানা আছে। সেখানে কচ্ছপের খোলার, পাথরের ও অন্যান্য সমস্ত শৌখিন জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। কয়েদীরা একজন শিল্পীর তত্ত্বাবধানে উহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। অন্য লোকের নক্সা

রস দ্বীপ হইতে দ্বীপের সাধারণ দৃশ্য (সেলুলার জেল দেখা যায়)

এবাডিনের বাজার

এই দিকেই "জয়োয়ার" ভয়। উইম্বার্লী-গঞ্জ একটি জেলা। এখানে ডিষ্ট্রীক্ট অফিস আছে।

হোপ টাউন। ইহাও প্রধান দ্বীপে অবস্থিত এবং মাউণ্ট হ্যরিয়েট নামক পাহাড়ের নীচে স্থাপিত। পাহাড় হইতে একটী ঝরণার জল এখানে আসিয়া ট্যাঙ্কে জমা হয় ও উহা হইতেই ষ্টীম-লঞ্চগুলি জল গ্রহণ করিয়া থাকে। মাউণ্ট হ্যারিয়েটে যাওয়ার জন্য বেশ ভাল রাস্তা আছে। এইখানেই লর্ড মেয়ো শের আফ্‌গান কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

মতও কার্য্য এখানে হইয়া থাকে। ইহাদের কার্য্য বড়ই সুন্দর। কচ্ছপের খোলার উপর নাম খোদাই, উপহারের বাক্স, অন্যান্য জিনিস ও কণ্ঠমালা প্রভৃতি বেশ সুন্দর ও সুদৃশ্য। এখানেও একটি হাসপাতাল আছে।

মাউণ্ট হ্যারিয়েট। ইহা প্রায় ১৬০০ ফিট উঁচু। চীফ কমিশনার গ্রীষ্মকালে এখানে বাস করেন। এ স্থানটী বেশ মনোরম ও ঠাণ্ডা। এখান হইতে পোর্ট ব্লেয়ারের দৃশ্য বেশ সুন্দর।

বংশ দ্বীপ। এখানে একটি ছোট হাসপাতাল আছে। এখান হইতে উইম্বার্লীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। ঘুরিয়া একটি বড় রাস্তা এবার্ডিন পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং উহার ধারে অনেকগুলি গ্রাম আছে। ইহাও প্রধান দ্বীপে অবস্থিত। উইম্বার্লী হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত এদিকে-ওদিকে বনবিভাগের কাজ হইতেছে। উহার জন্য ছোট রেলগাড়ী আছে। রবারের আবাদও এখানে আছে। রবার ও চায়ের কারখানাও এখানে ছিল। এখন এই দুই-ই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার উত্তরে গোবাং ইত্যাদি স্থানে ট্রোলীতে অথবা গাড়ীতে যাওয়া যায়; এবং

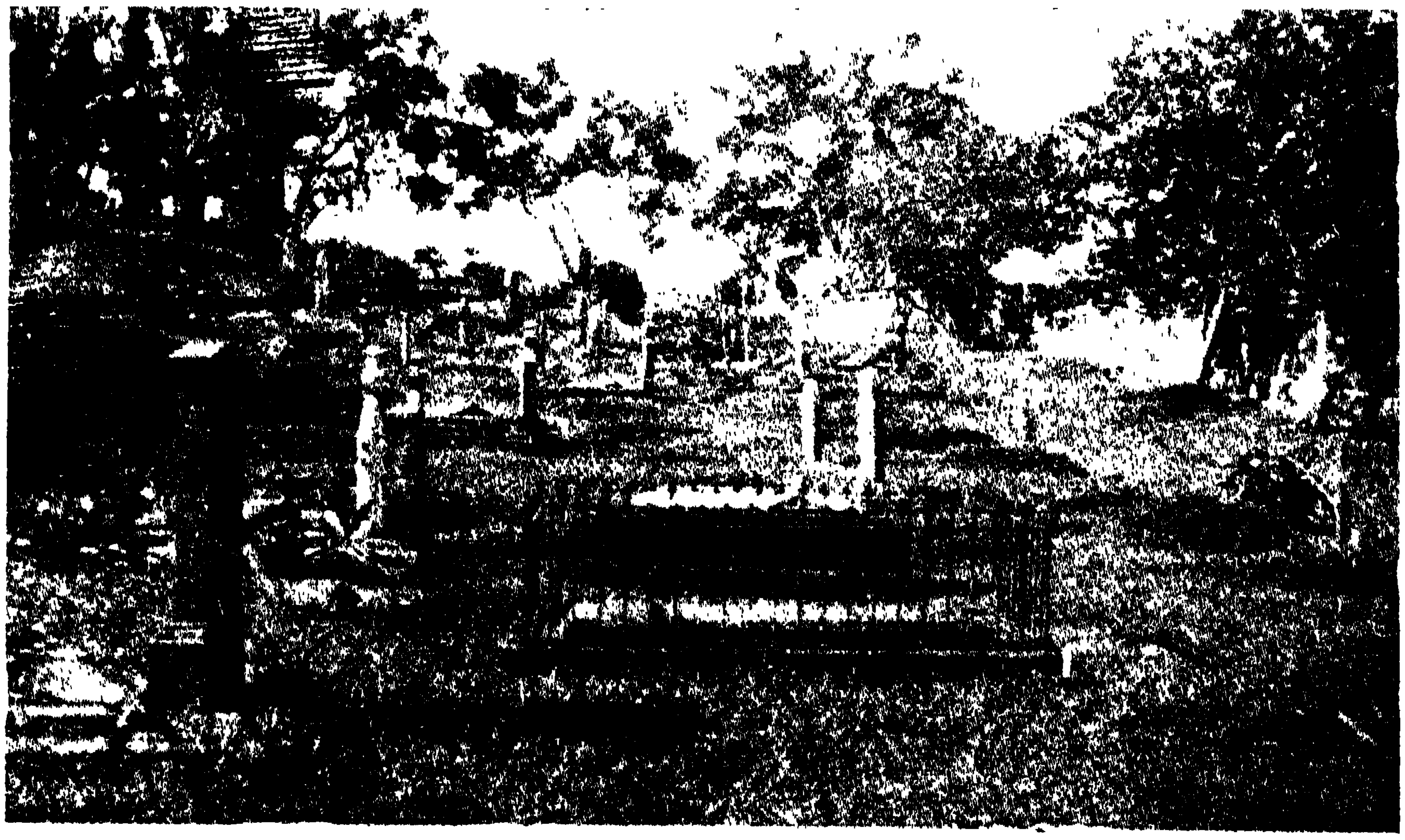

গোরস্থান—এবার্ডিন

কার্বাইন কোভ। সাউথ পয়েণ্ট হইতে প্রায় দু'মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এবার্ডিন হইতে এখানে যাওয়ার জন্য বেশ সুন্দর রাস্তা আছে। এখানে সমুদ্রের ধারে বেশ সুদৃশ্য বালু আছে; সেইজন্য এখানে অনেক সাহেব মেম

স্নান ও বন-ভোজন করিতে আসিয়া থাকেন। স্থানটীর দৃশ্য খুব মনোরম।

ভারতবর্ষ হইতে কয়েদীদিগকে লইয়া আসিয়া প্রথমে সেলুলার জেলে কয়েকমাস রাখা হয়। পরে সেখান হইতে তাহাদের সমস্ত ঠিক হয়। এ সমস্ত বিষয়ে বেশী বিস্তৃত বিবরণ লেখার কোন প্রয়োজন মনে করি না। তবে এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, কয়েদীদিগের দ্বারাই এখানে সমস্ত কাজ করান হইয়া থাকে। ইহারা এমন সুন্দর ভাবে ও বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়া থাকে যে, উঁহাদের সহিত পাল্লা দিয়া অন্য কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে পারে না। এক একটী জেলা বা ষ্টেশনে প্রায় ৫০০ হইতে ৮০০ পর্য্যন্ত কয়েদী থাকে। ১০ জন কয়েদীর উপর একজন কয়েদী পেটী অফিসার; ১০ জন পেটী অফিসারের উপর একজন টিণ্ডাল; এবং ৭।৮ জন টিণ্ডালের উপরে একজন জমাদার থাকে। জমাদার ইত্যাদি সকলেই কয়েদী। চাপরাসের ফিতা কাল, কাল ও লাল এবং লাল দেখিলেই যথাক্রমে পেটি অফিসার, টিণ্ডাল ও জমাদার বলিয়া বুঝা যায়। যাহাদের যেখানে ও যে বিভাগে কাজ করিতে হইবে, তাহা ঠিক করা থাকে; এবং প্রতিদিন ততগুলি লোক তাহাদের নিজ-নিজ নির্দ্ধারিত কার্য্য করিয়া আসিলে

ফিনিক্স উপসাগর—কারখানা

রাত্রি ৮টার সময় সকলে আপন-আপন ব্যারাকে বন্ধ থাকে। যদি কেহ পলাইয়া যায় বা অসুস্থ হয়, তবে তাহার পেটি অফিসার বা টিণ্ডালকে সময়মত জমাদারকে খবর দিতে হইবে। যখন সকলে ব্যারাকে যাইবে, তখন জমাদার সমস্ত লোক গণিয়া লইবে। তাহাদের আহারাদি সরকার হইতে দেওয়া হয়; এবং ব্যারাকেই রান্না ঘরে কয়েকজন কয়েদী আহার্য্য প্রস্তুত করে। খাওয়ার সময় সকলে ছুটী পাইয়া থাকে। জমাদার নিজ ষ্টেসনের কয়েদীর জন্য দায়ী।

কারখানা—ফিনিক্স বে

যদি সেখানকার স্বাধীন লোক অথবা অন্য কাহারও কাজের জন্য মজুর অথবা গাড়ী টানিবার লোকের প্রয়োজন হয়, তবে সেই জেলার অফিসারের নিকট হইতে কয়েদী ধার করিতে হয়। ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার সেই লোকের দরকার-মত কয়েদী

পাঠাইয়া দিয়া পরে লোক ও ঘণ্টা হিসাবে তাহার নিকট হইতে বিল করিয়া টাকা লইয়া থাকেন। কয়েদীদের মজুরীর হার আমাদের দেশের হিসাবে খুবই কম। লোক অনুযায়ী উহাদের সহিত পেটি অফিসার বা টিণ্ডাল আসিয়া থাকে; এবং তাহাকে সমস্ত কাজ বলিয়া দিলে, সে তাহা বেশ সুচারু রূপে করাইয়া দিয়া থাকে। সরকারী জিনিষ যেমন কয়েদী, অথবা সরকারী বাগিচা হইতে নারিকেল, ডাব, নেবু, ইত্যাদি, যখনই লইতে হইবে তখনি উহা ইণ্ডেণ্ট করিতে হইবে।

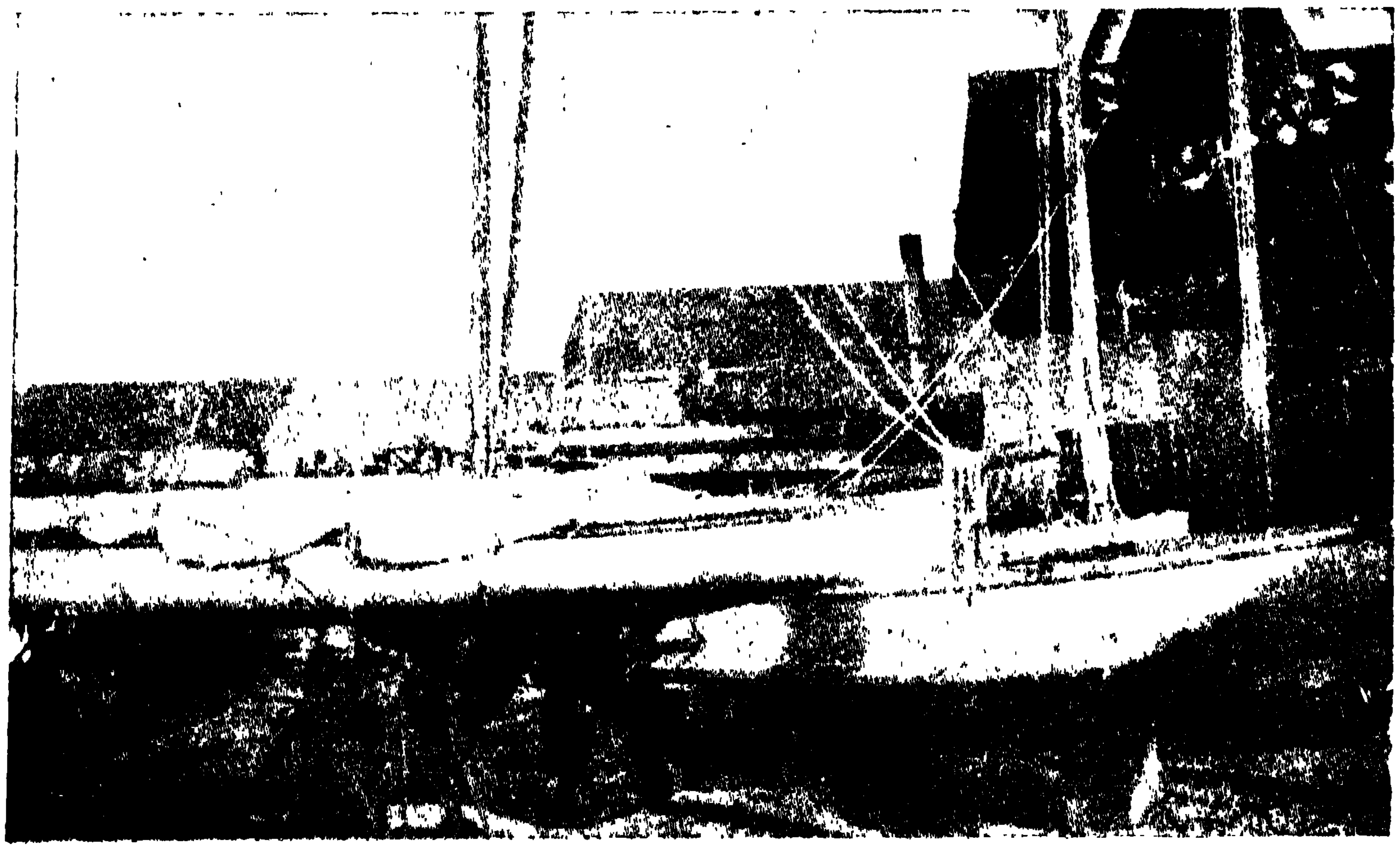

ডক—ফিনিক্স বে

যে সমস্ত কয়েদী টিকেট লীভ বা নিজে করিয়া খাইবার জন্য ছুটী পাইয়া থাকে, তাহারা নিজে কারবার, কিম্বা গরু, ভেড়া, মুরগী ইত্যাদি পালিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে। স্বাধীন ভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের অনুমতি একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে কয়েদীর স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া চীফ কমিশনার ইচ্ছামত দিয়া থাকেন। কয়েদীদের মধ্যে যাহারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত তাহারা মাসিক বার আনা, যাহারা দ্বিতীয় শ্রেণী-ভুক্ত তাহারা ১৲ এইরূপ পাইয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ইত্যাদি ওখানে বৎসর হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। আমার ঠিক মনে নাই—তবে বোধ হয় ৫ বৎসর সেখানে কাটাইলে তৃতীয় শ্রেণী, দশ বৎসর কাটাইলে দ্বিতীয় শ্রেণী—এইরূপ হইয়া থাকে। যদি ইহার মধ্যে তাহার আবার কোন অপরাধ হয়, তবে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি হয়; অথবা হয় ত কিছু সময়ের জন্য তাহাকে নিম্নতর শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হয়। উহাদের মধ্যেই আবার যোগ্যতা অনুসারে উহাদিগকে পেটি অফিসার, টিণ্ডাল ইত্যাদি করা হইয়া থাকে। অথবা কাহাকেও হয় ত কম্পাউণ্ডার, Sea-canny, লেখক, ইত্যাদি কাজ শিখাইতেও লওয়া হইয়া থাকে।

ফিনিক্স বে

এখানে সকল কর্ম্মচারীকে তাহাদের মাহিয়ানা হিসাবে কয়েদী চাকর বিনা বেতনে দেওয়া হইয়া থাকে। যদি বেশী চাকরের দরকার হয়, কিম্বা মেয়ে জেল হইতে "আয়া" দরকার হয়, তবে সেই কয়েদীর বা আয়ার সংখ্যা জানাইয়া, চীফ্ কমিশনারের হুকুম পাইলে পাওয়া যায়; এবং তাহাদের জন্য আলাহিদা টাকা দিতে হয়। যে-সে কয়েদীকে ইচ্ছামত লইতে পারা

যায় না। যাহাদের সময় হইয়াছে, তাহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। এ সমস্তই চীফের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহারা কোন দোষ করিলে, কিম্বা পলাইয়া গেলে রিপোর্ট করিলেই সাজা পাইয়া থাকে। তাহারা মুনিবের ইচ্ছামত সকল স্থানে যাতায়াত করিতে পারে। তবে রাত্রে মুনিবের নিকটে থাকিবে।

মেয়ে-ছেলে কয়েদীগণের মধ্যেও অনেক পুরুষদের মত টিণ্ডাল ইত্যাদি হইয়া থাকে। তবে তাহাদের জেলের মধ্যেই সমস্ত কাজ করিতে হয়। বিবাহ না হইলে কেহ বাহিরে আসিতে পায় না। কেবলমাত্র চীফ্ কমিশনারের হুকুম মত আয়া ইত্যাদি কাজের জন্য উহারা আসিতে পারে। জেলের মধ্যে উহারা পুরুষ কয়েদী ও নিজেদের জন্য কাপড়, কোট, অথবা বাহিরের লোকদের ফরমাস মত সতরঞ্জি, চাদর ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

কয়েদীরা ট্রোলি চালাইতে উদ্যত

যে ছুটী-প্রাপ্ত বা মুক্তি-প্রাপ্ত কয়েদী বিবাহ করিতে চায়, তাহাকে বড় সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়। তাহার যদি সেখানে বিবাহ করিবার সময় তখন হইয়া থাকে, ও স্বভাব ভাল থাকে, তবে বড় সাহেব তাহাকে বিবাহের অনুমতি দিয়া থাকেন। সে তখন, মেয়ে জেলে এ যে সমস্ত মেয়ে কয়েদীগণের বিবাহের সময় হইয়াছে;—তাহাদের মধ্য হইতে একজন পাত্রীকে রাজী করাইয়া, তাহার নম্বর

বেম্বু ফ্লাট—একটী রাজপথ

বড় সাহেবকে দেয়। তিনি তখন সেই মেয়ের দেশে তাহার স্বামী অথবা তাহার আত্মীয়বর্গকে সেই খবর জানাইয়া, তাঁহাদের মত চান; এবং যদি তাঁহারা বিবাহে মত দেন, তবে সেই মেয়েকে বিবাহ করিতে হুকুম দেন। যদি তাহার আত্মীয়েরা বা স্বামী মত না দেন, তবে তাহাকে বিবাহ করিতে হুকুম দেন না। যাহা হউক, এইরূপে ইহাদের বিবাহ ঠিক হইয়া গেলে, দু'জনে আদালতে গিয়া রেজীষ্টারি করাইলে বিবাহ হইল। তখন যদি তাহার স্বামীর ঘর না থাকে, তবে সরকার হইতে "সাদিপুর" নামক স্থানে উহাদিগকে থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। সেখানে এজন্য কতকগুলি ঘর প্রস্তুত করা আছে। সেখানে কিছু দিন থাকিয়া, পরে উহারা স্থান ঠিক করিয়া, অথবা ঘর প্রস্তুত করিয়া, নিজের ইচ্ছামত স্থানে থাকিতে পারে। বিবাহ করিলে সরকার হইতে সেই

মেয়েকে কিছু-কিছু মাসোহারাও দেওয়া হইয়া থাকে। বিবাহের দু'বৎসর পরে যদি তাহার স্বামীর রেহাই হইবার সময় হয়, এবং যদি সেই মেয়ের আরও পাঁচ বৎসর কয়েক থাকে, তাহা হইলে তাহার স্বামী সেই পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বে রেহাই পাইবে না। পাঁচ বৎসর পরে স্বামী স্ত্রী দু'জনে রেহাই পাইলে, তবে দেশে যাইতে পারে। কিন্তু

ট্রোলি

স্ত্রীকে ফেলিয়া স্বামী কিম্বা স্বামীকে ফেলিয়া স্ত্রী যাইতে পারিবে না। যদি দেশে যাইবার ইচ্ছা হয়, তবে দু'জনকেই একসঙ্গে যাইতে হইবে। দেশে যাওয়ার ইচ্ছা স্বামীর উপরেই নির্ভর করে। তাহার ইচ্ছা হইলেই সে স্ত্রীকে লইয়া যাইতে পারে—স্ত্রীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর উহা নির্ভর করে না। স্ত্রীর যদি যাইতে অমত থাকে, তবে স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে "তালাক" দিয়া দেশে চলিয়া যাইতে পারে—ইহা স্বামীর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। নতুবা সরকার হইতে তাহার স্ত্রীকে, তাহার সহিত জাহাজে উঠাইয়া দেওয়া হয়। এতদিন কয়েদীদের মধ্যেই বিবাহ হইত। কিন্তু এবারে শুনিলাম যে, স্বাধীন লোকদের মেয়েদের সহিতও কয়েদীর এবং স্বাধীন লোকদের সহিত মেয়ে কয়েদীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব চলিতেছে। উপরে যে বিবাহের সময়ের কথা বলিয়াছি,—উহার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় পুরুষ ও মেয়ে কয়েদীদের জন্য আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট সময় সেখানে কাটাইলে, পরে উহাদের বিবাহের সময় হইয়া থাকে।

কয়েদীগণ রেহাই পাইয়াও যদি সেখানেই থাকিতে চায়, তবে তাহারাও স্বাধীন উপনিবেশিকদের মতই সেখানে থাকে

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মজুমদার

ও নিজের ইচ্ছামত বিবাহ ও কাজকর্ম্মও করিতে পারে; এবং ইচ্ছামত দেশে যাতায়াত করিতে কিম্বা তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়াও আসিতে পারে। এইরূপেই পোর্ট ব্লেয়ারের অধিবাসী গঠিত হইতেছে। পূর্ব্বে এখানে ভাল স্কুল

ছিল না—এখন এখানে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং একটী বালিকা বিদ্যালয়ও হইয়াছে।

ফসলের মধ্যে এখানে এখন ধান চাউলই বেশী। ভুট্টাও কিছু-কিছু হয়। কিন্তু ফসল এত কম যে, উহাতে পোর্ট ব্লেয়ারের লোকেরই কুলায় না। সেজন্য রেঙ্গুন হইতে সমস্ত আনিতে হয়। তরি-তরকারী, ফল-মূল এখানে বেশ হয়। ফসলের জমী এখন বেশী করিবার কথা হইতেছে। ডাব, নারিকেল, পেঁপে, কলা, তরমুজ ইত্যাদি এখানে বেশ হয় ও খুব বড়-বড় হইয়া থাকে। এখানকার মাটী বেশ উর্ব্বর এবং যাহা লাগান যায় তাহাই প্রায় হইয়া থাকে। চাষের জন্য লোকের অভাব এখানে খুব বেশী বলিলেই হয়। এখানকার লোক এ বিষয়ে এখনও অত্যন্ত অমনোযোগী।

পোর্ট ব্লেয়ারের লোকদের মধ্যে সমস্ত বিবাহ আদালতে রেজীষ্টারী করিতে হয়। জাতি-বিচার নাই বলিলেই চলে; কেবলমাত্র হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতি আছে। হিন্দুদের সহিত যে-কোন সম্প্রদায়ের হিন্দুর, ও মুসলমানের সহিত যে-কোন সম্প্রদায়ের মুসলমানের বিবাহ হইয়া থাকে। হিন্দুদের বিবাহের সময় বর ও কন্যাপক্ষ যতদূর সম্ভব খিচুড়ী পাকাইয়া, কন্যাদান, লগ্ন ইত্যাদি কিছু-কিছু করিয়া লয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথাও প্রচলিত আছে।

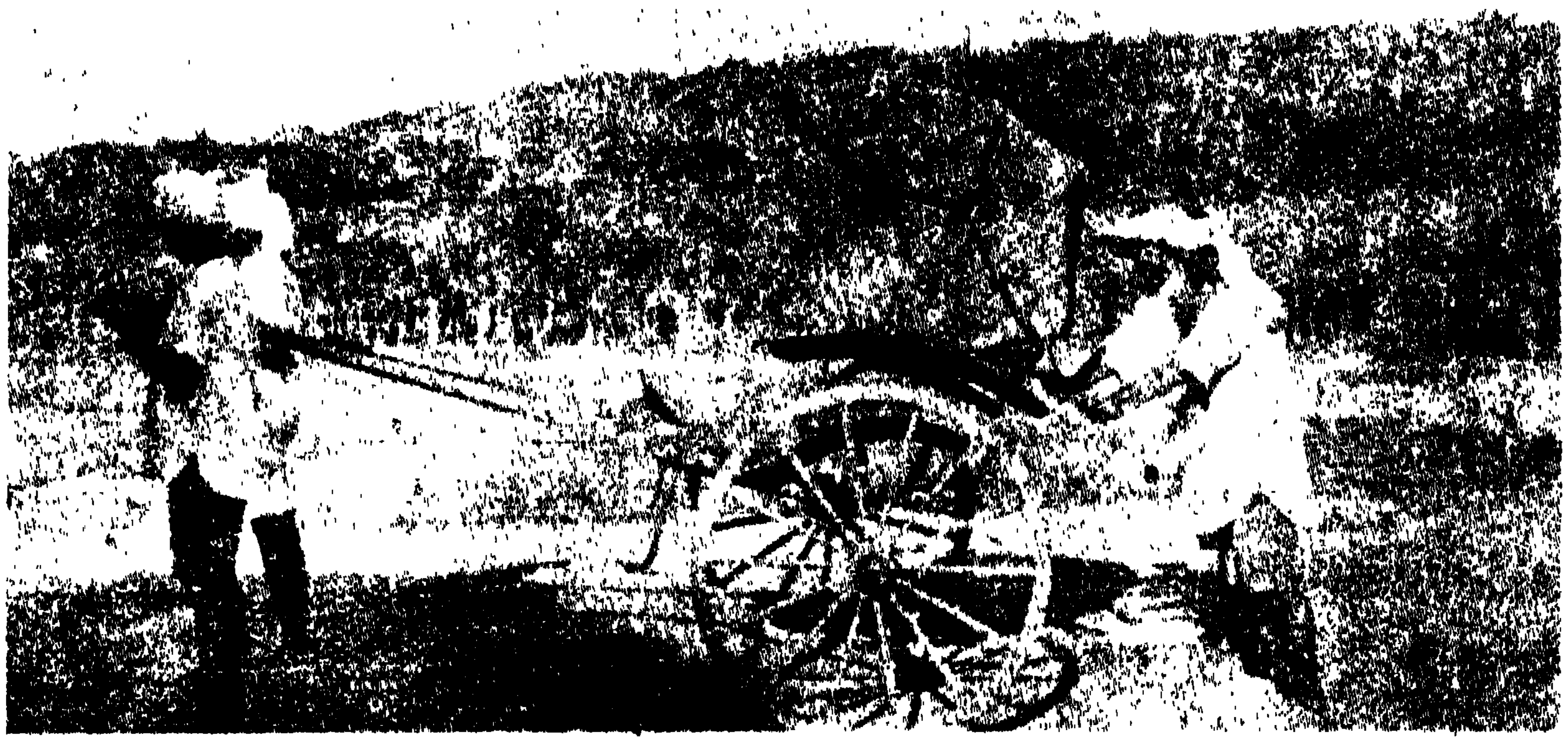

রিক্সা-চালক কয়েদী

কোন নারী বিধবা হইলে কিম্বা বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিলে, সেই মেয়ের জন্য যদি তাহার কোন আত্মীয় দায়ী না হয়, তবে সরকার হইতে সেই মেয়েকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় বিবাহ করিতে বলা হয়; এবং যদি সে তাহা না করে, তাহা হইলে তাহাকে রেঙ্গুন অথবা কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। যদি মেয়ের সচ্চরিত্রতা ও তাহার খাওয়া-দাওয়া ভরণ-পোষণের দায়ী তাহার কোন ভাই কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় হইতে পারে, তাহা হইলে সে তাহার আত্মীয়ের নিকট থাকিতে পারে ও তাহার খুসীমত পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রীর মত থাকিলে ও সে কথা আদালতে স্বীকার

কয়েদীরা পাথর ভাঙ্গিতেছে

করিলে, স্বামী দুইটী বিবাহ করিতে পারে; নতুবা নহে।

এখানে মুসলমান, শিখ ও হিন্দুদের জন্য মস্‌জিদ, গুরুদোয়ারা ও মন্দির সমস্তই আছে। এবাডিনে মাঝে-মাঝে দু'একস্থানে জলের কলও আছে। এ দেশের মেয়ে ও পুরুষ দুই-ই ধূমপান করিয়া থাকে—এবং মেয়েরা অনেকেই লুঙ্গীর উপরে সাড়ী পরিয়া থাকে। কেহ-কেহ খালি সাড়ীও পরিয়া থাকে। সকলেই হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলিয়া থাকে; কিন্তু উর্দ্দুতে লেখা-পড়া করিয়া থাকে এবং আদালতে উর্দ্দু লেখা গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

রাস্তা-মেরামতে নিযুক্ত কয়েদী

কয়েদীগণ অনেক সময়ে কাজ করিতে-করিতে অথবা সুবিধামত, পলাইয়া গিয়া নিকটস্থ কোন জঙ্গলে বাস করে এবং খাদ্যের জন্য মাঝে-মাঝে গ্রামে বা সহরে আসিয়া চুরি ডাকাতিও করিয়া থাকে। এজন্য অনেক সময়ে রাত্রে যাতায়াত নিরাপদ নহে। তবে প্রায়ই দেখা ও শুনা যায় যে, তাহারা কয়েদীগণকে কখনও কিছু বলে না। অবশ্য কোন কয়েদী যদি তাহাদের সহিত শত্রুতা করে, তবে তাহাকেও ছাড়ে না। কয়েদীগণ প্রতি রবিবার ছাড়াও পূজা-পর্ব্ব উপলক্ষে মাঝে-মাঝে ছুটী পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে অনেক কয়েদী নৌকা চুরি করিয়া রেঙ্গুন ইত্যাদি স্থানে পলাইয়া যাইত। এজন্য সেখানে সমস্ত নৌকা প্রত্যেক ঘাটে পুলিশের নিকট জমা থাকে। লোকে পুলিশের নিকট হইতে পাশ লইয়া নৌকায় চড়িয়া এদিক-ওদিকে যাতায়াত করিতে পায়; এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা পুনরায় পুলিশের নিকট জমা দিতে হয়। জঙ্গলে কিম্বা অন্য কোন স্থানে কয়েদী-সহ নৌকা লইলে নৌকার সহিত পুলিশ যাইয়া থাকে; অথবা একজন পেটি অফিসার সঙ্গে থাকে।

কুলী-কয়েদী

এদিকে একপ্রকার খাদ্যোপযোগী পাখীর বাসা পাওয়া যায়; তাহার নাম আবাবাইল। ছোট-ছোট পাখীরা তাহাদের লালা দ্বারা বাসা প্রস্তুত করিয়া থাকে; এবং তাহাই ভাঙ্গিয়া লইয়া আসা হয়। কতকগুলি স্থানে পাহাড়ের মধ্যে পাথরের গুহার ভিতরেও বাসা পাওয়া যায়; এবং বৎসরে প্রায়

তিনবার করিয়া বাসা ভাঙ্গা হয়। যাহারা বাসার ঠিকা লয়, তাহারা নৌকায় চড়িয়া যাইয়া উহা লইয়া আসে। গুহাগুলি বেশ বড় ও তাহার ভিতরে খুব অন্ধকার। বড়-বড় সাপও ঐ পাখীর ছানা খাইবার আশায় গুহার ভিতরে

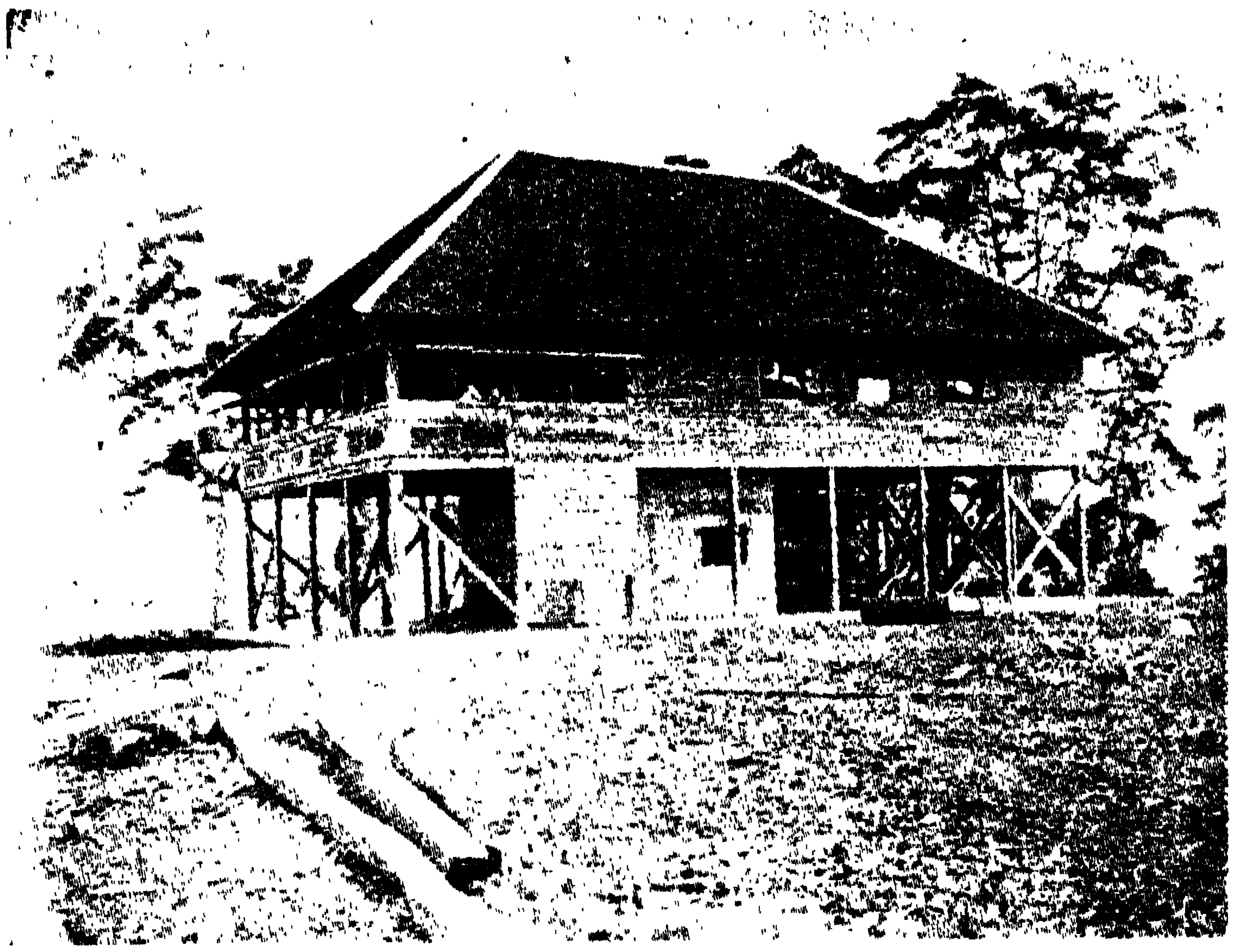

ডাক্তারের বাঙ্গলো

থাকে। যাহারা বাসা ভাঙ্গিতে যায়, তাহারা বলিয়া থাকে যে, সেই সাপগুলির কোন অনিষ্ট না করিলে বা তাহাদিগকে না মারিলে তাহারা প্রায়ই কিছু বলে না। সকলেই মশাল লইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। এই বাসাগুলি ছোট-ছোট জালে তৈয়ারী সাদা বাটীর ন্যায় এবং তাহাদের ভাল-মন্দ অনুসারে কম-বেশী দামে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহা লোকে দুগ্ধের সহিত খাইয়া থাকে; এবং কতকগুলি ব্যারামের পক্ষে ইহা বেশ ভাল ঔষধ।

এদিককার জঙ্গলে খুব সুন্দর ও নানা প্রকারের অর্কিড ফার্ণ ইত্যাদি এবং লতা পাতা ও প্রজাপতি পাওয়া যায়। একপ্রকার কাঁচের বাক্সে প্রায় ৫০।৬০ রকমের প্রজাপতি সাজাইয়া অনেক দামে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। প্রজাপতি ধরিবার জন্য অনেক লোকও মাঝে-মাঝে নিযুক্ত হইয়া থাকে। লতা-পাতা দিয়া এদিকে অনেকেই নিজের-নিজের ঘর সাজাইয়া থাকে।

নিকোবরে একজন এজেণ্ট আছেন। সেখানে প্রায়ই সিঙ্গাপুর, চীন ইত্যাদি স্থান হইতে নারিকেল লইতে জাহাজ আসিয়া থাকে। কারণ, নারিকেল ওদিকে খুব পাওয়া যায়। সম্প্রতি সেখানে একটি হাসপাতাল ও অন্যান্য আফিস হইয়াছে। নিকোবরিগণও আন্দামানীদের মত সরল প্রকৃতির লোক। উহারা দেখিতে সুশ্রী এবং সুগঠিত। আন্দামান হইতে প্রায় মাসে একবার সেখানে জাহাজ যাইয়া থাকে—এবং সেখানেও কোন কাজের দরকার হইলে এখান হইতে কয়েদী-

কার্ব্বাইন কোভ

গণই যাইয়া কাজ করিয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রথমে উত্তর আন্দামানের উত্তর সীমায় পোর্ট কর্ণওয়ালিস নামক স্থানে কয়েদী-উপনিবেশ স্থাপন করা ঠিক হইয়াছিল। কিন্তু সেস্থান অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে এখানে

লইয়া আসা হয়। এজন্য পোর্ট কর্ণওয়ালিসকে এখনও "পুরানা চাটাম" বলিয়া অনেকেই জানে। জঙ্গলের স্থানে স্থানে এখনও নারিকেল ও নেবু ইত্যাদি বৃক্ষ দেখা যায়। জেল কমিশান গিয়া এখানকার কয়েদী-নিবাস তুলিয়া দিয়াছেন। এখানে এখন নৌ-বিভাগীয় বন্দর নির্ম্মিত হইবে। এস্থানে কয়েদী লইয়া আসা বন্ধ করিয়া কয়েদীগণের ইচ্ছামত নিজের দেশের জেলে পাঠাইয়া দিয়া অথবা সেইখানেই স্থায়ী ভাবে বাস করাইয়া জেল ক্রমে-ক্রমে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। এদিককার সমস্ত ঘরই রেঙ্গুনের মত কাঠে প্রস্তুত। এদিকে মাত্র একখানি জাহাজ—"ম হা রা জা ই" যাতায়াত করিয়া থাকে চীফ কমিশনারের জন্য এখানে আর একখানি ষ্টেসন ষ্টীমার সর্ব্বদাই

কার্ব্বাইন্‌কোভ

এখানে পূর্ব্বে হয় ত তাঁবু খাটাইয়া লোক রাখিবার বন্দোবস্ত ছিল। এখন সে সকল প্রায়ই জঙ্গলীগণ ভোগ করিয়া থাকে। কোকো দ্বীপে এখন মাত্র একটি আলোক-স্তম্ভ আছে। এখানে সময়-মত জাহাজ গিয়া বদলী লোক ও তাহাদের রসদ দিয়া আসে।

শুনা যায় যে, বহু পূর্ব্বে পোর্ট ব্লেয়ারে লোকের বাস ছিল; এবং এখনও না কি দু'একস্থানে বহু পূর্ব্বের জাহাজের শিকল ইত্যাদি অন্যান্য পুরান দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতেছে। এ সমস্তের এখনও খোঁজ চলিতেছে। গত বৎসর

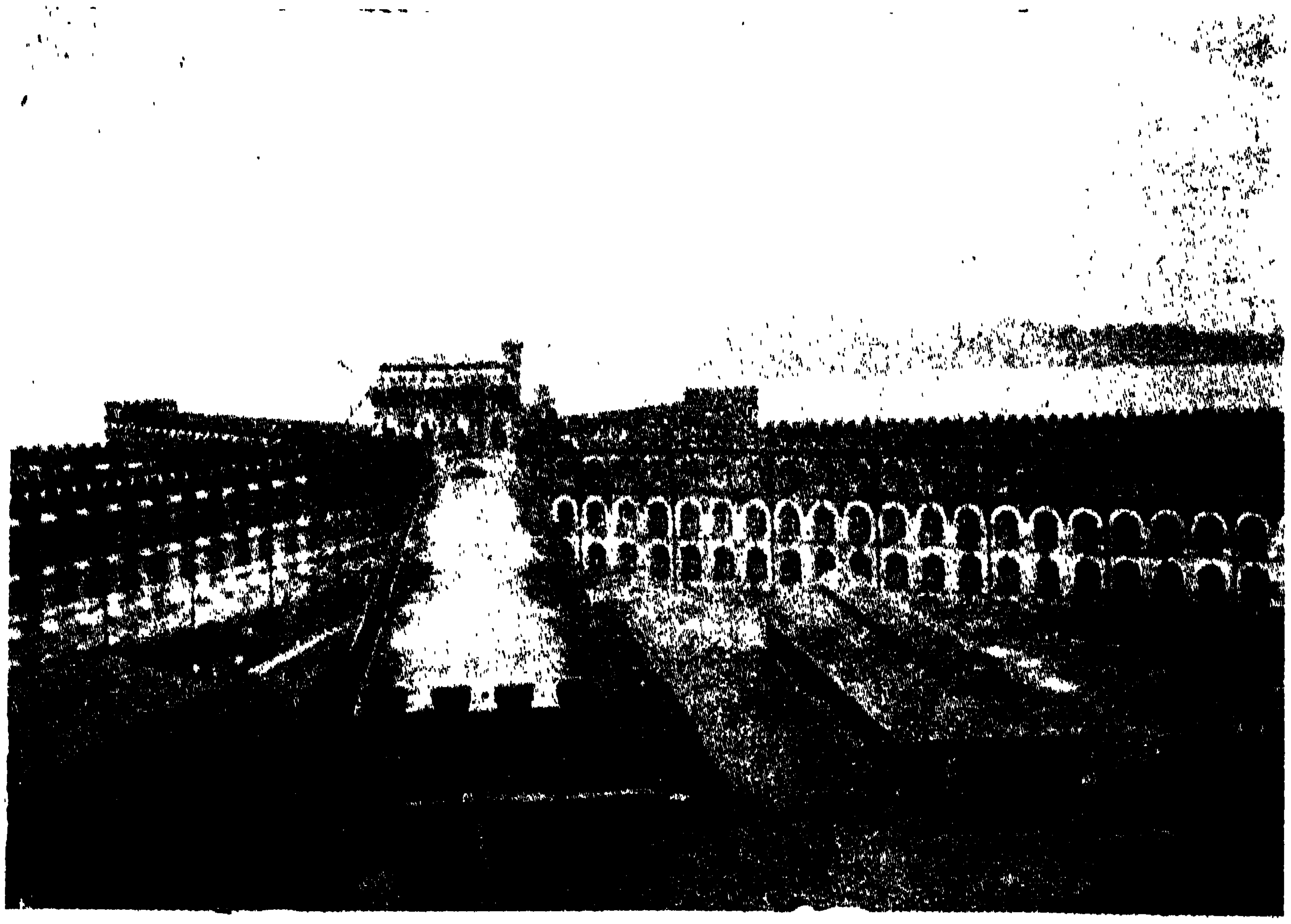

সেলুলার জেল—সাধারণ দৃশ্য

থাকে; এবং উহা চীফের হুকুম-মত নিকোবর, রেঙ্গুন ও কোকো দ্বীপে যাতায়াত করিয়া থাকে। এখানে পূর্ব্বে প্রায় সমস্ত ডাক্তারই বাঙ্গালী ছিলেন। এখন

সমস্তই সাময়িক ডাক্তার আনা হইতেছে। এখন মাত্র ওভারসিয়ার, চীফ কমিশনারের কেরাণী ও খাজাঞ্চি-খানার হিসাবনবীশ এই তিন জন বাঙ্গালী পোর্টব্লেয়ারে আছেন। ইঁহাদের মধ্যে ট্রেজারী আফিসের বাবুটির নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ, তিনি সেখানেই ১৬ বৎসর চাকুরী করিতেছেন। ইঁহার বাড়ী শীলেটে। পোর্ট ব্লেয়ারে সকলেই তাঁহাকে "রায় বাবু" বলিয়া জানে। ইঁহার পুরা নাম শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব রায়। ইনি সপরিবারে এখানে আছেন। এখানে বাঙ্গালী যিনিই যান না কেন, তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইতেই হইবে। ইনি খুব সজ্জন। জাহাজের হয়। সেজন্য যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালীর মুখ দেখিবার জন্য উৎসুক থাকেন এবং বাঙ্গালী পাইলে যে তাঁহারা কতদূর সুখী হন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমিও এ বিষয়ে ভুক্তভোগী; সুতরাং বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। আন্দামানে যাইতে হইলে, সেখানকার চীফ কমিশনারের নিকট হইতে তীরে অবতরণের জন্য অনুমতির দরকার হয়। উহা দরখাস্ত করিলেই পাওয়া যায়। জাহাজের ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রায় ৩৫৲ টাকা এবং ডেকে বিনা খোরাকী ১০৲। আমার মনে হয় সঙ্গে স্ত্রীলোক না থাকিলে ডেকে যাওয়াই সুবিধা। খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত জাহাজেও করা যাইতে পারে।

কার্নিউ দ্বীপে শান্তি-উৎসব

যদি কেহ সেখানে কখনও যান, তবে সেখানকার দ্বীপগুলি দেখিয়া, সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের গা দিয়া বাঁধান রাস্তার বেড়াইয়া, নারিকেল বৃক্ষের সারি দেখিয়া, ডাব, কলা, পেঁপে, তরমুজ ভক্ষণ করিয়া, সমুদ্রের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া এবং সেখানকার উপরিউক্ত তিনজন ভদ্রলোকের বাড়ী "যৎসামান্য" আহার করিয়া, আশা করি, তিনি বেশ মোটা ও হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়াই দেশে ফিরিয়া আসিবেন। আর যদি আমার মত অভাগা হন, তবে জঙ্গলে জলে ভিজিয়া, কাদায় বেড়াইয়া, এঁটুলী, তেঁতুলে-বিছা, সাপ ও "চড়ুয়ে" মশার কামড় খাইয়া, রোদে পুড়িয়া, অনাহারে অথবা হাতীর ধান সিদ্ধ করিয়া খাইয়া, শীঘ্রই সর্ব্বংসহ হইয়া দেশে আসিয়া সুখে বেড়াইতে পারিবেন।

আফিসে কোন বাঙ্গালীর নাম যাত্রীর তালিকায় দেখিলে, ইনি তাঁহাকে জাহাজ হইতে লইয়া আসিয়া বাসায় রাখিয়া থাকেন। তাঁহার "গরীবের পর্ণকুটীরে" "যৎকিঞ্চিৎ" আহারাদি না করিয়া কাহারও সে স্থান ত্যাগ করা সহজ নয়; তিনিও কাহাকে যাইতে দেন না। অন্য দু'জন সেখানে সম্প্রতি আসিয়াছেন। তাঁহাদেরও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ না খাইয়া আসিলে রক্ষা নাই। ইঁহাদের সকলের আদর-যত্ন খুবই। যদি কখনও কেহ সেখানে যান, তাহা হইলে স্বচক্ষে তাঁহাদের আদর-যত্নের প্রমাণ পাইবেন। এখানে বাঙ্গালী নাই বলিলেই

ঝরা পাতা

[শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ]

কি ভাব্‌ছ ?

বিশেষ কিছুই না।

তবে অমন করে আছ কেন ?

বিশ্রী কোন রকম একটা ভাব আমার মুখের ওপর ফুটে আছে না কি ?

বিশ্রী কি সুশ্রী, তা জানি না; কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না, সে আর···

তাকিও না।—ইচ্ছে করে নিজেকে অসুবিধেয় ফেলবার দরকার ?

কি হয়েছে তোমার ?

এমন কিছুই ত না।—ব্যস্! অম্‌নি চোখ ছল্‌ছল্ করে এল......

কি করেছি আমি ?

আর আমিই বা কি করেছি ?—বোস, উঠে যেয়ো না।

ভাল লাগ্‌ছে না যে কিছু !

সে আর এমন আশ্চর্য্যের কি ?—আমারও ত ভাল লাগে না কিছুই।......

কেন এমন হল ?......

জানি না।

কি কর্‌ব আমি ?···

ঠিক ঐ কথাটা আমিও ভাবি,—কি করব আমি···ঐ ছোট্ট কথাটার মধ্যে কি বিরাট একটা শূন্যতা আছে জানি না!......ভেবে ভেবে এমন কিছুই এখনও বার করতে পারিনি, যাকে আশ্রয় বলে ধর্‌তে পারি,—একটা কুটোর মতও না!······কি করব আমি ?······কি দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি আমার জগতকে!—কিছু নেই!... কেউ নেই!...মনে হয় তুমিও নেই আমার কাছে!—না, অমন কোর না তুমি। আমার যা মনে হচ্ছে, আমি তাই বল্‌ছি। এগুলোকে আমার শুধু কল্পনা ভেবো না।—দেখ আমাকে কষ্ট দিতে তোমার খুব ভাল লাগে,—না ?

কি করেছি আমি ?...

কি করেছ!······আমার চোখের সাম্‌নে বসে কাঁদ্‌ছ... তোমার চোখ ছাপিয়ে, গাল বেয়ে পড়ছে জল!......এ আমি দেখ্‌ছি। ঐ জলের ফোঁটাগুলো যে আমারই বুকের রক্ত······ওরা বেরিয়ে যাবার সময় আমার—

আর বোল না—আমি পার্‌ব না শুন্‌তে······আমায় দয়া কর—

মোছ চোখের জল।

তুমি মুছিয়ে দাও।...

না।

না ?......কি চমৎকার কথাটা! ভারি মিষ্টি!······ বুক ভরে গেল আমার,—কিন্তু আমিও পার্‌ব না।—ঝরুক যেমন ঝর্‌ছে।

ঠিক বলেছ! এত সহজ কথাটা আগে মনে হয় নি!... ঝরুক যেমন ঝর্‌ছে......বন্ধ করাটা ঠিক নয়—তা সে চোখের জলই হোক, আর বুকের রক্তই হোক—ঝরুক যেমন ঝর্‌ছে।···

আরো কত দিন এমন করে চল্‌বে ?

ও কি! এরি মধ্যে এত অসহ্য লাগ্‌ছে...মনে রেখো তোমার বয়েস—

মনে আছে বলেই ত বল্‌ছি।—কি করে কাটাব সমস্ত জীবনটা;...তবে আমার সান্ত্বনা এই—যত দুঃখই পাই, সেটা তুমি আমার সঙ্গে ভাগ করে নেবেই।

কি করে বুঝলে—ইচ্ছে করে আমার সুখ-স্বার্থ ছেড়ে তোমার সঙ্গে দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াব, এমন কোন প্রতিজ্ঞা ত করিনি আজ পর্য্যন্ত—

তাই ত আমার ভরসা হচ্ছে।—প্রতিজ্ঞা কর্‌লে হয় ত তোমার ওপর এতটা নির্ভর করতাম না।

চমৎকার যুক্তি কিন্তু!···

তা যা'ই বল। তোমার কাছে আমি এমন জিনিস পেয়েছি, যা মানুষের মুখের কথার চেয়ে অনেক বড়—যার সমান আর কিছুই নেই।

সে আবার কি ?...

তোমার চোখের দৃষ্টি।—ওরা আমার সব বলে দেয়। মুখের কথা অনেক শুনেছি—ভুলেও গেছি।

এ দৃষ্টিও পারবে এক দিন ভুল্‌তে—

না।

না ?...কি করে জান্‌লে ?...

তা জানি না; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তোমায় দেখেছি, সেই মুহূর্ত্তেই মনে হয়েছে আমার ও-কথা;—কিন্তু সব চেয়ে কষ্ট পাই কিসে জান ?

কিসে ?

অভিনয় করতে।—নিজের সমস্ত হীনতার ওপর ঝুটো আভরণ চড়িয়ে, প্রতিদিন মানুষের চোখের সাম্‌নে ভেসে বেড়ান...আমার ক্ষুধিত আত্মার কান্নার ওপর মিথ্যে হাসির ঢেউ খেলিয়ে, মন ভুলিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটান।...আমার এই অভিনয়ের সময় তোমাকেও হারাই......তখন আমার মত অসহায় এ পৃথিবীতে আর কেউ থাকে কি না জানি না।......তুমি বুঝ্‌বে না আমার ব্যথা—

না, কি করে বুঝ্‌ব ?—অন্ততঃ তুমি যদি ঐ ভেবে একটু শান্তি পাও, তা হলে ভাব্‌তে পার—আমার আপত্তি নেই।

রাগ করলে ?···

না।

ঐ যে তোমার চোখ রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল।···

ভয় নেই। আমার চোখ খুব পোষ-মানা। তোমার চোখের মত অবাধ্য নয়।···রাঙ্গা হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, ঝরে না কোন দিন।...মনে হয়, ওর মধ্যে জল বলে কিছু আর নেই;...শুক্‌নো—শুধু জ্বালা করে;··· অমন অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলে যে আমার মুখের দিকে ?

দেখ্‌ছি তোমাকে।...

পুরাণো হয়ে যাইনি তা হলে এখনও ?···

বল্‌ব না—যাও। কিন্তু একটি কথার জবাব দেবে আমার ?

কি ?

তুমি শুন্তে পেয়েছিলে ?···

শাঁখের শব্দ ?—পেয়েছিলাম।

আশ্চর্য্য !—না ?···

না, আশ্চর্য্য আর কি ?

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কি করে হল ?···

ওটা হওয়ার দরকার ছিল তাই;—তোমার মনে আছে সব কথা ?

মনে থাক্‌বে না ?...সে কি ভুল্‌ব কোন দিন ?—আমরা এসে পড়েছিলাম মাঠের ধারের পথটির মাঝখানে...কুয়াসায় সমস্তই ঢাকা পড়েছে।...নিস্তব্ধ চারিধার। অনেক দূর দিয়ে কা'রা গান করতে করতে যাচ্ছিল। তারই শব্দ শুধু ভেসে আস্‌ছিল। গাছটির নীচে, যেখানে অন্ধকার জমাট বেঁধে পড়েছিল, সেইখানে এসে তুমি দাঁড়ালে... আমার চলাও থাম্‌ল···

—তোমার একখানি হাত আমার মুখের ওপর দিয়ে গিয়ে আমার বুকের ওপর এসে পড়েছিল...আর একখানি হাত ছিল আমার মাথাটিকে ধরে, মনে আছে তোমার ?···

না, তবে, তোমার মুখখানিকে তুলে ধরতেই, পাতার ফাঁক্ দিয়ে অল্প একটুখানি চাঁদের আলো তোমার কপালের ওপর এসে পড়েছিল দেখেছি···

তোমারও মাথার চুলে আর ডান দিক্‌কার গালে সে আলো লেগেছিল...আমি আর তাকিয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না।···আবার যখন এই মাটীর পৃথিবীতে ফিরে এলাম, তখন শুনি—শাঁখ বাজ্‌ছে!···

—কে আমাদের বরণ করে নিল ?—অমন চম্‌কে উঠ্‌লে কেন ?· কোথা যাচ্ছ ?—

বাইরে।

বাইরে কোথায় ?···

তা কি করে বল্‌ব ?—যেখানে খুসী।...

যেখানে খুসী ?...তুমি পার চলে যেতে ?···পথে তোমার কোন বাধা নেই ?···

না। ঐ পথে আমার একমাত্র মুক্তি—ওখানে আমার কোন বাধা নেই—আমি চলে যেতে পারি।

আর আমি ?···

বনচাঁড়ালের কড়চা

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ]

যে রকম করিয়াই হোক্,—জীবনের স্রোতটা যেখানে তার গভীর খাতে আপনার সমস্তখানি বেগ আর ভল্যুমের বিপুলতা লইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে আবর্ত্তিত করিতে করিতে ছুটিয়াছে, সেইখানটায় আমাদের জায়গা হইল না। আমরা তীরের কাছে-কাছে অত্যন্ত মন্দা চালে চলি,—মূল স্রোতটার উল্টা দিকে। এই আমাদের ভাগ্য। যুগের-যুগের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা আমরা—আমরা waifs and strays। আমাদের জীবিকা-উপার্জ্জনের ভদ্র বা অভদ্র কোনো প্রণালী-ই নাই। মোদ্দা, আমরা জীবিকা-অর্জ্জন করি-ই না। আমরা যূথভ্রষ্ট। আমরা নৃজাতির 'ধ্বসে'-যাওয়া পাহাড়। আমরা দহ্। আমরা বেদিয়া, আমরা তমিস্র-যুগের গিরি-পুরী-ভারতী উর্দ্ধ-বাহু নেংটা নাগা—পৌরাণিক যুগের অগস্ত্য, দুর্বাসা, অষ্টাবক্র, বিশ্বামিত্র, আস্তিক—ইংরাজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে চা-খোর ইস্কুলমাষ্টার। যেখানেই যাই, আমাদের জ্ঞাতি আছে, এবং ধরা পড়িতে আর ধরিয়া ফেলিতে আমাদের কোনো দিন দেরি হয় নাই।

বাংলাদেশের এক নিভৃত প্রান্তে লবণাম্বুরাশির ধারে এক নারিকেলের বনে কয়েকটি জ্ঞাতির একদা দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল। "গিয়াছে সে এক দিন।" প্রপার্টি নামক ইন্‌স্‌টিট্যুশানের মর্য্যাদা আমাদের হাতে সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এমন কথা কোন্ মুখে হলপ্ করিয়া বলিব? এই, সে-বছর লক্ষ্ণৌ-প্রত্যাগত বন্ধু-প্রবরের সংবর্দ্ধনার জন্য আহরিত, চাঁদিনী যামিনীতে কুড়াইয়া-পাওয়া পাঁঠাটার জন্য তমালতালীকুঞ্জনিবাসীরা আজও পর্য্যন্ত আমাদের ভুলিতে কি পারিয়াছে?

কিন্তু, বিলাপ যেমন শোকদিগ্ধ মানসের আভ্যন্তরীণ একটা দর্‌কার হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে,—ডাঃ গিরীন্দ্র-শেখর বসু দেখাইয়াছেন, যে, এদেশে অস্থানে যাইয়া অভক্ষ্য খাওয়ার মধ্য দিয়া ঐ রকম ভিতরকার একটা উদ্বেগেরই প্রশমন আছে;—ওর সবখানিই কেবল জিহ্বার লালসা থেকে নয়—এরও মূলগত কারণটি প্রিয়জন-বিচ্ছেদের স্বজাতি-ই এবং সমানই প্যাথেটিক্। অপহৃত ছাবের জন্য গ্রাম্যরা যদি আমাদের ক্ষমা না করিয়া থাকে,—গ্রাম্যদের ক্ষমা না পাওয়ায় যে কি সুগভীর ক্ষুধা সভ্যতার সৃষ্টির দিন থেকে আমাদের জীবনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে—

'সে কথা কাহারে সুধাই গো, কে করিবে প্রত্যয়!'

প্রত্যয় যে-ই করুক্, না করুক্,—যাদের মধ্যে আমাদের ভাগ্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাদের সঙ্গে এই রকম করিয়া যে একটু-আধটু স্কার্মিশ্, একটু-আধটু সংঘর্ষ,—আমাদের নিজেদের জন্য, এর একটা মস্ত মানে আছে। যাকে esprit de Corps বলে, সেই জিনিসটার পরিপুষ্টির জন্যে এ কম সাহায্য করে নাই।

চক্রান্ত করা যাদের ব্যবসা, 'নাঠা' শ্রেণীর সেই জীবকে পাড়াগাঁয়ে 'কেন্দ্রী' বলে;—এদের কাজ হচ্ছে দল-পাকানো। মানেটা হচ্ছে, মধ্যখানে এরা কেন্দ্র,—এদেরই চারিধারে ইতরে পাক খাইতে থাকে। দেখা গেছে, এদের একজনকে তুলিয়া লইলে, সেই দলের সমুদায় ক্রিয়া দেখিতে-দেখিতে বন্ধ হইয়া যায়।

এই যেমন নাঠা-দল সম্বন্ধে, তেম্নি সকল দল সম্বন্ধে। নাটকের দলে, সাহিত্য-সভায়, খেলার টীমে—সকলেই একজন না একজন অনভিষিক্ত সর্দ্দারের অদৃশ্য প্রভাব অনুভব করিয়া থাকিবেন;—কোন্ 'প্লে'-টা এবারে 'নামাইতে' হইবে, তার নির্ব্বাচন তার জন্য অপেক্ষা করে,—তারই ব্যবহৃত কথাগুলি হরদম কোটেড্ হইতে থাকে বক্তারই অজ্ঞাতসারে,—এবং ছিদাম বলাই প্রভৃতিকে যেমন যশোদার দরজায় গোষ্ঠের পথে, তিন দণ্ড হোক্ চারি দণ্ড হোক্, খাড়া থাকিতে হইত ধড়াচূড়া-বন্ধন-সমাপন-যাবৎ; তেম্নি তারই জন্য সর্ব্বদা খেলোয়াড়দের মাঠে যাইতে বিলম্ব ঘটিতে থাকে।

পরেশ গুপ্ত ঠিক্ আমাদের সেই কেন্দ্রস্থ ব্যক্তিটি ছিল না। অশ্বত্থামা যেমন মস্তকে একটি মণি লইয়াই ধরায়

আসিয়াছিলেন, তেম্নি এক-একজন মানুষ আছে, যে জ্যেষ্ঠ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, তা' মা'র যে-গর্ভের সন্তানই সে হোক্ না। যেখানেই সে যায়,—দেখিতে-দেখিতে তার নামের প্রথম শব্দটার শেষে 'দা' এই কথাটির যোজনা হইতে দেরি হয় না; সবচেয়ে যে অহঙ্কারী, সে-ও তার পার্শ্বচর হইয়া গিয়া যেন চরিতার্থ হয়।—সে লোক কেবলমাত্র জোরের সঙ্গে কথা বলে, আর প্রবল রূপে ধাক্কা দেয়, তা'ই নয়,—বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অনুচরদের প্রবল রূপে সমর্থন করে—এবং মানব-সমাজের এই জাতীয় রাজন্যগণ আপন চ্যালাদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যকে নিরতিশয় সম্মান দান করেন বলিয়া বল্‌গাকে যতদূর সম্ভব ছাড়িয়া দেন, গেঁয়েদের চোখে যেটা প্রশ্রয় বলিয়া ঠেকে;—এবং এই করিয়াই নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত বটুকবর্গের উপরেও বিনা ছত্রে বিনা দণ্ডে রাজত্ব করিয়া থাকেন।

পরেশ গুপ্ত'র ধাতটা এর ঠিক্ উল্‌টা ছিল। লোকটার মধ্যে যে শক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভাব ছিল তা নয়, বরং তার বিপরীত;—মানব এবং মানবীকে সে আপনার চোখ দিয়াই দেখিয়া লইয়াছিল—বিশেষ করিয়া শেষোক্তাকে;—এবং অধিকাংশের জীবনে যেমন এই দুই জীব আসে এবং যায়, লেনা-দেনা করে, এমন কি ঘর করে,—তবু রেখা মাত্র কাটিয়া যায় না—এ ব্যক্তির পক্ষে ঠিক্ তদ্রূপ ছিল না। এর হৃদয়ের মধ্যে সহ-জ একটি আরসি ছিল—চতুঃপার্শ্ব যার উপরে অনবরত ছায়া ফেলিতে-ফেলিতে চলিত। এবং এরা তাকে বাচালও করিয়া তুলিয়াছিল। অতএব, যে সমস্ত ধাতুতে লোককে শিল্পী বানায়, এর মধ্যে সেই সকলের আত্যন্তিক অসদ্ভাব ছিল না। এক কথায়, সে যদি ক্যারিকেচারিষ্ট্ না হইত, ত মুজিশিয়ান্ হইয়া উঠিত, অথবা, যা আরো সত্য, গায়ক হইলে হাস্য-রসিক হইত না।

গায়ক হইবার পক্ষে তার বাধা ছিল। তার পক্ষে দুর্ভাগ্যবশতঃ আর আমাদের জন্য সৌভাগ্যবশতঃ, তাঁর হৃদয়নিহিত দর্পণের কাচটি হয় কুব্জ নয় ন্যুব্জ ছিল বলিয়া, বস্তুনিচয়ের সামঞ্জস্যের সুষম চেহারাটিকে বিভগ্ন না করিয়া বিম্বিত করা তার প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব ছিল। সেইজন্যেই ঠিকঠিক ওরিজিন্যাল্ হওয়া তার হইল না; সেইজন্যেই সে স্বভাবতঃই অনুজ, কোনো না কোনো বলিষ্ঠ প্রকৃতির অনুচর।—অথচ, অযথার্থ অনুপাতের জন্য আমাদের দলের একটা অদম্য তৃষ্ণা—একে হয় ত কেহ morbid বলিবেন।—মেয়েমানুষের Flatus আছে কি নাই, এই দুর্নির্ণেয় তত্ত্বের মীমাংসা প্রসঙ্গে, কি রকম করিয়া Societyতে হঠাৎ···করিয়া ফেলিয়া একদা এক ইংরাজ মহিলা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, এবং ব্রীড়াশীলা বাঙালী বধূ জীর্ণাবশিষ্ট ভুক্ত দ্রব্যের বিলি-ব্যবস্থা ব্যাপার কখন্ কিরূপে ম্যানেজ করেন—ইত্যাদি সম্পর্কে সত্য ঘটনা অবলম্বনে যখন বন্ধুটি আলোচনা করিতে থাকেন, তখন তাঁর প্রতি সঙ্গীত-সরস্বতীর অকৃপার হেতু বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। হাঁ, এখানে একটা ছোট্ট, অনুল্লেখ্য, এবং বরঞ্চ গোপনীয়, ব্যাপারকে অযথা বড় আকার দিয়া হয় ত অনেকখানি সত্যিকার সৌন্দর্য্য ও মহিমাকেই আচ্ছন্ন ও আড়াল করিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু যেটা বরাবরই হইয়া আসিয়াছে, যেটা হয়-ই, আর ঠিক্ সেইজন্যেই নজরে আর পড়েই না, এই রকম সব minor pointকে প্রাধান্য দেওয়াই উৎকেন্দ্রিক ও বৈজ্ঞানিক এই দুয়েরই সাধারণ লক্ষণ।

সে যা'ই হোক্, এই শেষ কথাটি যাঁর উক্তির unconscious প্রতিধ্বনি, তিনি আমাদের Rob Roy। দূর লক্ষ্ণৌ সহরে Astro-Physicsএর অধ্যাপনায় বৎসরের তিন পোয়া ভাগ কাটানর পর পূজায় এবং গরমে যে দু'টি বার তাঁকে পাওয়া যাইত, তখন নারিকেলের বনে ঘোরতর মাতামাতির কাল। তখনো দেশে নানাবিধ লোকের নামের শেষে "জয় জয়" আওয়াজে আকাশ পাগল হইয়া উঠে নাই। তবু আমাদেরও কতকগুলি war-cry আপনা থেকে গজাইয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেইগুলির পেছনে কোনও ইতিহাস ছিল না, তথাপি সর্ষপতৈলসিক্ত-ভুঁড়ি দৈপ্রাহরিক নিদ্রা কেবলি খামাখা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত। এই দুই ঋতুতে, নদীতীর থেকে রাত্রির তৃতীয় যামে গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনে যেমন একদিকে বাড়ীতে-বাড়ীতে পাচক ও ভৃত্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, তেম্নি অপর দিকে ডজন-ডজন নন্দনের আইন-জীবী-জনককুল মূত্রকৃচ্ছ্র শয্যায় হঠাৎ উঠিয়া বসিত—রাস্তার হল্লায়।

একদা এই রকম এক রাত্রে বাড়ী ফেরার কালে গোপালবাড়ীর প্রাঙ্গণে উদ্দণ্ড (?) নৃত্য হইতেছে, দেখা গেল। তিন ঘণ্টা যাবৎ একটিমাত্র লাইনের আবৃত্তি চলিতেছিল। অধ্যাপক বলিলেন, "আজ আর বাড়ী নয়।

তোমরা হয় ত আমাকে বৈষ্ণব বল্‌বে—কিন্তু এই যে 'চৌদিকে খোল করতাল বাজে মধ্যে নাচে গোরা' এই পদটার উপরে একটু ডিস্‌কাস্‌ না করে যে আমি নড়্‌তে পারি এমন সাধ্য নাই। ওপরের আকাশে দেখ, চারদিকে সমান তালে নাচছে; এমন সব 'পার্ষদ'দের নিয়ে রাসমণ্ডলমধ্যবর্ত্তীরা মিটিমিটি জ্বল্‌ছেন। গায়ত্রী মন্ত্র যদি ভারতবর্ষের বীজমন্ত্র হয়, তা হলে নিঃসন্দেহ ভারতবর্ষ সূর্য্যের উপাসক। ঘাব্‌ড়ে যেয়ো না। ঐ উত্তপ্ত জড়পিণ্ডটা এ পৃথিবীর কেবলমাত্র প্রাণেরই প্রেরক তা'ই নয়, কিন্তু মানুষের ধী, সমস্ত চিন্তাকে কি প্রকারে একটা মূল জায়গা থেকে প্রচোদিত করচে, তা তোমরা যখন শুনবে, স্তম্ভিত হবে। কিন্তু, যেটা আমার এখনকার point, সেটা হচ্ছে এই, যে, একটা সূর্য্য দিনের বেলাকার,—কিন্তু রাত্রি-বেলার এই নিযুত সূর্য্য মানুষের মনকে এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তের মরুদেশগুলিতে কি রকম বিচিত্র করে' অনুভাবিত করেছে, এবং সেই সব বালুকা-প্রান্তরের যাযাবরদের উটে চড়ে এসে সেই সব বিচিত্র অনুভাব কি রকম করে ভারতবর্ষের চিত্তের মধ্যে কি কি কাণ্ড করেছে, ইতিহাসের সেই এক অলিখিত অধ্যায়।—খেয়াল কোরো, দরবেশের ঘূর্ণি নাচ এবং চড়কের পাক, এবং (চম্‌কে যেয়ো না) চড়কের 'মাস্তলটা', এবং ম্যাজারীন্‌এর ক্রুশকাঠ—এইগুলির মধ্যে যদি কোনো সাদৃশ্য থাকে বাস্তবিক, তবে সেটাকে হঠাৎ যতটা আকস্মিক মনে হবে, আসলে তা ততটা আকস্মিক না-ও হতে পারে।"

পরেশ আর থাকিতে পারিল না, তার বাড়ী ফেরা'র গরজ ছিল। যদিও সে সকলের সঙ্গে এক তালেই "যাব না আর ঘরে রে ভাই, যাব না আর ঘরে" নামক আমাদের 'ন্যাশন্যাল্‌' আন্‌থেমে সুর মিলাইত, তথাপি তদানীন্তন কালে তার পথের নেশা ঠিক্‌ সাড়ে আট্টা থেকে ন'টার মধ্যে ছুটিয়া যাইত। সে বলিল, "ফোর্থ্‌ ডাইমেন্‌সান্‌, আর 'Squaring the circle' প্রভৃতি আজগুবি'র অত্যাচার আপনার কাছ থেকে বিনা বাক্যব্যয়ে ঢের সওয়া হয়েছে বলে' আপনি ভুলে যাবেন না, যে, শিষ্যেরও ধৈর্য্যের সীমা থাকাটা নেহাৎ অসম্ভব না হতে পারে। এর পর কোন্‌ দিন শুন্‌তে পাব, বিষ্ণুর চতুর্ভুজ সপ্তাশ্ব-রথের চাকাটারই এক বিচিত্র সংস্করণ। 'আপনি আমার কলা বোঝেন', অকাট্য এই শেষ যুক্তিটির দ্বারায় যে সেদিন কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ-সাধক কালেক্‌টরীর বৈদান্তিক আম্‌লাকে গম্ভীররূপে বিদায় করেছিলেন, সে বোধ করি এই জন্যে, যে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, কদলী, আর সূক্ষ্ম শরীর এই তিন বস্তুর মধ্যে সংপ্রতি কোনো একটা নিগূঢ় যোগসূত্র আবিষ্কার করেছেন, যা হয় ত ফলিত জ্যোতিষের এক অলিখিত অধ্যায়? সে যা'ই হোক্‌, আর যা'ই শুনি, এ কথা শুন্‌তে আমি কোনো দিন রাজি হব না, যে, বটুগোপালের Thumb sucking বিশ্বামিত্র ঋষি'র আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বাভাস।"

"আচ্ছা, Grimm's Tales এর Tom Thumb-এর গল্পটা পড়ে' রাখিস্‌। তার পর কথা হবে।" ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

মিথিলা—জনকপুর

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ]

গঙ্গা বহথি জনিক দক্ষিণ দিশি পূর্ব্ব কৌশিকী ধারা।
পশ্চিম বহথি গণ্ডকী, উত্তর হিমবৎ বলবিস্তারা॥
কমলা ত্রিযুগা অমৃতা ধেমুড়া বাগবতী কৃত সারা।
মধ্য বহথি লক্ষ্মণা প্রভৃতি সে মিথিলা বিত্তাগারা॥

চন্দাঝা

"গঙ্গা যাহার দক্ষিণে বহিতেছে, পূর্ব্বে কৌশিকী-ধারা; গণ্ডকী যাহার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত, উত্তরে হিমাচল বল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; যাহার মধ্যে লক্ষ্মণা প্রভৃতি নদী বহিতেছে, যাহার ভূমি কমলা ত্রিযুগা অমৃতা ধেমুড়া বাগ্‌বতী প্রভৃতির সলিলে সরস, সেই মিথিলা বিত্তাগার।" (শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী")।

বর্ত্তমান কালের চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দারভাঙ্গা জেলা লইয়া প্রাচীন মিথিলা গঠিত হইয়াছিল। মিথিলার অতীত গৌরবময়। এখানে জনক রাজত্ব করিয়াছিলেন,—সীতা-

দেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জনকের রাজ-সভা বিদ্যা-চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল। এখানে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধযুগেও মিথিলার খ্যাতি নষ্ট হয় নাই। মিথিলার অন্তর্গত বৈশালী নগরে প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ গণতন্ত্র-প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতেন। বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে মিথিলার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন,—বৈশালী নগরে তিনি তিনবার পদার্পণ করিয়াছিলেন। জৈনধর্ম্ম-প্রচারক মহাবীর বৈশালীর সম্ভ্রান্ত লিচ্ছবিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিও বুদ্ধদেবের ন্যায় সাংসারিক সুখ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। চম্পারণ জেলার অন্তর্গত লউড়িয়া নন্দনগড়, লউড়িয়া অররাজ প্রভৃতি স্থানের অশোক স্তম্ভ ও অশোক অনুশাসন এখনও মিথিলায় বৌদ্ধকীর্ত্তি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ান চোয়াঙ্গ মিথিলা ভ্রমণ করিয়া ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে বাচস্পতি, উদয়ন, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিতগণ মিথিলার যশোভাতি উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন। রাজা শিবসিংহের রাজত্বকালে তাঁহার সভাকবি বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীতে মিথিলা মুখরিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতির পদাবলীতে রাজা শিবসিংহ এবং তাঁহার বিদুষী মহিষী লখিমা দেবী চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পদাবলীর মধ্যে আমরা রাজ-দম্পতির সুখময় চিত্র পাই;—তাঁহাদের জীবনের শেষ ভাগ যে সুমহৎ দুঃখ ও বিপদের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল, পদাবলী পড়িবার সময় তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়। কথিত আছে যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা শিবসিংহ দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ১৪০২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন হইতে সমর্থ হন। মাত্র তিন বৎসর স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া শিবসিংহ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হন, এবং বন্দী ভাবে দিল্লীতে আনীত হন। তাঁহার মহিষী লখিমা দেবী বিশ্বস্ত অনুচর বিদ্যাপতি কবির সহিত নেপালের অন্তর্গত জনকপুরের নিকটবর্ত্তী বণৌলি গ্রামে আশ্রয়লাভ করেন। সেখানে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করিয়া, অবশেষে স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া, লখিমা জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করেন (Bengal District Gazetteers, Darbhanga by L. S. S. O'Malley)। অপর প্রবাদ এই যে, রাজা শিবসিংহ যবন কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিরুদ্দেশ বা নিহত হন (শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত বিদ্যাপতি ঠাকুরের জীবন-বৃত্তান্ত)।

মিথিলার অন্তর্গত নানা স্থান জনশ্রুতি প্রাচীন কীর্ত্তির সহিত বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। প্রবাদ অনুসারে দারভাঙ্গা জেলার নিকটবর্ত্তী নেপালের অন্তর্গত জনকপুর নামক স্থানে রাজর্ষি জনকের রাজধানী ছিল। এখান হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ধনুক্ষ নামক স্থানে হরধনু ভঙ্গ হইয়াছিল; সেই ভগ্ন ধনুঃখণ্ডগুলি প্রস্তরীভূত হইয়া এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। যমুনা ও কমলা নদীর সঙ্গমের নিকট জৈমিনি ঋষি বাস করিতেন। কমলা ও করাই নদীর সঙ্গমের নিকট ককরোল গ্রামে কপিলমুনি বাস করিতেন। কথতৌল ষ্টেশনের নিকট অহিয়ারি গ্রামে ন্যায়শাস্ত্র-প্রণেতা গৌতম মুনির আশ্রম ছিল। এখানে তাঁহার অভিশাপে পত্নী অহল্যা দেবী পাষাণে পরিণত হন; পরে বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া পাষাণে পদস্পর্শ করাতে অহল্যা দেবী উজ্জীবিত হন।* নিকটবর্ত্তী বিশৌল গ্রামে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল; এবং জগবনে একটী বিশাল বট-বৃক্ষের নিকটে যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রম নির্দ্দেশ করা হয়। এই সকল স্থান দারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত। মজঃফরপুরের অন্তর্গত সীতা-মাঢ়ী নামক স্থানে সীতাদেবীর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

আমি একবার কার্য্যোপলক্ষে দারভাঙ্গা গিয়াছিলাম। সেখানে শুনিলাম যে, দুইদিন পরে শ্রীরামনবমী উপলক্ষে জনকপুরে খুব বড় মেলা হইবে। ইহা শুনিয়া আমি মেলার সময় জনকপুর দেখিবার সংকল্প করিলাম। জনকপুরে যাইবার দুইটি পথ আছে। দারভাঙ্গা হইতে জয়নগর পর্য্যন্ত ট্রেণে গিয়া, সেখান হইতে গরুর গাড়ীতে ১৫।১৬ মাইল যাইলে জনকপুর পাওয়া যায়। অপর পথে দারভাঙ্গা হইতে ভিন্ন রেলওয়ে লাইনে জনকপুর রোড নামক ষ্টেশনে গিয়া, সেখান হইতে গরুর গাড়ী করিয়া যাইতে হয়। আমি শুনিলাম, প্রথমোক্ত পথটি বেশী সুবিধাজনক—

* অপর প্রবাদ অনুসারে বক্সারের নিকটবর্ত্তী চরিত্রবন নামক গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল; এবং এখান হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে অহোরিয়া গ্রামে অহল্যা দেবী পাষাণীভূতা হইয়াছিলেন। ঐ গ্রামে একটী ক্ষুদ্র মন্দির-মধ্যে একটী প্রাচীন শিলামূর্ত্তি অহল্যামাঈ বলিয়া পূজিতা হইয়া থাকেন।

কিম্বা কম অসুবিধাজনক। এ জন্য আমি জয়নগর দিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। বিকালবেলা দারভাঙ্গা জেলার সদর লাহেরিয়াসরাই ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলাম। মেলা উপলক্ষে ট্রেণে অসম্ভব জনতা। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি যাত্রীতে বোঝাই হইয়াছে; তাহার উপর গাড়ীর বাহিরে পাদানীর উপর দাঁড়াইয়া অসংখ্য যাত্রী। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিও ভর্ত্তি। সেই ভীড়ের মধ্যে কে বা কাহার টিকিট দেখে। অল্পক্ষণ পরে গাড়ী দারভাঙ্গা ষ্টেশনে পৌঁছিল। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া জয়নগরের জন্য অন্য গাড়ীতে উঠিতে হইবে। ষ্টেশনে লোকারণ্য দেখিয়া মনে ভীতির সঞ্চার হইল—কি করিয়া গাড়ীতে স্থান পাওয়া যাইবে। ভীড়ের মধ্যে স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশু—সবই রহিয়াছে। সকলেই জয়নগর যাইবে। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। সেবা-সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ ভীড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিঞ্চিৎ জলযোগ সারিয়া আমি ট্রেণের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ আসিলে একটী কামরায় উঠিয়া পড়িলাম এবং বেশী ভীড় হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্কের উপর উঠিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলাম। গাড়ী ছাড়িবার পর মধ্যে-মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িতেছিলাম,—মধ্যে-মধ্যে যাত্রিগণের কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। জয়নগর ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ষ্টেশনের জনতার মধ্যে কোনরূপে অগ্রসর হইয়া বিশ্রামঘরে অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলাম। প্রত্যুষে একটি গরুর গাড়ীতে উঠিয়া জনকপুর অভিমুখে রওনা হইলাম।

সমস্ত পথ যতদূর দেখা যায়, শ্রেণী বাঁধিয়া যাত্রীর দল চলিয়াছে। অধিকাংশ লোক হাঁটিয়া চলিয়াছে। মধ্যে-মধ্যে দুই একটা গরুর গাড়ীও দেখা যাইতেছে। পথের দুই পাশে চাষের জমি। মাঝে-মাঝে আম-বাগান। এই সকল বাগানকে এদেশে "গাছি" বলে। বাগানের সংখ্যা এখানে খুব বেশী। আমগাছ লাগান লোকে পুণ্য-কার্য্য বলিয়া মনে করে। বলা বাহুল্য আমও খুব চমৎকার হয়।

জয়নগর হইতে জনকপুর সমস্ত পথ হইতে হিমালয় পর্ব্বত দেখা যায়। পর্ব্বত এখান হইতে অনেক দূর,—আকাশের গায়ে চিত্রিতের ন্যায় দেখা যায়। জয়নগর হইতে ৫।৬ মাইল আসিয়া আমরা দেওধা নামক গ্রাম অতিক্রম করিলাম। গ্রামটি বড়—পুলিশের থানা, ডাকঘর প্রভৃতি আছে। এই গ্রাম ছাড়াইয়া একটু পরেই আমরা নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। ইংরেজ রাজ্য ও নেপাল রাজ্যের সীমানা নির্দ্দেশ করিবার জন্য কিছু দূরে দূরে ৬।৭ হাত উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি-পত্রের প্রয়োজন হয়। এখন মেলার সময় বলিয়া তাহার দরকার ছিল না। বেলা ১০৷৷০টার সময় আমরা ডুহবি নামক গ্রামে পৌঁছিলাম। এই সকল গ্রামের অধিবাসিগণ বেহারী বা মৈথিলী; গুরখা ও পাহাড়িয়ারা পাহাড়ের উপরে বাস করে। ডুহবি গ্রামে আমি স্নানাহার সমাপন করিলাম। ভাত আর রাঁধা হইল না—দোকান হইতে লুচি, দহি, মেঠাই, কলা প্রভৃতি কিনিয়া খাইলাম। আবার গাড়ী চলিল। ক্রমে রৌদ্র-তেজ প্রখর হইল। আমি গাড়ীতে শুইয়া রহিলাম। সমস্ত পথ যাত্রীর ভীড়। স্ত্রীলোকগণ ক্রোড়ে শিশু এবং মস্তকে মোট লইয়া রৌদ্র-ক্লান্ত দেহে সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেছে। রাস্তা বড় খারাপ—গাড়ী কখনও কাত হইতেছে, কখনও উঁচু হইতেছে, কখনও খালের মধ্যে নামিতেছে, কখনও এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া চলিয়াছে! বিকালে জনকপুর হইতে ২।৩ মাইল দূরে আমরা একটা প্রাচীন শিবমন্দির দেখিলাম—নাম কপিলেশ্বর। মেলার জন্য এখানেও পথের ধারে দোকান বসিয়াছিল। এখান হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা জনকপুর পৌঁছিলাম।

গ্রামের চারি ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত মাঠের উপর লোকজন বিশ্রাম করিতেছিল। এখানে তাহারা পাক করিয়া ভোজন করিবে, এবং রাত্রে এখানেই ঘুমাইবে। লোকসংখ্যা বোধ হয় পঞ্চাশ সহস্রের অধিক হইবে। আমরা প্রথমে বাসার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কোন বাসাই পাওয়া গেল না। অগত্যা গাছের তলাতেই রান্না করিতে বসিলাম। সেইখানেই আহার করিয়া, একটী দোকানদারের বাসার সংলগ্ন বারান্দাতেই রাত্রি কাটাইলাম। রাত্রে মেঘ করিয়া ঝড় উঠিল। বৃষ্টি হইলে কোথায় আশ্রয় পাইবে—এই ভাবিয়া সেই বিশাল জনতা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বৃষ্টি হইল না। যখন প্রবল ঝড়ে মেঘ উড়াইয়া লইয়া গেল, তখন সেই বিশাল জনতা হইতে সহস্র-সহস্র মিলিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু

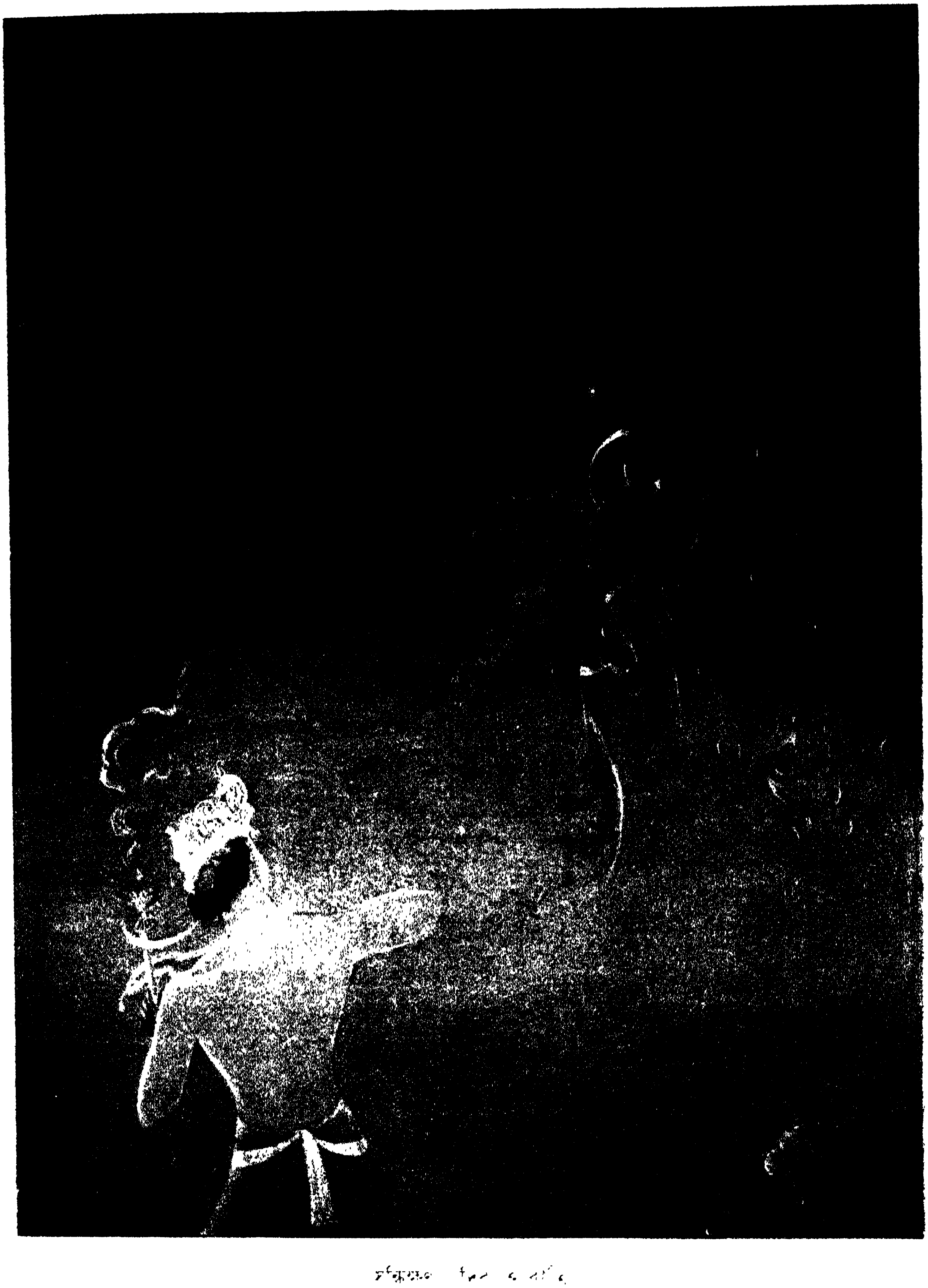

[illegible]

[illegible]

Bharatvarsha Ptg. Works.

Block by BHARATVARSHA HALFTONE WORKS

প্রবল ধ্বনি উঠিতে লাগিল,—"জানকী মাইজি মহারাণী কি জয়।"

সকালে উঠিয়া মন্দির দেখিতে গেলাম। পথের দুই পাশে অসংখ্য বিপণী—খাবার, কাপড়, বাসন, খেলনা, বহি, কত কি জিনিষ সাজান রহিয়াছে। বিপণী-শ্রেণীর মধ্য দিয়া আমরা গঙ্গাসাগর নামক বৃহৎ পুষ্করিণী অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। প্রবাদ এই যে, এই পুষ্করিণীর নিকটেই জনকের রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। যাত্রীগণ এই পুকুরে স্নান করিতেছে; এবং পুকুরের তীরে রামচন্দ্রজির মন্দির দর্শন করিয়া, নিকটবর্ত্তী জানকীজির মন্দিরে যাইতেছে। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত অসম্ভব ভীড়। ঠেলাঠেলিতে লোক আগাইতে পারিতেছে না। স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধেরা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেছে। পূজারী, সন্ন্যাসী এবং সেবাসমিতির স্বেচ্ছাসেবকের দল যাত্রীদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ভীড় কমাইবার চেষ্টা করিতেছে। জনতা হইতে "জানকী মাইজি কি জয়" "রামচন্দ্রজি কি জয়" এবং মধ্যে-মধ্যে "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" ধ্বনি শোনা যাইতেছে। এই ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করা আমি নিরাপদ মনে করিলাম না। সেখান হইতে জানকীজির মন্দিরে আসিয়া দেখিলাম, এখানেও ভীড় প্রায় সেইরূপ। অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিলাম, দুপুরে ভীড় কমিলে দর্শন করিব।

রন্ধনের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় পশ্চিম দিকে পাহাড়ের নীচে মেঘ দেখা গেল। মেঘ শীঘ্র-গতিতে আকাশ ছাইয়া ফেলিল; এবং অল্পক্ষণ পরে ঝড় ও জল আরম্ভ হইল। লোকজন আশ্রয়ের জন্য ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল। আমি বিছানা লইয়া নিকটবর্ত্তী একটী ছোট মন্দিরে আশ্রয় লইলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হইতেই অত্যন্ত শীত করিতে লাগিল। বৃষ্টি থামিলে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পথ অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। দোকানগুলি জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। দোকানীরা জিনিসপত্র সরাইয়া জল ও কাদা পরিষ্কার করিতেছে। এই সময় মন্দিরে ভীড় কিছু কম হইতে পারে, এই আশায় আমি নিকটবর্ত্তী জানকীজির মন্দিরে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে এখন বেশ দর্শন হইল।

এই মন্দিরটি ৭।৮ বৎসর হইল টিকমগড়ের রাজা তাঁহার পুত্রসন্তান লাভের মানসিকরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শুনিলাম মন্দির-নির্ম্মাণে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ—তাহার চারিপাশ উচ্চ দেয়ালে ঘেরা। এই দেয়ালের উপর অসংখ্য ক্ষুদ্র মন্দির-আকারের বেষ্টনী নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাহাদের ধাতুমণ্ডিত চূড়াগুলি সূর্য্যালোকে সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত মূল মন্দিরের উচ্চ চূড়া এবং ইতস্ততঃ অন্যান্য মন্দিরের চূড়াও শোভা পাইতেছিল। এখানকার মন্দির খুব বেশী উচ্চ নহে। দেখিতে কতকটা প্রাসাদ বা palaceএর মত। প্রাঙ্গণের চারিদিকে বারান্দা—মধ্যে-মধ্যে কক্ষ। এগুলি দুই-তালা। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মন্দির। মন্দিরটি দুই-ভাগে বিভক্ত। মূল-মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত—সম্মুখে নাটমন্দির। উভয় মন্দিরের তলদেশ মর্ম্মরাবৃত। মূল-মন্দিরের প্রাচীর এবং স্তম্ভগুলিও মর্ম্মর-নির্ম্মিত—মর্ম্মরের উপর সুন্দর কারুকার্য্য। একটা সোপানযুক্ত বেদীর উপর রামচন্দ্রজি ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি;—একপার্শ্বে প্রাচীন মূর্ত্তিদ্বয়, অপর পার্শ্বে টিকমগড়ের রাজার প্রতিষ্ঠিত নূতন মূর্ত্তি। প্রাচীন মূর্ত্তিদ্বয় কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়। নূতন মূর্ত্তিদ্বয় শ্বেতমর্ম্মর-গঠিত এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের। এই মূর্ত্তিগুলির মুখশ্রী অতি কমনীয়,—দৃষ্টি করুণা ও প্রীতিতে পরিপূর্ণ। নাটমন্দিরের চারিদিক বেষ্টন করিয়া দুইসারি স্তম্ভ,—প্রত্যেক সারিতে পাশাপাশি দুইটি করিয়া স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির উপর বারান্দা—উপরের বারান্দাও স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত। নাটমন্দিরের স্তম্ভগুলি রক্ত-প্রস্তরনির্ম্মিত; স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী খিলানগুলি সাদা পাথরের,—তাহার উপর উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য। যাত্রিগণ এই নাটমন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইতেছে এবং রামচন্দ্র ও সীতা-দেবীকে দর্শন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। দেবমূর্ত্তির সম্মুখে স্তূপীকৃত পুষ্প, পত্র এবং তণ্ডুলরাশি জমা হইয়াছে। যাত্রিগণের ভক্তি ও ব্যাকুলতা পরিস্ফুট।

এখান হইতে আমি রামচন্দ্রজীর মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। পিচ্ছিল পথের উপর যথাসম্ভব সাবধানে চলিয়াও আমি মহামতি নিউটন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি নাই। উচ্চ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ দর্শকগণ ইহাকে ভূমিতে পতন মনে করিয়া হাস্য করিয়াছিল,—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, রামচন্দ্রজির মন্দিরে উপস্থিত হওয়া গেল।

এ মন্দিরটি পুরাতন। এখন ভীড় কিছু কম হইয়াছিল। মন্দির-মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু মূল মন্দিরে প্রবেশ করা দেখিলাম অসম্ভব। বাহির হইতে দেখিলাম মূল মন্দিরটি ক্ষুদ্র। ইহা পার্ব্বত্য প্রথায় নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটি একটী দ্বিতল কক্ষ;—উপরের কক্ষটি নীচের কক্ষ অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট। নীচের কক্ষ ও উপরের কক্ষ উভয়ের উপরে চারিদিকে কাঠের ঢালু ছাদ। এই মন্দিরের সম্মুখে হনুমানজির একটী ছোট মন্দির এবং কয়েকটী শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে এক বিশাল বটবৃক্ষ দেখিলাম। লোকে ইহাকে অক্ষয় বট বলে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে দ্বিতল বারান্দা ও কক্ষশ্রেণী। এক পার্শ্বে একটি দ্বার দিয়া আর একটী এই প্রকার কক্ষ-বেষ্টিত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এখানে কয়েকটি ধাতু ও প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিলাম। এই প্রাঙ্গণ হইতে আর একটী পথ দিয়া বাহির হইয়া যাত্রিগণ চলিয়া যাইতেছে।

এই দুইটি বড় মন্দির ব্যতীত জানকীজির মন্দিরের পাশে একটী ছোট মন্দির আছে; তাহাকে লছমণজির মন্দির বলে। নিকটবর্ত্তী নানাস্থান, জনপ্রবাদ শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর পরিণয়-কালীন নানা ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। কোন স্থান দেখাইয়া বলে, এখানে শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল। কোন স্থানে সানুচর দশরথ আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। কোন স্থানে জনকের "ফুলবাড়ী" ছিল—যেখানে বিবাহের পূর্ব্বে মহাদেবের পূজা করিতে গিয়া সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন;—তুলসীদাসের রামায়ণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। আবার কোন স্থান দেখাইয়া বলে, এখানে সীতাদেবীর বিবাহের সময় তৈলের সরোবর হইয়াছিল।

সারাদিন থাকিয়া-থাকিয়া নহবৎ বাজিতেছিল। বহু দূরের গ্রামগ্রামান্তর হইতে সমাগত যাত্রীর দল কোলাহল করিতে-করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমার মনে হইতে লাগিল, বহুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে আর এক দিন এই রূপ জনতা হইয়াছিল, যেদিন সীতাদেবীর বিবাহ উপলক্ষে নগরী উৎসব-বেশে সজ্জিতা হইয়াছিল,—গৃহগুলি পুষ্প ও পতাকা দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছিল,—রাজপথের উপর স্থানে-স্থানে তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল,—কোথাও বাদ্যকরের দল সুমধুর সঙ্গীত আলাপ করিতেছিল। সেদিনও এইরূপ দূর-দূরান্তর হইতে প্রজাগণ স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া রাজকন্যা চতুষ্টয়ের পরিণয় দর্শন করিবার জন্য জনকরাজপুরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। মঙ্গল-আয়োজন-নিরতা রমণীগণের মধ্যে না জানি সে দিন রাজ-অন্তঃপুরে কোথায় সীতাদেবী বসিয়া ছিলেন। বিবাহ-গৃহের উজ্জ্বল ও সুন্দর দৃশ্যগুলি এবং সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি নিশ্চয় তাঁহার কোমল হৃদয় অভিভূত করিয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে—দণ্ডকারণ্যের নিবিড় বনে, লঙ্কার অশোক-কাননে, বাল্মীকির তপোবনে এই উৎসব-রজনীর কথা সীতাদেবীর স্মৃতিপটে কত বার ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে। সে দিন এই জনক-পুরে যে শুভ-মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, সংসারের সকল দুঃখ ও বিরহ অগ্রাহ্য করিয়া, কালের কুটিল গতি উপেক্ষা করিয়া, চিরকালের জন্য সেই মিলন অমর হইয়া গিয়াছে। আজিও ভারতবর্ষে সহস্র-সহস্র মন্দিরে সেই মিলনের যুগলমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে; লক্ষ লক্ষ ভক্ত-হৃদয়ে সেই শুভ-মিলনের মহামন্ত্র "সীতা-রাম" শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। অগ্রহায়ণের পঞ্চমী তিথিতে সেই পুণ্যদিন স্মরণ করিয়া আজিও জনকপুরে প্রতি বৎসর মেলা বসিয়া থাকে। দশরথ অনুচর-পরিবৃত হইয়া মিথিলায় আগমন করিয়াছিলেন,—তাহার স্মরণার্থ এখনও শোভাযাত্রা হয়। পশ্চিমাঞ্চলের ভাষায় ইহাকে "বরিয়াত" বলে।

কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ঐ উত্তর দিকে হিমালয় স্থির নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়াইয়া কত বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন দর্শন করিয়াছে। এতদিনেও সেই সুদূর অতীতের পুণ্যময় ঘটনাগুলি লোকে ভুলিয়া যায় নাই। যেদিন শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যেদিন সীতাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, সেই সকল দিনে সূর্য্যদেব নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে যেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, প্রতিবৎসর ঘুরিতে-ঘুরিতে সূর্য্যদেব আবার যখন সেই স্থানে ফিরিয়া আসেন, তখন সহস্র-সহস্র যাত্রী দুঃখ-কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া, দূর-দূরান্তর হইতে আসিয়া, এই পুণ্য স্থানে সমবেত হয়; এবং সীতা-রামের পুণ্য-স্মৃতিতে তাহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ করিয়া ভক্তি-ব্যাকুল কণ্ঠে "জানকী মাইজি কি জয়" ও "রামচন্দ্রজি কি জয়"—শব্দে আকাশ মুখরিত করে।

বিজিতা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১০)

আহারের সময় ভৃত্য বাবুকে ডাকিবার জন্য বাহিরে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল বাবু বাড়ীর মধ্যে গিয়াছেন।

সুষমা তখন স্বহস্তে থালাতে ভাত বাড়িতেছিলেন। পাচিকা কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। পিসীমা দরজার কাছে একখানি পিঁড়িতে বসিয়া অমিয়ের সঙ্গে তর্ক করিতেছিলেন। অমিয় তাঁহাকে যত বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল পৃথিবীটা কমলা লেবুর ন্যায় গোল, উত্তর পশ্চিমে একটু চাপা,—পিসীমা ততই সঘনে মাথা নাড়িতেছিলেন, এবং জেদের সহিত বলিতেছিলেন "এ কখনই হতে পারে না। পৃথিবী আবার না কি গোল, তাও আবার কমলা লেবুর মত; থালা, বাটী, রেকাবখানার মতও নয়। এ কি কখনও হতে পারে?" তিনি যত জেদ করিতেছিলেন, অমিয়ের জেদও তত বাড়িয়া উঠিতেছিল। কাল তাহাদের স্কুলে পৃথিবীর বিবরণ সে জানিয়াছে, ম্যাপে অঙ্কিত চিত্র দেখিয়াছে, আজ সকালেও প্রাইভেট টিউটর সুরেন বাবু তাহাকে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—এখন এই বুড়ি ঠাকুরমা কি না সব মাটী করিতে চায়?

সুষমা বৃদ্ধা ও বালকের বিবাদ দেখিয়া হাসিতেছিলেন। যখন দেখিলেন অমিয়ের চোখ-দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া অস্থির ভাবে এদিক-ওদিক চাহিতেছে, তখন ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া তিরস্কারের সুরে বলিলেন "ছি অমিয়, ও আবার কি? উনি যা বলছেন, তাই মেনে নাও না কেন?"

তাহা হইলে বইখানাই যে মিথ্যা হয়! ছাপার অক্ষরে লেখা অত-বড় বইখানা, তাহা মিথ্যা হইবে? অমিয় হঠাৎ তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া সজল নেত্রে বলিয়া উঠিল "বাঃ, তা হবে কেন?"

সুষমা বলিলেন, "হবে না যদি জেনে থাক, সে ত খুব ভাল কথাই। আমি বলছি, উনি যদি না মানতে চান পৃথিবীটা গোল, তখন কেন ওঁর কাছে বলা? যাও, ওঁকে ডেকে আন বার হতে,—বলগে ভাত দিইছি।"

ভৃত্য শ্যাম বারাণ্ডা হইতে বলিয়া উঠিল "তিনি বাইরে নেই, বাড়ীর মধ্যেই এসেছেন না কি।"

পিসীমা পৃথিবীর কথা ভুলিয়া গিয়া বলিলেন, "কই, দেখে আয় তো শ্যাম, তবে শোবার ঘরে হয় তো গ্যাছে।"

শ্যাম চলিয়া গেল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "তিনি ঘুমুচ্ছেন।"

উৎকণ্ঠিতা হইয়া পিসীমা বলিলেন, "ঘুমুচ্ছে? এখনও স্নান করে নি,—ভাত বাড়া মুখের, ঘুমুচ্ছে,—সে আবার কি কথা? অসুখ-বিসুখ করে নি তো? তা আর হতেই বা কতক্ষণ? বাড়ীতে যে দিনরাত খিটিমিটি লেগেছে,—বেশ জানছি, একটা কাউকে না খেয়ে রাক্ষুসীরা থামবে না। গেরস্তর ঘরে,—সাঁজ নেই, সকাল নেই,—ঝগড়া লেগেই আছে। আর বড় বউ-মা, তুমিও বাছা হাঁ করে কি দেখছ বল তো? যাও না,—দেখে এসো কি হল? আমি আবার এই তেপান্তর সিঁড়ি ডিঙিয়ে যেতে পারি নে। তোমরা বাছা জোয়ান মানুষ হয়েও নিজের সুখটী বেশ বোঝ; বুড়ো-মানষের সুখ-দুঃখের পানে যদি একবার তাকাও।"

অপ্রস্তুত হইয়া সুষমা তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া রন্ধনগৃহ হইতে বাহির হইলেন।

নিজের গৃহে যোগেন্দ্র চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। সুষমা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে-করিতে বলিলেন "এমন সময় শুয়ে আছ যে? অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি তো?"

যোগেন্দ্র দ্বারের দিকে ফিরিলেন। একটু হাসির রেখা সেই মলিন মুখে ফুটিয়া উঠিয়া তখনই বিলীন হইয়া গেল—"না, অসুখ করে নি সুষমা!"

সুষমা বলিলেন "তবে শুয়ে পড়েছ যে এমন অসময়ে?"

যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিছু ভাল লাগল না,—তাই এসে শুয়ে পড়লুম।"

সে কথা সুষমার বিশ্বাস হইল না। তিনি স্বামীর ললাটে, বক্ষে হাত দিয়া দেখিয়া বলিলেন "সত্যিই তো, অসুখ করে নি,—হঠাৎ তোমার মন এ রকম খারাপ হয়ে গেল কেন?"

"হঠাৎ?" যোগেন্দ্র উঠিয়া বসিলেন; স্ত্রীর দুই হাত নিজের মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া আবেগভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "তুমি সত্যি কথা বলবে সুষমা, মিথ্যা বলবে না?"

সুষমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন "তোমার কাছে কবে মিথ্যা কথা বলেছি? আজ যে কয় বছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে আমি কখনই তো তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলি নি।"

যোগেন্দ্র তেমনি উচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "তবে বল, আমায় তুমি কতখানি ভালবাস, আমার অমিয়কে তুমি কতখানি ভালবাস?"

সুষমা আরও বিস্মিতা হইয়া গেলেন। স্বামী পূর্ব্বে আর কখনই তাঁহার ভালবাসার পরিমাণ জানিতে চাহেন নাই। সুষমা খানিক নির্ব্বাকভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, "আজ হঠাৎ তোমার এ ভাব হল কেন? আমি তোমায় বা অমিয়কে ভালবাসি বা না বাসি, সে তোমরা দুজনেই তো বুঝতে পার। মুখের কথায় সে সব আমি প্রকাশ করতে চাই নে।" হাত দুখানা ছাড়িয়া দিয়া শান্তিপূর্ণ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া যোগেন্দ্র বলিলেন "আঃ, বড় শান্তি দিলে আমায় আজ সুষমা। জগতে কেউ কারও নয়, এই ধারণা নিয়েই আমি শুয়েছিলুম, তুমি জানালে তুমি আমারই আছ। সকলেই আমায় অন্তর করতে পারবে, কেবল তুমিই আমায় বড় স্নেহে, বড় আদরে কাছে টেনে নেবে। জানছি বড়-বউ, সবই জানছি; তবু আবার বল, আবার আমার গায়ে হাত দিয়ে আকাশের পানে মুখ ফিরিয়ে আবার বল, আবার প্রতিজ্ঞা কর, আমি যত দিন বেঁচে থাকব, কোথাও যাবে না ততদিন আমায় ফেলে।"

সুষমার চোখে হঠাৎ খানিকটা জল আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ক্ষিপ্র-হস্তে চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন "তুমি আমায় অবিশ্বাসিনী ভেব না। জগতে তোমার চেয়ে বড় দেবতা কেউ নেই আমার কাছে। আকাশকে আমি শূন্য বলেই জানি। ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে কি প্রতিজ্ঞা করব আমি? দেবতার নামও মিছে আমার কাছে, কারণ প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি রয়েছ আমার সামনে; তোমার বুকে মুখ রেখে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—"

সুষমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; বড় বড় দুইটা চোখ বাহিয়া অনর্গত অশ্রুধারা ছুটিল। তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "যেদিন ঈশ্বর সাক্ষী রেখে আমার বাপ-মা তোমাকেই ঈশ্বর বলে দেখিয়ে দিলেন, তোমার হাতে আমায় সমর্পণ করলেন, সেই দিন হতে তোমাকেই আমি ঈশ্বর বলে জানি। আমি কোথায় যাব? তোমাকে একা ফেলে যাবার মত আর কোন্ স্থান আছে আমার? তুমি যদি নির্দ্দয় হও, তুমি যদি আমায় শত-সহস্র লাথি মেরে যাও, আমি তা-ও আদর করে বুক পেতে নেব যে! তুমি কেন এ কথা বলছ, কেন এ রকম করছ? আমায় সব কথা বল, আমায় বিশ্বাস কর, আমাকে অবিশ্বাস করো না।"

যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আজ নৃপেন কি না মুখ-ফুটে আমায় বললে, সে পৃথক হবে। সে না আমার ভাই বড়-বউ! আমি না তাকে হাতে করে মানুষ করেছি। এমনই অকৃতজ্ঞ নরাধম, সে সব কথা এখন—"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; চোখ দিয়া হঠাৎ দুই ফোঁটা জল কোনও বাধা না মানিয়া উপছাইয়া পড়িল।

সুষমা স্বামীর হৃদয়-বেদনা বুঝিলেন। তিনি যে ভাইদের কতদূর ভালবাসিতেন, তাহা তিনি জানিতেন। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরবে তিনি স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিলেন।

যোগেন্দ্র কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া বলিলেন "এই তো ভাইয়ের উপরে ভাইয়ের ভালবাসা সুষমা! আমি দেখছি, জগতে যে যাকে ভালবাসে, সে কেবলই স্বার্থের জন্যেই; সকলের মূলেই স্বার্থ রয়েছে। ভালবাসার জন্যে যে ভালবাসা, তা নয়। আমি তো ওদের কাছে কিছুই চাই নি সুষমা! নিজেরটা দিয়েই ওদের বাড়িয়েছি। এইটুকু আমার ইচ্ছা ছিল, আমার সংসারে ঝগড়া-বিবাদ যেন না আসে; ভাইগুলি সব যেন এক হয়েই থাকে। আমি যেন এদের একত্র রেখে শান্তিতে চলে যেতে পারি। বড় শান্তির প্রত্যাশা করেছিলুম কি না, তার তেমনি ফল পাচ্ছি।"

তিনি চুপ করিলেন। সুষমা ধীরে ধীরে বলিলেন "সেজ-ঠাকুর-পো কি বলেন?"

যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সে-ও না কি পৃথক হওয়ার পক্ষপাতী।"

সুষমা তবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি নিজে মত দেছেন?"

বিরক্ত হইয়া যোগেন্দ্র বলিলেন "নিজের মুখে বলা আর পরের মুখ দিয়ে নিজের কথা ব্যক্ত করা, এ একই সুষমা! তার সঙ্গে সেদিন এক নিমেষের দেখা মাত্র হয়েছিল। নৃপেনের কাছেই তো দিনরাত থাকত সে; কথাবার্ত্তাও সব এখন তার নৃপেনের সঙ্গে। সে না বললে নৃপেন কি নিজেই তার মোক্তার হয়ে আসবে? অবশ্য তাদের মধ্যে এ-সব কথা হয়েছে বই কি।"

সুষমা পতনোন্মুখ নিঃশ্বাসটাকে চাপিয়া ফেলিয়া উদাস ভাবে বলিলেন "হতে পারে। আর ছোট ঠাকুর-পো—"

যোগেন্দ্র ম্লান হাসিয়া বলিলেন "সে-ও যে তার দাদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না, তার ঠিক কি?"

সুষমা বলিলেন "তুমিও তো তার দাদা।"

যোগেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কড়ি-কাঠের পানে তাকাইয়া বলিলেন "না বড়-বউ, সে সম্পর্ক ফুরিয়ে গেছে।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার তিনি হাসিলেন; বলিলেন "আমাকে মস্ত একটা গাধা মনে করছ বড়-বউ। বাস্তবিকই আমি গাধা বই কি। ওরা নিজেদের সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে, অথচ আমি ওদের জন্যে কেঁদে মরছি, ওরা কিন্তু আমার পানে একবারও ফিরে তাকাচ্ছে না। একবার মনে করছি, কিসের সংসার, কিসের কি? আমিই যখন আমার নিজের নই, তখন ওদেরই বা আপন বলে জড়িয়ে নিই কেন? বৈরাগ্যটা মনে যখন বেশ জেগে উঠে, তখনি মনে একটা ছবি জেগে উঠে; সে ছবিটা ছোট ছোট তিনটী শিশুর। আমি সকালে কাজে বেরিয়ে যেতুম; সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়ী ফিরতুম, তিনটীতে আমার আশায় দরজায় দাঁড়িয়ে। আমায় দূর হতে দেখবামাত্র তিনজনে ছুটে এসে কেউ কোলে লাফিয়ে উঠত, কেউ পিঠ আঁকড়ে ধরত, কেউ বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আজ ভাবছি সুষমা, সে তিনটী শিশু আজ কোথায়? আমার জীবনের উপর দিয়ে অনেক বছর আঘাত করে চলে গেছে; তবু তো আমি তাদের সেই দাদাই আছি; তাদেরই শুধু এ পরিবর্ত্তন হল কেন সুষমা?"

তাঁহার চোখের প্রবহমান জলধারা মুছাইয়া দিতে দিতে, নিজের চোখের জল গোপন করিতে করিতে সুষমা বলিলেন "এই রকমই হয়। জগতের নিয়মই এই, তা আর তুমি ভেবে করবে কি বল? 'প্রফুল্ল' থিয়েটার গত বছর যে আমাদের বাড়ী হল, তাতেও তো দেখেছিলে, ভাই কেমন ভাইয়ের শত্রু হয়? অমন দেবতুল্য ভাই, তার শেষে কি দুর্দ্দশাই না করলে রমেশ। ছোট ভাইকে জেলে দিয়ে পাথর ভাঙ্গালে পর্য্যন্ত। সংসারে মেজগুলোই অনেক সময় এমনই অনর্থ বয়ে আনে। কথা হচ্ছে কি, যাকে যত প্রাণ ঢেলে ভাল বাসবে, সে ততই গরল উগরে দেবে। কেন তুমি নিজেকে সংসারে এমন করে জড়িয়ে রাখছ? নিজেকে গুছিয়ে নাও। একটা আধার—যাকে ভাল বাসলে সহস্র গুণ ভালবাসা পাবে, তারই উপরে সব ভালবাসাটা ঢেলে দাও।"

যোগেন্দ্র স্থির হইয়া বলিলেন "তুমি সত্য কথাই বলেছ বড়-বউ। সেবার যখন 'প্রফুল্ল' প্লে হয় আমাদের বাড়ী, আমি তখন ঘৃণায় রমেশের পানে চাইতে পর্য্যন্ত পারি নি। গর্ব্বে তখন বুকটা আমার ভরে উঠেছিল—আমার ভাইয়েরা তেমন নয়। কিন্তু এখন আমার সে ভুল ভেঙ্গেছে বড়-বউ, সে ভুল ভেঙ্গেছে। আমার নিজের জন্যেও ততটা ভাবনা নেই, যতটা অমিয়ের জন্যে হচ্ছে।"

সুষমা বলিলেন "তার মা যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ তার ভাবনা তোমায় করতে হবে না। আমি এসে তাকে কোলে নিয়েছি নিজের সন্তান বলেই। সেও আমাকে তার নিজের মা বলে জানে, আমি তাকে আমার নিজস্ব বলেই ভাবি। সে আমায় মা বলে ডেকে যে আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, জগতে আর কেউ সে আসনে আমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। আমি যখন ভাবি, আমি আর কিছু নই, আমি মা, আমার বুকটা তখন কতদূর ভরে ওঠে, তা আর তোমায় কি জানাব।"

তাঁহার মুখখানা তখন এমন দীপ্ত হইয়া উঠিল ও চক্ষু দুইটী আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, যোগেন্দ্র বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, চোখ ফিরাইতে পারিলেন না।

হঠাৎ আবেগের মাথায় অনেকগুলা কথা আজ সুষমার

মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সুষমা স্বামীর পানে চাহিয়া নিজেকে বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে কথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন "নাও, এখন উঠে খাবে চল। ছেলেটা রোজ তোমার সঙ্গে খায়, তা বুঝি মনে নেই? বেলা বারটা বাজতে চলল, সে বেচারার এখনও খাওয়া হয় নি।"

"ও হো হো, তাই তো।"

তাড়াতাড়ি যোগেন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পাড়লেন। "তা হলে সুষমা, তোমায় আমি অমিয়ের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমার অবর্ত্তমানে—"

সুষমা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "কেন ও-সব কথা বলছ? যা আমি সইতে পারি নে, কেবল তাই বলবে। আমাকে জ্বালানই কেবল মতলব তোমার, তা আমি জানি।"

যোগেন্দ্র একটু হাসিলেন; তাহার পর বলিলেন "মানুষের জীবন-মরণের কথা কে বলতে পারে সুষমা? এই আমি বেঁচে আছি, একঘণ্টা পরে লোকে হয় তো আমায় শ্মশানে চিতার উপরে দেখতে পাবে। মরণের জন্যে মানুষকে সদাই প্রস্তুত থাকতে হয়, তাতো জানই। তুমিই না কতদিন আমাকে এ উপদেশ দিয়েছ? আমি নিজের কথা বলছিনে সুষমা, তোমাকে জ্বালাবার জন্যেও বলছিনে। আমি বলতে চাচ্ছি—এটা ঘটাও তো অসম্ভব ব্যাপার নয়।"

সুষমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "যখনকার কথা তখন হবে, এখন খাবে এসো।"

উপর হইতে নামিয়া যোগেন্দ্র সবেমাত্র রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, সেই সময় পিসীমা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন "আচ্ছা যোগেন, তোর আক্কেলটা কি বল্ দেখি? এই কচি ছেলেটা—এই বেলা বারটা ইস্তক না খেয়ে শুকিয়ে মরে, এটা ভেবেও তো আসতে হয় তাড়াতাড়ি করে। আর ছেলেও কি এক-রোখা বাছা, বলছি এত করে, খেয়ে নে, খেয়ে নে তুই। তা কিছুতেই নয়। মুখ ফুলিয়ে বসে আছে দেখ না, যেন সংটী।"

যোগেন্দ্র পুত্রের পানে চাহিয়া হাসি-মুখে বলিলেন "না না, পিসীমা, ওকে কিছু বল না। বেশ তো, আমার সঙ্গে রোজ যখন খায়, একদিন কেন বাদ দেবে? বস অমিয়, খেতে বস।"

পিতা-পুত্রে আহারে বসিলেন। সুষমা পাচিকাকে সরাইয়া স্বহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পিসীমা যোগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আজ তোর ব্যাপারখানা কি বল্ তো? অন্যদিন এগারটার মধ্যে তোর খেয়ে ওঠাই চাই, আর আজ বেলা বারটা বেজে গেছে, খেতে আসবার নামটী নেই।"

যোগেন্দ্র বলিলেন "শোন পিসীমা, নৃপেন যে পৃথক হবার জন্য ভারি চেষ্টা করছে।"

পিসীমা মাথা নাড়িয়া বলিলেন "সে তো বাছা, জেনেই আছি। পষ্ট বলেছে তোমায়?"

যোগেন্দ্র বলিলেন "হাঁ, আজ তাই বলে গেল?"

কপালে চোখ দুইটা তুলিয়া পিসীমা বলিলেন "বলে গেল? মুখ ফুটে বলতে পারলে এ কথা তোকে?"

যোগেন্দ্র অমিয়ের পাতে নিজের মাছখানা তুলিয়া দিয়া বলিলেন "পারবে না কেন?"

পিসীমা বলিয়া উঠিলেন "হা হা, করিস কি? ওকে মাছের মুড়ো আর ন্যাজাখানা দেওয়া হয়েছে, তোর জন্যে পেটি কখানা ভাজা রাখা হয়েছে, তা আবার দিলি কেন তুলে? যাক্ গে, আমি ভাবছি, কেমন করে, কোন্ মুখে সে এ কথা বললে তোর কাছে? এইটাই ভারি আশ্চর্য্যের কথা বউ-মা?"

সুষমা অদ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে ফিস-ফিস করিয়া বলিলেন "এতে আশ্চর্য্যের কথা কিছু নেই। যা আক্‌চার হয়ে আসছে, এ-ও তাই। নূতনত্ব আর কি আছে এতে; হাজার বইতে এর চেয়ে কত ভয়ানক কথা আছে।"

হাত নাড়িয়া ঘৃণার সুরে পিসীমা বলিলেন "বইয়ের কথা ফেলে রেখে দাও গে বাছা! বইতে কি না বলছে? ভাই হাসতে হাসতে ভাইয়ের গলায় ছুরি বসাচ্ছে, তা বলে সত্যিই কি তাই হয়?"

সুষমা তেমনি চাপা সুরে বলিলেন "হয় বই কি?"

বিরক্তির রেখা পিসীমার মুখে ফুটিয়া উঠিল "তাতো বলবেই বাছা! তর্কে কেউ যে তোমায় হারাতে পারবে না, তা আমি বরাবরই জানি। এমন এক একটা আজগুবি কথা শোনা যায় তোমার কাছে, যা শুনলে মানুষ একেবারে অবাক্ হয়ে যায়। কি এক গাড়ী আছে না কি, তা আবার আকাশ দিয়ে চলে যায়; জলের ভেতর নাকি ইষ্টিমার চলে। কোন্ দিন হয় তো বলে বসবে,—যাক সে সব কথা। ও-সব

নিয়ে তর্ক করবার সময় আমার এখন নেই। আর যা বলবে বল বাছা, ভাই যে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয় হাসতে হাসতে, তাই আবার হচ্ছে সংসারে, এই কথাটি বলো না। আমাদেরও কি ভাই-বোন ছিল না গা? একটি ভাই কি বোনের একটু মাথা ধরলে আমরা সকলে যেন নিজের মাথা ব্যথা হয়েছে ভাবতুম। ভাই-বোন এমনি জিনিস বাছা, এমনি জিনিস! আচ্ছা, তা যাক্ গে সে কথা। হ্যাঁ রা যোগীন, কি বললে সে তোকে?"

যোগেন্দ্র দুধের বাটীর পানে চাহিয়া বলিলেন "দুধ দিয়েছ কেন আমাকে? বাটীটা সরিয়ে নাও এই বেলা, এখনও এঁটো হয় নি।"

পিসীমা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন "না না, ভুলো না বলছি বড় বউ-মা, এই দেহ, আর এই ভাবনা-চিন্তা, একটু দুধ-ঘি না খেলে বাঁচবে কি করে? নে বাবা, দুধটুকু না হয় চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেল্। একটু চিনি ফেলে দেব ওতে, বেশ মিষ্টি হবে'খন? দাও তো বউ-মা, একটু চিনি।"

যোগেন্দ্র বলিলেন "না না, চিনি আর দিতে হবে না।"

পিসীমা বলিলেন "আচ্ছা, পষ্ট সে বললে, আমি পৃথক হব?"

গম্ভীর মুখে যোগেন্দ্র বলিলেন "মুখে বাধবেই বা কেন? বাধবার মত কোনও জিনিস তো এটা নয়।"

গালে হাত দিয়া পিসীমা নাকি সুরে বলিলেন "নয়? তুই বল্‌ছিস কি রে? হাতে করে মানুষ করলি, খাওয়ালি পড়ালি, আমি কি কিছু জানিনে না কি? কি নিয়ে ওরা পৃথক হতে চায়? এ সবই যে তোর যোগীন! আমি তো জানি, দাদা মরবার সময় রেখে গেছলেন কি? হাজার টাকা দেনা আর একখানি খড়ো ঘর মাত্র,—বিক্রি করতে গেলে দুইটি টাকাও দাম হত না। এ সব তো তোরই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জন করা। ওরা গণ্ডমূর্খ; নইলে বুঝতে পারত তোর জিনিস ওরা কোন্ হিসেবে দাবি করে। পৃথক হবে? উঃ, বড্ড লম্বা-চওড়া কথা শুনতে পাই যে। পৃথক হতে চায়, বউয়ের হাত ধরে তার বাপের বাড়ীর বিষয় নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাক না। এখানকার যা, তা এখানে রেখে যাক্।"

ব্যস্ত ভাবে যোগেন্দ্র বলিলেন "চুপ কর পিসীমা, একটু আস্তে কথা বল।"

"আস্তে কথা বলব, কেন, কিসের জন্যে? ওরা করতে পারে, আমি বলতে পারিনে? সবাই বউয়ের গোলাম হয়েছে? ভাই গেল, ধর্ম্ম গেল, বউয়ের পা ধরেছে সব? ঘেন্নায় মরে যাই, লজ্জায় মরে যাই। ছি, ছি, ছি, কলিকাল আর কাকে বলে?"

বকিতে বকিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুষমা তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন "রক্ষে কর পিসীমা, আর যেও না তাদের কাছে। তাদের মুখের কাছে পারবেও না, কিছুই না, অনর্থক কেবল চেঁচাচেচি—"

"পারব না?" জোর করিয়া হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া পিসীমা বলিলেন "পারব না কি? ঝগড়ায় আমি হারি কখনও? যেমন বলবে, তেমনি শোনাব, তার আবার কি?"

পিসীমা দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

যোগেন্দ্র স্ত্রীর পানে তাকাইয়া বলিলেন "নাও, আজ আবার এক কাণ্ড হয় বুঝি।"

সুষমা বলিলেন "উনি তো কিছুতেই থামবেন না।"

যোগেন্দ্র বলিলেন "তুমি যাও। ঝগড়া করতে দিয়ো না। পায়ে পড়ে হোক, যেমন করেই হোক, ওঁকে ফিরিয়ে আনা চাই। জোর করে কি কাউকে আটক রাখা যায়? নৃপেন রমেন যখন পৃথক হবেই, তখন আমি জোর করে, ঝগড়া করে তাদের আটকে রাখতে যাই কেন? আমার যা আছে, সমান চারি ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হবে তো, এই কথাটা তুমি মেজ বউ-মা আর সেজ বউ-মাকে বুঝিয়ে দিয়ো। যাও, এতক্ষণ ঝগড়া বেধেছে।"

সুষমা বাহির হইয়া পড়িলেন।

(১১)

আজ সুলতার মনটা বড় প্রফুল্ল ছিল। নৃপেন তখন আহারে বসিয়াছিল; সুলতা আজ তাহার সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। বহুকাল নৃপেনের ললাটে এমন দিন আসে নাই। আজ সুলতার মুখখানি হাসিতে উচ্ছ্বসিত; হাসির আভায় তাহার গণ্ড ললাট আরক্ত হইয়া উঠিতেছে।

সবেমাত্র নৃপেনের আহারটা সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় ঝড়ের মত আসিয়া পড়িয়া গর্জ্জিয়া পিসীমা ডাকিলেন "হ্যাঁ রে নেপ—"

বিস্মিত নৃপেন তাঁহার পানে চাহিল। মেজ-বউয়ের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; সে মুখ শক্ত কঠোর হইয়া উঠিল। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সে পিসীমার পানে চাহিল।

তাহার দিকে না চাহিয়া পিসীমা বলিতে লাগিলেন "হ্যাঁরা, তুই কি এমনই করে বয়ে গেছিস রে? বিয়ে করলে কি এমনই করে বউয়ের গোলাম হতে হয়? তুই পুরুষ, তোর কথাতেই না তোর বউ উঠবে বসবে চলবে? তুই কি না ওর কথায় উঠিস, বসিস, কাজ করিস? বলি, ও পোড়ারমুখো, এই রকম করবি জানলে আমি কি তোকে বুকে করে মানুষ করতুম রে! তখনই যে তোকে খানিকটে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতুম। একেবারে এমনি করেই বয়ে গেলি রে হতভাগা! মুখ রাখবার মত একটু জায়গা রাখলি নে!"

বিরক্ত হইয়া নৃপেন বলিল "কি করেছি আমি, যাতে তুমি দেখলে আমি একেবারেই বয়ে গেছি?"

পিসীমা নিজের গালে নিজেই গোটাকত চড় মারিয়া আক্ষেপ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "হায় রে, তোর বোকার মত এই কথাগুলো শুনে আমারই যে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে। ওরে হতভাগা, তোর কপালে এ ও লেখা ছিল রে।"

রাগিয়া উঠিয়া নৃপেন বলিল "ভালো আপদ হয়েছে। ঠিক খাওয়া-দাওয়ার সময় উনি এলেন কি না শাপ গাল দিতে। গলায় দড়ি দিয়ে মরবে, তা মরগে যাও। আমি কি তোমায় আটক করে রেখেছি নাকি?"

পিসীমা অবাক হইয়া গেলেন "এখন তা তো বলবিই তুই! বলবি নে কেন? যখন চোখ থাকতে কাণা ছিলি, কাণ থাকতে কালা ছিলি, হাত পা থাকতেও খোঁড়া, নুলো হয়ে বসে ছিলি, তখন এ সব কথা ছিল কোথায়? তখন কি বউ এসে তোর সেবা করেছিল, না তোকে জগৎ চিনিয়েছিল? এখন তো সবাই এ কথা বলবি; তখন বলতে পারিস নি, যখন—"

বাধা দিয়া রূঢ় বাক্যে নৃপেন বলিয়া উঠিল "পিসীমা, তখন কে তোমায় বলেছিল মানুষ করতে? গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলে দিলেই পারতে। যাও, এখন বোকো না, আমার ঢের কাজ আছে। এখনই শৈলেনকে রমেনকে টেলিগ্রাফ করতে হবে আসবার জন্যে।"

পিসীমার গায়ে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন "ওঃ, পৃথক হবি বলে তাদের আন্‌ছিস? বলি হতভাগা, পৃথক যে হবি, কি নিয়ে হবি বল্ দেখি? এখনি যে খেয়ে উঠ্‌লি, ও যে তোর দাদারই। এই যে তেতালার ঘরে শুয়ে-বসে বাবুয়ানা করছিস, এও তো তোর দাদার দয়ায়। ওই যে পরণে ফিনফিনে পাতলা কাপড়, জামা, ও-যে তোর দাদার। শ্বশুরবাড়ীর কয়টা জিনিস আছে তোর, যা নিয়ে পৃথক হবি তুই? আলাদা হতে চাস, যা, বউয়ের হাত ধরে, তার বাপের বাড়ীর জিনিস-পত্তর নিয়ে বেরিয়ে যা। মনে করব তুই মরে গেছিস; বস্, সব ফুরিয়ে গেল।"

রাগে নৃপেনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল; সে কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। পিসীমা সুলতার রাগত মুখখানার পানে চাহিয়া বলিলেন "হ্যাঁগা মেজ-বউমা, কাজটা কি ভদ্দর লোকের মেয়ের মত হচ্ছে বাছা? এ যে আমাদের দেশের ছোট-লোকের মেয়েরা, যারা কিছু জানে না, গণ্ডমূর্খ, তারাই করে। বেশী লেখা-পড়া শিখলে কি যা, দেওর, ভাসুর, এদের সঙ্গে একত্রে বাস করা যায় না! আলাদা না হলে বুঝি শান্তি হয় না? তুমি বাছা, মানুষের গলায় অনায়াসে ছুরি বসাতে পার? ওই যে সে-দিন প্রতিভা কি একটা ছড়া বলছিল, মেয়েদের মুখে মধু, বুকে বিষ, তোমার হয়েছে ঠিক তাই। তোমার পেটে বিস, এদিকে মুখে বেশ হাসি ছড়াতে পার। সে যা হোক বাছা, মাপ কর, আলাদা আর হোয়ো না। গো-বেচারা ভাসুরটার পানে একটু তাকাও, আমার পানে চাইতে বলছি নে।"

নৃপেন চীৎকার করিয়া বলিল "দেখ পিসীমা, অনেক কথা বলছ তুমি—কিন্তু—"

আর দু-পা অগ্রসর হইয়া পিসীমা বলিলেন "কি করবি তুই নেপ, মারবি না কি? সবই তো করেছিস, মারটা কেন বাকি থাকে? বউয়ের গোলাম হয়েছিস, আমাদের কাছে বীরত্ব দেখাবিনে কেন? আয় না, গায়ে হাত তোল্ না একবার।" ঠিক সেই সময় সুষমা সেখানে আসিয়া পড়িলেন। নৃপেনের উদ্ধত ভাব দেখিয়া ভর্ৎসনার সুরে তিনি বলিয়া উঠিলেন "ছি ঠাকুর-পো।"

সে চোখের উপর চোখ পড়িবামাত্র নৃপেন পিছাইয়া গেল।

সুষমা পিসীমার হাত ধরিয়া অনুনয়ের সুরে বলিলেন "চল পিসীমা, তোমার পায়ে পড়ি, খাবে চল। অনর্থক এই দুপুর-বেলা কেন আর ঝগড়া করতে এলে?"

পিসীমা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "দেখলে বউ-মা, নেপ কিনা আমায় যাচ্ছে-তাই কথা বলে। তুমি যদি না এসে পড়তে—হয় তো কি করতো আমার। সেই নেপ—যাকে আমি হাতে করে মানুষ করেছি, সে কি না এখন—" বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়াই আকুল হইলেন।

সুষমা জ্বলন্ত দৃষ্টি নৃপেনের মুখের উপর ফেলিয়া কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ঠাকুর-পো—"

নৃপেন যে কথা কহিতে পারিবে না, তাহা জানিয়া সুলতা রক্তবর্ণ মুখে বলিল "তোমার বড় দোষ আছে বড়-দি। উনি বললেন, যা-না-তাই বলেছে, তুমিও অমনি কি না তাই বিশ্বাস করলে? এমনতর পার্শালিটি দেখালে আমরা যাই কোথায়? উনি যে রকম করে এসে, যে রকম মুখ খারাপ করছেন, সভ্য-সমাজ হলে এতক্ষণ মাথায় ঘোল ঢেলে দূর করে দিত। আমরা না কি পরাধীন, তাই সয়ে যাচ্ছি সব।"

তাহার দিকে ফিরিয়া সুষমা বলিলেন, "তুমি চুপ কর সেজ-বউ, তোমায় আমি কথা বলতে ডাকছিনে। ঠাকুর-পোর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে, তখন হয়েই যাক।"

নৃপেনের পানে তাকাইয়া তিনি বলিলেন "বুড়ো-মানষের মাথার ঠিক থাকে না ঠাকুর-পো! একটা কথা বলতে তারা আর একটা কথা বলে থাকে। তাতে রাগ করে যারা, আমি স্পষ্ট বলছি তারা হস্তীমূর্খ। তুমি এত লেখা-পড়া শিখে, এত জ্ঞান লাভ করেও যা না জান, পথের ওই যে ভিখারী, যে কখনও বইয়ের পাতাটা উল্টায়নি, সে তার চেয়ে বেশী জানে। পিসীমা যদি কড়া কথাই বলে থাকেন দুটো, তাতে তোমার চোখ মুখ রাঙাবার কোনও দরকার ছিল না ঠাকুর-পো! এটুকু মনে করতে পারলে না, তিনি যদি তোমাদের সেই ছোট বেলায় কোলে টেনে না নিতেন, এতদিন কোথায় থাকতে তোমরা? পৃথক হবার কথা আলাদা; তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। পৃথক হবার কথা তোমার দাদা যা বলেছেন, তা হবেই। আমাদের যা কিছু আছে, সমান চার ভাগ হবে তা, কেউ একটু বেশী নেবে না। তোমাদের এ নতুন বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আমরা পুরোনো বাড়ীতে উঠে যাব। সে জন্যে কিছু ভেব না ঠাকুর-পো! সে কথা কখন রদ্ হবে না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, যিনি তোমাদের মাতৃস্থানীয়া হয়ে পালন করেছেন, শুধু তাঁকে একটু সম্মান দেখিয়ো, যদি পার। আমাদের জন্যে কিছু করতে কখনও তোমায় বলতে আসব না।"

নৃপেন মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বড়-বউয়ের কথার উপর একটা কথা কহিতে কখনও তাহার সাহস হয় নাই; বরাবরই সে সেখানে নির্ব্বাক। বড়-বউয়ের মুখের পানে তাকানও যায় না, সে মুখে যেন আগুন জ্বলে।

স্বামীর এই কাপুরুষতা দেখিয়া সুলতার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু একটা কথা সেও বলিতে পারিল না।

তাঁহার প্রতি বড়-বউয়ের সহানুভূতি দেখিয়া পিসীমা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন; আনন্দে তাঁহার চোখের জল কখন শুকাইয়া গিয়াছিল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন "বড়-বউমা—"

শান্ত কণ্ঠে সুষমা বলিলেন "হাঁ মা, যতক্ষণ আমি আর আপনার বড় ভাই-পো বেঁচে আছি, আপনার কোনও ভয় নেই, ভাবনা নেই ততক্ষণ; আপনি খাবেন আসুন পিসীমা!"

তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সুষমা বাহিরে আসিলেন।

সিঁড়ির উপর শুষ্কমুখী প্রতিভা দাঁড়াইয়া ছিল। সে আর সে প্রতিভা ছিল না। মেজ-বউয়ের দেওয়া সেই একটী দিনের একটী আঘাত তাহাকে বড় করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিভা এখন ছেলেমানুষি করা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ প্রাচীনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে এখন দিনরাত গৃহ-কর্ম্ম ও পূজার্চ্চনাদি লইয়া আছে। এখন আর প্রতি কথায় তাহার হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না; সে হাসে, কিন্তু বড় নীরবে। সে হাসি একটুখানি মুখে বিকশিত হইয়া তখনই মিলাইয়া যায়।

সুষমা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "কি রে, তুই এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভাবচিস বুঝি তোরই কোন কথা হচ্ছে,—কেমন না?"

প্রতিভা একটু হাসিয়া বলিল "না, তা নয়, তা ভাবিনি। মেজ-দিদির পান সেজে দিয়ে আসতে হবে, তাই—"

পিসীমা বলিয়া উঠিলেন "খবরদার, যেতে পাবি নে। নিজে আছে, বাপের বাড়ীর হাতীর মত ঝিটা আছে, পান সেজে নিতে পারে না? তোকে বুঝি রোজই যেতে হয় পান সাজতে?"

প্রতিভা ঘাড় কাত করিয়া জানাইল, হাঁ।

পিসীমা বলিলেন "তুই যাস্ কোন্ আক্কেলে প্রতি? সেদিন যে অমন করে অপমান করলে তোকে, আবার তারই কাজ করে দিস রোজ তুই? আমি জানতে পারলে কখনও তোকে ও-ঘরমুখো হতে দিতুম না। তোর কি একটু ঘেন্না-পিত্তি নেই রে?"

প্রতিভা মুখ ফিরাইয়া চাপা সুরে বলিল "বিধবার আবার ঘেন্না-পিত্তি কিসের থাকে পিসীমা?"

সুষমা ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "প্রতিভা!"

প্রতিভা ফিরিয়া দেখিল তাঁহার চক্ষু দুইটী অশ্রু-পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন "পোড়ারমুখী, কেবল এই কথা বলবি? যা আমি শুনতে পারিনে, তাই কেবল শুনাবি আমাকে? তুই বিধবা কিসের? মনে কর্ তুই বিবাহিতা, তোর স্বামী মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে। মনে কর না কেন, তুই সকলের উপরে, তোর পায়ের নিচে সারা বিশ্ব লুটোপুটি খাচ্ছে তার ব্যর্থতা নিয়ে। সে ব্যর্থতা তোকে ছুঁতে পারবে না, কারণ তোর স্বামী মহান্, তাঁর শক্তি তোতে আছে। নিজেকে কেন এমন দীন-হীনা করে জগতের পায়ের তলায় ফেলে দিচ্ছিস প্রতিভা? ওতে নিজেকে হারবার অবসর দেওয়া। তুই তো হারতে আসিসনি বোন, জিততে এসেছিস। মিথ্যে সংসারে জড়িয়ে পড়তে আসিসনি, একটা চিহ্ন রেখে যেতে এসেছিস। ব্যর্থতা আনিসনে; ওকে ছুঁলে তুই মরবি প্রতিভা, একেবারেই মরবি।"

প্রতিভা চুপ করিয়া রহিল। সুষমা তাহার হাতখানা ধরিয়া বলিলেন "পান সাজতে যেতে হবে না আর, আমার সঙ্গে আয়।" (ক্রমশঃ)

কোস্‌নে কথা

[শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী]

যা' তোরা যা' তরী বেয়ে
আমার সনে কোস্‌নে কথা—
আজ চিনিবি কেমন ক'রে,
সে ঘর গেছে ভীষণ ঝড়ে,
উপ্‌ড়ে গেছে রসাল, পলাশ,
শুকিয়ে গেছে স্বর্ণলতা।
তোরা যেদিন গেছলি সাঁঝে,
খেল্‌ছে শশী নদীর মাঝে,
শুভ্র কুমুদ ফুটে আছে,
কালো জলে আলো হোথা!
দেখ্‌লি তীরে বাদাম গাছে,
দুইটী পাখী জেগে আছে,
আকাশ-ভরা গান ধরেছে,
আজ্‌কে তাদের পাবি কোথা।

সেই যে রক্ত-বসন-পরা,
কেশের রাশি এলো করা,
কক্ষে কলস জলে ভরা,
সাধ্বী সতী পতিব্রতা;
সঙ্গে শিশু চাঁদের মত,
ছুটাছুটি কর্‌তো কত,
মায়ের আঁচল টেনে নি'ত,
ঢাল্‌'ত হাসির মধুরতা।
ছিল যে মা অন্নপূর্ণা,
ঘরে সদাই লক্ষ্মী পূর্ণা,
হিয়াখানি ম'লা শূন্যা,
আত্মহারা সে মমতা।—
আজ্‌কে প্রভাত-বিহগ মত,
চলে গেছে সে সব যত,

একাই নিয়ে স্মৃতি শত,
পড়ে আছে মর্ম্মব্যথা।
গেছে সে সব প্রতিবাসী,
গেছে সে সব আদর হাসি,
প্রাণের জ্বালা সর্ব্বনাশী,
রক্ত-মাংসে অনুরতা!
যা'রে যা' ভাই, তরী বেয়ে,
আমার সনে কোস্‌নে কথা
বুকের মাঝে বহ্নি জ্বলে,
এখন চাহি নীরবতা।

জার্ম্মাণ-চোখে জাপানী

[শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ]

(১)

বার্লিনের "টাগেব্লাট" (Tageblatt) পড়িতেছি। এই দৈনিকটা জার্ম্মাণ "বৈশ্য"দের মুখপত্র। খাঁটি "স্বদেশী" জার্ম্মাণদের মতে এটা জার্ম্মাণ "কুল্‌টুরে"র অঙ্গই নয়! কেন না, এই কাগজ ইহুদির টাকায়, ইহুদির স্বার্থে, ইহুদির সম্পাদকতায়, মায় ইহুদি ফেরিওয়ালাদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন হইতে এক জার্ম্মাণ সংবাদদাতা খবর পাঠাইয়াছেন। লেখাটার ভিতর জাপানের কথাই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

জাপানীরা আদা-নুন খাইয়া মার্কিণ নর-নারীকে ভজাইতে লাগিয়া গিয়াছে, বুঝিতেছি। সহরের এক বড় হোটেল জাপানী ডেলিগেটদের জন্য আগাগোড়া ভাড়া লওয়া হইয়াছে। কম্-সে-কম দুইশত জাপানী সমঝদার না কি ওয়াশিংটনের বারোয়ারিতলায় দুনিয়াখানাকে চূণ-সুরখি দিয়া গাঁথিয়া তুলিবার জন্য হাজির আছেন। এই সমঝদার ওস্তাদ মহাশয়গণের ভিতর প্রায় অর্দ্ধেক হইবেন খবরের কাগজের সম্পাদক, সংবাদদাতা, এজেন্ট, করেস্পণ্ডেণ্ট বা ঐ জাতীয় আর কিছু।

দুনিয়া মেরামতের ফরমায়েস লইতে আসিয়া জাপানীরা ইয়াঙ্কি মুলুকের নগরে-নগরে বিরাট জাপানী মেলা খুলিয়া বসিয়াছে। মহলে-মহলে জাপানের জয়-জয়কার চলিতেছে। থিয়েটারে, সিনেমা-ঘরে জাপানী জীবনের দৃশ্য দেখানো হইতেছে। মার্কিণ বা বুঝিতেছে, তাই ত! জাপানে চাষ-আবাদের জমির পরিমাণ যার-পর-নাই কম। অথচ প্রত্যেক পরিবারেরই লোকসংখ্যা যার-পর-নাই অনেক। পাড়ায়-পাড়ায় পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাটে খোকা-খুকী দেখা যায় অগণিত। এই সবের জন্য ঠাঁই চাই ত। ঠাঁই আর পাওয়া যাইবে কোথায়? কাজেই জাপানীদের জন্য জগতে উপনিবেশ চাই,—অন্ততঃ পক্ষে এশিয়ায় অর্থাৎ চীনে ও সাইবিরিয়ায় জাপানী সাম্রাজ্য স্থাপিত হউক।

(২)

জাপানীরা ওয়াশিংটনে এক নব্বুই বছরের বুড়ীকে আনিয়া হাজির করিয়াছে। এই বৃদ্ধার হাতে একশ গজ লম্বা কাগজে লেখা লাখ-লাখ জাপানী নরনারীর নাম। যে সকল লোকের নাম সহি আছে, তাহারা সকলেই সমর-বিরোধী এবং জগতে চিরশান্তির কামনা করে। এতগুলা শান্তি-পন্থীর নাম দেখিয়া মার্কিণ মহিলা-সমিতির সভ্যারা আহ্লাদে আটখানা। তাহা হইলে জাপানকে লড়াই-প্রেমিক বলা যায় কি করিয়া? জাপানী বুড়ীর সম্বর্দ্ধনা চলিতেছে ওয়াশিংটনের ছোট, বড়, মাঝারি সকল ক্লাবে। আমেরিকানরা বুঝিল, জাপান ইয়াঙ্কিকেও "প্রপাগাণ্ডা"য় হারাইয়াছে। হুজুগ বাগাইবার ফিকিরে জাপানী "রাজ-মিস্ত্রিরা" ডিগ্রি পাইবার উপযুক্ত নয় কি?

নিউ-ইয়র্কের বড়-বড় ব্যাপারীরা জাপানী সওদাগর ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ইতিমধ্যে একটা "সমঝোতা" কায়েম করিয়া ফেলিল। চীন, সাইবিরিয়া ইত্যাদি জনপদ লইয়া জাপানে-আমেরিকায় যে আড়া-আড়ি চলিতেছিল, তাহার অনেকটা রেহাই হইতে পারিবে।

জাপানীরা আর এক নয়া চালও চালিয়াছে। "টাগেব্লাটে" পড়িতেছি, জাপান বলিতেছেন—"পৃথিবীর বড়-বড় রাষ্ট্রশক্তিগুলা মিলিয়া একটা টেঁকসই বিশ্বব্যবস্থা খাড়া করিতে অগ্রসর হউন। তাহা হইলে এমন কি বৃটিশ-জাপানী সন্ধিটাও রদ করিতে জাপানীদের কোনো আপত্তি থাকিবে না।"

জাপানীদের রাষ্ট্রনৈতিক কারচুপী দেখিয়া জার্ম্মাণরা খুব বাহবা দিতেছে। জাপান এক হাতে ইংরেজকে রুখিতেছে, আর একহাতে ইয়াঙ্কিকে রুখিতেছে, অথবা একই সঙ্গে দুই জনকে তোয়াজ করিতেছে। এই দৃশ্য পাশ্চাত্য নরনারীকে চমক লাগাইয়া দিবে না কেন? জাপানী ডিপ্লোমেসির তারিফ করিয়া জার্ম্মাণির নানা সংবাদপত্রে নানা লেখক প্রবন্ধ ছাপিতেছেন।

জাপান বৃটিশ-মার্কিণ সন্ধির ভয়ে সন্ত্রস্ত। জার্ম্মাণ ওস্তাদরা বলিতেছেন "জাপানের চেষ্টায় কিছুকাল অন্ততঃ এই সন্ধি বা বন্দবস্ত ধামাচাপা থাকিবে।"

(৩)

ইয়াঙ্কিদের চিঁড়ে একমাত্র জাপানী বোলচালে ভিজে নাই। জাপানী-মার্কিণ প্রেমের পশ্চাতে কতকগুলা জবর "বস্তু" বিরাজ করিতেছে। জাপানীদের বাস্তব-নিষ্ঠায় অনেক দূরদর্শিতা সপ্রমাণ হয়। জার্ম্মাণদের চোখে জাপানী রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্রের বস্তুতান্ত্রিকতা সহজেই ধরা পড়িয়াছে।

ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড—বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই উপনিবেশগুলা জাপানের চিরশত্রু। ইহারা প্রত্যেকেই নিজ-নিজ রণতরী-বিভাগ পাকা করিয়া তুলিতে সচেষ্ট। প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটিশ প্রতাপ অসহনীয় আকার ধারণ করিতেছে। মাস-কয়েক হইল, লণ্ডনে এক বৃটিশ সাম্রাজ্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। জাপান এই সম্মেলনের ঘটা দেখিয়া বিশেষ বিব্রত।

এ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় জাপানের আছে মাত্র এক। যেন তেন-প্রকারেণ জাপানকে আমেরিকার মিত্রতা লাভ করিতেই হইবে। অন্ততঃ পক্ষে আমেরিকা যাহাতে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের সঙ্গে খোলাখুলি যোগ না দেয়, তাহার ব্যবস্থা করা জাপানের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ওয়াশিংটনের সম্মেলনে দুনিয়া মেরামতের কর্ম্মে যোগ দিতে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই, জাপানীরা সেই পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

বিগত মে মাসে (১৯২১) লণ্ডনে বৃটিশ-সাম্রাজ্য-সম্মেলন বসিবার পূর্ব্বেই জাপান সরকার "জাপানী উপনিবেশ"-সমূহের অবস্থা আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে এক কংগ্রেস ডাকিয়াছিলেন। সেই কংগ্রেসে স্থির হইয়াছে যে, জার্ম্মাণির নিকট হইতে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল দ্বীপ লাভ করিয়াছেন, তাহার কোথাও কোনো প্রকার কেল্লা বা লড়াইয়ের প্রতিষ্ঠান গড়া হইবে না। এই মীমাংসা শুনিয়া মার্কিণ নরনারী এবং গবর্মেণ্ট জাপানের শান্তিপ্রিয়তা সম্বন্ধে অনেকটা আশ্বস্ত।

(৪)

জাপানীরা আমেরিকাকে বড় করিবার জন্য অনেক কিছু করিয়াছে। ব্রেমেন সহর হইতে প্রকাশিত এক জার্ম্মাণ কাগজে জাপানের পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে সমালোচনা দেখিলাম। লেখক বলিতেছেন:—"আর্মিষ্টিসের সময় হইতেই সাইবিরিয়ায় জাপানী পল্টন বাহাল আছে। আমেরিকান গবর্মেণ্ট সর্ব্বদাই এই সেনানিবেশের বিরোধী। কিন্তু জাপানী উপনিবেশ-সম্মেলনে সাইবিরিয়া হইতে পল্টন তুলিয়া লওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। এই মীমাংসায়ও যুক্তরাষ্ট্রের গবর্মেণ্ট জাপানকে সুনজরে দেখিতেছেন।"

জাপানী উপনিবেশ বলিলে চীনের কথা প্রথমেই মনে উঠা স্বাভাবিক। চীন সম্বন্ধেও জাপানীরা মার্কিণকে ভজাইতে পারিয়াছে। চীনের কোনো অঞ্চলেই জাপানীরা একচেটিয়া জাপানী এক্তিয়ার বা অধিকার চাহে না,—যুক্তরাষ্ট্রের কাণে এই বাণী অমৃতের সমান। কেন না,—"দুনিয়ার সকল জাতিই চীনের প্রত্যেক জনপদে সমান অধিকার ভোগ করিবে" আমেরিকা বিশ বৎসর ধরিয়া তোতা পাখীর মতন এই বুলি আওড়াইয়া আসিতেছেন। চীন সম্বন্ধে "খোলা দুয়ার"-নীতি প্রচার করিয়া জাপানী "রাজমিস্ত্রিরা" বিগত মে মাসে আর এক কেল্লা ফতে করিয়াছে বলিতে পারি।

আরও এক কথা। ভার্সাই সন্ধি অনুসারে জাপান য়াপ দ্বীপের উপর "ম্যাণ্ডেটারি" এক্তিয়ার,—অর্থাৎ লীগ

অব্ নেশ্যন্সের (বিশ্ব-রাষ্ট্র-পরিষদের) অধীনস্থ অভিভাবকের ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। জাপানের এই অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দসই ছিল না। ইহাতে জাপানে-আমেরিকায় মন-কষাকষি চলিতেছিল।

কিন্তু জাপানীরা য়াপ লইয়া গণ্ডগোল ঘটাইতে চায় না। জাপানী ধুরন্ধরেরা ঠিক করিয়াছেন যে, য়াপ দ্বীপের সাধারণ শাসনকার্য্য মাত্র জাপানীদের তাঁবে থাকিবে। কিন্তু মার্কিণ গুআম দ্বীপের সঙ্গে য়াপ দ্বীপের সমুদ্র-তারের যে সংযোগ আছে, সেই যোগাযোগ পুরাপুরি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনেই থাকিবে। অর্থাৎ য়াপ দ্বীপের তার-আফিসে জাপানীরা কর্ত্তামি ফলাইতে উদ্‌গ্রীব নয়। এইরূপ বুঝাপড়ার ফলে তিন বৎসরের ঝগড়া এক মুহূর্ত্তে মিটিয়াছে।

(৫)

জার্ম্মাণদের শাণ্টুঙ্ জাপানীদের হাতে। কাজেই শাণ্টুঙ্‌কে লইয়া জাপানীরা কি করিতেছে, প্রত্যেক জার্ম্মাণ ওস্তাদের তাহা আলোচ্য বিষয়। জার্ম্মাণ কাগজে চীনের এই "জার্ম্মাণ উপনিবেশ" অনেক সময়েই বিশেষ স্থান অধিকার করে।

জাপানীরা মে মাসের সম্মেলনে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন,— "একদিন না একদিন চীনকে শাণ্টুঙ্ প্রদেশ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। এই প্রতিজ্ঞাতে জাপানের উপর আমেরিকার মেজাজ শরীফ্।

মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব জাপান ততদূর নরম হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী। জাপানের প্রেমালিঙ্গন অগ্রাহ্য করিবার কোনো প্রকার ওজর দেখানো মার্কিণ নরনারীর পক্ষে আজ অসম্ভব।

জাপানীরা ইয়াঙ্কির চরিত্র অতি গভীরভাবেই দখলে আনিয়াছে। জার্ম্মাণ লেখকেরা জাপানের এই ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ। পরের চরিত্র বুঝিতে পারা এবং বুঝিয়া নিজের মতলব হাঁসিল করিবার উপযোগী ফিকির খাটানো,—এই দুই বিদ্যায় জার্ম্মাণরা ফেল মারিয়াছে। কিন্তু জাপানীরা এই দিকে ওস্তাদ,—এই কথা জার্ম্মাণ সমাজে বুঝানো জার্ম্মাণ রাজমিস্ত্রিরা এক কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন।

ইয়াঙ্কিরা জাপানের উপর আরও অনেক কারণে খুসী। ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে জাপানী মজুরদের যাতায়াত লইয়া আমেরিকা চিরকালই জাপান-বিরোধী। সেই মজুর-সমস্যা এখনো মিটে নাই। কিন্তু জাপানীরা বলিতেছেন,— "ওয়াশিংটনে যে সম্মেলন বসিল, সেই সম্মেলনে এই পুরানো কথা তুলিয়া হ-য-ব-র-ল বাড়ানো হইবে না।"

জাপানে আমেরিকায় জবর আড়াআড়ি চলে আর একটা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে। ভার্সাই সন্ধির সময়ে জাপানী প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন:—"দুনিয়ায় চলাফেরা সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতিরই সমান অধিকার স্থাপিত হউক।" ইয়াঙ্কি প্রতিনিধিরা এই "জাতিগত সাম্য" বিষয়ক প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদ করেন। জাপান তাহাতে অসন্তুষ্ট। সেই বিবাদ শীঘ্র মিটিবার নয়। গোটা এশিয়া এই ক্ষেত্রে জাপানের সপক্ষে।

যাহা হউক, জাপানীরা এই "অনর্থের মূল"টাকেও ধামা-চাপা দিয়া রাখিয়া ওয়াশিংটনে আসিয়াছে। ফলতঃ, গলাগলি, বন্ধুত্ব, সহাস্য বদন এবং মুখমিষ্টির চূড়ান্ত চলিতেছে আজ জাপানী ইয়াঙ্কি মেলামেশায়।

মাথা-গরম লোক বা জাতের দ্বারা পররাষ্ট্রনীতি, দৌত্যবিভাগ বা রাজদরবারে আনাগোনা চালানো সম্ভবপর নয়। তাহার জন্য চাই শুভ মুহূর্ত্ত বুঝিয়া কর্ত্তব্য করিবার ক্ষমতা,—যখনকার যা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনীতির পরিভাষায় ইহার নাম "রেআল পোলিটিকে" দখল।

"আদর্শ", "দূর ভবিষ্যৎ", "জীবনের লক্ষ্য" ইত্যাদি মাল টেঁকে গুঁজিয়া, অর্থাৎ ঐ সকল হেঁয়ালিপূর্ণ বাগাড়ম্বরপূর্ণ শব্দ কপ্‌চাইতে প্রলুব্ধ না হইয়া, যাঁহারা প্রতিক্ষণে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা রেআল পোলিটিক (Real politik) হজম করিয়াছেন বলিতে হইবে। জাপানে এই ধরণের ওস্তাদ অনেক দেখা যায়। এইজন্যই জাপানের "মার" নাই।

বলা বাহুল্য, ইংরেজ এই বিদ্যায় দুনিয়ার এক। জার্ম্মাণরা লড়াইয়ে হারিবার পর হইতে এই কথা শয়নে-স্বপনে নিশি-জাগরণে ভাবিতেছে। শত্রুকেও মিত্রে পরিণত করিবার শিক্ষা বৃটিশ চরিত্র হইতে জার্ম্মাণরা আজকাল শিখিতে সুরু করিয়াছে। জাপানীরাও জার্ম্মাণদের ওই বিদ্যার শিক্ষক হইবার উপযুক্ত।

অগ্নি-পরীক্ষা

[শ্রীনিশিকান্ত সেন]

বসন্তের স্নিগ্ধ হাওয়ায়, খোলা ছাতের সান্ধ্য-সভায় কবিতা পাঠ করছিলুম—আমার নিজের লেখা কবিতা। শ্রোতা ছিলেন আমার বন্ধু-বান্ধব—বালখিল্য লেখক-সম্প্রদায়। তাদের কেমন লাগছিল বলতে পারিনে, তবে আমি যে মশগুল্ হয়েছিলুম, তার সন্দেহ নেই। হঠাৎ পাড়ার ব্রজমোহন ঠাকুরদার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখি, তিনি আমার ঠিক সামনেই একটা তাকিয়ার ওপর কাত হয়ে পড়ে মুচকি হাসি হাস্‌ছেন। কখন যে ঠাকুরদা সভায় প্রবেশ করে সভার মর্ম্মস্থান দখল করে বসেছেন, টেরও পাই নি। সলজ্জভাবে খাতাখানা বন্ধ করতেই তিনি বল্‌লেন, "কেন বন্ধ করলে হে? লজ্জা কিসের? নাচতে বসে ঘোমটা!—এ আবার কোন্ দেশী ঢং?"

আমাদের এই ঠাকুরদা লোকটি রসিক এবং রসগ্রাহীও বটেন, তবু তাঁর কাছে প্রেমের কথা পাড়তে গেলেই, কেন যে তা প্রলাপের মতো অর্থহীন খাপ-ছাড়া শোনায়, বল্‌তে পারিনে। বয়সের তফাৎও অবশ্য এর একটা কারণ হতে পারে। যাই হোক এটা যে দুর্ব্বলতা, তা অস্বীকার করা যায় না। আর দুর্ব্বলতা দশের কাছে প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। তাই সেটাকে কোন রকমে চাপা দেবার জন্যে বল্‌লুম, "ঠাকুরদা, উলুবনে মুক্তো ছড়াবার পাত্তর আমি নই।"

ব্রজমোহনবাবু স্মিতহাস্যে বল্‌লেন, "উলু হলেও এ সোনার উলু ভায়া, মুক্তো ছড়ালে তা নিতান্ত অস্থানে পড়ত না। কিন্তু তোমার মুক্তো যে খাঁটি মুক্তো নয়—ঝুটো, তার প্রমাণ এই যে, তুমি তা ভয়ে-ভয়ে লুকিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করছ—পরখ করতে দিচ্ছ না।"

আমি বল্‌লুম, "ঠাকুরদা, তোমার ও-বয়সে খাঁটি বলে যদি কিছু মনে হয়—সে ভগবদ্ভক্তি; দুঃখের বিষয়, আমার কবিতায় আর যাই থাক্, ও-জিনিসটার নামগন্ধও নেই—আমি কবুল করছি।"

ব্রজমোহনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "সে কি খুব একটা গৌরবের কথা? বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঐ ভক্তি আর ভক্তের সম্বন্ধে কি বলে গেছেন, শুনবে?—

'তাবৎ রাজ্যাদি পদ সুখ করি মানে।
ভক্তিসুখ মহিমা যাবৎ নাহি জানে॥
রাজ্যাদি সুখের কথা সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ-সুখ অল্প জানে কৃষ্ণ-অনুচরে॥"

আমার এক গল্পপ্রিয় বন্ধু অধীর হয়ে বল্‌লেন, "ও ইষ্টুপিডের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা—ওর মাথায় স্ত্রী, আর স্ত্রীজাতির রূপ যৌবনের মাহাত্ম্য ছাড়া আর কোনো জিনিসেরই স্থান নেই। গাধা পিটলে বরং সে একদিন ঘোড়া হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু ভক্তি-শাস্ত্রের ঝড় বইয়ে দিলেও যে তুমি ওকে কৃষ্ণ অনুচর করে তুলতে পারবে, তার আশা নেই তুমি গল্প বলো।"

ঠাকুরদা হেসে বল্‌লেন, "বলতে হলেও যে, আমাকে ঐ ভক্তি-তত্ত্বেরই গল্প বলতে হয়। তোমাদের কবি-বন্ধু বলেছেন, এ বয়সে খাঁটি বলে যদি কিছু মনে হয় তো সে ভক্তি; কথাটা বড় মিথ্যে নয়। তা হলে খাঁটি বলে যা জানি, আর মানি, তারই একটি গল্প বলাই ভাল—কি বলো?"

চারদিক থেকে সমস্বরে আপত্তি উঠল, "রক্ষা করো, রক্ষা করো ঠাকুরদা, ভক্তি-ফক্তি তোমার এ ভাক্ত সভায় চলবে না, তা তোমার বোঝা উচিত।"

ঠাকুরদা বল্‌লেন, "তা হলে বুঝতে হবে, এ সভায় একমাত্র সচল পদার্থ হচ্ছে, স্ত্রী আর স্ত্রীজাতির রূপ-যৌবনের মাহাত্ম্য,—যাতে শুধু আমার কবি-ভায়ারই মন মজেনি, সভার আর দশজনেরও মন মাতোয়ারা। যাই হোক, ওতেও তোমাদের ঠাকুরদা পেছপাও নয়।"—বলে তিনি পার্শ্বস্থ গড়গড়ার নলটি মুখে পুরে দিয়ে সমাহিত-চিত্তে ধূমপান করতে লাগলেন। আমিও উপস্থিত তাঁর সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

কিছুক্ষণ পরে গড়গড়ার নলটি সশব্দে বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে একটু খাড়া হয়ে বসে ব্রজমোহনবাবু বললেন, “এক সময় তোমাদের এই ঠাকুরদার বয়স ছিল, তোমাদের মতোই কাঁচা, এবং তারও তরুণ সাঙ্গোপাঙ্গের অভাব ছিল না। এ কথাটা আজ তোমাদের কাছে বিদ্রূপের মতো ঠেক্‌লেও মিথ্যা নয়—আজকের এই বসন্তের রাত্রের মতোই সত্য। তখনো এমনি-ধারা চাঁদ উঠত, ফুল ফুট্‌ত, কোকিল ডাকৃত, সুতরাং আমরাও অহরহ ভক্তিতত্ত্বের চর্চ্চা করতুম না। প্রেমিক এবং কবি দুচারজন আমাদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু এত মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক-পত্রের ছড়াছড়ি যে তখনকার দিনে ছিল না, তা সত্য, কাজেই প্রেমিকের প্রেম এবং কবির কাব্য অনেক সময় সদর অন্দর কি, বড় জোর বন্ধু-মহলেই গুলজার করতে পারত, তার বেশি এগুতে পারত না।

আমাদের এই নব্য দলে নবীনমাধব একাধারে কবি এবং প্রেমিক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল—অবশ্য ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে। বে' হবার অনেক পূর্ব্বেই নবীন তার অজানা ভাবী পত্নীর উদ্দেশে ঢের-ঢের প্রেমের কবিতা লিখেছিল। বে'র পরেও যেরকম অবস্থায় পড়ে সে কাব্য-চর্চ্চা করেছে, তাতে করে তাকে মহাকবি আখ্যা না দিলে অন্যায় করা হয়। কিন্তু তার কবিতাগুলি আমরা যে-ভাবে গ্রহণ করতুম, তার পত্নী লীলাবতী ঠিক সেভাবে গ্রহণ করত বলে মনে হয় না। নবীনের যে-সব করুণ-রসের প্রেমের কবিতা শুনলে আমাদের দস্তুর মতো কান্না পেত, তাই শুনে অনেক সময় লীলাবতীর হাস্যরসের উদ্রেক হত! স্বামীর কবিতা যে লীলাবতীর কাছে ঠাট্টার সামগ্রী ছিল, তা অবশ্যই নয়। কেননা, সে স্বামীকে ভালবাসত, এমন কি ভক্তি কর্‌ত বললেও মিথ্যা বলা হবে না। তবু তার হাসি পেত। তার কারণ বোধ হয় এই যে, হাস্যরসের দিকটা তার অসামান্য বিকাশলাভ করেছিল—অসম্ভব স্থান থেকেও সে ঐ রসের আঘ্রাণ পেতে পারত। কিন্তু তার হাসির মধ্যেও আবার একটুখানি বৈচিত্র্য ছিল, হাসি পেলেই সব সময় সে হাস্‌ত না—হাসিটাকে ইচ্ছা মতো চেপে রেখে ভাল মানুষের অভিনয় করতে পারত। কাজেই, দেখা অস্ত্র অপেক্ষা অ দেখা অস্ত্রের আঘাত যেমন মারাত্মক হয়ে থাকে, লীলার এই অ-দেখা হাসির আঘাতও তেমনি অনেক সময় স্বামী বেচারার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠ্‌ত।

বে'র পর নবীন যখন সবপ্রথম শ্বশুরবাড়ী গিয়ে গভীর রাত্রে লীলাবতীকে তার কবিত্বের পরিচয় দেয়, সে বেশ গম্ভীরভাবেই তা গ্রহণ করেছিল। নবীন ভাবলে, কেল্লা ফতে—চিত্তজয়ের আর বিলম্ব নেই। কিন্তু পরদিন, বেলা আন্দাজ দশটায় তার সেই নিশীথের ছন্দে-গাঁথা প্রেম-সম্ভাষণ ছোট-ছোট শালী-শালাজদের কণ্ঠে এমনভাবে একতানে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল যে, নবীনের আর অধিকক্ষণ শ্বশুরবাড়ীতে টিকে থাকা সম্ভবপর হল না—মধ্যাহ্ন ভোজন অসমাপ্ত রেখেই তাকে সেখান থেকে চম্পট দিতে হল।

এর জন্যে অবশ্য স্ত্রীর ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, গোপন-কবিতা শেখানো এবং তার আবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়ায় লীলার হাত ছিল, সন্দেহ করা যায়। কিন্তু নবীনমাধব যে প্রেমিক আর কবি ছিল, তা ভুলে গেলে চলবে না, এবং স্ত্রীও ছিল রূপসী। নবীন এর পরেও অবশ্য লীলাকে লীলাপদ্ম এবং গাজিপুরের গোলাপ বলে সম্ভাষণ করেছে, কিন্তু কাঁটার উল্লেখ করতে ভোলেনি।

বে' হবার কিছুদিন পরে, একদিন ফাগুন রাতের অশান্ত হাওয়ায় মনে হল, জগতের বাস্তবতার শিকড়গুলো সব আলগা হয়ে উঠেছে। আকাশের জ্যোৎস্না স্বপ্নলোকের সন্ধান নিয়ে এসে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছে; বাইরে আমবাগানে পাপিয়ার কণ্ঠে যে সুর শোনা যায়, তাকে ইহলোকের সুর বলে চেনা যায় না। লীলাবতী নবীন-মাধবের ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি আমায় ভালবাস?”

অন্যত্র অন্য সময় হলে হয় তো নবীন মনে করত, ঠাট্টা। কিন্তু আজকের এ নিশীথে যে অসম্ভবও সম্ভাবনার তীরে অবতরণ করেছে! লীলার কথাকে সে বিদ্রূপ বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না; খুব গম্ভীর হয়েই তার কথার জবাব দেবার চেষ্টা করলে। এমন একটা কবিত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাবে নবীনের কবিত্বের সাগর উদ্বেলিত হয়ে ওঠারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু জবাব দিতে গিয়ে দেখলে, কোনো কথাই তেমন জোগাচ্ছে না; সুতরাং এ অবস্থায় অধিকাংশ লোকেও যা বলে থাকে, সেও তাই

বল্‌লে। বল্‌লে যে, "তুমি কি জান না, ভালবাসি, কি না-বাসি ?"

লীলা বল্‌লে, "না। আমি শুন্‌তে চাই,—তোমার মুখ থেকে। সবাই তো বলে ভালবাসি, কিন্তু সবাই কি আর ভালবাসে সবাইকে ?"

নবীনমাধব সগর্ব্বে বল্‌লে, "তুমি কি আমাকে সকলকার সমান মনে করো ?"

লীলা বললে, "না, তা অবিশ্যি মনে করিনে। কিন্তু তুমি আমাকে বলো, গাজিপুরের গোলাপ ; শুনে যে আমার আনন্দ না-হয় তা বলতে পারিনে ; আবার ভয়ও হয়, বুঝি এই রূপের জন্যেই আমার এত আদর, এত ভালবাসা। কিন্তু রূপ মানুষের কদিনের ? যখন এ না থাকবে ?"

নবীন লীলার হাতের আঙুলগুলো মটকে দিতে দিতে বললে, "তখন তো দরকার হবে না রূপের। মানুষের অন্তরের পরিচয় পাবার জন্যেই না তার বাইরের রূপের দরকার যা-কিছু ? সেই পরিচয়ই যখন পাকা হয়ে ওঠে, তখন রূপ থাক্, আর যাক—কি আসে যায় ?"

"কি করে জানব যে, পরিচয় কাঁচা নেই—পাকা হয়ে গেছে ?"

"কেন মন দিয়ে।"

লীলা হাসির ভরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌লে, "ঐ শোনো, কাক ডাকছে। পোড়া কাকের মন বলছে, সুপ্রভাত। কিন্তু তবু ত্যাখো, রাত দুপুর!"

নবীন সভয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে দেখ্‌লে, লীলা যেন বিদ্রূপের একখানি শাণিত খড়্গ—বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কবিত্ব মাধুর্য্য খণ্ড খণ্ড করে কেটে জল্ জল্ করে জলছে।

এর পরেই এল, জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠিবাঁটা। মাস পড়তেই নবীনমাধবের শ্বশুর লীলাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তাঁর কন্যা-সন্তান এবং পুত্র-সন্তান দুই-ই ছিল, তবু তিনি কন্যাদের কম ভালবাসতেন না। তার কারণ, তাঁর ভালবাসার পক্ষপাত ছিল না এবং তখন বাজারও ছিল সস্তার। কন্যাকে ভালবাসতে হলে জামায়েরও আদর-যত্ন চাই। নবীনের মাঝে-মাঝে শ্বশুরবাড়ী থেকে সাদর নিমন্ত্রণ আসত। ষষ্ঠীবাঁটা উপলক্ষেও এল। কিন্তু এর পূর্ব্বে বারকতক সেখানে নেমন্তন্ন খেয়ে নেমন্তন্নের ওপর নবীনের এম্‌নি একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল যে, এবার ষষ্ঠী-বাঁটার নামে তার পেটের অসুখ করে বস্‌ল। তখনকার দিনে লোকেরা কেমন করে খাওয়াতে হয় তা জান্‌ত, আর জানত, জামাই-জনকে নিয়ে সাধ-আহ্লাদ করতে। তার ওপর নবীনের শ্বশুর ছিলেন জামাই-বৎসল।

কিন্তু হলে কি হয়, সে-কালের শ্বশুরবাড়ীর আহার আর রঙ্গরস হজম করবার ক্ষমতা নবীনমাধবের ছিল না। একালের কবিদের মতোই সে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, ছিপছিপে, আর পেটরোগা—ডিসপেপ্‌টিক—ছিল কি-না তাই।"

সভার সবাই একসঙ্গে হো হো—হা-হা—হি হি করে হেসে উঠল। ঠাকুরদার গল্পটা যে আমার প্রতি বক্র-কটাক্ষ, তা বুঝতে কারো আর এতটুকু বাকি রইল না। কিন্তু ঠাকুরদার এ কটাক্ষ উপভোগের সামগ্রী ; আমিও সে হাসিতে যোগ না দিয়ে থাকৃতে পারলুম না। বল্‌লুম, "ঠাকুরদা, তুমি বোধ হয় তোমার শ্বশুরবাড়ীর ঐ সব আহার্য্য বেশ বে-মালুম হজম করতে পারতে ?"

ঠাকুরদা আবার গড়গড়ার নলটি হাতে তুলে নিয়ে বল্‌লেন, "এখনকার হজমশক্তির নমুনা দেখেও কি তা বুঝতে পারছ না, ভায়া ! কিন্তু নবীনের ধাত ছিল আর এক রকমের, তা বলেছি। ভয়ে ষষ্ঠীবাঁটার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে পারলে না। কিন্তু স্ত্রীর জন্যে অস্থির, আর বিরহের কবিতায় আমাদের অতিষ্ঠ করে তুললে। লীলাবতী ঘরে ফিরলে যে নবীন একলাই বাঁচে, তা নয়, আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু তার এমনি বুদ্ধি-বিবেচনা যে, ষষ্ঠীবাঁটার পরের সপ্তাহেও ঘরে ফিরে আসার নামটি করলে না। দরোয়ান রামাবতার তাগিদ দিতে গেল, কিন্তু তারা বলে পাঠালে যে দিনকতক বাদেই যাচ্ছে, ব্যস্ত হবার কারণ নেই।

দিনকতক মানে অবশ্য বড় জোর সপ্তাহ। কিন্তু এক পক্ষের মাথায়ও যখন লীলাকে পাওয়া গেল না, তখন শ্বশুরবাড়ীর কথায় শ্রদ্ধা রক্ষা করা নবীনের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। সে অগত্যা ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন করলে। ওদিনে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন মানুষে পুণ্যি লাভের জন্যেই করে—অন্ততঃ সেকালে তাই করত ; কিন্তু

নবীনমাধব করলে স্ত্রীলাভের জন্যে। লীলাবতী রসিকা, সুতরাং আমুদেও বটে। সাধ-আহ্লাদ কাজ-কর্ম্মের নামে সে নেচে উঠত। লীলা যে এই ব্যাপারে যোগ না দিয়ে থাক্‌তে পারবে না, এই ছিল নবীনের বিশ্বাস। সে কাজের আগের দিন সকালবেলা রামাবতারকে শ্বশুরবাড়ী পাঠালে, আর এই মর্ম্মে একখানি চিঠি দিলে যে, এই ব্যাপারে খুব ব্যস্ত আছে বলেই নিজে যেতে পারলে না, নইলে নিশ্চয় সে যেত, এবং লীলাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসত।

নবীনের বড় শালাজ পত্রখানি পড়ে দেখে বললেন, "তা বেশ, যাবে এখন তার আর কি, কিন্তু সে জন্যে তোমার বসে থাকার দরকার নেই—বাড়ীতে কাজ।"

রামাবতার বললে, "বাবু যে এখনি নিয়ে যেতে বলেছেন। একবার দেখা হয় না তাঁর সঙ্গে?"

বড় শালাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, "দেখা হয়ে তো কোনো ফল নেই। এ বাড়ীতে আমার কথার ওপর কথা কইবার ক্ষ্যামতা কারো নেই। তবে যখন বলেছি, যাবে; তখন যাবেই অবিশ্যি। কিন্তু এবেলা এখনি না খেয়ে দেয়ে তার যাওয়া হতে পারে না।"

রামাবতারকে ক্ষুণ্ণমনে ফিরতে হল।

আষাঢ়ের লম্বা বেলা যে নবীন কি ভাবে কাটালে, তা সেই জানে। তারপর এল রাত। রাত যতই ঘনিয়ে আসে, নিরাশার অন্ধকার ততই যেন তার বুকের ওপর ভারি হয়ে চেপে বসে, আর মনে হয়, সব বৃথা, সব বৃথা,—বৃথা এ ঘরসংসার, বৃথা এ ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন। ভোজনের এই ব্যর্থ আয়োজনটা কোনোগতিকে বন্ধ করা যায় না?

রাত যখন প্রায় দুপুর, নবীনের বুকের রক্তস্রোতে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করে এক রমণী তার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। মাথার ঘোমটা তার বুক-অবধি ঝোলানো, এবং ঘোমটার মুখ বাঁ-হাতের আঙুলে বেশ আঁট করে জড়ানো। কোনো কথা না কয়ে সে ধীরে ধীরে খাটের একটি পাশে এসে বস্‌ল। মুখ না দেখতে পেলেও এই অবগুণ্ঠনবতী যে কে, তা বুঝতে নবীনকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। ঘোমটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "লীলাময়ীর এ আবার কি আশ্চর্য্য লীলা?"

লীলা খাটের পাশ থেকে নেমে এসে মেঝের ওপর বস্‌ল; ঘোমটাও খুললে না, কথাও কইলে না।

নবীন কবিত্ব করে বললে, "পিপাসী জনকে আর কেন ছলনা করছ, লীলা?"

লীলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে, "তুমি আর আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না, আমি যে অমনি ছটফট্‌ করে মরছি।"

নবীন একটু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে তোমার?"

লীলা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "বল্‌ছি। কিন্তু আগে কথা দাও যে, তুমি আমার মুখ দেখ্‌বে না।"

কাষ্ঠহাসি হেসে নবীন বললে, "স্ত্রীর মুখ না-দেখে মানুষ কখনো স্থির থাক্‌তে পারে?"

লীলা বল্‌লে, "কেন পারবে না? তুমিই না বলেছিলে, পরিচয় পাকা হয়ে গেলে, আর রূপের দরকার নেই?"

নবীন হো হো করে হেসে খাট থেকে নেমে পড়ে বল্‌লে, "তাই জন্যেই বুঝি আজ আমার এই অগ্নি-পরীক্ষা? কিন্তু এ পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হতে পারব না—জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব—স্বীকার করছি।"

লীলা ত্রস্ত হয়ে সরে গিয়ে বল্‌লে, "তা হলে তোমার কথার কি কোনো মূল্য নেই—সবই মিথ্যে ছলনা?"

লীলার কথার মধ্যে একটা অপ্রিয় সত্যের খোঁচা ছিল, নবীন থতমত খেয়ে বল্‌লে, "না না আমি যে রসিকতা করছিলুম তোমার সঙ্গে, তা কি তুমি বুঝতে পারনি নাকি?"

লীলা তার ঘোমটা-ঢাকা কপালে করাঘাত করে বললে, "আঃ আমার পোড়া কপাল! ওর নাম রসিকতা! তা কি করে বুঝব, এতকাল ছিলে কবি—খালি দুঃখের কবিতাই লিখেছ, আমার এই দুঃসময়ে হঠাৎ যে তোমার আবার রসের জোয়ার আসবে তা কে জানতো বলো?"

নবীন লজ্জিতভাবে বললে, "কি হয়েছে তোমার, তাই বল না?"

লীলা বেদনাতুর স্বরে বললে, "মুখ আমার দেখাবার উপায় নেই, দেখাবার হলে নিশ্চয় দেখাতুম আমি, কিছুই বলতে হত না তোমাকে।"—

নবীন অধীর হয়ে বললে, "কখনো দেখতে পাব না মুখ!

দিন রাত চব্বিশঘণ্টা তুমি অমনি ধারা মুখের ওপর ঘোমটা টেনে জুজু হয়ে বসে থাকবে! এতো মজার কথা মন্দ নয়!"

লীলা বললে, "বসে অবিশ্যি আমি থাকব না—কাজকর্ম্ম যা-যা করবার হয়, সব আমি ঠিক ঠিক করে যাব। খালি—"

"খালি দুজনের মধ্যে পর্দ্দার একটা অসহ্য নিষ্ঠুর অন্তরাল রেখে! নিশ্চয় তুমি ক্ষেপেছ।" ধৈর্য্যহারা নবীন স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জোর করে তার মুখের ঘোমটা খুলে দিলে!—বাপস্! স্ত্রী, না শ্মশানচারিণী বীভৎসতা! এত রাত্রে ঘরে ঢুকে নবীনের প্রাণের উদ্বেল কবিত্বশক্তিকে হিম করে জমাট বেঁধে দিতে এসেছে! অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ হাত তফাতে সরে গিয়ে নবীন গলা কাঁপিয়ে ডাকতে লাগল "রা-রা—রাম! রা-রা মা!!"

লীলা চাপা গলায় বললে, "চুপ করো, চেঁচিও না!"

নবীন অত্যন্ত ভীত ও উত্তেজিত হয়ে বললে, "চেঁচাব না! কেন চেঁচাব না? রা-রা রামা, রামা—বতার!"

লীলা বললে, "তুমি অমন করছ কেন? আমি মরে ভূত হইনি সত্যি।"

নবীন বললে, "না-মরেই! কি ভয়ানক!—রা-রা, রামাব—তার!"

লীলা বললে, "আগে শোনোই কি হয়েছে, তারপর চেঁচিও যত পারো। ষষ্ঠীবাঁটার দিন সখ করে রান্না করতে গেলুম। তুমি যে যাবে না, সে কি আমি জানি? জানলে কি আর আমি রান্নার কাছে যাই, না আর কিছু করি! তুমিও গেলে না, আর ওদিকে কড়ার তেল জ্বলে উঠে আমার এই দশা! যাই আর কি!—চোখ গেল, মুখ গেল জ্বলুনী পুড়ুনীতে প্রাণও যায় যায়! তখনি সবাই তোমাকে খবর দিতে চেয়েছিল, কেবল আমিই দিতে দিই নি। ভাবলুম, আমি মরব না। এ জ্বালাও যেমন করে হোক, বরদাস্ত হবে। কিন্তু এ পোড়া মুখ তাঁকে আমি দেখাতে পারব না কিছুতে। তিনি আমাকে অকলঙ্ক চাঁদ বলেন, গাজিপুরের গোলাপ বলেন। আগে অযুধপত্তর দি, ঘা শুকিয়ে মুখের শ্রী ফিরে আসুখ, তারপর যা হয় হবে। কিন্তু কি গেরো! পোড়া ডাক্তার আইডিন মাইডিন কি সব লাগিয়ে আমার মুখের দফা একেবারেই শেষ করে দিয়েছে। ঘা যতই শুকুচ্ছে, দাগ ততই জ্বল-জ্বলে হয়ে মুখময় ফুটে বেরুচ্ছে।"

নবীন অস্ফুট স্বরে বললে, "কি ভয়ানক!" যদিও বহুক্ষণ পূর্ব্বেই লীলা ঘোমটা টেনে ভাল করে মুখ ঢেকে বসেছিল, তবুও নবীনমাধবের মনে হল, যেন লীলার মুখের অতি বিকট আকার সাদা কালো লালচে দাগগুলো কাপড়ের ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে!

লীলা মিনতিপূর্ণ স্বরে বললে, "ওগো, কেন তুমি আমার বাইরেটা দেখছ?—অন্তর ত্যাখো, সেখানে আমি যে কত সুন্দর—কত পারিজাত, কত মন্দারের শোভায় ঝলমল্! আমার এই মুখখানাই আমার সব নয়, ওগো, সে কথা আজ তুমি কেন ভাবতে পারছ না?"

নবীন কথা কইলে না, কাঠের মতো শক্ত হয়ে ভাবতে লাগল, মুখ মুখ, মুখ আজ মনে হচ্ছে জগতে—মুখই সর্ব্বস্ব, মুখ ছাড়া আর কিছুই মনে করবার নেই। বাগানের গোলাপ বলো, জলের পদ্ম বলো, আকাশের চাঁদ বলো—মুখ বই আর কিছুই নয়। মুখের জন্যই আজ এই নারী, তার জীবনের সমস্ত গৌরব সমস্ত মাধুর্য্য হারিয়ে মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা। আজ ওকে ভালবাসা দূরে থাক, স্ত্রী বলে স্বীকার করতে, বুকের কাছে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারে, জগতে এমন কোনো ভদ্রসন্তান, এমন কোনো বীর পুরুষ আছে বলে, কল্পনা করাও অসম্ভব। নবীনমাধব ঢোক গিলে বললে, "এই অবস্থায় তোমার এখানে আসার কি দরকার ছিল, লীলা?"

লীলা বললে, "কেন, তোমার কাছে আশ্রয় পেতে। আর যে যাই বলুক, যে যাই করুক, আমি জানি যে, তুমি আমায় পায়ে ঠেলতে পারবে না।"

মাথা চুলকে নবীন বললে, "কিন্তু কাল আমার বাড়ীতে কাজ, কত লোক আসবে নেমন্তন্ন খেতে। আমি বলি কি চল তোমাকে—"

লীলা বললে, "বাড়ীর একটা কোণে আমি চট্ মুড়ি দিয়ে চুপটি করে পড়ে থাকব, কেউ টেরও পাবে না—কেন ভাবছ?"

নবীন ত্রস্ত হয়ে বললে, "না-না সে কি হয়! এ বাড়ীতে তেমন লুকোবার জায়গা কই! থাকতে গেলেই কেলেঙ্কারী। এখন চল, তোমায় রেখে আসি। কাজকর্ম্ম চুকে যাক, তারপর যা হয় হবে।—চল লক্ষ্মীটি!"—বলে নবীনমাধব স্ত্রীর হাত ধরলে।

লীলা দুহাতে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বল্‌লে, "আর তোমাকে আমার জন্যে অতো কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। আমার পথ আমি নিজেই চিনে নিতে পারব।"—বলেই সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মিনিট চার পাঁচ পরে আবার বিদ্যুৎগতিতে ঘরের ভিতরে ছুটে এসে আলোর কাছে দাঁড়ালে। নবীন সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, ঘোমটা নেই, মুখে মেঘকলঙ্কহীন শরচ্চন্দ্রের শোভা। লীলা দাঁতে ঠোঁট চেপে সুধাবিষে মিশিয়ে কি একটা অদ্ভুত হাসি হাসছে! আজ যে তার লীলাময়ী লীলা বহুরূপিণী সেজে স্বামীর সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছিল, তা বুঝে নবীন যতই হাসবার চেষ্টা করে, ততই তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, আর গা দিয়ে দরদরধারে ঘাম ছুটতে থাকে। এই শঙ্কটাপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করেও লীলা স্বামী বেচারার প্রতি কিছুমাত্র করুণা প্রকাশ করলে না। রূপের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য যত দূর দেখাবার হয় দেখিয়ে বিশ্ববিজয়িনী মূর্ত্তিতে হেলে দুলে দরজার দিকে অগ্রসর হল।

নবীনের সাধা প্রেম, সখের কাব্য, আর সাধের ভোজ এক সঙ্গে আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল।" বলেই ঠাকুরদা গড়গড়ায় মনোনিবেশ করলেন। তৎক্ষণাৎ চারদিক থেকে চীৎকার উঠ্‌ল, "তারপর? তারপর?"

ঠাকুরদা বললেন, "তারপর যে কি, তাও যদি তোমাদের বলে দিতে হয়, তা হলে তোমরা বৃথাই গল্প লিখছ—গল্প লেখা তোমাদের বিড়ম্বনা।"

আমি বল্‌লুম, "তারপর অনাবিল ভক্তিতত্ত্ব,—

স্মরগরল খণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

ইত্যাদি।"

ঠাকুরদা উৎসাহের সঙ্গে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "এ ছোকরার রসজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান দুই-ই আছে, এ কালে লেখক বলে নাম কিন্‌তে পারবে।"

মাঙ্গালোর

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি-এল]

মালাবার-উপকূলের কানানোর হইতে মাঙ্গালোরের দূরত্ব ৮১ মাইল; মেল ট্রেণে ৩ ঘণ্টার পথ। রেলওয়ে লাইন বরাবর পশ্চিম উপকূল ধরিয়া উত্তরাভিমুখে গিয়াছে। চলন্ত গাড়ী হইতে বাম দিকে পুনঃ-পুনঃ দিগন্ত-বিস্তৃত আরব সমুদ্রের নীলাম্বুরাশি দেখিতে পাওয়া যায়।

মাঙ্গালোর দক্ষিণ-কানাড়া জেলার প্রধান সহর। এই জেলা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত; ইহার উত্তরে উত্তর-কানাড়া—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত; পূর্ব্বে মহীশূর রাজ্য।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়ার মধ্যে কোনই প্রভেদ লক্ষিত হইল না। সেই সারি-সারি নারিকেলকুঞ্জ, অনন্ত গিরিশ্রেণী, শ্যামল শস্যক্ষেত্র। মাঝে-মাঝে নদী ও জলাভূমি (ব্যাক্-ওয়াটার) দেখিতে-দেখিতে চলিলাম। এক স্থানে সুড়ঙ্গ-পথে ছোট একটি পাহাড় অতিক্রম করিয়া ট্রেণ চলিয়া গেল।

মাঙ্গালোর সহরের ঠিক দক্ষিণেই নেত্রবতী নদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। নদীর অপর পার হইতে ঘন নারিকেলতরু-বেষ্টিত মাঙ্গালোর নগর দৃষ্টিগোচর হইল। শকটমালা যখন সেতু-বক্ষে, তখন ঠিক সন্ধ্যা:—

আকাশ সোণার বর্ণ　　সমুদ্র-গলিত স্বর্ণ
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোণার স্বপন।"

আরব-সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সহরে প্রবেশ করিলাম। সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এই লাইনের ইহাই শেষ ষ্টেশন (terminus)।

মাঙ্গালোর সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর হইলেও, সহর ও সমুদ্রের মধ্যে "ব্যাক্-ওয়াটার।" এই জন্য বড়-বড় জাহাজ বাহির

সমুদ্র হইতে বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু অসংখ্য দেশীয় নৌকার ইহা আশ্রয়-স্থান।

কিম্বদন্তী অনুসারে, পরশুরাম কর্ত্তৃক সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধৃত কেরলদেশ সহ্যাদ্রির পশ্চিমভাগে উত্তরে কানাড়া হইতে দক্ষিণে ত্রিবঙ্কুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভৌগোলিক হিসাবেও, মালাবার প্রদেশের সহিত কানাড়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কিন্তু কানাড়ার অধিবাসী ও মালাবারবাসীদের মধ্যে আচার, ব্যবহার, ভাষা, পরিচ্ছদ, ইত্যাদি কোন বিষয়েই সাদৃশ্য নাই। কানাড়ার অধিকাংশ লোকের ভাষা "কন্নাড়"—সংস্কৃতে "কর্ণাটক।" মহীশূর, কুর্গ, এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্রেও এই ভাষা প্রচলিত। কানাড়ায় হিন্দুদিগের মধ্যে গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণ এবং "বন্ত" নামক শূদ্র জাতি প্রধান। 'বন্ত' জাতি ভূম্যধিকারী। 'বিল্লভী' নামে একটি জাতি আছে—উহারা তাড়ি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। মান্দ্রাজের অন্যান্য জেলার তুলনায়, লোক-সংখ্যার অনুপাতে এখানে ব্রাহ্মণ বেশী—শতকরা বার জন।

মাঙ্গালোর নগরের উপকণ্ঠে 'মঙ্গলাবতী' দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। এই দেবীর নাম হইতেই স্থানের নাম হইয়াছে—'মাঙ্গালোর' অর্থাৎ "মঙ্গলা-পুর।"

১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পর্টুগীজ ভাস্ক-ডি-গামা মাঙ্গালোর আক্রমণ করেন। তখন এই অঞ্চল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই বাণিজ্য-সূত্রে মাঙ্গালোর ভারতবর্ষের বাহিরে পরিচিত ছিল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পর্টুগীজ কর্ত্তৃক এই নগর অধিকৃত হয়, এবং সেই সময় হইতে ক্যাথলিক পাদ্রি-সম্প্রদায় এই অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। ক্রমশঃ সমগ্র পশ্চিম উপকূলেই পর্টুগীজদিগের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু রাজত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে তাহারা প্রস্তুত ছিল না। রাজ্য-শাসনের ভার স্থানীয় নৃপতিগণের উপর ন্যস্ত করিয়া, তাহারা প্রতি বন্দর হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যদ্রব্য কর-স্বরূপ আদায় করিত। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে পর্টুগীজগণ মাঙ্গালোরে প্রথম কুঠী স্থাপন করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাসবাপ্পা নায়ক নামক একজন রাজা মাঙ্গালোরে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে, মহীশূরপতি হায়দর আলি হিন্দুরাজশক্তি চিরদিনের জন্য নিষ্পেষিত করিয়া মাঙ্গালোর অধিকার করেন। তিনি এখানে রণপোত ও যুদ্ধোপকরণের এক কারখানা স্থাপন করেন। ইহার পর ইংরেজদিগের সহিত হায়দর আলির বিরোধ উপস্থিত হয়। ইংরেজগণ মাঙ্গালোর দখল করেন। কিন্তু টিপু সুলতান ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে উহার পুনরুদ্ধার করিয়া দুর্গটি বিধ্বস্ত করিয়া দেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুর পতনের পর, কানাড়া জেলা ইংরেজ শাসনে আসিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অঙ্গীভূত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, এই জেলার উত্তরভাগ 'উত্তর কানাড়া' নামে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

মাঙ্গালোরে আসিলে ইহার শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "মাঙ্গালোর টালি" (tiles) আজকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিখ্যাত। বাঙ্গালাদেশের সুদূর প্রান্তেও গৃহনির্ম্মাণে "Basel Mission" নামাঙ্কিত লাল রঙের টালির ব্যবহার দেখিয়াছি। 'ব্যাসেল মিশন' সম্প্রদায় প্রটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টান, জাতিতে জার্ম্মাণ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা মাঙ্গালোরে আসিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এবং টালি-নির্ম্মাণ, বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করেন। এখন মাঙ্গালোরে অনেকগুলি টালি-নির্ম্মাণের কারখানা চলিতেছে—উহাদের কতকগুলির মালিক ভারতবাসী। এই সকল কারখানার উচ্চ চিম্‌নিগুলি সহরের বাহির হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। টালি ভিন্ন, মাঙ্গালোর হইতে কফি, মশলা, শুষ্ক নারিকেল (copra), চাউল, শুষ্ক মৎস্য, কাষ্ঠ ইত্যাদি দেশ-বিদেশে রপ্তানি হয়। এই বাণিজ্যের অধিকাংশই 'মপ্লা' জাতীয় মুসলমানদিগের হাতে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল পূর্ব্বে আরবদেশ হইতে আসিয়া মালাবার উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে প্রায় চৌদ্দ-আনা রোমান ক্যাথলিক। তাহাদের হিতার্থ ক্যাথলিক পাদ্রিগণ কয়েকটি শিল্প-বিদ্যালয় ও কারখানা খুলিয়াছেন। আমি একদিন তাঁহাদের পরিচালিত St. Joseph's Asylum—Industrial School and Workshops দেখিতে গেলাম। এইখানে নানাপ্রকার চামড়ার জিনিস, কাঠের আস্‌বাব এবং মৃন্মূর্ত্তি প্রস্তুত হইতেছে। মূর্ত্তিগুলি যীশু খৃষ্ট এবং মাতা মেরীর। ইঁহাদের কারখানার জুতা খুব ভাল। সেইজন্য নানা স্থান হইতে জুতার এত 'অর্ডার' আসে যে, অনেক সময় জুতা যোগাইয়া উঠা সম্ভব হয় না। শিল্প-বিদ্যালয়ে

এঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং প্রভৃতি নানা বিভাগ আছে। বহু দরিদ্র খৃষ্টান এই সকল কারখানায় শিক্ষালাভ ও জীবিকা উপার্জ্জন করে। কারখানার সমস্ত আয় অনাথ-আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রদত্ত হয়।

মিশনারীদের সদনুষ্ঠানের আর একটি নিদর্শন, স্বর্গীয় ফাদার মূলারের স্থাপিত কুষ্ঠাশ্রম, চিকিৎসালয় ও "দরিদ্র"-ঔষধালয়। এই ঔষধালয় হইতে বহুকাল যাবৎ অতি সুলভ মূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া আসিতেছে। সহরের এক প্রান্তে, "কঙ্কনদী" পাড়ায়, সমতল হইতে উচ্চ, বিস্তৃত এক ভূমি-খণ্ডে এই সকল আশ্রম অবস্থিত।

মাঙ্গালোরের রাজপথগুলি প্রশস্ত। য়ুরোপীয়গণ যে দিকে বাস করেন, সেই দিক বেশ সুন্দর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। সহরের মধ্যভাগে ফাঁকা ময়দান। তাহার এক ধারে ক্যাথলিকদিগের কুমারী-আশ্রম,—অনেক শ্বেতাঙ্গ বালিকা এখানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করে।

মাঙ্গালোরের প্রধান দ্রষ্টব্য জেসুয়িটদিগের St. Aloysius College। এটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ,—১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। সহরের সর্ব্বোচ্চ পাহাড়ের শীর্ষদেশ সমতল করিয়া তদুপরি কলেজের রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। কলেজ-সংসৃষ্ট ছাত্রাবাস ইত্যাদি পর্ব্বতের অধিত্যকায় অবস্থিত। এই কলেজ হইতে সমুদ্রের ঊর্ম্মিলীলা এবং বনরাজিনীলা বেলাভূমির দৃশ্য অতি মনোহর। ভারতবর্ষে এরূপ প্রাকৃতিক শোভা-সমন্বিত বিদ্যালয় আর আছে কি না সন্দেহ। আমার মনে হইতেছিল, এই কলেজের ন্যায় কোন স্থানে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইলেই বুঝি ঠিক উপযুক্ত হইত।

আমার সঙ্গী বলিলেন, এই কলেজ-সংলগ্ন উপাসনা-মন্দিরটি না দেখিলে কাহারও মাঙ্গালোর দর্শন সম্পূর্ণ হয় না। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এই সুসজ্জিত হর্ম্ম্যের প্রতি দেয়াল, স্তম্ভ, এবং ছাত, আড়াগোড়া চিত্রময়। যীশু খৃষ্টের জীবনের সমস্ত ঘটনা ও তাঁহার উপদেশাবলী সারি-সারি সুরঞ্জিত চিত্রে বর্ণিত। এরূপ বিচিত্র হর্ম্ম্য-চিত্র এসিয়াখণ্ডে আর কোথাও নাই। শুনিলাম, এই চিত্রাবলী একজন অসামান্য প্রতিভাশালী ইতালীয় পাদ্রির স্বহস্তে অঙ্কিত। তাঁহার নৈপুণ্য ও অধ্যবসায়ের কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। দেশীয় খৃষ্টান ছাত্রদের একটা বিশেষ রীতি লক্ষ্য করিলাম যে, তাহারা কলেজে আসিয়া প্রথমেই উপাসনা গৃহে প্রবেশ করে, এবং কয়েক মিনিট নীরবে উপাসনা করিবার পরে, প্রাচীর-সংলগ্ন একটি পাত্রে রক্ষিত পবিত্র জল অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া ক্লাসে যায়।

মাঙ্গালোরে গবর্ণমেণ্টেরও একটি কলেজ আছে;—সেটি দ্বিতীয় শ্রেণীর।

মাঙ্গালোর সহরের নিকটে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে; এবং পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থানে জৈনমন্দির ও জৈন স্তূপ বা স্তম্ভ এখনও অতীত জৈন-রাজত্বের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

মাঙ্গালোর হইতে ৩৭ মাইল উত্তরে, উডিপি নামক স্থানে বৈষ্ণব-গুরু মধ্বাচার্য্য (মাধবাচার্য্য) কর্ত্তৃক স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। মধ্বাচার্য্য ১১১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে শৈব ছিলেন; পরে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিয়া একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করেন। মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী। ইঁহাদের ভক্তি-সাধনার তিনটি বিশেষ অঙ্গ—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন।

(১) অঙ্কন—শরীরের দ্বাদশ স্থানে শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ।

(২) নামকরণ—বিষ্ণু অথবা বিষ্ণু-ভক্ত বুঝায়, এই রূপ নামে সন্তানগণের নামকরণ।

(৩) ভজন—সংকীর্ত্তন, নাম-জপ ও শাস্ত্র-পাঠ।

চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, চৈতন্য দেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে আসিয়া, মধ্বাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত "উডুপকৃষ্ণ" দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি যে মালাবার ("মল্লার-দেশ") হইতে মাঙ্গালোরের পথে উডিপি গিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। এখনও প্রতি বৎসর উডিপি-যাত্রী বহু বৈষ্ণব ভক্ত মাঙ্গালোরে আসিয়া থাকেন। আমি মাঙ্গালোরে পৌছিয়া দেখিলাম, একজন মহীশূরী ভদ্রলোক সপরিবারে ডাকবাঙ্গলার অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া আছেন; তাঁহারা তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে উডিপি যাইবেন। আজ-কাল মাঙ্গালোর হইতে উডিপি যাতায়াতে কোন অসুবিধা নাই—যাত্রীদের জন্য প্রাত্যহিক 'মোটর সার্ভিস' আছে।

শুভ-বিবাহ

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্]

(১)

সমস্ত দিনটা ঘন-কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া আছে এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িয়া কলিকাতার দেশী-পাড়ার রাস্তাগুলোকে অগম্য করিয়া তুলিয়াছে। না বাহিরে যাওয়া চলে, না ভিতরে থাকিতে মন রাজী হয়। আমরা মেসের একদল ছেলে গল্প-গুজব করিয়া এবং ঘুমাইয়া সমস্ত দিনটা কাটাইয়াছি ;—যাহারা খুব ভাল ছেলে তাহারাই শুধু কলেজ কামাই করে নাই।

ভরসা করা গিয়াছিল যে, বিকালের দিকটা হয় ত বা পরিষ্কার হইবে, এবং সমস্ত দিনের অবরোধ ঘুচাইয়া সেই সময় খুব খানিকটা বেড়াইয়া আসিব। কিন্তু সে আশা বৃথা, কারণ বিকালে বৃষ্টি আরও চাপিয়া আসিল। তখন আবার আমরা জমায়েৎ হইয়া বসিলাম, এবং চাকরের উপর হুকুম হইল যে, সাড়ে বত্রিশ হইতে আরম্ভ করিয়া যত-প্রকারের উপাদেয় ভাজা সে বাজারে পাইবে, তাহা জন-দশেকের মত প্রচুর পরিমাণে যেন লইয়া আসে।

আমাদের এই মেস্‌টি পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলেদের মেস্। কেহ বা এম্-এ, কেহ এম্-এস-সি এবং কেহ বি-এল পড়ে। ছাত্র-জীবনের এই অবস্থাই সব-চেয়ে লোভনীয় অবস্থা। কারণ তাহার সম্মুখে বিরাট ভবিষ্যৎ তাহার অসীম সম্ভাবনা লইয়া পড়িয়া আছে। যে ছেলেটিকে হয় ত ষাট টাকার মাষ্টারী করিয়া জীবন-যাপন করিতে হইবে, সেও ল'ক্লাশে যাতায়াত করিতে ভবিষ্য রাসবিহারী হইবার স্বপ্ন দেখে। এবং বাহির হইতে খাতিরও লাভ করা যায় প্রচুর! বাংলা-দেশে বিবাহ-যোগ্যা কন্যার পিতাদের অবিরাম দৃষ্টি এমনি এক-একটি মেসের উপর লাগিয়াই আছে এবং বোধ করি একটি দিন এমন যায় নাই যে, আমাদের এই মেস্‌টি কোনও না কোন ঘটক-প্রবরের শুভাগমন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে!

যা হোক, টাট্‌কা ভাজা আসিয়া পৌছানয় অন্ততঃ খানিক-ক্ষণের জন্য সময় কাটাইবার একটা ব্যবস্থা হইল দেখিয়া আমরা জন-দশেক ছেলে কতকটা আরাম বোধ করিলাম। গোটা-দুই বড় থালায় করিয়া ভাজা-গুলা সম্মুখে রাখা-মাত্রই তাহার দ্রুত সদ্ব্যবহার আরম্ভ হইয়া গেল।

এমন সময় সতীশ ভিজিতে-ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত। আমাদিগকে উক্ত প্রকার সদ্ব্যবহার-কর্ম্মে নিরত দেখিয়া কহিল, 'বাঃ রে, অতিথিকে অপমান! জানো দুর্ব্বাসা মুনির সেই অভিসম্পাতের কথা!'

আমি কহিলাম, 'অভিসম্পাতে প্রয়োজন নেই! হে অতিথি, আরম্ভ করুন।'

সতীশ আমাদের সহ-পাঠী; কলিকাতাতেই বাড়ী। তাহার স্বভাবের বিশেষত্ব এই যে, যেখানেই একটু অভিনবত্ব, খানিকটা বিপদের, অনিশ্চিতের আশঙ্কা, সেইখানেই তাহার রুচি। তাহা না হইলে এই বৃষ্টিতে তাহাকে আশা করা চলিত না। পিতার অবস্থা ভাল; সে এম্-এস্-সি পড়ে এবং ছেলে খুবই ভাল। পিতার ইচ্ছা ছিল, বি এল পাশ করিয়া সে একজন হোমরা-চোমরা উকীল হয়; কিন্তু যেহেতু সতীশের তাহাতে রুচি হয় নাই, সেই হেতু তাহাকে কিছুতেই বি-এল পড়ান গেল না।

(২)

ভাজা শেষ করিয়া সতীশ কহিল, 'নিয়ে এসো হার্ম্মোনিয়াম।'

সে গাহিতেও পারে বেশ। হার্ম্মোনিয়াম আসিলে, একবার তাহার ভাব-পূর্ণ চক্ষু দুটি সুদূরে প্রেরণ করিয়া গাহিতে লাগিল—

সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি
নন্দন-ফুল হার।
তুমি অনন্ত নব-বসন্ত
অন্তরে আমার!

গান শেষ হইয়া গেলে সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, যেন গানের ভাবে তাহা তখনও পরিপূর্ণ। গানের সৌন্দর্য্যে ও গাওয়ার মাধুর্য্যে শ্রোতাদের মনও স্তব্ধ, নিশ্চল হইয়া রহিল।

এমন সময় মৃদু চুড়ির আওয়াজ আসিল—ঠুন্-ঠুন্!

দেখা গেল, সম্মুখের বাড়ীর খোলা-জানালার সম্মুখে একটি কিশোরী বসিয়া, বোধ করি গানই শুনিতেছিল; অনবধানতায় চুড়ির শব্দ হইয়া থাকিবে। মেয়েটিকে দেখিয়া সহসা চোখ্ ফেরান কঠিন, এমনই শ্রী! ঘন-কৃষ্ণ কোঁকড়া চুলগুলি, গোলাপ ফুলের মত ঈষৎ রক্তিমাভ মুখের চারিদিকে ইতস্ততঃ বিন্যস্ত হইয়াছিল; মনে হইতেছিল যেন গানের সমস্ত সৌন্দর্য্যের ছাপ ওই মেয়েটির মুখে-চোখে পড়িয়াছিল।

সতীশ তাহার মুগ্ধ বিস্ফারিত চোখ দুটি মেয়েটির দিকে ফিরাইতেই, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েটির মুখে সৌন্দর্য্যের সহিত এমন একটা বিষণ্ন ভাব ছিল, যাহা মুহূর্ত্তে অনুভব না করিয়া থাকা যায় না এবং কেমন যেন একটা করুণারও উদ্রেক করে।

সতীশ কহিল, 'বাঃ দিব্যি মেয়েটি ত! এঁরা কে?'

মেয়েটিকে আমরা জানিতাম। আমাদের সম্মুখের বাড়ীর নরেন বাবুর ভাই-ঝি। মেয়েটি পিতৃহীনা; বছর দুয়েক হইল মাতৃহীনাও হইয়াছে। বিবাহের বয়স হইয়াছে; কিন্তু পাত্র পাওয়া যাইতেছে না; তাহার কারণ নরেন বাবুর অবস্থা তেমন ভাল নয়, এবং নিজের কন্যা হইলে যেরূপ চেষ্টা ও অর্থব্যয় হইতে পারিত, এ ক্ষেত্রে বোধ করি, তাহা সম্ভব নয়। মেয়েটি গাহিতে পারে চমৎকার, এবং বোধ হয় সতীশের গানই তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

সতীশ কহিল 'এঁরা কি জাত?'

যতীন কহিল 'বামুন, কেন হে?'

সতীশ কহিল, 'না, কিছু নয়। আমি এই কথাই ভাবছিলাম যে, পণ-গ্রহণের কসাই-গিরিতে বামুন আজ কারুর চেয়ে খাটো নয়! হয় ত বা একদিন শুনব যে, কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে ম'রে ঐ মেয়েটি বাংলার পাপের স্তূপকে প্রায়শ্চিত্তের পথে আরও এক-ধাপ এগিয়ে দিয়েছে!'

সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, কারণ সতীশ যখন অন্তরের ভিতর হইতে কথা বলে, তখন তাহাকে ভুল করা চলে না।

সতীশ হার্ম্মোনিয়ামটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, 'দোষ হ'চ্ছে এই যে, আমরা অকারণ হাউ-চাউ ক'রে মরি। আমরা গলাবাজী করে রাজত্বটাই উদ্ধার করতে চাই; অথচ এই যে সমাজের মধ্যে আমাদের অতি নিকটে এই সঞ্চীয়মান পাপ দিনে-দিনে ভীষণ ভাবে বেড়ে চলে, আমাদেরই বেড়া-জালে ঘিরে মেরে ফেল্‌ছে, কত ঘরে হাহাকার উঠ্‌ছে,—যা একান্ত আমাদেরই তৈরী, আর আমাদেরই মারছে, সে পাপের বহ্নিতে অন্তরে-অন্তরে দগ্ধ হ'য়েও আমরাই তার ইন্ধন যোগাচ্ছি, এবং পরম-নিশ্চিন্ত মনে গুড়ুক খাচ্ছি, এবং দিল্লীর লাড্ডু পাবার আন্দোলন করছি। জানি যে, এটা সাপ, আমাকেই কামড়াচ্ছে এবং এর প্রতীকারও আমারই হাতে—এই তিনটে ধ্রুব সত্য জেনেও যে জাতি সেই সাপের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান কামড়কে নিশ্চিন্ত মনে বরদাস্ত ক'রে, এই এত বড় ক্লীব পঙ্গু জাত দুনিয়ায় বোধ করি আর মেলা ভার! যদি বিলেত কি আমেরিকা হোত, ত তারা একরাত্রিতে সবাই মিলে ঠিক ক'রে পরের দিন সকাল থেকে এ প্রথা উঠিয়ে দিত নিশ্চয়ই!'

সতীশের চোখ দুটা চক্‌চক্ করিতেছিল এবং সামনের ঐ যে মেয়েরূপী একান্ত সত্যকে আশ্রয় ক'রে, সতীশের অন্তর থেকে এই কথাগুলো বেরোলো, তার গুরুত্ব নিমেষে সমস্ত ঘরটাকে ভারাক্রান্ত ক'রে দিলে! বাইরে তখনও ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল; তার ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই মৃত, শীতল সমাজের ক্লেদের মত ভারী বোধ হ'তে লাগল। সতীশ হঠাৎ 'উঠি' ব'লে উঠে প'ড়ে, সেই বৃষ্টির ভিতরেই চ'লে গেল।

(৩)

দিন বারো-চৌদ্দ পরে, সেদিন একটা রবিবার দেখিয়া আমাদের মেসে আমরা একটা ভোজের আয়োজন করিয়াছিলাম।

মেসের একঘেয়ে ভাব ঘুচাইবার জন্য মাঝে-মাঝে এমন অনুষ্ঠান হয়। সে দিনটা ভারি আনন্দে কাটে; ঠিক যে ভাল খাওয়ার আনন্দ, ত' নয়। এ যেন একটা উপলক্ষ করিয়া আনন্দ তৈরী করা। হয় ত বা যে জিনিষটা তৈরী হইল, সেটা ধরিয়া-পুড়িয়া একেবারেই অখাদ্য হইল। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া-যায়? তাহারই চেষ্টায় সকাল হইতে সন্ধ্যা কাটে, এবং এই ধরা-পোড়া জিনিষটির আলোচনা দিন দুই পর্য্যন্ত চলে। আনন্দকে সৃজন করিয়া লইয়া এমনি করিয়া উপভোগ করা মনের একটা সহজ ক্ষমতা নহে, এবং যে তরুণ বয়সে মনের এই ক্ষমতা থাকে, সে

বয়স সকল অদ্ভুত কর্ম্মই করিতে পারে। বাঙ্গালীর সমাজ সেই আনন্দের উৎসকে বিধান-অনুশাসনে শুকাইয়া তোলে; তাই বোধ করি সে তাহার সমস্ত জীবনী-শক্তি হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছে!

সন্ধ্যার সময় যখন ঠাকুরের হেফাজতে সেই অপূর্ব্ব খাদ্য রন্ধন-শালা হইতে যুগপৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ বিকীরণ করিতে লাগিল, এবং একদল ছেলে তাহাকে সুষ্ঠু, সুস্বাদু করিবার জন্য চেষ্টিত রহিল, তখন আমরা বাকী দল তাস এবং হার্ম্মোনিয়াম লইয়া বসিলাম, কেন না এমন আনন্দের দিনটাকে ষোল-আনা না উপভোগ করিয়া কিছুতেই ছাড়িতে রাজী নই!

সতীশও আসিয়াছিল, কেন না তাহারও নিমন্ত্রণ ছিল।

আমরা তাসে বসিলাম। সামনের বাড়ী হইতে মিঠে সানাইয়ের শব্দ আসিতেছিল, এবং লোক-জনের যাওয়া-আসারও আওয়াজ আসিতেছিল। সতীশ তাস দিতে-দিতে কহিল 'ও-বাড়ীতে আজ কি রে?'

যতীন এ সকল খবর রাখে; সে কহিল, 'সেই—সে মেয়েটির বিয়ে আজ।'

সতীশ কহিল, 'তবু ভাল। আর একটা কেরোসিন-দাহের অভিনয় না হ'য়ে যে বিয়েটা হোল—এ প্রশংসার। বাড়ীটা বোধ হয় বাঁধা পড়ল!'

যতীন কহিল, 'অত—খবর রাখি না, তবে কাছাকাছি কিছু হবে বোধ করি, কেন না নরেন বাবু শুনেছি শ-খানেক টাকা মাইনে পান,—ছেলেপুলে কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে ও-রকম একটা কিছু অপরিহার্য্য বোধ হয়।'

সতীশ তাস দেখিয়া ডাকিল 'ওয়ান্ হার্ট।'

যতীন কহিল 'টু ডায়মণ্ডস্।'

আমি ডাকিতে যাইতেছি, এমন সময় সামনের বাড়ীতে একটা ভীষণ কলরব উঠিল 'মারো মারো'। চারিজনেই যুগপৎ পরস্পরের দিকে চাহিলাম; কিন্তু কলরব এতই বাড়িয়া চলিল যে, তাস ফেলিয়া আমরা এবং মেসের বাকি সবাই সেই দিকে ছুটিলাম।

গিয়া দেখিলাম, প্রায় রীতিমত মল্ল-যুদ্ধের উপক্রম। এক পক্ষে জন ৩০।৪০ বরপক্ষীয়ের লোক এবং অপর-পক্ষে প্রায় সমসংখ্যক কন্যাপক্ষের লোক দাঁড়াইয়া ঘোর বাগ্-বিতণ্ডা হইতেছে, এবং ভাবে বোধ হইল যে, ইহাঁরা একটি মাত্র শুভ অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছে, যখন এই বাগ্-যুদ্ধ মল্ল-যুদ্ধে পরিণত হইবে।

আমাদের মেসের জন পনর কুড়ি ছেলেকে দেখিয়া বোধ করি নরেন বাবুর সাহস হইল; তিনি বলিলেন 'দেখুন ত মশাই ব্যাপারটা!'

হঠাৎ বিবাহ-ক্ষেত্র সমর-ক্ষেত্রে পরিণত হইবার কারণ জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছিলাম। শোনা গেল, ব্যাপারটা এইরূপ হইয়াছিল। নগদ পণের কথা হইয়াছিল দেড় হাজার টাকা; কিন্তু নরেন বাবু অনেক কষ্ট করিয়াও নয়শত টাকার বেশী যোগাড় করিতে পারেন নাই। এই কথা জানিতে পারিয়া বরের পিতা ধৈর্য্য হারাইলেন! নরেন-বাবু অনেক মিনতি করিয়া এই টাকা আপাততঃ ছাড়িয়া দিতে বলেন, কারণ তিনি নিরুপায়; তবে এ কথাও বলেন যে, ভবিষ্যতে ইহা পরিশোধ করিবার জন্য তিনি সাধ্য-মত চেষ্টা করিবেন। কথার এত বড় খেলাফে বরের পিতা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেন, এবং অকথ্য ভাষায় নানা গালি দিতে আরম্ভ করেন। সকলের পক্ষেই নাকি ধৈর্য্য জিনিষটার একটা সীমা আছে; এমন কি বাংলা দেশের মেয়ের পিতার এবং খুড়ারও; সেই জন্য নরেন বাবুও না কি পনর-মিনিটের বেশী সে গালি বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। এবং তাহার ফলে এই সমরাভিনয়।

আমরা খানিকটা চিত্রার্পিতের মত বাঙ্গালীর এই অপূর্ব্ব সমরোদ্যম দেখিতেছিলাম, এমন সময় সতীশ বরের পিতার নিকট আগাইয়া গিয়া বলিল, 'মশায়, এ কি কাণ্ড! ভদ্রলোক অনেক চেষ্টা করে পারলেন না; না হয় ও-টাকাটা ছেড়েই দিন না! এ যে কেলেঙ্কারী হ'তে চললো।'

বরের বাপ চোখ রাঙ্গাইয়া কহিলেন, 'চোপরাও ডেঁপো ছেলে কোথাকার!'

সতীশ নরেন বাবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, 'তবে লড়েই দেখা যাক্; উনি বিনা-যুদ্ধে ছাড়বেন না দেখ্ছি। পরেশ, যাও ত হে, পাশের দুটো মেসের ছেলেদের খবর দেও, বল এই মুহূর্ত্তে যেন আসে। জন ৩০।৪০ হবে। যতীন, গলির মোড়ের ঐ গুণ্ডাদের আড্ডাতে খবর দেও ত ভাই, এখনি জন পঁচিশ চাই। এই নেও টাকা।' বলিয়া গোটাকতক নোট বাহির করিয়া যতীনের হাতে গুঁজিয়া দিল।

তাহার পর বরের পিতার দিকে ফিরিয়া কহিল, 'আসুন

মশাই, আমরাই আপাততঃ সুরু করে দি। ডেঁপো ছেলে বলে অবহেলা করবেন না।' বলিয়া হাতের আস্তিন গুটাইতেই যে কব্জীটা বাহির হইয়া পড়িল, সেটা নিশ্চয়ই বরের পিতার কাছে লোভনীয় বোধ হইল না।

জোঁকের মুখে নুন পড়িলে যেমন তাহার অবস্থা হয়, ডেঁপো ছেলেটি বরের পিতারও তদ্রূপ অবস্থা করিয়াছিল। আর সবই তিনি সহ্য করিতে পারিতেন; কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেল, ওই গুণ্ডার নামে তাঁহার মুখ একবারে কালী হইয়া গেল। আর শুধু ভয় দেখানও নয়; এই ছেলেটা একেবারে টাকা শুদ্ধ দিয়া লোক রওনা করিয়া দিল, এবং এও সম্ভব যে, হয় ত মিনিট-দশেকের ভিতরই তাহারা শুভাগমন করিয়া দেহের এবং পৃষ্ঠের এমন অবস্থা করিতে পারে, যাহা বিশেষ বাঞ্ছনীয় নয়।

সুতরাং তিনি আবার দলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন 'চল হে, এমন স্থানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকা নয়! নরক—নরক!'

বরপক্ষীয়েরা রিট্রিটের জন্য প্রস্তুতই ছিল; সর্দ্দারের এই অনুমতি পাইবামাত্র, যে কাণ্ডটা হইল তাহাকে 'অর্ডারলি' কিছুতেই বলা চলে না। কে কাহার উপর দিয়া, কাহাকে ঠেলিয়া, কেমন করিয়া যে পালাইবে, তাহা বুঝা কঠিন। এই রিট্রিটের মুখে নরেন বাবু একবার হাতযোড় করিয়া বরের পিতাকে কি বলিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি না কি আরও প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই আর সে কথায় কর্ণপাতও করিতে পারিলেন না। মিনিট দুই-একের মধ্যেই বাঙ্গলার সমরাঙ্গন সাফ্ হইয়া গেল।

(৪)

উত্তেজনার মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেলে প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। এত বড় একটা অনর্থ কাণ্ড হইয়া গেল, যা কোথাও কখন শোনা যায় নাই! ভিতর হইতে নরেন বাবুর মা কাঁদিতে লাগিলেন; নরেন বাবু শুষ্ক-মুখে বসিয়া পড়িলেন; এবং পিঁড়ীর উপর উপবিষ্টা ওই নিরপরাধা মেয়েটি যেন কাঠ হইয়া গেল!

খানিকক্ষণ পরে দুই জলে-ভরা চোখ তুলিয়া নরেন-বাবু একবার সতীশের দিকে, তাহার পর মেসের ছেলেদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'বাঁচালেন আপনারাই, কিন্তু জাত যায় যে! এইবার রক্ষা করুন! ওই মেয়েটির নইলে আর কোন উপায় হয় না; ও একেবারেই হয় ত' গেল!'

ভয় দেখাইতে, বড়াই করিতে মেসের ছেলেরা দলবদ্ধ হইতে পেছপা নয়; কিন্তু লড়াই-এর পর যে এতবড় একটা বিরাট সমস্যা হঠাৎ আসিয়া উদয় হইতে পারে, মেসের ছেলেরা তা ভাবিতেও পারে নাই এবং তাহার জন্য দায়িত্বও বোধ করি তাহাদের নাই। আপাততঃ প্রহারের হাত হইতে রক্ষা করাই মানব-সমাজের পক্ষে একটা সহজ উপকার নয়, বোধ করি আমাদের মেসের ছেলেদের এই রকমই একটা ভাব মনে উদয় হইতেছিল।

নরেন বাবু আর একবার কহিলেন, 'বাংলা-দেশের আশা আপনারাই। আপনাদের কাছে আমার নিবেদন, উপায় কি নেই?'

এই কথায় আমরা যখন পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতেছিলাম, তখন সতীশ কহিল 'যদি আপনার অমত না থাকে, ত আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি।'

বোধ হয় বজ্রপাত হইলেও আমরা এত বিস্মিত হইতাম না। নরেন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পিঁড়ীর উপরকার মেয়েটি তাহার সজল চক্ষু-দুটি তুলিয়া একবার তাহার মুক্তি-দাতাকে দেখিয়া লইয়া, আবার চক্ষু নত করিল।

বিস্মিত নরেন বাবু কহিলেন 'আপনি?'

সতীশ কহিল, 'আমি ব্রাহ্মণের ছেলে মুখুজ্যে—শুনেছি আপনারা বাঁড়ুয্যে।'

যতীন কহিল 'সাধু সতীশ। বাকীটা আমিই বলি। বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল। ও এম-এস-সি পড়ে; চরিত্র সম্বন্ধে কিছু পরিচয় পেলেন বোধ করি।'

নরেন বাবু এতই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ করি চোখের জল ঢাকিবার জন্য।

সতীশ কহিল 'একটা কথা; বাবার মত নেওয়া হয়নি, নেওয়া সম্ভবও নয়। হয় ত বা তাঁর মত নাও হ'তে পারে। তা হ'লে যে-সব অসুবিধা হবে, সেগুলো বিবেচনা করতে ভুলবেন না।'

উত্তরে নরেন বাবু উঠিয়া সতীশের দুই হাত ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন 'দীর্ঘজীবী হও বাবা, চিরসুখী হও।'

'সুতরাং বাকী পিঁড়ীটায় গিয়া সতীশকে বসিতে হইল। ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে আবার আনন্দ-কলরোল উঠিল। শাঁখের শব্দ এবং হুলুধ্বনির ভিতর এই অপূর্ব্ব বিবাহ হইয়া গেল।

যতীন কহিল 'সতীশ এইবার টু হার্টস্!'

(৫)

বাকী রহিল বৌ লইয়া বাড়ী যাওয়া।

সকলেই বুঝিয়াছিলাম, এ একটা অতি কঠিন পরীক্ষা। সেইজন্য সতীশ ও তাহার নববধূকে লইয়া আমরা মেস-শুদ্ধ ছেলে সতীশদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

সতীশের পিতা কৈলাস বাবু সবেমাত্র বাহিরে আসিয়া একটা ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন।

আমরা ঘরে ঢুকিতেই সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এঁরা?'

'আমার বন্ধু।'

'কাল রাত্রে আসোনি যে—থিয়েটারে গিয়েছিলে নাকি সবাই?'

সতীশ কহিল 'আজ্ঞে না!'

'তবে?'

সতীশ চুপ করিয়া রহিল। আমরাও খানিকটা চুপ করিয়া থাকিলাম। তার পর আমি কহিলাম 'হয় ত একটা মস্ত অপরাধ হ'য়ে গেছে—সেই কথাই বল্‌তে এসেছি।'

বিস্মিত কৈলাসবাবু কহিলেন 'কি অপরাধ?'

আমি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলাম 'কাল রাত্রে সতীশের বিয়ে হ'য়েছে।'

একেবারে খাড়া হইয়া চেয়ারের উপর বসিয়া কৈলাস বাবু কহিলেন 'বিয়ে—কি রকম?'

আমি কহিলাম 'সব কথা শুনলে হয় ত' আপনি মাপ করবেন।'

কৈলাস বাবু খানিকটা থামিয়া কহিলেন 'আচ্ছা বলুন।'

তখন আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিলাম। কেমন করিয়া ছয়শত টাকার জন্য নীচতার পরকাষ্ঠার অভিনয় হইয়া গেল; তাহার পর যুদ্ধোদ্যম; তাহার পর বরপক্ষের পলায়ন; তারপর নিরুপায় কন্যাপক্ষের শোক ও ক্রন্দন, এবং নরেন বাবুর কাতর নিবেদন, সবই বলিলাম। শুনিয়া কৈলাস বাবুর মুখ কখনও বিরক্তিতে, কখনও সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

আমি কহিলাম, 'এই সময়ে যখন বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠেছে, যখন মেয়েটি ভয়ে লজ্জায় কাঠ হ'য়ে একশো লোকের কৌতূহলী চোখের সামনে বোধ করি মৃত্যুই কামনা করছিল, তখন নরেন বাবু দুটি হাত-যোড় ক'রে আমাদের বল্লেন, এর কি কোন উপায় হয় না? ওই মেয়েটি যে চিরজীবনের জন্যে যায়। আমরা লজ্জায় মুখ হেঁট ক'রে রইলাম, কেন না উপায় ঠাওরাবার মত সাহস আমাদের ছিল না; কিন্তু সতীশ আমাদের মুখ রক্ষা ক'রেছে, বোধ করি বাঙ্গালীরও মুখ রেখেছে;—সে তখনই তাঁদের অবস্থা দেখে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে রাজী হোল। লগ্ন ব'য়ে যায় ব'লে আপনার মত নেওয়া হ'লো না। তারপর বিয়ে হোল।'

কৈলাস বাবু সতীশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন 'সতীশ, তোমার কি মনে হয়, আমার মত পেতে?'

সতীশ সোজা গলায় কহিল 'ঠিক জানিনে; কিন্তু আমার এ বিশ্বাস এখনও আছে যে, এমন কাজে আমার বাবার অমত কিছুতেই হবে না।'

কৈলাস বাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'বেশ করেছো সতীশ, খুব ভাল ক'রেছো। হয় ত এত বড় সাহসের কাজ আমিও করতে পারলাম না; কিন্তু আমি বুঝি যে এ মহৎ কাজ; আর এমন কাজের দরকার হ'য়েছে। সেইজন্যে আমার যে ছেলে এমন কাজ করতে পেরেছে, সে যে সৎসাহসে আমার চেয়ে বড়, এই ভেবে আমি সমস্ত মাপ করলাম, এমন কি আমি গর্ব্ব অনুভব করছি। বেশ ক'রেছো বাবা!'

বলিয়া তিনি সতীশকে দুইহাতে ধরিয়া আপনার নিকট লইয়া গিয়া বারম্বার শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন 'বেশ ক'রেছো' এবং ঝর-ঝর করিয়া তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। পিতার এই স্নেহ সতীশকেও কম অভিভূত করে নাই; সেও কাঁদিয়া ফেলিল, এবং ধীরে-ধীরে পিতার পায়ের ধূলা মাথায় গ্রহণ করিল।

কৈলাস বাবু আবার চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, 'আসলেই ভুল,—মা কোথায়,—বৌমা?'

আমরা বলিলাম, 'গাড়ীতে।'

তখন তিনি ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে সতীশের মাকে ডাকিয়া আনিলেন। আমাদের দেখাইয়া বলিলেন, 'এঁরা

সতীশের বন্ধু—লজ্জা নেই। বউমা এসেছেন যে গো, সতীশের বউ!'

বিস্মিত সতীশের মা তাঁহার দিকে চাহিতেই কহিলেন, 'সত্য কথা, পরে সব শুনবে, আনন্দের কথা, গৌরবের কথা! বৌমাকে তুলে নিয়ে এসো এখন।'

সতীশের বউ অমলা আসিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিল। তখন তাঁহারা যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এমন সত্যকার প্রাণের আশীর্ব্বাদ বোধ করি আর কোনও দিন শুনিব না।

হুলুধ্বনি, শঙ্খরব ও আনন্দের কলরোলের মধ্যে কৈলাস বাবু ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, 'বাবারা সব, বৌ-ভাত পর্য্যন্ত রোজ দুবেলা তোমাদের নেমন্তন্ন রইল এখানে।"

অস্ত-রহস্য

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল]

রবি বলে অস্তাচলে চলিলাম, ওগো সিন্ধুরাণি!
বিদায়ের কালে তাই বলে' যাই হৃদয়ের বাণী;
উষার ধূসর পথে স্বর্ণরথে যবে প্রাচীমূলে
স্বর্গ হ'তে নামিলাম গগনের পূর্ব্ব-দ্বার খুলে,
অজানা সৌভাগ্য সম অকস্মাৎ মম অভ্যুদয়ে
জাগিল নিখিল বিশ্ব আলোকের বিপুল বিস্ময়ে,
চেতনা-চঞ্চল চিত্তে মহানন্দে হইয়া মুখর
বন্দনা গাহিল সবে "নমো নমো নবীন ভাস্কর!"
জাগরণ, মহোৎসব, কি গৌরব মোর চারিধারে!
তখন কি প্রিয়জন ঘরে মোরে পারে বাঁধিবারে!
সুনীল সজল আঁখি, সূক্ষ্ম-আর্দ্র-নীলাম্বরে ঢাকা
লক্ষ প্রেম উর্ম্মিভরা বক্ষ তব মোর পায়ে রাখা
ফিরাল না মোরে, হায়, সুদূরের উচ্চ অভিলাষে
তুচ্ছ করি' প্রেম তব উঠিলাম মধ্যাহ্ন-আকাশে।
সেই আমি অপরাহ্ণে হতমান অস্তমান রবি
ম্লান অবনত মুখে ভাবিতেছি কোথা এবে লভি
নিরালা বিশ্রাম ঠাঁই, শান্তি পাই কার স্নিগ্ধ বুকে?
কাতরে উচ্ছ্বাসভরে সিন্ধু কহে লাজ-রক্ত মুখে,
"কেন হেন অনুতাপ, ওহে বন্ধু, ওগো প্রিয়তম!
তুমি ছিলে দূরে, তবু ছবি তব ভরি' বক্ষ মম
ভৃগুপদচিহ্ন সম সমুজ্জ্বল ছিল মর্ম্ম মাঝে
অধীনার আরাধনা পূর্ণ তাই হ'ল পুণ্য সাঁঝে
এস তবে, হে ব্যথিত, বেদনার হ'ক অবসান,
হে তৃষিত, বুকে এস পাবে সেথা সুধার সন্ধান,
সঞ্জীবনী নীরে মোর ফিরে পাবে বিলুপ্ত মহিমা,
নিশান্তে উদিবে বিশ্বে আলো করি' দিগন্তের সীমা।"
আকুল কল্লোলে সিন্ধু কাছে এস, কাছে এস, বলে,
সে প্রেম আহ্বানে রবি নিদ্রা গেল প্রিয়া-বক্ষতলে।

গরীব

[শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী]

লক্ষ্মণ জাতে মুচী, কিন্তু সে জাত-ব্যবসা করতো না। তেরো চৌদ্দ বছর বয়সে যখন তার বাপ মারা যায়, তখন সে পাঠশালে পড়ছিল। গাঁয়ের ভদ্রলোক মুরুব্বীরা লক্ষ্মণের বাপ মুকুন্দকে প্রায়ই বলতো—মুচীর ছেলের আবার পাঠশালা কেন রে? জাত-ব্যবসা শিখিয়ে নিজের কাজে লাগিয়ে দে।

ছেলেকে পাঠশালে দেওয়ার জন্য মুকুন্দ গাঁয়ের লোকদের কাছে প্রায়ই খোঁচা খেতো বলে তার মনের মধ্যে একটা জায়গা অত্যন্ত দুর্ব্বল হোয়ে পড়েছিল, এইখানে আঘাত লাগলেই সে সঙ্কুচিত হোয়ে বলে ফেলতো—এইবার—এই কটা দিন গেলেই ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দেবো।

মুচী হোয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার এত আগ্রহ

দেখে তার স্বজাতি ও গ্রামের অন্য লোকেরা বিরক্ত তো হোতোই, বিস্মিতও বড় কম হোতো না।

মুচীর ছেলে হোলেও অতি শৈশব থেকেই পড়াশুনা করার দিকে লক্ষ্মণের বিশেষ ঝোঁক ছিল। গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেরা যখন তল্পী বগলে নিয়ে পাঠশালার গল্প করতে করতে তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে যেতো, তখন লক্ষ্মণ তার মার কাছে গিয়ে আব্দার ধরতো—মা আমায় পাঠশালে নিয়ে চল্।

বালকের আগ্রহ দেখে মুকুন্দ গ্রামের গুরুমশায় রঘুনাথ চাটুয্যের কাছে গিয়ে ধন্না দিয়ে পড়লো! তার ভয় ছিল যে, গুরুমশায় হয়তো মুচীর ছেলেকে তাঁর পাঠশালে নেবেন না। কিন্তু তিনি আগ্রহের সঙ্গে তার ছেলেকে নিতে রাজী হওয়ায় একদিন মুকুন্দ শিশু লক্ষ্মণের হাত ধরে পাঠশালায় দিয়ে এল।

রঘুনাথ চাটুয্যের তিন কূলে কেউ ছিল না। তাঁর কয়েক ঘর প্রজা ছিল, তারাই দয়া কোরে যা দিত তাই দিয়ে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন চলতো। ছেলে পড়ানো রঘুনাথের এক বাতিক ছিল। কবে থেকে যে তিনি এই কাজ করছেন তার সাক্ষী দেবার লোক গ্রামের মধ্যে ছিল না বল্লেও চলে। এখনকার পিতামহ-সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁর ছাত্র। রঘুনাথ গ্রামের কারো সঙ্গে মিশতেন না। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ছেলে পড়িয়ে তার পর নিজে হাতে রেঁধে খেয়ে অনেক রাত্রি অবধি পড়াশুনা কোরে তিনি শুয়ে পড়তেন। বহু দিন থেকে এই নিয়মই চলে আস্‌ছে। গ্রামের মধ্যে বাস কোরেও তিনি গ্রাম-ছাড়া গোছের লোক ছিলেন।

লক্ষ্মণ পাঠশালায় ভর্ত্তি হওয়া মাত্র গ্রামের ভদ্র লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বেনে, সোনার বেনে সকলের মুখেই এক কথা—এঁ্যা! বল কি হে, মুচীর ছেলে পাঠশালায়!

গ্রামের কয়েক ঘর নমঃশূদ্র দু-পুরুষ থেকে লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোকের পৈঠায় উঠেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মোটা মাইনের সরকারী চাকরী কোরে দু-পয়সার সংস্থানও করেছে। মুচীর ছেলে পড়তে সুরু করেছে শুনে তারাও বিস্মিত হোয়ে গেল—তাই তো বল কি হে?

গ্রামের মুরুব্বীরা রঘুনাথকে গিয়ে বল্লে—চাটুয্যে মশায় এটা কি ভালো হলো? বামুন, কায়েতের ছেলের সঙ্গে মুচীর ছেলে এক সঙ্গে বসে পড়বে! রঘুনাথ হেসে বল্লেন—তাতে দোষটা কি হয়েছে! রঘুনাথের উত্তর শুনে আশ্চর্য্য হোয়ে তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো, যেন দোষটা অন্যের মুখের ওপর লেখা আছে। মুখ দেখা-দেখির পালা সাঙ্গ হোলে হরিহর ভট্টাচার্য্য এগিয়ে এসে বল্লে—তা হোলে আমাদের ছেলেদের আর এখানে রাখা চলে না।

হরিহরের কথা শুনে মুরুব্বীদের মুখে একটা প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠলো, ভাগ্যে হরিহর সঙ্গে এসেছিল।

হরিহরের কথা শুনে রঘুনাথ কিছুক্ষণ গুম্ হোয়ে বসে রইলেন। তার পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বল্লেন—সে তোমাদের অভিরুচি। ছেলে-পড়ানোর জন্য আমি কারো কাছ থেকে একটি কপর্দ্দকও গ্রহণ করি না। মুকুন্দর ছেলের বুদ্ধি তোমাদের কারো ছেলের চেয়ে কম নয়; আর কমই হোক্ কি বেশীই হোক, আমার কাছে সে যখন পড়তে এসেছে তখন আমি তাকে শিক্ষা দেবোই। এতে যদি আমার এখানে ছেলে পাঠাতে কারো আপত্তি থাকে সে যেন না পাঠায়।

মুরুব্বীরা আর বাক্য-ব্যয় না কোরে ফিরে এলেন, তাঁদের ছেলেরাও পাঠশালে যেতে লাগলো; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হোয়ে গেল যে, লক্ষ্মণ মুচীনীর গর্ভে জন্মালে কি হবে, ও মুচীর ছেলে কখনই নয়। মুচীর ছেলের কখন অত বুদ্ধি হয়!

বাপের মৃত্যুতে লক্ষ্মণ দুনিয়া অন্ধকার দেখলে। একে সে জাত-ব্যবসা শেখেনি; বাপের এমন সংস্থানও নেই যে, দু-দিন বসে খাওয়া চলবে। মুকুন্দর কয়েক বিঘে জমি ছিল, জাত-ব্যবসা ছাড়া সে ভাগে চাষও করতো। বাপের মৃত্যুতে লক্ষ্মণ নিজে চাষ-বাস সুরু করলে। সেই অল্পবয়সে সহায়হীন হোয়েও দুঃখে সুখে সে নিজের সংসার এক রকমে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল, কারো কাছে হাত পাত্‌তে হয়-নি।

বাপের মৃত্যুতে পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করতে হোলেও লেখাপড়ার চর্চ্চা লক্ষ্মণ কোনো দিনই ছাড়ে নি। অবসর পেলেই সে তার গুরুমশায়ের কাছে গিয়ে বসতো, তাঁর কাছ থেকে নানা বিষয়ের বই নিয়ে এসে বাড়ীতে পড়তো; কোনো জায়গায় বুঝতে না পারলে রঘুনাথকে গিয়ে জিজ্ঞাসা

করতো। রঘুনাথ কলকাতা থেকে খানকয়েক দৈনিক কাগজ আনাতেন; ইদানীং চোখের জ্যোতিঃ কমে আসায় তিনি রাত্রে আর পড়তে পারতেন না। লক্ষ্মণ রোজ সন্ধ্যা-বেলা গুরুর বাড়ী গিয়ে তাঁকে কাগজগুলো পড়ে শুনিয়ে আসতো। এই দুটি গুরু আর শিষ্যে, ব্রাহ্মণ আর মুচীতে এমন একটা বাঁধন কোথায় লেগে গিয়েছিল যেটা কোনও দিনই ছেঁড়েনি কিংবা আলগা হয় নি। রঘুনাথের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত লক্ষ্মণ সমান ভাবে তাঁর সেবা করেছিল।

গ্রামে আরও কয়েক ঘর মুচী ও হাড়ির বাস ছিল। এরা জাত-ব্যবসা ছাড়া সকলেই চাষ-বাস করতো। লক্ষ্মণ ছিল এদের মুরুব্বী। কোনো বিপদে পড়লে অথবা কোনো কাজের জন্য পরামর্শ করতে হোলে আগে তারা গ্রামের ভদ্র লোকদের শরণাগন্ন হোতো; কিন্তু লক্ষ্মণ মাতব্বর হোয়ে ওঠার পর এরা পরামর্শের জন্য তার কাছেই যেতো এবং লক্ষ্মণ তাদের জাত হোয়ে তাদের মধ্যে থেকেই এমন যে একজন লায়েক হোয়ে উঠেছে সে জন্য মনে মনে গর্ব্বও অনুভব করতো।

উপরি-উপরি দু-বছর অজন্মা হওয়ার পর খাজনা আদায়ের আগে জমিদারের নায়েব যখন বলে দিলেন যে, জমিদারের ছেলের বিয়ের জন্য এবার চার আনা কোরে মাথট দিতে হবে, তখন লক্ষ্মণের অনুগতরা এসে তাকে ধরে পড়লো—দাদা বাঁচাও, তুমি নায়েব মশায়কে বলে এ-বছরের খাজনাটা আমাদের রেহাই করিয়ে দাও।

অজন্মা হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মণ জমিদারের খাজনাটা কোনো রকমে যোগাড় কোরে রেখেছিল। কিন্তু তার জাত-ভায়েরা বল্লে—তুমি যদি খাজনা দাও তা হোলে আমাদের ওপর অত্যাচার হবে, নায়েব আমাদের জোত বেচে খাজনা আদায় করবে। তুমি আমাদের মুরুব্বী হোয়ে নায়েবকে গিয়ে বল।

ক-দিন ধরে পঞ্চায়েত বসবার পর একদিন বিকেলে লক্ষ্মণ নায়েবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য জমিদারী-কাছারীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো। নায়েব তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—সংবাদ কি বাপু?

—আজ্ঞে নায়েব মশয়, দু-বছর উপরি-উপরি অজন্মা গিয়েছে, এবারও ফসল ভাল হয়-নি। আপনি সবই তো জানেন? এবারে আমাদের খাজনাটা রেহাই দিতে আজ্ঞা হোক্।

নায়েব বল্লেন—হাসালে যে! ওদিকে জমিদার তাগাদা দিচ্ছেন খাজনার টাকা পাঠাও, মাথটের টাকা পাঠাও, আর এদিকে তোমরা বলছো খাজনা রেহাই দাও! ও সব হবে না, খাজনা যার যার দিয়ে যেতে বলো। হাঙ্গামা কোরো না, হাঙ্গামা করলে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

—আজ্ঞে টাকা না থাকলে কোথা থেকে খাজনা দেবো? পেটে খেয়ে তবে তো জমিদারের খাজনা—

লক্ষ্মণের কথা থামিয়ে দিয়ে নায়েব একটা হুঙ্কার ছেড়ে বল্লেন—চোপ্‌রাও শূয়ার! যত বড় মুখ ততবড় কথা! আগে উনি পেটে খাবেন তবে জমিদারকে খাজনা দেবেন। টাকা না থাকে হাল গরু বেচে খাজনা দাও।

লক্ষ্মণ হাত জোড় কোরে বল্লে—আজ্ঞে এ বছর হাল গরু বেচে খাজনা দিলে ভবিষ্যতে যে কোনো দিনই খাজনা দিতে পারবো না।

লক্ষ্মণের কথা শুনে নায়েব স্তম্ভিত হোয়ে গেলেন। মুচীর সন্তানের এত বড় স্পর্দ্ধা! তখুনি তাকে জুতিয়ে সিধে করবার একটা দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা তাঁর শিরায় শিরায় লাফালাফি করতে লাগলো। কিন্তু সদাশিব চৌধুরী নায়েবী কোরে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। জুতিয়ে সিধে করার আগে তিনি ভেবে দেখলেন যে, লক্ষ্মণ মুচীর সন্তান হোলেও লেখাপড়া জানা মুচী। তার ওপরে প্রায় দেড়শো-ঘর প্রজা তার বিশেষ অনুগত; এক্ষেত্রে সদরে সংবাদ না দিয়ে এমন একজন মাতব্বর প্রজাকে সিধে করাটা যুক্তি-সঙ্গত হবে না। রাগটা কোনো রকমে হজম কোরে ফেলে তিনি বল্লেন—খাজনা যদি দেবার ইচ্ছা না থাকে দিও না, কেমন কোরে খাজনা আদায় করতে হয় আমাদের তা জানা আছে।

এই কথার ওপরে আর কিছু বলা বৃথা মনে কোরে লক্ষ্মণ কাছারী থেকে ফিরে এসে সবাইকে জানিয়ে দিলে—খাজনা মাফ হবে না। যেমন কোরে পারো খাজনা দাও; হাল গরু বেচে খাজনা দাও। তোমাদের পেট ভরুক আর নাই ভরুক, জমিদারের পেট ভরানো চাই।

বাড়ীতে ফিরে এসে লক্ষ্মণ ভাবতে বসলো—কি করা যায়! এই যে কয়েক-ঘর লোক, আমারই মত গরীব তারা, তাদের দুঃখে সহানুভূতি পাবে বলে আমাকে এসে ধরেছে—এর কি কিছুই করতে পারবো না। একে ঘরে অন্ন নাই, মহাজনের সুদ গুণে পেট-ভরে খাওয়ার কথা

বেঁচারীরা ভুলেই গিয়েছে। কিন্তু এবার—? অর্দ্ধাশন সহ্য করে বলে কি অনশন সহ্য হবে? বছরে-বছরে অজন্মা, অনাবৃষ্টি লেগেই আছে। দেবতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই যে গরীবরা বুকের রক্ত জল কোরে পাথরের মতন মাটি-চয়ে শস্য ফলায়, তাদের পেট কি কখনো ভরবে না! এর কি কোনো উপায় নাই? গরীব—তারা যে গরীব, তারা যে অভিশপ্ত। জন্মের সঙ্গেই ঈশ্বর তাদের কপালে অভিসম্পাতের টীকা পরিয়ে দিয়েছেন। ভেবে সে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না, তার মাথা ঘুরতে লাগলো।

লক্ষ্মণের ছেলে উদ্ধব কোথা থেকে খেলা কোরে বাড়ীতে ফিরে এসে বাপকে বিষণ্ণ মুখে দরজার কাছে বসে থাকতে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। খানিকক্ষণ বাপের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বল্লে—তামাক দেবো বাবা?

লক্ষ্মণ কোনো কথা না বলে ছেলের দিকে উদাস-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। অস্ত-অচলের শিখরে তখন মহা-সমারোহে দিনের চিতা জ্বলে উঠেছিল; সেই অগ্নি-শিখার জ্বালাময়ী স্পর্শে সমস্ত আকাশটা ঝল্‌সে লাল হোয়ে এই শ্যাম ধরণীর শীতল পরশ পাবার জন্য উন্মুখ হোয়ে থর্‌থর্ কোরে কাঁপছিল। সে ছেলের মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অবহেলায় একবার আকাশের দিকে চেয়ে আবার তাকে দেখতে লাগলো—ওরে আমার পাগলা ছেলে, ওরে আমার বংশের দুলাল, এই গরীবের ঘরে কেন এসেছিস্ বাবা? গরীবের কি দুঃখ তা তো তুই জানিস্ না। এই রক্ত-মাংসের শরীরে ক্ষিদের যন্ত্রণা যে কি যন্ত্রণা তা তুই এখনো বুঝিস্ নি; কিন্তু তোকে বুঝতেই হবে,—একদিন বুঝতেই হবে, কিছুতেই নিস্তার নেই। উদ্ধব বাপের অশ্রু-সজল চোখ দেখে আরও কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে বাবা?

লক্ষ্মণের স্ত্রী বেঁচে নেই। সংসারে সে, তার মা ও একমাত্র ছেলে উদ্ধব। উদ্ধবকে বছর-খানেকের রেখে তার স্ত্রী মারা যায়, তার ঠাকুরমাকেই সে মা বলে জানতো। তাদের ঘরে নয় দশ বছরের ছেলে সংসারের ও বাইরের অনেক কাজই করে; কিন্তু লক্ষ্মণ তাকে কিছু করতে দিত না। গরীবের ছেলে বেঁচে থাকলে সারাটা জীবনই তো খেটে মরতে হবে; তবুও শেষ-জীবনে কর্ম্মক্লান্ত সন্ধ্যাবেলায় অতীতের কথা মনে কোরে দুর্ব্বিসহ জীবনের কয়েকটা মুহূর্ত্তও সুখে ভরে উঠবে, এই আশায় সে উদ্ধবকে এখনও কাজে লাগায় নি। এই স্মৃতি জপ করা গরীবের জীবনে যে কত বড় বিলাসিতা তা লক্ষ্মণ ভাল কোরেই জানতো। উদ্ধব কাছে এলে লক্ষ্মণ তাকে বল্লে—এইখানে বস, মনটা বড় খারাপ হোয়ে গেছে বাবা, তাই চুপ কোরে বসে আছি।

—তুমি নায়েব মশায়ের কাছে গিয়েছিলে বাবা?

—হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই হোলো না, তিনি বলে দিলেন খাজনা সবাইকে দিতেই হবে, খাজনা জমিদার মাফ করবে না।

উদ্ধব কিছুক্ষণ চুপ কোরে রইলো। তারপর বল্লে—জমিদারের তো অনেক টাকা আছে বাবা, এইবারটি খাজনা মাফ করতে পারে না। লখীন্দর কাকা বলছিল তার ঘরে এক মুঠো চাল পর্য্যন্ত নেই—

পারে না রে পারে না। আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েই তবে না তার অনেক টাকা। সে তো আর আমাদের মতন গতর খাটিয়ে টাকা রোজগার করে না।

উদ্ধব তার শিশু শক্তিতে এ কথার কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে বাপের পাশে আরও ঘেঁসে চুপটি কোরে বসে রইলো। তাদের চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে উঠতে লাগলো। লক্ষ্মণ তখনো ভাবছিল কি করি—

উদ্ধব হঠাৎ বল্লে—একবার বাবুদের গিয়ে বল না বাবা, তাঁদের তো অনেক টাকা আছে।

লক্ষ্মণের মনে অনেকক্ষণ থেকে এই কথাটা উঁকি মারছিল। নায়েব তো চাকর মাত্র, জমিদার ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন। উদ্ধবের মুখে কথাটা শুনে সে আর কোনো জবাব না দিয়ে তাকে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

পরদিন সকালে লক্ষ্মণ সবাইকে জানালে যে, সে একবার জমিদারের সঙ্গে দেখা করবে, মিনতি কোরে বলে দেখবে; তাতে যদি কোনো ফল না হয় তা হোলে কেউ এক পয়সা খাজনা কিংবা মাথট দেবো না—প্রাণ থাকতে নয়, এতে তোমরা রাজী আছ?

সবার সম্মতি নিয়ে লক্ষ্মণ সেই দিনই জমিদারের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় চলে গেল।

কলকাতায় গিয়ে বাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া যে বিশেষ সোজা ব্যাপার নয়, সেটা লক্ষ্মণের আগেই জানা ছিল। বাবুর কর্ম্মচারীরা তার কলকাতায় আসার কারণ জানতে পারলে বাবুর সঙ্গে হয়তো দেখা নাও হোতে পারে, এই ভেবে সে

জমিদারের নাপিতের সঙ্গে ভাব-সাব কোরে সকাল-বেলা তার সঙ্গে বাবুর বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হোলো।

জমিদার রায় প্রদ্যুম্নপ্রকাশ অধিকারী, সাহেব তখন সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠে নীচের ঘরে এসে বসেছেন। রক্তচক্ষু তখনো স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে পায় নি। লক্ষ্মণ গিয়ে একেবারে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কোরে হাত জোড় কোরে দাঁড়ালো। জমিদার একবার মুখ-তুলে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে? কি চাও তুমি?

লক্ষ্মণ হাত জোড় কোরে বল্লে—আজ্ঞে আমি আপনা-দেরই আশ্রিত একজন প্রজা। আমার নাম লক্ষ্মণচন্দ্র দাস।

জমিদার সবে কাল যাদবপুর তালুকের নায়েবের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন যে, বিষ্ণুগ্রামের লক্ষ্মণদাস নামে একজন মাতব্বর প্রজা বিদ্রোহী হয়েছে। নায়েব এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তার পরামর্শ চেয়েছিল। তিনি পত্রপাঠ তাকে জানিয়েছেন যে, বিদ্রোহীকে যেমন কোরে পার সায়েস্তা করো, না হোলে অন্য প্রজারাও খাজনা বন্ধ করবে। লক্ষ্মণের নাম শুনে জমিদার রক্তনেত্রে তার দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমার নাম লক্ষ্মণ মুচী? তুমি খাজনা দেবো না বলেছো?

লক্ষ্মণ বল্লে—আজ্ঞে খাজনা দেবো না এমন কথা কি আমরা বল্‌তে পারি! দু-বছর উপরি-উপরি অজন্মা হয়েছে, কিন্তু আমরা ধার কোরে খাজনা জুগিয়েছি; এবার মহাজনও টাকা দিতে চায় না, আর বীজ ধানও নেই যে বেচে টাকা দেবো! এ বছরের মত খাজনাটা মাফ কোরে দিতে আজ্ঞা হয়। ভগবান আপনার—

জমিদার ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—দেখ, ছোটলোকের মুখে লম্বা-লম্বা কথা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। উনি বলবেন তবে ভগবান আমার মঙ্গল করবেন—আস্পর্দ্ধা দেখো না।

লক্ষ্মণ ক্ষুব্ধস্বরে বল্লে—আমরা ছোটলোক, আপনাদের মর্য্যাদা রেখে কথা বলতে জানি না, মাফ কর্ব্বেন?

—তারপর, কি বলতে চাও, খাজনা-টাজনা দেবে?

—হুজুর এবারের মত আমাদের মাফ করুন।

—মাফ হবে না বাপু, খাজনা আর মাথট দিয়ে দাও! সরকার তো আমায় মাফ করবে না।

—আজ্ঞে খাজনা কোথা থেকে দেবো! টাকা দূরের কথা, একমুঠো ধান যে কারো ঘরে নেই।

—খাজনা না দিলে বাস তুলতে হবে জেনে রেখো।

লক্ষ্মণ আর সহ্য করতে পারছিল না, অনেক কথা তার বলবার ইচ্ছা হোতে লাগলো। কিন্তু গ্রামের সেই ক্ষুধাতুর বন্ধুদের মিনতি-ভরা মুখগুলো মনে কোরে সে নিজেকে কোনো রকমে সম্বরণ কোরে শেষে বলে ফেল্লে—হুজুর দশ বছর হোলো এই তালুক কিনেছেন, আর আমরা দশ পুরুষ ধরে এই গ্রামে বাস করছি। আমাদের ভিটে ছাড়া করলে আপনাদের অকল্যাণ হবে।

লক্ষ্মণের কথা শুনে জমিদার বাবু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি হাঁক ছাড়লেন—তবে রে! কে আছিস্, পঞ্চাশ জুতো গুণে মেরে একে বাড়ী থেকে বের কোরে দে।

তখুনি কয়েকজন দরোয়ান এসে লক্ষ্মণকে মারতে মারতে বাড়ী থেকে বার কোরে দিলে।

রাস্তায় এসে লক্ষ্মণ স্তম্ভিত হোয়ে দাঁড়ালো। এতটা যে হবে তা সে ধারণায় আন্‌তে পারে নি। রাগে, দুঃখে, অপমানে, ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে সে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চল্লো। পথ চল্‌তে-চল্‌তে ভাবতে লাগলো যে, সে কি এমন কথা বলেছে, যার জন্য তাকে জুতো মেরে এমন কোরে তাড়িয়ে দেওয়া হোলো? এর কি কোনো প্রতি-বিধান নাই? কি প্রতিবিধান হবে? ধনী যে সে যুগ-যুগ ধরে গরীবকে এমনি ভাবে জুতোই মেরে আস্‌ছে। গরীবকে দলন করার প্রবৃত্তি যে তার মজ্জাগত হোয়ে গিয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে অস্বাভাবিক ব্যবহার, এ কি বিধাতারই নিয়ম!—দারুণ বিধাতা,—নিষ্ঠুর বিধাতা! বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখবো যে অসহায় বন্ধুরা আমার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে, আমাকে দেখে আশায় তাদের অন্তর উৎফুল্ল হোয়ে উঠবে—তাদের গিয়ে কি বলবো?

লক্ষ্মণ যখন গ্রামে ফিরে এল তখনও সন্ধ্যে হোতে অনেক দেরী। সে উদ্ধবকে ডেকে বল্লে—তোর লখীন্দর কাকাকে বলে আয় আমি ফিরে এসেছি; আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ীর সামনের মাঠে পঞ্চায়েত বসবে। সে সবাইকে যেন খবর দিয়ে এইখানে নিয়ে আসে।

লক্ষ্মণের মা জিজ্ঞেস করলে—জমিদার-বাড়ীতে গিয়ে কিছু সুবিধে করতে পারলি বাবা ?

—কিছুই হোলো না মা, তারা আমাকে মেরে অপমান কোরে তাড়িয়ে দিলে।

বৃদ্ধা পুত্রের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে—তারা বড়লোক, তাদের সঙ্গে কি ঝগড়া কোরে পারবি বাবা ?

—ঝগড়া কোরে পারবো না, কিন্তু টাকা না থাকলে দেবো কোথা থেকে ?

—নে তুই এখন নেয়ে খেয়ে নে। কাল সারাদিন নায়েব-কাছারি থেকে দু-বার পেয়াদা এসেছিল ডাকতে।

লক্ষ্মণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে—আর নায়েব-কাছারী! খাজনার জন্য যে কটা টাকা রেখেছিলুম কলকাতায় যেতে আসতেই তো তার অর্দ্ধেক খরচ হোয়ে গেল। এখন কেটে ফেল্লেও আর একটি পয়সা বেরুবে না।

লক্ষ্মণের মা তাকে তাড়া দিয়ে বল্লে—যা তুই নাইতে যা, আমি ভাত চড়িয়ে দিয়েছি।

সন্ধ্যার পর লক্ষ্মণের বাড়ীর সামনে মাঠের ওপর দলে দলে লোক এসে জুটতে লাগলো। পঞ্চায়েতের খবর সদাশিব চৌধুরীর কানে সন্ধ্যের আগেই গিয়ে পৌঁছেছিল। তিনি দশ-বারো জন পাইক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ; কিন্তু তারা ফিরে এসে খবর দিলে যে, সেখানে প্রায় দুশো লোক জমায়েৎ হয়েছে। দু-দশ জন পাইকের কর্ম্ম নয়, তাতে ঘায়েল হবার সম্ভাবনা আছে। সংবাদ নিয়ে নায়েব তাদের নিজের কাজে যেতে বলে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে বসলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ নিবিড় হোয়ে এসেছে। লক্ষ্মণের চালা-বাড়ীর সামনে মাটির ওপর সব লোক বসে গিয়েছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কেউ মাথা নাড়লে তবে বুঝতে পারা যায় যে লোক আছে। লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সবাইকে সম্বোধন কোরে বল্লে—বন্ধু সব, একটা কথা জানাবার জন্য তোমাদের আজ এখানে ডেকেছি—

অনেকগুলো গলা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—বল, তোমার কথাই আমরা শুনবো—আমরা আর কাউকে জানি না—

লক্ষ্মণ বল্লে—সবার আগে তোমাদের জানিয়ে রাখি, আমি যে জন্য কলকাতায় গিয়েছিলুম সে কাজ কোরে আসতে পারি-নি। জমিদার বলে দিয়েছেন খাজনা দিতেই হবে—না দিলে বাস তুলতে হবে। তার ওপর জমিদার আমায় জুতো মেরে বাড়ী থেকে বের কোরে দিয়েছে।

—কি বল্লে! জুতো মেরেছে ?

একজন লোক দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—জুতো মেরেছে ?

জুতো মারার কথা শুনে সবার মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। কেউ বলতে লাগলো—গরীব বলে জুতো মারবে? কেউ বল্লে—আস্পর্দ্ধা দেখেছো ?

দেখতে দেখতে সবাই উত্তেজিত হোয়ে তৃণাসন ছেড়ে উঠে পড়লো। সকলের মুখে এক কথা—কিছুতেই খাজনা দেবো না—

হঠাৎ তাদের সকলের গলা ছাপিয়ে লক্ষ্মণের গলা উঠলো—শান্ত হও, মিথ্যে আস্ফালন কোরো না।

লক্ষ্মণের কথা শুনে আবার তারা বসে পড়লো, সভা-ক্ষেত্র আবার নীরব।

লক্ষ্মণ বল্লে—ভাই সব, আমরা গরীব, আমাদের দু-বেলা পেট ভরে অন্ন জোটে না –

অন্ধকারের বুক চিরে সহস্র বৎসরের ক্ষুধা করুণস্বরে আর্ত্তনাদ কোরে উঠলো—গরীব, ভাই আমরা বড় গরীব ; পেট ভরে খেতে পাই না আমরা—

লক্ষ্মণ বলতে লাগলো—চুপ করো, আগে আমার কথা শেষ হোতে দাও। আমরা গরীব বটে, কিন্তু একবার ভেবে দেখো, আমরাই পৃথিবীর সমস্ত লোককে লালন-পালন করছি। মানুষের জ্ঞান হবার আগেই আমরা তাদের আনন্দের জন্য খেলনা তৈরি কোরে রাখি, তাদের সুখের জন্য দোলনা তৈরি কোরে দিই ; নিজের ছেলে ফেলে রেখে ধনীর ছেলেকে আমরা বুকে কোরে মানুষ করি। আমরা প্রাণপণ যত্নে খাবার তৈরি কোরে নিজে অনাহারে থেকে তাদের মুখের কাছে আমাদের অন্ন ধরে দিই। সমস্ত জীবন ধরেই তাদের বিলাসের সামগ্রী জুগিয়ে চলি। তারা মরে গেলে আমরা গরীবরাই তাদের শ্মশানে মুর্দ্দাফরাসের কাজ করি। আমরা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাদের এইভাবে সেবা কোরে চলেছি। এর বিনিময়ে আমরা ধনীর কাছ থেকে দাম পাই বটে, কিন্তু আমরা যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে যুগ যুগ ধরে তাদের ষোড়শোপচারে পুজো

[illegible]

Photo by—Photo Temple (Copyright Reserved)
Bharatvarsha Ptg. Works.

Engraved by—
Bharatvarsha Halftone Works.

কোরে আস্‌ছি—তার পুরস্কার আমরা কি পেয়েছি—তাদের কাছ থেকে ?

অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে একজন লাফিয়ে উঠে বল্লে—জুতো—তার বদলে জমিদার তোমায় জুতো মেরেছে।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে লক্ষ্মণ বল্লে—ঠিক বলেছো ভাই, আমাকে জুতো মেরে জমিদার সমস্ত গরীবকে জুতো মেরেছে। প্রাণদাতা, অন্নদাতাদের প্রতি সে এইভাবে তার কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে।

—কিন্তু আর আমরা সইবো না—

—না, আর সহ্য করবো না, জমিদার বলেছে খাজনা দিতেই হবে, নায়েব বলেছে মাথট না দিলে মাথা যাবে—আমরা মাথাই দেবো।

—হ্যাঁ আমরা মাথাই দেবো, মাথট দেবো না। টাকা না থাকলে কোথা থেকে দেবো! পেটে খেতে পাচ্ছি না খাজনা দেবো কোথা থেকে!

সেদিনকার পঞ্চায়েতে ঠিক হোয়ে গেল, খাজনা কেউ দেবে না।

পরদিন সকালে লক্ষ্মণ কাজে বেরুচ্ছে এমন সময় কাছারী থেকে দু-জন পাইক এসে লক্ষ্মণকে ডেকে নিয়ে গেল। নায়েব আগেই জমিদারের কাছ থেকে হুকুম পেয়ে ঠিক হোয়ে বসে ছিলেন, তার ওপর লক্ষ্মণ যে তাঁকে অবজ্ঞা কোরে জমিদারের কাছে গিয়েছিল ও সেখান থেকে ফিরে এসে পঞ্চায়েত করেছিল, এ সমস্ত সংবাদই তিনি পেয়েছিলেন। লক্ষ্মণ আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি, পঞ্চায়েতে কি ঠিক হোলো ? খাজনা দেবে ?

লক্ষ্মণ ধীরভাবে বল্লে—আজ্ঞে খাজনা দেবার শক্তি আমাদের নেই, সে কথা তো আগেই জানিয়েছি।

নায়েব তাকে কোনো কথা না বলে হাঁক দিলেন—পদারৎ!

ডাক শুনে দু-তিন জন যমদূতের মত হিন্দুস্থানী এসে লক্ষ্মণকে ঘিরে দাঁড়ালো।

নায়েব বল্লেন—লে যাও ইস্কো।

হুকুম পাওয়া মাত্র তারা লক্ষ্মণকে ধরে নিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরেই তার আর্ত্তনাদে কাছারী-বাড়ী ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো—বাবা গো, মেরে ফেল্লে গো—

দেখতে-দেখতে হাড়িপাড়ায় ও মুচিপাড়ায় খবর রটে গেল যে, জমিদারের পাইক এসে লক্ষ্মণকে ধরে নিয়ে গেছে, আর তার ওপরে অমানুষিক অত্যাচার হচ্ছে।

খবর পেয়ে উদ্ধব ছুটে কাছারী-বাড়ী গেল। একটু দাঁড়িয়ে থাকতে না থাকতেই সে বাপের আওয়াজ পেলে—ও বাবা গেলুম—

সে ছুটে বাড়ী এসে তার ঠাকুরমাকে বল্লে—মা, জমিদারের লোকেরা বাবাকে মেরে ফেল্লে।

লক্ষ্মণের লোকেরা অসহায়ের মত চারিদিকে ছুটোছুটি কোরে বেড়াতে লাগলো। কি করবে, কি করলে লক্ষ্মণকে এই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়, কেউ স্থির করতে পারলে না। লক্ষ্মণের মাকে নানা লোকে নানা কথা বলে যেতে লাগলো।

কেউ বল্লে—তাকে খুন কোরে মহানন্দায় ভাসিয়ে দেবে।

কেউ বা বল্লে—জমিদারের সঙ্গে কি এঁটে ওঠা যায়—

লক্ষ্মণের মা এই আশীবছর ধরে একটা দুটো কোরে পয়সা জমিয়ে সতেরোটা টাকা জমিয়েছিল। বৃদ্ধা বিকেল নাগাদ টাকা সমেত সিঁদুর-চুপ্‌ড়ীখানা নিয়ে ছুটে গিয়ে সদাশিব চৌধুরীর পায়ে ধরে দিয়ে কেঁদে পড়লো—নায়েব মশায়, এই টাকা নিয়ে আমার নথেকে ছেড়ে দাও। আর যা পাওনা থাকবে আমি বৌমার তাগা বিক্রি কোরে শোধ কোরে দেবো।

নায়েব গম্ভীর ভাবে টাকা গুণে দেখলেন যে, চুপড়ীতে সতেরোটি টাকা আছে। নিতি খাজনা, মাথট, জরিমানা ইত্যাদি হিসাবে সব কটি টাকা নিয়ে লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিলেন।

বৃদ্ধা আজন্ম-সঞ্চিত টাকাগুলোর বদলে ছেলেকে ফিরে পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

লক্ষ্মণকে যখন ছেড়ে দেওয়া হোলো, তখন সে আর দাঁড়াতে পারছে না। প্রহারে সমস্ত অঙ্গ জর্জ্জরিত, বেদনায় পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কন্‌কন্ করছে। কোনো রকমে সে বৃদ্ধা জননী ও উদ্ধবের ওপর ভর দিয়ে বাড়ী এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

তখনো সন্ধ্যা হয়-নি, বাইরে একটু আলো আছে। লক্ষ্মণের ঘরের মধ্যে একটু একটু কোরে সন্ধ্যার আবছায়া ঘনিয়ে উঠছিল। মূর্চ্ছিতপ্রায় বাপের মাথায় উদ্ধব জলপটি

লাগিয়ে দিয়ে তাকে ধীরে ধীরে বাতাস করছিল আর ভাবছিল। কত কথাই ভাবছিল তার কিছু ঠিক ঠিকানা নাই। লক্ষ্মণের কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে তাকে ঘুমন্ত মনে কোরে সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে নায়েবের কাছারীর দিকে ছুটলো। কাছারীর কাজ তখন শেষ হোয়ে গিয়েছে, নায়েব ও আরও দু-তিন কর্ম্মচারী নিয়মমত সান্ধ্য-রসায়ন পান কোরে মেজাজটা একটু প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করছেন। সদাশিবের মেজাজ আজ ভারী খুসী, লক্ষ্মণ শায়েস্তা হয়েছে এখন আর কেউ খাজনা ফেলে রাখতে সাহস করবে না—এই ভেবে। এমন সময় উদ্ধব সেখানে গিয়ে হাজির হোলো। নায়েব তাকে দেখে একটু হেসে বল্লেন—কে রে? কি চাস এখানে?

উদ্ধব উদ্ধতস্বরে বল্লে—তোমরা আমার বাবাকে মেরেছো কেন?

নায়েব চক্ষু বিস্ফারিত কোরে জিজ্ঞাসা করলেন—কে রে তুই? লক্ষ্মণ মুচীর ছেলে না?

—হ্যাঁ, তোমরা আমার মাকে ফাঁকি দিয়ে টাকা চুরি করেছো,—চোর কোথাকার—

তবে রে! বলে নায়েব টলতে টলতে উঠে এসে উদ্ধবের গালে এক চড় কষিয়ে দিলে। উদ্ধব ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে গেল। কাছেই তামাক সাজবার জন্য আগুন-ভরা একটা মালসা ছিল, উদ্ধব উঠেই সেই মালসাটা তুলে নায়েবকে লক্ষ্য কোরে ছুঁড়ে মারলে। মালসা নায়েবের গায়ে পড়লো না বটে, কিন্তু দপ্তরের ফরাশের ওপর আগুন পড়তেই সেখানে একটা হৈ চৈ বেধে গেল;—সামাল সামাল। দরোয়ান, চাকর চারিদিক থেকে বেরিয়ে উদ্ধবকে ধরে ফেল্লে। তারপর তার ওপরে কীল, চড়, লাথি। শেষে মূর্চ্ছিতপ্রায় উদ্ধবকে টেনে নিয়ে গিয়ে তারা কাছারী-বাড়ীর বাইরে ফেলে দিলে।

বাইরে বেরিয়ে দু-এক-পা যেতে না যেতেই সে অজ্ঞান হোয়ে একটা ঝোঁপের পাশে পড়ে গেল।

উদ্ধবের যখন জ্ঞান হোলো তখন অন্ধকার, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার! নিশীথিনী হাজার পাঁয়জোর পায়ে দিয়ে পৃথিবী দাপিয়ে ছুটে চলেছে—ঝম্ ঝম্ ঝম্। উদ্ধব কোনো রকমে নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে সেই ঝিল্লী-মুখরিত বনপথ দিয়ে বাড়ী ফিরে চল্লো—মুচীর ছেলে—গরীবের ছেলে। বাড়ীর দরজা খোলা ছিল, সে দেয়ালে ভর দিয়ে কোনো রকমে লক্ষ্মণের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। এমনিতেই সে চোখে দেখতে পাচ্ছিল না, তার ওপরে ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার; তার মনে হোতে লাগলো বাইরের যত অন্ধকার যেন তার সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। হাতড়ে-হাতড়ে সে বাপের খাটখানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর একখানা হাত বাপের বুকের ওপর রেখে ডাকলে—বাবা!

ঘুমন্ত লক্ষ্মণ চমকে উঠে তার দু-খানা আহত হাত দিয়ে উদ্ধবের হাতখানা চেপে ধরে বল্লে—কে উদ্ধব? কোথায় গিয়েছিলি বাবা?

উদ্ধবের গলাটা কে যেন দু-হাতে চেপে ধরতে লাগলো। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে সে বল্লে—ওরা আমায় মেরেছে বাবা—বড্ড মেরেছে—

লক্ষ্মণ উদ্ধবকে পাশ থেকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে তার জ্বরতপ্ত দেহ দিয়ে পুত্রের বেদনা শুষে নিতে লাগলো।

দুর্লভ

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

ডাগর আঁখিতে আলোর সাগর কুসুম গালে লালের মায়া,
আধ' শশী তার শোভন ললাট কুসুম-ধনুর ভ্রূ-দুটি ছায়া
নয়নের ভুল, বেণী-বাঁধা চুল ; শ্রেণী গাঁথা অলি
ও নহে মোটে
হিংসুক নহে কিংশুক আর, পড়েছে ঘুমায়ে তাহারি ঠোঁটে।

কিসের লাগিয়া জানি না দেবতা আসিলা সাগর মথন করি'
কোন্ ভুলে ভোলা ভুলি' আপনারে রাখিল কণ্ঠ
গরলে ভরি'
আমি শুধু জানি গোপন বারতা অমৃতের কথা সকলি ফাঁকি,
কোথা এতদিন ছিল সে গোপন কোন্ সে মুখের
সোহাগ মাখি।

ওই যে কমল, যুগে যুগে যার বিশ্ব-সভায় রটিল খ্যাতি
কুমুদ যাহার সতত' বহিন্, স্থলের পদ্ম যাহার জ্ঞাতি,
নিখিলের কবি হইল ক্লান্ত রচি' রচি' তার শুচির স্তুতি,
বুঝিল না শুধু, কাহার হাসিটি ধরিয়া হিয়ায় তাহার দ্যুতি।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া পরশ-পাথর ফিরিল যে ক্ষ্যাপা পাথার-তীরে;
মিটিল কি তাহে কোন আশা তার, জীবনের সাধ
পূরিল কি রে ?
কোথায় মিলিবে পরশ-রতন ? প্রাণপণ সুখে
আদরে তা' যে
আমি রাখিয়াছি দূর মনোগেহে ঢাকিয়া নিভৃতে
বুকের মাঝে।

অমূল তরু

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

১

কলকাতার ঝামাপুকুর লেনে কোন মেসে কয়েকজন ছাত্র মিলিয়া গুপ্ত-মন্ত্রণা চলিতেছিল। হেমন্তের অলস মধ্যাহ্ন ধীরে-ধীরে অপরাহ্নের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ছুটির দিন বলিয়া এত বেলায় সবেমাত্র বাবুরা আহার করিয়া উঠিয়াছেন। নীচে ঝি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাসন মাজিতেছিল কি ভাঙ্গিতেছিল, ঠিক বুঝা যাইতেছিল না; এবং পাকশালায় পাচক ব্রাহ্মণ তদবসরে নিবিষ্ট-চিত্তে ঝির অংশে অস্থি, এবং নিজ অংশে মাংস ভাগ করিয়া লইতেছিল। ঝির ক্রোধের একমাত্র কারণ, সেই হাড়গুলির দ্বারা দন্তশ্রেণীকে বিপন্ন করিবার বিলম্ব ঘটিতেছিল। আজ মেসে মাংস রাঁধা হইয়াছে।

প্রকাশ কহিল, "লোকটা প্রেমে পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে, একটা সুযোগ হলেই হয়।"

প্রবোধ কহিল, "আর কাব্যের জন্য, ত মেসে টেকা দায় হয়েছে! পূর্ণিমা রাত্রির কথা ছেড়ে দাও, অমাবস্যাতেও নিস্তার নেই! অন্ধকারেও কবিত্ব উথলে ওঠে!"

প্রভাস কহিল, "ভাই বিনোদ, তোমার এ প্লট্‌টি যদি সফল হয়, তা হলে চারদিন তোমাকে ফ্যান্সি হোটেলে চর্ব্ব্য-চুষ্য করে খাওয়াব।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "আজই আমি প্ল্যান আগা-গোড়া দুরস্ত করে আসছি, ফেল হবার কোন ভয় নেই। আমার শালাটীকে বালিকার বেশে দেখলে বুঝতে পারতে।"

নীরদ কহিল, "আমার ভয় হয়, মোটে চোদ্দ বছরের ছেলে, ঠিক অভিনয় করতে পারবে কি না।"

বিনোদ কহিল, "চোদ্দ বছর তার বয়স, মেয়ে সাজালে

তাকে ষোল বছরের মত দেখায়; কিন্তু সে অভিনয় করে ঠিক আঠার বছরের মেয়ের মত। তাদের স্কুলে একটা অভিনয়ে আমি তাকে ফিমেল-পার্ট প্লে করতে দেখেছি—চমৎকার!"

সহসা প্রকাশ বক্র কটাক্ষে তীব্রভাবে ইঙ্গিত করিল, এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের মত নিমেষের মধ্যে সকলে একযোগে সম্বৃত হইল।

একখানা কাব্য-পুস্তক হস্তে সুবোধ প্রবেশ করিল। সন্দেহোদ্দীপক নীরবতা নষ্ট করিবার জন্য নীরদ কহিল, "ওটা কি বই হে সুবোধ?"

প্রসঙ্গটা অবতারণা করিবার জন্য সুবোধ সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল; এরূপ অভাবনীয় ভাবে সুবিধা ঘটিয়া যাওয়ায় সে উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "প্রণয়-কুসুম।" একটা কবিতা শোন, কেমন চমৎকার!

নয়নে নয়নে আসিয়াছি কাছাকাছি—
হৃদয় পেয়েছে হৃদয়ের—পরিচয়
ইঙ্গিত ভরে যতবার কাঁদিয়াছি—
বুঝেছি ধারণা মিথ্যা কখন নয়।
তব ভাষা দিয়া পরখিতে কাঁপে মন
মূক হয়ে রই শুনাইতে যদি যাই,
পাছে দিবালোকে ভেঙ্গে যায় সুস্বপন!
অধিক প্রমাণে কাজ নাই, কাজ নাই!

কি মারাত্মক অবস্থা! এদিকে মনে-মনে প্রাণে-প্রাণে সমস্ত স্থির হয়ে গেছে; নয়নের ভাষায় যতটুকু বোঝা যাবার—তা বোঝা গেছে; তবু সন্দেহ, তবু আশঙ্কা যদি সে সমস্ত মিথ্যা হয়! যদি হৃদয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার মিল না ঘটে, তখন আত্ম-অভিমান নিয়ে পালাবার পথ পাওয়া যাবে না! অথচ এত কাছাকাছি এসেও যদি একটা বোঝাপড়া না হয়, ফিরতে হয়, তার বাড়া দুর্ভাগ্য আর নেই!"

প্রকাশ কহিল, "দুর্ভাগ্য বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু দোহাই সুবোধ, মাংস আর কাব্য একসঙ্গে হজম করতে পারে, এমন পরিপাক-শক্তি আমাদের মেসে কারও আছে কি না, তাও সন্দেহ! কাব্য যদি আর একটু জমিয়ে তোল, তা হলে পেটের মধ্যে পাঁঠার মাংসগুলা ডাকতে আরম্ভ করবে!"

সুবোধ কহিল, "কিন্তু এর বিপরীতটা তোমাদের পক্ষে আরও কঠিন হবে। খালি পেটে যদি কাব্য-চর্চ্চা করতে যাও, তখন দেখবে যে তোমাদের পরিপাক-শক্তি এতই তীব্র যে, মাছ-মাংসের মত একটা কোন গুরুপাক জিনিসের ব্যবস্থা না করলে পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত পরিপাক হয়ে যাবার উপক্রম করবে! অতএব—"

প্রবোধ সুবোধের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "অতএব, এমন অসুবিধার ব্যাপারকে সর্ব্বথা বর্জ্জন করাই ভাল!"

ক্ষুব্ধ সুবোধ পুস্তক বন্ধ করিয়া কহিল, "তবে বর্জ্জন করাই গেল। কিন্তু তোমাদের কাব্য ভাল লাগে না, প্রেম ভাল লাগে না, বিধাতা কি দিয়ে তোমাদের হৃদয় গড়েছেন সেটা একটা অনুশীলনের জিনিস!"

নীরদ কহিল, "দিনের মধ্যে অকারণ যে কাব্য-চর্চ্চা করছে, আর একশ-বার করে প্রেমে পড়ছে, তার মস্তিষ্ক বিধাতা কি দিয়ে গড়েছেন, সেটাও একটা পরীক্ষা করবার বিষয়! কাব্যও তোমার প্রচুর, প্রেমও তোমার পর্য্যাপ্ত। কিন্তু নায়িকা কই হে? জিন, সাজ, রেকাব, চাবুক তোমার তৈয়েরী, যা কিছু অভাব একমাত্র ঘোড়ার!"

নীরদের কথা শুনিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। সুবোধ কহিল, "আজ হাসছ। কিন্তু একদিন যখন আমার নায়িকা ফুলের রাশির উপর দুটি কোমল চরণ ফেলে, স্বপ্নের নীলাঞ্চল উড়িয়ে, তারকার মালা মাথায় জড়িয়ে, সলজ্জ হাস্যে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে—"

প্রকাশ সুবোধকে বাধা দিয়া কহিল, "চুপ কর, সুবোধ, চুপ কর। সেদিন আমরা সকলে নিশ্চয়ই মূর্চ্ছা যাব!"

সুবোধ কহিল, "সেদিন দেখবে কাব্য আর প্রেমের চর্চ্চা বৃথা যায়নি; সেদিন দেখবে অতীতের ফুলের সৌরভ, যাকে হাওয়া মনে করেছিলে, বর্ত্তমানে ফলের রসে পরিণত হয়েছে।"

বিনোদ কহিল, "আর তার পরদিন দেখবে সেই ফলের রস লেহন করে তোমার কাব্য-ব্যাধিগ্রস্ত মন একেবারে নীরস হয়ে গেছে!"

উচ্চ-হাস্যে মেসের গৃহ সচকিত হইয়া উঠিল; এমন কি পাঁঠার-হাড় বেশী শক্ত অথবা মানুষের দাঁত বেশী কঠিন, সে সম্বন্ধে স্থির যে কঠোর পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহাতেও ক্ষণিকের জন্য বাধা পড়িল।

বিনোদ কহিল, "সে সব কথা যাক্, একটু বেড়িয়ে আসবে ত' চল।"

"কোথায় ?"

"আমার শ্বশুর-বাড়ী।"

সবিস্ময়ে সুবোধ কহিল, "শ্বশুর-বাড়ী ? কেন, তোমার স্ত্রী ত' এখানে নেই ?"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "মন্দ নয়! তোমার নায়িকা নেই, অথচ তুমি প্রেম করতে পার, আর স্ত্রী না থাকলে শ্বশুর-বাড়ী গেলে আমার অপরাধ ?"

সুবোধ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা বটে!" তাহার পর অল্প চিন্তা করিয়া কহিল, "উঃ, সেই বাগবাজার যেতে হবে ? আচ্ছা চল, কিন্তু বাগবাজারের রসগোল্লা খাওয়াতে হবে, তা যেন মনে থাকে।"

বিনোদ বন্ধুবর্গের প্রতি হস্ত-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "সেটা আমি এদের সাক্ষী রেখে হলফ করে বলছি খাওয়াব।"

বন্ধুবর্গ পুনরায় উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিল।

(২)

শ্বশুরালয়ে পৌছিয়া বিনোদ সুবোধকে বৈঠকখানায় বসাইয়া কহিল, "তুমি এইখানে একটু বোস, আমি দেখা করে আসি।"

সুবোধ কহিল, "একা বেশীক্ষণ বসে থাক্‌তে পারব না, শীঘ্র এসো।"

"আধ ঘণ্টার বেশী দেরী হবে না" বলিয়া বিনোদ অন্দরে প্রবেশ করিল। অন্দরে প্রবেশ করিয়া সাক্ষাৎ হইল প্রথমে সুমতির সহিত। সুমতি বিনোদের প্রথমা শ্যালী; মুখে-চখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি, হাস্য-মধুরা এবং স্বভাবতঃ কৌতুক-প্রিয়া। স্ত্রীর সম্পর্কে বিনোদ সুমতিকে দিদি বলিয়া ডাকিত।

সুমতিকে দেখিয়া বিনোদ ব্যগ্রভাবে কহিল, "দিদি, যোগেশ বাড়ী আছে ?"

সুমতি কহিল, "আছে। কিন্তু এসেই তাকে খোঁজ কেন ?"

"শীঘ্র তাকে ডেকে নিয়ে আসুন—সে এলে বলছি কেন খোঁজ।"

অদূরে সুনীতিকে দেখিতে পাইয়া সুমতি যোগেশকে ডাকিবার জন্য আদেশ করিল।

সুনীতি বাটীর তৃতীয়া কন্যা; বয়স বছর পনের-ষোল। বিনোদের শ্বশুরালয়ে এই মেয়েটি দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী; এখনও বিবাহ হয় নাই। সুনীতির মাতার ইচ্ছা আর বিলম্ব না করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়; পিতা কিন্তু উদার-তন্ত্রের ব্যক্তি; তাঁহার ইচ্ছা আরও কিছুদিন লেখা-পড়া শিখাইয়া তাহার পর বিবাহের কথা।

সুনীতি ও যোগেশ আসিলে, বিনোদ বিশদভাবে তাহার ফন্দীটি সকলের নিকট ব্যক্ত করিল। শুনিয়া সুমতি এবং যোগেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এমন একটা কৌতুকপ্রদ চক্রান্তে যোগ দেওয়াই যথেষ্ট আনন্দদায়ক বলিয়া তাহাদের মনে হইল। অভিনয়টি করিবার পক্ষে অসুবিধার কথাও কিছু ছিল না; কারণ বিনোদের শ্বশুর কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিতেন এবং শাশুড়ী রত্নময়ীর দেহ বাতে এবং মন সারল্যে, এমন পঙ্গু ছিল যে, তাঁহার সংসারে যত কঠিন কাজই হউক না কেন, তাঁহার অগোচরে করা কিছুমাত্র কঠিন হইত না।

বিনোদ কহিল, "আজই একবার যোগেশকে সাজিয়ে সুবোধের সামনে বার করলে হয়, রোজ-রোজ ত' আসবে না।"

সুমতি ব্যগ্র হইয়া কহিল, "তা ত' এখনি হতে পারে, কিন্তু চুলের কি হবে ?"

যোগেশ তৎপর হইয়া কহিল, "সে আমি এক-দৌড়ে পাঁচ-মিনিটের মধ্যে নিয়ে আস্‌ছি, বাগবাজার ড্রামাটিক্ ক্লাব থেকে।" বলিয়া কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুমতি হাসিয়া কহিল, "চুল নিয়েই ভয়, থিয়েটারের চুলগুলো ভারি খারাপ হয়।"

বিনোদ কহিল, "কোন ভয় নেই দিদি, কোন ভয় নেই, একেবারে অন্ধ। যার মন দিবারাত্র কাব্যে মস্‌গুল রয়েছে, তার কি দৃষ্টিশক্তি ঠিক্ থাক্‌তে পারে? জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে যে এমন অধীর হয়ে পড়েছে, জল ভুল করে পাথরের উপর লাফিয়ে পড়লেও সে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করবে।"

বিনোদের কথা শুনিয়া সুমতি হাসিতে লাগিল।

বাল্য-সুলভ রঙ্গ-প্রিয়তার জন্য মনে-মনে কৌতুক অনুভব করিলেও এই কপট অভিনয়ের নিষ্ঠুরতার দিকটা

সুনীতিকে ঈষৎ পীড়ন করিতেছিল। সে কহিল, "এমন অন্ধ লোককে পাথরের উপর আছড়ে আপনাদের কি লাভ হবে মেজ জামাইবাবু?"

বিনোদ কহিল, "লাভ আমাদের চেয়ে তার নিজের বেশী হবে। পাথরের উপর আছাড় খেয়ে তার যদি চৈতন্য হয়, তা হ'লে ভবিষ্যতে গভীর-জলে ডুবে মরবার ভয় তার অনেক কমে যাবে। তা ছাড়া আসল কথা কি জান, এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিশোধ! যে নাকালটা আমরা প্রতিনিয়ত সদা-সর্ব্বদা পাচ্ছি, তার পাল্টা নাকাল একবার আমরা দিতে চাই।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "কিন্তু, বেচারার অপরাধ ত আপনাদের কবিতা শোনান—কবিতা ত আর খারাপ জিনিস নয়।"

বিনোদ কহিল, "কবিতা ভাল জিনিস ও খুবই সরস; কিন্তু দিন নেই, রাত্রি নেই, সন্ধ্যা নেই, সকাল নেই, সব সময়েই যদি সেই সরস জিনিসের জুলুম চলে, তা'হলে মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে। জল জিনিসটা খুব ঠাণ্ডা আর নরম ত? কিন্তু, এক সময়ে সব চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কি ছিল জান? অপরাধীকে কাঠের ফ্রেমে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রেখে, উঁচু থেকে টপ্-টপ্ করে তার মাথার উপর ফোঁটা-ফোঁটা জল ফেলা হোত। প্রথমে তাতে কোন কষ্টই হোত না; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এমন ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হোত যে, অনেকে তাতে পাগল হয়ে যেত।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "যাই বলুন, ও কিন্তু লঘু-পাপে গুরু-দণ্ড হচ্ছে; আমার ও-বেচারার জন্যে দুঃখ হচ্ছে।"

সুমতি স্মিতমুখে কহিল, "কেন বল দেখি হঠাৎ তোমার এমন করুণা জেগে উঠল?"

সুনীতি বলিল, "কেন জাগ্‌বে না দিদি? কি রকম ভাবুক লোক তা'ত শুনছ;—যেদিন টের পাবে যে, একটা সাজান বেটাছেলের মিথ্যা ফাঁদে পড়ে ঠকেছে, সেদিন বেচারী কি ভয়ানক দুঃখ পাবে বল দেখি?"

সুনীতির কথা শুনিয়া বিনোদ হাসিয়া উঠিল। কহিল, "এই যদি তোমার দুঃখ হয়, তা'হলে তার উপায় ত' তোমার হাতেই রয়েছে,—যোগেশের বদলে তুমি অভিনয় কর—তা' হলে মিথ্যা ফাঁদও হবে না, আমাদের কাজও অনেক সহজ হয়ে যাবে। আসল চুলে সুবোধকে বাঁধতে পারলে আর নকল চুলের ভাবনা ভাবতে হবে না।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "আমার আপত্তি ছিল না মেজ-জামাইবাবু; কিন্তু তাতে আপনার বন্ধু আরও কষ্ট পাবেন। নকল জিনিস না পাওয়ায় কষ্ট হলেও আসল জিনিস না পাওয়ার কষ্ট তার চেয়েও অনেক বেশী হবে।"

এই কথোপকথনের সূত্রে সুমতির হঠাৎ একটা কথা মনে হইল। পরিহাস রঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়া যদি বাস্তবিকই একটা সত্যকার ব্যাপার গড়িয়া তোলা যায়, ত মন্দ কি। সুনীতির বিবাহের বয়স হইয়াছে, রত্নময়ী তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু পিতা সম্মত নহেন বলিয়া সুনীতি দম্ভ করিয়া বেড়ায় যে, সে বিবাহ করিবে না। এই সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তি যদি এই কৌতুক-ক্রীড়ার মধ্য দিয়া করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এ ব্যাপারটা কেবলমাত্র অসার ক্রীড়াই হয় না।

সুমতি বলিল, "বিনোদ, তোমার বন্ধুটি কি রকম ছেলে?"

"একটি আস্ত পাগল।"

"তা'ত শুনেছি। আমি জিজ্ঞাসা করছি লেখাপড়ায় কেমন?"

"ভাল।"

"স্বভাব-চরিত্রে?"

"চমৎকার।"

"অবস্থায়?"

"খুব ভাল।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "শুধু মস্তিষ্কেই যা একটু গোল।"

বিনোদ সুনীতির দিকে ফিরিয়া কহিল, "একটু নয়, বিশেষ। কিন্তু ঠিক কর্ণধার-হীন নৌকায় মত; একজন শক্ত মানুষ কান ধরে বসলেই আর কোন গোল থাক্‌বে না।"

সুনীতি হাস্য-মুখে কহিল, "আপনি কি মনে করেন মেজজামাইবাবু, একমাত্র আপনার শ্বশুর-বাড়ীতেই তেমন শক্ত মানুষ পাওয়া যায়?"

সুনীতির কথা শুনিয়া সুমতি হাসিয়া উঠিল।

এমন সময়ে পরচুলা লইয়া যোগেশ উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে বালিকা বেশে সাজাইবার জন্য সুমতি লইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

নারীর স্থান কোথায় ?

[শ্রীতমাললতা বসু]

আমাদের দেশের পুরুষরা নারীর স্থান যে কোথায় নির্দ্দেশ করেচেন, আজও তা বোঝা গেল না। সভায় বক্তৃতার মুখে যাঁরা তাঁদের দেবী বোলে ভাবে গদ্‌গদ হোয়ে ওঠেন, বাড়ীতে তাঁদের মধ্যে অনেকেই নারীকে ক্রীতদাসীর চেয়ে নীচু বোলে মনে ভাবেন; তাদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেন, তাতে সয়তানও লজ্জিত হয়। অনেক ঘরে দেখেছি, নারীর বিন্দু ত্রুটি ঘট্‌লে অকথ্য ইতর ভাষায় তাদের গাল-মন্দ দেওয়া তো হয়-ই, তার পূর্ব্ব-পুরুষদের প্রতিও অশ্রাব্য কটূক্তি কোর্‌তে তাঁরা ছাড়েন না।

কিন্তু এই ঘৃণিত ব্যবহারে দিনের পর দিন মনে নির্ম্মম আঘাত পেয়ে নারী যদি কোনদিন বিচলিত হোয়ে কোন তীব্র কথা বলে, তা হোলেই সর্ব্বনাশ! তার গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, তার পতি-ভক্তি নেই, তার কাণ্ডজ্ঞান নেই, তার লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, ইত্যাদি নানা কুৎসা তার নামে লাগান হবে।

দেবতা সাক্ষী কোরে, অগ্নি সাক্ষী কোরে এবং নারীর পিতার অর্থ লক্ষ্য কোরে, পুরুষ যেদিন মন্ত্র-পূত কোরে স্ত্রীকে গ্রহণ করেন, সে তো বেশ অম্লান-বদনে সুখ-দুঃখ-ভাগিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী বোলে গ্রহণ করেন। কার্য্য-কালে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তার অনেকগুলিরই পরিচয় পাই না কেন?

দুঃখভাগিনী হয়তো নারী হোলেও হোতে পারে, কিন্তু সুখভাগিনী প্রায়ই তাদের করা হয় না। অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী তো একেবারেই নয়, নইলে সব ভাল কাজেই অর্দ্ধাঙ্গ বাদ্ পড়ে কেন?

কোন স্থলে আবার দেখা যায়, মাতৃরূপিণী, ভগিনী-রূপিণী নারী লাঞ্ছিত হোচ্চেন, কিন্তু স্ত্রীরূপিণী নারী মাথার মণি হোয়ে আছেন। দাসীরূপিণী নারী পায়ের তলায় প'ড়ে দলিত হোচ্চে, প্রণয়ীরূপিণী নারী পূজা পাচ্চে। কাজেই মনে সর্ব্বদাই প্রশ্ন ওঠে "নারীর স্থান কোথায়?"

সত্যি কথা বোল্‌তে কি, বাস্তবিক সহধর্ম্মিণী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, নারী বোল্‌তে যা বোঝায়, তা এদেশে দুর্লভ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল নেই, ভাই-বোনের মনের মিল নেই, মা-ছেলের মনের মিল নেই, এবং সেজন্যে সংসারে সুখ নেই, গৃহে শান্তি নেই।

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কোরে, বোসে-বোসে চোখ বুজে ভগবানকে ডাকাটা খুব একটা বাহাদুরী নয়। সংসারের কোলাহলের মধ্যে থেকে কামিনী-কাঞ্চন সামনে রেখেও যে তাঁকে ডাক্‌তে পারে, তার ডাকাই ডাকা, সেই

সত্যিকারের সাধু ঋষি, প্রেমিক; এই জন্যেই জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বোলেছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"।

আজ নারী যে এমন বিচলিত হোয়ে উঠ্‌ছে, তার কারণ কি? তাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃই কোমল; পতির প্রতি ভক্তি, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, সেবায় আস্থা, এ সব তাদের প্রকৃতিগত ব্যাপার। তারা তো তার অন্যথা আচরণ কর্ব্বার অভিলাষী নয়। কিন্তু, তারা যদি দেখে যে, যারা দেবতার পূজা দাবী কোর্‌ছে, তারা দানবের রীতিনীতি অনুসরণ করে, তারা যদি দেখে যে তার সঙ্গে পুরুষের মনের, মস্তিষ্কের, ভাবের কোনো যোগ কোনোখানে নেই, তবে তারাও তাদের রীতিনীতির পরিবর্ত্তন কোরবে। নারীও যে মানুষ, এই মোটা কথাটা অনেকেই ভুলে যান।

নারীর স্থান মাথার ওপরেও নয়, পায়ের নীচেও নয়—অন্তরের মধ্যে। সে পূজাও চায় না, অবহেলাও সহ্য কোরতে চায় না। সে যে মাতা, কন্যা, ভগিনী, বধূ;—সে স্বতঃই স্নেহ-পরায়ণা, করুণ-হৃদয়া। সে চায় স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম। কিন্তু তাই বোলে সে অন্যায়, অত্যাচার, অবজ্ঞার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হোতে ছাড়্‌বে না; আঘাত পেলে প্রতিঘাতও কোর্বে। সে ভুবনেশ্বরী রূপে দেখা দিলেও, প্রয়োজনকালে মহাকালীও হোতে পারে।

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা

'মলহরি'

[শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম বি]

(১)

দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়ে-কামরায় তিল ধারণের স্থান নাই। মেয়েদের ঠেসাঠেসি; ছেলেদের কান্না; স্থানের জন্য উচ্চকণ্ঠে কোঁদল; স্থানাভাবে দুই চক্ষে বাদল; হাঁড়ি, কলসী, কুজো, ঘটি, প্যাঁটরা, গাঁটরী প্রভৃতির গড়াগড়ি; গাড়ীর দরজায় প্রবেশার্থিনীদের হুড়াহুড়ি। চন্দ্র-গ্রহণে ত্রিবেণী স্নানের জন্য এই যাত্রীর ভিড়। বৃদ্ধা ধাত্রী নিঃসঙ্গ ও নির্ভয়। সুতরাং পার্শ্বস্থ পুরুষ-কামরায় আসন গ্রহণে তার কোন প্রতিবন্ধক নাই। সেই কামরায় ছিলেন দুইজন সাহেব এবং দুইজন বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একজন গৌরবর্ণ, খর্ব্বকায়, হাড়ের উপর চামড়া পরান, মাথায় টিকি ঝুলান। ঠিক যেন পঞ্জিকার একাদশী ঠাকুর। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঠিক তাহার বিপরীত—বর্ণ মসীকৃষ্ণ, দৈর্ঘ্য ৪॥০ হাত, প্রস্থ ১॥০ হাত, ভাটা সদৃশ চক্ষুদুটী ঘূর্ণিত, হস্তে গদাতুল্য দীর্ঘ যষ্টি শোভিত,—এক কথায় কলির ভীম; কিন্তু বন্ধুদের অমরকোষ অনুসারে "কালা পাহাড়।" সাহেব ও বাঙ্গালী সামনা-সামনী বসিয়াছেন। সাহেবেরা জাতীয় সভ্যতা অনুসারে সবুট চরণ-চতুষ্টয় সম্মুখের বেঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। কালা পাহাড় ও একাদশী ঠাকুরেরও সেই ভঙ্গি; অধিকন্তু কালা পাহাড়ের কর্দ্দমাক্ত দুখানা প্রকাণ্ড কাল পানসী সাহেবের নিতম্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত। গাড়ী ছাড়িলে সাহেব রোষকষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন "Get down those dirty legs you niggers" ("কালা কাফরী সকল, ময়লা পাগুলি নীচে নামাও)। কলির ভীম আস্তিন গুটাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রক্তবর্ণ চক্ষু দুটী ঘুরাইয়া বলিলেন, "What! 'niggers'—plural gender!" তাঁহার শিক্ষার দৌড় পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত. বচন এবং লিঙ্গ-প্রকরণ ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই বলিলেন "কি! নিগার সকল। আবার বহু লিঙ্গ!" সাহেবেরা হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন এবং কালা পাহাড়ের বিরাশী সিক্কে ওজনের ঘুসি পতনোন্মুখ দেখিয়া বলিলেন "All right Babu, that will do" (ঠিক হয়েছে বাবু, এতেই হবে, আর কিছু করতে হবে না)। সাহেবদের চরণ-চতুষ্টয় নিম্নগামী হইল। তাঁহারা শ্রীরামপুর ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেন। একাদশী ঠাকুর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ্‌লে মা, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। আমি

প্রতিদিন আফিস থেকে বাড়ী যাবার সময় এই সাহেব দুটীও শ্রীরামপুর যায়। তারা পা বেঞ্চের উপর তুলে দেয়! আমি পা তুল্‌লে ঐ রকম ভাষায় রোজই পা নামাতে বলে। আমি ক্ষীণজীবী ম্যালেরিয়া রোগী। কিছু বলি না, পাছে বুটশুদ্ধ লাথি মারে। মরে গেলেও ত নিস্তার নাই; পিলে ফাটা প্রমাণ করবার জন্য কাটা-ছেঁড়া করবে। কাজেই এতদিন গালাগাল হজম ক'রে আজ এই বন্ধুকে নিয়ে এসেছি। যদিও এক গ্রামে বাড়ী, বন্ধুটীর আমার মতন খাওয়া-পরার কষ্ট আর অন্ধকার গুদামে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি নেই। দারিদ্র্যের সঙ্গেই রোগের বন্ধুতা। ধনী বন্ধুটীর ত্রিসীমায়ও রোগ আস্‌তে পায় না।" কথা শেষ হইলে উৎসাহ-কম্পিত একাদশী ঠাকুর এবং বল-গর্ব্বিত কালা পাহাড় পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিলেন।

(২)

গাড়ী মগরা ষ্টেশনে থামিল। রোগীর লোক একখানা গাড়ী লইয়া উপস্থিত। পক্ষীরাজ দুইটী কষাঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়িয়া 'যাচ্ছি যাব, যাচ্ছি যাব' বলিতে-বলিতে চলিল। সঙ্গী রাস্তার দুইধার দেখাইয়া গল্প করিতে লাগিলেন। "ঐ যে জরাজীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ইষ্টকস্তূপ জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে কতদিন থেকে পথিকদের যাতায়াত দেখ্‌ছে, ওখানে বাগাটীর সুপ্রসিদ্ধ বক্তা রামগোপাল ঘোষের বাড়ী ছিল। পূর্ব্বে এখানে ষ্টেশন ছিল না, কিন্তু রামগোপাল ঘোষকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সাহেবেরা এই স্থানে গাড়ী থামাত। যাঁর বক্তৃতায় টাউন-হল কম্পিত হত, আজ তাঁরই ভিটায় শৃগালধ্বনি বই কিছুই শোনা যায় না। যে সরস্বতীর পোলের উপর দিয়ে আস্‌তে উনিশটা খিলান দেখেছেন, সেই নদী পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। রেলের কৃপায় আপনাদের মতন লোক, আর সুচিকিৎসা পাওয়া যাচ্চে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়াও পাওয়া গেছে। রেল প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে পূজার সময় একবার বহুদিন ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। সরস্বতীর জল টেনে নেবার শক্তি

কেরোসীন সিঞ্চনে পেনামা ম্যালেরিয়া-মুক্ত

আর নাই; রেলের রাস্তা জল যাবার রাস্তা বন্ধ করেছে। ত্রিবেণী জল-মগ্ন। সেই জল যত শুকাতে লাগ্‌ল, গ্রামে এক প্রকার জ্বরের প্রাদুর্ভাব হল। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ঘরে-ঘরে আর্ত্তনাদ, আর মড়কের ভীষণ দৃশ্য। যাঁদের সম্বল ছিল, তাঁরা কলিকাতা পালিয়ে গেলেন। ঐ যে প্রকাণ্ড মাঠে ঐ একটী মন্দিরের ভগ্নাংশ দেখ্‌ছেন, ওখানে ছিলেন 'ডাকাতে কালী'। ওখানকার মাটির নীচে কত লোকের রক্ত জমাট হয়ে আছে। এই ত্রিবেণী গ্রামে কত দেব-মন্দির, দোল-দুর্গোৎসব, ব্রাহ্মণ-সেবা, অতিথি-সেবা ও সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের টোল ছিল। নব্য-তন্ত্রের লোকেরও

অভাব ছিল না। এই গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সিনিয়ার স্কলার ৺চন্দ্রকান্ত সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত তমোহারিণী সভায় আচার্য্য কেশবচন্দ্রও বক্তৃতা করেছেন, আর ভট্টাচার্য্যেরা 'একাকারের লক্ষণ' দেখে সভা ছেড়ে উঠে গিয়েছেন। এখন সভা-সভ্যের বদলে আছে গুলি ও গাঁজার আড্ডা, আর দোল-দুর্গোৎসবের পরিবর্ত্তে ম্যালেরিয়া-চর্ব্বিতের হাহাকার।"

(৩)

ভট্টাচার্য্য-পাড়ার বাঁড়ুয্যেরা বর্দ্ধিষ্ণু লোক। ৺ভবানন্দ বাঁড়ুয্যের ঠাকুরদাদা রসদের কাজ করিয়া বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রোগিণী ভবানন্দের কন্যা এবং নৈহাটী ট্রেণের সহযাত্রিনী পিসীমার ভাইঝি। মেয়ের সেই সোণার রঙ্গে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। প্রতিদিন কম্প দিয়া জ্বর আসে। জ্বরের সময় প্রলাপ ও বমি। জিভ, ঠোঁট, চোক একেবারে শাদা। এই অবস্থায় নাকি ডাক্তারী ঔষধ উত্তরায় গর্ভনাশোন্মুখ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র অপেক্ষাও ভীষণতর; তাই অচিকিৎসাই শিশু-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পিসীমা বলিলেন "মা, নৈহাটীতেই ত তোমাকে বলেছি, এই মেয়েটীকে রক্ষা করতে হ'বে। এই আট মাস। কোন্ সময় ছেলে হ'য়ে পড়ে। তাই তোমাকে ডেকেছি।" আমি পিসীমাকে বুঝাইয়া বলিলাম, চিকিৎসার দরুণ গর্ভপাতের যে ভয় করা হয়, অচিকিৎসার সে ভয় ত আছেই, তা ছাড়া ঢাকি-শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিবার আশঙ্কাও আছে। বাঙ্গলা দেশে বাৎসরিক গর্ভপাতের সংখ্যা প্রায় চারি লক্ষ। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী এক লক্ষ শিশুকেই গর্ভে নাশ করে। এই রাক্ষসী-মারণের অস্ত্র ডাক্তারদের হাতেই আছে।

কলকাতা হইতে ডাক্তার আসিয়াছেন। পিচকারী দ্বারা মাংসচ্ছেদন পূর্ব্বক কুইনাইন প্রয়োগ করিবার পর গর্ভিনী সম্পূর্ণ জ্বর-মুক্ত। আজ সকলেরই মুখ প্রফুল্ল। ডাক্তার বাবুকে দেখিবার জন্য অনেকেই আসিয়াছেন; তন্মধ্যে গ্রামের বলাই দাদা প্রসিদ্ধ। তিনি একাসনে কুড়ি কলিকা গঞ্জিকা সেবন করিতে পারেন; এক কলিকা গাঁজা পাইলে দুপ্রহর রাত্রে বিনা ওজরে মড়া পোড়াইতে গিয়া থাকেন। তিনি বাজখাঁই স্বরে ডাক্তার বাবুকে বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, এ সব কি রোগীই দেখ্ছেন? রোগী দেখতেন কিছুদিন আগে আমার জন্মস্থান দেবানন্দ-পুরে। 'মলহরি' প্রথম কৃপা করলেন বড় দাদাকে। তিনি ত এক মাসেই শিঙ্গে ফুঁকলেন। তারপর ক্রমে বড়-বউ, মেজদা, মেজবউ, এমন কি ছোট বৌ পর্য্যন্ত আমাকে ফেলে পটল তুললেন। শ্মশানে ডোম ব্যাটাদের ত আনন্দ আর ধরে না। ক্রমে 'মলহরির' দৃষ্টি আমার উপরও পড়ল। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, এক চুমুকে দুসের পাঁচ সের জল খেয়ে ফেলি; খেয়েই কলসী-কলসী বমি। তার পর পেটের ভেতর এত বড়-বড় কেঁসর-ঘণ্টা ঝুলতে লাগল। পটল তুলবার জন্য ত ঝুড়ি খুঁজতে লাগলাম। একদিন মনে হল, আচ্ছা! ডোম ব্যাটারা এত মলহরি ছোঁয়, আর পোড়ায়, ও-ব্যাটাদের কাছে তিনি ঘেঁসে না কেন? শ্মশানে গিয়ে দেখি গঙ্গাপুত্রেরা চুলির আগুন নিয়ে গাঁজা সেজে কসে দম দিচ্ছে। বাবার কৃপায় চোক খুলে গেল।

পরদিন পাঁচসের গাঁজা নিয়ে তারকেশ্বরে ছুট। তিন দিন হত্যে দিয়ে পড়ে আছি। বাবা তারকনাথ শিঙে বাজাতে-বাজাতে এসে বললেন "চেয়ে দেখ্, তোর হাতের ভেতর ওষুধ রেখে গেলাম।" চোক খুলে দেখি মুটোর ভেতর গাঁজা। ঐ গাঁজা ভাল ক'রে সেজে 'জয় বাবা তারকনাথ' ব'লে ক'সে এক দম মেরেছি, আর শালা জ্বর ঘামের সঙ্গে ভেসে কোথায় গেল! পেটের কেঁসর-ঘণ্টা গ'লে কাপড়-চোপ্ড় ভাসিয়ে দিলে। বাবার সামনেই বেয়াদবি ক'রে ফেল্লাম। যা হোক, সবটুকু পেসাদ না খেয়ে একটু কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে গ্রামে ঢুকতেই দেখি রাম চক্কত্তি টল্তে-টল্তে গাইতে গাইতে আসচে—

বোতল তোমার কাল অঙ্গে
ভাল রং সেজেছে হে।
লাল জলেতে অঙ্গ মাখা,
কাল রূপ গিয়েছে ঢাকা,
মুখে কেবল কাকটী আঁটা
তাইতে চেনা গেছে হে॥

আমাকে দেখেই বল্লে "কে বাবা বলাই দা? তোমার

অমন চাকাই জালাটা কে ভেঙ্গে দিলে বাবা?" আমি চোক বুজেই গান ধ'রে দিলুম—

"কে পারে ঘুচাতে জ্বালা?
বিনে সেই ভব-ভোলা?
সিদ্ধি খেয়ে সিদ্ধেশ্বরে
নাচে তাধেই তাধেই ক'রে,
কাঁপে ধরা, ভেঙ্গে পড়ে
জ্বালা-ভরা ভব-জালা॥

চক্কত্তি ঠাকুর! জল-পথে থেকে এর মর্ম্ম বুঝবে না। বুঝতে চাও ত ডাঙ্গা-পথ ধর—

যে পথেতে হরিশ ম'ল,
যাতে গুপ্ত লুপ্ত হ'ল,
সে পথেতে যেতে মানা—
বিধি, ডাঙ্গা-পথে চলা॥

গান শুনে অবধি চক্কত্তি ঠাকুর ডাঙ্গা-পথ ধরেছে। সেই থেকে যেখানে দেখি 'মলহরি' কৃপা করেছেন, সেখানেই সকলকে বলি 'খাও বাবা এক কলকে গাঁজা, কিন্তু তারকনাথের এই পেসাদ ছুঁইয়ে দিয়ে খাও, আর কোন ভয় থাকবে না। সেই থেকে দেবানন্দপুরে মলহরি আর দর্শন দেন না; আর সেই থেকে এই দেখ বাবার পেসাদ খুঁটে বেঁধে নিয়ে বেড়াই। একটু নিয়ে যাও ডাক্তারবাবু, এমন ওষুধ আর নেই। কোথায় তোমার কুইনায়ান এর কাছে লাগে? বড়া-বড়া কুইনায়ান মিক্‌চার ত মুখে ঢেলেছি, পেটের ভেতর এমন দু'তিনখানা জাহাজ চলতে পারত। ডাক্তার বল্লে অনেক জল হয়েছে, এখন শুকিয়ে নিতে হবে। কাগজের ঠোঙ্গা করে দু'তিন মন শুক্‌নো কুইনায়ান গুঁড়ো পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিলে; চড়া পড়ে গেল, তবু 'মলহরি' এক পা নড়েন না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার কাছে ত তিকিচ্ছের কের্দ্দানিটা শিখে নিলে; তোমাদের ঐ বিদ্‌কিচ্ছি কুইনায়ানটা কোত্থেকে এনে মলহরির রাজত্বটা আরও বাড়িয়ে দিলে, সেই গল্পটা একবার বল দেখি।"

(৫)

(ডাক্তারবাবু কথিত কুইনাইন-পুরাণ)

"আমাদের পায়ের নীচে একটা বড় দেশ আছে। এখানে এখন সকাল আটটা, সেখানে এখন রাত্রি আটটা। সে দেশের দক্ষিণে পিরু বলে একটা জায়গা আছে। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে সে দেশের বড়লাট ছিলেন কাউন্ট চিঙ্কন (Chinchon)। তাঁহার স্ত্রী ভয়ানক জ্বরে শয্যাগত হইলেন। পিরুবাসীরা জ্বর তাড়াইবার জন্য একপ্রকার গাছের ছাল ব্যবহার করিত। সেই গাছের ছাল ব্যবহার করিয়া বড়লাট-পত্নী কাউণ্টেস্ চিঙ্কন আরোগ্যলাভ করিলেন। এইজন্য ইহার নাম হইল 'সিঙ্কোনা'। পিরুর জেস্যুইট সম্প্রদায়ভুক্ত প্রচারকেরা সেই ঔষধ উরূপ-খণ্ডে প্রেরণ করিলেন। সবিরাম জ্বরে আক্রান্ত সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই এই ঔষধ সেবন করিয়া জ্বরমুক্ত হইলেন। ঔষধের গুণ দেশে দেশে প্রচারিত হইবার ফলে অরণ্য বৃক্ষশূন্য হইল। হলাণ্ড বলিয়া পাতাল-অঞ্চলে একটা দেশ আছে। সে দেশ এত নীচে যে, সমুদ্রের জলে ডুবিয়া যাইবার ভয়ে বড়-বড় বাঁধ দিয়া জল আট্‌কান হইয়াছে। সেই দেশের রাজা ১৮৫২ সালে পিরু দেশের বীজ লইয়া জবদ্বীপে ঐ গাছের চাষ করিলেন; আর আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভারতবর্ষে বীজ পাঠাইবার ব্যবস্থার জন্য পিরু দেশে লোক পাঠাইলেন। এ গাছের ছাল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হইল। উরূপা অঞ্চলে ইটালী বলে এক দেশ আছে। সে দেশের লাহিববান্ নামক একজন ডাক্তার একদিন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দূরবীণ্ (মাইক্রোস্কোপ্) দিয়া দেখিলেন, ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে একপ্রকার খুব সরু কীট আছে, যা চক্ষে দেখা যায় না, যন্ত্রে দেখা যায়। এক-টুকরা পচা মাংসে যেমন লাখ-লাখ কৃমি কিল-কিল করে, তেমনি ম্যালেরিয়া রোগীর একবিন্দু রক্তে লাখ-লাখ কীট নড়িয়া বেড়ায়। ইহারা রক্তের লাল অংশটুকু খাইয়া ফেলে; তাইতে রোগীর রং ফ্যাকাসে হইয়া যায়। এই কীটের দরুণ জ্বর হয়, এই ব্যাপারটা বোঝা গেল। কিন্তু কীট আসে কোথা হইতে, এ কথা ত জানা গেল না? সব কাজেই তপস্যার প্রয়োজন। এই কথা জানিবার জন্য এই ভারতবর্ষে রস্ নামক একজন গোরা ডাক্তার একাগ্রচিত্তে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত বৎসর ধরিয়া তিনি এই কীটের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। খেলিতে-খেলিতে খেলা ত্যাগ করিয়া ডোবা-নর্দ্দামা হইতে মশা ধরিতে যাইতেন; কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মশার দেহ হইতে এই ম্যালেরিয়া-কীট রোগীর দেহে আসে। প্রতি বৎসর ভারতে ১৩,০০,০০০

(তের লক্ষ) লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। এদের বাঁচাইবার উপায় কি? রস্ এই চিন্তায় আকুল। ভাবিতে-ভাবিতে কবি ডাক্তার লিখিলেন—

"অদৃশ্যের অন্ধকার-মাঝে, হে ঈশ্বর!
ফুটাও আলোক প্রভো! আন দৃষ্টিপথে
লক্ষ-ঘাতী সূক্ষ্ম রিপু চক্ষু-অগোচর;
মারি শত্রু মৃত্যু-মুক্ত করিব ভারত॥"

সাত বৎসর পরে ঈশ্বর কৃপা করিয়া মশকীর উদর হইতে সেই অদৃশ্য চর্ম্মচক্ষু-অগোচর লক্ষ-ঘাতী মানব-শত্রু ম্যালেরিয়া-কীট ধরিয়া রসের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। আনন্দে ডাক্তার কবি গাহিলেন—

"অশ্রুসিক্ত শ্রান্ত ক্লান্ত, কতদিন ধরি
খাটি, ধরি বিধাতার আজ্ঞা শিরোপরি,
পাইয়াছি এতদিনে, খলমতিমান
লক্ষ লক্ষ-ঘাতী-কাল-গতির সন্ধান॥
হে কাল! দংশনে তব না রবে গরল।
হে শ্মশান! জ্বলিবে না তোমার অনল॥"

এই আবিষ্কারের পর হইতে মশার বাসস্থান খানা-ডোবা প্রভৃতি বোজান, পুকুরে কেরোসীন ফেলা, জঙ্গল কাটিয়া নানাবিধ ফলের গাছ রোপন, জল-নিকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা উপায়ে অনেক ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশ রোগমুক্ত করা হইয়াছে। আফ্রিকায় ফরাসীশ উপনিবেশ আলজিরিয়ার অন্তর্গত মিটিজ্জা নামক স্থানকে ইতিপূর্ব্বে ফরাসীশ গোরস্থান বলিত; কারণ সেইস্থানে ফরাসীশরা আসিবামাত্র ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এখন উপরিউক্ত উপায়ে সেস্থান ম্যালেরিয়ামুক্ত; এখন ইহাকে বলে "মরকতকুঞ্জ"। মিটিজ্জা জঙ্গল কাটিয়া কমলানেবু প্রভৃতির চাষ করিয়া, দুবেলা কুইনাইন খাইয়া, রাত্রে মশারি খাটাইয়া এবং মশারির অভাবে কেরোসীন্ চন্দন-তেল প্রভৃতি মাখিয়া অনেকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

এই বাঙ্গালা দেশে প্রতিবৎসর ৫।৬ লক্ষ লোক এই রাক্ষসীর কবলে পতিত হয় এবং ৫০।৬০ লক্ষ লোক ইহারই স্পর্শে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যাহারা পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করিয়া সহরের বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা যদি স্ব স্ব গ্রামের দিকে একবার করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সময়ে-সময়ে সেখানে গিয়া পল্লী-স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করেন, দরিদ্র গ্রামবাসীর অন্ন-বস্ত্র-সংস্থানের ব্যবস্থা করেন এবং গো-জাতির উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করেন; যে সমুদয় যুবক সহরে থাকিয়া দুবেলা মুদী ও বাড়ীওয়ালার তিরস্কার এবং দুপ্রহরে গৌরাঙ্গপ্রভুর চোখ-রাঙ্গানি সহ্য করিতেছে, তাহারা যদি কৃষক-ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিয়া জঙ্গল পরিষ্কার, ছোট-ছোট ডোবা বোজান, বড় ডোবা প্রভৃতির জলে কেরোসীন্ নিক্ষেপ, জল-নিকাশের ব্যবস্থা, রুগ্ন পরিবারে ঔষধ ও পথ্য বিতরণ, প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করে, তাহা হইতে এই ৫০।৬০ লক্ষ অক্ষম লোক সক্ষম হইয়া বঙ্গ-শ্মশানে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা রূপ

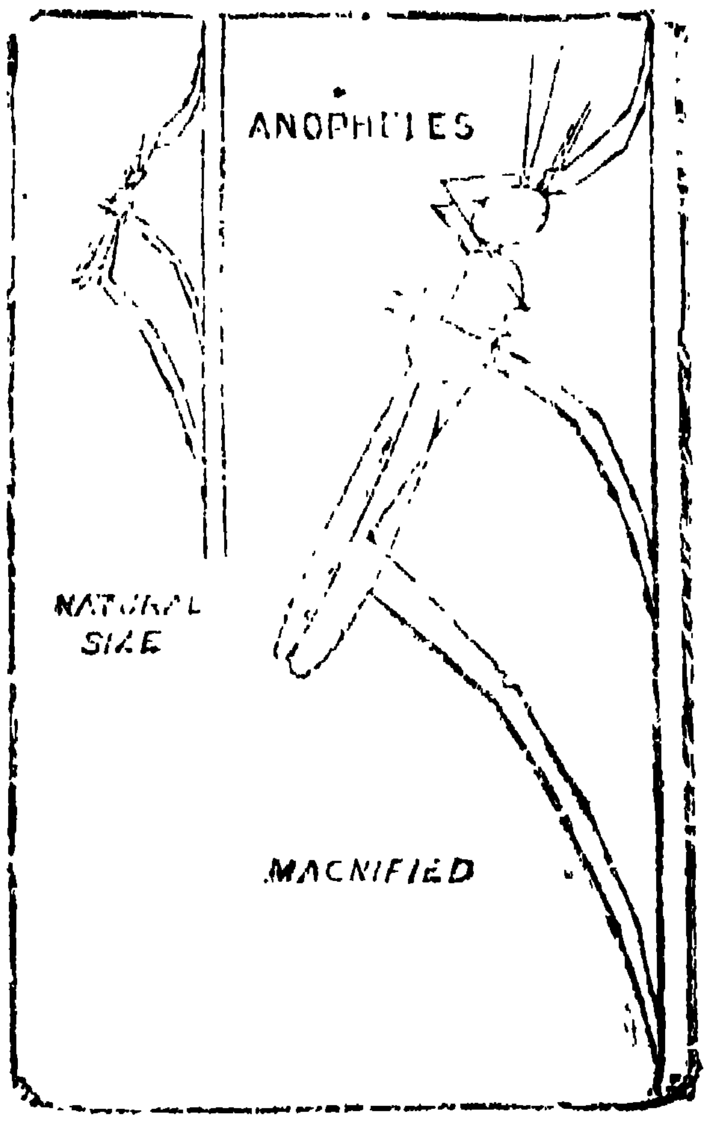

ম্যালেরিয়া-বাহিনী মশক দেওয়ালে বসিয়াছে

ফুটাইয়া তুলিবে, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দেখ ম্যালেরিয়া-কীটবাহিনী মশকের ছবি এবং তাহাদের ডিম ও ছানা কেরোসীন-ধারায় মারিবার ছবি। এই সমুদয় উপায়ে প্যানেমা নামক ম্যালেরিয়ার আবাস ম্যালেরিয়া-শূন্য করা হইয়াছে।"

(৬)

আজ বাঁড়ুয্যে-ভবনে আটকৌড়ি উৎসব। প্রসূতি আট দিন পূর্ব্বে একটী সুস্থকায় সুসন্তান প্রসব করিয়াছে। বলাই দাদা কুইনাইনের উপকারিতা স্বীকার করিয়া ডাক্তার বাবুর কল্যাণে কুড়ি কলিকা গঞ্জিকা সেবনের ব্যবস্থা করিলেন।

অপরাহ্নে একজন ভদ্রলোককে লইয়া গ্রাম পরিদর্শনে বহির্গত হইলাম। কিঞ্চিৎ দূরে অরণ্যের মধ্যে এক

দেবমন্দির। মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বাসুদেব; যাঁহার নামে গ্রামের নামকরণ, এবং চিত্তেশ্বরী কালী—যাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ডাকাতেরা লুণ্ঠনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। এইরূপ জনশ্রুতি, একদা মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা জমিদারের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল "আমি এত হট্টগোল ভালবাসি না; জনতা নিবারণ কর।" মন্দিরের চতুর্দ্দিক জনশূন্য হইল। ব্যাকুল ভক্ত-কোলাহলের পরিবর্ত্তে বিরাট নিস্তব্ধতা! সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যথাসময়ে পূজার বাদ্য সুদূর গ্রামবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিত। দস্যুবৃত্তির সুব্যবস্থার সঙ্গে এই স্বপ্নাদেশের নিকট সম্বন্ধ আছে কি না বলা যায় না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, পূজাবাদ্য স্থগিত হইবার পর যখন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইত, গ্রামবাসীরা বুঝিত দস্যুরা সমররঙ্গিনীর সমক্ষে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। গ্রামবাসীরা কাহাকেও কিছু বলিত না। এই নীরবতার পুরস্কারস্বরূপ তাহারা লুণ্ঠন-ব্যাপার হইতে নিস্কৃতি লাভ করিত। এই মন্দির এবং "ডাকাতে কালী মন্দির" এই দুইটী স্থান নরপিশাচদের লীলাভূমি ছিল। নিকটস্থ ঐ প্রকাণ্ড দীঘিতে এবং গোবরা-খাঁর দীঘিতে লাস নিক্ষিপ্ত হইত। এখনও সেখানে নরকঙ্কাল অতীত হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ যে সমস্ত বৃক্ষশ্রেণী মন্দির পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার শাখায় দস্যুকীর্ত্তির পতাকা স্বরূপ নরমুণ্ডমালা দোলায়মান হইত।

গল্প শুনিয়া শরীরে কম্প আসিল। পরদিন প্রাতের গাড়ীতে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। পথে সেই একাদশী ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাকে দেখিলে এখন সেই সাহেবদ্বয় সসম্ভ্রমে "গুড্ মর্ণিং" করিয়া থাকেন।

চাষা

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,]

১

আদম যখন চষ্‌তো মাটী, কাটতো সূতা 'ইভ'
চাষায় বলে অভদ্র যে, লম্বা তাহার জিভ।
বসুন্ধরার স্তন্যে অধর আর্দ্র আছে যার
নয় সে চাষা, দেশের আশা সেই যে অলঙ্কার।
পৃথ্বী সে যে দোহন করে, ধূলায় ফলায় ফল।
তাহার দ্বারে হাত পাতেনি নিকষ কে ভাই বল?
মণ্ডপেরি নিয়ে দেবে পংক্তি করে তার,
কৃতঘ্ন সব ভাট্ ভিখারীর শুষ্ক অহঙ্কার?

২

সূর্য্য শশী হাস্য মুখে দেয় যাহারে ভেট্,
তারেই বুঝি মান দিলে হয় মস্ত মাথা হেট্।
বৃষ্টি যারে পুষ্ট করে, তুষ্ট করে তাপ,
মাঠের বায়ু যায় আয়ুতে নিত্য রাখে ছাপ।
ছয়টী ঋতুর সৌখ্য নিবিড় ঘটলো যাহার সাথ,
দিবস যাহার কর্ম্ম আনে, শান্তি আনে রাত।
শ্রম-জলে যার নিত্য জোগায় মুখের কাছে গ্রাস;
অভদ্র কে এমন, তারে করবে উপহাস?

৩

নিসর্গেরি বিদ্যালয়ে অর্জ্জিত যার জ্ঞান,
হস্ত পাতি নিত্য লভে বিশ্বপিতার দান।
সৌম্য সরল মৌন কবি, অজ্ঞাত ধার্ম্মিক,
সকল জাতি বিজয়-মালা কণ্ঠে তাহার দিক্।
ঊর্দ্ধে যাহার নির্ভরতা, ঊর্দ্ধেতে বিশ্বাস,
পুণ্যে যাহার স্বতঃ প্রীতি, পাপকে দেখে' ত্রাস।
ব্যর্থ আভিজাত্য লয়ে গর্ব্ব কেন আর,
দেশ-জননীর প্রিয়-সেবকে জানাও নমস্কার!

নিখিল-প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

হিমালয়ের ওপারের কথা।

(১)

কাশ্মীর থেকে কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্যোমস্পর্শী হিমালয়ের আড়ালে যে দেশটি এতকাল ধ'রে লুকিয়ে ব'সে আছে, কাল-স্রোতে জগতের উপর দিয়ে যুগে-যুগে পরিবর্ত্তনের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে, অথচ তার কণামাত্র এখনও যে দেশের অঙ্গ স্পর্শ ক'রতে পারে নি, বর্ত্তমান সভ্যতার দুর্দ্দান্ত দস্যু উন্নতির অগ্নি-গর্ভ মশাল হাতে ক'রে যার দারে পরিবর্ত্তনের ঝড় জগতকে প্রতিবার ভেঙ্গে-চুরে নূতন ক'রে গ'ড়ে দিয়ে গেছে, তার মধ্যে কেবলমাত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই অপ্রতিহত শক্তি প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য পাষাণ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে হিমালয়ের ওপারে প্রবেশ ক'রতে সক্ষম হয়েছিল। তিব্বতের আদিম ধর্ম্মানুশাসনে সে দেশে যে বিবিধ ভূত-পূজার' পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অরুণ-

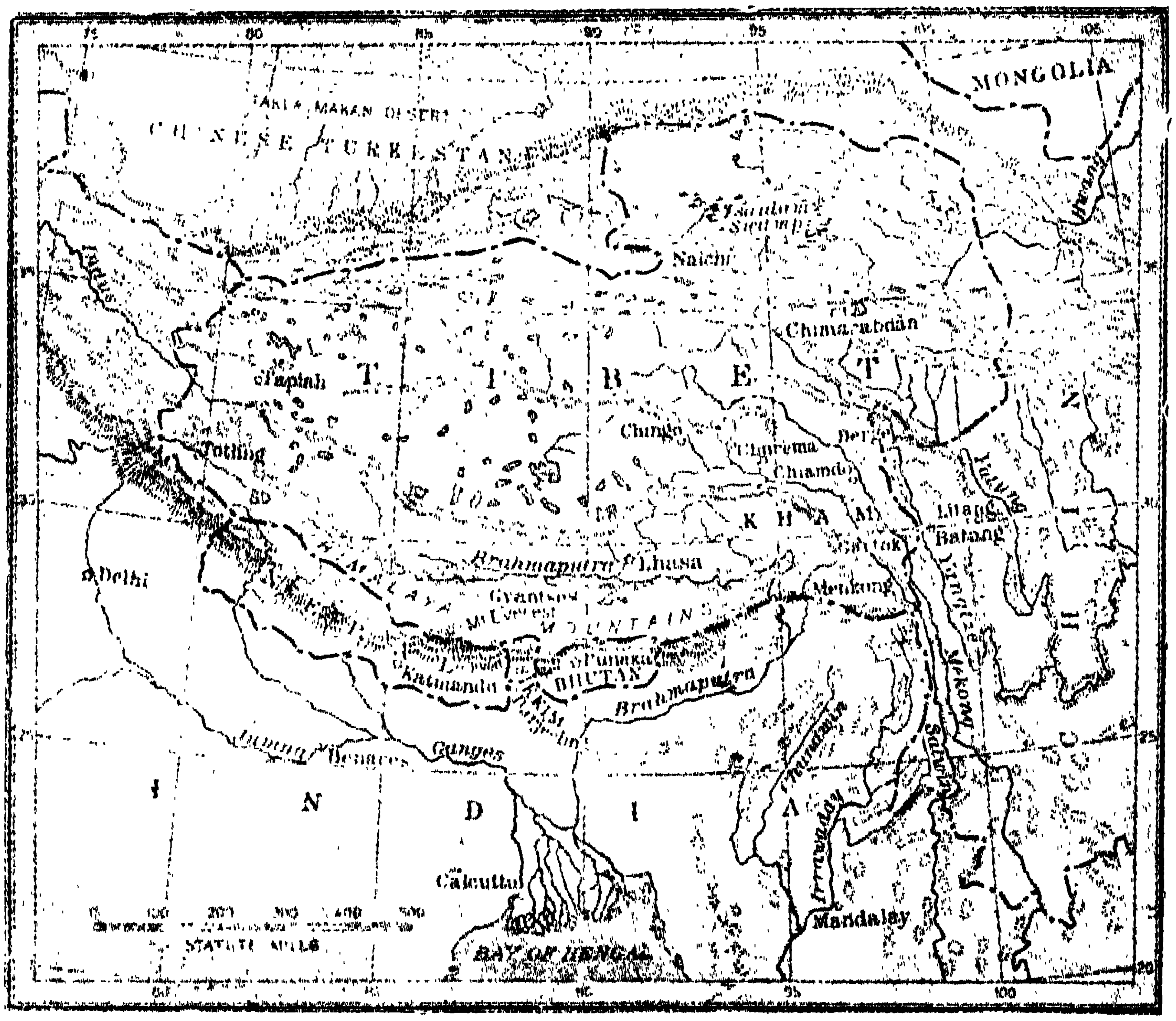

তিব্বতের মানচিত্র

বারবার ব্যর্থ করাঘাত ক'রে ফিরে গেছে, প্রাচ্যের প্রাচীনতম আদর্শকে এখনও যে জাত প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে চিরদিন নূতনকে অবহেলা ক'রে এসেছে, সেই অদ্ভুত জাতের দুর্গম দেশ সম্বন্ধে কিছু জানবার কৌতূহল বোধ হয় আমাদের মধ্যে অনেকেরই আছে।

ইতিহাসে দেখ্‌তে পাই, যে সব বড়-বড় বিপর্য্যয় ও কিরণে তার কতকটা ভৌতিকত্ব বিদূরিত হ'য়েছিল বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়ে নি। তিব্বতী ভূত তথাগত ধর্ম্ম-সঙ্ঘের শরণাগত হ'য়ে শেষে বৌদ্ধ-ভূতে পরিণত হয়েছিল। সে যা হোক্‌, এখন তিব্বতের কিছু ভৌগোলিক পরিচয় নেওয়া যাক্‌।

হিমালয়ের ওপারের পাদমূল থেকে আরম্ভ ক'রে

চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল পার্ব্বত্য প্রদেশটির নামই তিব্বত। চীন আর তিব্বতকে পৃথক ক'রে রেখেছে দীর্ঘ-স্রোতা য়্যাংৎজে নদী। এই নদীটি সমস্ত চায়না-ময় প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল ঘুরে-ঘুরে তবে সাগরে গিয়ে মিশেছে! তিব্বতের পরিমিতি চার-লক্ষ তেষট্টি হাজার বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা আন্দাজ ষাট লক্ষ; কারণ সেখানে আদম-সুমারীর কোনও ব্যবস্থা কখনও হয় নি। চীনেরা একবার, সে প্রায় দু'শো বছর আগে, তিব্বতের শুদ্ধমাত্র লামা লেতীদের একটা হিসেব নিয়ে দেখেছিল যে, প্রায় তিন লক্ষ ষোল হাজার লামা যায়, শত-শত ক্রোশ-ব্যাপী অসংখ্য আকাশস্পর্শী গিরি-শিখর সূর্য্য-কিরণের সপ্তবর্ণে বিরঞ্জিত তুষার-মুকুট মাথায় পরে, যেন তন্ময়-চিত্তে, তদ্গত হ'য়ে সেই মহা-সুন্দরের ধ্যান ক'রছে! নিম্নে, গিরি-মূলে বহুদূর-বিস্তৃত বনরাজি রং-বেরংয়ের বিবিধ পার্ব্বত্য-পুষ্পে পরিশোভিত হ'য়ে যেন ইন্দ্রলোকের নন্দন-কাননের অনুপম শ্রী ধারণ ক'রেছে ব'লে মনে হয়। মাঝে-মাঝে নীল পাহাড়ের গায়ে স্বচ্ছ কাঁচের মত নির্ম্মল-সলিলা সরসীনিচয় যেন প্রকৃতি-সুন্দরীর প্রসাধনের জন্য বিস্তৃত দর্পণের মত চক্-চক্‌ ক'রছে! সে সৌন্দর্য্য, সে অলোক-সামান্য দৃশ্য বর্ণনাতীত!

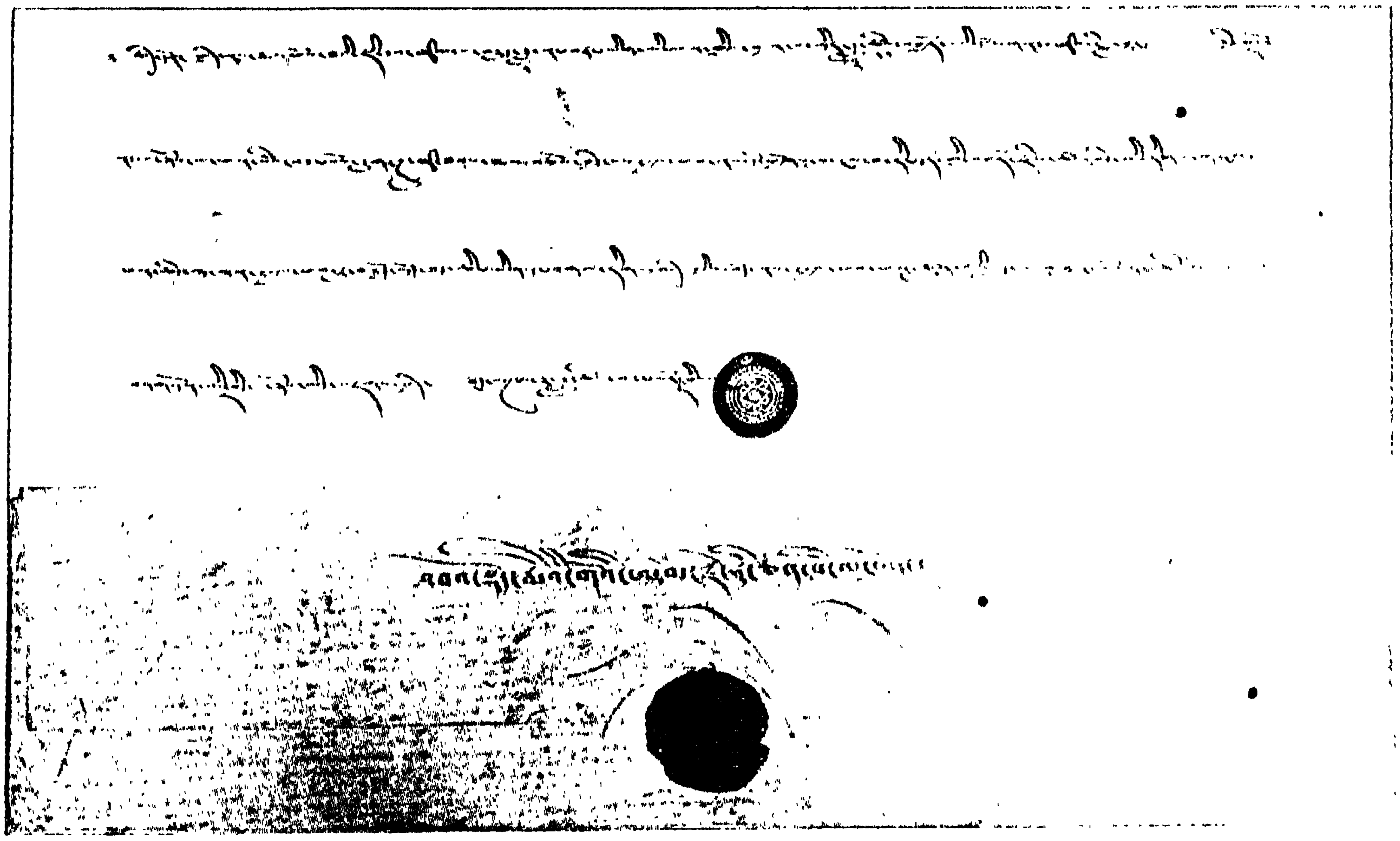

দালাই লামার মোহরাঙ্কিত তিব্বত প্রদেশের ছাড়পত্র

আর দু'লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার লেতী ওখানে বাস করে। তিব্বতের চার পাশের পার্ব্বত্যভূমি স্থানে স্থানে প্রায় বারো হাজার থেকে ষোল হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঁচু। এক-একটা পর্ব্বত-শৃঙ্গ উচ্চে বিশ হাজার ফু'টরও বেশী!

এই পর্ব্বতাকীর্ণ সুন্দর দেশটিতে পরিভ্রমণ করতে হ'লে অনেকগুলি পার্ব্বত্য গিরি-সঙ্কট উত্তীর্ণ হ'তে হয়। এই গিরিপথের দু'ধারের দৃশ্য এমন অপূর্ব্ব ও নয়নাভিরাম যে, পৃথিবীতে আর কোথাও এর চেয়ে সুন্দর শোভা আছে কি না সন্দেহ। মেঘ-নির্ম্মুক্ত উজ্জ্বল দিনে যতদূর দৃষ্টি

তিব্বতীয়দের আদি জন্ম সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাদের আকৃতি-প্রকৃতি চীনেদের সঙ্গেও মেলে না, ব্রহ্ম-দেশবাসীদের সঙ্গেও মেলে না। নৃতত্ত্ববিদেরা ওদের বর্ণ ও শরীরের গঠন প্রভৃতির উপর নির্ভর করে ওদের মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত ব'লে অনুমান করেন। ওদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিব্বতীয়দের মধ্যে একটি বেশ মজার গল্প প্রচলিত আছে। ওরা বলে যে, কোন এক বিস্মৃত যুগে হিমালয়ের এক দেবকন্যার সঙ্গে না কি ভারতের কোনও ভাগ্যবান পুরুষের দৈবাৎ মিলন ঘটেছিল;

আর তাদেরই প্রেমোৎপন্ন স্বরূপ তিব্বতীয়দের আদি পূর্ব্ব-পুরুষগণের জন্ম হয়।

তিব্বতের পূর্ব্বান্ত প্রদেশের নাম 'ক্ষেম।' প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্যে তিব্বতের আর কোনও প্রদেশের সহিত ক্ষেমের তুলনা হয় না। ক্ষেমের অধিবাসীরা অসুরের

'ক্ষেমের' শাসনকর্ত্তা, তাঁহার পত্নী ও নকিব

মত শক্তিশালী! এই অমিত-বলশালী জাতির অধিকাংশই যাযাবর শ্রেণীভুক্ত। তারা তাদের মেষপাল আর চমরী গরু নিয়েই জীবন যাপন ক'রে। চমরীর কালো লোমে তৈয়ারী পথে পাতা তাঁবুর মধ্যেই তাদের জীবনের

অধিকাংশ দিনগুলি অতিবাহিত হ'য়ে যায়। পাহাড়ের নীচের লোকেরাই যা একটু-আধটু মোটা রকমের চাষ-বাস ক'রে, কারণ সেখানে ছাড়া আর কোথাও অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্যে ফশল জন্মাতে পারে না।

'বাতাঙে'র প্রধান পুরোহিত ও তদীয় অনুচরবর্গ

এই চাষজীবী পাহাড়তলীর তিব্বতীয়রাই কেবল পাকা-বাড়ীতে বাস ক'রে। বাড়ীগুলি মাটির তৈয়ারী, উপরে চৌকো চিতেন ছাত। মাটির দেওয়াল গড়বার সময় তিব্বতীরা কাঠের তক্তায় তৈয়ারী একহাত পরিমাণ উঁচু

বাতাঙ্ সহরের পথ

দেওয়ালের 'ফর্ম্মা' ব্যবহার করে। একেবারে চার-পাশের দেওয়ালের সেই ফর্ম্মা সাজিয়ে নিয়ে তার মধ্যে কাদামাটি ভরে ছেড়ে দেয়। মাটি শুকিয়ে একেবারে বজ্রের মত এঁটে গেলে, তখন ফর্ম্মা খুলে নিয়ে আবার তার উপর বেঁধে আর একহাত দেওয়াল তোলা হয়। এমনি ক'রে আস্তে-আস্তে সমস্ত বাড়ীখানি গড়া শেষ হয়। চাষ-জীবীদের গৃহপালিত পশু-পক্ষী খুব কম। চমরী গরু দিয়েই তারা জমীতে লাঙল দেয়; লাঙলগুলি সেই বৈদিক-যুগের কাঠের তৈয়ারী এক-ফালা লাঙল। জমীতে লাঙল দেওয়া, বীজ ছড়ানো, এগুলো পুরুষরাই করে; কিন্তু ফশল কাটার ভার মেয়েদের উপর। ক্ষেতের কাজটা ওরা এই ভাবে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভাগা-ভাগী ক'রে নিয়েছে। কাঁচা শস্যই তারা না শুকিয়ে নিয়ে অমনি জাঁতায় গুঁড়িয়ে ফেলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে ভেজে তুলে রেখে দেয়। এইটেই তিব্বতীদের প্রধান খাদ্য, এটাকে তারা 'ৎস্বা' বলে।

ওদের ওই মাটির পাকাবাড়ীগুলিতে ঘর কিন্তু প্রায়ই মোটে একখানি মাত্র থাকে। সেই ঘরেতেই তারা শোয়া-বসা ওঠা-দাঁড়ানো রাঁধা-বাড়া খাওয়া-দাওয়া সব ক'রে। অত ঠাণ্ডা দেশ, তবু অধিকাংশ লোকেই এখনও খাটিয়া বা তক্তাপোষ ব্যবহার ক'রতে জানে না। শোবার সময় সবাই আগুনের দিকে পা ক'রে মেঝের ওপরই লেটিয়ে পড়ে! এই আগুন-তাতে পা রেখে শোয়াটা তিব্বতীদের যেন একেবারে একটা মাথার দিব্য দেওয়া নিয়মের মধ্যে; কেউ কখন পারতপক্ষে এর ব্যতিক্রম করে না। ঠাণ্ডা দেশ ব'লে বারোমাস রাত্রে তাদের ঘরের মধ্যে আগুন ক'রে রাখতে হয়। দরিদ্র পরিবারের সকলেই একত্রে এক ঘরের মধ্যেই শোয়। যদি কারুর গৃহ-পালিত পশু থাকে, তাহলে সেগুলোও সেই ঘরেই আশ্রয় পায়। তবে, দৈবাৎ সৌভাগ্যক্রমে যাদের বাড়ীতে দু'খানা ঘর থাকে, তারা পশুদের জন্য রাত্রে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা ক'রে। যাদের বাড়ী দোতলা, তারা নিজেরা ওপোর তলায় থাকে, পালিত পশুগুলোকে নীচের তলায় রাখে।

'জালা'র শাসনকর্ত্তার কন্যা ও জামাতা

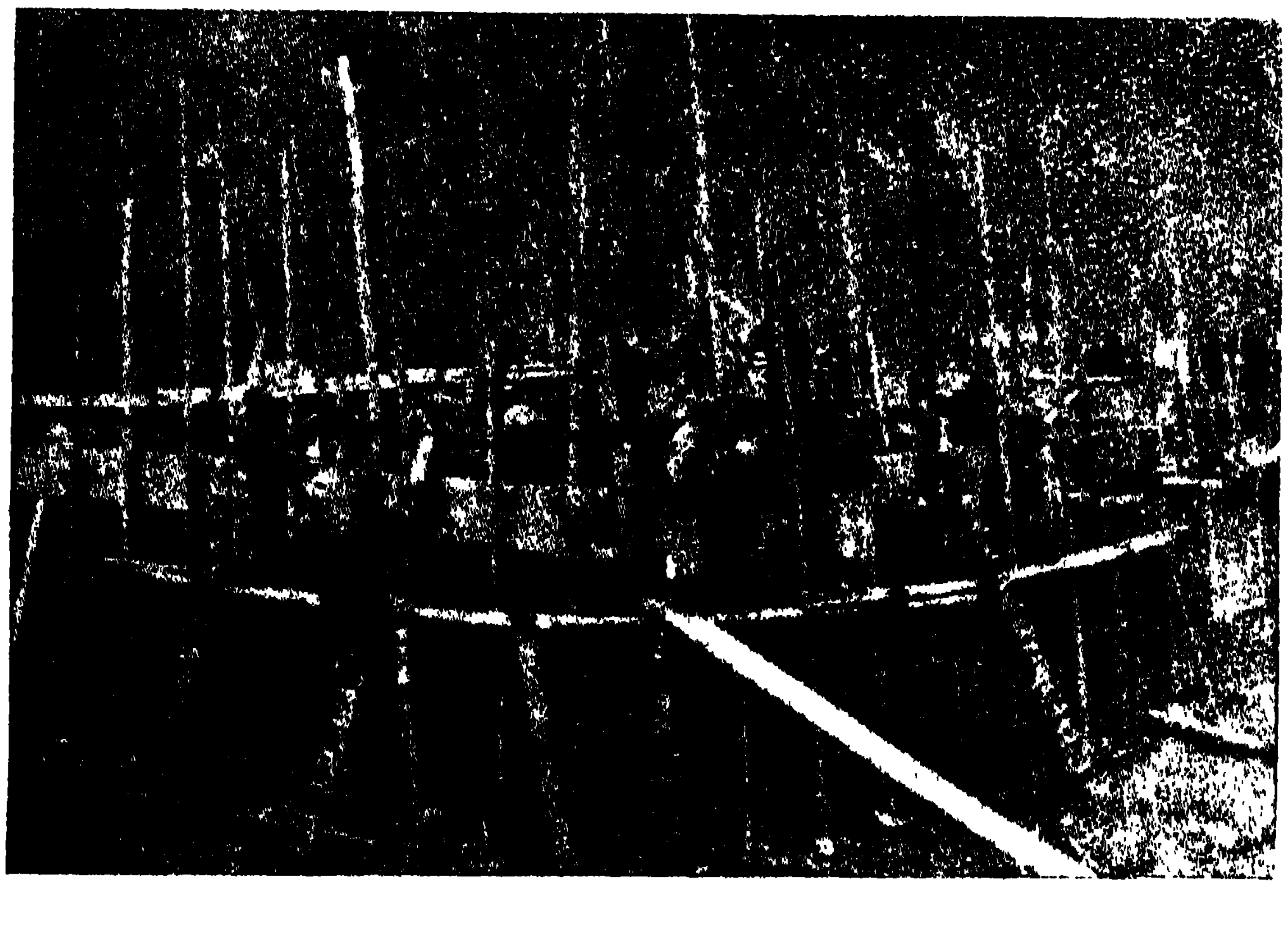

গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য

আহারের মধ্যে ওদের 'ৎস্বা' আর চা-মাখনই প্রধান। তিব্বতীরা দুধ-চিনি দিয়ে আমাদের মত চা খায় না। চীনে-চা খুব কড়া ক'রে সিদ্ধ ক'রে নিয়ে তাইতে খানিকটা মাখন আর একটু নুন ফেলে দিয়ে গরম-গরম খেয়ে নেয়। কখন-কখনও চায়ের সঙ্গে 'ৎস্বা'ও মেখে নিয়ে গুড় ছাতুর মত পাঁচ আঙ্গুলে হাপরে খেয়ে, শেষে কাঠের বাটীটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিভ দিয়ে চেটে সাফ করে তবে ছেড়ে দেয়। মাঝে-মাঝে মাংসও খায়, তবে সকলে নয়। যারা যাযাবর শ্রেণীর, তাদের "ৎস্বা"ই ভরসা। কখনও মাংস জুটলে তারা খানিকটা শুকিয়ে নিয়ে রেখে দেয়, অসময়ে কাজে লাগ্‌বে বলে। মাংস পচে গেলে অনেক সময় ওরা কাঁচাই খেয়ে

ফেলে! দুধ ওরা জমাট বাঁধিয়ে তুলে রেখে দেয়। আগে দুধ থেকে মাখন তুলে নিয়ে, তারপর দুধটা কড়ায় চাপিয়ে জ্বাল দিতে থাকে, যতক্ষণ না সেটা ঘন হ'য়ে আসে; তারপর তাকে আমসত্ব দেবার মত, বড় বড় চেপ্টা থালায় পুরু ক'রে ঢেলে, শুকোতে দেয়। শুকিয়ে গেলে থালা থেকে সেগুলো ক্ষীরের ছাঁচের মত তুলে নিয়ে, তাল-পাকিয়ে রেখে দেয় বটে, কিন্তু জিনিসটা মোটেই ক্ষীরের ছাঁচ কিম্বা আমসত্বর মত নরম হয় না; সে একেবারে শুকিয়ে চাম্‌ড়ার মত শক্ত হ'য়ে যায়; দাঁত দিয়ে টেনে ছেঁড়া যায় না; তাই ওরা সেগুলো গরম মাখন-চায়ে ডুবিয়ে নরম ক'রে নিয়ে খায়। দুধ কি করে চুমুক দিয়ে না খেয়ে, চিবিয়ে খাওয়া যায়, তা বোধ হয় এই তিব্বতীরাই জগতে প্রথম আবিষ্কার ক'রেছিল! তিব্বতী গোয়ালাদের দুধের চেয়ে মাখনের কারবারটাই সব চেয়ে বড়; তবে ওদের মধ্যে গোয়ালা বলে বিশেষ কোনও শ্রেণী নেই; যাদেরই ঘরে চমরী গাই আছে বেশী, আর দুধ হয় উদ্বর্ত্ত, তারাই প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাগটুকু অন্য জিনিসের বিনিময়ে বেচে ফেলে! অর্থাৎ কেউ সে দুধের পরিবর্ত্তে 'ছুম্বা' সংগ্রহ করে, কেউ বা মাখন, কেউ বা নুন,—এই রকম! নুনের ওরা ভারি ভক্ত, অথচ নুন সেদেশে বড় দুর্লভ;—সেই জন্যে নুন যার ঘরে বেশী থাকে, তাকে একরকম ওদেশের বড়লোক বলা চ'লে, কারণ নুনের বিনিময়ে সে যখন যা খুসি পেতে পারে! ওখানে টাকার চেয়েও নুনের কদর বেশী! এই জন্য অনেকেই নুনের

শ্রোতৃবৃন্দ

ব্যবসা ক'রে। ইয়েঙ্গীশ উপত্যকা তিব্বতী নুন উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। সেখানে স্বল্প গভীর কুয়ো খনন ক'রলেই লবণাক্ত জল পাওয়া যায়। সেই জল তুলে নিয়ে তারা নুন তৈয়ার করবার জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত বাঁশের মাচার ওপর ঢেলে দেয়। মাচার ওপরটা এমন ক'রে মাটি-লেপা আর তার, চারধারে কানা উঁচু করা থাকে যে, জল একটুও গ'লে প'ড়্‌তে পারে না। যথা-সময়ে জল শুকিয়ে গিয়ে মাচার ওপর পাত্‌লা নুন থিতয়ে জমে থাকে। সেই নুন সযত্নে চেঁচে তুলে নিয়ে—তারা ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে রাখে। সে নুনের সঙ্গে অবশ্য ধুলোমাটিও প্রচুর থাকে; কিন্তু তিব্বতীরা সে সব গ্রাহ্যই ক'রে না। দুধে অসংখ্য চমরীর লোম ভাস্‌ছে দেখেও তিব্বতীরা তা কিন্‌তে একটুও ইতস্ততঃ করে না। তিব্বত ও চীন-সীমান্তের মাঝা-

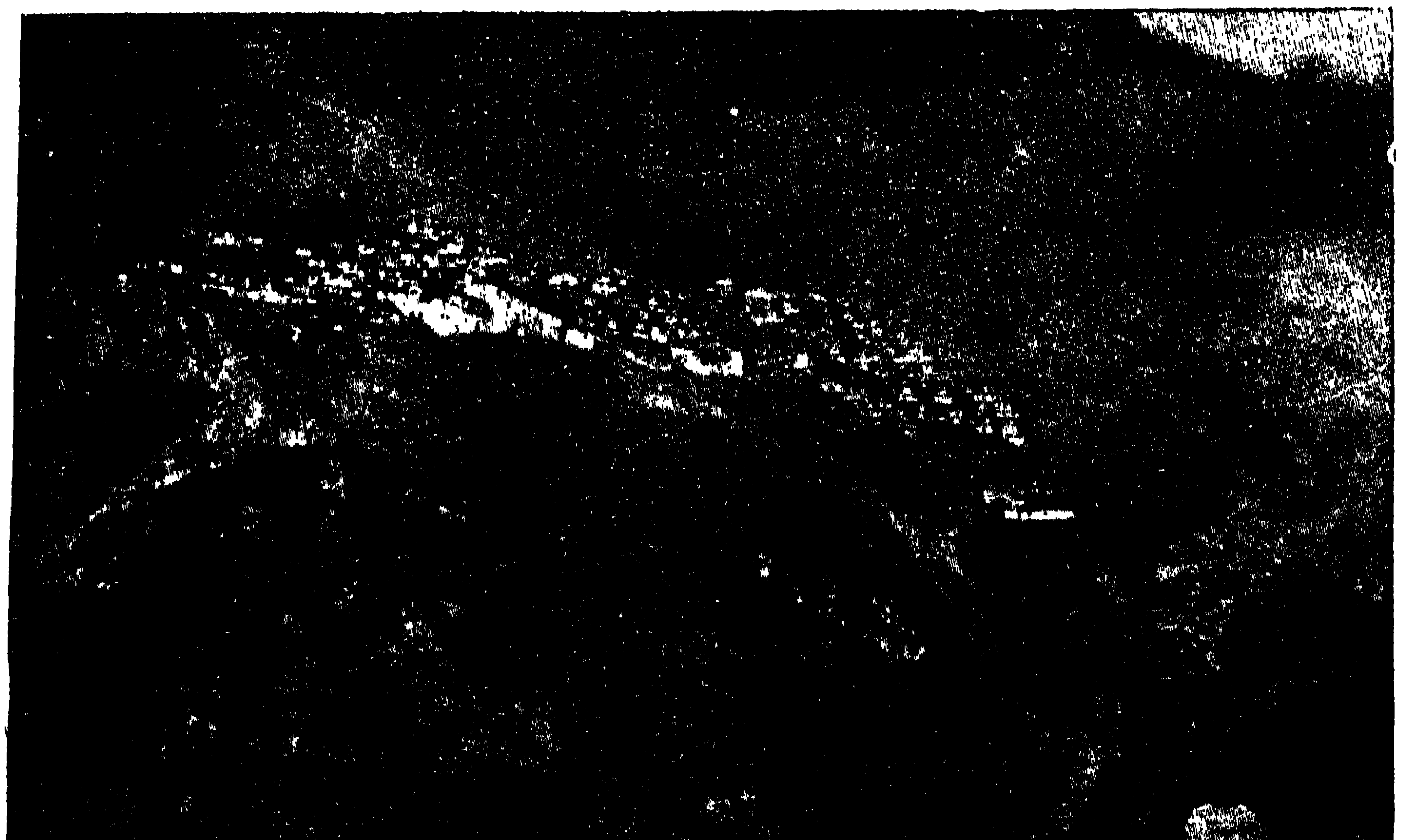

'গার্টক' মঠ ও লামাশাহী

'ইয়েঙ্গীনের' নুনের কারখানার অসংখ্য মাচা

তিব্বতের পার্ব্বত্য গ্রাম

মাঝি 'বাতাঙ্' ব'লে একটা জায়গা আছে; সেখানেও নুনের কারবার আছে; আর অন্য কোথাও নুন না পাওয়া যাওয়ার দরুণ তিব্বতের অভ্যন্তর প্রদেশে নুনের দাম খুবই চড়া।

পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির জন্যে ভারতের মত তিব্বতকে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয় না; কারণ অধিকাংশ তিব্বতীরা সলোম মেষ-চর্ম্মের গাত্র-বস্ত্র ব্যবহার ক'রে। একটির বেশি দুটি পোষাক কেউ তৈয়ার ক'রে রাখে না। যে পর্য্যন্ত না পোষাকটি ছিঁড়ে-খুঁড়ে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হ'য়ে পড়ে, ততদিন পর্য্যন্ত তারা কেউ আর নূতন পোষাক তৈয়ার করায় না। মেষ-চর্ম্মের পরিচ্ছদের অভ্যন্তর-ভাগে প্রায় একরকম সাজ; তবে ওরই মধ্যে মেয়েদের পোষাকের একটু বাহারটা বেশী থাকে ব'লে যা প্রভেদ দেখা যায়। পুরুষেরা আগ্রীব ঝাঁকড়া চুল রাখে, আর মেয়েরা পৃথিবীর সব দেশের মেয়েদের মতই, দীর্ঘকেশিনী ও সালঙ্কারা! এদের পোষাক দেখে সব সময় ঠিক ধরা যায় না যে, কে কি দরের লোক! ভেড়ার লোমে ঢাকা ভাল্লুকের মত একটা জংলী চেহারার তিব্বতী দেখ্‌লে মনে হয় যেন নোংরার শিরোমণি, সাতজন্মে কখনও স্নান করেনি; মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলে জটা প'ড়ে গেছে; তারই ওপোর আবার এককান-ঢাকা চিটে-পড়া ময়লা টুপী! গায়ের

যাযাবর দলের আস্তানা

পশমের অস্তর দেওয়া থাকে। এক-একটা পোষাক বহুকাল চলে; চামড়া আর পশমের সংযোগে তৈয়ারী তাদের সেই কিম্ভূত-কিমাকার পরিচ্ছদ ভারি মজবুত ও টেঁকসই। গ্রীষ্মকালে তারা পোষাকের ওপোরটা খুলে ফেলে গলা-থেকে কটিদেশ পর্য্যন্ত নগ্ন রেখে দেয়।

তিব্বতী মেয়েরা ভেড়ার লোম থেকে পশমের সুতো বানিয়ে মোটা-মোটা পশ্‌মী কাপড় বুনে রাখে। সেই কাপড় থেকেই তাদের সেই ঢিলে লম্বা জগদ্দল-ভারি—জাব্বা জোব্বার মত পোষাক তৈয়ারী হয়। মেয়ে-পুরুষ দুইয়েরই গন্ধে নাকে রুমাল-চাপা দিতে হয়; অথচ সে হয় ত অগাধ টাকার মালিক! টাকা হিসেবে কোনও তিব্বতী-মুদ্রা সে-দেশে প্রচলিত নেই। ধনী যারা, তাদের কাঁধে ঝোলানো চামড়ার থলের মধ্যে সোনার গুঁড়ো ভরা থাকে। বিদেশীর কাছে কোনও জিনিস কেন্‌বার সময় তারা সেই থলের ভিতর থেকে মুঠো-মুঠো সোনার গুঁড়ো বার ক'রে দেয়। একমাত্র চীনের রাজমুদ্রা ভিন্ন তিব্বতে অন্য কোনও দেশের মুদ্রার প্রচলন নেই। দরিদ্রদের মধ্যে নুন আর 'চীনে চা' কোনও কিছু ক্রয়-বিক্রয়ের সময় অর্থের বিনিময়ে ব্যবহৃত হয়

তিব্বতীদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সে আবার এক-বিবাহ, বহু-বিবাহ ও পারিবারিক যৌথ-বিবাহ প্রভৃতি নানা-রকমের এক মিশ্রিত খিচড়ী! প্রকৃত-পক্ষে এক বিবাহই হ'চ্ছে ওদেশের প্রচলিত নিয়ম;— কিন্তু পারিবারিক যৌথ-বিবাহটাই এই সভ্যযুগে পৃথিবীতে তিব্বতের একটা প্রধান বিশেষত্ব হিসাবে রটে গেছে! এই পারিবারিক যৌথ-বিবাহের নিয়ম হ'চ্ছে, যিনি বড় ভাই, তিনি গিয়ে একজনকে বিবাহ ক'রে আন্‌বেন; আর সেই বধূ তার স্বামীর অন্যান্য ভ্রাতাদেরও পত্নী-স্থলাভিষিক্তা হ'য়ে থাক্‌বেন। যাযাবর শ্রেণীর মধ্যেই এটা খুব বেশী রকম প্রচলিত আছে;— তারা পাঁচ ভাই সাত ভাই পর্য্যন্তও এক পত্নী নিয়েই সংসার করে; অথচ তাদের মধ্যে কোনও দিনের জন্যেও এতটুকু অশান্তি বা মনোমালিন্য দেখা যায় না। ভা'য়েরা, সব যে যার কাজ, ভাগা-ভাগী ক'রে নেয়। কেউ হয় ত ঘর-সংসারের কাজ দেখে, কেউ ক্ষেত-খামারের তত্ত্বাবধান করে,

পথের ধারে জড় করা মন্ত্রখোদিত প্রস্তরখণ্ড

কারুর ওপর মেষপাল চমরীগাইগুলির ভার থাকে,—কারুর ওপর বা কারবার দেখ্‌বার বা কোনও ব্যবসা চালাবার ভার পড়ে। যে বড় ভাই, সেই-ই বাড়ীর কর্ত্তা। সব ছেলে-মেয়েরা তাকেই পিতৃ সম্বোধন করে। অন্যান্য ভায়েরা ছেলে-মেয়েদের কাছে পিতৃব্যেরই সামিল হ'য়ে থাকে। যে পরিবারের পুত্র-সন্তান নেই, কেবল কন্যা আছে, তারা একটি কন্যাকে বাড়ীতেই রাখে। কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে তাকেও স্বীয় পরিবারভুক্ত ক'রে নিয়ে বংশের

মন্ত্রাঙ্কিত পতাকা-পরিবেষ্টিত সাধুর সমাধিভূমি

ধারা রক্ষা করে। অন্যান্য মেয়েদের যথাসময়ে পাত্রস্থ করা হয়। যদি কোনও পরিবারে কেবলমাত্র দু'টি মেয়ে থাকে, তবে দু'টিকেই তারা একই মনোমত পাত্রের হাতে সমর্পণ ক'রে দিয়ে, জামাতাকে নিজেদের ঘরে এনে রেখে দেয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে—যে এক পত্নীর বহু স্বামী বা এক স্বামীর বহু পত্নী গ্রহণে তিব্বতে কোনও শাস্ত্র-শাসন নেই।

এক স্ত্রী একাধিক স্বামীর পরিচর্য্যা করে ব'লে কেউ যেন মনে কোরবেন না যে, তিব্বতে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা নেই। প্রাচ্য ভূখণ্ডের সকল দেশের মধ্যে নারীর মর্য্যাদা তিব্বতেই সব চেয়ে বেশী! সেখানে নারী শুধু গৃহকর্ত্রী নয়, পরিবারের মধ্যে তিনি সাম্রাজ্ঞী-তুল্যা! তাঁর আদেশ ও অনুমতি ভিন্ন ঘরে-বাইরের কোনও কাজই হবে না। এমন কি, এই গৃহ-রাণীর হুকুম ব্যতীত পরিবারের কোনও স্ত্রী-পুরুষেরই প্রতিদিন প্রত্যেকবার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবার বা বাড়ীর বাইরে যাবার উপায় নেই। প্রতিবেশীদেরও তাঁর অনুমতি

নিয়ে তবে তাঁর পরিবারের কারুর সঙ্গে দেখা করতে আসতে হয়! আর সে দেখাশুনো বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে বা ব'সে সারতে হয়; প্রতিবেশীরা পরস্পরের গৃহের

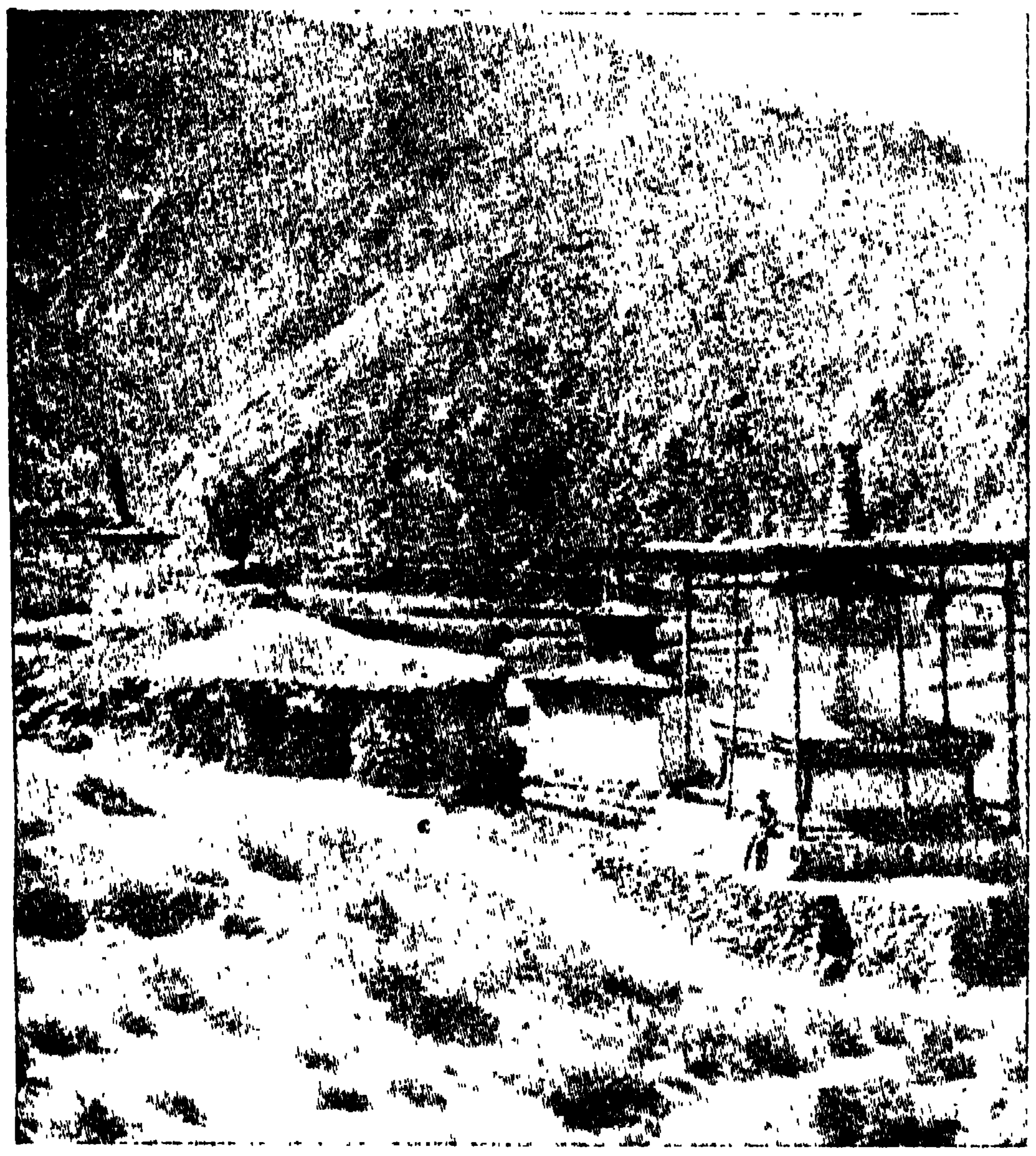

বৌদ্ধ-চৈত্য

ভিতর প্রবেশাধিকার পায় না। কিন্তু তিব্বতীদের গৃহের এই সর্ব্বময়ী অধীশ্বরীটি কারুর অনুমতির অপেক্ষা না রেখে যখন যেখানে ইচ্ছে যাওয়া-আসা করতে পারেন।

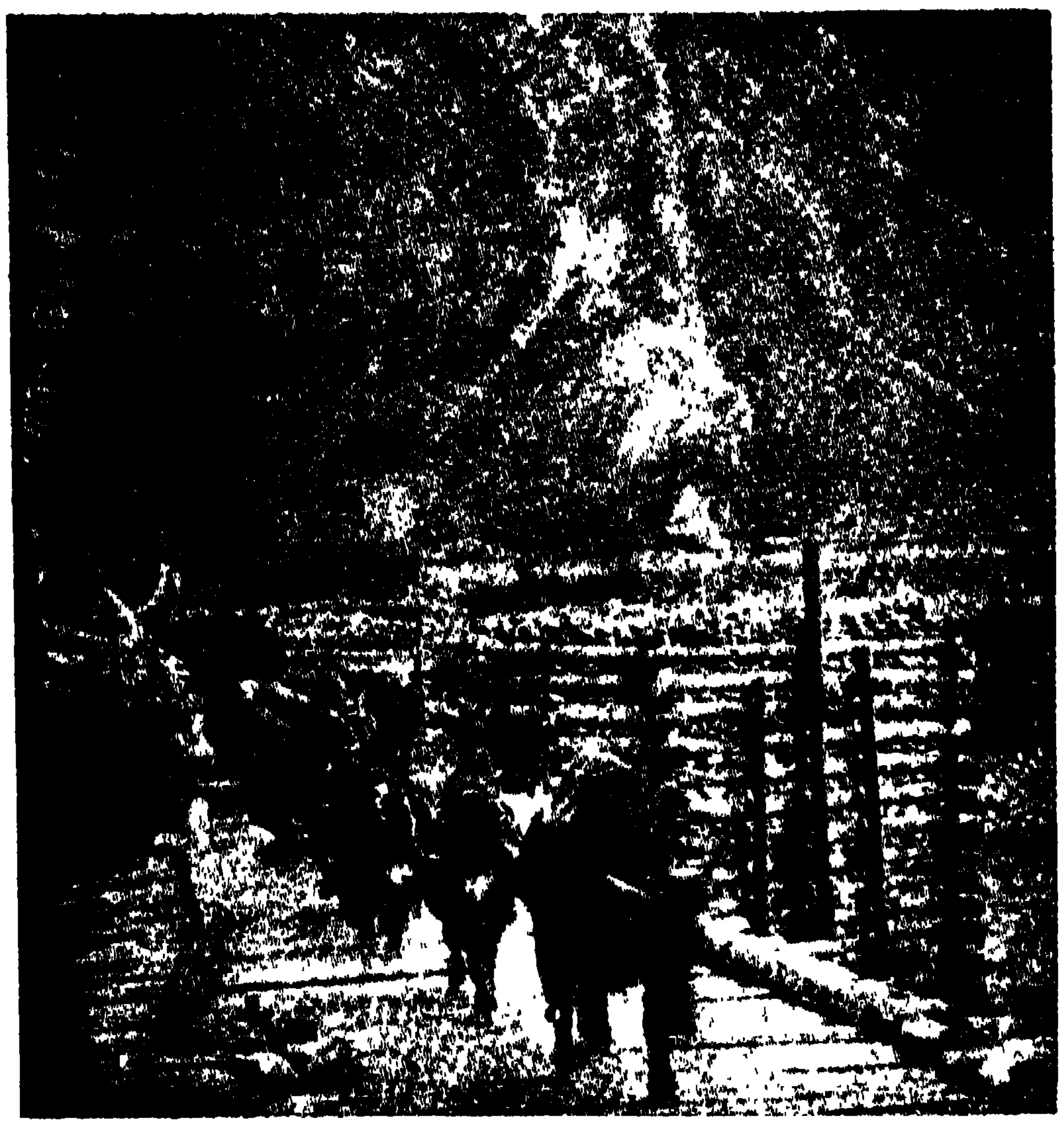

মেকং নদীর উপর কাঠের বাঁধা তিব্বতী সেতু

এতখানি সম্মান ও প্রতিপত্তি বোধ হয় কোনও দেশেরই নারীর ভাগ্যে ঘটে না।

তিব্বতীদের প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই একটী ক'রে ছেলে 'লামা' হয়ে যায়। ওদের লামা হওয়াটা অনেকটা আমাদের দেশের সন্ন্যাস অবলম্বন করার মত। লামারা সকলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-যাজক বা গুরু-পুরোহিতের কাজেই লিপ্ত থাকে। এক-একটা মঠে অনেকগুলি লামা একত্রে আশ্রম ক'রে বসবাস করে। সেগুলোকে 'লামাশারী' বলে। লামাশারীর সমস্ত খরচ দেশের লোকের দানের ওপরই চলে; সে দান তাদের এত অপরিমেয় যে, এক-একটা

বাতাঙের বৃহত্তম প্রস্তর-স্তূপ

লামাশারীর সমস্ত খরচ-খরচা বাদ যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে; এমন কি কোন-কোনও লামাশারীর ভূ-সম্পত্তি আর নগদ টাকা এত বেশী যে, তারা সেই সব জমী ভাড়া খাটিয়ে, আর মহাজনী কারবারে টাকা সুদে লাগিয়ে, তাদের আয় চতুর্গুণ বাড়িয়ে ফেলেছে। লামারা অধিকাংশই অল্প-বিস্তর শিক্ষিত। শিক্ষার জন্য প্রত্যেক লামাকেই কিছুদিনের জন্য তিব্বতের রাজধানী 'লাহ্সা' সহরের কোনও একটা প্রধান মঠে অবস্থান করতে হয়। শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে তারা যে যার দেশে ফিরে এসে গাঁয়ের মঠে যোগদান করে।

তিব্বতের গ্রাম বা সহর সমস্তই ছোট-খাটো রকমের; মাত্র খানকয়েক ঘর-বাড়ী, দুচারখানা দোকান, আর অন্ততঃ পক্ষে একটা লামাশারী থাকলেই সেটা একটা গ্রাম হিসাবে গণ্য হয়। তিব্বতের যা কিছু শিল্প বা চিত্র-কলা, তা ওই লামাশারীতেই কেবল দেখতে পাওয়া যায়। কোনও লোক মারা গেলে তার শেষ সময়ে যে লামা এসে উপাসনাদি করায় বা ধর্ম্ম-তত্ত্ব শোনায়, সেই লামাই মৃতের ধন-সম্পত্তি বা আস্‌বাবপত্র যা থাকে, তার মধ্যে যা কিছু ইচ্ছে, সর্ব্বাগ্রে

ধান মাড়াই

বিবাহ-সভা

পছন্দ ক'রে নিতে পার্ব্বে, এই রকম নিয়ম সেখানে প্রচলিত আছে। লামাদের এরা যেরূপ সম্মান করে, দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে এদের চেয়ে ধর্ম্মভীরু জাত বোধ হয় আর নেই।

ভূত-প্রেতের উপরও এদের বিশ্বাস এখনও কিছুমাত্র শিথিল হয় নি। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের প্রত্যেক কাজে ও সর্ব্বপ্রকার দুর্ঘটনার মূলে যে নিশ্চয় কোনও অশরীরী প্রেতাত্মার অলক্ষ্য হাত কাজ ক'রে যাচ্ছে, এ তারা, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে। তিব্বতী ভাষার একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক এক-দিন খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পড়াতে এলেন দেখে তাঁর বিদেশী ছাত্র জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে? অমন খুঁড়িয়ে আস্‌ছেন কেন আজ?" অতবড় পণ্ডিত ও সুশিক্ষিত তিব্বতী অধ্যাপক বেশ সহজ সরলভাবে বল্লেন, "আর বাবা, তোমার এখানে আস্‌বার সময় পথে দিলে এক বেটা ভূতে আমার ঠ্যাং ভেঙে!"

শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীরা—(অন্যের গৃহে প্রবেশ ক'রে চুরীর অপরাধে একজনের একটী হাত ও একখানি পা, এবং আর একজনের শুধু একখানি হাত কেটে দেওয়া হয়েছে।)

বিদেশী ছাত্রটি মনে-মনে খুব হাস্‌লেও গম্ভীর ভাবে বল্‌লে, "তাই ত! কিন্তু পা দেখে মনে হচ্ছে যেন আপনি রাস্তার কোনও ইট-পাথরে হোঁচট্ খেয়ে পাটা মচ্‌কে ফেলেছেন!"

তিব্বতী অধ্যাপক চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লে, "বল কি ছোক্‌রা? আমার এতখানি বয়স হ'ল—আমায় কি তুমি এতই মূর্খ মনে কর যে, ভূতের ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি? তুমি ঠিক জেনো যে, মানুষের কখনও কোন দুর্ঘটনা হ'তে পারেনা, যদি না ঐ ভূত-প্রেতগুলো তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে!"

মন্ত্রাঙ্কিত পতাকাবলি

(এই পার্ব্বত্য গিরিসঙ্কটে অপদেবতার উৎপাত নিবারণের জন্য পথটিতে বরাবর মণিপদ্ম-মন্ত্রাঙ্কিত নিশান ঝোলানো আছে।)

ভূত সম্বন্ধে যখন একজন শিক্ষিত তিব্বতী অধ্যাপকের এই অভিমত, তখন বুঝ্‌তেই পাচ্ছেন বোধ হয় যে, অশিক্ষিত নিরক্ষরদের কাছে ভূতের অস্তিত্ব সেখানে আরও কি রকম দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

শত্রু-নিপাত কটাহ

(চীন ও তিব্বতের যুদ্ধে তিব্বতীয় বন্দীদের চীনেরা এই কটাহের মধ্যে ফেলিয়া সিদ্ধ করিয়া মারিত।)

তিব্বতের শাসন-বিভাগ ও রাজকার্য্য এখনও সেই প্রাচীন ধর্ম্ম-তন্ত্রের বা পুরোহিত-প্রতিপত্তির অধীন। লাহ্‌সার শ্রেষ্ঠতম লামাশারীর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজকের উপাধি হ'চ্ছে 'দালাইলামা'। ইনিই তিব্বতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা! ধর্ম্মরাজ্যে ও শাসন-কার্য্যে ইনি সকলের উপরে। এঁকেই যথার্থ 'গুরুমহারাজ' বলে সম্ভাষণ করা সাজে। এঁর মন্ত্রী, অনুচর, সদস্য, সভাসদ, পারিষদ সকলেই লামা সম্প্রদায়-ভুক্ত। এই জন্যই লামাদের প্রভুত্ব তিব্বতে সকলের চেয়ে বেশী। তারপর সেখানে অন্যান্য গৃহী কর্ম্ম-সচিবদের প্রভাব। তাদের চাঁইরা প্রায় অধিকাংশই বেশ অবস্থাপন্ন ও ধনী বলে পরিচিত। সকলের চেয়ে হীন অবস্থা হল সেখানে ভৃত্য, পরিচারিকা, ক্রীতদাস বা কৃতদাসীদের। তিব্বতে ছেলেদের শিক্ষার ভারও ঐ লামাদের হাতেই সমর্পিত হয়েছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকল লামা বেশ যোগ্যোচিত উচ্চ-শিক্ষিত নয়; কাজে-কাজেই সকল ছেলেদের শিক্ষা ঠিক দেশের বর্ত্তমান সময়োপযোগী বা কার্য্যকরী হচ্ছে না। অনেক লামা আছেন, যাঁরা লিখ্‌তে-পড়্‌তেও জানেন না, কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে বড়-বড় মন্ত্র বেশ সড়-গড় হ'য়ে গেছে! লামার দল দিনরাত কেবল জপ করছেন, "ওঁ মণিপদ্মে হুং" তাঁদের বিশ্বাস, এই মন্ত্র অবিরাম জপ করলে নিশ্চয়ই

আত্মোন্নতি হবে; অক্ষয় স্বর্গবাসও অসম্ভব নয়; কারণ মন্ত্র জপের প্রভাবে চাই কি হয় ত পুনর্জন্মের দুর্ভাগ্যটার হাত থেকেও এড়ানো যেতে পারে! জপ করার সুবিধা হবে বলে তিব্বতীরা এক রকম ধাতু-নির্ম্মিত 'জপযন্ত্র' ব্যবহার করে; বৌদ্ধ মঠ বা স্তূপের চারিধারে মন্ত্রাঙ্কিত পতাকা পুতে রাখে। ছোট-ছোট পাথরের টুক্‌রোর উপর তিব্বতীরা মন্ত্র খোদিত ক'রে, কোনও পবিত্র স্থানে জড় ক'রে রেখে দেয়। এক-এক জায়গায় বহুকাল ধরে অসংখ্য লোকের মন্ত্র খোদিত। এই শিলাখণ্ড জড় হ'য়ে

মৈত্রেয় মূর্ত্তি

(তিব্বতে এই অনাগত বুদ্ধ-মূর্ত্তির বৃহৎ মন্দির ও পূজার ব্যবস্থা আছে। তিব্বতীদের বিশ্বাস, ইনি শীঘ্রই অবতীর্ণ হইয়া ধরার দুঃখভার হরণ করিবেন।)

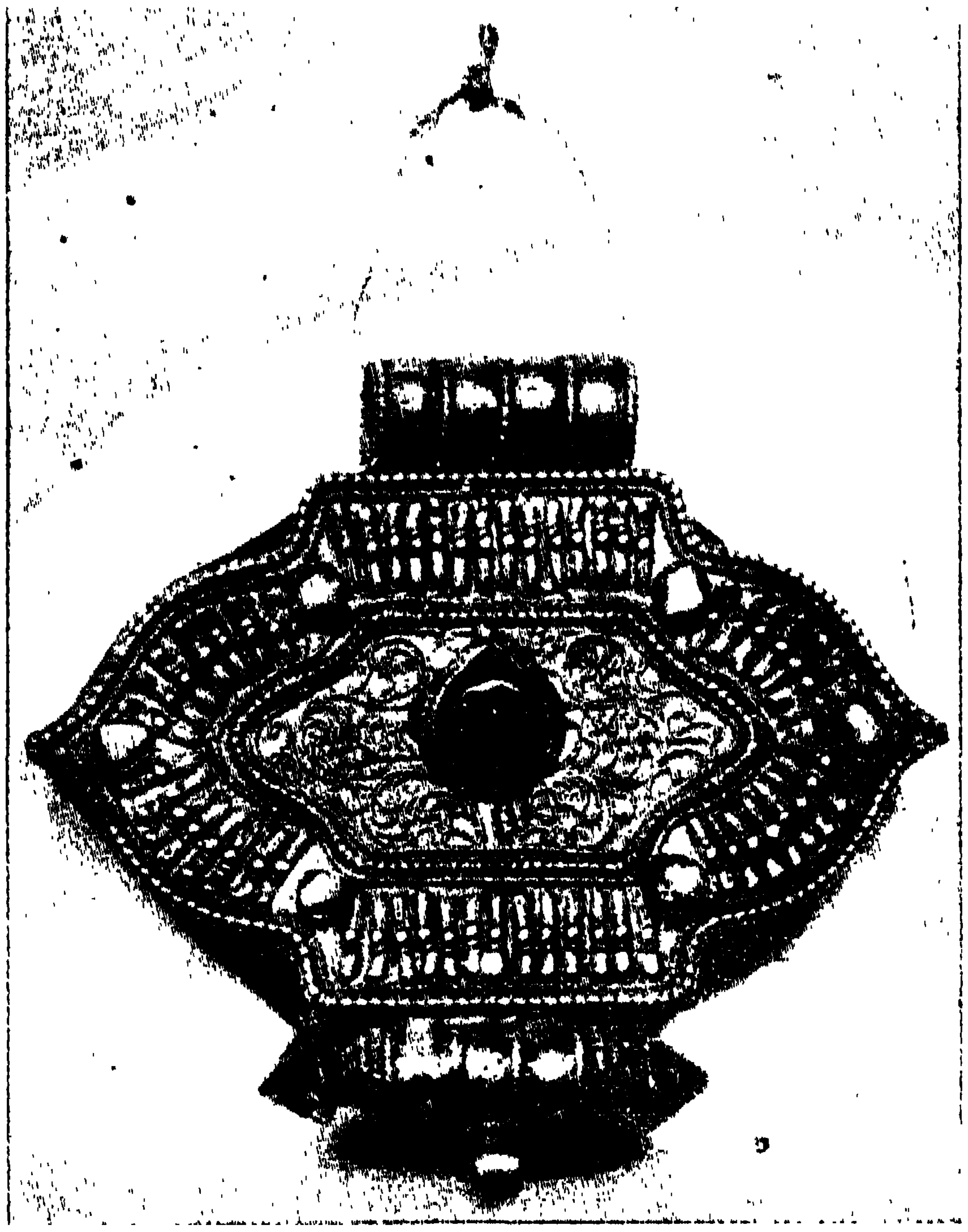

সিদ্ধ কবচ

ক্রমে পর্ব্বতাকার স্তূপ হ'য়ে উঠে। তিব্বতে এমন কোনও জায়গা নেই বল্‌লেই হয়, যেখানে 'ওঁ মণিপদ্ম হুং' মন্ত্রটী কোথাও না কোথাও লেখা আছে, চোখে পড়ে না।

তিব্বতের ব্যবসা চীনেদের সঙ্গেই খুব বেশী চলে। মৃগনাভি আর কাঁচা হরিণের শিং সংগ্রহ করবার জন্য প্রতি বৎসর তারা অসংখ্য হরিণ মারে। এ ছাড়া হরেক-রকম গাছগাছড়া, শিকড়, ব্যাঙের ছাতা, লতা-গুল্ম, এমন কি কোনও বিশেষ-বিশেষ কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্তও তিব্বত থেকে

অতিকায় চায়ের কেটলি

তিব্বতীয় অভিবাদন (মাথায় হাত দিয়া)

তিব্বতীয় অভিবাদন (জিভ বাহির করিয়া)

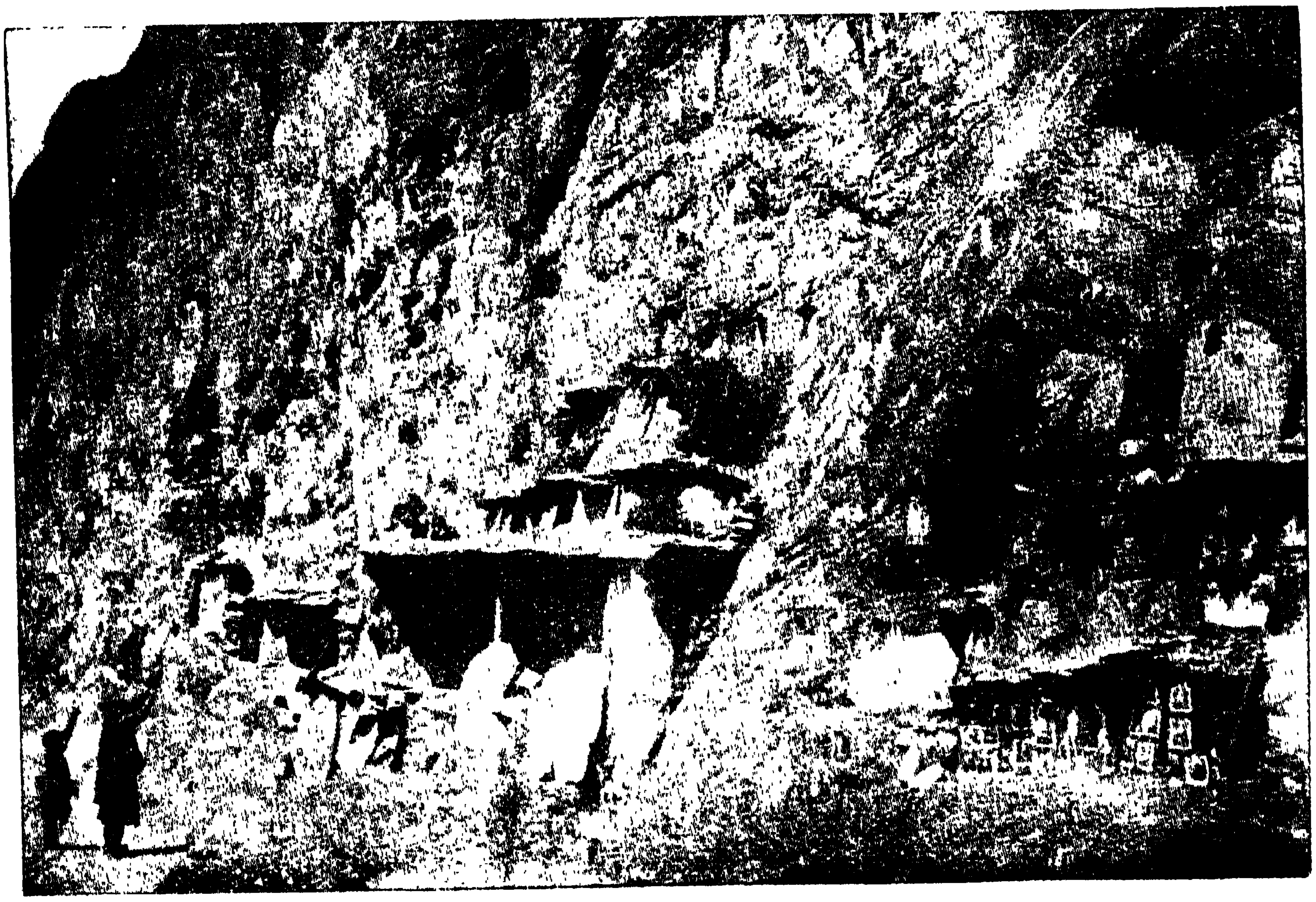

দেবগিরি

(এই পর্ব্বতগাত্রে অসংখ্য বুদ্ধ-মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং উহা অপরূপ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। তিব্বতীরা এই পর্ব্বতকে অতি পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া মনে করে।)

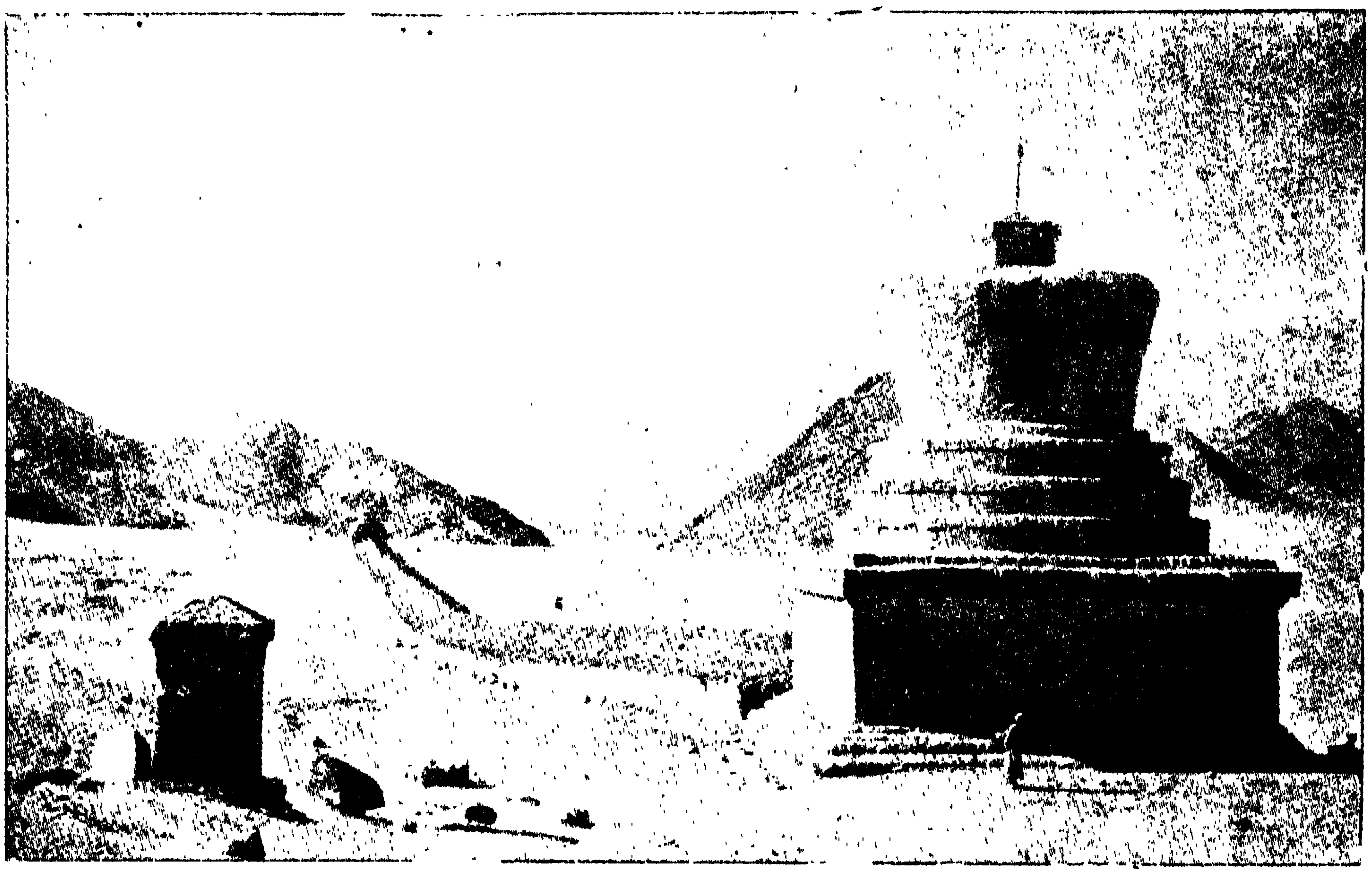

প্রাচীর তীর্থ

(দুইটী বৌদ্ধ স্তূপকে সংলগ্ন করিয়া এই বিরাট প্রাচীর বিস্তৃত। 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' এই মন্ত্র উৎকীর্ণ অগণিত প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা এই প্রকাণ্ড প্রাচীরটী নির্ম্মিত।)

শবযাত্রী

কাল-চক্র

(বৌদ্ধ মঠের নাটমন্দিরের গায়ে এই 'কালচক্রের' অতি চমৎকার চিত্র উৎকীর্ণ থাকে। ইহাতে মৃত্যুর পর আত্মার ছয়টী অবস্থা, এবং বুদ্ধবর্ণিত জন্মান্তর-রহস্য প্রদর্শিত হইয়াছে।)

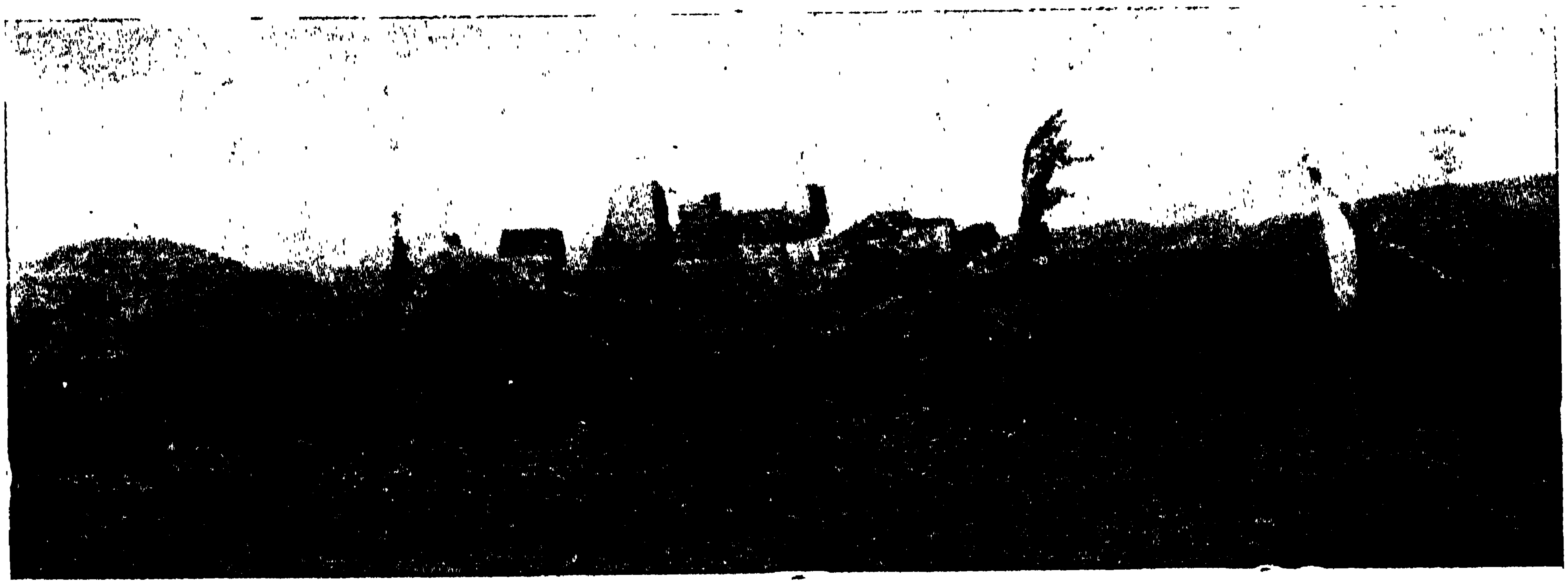

পর্ব্বত-পূজা

(তিব্বতীদের বিশ্বাস, 'চুমুলহারী' পর্ব্বতে এক দেবী বিরাজ করেন ; তাই ঐ পর্ব্বতের উদ্দেশে অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য নিক্ষেপ করিয়া তাহারা দেবীর আরাধনা করে।)

চীনে রপ্তানী হয়। এ সমস্তই চীনেরা ঔষধ প্রস্তুতের জন্য ক্রয় করে।

তিব্বতের পূর্ব্বাঞ্চলে কয়েকটা খনি আছে। তিব্বতীরা তা থেকে সোণা সীসে আর লোহা তুলে নিয়ে অল্প অল্প ধাতু-দ্রব্য নির্ম্মাণ করে। লোহাতে সাধারণতঃ তরবারী বন্দুক ও কামান প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রই প্রস্তুত করে; তা ছাড়া লোহা থেকে সুরা রাখবার জন্য এক প্রকার আধার প্রস্তুত হয়, যেটা তিব্বতীরা সকলেই প্রায় ব্যবহার করে। খেম প্রদেশের 'চীয়াম দো,' সহরটা কেবল এই সুরা-ধার নির্ম্মাণ করেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তরবারীর খাপটা তিব্বতীরা সোণা রূপা প্রভৃতি বিবিধ মূল্যবান ধাতুর সূক্ষ্ম কারু-কার্য্যের দ্বারা অলঙ্কৃত করে নিতে ভালবাসে। সোণার গিল্টী-করা ধাতু-নির্ম্মিত দেব-দেবীর ছোট-বড় নানা আকারের প্রতিমূর্ত্তিও তিব্বতে অসংখ্য বিক্রয় হয়। 'গার্টকে'র মঠ এই মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের জন্য সুপরিচিত। বাতাঙ প্রদেশের প্রায় দুশো মাইল তফাতে 'লীটাং' বলে জায়গাটা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশের জন্যই বিখ্যাত হয়ে প'ড়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রকে তিব্বতীরা 'কাঞ্জুর' বলে, আর তার টীকা-ভাষ্যগুলোকে বলে 'তাঞ্জুর'! এক একখানি তিব্বতী ধর্ম্মগ্রন্থ সাধারণতঃ ১০৮ খণ্ডে বিভক্ত। লীটাংয়ের লামাশারিতে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল, তার প্রত্যেক ছত্রটি সোণা ও রূপার অক্ষরে লেখা। কিছুদিন আগে চীনের সহিত তিব্বতের যখন যুদ্ধ বাধে, সেই সময় নিরক্ষর চীন-সৈন্যেরা লীটাং আক্রমণ ক'রে উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি আরও অনেক অমূল্য জিনিস নষ্ট করে দিয়ে গেছে! আগামী বারে তিব্বত সম্বন্ধে আরও কিছু লিখবো। *

পশ্চিম তিব্বতের মহিলা

* আমেরিকার বিখ্যাত শ্রমণ ডাঃ এ, এল্ শেল্টনের রচিত প্রবন্ধ হইতে। ইনি প্রায় সতেরো বৎসরের অধিক কাল তিব্বতে বাস করিয়াছিলেন। সম্প্রতি একদল তিব্বতীয় দস্যুর হস্তে নির্মমভাবে হত হইয়াছেন।

মাতাল

[শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ]

(১)

নরেশ ভাদুড়ী কিন্তু চিরদিনই মাতাল ছিল না। বাপের অগাধ ঐশ্বর্য্য, মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ মমতা, স্ত্রীর ভালবাসা, সকলই তার অদৃষ্টে প্রচুর পরিমাণেই জুটিয়াছিল; কিন্তু গ্রহের অনুগ্রহ, নিগ্রহ, সকলকেই একদিন না একদিন সমভাবেই ভোগ করিতে হয়। তাহা না হইলে ধনীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা জীর্ণকুটীরে পরিণত হইত না, আবার নরেশবাবুদের পাশের বাটীর মাণিক মুদিও আজমৎগরের দেওয়ান হইত না। নরেশের পিতা অতুল ভাদুড়ী বিশেষ বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। যখন এদেশে রেল-পথ হয় নাই, তখন তিনি একদিন বাড়ীতে রাগারাগি করিয়া, খুড়ীমার বাক্স ভাঙ্গিয়া, একেবারে বিকানীরের মরুপ্রান্তে যাইয়া হাজির হইলেন। বিকানীর ত দূরের কথা, হিন্দুস্থানের কোন রাজ্যেই তখন বাঙ্গালীর বড়-একটা গতিবিধি ছিল না। স্কুল-কলেজের বিদ্যা, তাঁর খুব বেশী ছিল না। কিন্তু অধ্যবসায় এবং অমায়িক স্বভাবের গুণে সকলেই অতুলবাবুকে বিশেষ স্নেহ করিত। ক্রমে বিকানীর দরবারে অতুলবাবু বেশ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। কেমন করিয়া কাহার অদৃষ্টে কখন কি হয়, বলা যায় না। অর্থাগমের সঙ্গে-সঙ্গে, অতুলবাবুর বুদ্ধি, বিদ্যা, মর্য্যাদা সকলই আয়ত্ত হইতে আরম্ভ করিল। চিরদিন আর বাংলার উর্ব্বরক্ষেত্র ছাড়িয়া বিকানীরের মরুপ্রান্তে পড়িয়া থাকা যায় না; তাই কস্মকোলাহলের মধ্যেও থাকিয়া-থাকিয়া অতুলবাবুর প্রাণটা দেশের দিকে ছুটিয়া আসিতে চাহিত। কিন্তু টাকার মায়া বড় মায়া। টাকার কাছে স্ত্রী-পুত্রের কথা, মায়ের স্নেহ সবই পরাজিত হয়। আজ-কাল করিয়া অতুলবাবুর আর দেশে ফিরিয়া আসা হইল না। একদিন প্রভাতে সত্যসত্যই অতুলবাবু, অতুল ঐশ্বর্য্যের মায়া কাটাইয়া দূর-প্রবাসে সুখ-দুঃখের পরপারে চলিয়া গেলেন। সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে বিকানীর রাজ্য হইতে অতুলের মৃত্যু-সংবাদ এবং তাহার অতুল ঐশ্বর্য্যের বার্ত্তা লইয়া লোক আসিল। কান্নাকাটি, শ্রাদ্ধশান্তি সকলই যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল।

(২)

অতুলবাবুর পুত্র নরেশ বেশ মেধাবী ছাত্র ছিল। অর্থশালী লোকের ছেলে বিদ্বান হউক, বুদ্ধিমান হউক, সে তোষামুদি ভালবাসিবেই এবং আপনার জনকে পর ও পরকে আপন জ্ঞান করিবেই। শেষে তোষামুদি তার এতটা মজ্জাগত হইয়া যায়, যে, সে তোষামুদির প্রভাবে সংসারের সকল আত্মীয়, স্বজন, পরিজনের স্নেহ-মমতা ভালবাসা ভুলিয়া যায়। দোষ তাহার নহে, দোষ অর্থের সঙ্গে তোষামুদি-প্রিয়তার। শেষে তোষামোদকারী তার ঘাড়ে এমনভাবে চাপিয়া বসে যে, ধনীর ছেলে তখন জীবন্মৃত হইয়া চাটুকারেরই পদলেহন করে। তখন তার বিদ্যাবুদ্ধি অতলজলে ডুবিয়া যায়।

নরেশ জলপানি পাইয়া বি-এ পাশ করিল, কিন্তু এক গ্রাম্য যুবক ছিল তার চিরসঙ্গী। নরেশ বন্ধুর পরামর্শ ছাড়া একপাও চলিত না। প্রথম-প্রথম নলিন তাহাকে ভাল পরামর্শ দিত। কিন্তু সংসার ত চিরদিনই স্বার্থপর। নলিনের যখন স্বার্থের টান পড়িল, তখন সে বন্ধুকে কুপথগামী করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও নলিন নরেশের সঙ্গে থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখিতে যাইত। থিয়েটার পরেশকে পাইয়া বসিল। তখন সুন্দরী অভিনেত্রী ছিল নীহার। ক্রমে ক্রমে নীহারের সঙ্গে নরেশের বিশেষ মাখামাখি হইল। একে শিক্ষিত, তার উপর পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে; নরেশ যাহা কিছু করিত, তাহাই চাটুকারেরা সুন্দর এবং রুচিকর বলিয়া মানিয়া লইত। ক্রমে নরেশ ভাদুড়ী সখের অভিনয় আরম্ভ করিল। নীহার আর নরেশ যে রাত্রে যে অভিনয়ই করিত, তাহাতেই দর্শকবৃন্দে নাট্যশালা ভরিয়া যাইত। ক্রমে নরেশ নীহারময় হইয়া পড়িল। নীহার নরেশকে মদ খাওয়া বেশী অভ্যাস করাইল।

(৩)

নরেশের বিবাহ গৌরী গ্রামের তারাকিশোর রায়ের কন্যা আশালতার সঙ্গে, খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল।

তখন পর্য্যন্তও নরেশের কলিকাতার কীর্ত্তিকাহিনী গ্রামে প্রকাশ পায় নাই। আশার শ্বশুরবাটী আসিবার পর হইতেই নরেশ ঘন-ঘন বাটী আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু থিয়েটারের অভিনেত্রীর নিকট যাহা পাওয়া যায়, তাহা গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝির নিকট আশা করা যায় না। এখন বাড়ী তো দূরের কথা, কলিকাতার বাসাই ভাল লাগে না। ক্রমে নীহারকে না দেখিয়া নরেশের এক মুহূর্ত্তও থাকিবার জো রহিল না। নীহার থিয়েটারের অভিনেত্রী হইলেও, বেশ্যার গৃহে জন্মে নাই; সেও একদিন ভদ্রঘরের কুলবধূই ছিল। অত্যাচারে, যন্ত্রণায় সে পতিতার দলভুক্ত হইয়াছিল। মনটা তার আগাগোড়াই ব্যবসাদারী অভিনেত্রীর চাইতে অনেকটা উঁচু ছিল।

বড়ঘরের ছেলে নরেশ মাতাল হইলেও, তাহার অনেক গুণ ছিল। সে কখনও ভদ্রঘরের মেয়েছেলের দিকে কু-নজর দিত না। অধিকন্তু গ্রামে গেলে যদি দেখিত যে টিকি-ফোঁটাওয়ালা দু'একজন নিরীহ ভালমানুষ মেয়েদের ঘাটের কাছে বসিয়া আড্ডা দিতেছে, তখনই যাইয়া নরেশ তাহাদের টুটি চাপিয়া ধরিত। গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ বদন বোসের বয়স চল্লিশের ওপারে গেলেও চোখের দোষটা খুবই ছিল। সে মাতাল নরেশকে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিত, কিন্তু রোজই সন্ধ্যার সময় ঘাটে যাইয়া সে বসিয়া থাকিত। নরেশ দুই তিন দিন দেখিল। চতুর্থ দিনের রাত্রিটা ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। নরেশ দেখিল, সন্ধ্যার পর যখন ভট্‌চাজ্‌দের অষ্টাদশ বর্ষীয়া বিধবা মেয়ে সরলা ঘাটে কাপড় ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে, তখনই বদনবাবুর হুকায় জল ভরিবার সময় হইল। নরেশের আর সহ্য হইল না; সে দৌড়িয়া যাইয়া বদনচন্দ্রের পৃষ্ঠে দু'চার ঘা বসাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল। সে আঘাতের ক্ষত ঘা শুকাইতে বদনচন্দ্রের মাসখানেক লাগিয়াছিল।

একবার নরেশ নীহারকে লইয়া ঢাকায় বেড়াইতে গিয়াছিল। বাসা সুবিধামত না পাওয়ায়, তাহারা লালকুঠীর ঘাটে প্রকাণ্ড একটা বজ্‌রা ভাড়া করিয়া ছিল। হেমন্তের সন্ধ্যা; বেশ শীত পড়িয়াছে; চতুর্দ্দিকে কুয়াসার ভিড়ও হইয়াছে—নরেশ যখন হাওয়া খাইতে খাইতে লালকুঠীর ঘাট ছাড়াইয়া কেবলমাত্র বাংলা বাজারের রাস্তায় পৌছিয়াছে, তখন একটা দোকানে একটী ছোট মেয়ে চেঁচাইয়া উঠিল "বাবা! মেরা ভাইকো কাপড়ামে আগুন ধর গিয়া।" রাস্তা দিয়া দুই একজন তামাসাগির যাইতেছিল; কেহই বালিকাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইল না। নরেশ দৌড়িয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গায়ের ওভার-কোটটা খুলিয়া ফেলিয়া সেই প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ছেলেটাকে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করিয়া লইয়া, মেডিক্যাল হাসপাতালে ডাক্তারের জিম্বা করিয়া দিল। ছেলের মা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিল। প্রায় অর্দ্ধপ্রহর রাত্রে নরেশ বজরায় ফিরিয়া আসিল। নীহার তখন বীণা লইয়া আপন মনে গাহিয়া যাইতেছিল। সে সুরে কি এক মোহ-মদিরা ছিল; যাহারা ঘাটে আসিয়াছিল, তাহারা ঘাটেই বসিয়া রহিল। নরেশ কিন্তু আজ নীহারকে পূর্ব্বের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিল না; তাহার মনে হইতে লাগিল সেই ছেলের মায়ের স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ।

নরেশ আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না; এ দৃশ্য তাহার ভাল লাগিল না, বাড়ীর দিকে, তাহার প্রেমময়ী পত্নী আশার কথা তাহার মনে হইল। সে আর বজরায় উঠিল না; সেই রাত্রিতেই একাকী দেশে চলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে নরেশ মদ ও সবরকম বদ্‌খেয়াল ছাড়িয়া দিল;—মাতলামীর নেশা অপেক্ষা পরোপকারের নেশাই তাহাকে চাপিয়া ধরিল। মদের মাতাল এখন কাজের মাতাল হইয়া পড়িল। কেহ তাহাকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিলে সে বলিত, "ঢাকার সেই ছেলেটীর মা আমার জন্য যে মদ এনে দিয়েছে, তার কাছে আর কোন মদই লাগে না—আমি এখন আর এক মদে মাতাল!"

প্রকাশ

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

যে কথাটি আমি বলি নি কখনো,
পরকাশ হ'ল তবু
কভু অধরের হাসির আড়ালে
নয়নের জলে কভু ;
দিবসের শত কাজ দিয়ে যত
আড়াল করিয়া রাখি,
তবু সবটুকু সবে জানি' লয়
রয় না তো কিছু বাকি।

তবু সে গোপন থাক ;—
গভীর হিয়ায় লুকানো রহিয়া
ভাষাহীন নিরবাক।
সারা রজনীর রঙিন স্বপনে,
দিনের অলস কাজে,
ক্ষণে ক্ষণে দেখি শঙ্কিত চিতে
সেই সে রাগিণী বাজে ;
কাননে কাননে আকাশে বাতাসে
শুনি তার গুঞ্জন,
পরাণ আমার ভুলাইয়া লয়,
ফিরি আসি উন্মন।

আমি শুধু ভেবে মরি ;—
আমার মনের ব্যাকুল ব্যথাটি
জানিল ওরা কি করি !

নয়ন কহিতে চাহে নি কো, তাই
চাহি নি তো কারো পানে,
গাহি নি কো গান, পাছে সেই কথা
ঝঙ্কারি উঠে গানে ;
সারা নিশিদিন একেলা একেলা
ফিরিয়াছি দূরে দূরে,
আপনার সাথে করিয়াছি খেলা
গোপন স্বপন-পুরে।

তবু সে প্রকাশ হল !—
সে কথাটি তবে কহিয়ো না কেহ
করিয়ো না কোলাহল !
আমার সরম আমার বেদনা
সঞ্চিত যত আশা,
সারা কিশোরের তরুণ হিয়ার
উচ্ছ্বাস ভালবাসা,
ভুলিতে পারিনি, বলিতে পারিনি,
গোপন করেছি শুধু,
মিলন বিরহ তারি সাথে মোর,
সেই সে পরাণ বঁধু!

ওগো দিয়ো না কো লাজ—
নারীর মরম-বেদনা প্রকাশি'
তোমাদের কিবা কাজ !

বহুরূপী গাছ

[শ্রীপিয়েমৃডি]

কোম্পানীর বাগানে (বোটানিকাল গার্ডেনে) আমরা যে সব অদ্ভুত রকমের গাছ দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে দুই-একটির বিবরণ ইতঃ-পূর্ব্বে পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ সেইরূপ আর একটি অদ্ভুত গাছের বিবরণ 'ভারতবর্ষের' পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম।

কোম্পানীর বাগানের যে স্থলে 'হুকার এভেনিউ' (Hooker Avenue) ও 'বেনিয়ান এভেনিউ' (Banyan Avenue) মিলিত হইয়াছে, সেই মিলন-স্থলের সন্নিকটে 'ষ্টার্কিউলিয়া এলেটা' (Sterculia alata) বা 'বুদ্ধনারিকেল'-এর একটি অদ্ভুত রকমের গাছ আছে (১ নং চিত্র দেখুন)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এই গাছের কোন পাতাই

ঠিক্ অন্য পাতার সদৃশ নহে। ইহার* বৈজ্ঞানিক নাম S. alata var. irregularis (১৯১১ সনের এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল দেখুন)। জানিতে পারিলাম, কোম্পানীর-বাগানে ইহা 'পাগলা গাছ' নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি পাতাই বিভিন্ন রকমের বলিয়া আমি ইহাকে বাঙ্গলায় 'বহুরূপী গাছ' আখ্যা দিতে ইচ্ছুক। সাধারণ 'বুদ্ধনারিকেল' গাছ আসাম, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি

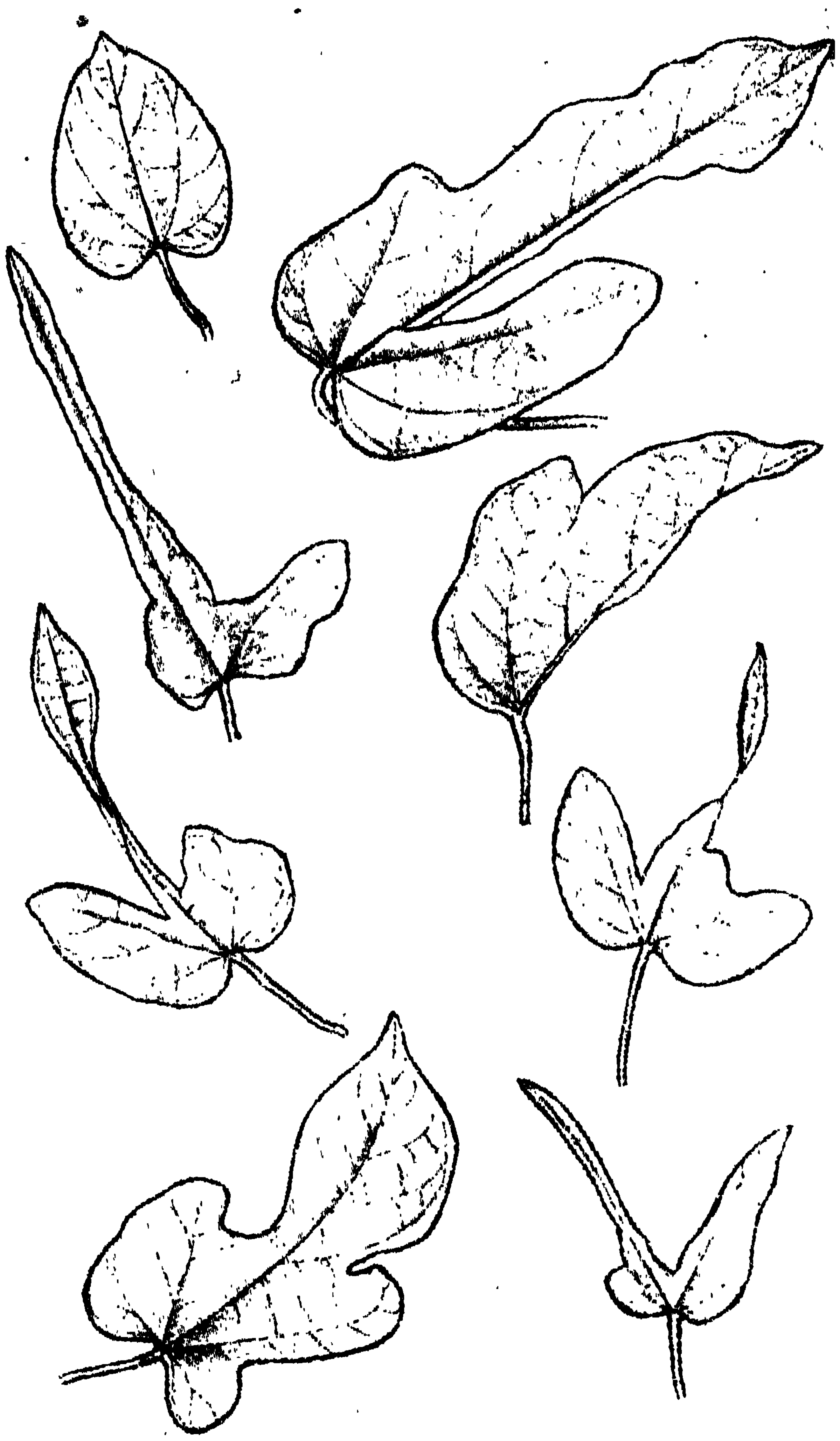

২নং চিত্র—বহুরূপী গাছের পাতা

স্থানের পাহাড়ে পাওয়া যায়। এই 'বহুরূপী গাছ' প্রকৃতির খেয়াল বা কোন অজ্ঞাত কারণ প্রভাবে 'বুদ্ধনারিকেল' গাছের রূপান্তর বিশেষ।

উদ্ভিদ্-জগতে এমন অনেক উদ্ভিদ্ আছে, যাহাদের বিভিন্ন বয়সের বা অবস্থার পাতার আকৃতি বিভিন্ন রকমের। অনেক উদ্ভিদ্ (যথা ধনে, গাঁদা, বেগুন ইত্যাদি) দেখা যায়, যাহাদের অঙ্কুর বা শৈশব অবস্থায় পাতার যে আকৃতি থাকে, বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই আকৃতির পরিবর্তন হয়। আবার একই গাছে (যথা—ঝাঁঝী লিম্নোফিলা (Limnophila), ব্রাহ্মী প্রভৃতি) জলে ও স্থলে উভয়ত্র থাকিলে, জলের গাছগুলির পাতার আকৃতি স্থলের গাছ-গুলির পাতার আকৃতি হইতে অনেক পৃথক ; অথবা জলের ভিতর যে পাতাগুলি থাকে, তাহাদের আকৃতি জলের উপরের পাতার আকৃতি হইতে বিভিন্ন হয়।

'বহুরূপী গাছে'র পাতা কিন্তু স্বভাবতঃই এরূপ বিভিন্ন রকমের,—বয়োবৃদ্ধিহেতু এ বিভিন্নতা নয়। কারণ, গাছটির বয়স এখন প্রায় ৫ বৎসর হইবে।

উদ্ভিদ্ সমূহের মধ্যে 'ক্রোটন' বা 'বাহার পাতা' (Codiaeum varicgatum) গাছের পাতা সময়-সময় একই গাছে নানা

১ নং চিত্র

বহুরূপী গাছ

আকৃতির হইতে দেখা যায়। কিন্তু 'বহুরূপী গাছে'র পাতার তুলনায় তাহাদের আকৃতির পরিবর্তন যৎ-সামান্যই হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই 'বহুরূপী গাছে'র পাতার আকৃতি প্রধানতঃ যে কয় প্রকারের দেখা যায়, তাহা ২ নং চিত্রে দেখান হইল। ইহার বীজ পোড়াইয়া বা ভাজিয়া খাওয়া যায়।

যযাতি-দেবযানী

[শ্রীকামিনী রায় বি-এ]

যযাতি। আমি আসিয়াছি দেবি!
দেবযানী। জয় মহারাজ,
দেখা দিয়া বাঞ্ছা মোর পূরাইলে আজ।
যযাতি। ডেকেছ আমারে প্রিয়ে?
দেবযানী। ডেকেছি তোমারে?—
ডেকেছি—প্রভুরে যদি ডাকিবারে পারে
দীনা দাসী; মৃত্যুকালে যথা বারে-বারে
পাপ-ক্ষমা লাগি পাপী ডাকে দেবতারে।
যযাতি। কি এ ব্যাধি? মৃত্যুভয় কেন মহারাণি?
দেবযানী। মহারাজ, শুক্রকন্যা এই দেবযানী
মৃত্যুরে করে না ভয়। জরাভার দিয়া
তব দেহে, জান না তো লয়েছি বরিয়া
কি ভীষণ আধি-ব্যাধি, আত্মার ভিতর—
দহিতেছি মর্ম্মে-মর্ম্মে। মৃত্যু প্রিয়তর
অনুতাপ-জ্বালা হতে। মৃত্যু শান্তিময়,
প্রাণ জুড়াবার পথ, তাহে নাহি ভয়।
যযাতি। কি কথা বলিতে চাহ?
দেবযানী। সব কথা হায়
সুদীর্ঘ ক্রন্দন হয়ে বাহিরিতে চায়।
একটু অপেক্ষা কর। প্রভু জানি আমি
বহু রাজকার্য্য আছে; নহ শুধু স্বামী
দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার; তুমি হও পতি
সসাগরা ধরণীর। শর্ম্মিষ্ঠা সে সতী,
নিজ গুণে বাঁধিয়াছে তব চিত্তখানি;
বাঁধ ছিঁড়ে' ছুটিয়াছে দূরে দেবযানী
উন্মত্তা উল্কার মত। ব্রাহ্মণ্য-দর্পিতা,
ক্রোধে চণ্ডালিনী, বক্ষে জ্বালিয়াছে চিতা
নিজ হাতে। ঈর্ষা, ক্ষোভ, ঘৃণা অভিমান
বিষ-দিগ্ধ শরে বিঁধি নিজ মর্ম্ম-স্থান।
ক্ষমাহীন নির্ম্মম সে দুর্ব্বলে লাঞ্ছিতে
দলিয়াছে পদতলে আপন বাঞ্ছিতে,
অজ্ঞাত অদৃষ্ট দোষে। আজ সুপ্রকাশ
চক্ষে তার জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস।
আপনার যত দোষ, যত ভ্রান্তিজাল
তোমারে দেখাব প্রিয়, রহ কিছুকাল
এই অপ্রিয়ার কাছে।

শৈশব, কৈশোর
জান কি আমার তুমি? পিতৃদেব মোর
দৈত্য-রাজ-গুরু, তাঁর চিত্ত অবিরত
দৈত্যের কল্যাণ-ধ্যানে থাকিত নিরত;
তবু বেগবতী এক স্নেহ স্রোতস্বতী
নিরন্তর বহিয়াছে তনয়ার প্রতি,
মানে নাই কোন বাধা। রাজ-সভামাঝে
সুরাসুর-যুদ্ধে, যজ্ঞে, পাঠে—সর্ব্ব কাজে
তাঁর অন্ধ চক্ষু যেন তনয়ার লাগি
সর্ব্ব দৃষ্টি অন্তরালে রহিয়াছে জাগি।
ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম অভিলাষ তার
হইয়াছে পূর্ণ সদা। না করি বিচার,
যা চেয়েছে পেয়েছে সে। শুক্র মহাজ্ঞানী
দৈত্যের ভরসা বল, তাঁর দেবযানী
দুর্ব্বিনীতা, জানে নাই নিজ ইচ্ছা বিনা
এ জগতে আর কোন ইচ্ছা আছে কি না;
আছে কি না লজ্জা, মান, ভাবে নাই কভু।
তার মান রেখেছেন দৈত্যকুল-প্রভু,
সেই দর্পে আশৈশব আছিল দর্পিনী
পূর্ণ অভিমান-বিষে। পালিতা সর্পিনী
দুগ্ধ-পুষ্টা, সামান্য আঘাতে অকস্মাৎ
দংশে রোষে দুগ্ধদাতা পালকের হাত।
ব্রাহ্মণ সংযমী, শুদ্ধ; দৈত্য অনাচারী;
আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, তাই মনে ভারী
গর্ব্ব ছিল সংযমের আর শুদ্ধতার।
তাই অসংযত' ক্রোধে এই উদ্ধতার
ভেসে গেল সব সুখ। যত ব্রত, স্নান,
শাস্ত্র পাঠ, দেবস্তুতি, দীনে ভিক্ষা-দান
ব্যর্থ সব, পুণ্যহীন। সেথা পুণ্য রহে,

শ্রদ্ধা স্নেহ ক্ষমা যথা নিরন্তর বহে
বিনয়ে আবৃত হয়ে।
　　　　ক্ষুদ্র অপরাধ
তাই লয়ে সখী সনে করিনু বিবাদ ;
তীক্ষ্ণ বাক্যবাণবিদ্ধা, ক্রুদ্ধা সে তরুণী
ফেলে দিলা কূপে মোরে। আর্ত্তনাদ শুনি
আর্ত্তবন্ধু, ক্ষাত্রধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান্,
দেহে বল, চিত্তে দয়া, চক্ষুঃ জ্যোতিষ্মান্,
আসিলে নিকটে মোর, বাড়াইয়া হাত
উদ্ধার করিলে মোরে। সকল আঘাত,
দেহের মনের, সেই বাহু-স্পর্শে তব
ভুলে গেনু, লভিনু সে কি আনন্দ নব।
সে আনন্দ-নীরে কেন ডুবিল না হায়,
হীন ক্রোধ ? কেন শাস্তি দিনু শর্ম্মিষ্ঠায় ?
বিবাদের বিপদের সমগ্র কাহিনী
কহিনু পিতারে কেন ? কন্যা-প্রাণ তিনি,
ক্ষিপ্ত প্রায় কহিলেন, "ত্যজি দৈত্যালয়,
যাব চলি এ মুহূর্ত্তে।"
　　　　"তাও না কি হয় !
দৈত্যকুল বাঁচে কভু শুক্রাচার্য্য বিনা ?
এত বড় কুল ধ্বংস শেষে হবে কি না—
এক বালিকার দোষে ! প্রায়শ্চিত্ত তার
করুক সে। রোষ, দেবি, কর পরিহার
শাসি সেই দুর্ব্বৃত্তারে ; দাসী কর তারে,
অপমান করেছে যে আচার্য্য-কন্যারে।"
কহিলেন পায়ে ধরি দৈত্যকুলরাজ,—
স্মরিয়া লজ্জায় আমি মরিতেছি আজ।
　পিতার আদেশে সখি মাথা নত করি
করিলা মার্জ্জনা-ভিক্ষা, মোর পায়ে ধরি।
সেই দিন হতে হল নানা গুণযুতা
অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী বৃষপর্ব্ব-সুতা
আচার্য্য-কন্যার দাসী। রাজার নন্দিনী
সৌধ ত্যজি পর্ণশালে হইল বন্দিনী।
　তার পর তুমি যবে মোরে এলে লয়ে
তোমার ঐশ্বর্য্য মাঝে, সেও দাসী হয়ে
এল মোর সাথে। আমি কৃপণের মত
যত সুখ, যত ভোগ, স্বামি-গর্ব্ব যত,
দুহাতে রাখিনু ধরে, আপনার তরে ;
না দেখিনু পার্শ্বে মোর কার আঁখি ঝরে
বিগত গৌরব স্মরি ; ছাড়ি প্রিয়জন
বৃন্তচ্যুত পুষ্প সম, করি বিতরণ
মৃদুল সৌরভ, কে যে শুকাইছে ধীরে ;
তুমি দেখেছিলে,—তাও দেখি নাই ফিরে।
তব গৃহে দাসীর কি ঘটিত অভাব ?
তাহা নহে, এ কেবল দীনের স্বভাব ;
রাজকন্যা দাসীরূপে দেখাব সকলে,
তাই আনিলাম সাথে, সখী-স্নেহ-ছলে।
সখিরূপে দিয়াছিনু স্নেহ কতখানি ?
সে আমার দাসী, আর আমি রাজরাণী,
এই জানায়েছি তারে। শত ক্ষুদ্র কাজে
মোর প্রসাধন-কক্ষে, মোর গৃহ-সাজে
তার কাছে এতটুকু ত্রুটি পাই নাই।
সে ছিল রাজার কন্যা, সে জানিত তাই
ঐশ্বর্য্যের ব্যবহার। তপস্বিনী আমি
শুধু জানিতাম আমি পাইয়াছি স্বামী
মহারাজ যযাতিরে। নিশ্চিন্ত সে জ্ঞানে
রাখি নাই স্বামী-চিত্ত সদা সাবধানে।
　যে করুণা উদ্ধারিল, তোরে দেবযানি,
কূপ হ'তে, তাই তোর দয়িতেরে আনি
মুছাইল শর্ম্মিষ্ঠার নয়নের নীরে ;
তার পর গুণমুগ্ধ প্রেম ধীরে ধীরে
মিশিল করুণা সাথে।
　　　　মূঢ়া বুঝি নাই
আমি যে নির্গুণা, হীনা, শর্ম্মিষ্ঠার ঠাঁই।
　কঠোর ভৎ‍র্সনা করি পতি, সপত্নীরে
ঈর্ষা-দগ্ধ পিতৃগৃহে আসিলাম ফিরে।
এতদিনে বুঝিয়াছি সব নিজ দোষ,
অযথা ভৎ‍র্সনা, মোর অযথা সে রোষ
ঢালিনু পিতার প্রাণে।

যযাতি।　　　　ন্যায্য সে ভৎ‍র্সনা
যাহা কিছু কহিয়াছ, তার এক কণা
নহে মিথ্যা, তেজস্বিনি ! যোগ্য তারে ক্রোধ,

যে অসীম বিশ্বাসের দেছে প্রতিশোধ
বিশ্বাসঘাতক হয়ে—হোক্ যে কারণে।
তুমি যে অখণ্ড প্রেমে বরিলে এ জনে
তাহার অযোগ্য ছিল, ক্ষত্র তব পতি,
বলেছিলে তুমি—সে তো সত্য কথা অতি।

দেবযানী। তুমি চেয়েছিলে ক্ষমা, আমি ক্রোধ-ভরে
বলেছিনু,—ক্ষমা নাই রমণীর তরে
যে পাপের, সেই পাপ করি, চিরদিন
অসংযত পুরুষ সে ধৃষ্ট, লজ্জাহীন
অদণ্ডিত রহে সুখে এই পৃথিবীতে;
সতীত্বেরে বাথানিয়া চাহে তা দেখিতে
কেবলি নারীর মাঝে; নারী তারে ক্ষমি
করে নিজ সর্ব্বনাশ, তার পায়ে নমি।
পুরুষ প্রবৃত্তি'পরে না লভিলে জয়,
নারীর সতীত্ব রবে? হোক্ সে নির্দ্দয়,
হোক্ ক্রোধে অগ্নিশিখা, হোক্ ক্ষমাহীনা,
দেখিবে এ নরকুল শুদ্ধ হয় কি না।

যযাতি। নহে অর্থহীন কথা। তবু ক্ষমা চাই,
যা হয়েছে তার যবে প্রতীকার নাই;
ক্ষমার কি নাহি যুক্তি?

দেবযানী। আছে কুলাচার,
দেশ-কাল-পাত্র ভেদ, কত কিছু আর।
ইহাও ভাবিতে ছিল, করিতে স্মরণ,
বিপ্রকন্যা ক্ষত্রিয়েরে করেছি বরণ—
বহুপত্নীকের জাতি। ব্রাহ্মণের রীতি,
নিয়ম, সংযম, তার এক-পত্নী-প্রীতি—
ক্ষত্রিয়ানী দেবযানী সে সবের লোভ
কেন রাখে? কেন হেন ক্রোধ আর ক্ষোভ
উন্মত্ত করিবে তারে?

যযাতি আর নাই ক্রোধ?
বল প্রিয়তমে! তবে রাখ অনুরোধ,
চল নিজ গৃহে তব। তব সিংহাসন
শর্ম্মিষ্ঠা চাহে না কভু। দাসীর মতন
চিরদিন পদসেবা করিবে তা জানি;
ফিরে চল দেবযানি, মোর মহারাণী!

দেবযানী। ফিরিবার পথ মোর নাই, আর নাই।
শর্ম্মিষ্ঠার পতিগৃহে আমি নাহি চাই
পত্নীত্বের অধিকার। স্বামী-গৃহ মম
ছিল যা হৃদয়ে আজ ভগ্ন-চূর্ণতম,
আর উঠিবে না গড়ি। সেথা সমাদরে
স্বামী ব'লে বসাইতে নারি প্রেমভরে।

যযাতি। আছে পুত্রদ্বয় তব, তাহাদের স্নেহে
ফিরে চল স্নেহময়ি, তব পুত্র-গেহে।

দেবযানী। পুত্র কথা শুনাইলে। বল হে রাজন্,
হয়েছে কি তারা তব স্নেহের ভাজন?

যযাতি। তাতেও সন্দেহ আছে?

দেবযানী বড় ক্ষোভ প্রাণে,
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র পূরু আত্ম সুখ দানে
তোমারে করেছে সুখী, ধন্য আপনারে,
যশস্বিনী জননীরে। আমি বারেবারে
নিজেরে জিজ্ঞাসি, কেন আমার সন্তান
পারে নাই সাধিতে এ ব্রত সুমহান্?
অসহিষ্ণু দেবযানী আত্ম-সুখ মাগি
ফিরিয়াছে চিরদিন; অপরের লাগি
কি কবে দিয়াছে ছাড়ি? কি দিয়াছে বলি
প্রেমের চরণে? শুধু আপনারে ছলি
শুদ্ধি সংযমের নামে পুষি অভিমান
ফিরিয়াছে, অসন্তোষে রোষে ভরি প্রাণ;
শুনায়ে কঠোরা বাণী, দিয়া অভিশাপ
বাড়ায়েছে চারিদিকে আশ্রম-সন্তাপ।
যে মহাপ্রাণতা পুত্র পূরুর মাঝার,
যদুর অন্তরে আমি কোন বীজ তার
পেরেছি রোপিতে কভু? আমি বটে সতী?
কি করেছি করণীয় পতি-পুত্র প্রতি?
শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী, শান্তা, শিল্প-কলাবতী,
যত হোক্ সে গৌরব, প্রেম তার অতি
না থাকিলে, হেন পুত্র জনমে কি তার?
তাই শর্ম্মিষ্ঠারে করি শত নমস্কার।
সে কথাই মহারাজ, চাহি জানাইতে,
তার প্রতি আর রোষ নাহি মোর চিতে।
শর্ম্মিষ্ঠাই ভার্য্যা তব, যোগ্য প্রজাবতী,
তারে লয়ে থাক সুখে। দেবযানী-পতি
হোক্ অতীতের স্মৃতি। মুক্ত জরাভার,
বলিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ তনু ল'য়ে পুনর্ব্বার
হও দেবকার্য্য-রত, প্রজাহিতকামী,
বীরভোগ্যা ধরণীর অসপত্ন স্বামী।
পিতার ক্রোধাগ্নি জ্বালি দহি তব দেহ,
আমি যে জ্বলেছি কত, জানিবে না কেহ,
যাও ক্ষমি ক্ষুব্ধ প্রেমোত্থিত হলাহল,
তীব্র ঈর্ষা, যাও ক্ষমি দীপ্ত রোষানল।
আজ তোমা নিরাময় হেরি, প্রিয়তম!
নির্ব্বাপিত মোর জ্বালা, স্বস্থ চিত্ত মম।

বিষাদিনী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

শোকাশ্রু

পল্লীপথে

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের
আলোক-চিত্র হইতে গৃহীত

জলকে চল্‌——

শিল্পী- শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পল্লী-ঘাটে

শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের আলোক-চিত্র হইতে গৃহীত

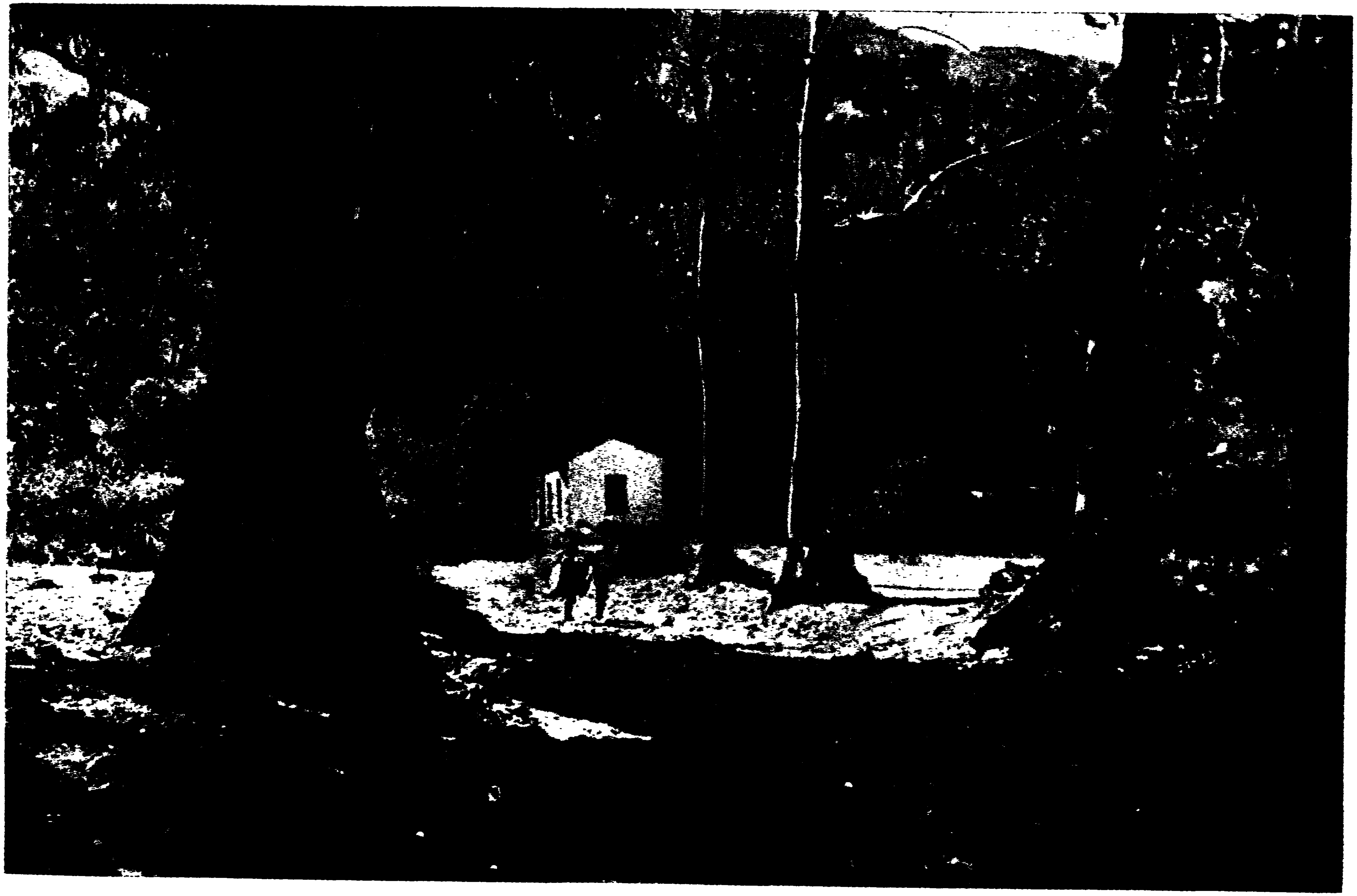

আলো ও ছায়া

জামাই

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

এই তো সবে প্রথম বিয়ের পর
ছ'টী মাসও হয় নি আজও, গেছে শ্বশুর ঘর
আমার মেয়ে টুনি ;
এর মধ্যেই শুনি
নানান্ জনে নানান্ কথা কয় ;
শাশুড়ী তার মোটেই নাকি মানুষ ভাল নয়,
মেয়েটাকে দিচ্ছে শতেক জ্বালা,
কোল থেকে তার কেড়ে নে যায় বেড়ে দেওয়া মুখের ভাতের থালা !
রাঁধা-বাড়া দুটি বেলা, বাসন মাজা একটি কাঁড়ি,
কচি মেয়ে ক'রছে আমার গিয়ে অব্ধি শ্বশুর-বাড়ী ;
কুট্‌নো কোটা, বাট্‌না বাটা, পান সাজাটার ভার,
এও শুনিছি তার ;
আরও ওসব ছাড়া,
ধোয়া, মোছা, ঘর-নিকোনো, ঝাঁট-পাট কি ঝাড়া
নেহাৎ দাসীর মতো
একরত্তি মেয়ে আমার ক'রছে ক্রমাগত !

*　　*　　*　　*

এমনি কোরেই কাট্‌ছে টুনির দিন,
শুন্‌ছি কেবল দেহ বাছার শুকিয়ে নাকি হ'চ্ছে ক্রমেই ক্ষীণ !
যতবারই পাঠিয়েছি লোক আন্‌তে ঘরে মা'কে,—
বেই-বেয়ানে ধ'মকে কেবল হাঁকিয়ে দেছে তাকে ;
হঠাৎ একদিন—ঠিক্ কবে কে জানে,
খবর এলো কানে,
টুনির ভারি জ্বর,—
পীড়ন তবু চল্‌ছে নাকি রুগ্ন মেয়ের পর !
আপিস থেকে সকাল ক'রে উঠে
গেলাম সে দিন ছুটে
দেখে আস্‌তে মেয়ে ;
গলা-ধাক্কা খেয়ে—
ফিরে এলেম শুক্‌নো মুখে একা ;
পেলেম না তার দেখা !

সে অপমান প'ড়লে আজও মনে,
মনে হয় যে পালাই কোনও বনে,
এ কালামুখ লোকালয়ে কোর্‌বো না আর বার ;
মরদ্ হ'য়ে মুরোদ নেইকো যার,
মরাই উচিত তার
গলায় দড়ী দিয়ে ;
ছি-ছি ! এ সব কী এ !
এম্‌নি চামার ! এমনি ইতর তারা ?
মেয়ে যাচ্ছে মারা—
দিলে নাকো দেখ্‌তে তবু তাকে ?
এ দুঃখ জানাই বল কাকে !
লোক পাঠিয়ে—চিঠি লিখে অমোন বিনয় ক'রে—
হাতে পায়ে ধরে—
তবু তাদের এক্‌টা দিনের পেলেম নাকো একটু অনুমতি –
যে উঁকি মেরে দেখে আস্‌বো একবারটী শুধু—মেয়ের আমার কি হয়েছে গতি !

* * * * *

বুঝ্‌তে পার্‌লেম যখন এবার
হবে না আর
চল্‌লে সোজা পথে ;
গেলাম আদালতে ;
হাকিমকে সব বুঝিয়ে বলে হুকুম নিয়ে তার
হ'লেম সে দিন বার ;
ডেকে-ডুকে পাড়া-পড়্‌শী বন্ধু দু'চার জন
থানার চেনা ইন্‌স্‌পেক্টার্ পাহারোলা আর সার্জ্জন,
ভাল একজন নার্স্ এবং সাহেব-ডাক্তার নিয়ে
উঠ্‌লেম এবার গিয়ে
মেয়ের শ্বশুরবাড়ী ;
না দাঁড়াতেই দোর-গোড়াতে গাড়ী,
আমার যেন সয় না সবুর,
আদালতের পেয়াদা গফুর
সঙ্গে ছিল, তাকে বল্লেম—"ধাক্কা মেরে দোরে
ঢুকে প'ড়ো না জোরে ;
দোষ নেইক' তাতে,
খোদ হাকিমের হুকুমনামা আছে যখন হাতে

ভয়টা বল কার ?
বেই চাঁড়ালের কোনও ওজোর শুন্‌তে চাইনি আর !"

*　　*　　*　　*

তেড়ে সবাই বাড়ীর মধ্যে পড়িছি যেই ঢুকে,
বেই অমনি রুখে
বোল্‌লে "তুমি কে হে বাপু ? কার হুকুমে এলে —
বাড়ীর ভিতর ঠেলে,
ঢুক্‌ছ' এসে ঘরে !
জানো এটা 'ট্রেস্‌পাস্‌', এর শাস্তি পাবে পরে ?"
আমি শুধু মুচ্‌কে হেসে দেখিয়ে দিলাম পাছে—
সঙ্গে এবার পুলিশ সার্জ্জন পাহারোলারা আছে !

*　　*　　*　　*

সবার আগে ঘরের ভিতর ঢুকে
ব্যাকুল হোয়ে ঝুঁকে
দেখ্‌লেম শুধু চেয়ে
শয্যাগত রুগ্ন-দেহে কঙ্কালসার মেয়ে ;
কথা নেইক' মুখে
প্রাণটা যেন যাবার আগে ধুঁক্‌ছে শুধু বুকে !
জ্বরের তাপে আগুন-পানা পুড়ে যাচ্ছে গা,
তার ওপরে বাছার আমার সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে বেরিয়েছে সব কেমন যেন ঘা !
কখন বুঝি মরে !
সাহেব ডাক্তার বোল্‌লে আমায় বহু পরীক্ষার পরে,
"অতি কুৎসিত কলঙ্কিত নিন্দনীয় রোগে
কন্যা তোমার ভোগে ;
ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর সঙ্গে সহবাসের ফলে,
নির্দ্দোষী এই মেয়েটির আজ সোণার অঙ্গ জ্বলে !
ভয় নেইক' মর্ব্বে না এ,
কিন্তু একটা কথা এই যে
বাপ হ'য়ে এর তুমি—
এমন হাতে মেয়ে দিলে যে ব্যাধির লীলাভূমি !
ভুগ্‌ছে বিষম ছোঁয়াচে এই নোংরা রোগে যে,
উচিত হয় নি তার সঙ্গে দেওয়া মেয়ের বে।"
শুনে আমি অবাক্, আমার বাক্ সরে না মুখে,
লজ্জা-ঘৃণায় ক্ষোভে এবং দুখে ;

বুঝিয়ে দিলেম শেষে, আমি দিই নি এটা জেনে,
ভদ্রঘরের ছেলে যখন স্বভাব হবেই সৎ নিয়েছিলেম মেনে ;
লেখাপড়া ক'রছে ভালো, বয়স বেশী নয়,
সে ছেলে যে এমন নষ্ট হয়
পারিনি তা বুঝ্‌তে ;
জান্‌লে কি আর তাকে আমি টাকার কাঁড়ি দিয়ে যেতাম মেয়ে গুঁজ্‌তে ?

* * * *

সাহেব শুনে ব'ল্‌লে হেসে,
"তোমার দেশে
থাক্‌তে বোকা মেয়ের বাপের দল, কেন নিন্দে কর পরের,
দেবার আগে মেয়ের বিয়ে দেখে নাও না কেউ স্বাস্থ্য কেমন বরের ?
যার জিম্মেয় দিচ্ছ মেয়ে এ জন্মের মতো,
আছে কি না রোগ কিছু তার, গোপন কোনও ক্ষত,
সেটা একবার চিকিৎসকের পরীক্ষাতে ফেলে
যাচাই ক'রে নাও না কেন কেমনতর ছেলে ?
দেখতে পাও না ঢুকতে গেলে কোনও একটা কাজে—
কারখানা, কল, রেল, কিম্বা ষ্টীমার জাহাজে,
এমনি কি ওই কেরাণী, যার কলম-পেশাই পেশা,
সরকারী সব আফিসগুলোয় তারও আইন এমা
যে, ঢুক্‌তে যাও না যে লাইনেই হবেই তোমায় দিতে
শরীরটার সব পরীক্ষাটা কোম্পানীরই 'ফী'তে !
তোম্‌রা কিন্তু জামাই কর, না দেখে তার স্বাস্থ্য ;
এর জন্যে হয় না শুধুই মেয়ের শরীর খাস্ত,
নির্দোষী যে শিশুর দল আস্‌বে এদের কোলে,
পিতার পাপের তাপে তাদের স্বাস্থ্য যাবে গলে !
চিররুগ্ন সেই ছেলে যার জন্ম দুষ্ট রক্ত,
ধ্বংস হয় সে বংশ পিতার ব্যাধির অভিশপ্ত !
তোমার দেশের ছেলেরা সব গোপন ক'রে রোগ ;
বে'করে চায় দাম্পত্য-জীবন সুখের ভোগ !
স্বার্থ-অন্ধ তারা কি কেউ ভাবে একবার ব'সে,
নিরপরাধ কত জীবন মজ্‌বে তাদের দোষে ?
কেবল কি হে দেখ্‌লে চলে পাশ ক'রেছে কটা,
কিম্বা বাপের পয়সা কত, ক'র্‌বে কেমন ঘটা ?
'ঠিকুজি' আর 'কুষ্ঠি' দেখে মেলাও শুনি 'গণ,'
স্বাস্থ্য এবং শরীরটা কি মেলাও দু'একজন ?

সুস্থ সবল অটুট দেহ যে ছেলেটির নয়
　সে বিবাহে মেয়ের জীবন হ'বেই বিষময় !
এই কারণেই জীবন-প্রাতে সিঁথের সিঁদুর মুছে,
　　　হাতের নোয়া ঘুচে,
তোমার দেশের বাল-বিধবার সংখ্যা উঠে বেড়ে !
মেয়ে যদি বাঁচাতে চাও, আজই নে'যাও কেড়ে,—
　নীচেয় আমার দাঁড়িয়ে আছে গাড়ী,
　সেরে উঠ্‌লে পাঠিয়ো না আর এমন জামাই-বাড়ী !"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুধু ভাব্‌তে লাগ্‌লেম আমি,
　এ দেশে তো মেয়েরা কেউ ত্যাগ ক'রে না স্বামী !
　হিঁদুর ঘরে জ'ন্মে তারা সতী হ'তেই বাধ্য,
　পতি যাদের দেবতা, তাদের ত্যাগ করা কি সাধ্য ?
　　　তারা সবাই জন্মাবধি 'মার্কামারা'সতী,
　পতি তাদের পরম গুরু—পরকালের গতি !
পুরুষ বটে পারে হেথায় ইচ্ছে-মাত্রই ত্যাগ ক'রতে স্ত্রী,
　স্বামী কিন্তু হ'লেও পাগল, কুষ্ঠ রোগে দুষ্ট-হতশ্রী,
　　　নারীর বেলা কড়া নিষেধ !
　　　শ্রুতি স্মৃতি সংহিতা বেদ
　পুরাণ পুঁথি চোখ রাঙিয়ে বল্‌ছে হেঁকে সবাই,
　　　নাই গো তোমার কোনও উপায় নাই ;
　　　হোক্ সে দারুণ দুশ্চরিত্র,
　　　　মদ্যপায়ী অপবিত্র,
পশুর অধম হোক্ না সে হীন, ব্যভিচারেও দুষ্ট,
　তার সঙ্গেই থাক্‌তে হ'বে পরম পরিতুষ্ট !
অত্যাচারের মাত্রাটা তার যতই চলুক বাড়্‌তে,
গলায় যখন মালা দিয়েছো, পার্ব্বে না আর ছাড়্‌তে !
　　　হায় অভাগী মেয়ে,
　ফেটে যাচ্ছে বুকখানা আজ তোর পানে মা চেয়ে !
তীর্থ তোদের স্বামীর ভিটে—স্বর্গ শ্বশুর-বাড়ী—!
　তোদের শাস্ত্রে নেই যে মাগো 'তালাক্' 'ছাড়াছাড়ি !'

টেনে হিঁচড়ে, মুখ দিয়ে নাক দিয়ে বের করতে হয়। ইহার প্রলাপ বা অপলাপ সাধু সমাজের অন্তরালে, সমজদারের দৃষ্টির বাহিরে, আড্ডায়, স্থান বিশেষে, অথবা নিভৃত গৃহ-কোণে। ইহাই—সংগীত—ছেঁদো গলার কাঁদা-হাসি।

৫। বউ-বাজার।

অবরোধ-প্রথার অবলম্বী হ'লেও আমাদের হিন্দু-সমাজ বরাবরই 'লিবারল্', কাজেই 'কন্‌সেসনের' মাত্রা ক্রমশঃই বেড়ে চলছে। বাদ্‌শা আমলের 'রূপের-হাট' "নওরোজ-বাজার" এখন অনেক স্থানেই "বউ-বাজারে" রূপান্তরিত। দিনের আলোয় একপক্ষ উদর-চিন্তায় যে যে-দিকে হয় বেরিয়ে পড়েন, অন্য পক্ষও অমনি বাটে-মাঠে হাট জমায়েত ক'রে 'কন্‌ফারেন্স' সুরু করে দেন—আজ হোলি, কাল গালি, পরশু ভোট, তারপর ঘোঁট।

গোধূলির আভাসে অন্যান্য প্রাণীরা স্ব-স্ব আবাসে ফিরে আসে, প্রথম পক্ষও তেমনি,—আর অপর পক্ষ তার কিঞ্চিৎ আগে এসেই একেবারে অসূর্য্যম্পশ্যা। একটু পরেই আবার সাজ-গোজ, তারপরে হাত ধরে ছড়ি ঘুরিয়ে কুকুর সঙ্গে রাজপথে একটু মুক্ত বায়ু-সেবন, ও চর্ম্ম-পাদুকায় অনভ্যস্ত কিন্তু তারই পীড়নে পীড়িত স-কষ্ট হাস্যাত্মক পদক্ষেপ।—তবুও এসব চাই, এ যে উন্নতির যুগে বউ-বাজারের মডেল—"ষ্টিমার ও—" বোটের অপূর্ব্ব সমন্বয়।

স্বাগত

[শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

স্বাগত শরত বিগত বরষা।
বিমলা রজনী হৃদয় হরষা।
বিশদ প্রকৃতি-হাসি,
মেঘমালা যায় ভাসি,
দগধা ধরণী শ্যামলা সরসা।
স্বাগত শরত বিগত বরষা।
গাইছে পঞ্চমে পাখী
বিরহী মুদিল আঁখি
মৃদুল সমীর বহিছে সহসা
পরাণ আকুল পারা
বিপুল পুলক ভরা,
চলিয়া গিয়াছে হৃদয়-তমসা।
স্বাগত শরত বিগত বরষা।
মায়ের মন্দির আজ
সুষমা মোহন সাজ
স্বাগত জননী···মোদের ভরসা।

উঃ

বরেন্দ্র-স্মৃতি

[কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ]

ক্রূর-হিংসা-বিষ-ভরা স্বার্থের সংসারে,
এসেছিলা লয়ে তুমি স্বর্গের সান্ত্বনা;
চির মমতার স্নিগ্ধ অমৃত আসারে,
কত তপ্ত হৃদয়ের জুড়ালে যাতনা।
নহে এ কবিতা মম করিতে রোদন,
তরুণ ঝঙ্কার নহে করুণ গাথায়;—
ছিন্ন বক্ষে উচ্ছ্বসিত রক্ত-প্রস্রবণ,
তোমারি কারণে বন্ধু, অজস্র ধারায়।
নহে এ মর্ম্মের গীতি বারিতে বেদনা,
ভুলিতে বিয়োগ-ব্যথা নির্ম্মম ভীষণ;
শুভ্র শুকতারা সম হেরিতে বাসনা,
তোমার স্মৃতির দীপে উজ্জ্বল কিরণ!
বিচিত্র রহস্যময় সে মহানির্ব্বাণে,
নিগূঢ় নিয়তি-লীলা বিধির লিখন।

ল্যাজ ও ল্যাজুড়

[শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন]

ল্যাজ বিধাতার হাতের কারিগরির এক আশ্চর্য্য নমুনা। ওটি যে শুধুই পশুপাখীদের অঙ্গশোভা, তা নয়; তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির, অঙ্গমার্জ্জনের এবং মনোভাব-প্রকাশের প্রধান উপকরণ। ঐ ল্যাজের বৈচিত্র্যেই সিংহ পশুরাজ,

ব্যাঘাচার্য্য

(শিকার ধরবার সময় ল্যাজের ডগাটি এধার-ওধার করে)

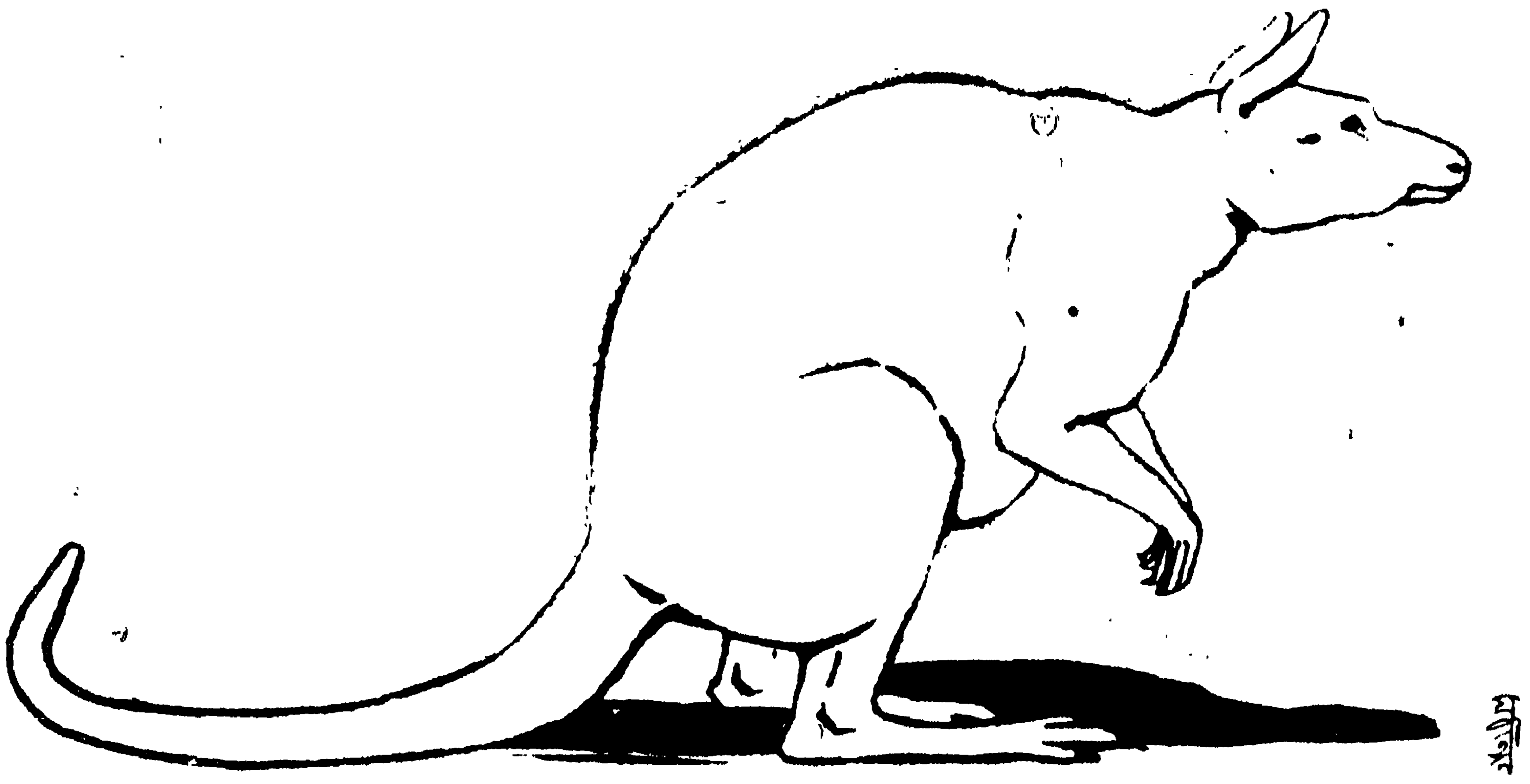

ক্যাঙারু

(ইনি ল্যাজের জোরেই চলেন)

ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রাচার্য্য, বেড়াল-বেড়ালী বাঘের মেসো এবং মাসী, শেয়াল পণ্ডিতধূর্ত্ত, আর পক্ষিকুলে কাক চতুর-চূড়ামণি।

বীরত্ব প্রকাশ করবার সময় মানুষ যেমন তর্জ্জনী তাড়না করে, এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে, কুকুর-বেড়াল-প্রভৃতি পশুরাও তেমনি লাঙুল বা ল্যাজ আস্ফালন করে অর্থাৎ আছড়ায়। আবার ভয় পেলে মানুষ গুটোয় হাত-পা, পশু গুটোয় ল্যাজ। অবশ্য মানুষের ল্যাজ থাকলে, সেও তাই-ই গুটোত; নেই বলেই তাকে অপর অঙ্গের শরণ নিতে হয়। কেননা,—মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—এটা হচ্ছে শাস্ত্রীয় বিধি।

আরও বিশেষ-বিশেষ কাজে ল্যাজ কিরূপ গুরুতর সহায়, ভেবে দেখা উচিত। বেড়াল বাচ্ছাকালে আপনার ল্যাজ

নিয়ে শিকার-শিকার খেলা করে, ভবিষ্যতে শিকারী হবে ব'লে; আর বুড়ো হ'লে ল্যাজ গুটিয়ে উনানের ধারে বসে তপস্যা করে, মোক্ষ লাভের আশায়। কুকুর ল্যাজে-মাথায় এক ক'রে কুণ্ডলী পাকায়, আয়েসের সাগরে সাঁতার কাটবার উদ্দেশ্যে; গবাদি পশু ল্যাজ ঝাড়ে, মশা-মাছি তাড়াবার জন্যে; ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করে, আনন্দে নৃত্য করবার ইচ্ছায়; আর কুকুর ল্যাজ নাড়ে প্রভুর ঘাড়ে 'আরোহণ করবার সাধু অভিপ্রায়ে। সুতরাং ল্যাজ যে ওদের মনোভাব জানবারও দর্পণস্বরূপ, তার সন্দেহ নাই।

এইবার ক্যাঙারুর ল্যাজের কথা চিন্তা করুন। দেখুন, অন্ধের নড়ির সঙ্গে ওর কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! ওরই ওপর ভর করে সে হন্‌-হন্‌ করে ছুটে চলে, ঘোরে-ফেরে, আবার স্থির হয়ে বসে, কাৎ হয়ে শোয়।

কোনো-কোনো জানোয়ারের ল্যাজে অমৃত আছে কিনা, ঠিক জানা নেই; তবে বিষ যে আছে, তা প্রত্যক্ষ। কাঁকড়া-বিছের ল্যাজ, ভিমরুলের ল্যাজ এবং কোনো-কোনো সাপের ল্যাজ এর অতি ভীষণ জ্বালাময় জ্বলন্ত সাক্ষী।

আবার শোনা যায়, আমেরিকার জঙ্গলে একপ্রকার সাপের ল্যাজে ঘণ্টা বাজে। ঘণ্টাকর্ণের ইতিহাস অবশ্য পুরাণ-প্রসিদ্ধ; ওরা কেন যে ঘণ্টাকর্ণের অবতার না হয়ে ঘণ্টালাঙ্গুল হ'ল, সে এক বিষম সমস্যা। বৈজ্ঞানিকরা ওদের সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, ওর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কোনো নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, অনুমান করা যায়।

ব্যাঙের ল্যাজ নেই, কিন্তু ব্যাঙাচির আছে। বর্ষাকালে ব্যাঙেরা খালবিলের ধারে দল বেঁধে কাঁদতে বসে কেন জানেন?—ঐ ল্যাজের বিরহে। কেউ কেউ বলেন, তারা কাঁদে না—গান গায়। ও-কথা সর্ব্বৈব মিথ্যে—অত দুঃখে কেউ কখনো গান গাইতে পারে?

টিক্‌টিকির কিন্তু ল্যাজুড়-বিরহ নেই, কেন না তার ল্যাজুড় খসে গেলেই গজায়। যতবার খসে ততবার গজায়। দশাননের মাথারও ঠিক অমনিধারা গজাবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তাঁর মাথার সঙ্গে টিকটিকির ল্যাজের খুব নিকট সম্বন্ধ থাকা সম্ভব।

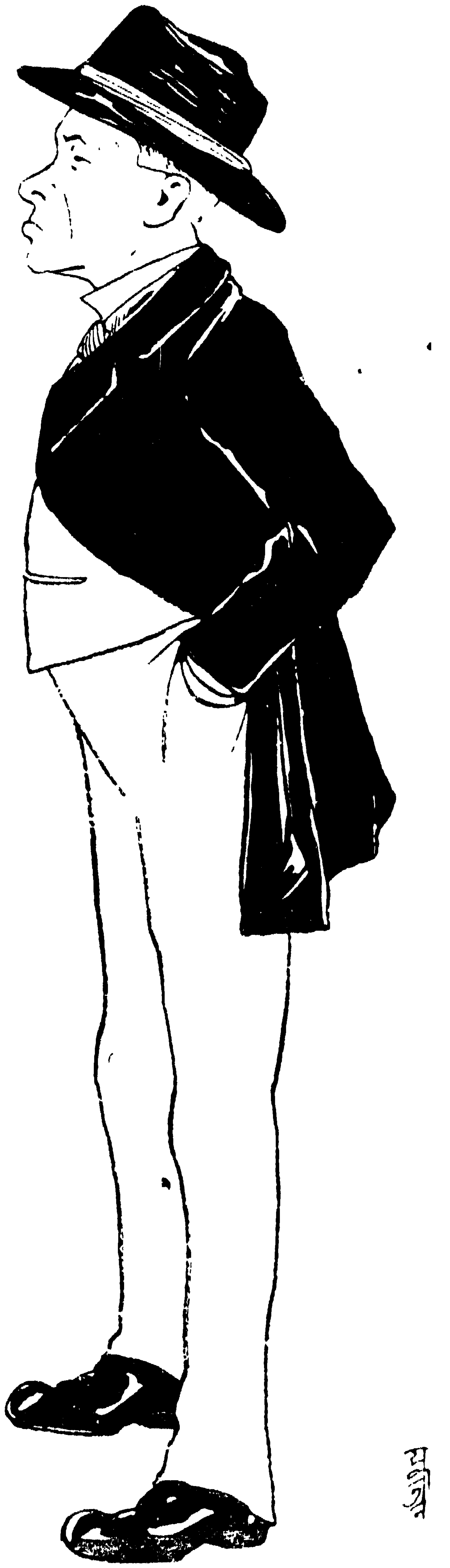

Dr. N. C. Dassero L M.D.S. (America)

তারপর, ল্যাজ যে অঙ্গের শোভা, তা বুঝাবার জন্য আমাদের বেশী মাথা ঘামাবার দরকার নেই। Bird of Paradise আমরা স্বচক্ষে না দেখে থাকলেও তার ছবি আমরা সবাই দেখেছি; ময়ূরের পেখম ধরা দেখা গেছে, আর

দেখা গেছে ঘোটকীর ল্যাজ। শুনা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঘোটকী-বিশেষের পুচ্ছ, অর্থাৎ ল্যাজের শোভা দেখেই 'ক্ষুধিত পাষাণে' অশরীর কেশদামের কল্পনা করেছিলেন; নইলে ও-বস্তু তাঁরও স্বচক্ষে দেখে আসার সম্ভাবনা অল্প।

এইবার বানরের ল্যাজের বিষয় আলোচ্য। বানরের ল্যাজের সঙ্গে-সঙ্গেই অবশ্য হনুমান, বনমানুষ এবং রাক্ষস-খোক্ষসের কথা মনে হয়। বানর-কুলতিলক হনুমান যে সীতা-উদ্ধারের প্রধান সহায় হতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁর ঐ অভ্রভেদী ল্যাজ। ল্যাজের বলেই তিনি সাগর ডিঙ্গিয়ে রাক্ষসরাজকে সর্ষপ-পুষ্প দেখিয়ে, লঙ্কা দগ্ধ করেছিলেন। লঙ্কাদগ্ধের সময় তাঁর ল্যাজের বহর কিরূপ হয়েছিল, শ্রবণ করুন,—

"কুপিত হইলা বীর পবননন্দন।
বাড়াইয়া দিলা ল্যাজ পঞ্চাশ যোজন।"

পঞ্চাশ যোজন যে ব্যাপারখানা কি, তা আপনারা খড়ি পেতে আঁক না কসলে, ঠিক বুঝতে পারবেন না। তারপর ঐ ল্যাজে ত্রিশ মণ ওজনের কাপড় জড়িয়ে, ঘি ঢেলে আগুন দেওয়া হয়,—

"মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন ল্যাজে অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়ে পড়ে বীর বড়ঘরের চালে ॥"

ল্যাজের বলেই যুবরাজ অঙ্গদ রাজ-সভায় ঢুকে দশাননের সিংহাসনের সমান উঁচু কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে, তারই দশ গালে চূণ আর দশ গালে কালি মাখিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যুবরাজের ল্যাজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এখানে তার একটু বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক;—

"কুণ্ডলী করিয়া ল্যাজ বসিল সভাতে।
পুরন্দর বায় যেন দিল ঐরাবতে ॥
সুমেরুপর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ।
রাক্ষসেরা—বলে বাপ!—এটা এল কেহ ॥"

পশ্বাদির ল্যাজের মহিমা শুনে এবং কতক-কতক দেখে আপনাদের দুঃখিত বা ঈর্ষান্বিত হবার কারণ নেই; কেন না, পণ্ডিতরাজ দারবীণ বলে গেছেন, ওটা আমাদেরও এককালে ছিল, এবং এখনও যে একেবারে নেই, তা নয়; আছে,—কিঞ্চিৎ হ্রস্ব হয়ে। এবং তাঁরই হেতুবাদ নিয়ে চোখ বুজে ভেবে দেখলে, এটাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাবে যে, দেবতাদেরও ঐ অত্যাবশ্যক বস্তুটি সশরীরে বর্ত্তমান।

কিন্তু আমরা হতভাগ্য মানুষেরা হ্রস্ব ল্যাজ নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট নই। তাই নানা রকম বস্তু ও অবস্তুকে ল্যাজ কল্পনা করে মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে থাকি। তার মধ্যে খেতাব হচ্ছে একটি। এটি অবস্তু, সুতরাং

R. D. Bosa K. C. E.

নিরাকার; কিন্তু প্রকারে বিচিত্র; যেমন—সরকারী-বে-সরকারী, স্বদেশী-বিদেশী, কেনা, দানে পাওয়া, প'ড়ে পাওয়া, চুরি করা, গজিয়ে নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে সরকারী খেতাব যাঁদের আছে, তাঁরা আছেন কেমন, তাঁদের হাল কি, চাল কিরূপ; এবং যাঁরা তা পাবার

ব্রাদার তমসুকভূষণ জোয়াদ্দার F. T. S.

প্রয়াসী, তাঁদেরই বা কর্ত্তব্য কিম্বিধ, তা আপনারা অনেকেই জানেন; আর মহাজনেরাও গদ্যে-পদ্যে সবিস্তারে তা লিখে গেছেন, সুতরাং ও-বিষয়ে আর আমার নূতন কিছু বলতে যাওয়া নিতান্তই বাহুল্য। তবে কথাটা যখন তোলা গিয়েছে, তখন এই সরকারী ল্যাজুড় সম্বন্ধে দুই-একটা দৃষ্টান্ত না দিলে বিবরণটী যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব আপনারা অবহিত হ'ন, আমি ল্যাজুড়-মাহাত্ম্যের দুই-একটা নমুনা দিই।

শুনেছি, এবং সত্য ব'লেও বিশ্বাস করি যে, এক মহাত্মা একটা ল্যাজুড়, যে উপায়েই হোক, লাভ করেছিলেন;

তাঁকে না কি একজন চিঠি লিখিবার সময়, ভ্রমক্রমে—ইচ্ছা করে নিশ্চয়ই নয়,—সেই ল্যাজুড়ের উল্লেখ করেন নি। এই মহা অপরাধে ল্যাজুড়ধারী মহোদয় ভদ্রলোকের চিঠিখানি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; খামের উপর লিখে দিয়েছিলেন—Refused, insufficiently addressed।

আবার, আর এক যায়গায়, বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি যে, কোন রায়-বাহাদুরণী, যাদের উক্ত বা উহা হইতে দীর্ঘতর ল্যাজুড় নেই, তাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে যেতেন না, পাছে ল্যাজুড়ের সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

আর ছিল, স্বরচিত একটা ল্যাজুড়; সেটা হচ্চে এফ্-এ-এফ্। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটার মানে ত বুঝতে পারছি নে?' লাঙ্গুলধারী সগর্ব্বে বল্লেন, 'ওটার অর্থ হচ্চে, এফ-এ পরীক্ষায় ফেল।' সাহেব সদরে গিয়ে সেইবারই তাঁর লাঙ্গুল দীর্ঘতর করে দিয়েছিলেন।

মানুষের এই সব ল্যাজুড় বইবার জন্য বাহন আছে; তাদের নাম সাধু ভাষায় 'সহকারী,' আমাদের চল্তি ভাষায় 'মোসায়েব'। তারা যখন-তখন ল্যাজুড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; কেহ ল্যাজুড়ের উল্লেখ না করে সম্বোধন

শ্রীমৎ চতুরানন্দ স্বামী

আমাদেরই একজন পূজনীয় প্রতিবেশী ছিলেন। সাধনা-বলে তাঁর একটা ল্যাজুড় লাভ হয়েছিল। একবার এক নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর গ্রামে পদার্পণ করেন। প্রতিবেশী মহোদয় দেখা করতে গেলে সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কে?" তিনি তখন নিজ মুখে নিজের ল্যাজুড়ের পরিচয় না দিয়ে পকেট থেকে এক কার্ড বের করে সাহেবের হাতে দেন। সে কার্ডে সরকারী ল্যাজুড়ের উল্লেখ ত ছিলই,

করলে তখনই সংশোধন করে দেয়। এর জন্য তারা নাকি কিছু-কিছু পেয়েও থাকে।

অন্য যে সব ল্যাজুড়ের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, তাদের মনোহারিত্বও কম নয়, সুতরাং তার গুণগান আমি একটু বিস্তৃত ভাবে করবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

এই শ্রেণীর ল্যাজকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়।—(১) শাস্ত্রীয়, (২) অশাস্ত্রীয় বা ইঙ্গ-বঙ্গীয়।

মিঞা বাবুল হুসেন, মালিক-ই-ফটক

শাস্ত্রীয় ল্যাজুড়, যথা,—'জ্ঞানারণ্য-বরেণ্য-শার্দ্দূল', 'জন-গণ-মন-ধনাধি-নায়ক', 'চিত্রকলার্ণব-রস-সিন্ধুঘোটক', 'কাব্য-কোকনদ-বনবিহারী-মধুপানোন্মত্ত মধুপ' ইত্যাদি।

ইঙ্গ-বঙ্গীয়, যথা—'Expert', 'L. M.', 'D. S.' 'P. M. C.' 'M. H. F. C.' প্রভৃতি।

উদাহরণ-মালা

একটি সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলের বইয়ে তার সল্যাজুড় নাম দেখা গেল, শ্রীকানাইলাল দত্ত P. M. C. 'P. M. C'র

শ্রীপদ্মরাগকান্তি তলাপাত্র—P. R. K. Tallaptra Esq : A. E., M. E., (Gr. Bt.)—(Automobile Engineer and Motor Expert ; Great Britain.)

শ্রীরামধন বোস—R. D. Bosa, K. C. B. (কেল্‌নার কোম্পানীর বাবু)।

রায়সাহেব রামসত্য তালুকদার, C. C. (Confidential Clerk.)

ক্ষীণেশচন্দ্র পাকড়াশী—B. C., (Bank Clerk).

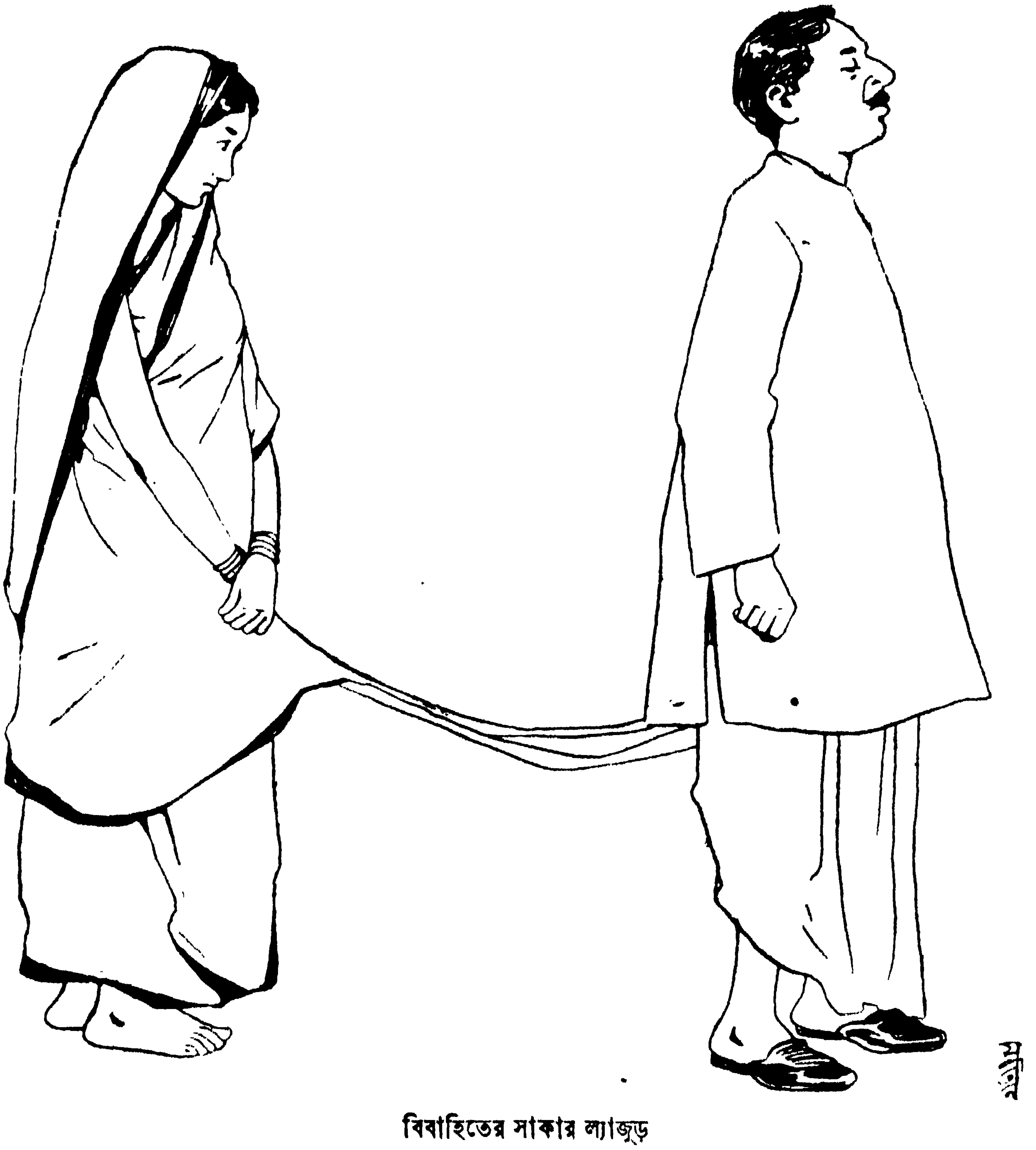

বিবাহিতের সাকার ল্যাজুড়

মানে, Pre-Matriculation class, অর্থাৎ কি না ছেলেটির তখনো Matric class হয় নি।

ক্রমে সাবালকদের দিকে আসুন।

শ্রীনকুড়চন্দ্র দাস। এঁর নাম ল্যাজুড়-সমেত, Dr. N. C. Dassero. L. M. D. S. (America) অর্থাৎ Licenciate in Medicine, Doctor of Surgery.

ব্রাদার তমসুকভূষণ জোয়াদ্দার, F. T. S., (Boston Mass)—(Fellow of the Theosophical Society)

শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর্ম্মকার—ইনি নাম বদ্‌লে ল্যাজুড় লাগিয়ে হয়েচেন—শ্রীমৎ চতুরানন্দ স্বামী।

মিঞা বাবুল হুসেন—মালিক—ই—ফটক্। ইনি একটি কারখানার দ্বাররক্ষী।

এইরূপ ল্যাজুড়ের আদি-অন্ত নেই—কত আর বলবো? ল্যাজযুক্ত প্রাণীরা ল্যাজের সাহায্যে যা-যা করে, ল্যাজুড়ওয়ালা জীবেরাও ল্যাজুড়ের সাহায্যে তাই তাই করে থাকে। এটি তাদের মনোভাব প্রকাশ করবার প্রধান সহায়।

নিরাকার ল্যাজের পরিচয় আপনারা পূর্ব্বেই পেয়েছেন, এইবার মানুষের সাকার ল্যাজুড়েরও একটু পরিচয় নিন, না হলে পরিচয়টা সম্পূর্ণ হবে না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বিবাহিত লোকেদের বরাতেই এটি জোটে। প্রকাশ করে বলতে হবে কি, দ্রব্যটি—পত্নী? বিবাহিত লোকের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, মনোভাব আরও বিশেষ বিশেষ চিত্তবৃত্তির বিকাশ—সবের মূলেই এই ল্যাজুড়! ক্যাঙারুর ল্যাজের মতন এটি যে ভর্ত্তাদের একটি বলবান অঙ্গ, তা প্রকাশ করে বলাই বাহুল্য।

এইখানেই পালা শেষ করতে চাই; কারণ স্থানাভাব, এবং নিরীহ পাঠকদেরও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। তবে আমার পক্ষে ভরসার কথা এই যে,—

লাঙ্গল-মঙ্গল কথা অমৃত সমান।
যারা যারা শোনে তারা সবে পুণ্যবান্॥

দেনা-পাওনা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(১৮)

অলকা?

বলুন।

তোমার এখানে তামাক-টামাকের ব্যবস্থা নেই বুঝি?

ষোড়শী একবার মুখ তুলিয়াই আবার অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল। জবাব না পাইয়া জীবানন্দ সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, ব্রজেশ্বরের কপাল ভাল ছিল। দেবী-রাণী তাকে ধরে আনিয়েছিল সত্যি, কিন্তু অম্বুরি তামাক খাইয়েছিল এবং ভোজনান্তে দক্ষিণা দিয়েছিল। বিদায়ের পালাটা আর তুল্‌ব না, বলি, বঙ্কিম-বাবুর বইখানা পড়েচ ত?

ষোড়শী স্থির করিয়াছিল এই পাষণ্ড আজ তাহাকে যত অপমানই করুক সে নিরুত্তরে সহ্য করিবে, কিন্তু জীবানন্দের কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটায় হঠাৎ কেমন যেন তাহার সঙ্কল্প ভাঙিয়া দিল; বলিয়া ফেলিল, আপনাকে ধরে আন্‌লে সেই মত ব্যবস্থাও থাক্‌ত,—অনুযোগ করতে হোতো না।

জীবানন্দ হাসিল, কহিল, তা' বটে। টানা হেঁচ্‌ড়া দড়ি-দড়ার বাঁধাবাঁধিই মানুষের নজরে পড়ে। ভোজপুরী পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে আনাটাই পাড়াশুদ্ধ সকলে দেখে; কিন্তু যে পেয়াদাটিকে চোখে দেখা যায় না,—হাঁ, অলকা তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে কি বলে? অতনু, না? বেশ তিনি।

ষোড়শী আরক্ত অধোমুখে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। জীবানন্দ কহিল, যৎসামান্য অনুরোধ ছিল, কিন্তু আজ উঠি। তোমার অনুচরগুলো সন্ধান পেলে ঠিক জামাই-আদর করবে না, এমন কি, শ্বশুর-বাড়ী এসেচি বলে হয় ত বিশ্বাস করতেই চাইবে না,—ভাব্‌বে প্রাণের দায়ে বুঝি মিথ্যেই বল্‌চি।

ষোড়শী কোন কথাই কহিল না; এই কদর্য্য পরিহাসে, অন্তরে সে যে কিরূপ লজ্জা বোধ করিল মুখ তুলিয়া তাহা জানিতেও দিল না।

জবাব না পাইয়া জীবানন্দ মুহূর্ত্ত কয়েক তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, অম্বুরি তামাকের ধুঁয়া আপাততঃ পেটে না গেলেও চল্‌ত; কিন্তু ধুঁয়া নয় এমন কিছু একটা পেটে না গেলে আর ত দাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক, নেই কিছু অলকা?

ষোড়শী চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু, তাহার নাম ধরিয়া শেষ প্রশ্নটা তাহাকে মৌন থাকিতে দিল না, মুখ তুলিয়া বলিল, কিছু কি? মদ?

জীবানন্দ হাসিয়া মাথা নাড়িল। কহিল, এবারে ভুল

হল। ওর জন্যে অন্য লোক আছে, কিন্তু সে তুমি নয়। তোমার কাছে যদি চাহিতে হয় ত, চাই এমন কিছু যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, মরণের দিকে ঠেলে দেয় না। ডাল-ভাত, মেঠাই-মণ্ডা, চিড়ে-মুড়ি যা'হোক দাও, আমি খেয়ে বাঁচি। নেই?

ষোড়শী স্থির চক্ষে চাহিয়া রহিল, জীবানন্দ বলিতে লাগিল, সকালে আজ মন ভাল ছিল না। শরীরের কথা তোলা বিড়ম্বনা, কারণ, সুস্থ দেহ যে কি, আমি জানিনে। সকালে হঠাৎ নদীর তীরে বেরিয়ে পড়লাম,—ধারে ধারে কতদূর যে হাঁটলাম বলতে পারিনে,—ফিরতে ইচ্ছেই হ'ল না। সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, একলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যে ভাল লাগ্‌ল বলতে পারিনে। তোমাকে মনে পড়ল। ফের্‌বার পথে, তাই বোধ হয় আর বাড়ী গেলুম না, খিদে-তেষ্টা নিয়েই এসে দাঁড়ালাম ওই মনসা গাছটার পেছনে। দেখি তোমার দোর খোলা, আলো জ্বল্‌চে। পিস্তল ছাড়া আমি এক পা বাড়াইনে,—ওটা পকেটেই ছিল, তবুও গা ছম্-ছম্ করতে লাগ্‌ল। জানি ত,—বাবাজীবনরা আড়ালে আবডালে কোথাও আছেন নিশ্চয়। হঠাৎ, পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি মেঝের ওপর তুমি চুপ্ করে বসে। আপনাকে আর সামলাতে পারলাম না। বাস্তবিক, নেই কিছু?

ষোড়শী এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু বাড়ী গিয়ে ত অনায়াসে খেতে পারবেন।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ, আমার বাড়ীর খবর আমার চেয়ে তুমি বেশী জানো। এই বলিয়া সে একটু হাসিল। কিন্তু হাসি তাহার না মিলাইতেই ষোড়শী সহসা বলিয়া উঠিল, আপনি সারাদিন খান্‌নি, আর বাড়ীতে আপনার খাবার ব্যবস্থা নেই এ কি কখনো হতে পারে?

একজনের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার আভাস গোপন রহিল না, কিন্তু আর একজন নিতান্ত ভালমানুষটির মত শান্ত ভাবে বলিল, পারে বই কি। আমি খাইনি বলে আর একজন উপোস করে থালা সাজিয়ে পথ চেয়ে বসে থাক্‌বে, এ ব্যবস্থা ত করে রাখিনি। আজ খামকা রাগ করলে চল্‌বে কেন অলকা! বলিয়া সে তেম্‌নি একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, আজ আসি। কিন্তু সত্যিসত্যিই থাক্‌তে না পেরে যদি আর কোনদিন এসে পড়ি, ত রাগ করতে পাবে না বলে যাচ্ছি।

এই লোকটির একান্ত বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রার যে চেহারা একদিন ষোড়শী নিজের চোখে দেখিয়াছিল তাহা মনে হইল। মনে হইল কদাচারী, মদোন্মত্ত, নিষ্ঠুর মানুষ এ নয়; যে জমিদার মিথ্যা দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে আর কেহ। একবার দ্বিধা করিল, কিন্তু তাহার পরেই অস্ফুটে কহিল, দেবীর প্রসাদ সামান্য কিছু আছে, কিন্তু সে কি আপনি খেতে পারবেন?

পারব না? তাই বল! এই বলিয়া সে আসনে ফিরিয়া গিয়া চাপিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, প্রসাদ খেতে পারব না? শীগ্‌গীর নিয়ে এসো, ঠাকুর-দেবতার প্রতি আমার কিরূপ অচলা ভক্তি একবার দেখিয়ে দিই।

তাহার সুমুখের স্থানটুকু ষোড়শী জল-হাত দিয়া মুছিয়া লইল, এবং, রান্নাঘরে গিয়া শালপাতায় করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ যাহা কিছু ছিল, বহিয়া আনিয়া জীবানন্দর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, দেখুন যদি খেতে পারেন।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে দেখ্‌তে হবে না, কিন্তু এ তো তোমার?

ষোড়শী কহিল, অর্থাৎ আপনার জন্যে এনে রেখেছিলাম কি না, তাই জিজ্ঞেসা কর্‌চেন?

জীবানন্দ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না গো না, তা জিজ্ঞেসা করিনি, আমি জিজ্ঞেসা করচি, আর নেই তো?

ষোড়শী কহিল, না।

তা হলে এ যে পরের মুখের গ্রাস একরকম কেড়ে খাওয়া অলকা?

ষোড়শী কহিল, পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খেলে কি আপনার হজম হয় না?

এ কথার উত্তর জীবানন্দ আর হাসিমুখে দিতে পারিল না। কহিল, কি জানি। নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না অলকা। কিন্তু, সে যাক্, তুমি খাবে কি? বরঞ্চ, অর্দ্ধেকটা রেখে দাও।

ষোড়শী কহিল, তাতে আমারও হবে না, আপনারও পেট ভরবে না।

জীবানন্দ জিদ্ করিয়া কহিল, না ভরুক, কিন্তু তোমাকে ত সারারাত্রি অনাহারে থাক্‌তে হবে না।

আজ খাবার কথা ষোড়শীর মনেও ছিল না,—জীবানন্দ না আসিলে ও-সকল পড়িয়াই থাকিত, সে হয়ত স্পর্শও করিত না। কিন্তু সে কথা না বলিয়া কহিল, ভৈরবীদের অনাহার অভ্যাস করতে হয়। তা'ছাড়া, আমার একটা রাত্রির কষ্টের ভাবনা ভেবে আপনি কষ্ট নাই পেলেন। বরঞ্চ, মিথ্যে দেরি না করে বসে যান্; ঠাকুর দেবতার প্রসাদের প্রতি অচলা ভক্তির সাফাই প্রমাণ দিন্।

তা' দিচ্চি, কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করচি জেনে সে উৎসাহ আর নেই—

বেশ, কম উৎসাহ নিয়েই সুরু করুন—এই বলিয়া ষোড়শী একটু হাসিয়া কহিল, আমাকে বঞ্চনা করায় নতুন অপরাধ আর আপনার হবে না। কিন্তু, ঐ যা নিয়ে তর্ক চালিয়েচেন তাতে আমারি লজ্জা করচে। এবার থামুন।

জীবানন্দ আর কথা না কহিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। মিনিট দুই পরে হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, প্রায় পোনর বছর হল, না? আজ একটা বড় লোক হতে পারতাম।

ষোড়শী নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। প্রায় বছর পোনর পূর্ব্বের ইঙ্গিতটা সে বুঝিল, কিন্তু শেষের কথাটা বুঝিল না।

জীবানন্দ কহিতে লাগিল, আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে মদের কথাটাই ধরি। মরতে বসেচি,—সে তো নিজের চোখেই দেখে এসেচ,—কিন্তু, এমন একটি শক্ত লোক কেউ নেই যে আমাকে মুক্ত করে দেয়। হয়ত, আজও সময় আছে, হয়ত, এখনো বাঁচ্‌তে পারি,—নেবে আমার ভার অচলা?

ষোড়শী অন্তরে কাঁপিয়া উঠিয়া চোখ বুজিল। সেখানে হৈম, তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার দাসদাসী, তাহার সংসারযাত্রার অসংখ্য বিচিত্র ছবি ছায়াবাজির মত খেলিয়া গেল।

জীবানন্দ কহিল, আমার সমস্ত ভার তুমি নাও অচলা—

আত্মসমর্পণের এই আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর ষোড়শীকে চমকিয়া দিল। এ জীবনে এমন করিয়া কেহ তাহাকে ডাকে নাই; ইহা একেবারে নূতন; কিন্তু ভৈরবী জীবনের সংযমের কঠোরতা তাহাকে আত্মবিস্মৃত হইতে দিল না। সে এক মুহূর্ত্ত থামিয়া কহিল, অর্থাৎ আমার যে কলঙ্কের বিচার করেছেন, আমাকে দিয়ে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়ে নিতে চান্। আমার মা'কে ঠকাতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে পারবেন না।

কিন্তু সে চেষ্টা ত আমি করিনি। না জেনে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেচি তা সত্যি। তোমার বিচার করেচি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কেবলি মনে হয়েছে এত বড় কঠিন মেয়ে মানুষটিকে অভিভূত করেচে, সে মানুষটি কে?

ষোড়শী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তারা আপনার কাছে তার নাম বলেনি?

জীবানন্দ কহিল, না। আমি বারবার জিজ্ঞাসা করেচি, তারা বারবার চুপ করে গেছে।

আপ্‌নি খান্, বলিয়া ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। দুই চারি গ্রাস আহারের পর জীবানন্দ মুখ তুলিয়া বলিল, আমি বেশী খেতে পারিনে—

বেশী খেতে আপনাকে বলিনে। সাধারণ লোকে যা' খায়, তাই খান্।

আমি তাও পারিনে। খাওয়া আমার শেষ হয়ে গেছে।

ষোড়শী কহিল, না, হয়নি। প্রসাদের ওপর অভক্তি দেখালে বাবাজীবনদের ডেকে দেব।

জীবানন্দ হাসিয়া বলিল, সে তুমি পারবে না। তোমার জোর আমি জানি। পুলিশের দল থেকে মায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবটি পর্য্যন্ত একদিন তার নমুনা জেনে গেছেন। তোমার মা যে একদিন আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে গেছেন এ অস্বীকার করার সাধ্য তোমার নেই।

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল, জীবানন্দ হাতমুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল, কহিল, আমি যখনি একলা থাকি, সে রাত্রের কথা মনে মনে আলোচনা করে কোথা দিয়ে যে সময় কাটে বল্‌তে পারিনে। বিশেষ করে চাকরদের ঘরে পাঠানোর ভয়ে তোমার সেই হাতজোড় করে কান্না! ভোলনি বোধ হয়?

ষোড়শী কহিল, না।

জীবানন্দ বলিল, তার পরে সেই শূল ব্যথা। একলা ঘরে তুমি আর আমি। শেষে তোমার কোলেই মাথা রেখে আমার রাত কাট্‌ল। তার পরের ঘটনাগুলো আর ভাব্‌তে ভাল লাগে না। তোমাকে ঘুষ দিতে যাবার কথা মনে হলে আমার পর্য্যন্ত যেন লজ্জায় গা' শিউরে ওঠে। এই সেদিন পুরীতে যখন মর-মর হোলাম, প্রফুল্ল বল্‌লে, দাদা, অলকাকে

একবার আনিয়ে নিন্। আমি বোল্লাম, সে আস্‌বে কেন? প্রফুল্ল বল্লে, গায়ের জোরে। আমি বোল্লাম, গায়ের জোরে ধরে এনে লাভ হবে কি? সে উত্তর দিলে, ঠাকরুণ একবার আসুন ত, তারপরে এর লাভ-লোকসানের হিসেব হবে। তাকে তুমি জানো না, কিন্তু এত বড় ভক্ত তোমার আর নেই।

এই ভক্ত লোকটির পরিচয় জানিতে ষোড়শীর কৌতূহল হইল, কিন্তু সে ইচ্ছা সে দমন করিয়া রাখিল।

জীবানন্দ কহিল, রাত অনেক হ'ল, তোমাকে আর বসিয়ে রাখ্‌তে পারিনে। এবার আমি যাই, কি বল?

ষোড়শী কহিল, আপনার কি একটা যে কাজের কথা ছিল?

কাজের কথা? কিন্তু বিশেষ কি কথা ছিল আমার আর মনে পড়চে না। এখন কেবল একটা কথাই মনে পড়্‌চে, তোমার সঙ্গে কথা কহাই আমার কাজ। বড্ড খোসামোদের মত শোনাল, না? কিন্তু এ রকম খোসামোদ করতেও যে পারি, এর আগে তাও জানতাম্ না। হাঁ অলকা, তোমার কি সত্যি আবার বিয়ে হয়েছিল?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া কহিল, আবার কি রকম? সত্যি বিয়ে আমার একবার মাত্রই হয়েছে।

জীবানন্দ বলিল, আর তোমার মা যে তোমাকে আমাকে দিয়েছিলেন সেটাই কি সত্যি নয়?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে কহিল, না, সে সত্যি নয়। মা আমার সঙ্গে যে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি তাই শুধু নিয়েছিলেন, আমাকে নেন্‌নি। ঠকানো ছাড়া তার মধ্যে লেশমাত্র সত্যও কোথাও ছিল না।

জীবানন্দ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কোন প্রকার উত্তর দিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। মিনিট পাঁচেক যখন এই ভাবে কাটিয়া গেল, তখন ষোড়শী মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং ম্লান দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিবার অবসরে চাহিয়া দেখিল সে যেন হঠাৎ ধ্যানে বসিয়া গেছে। এই ধ্যান ভাঙিতে তাহার দ্বিধা-বোধ হইল, কিন্তু ক্ষণেক পরে সে নিজেই যখন কথা কহিল, তখন মনে হইল কে যেন কতদূর হইতে কথা কহিতেছে।

অলকা, এ কথা তোমার সত্য নয়।

কোন্ কথা?

জীবানন্দ কহিল, তুমি যা জেনে রেখেচ। ভেবেছিলাম সে কাহিনী কখনো কাউকে বলব না, কিন্তু সেই কাউকের চেয়ে আজ তুমি বড়। তোমার মাকে ঠকিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে ঠকাবার সুযোগ ভগবান আমাকে দেন নি। আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে?

বলুন?

জীবানন্দ কহিল, আমি সত্যবাদী নই, কিন্তু আজকের কথা আমার তুমি বিশ্বাস কর। তোমার মাকে আমি জানতাম, তাঁর মেয়েকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করার মৎলব আমার ছিল না,—ছিল কেবল তাঁর টাকাটাই লক্ষ্য, কিন্তু সে রাত্রে হাতে হাতে তোমাকে যখন পেলাম, তখন না বলে ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছাও আর হোলো না।

তবে কি ইচ্ছে হোলো?

জীবানন্দ কহিল, থাক্, সে তুমি আর শুনতে চেয়ো না। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত শুনলে আপনিই বুঝ্‌বে, এবং সে বোঝায় ক্ষতি বই লাভ আমার হবে না, কিন্তু এরা তোমাকে যা বুঝিয়েছিল তা তাই নয়,—আমি তোমাকে ফেলে পালাই নি।

ষোড়শী এ ইঙ্গিত বুঝিল, এবং ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া কহিল, আপনার না-পালানোর ইতিবৃত্ত এখন ব্যক্ত করুন।

তাহার কঠোর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিল। কহিল, অলকা, আমি নির্ব্বোধ নই, যদি ব্যক্তই করি, তার সমস্ত ফলাফল জেনেই কোরব। তোমার মায়ের এত বড় ভয়ানক প্রস্তাবেও কেন রাজী হয়েছিলাম জানো? একজন স্ত্রীলোকের হার আমি চুরি করি; ভেবেছিলাম টাকা দিয়ে তাকে শান্ত কোরব। সে শান্ত হল, কিন্তু পুলিশের ওয়ারেণ্ট তাতে শান্ত হল না। ছ'মাস জেলে গেলাম,—সেই যে শেষরাত্রে বার হয়েছিলাম, আর ফেরবার অবকাশ পেলাম না।

ষোড়শী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পরে?

জীবানন্দ তেম্‌নি মৃদু হাসিয়া বলিল, তার পরেও মন্দ নয়। বাবুর নামে আরও একটা ওয়ারেণ্ট ছিল। মাস কয়েক পূর্ব্বে রেলগাড়ীতে একজন বন্ধু সহযাত্রীর ব্যাগ নিয়ে তিনি অন্তর্ধান হন। ফলে আরও দেড় বৎসর। এক্রমে এই বছর দুই নিরুদ্দেশের পর বীজগাঁয়ের ভাবী জমিদারবাবু

আবার যখন রঙ্গমঞ্চে পুনঃ প্রবেশ করলেন, তখন কোথায় বা অলকা, আর কোথায় বা তার মা!

জীবানন্দর আত্ম-কাহিনীর এক অধ্যায় শেষ হইল। তার পরে দুজনেই নিঃশব্দে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

রাত কত?

বোধ হয় আর বেশী বাকি নেই।

তা'হলে এ অন্ধকারে বাড়ী গিয়ে আর কাজ নেই।

কাজ নেই? তার মানে?

ষোড়শী কহিল, কম্বলটা পেতে দিই আপনি বিশ্রাম করুন।

জীবানন্দর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, কহিল, বিশ্রাম কোরব? এখানে?

ষোড়শী কহিল, ক্ষতি কি?

কিন্তু বড়লোক জমিদারের যে এখানে কষ্ট হবে অলকা?

ষোড়শী বলিল, হলেও থাকতে হবে। গরীবের দুঃখটা আজ একটুখানি জেনে যেতে হবে।

জীবানন্দ এক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিল। তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল; ইচ্ছা হইল বলে, আমি জানি সব, কিন্তু বুঝিবার মানুষটা যে মরিয়াছে। কিন্তু এ কথা না বলিয়া কহিল, যদি ঘুমিয়ে পড়ি অলকা?

অলকা শান্ত ভাবে জবাব দিল, সে সম্ভাবনা ত রইলই।

(ক্রমশঃ)

চরণামৃত

[শ্রীঅমূল্যধন ঘোষ]

সে একটা চৈত্রমাসের সকালবেলা। সারারাত্রি গরমে ভাল ঘুম হয় নাই। ভোরে উঠিয়া একটু ঠাণ্ডা বাতাসে বসিবার জন্য বাহিরে গিয়া দেখি সনাতনপুর গ্রামের রূপনাথ মণ্ডল বাহিরে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

রূপনাথ আমার বাল্য-বন্ধু ধীরেনের ভিটাবাড়ীর খোদগস্ত প্রজা। ধীরেনের বাড়ীতে কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে আমিই চিকিৎসা করিয়া থাকি এবং রূপনাথই বরাবর আমার কাছে ছুটোছুটি করিত।

সনাতনপুর আজ প্রায় পনের কুড়ি দিন যাবৎ কলেরায় উজাড় হইয়া যাইতেছিল। আমি ঘরে বসিয়া সে খবর রাখিতেছিলাম।

গরীবের দেশ,—ডাক্তার ডাকাইবার ক্ষমতা ত' অনেকেরই নাই। সহর হইতে গ্রামে ডাক্তার লইয়া যাওয়া এমনিই ত' শক্ত ব্যাপার; তাহার উপর আবার কলেরা রোগে কোনও ডাক্তারই ঘেঁসিতে চান না। ইহার উপর আরও এক অসুবিধা,—এতদূর হইতে ঔষধাদি লইয়া যাওয়া, সংবাদাদি দেওয়া-লওয়া করে কে? সকলে নিজের নিজের লইয়াই ব্যস্ত;—পয়সা দিলেও একটা লোক পাওয়া যায় না।

ধীরেন সে গ্রামের একজন ছোট-খাটো জমিদার। দশজন লোক তাহার বাধ্য। কিন্তু, এ সময়ে সেই এক রূপনাথ ছাড়া আর কাহাকেও সে আমার কাছে পাঠাইতে পারে নাই। সেও গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেছে,—শুধু মনিবের অনেককালের খাতিরে, যাইবার পথে তাহার এমন ভীষণ রোগটার সংবাদ আমায় দিতে আসিয়াছে।

বন্ধুর এত-বড় বিপদের কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিতে যাইবার জন্য আমার প্রাণটা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু, আমি যে তাহাকে চিকিৎসা করিতে যাইব, ঠিক এতটা আশা করিয়া সে খবর দেয় নাই;—তবে হয় ত তাহার মনে বাল্য-বন্ধুতার একটু দাবী ছিল।

সনাতনপুরের খবর আমি নিজে যদিও অনেকটা শুনিয়াছিলাম, তবুও রূপনাথের কাছে আরও জানিলাম। সেখানকার অধিকাংশ গৃহই খালি পড়িয়া আছে। গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইয়াছে;—কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে, কেহ বা আধমরা হইয়া পড়িয়া আছে। গোরু-বাছুর বিস্তর মরিয়াছে,—অনেকগুলি প্রতিপালক বিহনে পথে-পথেও চরিয়া বেড়াইতেছে।

গ্রামে ওলাউঠা দেখা দিতেই ধীরেন তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি ভিন্ন গ্রামে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া দিয়া আসিয়াছিল। নিজে বাড়ীতেই বাস করিতেছিল। তাহার কারণও ছিল। বাড়ীতে গোরু-বাছুর প্রভৃতি অবশ্য প্রতিপাল্য কয়েকটী জীব ও কয়েকটী কর্ত্তব্য ছিল। তন্মধ্যে প্রধান দুটি জীব,—একটি বিধবা ভগিনী ও অপরটি পাষাণমূর্ত্তি নারায়ণ। সকলকে ছাড়া যায়, কিন্তু ইহাদের দুটিকে ছাড়িয়া দিলে বেচারীরা নিরুপায়!

পৈতৃক ভিটায় তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো চাই, নারায়ণের নিত্য-সেবাও বন্ধ দেওয়া চলে না; আর যে সব গাভীর দুধ খাইয়া বাছারা মানুষ হইয়াছে, তাহাদেরও অসহায় অবস্থায় পথে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

সর্ব্বোপরি সেই বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী,—যে তাহার কৈশোরের প্রারম্ভেই কোন এক অভিশপ্ত স্বর্গচ্যুত দেবীর ন্যায় দাদার সংসারে আসিয়া, তাহার কোনও সুখে ভাগ না লইয়া, কেবল তাহার সকল বিপদ-আপদ দুঃখের সঙ্গে নিজের একান্ত নির্ভরতা-পরায়ণ জীবনকে একটা দুশ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া দিয়া, তাহার সকল দুরূহ কর্ত্তব্যের ভার স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছে; সেই অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণীর উপর সকল ভার চাপাইয়া এমন স্থানে একাকিনী রাখিয়া, নিজের প্রাণ লইয়া পলাইতে গেলে নিজের কর্ত্তব্যের বাঁধনে বড় নিষ্ঠুরভাবে টান পড়ে।

তাই ধীরেন ও তাহার ভগিনী, পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া গ্রামে রহিল। গ্রামের স্বল্পাবশিষ্ট লোক, সকলেই আসন্নমৃত্যুর বিভীষিকা মুখে বহন করিয়া, দিনের বেলায় যেন বায়ুচালিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু রাত্রে যখন অন্ধকারের ভিতর দিয়া শৃগাল কুকুরের বিকট রবে মৃত্যুর নীরব বিভীষিকাকে একটা ভীষণ সজীবতা দান করিয়া লাফাইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, একটি প্রাণীও তখন ভয়ে গৃহের বাহির হইতে পারে না। সন্ধ্যা হইলেই যেন মৃত্যু আসিয়া প্রতি গৃহস্থের উঠানে তাহার করাল বদন ব্যাদান করিয়া ক্ষুধায় দাবি লইয়া বসে,—আর গৃহস্থও আত্মরক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, সকলে এককোণে জড়সড় হইয়া ভয়ে চুপ করিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া দীপ-সম্মুখে বসিয়া থাকে।

গতরাত্রে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঠাকুরের আরতি সারিয়া, তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া, গোরু-বাছুর প্রভৃতির আহার দিয়া, ধীরেনের ভগিনী, সেই শূন্য পল্লীর নৈশ নিস্তব্ধতার ভীষণত্বের মাঝখানে ভাইয়ের স্ত্রী-পুত্র পরিত্যক্ত ফাঁকা গৃহের কোণে ভাইয়ের সঙ্গে মুখোমুখী চাহিয়া, যেন মৃত্যুরাজের নির্জ্জন কারাগৃহে দুটি বন্দীর মত, অজ্ঞাত দণ্ডের অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহারা দুইজনে কত আপনার, এই কথাটা বেশ করিয়া ভাবিয়া লইবার জন্যই যেন এই দারুণ দুর্যোগ তাহাদের উভয়কে এই সন্ধ্যাকালের ক্ষুদ্র অবকাশটা দিয়াছিল। উভয়েই স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা ভাবী দুর্ঘটনার যত কিছু দুরবস্থা কল্পনা করিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যেন অজ্ঞানের মত কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

শেষ রাত্রে ধীরেন কলেরায় আক্রান্ত হইল। সে শয্যায় শুইয়াই ডাকিল, শান্তি!

অসময়ে দাদার ডাকে শান্তির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। পার্শ্বসংলগ্ন ঘরের দ্বার খুলিয়া সে পড়ি-মরি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হাত-পা অবশ হইয়া আসিল।

একটু বেলায় আমার কাছে খবর পৌছিল। শুনিলাম ধীরেনের শ্বশুরবাড়ীতে সংবাদ পাঠাইবার জন্য লোক পাওয়া যায় নাই। আমি সংবাদ পাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সকালে খালিপেটে যাইতে সাহস না হওয়ায়, আহারের পর দুপুরবেলা রওনা হইলাম।

সেখানে পৌছিতে আমার প্রায় অপরাহ্ন হইল। ধীরেনের বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া উঠানে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না;—কাহারও কোন সাড়াও পাইলাম না। নিজে সাড়া দিয়া তাহার বাড়ীতে ঢুকিবার আমার কখনও প্রয়োজন হইত না। বরাবরের মত সোজা ধীরেনের ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, ধীরেন নিস্পন্দ ভাবে মেঝের উপর একটা বিছানায় পড়িয়া আছে। আমি কাছে বসিয়া নাড়ীর সন্ধান করিলাম,—নাড়ী খুঁজিয়া পাইলাম না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা,—কপাল ঘামিতেছে। আমার মনে হইল, আর বেশী দেরী নাই। সে আমায় দেখিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিল,—তাহার স্বর ফুটিল না; হাত দিয়া শুধু নিজের কপালটা দেখাইয়া দিল। আর তাহার গণ্ড বাহিয়া দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

আমার সঙ্গেই ঔষধ ছিল। কিন্তু তাহার সে অবস্থায় ঔষধ ব্যবস্থা করা, অথবা অন্য বিষয়ে ব্যবস্থা করা ঠিক সময়োচিত কার্য্য হইবে, তাহাই সহসা স্থির করিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সহসা চাহিয়া দেখি, সম্মুখে শান্তি!—আলুলায়িত-কুন্তলা, গললগ্নীকৃত-অঞ্চলা, নিরাভরণা, শান্তি!—তাহার অনাবৃত রুক্ষকেশে, বদনে ও উদাস-দৃষ্টিতে যেন বাহ্যজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দিতেছে।

শান্তিকে আর কখনও আমি এমন করিয়া দেখি নাই। সে যদিও আমার সম্মুখে বাহির হইত বটে, কিন্তু অবগুণ্ঠিত বদনে। এবং যদিও আমাকে তাহার দাদারই মত দেখিত ও 'ডাক্তার দাদা' বলিয়া ডাকিত, তবুও মুখোমুখি চাহিয়া কখনও কথা কহে নাই।

আজ তাহার দাদার বিছানার উপর আমি বসিয়া আছি,—কখন আসিয়াছি তাহা সে জানেও না এবং এরূপ-ভাবে আমার সেখানে উপস্থিত থাকিবার আশাও করিতে পারে নাই;—তথাপি সহসা আমায় দেখিয়া একটুও বিস্ময়, লজ্জা, সঙ্কোচ, কিছুই প্রকাশ করিল না;—বেশ সহজেই অমন আলুথালু-বেশে ঘরের মধ্যে আসিল।

তাহাকে দেখিয়া বুঝা গেল যে, সে আহ্নিক-পূজা করিতে-করিতে উঠিয়া আসিয়াছে। তাহার হাতে একটা সাদা পাথরের বাটিতে এক বাটি জল, তাহার উপরে দুটা শ্বেত পদ্মের পাপ্‌ড়ি ভাসিতেছে। সেই জলটুকু পানে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সে সোজা আমার কাছে আসিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, 'দাদা, ঠাকুরের চরণামৃত এনেছি, খাও।'

তাহার সেই দৃষ্টি অতি কোমল; শ্বেতবর্ণ ক্ষীণ ঈষদ্দীঘ বদনমণ্ডলের উপর কালো, ঘন, দীঘ পদ্মের ছায়ায় ঢাকা তাহার সেই আনত চক্ষুদুটা বড়ই কোমল; কত শত হৃদয়-হীন দীর্ঘ দিবারাত্রির অনাদর ও অবজ্ঞার আঁচে পুড়িয়া পুড়িয়া দীনতায় কোমল;—কিন্তু তাহাতে এমন বাহ্যজ্ঞান-হীনতার উদাস চাহনি বোধ হয় কখনই ছিল না। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট পাংশুবর্ণ গণ্ডের উপর অশ্রুধারার দাগ তখনও চক্‌ চক্‌ করিতেছে,—তাহার অধরোষ্ঠ তখনও মন্ত্রের অস্ফুট ভাষায় কাঁপিতেছে। সেই তৃতীয় প্রহর বেলা পর্য্যন্ত উপবাসে থাকিয়া, সে তাহার ইষ্ট-দেবতার পূজা করিয়াছে;—একান্ত নিরুপায় অন্তরের কাতর ক্রন্দন একান্ত-নির্ভরে তাঁহার পায়ে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া, নিজের নির্ম্মল শ্বেত হৃদয়-পদ্মের শতপর্ণ স্বহস্তে ছিঁড়িয়া পায়ে উপহার দিয়া, এই অমল-ধবল আধারে সেই চরণামৃত ধরিয়া ভরিয়া লইয়াছে। সেই তাহারই ভগিনী-হৃদয়ের করুণ-অশ্রু, তাহারই সযত্ন উৎপাটিত নারী হৃদয়ের দুটী ছিন্ন পর্ণ, দেবতার আশীস্-ধারার সঙ্গে মিশাইয়া পূর্ণ অন্তরে পাত্র পূরিয়া দাদার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে।

তাহার উদাস তন্ময় দৃষ্টি দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম, যে দেবতার উদ্দেশে সে এতক্ষণ তাহার কাতর নিবেদন জানাইয়াছে,—আত্মীয়-বন্ধু-হীনা অসহায়া বালিকার ভক্তিপূর্ণ একাগ্র হৃদয় অকপটে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে,—সেই দেবতার অজ্ঞাত রাজ্যের অনন্ত সান্ত্বনা বহন করিয়া তাহাতেই তন্ময় হইয়া সে দাদার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে।

আমার চেহারাটা অনেকটা ধীরেনেরই মত ছিল। তবুও মৃতপ্রায় ধীরেন যে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া থাকিতে পারে, অতি উন্মাদ কল্পনায়ও শান্তি এরূপ ধারণা করিতে পারিত কি না জানি না;—তাহার বিশ্বাসের ঠাকুর তাহাকে ততটা আশার আশ্বাস দিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না;—কিন্তু সে আমারই মুখের কাছে তাহার বাটিটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'দাদা, ঠাকুরের চরণামৃত এনেছি, খাও।'

বিশ্ব-জগতের যেখানকার যত ভগিনী সেই স্বরের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল 'দাদা, খাও।' বিশ্বাসে, ভক্তিতে, কাতরতায় গাঢ় সেই কোমল করুণ স্বর বারবার বলিতে লাগিল, 'দাদা, চরণামৃত এনেছি, খাও।'

চরণামৃতস্থিত চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পের সুগন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে;—সেই পাত্রস্থিত তরলীভূত ভগিনী-প্রেমে শুদ্ধা-চারিণীর হৃদয়-কুসুমের সুরভি বহিতেছে,—ধীরেন নিস্পন্দ-ভাবে দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইয়া আছে;—আমি পার্শ্বে বসিয়া আছি;—আর বালিকা আমারই সম্মুখে তাহার পূর্ণপাত্র ধরিয়া আবার বলিল, 'কই দাদা, খেলে না?'

দাদা পাত্র ধরিয়া পান করিল না। ভগিনীর আশা সফল হইল না। দাদা উঠিয়া বসিয়া এক নিঃশ্বাসে সেই দেবতার করুণা-রস পান করিয়া অমর হইবে—এ দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি তাই বুঝি নড়িয়া উঠিল!—বালিকা কাতর-কণ্ঠে বলিল, 'কই দাদা, খেলে না?'

ভগিনীর ভালবাসা কাঁদিয়া উঠিল,—সারা বিশ্বের ভগিনী-প্রাণ আকুল হইল,—জগতের একটী দাদাও সাড়া দিল না;—তাই সন্দেহের চাহনি ফিরিয়া আসিয়া পূর্ণ-বিশ্বাসের তন্ময়-দৃষ্টির স্থান জুড়িয়া বসিল। স্বর্গীয় দৃষ্টি দূরে গেল,—শান্তি তাহার পার্থিব দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল,—এ তাহার দাদা নয়!

সে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। আমায় কি সে মনে করিল, বলিতে পারি না। আমি কিন্তু, এতক্ষণ নীরব থাকার অপরাধে লজ্জায় মরিয়া গেলাম। অন্ধমুনির সম্মুখে সিন্ধুর মৃতদেহবাহী রাজা দশরথের মত আমার অবস্থা হইল। আমি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

একটু পরেই অবগুণ্ঠিত মুখে শান্তি দরজার কাছে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া মৃদুস্বরে আমায় জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তার দাদা, আমার দাদাকে ওষুদ দিলেন না?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি এসেই ওষুদ খাইয়ে দিয়েছি, বোন্। আর ওষুদের এখন দরকার হবে না। এখন আমি তোমার দাদার শ্বশুরবাড়ীতে খবর পাঠাই গে'। মনে মনে বলিলাম, তোমার ওই অমর-বাঞ্ছিত ঔষধ থাকিতে আমাদের কয়েকটা বিষবড়ি খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলি কেন? যদি পারিতাম তবে তোমার ওই বাটিটার শীতল সুধা শিশিতে ভরিয়া লইয়া থাইতাম।

বাড়ী ফিরিয়া রাত্রে ভাল ঘুমাইতে পারিলাম না। সকালে একটু বেলায় উঠিয়া একজন পথিকের কাছে খবর পাইলাম যে, ভোর রাত্রে ধীরেনের বাড়ীতে কে মারা গিয়াছে।

মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। শান্তির দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল। বন্ধুর ভগিনীর প্রতি যতটা স্নেহ আগে আমার ছিল, গত কল্যকার ঘটনার পর তদপেক্ষা অনেক বেশী ভক্তি আমি তাহাকে দিয়াছিলাম।—তাই তাহার ব্যর্থ পূজার গ্লানি তাহার পাষাণ-ঠাকুরের চেয়েও বুঝি আমার প্রাণে অনেক বেশী বাজিল।

সংবাদটা ঠিক কি না জানিবার জন্য তখনই বাহির হইলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, ধীরেন ভাল আছে, তাহার ভগিনী সেই রাত্রিতেই কলেরা রোগে মারা গিয়াছে। আমি একবার তাহাকে দেখিতেও পাইলাম না। যে চরণামৃত মৃতকে জীবন দান করিল, তাহার একবিন্দুও কি সে নিজের জন্য রাখে নাই?

য়ুরোপে

[শ্রীদিলীপকুমার রায়]

তিনি ছিলেন রাশিয়ান; বয়স ২৭।২৮ বৎসর। চোখদুটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অত্যুজ্জ্বল! কোনও কোনও লোকের বুদ্ধিশালিতা চোখে ফুটে ওঠে, আবার কারুর কারুর ওঠে না। ইনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর লোক। আমার এই বন্ধুবরের মধ্যে দিয়ে রুষজাতির গুটিকতক মনোজ্ঞ জাতীয় গুণের পরিচয় পেয়েছিলাম, যার উল্লেখ এর আগেকার প্রবন্ধে করেছি। এঁর পিতা ইহুদী-ধর্ম্মাবলম্বী, মাতা খ্রীষ্টীয়ান। সঙ্গতিপন্ন পরিবার। পিতা ইংলণ্ডে বসবাস করেন—ডাক্তার। পিতা ও মাতা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হ'লে সন্তানের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত বোধ হয় স্বভাবতঃ একটু উদারতা-প্রবণই হ'য়ে থাকে। মানুষের ধর্ম্মানুরাগের খুব বেশীর ভাগই পারিপার্শ্বিক ও প্রিয়জনের ধর্ম্মভাবের ওপর নির্ভর করে বলে যদি আশৈশব পিতা ও মাতার মত দুজন প্রিয়তম আত্মীয়কে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দেখে আসা যায়, তাহ'লে বোধ হয় বাল্যাবধি কোনও একটা বিশেষ ধর্ম্মের ওপর প্রবল টান না পড়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক হয়ে থাকে। অথচ ধর্ম্মভাবের ও বিশ্বাসের খানিকটা আমাদের একটা স্বভাবজ প্রবণতার ওপর নির্ভর করে, এটা মেনে না নিয়েই গত্যন্তর নেই; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বোধ হয় একথাটাও অস্বীকার করা চলে না যে, ধর্ম্ম জিনিষটা রক্তের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে আবেষ্টনের (environments) ওপর। সে কারণ যাই হোক্, আমার এই বন্ধুবরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও একরোখা পরিণতি মনে গড়ে ওঠেনি। আবাল্য কোনও একটা বিশেষ ধর্ম্মের ওপর নিবিড় টান পুষ্ট করে তোল্‌বার সুযোগ না পেয়ে এঁর অনুসন্ধিৎসু মনটি

ইহুদী ধর্ম্মের কুসংস্কার ও উদারতা সম্বন্ধে যতটা স্বাধীনভাবে ভেবে অনেকগুলি সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, তেমনি খৃষ্টান ধর্ম্মের আচারগত গোঁড়ামি ও তত্ত্বগত গভীরতা সম্বন্ধেও অনুরূপ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিল বলে আমার মনে হয়েছিল। এঁর বুদ্ধিমত্তা, আদর্শবাদ ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা প্রবুদ্ধ উদারতা আমার কাছে একটু বেশী রকমই ভাল লেগেছিল। তাই আমি এঁর সাহচর্য্যে একটু সত্যকার আনন্দ পেতাম ও উপকার বোধ কর্ত্তাম; এবং সেই সূত্রে এঁর বিভিন্ন দেশের সম্বন্ধে lively interest ও খোলা মনের পরিচয়ে একটু বেশী খুসি হয়ে পড়ার দরুণ ক্রমে ক্রমে আমাদের আলাপ-পরিচয়টা প্রীতির রসে রঞ্জিত হয়ে একটা সত্য বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করেছিল। এঁর সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ভাবেই লিখবার বাসনা নিয়ে কলম ধরা গেছে।

এঁর পিতামাতা রুষ হ'লেও এঁর জন্ম হয় সুইজর্লণ্ড দেশে। ইনি আমাকে বার্লিন হতে প্যারিসে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, "Je suis né à Genève. Mon enfance s'est écoulée entre la Russie et la Suisse. De là, ma connaissance égale des deux langues * * *. En Russie j'avais nostalgie de la Suisse, en Suisse celle de la Russie ; mais le fait qu'en Suisse j'étais un étranger m'a poussé à cultiver et développer un patriotisme russe, concentré et artificiel, intolérant, charwin, orgueilleux, en un mot occidental, c'est à dire non Russie." অর্থাৎ "আমার জন্ম (সুইজর্লণ্ডের অন্তর্গত) জেনেভা নগরে। আমার শৈশব রুষ ও সুইজর্লণ্ডের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে কেটেছিল। * * * রুষদেশে আমার সুইজর্লণ্ডের জন্য মন কেমন কর্ত্ত, সুইজর্লণ্ডে আবার রুষদেশে ফিরে যাবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা হ'ত। কিন্তু সুইজর্লণ্ডে যে আমি চিরকালই একজন বিদেশী মাত্র থাকব, এই চিন্তা আমার মনে সতত আঘাত দেওয়ার দরুণ আমি আমার মনের মধ্যে রুষদেশের প্রতি একটা প্রবল ভক্তি গড়ে তুলি;—একটা অস্বাভাবিক, গোঁড়া আত্মসর্ব্বস্ব শ্লাঘারঞ্জিত দেশভক্তি—যাকে এক-কথায় বলা যায় প্রতীচ্য, অর্থাৎ যা মোটেই রুষজাতিসুলভ নয়।"

এঁর কথাবার্ত্তা, তর্ক-আলোচনার মধ্যে সর্ব্বদাই এই আত্মবিশ্লেষণ-চেষ্টা আমার ভারি ভাল লাগ্‌ত, যে চেষ্টা বিরাট্ রুষ-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যে অনুপমভাবে পুষ্পিত ও পল্লবিত করে তুলেছেন। শিক্ষিত ও সূক্ষ্ম (refined) হ'লে যে মানুষ সব সময়ে আত্মবিশ্লেষণপরায়ণ হয় তা নয়, কিন্তু আত্মবিশ্লেষণপরায়ণ হ'লে যে সে মানুষ সচরাচর একটু সূক্ষ্মচরিত্র হয়ে থাকে, এ কথা বোধ হয় সত্য। আমার বন্ধুবরের মধ্যে এই আত্মবিশ্লেষণের একটা প্রবণতা থাকার দরুণ তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও যথেষ্ট পড়াশুনা থাকা সত্ত্বেও এঁকে কখনও আত্মশ্লাঘা কর্ত্তে শুনি নি—এবং কি সাধারণের কি মহাত্মাদের, কারুর সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ আলোচনায় সময়েও এঁকে সর্ব্বদা নিতান্ত জিজ্ঞাসু ও নম্রভাব অবলম্বন কর্ত্তে দেখে এসেছি। আমরা অনেক সময়ে মহাজনদের বিচার কর্ত্তে বসে একটু অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠি, বিশেষতঃ তাঁদের জীবনে কোথাও কোনও দুর্ব্বলতার সমালোচনার সময়ে। এরূপ সময়ে আমরা যে তাঁদের প্রতি অবিচার করে বসি, তার মূল কারণ আমাদের অন্তর্নিহিত গর্ব্ব—যার দিকে সতর্ক দৃষ্টি না রাখ্‌লে সে, শিক্ষা ও স্বাধীনচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে, অনেক সময়ে অলক্ষিতে বেড়ে উঠে থাকে। আমার বন্ধুবর কিন্তু কখনও কোনও মহাত্মাকে বিচার কর্ত্তে গেলে যেমন তাঁদের বেদীতেও বসাতেন না, তেমনি সাধ্যমত তাঁদের কোনও দুর্ব্বলতাকেও অসহিষ্ণু কঠোরতার তুলাদণ্ডে মাপ্‌তে যেতেন না। একদিন টলষ্টয়ের এক উৎসাহী ভক্ত, আমার এক রুষ বান্ধবী, আমি ও আমার বন্ধুবর তিনজনে একত্র গল্প কর্চ্ছিলাম। আমার এই বান্ধবীটি কোনও মতেই স্বীকার কর্ত্তে চান না যে, টলষ্টয় যা প্রচার করেছেন কার্য্যক্ষেত্রে সব সময়ে তদনুসারে জীবনযাপন কর্ত্তে পারেন নি। ইনি মহাত্মা গান্ধিকেও খুব ভক্তি কর্ত্তেন; কিন্তু কথায়-কথায় বলেন যে গান্ধি টলষ্টয়ের মত অতবড় অভ্রভেদী মানুষ নন্। আমার বন্ধুবর বলে ওঠেন "Mademoiselle, (কুমারি!) এরূপ অন্ধ ভক্তি কেন? দৈনিক জীবনের গরিমার তুলাদণ্ডে বিচার কর্ত্তে গেলে মানুষ হিসেবে গান্ধির স্থান টলষ্টয়ের চেয়ে নিশ্চয়ই বড়, যদিও চিন্তা-প্রসারণ হিসেবে সম্ভবতঃ টলষ্টয় বড়, এবং আর্টে ত একের অপরের সঙ্গে তুলনাই চলে না, যেহেতু একজন হচ্ছেন শ্রেষ্ঠশ্রেণীর আর্টিষ্ট, অপরজন আর্টে কোনও সৃষ্টিই করেন নি। মানুষ হিসেবে গান্ধি বড়, কারণ জীবন সম্বন্ধে তাঁর out-look

টলষ্টয়ের মতই কার্য্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রতি পদে নিজে যা প্রচার করেছেন, তদনুসারে স্বীয় জীবন গড়ে তুলেছেন। টলষ্টয় এজন্য একটা মহান্ ও বিরাট্ চেষ্টা করে গিয়েছেন বটে, কিন্তু বাস্তব-জীবনে কথা ও কাজের মধ্যে সব সময়ে সঙ্গতি দেখাতে পারেন নি। তাই মানুষ হিসেবে গান্ধির নীচে।" এই কথায় আমার বান্ধবীটি বলে ওঠেন, "টলষ্টয়ের জীবনকে যারা অসঙ্গতি-দোষ দুষ্ট বলে মত প্রকাশ করে, তারা তাতে তাদের অসহিষ্ণুতারই পরিচয় দিয়ে থাকে। তাঁর জীবন জগতের ইতিহাসে মহিমময়, অনুপম" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার বন্ধুবর উত্তরে বলেন "Mademoiselle, সমালোচনার গন্ধেই এতটা ক্ষুব্ধ হয়ে পড় কেন? টলষ্টয়কে অনেক তথাকথিত বিজ্ঞম্মন্য অসহিষ্ণু সমালোচকের মত সমালোচনা ত' আমি কর্চ্ছি না। তাঁর জীবনের গরিমার অভ্রভেদিত্ব আমি একশো-বার স্বীকার করি। তিনি তাঁর নিজের আদর্শ অনুসারে অনেক সময়েই নিজের জীবন যাপন কর্ত্তে না পার্লেও তাঁর তদর্থে বিরাট্ চেষ্টার মহিমা চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। আমি কেবল এই কথাটুকু বল্‌তে চাই যে, টলষ্টয় রাম-শ্যাম যদু না হয়ে টলষ্টয় ছিলেন বলেই আমি মনে করি, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর স্বপ্রচারিত আদর্শের আরও একটু কাছে পৌছলে তাঁর জীবন-চিত্রের মহত্ত্ব সুসৌষ্ঠব হ'ত। তিনি তা না কর্ত্তে পারার দরুণ এই চিত্রের সম্পূর্ণতার দিক্ দিয়ে একটু খর্ব্বতা সাধিত হয়েছে—এইটুকু আমার মাত্র আক্ষেপ। এটা আক্ষেপমাত্র; এজন্য তাঁকে দোষ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই।"

সমালোচনার মধ্যে এতটা বিনয়, অনুকম্পা (allowance) ও মর্য্যাদার (dignity) এরূপ একত্র পরিচয় আমি এঁর মতামতের ভিতর প্রায়ই পেতাম। মহাজনের জীবন অনেক সময়ে আমাদের জীবনের গতির স্রোত এতটা বদ্‌লে দিতে পারে যে, আমরা সে সব সময়ে এরূপ মহাজনকে দেবত্বপদে অধিষ্ঠিত করিয়ে দিয়ে বসি। পক্ষান্তরে, অনেক সময়ে আবার তাঁদের নিক্তির ওজনে প্রশংসা করাই একমাত্র পন্থা। তবে তাঁদের জীবনের কোনও বিশেষ পরিণতির বাধাবিঘ্নগুলিকে যথাযথ অনুকম্পার (allowance) সঙ্গে দেখি না। এর ফলে প্রথম ক্ষেত্রে যেমন আমরা সাধারণ জীবনকে ও তার গরিমাকে অযথা খাটো করে দেখে একটু ভুল করে বসি; তেম্‌নি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা নিজেদের অজ্ঞাতসারে নিজেদের একটু উচ্চ মঞ্চে বসিয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। আমার এই রুষ বন্ধুটির মতামত ও সমালোচনার মধ্যে বরাবর এই দুই রকম ভুল মানদণ্ডের সামঞ্জস্য করে চলার একটা সংযত চেষ্টা লক্ষ্য করেছিলাম, সত্যের স্থানীয় মান নির্দ্দেশে যার দাম খুবই বেশি।

ধর্ম্মসম্বন্ধে এঁর মতামত উদার ছিল, এ কথার ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। ইনি একদিন আমাকে বলেন "খ্রীষ্টানরা যখন ইহুদীধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করেন, তখন তাঁরা এটা যথেষ্ট অনুকম্পার সঙ্গে বিচার করেন না যে, সে ধর্ম্মটি কিরূপ মারামারি-কাটাকাটির মধ্যে পরিণতি লাভ কর্ত্তে বাধ্য হয়েও শেষটা 'তোমার প্রতিবাসীকে নিজের মত ভালবেস' রূপ মহৎ নীতিতে পৌছেছিল। তেম্‌নি, পক্ষান্তরে, আবার ইহুদীরা যখন বলে যে, খ্রীষ্ট যা প্রচার করে গেছেন তার মধ্যে ইহুদীধর্ম্মের দশ আদেশের (Ten Commandments) অতিরিক্ত বড় কিছু বলেন নি, তখন তারা ভুলে যায় যে, খ্রীষ্ট বলেছিলেন 'তোমার প্রতিবাসীকে ভালবেস যেমন আমি তোমাদের ভালবাসি'। এরূপ তুলনা আরও দিয়ে দেখান যেতে পারে যে, খ্রীষ্ট অনেকগুলি প্রসঙ্গে ইহুদীধর্ম্মকে ঢের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন; যদিও সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইহুদীধর্ম্ম যে 'An eye for an eye', 'A tooth for a tooth' নীতিকে ছাপিয়ে শেষটায় দশ আদেশ-রূপ মহৎ নীতি প্রচার কর্ত্তে পেরেছিল, সেটাও মানুষের ধর্ম্মজীবনের উপলব্ধির একটা সুন্দর পরিণতি।"

বুদ্ধের সম্বন্ধে ইনি সাধারণ ভারতীয়দের চেয়ে অনেক বেশী খবর রাখ্‌তেন ও পড়াশুনা করেছিলেন। প্রায়ই বল্‌তেন "আমি জগতে কাউকে তত শ্রদ্ধা করি না যত বুদ্ধকে করি, এমন কি যীশুখ্রীষ্টকেও নয়।" দেশ-জন-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এরূপ একটা উদারতা আমি এঁর মধ্যে প্রায়ই লক্ষ্য কর্ত্তাম, যেটা মনের একটা বেশ বড় পরিণতি ও সত্যনিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে। আমি একদিন এঁকে আমাদের ধর্ম্মে যে কতটা সার্ব্বজনীন বাণী আছে, তার উল্লেখচ্ছলে গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যা রূপ সুন্দর শ্লোকটি শোনাই। এ উক্তিটি তাঁর

যে, দু'তিন দিন বাদে একদিন নিজে থেকে বলেন "তোমাদের ধর্ম্মে এত উদার ও মহৎ বাণী আছে তা আমি জান্‌তাম না, কারণ আমি বুদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধেই একটু পড়াশুনা করেছি, তোমাদের হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বড় বিশেষ কিছু জান্‌বার সুযোগ পাই নি। ঈশ্বরে শরণ নেওয়াটাই হচ্ছে আসল জিনিষ; কোনও বিশেষ ধর্ম্মই একমাত্র পন্থা নয়, তোমাদের ধর্ম্মের এই সার্ব্বভৌমিক ভাবটা এই ধর্ম্মের গোঁড়ামির যুগে আমার এতই ভাল লেগেছে যে, এ দুদিন আমার ও-বাণীটি কেবলই মনে হয়েছে—এমন কি শোবার সময়েও বাদ যায় নি।" বিদেশী ও ভিন্নধর্ম্মীর এরূপ উদার তারিফটা যে একটু বেশী রকমই ভাল লাগে তা বলাই বাহুল্য।

এঁর মনের একটা সূক্ষ্ম দিকের চমৎকার বিকাশ হয়েছিল, এ কথা আগেই বলেছি। তার দরুণ ইনি আর্টের—বিশেষতঃ সঙ্গীতের ও সাহিত্যের একজন খাঁটি অনুরাগী ছিলেন। অথবা ইনি আবাল্য নিজের মনটিকে ফরাসী ও রুষ সাহিত্য-রসে সিক্ত কর্ব্বার অবকাশ পাওয়ার দরুণ মনের এই aesthetic দিক্‌টার বিকাশ সাধন কর্ত্তে পেরেছিলেন, যেটা তাঁর কথাবার্ত্তার সূক্ষ্মতায়, রসিকতার প্রবুদ্ধ উপভোগে ও সঙ্গীতে গভীর আনন্দানুভূতিতে ফুটে উঠ্‌ত। উচ্চতম সঙ্গীত শুনে আনন্দের তীব্রতায় কখনও কখনও যৌবনেও চোখের জল ফেলেছেন, এ কথা তিনি আমাকে একদিন কথাচ্ছলে বলেছিলেন। এ থেকে তাঁর সঙ্গীত জিনিষটির প্রতি অনুরাগ যে সাধারণের সামাজিক 'Oh I love music' রূপ মনোভাবের অনুরূপ ছিল না, তা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এ সূত্রে আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল ও আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল, যখন একদিন ইনি আমাদের একটি ভারতীয় সঙ্গীত-রজনীতে ভারতীয় সঙ্গীত শুনে আন্তরিক উৎসাহে আমাকে বলেছিলেন "তোমাদের সঙ্গীত যে এত অপূর্ব্ব ও উচ্চদরের হ'তে পারে, তা আমি জান্‌তাম না। তোমাদের সঙ্গীত শুন্‌তে তুমি যে আমাকে মনে করে নিমন্ত্রণ করেছিলে, এ জন্য যে আমি কত খুসি হয়েছি তা সত্যিই বল্‌তে পারি না।" এই সঙ্গীত-রজনীতে আমি আমার পূর্ব্বোক্ত রুষ-বান্ধবীকেও নিমন্ত্রণ করেছিলাম এবং তাঁদের দুজনের উৎসাহের আন্তরিকতা আমার ভারি ভাল লেগেছিল। এটা আরও ভাল লেগেছিল এই জন্য যে, য়ুরোপে অধিকাংশ লোকেরই ভারতীয় সঙ্গীত ভাল লাগে না, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বার বার এতটা অখণ্ডনীয় ভাবে প্রমাণিত হয়ে আমাকে একটু নিরাশ করেছিল যে, এ সম্পর্কে "সঙ্গীত বিশ্বজনীন" "The man that hath no music in himself, Nor is not mov'd by concord of sweet sounds, Is fit for treasons stratagems and spoils" ইত্যাকার কতকগুলি মামুলি কথা বড় একটা সাড়া তুল্‌ত না। কারণ আমি বিবিধ "দৈনিক-সত্য (fact) থেকে এই সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, যেহেতু একের সঙ্গীত অপরের মনে কোনই ঝঙ্কার তোলে না, সেহেতু music বল্‌তে এখানে স্পষ্ট কিছুই ধরা ছোঁওয়া যাচ্ছে না; অতএব এ সব কথা platitude মাত্র। তবে রোমাঁ রোলাঁ, প্যারিসে দুই-একজন সঙ্গীতবেত্তা ও দুচারজন রুষ বন্ধুবান্ধবীর এ বিষয়ে একটু সত্যকার তারিফে আজকাল এতে মনটা একটু-আধটু সাড়া দেয়। এ সম্বন্ধে লিখ্‌তে গেলে বর্ত্তমান প্রবন্ধটির কলেবর অত্যন্ত স্ফীত হয়ে উঠবে, এই ভয়ে এখানে এ সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ এইটুকু বলেই নিরস্ত হ'লাম যে, আমার বোধ হয় যে আমাদের সঙ্গীত এদের কাছে মোটের উপর খারাপই লাগ্‌বার কথা, যদি না এরা একটু উদারভাবে সঙ্গীতের বিচার কর্ত্তে প্রবৃত্ত হয়; অর্থাৎ, যদি এরা সঙ্গীত সম্বন্ধে এদের অভ্রান্ত নিয়মকানুন ও রূপই চিরন্তন, এ ভুল ধারণাটি বিসর্জ্জন দিয়ে সত্যানুসন্ধিৎসার খাতিরে আমাদের সঙ্গীতের অনুপম মাধুর্য্যটি হাত্‌ড়ে খুঁজে বার কর্ব্বার চেষ্টা না করে। বলা বাহুল্য যে, পক্ষান্তরে আমাদের প্রতীচ্য সঙ্গীত উপভোগ সম্বন্ধেও এ কথা সমান খাটে। সে যাই হোক্‌, আমাদের সঙ্গীতে এরূপ আন্তরিক রস-বোধ করা থেকে আমি এঁর উদারতার মনে মনে তারিফ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছিলাম।

মনের এই সূক্ষ্ম দিকের বিকাশের একটা চিহ্ন হাস্য-রসিকতার উদ্ভবে। আমার এ বন্ধুটির মধ্যে এ কৌতুক-প্রিয়তাটিরও বেশ বিকাশ হয়েছিল। ফলে অপরের আচরণের মধ্যে কোনও বেসামাল কথার গন্ধমাত্র থাক্‌লেও ইনি সেটা এত চট্‌ করে আবিষ্কার করে ফেল্‌বেন যে, তার ফল অনেক সময়ে বক্তার কাছে বড় স্বস্তিকর হ'ত না। ইনি অপরের এরূপ লৌকিক tactless কথাকে সহসা আক্রমণ করে অনেক সময়ে তাকে কিরূপ অপ্রস্তুত করে দিতে পার্ত্তেন, তার একটা মজার উদাহরণ দেব।

একদিন আমার বন্ধুবর, আমার আর একটি বান্ধবী ও আমি একসঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম। কথাবার্ত্তার মধ্যে হঠাৎ একটা সাময়িক নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করে আমি আমার বান্ধবীকে, তিনি কি ভাবছেন, জিজ্ঞাসা করে বস্‌লাম। আমার বন্ধুবর তৎক্ষণাৎ একটু মৃদু হেসে উত্তর দিলেন "তুমি বড় Indiscreet লোক! ভদ্র মহিলাকে কি এমন কথা এমন খপ্ করে জিজ্ঞাসা করে বসতে আছে! তিনি যে এখন ঠিক্ তোমার কথাই ভাব্‌ছিলেন!" (এখানে বলে রাখা ভাল যে, কোনও মহিলাকে কি ভাবছে জিজ্ঞাসা করা খুব লোকাচার-অনুমোদিত নয়।)

আমার এই বন্ধুবরের জীবনের উপর দিয়ে এত ঝড় জল বহে গিয়েছে যে, তার কাহিনী শুন্‌তে-শুন্‌তে মনে হ'ত যে বাস্তবিকই অনেক সময়ে "সত্য উপন্যাসের চেয়েও আশ্চর্য্য হয়ে ওঠে।" ইনি সুইজর্লণ্ডে ফরাসীভাষা ও বিজ্ঞানের শিক্ষকতার কাজ কর্ত্তেন। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে পিতামাতার আপত্তি সত্ত্বেও নিরাপদ জীবন-যাত্রা তুচ্ছ করে সুইজর্লণ্ড ছেড়ে রুষদেশে গিয়ে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করেন। কারণ ইনি আমাকে পরে লিখিয়াছিলেন। তার মধ্যেও তাঁর এই চিত্তাকর্ষক আত্ম-বিশ্লেষণের পরিচয় পেয়েছিলাম বলে তাঁর পত্রের এ অংশটি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ কর্ত্তে পার্‌লাম না। "Je suis allé volontairement à la guerre 1° entrainé par l'esprit du troupeau; 2° par réaction contre une partie de mon entourage qui parlait avec mépris et dégoût de la guerre. Ce qui me choquait dans leurs arguments, c'est le prix qu'ils attachaient a la vie humaine. Je partis non pas pour tuer, mais pour être tué, sans du tout désirer la mort." এর ভাবার্থ এই:—"আমি যুদ্ধে স্বেচ্ছায় গিয়েছিলাম প্রথমতঃ যূথমতের প্রভাবে পড়ে, দ্বিতীয়তঃ আমার চার-পাশে সকলকে সদাসর্ব্বদা অবজ্ঞা ও ঘৃণার সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্ত্তে শোনার reactionএর (প্রতিক্রিয়া) ফলে। আমার এঁদের যুক্তি-তর্কে সবচেয়ে বেশী খারাপ লাগ্‌ত তাঁদের প্রাণের-মায়া জিনিষটিকে এত বড় করে দেখাটা। আমি যুদ্ধ যাত্রা করি হত্যা করার জন্য নয়—নিহত হবার জন্য, যদিও নিহত হবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। একটা প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের মনে যে জীবনে আসক্তি কিছু-কালের জন্য প্রায় লুপ্ত হতে পারে, এটা সংসারে মোটেই অসম্ভব নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের মনে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাও জুড়ে বসে না। এটা জীবনের একটা স্থূল দৃশ্যতর অসঙ্গতি-দোষ। কিন্তু একটু আত্মবিশ্লেষণের প্রবণতা না থাকলে বোধ হয় জীবনের এ দৃশ্যতঃ অসঙ্গতি-দোষ ধরা পড়ে না, অথচ একটু তলিয়ে ভাবতে গেলেই দেখা যায় যে জীবন এরূপ অসঙ্গতিতে ভরা।

রুষদেশের প্রতি দুর্জ্জয় ভক্তির স্রোত যখন এঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করে, তখনকার মনোভাব সম্বন্ধে ইনি আর একস্থলে লিখ্‌ছেন "Dans Dostoevski je ne cherchais pas l'art, mais les injures à la France et les moqueries sur l'Allemagne. Dans Beethoven même, je trouais que ce qui passe pour le plus beau dans son ouvre est ce qui ressemble le plus à de la musique populaire russe. এর ভাবার্থ এই:—"ডষ্টয়েভস্কির লেখার মধ্যে আমি আর্ট খুঁজতাম না, খুঁজতাম—ফরাসী জাতির উপর বিদ্রূপ কটাক্ষ ও জার্ম্মাণ জাতির প্রতি ব্যঙ্গ। এমন কি বেথোভেনের (জর্ম্মণীর ও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচয়িতা) সম্পর্কেও আমার মনে হ'ত যে তাঁর রচনার মধ্যে যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য, সেগুলির সঙ্গে যেন রুষ-জাতির জনপ্রিয় সঙ্গীতের সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য আছে।" এঁর পত্রাবলীর মধ্যে আরও দু-এক স্থল থেকে উদ্ধৃত করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে লোভ সংবরণ কর্ত্তে হ'ল, যেহেতু সেগুলি একটু বেশী confidential; কিন্তু সে সব থেকেই এঁর মধ্যে সেই রুষজাতি-সুলভ আন্তরিকতা দেখতে পেতাম, যা নিজেকে গ্রাহ্য করে না, বরং নিজের দোষ ত্রুটিকে যেন একটু তীব্রভাবেই সমালোচনা কর্ত্তে প্রয়াসী—এবং যার উচ্চতম পরিণতির ফলে রুষ সাহিত্যে টলষ্টয়, ডষ্টয়েভস্কি ও টুর্গেনিভের জন্ম।

ইনি জীবনে আদর্শবাদের জন্য অনেক পারিবারিক মনোমালিন্য সহ্য করেছেন, যা জীবনে কমবেশী অপরিহার্য্যই বলা যেতে পারে; এবং ফলে অনেক সময় প্রায় মৃত্যুমুখ হ'তে ফিরে এসেছেন বল্‌লেই হয়। ইনি মাঝে-মাঝে

আমাকে করুণ-কৌতুকচ্ছলে বল্‌তেন যে, তাঁর মনে কেমন একটা আবছায়া বিশ্বাস আছে যে রোগ-শয্যায় মৃত্যু তাঁর অদৃষ্টে লেখা নেই, আকস্মিক বিপৎপাতেই যেন তাঁর জীবন শেষ হবে। আমি তাঁর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি নির্ভীক মনে এরূপ কুসংস্কার-জড়িত ধারণা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কর্লে তিনি হেসে বল্‌তেন যে, তাঁর জীবনের মত ঝঞ্ঝা-বাত্যাবহুল জীবন যে কেউ যাপন করেছে, তার মনে এরূপ একটা আবছায়া ধারণা দৃঢ়মূল হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। একদিন তিনি আমার কাছে গল্প কর্লেন যে, যমরাজ কিরূপ হঠাৎ দেবভাবোপেত পশুপতির মত মাত্র তাঁর অঙ্গাঘ্রাণ করেই তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন :—"তখন আমি যুদ্ধে White armyর বন্দী। আমার সঙ্গীদের দু-চার জনকে প্রহরীরা একে একে বাইরে নিয়ে যেতে লাগল। অব্যবহিত পরে গুলির আওয়াজ ও তাদের মৃত্যু-আর্ত্তনাদ শুনছিলাম ও মনে-মনে ভাব্‌ছিলাম জীবনের ও-পারের সঙ্গে পরিচয় লাভের পালা আমারও বুঝি এল। এক, দুই, তিন,—আমারও হিসেব-নিকেশের ডাক পড়ল। সে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব মনোভাব নিয়ে ধীর-মন্থর-গমনে আমি বাইরে এলাম। হঠাৎ লক্ষ্য কর্লাম যে আমার হাতে বেড়ী আছে বটে, কিন্তু পায়ে নেই। মৃত্যু-দেবের আত্মীয়তাটা সহসা যেন একটু অনাবশ্যক রকমের গায়ে-পড়া গোছের মনে হ'ল। আমার ইদানীন্তন উদাসীন জীবনেও হঠাৎ কেমন একটা দুর্জ্জয় স্পৃহা এল; আমি প্রাণপণে দৌড়িলাম। আমাকে ধর্ত্তে প্রহরীরা ছুটল; কিন্তু প্রাণের দায়ে ছোটা ও শিকারের সন্ধানে ছোটার মধ্যে একটু প্রভেদ থাকার দরুণই হোক্‌ বা না হোক্‌, তারা আমাকে ধর্ত্তে পার্লে না। যদি পার্ত্ত, তবে আজ তোমাকে এ কাহিনী বল্‌বার কোনও লোক যে অবশিষ্ট থাকৃত না, তা ধ্রুব।" পরে Prince Kropotkinএর Memoirs of a Revolutionist নামক অনুপম জীবনীতে তাঁর হঠাৎ ছুট দিয়ে শান্ত্রীদের হাত এড়ানর কাহিনী পড়তে পড়তে আমার এই বন্ধুবরের পলায়ন-কাহিনী মনে হয়েছিল। কেবল প্রভেদ এই যে ধরা পড়লে আমার বন্ধুবরের ক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রাটা একটু বেশী রকম কঠোর হ'ত।

ভারতের প্রতি এঁর শ্রদ্ধা ছিল সত্য এবং ভারতের ভূত গৌরব সম্বন্ধে ইনি নিতান্ত অল্প খবর রাখ্‌তেন না। ভারতবর্ষে আসার ইচ্ছা এঁর মধ্যে সত্যসত্যই ভারি প্রবল ছিল এবং সে ইচ্ছাটার মূলে ছিল ভারতের একটা নিকট পরিচয় লাভের সত্যকার আকাঙ্ক্ষা—দৃশ্যদর্শনের বা "toppin' time" উপভোগ করার তরল স্পৃহা নয়। এবং একদিন হঠাৎ হয় ত আমার দরজায় এসে ঘা দিতে পারেন, এ সম্ভাবনার কথাও আমাকে মাঝে মাঝে হাস্‌তে হাস্‌তে জানাতেন। ইংরাজজাতি যে আমাদের দেশে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়েও ভারতের মনোজগতের খবর রাখে না বা রাখ্‌তে চায় না, তারা যে নিজেদের মধ্যেই মিশে ও আবদ্ধ থেকে সুদীর্ঘ ভারত-প্রবাসের পরও ভারত সম্বন্ধে শোচনীয়-তর অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত-তরল ধারণা নিয়ে ফিরে আসে, এতে ইনি একটা ভারি সবিস্ময় কৌতুক অনুভব কর্ত্তেন।

এক-একজন লোক থাকে যাদের মনোরাজ্যে interest বস্তুটি অফুরন্ত; কিন্তু তারা কোনও নির্দ্দিষ্ট লাইনে কোনও নিজস্ব গবেষণার জন্য একটানা পরিশ্রম কর্ত্তে নারাজ। আমার এ বন্ধুটি ছিলেন অনেকটা এই প্রকৃতির লোক। সংসারে প্রায় কোনও তথ্যই—তা জগতের যেখানকারই হোক্‌ না কেন—এঁর মনে রং না ফলিয়ে ছাড়ত না, যেটা রাস্কিন কোথায় সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন,—"মানুষের সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান বা তথ্যই আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় নয়।" এরূপ লোকের দ্বারা হয় ত সংসারে কোনও গবেষণার কাজ হয় না; কিন্তু তা হোক্‌ বা না হোক্‌, এরূপ মানুষের সংস্পর্শটা যে বড় মনোজ্ঞ হয়ে থাকে, এটা আমি বরাবরই দেখে এসেছি। জগতে মানুষের জ্ঞান ও কীর্ত্তির শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ জগত দিন দিন বিশেষজ্ঞদেরই (specialist) লীলাভূমি রূপে পরিণত হচ্ছে, দেখতে পাওয়া যায়। এরা যে জগতকে অনেক দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, এ কথা কেউ-ই অস্বীকার কর্ত্তে পারে না, বা আমার তা অস্বীকার করা উদ্দেশ্যও নয়। আমি এখানে কেবল এই কথাটি মাত্র বল্‌তে চাই যে, আমার মনে হয় যে, যে সব বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি গবেষণার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনও বিশেষ গবেষণার দিকে সমগ্র শ্রম নিয়োগ না করে তথ্য আহরণে ও মানুষের বিবিধ প্রচেষ্টার খবর রেখে কাটিয়ে দেন, তাঁদেরও একটা সত্যকার সামাজিক দাম আছে, যদিও বিশেষজ্ঞগণ এ কথা স্বীকার কর্ত্তে রাজি হবেন না। এঁদের কাছে—

"Not on the vulgar mass
"Call'd work must sentence pass
(But) All instincts immature
all purposes unsure
"That weigh'd not as his work yet swell'd
the man's amount
"All I could never be
• all men ignored in me
"This was I worth to God."

-রূপ মনোভাবটি কবির উচ্ছ্বাস বলেই অবজ্ঞাত। এঁরা মানুষের হৃদয়ের রঞ্জিত উন্মুখ কামনা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির প্রতি একটা কৃপাকটাক্ষপাত করেই মুখ ফিরিয়ে নেন, যদি সে কোনও স্থূল পরিমাপ্য গবেষণার ওজন দিয়ে নিজের কৃতিত্বের অকাট্য প্রমাণ দেখাতে না পারে। এই গবেষক-সম্প্রদায় সচরাচর জীবনের রঙীন দিক্‌টাকে, মেলামেশা ও প্রীতির দিক্‌টাকে, মানবহৃদয়ের সহস্র অপূর্ণ বাসনার ও তৃপ্তি ও সার্থকতার দিক্‌টাকে বড় জোর ছেলেমানুষি বলে একটু অনুকম্পার চোখে দেখে থাকেন। কিন্তু পক্ষান্তরে তাঁরা বা তাঁদের ভক্তগণ বড় একটা লক্ষ্য করেন না যে, একটা মাত্র বিষয়ে নিরন্তর পরিশ্রমের চাপে অনেক সময়েই তাঁদের নিজেদের মনে রসের উৎস শুকিয়ে গিয়ে তাঁরা সামাজিক হিসাবে একটা ভারী অদ্ভুত "চীজ্‌" হয়ে দাঁড়ান। বিচিত্র জগতের বিবিধ সরস প্রসঙ্গ এদের মনের তন্ত্রীতে কোনও অনুরণনই তুল্‌তে পারে না এবং নিজের বিশেষ বিষয়টি ছাড়া অন্য কোনও আলোচনাতে এঁরা অনেক সময়েই একটুও রস পান না। ফলে তাঁরা মানবহৃদয়ের সামাজিক হৃদ্যতার মত একটা মস্ত দিক্‌কে প্রায় অঙ্কুরে বিনাশ করে বসেন। এরূপ কেন হয়, তা বোঝা কঠিন নয়; এবং কি উপায়ে জ্ঞান-সাধনা ও হৃদয়ের তারুণ্যের সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, সে সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পাওয়াও বোধ হয় একান্ত দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু আপাততঃ আমি নিদান বা ঔষধ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না বলে শুধু এইরূপ গবেষক-সম্প্রদায়ের হৃদয়ের এই অতি প্রয়োজনীয় পরিণতির অভাবের উল্লেখ করেই নিরস্ত হ'লাম। আমি এ "রাজ্যের খবর রাখা রূপ" বা বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার প্রবৃত্তিটিকে একটু বেশী বড় করে দেখ্‌ছি, এ কথা উঠতে পারে বটে। কিন্তু যদি জগতের মানুষের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়টা কাম্য বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে বোধ হয় মানুষ ও বিশেষতঃ বিদেশীর সঙ্গে এরূপ সহজ হৃদ্যতার দিক্‌টাকে গবেষণার চেয়ে খুব ছোট মনে করাও চলে না। কারণ কোনও জাতির স্বস্বরূপ জ্ঞান বা তার প্রতি প্রীতির ভাবটাকে আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রীতি ও বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে বড় কম পাই না। তাই জগতে ক্রমে যখন আরও বেশী লোক জগতের মানুষের পরিচয় পাবার সুযোগ পাবে—সভ্যমানব-সমাজের একটা মূলতঃ পরিবর্দ্ধন সংসাধিত কর্ত্তে পারে যেটা মোটেই অসম্ভব নয়, তা Kropotkin, Bertrand Russel প্রভৃতি মনীষিগণ প্রমাণ করেছেন, * তখন মানুষের ঐক্য বড় কম সুসাধিত হবে না।

কিন্তু যা বল্‌ছিলাম। আমার এই বন্ধুবরের মধ্যে জগতের বিভিন্ন প্রদেশের খবর জান্‌বার আগ্রহ যতটা প্রবল দেখেছিলাম, ততটা আগ্রহও আবার এই জীবনযুদ্ধশ্রান্ত মানুষের মধ্যে বড় বেশী উদ্‌বৃত্ত থাক্‌তে দেখি নি? চীন জাপান সম্বন্ধে বন্ধুবর অনেক খবর রাখ্‌তেন ও পড়াশুনাও কর্ত্তেন। একদিন হঠাৎ এঁর হাতে দেখি এক জাপানী ভাষার ব্যাকরণ। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "এ আবার কি?" বন্ধুবর হেসে বল্লেন "এ তাঁর আর একটা খেয়াল"। আর একদিন আমার কাছে এস্পেরাণ্টো ভাষার † এক ব্যাকরণ হাতে করে এসে উপস্থিত। আমাকে একটি কবিতা পড়ে শোনালেন; বেশ সুন্দর শুন্‌তে,—লালিত্য অনেকটা ইতালীয়ান ভাষার মত। তারপর আমাকে বোঝাতে আরম্ভ কর্‌লেন, কি কি কারণে আমার এ ভাষাটি শেখা উচিত, এর শব্দকোষ মনে রাখা কিরূপ সহজ, এর ব্যাকরণের নিয়মাবলী কিরূপ সরল ও ব্যতিক্রম-বর্জ্জিত, প্রত্যেক

* Prince Kropotkin'si Memoirs of a 'Revolutionist." Bertrand Russel এর "Road to Freedom" এর 'The world as it could be made' নামক শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† কিছুদিন আগে একটি সার্ব্বভৌমিক ভাষা সৃষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা লোকের মনে উদয় হওয়াতে Zamenoff বলে এক ইহুদী ভদ্রলোক তিনটি চারটি ভাষা থেকে শব্দকোষ তৈরি করে অভিনব উপায়ে একটি অতি সহজ ভাষার সৃষ্টি করে তার নাম দেন এস্পেরাণ্টো (Esperanto) যুরোপের শিক্ষিত-সমাজে এ ভাষার চল ক্রমেই বিবর্দ্ধমান, বিশেষতঃ ফরাসীদেশ, সুইজর্লণ্ড, জাপান, কানাডা প্রভৃতি দেশে।

শিক্ষিত লোকেও যদি অল্প পরিশ্রম করে এ ভাষাটি শেখেন, তাহ'লে জগতের মানুষের পরস্পরের সঙ্গে মেশা কত সহজসাধ্য হয়ে উঠে—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার প্রথমোক্তা রুষ বান্ধবীটি এ ভাষাটির উপযোগিতা সম্বন্ধে এই বলে সন্দিগ্ধচিত্ততা প্রকাশ কর্লেন যে, এ ভাষা শিক্ষা করার পরিশ্রম অন্য কোনও ভাষা শিক্ষায় নিয়োগ কর্লে বেশী কাজ হবে, কারণ এ ভাষায় সাহিত্য নেই, যেহেতু এর পিছনে প্রাণশক্তি নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তরে বন্ধুবর বল্লেন "যার যা উদ্দেশ্য নয়, তার কাছে তা চাইলে চল্বে কেন? সাহিত্য-সৃষ্টি ত এ ভাষার উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য—সবচেয়ে কম পরিশ্রমে জগতের লোকের পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ও চিঠিপত্রাদিতে মেলামেশার সহায়তা করা। এ ভাষাটির প্রসার ধীরে-ধীরে বাড়ছে; কিন্তু কেবল এই সব ভুল আপত্তির জন্য যতটা তাড়াতাড়ি বাড়া উচিত ছিল, ততটা তাড়াতাড়ি বাড়ছে না। আর ভাষাশিক্ষার পরিশ্রম সম্বন্ধে একটু ভাব্লেই দেখ্তে পাবে যে এ ভাষাটি শেখা অন্য যে কোনও ভাষা শেখার চেয়ে কত বেশী সহজ-সাধ্য। উচ্চারণ সহজ, ১৭টি মাত্র ব্যাকরণের নিয়ম, শব্দকোষ অভিনব phonetic উপায়ে উদ্ভূত, যাতে প্রায় সব য়ুরোপীয় জাতিরই এতে সুবিধা হতে পারে, এবং এর potentiality কম নয়।" এ ভাষাটির কেবল একটিমাত্র অসুবিধা মনে হ'ল এই যে, এর সঙ্গে প্রাচ্য ভাষাগুলির কোনও সাদৃশ্য না থাকার দরুণ সার্ব্বজনীন সুবিধার দিক্ দিয়ে এর একটু অঙ্গহানি হয়েছে।

এক এক জন লোক দেখা যায়, যাদের প্রথমটা এতই চাপা বলে প্রতীয়মান হয় যে, তখন মনে হয় যে তাদের মনের নাগাল পাওয়া বোধ হয় অসাধ্য। কিন্তু এরূপ শ্রেণীর লোক যখন আবার একবার বিশ্বাস করে হৃদয়ের দুয়ার খোলে, তখন আশ্চর্য্য হ'তে হয় এই ভেবে যে, এত রস ও কোমলতার উৎস-ধারা সে এতদিন কি অজ্ঞাত উপায়ে রোধ করে রেখেছিল! আমার এই বন্ধুটি ছিলেন এই প্রকৃতির লোক। অনেকদিন অবধি আমি এঁর মহত্ত্ব ও আদর্শবাদের সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জান্তে পারিনি; কেবল বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্রের একটা মাধুর্য্যের পরিচয়েই মিশ্তাম। কিন্তু তার পর যখন একটু নিকট-পরিচয়-পেয়েছিলাম, তখন ভিতরকার কোমল ও উচ্চমনাঃ মানুষটির পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য্য হ'তে হয়েছিল, মনে আছে। ইনি সঙ্গতিপন্ন পিতামাতার সন্তান হয়েও সুইজর্লণ্ডের নিরাপদ ও আরামময় জীবন ছেড়েও যে একটা আদর্শবশে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অজ্ঞাতের পিছনে ছুটেছিলেন, তার জন্য এঁকে শ্রদ্ধা কর্ত্তেই হয়। কয়টা মানুষ এ সংসারে নিশ্চিন্ততা ও ধ্রুব ছেড়ে বিপদ ও অধ্রুবের পিছনে ছোটে—তা আবার প্রিয়জনের আপত্তি ও এমন কি বিরাগ সত্ত্বেও। মেটারলিঙ্ক্ তাঁর "La Sagesse et Destinée" (জ্ঞান ও নিয়তি) নামক গভীর ও সুন্দর বইখানিতে কোথায় একস্থলে লিখেছেন যে, সংসারে বীরত্বের (heroism) সুযোগের অভাব নেই, অভাব দিলের। তিনি লিখছেন:—"N'oublions pas que rien ne nous arrive qui ne soit de la même nature que nous-mêmes. Toute aventure qui se présente, présente à notre âme sous la forme de nos pensées habituelles, et aucune occasion héroique ne s'est jamais offerte à celui qui n'était pas un héros silencieux et obscure depuis un grand nombre d'années. অর্থাৎ এমন কিছুই আমাদের জীবনে ঘটে না, যার প্রকৃতি আমাদের নিজেদের আসল রূপটির অনুরূপ নয়। যে সব ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে সে সব অভিজ্ঞতাই আমাদের কাছে স্বীয় অভ্যস্ত চিন্তার ধারাতেই ফুটে উঠে থাকে এবং বীরত্বের কোনও সুযোগই কখনও তার সাম্নে আসে না, যে বহুদিন ধরে নীরবে ও নিভৃতে তার অর্চ্চনা না করেছে।

য়ুরোপে আমার অনেকগুলি কুমারীর সঙ্গে একটু ভালরকম মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল—বিশেষতঃ বার্লিনে। তার মধ্যে অনেকগুলি রুষ কুমারীর সঙ্গে পরিচয় হয়। এঁদের মধ্যে একজনের কথা পরে লিখবার ইচ্ছা আছে, যাঁকে আমার প্রথমটা বর্ত্তমান যুগের রমণীর একটা type হিসাবে খুব চিত্তাকর্ষিণী মনে হ'য়েছিল। আপাততঃ আমি আমার সেই বান্ধবীটির কথা লিখে এ প্রবন্ধের শেষ কর্ব্ব, যাঁকে আমার সব চেয়ে বেশী ভাল লেগেছিল, এবং যিনি টল্‌ষ্টয়ের খুব ভক্ত বলে এর আগে উল্লেখ করেছি। আমার এই বান্ধবীটি চিত্রবিদ্যা শিখতে কিছুদিনের জন্য বার্লিনে এসে-ছিলেন। অত্যন্ত ছেলেমানুষ—য়ুরোপীয় লোকমত হিসেবে অবশ্য—কারণ আমাদের দেশে ২০।২১ বৎসর বয়সের

মেয়েকে লোকে স্বপ্নেও ছেলেমানুষ আখ্যা দেয় না। এঁর পিতা মস্কোবাসী ও একজন মহাপ্রাণ লোক। ইনি ছিলেন টলষ্টয়ের একজন প্রিয়বন্ধু; এবং ইনি তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড জীবনী লিখেছেন। ইনি যুদ্ধ-বিগ্রহ সর্ব্বদাই অন্যায়, এরূপ মতামত প্রচার করার দরুণ Tolstoyএর প্রিয়তম বন্ধু Tchertkoffএর মত * জার কর্ত্তৃক স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে সপরিবারে সুইজর্লণ্ডে অনেক দিন বসবাস করেন। তারপর একটি সাধারণ amnestyর সময়ে রুষদেশে ফিরে টলষ্টয়ের শেষ জীবনে তাঁর কাছেই কাটান। টলষ্টয় যা যা প্রচার কর্ত্তেন ও যা নিজ জীবনে কার্য্যে পরিণত কর্ত্তে পারেন নি (যেমন খ্রীষ্টের "সব ছেড়ে আমার অনুগমন কর," বা "তোমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমার জীবিকা উপার্জ্জন করা উচিত"-রূপ বাণী) সে সবের অনেকগুলি উপদেশ ইনি ব্যক্তিগত জীবনে কার্য্যে পরিণত করেছিলেন। ইনি মস্কোতে তাঁর প্রাসাদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে, কিছুদূরে স্বহস্তে প্রতিবেশীদের সাহায্যে এক কুটীর তৈরী করেন ও সেখানে বাস কর্ত্তে আরম্ভ করেন। স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস ছেড়ে এই দারিদ্র্য বরণ করার দৃষ্টান্ত রুষ দেশে খুব বিরল না হ'লেও, সর্ব্বদাই এই দুঃখদৈন্যময় জগতে তৃপ্তিদ। পিতার এই উচ্চ আদর্শবাদ স্বতঃই মধুর-প্রকৃতি কন্যার মনে অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই আমার এই বান্ধবীটি আবাল্য একটা চমৎকার উজ্জ্বল আদর্শবাদের প্রেরণা পেয়েছিলেন। দৈনিক জীবনে ইনি টলষ্টয়ের নির্ব্বিরোধ, অনাড়ম্বরতা ও অহিংস নীতির অনুবর্ত্তিনী ছিলেন। তাই ইনি জীবনে কখনও মাছ মাংস বা মদ্য স্পর্শ করেন নি ও যৌবনেও বেশভূষার পারিপাট্যের দিকে একান্ত উদাসীন ছিলেন। এমন কি সান্ধ্য-পার্টি প্রভৃতিতেও এঁকে নিতান্তই সাধারণ বেশ ছাড়া অন্য কোনও বেশ পরিধান কর্ত্তে দেখি নি, যেটা য়ুরোপে রমণীমহলে অত্যন্ত unlady-like বলে গণ্য। আমরা কত সময়ে পরচর্চ্চা কর্ত্তাম; কিন্তু এঁকে কখনও তাতে যোগ দিতে দেখি নি। ইনি জীবনের সব সমস্যারই একটা সহজ সরল সমাধান নির্দ্দেশ করা সম্ভব বলে মনে কর্ত্তেন। জীবনের জটিলতা এঁকে অন্ততঃ এখনও অবধি ভাবিয়ে তোলেনি—যদিও ইনি সত্যই চিন্তাপ্রবণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাই বুদ্ধিমতী হয়েও তর্ক-আলোচনায় মানুষকে এমন একটা সহজ ও ঋজু প্রকৃতির জীব বলে ধরে নিয়ে অগ্রসর হ'তেন যে, বিশেষতঃ আমার পূর্ব্বোক্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি রুষ বন্ধুটির কাছে তাঁকে প্রায়ই ভীষণ রকম হেরে যেতেন। এ সব বিষয়ে এঁর মনে সংশয়ের এতই আত্যন্তিক অভাব লক্ষ্য করেছিলাম যে, আমার মনে হ'ত জীবনের সঙ্গে অন্ততঃ অদ্যাবধি বড় বেশী রূঢ় পরিচয় লাভ করার সুযোগ এঁর অদৃষ্টে ঘটেনি। মানুষের উপর এঁর যে অসীম বিশ্বাস আমি দেখ্‌তাম, তাতে আমি ও আমার পূর্ব্বোক্ত রুষ বন্ধুটি আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা কর্ত্তাম যে, এ রকম ছেলেমানুষ ও সরলপ্রকৃতির মেয়ের চিত্রবিদ্যা শিখ্‌তে একাকী বার্লিনের মত সহরে বাস করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এঁর কথাবার্ত্তার মধ্যে বা ভাবভঙ্গীর ছটায় coquetryর লেশমাত্রও কখনও দেখিনি, যদিও তরুণী কুমারীর মধ্যে একটু-আধটু coquetryর ভাবে য়ুরোপে সাধারণতঃ লোকে প্রীতই হয়, এ কথা বল্‌লে বোধ হয় আমি অত্যুক্তি দোষে দোষী হব না। মানুষের প্রতি একটা সহজ সরল বিশ্বাস ও প্রীতির ভাব এঁর মধ্যে প্রতি তর্ক-আলোচনাতেই ফুটে উঠ্‌ত; তাতে সময়ে সময়ে আমার ভারি আশ্চর্য্য মনে হ'ত। এঁর মধ্যে আর একটা জিনিষ আমার ভারি ভাল লাগ্‌ত; সেটা হচ্ছে এই যে সামাজিক সাধুবাদে ও লৌকিক ভদ্রতার অভিনয়ে এঁকে আমি কখনও সাড়া দিতে দেখিনি। য়ুরোপে এটা দুষ্য বলে গণ্য; কিন্তু আমি এ গুণটিকে বরাবরই একটি বড় গুণ বলে মনে করে এসেছি বলে কোনও য়ুরোপীয় কুমারীকে এ সম্বন্ধে সমমতাবলম্বী দেখে আমার মনটা ভারি খুসি হয়ে উঠ্‌ত। এটা অবশ্য এঁর কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, যেহেতু এঁর মনে আবাল্য সত্যের প্রতি একটা আন্তরিক গভীর টান জন্মেছিল। ইনি সুন্দরী ছিলেন না; কিন্তু ইনি ছিলেন সেই প্রকৃতির মানুষ, যাদের সঙ্গে একটু পরিচয় হ'লেই শুধু যে মিল্‌তে ভাল লাগে তাই নয়, তাদের দেখ্‌তেও ভাল লাগে। কারণ, যে সুন্দর ও পবিত্র স্বভাবটির প্রতিচ্ছবি এরূপ মানুষের মুখে স্ফুট হয়ে উঠে, তার একটু বেশী দাম না দিয়েই বোধ হয় পারা যায় না। ইনি আমার ঘরে অনেক সময়ে চায়ের নিমন্ত্রণাদিতে একলা আস্‌তেও সঙ্কোচ বোধ কর্ত্তেন না। (য়ুরোপে কুমারী মেয়ের chaperone * এর

* এঁর কথা আমি ইতঃপূর্ব্বে লিখেছি।

* কুমারী মেয়ে একাকিনী কোথাও যেতে পারেন না বলে আত্মীয়া মহিলার অভাবে কোনও বিবাহিতা বয়িয়সী মহিলার সঙ্গে

সঙ্গে ছাড়া কোনও পুরুষ বন্ধুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হলেও ইনি কখনও এরূপ অদ্ভুত মর্য্যাদারক্ষিণীর উপস্থিতি অনুপস্থিতির ধার ধারতেন না।) সেখানে তিনি, আমি ও আমার রুষ বন্ধু কত সময়েই না তর্কালোচনায় ও গল্পগুজবে কাটিয়েছি। জীবনের outlook সম্বন্ধে আমাদের তিন-জনের মনের মিল মূলতঃ খুবই বেশী ছিল বলে আমাদের ভারি বনত। কেবল জীবনের সকল সমস্যায়ই তিনি যে একটা সহজ সরল মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছি, তার বিপক্ষে আমার রুষ বন্ধুটি প্রায়ই ঘোরতর প্রতিবাদ কর্ত্তেন। তিনি এঁকে বল্‌তেন "Mademoiselle, জীবন বস্তুটি এত সরল সহজ ও বোধগম্য নয় যে, তুমি এক কথায়ই তার মীমাংসা করে ফেল্‌বে।" এঁকে দেখে আমার রোমাঁ রোলাঁ মহোদয়ের Jean Christophe নামক অনুপম উপন্যাসের আরম্ভে খ্রিস্তফের পিতার একটি অর্দ্ধস্বগতঃ উক্তি মনে হ'ত, যেটা আমার তখন ভাল লেগেছিল। তার ভাবার্থ এই যে, জগতে একটি সহজ সরল ভাল লোক হচ্ছে সৃষ্টির একটা শ্রেষ্ঠ বিকাশ। এঁর জীবনে দুটি মহান্ প্রভাব ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে ছিল। একটি ঋষি টলষ্টয়ের জীবনের প্রভাব—যাঁর সম্বন্ধে ইনি এঁর পিতার কাছে সর্ব্বদাই গল্প শুন্‌তেন,—ও অপরটি এঁর সত্যকার খ্রীষ্টীয়ান ও মহানুভব পিতার চরিত্রের প্রভাব।

আমার রুষ চরিত্রের অল্প-স্বল্প অভিজ্ঞতাতেই আমি লক্ষ্য করেছি যে, ওদের মনোজগত ও য়ুরোপের মনোজগতের মধ্যে প্রভেদ খুবই মূলগত, যদিও আমরা য়ুরোপ বল্‌তে রুষ দেশকেও বুঝে থাকি। এ বিষয়ে আমার যে তিনজন উচ্চস্তরের রুষ বন্ধুর কথা লিখেছি, শুধু যে তাঁদেরই চরিত্র থেকে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তা নয়, আমার অন্য অনেকগুলি রুষ বন্ধু-বান্ধবীর চরিত্র থেকেও কম-বেশী ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি। এদের মনোজগতটার সঙ্গে আমাদের একটু বেশী মেলে এবং য়ুরোপে একটা ধারণা আছে যে রুষ মন একটু প্রাচ্য সুতরাং দুর্ব্বোধ্য। আমার এক বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ফরাসী বন্ধুও আমাকে একদিন এই কথা বলেছিলেন যে, রুষদের তিনি ঠিক্ বুঝ্‌তে পারেন না। প্রিন্স ক্রপট্‌কিনের আত্ম-জীবনীতে সেদিন পড়েছিলাম যে, তিনি যখন পারিসে ছিলেন, তখন বিখ্যাত রুষ-সাহিত্যিক টুর্গেনিভ তাঁর রুষ-কারাগার হতে পলায়ন উপলক্ষে একটি ভোজ দেন। তাতে টুর্গেনিভ মহোদয় প্রিন্স ক্রপ-ট্‌কিনকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রতীচ্য ও রুষ এ দুয়ের মনোজগতের মধ্যে একটা গভীর ব্যবধান তিনি অনুভব করেছেন কি না। টুর্গেনিভ মহোদয় আরও বলেন যে, অন্ততঃ তিনি নিজে এটা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করেছেন, কারণ তিনি কোনও মতেই প্রতীচ্য মনকে যেন ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারেন না। এ সম্পর্কে ক্রপট্‌কিন মহোদয় লিখ্‌ছেন; "তখন আমি এ কথায় সায় না দিলেও পরে বুঝেছিলাম যে, টুর্গেনিভ তাঁর অনন্য-সাধারণ মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এ বিষয়ে ঠিক্‌ই বুঝেছিলেন।" আমার মনে হয়, রুষ সাহিত্যে ভারতীয় মন যে এতটা সাড়া দেয়, তারও ঐ একই কারণ; সে কারণ এই যে, রুষ সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে য়ুরোপীয় নায়ক-নায়িকার একটা গভীর মনোগত পার্থক্য আছে, যে পার্থক্যটা রুষ চরিত্রকে যেন অনেকটা আমাদের নিজেদের মনোজগতের কাছে টেনে আনে।

টুর্গেনিভের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পড়্‌তে-পড়্‌তে আমার সেদিন আরও মনে হয়েছিল আমার এই বান্ধবীর কথা। ইনি বার্লিন থেকে আমাকে পারিসে একটি পত্রে যা লিখেছিলেন, তার ভাবার্থ এই; "আমি আমার পিতার সঙ্গে আগে একবার পারিস যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু তিনি স্থির করেছেন যে আমার এখন একেবারে মস্কো যাওয়াই ঠিক্। আমার চিরারাধ্য রুষদেশে আমি যে এই সপ্তাহেই ফিরব, এ চিন্তা আমাকে গভীর আনন্দ দিচ্ছে। সেখানে কি ভাবে জীবন-যাপন কর্ব্ব, তার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা আমি রচে রেখেছি। প্রতীচ্যে বোধ হয় আমি জীবনে আর কখনও ফিরব না। সেজন্য আমার কোনও দুঃখও নেই; কারণ প্রতীচ্য আমাকে মোটেই আকৃষ্ট কর্ত্তে পারে নি। তার সঙ্গে আমাদের কোনও মনের মিল নেই।" এই চিঠির শেষ কথাগুলি বিশেষভাবে রুষ মনোভাবের পরিচায়ক—যে মনোভাব প্রতীচ্যকে বিদেশী মনে করে, যে মনোভাব একটা নূতন সভ্যতা ও সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টির চেষ্টাতেই মগ্ন। এই প্রতীচ্যকে দূরে ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে যে কারণেই হোক্ এরা ভারতীয় সভ্যতাকে আত্মীয় বলে মনে কর্ত্তে চায়, এটাও

বাহিরে বা নিমন্ত্রণাদিতে গিয়ে থাকেন। এরূপ সঙ্গিনীর নাম chaperone.

আমি বরাবর দেখে এসেছি। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, ভারতের অলোকপন্থা (Mysticism) ও ভারতের অন্তর্মুখিতার প্রতি একটা নিগূঢ় শ্রদ্ধার ভাব এদের মধ্যে একটু গভীর-চিত্ত লোকের মনে প্রায়ই বদ্ধমূল দেখেছি। রুষদেশের বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সঙ্গে আমার একবার পরিচয় লাভের সুযোগ হয়েছিল। ইনি খুব ধর্ম্মপ্রবণ ও গভীরচিত্ত মহিলা বলে আমার মনে হয়েছিল। ইনি আমাকে বলেছিলেন "তোমরা জান না, আমাদের—রুষজাতির মধ্যে ভারতের নিকট-পরিচয় লাভের চিন্তা কতটা পুলক-শিহরণ জাগিয়ে তোলে।" ইনি শীঘ্রই আমার এক ভারতীয় বন্ধুর অতিথি হয়ে আমাদের দেশে যাবেন, এইরূপ আলোচনার প্রসঙ্গেই আমাকে উপরোক্ত কথাগুলি বলেছিলেন। আমার এই রুষ বন্ধুর কাছেও রুষদেশে ভারতের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাব কিরূপ বদ্ধমূল, তার অনেক খবর পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, শুদ্ধ ভারতীয় বলে তিনি রুষদেশে কতটা আদর-যত্ন লাভ কর্ত্তেন। আমার পূর্ব্বোক্তা বান্ধবীও আমাকে তাঁর একটা চিঠিতে যা লিখেছিলেন, তাতে তাঁরা আমাদের যে প্রতীচ্যের চেয়ে অনেক কাছে মনে করেন, তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন:—
"* * * quant à moi, malgré toute la difference des milieux dont nous provenous, moi, je sentais en vous tout de même quelquechose comme un frere de pensée. Si j'idealisais un peu trop le caractère de la Russie, je faisais de même et bien plus encore avec celui de l'Inde. Cette recherche canstante et opiniâtre qui ue s'arrête devant aucun obstacle matérial, c'est cette recherche du bonheur vrai, placé au-délà de ce monde qui fait attrayant le caractère de nos deux pays". এর ভাবার্থ এই; "যদিও আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গড়ে উঠেছি, তবু তোমার মধ্যে আমি আমাদের চিন্তাধারার একটা যেন রক্তগত মিল খুঁজে পেতাম। হয় ত আমি তোমার কাছে রুষ মনোজগতকে একটু বেশী বাড়িয়ে বলে থাকব; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাটাও সত্য যে, ভারত সম্বন্ধেও আমি শুধু যে সমোচ্চ ধারণা মনে পোষণ করি, তাই নয়; ভারতকে আমি আমাদের দেশের চেয়েও উচ্চ স্থান দিয়ে থাকি। আমাদের এ দুই দেশের মধ্যে যে একটা একরোখা অনুসন্ধিৎসা আছে, যা কোনও পার্থিব বাধার সামনেই মাথা হেঁট করে না। সত্য ও শিবের জন্য এই যে ছোটা—যার স্থান এ জগতে নয়, ওপারে, এই প্রবণতাটি আমাদের দেশদ্বয়ের একটি মনোজ্ঞতম চরিত্র-লক্ষণ।" ইনি আর একস্থলে লিখেছিলেন যে, ভারতকে তিনি le frère ainé de la Russie অর্থাৎ রুষদেশের বড় ভাই বলে মনে করেন।

আমি এঁকে বা আমার অন্য দুচারজন য়ুরোপীয় বন্ধু-বান্ধবদের আমাদের দেশ সম্বন্ধে একটু বেশীরকম উচ্ছ্বসিত হবার উপক্রম দেখলে বল্‌তাম যে, আমাদের দেশকে এত বড় করে না দেখাই ভাল; কারণ আমাদের মধ্যে যেমন আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শের জন্য স্থূল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তেমনি নীচতা, কুসংস্কার ও জড়বাদেরও যে ঐকান্তিক অভাব আছে, তা নয়। আমাদের দেশ সম্বন্ধে এরূপ উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়িতে আমি একটু বাধা দিতে বাধ্য হতাম সত্যের খাতিরে, এবং তা যে একটু ব্যথার সঙ্গে, তা বলাই বেশী; কারণ নিজেদের দেশকে অপর জাতীয়ের এই আকাশে তুলে ধরবার চেষ্টা দেখলে মনে স্বতঃই আনন্দ হয়ে থাকে, বিশেষতঃ যখন ইংলণ্ডে বিজ্ঞ্যম্মন্য ইংরাজের ও মহানুভব ইংরাজ খ্রীষ্টশিষ্যগণের আমাদের বিরুদ্ধে propaganda-র ঘা খেয়ে-খেয়ে ইংরাজের জাতির কাছে আমাদের জাতীয় সভ্যতার প্রশংসায় মনে একটু বেশী রকমই তৃপ্তি লাভ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আমার য়ুরোপীয় বন্ধুরা আমাকে আমাদের দেশ সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা কর্লে আমি আমাদের জাতীয় হীনতা, বা দোষ-বিশেষকে অস্বীকার করার বা ছোট করে দেখাবারও চেষ্টা কর্ত্তাম না;—যথা, আমি খোলাখুলি ভাবে স্বীকার কর্ত্তাম যে, স্ত্রীজাতির প্রতি, হিন্দু বিধবার প্রতি ও নিম্নজাতীয়ের প্রতি আমাদের সামাজিক আচার নিতান্ত হৃদয়হীন ও নীচ; এবং স্বীকার কর্ত্তাম যে, আমাদের সমাজে গোঁড়ামির, ভণ্ডামির ও নিজহিতমূঢ় প্রচেষ্টার অভাব মোটেই নেই। তা না হ'লে আমাদের গোঁড়া ধর্ম্মধ্বজগণ বিদ্যাসাগর, রামমোহন প্রমুখ আমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শকগণকে

একঘরে করে, আগাছায় সমাজ ভরিয়ে রাখ্‌তেন না; তা না হলে আমাদের সমাজ-নেতৃগণ পাটেলবিলের বিরুদ্ধে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে সভাসমিতি করে তা পাশ হওয়া রদ করার চেষ্টা পেতেন না; তা না হ'লে আমরা আমাদের ধর্ম্মের যা সার ও গৌরবের—অর্থাৎ বুদ্ধ, কবীর, চৈতন্য-প্রমুখ মহাপুরুষদের জীবনচরিত বা গীতোপনিষদ্‌ প্রভৃতির উচ্চতম বাণী দ্বারা জাতীয় ও ধর্ম্ম-জীবন নিয়ন্ত্রিত না করে, কেবল হৃদয়হীন ও বাতুলজনোচিত আচার ও কুসংস্কারকেই কোলে করে পুলকিত হয়ে উঠ্‌তাম না। আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা কর্লে আমি এ সমস্তই স্বীকার কর্ত্তাম। এ স্থলে আমার কোনও কোনও দেশভক্ত বন্ধুর সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না। তাঁরা বলেন যে, বিদেশীর কাছে আমরা কেন নিজেদের ছোট কর্ব্ব? কিন্তু আমার বোধ হয় এরূপ মত একটা মিথ্যা জাতীয় আত্মমর্য্যাদা থেকেই উদ্ভূত। নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য বলার চেয়ে বড় আদর্শ কি থাক্‌তে পারে, তা আমি জানি না। সত্য বল্‌তে হবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে, এরূপ মত যেন রাজনীতিকগণেরই একচেটে হয়; এতে যেন কোনও প্রকৃত দেশহিতৈষীর মনই সাড়া না দেয়। আমি স্বীকার করি যে, এরূপ স্বীকারোক্তিতে অনেক সময়ে আমি আমার প্রতীচ্য বন্ধুবান্ধবদের কাছে অবজ্ঞার হাসিও পেয়েছি; কিন্তু তাই বলে মিথ্যা বা অর্দ্ধসত্য বলে নিজেকে সে দায়িত্বভার হতে সাময়িক ভাবে অব্যাহতি দেবার প্রয়াসে যে বিশেষ লাভ আছে, তাও আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়, আমরা যদি জগতের শ্রদ্ধার পাত্র হই, তবে সে শ্রদ্ধা যেন আমাদের সত্যকার জাতীয় গুণাবলীর উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়; তা যেন নিজেদের বর্ত্তমান সামাজিক কদাচারকে গোপন করার উপর আংশিক ভাবেও নির্ম্মিত না হয়। কারণ তা যদি হয়, তবে বিদেশীর এ শ্রদ্ধা ঊর্ম্মিমালার আঘাতে বেলাপহত বালুরাশির মতনই সত্বর অপসৃত হবে। মিথ্যার মুখস পরে বেশীদিন কারুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সম্ভব নয়—তা সে কি স্বদেশে কি বিদেশে। তা ছাড়া, এটা একটা সত্য যে, ভারতীয়গণ যদি শ্রদ্ধার যোগ্য হন, তবে এ সব শত দোষ সত্বেও বিদেশীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর্ত্তে পারেন; এবং সে শ্রদ্ধা যে স্থায়ী, এটাও বোধ হয় বলা যেতে পারে। তা যদি হয়, তবে কেন আমাদের প্রাপ্য কলঙ্কের দায়িত্ব অস্বীকার করে শুধু একটা সাময়িক গৌরব বাড়ানর ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মিথ্যা ও অর্দ্ধ-সত্য কথনে নিজেকে নিজের চোখে ছোট করে বসি?

হাম-দরদী

[শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি-এ]

(১)

উত্তেজনার বশেই হোক, আর বাঙ্গালী জাতির ভীরুতার কলঙ্ক ঘুচাইব—এই মহৎ কল্পনা-প্রণোদিত হইয়াই হোক, আমরা কয় বন্ধুতে যখন "বেঙ্গল এম্বুলেন্স কো'রে" যোগদান করিয়া মেসপোটেমিয়ায় গিয়াছিলাম, তখন যুদ্ধের ভীষণতার কোন ধারণাই ছিল না। তখন ভাবিয়াছিলাম, বাল্যকালের বক্তৃতায় ভারত-উদ্ধারের মতই ইহা—"জল-খেলা" মাত্র; তখন আহত জেনারেলকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়া "ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌" প্রাপ্তির কল্পনা যে মাথায় না ঢুকিয়াছিল, তাহা 'শপথ' করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু 'মেসপটে' গিয়ে যখন আসল কাজের আস্বাদ পাইলাম, তখন সে স্বাদ মধুর লাগে নাই। তারপর যখন জেনারেল টাউন্‌সেণ্ডের দলের সঙ্গে বন্দী হইয়া তুর্কদের কয়েদী-ক্যাম্পে কাল-যাপন করিতে হইয়াছিল, তখন ভারত-উদ্ধারের ভাবনা ভুলিয়া দিন-রাত্রি নিজের উদ্ধারের কথাই ভাবিতাম। তখন বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা কেন এ দুনিয়াকে মায়া মনে করিয়া এ সব লাঠা-লাঠি কাটা-কাটি হইতে বিরত হইয়া, আমাদিগকেও সেই "ত্যাগের" পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া সাত্ত্বিক হওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা ভারতীয় আর্য্য, আমাদের কি এই পাশবিক ব্যবসা পোষায়? কিন্তু তখন ত আর উপায়

ছিল না। তারপর যখন উভয় পক্ষের বন্দী বদল করায় আমরা জন-কতক ছাড়া পাইয়া আবার ভারত-মাতার মুখ দেখিলাম, তখন শরীরে হাড় ও চামড়া এবং মনে গভীর বিষাদ ছাড়া আর কিছু বাকী ছিল না। এই অবস্থায় করাচী পৌঁছিয়া আমার দিল্লী-প্রবাসী এক বন্ধুর তার পাইলাম; তিনি আমাকে দিন-কতক সেখানে থাকিয়া ভগ্ন-স্বাস্থ্য জোড়া দেওয়ার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। দেশে ঠিক আপনার বলিতে কেহ না থাকায় আমি বন্ধুর আহ্বানে দিল্লী পৌঁছিলাম।

(২)

বন্ধুর আগ্রহে আমার দিল্লী-প্রবাস দু'এক সপ্তাহ হইতে দু'তিন মাসে দাঁড়াইল; শরীরও সম্পূর্ণ সারিয়া গেল;—কিন্তু সে কথা বন্ধুকে ঠিক বোঝান গেল না। এমন সময় তুর্কদের সহিত সন্ধির সংবাদ আসিল এবং দলে-দলে মেসপট্ হইতে সৈন্যদল ফিরিতে আরম্ভ করিল। একদিন খবর পাইলাম, কুট-অল্-আমারায় আমাদের সঙ্গের যাহারা বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে ফিরিতেছে। সেই দিন হইতে খাকী-পোষাকে সজ্জিত হইয়া পরিচিতের সন্ধানে ফেরা, আমার একটা নিত্য-কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইল।

এমনি করিয়া একদিন বৈকালে কেল্লার সামনে বেড়াইতে-বেড়াইতে কতকগুলি শিখ-সৈন্য দেখিতে পাইয়া, তাহাদের মধ্যে আমাদের কোন সঙ্গী আছে কি না দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া তাহাদের দিকে চলিলাম। তাহারা তখন খুব হল্লা করিতে-করিতে জুম্মা মস্‌জিদের দিকে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই তখন বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। দেশে ফেরার আনন্দে অনেকেই পানের মাত্রা ঠিক রাখিতে পারে নাই। কেহ সঙ্গীকে জড়াইয়া ধরিয়া চলিয়াছে, কেহ কোনও প্রকারে আপনার ভার-কেন্দ্রকে ঠিক রাখিয়া নিজের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকেরই পাগড়ী খসিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। তাহাদের উল্লাসের মাত্রাধিক্য দেখিয়া পথের লোকেরা হাসিতেছে, দোকানীরা তটস্থ হইতেছে, ভদ্রলোকেরা তাহাদের "শস্ত্র-পাণি" দেখিয়া শত-হস্ত ব্যবধান রাখিবার চেষ্টায় অন্য ফুট্-পাথ দিয়া চলিয়াছে। আমি ধীরে-ধীরে তাহাদের অনুসরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে জুম্মা মস্‌জিদের পিছনে বাজারে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আমি মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া তাহাদের গতি-বিধি দেখিতেছিলাম, হঠাৎ এক জায়গায় গোলযোগ শুনিয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম, তাহাতে হাস্য-রসের অনেক উপকরণ ছিল। একজন শিখ-সিপাহী একজন দোকানদারের দু'খাঁচা পায়রা দখল করিয়া—খাঁচার দরজা খুলিয়া একটি-একটি করিয়া পায়রা উড়াইয়া দিতেছে। দোকানদারের চীৎকারে চারিদিকের লোক একত্র হইয়াছে; দোকানদার ও তার বন্ধুরা নানা প্রকার ভদ্র ও অভদ্র ভাষায় সিপাহীকে তাহার এ খাম-খেয়ালী হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে সে যে কর্ণপাত করিতেছে,—তাহার কোন চিহ্ন দেখিলাম না। সে একটি একটি করিয়া পায়রা উড়াইয়া দিতেছে, আর হাস্য-মুখে বলিতেছে "ও গিয়া—ও গিয়া"; আর তার দু-একজন সঙ্গী হাততালি দিয়া এই পিঞ্জরাবদ্ধ কপোতদিগের স্বাধীনতা-লাভে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ব্যাপারটা দর্শক-বৃন্দের হাস্য উদ্রেক করিলেও দোকানদারের কাছে তাহা বিশেষ হাস্যকর হইতেছিল না; কেন না দেখিতে-দেখিতে তাহার প্রায় শতাধিক পায়রা তখন মুক্ত-আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। দোকানদার আর কোন উপায় না দেখিয়া 'পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনেক সোরগোলের পর তিন চারি জন শান্তি-রক্ষকের আবির্ভাব হইল। তাহারা সকলেই বুদ্ধিমান; কাজেই হঠাৎ শিখ-সিপাহীকে গ্রেপ্তার না করিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, তাহাকে একশত "কবুতরের" মূল্য দিতে হইবে; অন্যথা তাহাকে কোতয়ালী যাইতে হইবে। "জংলী কবুতর কা কিমৎ দেনে পড়ে গা।"—শুনিয়া সিপাহী ত হাসিয়া আকুল; তা' ছাড়া সে যখন শুনিল যে একশ' পায়রার দাম ২৫৲ টাকা, তখন সে এটা খুব বড় রকম রসিকতা ঠাওরাইয়া বলিল—"ভাই আমার কাছে ত যা' ছিল—তা 'ক্যান্টিন'-এ খরচ করিয়া আসিয়াছি; আর এত টাকা পাইব বা কোথায়। তা চল তোমার কোতোয়ালীতে।" এত বড় জোয়ান শিখ, তাও আবার সম্প্রতি লড়াইয়ের-ফেরৎ, সে যে এত সহজে কোতোয়ালী যাইতে রাজী হইবে,

পুলিশের কনেষ্টবলের অভিজ্ঞতার সহিত ইহা কোন প্রকারেই মিলিল না। তাহারা দু'তিন জন মিলিয়া শিখকে ঘিরিয়া, দোকানদারকে সঙ্গে লইয়া চাঁদনী-চকে কোতোয়ালীতে লইয়া গেল। ব্যাপারটা নূতনতর দেখিয়া অন্যান্য তামাসগিরের সহিত আমিও চলিলাম।

(৩)

জনতা কোতোয়ালীর বাহিরেই রহিল; আমার 'খাকী' পোষাক ছিল, তাই আমাকে কেহ বাধা দিল না। একটা বারান্দায় কোতোয়াল সাহেব বসিয়া ছিলেন। আসামী উপস্থিত হইলে, তিনি প্রথমে দোকানদারের 'বয়ান' লিখিয়া লইয়া অপরাধীকে এমন অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিখ-সিপাহী যাহা জবাব দিল, তাহার মধ্যে অবান্তর কথা বাদ দিয়া যাহা দাঁড়ায়, তাহা এই :—

"আমার নাম খড়্গ্ সিং। বাড়ী অমৃতসর। আমি—নং পল্টনে সুবেদার। আমি লড়াইয়ের গোড়াতেই মেসপটেমিয়ায় গিয়া জেনারেল টাউন্সেণ্ডের দলের সহিত কুট-অল-আমারার যুদ্ধে বন্দী হইয়া প্রায় তিন-চার মাস তুর্কদের নিকট ছিলাম। এই তিন চারি মাস আমরা যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই;—আপনারা তাহা খবরের কাগজে কতক-কতক পড়িয়াছেন। তারপর একদিন সুযোগ পাইয়া আমরা ৪।৫ জন এবং একজন সাহেব 'অফ্সর' তুর্ক ক্যাম্প হইতে পলাইয়া আসি। যে কষ্টে আমরা ক'জন এবং আমাদের সঙ্গী কাপ্তান ফেন্টন্ সাহেব আমাদের লাইনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, তাহা বলিলেও আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। লাইনে আসিয়া পৌঁছিবার পর আমার সঙ্গীদের মধ্যে দু'জন ত হাসপাতালেই মারা গেল। কাপ্তান সাহেব গোড়া হতেই অসুস্থ; তাঁর কপালে সঙ্গীনের খোঁচা লাগিয়া যে ঘা' হয়েছিল, সেটা তুর্ক ক্যাম্পে অচিকিৎসায় এবং পথের অনিয়মে খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। পলাইবার সময় আমরা ৩।৪ জনে মধ্যে-মধ্যে তাঁকে পিঠে করিয়া আনিয়াছি। সাহেবকে যখন হাসপাতালে লইয়া গেল, তখন অজ্ঞান অবস্থা। আমরা যে ২।৩ জন বাঁচিয়াছিলাম, সবল হইয়া আমরা আবার সেখানেই ফৌজের সহিত রহিয়া গেলাম। এখন আমাদের কাজ শেষ হইয়াছে, আমাদের ছুটি; তাই দেশে যাইতেছি। বন্দী হওয়ার যে কি কষ্ট, তা' আমি খুব জানি; আপনারা দূরে ব'সে তা কি বুঝবেন। তাই যখন দেখলাম যে দু'টো ছোট ছোট খাঁচার মধ্যে একশ'টা জঙ্গলের স্বাধীন কবুতরকে এরা কয়েদ করেছে, তখন আমাদের কষ্ট মনে পড়ে গেল; আমি পাখীগুলোকে ছাড়িয়া দিলাম। হুজুর যদি তাদের 'খুসী' দেখ্তেন! জানি না আমি কি দোষ করেছি; "হুজুর-মালিক; আগর্ মেঁ কসুরওয়ার হুঁ ত' মুঝে সাজা দিজিয়ে। লেকেন মেরা খেয়ালমে খেলে কোই কসুর নেহি গিয়া।"

আমরা সব অবাক্ হইয়া এই সরল-হৃদয় বীর সিপাহীর কথা একমনে শুনিতেছিলাম। তখন লক্ষ্য করি নাই যে, অদূরে একজন অল্প-বয়স্ক সাহেব বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন,—কাগজের আড়ালে তাঁর মুখ ঢাকা ছিল। খড়্গ সিংহের কাহিনী শেষ হওয়া মাত্র সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"সুবেদার সাহেব,—'আদাব'! আমাকে চিনিতে পার?" "কাপ্তান সাহেব, 'তস্লিম'! আপনি এখানে?"

"হাসপাতাল হইতে ছাড়া পাইয়া যখন আমাকে ডাক্তার লড়াইয়ের অনুপযুক্ত করিয়া দিলেন, তখন হইতে আমি আমার পূর্ব্বের চাকরীতে যোগ দিয়াছি! তুমি ত জানতে না, আমি পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্টেনডেণ্ট! যাক্ সে সব কথা! এখন বল, কেমন আছ? এ সব কি ব্যাপার! তোমার এ পাগলামী মাথায় কেন ঢুকিল? এ' ত মেসপট্ নয়—এখানে যে আইন-কানুন বড় কড়া।"

"সাহেব, আমরা সিপাহী—অত আইন-কানুন কি বুঝি! শুধু এইটুকু বুঝি যে, বনের পাখীই হউক, আর সহরের মানুষই হউক, সকলের কাছে স্বাধীনতাটা সব চেয়ে বড় পেয়ারের জিনিষ। আর আমাদের কয়েদের কষ্ট মনে পড়িয়া গেল? কাপ্তান সাহেব, মনে আছে—কি নরক-যন্ত্রণা আমরা ভোগ করেছি। পাখীগুলোকে উড়াইয়া দেওয়া যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তবে ত তুর্ক ক্যাম্প হইতে পালাইবার জন্য আমরা যে সব কাণ্ড করেছিলাম, তাও অন্যায় হয়েছিল!" খড়্গ সিংহের কথার ভঙ্গীতে সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তাহার কর মর্দ্দন করিলেন। তারপর বিস্মিত কোতোয়াল ও দোকানদারের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"এ দোকানদারকে ২৫৲ টাকা 'হরজানা' দিয়া দাও; টাকাটা আমি দিতেছি।"

এই দুই বিভিন্ন দেশবাসী, বিভিন্ন বয়স্ক সিপাহীদের রকম দেখিয়া আমার মহাকবির উক্তি মনে পড়িয়া গেল—

"One touch of nature makes the whole world kin."

শোক-সংবাদ

৺মতিলাল ঘোষ

৺নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

৺মতিলাল ঘোষ

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের মুকুটমণি, দেশ-হিতব্রত, অতুল তেজস্বী, বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান, 'অমৃত-বাজার পত্রিকার' কর্ণধার মতিলাল ঘোষ মহাশয় আর ইহজগতে নাই;—৭৫ বৎসর মর-জগতে বিরাজ করিয়া মায়ের আদরের দুলাল জগজ্জননীর স্নেহের ক্রোড়ে চলিয়া গেলেন। বড়ই দুর্দ্দিনে আমরা মতিবাবুকে হারাইলাম। তাঁহার বয়স হইয়াছিল; পরপারে যাওয়ারও সময় হইয়াছিল; তবুও আমাদের মনে হইত, মতিবাবু আরও কিছুদিন আমাদের মধ্যে থাকুন; আরও কিছুদিন এ দেশে তাঁহার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, সকল প্রয়োজনের যিনি মালিক, সকল বিধানের যিনি বিধাতা, তিনি সর্ব্বদর্শী; তিনি মতিবাবুকে লইয়া গেলেন; আর তাঁহার ন্যায় আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয় মহাত্মার তিরোভাবে শুধু আমরা কেন, সমগ্র ভারতবাসী জাতিধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে হাহাকার করিতেছে। সত্য-সত্যই ভারতবর্ষের একজন অসাধারণ পুরুষের তিরোভাব ঘটিল। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনার কথা বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না; আজ আমাদের দেশে যে স্বাদেশিকতার তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার অগ্রদূত বলিয়া যাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে হয়, মতিবাবু তাঁহাদের অন্যতম। মতিবাবুর বিয়োগ-বেদনা শুধু তাঁহার বৃহৎ পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ হয় নাই; দেশবাসী নর-নারী সে বেদনায় সমানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

৺বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষকে বাঙ্গালা দেশের লোক ভাল করিয়া জানিবার চিনিবার তেমন সুযোগ পাই নাই; কিন্তু যাঁহারা স্বদেশী ব্যবসায়-বাণিজ্যের, কল-কারখানার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন বরেন্দ্রকৃষ্ণের অকালে পরলোক-গমনে আমরা একজন অক্লান্তকর্ম্মা, স্বদেশহিতে-উৎসর্গীকৃত-জীবন যুবককে হারাইয়াছি। বরেন্দ্র-কৃষ্ণের কার্য্যক্ষেত্র বাঙ্গালা দেশে ছিল না; তিনি বোম্বাই প্রদেশেই তাঁহার অতুলনীয় কার্য্যতৎপরতার কেন্দ্র করিয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান বাঙ্গালী বরেন্দ্রকৃষ্ণের অক্লান্ত চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলেই বোম্বাই আহমদাবাদে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিল, শ্রীবিবেকানন্দ মিল প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই জয় ঘোষণা করিতেছে। চিরকুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ দেশের সেবায়, দেশের শিল্পোন্নতির জন্যই আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। অকালে পরলোকগত না হইলে তিনি আরও কত কাজ করিতে পারিতেন। তাঁহার মনের বাসনা মনেই রহিল; বঙ্গ-মাতার কর্ম্মী সন্তান কত কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া গেলেন; আমরা তাঁহার অভাবে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি।

আঁখির অত্যাচার

[শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

কবি বলেছেন 'আঁখি কি মজাতে পারে না হ'লে মন-মিলন'। বোধ হয় কবি ভুল করেছেন—না হয় মনোভাব উল্টে প্রকাশ করেছেন। আর এ কথা একজন প্রাচীন কবির বিরুদ্ধে অন্য সমাজ হ'লে জোর করে ব'লতে পারতুম কি না সন্দেহ; তবে আমাদের এই হিন্দু সমাজে আঁখিই আগে মজায়, পরে মনের মিলন হয়, কারণ এখানে বিয়ের পূর্ব্বে তো মন-মিলন হ'বার কোনই সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ব-রাগ জিনিষটা তো আর আমাদের বঙ্গসমাজে নাই, কেবল পূর্ব্ব-দৃষ্টি আছে। তবে যে সকল পাশ্চাত্য সমাজে পূর্ব্ব-রাগ আছে, সেখানেও মনের চেয়ে আঁখিই বেশী অনর্থের মূল। সেখানেও 'লাজ নয়নের চকিত চাহনি' অনেক বীর পুরুষকেই কাবু করিয়া ফেলে।

কোর্টসিপটাকেই বিবাহের মূল কারণ বলে মনে করা অনেক সময় ভ্রমাত্মক; কারণ অনেক সময় কোর্টসিপের অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনা আর কিছুই নয়—একটি হরিণ-নয়নার প্রেম-কাতর বা সহানুভূতি-ব্যঞ্জক দৃষ্টি—তা' সে প্রাসাদেই হোক, বিপণিতেই হোক, আর দেবালয়েই হোক।

কেন চোখের এই অদ্ভুত শক্তি? তাহার ভিতর বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক শক্তি আছে কি না, সে মীমাংসা আমার দ্বারা সম্ভব নয়—আমি চোখের ডাক্তারি ক'রতে তো বসি

নাই। তবে আমাদের চক্ষু যে প্রণয়-ব্যাপারে মনসিজকে যথেষ্ট সাহায্য করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "সে কেন আমার পানে ফিরে ফিরে চেয়ে গেল" এই আক্ষেপের উপরই ত শতকরা নিরেনব্বইটা প্রণয়ের ভিত্তি।

এখানে অনেক সময় পিতামাতা ছেলেকে অনুরোধ করেন 'মেয়ে' অর্থাৎ কনে দেখে আসতে; আর সে অনুরোধ না ক'রলেও ছেলে অনেক সময় পাত্রের বন্ধু সেজে মেয়ে দেখে আসেন। যদি মেয়ের চেহারা ছেলের চোখে ধরে যায়, তা'হ'লে সেই মুহূর্ত্তেই তো মেয়ের বাপ ও তদূর্দ্ধতন পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে গেলেন। আর যদি সে দৃষ্টি ফটোর উপর দিয়েই চলে যায়, তা' হইলেও আসল শুভদৃষ্টির সময় যা'তে মেয়ে পাত্রের সুনজরে পড়ে, সে জন্য কন্যার অভিভাবকগণ সতর্কতার সহিত শুভলগ্ন স্থির করেন। সেই ত আসল বিবাহ;—সুনজরে পড়িলেই ত বিবাহ সার্থক হ'ল। হাজার বেদমন্ত্র আওড়াও, হাজার অরুন্ধতী দেখাও, যদি দুজনের মন দুজনের নয়ন-সাগরে না ডুব দিল—তবে প্রেমের শুক্তি উঠ্‌বে কেন? এইখানেই চোখের পালা শেষ নয়;—বিবাহের পরও বাপমার একান্ত কামনা যা'তে তাঁদের মেয়েটি শ্বশুর-শাশুড়ীর ও স্বামীর সুনজরে পড়ে। সুনজরে পড়ার মানেই সুমনোনীত হওয়া। গুণাগুণ বিচার দ্বারা মনোনীত ক'রবার প্রণালী প্রায়ই কেউ অবলম্বন করেন না; প্রায়ই মনোনীত করেন চোখের সুপারিশে। এই সুপারিশ অনুসারে কার্য্য করাটাকে যদি রূপজ মোহ বলেন, তা' হ'লে আমার আপত্তি আছে;—রূপজ মোহও ক্ষণস্থায়ী। চোখের ইন্দ্রজাল যে চিরজীবনের, সে যে কুরূপাকেও অপ্সরা-সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করে—আর চোখের মিল না হ'লে প্রাণে প্রাণে মিল বা খাঁটি ভালবাসা কি করে যে হবে, তা' তো বু'ঝতে পারি না। কথাই ত আছে 'যাকে দে'খতে নারি তার চলন বাঁকা'। যার সঙ্গে ঘর ক'রতে হবে, তা'কে চোখে যদি না ধরে তা' হলে মনে ধরে কি?

আর তা'রপর রূপজ মোহ যদি চোখের নেশাই হয়, তা' হ'লেই বা দোষ কি? এই ভালবাসা বা প্রণয় জিনিষটাই তো নেশা; তা' না হলে একপক্ষের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তা ছুটে যায় কেন?

আর চোখের নেশা হ'তেই তো মনের নেশা জন্মে—ইন্দ্রিয় থেকেই তো অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছাইতে হয়;—আগে মাটীতে ভর না দিলে হাওয়ায় লাফান যায় না। খিলানে প্রথম দাঁড়ায় বাঁশের উপর ভর দিয়ে; তারপর দাঁড়ায় নিজের জোরে। ইন্দ্রিয়ের উপর ভর না দিয়া, শূন্যের উপর প্রেমের খিলান গাঁথব—এ কথা যিনি বলেন, তিনি প্লেটোর আত্মীয়—তাঁর সে পবিত্র প্রেমের 'ছোপে' সাধারণ মনের উপর রং ধরে কি না সন্দেহ। যে অনুরাগের নেশায় আমাদিগের মন রাঙ্গা হয়ে যায়, তা'র ভিতর থেকে চোখের ছাপটুকু বাদ দেওয়া যায় না। চোখের মোহেই তো দুনিয়া মুগ্ধ;—পবিত্র ফুল হাওয়ায় ফোটে, কিন্তু অপবিত্র মাটিতেই তা'র শিকড়।

আর যদি সে চোখের নেশা অপবিত্রই হয়, তা' হ'লে তোমার পবিত্র ভালবাসা কি? তা'র মধ্যে ভোগের লালসা না থাক, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যজ্ঞানও কি নাই? তা' না হ'লে পুরুষের কাছে নারী এত বিশেষ ভালবাসার বস্তু কেন? আসল কথা যে ভালবাসাই লও, তা'র উপর চোখের প্রভাব অস্বীকার ক'রতে পা'রবে না।

ভালবাসা মাত্রই যে একপ্রকার ব্যাধি, তাহা একজন ইউরোপীয় মনোজগতের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন। সে ভালবাসার উৎপত্তি-স্থান চোখেই হোক, মুখেই হোক্, হৃদয়েই হোক্, মস্তিষ্কেই হোক্, তাহাতে কিছু আসে-যায় না—ব্যাধি একই। বিষ উদরে গিয়াই দেহকে আক্রমণ করুক, আর রক্তে মিশ্রিত হয়েই আক্রমণ করুক, সে সমানই কথা। এই প্রেম-ব্যাধি সকল সময়েই মানুষকে আক্রমণ ক'রতে পারে; তবে স্ফুটনোন্মুখ যুবক-যুবতীর উপরই ইহার প্রকোপ বেশী; আর বসন্তকালেই ইহা epidemic formএ দেখা দিয়া থাকে। সুচিকিৎসকের অভাব হ'লে এই ব্যাধি যে রোগীর বা রোগিনীর মুণ্ডপাত করে ছাড়ে, তা' কে না জানেন? তবে মোটের উপর এ রোগের নিদান আছে—চিকিৎসা আছে,—দুরারোগ্য ব্যাধি এ নয়।

আর আমার মনে হয় যে, চক্ষুর মধ্য দিয়াই এই প্রেম-ব্যাধির বীজ সংক্রামিত হয়; কিন্তু একবার ব্যাধির সূত্রপাত হইলে চক্ষু উৎপাটন করে ফেললেও কোন ফল হয় না।

বিল্বমঙ্গলের হয়েছিল সেই দশা। রজনী জন্মান্ধ হ'লে কি হয়, মনের ভেতর সে চোখ ফুটিয়েছিল, সে কাণে

যা শুনত, মানস-চক্ষে তা' প্রত্যক্ষ করে ছাড়ত;—তাই সে প্রেম-ব্যাধির হাত থেকে অব্যাহতি পায় নি। তবে তার বিবাহে যে বিলম্ব হয়েছিল, তার কারণ তার বাহিরের চক্ষে কটাক্ষ ছিল না বলে।

অনেকে হয় ত ব'লবেন যে, প্রণয়ে আঁখির প্রভাব যদি সত্য হয়, তবে বিলাতে প্রণয়-দেবতাকে অন্ধ বলে কল্পনা করা হয় কেন?—সে কল্পনার উদ্দেশ্য কি এই যে, তিনি মিলন করান প্রাণে-প্রাণে, বহিঃসৌন্দর্য্য দেখেন না—

না, ইহার অর্থ স্বতন্ত্র। আমার মনে হয় প্রণয়-দেবতাকে অন্ধ বলে কল্পনা করা হয় এই জন্য যে, তিনি স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করেন না; তিনি দেখেন শুধু প্রণয়ের বস্তুকে; তা'র বাহিরের—আশে-পাশের কিছুই দেখেন না। তিনি অন্ধ নন, তবে চক্ষু থা'কতে অন্ধ ব'লতে পার।

আমার এক-এক সময় মনে হয় যে, আঁখি আর কিছুই নয়—মনের দূত। দুটি মন কাছাকাছি এসে—তাঁরা এই দূতমুখে পরস্পরের বিষয় অবগত হন। তাঁদের দূতেরা শব্দহীন ভাষার সাহায্যে এরূপ ভাবে কথোপকথন করে থাকে যে, সম্ভবতঃ তাহারই অনুকরণে সার জে, সি বসু ও ইটালীর বৈজ্ঞানিক মার্কোনি তার-বিহীন বার্ত্তার উদ্ভাবন করিয়াছেন। বার্ত্তাবহ-যন্ত্র অবশ্য সকলের ঘরে নাই, কিন্তু আঁখির বার্ত্তাবহ-যন্ত্র প্রায় সকল গৃহেই আছে। আধ হাত পরিমিত ঘোমটার মধ্য হ'তে নবোঢ়া বধূর নিঃশব্দ বার্ত্তা একেবারে পতির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে এবং সেখানে এমন একটা মধুর উন্মাদনার সৃষ্টি করে, যাহা অনির্ব্বচনীয়।

এই ভাষায় অবশ্য সকলে অভিজ্ঞ নন;—যৌবনের সীমা পার হ'তে না হ'তেই এ ভাষার স্বরূপ অনেকে ভুলিয়া যান। তাহার কারণই বোধ হয় এই যে, বিবাহ-জীবনের উত্তরকালে এ ভাষার আর চর্চ্চা থাকে না। তরুণ পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট এ বিষয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে যাঁহারা এখনও অবিবাহিত, তাঁহারা যদি এ ভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হন—তা'হলে নজীর দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগকে সেক্সপিয়ার লিখিত—"মার্চেণ্ট অফ ভিনিস" বা তাহার অনুবাদ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অতএব দেখা গেল যে, আঁখি একটি ভয়ঙ্কর বস্তু; ইহা আপনার বৈদ্যুতিক শক্তিতেই হোক্, বা অর্থপূর্ণ সঙ্কেত-বাক্য দ্বারাই হোক্, মনুষ্যকে মনুষ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে;—সে আকর্ষণ প্রথমত দর্শন-লিপ্সা, তা'রপর সঙ্গলিপ্সা ও অবশেষে অচ্ছেদ্য বা দুশ্ছেদ্য দাম্পত্য-বন্ধনে পরিণত হয়। ইহা গৃহীর পক্ষে প্রথম-জীবনে আনন্দের বস্তু হইতে পারে; কিন্তু শেষ জীবনে ইহার নীরব ভৎর্সনা অনেক সময়েই বিকর্ষণের পক্ষে কার্য্য করে। যদি সংসার ত্যাগ করে পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে গমন করেন, তাহা হ'লেও আঁখির হাত হ'তে নিস্তার নাই; কারণ ইহাই তপস্যার প্রধান বিঘ্ন। পুরাণকারেরা বলে গিয়েছেন—

পার্থিব প্রেমের পক্ষে ইহা যেরূপ সহায়,
ভগবৎ প্রেমের পক্ষে ইহা সেইরূপ অন্তরায়।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস "চক্র" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২॥০।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর নূতন উপন্যাস "প্রত্যাবর্ত্তন" প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত নূতন গীতি-নাট্য "অপ্সরা" প্রকাশিত হইল, মূল্য ।৵০।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "রহস্য-লহরী সিরিজে'র 'ধূমকেতু' ও "মনার দল" প্রকাশিত হইল, মূল্য প্রত্যেকখানির ৸০।

শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগচী প্রণীত "শ্রীশ্রীবিজয় কথামৃত" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ২।০।

শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত "কুমারী" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত অবতারচন্দ্র লাহা প্রণীত "আমার ফটো" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১॥০।

শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার প্রণীত সচিত্র উপন্যাস "প্রলাপ" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲।

৷৷০ সংস্করণ গ্রন্থমালার ৭৯ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী প্রণীত "অন্ধ" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "রণডঙ্কা" বহু চিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দে প্রণীত "পাগলের প্রাণের কথা" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ৸০।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "অবতার" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

চাতক

চিত্র-শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

Engraved by—
BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

ভারতবর্ষ

কার্ত্তিক, ১৩২৯

প্রথম খণ্ড | দশম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

রসস্য নিবেদনম্

শ্রীযামিনীকান্ত সেন বি-এল

সমুদ্র-গর্ভে যখন প্রবাল জন্মে, তখন সে রাজ্যের কেউ কল্পনা করে না যে, তা' নিয়ে বাইরে একটা বিপ্লব উপস্থিত হ'তে পারে। অথচ, তা' নিয়ে মানুষের মহলে নানা ঝড় উঠেছে। মুক্তামালা মানুষকে মুগ্ধ করেছে ;—রাজারা মুকুটে পরেছে ; রাণীরা গলায় ঝুলিয়েছে ; এবং তারই পদাঙ্কে কেনা-বেচা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা দুন্দুভি বরাবরই বেজে চলেছে ! তেমনি যুগে-যুগে মানুষ সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে নানা রম্য স্বপ্ন রচনা করে এসেছে,—এতকাল তার কোন স্বতন্ত্র সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় নি ; হৃদয়ের গোপন কক্ষে স্থান দেওয়ার প্রলোভন হ'লেও, কেউ সিংহাসন দেওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখে নি। কাব্য, চিত্র এ সব যেন অলস অবসরের খেয়াল—ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-কলাদি যেন ধন-গর্ব্ব-পুষ্ট রাজন্যগণের কীর্ত্তিমুখর ফরমায়েস বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন ব্যাপার ঘটেছে, যাতে এ রকম ভাবে ললিতকলার সরস সৃষ্টিকে আর দেখ্‌বার উপায় নেই ;—আধুনিক জগৎ রস-সন্ধানের ভিতর দিয়ে নূতন-নূতন তথ্য পাওয়ার মন্ত্র লাভ করেছে।

রসতত্ত্বের জটিল কথা পরে উত্থাপন করব ; আপাততঃ রসতথ্যের কথা হোক্। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি মানুষের এমনি একটা অফুরন্ত উৎস হতে দীপ্ত হয়েছে যে, তাতে বিচার ও তর্কের অগণ্য খণ্ডতা কূল পায় না। মানুষ যেখানে অখণ্ড—মানুষ যেখানে সংহত—সেই অনাদ্যন্ত কূল হতে চিত্তের মাঝে স্বতঃ-দীপ্ত হয়ে থাকে সুন্দরের সৃষ্টি। তাকে বেনেডেটো ক্রোশ এজন্য বলেছেন 'a priori'। তা দেশ-কালাতীত চিত্তোৎস হতে উৎসারিত হচ্ছে। এই সমগ্রতার উপর নিহিত ও মুকুলিত হয়েছে বলে' তার এমন একটা সার্থকতা এ যুগে

দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে, মনে হয়, যে যুগ "আস্‌ছে", সে যুগের একটা বড় রকমের Synthesis বা ভাব-সমন্বয় এই রসাস্বাদ ও রসসৃষ্টির নিবেদন হ'তেই সম্ভব হবে।

একটি কবিতা, একখানি চিত্র বা মূর্ত্তি—এ সব দেখ্‌বার দুটি দিক্‌ আছে। একটা হচ্ছে বিশুদ্ধ কলা বা সৌন্দর্য্যের দিক্‌; আর একটা মিশ্র দিক বা জ্ঞানের দিক। এতকাল মিশ্র দিক হ'তেই চিত্র ও কলাদির বিচার হয়ে এসেছে। ললিতকলার কাঁধে ধর্ম্ম, নীতি, তত্ত্ব প্রভৃতির গুরু ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এজন্য কোন আধুনিক আলোচক চিত্রকলা সম্বন্ধে স্পষ্ট বলেছেন :—"Painting has been a bastard art—an agglomeration of literature, religion, photography and decoration. The efforts of painters for the last century have been devoted to the elimination of all extraneous considerations to making painting as pure as music." সমস্ত কলা সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। যা'কে মিশ্র দিক্‌ বলছি,—যা'কে Croce "practical" দিক্‌ বলেছেন, তা'তেও সৌন্দর্য্য-সম্পর্কের সার্থকতা এতকাল সুস্পষ্ট হয়নি। নানা অলি-গলির ভিতর দিয়ে এলোমেলো ভাবে তা'র বিচার হয়েছে। কিন্তু গত দশ বছরের ভিতর সৌন্দর্য্যানুশাসনের একটা বড় রকম অন্যায় আবিষ্কারের পথ অনেকটা পাওয়া গেছে। রসসৃষ্টির পদাঙ্কগুলি অনুধাবন করলেও যে এক আশ্চর্য্য বার্ত্তা পাওয়া যেতে পারে, তা কিছুকাল পূর্ব্বে কেউ কল্পনাও কর্ত্তে পারে নি। শুধু সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ভাব প্রকাশ কর্ত্তে গেলে, তা' উচ্ছ্বাসে পরিণত হ'তে পারে। আপাততঃ সে চেষ্টা কিছুকাল স্থগিত রেখে দেখা যাক্‌—এই নীলাকাশসঞ্চারী বলাকা-প্রবাহের মত অকেজো সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ধারা এ যুগে একটা বিপরীত ও অচিন্তিত পথে কি অদ্ভুত রকমের ভাব-বিপ্লব উপস্থিত করার উপক্রম করেছে।

কিন্তু তার আগে একটা কথা বল্‌তে হয়। সেটা হচ্ছে জ্ঞান, বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও তর্ক প্রভৃতির ভিতর দিয়ে এতকাল মানুষ অগ্রসর হয়েও, সৃষ্টি সম্বন্ধে ভাল রকমের বোঝাপড়া কর্ত্তে পারে নি। পরলোকের কথা ছেড়ে দিই। ইহলোকের ভিতরই যে সমস্ত উৎপাত উপস্থিত হয়েছে, তা'তে বর্ত্তমান সভ্যতার যাঁরা শ্রেষ্ঠ ভাবুক, তাঁরা হেঁটমুখ হয়ে গেছেন। নীতি ও ধর্ম্মের এত হিতোপদেশও বর্ণ ও জাতিগত উগ্র বৈষম্যকে কোন সুশীতল পাদপীঠে স্থাপন কর্ত্তে পারেনি—বরং তা' বেড়েই চলেছে। এবার সৌন্দর্য্যোপাসকের দিন এসে পড়েছে—এবার রস-সৃষ্টির ডাক্‌ পড়্‌বার সময় হয়েছে। নানা দিকে নানা ভাবে তা' কিরূপে অগ্রসর হচ্ছে, তা' শোন্‌বার সময় হয়েছে!

বর্ত্তমান দুনিয়ার হৃদ্‌-স্পন্দন যেখানে হচ্ছে, সেই য়ুরোপে কিছুকাল হ'তে এ রকমের একটা ভাব-বিপ্লব এসেছে। দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—তা'তে ভবিষ্যতের ছায়া কতকটা পড়েছে। তাত্ত্বিকগণের মধ্যে যিনি আধুনিকতম, তিনি সৌন্দর্য্য-সংস্কারকেই মানুষের আদিম ও সর্ব্বাভিভাবী ব্যাপার বলে বলতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর মতে সৃষ্টি—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি—expression—সহজ-সংস্কার-জাত ব্যাপার—তা' মনের ইতিহাসের আদ্যাবস্থা;—তর্ক, বিচার, philosophy হচ্ছে তার পরবর্ত্তী। এটাকে তিনি একটা আধুনিক আবিষ্কার বল্‌তে চান :—"We have lost the consciousness of our aesthetic activity; the other activities, in particular those which are practical and of those which are practical in particular, those which are economic have so overlaid the aesthetic activity that though fresh in the ideal history of mind, it is last in the order of scientific discovery. Aesthetic Science is the latest comer, the last discovery of Philosophy." তত্ত্বের দিক্‌ হ'তে রস-সমস্যা এরূপে একটা নূতন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করার চেষ্টা কচ্ছে। অপর দিকে, যাঁরা রস-সৃষ্টি কচ্ছেন, তাঁরাও সকল রকমের ভৌগোলিক বিচ্ছেদ ও স্বাতন্ত্র্যের বাধা চূরমার করে দিচ্ছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় আর্ট চৈনিক, জাপানী, পারসী, এমন কি নিগ্রো আর্টের সঙ্গে পরম আত্মীয়তার সঞ্চার করেছে—যা য়ুরোপের পক্ষে অন্য প্রসঙ্গে কখনও হয় নি। নিগ্রো আর্টকে আধুনিক মাতিস [Matisse]-প্রমুখ শিল্পীরা যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করেছে, তা' দেখে মনে হয়, বিশ্বময় যদি কেবল ভাবের সুকুমার বন্ধন সম্ভব হয়, তবে

তা' ললিতকলাই সম্ভব কর্‌বে—মানুষের সৌন্দর্য্যানুরক্তিই তাকে চরম মুক্তির পথ দেখাবে।

যাঁরা প্রত্নতত্ত্ববিদ্, তাঁদের হাতেও কাব্য ও কলা নূতন-নূতন পথ উদ্ঘাটন করে' এক নূতন মর্য্যাদা পাওয়ার অধিকারী হয়েছে। অনেক বিচার ও বিতর্কের বিষয় সম্বন্ধেও সুন্দর মীমাংসা আরম্ভ হয়ে গেছে। এইজন্য বিশেষ ভাবে বলা যায়, এ যুগে সৌন্দর্য্যের ডাক্ এসেছে;—রসের নিবেদন একালে অপূর্ব্বভাবে সার্থক হয়ে' উঠ্‌ছে।

নানা দেশের ও নানা সভ্যতার হৃদয়-তত্ত্ব খোঁজা ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের একটা প্রধান সমস্যা। তাম্রশাসন, খোদিত-লিপি, ইতিহাস, দর্শন ঘেঁটেও অনেক সময় জাতির হৃদয়-কথা পাওয়া যায় না। নানা রকম বৈপরীত্য প্রতি পদে বিচারকে নানা জায়গায় কণ্টকিত করে' তোলে। এজন্য আজ-কাল রসসৃষ্টির ভিতর দিয়ে কাব্য ও কলার পথে সভ্যতা অধ্যয়নের নিপুণ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। কাব্য ও কলায় মানুষ চিত্তকে, হৃদয়-বেদনা ও স্বপ্নকে অর্গলহীন ভাবে নিবেদন করেছে। এজন্য সে পথে বিপ্রলব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম। মানুষের সহজ সংস্কারের ভিতর দিয়ে আনন্দে যা বিগলিত হয়েছে, তার সাক্ষ্য অতি নিশ্চিত বল্‌তে হবে। কিন্তু এ সব অধ্যয়নের প্রণালী এতকাল আবিষ্কৃত হয় নি।

ভারতবর্ষের উদাহরণ দিই প্রসঙ্গতঃ। পরে আরও দিতে হবে। তিনটি জার্ম্মাণ ভাবুক বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষকে অনুধ্যান করেছিলেন—তাঁরা হচ্ছেন, সোপেনহোর, গোটে ও হেয়ারডেয়ার। তিনজনেই ভারতের প্রাণতত্ত্ব সন্ধান করেছিলেন। তার ভিতর সোপেনহোরের কথা আপনারা জানেন। উপনিষদের তত্ত্ব ও কাব্য তাঁর Philosophy of Willকে কতটা জন্ম দিয়েছে, তার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। উপনিষদের সম্পর্ক ছাড়া তাঁর পক্ষে thing-in-itselfকে will বলে কল্পনা করা সম্ভব হ'ত কি না, সে আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় হচ্ছেন গোটে। তিনি কাব্যের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষকে যতটা বুঝতে পেরেছিলেন, একালের পণ্ডিতদের পক্ষেও তা সম্ভব হয় নি।—সে আলোচনার স্থান নেই। আমি শুধু হেয়ারডেয়ারের একটা উক্তি উদ্ধৃত করব। তিনি রসবিদের মতই বলেছিলেন:—"Do you not wish with me that instead of these endless religious books of the Vedas, Upavedas etc., they would give us the more useful and more agreeable works of the Indians and specially their best poetry of every kind? It is here the mind and character of a nation is best brought to life before us; and I gladly admit that I have received a truer and more real notion about ancient Indians from this one Sakuntala than from all their Upanishads and ভাগবতs."

আশা করি, কেউ এ কথাটিকে একটা অত্যুক্তি মনে কর্‌বেন না। সকল দেশ সম্বন্ধেই এ কথাটি খাটে।

যতদিন মিশরের জীবন-তত্ত্ব Book of the Dead বা Book of Gates ঘেঁটে বের করার চেষ্টা হয়েছিল, ততদিন অতি সামান্য জ্ঞানই লাভ করা গেছে। মৃত্যুমৌলিক দেববাদ মিশরের চিত্তকে চিরকাল একটা দুর্ভেদ্য অন্ধকারে রেখে এসেছে। কিন্তু মিশরীয় আর্ট আলোচনা করে' অনেক নূতন তথ্য, নূতন আলোক পাওয়া গেছে। সাহিত্যেও মিশরের মূর্ত্তি অনেকটা ধরা পড়েছে। Adventures of Sa-nehet, Tale of the two Brothers পড়ে দেখা যায়, এ জাতি যতদিন অজ্ঞাত ছিল—দূরে ছিল—ততদিন, বড় বলে' লোকের একটা ভ্রান্তি ছিল, কাছে এসে' তা' আজ ছোট হয়ে' পড়েছে। ব্যাবিলন ও এসিরিয়া সম্বন্ধে বিপরীত ব্যাপার ঘটেছে—তা কাছে এসে বড় হয়েছে। মিশর সম্বন্ধে সাহস করে' এজন্যই কোন পণ্ডিত বলেছেন:—"There is something greater in a single canto of Homer, in a single tragedy of Aeschylus or in one single hymn of Pindar than in the whole literature of Egypt."

মিশরের সাহিত্যে মন্ত্রতন্ত্রাত্মক মৎলব প্রচুর। ও-সবকে ধর্ম্মের পাথেয় করা হয়েছে, সৌন্দর্য্যের বা ভাবের ধারা ওখানে সহজে মাথা তুল্‌তে পারে নি। চিত্র ও তক্ষণ-কলার এত প্রাচুর্য্য খুব কম জায়গায় পাওয়া যায়।

কিন্তু ও-সবের পেছনে গূঢ় সঙ্কেত ও মৎলব আছে; ও-সব পরলোককে লক্ষ্য করে, পরলোকের বিভীষিকা হ'তে মুক্তির জন্য রচিত হয়েছে। মন্দিরের দেয়াল, কবরস্থান, শবাধার প্রভৃতিতে যেন দাবানল লেগেছে; আক্ষরিক লিপির প্রাচুর্য্য তাকে আরও ভারগ্রস্ত করেছে। তার উপর অনুশাসনও বাদ যায় নি। কবরের মৃত্যু-গ্রন্থের সংখ্যাও সামান্য নয়। এসব এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের জন্য অদ্ভুত আয়োজনের কাণ্ডে পর্য্যবসিত হয়েছে।

যতদিন এসবের মর্ম্ম-কথা আর্টের ভিতর দিয়ে কেউ গ্রহণ করে নি, ততদিন সকলে ভেবেছে মিশরের চিত্ত বুঝি ঐ পিরামিডের মতই মহত্ত্বে আকাশস্পর্শী। শুধু অল্পদিন হল, সৌন্দর্য্যবিধির পদাঙ্ক অনুসরণ করে' দেখা গেল, পিরামিডের অন্তস্তলে গুপ্ত ক্ষুদ্রতম নিভৃত কক্ষের মত অতিকায় মিশরের ভয়-কম্পিত চিত্তটি অতি ছোটই ছিল।

ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যা'র সম্বন্ধে এ রকমের বোঝাপড়া, যাকে সংক্ষেপে decorative দিক হ'তে অধ্যয়ন বলা যায়, হয় নি। জাপান ও চীনের মর্ম্ম-কথা অধ্যয়নের অনেক সুস্পষ্ট পথ আছে—অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ আছে—যদিও ললিতকলার দিক হ'তেও ভাল রকমে চর্চ্চা দেখা সেখানেও প্রয়োজন; Amidists shinshu, Nichiren ও Zen প্রভৃতি ধর্ম্মশাখার ভিতর দিয়ে এ জাতিটি কি ভাবে অগ্রসর হয়েছে—ইতিহাস ও তত্ত্বের পর্য্যাপ্ত নমুনা তা অনেকটা প্রকাশ করেছে। কিন্তু তা'ও যে সকলের মনঃপূত হয় নি, তা' আধুনিক ভাবুক ওকাকুরা প্রভৃতির গ্রন্থ হতে দেখা যায়। এ সব লেখকেরা আর্টের দোহাই দিয়ে জাপানের চিত্ত-কথার একটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওকাকুরার চেষ্টাও একটা কল্পকেলি; আধুনিক আর্ট ও কাব্যের মর্ম্মানুসারে প্রাচ্য শিল্প অধীত হওয়া এখনও বাকি আছে। অবশ্য জাপানের হৃদয়-তত্ত্ব জানা সে বিচারের অপেক্ষা কচ্ছে না,—নানা দিক্ হ'তে তা পরিস্ফুট হয়েছে।

চৈনিক চিত্ত অপেক্ষাকৃত দুর্জ্ঞেয় হলেও, দুঃসংস্কারের প্রাচুর্য্য হতে চীনকে চেনবার পথে তেমন কোন কাঁটা পড়েনি। ভদ্রবেশী কনফুসিয় ধর্ম্ম ও রহস্যাত্মক Taoismএর উপর বৌদ্ধধর্ম্ম একটা বিরাট দেববাদ ও ধর্ম্মসংগ্রহ উপস্থাপিত করে, দেশটাকে একটা ঐক্য দেওয়ার চেষ্টা করে' ব্যর্থ হয়েছে। মন্দিরে বৌদ্ধ-দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে; কিন্তু উপকণ্ঠের ক্ষুদ্র দেবশালায় Taoist ছোটখাট দেবতারাও আসন পেয়েছে। কিন্তু রহস্যাত্মক মধ্যএসিয়া-রঞ্জিত বৌদ্ধধর্ম্ম ও Taoism যে চীনের হৃদয়ে আসন পেয়েছে, তা'র প্রমাণ হচ্ছে উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতির মূলে এই দুইটি ধর্ম্মই বারি সেচন করেছে। Dream of the Red Chamber, Strange Stories from Chinese Studio প্রভৃতিতে তা দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের নূতন উদ্যমে ও কলরবে চীনের প্রাচীন কালের শিল্পধারা সম্ভব-মত লুপ্ত হয়ে গেছে। তার প্রমাণ হচ্ছে, বিটিশ ম্যুজিয়মে রক্ষিত Kukaichir (কুকাইচির) বিখ্যাত roleএ ভারতীয় প্রভাব দেখা যায় না।

এ চৈনিক চিত্ত বোঝবার শিল্পাত্মক ছাড়া অন্য উপকরণও প্রচুর রয়েছে। ইতিহাস-তত্ত্ব-সংগ্রহের ব্যবস্থা ভারতবর্ষ হ'তে সেখানে অনেক বেশী। অতি প্রাচীন কালেও সেখানে ম্যুজিয়ম ও খোদিত-লিপির বিধিবদ্ধ সূচী পাওয়া যায়। কোন লেখক বলেন, "Quite apart from European influence the Chinese produced several centuries ago Catalogues of museums and descriptive lists of inscriptions—works which have no parallel in India" এজন্য চীনকে অধ্যয়ন করা তেমন দুঃসাধ্য নয়। অন্ততঃ চৈনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতের মত মতের প্রবল বৈপরীত্য দেখা যায়নি। কিন্তু, তবুও বিচার সেখানে এখনও অনেক বাকি আছে। Yang Wen Hui (ইয়াং-ওয়েন হুই) রচিত গ্রন্থের যে অনুবাদ Hackmann করেছেন, তাতেও এ অসম্পূর্ণতা দেখা যায়। সুংমেন (Tsungmen) সম্প্রদায়, বোধিধর্ম্মের সম্প্রদায়, সিওমেন (Chiao-men) সম্প্রদায়, ইয়েন টাই (Yien Tai) সম্প্রদায়, ফা সিয়াং (Fa Hsiang), লু সাঙ, (Lu Tsung) মন্ত্রযান সম্প্রদায়ের পরিস্ফুট মতামতের ভিতরে যে বিরোধ আছে, তার ভিতর চৈনিক চিত্ত কিরূপ বিশিষ্ট ভাবে মুকুলিত হয়েছে, তার আলোচনা এখনও হচ্ছে।

এ-সবের একটা না একটা কূল মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তা একেবারে বলা যায় না।

ভারতের সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, ও ইতিহাসের আলোচনা বহুকাল হ'তে সুরু হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যান্ত ভারতবর্ষের 'কালচারে'র কোন সুসম্বন্ধ পরিমাপ হ'তে পারে নি। এদেশ প্রাচীন বলে নয়,—চীন, মিশর প্রভৃতি হয় ত আরও প্রাচীনতর দেশ অনেক আছে। সে সব দেশের মনের যে বিশিষ্ট আকার,যা'কে প্রসঙ্গতঃ Categories of thought বলতে পারি,—তা অদ্ভুত ও অপরিচিত—সুদূর ও দুর্গম। কিন্তু তা বলে সে সব দেশের প্রাণ-কথার আলোচনা কর্ত্তে পণ্ডিতদের পদে-পদে এখনও প্রতিহত হ'তে হচ্ছে না।

আমি এ প্রসঙ্গে শুধু বলব, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সমস্যা এখানে শেষ হয়নি,—সুরু হয়েছে মাত্র। আরও কয়েকটা বড় দিক থেকে ভারতবর্ষকে দেখ্‌তে হবে। স্থানান্তরে সে বিচারের সূত্রপাতও করেছি। স্পষ্টই এ কথা বলা চলে, ভারতবর্ষের Culture ও তদের সমন্বয়োগের চারু বৈচিত্র্য উদ্‌ঘাটনে আকাশতত্ত্ব যতটা সাহায্য করবে, আর্কিও-লজি বা ঐতিহাসিক অনুশাসনের স্তূপীকৃত বিচ্ছিন্ন সংগ্রহ তার চেয়ে বেশী নয়। এজন্য ভারতবর্ষের Culture history আজকার দিনে এতটা ফাঁক ও শূন্যগর্ভ। অথচ, সাহিত্য ও শিল্পে, কলা ও কাব্যপ্রভৃতিতে এত অসংখ্য উপকরণ পৃথিবীর কোন জাতিই রেখে যায় নি। এত বিচিত্র ও ললিত উপকরণ সত্ত্বেও, এত অসম্যক বিপরীত ও অদ্ভুত উক্তি পণ্ডিতদের মুখে শোনা যায় যে, সে সব পরস্পর-বিরোধী না হ'লে, সকলকেই বিপ্রলব্ধ হ'তে হ'ত। কিন্তু এ রকম হওয়ার কারণ হচ্ছে, ঠিক জায়গায় কারও সন্ধান পৌঁছায় নি। ভারতবর্ষকে আধুনিক সৌন্দর্য্যবিধির দিক থেকে অধ্যয়নের কোন চেষ্টাই হয় নি।

ভারতবর্ষের আদিতম সাহিত্য শুধু গীতিতে নয়, নাটকেই আবদ্ধ হয়েছে। সিলভাঁ লেভি ও Schrode প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে, ঋক্‌বেদের যম ও যমী, পুরুরাজ ও উর্ব্বশী প্রভৃতির কথাবার্ত্তা নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কংশবধ ও বালিচন্দনের উল্লেখ আছে। এতে দেখা যায়, কলার ও কাব্যের ধারার সহিত এ দেশের জীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে—আদিতম কাল হ'তে। আমি পরে দেখাব যে, ভারতবর্ষে 'কালচারে'র প্রতিসন্ধিস্থলে এক রকমের একটা শাশ্বত যোগ ললিতকলার সঙ্গে আছে, দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

ভারতের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যেখানে কোন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা'তে কলাবিদ্যার একটা ধারা সব জায়গায় রয়েছে। অল্প দিন হ'ল Aureil Stein মধ্যএসিয়ায় Turfan, Kholai প্রভৃতি জায়গায় অজস্র পুঁথিপত্র ও শিল্পসংগ্রহ আবিষ্কার করেছেন। তা'তে দু'রকমের প্রমাণ সাম্‌নে পাওয়া যায়; একটা হচ্ছে ভাষাগত, দ্বিতীয় হচ্ছে কলাগত। Ming-oiতে প্রাপ্ত তালপাতার পুঁথিতে নূতন ও অজ্ঞাত প্রাকৃত ভাষার খোঁজ আবিষ্কৃত হ'ল—তা বুঝ্‌তে দেরী হ'ল না। যে দুটি নূতন ও আশ্চর্য্য ভাষা বেরোল—Nordarisch ও ডোখারিয়ান,—একটি অনেকটা ইরান ও ভারতীয় ভাষার সংযোগের ফল, অন্যটি ল্যাটিন, গ্রীক, কেলটিক ও স্লাভনিক প্রভৃতির সংযোগের ফলে উৎপন্ন। তাদের গুঞ্জন বেশী দিন অনুক্ত থাকতে পারে নি।

কিন্তু কলার পরিচয়ই মুস্কিল, ওখানে এসেই সব ঠেকছে। সিলভাঁ লেভি যতক্ষণ এ সব ভাষা ও উপ-করণের অদ্ভুত গ্রন্থি রচনা করবেন, ততক্ষণ মুগ্ধ হয়ে শুনব। যতক্ষণ তিনি অন্তর্নিহিত প্রমাণে বল্‌বেন অনেক মহাযান সূত্র মধ্যএসিয়ায় লিখিত বা সম্পাদিত, কারণ সূর্য্যগর্ভসূত্রে খোটানের গোশৃঙ্গ পর্ব্বতের স্তব আছে, ততক্ষণ নিশ্চল থাকব। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি বল্‌বেন, বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী ডোখারীয় দেবতা, ওখানেই তাঁর আবির্ভাব, তখনই একটু চঞ্চল হ'তে হবে;—কারণ, আর একরকমের প্রমাণ বা অনু-মান অর্থাৎ কলা ও সৌন্দর্য্যশাসনের—সেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে খটকা তুলবে।

এই সৌন্দর্য্যশাসনের বার্ত্তা তাম্রশাসনকে প্রতি পদে তুচ্ছ করেছে। রস-সৃষ্টি ও রসোপলব্ধির একটা ব্যাপক প্রভাব আছে, যা কোন দেশ বা কাল সম্বন্ধে কোথাও কৃপণতা করে নি,—যা নিঃশব্দ অনুরাগে মানুষের অন্তঃপুর পূর্ণ করে আছে। তা'কে বুদ্ধির শাণিত সূত্রে বারবার বিধি দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে; কারণ, তা' কোন বাঁধন মানে নি। সাগরের ঊর্ম্মিভঙ্গ বেলায় ছাপিয়ে পড়ে' নানা বিচিত্র আলপনা এঁকে দেয়—তাকে জ্যামিতি বা

মন্ত্রে শাসন করা চলে না ; অথচ, তারই ভিতর একটা স্বতঃসিদ্ধ সৃষ্টিশাসন থাকে তাতে অনেক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করা যায়। তেমনি সৌন্দর্য্যের সহজ বিগলিত অন্তঃপুরের কারুতা জীবন-যাত্রার সমস্ত জটিল তত্ত্বকে এক গূঢ় ঐক্যের ভিতর পরম সমন্বয় বিধান করে। এ সমন্বয় লক্ষ্য ও অনুধাবন করার দিন এতকাল পরে এসেছে।

সৌন্দর্য্যের ডাক এসেছে। যারা য়ুরোপের কাব্য ও কলার আধুনিক উন্মেষভঙ্গ সম্বন্ধে কিছু জানেন, তাঁহাদের বল্‌তে হবে না— কতবড় বাধা ঠেলে তা বিরাট জগৎকে একাত্মক ভাবপীঠে টেনে এনেছে। রাষ্ট্রীয় কূটনীতি ও খণ্ড-বিপ্লব, বিশ্বময় সংহারের ও আত্মঘাতের শাণিত স্বার্থপরতা ভেদ করে' তা' কি উপায়ে সকলকে একটা বড় জায়গায় টেনে এনেছে— যে জায়গায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমের, বর্ণ বা বিবর্ণের ভেদ নেই— তা ভাবতে গেলে বিস্মিত হ'তে হয়।

যে মুহূর্ত্তে য়ুরোপে পরম স্বার্থবুদ্ধি রাষ্ট্রদম্ভের ভিতর দিয়ে বিশ্বময় অর্থলোলুপ চোখ ঘুরিয়ে সব জায়গায় ঝগড়া সুরু করেছে—নিগ্রোকে নিপাত করেছে, চীনকে আফিং খাইয়েছে, পারস্য তুরস্ককে বেকায়দায় জব্দ করে' তাতে শৃঙ্খল দিয়েছে, সে মুহূর্ত্তে মাতিসের মত রসানুধ্যায়ী নিগ্রো আর্টের বিভ্রম-বিলাস পরম আগ্রহে অধ্যয়ন করেছে— গোগ্যা তাহিতি দ্বীপে ঘুরেছে। পলিনেশীয়, পেরুভীয়, মেক্সিকো আর্টেরও রস-সন্ধান হয়েছে—কোন ভূতত্ত্ব বা রাষ্ট্রতন্ত্রের খাতিরে নয়— সৌন্দর্য্যের বিশ্বব্যাপী সগর্ব্ব আহ্বানে। শুধু তা নয়—গ্রীক, মিশর, চৈনিক ও ভারতীয় আর্টের অপেক্ষাও অধিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা এ-সব তথাকথিত বর্ব্বর কলার ভাগ্যে ঘটেছে। মাতিস্ বিনীত ভাবে নিগ্রো কলা হ'তে অনেক আশ্চর্য্য তথ্য পেয়েছে— এ যুগের গর্ব্বস্ফীত কোনও শাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্ এ জাতির কাছে এখন মাথা নত কর্ত্তে ত শেখে নি। কিন্তু সৌন্দর্য্যের ডাক—রসের নিবেদন মানব-হৃদয়কে এ রকম অমলিন রূপ-লোকে আকৃষ্ট কর্ত্তে পারে যে, যারা শুধু তত্ত্ব ও তর্ক, জ্ঞান ও গবেষণা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, তারা তা কল্পনাও কর্ত্তে পারে না। শুধু মাতিস্ নয়— এ যুগের অনেক আর্টিষ্ট নিগ্রো আর্টকে মৌচাকের মত ঘিরে আছে। কোন লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "The abstractness of Negro sculpture, its bending of all human forms to an ornament, its archaic rigidity which is the antithesis of fluent movement—these are the qualities which have gripped the imagination of modern artists."

এ বিচিত্র হৃদয়-বিরূপতা এ যুগের একটা আত্মবিরোধ (Antithesis) হইতে জন্মলাভ করেছে। য়ুরোপের বড় ছোট সকলেই চীনকে mailed fistএই হোক, ঋণদান করেই হোক, উত্তরোত্তর অসহায় ও কাবু করার ব্যবস্থা করে। যখন চীন জব্দ হয়েছে মনে হল, তখন দেখা গেল, য়ুরোপের সমস্ত শিল্প ও কাব্য টিকি না চাবুক Yellow হয়ে গেছে। এটাই যথার্থ Yellow Peril (আলখোল্লা)। য়ুরোপের সৌন্দর্য্য-উপাসকরা চীনের চরণে লুণ্ঠিত হওয়া পরম সৌভাগ্য মনে কচ্ছে! রাঁনোয়া, গোঁগা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ চৈনিক আর্ট য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে Kandenskyতে সিংহাসন পেতে বসেছে। তত্ত্ব ও রসের যোগ বিধানকল্পে Kandensky আধুনিক কলা-মন্দিরে চৈনিক পতাকাই উড়িয়েছে। বিজেতার রাজসভায় লাঞ্ছিত বন্দীর কণ্ঠে জয়মালা দিয়ে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী স্বয়ম্বরা হ'তে কুণ্ঠিত হন নি।

ঘটনা হিসাবে ইহাকে সামান্য মনে করব ; কারণ, আরও বিপুল কাজ কাব্য ও কলাগত সৌন্দর্য্য-শাসন সম্ভব কচ্চে। এতদিন সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির ভিতর দিয়ে জাতির আনন্দ ও আর্টকে পণ্ডিতেরা অনুধাবন করেছেন ; কিন্তু ঠিক উল্টো পথে যাওয়ার সময় এসে পড়েছে। অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-রচনা ও সৃষ্টির আলোকে এবার সমস্ত তথ্যানুসন্ধানকে—সমস্ত খণ্ড, ভগ্ন ও জীর্ণ জ্ঞান-সংগ্রহকে সোনার কাঠির মত স্পর্শ কর্ত্তে হবে। এ কাজ সামান্য রূপে পশ্চিমে সুরুও হয়েছে।

সমগ্র বিশ্বের বহুধা বিকীরিত সংজ্ঞার অধ্যয়নের জন্য যে বিপুল বৈজ্ঞানিক আয়োজন মানুষ করে' তুলেছে, তাতে হঠাৎ মনে হয়, এ জাল ভেদ করে' কোন ঘটনা বা তথ্যের পালিয়ে যাবার যো নেই। সব কিছুই তার ভিতর ধরা পড়্‌বে, এবং তার পরে তাকে বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিতর এনে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানস্তূপের অঙ্গীভূত করা যেতে

পারবে। কিন্তু জ্ঞানের মূলে যে জ্ঞানী অহোরাত্র জাগ্রত আছে, তারই ভিতর এক বিরাট ও অপরিসীম অজ্ঞেয়তা আছে, যা' প্রতি মুহূর্ত্তে সমস্ত আয়োজন ও উদ্যোগ পণ্ড করে' তোলে। মানুষের প্রাণশায়ী সে পরম পুরুষ সীমা ও অসীমের বন্ধন-রজ্জুর অঞ্চল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাতে করে প্রতি পদে মানুষের উদ্যম, চেষ্টা, অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতাতে পরিণত হচ্ছে। এজন্য বিজ্ঞান যেমন অনেকটা রাজ্য উজ্জ্বল করে' তুল্ছে, তেমনি অজানার সীমারও নানা সন্ধান দিচ্ছে। অজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গড়ে' তুলতে হচ্ছে—তা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু তা'ও সামান্য ব্যাপার নয়। প্রাতিভাসিক জগতের উপাদান ও নিয়ম বিবর্ত্ত ও শৃঙ্খলিত না হ'লে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

এজন্য নানাদিকে নানাশাস্ত্র মানুষ গড়ে তুলছে, যাতে করে বিশ্বের বস্তু বা ভাবাবর্ত্তের একটা পরিমাপ হ'তে পারে। কিন্তু মানুষের খণ্ড চেষ্টার মহিমা যেমন জগৎকে আজ বিস্মিত ক'রে তুলছে,—দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ যেখানে অখণ্ডভাবে আত্মদান বা নিবেদন করেছে, তা' বিশিষ্ট আনন্দ দান করলেও সার্থকতা হিসাবে তেমন মর্য্যাদা পেয়ে উঠতে পারে নি। বিশ্লেষণ ও পর্য্যবেক্ষণে মত্ত মানুষ সহজেই যা' অবিভাজ্য ও অনাদি, তার সঙ্গে তেমন বোঝাপড়া কর্ত্তে চায় নি।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানুষ যা চায় নি, তা'ও বা কোথাও সৃষ্টির নিয়মে সৃষ্ট হয়ে এসেছে—কোথাও বা কাজের খাতিরে তা'কে তৈরী কোর্ত্তে হয়েছে,—তাকে তলব দিতে হয়েছে। আজকে তা'কে অবহেলা করা দূরে থাক্, তা'র প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ বলে' কোন-কোন বিষয়ে মেনে নিতে হচ্ছে। বিশেষতঃ যেখানে জটিল তথ্য সংগ্রহের বোঝা কূটবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের হাতে পড়ে নিত্য নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ কচ্ছে, তা'কে তলিয়ে দেখ্বার ভার পড়েছে আর্টের উপর—সৌন্দর্য্য-রচনার উপর—মানুষের লীলা-সৃষ্টির উপর। শুধু তা' নয়। এই সৃষ্টির অপরূপ লালিত্য যেমন দেশ-কালাতীত নিত্য সংস্কার হতে জন্মলাভ করেছে—তেমনি তা বহুধা ভগ্ন ও গলিত, ছিন্ন ও পীড়িত মানব-সমাজের ভিতর দেশ-কালের বন্ধনের দূরত্ব দূর করবার ব্রত অল্পকাল হ'তে গ্রহণ করেছে।

কলার কল্লোল অতীতের যে বার্ত্তা মুখরিত কর্চ্ছে, তা' মুছে ফেলবার যো নেই—তা'কে অস্বীকার করা চলে না। মানুষের লীলালোল হৃদয় যা রচনা করেছে—তা'র ভিতরকার বাণী এতকাল প্রচ্ছন্ন ছিল—তা'র ভিতরকার কোন বীজমন্ত্র এতদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি, যা'তে করে' নানা জায়গার কাব্য, কবিতা, গান, চিত্র ও মূর্ত্তি প্রভৃতির ভিতরকার কোন মোহনীয় বার্ত্তা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কিছুকাল হ'ল নানা সাধনা ও তপস্যায় সৌন্দর্য্যের বহুমুখী স্বরূপ-সংঘর্ষে হঠাৎ একটা দীপশিখা জ্বলে' উঠেছে, যা কবিকথিত সঞ্চারিণী আলোক-কণিকার মত নানা দেশের ধূসর ও অন্ধকার কলাকীর্ত্তির উপর এক আশ্চর্য্য ও অপরূপ জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করেছে। সে বার্ত্তা এখনও এদেশে এসে' পৌঁছে নি।

বাইরের নানা আনুষঙ্গিক ও অবিচ্ছেদ্য কারণেও কলা-বাহুল্যকে মানুষ সৃষ্টি করেছে। ধর্ম্মপ্রচারে শিল্পের সহায়তা প্রয়োজন হয়েছে, রাজ্য প্রচারে হয়েছে। কা'রও মতে বৌদ্ধধর্ম্মের এসিয়াব্যাপী প্রচারের মূলে আর্টের একটা বড় রকমের আনুকূল্য পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা প্রচারের জন্য কেবল পুঁথি হাতে করে দিগ্বিদিকে ছোটে নি, বুদ্ধের মূর্ত্তি ও জীবন-কাহিনী প্রচারের চিত্রাবলী ও মূর্ত্তি-সংগ্রহের ধারাও সঙ্গে নিয়ে গেছে। তা'তে করে চীন ও জাপানকে সহজে অভিভূত করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয় যতটা আর্টের, ততটা শাস্ত্রের নয়।

"And if Buddhism has conquered the whole of Asia as Christianity conquered the whole of Europe this is due to the fact that its missionaries who took their way to Korea and China as tradition tells us set off armed not only with sacred books but also images and idols."

খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসেও আরও গভীর জায়গায় আর্ট কাজ করেছে। খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে গোড়াকার তথ্য হচ্ছে যে, তা' সেমিটিক ও গ্রীক-রোমান ভাবের দ্বৈতের ভিতর প্রকাশ পেয়েছে। তাতে কোন্ ভাবটি বেশী কাজ করেছে, এ নিয়ে খুব একটা তর্ক চল্ছে।

এ ছটি অনুপ্রেরণায় গোড়াকার কথা হচ্ছে, সেমিটিজম্ মূর্ত্তিবাদের বিরোধী ও প্রতিকূল ছিল ; অথচ গ্রীকো রোমান ব্যাপার তা'র একান্ত পক্ষপাতী ছিল। গোড়াকার খৃষ্টধর্ম্মের ভিতর নানা প্রতীক ও রূপকের সঙ্কীর্ণ সীমায় খৃষ্টধর্ম্ম সন্দিগ্ধ ও একটা অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ বাইবেলের নানা ঘটনা ও খৃষ্টজীবনী নানা কীর্ত্তিকে প্রস্তরে উৎকীর্ণ ও পটে চিত্রিত করে প্যাগান ভাবের বিজয় ঘোষিত হয়। কারও মতে এই প্যাগানাত্মক শিল্পাণুকলা লাভ করাতেই খৃষ্টধর্ম্ম জগজ্জয়ী হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রীকো রোমান শিল্পানুপ্রেরণায় এবং সাহায্যে দৈ হিব্রুধর্ম্মের প্রভাবকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হতে অনেকটা নির্ম্মুক্ত কর্ত্তে পেরেছে, তাও আজকাল প্রমাণস্বরূপ বলা হচ্ছে।

"But plastic Art which forms the true and essential of separation between the Hebrew religion and the Christian religion at its first origin has not been brought into the field as an argument to give weight to the evidence of the influences of Greco-Roman civilisation."

বড় রকমের কয়েকটা কাজের দিক হ'তে বিশ্বময় এই যে কলার বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্ট হয়েছে, তাকে এতকাল আখ্যান, উপাখ্যান, তত্ত্ব ও তর্ক, সাহিত্য, নীতি, ধর্ম্ম হতে আলাদা করে দেখা সম্ভব হয় নি নানা কারণে। খৃষ্টের মূর্ত্তিধারা বা বোধিসত্ত্ব কল্পনার অশান্ত প্রাচুর্য্যের ভিতর aesthetic বা সৌন্দর্য্যগত লীলা কোথায় এবং তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক বা নৈতিক আখ্যানটি কি—এসব ভাল করে দেখবার ক্ষমতা সেকালের কারও জন্মে নি।

কিন্তু একালের সৌন্দর্য্যপিপাসুরা, কোন চিত্র বা মূর্ত্তির ভিতর শিল্পী কোথায় কতটুকু লীলাত্মক বিভ্রম সঞ্চার করেছে—কোথায় সে আড়ষ্ট হয়ে শুধু উপরিওয়ালার হুকুম তামিল করেছে- এসব বের করেছে। এবং তাতে করে নানা দেশের ধর্ম্মানুশাসন যেখানে মূর্ত্তি, প্রতীক, চিত্র, বা কাব্য প্রভৃতিকে উপায় স্বরূপ গ্রহণ করেছে—তা পরীক্ষা করে কলার দিক হতে এক আশ্চর্য্য আলোকপাত করেছে। তাই আজ প্রত্নতাত্ত্বিকগণও তাম্রশাসন ছেড়ে সৌন্দর্য্যানুশাসনের প্রভাবে বিশ্বময় বিপুল আবর্ত্তে ঝড়ের মত ছুটেছে। এটা যে আধুনিক কালে একটা বড় অধ্যায়, তা' যাঁরা পশ্চিমের প্রত্নতাত্ত্বিকগণের নানা প্রচেষ্টার বিষয় জানেন, তাঁদের অগোচর নেই।

এদেশে অনেকেরই বিশ্বাস, গ্রীকশিল্প বা গ্রীকধর্ম্ম বুঝি বা হঠাৎ একটা যায়গায় তৈরী অবস্থায় পক্ক বেলের মত ঝরে' পড়েছে। গত দশবছরের ভিতর গ্রীকজাতির আদিম ইতিহাস ও তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে এত নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, সে সব গুছিয়ে নিতে বোধ হয় এখনও অনেক দেরী হবে। ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করে সুদূর অতীতের একটা কালচার মিশর, ব্যাবিলন, পারস্য ও আদিম গ্রীক্ জাতির ভিতর একটা অবশ্যম্ভাবী সামাজিকতার সূত্রপাত করেছিল। মিশর ও ব্যাবিলন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে Aegean বা Natidan একটা আশ্চর্য্য সভ্যতার নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে, যাকে সংক্ষেপে এখন Mycenaean civilisation বলা হয়। Peloponessus, Attica, Thessaly, Troad, Sporades, Cyclades, Crete প্রভৃতি জায়গা উৎখাত করে এ খবর নিশ্চিত ভাবে পাওয়া গেছে।

যা' কিছু লিখিত পুঁথিপত্র বা খোদিত ফলক প্রভৃতি পাওয়া গেছে,- যতটা জানি, তার এখনও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। এখনও তা নির্ব্বাক অবস্থায় আছে। কাজেই ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের সাহায্যে এ জাতির মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন কর্ত্তে হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, তা'ও কি সম্ভব? ছচারিটি ছবি বা মূর্ত্তি দেখে কি একটা জাতির theology বা mythology গড়ে' তোলা যায়? কিন্তু তা' হয়েছে। শুধু এ জাতি সম্বন্ধে নয়,—অন্যান্য প্রাচীন জাতি সম্বন্ধেও। এমন কি অনেক প্রাচীন জাতি সম্বন্ধে একালের অনেক ধারণা এই নূতন পথে বিপর্য্যস্ত কর্ত্তে হয়েছে।

মাইকিনীয় শিল্পের উদাহরণ দিচ্ছি। এ শিল্পে দেখা যায়, যদিও গ্রীক্ সভ্যতা মাইকিনীয় সভ্যতার পরবর্ত্তী এবং অনেকটা উত্তরাধিকারী স্থানীয়, তবুও এ ছইটী জাতির ধর্ম্ম ব্যবস্থা কলা-প্রমাণ হতে একেবারে বিপরীত বলে নির্ণীত হয়েছে।

মাইকিনীয় দেবতা প্রতীক ও রূপকরূপী। তাতে বোঝা যায়, এ জাতি অনেকটা অধ্যাত্মবাদী ও অরূপধর্ম্মী,—রূপধর্ম্মী ও anthropomorphic গ্রীক্ জাতির সঙ্গে এ জাতির

এক্ষেত্রে কোন সমান ভূমিই নেই। প্রোফেসর রাইসেল (Reichel) মাইকিনীর 'শূন্য সিংহাসন' রচনা সম্পর্কে এ জাতির অদৃশ্য দেবতানুরক্তি প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে চান। মিঃ Evansএর মতে মাইকিনীয় স্তম্ভগুলি দেবতার রূপস্থানীয় কিছু। কিন্তু দ্বিমুখ কুঠার bilobale shield গাছ স্তম্ভাসীন পাখী এসবে এ জাতিকে স্পষ্টই অধ্যাত্মধর্ম্মী বলে মনে হয়। মিশর বা গ্রীসের মত জড়বাদী বা materialistic মনে হয় না। Haghia Triasa Sarcophagus এবং মাইকিনীয় স্বর্ণাঙ্গুরীয়কে এসব পাওয়া গেছে। Krossosএ যে সোণার আংটি পাওয়া গেছে, তাকে কোন একটা যজ্ঞানুষ্ঠানের শিরোদেশে ভগবানের অবতারের বা Theophaniaএর একটা ছায়ামূর্ত্তি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পণ্ডিতেরা আরও অন্যান্য শিল্পসংগ্রহ হ'তে এ রকম প্রমাণ পেয়েছেন, যাতে এ জাতিকে ভোগধর্ম্মী, ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ বা জড়বাদী বলা যায় না।

এসবকে totemestic বলার যো নেই। কারণ জন্তু প্রভৃতি বা গ্রহনক্ষত্র যেখানে দেবতা হয়ে থাকে, সেখানে ও'রকম কল্পনা চলে;—কিন্তু যা মানুষের নিজের হাতের তৈরী জিনিষ, তা' নিয়ে ও-রকমের কল্পনা চলে না।

তাছাড়া পশু-রচনায়ও এ জাতিকে ভীতিনক্ত অধ্যাত্মবাদী মনে হয়। মিশরের দেবতারা পশুমুখী বা Theriomorphic,—সে সব দেবতা বলে' অলঙ্করণস্থানীয় বা decorative করা সম্ভব হয় নি মিশর আর্টে। শিল্পী আড়ষ্ট হয়ে ভীতচিত্তে সে সবের কোন রকম পরিবর্ত্তন, বর্জ্জন বা বর্দ্ধন কর্ত্তে পারে নি—কলার কোন লীলাই তাতে সম্ভব হয় নি। কোন লেখক সংক্ষেপে বলেছেন :—

"Egyptian Art does not know the beast as an element of decoration—it has never been able to forget that its gods were chiefly animal. Michaenian art on the other hand has a predilection for the figures of the animal and treats it exclusively as a subject of decoration—it sees in the beast a subject for representation not an object of adoration."

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মাইকিনীয় সভ্যতার মৌলিক অনেক তত্ত্ব এরূপভাবে পাওয়া গেছে, যা' পুঁথিপত্রে পাওয়া সম্ভব ছিল না। যেখানে ধর্ম্ম বা আচারের ফরমায়েস তীব্র ও দুর্লঙ্ঘ্য হয়, সেখানে শিল্পী সহজে দৃষ্টির সৌন্দর্য্যসম্ভারের সহিত সহজ সম্পর্ক স্থাপন কর্ত্তে পারে না। শিল্পীকে ভয়ে-ভয়ে অগ্রসর হতে হয়:—যে দেবতাকে ভয় কর্ত্তে হয়, তাকে নিয়ে শিল্পীর লীলা চলে না—তাকে decorative করা যায় না।

এ হিসাবে মাইকিনীয় আর্ট খুব উঁচুদরের সভ্যতার কীর্ত্তি বলতে হবে। বিষয়-নির্ব্বাচনে তা' গ্রীক চিত্র হ'তে বেশী আধ্যাত্মিক—বিষয়-বণ্টনায় তা মিশর সভ্যতা হ'তে অনেক উচ্চস্তরে স্থিত বলে স্থির হয়েছে। আর্ট যে সভ্যতায় decorative হয়েছে, সে সভ্যতার ভিতর স্বচ্ছন্দ বিহার ও চিত্তের মুক্তি সম্ভব হয়েছে। অনেক আদিম সভ্যতার মত তা শৃঙ্খলিত, আড়ষ্ট ও গতিহীন হয়ে পড়েনি। এরূপে মাইকিনীয় জগৎকে উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

মিশর-সভ্যতাকেও আজ আর্টের ভিতর দিয়ে পরখ করে' দেখা হচ্ছে। মিশরীয়েরা পুনর্জন্মবাদী। তারা মনে কর্ত্ত, মানুষের আত্মা কিছুকাল পরে ফিরে এসে আবার মৃত শরীরে ঢুকে তাকে উজ্জীবিত কর্ত্তে পারে। এ জন্যই মৃত-শরীর রক্ষার অসাধারণ ব্যবস্থা সেখানে হয়েছিল। শুধু তা নয়, পাছে মৃত-শরীর নষ্ট হ'লে আত্মাকে এসে ফিরে যেতে হয়, এজন্য অনেক পাথরের নকল শরীরও গড়ন করা হ'ত, এবং শবদেহের পাশে রাখা হ'ত—যাতে 'কা'—এসে এগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তে পারে। এজন্যই শিল্প হিসাবে এই 'কা'মূর্ত্তিগুলির বিশেষ মূল্য নেই। মিশরী আর্টে টাইপও খুব কম।

আর্ট ও কাব্যাদির ভিতর মিশরের সঙ্কীর্ণতা স্পষ্ট প্রস্ফুট হয়েছে। যতদিন পাণ্ডিত্যের ভিতর দিয়ে, লিপিবাহুল্য প্রভৃতির ভিতর দিয়ে, মিশরকে বোঝবার চেষ্টা হয়েছে, ততদিন সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক সভ্যতাকেও মিশর বেশী কিছু দান করে নি। শুধু Cult of Isis ও Horus বা মাতৃমূর্ত্তির পূজা গ্রীক সভ্যতার একটা শূন্য স্থান পূরণ করেছিল বলে'—সেটাই অনেকটা মিশরের একমাত্র দান বলে বিবেচিত হচ্ছে।

মিশর ও মাইকিনীয় শিল্প সম্বন্ধে যা বলা হোল, গ্রীক রোমক ও ব্যাবিলনীয় কলা সম্বন্ধেও তা বলা চলে,—তাও এ সমস্ত জাতির মনস্তত্ত্বের নানাদিক উদ্ঘাটিত কর্চ্ছে।

গ্রীসে স্পষ্টই একটা বিরোধ দেখা যায়। কোন লেখক সংক্ষেপে বলেছেন,—"In the Greek temples two different currents meet—one rising from the midst of the populace below; the other descending from above, from the rich upper classes. The one creates the idol and votive statues, the other creates the decoration."

গ্রীক-কাব্যেও নানা প্রসঙ্গ উঠেছে এবং সে প্রসঙ্গে নানা তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, যা আগে কেউ কল্পনা করে নি। এক সময় ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মনে করেছেন যে, আমাদের কতকগুলি abstract verbal roots যা থেকে তাদের সমস্ত বিশেষ্য সৃষ্ট হয়েছে এবং তাদের এজন্যই abstract বা অবিশেষ ভাবে চিন্তা করা—সমগ্রকে উপলব্ধি করা একটা আদিম অধিকার। সম্প্রতি Ridgeway প্রমুখ পণ্ডিতেরা তা' স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, সমগ্রের দিক দেখ্‌বার ক্ষমতা গ্রীসের অনেক পরে হয়েছে। Xenophanesএর বিশ্বের ঐক্য সমর্থন করা Aristotleএর কাছে নূতন ব্যাপার মনে হয়েছে। এ সম্বন্ধে কাব্যের প্রমাণ আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে Socrates প্রমুখ কয়জন বহুর ভিতর একের সন্ধান করেন ঠিক; কিন্তু Aristophanesএর clouds নাটকের পাত্র Strepsiades হতে সাধারণ এথেনীয় ভদ্রলোক কি রকম চিন্তা করেছে, বোঝা যায়।

মিশর ও মার্কিনীয় সভ্যতার আলোচনায় কলা-পরিচয় যেমন বড় রকমের একটা অপূর্ব্ব বার্ত্তা নিয়ে এসেছে, তেমনি নিগ্রো, পলিনেসিয়, পেরুভিয় ও মেক্সিকো শিল্পেও এ সমস্ত জাতির কল্পনা লোককে অপূর্ব্ব সার্থকতা দিয়েছে।

ভারতবর্ষের শিল্পকলা এখনও অপরিচিত অবস্থায় পড়ে আছে। এখন সন্ধানও সুরু হয় নি বল্‌তে হয়। ভারতীয় কলা নানা দিকে নানা ভাবে কল্পনা ও বাস্তবের ভিতর—সীমা ও অসীমের নানা গুম্ফিত জটিলতার ভিতর অনেক রকমের বোঝাপড়া করেছে, যার পাঠোদ্ধার এখনও হয় নি। পশ্চিমের সমালোচকগণ শুধু দেববাদের অভিধান বা স্তবমালার শ্লোকের অনুবাদ হতে মূর্ত্তিগুলি বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছে। কোন দেশেই আর্টকে এ ভাবে বোঝা যায় না। বিশিষ্ট উপকরণ ও ব্যঞ্জনা-প্রণালীর বিচিত্র হেতু আছে—বাঁধা গতের শ্লোক পড়ে' সে সবের মর্ম্মোদ্ধার হয় না।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যদি আলোচনা কখনও সম্ভব হয়, তবে বলা যায়, এ জাতির সৌন্দর্য্য-পিপাসা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, যুগে-যুগে যে সমস্ত জটিল ও গভীর অধ্যাত্ম তর্কে এ দেশের আবহাওয়া ধূমায়মান হয়েছে, তার ভিতরে এক অপূর্ব্ব ও অনাস্বাদ্য রসস্পৃহাই প্রতি যুগে সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করেছে। এ কথা দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও উঠেনি। রস-সাহিত্যের অপূর্ব্ব স্তরভেদ ও ভোগের সীমাহীন কারুতায় এ দেশের কলা-জগৎ স্পন্দিত হয়েছে। রসের বহু রূপ, কলার অসংখ্য অঙ্গ—এ সবের পরিচয়ও আজ কা'কেও এ দেশ সম্বন্ধে নূতন অভিজ্ঞানে বিচলিত করে নি, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসহ। এ দেশে দার্শনিকের বা তত্ত্ববিদের এই বিশ্বাস কেউ সহজে নানা কারণে ছাড়ছে না। এজন্য ভারতের দর্শন ও ন্যায় অধীত হচ্ছে ভারতের হৃদয় ছেড়ে। জ্ঞানের উর্ম্মিভঙ্গ অনুসরণ করা হচ্ছে অন্তঃ প্রবাহিত রস-স্রোতের গভীর ধারাকে অবজ্ঞা করে। এ দেশের লোকও স্বপ্ন দেখেছে; দুঃখে মূর্চ্ছিত, আনন্দে অধীর এদেশের লোকও হয়েছে। রূপ-রস-গন্ধের অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালে ইন্দ্রিয় এখানেও বিভ্রান্ত হয়েছে। এমন কি রসস্পৃহার অপূর্ব্ব কারুতার মাঝে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণও করেছে। শুধু তা নয়। প্রত্যক্ষ ভাবে অসীমের সন্ধান করে দেশকালাতীত আত্মপ্রত্যয়-ক্ষেত্রে রস-সৃষ্টির সহিত অচিন্তিত পরিচয় ও সঙ্গম এখানে ঘটেছে।

দর্শনকারেরা গুরুতর প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্ত্তেও কলা-লীলাকে উপমাস্থানীয় কর্ত্তে সঙ্কুচিত হন নি। আপনাদের সাংখ্যকারিকার শ্লোকটি মনে হবে। সৃষ্টিতে কিরূপে সৃষ্টিগত রাগ বিরাগে পরিণত হয় এবং সংস্থিতি বিরতিতে পর্য্যবসিত হয়, তা বোঝাবার জন্য কারিকা বল্‌ছে:—

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ
পুরুষস্য তথা আত্মানাং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।

নর্ত্তকী যেমন দর্শক সমক্ষে আপনার সমস্ত নৃত্যকলা প্রদর্শন করে' বিরত হয়, তেমনি বিরত প্রকৃতিও পুরুষ সমক্ষে একে-একে আপনার সমস্ত রূপ প্রকাশ করে' নিবৃত্ত হয়। অতি নীরস তত্ত্বোদ্‌ঘাটনেও রসশাস্ত্রের প্রসঙ্গ

উত্থাপন যে সহজ ও সুপরিচিত, তা এতে দেখা যায়। আবার রসশাস্ত্র-প্রসঙ্গেও সে প্রশ্ন উঠেছে ঃ—

ব্রহ্মাস্বাদন সহোদরঃ রসাস্বাদ লোকত্তরঃ”

এ কথাটি সামান্য নহে। রসাস্বাদকে এত বড় মর্য্যাদা খুব কম জায়গায় কেউ দিয়েছে। অপূর্ব্ব একটা বিশিষ্ট কারণে ভারতবর্ষে এই রসবন্যার এক সঙ্গম ঘটিয়েছিল। এ দেশের চিন্তাক্ষেত্রের ভিতর দুটি ধারার চিরন্তন সংঘর্ষ হয়ে এসেছে, দেখা যায়। সহজে তার নামকরণ সম্ভব নয়। মোটামুটি বলা যায়, দুটি তত্ত্বের সঙ্ঘাত এদেশকে বিপরীত দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। একটা হচ্ছে আত্মবাদ, অন্যটি হচ্ছে অনাত্মবাদ বা বস্তুবাদ। আদিম ও আর্য্য-মতবাদের ইতিহাস এর মূলে হয় ত আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম প্রভৃতির সঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের যে প্রবল বিরোধ, তার ছায়া সুদূর কাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে' এসেছে। বৈদিক ধর্ম্ম অনেকটা গৃহস্থের ধর্ম্ম; বৌদ্ধধর্ম্মাদি সন্ন্যাসের। আচার ব্যবহার প্রভৃতি ব্যবস্থায়ও এ দুটির ভিতর অনেক বৈষম্য আছে। এ উভয়ের ভিতর একটা সমন্বয়ের চেষ্টাও প্রতি পদে হয়েছে। এটা হচ্ছে বাইরের কথা। ভিতর দিক হ'তেও দেখলে, এই স্পষ্ট বিরোধ দেখা যাবে।

কেউ বিশ্বপ্রপঞ্চ এক অপূর্ব্ব অদ্বৈত আত্মতত্ত্বে এনে উপস্থিত করেছে,—সমস্ত জগৎকে এক অপূর্ব্ব ব্রহ্মবস্তুতে পর্য্যবসিত করেছে। এই জন্য subjectকে—এই অদ্বিতীয় পরমার্থ বস্তুকে বলা হয়েছে 'তত্ত্বজ্ঞান'। তাহা হইতে জগৎ জাত, তাঁতে অবস্থিত ও তাঁতে নিহিত। আবার বিভিন্ন পন্থীরা বিষয়ের বা objectএর দিক হতে subjectকে একেবারেই উপেক্ষা করেছে। বৌদ্ধদের শূন্যবাদ—theory of no soul আর একটা দিকে বিচারকে নিয়ে এসেছে। পালিভাষায় একে 'নিঃসত্ত্বনিজ্জিবতা' বা non-soulness বলা হয়। বিশ্বের কেন্দ্রমূলে প্রবাহিত অকাট্য নিয়ম-ধারায় সমস্ত গ্রথিত—কল্পনা করা হয়েছে। অতি পরিস্ফুট ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মবাদকে প্রত্যাখ্যান করে ইহলোকের দিকে লোকের দৃষ্টি ফিরিয়েছে।

মজ্জিমা নিকায়ে স্পষ্ট আছে—

"Since neither self nor aught anything belonging to self can really and truly exist the view which hold that this 'I' who am world shall hereafter live permanent persisting, eternal, unchanging, eg alive eternally—' is not this utterly and entirely a foolish doctrine."

বিশ্বের বিরাট বস্তু পর্য্যায় এক অসীম কাব্যের, এ প্রমাণ হ'তে গ্রীক সম্বন্ধে আরও নানা প্রশ্ন উঠেছে, যাতে ঐতিহাসিকদের মাথা ঘুরে' গেছে। গ্রীক-জাতিকে অনেকটা অভিন্ন জাতি বলে অনেকে মনে করেছে। অথচ গ্রীক শিল্প ও আর্টে তার বিরুদ্ধ ব্যাপার দেখা যায়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে Apollo of Tane মূর্ত্তি যে রকমের রচনা, পরবর্ত্তী যুগের রচনা সে রকমের নয়। অথচ Greenerএর মতে হেলেনিক কাল্‌চার ও জীবনের তখন মধ্যাহ্ন। এ প্রসঙ্গে কোন পণ্ডিত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় বলেন,

"I am judging purely from the artistic records. But I have no doubt - I could trace the two art-wills to two distinct races of men who from the days of the fall of Mycenaean culture strove for mastership of Greece."

এ হচ্ছে ভাস্কর্য্যের দিক হতে প্রশ্ন। আবার কাব্যের দিক হতে বিচারিত রসের বিরূপ ব্যঞ্জনার নূতন প্রশ্ন উঠেছে। Illiad ও Odysseyতে একরকমের culture দেখা যায়; অথচ, Hesiod's Theogony অন্য রকম। তার মানে কি? এ প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, দু'রকমের জাতির ইতিহাস এর ভিতর লুকান আছে। কোন পণ্ডিত কাব্যগত এই বৈষম্য দেখে বলেন:—

"The present writer has offered an explanation for apparently contradictory phenomena by pointing out that in the Illiad and Odyssey there are reflected the social and religious idea of the Achaeans who descended from central Europe and entered the Aegean basin by at least 1400B. C. On the other hand in the gross conception of the Gods

revealed in Hesiod's Theogony and in the manifold cults of classical and post-classical Greece are mirrored the social and religious conception of the aboriginal races."

কাজেই ইতিহাসকে আবার তলিয়ে দেখ্‌তে হয়েছে। সে কাজ সুরু হয়েছে। Dr. Farnell অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে Wilde lecture প্রসঙ্গে বলেছেন, গ্রীক সভ্যতাকে ভাল ক'রে বিশ্লেষণ করার কাজ্ আরও পঞ্চাশ বছরের চেষ্টায় শেষ হয় কি না সন্দেহ। দর্শন হ'তে বা তথাকথিত ইতিহাস হ'তে এ সব প্রশ্ন উঠে নি। কাব্য ও কলার ভিতর গ্রীক চিত্ত যে অপূর্ব্ব অঙ্গুরীয়ক ভবিষ্য অভিজ্ঞানের জন্য রেখে গেছে—তাই আজ হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত রাজ্যকে উদ্ঘাটিত করেছে। তাই আজ প্রত্নতাত্ত্বিকদেরও কলাকে একটা পরোক্ষ মর্য্যাদা দিতে হচ্ছে।

এরূপে কলার সাক্ষ্য পরিচয় বিশ্বের নানা তথ্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করছে। কিন্তু বিশুদ্ধ কলা-পরিচয়ও আর এক নূতন বিস্ময় উপস্থিত করেছে। তাও আজ বিশ্বকে নিকটে নিয়ে এসেছে। নিয়ম-ধর্ম্মচক্রে গ্রথিত করার অপূর্ব্ব চেষ্টা, আত্মবাদের প্রতিকূলে একটা বিরাট antithesis ভারতেই হ'য়েছিল। অভিধর্ম্মপিটকেই তার সূচনা। বৌদ্ধের কারণ-বাদ ও নিয়মচক্রের ধারার মর্ম্ম একালের Bergson প্রভৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে। সমস্ত জ্ঞানই স্থিতি ও গতির ভিতর পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের সঙ্ঘাতেই সত্যোপেত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতেই তত্ত্বের এ দুটি চরম দিকে দার্শনিকগণ প্রথম এসেছেন।

অদ্বৈততত্ত্ব ম্যাক্সমূলরের মতে আমাদের dizzy height-এ মাত্র নিয়ে যায়—তা বস্তু-জগতের সহিত সত্যের দিক্ থেকে কোন বোঝাপড়া করেনি। তেমনি বৌদ্ধমত সর্ব্বান্তঃকরণে objective worldকেই পরমার্থ মনে করেছে, তারই মহিমা বাড়িয়েছে।

তত্ত্বালোচনার জায়গা এটা নয়—তার সুযোগও এখানে নেই। কিন্তু রসতত্ত্ব প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন তুল্‌তেই হয়। বল্‌তেই হয়, এই দুটি উন্মত্ত ও প্রবল বিমুখী ধারার অপূর্ব্ব সঙ্গম হয়েছে ভারতের রস ও ভক্তিতত্ত্বের সৌন্দর্য্য-সমুদ্রবেলায়। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে, মাধব দ্বৈতবাদে, বল্লভ শুদ্ধাদ্বৈতবাদে একটু-একটু করে' অদ্বৈতবাদের অচলায়তন-গর্ব্বিত—আকাশস্পর্শী দুর্গ ভেঙেছিলেন—ভক্তিবাদের অসীম রস সঞ্চার করে। গীতায়ও তা'র একটি বহুমুখী অপূর্ব্ব প্রতিরূপ রয়েছে। ওদিকে হীনযান ভেঙে পড়ল মহাযানের বিচিত্র আলোড়নে। ওখানেও ভক্তিবাদ একটা বিরাট দেবলোক সৃষ্টি করে' বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের উপাস্য করে' তুল্‌লে। এরূপে উপাস্য ও উপাসকের ভিতর একটা অপূর্ব্ব ভক্তি ও রসলীলার সূচনা হ'ল। বুদ্ধের আরতির মঙ্গল-ধ্বনির ভিতর কত রূপলোক ও কামলোকের স্বপ্ন সূচিত হল, তার ইয়ত্তা নেই। ক্রমশঃ যোগাচার্য্যেরা এসে রসমৌলিক তন্ত্রাচারের ভিতর দিয়ে মন্ত্রযান ও বজ্রযানের কুজ্ঝটিকা তুললে। কত দেবতা কল্পিত হ'ল, ঠিক নেই। তন্ত্রে শতাধিক দেবতাই কল্পিত হ'ল সাধনমালায় আরও কত—সীমা নেই বললেই চলে।

এরূপে ভোগের ভিতর ত্যাগের রহস্য লুপ্ত আছে ব'লে ব্রহ্মলোকের গূঢ় রহস্যের দিকে সকলে ছুটলো। নিরানন্দ ও শুষ্ক জগতে ভগবানের রসরূপ কল্পনা করে, আবির-কুঙ্কুমে হোলির রোল উপস্থিত হ'ল। রূপ-রস-গন্ধই রূপাতীতের প্রতিরূপ—রূপ-লীলাই অরূপলীলার দ্যোতক মনে করে, বিশ্বকে আবার আনন্দে আঁকড়ে ধরলে। মাটিই মুঠিমুঠি সোনায় পরিণত হ'ল—সলিল-তরঙ্গ বুকে নিতে গিয়ে, রস-শিল্পী চৈতন্যে আত্ম-সমর্পণ কর্‌লেন। প্রেমের ভিতর দিয়ে ভগবানকে পাওয়ার পথে দুনিয়া রস ও সৌন্দর্য্য-লোকে পরিণত হ'ল। নীরস মায়াবাদ রসোজ্জ্বল লীলাবাদে পরিণত হ'ল। শ্রীকৃষ্ণোপাসনার অসংখ্য রূপতরঙ্গে এক অনির্ব্বচনীয় জগৎ উদ্ঘাটিত হ'ল। বাঁশীর আওয়াজ কাণে পৌঁছল, যমুনার স্রোত চোখে পড়ল। নৃত্যগীতির অপূর্ব্ব প্রাচুর্য্য প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-জগৎ সৌন্দর্য্যের এক মধুর গোলকধাঁধাঁ উপস্থিত কর্‌লে।

ভক্তিবাদ মানুষ ও দেবতার মাঝে সেতু-বন্ধন করে' দেবতাকে মানবধর্ম্মে সংক্রান্ত করেছে। এজন্য অবতারবাদে মানুষ ভগবানকে সামাজিকতার ভিতর পায়। যতদিন বুদ্ধ নিয়মচক্রে পর্য্যবসিত ছিলেন, ততদিন আর্টে তাঁর

স্থান হয় নি। কিন্তু যখনই বুদ্ধ অবতার হ'লেন, তখনই মন্দিরে-মন্দিরে তাঁর রমণীয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ল—অর্চ্চনায় সঙ্গীতে বুদ্ধের কীর্ত্তি-প্রসঙ্গ মুখরিত হ'ল। অমরাবতী বরভুধর ও অজন্তার শিল্পীরা সীমাহীন ভাবে তাঁকে খোদিত করে' চিত্তের পরিতৃপ্তি খুঁজ্‌তে লাগল।

আজ এসব অধ্যয়নের সূত্রপাত কর্ত্তে হবে—যাকে বলেছি decorative দিক্ হ'তে। সে কাজ পড়ে আছে।

এতে দেখা যায়, অন্ততঃ অতীতে সৌন্দর্য্য-সঙ্গম হয় ত একটা বড় রকমের সমন্বয় ঘটিয়েছিল। এ যুগেও কি তা' আশা করা বৃথা? যাঁরা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ভিতর একটা ভাব-সমন্বয় কল্পনা কচ্ছেন—তাঁরা কি ভাবেন, বিশুদ্ধ তর্ক ও তত্ত্বের ভিতর দিয়ে তা' হবে? রাষ্ট্রধর্ম্মের ভিতর দিয়ে তা' হচ্চে না,—তা পশ্চিমকেও শতধা খণ্ড করেছে। ধর্ম্ম-প্রচারও প্রচুর হয়েছে। নীতি-চর্চ্চাও সামান্য হয় নি। কিন্তু তবু মানুষের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব কল্পনারই বা ফল কি হ'ল? পশ্চিমে আজ যাঁরা কলা-রসিক, তাঁরাই শুধু সকল দেশকে রস-সন্ধান প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছেন—এ কথা বলেছি। তাঁদের হাতেই আজ বিশ্বময় রাখি-বন্ধনের ভার পড়েছে, এ কথা স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। ভারতবর্ষকেও এ কাজে যোগ দিতে হবে। সৌন্দর্য্যস্বরূপকে পরশ পাথরের মত খুঁজে-খুঁজে যারা দেশ-কালের সঙ্কীর্ণতা ভুলে গেছে—তাদের পার্শ্বে আসীন হ'তে হবে। তবেই আধুনিক শিল্পীর রস-কুটীর ভবিষ্যের আরতি-মন্দিরে পরিণত হবে। The studio of the artist of to-day would be temple of humanity to-morow.*

* সৌন্দর্য্য ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে প্রদত্ত প্রথম

অন্ন

শ্রীকপিঞ্জল

প্রাণ তব আশ্রিত, অন্ন হে অন্ন,
জয় জয় ধন্য হে, ধন্য অনন্য!

সঙ্গীতে 'সারেগামা' অঙ্গের বিস্তার,
চোরের সিঁদ-কাঠি, নাক ডাকা নিদ্রার,
জ্যোতিষের লগ্ন ও কুণ্ডলীচক্র,
বাদ্যের 'তেরে কেটে', নদী নদে নক্র।
ঔষধে কুইনিন্, কনসার্ট যাত্রায়,
টরে-টক্ টরে-টক তড়িতের বার্ত্তায়।
রেনফোর্সড্ কন্‌ক্রিট পূর্ত্তের কার্য্যে,
দণ্ডের সেক্‌সন্ ফৌজদারী চার্জ্জে,
রাস্তার ধূলা তুমি, এঞ্জিনে কয়লা,
অঙ্কের সংখ্যা হে বরষের পয়লা।

২

চিত্রের রং তুমি, নুন তুমি রান্নায়,
ন্যায়ে তুমি তর্ক হে, আঁখিজল কান্নায়।
দধিতে সাজুনা তুমি, রোশনায়ে গন্ধক,
মহাজন কাছে তুমি খৎ-স্থিত বন্ধক।
পিষ্টকে 'পুর' তুমি, ফুলে তুমি গন্ধ,
চাকুরীতে তোষামুদী, কবিতায় ছন্দ
বিবাহের তুমি ঠিক কবিতা ও অর্থ,
সন্ধির ফন্দীতে ফাঁশ পাকা সর্ত্ত।
তুমি হে গায়ত্রী, তুমি বীজমন্ত্র,
তুমি বিনা ধরা মহানির্ব্বাণতন্ত্র।
বৌদ্ধের ত্রিপিটক, গীতা তুমি হিন্দুর,
চীনাদের টিকি তুমি, সধবার সিন্দুর।
তুমি বায়ু তুমি আয়ু ভুবনের ভর্ত্তা,
ভজনে ও ভোজনেতে তুমি এক কর্ত্তা।

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

মনোরমার গুরুঠাকুর হরিনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রৌঢ় বয়স প্রায় যায়-যায় হইয়াছে। তাঁর আচার নিষ্ঠা ও সাধনার কথা তাঁর নিজের গ্রামে সুপরিচিত। সম্পূর্ণ গৌরকান্তি না হইলেও তিনি সুপুরুষ। দীর্ঘ-দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, সৌম্যমূর্ত্তি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বেশীর ভাগ সময় পূজা-অর্চ্চনায় ব্যয় করিতেন। আর তাঁর মুখে সর্ব্বদাই একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ফুটিয়া থাকিত। তাঁর গলায় লহরে-লহরে রুদ্রাক্ষের মালা; হাতে স্ফটিকের মালা সর্ব্বদাই ঘুরিত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় শৈশবে কলাপ ব্যাকরণখানা প্রায় শেষ করিয়াছিলেন। তার পর হঠাৎ তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, তাঁহাকে অনেকগুলি শিষ্যের পরকালের ভার গ্রহণ করিতে হইল, তাই তিনি আর জ্ঞানমার্গে নিঃশ্রেয়স লাভের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই যৎসামান্য ব্যাকরণের বিদ্যা, জ্যোতিষের সামান্য দু' চারিটা মোটা কথা এবং মুখে-মুখে স্মৃতির আচার-কাণ্ডের সামান্য পরিচয় সম্বল করিয়া তিনি গভীর শাস্ত্রজ্ঞের মত সকল শিষ্য সেবকের যাবতীয় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সমস্যার মীমাংসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঠাকুর মহাশয়ের একটা স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, যার বলে সকল বিষয়ে তিনি এমন ভাবে উপর-উপর আলাপ করিয়া যাইতে পারিতেন যে, লোকের মনে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়া যাইত।

মনোরমা ভক্তি-গদ্গদচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইন্দ্রনাথের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ছাড়িয়া পলাইল। সরযূ ভক্তিভরে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের পূজার আয়োজন করিতে বসিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে বারণ করিয়া বলিলেন, "গঙ্গাতীরে আসিয়া গঙ্গাস্নান না করিয়া, মায়ের পূজা না করিয়া আমি জলগ্রহণ করিব না। মায়ের বাড়ীতেই পূজার জোগাড় করিয়া লইব।" মুখ-হাত ধুইয়া তিনি তাড়াতাড়ি কালীঘাটে চলিয়া গেলেন।

দ্বিপ্রহরের পর তিনি কালীঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রকাশ থাকে যে, সেখানে স্নান ও পূজা সমাপন করিয়া, তিনি মোদক-গৃহে বসিয়া নানা উপচারে উদর পূর্ত্তি করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু মনোরমা কলেজ কামাই করিয়া, তখন পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস করিয়া বসিয়া ছিল।

গৃহে ফিরিয়া ঠাকুর মহাশয় সরযূর আয়োজনের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া নানা উপচারে রন্ধন করিলেন। এ কথা বলিতেই হইবে যে, পাচক হিসাবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃতিত্ব অল্প নহে। আহারান্তে তিনি মনোরমার দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিলে, মনোরমা পাখা হাতে করিয়া তাঁকে বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর তিনি অনুমতি দিলে, মনোরমা তাঁহার পাতে বসিয়া প্রসাদ পাইল। ইন্দু কলেজে যাইবার সময় বার বার করিয়া বলিয়া গিয়াছিল যে, মনোরমা আর যাই করুক ঠাকুরের পাতে যেন না খায়। শুনিয়া সরযূর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। স্বামী যে ঠাকুর ফিরিবার আগেই ভালয় ভালয় কলেজে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বেলা ৫টার সময় ঠাকুর মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলেন, গঙ্গাতীরে সায়ংসন্ধ্যা করিবেন বলিয়া। সন্ধ্যার পর তিনি ফিরিলেন। তার পর আহারাদির পর্ব্ব, তার পর শয়ন।

পরের দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া ঠাকুর মহাশয় সন্ধ্যা বন্দনা, গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ, স্তোত্র পাঠ প্রভৃতি সারিয়া উঠিতে উঠিতে অনেকটা বেলা হইল। মনোরমা শিবের মাথায় ৩টো বিল্বপত্র দিয়া ঠাকুরের পূজার আয়োজন করিয়া দিল। ঠাকুর মহাশয় পূজা সমাপন করিয়া জল-যোগান্তে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন। সরযূ যতক্ষণ রান্নার যোগাড় করিতেছিল, ততক্ষণ মনোরমা ঠাকুরের কাছে বিনীত ভাবে আসিয়া বসিল।

ঠাকুর এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলেন, "কি মা, আমাকে স্মরণ করেছ কিসের জন্য বল দেখি।"

মনোরমা মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার মন বিক্ষিপ্ত হ'য়েছে, আমি শ্রদ্ধা হারিয়েছি ; পূজায় আমার মন বসে না ; আপনি আমার চিত্ত শান্ত করুন,—আমায় ভক্তি দিন।"

ঠাকুর মহাশয় স্নিগ্ধ হাস্য করিয়া বলিলেন, "গুরুর চরণ আশ্রয় কর মা, তা' হ'লেই চিত্ত স্থির হ'বে। স্মরণ রেখো মা, আমাদের নিজের বুদ্ধি পরমার্থতত্ত্বের উদ্ঘাটনের পক্ষে একান্তই অক্ষম। তাই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ঋষির বাক্য আর গুরুর চরণ। গুরুকে মানুষ বলে জ্ঞান করো না। গুরু যখন শিষ্যকে উপদেশ দেন, তখন সাক্ষাৎ বিষ্ণু এসে তাঁর শরীরে অধিষ্ঠিত হন। তা' ছাড়া, ভগবান ব'লেছেন, "মন্মনা ভবমদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু", এইটাই হ'ল জীবনের প্রধান কথা। সর্ব্বদা ভগবানকে ঋষি-গুরু নির্দ্দিষ্ট পথে পূজা ক'রবে,—সমস্ত সময়ে নিজেকে পূজায় নিযুক্ত ব'লে বিবেচনা ক'রবে। শ্রীভগবান বলেছেন,

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি চিন্তসি যৎ,
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।

এই শ্রেষ্ঠ পূজা—সমস্ত জীবনটাই এমনি ক'রে একটা পূজায় পর্য্যবসিত করা যায়। যা ক'রবে—যৎ করোষি, যা খাবে—যদশ্নাসি, যা যজ্ঞ ক'রবে—যজ্জুহোষি, যা চিন্তা ক'রবে—চিন্তসি যৎ, যা তপস্যা ক'রবে যত্তপস্যসি—হে অর্জ্জুন সে সমুদয় আমাকে সমর্পণ ক'রবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ব'লছেন, আমাকে সমর্পণ ক'রবে ; কেন না ভগবান স্বয়ং অর্জ্জুনের গুরু। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের কি সাধ্য আছে যে তাঁর চরণে কিছু পৌঁছাই! হাঁ, উপায় আছে ; ভগবান গুরুরূপে আমাদের কাছে উপস্থিত হ'য়ে, আমাদের সকল দান গ্রহণ করেন। তাই ব'লছিলাম, গুরুই আমাদের একমাত্র সম্বল।"

কথাগুলি যেন মনোরমার কর্ণে অমৃতসিঞ্চন করিয়া দিল ;—তাই তো,—এই তো ধর্ম্ম,—এই পূজা—যৎকরোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, চিন্তসিযৎ, যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্। চক্ষু বুজিয়া মনোরমা এই ধর্ম্ম আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিল।

গুরু বলিয়া গেলেন, "ধর্ম্ম যদি সমস্ত জীবনে না ক'রতে পারলাম, তবে সবই বৃথা। সমস্ত জীবনে, সমস্ত কর্ম্মে শ্রীভগবানকে ধ্যান ক'রবে,—তবেই না তুমি ধার্ম্মিক। এ জগতে তিনি ছাড়া যে কিছুই নাই মা ; কাজেই যাকে যা কর, সবই তাঁকে করা হয়। শ্রীভগবান ব'লেছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি" সেই তত্ত্ব-জ্ঞানী। তাই যদি হয়, তবে তো ধর্ম্ম সমস্ত জীবনব্যাপী,—জীবনের সব দিন সব মুহূর্ত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান ক'রতে পারি।"

কি মধুর কথা! মনোরমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মনোরমা বলিল, "প্রভু, আপনি আমাকে গীতা পাঠ করে ব্যাখ্যা ক'রে দেবেন?"

এইবার ঠাকুর বিপদে পড়িলেন। গীতার কয়েকটি সুপরিচিত শ্লোকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। তিনি প্রত্যহ—অন্ততঃ শিষ্য বাড়ীতে—প্রাতে উঠিয়া গীতার এক অধ্যায় পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু ঐ পাঠ পর্য্যন্ত,—তার তাৎপর্য্য গ্রহণের কোনও চেষ্টা কখনও করেন নাই। কাজেই মনোরমার মত শিক্ষিতা, সংস্কৃতাভিজ্ঞা শিষ্যাকে গীতার ব্যাখ্যা করিয়া শুনান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, আমার গীতা-ব্যাখ্যা শুনতে চাও,—তা শোনাব মা, শোনাব। কিন্তু এ যাত্রায় তা' হ'বে না। গীতা পাঠ অমনি ক'রলেই তো হয় না, তার জন্য প্রথমে প্রস্তুত হ'তে হয়। সংযমের দ্বারা মন প্রস্তুত হ'লে তবেই গীতা পাঠে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। তাতে দুই-তিন দিন লাগবে; আর ব্যাখ্যায়ও অনেক দিন লাগবে। এতদিন তো আমি এ যাত্রায় থাকতে পারবো না। অন্য এক সময় তোমাকে শোনাব। তা' তুমি সংস্কৃত পড়েছ,—তুমি একখানা শাঙ্কর ভাষ্যযুক্ত গীতা কিনে, নিজে একটু পড়তে চেষ্টা করো না কেন?"

তার পর মনোরমা, ক্রমে, তার মনে প্রতীকোপাসনা, জাতিভেদ প্রভৃতি বিষয়ে যে সব সমস্যা উঠিয়াছিল, সেই সব কথা গুরুর কাছে উপস্থিত করিল। গুরুদেব ফাঁপরে পড়িলেন। সমস্যাগুলি মনোরমা যে ভাবে উপস্থিত করিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে তিনি কোনও দিন বিচার করিবার সুযোগ পান নাই। কাজেই, এ সব বিষয়ে তাঁর পল্লবগ্রাহী বিদ্যারও পরিচয় দিতে তিনি অসমর্থ হইলেন। তাই তিনি কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া, যে যুক্তি তিনি শত-শত স্থানে প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সব কথার ধর্মোদ্গীরণ করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "দেখ মা, এ সব কথা চট্ করে' আরাম-কেদারায় ব'সে কেবলমাত্র সহজ বুদ্ধিতে সমাধান করা যায় না। এ সব বুঝতে গেলে তার জন্য একটা শিক্ষা ও দীক্ষার প্রয়োজন আছে। 'প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' এই জ্ঞান অর্জ্জন ক'রতে হয়। তার জন্য মনটাকে আগে প্রস্তুত ক'রতে হয়। ফসল জন্মাতে গেলে যেমন আগে জমীটা তৈয়ার ক'রতে হয়, তেমনি মনটাকে তৈয়ার ক'রলেই তবে তার ভিতর এ সব জ্ঞানের ফসল জন্মাতে পারে। তাই গুরুর কর্ত্তব্য হচ্ছে, অধিকারী বিচার করে ধাপে-ধাপে জ্ঞান দেওয়া। তাই গুরু চাই;—গুরুর কাছে প্রথমে নিতে হ'বে অধিকার অনুসারে নিম্নস্তরের সাধনায় দীক্ষা, তার পর ক্রমে-ক্রমে মন যত তৈয়ার হবে, ততই উচ্চ অঙ্গের সাধনার দীক্ষা নিতে হ'বে—খুব একটা উচ্চ স্তরে পৌছুলে তবেই শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা এসব বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মাতে পারে। তোমার এখনও এসব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবার অধিকার জন্মায় নি। স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ কখনই এ অধিকার জন্মায় না। তাই বেদ বলে গেছেন, স্ত্রী-শূদ্রের বেদে বা পরাবিদ্যায় অধিকার নাই। যদি ভগবৎকৃপায় তোমার এ অধিকার জন্মায়, তবে তুমি তার উপযুক্ত জ্ঞানও পাবে। শ্রীবিষ্ণু আমার মুখ দিয়েই তোমাকে এ সব তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। এখন তোমায় এ সব অনধিকার চর্চ্চা ছেড়ে তোমার যে স্বধর্ম্ম, তার অনুশীলন ক'রতে হ'বে। গীতায় শ্রীভগবান ব'লেছেন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

এই কথাটা মনে রেখে, তোমার অধিকার অনুসারে, গুরূপদিষ্ট যে ধর্ম্ম, শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অনুষ্ঠান ক'রে যাও; ভগবানের কৃপা হ'লে, এতেই তোমার মোক্ষলাভ হবে।"

মনোরমা এ কথায় সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারিল না। তার জ্ঞান ও সংস্কার পক্ষে এ সব কথা এতই বিরুদ্ধ যে, গুরুর মুখ হইতে শুনিয়াও এ কথা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে তাহার মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল।

হঠাৎ গুরুদেবের আর একটা শ্লোকের কথা মনে পড়িয়া গেল,—সেটাও না বলিলেই নয়। তাই তিনি বলিয়া গেলেন, "আর দেখ, যুধিষ্ঠির ব'লে গেছেন,

বেদাঃ বিভিন্নাঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির, যিনি সশরীরে স্বর্গারোহণ ক'রে-ছিলেন, তাঁর পক্ষে যদি এই ধর্ম্মই যথেষ্ট হ'ল, তবে তোমার মত নিম্নাধিকারীর পক্ষে কি এই যথেষ্ট নয়? শিবলিঙ্গ পূজা বেদে উপদিষ্ট হ'য়েছে,—অষ্টাদশ পুরাণ, তন্ত্র,—স্মৃতি সকল শাস্ত্রে এর উপদেশ আছে। তা ছাড়া, স্বয়ং শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য, যিনি সকল তত্ত্ববিদ্যার সাগর ছিলেন, তিনি

শিবলিঙ্গ পূজা প্রচার ক'রেছেন—এই যে মহাজন-নির্দিষ্ট পথ,—এর অনুসরণ ক'র্‌তে ভয় কি ? ভাবনা কিসের ?"

মনোরমাও মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নিজের বিচার-বুদ্ধিকে এমনি সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া, গতানুগতিক ভাবে শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণ তার সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কারের এত বিরুদ্ধ যে, সে কিছুতেই মনকে বাগাইতে পারিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমি মন স্থির কর্‌বার জন্য কর্‌বো কি, তার উপদেশ দিন। আর উচ্চাধিকারই বা কি ক'র্‌লে লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো ?"

"মহাভারত রামায়ণ বারবার করে পাঠ ক'র্‌বে। গীতা পাঠ ক'র্‌তে ইচ্ছা কর ক'র্‌তে পার, আর সহস্রবার বীজমন্ত্র জপ না ক'রে জলগ্রহণ ক'র্‌বে না। আপাততঃ এই ব্যবস্থাই যথেষ্ট। এর পর ক্রমশঃ সহস্র থেকে লক্ষবার পর্যন্ত জপ ক'র্‌তে হ'বে।"

রন্ধন করিতে-করিতে গুরুদেব ভাবিলেন, এ স্থানে আর অধিকক্ষণ বাস নিতান্ত অবিধেয়। এই শিষ্যাটিকে লইয়া অধিক নাড়াচাড়া করিতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তা' ছাড়া, শ্রীমান্ ইন্দ্রনাথের ব্যবহারটাও তাঁর কাছে খুব প্রীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইল না। সে এ পর্যন্ত নীরবে আছে বটে, কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে তর্ক আরম্ভ করিয়া দিতে পারে। ঠাকুর মহাশয়ের শোনা ছিল যে, শ্রীমান্ বেদবেদান্ত অনেক পাঠ করিয়াছে। সুতরাং তাহার সঙ্গে তর্ক হইলে ঠাকুর মহাশয়ের মেকীটা শিষ্যার সাম্‌নে প্রকাশ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আর এ স্থানে সময়ক্ষেপ কর্ত্তব্য নহে।

আহারান্তে মনোরমাকে বলিলেন, "মা, এখন তোমার কাজ তো হ'য়েছে, তবে আজই আমি বিদায় হই !"

মনোরমা খুব আগ্রহ করিয়া ধরিল যে, আর দুই-এক দিন থাকিয়া যান। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় অন্য একটা শিষ্যের বাড়ীতে বিশেষ প্রয়োজনের জন্য কিছুতেই তার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কাজেই বিকালবেলা সরযূ মনোরমার হাতে দশটা টাকা দিয়া ঠাকুর মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়া দিল। মনোরমা টাকা দশটা তাঁহার পায়ে রাখিয়া প্রণাম করিল।

গুরুদেব হাসিয়া টাকা কয়টা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, মা তোমরা শ্রদ্ধা করে যা' দেও তাই যথেষ্ট। তবে আমার পাথেয়টা ! যাতায়াতে আট টাকা লাগবে। আবার বাড়ী গিয়েই মায়ের পূজা আছে,—শিষ্য-সেবকদের কাছে—হেঁ, হে—কিছু কিছু না পেলে—গরীব ব্রাহ্মণ—"

মনোরমা বাক্য-ব্যয় না করিয়া আর দশটি টাকা নিজের বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিল। এ টাকা কয়টা সে খোকার একটা পোষাকের জন্য জমাইয়া রাখিয়াছিল।

ইহার পরও যখন গুরুদেব যাইবার সময় তাঁর বার্ষিকের আপত্তিটা জানাইয়া গেলেন, তখন মনোরমার মনটা সত্য-সত্যই তিক্ত হইয়া গেল। সে বহু কষ্টে তার বিরক্তি গোপন করিয়া, গুরূপদিষ্ট সাধনায় লাগিয়া গেল। গীতা ও রামায়ণ ইন্দ্রনাথের লাইব্রেরীতেই ছিল,—সে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। গীতা পড়িতে গিয়া সে দেখিল, তার উপোদ্ঘাতে একটি শ্লোক আছে,

সর্ব্বোপনিষদঃ গাবঃ দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ

দেখিয়া তার উপনিষদ্ পড়িতে ইচ্ছা হইল। দাদার ঘর হইতে উপনিষদ আনিয়া খুলিতেই তার চক্ষের সামনে পড়িল কেনোপনিষদের,

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্মত্বদ্বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে।
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্
তদেব ব্রহ্মত্বদ্বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে।

সে আরও পড়িল,

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনংত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো-রূপম্। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্।

কথা কয়টিতে তার চমক লাগিয়া গেল। এই কথা যদি সত্য হয়, তবে সে কি লইয়া বসিয়া রহিয়াছে ? উপ-নিষদ্ ব্রহ্মবাক্য, এ কথা তার গুরুর গুরুও স্বীকার করিবেন। সেই উপনিষদ যখন বলিতেছে, ব্রহ্ম "নেদং যদিদমুপাসতে," তবে কেন এ ভড়ং।

সে গোড়া হইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে ঈশোপনিষৎ পড়িল। সেখানে পাইল,

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়ামরতাঃ।

কঠোপনিষদে পড়িল,

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধে নৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।

মনোরমা চমকিয়া উঠিল। এ কি ঠিক তারই কথা নয়? তার গুরুর দ্বারা চালিত সে কি ঠিক এই অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ নয়? ঈশ, কেন ও কঠোপনিষদে যে ব্রহ্মের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, যাহার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, তার সঙ্গে তার গুরূপদিষ্ট দেবতা ও পূজার কোনও সম্পর্কই নাই বলিয়া তার মনে হইল। তবে কি সে অন্ধের দ্বারা নীত হইয়া অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছে। সংশয়ে চিত্ত ভরিয়া গেল। গুরুর বাক্যে আস্থা হারাইয়া সে ক্লিষ্ট হইল।

পরের দিন প্রাতে উঠিয়া সহস্রবার বীজমন্ত্র জপ করিবার সময় তার কেবলি মনে হইতে লাগিল, "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহ বিদ্যামুপাসতে।" সে মালা টপ-কাইয়া জপ করিয়া গেল; কিন্তু তাহার মন ভয়ানক বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে সুকুমার বাবুর সঙ্গে উপাসনা করিবার জন্য তৃষিত হইয়া উঠিল।

১৬

সেই দিনকার নিভৃত আলাপে ইন্দ্রনাথের মনের ভিতর একটা প্রচণ্ড বাত্যার সৃষ্টি করিল। সে যেন তাহার মুখে কুটার মত ঘুরিয়া-ফিরিয়া বারবার অনীতারই পায়ের তলায় আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।

সে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, সে সরযুকে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে। সে প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করিতে ত্রুটি করে নাই। একান্ত সাধনার দ্বারা সে সরযূর প্রতি স্নেহ উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সরযূর গুণগুলি সে খুব বড় করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিত; তার দোষ-ত্রুটিগুলি সে অগ্রাহ্য করিত,—তার সংশোধনেরও কোনও চেষ্টা করিত না।

এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তার প্রায়ই মন্ত্র-দাতা গুরুর সঙ্গে তার পরামর্শের প্রয়োজন হইত। সুতরাং সে প্রায় প্রত্যহই অনীতার সঙ্গে এ সম্বন্ধে নিভৃত আলাপের সুযোগ খুঁজিত। ঠিক যে সময়টাতে অনীতাকে সম্পূর্ণ একলা পাওয়া যাইবে, সেই সময়ই সে তাহাদের বাড়ী যাইত; এবং প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে অনীতার সঙ্গে একলা বসিয়া, গভীর ভাবে তার এই প্রেম-সাধনার বিষয়ে আলাপ করিত। অনীতা তাহাকে উৎসাহিত করিত। ইন্দ্রনাথ প্রতিদিনকার সমস্ত ঘটনা তার কাছে নিবেদন করিত। অনীতা তাহার কার্য্যের সমালোচনা করিত; ভুল সংশোধন করিত; সরযূর মনের কথা বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইত। ইন্দ্রনাথ ভক্ত শিষ্যের মত কাণ পাতিয়া, তার সেই কথার অমৃতধারা পান করিত। তার পর পরিতৃপ্ত হৃদয়ে ইন্দ্রনাথ তার সাধনার পথে ফিরিয়া যাইত।

এ সাধনা ইন্দ্রনাথ করিত কেন? অনীতা তাহাকে বুঝাইয়াছিল যে, সরযূর প্রতি কর্ত্তব্যবশতঃ তার ইহা করা উচিত। সরযূর সুখের জন্য, ইন্দ্রনাথের সারা জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, এই সাধনা করিয়া তাহার পূর্ব্ব-প্রেম ফিরাইয়া আনা তার দরকার—এ কথা ইন্দ্রনাথও মনে-মনে আওড়াইত। কিন্তু তার মনের অন্তস্তলস্থ প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দেখা যায় যে, বাস্তবিক তার প্রবৃত্তির বার আনা হেতু ছিল অনীতা। অনীতা যে তার হাত ধরিয়া, তার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ বহাইয়া, তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল, সেই কথা তার সর্ব্বদা স্মরণ থাকিত। আর তার চোখের সামনে সর্ব্বদা ভাসিত অনীতার সেই একাগ্র মূর্ত্তি, তার সাগ্রহ অনুরোধ, আর তার সিক্ত অক্ষিপল্লব। শুধু তাই নয়! এই সাধনা উপলক্ষ করিয়া যে সে ঘন-ঘন অনীতার সঙ্গে নিভৃত সম্ভাষণ উপভোগ করে, ইহাও তাহার পক্ষে কম প্রলোভনের হেতু হয় নাই।

অনীতাকে যে সে ভালবাসে, সে কথা ইন্দ্রনাথ নিজের মনের কাছে গোপন করিতে পারিত না। কিন্তু সে কখন-কখনও এই বলিয়া নিজের মনকে ভুলাইতে চেষ্টা করিত যে, সে তাহাকে ভগিনীর মত, মনোরমার মত ভালবাসে। অনীতা সুন্দরী, অনীতা গুণবতী, অনীতা চিত্তহারিণী—তাতে তার আনন্দ। মনোরমাকে দেখিয়াও কি তার ঠিক তেম্‌নি আনন্দ হয় না? কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ইন্দ্রনাথ এ কথা অস্বীকার করিতে পারিত না যে, যে মত্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে প্রায় প্রতিদিন অমলের বাড়ী ছুটিয়া যায়, সেটা ভগিনীর প্রতি কখনও হয় না। অনীতার প্রত্যেক কথায়, তার অঙ্গের প্রতি স্পর্শে তার শিরায়-শিরায় যে নাচন উঠিয়া যায়, সেও ঠিক ভগিনীর স্পর্শে বা শব্দে হয় না।

এ কথাও তার মনে হইত যে, বুঝি অনীতাও তাকে ভালবাসে। অনীতার সেদিনকার গোটাকয়েক কথা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া তার কর্ণে ধ্বনিত হইত—"আপনার মত লোকের ভালবাসা পাওয়া যে কোনও নারীর তপস্যার ফল," "আপনি হৃদয়-সম্পদে যত বড় ধনী, তত বড় ধনী আর কয় জন ?" এ কথাগুলির মানে কি ? অনীতা কি মনে-মনে তাকে ভালবাসে ? এ কল্পনায় তার বড় আনন্দ হইত। যদিও পরক্ষণেই সে তীব্র বেদনার সহিত অনুভব করিতে যে, এ কথা কি সর্ব্বনাশের কথা ! এ কথা মনে করাও তার পক্ষে কি ভীষণ পাপের, স্বার্থপরতার, বিশ্বাসঘাতকতার কথা ! কিন্তু তবু ঘুরিয়া-ফিরিয়া সে এ কথা মনে না করিয়া পারিত না।

অনেকবার সে ভাবিয়াছে যে, তার এই তথাকথিত সাধনা একটা আত্ম-বঞ্চনা। বাস্তবিক সে সরযূকে ভালবাসিবার পথে এক পাও অগ্রসর হইতেছে না, বরং একটা ভয়ানক সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতেছে। সরযূর প্রতি প্রেমের সাধনায় তার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য, অনীতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ। কিন্তু যখন বিকাল বেলায় সে অবসর পাইত, তখন তার মন যে তীব্র তৃষ্ণার সহিত অনীতার বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিত, তাহাকে ফিরাইবার সাধ্য বা সাধনা তাহার ছিল না। সে কেবলমাত্র একটা ছুতা খুঁজিয়া, তার এই লোভের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিত না।

এমনি ভাবে অনেক দিন গেলে পর, একদিন টম লিণ্ডলে তাহাকে কলেজে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, "বোস, তুমি অনীতার সম্বন্ধে কি ভাব ?"

ইন্দ্রনাথ চমকাইয়া উঠিল। তার মনের পাপ তাহাকে ভয় লাগাইয়া দিল। এ সহজ কথার অর্থ সে ইহাই বুঝিল যে, টম তার মনের কথার সন্ধান পাইয়াছে ; এবং সেই জন্যই তাহাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, সে অনীতার প্রতি অবৈধ প্রেম পোষণ করে কি না ?

তার সমস্ত মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। তার পর সে কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া উত্তর করিল, "আমি কি ভাবি ? আমি ভাবি যে, সে একটি পরম সুন্দর এবং খুব ভাল মেয়ে।"

টম। Agreed ! এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার কোনও মতভেদ নাই। কিন্তু আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নি। আমি জানতে চাই যে আমার উপর অনীতার মনের ভাব কি রকম ব'লে তুমি মনে কর ?" ইন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল! তার মনের গোপন কথার সন্ধান তবে এ পায় নাই। সে বলিল, "সে কথা তো আমি তাকে জিজ্ঞাসাও করি নি, কোনও কিছু বিশেষ লক্ষ্যও করি নি।"

টম একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তুমি একটু চেষ্টা ক'রবে তার মনের কথা জানতে ? তোমার উপর তার ভয়ানক শ্রদ্ধা,—তুমি হয় তো সহজেই তার মনের কথাটা আদায় ক'রতে পারবে। তার মনের কথার একটু আঁচ না পেলে আমি স্থির হ'তে পারছি না। তুমি আমার এ উপকারটা ক'রবে বোস ?"

ইন্দ্র স্বীকৃত হইল। এ যে একটা অতিরিক্ত ছুতা ! টমের এ দৌত্যের ওজুহাতে সে সেদিন বাড়ী ফিরিয়াই তাড়াতাড়ি অনীতাদের বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সরযূ তাহাকে হঠাৎ বলিল, "আচ্ছা, অনীতা এ সপ্তাহের মধ্যে একদিনও কেন এখানে এল না বল দেখি ?"

"তা তো ব'লতে পারলাম না।"

"কোনও অসুখ-টসুখ করে নি তো ?"

"না, এই তো কালও টেনিস খেলে এলাম তার সঙ্গে।"

সরযূ একটু হাসিয়া বলিল, "ওঃ, তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে তা' হ'লে ! যাক, আজ একবার সেদিকে যাবে ?"

সোজাসুজি কথাটা স্বীকার করিতে ইন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হইল। সে বলিল "যেতে পারি হয় তো !"

"যদি যাও তো তাকে কাল চায়ের নিমন্ত্রণ ক'রে এস। তার আসা চাই-ই-চাই—তার দাদা আসুক বা না আসুক।"

"কেন ? এত তাগাদা কিসের জন্যে ?"

"কিসের জন্যে আবার ? সাত দিন তার সঙ্গে দেখা-শুনা নেই তাই।"

ইন্দ্র কর্ত্তব্য বোধে, কিন্তু সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, বলিল, "তবে তুমিই আজ চল না কেন আমার সঙ্গে ?"

সরযূ যখন সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বসিল, তখন ইন্দ্র বাঁচিয়া গেল। সে নিমন্ত্রণ করিতে স্বীকার করিয়া চলিল।

সরযূ তার হাতে গালা-মোহর দিয়া প্যাক করা একখানা খাতা দিয়া বলিল, "এখানা অনীতাকে দিও, তুমি দেখো না "

"প্রথম কথার উত্তর আচ্ছা ; শেষ কথার উত্তর বলতে পারলাম না।"

সরযূ ব্যগ্র ভাবে বলিল, "না, সত্যি, দেখো না।"

ইন্দ্র তা-না না-না করিতে-করিতে বাহির হইয়া গিয়া ট্রামে চড়িল। ট্রামে উঠিয়া খাতাখানার শীল ভাঙ্গিয়া খুলিয়া সে দেখিল। দেখিয়া অবাক হইল। খাতার মধ্যে সরযূর কতকগুলি ইংরাজী লেখার অনুবাদ, রচনা, গল্প প্রভৃতি। ইন্দ্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, সরযূ এই কয় দিনে ইংরাজীতে অনেকটা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে। সে অনুমান করিল, অনীতা এতদিন গোপনে-গোপনে সরযূকে শিখাইয়াছে। সরযূ তাহার অনুশীলনের খাতা সংশোধনের জন্য অনীতাকে পাঠাইতেছে।

অনীতার এই নিঃস্বার্থ ঐকান্তিক হিতৈষণার কথা চিন্তা করিতে ইন্দ্রের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ইন্দ্রের মঙ্গলের জন্য, তার তৃপ্তির জন্য, প্রকাশ্যে ও গোপনে এই অসামান্যা নারী যে নিপুণ অধ্যবসায় দেখাইয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রনাথের হৃদয় তাহার উপর আরও ব্যগ্রভাবে ছুটিয়া গেল।

কিন্তু ইন্দ্রনাথ দেখিতে পাইল না ইহার ভিতর সরযূর পরিপূর্ণ পতিপ্রাণতা। সরযূ যে-দিন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিল যে, তার স্বামী সত্য-সত্যই তার কাছে যাহা আশা করেন, তাহা সে দিতে পারে না; আর তাই তার স্বামীর মনে একটা মস্তবড় দাগা রহিয়া গিয়াছে, তখন হইতে সে একটা সম্পূর্ণ নূতন রকম উৎসাহে পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করিল। সে অনীতাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল, "তুমি ভাই আমাকে যেমন করে' চাও গড়ে-পিটে নাও।" অনীতা আনন্দের সহিত এ ভার গ্রহণ করিল। মাস-খানেকের মধ্যেই সরযূ এতটা অগ্রসর হইয়া পড়িল যে, অনীতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

সে শুধু ইহাই করে নাই। যেদিন সে সত্য-সত্যই আবিষ্কার করিল যে, সে নিজের দোষে পতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি হারাইয়া বসিয়াছে, সেই দিন হইতে তার প্রাণ স্বামীর প্রতি সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। কি করিলে ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকার হয়, সে একা-একা এ কথা অনেক ভাবিয়াছে। সে যে লেখাপড়া শিখিয়া, ইংরাজী কায়দা-কানুন শিখিয়া ইন্দ্রনাথের ঠিক মনের মত সহধর্ম্মিণী কোনও দিন হইতে পারিবে, এ কথা সে মনে স্থান দিতে পারিল না। কেন না, সে স্বামীর মনের আদর্শ অনীতায় জীবন্ত দেখিতে পাইল; আর সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করিল যে, অনীতার মত শিক্ষা-দীক্ষায় বা কোনও বিষয়েই এত উন্নত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব!

একটা কথা তার মনে হইল। সে যদি এখন মরিয়া যায়, তবে তো তার স্বামী অনীতাকে বিবাহ করিয়া, যোগ্য পত্নী পাইয়া সুখী হইতে পারিবেন। সে মরিলেই তো পারে। তার স্বামী যে অনীতাকে ভালবাসেন, সে সম্বন্ধে তার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। সে মারা গেলে ইন্দ্রনাথ কিছুদিন কষ্ট পাইবে বটে, কিন্তু অনীতাকে পাইলে সে শোক বেশী দিন থাকিবে না। আর সে তার জীবনটা সার্থক বোধ করিবে। কিন্তু একটা কথা! অনীতা কি ইন্দ্রকে ভালবাসে? অনেক দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া সরযূ সাব্যস্ত করিয়াছিল যে, অনীতা ইন্দ্রনাথকে ভালবাসে; খুব সে ভালবাসে বলিয়াই, সরযূকে ইন্দ্রের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য তার এত গরজ! ব্যস—তবে তো লেঠা চুকিয়াই গেল,—সরযূ মরিলেই তো হয়! মেয়ে দুটির জন্য সরযূর কোনও ভয় হইল না,—অনীতার হাতে তাদের কম আদর-যত্ন হইবে না। আর তার উপর তাদের পিসীমা তো আছেই। তবে সরযূ মরিবে না কেন? মরা তো খুবই সহজ!

মরিবার নানা উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া, সরযূ সাব্যস্ত করিল যে, কাপড়ে কেরোসিন মাখিয়া আগুন ধরাইয়া, সম্পূর্ণ আধুনিক উপায়ে মরাটাই প্রশস্ত। এ সম্বন্ধে সে সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু পরদিন হঠাৎ একটা খবরের কাগজের লেখা পড়িয়া তার মনে হইল যে, সে যদি আত্মহত্যা করে, তবে তার স্বামীর মস্ত একটা কলঙ্ক হইবে; এবং চাই কি, অনীতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। আর লোকে যেমন আর দুই-এক স্থলে বলে,—এখানেও এ কথা বলা অসম্ভব নয় যে, অনীতা ও ইন্দ্রনাথ তাদের প্রেমের পথের বিঘ্ন সরাইবার জন্য যুক্তি করিয়া, তাহাকে ইচ্ছা করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। সে আত্মহত্যা করিয়া কি শেষে স্বামীর ঘাড়ে এমনি একটা কলঙ্ক চাপাইয়া যাইবে! সে অসম্ভব! তাই সে নিরন্তর ভগবানের কাছে মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। আর যতদিন বাঁচিয়া থাকে, অনীতার ছায়ায় বসিয়া যতদূর সম্ভব অনীতার মত হইতে চেষ্টা করিবে স্থির করিল। সে চেষ্টার ফল এই উন্নতি। (ক্রমশঃ)

আমাদের নাট্যশাস্ত্র

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ

(২)

অভিনয়-ব্যাপার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—লোকধর্ম্মী ও নাট্যধর্ম্মী। লোকধর্ম্মী অভিনয় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে সংসার-রঙ্গভূমিতে সম্পন্ন হইতেছে। তাহার জন্য সজ্জা, পট, অনুরঞ্জন প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। নাট্যধর্ম্মী যে অভিনয়, তাহার জন্যই ঐ সকলের প্রয়োজন। এই নাট্যধর্ম্মী অভিনয়ই আমাদের বক্তব্য বিষয়।

নাট্যধর্ম্মী অভিনয় বা সাধারণ ভাবে অভিনয় চারিটী ভাগে বিভক্ত—

(১) বাচিক অর্থাৎ আবৃত্তি বা Delivery; (২) আঙ্গিক, অর্থাৎ বাক্যের সহিত অঙ্গসঞ্চালন বা Motion; (৩) আহার্য্য অর্থাৎ দৃশ্যপট, পরিচ্ছদ ইত্যাদি বা Scenery and make up; (৪) সাত্ত্বিক বা আবৃত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা Emotion.

Aristotle-এর Rhetoric নামক গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত। তাহারই তৃতীয় খণ্ডের নাম আবৃত্তি-বিজ্ঞান। এই খণ্ডে তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্বরভঙ্গীই আবৃত্তির প্রাণ। তিনি কহিয়াছেন—"The art of delivery is the art of knowing how to use the voice for the expression of each feeling, of knowing when it should be loud, low or moderate, of managing its pitch—shrill, deep or middle and of adopting the cadence to the theme."

বৃদ্ধ Aristotle-এর বহুপূর্ব্বে ভারতের নটগুরু নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—

অলঙ্কার বিরামাভ্যাং সাঙ্গতেঽর্থ নিশ্চয়ঃ।

নাট্যশাস্ত্রে স্বরাধ্যায় নামক একটি অধ্যায় আছে; তাহাতে এই বিষয়ের অতি সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম আলোচনা দেখা যাইবে।

সে আলোচনা এতই বিপুল যে, ক্ষুদ্র একটী প্রবন্ধে তাহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে, নাট্যাচার্য্য স্বরকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সাকাঙ্ক্ষ ও নিরাকাঙ্ক্ষ। এই উভয়বিধ ঘনিষ্ঠ স্বর উৎপত্তি-স্থানের ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত—(১) বক্ষ, কণ্ঠ ও শির। তারা, উদারা, মুদারার ন্যায় এই তিনটী যেন তিন গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামে ষড়্জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত এক-একটী স্বর-সপ্তক কল্পিত হইয়াছে। সপ্তকের প্রত্যেকটী স্বরের চারিটী করিয়া অবস্থা; যথা—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও সম্মিত। ইহাদেরই নাম কণ্ঠ স্বরের বর্ণ। প্রত্যেক স্বরের আবার ছয়টী করিয়া অলঙ্কার কল্পিত হইয়াছে; যথা—উচ্চ, নীচ, মন্দ্র, দীপ্ত, বিলম্বিত ও হ্রস্ব। অলঙ্কার থাকিলেই অঙ্গ থাকিতে হয়। স্বরের সেই সকল অঙ্গের নাম—বিরাম, অনুবন্ধ, প্রশমন, অর্পণ, বিসর্গ, দীপন প্রভৃতি।

মনে করুন, হাস্যরস অভিনীত হইতেছে। ভারতের নাট্যাচার্য্যের সাধারণ নির্দ্দেশ এই যে, হাস্যরসে স্বর-সপ্তকের মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের প্রয়োজন। সেই স্বরের বর্ণ উদাত্ত বা স্বরিত বা এতদুভয় হইবে। তাহার অলঙ্কার হইবে বিলম্বিত। সেইরূপ বীররসের অভিনয়-কালে কণ্ঠে ষড়জ ও ঋষভ, এই দুইটী স্বরের প্রয়োজন। সে স্বরের বর্ণ উদাত্ত ও কল্পিত; তাহার অলঙ্কার উচ্চ বা দীপ্ত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের নাট্যাচার্য্য য়ুরোপীয় সভ্যতার বহুপূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, অভিনয়কালে স্বর নানা অবস্থায় তিনটী স্থান হইতে উদ্ভূত হয়; যথা—(১) বক্ষ, (২) কণ্ঠ (৩) শির। যখন দুই জনে নিকটে বসিয়া কথোপকথন করিতেছে, উত্তেজনার কোন কারণ নাই, তখন তাহারা যে কণ্ঠে কথা কহে, তাহাই বক্ষস্থ স্বর—ইহারই অন্যতম সংজ্ঞা সমীপস্থ আভাষণ। যখন এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে অদূরে দেখিয়া ডাকিতেছে, তখন সে যে কণ্ঠে ডাকে, তাহাই কণ্ঠস্থ স্বর। ইহার নাম দূরস্থ আভাষণ। যখন এক ব্যক্তি অপরকে দেখিতে পাইতেছে না, অথচ চীৎকার করিয়া গ্রীবা হেলাইয়া

ডাকিতেছে, তখন যে সুর উদ্ভূত হয়, তাহারই নাম শিরস্থ সুর। চিত্তের কোন্ অবস্থায় কি প্রকার সুরে, কোন্ গ্রামে অভিনয় করিলে, কোন্ ভাব প্রকাশ করা যায়, ঋষি ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে যেরূপে সেই পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অনুরূপ নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর কোন অভিনেতা বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হন নাই।

Yule কলেজের অধ্যাপক Day সাহেব এতকাল পরে ভরতমুনির পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া কহিতেছেন—

"There are 3 varieties of quality of voice which affect the character of vocal expression—they are the orotund, the guttural and the aspirate."

কণ্ঠলীলা তাই আবৃত্তির প্রাণ। কণ্ঠস্বরের সাহায্যেই আমরা রঙ্গপীঠে দেবীকে স্থাপিত করি, পিশাচীকে আনি, রোষকে প্রজ্জ্বলিত করি, বর্ণকে ফুটাইয়া তুলি, আবার অশ্রুর বন্যায় চারিদিক ভাসাইয়া দিই। এই কণ্ঠের লীলাতেই আবার মূর্ত্তিমতী প্রেমের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গাহি—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

দুই একটী উদাহরণ লওয়া যাউক।

যুবরাজ মেঘনাদ যখন প্রমোদভবনে শুনিলেন—"ঘোরতর রণে হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী" তখন—

"হা ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার। "হা ধিক্ মোরে"! বৈরীদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে।"

পতি-বিরহ-বিধুরা ব্যথিতা প্রমীলা যখন প্রমোদভবন ত্যাগ করিয়া চেড়ীদলসহ লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন—

"গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীচ্ছন্দে।"

সখি পরিবেষ্টিতা প্রমীলাকে লঙ্কায় সিংহদ্বারে দেখিয়া হনুমান চিন্তামগ্ন। শেষে—

"এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
..................কহিলা গম্ভীরে—"

আবার দেখুন—

লঙ্কার "উদ্যান-দুয়ারে" উপস্থিত হইয়া বীর সৌমিত্রী দেখিলেন, স্বয়ং ভূতনাথ ত্রিশূল হস্তে প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত। তখন প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন—"ছাড় পথ, পূজিব চণ্ডীরে...নহে দেহ রণ দাসে!" এই বীরবাক্য শ্রবণ করিয়া—

"যথা শুনি বজ্রনাদ উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে—
বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়ামণি
লক্ষ্মণ!"

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যখন মেঘনাদ কহিলেন—

".........নিরস্ত যে অরি
নহে রথিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।"

তখন—

"জলদপ্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রী
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়েরে কিরাত তারে?"

বিভীষণ যখন অস্ত্রাগার দ্বার ছাড়িলেন না এবং কহিলেন—"পরদোষে যে চাহে মজিতে"

তখন—

"রুষিলা রাঘবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্ররূপী,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী।"

ইন্দ্রজিৎ হত। রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে চলিয়াছেন! তাঁহাকে দেখিয়া—

"নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।"

রথ অগ্রসর হইল। কিন্তু বোধ হইল যেন রথের গতি শিথিল হইয়াছে। শত্রুশোণিতে প্রতিহিংসা-জ্বালা নিবারণ করিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিতেছে না।

তখন—

"...স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গম্ভীরে—
চালাও হে সূত! রথ, যথা বজ্রপাণি
বাসব।"

আবার দেখুন—

রাবণের রথ কার্ত্তিকেয়ের রথের নিকট আসিল। তখন—

"নতশিরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে।"

বঙ্গ-কবি-রাজ মাইকেলের গ্রন্থ হইতে গম্ভীর কণ্ঠের কতকগুলি উদাহরণ দিলাম। আবার সেই গম্ভীর কণ্ঠের পরিচয় গ্রহণ করুন—

শৈলেশ্বরের মন্দির-সান্নিধ্যে আসিয়া ভীত গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে অধিকতর ভীত করিবার জন্য বিমলা গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"হুঃ!"

হর্ষ একটা চিত্তবৃত্তি। তাই বলিয়া কি হর্ষমাত্রেরই একই রূপ মূর্ত্তি? যোগীর ভগবচ্চরণ দর্শনে হর্ষ, ভোগীর বিলাস-সামগ্রী দর্শনে হর্ষ, সেনাপতির যুদ্ধ-জয়ে হর্ষ, বিনা বাধায় পরস্বাপহরণে কৃতকার্য্য হইয়া তস্করের হর্ষ—জননীর প্রিয় সুত দর্শনে, বিরহিণীর প্রিয়-সম্মিলনে—এ সকলই হর্ষ,—কিন্তু অবস্থাভেদে কত বিভিন্ন।

চিন্তা একটা মনোবৃত্তি। অভিনয়কালে ইহাকে বাক্যময় করিয়া দেখাইতে হয়। নাট্যাচার্য্য ইহাকেই নাট্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেখানে বাক্য, সেইখানে ধ্বনি। যেখানে ধ্বনি সেইখানেই তাহার বিরাম, বিচ্ছেদ, উত্থান, পতন, দীপন, অনুবন্ধ প্রভৃতি। পলাশী-প্রাঙ্গণে ক্লাইব ভাবিতেছেন 'কি হয়, কি হয়! রণে জয় পরাজয়!" শিবাজী ভাবিতেছেন কিরূপে দিল্লী হইতে পলায়ন করিবেন। গোবিন্দলাল ভাবিতেছে—"স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?" ভ্রমর ভাবিতেছে—"কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে, আমাকে ত্যাগ করিবে?" আবার আসন্ন সময়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া পার্থ ভাবিতেছেন—এ বিজয় কাহার জন্য? এ সকলই চিন্তা বটে—কিন্তু এক কারণে উদ্ভূত নহে—সুতরাং অভিব্যক্তিও একরূপ হইবে না। কিরূপে হৃদ্গত বিভিন্ন ভাবকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে, আমাদের নাট্যাচার্য্য তাহার স্বর-গ্রাম পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অভিনয়-কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য এরূপ আদর্শ গৃহে থাকিতে, আমরা কেন বিদেশে যাইব? দান করিলে ধন ফুরায় না, এত আমাদের—আমরা কেন ভিখারী হইব?

কণ্ঠস্বর যতদূর পারে আমাদিগের সুছন্দের ভাব ফুটাইয়া দেয়। যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহা পরিপূর্ণ করে আমাদের নয়ন, বদন, শির—আমাদের অঙ্গ, উপাঙ্গ প্রভৃতি। ইহাদের অভিনয় কৌশলই ভরত কর্ত্তৃক আঙ্গিক অভিনয় নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখ ক্রিয়াত্ময়ঃ
সোঽঙ্গাভিনয় সংযুক্তা নাট্যধর্ম্মী প্রকীর্ত্তিতা।

বাচিক অভিনয়ে যেমন, অঙ্গাভিনয়েও তেমনি পাত্রাপাত্র-বিচার বিশেষ রূপে প্রয়োজন। দাস প্রভুর সমক্ষে যেরূপ কণ্ঠে কথা কহে, নিজের বন্ধুর নিকটে সেরূপে কহে না। পিতা পুত্রের সহিত কথা কহিতে যেরূপ অঙ্গাভিনয় করেন, পুত্র পিতার সহিত কথোপকথন কালে সেরূপ করিলে শোভন হয় না।

মাধবাচার্য্য ক্ষুব্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে কহিলেন—
* * "কেনই বা দ্বাদশবর্ষ দেবারাধনা ত্যাগ করিয়া এ পাষণ্ডকে সকল বিদ্যা শিখাইলাম?"

"* * * ক্রমে হেমচন্দ্রের অনিন্দ্য গৌর মুখকান্তি মধ্যাহ্ন মরীচি-বিশোষিত স্থলপদ্মবৎ আরক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু গর্ভাগ্নি গিরিশিখর তুল্য, তিনি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।"

মাধবাচার্য্য যখন কহিলেন—"আর যদি মৃণালিনী মরিয়া থাকে?"

"হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল।" অন্যত্র হেমচন্দ্রের ক্রোধের পরিচয় দেখুন—

হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সন্ধান পাইতেছেন না। গিরিজায়া সে সন্ধান জানে। সে কহিল—"আমি সন্ধান করিয়াছি, সে অনেকদূর। এখান হইতে দক্ষিণে, তার পর পূর্ব্বে, তারপর উত্তর, তারপর পশ্চিম—"

হেমচন্দ্র হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। কহিলেন—"এ সময়ে তামাসা রাখ, নহিলে মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।" ইহাও হেমচন্দ্রেরই ক্রোধের পরিচায়ক।

আবার দেখুন—

মৃণালিনীর প্রসঙ্গে মাধবাচার্য্য সঙ্কুচিত স্বরে কহিলেন—"হৃষীকেশেরই কথা মিথ্যা বোধ হয়।"

হেমচন্দ্র কহিলেন—"হৃষীকেশ প্রত্যক্ষ।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পিতৃদত্ত শূল হস্তে লইলেন। কম্পিত কলেবরে গৃহমধ্যে নিঃশব্দে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।"

এই স্থলে "কম্পিত কলেবরে" এবং "নিঃশব্দে" এই দুইটী অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন! সে ক্রোধ কিরূপে তাঁহার বদনমণ্ডলকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল তাহা

তাহা মনোরমার কথায় পরিস্ফুট রহিয়াছে। মনোরমা কহিতেছেন---

"তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার। ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত রাগে ভরা। অত ভ্রূকুটি করিতেছ কেন? চক্ষের পলক নাই কেন?---আর দেখি,---তাই ত চোখে জল; তুমি কেঁদেছ?"

হেমচন্দ্র কাব্যের উত্তম চরিত্র। গিরিজায়া দাসী। গিরিজায়ার ক্রোধের পরিচয় লই:-

হেমচন্দ্র কর্তৃক লাঞ্ছিতা ও পরিত্যক্তা হইবার পরদিন মৃণালিনী কহিলেন--

"গিরিজায়া, আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম--আজিও তাঁহার দাসী।"

"গিরিজায়ার বড় রাগ হইল। সে উঠিয়া বসিল। বলিল---কি ঠাকুরাণী! তুমি এখনও বল---তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী।" মৃণালিনী বলিলেন---"তিনি আমার স্বামী। তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না।"

"গিরিজায়া আরও রাগ করিল। বহুযত্ন-রচিত পর্ণশয্যা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। কহিল---পাষণ্ড বলিব না? একবার বলিব? (বলিয়াই কতকগুলি শয্যা-বিন্যাসের পল্লব সদর্পে জলে ফেলিয়া দিল।' "একবার বলিব? দশবার বলিব," (আবার পল্লব নিক্ষেপ) ---"শতবার বলিব" (পল্লব নিক্ষেপ)---হাজারবার বলিব।" এইরূপে সকল পল্লব জলে গেল।

রাজসভায় শিবাজীর ক্রোধ কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, রমেশচন্দ্রের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' হইতে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি;--

রুদ্রমণ্ডল জয় করিয়া শিবাজী তথায় "অপরূপ সভা সন্নিবেশিত" করিলেন। বন্দীকৃত কিল্লাদার রহমৎ খাঁ সেই সভায় প্রকাশ করিলেন, সেনার মধ্যে সকলেই প্রভুভক্ত নহে, দুর্গাক্রমণের সংবাদ পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহাকে একজন জানাইয়াছিল।

"রোষে শিবাজীর মুখমণ্ডল একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল।"

নিশীথে কারাকক্ষে বন্দী জগৎসিংহের সম্মুখে ওসমান যখন আয়েসার কথার উত্তরে বলিলেন---আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?

"আয়েসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ববৎ ওসমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার বিশাল লোচন আরো যেন বর্দ্ধিতায়তন হইল। মুখপদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ ঈষৎ একদিকে হেলিল। হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবালদলবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল।

আবার অন্যত্র দেখুন---

নবাব মীরকাসেমের নিকট শৈবলিনী যখন বলিল---"দুইজন ইংরাজ তাহাদিগকে (দলনী বেগম ও কুলসমকে) ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"---

তখন---

"নবাব মৌনী হইয়া রহিলেন। অধর দংশন করিয়া শ্মশ্রু উৎপাটন করিলেন।"

অন্যত্র আবার---

কমলমণির সঙ্গে যখন স্বামী শ্রীশচন্দ্রের প্রেমের সমর চলিতেছিল, তখন শ্রীশচন্দ্রের একটা কথায় "কমলমণির বড় রাগ হইল। সে ভ্রূকুটি করিল, শ্রীশকে ভেঙ্গাইল এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজখানায় লিখিতেছিল, তাই ছিঁড়িয়া ফেলিল। শ্রীশ হাসিয়া বলিল---"তা' লাগতে এসো কেন?"

"রত্নাকর রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী" যখন প্রমোদকুঞ্জে আসিয়া মেঘনাদকে কহিলেন---"যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুলমান, এ কাল সমরে রক্ষঃ-চূড়ামণি!" তখন--

"ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক বলয়
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল, অশোকের তলে
আভাময়।"

রোষের নানারূপ বিকাশ দেখিলাম---অধম, মধ্যম ও উত্তম চরিত্রাদির রোষের পরিচয় পাইলাম। রোষে অঙ্গ উপাঙ্গাদির কিরূপ সঞ্চালন বা পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাও দেখিলাম। এখন অন্যান্য দুই একটী চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ দেখি।

পৃথিবীতে কে না হাসে? আমরা হর্ষে হাসি, বিষাদে হাসি, বিদ্রূপে হাসি, ঘৃণায় হাসি। হাস্য আরও কত কারণে ফুটিয়া উঠিয়া চিত্তের ভাবকে প্রকাশ করে। এই কারণেই আমাদের নাট্যশাস্ত্রে ৪৮ প্রকার হাস্যের বর্ণনা আছে।

গুহা মধ্যে শৈবলিনী স্থির হইয়া চন্দ্রশেখরকে বলিতে লাগিল—"অল্পদিন বাঁচিব, মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখ্‌তে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? — যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি?"

শৈবলিনী কাতরতার বিকট হাসি হাসিল।

মেঘনাদ বধের পর রাবণ স্বয়ং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন—

"আইলা কিষ্কিন্ধাপতি — —
— — হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ;...রাজভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে
বর্ব্বর! আইলি তুই এ কনকপুরে!
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর, তারাকারা রূপে;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে
তুই রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ!"

রাবণের এই উক্তি শ্লেষে পরিপূর্ণ। হাস্য সেই শ্লেষকে তীক্ষ্ণতর করিয়াছে।

শঙ্করের পাদমূলে বসিয়া শঙ্করী সরোদন কহিতেছেন—

"কে আর! হে বিশ্বনাথ! পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে? বিষম লজ্জা দিলে নাথ আজি
আমায়, ডুবালে নাথ কলঙ্ক সলিলে।

* * * *

কুক্ষণে মৈথিলিপতি পূজিল আমারে।"

তখন—

"হাসি উত্তরিলা শম্ভু এ অল্প বিষয়ে
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্র-নন্দিনি?"

মেঘনাদ যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, জননী কাতর হইয়া কাঁদিয়া কহিলেন—

কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!

বীর পুত্র মাতার এই অলীক ভীতি দেখিয়া হাস্য করিলেন। সে হাসি বীরেরই উপযুক্ত। তাহাই যেন বলিয়া দিল, ভয় কি মা—আমি নিশ্চয়ই বিজয় লাভ করিব।

"হাসিয়া, মায়ের পদে উত্তরিলা রথী
কেন মা ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে

* * * *

কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি।"

আবার দেখুন, সেই মেঘনাদ কুসুমাকীর্ণ পথে নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালায় যাইতে-যাইতে যখন পশ্চাতে প্রমীলার নূপুরধ্বনি শুনিলেন, তখন হৃদয়ে প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। হর্ষে গর্ব্বে পরিপূর্ণ প্রেমে প্রমীলাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া তিনি হাসিলেন।

"............হাসিলা বীরেন্দ্র;
সুখে বাহুপাশে বাঁধি, ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে।"

কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবশিবির। সমাগত সমর সম্বন্ধে উত্তরার সহিত অভিমন্যুর কথা হইতেছিল। অভিমন্যু কিরূপে যুদ্ধ করিয়া কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতিকে পরাজিত করিবেন, উত্তরাকে তাহাই বুঝাইতেছিলেন। উত্তরা ক্ষুদ্র যূথিকা। বীরের বাক্যে তাঁহার শঙ্কা দূর হইল না।

"কিন্তু সাত জনে যদি করে আক্রমণ?"

তাহাও কি সম্ভব? এ যে ক্ষত্রিয়ের সহিত ক্ষত্রিয়ের সমর—এ যে ধর্ম্ম-যুদ্ধ!

"অভিমন্যু উচ্চ হাসি উঠিল হাসিয়া"

কহিল—

"এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম; জাতিতে কেশরী
ক্ষত্রিয়ের— এই নীচ বৃত্তি শৃগালের,
নহে ক্ষত্রিয়ের।"

এই সকল উদাহরণ হইতেই দেখা যাইতেছে যে চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পাত্রাপাত্র ও অবস্থাভেদে চক্ষু, মুখ, হস্ত, পদ—সর্ব্বশরীরের বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তনগুলি যথাযথ দেখাইতে পারিলেই, রস ও ভাবের সহিত অভিনয়ের সম্বন্ধ স্থির থাকে। সেই জন্যই নাট্যাচার্য্য ভরত বলিতেছেন—

অথৈকাংরসভাবেষু বিনিয়োগং নিবোধত।

অন্যত্র—

দেশং কালং চ পাত্রং চ অর্থসক্তিসবেক্ষ্য চ।
তস্মাহেতে প্রয়োক্তব্যান্নূনাং স্ত্রীনাংবিশেষতঃ॥

ইত্যাদি

কতকগুলি সাধারণ সূত্র রচনা করিয়াই ঋষি ভরত আঙ্গিক অভিনয় সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন নাই; নরচিত্তকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া একে-একে দেখাইয়া-

ছেন—চিত্তবৃত্তিগুলির পরিচয় বিবৃত করিয়াছেন উৎপত্তির কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন; এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে বহিঃপ্রকাশোপযোগী কণ্ঠ ও অঙ্গভঙ্গী পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার মধ্যে যে অসংখ্য রত্নরাজি বর্ত্তমান আছে, ক্ষুদ্র একটী প্রবন্ধে কিরূপে তাহা দেখাইব—কিরূপে বুঝাইব যে নাট্যকলার আদর্শের জন্য আমাদের কাহারও কাছে ভিক্ষা করিতে যাইবার প্রয়োজন নাই আপনার গৃহচত্বরেই সে আদর্শের সন্ধান-লাভ ঘটিতে পারে।

নয়ন হৃদয়ের দর্পণ। নয়ন ও মুখভঙ্গীই আঙ্গিকাভিনয়ের প্রাণস্বরূপ। তাই মুনিবর ভরত বলিয়াছেন—

শাখাঙ্গ উপাঙ্গ সংযুক্তঃ কৃতোপি অভিনয়ঃ শুভ।
মুখরাগবিহীনস্থ নৈব শোভান্বিত ভবেৎ॥
ইত্যাদি।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, শাখাঙ্গ উপাঙ্গ জিনিষটা কি? মানব-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি তিনটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া ভরত তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন, অঙ্গ, উপাঙ্গ, শাখা। অঙ্গ অর্থে দেহের প্রধান-প্রধান অংশ; উপাঙ্গ অর্থে অপ্রধান অংশ; এবং শাখা অর্থে এক দেশ বুঝিতে হয়। শির, বাহু, কটি, হস্ত, বক্ষ, পার্শ্ব এইগুলি অঙ্গ; নেত্র, ভ্রূ, নাসা, কপোল, অধর, চিবুক গ্রীবা ইত্যাদি উপাঙ্গ; এবং হস্ত ও পদ শাখা। ভরতের গ্রন্থে কি অঙ্গ, কি উপাঙ্গ, কি শাখা—প্রত্যেকেরই কখন কিরূপ অভিনয় করা প্রয়োজন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি কেবল নয়নভঙ্গীগুলির বর্ণনা করিয়াই নিরস্ত হন নাই,—ভ্রূ-অভিনয় পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন,—অক্ষি-তারকার অভিনয় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

অঙ্গলীলা শারীর অভিনয় নামে পরিচিত। বিভিন্ন প্রকারের শারীর অভিনয়ের পার্থক্য ও প্রয়োজন বিস্তৃত ভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত বর্ণনা করিবার জন্য নাট্যাচার্য্য আঙ্গিকাভিনয়কে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

(১) শারীর (২) মুখজ এবং (৩) চেষ্টাকৃত। এই তিনটী প্রধান ভাগ আবার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। শারীর অভিনয়ের ৫টী ভাগ; যথা—বাক্য, অঙ্কুর, স্বচা, নৃত্য, নিবৃত্যঙ্কুর। মুখজের ৪ ভাগ; যথা—প্রসন্ন, রক্ত, বন্যাস ও স্বাভাবিক, এবং চেষ্টাকৃতের তিন ভাগ; যথা গতি, নৃত্য, যুদ্ধাদি।

অঙ্গাভিনয়ে, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে action বা motion বলা চলে তাহাতে, দুইটী প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় (১) ইহা লোক-স্বভাবের অনুরূপ হইবে কি অতিরিক্ত হইবে এবং (২) ইহা বাক্যের পূর্ব্বে বা পরে বা বাক্যের সঙ্গে-সঙ্গে চলিবে।

অভিনয়ই যখন লোক-স্বভাবের অনুকরণ, তখন আঙ্গিকাভিনয় লোক-স্বভাবেরই অনুরূপ হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ভারতের নাট্যাচার্য্য বলিতেছেন

নহি অঙ্গাভিনয়াৎ কশ্চিৎ অন্তেবাগঃ প্রবর্ত্ততে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, অঙ্গাভিনয় ঠিক অভিনয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চলিবে। এ কথা সাধারণতঃ সত্য হইলেও সর্ব্বদা সত্য নহে। কখন-কখনও অঙ্গরাগ বাক্যের পুরোগামী হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু বাক্যের পশ্চাৎগামী কখনও হইবে না।

লক্ষ্মণ যখন মেঘনাদকে কহিলেন—"দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে", তখনই তিনি অসি নিষ্কোষিত করিলেন। নিষ্কোষিত অসি হস্তে এ কথা বলেন নাই।

"এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি,
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল তেজে।"

এখানে অঙ্গাভিনয় বাক্যের সমকালীন হইল।

অন্যত্র—

"বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি উত্তরিল বলী
বিভীষণ—যা কহিলা সত্য শূরমণি"

এখানে অঙ্গাভিনয় (নিঃশ্বাস ত্যাগ) বাক্যের পূর্ব্বগামী।

সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের কুন্দনন্দিনী সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। কথা বলিতে-বলিতে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের চরণ-প্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়ন-জলে সিক্ত করিলেন। তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না।

বৃত্র-সংহারে দেখুন—

"ভ্রূকুটি করিয়া তবে, ললাট প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলিদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া
কহিলা দানবপতি—"সুমিত্র হে এই—
এই ভাগ্য যতদিন থাকিবে পুত্রের
জগতে কাহারো সাধ্য নাহি সে আবার
সবলে পরাস্ত করে কিংবা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তার।"

দুর্গাদাস নাটকে দেখুন—

আকবর। একে ভেতরে রেখে আয়—ঠেলে নিয়ে যা। দাঁড়িয়ে রৈলি যে।

দৌবারিক আসিয়া রাজিয়ার হাত ধরিয়া কহিল—"আসুন শাহাজাদী।"

নাট্যশাস্ত্রে মুখ্যতঃ অষ্টাদশ প্রকারের দৃষ্টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি এইরূপ—কখনো ঊর্দ্ধ, কখনো নিম্ন, কখনো স্থির, কখনো বক্র গূঢ় চকিত চক্ষু-তারা— ইহারই নাম শঙ্কিতা দৃষ্টি। এইরূপে দৃশ্যের অভিনয় বর্ণনা করিয়া নটরাজ নয় প্রকার চক্ষু-তারকার ও সাত প্রকার ভ্রূযুগের অভিনয়-কৌশল বর্ণনা করিয়াছেন।

চক্ষুর অভিনয় সর্ব্বদা আমরা লক্ষ্য করি না। কিন্তু উহার শক্তি অসীম।

নবাব মীরকাশেম গুরগিন্ খাঁকে বিদায় দিলেন। গুরগিন্ খাঁ যখন যান, নবাব তাঁহার প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ এই, যতদিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, ততদিন তোমায় কিছু বলিব না—যুদ্ধকালে তুমি আমার প্রধান অস্ত্র। তার পর দলনী বেগমের ঋণ তোমার শোণিতে পরিশোধ করিব।"

অন্যত্র—

"তকি বলিল, শুন সুন্দরী, আমাকে ভজ বিষ খাইতে হইবে না। শুনিয়া দলনী—লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন। মহম্মদ তকির বিষদান করা হইল না। মহম্মদ তকি দলনীর, প্রতি অদ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে-চাহিতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল।"

মনোরমা যখন পশুপতিকে বলিল—

"তুমি রাজ্যচ্যুত হইবে—স্ত্রৈণ রাজার রাজ্য থাকে না।"

তখন—

"পশুপতি প্রশংসমান লোচনে মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কহিলেন—"যাহার বামে এমন সরস্বতী, তাহার আশঙ্কা কি।"

ইন্দ্রপ্রিয়া যখন চপলাকে কহিলেন—

"সসর্প গৃহেতে বাস, পরবশ আর—
দুই তুল্য জীবিতের—দু-ই তিরস্কার!
মর্ত্ত্য ছাড়ি পরাশ্রয়ে যাব না চপলা।"

চপলা তখন বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কহিল—তবে ছদ্মবেশ ধর। এ কথা শুনিবামাত্র গর্ব্বিতার নয়নে বদনে গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, কি! আমি ইন্দ্রের ঘরণী—আমি কুহকী ছলা অবলম্বন করিব!

"বলিতে-বলিতে আস্যে হইল প্রকাশ
অপূর্ব্ব গরিমা-ছটা কিরণ আভাস।
নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব-সূর্য্যোদয়!"

স্বেদ নির্গম হইতেছে—এইরূপ অভিনয় করা আঙ্গিকাভিনয়ের একটি অংশ। দারুণ গ্রীষ্মে, অত্যন্ত শ্রমে, হর্ষে, ভয়ে, অপমানে, ক্রোধে—নানা কারণে শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হয়। কোন্ ভাব প্রকাশ করিবার জন্য স্বেদনির্গম অভিনয় করিতে হইবে, অনুসন্ধান করিলে তাহার বিবরণও নাট্যশাস্ত্রে লাভ করিতে পারা যায়। সে সকল সূত্র যে লোক-স্বভাবানুবর্ত্তী; দুই একটি উদাহরণ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

কাপালিক নবকুমারকে কহিল—"বৎস, কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা। আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাহাকে বধ করিব!—তুমি আমাকে সে সাহায্য প্রদান কর।

কাপালিক বাক্য সমাপ্ত করিলেন। নবকুমার কিছুই উত্তর করিলেন না। নবকুমার ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

রাজসিংহে উদীপুরী বেগমকে চঞ্চলকুমারী কহিতেছেন—

বেগম সাহেব!—অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে তামাকুটা সাজিয়া দিন।

......উদিপুরীর সর্ব্বশরীরে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল।

......উদিপুরী কাঁদিয়া ফেলিল, দুঃখে নহে, রাগে।"

কাপালিকের আহ্বানে নবকুমার যখন কুটীর হইতে তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ অনুগমন করিল, তখন পথিমধ্যে কপালকুণ্ডলা তীরের ন্যায় বেগে তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া

গেল। যাইবার সময় কহিল—"এখনও পলাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না ?"

নবকুমারের কপোলে স্বেদনির্গম হইতে লাগিল।

এইবার অভিনয় ব্যাপারের তৃতীয় কাণ্ডের কথা কহিব। তাহার নাম আহার্য্যাভিনয় বা Scenery and make up। অধ্যাপক Macdonell তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কহিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে ভারতের রঙ্গালয়ে দৃশ্যপটাদির সেরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না।

সাহেব বলিতেছেন—"It is somewhat curious that while there are many minute stage directions about dress and decorations no less than about the actions of the players, nothing is said in this way as to change of scene."

এ উক্তি বিচারসহ নহে। আহার্য্য অভিনয় নেপথ্যবিধি নামে পরিচিত। নেপথ্যবিধি কেন ? না, লোকচক্ষুর অন্তরালেই পরিচ্ছদাদি গ্রহণ করিতে হয়। এই নেপথ্যবিধি চারি প্রকারের ; যথা—পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গরচনা।

শৈল, যান বিমানানি চর্ম্মবর্ম্মায়ুধ ধ্বজাঃ।
যানি ক্রিয়ন্তে তান্যেব না পুস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥

পর্ব্বত, যান, বিমান অর্থাৎ ব্যোমচারি যান, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা প্রভৃতিকে পুস্ত জাতীয় বলা হইয়াছে। রঙ্গপীঠে প্রদর্শিত না হইলে এ সকলের উল্লেখ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না।

এখন দেখা যাউক, সংজীব নেপথ্য কাহাকে বলে।

যঃ প্রাণিনাং প্রবেশস্তু স সংজীব ইতি স্মৃতঃ—

নেপথ্য হইতে রঙ্গপীঠে প্রাণী প্রবেশ করাইবার নাম সংজীব।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেকালে রঙ্গভূমে পর্ব্বত, রথ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি জীব প্রদর্শিত হইত ; এমন কি, বিমান বা ব্যোমচারি যান পর্য্যন্ত রঙ্গভূমে আসিত।

বারান্তরে অবশিষ্ট আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

চাওয়া

শ্রীসুনীতি দেবী

চাইতে আমি আসিনি ত
তোমার দুয়ার 'পরে,
তোমায় আমি চাইব কেমন করে ?
পূজারিণী পূজা করে দেবতারে তার,
বুকে নেবার নেই ত অধিকার।
তাই, চোক ভ'রে চাই—
দেখ্‌তে তোমায়,
শুনতে তোমার বাণী ;
ঐটুকুতেই ব্যর্থ জীবন
ধন্য হ'ল মানি।
চোখের জলে চরণ ধুয়ে
মুছিয়ে আকুল কেশে,
তোমার কাছে সঁপে দেব
আপনাকে নিঃশেষে।

এই বুঝি বা ছিল গোপন সাধ
তাতেও বিধির বাদ্ !
অশুচি যে স্পর্শ আমার,
মলিন না কি মন,
পাই না যে তাই ধর্‌তে বুকে
তোমার ও চরণ।
স্পর্দ্ধা দেখে হাসে বা কেউ
তাইত লাজে মরি,
পূজার থালি লুকিয়ে রাখি
বুকের বসন ঘিরি।
কেউ বোঝে না হায় !
হৃদয় কিবা চায়,
আমার চাওয়া নয় ত তোমার নেওয়া
আমার চাওয়া সব বিলিয়ে দেওয়া।

বিজিতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১২)

হঠাৎ বাড়ী ফিরিবার জন্য টেলিগ্রাম পাইয়া, শৈলেন একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কাল বউদি যে পত্র লিখিয়াছেন, আজ সে তাহা ঘণ্টা তিনেক আগে পাইয়াছে। তাহাতে বাড়ীর সকলেই ভাল আছে, ঐ সংবাদ সে পাইয়াছে। এ টেলিগ্রাফ করিবার মানেটা কি? এক্‌জামিন আরম্ভ হইবার আর মাত্র কুড়ি দিন বাকি আছে,—এখন বাড়ী গেলে পড়ার যে অনেক ক্ষতি হইবে, ইহা জানা কথা।

সে টেলিগ্রাফখানা পকেটে ফেলিয়া, রমেন্দ্রের মেসে চলিল। গ্রে ষ্ট্রীটে রমেন্দ্র থাকে। শৈলেন যখন সেখানে গিয়া পৌছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

সে যখন মেসে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময় রমেন্দ্রও খুব তাড়াতাড়ি বাহির হইতে গিয়া একেবারে তাহার ঘাড়ের উপর হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। শৈলেন লোকটাকে চিনিতে না পারিয়া, রাগান্বিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আর ইউ ব্লাইণ্ড স্তার!"

"কে রে, শৈলেন না কি? আরে, আমিও যে তোর কাছেই যাচ্ছিলুম।" বলিতে-বলিতে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিস্মিত ভাবে শৈলেন বলিল, "তুমি! একটু দেখে-শুনে চল্‌তে হয়—মানুষ কি গরু আছে সামনে। অন্য কেউ হলে তো তোমায় এতক্ষণ গোটাকতক ঘুসি লাগিয়ে দিত।"

রমেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তুইও ভারি কম করতিস, না? এখনি ব্লাডি নিগার বলে ঘুষি তুলতিস, যদি শুনতিস আমি তোর ভাই নই, আর ব্লাইণ্ড নই। আমার কি এখন মাথার ঠিক আছে যে, দেখে-শুনে বার হব? চলছি তো চলছি-ই ব্যস্!"

শৈলেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "আবার মদ খেতে আরম্ভ করেছ বুঝি? তুমি এমনি করে কোন্ দিন যে মোটরকার কি ট্রামের তলায় চাপা পড়বে, আমি তা ঠিক জানছি। তোমার মরণ আছে এতেই। এত মাতালের পরিণাম দেখছ, তবু তো চোখ ফুটছে না।"

রমেন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিল, "মাইরি ভাই, আজ মদ খাইনি। এই দেখ্, গন্ধ পেয়ে যা খুসি আমায় বল ত। আজ আমাকে যা খুসি তাই বলতে পারবি—কেবল মাতাল ছাড়া। তোর কাছেই আমি যাচ্ছিলুম।"

শৈলেন বলিল, "আমার কাছে! আমিই যে এসেছি তোমার কাছে- একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে!"

সে ভাবিয়াছিল, টেলিগ্রামের নাম শুনিয়াই রমেন্দ্র চমকাইয়া উঠিবে। কিন্তু রমেন্দ্র বেশ শান্ত ভাবে পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া, একটা সিগারেট ধরাইতে-ধরাইতে বলিল "সে তো জানা কথা; আমাকেও তো টেলিগ্রাম করেছেন বাড়ী ফেরবার জন্যে। তা, আমি ও-সব ব্যাপারে মাথা দিতে পারব না—তাই বলতে যাচ্ছিলুম তোকে।"

শৈলেন বিস্ময়ে বলিল, "কি সব ব্যাপারে?"

রমেন কথাটাকে এড়াইয়া চলিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "না সে কথা নয়। আসল কথা, আমি যেতে পারব না।"

শৈলেন বলিল, "যেতে পারবে না, তার মানে? হয় তো বড়দার অসুখ-বিসুখ হয়েছে, তার জন্যেই বড়দা আমাদের দুজনকে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাফ করেছেন। আমি দশটার মেলে যাব; তুমি যাবে না কেন? বড়দার অসুখ করা সত্বেও—"

সে যে রাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা রমেন্দ্র বেশ বুঝিল। হাসিয়া, তাহার গা চাপড়াইয়া বলিল, "তার মানে আছে ভাই, মানে আছে। দাদার অসুখও হয় নি, কিছুই না। মেজদা যে টেলিগ্রাফ কেন করেছে, তার মানে আমার বাক্সে আছে। যাক, সে সব জানতে পারবি তুই সেখানে

বিস্মিত হইয়া যোগেন্দ্র বলিলেন, "বড় বউকে? কি দিয়েছে দেখি?"

শৈলেন বাক্সের ডালা খুলিল। ভিতরের জিনিষগুলার পানে চাহিয়া, যোগেন্দ্র শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "অনর্থক এ সব দেবার কি দরকার ছিল তার? বড় বউয়েরই বা তাকে এ খরচগুলো করানোর মানে কি? আমায় বললে কি আমি কিনে দিতে পারতুম না? যাক, যা হয়েছে তার তো আর চারা নেই। দে গিয়ে বড় বউকে ওগুলো।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা বিষণ্ণ ভাব ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল যে, শৈলেন আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার পানে চাহিল। তাই তো, এ যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! যোগেন্দ্রের চোখ দুইটা ভিতরে বসিয়া গেছে; তাহার নীচে কালি পড়িয়াছে! নাকটা একটু বেশী উঁচু দেখাইতেছে; কারণ, পরিপুষ্ট গণ্ড শুকাইয়া গেছে। বার্দ্ধক্য যেন এই কয় মাসে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সম্মুখের দিকে একটু যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন,—রোগাও যথেষ্ট হইয়া গিয়াছেন। পাঁচ মাস আগে শৈলেন যে দাদাকে দেখিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া আর সে দাদাকে দেখিতে পাইল না।

সে আস্তে-আস্তে বাক্সটা তুলিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিল। অমিয় তখন ভিতরের বারাণ্ডায় এক মনে একটা লাটিমে সূতা জড়াইয়া, সবে মাত্র সেটা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছিল,—সম্মুখেই ছোট কাকাকে দেখিয়া, সে লাটিম ফেলিয়া আনন্দে ছুটিয়া আসিয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিল "বাক্স করে আমার জন্যে কি এনেছ কাকাবাবু! দাও না বাক্সটা আমাকে?"

সে বেশ জানে, অমন রঙিন কাগজের বাক্সে তাহারই খেলার জিনিষ আসে। তাহাতে যে আর কাহারও জন্য কোনও জিনিষ আসিতে পারে, ইহা তাহার ধারণারও অতীত।

কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে না পারিয়া, শৈলেন বাক্স খুলিয়া দেখাইল। অভিমানে অমিয়ের ওষ্ঠ স্ফীত হইয়া উঠিল, "ওঃ, মার জন্যে সব আনতে পেরেছেন,—আমার জন্যে কিছু আনতে পারেন নি। কত করে পত্র লিখলুম, আমার জন্যে গোটাকত মার্ব্বেল আনতে, তাও আনতে—পারেন নি।"

তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া, তাহার ললাটে একটা স্নেহ-চুম্বন দিয়া শৈলেন বলিল, "সত্যি অমিয়, এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছি যে কি বলব। এগুলো সেজদা দিলে, তাই আনতে পেরেছি; নচেৎ কিছু আনতে পারতুম না।"

অমিয়ের রাগ দূর হইয়া গেল।

শৈলেন রন্ধন-গৃহের বারাণ্ডাতে দণ্ডায়মানা সুষমাকে দেখিতে পাইয়া, একমুখ হাসিয়া, বাক্সটা তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল।

হাসিমুখে সুষমা বলিলেন, "আমার জন্যে আবার কি আনলে ভাই?"

শৈলেন বলিল, "দেখ না কেন?"

বাক্স খুলিয়া দেখিয়া, সুষমা একটু মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "আমার জন্যে আবার এ সব আনবার কি দরকার ছিল ঠাকুরপো! এই কাপড়খানা কিনতে তো বড় কম টাকা লাগে নি। আর এই সোণা-বাঁধানো হাতীর দাঁতের কৌটাটাও বিলক্ষণ দামী জিনিষ। তুমি তো সেই নিজের খরচ হতেই না খেয়ে না দেয়ে বাঁচিয়ে এ সব করেছ।"

শৈলেন হাসিয়া উঠিল "তেমন ছেলেই নই বউদি, যে, নিজের খরচের টাকা বাঁচাতে যাব। পকেটে টাকা থাকলেই ঘাড়ে ভূত চাপে। মনে হয়, কতক্ষণে খরচ করে বাঁচব। দেখেছই তো বউদি, ভাইটা তোমার কি লোভী! যা দেখছি কিনছি,—আর রাক্ষসের মত খেয়ে যাচ্ছি। আমার কপালে তোমায় সাজাবার মত দিন আসবে কি না, জানি নে বউদি। যে-দিন নিজের উপার্জ্জন-লব্ধ টাকা দিয়ে জিনিষ কিনে এনে দেব তোমার পায়ের কাছে, সে দিন কতদূরে, কে জানে। এ সৌভাগ্য সেজদার কপালেই জুটে গেল বউদি। এ সব সেজদা কিনে পাঠিয়ে দেছে।"

বিস্মিতা সুষমা বলিয়া উঠিলেন, "সেজ ঠাকুরপো?"

শৈলেন বলিল, "থাক, তার কথা পরে হচ্ছে। এখন আমায় একটা কথার মানে বুঝিয়ে দাও দেখি। সেখানে সেজদার এমনি ভাব, যেন কিছুর মধ্যেই নেই। উদাস ভাবে নেহাৎ কথা বলতে হয় তাই বলছে। বড়দা যেমন শুনলেন সেজদা পাঠিয়েছে, অমনি লাফিয়ে উঠলেন। তুমিও সেজদার নাম শুনে একেবারে আকাশ হতে পড়লে। সেজদা করেছে

কি, যাতে সে আজ এমন একটা বিস্ময়কর জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে ?"

সুষমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কেন এসেছ, তাও জান না ?"

শৈলেন বলিল "কেমন করে জানব ? তোমরা কি সংসারের কোনও কথা জানাও আমায় ? প্রতিভাটা আগে তবু মাঝে-মাঝে পত্র দিত, এবার গিয়ে পর্যন্ত তারও কোনও পত্র নেই। নিজেরা তোমরা কেউ কিছু জানাবে না। পাছে সে জানায়, তাই তাকেও বারণ করেছ বুঝি ?"

প্রতিভা ভাঁড়ার-গৃহের দরজা পর্যন্ত আসিয়াছিল,—তাহার নাম শুনিবামাত্র সে অন্তর্হিতা হইয়া গেল।

সুষমা ধীরভাবে বলিলেন, "সব শুনতে পাবে ভাই,—সব দেখতেও পাবে। একটু বস, জিরিয়ে নাও, সব বলছি।"

শৈলেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি কোদাল পেড়ে, কাঠ কেটে আসছি আমি, যাতে ঘণ্টাখানেক আমার রেষ্ট নিতে হবে ? না, সত্যি বলছি বউদি, যতক্ষণ আসল কথাটা না শুনতে পাব, ততক্ষণ কিছুতেই আমি শান্ত হতে পারব না।"

সুষমা হাসিলেন, "পাগল কোথাকার। কথাটা এমনি কিছু নয়,—তোমরা সব পৃথক হবে কি না, তাই সুকলকে আসতে বলা হয়েছে। কাল সকালে চার ভাইয়ে পৃথক হয়ে যাবে।"

সুষমার কথার মধ্যে, হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যথা ঝরিয়া পড়িল। পাছে সে ব্যথা মুখের উপর স্ফুট হইয়া উঠে, সেই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

শৈলেন বিস্ফারিত নেত্রে খানিক সুষমার পানে চাহিয়া রহিল। চিরদিন সে যে কথাটা বিদ্রূপের ভাবেই উড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে, আজ কি না তাহাই যথার্থ সত্যে পরিণত হইতে চলিল! এটা সম্ভব নয় বলিয়াই সে এই কথাটা মুখে আনিয়াছে। অসম্ভব যে নিশ্চয়ই, তাহা সে বেশ জানিত।

অনেকক্ষণ পরে ধীরে-ধীরে বলিল "সত্যি বউদি ? না, এ কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি মিছে কথা বলে মজা দেখছ।"

সুষমা আবার হাসিলেন, "মিছে কথা বলবার আমার দরকার কি ঠাকুরপো ? কাল সকালেই দেখতে পাবে, সব ভাগ হয় কি না।"

শৈলেন প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাঃ, এ আমি কক্ষনো হতে দেব না। তাই কি কখনও হয় বউদি ? ভাইয়ে-ভাইয়ে কখনও পৃথক হওয়া যায় ?"

সুষমা বলিলেন "আজকাল তো ভাইয়ে-ভাইয়ে পৃথক হচ্ছেই ভাই। মা-বাপকে পর্যন্ত পৃথক করে দিচ্ছে, তার তো—

বাধা দিয়া বিকৃত মুখে শৈলেন বলিল, "যাদের ইচ্ছে হয়, যারা যে রকম শিক্ষায় শিক্ষিত, তারা দিক না কেন; তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও কানেকশান নেই বউদি। লোকের মন্দ দৃষ্টান্ত আমরা নিতে যাব কেন ? এক সংসারে থাকার উপকারিতা যদি অন্য কেউ না বোঝে, আমরা বুঝেও কেন তাদের অনুকরণ করব ? নাঃ, এ আমি হতে দেব না।"

সুষমা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন "তুমি হতে দেবে না কি ঠাকুরপো, সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে,—তোমার মেজদা এ দিকে সারা গ্রামে রাষ্ট্র করে দিয়েছেন। তুমি আর তোমার বড়দা এর বিপক্ষে,—কিন্তু তোমার মেজদা-সেজদা তো তেমন ন'ন। তাঁরাই তো পৃথক হবার কথা পেড়েছেন। তোমার সেজদা নিজে আসেন নি, কিন্তু বউকে বেশ করে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। সে এখন স্বামীর দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজ ঠাকুরপো এর মধ্যে বেশ চালাক ঠাকুরপো। তিনি চক্ষুলজ্জার সামনে আসছেন না, কিন্তু এ দিকে সব ঠিক আছে। যখন সব শেষ হয়ে যাবে তখন তিনি আসবেন। তুমি এখন কি থামিয়ে রাখতে পারবে তাঁদের ?"

শৈলেন দর্পভরে বলিল, "কেন পারব না ? আমি চেষ্টা করে দেখব না তা'বলে ;—যদি ফিরাতে পারি ? সেজদা এই জন্যেই আসে নি। বাস্তবিক বউদি, মানুষের মধ্যে এত বিষ থাকে ? ভাই ভাইয়ের এমন শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে ? উঃ, মনে করতেও বুকের মধ্যে কি রকম করে ওঠে। খবরদার বউদি, সেজদার দেওয়া ওসব জিনিস তুমি নিতে পারবে না,—পরতে পারবে না ! ও বাক্স ফেলে দিয়ে এসো সেজ বউদিকে।"

প্রতিভা পিছন হইতে কুণ্ঠিত কণ্ঠে ডাকিল, "দিদি !"

"কি রে, কি চাস ?" সুষমা তাহার দিকে ফিরিলেন।

প্রতিভা জড়সড়ভাবে বলিল, "বামুন-ঠাকরুণ বলছেন তেল নুন দিতে,—আর আজ কি রান্না হবে তার একটা—"

সুষমা অঞ্চল হইতে চাবির গোছাটা তাহার সম্মুখে

ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নিয়ে যা চাবি, যা দরকার লাগে, দে গিয়ে। আর রান্না,—ডাল হবে, দু'রকমের ভাজা, ঝোল সুক্ত, আর একটা যা হয় মোটামুটি তরকারী হবে। ঠাকুরপো মাছের ডালনা খেতে ভালবাসে,—তার একটা যোগাড় করে দিস্। পিসীমার তরকারী তো জানিস তুই। মানে, প্রত্যেক দিন যা হয়, আজও তাই হবে। কালকের ব্যবস্থা কাল দেখে করা যাবে।" প্রতিভা চাবি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "আর দুধের কি করব?"

সুষমা বলিলেন, "দুধ প্রত্যেক দিন যেমন মানুষের হিসাবে দেওয়া হয়, তেমনিই দেওয়া হবে। তরকারী রোজ যে আন্দাজে কুটে দিস্, সেই রকমই কুটে দিগে যা।"

শৈলেন অবাক হইয়া এই নূতন প্রতিভার পানে চাহিয়া ছিল। পাঁচ মাস আগে সে যে প্রতিভাকে দেখিয়া গিয়াছিল, সে প্রতিভাকে ত ফিরিয়া আসিয়া আর সে দেখিতে পাইল না। এ প্রতিভার মধ্যে সে বালিকাসুলভ চপলতা একেবারেই নাই। সে হঠাৎ এত গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে, যাহা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। শৈলেন ভাবিতেছিল, কোন ঐন্দ্রজালিকের যাদুস্পর্শে প্রতিভা এমন করিয়া বদলাইয়া গেল?

প্রতিভা চলিয়া যাইতেছিল, সুষমা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ছোট ঠাকুরপোর জন্যে এক কাপ চা আর খানকতক লুচি আগে করে ফেলগে যা তো। দেরী হয় না যেন, বুঝেছিস্?" মাথাটা কাত করিয়া প্রতিভা চলিয়া গেল।

শৈলেনের মুখের পানে চাহিয়া, একটু হাসিয়া সুষমা বলিলেন, "অবাক হয়ে গেছ যে ঠাকুরপো? তুমি বলছিলে আগে প্রতিভা তোমায় পত্র দিত, এখন আর দেয় না কেন। বাস্তবিকই আমি বারণ করেছি ওকে। সংসারের সব কাজ এখন ওর মাথায় চাপিয়ে দিয়েছি। বাধ্য হয়ে করতে হয় ভাই। নইলে ওই ছেলেমানুষের ঘাড়ে এই ভার চাপিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি? আমার যে কি জ্বালা হয়েছে ওকে নিয়ে, তা জানেন একমাত্র ভগবান,—আর কেউ নয়। নীলকণ্ঠের মত ঐ বিষ আমি গলায় রেখেছি;—গিলতেও পারছিনে, ফেলতেও পারছিনে।"

তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, গলাটাও ভারি হইয়া আসিল। তখনি নিজেকে সামলাইয়া বলিলেন "সবই জানতে পারবে ভাই,—সবই শুনতে পাবে। এখন এস, হাত-পা ধুয়ে বস। এখনই সে চা নিয়ে এল বলে।"

শৈলেন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

পুনর্মিলন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সেদিন তোমারে ছেড়ে চলে যাই সরিয়া,
কত বেজেছিল তব মরমে ;—
তোমার ও-ক্ষীণ বাহুলতা দিয়া ধরিয়া
কত বলেছিলে আধ সরমে !
ডাগর ও-দুটি আঁখি উৎপল তুলিয়া
কত ভাষাহীন গীতি গাহিলে,—
স্নিগ্ধ ক'ফোটা ব্যথা-ভরা জল ফেলিয়া
কত মনে-করা বর চাহিলে !
উদাসিনী প্রায় আঁচলখানিরে টানিয়া
দিলে আঙুলে আমার জড়া'য়ে,
নীরবে কেবল হাতখানি মোর টানিয়া
দিলে আবার তাহারে সরায়ে !
দীরঘ নিশাস সঘন চকিতে আসিয়া
বুকে মিলাল কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
মুক্ত উদার কম্পিত রাগে ভাসিয়া
তোমা বক্ষে ধরিনু ছাপিয়া !
আর আজি, কত অশেষ বরষ ধরিয়া,
শত চিন্তিত-গত-বিরহে,—
মন-বাঞ্ছিত ধন মিলন সুমুখে করিয়া
বাধা-সন্দেহ তবু কি রহে ?
তবে অচপল নয়নে কিসের লাগিয়া
উঠে উছল অশ্রু ভরিয়া
কেন অবিরল কম্পন বুকে জাগিয়া
তোলে এমন ব্যাকুল করিয়া ?
অকথিত বাণী কণ্ঠে যে যায় থামিয়া,—
কাঁপে অধরে অধর রাখিতে ;—
এ কি বিরহের বেদনা চকিতে নামিয়া
ওগো ঝরে মিলনের আঁখিতে !

মার্কিণ মুলুক

শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আরও কিছু আজ বলিব। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যতগুলি গৃহ আছে, তন্মধ্যে লাইব্রেরীই সম্ভবতঃ ছাত্রগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। যখন কোন ক্লাশ থাকিত না, তখনই আমি লাইব্রেরীতে চলিয়া যাইতাম; এবং রাত্রিকালেও বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, সেখানে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতাম। যখন দেখিতাম যে, শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী পাশাপাশি বসিয়া অনন্যমনে অধ্যয়নে রত

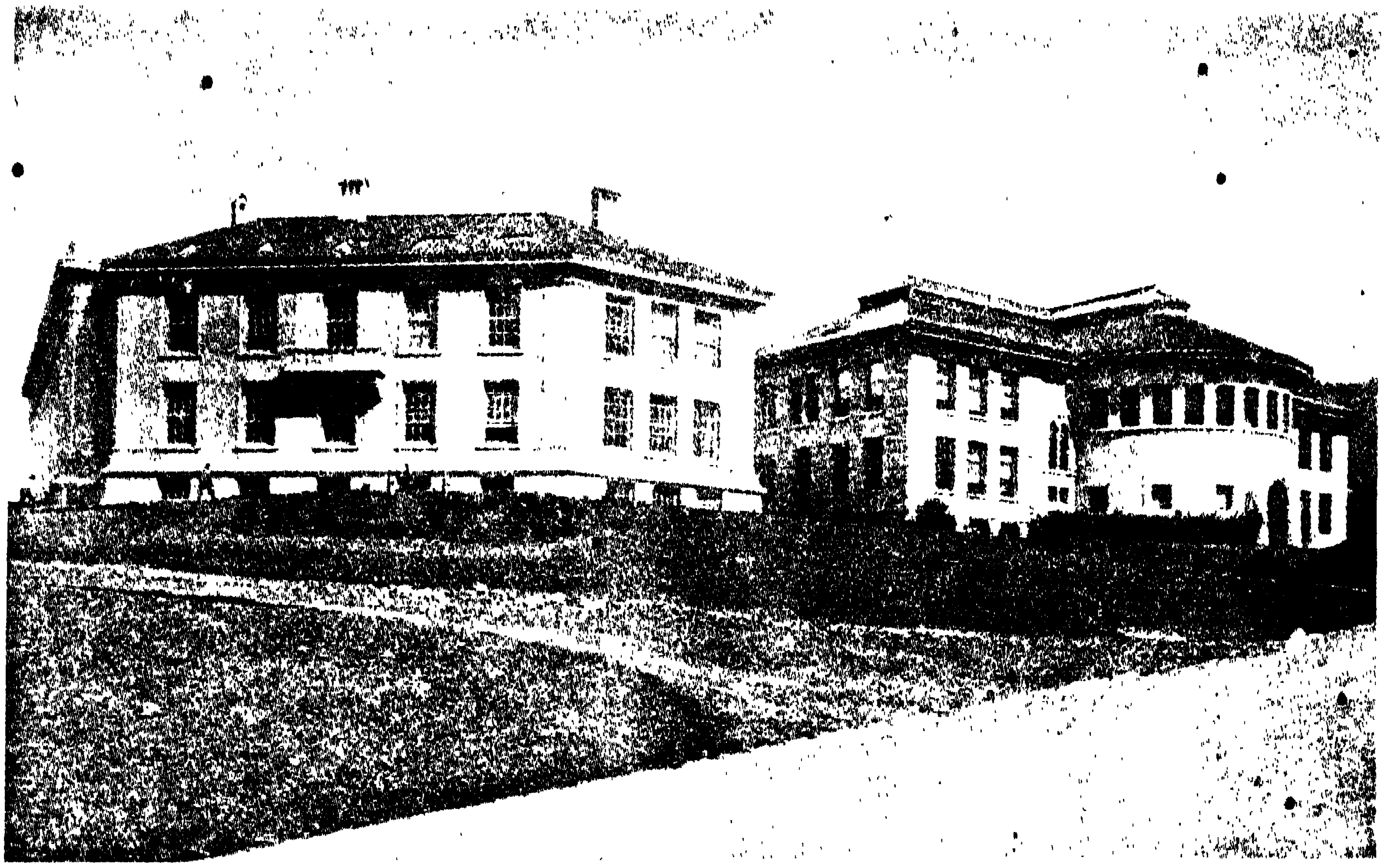

কৃষি শিক্ষাগার—ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

হইয়াছে, তখন আমারও বেশ পড়ায় মন লাগিয়া যাইত। লাইব্রেরীর পাঠাগারে বসিয়া আমার যতদূর কাজ হইত, বাসায় নিজের কক্ষে বসিয়া ততটা কাজ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদিগের মধ্যে যে জ্ঞান বিস্তার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহিত্যিক উদ্যম আছে, তাহা তাহাদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকাগুলির সংখ্যা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। ইথাকানগরী অক্‌স্‌ফোর্ড্ ও কেম্ব্রিজের ন্যায় ক্ষুদ্র,—লোকসংখ্যা বিংশতি সহস্র মাত্র; কিন্তু সাধারণের জন্য ঐ স্থানেই দুইটা দৈনিক সংবাদপত্র বাহির হয়। এতদ্ব্যতীত কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দশখানি পত্রিকা বাহির করিয়া থাকে; তন্মধ্যে একটা দৈনিক, একটা সাপ্তাহিক, পাঁচটা মাসিক এবং তিনটা বার্ষিক। নিম্নে ঐ গুলির নাম বিবৃত হইল:

(১) কর্ণেলিয়ান—বার্ষিক সচিত্র। প্রত্যেক বৎসরের শেষভাগে জুনিয়ার্ ক্লাশের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উহাতে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত, বিশেষতঃ জুনিয়ার ক্লাশ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ থাকে।

(২) ক্লাশবহি—বার্ষিক, সচিত্র, "সিনিয়ার" গণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতির চিত্র এবং সিনিয়ার ক্লাশের প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর চিত্র সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে প্রকাশিত হয়।

(৩) সার্ব্বভৌমিক বার্ষিক পত্রিকা (The cosmopolitan Annual)—সচিত্র। পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ হইতে যে সকল ছাত্র আসিয়া কর্ণেলে অধ্যয়ন করিতেছে,

তাহাদের সার্ব্বভৌমিক সমিতি হইতে উহা বর্ষ শেষে প্রকাশিত হয়।

(৪) কর্ণেল ডেইলি সান (Cornell Daily Sun) দৈনিক সচিত্র পত্রিকা।

(৫) কর্ণেল এলামনি নিউস্ (Cornell Alumni News) সাপ্তাহিক পত্রিকা। কর্ণেলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ কর্তৃক প্রকাশিত।

(৬) কর্ণেল এরা (Cornell Era) মাসিক, সচিত্র, সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকা।

(৭) উইডো (Widow) মাসিক, সচিত্র, হাস্য-রসাত্মক পত্রিকা।

উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে ক্লাশবহি ও সার্ব্বভৌমিক পত্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সার্ব্বভৌমিক পত্রিকা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইবে। ক্লাশ-বহি সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা এই স্থানে বলা যাইতেছে। উহার মূল্য ছয় ডলার (প্রায় উনিশ টাকা)। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও সিনিয়ার ক্লাশের যে কয় শত ছাত্র ও ছাত্রী ডিগ্রীর জন্য পরীক্ষা দিবে (১৯০৬ সনে উহাদের সংখ্যা ছিল ৫৭১) তাহাদের চিত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সিনিয়রদিগের সম্বন্ধে অন্যান্য চিত্র, ঐ বহিতে প্রকাশিত হয়। কাজেই উহার মূল্য অন্যান্য পত্রিকা হইতে অধিক। এক

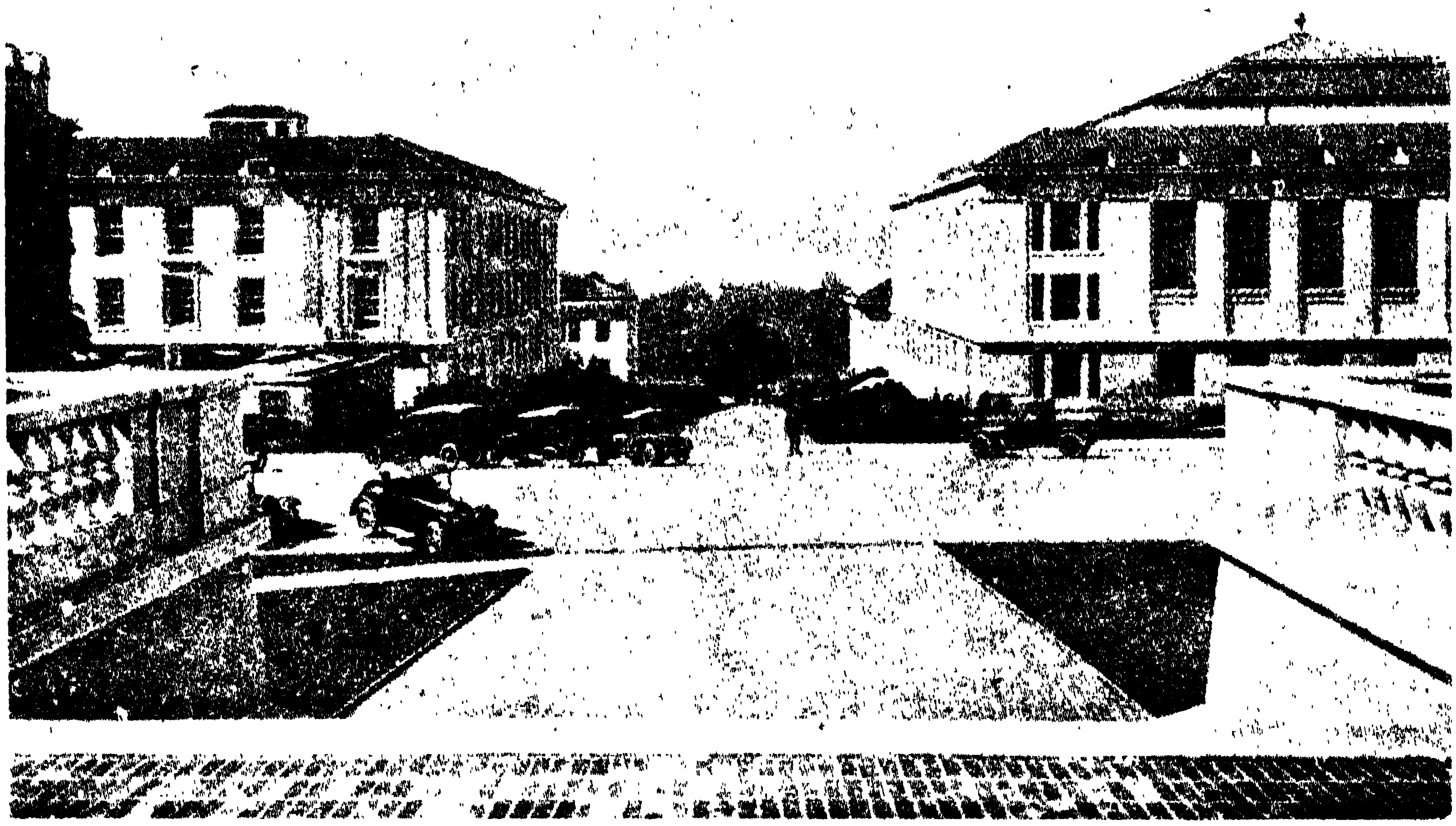

কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ

(৮) কর্ণেল কণ্ট্রিম্যান (Cornell Countryman) মাসিক, সচিত্র, কৃষিবিষয়ক পত্রিকা।

(৯) সিব্‌লি জর্ণেল (Sibley Journal) মাসিক, সচিত্র, পূর্ত্তবিষয়ক পত্রিকা।

(১০) সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ম্যাগাজিন—মাসিক, সচিত্র পত্রিকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত কলেজগুলি হইতেও আজকাল মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে; ইহা সুলক্ষণ বটে। পূর্ব্বে যে দশটী পত্রিকার

একজন সিনিয়রের ছবির পাশে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে। খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের দ্বারাই ঐ গুলি লিখিত হয়। বিবরণগুলি বেশ হাস্যরসাত্মক। ১৯০৬ সালের যে ক্লাশবহি আমার নিকট আছে, তাহা হইতে যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকটী ছাত্র ও ছাত্রীর বিবরণ প্রদত্ত হইল। নিম্নলিখিত দুইটী বিবরণ ছাত্রীদের সম্বন্ধে :—

"মার্গারেট য়্যালেন (Margaret Allen)। গুভার্ণার (Gouverneur) হইতে এই কুমারীর কর্ণেলে শুভাগমন। সেখান হইতে আসিয়া যখনই ইনি

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী বৃত্তি লাভ করিলেন, তখন হইতেই ঐ স্থানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল। সমচতুষ্কোণ চিবুক, পেঁজা তুলার মত চুল ও মৃদু মধুর হাসি এই তিনটীই মার্গারেটের বিশেষত্ব। চিবুকটী তাহার

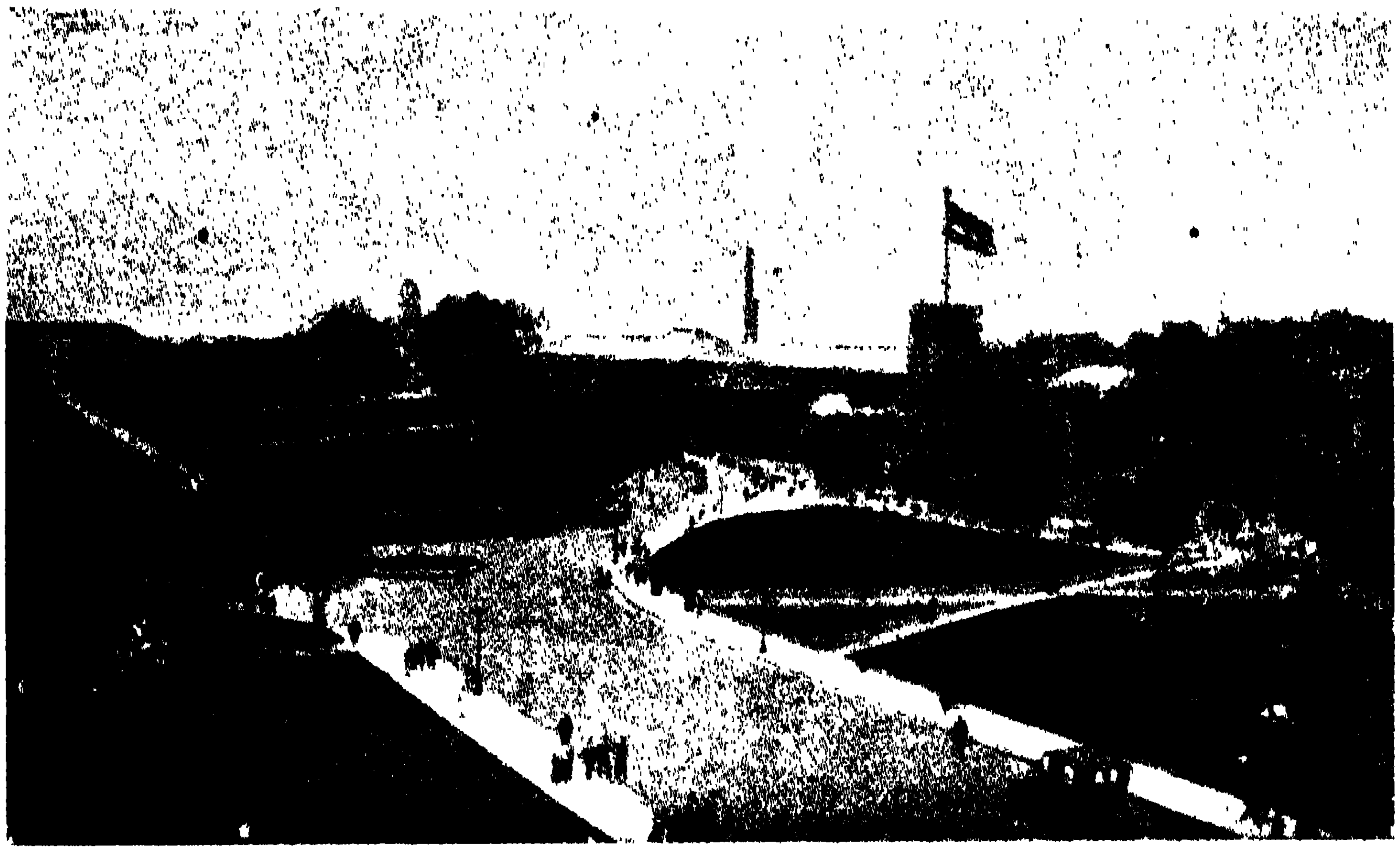

প্রবেশ-পথ ও প্রাঙ্গণ—ওহাও বিশ্ববিদ্যালয়

চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু অন্য দুইটা অর্থাৎ কুন্তল ও হাস্য তাহার স্ফূর্ত্তি করিবার প্রবৃত্তিরই পরিচায়ক। দক্ষিণের পাহাড়ে পরিভ্রমণ ও সন্তরণই তাহার প্রধান আকর্ষণ। বীজ-জ্যামিতি হইতে আরম্ভ করিয়া রসায়ন-শাস্ত্র ও পদার্থ-বিদ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েই মার্গারেটের পূর্ণ অধিকার। সে অনেকগুলি ভাষাতে বেশ তাড়াতাড়ি, এমন কি বিশেষ তেজের সহিত, কথা বলিতে পারে; চমৎকার ঘাঘ্‌রা ও টুপি বানাইতে পারে; এবং মুখরোচক দশ-রকমের খানাও প্রস্তুত করিতে পারে। মার্গারেটের ইচ্ছা যে সে শিক্ষাব্রতই গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার বন্ধুগণের বিবেচনায় এমন একটি দক্ষ ঘরণীর জীবন কখনই ঐরূপে নষ্ট হইতে পারে না।

"সার্লোট্ এভারেষ্ট্ সাম্‌ওয়ে (Charlotte Everest Seumway) ইনি নিউ-ইয়র্ক প্রদেশের চ্যাম্‌প্লেন (Champlain) নামক স্থান হইতে আগত। ওয়েলেস্‌লি (Wellesley) মহিলা কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষকতার কার্য্যে স্থাম্‌প্লেন্ হইতে কলোরেডো (Colorado) ফ্লোরিডা (Florida) প্রভৃতি নানা স্থানে ঘুরিয়া, এমন কি পর্টোরিকো (Porto Rico) পর্য্যন্ত বাদ না দিয়া, ও মার্কিণ মুলুকের নানা বয়সের নানা শ্রেণীর ও নানা বর্ণের সন্তানগণের পৃষ্ঠদেশে বেত চালাইয়া, সম্প্রতি ইনি কর্ণেলে দুই বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন। এখান হইতে ডিগ্রীরূপ বর্ম্মে সুরক্ষিত

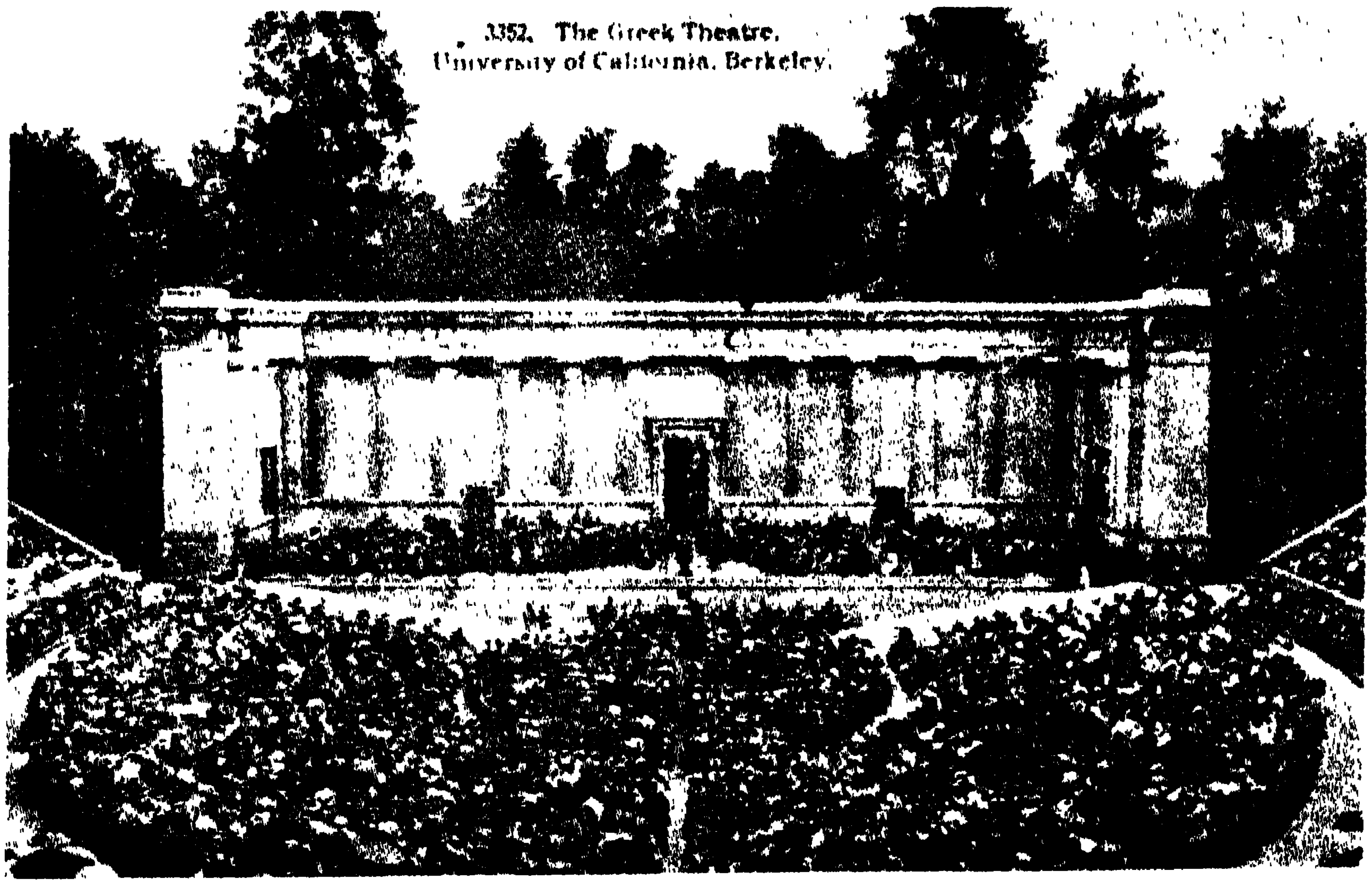

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙ্গালয়

হইয়া ইনি নূতন-নূতন দেশ জয় করিবার মতলব করিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষায় ইঁহার দখল অপরিসীম; কাজেই ফিজি দ্বীপ-পুঞ্জও ইঁহার তালিকা হইতে বাদ পড়িবে কি না সন্দেহ।

নিম্নলিখিত চারিটী বিবরণ ছাত্রদিগের সম্বন্ধে:—

"এডোয়ার্ড এল্‌ওয়ে ফ্রি (Edward Elway Free)

ওরফে এডি (Eddie)। এডি ষ্ট্রীটের (Eddy St.) একই বাড়ীতে ক্রমান্বয়ে কয় বৎসর কাটাইয়া দেওয়ায় বন্ধুগণ তাহাকে ঐ নামটা দিয়াছে। যখন সে কাঁচা ফ্রেস্‌ম্যান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হইতেই ঐ বাটীর প্রতি তাহার টান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে কেন, তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারে না। কিন্তু এই আকর্ষণ সম্বন্ধে নানাবিধ সরস জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। শিষ্ট, শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তির জন্য এডোয়ার্ড ডিকন (Deacon) অর্থাৎ পাদরী নামেও সুপরিচিত। সে বাস্তবিকই একজন ভাল প্রচারক। সময়ে সময়ে ধর্ম্মো-পদেশ দিবার প্রবৃত্তিও

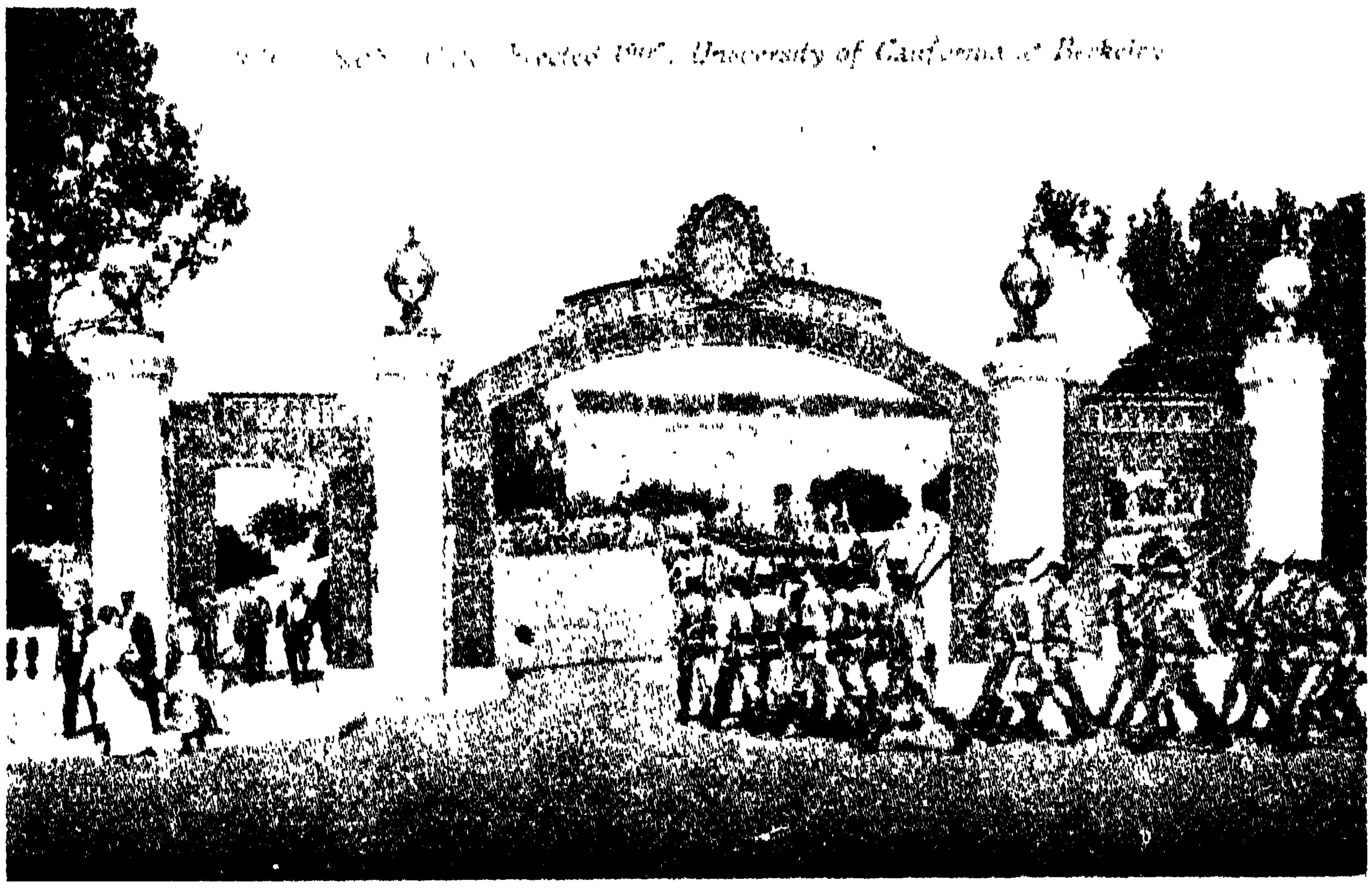

প্রবেশ-দ্বার—ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ওহাও বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিস-ঘর

তাহার জাগিয়া উঠে। এডোয়ার্ড বেশ মেধাবী ছেলে। ইহা আশা করা যায় যে, তাহার প্রতিভার শিখায় তাহার জন্ম-ভূমি একদিন প্রদীপ্ত হইবে—অবশ্য সূর্য্যের যদি ঐ দিবস বেশ তেজ থাকে। তাহার সদা-প্রফুল্ল বদন দেখিয়া মনে হয় যেন সে প্রণয় ব্যাপারে কখনও হতাশ হয় নাই।"

"পার্সি এড্‌ইন ক্ল্যাপ্ (Percy Edwin Clapp) * * * * * জীবতত্ত্ববিদেরা কোন মানুষের পার্সির ন্যায় লাল টুকটুকে গণ্ডদেশ দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। এই কারণে মেয়ে-মহলে পার্সির যথেষ্ট খাতির। পার্সি কিন্তু ঐ সবের ধার ধারে না। অর্থো-পার্জ্জনের দিকেই তাহার বিশেষ আসক্তি। কৃষিবিদ্যা-লয়ের 'কর্ণেল কান্ট্রিম্যান' নামক মাসিক পত্রখানি সে দক্ষতার সহিত চালাইয়াছে; এবং ছাত্রেরা যে রজকের কারখানা খুলিয়াছে, সে তারও একজন স্বত্বাধিকারী। বন্ধুদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কুক্কুট, পনির কিম্বা জীবাণু যে বিষয়েই পার্সি ভবিষ্যতে হাত দিউক্ না কেন, পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে তাহার জন্য একটা সুন্দর কাজ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে।"

"ফ্রেড্ জন্ ফার্ম্মাণ (Fred John Furman)—

সম্ভ্রান্ত মানুষটী—বিংশতি কি ত্রিংশং বর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করে। অল্প বয়সেই তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; কারণ, সে ম্যানস্‌ফিল্‌ড্ (Mansfield) নর্ম্মাল স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করিয়াই কর্ণেলে আগমন করিয়াছে। কর্ণেলে সে বিশুদ্ধ ব্যায়ামের পক্ষপাতী হইয়া অনেক বিষয়ে সংস্কার সাধন করিয়াছে। ওজনে সে দুইশত পাউণ্ড (আড়াই মণ) বটে, কিন্তু ওজন হিসাবে সে খুব খর্ব্বাকৃতি। তাহার সুমধুর প্রকৃতির দরুণ ললনাদিগের সে বড়ই প্রিয়; তাহাদিগের উপর কিন্তু তাহার জাতবিদ্বেষ। ললনাদিগের সম্মুখে ঐ বিদ্বেষ ভাব দমন করিতে অবশ্য তাহার যথেষ্ট প্রয়াস দেখা যায়। সে কলেজের

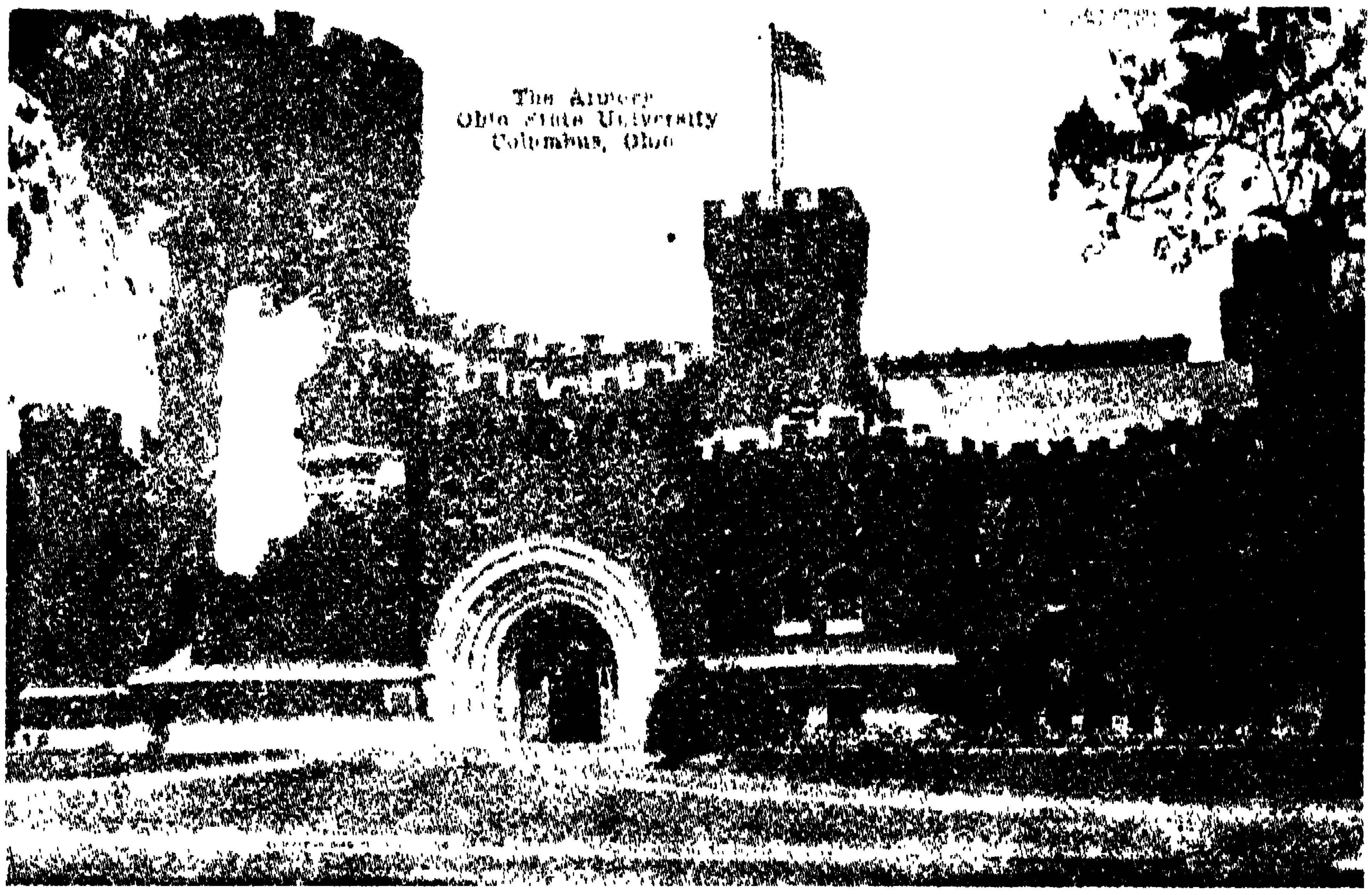

ব্যায়াম মন্দির—ওহাও বিশ্ববিদ্যালয়

জাতিতে সে স্পানিশ্, শিক্ষায় সে ফরাসী, এবং মোটর উপর সে একজন ভাল আমেরিকান্ ছাত্র। ব্যায়ামে তাহার স্বাভাবিক আসক্তি, কিন্তু অধ্যয়নেও তাহার অনুরক্তি কম নহে। এক দিকে যেমন সে শান্ত শিষ্ট, অন্য দিকে আবার তেমনি সে সুরসিক। অশ্বারোহণে, সাইকল চালনে ও নৌকাবাহনে পুরস্কার লাভ করিয়া সে আমাদের নিকট আসিয়াছিল। দৌড়ে ও ফুটবলে জয়মালা পরিয়া সে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছে। পারী (Paris), লাইমা (Lima), ব্যাটন্ রুস্ (Baton Rouge) ও ইথাকা—এই চারিটী বৃহৎ স্থানের সমবেত বিদ্যাও তাহার মন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষার তৃষ্ণা দূর করিতে পারে নাই। কর্ণেল হইতে বিজ্ঞানে ডিগ্রী লইয়া লুসিয়ানা (Louisiana) প্রদেশ হইতে ইক্ষুসম্বন্ধে ডিগ্রী পাইবার আশায় সে যাইতেছে। তার পর বিলাতের হাওয়া খাইয়া ফরাসী দেশে স্ফূর্ত্তি করিয়া ও হাউয়াই (Hawaii) দ্বীপের স্বাদ লইয়া মন্ত্রবিজ্ঞানে একজন ওস্তাদ

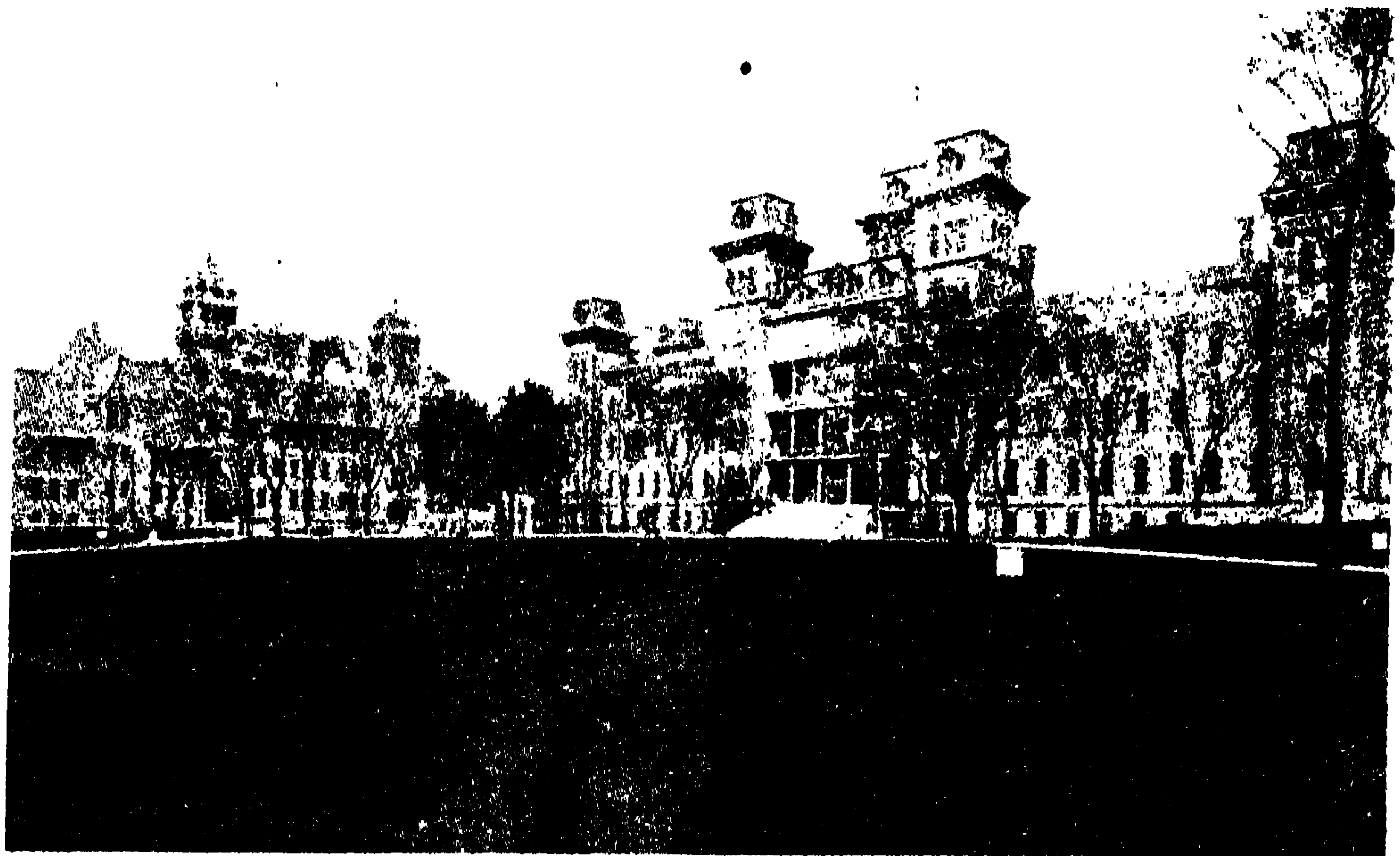

মূক ও বধির বিদ্যালয়—কলম্বাস্ (ওহাও)

অধ্যক্ষ হইবে, না আইনের পরীক্ষা পাশ করিয়া কেবল তালাকের মোকর্দ্দমায় মাথা খাটাইবে, তদ্বিষয়ে এখনও কোন ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই।"

"ফার্ণাণ্ডো অর্টিস্ ডি জেভেলোসের (Fernando Ortis de Zevallos) জন্মস্থান পেরু (Peru); কিন্তু

এবং ইক্ষুসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইয়া সে নিজের দেশের জন্য পোতারোহণ করিবে ও দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চিনির কারবার চালাইবে।"

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে একটী মিলিত সংঘবদ্ধ জীবন রহিয়াছে, তাহা আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। ভারতবর্ষের ন্যায় ক্লাশের বাহিরেই ছাত্র ও অধ্যাপকের সম্বন্ধ শেষ হইয়া যায় না। অধ্যাপকেরা অনেক সময় ছাত্রদিগকে নিজ নিজ আলয়ে নিমন্ত্রণ করেন, সেখানে ছাত্রদিগের গুরুপত্নী ও গুরুকন্যাদের সহিতও আলাপ পরিচয়ের বিশেষ সুযোগ ঘটে। যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের স্থান অনেক উচ্চে। কেবল যে তাঁহারা মনোরাজ্যেই নেতৃত্ব করিয়া থাকেন, তাহা নহে; মার্কিন সাধারণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যাপারসমূহেও তাঁহারা দেশের নেতা। আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রিনসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট্ ছিলেন। ডাক্তার এনড্রু হোয়াইট্ (Andrew White) যিনি রুশ্ দেশে ও জার্ম্মেণীতে যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি (Ambassador) হইয়াছিলেন, তিনিও কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট্। আর চার্লস্ হিউজ (Charles Hughes) যিনি নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত থাকিয়া সাধারণতন্ত্রীদলের (Republican Party) প্রতিনিধি রূপে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের পদের জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন, তিনিও কর্ণেলের একজন ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী থিওডোর্ রুসভেল্ট্ যিনি ক্রমান্বয়ে দুইবার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট্ পদ লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও রাষ্ট্রনায়কের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া হার্ভার্ডের অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কর্ণেলের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে ছাত্রেরা কেবল স্বীয় কলেজের নহে অন্যান্য কলেজের অধ্যাপক ও বিভিন্ন দেশের ছাত্রদিগের সহিত মিশিবার যথেষ্ট সুযোগ পায়, সেখানে যে ছেলেদের শিক্ষা সঙ্কীর্ণতার গতি ছাড়াইয়া বিশেষ উদারভাবাপন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগের মনে ভয় অপেক্ষা শ্রদ্ধা-ভক্তিই অধিক উদ্রেক করিয়া থাকেন। অধ্যাপকগণের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের সহিত ছাত্রদের কিরূপ হৃদ্যতা, তাহা দুই চারিটী দৃষ্টান্তেই পরিস্ফুট হইবে। ছাত্রদিগের সহিত তাঁহারা অনেক সময়েই ফটো বিনিময় করিয়া থাকেন; এবং ফটোতে শুভাকাঙ্ক্ষাসূচক অনেক কথাও লিখিয়া থাকেন। আমার পাঠাগারে যে সকল আলোক-চিত্র টাঙ্গান আছে, তন্মধ্যে একখানি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট্ জেকব্ গোল্ড্ সার্মন (Zacob Gold Schurman) মহোদয়ের। ডাক্তার সার্মন্ কর্ণেলের উন্নতিকল্পে যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রেসিডেণ্টের কার্য্য চালাইতেছেন, তজ্জন্য আমেরিকাবাসী-দিগের নিকট তিনি সুপরিচিত। তিনি ফটোর নিম্নে লিখিয়াছেন "মিঃ আই বি দে মজুমদারকে তাহার বন্ধু জে বি সার্মনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভ ইচ্ছার সহিত প্রদত্ত হইল।" আর একখানি আলোকচিত্র কৃষিবিদ্যালয়ের ডিরেক্টর্ ডাক্তার লিবার্টি হাইড্ বেইলির (Liberty Hyde Bailey)। তিনি আমেরিকার কৃষি ও উদ্যানজাত ফলফুলের সম্বন্ধে বিশ্বকোষ সম্পাদন করিয়াছেন। ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত কৃষিবিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তকাবলীর ও (Rural Science Series) তিনি প্রণেতা। মোট কথা, ডিরেক্টার বেইলির ন্যায় কৃষিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বর্ত্তমানে পৃথিবীতে আর কেহ আছেন কি না, জানি না। তিনিও তাঁহার আলোকচিত্রের নিম্নে লিখিয়াছেন, "মিঃ আই বি দে মজুমদারকে প্রীতিসহকারে প্রদত্ত হইল। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে যেন সফলতা লাভ হয়, এই আশীর্ব্বাদই করিতেছি।" মহাপুরুষ মাত্রেরই প্রতিকৃতি তাঁহাদের জীবনের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করাইয়া দেয়। আর যে সকল মহাত্মার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য ঘটে, তাঁহাদের আলোকচিত্র বা ছবি দেখিলেই যে আমরা তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকি, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমার প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল, "ক্ষেত্রজ শস্য।" ঐ বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন টমাস্ হাণ্ট্ (Thomas Hunt)। ইনি "Cereals in America" "How to Choose a Farm" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। আমার দ্বিতীয় শিক্ষার বিষয় ছিল, "উদ্যানজাত ফলফুল"। ঐ বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন জন্ ক্রেইগ্ (John Craig)। ইনি একজন ক্যানাডাবাসী। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়

অপরাপর অধ্যাপকদিগের নিকট পড়িতে হইত। ইঁহাদের ছাড়াও আমার অপর অনেক অধ্যাপক-পরিবারের সংস্রবে থাকিবার ও আতিথেয়তা গ্রহণ করার সৌভাগ্যলাভ হইয়াছিল। তন্মধ্যে অর্থনীতির অধ্যাপক জে. ডব্লিউ জেঙ্ক্‌স্ (J. W. Jenks), উদ্ভিদ-বিদ্যার অধ্যাপক জি. এফ্. য়্যাট্‌কিন্‌সন (G. F. Atkinson) ও

পুস্‌বল ক্রীড়া—প্রথম চিত্র

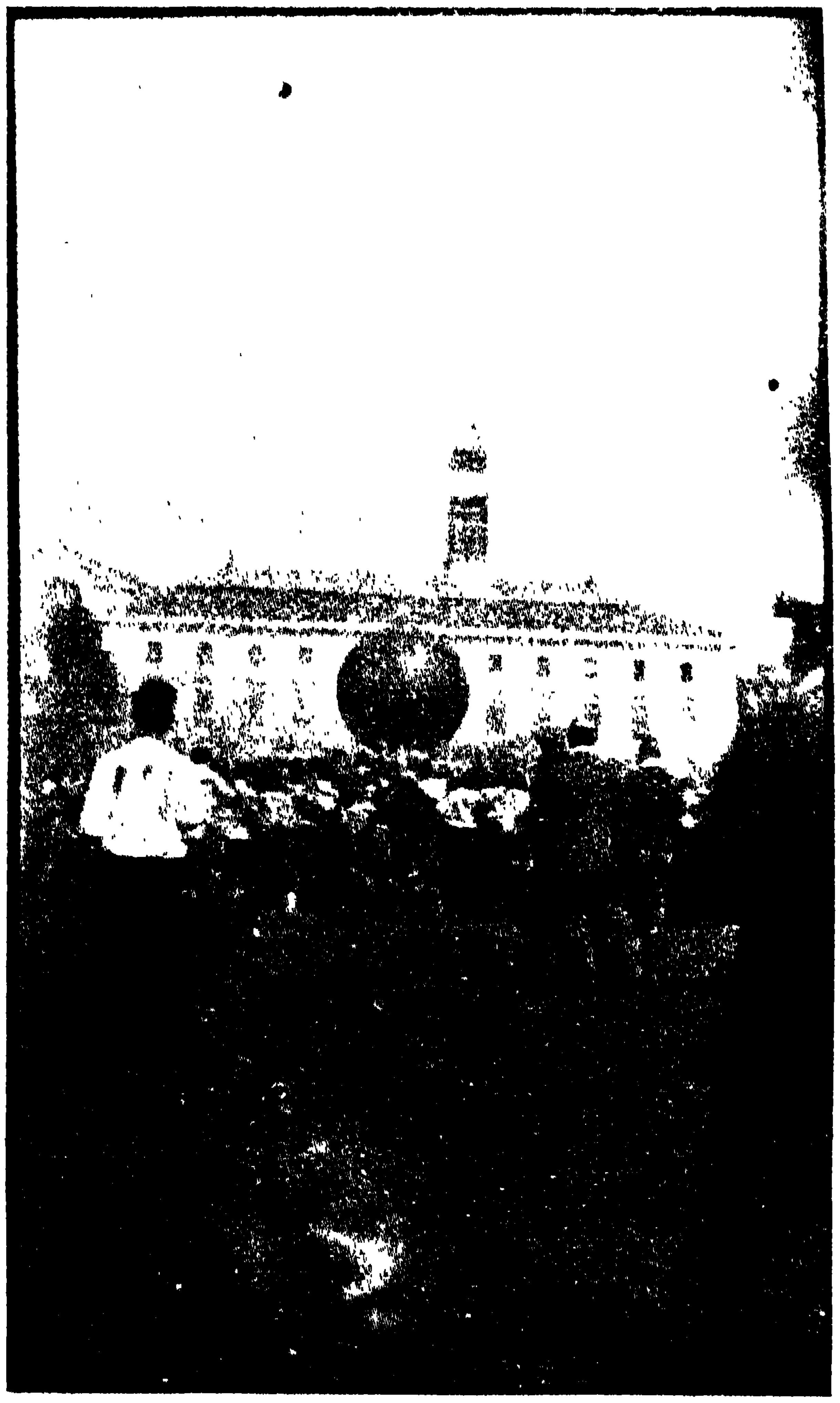

পুস্‌বল ক্রীড়া—দ্বিতীয় চিত্র

পুস্‌বল ক্রীড়া—তৃতীয় চিত্র

ইতিহাসের অধ্যাপক আর্, সি. এইচ্ ক্যাটারল (R. C. H. Catterall) ও তাঁহাদের পত্নীগণের সহিতই অধিক পরিচিত হইয়াছিলাম। গণিতাধ্যাপক জে এইচ্ ট্যানারের (J. H. Tanner) বাড়ীতে কুচবিহারের মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের সহিত কয়েকদিন অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। ট্যানার-পত্নী এতদূর অতিথি-পরায়ণা যে, যখন আমি তাঁহার বাটী হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলাম, তখন তিনি (আমেরিকার রেলগাড়ীতে দার্জ্জিলিঙ্গের মেলের ন্যায় আহারাদির সুবন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বে) গাড়ীতে আহার করিবার জন্য খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে দিতে ভুলিলেন না।

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম ক্রীড়া সম্বন্ধে কয়েকটা কথা না বলিলে এই পরিচ্ছেদটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বেস্‌বল্, বাস্কেট্ বল, ক্রিকেট্, ফুটবল, আমেরিকান ফুটবল্ প্রভৃতি ক্রীড়াগুলিই ছাত্রদিগের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত। মল্লযুদ্ধ, ঘুষাঘুষি, অস্ত্রপরিচালনা প্রভৃতিও ব্যায়াম ঘরে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেয়ুগা হ্রদ দাঁড়-টানা শিখিবার উত্তম স্থান। এই কারণেই কর্ণেলের ছাত্র মাল্লারা সুবিখ্যাত। শীতকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন বীবি হ্রদ (Beebe Lake) যখন জমিয়া উঠে, তখন বরফের উপর স্কেটিংয়ের ধুম পড়িয়া যায়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যে সকল ম্যাচ্ খেলা হইয়াছে, তাঁহার অনেকগুলিতেই কর্ণেল জয়লাভ করিয়াছে। আমেরিকার খেলোয়াড়দের আচরণের বিরুদ্ধে অনেক তীব্র সমালোচনা শুনা যায়। এই সম্পর্কে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১০-১১ সনের প্রেসিডেন্টের রিপোর্ট হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"২৭শে মে শনিবার দিনের ঘটনাবলী কর্ণেলের যশঃ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়াছে। ঐ দিন বেসবলে, দাঁড়-টানায় ও দৌড়ে মার্কিণ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কর্ণেল প্রথম স্থান অধিকার করাতে ঐ বিষয়ে খবরের কাগজে অনেক আন্দোলন হইয়াছে। কর্ণেলের জয়ে কর্ণেল-বন্ধুদের সুখী হইবার কথা; কর্ণেল-খেলোয়াড়দের আচরণও যে সম্পূর্ণ ভদ্রজনোচিত এবং তাহারা যে যথার্থই যশঃ পাইবার অধিকারী, তাহা মনে করিয়া বন্ধুদের অধিকতর সুখী হওয়ার কারণ রহিয়াছে। আমেরিকার সুবিখ্যাত সংবাদপত্র বষ্টন্ ট্রান্স্‌ক্রিপ্টের (Boston Transcript) ২৯শে মে তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কর্ণেল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

'কর্ণেল অবশেষে জলে-স্থলে উভয়তঃই জয়লাভ করিয়াছে। কর্ণেলের নিকট পরাজিত—বিশেষরূপে পরাজিত হইলেও, তাহাতে দুঃখ না হইয়া বরং আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহাদের প্রতি হিংসা না জন্মিয়া বরং শ্রদ্ধাই জন্মে। আমরা শনিবারের মন্তব্যেই বলিয়াছি, কর্ণেলকে হারাইয়া যে সম্মানলাভ হয়, তাহার পরের সম্মানই কর্ণেলের নিকট পরাজিত হওয়া। কর্ণেলের খেলোয়াড়দিগের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভদ্রতানুমোদিত। তাহারা যেমন উদারভাবে জয়লাভ করিতে পারে, তেমন অকুণ্ঠিতভাবে পরাজয়ও স্বীকার করিতে পারে। কর্ণেলের নিকট পরাজিত হওয়ায় কাহারও লজ্জায় মাথা হেঁট হইবার কথা নহে। কর্ণেল যে জয়লাভ করিবে, তাহা ত একরকম জানা কথা।"

রক্ত ও ধবল এই দুইটী কর্ণেলের সত্যকার বর্ণ; হার্ভার্ডের পতাকা লোহিত ও ইয়েলের পতাকা নীল। ক্রীড়াদি সম্বন্ধে কর্ণেলের অনেকগুলি সঙ্গীত ছাত্রেরা সর্ব্বদাই গাহিয়া থাকে, তন্মধ্যে "রক্ত ও ধবল" নামক গানটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ গানের প্রথম কয়টী লাইন উদ্ধৃত হইল। হার্ভার্ড ও ইয়েলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ঐ সঙ্গীতের বিষয় :—

রক্ত ও ধবল।

কর্ণেল-ধ্বজা দুলিতেছে বায়ুভরে,
কর্ণেল-ধ্বজা পথনির্দ্দেশ করে।
অই সুবিমল রক্ত-ধবল ভাস
নীল লোহিতেরে করিতেছে উপহাস।
দুর্দ্দমনীয়, দৃঢ়তর চিরদিন
নিজপথে ধায় কর্ণেল বাধাহীন।

ফুটবলের খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে, তরীচালকদের সম্বন্ধে, তরীচালনা সম্বন্ধে কর্ণেলের এক-একটী সঙ্গীত আছে। সে সকল সঙ্গীত চিত্তে উত্তেজনা আনয়ন করে। তরীচালকদিগের সঙ্গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

মাল্লার গান।

চল বিহগের মত ছুটি!
ঢেউ, পড়ুক দু দিকে টুটি।
এ যে অসীম উত্তেজনা—
নাহি ক্লান্তি মোদের জানা।
তরী যাক্ জলরাশি ভেদি,
অই ঢেউয়ের বাধন ছেদি।

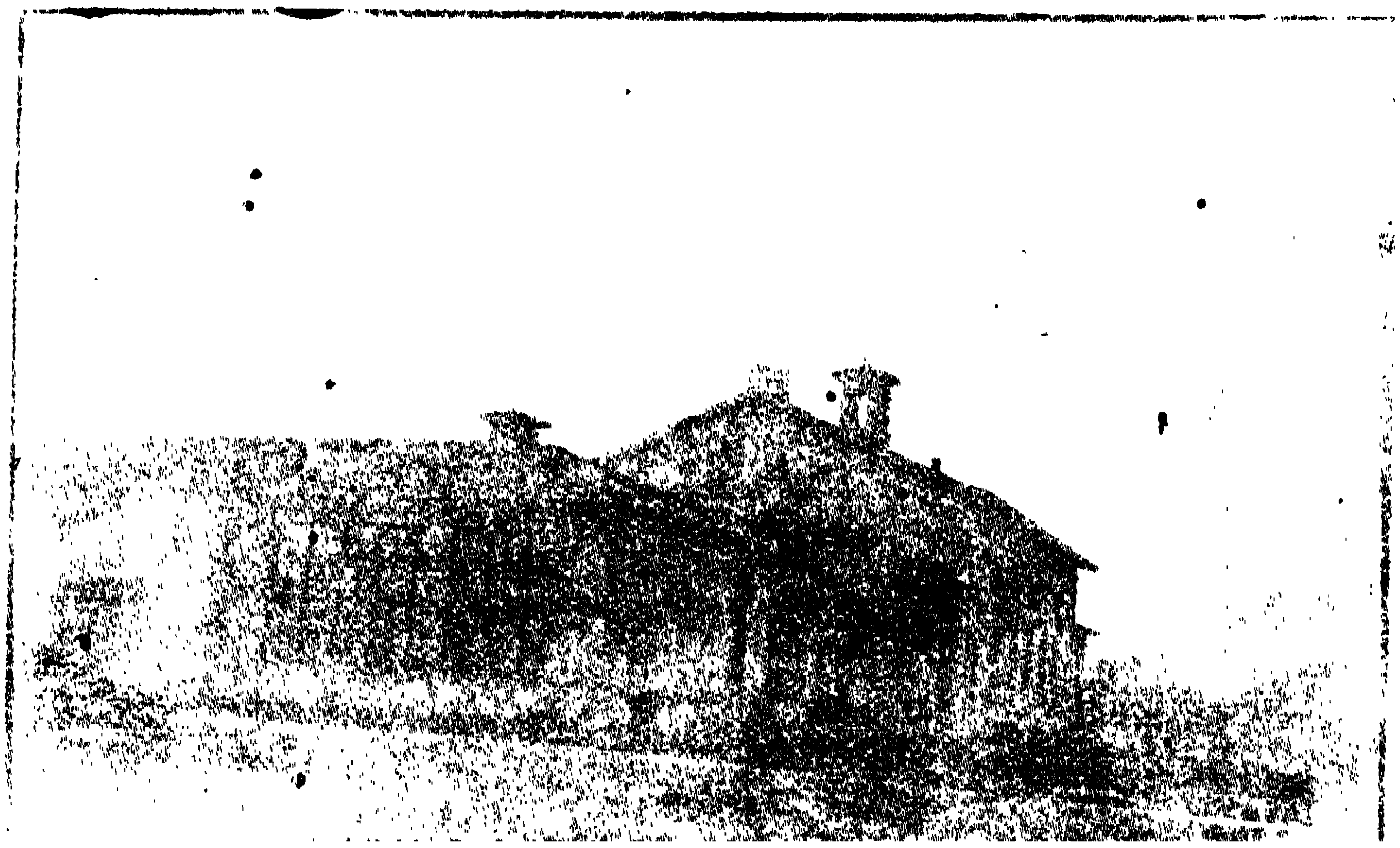

নৈশ-বিদ্যালয়—বার্কলি (ক্যালিফোর্ণিয়া)

ছেলেদের খেলিবার মাঠ, অদূরে শিক্ষক দণ্ডায়মান

গাও জননীর যশ গাও
জলে দৃপ্ত আঘাত দাও
জয় কর্ণেলের হোক্ জয়!
যার যত তেজ দেহময়,
সব জাগি যেন আজি উঠে,
এই তরী যেন আজি ছুটে,
বেগে ক্ষিপ্ত তরীর মত!
টানো রক্তে শক্তি যত!
ওহে! হও সবে হুসিয়ার,
চাই জয় চাই আজিকার!

দেখ শিরা-উপশিরাগুলি,
তাজা রক্তে উঠেছে ফুলি!
কিবা উল্লাস খরতর!
ধর, ক্ষেপণী সজোরে ধর।

মার্কিণ কলেজগুলিতে যেসকল সঙ্গীত প্রচলিত আছে, সেগুলি বড়ই উত্তেজক। প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজগুলির সহিত যখন ক্রীড়া হইয়া থাকে, তখন ঐগুলি খেলোয়াড়দিগকে যে শক্তি প্রদান করে ও জয়লাভের কারণ হয়, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। "নৌচালন সঙ্গীতের" ও "কর্ণেল জয় সঙ্গীতের" ধুয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল

নৌচালন-সঙ্গীত (কোরস্)।

চালাও তরণী অমিত বলে
ঘন ঘন দাঁড় পড়ুক জলে!
আঘাতে আঘাতে নাচুক বারি!

নিশ্চয় মোরা বলিতে পারি,
কর্ণেল আজি লভিবে জয়,
গৌরব অন্য কাহারও নয়।

কর্ণেল্ জয়-সঙ্গীত (কোরস্)।

পর্ব্বত হ্রদে গর্ব্বিত নাদে
গর্জ্জি উঠিছে রব,
চীৎকার করি উচ্চারে আজি
কর্ণেল নাম সব।

তাহা বিনা কিছু জানি না অন্য।
সাহসী সৈনিক আঁকে শাণিত অসিতে
ধরার উপরে নব শোণিত-মসীতে,
নৃপতি আপন নাম পাষাণে মর্ম্মর
সগর্ব্বে রাখিয়া দেয় করিয়া অমর।
কর্ণেল তোমার নাম উজল আঁখরে
আঁকিয়া রেখেছি মোরা হৃদয়ের 'পরে।

স্বদেশের পরেই মার্কিণ ছাত্রেরা তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে। তাহাদের সঙ্গীতগুলিতে ইহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে যে "কর্ণেল" নামক সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কোন কর্ণেলিয়ানের কর্ণেল নাম হইতে অধিকতর প্রিয় কিছুই নাই:—

আপেল প্রদর্শনী—ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

কর্ণেল।

সেনানায়কের নাম সেনানীর কাছে প্রিয়,
উইলোর কাছে নদী অতি রমণীয়,
মার নাম মধুমাখা তনয়ের কাছে,
কবি সে ছুটিয়া যায় স্বপনের পাছে,
নাবিকের প্রিয় অবতরণের ঘাট,
ছায়া ভালবাসে দূর পাহাড়ের বাট,
আমাদের প্রিয় নহে আর কোন নাম,—
শুধু চাই কর্ণেল-নাম অভিরাম।

(কোরস্)

কর্ণেল শুধু ধন্য ধন্য,
কিছু মহনীয় নহে তো অন্য।
যতদিন ভবে বহিবে বায়ু,
সাগরের আছে যাবৎ আয়ু,
কর্ণেল শুধু ধন্য ধন্য,

যতদিন বেঁচে রব এই ধরাধামে
মাতিয়া উঠিবে প্রাণ শুধু তব নামে।

কলেজ পরিত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গেই মার্কিণ ছাত্রদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ভক্তি অন্তর্হিত হয় না। বৃদ্ধ বয়সেও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ নিজ-নিজ বিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে অকাতরে অর্থদান করিয়া উহার উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকে। ১৯০৫ সনে ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রেসিডেণ্ট্ হ্যাড্লি (Hadley) তাঁহার বক্তৃতায় ঘোষণা করিলেন যে, ইয়েলের উন্নতিকল্পে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী মার্কিণ ধনকুবের জন্ ডি রকফেলার (John D. Rockefeller) ১০ লক্ষ ডলার মুদ্রা ও ইয়েলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রেরা মিলিয়া আরও ১০ লক্ষ মুদ্রা বিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। এক ডলারের মূল্য তিন টাকা ৫ই আনা হিসাবে ধরিলে, ২০ লক্ষ ডলার ভারতবর্ষের মুদ্রায় ৬০ লক্ষ টাকারও অধিক। জন্ ডি রকফেলার

সিকাগো (Chicago) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-কল্পেও ৬০ লক্ষ ডলার মুদ্রা (১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার উপর) দান করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের জুন্ মাসে কর্ণেলের পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসবে, সংবাদ পাইয়াছি, ভূতপূর্ব্ব ছাত্রেরা মিলিয়া ২০ লক্ষ ডলার মুদ্রা বিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে দিয়াছেন। সার্ তারকনাথ পালিত ও সার্ রাসবিহারী ঘোষের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল। তাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দান করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। আমেরিকায় কিন্তু ঐরূপ দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র অভাব নাই। হার্ভাড, ইয়েল্ প্রিন্স্টন্ প্রভৃতি আমেরিকার প্রধান-প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গভর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে; সকলগুলিই সাধারণের অর্থে চালিত।

স্কুল ও কলেজে জীবনের যে অংশ অতিবাহিত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখের। এই পরিচ্ছেদটী লিখিবার সময় কর্ণেলে যে কি আনন্দে কয়টা বৎসর কাটাইয়াছিলাম, সেই কথাই বার-বার মনে হইতেছে। সে সব সুখের দিন চিরকালের তরে অন্তর্হিত হইয়াছে। কর্ণেলে থাকিতে ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদিগের যে নিম্নোক্ত সঙ্গীতটী (Alumni song) মাঝে-মাঝে শুনিতে পাইতাম, আজ সেই সঙ্গীতের প্রত্যেকটী বাক্য মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছি :—

"আজি রজনীতে জাগিতেছে চিত সেই কলেজের কথা;
কত না সুখের সেই দিনগুলি উড়ে চলে গেছে কোথা!
কত আনন্দ কলহ-দ্বন্দ্ব প্রণয়বন্ধ কত,
মধুবসন্ত হয়েছে অন্ত চিরজীবনের মত।

কোরস্

"এস আজি শুধু একটী রাতি,
প্রাণ খুলি সবে হরষে মাতি;
পেয়ালার এই ঠুন্‌ন্ ঠুন্
বাজাক্ পরাণে তাহারি গুণ;
সকলে যাহারে বেসেছি ভাল
থাকুক্ প্রাণে সে প্রাণের আলো।

"তারি গৌরবে গরব আমার আমি কিছু নই, জানি;
তাহারি রক্ত-ধবল অমল বিজয় পতাকাখানি
আকুল হরষে করিয়া পরশ গাহিব উদার স্বরে
তারি যশোগাথা, বরিব স্মরিব তারে চিরকাল তরে।

নায়েব মহাশয়

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এইবার আমরা মুচিবাড়িয়া থানার দারোগা নলিনীকান্ত মুস্তফীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব; কারণ, মুচিবাড়িয়া থানায় তাহার শুভাগমনের পর হইতে থানাটি কাণ্‌সারণেরই শাসন বিভাগের অঙ্গীভূত হইয়াছিল, এবং দারোগা বাবু গবর্মেণ্টের চাকর হইলেও, হাম্‌ফ্রি সাহেবের 'মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট ও হম্বল সারভেণ্টে' পরিণত হইয়াছিল। সাহেবের প্রতি তাহার আনুগত্যের বহর দেখিয়া কেহ বিদ্রূপচ্ছলে ইঙ্গিত করিলে নলিনী দারোগা সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া বলিত, "বুঝেছ হে, আমরা গবর্মেণ্টের চাকর হ'লেও 'পাব্‌লিকের সারভেণ্ট' এ কথা ত অস্বীকার করবার উপায় নেই। সরকার ত আর বিলেত থেকে টাকা এনে আমাদের প্রতিপালন করে না, পাব্‌লিকের অর্থেই আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি। মুচিবাড়িয়ায় পাব্‌লিকের মাথা হচ্ছেন হাম্‌ফ্রি সাহেব; সুতরাং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে, ও বিপদ-আপদে তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে আমি ন্যায়তঃ-ধর্ম্মতঃ বাধ্য।" কথাটা হাম্‌ফ্রি সাহেবের কাণে উঠিলে, দারোগার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; এবং দারোগা যাহাতে সুখেস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, তাহার বেতন ও ভাতার টাকা কয়েকটি হইতে

একটি পয়সাও ভাঙ্গিয়া খাইতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে নায়েবকে আদেশ করিলেন। নলিনী দারোগা তাহার ইয়ার নায়েব-পুত্র মহাদেবের নিকট হইতে অবিলম্বেই এই সংবাদ শুনিতে পাইল; এবং সাহেবের কামরায় গিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার প্রতি সাহেবের নেক-নজরের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। সাহেব এই বুদ্ধিমান, শিষ্ট, ও উৎসাহী যুবক দারোগার আনুগত্যে প্রীত হইয়া, তাহাকে যথেষ্ট আশা ভরসা দিয়া বিদায় করিলেন। দারোগা বুঝিল, অর্থ সঞ্চয়ের এমন সুযোগ জীবনে আর কখন আসিবে কি না সন্দেহ!

নলিনী দারোগা মুচিবাড়িয়া থানায় বদলী হইয়া আসিয়া কয়েক মাস একাকী ছিল,—নানা প্রকার অসুবিধার আশঙ্কা করিয়া 'পরিবার' বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছিল। সে কয়েক মাসের মধ্যেই মিষ্ট কথায় ও অমায়িক ব্যবহারে কাছারির সকল আমলাকেই বশীভূত করিয়া ফেলিল। কাছারির ছোট বড় সকল কর্মচারীই তাহাকে পরম স্নেহভাজন সুহৃদ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। পুলিশকে সকলেই একটু সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকে, এবং সাধারণতঃ তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে রাজী হয় না; কিন্তু নলিনী দারোগার স্বভাব এমন মিষ্ট, সে এমন সদালাপী, বন্ধু-বৎসল, ও মিশুক যে, কেহই তাহাকে পর মনে করিতে পারিত না,—সকলের গৃহই তাহার পক্ষে অবারিত-দ্বার। নায়েব মহাশয় প্রজা-সাধারণের ছেলেদের পণ্ডিত করিবার ইচ্ছায় বহু চেষ্টায় একটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের হেড্‌পণ্ডিত রাসবিহারী বাবু বড়ই রসিক ও মজ্‌লিসী লোক। নলিনী দারোগাকে তিনি সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় নলিনী মাসের মধ্যে আট-দশ দিন নিমন্ত্রণ খাইত। পণ্ডিত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীঠাকুরাণী রন্ধনে দ্রৌপদীতুল্যা ছিলেন। তিনিও দারোগাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, এবং 'ঠাকুর পো' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। দারোগা তাঁহার দেবরের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল!

লক্ষ্মীঠাকুরাণী একদিন নলিনীকে খাইতে বসাইয়া, পরিবেশন করিতে-করিতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর পো, আর কত দিন একা থাকবে এখানে? বৌকে নিয়ে এস না। আমরা না হয় দু'দিন তোমার বাসায় গিয়ে মুখ বদ্‌লিয়ে এলামই বা! ভয় নেই, তাতে তোমার ভাণ্ডার খালি হ'য়ে যাবে না। সে এলে তার কাছে পোলাও রান্নাটা শিখে নেব মনে করচি! আমি ত ওসব রাঁধ্‌তে জানি নে।"

নলিনী হাসিয়া বলিল, "পোলাও রান্না শিখ্‌বে, বৌ' দিদি! তার কাছে? তবেই হয়েছে! লাউ কি রকম ক'রে রাঁধ্‌তে হয়, তাই সে জানে না,—তা 'পো-লাউ'। তার হাতের রান্না এক দিন খেলেই তোমাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে! বরং তুমি যদি তারে রান্নাটা শিখিয়ে মনিষ্যির গোত্তরে আনতে পার, তাহলে এখানে তাকে আন্‌বার চেষ্টা করি। কি বল বৌ-দিদি?"

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বলিলেন, "তা শিখিয়ে দেব; এই মাসেই তাকে নিয়ে এসো। এখানে ত তোমার কোন অসুবিধা নেই। কেমন, আনবে ত?"

নলিনী বলিল, "তা আমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌তে পারচি নে, তবে চেষ্টা করে দেখা যাবে।"

নলিনী প্রসঙ্গ-ক্রমে সেই দিনই তাহার 'দোস্ত' মহাদেবকে লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধের কথা বলিল। মহাদেব সোৎসাহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিল; এবং শীঘ্রই 'পরিবার' আনিবার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। নলিনীরও অনিচ্ছা ছিল না; সে পুলিশ সাহেবের কাছে কয়েক দিনের ছুটি লইয়া, পরিবার আনিতে বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু মহাদেব ভিন্ন এ কথা আর কাহাকেও জানাইল না; এমন কি, তাহার 'বৌ-দিদি' লক্ষ্মীঠাকুরাণীও তাহা জানিতে পারিল না! সকলেই শুনিল, দায়রা আদালতে একটা মামলায় সাক্ষ্য দিতে সে জেলায় যাইতেছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নলিনীর পত্র পাইয়া মহাদেব দারোগা-দম্পতির জন্য রেল-ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইয়া দিল। মুচিবাড়িয়ায় ইংরাজী স্কুল নাই; সুতরাং সেখানে আনিলে পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে বুঝিয়া, নলিনী তাহার ছেলেটিকে বাড়ীতেই রাখিয়া আসিয়াছিল। কেবল তাহার স্ত্রী রমণীমণি তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। নলিনী মহাদেবের প্রেরিত গাড়ীতে সন্ধ্যার পর সস্ত্রীক বাসায় উপস্থিত হইল। নলিনী সপরিবারে আসিতেছে এ সংবাদ মহাদেব কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। সে দিন ১লা এপ্রিল।

নলিনী দারোগা রসিক যুবক ; কিন্তু স্থানবিশেষে তাহার রসিকতা মাত্রা অতিক্রম করিত। তাহার কি খেয়াল হইল, সে সস্ত্রীক বাসায় পদার্পণ করিয়াই, স্ত্রীকে নিজের ‘ইউনিফর্মে’ সজ্জিত করিল ; মাথার খোঁপাটি ঢাকা পড়ে এভাবে বি, পি, মার্কা-শোভিত টুপিটি স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল (তখন পুলিশের দারোগারা একালের দারোগাদের মত ‘হাফ্ প্যাণ্ট’ ও ‘হ্যাট’ পরিয়া পণ্টুনে সিপাই সাজিতেন না)। তাহার পর পাদুকায় চরণ-কমল আবৃত করিয়া, পুলিশ বেশধারিণী পত্নীসহ রাসবিহারী বাবুর বাসায় প্রবেশ করিল। কোন সংবাদ না দিয়া তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোকের শয়ন-কক্ষে উপস্থিত! লক্ষ্মী ঠাকরাণী তখন নিভৃতে স্বামীর কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। নলিনীর সহিত একজন অপরিচিত দারোগাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তিনি লজ্জায় ঘোমটা টানিয়া অত্যন্ত বিব্রতভাবে ঘরের এক কোণে পলায়ন করিলেন। রাসবিহারী বাবু নলিনীকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, নলিনীরও তাঁহাদের উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ছিল না,—পাঠক তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু নলিনী একজন অপরিচিত দারোগাকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, এভাবে তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করায়, তিনি বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল, নলিনী নেশা করিয়া আসিয়া এইরূপ ধৃষ্টতার পরিচয় দিল! তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, “তোমার সঙ্গে উনি কে?” —অপরিচিত আগন্তুক পাছে ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে তিনি কোন অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

নলিনী দারোগা অসঙ্কোচে বলিল, “উনি হচ্ছেন আমার প্রাণের বন্ধু রমণীবাবু,—মাণিকচর থানার দারোগা,—এই সবে ‘ট্রেণিং’ থেকে বেরিয়েছেন। মরুব্বির জোরে এত অল্প বয়সে ‘থানা আফিসার’ হতে পেরেছেন। আমার সঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুত্ব; তাই একবার দেখা-শুনা করতে এসেছেন।”—ভদ্রলোকের মেয়ের তখনকার অবস্থাটা আপনারা কল্পনা করিয়া দেখুন :—যতই হউক, বাঙ্গালীর মেয়ে ত! দারোগা-পত্নী লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। পণ্ডিত মহাশয় মনে-মনে বলিলেন, “এরকম মুখচোরা লোকও থানার দারোগা হয়!”

দুই-চারি কথার পর নলিনী দারোগা ছদ্মবেশিনী পত্নীসহ রাসবিহারী বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। রাসবিহারী বাবুর স্ত্রী তক্ষকের মত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; এবং ভবিষ্যতে নলিনীর মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সাধ্বী পত্নীকে সান্ত্বনা দানের জন্য রাসবিহারী বাবু বলিলেন, “আমার বাড়ীতে নলিনী দারোগার আত্মীয়তা করতে আসার এই শেষ। হতভাগাটা মহাদেবের বন্ধু, মহাদেবকে নলিনীর ব্যবহারটা ব’লে তাকে সতর্ক ক’রে দিতে হবে।”

সেই রাত্রে নায়েব-নন্দন মহাদেব সান্যালের সহিত রাসবিহারী বাবুর সাক্ষাৎ হইল না; তিনি পরদিন প্রভাতেই মহাদেবের নিকট নলিনী দারোগার ‘বেলাল্লা গিরি’র পরিচয় দিলেন।

মহাদেব বলিল, “নলিনী আমার বন্ধু হ’লেও, আমি তার বাঁদরামির সমর্থন করিনে ; কিন্তু সে কি এতই কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত যে, আপনার বাসার ভিতর শোবার ঘরে, যেখানে আপনার স্ত্রী আছেন—সেখানে আপনাদের অপরিচিত একজন বিদেশী দারোগাকে নিয়ে গিয়ে তুলবে? আর আমি জানি, তার কোন দারোগা বন্ধু-টন্ধু আজকাল থানায় আসে নি। সে কি বলে তার বন্ধুর পরিচয় দিলে?”

রাসবিহারী বাবু বলিলেন, “সে বল্লে, ছোকরা মাণিকচর থানার দারোগা,—সবে ‘ট্রেণিং’ থেকে বেরিয়েই মুরুব্বির জোরে না কি থানার চার্জ্জ পেয়েছে! সুন্দর চেহারা, মুখে দাড়ি-গোঁফের রেখাও ওঠেনি। আর কেমন যেন অপ্রতিভ ভাব,—মুখ তুলে আমার দিকে একবার চাইলেও না। যে পনের মিনিট ছিল, মাথায় তার পুলিশের টুপি এঁটে, ঘাড় গুঁজে ব’সে থাকলো। নাম বল্লে রমণীমোহন—না রমণীকান্ত—ঐ রকম কি একটা। আমার স্ত্রী ত রেগেই আগুন! তিনি আর নলিনীকে আমার বাসায় উঠতে দেবেন না।”

মহাদেব রাসবিহারী বাবুর কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, “আর বলতে হবে না। তার নাম রমণীমোহন টোহন নয়, তার নাম রমণীমণি ; কাল সন্ধ্যার পর নলিনীর স্ত্রী এখানে এসেছে, লক্ষ্মীছাড়াটা তাকেই নিজের পোষাকে দারোগা সাজিয়ে এনেছিল! হয়েছে, কাল ইংরাজী মাসের কোন তারিখ, মনে আছে?”

রাসবিহারী বাবু বলিলেন, “১লা এপ্রিল।”

মহাদেব বলিল, "সে কাল রাত্রে তার স্ত্রীকে দারোগা সাজিয়ে এনে, আপনাদের স্বামী-স্ত্রীকে 'ফুল' বানিয়ে গিয়েছে।"

উদার-হৃদয় রাসবিহারী বাবু বলিলেন, "তাই না কি? যাওয়ার সময়ও ব্যাপারটা আমাদের বুঝ্‌তে দেওয়া তার উচিত ছিল। মেয়েটীর আদর-অভ্যর্থনা কিছুই করা হয় নি; বড়ই অন্যায় হয়ে গিয়েছে।"—রাসবিহারী বাবুর অসন্তোষ ও ক্রোধ অন্তর্হিত হইল; নলিনীর স্ত্রীকে আদর-যত্ন করা হয় নাই বলিয়া তিনিই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার স্ত্রীকে সকল কথা বলিতে চলিলেন।

আমরা এই উপন্যাসে এই অকিঞ্চিৎকর অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিতাম না; কিন্তু এরূপ উদার হৃদয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু শিক্ষকের প্রতি পরে কিরূপ ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার পরিচয় দিতে হইবে বলিয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের প্রসঙ্গে দুই-এক কথার উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করিলাম না।

নলিনী দারোগা তাহার স্ত্রীকে কর্ম্মস্থলে লইয়া আসিবার পর, নায়েব মহাশয় নলিনীকে হস্তগত করিবার অধিকতর সুযোগ লাভ করিলেন। তিনি ল্যাজে খেলিতে লাগিলেন! সাহেব ত পূর্ব্বেই নলিনীর মুরুব্বি হইয়া বসিয়াছিলেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব নলিনীকে সুপারিশের জোরে পুলিশের বড় সাহেব বানাইবে, কি, লাটের গদীতে বসাইয়া দিবে, নলিনী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, সাহেবের কেনা গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর সান্যাল নায়েবের নায়েবী চাল! তিনি মহাদেবের হাত দিয়া মুক্তহস্তে নলিনীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কুঠীর খরচে নলিনী দারোগার বাসায় সকালে-বিকালে জলযোগের সময় রাজভোগের আয়োজন হইতে লাগিল,—তাহাতে বন্ধু-বান্ধব সকলেই যোগদান করিতে লাগিল। 'বৌমার সোণার অঙ্গে ভাল অলঙ্কার নাই' শুনিয়া, নায়েব মহাশয়ের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল! কিছু দিনের মধ্যেই দারোগা-পত্নীর-সোণার অঙ্গে' সোণার চুড়ী, সোণার সূর্য্যহার, সোণার বিছে উঠিয়া, তাঁহার নারীজন্ম সফল করিল। নলিনী দারোগার দিনগুলি সুখস্বপ্নের ন্যায় অতিবাহিত হইতে লাগিল। সে সময় যদি গবর্ণমেণ্ট 'চার ডব্‌ল' প্রমোশন দিয়া নলিনীকে ডেপুটী পুলিশ সাহেব করিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় নলিনী দারোগা তাহা প্রত্যাখ্যান করিত। কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব কিম্বা তস্য নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল নিঃস্বার্থ প্রেমের খাতিরে নলিনী দারোগাকে মাথায় তুলিয়া নাচাইতেছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিবেন—আশা করি আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে তত নির্ব্বোধ কেহই নাই। নলিনী অকৃতজ্ঞ ছিল না। সে 'থানা অফিসার' পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে, কেহ কাণ্‌সারণের বিরুদ্ধে বা কাণ্‌সারণের কোন আমলার বিরুদ্ধে 'রোজ নাম্‌চা' (ডায়েরী) করিতে আসিলে, তাহার অভিষ্টসিদ্ধি ত হইতই না, বরং সময়ে-সময়ে উল্টা ফল হইত, 'রাম উল্টা বুঝিত।' কিছুদিনের মধ্যেই কাণ্‌সারণের অধীন সকল প্রজা বুঝিয়া লইল, এখানকার পুলিশ কাণ্‌সারণের চাকর,—গবর্মেণ্টের চাকর নহে; নলিনী দারোগা দ্বারা কোন অত্যাচারের তদন্ত, বা প্রতিকারের আশা নাই। নায়েব কল টিপিলে সে উঠে-বসে, ও পেটটেপা পুতুলের মত 'প্যাঁক্‌-প্যাঁক্‌' করে! সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া, প্রজারা সকল অভাব-অভিযোগের কথা হাম্‌ফ্রি সাহেবেরই গোচর করিতে লাগিল। পুলিশ-আদালত হইতে 'প্রিভিকাউন্সিল' পর্য্যন্ত সকলই একাধারে বর্ত্তমান হওয়ায়, সাহেব ফাঁসি-শূলীর ভিন্ন আর সকল বিচারই স্বয়ং করিতে লাগিলেন। ইহাতে কাণ্‌সারণের কাযকর্ম্মের যে সুবিধা হইয়াছিল, তাহার তুলনায় নলিনী দারোগার স্ত্রীর আপাদমস্তক সোণায় মুড়িয়া দিলেও সাহেবকে ষোল আনা লাভের সিকি পাই মাত্র ত্যাগ করিতে হইত না। কিন্তু নলিনী দারোগা মাত্রা ঠিক রাখিতে না পারায় ব্যাপার ক্রমে কিরূপ গুরুতর হইয়া উঠিল, এইবার তাহার আভাস দিই।—

* * * * *

আমরা যে সময়ের কাহিনী লিখিতেছি, তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে মুচিবাড়িয়ায় মুন্সেফীর একটি 'চৌকি' ছিল। আমাদের দেশের অনেক জেলাতেই এরূপ আছে; মহকুমার দেওয়ানী-ফৌজদারী আদালত নিকটে নহে, অথচ অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস,—এরূপ স্থানে সবরেজেষ্ট্রী আফিসের ন্যায় এক-একটি মুন্সেফী থাকায়, স্থানীয় লোকের মামলা-মকদ্দমা করিবার সুবিধা হয়। মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী আদালতে যে কয়েক জন উকীল ওকালতি করিতেন,

ভবতোষ বাবু তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। প্রাচীন না হইলেও তিনি তখন নবীন নহেন, এবং তাঁহার পসার-প্রতিপত্তিও ভাল ছিল। তাঁহার আর একটি মহৎ গুণ ছিল,—প্রবলের বিরুদ্ধে তিনি দুর্ব্বলের সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কোন দরিদ্র ব্যক্তি উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার সহায়তা-প্রার্থী হইলে, তিনি সাধ্যানুসারে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেন; ইহাতে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্তও হইতেন।

একদিন প্রভাতে উকীল ভবতোষ বাবু তাঁহার কাছারী-ঘরে বসিয়া তাঁহার কয়েকটি মামলার কাগজ-পত্র দেখিতেছেন; পাশেই সতরঞ্চি-মণ্ডিত একখানি চৌকীর উপর তাঁহার মুহুরী আর্জ্জি-ওকালতনামা লিখিয়া উকীল বাবুর দস্তখতের জন্য গুছাইয়া রাখিতেছে। উকীল বাবুর কাছারী-ঘরের ঘড়িতে ঠং-ঠং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। প্রথম কাছারীতে আর্জ্জি দাখিল করিতে হইবে বলিয়া, মুহুরী কাগজপত্রগুলি গুছাইয়া লইয়া বাসায় যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছে; এমন সময় মনিরুদ্দিন জোলা ভবতোষ বাবুর সম্মুখে আসিয়া "উকীল বাবু, সেলাম!" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

মনিরুদ্দিন কাপড়, গামছা প্রভৃতি বুনিয়া বিক্রয় করিত। ভবতোষ বাবু তাহার নিকট মধ্যে-মধ্যে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতেন। হয় ত তাহার কিছু পাওনা আছে, তাই 'তাগাদায়' আসিয়াছে মনে করিয়া, ভবতোষ বাবু বলিলেন, "কি হে মনিরুদ্দী, খবর কি? কাপড়-চোপড়ের কিছু দাম পাওনা আছে না কি?"

মনিরুদ্দিন বলিল, জ্বে! না; হুজুরের কাছে আমার পাওনা-টাওনা কিছু নেই; আপনাকে আমার একটা 'আরজ' শুনতে হবে। আমি—"

ভবতোষ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "তাই ত, কাছারীর বেলা হয়ে গিয়েছে,—হাকিম আবার এগারটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে এজলাসে বসেন। তোমার কি নালিশ, যদি অল্প কথায় বল্‌তে পার ত এখন শুনি। নৈলে কাছারীর পর আস্‌তে পারলে ভাল হয় মনিরুদ্দী!"

মনিরুদ্দিন ব্যগ্র ভাবে বলিল, "আমি সংক্ষ্যাপেই সকল কথা বল্‌ছি কর্ত্তা! আমি এই 'কাণ্‌সার্ণি'র দশ কাঠা জমি, কর্ত্তা, জমা রাখি; আজ বিশ বছর এক নাগাড়ে তা ভোগ করে আস্‌ছি। সেই জমিতে আমার কোন ঘর দুয়োর নেই, কর্ত্তা! কাল খামোকা দীনুনাথ আমার সেই জমীতে একখানা ঘর তুলেছে। সে বল্‌লে নায়েবের কাছে সে ও-জমি বন্দোবস্ত করে নিয়েছে! আমি ত আর হুজুর, কাঁচা কাজ করে রাখি নি,—এই দেখুন, আমার দলিল; এই দলিলে, ম্যানাজার' সায়েব আর নায়েব দু'জনারই সই আছেন।"—দলিলখানি সে ভবতোষ বাবুর হাতে দিয়া বলিতে লাগিল, "আমি কাণ্ড-কারখানা কিছু সমজাতে না পেরে নায়েবের কাছে গেলাম। নায়েব বল্লে—ও-জমি আমি পাব না। আমরা ৬০ ঘর জোলা এক জোটে আছি; নায়েব বহুৎ চেষ্টা করে আমাদের নেড়েচেড়ে দেখেছে, কিছুতে আমাদের জেরবার করতে পারে নি; এইবার সুমুন্দি আমার পাছে লেগেছে! তাই একটা সলা-পরামর্শ করতে হুজুরের কাছে আসা।"

ভবতোষ বাবু মনিরুদ্দিনের দলিলখানি পাঠ করিয়া তাহাকে বলিলেন, "তোমার এ জমিতে আর কেউ ঘর করতে পারে না; মামলা করলে তুমিই জিত্‌বে; দলিলের স্বত্ব পরিষ্কার।"

মনিরুদ্দিন বলিল, "হুজুর, সব্বাই সায়েব সরকারের দিকে হয়েছে। আমরা গরিব প্রেজা, আমাদের মুখের দিকে তাকাতে কেউ নেই, হুজুর! আর আমাদের তেমন পয়সারও জোর নেই। খরচ-পত্তোর ক'রে মামলা চালানো কি আমাদের সাধ্যি? তবে আপনি গরিবের মা-বাপ; আপনার দয়ার 'শরীল', মেহেরবাণী করে যদি চরণে একটু যায়গা দেন, তা হ'লেই আমরা দুটো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে টি'কে থাকতে পারি। নৈলে আমাদের ফেরার হতে হবে।"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তা আমি তোমাদের পক্ষে দাঁড়াতে পারি; কিন্তু তুমি ত জান, ইংরাজের আদালতে বে-খরচায় বিচার পাওয়া যায় না। মামলা করতে গেলে খরচপত্র কিছু হবেই। তবে যত কমে হয়, আমি তার ব্যবস্থা করবো। যদি মামলাই কর্ত্তে চাও, তবে খরচপত্র বাবদ পাঁচ টাকা দিয়ে যাও।"

মনিরুদ্দিন তৎক্ষণাৎ কোঁচার মুড়ো হইতে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া দিল। তখন ভবতোষ বাবু তাঁহার মুহুরীকে বলিলেন, "আর্জ্জির জন্য দু'খানা ডেমিতে, আর ওকালত-নামার ডেমিতে মনিরুদ্দীর নাম দস্তখত করিয়ে রাখ; আর্জ্জি-

খানা আজ প্রথম কাছারীতেই দাখিল কর্ত্তে হবে। এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে, কাজটা শেষ করে রেখে যাও।"

মনিরুদ্দিন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল না; কষ্টেসৃষ্টে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে পারিত। সে তিনখানি সাদা ডেমিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিজের নামধাম লিখিয়া দিয়া, ভবতোষ বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। ভবতোষ বাবু তাঁহার কাছারী-ঘরে আরও কিছুকাল বসিয়া মনিরুদ্দিনের আর্জ্জিখানির মুসাবিদা দেখিয়া দিলেন। দশটা বাজিলে তিনি ও মুহুরী স্নানাহারের জন্য উঠিলেন।

মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী আদালত খড়ের ঘর। মামলা-মকদ্দমার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। পাঁচ-সাতজন উকীলের সকলেরই কোন রকমে চলিয়া যাইত। বড় উকীল বলিয়া ভবতোষ বাবুর খ্যাতি ছিল,—পয়সাও তিনি যথেষ্ট পাইতেন; তাঁহার প্রতি মক্কেলদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। মক্কেলদের স্বার্থের প্রতি তাঁহারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

ভবতোষ বাবুর মুহুরী যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইয়া যথাস্থানে মনিরুদ্দিনের আরজি দাখিল করিল। আরজিতে প্রতিবাদীগণের নাম দেখিয়াই আদালতের আমলাদের চক্ষু স্থির! মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী আদালতে এ পর্য্যন্ত আর কেহ সম্মিলিত জমীদারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে সাহস করে নাই, এবং কোন উকীলও 'জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ' করা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী আদালতের অন্য কোন উকীল পঞ্চাশ টাকা পাইলেও, এই আরজি দাখিল করিতেন না। সুতরাং ভবতোষ বাবুকে একটা সামান্য প্রজার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক আর্জ্জি দাখিল করিতে দেখিয়া, আদালতের আমলাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! কথাটা তৎক্ষণাৎ সকলেরই কর্ণগোচর হইল, এবং একঘণ্টা অতীত না হইতেই, এই বিস্ময়াবহ ঘটনার কথা লইয়া হাকিমের এজলাসে, আমলাদের সেরেস্তায়, বার-লাইব্রেরীর আটচালায়, গাছতলার পানের দোকানে আন্দোলন, আলোচনা ও গবেষণা আরম্ভ হইল! ভবতোষ বাবুর সহযোগী উকীলেরা, এমন কি, আদালতের আমলা ও পেয়াদাগুলি পর্য্যন্ত, তাঁহার বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতায় সন্দেহ করিতে লাগিল। ভবতোষ বাবুর বন্ধু—আদালতের অন্যতম প্রধান উকীল রামচরণ দত্ত হাসিয়া বলিলেন, "ভায়া, কাজটা ভাল কল্লে না; কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ উঠে পড়বে! শেষটা পস্তানীর সীমা থাকবে না। এ রকম অবিবেচনার কাজ কেন করলে?"

ভবতোষ বাবু একখানি 'ল রিপোর্ট' খুলিয়া একটা নজীর দেখিতেছিলেন। তিনি কেতাবের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি সংলগ্ন রাখিয়াই বলিলেন, "যে কাজের সঙ্গে আমার স্বার্থের, আমার ভবিষ্যতের সুবিধা-অসুবিধার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে কাজ হাতে নেওয়ার আগে আমি যে ফলাফলের কথা ভেবে দেখে নি, তা মনে করো না। কিন্তু আমার বিবেচনায় ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারি নি। তোমরা যে দিক থেকে দেখ্‌চো, সে দিক থেকে দেখ্‌লে মামলাটা হাতে নেওয়া উচিত ছিল না, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বিষয়টা অন্য দিক থেকেও দেখা যায়। আর যে জন্য আমাদের এই ওকালতি পেশার এত গৌরব, তাতে, আমি যে দিক থেকে দেখিচি, সেই দিক থেকেই তা দেখা সঙ্গত। একটা গরিব প্রজা অন্যায় রূপে উৎপীড়িত হচ্চে; প্রতিকার প্রার্থনায় সে আদালতের আশ্রয় নেবে, কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষ পাছে আমাদের অনিষ্ট করে,—এই ভয়ে আমরা যদি তার পক্ষ সমর্থন না করি, আমাদের মনের দুর্ব্বলতায় যদি সে ন্যায় বিচার লাভের সুযোগ না পায়, তা'হলে তাতে কেবল যে আমাদের ব্যবসায়েরই গৌরব আমরা ক্ষুণ্ণ করবো, এরূপ নয়,—আমাদের মনুষ্যত্বের সম্মানও তাতে নষ্ট হবে। তুমি কি আমার এ কথা অস্বীকার করতে পার?"

রামচরণ বাবু বলিলেন, "না, তা পারি নে; কিন্তু পরের জন্যে উড়ো ফ্যাসাদে পড়তে আমাদের সাহসও হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না। ব্যবসায়ের গৌরব, মনুষ্যত্বের সম্মান, ওসব কেতাবের কথা—কেতাবে বন্ধ করে রাখাই ভাল। সংসারে ঢুকে, উঁচু আদর্শ সাম্‌নে রেখে চল্‌তে গেলেই, পদে-পদে ঠোক্কর খেতে হয়। শেষে শ্যাম ও কুল—একটাও রক্ষা করা যায় না! তোমাকে এ কাজের জের সাম্‌লাতে কতখানি বেগ পেতে হয়, তা শীঘ্রই টের পাবে ভায়া!"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তা জেনে-শুনেই এ মামলা হাতে নিয়েছি। নিরাশ্রয় বিপন্নকে সাহায্য করতে গিয়ে যদি বিপদ ঘটেই, সেজন্য আক্ষেপের কোন কারণ দেখ্‌চি নে।"

রামচরণ বাবু মনে-মনে বলিলেন, "তোমার তেল কিছু

বেশী হয়েছে। হাম্‌ফ্রি সাহেব ও সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেল কি চিজ্, তা এখনও বুঝ্‌তে পার নি : শেষে 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' ব'লে স'রে দাঁড়াবার পথ পাবে না। ব্যবসায়ের গৌরব, আর মনুষ্যত্বের সম্মান, তখন শিকেয় উঠ্‌বে।"—কিন্তু প্রকাশ্যে আর কোন কথা বলিলেন না।

এতবড় গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন যে আদালতেই নিবৃত্তি লাভ করিবে—একথা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না। মনিরুদ্দিন জোলা ও তাহার উকীল ভবতোষ বাবুর অদ্ভুত সাহস ও অপূর্ব্ব স্পর্দ্ধার সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে এই বিশাল কাণ্‌সারণের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া, তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিল! যে সকল উৎপীড়ন-জর্জ্জরিত, নিত্য-নিগৃহীত প্রজা রাম-রাজত্বের সুখ মর্ম্মে-মর্ম্মে উপভোগ করিয়া, দুই হাত তুলিয়া, ভগ্ন হৃদয়ে ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিতেছিল, তাহারাও এই সংবাদ শুনিয়া বিস্মিত হইল; এবং জোলার নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, 'খাচ্ছিল জোলা তাঁত বুনে, মরবে এবার ঘানি টেনে!'—সঙ্গে-সঙ্গে ভবতোষ বাবু দরিদ্র বিপন্নের পক্ষ সমর্থনের জন্য সংসারজ্ঞানহীন, নির্ব্বোধ, হামবড়া ও নামের কাঙ্গাল—প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত হইলেন। যে হতভাগ্য নিরুপায় নিঃস্ব প্রজাপুঞ্জের পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত মস্তকে ধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে ও কৃপাপাত্র মনে করিতে লাগিল! জমিদার কোম্পানীর প্রসন্নতা লাভের জন্য কেহ-কেহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে ও অনিষ্ট সাধনেও প্রবৃত্ত হইল! এই হতভাগ্য অভিশপ্ত দেশে ঘুঁটেকে পুড়িতে দেখিয়া গোবর চিরদিনই হাসিয়া আসিতেছে,- এ দেশের ইহাই সর্ব্বপ্রধান বৈচিত্র্য! ইহার ব্যতিক্রম কোথায়!

দীননাথ নামক নায়েবের অনুগৃহীত যে প্রজাটি মনিরুদ্দিনের জমি অধিকার করিয়া সেখানে ঘর তুলিয়াছিল, সে সেইদিন সায়ংকালে নায়েবের নিকটে উপস্থিত হইয়া, মনিরুদ্দিনের স্পর্দ্ধার সংবাদ তাঁহার গোচর করিল। ভবতোষ বাবু মনিরুদ্দিনের পক্ষাবলম্বন করিয়া আদালতে তাহার আর্জ্জি দাখিল করিয়াছেন শুনিয়া, নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্ন্যালের মুখমণ্ডল নিদাঘাপরাহ্নের মেঘের ন্যায় ভীষণ কান্তি ধারণ করিল। তিনি দীননাথকে আশ্বাস দানে বিদায় করিলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন, "তুই এখনই দারোগা বাবুকে আমার নাম করিয়া বল, আমি তাকে তাড়াতাড়ি কামরায় গিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে বলিলাম। সে যেন যাইতে দেরী না করে।" নায়েব মহাশয়ের তখনও সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ হয় নাই! তিনি তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা শেষ করিয়া সাহেবের খাসকামরায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নলিনী দারোগা খবর পাইয়াই সাহেবের নিকটে হাজির হইয়াছে। সাহেবের ইঙ্গিতে নায়েব একখানি চেয়ারে বসিলে, কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শ চলিল।

অনিমন্ত্রিত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

স্থল নাহি আর অঙ্গনেতে স্থল যে নাই,
ভরলো বাড়ী অনাহূতের দল রে ভাই।
নিমন্ত্রণের পত্র তারা চায় না কো,
সোখা এতই, তাড়িয়ে দিলে যায় না কো!
নাইক তাদের লজ্জা, নাহি শঙ্কা রে
করলে পাগল একতারারি ঝঙ্কারে।
বল্ কে রে ভাই, নিমন্ত্রিতে বাদ দিয়ে,
ডাকলে এ সব অনাত্মীয় আত্মীয়ে?

আজকে কানন নেই ত কুসুম-কুন্তলা,
জীর্ণ শাখায় টাঙ্গাও বধু হিন্দোলা।
ভিক্ষুকের এ কক্ষে এসো ভাণ্ডারী,
দীন তরীতে বৈতরণীর কাণ্ডারী।
পালিয়ে গেছে রাজ রাজাদের দূত সবে,
ডাকছি দয়াল অনাহূতের উৎসবে।
ডাকছে তোমায় ডাকছে দয়াল নিঃস্ব আজ,
ধলার ঘরের সিংহাসনে বিশ্বরাজ!

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বৈদিক রহস্য

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

বেদ নিত্য নহে

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বেদ "অপৌরুষেয়" নহে। এই প্রবন্ধে দেখাইব যে বেদ সকল "নিত্য"ও নহে, এবং নিত্যও হইতে পারে না। নিত্য কাহাকে কহে?

যাহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, চিরকাল আছে এবং চিরকালই থাকিবে, তাহাই নিত্য। অজ, অনাদি, অনন্ত পরমেশ্বর নিত্য, অনন্ত ও অপার গগন নিত্য, কেন না উহা অভাব পদার্থ এবং কালও নিত্য, কেন না উহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। পক্ষান্তরে বেদ নিত্য নহে, কেন না উহা জন্য পদার্থ।

দেবগণ, দেবপত্নীগণ, দেবকন্যাগণ, ঋষিগণ, ঋষিপত্নীগণ ও ঋষিকন্যাগণ এবং দাসীপুত্র শূদ্র পারশব (ব্রাহ্মণ ও শূদ্রা প্রভব) কক্ষীবান্, কক্ষীবানের কন্যা পারশবী ঘোষা ও দাসীপুত্র শূদ্র ঐলূষ কবষ বেদমন্ত্র সকলের রচয়িতা, সুতরাং মনুষ্যপ্রণীত এহেন বেদমন্ত্র সকল কি প্রকারে নিত্য হইতে পারে? তবে কেন ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাৎ অজায়ত ॥ ৯। ৯০। ১০ম

অত্র সায়ণভাষ্যং সর্ব্বহুত তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ যজ্ঞাৎ ঋচঃ সামানি চ জজ্ঞিরে, উৎপন্নাঃ। তস্মাৎ যজ্ঞাৎ ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি জজ্ঞিরে, তস্মাৎ যজ্ঞাৎ যজুরপি অজায়ত।

সর্ব্বজন-পূজনীয় সেই পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই যজ্ঞ হইতে গায়ত্রীপ্রভৃতি এবং ছন্দঃ সকলও উৎপন্ন হইয়াছে।

সায়ণের এই অর্থ ঠিক হয় নাই। কেন না যেমন যজ্ঞকুণ্ড হইতে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর জন্ম হইয়াছিলনা, তদ্রূপ যজ্ঞকুণ্ড হইতেও বেদের জন্ম হইতে পারে না। ফলতঃ এখানে—

"বাহুলয়ো বহুলং"

এই পাণিনিসূত্রের সহায়তায় যজ্ঞাৎ পদকে যজ্ঞায় করিয়া অর্থ করিতে হইবে। যজ্ঞে বেদমন্ত্রের ব্যবহারের জন্য দেবতাখ্য ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী ও শূদ্রাশূদ্রীপ্রভৃতি সকলে সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্র সকল এবং জগতী ও গায়ত্রীপ্রভৃতি ছন্দঃ সকলের রচনা ও সৃষ্টি করিয়াছেন। যদাহ হরিবংশঃ.

ঋচো যজূংষি সামানি নির্ম্মমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে।

সাধ্যাশ্চ বৈ তৈ রযজন্ ইত্যেব মনু শুশ্রুমঃ ॥

দেবগণ যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ যজ্ঞে শ্রুতিমন্ত্র সকলের ব্যবহার জন্য ঋক্, যজু ও সাম বেদের মন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি সাধ্যাদি দেবগণ সেই সকল মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—যজ্ঞাৎ যজ্ঞপুরুষাৎ বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরাৎ বেদা উৎপন্নাঃ, অপি চ যখন তোমরাই বলিতেছ যে বেদ সকল ঈশ্বর হইতে সমাগত ও সায়ণও যখন বলিতেছেন যে "জজ্ঞিরে উৎপন্নাঃ", তখন তজ্জন্য পদার্থ সেই বেদের নিত্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে?

সায়ণের এ ব্যাখ্যা ঠিক নহে, "জনিঃ প্রাদুর্ভাবে" জজ্ঞিরে শব্দের অর্থ প্রাদুর্ভূতা বভূবুঃ। যেমন ঈশ্বরও চিরকাল আছেন, বেদ সকলও তদ্রূপ চিরকাল রহিয়াছে। উহা ঋষিগণের নিকট কেবল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল মাত্র।

তোমাদিগের এ সিদ্ধান্তও ঠিক হইতেছে না। বর্ণাত্মক বেদমন্ত্র সকল ঈশ্বরের নিকট ছিল, এ কিরূপ ধারণা? বেদমন্ত্র সকল ঈশ্বরের কণ্ঠস্থ ছিল, না তাঁহার লোহমঞ্জুষায় পড়িয়াছিল, তৎপর তাঁহার খাশ পিওনদ্বারা তিনি উহা ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছিলেন? ফলতঃ এই সকল অনুমান কল্পনা মহাসাগরের লবণাক্ত ফেনবুদ্বুদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এক একটী বেদমন্ত্র ছন্দোবদ্ধ, উহা কবিতাময়। কবিতা সকল বর্ণাত্মক; পূর্ব্বে বর্ণ ছিল না, ভাষা ছিল না। ক্রমে স্বর্গের দেবতারা ভাষার সৃষ্টি করেন। যদাহ—ঋগ্বেদঃ—

দেবীং বাচং অজনয়ন্ত দেবাঃ,

তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। ১১। ৮৯। ৮ম

দেবতারা দেবীবাক্ বা গীর্ব্বাণবাণী অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার উদ্ভাবয়িতা, পৃথিবীর সকল লোক (মনুষ্যও গ্রাম্যপশুবিশেষ) উক্ত সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন।

তৎপর লোকের মনে কবিত্বের উন্মেষ হইলে কবিত্বময় বেদমন্ত্রের সৃষ্টি হয়। কি প্রকারে আদি স্বর্গের দেবতারা সর্ব্বাদৌ মুখে মুখে কবিতা সকল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, সুতরাং উৎপন্ন বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? ঋগ্বেদের এক ঋষি বলিতেছেন যে—

ইন্দ্র যন্তে নবীয়সীং গিরমন্দ্রাজনং। ৫। ৮৪। ৮ম

হে ইন্দ্র যে ঋষি তোমার স্তুতির জন্য এই নূতন মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তথাহি—

নব্যসী হৃদ আজায়মানং। ৩। ৬০। ১ম

আমার হৃদয় হইতে এই নূতন বেদমন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। তথাহি—

ইন্দ্রাগ্নী যুবভ্যাং স্তোমং জনয়ামি নব্যং। ২। ১০১। ১ম

হে ইন্দ্র হে অগ্নি! তোমাদিগের স্তুতির জন্য আমি এই নূতন মন্ত্র রচনা করিতেছি। তথাহি—

ইদং ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং নবীয়ঃ। ১৪। ৩৫। ৭ম

এই বেদমন্ত্র নূতন বিরচিত হইয়াছে। তথাহি—

নবানি কৃতানি ব্রহ্ম ইমানি। ৬। ৬১। ৭ম

এই সকল বেদমন্ত্র নূতন বিরচিত হইয়াছে।

যদি ঋষিগণ নূতন বেদমন্ত্র সকলের রচয়িতা হয়েন, তাহা হইলে তোমরা কেমন করিয়া বলিতে পার যে এই সকল বেদমন্ত্র পূর্বেই পরমেশ্বরের কালেকটারীতে মজুত ছিল? যাহা নূতন বিরচিত, তাহার জন্যত্ব ভিন্ন নিত্যত্ব কোথায়? এই জন্যই ত ভগবান্ কপিল তদীয় সাংখ্য দর্শনে বলিতেছিলেন যে—

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ।

বেদ মন্ত্র সকল কার্য্য, উহারা মনুষ্যপ্রণীত, প্রথম মনুষ্যের জন্মের পূর্ব্বে বেদ মন্ত্র ছিল না, মনুষ্য জন্মিবার পরও যতদিন ভাষা ও কবিতা ছিল না, ততদিন জগতে বেদ মন্ত্র ছিল না। মনুষ্যগণ কবিতাময় মন্ত্র সকল রচনা করিলে তবে তৎসমষ্টি হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। বেদমন্ত্রের সহিত ঈশ্বর বা ঈশ্বরের কি কোনও সংস্রবই নাই? আছে। তাহা অমূলক অন্ধ বিশ্বাস হইতে সমাগত।

সুতরাং মনুষ্যের কৃত—মনুষ্যের কার্য্য বেদ মন্ত্র সকলের নিত্যত্ব হইতে পারে না, বেদ মন্ত্র সকল অনিত্য।

তবে কেন ভগবান্ মনু তদীয় সংহিতায় বলিতেছিলেন যে—

ত্রয়ং ব্রহ্ম—সনাতনং। ২৩।১অ

বেদত্রিতয় অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ সামবেদ "সনাতন" অর্থাৎ নিত্য।

হাঁ ভৃগুপ্রোক্ত বর্ত্তমান মনুসংহিতাতে এই কথাগুলি আছে। কিন্তু গদ্যময় মানবধর্ম্মসূত্রে—বেদ নিত্য বা সনাতন এমন কোনও কথা আছে কি না, তাহা অনুসন্ধেয়।

ধরিয়া লও, মূল মনুসংহিতাতেও এইরূপ কথাই আছে। কিন্তু "বেদ সনাতন" ইহা কেবল মনুর বেদের প্রতি ভক্তিপ্রকটনমাত্র। এই সনাতন শব্দের প্রকৃতার্থ "যাহা বহুকাল যাবৎ আছে"। মনুর মনের ভাব ইহাই যে বেদমন্ত্র সকল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। ফলতঃ যাহা দেবতা ও মনুষ্যগণের জন্মের বহু কোটি বৎসরান্তে বিরচিত, তাহা কখনও নিত্য হইতে পারে না। দেখ মহর্ষি জৈমিনিও তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসাগ্রন্থে বেদসমূহকে অনিত্য বলিয়াই সংসূচিত করিতেছিলেন।

বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ। ২৭।৪০ পৃ—

তত্র শবরস্বামী......সন্নিকৃষ্টকালাঃ কৃতকা বেদা ইদানীন্তনাঃ। তে চ চোদনানাং সমূহাঃ, তত্র পৌরুষেয়াশ্চেৎ বেদাঃ? অসংশয়ং পৌরুষেয়াঃ চোদনাঃ। কথং পুনঃ কৃতকা বেদা ইতি কেচিৎ মন্যন্তে যতঃ পুরুষাখ্যাঃ, পুরুষেণ হি সমাখ্যায়ন্তে।

কেহ কেহ বলেন যে বেদ মন্ত্র সকল আদেশাখ্যকনামকাপণ—উহা মনুষ্যকৃত ও আধুনিক, পরন্তু নিত্য নহে।

অনিত্যদর্শনাচ্চ। ২৮

তত্র শবরস্বামী......জননমরণবন্তশ্চ বেদার্থাঃ, শ্রূয়ন্তে ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত। কুসুরুবিন্দ ঔদ্দালকিরকাময়ত। ইত্যেবমাদয়ঃ। উদ্দালকস্য অপত্যং গম্যতে ঔদ্দালকিঃ। যদ্যেবং, প্রাক্ ঔদ্দালকিজন্মনঃ নায়ং মন্ত্রো ভূতপূর্ব্বঃ? এবমপি অনিত্যতা।

বেদ মন্ত্র সকল যে অনিত্য অর্থাৎ জন্য এবং আধুনিক তাহা কার্য্যতও দেখা যায়। দেখ, শ্রুতিতে আছে প্রবাহণের পুত্র ববর ও উদ্দালকের পুত্র কুসুরুবিন্দ কামনা করিয়াছিলেন। অতএব যে যে শ্রুতিতে উহাদিগের উভয়ের নাম রহিয়াছে ঐ সকল শ্রুতি উহাদিগের জন্মের পরে হইয়াছে, সুতরাং জন্য পদার্থ এবং আধুনিক ঐ সকল শ্রুতি অবশ্যই অনিত্য? কেননা উহারা ববর ও কুসুরুবিন্দের জন্মের পূর্ব্বে ছিল না?

কিন্তু ঐ জৈমিনির এই সূত্রদ্বয় পূর্ব্বপক্ষ, তিনি পরবর্ত্তী তিনটী সূত্রে ইহার সিদ্ধান্ত মীমাংসা করিয়াছেন। যথা—

উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বং। ২৯

আখ্যা প্রবচনাৎ। ৩০

পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রং। ৩১

হাঁ পূর্ব্বমীমাংসাগ্রন্থে এই তিনটী সূত্রও দেখা যায়। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে প্রস্তুত যে, এই তিনটী সূত্র মীমাংসা-দর্শনে প্রক্ষিপ্ত। কোনও যুক্তিবাদী বিবেকশীল ব্যক্তি এরূপ সূত্র রচনা করিতে পারেন না। এই তিনটী সূত্রদ্বারা বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না ও হইতে পারে নাই। কেন?

দেখ, প্রথম মন্ত্রের অর্থ ইহাই যে—শব্দ বা বেদ (আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ইতি গোতমঃ) সকলের পূর্ব্বকালীন। অর্থাৎ স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতাদি যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে বেদ সকলের পূর্ব্বের। বেদের মতন প্রাচীনতম গ্রন্থ আর নাই।

ইহা অতি সত্য কথা—কিন্তু তাহাতে বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল কি প্রকারে? বড় জেঠা মহাশয়, ছোট জেঠা মহাশয়, বাবা, বড় খুড়া মহাশয় এবং ছোট খুড়ামহাশয় হইতেও বয়সে বড়। কিন্তু ইহাতেই কি বুঝিতে হইবে যে বড় জেঠা মহাশয় নিত্য পদার্থ? তাঁহার জন্ম হয় নাই? মৃত্যুও হইবে না? এই জন্যই আমরা বলি যে এই যুক্তিহীন সূত্র রচনা করিয়া জৈমিনি কখনই বেদের নিত্যত্ব দৃঢ়ীভূত করিতে প্রয়াসী হইতেছিলেন না; এ সূত্র তিনটী প্রক্ষিপ্ত।

আখ্যা প্রবচনাৎ, এই সূত্রটীও নিরর্থক। কেননা প্রকৃষ্টরূপে

বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যা বলিয়াছিলেন বলিয়া কঠ, ছান্দোগ্য ও মুণ্ডক প্রভৃতির আখ্যা বা নাম ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে যোজিত হইয়াছে। পরমার্থতঃ শ্রুতি সকল তাঁহাদিগের রচিত নহে, পরন্তু তাঁহারা শ্রুতির ব্যাখ্যাকারক মাত্র।

ইহাও অতি সত্য কথা। উপনিষদে যে সকল বেদ মন্ত্র অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে (যেমন দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া ইত্যাদি) ঐ সকল বেদ মন্ত্র কঠপ্রভৃতির বিরচিত নহে। কিন্তু ঐ সকল মন্ত্র যে প্রাচীনতম যুগের প্রাচীনতম ঋষিগণের বিরচিত, তাহা কি বেদই (১।১৬৪।২০ম প্রভৃতি মন্ত্রে) বলিয়া যান নাই? অতএব এই যুক্তিও বেদ মন্ত্রের নিত্যত্বের কোনও সহায়তা করিতে পারিল না।

তৎপর "পরন্তু শ্রুতি সামান্য মাত্রং" এই কথাটার মতন অকর্মণ্য কথা আর হইতে পারে না। ইহা কখনই একজন চিন্তাশীল ঋষির লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইতে পারে না। কেন যে অসামান্য শবর ইহার ভাষ্য করিয়াছিলেন, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। শবর ভাষ্যে বলিতেছেন যে—

শবরভাষ্য—যচ্চ প্রাবাহণি রিতি, তত্র প্রবাহণস্য পুরুষস্য অসিদ্ধত্বাৎ, ন প্রবাহণস্য অপত্যং প্রাবাহণিঃ। প্র শব্দঃ প্রকর্ষে সিদ্ধঃ। বহতিশ্চ প্রাপণে, নশ্চ অস্য সমুদায়ঃ কচিৎ সিদ্ধঃ। ইকারস্তু যথৈব অপত্যে সিদ্ধঃ, তথা ক্রিয়া যামপি কর্তরি। তস্মাৎ যঃ প্রবাহয়তি, স প্রবাহণিঃ। ববর ইতি শব্দানুকৃতিঃ। তেন যো নিত্যঃ অর্থ, তমেব এতৌ শব্দৌ বদিষ্যতঃ। অতঃ উক্তং পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্।

অতি নিকৃষ্ট ব্যাখ্যা—যদি প্রাবাহণি—প্রবাহণের পুত্র ও ববর এবং কুরুক বিন্দাদি কাহারও নাম না হয়—যদি ঐ সকল নামের কোনও পুরুষ ছিল না ইহাই সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে, "আকম্পয়ত" ক্রিয়ার কর্তৃ কে হইবে? ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে—

প্রবাহণো জৈবলির বাচ

জীবলের পুত্র প্রবাহণ—বলিলেন যে ইত্যাদি

এখানেও কি প্রবাহণ কেহ নাই—শ্বেতকেতুও কেহ নয়, এগুলি কেবল কথার কথা শ্রুতি সামান্য মাত্র? তাহা হইলে ছান্দোগ্যে যে কৃষ্ণ ও দেবকীর নাম আছে এবং বেদে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতির নাম রহিয়াছে, তাঁহারাও বস্তুত কেহ নহেন—পরন্তু শ্রুতি সামান্য মাত্র?

ফলতঃ এই সূত্রত্রিতয় প্রক্ষিপ্ত। জৈমিনি, বেদ সকল অনিত্য ও পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষ কৃত জানিতেন বলিয়াই—বেদকে পৌরুষেয় ও অনিত্য বলিয়া গিয়াছেন।

তবে যে জৈমিনি "একে" কথায় ব্যবহার করিলেন? তিনিও সমাজের ভয়ে বেদকে অনিত্য ও পৌরুষেয় বলিতে সাহসী না হইয়াই বলিয়াছিলেন, যে কেহ কেহ বলেন। দোহাই তোমার আমি বলি না, তোমরা আমায় নিমন্ত্রণ বন্ধ করিও না। আমরাও যেখানে ভয়, সেখানে আমি বলি, না বলিয়া কেহ কেহ বলেন, বলিয়াও লিখিয়া থাকি।

আচ্ছা উপনিষৎ ত বেদের জ্ঞানকাণ্ড, সেই স্বয়ং উপনিষৎ শ্বেতাশ্বতর কেন বলিলেন যে—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। ১৮ ৬ ২।—

যে পরমেশ্বর এই ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিকট বেদ সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ঐ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই কথা গুলি আছে, কিন্তু ইহা প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। কেন শ্রুতিও প্রামাণ্য নহে? অবশ্য গৌতম শব্দ বা বেদকে প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা যুক্তিহীন হইলে বেদবাক্যও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি না। ফলতঃ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ লৌকিক সংস্কৃতে বিরচিত, ইহা গোপালতাপনী ও রাধাতাপনীপ্রভৃতির ন্যায় বাজে গ্রন্থ, পরন্তু বৈদিক যুগের গ্রন্থ নহে। লৌকিক যুগের কি কোনও গ্রন্থই প্রামাণ্য নহে? অবশ্যই প্রামাণ্য। আমরা পুরাণের যুক্তিযুক্ত বাক্য সকল (যেমন গোমাংসভক্ষণ নিষেধ) বেদবাক্য হইতেও প্রামাণ্য মনে করি। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত নহে। কেন? যেহেতু পরমেশ্বর নাগরী অক্ষরে লেখা তালপাতার পুঁথি বেদ তাঁহারই খাস পিওনদ্বারা বা ভি, পী, পার্শ্বেলে ব্রহ্মাকে পাঠাইয়াছিলেন, এমন কোনও রেকর্ড পরমেশ্বরের মহাফেজখানায় নাই। ব্রহ্মা তিন জন, একজন স্বয়ং পরমেশ্বর আত্মভূ বা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, তিনি প্রেরক; দ্বিতীয় ব্রহ্মা আদি মানব লোকপিতামহ হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট, তিনি ভাষা ও বর্ণজ্ঞানবিহীন ছিলেন, তাঁহার নিকট কখনই বেদ প্রেরিত হয় নাই। তৃতীয় ব্রহ্মা পরমেষ্ঠী বা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা। তিনি বেদের মালিক ছিলেন বটে। কিন্তু আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে—সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার পিতামহগণ ব্রহ্মার বাপ কশ্যপেরও বহু পূর্বে বেদজ্ঞঋষি ছিলেন। যথাঃ বায়ু পুরাণ—

বেদাঃ সপ্তর্ষিভিঃ প্রোক্তাঃ

শ্রোতা ব্রহ্মা মনুস্তথা॥

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য প্রভৃতি সপ্তর্ষি বেদের বক্তা ছিলেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র বা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা। সুতরাং তিনি আদি বেদজ্ঞ নহেন। ভাগবত যে তাঁহাকে আদিকবি বলিয়াছেন, তাহাও ষোল আনা মিথ্যা কথা। বিশ্বদেব নিবিদের রচয়িতা দেবতারা বেদ মন্ত্রের আদি এবং মরীচিপ্রভৃতি সপ্তর্ষি দ্বিতীয় যুগের কবি। অতএব শ্বেতাশ্বতরের একথা মিথ্যা যে পরমেশ্বর সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট বেদ পাঠাইয়া ছিলেন। তবে কেন মহামান্য মহাভারত এরূপ বলিতেছেন যে—

অনাদি নিধনা বেদাঃ

বাক্ উৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। শান্তিপর্ব।

বেদ বাক্য সকল অনাদি ও অবিনাশী, উহা স্বয়ং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার মুখনির্গত বাক্য।

মহাভারত ধাপার মাঠের ন্যায় নানা আবর্জ্জনাপরিপূর্ণ।

উহা প্রক্ষেপে প্রক্ষেপে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কথনই এই কথাটী বলিয়া যান নাই, উহা কোনও বেদভক্ত কুসংস্কারান্ধ অন্ধ বিশ্বাসীর লেখনীলীলামাত্র। স্বয়ং বেদ বলিতেছেন যে বেদ দেবতা ও ব্রাহ্মণেরা রচনা করিয়াছেন, আর মহাভারত বলিতে পারেন যে বেদবাক্য সকল ঈশ্বর হইতে সমাগত; বেদের যদি বিনাশই না থাকিবে, তাহা হইলে সামবেদের সহস্র সহস্র শাখা আজি কোথায় গেল ?

আচ্ছা, বেদমন্ত্র সকল যে দেবতা ও ব্রাহ্মণকৃত, ইহার কোনও প্রমাণ বেদে আছে ? হে ভ্রাতৃগণ! যাঁহারা বেদ না পড়িয়া বৈদিক ও শাস্ত্র না পড়িয়া শাস্ত্রী এবং বিদ্যা অভ্যাস না করিয়া বিদ্যাবাগীশ, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা তোমাদিগকে বিনয়ের সহিত বলি যে তোমরা একবার নিজ চক্ষে বেদ সকল পড়। (৮।৮৮।১০ম দেখ)।

কেমন করিয়া পড়িব ? আমরা যে শূদ্র ? এই যে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিতেছেন যে—

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা

স্ত্রীলোক, শূদ্র, মূর্খ দ্বিজ ইহার কানেও বেদ বাক্য শুনিবে না। মনুতে আছে যে শূদ্র বেদ শুনিলে সীস গলাইয়া উহার কাণে ঢালিয়া দিবে।

এই ভাগবতবচনও অলীক। অষ্টাদশ মহাপুরাণের একখানিও ব্যাসপ্রণীত নহে। প্রচলিত ভাগবত বেদাকুলবুরুক্ষর বোপদেব গোস্বামিবিরচিত, আর মনুর ঐ সকল শ্লোক চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের লেখনিলীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেখ স্বয়ং যজুর্বেদ কি বলিতেছেন—

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।

ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় স্বায় চারণায় চ ॥২।২৬ অ যজুঃ।

এই যে আমি বেদের কল্যাণীবাণী বলিতেছি—ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র ও দাস দাসী সকলেরই জন্য।

এখন তোমরা বেদ মানিবে, না, ভাগবত মানিবে ? ফলতঃ বেদ মন্ত্র সকলেরও বহু অংশ যে নারীগণ ও পারশব শূদ্র কক্ষীবান্ এবং কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা বিরচিত, তাহা বেদানভিজ্ঞ বোপদেব অবগত ছিলেন না। জনকরাজ সভাতে কি বেদ-বিদুষী গার্গী ও মৈত্রেয়ী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন না ? স্বয়ং সরস্বতী কি বহু বেদ মন্ত্রের রচয়িত্রী—ছিলেন না ? দেখ বেদেই আছে যে—

সরস্বান্ ধীভির্বরুণো ধৃতব্রতঃ পূষা বিষ্ণুর্মহিমা বায়ুরশ্বিনা।

ব্রহ্মকৃতো অমৃতা বিশ্ববেদসঃ শর্ম্ম নো যংসন্ ত্রিবরূথ মংহসঃ ॥৫।৬৬।১০ম

ধৃতব্রত অমর অভিজ্ঞ সরস্বান্, বরুণ, পূষা, বিষ্ণু, বায়ু, অশ্বিদ্বয় আপন আপন বুদ্ধিবলে ও কবিত্ব মহিমায় বহু বেদ মন্ত্রের রচনা করিয়াছেন। দেবতারা আমাদিগকে এই শত্রুকুল হইতে অন্যত্র লইয়া যাইয়া ত্রিতল গৃহ প্রদান করুন। তথাহি—

দিবো ধর্ত্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ

কবির্বৌজনং সবিতা উক্থ্যম্ ॥ ২ । ৫৩ । ৪ম

স্বর্গের ধারণ কর্ত্তা, সকল ভুবনের প্রজাপতি কবি সবিতা (ব্রহ্মার পিতা) উক্থ বা সামমন্ত্রের রচনা করিয়াছেন। তথাহি—

বৃহস্পতে—বিশ্বেষাং জনিতা

ব্রহ্মণামসি। ২। ২৩। ২ ম

হে বৃহস্পতে! তুমি বহু বেদ মন্ত্রের জনয়িতা। তথাহি

ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনাং। ৬। ৯৬। ৯ম

কশ্যপের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বয় জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে কবি পদ ভাক্ ছিলেন।

অগ্নয়ে ব্রহ্ম ঋভবস্ততক্ষুঃ। ৭।৮০।১০ম

ঋভুগণ অগ্নির স্তুতির জন্য বেদ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। তথাহি—

উত স্বরাজে অদিতিঃ স্তোম

মিন্দ্রায় জীজনৎ। ১৪।১২। ৮ম

দেবমাতা অদিতি আপনার পুত্র দেবরাজ ইন্দ্রের প্রশংসাজন্য বেদমন্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পরও কি কেহ বলিবে যে—বেদ মন্ত্র সকল মনুষ্য প্রণীত নহে, পরন্তু অপৌরুষেয় ও নিত্য ? তবে কেন পরাশর বলিতেছেন—

ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ

বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।

কেহ বেদের প্রণেতা নহেন, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও বেদের স্মরণকর্ত্তা মাত্র। পরাশরের এ বচন হয় প্রক্ষিপ্ত—না হয় তিনি নিজে বেদজ্ঞ ছিলেন না, তাহা হইলে তিনি এরূপ কথা বলিতেন না।

আচ্ছা তবে কেন পাণিনির মহাভাষ্যপ্রণেতা স্বয়ং পতঞ্জলি বলিলেন যে—

শব্দাশ্চ নিত্যাঃ

শব্দ বা বেদ মন্ত্র সকল নিত্য। ইহা পতঞ্জলির বেদে অচলা ভক্তির নিদর্শন। ফলতঃ বেদ যে নরনারীর প্রণীত, যখন তাহার প্রমাণ বেদেই বর্ত্তমান, তখন পতঞ্জলির একথা প্রমাণ হইতে পারে না।

যদি বল, এ শব্দ শব্দের অর্থ বেদ নহে, তাহা হইলেও শব্দের নিত্যত্ব হইতে পারে না। শব্দ—দুই প্রকার; ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দ সকল হস্ত লগুড়াদি ও বায়ুর অভিঘাতে উৎপন্ন, সুতরাং উহার জন্য ? আর বর্ণাত্মক শব্দও—বায়ু ও কণ্ঠাদির সহায়ে উৎপন্ন—সুতরাং জন্য—জন্য ও জাত কোনও বস্তু নিত্য হইতে পারে না। ফলতঃ একমাত্র পরমেশ্বরই—অজ অবিনাশী ও নিত্য, কাল ও গগনও নিত্য, পশ্চাদুদ্ভূত উৎপন্ন বেদ মন্ত্রের কিছুই নিত্য হইতে পারে না ও উহারা নিত্যও নহে।

ওরাঁওদের—'বানগাড়ি ও খলিহান পূজা এবং নওয়া খানী'

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ

জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষে 'ওরাঁওদের সেরহুল' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, যে যে জাতির প্রধান উপায় কৃষি, তাহাদের মধ্যে দেবদেবীর পূজা উৎসবের বাহুল্য খুবই। তাহারা প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যকে, প্রকৃতির বিভিন্ন কার্য্যকলাপকে পূজা করে। তাহারা নানারূপ দেবতার কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে পূজা ও উপহারে সন্তুষ্ট করে, যাহাতে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। সেই জন্যই বোধ হয়, ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যে এত দেবদেবীর বাহুল্য। সেই জন্যই পাশ্চাত্য জাতিরা আমাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় যে, ইহারা পৌত্তলিক, ইহারা কুসংস্কারান্ধ, superstitious। কিন্তু যখন তাহারাই কৃষির উপর নির্ভর করিত, তখন তাহারাও পৌত্তলিক, তাহারাও superstitious ছিল। বস্তুতঃ, অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুদিগের প্রত্যেক উৎসবের সম্বন্ধ কৃষিকার্য্যের সহিত সম্পূর্ণভাবে না থাকিলেও কতক পরিমাণে আছেই।

ছোটনাগপুরের ওরাঁওরা জীবিকার জন্য কৃষিকার্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে; তাই তাহাদের প্রত্যেক পূজা, পার্ব্বণ, প্রত্যেক উৎসব, এমন কি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পর্য্যন্ত, সমস্তই, এমনই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা ফল আকাঙ্ক্ষা করে একটি—প্রচুর শস্যোৎপাদন।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ওরাঁওদের 'সেরহুল' ও আনুষঙ্গিক পূজা ও উৎসবের উদ্দেশ্য প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা,—যদিও তাহারা বলে যে, পূজার দিন সূর্য্যের সহিত 'ধর্ত্তি মাই' এর বিবাহ হয় এবং এ উৎসব সেই জন্যই। সূর্য্য বৃষ্টির কর্ত্তা, আর, ধর্ত্তি মাই' শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র। জমীতে সময়ে উপযুক্ত বৃষ্টি পড়িলে ভাল শস্য উৎপন্ন হইবে; সুতরাং তাহাদের এই কথা যে সেরহুলের দিন সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর বিবাহ হয় এবং সেরহুল তাহারই উৎসব—ইহার অর্থও কৃষিকার্য্যের সহিত জড়িত।

ধানের চাষ আরম্ভ করার পূর্ব্বে ও পরে ওরাঁওরা কি-কি উৎসব করিয়া থাকে, এবং কিরূপ ভাবে ক্ষেত্রাধিপতি দেবতাদের সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করে, এই প্রবন্ধে তাহাই বলিব।

ওরাঁওরা চাষবাসের কাজ শেষ করিয়া, বিদেশে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় যায়। তার পর চাষবাসের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়া সেরহুল বা খর্দ্দি উৎসব করে। জমীতে দুই চারিবার লাঙ্গল ফিরাইয়া লইয়া, সার দিয়া, বৃষ্টি পড়িলেই বীজ বপনের উপযোগী করিয়া রাখে।

বীজ বপনের পূর্ব্বে, গ্রামের সামাজিক নেতা 'পাহান' সেই গ্রামের অধিবাসীগণের ক্ষেত্রে যাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় এই প্রার্থনা করিয়া, ক্ষেত্রাধিপ প্রমুখ দেবতাদিগের উদ্দেশে কুক্কুট বলি প্রদান করিয়া তাঁহাদের প্রসন্ন করে। তার পর গ্রামের 'মাহাতো'কে (১) দিয়া প্রতি গৃহে সংবাদ পাঠায় যে, একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে রাত্রে যেন গ্রামস্থ প্রবীণ ওরাঁওরা গ্রাম্য আখড়ার সমবেত হয়। সেই সম্মিলনীতে বীজবপন আরম্ভ করিবার দিন স্থির হয়। বীজবপনের প্রথম দিবসের দুই-তিন দিন পূর্ব্বে পাহান মাহাতোকে দিয়া গ্রাম হইতে পাঁচটি পাঁচরঙ্গের (যথা কাল, সাদা, তামাটে, লাল ও বিচিত্র বর্ণযুক্ত) মুর্গী ধরাইয়া লইয়া আসে ও সেইগুলিকে অতীব যত্নের সহিত আলোচাল খাইতে দেয়। পরে পূজার দিন স্নান করিয়া হাড়িয়া ও মুর্গী কয়টি লইয়া গ্রাম্য দেবীমণ্ডপে 'গাঁওয়া দেওতীর' (২) পূজা করিবার জন্য গ্রামস্থ মুখ্য ব্যক্তিগণের সহিত উপস্থিত হয়। তৎপরে সমস্ত গ্রামের অধিবাসী কি হিন্দু, কি মুসলমানও, কি ওরাঁও সকলের মঙ্গল কামনায় কল্যাণ ও সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়া, 'গাঁওয়া দেওতীর' আরাধনা করিয়া, পঞ্চ কুক্কুট বলি দেয়, ও সেই রক্ত ও মদ্য দিয়া দেবতার পূজা করে। তার পর পূজার উৎসর্গীকৃত আতপ চাউল, মুর্গীর মাংস ও মদ্য লইয়া পাহানের বাড়ী ফিরিয়া আসে; এবং সমবেত ওরাঁওরা সেই মাংস আলোচাল ও মদ্য ভক্ষণ ও পান করে। যাহারা অনুপস্থিত থাকে, তাঁহাদের বাড়ীতে প্রসাদ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই উৎসবের পর, পাহান আপনার জমীতে বীজ বপন করে ও সন্ধ্যায় পঞ্চায়েৎ করিয়া সকলকে বীজবপনের আদেশ প্রদান করে।

বীজ বপনের পূর্ব্ব দিবসে প্রত্যেক ওরাঁও আপন-আপন বাটীতে গৃহদেবতা 'বুঢ়াবুঢ়ীর' (৩) নিকট শ্বেত কুক্কুট ও মদ্য দিয়া পূজা করে, এবং বাড়ীর প্রত্যেকেই সামান্য 'প্রসাদী' গ্রহণ করে। এমন কি, যদি বাড়ীতে নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুও থাকে, তাহারও মুখে মদ্য ও মাংস স্পর্শ করাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর গৃহকর্ত্তা, অভাব পক্ষে গৃহের কোনও প্রৌঢ় ব্যক্তি, একাকী অন্ধকারের মধ্যেই বিনা আলোক-সাহায্যে কিঞ্চিৎ বীজ লইয়া, তাহাতে সেরহুলের দিন যে কাঁকড়া উনানের উপর ঝুলাইয়া রাখা থাকে, তাহা ঐ বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হয়। তার পর নিঃশব্দে পা টিপিয়া আপনাদের শস্য-ক্ষেত্রের কোনও অংশে উপস্থিত হয়। রাস্তায় চলিবার সময়, কোনও রূপ শব্দ করা একেবারে নিষিদ্ধ। খুব সতর্কতার সহিত পশ্চাৎ দিকে না চাহিয়া চলিয়া যাইতে হয়। কারণ, ওরাঁওদের বিশ্বাস যে, সেই সময়ে তাহাদের গৃহদেবতা 'বুঢ়াবুঢ়ীর'

(১) মাহাতো সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি আহরণ করে। এই কার্য্যের জন্য যে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে, তাহার ফসল তাহারই প্রাপ্য।

(২) 'গাঁওয়া দেওতী' গ্রাম্য দেবতা। এই দেবতার পূজায় হিন্দু মুসলমান সকলের সমান অধিকার।

(৩) 'বুঢ়াবুঢ়ি' Family Deities.

প্রতিকূল যে সকল দেবতা ও অপদেবতারা আছে, তাহারা উহাদের সৌভাগ্যের পথে বাধা-বিঘ্ন ঘটাইয়া অমঙ্গল করিতে পারে। তাহারা (অপদেবতারা) উহার পিছনে-পিছনে যাইতে থাকে। সেই জন্যই পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি ফিরান বারণ, পাছে তাহাদের সহিত 'চোখো-চোখি' হইলে অনিষ্ট হয়। যে ব্যক্তি সেই রাত্রে বীজ লইয়া ক্ষেত্রে যায়, সে একা যাইতে ভয় পাইলে অন্য একজনকে সঙ্গে লইতে পারে; কিন্তু পথে কথাবার্ত্তা বলা একেবারেই নিষিদ্ধ। যদি একান্তই কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, তাহা হইলে এমনই ভাবে কথা বলা নিয়ম যে, কাছে অন্য কেহ থাকিলেও যেন না শুনিতে পায়। এই কার্য্যে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে গৃহ-দেবতাদের পূজা করিয়া যাইতে হয়, এবং কোনও বলি মানত করিতে হয়। ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নিঃশব্দে বীজ জমিতে ছড়াইয়া দিতে হয় ও পুনরায় সেইরূপ সতর্কতার সহিত ফিরিয়া আসিতে হয়—ঠিক যেমন সতর্কতা যাইবার সময় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। যদি যাইবার সময় বা ফিরিবার সময় অপর কোনও লোকের সহিত বা কোনও জানোয়ারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়, তাহা অতীব অমঙ্গল-সূচক মনে করা হইয়া থাকে। যদি কেহ জানিতে পারে ও বলে যে, "অমুক ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে যাইতেছে বা বীজ বপন করিয়া ফিরিতেছে", তাহা হইলে সেই রাত্রের কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়। পরদিবস আবার সেইরূপ ভাবে গিয়া বীজ ছড়াইয়া আসিতে হয়। আর যদি প্রাথমিক বীজ-বপন বেশ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে যে জীবটি বলির জন্য মানত রাখা হইয়াছে, তাহাকে আলো চাউল খাইতে দেওয়া হয়; এবং ধান কাটার পর বলি দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

যে ব্যক্তিকে প্রাথমিক বীজ বপন করিতে হয়, তাহাকে বীজ বপন করিবার দিন, দিনে ও রাত্রে সর্ব্ব প্রকারে সংযম করিয়া থাকিতে হয়। আলো চাউলের ভাত খাইতে হয়; অন্ততঃ দুইবার, একবার প্রাতঃকালে ও একবার বীজ বপন করিতে যাইবার সময়. স্নান করিয়া যাইতে হয়। পরদিন প্রাতঃকালে সেই বাড়ীর সকলে গিয়া ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার সময় উপস্থিত থাকে। ক্ষেত্রে যে কেহই বীজ বপন করিতে পারে; রাত্রে বীজ বপন করিতে যাইবার মত বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। তবে রাত্রে যেখানে প্রথম বীজ বপন করা হইয়াছে, সেই স্থান হইতেই বপন আরম্ভ করিতে হয়।

যখন বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া বেশ বড় হয় ও পুনর্ব্বার রোপণের (transplantation) উপযুক্ত হয়, তখন ক্ষেত্রের অধিকারীকে, পাড়ার সকলকে সংবাদ দিয়া, পল্লী-স্ত্রীলোকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আসিতে হয়।

রোপণের প্রথম দিন প্রাতঃকালে গৃহকর্ত্তা এক কলসী হাঁড়িয়া লইয়া গ্রামের পাহান বা পাহানের অনুপস্থিতিতে, পাহানের কোন জ্ঞাতিকে সঙ্গে করিয়া, যে ক্ষেত্রে রোপণ আরম্ভ হইবে, সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। সেই স্থানে পাহান বা পাহানের প্রতিনিধি কলসী হইতে শালপাতার ঠোঙ্গায় হাঁড়িয়া ঢালিয়া ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিতে-দিতে বলে—হে মাতঃ বসুন্ধরে! এই ক্ষেত্রের শস্য যাহাতে খুব ভাল হয়, সেই জন্য তোমায় 'তাপাও' (৪) দিয়া প্রার্থনা করি, যেন ক্ষেত্রকর্ত্তার উৎকৃষ্ট ফসল হয়। এই প্রার্থনা করিয়া তিনবার হাঁড়িয়া ছিটাইবার পর, সেই কলসী হইতে কিঞ্চিৎ মদ্য নিজে পান করে ও কিঞ্চিৎ ক্ষেত্রস্বামীকে পান করিতে দেয়। কোন কোনও গ্রামে এই সময় একটি মুর্গী বলিও প্রদান করা হইয়া থাকে। তবে বলি দিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। ক্ষেত্রস্বামীর সামর্থ্য ও পাহানের ইচ্ছার উপর সমস্তই নির্ভর করে।

হাঁড়িয়া পান করিবার পর পাহান স্বহস্তে কয়েকটি চারাগাছ ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া দেয়। পরে সমবেত স্ত্রীলোকেরা রোপণ-কার্য্য করিতে থাকে। ক্ষেত্রস্বামী ও পাহান ক্ষেত্রস্বামীর গৃহে ফিরিয়া আসে। সেইখানে ক্ষেত্রস্বামী নিজে পাহানকে স্নান করাইয়া যথাসাধ্য আহার ও মদ্য পান করিতে দিয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণা (৵০ হইতে ৷৵০) পর্য্যন্ত দিয়া বিদায় করে। ওদিকে সমস্ত পল্লী রোপণে-প্রবৃত্ত স্ত্রীলোকদিগের সুমধুর সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে মুখরিত হইয়া গ্রামবাসীর প্রাণে এক নূতন আনন্দ, নূতন আশা জাগাইয়া দেয়। বস্তুতঃ এই সময়ে ওরাঁও গ্রামে প্রবেশ করিলে সত্যই প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ইচ্ছা হয়, কবির মত প্রতি লোমকূপ দিয়া I listen till I have my fill. এই সময় হইতে ধান কাটা হওয়া পর্য্যন্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাকে।

এই মাত্র যে উৎসবের বিষয় বর্ণনা করা হইল, তাহার নাম 'বন-গাড়ী'।

ধানের গাছগুলির যাহাতে কোনও রূপে অনিষ্ট না হয়, সেই জন্য ওরাওঁরা খুব সতর্ক থাকে। দিনের বেলায় সকলে পালা করিয়া ক্ষেত্রে পাহারা দেয়। কখন কখনও দুষ্ট লোকের কুদৃষ্টি ও পাখীদের হাত হইতে গাছগুলি বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে, একটি কাল হাঁড়ির তলদেশে চূণ দিয়া সাদা-সাদা দাগ করিয়া, উল্টা করিয়া একটা বাঁশের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। আর রাত্রে চোরের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাচা তৈয়ার করিয়া তাহাতেই একজনকে বিনিদ্র রজনী কাটাইতে হয়। বালকেরা এই সময়ে গরু মহিষ লইয়া চরাইতে যায়। এইরূপে পশুর হাত হইতে গাছগুলি বাঁচান হয়। দরিদ্র ওরাঁওরা এত কষ্ট করিয়া, বুকের রক্ত নিংড়াইয়া ধানগুলিকে রক্ষা করিলেও, সামান্য দুই-চারিজন ব্যতীত সকলকেই চাষের কাজ শেষ করিয়া বাংলা দেশে গিয়া, অথবা চা বাগানে গিয়া, প্রাণান্ত পরিশ্রমে মজুরী করিতে হয়। তাহার কারণ—১ম, তাহাদের অত্যধিক সরলতার জন্য গ্রাম্য উত্তমর্ণের অত্যাচার; ২য়, ছোটনাগপুরের স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর জমী।

ধানগুলি পাকিয়া আসিলে, কর্ত্তনের পূর্ব্বে 'খলিহান' (৫) উত্তম-

(৪) তর্পণের বারি।

(৫) খলিহান—গৃহের নিকটের উন্মুক্ত স্থান; কোথাও কোথাও প্রস্তরময়। এইখানে ধান 'মিশা' ও 'মাড়া' হইয়া থাকে।

রূপে গোময় দিয়া লেপন করিয়া পরিষ্কার করা হয় ও সেই স্থানে পূজা করা হইয়া থাকে। ইহার নাম খলিহানি পূজা। এই পূজা প্রথমে গ্রাম্য পুরোহিত, পাহান, আপনার খলিহানে সংসাধিত করে। পরে গ্রামস্থ অন্যান্য ব্যক্তিরা করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট দিনে, যে মুর্গী অথবা সামর্থ্য হিসাবে ছাগল, বা শূকর, বীজ বপনের সময় মানৎ করা থাকে, তাহা খলিহানে লইয়া আসা হয় এবং খলিহান ভূতের নিকট বলি দেওয়া হয়। হাঁড়িয়া ও মদ্যপান এবং নৃত্যগীত যথেষ্টই হইয়া থাকে। তাহার পর শস্য কাটা হয় ও খলিহানে বহন করিয়া আনিয়া জমা করিয়া রাখা হয়। এই স্থানে ধান গাছ হইতে ছাড়াইয়া মাড়িয়া ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। যতদিন না সমস্ত কার্য্য শেষ হয়, ততদিন খড়েরই একটি ছোট ঘর তৈয়ার করিয়া দুইজন কি একজন ওরাঁও রাত্রে শয়ন করিয়া খলিহান পাহারা দেয়। এই ঘরটির সমস্তই খড়ের এবং দুই পাশ ঢালু—যাহাতে বৃষ্টি পড়িলেও ভিতরের বিশেষ কিছু ক্ষতি না হয়। ওরাঁওরা বলে যে, এক শ্রেণীর ভূত আছে, যাহাদের নাম 'চোর দেওয়া'। তাহারা খুব খর্ব্বাকৃতি- কেহই এক হাতের বেশী উঁচু নয়। মাথায় তাহাদের এত বড়-বড় জটা যে, চলিবার সময় মাটীতে লুটাইয়া পড়ে। তাহাদের বর্ণ ঘোর কাল; কিন্তু চোখ দুইটী খুব বড়-বড়, ও আগুনের ভাঁটার মত জ্বলজ্বল করে। ইহাদের যাহারা বশে আনিতে পারে, তাহাদের জন্য ইহারা নানারূপ ধন-দৌলত ও ধান চুরি করিয়া আনিয়া দেয়। খলিহানে ইহারা প্রত্যহই যায় ও পাহারার লোক অন্যমনস্ক অথবা অসতর্ক থাকিলে, ধান চুরি করিয়া পলাইয়া যায়। এই জন্য খলিহানে ওরাঁওরা সমস্ত রাত্রি পাহারা দেয়।

ওরাঁদের চাষ সংক্রান্ত আরও একটি প্রধান উৎসব 'নওয়াখানি' (৬)। ভাদ্রমাসে যখন গোড়া ধান পাকিয়া উঠে, সেই সময় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামস্থ ব্যক্তিদের পূর্ব্বেই পাহানই প্রথম আপনার 'নওয়াখানী' সম্পন্ন করে। উৎসবের দিনের দুই-এক দিন পূর্ব্বে উষাকালেরও পূর্ব্বে পাহান ও মাহাতো দুইজনে পার্শ্বস্থ গ্রামের শস্যক্ষেত্র হইতে কিছু ধান্য সংগ্রহ করিয়া আনে। ক্ষেত্রাধিপতির অনুমতি পূর্ব্বাহ্নেই লইয়া রাখা হইয়া থাকে। সেই ধান্য হইতে পাহান আপনার বাড়ীতে চিড়া প্রস্তুত করাইয়া লয় এবং 'মাহাতো'র দ্বারা গ্রামস্থ প্রবীণদিগকে ডাকাইয়া আনায়। পরে শীতল জলে স্নান করিয়া, যে ঘরে গ্রাম্য দেবতা 'চালো পাচ্চো' বা সর্ণাবুঢ়িয়ার পবিত্র কুলা (৭) রাখা থাকে, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই কুলার উপর সর্ণাবুঢ়িয়াকে আবাহন করিয়া, চিড়া উৎসর্গ করে; এবং প্রসাদ আনিয়া সমবেত সকলের হাতেই কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ বিতরণ করে। যাহারা অনুপস্থিত থাকে, তাহাদের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর হাঁড়িয়া ও ভাত খাওয়া হয়। পাহানই খাওয়ার সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিয়া থাকে।

তাহার পর গ্রামস্থ ব্যক্তিরা আপন-আপন 'নওয়াখানী' উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারাও প্রতিবেশীর ক্ষেত্র হইতে নূতন ধান্য সংগ্রহ করিয়া চিড়া করে এবং কোনও পূজা না করিয়াই গৃহের সকলে মিলিয়া আহার করে ও প্রচুর মদ্য পান করে। রাত্রিতে যুবক-যুবতীরা আখড়ায় একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করে ও তাণ্ডবে রাত্রি শেষ করিয়া দেয়।

(৬) 'নওয়াখানী'—নবান্ন। এই উৎসব না করিয়া নূতন চাউল ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

(৭) এই কুলাখানি ওরাঁওদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়। যখন যে পাহান হয়, তখন তাহারই গৃহে রাখা হয়। এই কুলা দ্বারা পাহান-নির্ব্বাচনও হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

রবার ও তাহার প্রস্তুত-প্রণালী

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-বি-এ-সি

আমরা প্রায়ই আজকাল যথা-তথা রবারের প্রস্তুত দ্রব্যাদি দেখিতে পাই। রবার জিনিসটা যে গাছের আঠা হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু তাহার প্রস্তুত-প্রণালী কিরূপ, তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত নহেন।

রবার-বৃক্ষ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং তাহার মধ্যেও নানা জাতি আছে।

১ম শ্রেণী—ইউফরবিয়াসিয়া (Euphorbiaceae)। ইহার ভিতর চারি জাতি আছে, যথা—

(ক) হিভিয়া (Hevea)

(খ) ম্যানিহট (Manihot)

(গ) সেপিয়াম (Sapium)

(ঘ) উরক্যানড্রাস্ (Urcandras)

২য় শ্রেণী—এপোসায়েনেসিয়া (Apocynaceae)। ইহার মধ্যে পাঁচ জাতি, যথা—

(ক) ফুন্টুমিয়া (Funtiumia)

(খ) ল্যানডল্‌ফিয়া (Lanndolphia), ইহা এক প্রকার লতা।

(গ) ক্লাইটেণ্ড্রা (Clitandra)

(ঘ) হেনকর্ণিয়া (Hancornia)

(ঙ) ডায়েরা (Dyera)

৩য় শ্রেণী—আরটিকেসিয়া (Urticaceae)। ইহার মধ্যে দুই জাতি, যথা—

(ক) ফিকাস ইল্যাসটিকা (Ficus Elastica)। ইহাকে ব্রহ্মদেশে রামবং (Rambong) কহে।

(খ) ক্যাস্টিলোয়া (Castilloa)

৪র্থ শ্রেণী—কম্পোজিটে (Compositae)। ইহার মধ্যেও দুই তিন জাতি আছে। কিন্তু এগুলি সবই গুল্ম জাতীয়।

প্রথম শ্রেণীর বৃক্ষগুলি প্রায় সবই দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে (ক), (খ) ও (গ) কেবল মাত্র আফ্রিকা দেশে জন্মে; (ঘ) দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে জন্মে, এবং (ঙ) মালয় উপদ্বীপে জন্মে। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে (ক) ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মলয় উপদ্বীপ, লঙ্কা, যবদ্বীপ এবং এসিয়ার অপরাপর স্থানে জন্মে; (খ) কেবলমাত্র মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় জন্মে।

এই সকল গাছের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর হিভিয়া গাছই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার চাষ আজকাল মলয় উপদ্বীপ, লঙ্কা প্রভৃতি দেশে বেশ ভালরূপই হইতেছে। ইহা হইতেই জগদ্বিখ্যাত "পারা" রবার প্রস্তুত হয়। এই গাছ উচ্চতায় প্রায় এক শত ফিট এবং প্রস্থে প্রায় ৪০ ইঞ্চি পরিমাণ হয়।

উপরিউক্ত বৃক্ষগুলির ত্বক ছেদন করিলে একপ্রকার দুগ্ধবৎ আঠা নির্গত হয়। ইহাকে ইংরাজিতে ল্যাটেক্স্ (latex) কহে। এই দুগ্ধকে জমাইলে তাহা হইতে প্রকৃত কাঁচা রবার পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে জলের পরিমাণ শতকরা ৫২ ভাগ ও রবারের পরিমাণ ৩৮ ভাগ। ইহা ব্যতীত উহাতে শর্করা (sugar) রজন (Resin), প্রোটিন (Protein) এবং ছাই (Ash) আছে। হিভিয়া গাছ পাঁচ বৎসরের না হইলে তাহা হইতে দুগ্ধ বাহির করা হয় না; ইহার বয়স অনুসারে দুগ্ধ নির্গত হয়।

৫ বৎসর	বয়সে	বৎসর	মোট	একপোয়া	দুগ্ধ	পাওয়া	যায়
৭	"	"	"	"	তিন পোয়া	"	"	"
১২	"	"	"	"	দুই সের	"	"	"
৩০	"	"	"	"	দশ সের	"	"	"

এবং প্রতি বৎসরে ইহার ত্বক ১৬০ বার ছেদন করা হয়। ক্যাস্‌টিলোয়া গাছ বৎসরে মোট ৪১৫ বার মাত্র ছেদন করা হয়। ইহা হইতে বৎসরে অর্দ্ধসের মাত্র দুগ্ধ পাওয়া যায়। গুল্মগুলির ডালপালা জলে সিদ্ধ করিয়া আঠা বাহির করা হয়।

এই সকল গাছের ত্বক ছেদন আমাদের দেশের খেজুর গাছ কাটার ন্যায় নহে। প্রথমে ইহার তলদেশ হইতে ৮ ফিট উচ্চ পর্য্যন্ত ঋজুভাবে একটি দাঁড়ি ছেদন করা হয়। তাহার পর মৎস্যের মেরুদণ্ডাকৃতিতে ট্যারচা ভাবে দুই পার্শ্বে কর্ত্তন করা হয়। ইহা ১/৬ ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া। এইরূপ আকারে কর্ত্তন করাকে ইংরাজিতে Herring bone অর্থাৎ হেরিং মৎস্যের মেরুদণ্ডাকৃতি কর্ত্তন কহে। প্রথম কর্ত্তন প্রায় ৭।৮ ফিট উচ্চ করা হয়, এবং প্রতিদিন বা একদিন অন্তর দুই ইঞ্চি নিম্নে নিম্নে V-আকৃতিতে ছেদন করা হয়। ক্রমে এই ছেদন বৃক্ষের তলদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে। পুনরায় এইরূপ প্রথাই অবলম্বন করা হয়। বৃক্ষের তলদেশে কোনও মৃৎ পাত্র বা টিনের পাত্র রাখিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করা হয়. এইরূপে দুগ্ধ সংগ্রহ করা হইলে, তাহাকে জমাইয়া কাঁচা রবার বাহির করা হয়। ইহাকে জমাইবার তিন চারি প্রকার পন্থা আছে।

১। ইহাকে কোনও কাষ্ঠ ফলকের উপর মাখাইয়া ধূমের উপর কিয়ৎকাল ধরিয়া থাকিলে, ক্রমশঃ উহা জমিয়া যায়। এইরূপ বারবার উহাতে আঠা লাগাইয়া ধূমে ধরিয়া জমানর পর, কাষ্ঠফলক হইতে উহা চাঁচিয়া লওয়া হয়। একেবারে প্রায় ৮।১০ সের পরিমাণ কাঁচা রবার পাওয়া যায়। ইহাকে গোলাকৃতি করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

২। রাসায়নিক উপায়েও ঐ দুগ্ধ জমান যায়। উহাতে সিরকা বা (Acetic acid), গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric Acid) কিংবা স্পিরিট (Alcohol) মিশ্রিত করিলে উহা জমিয়া যায়।

৩। ঘূর্ণায়মান যন্ত্রে (Centrifugal machine) এই দুগ্ধকে খুব জোরে ঘুরাইলে ইহার জল ও রবার পৃথক হইয়া যায়।

৪। এই দুগ্ধের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণ করিলে উহা জমিয়া যায়।

৫। কতক প্রকার গাছের দুগ্ধ কেবল মাত্র ফুটন্ত জলের (100°c) উত্তাপে রাখিলেও জমিয়া যায়।

উপরিউক্ত যে কোনও প্রকার উপায়ে পৃথকীকৃত কাঁচা রবারের মধ্যে নানা প্রকার পদার্থ থাকে বলিয়া, উহাকে উত্তমরূপে জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়; এবং বারম্বার বাষ্পে গরম করিয়া ময়দা মাখার ন্যায় প্রণালীতে তাপ দিয়া ও নিংড়াইয়া উহাকে বেশ নরম ও স্থিতিস্থাপক করা হয়। এইরূপে প্রস্তুত রবারই হইল বিশুদ্ধ রবার। কিন্তু ইহা দ্বারা বিশেষ কোন প্রকার দ্রব্যাদি তৈয়ার করা যায় না। এই নিমিত্ত ইহাকে Vulcanize বা গন্ধক মিশ্রিত করিতে হয়। শতকরা ৮।১০ ভাগ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কোনও যন্ত্রের মধ্যে অধিক চাপে দুই তিন ঘণ্টা কাল ১৩০°—১৪০° ডিগ্রি (130°—140° c) উত্তাপে উহাকে রাখিয়া দিলে, উহা গলিয়া বাজারে প্রচলিত সাধারণ রবার প্রস্তুত হয়। এইরূপ রবারকে যন্ত্র সাহায্যে চাপিয়া পাতলা পাতলা চাদর তৈয়ার করা হয়; এবং উহা হইতে ইচ্ছানুযায়ী নল প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু তৈয়ার করা যায়।

বিশুদ্ধ রবারের সহিত শতকরা ৪০ ভাগ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া, ছয় ঘণ্টা কাল উপরিউক্ত উপায়ে "ভলকানাইজ" করিলে, এক প্রকার কঠিন পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহাকে ইংরাজিতে "ভল্‌কানাইট, ইবনাইট বা হার্ড রবার" কহে। ইহা হইতে মাথার চিরুণী, কাঁকই, দ্রব্যাদির হাতোল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির অংশ প্রভৃতি বস্তু তৈয়ার হয়।

গন্ধক মিশ্রিত রবারে সকল প্রকার বস্তু প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে বলিয়া, তাহাতে নানা প্রকার ভেজাল সামগ্রী মিশ্রিত করা হয়।

১। মূল্য হ্রাস এবং পরিমাণ বৃদ্ধির নিমিত্ত উহাতে ফুলখড়ি, দস্তা ভস্ম (Zinc oxide), Barium Sulphate. পুরাতন রবারের দ্রব্যাদি প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়।

২। খুব ঘন করিবার জন্য উহাতে পিচ্ (Pitch), bitumen (গন্ধক জাতীয় দ্রব্য বিশেষ), Asphalt, মাটি হইতে জাত মোম (Ozokerite) প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়।

৩। স্থিতিস্থাপকতা ও ভার রাখিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত উহাতে-সীসা ভস্ম (Litharge), চূর্ণ ও ফুলখড়ি, ম্যাগনেসিয়া

(magnesia), দস্তাভস্ম (Zinc oxide), লিথোপোন (Lithopone), কাঁচচূর্ণ, বালাটা (Balata, ইহা রবার জাতীয় দ্রব্য) প্রভৃতি দ্রব্যাদি মিশ্রিত করা হয়।

ইহা ব্যতীত নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত উহাতে সিন্দূর, Cadmium yellow, Chrome yellow, Chrome green, Prussian blue, Antimony Sulphiyde, খড়িমাটি, ধাতুচূর্ণ, পিত্তলচূর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যাদিও মিশ্রিত করা হয়।

রবারের দ্রব্যাদি যে জগতে কতকাল হইতে প্রচলিত, তাহার সঠিক নির্ণয় করা বড় সুকঠিন। তবে য়ুরোপীয় পুস্তকে পাঠ করা যায় যে, ১৫২৫ খৃঃ Martyrd' Anghiera মেক্সিকো (Mexico) দেশে রবারের খেলিবার বলের প্রচলন দেখেন। ১৬শ শতাব্দীতে যখন স্পেন ও পর্টুগাল দেশবাসীরা দক্ষিণ আমেরিকা জয় করেন, সেই সময় তাহারা তথাকার আদিম অধিবাসীদের রবারের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে দেখেন। ঐ সকল জাতিরা কেবল মাত্র খেলিবার বল, দ্রব্যাদি রাখা ছোট ছোট থলি, জুতা এবং বৃষ্টি-নিবারক জামা তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিত। ১৭৭০ খৃঃ অম্লজান বাষ্প আবিষ্কারক Priestley সাহেব রবারের দ্বারা কাগজে লিখিত পেন্সিলের দাগ যে মুছিয়া ফেলা যায়, তাহা আবিষ্কার করেন; এবং উহাকে ঐরূপ ভাবে ব্যবহার করিবার প্রণালীর প্রচার করেন। তৎকালীন সকল রবারই আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া (West India) দেশ হইতে আসিত বলিয়া, উহার নামকরণ India rubber হইল। সেই হইতেই উহা ঐ নামেই আজ পর্যন্ত প্রচলিত।

ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত রবারের দ্রব্যাদি সর্ব্বপ্রথম ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮২৫ খৃঃ C. Macintosh নামক ম্যাঞ্চেষ্টার-নিবাসী জনেক ইংরাজ বস্ত্রাদির উপর রবারের প্রলেপ দিয়া তাহাকে জল রোধক করিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। কিন্তু গন্ধক মিশ্রিত করিয়া তাহাকে "ভলকানাইজ" করিবার উপায় ১৮৩৯ খৃঃ Charles Goodyear নামক জনৈক আমেরিকাবাসী সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ১৮৪৪ খৃঃ Hancock নামক জনৈক ইংরাজও ঐরূপ প্রথা আবিষ্কার করেন। ১৮৪৬ খৃঃ A. Parkes নামক জনৈক ইংরাজ যাহাতে শীতল অবস্থাতে ঐরূপ গন্ধক মিশ্রিত করা যায়, তাহার উপায় আবিষ্কার করেন। ইহাকে ইংরাজিতে Cold Vulcanization কহে। রবারে এই সকল গন্ধক সংমিশ্রণের উপায় যদি আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় জগতে রবারের দ্রব্যাদির এত বহুল-প্রচলন হইত না।

জগতের মধ্যে অর্দ্ধেক কাঁচা রবার কেবলমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, বলিভিয়া এবং ব্রেজিল দেশ হইতে রপ্তানি হয় এবং ঐ সকল রবার কেবল ঐ হিভিয়া জাতীয় বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ, লঙ্কা, মলয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে এত রবার গাছ আছে যে, ১৯১৩ খৃঃ ঐ সকল দেশ হইতে ৮,৮৭,০০০ মণ কাঁচা রবার বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল; এবং উহার মূল্য অনুমান ১৬১,০০০,০০০৲ টাকা। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল ব্যবসা বিদেশীয়দের হস্তে রহিয়াছে; এবং ভারতবর্ষে একটিও রবারের কল-কারখানা নাই।

উপরিউক্ত রূপ রবার কেবল স্বাভাবিক উদ্ভিদজাত রবারের বর্ণনা। আজকাল মানববুদ্ধিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আল্‌কাতরা হইতে জাত নকল রবারেরও দ্রব্যাদি বাজারে অনেক প্রচলিত হইতেছে। ইহা স্বাভাবিক রবার হইতে কোনও অংশ ন্যূন নহে। ইহাকে ইংরাজিতে সিনথেটিক রবার (Synthetic Rubber) কহে।

রংয়ের কথা

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

রং শুধু দেখাই যায় না,—শোনাও যায়।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সব সময়েই আদরণীয়। বিশেষতঃ, যখন কোনো আবিষ্কার দেশীয় লোক দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা আমাদিগকে অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট করে। করাচীর একজন ভদ্রলোক সম্প্রতি একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার নাম ডাক্তার পেশোতন সোরাবজি গুলবাই ডুবাশ। তিনি কিছুদিন হইতে রংএর বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন; এবং রং যে শুধু আমাদের চোখের দ্বারাই জানা যায়,—আর কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় কি না এই দিকে একটু চিন্তা করিতেছিলেন। সকলেই জানেন, মানুষের একটা ইন্দ্রিয় যদি বিকল হয়, তাহা হইলে অন্য ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি সাধারণতঃ কিছু অধিক হইয়া থাকে। এই তত্ত্ব স্মরণ রাখিয়া, তিনি একজন জন্মান্ধকে আনিয়া, তার কাণের উপর একটা রঙীন রুমাল চাপিয়া ধরিলেন। প্রশ্ন হইল "কোন শব্দ শুনিতে পাও?" উত্তর আসিল, "হাঁ, পাই।" ডাক্তার আনন্দে একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। অমনি যত অন্ধ যেখানে পাইলেন, সকলকেই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সকলেই বলিতে লাগিল, "শব্দ শুনিতে পাই।" প্রমাণ হইল, রং শোনা যায়। এখন ডাক্তার ডুবাশ ভাবিলেন, সব রং যেমন দেখিতে এক রকম নয়, সব রং শুনিতেও বোধ হয় এক রকম হইবে না। তাই তিনি লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি নানা রং লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং অনুসন্ধান করিয়া বহু অন্ধ যোগাড় করিলেন। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেল, বিভিন্ন রংএর বিভিন্ন শব্দ! অর্থাৎ একটা রংকে অধিকাংশ অন্ধই এক রকম শুনিতে পায়; আর একটা রং আর এক রকম শোনা যায়। অবশ্য এটাও ঠিক যে, সব অন্ধই এ সম্বন্ধে একমত নয়। কিন্তু অধিকাংশেরই একমত। শব্দের জোরেরও আবার কমবেশী আছে। কোনো রংএর শব্দ জোরে, কোনটার বা আস্তে হয়। একজন ১৮ বৎসর বয়সের যুবক তিন বছর বয়সে অন্ধ হইয়াছে। সে শব্দের জোরের তারতম্য অনুসারে রংগুলোকে সাজাইয়া দিল। এই ভাবে সাজাইল:—বেগুনী, নীল, সবুজ, হল্‌দে, কমলা, লাল, কাল। অর্থাৎ বেগুনীর শব্দ সপ্তমে চড়া; তার পর নীল

ইত্যাদি ; এবং কালর শব্দ সব চেয়ে কম। কোনো-কোনো অন্ধ এরূপও বলিয়াছে যে, তাহারা কোনো রংকে উষ্ণ ও কোনো রংকে শীতল বলিয়া অনুভব করে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ডাক্তার ডুবাশ সকল অনুসন্ধিৎসু লোককেই আমন্ত্রণ করিয়েছেন যে, এ বিষয়ে যদি কেহ কোনো নূতন ফল পাইয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবেন।

আতস-বাজী

শ্রীবিজনবিহারী সান্নাল

আজ ক'মাস ধরে মনে একটা বড় ব্যথা লেগেছে যে, জগতের এই এত বড় একটী Science কতকগুলো বাজে লোকের হাতে চাপা রয়েছে। তারা কেবল মামলি ধরণের বাজী প্রস্তুত-প্রণালীই জানে; নূতনের ধার দিয়াও যায় না। এই কারণেই লোকের মনে কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব এসে পড়েছে। কারণ, কালী পূজার সময় ছোকরা এবং বাবুর দল দোকানে ঢুকেই বলে বসেন "আরে, সেই একঘেয়ে বাজী ;—নূতন কিছু নেই মশাই!" নূতন অনেক আছে; কিন্তু করে কে? এই আতস-বাজীতে এমন সব নূতন জিনিষ দেখান যায়, যে আপনারা শুনলে আশ্চর্য্য হবেন। ঠিক্ দুপুর বেলায় বাজীর ভিতর হতে সন্দেশ, গজা, কচুরি, ঘোড়া, কুকুর, ব্যাং, মানুষ, লজেঞ্জস, চকলেট, রকমারি ধোঁয়া ইত্যাদি যে দেখান যায়, তা আপনারা দেখেছেন কি? আজগুবী বলে হেসে উড়িয়ে না দিয়ে, একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন—পরে সব জানতে পারবেন।

আমার মনে হয় এমন অনেকেই আছেন, যাহারা মাল মসলার নাম এবং ভাগ পেলে বাজী তৈয়ার করিতে পারেন। আমি তাঁদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; কতদূর সফল হইব, তাহা শ্রীভগবানের হাত। একটা কথা এখানে বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা ধূমপান করেন, তাঁহাদের এ চেষ্টা না করাই মঙ্গলজনক। কারণ, সামান্য একটী সিগারেটের ফুলকিতে ভীষণ অনর্থপাত ঘটিতে দেখা গিয়াছে। এই সঙ্গে ইহাও বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, উৎকৃষ্ট আতস-বাজী উৎকৃষ্ট মাল মসলার উপর এবং অপরিমিত যত্নের উপর নির্ভর করে।

কয়লাঃ—

গেঁয়ো কাঠের কয়লা সবচেয়ে হাল্কা—এই জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অড়হর কাঠ এ দেশে পাওয়া যায় না বলিয়াই এ দেশে গেঁয়ো কাঠের আদর ; নচেৎ অড়হর কাঠই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সোরা ঃ—

যে সোরায় যত জল এবং নুনের ভাগ কম, সেইটাই বাজীর কাজের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কলমী সোরায় জল এবং নুনের ভাগ কম বলিয়াই এই কাজে ব্যবহৃত হয়।

গন্ধক ঃ—

আজকাল জাপানি গন্ধকে বাজার ছাইয়া গিয়াছে; এই গন্ধক দিয়া বারুদ করিলে মাল ভাল হয় না—এই জন্য বিলাতী গন্ধক ব্যবহার করা উচিত।

লোহাচর ঃ—

পোকাটা চর ভাল নয়। কাণ্টিই ভাল।

চাচ গালা ঃ—

হামান-দিস্তায় করিয়া কুটিয়া, মোটা কাপড়ে ছাঁকিবেন,—মোটা দানা যেন না পড়ে। জিনিসটা বড়ই চিমড়ে। বুদ্ধিমানের মতন যেন রৌদ্রে দিয়া কড়্কড়ে করিবার মতলবে যাবেন না। তা হ'লেই সমস্তই মাটী!

হাঁস কিম্বা মুরগির ডিম ঃ

ডিমের সাদা ভাগই বাজীর কাজে লাগে। হলদে ভাগ হয় ভাজিয়া বা সিদ্ধ করিয়া খান, নচেৎ ফেলিয়া দিন। তা ব'লে বুদ্ধিমানের মতন যেখানে বাজির কাজ হয়, সেখানেই যেন আগুন করে ভাজিতে বা সিদ্ধ করিতে যাবেন না।

পটাস্, ব্যারাইটা, ক্যালোমেল, ইত্যাদি ডাক্তারখানা হইতে লইবেন। দামে হয় ত দু'চার পয়সা বেশী লইতে পারে—কিন্তু জিনিষটী মিলিবে খাঁটী।

শ্রীরামপুরের ১৬ পুনি কাগজই বাজির কাজের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। কোয়ার্টার ইঞ্চি মোটা কাঠের রুল একফুট আন্দাজ লউন। রুলের বদলে একটী সাধারণ লেড পেনশিল লইলেও চালাতে পারে। কাগজ ১০ ইঞ্চি লম্বা ভাবে অবশ্য লইবেন এবং চওড়ার দিকে লইবেন ঐ রুল কাঠের ৩ পেচ পর্য্যন্ত। একবার কাগজ রুলের গায়ে জড়ান—জোড়ের মুখে অল্প লেই দিয়া জুড়িয়া দিন; তলায় লেই দিয়া মুড়িয়া দিয়া খোল শুকাইয়া রাখুন। অবশ্য যে যার বারুদ আন্দাজ করিয়া খোল পেঁচাইবেন। কারণ যার বারুদ অল্প, তিনি ছোট খোল করিয়া তাহাতে বারুদ ঠাসিয়া সখ মিটাইতে পারেন। এই যে খোলের কথা বলা হইল, ইহাতে রকম-রকম বারুদ ঠাসিয়া এবং অল্প সামান্য মাথা খেলাইলে, কদম গাছ, আটপলে ঝাড়, জাহাজ, কেল্লা পর্য্যন্ত তৈয়ার করা যায়। ২।০ ইঞ্চি খোলও করিবেন। সেই খোল হাউই এবং গোলায় লাগিবে।

তুবড়ীর খোলের মুখ বেশ বড় করিয়া লইতে হয়। ইহা অনেকেই জানেন না। এই মুখ বড় করিয়া না লইবার দরুণ অনেকে ভাল মসলা দিয়াও নিরাশ হইয়া পড়েন। সাধারণ নিয়ম ঃ—ছটাকে তুবড়ির মুখ, কড়ে আঙ্গুলের প্রায় তলা পর্য্যন্ত যায়, এইরূপ বড় করিতে হয়। আধপোয়া খোলের নিয়ম, মাঝের আঙ্গুলের প্রায় তলা পর্য্যন্ত এবং ।০ পোয়া খোলে সমস্ত বুড়া আঙ্গুল বেশ ভাল ভাবেই গলিয়া যায়, এইরূপ ছেঁদা বড় করিয়া লইতে হয়।

তুঁইএর বেলাতেও এই একই ব্যবস্থা।

তুবড়ির খোলের মাপ ছটাকের উপর হইলেই গায়ে পাট জড়াইয়া

লইতে হয়। পাট গোছা করিয়া ১ হাত ১।০ হাত লম্বা করিয়া কাটুন। তার পর সরু-সরু গোছা করুন, এবং বেশ করিয়া কাই মাখান। এইবার বেশ করিয়া খোলের চারিধারে জড়ান।

তুবড়ি খুব বেশী উঠিলেই যে বাজী ভাল হইবে, তার কোন মানে নাই। যত বেশী ঝাড় হইবে, তুবড়ির বাহার তত। এই ঝাড়ের জন্যই মুখ বড় করার নিয়ম।

ভাল তুবড়ির ভাগ হচ্ছে সোরা /১, গন্ধক /।০, কয়লা /৶০। সমস্ত জিনিসগুলি সবই বিশুদ্ধ হইবে—ভেজাল একটুও থাকিবে না।

সমস্ত জিনিষ একসঙ্গে শীলে করিয়া গুঁড়ান; খুব মিহি করিবার দরকার নাই। সুজির মতন মোটা হইলেই হইবে।

এইবার সমস্ত বারুদ ওজন করিয়া সেরকরা /৷৴০ পাঁচ ছটাক্ কাস্তিচুর দিবেন্। এখন লোহাচুর সম্বন্ধে কিছু বলা বিশেষ দরকার মনে করি। এক ছটাক্ খোলে যে রকম মোটা লোহাচুর লাগিবে, আধপোয়া খোলের বেলায় তাহার অপেক্ষা মোটা চুর লাগিবে—ইহা অতি অবশ্য জানা দরকার। সেইজন্য লোহাচুর কিনিবার পূর্ব্বে, কিরূপ খোলে বারুদ ঠাসিবেন, তাহা ঠিক করিয়া চুর কিনিবেন। ইহার সহিত আবার এলুমিনিয়মের মোটা দানা মিশ্রিত বারুদের সেরকরা /৶০ পোয়া মিশাইয়া দিলে আরও বাহার হইবে। ফুল এবং মুক্তা দুই ঝরিবে। যেমন-যেমন ছেলেবেলায় গল্পে শুনিতাম,—সোনার গাছে মুক্তার ফল।

ইলেক্‌ট্রিক তুবড়ি।

ক্লোরেট পটাস /১, চাঁচ গালা /।৶০, এলুমিনিয়ম্ পাউডার অথবা মেগ্‌নিসিয়ম্ পাউডার /।০।

পটাস্‌কে কাগজের উপর রাখুন। বোতল দিয়া বেশ করিয়া দলিয়া নিন। পরে মিহি চালুনি দিয়া ছাঁকুন। গালা হামান দিস্তায় গুঁড়ান—মোটা কাপড়ে ছাঁকুন। এইবার তিনটি বেশ করিয়া মিশাইয়া তুবড়িতে বেশ জোর করিয়া ঠাসুন। যদি অসুবিধা বোধ করেন, অল্প জল-হাত করিয়া লইতে পারেন। তলার দিকে যে মাটী দিতে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

ভুঁই বা হাত তুবড়ি।

সোরা /১, গন্ধক ৴০ ছটাক, কয়লা /৸০, মিহি লোহাচুর /।।০ মোটা এলুমিনিয়মের দানা /।৶০।

সোরা, গন্ধক এবং কয়লা বেশ করিয়া একসঙ্গে গুঁড়ান। তুবড়ির বারুদের অপেক্ষা মিহি করুন। এইবার লোহাচুর এবং এলুমিনিয়ম্ দানা বেশ করিয়া মিশান। খোলের মধ্যে ঠাসুন। চারিধারে বুড়া আঙ্গুলের চাপ দিয়া ভুঁয়ের মধ্যে বারুদ ঠাসিবার নিয়ম। ভুঁই, ঝরণা এবং তারাবাজি একই বারুদে প্রস্তুত হয়। কেবল খোলের আকার বিভিন্ন মাত্র। পরে-পরে সব খুলিয়া লিখিয়া দিব।

লাল রংমশাল এবং লাল গুল্ (তারা)

ষ্ট্রন্‌সিয়া /১।০, পটাস্ ক্লোরেট /১, চাঁচ গালা /।৴০, ক্যালোমেল্ ¼ তোলা।

প্রত্যেকটী দ্রব্য ভিন্ন-ভিন্ন পাত্রে গুঁড়ান। প্রথম দুটী জিনিস বেশ পুরু করিয়া কাগজের উপর ঢালিয়া কাঁচের বোতল দিয়া ডলুন। তার পর মিহি চালুনিতে করিয়া ছাঁকিয়া লউন। চাঁচ গালা হামান্-দিস্তায় কুটুন। পুরু কাপড়ে ছাঁকুন। মোটা দানা না পড়ে। এইবার সমস্ত জিনিস একসঙ্গে বেশ করিয়া মিশান, কাগজের খোলের মধ্যে ঠাসিয়া জ্বালাইলে লাল রংমশাল হয়। রংমশালের জন্য ব্যবহার করিতে হইলে ধরিবার জন্য ১৷০ ইঞ্চি আন্দাজ তলায় ধূলা ঠাসিয়া পরে বারুদ ভরিবেন। হাউই এবং গোলায় ব্যবহারের জন্য হাঁসের অথবা মুরগির ডিমের সাদা ভাগ দিয়া বেশ করিয়া একটী পাত্রে ময়দা মাখার মতন মাখুন; তারপর লুচির মতন করিয়া পাত্রে বেশ করিয়া থাবড়িয়া-থাবড়িয়া, যেন খুব পুরু না হয়—চৌকা অথবা গোল করিবেন। ছুরি দিয়া গজার মতন ছোট-ছোট করিয়া কাটিয়া, খুব সামান্য পরিমাণে gunpowder ছিটাইয়া দিবেন। এই gunpowder মাখাইবার নিয়ম হচ্ছে যে বেশ বড় খবরের কাগজের ওপর পাউডার ছিটাইয়া, যে পাত্রে গুল কাটা হচ্ছে ঠিক তার নীচে রাখুন। গুল কাটুন এবং ছুরি দিয়া কাগজের উপর ফেলুন। এইবার সমস্ত গুল কাটা হইলে কাগজের কোণা ধরিয়া চারিধারে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিন। তাহা হইলেই সমস্ত গুলের গায়ে বারুদ লাগিয়া যাইবে। মাখি বারুদ দিবার কারণ—সহজেই উপরে উঠিয়া গুলে আগুন ধরিয়া যাইবে।

সবুজ রংমশাল বা সবুজ তারা।

পটাস্ ক্লোরেট /১, ব্যারাইটা /১, চাঁচ গালা /।৴০, ক্যালামেল ¼ তোলা।

লাল রংমশাল এবং তারা যে নিয়মে করিবেন, সবুজের বেলাও ঐ একই নিয়ম। এই লাল, সবুজ আবার গন্ধকের পর্য্যায়েও আছে; পটাসের সঙ্গে গন্ধক বড় বিপজ্জনক। এইজন্য দিলাম না। এই বিলাতি ভাগে কিছু খরচ বেশী হয় বটে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা নাই বলিলেও চলে এবং রংও অনেক জোর হয়।

GUNPOWDER

সকলের পক্ষে gunpowder মেলার সুবিধা একেবারে নাই। কারণ উহা লইলে লাইসেন্স দরকার করে। এইজন্য ইহার বারুদের ভাগ লিখিয়া দিলাম—

সোরা—৭৫, গন্ধক—১০, কয়লা—১৫।

এই তিনটী জিনিষ কাঠের হামান্-দিস্তায় গুঁড়ান। শীলে গুঁড়ান বিপজ্জনক; কারণ যদি পাথরে-পাথরে ঘসিয়া জ্বলিয়া উঠে। যদি কাঠের হামান-দিস্তা না পান, তিনটী জিনিষ আলাদা করিয়া শীলে খুব মিহি করিয়া গুঁড়াইয়া লইয়া তার পরে বেশ করিয়া মিশান। এইটি খুব ভাল করিয়া মনে রাখিবেন। পরে ইহার দরকার অনেক আছে। ইহার নাম gunpowder অথবা দেশী নাম দানা বারুদ অথবা মাখি বারুদ।

হাউই

সোরা /১ গন্ধক /৶ কয়লা /৶ সাত ছটাক।

বেশ ভাল করিয়া যাঁতায় পিষিয়া লউন অথবা শিলে গুঁড়ান। ইহা তৈয়ারি করা খুব কষ্টসাধ্য। সামান্য ত্রুটীতে অধিক ক্ষতি।

এখন দুই রকম হাউই হইতে পারে। প্রথমতঃ কাগজের খোলে এবং দ্বিতীয়তঃ বাঁশের চোঙায়। কাগজের খোলে করা শক্ত এবং ব্যয় সাপেক্ষ। এখন যেরূপ বাজার তাহাতে সস্তার জিনিষ না লিখিলে হয়ত অনেকেই পড়িবেন না।

মাঝারি সাইজের কাঁচা বাঁশ আনুন। একগাঁটের নীচে হইতে অন্য গাঁটের নীচে পর্য্যন্ত লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটুন। গা বেশ ধারাল দা দিয়া ছুলিয়া লউন। মুখের খোলা দিক্ বেশ চৌরস করিয়া লইবেন এবং তলার দিক্ যদি বেশী মোটা থাকে ত খানিক চাঁচিয়া লউন। এইবার রান্নাঘরের ধোঁয়া যাহাতে লাগে, এমন জায়গায় ১৫।২০ দিন রাখিয়া দিন। ভুলেও রৌদ্রে দিবেন না; কারণ, ফাটিয়া যাইবে। পাট সরু করিয়া লইয়া কাই মাখাইয়া খোলের গায়ে জড়ান; বেশ ভাল করিয়া আধ ইঞ্চি মাপের মাটী পিটিতে হইবে। তার পর যত বড় খোল, তার তিন ভাগ বারুদ খুব জোরে পিটতে হইবে। কারণ, সমস্ত নির্ভর করিতেছে বারুদ পিটার উপর। এইবার দিন দুইতিন সামান্য রৌদ্রে শুকাইয়া লউন। কাঠ-ফাটা রৌদ্রে দিবেন না; কারণ, ইনি বড় মেজাজী লোক—দয়া করিয়া উঠিবেন না। কতকগুলি সরু ধরণের কাটী লইয়া বসুন। নানান্ সাইজের তুরপুন্ লইয়া কাটীর কাছে রাখুন। একটী হাউই এবং একটী কাটী লউন। কাটী দিয়া ভিতরের যে গোলাকার যন্ত্র তাহার মাপ লইয়া কাটীতে চিহ্ন দিন; অর্থাৎ কাটীর মাপ লইয়া সেইখানে মচ্‌কাইয়া রাখুন। এইবার তুরপুন লইয়া কাটীর যে মাপ আছে, ঠিক্ তার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত যে তুরপুন হয় সেইটী পর্য্যন্ত লইবেন। তার পর তলায় ছেঁদা করুন ঠিক মাঝখান করিয়া—অবশ্য যে পর্য্যন্ত না অল্প পরিমাণের বারুদ বাহিরে আসে। আবার একটী কাটী লইয়া ভিতরকার গোলকের মাপ লউন। তাহা তিন ভাগ করুন। সেই তিন ভাগের একভাগের মাপের একটি তুরপুন লউন। এইবার বারুদ কাটিতে থাকুন। যতদূর পর্য্যন্ত বারুদ বসিয়াছে, সেইখানে হাতের বুড়া আঙ্গুলের মাথায় একটীপ্ বারুদ রাখিয়া তার তলা পর্য্যন্ত কাটিবেন। এখন এইটী ঠিকমত কাটা হইল কি না তাহা দেখিবার একটী বেশ সহজ উপায় আছে। তাহা এই:—বুড়া আঙ্গুলের টিপ্‌টী নিশ্চয় বাহিরের দিকে থাকিবে। এইবার যে তুরপুনটী দিয়া কাটিতেছেন, তাহা বাহির করিয়া যতদূর পর্য্যন্ত কাটিলে আঙ্গুলের তলায় বসাইলেই বেশ সহজ হইয়া যাইবে। আবার রৌদ্রে শুকাইতে দিন।

ইহাই হইল বেঁশো হাউই। এখন ইহার ভিতর হইতে বাঁশীর আওয়াজ, সাপ, বিদ্যুৎ, রঙ্গিন তারা, বেলুন, ইলেকট্রীক তারা ইত্যাদি নানা রকমারি দেখান যায়। এখন আপনাদের যাহা অভিরুচি তাহাই করিতে পারেন। যদি রঙ্গিন তারা দেখিতে ইচ্ছা হয় ত কতকগুলি রঙ্গিন তারা দিয়া উপরে কাগজ আঁটিয়া একটী পাটকাটীকে balance করিয়া লইয়া পলিতায় আগুন ধরাইলে উপরে মজা দেখা দিবে। সমস্ত রকম হাউইয়ের মধ্যেই গুল, সাপ, বাঁশী, বিদ্যুৎ একই রকমে সাজান হয়। কেবল বেলুনের বেলা অন্যরূপ। বেলুন Silkএর হইলেও ভাল হয়, কারণ কাগজের বেলুন তৈরি করা একটু শক্ত এবং বেলুনের ভারের উপর বাজীর সফলতা নির্ভর করে। বেলুন তৈয়ারি করিয়া রাখুন। শ্রীরামপুরী কাগজের খোলপুনি যে কাগজ তার ৫।৬ ইঞ্চি চওড়া কাগজ লউন। মোটা অর্থাৎ ½ ইঞ্চি মাপের একটী কাটের রুলে ৪।৫ পাক খায়, এইরকম ২ মুখ খোলা খোল করুন। এখন যে রকম বারুদ ইচ্ছা ভিতরে ঠাসুন। একদিকের মুখে দেশী মাখি বারুদ জলে গুলিয়া বেশ করিয়া লাগান; অন্য মুখে ২½ ইঞ্চি চওড়া ন্যাকড়া ৩।৪ ফের কাই দিয়া জুড়িয়া লইয়া বেলুনের খোলনের সুতার সঙ্গে বাঁধুন।

হাউইএর মুখে পাতলা কাগজ মারুন। এইবার মোটা কাগজের একটা ঠোঙ্গার মতন লাগান; রৌদ্রে শুকাইয়া লউন। এইবার বেলুনটার মধ্যে কিছু গমের ভুষি দিয়া আল্‌গা ভাবে পাট করুন—মোটা বাতিটা আগে ঐ ঠোঙ্গার ভিতর বসান। তার পর বেলুনের সুতা গুলি বেশ সংযত ভাবে বেলুন শুদ্ধ একধারে বসাইয়া রাখিয়া একটা গাধার টুপির মতন মাথায় বসাইয়া চোঙ্গা এবং টুপির জোড়ের মুখ সরু কাগজ দিয়া জুড়ুন। বেলুন হাউই বেশ বড় চোঙ্গ দেখে নিতে হয়। এই জন্য দুইটা পাটকাটা না হইলে balance ঠিক্ হয় না। মালা হাউই ঠিক্ একই রকম। তবে তাহাতে দুইটা বেলুন লাগে। পাটের টুয়াইন্ দড়ি ৪।৫ হাত লউন—বেশ পাতলা করিয়া মাটীর কোটীং লাগাইয়া শুকাইয়া লউন। Single বেলুনের মত অত মোটা খোলে বারুদ না ঠাসিয়া লহরের খোলে ঠাসুন। এক মুখে মাখি বারুদ লাগান। অন্য মুখে ন্যাকড়া জুড়ুন। এইবার আধ হাত অন্তর এক-একটী খোল দড়ির সহিত ঐ ন্যাকড়া দিয়া সুতার সাহায্যে বাঁধুন। দুইটী ধার অবশ্য খালি রাখিবেন এবং নানা রকমারি বারুদ মালার জন্য লইবেন। এইবার খোলগুলি এক জায়গায় ঠিক পরের পর (কারণ মালা জড়াইয়া যাইবে) লইয়া দেশী পলিতা দিয়া জড়াইয়া সুতা দিয়া বাঁধিবেন। এইবার দুইটী বেলুন দুধারে বাঁধিয়া যেমন single বেলুন তৈয়ার হয়, সেই রকম করিয়া ছাড়িতে হইবে।

আশা-পথে

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

১

আমি ফিরছিলাম শস্যশ্যামলা-রত্নবিভূষিতা বঙ্গজননীকে ছেড়ে নিজ কর্মস্থানে। সুদীর্ঘ পূজার ছুটীর পর স্বদেশ ছেড়ে যেতে কষ্ট সকলেরই হয়, আমারও হয়েছিল।

সেকেণ্ড ক্লাসে একটা বার্থ রিজার্ভ করা পূর্ব্ব হতেই ছিল। বিদেশ-গমনেচ্ছু যাত্রীর ভিড় ভেদ করে, আমি অতি কষ্টে এসে প্লাটফর্মে পৌঁছলুম। মুটের মাথা থেকে বিছানা-ব্যাগ প্রভৃতি সঙ্গের সাথীগুলিকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে আমি সটান শুয়ে পড়লাম—নিজের বিছানাটা পেতে। তারপর যথাসময়ে নৈশ ঘন-অন্ধকার ভেদ করে পাঞ্জাব মেল ছুটতে আরম্ভ করল; আমি চক্ষু বুজে স্বদেশের কথা,—আরও কত কথা ভাবতে লাগলাম।

গাড়ি যখন বর্দ্ধমানে পৌঁছল, আমি নিদ্রাজড়িত নিমিলিত চক্ষুদুটা উন্মিলিত ক'রে দেখলুম—আমার সহযাত্রীদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তারপর কখন যে নিদ্রাদেবী তাঁর স্নিগ্ধ হস্তে ঘুম পাড়ালেন, তা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

কতক্ষণ পরে জানি না, একটা গগনভেদী ভীষণ শব্দে আমার ঘুম হঠাৎ ভেঙ্গে গেল, তার সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পেলুম যাত্রীদের করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি। ব্যাপারটা আমার বুঝতে দেরী লাগল না, আমি আমার আঘাত-প্রাপ্ত দেহটাকে যথাসম্ভব সত্বর গাড়ি থেকে টেনে বার করে নিয়ে, সেই ঘন তমসাবৃত রজনীতে ভয়-ব্যাকুল নেত্রে চারিদিকে চাইতে চাইতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলুম; কিন্তু অধিকদূর যেতে পারলুম না, ক্লান্ত শরীর শীঘ্রই অবসন্ন হয়ে এলো—মূর্চ্ছিত হয়ে এক অজানা-অপরিচিত মাঠের মাঝখানে পড়লুম।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলুম, চেয়ে দেখি বিছানায় শুয়ে রয়েছি; আর পার্শ্বে আমার সেবায় নিযুক্তা এক পরমা সুন্দরী তরুণী। কি কোমল তার দেহের সৌন্দর্য্য—কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তার মুখখানি। আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তার দিকে চেয়ে রইলুম; মনের ভাব মুখে প্রকাশ করবার মত ক্ষমতা তখনও পাইনি।

শরীরের আঘাতটা বড় অল্প লাগেনি। কতকটা সুস্থ হবার পর উঠবার জন্য চেষ্টা করতেই প্রথমেই বাধা পেলুম—সেই তরুণীটার কাছে। আমায় উঠতে দেখে তরুণী ব্যস্ত হয়ে বলল—এখন উঠবেন না—উঠবার মত শক্তি এখনও আপনার হয় নাই।

আমি লজ্জিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। কি সম্বোধনে তাঁকে আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করব, আমি তাই ভাবতে লাগলাম, এমন সময়ে গৃহমধ্যে আসলেন একজন পুরুষ। তিনি আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে তরুণীকে জিজ্ঞাসা করলেন—উনি কেমন আছেন, সেবা?

বুঝতে পারলুম সেই অপরিচিতার নাম সেবা। এমন করে যে সম্পূর্ণ অপরিচিত, নিরাশ্রয়কে সেবা করতে পারে, তার 'সেবা' নাম সত্যসত্যই সার্থক হয়েছে। সেবা বলল 'জ্ঞান হয়েছে, একটু ভাল।'

পুরুষটা আমায় লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন—'এখন কেমন আছেন?'

আমি জড়িত স্বরে অতি কষ্টে জানালাম 'একটু ভাল', তারপর জিজ্ঞাসু নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে বললাম—'আমায় কোথায় এনেছেন?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এটা আপনার নিজের বাড়ী মনে করে থাকলে সুখী হব',—বলে লোকটা হাস্যবদনে চলে গেলেন। আমি এই লোকটার ব্যবহারে কতকটা বিস্মিত হয়ে তাঁর কথা ভাবতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে একটু বেলা হলে—স্নানাদি সেরে, বাটিতে খানিকটা গরম দুধ এনে, আমায় খাবার জন্যে সেবা অনুরোধ করল।

এইরূপে বিছানায় সমস্ত দিন পড়ে থেকে সেই তরুণীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সেবার গুণে আমি কয়েকদিনের মধ্যেই

কতকটা সুস্থ হয়ে উঠ্লুম। তার এই নিঃস্বার্থ সেবাই আমাকে সে যাত্রা মৃত্যুর হাত থেকে টেনে তুলেছিল। কি দিয়ে যে তার এ মহৎ উপকারের ঋণ পরিশোধ কর্‌ব—আমি কেবল তাই চিন্তা কর্‌তাম।

২

কতকটা সুস্থ হবার পর একদিন সন্ধ্যার অত্যল্প-কাল পূর্ব্বে সেবার পিতা রজনী বাবুকে বল্লুম—"রজনীবাবু, আজই আমি যাব মনে কচ্ছি।"

আমার দিকে ফিরে যেন আশ্চর্য্য হয়ে রজনী বাবু বল্লেন—"আজই!"

"হ্যাঁ, এখন আমি বেশ সুস্থ হয়েছি; আর বিলম্ব করা ঠিক নয়।"

রজনী বাবু বল্লেন—"এ কয়টা দিন আপনার সঙ্গে গল্প করে বেশ আনন্দেই কেটেছিল।"

একটু হাস্‌লুম, তারপর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে বললাম—"আপনাদের এ উপকার আমি জীবনে কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না; যে রকম অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে টেনে এনেছেন, সে ঋণ ইহজীবনে শোধ কর্‌বার নয়।"

বাধা দিয়ে তিনি বল্লেন—"আমায় যতটা প্রশংসা কচ্ছেন, সেটার ন্যায্য অধিকারী আমি নই; দিবানিশি যদি কেউ আপনার সেবা ক'রে থাকে ত, সে আমার স্নেহের কন্যা সেবা।"

রজনী বাবুর নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে সেবার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তার নিকটে আস্‌লুম। একটা শিলাখণ্ডের উপর সেবা বসে ছিল। পিছন হতে আমি মৃদুস্বরে ডাকলাম—"সেবা"।

প্রথম সম্বোধনে সেই চিন্তাকুল রমণী চকিতে লজ্জা-স্নিগ্ধ আরক্ত মুখখানি নিচু করে বল্‌ল—"আমায় ডাক্‌চেন?"

"এখানে একলা ব'সে রয়েছ কেন?"

"এ স্থানটা আমার বড়ই ভাল লাগে—আমি নির্জ্জন স্থান বড় ভালবাসি।"

"কি ভাবছিলে, সেবা?"

"হঠাৎ এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন?"

"এরূপ নির্জ্জনে মানুষ যে নিশ্চিন্তে বসে থাক্‌তে পারে—আমার তা মনে হয় না। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম—কি ভাবছো"।

সেবার গোলাপের ন্যায় লাল আভাযুক্ত গণ্ডদ্বয় লজ্জায় সিন্দুরের মত লাল হয়ে উঠ্‌ল। মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে বল্‌ল—"ভাবছিলাম, আকাশে ঐ যে সব পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে—ওরা কেমন স্বাধীন; মানুষ যদি ও-রকম স্বাধীন হত—!"

"তা হলে কি হত সেবা?"

"যে যার ইচ্ছামত স্বাধীন ভাবে কাজ করত।"

"তুমি যদি স্বাধীন হও, কি কর?"

"কি করি তা জানি না; তবে, আর্ত্তের সেবায় জীবন যদি কখনও উৎসর্গ কর্‌তে পারি, সেদিন হয় ত আমি ঐ ওদেরই মত সুখী হ'তে পারব।"

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোকে সেবার দিকে চেয়ে রইলুম,—আর ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—কি মহৎ হৃদয় এর! ভগবান একে এত সৌন্দর্য্য দিয়েও সমস্ত গুণটুকুও দিতে কৃপণতা করেন নি; কেবল এক জায়গায় একটু অবিচার করেছেন—এ নন্দন-কাননজাত পুষ্প এমন স্থানে এনে—মানব-চক্ষুর অন্তরালে রাখাটাই তাঁর অবিচার বলে মনে হ'ল।

নিৰ্জ্জন প্রদেশে এইরূপ নিভৃতে অধিকক্ষণ আলাপ আমি কর্ত্তব্য মনে করলাম না। আমি বললুম—"সেবা; আজ আমি চলে যাব। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তোমার উপকার আমি জীবনে কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না, যদি কখনও পারি এ উপকার পরিশোধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।" আমার চলে যাবার কথা শুনে তার মুখখানা কেমন ম্লান হয়ে গেল; সে যেন বিস্মিত হয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—"আজই যাবেন!"

আর কিছু বল্‌ল না। আমার তখনকার অবস্থাটা ঠিক কেমন হয়েছিল তা বলে বোঝবার শক্তি আমার নেই।

৩

সেবার কাছ হ'তে কর্ম্মস্থানে চলে আসবার পর—অনেকদিন পর্য্যন্ত তার কথা, তার সেই অনুপম রূপরাশি, আমার হৃদয়ের অনেকখানি স্থান অধিকার করে ছিল। সংসারে এই জিনিষটাকেই আমি খুব বেশী রকম ভয় করে, তা হ'তে দূরে-দূরে থাকতাম। অল্প কয়দিনের পরিচয়ে সে যে আমার হৃদয়ের উপর এতটা আধিপত্য বিস্তার করবে, এ ধারণাটা আমার

মোটেই ছিল না। আমার এই পাষাণ প্রাণ এত সহজে কেমন ক'রে তার সুন্দর ঢল ঢল কোমল দৃষ্টিতে মুগ্ধ করে দিলে, আমি তো কিছুতেই বুঝতে পার্‌লাম না।—

আমার কর্ম্মস্থান সাজাহানপুরে। আমি একজন মুন্‌সেফ্। সেখানকার অধিকাংশ বাঙ্গালী-প্রবাসীর সঙ্গেই আমার আলাপ ছিল এবং সকলেই আমার বাড়িতে আস্‌তেন, কর্ম্মশ্রান্ত জীবনটাকে ছুটো খোসগল্প করে বিশ্রাম দিবার জন্যে। কাজেই বাইরের বড় বৈঠকখানা ঘরটি যে একটা মস্ত বড় খোসগল্পের আড্ডা ছিল, তা আর বল্‌তে হবে না।

ছুটীর পূর্ব্বে যে রকম আমোদ-আহ্লাদে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দিনগুলো কাটিয়ে দিতাম, এবারে ঠিক সেই রকম হাসি মুখে দিন কাটান আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়ে উঠ্‌ল। পূর্ব্বের মত সকলেই আমার বাড়ী আস্‌তেন; কিন্তু আমি নির্জ্জীবের মত একধারে পড়ে থাক্‌তাম। তাদের সঙ্গ আর আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ত না, পছন্দও কর্‌তুম না।

কিন্তু আমার এই ভাবান্তর ব্রজেশের চক্ষু এড়াল না। সে একদিন নির্জ্জনে আমায় সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ল। আমার ইচ্ছা ছিল-না যে, মনের এ দৌর্ব্বল্যটুকু ব্রজেশের কাছে প্রকাশ করি। কিন্তু ব্রজেশ ছাড়্‌ল না; প্রকৃত ব্যাপার সব শুনে সে উচ্চৈঃস্বরে হাস্‌তে হাস্‌তে বললে "বাঃ, full of romance, তুমি কি সেই দেবকণ্ঠ, না তার কঙ্কাল? এ মজার কথা আমি হেম আর তারাকে না বলে থাক্‌তে পারছি না ভাই।"

আমি ব্রজেশের হাতখানা টেনে ধরে লজ্জায় আরক্ত মুখখানা মাটীর দিকে নিচু করে বল্‌লাম—"যদি বলিস্ ত তোর ঈশ্বরের দিব্যি রইল।"

ব্রজেশ বিজ্ঞের মত মাথাটা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বলল— "না ভাই, তুমি যদি তোমার চুল শুদ্ধ মাথাটা খাবার দিব্যিও দাও, আমি সেটা খেতে রাজি আছি, তবু তোমার এ রোগের কথা আমি কখনই গোপন করব না।"

কি বিপদেই পড়্‌লাম!—কাতরতা-পূর্ণ দৃষ্টিতে ব্রজেশের মুখপানে চেয়ে বল্‌লুম "আচ্ছা কি কর্‌লে এ কথা হেম ও তারাকে বলবিনি বল, আমি তাই করব।"

ব্রজেশ তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে কড়িকাঠ সমান এক লাফ দিয়ে চীৎকার করে বল্‌লে "সত্যি বলছিস্? প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ কর্‌লে কিন্তু তার শাস্তি অতি ভীষণ।"

আমি বললাম "আচ্ছা।"

"তবে আজ এই পর্য্যন্তই থাক্, আফিসের বেলা হল, কাল রবিবার আছে, এর ব্যবস্থা হবে।" বলে ব্রজেশ চলে গেল।

কোর্ট থেকে বাড়ী ফিরে মনটা যেন কেমন এক-রকম হয়ে গেল। ইজি-চেয়ারটার উপর চক্ষু বুজে খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে উঠ্‌লুম। চাকরটাকে ডেকে বললুম "দেখ্, আজ আমি একজায়গায় যাব, বাড়ী থাকব না। কাল সন্ধ্যার সময় আস্‌ব। ব্রজেশ আজ কি কাল যদি আসে, বলিস্ রবিবার অনেক রাত্রে আস্‌ব বলে গেছি। এই চাবিগুলো নে, সমস্ত ঘরে ভাল করে চাবি লাগিয়ে সাবধানে থাকিস্।"

তার পর কাপড়-জামা পরে, একখানা গাড়ি ভাড়া করে বরাবর ষ্টেসনে এসে উপস্থিত হ'লুম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডাউন এক্‌স্‌প্রেস আস্‌ল। আমিও উঠে পড়্‌লুম। সমস্ত রাত্রি ট্রেনে কাট্‌ল। পরদিন সকাল-বেলা গাড়ি এসে একটা ছোট ষ্টেসনে থাম্‌ল! ষ্টেসনের কুলিগুলো ষ্টেসনের নাম করে চেঁচাতে লাগল। আমি চকিতে গাড়ীর ভিতর হ'তে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লুম, এই ত সেই পরিচিত ষ্টেসন। তাড়াতাড়ি গাড়ি হতে নেমে পড়ে, টিকিট দিয়ে, দ্রুতপদে ষ্টেসনের বাহিরে এসে উপস্থিত হলুম ও যথাসম্ভব সত্বর সেবাদের গৃহাভিমুখে চল্‌লুম।

হায় অদৃষ্ট! এত পরিশ্রম, সমস্তই পণ্ড হ'ল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে দেখ্‌লুম তাদের সে বাড়ীখানির সামান্য চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নাই। হতাশ হয়ে এদিক-ওদিক তাদের অনুসন্ধান কর্‌তে-কর্‌তে সেখানকার এক অধিবাসীর নিকট জান্‌লাম, আজ তিন মাস হল সেবার পিতামাতার কাল হয়েছে। সেবাও অর্থাভাবে খেতে না পেয়ে প্রায় এক মাস হল এ দেশ ত্যাগ করে গেছে। কোথায় যে গেছে, তার সংবাদ কেউ দিতে পার্‌ল না। ব্যথা-চিন্তা-ক্লিষ্ট চিত্তে সেই রাত্রেই গৃহে ফির্‌লাম।

৪

"দেবকণ্ঠ! কাল কোথায় গেছলে ভাই? সেই তরুণীর সন্ধানে ঘরের বার হয়েছিলে না কি? দর্শন

মিলন ?" কৌতুক-মিশ্রিত স্বরে ব্রজেশ এই কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করল।

সমস্ত রাত্রি ট্রেণে এসে, আফিসে আর সে-দিন যেতেই পারিনি। দুশ্চিন্তার হাত হতে নিজকে বাঁচাবার জন্য নিদ্রাদেবীর শরণাগত হলুম, কিন্তু বিফল প্রয়াস। তন্দ্রা আসল, সুনিদ্রা হল না ; সমস্ত দুপুরটী এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে উঠে বসেছি, এমন সময় ব্রজেশ এসে জেরা আরম্ভ করল।

মনটা আমার তেমন ভাল ছিল না ; তাই তার এ রহস্য আদৌ আমার ভাল লাগল না ; আমি উদ্দেশ্য-বিহীন নেত্রে তার দিকে চেয়ে রইলুম—কিছুই বলতে পারলাম না।

ব্রজেশ পুনরায় বল্ল "কি বাবা, মুখের কথাটী কি ঠাকুরবাড়ী দিয়ে এসেছ না কি ? না সেই দেবী-মূর্ত্তির ধ্যানে এখনও বিভোর রয়েছ ? বলি, কথা কও।"

ইচ্ছা হল প্রাণের সমস্ত গুপ্ত বেদনা ব্রজেশকে বলি,—মনের ময়লা কতকটা দূর করি ;—কিন্তু সাহস হল না তাকে বলতে ;—তার সব জিনিষের চেয়ে আমি তার ঠাট্টাকে অত্যন্ত ভয় করতাম। তার প্রত্যেক কথাটী তীক্ষ্ণ বাণের মত এসে আমার হৃদয়ের এক নিভৃত স্থানে আঘাত করত। জড়িত স্বরে বললাম "ভাই, আমার শরীরটা তেমন ভাল নয়। আজ আমায় মাপ কর।"

"বলি সেই তরুণীটী কেমন ? নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী! নয় ত তোমার মত কলির ভীষ্মের মন কি সামান্য ব্যাপারে এতটা টলতে পারে।"

আমি তেমনই নির্ব্বাক্ হয়ে বসে রইলুম, কোন কথা বল্লাম না। ব্রজেশ খানিক বসে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠে গেল।

আইনের কূটনীতি আমার মোটেই আর ভাল লাগ্ছিল না। পূর্ব্ব হ'তে আমি কয়েক মাসের ছুটীর দরখাস্ত ক'রে-ছিলুম। ছুটী মঞ্জুর হয়ে এল। আমিও কর্ম্ম হতে অবসর নিয়ে দেশ-ভ্রমণে বেরুলুম।

* * * * *

* * * *

কয়েক মাস নানা দেশ বেড়ালুম। অশ্রান্ত পরিশ্রমে শরীরটাও ভেঙ্গে পড়ল। 'সেবা'র কত সন্ধান করলাম। কিন্তু তার সন্ধান পেলুম না। সেই অসুস্থ শরীর নিয়েও যথারীতি পূর্ব্ববৎ বেড়াতে লাগলুম। পথে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একদিন ভীষণ জ্বর ;—সেই প্রবল জ্বরের প্রতাপ সহ্য করা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলো। অজ্ঞান হয়ে রাস্তার উপরেই পড়ে গেলাম। তারপর কেমন করে যে আশ্রয় পেলাম, তা জানি না।

যখন জ্ঞান হল, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখলাম—যার সন্ধানে শরীরপাত করে এতদিন দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সেই—সেই সেবা আমার সেবায় নিযুক্তা। ঠিক বুঝতে পারলাম না—এ কি স্বপ্ন দেখ্ছি, না কোন মায়াবিনী সেইরূপ ধরে ছল করছে। আমি আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে ডাকলাম—"সেবা !"

সেবা তেমনই কোমল স্বরে বল্ল—"কেন দেব বাবু ?"

"তুমি কি সত্যই সে সেবা, না ছল করে আমার অদৃষ্টের সঙ্গে পরিহাস করবার জন্য তার রূপ ধরে এসেছ !"

"না দেববাবু, আমি সত্যই সেই ! আমি মায়াবিনী নই।"

আনন্দাপ্লুত নয়নে তার কোমল করযুগল ধরে—গদগদ স্বরে বললাম—"তোমার জন্যে আমি কত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি ; কোথাও তোমায় পাই নি। এমনই করে লুকিয়ে থাকতে হয় সেবা ?"

"আপনি একটু আস্তে আস্তে কথা বলুন ; আপনার শরীর দুর্ব্বল।"

"তোমাদের বাড়ী গিয়ে শুনলুম—তুমি দেশত্যাগী হয়েছ, তোমার বাপ-মা দুজনেই মারা গেছেন, একটা স্মৃতিচিহ্ন বুকে ধরে সুদূর অতীতের স্মরণীয় দিনের ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিলে তোমাদের সে ভগ্ন-কুটীর ; তা ছাড়া আর কিছুই সেখানে পেলুম না।"

"হাঁ, বাবা-মা দুজনেই যখন মারা গেলেন, তারপরেও কয়েক মাস আমি সেখানেই ছিলাম। আমি নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোক, সেখানে একা থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল ; কাজেই বাধ্য হয়ে সে স্থান আমার ত্যাগ করতে হল।"

"আমায় একটা খবর দাওনি কেন সেবা—আমি কি তোমার কোন উপকার করতে পারতুম না।"

"দুনিয়ায় মা বাবা ছাড়া আপনার জন' বলতে আপনি

ব্যতীত আর কেউ আমার আছে কিনা জানি না ; যে দিন আপনি কতকটা সুস্থ হয়ে আমাদের বাড়ী থেকে চলে এলেন, কি বলব—থাক পুরাতন কথা তুলে আর দুঃখ বাড়াব না। আমার বিবাহ দেবার জন্যে মা বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। তাঁরই আগ্রহে বাবা আয়োজন করতে বাধ্য হলেন। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তের প্রথম দর্শনে আপনার সৌম্য মূর্ত্তি আমার হৃদয়ের সমস্ত স্থানটুকু অধিকার করে বসেছিল—তা জানতে পারিনি। যখন বুঝ্লাম যে আর কোন প্রকারে গোপন রাখা চলে না, বরং তাতে নারী-ধর্ম্মের উপর আঘাত পড়ে, তখন সব সঙ্কোচ মন থেকে দূর করে মাকে বললাম—"মা, আমি দেববাবুকেই আমার স্বামী বলে ভেবে নিয়েছি ;—অন্যস্থানে বিবাহে আমার স্ত্রী ধর্ম্মে আঘাত পড়বে।" মা বললেন—"আর্ত্তের সেবার জন্যেই তোমায় নিযুক্ত করা হয়েছিল সেবা।"

আমি বল্লম—"মা ! হিন্দু স্ত্রীলোকের স্বামী মনোনীত করবার অধিকার সমাজ কি তাদের দেন নি। তারা কি এতই হীন—তাদের কি সাধ আহ্লাদ একেবারেই নাই।"

মা বললেন—"সমাজ একেবারে এ অধিকারটা দেন নাই সে কথা কেমন ক'রে বলব বাছা। সাবিত্রীও তাঁর স্বামী নিজেই পছন্দ করেছিলেন। তবে যেটা অসম্ভব, সেটার উপর লোভ থাকা অন্যায়। তুমি যদি তাঁকে সত্যই ভালবেসে থাক, অন্যস্থানে তোমার বিবাহ হ'তে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে আর্ত্তের সেবায় নিজের জীবনটা উৎসর্গ কর। আশীর্ব্বাদ করি, দেববাবুর সেবায় যেমন আনন্দ পেয়েছিলে ঠিক তেমনটাই তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে বিপন্নের সেবাতে পাবে সেবা !"

আমি দেখলুম—কোন্ সুদূর অপরিচিত দেশে আপনি থাকেন তা জানি না। আর আমাদের মিলন হওয়া সম্ভব নয়। বুঝি বা বিধাতার ইচ্ছা তা নয়। অনেক পর মার সেই আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে, তাঁর মৃত্যুর পর আমি সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করে এই লোকসেবা-ধর্ম্মে নিজেকে নিযুক্ত করেছি—দেববাবু।—"

"সেবা ! সেবা। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও তোমার কথা শুনে যে কি অপার আনন্দ পাচ্ছি, তা ভগবানই জানেন। একদিন ভেবেছিলাম, তোমায় বিবাহ করলে আমি সর্ব্বসুখে সুখী হব। কিন্তু ভাগ্য-লিপি অন্যরূপ। আমিও আর তুচ্ছ পার্থিব সুখ চাই না সেবা। আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে। তোমার মত আর্ত্তের সেবা করবার শক্তি আমায় দাও। আমি ধন-ঐশ্বর্য্য কিছুই চাই না। তোমার কাছ থেকে—তোমারই মত পরের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই সুখী হব বলে মনে করি।"

"না দেববাবু,—তা হতে পারে না। আপনার প্রবল জ্বরের অবস্থায়ও যখন বিকারের ঘোরে আপনি আমার নাম ধরে—সেবা, সেবা বলে চীৎকার করে উঠতেন—তখন আপনার মুখে আমার নাম শুনে, আমি আমার কর্ত্তব্য ভুলে যেতাম। যেন কত যুগযুগান্তরের বিরহীর প্রবল মিলন-আকাঙ্ক্ষা এসে আমায় পার্থিবের সুখ-সম্পদে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইত। যা নিত্য, যা সত্য—যা পরমানন্দের, তা ভুলিয়ে দিত। মন বড় দুর্ব্বল, কর্ম্ম বড় কঠিন—আপনি এ জীবনের মত আমার কাছ থেকে সরে যান। প্রলোভনের হাত থেকে অব্যাহতি দিন।"

সেবা আর আমার কাছে দাঁড়াল না। কম্পিত-পদে, রুদ্ধ আবেগে, কম্পিত দেহে সে ঘর হতে চলে গেল। তারপর এতদিনের মধ্যে তার আর কোন সন্ধানই পাই নাই। জীবনের এ-পারে বুঝি আর দেখা হয় না।

উদ্ভট-সাগর

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট-সাগর বি, এ

(৪)

চন্দ্র বিরহীর বিষম যন্ত্রণা-দায়ক। সময়ে সময়ে বিরহী জন চন্দ্র-দেবের অমৃতময় কিরণকেও প্রচণ্ড রৌদ্রবৎ মনে করেন। সীতা-বিরহিত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে এই বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে :—

ভ্রাতঃ প্রাপয় মামনাতপভুবং প্রাপ্তোদয়োঽয়ং রবি-
র্নাথাঽসৌ রজনীকরস্থিতরথা চাস্মিন্ কলঙ্কঃ কথম্।
বংশেঽস্মিন মদকীর্ত্তিতঃ কুমুদিনী কস্মাদিয়ং কাশতে
ন হ্যেবং নলিনীপ্রিয়াঙ্কণলাঙ্কাস্তং করোতি স্ফুটম্॥

রামচন্দ্র—সূর্য্যোদয় হইয়াছে, শুন ওরে ভাই!
আমারে লইয়া যাও, রৌদ্র যথা নাই।
লক্ষ্মণ ইহা চন্দ্র;—কি আশ্চর্য্য সূর্য্য যদি হবে,
কলঙ্কের চিহ্ন কেন দেখা যায় তবে?
রামচন্দ্র—সূর্য্যোতে কলঙ্ক রয় কলঙ্কে আমার,
লক্ষ্মণ— তাই হ'লো,—কুমুদিনী কেন হাসে আর?
রামচন্দ্র—যে হাসি হাসিয়া থাকে কুমুদিনী ধনী,
এ হাসি সে হাসি নয়,—হেন মনে গণি।
পদ্মিনীর প্রাণ-ধন দেব দিবাকর,
কলঙ্কের রেখা রয় তাহার উপর।
'ইহা দেখি' কুমুদিনী আহ্লাদে মাতিয়া
হেসে হেসে চারিদিকে পড়িছে ঢলিয়া!

(৫)

মনুষ্য হইতে ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় জীব, জীবন-সংগ্রামে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

ভেকো ধাবতি তঞ্চ ধাবতি ফণী সর্পং শিখী ধাবতি
ব্যাধো ধাবতি কেকিনং বিধিবশাদ্ ব্যাঘ্রোঽপি তং ধাবতি।
স্বস্বাহারবিহারসাধনবিধৌ সর্ব্বে জনা ব্যাকুলাঃ
কালস্তিষ্ঠতি পৃষ্ঠতঃ কচধরঃ কেনাপি নো দৃশ্যতে॥

ভেকের পশ্চাদ্-ভাগে ছুটিতেছে ফণী,
ময়ূর ফণীর পিছে ছুটিছে তখনি।
ময়ূরের পিছে ব্যাধ ছুটিছে সত্বর,
ব্যাধের পিছনে ব্যাঘ্র ছুটে নিরন্তর।
সাধিবারে নিজ নিজ আহার বিহার
এ সংসারে সকলেই ব্যস্ত অনিবার।
পশ্চাতে র'য়েছে যম কেশ-গুচ্ছ ধরি',
হায় রে কেহই ইহা না দেখে বিচারি'!

(৬)

কিরূপ ভৃত্য, গৃহে থাকিলে গৃহীর অশেষ দুর্গতি হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

আহারে বড়বানলশ্চ শয়নে যঃ কুম্ভকর্ণায়তে
সন্দেহে বধিরঃ পলায়নবিধৌ সিংহঃ শৃগালো রণে।
অন্ধো বস্তুনিরীক্ষণেঽথ গমনে খঞ্জঃ পটুঃ ক্রন্দনে
ভাগ্যেনৈব হি লভ্যতে পুনরসৌ সর্ব্বোত্তমঃ সেবকঃ॥

বাড়বাগ্নি জ্ব'লে উঠে আহার-সময়ে,
দিবানিশি নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ হ'য়ে;
কথাটা শুনিতে হ'লে কাণে লাগে তালা,
সিংহের বিক্রম ধরে পলাবার বেলা;
শৃগালের মত হটে হাঙ্গাম বাঁধিলে,
চক্ষের মাথাটা খায় দেখিতে হইলে;
যেতে হ'লে নাহি চলে চরণ দুখানি,
কাঁদিবার কালে কিন্তু ফাটায় মেদিনী;
এ সংসারে মহাপুণ্য যার নিরন্তর,
তারি ভাগ্যে মিলে হেন সোণার চাকর!

মাতৃস্তন্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ছেলেকে মাই ছাড়াবার জন্যে মায়েরা অনেকেই ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েন। এর কারণ আর কিছুই নয়—কেবল মাই-দুধের কি গুণ, আর ছোট ছেলেদের পক্ষে যে সেটা কতদূর উপকারী, সেইটে এখনকার মায়েরা অধিকাংশই ভাল জানেন না ব'লে!—আবার অনেক হতভাগা শিশু অকালে মাই ছাড়তে বাধ্য হয়—তাদের মাতৃস্তন্যের অভাবে! জননীর স্তনদুগ্ধের অভাব হওয়ার কারণ দেখা যায় প্রধানতঃ দু'টি—প্রথম, ছেলের মা'র মানসিক অবস্থার বিপর্যায়; দ্বিতীয়, তাঁর শারীরিক অসুস্থতা!

মানসিক বিপর্যায়ের কারণ হচ্ছে—গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক মায়ের মনে এই ভাবটা বদ্ধমূল হয় যে, আমি হয় ত আমার ছেলেকে মাই দিতে পারবো না;—আমার এ স্তনযুগে হয় ত তেমন পর্যাপ্ত দুগ্ধের সঞ্চার হ'বে না—আমার স্তন্য পান ক'রে বোধ হয় ছেলের পেট ভ'র্‌বে না! এই সব উদ্ভট ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গেই নবীনা জননীর তরুণ স্তনকোষে পীযূষ-উৎসের গোপন আবির্ভাবের পূর্ব্বেই অমনি তাঁর সহজ কল্পনায় জেগে উঠে সেই ছোট-খাটো ঢেউ-খেলানো কাঁচের নৌকোর মত আকৃতি-বিশিষ্ট, আগু-পিছু স্বচ্ছ রবারের চুষি আর টুপি আঁটা, ছেলে-মজানো 'মাইগোষ' বোতোলগুলো! শিশুকে এই বোতলে ভ'রে দুধ খাওয়ানোর প্রথাটা ছেলের মাতৃস্তন্যের অভাব পূরণের জন্যে যতটা না হোক, অল্পবয়স্কা জননীদের সখ মেটাবার জন্যেই আজ কাল এত বেশী প্রচলিত হ'য়েছে! ওটা যেন উপস্থিত এক রকম ফ্যাসান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!

শারীরিক বিপর্যায়ের কারণ হচ্ছে—এ দেশের অশিক্ষিতা বা অল্প শিক্ষিতা মা-জননীরা কেউ স্বাস্থ্য-তত্ত্বের 'ক' বর্ণটি পর্য্যন্ত জানেন না,—কখনও তা জান্‌বার চেষ্টাও করেন না। আবার ডাক্তারে যদি কিছু সদুপদেশ বাৎলে দিয়ে যায়, সেটাও মোটেই মেনে চলেন না। কাজে-কাজেই আজকালকার সন্তানসম্ভবা তরুণী মায়েদের আমরা আহারে-বিহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, শ্রমে ও আরামে যথেচ্ছাচরণ করতে দেখি! ফলে, তাঁদের সন্তানরা শীঘ্রই মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত হয়! এ ছাড়া, প্রসূতির অপরিণত বয়েস, গর্ভিনীদের কটিদেশে কাপড়ের কসি এঁটে পরার দোষ, বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘরখানি সুতিকাগারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া,—এবং মাসাধিক কাল উক্ত কক্ষে আবর্জ্জনার মত নোংরা অবস্থায় বস-বাসের ফলে স্বাস্থ্য দূষিত হওয়া—আর গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা রোগটাকে অগ্রাহ্য করা—প্রভৃতি কয়েকটা হামেশা-কৃত অন্যায়ও তাঁদের শারীরিক বিপর্য্যয় সংঘটন হেতুর পর্য্যায়ভুক্ত!

কচি ছেলেদের যাতে 'দুধের শিশি' না ধরা'তে হয়, তার উপায় ক'রতে হোলে, শুধু ছেলেটিকেই কড়া নজরে আর বিশেষ যত্নে রাখ্‌লে চ'ল্‌বে না,—ছেলের মার শরীর ও মনের দিকেও বিলক্ষণ নজর রাখা চাই; আর যত্নও তার পক্ষে সমানই দরকার,—এতটুকু কম-বেশি কর্‌লে হ'বে না।

ছেলে মানুষ করা কাজটা নিতান্ত সোজা নয়; তাই এ দেশের ছেলেমানুষ মায়ের দলও এ কাজটিতে বিশেষ অপটু! তাঁরা অনেকেই, ছেলেকে কি ক'রে মাই দিতে হয়, তাই জানেন না! এই কাজটির তাগ্‌বাগ ও খুটিনাটি-গুলো যে মায়েরই একটু-আধটু জানা থাকে, তাঁর ছেলেই আরামে মায়ের 'মেনু' খেয়ে পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট হোয়ে উঠ্‌তে পারে! প্রথমেই দেখ্‌তে হবে যে, মাই দেবার সময় খোকার ক্ষুদে নাকটি যেন জননীর স্তনভারে না চাপা পড়ে যায়। আগে খোকাকে কোলের কাছ-বরাবর টেনে নিয়ে, তার মাথার নীচে একটি নরম বালিশ দিয়ে তাকে আরামে শোয়াতে হ'বে; তার পর, তাকে স্তন্যপান করাবার সময় জননীর বক্ষবাস একেবারে ঢিলে করে দিতে হবে। গায়ে জামা-জোড়া কি সেমিজ থাকলে, তার সব'কটা বোতাম খুলে ফেলা দরকার। আলস্য করে দু'একটা বোতাম খুলে কোনও প্রকারে সেই ফাঁকে স্তনাগ্র এগিয়ে এনে, ছেলের মুখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঠেলে দিলে চল্‌বে না;—সমস্ত বক্ষটি অনাবৃত রাখতে হ'বে—যাতে শিশু সহজেই স্তনবৃন্তটি আয়ত্ত ক'রতে পারে, এবং আকর্ষণেই দুধ পায়। মাই দেবার সময় এমন কোরে ছেলের মাথাটি সাবধানে ধরে থাক্‌তে হ'বে, যা'তে তার মাই-টানা খুব সহজ ও সন্তোষজনক হয়। বেশ নিশ্চিন্ত ও নির্ঝঞ্ঝাট হোয়ে ছেলেকে মাই দেওয়া উচিত। মাই দিতে-দিতে সাতবার ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে অন্য কাজে ছুটে উঠে গেলে চল্‌বে না; কিম্বা ছেলেকে ট্যাঁকে করে তাকে স্তন্য পান করাতে-করাতে সেই অবস্থায় সংসারের অন্য পাঁচ কাজে ঘুরে বেড়ালেও অত্যন্ত অন্যায় করা হবে; কারণ স্তন্যদানের সময় চলাফেরা ক'রলে শরীর সঞ্চালনের সঙ্গে-সঙ্গে স্তনদ্বয় কম্পিত হয় ও শিশুর পানাকুল অধরপুট থেকে স্তনবৃন্তটি ক্রমাগত খুলে-খুলে পড়ে। ক্ষুধিত শিশু এই ব্যাপারে বিরক্ত হ'য়ে কেঁদে উঠে; এবং অধীর ব্যগ্রতার সঙ্গে জননীর স্তনাগ্রচূড়া তার ক্ষুদ্র অধরপুটে বাগিয়ে ধরবার জন্যে বৃথাই লালায়িত হ'য়ে উঠে! এ ব্যাপারগুলোকে আমাদের মাঠাকরুণেরা কিন্তু একেবারে গ্রাহ্যই করেন না;—তাঁদের বোধ হয় ধারণা যে এটুকুতে আর এমন কি ক্ষতি হবে। অথচ স্তনদুগ্ধের প্রাচুর্য্য ও দীর্ঘকালস্থিতি যে এই সব খুটিনাটির উপর অনেকখানি নির্ভর করে, এটা তাঁরা কিছুতেই মনে রাখ্‌তে পারেন না!

জননীর মানসিক অবস্থা শিশুপালনের অনুকূল ও উপযোগী ক'রে তুল্‌তে হ'লে, মা'র মনে তাঁর নিজের উপর একটা প্রবল আস্থা থাকা চাই;—অন্ততঃ তিনি যেন প্রকৃতির এই মহান্ সত্যটি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক ছেলের মা'ই ইচ্ছে ক'রলে তাঁর ছেলেকে, যতদিন না সে ভাত খেতে শেখে ততদিন, শুধু নিজের স্তন্য দিয়েই প্রতিপালন ক'রতে পারেন। জীব-সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে যিনি এমন অজ্ঞাত উপায়ে জীবের আহারের ব্যবস্থা করেন—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অপার করুণাভিসিঞ্চিত সৃষ্টি-রহস্য-লীলার উপর যদি অচল বিশ্বাস থাকে—ও সেই সঙ্গে সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও আমি আমার ছেলেকে প্রাণপণ যত্নে মানুষ করে তুলবই তুলবো—এমনিই একটা সুদৃঢ় পণ—একটা বলবতী আকাঙ্ক্ষা যে মায়ের প্রাণে জেগে উঠে—কোনও বাধাই তাঁর ভাগ্যবান্ সন্তানকে স্নেহসিক্ত মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। আমার গর্ভজাত শিশুকে আমিই স্তন্যদানে লালন ক'রতে পার্ব্বো, এ বিশ্বাস সকল জননীর মনেই বদ্ধমূল থাকা চাই; এ বিষয়ে একে-বারে কোনও সন্দেহ, কোনও দ্বিধা যেন অন্তরে কোথাও না স্থান পায়। কোনও রকম বিপরীত আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তা যেন মনের কোণেও কোনও দিন ঘেঁষতে না পারে। ভগবদ্‌ভক্তি, মানসিক শান্তি ও আত্মশক্তির উপর অটুট বিশ্বাসই নারীর মাতৃকা-শক্তির মূল ভিত্তি।

জননীর শারীরিক অবস্থা সন্তান-পালনে সমর্থ ও উপযুক্ত রাখ্‌তে হ'লে, গর্ভাবস্থার প্রারম্ভ থেকেই মা'কে প্রস্তুত হ'তে হবে! প্রথম কাজ হ'চ্ছে তাঁর প্রতিদিন স্তন-বৃন্ত দু'টি ধোরে কিছুক্ষণ আস্তে-আস্তে চুঁচে দেওয়া, আর তেল-হাত বুলিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, সকাল-সন্ধ্যে দু'টি বেলা ঠাণ্ডাজলে স্তনযুগল ধুয়ে ফেলা। তার পর তাঁর কাজ হচ্ছে, কিছু অধিক পরিমাণে পানীয় দ্রব্য সেবন করা,—যেমন পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল, সর্ব্বৎ, কি লেমনেড।

তবে ঠাণ্ডা জলই সবচেয়ে ভালো আর নিরাপদ। অন্তঃসত্ত্বা যুবতীদের জামাজোড়া একেবারে না পরাই উচিত। শীতের সময় খুব ঢিলে-ঢালা গরম কাপড় কিছু গায়ে দিয়ে কাটাবার চেষ্টা ক'রতে হবে। আঁটসাঁট বডি, জ্যাকেট, ব্লাউস, কি পেটীকোট গর্ভিনী নারীর পক্ষে যথাসাধ্য বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। এই সময় উপুড় হোয়ে বুক চেপে শোয়া তাঁদের একেবারেই নিষেধ। এই সব ছোটখাটো বিধি-নিষেধগুলো প্রতি অক্ষরে প্রতিদিন প্রতিপালন ক'রে চ'ল্লে, কেবল যে শরীরের দিক দিয়েই সুফল পাওয়া যাবে, তা নয়: মনের দিক দিয়েও এর একটা খুব বেশি রকম সার্থকতা আছে। যে মা দীর্ঘ দশমাস ধ'রে দিনের পর দিন এমন সাবধানে সযত্নে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের কল্যাণ-কামনায় তদ্গত-চিত্ত হ'য়ে ব্রতচারিণী তাপসীর মত এমন নিষ্ঠা ও সংযম অভ্যাস করেন, যোগিজনের মত কেবল ঐ চিত্তবৃত্তির একাগ্রতাই তাঁর সেই ঐকান্তিক সাধনাকে অনিবার্য্য সিদ্ধি ও সফলতা এনে দেয়। সেই স্নেহশীলা সুশীলা জননীর সমস্ত দেহমনে সন্তান পালনের একটা অপূর্ব্ব শক্তি স্ফুরিত হ'য়ে উঠে; এবং তনয়ানন্দ-সঞ্জাত অফুরন্ত পীযূষধারায় তাঁর যুগল বক্ষ-পুট পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠে!

(২)

প্রসবের অব্যবহিত পরেই প্রসূতির খানিকটা গাঢ় সুনিদ্রার প্রয়োজন। তার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আট-দশ ঘণ্টা পরে, শিশুকে একবার অল্পক্ষণের জন্য মাই ধরানো উচিত। প্রথম দু'টো দিন সদ্যোজাত শিশুকে ছ'ঘণ্টা অন্তর স্তন্যপান করালেই চল্‌বে; কিন্তু তার পর থেকে ছেলের স্বাস্থ্য ও শরীরের ওজন বুঝে, তিন ঘণ্টা কি চার ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দিতে হবে। প্রত্যেকবারে অন্ততঃ বিশ মিনিট ক'রে ছেলেকে মাই টান্‌তে দেওয়া চাই। তার মধ্যে উভয় স্তনই এটা-ওটা ক'রে ঘুরিয়ে সমানভাবে তাকে টানানো দরকার। তবেই উভয় স্তনতটে সম-পীযূষধারার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ ও কায়েম মোতায়েম হওয়া সম্ভব। কোন-কোনও পরিবারে ব্যবস্থা আছে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তিন দিন পর্য্যন্ত তাকে কোনও ম'তে মাই ধরানো হবে না—! এটা কিন্তু তাঁদের একটা মারাত্মক ভুল!

যতদিন না ছেলে মাই ছেড়ে ভাত খেতে শেখে, ততদিন ছেলেকে মাই দেবার সময় প্রত্যেকবারে মায়েদের এক গ্লাস ক'রে ঠাণ্ডা জল পান করা দরকার। এ ছাড়া, স্তন্য-দায়িনীদের এই দু'টো কথা বিশেষ করে শেখা আর মনে করে রাখা দরকার যে, শিশুর স্তন-শোষণ-জনিত শারীরিক উত্তেজনাই স্তন-মুখে পীযূষ ক্ষরণের একমাত্র কারণ। আর সেই জন্যই শরীরের অন্যান্য অবয়বের মত স্তন-যুগলেরও নিয়মিত বিশ্রাম আবশ্যক।

সুতরাং ছেলেকে মাই দেবার নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারণ ক'রে রাখা উচিত—যাতে সেই সময়টুকু ছাড়া আর অন্য সময় পাকস্থলীরই মত স্তনদ্বয় উপযুক্ত বিশ্রাম উপভোগ করতে পারে। রাত্রে শিশুকে স্তন্যদান করা একেবারেই বন্ধ রাখ্‌তে হ'বে।

সূতিকাগার পরিত্যাগ ক'র্‌বার পর প্রসূতিরা যখন তাঁদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা আবার সুরু ক'রতে আরম্ভ করেন, সেই সময়টাই তাঁদের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। প্রায়ই দেখা যায় যে, যাদেরই কোলে স্তন্যপায়ী শিশু বিদ্যমান, তাঁরাই বেশীর ভাগ নাকি-সুরে কাঁদেন—"আর পারি নে বাপ্!" "জ্বালাতন!" "মরণ হোলেই বাঁচি!—" ইত্যাদি—। তাঁদের এই আক্ষেপোক্তিগুলোর কারণ আর কিছুই নয়—একদিকে তাঁদের কচি ছেলের ধকল সাম্‌লাতে হয়,—অন্য দিকে আবার সংসারের সহস্র বোঝাও নিত্য-নিয়মিত ভাবে বইতে হয়। কাজে-কাজেই, তাঁরা কায়-মনে ক্লান্তি অনুভব করেন, আর তারই ফলে তাঁদের মুখে অবসাদের আর্ত্তনাদ স্বভাবতঃই শোনা যায়! কিন্তু এ রকম শরীর ও মনের অবস্থা প্রসূতির পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। যদি কোনও মা হাসি-মুখে, সন্তুষ্ট-চিত্তে, কোনও রকম অভাবের অভিযোগ উত্থাপন না করে, সংসারের কর্ত্তব্যের সঙ্গে তার সন্তান পালনের গুরুতর দায়িত্বটাও বহন ক'রতে না পারেন, তাহ'লে গৃহকর্ম্মও যেমন তাঁর কাছে ভার বোধ হবে, শিশুর তত্ত্বাবধানও তাঁর কাছে তেমনিই কষ্টদায়ক মনে হবে! দেহ-মনের এই অবসন্নতার ফলেই মেজাজ সর্ব্বদা ব্যাজার ও রুক্ষ হোয়ে উঠে। আর তারই পরিণাম হ'চ্ছে, গুণে ও পরিমাণে স্তন-দুগ্ধের সত্বর হ্রাস প্রাপ্তি! যেখানে জননীদের এই অবস্থা, সেখানে পর্য্যাপ্ত স্তন-দুগ্ধের অভাবে তাঁদের শিশু সন্তানের স্বাস্থ্যও, দিন-দিন শশিকলার মত বৃদ্ধি না পেয়ে, বরং ক্ষয় হ'তেই থাকে!

বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও স্বাস্থ্য-বিকৃতির জন্য জাতির জননীরা বহু পরিমাণে অপরাধিনী। গৃহকর্ম্ম ও সন্তান পালনে বিরক্ত জননীদের যথাসময়ে সদুপদেশ আর সহানুভূতিপূর্ণ উৎসাহ দিয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হ'তে সাহায্য করা উচিত। যখনি দেহ ও মনের অবসাদ বোধ হবে, তখনই প্রত্যেক জননীর সাবধান হওয়া দরকার। সন্তানের কল্যাণ-কামনায়, আর দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে, তাঁদের সে সময়ে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি একনিষ্ঠ ভাবে পালন করা কর্ত্তব্য—

১। তিন চার ঘণ্টা অন্তর শিশুকে প্রত্যেক স্তনে দশ মিনিট করে দুটিতে বিশ মিনিট কাল স্তন্য দিতে হবে।

২। খোলা আলো বাতাসে নিয়মিত বেড়িয়ে স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা ক'রতে হবে।

৩। অনুত্তেজক ও নির্দ্দোষ পানীয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করতে হবে।

৪। সকাল-সন্ধ্যে নিয়মিতভাবে ঠাণ্ডা জলে উভয় স্তনকে স্নান করাতে হবে।

৫। আমার স্তন-দুগ্ধের পরিমাণ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হবে—মনে সদাসর্ব্বদা এই অটুট সঙ্কল্প আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

শেষোক্ত বিশ্বাসটুকুই সিদ্ধি ও সফলতার মূলাধার। ওই বিশ্বাসটুকু না থাকলে সকলই বৃথা হবে। জননীর সেই অবস্থায় শিশুর পিতাকেও সন্তানের মুখ চেয়ে ও জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কল্যাণের নিমিত্ত, অসহায়া জননীকে বিধিমতে সাহায্য করা উচিত। তাঁকে প্রতিদিন উৎসাহ দেওয়া, সাহস দেওয়া ও আশ্বাস দেওয়া দরকার। গৃহ-কর্ম্মের দুর্ব্বহ বোঝার ভার স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কতকটা নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে, জননীর পরিশ্রম লাঘব করা এবং নিজের সুখ, স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতা যথাসম্ভব প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত হ'য়ে পিতার সহৃদয়তায় পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যেখানে পিতার এরূপ সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব, সে স্থলে মাতাকে একাই কৃতকার্য্য হবার জন্যে বদ্ধপরিকর হ'তে হবে।

যখনই কোনও মা-জননীর মুখে এই আশঙ্কার খেদোক্তি শোনা যাবে যে, "আমার এ ছাই শুখনো মাই টেনে বাছার বোধ হয় মোটেই পেট ভ'রে না!' তখনই বুঝতে হ'বে যে, তাঁর স্তন-দুগ্ধের আসন্নকাল উপস্থিত হ'তে আর বিলম্ব নেই! নরনারী-নির্ব্বিশেষে নিজের শক্তি-সামর্থ্য বা যোগ্যতার উপর এই সর্ব্বনাশী অনাস্থাই সকল অনিষ্টের মূল—তা সে ব্যক্তিগত জীবনেই হোক্, বা জাতীয় জীবনেই হোক! এ ছাড়া নিম্নলিখিত কারণ-গুলোও স্তন-দুগ্ধের স্বল্পতার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী—

১। কাপড়ের কসি এঁটে পরা।

২। আঁটসাঁট জামা গায়ে দেওয়া।

৩। বুক চেপে উপুড় হো'য়ে শোয়ার অভ্যাস।

৪। যখন-তখন ছেলেকে মাই দেওয়া।

৫। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে স্তন্যদান।

৬। অধিকক্ষণ ধ'রে ছেলেকে মাই টান্তে দেওয়া।

৭। রাতে উঠে ছেলেকে মাই দেওয়া।

৮। ছেলের মুখে মাই দিয়ে ঘুমোনো।

৯। অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস।

১০। গৃহকর্ম্মে অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি।

১১। বিবাহিত জীবনে অসন্তোষ ও অশান্তিজনিত মনের অবসাদ।

১২। গৃহ-কোণে চিরবন্দিনী অবস্থায় যাপন!

১৩। মুক্ত আলো বাতাসের স্বাস্থ্যকর স্পর্শলাভে বঞ্চিত থাকা।

১৪। অতিরিক্ত আহার।

১৫। অর্দ্ধ-ভোজন।

১৬। অনাহার।

১৭। 'এনিমীয়া' বা শরীরে শোণিতাংশের অল্পতা।

১৮। সুস্বাদু ও নির্দ্দোষ পানীয় দ্রব্য সেবনের অভাব।

১৯। কড়া 'চা' পান করা।

২০। কোষ্ঠবদ্ধতা ও তজ্জন্য যা-তা জোলাপ নেওয়া।

২১। বিপরীত গুণবিশিষ্ট ভৈষজ্যে প্রস্তুত কোনও পেটেণ্ট ঔষধ খাওয়া।

২২। অসংযম। (যে সৌভাগ্যবতী নারী সন্তান-সম্ভবা, তাকে স্বামী, সহবাস-পরিত্যাগ ক'রে ব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণীর মত অবস্থান করতে হবে।)

যখনই বুঝতে পারা যাবে যে, এই রকমের কোনও না কোনও অনিয়মের জন্যেই জননীর স্তনদুগ্ধের ক্ষতি হ'য়েছে,

তৎক্ষণাৎ তার প্রতীকার করা উচিত। সঙ্গে-সঙ্গে অমনি ছেলেকে ঘড়ী ধ'রে নিয়মিত মাই দেবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। মাই দেবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রস্থতিকে শীতল জল পান ক'রতে হবে; দু'টিবেলা প্রত্যহ স্তনদ্বয়কে স্নান করাতে হবে; এবং ছেলের মা অন্ততঃ যাতে একবেলাও খানিকটা গরম দুধ খেতে পান, তার উপায় করা দরকার। এক সপ্তাহ এইভাবে চলবার পরও যদি দেখা যায় যে, কেবলমাত্র মাতৃস্তন্য পান ক'রে শিশুর পেট ভ'রছে না, তা হ'লে ঐ কড়ি মিনিট মাই দেবার পর, ছেলেকে দু'এক ঝিনুক গরুর দুধ কিম্বা গাধা বা ছাগলের দুধ দেওয়া উচিত। কিন্তু দেবার আগে, দুধটুকু এমন কায়দা ক'রে জল মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে নিতে হবে, যাতে সে দুধ যতটা সম্ভব মাই-দুধের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পারে। ছেলেদের কোনও মতেই শিশি ধরানো উচিত নয়,— বাটী-ঝিনুকেই দুধ খাওয়ানো ভালো। তবে ঝিনুকে ক'রে দুধ খাওয়াবার সময়, প্রত্যেকবার দুধের বাটীতে আঙুল ডোবানো স্বভাবটা একেবারে ভুলতে হবে। এ যাঁরা না পারবেন, তাঁরা বরং একটা চায়ের চাম্‌চে ক'রে দুধ তুলে, চাম্‌চের হাতোলটা ধরে ছেলের মুখে ঢেলে দেওয়া অভ্যেস করুন। এক ঝিনুক দুধের ভিতর বুড়ো আঙুলটা বুড়িয়ে ছেলের মুখে গুঁজে দেওয়া খুবই অন্যায়। ওটা ছেলের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। ছেলেকে দুধ খাওয়াবার সময় প্রত্যেকবার একখানি তোয়ালেতে ছেলের কাণ দুটাকে বেশ ক'রে ঢেকে গলায় জড়িয়ে দেওয়া উচিত। কারণ, প্রায়ই দেখা যায়, ছেলের গাল বেয়ে দুধ গড়িয়ে এসে তার কাণে ঢোকে ব'লেই তার কাণ কট্‌কট্ ক'রে, কাণে পুঁজ হয়, 'কাণ-চটা' হয় ইত্যাদি। দু'এক চাম্‌চে দুধ দেবার পরও ছেলে যদি আরও খাবার জন্য কাঁদে, তা'হলে আর দু'এক ঝিনুকও তাকে দিতে হবে; কিন্তু পরের সপ্তাহ থেকেই আধ ঝিনুক হিসেবে ক্রমশঃ বাইরের দুধ দেওয়াটা কমিয়ে আনা দরকার, যদি বেশ বুঝতে পারা যায় যে, জননীর স্তনদুগ্ধের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার পর যেমন ধীরে-ধীরে স্তনদুগ্ধ বাড়তে থাকবে, অমনি বাইরের দুধ খাওয়ানোও আস্তে-আস্তে কমিয়ে এনে, পরে একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।

কোনও প্রস্থতির স্তনদুগ্ধ অসময়ে একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেলে, কিম্বা নিতান্ত কম হ'য়ে গেলে, তিনি যদি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাটি কিছু দিন ধরে মেনে চলেন, তাহ'লে অভাগিনীর স্তন্যহীন বক্ষে নারীর পরম গৌরবের বস্তু মাতৃ-স্তন্যের পূর্ণ মাত্রায় পুনরাবির্ভাব হ'তে পারে।

নিয়ম।

ক। ভোর ছটায় উঠে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল কিম্বা গরম জল বা পাত্‌লা চা পান ক'রবে।

খ। ছ'টা বেজে দশ মিনিট থেকে সাড়ে ছ'টা পর্য্যন্ত ছেলেকে সমানভাবে উভয় স্তনেই স্তন্যপান করাবে।

গ। সাতটা থেকে স' সাতটার মধ্যে প্রাতঃস্নান সেরে ফেল্‌তে হবে। তার পর পূজো-আহ্নিক সেরে কিছু ফলমূল জলযোগ ক'রে, আটটা পর্য্যন্ত খোলা আলো-বাতাসে খুব খানিকটা বেড়িয়ে আস্‌তে হবে।

ঘ। আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ছেলেকে স্নান করিয়ে দিতে হবে। ছেলেদের রোজ নাওয়ানো অভ্যাস করা ভালো।

ঙ। নটার সময় ছেলেকে আবার ঠিক পূর্ব্বের মতই বিশ মিনিট স্তন্য পান করাবে।

চ। দশটার সময় গরম জল আর ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে স্তন-যুগলের স্নান ও পরিচর্য্যা করবে।

ছ। স' দশটা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম ক'রবে। এই সময় ছেলের কাঁথা শেলাই, পশম বোনা, বই পড়া যা'হোক্ করা চলবে।

জ। এগারোটার সময় এক বাটী গরম দুধ কিম্বা এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাবে।

ঝ। এগারোটা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত শারীরিক ব্যায়াম ক'র্‌তে হবে; কিম্বা এমন কোনও পরিশ্রমজনক সংসারের কাজ ক'রতে হবে, যাতে হাতে-পায়ে বেশ জোর লাগে এবং খানিকটা দম হয়!—যেমন কূয়ো থেকে জল তোলা, বাট্‌না বাটা, ঢেঁকি কোটা, জাঁতা পেশা ইত্যাদি।

ঞ। বারোটার সময় ছেলেকে আবার পূর্ব্ববৎ স্তন্য দান ক'রবে।

ট। সাড়ে বারোটার মধ্যেই মধ্যাহ্ন ভোজন ক'রবে। ভোজনের পর বেলা তিনটে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্রাম। কিন্তু পা দু'টি উপর দিকে উঁচু ক'রে তুলে শুয়ে থাক্‌তে হবে।

ঠ। তিনটের সময় ছেলেকে আবার পূর্ব্বের মত স্তন্য দান।

ড। সাড়ে তিনটের সময় সর্ব্বৎ বা চা পান,—পরে ছেলেকে নিয়ে খেলা কিম্বা বেড়ানো।

ঢ। পাঁচটার সময় ছেলেকে ঘুম পাড়ানো।

ণ। ছটার সময় ছেলেকে পূর্ব্ববৎ স্তন্য দান, পরে খানিকটা সান্ধ্য-ভ্রমণ।

ত। সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে সান্ধ্য-ভোজ শেষ করা।

থ। আটটার সময় স্তনদ্বয়ের স্নান ও পরিচর্যা।

দ। আটটা থেকে দশটা পর্য্যন্ত পুস্তকাদি পাঠে সময়-ক্ষেপণ।

ধ। দশটার সময় ছেলেকে পূর্ব্ববৎ স্তন্যদান।

ন। সাড়ে দশটার মধ্যে একগ্ল্যাস গরম কিম্বা ঠাণ্ডা জল পান ক'রে শুয়ে প'ড়তে হবে। রাত্রে ছেলেকে আর মোটে মাই দেবে না।

বাড়ীতে একটা ছেলে ওজোন ক'র্বার কাঁটাযন্ত্র থাকলে খুব ভালো হয়। প্রতিবার ছেলেকে মাই দেবার আগে ও পরে ওজোন ক'রে দেখা দরকার যে, কতটা স্তনদুগ্ধ শিশু আকর্ষণ ক'রে নিতে পেরেছে; এবং ক্রমশঃ তার পরিমাণ বাড়ছে কি না? যদি দেখা যায় যে, শিশু যে পরিমাণ স্তন্য পেয়েছে, সেটা তার বয়সের অনুপাতে প্রয়োজনের চেয়ে কম হ'য়েছে, তাহ'লে স্তন্য দানের পর তাকে অল্পমাত্রায় গোদুগ্ধ সেবন করানো উচিত।

কোন্ বয়সের ছেলের কতটা পরিমাণ স্তন-দুগ্ধের প্রয়োজন, তার একটা মোটামুটি হিসাব এখানে দেওয়া গেল—

১। আড়াই মাসের ছেলে ওজনে যদি পাঁচ সের হয়, তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ চব্বিশ আউন্স দুধ তার পেটে পড়া চাই।

২। ছ'মাসের ছেলে ওজনে যদি সাড়ে সাত সের হয়, তাহ'লে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ আউন্স দুধ তার পাওয়া দরকার। এই হিসেবের অনুপাতে ছেলেদের মাতৃস্তন্যের হার প্রয়োজনমত কম-বেশি ক'রে নিতে হবে। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় যে, এই বয়সের ছেলের যে পরিমাণ স্তনদুগ্ধ প্রয়োজন, সে তার চেয়ে অনেক কম পেয়েও বেশ পরিপুষ্ট হ'চ্ছে। তার কারণ আর কিছুই নয়—সেই বিশেষ শিশুটির সৌভাগ্যক্রমে তার মাতৃস্তন্যে অসাধারণ তেজস্কর গুণ বিদ্যমান আছে। আবার কোন-কোনও ছেলের সম্বন্ধে ঠিক এর বিপরীত ব্যাপার ঘটতেও দেখা গেছে—প্রয়োজনের অতিরিক্তি আহার পেয়েও সে পুষ্ট হ'তে পারছে না। সে স্থলে মাতৃদুগ্ধের দুর্ব্বলতাই প্রধান কারণ বুঝতে হবে; এবং যাতে সেই শিশুর জননীর স্তন-দুগ্ধের গুণ ও তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়—পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তার ব্যবস্থা করা উচিত।

স্তনদুগ্ধের রক্ষণ, ধারণ, উন্নতি ও পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি এবং লুপ্ত স্তনদুগ্ধের পুনরুদ্ধারের জন্য যে সকল ব্যবস্থা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হ'য়েছে, এ সমস্তই বিখ্যাত নারী-চিকিৎসা বিশারদ ডাক্তার টুবী কিংয়ের (Dr. Truby King) প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা; এবং বিলাতে অনেক স্থলে জননীরা এই ব্যবস্থা মেনে চলে আশাতিরিক্ত ফল পেয়েছেন!

অবশ্য এই সব নিয়ম অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালন ক'রে চ'লতে পারলে, প্রকৃতির সুফল পাবার আশা আছে; কিন্তু এ কথাটাও ভুললে চলবে না যে, মা'র মনে অটুট বিশ্বাস থাকা চাই যে—'তিনি এই উপায় অবলম্বন ক'রে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হ'বেন।' তা ছাড়া, সন্তানবতী জননীদের মনে এ কথাটাও সদা-সর্ব্বদা জাগরুক থাকা দরকার যে, তিনি এই কষ্টটুকু সহ্য করে শুধু তাঁর নিজের সন্তানের নয়, সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ জীবন রক্ষা করছেন। এই উচ্চ আদর্শের দিকটা সুস্পষ্ট করে বাঙ্গালী, তথা ভারতীয় জননীদের চখের সামনে ধ'রতে হবে। বক্ষের পীযুষ-ধারায় শিশুকে মানুষ ক'রে তোলবার যে আশ্চর্য্য ঐশ্বরিক ক্ষমতা তাঁরা পেয়েছেন, সেটা থেকে বঞ্চিত হওয়ার মত দুর্ভাগ্য নারীর জীবনে আর কিছুই নেই। জননীর এই শক্তির উপর তাঁর সন্তানেরই সম্পূর্ণ দাবী-দাওয়া—নাবালক শিশুর গচ্ছিত সম্পত্তির মত মাতৃস্তন্যকে সর্ব্বদা সযত্নে সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা ক'রতে হবে! এই যে জগৎ-জোড়া মানুষ জাত, এদের প্রথম জীবনের বাঁচবার যা প্রধান প্রয়োজনীয় পদার্থ, সে যে আমাদেরই এই বক্ষ-সঞ্চিত স্নেহ-রস-ধারার মধ্যে বর্ত্তমান, এই চৈতন্য, এই আনন্দের অনুভূতি মায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলে, সন্তান-পালনে তাঁকে আর কোনও দিনই অকৃতকার্য্য হ'তে হ'বে না।

রোগ-শয্যায়

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ

আজকে হেথায় তোমায় ছেড়ে রোগের মাঝে প'ড়ে'
সেই কথাটা বুঝছি বেশী আরো ;—
বিদায়-দিনে চোখের জলে বলেছিলে হেসে ;—
'দেখবো, তুমি ভুলতে কেমন পারো !'
জ্বরের শীতে, মাথার ব্যথায় একলা হেথায় প'ড়ে
আছি যেন বিজন কারাবাসে,—
'কেমন আছেন'' 'তাই ত মশাই' বলেই যে যায় ফিরে,
দয়া ক'রে দেখতে যারা আসে।
নিজেই উঠে ঢালছি ওষুধ, যাচ্ছে কতক প'ড়ে ;
কাঁপা-হাতে শিশি ধ'রে কাঁদি।
ছট্‌ফটিয়ে চোখের জলে ভিজিয়ে ফেলি বালিশ,
পড়ে আছি পায়ে কাপড় বাঁধি।
কাঁদছি কত, বকছি কত, হ'য়ে পাগল প্রায়,
খোঁজই বা কে নিচ্ছে আমার তরে !
দরজা টা জানালা, আর দেওয়ালগুলো শুধু
দুঃখে বুঝি আছে চুপটী ক'রে।
ঘুমটা এলে স্বপন ঘোরে দেখবো তোমায় ভাবি,
ঘুমও যে গো যাচ্ছে ফাঁকি দিয়ে,—
রোগীর দেহে ঘেঁষবে না সে ; কষ্টে আমার তরে
সইবে কেন সুখের শরীর নিয়ে।
প্রতিক্ষণে, ভাবছি মনে তোমার কচিমুখে
তত কথা শিখিয়ে দিল কেবা !
ছেলেমানুষ আজও তুমি, পুতুল খেলার মাঝে
কেমন করে শিখলে এমন সেবা !
কপালে হাত বুলিয়ে দিতে চাঁপার কলি দিয়ে
মাথাটা মোর কোলে তোমার তুলে,
রোগের নিঠুর যন্ত্রণাটা কোমল পরশ পেয়ে,
সবই আমি যেতাম প্রিয়ে ভুলে।
'উহু উহু 'মরে গেলাম ! বাবারে কি করি !!'
এমনি ক'রে কাঁদলে তোমার কাছে,
বলতে তুমি কচিমুখে নলক নেড়ে হেসে
'পুরুষমানুষ, কাঁদতে বুঝি আছে !'
ভুলিয়ে মোরে রাখতে তুমি, বল্‌তে কত কথা ;—
করেছিলে কত রকম 'বত্ত'—
পাতিয়েছিলে 'বেয়ান' কখন পুতুল বিয়ে দিয়ে,
পাঠিয়েছিলে কেমন ধারা 'তত্ত্ব'।—
ক'জন ছিল খেলার সাথী, হয়েছে কার বিয়ে,
কে-ই বা গেছে শ্বশুর-বাড়ী চ'লে ;
কাহার বরের বয়স কত, রংটা কেমন কার,
আপন মনে যেতে তুমি ব'লে।
তারই মাঝে ব'ললে পরে 'বল দেখি সত্যি
তোমার নিজের বরটা কেমন-তর,'
মুখ ফিরিয়ে বলতে রেগে 'ক'ব না আর কথা
এমন ধারা যদি তুমি কর।'
ওষুধ খেতে বলতাম যদি 'এমন তিতো ওষুধ,
কেমন ক'রে খাব বারে-বারে।'
বলতে তুমি ছোট্ট ছেলে ভুলায় যেমন ক'রে,
'নইলে বুঝি অসুখ কারো সারে ?'
ঘুম এলেও ছাড়তে নাকো পাছু'খানি মোর
বলতে শুধু 'ঘুমাও আগে তুমি।'
হঠাৎ জেগে, খুঁজতে গিয়ে, দেখতাম পায়ের কাছে
ঘুমিয়ে গেছ, শয্যা তোমার ভূমি।
রেখেছিলে কেমন ক'রে লুকিয়ে লাজে সবে
'হরির লুটের' পয়সা দু'টা তুলে ;
সে সব কথা ভাবতে গেলে চক্ষে আসে জল,
কেমন ক'রে যাই গো তাহা ভুলে !
তোমার অভাব জাগছে বেশী তোমার স্মৃতি নিয়ে,
চোখের জলে যাচ্ছে যে বুক ভেসে,
'ঢাকাই-সাড়ীর' আধ ঘোমটায় তেমনি ক'রে হেসে
আদর কর আজকে কাছে এসে।

[illegible]

[illegible]

Photo by Photo Temple (Copyright Reserved)

অমূল তরু

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৩)

বিনোদ অন্দরে প্রবেশ করিলে, সুবোধ মনোযোগ দিয়া বৈঠকখানা ঘরের আসবাবপত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। একটি টেবিল, তিনখানি চেয়ার, দুইটি তক্তপোষ পাশাপাশি করিয়া রাখা; তাহার উপর ছিটের চাদর পাতা; এবং টেবিলের উপর মাথার কাঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ পর্য্যন্ত পৃথিবীর অর্দ্ধেক জিনিষ পুঞ্জীকৃত। অনতি-বিলম্বে সেই বিচিত্র রহস্যপূর্ণ টেবিলখানি অবসর-পীড়িত সুবোধের নিকট নবাবিষ্কৃত রাজ্যের ন্যায় চিত্তা-কর্ষক হইয়া উঠিল। সুবোধ ধীরে-ধীরে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। একখানি অর্দ্ধছিন্ন বি, কে, পালের পঞ্জিকা, একটি দুই বৎসরের পুরাতন টাইম-টেবল, হিসাবের খাতা, বাজারের ফর্দ্দ, জুতার মাপ, অবশেষে একখানি মলাট দেওয়া "স্বদেশ"; মলাটের উপর পরিষ্কার অক্ষরে লেখা শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী। সুবোধ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেই পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরের প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার মনে পড়িল, বিনোদের মুখে একদিন শুনিয়াছিল যে, সুনীতি নামে বিনোদের একটি অবিবাহিত শ্যালিকা আছে, এবং সে শিক্ষিতা ও সুন্দরী। সুলিখিত হস্তাক্ষর-গুলির প্রতি চাহিয়া-চাহিয়া সুবোধের হৃদয়-পটে আপনা-আপনি লেখিকার একখানি চিত্র অঙ্কিত হইয়া আসিতেছিল; একটি সুন্দরী, কিশোরী মূর্ত্তি, সরক্ত গৌরবর্ণ; মুখে সলজ্জ হাস্য, চক্ষে উজ্জ্বল দীপ্তি, গণ্ডে বালার্কের আভা এবং ক্ষীণ ঋজু দেহ ব্যাপিয়া একটি সহজ সুমিষ্ট সঙ্কোচ। তাহার পর সে ধীরে-ধীরে বহিখানির পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। বহিখানির প্রথমার্দ্ধ পঠিত হইয়াছে; তাহা সূচিত হইতেছিল পাঠিকা কর্ত্তৃক প্রতি পৃষ্ঠার পার্শ্বে ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত মন্তব্যের দ্বারা। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল বলিয়া অস্পষ্ট আলোকে ভাল পড়া যাইতেছিল না। সুবোধ বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়া লইয়া মনোযোগ সহকারে মন্তব্যগুলি একে-একে পড়িতে লাগিল। তাহার পর সহসা এক মুহূর্ত্তে যখন সে মন্তব্য অতিক্রম করিয়া মূল প্রবন্ধে নিবিষ্ট হইয়া পড়িল, তখন আর তাহার মনে রহিল না যে, সে বিনোদের শ্বশুরালয়ে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছে এবং বিনোদের আসিতে ক্রমশঃই বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে।

তাহার চমক ভাঙ্গিল পদশব্দে। ফিরিয়া দেখিল, বিনোদ স্মিত মুখে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে; এবং তাহার পশ্চাতে একটি সুন্দরী কিশোরী সকুণ্ঠ ভঙ্গীতে দ্বিধালস পদে অনুসরণ করিতেছে।

বিনোদ নিকটে আসিয়া হাস্যমুখে কহিল, "তোমাকে অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রেখেছি বলে ক্ষমা চাচ্ছি সুবোধ। তুমি আমার সঙ্গে আসায় শ্বশুরবাড়ীর সকলেই বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন; কিন্তু উপস্থিত এ বাড়ীতে পুরুষের একান্ত অভাব; তাই এতক্ষণ তোমার অভ্যর্থনায় কেউ আস্‌তে পারেন নি। কিন্তু তুমি অভ্যাগত, তার ওপর জামাইয়ের বন্ধু; সেই জন্যে অনেক লজ্জা এবং সঙ্কোচ কাটিয়ে ইনি—আমার ছোট শ্যালী তোমার অভ্যর্থনায় এসেছেন। এঁর সীমন্তে নিষেধের রক্ত-বিন্দু এখনও পড়ে নি; তাই ইনি আস্‌তে পেরেছেন। নইলে এঁরও আসার উপায় থাকত না।"

বিনোদের কথা শেষ হইলে, সুবোধ ধড়মড় করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং বালিকাবেশধারী যোগেশের নিকট হইতে একটি সকুণ্ঠ নমস্কার লাভ করিয়া, প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া বিনোদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি বিসদৃশ ভাবে একটা প্রতি-নমস্কার করিয়া বিনোদকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এঁকে কেন কষ্ট দিয়ে—না, না, ভারি অন্যায় বিনোদ—এঁকে কেন—"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "এঁকে কেন, তার কারণ এখনি ত বললাম। ইনি ছাড়া আর যারা আছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ আস্‌তে কখনই রাজি হতেন না।"

সুবোধ রক্তবর্ণ হইয়া কহিল, "ছি, ছি, আমি কি তাই বলছি? আমি বলছি, ইনি না এলে কোন ক্ষতি ছিল না।"

বিনোদ আবার সহাস্যে বলিল, "ইনি যদি এতই সামান্য যে, ইনি না এলে কোনও ক্ষতি হয় না, তা হলে এঁর হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, এবং এঁকে উপদেশ দিচ্ছি যে আর বেশী বিলম্ব না করে—"

সুবোধ বিনোদকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি কি তাই বলছি? আমি বলছি যে, এঁর কষ্ট করে আসবার কোন দরকার ছিল না।"

বিনোদ কহিল, "শুনে আশ্বস্ত হও যে, অনায়াসেই ইনি এসেছেন; যেহেতু ইনি বাতে পঙ্গু নন যে, ভিতরবাড়ী থেকে বার-বাড়ীতে আস্‌তে কষ্ট করতে হবে।"

এবার যোগেশও মৃদু হাস্য করিল; এবং দ্বারান্তরালে কোন অসতর্ক কণ্ঠ হইতে মৃদু হাস্যধ্বনি শুনা গেল।

বিনোদ একবার বক্রকটাক্ষে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "সুবোধ, আমাকে দু-মিনিটের জন্য ক্ষমা কর ভাই, এখনি আসছি।" বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

এতক্ষণ বিনোদের জন্য যোগেশকে কোনও কথা কহিবার প্রয়োজন হয় নাই;—একাকী হওয়ায় অগত্যা তাহাকে কথা কহিতে হইল; বলিল, "সুবোধবাবু, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

সুবোধ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আপনি বসুন!"

অভ্যাগতকে দাঁড় করাইয়া নিজে প্রথমে বসা ভদ্রোচিত হইবে না বলিয়া যোগেশের মনে হইল। তাই সে হাসিয়া কহিল, "আপনি আগে বসুন, তার পর আমি বসব।"

বিনোদের অনুপস্থিতি ও যোগেশের সহিত কথাবার্ত্তার ফলে সুবোধ নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "নামে আপনি সুনীতি হয়ে এ রকম নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করতে কেন আমাকে আদেশ করছেন? আপনি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আমি কি বস্‌তে পারি? আপনি বসুন, তার পর আমি বসছি।"

সুবোধের কথা শুনিয়া চিন্তিত মনে যোগেশ একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। সমস্ত অভিসন্ধি ও চক্রান্তের মধ্যে যেমন একটা না একটা গলদ থাকিয়াই যায়, আজিকার চক্রান্তের মধ্যেও সেইরূপ অন্ততঃ একটা ছিল। যোগেশের কেশহীন পুরুষমস্তকে সুদীর্ঘ বেণী সম্বদ্ধ করিতে যখন সকলে ব্যস্ত ছিল, তখন তাহার পুরুষ নামের পরিবর্ত্তে একটা স্ত্রী-নামও যে স্থির করিতে হইবে, সে কথা কাহারও মনে হয় নাই। সুবোধের মুখে তাহার দিদির নাম শুনিয়া সে ঠিক করিতে পারিল না যে, তাহার সুনীতি নাম সে স্বীকার করিবে, কি অস্বীকার করিবে। এ কথাও তাহার মনে হইল যে, হয় ত বিনোদ সুবোধের নিকট সুনীতি নামেই তাহার পরিচয় দিয়াছে। তাই সে কোনও প্রকার কবুল না করিয়া, পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কহিল, "আমার নাম যে সুনীতি, তা আপনি কেমন করে জানলেন?"

সুবোধ যোগেশকে সুনীতি বলিয়া সম্বোধন করায়, অন্তরালে সুনীতি ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনাত্মীয় পুরুষমানুষের সহিত রঙ্গ-কৌতুকে তাহার নামটা জড়িত হয়, ইহা তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না; তাই সুবোধ কি বলে, শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

সুবোধ সহাস্যমুখে কহিল, "সে বিষয়ে আপনি যদি প্রশ্ন তোলেন, তা'হলে আমি তার একাধিক প্রমাণ দিতে পারি। প্রথমতঃ, আমি আপনাকে এমনিই জানি যে, আপনার নাম সুনীতি। দ্বিতীয়তঃ, একটা লিখিত প্রমাণ দিচ্ছি—সেটা বোধহয় যথেষ্টরও বেশী হবে।" বলিয়া 'স্বদেশ' পুস্তকখানা যোগেশের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "এটা কেবল মাত্র আপনার নাম নয়, আপনার হাতের লেখাও বটে।"

এই দ্বিবিধ প্রমাণের সম্মুখে যোগেশ একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। বিনোদ যদি সুনীতি নামে তাহার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে বলিবার আর কোনও পথ নাই। অথচ দ্বিতীয় প্রমাণটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারা যাইত, যদি না সুবোধ বলিত যে তাহার সুনীতি নাম সে জানে। গৃহে দুইটি বালিকার নাম সুনীতি আছে, ইহা বলিবার মতও নয়, বিশ্বাসযোগ্যও নয়। কাজেই অনাপত্তির দ্বারা যোগেশকে শুধু যে তাহার সুনীতি নাম স্বীকার করিতে হইল তাহাই নহে, 'স্বদেশ' পুস্তক-খানিতে তাহারই হস্তাক্ষর লিখিত, তাহাও স্বীকার করিতে হইল।

যোগেশের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া, সুবোধ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আপনার নাম নিয়ে আলোচনা করায়

আপনি কি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমার অন্যায় হয়েছে—আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।"

যোগেশ তাড়াতাড়ি তাহার বিব্রত ভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া, হাসিয়া কহিল, "না, না, অসন্তুষ্ট হব কেন? আমি ভাবছিলাম, আমার নাম আপনি কি করে জান্‌লেন।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিনোদ কক্ষে প্রবেশ করিল; এবং যোগেশের কথার শেষাংশ শ্রবণ করিয়া সুবোধের প্রতি চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এই দুই মিনিটের মধ্যে নামও জেনে নিয়েছ না কি?"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "আগেই নাম বুঝে নিয়েছিলাম, এ দু'মিনিটে সেটা নিঃসংশয়ে জেনে নিয়েছি।"

সুবোধ কি নাম বুঝিয়াছিল, এবং কি নাম জানিয়া লইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য বিনোদ উৎসুক হইয়া উঠিল। কারণ, পরামর্শ করিয়া যোগেশের কোন নামই রাখা হয় নাই। সহজ ভাবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা চলে না;—তাই একটু ভাবিয়া সে সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি নাম তুমি বুঝেছিলে?"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "ঠিক নামই বুঝেছিলাম—সুনীতি।"

বিনোদ একবার বিস্মিত নেত্রে যোগেশের দিকে চাহিল। তাহার পর কহিল, "আর কি করে জান্‌লে যে তোমার আন্দাজ ভুল হয় নি?"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "আমার আন্দাজ যে ঠিক হয়েছিল, তা ইনি অস্বীকার করতে পার্‌লেন না—অস্বীকার কর্‌বার উপায়ও ছিল না। কারণ, আমি প্রমাণ স্বরূপ একটা দলিল ওঁর সাম্‌নে দাখিল করেছিলাম।"

সমধিক বিস্ময়ে বিনোদ প্রশ্ন করিল, "কি দলিল?"

'স্বদেশ' বহিখানি পুনরায় বিনোদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া, তাহার পৃষ্ঠায় সুনীতির নাম দেখাইয়া, সুবোধ কহিল, "এই দলিলখানি শুধু নাম নয়—ওঁর হাতের লেখার সঙ্গে পর্য্যন্ত আমাকে পরিচিত করে দিয়েছে।"

শুনিয়া বিনোদ স্মিত মুখে একবার যোগেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; এবং তাহার কুণ্ঠিত করুণ মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, নাম সম্বন্ধে যাহা কিছু স্বীকার হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এখন প্রতিনিবৃত্ত হইতে গেলে সুবোধের মনে স্বভাবতঃ একটা সন্দেহ আসিতে পারে।

যোগেশকে লক্ষ্য করিয়া সুবোধ কহিল, "এই বইখানি এতক্ষণ আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আপনার কাছে আমার একটু ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌বার আছে। পাতায়-পাতায় আপনি যে নোটগুলি লিখেছেন, আপনার সম্মতি না নিয়েই আমি সবগুলি পড়ে ফেলেছি। কিন্তু, আমার অপরাধ এই জন্যে লঘু বিবেচনা করা উচিত যে, নোটগুলি এমন চমৎকার করে লেখা হয়েছে যে, একবার আরম্ভ কর্‌লে শেষ না করে আর উপায় নেই!"

নোটের কথায় যোগেশ প্রমাদ গণিল! প্রথমতঃ বইখানিতে কি যে নোট লেখা ছিল, তাহা সে কিছুমাত্র জানিত না। দ্বিতীয়তঃ, যাহাই লেখা থাকুক না কেন, তাহা যে তাহার বিদ্যাবুদ্ধির অতিরিক্ত, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ ছিল না। অথচ বইখানির অধিকার-স্বত্ব স্বীকার করার পর, নোট সম্বন্ধে যদি কোন আলোচনা উঠে, তখন তাহাতে যোগ দিতে না পারিলে, অতিশয় বিসদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইবে।

যোগেশের দুস্থ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বিনোদ কহিল, "নোটগুলি যদি তোমাকে ভুলিয়ে রেখে থাকে, তা হলে লেখিকার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত; সেগুলির এমন করে প্রশংসা করে তাঁকে বিমূঢ় করে দেওয়া তোমার উচিত হয় না।"

সুবোধ একবার যোগেশের প্রতি ত্বরিত দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদকে কহিল, "তা যদি আমি করে থাকি, তা হলে আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু বাস্তবিক বিনোদ, এক-একটা নোট এতই সুন্দর যে, তোমার মেসে বি-এ, এম-এ যতগুলি ছেলে আছে, তার মধ্যে একজনও তেমন করে লিখ্‌তে পারে না। তুমিও পার না, আমি ত পারিই নে।" তাহার পর সহসা যোগেশের দিকে ফিরিয়া কহিল, "আচ্ছা, আপনি প্রবন্ধ লেখেন?"

যোগেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "এ পর্য্যন্ত ত চেষ্টা করি নি।"

সুবোধ কহিল, "করেন নি তাই; কর্‌লে, আমার বিশ্বাস, আপনি খুব ভাল প্রবন্ধ লিখ্‌তে পারেন—আপনার নোটগুলির মধ্যে এমন চিন্তাশীলতা, এমন বিচার-শক্তির

পরিচয় আছে—দৃষ্টান্তের মত আমি একটা দেখাচ্ছি—” বলিয়া সুবোধ বহিখানার পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল।

বিনোদ ও যোগেশ মনে-মনে যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিল, তাহাই উপস্থিত হইবার উপক্রম করিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাটীর একজন পরিচারিকা কক্ষে প্রবেশ করায়, যোগেশের পরিত্রাণ পাইবার সুযোগ ঘটিয়া গেল।

পরিচারিকা প্রবেশ করিয়াই, মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিয়া, যোগেশকে কহিল, “দিদিমণি, সব তয়ের হয়েছে।”

যোগেশ আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল, “সুবোধ বাবু, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি।” বলিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই সুনীতি দাঁড়াইয়া ছিল। যোগেশকে দেখিয়া সে সক্রোধে কহিল, “তুই হতভাগা, আমার নাম কেন কর্‌লি তা বল ?”

যোগেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, “বা রে, তা আমি কি কর্‌ব ? তোমার বই দেখিয়ে বল্‌লে——”

সুনীতি তেম্‌নি ক্রোধভরে কহিল, “বা রে, তা আমি কি কর্‌ব ? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি সব ভেঙ্গে দিচ্ছি,—এখনি বলে পাঠাচ্ছি যে, তুই থিয়েটারের একটা বকাটে ছেলে।”

যোগেশ নাকি-সুরে পূর্ব্বের মত বলিতে লাগিল, “বা রে ! তা আমি কি কর্‌ব, বা রে ! আমার কি দোষ ?”

যোগেশ ও সুনীতির কলহ শুনিতে পাইয়া, সুমতি তাহাদের নিকট ছুটিয়া আসিয়া, তাহাদিগকে দূরে টানিয়া আনিয়া, নিম্নকণ্ঠে কহিল, “ওরে চেঁচাস্‌ নে, শুন্‌তে পেলে সব মাটী হয়ে যাবে !”

সুনীতি শক্ত হইয়া, চাপা গলায়, কিন্তু উত্তেজিত ভাবে কহিল, “আমি ত শুনিয়ে দিতেই চাই। কেন ও আমার নাম কর্‌লে ?”

সুমতি হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, “তাতে আর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে ? সুনীতি নাম হলেই ত আর তুই হলি নে।”

সুনীতি তেম্‌নি উত্তেজিত ভাবে কহিল, “তুমি কি যে বল দিদি, তার ঠিক নেই ! শুধু নাম ? আমার হাতের লেখা পর্য্যন্ত দেখান হয়ে গেল।” তাহার পর যোগেশের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, “যা, তুই এখনি আমার বই এনে দে লক্ষ্মীছাড়া—”

সুমতি এবার ঈষৎ রাগত ভাবে কহিল, “ওকে মিছিমিছি অত বক্‌ছিস কেন নীতি ? ওর দোষ কি ? ও ত' ইচ্ছে করে তোর নাম করে নি,—বাধ্য হয়ে করেছে।” তাহার পর মৃদু হাসিয়া কহিল, “তোর নোটের কত সুখ্যাতি কর্‌ছিল বল্‌ দেখি ? তোর ত' খুসী হবার কথা রে !”

“ভারি সুখ্যাতি ! খোসামুদে কথা শুনে পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে যাচ্ছিল।” দুঃখে ও ক্রোধে সুনীতির চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

সুনীতি ক্রমশঃই অধিকতর অসংযত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সুমতি ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, “ছি নীতি, ও রকম অবুঝের মত কর্‌ছিস কেন বল দেখি ? মিছিমিছি তিলকে তাল করে তুল্‌ছিস। বিনোদ আমোদ করে একটা ব্যাপার কর্‌ছে—তুই তার মধ্যে একেবারে কান্নাকাটি লাগিয়ে দিলি ! জান্‌তে পার্‌লে সে কতদূর অপ্রস্তুত হয়ে যাবে বল্‌ দেখি ?”

বলিতে-বলিতেই তথায় বিনোদ আসিয়া পড়িল, এবং সুনীতির ক্রুদ্ধ-আরক্ত মুখ ও সুমতির বিমূঢ় নীরব ভাব লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে দিদি ?”

সুমতি মুহূর্ত্তের জন্য একবার সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া কহিল, “হয় নি কিছু ! সুবোধ বাবুর কাছে যোগেশের নাম সুনীতি বলা হয়েছে বলে তোমার শ্যালীর রাগ হয়েছে। তুমি একটু এইখানে দাঁড়াও বিনোদ, আমি চা আর খাবার নিয়ে আসি।” বলিয়া সুমতি প্রস্থান করিল।

বিনোদ হাসিয়া কহিল, “রাগ কার ওপর করছ সুনীতি ? দৈবাৎ তোমার বইখানা পড়েছিল বলেই ত হোল। দৈব যদি তোমার বিরুদ্ধ হয়, অন্য লোকে কি করতে পারে বল ?”

পাছে বিনোদ দুঃখিত হয় এই আশঙ্কায়, বিরক্তি-বিরূপ মুখে যতটা সম্ভব প্রফুল্লতা আনিয়া সুনীতি কহিল, “কিন্তু, লোকে দৈবর সঙ্গে যোগ দেয় কেন ?”

বিনোদ কহিল, “লোকে দেয় দিক্‌, তুমি না দিলেই হোল। নামের ওপর তোমার ত আর সে রকম অধিকার নেই—মনের ওপর যেমন আছে। নামটা তোমার সবাই দিতে পারে ;—কিন্তু তোমার মন দেয় কার সাধ্য, যতক্ষণ না তুমি নিজে দিচ্ছ।”

এবার সুনীতি হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "সে ভয় আপনার নেই মেজ জামাইবাবু,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বিনোদ মুখ গম্ভীর করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "উঁহু! আমি সে বিষয়েও একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তোমার এমন একটা ফাঁড়া আসছে, যা থেকে তোমাকে উদ্ধার করা কঠিন হবে। দেখছ না—কেমন তুমি আস্তে-আস্তে জড়িয়ে পড়ছ?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "উদ্ধার না-ই করলেন মেজ জামাইবাবু। যা বল্লেন, তাতে ফাঁড়াটিও মন্দ মনে হোল না—বেশ শান্ত, শিষ্ট, ধনবান, বিদ্বান—এ' ত স্বস্ত্যয়নের চেয়ে ফাঁড়াই ভাল।"

বিনোদ এই সপ্রতিভ প্রগলভ বাক্যের যথাযথ উত্তর দিতে না পারিয়া কহিল, "তবে তোমার নাম ব্যবহার করা হয়েছে বলে রাগ করছিলে কেন? তাহলে সে ত' ভালই হয়েছে।"

দুইজন পরিচারিকার হস্তে চা ও খাবার লইয়া সুমতি তথায় উপস্থিত হইল; এবং তাহাদিগকে সঙ্গে দিয়া যোগেশকে বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

বিনোদ যোগেশকে অনুসরণ করিতে-করিতে মুখ ফিরাইয়া সুনীতিকে বলিল, "তা'হলে ত' আর কোন গোল নেই—তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।"

বাহিরে আসিয়া যোগেশ ক্ষিপ্রহস্তে টেবিলের এক অংশ পরিষ্কার করিয়া, পরিচারিকার হস্ত হইতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া তথায় স্থাপিত করিল। তাহার পর অপর পরিচারিকার হস্ত হইতে দুই রেকাব খাবার লইয়া, একখানি সুবোধের সম্মুখে রাখিয়া স্মিতমুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "সুবোধ বাবু, দয়া করে একটু খান।"

প্রথমে যখন যোগেশ বালিকা-মূর্তিতে সুবোধের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন সুবোধের মন যে প্রবল দোল খাইয়া উঠিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা আদৎ জিনিস নহে—তাহা শুধু ঘটনার আকস্মিকত্বের ক্রিয়া। সূচ্যগ্রস্থিত লৌহ-শলাকার সম্মুখে সহসা শক্তিশালী চুম্বক ধরিলে আকর্ষণে স্তব্ধ হইবার পূর্ব্বে তাহা যেমন দক্ষিণে বামে দুলিতে থাকে, ইহাও ঠিক তেমনি। তাহার পর অবসর পাইয়া সে যখন ধীরে-ধীরে তাহার প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিল, তখন তাহার মন আকর্ষণের রেখায় অভিনিবিষ্ট হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এত সুন্দর, এত মনোরম, অথচ এত সুলভ! সুবোধ একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া লইল যে, সে স্বপ্ন দেখিতেছে না।

"—একটু খান।"

সহসা সুবোধ তাহার মোহাবেশ হইতে সচেতন হইয়া কহিল, "এখানে এসে দেখছি বাস্তবিকই আমি অপরাধ করেছি—নানা রকমে তখন থেকে আপনাদের বিব্রতই করে রেখেছি।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "অপরাধ যদি করে থাক, তা'হলে লঘুই বলতে হবে; কারণ, তুমি ইচ্ছা করে আস নি; আর এ কথাও ঠিক জানা ছিল না যে, তুমি এলে এঁরা এই রকমে বিব্রত হবেন। কাজেই, ভবিষ্যতে আর কখন আসবে না এই আশ্বাস দিয়ে, যদি ক্ষমা চেয়ে নাও, তা'হলে তোমার আর বড় কিছু দোষ থাকে না।"

যোগেশকে বিনোদ ও সুমতি শিখাইয়া দিয়াছিল যে, বেশী কথা বলিবার চেষ্টা যেন সে না করে; এবং সে যে স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা এবং মুখচোরা, সেইরূপ ভাবেই যেন অভিনয় হয়। যোগেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "না, না,—আপনি একটুও বিব্রত করেন নি,—আপনার যখন ইচ্ছা হয় আসবেন।"

বিনোদ কহিল, "যখন ইচ্ছা আসবার অনুমতি পেয়েছ—কিন্তু যতক্ষণ ইচ্ছা, থাকবার অনুমতি ত' আর পাও নি;—অতএব এস, চট্‌পট্ আহারটা শেষ করে উঠে পড়া যাক্।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "না, না,—যতক্ষণ ইচ্ছা আপনি থাকবেন—তাতে কোনও আপত্তি নেই।"

বিনোদ একমুহূর্ত্ত যোগেশের প্রতি কপট রোষে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "দেখ, তুমি যদি প্রতি কথায় এমনি করে ঘরের লোককে নীচু করে বাইরের লোককে প্রশ্রয় দেবে, তা'হলে বাইরের লোকের স্পর্দ্ধা ভারি বেড়ে যাবে বল্‌ছি!"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "অতিথি-সৎকার করবার জন্য উনি যখন স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন, তখনই ত আমার স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে ভাই—আর বেশী কি বাড়বে?"

দুইবন্ধু আহার করিতে বসিলে, যোগেশ উভয়কে পীড়াপীড়ি করিয়া পুনঃ পুনঃ পরিবেশন পূর্ব্বক আহার

করাইল ; এবং আহারান্তে উভয়ের জন্য সযত্নে দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া দিল।

চা-পানান্তে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বিনোদ ও সুবোধ যখন প্রস্থানের জন্য উঠিল, তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল।

পানের ডিবা হইতে কয়েক খিলি পান বাহির করিয়া উভয়কে দিয়া যোগেশ কহিল, "অনেকখানি পথ যেতে হবে, পানগুলো নিয়ে যান।"

সুবোধ একখিলি পান মুখে দিয়া, বাকিগুলা সকলের অলক্ষ্যে পকেটে পুরিল ; এবং পরে মেসে পৌছিয়া কৃপণের ধনের মত সেগুলিকে সযত্নে তাহার বাক্সে পুরিয়া রাখিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমন্তের প্রতি সুশীলা

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

১

কি সাধে রবে না বঁধু, যাবে হে কোথায়,
জুড়ায়ে রাখিব তোমা নিদাঘ-জ্বালায় :
শোয়াব ভিজায়ে কচি কমলের পাত,
সোহাগে বুলাব দেহে তরুণীর হাত।
কোথা রবে প্রাণনাথ বরষার দিনে,
ভাল কি লাগিবে একা বিদেশ-বিপিনে ?
রবে হেথা পাশে বসি এ নবীনা নারী,
দু'জনে দেখিব সুখে মেঘে ঝরে বারি।
শারদে সাজায়ে মোরে বিরহিণী বেশে,
পূজিবে সে দশভুজা গিয়া কোন্ দেশে :
হেথা দোঁহে ভক্তিভরে হেরিয়া জননী,
তারাকারা দীপহারা পোহাব রজনী।
আমি কি পারি হে স্বামী ছাড়িতে তোমায়,
রহে কি বিহগে ত্যজি বিহগী কুলায় !

২

'হায়নে হিমানী-হিমে ভুলিয়ে ভামিনী,
কেমনে যাপিবে সেথা দীরঘ যামিনী ;
বিলাসে বঞ্চিবে নিশি এ দেশে হরসে,
তুষিব বাঁধিয়ে ভুজে নানা প্রেমরসে।
থাকিলে দারুণ শীতে দূরদেশে পতি,
পারে কি ধরিতে প্রাণ বিরশা সবতী ?
নিভৃতে দু'টীতে রব প্রেমের কুটীরে,
কপোত-কপোতী সম মুখোমুখী নীড়ে।
মধুতে মধুরা ধরা ঘেরা ফুলমালে,
ললিতা-লতিকা-বধূ-লালসা রসালে ;
রোহিণী শশাঙ্কে মিলে, নলিনী তপনে,
দয়িতা দয়িত-সঙ্গ ত্যজিবে কেমনে ?
বিনোদ বসন্তে রবে পথ চেয়ে কার,
বিরহ-বিধুরা বঁধু বনিতা তোমার !

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

থিওরি লইয়া বেদে হাত দিলে, অনেক রকম হাত-সাফাই দেখান চলে; কারণ, শ্রুতি আমাদের কামদুঘা, বাঞ্ছাকল্পলতা। যেমনটি দেখিতে চাও, শ্রুতি তোমাকে তেমনটিই দেখাইবেন। বেদকে শিশু ভাবিয়া "সরল" ব্যাখ্যা দিবে—দাও, বেদের তাহাতে আপত্তি নাই। তুমি বেদের সঙ্গে ধূলোখেলা করিতে সাধ কর—ভাল, বেদ তোমাকে ধূলোর ঘরই তৈয়ারি করিয়া দিবেন। আর তুমি চাও বেদের কাছে পরম পুরুষার্থ? অনলস, সহিষ্ণু প্রযত্ন দ্বারা বেদের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ব্যাখ্যার ছদ্মবেশের মাঝ হইতে সেই মুঞ্জাভ্যন্তরস্থিত ইষীকার মত অধ্যাত্মতত্ত্বটিকে আবিষ্কার করিয়া লও—তাহার সঙ্কেত ও উপায় দেওয়া রহিয়াছে—তোমায় বিফলমনোরথ হইতে হইবে না। তুমি বৈদিক পণ্ডিত, দেবতা-টেবতা উড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে মানুষ বানাইতে চাও? খোঁজ, তোমার অভীষ্টবর্ষী বচনের অভাব নাই। মা গঙ্গা মরা লইতে আলেন না, বিশেষ এই শীতের শেষে; আমাদের বেদ-মাতাও থিওরির জঞ্জাল টানিয়া লইয়া স্বীয় অঙ্গের ভূষণ করিতে দ্বিরুক্তি করেন না, বিশেষ এই কলির সন্ধ্যায়। ঋগ্‌বেদ ও গীতার ভাষায়, সমুদ্রে যেমন সকল "আপ" প্রবেশ করিতেছে, অথচ তাহাতে সমুদ্রের প্রতিষ্ঠা টলিতেছে না, সেইরূপ বেদের মধ্যে যুগযুগান্তর ধরিয়া ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা বহিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে বেদের প্রতিষ্ঠা তত্ত্বদর্শী, নিগূঢ় রসের রসিক সাধকের দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। ছোট-বড় সকল রকম থিওরিরই মূল বেদে খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করা চলে। বেদের ঋষিরা এরোপ্লেনে চড়িয়া হাওয়া খাইতেন—ইহাই তোমার থিওরি? খোঁজ, ঋগ্‌বেদের ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্ম্মা শুধু ইন্দ্রের জন্য বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াই খালাস পান নাই, রথ বা বিমানও হয় ত বানাইয়াছেন। ফল কথা, বচনের অসদ্ভাব নাই। আর অসদ্ভাব থাকিলেই বা কি? যেমন-তেমন একটা বচন লইয়া, নানা ধাতুর নানা অর্থ করিয়া, টানিয়া ছিঁড়িয়া কায়ক্লেশে একটা বিমান তুমি বেদের মধ্যে গড়িয়া তুলিলেই

বা তোমায় ঠেকায় কে? লৌহ-যান বা বাষ্প-শকট ত পড়িয়াই আছে; তবে বাষ্প তৈয়ার হইত কিরূপে—এ প্রশ্ন করিলে, কেহ হয় ত উত্তর দিবেন, কাষ্ঠাদি ইন্ধন পোড়াইয়া, কেহ বা বলিবেন গঞ্জিকার স্তূপই ইন্ধনরূপে কল্পিত হইত। আসল ব্যাপারটা এই:—বেদের অর্থ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি,—তাহার ভাষা কতকটা সাঙ্কেতিক ভাষার সামিল হইয়া পড়িয়াছে।

শুধু আমরা বলিয়া নহে; সায়ণাচার্য্য 'সেদিনকার' ছেলে, তিনি বেদের অর্থ নানারকমে করিতে পারেন; কিন্তু নিরুক্তকার যাস্ক ত প্রাচীন, তিনিই মন্ত্রবিশেষের অর্থ যে কি করিবেন, তাহা যেন ঠাওর পাইতেছেন না বোধ হয়। ঋকের দেবতা কোন্-কোন্ স্থলে অশ্বিদ্বয়। কে ইঁহারা? যাস্ক লিখিতেছেন—"তৎ কৌ অশ্বিনৌ? দ্যাবা-পৃথিব্যৌ ইত্যেকে। অহোরাত্রৌ ইত্যেকে। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ইত্যেকে। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ।" ইত্যাদি। নানাজনের নানা-রকমের ফিকির। ধাতুর অর্থ লইয়া মানে অনেক রকমই করা চলে। যাস্ক ও সায়ণ অর্থ-সঙ্গতির জন্য একই শব্দের নানা অর্থ বিভিন্ন স্থানে করিয়াছেন। ঋগ্-বেদের প্রথম মণ্ডলের ৫৫ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋকে "সমুদ্রিয়ঃ" পদটি আছে। ইন্দ্রের বিশেষণ। ইন্দ্র সমুদ্রে জন্মিবেন কিরূপে? সুতরাং সায়ণ ব্যাখ্যা দিলেন—"সমুদ্রং অন্তরিক্ষং তদ্ভবঃ সমুদ্রিয়ঃ।" অর্থাৎ সমুদ্র মানে অন্তরীক্ষ বা আকাশ। আকাশ বা দ্যু সকল দেবতার পিতা, এ কথা বেদের বহু স্থানেই আছে; সেরূপ মনে করিতে ত আমাদের বাধে না; কাজেই 'সমুদ্র' মানে 'আকাশ' করিয়া দিলেন সায়ণাচার্য্য। আবার, ১।১১০ সূক্তের প্রথমা ঋকে "সমুদ্রঃ" পদটি আছে। সায়ণ ধাত্বর্থ অন্য-দিকে লইয়া মানে করিলেন—"সমুদন শীলোঽয়ং সোমরসঃ।" 'সমুদ্র' 'সোমরস' হইলেন! 'সোম' কথাটার মানে শুধু যে সোমলতার রস, ইহা মনে করিলে সব সময়ে চলিবে না। ১।৯১ সূক্তের দেবতা সোম। ঐ সূক্তের চতুর্থী ঋক্—"যাতে ধামানি দিবিয়া পৃথিব্যাং" ইত্যাদি; ইহার বাঙ্গালা শুনুন:—হে সোম! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে পৃথিবীতে, পর্ব্বতে, ওষধিতে এবং জলে আছে, সেই তেজযুক্ত হইয়া হে সুমনা এবং ক্রোধহীন রাজন্, আমাদের হব্য গ্রহণ কর।" পুনশ্চ ঐ সূক্তের ২২ ঋক্—"ত্বমিমা ওষধীঃ" ইত্যাদি; ইহারও বাঙ্গলা শুনুন:—"হে সোম! তুমি এই সমস্ত ওষধি উৎপাদিত করিয়াছ ও বৃষ্টির জল সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি সমস্ত গাভী সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ, ও তাহার অন্ধকার জ্যোতিঃ দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছ।" এ স্তুতিবাক্য শুনিয়া সোমকে কি ভাবিব বলুন দেখি? শুধু লতাবিশেষের মাদকরস ভাবিলে কুলাইবে কি? সরল "কৃষক"দের গানে এ কিসের গভীর, বিপুল ঝঙ্কার? যজ্ঞে যে সোমের অভিষব করিতেছি, সে সোমের মধ্যে কি যেন এক সর্ব্বব্যাপী দিব্য বস্তুর অব্যক্ত অনুভব জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে! অথচ ঐ সূক্তের সপ্তদশ ঋকে সোমকে লতাও বলা হইয়াছে। ঐ লতাটিকে 'প্রতীক' রূপে আশ্রয় করিয়া এ কাহার অনুধ্যান ও উপাসনা বলুন ত! আবার ১।৯০ সূক্তের ৬, ৭, ৮, ৯ ঋকগুলি আপনারা সাবধানে শুনুন: "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" ইত্যাদি। ঋক কয়টি যেন মরুমন্দারমালা; অনুভব ও "দূরে আস্থাং" কাণে শুনিলেই যেন প্রাণটা মধুময় হইয়া যায়। বাঙ্গলা অনুবাদ দিতেছি:—"বায়ু সকল মধুবর্ষণ করে, নদীসমূহ মধু ক্ষরণ করে; ওষধি সকলও মাধুর্য্যযুক্ত হউক। আমাদের রাত্রি ও উষা মধুর হউক; পার্থিব জনপদ মাধুর্য্যবিশিষ্ট হউক; যে আকাশ সকলের পালয়িতা, সে আকাশও মধুযুক্ত হউক। বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুর হউক; সূর্য্যও মধুর হউক; ধেনুসকল মধুর হউক। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিস্তীর্ণ পদক্ষেপকারী বিষ্ণু আমাদের সুখকর হউন।" এই যে নিখিল পদার্থজাতের মধ্যে ওতপ্রোত মাধুর্য্য বা আনন্দের অনুভব, কটু-কষায়-তিক্ত সকল রসের মধ্যে মধুররসের ফল্গু প্রবাহের আবিষ্কার, ইহা যে হৃদয় করিতে পারিল, তাহাতে শৈশবের সারল্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু শৈশবের মূঢ়তা তাহাতে নাই; সে হৃদয়ের বেদনায় শৈশবের স্বচ্ছতা ও নির্ম্মলতা আছে, কিন্তু সঙ্কোচ ও চপলতা নাই। ইহাকে শিশু বলিতে হয় বল—কিন্তু এই বেদবিগ্রহ বামনরূপী হইলেও বিষ্ণুর ন্যায় ইহার পদক্ষেপে দ্যাবা পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ আক্রান্ত ও আবৃত হইয়া যায়! যাহা হউক, বেদব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদশব্দগুলি কাটাছাঁটা ও একঘেয়ে রকমের অর্থ করিলে সব সময়ে চলিবে না। স্বয়ং

শ্রুতিরই সঙ্কেত বা নির্দ্দেশ মত অর্থ নানারকমে করিতে হয়। যাস্ক, সায়ণ প্রভৃতি বেদব্যাখ্যাতাগণ তাহাই করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য অবশ্য হয়েন নাই। বেদশব্দগুলির অর্থসমূহকে স্থিতিস্থাপক (elastic) করিয়া লইলে, একদিকে যেমন ইষ্টাপত্তি ও সুবিধা, অন্যদিকে থিওরির উপদ্রবের বাড়াবাড়ি হইলে তাহাতেই আবার সর্ব্বনাশ। এক কথায়, বেদার্থ টা ঠিক স্পষ্টভাবে চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া বেড়ায় না বলিয়া, বেদশব্দ-রাশির মধ্য হইতে সত্যসিদ্ধান্ত বাহির করিয়া লওয়ারও যেমন সুবিধা হইয়াছে, নিজের খেয়ালমত বেদের শিবকে বানর বানাইয়া লইবারও তেমনি সুবিধা হইয়াছে। যেখানে অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাই না, সেখানে ঝোপ জঙ্গলকে কল্পনায় ভূত পিশাচ বানাইব, ইহাতে আর বিচিত্র কি? থিওরি একেবারে বর্জ্জন করিয়া সদাশিবটি বা "নাঝারি মাণুষ"টি হইয়া বেদ পড়া বোধ হয় চলে না; কিন্তু একটা অঙ্ক পড়িতে না পড়িতেই স্কন্ধে থিওরির ভূতগুলা এমনধারা কিলাইতে আরম্ভ করে যে, তখনই পুঁথি ফেলিয়া লেখনী রথে বৈদিক দেবতাদের মত গণ্ডা গণ্ডা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যুড়িয়া দিতে প্রবৃত্তি হয়; লিখিয়া আর সাধ মিটে না, স্পর্দ্ধার সীমা থাকে না; সাধ হয় নিজের মানসী থিওরী-দেবীর সম্মুখে নতজানু হইয়া স্তব করি—

> অসিতগিরিনিভং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
> সুরতরুবর শাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
> লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
> তদপি তব গুণানাং দেবি পারং ন যাতি॥

তাই প্রার্থনা করি—হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের পুরাকীর্ত্তি ত "বহুধা শ্রূয়তে"; তোমরা আমাদিগকে থিওরির অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ দাও। আমার এইরূপ থিওরির বিরুদ্ধে অভিযান দেখিয়া আপনাদের হয় ত একটা কথা আমাকে শুনাইবার জন্য রসনা কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইয়াছে। কথাটা বোধ হয় এই—"ওহে বক্তাঠাকুর! থিওরি স্বকীয়া হইলে বুঝি আর দোষ হইল না! কেন, থিওরি পরকীয়া হইলে তাহার রসাস্বাদ করিতে গোস্বামী মহাশয়েরা কি বারণ করিয়াছেন? তুমি অপরের থিওরিতে অসহিষ্ণু হইতেছ; তোমার নিজের একটা থিওরি নাই কি? তুমি ঐ ব্যাপনশীল, দ্যুতিমান্ সোমরসকে বিজ্ঞানের পরিভাষা মত "a universal stream of radiation" বলিয়া এখনই কত না ব্যাখ্যা গড়িয়া দিবে, তাহা কি আর আমরা বুঝিতে পারিতেছি না! আমার ঘাড়ে না হয় এরোপ্লেন, বাষ্পশকটের ভূত, তোমার ঘাড়ে হয় ত ইলেক্‌ট্রণ, রেডিয়াম, ঈথারের ভূত! ঘুরে-ফিরে আমরা দুই-ই সমান।" আপনারা কেহ এইরূপ জেরা তুলিলে, আমার আপাততঃ কৈফিয়ৎ দিবার ক্ষমতা নাই। স্বীকার করিয়া যাইতেছি—আমারও একটা থিওরি আছে। তবে যদি 'নির্ভয়ে কহিবার' আজ্ঞা দেন, তবে এইটুকু নিবেদন করিয়া রাখি যে, এ থিওরির মন্ত্র আমার কাণে দিয়াছেন স্বয়ং বেদমাতা। অবশ্য আমি, সাধন-ভজন করিয়া ঠিক মিলাইয়া লইতে পারি নাই; তবে যতটুকু ভাবিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে, বেদ আমায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, নববিজ্ঞান আবার তাহাই পাকে-প্রকারে ধীরে-সুস্থে বলিতে সুরু করিয়াছেন। আরও মনে হইয়াছে যে, আমাদের মত অসাধক, অপরীক্ষক যাহারা, তাহাদের, বিশাল বেদায়তনের কক্ষগুলিতে বিন্যস্ত রত্নরাজি আবার পরখ করিয়া চিনিয়া লইবার পক্ষে নববিজ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা কম্পিত-চঞ্চল হইলেও কথঞ্চিৎ পথ-প্রদর্শিকা, অন্তঃপুর-পরিচারিকা হইতে পারে। কতদূর কি হয় না হয়, ক্রমে পরিচয় পাইবেন। তবে একটা কথা—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নববিজ্ঞানের আলোকরশ্মিগুলিকে সংহত করিয়া সত্য-সত্যই তাহাকে একটা উজ্জ্বল বর্ত্তিকায় পরিণত করিতে যেরূপ মনীষা ও একনিষ্ঠা দরকার, তাহা আমার মধ্যে নাই। কাজেই, একা এ কাজ আরম্ভই করিতে পারি মাত্র; আর আরম্ভটা সদোষই হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও দশে মিলিয়াই কাজ করিতে হইবে। ঋগ্বেদ-সংহিতার উপসংহারের সেই মন্ত্র (১০।১৯১) স্মরণ করুন—"তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও।"

আচ্ছা, থিওরির কথা না হয় যাক্। বেদের সকল কথাই কি অক্ষরে-অক্ষরে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে? অর্থাৎ, বেদে কি কবিত্ব নাই, রূপক নাই? আছে, প্রচুর আছে; আছে বলিয়াই অতি সাবধানে যথার্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। কবিত্বের উদাহরণ দিতে হইলে, সমগ্র

সংহিতাখানাকেই ধরিয়া হাজির করিতে হয়। তাহার প্রয়োজন নাই। রূপক ? তাহাও যথেষ্ট। ইহার দুটো একটা দৃষ্টান্ত দিই ; অন্ততঃ তাহাতে এইটুকু বুঝিবেন যে, কেন আমরা বেদ-বারিধিতে জাল ফেলিয়া বৈজ্ঞানিক তথ্য তুলিতে প্রয়াস পাইতেছি। বেদমন্ত্রে বৈজ্ঞানিক তথ্য কোথাও বা স্পষ্টভাবে, কোথাও বা অস্পষ্ট ভাবে, রূপকছলে নিহিত রহিয়াছে : একটু তাকাইয়া দেখিলেই ধরিতে পারি যে, ইহা বৈজ্ঞানিক রহস্য scientific truth। আমার আবার মনে হয় যে, সে বৈজ্ঞানিক রহস্যগুলি নিগূঢ় রহস্য ; কিছুদিন পূর্ব্বে বুঝিবার চেষ্টা করিলেও হয় ত বুঝিতে পারিতাম না ; এখন বিজ্ঞানের আকৃতি-প্রকৃতি বদলাইয়া যাওয়াতে, বোঝার কতক-কতক সম্ভাবনা হইয়াছে। তবে গোড়ামি করিলে চলিবে না। সম্ভাবনা কিয়দংশে কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে সর্ব্বাংশে সর্ব্বতোভাবে এখনও হয় নাই। অথাৎ, বিজ্ঞানের ইলেকট্রণ, ঈথার, রেডিয়েশন প্রভৃতি নূতন conceptগুলিকে বেদের অদিতি, মরুদ্‌গণ, সোম প্রভৃতির তটস্থ বিবৃতি বা approximate description ভাবে গ্রহণ করিতেই আমি পরামর্শ দিই। কে কাহার প্রতিনিধিস্থানীয়, তাহা পরে বলিব। তবে আপনারা, গোড়ায় যে সিরিজ ও লিমিটের কথা বলিয়া লইয়াছি, তাহা সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন। নাহিলে, বেদকুলও যাইবে, বিজ্ঞানকুলও যাইবে।

বামনাবতারের কথা আপনারা পুরাণে পড়িয়াছেন, যাত্রায় গানে শুনিয়াছেন। ইহার মূল রহিয়াছে বেদে—১।২২ সূক্তের ১৭ ঋক্ শুনুন,—"বিষ্ণু ইহা পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন ; তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।" ইহার মর্ম্মার্থ কি ? যাস্ক বলিতেছেন—"বিষ্ণুরাদিত্যঃ"—সূর্য্যই বিষ্ণু। সায়ণও সূর্যপক্ষে অর্থ দিয়াছেন। আত্মপক্ষে অথবা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটি ঋষির মনে ছিল না, তাহা আমি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে সুর দিয়া বলিতে পারিব না। তাঁহাদের মতে আত্মপক্ষে চিন্তা শৈশবে সম্ভবে না ; ঋগ্‌বেদের ঋষিরা প্রায়ই শৈশবদশায়। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী আত্মা ; তাঁহার তিন প্রকার পদবিক্ষেপ—জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এ রকম ব্যাখ্যা কেহ দিতে যাইলে আমি লাঠি বাহির করিব না। তবে স্পষ্টতঃ একটা আধিভৌতিক, অর্থাৎ ভূতপক্ষে, অর্থ ঐ রূপকের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ভূতপক্ষে ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া যাস্ক শাকপূণি ও আচার্য্য ঔর্ণনাভের নজির দেখাইয়াছেন। মোটের উপর ধরুন—সূর্য্য উদয়গিরি, অন্তরীক্ষ এবং অস্তগিরি, এই তিন স্থানে পদবিক্ষেপ করেন, এইরূপ একটা অর্থ দাঁড়াইল। কিন্তু "ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত করেন"—ইহার অর্থ কি ? "অস্য পাংসুরে"—ইহার মানে, সূর্য্যের কিরণ দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হয়, শুধু এইটুকুই কি ? এইরূপ মানে করিলে 'পাংসুরে' পদটিকে গোলে হরিবোল দিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। সূর্য্যের রশ্মি বা radiation যে এ স্থলে অভিপ্রেত, সে পক্ষে সন্দেহ নাই ; কিন্তু কেমন ধারা রশ্মি, ইহাই হইল প্রশ্ন। সূর্য্যের রশ্মি সম্বন্ধে অনেক গূঢ় রহস্য ঋষিরা জানিতেন : বেদের নানা স্থানে সূর্য্যের রথ সপ্ত অশ্বে টানিতেছে, এইরূপ রূপক বর্ণনা দেখিতে পাই। 'অশ্ব' সে সব স্থলে রশ্মি বা কিরণের রূপক। সপ্ত-অশ্ব কেন ? নিউটন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সূর্য্যকিরণে মূলতঃ সপ্তবর্ণের রশ্মি সম্মিলিত থাকে, ত্রিপার্শ্ব কাচের মধ্যে আনিতে গেলে সূর্য্যকিরণ সপ্তধা বিভক্ত হইয়া যায় : আবার সেই সপ্তকিরণ সম্মিলিত করিয়া সূর্য্যের শুভ্র কিরণ পাওয়া গিয়া থাকে। আলোকবিজ্ঞানের এটা একটা প্রধান কথা। বেদে এই সপ্তরশ্মির কথা বহুস্থলেই রহিয়াছে দেখিতে পাই। অতএব বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ঋষিরা রশ্মি সম্বন্ধে আনাড়ী ছিলেন না। তার পর, নিউটনের আর এক কথা। তিনি মনে করিতেন যে, আলোক খুব সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রেণু (corpuscles) র মত বেগে ছুটিয়া আসে। উহারাই যেন আলোর দানা। তার পর ইয়ং, ফ্রেস্‌নেল প্রভৃতি অনেকে, নানা কারণে, নিউটনের মত পরিহার করিয়া, আলোক-রশ্মিকে ঈথার-সমুদ্রের তরঙ্গ মনে করিতে আরম্ভ করেন। ইহা যে আবার স্বরূপতঃ electro-magnetic disturbance তাহা পরে ম্যাক্‌সওয়েল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আলোক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার সময় আজ আর আমাদের নাই ; তবে সংক্ষেপে বলিতে চাই যে, নিউটনের corpuscleগুলি (অথবা তৈজস রেণুগুলি) চেহারা বদ্‌লাইয়া আবার দেখা দিতেছে। H. A. Lorenz প্রভৃতি অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন দেখাইতে, কিরূপে

সূক্ষ্ম কর্পাস্‌ল বা ইলেকট্রণগুলি ছন্দোবদ্ধ ভাবে এটমের ভিতরে নৃত্য করিয়া ঈথার সাগরকে কাঁপাইয়া দেয়; এবং তার ফলে আলোকের সৃষ্টি করে। অতএব কর্পাস্‌ল গুলাই আলোকের মূলে। নিউটনের প্রতিভাদৃষ্টি এই গোড়া পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছিল। ঠিক কর্পাস্‌লগুলাই বাহিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া আমাদের মস্তিষ্ককে চঞ্চল করিয়া আলোকের জ্ঞান জন্মাক আর নাই-ই জন্মাক, সে চাঞ্চল্যের মূলে কিন্তু সেই সূক্ষ্ম তৈজসভূতগুলাই রহিয়াছে। তারাই নানা ছন্দে এটমের মধ্যে নৃত্য করিয়া spectrumএ নানা রং-বেরংএর রেখার সৃষ্টি করে। Dr. Johnstone Stoneyর উক্তি শুনুন:—"Now, an electron when undergoing periodic motion of any kind, propagates electro-magnetic, that is to say luminous waves through the surrounding aether; etc." কিন্তু আপনারা জিজ্ঞাসা করিবেন—ইলেকট্রণ বা কর্পাস্‌ল যে আলোকের উৎপাদক, তাহা ত থিওরিতে পাইতেছি; ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায়? রেডিয়াম প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গে পরিচয়ে আমরা সত্য-সত্যই এই সূক্ষ্ম ভূতগুলাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি! সে কথা আগে মাঝে-মাঝে বলিয়াছি, ভবিষ্যতে আরও সবিস্তর বলিব। অতএব এই সূক্ষ্ম পদার্থগুলা শুধু থিওরি নহে। ইলেকট্রণগুলা আবার জীবের মত দুই প্রকারের—মুক্ত ও বদ্ধ। এটমের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পাক খাইতেছে কতকগুলা—এবং তাহাদেরই নৃত্যে ব্যোমকেশের জটাজাল অন্তরীক্ষে ছড়াইয়া পড়ে—অর্থাৎ আলোকরশ্মিজাল সমন্তাৎ প্রসারিত হয়। কিন্তু এ ছাড়াও গণনাতীত ইলেকট্রণ মুক্ত ভাবে ঈথার-সাগরে অথবা শূন্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; ইহাদের বাহিনীর যে অভিযান বা প্রবাহ, সেটাকেও বিজ্ঞান radiation বলে। তবে অনেক স্থলে সেগুলা আমাদের দৃষ্টিকে জাগায় না; সুতরাং অদৃষ্ট, অরূপ বা non-luminous রূপে থাকিয়া যায়। সূর্য্য বা আদিত্যমণ্ডল হইতে এই দ্বিবিধ (দৃষ্ট ও অদৃষ্ট—luminous and non-luminous) radiationই হইতেছে; অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলে ইলেকট্রণগুলা নানা ছন্দে নৃত্য করিয়া আমাদিগকে ঈথারের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি পাঠাইতেছে। আবার সূর্য্যমণ্ডল হইতে সংখ্যাতীত সূক্ষ্ম charged particles ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং সংখ্যাতীত ইলেকট্রণ সূর্য্যমণ্ডলের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। এক কথায়, নিখিল সৌরজগতে, এমন কি তাহারও বাহিরে নক্ষত্রলোকে, সূর্য্যদেব এই সংখ্যাতীত সূক্ষ্ম তৈজস-ভূতগুলাকে লইয়া কন্দুক-ক্রীড়া করিতেছেন, তাহাদিগকে ছুড়িয়া দিতেছেন, আবার লুফিয়া লইতেছেন। বৈজ্ঞানিক একটা ছোট বর্ত্তুল (small drop) লইয়া আলোচনা করিয়া, উপসংহারে কি বলিতেছেন শুনুন:—"Such drops are constantly being repelled from the Sun in enormous numbers. Their expulsion keeps up the Sun's positive charge; but that positive charge does not increase indefinitely, since the sun drains vast tracts of space of the electrons (or negative charges) which abound in them. Arrhenius has estimated that the sun drains the space as far out as one-sixth of the distance of the nearest fixed star of its free electrons, and thus maintains a constant circulation of electricity throughout the solar system." সারা সৌরজগতে একটা তাড়িত শক্তির প্রবাহ বহাইয়া রাখিয়াছেন সূর্য্যদেব; আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাড়িতের প্রবাহ একটানা (continuous) জিনিষ নহে—তাহা যেন একটা বিপুল সেনার অভিযান; ব্যোমকেশ মহাব্যোমে রশ্মিজাল-রূপে তাঁহার জটাকলাপই যে শুধু বিছাইতেছেন এমন নহে; তাঁহার দিব্য অঙ্গের ভস্ম-বিভূতিগুলাও দিগ্‌দিগন্তরে ছড়াইতেছেন। এই charged particles গুলার সমন্তাৎ প্রবাহ বুঝাইবার জন্য—বেদমন্ত্রে ঐ সংক্ষিপ্তপদ—"তস্য পাংসুরে"—তাহার ধূলি-বিশিষ্ট পদে জগৎ ছাইয়া ফেলিতেছেন। বিজ্ঞানের atomic structure of radiation বুঝান ছাড়া আর কি যে "পাংসুর" শব্দটি বুঝাইবে, তাহা ত আমি খুঁজিয়া পাই না। বাস্তবিক, আমার মনে ঐ "পাংসুর" শব্দের ইঙ্গিতে ঋষিরা তাঁহাদের ধ্যানলব্ধ বা পরীক্ষালব্ধ বা আপ্ত Radiation theoryর কথা আমাদিগকে শুনাইয়া গিয়াছেন। শুধু এক' যায়গায় একটা কথা পাইলে, না হয় ধাতুর অর্থ ধরিয়া, এটা সেটা

একটা লাগসই অর্থ গড়িয়া দিতাম ; কিন্তু মরুদ্‌গণের বাহন যখন বিন্দু-চিহ্নযুক্ত মৃগ—এইরূপ বহুস্থলে দেখিতে পাই, বৈদ্যুতাগ্নি দ্বারা মেঘের গর্ভ রচনা ভাবিয়া দেখি, ইন্দ্রের সহস্রধারাযুক্ত বজ্রের কথা শুনি, তখন আর মনে সন্দেহ থাকে না, যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তৈজস পদার্থ (corpuscles বা electron-)গুলি মন্ত্র-দ্রষ্টাদের কাছে নিতান্ত অদৃষ্ট ছিল না। তাহাদের মাপ-ওজন ও চলা-ফেরার আইন-কানুন লইয়া তাঁহারা আঁক কষিতেন কি না, জানি না ; তবে যে উপায়েই হউক, তাঁহারা ধরিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছেন ইহাদিগকে। সাহেব পণ্ডিতেরা ওখানে 'পৃশ্নি' কথাটাকে লইয়া যে কিরূপে গোজামিল দিবেন, তাহা ভাবিয়া পান না। বলা বাহুল্য, আমি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া বগল বাজাইবার পক্ষপাতী নহি। আজও ঈথার কায়ক্লেশে আছে,—কা'ল হয় ত থাকিবে না, বা থাকিয়াও না থাকার মত হইবে। সম্প্রতি আইনষ্টাইনের খুব নাম হইয়াছে ; তিনি থিওরি করিয়াছিলেন যে, শুধু magnetismএর কেন, gravitationএরও আলোকরশ্মির উপর প্রভাব আছে ; অর্থাৎ কোন সুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রের আলোক যদি সূর্য্যমণ্ডলের কাছ দিয়া আসে, তবে সূর্য্য তাহাকে নিজের কাছে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। সম্প্রতি পরীক্ষায় থিওরি যাচাই হইয়া বাহাল হইয়াছে। অথচ আইনষ্টাইনের হিসাবে ঈথারের প্রয়োজন কতটুকু ? ফল কথা, ঈথার হয় ত খসিয়া যাইবে—অন্ততঃ ঠিক যে ভাবে এখন মানিতেছি। কিন্তু ঐ শিবানুচর সূক্ষ্ম ভূতগুলার (corpusclesদের) মা'র নাই। অতএব আমরা নিশ্চিন্ত মনে বিষ্ণুর ঐ বিশ্বব্যাপী পাংসুর পদের পাংসুরাজি মস্তকে ধারণ করিতে পারি। বেদে রশ্মি (radiation) সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। ঐ ১।২২ সূক্তের ১৬ ঋকে "সপ্তধামভিঃ" পদ আছে ; সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দো দ্বারা। এ অর্থ যদি ঠিকই হয়, তবে প্রশ্ন উঠে—সূর্য্য সপ্তচ্ছন্দে পরিক্রম করিতেছেন কিরূপে ? তাঁহার সাতটি কিরণ সাত প্রকার ছন্দোবদ্ধ নৃত্য বা স্পন্দন হইতে সমুৎপন্ন—wave-motion is harmonic motion ; প্রত্যেক প্রকার কিরণের জন্য এক-এক প্রকার harmonic motion দরকার—সেইগুলিই এক-একটা ছন্দঃ। ছন্দঃ মন্ত্রের ছন্দ ত বটেই, তা'ছাড়া বর্ত্তমান রূপকে ইহা বুঝাইতেছে harmonic motion। চোখে রশ্মির কম্পন কই ত আমরা অনুভব করি না, অথচ রশ্মি যে প্রকৃত প্রস্তাবে oscillation বা undulation তাহা ঋষিরা কেমন করিয়া দেখিয়াছিলেন ? ১।৬৩।১ বলিতেছেন—"বিশ্বের সমস্ত ভূত ও পর্ব্বতসমূহ এবং অন্য যে সমস্ত মহৎ ও দৃঢ় পদার্থ আছে, তাহারাও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তোমার ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল।" সূর্য্যরশ্মির কম্পন হইল উপমা। আজ আর পুঁথি বাড়াইব না—বেদের মধ্যে জড়তত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের অনেক গভীর রহস্যই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আজ আমাদের একটা রূপক ভাঙ্গিতেই দিন গেল। ব্যাপারখানা কিন্তু সহজ নয়। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক রূপক আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিন দিক হইতেই ভাঙ্গা চলিতে পারে ; আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলিতে বিজ্ঞানের, অর্থাৎ আধিভৌতিক দিক্ হইতেই ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিব। আজিকার আলোচনায় বেদ বুঝিবার একটা প্রণালী আমরা অন্বেষণ করিয়া বোধ হয় একেবারে বিফল-প্রযত্ন হই নাই। যিনি যে ভাবে বেদকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহেন, সেই ভাবে বুঝুন ও বোঝান। কিন্তু করযোড়ে মিনতি করি,—গোড়ামি করিবেন না। "আমার ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা, আর সব অপব্যাখ্যা"—এ আস্ফালন করিবেন না।

শেষকালে, আকাশের কথা একটু বলিয়া আজকার মত বিদায় লইব। আমরা সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড (continuum) জিনিষ খুঁজিতে সুরু করিয়াছি। কেন জানেন ? ইহাই "জ্যায়ান" ও "পরায়ণ" বলিয়া। ইহাই গোড়ায় ; ইহা হইতেই ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, মরুদ্‌গণ সমস্তই। এই গোড়াটি না চিনিলে আমাদের যে কিছুই চেনা হইবে না। ১।৮৯।১০ বলিতেছেন—"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষং" ইত্যাদি ; "অদিতি আকাশ ; অদিতি অন্তরীক্ষ ; অদিতি মাতা ; তিনি পিতা ; তিনি পুত্র ; অদিতি সকল দেব ; অদিতি পঞ্চজন ; অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ।" আপনারা পুরাণে এই অদিতিকে কশ্যপের ভার্য্যা ও দেবগণের প্রসূতি বলিয়া দেখিয়াছেন। তিনি কে ? তিনি সেই সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড বস্তু, যাহার অন্বেষণ আমরা করিতেছি—সেই Continuum in the limit। 'দিৎ' ধাতু খণ্ডনে বা ছেদনে। সুতরাং 'অদিতি' মানে অখণ্ড, অছিন্ন, অসীম

বস্তু। ইঁহা হইতেই সব জন্মিয়াছে এবং ইনিই সব হইয়াছেন। আগামীবারে ইঁহার স্বরূপ আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে, এবং দেখিতে হইবে, কি ভাবে ইঁহা হইতে ইন্দ্রাদির উদ্ভব। বিজ্ঞানের দিক্ হইতে ইন্দ্র, অগ্নি, মরুদ্‌গণ প্রভৃতি আমরা বুঝিব কিরূপে? প্রসঙ্গক্রমে বিজ্ঞানের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া আমাদের করিয়া লইতে হইবে।

বিজ্ঞান ও কল্পনা

ডাক্তার শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ-ডি, আই-ই-এস্

সাধারণের ধারণা, বিজ্ঞানের সহিত কল্পনার (imagination) কোনও সম্পর্ক নাই। ও জিনিসটা কবির এক-চেটিয়া সম্পত্তি। সেইজন্য কোনও অসম্ভব বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, উহা কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার প্রথা বিদ্যমান। মধুসূদন তাঁহার মহাকাব্য রচনার প্রারম্ভেই বীণাপাণির সহিত কল্পনা দেবীকে আরাধনা করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন—

"তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত ফুলবন মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি!"

কবিবর ঠিক স্থানেই আর্জ্জি পেশ করিয়াছেন। কবি কল্পনার সাহায্যে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলের স্থূল ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ছন্দ ও ললিত ভাষার সাহায্যে পাঠকের নিকট সুস্পষ্ট করিয়া প্রতিভাত করেন। ইহারই সাহায্যে কবি "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" বিরহী জনের আকুল ব্যথা অনুভব করেন; ভ্রমর-গুঞ্জন, প্রণয়ীর মধুর সম্ভাষণ শুনিতে পান; স্বর্গে ইন্দ্রের রাজসভায় অপ্সরাবৃন্দের নূপুরনিক্কণ কর্ণগোচর করেন; এবং রৌরব নরকে পাপীবৃন্দের কঠোর শাস্তি দেখিতে পান। এ সবই ঠিক কথা। কিন্তু তাই বলিয়া এটা আদৌ ঠিক নহে যে, বৈজ্ঞানিকের কল্পনা-শক্তির কোনই প্রয়োজন নাই। সাধারণের ধারণা—কাব্য ও বিজ্ঞান ঠিক আলোক ও অন্ধকারের মত সম্পূর্ণ বিসদৃশ পদার্থ। কবি কল্পনাপ্রবণ; বৈজ্ঞানিক শুষ্ক ও নীরস। কাব্য অসম্ভব আকাশকুসুম, বিজ্ঞান কঠোর দৃষ্ট সত্য। এ কথাটা যে আদৌ সত্য নহে, তাহাই সপ্রমাণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাস্তবিক, কল্পনার সাহায্য না লইলে যেমন কবির একদণ্ড চলে না, বৈজ্ঞানিকের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। কল্পনা ব্যতীত বৈজ্ঞানিকেরও একদণ্ড চলে না; এবং যে বৈজ্ঞানিক কল্পনার সাহায্যে স্থলে যত সূক্ষ্মতা দেখিতে পান, নানা পরীক্ষিত তথ্যের (experimental result) মধ্যে গূঢ় সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি তত বড় বৈজ্ঞানিক। অবশ্য, এ কথা বলিতেছি না যে, আজগুবি কল্পনা করিতে পারিলেই বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়। আজগুবি কল্পনা পদ্যে ফলাইলেই কি কবি হওয়া যায়? তা নহে। কথাটা এই যে,কি কবি,কি বৈজ্ঞানিক,প্রত্যেকেই কল্পনার সাহায্যে প্রকৃতির মধ্যে নিহিত গূঢ় সত্যের সন্ধান করেন। কবি সৌন্দর্য্যের দ্বারা বেশী আকৃষ্ট হন; বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্যের মূলীভূত কারণের সন্ধানে বেশী ব্যস্ত। কিন্তু উভয়েই কল্পনা-প্রবণ; উভয়েই ভাবরাজ্যের বিশিষ্ট প্রজা।

কল্পনার সাহায্যে বিজ্ঞানের কত উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা, জ্যোতিস, প্রাণিবিদ্যা, বৃক্ষবিদ্যা, মনস্তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানাবিভাগ হইতে উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু সকলগুলি উদ্ধৃত করিতে হইলে একখানা পুস্তক লিখিতে হয়। গোটাকতক মোটা-মোটা দৃষ্টান্ত দিলেই সাধারণ পাঠক কথাটার সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তাহার পূর্ব্বে বলিয়া রাখি যে, কল্পনার বলেই বৈজ্ঞানিকের যত অনুমানের (Theory) সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক একটা মিথ্যা অনুমানও আঁকড়াইয়া ধরিবেন, কিন্তু অনুমান ব্যতীত তিনি চলিতে পারেন না। কতকগুলি পরীক্ষালব্ধ তথ্যের আবিষ্কার হইলে, আবিষ্কারক নিজে অথবা অপর একজন উহাদিগকে ভিত্তি করিয়া কল্পনার সাহায্যে একটা অনুমান খাড়া করিলেন। ভগবানই জানেন যে, ঐ অনুমান সত্য কি না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উহাকে আপাততঃ সত্য মনে করিয়া, উহারই উপর নির্ভর করিয়া, নানা পরীক্ষিত তথ্য আবিষ্কৃত করিতে থাকিবেন। ক্রমে এমন এক সময় আসিতে পারে (এবং প্রায়ই আসিয়া থাকে), যখন দেখা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অনুমান অধুনালব্ধ পরীক্ষিত তথ্যের অনুযায়ী হইতেছে না। তখন পরীক্ষক নিজে বা অপর কল্পনাকুশল বৈজ্ঞানিক আর একটি অনুমান বা theory রচনা করিলেন। কালক্রমে এই অনুমান পূর্ব্ববর্ত্তী অনুমানের মত মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, বা সত্য বলিয়াই চলিতে থাকিতে পারে। এই সকল কল্পনা-প্রসূত অনুমানই বিজ্ঞানের ভিত্তি। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এইরূপ কত-শত ভগ্ন, পরে অসত্য বলিয়া পরিত্যক্ত, অনুমানের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। বৈজ্ঞানিক কখনও গর্ব্ব করেন না যে, তিনি নিরপেক্ষ খাঁটি সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিবেন যে, তাঁহার অনুমান ততক্ষণই সত্য, যতক্ষণ অন্য অনুমান উহার স্থান দখল না করিতেছে। অবশ্য নিয়ম (Law) ও অনুমানের মধ্যে পার্থক্য আছে। নিয়ম পরীক্ষালব্ধ তথ্য, অনুমান তথ্যমূলক, কল্পনা-প্রসূত সত্য।

বৈজ্ঞানিক কল্পনালব্ধ অনুমানের এত পক্ষপাতী কেন? তাহার কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিক, সেই অনুমান সত্য কি মিথ্যা, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য নানারূপ পরীক্ষার সৃষ্টি করেন। এইরূপে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকে; এবং ক্রমশঃ সত্য অনুমানের সৃষ্টি হইবার পথ পরিষ্কৃত হইতে থাকে। এইরূপেই বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। মানবের জ্ঞান ও সৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া, একই সময়ে একই বিষয়ে একাধিক অনুমান বিজ্ঞানে প্রচলিত দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কোনটি সত্য (বা সবগুলিই মিথ্যা) পরে তাহা সপ্রমাণ হইয়া থাকে।

মিথ্যা অনুমানের দ্বারা কিরূপে বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা দুই-একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছি। প্রত্যেক রাসায়নিক পুরাকালের "ফ্লজিষ্টনবাদে"র (Phlogiston theory) সহিত পরিচিত। কাঠ কেন জ্বলে? লৌহাদি ধাতু, গন্ধক, বাতি প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ জ্বলে কেন? এবং উহারা যখন জ্বলে, তখন কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হয়? ইহার উত্তরে সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ রাসায়নিক ষ্টাল একটি অনুমান খাড়া করিলেন। তিনি বলিলেন যে, দাহ্যপদার্থ মাত্রেই ফ্লজিষ্টন নামে একটি পদার্থ আছে—দহনকালে এই পদার্থটি দাহ্য পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া বাহির হইয়া যায়। ইহা নিছক কল্পনা। ফ্লজিষ্টন কেমন পদার্থ ষ্টাল তাহা কখনও দেখেন নাই,—তাহার স্বরূপ কি তাহাও জানিতেন না। অথচ এই ফ্লজিষ্টনবাদ তাৎকালিক প্রত্যেক রাসায়নিক গ্রহণ করিলেন; এবং তখনকার রাসায়নিক পরিভাষা এই ফ্লজিষ্টনকে বেষ্টন করিয়া রচিত হইল। এইরূপে অনেক বৎসর কাটিল; এই ফ্লজিষ্টনবাদ সত্য কি মিথ্যা, তাহার নির্ণয়কল্পে বহু পরীক্ষা চলিতে লাগিল। তাহার ফলে মূল্যবান্ রাসায়নিক তথ্য সকল আবিষ্কৃত হইতে লাগিল; বায়ু হইতে অক্সিজেন আবিষ্কৃত হইল; বায়ুর স্বরূপ এবং জলের স্বরূপ আবিষ্কৃত হইল। রাসায়নিক পরীক্ষায় তুলাদণ্ডের (balance) ব্যবহার প্রচলিত হইল। সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক প্রিষ্টলে, কেভেণ্ডিস, সিল, এবং সর্ব্বোপরি ল্যাভোয়াসিয়ে এই যুগের রাসায়নিক। ইঁহাদের পরীক্ষামূলক গবেষণায় ক্রমশঃ দেখা গেল যে, ফ্লজিষ্টনবাদ আর টিকে না। ফ্লজিষ্টনবাদ সত্য হইলে দহনের পরে দাহ্য-পদার্থের ওজন কমিয়া যাইবে; কারণ, ফ্লজিষ্টন নামক একটি পদার্থ বাহির হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ইঁহাদের গবেষণার ফলে দেখা গেল যে, যখন দাহ্য পদার্থ জ্বলে, তখন তাহা হইতে প্রাপ্ত পদার্থগুলি যদি সাবধানে সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে উহাদের সমষ্টি দাহ্য-পদার্থের ওজন অপেক্ষা কম ত নহেই, বরঞ্চ বেশী হয়। কতটা বেশী এবং কি জন্য বেশী তাহাও সপ্রমাণ হইয়া গেল। এই সকল পরীক্ষার অধিকাংশ জন্ মেয়ো, প্রিষ্টলে, সিল, কেভেণ্ডিস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের

স্বকৃত পরীক্ষার প্রকৃত রহস্য কল্পনার দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন না। অপর পক্ষে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক কল্পনাকুশল ল্যাভোয়াসিয়ে এই সকল পরের এবং স্বকৃত পরীক্ষা হইতে বুঝিতে পারিলেন যে, ফ্লজিষ্টনবাদ অসত্য; এবং তিনি প্রচার করিলেন যে, দহনকালে কোনও পদার্থ পৃথক হয় না,—বরঞ্চ উহার বিপরীত ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। দহনকার্য্য আর কিছুই নহে, দাহ্য পদার্থের উপাদানগুলির সহিত বায়ুমধ্যস্থিত অম্লজানের সংযোগ; এবং এই অম্লজানের সংযোগের জন্যই দহনের পরে দাহ্য-পদার্থের ওজন বাড়িয়া থাকে। ইনিই এইরূপে ফ্লজিষ্টনবাদের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া আধুনিক রসায়নের জন্মদান করিলেন। ফ্লজিষ্টনবাদ অসত্য প্রমাণিত হইল বটে, কিন্তু এই অসত্য অনুমানের ফলেই নব্য-রসায়নের জন্ম সম্ভবপর হইল।

আর একটি দৃষ্টান্ত পদার্থবিদ্যা হইতে দিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিউটনের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণের (gravitation) আবিষ্কর্ত্তা নিউটন্ আলোকের (light) স্বরূপ সম্বন্ধে একটি অনুমান প্রচার করিয়াছিলেন - তাহার নাম আলোকের জড় পদার্থমূলক অনুমান (corpuscular theory of light)। তাঁহার মত এই ছিল যে, আলোকরশ্মি অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম জড়পদার্থের কণার দ্বারা গঠিত; এবং এই সকল পদার্থের সূক্ষ্ম কণা আলোকাধার হইতে বিকীর্ণ হইতে থাকে। ক্রমশঃ, নানা পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণবাদ সত্য হইলেও তাঁহার আবিষ্কৃত আলোকবাদ সত্য নহে। আলোক জড়পদার্থ (matter) নহে, উহা ইথার বা ব্যোম নামক অভাবনীয় দ্রবপদার্থের (imponderable fluid) তরঙ্গ-প্রসূত। আলোকের জড়পদার্থমূলক নিউটনের অনুমান অসত্য প্রমাণিত হইলেও, উহার দ্বারা আলোক-বিজ্ঞানের কম উন্নতি সাধিত হয় নাই। উহার সত্যতা-নিরূপণ কল্পে যে সকল পরীক্ষামূলক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান।

এই প্রসঙ্গে আমি যে আসল কথাটা বলিতে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তাহা যেন পাঠক ভুলিবেন না। ফ্লজিষ্টনবাদ উপলক্ষে পাঠক জানিতে পারিয়াছেন যে, প্রিষ্টলে, ক্যাভেণ্ডিস প্রভৃতি ইংরাজ রাসায়নিকগণ, উহার প্রতিবাদ-কল্পে যে সকল পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল, তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক কল্পনাশক্তি—স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম কারণ নির্ণয় করিবার শক্তি,—এ স্থলে উপযুক্ত পরিমাণে প্রযুক্ত না হওয়াতে, তাঁহারা ঐ ফ্লজিষ্টনবাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন নাই। অপর দিকে রাসায়নিক-প্রবর ল্যাভোয়াসিয়ের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক কল্পনাশক্তি সমধিক পরিমাণে বিকশিত হওয়াতে, তিনি আঁধারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন; এবং ফ্লজিষ্টনবাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, নব্য-রসায়নের জন্মদাতারূপ গৌরবময় আখ্যা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেইরূপ আলোকের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধেও পাঠক বৈজ্ঞানিক কল্পনার লীলা দেখিতে পাইবেন। আধুনিক ইথারের তরঙ্গমূলক অনুমানের ভিতর কত বড় কল্পনাই না প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই ইথার যে কি, তাহার স্বরূপ কি, কেহ জানেন না, উহা imponderable fluid; অথচ এই ইথার-তরঙ্গের সাহায্যে শুধু আলোক কেন, বিদ্যুৎ, চৌম্বকত্ব (magnetism) প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির স্বরূপ অনুমিত হইতেছে। এই ইথার বৈজ্ঞানিকের কল্পনার চক্ষে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। বায়ুস্তরের ঊর্দ্ধে নভোমণ্ডলে সর্ব্বত্র শুধু ইথার ব্যাপ্ত। অণু-পরমাণুর চতুর্দ্দিকে এই ইথার। অথচ বৈজ্ঞানিকের এই ইথার imponderable fluid!

এই ইথারবাদ ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা আবার নব্য-রসায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এই সুবৃহৎ বিজ্ঞান একটা সুবৃহৎ অনুমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একজন রাসায়নিক সত্যই বলিয়াছেন যে, আধুনিক রসায়ন ড্যাল্টনের পরমাণুবাদের অভিব্যক্তি মাত্র (Modern Chemistry is only an elaboration of Dalton's atomic theory)। পরমাণুবাদ দার্শনিক সত্য হিসাবে বহুকালের জিনিস। ভারতে বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ, গ্রীসে ডিমক্রাইটস প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই পরমাণুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাকে পরিমাণাত্মক (quantitative) বিজ্ঞানের উপযোগী করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন—সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ রাসায়নিক জন্ ড্যাল্টন। সেই অবধি আধুনিক রসায়ন এই পরমাণুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবের দৃষ্টি-শক্তির বহর অতি সামান্য। চর্ম্মচক্ষে বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আজ

পর্য্যন্ত কেহ অণু (molecule), পরমাণু (atom) প্রত্যক্ষ করেন নাই। কিন্তু রাসায়নিক মানসচক্ষে, কল্পনার চক্ষে প্রত্যেক জড়পদার্থের মধ্যে অণু, পরমাণুর সংস্থিতি, ক্রমাগতঃ-ঘূর্ণায়মান গতি প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এমন কি, তাহাদের স্বরূপ ও আকৃতি পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্র্যাগ, পোপ, বার্লো প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ দানাদার দ্রব্যের (crystalline) মধ্যে অণু-পরমাণুর অতি সুন্দর সুশোভন বিন্যাস উপলব্ধি করিয়া, পাঠকের সম্মুখে তাহার আলেখ্য ধরিয়াছেন। আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন,—তাহার নাম দিয়াছেন বিদ্যুতণু (electron)। এই বিদ্যুতণুবাদের সাহায্যে প্রাকৃতিক সৃষ্টির কত নূতন গূঢ় তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু মনে রাখিবেন, যখন অণু-পরমাণু কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই, তখন বিদ্যুতণু প্রত্যক্ষ করিবার আশা সুদূরপরাহত। এ সকলই অনুমান, কল্পনা,—ভাবের বিকাশ। কিন্তু এই সকল অনুমানই আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি।

ভূবিদ্যার আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এই বৈজ্ঞানিক কল্পনাশক্তির কত প্রাদুর্ভাব। ভূতত্ত্ববিৎ আল্‌পস্ বা হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরবাহী তুষার নদের (glacier) কার্য্য অথবা মৃত্তিকার স্তরবিন্যাস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পৃথিবীর আদি অস্তিত্ব, তাহার ক্রম-পরিণতির কত বড়-বড় অনুমান আবিষ্কার করিয়াছেন। পৃথিবীর বয়স অত লক্ষ কোটি বৎসর। পূর্ব্বে উহা তরল ছিল; পরে কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। এখন যেখানে পর্ব্বত-প্রস্তরময় প্রান্তর দেখিতেছেন, পুরাকালে ঐ স্থানে তুষারের নদী প্রবাহিত ছিল। এই সকল অনুমান শুনিতে-শুনিতে আজগুবি গল্প বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহাই ভূতত্ত্ববিদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। আধুনিক প্রাকৃতিক বহু পরিবর্ত্তনাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতত্ত্ববিৎ যুক্তি ও কল্পনার বলে এই সকল সত্যে উপনীত হইয়াছেন।

ভূবিদ্ ও প্রাণিবিদের প্রাগৈতিহাসিক কালের জন্তু, মৎস্য, পশু, পক্ষীর কথা শুনিয়াছেন? বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল জন্তুর কি অবয়ব ছিল, তাহা আপনিও দেখেন নাই, আমিও দেখি নাই—ভূবিদ্ বা প্রাণিবিদ্‌ও দেখেন নাই। কিন্তু মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে প্রোথিত ও লুক্কায়িত বহু জীব-কঙ্কাল (fossil) বৈজ্ঞানিক মাঝে মাঝে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই সকল কঙ্কাল আধুনিক জন্তুবর্গের কঙ্কাল হইতে অনেক পৃথক। তদ্দৃষ্টে এই সকল বৈজ্ঞানিক স্বকীয় কল্পনার সাহায্যে—বহু সহস্র বা লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার পশু, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতির আকৃতি আপনাকে দেখাইয়া দিতে সমর্থ; এবং সেই সকল স্তর দৃষ্টে পৃথিবীর বয়সও তাঁহারা অনুমান করিয়া থাকেন।

ডারউইনের নাম শুনিয়াছেন? তাঁহার ক্রমবিবর্ত্তনবাদের (Theory of Evolution) কথা নিশ্চয়ই জানেন। এই সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জগতের তাবৎ বৃক্ষলতা ও জন্তুর সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়া যে অনুমানে উপনীত হইয়াছেন, তাহার নাম ক্রমবিবর্ত্তনবাদ। ইঁহারই মতে মানবের পূর্ব্বপুরুষ বনমানুষ। শুনিয়া লোকে হাসে। হাসিবার ইহাতে কিছুই নাই। বৈজ্ঞানিক বহু পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা, বহুদূরদর্শী কল্পনার সাহায্যে যে সত্য উপলব্ধি করেন, তাহা আপনি-আমি পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তাহা আকাশ-কুসুম বলিয়া উপেক্ষা করেন না। ডারউইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ আধুনিক কালে কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য,—কিন্তু কে বলিতে পারে যে, ভবিষ্যতে এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদ কল্পনা ও অনুমানের রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধ্রুব-সত্যের আকার ধারণ করিবে না!

নব্য জ্যোতিষের উন্নতির প্রধান কারণ দুইটি—একটি দূরবীক্ষণ (telescope) যন্ত্রের আবিষ্কার, অপরটি নিউটন কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণবাদের প্রচার। এই মাধ্যাকর্ষণবাদ এখন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের (law) আকার ধারণ করিয়াছে। এই অসংখ্য দৃষ্ট ও অদৃষ্ট গ্রহনক্ষত্রবহুল সৌরজগতের স্থিতি, গ্রহ-নক্ষত্রের ভ্রমণ ও অবস্থান প্রভৃতির নিরূপণ মধ্যাকর্ষণবাদের সাহায্যেই সম্ভবপর হইয়াছে। এই মনীষাসম্পন্ন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক কিরূপে মাধ্যাকর্ষণ নিজে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সে গল্প অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। কথিত আছে, নিউটন এই মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহার বাগানে বসিয়া। তিনি বাগানে বসিয়া এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন; তখন দেখিতে পাইলেন যে, সম্মুখস্থ এক বৃক্ষ হইতে একটি সুপক্ক ফল মাটিতে পড়িয়া গেল। তখনই তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, ফল পড়ে কেন ? হঠাৎ মন হইতে কল্পনা উত্তর দিল—ফল পড়ে, পৃথিবী ফলকে আকর্ষণ করে বলিয়া। তাই না কি ? নিউটন মাধ্যাকর্ষণের সন্ধান পাইলেন। তার পর তাঁহার অমানুষিক বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও কল্পনার সাহায্যে তিনি বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণুর সহিত প্রত্যেক অণুর,—প্রত্যেক গ্রহের সহিত গ্রহ-উপগ্রহের—আকর্ষণ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন ; এবং ক্রমশঃ এক বিজ্ঞানের জন্মদান করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার আগে গাছ হইতে ফল পড়িতে ত অনেকেই দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু কই, কেহই ত মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। হইবেনই বা কি প্রকারে ? সকলেরই ত নিউটনের মত ধীশক্তি ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ক্ষমতা থাকে না !

আর কত উদাহরণ আপনাদিগকে দিব। যে বিজ্ঞানই দেখুন, সর্ব্বত্রই দেখিবেন কল্পনা, অনুমান—theory, hypothesis প্রভৃতি। "অনুমান, অনুমান—ধূল পরিমাণ।" "দশ বিশ গণ্ডা" ছোট, বড়, মাঝারি অনুমান প্রত্যেক বিজ্ঞানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এক ইস্পাত পোড়াইয়া তখনই জলে ঠাণ্ডা করিলে শক্ত হয় কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, রাসায়নিকগণ তিন-তিনটা অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন—এলোট্রপিক (allotropic) কার্ব্বণ (carbon) ও সলিউসন (solution) অনুমান। লবণ প্রভৃতি জলে দ্রবণীয় পদার্থ জলে গুলিলে যে কি আকারে জলে থাকে—তাহার কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত বৈজ্ঞানিক বহু প্রকার অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন। মূল কথা, বৈজ্ঞানিক সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর হইয়া থাকেন। এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে খুব সমর্থ এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করিতে দক্ষ। অপর শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমধিক কল্পনাকুশল এবং সেইজন্য অনুমান গঠনে সুদক্ষ। উভয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের কার্য্যই মূল্যবান ; কারণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাই অনুমানের ভিত্তি ; এবং অনুমান না থাকিলে, পরীক্ষা বড় অগ্রসর হয় না। তবে পরীক্ষার ফল অনেক স্থলে সীমাবদ্ধ ; কিন্তু অনুমানের কার্য্য বহু-বিস্তৃত। সেই জন্যই কোনও বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের যুগ প্রধান-প্রধান অনুমানের আবিষ্কার হইতে গণিত হয়। সেই হিসাবে অনুমান পরীক্ষা হইতে বড়। সেইজন্যই রসায়ন-শাস্ত্রে ডাল্টন, মেণ্ডেলিএফ, ভ্যাণ্টফ, এভোগাড্রো প্রভৃতি রাসায়নিক অনুমানের আবিষ্কর্তার নাম এত সুপ্রসিদ্ধ। সকল বিজ্ঞানেই এই কথা খাটে। সে যাহা হউক, এখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বড় কি বৈজ্ঞানিক অনুমান বড়, সে বিতণ্ডা উপস্থিত করিবার ইচ্ছা নাই। কেবল এই আমি দেখাইতেছিলাম যে, বিজ্ঞান কেবল পরীক্ষামূলক নহে, উহার একটা অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, বলিতে গেলে ভিত্তি,—অনুমান। এই অনুমান আবার কল্পনা-প্রসূত। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, কল্পনাশক্তি যেমন কবির প্রয়োজন, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উহা সমধিক এমন কি ততোঽধিক আবশ্যক।

সুখ-দুঃখ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

আট বৎসরের মেয়ে রেণু চুপি চুপি বলিল—বাবা, মার আজ বড্ড হাত কেটে গেছে।

বেলা দশটায় স্কুলে যাইয়া, পাঁচটায় বাড়ী ফিরিয়া, শ্রীশ-চন্দ্র প্রথমেই এই কথাটি শুনিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—কি করে কাটলো ? কন্যা খুব গিন্নিপনার মত মুখ নাড়িয়া বলিল—বাসন মাজ্তে গিয়ে ! একখানা থালা ভাঙ্গা ছিল, তারি ভাঙ্গা কাণায় লেগে। রক্ত যা পড়েছিল বাবা !

'হুঁ' বলিয়া শ্রীশচন্দ্র বারান্দার নীচে নালীর কাছটায় মুখ ধুইতে গেলেন। একটি বালতিতে ভরা জল, পরিষ্কার ঝকঝকে ঘটি, তাহার উপর ভাঁজ-করা শুভ্র গামছা পূর্ব্ব হইতেই সেখানে গোছান ছিল। কলিকাতা-বাসীদের কলে গিয়া হাত-মুখ ধোওয়ার সুবিধা হইলেও, শ্রীশচন্দ্রের সে সুবিধা হয় না। কারণ ছয় টাকা ভাড়া দিয়া খোলার বাড়ীর ঘর দু'খানিতে তাঁহারা থাকেন। সেই বাড়ীতে

আরও তিনটি গরীব পরিবারও ঐ একটিমাত্র কল ভরসা করিয়া দিন কাটায়। তাই কলতলা কখন খালি থাকে না থাকে ভাবিয়া, পূর্ব্বাহ্নেই জল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়।

স্ত্রী শৈলজা ততক্ষণ আসন পাতিয়া, সম্মুখে জল-খাবার রাখিয়া, পাখা হাতে করিয়া মেঝেতে বসিয়া ছিল।

ঘরে ঢুকিয়াই বিষাদ-গম্ভীর মুখে শ্রীশ বলিলেন—কতখানি হাত কেটেছ দেখি?

শৈলজা চমকিয়া বলিল হাত কেটেছে! কে বল্লে তোমাকে?

সেই বলেক না, দেখি? বলিয়া শ্রীশ স্ত্রীর ব্যজন-নিরত দক্ষিণ হাতখানি খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর হইতে মাঝামাঝি পর্য্যন্ত একইঞ্চি পরিমিত স্থান লম্বালম্বি কাটিয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া শ্রীশ বলিলেন—উঃ কি করে কাটলে এতখানি!

শৈলজা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—আসতে না আসতে কথাটি কে তোমার কাণে তুললে বল ত? বেণু বুঝি? মেয়ে সব তাতে শিউরে ওঠেন একেবারে! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা তার।

স্ত্রীর হাতটা ছাড়িয়া দিয়া শ্রীশ বলিলেন—মস্ত অপরাধ করেছে সে; মজা দেখাবে বৈ কি! কি করে কাটলে বল তো!

শৈলজা স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—সেই থালাখানা কাঁধা-ভাঙ্গা ছিল না—মাজতে গিয়ে অসাবধানে হঠাৎ একটু কেটে গেছে।

হাঁ, একটু বৈ কি,—আঙ্গুলটা তো সব যায় নি। সে দিন বড় বাল্‌তির এক বাল্‌তি জল আনতে গিয়ে, কলতলায় আছাড় খেলে। তার জন্য কোমরের ব্যথা আজও গেল না। সেও সামান্য। বলিয়া শ্রীশ একটু বিষাদের হাসি হাসিল।

তা নয় ত কি গা? গেরস্ত-ঘরে এ সব কাজ কে না করে বল ত? তবু তো এখানে কলের জল। অর্দ্ধেক কাজ কম। দেশে হলে যে পুকুর-ইঁদারা থেকে জল তুলতে হ'ত! দেশের মেয়েরা বুঝি আর এ সব করছে না! বলিয়া শৈলজা স্বামীর পানে মিষ্ট অনুযোগ-ভরা চক্ষে চাহিল।

গামছাখানি দুয়ারের মাথায় রাখিয়া শ্রীশ বলিলেন—দেখ, তুমি জেনে-শুনে ও-রকম তর্ক কোরো না। তোমার বয়স বাইশ, কিন্তু সন্তান হয়েছে পাঁচটি এর মধ্যে। ছেলে-মেয়েদের সামলানো, আর সমস্ত কাজ নিজ হাতে করে দশটার মধ্যে ইস্কুলের ভাত দেওয়া—এটা যে অতি সোজা কাজ, তা বুঝাবার জন্যে অত চেষ্টা কোরো না।

স্বামীর মেজাজটা আজ অন্য দিনের চেয়ে সত্যই অন্য ভাবের বুঝিয়া, হার মানিয়া শৈলজা কহিল—আচ্ছা, না হয় অতি শক্ত কাজই হ'ল। এখন জল খেতে বস।

শ্রীশ জলযোগ করিতে বসিবার কোন লক্ষণই না দেখাইয়া বলিলেন—না, এ করে তো আর চলে না। কত দিন থেকে ভাব্‌ছি একটা ঠিকে ঝি রাখ্‌ব। তিনটে টাকা খরচ—তাও ঘটে উঠ্‌ছে না। প্রতি মাসেই ধার, প্রতি মাসেই ধার। কি যে করি। বলিয়া বিছানার উপর মাথায় হাত দিয়া শ্রীশ বসিয়া পড়িলেন।

শৈলজা একটু অনুনয় করিয়া বলিল—এই খেটেখুটে এসে কি এখন ঐ সব ভাবনার সময়? জল খেয়ে একটু জিরিয়ে বরং একটু বেড়িয়ে এস, মাথাটা ভাল হবে'খন।

শ্রীশ উঠিয়া আসনে বসিবার পরিবর্ত্তে জামাটা কাঁধে ফেলিয়া জুতা পায়ে দিতে গেলেন।

ও কি, খালি মুখে এখনি বেরুচ্ছ কোথায়? বলিয়া শৈলজা শশব্যস্তে উঠিয়া স্বামীর হাত ধরিল।

শ্রীশ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—ভয় নেই, সংসার ত্যাগ করে পালাচ্ছি নে। বৈকালে একটা টিউশনির যোগাড় দেখ্‌তে যাচ্ছি।

বল কি? সকালে দুটো টিউশনি, রাত্রে একটা; আবার বিকালে? শরীর টিক্‌বে?

না টাকে, দিনকতক পরে আপনিই জবাব দেবে। সেও ভাল। বেঁচে থেকে এ সব সহ্য করা যায় না। তখন আমি তো দেখ্‌তে আস্‌বো না।

তা তো বটেই! এই না হল ভালবাসা! এখন নিজের বাড়ীর বাসন মাজা দেখে কষ্ট হচ্ছে,—তখন পরের বাড়ীর বাসন মেজেও ভাত জুটবে না। আর ছেলে-মেয়েগুলো কুকুর-শেয়ালের মত কেঁদে-কেঁদে ফিরবে, বলিয়া শৈলজা স্বামীর হাত ছাড়িয়া দিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে লাগিল।

শ্রীশ বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। ছিঃ, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ! চুপ চুপ বলিয়া কাঁধের কোটটা

বিছানায় ফেলিয়া জলযোগে বসিলেন। ছেলে-মেয়েদের ডাকিলেন, ওরে এদিকে আয় সব।

ছেলে মেয়েরা সব বারান্দা হইতে উকি মারিল। রেণু তাঁহাকে বেশ বিজ্ঞের মত বলিল—আমরা সবাই খেয়েছি বাবা, তুমি খাও।

চার বছরের ছেলেটা পর্যান্ত বলিল—আমরা বুঝি খাই নি, বা রে!

মায়ের নিষেধে ছেলেমেয়েরা আসিতেছে না, ইহা শ্রীশের বিলক্ষণই জানা ছিল। তথাপি আর দুই-একবার ডাকিয়া, সব-ছোট ছেলেটির হাতে খাবারের একটা অংশ তুলিয়া দিলেন। পরে আর তিন জনের জন্য পাত্রে ভাগ করিয়া রাখিয়া আপনি খাইতে বসিলেন।

শৈলজা ততক্ষণে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলার জন্য লজ্জিত হইয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়াছিল। ছেলে-মেয়েদের ভাগ করিয়া দিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধেকের কমও খাইতে দেখিয়া বলিল—আচ্ছা, ওরা তো খেয়েছে,—আবার ওদের জন্য আলাদা রাখবার কি দরকার। কতটুকু খেলে?

দেখ, ও কথাটি বলো না। ওটি আমি রাখতে পারব না। ওরা যা খায়, তা তো আর আমার জানতে বাকী নেই। কল্‌কাতা সহরে কোন প্রকারে ৭০৲ টা টাকা উপায় করে, তারি থেকে ধার শোধ, আর সংসার চালাতে হলে, ছেলে-মেয়েদের যে কত খাওয়ানো যায়, তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

শৈলজা আর কিছু বলিল না। শ্রীশ উঠিয়া আচমন করিয়া ছোট ছেলেটিকে একটু কোলে করিলেন, বড়দের গায়ে হাত দিয়া একটু আদর করিলেন এবং একটু পরে বাহির হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি আন্দাজ দশটায় শ্রীশ ফিরিয়া আসিলেন। ছেলে-মেয়েরা তখন ঘুমাইয়াছে। শৈলজা উঠিয়া ভাত বাড়িতে গেলে, শ্রীশ বলিলেন—দেখ, আমার ভাতটা ঢাকা দিয়া রেখে তুমি খেয়ে নেও। আমার একটু কাজ আছে, সেটা সেরে ভাত খাব।

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল—এখন আবার কি কাজ?

শ্রীশ বলিলেন—ভেবে ঠিক করেছি, এ বছর পি-এলটা দেব।

শ্রীশ অনেক দিনের বন্ধ করা আইনের বই লইয়া বসিলেন।

শৈলজা খানিকক্ষণ শুষ্ক মোটা বইখানার পানে চাহিয়া থাকিয়া, মাটিতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

শ্রীশ জিজ্ঞাসা করিলেন—খেলে না?

শৈলজা উত্তর দিল—তুমি পড়ে নেও তো। তারপর হবে'খন।

শ্রীশ পড়িতে লাগিলেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শৈলজা একটু বাদেই ঘুমাইয়া পড়িল।

খানিক পরেই শ্রীশ বুঝিলেন, এরূপ করিলে শৈলজার কষ্ট বাড়ানো হবে। অন্য দিন সে এতক্ষণে আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িত; আজ এখনও খাওয়া হইল না। শ্রীশ স্থির করিলেন, কাল হইতে খাইয়া লইয়া তবে পড়িতে বসিবেন। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, বই বন্ধ করিয়া, শ্রীশ উঠিয়া শৈলজাকে ডাকিয়া খাইতে বসিলেন।

শ্রীশ বি এ ফেল করিয়া, কলিকাতায় একটা প্রাইভেট স্কুলে মাসিক ত্রিশ টাকায় মাষ্টারি করেন। সকালে সন্ধ্যায় টিউশনি করিয়া আরও ৩০৲।৪০৲ উপায় করেন। তাহাতে যে সংসার কত সচ্ছল ভাবে চালাইতে পারা যায়, তাহা ভুক্তভোগীরাই ভাল রূপে বুঝিতে পারিবেন।

২

ছয় মাস পরের ঘটনা।

স্বামীকে অন্যান্য দিন অপেক্ষা আগে ফিরিতে দেখিয়া শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ গা, আজ এত সকাল-সকাল যে?

শ্রীশ প্রফুল্ল মুখে বলিলেন—একটা সুখবর আছে।

কি? কিসের? পাশের খবর বোধ হচ্ছে? পাশ হয়েছ? অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল।

'হ্যাঁ, হয়েছি' বলিয়া শ্রীশ স্ত্রীকে সাদরে চুম্বন করিলেন।

একবার দুয়ারের দিকে চাহিয়া, ছেলে-মেয়েরা কেহ নিকটে নাই দেখিয়া, সেও স্বামীকে চুম্বন করিল।

শ্রীশ সানন্দে বলিলেন—তবু ভাল। না চাইতে পাওয়া গেল।

আহা, তোমার যেমন কথা। বলিয়া শৈলজা অন্য কথা পাড়িল।

বাঁচা গেল। আমার যা ভাবনা হয়েছিল। এত কষ্ট করে যদি পাশ না হতে, তা'হলে তুমি যে কি রকম মুষ্‌ড়ে

যেতে, তাই ভেবে কি ভয় যে হ'ত! এখন কি করবে?

শ্রীশ জামা খুলিয়া আল্‌নার উপর রাখিয়া দিয়া, ভাল হইয়া বসিয়া বলিলেন—মাসখানেক পরে মাষ্টারিটা ছেড়ে দেব। তারপর লাইসেন্স্ নিয়ে প্র্যাকটিস্ সুরু করব।

শৈলজা বলিল—কি করে চল্‌বে? শ্রীশ উত্তর দিলেন—যে কটা টিউশনি আছে, তা তো রাখ্‌তেই হবে। আরও দুই একটা বাড়াতে হবে। তাতেও কিছু কষ্ট হবে। বছরটাক কষ্ট করে চালাতে পার্‌বে না?

শৈলজা সাহস দিয়া বলিল—ভগবান চালিয়ে দেবেনই একরকম করে।

শ্রীশ একটু চিন্তিত মুখে বলিলেন—কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জান? প্রথমটা আরম্ভ করা। মনে কর, উকিল হলে তো এ রকম বাসায় থাকলে চল্‌বে না। তা হলে তো মক্কেলই জুটবে না। প্রথম তো বাসা বদলাতে হবে। অন্ততঃ ২৫৲ টাকার কমে একটা চলন সই বাসা মিল্‌বে না। তার পর ধর, পোষাক-পরিচ্ছদ। সেইটাই মোটা খরচ। লাইসেন্সের খরচটা বিকালের টিউশনী যোগাড় করা আছে। তুমি যাই ঝি-টি কিছু রাখতে দাও নি, তাই তো টাকা কটা জম্‌ল।"

নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া শৈলজা বলিল—আমার গতর সুখে থাক্। ঝি রাখতে গেলাম কোন্ দুঃখে।

শ্রীশ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ভাবে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—গতর তো সবারি থাকে। কে এত খাটুনি ইচ্ছে করে খাটে বল?

শৈলজা বলিল—সে কথা থাক্। এখন কি উপায় কর্‌বে, তাই ভাব।

ভাবছি, সকালে যাদের বাড়ী পড়াতে যাই, সেই অমর বাবুর কাছ থেকেই কিছু ধার নেব। তিনিও পুলিশকোর্টে প্র্যাকটিস করেন। খুব নামজাদা। আমাকে প্র্যাকটিসে সাহায্য করবেন বলেছেন।

সে খুব ভাল কথা। কিন্তু টাকা ধারটা তাঁর কাছ থেকে চাওয়া উচিত নয়। ধার চাইলেই তোমার ওপর তাঁর তেমন শ্রদ্ধা থাক্‌বে না। প্র্যাকটিসে সাহায্য হয় ত তেমন মন দিয়ে কর্‌বেন না।

কিন্তু নইলে আর তো কোন উপায় নেই।

আমি একটা উপায় ভেবেছিলাম। আমার যে এক জোড়া বালা আর এক জোড়া অনন্ত আছে, সেই দু' জোড়া গহনা বেচে ফেলে, তার থেকে পোষাক-পরিচ্ছদ কিনে ফেল। আর বাকী যা থাক্‌বে, মাস ছয়েক তো বাড়ী-ভাড়া চল্‌বে। ততদিনে কি আর ভগবান্ মুখ তুলে চাইবেন না?

শৈলজার বুদ্ধি ও তাহার ত্যাগে শ্রীশ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। খানিক নির্ব্বাক থাকিয়া বলিলেন—কিন্তু, এই দশ বছর বে হয়েছে; এর মধ্যে একটা রূপার কাঁটা তোমাকে দিতে পারি নি—নেব কোন্ লজ্জায়?

লজ্জায় নেবে না। নেবে এই ভরসায় যে সুদ শুদ্ধ পুষিয়ে দেবে।

সত্য বলছি শৈল, উঁচু মন আর ত্যাগের কথা ভাব্‌লেই, তোমার কাছে আমাকে ভারি ছোট বলে মনে হয়।

দেখ, ও-সব বাড়ানো কথা বোলো না। স্বামীর দরকারে কোন্ হিঁদুর মেয়ে তার গহনা খুলে দেয় না? এটা কিছু বড় কাজ নয়। তা ছাড়া, একে ত্যাগ বলে না। এটা বেশী লাভের উপায়। যারা ব্যবসা করতে কোন বিষয়ে টাকা ফেলে, তুমি বল্‌বে তা'হলে তারা একেবারে দাতা হরিশ্চন্দ্র।

শ্রীশ পত্নীকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—না, কথা খুব শিখেছ—এটা বল্‌তেই হবে। আমার বদলে তুমি কোর্টে বেরুলে, বোধ হয় বেশী পশার হ'ত। কি বল?

আহা, কথায় আমি যেন ওর পায়ের নখের যুগ্যি! কথা শেখা তো তোমারই কাছে।

তা'হলে ত বিদ্যেটা এখন গুরু-মারা হয়ে দাঁড়িয়েছে!

সে রাত্রে দুজনার কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসে নাই। ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা ও ছবি লইয়া দুজনেরই বড় সুখে রাত কাটিয়া গেল।

৩

পাঁচ বৎসর পরেকার ঘটনা। বেলা পাঁচটা বাজিতে, হ্যারিসন রোডের উপরিস্থিত একটি অট্টালিকার সম্মুখে তেজস্বী অশ্ববাহিত একখানি সুদৃশ্য গাড়ী আসিয়া থামিতে লালবাজারের বিখ্যাত উকিল শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং সিঁড়ি দিয়া বরাবর উপরে উঠিয়া আসিলেন।

বলা বাহুল্য, মাষ্টারির সেই দুঃখের দিন কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার সাহায্যকারী উকিল অমর বাবুর মৃত্যুর পর তিনিই তৎস্থলাভিষিক্ত বিবেচিত হইয়াছেন; পাঁচ বৎসরের মধ্যেই আশাতিরিক্ত উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ উপরে উঠিয়া, সদর ও অন্দরের মাঝামাঝি একটা বড় ঘরে আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, বাড়ীর ভিতর গেলেন। ভৃত্য আগে হইতেই জল, গামছা ইত্যাদি লইয়া প্রস্তুত ছিল। তাহার নিকট জল লইয়া হাত-পা ধুইয়া, তিনি ধীরে-ধীরে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সম্মুখের বারান্দায় ক্রীড়াশীল পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হরি, তোমার মা কোথায় গেলেন?

পুত্র বলিল—সইমা এসেছেন! মা তাঁর সঙ্গে গল্প কচ্ছেন।

'ওঃ' বলিয়া তিনি তাকের উপর হইতে একখানি পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন। পাশের ঘর হইতে পাচক ব্রাহ্মণ ডাকিল বাবু, জলখাবার দেওয়া হয়েছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্রীশ উঠিয়া জলযোগ করিতে গেলেন। খাবার মুখে দিবার আগে জিজ্ঞাসা করিলেন—ছেলেরা সব খেয়েছে?

পাচক উত্তর করিল—আজ্ঞে হাঁ। শ্রীশ নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিলেন। ভৃত্য পশ্চাৎ হইতে বাতাস দিতে লাগিল।

জলযোগের পর শ্রীশ বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে ছেলে-মেয়েরা আসিয়া জুটিল। শ্রীশ জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁরে, তোরা আমার খাবার সময়ে আর আসিস্ না কেন রে?

হরি তৎক্ষণাৎ বলিল—মা যে বারণ করেছেন।

রেণুর এখন বয়স হইয়াছে। সে কথাটাকে একটু মোলায়েম করিয়া বলিল—কোর্ট থেকে এলে আপনি ক্লান্ত থাকেন কি না, তাই মা বারণ করে দিয়েছেন।

রেণু ও অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা আগে তুমি বলিত। শৈলজার সই একদিন আসিয়া, তুমি কথাটা দোষাবহ বলিয়া যাওয়াতে, শৈলজা তাহাদের আপনি বলিতে অভ্যস্ত করাইয়াছে।

শ্রীশ "ওঃ" করিয়া চুপ করলেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন—বুঝি বা শৈলজাও সেইজন্য আসেন না!

ঘণ্টা কয়েক পরে শৈলজা আসিল। শ্রীশ একটু হাসিয়া বলিলেন—এতক্ষণে বুঝি সময় হল?

শৈলজা বলিল—সইকে আর তার মেয়ে দুটিকে আজ নেমতন্ন করেছিলাম কি না। তাই তাদের কাছে বসে ছিলাম। জল খেয়েছ ত?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ দেখ, তুমি কি আজ সন্ধ্যার আগে বেরুবে?

কেন?

আজ একবার ওদের নিয়ে বায়স্কোপে যাব। তোমার গাড়ী কি দরকার হবে?

না। আমি তো বিকালে হেঁটে বেড়াই। তোমরা গাড়ী নিয়ে যেও।

তুমি আমাদের নিয়ে যেতে পারবে, না বিষ্ণুকে বলব? বিষ্ণু শৈলজার ভাইপো। এখানে কলেজে পড়ে।

শ্রীশ বলিলেন—তোমার সই যখন রয়েছেন, বিষ্ণুর যাওয়াই ভাল।

তাই তবে যাই। যাই তবে? ওদের জলটল খাইয়ে, রাতের খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে, তবে ত ছুটি পাব। বলিয়া শৈলজা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীশ বাহিরে তাঁহার লাইব্রেরীতে আসিয়া বসিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, সে দিন আর এ দিন!

অল্প অদশনে সে দিনকার ব্যাকুলতা আজিকার অর্থ ও স্বচ্ছন্দতার আড়ালে কোথায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে!

স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া শত কাজ ফেলিয়া সম্মুখে বসিয়া না খাওয়াইলে যাহার তৃপ্তি হইত না, আজ একটা মুখের কথাতেই তাহার সমস্ত উদ্বেগ প্রশমিত হইয়া যায়। এইরূপে হৃদয়কে অনশনে রাখিয়া শরীরকে খাদ্য যোগাইবার জন্যই কি মানুষ ঐশ্বর্য্যের কামনা করে!

এই ত সেদিনের কথা—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর রাত্রে টিউশনি শেষ করিয়া যখন তিনি বাড়ী ফিরিতেন, সংসারের সমস্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া কি করিয়া তাঁহার স্ত্রী তখনও জাগিয়া থাকিত, ও হাসিমুখে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইত, আজ শ্রীশ তাহা ভাবিয়াও পান না। শৈলজার সহিত গল্প করিয়া খাইতে-খাইতে তাঁহার সমস্ত অবসাদ ও ক্লান্তি কোথায় চলিয়া যাইত! আজকাল কথা কহিবার প্রচুর অবসর হইয়াছে বলিয়া কি সে ইচ্ছাটুকুও চলিয়া গিয়াছে?

সর্ব্বাপেক্ষা কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্যের কথা যে, যখন সেই

সেবা ও আনুরক্তির প্রাচুর্য্যে তাহার দরিদ্র জীবন পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তখন ত ইহার মর্য্যাদা তিনি বুঝেন নাই। যদি বুঝিতেন, তাহা হইলে সে সমস্তের পরিবর্ত্তে আজিকার এই নীরস-ঐশ্বর্য্য কামনা করিতেন না।

হায় রে মানুষের মন! না হারাইলে বুঝি সে কোন কিছুরই মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না!

ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবু, রাত্রি হয়ে গেছে। খাবার দেওয়া হবে?

খাবার? কত রাত হয়েছে? বলিয়া নিজেই ঘড়ি দেখিলেন—দশটা বাজিয়া দশ মিনিট!

শ্রীশ উঠিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। ব্রাহ্মণ খাদ্য দিয়া গেল। শ্রীশ খাইতে বসিলেন। ভৃত্য পাখা লইয়া বাতাস করিতে আসিল। শ্রীশ নিষেধ করিলেন। আজ খাবার এ সব ভাল লাগিল না। শ্রীশ নিঃশব্দে খাইয়া উঠিলেন।

শয়ন গৃহে আসিয়া শৈলজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কখন ফিরলে? শৈলজা বলিল—ঘণ্টাখানেকের উপর হবে। ভারী গরম, শরীরটা যেন অবশ মত হয়ে গেছে। তুমি কখন বেড়িয়ে ফিরেছিলে?

আমি লাইব্রেরীতেই ছিলাম। আজ আর বার হই নি।

কেন যাও নাই সে কথাটাও শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল না। মেয়েমানুষও সুখে থাকিলে ছোট-খাট জিনিষকে এমনি করিয়া তুচ্ছ করিতে শিখে।

শ্রীশ একখানি বই লইয়া বসিলেন। শৈলজা খাইতে গেল।

খাইয়া আসিয়া শৈলজা বলিল—দেখ, এ ঠাকুরকে দিয়ে খাবার-টাবার করান চলে না। তুমি সেই রকম হিংয়ের কচুরি খেতে চেয়েছিলে। এত করে ওকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলাম, কচুরি করেছে দেখেছ একবার, মুখে দেওয়া যায় না।

শ্রীশ শুধু বলিলেন—হ্যাঁ, ভাল হয় নি বটে!

শৈলজা বলিল—এক বামনি সেদিন এসেছিল। জলখাবার টাবার নানারকম তৈরী করতে জানে। আমি ভাবছি তাকেও রাখি। জলখাবার তৈরী করবে। ছেলে-মেয়েদের খাওয়াবে-দাওয়াবে। কি বল!

বেশ, রাখ, শ্রীশ উত্তর দিলেন। কচুরির কথা উঠায় শ্রীশ অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। সেকালে শৈলজার হাতের কচুরী তিনি কত না প্রশংসা করিয়া খাইতেন। বুঝি সে কথাটা অনেক দিন তাহাকে ব্যথা দিতেছিল, তাই বলিয়াছিলেন সেই রকম কচুরী একদিন খাওয়াও না। শ্রীশের ইচ্ছাটা ছিল শৈলজার হাতের তৈয়ারী খাবার খাইবার। এই সামান্য কথাটা শৈলজা বুঝিল না, তাই ব্রাহ্মণের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াই সব শেষ করিয়া ফেলিল।

একটু বেশী রাতে শয্যায় আসিয়া শ্রীশ দেখিলেন, শৈলজা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া শৈলজার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শ্রীশ ভাবিলেন—কেন এমন হইল?

বনবাসের সুখ দুঃখের সঙ্গিনী সীতাকে হারাইয়া, ঐশ্বর্য্যের মাঝে এ স্বর্ণ সীতা লইয়া কি করিব? যে দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এত কষ্ট করিলাম, সে দুঃখ আজ দূর হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনের সুখগুলিও লুপ্ত হইয়া, শূন্য স্থানে দুঃখ ফুটিয়া উঠিল। এ যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল। একটিকে নষ্ট করিতে যাইয়া অপরটিও শুকাইয়া গেল! কিন্তু অন্তরটাকে বুভুক্ষু রাখিয়া, খালি শরীরকে পুষ্ট করিয়া মানুষ কি করিয়া সুখী হইবে!

শ্রীশ ভাবিলেন—আজিকার সুখহীন এই ঐশ্বর্য্য ও বহুবিধ বিলাসিতার উপকরণ ত্যাগ করিয়া আবার কি সেই পুরাতন জীবন ফিরাইয়া আনা যায় না!

হায় রে মানুষের মন! হায় তাহার সুখ-দুঃখ!

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(২)

হিমালয়ের ওপারের কথা

সন্তান জন্মগ্রহণ ক'রলে তিব্বতে সেটা একটা বিশেষ কিছু আনন্দের ব্যাপার ব'লে গণ্য হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী তিব্বতীরা জানে, যে ছেলে আজ ঘটনাক্রমে তাদের ঘরে এসে জন্মালো, সে তাদের কেউ নয়! সে এক অপরিচিত আত্মা—তার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে আজ তাদের সন্তান রূপে জন্মলাভ করেছে! তবে এ বিশ্বাস তাদের থাকা সত্ত্বেও, তিব্বতী পিতা-মাতারা তাদের নব-জাত শিশুকে কোনও দেশের পিতামাতার চেয়েই কম ভাল বাসে না। পিতামাতার স্বাভাবিক স্নেহ ও যত্নে তিব্বতী শিশুও সকল দেশের শিশুর মতই মানুষ হ'য়ে উঠে। শিশুর জন্মদিনে বৌদ্ধ মন্দিরে বা মঠে রীতিমত পূজা পাঠানো হয়। যারা সন্তান কামনা ক'রে কোনও কিছু মানসিক ক'রে রাখে, তারা তৎক্ষণাৎ তাদের সে মানত কার্য্যে পরিণত করে। ভারতবর্ষের মত তিব্বতেও

তিব্বতের শ্রীশ্রীদালাইলামা

কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানের মানই বেশী; তবে তার কারণ কিন্তু উভয় দেশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে যেমন অবরোধ, পণপ্রথা, বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি কতকগুলি কারণে কন্যা ভাগ্য বাঞ্ছনীয় নয়, সেখানে কিন্তু এসব বালাই কিছু নেই; কেবল দেশে কন্যার সংখ্যা অধিক বলে তারা মেয়ে হওয়াটা তেমন পছন্দ করে না।

নবজাত শিশুকে তারা স্নান করায় না। তিন দিন বাদে তাকে মাখন মাখিয়ে কিছু-দিন ধরে নিয়মিত ভাবে রোদে শুকোতে দেয়। কচি ছেলেকে তারা দুধ খাওয়ায় খুবই কম। তাকেও সেই 'মাখন চা' আর তাতে 'ৎসম্পা' গুলে গেলানো হয়! ছেলের ভবিষ্যৎ জানবার জন্য, আর গ্রহ-নক্ষত্রের যদি কোনও ফাঁড়া থাকে তবে শান্তি স্বস্ত্যয়ন ক'রে সেটা কাটিয়ে রাখবার জন্য, জ্যোতিষী আনিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব

মৃতের সৎকার

নরকপাল-মালা

ছেলের একখানি জন্মপত্রিকা প্রস্তুত ক'রে নেওয়া হয়। ভূত-পেত্নীর দোস-নজর প্রভৃতি এড়াবার জন্যে, ছেলের গলায় মন্ত্রপূত বড়-বড় মাদুলী, কবচও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। খুব সমারোহ ক'রে ছেলের একদিন নামকরণও সম্পন্ন হয়। একটা বেশ জাঁদরেল গোছ . নাম

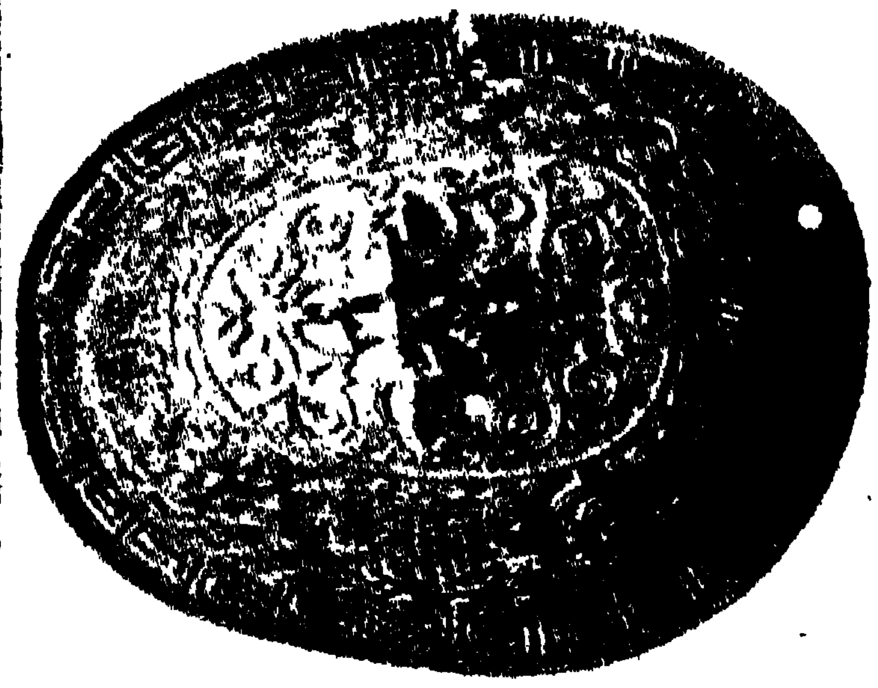

[illegible]কিত খুলির পানপাত্র

তিব্বতীয় উষ্ণীস

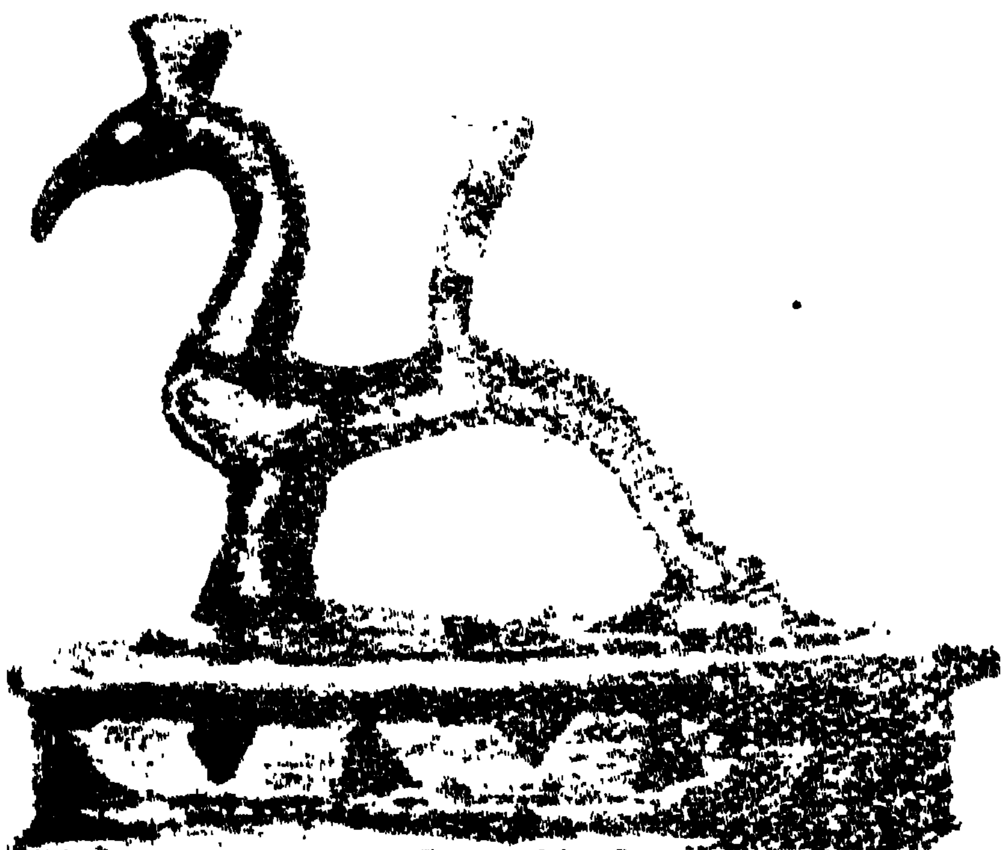

ধূপদান

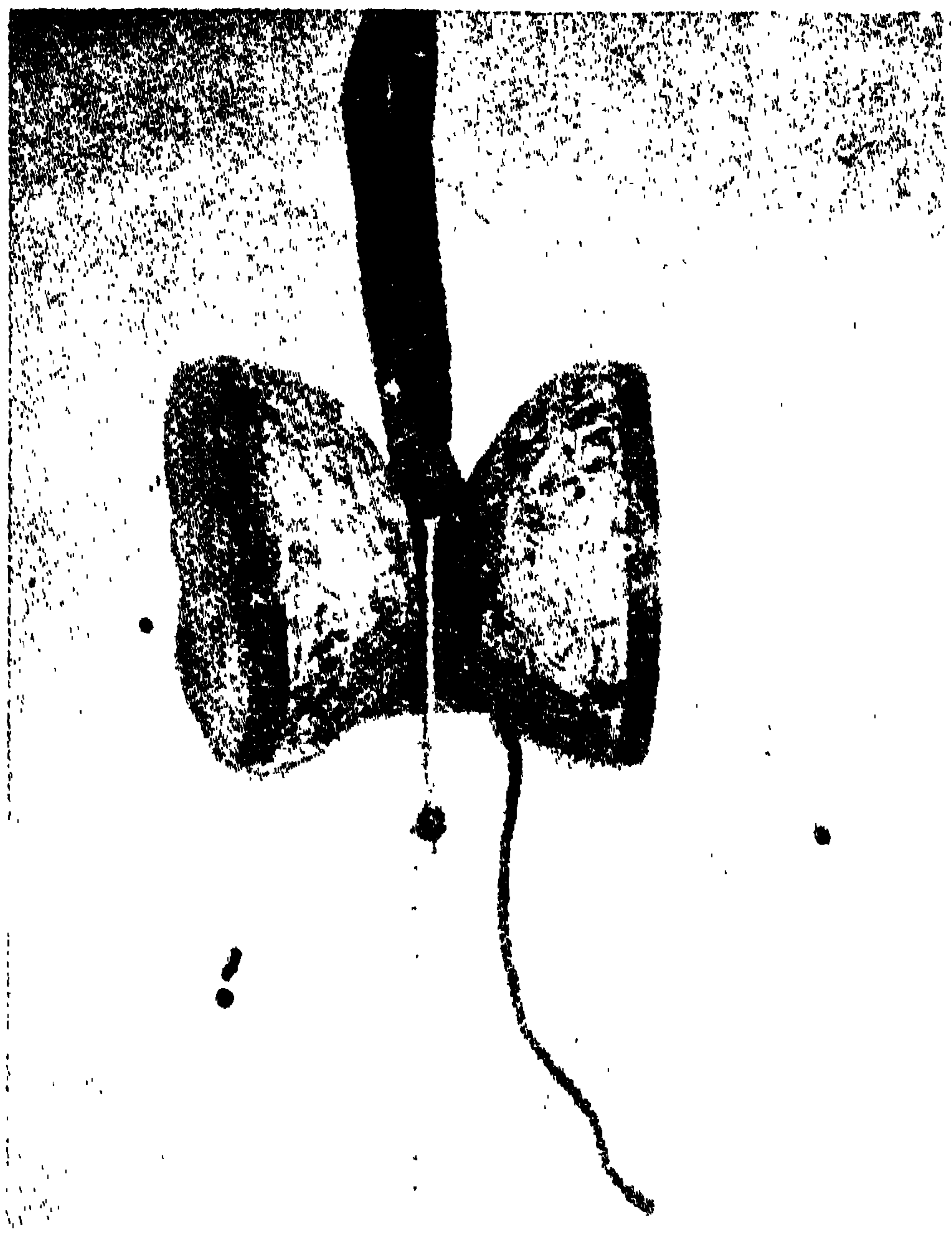

নরকপাল-নির্ম্মিত ডমরু

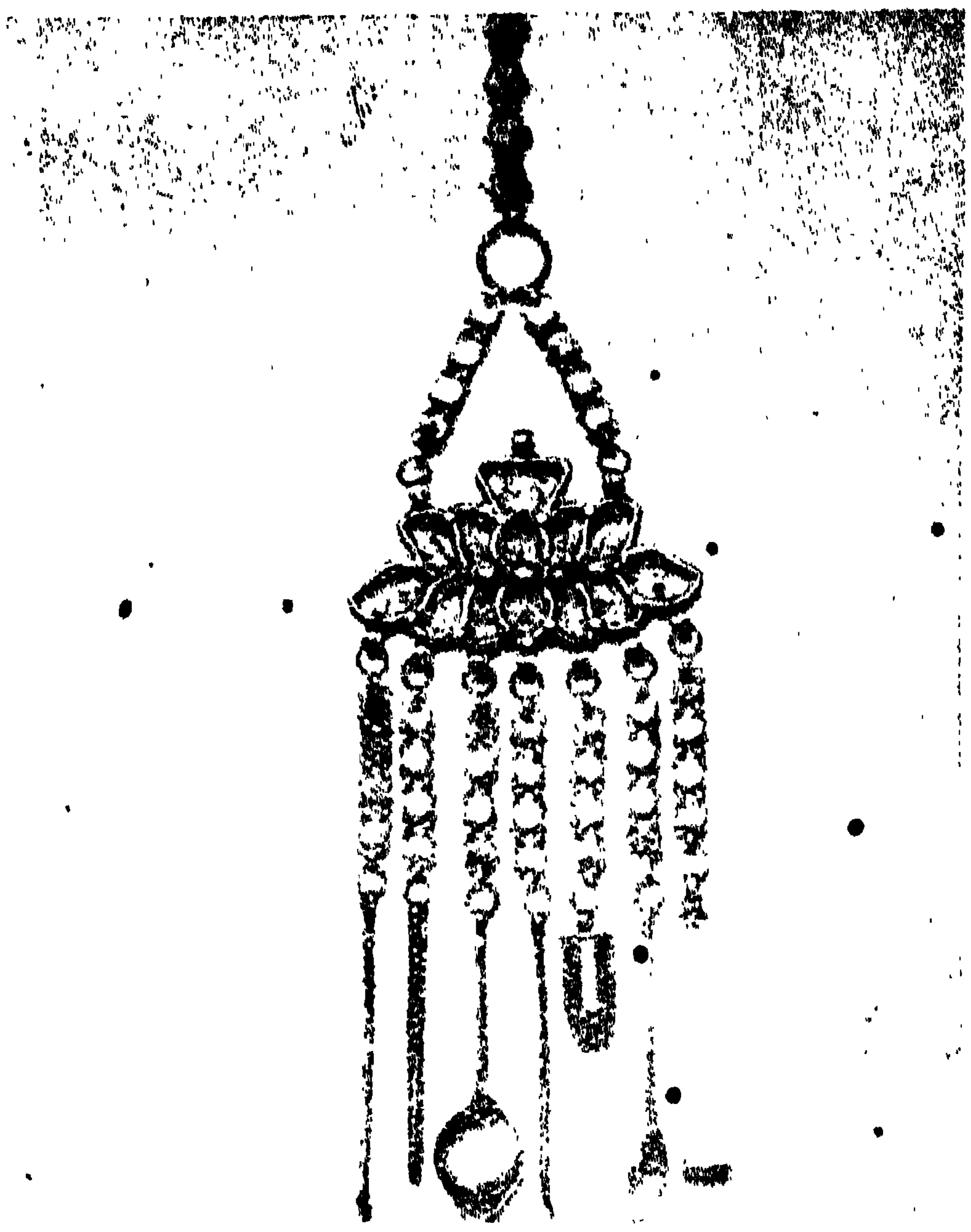

[illegible] ব্যবহার্য্য অলঙ্কার

(এই অলঙ্কারের সঙ্গে ক’একটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংযুক্ত আছে যথা—সোনা [illegible], তিল-তোলা, কান-খুস্কি, মাথার চামচে ইত্যাদি।)

পাহাড়ের পথে

(যেখানে পর্ব্বতারোহণের আর পথ নেই, সেখানে তিব্বতীরা কাঠের পথ তৈয়ার ক’রে নিয়েছে। খুব সাবধানে এই রকমের পথটুকু পার হ’তে হয়। একটীবার পদস্খলন হলেই মৃত্যু অনিবার্য্য!)

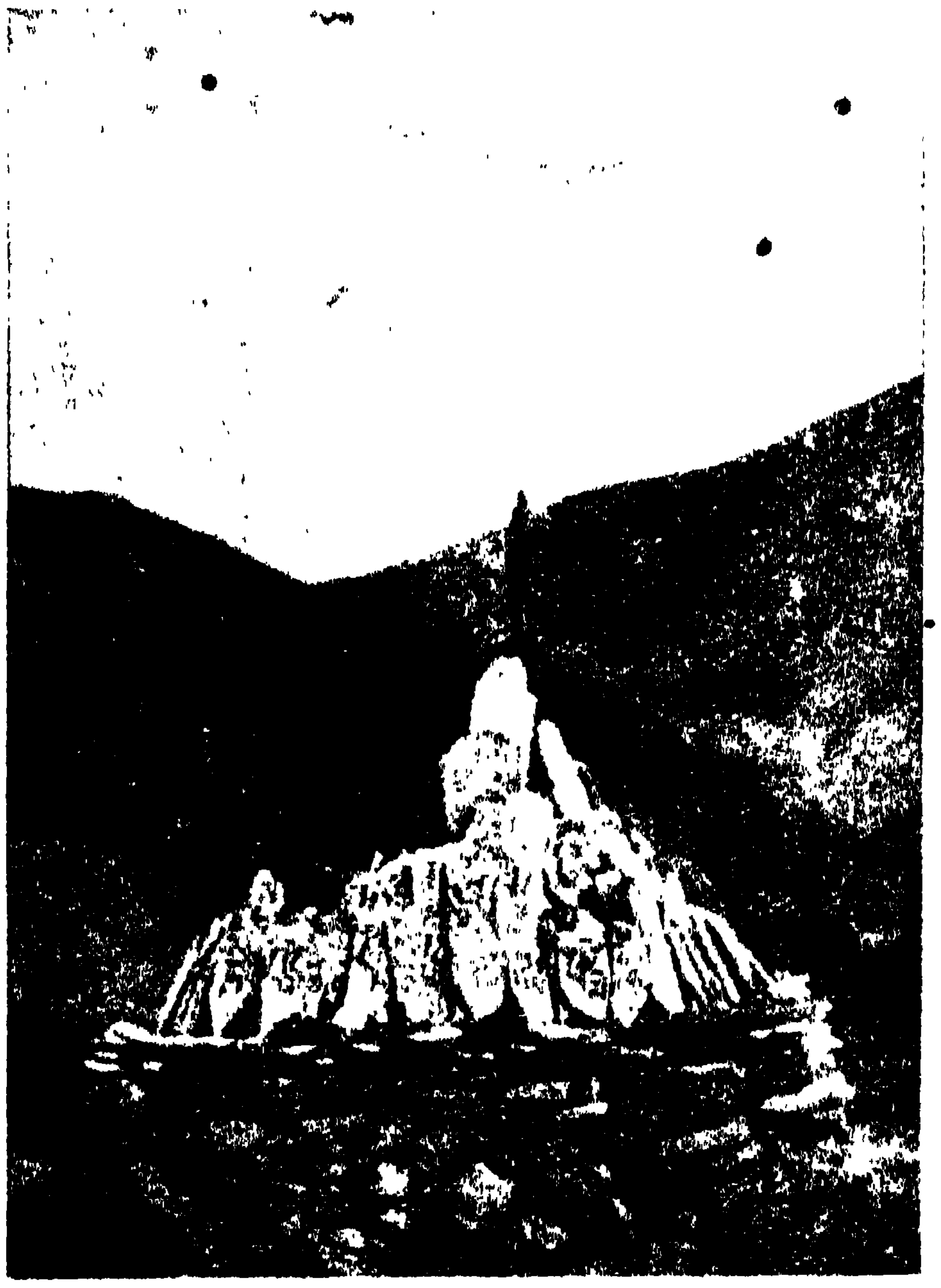

পর্ব্বতমূলে রচিত প্রস্তর স্তূপ। (মন্ত্র খোদিত)

রাখবার দিকে সকলের ঝোঁক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। 'দীর্ঘায়ু বজ্রপাশ' (দোর্জ্জে তেশেরীং) বা 'বিরাট ধ্বজপতাকা' (দার্গায়াস্) ইত্যাদি নামই অধিকাংশ ছেলেদের রাখা হয়। কোনও কোনও ছেলের আবার জন্ম বার ধ'রেও নামকরণ করা হয়। যেমন রবিবারে জন্ম হ'লে তার নাম হয়—'ভাস্কর' বা 'সূর্য্য' (ঞিইমা); কিম্বা শনিবারে জন্ম হ'লে তার নাম হয় 'শনি' (পেম্বা)। মেয়েদের নাম ওরা প্রায়ই বুদ্ধ জননীর

[illegible]ক্যো' শাসনকর্তা, তার পত্নীদ্বয় ও অন্যান্য পরিবার

স্বজাতি বা স্ব শ্রেণীর বাইরের কোনও বিদেশী মেয়েকে পছন্দ হ'লেও, স্বচ্ছন্দে বিবাহ ক'রতে পারে। সামাজিক বা শাস্ত্রীয় শাসনের কোনও বাধাই সেদেশে দুটী প্রণয়বদ্ধ তরুণ হিয়ার পরস্পর মিলনের মাঝখানে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে চিরজীবনের মত তাদের অসুখী ক'রে দিতে পারে না! মেয়েদের চারিদিকে সেখানে অবরোধ বা পর্দ্দা প্রভৃতি মানুষের পক্ষে কোনও লজ্জাকর ও অপমানজনক

ভারবাহী চমরীদল

নামানুকরণে 'তারা' বা 'দোল্‌মা' রাখে।

একে দেশের তিনভাগ লোকের মধ্যে একভাগের উপর লামা সন্ন্যাসী; তার উপর আবার এক স্ত্রীর বহুপতি বিধান থাকায়, অবিবাহিতা নারী ও তরুণী কুমারীদের সংখ্যা সেখানে এত বেশী যে, বিবাহেচ্ছুক যুবকেরা পত্নী নির্ব্বাচন ক'রে নেবার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা পায়। স্ত্রী পছন্দ করে নেবার অবধি এমন কি অসংযত স্বাধীনতাও সে দেশের ছেলেদের দেওয়া হয়! তারা,

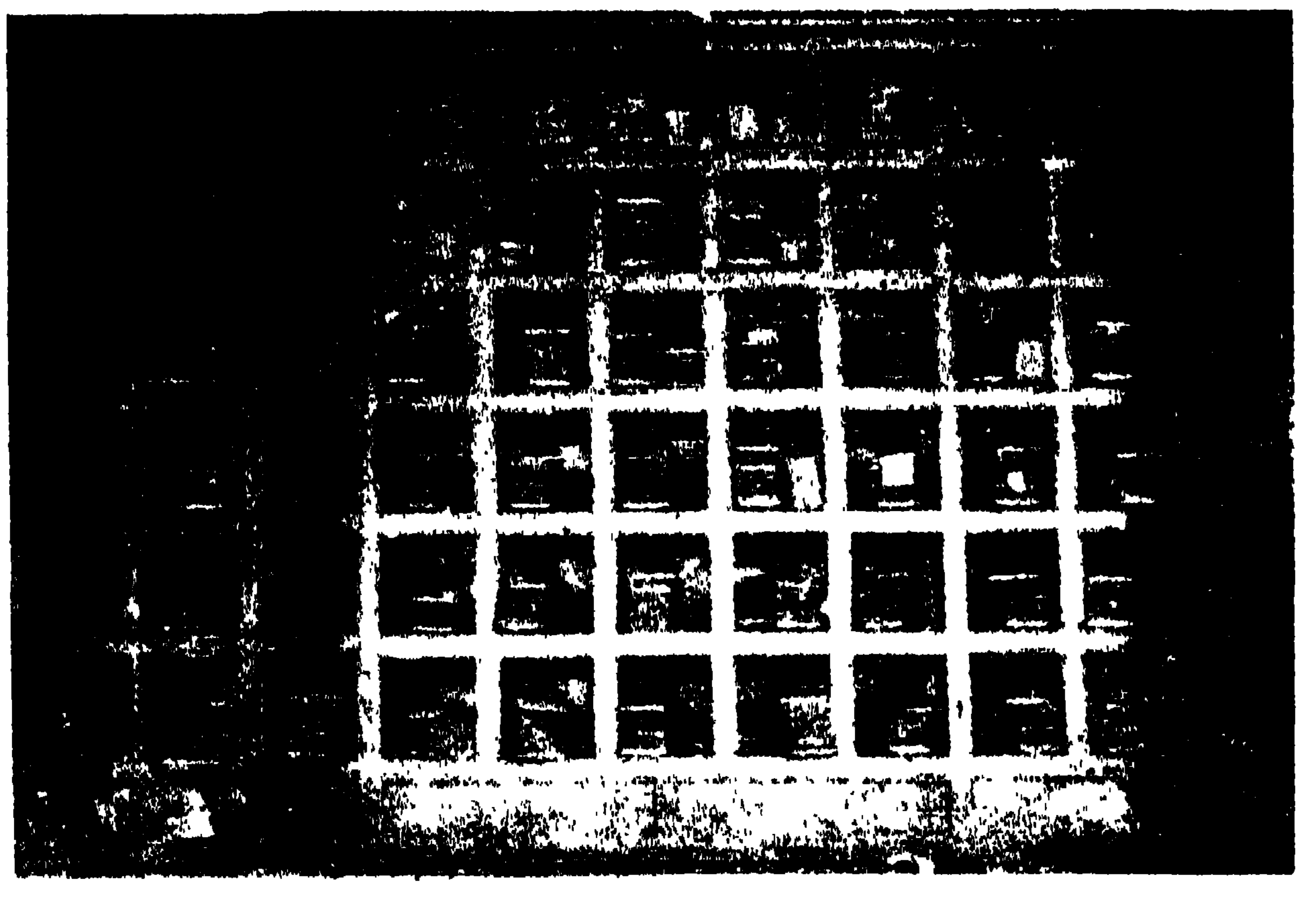

'লিটাং' লামাশ্রমীর গ্রন্থাগার

আড়ালের ব্যবস্থা নেই বলে, সে দেশে স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশ্‌তে পায়—পরস্পরকে ভাল বাসবার সুযোগ পায়! সেইজন্য সে দেশের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রকৃত প্রেম-পরিশুদ্ধ পরিণয় সংঘটিত হওয়াও সম্ভব হয়।

এমনি ক'রে যখন দুটি ছেলে-মেয়ে পরস্পরকে ভাল বেসে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'তে চায়, তখন পাত্রের কোনও বন্ধু পাত্রীর পিতা-মাতার কাছে সুহৃদের অন্তরী-ভিলাষ জ্ঞাপন ক'রে আসে। সে দেশের সেই অসভ্য জংলী বাপ-মা সভ্য জগতের শিক্ষিত পিতা-মাতার মত কোনও দিনই সন্তানের মনো-নীত পরিণয়ে প্রতিবাদী হ'য়ে হৃদয়-হীনতার পরিচয় দেয় না! বিবাহের দিন স্থির কর্ব্বার জন্যে কন্যা-

মধ্য তিব্বতের মহিলা

পক্ষের গৃহে একটী সভার আয়োজন হয়। বরের বন্ধু ঘটকটি মদ্য ও মূল্যবান উপহার সঙ্গে সেদিন পাত্রীর গৃহে উপস্থিত হয়; এবং সমবেত সভাবৃন্দকে মদ্যপানে পরিতুষ্ট ক'রে। উপস্থিত সকলের অনুমতি নিয়ে একটা বিবাহের দিন ধার্য্য হ'লেই, ঘটক-বন্ধু ভাবী ক'নের সিঁথীর উপর একটা কাঁচকড়া, শঙ্খ, ঝিনুক বা স্ফটিকের মালা পরিয়ে দিয়ে যায়। সেই মালাটি হ'চ্চে ক'নেকে বরের প্রথম উপহার। এ ছাড়া চায়ের বাট, পোষাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, অশ্ব, মদ্য, মাংস প্রভৃতি অন্যান্য উপঢৌকনও বরের বাড়ী থেকে ক'নের বাড়ীতে আসে।

বিবাহের দিন শালগ্রামশিলা, পুরোহিত ও মন্ত্র প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না! বর-ক'নেকে সেদিন কেবল এক-খানা বিবাহের চুক্তিপত্র সই ক'রে দিতে হয়—যদিও শুভ-দিনটা ধার্য্য ক'রে দেয় জ্যোতিষী রা পাত্র-পাত্রীর জন্ম-পত্রিকা দেখে গণনা ক'রে। কোন্ দিন কোন্ সময় এদের মিলন হ'লে সে পরিণয় সুখের হবে, এটা তারা বলে দিলেই, সেদিন আত্মীয়, বন্ধু প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়। নিমন্ত্রণ পেয়ে তারা সকলেই বরং ক'নেকে কিছু না কিছু উপহার পাঠিয়ে দেয়! বিবাহের দিন স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে বরের আত্মীয়-বন্ধুরা উৎসবের সাজে সুসজ্জিত হ'য়ে কনেকে আন্‌তে যায়—বর নিজে যায় না। তারা গিয়ে উপস্থিত হ'লেই, কন্যার পক্ষ থেকে তাদের মহাসমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে বসিয়ে খাওয়ানো

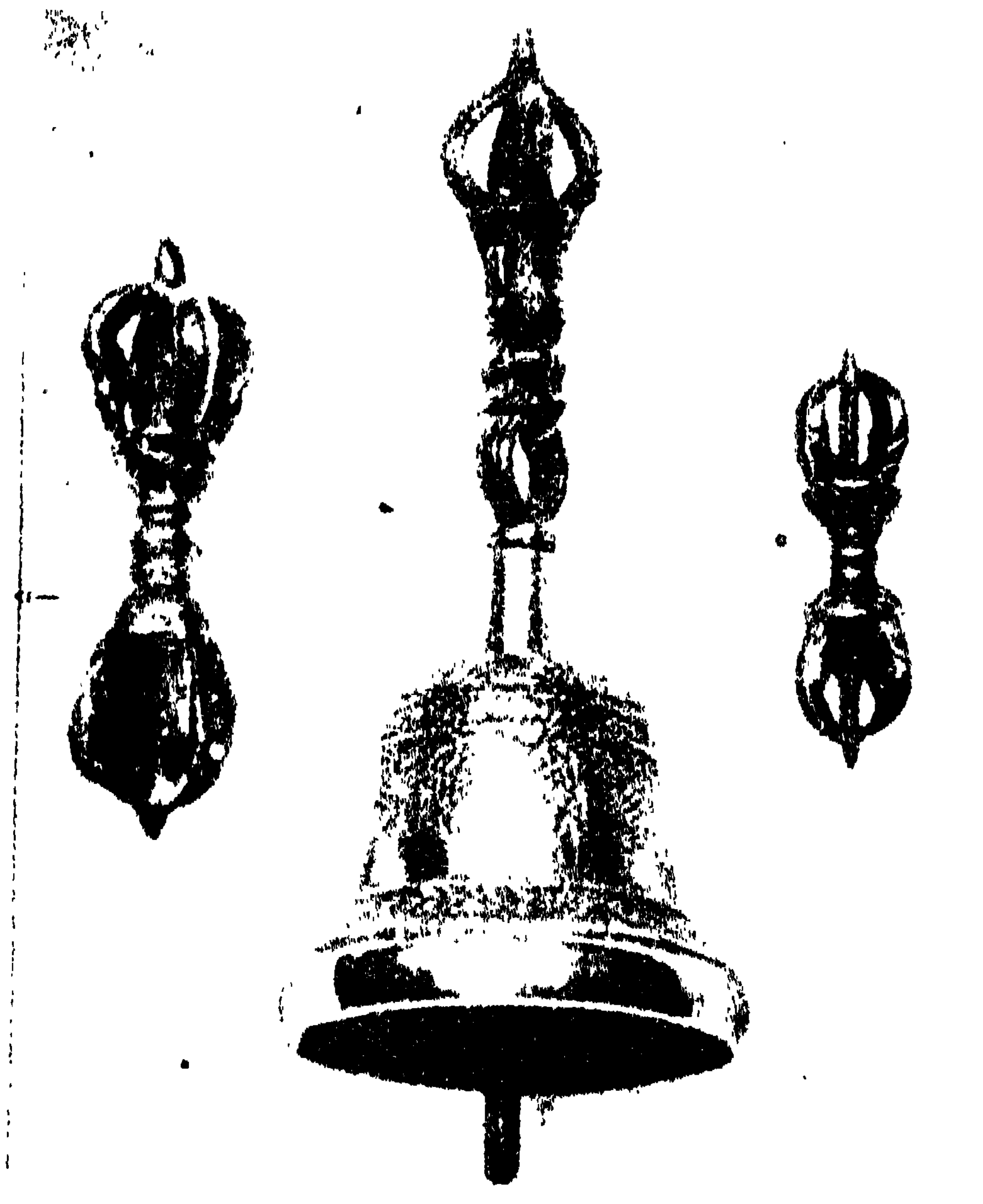

লামাদের নিত্য-ব্যবহার্য ঘণ্টা ও বজ্র-বাণ

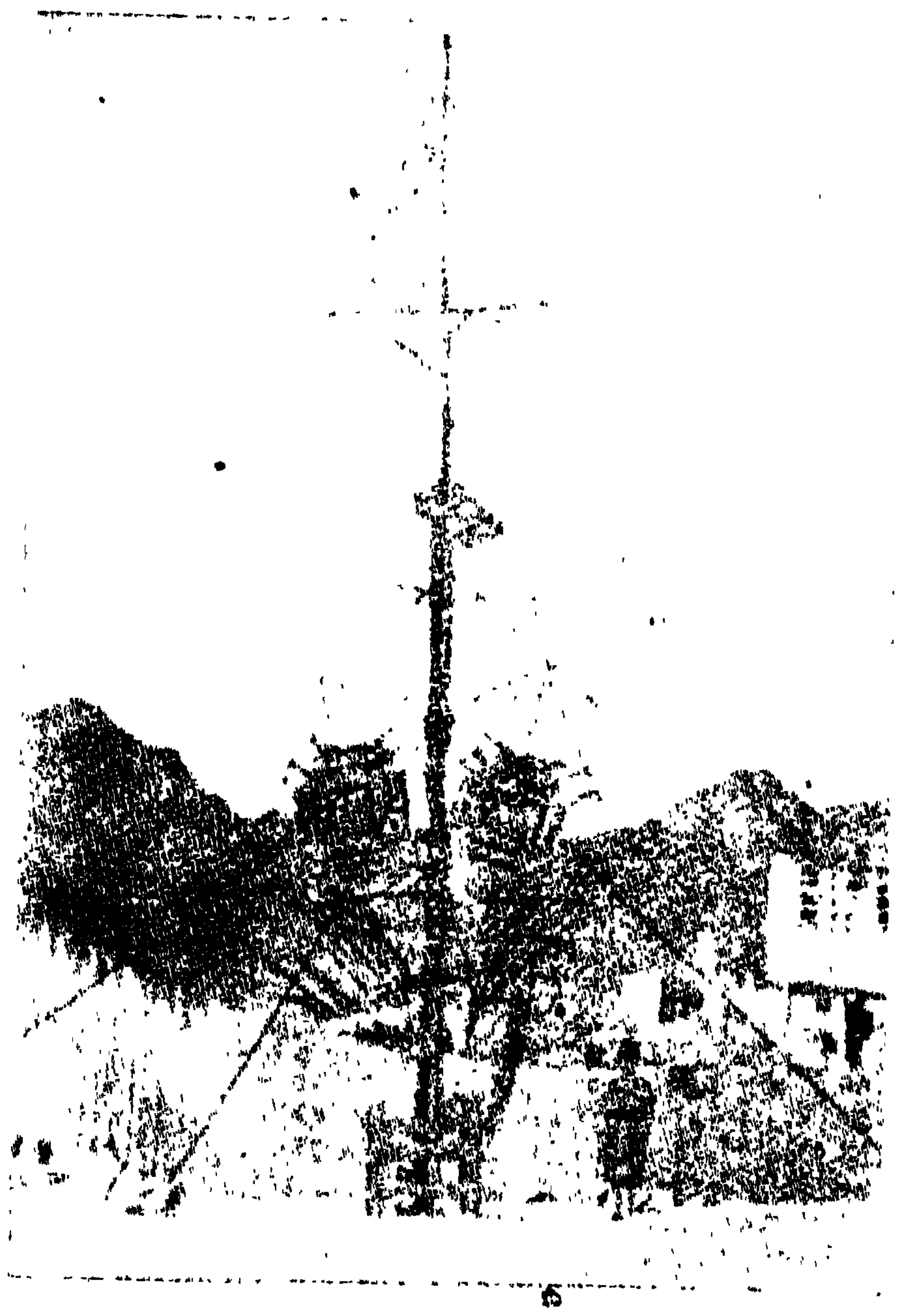

[illegible]

অশ্বারোহী দস্যু সর্দার

জপমন্ত্র ও জপমালা হস্তে তিব্বতী সাধু

(জপমালায় ১০৮টি বীজ আছে, জপমন্ত্রের প্রতি আবর্তনে একবার করিয়া জপমালার বীজ এক একটী সরানো হয়)

হয়। কন্যাপক্ষের আত্মীয়-বন্ধুরাও সেদিন নিমন্ত্রিত হ'য়ে তাদের সবচেয়ে ভাল পোষাক ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হ'য়ে সেখানে উপস্থিত থাকে। ভোজের পর ক'নের পিতামাতা মেয়ের গলায় শুভ চিহ্ন-স্বরূপ পূত শুভ্র গলা-বন্ধ বেঁধে দিয়ে এই ব'লে মেয়েকে বিদায় দেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, তুমি স্বামী-সোহাগিনী ও বীরপ্রসবিনী হও!" তার পর বর-কনের আত্মীয়-বন্ধুরা সকলে ধান্য বিকীর্ণ ক'রতে-ক'রতে বধূকে সঙ্গে নিয়ে বরের গৃহে উপস্থিত হয়। সেদিন বরের গৃহে আর বিশেষ কিছু উৎসব হয় না—কেবল বর-ক'নে সেদিন সর্ব্বপ্রথম একত্র বসে' পান-ভোজন ক'রে। তার পর নব-দম্পতী একত্র দাঁড়িয়ে সমবেত নিমন্ত্রিতগণের কাছ হইতে অভিবাদন ও উপহার গ্রহণ করে। এই সময় কেউ-কেউ একজন লামা পুরোহিতকে নিয়ে আসে—ভগবানের স্তবগান

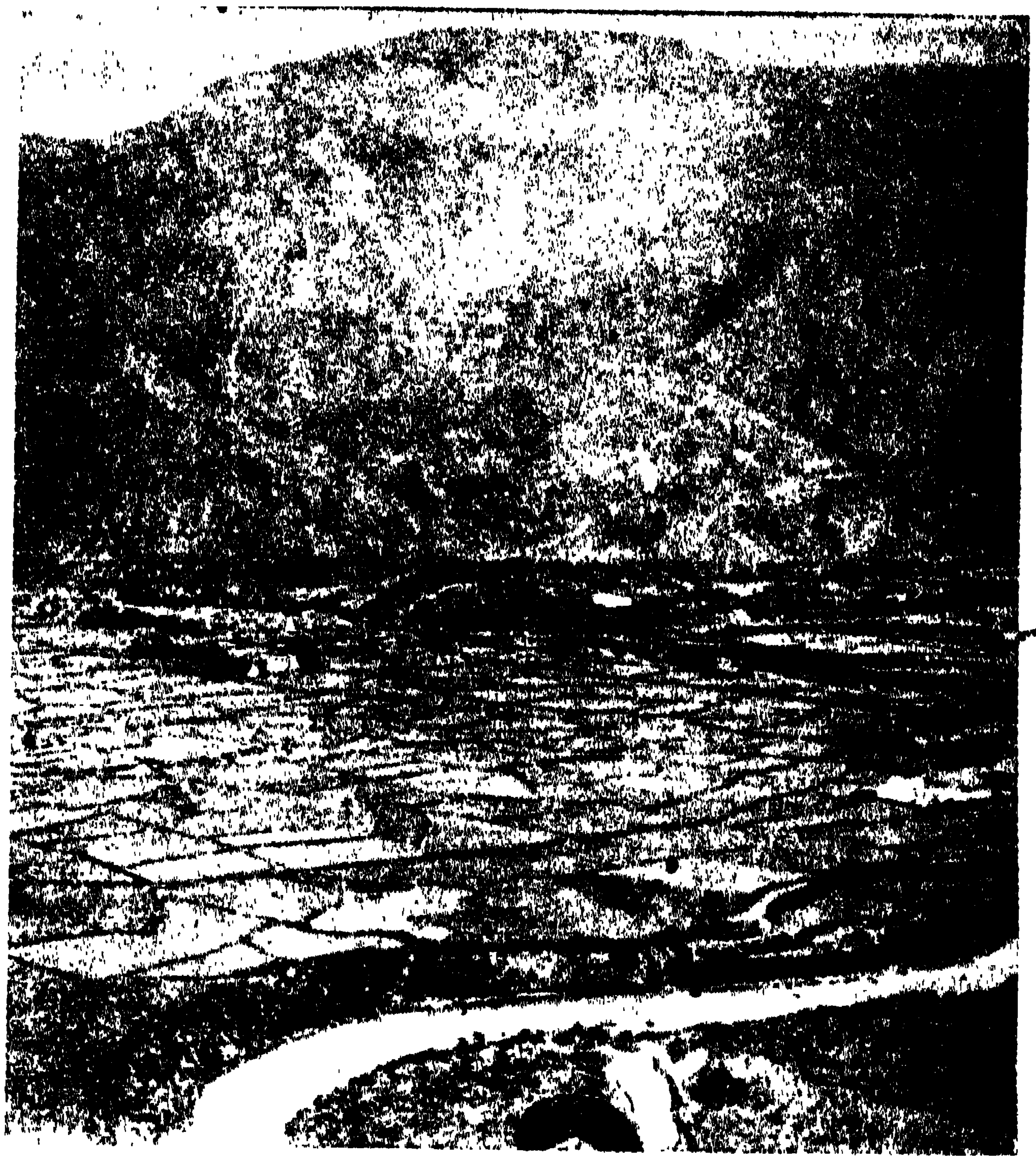

পাহাড়ের চাপা বাঁধা শস্য ক্ষেত্র

জাতকের নাটকাভিনয়

শোনাবার জন্যে, আর নব-দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বার জন্যে। এটা কিন্তু অবশ্য-কর্ত্তব্য বা বিবাহের একটা অঙ্গ-স্বরূপ নয়,—এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কর্ম্মকর্ত্তাদের খেয়ালের অধীন!

লবণাক্ত মাখন-চা, মদ, আর চাপাটি খেয়ে নিমন্ত্রিতেরা গৃহে ফেরবার সময় কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন আর 'ছুম্বা' ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যায়। তিন দিন ধরে বর-কনে সেজেগুজে তাদের সমস্ত বন্ধুদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরে আসে। যেদিন যেখানেই এই নবদম্পতী যায়, সেদিন তাদেরই ওখানে একটু ছোটখাটো উৎসবের আয়োজন হয়,—বরকনেকে মাখন-চা, চাপাটি আর মদ খেতে দেওয়া হয়। তাদের নিয়ে নৃত্যগীত প্রভৃতি আমোদের অনুষ্ঠানও হয়। বরকনেও যোগ দেয়।

অশীতিপর বৃদ্ধ তিব্বতী। (প্রায় এক মণ দশ সের ওজনের মাল অবলীলাক্রমে বহন ক'রে পাহাড়ে উঠ্‌ছে!)

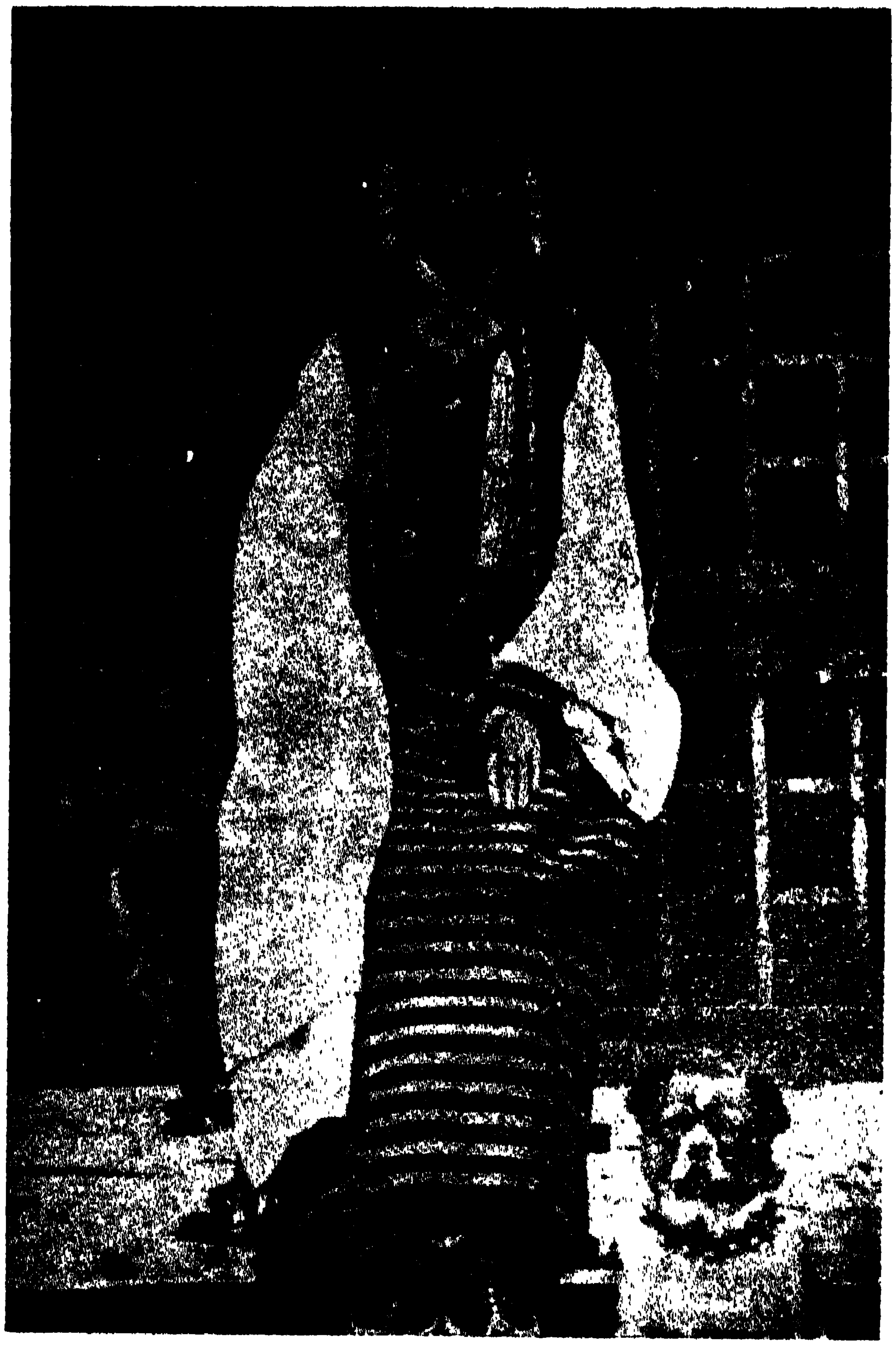

সুসজ্জিতা সম্ভ্রান্ত তিব্বতী মহিলা

এই সব আমোদ-উৎসবের দিনে যে বড়-বড় চায়ের কেটলী ব্যবহার হয়, সেগুলি দেখ্‌বার জিনিস। প্রকাণ্ড আকৃতি, তামায় গড়া, অথচ দেখ্‌তে সুশ্রী! আগা-গোড়া নানা কারু-কার্য্যে খোদিত; কিম্বা রৌপ্য বা পিতলের লতা, পাতা, ফুল প্রভৃতি সুচারু শিল্পে বিমণ্ডিত। কিন্তু চা পান করা হয় কাঠের বাটিতে! এই কাঠের পেয়ালাটি নিমন্ত্রিতেরা যে যার সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসে। নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা ঘুরে-ফিরে কেবল লক্ষ্য ক'রে বেড়ান, কার পেয়ালাটি নিঃশেষিত হ'য়েছে। অমনি তৎক্ষণাৎ আবার সেই শূন্য পাত্র পূর্ণ ক'রে দেওয়া হয়। যাঁরা এক পাত্রের বেশি পান ক'রতে ইচ্ছুক নন, তাঁরা কিছুতে পেয়ালাটি নিঃশেষ করেন না। মধ্যে-মধ্যে এক-

তিব্বতী গৃহ

একটি চুমুক মারেন, আর ব'সে গল্প-গুজব করেন! মাথার টুপি খুলে, সাম্নে দিকে হেঁটমুখ হয়ে,

দস্যুদল

কিম্বা জিহ্বা প্রদর্শন করে অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করা হ'য়।

তিব্বতীদের বিবাহে যেমন বিশেষ কিছু হাঙ্গামা নেই, তেমনি আবার বিবাহ-বিচ্ছেদে অর্থাৎ পতি-পত্নীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কোরতেও বিশেষ কোনও হাঙ্গামা করতে হয় না। উভয়ে পরস্পরের অনুমতি নিয়ে যে যার উপহারের দ্রব্য-সামগ্রী প্রত্যর্পণ করে পৃথক হয়ে যেতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও তদনুষঙ্গিক লামা সম্প্রদায় ছাড়াও, তিব্বতের বর্ব্বর যুগের আদিম ধর্ম্মসম্প্রদায় এখনও অল্প কয়েকটি আছে। এরা ভূত-প্রেতের পূজা করে। এদের পুরোহিতেরা শামান নামে অভিহিত। তারা সকলেই ভূতের ওঝা, ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যাবিশারদ বলে খ্যাত। প্রেতের নৃত্য তাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটা প্রধান অঙ্গ!

ব্যবসারম্ভে ও জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ব্যাধি, বীজ-বপন, শস্য-সঞ্চয়, গৃহ-নির্ম্মাণ, ভ্রমণ, এমন কি বর্ষারম্ভে পর্য্যন্ত তিব্বতীরা জ্যোতিষীর দ্বারা দিনক্ষণ দেখাইয়া শুভাশুভ গ্রহ-বিচার করিয়া প্রয়োজন-মত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও পূজা-অর্চ্চনাদির দ্বারা গ্রহদেবতার প্রসন্নতা কামনা করে,—উৎসব, সৎকার ও চিকিৎসা প্রভৃতি আরব্ধ করে। প্রতিদিনের বারদোষ, বারবেলাটুকু পর্য্যন্ত তারা মেনে চলে। এতটা গ্রহবৈগুণ্য, আর দেবতা ও অপদেবতার অপ্রসন্নতায় ভয়ে সদাই সন্ত্রস্ত থাকায়, তিব্বতীরা ভারতবাসীদের মত হরেক রকম মন্ত্রপূত তাগা, তাবিজ, কবচ, মাদুলী প্রভৃতি ব্যবহার করে। শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের নামাঙ্কিত ও উপদেশ-সম্বলিত ধ্বজ-পতাকামালা প্রতি গৃহচূড়ে প্রোথিত ও প্রলম্বিত দেখা যায়। বিশেষতঃ বিপদসঙ্কুল গিরিপথে,

ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা। (ক্রমে বন্দুক ধনুকের স্থান অধিকার করে নিচ্ছে)

ভূতাবিষ্ট বৃক্ষশাখায়, মন্দির ও মঠশীর্ষে এই ব্যবস্থার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

চাষের সময় অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় নিবারণের জন্য গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী সকল

সম্প্রদায়ের তিব্বতীরাই ঐন্দ্রজালিকদের সাহায্য গ্রহণ করে। ঐন্দ্রজালিকরা যে মন্ত্র প্রভাবে প্রাকৃতিক ঘটনাকেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, এ বিষয়ে তিব্বতীদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। বড়-বড় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও রাজ্যশাসন বিভাগের কর্ত্তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐন্দ্রজালিকদের দ্বারস্থ হতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। এদিকে আবার বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা ও উপদেশের গুণে তারা এটাও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে যে, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলেই মানুষ কানা, খোঁড়া বা বোবা হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়! বৌদ্ধ জাতকের

গিগি-মরুতোৎসব

(বসুধা ও বায়ু দেবতার পূজার উদ্দেশ্যে তিব্বতের এক সম্প্রদায়ের লোক উৎসবের অনুষ্ঠান করে। একটি আকাশস্পর্শী ধ্বজা মাটিতে প্রোথিত ক'রে পর্ব্বতের চূড়ায় তাহাতে পাঁচটি লূতাতন্তু নির্ম্মাণ করে এই পূজার আয়োজন হয়)।

গল্পগুলি এই শিক্ষার প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে! এই জাতকের গল্প অবলম্বনে তিব্বতী ভাষায় বহু নাটক রচিত হয়েছে। পাল-পাক্কাণে উৎসবের দিনে মহাসমারোহে পুরোহিত সম্প্রদায় মুখে অদ্ভুত জীবজন্তু, ভূত, প্রেত ও দৈত্য দানবের মুখোস পরে, নানা রহস্যময় অলৌকিক ব্যাপারের অভিনয় প্রদর্শন করেন। নাটকের প্রত্যেক

ভৌতিক নৃত্য

এই নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় দেখ্‌বার জন্য দলে-দলে লোক আসে। এদের নাট্যাভিনয় রঙ্গমঞ্চের উপর হয় না, অনেকটা আমাদের দেশের যাত্রার আসরের মত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অভিনীত হয়। কখন-কখনও লামা ও অঙ্কের ব্যবধান-কালে, অভিনেতাদের ক্ষণিক অবসর কালে, পুরুষ নৃত্যকরেরা নানা অঙ্গভঙ্গী দেখিয়ে দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন করে। প্রত্যেক নাটকের মূল উদ্দেশ্য থাকে লোকশিক্ষা।

জীবিত অবস্থায় তিব্বতীরা ভৌতিক উৎপাতের ভয়ে যতটা না শশব্যস্ত থাকুক, কারুর মৃত্যু হবার পর তার প্রেতাত্মার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মৃতের আত্মীয়-বন্ধুরা অধিকতর উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে। এ জন্য তারা পুরোহিত এনে মৃত আত্মার প্রীতির উদ্দেশ্যে অনেক অর্থ ব্যয় করে—শ্রাদ্ধ, শান্তি, বন্দনা ও তর্পণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান আরম্ভ করে। ভারতবর্ষের অনুকরণে তিব্বতেও বৌদ্ধ স্তূপ ও চৈত্য প্রভৃতি তো আছেই; তা ছাড়া দেশের মৃত মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার জন্যও তারা অনেক ছোট-বড় স্তূপ, স্তম্ভ, মন্দির ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে রেখেছে। মৃত আত্মার পূজার সরঞ্জাম অধিকাংশই নরকঙ্কালে নির্ম্মিত। মানুষের মাথার খুলি সেখানে পানীয় নিবেদনের পাত্র স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। আবার করোটীর মুখে চামড়া এঁটে তাকে বাদ্য-যন্ত্রেও পরিণত করে নেওয়া হয়। উরুদেশের অস্থিকে শৃঙ্গবাদ্য স্বরূপ ধ্বনিত ক'রে ভূতগণের আবাহন করা হয়। পঞ্জরাস্থি দ্বারা পুরোহিতের যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত হয়। অঙ্গুলীর গ্রন্থি প্রভৃতি টুকরা অস্থিগুলি গ্রথিত ক'রে নিয়ে, প্রেত-পূজার মালারূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রলয়ঙ্করের প্রতিকৃতি

(ইহা তিব্বতীয় চিত্রকলার চমৎকার নিদর্শন। চতুঃপার্শ্বে লেলিহান অগ্নিশিখা পরিবেষ্টিত, অনলোদ্গারী বজ্র ও শোণিতপূর্ণ নরকপাল করে এই করাল সিংহবাহন প্রলয়ঙ্করের মূর্ত্তি ভীষণতার চরম কল্পনা!)

শব-সংকার বেদী (শকুনী, গৃধিনী, কুকুর প্রভৃতির ভোজনার্থ শব-দেহ এইরূপ প্রস্তুত বেদীর উপর রাখিয়া যাওয়া হয়, কেহ বা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেয়।)

মৃত্যুর পর যতক্ষণ না পুরোহিত এসে মন্ত্র দ্বারা তার আত্মার সদ্‌গতি করেন, ততক্ষণ আর কেহ মৃত-দেহ স্পর্শ করে না। কেবল মাত্র একখানা শ্বেত বস্ত্র মৃতের মুখে চাপা দিয়ে রাখা হয়। তিব্বতীদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পরও অন্ততঃ চারদিন মানুষের আত্মা মৃতদেহের মধ্যে বাস করে; আর পুরোহিত এসে যদি তার সদ্‌গতি করেন, তবেই সে আত্মার উদ্ধার হবে, এবং তার আত্মীয়-বন্ধুরাও নিরাপদ হবে। পুরোহিত এসে উপস্থিত হলেই সকলে মৃতের কাছ থেকে সরে যায়। সে ঘরের সমস্ত নির্গম পথ রুদ্ধ ক'রে দিয়ে, পুরোহিত একা মৃতের শিয়রে বসে মন্ত্র উচ্চারণ করে, তার আত্মার সদ্গতির পথ নির্দ্দেশ করে দেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হ'লে, তিনি মৃতের মাথা থেকে এক গুচ্ছ কেশ সজোরে ছিঁড়ে নেন! এটা করবার উদ্দেশ্য এই যে,

সেই ছিন্ন কেশের গোড়ার ছিদ্র দিয়ে মৃতের আত্মার সহজেই বেরিয়ে আসবার পথ পরিষ্কার করে দেওয়া! চুল ছিঁড়ে নেবার সময় যদি রক্তপাত হয়, তবে সেটা একটা শুভলক্ষণ বলে গণ্য হয়। আত্মার সুব্যবস্থা ক'র্‌তে পুরোহিতের প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় লাগে। এ কাজের জন্য তাঁরা বেশ আশাতিরিক্ত ভাবে পুরস্কৃত হন।

পুরোহিত মৃতের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে যখন ঘোষণা করে দেন যে, তার আত্মা নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গারোহণ ক'রেছে, তখন জনকতক লোকের ঠিকুজি-কুষ্ঠি মিলিয়ে দেখে, নির্দ্ধারিত দিন পর্য্যন্ত পুরোহিতেরা পালা করে মৃতের ঘরে রাত্রি জাগরণ ক'রে পাহারা দেন। সে ক'দিন তাঁদের অবিশ্রান্ত মন্ত্র-ধ্বনিতে কাণ ঝালাপালা হ'য়ে যায়। মৃতের আত্মীয়েরা শবের নিয়মিত ভোজনার্থে তার সম্মুখে বিবিধ খাদ্য-দ্রব্য রেখে আসে। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তার পান-পাত্রটি সদাসর্ব্বদা চা কিম্বা সুরায় পরিপূর্ণ ক'রে রাখা হয়। মৃতদেহ সৎকার ক'র্‌তে নিয়ে যাবার আগের দিন মৃতের গৃহে আত্মীয়-বন্ধুদের একটা পান-ভোজনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; কারণ সৎকার হয়ে যাবার

মুখোস-পরিহিত রহস্যময় অভিনয়

পর এক মাস আর ভয়ে কেউ সে বাটীতে জল স্পর্শ করে না।

মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যাদের গ্রহ-নক্ষত্র এক হয়ে যায়, তাদের উপর শব নিয়ে যাবার ভার পড়ে। তার পর পাঁজিপুঁথি দেখে সৎকারের দিনক্ষণ নির্দ্ধারিত হয় ও শ্রাদ্ধ-শান্তির তারিখ স্থির হয়। তার পর দড়ি-দড়া বেঁধে একটা চামড়ার থলের মধ্যে মৃতদেহটিকে বসিয়ে, গৃহ-কোণে একটি শয্যার উপর স্থাপন করা হয়; আর সেই শয্যার সামনে একখানা পর্দ্দা ঝুলিয়ে দিয়ে, চারিদিকে দীপ জ্বেলে দেওয়া হয়। অবস্থা অনুসারে আটটি থেকে আরম্ভ করে একশ' আট পর্য্যন্ত প্রদীপ দেবার ব্যবস্থা আছে। সংকারের

ঢাক,ঢোল, তুরি,ভেরী ও ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে,মিছিল করে শব নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির প্রধান আত্মীয় যদি স্ত্রীলোক হ'ন, তা হ'লে তাঁকে আর শবের অনুগমন ক'র্‌তে হয় না। কিন্তু পুরুষ হ'লে সে একেবারে যেতে বাধ্য। পুরোহিতেরা মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌তে-কর্‌তে আগে-আগে যান; তার পর আত্মীয়-বন্ধুরা, সবশেষ মৃতদেহ বহন করে শববাহকরা চলেন। মৃত ব্যক্তি যদি সম্ভ্রান্ত ও ধনী

হয়, তবেই তাকে শবাধারে বন্ধ করে নিয়ে যাওয়া হয়, নচেৎ সেই চামড়ার থলেই সম্বল। প্রধান পুরোহিত বরাবর শবের সঙ্গেই থাকেন। তিনি এক হাতে ডমরু-ধ্বনি কর্‌তে-ক'র্‌তে, অন্য হাতে শবাধার স্পর্শ করে চলেন। মৃতদেহ কবর দেওয়া বা দাহ করা তিব্বতের প্রথা নয়। তবে যারা সাধু-সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ বা দেশের প্রধান লামা, তাঁদেরই দেহ কেবল সমাধিস্থ ক'রে তদুপরি স্তূপ বা স্মৃতি-মন্দির নিৰ্ম্মাণ করে দেওয়া হয়। পুরোহিতের মৃতদেহ দাহ করা হয়; এবং সেই ভস্মাবশেষ মাটির সঙ্গে মেখে নিয়ে,

ডাঃ শেল্টন্‌
(তিব্বত-প্রবাসী আমেরিকান বৈদ্য-শ্রমণ। ইনি ১৭ বৎসর তিব্বতে বাস করিতেছিলেন; তথাপি সেদিন একদল দস্যুর আক্রমণে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে।)

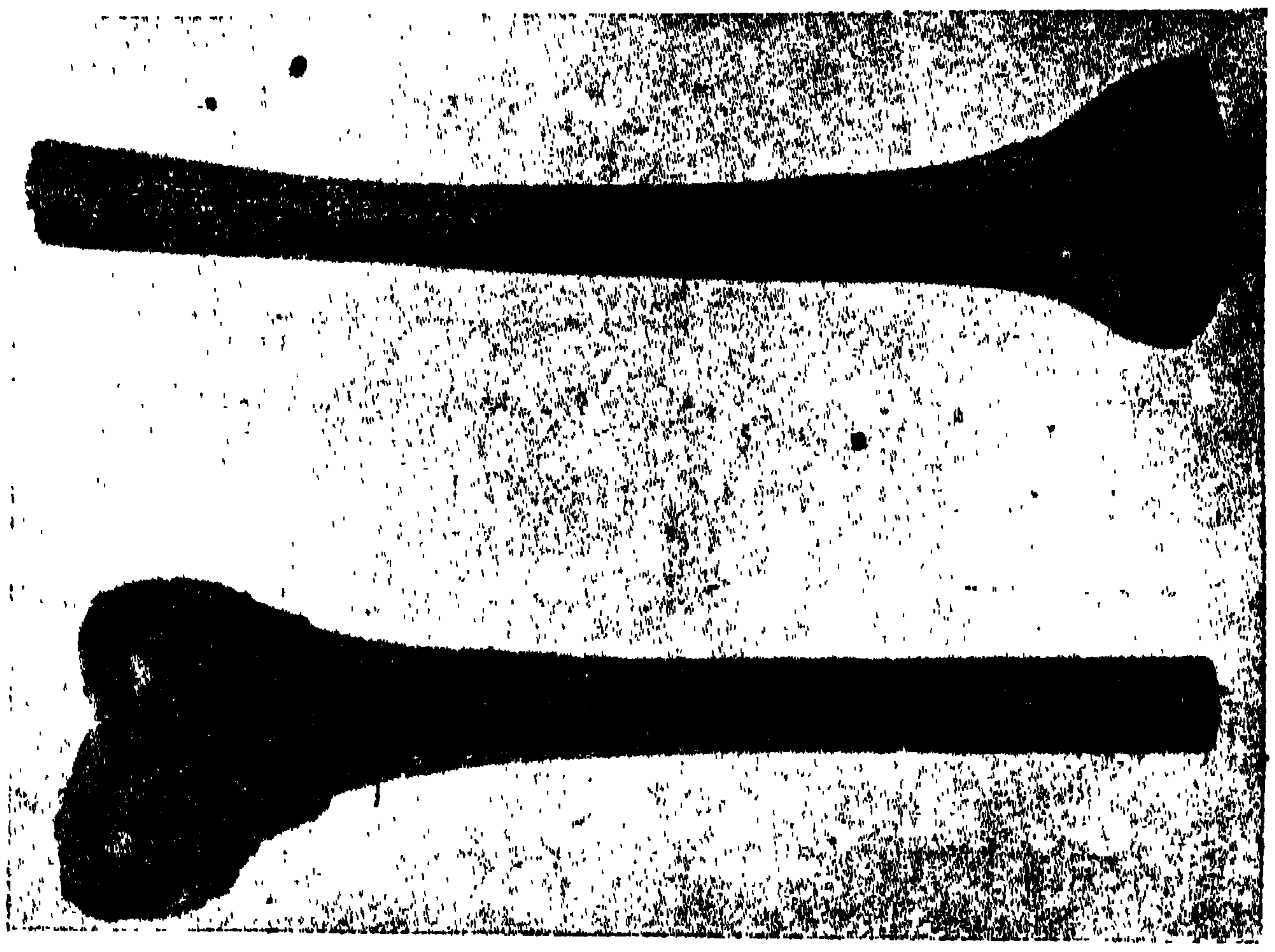

নর-অস্থি নিৰ্ম্মিত ভেরী

মণ্ডলাকৃতি ক'রে কোনও দেব-মন্দির বা স্তূপের মধ্যে রাখা হয়। সাধারণ লোকের মৃতদেহ প্রায়ই শকুনী গৃধিনী ও কুক্কুরের ভক্ষ্য স্বরূপ পাহাড়ের তলদেশে ফেলে রেখে আসা হয়। কেউ-কেউ বা আবার মৃতদেহকে খণ্ড-খণ্ড ক'রে কেটে ছড়িয়ে দিয়ে আসেন। শকুনী গৃধিনীর ভুক্তাবশেষ অস্থিখণ্ডগুলি কেউ বা মাটির মধ্যে পুঁতে দিয়ে আসেন; কেউ বা সেগুলি আটা-ময়দার মত জাঁতায় পিসে নিয়ে, ইহার সঙ্গে সেই অস্থিচূর্ণ মিশিয়ে, পশু-পক্ষীদের নিঃশেষ করে খাইয়ে আসেন। দীন, দরিদ্র, পাপী, অপরাধী, ব্যাধিগ্রস্ত, এমন কি নিঃসন্তান নারীদের মৃতদেহও অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে একগাছা দড়ী বেঁধে কুকুর-বেড়ালের মত টান্‌তে-টান্‌তে নদী বা সরোবরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসা হয়। মৃতের আত্মীয়েরা কেউ-কেউ তিন মাস, কেউ-কেউ এক বৎসরও অশৌচ পালন করেন। এই সময় তাঁরা সব রকম আমোদ-প্রমোদ, বেশভূষা বা বিলাসিতা বর্জ্জন করে বিষণ্ণ হৃদয়ে দিন যাপন করেন।

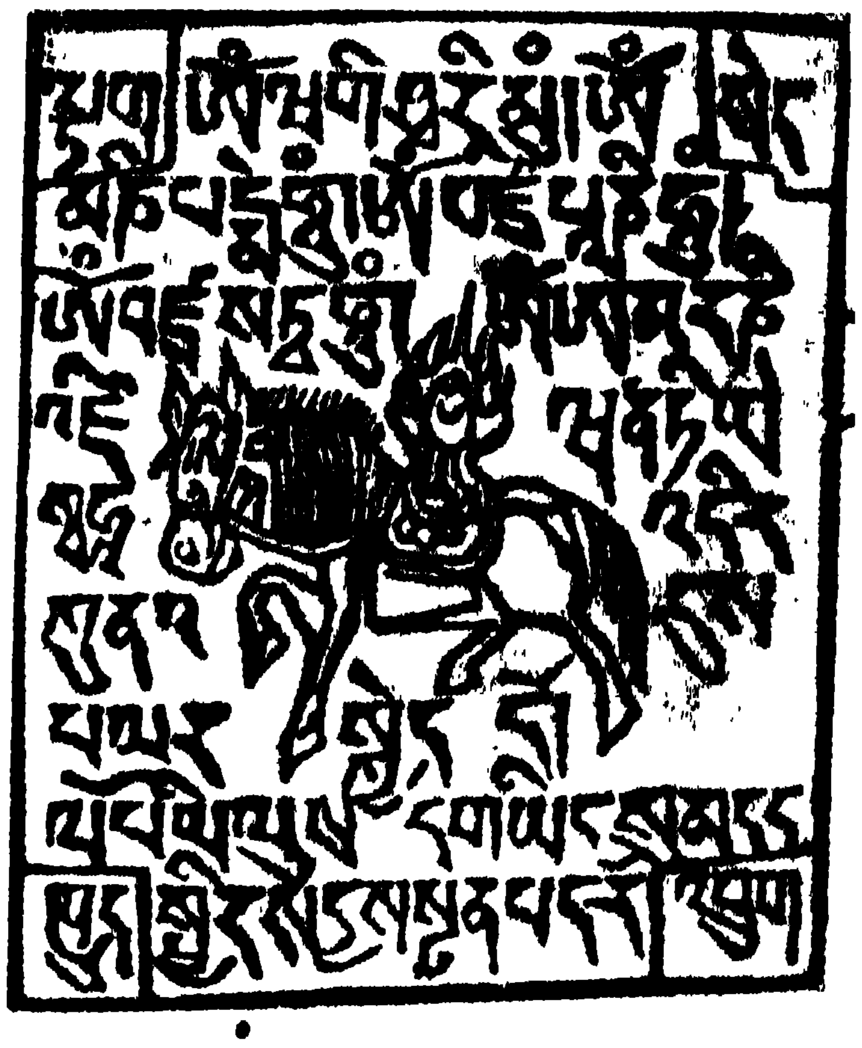

মন্ত্রাঙ্কিত পতাকা
(এই বিশেষ প্রকারের পতাকা সৌধ-শীর্ষে উড্ডীয়মান থাকিলে গৃহে অশনিপাত ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না।)

সকল সভ্য দেশের মত তিব্বতীরাও বৃদ্ধ অপেক্ষা অল্প-বয়স্কের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে। প্রতি মাসে বা প্রতি বৎসরে একদিন নিয়মিত রূপে মৃতের স্মরণার্থ শোক প্রকাশক অনুষ্ঠান হয়। সেদিন পুরোহিত এসে জন্ম-মৃত্যুর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেন। স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা করে পুনর্জন্ম-দেহান্তরবাদ ও নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রভৃতির আলোচনা করেন।

এই নির্ব্বাণ-মুক্তি কামনায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী তিব্বত ইহ-কালের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ" এই মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারলেই যে পরামুক্তি তাদের করতলগত হবে, এ বিশ্বাস তাদের সকলের মধ্যেই প্রবল। তিব্বতের প্রতি পর্ব্বত-গাত্রে, বৃক্ষকাণ্ডে, গৃহ-ভিত্তিতে, মন্দির-প্রাচীরে, ধ্বজ-পতাকায় সর্ব্বত্র অগণিতবার ওই মন্ত্রটি লেখা আছে দেখ্তে পাওয়া যায়! দালাই লামাকে তিব্বতীরা দেবতার মত ভক্তি করে। অনেকের বিশ্বাস, দালাই লামাকে তারা শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের অবতার স্বরূপ মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। বরং তাঁকে তিব্বতীরা বৌদ্ধদেবতা অবলোকিতেশ্বরের অংশ বিবেচনা করে' তাঁর পূজা করে। স্বর্গ ও নরকের বিধায়ক, জন্ম ও মুক্তির নিয়ামক এই দেবাদিদেব অবলোকিতেশ্বরের কৃপাকণা লাভ করবার জন্য তিব্বতীরা দিবারাত্র জপ ক'রবে "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ! শিশুর প্রথম বাক্য-স্ফূর্ত্তির সঙ্গে-সঙ্গে তাকে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে শেখানো হয়। তিব্বতের আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে সদাসর্ব্বদা এই মন্ত্র ধ্বনিত হ'চ্ছে। সংসার-ধর্ম্ম ও বিষয় কর্ম্মরত গৃহস্থের মুখেও এই মন্ত্র—সংসার-বিরাগী, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখেও এই মন্ত্র---জীবনের অপরাহ্ণবেলায় মরণ-পথের আসন্ন যাত্রীর মুখের শেষ কথাও এই মন্ত্র—

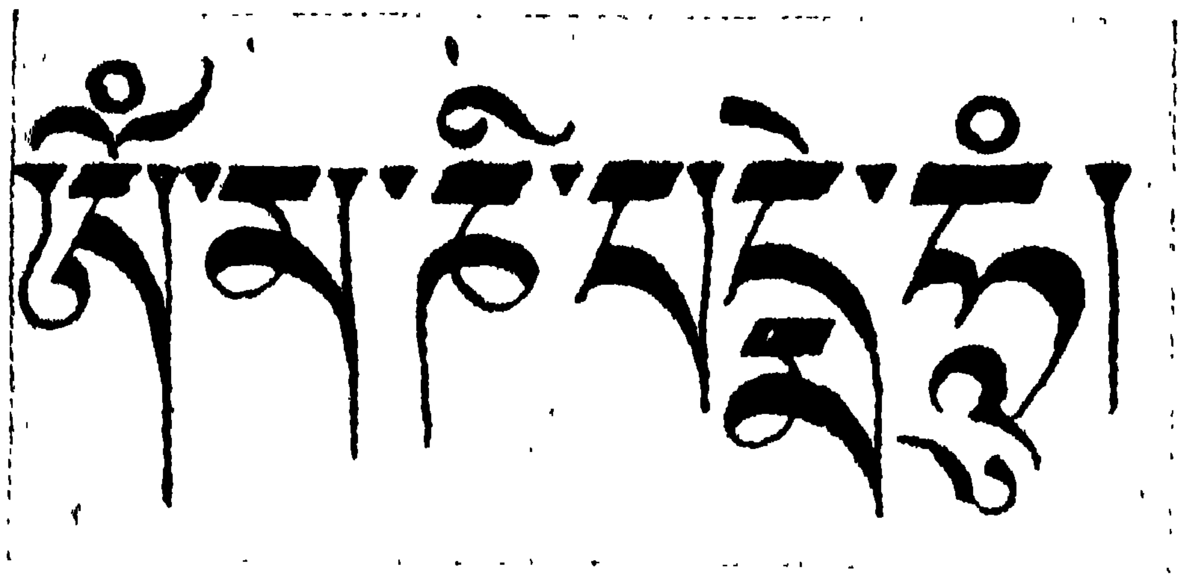

ওঁ মণিপদ্মে হুঁ

"ওঁ মণি পদ্মে হুঁ" *

---

* মিঃ এল, এ, ওয়াডেল সি-বি, সি-আই-ই, এফ্-আর-এ আই-রচিত 'তিব্বত' অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত।

আশ্চর্য্য কাষ্ঠ

শ্রীবৈদ্যনাথ মিত্র

সম্প্রতি হাজারিবাগে একটী অতি আশ্চর্য্য কাষ্ঠখণ্ড দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহার অদ্ভুত শক্তি এই যে, অন্ধকারে রাখিলেও কাষ্ঠখানি হীরক-খণ্ডের মত জ্বলে। ইহা হাজারিবাগের নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামের একটী চাষার ছেলে পাইয়াছে। এই কাষ্ঠ লইয়া হাজারিবাগ কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। কলেজের রসায়নাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক উপায়ে 'Calcium Sulphite' কাষ্ঠ খণ্ডটীর উপর জমিয়া যাওয়াতে উহা ঐরূপ ভাবে জ্বলিতেছে। আরও এক কথা, কাষ্ঠ খণ্ড হইতে ছোট এক টুকরা ভাঙ্গিয়া দেখা গেল, উহার উপরিভাগই শুধু জ্বলিতেছে; কিন্তু ভিতর জ্বলে না।

যাহাই হউক, মোটের উপর ইহা একটী আশ্চর্য্যের বিষয়, কথাটা এত শীঘ্র চাপা পড়িয়া যায় নাই; বিজ্ঞান-বিভাগের সকলেই এই কাষ্ঠখণ্ডের তথ্য জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন। কাষ্ঠখানির অদ্ভুত গুণের যথার্থ কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিলে আমাদের সন্দেহ দূর হয়।

মুকুল

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

এক

শরতের স্নিগ্ধনীল আকাশে বকের সুকোমল পালকের মত সাদা মেঘ ছড়ানো; খোকার মুখের সুন্দর হাসির মত সুমধুর আলো ঝরিয়া পড়িতেছে; কালো পিচে মোড়া কলিকাতার রাস্তার ওপর, মোটর গাড়ী ট্রামের ওপর, পূজার বাজারের জনপ্রবাহ ও সুসজ্জিত দোকানের সারির ওপর শরৎ-প্রভাতের আলো অপরূপ মায়া মাখাইয়া দিয়াছে।

সপ্তমী পূজার প্রভাতে কলেজ ষ্ট্রীটের কাপড়ের দোকান-গুলির সামনে শশব্যস্ত হইয়া যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ঘুরিতেছেন, শরৎ তাঁহার মুখেও মোহনমন্ত্র বুলাইয়া দিয়াছে; ব্যথাজীর্ণ কর্ম্মভারপীড়িত এই বৃদ্ধ কেরাণীর মুখ ভরানদীর মত পূজার আনন্দে ভরা। বৃদ্ধটির এক হাতে তাঁর ভগ্ন জীবনের মত এক বহুপুরাতন দাগধরা লাঠি—এক সময় সেটি রূপা দিয়া বাঁধান ছিল, আর এক হাতে হেনার মঞ্জরীর মত একটি ছোট মেয়ের হাত। সব কাপড়ের দোকানে পূজার ভিড়। বৃদ্ধটি প্রতি দোকানের ভিড় দেখিয়া চঞ্চল হইয়া মেয়েটির হাত জোর করিয়া ধরিতেছিলেন, আর মেয়েটি দোকান-গুলিতে নানা রংএর কাপড় দেখিতেছিল; আর শেফালি-ফুলের মত সুন্দর তাহার চোখ দুইটি জল জল করিয়া উঠিতেছিল।

এক দোকানে একটু কম ভিড় দেখিয়া বৃদ্ধ মেয়েটিকে লইয়া ঢুকিলেন। দোকানের লোকেরা অন্য ক্রেতাদের কাপড় দিতেই ব্যস্ত; তাহারা দামী কাপড় কিনিতেছে, তাহাদের সরাইয়া দিয়া অল্পদামের কাপড় চাইতে বৃদ্ধের সাহস হইতেছিল না। তিনি এক কোণে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার পাশেই একজন আনারসী রংএর সিল্কের শাড়ী কিনিতেছিল; খুকী তাহার ছোট চোখ দুইটি নাচাইয়া বৃদ্ধের একটু গা ঘেসিয়া বলিল,—দাদামশাই, এ কাপড় আমার বেশ পছন্দ।

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, মিনু, ওই রকম কাপড় তোকে কিনে দিচ্ছি; অ মশাই, ওই রকম একটা ছোট সাড়ী দিন ত'।

সাড়ীখানি যে সিল্কের, বৃদ্ধ তাহা ভাল করিয়া দেখেন নাই। পাশের ভদ্রলোক যখন সাড়ীর দাম দিবার জন্য নোটের তাড়া বাহির করিল, দাদামহাশয়ের মুখ একটু ম্লান হইয়া গেল। মিনুর করুণ মধুর মুখের দিকে চাহিয়া দোকানের একটি ছোকরা এবার বৃদ্ধের কথায় মনোযোগ দিয়াছিল; বৃদ্ধ একটু শুষ্কস্বরে তাহাকে বলিলেন,—একটু শস্তার কাপড় দিও বাবা!

ছোকরাটি টাঙ্গাইলের এক আনারসী রংএর সাড়ী বাহির করিয়া আনিল। উৎসাহের সহিত কাপড়খানি ছোকরার হাত হইতে প্রায় ছিনাইয়া লইয়া দুই হাত দিয়া আদরের সহিত স্পর্শ করিয়া আল্‌তার মত রাঙা পাড়ের দিকে চাহিয়া মিনু বলিল,—বেশ সুন্দর কাপড়, দাদামশাই।

দাদামহাশয় তাঁহার একটা ডাল-ভাঙা ফিতে দিয়ে বাঁধা চশমাটা নাড়িয়া শীর্ণ আঙুলগুলি কাপড়খানির ওপর বুলাইয়া বলিলেন,—কত দাম বাবা?

ছোকরাটি একবার মিনুর ম্লান মুখের দিকে আর একবার বৃদ্ধের জীর্ণ পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল,—এগারো টাকা।

বড়বাবুর-বকুনি-খাওয়া মুখের মত কালো মুখে বৃদ্ধ বলিলেন,—আর একটু সস্তার দাও বাবা, এই টাকা পাঁচেকের মধ্যে।

ছোকরাটি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু খুকীর করুণ মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া শস্তা-দরের কাপড়ের সন্ধানে চলিল। মিনু ধীরে তাহার হাতের কাগজে-মোড়া জামাটা নাড়িয়া বলিল,—দাদামশাই, আগে খোকার জামাটা কেন, আমার কাপড় পরে হবে।

ছোকরাটি বাসন্তী রংএর একখানি ছোট সাড়ী বাহির করিয়া আনিয়া বলিল,—দেখুন মশাই, শস্তা আছে, পাঁচ টাকার মধ্যে হবে। তা তোমাকে বেশ মানাবে, বলিয়া খুকীর দিকে চাহিল।

মিনুর আর কাপড়খানি ভাল করিয়া দেখা হইল না। বৃদ্ধ কাপড়খানি তুলিয়া লইয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—কেমন পছন্দ হয়েছে রে। তাঁহার নিজের পছন্দ না হইলেও, শস্তায় ত শিল্কের কাপড় পাওয়া যায় না।

হাঁ, দাদামশাই, বেশ কাপড়, বলিয়া মিনু বৃদ্ধের মুখের দিকে হাসিমুখে চাহিল। কাপড়ের রংটি তাহার সত্যই পছন্দ হইয়াছিল।

আচ্ছা বেশ, কত দাম, বলিয়া বৃদ্ধ পকেটে হাত দিলেন। মেয়েটি কাপড় পাইয়া খুসি হইয়াছে দেখিয়া ছোকরা আনন্দিত হইয়া বলিল,—চার টাকা বার আনা; দিন, বেঁধে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ পকেটে হাত দিলেন; ডান দিকের পকেট, বাঁ দিকের পকেট, বুকের পকেট,—কৈ; মণিব্যাগ কোথায় গেল!—অ্যাঁ, আমার মণিব্যাগ, হাঁরে মিনু, তোকে দিয়েছি? সলজ্জিত হইয়া মিনু বলিল,—না, দাদামশাই।

তবে—এ্যাঁ,—ঝড়ে-দোলানো লতার মত কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আবার পকেটগুলিতে হাত দিয়া খুঁজিলেন, জামা ঝাড়িলেন, তারপর বজ্রদীর্ণ তরুর মত বসিয়া পড়িলেন। কান্নার সুরে বলিলেন,—টাকাগুলো চুরি গেছে রে মিনু!

বাসন্তী রংএর সাড়ীটার দিকে চাহিয়া মিনুর কান্না পাইল। দাদামহাশয়ের বেদনাময় মুখের দিকে চাহিয়া আপনাকে দমন করিয়া বলিল,—ভাল করে খোঁজ না, আছে পকেটে। বাড়ীতে ফেলে আস নি ত?

বৃদ্ধ প্রস্তরমূর্তির মত বসিয়া রহিলেন। এই দোকান-ভরা নানা রংএর কাপড় একটা রঙীন পরিহাস, এই চারিদিকের আনন্দকোলাহল কিসের ব্যঙ্গধ্বনি, এই যে প্রতি জন প্রিয়জনের জন্য আনন্দদীপ্ত মুখে উপহার কিনিতেছে, এ কি ছায়াবাজি! মিনু দাদামহাশয়ের সব পকেট হাৎড়াইয়া দেখিল,—সত্যই মণিব্যাগ নাই।

ছোকরাটি করুণমুখে মিনু ও দাদামহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার ইচ্ছা করিতেছিল সে নিজে কাপড়খানি কিনিয়া মিনুকে দেয়; কিন্তু তাহার সে টাকা কোথায়!

দোকানের ক্রেতা ও বিক্রেতারা একবার উৎসুক নয়নে এই করুণ দৃশ্যটির দিকে চাহিল। 'আহা তাই ত, টাকাগুলো কোন্ পকেটে রেখেছিলেন—' 'একটু সাবধানে রাখতে হয়। পূজোর ভিড়—'। আবার তাহারা বেচাকেনায় মন দিল, পরের দুঃখ দেখিবার মত তাহাদের সময় কোথায়। পেছন হইতে একটু ধাক্কা আসিল,—সরবেন মশাই, ভিড়টা ছাড়ুন।

মিনু ধীরে দাদামহাশয়ের লাঠি তুলিয়া লইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল,—চল, দাদামশাই।

মিনুর সরল মধুর মুখের দিকে চাহিয়া কোনমতে কান্না দমন করিয়া কম্পিত হস্তে লাঠি ধরিয়া বৃদ্ধ বাহির হইলেন। ষাট টাকা, তাঁর একমাসের মাহিনা, সব গেল, এবার পূজার কিছুই কেনা হইবে না।

মিনু এক হাতে ছোট ভাইটির কাগজ-জড়ানো জামাটি ধরিয়া আর এক হাতে দাদামশাইয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। নিজের কাপড় কেনা হইল না বলিয়া তাহার মনে খুব বেশী কষ্ট হইতেছিল না, কিন্তু তাহার ছোট ভাইটির জামা কেনা হইল না বলিয়া সত্যই মনে দুঃখ হইতেছিল। একবার ভয়ব্যাকুল নয়নে দাদামহাশয়ের মুখের দিকে, আর বার পথের প্রফুল্ল হাস্যময় জনতার দিকে চাহিল। দাদামহাশয় তাহার হাত ধরিয়া যন্ত্র-চালিতের মত চলিলেন।

চল, দাদামশাই, বিষ্টি আসবে;—বলিয়া মিনু ভিড় বাঁচাইয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া চলিল।

দুই

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় সুকীয়া ষ্ট্রীটের একটি গলির অন্ধকার দিয়া একটি বয়স্ক মুসলমান অতি সন্তর্পণে যাইতেছিল। অন্ধকারে তাহার লাল লুঙ্গি আর কালো ছায়া অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। হাতে একটি কাগজের প্যাকেট লইয়া সে শঙ্কিতভাবে অগ্রসর হইতেছিল। গলির এক গ্যাসপোষ্টের কাছে আসিতেই সহসা তাহার সম্মুখে এক দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। শুভ্রমূর্ত্তিটি তাহার দিকে আরও একটু অগ্রসর হইতেই সে ভয়ে তাহার পাশ দিয়া ছুট দিল। অমনি সে মূর্ত্তিও তাহার পেছন-পেছন ছুটিল এবং গলির আর এক মোড়ে এক গ্যাসপোষ্টের

তলায় তাহার গলা সজোরে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলিল,—হ্যালো, চোর হায়, কাঁহা ভাগ্‌তা।

মুসলমানটি, বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি যুবকটির হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া তাহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া করুণ সুরে বলিল,—আমায় ছেড়ে দিন, আমি চোর নই, সত্যি চোর নই—

চোর নও, সাধু! দেখি তোর বোঁচকা, কোত্থেকে চুরি করেছিস্।—

বাবু, সব বলছি, আমায় আগে ছাড়ুন। এই নিন, আমার কথা আগে শুনুন।

আচ্ছা বল্, বলিয়া মুসলমানটির হাত হইতে কাগজের প্যাকেটটি লইয়া এক বাড়ীর দেওয়াল আর গ্যাসের পোষ্টের মধ্যের স্থানটুকুতে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া যুবকটি তাহার গলা ছাড়িয়া দিল। গ্যাসের আলো মুসলমানটির মুখে পড়িতেই যুবক বিস্মিত হইয়া বলিল,—আরে তুই, রহিম, জেল থেকে ছাড়া পেয়েই বুঝি আবার ব্যবসায়ে লেগেছিস্—কবে ছাড়া পেলি!

ও, আপনি সাহেব, সেলাম, বলিয়া মাথা নত করিয়া মুসলমানটি সেলাম করিল; বলিল,—এই পরশু ছাড়া পেয়েছি। জেল থেকে বের হয়েই দেখি মেয়েটা মারা গেছে, আর মাগীটা কার সঙ্গে ভেগেছে। ভাবলুম, আর এ-সব কাজ ভাল নয়; কিন্তু সর্দ্দার ডেকে পাঠালে, কি করি থাওয়া ত চাই। আজ সকালে ওই টাকাগুলো কামিয়েছিলুম, কিন্তু বড় দুঃখ হল, ফেরৎ দিতে যাচ্ছি—

—ও, সাধু হয়েছিস্, বটে! জেলের ঘানি মনে হয়ে, না দড়ি পাকানোর কথা—

—না সাহেব, বুড়োর পকেটে দেখলুম একগাছা নোট। লোভ সামলাতে পারলুম না; কিন্তু পকেট কেটেই মনে বড় দুঃখ হল; পূজোর দিন বাজার করতে বেরিয়েছে, টাকাগুলো সব নিলুম,—আবার সঙ্গে এক ছোট মেয়ে ছিল। দোকানে গিয়ে কাপড় পছন্দ করে কিনতে পারলে না—

যুবক একটু বিস্মিত হইয়া কাগজের প্যাকেটটি খুলিল, একখানি লাল সাড়ী আর তাহার মধ্যে ছয়খানি দশটাকার নোট।

যুবক ধীরে বলিল,—সত্যি কথা বল্‌ছিস্ ত রে?

—আপনার কাছে কি লুকাব সাহেব, আপনি বড় ব্যারিষ্টার, সবই বুঝতে পারেন, আপনায় দিয়েছিলুম বলেই ত তিন বছরের জায়গায় তিনমাস জেল হল—

—কত চুরি করেছিলি?

—ওই ষাট টাকা।

—আর কাপড়টা?

—ও সাহেব, ঘরে ছিল। আমার ডালিমের কাপড়। ভাবলুন, মেয়েটা ত মরে গেছে, ও ছোট কাপড় রেঁখে আর কি হবে, দিয়ে দি।

রহিম চুপ করিল। গ্যাসের আলো তাহার কালো মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। যুবক বিস্ময় শ্রদ্ধার সহিত সে মুখের দিকে চাহিল। এই পাপের কালীভরা মুখ, দৈন্য ও হীনতা-জীর্ণ দেহ কোন্ মায়ামন্ত্রবলে যেন বদলাইয়া গেল; ওই কালদাগ-ভরা কলঙ্কমাখা মুখে ক্ষণিকের জন্য কি দিব্য জ্যোতিঃ ঝলসিয়া গেল। চোখ দুইটি কি বেদনায় ঝকমক করিতেছে;—সে হীন লম্পট জেলের কয়েদী নয়, সে গাঁটকাটা হৃদয়হীন পাষণ্ড নয়, সে পিতা! প্রেমময় বিশ্বপিতার সহিত তাহারও কল্যাণময় সুন্দর যোগ রহিয়াছে। যুবকের তৃষিত হৃদয় রহিমের কন্যা শোকাতুর পিতৃ-হৃদয়ের সহিত গভীর বেদনায় এক হইয়া গেল।

রহিমের হাত ধরিয়া গ্যাসের কোণ হইতে বাহির করিয়া পিঠ চাপড়াইয়া যুবকটি কাপড় আর টাকা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল,—কোন্ বাড়ীতে দিয়ে আসবে?

রহিম একটু লজ্জিতভাবে কাপড় ও নোটগুলি ধরিয়া শান্তস্বরে বলিল,—ওই সামনের মোড়টা পেরিয়ে গলির ভিতর।

—আচ্ছা চল, দেখে আসি বাড়ীখানা। কেমন করে দেবে?

—জানালার কোণের ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে রেখে আসব। আজ বুড়োর পেছন পেছন এসে বাড়ীখানা দেখে গেছি।

দুইজনে ধীরে ধীরে চলিল। সরু গলির ভিতর ঢুকিয়া রহিম ভাঙ্গা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই একমুখো গলির ভিতর কোন আলো নাই, মোড়ের গ্যাসের আলো একটু আসিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতেই একটি ছোট ছেলের মিষ্টি হাসি ও ছোট মেয়ের মৃদু গীতগুঞ্জরণ শোনা গেল। ইট বাহির করা অপরিষ্কার রকে উঠিয়া যুবকটি একটি খোলা জানালা দিয়া ঘরের ভিতর

উঁকি মারিল। ভিতর হইতে সার্সি দেওয়া; সার্সির কয়েকখানি কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাতে নানা বর্ণের কাগজ মারা। একখানি ছেঁড়া কাগজের ফাঁক দিয়া যুবকটি ঘরের ভিতর দেখিতে লাগিল।

এককোণে একটি হ্যারিকেনের আলো জ্বলিতেছে; তাহার ফাটা চিমনী সাদা কাগজ দিয়া জোড়া। মৃদু আলোয় একটি বৃদ্ধের অর্দ্ধশায়িত দেহ ছেঁড়া মাদুরের ওপর দেখা যাইতেছে। বৃদ্ধের পাশে একটি ছোট মেয়ে একখানা বইয়ের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলি বৃদ্ধের বুকের ওপর আসিয়া পড়িতেছে।

পড়িতে পড়িতে ছোটমেয়েটির মন উদাস হইয়া উঠিল; তাহার রাজপুত্র কবে আসিবে, তাহার রাজকন্যা কবে জাগিয়া উঠিবে? মুখ তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—দাদামশাই, তেপান্তরের মাঠ কতদূর? তুমি সেখানে গেছ? সে কেমন?

দাদামহাশয় একটু মাথা নাড়িয়া পাশের গড়গড়ার নলটা মুখে পুরিলেন।

মিনু হাসিয়া বলিয়া উঠিল,—অ দাদামশাই, কল্কে বসানো নেই যে, শুধু টান্‌ছ, আমি সেজে আন্‌ছি। মিনু লাফাইয়া উঠিয়া ঘরের কোণে তামাক-সাজার সরঞ্জামের নিকট গিয়া তামাক সাজিতে বসিল। পাশের দরজা দিয়া একটি সুন্দরী নারীমূর্ত্তি প্রবেশ করিলেন; ভোর বেলার গোলাপের মত তাঁহার কোলে একটি আধঘুমন্ত খোকা। খোকা কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার দিদির তামাক সাজার আয়োজন দেখিয়া কোল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ঝর্ণার মত কলহাস্যে দিদির দিকে ছুটিল এবং মিনু সাবধান হইবার পূর্ব্বেই হাতে কয়লা মাখিয়া মিনুর গাল টিপিয়া ধরিল।

আরে দুষ্টু,—বলিয়া খোকার মাতা খোকাকে ধরিতে ছুটিলেন।

ধ ধত্তে পাল্লে না,—বলিয়া খোকা দাদামহাশয়ের আড়ালে আশ্রয় লইবার জন্য ছুট দিল। ধল, ধল, বলিয়া খোকা দাদামশাইকে ঘিরিয়া নাচিতে নাচিতে ঘুরিতে লাগিল; বৃদ্ধকে ঘেরিয়া মা ও শিশুর লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হইল। মা ও ছেলের মৃদু চরণ-নৃত্যধ্বনিতে, মধুর হাস্যে, খুকীর কলগানে, বৃদ্ধের স্মিত আনন-আভায়, হ্যারিকেনের আলোকের আনন্দ-কম্পনে এই জীর্ণ, অন্ধকার ঘর-কোণ যেন স্বর্গলোক হইয়া উঠিল।

যুবকটি জানালার কাগজের ফাঁক দিয়া মুগ্ধনেত্রে এই বিধবা মাতার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। জুঁই ফুলের মত সাদা কাপড়খানি কোথাও হলুদের দাগে, কোথাও কাদার ছিটায় যেন চিত্রিত; রুক্ষ কেশগুলি আগুনের আভার মত; মুখখানি রক্ত গোলাপের মত রাঙ্গা নয়, যেন ভোর বেলার শ্বেতপদ্ম,—স্নিগ্ধ পবিত্র, রমণীয়!

ছুটাছুটি করিতে-করিতে মাতা জানালার কাছে আসিয়া পড়িলেন। খোকা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া একবার শূন্যে ছুঁড়িয়া হাসিয়া দোলাইয়া আপন বক্ষে জড়াইয়া চুম্বনে ভরিয়া দিলেন। মাতার মুখের ওপর আলো আসিয়া পড়িল। যুবকটি এবার স্পষ্ট করিয়া সেই দিব্য স্নিগ্ধ মুখ দেখিতে পাইল; তাহার সমস্ত বুকের রক্ত দুলিয়া নাচিয়া উঠিল।

মুকুল আমার—সোনা—মানিক, বলিয়া আবার মাতা খোকাকে দোলাইয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া যুবক জানালা হইতে মুখ সরাইয়া ধূলি-জঞ্জালময় রকের ওপর শাওলাভরা দেওয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারি নাম সে আপন ছেলেটিকে দিয়াছে! তাহাকে সে ভোলে নাই। সম্মুখে অন্ধকার গলিটায় অশ্রুজলের কালো নদীর মত দুই বাড়ীর ছাদের ফাঁক দিয়া একটি তারার ম্লান আলো দেখা যাইতেছে। তাহার মুখে নিজের নাম কি মিষ্টি! মুকুল! কি অপরিসীম সুখ, কি অসহনীয় বেদনা!

রহিম ভয় পাইয়া ডাকিল,—সাহেব।

মুকুল কোন উত্তর দিল না। বিস্মিত ভীত হইয়া রহিম একবার জানালায় উঁকি মারিতে গেল। মুকুল তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া আবার কাগজের ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল।

ঘরটি এখন শান্তিময় ছবির মত। দাদামহাশয় তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া ধীরে গুড়গুড়ি টানিতেছেন; আলোর সামনে খুকী গল্পের বৈয়ের ওপর চুল ঝুলাইয়া পড়িতেছে; তাহার রাজপুত্র দৈত্যপুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; তাহার বুক ভয়ে দুরদুর করিতেছে। দাদামহাশয়ের অপর পার্শ্বে খোকা মায়ের কোলে দুধ খাওয়া শেষ করিয়া ঘুমাইবার আয়োজন

করিতেছে ; মাতার সুন্দর পিঠটা দেখা যাইতেছে ; খোকার বুকের কাছে তাঁর মাথা নত হইয়া পড়িয়াছে ; কোলে দোলা দিতে দিতে তিনি মৃদুগুঞ্জরণে গান করিতেছেন,—

মুকুল আমার ঘুমোয় রাতে
জাগ্‌বে আবার সোনার প্রাতে।

সকলের ছায়ামূর্ত্তি দেওয়ালে স্তব্ধ ছবির মত অচল !

রহিম ধীরে মুকুলের হাত ধরিয়া একটু নাড়িল। যেন কোন স্বপ্নঘোর হইতে জাগিয়া উঠিয়া মুকুল চমকিয়া গলির অন্ধকারের দিকে চাহিল; চোখ দুইটি আবার জানালার দিকে যাইতেছিল; জোর করিয়া মাথাটা জানালা হইতে ছিনাইয়া লইয়া সে রহিমের হাতটা আবার টানিয়া ভূতাবিষ্টের মত গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

বড় রাস্তায় বাহির হইয়া একটি ট্যাক্সি ডাকিয়া রহিমকে তুলিয়া লইয়া মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের দিকে ট্যাক্সি হাঁকাইতে বলিল।

তিন।

বাজার হইতে বাড়ী ফিরিয়া মুকুল একটি দোলনা-চেয়ার লইয়া ছাদের কোণে বসিল। স্বচ্ছ নীল আকাশে স্বপ্নের মত কয়েকখানি লঘু মেঘ ভাসিতেছে। সুন্দর জ্যোৎস্নার আলোয় বসিয়া সে প্রেমস্মৃতির কোন্ অলকায় চলিয়া গেল,—এই শরৎ রাত্রির অপরূপ আলোকময় কোন্ চির-বিরহিনীর কুঞ্জবনে।

তখন তাহার বয়স একুশ ; সে এম-এ পড়ে। সকাল-বেলা হইলেই সে বই বন্ধ করিয়া কলিকাতার পথে বাহির হইয়া পড়িত, এবং যে কোন বন্ধুর বাটিতে কিছুক্ষণ গল্প করিয়া ঘুরিয়া আসিত। আলো হাতছানি দিয়া ডাকে, আকাশে নীলনয়ন চাহিয়া থাকে, বাতাসে কাহার সৌরভ আসে—এ সেই বয়স !

এক শরতের সোনা-মাখানো সকাল-বেলায় সে তাহার এক পিসিমার বাড়ী গিয়া হাজির হইয়াছিল। এ পিসিমার সঙ্গে ছেলেবেলা হইতেই তাহার খুব ভাব। পিসিমা ভাঁড়ার-ঘরে আলু পটল শাক ইত্যাদি তরকারি পরিবৃত হইয়া বঁটি লইয়া বেগুন কুটিতেছিলেন। মুকুল ভাঁড়ার-ঘরে সটান ঢুকিয়া একেবারে পিসিমার পাশে গিয়া বসিল; একখানি ছোট বঁটি টানিয়া কতকগুলি আলু তুলিয়া বলিল,—কি আলু কুটতে বাকি পিসিমা, ভাজার না ডাঁলার ?

পিসিমার পাশেই যে এক সুন্দরী কিশোরী বসিয়া পান সাজিতেছিল, তাড়াতাড়িতে তাহা সে লক্ষ্য করে নাই ; এখন দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেও সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না : বস্তুতঃ এইটুকু মেয়ের জন্য লজ্জায় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে তাহার নব্যশিক্ষিতাভিমানী মন কিছুতেই রাজী হইল না।

পিসিমা একটু মিষ্ট ভৎসনার স্বরে বলিলেন,—রাখ্, রাখ্ বঁটি, কেন আঙুলগুলো কাট্‌বি।

—আচ্ছা, দেখ, পিসিমা, ও কে কুমড়ো কুটেছে, যাচ্ছে-তাই—কথাগুলি বলিয়াই কিন্তু মুকুল লজ্জিত হইয়া উঠিল ; এ দিকের তরকারি যে ওই অপরিচিতা কিশোরীর কোটা হইতে পারে, তাহা সে খেয়াল করে নাই।

মেয়েটি একটু মুস্কিলেই পড়িয়াছিল ; তাহার সম্মুখে চূন-মাখান চেরা পানগুলি প্রায় দরজা পর্য্যন্ত সাজান পড়িয়া আছে ; আর পিসিমার অপর দিকে মুকুল বসিয়াছে ; ঘর হইতে বাহির হইবার পথ তাহার বন্ধ। তাহার লজ্জা করিবার বয়স না হইলেও সে মুখ রাঙা করিয়া খোলা চুল-গুলি তাড়াতাড়ি মাথার ওপর ঝুঁটির মত বাঁধিয়া পানগুলি মসলা দিয়া মুড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার বসিবার ভঙ্গী, পান মোড়ার লীলা, মুখের আভা, চকিত চাউনি, সব মিলিয়া মুকুলের তরুণ মনে অরুণ রং লাগাইয়া দিল।

বঁটি নাড়িতে নাড়িতে মুকুল বলিল,—কি কুট্‌ব পিসিমা, বল না ?

—জেঠামি করিস্ নে মুকুল, আমার হাড় জ্বালাস্‌নে, সর, ওঠ, এই নেয়ে এলুম, ছুঁস্‌নি—রেণু তোমার পান সাজা হল ? ওঠ, ওকে পটল কুট্‌তে হবে।

—বাঃ, আমি কুট্‌তে জানি না বুঝি, বলিয়া মুকুল কতকগুলি পটল বাটির জলে ধুইয়া কুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ছেলেবেলা হইতেই সে মায়ের আদরের ছেলে ছিল, মায়ের সঙ্গে কুট্‌নোকোটা, রান্না করা তাহার প্রধান আনন্দ ছিল।

পটল কুটিতে-কুটিতে হাসিমুখে পিসিমার দিকে চাহিতেই কিশোরীর সুন্দর দীপ্ত নয়ন তাহার মুখের ওপর শুক তারার মত জ্বলিয়া উঠিল। এ সেই বয়স, যখন নয়ন-মনের সব কথা বলে, যখন চোখের একটু চাউনিতে অমৃতময় আনন্দলোক খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মেয়েটি

তাহার-পটল কোটা দেখিতেছিল ; ধরা পড়িয়া লজ্জিত হইয়া পান সাজায় মন দিল। পান-ধোওয়া জল তাহার দুই হাত রাঙা করিয়া তুলিয়াছে ; সেই রাঙা হাতের মত তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

পান সাজা যখন প্রায় শেষ হইল, মুকুল একটু দুষ্টামি করিয়া বলিল,—পিসিমা, বড় জল-তেষ্টা পেয়েছে।

কাছে আর কেউ ছিল না, পিসিমা তরকারি কুটিতে ব্যস্ত, সুতরাং রেণুকাকেই আদেশ হইল।

—দাও ত মা, মুকুলকে এক গেলাস জল। আর কাল এলনাক কি হল, কত খাবার তৈরী করেছিলুম।

মুকুল একটু হাসিয়া বলিল,—না শুধু এক গেলাস জল।

—না, আর ঢং করিস্ নে। রেণু দেখ্ত, ওই মিট-সেফে কি খাবার আছে? বাসি লুচি খাবি?

রেণুকা পান সাজার রাঙা জলের ওপর সুন্দর কোমল পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইল; তাহার বাসন্তী রংএর সাড়ীর একটুকু প্রান্ত জলে ভিজিয়া গেল। কাঁসার ঝক্‌ঝকে একটি রেকাব আনিল; ধীরে মিট-সেফ খুলিয়া, লুচি, রসবড়া, পান্তুয়া, সন্দেশ সুন্দর করিয়া সাজাইয়া ঘরের এক পরিষ্কার কোণে রাখিল; একটি ফুলকাটা আসন পাতিয়া এক গেলাস জল গড়াইয়া রেকাবীর পাশে রাখিয়া ধীরে পিসিমার পাশে আসিয়া খোঁপা খুলিয়া চুল মেলিয়া বসিল। মুকুল তাহার নীরব গমনাগমন, কিশোর হস্তের শ্রীমণ্ডিত কাজগুলি, লজ্জারুণমণ্ডিত স্থির আনন্দ-উজ্জ্বল বিকচ পদ্মসম মুখ, তাহার গতির ছন্দ, বাসন্তী রংএর ঢেউ, চুলের দোলা—সব যেন মোহন ছবির মত দেখিতেছিল।

মুকুল যখন খাইতে সুরু করিল, রেণুকা ধীরে বলিল,—আর কোন কাজ আছে পিসিমা?

মুকুল সব পটল কুটিয়া শেষ করিয়া দিয়াছিল। না, মা, বলিয়া পিসিমা আদরের সঙ্গে তাহার দিকে চাহিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রেণুকা উঠিয়া দাঁড়াইতেই মুকুল বলিল,—পান্তুয়াগুলো ভারি সুন্দর হয়েছে পিসিমা।

পিসিমা স্নেহে গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন,—ওকে আর কয়েকটা দিয়ে যাও ত মা।

মুকুল কোন প্রতিবাদ করিল না। ধীরে রেণুকা মিট-সেফ খুলিল, কয়েকটি পান্তুয়া তুলিয়া মুকুলের পাতে দিয়া একটু চঞ্চলপদে চলিয়া গেল।

মুকুল গেলাসের জলটুকু নিঃশেষে পান করিয়া বলিল,—মেয়েটি কে পিসিমা?

—ও, আমাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে, কেমন দেখ্‌লি?

—মুকুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—চল্লুম পিসিমা।

—এক্ষুণি কি রে, আচ্ছা তোকে কোন কথা জিজ্ঞেস কর্‌ছি না, বস।

না, পিসিমা, কাল আস্‌ব'খন, আজ চল্লুম,—বলিয়া মুকুল নিমেষে ভাঁড়ার-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর পিসিমার বাড়ীতে যাতায়াত তাহার ঘন ঘন হইয়া উঠিতে লাগিল। কোন দিন দুপুরে পিসিমা হয় ত সিমেণ্টের মেজেতে শুইয়া আছেন, রেণু পাশে বসিয়া কোন মাসিক পত্রিকা হইতে গল্প পড়িয়া শুনাইতেছে;—মুকুল আসিয়া হাজির। রেণুর গল্প পড়া বন্ধ হইয়া যাইত, পিসিমার ধমকেও কোন ফল হইত না। তখন মুকুল নিজেই বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিত!

একদিন পিসিমার কাছে গল্প করিতে করিতে মুকুল হঠাৎ বলিল—পিসিমা, রুমালগুলো এত হারাচ্ছে; সবাই আমার রুমাল টেনে নেয়।

—চেন্না করে কেন রাখ না বাবা?

—কে করে, পিসিমা।

—আচ্ছা আমায় দিস্ করে দেব।

এই নাও, বলিয়া মুকুল তিন পকেট হইতে তিনখানি রুমাল বাহির করিল।

—এই বুঝি তোর রুমাল হারায়; দে ত রেণু, চেন্না করে। রেণুকা পিসিমার সেলাইয়ের বাক্স আনিয়া লাল সূতা দিয়া সুন্দর করিয়া 'মুকুল' লিখিতে বসিল।

পিসিমা বলিলেন,—শুধু একটা অক্ষর লিখে দে।

রেণুকা মুখ রাঙা করিয়া বলিল,—না পিসিমা, সে বিচ্ছিরি হবে।

কোন সন্ধ্যাবেলায়, পিসিমা রান্নাঘরে ময়দা মাখিতেছেন, রেণুকা পাশে বসিয়া নেচি কাটিতেছে; মুকুল হঠাৎ আসিয়া একেবারে পিসিমার পাশে বসিয়া চাকী-বেলুন টানিয়া লইয়া বলিত—দাও না পিসিমা, কয়েকখানা লুচি বেলি।

পিসিমা একটু বিরক্ত হইয়া বলিতেন,—যা, যা, কোথেকে ঘুরে এলি।

—ওঃ, আজ সারা দুপুর আর বিকেল যা ঘুরেছি।

—কিছু খাসনি বুঝি, রেণু দে ত মা, কয়েকখানা লুচি ভেজে।

মুকুলের হাত হইতে চাকি বেলুন কাড়িয়া লইয়া পিসিমা বেলিয়া দিতেন, রেণু ভাজিত, থালা আনিত, লুচি তরকারি খাবার দিত। সমস্ত কাজ সে নীরবে করিয়া যাইত বটে, কিন্তু তাহার সব কাজের ভিতর কি অনাহত মধুর সঙ্গীত বাজিত, তাহা মুকুলই শুনিতে পাইত। তাহার চলায় হাত-নাড়ায়, জিনিষ রাখায়, মুখের প্রসন্নতায়, চোখের দীপ্তিতে কি মাধুরী ভরা থাকিত।

এম্নি করিয়া ধীরে ধীরে রেণুকার প্রেম-আঁখিতে মুকুলের হৃদয় পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি মিলিয়া রঙীন হইয়া ফুটিতে সুরু করিল। কিন্তু সে প্রেমপদ্ম ত ফুটিয়া উঠিতে পারিল না।

পিসিমা রেণুকার সহিত তাহার বিবাহের সব ঠিকঠাক করিলেন; তাহার মা একদিন পিসিমার বাড়ী আসিয়া মেয়েটিকে পছন্দ করিয়া গেলেন; কিন্তু বাধা উঠিল, তাহার পিতা কিছুতেই এ বিবাহে সম্মতি দিলেন না।

মা বলিলেন,—ওগো শোন, দেখছ ছেলে ধরে বসেছে। ওর গোঁ জান ত, ওইখান ছাড়া ও আর কোথাও বিয়ে করবে না।

বাবা রুক্ষস্বরে উত্তর দিলেন,—না করে না করুক; আলাদা হয়ে করুক, আমার বাড়ীতে ভবেশ মিত্তিরের মেয়েকে আমি বৌ করে তুলতে পারব না।

মা বলিলেন,—কেন শুনি, ওরা কি?

—দেখ, তোমরা মেয়েমানুষ, সংসারের বোঝ কি? বলছি হবে না। যার সঙ্গে আমার রেষারেষি মামলা চলছে, তার মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে মকোদ্দমা আপোষ করবে, নবীন ঘোষ সে লোক নয়।

ইহার পরেও তাহার মাতা, পিতার সহিত কত অনুরোধ অভিমান ঝগড়া করিয়াছেন, কিন্তু পিতার সম্মতি পান নাই। তারপর যখন তাহার পিতা মকোদ্দমায় জয়ী হইলেন এবং রেণুকার সহিত বিবাহে সম্মতি জানাইলেন, তখন রেণুর অন্য জায়গায় বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। ভবেশ মিত্তির জবাব পাঠাইলেন, না খাইয়া মরিব, তবু নবীন ঘোষের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না।

অন্য জায়গায় রেণুকার বিবাহ হইয়া গেল। মুকুল আর কোথাও বিবাহ করিতে রাজী নয় দেখিয়া তাহার বাবা তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন।

আজ সে পিতা পরলোকে, তাহার মাও নাই। জ্যোৎস্নাধৌত আকাশে তারাগুলির দিকে চাহিয়া তাহার মায়ের মুখ মনে পড়িতে লাগিল।

গির্জ্জার ঘড়িতে রাত একটা বাজিল। মুকুল ঘরে গিয়া আইনের পুস্তক-ভরা আলমারিগুলির দিকে চাহিল। এক আলমারির কোণে রহিম শুইয়া ছিল; তাহাকে ঠেলিয়া জাগাইল।

চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে রহিম বলিল,—সময় হয়েছে সাহেব?

—হাঁ হয়েছে, ওঠ।

দুইজনে টেবিলের সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের ওপর খেলার রেলগাড়ী, কুকুর, বড় মেম-পুতুল, লজঞ্চুসের শিশি, ময়ূরকণ্ঠী রংএর এক সিল্কের সাড়ী, ফ্রক, ছোট রঙীন পাঞ্জাবী ইত্যাদি, মিনু ও খোকার জন্য নানা উপহারের দ্রব্য সাজান ছিল। এইগুলি রাত দশটা পর্য্যন্ত বাজারে ঘুরিয়া দুইজনে মিলিয়া কিনিয়াছে।

ম্লান-মধুর হাসিয়া মুকুল বলিল,—দেখ্‌ব রহিম, তুমি কেমন পাকা চোর। এতদিন ত সিঁদ কেটে বাড়ী থেকে জিনিষ নিয়ে এসেছ, এবার দেখি কেমন লুকিয়ে দিয়ে আসতে পার।

তাহার রাঙা দাড়ীটা নাড়িতে নাড়িতে রহিম বলিল,—ও খুব পার্‌ব, দেখে নেবেন।

জিনিষগুলি সব এক তোয়ালের ওপর গুছাইয়া সাজাইয়া বাঁধিয়া সেফ্‌টিপিন দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া সুন্দর পুঁটলিটি মুকুল রহিমের হাতে দিয়া বলিল,—এখন যা, দেড়টা বেজে গেল, কোথায় রেখে দিবি বল্‌ ত?

—মেয়েটির মাথার গোড়ায়—

—না, তার চেয়ে খোকার মাথার কাছে—

—কিন্তু,

—আচ্ছা, দে, দুটো ক'রে বাঁধতে হবে।

ধীরে আবার সেফ্‌টি-পিনগুলি খুলিয়া মিনু ও খোকার জিনিষগুলি মুকুল আলাদা করিয়া রাখিল। তারপরে ম্লানমৃদু হাসিয়া নিজের কাপড়ের আলমারি খুলিয়া এক

কোণ হইতে একখানি শ্বেতপদ্মের মত সাদা রুমাল বাহির করিল; তাহার-এককোণে রক্তচন্দনের মত রাঙা সূতায় 'মুকুল' লেখা। রঙিম রুমালটি দিয়া খোকার খেলার জিনিষগুলি জড়াইয়া কাপড় জামা তোয়ালে দিয়া এক পুঁটলি বাঁধিল; মিনুর জিনিষগুলি তাহার মেয়ের লাল সাড়ী দিয়া বাঁধিয়া লইয়া রহিম চলিয়া গেল।

ইলেক্‌টিকের আলো নিবাইয়া দিয়া একা স্তব্ধ ঘরে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া মুকুল ভাবিতে লাগিল, কেন এমন হয়? জীবনের তার বাঁধিতে বাঁধিতে হঠাৎ ছিঁড়িয়া যায়, গান আর গাওয়া হয় না। ছেঁড়া তার কি আর জোড়া দেওয়া যায় না?

সে স্থির করিল, পিতার বিষয়লোভের অহঙ্কারের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতেই হইবে। তাহার পিতা যে বিষয় সম্পত্তি মকোদ্দমায় জিতিয়া লইয়াছেন, সেই বিষয় আজ যদি ওই বৃদ্ধ কেরাণী ভবেশ মিত্তিরকে সে ফিরাইয়া দিতে চায়, তিনি কি লইবেন না? মিনু ও মুকুলের মঙ্গল ভাবিয়া তাঁহার লওয়া কি উচিত নয়? কিন্তু মুকুল নিশ্চয় বুঝিল, ওই বৃদ্ধ পথে-পথে ভিক্ষা করিবে, না খাইয়া মরিবে, তবু নবীন ঘোষের পুত্রের কাছ থেকে কোন দান লইবে না।

নাই লউন। আজ হইতে ওই বিষয়-সম্পত্তি আর তাহার নহে; সে মিনু ও শিশু মুকুলের কাছে এই সম্পত্তি মনে মনে উৎসর্গ করিল; সে শুধু ওই বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, বিষয়ের সব আয় মিনু ও মুকুলের নামে ব্যাঙ্কে জমা হইবে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের দিয়া দিবে।

ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত হইয়া মুকুল চোখ বুজিয়া চেয়ারে যেন লুটাইয়া পড়িল। তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল। সংসারের দুঃখ-সংগ্রামময় পথে প্রতি যুবকের জীবনে মাঝে মাঝে এমন শান্তিহারা সময় আসে, যখন মনে হয় কোন স্নেহশীলা কল্যাণী নারীর সুকোমল স্নিগ্ধ বক্ষে এই চিন্তাক্লিষ্ট ব্যথাদীর্ণ তপ্ত মস্তিষ্ক রাখিয়া শুইয়া পড়িতে পারিলে একটু শান্তি আসে। একটি নারীর হাতের স্নিগ্ধ স্পর্শের জন্য, বক্ষের শান্তিনীড়ের জন্য মুকুলের অবনত দেহমন যেন তৃষিত হইয়া উঠিল। সে অবসন্ন হৃদয়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া মুকুলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু স্বপ্নের ঘোর এখনও রহিয়াছে। কচি পায়ের শব্দ ঘরের মেজেতে বহিতেছে, ঘরের দেওয়াল বীণের তারের মত কাঁপিতেছে, জোৎস্নার তারে বাঁধা কোন্ অচীন বীণায় শিশুর হাসিধ্বনি শোনা যাইতেছে।

ধীরে সে ছাদে বাহির হইয়া আসিল। পূর্ব্বদিকে আলোকের ঈষৎ রেখা দেখা যাইতেছে। ধীরে, ধীরে, পূর্ব্বতোরণ হইতে গলিত স্বর্ণধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, স্বর্গের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী তাঁর হেমঝারি খুলিয়া চারিদিকে সুধা প্রবাহিত করিতেছেন। মুকুল শরতের সোণার আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন হয় ত মিনু ও খোকা জাগিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের খেলনা কাপড় পাইয়া ছোট ঘরটিতে কি আনন্দ কলগান তুলিয়াছে; এই সোণার আকাশের চেয়েও বুঝি সেই শিশুদের মুখের হাসি সুন্দর, মধুর।

এই শরৎ আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার মন শান্ত হইল। সে যেমন ভালবাসিয়া মিনু ও খোকার জন্য রঙীন খেলনা পাঠাইয়াছে, তেম্নি কে যেন তাহাকে ভালবাসিয়া এই রঙীন প্রভাতটিকে পাঠাইল।

দেবতা ও ভক্ত

শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী

দেবতা জাগে কোন্‌খানে গো, দেবতা জাগে কোন্‌খানে?
স্বরূপ কি তার ফুটল আপন দেবত্বেরি গৌরবে?
মিথ্যা কথা!—নয় কভু তা, মন জানে যে, মন জানে,
বোধন তার এই ভক্ত-হিয়ার অমৃতেরি উৎসবে।

ভক্ত সে কি সৃষ্ট শুধু দেবতা-হাতে পুত্তলী?
দেবতা আপন দেবত্বেরি অমর-রসে জীবন্ত?
মন যে কহে,—নয় গো নহে, আমারি প্রেম উচ্ছলি'
মোর জীবনের ধারায় তারে করেছে যে অনন্ত!

চিত্রশালা

আন্‌মনা

শিল্পী—রিজ্‌ওয়ে নাইট

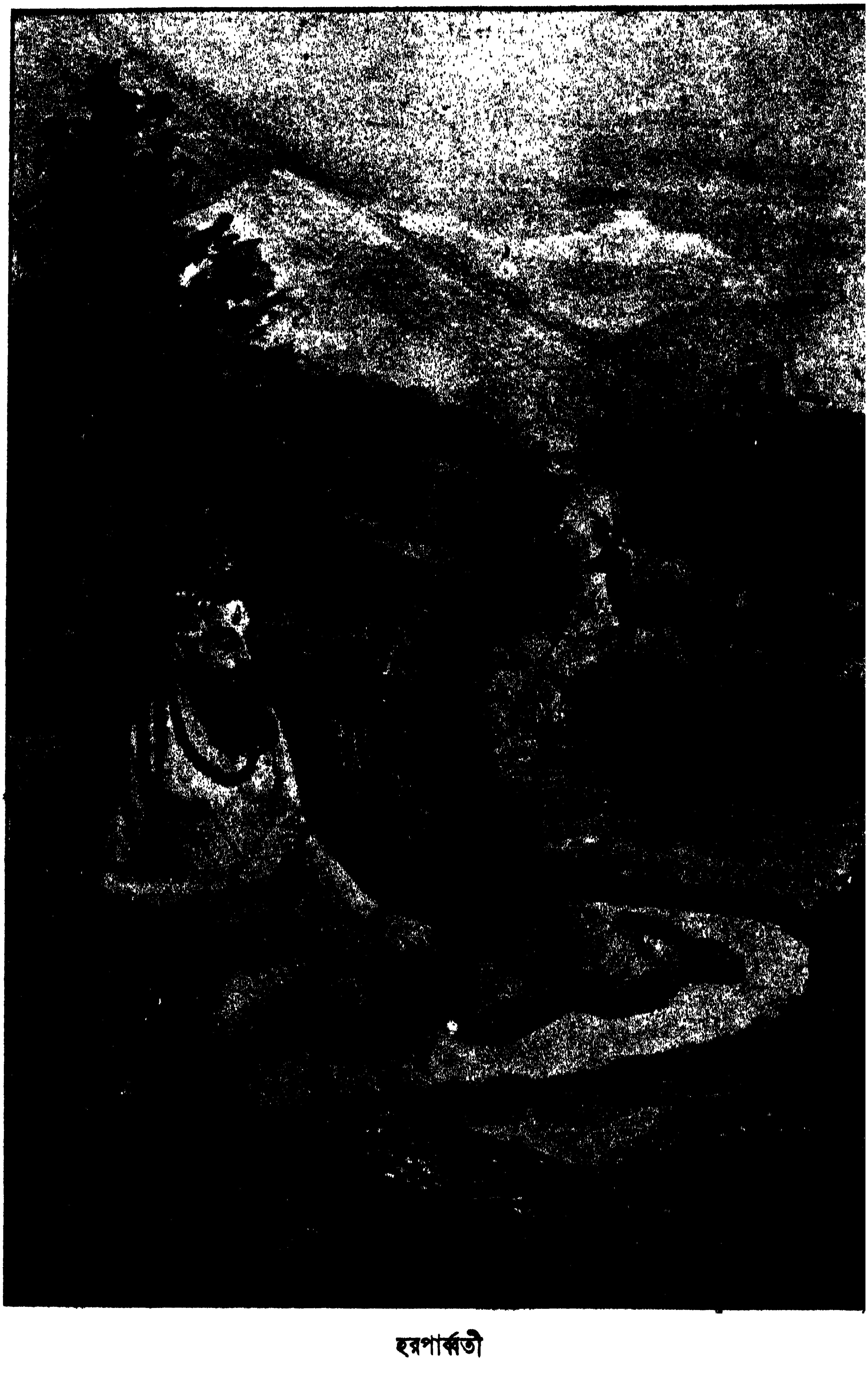

হরপার্ব্বতী

শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী গৃহীত
আলোক চিত্র হইতে

প্লাবিত পল্লী

বর্ষার পথ

শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী গৃহীত
আলোক চিত্র হইতে

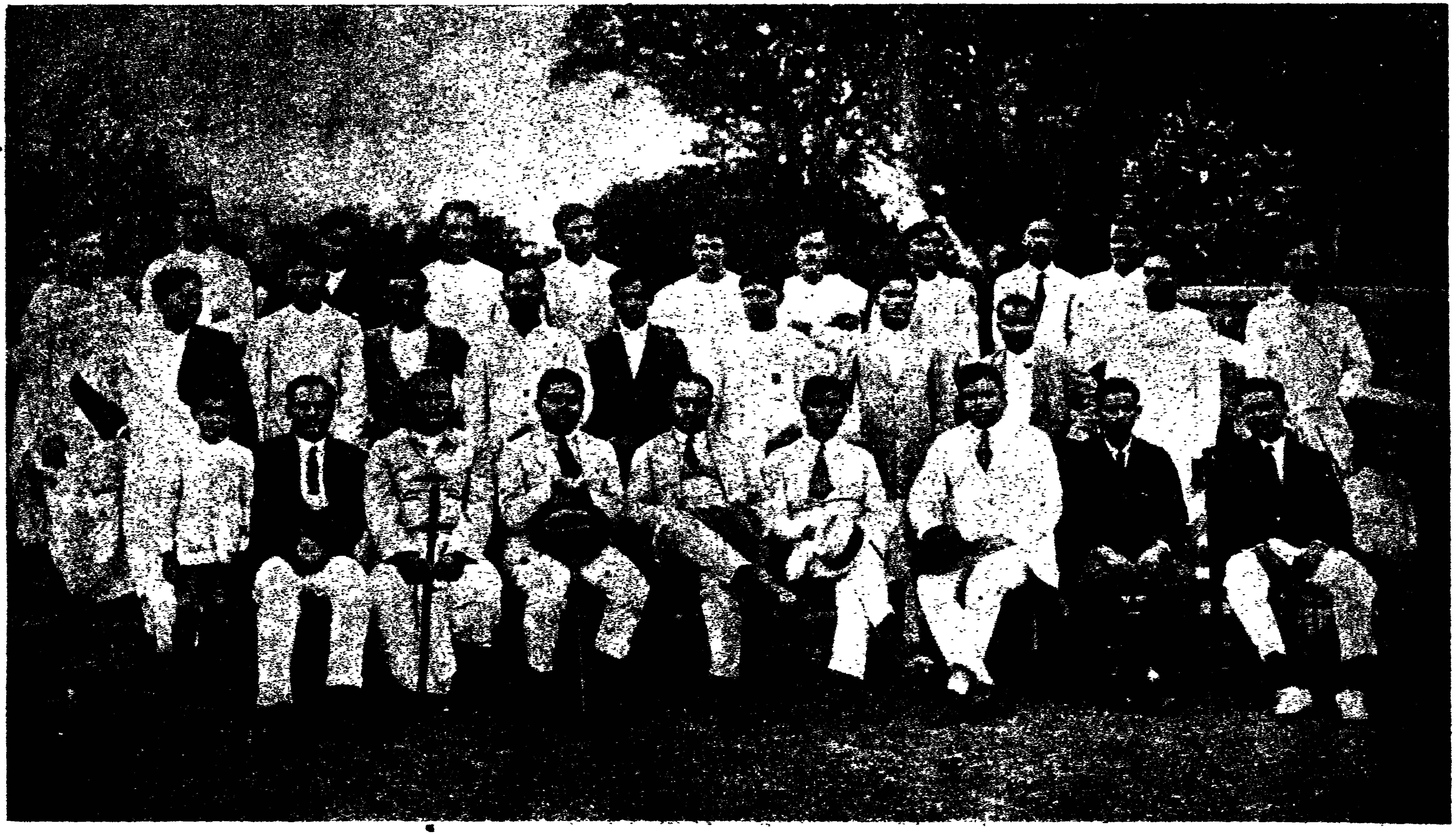

বাঙালী ক্লাব—করাচী

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা

কোকেন্‌-কামিনী

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি

চণ্ডীপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে জমিদারের চাকর আমার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠীতে ইংরাজী ভাষায় মেয়েলী হরফে লেখা—

প্রিয় মহাশয়,

আমার প্রিয়তমা ভগিনী কঠিন রোগে শয্যাশায়িনী। আমরা আপনার মূল্যবান সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। টাকার জন্য ভাবিবেন না। যত শীঘ্র সম্ভব এই বিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসিবেন।

একান্ত আপনার
শ্রীকামিনী দেবী

গন্তব্য স্থান তালপুকুর,—চণ্ডীপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে। সদর দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র, সাড়েচারি হস্ত দীর্ঘ যষ্টিধারী একজন দূত, সোয়াচারি হস্ত দীর্ঘ কায় অবনত করিয়া সেলাম ঠুকিল এবং পেশোয়ারী সুরে বলিল, "মাজি, গাড়ী হাজির।"

ধান-মাঠের উপর দিয়া নানা প্রকার কসরত করিতে-করিতে গাড়ী উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে। জটাজুট-বিলম্বিত বটবৃক্ষের পাদস্পর্শ করিয়া, পর্ণকুটীরদ্বারস্থ কুকুরবৃন্দের সাদর সম্ভাষণে এবং শকটবানের বংশযষ্টি চুম্বনে আপ্যায়িত হইয়া অশ্বিনীকুমারযুগল যথাশক্তি গতিবেগ সংবরণ করতঃ চলিতে লাগিল। তাহাদের চলিবার তারিফ আছে। যে সমুদায় পুষ্করিণীর পাড় তালগাছ শুদ্ধ জলে হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে, সেই পাড় দিয়া তাহারা নির্ভয়ে চলিতেছে, কলিকাতার বাবু ঘোড়া হইলে, আরোহী সমেত ঐ পুষ্করিণীতে অবগাহন করিত।

গাড়ী বেহুলা নদীর সৈকতভূমির উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। বেহুলা লখিন্দরের শব ভেলায় তুলিয়া এই নদীর বক্ষেই ভাসিয়াছিলেন। ঘোষ বাবুদের লোকটী বলিলেন, এখন দেখিতেছেন কেবল বালি,—বর্ষাকালে দেখিবেন, কেবল বিস্তৃত জল আর প্রবল স্রোত। এ স্থান হইতে গোদাঘাট বেশী দূর নয়। এই গোদাঘাটেই—

"বেহুলার রূপে গোদা হইল মূর্চ্ছিত।
কাকুতি মিনতি করে কথা বিপরীত॥
নিবসহ কোন গ্রামে কাহার রমণী।
কলার বান্দাসে জলে ভাস কেন ধনী॥
আমার মন্দিরে আইস শুন সীমন্তিনী।
তোমারে করিব আমি প্রধানা গৃহিণী॥"

বেহুলা বলিলেন :—

"সারাদিন বড়শি বাও, ডুবুড়ি নবুড়ি পাও,
বরশি বাহিলে তোর ভাত।
বামণ বংক্কুর হইয়া, উচ্চদ্বীপে দাণ্ডাইয়া,
চাঁদেরে বাড়াতে চাও হাত॥"

গোদা বলিল :—

"চারি নারী মোর ঘরে, অনেক বিলাস করে,
খাসা গুয়া খান সাচী পান।
সীতায় সিন্দুর ভরা, সুখে ঘর করে তারা,
জঞ্জাল গোদের মাত্র ত্রাণ॥"

বেহুলা যখন কিছুতেই রাজী হইলেন না, গোদা তখন তাহাকে ধরিবার জন্য এই নদীতেই ঝাঁপ দিয়াছিল এবং

"বেহুলা শাঁপিল তাকে, গোদা পরিত্রাহি ডাকে
গোদ লইয়া নড়িতে না পারি।
নাকে মুখে জল যায়, গোদা ডাকে পরিত্রায়,
ত্রাণ কর হে সতী সুন্দরী॥

এই নদী দামোদর হইতে আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। ইহারই এক শাখা বৈদ্যপুরের রাস্তা ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই বৈদ্যপুরে নাকি—

"এক বৈদ্য স্নান করে সেই বান্ধাঘাটে।
কলার মান্দাস আইল তাহার নিকটে॥"

সেই বৈশ্য কহে ধনী কেন ভেসে যাস।
আমি মরা জীয়াইব রাখহ মান্দাস॥"

বেহুলা তাহার কুৎসিত প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া ভেলা ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন।

যে স্থানে বেহুলা নদীর তিনটী মুখ মুক্ত-বেণীর ন্যায় তিন দিকে প্রসারিত, সে স্থানের নাম ত্রিমোহনী ঘাট। এই স্থান দিয়া কালনা হইতে দেবীপুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতে হয়। দুধারে বন, শীতকালে না কি ব্যাঘ্র প্রভৃতি অতিথিকে আশ্রয় দিয়া থাকে। বিদ্বেষপরায়ণা জনশ্রুতি বলে, এই স্থানে না কি পুরাকালে ঘোষ বাবুদের আশ্রিতেরা হনন ও লুণ্ঠন কার্য্য অবাধে সম্পাদন করিত। কথাটা শুনিয়া গাটা কেমন ছমছম করিতে লাগিল। চারিদিকে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার; সঙ্গে গদাধারী সাক্ষাৎ যম,—বাক্সে টাকা। টাকা যাক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু মনে এই দুঃখ রহিল যে, মৃত্যু কলিকাতার রাজপথে বৈদ্যুতিক রথচক্রাঘাতে নয়,—কিন্তু গ্রাম্য-পথে অশিক্ষিত বর্ব্বরের দণ্ডাঘাতে। ছি! এ মরণ আমি চাই না—মরিলাম না। ঘর্ঘর শব্দে নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গাড়ী ঝাঁপানতলায় উপস্থিত হইল। স্থানটীর নাম নারিকেলডাঙ্গা। এখানকার বিগ্রহ প্রস্তর-মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণা সিংহবাহিনী জগৎগৌরী। ক্ষমানন্দের মতে এইখানে ছিলেন "মৃন্ময়ী বিষহরি ঠাকুরাণী।"

"কুলার মান্দাসে চড়ি আইল তথায়।
বেহুলা দেবীরে পূজে নারিকেলডাঙ্গায়॥"

জগৎগৌরী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে দুই প্রকার মত আছে। কেহ-কেহ বলেন বৈদ্যপুরের নন্দীবংশীয়া একজন বৃদ্ধা মাঠে ঘুঁটীয়া কুড়াইতে-কুড়াইতে এই বিগ্রহ পাইয়াছিলেন। নন্দী বাবুরা এই নাড়িকেলডাঙ্গার বনে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গ্রামের বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু বলেন, তাহা নয়। বৈদ্যপুরের রাজার মশানে এই বিগ্রহ ছিল। রাজবংশ ধ্বংসের সঙ্গে দেবী কচুদা পুষ্করিণী-গর্ভে অন্তর্হিত হইলেন। জনৈক কলু স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া, পুষ্করিণী হইতে ঐ বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া, নারিকেলডাঙ্গার বন্দ্যোপাধ্যায়দের গৃহে স্থাপন করিয়াছিল। প্রতিদিন ঐ ব্রাহ্মণগৃহেই পূজা হয়; প্রথম পূজা কলুর, দ্বিতীয় পূজা বর্দ্ধমান রাজার, তৎপরে পূজা সর্ব্বসাধারণের। ঐ ব্রাহ্মণ কুলীন হইলেও কেবল বৈদ্যপুরেই চলিত; অন্যত্র কলুর ব্রাহ্মণ বলিয়া অনাচরিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝাপানের সময় কলু-প্রতিষ্ঠিত ঝাঁপান-মন্দিরে ঐ বিগ্রহ আনীত হন। ঝাঁপানের দিন মুসলমান চাষারাও কর্ষণ স্থগিত করিয়া বলে, "যে এইদিনে চাষ করিবে, তাহার লাঙ্গলের সঙ্গে সাপ উঠিবে।"

ঝাঁপানের গল্প শুনিতে-শুনিতে মৈত্রভবনে উপস্থিত হইলাম। দণ্ডধারী পেশোয়ারী আর একবার সেলাম ঠুকিয়া বলিল, "মাজি, এই কুঠী।" আমি গাড়ী হইতে নামিবামাত্র একজন ত্রিংশ বর্ষীয় যুবক এবং সমবয়স্কা অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। যুবক রোগিণীর স্বামী; নাম রামচন্দ্র সান্ন্যাল। যুবতী পত্রলেখিকা কামিনী;—সকলে কোকেন্-কামিনী বলিয়া ডাকে। মনে হইল যুবতীকে যেন কোথায় দেখিয়াছি।

২

"ঘরে ফিরে না এসে গঙ্গায় ডুবে ম'লে না কেন? এখন লোকের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে?"

"ওগো, আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে চাই না। আমায় বিষ এনে দাও। হে হরি! আমার নলিনীকে এনে দাও। কে আমার নলিনীকে এনে দেবে। যে দেবে, আমার সর্ব্বস্ব দেব। এই জন্যে কি মেয়েকে এত লেখা পড়া গান বাজনা শিখিয়েছিলাম! মেয়ে আমার কি না জানে? যেমন ঘোড়ায় চড়তে জানে, তেমন মটর হাঁকাতে পারে। ওগো, সেই মেয়ে আমার কোথায় গেল?"

প্রথম বক্তা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, হাইকোর্টের একজন প্রধান উকীল। নলিনী তাঁহার একমাত্র সন্তান, বালবিধবা। তাহার মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য কালীবাবু তাহাকে নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিতা করিয়াছিলেন। তাহার কোন আবদার অপূর্ণ থাকিত না।

আজ অর্দ্ধোদয় যোগ। নলিনী পদব্রজে গিয়া গঙ্গাস্নান করিবে বলিয়া জেদ ধরিল। মা পাড়ার দুচার জন বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া নলিনীকে গঙ্গাস্নান করাইতে চলিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট দিয়া গিয়া যখন চিৎপুর রোডে পড়িলেন, একখানা মোটরকার ভঁক ভঁক শব্দ করিতে-করিতে ভিড়ের ভিতর আসিয়া পড়িল। নলিনীর দল দুইভাগে বিভক্ত

হইল। যে দলে নলিনী, তন্মধ্যে দশবারো জন স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইয়া নলিনীকে ঠেলিয়া দূরে লইয়া গেল এবং পশ্চাতে একখানা মোটরকার তাহাকে তুলিয়া লইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

নলিনীর মা অন্য দলে ছিলেন; তাঁহারা প্রথম মোটরের পশ্চাতে উত্থিত ধূলি মেঘের মধ্যে থাকিয়া কিছুই দেখেন নাই। এবার ১৯০৮ সালের মতন স্বেচ্ছাসেবকদের কোন ব্যবস্থাও ছিল না। সুতরাং দিবালোকে রাজপথে এই প্রকার যুবতী-হরণ ব্যাপার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বারের ন্যায় অবাধে সম্পাদিত হইল। নলিনীর মা লজ্জায় রাস্তায় চেঁচাইতেও পারেন না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় সকলের সঙ্গে গিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিলেন এবং প্রাণসমা কন্যা-রত্নটীকে হারাইয়া ঘরে ফিরিলেন। প্রত্যাগমনের পর স্বামী-স্ত্রীতে উপরিউক্ত কথোপকথন।

৩

"নরেন, লক্ষ্মীটী, তোমার পায়ে পড়ি,—আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে দিয়ে এস। মা কত কাঁদচেন, বাবা মাকে কত বকচেন। আমাদের ভালবাসা ত বাড়ীতে থেকেই চল্‌তে পারে। কেন আমাকে এমন জায়গায় নিয়ে এলে?"

"দেখ নলিনী, ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। তুমি ধুতীর খুঁটে বেঁধে যে চিঠি জানালা দিয়ে ঝুলিয়ে আমার হাতে দিয়েছিলে, তাইতে লিখেছিলে 'প্রাণেশ্বর! ত্বয়া সহ নিবৎস্যামি বনেষু মধুগন্ধিষু।' এখন কেন অমন করচ ভাই? এখানে ত তুমি রাণীর হালে থাক্‌বে। আর এই সঙ্গিনী সব তোমার,—এরা তোমায় রাত্রিদিন আনন্দ দেবার জন্য নিযুক্ত থাক্‌বে। তা ছাড়া, তুমি বাড়ী গেলে তোমাকে নেবে কেন? আজ চতুর্থ দিন। যদিই বা তোমার মা নেন, সকলে তাঁদের একঘরে করবে। লক্ষ্মীটী, কেঁদে-কেটে অসুখ করো না। পতিত পর্ব্বত লঘু। মাথার উপর পাহাড়ের মতন একটা ভারি জিনিস পড়লে, প্রথম-প্রথম খুব ভারি ব'লে কষ্ট হয়। পরে সয়ে যায়,—তখন মনে হয় না, তত ভারি। এখন ভাবলে কি হবে? মা বাপ কারো চির সঙ্গী নয়। কিছুদিন কষ্ট হবে, তারপর সয়ে যাবে।"

"দেখ নরেন, তুমি ত আমাকে এই রকম যায়গায় নিয়ে আসবার কথা বল নাই। এদের দেখে আমার বড় ভয় করচে।"

"তুমি কি মনে করেছ, এরা খারাপ লোক? এরা বড় ভাল মেয়ে। এরা যাদের বাবু বলে, তাদের সঙ্গে স্ত্রী-ভাবে কত বছর ধ'রে রয়েছে। সবর্ণ নয় বলে সমাজে বিয়ে হয় নাই। তাই ব'লে কি ভগবানের চক্ষে এরা স্বামী-স্ত্রী নয়?"

এই কথোপকথনের পর এক মাস চলিয়া গিয়াছে। নলিনী এখন বীভৎস দৃশ্য দেখিতে, অনেকটা অভ্যস্তা হইয়া পড়িয়াছে। নরেন্দ্র প্রতিদিন আসিত। সম্প্রতি পিতার রোগের সংবাদ পাইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে একজন মাড়োয়ারী যুবকের প্রলোভনে পড়িয়া নলিনী মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটে উঠিয়া গিয়াছে। সেখানে যখন জরায়ু-রোগে কষ্ট পাইতেছিল, আমাকে একদিন ডাকিয়া পাঠাইল। সে বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র, একটী কাকাতুয়া রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া, "—খেকোর ব্যাটা, ঝাঁটা মারি তোর মুয়ে" বলিয়া অভ্যর্থনা করিল। বাড়ীতে আট ঘর-বারাঙ্গনা। প্রত্যেক ঘরে একটী বৈদ্যুতিক আলো ও বৈদ্যুতিক ব্যজন। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন রান্নার ব্যবস্থা। ঢালা বিছানা, বড় বড় তাকিয়া, ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র। নলিনীর ঘরে এক পাশের দেয়ালে দু'দিকে বড়-বড় আরশী। আরশীর নীচে দুটী পেরিস্ প্লাষ্টারের কুকুর। দুই আরশীর মাঝখানে একটা কাঁচের ময়ূর পেখম ধরিয়া রহিয়াছে। ময়ূরপুচ্ছ বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত। নলিনী একজন মাড়োয়ারীর অনেক রক্ত শোষণ করিয়াছে। তাহার আসবাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। একদিন সে ঐ মাড়োয়া-রীকে লইয়া অস্‌লার ও অন্যান্য বড় দোকানে আস্‌বাব ক্রয় করিতে গেল। দোকানীদের নিকট ৮০,০০০, হাজার টাকার আসবাব কিনিয়া মাড়োয়ারীকে বলিল, "তুমি এখন টাকাটা দাও, আমি বাড়ী গিয়ে শোধ করব।" মাড়োয়ারী বাড়ী ফিরিয়া টাকার কথাটা পাড়িবার আর অবকাশ পাইল না। একমাস পর মাড়োয়ারী যখন টাকা চাহিল, নলিনী বলিল "জহরমল, এই টাকার জন্য তুমি এত ব্যস্ত, আশি হাজার টাকা আবার টাকা? যাও, তোমার এখানে আসা আর উদ্বাহু কমলের প্রাংশুলভ্য ফলের আশা করা একই কথা।" মাড়োয়ারী সেদিন বাইজীর অনেক তোষামোদ করিল। পরদিন নলিনী আসবাবপত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া, বিডন ষ্ট্রীটের একটী গলিতে

আর একখানি বাড়ী-ভাড়া করিল। প্রকাশ্যতঃ ব্যবসায় বস্ত্র-বিক্রয়; কিন্তু আয়ের প্রধান উপায় বস্ত্রাচ্ছাদিত কোকেন্। সাধু ব্যবসায়ী নামধারী ইংরাজ বণিক বস্ত্রের বস্তার সঙ্গে কোকেন্ রপ্তানি করিতেন। নলিনীর নাম এখন কামিনী। কিন্তু কোকেনের প্রসাদে যখন কলিকাতা সহরে সে পাঁচখানি রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ক্রয় করিল, এবং নগদ পাঁচ লক্ষ টাকার অধিকারিণী হইল, তখন তাহার নামকরণ হইল কোকেন্-কামিনী। তাহার আয়ের অন্য উপায়ও ছিল। তাহার বাড়ীর এক চোর-কুঠরীতে প্রতি রাত্রে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, পেশোয়ারী প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক সমবেত হইয়া জুয়া খেলিত। সেই আড্ডায় মোটর ডাকাতির পরামর্শ চলিত। তাহাতেও কোকেন্-কামিনীর বিশেষ লাভ। একদিন তাহার একজন পাণ্ডিত্যাভিমানী মোক্কেল তাহাকে বলিল, "কামিনী, তোমার ত কুবেরের ভাণ্ডার, তবে বিপজ্জনক ব্যবসার প্রয়োজন কি?" কোকেন্-কামিনী বলিল, "এত বড় পণ্ডিত হ'য়ে কি জান না?—

"দশী শতং শতী দশশতং
লক্ষং সহস্রাধিপঃ?"

আর একটা কথা। শাস্ত্র না কি বলেন,—ঈশ্বরই সমুদয় ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। আমি বলি, শাস্ত্রের মর্ম্ম সকলে বুঝে না।

"নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব"

এ শ্লোকের অর্থ কি? এর অর্থ "হে পয়সা! তুমিই মানুষের একমাত্র গতি, মুক্তি, ভরসা।" কোকেন্-কামিনীর পাণ্ডিত্য দেখিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানীর আক্কেল গুড়ুম। গান, বাদ্য, অশ্বারোহণ, মোটর-সঞ্চালন, পাণ্ডিত্য, কবিত্ব প্রভৃতি নানা গুণে কামিনী পণ্ডিত হইতে পুলিশ পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর লোক আকর্ষণ করিত। পুলিশের বড় সাহেব, হেমচন্দ্র ঘোষালের পুত্র রামচন্দ্র ঘোষাল কামিনীর ক্রীতদাস। তাই চোর-কুঠরীর অধিবাসিগণের সাত খুন মাপ। দরিদ্র নারায়ণের সেবা, রোগীর শুশ্রূষা ও বিপন্নদের সাহায্য প্রভৃতি কারণেও বহু লোক কামিনীর বাধ্য; তাহারা তাহার ব্যবসা রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। এই কামিনী রামচন্দ্রের সঙ্গে তাহার স্ত্রীকে দেখিতে আসিয়াছিল।

৪

রোগিণীর বয়স দ্বাবিংশতি,—এ দেশের পক্ষে একটু বেশী বয়সে প্রথম প্রসব। প্রসবের পর আজ আটাশ দিন। আট দিনের দিন হইতে জ্বর ও পেটে ব্যথা। তলপেটে পাঁচমাস গর্ভের মতন একটা শক্ত চাকা। তাই আমাকে ডাকা হইয়াছে। আমি বলিলাম, পেটের ভিতর ফোঁড়া। কলিকাতার বড় ডাক্তার বাবুও তাহাই বলিলেন। তাঁহার মতে সত্বর অস্ত্র না করিলে ফোঁড়া ফাটিয়া পেটে পূঁয পড়িবে। তাহাতে রোগিণীর মৃত্যু অনিবার্য্য। অন্দর-মহলে মেয়ে মজলিসে অনেকে বিনামূল্যে অনেক পরামর্শ বিতরণ করিলেন। পরামাণিক গিন্নি বলিলেন;—"রেখে দাও তোমার মেটে কালেজের বড় ডাক্তার। ডাক্তার যেমন বেঁটে, তার কালেজও তেমন মেটে। আমাদের গণি লাট ক্যাম্বেলী পাশ, তাছাড়া তিন রকম তিকিচ্ছেয় পণ্ডিত—হুমপাথী, কবিরাজী, ডাক্তারী। সরু পিঁপড়ের ডিমের মতন কি খেতে দেয়,—নাড়ী-ছাড়া রোগী তিড়িং ক'রে উঠে দাঁড়ায়। অস্ত্র বিদ্যেই কি কম জানে? এই সেদিন বাঙ্গাল দেশের এক জায়গা—গোপাল-নন্দ, সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সে রোগীর পেটেও পেল্লায় এত বড় এক ফোঁড়া হয়েছিল। একটা বোতল চেয়ে নিয়ে ভেঙ্গে তার এক টুক্‌রা নিয়ে পেট চিরে সব পূঁয বার ক'রে দিলে। সে কি একদণ্ড এখানকার পসার ছেড়ে থাক্‌তে পারে? তাই অস্ত্র ক'রেই একেবারে রেল গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল। বাঙ্গালেরা 'মার মার' শব্দে যখন এল, গাড়ী ছেড়ে দিলে। তার বাবু অত টাকার কামড়ও নাই, আর অস্ত্রশস্ত্রের অত ভড়ংও নাই। এই সেদিন মিত্তিরদের বাড়ী অস্ত্র হল, একটা মহা যজ্ঞি। দেড় গণ্ডা ডাক্তার, এক গণ্ডা দাই, যোড়া যোড়া চাকর, বেয়ারা, হাঁড়ি হাঁড়ি গরম জল, ফোঁসফোঁসানি চুলো, বাটী, থালা, তুলো, ওষুধ, অস্ত্র শস্ত্র, সোর গোল, যেন একটা কুরুক্ষেত্র। কাজেও তাই হল; দু'দিন পরেই রোগী ওক্কা পেল। আমাদের গণির বাবু অত সব নাই। তাই সকলে ওর মর্য্যাদাও বুঝতে পারে না।"

গণেশচন্দ্র প্রামাণিক ক্যাম্বেলের কম্পাউণ্ডারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার দত্ত ফার্মেসীতে এক বৎসর কম্পাউণ্ডারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ব্যবস্থা আদায়

করিবার জন্য বড়-বড় ডাক্তারদের নিকট ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহার একটা প্রধান কাজ ছিল। উক্ত ঔষধালয়ের অনেক-গুলি ঔষধ পুঁজি করিয়া পাঁচ বৎসর হইল এই গ্রামের "ডিঁসপিস্" খুলিয়া অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বচনে সিদ্ধ; সুতরাং নারী-মহলে বিশেষ পসার। পসারের আরম্ভ ঘোষেদের বাড়ীতে। ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র পুত্রের সামান্য সর্দ্দি হইয়াছে। পরামাণিক গিন্নি ঘোষজায়াকে বলিলেন, "পাঁচুর মা, কি করচিস্? পাঁচু ঠাকুরের কল্যাণে যদি ক্ষুদ-কুঁড়ো পেয়েছিস্, বেঁচে থাক্। গণি কল্কাতা থেকে খুব ভাল ডাক্তারি শিখে এসেছে। তাকে পাঠিয়ে দিচ্চি; এক ফোঁটা ওষুধে সব সেরে যাবে।" এ হেন গণেশচন্দ্র প্রামাণিক ওরফে গণি ডাক্তারের চরিত কীর্ত্তন শেষ হইবামাত্র, কোকেন্-কামিনী হাসিয়া-হাসিয়া বলিল, "মাসীমা, গণেশ ডাক্তার মশাই ত ঘরের লোক,—তাঁর হাতে ত রোগী থাক্বেই। আপাততঃ কল্কাতা থেকে একজন ভদ্রলোককে ডেকে আনা হয়েছে, তাঁর মর্য্যাদা রক্ষে করা উচিত।" এই বলিয়া সে নিজেই আমাকে লইয়া অস্ত্রের সমুদয় আয়োজন করিল। পরদিন প্রাতে অস্ত্র হইবার পর রোগী অনেকটা সুস্থ। প্রায় আধসের পূঁয নির্গত হইয়াছিল। ফোড়া কাটিয়া ঐ পূঁয নাড়ী-ভুঁড়ীর উপর পড়িলে রোগিনীর মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল। পোয়াতি পরীক্ষার সময় একটুখানি ফোটান গরম জল, সাবান, টিংচার আয়োডিন্ আর পোয়া ঘণ্টা সময় ব্যয় করিয়া হাতটি পরিষ্কার ও শোধিত করা। এইটুকু পরি-শ্রমের অভাবে দাইয়েরা কত বড় কাণ্ড করিয়া বসে!

৫

পোনোর দিন পরে বড় ডাক্তার কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রসূতির অবস্থা খুব ভাল। কোকেন্-কামিনী শিশুর স্নান ও আহারের ভার আপনার হাতে লইয়াছে। পোনোর দিন ধরিয়া চব্বিশ ঘণ্টা রোগিনীর শুশ্রূষা করিয়াও তাহার কিছুতেই ক্লান্তি বোধ হয় না। একদিন ঐ দুই মাসের হৃষ্টপুষ্ট রাজপুত্র তুল্য শিশুটীকে স্নান করাইয়া, বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘন-ঘন চুম্বন করিতে-করিতে বলিতেছিল, "আমার ধনটা! আমার মাণিকটা!" আমি আসিবামাত্র তাহার আদর-আপ্যায়ন স্থগিত হইল, এবং আকর্ণ সমুদায় মুখটী লাল হইয়া উঠিল। তাহার শয়নাগারের পার্শ্বেই আমার শয়নের ব্যবস্থা। কিছুদিন হইল অনেক রাত্রে জাগিয়া শুনিতাম, কোকেন্-কামিনী বিড়-বিড় করিয়া বকিতেছে। সেই রাত্রে মনে হইল, সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছে। চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ, আর অশ্রুসিক্ত।

আজ রোগিনীর আরোগ্য-স্নানের দিন। গ্রামশুদ্ধ নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ-সভায় গ্রাম্য ধাত্রীদের মূর্খতা এবং আধুনিক চিকিৎসার গুণ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। অকস্মাৎ একজন সাধুর আবির্ভাবে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখে কি অপূর্ব্ব কান্তি! তপ্তকাঞ্চনদেহে অঙ্গে অরুণ বসনের কি অতুলনীয় শোভা! স্বর্গীয়-জ্যোতিঃ-দীপ্ত চক্ষু দুটী যেন কাহার অন্বেষণে ঘুরিতেছে। গ্রামের ভক্তেরা মনে-মনে বলিলেন, "এ কি পাপান্ধকার নাশের জন্য নবদ্বীপচন্দ্রের পুনরুদয়?" ভগবান ভক্ত রূপ ধারণ করিয়া যখন ধরা পবিত্র করিতে আসেন, ধরায় কি সে রূপের তুলনা মিলে?

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং"

শ্রীভগবান আপনার যোগমায়ার বল প্রদর্শনের জন্য মর্ত্ত্য-লীলার উপযোগী রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।"

সেই অপরূপ নরবপুর দিকে আমরা মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল অনিমেষ নেত্রে বহুক্ষণ ধরিয়া সেই রূপসুধা পান করি; কিন্তু পলক আসিয়া বাদ সাধিল। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে অতৃপ্তা গোপিনীগণের ন্যায় চক্ষের পক্ষ্ম-নির্ম্মাতাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল;—

"জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং"

চক্ষু-লোম-নির্ম্মাতা বিধাতা কি মূর্খ! আমাদের চক্ষের তৃপ্তি হইতে না হইতে সাধু সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া, গৃহকর্ত্তাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কি বলিলেন; এবং অন্তঃপুরে যে স্থানে কোকেন্-কামিনী উপুড় হইয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে হস্তধারণ করিয়া উঠাইলেন! সে ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "এ কি করলেন প্রভু! আমার ন্যায় অস্পৃশ্যাকে আপনি স্পর্শ করলেন!" প্রেমদীপ্ত চক্ষু দুইটী তাহার অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু-যুগলে স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "মাঁ রে, তোকে যে স্পর্শমণি স্পর্শ

করেছে,—আর কি তুই অস্পৃশ্যা আছিস্? যাঁকে বিষাক্ত স্তন্য পান করিয়েও পূতনা স্বর্গে ধাত্রী-গতি প্রাপ্ত হয়েছিল, তাঁকে শিশুরূপে বুকে ধ'রে অশ্রুধারায় যে সমস্ত পাপ ধুইয়ে ফেলেছিস্। বাৎসল্যরসের আশ্চর্য্য মহিমা! ঐ রসে রসান দিয়ে, অগ্নিদগ্ধ ক'রে, রসময় স্বর্ণকার তোকে ত খাঁটি সোণা করে দিয়েছে। যে গোপাল তোকে এমন করেছে; যাকে পাবার জন্য তুই এত লালায়িত হয়েছিস্, এই নে তাকে, আমি তোর জন্য ধরে এনেছি।" এই বলিয়া গৈরিকের মধ্য হইতে একটা অপূর্ব্ব গোপাল-মূর্ত্তি বাহির করিয়া কামিনীর হস্তে দিলেন; এবং কোন্ দিক দিয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন, কেহ বুঝিতে পারিল না। কোকেন্-কামিনী আজ গোপাল-জননী হইল। তাঁহাকে কোলে করিয়া অনেকক্ষণ মুখচুম্বন করিল; এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া, ধনরত্ন সমুদায় বৈষ্ণবকে বিতরণ করিয়া, হরিবোল বলিতে-বলিতে দিশাহারা হইয়া চলিল। আজ সকলের মুখেই হরিবোল। কেবল স্তম্ভিত রামচন্দ্র কামিনীর পশ্চাতে গিয়া ডাকিল 'কামিনী'। কামিনী বলিল, "রামবাবু, কামিনীর মৃত্যু হয়েছে। তুমি যাকে মনে ক'রে ডাকচ, তার মতন হাজার-হাজার অভাগিনী তোমাদের খেলার পুতুল সেজে কলিকাতার গলিতে-গলিতে রয়েছে। আজকার দৃশ্য দেখেও যদি চৈতন্য না হ'য়ে থাকে, যাও সেখানে; যতদিন না মানুষ চিনবে, ততদিন পুতুল নিয়ে খেলা কর গে। যখন সেই মানুষ এসে তোমার ভিতরকার মানুষটাকে টেনে বাহির ক'রবে, তখন তুমিও আমার মতন পাগল হ'য়ে রাস্তায় বেরোবে।" এই বলিয়া গোপাল-মূর্ত্তি বক্ষে জড়াইয়া সে ষ্টেশনের দিকে ধাবিত হইল; এবং কলিকাতায় আসিয়া কোথায় গেল, তাহার কোন সন্ধান কেহ পাইল না।

৬

নলিনীর পিতা হাইকোর্টের উকীল কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হরিহরপুর। প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি বসতবাটী অরণ্যে পরিণত করিয়া কলি-কাতায় রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে আজ বিশ বৎসরের কথা। এতদিন পরে এক নবীন সন্ন্যাসিনী সেই পতিত ভিটায় একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া গোপাল সেবায় কায়মন অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "গোপাল-সেবাশ্রমে" দৈনিক তিন শত লোকের চিকিৎসা চলিতেছে; এবং বহু দরিদ্র প্রসূতি ও শিশু দুগ্ধ ও পথ্য পাইতেছে। যে সমুদায় মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারে অর্থের অভাবে চিকিৎসা চলে না, অথচ খয়রাতি চিকিৎসা-গ্রহণে সংকোচ, তাহাদের জন্য অর্দ্ধমূল্যে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা আছে। যিনি জোলাকুল পবিত্র করিয়াছিলেন, তাঁহার নামে একটী "কবীর বয়ন বিদ্যালয়" স্থাপিত হইয়াছে। যে সমুদায় স্ত্রী-পুরুষ অর্থলোভে সহরে গিয়া কারখানাসমূহে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল, এবং পবিত্র গ্রাম্য-শাসনের অভাবে বিপথগামী হইয়াছিল, তাহারা গ্রামে ফিরিয়া এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। বৎসর-বৎসর উৎসবের সময় গোপাল মন্দিরের সম্মুখে সহস্র কণ্ঠে "জয় নন্দরাণীজীর জয়" ধ্বনিতে যখন দিঙমণ্ডল কম্পিত হইত, নন্দরাণী নামধারিণী এই নবীন সন্ন্যাসিনী বিকট জনসংঘের দিকে তাকাইয়া, শতধারে বক্ষ ভাসাইতেন; এবং তাহাদের মধ্যে গোপালকে প্রত্যক্ষ করিয়া নারী-জীবন ধন্য করিতেন।

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

ঢেঁকি অবতার

আজ আপনাদের সঙ্গে একটী নূতন জিনিসের পরিচয় করাইয়া দিব। জিনিসটি চিরপুরাতন, অথচ নূতন। ঢেঁকি আমাদের ঘরেরই ঢেঁকি—আমাদের নিতান্তই আপনার জিনিস। সেই অনাদি কাল হইতে এই ঢেঁকি আমাদের কুললক্ষ্মীগণের রাঙা চরণতলে নাচিয়া নাচিয়া ধান ভানিয়া আসিতেছে। ঢেঁকিকে বুঝাইলেও বুঝে না—নিত্যই ধান ভানে—এমন কি, স্বর্গে গিয়াও।

কিন্তু এই নব্য বৈজ্ঞানিক-যুগে ঢেঁকি আপনার রূপ

বদলাইয়াছে,—এখন বহুমুখী হইয়াছে—মালক্ষ্মীগণের রাঙা চরণের আঘাতে নাচিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয় 'ভারতবর্ষের' পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে অপরিচিত নহেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি 'ভারতবর্ষের' পাঠক-পাঠিকাগণকে বিদ্যুতের কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। আমাদের চিরন্তন ঢেঁকি ইঁহার হাতে পড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন জিনিস হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার ঢেঁকিতে আমাদের যতটা কাজ হইত, নবাবিষ্কৃত ঢেঁকিতে হিসাব মত তাহার ছয়গুণ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বহুগুণ কাজ আদায় হইবে।

আমাদের মূলধন অল্প, সংহতি-শক্তি সামান্য,—অথচ, অনেক কাজ আমাদের করিবার রহিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বড় বড় কলকারখানা আমাদের পক্ষে, এ দেশের পক্ষে তেমন সুবিধাজনক নহে। হোম ইণ্ডাষ্ট্রি বা কুটীর শিল্প আমাদের পক্ষে খুব সুবিধাজনক এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী ও একমাত্র অবলম্বন। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি এই কয় বৎসর ধরিয়া "ভারতবর্ষের" ইঙ্গিত লিখিতেছি। আমাদের সেই সাবেক ঢেঁকি একটা কুটীর-শিল্প। এখন চাউল-ছাঁটা কল হইয়াছে—অনেক স্থলে চলিতেছেও। কিন্তু কলে অনেক চাউল নষ্ট হয়,—কতক গুঁড়া হইয়া, কতক ক্ষুদ হইয়া। ঢেঁকিতে এ সকল দোষ ঘটে না। সেইজন্য ঢেঁকির আদর—এই কলকজার যুগে—বৈজ্ঞানিক যুগেও—কমে নাই। কলে আর একটা দোষ হয়। চাউল অতি-মাত্রায় পরিষ্কার—সাদা ধবধবে—মাজাঘষা হইয়া যায়। এরূপ চাউল স্বাস্থ্যের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। মাজাঘষা, সাদা ধবধবে চাউলে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর অংশ বাদ যায়। সেই অংশে ভাইটামাইন নামক একটা পদার্থ থাকে। চিকিৎসকেরা বলেন, এই জিনিসটিই চাউলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর, সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ। ঢেঁকিতে চাউল ছাঁটা হইলে এই জিনিসটি নষ্ট হয় না—চাউলের দানার গায়ে লাগিয়া থাকে। সেইজন্য ঢেঁকিছাঁটা চাউল কলে ছাঁটা চাউল অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। বোধ হয় এই কারণেই ঢেঁকি বৈজ্ঞানিক কলকজাকে পরাস্ত করিয়া আপনার প্রভুত্ব এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের 'ছয়মুখী' আমাদের সেই মান্ধাতার আমলের "লাথির ঢেঁকি"রই নূতন "রাজ সংস্করণ"। কিন্তু বড় বেহায়া। সেকালের ঢেঁকি চড়ে উঠে না বটে, কিন্তু লাথি মারিলে উঠে। এ নূতন সংস্করণের ঢেঁকি লাথিতেও উঠিবে না। ইহাকে তুলিতে হইলে, মহিষের বা বলদের সাহায্য লইতে হইবে। একটী মাত্র ষাঁড় বা মহিষ এই ঢেঁকি-কল চালাইতে পারিবে, এবং ক্রমান্বয়ে ছয়টি মুষল উঠিতে ও নামিতে থাকিবে।

আমাদের ঢেঁকির যদিও ধান ভানাই প্রধান কাজ, কিন্তু ইহার দ্বারা ধান ভানা ছাড়া আরও অনেক কাজ হয়। সেই সকল কাজের জন্য অবশ্য বিলাতী কল অনেক প্রকারের আছে; কিন্তু কলের একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, যে কাজটির জন্য যে কলটি তৈয়ারী হইয়াছে,—কলটি ঠিক সেই কাজেরই উপযোগী করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। সেই কলে সেই কাজ ছাড়া সেই ধরণের অন্য কোন কাজ সাধারণতঃ হইবার যো নাই। কিন্তু, ঢেঁকিতে সে অসুবিধা নাই বলিলেও চলে। বস্তুতঃ, ধান ভানা ছাড়া হাজার রকম কাজ ঢেঁকিতে সম্পন্ন হয়। সেই সকল কাজই সরকার মহাশয়ের ঢেঁকিতে সম্পন্ন হইতে পারিবে।

কলটি গৃহশিল্পের কিরূপ উপযোগী হইয়াছে, তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ বিলাতী "হালার" বা চাউল ছাঁটিবার কলের মত ইহাতে চাল ছাঁটা ত হইবেই—যথেষ্ট পরিমাণেই হইবে; অধিকন্তু, হালারে কেবল সিদ্ধ ধান ভানা যায়,—এই ঢেঁকিকলে সিদ্ধ, অসিদ্ধ, সরু, মোটা—সকল রকম ধান অনায়াসে ছাঁটা হইবে। তা' ছাড়া, কল ও ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের মধ্যে গুণের ও স্বাদের যে তারতম্য হয়, তাহার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার উপর, ঢেঁকিতে এমন একটা কাজ হয়, যাহা বিলাতী "হালারে" আদৌ হইতে পারে না। সেটা চিঁড়ে কোটা। বিলাতী কলের সাহায্যে চিঁড়ে কুটিতে হইলে তাহার জন্য আলাদা কল তৈয়ার করিয়া না লইলে চলিবে না।

পল্লীগ্রামে এখনও সকল স্থলে সুরকীর কল বসে নাই। পাঁজা পোড়াইয়া ইট প্রস্তুত করিয়া, সেই ইট ঢেঁকিতে কুটিয়া সুরকী তৈয়ার করিয়া এখনও অনেক বড় বড় ইমারত তৈয়ার হইয়া থাকে। সুরকীর যে বিলাতী কল

আছে, তাহা সুরকী তৈয়ার করিবার পক্ষে বেশ উপযোগী। কিন্তু সে কলে ধান ভানা হইতে পারে না, এবং বিলাতী ধান ভানা কলে সুরকী তৈয়ার হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের ঢেঁকি ধানও যেমন ভানিতে পারে, চিঁড়াও তেমনি কুটিতে পারে, সুরকীও তেমনি তৈয়ার করিতে পারে। তেমনি, তামাক প্রস্তুত করিবার জন্যও ঢেঁকি সমান উপযোগী। অথচ, তামাক-পাতা কুটিতে বিলাতী কল সম্পূর্ণ আলাদা রকমের চাই। মসলা কুটিতেও ঢেঁকি অদ্বিতীয়।

ঢেঁকিতে কি হয় না হয় তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে বিলাতী কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ঢেঁকির অনেক কাজ এখন বন্ধ হইয়াছে। যেখানে সুরকীর কল বসিয়াছে, সেখানে ঢেঁকিতে আর সুরকী কোটা হয় না। এক সময়ে এদেশে কাগজীরা যথেষ্ট পরিমাণে দেশী কাগজ প্রস্তুত করিত। কিন্তু বিলাতী কলে প্রস্তুত কাগজ খুব সস্তায় এদেশে আমদানী হয় বলিয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া প্রস্তুত করা দেশী কাগজ আর বিকায় না। এই শিল্পটি এক রকম লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। আমার মনে হয় সরকার মহাশয়ের ছয়মুখী ঢেঁকি ব্যবহার করিলে আমাদের কাগজ-প্রস্তুত শিল্পটিকে পুনরুজ্জীবিত করা যাইতে পারে। সস্তার কাগজ অবশ্য চলিবেই। কিন্তু কলের কাগজের অপেক্ষা হাতে প্রস্তুত কাগজের একটা বিশেষত্ব আছে। হাতে প্রস্তুত কাগজ কলে তৈয়ারী কাগজ অপেক্ষা অনেক বেশী মজবুত, টেঁকসই ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সেইজন্য ঐ সকল উদ্দেশ্যে হাতে প্রস্তুত কাগজ এখনও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সাবেক ঢেঁকিতে কুটিয়া কাগজ প্রস্তুত করিতে যে খরচ অর্থাৎ মজুরী পড়িত, সরকার মহাশয়ের ঢেঁকি চালাইলে কাগজ প্রস্তুত করিবার পড়তা অনেক কমিয়া যাইবে, সুতরাং প্রতিযোগিতা অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে। তাহার উপর, সরকার মহাশয় যেমন বুদ্ধি খাটাইয়া এই বহুমুখী ঢেঁকি প্রস্তুত করিয়াছেন, তেমনি অপর কেহ যদি কাগজ তৈয়ারী করিবার উপযোগী করিয়া হাতে চালানো আরও দুই একটা কল প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে হোম ইণ্ডাষ্ট্রি হিসাবেই আমরা যে বিলাতী কলে প্রস্তুত কাগজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিব না, এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে যে কয়টি প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, তার মধ্যে প্রথমটি মসলা কোটা। তার পর তাহাকে জলে ধুইয়া কাগজের আকার প্রদান করা। তৃতীয় কাজ, কাগজগুলিকে শুকাইয়া লওয়া। চতুর্থ, সাইজিং বা মাড় মাখানো এবং মাজিয়া মসৃণ করিয়া লওয়া। আবার শুকাইয়া লওয়া। শেষ, সমান আকারে কাটা। আমার মনে হয়, প্রত্যেক দফার কাজটি হাতে চালানো কল তৈয়ার করিয়া লইয়া সম্পন্ন করা যায়। প্রথম দফার কাজ মসলা কোটা, বহুমুখী ঢেঁকির দ্বারা উত্তমরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। অপর কাজ হাতে চালানো কলে প্রস্তুত করা সম্ভব বলিয়া আমার মনে হইতেছে। কেহ না কেহ একটু মাথা খাটাইয়া স্বচ্ছন্দে এরূপ কল প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবেন। কলের ঢেঁকির দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করার কাজটিই আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছি।

সরকার মহাশয়ের ঢেঁকি-কলে আরও অনেক কাজ করা চলিবে। কুমোররা মাটী মাখিবার ও মিশাইবার কাজে এই কল হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন। এখন কবিরাজ মহাশয়দের বৃহস্পতির দশা যাইতেছে। অনেক কবিরাজের বাড়ীতেই আজকাল প্রচুর পরিমাণে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের সম্বলের মধ্যে হামান-দিস্তা। বেশী ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, গাছ গাছড়া কুটিবার, মিশাইবার বা মাখিবার জন্য তাঁহারা এই কল স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারিবেন। মোট কথা, ভাঙা এবং কোটার প্রায় সকল কাজই এই কলের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিবে। সারের জন্য হাড় গুঁড়ানো, সিরিস কাগজ তৈয়ার করিবার জন্য কাচ গুঁড়ানো, ব্ল্যাকো তৈয়ার করিবার জন্য খড়ি গুঁড়ানো, বিলাতী মাটী গুঁড়ানো—এ সকল কাজই এই ঢেঁকি করিতে পারিবে।

পল্লীগ্রামে এমন দরিদ্র গৃহস্থ অনেক আছেন, যাঁদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা অপর সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীতে ধান ভানিয়া, কিছু কিছু ধান বা নগদ অর্থ পাইয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের সংসারের অনেক সাশ্রয়, এমন কি, অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহও হয়। সরকার মহাশয়ের ঢেঁকির কথা শুনিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল, এই ঢেঁকি চলিলে, সেই সকল দরিদ্র গৃহস্থের অন্নসংস্থানে ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু

ইহার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া সে আশঙ্কা দূর হইল। এই ঢেঁকিতেও সেই মেয়েরাই কাজ করিবেন। তবে তাঁহাদের অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না। পরিশ্রমের কাজটা বলদের দ্বারা হইবে। প্রত্যেক মুষলের কাছে একটী করিয়া মেয়ে কাজ করিবে। এইরূপে এক-একটী কলে ছয়জন মেয়ে কাজ করিতে পারিবে। ইহাতে যখন সাধারণ ঢেঁকির অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইবে, মজুরী যখন অনেক কমিয়া যাইবে, তখন ঢেঁকির মালিক ঢেঁকিতে নিযুক্ত মেয়েগুলিকে হাসিমুখে কিছু বেশী পারিশ্রমিক অক্লেশেই দিতে পারিবেন।

তবে একটা কথা, কলের ঢেঁকিতে যখন কাজ বেশী হয়, তখন মোটের উপর কাজের পরিমাণ কমিয়া গিয়া ঐ দরিদ্রা মেয়েগুলির পারিশ্রমিক হিসাব মত কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে আশঙ্কা করিবারও কারণ নাই। ঢেঁকিতে যখন সকল রকম কাজ চলে, এবং পল্লীগ্রামে এমন অনেক কাজ আছে যাহা লোকাভাবে অনেক সময় করা যায় না, তখন সেই সকল কাজ এই ঢেঁকির দ্বারা করানো যাইতে পারিবে। সুতরাং ধান ছাঁটার পরিমাণ কম হইলেও, অন্য অনেক কাজ হইবে বলিয়া মোটের উপর তাহাদের উপার্জ্জন বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয়।

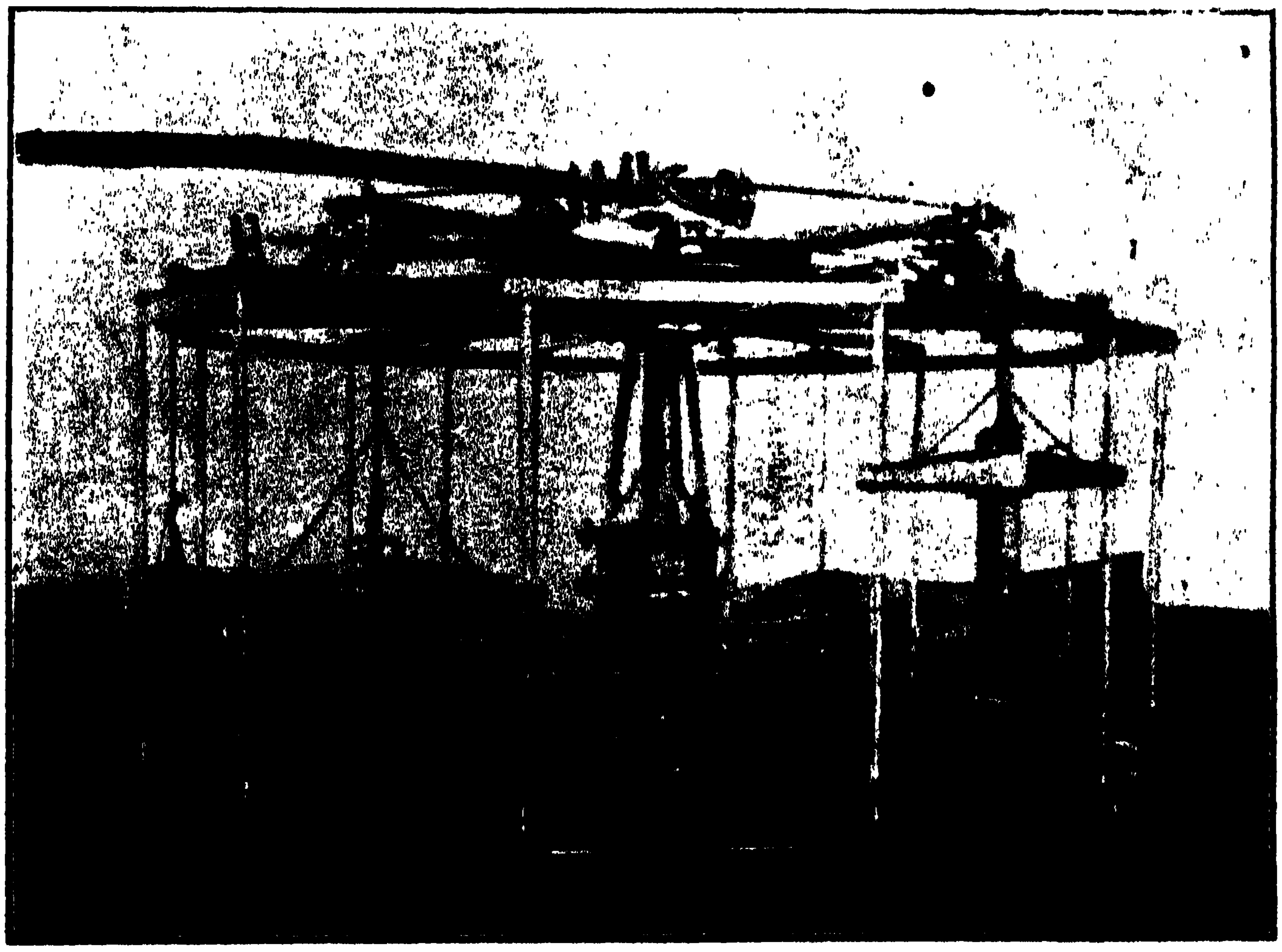

'ছয়মুখী' ঢেঁকি

মনে করুন, এক গৃহস্থ-বাড়ীতে একটী লাথির ঢেঁকি আছে। গৃহস্থের ধান-জমিতে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত ধান ভানিতে হইলে ঢেঁকিটী বারমাস ত্রিশ দিন চালাইতে হয়; এবং একটী গরীব গৃহস্থ-কন্যা সেই ঢেঁকি চালাইয়া বার মাস ত্রিশ দিন তাহার অন্ন-সংস্থান করিতে পারে। এখন সেই গৃহস্থ বেশ সম্পন্ন। তিনি কিছু টাকা খরচ করিয়া সরকার মহাশয়ের একটী কলের ঢেঁকি বসাইলেন। সেই ঢেঁকিতে ছয়টী মেয়েকে নিযুক্ত করিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার সারা বৎসরের কাজ দুইমাসে কিম্বা তদপেক্ষা কম সময়েই শেষ হইয়া গেল। বৎসরের বাকী দশ মাস তিনি কি করিবেন? তাঁহার অবস্থা বেশ ভাল। কিন্তু তাঁহার লাথির ঢেঁকিটি বার মাস ধান ভানার কাজে নিযুক্ত থাকে বলিয়া তিনি ইচ্ছা করিলেও, তাঁহার অবস্থা ভাল হইলেও, সুরকী কুটিয়া কোঠা তুলিতে পারেন না। কলের ঢেঁকি বসাইয়া দুই মাসে ধান ভানার কাজ শেষ করিয়া, বাকী দশ মাস সেই ঢেঁকিতে সুরকী কুটিয়া তিনি কোঠা তুলিতে পারিবেন। সুতরাং একটী স্ত্রীলোকের যায়গায় ছয়টি স্ত্রীলোকের বারো মাসের অন্ন-সংস্থানের উপায় ইহাতে হইতে পারিবে। তার পর ভাগাড় হইতে হাড় সংগ্রহ করিয়া ঢেঁকিতে চূর্ণ করিয়া ধান-জমিতে সেই সার প্রয়োগ করিয়া ধানের ফলন বাড়াইতে পারেন।

কলের ঢেঁকির একটা মস্ত সুবিধা এই যে, ইহাতে এক সময়ে ছয় রকম কাজ হইতে পারিবে; আবার প্রয়োজন হইলে যে কোন একটী বা একাধিক মুষলের কাজ বন্ধ রাখিয়া বাকীগুলি চালাইতে পারা যাইবে।

কলটী খুব সোজা। পাড়াগাঁয়ের পক্ষে খুব উপযোগী। একটী চাষের বলদ ও ছয়টী মেয়ে স্বচ্ছন্দে কল চালাইতে পারিবে। বলদের বদলে, যেখানে সুবিধা হইবে সেখানে

অয়েল ইঞ্জিন বা ইলেক্‌ট্রিক মোটরের সাহায্যেও এই কল চালাইতে পারা যাইবে। সর্ব্বপ্রকারে ইহা হোম ইণ্ডাষ্ট্রির খুব উপযোগী হইয়াছে। ইহা বসাইতে বিস্তৃত স্থানেরও দরকার নাই। ২৪ ফিট দীর্ঘ ও ২৪ ফিট প্রশস্ত একটা ঘর বা আটচালায় বসানো যাইতে পারিবে। সমস্ত কলটির ওজন ২৫ মণ। যিনি ঢেঁকি বসাইবেন, তাঁহার ঘরের কাজ ত হইবেই, তা ছাড়া তিনি সমগ্র কলটা অথবা একটা কি দুইটা মুষল অপরকে ভাড়াও দিতে পারেন। তাঁহার নিজের কাজও চলিবে, আবার ভাড়া বাবদ বাহিং হইতেও কিছু আদায় হইবে। গ্রামে একটা এইরূপ ঢেঁকি বসিলে, অনেক লোকই ধান আনিয়া ভানাইয়া লইয়া যাইবে।

ঘরের কাজ ছাড়া, ইহাতে রীতিমত ব্যবসায়ও চালাইতে পারা যাইবে; এবং সরকার মহাশয় প্রধানতঃ ব্যবসায় চালাইবার উপযোগী করিয়াই কলটা তৈয়ার করিয়াছেন। ধান ছাঁটা কলে (huller) যে ভাবে কাজ হয়, এই ঢেঁকিতে সেই রূপই কাজ হইবে। ধান কিনিয়া ঢেঁকিতে ভানিয়া বিক্রয় করিতে পারা যাইবে। ব্যবসায় করিতে হইলে লাভ লোকসান কিরূপ হইবে, তাহা একবার খতাইয়া দেখা আবশ্যক।

মূলধন।

একটা ঢেঁকি কল	১৭৩০৲
ছয়টি মটার বা মুষল ও জোয়াল	২০৲
কারখানার ঘর তৈয়ার করিবার খরচ	১০০৲
অন্যান্য খুচরা খরচ	৭৫৲
মোট	১৯২৫৲
ধরুন	২০০০৲

দৈনিক ব্যয়

ছয়টা স্ত্রীলোকের মজুরী দৈনিক আট আনা হিসাবে	৩৲
বলদ চালাইবার জন্য একটা রাখাল বা কৃষক বালক দৈনিক	।০
একটা বলদের খোরাকী প্রভৃতি বাবদ দৈনিক	১৲
কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য একটা লোকের দৈনিক পারিশ্রমিক	১৲

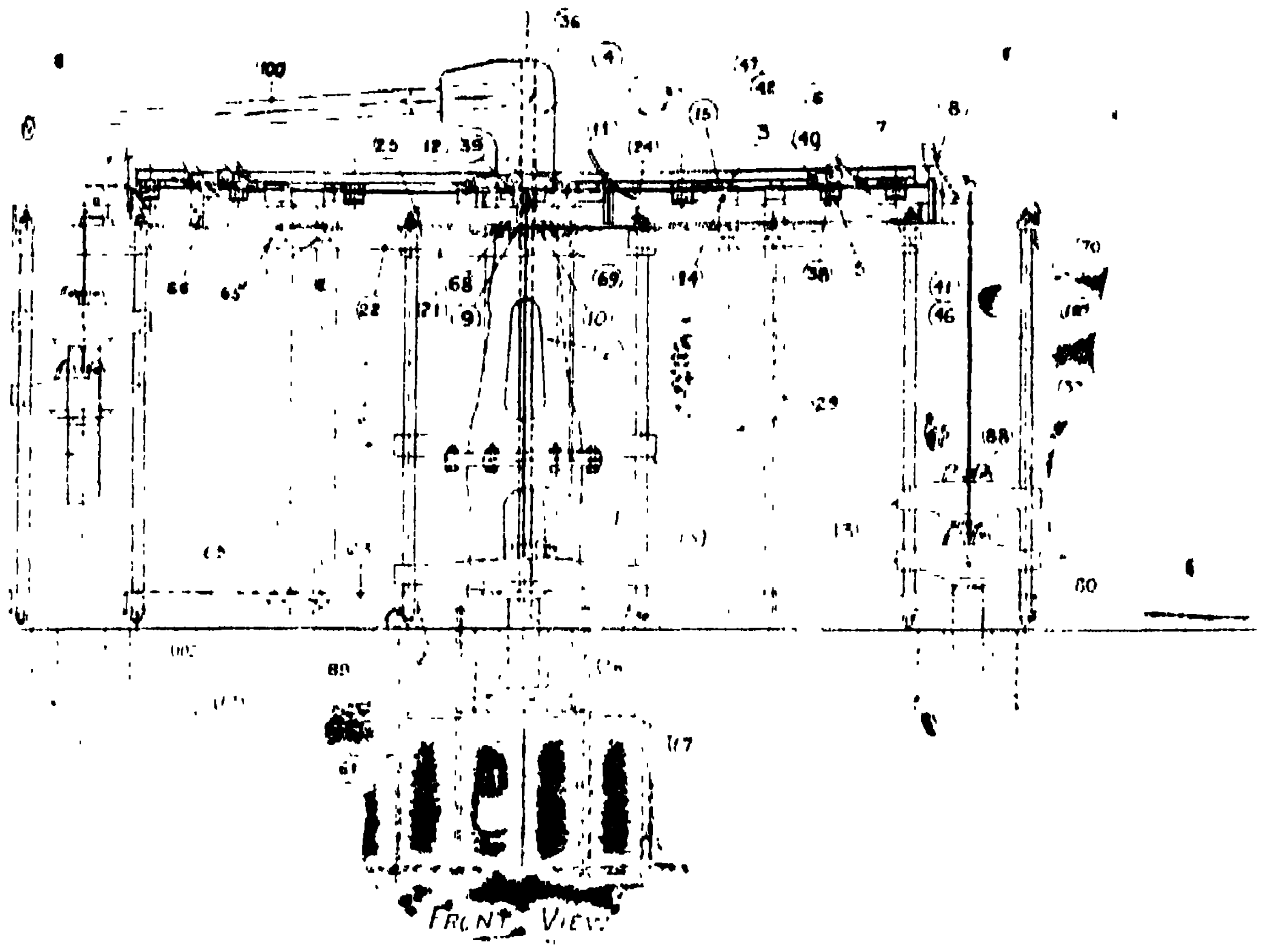

ঢেঁকির সম্মুখভাগ

ঘর ভাড়া, আপিস খরচ ইত্যাদি বাবদে দৈনিক	১৲
মোট	৬।০

দৈনিক উৎপাদন।

প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ হইলে দৈনিক ২৭ মণ ধান ছাঁটা হইবে। তাহার মূল্য ৩॥৵০ মন হিসাবে ৯৭৸৵০। ঐ ২৭ মণ ধান হইতে উৎপন্ন ১৯ মণ ৭ সের চাউলের মূল্য

মণ প্রতি ৬৲ টাকা হিসাবে	১১৫৲
৫॥৭ ভুসি ১।০ মণ হিসাবে	৭৲
১৸৪ খুদ ২॥০ মণ হিসাবে	৩।৵০
(বাকী ৩২ সের ঝড়তিপড়তি বাদ)	
মোট	১২৫।৵০

দৈনিক নিত্য খরচ	৬।০
ধানের মূল্য	৯৭৸৵০
	১০৪৵০
দৈনিক লাভ	২১।০

মাসে গড়ে যদি ২৬ দিন কাজ হয়, তাহা হইলে গড়ে মাসে ফেলিয়া ছড়াইয়াও ৫০০৲ লাভের প্রত্যাশা করা যায়।

৩০০০৲ টাকা লইয়া কাজ আরম্ভ করিলে অল্পদিনের মধ্যে মূলধন ঘরে তুলিয়া লইয়া লাভের টাকা হইতেই কল চালানো যাইবে।

চন্দ্রশেখর বাবু তাঁহার কলের যে সকল উপযোগিতার কথা আমাকে বলিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরও একটী উপযোগিতা আমি দেখিতে পাইতেছি। পুরাতন ছেঁড়া কাগজ কুটিয়া গুঁড়া করিয়া এই কলে Papier mache প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহাতে পুতুল, খেলানা, বোতাম ও নানা প্রয়োজনীয় জিনিষও তৈয়ার হইতে পারিবে।

ব্রহ্মদেশে পদব্রজে ভূ-প্রদক্ষিণকারী মিঃ মার্টিনি

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু

আমেরিকাবাসী ভূ-পর্য্যটক মিঃ হিপোলাইট মার্টিনি (Mr. Martinet) ১৯২০ খৃঃ অব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে যুক্তরাজ্যের ওয়াসিংটন প্রদেশের সিয়াটল নগর হইতে পদব্রজে পৃথিবী-পর্য্যটনে যাত্রা করেন। ইংলণ্ড, হলণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, আলবেনীয়া, গ্রীস্, মিশর, প্যালেষ্টাইন, মেসোপোটেমিয়া, আরব ও ভারতবর্ষ হইয়া ইনি ১৯২২ খৃঃ অব্দের, ১৯শে

ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী পরিবার মধ্যে মিঃ মার্টিনি

আগষ্ট তারিখে ব্রহ্মদেশের পিনম্যানা নামক স্থানে পৌঁছেন। তিনি সমস্ত পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছেন। কেবল মধ্যে-মধ্যে সাগর ও নদী পার হইবার জন্য জাহাজ ও নৌকার

সাহায্য লইয়াছেন। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নদী, খাল, ও ঝিল সাঁতার কাটিয়া পার হইতে হইয়াছে। তাঁহার বয়স এখন ৪৪ বৎসর। মিঃ মার্টিনি বিবাহ করেন নাই, কৌমারব্রত পালন করিতেছেন। তিনি অতি অমায়িক, স্নেহপরায়ণ, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু।

তিনি ক্ষুদ্র কুলী হইতে উচ্চপদস্থ লোক পর্য্যন্ত সকলের সহিত সর্ব্বদা সস্নেহে আলাপ করেন। তাঁহার জীবন খুবই সাদাসিধে। মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য বড় একটা ব্যবহার করে না। ধূমপান একেবারেই করেন না। তাঁহার এক প্রস্থ পোষাক—একটি পাজামা ও সার্ট। টুপি, কোট প্রভৃতি কিছুই তিনি ব্যবহার করেন না, নগ্ন পদে ও নগ্ন মস্তকে পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। তাহার শ্রমসহিষ্ণুতাও অতুলনীয়। তিনি কপর্দ্দক-শূন্য অবস্থায় দেশ হইতে বাহির হইয়াছেন। মিঃ মার্টিনির পদব্রজে ভূ-প্রদক্ষিণ করিবার খেয়ালটা অনেকটা বিখ্যাত আলেকজাণ্ডার ক্সোমাকোরসের ন্যায়। ক্সোমা-কোরস্ ও ভূ-প্রদক্ষিণ মানসে হাঙ্গেরী হইতে কপর্দ্দক-শূন্য অবস্থায় দেশ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে দারজিলিঙ্গ সহরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁহার মনো-বাসনা পূর্ণ হইতে পারে নাই। আমেরিকা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত মিঃ মার্টিনির ভ্রমণ-বিবরণ সংবাদপত্রের পাঠকেরা অবগত আছেন। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

মিঃ মার্টিনির কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশে আসিবার পথের বিবরণ আমরা এস্থানে বিবৃত করিব। ৯ই জুলাই কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১৭ই জুলাই তিনি চট্টগ্রামে পৌছেন। চট্টগ্রাম হইতে ২২শে জুলাই রওনা হইয়া ১৯শে আগষ্ট ব্রহ্মদেশের পিনমানা নামক স্থানে পৌছেন। পথে পাড়ুয়া, ইডংগং, উখিয়া, মংডো, অণ্ডান, আঙ্গুমা, আকিয়াব, প্রোম, আলান মিয়ো, টাউনডুয়িনজি, লেভেনডো, মিনবিন প্রভৃতি স্থানে এক রাত্রি করিয়া যাপন করিয়াছেন। উপরিউক্ত অণ্ডান হইতে আঙ্গুমার পথে প্রবল বর্ষার মধ্যেও অনেক স্থানে ভীমবেগে প্রবাহিতা খাল ও নদী তাঁহাকে সাঁতার কাটিয়া পার হইতে হইয়াছে। তাঁহার "নোটবুক" হইতে জানিতে পারা যায়, গড়ে তিনি ৪০ মাইল পথ প্রত্যহ হাঁটিয়াছেন। তিনি বড়ই দ্রুত গতিতে হাঁটিতে পারেন। তিনি গড়ে ঘণ্টায় ৪ মাইল হিসাবে চলিয়াছেন। আকিয়াব হইতে পিনমানা আসিবার পথে বহু ভীষণ অরণ্যানী ও দুরারোহ পার্ব্বত্য অঞ্চলও তিনি অতিক্রম করিয়াছেন। পথে এক ব্যাঘ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু সে দয়া করিয়া তাঁহার কোন অনিষ্ট করে নাই। আত্মরক্ষার জন্য তিনি কোন অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখেন না। একখানা ছুরি ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে আর কোন অস্ত্র নাই। আকিয়াব হইতে পিনমাত্রার পথে সময়ে-সময়ে তিনি খুবই ক্লেশ পাইয়াছেন। শুধু ডাব নারিকেল ও গুড় খাইয়া কয়েক দিন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল,—অন্য খাদ্য জোটে নাই। মিঃ মার্টিনিকে দেখিলে মনে হয় না যে, এত পরিশ্রমেও তাঁহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির কোন অপচয় ঘটিয়াছে।

উপরিউক্ত লেভেণ্ডো নামক স্থানে ১৭ই আগষ্ট রাত্রিতে এক প্রবাসী পঞ্জাবীর বাড়ীতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহস্বামীর এক পুত্র তাঁহাকে একটি বর্ম্মা কুকুর উপহার দিয়াছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কুকুরটি তাঁহার বড়ই প্রিয় হইয়াছে। ঐ কুকুরটি এক্ষণে তাঁহার পর্য্যটনের সঙ্গী। তাহার ইচ্ছা, কুকুরটিকে আমেরিকাতে লইয়া যান। পথে শয়নের জন্য আমেরিকা হইতে রবারের একটি বিছানা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শুইবার সময় উহা বায়ু পূর্ণ করিয়া লইতে হইত। ইহা এক্ষণে আর শয়নের জন্য ব্যবহার করিতে পারেন না; কারণ, চট্টগ্রাম হইতে ব্রহ্ম-দেশে আসিবার সময়, ক্রমাগত কয়েকদিন প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি হওয়াতে, উহা কাটিয়া দুই খণ্ড করিয়া, উহার দ্বারা শরীর ও মস্তক আবৃত করিয়াছিলেন। ঐ দুই খণ্ড রবার এখনও তাঁহার সঙ্গে আছে। তিনি আমাদের বাড়ীতে দুই দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ প্রভৃতির গল্প লইয়া সকাল-সন্ধ্যা কাটাইয়াছি। আমি ব্রহ্মদেশের সকল দর্শনীয় স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া "বিচিত্র ভুবন" নামক পুস্তক লিখিয়াছি শুনিয়া, তিনি আমার সহিত ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই রসিক পর্য্যটকের সহিত আমার বেশ ঘনিষ্টতা হইয়াছিল।

তিনি মাছ মাংস বড় ভালবাসেন না। এখানে অবস্থান কালে প্রথম দিবস সাহেবদের প্রথানুযায়ী খাদ্য-

সামগ্রী দেওয়া হইয়াছিল ; তাহাতে তিনি একটুক অসন্তুষ্ট হন ; এবং বাঙ্গালীর অতিথি হইয়াছেন,—সুতরাং বাঙ্গালী প্রথায় আহার করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা জানান। পরে তাঁহাকে আমাদের প্রথানুযায়ী খাদ্য-সামগ্রী দেওয়া হইয়াছিল। রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা, সন্দেশ, মিষ্টান্ন (পায়েস) ও আমসত্ত তাহার নিকট খুবই তৃপ্তিজনক হইয়াছিল। ফলের মধ্যে আনারস ও আঁতা খুবই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। এ স্থান হইতে ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী মান্দালয় নগরে যাত্রা করিবার সময় আমার স্ত্রী তাঁহাকে কয়েকখানা আমসত্ত দেন। তিনি অতি সাদরে উহা গ্রহণ করেন ও পথে পরিশ্রান্ত হইলে সদ্ব্যবহার করিবেন, তাহাও পুনঃ-পুনঃ বলিতে ভুলেন নাই।

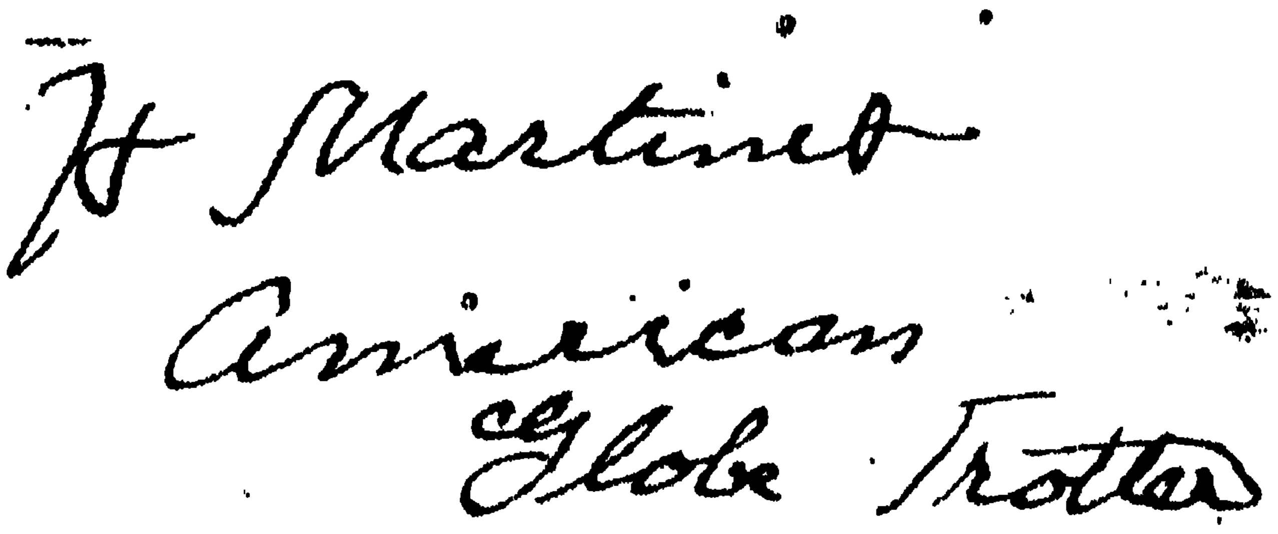

মিঃ মার্টিনির নিজ হস্তাক্ষর (Autograph)

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই তিনি যে আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, তাহাও আমাদের নিকট উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলবেনিয়ান ব্যতীত ভারতবাসীদের মত অতিথিপরায়ণ জাতি তিনি আর কুত্রাপি দেখেন নাই। একটা বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি,—তিনি বাঙ্গালীদের অতি সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন। বাঙ্গালীদের আতিথেয়তা তাঁহার না কি ভারি ভাল লাগে। কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীদের অমায়িকতায় ও আদর-আপ্যায়নে তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি কলিকাতার "ওল্ড ক্লাব" ও কলেজ-স্কোয়ারের সন্তরণ সমিতির সদস্যগণের ভদ্র ব্যবহারের বিষয় তিনি কথা-প্রসঙ্গে এ স্থানের সাহেব ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন ; এবং তাঁহাদের সৌজন্যে যে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহাও বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানে অবস্থান কালে স্থানীয় আমেরিকান, ইংরাজ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন।

মিঃ মার্টিনি ২৫শে আগষ্ট মান্দালয়ে পৌঁছিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র বি-এ, বি-এল মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। মান্দালয় হইতে ভামো হইয়া তিনি হংকং, সাঙ্গহাই, চায়না, জাপানে যাইবেন। দেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার এ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন বলিয়াছেন।* এ স্থানে অবস্থান কালে আমরা তাঁহার যে ফটোগ্রাফ্ খানা লইয়াছি, তাহা প্রকাশিত হইল।

* Mr. Martinet উচ্চারণ মার্টিনি,—মার্টিনেট্ নহে। Mr. Matinet বলিয়াছেন "T" না কি উচ্চারিত হইবে না।

কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এল, এজি,

আজ আমাদের দেশে ভীষণ অন্নবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আগ্রহ কৃষি ও শিল্পের প্রতি বাড়িতেছে। এতদিন দেশের শিক্ষিত লোক বড়-বড় আন্দোলন ও আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন,— দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা ভাবিবার অবকাশ তাঁহাদের ছিল না। আজ তাঁহারা, দেশের যাহারা প্রকৃত মেরুদণ্ড, তাহাদের, এবং দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে যাহা করিতে হয়, সেই কৃষি ও শিল্পের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার সাধের রসায়নচর্চ্চা ফেলিয়া ক্ষীণ স্বাস্থ্য লইয়া নানা স্থানে গমনপূর্ব্বক জনসাধারণকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 'ব্যাক্ টু ল্যাণ্ড্' Back to land ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই।'

স্বাস্থ্য ও খাদ্য আমাদের এখন প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আমাদের মৃত্যুসংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে, তাহাতে এখন হইতে আমরা যদি সাবধান না হই, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব যে অচিরে বিলুপ্ত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সরকারী

শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই সি, এস

স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তারাই বলিয়াছেন যে, আমরা পেট ভরিয়া খাইতে পাই' না বলিয়াই আমাদের মৃত্যুর হার এরূপ বাড়িতেছে। ব্যাধির সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি না থাকার জন্যই ব্যাধি এরূপ অবাধ-গতিতে আমাদের আক্রমণ করিতেছে। পূরা আহার না করিলে স্বাস্থ্য থাকিবে কি করিয়া! এখন পূরা আহার পাইতে হইলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বা প্রচলন না করিলে চলিবে না। শতকরা নব্বই জন লোকের জীবিকা এই কৃষি ও শিল্পের উপর নির্ভর করিতেছে। শতকরা এই নব্বই জন লোককে জাগাইবার প্রকৃষ্ট প্রণালী বাহির করিতে হইবে।

কৃষি ও শিল্পবিষয়ক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী যে একটী প্রধান উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে এদেশে কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী হইয়া আসিতেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা ৺ভগবানচন্দ্র বসু এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। ফরিদপুরের কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী তিনিই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নূতন নূতন ফসল ও শিল্পের প্রচলন, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা শিক্ষা দান ও সকলের সম্মুখে নানা-প্রকারের ফসল ও শিল্পের একত্র সমাবেশ করাই কৃষি-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

বাঙালী আমরা চিরকালই হুজুগ্-প্রিয়। সেই সময়ে হুজুগের স্রোতে নানাস্থানে কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী স্থাপিত হয়। এই সকল প্রদর্শনীতে আমোদ-প্রমোদেরই অধিক-তর ব্যবস্থা থাকে। কলিকাতার থিয়েটার, বাইনাচ আনাইবার দিকে বেশী ঝোঁক পড়ে। কৃষক ও শিল্পী-দিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা তত থাকে না। ইহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিক পাওয়া গিয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এমনও দেখা গিয়াছে ও শুনা গিয়াছে যে, মফঃস্বলের দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থগণ পরিবারের অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া সেই অর্থে কলিকাতার থিয়েটার ও বাইনাচ দেখিয়া প্রদর্শনীর ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। নৈতিক অবনতির উদাহরণও অনেক পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, প্রথম উত্তেজনার পর অনেক প্রদর্শনীরই অকালমৃত্যু ঘটিয়াছিল। দুই চারি স্থানের প্রদর্শনী

(যথা ফরিদপুর, শিউড়ী, বানজেঠিয়া প্রভৃতি) অনেক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল প্রদর্শনীতে

বাঁকুড়া প্রদর্শনীর প্রবেশ-দ্বার

বাঁকুড়া প্রদর্শনীর প্রবেশ-দ্বার (স্বাস্থ্য-বিভাগ)

নানাস্থান হইতে অনেক প্রকারের সুন্দর সুন্দর জিনিষ আসে বটে, অনেক ব্যবসাদার যথেষ্ট লাভ করিয়া যান বটে, প্রদশনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ বহু অর্থ ব্যয় করেন বটে; কিন্তু সেই ব্যয়ের পরিমাণে স্থানীয় কৃষি ও শিল্পের

উন্নতি সাধিত হয় নাই। সহরের উপর প্রদর্শনী হইলে কয়জন কৃষকই বা আসে; এবং যাহারা আসে তাহাদের কয়জনকেই বা যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া হয়! আজকাল প্রদর্শনীতে প্রধানতঃ যে নমুনাদি দেখা যায়, তাহা কৃষকেরা কোনও উন্নত প্রণালী বা বিশেষ পরিশ্রম সহকারে উৎপাদন করে না। মামুলী প্রথানুসারে যেমন এ যাবৎ করিয়া আসিতেছে, সেইরূপ ভাবেই করে। ক্ষেতের মধ্যে যে কুমড়োটা সব চেয়ে বড় হইয়াছে, বা যে অল্প পরিমাণ পাট লম্বা হইয়াছে, কিংবা যে দু'চারটে আলু বড়-বড় হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শনীতে আনে। এইরূপ নমুনার জন্য প্রভৃতি জিনিষ দেখাইলে শিল্পশিক্ষার বিস্তার হইবে না। কি উপায়ে কোন্ ফসলের কিরূপ উন্নতি করিতে পারা যায়, সারের তারতম্যে ফসলের কত প্রভেদ হয়, কি উপায়ে বীজ-সংরক্ষণ করিলে পোকার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে, কি ফসল কি ভাবে উৎপন্ন করিতে হয়, উন্নত কৃষি-যন্ত্রাদির ব্যবহার-প্রণালী ও তাহার উপকারিতা কি, প্রভৃতি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। কি প্রকারে রেশম প্রস্তুত হয়, এবং কি উপায়ে ইহার চাষের উন্নতি হয়, কি উপায়ে দেশীয় বোতাম, পেন্সিল প্রভৃতি বিদেশীয়দিগের প্রস্তুত দ্রব্যাদির

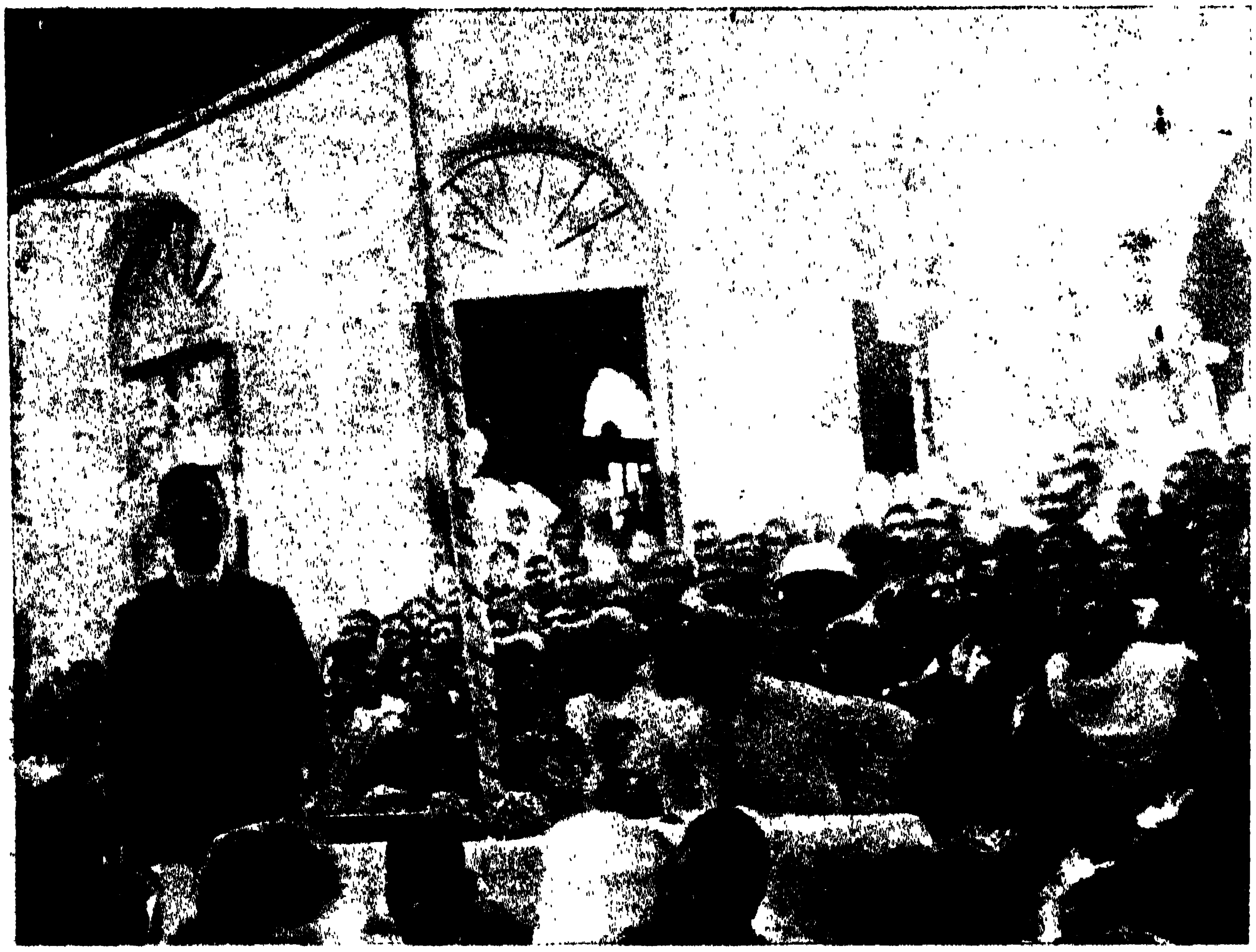

বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন

পুরস্কার দিলে কোনও ফল হয় না। কৃষকগণ ইহাতে কি পরিমাণ আগ্রহ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছে, কিংবা ঐ সকল ফসলের বিঘা-প্রতি ফলনে ব্যয় কত হইয়াছে, পুরস্কার প্রদানের সময় তাহা বিবেচনা করা হয় না। এইরূপভাবে পুরস্কার দিলে কৃষকদিগের নূতন ফসল উৎপাদন করিবার অথবা ফলন বৃদ্ধি করিবার প্রতি আগ্রহ ও উদ্যম তত বাড়ে না। শিল্পসম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। ঢাকাই কাপড়, মুর্শিদাবাদের রেশম, নারায়ণগঞ্জের বোতাম সমান উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, তাহা দেখাইবার ও বুঝাইবার ব্যবস্থা থাকা চাই। "বাবুদের" ডাকিয়া প্রদর্শনী না দেখাইয়া কৃষকদিগকে এই সকল উন্নত প্রণালী দেখাইলে ও বুঝাইলে সুফল নিশ্চয়ই হইবে। প্রদর্শনী হইতে যদি একজন কৃষকও শিক্ষালাভ করে, বা একজন শিল্পীও শিল্পসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া যাইতে পারে, তবে তাহার শিক্ষার ফলে, তাহার অনুসৃত প্রণালী দেখিয়া, সেই গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অন্যান্য কৃষকেরাও

বাঁকুড়া প্রদর্শনীতে সমবায়ের শক্তি বুঝাইবার চিত্র

ফরিদপুর কৃষি-প্রদর্শনীতে একটা আশী বছরের বৃদ্ধ পাটী-বুনানো দেখাইতেছে। তাহার পাশে পাটী-ঘাস রহিয়াছে। ফরিদপুরের এই শিল্প মৃত প্রায় হইয়াছে।

স্ব স্ব ক্ষেত্রে ফসলের উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করিবে। মোট কথা, প্রদর্শনীতে শিক্ষার ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত

শিক্ষকের প্রাচুর্য্য থাকা বিশেষ আবশ্যক। শিক্ষা দিবার লোকের উপরও সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে।

আন্তরিক যত্নসহকারে শিক্ষার ভার লইতে হইবে—নিরক্ষর অজ্ঞ 'চাষা' বলিয়া ঘৃণা করিলে চলিবে না।

বর্ত্তমান প্রদর্শনীগুলির স্থায়ী কমিটীও অনেক স্থানে নাই; এবং প্রত্যেক বৎসরই যে প্রদর্শনী হইবে, তাহারও স্থিরতা নাই। যে বৎসর প্রদর্শনী হয়, তাহার ২।১ মাস পূর্ব্বে একটা কমিটী গঠন করিয়া, বিজ্ঞাপনের দ্বারা জানান হয় যে, প্রদর্শনী হইবে। ইহাতে সারা বৎসরের সকল রকমের ফসল পাঠাইবার আয়োজন করা কৃষকদিগের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। সেই সময়ের যে ফসল, মাত্র তাহাই হইবে। নমুনার পরিমাণ, উহার গুণাগুণ, কি প্রণালীতে উহা উৎপন্ন হইয়াছে ও কি পরিমাণ আয় এবং ব্যয় হইয়াছে, তৎপ্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পুরস্কার বিতরণ করা উচিত। তবেই উন্নত শ্রেণীর ফসলের প্রচলন হইবে। প্রত্যেক ফসলের পর ছোট ছোট প্রদর্শনী করিয়া পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিলে আরও ভাল হয়।

সুখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে দু'একটী প্রদর্শনীতে প্রকৃত শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস, বীরভূমে অবস্থিতিকালে সিউড়ীর প্রদর্শনীর

ফরিদপুর প্রদর্শনীতে কলের লাঙ্গলের (Motor Tractor) সাহায্যে চাষের কার্য্য দেখান হইতেছে

দেখান হইয়া থাকে। প্রদর্শনীর জন্য একটী স্থায়ী কমিটী থাকা উচিত। সারা বৎসর ধরিয়া ঐ কমিটী কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর জন্য নমুনা সংগ্রহ করিবার ও প্রদর্শনীর দিকে লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিবেন। সহরের নিকটে প্রদর্শনী না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে থানায়-থানায় সেই স্থানোপযোগী ফসল ও শিল্প লইয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রদর্শনী খুলিলে, আরও সুফল লাভের সম্ভাবনা। প্রত্যেক রকমের ফসল বপনের পূর্ব্বে ভাল করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে যে, কি কি কারণে সেই ফসলের জন্য পুরস্কার দেওয়া যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। বাঁকুড়ায় যাইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একটী প্রদর্শনী স্থাপন করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কর্তৃক উহার দ্বারোদ্ঘাটন হয়। যাঁহারা এই প্রদর্শনী দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এই প্রদর্শনীতে শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল। নানাবিধ শিল্প ও ফসলের নমুনা ব্যতিরেকে কোন্-কোন্ কুটীর-শিল্পের (cottage industry) ও কোন্-কোন্ নূতন ফসলের প্রবর্ত্তন করিলে বাঁকুড়া জেলার গৃহস্থের আর্থিক উন্নতি হইতে পারে, তাহা আগাগোড়া হাতে-হেতেরে দেখান

হইয়াছিল। নানাবিধ রঙিন চিত্র ও নক্সাদির সাহায্যে বাঁকুড়া জেলার বর্ত্তমান অবস্থা, অভাব, অভিযোগ এবং তাহাদের প্রতীকারের ব্যবস্থা পরিস্ফুটরূপে সাধারণের বোধগম্য করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে উদ্যোগী ব্যক্তিগণের আন্তরিকতা, কার্য্য-কুশলতা ও কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। কৃষকদিগের অবাধ গতিবিধি থাকাতে প্রদর্শনীর মধ্যে যেন একটা প্রাণের সাড়া জাগিয়াছিল। আলোক-চিত্রের সাহায্যে নানারূপ বক্তৃতার দ্বারা কৃষকদিগকে সমবায়

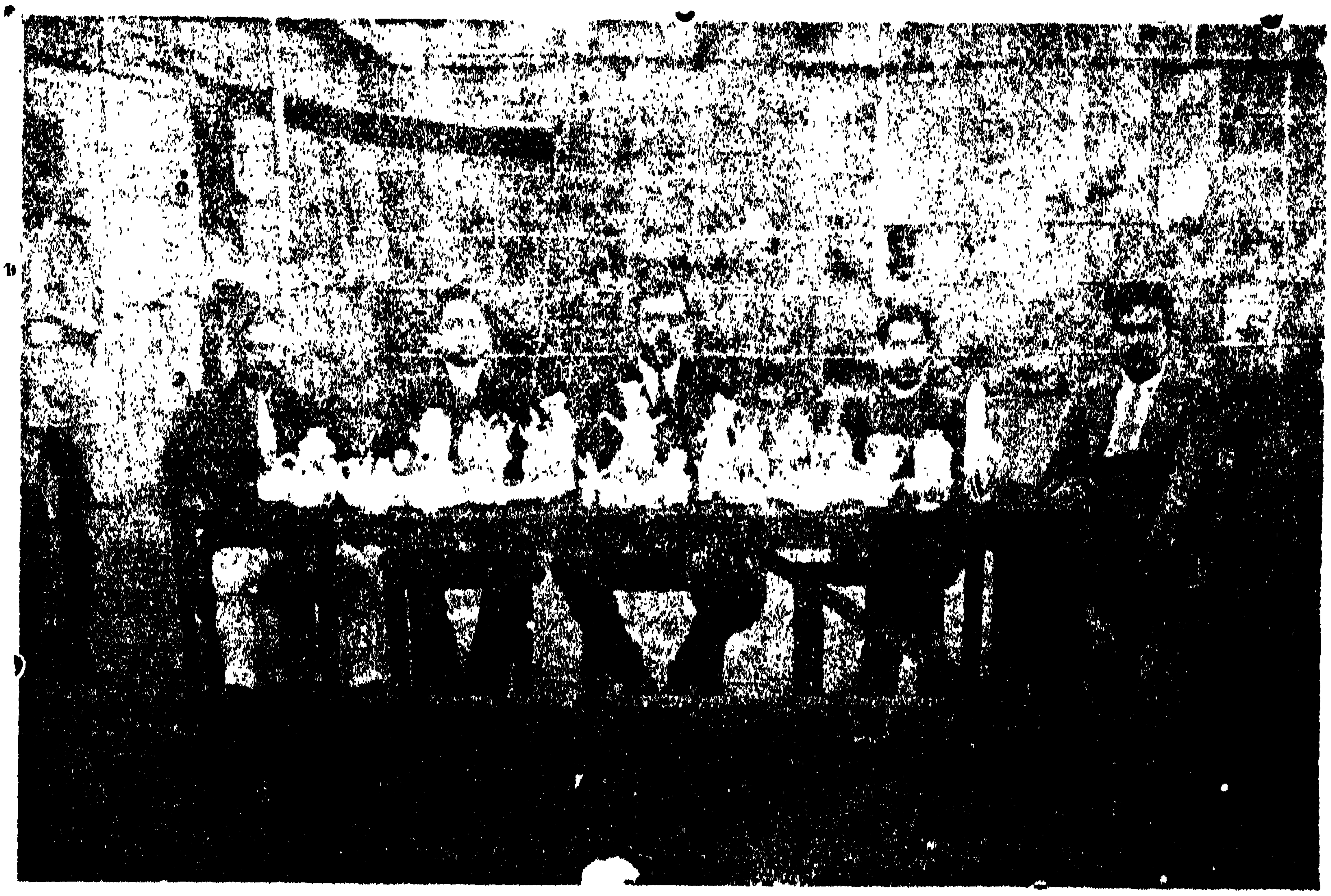

ফরিদপুর প্রদর্শনীতে কলিকাতা পটারি-ওয়ার্কসের পুতুল, বাসন ইত্যাদি জিনিস কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় তাহা শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব সুন্দর সহজ বক্তৃতার দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। সাধারণ কৃষকদিগের সহিত দত্ত সাহেবের অবাধে মেলামেশা দেখিলে সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইতে হয় না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দ্বারোদ্ঘাটন কালে বলিয়াছিলেন যে, যদি দত্ত সাহেবের মত প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারী জনসাধারণের সহিত এরূপ অবাধে মেলামেশা করেন, তবে নন্—কো—ওপারেশান্ (Non—co—operation) ভাসিয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বঙ্গদেশে কৃষি প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও, কৃষি-প্রদর্শনীগুলিকে নূতন পথে লইয়া যাইতেছেন। এ বিষয়ে তিনিই অগ্রণী।

আমার সামান্য চেষ্টা ও স্থানীয় ভদ্রলোকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯২০ সালের ফরিদপুরের প্রদর্শনীতেও শিল্প, কৃষি, সমবায় প্রভৃতির শিক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রদর্শনীর ময়দানে নানাবিধ সবজীর চাষ করিয়া দেখান হইয়াছিল। বহরমপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁত ও কারিগর আনাইয়া কি প্রকারে ঐ সকল জেলার তাঁতিরা কাপড় বয়ন করে, তাহা দেখান হইয়াছিল। কলের লাঙলের সাহায্যে জমির আবাদ, এঞ্জিনের সাহায্যে তৈল প্রস্তুত, চাল ছাঁটা, মাখন প্রস্তুত প্রভৃতি শিক্ষা দিবার যথেষ্ট আয়োজন ছিল। মোট কথা, প্রস্তুত (Finished) শিল্প দ্রব্যাদি দেখাইলে শিক্ষার বিস্তার হইবে না। কি প্রণালীতে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, উহার আয়-ব্যয় কত, তাহা দেখাইলে আগাগোড়া দেখাইতে হইবে। যেমন কেবলমাত্র 'পাটী' চলিবে না, কি গাছ হইতে কি ভাবে পাটী প্রস্তুত

করে, তাহার যন্ত্রাদি কি, তাহা চোখের উপর দেখাইয়া দিলে তবে এই মৃত শিল্পের পুনরুদ্ধার হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত, সরকারী কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য দর্শনীয় বিষয়ও ছিল। ফরিদপুরে পঞ্চাশ বৎসর হইতে প্রদর্শনী হইতেছে; কিন্তু স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঐ বৎসরকার প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আশা করি, আগামী শীতকালে নানা স্থানে প্রদর্শনী হইবে। প্রদর্শনীর কর্ত্তারা যদি আমোদ-প্রমোদের দিকে ঝোঁক না দিয়া, কৃষকদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। আমোদ-প্রমোদ যে আদৌ থাকিবে না, এ কথা বলিতেছি না; কিন্তু এরূপ ক্রীড়া-কৌতুক দরকার, যাহাতে শিক্ষা ও আমোদ একাধারে হইতে পারে। ফরিদপুর প্রদর্শনীতে সমবায় ও মর্ত্ত্য-মঙ্গল নামক নাটকদ্বয় অভিনীত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা সমবায় ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি করাই উদ্দেশ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত আলোক-চিত্রের সাহায্যে কৃষি শিল্প-বিষয়ক-ছবি দেখান হইয়াছিল। আমাদের দেশের বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে এইরূপ নাটক যাত্রার সাহায্যে অভিনয় করিলে, শিক্ষার অনেকটা বিস্তার হইতে পারে। ফরিদপুর সহরের উপর ছাড়া, জেলার ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ছোট-ছোট প্রদর্শনী স্থাপন করিয়া কৃষি-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা হইয়াছিল।

সমর্পণ

শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধন হ'তে মুক্তির পথে—বাহিরেতে চাহি মন;
হে হরে মুরারে তোমারেই, ক'রে আত্ম-সমর্পণ!
ওহে পথিক-বন্ধু সন্ধানী-আলো!
অন্তরেতে দীপ ভাল করে জালো,
সত্যের টীকা ভালে হোক লিখা—
চন্দন-বিলেপন;
বাহিরের আঁখি ভিতরের পানে
বিকশিত রাখ অমৃতেরি ধ্যানে;
গানে প্রাণে কর অন্তর দেব
নন্দন-নিকেতন।
আজি বন্ধন হ'তে মুক্তির পথে—বাহিরিতে চাহি মন;
—হে হরে মুরারে তোমাকেই করে—সর্ব্ব—সমর্পণ!
তব মৃত্যু-বিজয়ী ভৈরবী গীতি—
ঘুচাক সবার তনু তমোভীতি;
সুপ্তশক্তি জাগ্রত কর
—নিদ্রিত নারায়ণ!
নয়নে সে এক জ্যোতি অভিরাম
হৃদয়ে সে এক প্রীতি উদ্দাম,
শিখাও সে নীতি আর্ত্তের তরে
উল্লাসে প্রাণ-পণ!
বন্ধন হ'তে মুক্তির পথে—বাহিরেতে চাহি মন;
হে হরে মুরারে তোমারেই করে—স্বার্থ-সমর্পণ।
মহাদেব-দেব অনাদি-নিধন
ধ্বনিত শঙ্খ দর্পী-শাসন
চক্র তোমার অতি বিভীষণ—
অতি সুদর্শন হে;
দণ্ড-বিধাতা প্রলয়েরি মাঝে,
—সৃষ্টি মৃণালে অপরূপ সাজে
শতদলে হাস হে মহা-মহিম্ন—
শান্তি-সদন হে।
আজি বন্ধন হ'তে মুক্তির পথে—বাহিরেতে চাহি মন
হে হরে মুরারে তোমারেই করে—আত্ম-সমর্পণ।

পুস্তক-পরিচয়

কান্তকবি রজনীকান্ত।—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত; মূল্য চারি টাকা। এই সুন্দর, সুবৃহৎ, বহুচিত্র-শোভিত পুস্তকখানি বাঙ্গালীর চিরপ্রিয়, বড় আদরের, অকালে লোকান্তরিত কান্তকবি রজনীকান্তের জীবন-কথা; লেখক আমাদের সর্ব্বজন প্রিয়, সুলেখক শ্রীমান নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; সুতরাং পুস্তকখানি যে বাঙ্গালা জীবনী-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরম উপাদেয় হইয়াছে, এ কথা না বলিলেও চলে। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে লিখিতে গেলে পাণ্ডিত্য, লিপিকৌশল, বর্ণনাচাতুর্য্যের প্রয়োজন হয়; কিন্তু জীবন-চরিত লিখিতে গেলে ও সকল গুণ ত চাই-ই, আর চাই, সর্ব্বাগ্রে চাই, যাঁহার জীবন-কথা লিখিতে হইবে, তাঁহার প্রতি লেখকের অকৃত্রিম অনুরাগ, অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধা, ঐকান্তিক আগ্রহ। রজনীকান্তের প্রতি শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জনের এ সকলই আছে, প্রচুর পরিমাণেই আছে; তাহার প্রমাণ এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি ছত্রে বিদ্যমান। আমরা জানি, আমরা দেখিয়াছি, এই জীবনী লিখিবার জন্য শ্রীমান নলিনীরঞ্জন আজ দ্বাদশ বৎসর কি একাগ্র সাধনাই করিয়াছেন, কি একনিষ্ঠ ভাবে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন; দিনের পর দিন সেগুলি যথাযোগ্য ভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। তাহারই ফল এই পুস্তকখানি। কান্তকবি রজনীকান্তের অপূর্ব্ব প্রতিভা, সুন্দর কবিত্ব-শক্তির বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ে লেখক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর রজনীকান্তের মৃত্যু-শয্যার রোজনামচা। শ্রীমান নলিনী যদি এই রোজনামচাই ছাপিতেন, তাহা হইলেও ইহা বাঙ্গালী মাত্রেই মাথায় করিয়া লইত—এমনই প্রাণস্পর্শী, এমনই পবিত্র এই রোজনামচা। পুস্তকখানির যে পৃষ্ঠা খুলি, সেইখানেই রজনীকে সশরীরে দেখিতে পাই; ইহা লেখকের কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। আমরা এই পুস্তকখানির পরিচয়মাত্র দিলাম; সুদীর্ঘ সমালোচনার প্রয়োজন বোধ করিলাম না, কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহা রজনীর পবিত্র জীবন-কথা; লেখক শ্রীমান নলিনীরঞ্জন; ইহার অধিক বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই; এই সামান্য বিজ্ঞাপনই যথেষ্ট; ইহাতেই বইখানি তাহার প্রাপ্য আদর আদায় করিয়া লইবে;—লইবে কেন—লইয়াছে; বাঙ্গালী পাঠক এমন অকৃতজ্ঞ হয় নাই যে, বাণীকুঞ্জের কোকিল রজনীকান্তকে ভুলিবে, তাঁহার জীবনী-লেখক অক্লান্তকর্ম্মী, সাহিত্যিকের সুখদুঃখের সঙ্গী নলিনীরঞ্জনের সেবাকে উপেক্ষা করিবে। আমরা শ্রীমান নলিনীরঞ্জনের গুণ-পক্ষপাতী; সেইজন্যই বিশেষ সঙ্কোচের সহিত একটী কথা বলিতেছি; ভবিষ্যতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় তিনি 'হাস্যরসে' রজনীকান্ত শীর্ষক অধ্যায়টি যদি বিশেষ অবধানতার সহিত পুনরালোচনা করেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়, কারণ তাঁহার মন্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

দেশী রং। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পাদিত। লেখক—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দুই প্রিয় শিষ্য। মূল্য ১॥০; রং-করা কাপড়ের নমুনা সহ—২॥০। প্রথমেই নজরে পড়ে পুস্তকের মলাট, সরল, অনাড়ম্বর প্রচ্ছদপটে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। তার পর বিষয়-সূচী ও বর্ণানুক্রমিক সূচী,—বৈজ্ঞানিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা-রীতির নিদর্শন। উৎকৃষ্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা। ভূমিকায় আচার্য্যদেব ভারতের লুপ্ত রঞ্জন-বিদ্যার কথা লিখিয়াছেন। পড়িলে বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছি। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে——"রং করার পদ্ধতির অনেক গূঢ় বিবরণ ভারতীয়দের জানা আছে, এবং মনে হয় ইয়োরোপে ব্যবহৃত অনেক পদ্ধতি এখানকার আদর্শে গড়া।...ভারতীয়দের রঞ্জনবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব কিছু দিন পূর্ব্বে বেশ বোঝা গিয়াছিল, যখন ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে কাপড় এ দেশে রং হইবার জন্য আসিত এবং শ্রেষ্ঠ বস্ত্র বলিয়া বিলাতের বাজারে পুনঃ প্রবেশ করিত।...এ দেশীয় রঞ্জকদিগের যে পারদর্শিতা দেখা যায়, এবং যে সকল সুন্দর-সুন্দর রং তাহারা আশ্চর্য্য উপায়ে গুটীকতক উপকরণে ও কয়েকটি মাটীর বাসনে ফলাইতে পারে, তাহাতে তাহাদের অদৃষ্ট আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।...পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রংএর উপাদান জন্মে। আর ভারতবর্ষ আমাদের (অর্থাৎ—ইংরাজের) বলিয়া অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমাদের রং বিষয়ে একটা স্বাভাবিক প্রাধান্য আছে, যাহার অনুশীলনে রংএর প্রতিযোগিতা নষ্ট করা কর্ত্তব্য।" কি ছিল আর কি হইয়াছে! ইংরাজ মনে করিয়াছিলেন, ভারতের রং লইয়া একচেটে ব্যবসায় করিবেন। জর্ম্মানির কৃত্রিম রংএর অভ্যুদয়ে ইংরাজের আশায় ছাই পড়িল, এ দেশের রঞ্জনবিদ্যাও লোপ পাইল। আমরা তুপাতা সায়েন্স পড়িয়া বলিলাম—আরে, এনিলিন রংএর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি গাছ-গাছড়ার কর্ম্ম? ইংরাজও গা করিলেন না, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলের লাভে তাঁহাদের ক্ষোভ নিবৃত্তি হইল। আমাদের তাঁতীকুল, রঞ্জককুল দুই-ই গেল; সাগরপারের আমদানী চটকদার কাপড় পরিয়া মোক্ষলাভ

করিলাম। আজ এই আত্মবিস্মৃত মৃতকল্প জাতির সংজ্ঞালাভের সন্ধিক্ষণে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশব্যাপী বিরাট কর্ম্মযজ্ঞের হোতারূপে বদ্ধপরিকর। এই পুস্তকের লেখকদ্বয় গুরু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ব্রতাংশ উদ্‌যাপন করিয়া স্বকীয় পরীক্ষার ফল দেশের মঙ্গলার্থ নিবেদন করিয়াছেন। আজ আমাদের বলিতে সাহস হয়—এনিলিন চাই না, দেশজাত গাছ-গাছড়ার সস্তা পাকা রংএই কাজ চলিবে। অনেকে বলিবেন, দেশী রং পাকা, সস্তা হইতে পারে, কিন্তু বিলাতী অপেক্ষা মলিন। হোক মলিন, এই শ্যামলদেশের পুত্রকন্যার শ্যামঅঙ্গে উগ্রবর্ণ পরিধেয় মানাইবে না। যখন নিজে এনিলিন প্রস্তুত করিব, তখন না হয় উজ্জ্বল বাসের সখ মিটাইব। আপাততঃ ধার করা ময়ূরপুচ্ছ না-ই পরিলাম। রঞ্জনকলা কঠিন বিদ্যা, কিন্তু এই বহি পড়িয়া আমাদের ভয় ভাঙ্গিয়াছে। এত সহজে এত সস্তায় এমন সুন্দর রং করা যাইতে পারে, তাহা না পড়িলে বিশ্বাস হয় না। ভাষায় জটিলতার লেশ নাই, কেমিষ্ট্রির কটমটি নাই, বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিবার সরল পন্থা পদে-পদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বহি পড়িয়া কালিয়া পোলাও রাঁধিতে শেখা যদি সম্ভব হয়, 'দেশী রং' পড়িয়া কাপড় জামা রং করিতে শেখাও সমান সম্ভব হইবে। গৃহলক্ষ্মীগণ অনায়াসে নিজের এবং ছেলে-মেয়েদের কাপড়-জামায় পাকা রং করিতে পারিবেন। পুস্তকে বর্ণিত দুই তিনটী প্রণালী একটু কঠিন, কিন্তু অনেকগুলি অত্যন্ত সুসাধ্য এবং সহজলভ্য উপকরণে নিষ্পন্ন। উদ্‌যোগী যুবকগণ এই পুস্তক সাহায্যে রংএর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অন্নসংস্থান করিতে পারিবেন। যাঁহাদের বুদ্ধি আছে, তাঁহাদের মাথা খুলিয়া যাইবে, অনেক অভিনব পদ্ধতি তাঁহারা স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারিবেন। পুস্তকের শেষে রঞ্জিত বস্ত্রের নমুনার অপূর্ব্ব সমাবেশ,—চোখে আঙুল দিয়া দেখায়, কোন্ উপকরণ হইতে কি রং হইতে পারে। পুস্তক বিক্রয়ের লভ্যাংশ আচার্য্য কর্ত্তৃক খাদিপ্রচার-কল্পে ব্যয়িত হইবে। যাঁহারা কিনিবেন, তাঁহারা সদ্‌ব্যয়ের তৃপ্তিলাভ করিবেন এবং একটি অর্থকরী মনোজ্ঞ কলাবিদ্যা অর্জ্জনের সুযোগ পাইবেন।

মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানি দশটী অধ্যায়ে ও প্রায় চারিশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই দশটী অধ্যায়ে গ্রন্থকার যথাক্রমে মেদিনীপুরের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক বিবরণ, প্রাচীন কালের ইতিহাস, হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজ শাসনকালে মেদিনীপুরের অবস্থা এবং উক্ত জেলার প্রাচীন কীর্ত্তি ও কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন। গবেষণামূলক ইতিহাস রচনায় যে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা এই গ্রন্থখানির প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে পরিদৃষ্ট হয়। বিনা প্রমাণে, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি কোন কথা বলেন নাই। গ্রন্থখানিতে গভীর গবেষণা ও যুক্তির সারবত্তা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গ্রন্থের ভাষা। প্রত্নতত্ত্বমূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থের ভাষা বিষয়ের গুরুত্বে প্রায়ই কিছু জটিল হইয়া থাকে। কিন্তু যোগেশ বাবুর এই গ্রন্থখানির ভাষা এমনি প্রাঞ্জল ও প্রবহমান যে, পাঠ করিতে একটুও ক্লান্তি বোধ হয় না। গ্রন্থের স্থানে-স্থানে ঐতিহাসিকের শুষ্ক বিবরণ অথবা প্রত্নতত্ত্ববিদের নীরস গবেষণা কবির সরস ভাবে ও ভাষায় সজীব হইয়া উঠিয়াছে। ভাষার লালিত্যে ও বর্ণনার মাধুর্য্যে পুস্তকের জটিল বিষয়গুলি সহজবোধ্য এবং পুস্তকখানি উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য হইয়াছে। "বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর" লিখিয়া ইতিপূর্ব্বে তিনি সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হইয়াছেন। "মেদিনীপুরের ইতিহাস" বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে এবং মেদিনীমাতার অন্যতম সুসন্তানরূপে তিনি চিরদিন জেলবাসীর গভীর শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকিবেন। পুস্তকের বাঁধাই, কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর।

লীলা-মাধুরী—শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তনবিশারদ কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। এ গ্রন্থখানি সরল গদ্যে লেখা কাব্য। রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট মহাজন পদাবলী আছে, গ্রন্থকার সেগুলিকে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যের একটি অভাব পূরণ করিয়াছেন। লীলা-মাধুরী দুই প্রকারে আস্বাদ্য। এক ধর্ম্মভাবের দিক দিয়া; অপর কাব্যের দিক দিয়া। যাঁহারা ধর্ম্মের দিক দিয়া লীলা-রস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। কাব্য-হিসাবে দেখিলেও বৈষ্ণব কবিতা যে পরম উপভোগের সামগ্রী, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্গ-সাহিত্য বৈষ্ণব কবির মোহ-জালে নিবিড় ভাবে আবদ্ধ হইয়া আছে। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও শিল্পচাতুর্য্যগুণে পদাবলী-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে অনেক উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। কিন্তু অনেক সময়ে আমরা তাহার রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হই না। যাঁহারা মনোযোগ দিয়া কীর্ত্তনগান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, গায়কের কলানৈপুণ্যে পদাবলী কিরূপ সরস ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠে! বৈষ্ণব কবিতাগুলি সাধারণতঃ গীত হইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। সুতরাং বিভিন্ন পদাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য না জানিলে, তাহার রস সম্যক্ উপলব্ধি করা অসম্ভব।

সিনান দোপর সময় জানি
পিয়া তপত পথেতে ঢালয়ে পানি।

এই পদটির ভাব গ্রহণ করিতে হইলে, ইহার আনুষঙ্গিক পদগুলি হৃদয়ঙ্গম করিলে ভাল হয়। তার পর ব্রজবুলি মিশ্রিত পদাবলী সাধারণ পাঠক বা শ্রোতার পক্ষে কিছু দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে।

অপরূপ পেখনু রামা
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।

অবশ্য অনেক পুরাতন পদ ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে

আধুনিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহাও বিবেচ্য। অনেক সময় এইরূপ রূপান্তরিত হইয়া পদগুলি আরও দুর্ব্বোধ ও সঙ্গতি-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

'লীলা-মাধুরী'র গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক। কলিকাতার সমাজে ইনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইনি শুধু গায়ক নহেন, ভাবুকতা ও রসগ্রাহিতাও ইঁহার অসাধারণ। ইঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত 'লীলাগান-পদ্ধতি'ও আমরা দেখিয়াছি। লীলাগান-পদ্ধতিতে অনেক মহাজন-পদ সংগৃহীত হইয়াছে। বহুদিন হইতে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারে ইনি সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য গ্রন্থকার সাহিত্য-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থখনিতে বিশারদ মহাশয় নিজের কথা না বলিয়া মহাজনদিগের কথাই অনেক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে। সমস্ত লীলাকে গায়কের ভাষায় তিনি কতকগুলি পালায় বা রসে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাতে রস-পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। মান মাথুর' বা রাসলীলার বাছা বাছা পদগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহারই গদ্যানুবাদ যথাক্রমে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন লীলা-রস আস্বাদন করিবার সুবিধা হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি এক সঙ্গে সরল ভাষায় পাওয়া গিয়াছে।

শুধু মহাজনপদ নির্ব্বাচনেই যে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব তাহা নহে; কাব্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সরল ভাষায় কবির ভাবের সূক্ষ্ম কারিগরীটুক তিনি যেরূপ ভাবে ধরিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট কবিত্বের পরিচায়ক। লীলামাধুরী পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক সুখানুভব করিবেন সন্দেহ নাই। ভক্ত রসিকগণ তত্ত্বের সহিত কাব্যরসের স্বাদ পাইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিবেন এবং কীর্ত্তনগায়কগণ পদামৃত-সমুদ্রের মধ্যে কূল-কিনারা দেখিতে পাইবেন।

প্রলাপ।—শ্রীযশোদালাল তালুকদার প্রণীত, মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

ইন্দুমতী, নন্দরাণী প্রভৃতি উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত যশোদা বাবু সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। তিনি এই পূজার বাজারে 'প্রলাপ' বাহির করিয়াছেন। নাম শুনিয়াই কেহ মনে করিবেন না, বইখানিতে 'প্রলাপ'ই আছে। তাহা নহে; এই প্রলাপ সুসম্বদ্ধ, অর্থাৎ ইহা মোটেই প্রলাপ নহে, ভূয়োদর্শনের সুন্দর অভিব্যক্তি। আমরা বইখানি পড়িয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি, পাঠকও বইখানি পড়িলে সেই কথাই বলিবেন।

প্রতিভা।—শ্রীহরিহর শেঠ প্রণীত, মূল্য একটাকা। ইহা একখানি নাটক। লেখক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলি 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণ পরম আগ্রহ-ভরে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহার এই 'প্রতিভা' যখন পাইলাম, তখন মনে হইয়াছিল যে, তিনি হয় ত বাণিজ্য-প্রতিভা সম্বন্ধেই বইখানি লিখিয়াছেন। খুলিয়া দেখিলাম, তাহা নহে, নাটক। তখন আগ্রহভরে পড়িলাম; দেখিলাম, ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে নানা রকমের লোকের সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা বৃথা হয় নাই; এই 'প্রতিভা'য় তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। হরিহর বাবু অনধিকার-চর্চ্চা করেন নাই, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতেছি।

আমার ফটো।—শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা প্রণীত; মূল্য দেড়টাকা। শ্রীযুক্ত অবতার বাবু যে একজন ভাল শিল্পী, তাহা আমরা জানিতাম; কিন্তু তিনি যে এমন সুন্দর আলোকচিত্র লইতে পারেন, এতবড় দক্ষ ফটোগ্রাফার এই বৃদ্ধ বয়সে হইয়াছেন, তাহা জানিতাম না। ফটোগুলি সুন্দর হইয়াছে, একেবারে যেমন-কে তেমন, কোনখানে একটু ছায়া পড়ে নাই, বা একটু আঁচড় লাগে নাই। আমাদের কথা ঠিক কি না, তাহা সকলে একবার পরখ করিয়া দেখিবেন।

জাগরণী।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত, মূল্য একটাকা। শ্রীমান যতীন্দ্রমোহন আমাদের বড় আদরের কবি। তিনি যখন যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই পরম আগ্রহে আমরা পড়িয়াছি, এখনও পড়ি; তবে আগেকার মত তিনি এখন বেশী লেখেন না, এই যা দুঃখ! তা হোক। সহরের লোকে হয় ত জানেন না যে, খেজুরের জিরেণ-কাট রস বেশী সুমিষ্ট হয়; যতীন্দ্রমোহনেরও তাই হইয়াছে। তিনি গোড়াতেই গাহিয়াছেন—

'বিধাতার দান প্রাচীর পাষাণ
রুধিবে সে কতদিন;
নির্ঝরধারা বন্ধনহারা
রয় কভু পরাধীন?

বরাবরই এই সুর—এই জাগরণের ধ্বনি। তাই এই কবিতা-পুস্তকের নাম জাগরণী! এই দেশব্যাপী জাগরণের দিনে কবিবর যতীন্দ্রমোহন ধীর উদাত্ত সুরে জাগরণের গান ধরিয়াছেন; আমরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গান শুনিতেছি, আর সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি সাধু, সাধু, বাঙ্গালীর আদরের কবি! যতীন্দ্রমোহনের কবিতার আমরা চির-পক্ষপাতী। তুলনায় আলোচনা করিব না; তবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, কবিবর রবীন্দ্রনাথের কৃতী শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহাদের নাম আমরা সসম্ভ্রমে উল্লেখ করি, যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদের অন্যতম,—প্রমাণ এই জাগরণী!

অদৃষ্টের পরিহাস।—শ্রীহরনাথ বসু প্রণীত ; মূল্য দেড় টাকা। এখানি উপন্যাস ; লেখক—স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু মহাশয়। তাঁহার রচিত বীরপূজা, ময়ূর-সিংহাসন, ভক্তকবরী প্রভৃতি গ্রন্থ আমরা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। এখন এই অদৃষ্টের-পরিহাস পাঠ করিয়া বুঝিলাম, গ্রন্থকারের যশঃ অক্ষুণ্ণ আছে। এই গ্রন্থের মধ্যে যে কয়েকটি চরিত্রের তিনি সমাবেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে জয়ন্তী ও রমেশের চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি ; বেশ সরল সহজ ভাবে হরনাথ বাবু গল্পটী বলিয়া গিয়াছেন ; কোন অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর করেন নাই।

বন্দীর ডায়েরী। শ্রীহেমন্তকুমার সরকার প্রণীত. মূল্য একটাকা। বর্ত্তমান গোলমালের সময় আইন অমান্য অপরাধে যাঁহারা কারা-বরণ করিয়াছিলেন, শ্রীমান হেমন্তকুমার তাঁহাদের অন্যতম; তিনি ছয়মাসের জন্য আলিপুরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই সময়কার কারাগারের অভিজ্ঞতা তিনি অতি সহজ সুন্দর মনোরম ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; কোন প্রকার গবেষণা নাই, কোন বক্তৃতা নাই ;—একেবারে হাসিতে-হাসিতে, সরস কৌতুক করিতে-করিতে সব কথা, যাকে বলে ঝেড়ে বলা, তেমনই ভাবে বলিয়াছেন। বইখানি পড়িতে বেশ লাগে।

রূপ রেখা। - শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত ; মূল্য একটাকা। অতি ছোট-ছোট নয়টী গল্প দিয়া শব্দ-শিল্পী শ্রীমান গোকুলচন্দ্র এই রূপ-রেখা টানিয়াছেন। রেখাগুলি অতি উজ্জ্বল হইয়াছে। এই রূপ রেখার কয়েকটী গল্প 'ভারতবর্ষে'ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীমান গোকুলচন্দ্র যেভাবে রূপ-রেখা অঙ্কিত করেন, তাহা বড়ই মনোজ্ঞ।

টলষ্টয়ের গল্প।—শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত ; মূল্য পাঁচসিকা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্বী, রুসিয়ার যুগ-প্রবর্ত্তক কাউণ্ট টলষ্টয়ের গল্পগুলি অতুলনীয়। সেই গল্পের দশটীর অনুবাদ করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। ইহা আক্ষরিক অনুবাদ নহে, স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে ; কোন স্থানে মূলের অঙ্গহানি হয় নাই, অথচ অনুবাদ বলিয়াও মনে হয় না। যাঁহারা বিদেশী ভাষা জানেন না, তাঁহারা এই অনুবাদ পড়িয়া প্রীতিলাভ করিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ।—শ্রীমতিলাল দে প্রণীত ; মূল্য দেড় টাকা। এখানি নাটক। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা-কাহিনী যিনি যে ভাবে, যেমন করিয়া লিখুন, তাহাই পরম উপাদেয় হয়। শ্রীযুক্ত মতিলাল বাবু সুলেখক, পরম ভক্ত, সুতরাং তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ যে অতি সুন্দর হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। আমরা পরম আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত এই পুস্তকখানির পাঠ সমাপ্ত করিয়াছি।

নিশানা

শ্রীকামিনী রায় বি এ

ধীরে ধীরে বাও মাঝি, ধীরে ধীরে বাও,
বলে দেব কোন্ ঘাটে লাগাবে এ নাও।
দিকে দিকে গেছে খাল, দেখি নাই কতকাল
নিশানা যা ছিল জলে ভেসে গেছে তাও।
ধীরে ধীরে বাও, মাঝি, ধীরে ধীরে বাও।

গাছে ভরা দুই কূল, দিনেতে না হত ভুল,
দেখা যেত ফাঁকে ফাঁকে আমাদের গাঁও ;
চতুর্থী চাঁদের আলো, ঠাহর হয় না ভাল,
সুধাব এমন জন দেখি না কোথাও।
ছিল লোক যত চেনা, কেহ পথ চলিছে না,
ধীরে যাও, দুই পারে চেয়ে চেয়ে যাও।

দেখ তো কেয়ার ঝাড়, আর পূর্ব্বদিকে তার
বড় শিমুলের দেখা পাও কিনা পাও।
সর্ব্বাঙ্গ সাজায়ে ফুলে হিজল দাঁড়ায়ে কূলে
ঝুঁকে মুখ দেখে জলে ? ভাল ক'রে চাও,
বাঁকা হিজলের মূলে বাঁধিবে এ নাও,
এ আঁধারে ধীরে, মাঝি কিছু ধীরে বাও।

কাঠের বাক্স

শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি-এল

১

একদিন সকালে ক্ষুদ্র রাধামাধবপুর গ্রামের সকলে শুনিল যে, কালীচরণ ও নারায়ণ দুই ভ্রাতায় বিবাদ বাধিয়াছে—তাহারা পৃথক হইবে। বলা বাহুল্য, জনকয়েক লোক আন্দোলনের উপযুক্ত একটা জিনিষ পাইয়াছে বুঝিয়া, একটু আনন্দের ভাব দেখাইলেও, বেশীর ভাগ লোক খুব বিস্ময় প্রকাশ করিল। জীবনের অর্দ্ধেকটা একান্নভুক্ত থাকিয়া কাটাইবার 'পর, হঠাৎ কালীচরণ তাহার ছোট ভাইকে পৃথক করিয়া দিবে; এটা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা তাহারা কিছুতেই ঠিক করিতে না পারিয়া, একে-একে কালীচরণের বাটীতে আসিয়া জড় হইতে লাগিল। সেখানে আসিয়া তাহারা দেখিল, কনিষ্ঠ নারায়ণচন্দ্র গৃহের তৈজসপত্র, এমন কি বালিশ-বিছানা পর্য্যন্ত, সব প্রাঙ্গণে জড় করিয়াছে—গ্রামের বয়োবৃদ্ধ দুইজনকে সম্মুখে রাখিয়া সব ভাগ করিয়া দিতে বলিতেছে।

বিবাদের কারণ যৎসামান্য। কালীচরণ ও নারায়ণ-চন্দ্রের মাতার একটি কাঠের বাক্স ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর—সে প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা—বড়বধূ অর্থাৎ কালীচরণের স্ত্রীই সেই বাক্সটি ব্যবহার করিতেছিল। সে দিন নারায়ণের কন্যা সহসা আব্দার ধরিল যে, ঐ বাক্সটি সে লইবে! বড়বৌ প্রথমটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তার পর যখন ছোটবৌ আসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল যে, ছেলে-মানুষ যখন আব্দার ধরিয়াছে, তখন তাহাকে উহা দিতে দোষ কি,—তখন বড়বৌ একবার স্থিরদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া সব বুঝিয়া লইল। তবু সে আর একবার বালিকাকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিল; বলিল, "দুর্গা, তোর বিয়ের সময় এটা তোকে দোব—শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাস্।"

দুর্গা কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই তাহার মাতা বলিল, "সামান্য একটা কাঠের বাক্স—তাও দিদি প্রাণ ধরে দিতে পার্লে না!" অনুযোগটা বড়বধূর প্রাণে লাগিল। নিঃসন্তান তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে যে দুর্গাকে নিজেদের মেয়ের মত আদর-যত্নে মানুষ করিয়াছে, সেই দুর্গার মাতা কি না আজ এই অন্যায় খোঁটা দিল! একটু বিরক্তি পূর্ণ স্বরে বলিল, "আমার নিজের জিনিষ হলে—যত দামীই হোক, দুর্গাকে দিতে—তোদের দিতে—কোন কষ্ট হোত না। কিন্তু এ তো আমার নয়,—এ যে সংসারের। শাশুড়ীর কাল হবার আগে থেকে তাঁর এ জিনিষ সংসারের ব্যবহারে লাগছে। এমন পবিত্র জিনিষ কি ছেলেদের খেলা কর্ব্বার জন্য দেওয়া যায়!"

একটু শ্লেষ দিয়া ছোটবৌ বলিল, "বেশ তো, সংসারের জিনিষ যদি হয়, তাহ'লে ওতে আমারও দখল থাকা উচিত।"

"বেশ, তাহ'লে ভাগ করে নাও—আমি কোন কথা কহিব না।" বড়বৌ আর দাঁড়াইল না। সে বুঝিয়াছিল যে, এ সংসার আর টিকিতে পারে না।

বলা বাহুল্য, ক্ষণকাল পরে নারায়ণ পত্নীর নিকট হইতে বিবাদের বৃত্তান্ত শুনিল; এবং কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, তৎক্ষণাৎ বহির্বাটীতে দাদার নিকট উপস্থিত হইল; এবং স্পষ্ট ভাষায় জানাইল যে, যখন সংসারে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, তখন আলাদা হওয়াই ভাল—নতুবা তাহাকে সপরিবারে বাটী ছাড়িতে হইবে।

কালীচরণের বিস্ময়ের ভাব কাটিবার পূর্ব্বেই, নারায়ণ দুইজন প্রতিবাসীকে ডাকিয়া মধ্যস্থ হইতে বলিল; এবং বিষম উৎসাহের সহিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেল। কালীচরণ একবার জোরে গলাটা সাফ করিয়া বলিল, "হাঁ রে নারাণ! এই শেষ বয়সে আমার বদনাম রটালি! এতকালের সব কথা ভুলে গেলি!"

নারায়ণও যেন তৈয়ারী হইয়া আসিয়াছিল; বলিল, "এর পর কি তোমার সঙ্গে হাতাহাতি হবে? এই বেশ সদ্ভাবের সঙ্গে ভাগ হয়ে যাওয়া ভাল নয় কি?"

কালীচরণ আর কিছু বলিল না। শুধু দাঁড়াইয়া দেখিল যে, সংসারের সমস্ত তৈজসপত্র পর্য্যন্ত দুইভাগে বিভক্ত করা হইল;—ভাগ মিলাইবার জন্য সতরঞ্চ, কার্পেট পর্য্যন্ত কাটিয়া ভাগ করা হইল;—'ওজন করিয়া পিত্তল-কাঁসার' জিনিষ ভাগ হইল;—ফলে, একধারে গেলাস, একধারে তাহার সরপোষ গেল; একধারে থালা, একধারে খাবার ঢাকা গেল।

শেষে কাঠের বাক্সটি ভাগ করিবার জন্য বাহির করা হইল। বড়বৌ সেটিকে লইবার ইচ্ছা জানাইলে, নারায়ণ তাহার বদলে দশগুণ দামের একটি দেরাজ লইয়া তুষ্ট হইল।

২

দারুণ বৈশাখী সূর্য্য সমস্ত দিন অগ্নিবৃষ্টি করিয়া, অপরাহ্ণ-কালে যেন অবসন্ন দেহে গগনমধ্য হইতে ঢলিয়া পড়িতেছিল। এ-হেন প্রখর রৌদ্র-তেজে দগ্ধপ্রায় হইয়া, কালীচরণ

অবসন্ন পদে, ক্লান্তদেহে গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া পত্নীকে ডাকিল। পত্নী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া, স্বামীর মুখপানে চাহিয়াই সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন শুষ্ক, বিষণ্ণ বদন, এমন হতাশা-মাখান, উদাস দৃষ্টি সে যে আর কখনো দেখে নাই!

সে শুধু বলিল, "জমীদার-বাড়ী থেকে ফির্‌তে এত দেরী হোল যে? সমস্ত দিন আমি বসে আছি!"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া কালীচরণ বলিল, "আজ সব কষ্টের শেষ করে এলাম। চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে এলাম।"

পত্নীর গলা শুকাইয়া গেল; বলিল, "সে কি! চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে এলে? এত দিনের চাক্‌রী!"

"আর চাক্‌রী করে কি হবে বড় বৌ? সারা জীবনটা তো খেটেছি—আর কার জন্য খাট্‌বো? দু'মুঠো খেতে আর পাব না? নাই যদি পাই, তাতে কি ক্ষতি হবে?"

স্বামী আজ কত দুঃখে কথা কয়টি উচ্চারণ করিল, তাহা সে, বেশ বুঝিতেছিল। তখন সে স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "তা বেশ করেছ। এখন এস, চান করে খাওয়া-দাওয়া কর্‌বে।"

প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতেই কালীচরণ চমকিত হইল। এ কি! একপাল রাজমজুর মহাধুমধামে উঠানের মাঝে জড় হইয়া মশলা মাখিতেছে—ইঁট জড় করিতেছে—মাটি খুঁড়িতেছে। সে পত্নীর পানে চাহিল, "বড় বৌ!"

পত্নী নতনেত্রে শুধু বলিল, "ঘরে চল—সব বল্‌ছি। ঠাকুরপো উঠানে পাঁচিল দিচ্ছে—সরিকানের উঠানে ছোট বোয়ের কাজ করবার অসুবিধা হয়!"

কালীচরণ সেই পশ্চিমের রৌদ্র সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া প্রাঙ্গণ মধ্যে বসিয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠ হইতে শুধু নির্গত হইল,—"বাপ-ঠাকুরদাদার উঠানে পাঁচীল না দিয়ে নারাণ ছাড়্‌লে না!"

বড়-বৌ বড়ই ভয় পাইল। সে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিল। সে দিকে মোটে লক্ষ্য না করিয়া কালীচরণ ডাকিল, "নারাণ! নারাণ!"

তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া আগে নারায়ণের কন্যা দুর্গা বাহির হইয়া আসিল। কালীচরণ বলিল, "মা, তোর বাবা কোথা রে?" দুর্গা বলিল, "বাবা কাছারীতে!"

"এ পাঁচিল দেওয়া হচ্চে কার হুকুমে?"

ইতিমধ্যে সরকার গোকুল সেদিকে আসিল। এখন ছোটবাবুর তরফে গেলেও, সে বহুকাল দুই ভায়ের সংসারে কাজ করিয়াছে।

গোকুল যখন টানাটানি করিয়া বড় বাবুকে গৃহমধ্যে লইয়া চলিল, তখন সে বলিল, "ওঃ, এই সংসার ঘাড়ে নিয়ে আমি বুকের রক্ত জল করে একে সাজিয়েছিলাম! আহা গোকুল! এমনটা হোল কেন বল্‌তে পার?"

৩

সেদিন প্রাতে গৃহিণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন বলিল, "ওগো! শুনেছ? দুর্গার বিয়ে!" অমনি কালীচরণ লাফাইয়া উঠিল; উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! কবে? কোথা?" পত্নী একটু শ্লেষ-জড়িত স্বরে বলিল, "তা' জেনে আর তোমার লাভ কি!" কালীচরণ গ্রাহ্য করিল না; বলিল, "পাগল! আমি তার জ্যাঠা! আমি তার বিয়ের কথা জান্‌বো না তো জান্‌বে কে?"

পত্নীর আর সহ্য হইতেছিল না। সে বলিল, "অত বাড়াবাড়ি কর্চ্চ কেন? কাল গায়ে-হলুদ, বিয়ে—সব। বলি, তোমার নেমন্তন্ন হয়েছে?"

কালীচরণ খুব চটিয়া বলিল, "আমি কন্যাকর্ত্তা—আমার আবার নিমন্ত্রণ কি! আর এতবড় একটা কাজ—নারাণের সাধ্য কি যে, আমি না দাঁড়ালে সব ঠিক বন্দোবস্ত করে!" এই বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। সে কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, পত্নী বাধা দিয়া বলিল, "তা' হবে না। বিনা নিমন্ত্রণে তুমি কি যেচে অপমান মাথা পেতে নেবার জন্য যাবে না কি! ভাই কি ইচ্ছা কর্‌লে তোমায় ডাক্‌তে পার্ত্ত না?"

তাই ত! এতটা ত কালীচরণ ভাবে নাই! ভাই যদি সত্যই অপমান করে! যদি দেশের, দশের সাম্‌নে—জ্ঞাতি-কুটুম্বদের দেখাইয়া বলে যে, সে ভাইকে চায় না—ভাই জোর করিয়া আসিয়াছে—তখন?

সহসা নারায়ণের বাটী হইতে সানাই সুর ছাড়িল। মধুর রাগিনীর আলাপ একেবারে পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া কালীচরণের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া—তাহার হৃদয়-দ্বারে সজোরে এক ধাক্কা মারিল। সঙ্গে-সঙ্গে সে মেঝেতে বসিয়া পড়িল!

সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে,—এমন সময় কক্ষদ্বার হইতে পুরোহিত কেদারনাথ ডাকিল, "বড়বাবু! একবার এদিকে আসুন!" সে চমকিত হইয়া লাফাইয়া উঠিল! ঐ যে তাহার নিমন্ত্রণ! নারায়ণ নিজে নিশ্চয় তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। "এই যে আমি ভাই—" বলিতে-বলিতে চঞ্চল পদক্ষেপে সে কক্ষদ্বারে আসিল—চারিদিকে চাহিল। কিন্তু পুরোহিতকে একাকী দেখিয়াই, সহসা কে যেন তাহার বক্ষে লৌহদণ্ড দ্বারা সবলে আঘাত করিল,—তাহার বক্ষের স্পন্দন পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। কেদার একখানি লাল কাগজ তাহার হাতে দিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "ছোট বাবুকে অত করে বল্লাম,—এই সুযোগে ঝগড়াটা মিটাইয়া ফেলুন—হাজার হোক বড় ভাই—!" সহসা সে কালীচরণের পাণ্ডুর বদন ও উদ্‌ভ্রান্ত নয়ন দেখিয়া ভয় পাইল। নিমন্ত্রণ-পত্র হাতে পড়িতেই, কালীচরণ আগে দেখিবার চেষ্টা করিল যে, কাহার নামে পত্র ছাপা হইয়াছে। প্রথমটা সে চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল

না। তার পর দ্বিতীয়বারও যখন দেখিল যে, কালীচরণ নহে নারায়ণচন্দ্র দত্ত নিজ নাম দিয়া পত্র ছাপাইয়াছে,—তখন সে সত্যই মরণ কামনা করিল! ছি! ছি! সমাজের সকলে বলিবে কি? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান—তবু ছোট ভাই নিজে কর্ম্মকর্ত্তা সাজিয়াছে!

৪

সানাই বিসর্জ্জনের সুর ধরিয়াছিল। তাহার বিনান-বিনান, করুণ অথচ মোলায়েম তান পর্দ্দায়-পর্দ্দায় উঠিয়া প্রভাতী বাতাসকে পর্য্যন্ত একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাসে পরিণত করিতেছিল। আর তাহার রেশ নারায়ণের হৃদয়ে পর্য্যন্ত প্রহত হইয়া তাহাকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রভাতে যখন সে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, বারান্দায় আসিয়া, ঘুমঘোর-মাখান দুর্গার মুখখানি দেখিল, আর ভাবিল যে, তাহার আদরিণী কন্যা আজ পরের ঘরে চলিল,—তখন সে সত্যই বিমর্ষ হইয়া গেল। শুধু তাই নহে; আরও একটা কি যেন দুর্ভাবনা তাহার হৃদয়-দ্বারে উঁকি মারিতেছিল!

সহসা পুরোহিত আসিয়া হাঁকিল, "ওগো, এয়োর দল, কোথা গেলে সব। মাঙ্গলিক কাজগুলো সেরে নাও না তাড়াতাড়ি। বর যে ট্রেনে যাবে।" তখন নারী মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। অনেক ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকির পর ঠাট্টা, বিদ্রূপ, হাসি, তামাসার ঢেউ বহিল—এয়োর দল নবদম্পতীকে ঘেরিয়া বসিয়া মাঙ্গলিক কর্ম্ম সুরু করিয়া দিল।

এমন সময় সহসা সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, কালীচরণ সেই নরনারীর ভীড় ঠেলিয়া ধীরে-ধীরে কক্ষ মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। কাহারও প্রতি লক্ষ্য না চাহিয়া, কোন কথা না বলিয়া, বরবধূর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, কম্পিত হস্তে একগাছি সোণার হার বাহির করিয়া দুর্গার গলায় পরাইয়া দিল। দুর্গা এমন অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইল। তার পর অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে "জ্যাঠামশাই" বলিয়াই তাহাকে প্রণাম করিল। জামাতাও তাহার দেখাদেখি মাথা নত করিল। কালীচরণ দুইটি হাত তাহাদের মাথার উপর দিয়া কি যেন বলিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিল। তার পর দ্রুত পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করিল। তখন সকলের চমক ভাঙ্গিল—পুরোহিত হাঁকিল "বড়বাবু, দাঁড়ান, দাঁড়ান। ছোটবাবু, যান, বড়বাবুকে ধরে আনুন।" নারায়ণের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়েছিল! বলা বাহুল্য, ততক্ষণে কালীচরণ নিজকক্ষে প্রবেশ করিতেছে। তাহার ব্যস্ত ভাব দেখিয়া পত্নী ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে তোমার?"

স্বামী কোন উত্তর না দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল দেখিয়া, সেও পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, বাক্স খুলে কি নিলে? কোথা গিয়েছিলে?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া খুব ছোট গলায় কালীচরণ বলিল, "বড়-বৌ! দুর্গাকে আশীর্ব্বাদ করে এলাম। তোমার হারগাছটা দিয়ে এলাম! নারাণ আমায় ডাকলে না বলে কি আমি যাব না? আমি দুর্গার জ্যাঠা—আমার তাকে আগে আশীর্ব্বাদ করার কথা। নারাণ ভুল করেছে বলে কি আমিও ভুল কর্ব্ব? কর্ত্তব্য হারাবো?" বলিতে-বলিতে আবেগে তাহার স্বর কাঁপিতে লাগিল।

৫

নারায়ণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। একটা কথা কহিবার, প্রতিবাদ করিবার শক্তিও সে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। প্রাতঃকাল হইতে যে কালো মেঘখণ্ড তাহার হৃদয়-কোণে উঁকি মারিতেছিল—দাদার এই অতর্কিত আবির্ভাবে তাহা আরও জমাট বাঁধিয়া, আরও বড় হইয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। দাদার ঐ বিরস, মলিন আকৃতি—বিষাদ-করুণ কাহিনী তাহাকে বজ্রাহত করিয়া দিয়াছে। দাদা যখন কন্যা-জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে উদ্যত হইল, তখন সে একবার ভাবিল, ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরে—তাহাকে বারণ করে। কিন্তু কি জানি কেন—কি একটা অভাবনীয় ভয় আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিল—তাহার হস্ত-পদকে শক্তিহীন করিল—কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করিল।

ছোট-বৌ আসিয়া তাহাকে যখন বলিল যে, দাদার যৌতুক ফিরাইয়া দিয়া আসিতে হইবে, তখন কে যেন তাহার বক্ষে হাতুড়ীর দ্বারা সবলে আঘাত করিল। সে পত্নীর দিকে চাহিল—তাহাকে ভাল করিয়া দেখিল। তার পর ধীরে-ধীরে বলিল, "আমি পার্ব্ব না।" উত্তেজিত কণ্ঠে পত্নী বলিল, "তা হ'বে না। এ ভিক্ষা আমরা নিতে পার্ব্ব না। তুমি যদি না পার,—আমি নিজে গিয়ে এ হার ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌বো।"

নারায়ণ পত্নীর দিকে পিছন ফিরিয়া বলিল, "ও জিনিষ দুর্গার—জামায়ের—ওটা ফিরে দেবার আমাদের কোন অধিকার নেই।"

বহুক্ষণ পরে, বিদায়ের পূর্ব্বে, বরকন্যাকে লইয়া বাটীর মহিলাবৃন্দ তাহার কক্ষদ্বারে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কন্যা-জামাতা বিদায় লইতেছে—তাহাদের আশীর্ব্বাদ কর।" সে তাড়া-তাড়ি উঠিয়া পড়িল; দেখিল, তাহার—আদরিণী কন্যা লালবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, কাঁদিয়া-কাঁদিয়া তাহার লাল কচি মুখখানি আরও লাল করিয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পার্শ্বে এক নবীন যুবক তাহার হাত ধরিয়া রহিয়াছে।

কন্যা-জামাতা তাহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, সে উভয় হস্তে তাহাদের বাধা দিল। টানিয়া তুলিয়া, উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দাড়াও, দাঁড়াও! আগে আমায় নয়—এস আমার সঙ্গে—" সে জোর করিয়া তাহাদের টানিতে-টানিতে, প্রাঙ্গণ পার হইয়া, একেবারে দাদার কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "দাদা!"

চুম্বক যেন লৌহকে আকর্ষণ করিল। একলম্ফে কালীচরণ কক্ষের বাহিরে আসিল। নারায়ণের আর কিছু বলিতে

হইল না—সম্মুখে নবদম্পতীকে দেখিয়াই কালীচরণ তাঁহাদের জড়াইয়া ধরিল—কথা বলিবার শক্তি যে তাহার জোগাইতেছিল না—আশীর্ব্বাদ-বাণী যে জিহ্বা পর্য্যন্ত আসিল না! দ্বার-পার্শ্বে বড়-বৌকে দেখিয়াই নারায়ণ ভগ্নস্বরে বলিল, "দুর্গা! তোর জেঠাই-মাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিস না?"

দুর্গা নত হইবার চেষ্টা করিতেই, তাহার জেঠাইমা চিলের মত ছোঁ মারিয়া নবদম্পতীকে কক্ষমধ্যে লইয়া গেল। তাহার নারী-হৃদয়ে আর সহ্য হইতেছিল না—উপস্থিত নরনারীর সম্মুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার শক্তিও যে তাহার ছিল না।

* * *

শুভযাত্রার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় বলিয়া পুরোহিত হাঁক দিতেই, নবদম্পতী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারা বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই কালীচরণ তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে একটা কাঠের বাক্স টানিয়া আনিল ও ভৃত্য সদার মাথায় সেটা তুলিয়া দিয়া বলিল, "যা, এটা দুর্গার পাল্কীতে তুলে দিয়ে আয়।"

শোক-সংবাদ

৺ইন্দিরা দেবী

আমরা এই পূজাবকাশের অব্যবহিত পরেই আর একটী শোক-সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে আমরা রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের লোকান্তর-গমন-সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখন আবার তাঁহারই পৌত্রী বাঙ্গলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিতা ইন্দিরা দেবীর পরলোক-গমন-সংবাদ পাঠক-পাঠিকাগণের গোচর করিতে হইতেছে। ইন্দিরা দেবীর অনেকগুলি সুলিখিত উপন্যাস হয় ত সকলেই পাঠ করিয়া তাঁহার লিপিকুশলতার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

দেনা-পাওনা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৯)

জীবানন্দর উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র ও ভুক্তাবশেষ প্রভৃতি ফেলিয়া দিতে, এবং রান্নাঘরের কিছু কিছু কাজ সারিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া আসিতে ষোড়শী বাহিরে চলিয়া গেলে তাহার সেই চিঠির ছেঁড়া টুক্‌রাখানা জীবানন্দর চোখে পড়িল। হাতে তুলিয়া লইয়া সেই মুক্তার মত সাজানো অক্ষরগুলির প্রতি মুগ্ধ চক্ষে চাহিয়া সে প্রদীপের আলোকে রাখিয়া সমস্ত লেখাটুকু এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। অনেক কথাই বাদ গিয়াছে, তথাপি এটুকু বুঝা গেল, লেখিকার বিপদের অবধি নাই, এবং সাহায্য না হোক, সহানুভূতি কামনা করিয়া এ পত্র যাহাকে সে লিখিয়াছে, সে নিজে যদিও নারী, কিন্তু প্রতি অক্ষরের আড়ালে দাঁড়াইয়া আর এক ব্যক্তিকে ঝাপ্‌সা দেখা যাইতেছে যাহাকে কোন মতেই স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হয়না। এই ছিন্ন পত্র তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। একবার, দুইবার শেষ করিয়া যখন সে আরও একবার পড়িতে সুরু করিয়াছে, তখন, ষোড়শীর পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া কহিল, সবটুকু থাক্‌লে পড়ে বড় আনন্দ পেতাম। যেমন অক্ষর, তেমনি ভাষা—ছাড়তে ইচ্ছে করেনা।

ষোড়শী তাহার কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন সহজে লক্ষ্য করিয়াও কহিল, একবার উঠুন, কম্বলটা পেতে দিই।

জীবানন্দ কান দিলনা, বলিল, নর-পিশাচটি যে কে তা সামান্য বুদ্ধিতেই বোঝাযায়, কিন্তু তাকে নিধন

কর্‌তে যে দেবতার আবাহন হয়েছে তিনি কে? নামটি তাঁর শুন্‌তে পাইনে?

এবারেও ষোড়শী আপনাকে বিচলিত হইতে দিলনা। শীতের দিনে আকস্মিক একটা দখিনা বাতাসের মত তাহার মনের ভিতরটা আজ অজানা পদধ্বনির আশায় যেন উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে জীবানন্দর বিদ্রুপ বেশ স্পষ্ট হইয়া পৌঁছিলনা,. সে তেমনি সহজ-ভাবেই কহিল, সে হবে। এখন আপনি একটু উঠে দাঁড়ান্ আমি এটা পেতে দিই।

জীবানন্দ আর কথা কহিলনা, একপাশে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহার কাজ করা দেখিতে লাগিল। ষোড়শী ঝাঁটা দিয়া প্রথমে সমস্ত ঘরখানি পরিস্কার করিল, পরে কম্বলখানি দুপুরু করিয়া বিছাইয়া চাদরের অভাবে নিজের একখানি কাচা কাপড় সযত্নে পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন। আমার কিন্তু বালিশ নেই—

দরকার হলেই পাবে গো,—অভাব থাক্‌বেনা। এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া কাপড়খানি তুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতে ষোড়শী মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া আরক্ত মুখে কহিল, কিন্তু ওটা তুলে ফেল্‌লেন কেন, শুধু কম্বল ফুট্‌বে যে?

জীবানন্দ উপবেশন করিয়া কহিল; তা' জানি, কিন্তু আতিশয্যটা আবার বেশী ফুট্‌বে। যত্ন জিনিসটায় মিষ্টি আছে সত্যি, কিন্তু তার ভান করাটায় না আছে মধু, না আছে স্বাদ। ওটা বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ো।

কথা শুনিয়া ষোড়শী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার মুখের উপর চোখের পলকে কে যেন ছাই মাখাইয়া দিল। জীবানন্দ কহিল, তাঁর নামটি?

ষোড়শী কয়েক মুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিলনা, তাহার পরে বলিল, কার নাম?

জীবানন্দ হাতের পত্রখণ্ডের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, যিনি দৈত্য বধের জন্য শীঘ্র অবতীর্ণ হবেন? যিনি দ্রৌপদীর সখা, যিনি—আর বল্‌ব?

এই ব্যঙ্গের সে জবাব দিলনা, কিন্তু চোখের উপর হইতে তাহার মোহের যবনিকা খান্‌খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। ধর্ম্মলেশহীন, সর্ব্বদোষাশ্রিত এই পাষণ্ডের আশ্চর্য্য অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া কেমন করিয়া যে তাহার মনের মধ্যে ক্ষণকালের নিমিত্তও ক্ষমামিশ্রিত করুণার উদয় হইয়াছিল ইহা সে সহসা ভাবিয়া পাইলনা। এবং চিত্তের এই ক্ষণিক বিহ্বলতায় সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার অনুশোচনায় তিক্ত, সতর্ক ও কঠোর হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল পরে জীবানন্দ পুনশ্চ যখন সেই এক প্রশ্নই করিল, তখন ষোড়শী কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া লইয়া কহিল, তাঁর নামে আপনার প্রয়োজন?

জীবানন্দ কহিল, প্রয়োজন আছে বই কি। আগে থেকে জান্‌তে পারলে হয়ত আত্মরক্ষার একটা উপায় করতেও পারি।

ষোড়শী তাহার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আর, আত্মরক্ষায় কি শুধু আমারই অধিকার নেই?

জীবানন্দ বলিয়া ফেলিল, আছে বই কি।

ষোড়শী কহিল, তা হলে সে নাম আপনি পেতে পারেননা। আমার ও আপনার একই সঙ্গে রক্ষা পাবার উপায় নেই।

জীবানন্দ একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, তাই যদি হয়, রক্ষা পাওয়া আমারই দরকার, এবং তাতে লেশমাত্র ত্রুটি হবেনা জেনো।

ষোড়শীর মুখে আসিল বলে, তা' জানি, একদিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছিল। সেদিন নিরপরাধা নারীর স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইয়া তোমার প্রাণ বাঁচিয়াছিল, এবং তোমার আজিকার বাঁচিয়া থাকিবার দামটাও হয়ত ততবড়ই আর একজনকে দিতে হইবে, কিন্তু সে কোন কথাই কহিলনা। তাহার মনে হইল এতবড় নর-পশুর কাছে অতবড় দানের উল্লেখ করার মত ব্যর্থতা আর ত কিছু হইতেই পারেনা।

জীবানন্দর হুঁস হইল। তাহার এতবড় ঔদ্ধত্যের যে জবাব দিলনা, তাহার কাছে গলাবাজির নিষ্ফলতা তাহার নিজের মনেই বাজিল। তাহার উত্তেজনা কমিল, কিন্তু ক্রোধ বাড়িয়া গেল। কহিল, অলকা, তোমার এই বীর-পুরুষটির নাম যে আমি জানিনে তা' নয়।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল; জানবেন বই কি, নইলে উদ্দেশে তাঁর ঝগড়া করবেন কেন? তা'ছাড়া পৃথিবীর বীরপুরুষদের মধ্যে পরিচয় থাক্‌বারই ত কথা।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে ঠিক। কিন্তু এ চিঠি ছিঁড়লে কেন?

ষোড়শী বলিল, আর একখানা পাঠিয়েছিলাম বলে।

কিন্তু সোজা তাঁকে না লিখে তাঁর স্ত্রীকে লেখা কেন? এই শব্দভেদী বাণ কি তাঁরই শিক্ষা না কি?

ষোড়শী কহিল, তার পরে?

জীবানন্দ বলিল, তার পরে, আজ আমার সন্দেহ গেল। বন্ধুর সম্বাদ আমি অপরের কাছে শুনেচি, কিন্তু রায় মশায়কে যতই প্রশ্ন করেচি, ততই তিনি চুপ করে গেছেন। আজ বোঝা গেল তাঁর আক্রোশটাই সবচেয়ে কেন বেশি।

ষোড়শী চমকিয়া গেল। কলঙ্কের ঘূর্ণী হাওয়ার মাঝখানে পড়িয়া তাহার দেহের কোথাও দাগ লাগিতে আর বাকি ছিলনা, কিন্তু, ইহার বাহিরে দাঁড়াইয়াও যে আর একজন অব্যাহতি পাইবেনা ইহা সে ভাবে নাই। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি শুনেচেন?

জীবানন্দ কহিল, সমস্তই। একটু থামিয়া বলিল, তোমার চমক্ আর গলার মিঠে আওয়াজে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাস্‌তে পারলামনা,—আমার আনন্দ করবার কথা এ নয়। সেই ঝড় জলের রাত্রির কথা মনে পড়ে? তার সাক্ষী আছে। সাক্ষী ব্যাটারা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে আগে থেকে কিছুই বলবার যো নেই। আমি যখন গাড়ী থেকে ব্যাগ নিয়ে পালাই, ভেবেছিলাম কেউ দেখেনি।

ষোড়শী কহিল, যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে সে কি এতবড় দোষের?

জীবানন্দ বলিল, কিন্তু তাকে গোপন করাটা? এই চিঠির টুক্‌রোটা? নিজেই একবার পড়ে দেখ ত কি মনে হয়? এ আমি সঙ্গে নিয়ে চল্‌লাম, আবশ্যক হয় ত যথাস্থানে পৌঁছে দেব। আমার মত ইনিও তোমার একবার বিচার করতে বসেছিলেন না? দেখ্‌চি তোমায় বিচার করবার বিপদ আছে। এই বলিয়া সে মুচকিয়া হাসিল।

ষোড়শী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। বিপদের বার্ত্তা জানাইয়া বাস্তবিক সে যে একজনকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আর একজনকে পত্র লিখিয়াছে, একজনের নাম করিয়া আর একজনকে আসিতে ডাকিয়াছে,—সেই ডাকটা যখন এই ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রা হইতে এই লোকটাকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দিতে পারিল না, তখন সম্পূর্ণ পত্রটা কি হৈমর চক্ষুকেই ঠকাইতে পারিবে? এবং ঠিক সেই দিকে কেহ যদি আজ আঙুল তুলিয়া হৈমর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাহে ত লজ্জার কিছু আর বাকি থাকিবেনা।

তাহার চক্ষের পলকে হৈমর ঘর-সংসারের চিত্র,—তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার বহু দাসদাসী, তাহার ঐশ্বর্য্য, তাহার সুন্দর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার ধারা,—যে ছবি সে দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছে,—সমস্ত এক নিমিষে কলুষের বাষ্পে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, মনে করিয়া সে নিজের কাছেই আর যেন মুখ দেখাইতে পারিলনা। আর এই যে পাপিষ্ঠ তাহারই ঘরে বসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতেছে, যাহার কুকার্য্যের অবধি নাই, যে মিথ্যার জাল বুনিয়া অপরিচিত, নিরপরাধ একজন রমণীর সর্ব্বনাশ করিতে কোন কুণ্ঠা মানিবেনা, ষোড়শীর মনে হইল এ জীবনে এতবড় ঘৃণা সে আর কখনো কাহাকেও করে নাই, এবং এ বিষ যে হৃদয় মথিত করিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত গর্ভতল সেই দহনে যেন অনলকুণ্ডের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

নির্ম্মল আসিবেই। তাহার যত অসুবিধাই হৌক এই দুঃখের আহ্বান সে যে উপেক্ষা করিতে পারিবেনা, নিজের মনের এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল। তখন তাহারই কলঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া শ্বশুর ও জামাতায়, পিতা ও কন্যায়, জমিদার ও প্রজায় সমস্ত গ্রাম ব্যাপিয়া যে লড়াইয়ের আবর্ত্ত উঠিবে তাহার বীভৎসতার কালোছায়া তাহার সাংসারিক দুঃখকষ্টকে কোথায় যে ঢাকিয়া ফেলিবে সে কল্পনা করিতেও পারিলনা।

বোধকরি মিনিট পাঁচ-ছয় নিস্তব্ধতার পরে ঠিক এই সময়ে জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেমন, অনেক কথাই জানি, না?

ষোড়শী অভিভূতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, হাঁ।

এ সব তবে সত্য বল?

ষোড়শী তেমনি অসঙ্কোচে কহিল, হাঁ, সত্যি।

জীবানন্দ অবাক্ হইয়া গেল। এই অপ্রত্যাশিত সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরে তাহার নিজের মুখেও সহসা কথা যোগাইলনা। শুধু কহিল, ওঃ—সত্যি! তাহার পরে হাত বাড়াইয়া স্তিমিত দীপশিখাটা উজ্জ্বল করিয়া দিতে দিতে

ক্ষণে ক্ষণে তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তা'হলে তুমি কি করবে মনে কর?

কি আমাকে আপনি করতে বলেন?

তোমাকে? এই বলিয়া জীবানন্দ স্তব্ধ নতমুখে বসিয়া তৈলবিরল প্রদীপের বাতিটা অকারণে শুধু শুধু কেবল উস্কাইতে লাগিল। খানিক পরে যখন সে কথা কহিল তখনও তাহার চক্ষু সেই দীপশিখার প্রতি। কহিল, তাহলে এঁরা সকলে তোমাকে যে অসতী বোলে—

এতক্ষণ পরে সে কথার মাঝখানে বাধা দিল, কহিল, সে কথা এখানে কেন? এঁদের বিরুদ্ধে আপনার কাছে ত আমি নালিশ জানাইনি। আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন। কোন কারণ দেখাবার দরকার নেই।

জীবানন্দ বলিল, তা' বটে। কিন্তু সবাই মিথ্যে কথা বলে আর তুমি একাই সত্যবাদী এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও অলকা?

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কি একটা বলিতে গিয়াও হঠাৎ চুপ করিয়া গেল দেখিয়া জীবানন্দ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিল। বলিল, একটা উত্তর দিতেও চাওনা?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

জীবানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, দেবার আছেই বা কি! সমস্ত ত স্পষ্টই বোঝা গেছে। ইহাতেও ষোড়শীর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা নষ্ট হইলনা, কহিল, স্পষ্ট বোঝা যাবার পরে কি করতে হবে বলুন?

তাহার প্রশ্ন ও অচঞ্চল কণ্ঠস্বরের গোপন আঘাতে জীবানন্দর ক্রোধ ও অধৈর্য্য শতগুণ বাড়িয়া গেল, কহিল, তোমাকে কি করতে হবে সে তুমি জানো, কিন্তু আমাকে দেবমন্দিরের পবিত্রতা বাঁচাতেই হবে। সত্যকার অভিভাবক তুমি নয়, আমি। পূর্ব্বে কি হোতো আমি জানিনে, কিন্তু এখন থেকে ভৈরবীকে ভৈরবীর মতই থাকতে হবে, না হয় তাকে যেতে হবে। এ রকম চিঠি লেখা তার চলবেনা! এই বলিয়া সে মুখ তুলিতেই তাহার ঈর্ষার ক্রূর দৃষ্টি অকস্মাৎ ষোড়শীর চোখে পড়িতে তাহার নিজের দৃষ্টি একমুহূর্ত্তে যেমন যোজন বিস্তৃত হইয়া গেল, তেমনি লালসার তপ্ত নিঃশ্বাস নিজের সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিয়া বিশ্ব-সংসারে যেন তাহার অরুচি ধরিয়া গেল। মনে হইল হৈম, তাহার সংসার, এই দেবমন্দির, তাহার অসহায় প্রজাদের দুঃখ, তাহার নিজের ভবিষ্যৎ কিছুতেই আর তাহার কাজ নাই,—সকল বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইয়া অজানা কোথাও গিয়া লুকাইতে পারিলে যেন বাঁচে। সকলের চেয়ে বেশি মনে হইল নির্ম্মল যেন না আসে। অনেকক্ষণ নীরবে স্থির থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, বেশ; তাই হবে। যথার্থ অভিভাবক কে সে নিয়ে আমি ঝগড়া কোরবনা, আপনারা যদি মনে করেন আমি গেলে মন্দিরের ভাল হবে, আমি যাবো।

ইহাকে বিদ্রূপ মনে করিয়া জীবানন্দ জ্বালার সহিত কহিল, তুমি যে যাবে সে ঠিক। কারণ, যাতে যাও তা আমি দেখ্‌ব।

ষোড়শী তেমনি নম্র কণ্ঠে বলিল, আমি যখন যেতে চাচ্চি, তখন কেন আপনি রাগ করচেন? কিন্তু আপনার উপর এই ভার রইল যেন মন্দিরের সত্যিই ভাল হয়।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কবে যাবে?

ষোড়শী উত্তর দিল, আপনারা যখনই আদেশ করবেন। কাল, আজ, এই মুহূর্ত্তে—আমি তখনি যাবো।

জীবানন্দ বিশ্বাস করিতে পারিলনা, কহিল, কিন্তু নির্ম্মলবাবু? জামাই সাহেব?

ষোড়শী কাতর হইয়া বলিল, তাঁর নাম আর করবেন না।

জীবানন্দর তথাপি সংশয় ঘুচিলনা, প্রশ্ন করিল, তোমাকে কি দিতে হবে?

আমাকে কিছুই দিতে হবেনা।

জীবানন্দ কহিল, এ ঘরখানা পর্য্যন্ত ছাড়তে হবে জানো? এ ও দেবীর।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে কহিল, জানি। যদি পারি ত কালই ছেড়ে দেব।

কালই? জীবানন্দ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, এ কি সত্যি বোল্‌চ? পরিহাস কোরচনা?

ষোড়শী শুধু কহিল, না।

কোথায় থাকবে ঠিক করেচ?

ষোড়শী কহিল, এখানে থাকবনা এর বেশি কিছুই ঠিক করিনি। একদিন কিছু না জেনেই আমি ভৈরবী হয়েছিলাম, আজ বিদায় নেবার সময়েও আমি এর বেশি কিছুই চিন্তা কোরবনা।

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মন সংশয় ও নিশ্চয়তার মাঝখানে দোল খাইতে লাগিল।

ষোড়শী বলিল, আপনি দেশের জমিদার, চণ্ডীগড়ের ভালমন্দের বোঝা আপনার উপর রেখে যেতে শেষ সময়ে আর আমি দুশ্চিন্তা কোরবনা। কিন্তু আমার বাবা বড় দুর্ব্বল, তাঁর উপর ভার দিয়ে আপনি যেন নিশ্চিন্ত হবেননা।

তাহার কণ্ঠস্বর ও কথায় সহসা বিচলিত হইয়া জীবানন্দ বলিয়া উঠিল তুমি কি সত্য সত্যই চলে যেতে চাও অলকা?

ষোড়শী তাহার পূর্ব্বকথার অনুবৃত্তি স্বরূপে কহিতে লাগিল, আর আমার দুঃখী, দরিদ্র ভূমিজ প্রজারা,—এদের সুখ-দুঃখের ভারও আমি আপনাকেই দিয়ে চল্‌লাম।

জীবানন্দ তাড়াতাড়ি কহিল,—আচ্ছা তা হবে হবে। কি তারা চায় বল ত?

ষোড়শী কহিল, সে তারাই আপনাকে জানাবে। কেবল আমি শুধু আপনার কথাটাই যাবার আগে তাদের জানিয়ে যাবো। হঠাৎ সে বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া কহিল, কিন্তু এখন আমি চোললাম,—আমার স্নান করতে যাবার সময় হল। এই বলিয়া সে তাহার কাপড় ও গামছা আলনা হইতে তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল।

জীবানন্দ বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, স্নানের সময়? এই রাত্রে?

রাত্রি আর নেই। আপনি এবার বাড়ী যান—বলিতে বলিতেই ষোড়শী ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার এই অকারণ আকস্মিক ব্যগ্রতায় জীবানন্দ নিজেও ব্যগ্র হইয়া উঠিল, কহিল, কিন্তু আমার সকল কথাই যে বাকি রয়ে গেল অলকা?

ষোড়শী কহিল,—আপনি বাড়ী যান।

জীবানন্দ জিদ্ করিয়া কহিল, না। কথা আমার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এইখানেই তোমায় প্রতীক্ষা করে রইলাম।

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না, আপনার পায়ে পড়ি আমার জন্যে আর আপনি অপেক্ষা করবেন না। এই বলিয়া সে বামদিকের বনপথ ধরিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাহিত্য-সংবাদ

"SARDHANA"—PUBLISHED BY SARDHANA MISSION এবং "REFUTATION OF THE CHARGES OF LUNACY BROUGHT AGAINST HIM BY THE COURT OF CHANCERY"
BY DYCE SOMBRE (Printed in Paris)

এই দুইখানি পুস্তক যদি কোন ভদ্রলোকের নিকট থাকে, তিনি দয়া করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, র‍্যাভেন্স কলেজ, কটক, এই ঠিকানায় একটা সংবাদ দিলে তাঁহাকে বিশেষ কৃতজ্ঞ করা হইবে।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ প্রণীত "মুদ্রাদোষ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক টাকা।

আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অশীতিতম গ্রন্থ—শ্রীচরণদাস ঘোষ প্রণীত "ঘণ্টুর মা" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বিপথে" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য সাত সিকা।

'প্রহেলিকা', 'জীবন' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত "জঞ্জাল" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত বামাচরণ ভৌমিক প্রণীত "যুগান্তর" বা সামাজিক নবন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "অবতার" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা গোস্বামী প্রণীত "হেমনলিনী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু প্রণীত "সমুদ্র-মন্থন" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত "পদ্মা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দুই টাকা।

ভ্রম সংশোধন—"রসস্থ নিবেদনম্" "প্রবন্ধের ৬৫০ পৃষ্ঠার ২০ লাইনের পর ৬৫১ পৃষ্ঠার ৬ লাইনের "কাব্যের এ প্রমাণ হইতে" আরম্ভ করিয়া ৬৫২ পৃষ্ঠার ১৯ লাইনের "নিকটে নিয়ে এসেছে" পর্য্যন্ত বসিবে। ৬৫১ পৃষ্ঠার ৬ লাইনের "এক অসীম"—এর পর ৬৫২ পৃষ্ঠার ১৯ লাইনের "নিয়ম ধর্ম্ম চক্রে" হইতে পড়িতে হইবে।

lisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatbarsa Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

"বিভোর প্রাণে আসবে যেদিন— আকুল মিলন-প্রতীক্ষায়
তৃণাসনে অতিথ্ সভা ছড়িয়ে যেথা তারার প্রায়;
উজল পায়ে আসবে যখন আমার যেথায় ছিল স্থান,
উপুড় ক'রে রেখো সেথায় আমার শূন্য পাত্রখান!"

ওমর খৈয়াম। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ-অনূদিত

চিত্র-শিল্পী—শ্রীযুক্ত রামেশ্বরপ্রসাদ বর্মা পরিকল্পিত এবং শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু কর্তৃক রঞ্জিত

ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

প্রথম খণ্ড | দশম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ

ভগবান্ মনু একাগ্রমনে সুখে উপবিষ্ট আছেন, —মহর্ষিগণ তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, যথোচিত পূজাদি করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন,—"ভগবন্! বর্ণ-চতুষ্টয়ের এবং তৎ-সম্ভূত সঙ্কর জাতিসমূহের সমুদায় ধর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হয়। কারণ হে প্রভো! সেই কর্ম্মবিধায়ক অচিন্ত্য, অপরিমেয়, অপৌরুষেয় সমগ্র বেদশাস্ত্রের কার্য্য, তত্ত্ব, এবং অর্থজ্ঞান বিষয়ে আপনিই একমাত্র অদ্বিতীয়।" অসীম জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন সেই ভগবান্, মহানুভবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে পর, "শ্রবণ করুন" বলিয়া তাঁহাদিগের কাছে সাদরে যে সকল তত্ত্বের বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে অর্থনীতি সংক্রান্ত অনেকগুলি বিষয় আমরা জানিতে পারি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়সমূহের আলোচনার প্রয়াস পাইব।

মনুর সময়ে কৃষিকার্য্যকে পবিত্র কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করা হইত না। মনু বলিয়াছেন (১০।৮৪), যদিও কেহ-কেহ কৃষি-জীবিকার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তথাপি ইহা সজ্জন-নিন্দিত, কারণ, এতদুপলক্ষে হল-কুদ্দালাদি সঞ্চালন দ্বারা ভূমিস্থিত বহু প্রাণীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা। বস্তুতঃ, ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা একপ্রকার নিষিদ্ধই ছিল। নিজবৃত্তি ও ক্ষত্রিয়-বৃত্তি—এই উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারা যখন ব্রাহ্মণের জীবিকা-নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিবে, তখনই কেবল কৃষি-বাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি তাঁহার অবলম্বনীয় হইবে।

জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেও, তিনি হিংসাবহুল গবাদি পশ্বাধীন কৃষিকার্য্য যত্নতঃ পরিত্যাগ করিবেন। (১০।৮২)

জাতিভেদ প্রথা বদ্ধমূল করিবার জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যে কারণেই হোক, প্রত্যেক জাতির নিজ-নিজ কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বৈশ্যের কর্ত্তব্য প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, বৈশ্য কৃতোপবীত হইয়া, দারপরিগ্রহ করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে সদা নিযুক্ত থাকিবে; এবং পশুদিগকেও সংরক্ষণ করিবে। প্রজাপতি পশুদের সৃষ্টি করিয়া, বৈশ্যের উপর উহাদের ভারার্পণ করেন; এবং প্রজা সমুদায় সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও রাজার উপর উহাদের ভারার্পণ করেন। বৈশ্যেরা এমন কথন মনে করিবেন না যে, "আমরা নীচকর্ম্ম—পশুপালন করিব না।" বৈশ্য—মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণাদি, বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য, এবং লবণাদি রস ইত্যাদি দ্রব্যের মূল্য এবং তাহাদের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। বৈশ্য সর্ব্বপ্রকার বীজের বপন-বিধিজ্ঞ হইবেন,—ভূমির দোষ-গুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন; এবং সপ্রস্থ দ্রোণাদি সকল প্রকার পরিমাণ ও তুলামান জ্ঞাত হইবেন। (৯।৩২৬ইঃ) বৈশ্যেরই এই সকল কার্য্য ছিল—এগুলি ব্রাহ্মণের পক্ষে হানকার্য্য ছিল। কিন্তু, আবার আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা স্বয়ং অন্যান্য কর্ত্তব্যের মধ্যে কৃষির প্রতি যত্নবান থাকিতেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, কৃষিকার্য্য নিতান্ত নিন্দনীয় ছিল না; কেবল ব্রাহ্মণগণকে কৃষিকার্য্য হইতে বিরত রাখিবার জন্যই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বেডেন পোয়েল্ নামক পাশ্চাত্য লেখক মনে করেন যে, আর্য্যজাতির উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ কৃষিকে নিন্দনীয় মনে করিতেন; এবং ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতির সহিত আর্য্যদের কোনই সংস্রব ছিল না। স্যার উইলিয়াম্ হাণ্টার্ও এই মতানুবর্ত্তী হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, আর্য্যগণ এত অধিক সংখ্যায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই, যাহাতে তাঁহাদের পক্ষে কৃষিকার্য্যের প্রতি অত্যধিক আনুরক্তি সম্ভবপর হইয়াছিল। অনার্য্যগণই কৃষিকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিত এবং মেষপালনে ও কৃষি নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়াই পরিগণিত হইত।

কিন্তু, উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত আদৌ সমীচীন নহে বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। প্রাচীন হিন্দু সমাজের গঠন ও কার্য্য-প্রণালীর পর্য্যালোচনা করিলে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত যে গ্রহণীয় নহে, তাহা সহজেই বলা যাইতে পারে। মিঃ বেডেন পোয়েল্ অনুমান করিয়াছেন যে, বৈশ্যের কেবল বাণিজ্য-বৃত্তিই প্রধান অবলম্বন ছিল। তিনি শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতেন; এবং তিনি পশুযূথের স্বত্বাধিকারীও ছিলেন। যে সকল কার্য্য তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রানুমোদিত ছিল, ভূমি-খনন তন্মধ্যে পরিগণিত হইলেও, তিনি উহাতে কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করিতেন। অপিচ, ভূমি-খনন তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও, ব্যক্তিগত ভাবে তাহার সহিত উঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না; তিনি উহাতে মূলধন প্রয়োগ করিতেন মাত্র। বর্ত্তমান ক্ষত্রি ও বণিয়াজাতি যে ভাবে জমিজমার স্বত্বাধিকারী, আর্য্যযুগের বৈশ্যগণও যে সেইরূপ ছিলেন, বেডেন পোয়েলের সেই মত। কিন্তু, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এরূপ উক্তি গ্রহণীয় নহে। আর্য্যেরা বৈদিকযুগ হইতেই কৃষিকার্য্যকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ব্রাহ্মণ এবং সূত্র সমূহেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বৈশ্যগণ কৃষিতে অনুরক্ত ছিলেন; এবং সময়ে-সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণও এই বৃত্তি অবলম্বন করিতেন।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মণগণ একটী মাত্র কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কৃষিকে হেয়জ্ঞান করিতেন না। সেই কারণটী এই—মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রচলিত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে অহিংসা-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; এবং একমাত্র এই কারণেই, অর্থাৎ কৃষিতে জীবহত্যা হইত বলিয়াই, ব্রাহ্মণগণ কৃষিকে পছন্দ করিতেন না। প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক কালেও কেহ কৃষিকে হীনবৃত্তি বলিয়া গণ্য করিতেন না; এখনও করেন না; এবং বেডেন্ পোয়েল্ যে বলিয়াছেন যে, বৈশ্য কেবল বাণিজ্যেই রত ছিলেন, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, কৃষি এবং বাণিজ্য উভয় বৃত্তিই বৈশ্যের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত ছিল।

দ্রব্য সকলের উৎকৃষ্টতাপকৃষ্টতা, দেশ সকলের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্যের লাভালাভ, পশুদিগের পরিবর্দ্ধনোপায় সকল, শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিক, ভিন্ন-ভিন্ন দেশের ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা, দ্রব্য সকলের উৎপত্তি স্থান ও তাহাদের পরস্পর সংযোগ বিষয়ক জ্ঞান এবং ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে সমুদায় জ্ঞাতব্য তথ্য—

বৈশ্য এই সকল বিষয়ই অবগত থাকিবেন। (মনুসংহিতা ৯।৩৩১) রাজার প্রাপ্য শুল্কনির্দ্ধারণ কালে সর্ব্বপণ্য বিচক্ষণ শুল্ক-কুশল বৈশ্য পণ্যের যে মূল্য নির্ণয় করিয়া দিতেন, নরপতি তদনুসারে লভ্যাংশের বিশ ভাগের এক ভাগ শুল্ক গ্রহণ করিতেন (৮।৩৯৮)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যে সকল বিক্রেয় দ্রব্য রাজার নিজের বলিয়া প্রখ্যাত, অথবা যে সকল দ্রব্য দেশান্তরে লইয়া যাইতে রাজা নিষেধ করিতেন, যে বণিক লোভ বশতঃ ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিত বা দেশান্তরে লইয়া যাইত, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিতেন। কতদূর হইতে দ্রব্য আসিত, কতদূরে যাইবে, কতকাল রাখিলে কত মূল্য হইবে, তাহাদিগের জন্য কত ব্যয় হইয়াছে, ইত্যাদি সমুদায় বিচার করিয়া রাজা পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করাইতেন (মনু ৮।৩৯৯,৪০১)।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে ব্যবসায়ের সৌকর্য্যার্থ বিশেষ চেষ্টা করা হইত। তৌল করিবার জন্য 'তুলামান' এবং ধান্যাদি মাপিবার জন্য প্রস্থ দ্রোণাদির প্রতি বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখা হইত। (৮।৪০৩) বিক্রয়-যোগ্য দেশে অনেকের সমক্ষে যথার্থ মূল্যে যে ক্রয় বিক্রয় হইত, তাহাই বিশুদ্ধ বাণিজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত (৮।২০১)। এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যে মিশাইয়া ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল (৮।২০৩)। ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া যে পশ্চাতে অনুতাপ করিত, সে সেই দ্রব্য দশ দিনের মধ্যে ফিরাইয়া দিতে বা ফিরাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু দশ দিন পরে প্রত্যর্পণ করিতে বা ফিরাইয়া লইতে পারিত না (৮।২২২)। যে ব্যক্তি সমমূল্যদাতাদিগের সহিত উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট দ্রব্য দ্বারা বিষম ব্যবহার করিত, অথবা সমমূল্যের দ্রব্য একজনকে অল্পমূল্যে দিত, রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিতেন। (৯।২৮৭)

ব্যবসায় স্থলপথেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, জলপথেও ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। নদীমার্গে দূরাদূর স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে, নদীর প্রবলতা বা স্থিরতা, তথা গ্রীষ্ম-বর্ষাদিকাল বিবেচনা করিয়া যাতায়াত করা হইত। নাবিকের দোষে নৌকারূঢ় ব্যক্তির দ্রব্য নষ্ট হইলে, নৌকাস্থ নাবিকগণকে মিলিয়া আপন-আপন অংশ হইতে ঐ ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইত। (৯।২৫৭)। স্থলপথ ও জলপথ-গমনকুশল, দেশকালার্থ-দর্শী বণিকেরা যান-বাহনাদির ভাড়া নির্ণয় করিতেন (৮।১৫৭)।

তৎকালীন নরপতির নানা কর্ত্তব্য ও অধিকার ছিল। প্রণষ্ট দ্রব্য রক্ষা হেতু রাজা, সাধুগণের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, ধন-স্বামীর নিকট হইতে ঐ ধনের ষড়্ ভাগ, দশম ভাগ বা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করিতেন। নষ্ট দ্রব্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলে, রাজা উহা রক্ষার্থ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতেন। রাজা পূর্ব্বোপনিহিত কোন নিধি ভূমি মধ্যে প্রাপ্ত হইলে, তাহার অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া,আপনি অর্দ্ধেক লইতেন। সুবর্ণাদি খনির রক্ষণ নিমিত্ত ভূমির স্বামিত্ব নিবন্ধন, রাজা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লব্ধ নিধির অর্দ্ধভাগ লইবেন। (৮।৩২ ইঃ) বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য—তাহা কতদূর হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার উপর ভক্তাদিতে কত খরচ পড়িয়াছে, চৌরাদি হইতে সংরক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যে ব্যয় এবং ব্যবসায়ের নিকট লভ্যাংশ—এই সমুদায় হিসাব করিয়া রাজা বাণিজ্য-দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করিতেন। যাহাতে নিজে এবং প্রজাবর্গ সকলেই স্ব স্ব কার্য্যের ফললাভ করিতে পারেন, এরূপ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রাজ্য মধ্যে কর নির্দ্ধারণ করাই রাজার কর্ত্তব্য ছিল। কোন প্রকারে প্রজাবর্গের মূলধনের অনুমাত্রও ক্ষতি না হয়, এরূপ ভাবে জলোকার শোণিত পানের ন্যায়, গো-বৎসের দুগ্ধ পানের ন্যায় এবং ভ্রমরের মধু পানের ন্যায়, অল্পে অল্পে প্রজাবর্গের নিকট হইতে বার্ষিক কর গ্রহণ করাই রাজার কর্ত্তব্য ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, পশু এবং রত্নাদির ব্যবসায়ের লভ্য ফলের পঞ্চাশৎ ভাগ এবং ভূমির উর্ব্বরতা ও কর্ষণ-ব্যয়ের তারতম্যানুসারে ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম এবং দ্বাদশাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল। বৃক্ষ, মাংস, ঘৃত, মধু, ওষধি, গন্ধদ্রব্য, বৃক্ষ-নির্য্যাস, ফল, মূল এবং পুষ্প—এই সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়-লব্ধার্থের ষষ্ঠাংশ রাজা গ্রহণ করিতেন। তৃণ, পত্র, শাক, মৃণ্ময়পাত্র, বংশপাত্র, স্বর্ণ-পাত্র, এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্য সমষ্টির ক্রয়-বিক্রয়-লব্ধার্থেরও ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল। রাজা অর্থাভাবে মরণাপন্ন হইলেও শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কখনও কর গ্রহণ করিতে পারিতেন না। (৭।১২৭ইঃ) এতদ্ব্যতীত, কারু, কর্ম্মকার, শিল্পী, দাস, দাসী অথবা যাহারা কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ

করে, তাহাদিগের দ্বারা রাজা মাসে একদিন করিয়া নিজ কার্য্য করাইয়া লইতে পারিতেন (৭।১৩৮)।

মনুর সময়ে রাজাই ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকারী ছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দৃষ্ট হয়। কেহ-কেহ বলেন যে, রাজাই সকল ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। গ্রীস-দূত মেগস্থেনিস্ বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের সকল ভূভাগেই রাজার স্বত্ব এবং অন্য কেহই ভূমির অধিকারী হইতে পারে না। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল্ মহাশয় এই মতের ঘোর বিরোধী। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন যে, ভারতীয় আইনে ভূমি সদা-সর্ব্বদাই রাজ-সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। সুপণ্ডিত জয়সোয়াল্ সাহেব এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

দায়প্রাপ্ত, মিত্রের নিকট হইতে লব্ধ, ক্রয়লব্ধ, জয়লব্ধ, ধান্যাদি-বৃদ্ধিলব্ধ, কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্ম্মযোগ লব্ধ এবং সৎপ্রতিগ্রহণ লব্ধ—এই সাত প্রকারে ধনাগম ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। সুদগ্রহণ পূর্ব্বক ঋণদান কর্ত্তব্য ছিল না; তবে ধর্ম্ম কর্ম্মার্থ অল্প সুদে নিকৃষ্ট কর্ম্মাকে ঋণদান করা যাইত (১০।১১৫, ১১৬)। স্থল বিশেষে কুসীদগ্রহণ নিন্দনীয় হইত (৪।২১০)। শাস্ত্রানুসারে অধিক হারে সুদ লওয়া সিদ্ধ নয়। এরূপ অধিক হারে সুদ গ্রহণকে পণ্ডিতেরা কুসীদ পথ বলিয়া নিন্দা করিতেন। অশাস্ত্রীয় সুদ গ্রহণ করাও উচিত ছিল না। লেখ্যপত্র প্রচলিত ছিল (৮।১৫৫)। যে অধমর্ণ ঋণদানে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার লেখ্যপত্র লিখিতে ইচ্ছা করিত, সে দেয় সমুদায় সুদ উত্তমর্ণকে প্রদান করিয়া লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিয়া দিত। (৮।১৫৮)। যদি সমুদায় বৃদ্ধি না দিতে পারিত, তবে যত বৃদ্ধি অবশিষ্ট থাকিত, তাহা এবং মূল একত্র করিয়া যত হইত, তাহার লেখা করিয়া দিত। বেতনাদির সম্বন্ধেও নির্দ্ধারিত নিয়ম ছিল।

তৎকালে মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। "সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে গবাক্ষ-বিবর হইতে যে ধূলিসমূহ উড্ডীয়মান হয়, উহার মধ্যে যে ধূলিকণা অতিশয় সূক্ষ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে, পরিমাণ গণনায় উহা প্রথমে গণ্য; উহাকে ত্রসরেণু বলে। ঐ ত্রসরেণুর আটগুণে এক লিক্ষা হয়; তার তিনগুণে এক রাজসর্ষপ এবং রাজসর্ষপের চারিগুণে গৌড় সর্ষপ হয়। ছয় সর্ষপে এক যবমধ্য হয়; তিন যবে এক কৃষ্ণল, পাঁচ কৃষ্ণলে এক মাষা, এবং উহার ষোড়শগুণে এক সুবর্ণ হয়। চারি সুবর্ণে এক পল হয়; দশ পলে এক ধরণ এবং দুই কৃষ্ণলে এক রৌপ্যময় মাষা হয়। ষোড়শ রূপ্য মাষায় এক রূপ্য ধরণ বা পুরাণ হয়। এক কার্ষিক বা আশী রতি পরিমিত তাম্রকে পণ বা কার্ষাপণ বলে। পূর্ব্বোক্ত দশ ধরণে এক রাজত শতমান হয় এবং চারি সুবর্ণে এক নিষ্ক হয়। তালিকায় ইহা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখান হইতেছে।

প্রথম তালিকা

রৌপ্য

২ রতি	=	১ মাষা		
৩২ "	=	১৬ "	= ১ ধরণ অথবা পুরাণ	
৩২০ "	=	১৬০ "	= ১০ "	= ১ শতমান

সুবর্ণ

৫ রতি	=	১ মাষা	
৮০ "	=	১৬ "	= ১ সুবর্ণ
৩২০ "	=	৬৪ "	= ৪ "
			= ১ পল বা নিষ্ক
৩২০০ "	=	৬৪০ "	= ৪০ সুবর্ণ
			= ১০ পল = ১ ধরণ

তাম্র

৮০ রতি	=	১ কার্ষাপণ

দ্বিতীয় তালিকা

৮ ত্রসরেণু	=	১ লিক্ষা	
২৪ "	=	৩ "	= ১ রাজসর্ষপ
৭২ "	=	৯ "	= ৩ "
			= ১ গৌড় সর্ষপ
৪৩২ "	=	৫৪ "	= ১৮ " = ৬ "
			= ১ যব
১২৯৬ "	=	১৬২ "	= ৫৪ "
			= ১৮ গৌড়সর্ষপ
			= ৩ যব
			= ১ কৃষ্ণল বা রতি।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতবাসিগণ এই সময়ে যে সভ্যতা-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, বহুশতাব্দী পরেও অনেক জাতি সেরূপ সভ্যতা লাভ করেন নাই।

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

যখন ইন্দ্র আসিয়া পৌঁছিল, তখনও অমলের আসিতে অনেক দেরী। আজকাল ইন্দ্র চেষ্টা করিয়া এমনি সময়েই আসিত। খুব যে ভাবিয়া-চিন্তিয়া চেষ্টা করিত, তাহা নহে—তার চেষ্টাটা প্রায় অর্দ্ধসবুদ্ধ। আসিয়া সে টেনিস খেলিত। তার পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা সেই লনে বসিয়া আলাপ করিত। আলাপ এমন বেশী কিছু নয়। বেশীর ভাগই সরযুর কথা,—ইন্দ্রনাথের সরযুকে সম্পূর্ণ ভাবে ভালবাসিবার চেষ্টার কথা,—মনোরমার কথা,—এই সব। কিন্তু সন্ধ্যার এই নির্জ্জন শান্তিতে বসিয়া আলাপটা ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত উপভোগ করিত; এবং ঐ সময়টির জন্য সারাদিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

আজও তাহারা টেনিস খেলিল। খেলার পর তাহারা দক্ষিণের নিভৃত বারান্দায় বসিয়া মৃদুস্বরে আলাপ করিতে লাগিল।

ইন্দ্র বলিল, "অনীতা, তুমি বিয়ে ক'রবে না?"

একটু অপেক্ষা করিয়া অনীতা বলিল, "বোধ হয় সে আমার ভাগ্যে নাই।"

"কেন?"

"মনের মত বর কই?"

"কেন, টম ত উপযুক্ত পাত্র,—আর সে তোমায় কত ভালবাসে।"

অনীতার মুখে একটা তীব্র বেদনার ছায়াপাত হইল,—ইন্দ্র সেটা লক্ষ্য করিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল, "আপনাকে বলেছি তো আমি, যে, মেয়েমানুষ, অন্ততঃ বাঙ্গালী মেয়েমানুষ, স্বামী বলে' যাকে বরণ করতে চায়, তাকে তার নিজের চেয়ে অনেকটা বড় দেখতে চায়। এমন একজন চাই, যার উপর নির্ভর করা যাবে, যাকে ভক্তি ক'রতে পারবে। টম খুব ভাল বন্ধু হ'তে পারে; কিন্তু আমি তাকে স্বামী ব'লে শ্রদ্ধা ক'রতে পারি না।"

ইন্দ্র। তোমার এ অন্যায়। প্রথমতঃ, তোমার এ কথা ঠিক নয় যে, স্বামী বড় বা শ্রেষ্ঠ না হ'লে বিবাহে নারী তৃপ্ত হয় না। সে রকম মিলন, যাতে একদিকে আছে আধিপত্য, আর একদিকে আছে আত্মসমর্পণ, তাতে সুখ যে খুব বেশী হয় না, সে তো আমার দৃষ্টান্তেই দেখতে পাচ্ছ। তা ছাড়া, আর একটা কথা ভেবে দেখ;—টম তোমাকে পাগলের মত ভালবাসে। তুমি যদি তা'কে বিয়ে ক'রতে অস্বীকার কর,—এত দিন অপেক্ষা করবার পর,—তবে সে বেচারার বুক ভেঙ্গে যাবে। তুমি কি এত নিষ্ঠুর হ'বে অনীতা? তার উপর একটু দয়া করবে না?

অনীতার বুক ফুলিয়া উঠিল, চোখ চক্‌চকে হইল, নাসিকা স্ফীত হইল। সে খানিকক্ষণ পীড়িত, নীরব দৃষ্টিতে

মাটীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। অনীতা নীরব রহিল।

ইন্দ্রনাথ একাগ্র চিত্তে তাহার মুখের দিকে উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল।—অন্ধকারে তাহার মুখের বিকৃতি ইন্দ্রের নজরে পড়িল না।

কিছুক্ষণ পরে সে পুনরায় বলিল, "তবে কি লিওলেকে বলবো আমি, যে, তুমি ভাববার জন্য সময় চাও।"

অনীতা গভীর ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলিল "না।"

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তাকে বলবো, তার আশা আছে?"

অনীতা শুধু বলিল, "না!"

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে বলিল, "অনীতা, কথাটা তোমার সঙ্গে আমি বিচার ক'র্‌তে চাই।—টম কিসে তোমার অযোগ্য বল। সে ইংরেজ সত্য, কিন্তু এতদিন তার সঙ্গে আলাপ করে' এত পরীক্ষার পরও কি তুমি বুঝতে পার নি যে, তার ভালবাসা তাকে সমস্ত জাতীয়তার অন্তরায় পার ক'রে এনে, তোমার পদপ্রান্তে ফেলেছে। সে যে তোমায় কত ভালবাসে, জান কি?"

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া অনীতা বলিল, "ভালবাসলেই কি ভালবাসার জিনিষ পাওয়া যায়! আমি তো দেখি, যতই ভালবাসি, ততই সেই স্নেহাস্পদ দুর্লভ হয়ে উঠে। কে জানে, এই বুঝি ভালবাসার নিকষমণি—ভালবাসার পরীক্ষা।"

পোড়া চোখের জল ঠিক এই সময়েই অনীতার সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাসাইয়া দিল। আত্ম-সংবরণ করিতে না পারিয়া, অনীতা ছুটিয়া বাথরুমের ভিতর লুকাইল। সেখানে অনেকক্ষণ কাঁদিয়া, শান্ত হইয়া সে হাত মুখ ধুইয়া আসিল।

ইন্দ্রনাথ অবাক হইয়া গেল। এতক্ষণে তার খেয়াল হইল যে, সে না জানিয়া অনীতার কোমল অন্তরে কঠিন আঘাত করিয়াছে। অনীতার অশ্রু যেন তাহার বুকের ভিতর ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। সে দাঁতে আঙ্গুল কাটিতে-কাটিতে খুব দ্রুতবেগে পায়চারি করিতে লাগিল।

অনীতা বাহির হইয়া আসিলে, ইন্দ্রনাথ তাহার কাছে গিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "অনীতা, আমাকে ক্ষমা কর।"

অনীতা এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তে তার সমস্ত মুখ ফেকাসে হইয়া গেল। ইন্দ্রনাথ বলিল, "আমি না জেনে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, ক্ষমা কর।"

অনীতা ব্যাকুল হইয়া ইন্দ্রনাথের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ক্ষমা কিসের? তোমাকে আমি ক্ষমা করবো, আমার এত কি যোগ্যতা আছে? তুমি আমার কাছে ভিক্ষা ক'রছো?—তুমি?"

ইন্দ্রনাথ এই স্পর্শে আত্মহারা হইল, অনীতা সম্বিৎ হারাইল। দুজনেরই প্রতি অঙ্গ একটা ভীষণ কম্পনে অস্থির হইয়া উঠিল। অনীতা স্থির দৃষ্টিতে ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—মুখ ফিরাইতে পারিল না;—একটা কিসের নেশায় তাহাকে পাইয়া বসিল!

অনেকক্ষণ তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! চোখের ভিতর দিয়া তাদের মনের সব গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া গেল। অনীতার বুকের ভিতরকার তরঙ্গিত প্রেমের পাথার ইন্দ্রনাথের চোখের সামনে উলঙ্গ হইয়া নাচিয়া উঠিল। অনীতাও ইন্দ্রনাথের চোখের ভিতর দিয়া তাহার প্রেমের তাণ্ডবলীলা দেখিতে পাইল। দুজনের ভিতর এতদিনকার যে পর্দ্দা ছিল, সেটা একেবারে খসিয়া পড়িল।

ইন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতর প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একটা তাল পাকাইয়া দিল; আর বিচার-বিবেচনার অবসর রহিল না। সেই মধুর সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অন্ধকারে তারা যেন দুটী সঙ্গীশূন্য আত্মার মত অনন্ত শূন্যের পথে ভাসিয়া চলিল;—বিশ্বে যেন আর কেউ নাই, কিছুই নাই,—শুধু দুটী প্রেমিক আত্মা তাদের চিরদিনের আলিঙ্গনে বাঁধা রহিয়াছে। অতীত যেন কখনও ছিল না, ভবিষ্যৎ যেন একটা মূর্খের কল্পনা;—একমাত্র সত্য যেন এক অনন্ত বর্ত্তমান।

যখন ইন্দ্রনাথ আবার সম্বিৎ লাভ করিল, তখন অনীতা তার বুকের কাছে লতাইয়া আসিয়াছে; ইন্দ্রের হাতখানা সে বুকের ভিতর জোরে চাপিয়া ধরিয়াছে; তার ভিতর দিয়া তার হৃদয়ের মত্ত নর্ত্তন তাড়িত-প্রবাহে ইন্দ্রের বুকের ভিতর ঠেকিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বলিতেছিল,—তার একটা ক্ষুদ্র রশ্মি আসিয়া অনীতার উদ্বেলিত বক্ষের উপর একটা আগুনের ঝলক দিয়া দিয়াছিল; আর তার

উত্তেজিত মুগ্ধ চক্ষের উপর একটা পাগল আলো ফুটাইয়া তুলিয়াছিল—তা' ছাড়া সেখানে সবই অন্ধকার।

সম্বিৎ লাভ করিয়া ইন্দ্রনাথ সরিয়া দাঁড়াইল,—ধীরে-ধীরে সেই লতার মত দেহখানি বুক হইতে ছিড়িয়া তফাৎ করিল। অনীতার হাতের কঠিন-মধুর বন্ধন হইতে হাতখানা ছাড়াইতে পারিল না। কিন্তু একখানা চেয়ারের পিঠ ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—"অনীতা।"

অনীতা তখন দুই হাতে ইন্দ্রনাথের হাতখানা মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতেছিল।

এ প্রিয় সম্বোধন সে অস্বীকার করিতে পারিল না। সে কান্না চাপিয়া অশ্রুপ্লাবিত বিস্রস্ত-কেশ-পরিবৃত অপরূপ সুন্দর মুখখানা তুলিয়া ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিল। ইন্দ্রনাথ চেয়ারের পিঠটা ধরিয়া ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তার মত্ত কল্পনায় যে প্রিয় মুহূর্ত্তের কত ছবি সে আঁকিয়াছে, সে মুহূর্ত্ত এখন আসিয়াছে! কিন্তু ইহার বিকট নগ্নতায় তাহার অন্তরাত্মা ভয়চকিত হইয়া উঠিয়াছে। সে কাঁপিতে-কাঁপিতে বলিল, "অনীতা, তুমি শান্ত হও, আমি যাই।"

অনীতা চক্ষু মুছিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, "যেয়ো না, একটু বসো। তোমায়-আমায় এই শেষ দেখা। আর আমি তোমার পথের সাম্‌নে আসবো না। যে কথা জন্মে কখনো প্রকাশ হ'বে না ভেবেছিলাম, আজ সেই কথা প্রকাশ হয়েছে। আমার সমস্ত সুখ-সৌভাগ্য আমি নিজের হাতে চুরমার করে ফেল্লাম। আর তোমায় দেখতে পাব না, —তোমার কথা শুনতে পাব না। কিন্তু আজ একটু বস।"

ইন্দ্রনাথ খুব খাড়া হইয়া তার চেয়ারের একেবারে ধারে বসিয়া পড়িল। অনীতা বলিল, "যখন কথাটা বলেই ফেলেছি, তখন আর দুটো কথা বলি। কতদিন ধরে আমি কার মূর্ত্তি নীরবে ধ্যান করছি জানো? বিলেতে গিয়ে কোনও দিন কোনও পুরুষকে দেখে মুগ্ধ হইনি কেন জান? তোমার ঐ বিশাল, মহান মূর্ত্তি আমার চক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে, আর সমস্ত জগৎটাকে আড়াল করে দিয়েছিল। ফিরে এসে যেদিন তোমাকে ফের দেখলাম, সেই দিন থেকে আমি গোপনে চিন্তায়, স্বপ্নে কেবল কাকে দেখেছি জান? সে তুমি। তোমার মত এতবড় একটা মানুষ কাউকে দেখলাম না বলেই, আমি বিয়ে ক'রতে পারলাম না। আমি তো তোমার কাছে কিছুই চাই নি। শুধু চেয়েছিলাম তোমায় দেখতে, তোমার পাশে-পাশে থাকতে, তোমাকে সেবা ক'রতে, সাহায্য ক'রতে।—কেন তুমি এমন ভাবে আমার সামনে এসে আমার সব সুখ চুরমার করে দিলে? তাই হ'ক,—ভগবানের যা ইচ্ছা, তাই হ'ক। কাল থেকে আমি তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা হ'ব—তোমার দৃষ্টির অন্তরালে, বহুদূরে গিয়ে আমি দিন কাটাব। কিন্তু আমার এ দুঃখের জীবন কাটাবার মত একটা কিছু সম্বল আমায় দেবে না কি?—একবার, শুধু একবার আমায় বল, তুমিও আমায় ভালবাস!"

স্তম্ভিত ইন্দ্র আর নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; দাঁড়াইয়া উঠিয়া বহু কষ্টে সে এই কটা কথা বাহির করিয়া বলিল, "এমন কথা আমি ব'লতে পারি না।"

সে যাইতে প্রস্তুত হইল। মূর্ত্তিমতী ক্ষুধিতা বাসনার মত অনীতা লাফাইয়া উঠিল। আবার ইন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি এত নিঠুর! আমার এই মরুভূমির মত জীবন দেখে, তোমার এক ফোঁটা দয়া হ'ল না। আমার চির-জীবনের সামান্য একটা সম্বল তুমি দিতে পারলে না। কিন্তু আমি কি ক'রবো—ওঃ!" বলিয়া ইন্দ্রের হাত মুখের কাছে লইয়া, তাহাতে দুটি চুম্বন দিয়া, বুকের ভিতর সে হাত চাপিয়া ধরিল!

"ইন্দ্রনাথ!" বজ্র নির্ঘোষে অমল ডাকিয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথ ও অনীতা দুই জনেরই মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

অমল তাহাদের কথাবার্ত্তা কিছুই শুনিতে পায় নাই। ইন্দ্রের পিছনদিককার দরজা দিয়া এ বারান্দায় বাহির হইয়াই শুনিতে পাইল একটা চুম্বনের শব্দ, আর দেখিতে পাইল অনীতার বুকের কাছে ইন্দ্রের হাত। সমস্ত শরীর দিয়া তার একটা তীব্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল,—সে ডাকিল, "ইন্দ্রনাথ!"

ইন্দ্রনাথ ভয়চকিত মুখ তাহার দিকে ফিরাইতেই, অমল বলিল, "আমার সঙ্গে এস।" বাড়ীর ফটকের কাছে গিয়া সে হঠাৎ থামিয়া যাইতে, ইন্দ্রনাথ তার হাতের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িল। অমল আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া প্রবল বেগে গলা ধাক্কা দিয়া, সে ইন্দ্রকে ফটকের বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "বেরো শূয়োর! ফের যদি আমি তোর মুখে দেখতে

পাই, তবে তোকে কুকুরের মত মেরে ফেলবো। সাবধান!"

ইন্দ্রনাথ হুমড়ি খাইয়া পড়িল। সে উঠিয়া গা ঝাড়িতে-ঝাড়িতে বলিল, "আমার একটা কথাও কি শুনবে না?"

"আমার কথা!" সিংহের মত অমল গর্জ্জিয়া উঠিল; তার পর বলিল "কি কথা?"

ইন্দ্র তৎক্ষণে আত্মস্থ হইয়া মনে করিল, সর্ব্বনাশ! সে কি করিতেছে? ছি!

সে বলিল, "না, কোনও কথা নেই।" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া সে চলিয়া গেল। তার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল;—সে কি যে ভাবিল, তাহা নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝিল না।

অনীতা তৎক্ষণে কম্পিত পদে, শঙ্কিত হৃদয়ে ইহাদের পিছু-পিছু ফটকের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—সে ইন্দ্রের শেষ কথা শুনিতে পাইল! সে কথা শুনিয়া তার বুক ভাঙ্গিয়া কান্না পাইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আছে বৈ কি কথা। বল তুমি, বলে যাও। আমার জন্য তুমি এতবড় মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা মাথা পেতে নিও না।"

পশ্চাতে অনীতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া পলাইল। অমল ঘুরিয়া দাঁড়াইল, ক্রোধে অন্ধ হইয়া সে অনীতার কথা শুনিতেই পাইল না। সে গম্ভীর কাতর তিরস্কারের স্বরে ডাকিল, "অনীতা!"

অনীতা একেবারে ভাঙ্গিয়া নুইয়া পড়িল। সেই পথের ধূলার উপর বসিয়া পড়িয়া সে বলিল, "দাদা, কি ক'রলে তুমি? কাকে তাড়ালে? দেবতাকে বিদায় করে তুমি পাপকেই"—

"অনীতা, ঐ পাপিষ্ঠের প্রসঙ্গও আমি তোমার কাছে শুনতে চাই না—কোনও কথাই শুনতে চাই না। তুমি ওঠ, ঘরে যাও।"

অনীতা দলিতা ফণিনীর মত উঠিয়া দাঁড়াইল। নীরবে সে গাড়ী-বারান্দার তলায় আসিয়া বেয়ারাকে মোটর তৈয়ার করিতে হুকুম দিল। অমল ছুটিয়া উপরে তার ড্রেসিংরুমে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়াছিল,—সে এ কথা শুনিতে পাইল না।

কিছুক্ষণ পর মোটরের ভেঁপু শুনিয়া, অমল বাহির হইয়া দেখিল, অনীতা মোটরে উঠিতেছে। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া তার কাছে আসিয়া বলিল, "কোথা যাচ্ছ?"

অনীতা বলিল, "সে কথায় তোমার কাজ কি? আমি তোমার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই।"

অমলও সমান রাগে বলিল, "আচ্ছা যাও, কিন্তু জেনো যে, এ বাড়ীতে আর তুমি ফিরতে পাচ্ছো না।"

"বহুত আচ্ছা!" বলিয়া সে বেগে মোটরের জানালার কাঁচ উঠাইয়া দিয়া শোফারকে চালাইতে বলিল। মোটর ভোঁ ভোঁ শব্দে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

অমল মাথায় হাত দিয়া সেখানেই একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

আমাদের নাট্যশাস্ত্র

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ

৩

সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, রামায়ণ ও সংহিতায় চিত্র-ব্যবসায়ী জাতির উল্লেখ আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ত্রিংশ অধ্যায়ের বৈশ্যগণ যে চিত্রকর ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। রামায়ণে চিত্রপটে সুশোভিত গৃহাদির যথেষ্ট বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডব সভায় চিত্রপট বিলম্বিত ছিল, এরূপ কথা মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ও হরিবংশে চিত্রের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীন চিত্রশিল্পের নিদর্শন অজন্তার

গুহায় আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া, পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। সুতরাং রঙ্গভূমিতে চিত্রিত পট প্রদর্শন করিবার প্রয়োজনীয়তা সেকালে অনুভূত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, এরূপ কথা বলা চলে না।

ইতিপূর্ব্বেই যে পুস্তনেপথ্যলিপির কথা কহিয়াছি, তাহা তিনভাগে বিভক্ত ছিল; যথা—সন্ধিমা, ভঙ্গিমা ও চেষ্টিমা। বস্ত্র বা পটাদি দ্বারা যে দৃশ্য লিখিত হইত, তাহাই সন্ধিমা নামে পরিচিত ছিল। দৃশ্য-বস্ত্রঘটিত হইলে, তাহাকে ভঙ্গিমা বলিত। যে দৃশ্য চেষ্টমান বা গতিশীল, তাহাকে চেষ্টিমা বলা হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একালের রঙ্গালয় এ বিষয়ে ভারত-নাট্যশালাকে ছাড়াইয়া অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে য়ুরোপে অনুরঞ্জন বা অঙ্গরচনা করিবার রীতি জানা ছিল না। য়ুরোপীয় নাট্যমন্দির চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পর জন্মলাভ করিয়াছে। সুতরাং য়ুরোপীয় নাট্যরঙ্গের বহুপূর্ব্বেই ভারতের নাট্যাচার্য্য জানিতেন যে, রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইলে, অঙ্গরচনার প্রয়োজন হয়। সেই জন্যই তিনি তাহার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীসে একজন কবি ছিলেন—তাঁহার নাম থেস্‌পিস্‌। তিনি কতকগুলি নট সঙ্গে লইয়া প্রথম-প্রথম নগরে-নগরে অভিনয় করিয়া বেড়াইতেন। তখন পর্য্যন্ত য়ুরোপে আধুনিক কালের ন্যায় সুগঠিত নাট্যশালা ছিল না। কিন্তু ভারতের আচার্য্যগণ তাহার বহুপূর্ব্বেই নাট্যগৃহ রচনা করিয়াছিলেন। নাট্যমণ্ডপের আকার কিরূপ হইবে, তাহারও বিষয় সেকালে লিখিত হইয়াছিল—

চতুঃষষ্টি করান্ কুর্য্যাৎ দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্।
দ্বাবিংশতিংচ বিস্তারান্মর্ত্যানাং যো ভবেদিহ॥ ইত্যাদি

যাহা হউক, এটিকার কবি থেস্‌পিস্‌ প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, নটদিগের বদনমণ্ডল উপযুক্তরূপে রঞ্জিত হইলে, দর্শকের প্রীতি বিধান করে। য়ুরোপীয় নাট্য-জগতে অনুরঞ্জন প্রথার ইহাই প্রথম প্রবর্ত্তন! আর দেখুন, সেই অতি সুপ্রাচীন কালেই ঋষি ভরত বলিয়াছিলেন—

বর্ত্তনাং তু বিধিং জ্ঞাত্বা তথা প্রকৃতি মেবচ
কুর্য্যাদঙ্গ রচনাং—

শুধু ইহাই নহে—সেই অঙ্গ-রচনা কিরূপ হইতে হইবে? না—দেশ, জাতি বয়ঃ প্রিতাম্। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে অভিনয়ে সাফল্য লাভ হইতে পারে না। কেন?

যে যেন ভাবোনাদ্দিষ্টঃ সুখদেনেতরেণ বা।
সতদাহিত সংস্কারঃ সর্ব্বং পশ্যতি তন্ময়ম্॥

"সর্ব্বং পশ্যতি তন্ময়মং"—ইহাই সৌষ্ঠবসম্পন্ন অভিনয়ের মূল মন্ত্র। সেই তন্ময়ত্ব কিরূপ হওয়া চাই? না—

যথা জন্তুঃ স্বভাবত্বং পরিত্যজ্যান্যং দৈহিকম্।
তৎ স্বভাবং হি ভজতে দেহান্তরমুপাশ্রিতঃ॥

জীবাত্মা যখন দেহান্তর পরিভ্রমণ করে, তখন যেমন আশ্রিত দেহেরই আকৃতি, প্রকৃতি, চিন্তা, কার্য্য প্রভৃতি পরিগ্রহ করে, তদ্রূপ তন্ময়ত্ব লাভ করা চাই—ইহাই নাট্যশাস্ত্রের নির্দ্দেশ। সেই অতীত কালের নির্দ্দেশের প্রতিধ্বনি আজ আমরা হার্বার্ট বারভূমট্রী প্রমুখ সুবিখ্যাত নটের মুখে শুনিতে পাইতেছি। 'How to make up' নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন—

I should lay it down, in fact, the chief thing is, that an actor should imagine himself to be the *character* and the audience will imagine that he is the character; that is the real art of make up I should say.

সেক্ষপীয়রের Richard III সমালোচনাকালে একজন দক্ষ সমালোচক বলিয়াছেন—

Our highest conception of an actor is that he shall assume the character once for all and be it throughout, and trust to this conscious sympathy for the effect produced.

আজ যাহা শুনিতেছি, রামায়ণের সমকালে ঋষি ভরতের মুখে আমরা তাহাই শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন—

এবং বুধঃ পরং ভাবং সোঽস্মীতি মনসা স্মরন্।
বেশ বাগঙ্গ লীলাভিসেচষ্টাভিসাং সমাচরেৎ॥

অভিনেতা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, বেশে, বাক্যে, বয়সে, আকারে, চিত্তবিকারে তাঁহাকে তাহাই হইতে হইবে; তিনি ইহাই মনে করিবেন যে, আমিই সেই। ইহারই নাম অভিনয়ে তন্ময়ত্ব। যখন যে ভূমিকা গ্রহণ করিব, তখন তাহাতেই মজিব, তাহাতেই ভুলিব; সেই অভিনেয় চরিত্রের চিত্তগত দুঃখ-হর্ষাদি আমার নিজের করিব। নটচূড়ামণি

ভরত তাই বলিয়াছেন—"নাট্য সত্বে প্রতিষ্ঠিতম্।" সত্ব কি? সুখ দুঃখাদিজনিত অন্তঃকার্য্যকে সত্ব বলে। এগুলি মানসিক বিকার মাত্র। অভিনেতাকে মনে করিতে হইবে যে, তিনি পরদেহে সমাশ্রিত হইয়া, তাহারই সর্ব্ব সত্বা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এ যুগের একজন রঙ্গ-পণ্ডিত বলিয়াছেন—

The speakers who endeavour to weep never can thoroughly feel what they say; for, when it is the soul that speaks, tears require no intermediate assistance to make them flow. If they are affected, the cheat is easily discovered and the effect they have is either none at all or very bad; but if they are natural, they touch the heart and steal the good wishes of the spectators.

শুধু ভান করিয়া কে কবে কোন্ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে? কার্য্যের ভান করিয়া কে কবে কর্ম্মী হইয়াছে, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া কে কবে ধার্ম্মিক হইয়াছে, প্রেমের ভান করিয়া কে কবে প্রেমিক হইয়াছে? তাই ভরত নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"সুখংচ প্রহর্ষাত্মকং তৎকথং দুঃখিতেন অভিনয়েৎ।"

চিত্র বল, শিল্প বল, স্থাপত্য বল, ভাস্কর্য্য বল, গীত বল, অভিনয় বল, দেখা যাইতেছে, সহানুভূতিই তাহাদের প্রাণ। যে শিল্পী সম্রাট্ সাজাহানের অশ্রুরাশি লইয়া মর্ম্মরে প্রেমের মন্দির রচনার পরিকল্পনা করিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই সম্রাটের ব্যথিত হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যে ভাস্কর আনন্দমঠের সেই বিরাট শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী, কৌস্তভ-শোভিত-হৃদয় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি গড়িয়াছিল—তাহার হৃদয়ে ভক্তি ছিল, সে ধ্যানকে ধারণা করিয়াছিল। ব্রহ্মচারী যখন অন্ধকার-সমাচ্ছন্না, হৃতসর্ব্বস্বা, নগ্নিকা, খেটক-খর্পরধারিণী, কঙ্কাল-মালিনী কালীমূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—'এই দেখ, মা যা হইয়াছেন'—তখন তাঁহার হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

এই ভাবের স্থান নরচিত্তে। হৃদয়ের তার যখন যেরূপে বাজিয়া উঠে, তখন মানুষকে তদ্রূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়। যে চন্দ্রশেখর একদিন শৈবলিনীকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি!... এই ক্লেশ-সঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া, রমণীমুখপদ্ম কি জন্মের সারভূত করিব? ছি ছি! তাহা পারিব না!" সেই চন্দ্রশেখর যেদিন দেখিলেন, শৈবলিনী পাগলিনী, তাঁহাকেও চিনিতে পারিতেছে না, তাঁহারই কণ্ঠলগ্ন হইয়া রোদন করিতেছে, নয়ন সলিলে নিজের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত করিতেছে—সেই দিন চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদিয়াছিলেন।" যে সুন্দরী একদিন গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনীকে বলিয়াছিল, "ভরসা করি, শীঘ্র তুমি মরিবে। দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়। ঝড়ে হোক্, তুফানে হোক্, নৌকা ডুবিয়া হোক্—মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।" সেই সুন্দরী যখন বেদগ্রামে উন্মাদিনী শৈবলিনীকে দেখিল, তখন তাহার চক্ষু "প্রথমে চক্চকে হইল, তার পর পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল। শেষে জলবিন্দু ঝরিল।" যে কবি গাহিয়াছিলেন,—"জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল"—তিনি শ্রীরাধিকার বিপুল প্রেম নিজের হৃদয়ে-হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন। এই কারণেই ভারতের নাট্যাচার্য্য পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছেন—নাট্য সত্বে প্রতিষ্ঠিত।

এই সত্ব বা সুখ-দুঃখাদিজনিত অন্তঃকাব্য কাহার? উহা অভিনেতার নিজের নহে—অভিনেয় চরিত্রের। অভিনেতা তখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, যখন তিনি সেই অভিনেয় চরিত্রের চিত্তগত দুঃখ-হর্ষাদি ভাবনায় নিজের চিত্তকে একান্ত অনুকূল করিতে পারেন—তাহার দুঃখ-হর্ষাদি সর্ব্বপ্রকারে নিজের করিতে পারেন। ইহারই নাম ভরত কথিত সাত্বিকাভিনয়;—অভিনয় ব্যাপারের ইহাই চতুর্থ বিভাগ। তাহার মূল সূত্র—

"সর্ব্বং পশ্যতি তন্ময়ম্" সুতরাং—

সত্বাতিরিক্তোঽভিনয়ো জ্যেষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে।
সমসত্বোভবেন্মধ্যঃ সত্বহীনোঽধমঃ স্মৃতঃ॥

বিশেষ সাধনা ভিন্ন এই তন্ময়ত্বে সিদ্ধিলাভ ঘটিবার যে সম্ভাবনা নাই, তাহা প্রাচীন কালের ঋষিগণ বিশেষ রূপে বুঝিতেন। একালের নাট্যাচার্য্যগণও বুঝিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—

It taxes several years for a shoe-mender

or a tailor to become a master of his craft, yet almost every one who goes on the stage imagines that he can play Hamlet at once, without having served his apprenticeship to his art. But no art requires more mental study and constant practice than acting.

নাট্যাচার্য্য ভরত বলিতেছেন - সিদ্ধি দুই প্রকার, দৈবী ও মানুষী।

সিদ্ধিস্তু দ্বিবিধা প্রোক্তা মানুষী দৈবিকী তথা।
বাঙ্মনঃ কায়াসম্ভূতা নানা ভাব রসাশ্রয়া॥"

এই কারণেই সকল সময়ে সকল দেশে, আর্ভিং, বারভূমট্রি, অমৃত বসু বা গিরিশ ঘোষ জন্মে না।

"মনুষ্যের কার্য্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনা দ্বারা সৌন্দর্য্যের সৃজন কাব্যের উদ্দেশ্য।" অভিনেতা অভিনয়কুশলতায় সেই সকল সৌন্দর্য্য দর্শকের নয়ন সমক্ষে আনয়ন করেন। দর্শক তখনই কবির ও অভিনীত কাব্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন বা কাব্যের রস উপভোগ করেন। কিরূপে ইহা ঘটে বুঝিতে হইলে, 'ভাব' কাহাকে বলে তাহাই অগ্রে জানিতে হয়।

ইংরাজ পণ্ডিতগণ বলেন, ভাব কতকগুলি conditions of the mind or body which are followed by a corresponding expressions in those who feel or are supposed to feel them, and a corresponding impression on those who behold them."

অভিনেয় চরিত্রে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া অভিনেতা মুখ্য কাব্যার্থ প্রকাশের জন্য কণ্ঠস্বরের সাহায্যে বাক্যগুলির আবৃত্তি করেন। সেই আবৃত্তি শ্রবণে এবং আবৃত্তির সহচর বিবিধ প্রকারের অঙ্গলীলা ও বেশাদি দর্শনে শ্রোতার হৃদয়ে কাব্যের অর্থ উদিত হইয়া যেরূপে তাহার চিত্তকে আবিষ্ট করে, তাহাই নাট্যাচার্য্য ভরত-কথিত ভাব।

প্রবীর মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

দাও মাগো, সন্তানে বিদায়,
চলে' যাই লোকালয় ত্যজি।
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়—
আদেশ পিতার ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে
... ...
ক্ষত্রিয় সন্তান, অপমান কেন স'ব?

পিতা আদেশ করিয়াছেন, অর্জ্জুনের অশ্ব প্রত্যর্পণ কর। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহা অপমানজনক। প্রবীর কি ঐই রুষ্ট হইয়া মাতার নিকট রোষ প্রকাশ করিতেছেন? না, অশ্বপ্রত্যর্পণ করিলে অপমানিত হইতে হইবে বলিয়া শোক করিতেছেন, কিম্বা পিতার অপ্রিয় ও অসঙ্গত আদেশের জন্য ক্ষুব্ধচিত্তে মনস্তাপ প্রকাশ করিতেছেন? প্রথমে দেখিতে হইবে—কবির মনোগত ভাব কি।

পুত্রের কথার উত্তরে জনা বলিলেন—

বৎস ত্যজ মনস্তাপ।
... ...
আমি বুঝাইব ভূপে।

দেখা গেল, কবি বলিতেছেন, প্রবীরের মনস্তাপ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার ক্রোধ বা শোক উপস্থিত হয় নাই।

রাবণ দূতকে কহিলেন—

নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিলা সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

রাবণ অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছেন, কেন না যে বীরবাহুর নিকট দেবতারাও পরাজিত, তাঁহাকে কি না শেষে একটা ভিখারী রাঘবে বধ করিল? সুতরাং অভিনেতাকে এস্থলে শ্রোতার হৃদয়ে বিস্ময়ের ভাব আনিতে হইবে।

প্রমীলা বাসন্তীর গলা ধরিয়া কাঁদিয়া কহিতেছেন—

ওই দেখ আইল লো তিমির যামিনী
কাল-ভুজঙ্গরূপে দংশিতে আমারে
বাসন্তি! কোথায় সখি, রক্ষঃকুলপতি
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তিকালে—
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি,
তুমি যদি পার সই, কহ লো আমারে।

প্রাণকান্তের অদর্শনে প্রমীলা বিরহবিধুরা। তাঁহাকে হিয়ার নিকটে পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা জাগিয়াছে—ইহা প্রকাশ করাই কবির উদ্দেশ্য। অভিনেতাকেও সেইজন্য রতির ভাব অভিনয় করিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আগে নিজে ভাবাবিষ্ট হইয়া, তবে অভিনয়-কৌশলে শ্রোতাকে ভাবাবিষ্ট করা যায়। ভরত তাই বলিতেছেন—আত্মাভিনয়নং ভাবঃ, বিভাব পরদর্শনম্। এই ভাব প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—স্থায়ী এবং সঞ্চারী। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থায়ী ভাবকে মনের permanent conditions বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থায়ী ভাবকে রস বলে—স্থায়ীভাবো রসস্মৃতঃ। রস হৃদয়ে অনুভব করিবার বিষয়। ভগবানের সত্তা যেমন হৃদয়ে অনুভব করিতে হয়, ইহাও তেমনি। তাই ভরত বলেন, রস "ব্রহ্মস্বাদ সহোদরঃ।"

বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদা কাঁদিতে-কাঁদিতে দশাননকে কহিলেন—

কিন্তু ভেবে দেখ নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে
কোন্ লোভে কহ রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব?

... ...

কে কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজকর্ম্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।

চিত্রাঙ্গদা এইরূপে মনস্তাপ প্রকাশ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলে পর, রাবণ বলিতে লাগিলেন—

এতদিনে (কহিলা ভূপতি)
বীরশূন্য লঙ্কা মম। এ কাল সমরে
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুল মণি!
অরাবণ, অরাম, বা হবে ভব আজি।

চিত্রাঙ্গদার বাক্যে পুত্র-শোকাতুরার কাতর মর্ম্মোচ্ছ্বাস আছে,—রাবণের জন্যই যে সে তাহার বীর পুত্রকে অকারণ হারাইয়াছে, এজন্য তীব্র অনুযোগ আছে। চিত্রাঙ্গদার অভিনয় শুনিয়া শ্রোতার হৃদয়ে সেই সকল ভাব উদিত হইতে লাগিল। রাবণ যখন বলিলেন, হায় হায়, লঙ্কার মান যায়—লঙ্কা যে বীরশূন্য হইল—সাজ সাজ, সকলে যুদ্ধে চল—তখন শ্রোতার হৃদয়ে কোন্ ভাব আসিল? কবি নিজেই তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।—

এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
... ... সে ভৈরব রবে
গর্জ্জিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীর মদে মাতি
দেবদৈত্য নরত্রাস।

তখন সৌধকিরীটিনী কনকলঙ্কা বীরপদভরে কম্পিত হইয়া উঠিল—উৎসাহে সকল প্রাণ নৃত্য করিতে লাগিল—সকলে আসন্ন সমরের জন্য বীরমদে মত্ত হইল। কোথায় বা রহিল চিত্রাঙ্গদার শোক, কোথায় বা রহিল রাবণের ক্ষোভ। সকল ভাসিয়া গিয়া রহিল শুধু—সাজ সাজ, চল—যুদ্ধে চল। উৎসাহরূপ চিত্তবৃত্তি তখন প্রবলা হইয়া সকলকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিল। ইহারই নাম স্থায়ী ভাব।

পণ্ডিতবর উইল্‌সন সাহেব বলিয়াছেন—

The *Rasas*, however, are considered usually as effects, not causes and they are said to come from the *Bhavas*, conditions of the mind or body which are followed by a corresponding impression on those who behold them. When these conditions are of a permanent or perdurable description and produce a lasting or general impressien, which is not disturbed by the influence of collateral or contrary excitements, they are, in fact, the same with the impressions.......when the conditions are incidental and transitory, they contribute to the general impression, but are not confounded with it.

জগৎসিংহ কারামুক্ত হইবার কিছুদিন পরে এক দিবস অপরাহ্নে "সহচর সমভিব্যাহারে পাঠানদুর্গে ওসমান প্রভৃতির নিকট বিদায় লইতে গমন করিলেন।" প্রত্যাগমনের সময়ে দুর্গদ্বারে ওসমানের সহিত তাঁহার

সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি একাকী তাঁহার সহিত গমন করিয়া এক নিবিড় শালবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন, সমাধি খাত ও চিতাসজ্জা উভয়ই প্রস্তুত। জগৎসিংহ কহিলেন—"আপনার কি অভিপ্রায় ?"

ওসমান কহিলেন—"সশস্ত্র আছ, আমার সহিত যুদ্ধ কর। সাধ্য হয়, আমাকে বধ করিয়া আপনার পথ মুক্ত কর। নচেৎ, আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া আমার পথ ছাড়িয়া যাও।"

তখন উভয়ে ভীষণ অসিযুদ্ধ হইল। ওসমানের হৃদয়ে তখন কোন ভাব আবির্ভূত হইয়াছিল ? যুদ্ধের জন্য উৎসাহের কি ? না, উহা আয়েসার প্রেম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আয়েষার প্রেমই প্রধান কারণ, যাহা ওসমানকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছিল। ইহাই সেই জন্য ভাব বা condition of the mind ;— এই ভাব হইতে ফল হইল কি ? যুদ্ধ অর্থাৎ বীররস। পণ্ডিতবর Wilson সাহেব সেই জন্যই কহিয়াছেন—"The Rasas...are considered usually as effects." এস্থলে রতির ভাব হইতে বীররস জন্মিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রসকে স্থায়ী ভাব বলে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি কারণে স্থায়ী ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হয় ! ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী ভাবগুলি একত্র সমাবিষ্ট হইয়া একটা স্থায়ী ভাবকে সঞ্চারিত করে। সেই জন্যই তাহাদের নাম সঞ্চারিত ভাব। ইহারা transitory এবং incidental বলিয়া আখ্যাত। এই সকল অল্পক্ষণস্থায়ী এবং আনুষঙ্গিক ভাবগুলির দ্বারা নিজে ভাবাবিষ্ট হইয়া, অভিনেতা শ্রোতার হৃদয়ে সেগুলি সঞ্চারিত করিবেন। উহারা যেন এক-একটী সোপান। সেই সোপান-শ্রেণীর সাহায্যে শ্রোতা রসের রম্য হর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিবেন। সেইজন্য ভরত বলিয়াছেন—আত্মাভিনয়নং ভাব বিভাবঃ পরদর্শনম্।

সঞ্চারি ভাব শুধু সঞ্চার করিয়া দিয়াই লয় প্রাপ্ত হয়; স্থায়ী দৃঢ়ভাব সু-আসন পাতিয়া হৃদয় অধিকার করে। সঞ্চারি ভাব অপ্রধান সাধারণ বিভাব বা কারণ হইতে জন্মলাভ করে; স্থায়ী ভাব ভূয়িষ্ঠ কারণ হইতে জন্মে। নরের মধ্যে নৃপতি যেমন, শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে গুরু যেমন, ভাবের মধ্যে তেমনি স্থায়ী ভাব। উহারা সংখ্যায় ৮টী; সঞ্চারী ভাব ৩৩টী। এক দুই বা ততোধিক সঞ্চারি ভাবে মিলিয়া একটী স্থায়ীভাবের উৎপত্তি হয়। সঞ্চারি ও ভাব-স্থায়ীও ভাব কিন্তু সকল সঞ্চারি ভাবের সাহায্যে সকল স্থায়ী ভাব জন্মে না। বিশেষ-বিশেষ স্থায়ীভাব সৃষ্টি করিবার জন্য বিশেষ-বিশেষ সঞ্চারি ভাবের প্রয়োজন। কোন্ কোন্ সঞ্চারি ভাবের সাহায্যে কি-কি স্থায়ী ভাব বা রস উপস্থিত হইয়া দর্শকের চিত্তকে আপ্লুত করে, আমাদের নাট্যশাস্ত্রে তাহার অতি বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সেরূপ বিশদ বিবরণ পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন গ্রন্থে আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

নানাপ্রকার উপাদানের সাহায্যে একটী সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় ; আহারকালে ভোক্তা সে সকল উপাদানের রস পৃথক্ ভাবে অনুভব করেন না। কাহারও অম্ল, কাহারও কটু, কাহারও মিষ্ট, কাহারও ঝাল প্রভৃতি স্বাদ একত্র মিলিত হইয়া ব্যঞ্জনকে পরম উপাদেয় করে। উপাদান-সমষ্টির সেই যৌগিক রস ভোক্তা উপভোগ করিয়া থাকেন। সঞ্চারি ভাবগুলি সেই সকল উপাদান, স্থায়ী ভাব সেই যৌগিক স্বাদবিশিষ্ট উপাদেয় ব্যঞ্জন।

প্রত্যেক ভাবেরই উৎপত্তির এক-একটী কারণ থাকে। সেই কারণের নাম বিভাব। এই বিভাবগুলি অভিনেতার জন্য, দর্শকের জন্য নহে। যে ভূমিকা অভিনীত হইতেছে, তাহা কিরূপে আবৃত্তি করিতে হইবে, আবৃত্তিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য কিরূপ অঙ্গলীলার প্রয়োজন, কিরূপ বেশ-ভূষার প্রয়োজন, প্রভৃতি ভাবোৎপত্তির কারণগুলি অনুসন্ধানে নির্দ্ধারিত করিয়া, তবে অভিনয় করিতে হয়। সুতরাং নাট্যশাস্ত্র কহিতেছে যে, আদৌ যে সকল কারণে এবং অবস্থায় একটী বিশেষ চিত্তবৃত্তি উদ্ভূত হয় বা আঙ্গিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাদের নাম বিভাব। ইংরাজ পণ্ডিত ইহাকেই নিম্নোদ্ধৃত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

The *Bibhabs* are the preliminary and accompanying conditions which lead to any particular state of mind or body.

সুতরাং বিভাব কারণ; ভাব সেই [illegible]ধীন কার্য্য ;—বিভাব অঙ্কুর, ভাব সেই অঙ্কুর [illegible] বৃক্ষ ;—বিভাব প্রাণ, ভাব সেই প্রাণে অনু[illegible]

যথা বীজাৎ ভবেদ্বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং [illegible]
তথা মূলং রসা সর্ব্বে ততোভাবাব্যব[illegible]

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিভাব হইতে যে ভাব পাইলাম, তাহা কিরূপে শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্চারিত করিব? উত্তর—অভিনয়ের দ্বারা! কোন্ অভিনয়?—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক এই চারি প্রকার অভিনয়। ইহারাই কৌশল। সেই কৌশলগুলি অবলম্বন করিয়া অভিনেতা যদি শ্রোতাকে কাব্যার্থের সহিত পরিচিত করাইতে পারেন, তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল।

এই কৌশলগুলিকে সাধারণ ভাবে অনুভাব বা স্থায়ী ভাবের বহির্লক্ষণ বা Expressions বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—"আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যে Expressions অর্থাৎ অনুভাব সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির হইয়াছে; কিন্তু আমাদের নাট্যশাস্ত্রের ভাব প্রকাশের ব্যাপারসমূহ যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবৃত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।"

শোক একটী স্থায়ী ভাব। যে দুঃখে বালক কাঁদে,—তুমি আমি তাহা অনায়াসে সহ্য করি, এবং অনেক স্থলেই গ্রাহ্য করি না। যে শোকে তুমি আমি রোদন করি, বীরপুরুষের হৃদয় তাহা সহ্য করিতে পারে। কেহ ভূমিতে আছাড় খাইয়া রোদন করে,—কাহারো নয়নের ধারা বর্ষার ধারার মত নীরবে ঝরে,—কেহ বা বিনাইয়া কাঁদে,—কাহারো শোক একান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে,—তাহার হৃদয়ে তপ্ত গৈরিকস্রাব বহিলেও, বাহিরে প্রকাশ পায় না।

পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর—

> এ হেন সভায় বসি রক্ষঃ কুলপতি
> বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
> অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
> যথা তরু, তীক্ষ্ণশর সরস শরীরে
> বাজিলে, কাঁদে নীরবে.........

বীরপুত্র রুদ্রপীড় দেবরণে নিহত হইলে পর, বৃত্রাসুর তাঁহার পত্নী ঐন্দ্রিলাকে কহিতেছেন—

> কি হবে বিলাপে এবে? হা রে অভাগিনি!
> বিলাপের বহুদিন পাইবে পশ্চাৎ—
> আক্ষেপের এ নহে সময়। আগে ঘাতি
> পুত্রঘাতি ইন্দ্রের হৃদয় এ ত্রিশূলে,
> পরে বিলাপিব দোঁহে।

সমরাঙ্গনে মৃত পুত্র প্রবীরকে দেখিয়া জনা কহিতেছেন—

> নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
> বিন্দু বারি, যেন নাহি ঝরে।
> ... ...
> প্রতিহিংসা-তৃষ্ণা
> মিটাইব অরির শোণিতে।

সংসপ্তক সেনাগণকে পরাজিত করিয়া বিজয়-গৌরবে শিবিরে ফিরিয়া অর্জ্জুন দেখিলেন, অভিমন্যু শরের শয্যায় শায়িত—"ক্ষত কলেবর রক্তজবা সমাবৃত"—"বক্ষে সুলোচনা মূর্চ্ছিতা; মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা, সহকার সহ ব্রততীর মত।"

অর্জ্জুন অমনি তীব্রবেগে কহিলেন—

> "অসি! অসি! বেগে অসি করি নিষ্কোশিত
> —বিদীর্ণ আগ্নেয়গিরি বর্ষিল গৈরিক—
> "বসাইব কার বুকে কহ মহারাজ?
> অর্জ্জুনেরে পুত্রহীন কে করিল বল?
> প্রহারিব এই বজ্র হৃদয়ে তাহার?"

চিন্তাকুলিত চিত্ত চন্দ্রশেখর অতি দ্রুতপদে গৃহে আসিয়া দেখিলেন, শৈবলিনী নাই! চন্দ্রশেখর বিকৃত কণ্ঠে ডাকিলেন—"শৈবলিনী!"

চন্দ্রশেখর শুনিলেন যে, শৈবলিনীকে ইংরাজে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন—"চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহ-প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম-শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবেশী-দিগকে ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সমস্ত একে-একে আনিয়া একত্র করিলেন ... সবগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।"

আসিরুদ্দিন ফিরিয়া আসিয়া যখন গর্ব্বিতা বাদশাহজাদী জেবউন্নিসাকে জানাইল যে, কিছুতেই মবারককে বাঁচান গেল না,—সে কাল-সর্পের বিষে মরিয়াছে—তখন "জেবউন্নেসা আতরমাখা রুমালখানি চক্ষুতে দিয়াছিল, এখন পাথরে মাথা লুটাইয়া পড়িয়া চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।"

আর অধিক উদাহরণ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। শোকের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে। এই-গুলি শোকের অনুভাব বা manifestations বা expressions. আমাদের নাট্যশাস্ত্রে শোক অভিনয়ের নিম্নলিখিত রূপ উপদেশ আছে—"প্রিয়-বিয়োগ, বিভবনাশ, বধ, ব্যসন ইত্যাদি বিভাব হইতে শোক জন্মে। অশ্রুপাত, বিলাপ, পরিবেদন, বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ, দেহ-শৈথিল্য, ভূমিপাত ক্রন্দন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় হয়।"

রোদন তিন প্রকার। আনন্দজ, কাতরতাজনিত ও ঈর্ষাকৃত। যাহা আনন্দজ, তাহাতে গণ্ড হর্ষে উৎফুল্ল, এবং অনুসরণ হেতু অপাঙ্গ হইতে অশ্রুপাত ও রোমাঞ্চাদি হয়। যাহা কাতরতাজনিত, তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে অশ্রুপাত, মুক্ত-কণ্ঠতা, অসুস্থ দেহের নানারূপ চেষ্টা, ভূমিপাত ও বিলাপাদি হয়। যাহা স্ত্রীলোকের ঈর্ষাকৃত তাহাতে গণ্ড ও ওষ্ঠস্ফুরণ, শিরঃকম্প, ভ্রূকুটি ও কটাক্ষের কুটিলতা ইত্যাদি হইয়া থাকে। স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতি মনুষ্যের দুঃখজ শোক হয়; উত্তম ও মধ্যমের ধৈর্য্যের সহিত এবং নীচের রোদনের সহিত ইহার অভিব্যক্তি হইবে।

ক্রোধ সম্বন্ধে ভরত মুনি বলিয়াছেন—"বিবাদ, কলহ, ও প্রতিকূলাচরণ দ্বারা ক্রোধ জন্মে। শত্রু নির্য্যাতন করিবার সময় ক্রোধে মুখ কুটিল ও উৎকট হইবে, করপরামর্ষণ, ঘন ঘন ভুজদণ্ডে দৃষ্টিনিক্ষেপ ও দন্ত প্রকাশ করিবে। কোন গুরু লোকের উপর ক্রোধ হইলে দৃষ্টি কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইবে, দেহে অল্প অল্প ঘর্ম্ম মুছিতে থাকিবে এবং কঠোর চেষ্টা অব্যক্ত রাখিবে। কোন প্রণয়ীর ক্রোধ হইলে বিচরণ স্বল্পতর হইবে, অপাঙ্গ-বিক্ষেপের সহিত অশ্রুপাত, ভ্রূকুটীও ওষ্ঠস্ফুরণ করিবে। পরিজনের উপর ক্রোধ হইলে ক্রুরতারহিত হইয়া ভৎর্সনা, তর্জ্জন, নেত্র বিস্ফারণ ও বিবিধ প্রকার দৃষ্টিপাত করিবে। ইত্যাদি। এই দুইটি উদাহরণ হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত মুনি নরচিত্তকে কিরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার বিরাট গ্রন্থ মধ্যে একে-একে দেখাইয়াছেন।

নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা করিলে এরূপ অসংখ্য বিধি-নিয়ম পাওয়া যাইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই প্রাচীন কালের নিয়ম একালে চলে কি না? যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য। যুগের পর যুগ গিয়াছে এবং যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে কি নরচিত্তের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? মানুষ সে কালেও যে কারণে হাসিত, কাঁদিত, ক্রোধে জলিত, এখনও তাহাই করে। চিত্তের সেই সকল ভাব প্রদর্শনই যদি অভিনয় হয়, তবে সে কালের নিয়ম একালে না খাটিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

প্রবীর বলিতেছেন—

দাও মাগো সন্তানে বিদায়,
চলে যাই লোকালয় ত্যজি।
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়;
আদেশ পিতার ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে
... ...
ক্ষত্রের সন্তান অপমান কেন স'ব?

এখন দেখা কর্ত্তব্য, এই অংশ কোন্ রসের অভিনয়। ভরত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মনস্তাপ হইতে শোক, ক্রোধ এবং উৎসাহ—এই তিনটি স্থায়ী ভাব জন্মে। শোক হইতে করুণ, ক্রোধ হইতে রুদ্র এবং উৎসাহ হইতে বীররস উদ্ভূত হয়। প্রবীরের কথার উত্তরে জনা বলিলেন—

বৎস ত্যজ মনস্তাপ।
... ...
স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হোক যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,
রণসাধ যদি তোর, রণ পণ মম।

বুঝা গেল, জনা উৎসাহের শেষ সীমায় আসিয়াছেন, রণ পণ করিয়াছেন। জনা এরূপ উৎসাহিতা হইলেন কেন? পুত্রের মনস্তাপ দূর করিবার জন্য। কিসের মনস্তাপ? পুত্র অর্জ্জুনের অশ্ব ধরিয়াছেন—এখন পিতার আদেশে প্রত্যর্পণ করিতে হইতেছে। তাহাতে মনস্তাপ কেন? অশ্বমেধের অশ্ব ধরিয়া বিনাযুদ্ধে প্রত্যার্পণ করিলে ভীরু আখ্যায় অভিহিত হইতে হয়। তাহা ক্ষাত্র ধর্ম্ম নহে।

ভরত বলিতেছেন, বীররসের বাক্যে নয় বা বিনয় মিশ্রিত থাকে। প্রবীর বলিতেছেন—"ক্ষত্রের সন্তান অপমান কেন স'ব?" ইহা কি শোকের পরিচয়? না, ইহা তেজোগর্ব্বসমন্বিত। জনাও উৎসাহের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে, কবির উদ্দেশ্য

অবসাদের সৃষ্টি নহে, উৎসাহের সৃষ্টি। মনস্তাপ হইতে যেমন শোক, তেমনি উৎসাহও উদ্ভূত হয়। এখানেও তাহাই হইতেছে। সুতরাং এ অংশের অভিনয় করুণ রসের নহে—উহা বীর রসের। উহার অভিনয় করিয়া শ্রোতার হৃদয়ে উৎসাহরূপ স্থায়ী ভাব আনয়ন করাই অভিনেতার কর্ত্তব্য। কিরূপে তাহা সম্ভব? অর্থাৎ expressions কি-কি?

বাক্যৈশ্চ আক্ষেপকৃতে বীররসঃ সম্যক্ অভিনেয়ঃ।
বৈমনস্য বিলাপ বিষাদ মুখবৈবর্ণ্যাদিভিঃ অভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ॥

মনস্তাপে বীররসের সঞ্চারি ভাবের নাম আবেগ। সুতরাং অভিনয়ে আবেগ প্রদর্শন করিতে হইবে। বৈমনস্য, বিলাপ, বিষাদ, মুখবৈবর্ণ্যাদি উহার অনুভাব বা expressions। এস্থলে বিলাপ ও বিষাদ যে আছে, তাহা কবি প্রবীরের মুখেই বলিয়া দিয়াছেন। প্রবীর কহিতেছেন—"চলে' যাই লোকালয় ত্যজি," "হীন প্রাণ কেন মা রাখিব!", "কেন মাগো ধরেছিলি গর্ভে মোরে?" বিলাপ, বিষাদ প্রভৃতি অন্তরের ভাব। তাহা কিরূপে দেখাইব? মুখ অন্তরের মুকুর। সুতরাং বিভাব বা expressions মুখে ফুটাইতে হইবে। কিরূপে? ম্লান মুখচ্ছবির দ্বারা,—উহারই নাম মুখবৈবর্ণ্য।

এইখানে আমরা নাট্যশাস্ত্রের একটী নূতন তত্ত্ব লাভ করিলাম। দেখিতেছি মুখবৈবর্ণ্য একটী অনুভাব। উহা মনের অবস্থাকেই সূচিত করে। স্বেদ, বেপথু, স্তম্ভ প্রভৃতিও সেইরূপ কতকগুলি মনোবিকারের বহির্লক্ষণ মাত্র। কিন্তু যে-যে বিকারের উহারা বহির্লক্ষণ, সেগুলি ঐ সকল লক্ষণ ভিন্ন অন্য উপায়ে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু এগুলি প্রকাশ না করিলে অভিনয় লোকধর্ম্মী হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভিনয় ব্যাপারকে ভরত প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, লোকধর্ম্মী ও নাট্যধর্ম্মী—"লোকধর্ম্মী নাট্যধর্ম্মী ধর্ম্মীতু দ্বিবিধা সম্মৃতা" লোকধর্ম্মী অভিনয় আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই করিতেছি। নাট্যধর্ম্মী অভিনয় সেই লোকধর্ম্মী অভিনয়ের নকল মাত্র। সেই নকল এরূপ হওয়া চাই যে, আসল বলিয়া যেন ভ্রম হয়।

"লোকে সিদ্ধং ভবেৎ সিদ্ধং নাট্যং লোকাত্মকন্ত্বিদম্"

অভিনয় লোকসিদ্ধ করিতে হইলেই, অভিনয়ে চরিত্রে তন্ময়ত্ব প্রয়োজন। আমিই সেই—এইরূপ ধারণা না হইলে, লোকসিদ্ধ অভিনয় হইতে পারে না।

সেইজন্য ভরত নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

আত্মরূপং সমাচ্ছাদ্য বর্ণকৈঃ ভূষণৈরপি।
যদাসং সম্য যদ্রূপং প্রকৃত্যা তস্য তাদৃশং॥
বয়ো বেশানুরূপেন প্রমোক্তং নাট্যচর্য্যান।

আধুনিক রঙ্গালয়ের গুরুস্থানীয় ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার "অভিনয় ও অভিনেতা" নামক প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছিলেন—

"নট মনকে যেন দুইখণ্ড করিয়া অভিনয় করেন। এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়; অপর খণ্ডে সাক্ষী স্বরূপ দেখান যে তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কি না, নাটকের কথা ভুল হইতেছে কি না, প্রতিযোগী অভিনেতা ঠিক বলিতেছে কি না......"ইত্যাদি।

মানসিক অবস্থার এইরূপ দ্বিত্ব ভাব মনোবিজ্ঞান সমর্থন করে কি না, তাহা অভিজ্ঞেরা বলিতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন ঋষির উপদেশ কিছুতেই এরূপ দ্বিত্ব ভাবের সমর্থন করে না। প্রাচীন ঋষি বজ্র-নির্ঘোষে কহিতেছেন—"যোগসিয়তি মনসা স্মরণ্" অভিনয় করিতে হইবে। য়ুরোপীয় সুবিখ্যাত নটও এই কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া কহিয়াছেন—

"Our highsst conception of an actor is that he shall assume the characteronce or for all and be it throughout."

আমরা পুরাতনে শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন হইয়াছি বলিয়া, ভরতের নাট্যশাস্ত্র আর ভারতে সমাদর পাইতেছে না। এখন আমরা অভিনয়-কৌশলের আদর্শ অনুসন্ধানে দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছি! বাঙ্গালা দেশের কি এমন কোন সুধী-সমাজ নাই, যেখানে সেই লুপ্ত রত্ন সমাদরে গৃহীত হইয়া, ভারতের ও ভরতের জয় ঘোষিত হইতে পারে? আমরা যেন এ কথা একবারে ভুলিয়া না যাই যে—

"অশ্রদ্ধায় হুতংসর্ব্বং যৎকৃতং পারলৌকিকম্।"

অমূল তরু

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৪

ট্র্যামে উঠিয়া অপরিচিত লোকজনের সম্মুখে কোন কথা কহিবার সুবিধা হয় নাই; কিন্তু ট্র্যাম্‌ হইতে নামিয়াই সুবোধ বিনোদের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

সবিস্ময়ে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"তোমার শালী আমার সামনে বেরিয়েছিলেন, সে কথা মেসের কারুর কাছে বলবে না।"

"কেন, তাতে দোষ কি?"

সুবোধ আবেগের সহিত কহিল, "না, কিছুতেই বল্‌তে পাবে না। তুমি হয় ত' জান না—আমাদের অদ্ভুত দলটির মধ্যে এমন সব কিম্ভূতকিমাকার আছেন, যাঁদের কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই। একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে জড়িত করে তারা ইচ্ছামত ঠাট্টা-তামাসা করবে—এ কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না!"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, সে না বল্‌লেই হবে।"

উভয়ে যখন মেসে পৌঁছিল, তখন এক দলের আহার হইয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় দল প্রস্তুত হইতেছিল। সিঁড়িতে উঠিতে-উঠিতে সুবোধ পাচককে লক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, "ঠাকুর, আমি আজ খাব না, আমার ভাত দিয়ো না।"

বিনোদ সুবোধের কর্ণের নিকট মুখ আনিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু তা হলে ত' সকলে বুঝ্‌তে পারবে যে, আমরা পুরো খাওয়া খেয়ে এসেছি, তা থেকে যদি ক্রমশঃ—"

সুবোধ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ক্রমশঃ কি?"

"সুনীতি তোমার সামনে বেরিয়েছিল—ক্রমশঃ যদি সে কথাও প্রকাশ হয়ে পড়ে?"

সুবোধ বিনোদের কথার আর কোন উত্তর না দিয়া, তিন-চার সিঁড়ি নামিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, "ঠাকুর, আমারও ভাত দাও,—আমি আসছি এখনি।"

অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া বিনোদ উপরে উঠিয়া গেল; এবং আহারের জন্য সুবোধ নীচে নামিয়া গেলে, দুই-তিনজন বন্ধুকে সংক্ষেপে শ্বশুরালয়ের ঘটনার বিবরণ দিয়া, এবং ট্র্যাম্‌ হইতে নামিয়া সুবোধ যে অনুরোধ করিয়াছিল তাহাও জানাইয়া, নীচে আসিয়া খাইতে বসিল।

কাহারও সহিত কথা না কহিয়া, সুবোধ নীরবে যথাসাধ্য আহার করিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যাকালের সুখস্বপ্নে তাহার মন তখনও আচ্ছন্ন ছিল।

আহারের চেয়ে আহার্য্য লইয়া সুবোধ নাড়াচাড়াই বেশী করিতেছিল। কিন্তু প্রকাশ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "সুবোধের মুখে যে কথাটি নেই; নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজে আহার করে চলেছ। ব্যাপার কি হে? বাগবাজার হাঁটাহাঁটি করে আজ পেটে ক্ষুধানল জ্বলে উঠ্‌ল না কি? এমন করে আহারে মনোযোগ দেওয়া ত' মোটেই কাব্য-শাস্ত্রের অনুমোদিত নয়!"

সুবোধ কোন উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিল।

প্রবোধ কহিল, "তোমার কোন অপরাধ নেই সুবোধ! বিনোদের পাল্লায় পড়ে, আমারও একদিন ঠিক এই অবস্থা হয়েছিল।"

মুখে অতিশয় বড় একগ্রাস অন্ন পুরিয়া, গাল ফুলাইয়া নীরদ কহিল, "কি রকম?"

প্রবোধ কহিল, "আরে ভাই, সে কষ্টের কথা আর বল কেন? বোধ হয় মাস-দুই-তিন হবে—একদিন বিকেল-বেলা ঠিক আজকেরই মত বিনোদ ধরে বসল, চল, শ্বশুরবাড়ী বেড়িয়ে আসি। সুবোধ রসগোল্লার সর্ত্ত করে নিয়েছিল; আমি কিন্তু তেমন কিছু করি নি। মনে করেছিলাম, বন্ধুর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ডানহাতের ব্যাপারটা ভাল রকমই হবে। সেই আশায় দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে ঘর্ম্মাক্ত হয়ে ত' পৌঁছন গেল। বন্ধু কি করলেন, জান? আমাকে বললেন, পাঁচ-

মিনিট তুমি অপেক্ষা কর, আমি দেখা করেই আসছি। প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হলাম,—দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে এসে রাস্তায় অপেক্ষা কর, কি রকম কথা! তার পর মনে করলাম—শ্বশুরবাড়ীতে ও নিজে ত' আর ওপরপড়া হয়ে খাতির করতে পারে না,—বাড়ীর লোক টের পেলে তখন যথেষ্টই খাতির-যত্ন হবে। কিন্তু কে কার খাতির-যত্ন করে! দশ মিনিট, পনের মিনিট হয়ে গেল—আমি ত' ঘর্ম্মাক্ত হয়ে পথেই পায়চারী করে বেড়াচ্ছি,—এমন সময় দেখলাম, একজন চাকর এক ঠোঙা খাবার নিয়ে বাড়ী ঢুকছে। উঁকি মেরে দেখলাম, ঠোঙার খাবার দুজনের পক্ষে খুব বেশী না হলেও, একজনের পক্ষে বেশী। তখন ভেবে দেখলাম, ওর অর্দ্ধাংশ, একগ্লাস ঠাণ্ডা জল, আর গোটা দুই-চার পান পেলেও একরকম করে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে। কিন্তু হায় মরীচিকা! কোথায় খাবার, কোথায় ঠাণ্ডা জল, আর কোথায় পান! প্রায় একঘণ্টা আমাকে রাস্তায় পায়চারী করিয়ে, আমাকে প্রায় অর্দ্ধ-অচৈতন্য করে, অবশেষে বন্ধুবর পান চিবুতে-চিবুতে বেরিয়ে মুচকি হেসে বল্লেন, 'একটু দেরী হয়ে গেল, কিছু মনে কোরো না' !—"

গল্পটা যে একেবারেই কল্পনা-প্রসূত তাহা জানিলেও, বিবরণের ভঙ্গীমায় সকলের উচ্চহাস্যে আহার-কক্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল।

হাসিতে-হাসিতে নীরদের বিষম লাগিয়া গিয়াছিল। কোনরূপে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "তার পর? তুমি কি বললে?"

প্রবোধ বলিল, "আমি আর বলব কি? মুগ্ধ হয়ে বন্ধুর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। তার পর প্রায় আধ পো রাস্তা এগিয়ে এসে, হাত থেকে দুটো পান বার করে বললেন—নাও, পান খাও। আমার ত' রাগে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত জলছিল! পান দুটোও হতভাগার অলক্ষ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পথ চলতে লাগলাম।"

আবার উচ্চহাস্যে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল! প্রকাশ কহিল, "সেদিন মেসে এসে বুঝি সুবোধের মত এই রকম গোগ্রাসে খেয়েছিলে?"

প্রবোধ কহিল, "ঠিক এই রকম।"

তাহার পর সুবোধকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কি বল সুবোধ, আমার ইতিহাস আর তোমার ইতিহাসে বোধ হয় কোন তফাৎ নেই?"

সুবোধ অল্প মুখ তুলিয়া, বিনোদের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া, স্মিতমুখে কহিল, "প্রায় নেই।"

প্রবোধ উচ্চস্বরে কহিল, "প্রায় কি হে! তবে তোমার ভাগ্যে কিছু হয়েছিল না কি?"

প্রকাশ বলিয়া উঠিল, "তা হবে না কেন? আমার অভিজ্ঞতা ত' একেবারে অন্য রকম প্রবোধ। আমার ত' খাতির-যত্নের কোন অভাব হয় নি। দিব্যি নবীন ময়রার রসগোল্লা আর সন্দেশ, আর বাড়ীর তৈরী নানা রকম,—সে আর কত বলব। তবে ওদের বাড়ীতে পুরুষমানুষ নেই বলে, বাড়ীর লোক উপস্থিত হয়ে আদর-অভ্যর্থনা করতে পারে না। কিন্তু বিনোদের শাশুড়ী এমনই ভদ্র যে, পাছে আমি কোন ত্রুটি মনে করি, সেই জন্যে বিনোদের শালীকে দিয়ে শেষকালে পান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিনোদের সে শালীটি কিন্তু একটি দেখবার জিনিস। সে আজ প্রায় এক বৎসরের কথা হোল,—বোধ হয় এতদিনে বিয়ে হয়ে গিয়েছে,—নইলে সুবোধ, তুমিও আজ দেখে আসতে। মেয়েটির কি নাম বিনোদ? সুনীতি, না?"

বিনোদ কহিল, "হ্যাঁ। এতদিনের কথা তোমার মনে আছে দেখছি।"

প্রকাশ কহিল, "কি বলব! তার কিছুদিন আগে সাত-পাকে জড়িয়ে গিয়েছিলাম; নইলে সে নাম আমার জপ-মালা হত। তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে কি?"

বিনোদ যেন একটু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "না।"

"হয় নি! তা হলে বড় হয়ে গিয়েছে বলে বোধ হয় আর বাইরে বেরোয় না। নইলে সুবোধ দেখতে। ফিরে এসে তোমার আর এ রকম ক্ষিদে থাকত না; বিশেষ তুমি যখন কবি মানুষ।"

প্রবোধ কহিল, "এও ত' হতে পারে, দেখে এসেছে, তাই মনের আনন্দে ক্ষিদে বেড়ে গিয়েছে। ক্ষিদে জিনিসটা শরীর ও মনের সুস্থতার পরিচায়ক নয় কি?"

প্রকাশ কহিল, "তাই না কি? তবে দেখে এসেছ না কি হে সুবোধ?"

সুনীতির প্রসঙ্গে সুবোধ উত্তরোত্তর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। প্রকাশের প্রশ্নে সে এবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া

বলিল, "দেখ প্রকাশ, রসিকতা আমরা করে থাকি, আর ভবিষ্যতেও করতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়েকে উপলক্ষ করে রসিকতা করতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নই। এ বিষয়ে আমাদের সংযমের দরকার।"

প্রকাশ কহিল, "দেখ সুবোধ, জীবনে আমাদের এত বিষয়ে সংযমের দরকার যে, বন্ধুর অবিবাহিতা শালীকে নিয়ে একটু রসিকতা করলে, মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যায় না। তা ছাড়া, এ কথা আজ কেন তুলছ ভাই? রোজই ত' আমার স্ত্রীকে উপলক্ষ করে কত রসিকতা করে থাক। আমার শ্বশুরের ভদ্রতার বিষয়ে তোমার কি কোন সন্দেহ আছে?"

প্রকাশের কথায় বন্ধুবর্গ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

সুবোধ কহিল, "না, একটুও নেই। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে নিয়ে পরিহাস করবার দাবী আমার ততদিন থাকবে, যতদিন তোমার উপর বন্ধুত্বের দাবী থাকবে। বিনোদের শ্যালীকে নিয়ে পরিহাস করবার দাবী আমাদের তেমন কিছুই নেই, যেমন বিনোদের স্ত্রীকে নিয়ে আছে।"

প্রকাশ উৎসাহিত হইয়া কহিল, "এই যদি তোমার রসিকতা করবার ধারা হয়, তা হলে, বিনোদের শ্যালী অবিবাহিতা আছে শুনে, বিনোদের কাছে যে প্রস্তাব আমি করব বলে মনে-মনে ভাবছিলাম, তা শুনলে তোমার আর কোন আপত্তি থাকবে না। ভাবছিলাম, কথাটা নির্জ্জনেই বিনোদকে বলব; কিন্তু যখন দাবী-দাওয়ার কথা উঠল, তখন প্রকাশ্যে বলাই ভাল।" তাহার পর বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার শালা সুরেনকে তুমি ত' দেখেছ বিনোদ? সে এবার এম-এস-সি দিয়ে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংএর জন্যে বিলেত যাচ্ছে। শ্বশুরের ইচ্ছা, বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠান; আমাকে সেদিন পাত্রীর জন্য বলছিলেন। তোমার শ্যালীটিকে দেখলে, আর কোন কথা নেই,—তখনি সব স্থির হয়ে যাবে। তোমার শ্বশুরের যদি মত হবার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে বল, না হয় ঘটকালী আরম্ভ করি।"

বিনোদ কহিল, "সাধুচরণ ভাত খাবে? না, হাত ধোব কোথায়! এও ঠিক সেই রকম কথা হোল। তোমার শালা যত শ্বশুরকুলের উপাস্য বস্তু,—তার মধ্যে মতামতের কথা ত' কিছু নেই।"

"তা হলে ঘটকালী আরম্ভ করি?"

বিনোদ সোৎসাহে কহিল, "নিশ্চয়ই!"

প্রকাশ উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "বেশ কথা। তা হলে তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক হবে বিনোদ? তুলনায় ভায়রাভাই ত'?"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "সে যাই হক না, একটু ভারি মধুর রকমই হবে,—তোমার শালী, আমার শালী।"

প্রবোধ হাসিয়া কহিল, "আর আমরা গোল্লা খাব খালি!"

তাহাদের উচ্চহাস্যে কৃষ্ণবর্ণা, সুদীর্ঘা, বৃদ্ধা ঝি কাদম্বিনী চকিত হইয়া পাচককে কহিল, "বাবুদের আজ সকাল থেকে কি হাঁসিতে লেগেছে গো! এ হাওয়া লাগল না কি?—"

পাচক ঔদাস্য সহকারে কহিল, "ও বয়সের হাওয়া। এমন আমি অনেক মেসে দেখেছি।"

প্রকাশ কহিল, "এর পর একটু রসিকতা করলে, তোমার বোধ হয় আপত্তি হবে না সুবোধ?"

সুবোধ তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "তোমার রুচিতে যা ভাল হয়, তা করবে,—আমার অনুমতির কোন দরকার নেই।"

উচ্চহাস্যের সহিত সকলে উঠিয়া পড়িল।

৫

পরদিন প্রত্যূষে—তখনও মেসের কোনও কক্ষের দ্বার খোলা হয় নাই,—বিনোদের কক্ষের দ্বারে আঘাত পড়িল, "বিনোদ! বিনোদ! উঠেছ?"

বিনোদের কক্ষ ক্ষুদ্র পরিসর বলিয়া, তাহাতে মাত্র দুই-জন ছাত্রের স্থান ছিল। প্রবোধ হাসিয়া উঠিল। কহিল, "বিনোদ, বড়শীতে বেশ ভাল রকমেই গেঁথেছ ভাই! এ যে চমৎকার খেলতে আরম্ভ করলে।"

বিনোদ হাস্যমুখে নিম্নকণ্ঠে কহিল, "চুপ, চুপ, শুনতে পেলে খুলে যাবে! কিন্তু শেষ রাত্রে খেলতে আরম্ভ করলে,—এ যে ভারি বিপদ হল।"

প্রবোধ কহিল, "বোধ হয় সমস্ত রাত্রি ঘুমোয় নি।"

আবার দ্বারে আঘাত পড়িল, "বিনোদ! বিনোদ!"

বিনোদ এবার সাড়া দিল,—"দাঁড়াও, খুলছি।" তাহার পর প্রবোধকে কহিল, "তুমি ঘুমোবার ভান করে পড়ে থাক।" প্রবোধ তাড়াতাড়ি পাশ ফিরিয়া শুইল।

দ্বার খুলিয়া বিনোদ কহিল, "কি হে—এত ভোরে কি মনে করে?"

"চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

বিনোদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! এই শেষ রাত্রে বেড়িয়ে আসা যাক?"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "একটু ভুল হচ্ছে ভাই! এখন ঠিক শেষ রাত্রি নয়, রাত্রি শেষ। বেড়াবার সময়ই এই। দুপুর রোদে তোমাকে যদি বেড়াতে ডাকতাম, তা হলে আপত্তি করতে পারতে।"

গাত্রবস্ত্রখানা ভাল করিয়া গায়ে দিয়া বিনোদ কহিল, "আপত্তি ত' এখনও করছি। কোথায় যাবে? এইখানে বসে পড়। শুয়ে-শুয়ে গল্প করা যাক্।"

সুবোধ বলিল, "বেড়াতে-বেড়াতে গল্প তার চেয়ে ঢের ভাল লাগবে।"

"রুচিভেদও ত' আছে সুবোধ। বিশেষতঃ তোমাদের মত কবি মানুষদের সঙ্গে আমাদের মত অকবিদের রুচির পার্থক্য হয়েই থাকে।"

সুবোধ কহিল, "কিন্তু এমনও অনেক বিষয় আছে, যাতে কবি আর অকবির কোন রুচিভেদ নেই। প্রাতভ্রমণও ঠিক সেই রকম একটা বিষয়। প্রমাণ যদি চাও ত' অন্ততঃ আজকের দিনটা চল, দেখবে, যত লোক বেড়াচ্ছে, তার এক আনাও যদি কবি হোত, তা হলে প্রত্যহ কলকাতা সহরের মোড়ে-মোড়ে কবির লড়াই চল্‌ত।"

বিনোদ কহিল, "তারা সব পেন্‌সন্ পাওয়া সবজজ—বহুমূত্র শ্রেণী। কবিদের চেয়েও তাদের বেড়ান বেশী দরকার। আমরা কেন অকারণ তাদের মধ্যে ভীড় করি?"

কিন্তু এত প্রকার আপত্তি সত্ত্বেও, বিনোদকে প্রাতভ্রমণের জন্য শয্যাত্যাগ করিতে এবং অত্যন্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে প্রস্তুত হইতে হইল।

বিনোদ কহিল, "প্রবোধকেও নিয়ে যাওয়া যাক্।"

সুবোধ ব্যগ্র ভাবে কহিল, "না, না, থাক্—বেচারা ঘুমুচ্ছে, ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাজ নেই।"

বিনোদ করুণ ভাবে কহিল, "সে কার্য্য ত' আমিও করছিলাম।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুবোধ কহিল, "আমি যখন ডাকছিলাম, তখন কি তুমি উঠ নি? পাছে তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায় বলে, আমি আস্তে-আস্তে ডাকছিলাম।"

মনে-মনে সুবোধকে কটূক্তি করিয়া বিনোদ বাহির হইয়া পড়িল।

প্রত্যূষে রাজপথে বাহির হইয়া, শীতল মুক্ত বায়ুর প্রভাবে বিনোদের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পথে লোকচলাচল তখনও বেশী হয় নাই। কলেজ ষ্ট্রীটে পড়িয়া উভয়ে গড়ের মাঠের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

আসল কথার অবতারণা করিতে সুবোধের লজ্জা করিতেছিল; তাই অবান্তর কথাই চলিতেছিল। বিনোদ দেখিল, এ সকল কথায় অনর্থক সময় নষ্ট হইতেছে; কারণ, কিছু সময় সুবোধ সুনীতির প্রসঙ্গে লইবেই। তাই সে নিজেই কথা উঠাইল।

"সুনীতিকে কেমন লাগল সুবোধ?"

"চমৎকার! যেমন শিক্ষিত, তেমনি মার্জ্জিত!"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "আর একটা কথা বাদ দিচ্ছ কেন হে? দেখ্‌তে কেমন লাগল?"

সুবোধ বিনোদের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিল, "সেটাও কি বলতে হবে ভাই? চক্ষুর যা ধর্ম্ম, তা থেকে আমার চক্ষু ত' বাদ পড়ে নি।"

"কিন্তু কবি-চক্ষু কেমন দেখলে তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

সুবোধ একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিল, "আমি কবি নই। কিন্তু এ কথা সাহস করে বলতে পারি, তোমার ছোট শ্যালী জগতের সমস্ত কবি চক্ষুকেই মুগ্ধ করতে সক্ষম। এমন কোন কাব্য আমি জানি না, যা সুনীতিকে আশ্রয় করে ফুটতে পারে না।"

বিনোদ মনে-মনে বলিল, 'তবুও ত' আসল জিনিসটি দেখ নি।'

সুনীতির প্রসঙ্গ সুবোধের নিকট রুচিকর হইলেও, উপস্থিত অন্য একটা ব্যাপার এরূপ প্রবল ভাবে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল যে, এ সকল কথাবার্ত্তায় তাহার আগ্রহ হইতেছিল না। তাই বিনোদ একটু চুপ করিতেই, সুবোধ আসল কথা পাড়িল।

"প্রকাশের শালাকে তুমি দেখেছ বিনোদ?"

বিনোদ মনে-মনে হাসিয়া কহিল, "দেখেছি বই কি,—অনেকবার দেখেছি।"

"কেমন ছেলে ?"

"খুব ভাল; 'বি-এ'তে সেকেণ্ড হয়েছিল।"

"স্বাস্থ্য? দেখতে-শুনতে?"

"খুব সুন্দর! দেখলে তোমার ভারি পছন্দ হবে। এমন বলিষ্ঠ কান্তিমান ছেলে হাজারের মধ্যে একটাও বেরোয় কি না সন্দেহ।"

"অবস্থা?"

বিনোদ সবিস্ময়ে কহিল, "কেন, প্রকাশের শ্বশুরের অবস্থা তুমি জান না? তিনি ত' একজন প্রসিদ্ধ ধনী লোক। বড়বাজারের ভাড়া-বাড়ী থেকেই তাঁর মাসিক আয় সাত-আট হাজার টাকা হবে।"

কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা হইল না। তাহার পর বিনোদ বলিল, "সুরেনের সঙ্গে বিয়ে স্থির হলে, সুনীতির খুব সৌভাগ্যই বলতে হবে।"

একটু নীরব থাকিয়া সুবোধ কহিল, "আমি কিন্তু ঠিক তা মনে করছি নে।"

বিনোদ সাগ্রহ বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিল, "কেন বল দেখি? এমন পাত্র ত' সহজে পাওয়া যায় না।"

সুবোধ কহিল, "ঐ যে বিলেত যাওয়ার কথা; ঐটেকে আমি বড় ভয় করি। বিলেত গিয়ে চরিত্র ভাল রাখতে পারে খুব কম লোকে।"

বিনোদ কহিল, "কিন্তু এ যে বিয়ে করে তার পর বিলেত যাবে।"

সুবোধ সজোরে কহিল, "সে আরও খারাপ,—সেখান থেকে মন্দ হয়ে এলে, আর কোনও উপায় থাকবে না। তার চেয়ে বিলেত থেকে ফিরে এলে, তার পর তাকে দেখে-শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যদি বিয়ে দাও, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

ঈষৎ চিন্তিত ভাবে বিনোদ কহিল, "সে কথা ঠিক বলেছ। এ একটা ভাববার কথা বটে। এ দিকেও দেখ, প্রকাশের শ্বশুরের মত হয় কি না। সুরেনও যেমন খুঁৎখুতে, তার হয় ত' সুনীতিকে দেখে পছন্দই হবে না।"

সুনীতিকে দেখিবার কথায় সুবোধের মনের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা আঘাত লাগিল। সে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "সুরেন দেখবে না কি?"

বিনোদ শান্ত ভাবে কহিল, "প্রকাশ ত' কাল রাত্রে তাই বলছিল। সে বলে, সুরেন দেখে পছন্দ করলে, তার শ্বশুরের আর কোন আপত্তি থাকবে না। সুরেন আট ন' দিন পরে এখানে আসবে, তার পর তাকে দেখান হবে,—এই কথা হয়েছে।"

সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "উঁহু, এ কোন কাজের কথা নয়; আগে তোমরা ঠিক কর, যে ছেলে বিলেত যাচ্ছে, তার সঙ্গে বিয়ে দেবে কি না। তার পর দেখান-শুনান।"

বিনোদ কহিল, "হ্যাঁ, তা ঠিক বটে,—আগে সেই কথাটাই স্থির করা যাক্,—তার পর অন্য কথা।"

আত্মরক্ষার স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা সুবোধের মনে হইতেছিল, সুনীতিকে সুরেন দেখিলে, ব্যাপারটা আরও অগ্রসর হইয়া যাইবে। সুনীতিকে দেখিয়া সুরেন পছন্দ করিবে না, ইহা সম্ভাবনার অন্তর্গত বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল না। এই আত্মরক্ষার উদ্বেগ তাহার কোন্ সম্পত্তি, কোন্ অধিকারকে বেষ্টন করিয়া জাগিয়া উঠিল, তাহা একটি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের কথা। সুনীতিকে এক দিন দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে; এবং ভবিষ্যতে আরও দুই-এক দিন দেখিবার লালসা এবং সম্ভাবনা আছে, এইটুকুই তাহার স্বার্থ বল, আর অধিকারই বল। এই সদ্যোজাত অনিরূপেয় অধিকার-কণার বিরুদ্ধে সহসা একজন অর্দ্ধ-পরিচিত ব্যক্তির সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট অধিকার উৎপন্ন হইয়া, তাহার অগঠিত অধিকার অথবা বাসনাকে নিরর্থক করিয়া দিবে, ইহা তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাই সে সুরেনের বিরুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল। সুরেন প্রতিরুদ্ধ হইলেই যে জগৎ প্রতিরুদ্ধ হইল তাহা নহে; কিন্তু উপস্থিত ত' দ্বার উন্মুক্ত রহিল। সে যে কোন্ আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বার, তাহা এখনও অনির্ণীত; কিন্তু উন্মুক্ত ত রহিল।

পথ চলিতে-চলিতে সুবোধ বিলাত এবং বিলাত-ফেরতদের বিরুদ্ধে, সত্য-মিথ্যা যতপ্রকার অভিযোগ হইতে পারে, সোৎসাহে বলিতে লাগিল; এবং বিলাত-প্রত্যাগত ছাড়াও যে দেশে বিদ্যাবুদ্ধি এবং অর্থে অসংখ্য উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ যুক্তি এবং উদাহরণ দেখাইতে লাগিল।

একই বিষয়ে বিস্তৃত পুনরুক্ত আলোচনায় বিনোদ মনে-মনে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর ধর্ম্মতলার

বহুবাজারের মোড়ে আসিয়া সুবোধ বলিল, "তবে আমিও একটা কাজ সেরে যাই" বলিয়া ট্রাম্ হইতে নামিয়া গেল।

বাসায় পৌঁছিয়া বিনোদ বলিল, "না ভাই, রণে ভঙ্গ দিলাম! আর পারছি নে, অসহ্য হয়েছে!"

"কি হয়েছে বল, কি হয়েছে বল?" বলিয়া প্রকাশ, প্রবোধ, নীরদ প্রভৃতি বিনোদকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিয়া বিনোদ কহিল, "এই ত কথা, কিন্তু হতভাগা বিশবার আমাকে একই কথা বলেছে, আর বলিয়েছে!" কিন্তু বন্ধুবর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বিনোদকে স্বীকৃত হইতে হইল যে, যত বিরক্তিকর হউক না কেন, মধ্যপথে চক্রান্তটিকে পরিত্যাগ করা হইবে না। স্থির হইল, এ অভিনয়ের যবনিকা পড়িবে যোগেশের সহিত সুবোধের জাল বিবাহ দিয়া। (ক্রমশঃ)

মোড়ে আসিয়া যখন সুবোধ বলিল, "চল বিনোদ, কার্জ্জন পার্কে বসে এ বিষয়টা একটু ভেবে দেখা যাক" তখন বিনোদ নিজেকে অতিশয় বিপন্ন বোধ করিয়া, করুণ ভাবে কহিল, "আর ভাববার দরকার কি ভাই? সুরেনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করতে প্রকাশকে মানা করে দিলেই হবে। এখন চল, বাসায় ফেরা যাক্" বলিয়া সুবোধের অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়া, একটা শ্যামবাজারগামী ট্র্যামে উঠিয়া পড়িল।

সুবোধ ট্র্যামে উঠিয়া বলিল, "এইটুকু পথের জন্য ট্র্যামে উঠলে বিনোদ? বেশ ত' গল্প করতে-করতে ফেরা যেত।"

বিনোদ কহিল, "না ভাই, আমায় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। অরুণের কাছ থেকে কদিন একটা নোট এনেছি, সেটা এখনই গিয়ে লিখে ফেলতে হবে।"

ভাষার কাহিনী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকা! আপনাদিগকে আজ এক অভিনব কাহিনী শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শুনিবেন। তবে ইহার ভিতর একটা অস্বস্তিকর "কিন্তু" আছে। এই কাহিনী নভেলের মত রসসিক্ত নহে। ইহাতে রাগানুরাগ, প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ নাই; চলচ্চিত্ত যুবক নায়ক ও মনোজ্ঞা রূপ-সমৃদ্ধা যুবতী নায়িকা নাই। তথাপি কাহারও নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। ঠিকমত বিবৃত করিলে, ভাষার কাহিনী চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হইবে। অত্র নায়িকা ভাষা-সুন্দরী স্বয়ং; আর নায়ক আপনারা যে কেহ হইতে পারেন। এইটুকু উপরি লাভ। তবে আপত্তি কি?

যাহা বাণীর পাদপীঠ শতধা শোভা ও সম্পদে বিভূষিত করিয়াছে, বাগ্দেবীর অমর কুঞ্জের শত-সহস্র কবি ও লেখকের সুর ও গান হইতে যাহার উদ্ভব,—সেই ভাষা-সুন্দরীকে লৌকিক নায়িকার সহিত তুলনা করিয়া হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। একমাত্র ব্যাকরণ-বিভীষিকা লোককে এই সৌন্দর্য্যানুভূতি হইতে বঞ্চিত করে। ভারতের মত ব্যাকরণ-শাসিত দেশ দুনিয়ার ভিতর আর কোথাও আছে কি না জানি না। কিন্তু এ দেশের ইতিহাসেও দেখা গিয়াছে যে, ব্যাকরণ কোনও ভাষাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। তাহার কারণ, ভাষা শুধু যে বয়সে ব্যাকরণের চেয়ে বড় তাহা নহে; ভাষা ব্যাকরণের চেয়ে অধিকতর শক্তির আধার।

মানুষ কতদিন এই পৃথিবীতে বাস করিতেছে, তাহা এখনও ঠিক করা যায় নাই। পরে যে যাইবে, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ করিবার কারণ আছে। তবে যতটা সম্ভব, মানুষ তাহার কার্য্য, চিন্তা প্রভৃতির একটা ইতিহাস বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। অবশ্য ইচ্ছা করিয়া নহে, বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারে। যাহাই হোক, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের লোক অতীতের উত্তরাধিকারী হিসাবে এই

প্রবৃত্তির অনেকগুলি ইতিহাস পাইয়াছে। একটা জৈব ইতিহাস—সেটা আজও রহস্যাবৃত; একটা সমাজগত ও একটা রাষ্ট্রগত,—সেটা ঘটনা-পরম্পরায় আজও প্রবহমান; একটা চিন্তাঘটিত—সেটার চরম রূপের নাম দর্শন; ইত্যাদি। কিন্তু কোনও ইতিহাসে বাগ্-বিতণ্ডা, বাদানুবাদের অভাব নাই। কোন বিষয়েরই চরম সিদ্ধান্ত হয় নাই—হইবেও না। কেন না, সৃষ্টি-প্রকরণের ঠিক মাঝখান দিয়া ভগবান্ এমন একটা প্রহেলিকার স্রোত ছুটাইয়াছেন, যে, কোন বিষয়ের অর্থ ও প্রয়োজন একেবারে নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না!

ভাষার কাহিনী একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। সুতরাং ইহার ভিতর যথেষ্ট বাদানুবাদ আছে; নানা মুনি ও তাঁহাদের নানা মত আছে। তবে সাধ্যমত সেই সমস্ত বাদানুবাদের বাহিরে থাকাই শ্রেয়ঃ; কেন না, তাহাতে বক্তব্য জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা ভাষার সম্ভব-পর্ব্বটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিতে পারি। এখানে বাগ্-বিতণ্ডার দ্বারা কোনও মীমাংসা না হওয়ায়, আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান আর সে সম্বন্ধে মাথা ঘামায় না। কিন্তু একদিন ইহার বিচার না হইলে, আসরে নামাই অনুচিত বলিয়া মনে করা হইত। সে সংবাদ অনুসন্ধিৎসু পাঠক বহু গ্রন্থে পাইবেন। আমরাও সংক্ষিপ্ত ভাবে সে সংবাদটা দিতে চেষ্টা করিব; কেন না, তাহাতে উপকার না হইলেও, আনন্দ আছে।

কিন্তু ভাষার সৃষ্টি কি করিয়া হইল, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা আমরা করিব না। Syce বা Max Mullerএর মত, খুব দীর্ঘ একপ্রস্থ বক্তৃতার কোনও প্রয়োজন নাই। ভাষা মানুষের ব্যবহারিক সম্পত্তি; প্রত্যহ সর্ব্বত্র ইহার ব্যবহার হইতেছে,—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ঘরে। তবে এই সম্পর্কে দু'টি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথম অর্থ-সমন্বিত বাক্ ভাষা; দ্বিতীয়, ইহা মানুষেরই ঐকান্তিক সম্পত্তি। অর্থবিহীন বাক্ ভাষা নহে; শিশুর অস্ফুট কাকলীর ভিতর মাধুর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষা নাই। আবার ঠিক প্রতিকল্পে বাক্‌বিহীন উদ্দেশ্যজ্ঞাপক কোন প্রকার আকারেঙ্গিতও ভাষা-পদ-বাচ্য নহে। আজকাল মূক-বধিররা বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনেক জিনিস শিখে ও আপনার মনোভাব ব্যক্ত করে। উত্তর-আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের সহিত কোনও বণিক সম্প্রদায় না কি শুধু আকারেঙ্গিতের সাহায্যে ব্যবসা-কার্য্য চালান। বিখ্যাত পণ্ডিত Liebnitz তাঁর "Stymologica Collectanea" গ্রন্থে য়ুরোপীয় কশ্চিৎ মূক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেশেও অনেক বাক্-সংযমী পুরুষ আছেন। কিন্তু ভাব প্রকাশের এই সমস্ত উপায় ভাষার অঙ্গ নহে। তেমনই মনুষ্যেতর প্রাণীর ভিতর যে ভাষাই থাক, তাহা আমাদের আলোচ্য ভাষাতত্ত্বের বিষয় নহে। আর ঠিক এই কারণেই, মহামতি Darwinএর Homo Ullalusকে আমরা বাদ দিতে পারি। Darwin সাহেব বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি যে হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে কথা স্বীকার করিতে পারেন নাই। আমরা নির্ব্বোধের দল সে কথাটা আদৌ স্বীকার করিয়া লই।

এইবার প্রশ্ন উঠে যে, জগতে এই সমস্ত অগণিত ভাষা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? আমাদের ভারতীয় শাস্ত্র ও অন্যান্য দেশের কতক পুঁথি বলেন যে, ভগবান্ দিয়াছেন। বেশ সহজ, সরল, মীমাংসা-বাঞ্জক উত্তর। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ এত সহজ, সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। এতদিন ধরিয়া সে যে ভাষাকে প্রকাশ্য ভাবে গড়িয়া আসিতেছে, ব্যবহার করিতেছে, তাহা হইতে একেবারে তাহার কর্তৃত্বকে সে লুপ্ত হইতে দিতে পারে না। সে বলে যে, বাইবেলের ঈশ্বর সদ্বিবেচক ছিলেন বটে; কেন না, আদমকে নামধাম সমেত সৃষ্টি-তত্ত্ব তিনি বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন কিছু লেখা নাই, যাহাতে বুঝা যায়, সকল দেশের ভগবান্ এইরূপ সদ্বিবেচক;—কাজেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে নিজে ভাব প্রকাশের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতে হইয়াছে। শুধু শব্দোচ্চারণের শক্তির জন্য মানুষ ভগবানের কাছে ঋণী—বস্।

ভগবান্ এই দাবীর উপর কোনও আপত্তি করিতে এখনও সাহস করেন নাই।

কিন্তু কথাটার মীমাংসা করিতে যাওয়া হঠকারিতা। যেখানে যুক্তির অভাব, সেখানে যুক্তির জন্য মাথা ঘামান বড় বিড়ম্বনা। তবে এই সম্পর্কে তিনটি বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করা যাইতে পারে, এবং তাহাতে আনন্দ আছে। দর্শক হিসাবে দাঁড়াইয়া রাস্তার মারামারি কাণ্ড দেখাটার ভিতর কৌতুক আছে। আর আসরে না নামিয়া, যাত্রার

আনন্দটা উপভোগ করাই বুদ্ধিমানের রীতি। পণ্ডিত Schliecher বলিলেন, "ভাষা মানুষের নহে—ইহা প্রকৃতি-ঠাকুরাণীর। ভাষার সাহায্যে প্রকৃতি-ঠাকুরাণী মানুষকে ইতর জন্তু হইতে স্বতন্ত্র করিয়া, বড় করিয়া, সৃষ্টি করিয়াছেন। মস্তিষ্কের যে অংশটি দিয়া ভাষার শব্দোচ্চারণ কার্য্যটি হয়, তাহা প্রকৃতি-ঠাকুরুণের হাতের ভিতর। তিনি দেশ, কাল, পাত্র নির্ণয় করিয়া দেন। আর ঠিক সেই কারণেই ভাষার বিভেদ ঘটে। মানুষ ইচ্ছা করিলেও, এই ভাষার উপর কলম চালাইতে পারেন না।" শুনিয়া Whitney সাহেব প্রমুখ Commonsense school বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। Whitney সাহেব তাঁহার "Language and the Study of Language" গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মোক্ষমূলর সাহেবকে গুটি দু'ই কড়া-কড়া কথা শুনাইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, "মানুষের হাত নাই, এ কথা বলা চলে না। অনেক শব্দ আছে, যেগুলি ব্যক্তিবিশেষ ভাষাকে দিয়াছে। Dr. Boycot, বৈজিক, ইত্যাদি। এই প্রকৃতির প্রায় এক সহস্র শব্দ মানুষ কয় শতাব্দীর ভিতরই ত সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষাও তাহা নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং কখনও বা ব্যক্তিগত কখনও বা সমষ্টিগত ভাবে মানুষই ভাষাকে বাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহার নূতন-নূতন আবিষ্কার ও প্রয়োজনকে নূতন-নূতন অভিধান দিতেছে। সুতরাং ভাষা আদৌ যে প্রকারেই সৃষ্ট হউক, মানুষের কর্তৃত্বকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না।"

দেখিয়া শুনিয়া, ঠেকিয়া আধুনিক পণ্ডিতের দল বলিলেন, "ও সব হাঙ্গামে কাজ কি বাবু? শব্দই ভাষা নহে।' তাহাতে অর্থানুপ্রবেশ করা চাই। তা ছাড়া, ব্যক্তি বিশেষের সব দান ভাষা লয় না,—লইবার উপায় নাই। ইহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা উচ্ছৃঙ্খল নহে। ভাষা কতকগুলি খুব সুন্দর নিয়মে কাজ করে। সেই নিয়মের বাহিরে সে বড় যায় না। তা' ছাড়া, শব্দ ও ভাব, উভয় পদার্থেরই পরিবর্ত্তন সামাজিক কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত। সুতরাং ভাষা সামাজিক ব্যবস্থা। সমাজই অজ্ঞাতসারে ইহার জাতি-নির্দ্ধারণ করে, ইহার গতিরও পথ নির্দ্দিষ্ট করে। আর অজ্ঞাতসারে করে বলিয়াই, ইহাকে স্বাভাবিক পদার্থ বলা চলে। ইহাতে উৎপত্তি-তত্ত্ব নির্ণীত হইল না; কেন না, তাহা হইবে না। সেই কারণে, একটা বৃহৎ আলোচ্য ছাড়িয়া, পর্দ্দা ছোট করিয়া, ভাষা কি-কি নিয়মে কাজ করে, আগে সেইগুলিই বুঝিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।"

বলা বাহুল্য, ইহা অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত কথা আর কিছু হইতে পারে না। প্রাগৈতিহাসিককে লইয়া যেরূপ গবেষণা সুরু হইয়াছে, তাহাতে মাঝে-মাঝে বড় মুস্কিলে পড়িতে হয়। অনেক সময়ে নিছক অনুমানের উপর বড়-বড় থিওরী গড়িয়া তুলা হয়। কি তখন ছিল, তাহা অবশ্য কেহই জানে না। তৎকালীন যে সমস্ত স্মৃতি পাওয়া যায়, তাহাদের জন্ম-মৃত্যু তারিখ, দিন-ক্ষণ দিয়া স্থির করিবার কোনও সহজ উপায় নাই। একটা মাথার খুলি লম্বা-চওড়া হিসাবে কোন যুগের লোকের, ইহা বাহির করা দুরূহ। কেন না, সে যুগেই যে ঐ "খুলি"-ওয়ালা লোক ছিল, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং যাহার স্থান এত অনিশ্চিত, সে সম্বন্ধে শক্ত করিয়া কোন কথা বলা যায় না। ভাষার উৎপত্তিও সেই যুগের কথা। এখানে পিছন দিক হইতে হাজার সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিয়া গেলেও, এমন এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হয়, যে তাহার পরে আর কোনও বিশ্বাস্য প্রমাণ মিলে না।

ভাষার উদ্ভব-পর্ব্বকে বাদ দিয়া বিকাশ পর্ব্বে পড়িতে হয়। অর্থাৎ ভাষা কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল, তাহার ইতিহাস। তর্ক-বিতর্ক এখানেও তুমুল; তবে অনেক দিনের পুরাতন মতগুলিকে বাদ দিয়া Darwin সাহেবের স্বভাব-থিওরী হইতেই আরম্ভ করা যাউক। Darwin ও Taine সাহেব দু'টি স্বভাব-শিশুকে লইয়া নিজ-নিজ আলয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, কি করিয়া মানুষ 'ভাষা' শিক্ষা করে। Syce সাহেবের Introduction to the Science of Language" এর দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে এই পরীক্ষার কথা বলা আছে। আমার কাছে যে সংস্করণটি আছে, তাহার পৃষ্ঠা নং ৩১১।৩১২। পরীক্ষার ফল প্রায় একই রকম হইয়াছিল। শিশু দু'টি প্রথমে স্বর ও তার পর ওষ্ঠ্য শ্রেণীর ব্যঞ্জন শিখে।

Syce সাহেব পরীক্ষার ফল যথেষ্ট গুরু বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাহা মনে করিতে পারি না। ইহাতে উপস্থিত পর্ব্বের কোন কথাই মীমাংসিত হইল না। মানুষ যে আদৌ সকলে এক পাল শিশু হইয়া

জন্মায় নাই, এ কথা সকলেই বিশ্বাস করিবে। আর যদি ধরিয়া লইতে হয় যে, প্রাগৈতিহাসিক মানুষ শিশুর মত সরল ছিল, তবে শব্দোচ্চারণে তাহার শিশুত্ব মানিয়া লইবার কোন কারণ নাই। স্বরবর্ণ সহজ ও শীঘ্র উচ্চারিত হইতে পারে; কিন্তু আদিম সমাজ শুধু যে স্বরবর্ণ লইয়াই কাজ চালাইত, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। ধ্বন্যাত্মক শব্দও বিশুদ্ধ স্বরের উপরে দাঁড়াইতে পারে না। তা' ছাড়া, শব্দোচ্চারণ যন্ত্রটির এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে, প্রথমেই স্বর-সংঘাতে ব্যঞ্জনের সৃষ্টি হওয়ার ভিতর বিস্ময় কিছু নাই। তবে ভাষার গঠনে স্বর ব্যঞ্জন অপেক্ষা বেশী কাজ করে। সকল দেশের ভাষাতে স্বরবর্ণের প্রকৃতি ভেদে শব্দ ও অর্থের পরিবর্তন ঘটে। তুলনাসূচক বিচারে বেশ বুঝা যায় যে, স্বর ও ব্যঞ্জনের এই থিওরীর উপর নির্ভর করার মত ভ্রান্তি আর কিছু নাই। সংস্কৃত ভাষা খুব উন্নত ছিল; কিন্তু সেখানে ব্যঞ্জন অপেক্ষা স্বরবর্ণের সংখ্যা অধিক। আবার গ্রীক্‌ভাষায় স্বরবর্ণের সংখ্যা সংস্কৃতের স্বর-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। কিন্তু তাহাতে বুঝায় না যে, গ্রীক্ ভাষার উন্নতি বেশী হয় নাই। সেই কারণে Syce সাহেব যে Polynesianদের স্বর-বাহুল্য দেখিয়া তাহাদের ভাষাকে আদিম বলিয়া বসিলেন, সে কাজটা বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই।

সুতরাং স্বর ও ব্যঞ্জন তফাতে থাকিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এরূপ বলা চলে না। এ সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত Brail সাহেব যে সন্দেহ প্রথমে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই আজ গ্রাহ্য যুক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ভাষার উৎপত্তি একটী মাত্র পদ বা শব্দে নহে। একেবারে বাক্যেই হইয়াছিল। স্বর ও ব্যঞ্জনকে তাহার পরে বাহির করিয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া লওয়া হইয়াছিল। অবশ্য একটা বিস্ময়সূচক শব্দ—"উঃ!" কিম্বা "আঃ!" প্রভৃতিকে লইয়া স্বরের গ্রাম তৈয়ারী হয় নাই। আদিম মানুষ আর যাহাই থাকুক, তাহার বিশ্লেষণী বুদ্ধিটা আমাদের মত পাকা ছিল না। ভাষার প্রকাশ একটা অবিচ্ছিন্ন কাজ; সে কাজ অবিচ্ছিন্ন শব্দ-সমষ্টির সাহায্যে সম্পন্ন হইত। তাহার পরে সেই ভাষাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, তাহাকে সুখোচ্চার্য্য করিয়া লওয়া হইয়াছে; তাহাকে বিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতর টানিয়া আনা হইয়াছে। যদি এইটাই সত্য হয়,—আর ইহা যে মিথ্যা, তাহা আজও প্রমাণিত হয় নাই—তবে Darwin ও Taine সাহেবের অনুসন্ধিৎসাকে আমরা প্রশংসা করিতে পারি বটে, কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হই।

আজ অবধি প্রায় শতাধিক ভাষা-জাতির সন্ধান মিলিয়াছে। বুধ-সমাজ এখন সেই সমস্ত ভাষার তুলনা-মূলক অধ্যয়নে রত আছেন। এই জাতি-নির্ণয়ের কাজ বড় আনন্দ-জনক; তাহার বিবৃতি বেশ রুচিকর পাঠ্য। তা ছাড়া, এই সমস্ত অধ্যয়নের ও আলোচনার ফলে, যে সমস্ত ভাষার বৃদ্ধি সম্বন্ধে নিয়ম পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিই প্রয়োজনীয় পদার্থ।

বিজিতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৪)

সুলতা নিজের কক্ষে বসিয়া একটা লেস বুনিতেছিল, সেই সময় পূর্ণিমা আসিয়া গম্ভীর ভাবে তাহার পার্শ্বে বসিল।

লেসটা নামাইয়া রাখিয়া, মুখ তুলিয়া সুলতা বলিল, "মুখ আজ এত ভার-ভার কেন সেজবউ?"

পূর্ণিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি ভাই, আজই বিকালে বাপের বাড়ী চলে যাব।"

বিস্ময়ে সুলতা বলিল, "বাপের বাড়ী যাবে? কাল সকালে বিষয় ভাগ হবে। সেজঠাকুরপো ছুটি পান নি বলে আসতে পারেন নি। তোমার মেজ ঠাকুর বলেছেন, সে না আসলেও ক্ষতি হবে না, কিন্তু তুমি থাকলেই হবে। সম্পত্তিগুলো আগে ভাগ-বখরা করা হয়ে যাক, তার পরে যা হয় তাই কোরো।"

পূর্ণিমা চোখে অঞ্চল দিয়া রোদনের সুরে বলিল, "আমার আর সহ্য হয় না মেজদি। যার যা খুসি, সে তাই বলে যাবে,—কেন, আমি কি চোর না কি? আমার কেউ নেই বলে, আমাকে এত কথা বলে যাবে? কিসের জন্যে

আমি এত সহ্য করতে যাব ভাই মেজদি? নিজে এ সময় বসে রইলেন কলকাতায়,—আমি কিসের জন্যে তাঁর জিনিস আগলাতে বসি? সে কথা কি বুঝবে? উল্টে, দেখো, যখন বাড়ী আসবে, আমায় যদি সাত ঘা ঝাঁটার বাড়ী না মারে, আমি বাপের বেটীই নই। আমার এত কিসের দায় ভাই মেজদি, আমি কার জন্যে লোকের নিন্দে সই, কার জন্যে আমি—"বলিতে-বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল,—সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুলতা প্রবোধ দিয়া বলিল, "তা তো সত্যিই ভাই সেজবউ! ওই যে কথায় বলে, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর—তোমার হয়েছে ভাই তাই। সেজঠাকুরপো যদি আমাদের মত এঁর মত হতেন, তা হলে ভাবনাটা কি ছিল তোমার! তাঁকে হাজার বোঝাও, তবু কি যে এক-রোখা তিনি,—নিজের জেদ যদি ছাড়েন। এবার পাখী পড়ানোর মত করে বুঝিয়েছি, চোখে আঙ্গুল দিয়ে সব দেখিয়েছি; এতেও যদি তিনি না বোঝেন, তবে আর কি করে বোঝান যায় বল? মানুষ বটে আমাদের ইনি। একবার একটু বললে, সব বুঝতে পারেন। যাক ভাই সেজবউ, অনর্থক কেঁদে আর কি কর্ব্বে বল? তুমি ত তাঁর পক্ষ নিয়ে দাঁড়াও; তার পর ইচ্ছে হয় তিনি নেবেন, না ইচ্ছে হয় ভাইদের দান করবেন।"

পূর্ণিমা চোখ মুছিতে-মুছিতে বলিল, "তিনি নিজে এসে যা হয় করলেই হ'তো; আমায় তো তা হলে এত ঝক্কি সইতে হত না, এত কথাও শুনতে হত না। কথা ত নয়, যেন ক্ষুরের ধার। সে চাল চিবিয়ে, দাঁতের পর দাঁত রেখে কথা যদি তুমি শুনতে ভাই মেজদি, তা হলে কি যে করতে, বলতে পারি নে। আমি না কি নেহাত হাবা মেয়ে, কথা বলতে পারি নে গুছিয়ে—তাই চুপ করে গেছি।"

উৎসুক হইয়া সুলতা বলিল, "কে—কার কথা বলছ?"

পূর্ণিমা বিকৃত মুখে উত্তর করিল, "ওই ছোটঠাকুর-পো।"

সুলতা বিরক্ত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। জানছি, এবার একটা কিছু করবে সে। না হোক হাজারবার তোমার মেজঠাকুরকে বলেছি, ওরা দু' ভাই যা খুসি তাই করুক,—তোমরা দু' ভাই পৃথক হয়ে যাও। তা না, সে খবর আগেই সকলকে জানানো চাই। আমি বলছিলুম, বটঠাকুর যখন একটুও আপত্তি না করে অমনি রাজি হলেন, তখন আগে ভাগ-বখরাটা করে নাও; তার পর সে বাড়ী এসে যা খুসি তাই করবে। ভাইদের পরে বড্ড ভালবাসা। দেখে-দেখে সত্যি ভাই সেজবউ, গা যেন জ্বলে যায় আমার।"

সে এমন ভাবে মুখ বিকৃত করিল, যেন না জানিতে পারিয়া কাঁচা লঙ্কায় কামড় দিয়াছে।

পূর্ণিমা নিজের দুঃখেই অভিভূত, সুলতার সব কথা তাহার কাণেও গেল না। নিজের মনেই সে বলিয়া চলিল, "ইস্, তেজ কত, দর্প কত! বলে কি না, দূর হয়ে যাও, এখানে থাকতে হবে না। বল তো ভাই মেজদি, কেন দূর হব আমি? অধিকার নেই কি আমার কিছুতে? সমান চার ভাগের এক ভাগ পাব আমি, অমনি যাব? এত তেজ কখনও থাকবে না, কখনও থাকবে না। সূর্য্যিদেব এখনও আকাশে উঠছে, এখনও দিনরাত হচ্ছে,—আমি যদি ভাল হই, এর ফল পেতে হবেই হবে। ও ছোঁড়াটাকে আমি চিনি নে? প্রতিভা ছুঁড়ির সঙ্গে কত হাসি, কত কথা,—সে আর কে না জানে? ঘরের কথা পরের কাছে এ পর্য্যন্ত ভাঙি নি। এবার যদি সব কথা না বলি, তবে আমার নামই পূর্ণিমা নয়।"

"মেজ বউদি, ঘরে যেতে পারি এখন?"

শৈলেনের কণ্ঠস্বর কাণে আসিবামাত্র, পূর্ণিমা সোজা হইয়া বসিল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ভীত ভাবে বলিল, "ওই এসেছে ভাই মেজদি,—এখন আমি কি করি?"

সুলতা বলিল, "কি আবার করবে? যেমন বসে আছ, তেমনি থাক।"

পূর্ণিমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না ভাই মেজদি, আমি পালাই। একে তোমার কাছে আমায় দেখলেই নানা কথা বলে,—তাতে আমি যে করে চেঁচিয়ে কথা বলেছি, যদি শুনে থাকে,—"

ভ্রূভঙ্গি করিয়া সুলতা বলিল, "অত ভয়টা কিসের? হক্ কথা বলেছ, তাতে ভয় করবার মত তো কিছুই দেখছি নে। বস না কেন চুপ করে, আসছে আসুক, কি বলবে বলে যাক। আর, কি-ই বা বলবে, বলবে তোমরা পৃথক হয়ো না, একত্র থাক।"

দ্বারের পানে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে সে বলিল, "ওমা, আজ

আবার নূতন ফ্যাসান যে ঠাকুরপো? আসবার জন্যে আবার অনুমতি চাইবার দরকার কি ভাই? তোমার যখন ইচ্ছে হয় তখনই তো এস,—কোন দিন কিছু তো বল নি।”

গৃহে প্রবেশ করিতে-করিতে শৈলেন গম্ভীর মুখে বলিল, “আর সে দিন নেই মেজ বউদি,—সময়ে ঢের পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। আজ কাল পারমিশন না নিয়ে এক পা এগুলে, অনধিকার প্রবেশ বলে গণ্য হয়ে যায়। কোর্টে এ রকম ঢের কেস হচ্ছে, তাই ভয় হয়।”

সুলতা বলিল, “আমার এখানে তোমার আসা কোন দিনই তো আনঅথরাইজড বলে গণ্য হয় নি ঠাকুরপো। যা হোক, এলেই যখন, বসো এই চেয়ারখানাতে।”

“বাঙ্গালীর ছেলের চেয়ারে বসা মানায় না, মাটিতে বসাই ভাল” বলিয়া শৈলেন মাটিতে বসিয়া পড়িল।

“ওমা, তাও না কি হয় কখনও? একখানা আসন এনে দি” বলিয়া সুলতা উঠিতেছিল; শৈলেন বাধা দিয়া বলিল, “থাক, আসন দিতে হবে না। পাঁচ দশ মিনিট মাটিতে বসলে কিছু ক্ষতি হবে না। এখন আমি তোমায় কয়টা কথা বলতে এসেছি,—বোধ হয় আগেই শুনেছ তা’?”

বিস্ময়ের ভান করিয়া সুলতা বলিল, “আগেই শুনব কি করে?”

“কেন, সেজবউদির কাছে” বলিয়া শৈলেন পূর্ণিমার পানে চাহিল। পূর্ণিমার শুভ্র মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল “কি বলেছি আমি, ঠাকুরপো?”

শৈলেন মাথা নাড়িয়া বলিল “না, তুমি কিছু বল নি। যাক, কিছু বলেছ কি না জানবার জন্যে আমি আসি নি। আমি তোমাকেও যা বলেছি, মেজবউদিকেও তাই বলে যাব। রাগ করো না মেজবউদি,—আমি যা বলছি, তা সকলের ভালর জন্যেই বলছি,—আমার তাতে কোনও স্বার্থ নেই। আচ্ছা, সত্যি বল দেখি, এই যে তোমরা সব পৃথক হচ্ছ, এটা কি ভাল হবে? এক সংসারে থাকা কি তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না?”

সুলতা চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, “আমরা পৃথক হতে চাচ্ছি, এ ডাহা মিথ্যে কথাটা কে বললে তোমার কাছে, ভাই ঠাকুরপো? আমরা মেয়েমানুষ, বিষয়-সম্পত্তির কি বুঝি আমরা বল দেখি? একত্র থাকলেও সেই খাব, পরব—পৃথক হলেও সেই খাব, পরব। পৃথক হওয়ার উপকারিতা অনুপকারিতা আমরা কি বুঝি ভাই ঠাকুরপো? আমাদের মিথ্যে দোষ দেওয়া। বাস্তবিক আমরা নির্দ্দোষী; পৃথক হবার কথা কিছু জানি নে।”

এই নির্জ্জলা মিথ্যা কথাটা শুনিয়া শৈলেনের অধরে একটু হাসি নিমেষের তরে ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। সুলতা ও পূর্ণিমা যে কতদূর ভালমানুষ, তাহা জানিতে সংসারের কাহারও বাকি ছিল না। মেজদাদা যে সুলতার হাতের পুতুল মাত্র, তাহা শৈলেন জানিত। সেজদাকেও সে চিনিত। সেজদা যে কি চোখে পূর্ণিমাকে দেখিত, তাহাও সে জানিত। তথাপি কেন যে সেজদা পৃথক হইতে চায়, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, বাস্তবিকই সে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শৈলেন বলিল “বেশ, তোমরা যেন এর কিছুই জান না,—তা হলে এ সব করছে কে?”

সুলতা বলিল “তোমার দাদারাই সব জানেন ভাই। তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি সবই পাবে তাঁদের কাছে। আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করার চেয়ে তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। তোমার সেজদা যেন এখানে নেই,—কিন্তু মেজদা তো এখানেই আছেন।”

রুষ্ট হইয়া শৈলেন কহিল, “ওসব ভালমানুষী আমার কাছে চলতে পারে না মেজবৌদি। মেজদাকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমায় যা বলবেন, তা’ আমি বুঝতে পারছি। তুমি দড়ি যখন যে দিকে ফিরাচ্ছ, তিনি সেই দিকেই ফিরছেন; তুমি যে কথা বলাচ্ছ, তিনি তাই বলছেন। ও সব চালাকি কার কাছে করতে এসেছ বউদি? আমি কি লোক না চিনেই তোমাদের কাছে এসেছি।”

সুলতা রাগিয়া উঠিল; বলিল, “বেশ তো, তাই যদি জেনে থাক, তবে তো কথাই নেই। এর জন্যে বলতে আসবার দরকার কি?”

সংযত কণ্ঠে শৈলেন বলিল, “যথেষ্ট আছে। আমি দেখছি, এটা তোমার ইচ্ছাতেই হচ্ছে।”

সুলতা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, “বেশ। তার পর?”

শৈলেন বলিল, “তুমি সকলকে পৃথক না করে ছাড়বে না!”

সুলতা তেমনি ভাবে বলিল, "তার পর ?"

অতিরিক্ত রাগিয়া উঠিয়া শৈলেন বলিল, "তার পর আমার মাথা।"

সুলতা ধীর ভাবে বলিল, "পাগলামী কোরো না ঠাকুরপো ; যা বলবে, সেটা বেশ করে ভেবে-চিন্তে বল।"

শৈলেন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, সত্যি মেজবউদি, এ কাজ তোমার অজ্ঞাতসারে যদি হয়ে থাকে,—আমি জানিয়ে যাচ্ছি তোমায়, এ কাজ হতে দিয়ো না। একত্র থাকায় কতটা শান্তি, তা এখনও কেউ বুঝতে পারো নি, আমি সেটা বুঝিয়ে দিতে চাই। বড়দার কথা একবার ভাব দেখি। সেই যে মানুষটা জন্মাবধি খেটে এ সংসার পাতিয়েছেন, এ সব সঞ্চয় করেছেন, এ কি আমাদের জন্যেই নয় ? তাঁর ইচ্ছা, আমরা যেন একত্র থাকি, আমরা যেন পৃথক না হই। তাঁর মুখের পানে আমি যে চাইতে পারছি নে মেজবউদি ; আমার সেই দাদাকে তোমরা এমন করলে কি করে ?"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। সুলতা নরম সুরে বলিল, "সত্যি কথা বলছি ভাই ঠাকুরপো, আমি বেশী কিছু জানি নে। কাণে যেটা নেহাৎ এসে পড়ে, বাধ্য হয়ে সেটাই শুনে যেতে হয়। আমি সকলকে বুঝাতে চাই, কেউ যদি না বোঝে, আমি কি করব বল। তোমরা অনর্থক আমায় দুষছ ভাই।"

শৈলেন এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, অভিমান-ভরা সুরে বলিল, "থাক, যথেষ্ট হয়েছে মেজবউদি, আর দরকার নেই। আমি সবই বুঝতে পেরেছি,—আর বেশী করে বুঝতে চাই নে। তোমাদের যা খুসি, তাই কর তোমরা। তোমরা দুজনে পৃথক হতে চাও, হও গিয়ে,—আমি কখনও বড়দার সঙ্গে পৃথক হতে পারব না।"

নৃপেন বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। হাতের ছড়িটা এক কোণে রাখিয়া বলিল, "কি বলছিস রে শৈলেন ?"

মেজ ভাসুরকে দেখিয়া পূর্ণিমা অবগুণ্ঠন টানিয়া, তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেল। সুলতা মাথায় কাপড় দিয়া ত্যক্ত বুনাটা তুলিয়া লইল।

শৈলেন রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল, "পৃথক হবার কথা বলছি। সত্যি বল দেখি মেজদা, এ কাজ কি ভাল হচ্ছে ? বউদিরা না জানুক, তুমি তো জান মেজদা, বড়দা আমাদের কি ? তুমি তো জান, নিজে না খেয়ে তিনি আমাদের খাইয়েছেন ? সেই বড়দাকে পৃথক করে দিয়ে মরণাধিক যন্ত্রণা দেওয়া কি আমাদের উচিত কাজ হবে ?"

নৃপেন একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া, সিগারেট ধরাইতে-ধরাইতে বলিল, "সে কাজ ভাল কি মন্দ, তা জানবার জন্যে তো তোকে ডাকি নি শৈলেন। ডেকেছি, তোর নেয্য অংশ গ্রহণ করবার জন্যে। নিতে হয় নে, না নিতে হয় ফেলে দে,—বস, ফুরিয়ে গেল! আমার ইচ্ছে আমি পৃথক হব, তোর তাতে এত লেকচার দেবার মানে কি ? এক সংসারে আমার বনবে না বলেই আমি পৃথক হতে চাচ্ছি।"

শৈলেন বলিল, "এক সংসারে বনবে না কেন ? এখনও অনেক সংসার আছে—"

বাধা দিয়া নৃপেন বলিল, "সে সব কথা রেখে দে তুই। বাংলার মধ্যে কয়টা জয়েণ্ট ফ্যামিলি আছে, দেখিয়ে দে দেখি! একত্র থেকে অপমান, লাঞ্ছনা ভোগ করার চেয়ে পৃথক হওয়া ভাল।"

শৈলেনের হৃদয়খানা জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি সে বাহ্যিক শান্ত ভাব দেখাইয়া বলিল, "কি অপমান, লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় তোমাকে ? আমি নিজকে দিয়েই তো দেখছি—দিব্য রয়েছি, কোনও কষ্ট নেই, কেউ একটা কথাও বলে না। আর বললেই বা কি ? সংসার তো পরের নয়, সংসার আমাদেরই, বউদের তো নয়।"

নৃপেন বলিল "তুই একলা মানুষ, পুরুষ ছেলে। বাইরে থাকবি,—ভেতরে আসবি, চারটী খেয়ে আবার বাইরে যাবি। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের পার্থক্য ঢের, তা জানিস ? আমাদের কানেকশান বাইরের সঙ্গে, মেয়েদের কানেকশান ভেতরের সঙ্গে, গৃহস্থালীর সঙ্গে—যেখানে সর্ব্বদা অন্যের সংঘর্ষণ অনুভব করতেই হবে। সেখানে যদি দিনরাত ঝগড়া, বিবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা চলে,—কেমন করে স্থির থাকা যায় বল তো ? একদিন নয়, আধ দিন নয়, রোজ কি আর সেই একঘেয়ে কথা শোনা যায়, না সহ্য করা যায় ?"

শৈলেন বলিল "সংসারে তেমন ঝগড়াটে মেয়েই বা কে আছে মেজদা ? বকবার মধ্যে এক বকেন পিসীমা। তা তিনি বরাবরই আমাদের কারও অন্যায় দেখলে বকে

থাকেন, আজ নূতন কিছু বকেন নি। বাড়ীতে মেয়ে-ছেলেরা যা ইচ্ছে তাই করবে,—তিনি গিন্নি মানুষ হয়ে যদি সে সব সহ্য না করেন। বউয়েরা যদি বুঝে, একটু সহ্য করে চলেন, তা হলে অনর্থক এত ঝগড়া-বিবাদ চলে না বাড়ীতে।”

উত্তেজিত হইয়া নৃপেন্দ্র বলিল, “বকবেন, বকবার অধিকার আছে বলে, যা না তাই কি বলে যাবেন, আর ওরা বউ হয়ে এসেছে বলে কি নীরবে সে সব সহ্য করে যাবে? না শৈলেন, আমি অতদূর সাধু নই,—কাউকে অতদূর সাধু হবার উপদেশও দিতে পারি নে। জানি, এতে তোরা আমায় মন্দ বলবি; আরও কত কি বলবি। কিন্তু তা জেনেও আমায় এ রকম হতেই হবে।”

অধৈর্য্য হইয়া শৈলেন বলিল, “আমি যদি শক্ত হতেম দাদা, তা হলে ঘরোয়া বিবাদ কখনই হতে পারত না। আমি মেজবউদির মুখের সামনেই বলছি—যদি সংসারে একটা কথা হয়, উনি দশখানা করে এসে তোমায় লাগিয়ে যান।”

সুলতা দর্পিতা সর্পীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল “আমি!”

শৈলেন দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, “হ্যাঁ তুমি! শুধু তুমিই নও, মেয়ে জাতটার কথাও বলছি। তোমরা না পার, এমন কাজ কি আছে? যতদিন না তোমরা এসে দাঁড়াও আমাদের মাঝখানে, আমরা বেশ থাকি,—কোনও কথা আমাদের কাণে আসে না, দিন-রাত কেউ কাণের কাছে মন্ত্রণা দিতে থাকে না। কি অশুভক্ষণে তোমাদের বরণ করে নিয়ে আসি ঘরে, বলতে পারি নে। বছরখানেক যেতে না যেতে দেখতে পাব, যেখানে একটু অসন্তোষ ছিল না, যেখানে কেবল বিমল ভালবাসাই উথলে উঠেছে, সেখানে বিরাজ করছে কেবল অসন্তোষ, মুখ-ভার। যে ভাই ভাইয়ের জন্যে প্রাণ দিতে এগিয়ে যেত, সেই ভাই কি না ভাইকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। জানি নে বউদি, কি মায়াবিনী জাত তোমরা, কেমন করে আমাদের মনুষ্যত্ব গ্রাস করে ফেল। আমরা যদি তেমন শক্ত হতে পারি,—তোমাদের মায়া অনায়াসে তা'হলে কাটিয়ে উঠতে পারি, তোমাদের মুখ বন্ধ করে ফেলতে পারি। কিন্তু আমরাই যে মুগ্ধ। এই মেজদা একদিন বড়দার পায়ে একটু আঁচড় লাগলে অস্থির হয়ে পড়ত। একদিন বড়দার অসুখ করেছিল, অবস্থাটা একটু খারাপ হয়েছিল,—আমরা তিন ভাই সেদিন জল পর্য্যন্ত খাই নি, আমাদের তিনজনের চোখের জল সেদিন সমান বয়েছিল,—তিনটী হৃদয়ের প্রার্থনা একই দিকে চলেছিল। আজ কোথায় গেল সে দিন? এই কি সেই মেজদা—যার মুখে 'বড়দার' কথা ধরত না,—কেউ বড়দার সামান্য একটু নিন্দে করলে, বুক ফুলিয়ে তাকে মারতে যেত? এ পরিবর্ত্তন ঘটালে কে,—তুমিই না কি? তোমরা মায়ের জাতি, তোমরা আদর্শ; কিন্তু সবই যে হারিয়ে বসে আছ। তুমি যে মা হয়ে সকলকে বুকে টানতে পারতে, স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাতে পারতে, কিন্তু তুমি এ করছ কি? কেবল নিজের দিকই দেখছ,—পরের কষ্ট দেখতে একেবারে উদাসীন। ছি ছি, খুব ঘৃণা ধরিয়ে দিলে মেয়েজাতের ওপরে।”

সুলতার দুই চোখে আগুন জ্বলিতেছিল। স্বামীর দিকে ফিরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, “পৃথক হবে তুমি,—আমাকে এরা এত অপমান করবার কে? তোমার জন্যে এ অপমানের বোঝা বইতে আমি রাজি নই। তোমার যা খুসি তাই কর গে, আমি বিদেয় নিয়ে এই বিকেলের মেলেই বাপের বাড়ী চলে যাব। যদি না যেতে পারি, বাইরে গাছতলায় পড়ে থাকব, তবু যদি তোমাদের এ বাড়ী থাকি তো আমি বাপের মেয়েই নই। উঃ! এত অপমান? কিসের জন্যে সহ্য করব আমি?”

চোখ মুছিতে-মুছিতে সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। হাতের বোনাটা পা লাগিয়া ছিটকাইয়া শৈলেনের কোলের উপর গিয়া পড়িল।

নৃপেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুলতা বাহির হইয়া যাইবামাত্র, সে গর্জ্জিয়া উঠিল, “তুই বুঝি পিসীমার আর বড় বউদির কাছ হতে শিক্ষে নিয়ে ঝগড়া করতে এসেছিস শৈলেন? তোদের এই রকম ব্যবহারই তো আমায় পৃথক করছে। আমি কারও কথা শুনব না। রমেনের ইচ্ছে হয়, পৃথক হবে; না হয় নাই হবে। আমি ঠিক আজ বিকেলে ওকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হব। দাদার একটা পয়সা আমি চাইনে। যদি ও পয়সা আমি হাতে নি, তবে যেন—”

সে এমন কুৎসিত একটা দিব্য করিল যে, শৈলেন চমকাইয়া উঠিল! ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মাপ কর মেজ দাদা। ভাল ভেবে বুঝাতে এসেছিলুম, তাতে যে মেজ-বউদি এমন করে কেঁদে উঠে যাবেন,—তুমি এ রকম করবে, তা আমি ভাবি নি। যাই হোক, যদি কিছু অন্যায় বলে থাকি, তার জন্যে আমি মাপ চাচ্ছি। তোমরা যা খুসি তাই কর গে,—আমার তাতে কিছু আপত্তি নেই 'আর। 'আর কখনও যদি একটা কথা বলতে আসি, তা হলে বলো আমাকে।"

শৈলেন যেন অশ্রু গোপন করিতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। নৃপেন্ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বড় ভাল কথা বলেছিস তুই। যা না বলবার, তাই বলেছিস,—আবার ক্ষমা চাইতে আসছিস কোন মুখ নিয়ে?"

শৈলেন আর কথা কহিল না। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে-ধীরে বাহিরে আসিল। এখানে অশ্রু আর মানা মানিল না,—দুই গণ্ড বাহিয়া হঠাৎ গড়াইয়া পড়িল। আপনা-আপনি সে বলিয়া উঠিল, "এই সংসার!"

চোখ মুছিয়া দ্রুতপদে সে নীচে নামিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীঅনন্তকুমার সান্যাল তত্ত্বনিধি সাংখ্যবেদান্তরত্ন

ধর্ম্ম ধরতি লোকান্ ধ্রিয়তে পুণ্যাত্মভিরিতি বা ধৃ—মন্ (অর্ত্তিস্তুরু প্রিতি উন্ ১।১৩৯)। যদ্দ্বারা অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স্ সিদ্ধি হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। জৈমিনি কৃত মীমাংসা-দর্শনে দেখা যায়, তিনি ধর্ম্মের "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বচনের নাম "চোদনা"; অর্থাৎ আচার্য্য-প্রেরিত হইয়া যে যাগাদি করা যায়, তাহাকেই ধর্ম্ম কহে।

"য এব শ্রেয়স্কর স এব ধর্ম্ম শব্দেনোচ্যতে" (মীমাংসা ১।২ সূত্র-ভাষ্য) যাহা কিছু শ্রেয়স্কর, অর্থাৎ মঙ্গলজনক তাহার নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র সুহৃদ। মৃত্যুর পর কেহই অনুগমন করেন না; কেবল একমাত্র ধর্ম্মই অনুগামী হইয়া থাকে।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।"

(হিতোপদেশ ১।৫২)

এই ধর্ম্ম বর্ণভেদে ভিন্ন প্রকার। হয় ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণের অধর্ম্ম হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেই কার্য্যানুষ্ঠানই পরম ধর্ম্ম। বর্ণের অনুকূল কার্য্যই ধর্ম্ম; এবং বর্ণের প্রতিকূল কার্য্যই অধর্ম্ম। ব্যাঘ্র সাজে আসিয়া জীব-জন্তুর হিংসা করিলে, ব্যাঘ্র-ধর্ম্মেরই যাজনা করা হয়। আবার মানব সাজে আসিয়া নিয়ত হিংসা-বৃত্তির পরিচালনা করিলে, মানব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। সুতরাং সাজ অনুসারে কার্য্য করা উচিত। তাহা হইলেই দেখা যায়, বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মই বিভিন্ন। ঐ সকল বিধি অনুষ্ঠান না করিলে, আশ্রমের ধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হয়, এবং তাহাই তাহার পক্ষে অধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে; এবং এই চারি আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

"সর্ব্বেষামপি চৈতেসাং বেদ স্মৃতি বিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তিহি॥" (মনু)

এই চারি আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ। কারণ গৃহী, ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও যতি এই তিন আশ্রমবাসীকে ভিক্ষাদি দ্বারা পোষণ করিয়া থাকে। যেরূপ নদ ও নদী সমুদ্রে যাইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ ঐসকল আশ্রমবাসীরাও গৃহস্থাশ্রমী লোকের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করে। এই চারি আশ্রমবাসীদিগেরই দশবিধ ধর্ম্ম আছে।

"চতুর্ভিরপি চৈ বৈ তৈ নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্ম সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥
দশলক্ষাণি ধর্ম্মস্ত যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে।
অধীত্য চানুবর্ত্তন্তে তে যান্তি পরমাংগতিং॥

(মনু ৬।৯১-৯৩)

ধৃতি অর্থাৎ সন্তোষ, ক্ষমা, দম অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে মনের দমন, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। যে সকল দ্বিজ এই দশপ্রকার ধর্ম্ম পাঠ করেন এবং পাঠ করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমা গতি লাভ করিয়া

থাকেন। এই দশটী ধর্ম্ম সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমেরই—বুঝিতে হইবে। এই জন্ম প্রত্যেকেরই এই দশবিধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ধর্ম্মের দশটী অঙ্গ—ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও তপস্যা এই তিনের দ্বারা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়; এবং দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, সুশান্তি ও অস্তেয় ইহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়।

অদ্রোহশ্চাপ্য লোভশ্চ দমো ভূতদায় তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্য মনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ॥
সনাতনস্য সধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদং।" (মৎস্য পুরাণ)

অদ্রোহ, অলোভ, দম, জীবগণের প্রতি দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অনুক্রোশ, ক্ষমা ও ধৃতি এই সকল সনাতন ধর্ম্মের মূল।

সাধারণ ধর্ম্ম—

"শ্রাদ্ধকর্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ।
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসূয়তা॥
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ।"

শ্রাদ্ধকর্ম্ম, ব্রত অর্থাৎ স্নান, দান, পূজা, হোম ও জপাদি, সত্য, অক্রোধ, সর্ব্বদা স্বীয় পত্নীতে সন্তোষ, বিশুদ্ধতা, বিদ্যা, অসূয়ারাহিত্য, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই সকল সাধারণ ধর্ম্ম।

"যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং হি সন্ত্যাগমবেদিনঃ।
স ধর্ম্মো যং বিগর্হন্তি তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে" (বিশ্বামিত্র)

আগতমন্তজ্ঞ আর্য্যগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, এবং যাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাকে ধর্ম্ম কহে; এবং যে সকল কর্ম্মের নিন্দা করেন, তাহাকে অধর্ম্ম কহে।

নানা অর্থে এই ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা সংস্কৃত ভাষার শব্দ। সংস্কৃতে ইহা যে-যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বাঙ্গালা ভাষাতেও ইহা সেই-সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সংস্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে "ধর্ম্ম" শব্দের উল্লেখ আছে; যেমন :—

"ত্রিণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মানি ধারয়ন্।" (ঋক্ ১।২২।১৮)

অর্থাৎ পরমেশ্বর আকাশের মধ্যে ত্রিপাদ পরিমিত স্থানে ত্রিলোক নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের মধ্যে "ধর্ম্ম" সকল ধারণ করিয়াছেন। এস্থলে 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ জগন্নির্ব্বাহক নিয়মসমূহ।

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে "ধর্ম্ম কি?" ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া, মনু বলিয়াছেন যে, রাগদ্বেষপরিশূন্য বিদ্বান ও সাধুলোক যে সমস্ত নিয়ম সমাজে পালন করেন, তাহাই "ধর্ম্ম"। এই অর্থ হইতেই বর্ণাচার, আশ্রমাচার, সদাচার প্রভৃতি ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়।

পুরাণ, শাস্ত্রে ধর্ম্মের একার্থ দেখা যায় না। নানা স্থানে ধর্ম্ম শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপসংহারে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা যাইতে পারে।—

"অহিংসা লক্ষণো ধর্ম্মো হিংসা চাধর্ম্মলক্ষণা"
(মহাভারত)

"বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসাং গুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে॥"
(ধর্ম্মদীপিকা)

স্থূল কথা, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যের মঙ্গল হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। সুতরাং শাস্ত্র-সম্মত এমন কার্য্য করা আবশ্যক, যাহার ফলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় না।

"বেদ প্রাণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ"
(শ্রীভাগবতম্)

"বেদ প্রাণহিতং ধর্ম্ম কর্ম্ম তন্মঙ্গলং পরং"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি খঃ)

বেদঘোষিত যে সকল কার্য্য, তাহাই ধর্ম্ম; কারণ, বেদ সর্ব্বশাস্ত্রের জনক।

শাস্ত্র—"শিষ্যতেঽনেন ইতি শাস্ত্রং"। শাস্ত্র অর্থে শাসন বাক্য। যেমন পুত্রের মঙ্গলকামনায় পিতা সন্তানের শৈশব অবস্থা হইতেই তাড়না করিয়া থাকেন, তজ্জন্য "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ" ইত্যাদি মহাজন বাক্য দেখা যায়, সেইরূপ জনহিতপরায়ণ—ঋষিরা পাছে আমরা ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য কতকগুলি শাসন-বাক্য বা বিধি-ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

যখন আমরা কোনও ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন যদি আমাদিগকে কেহ বাধা প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা সহজে সেই ব্যক্তির কথা মানিতে চাহি না। তবে যদি তিনি এইরূপ কোনও ভয় প্রদর্শন করেন, যাহাতে আমাদের অনিষ্টের একান্তই সম্ভাবনা, তখন সেই ভয়ে আমরা আর ঐ কার্য্য করিতে সাহসী হই না। ধর্ম্মের জন্য যে সমস্ত শাসন-বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়, উহাও অনেকটা ঐ প্রকারের। আমরা সিপাই দেখিলে খুব ভয় পাই;—লালপাগড়ীর দোহাই না দিলে সহসা কোনও কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া বিধান-কর্ত্তারা বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে খারাপ কার্য্যের বিনিময়ে ভয় এবং সৎকার্য্যের ফল স্বরূপ সুখ ভোগের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে দুই চারিটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

"প্রতিপদি কুষ্মাণ্ডং নাশ্নীয়াৎ" এই নিষেধ-বিধি অনুসারে আমরা প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড খাই না। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, 'কেন মহাশয়? ইহাতে দোষ কি?' তখনই আমাদিগকে বলিতে হইবে "কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃস্যাৎ"। তবুও আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, 'এ নিষেধ-বাক্য কোথায় পাইলেন?' ইহার তাৎপর্য্য এই,—যদি কোনও প্রকারে এই বচনের লঘুত্ব প্রমাণ করিতে পারি,—ইহা পরিত্যাগ করিবার একটা সুযোগ পাই। কিন্তু যদি দেখি, তিথি-তত্ত্বের মধ্যে স্মৃতির বচনে দেখা যায়—

"কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাদ্ বৃহত্যাং ন স্মরেদ্ধরিং।
বহুশত্রুঃ পটোলে স্যাদ্ধন হানিস্তু মূলকে। ইত্যাদি"।

তখনই আর মুখে কথা থাকে না। ভালমানুষের মত সেইটী প্রতিপালন করিয়া থাকি। তখন আমরা মনে করি বা বিশ্বাস করি,

প্রোক্ত দিবসে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ না করিলে অবশ্যই শারীরিক বা মানসিক কোন উপকার আছে; অথবা ভক্ষণ করিলে কোনও না কোন অপকার আছে।

প্রভুর আজ্ঞা-বাক্যে ভক্ত সেবকের অটল বিশ্বাস ও ভক্তি থাকায় তাহারা যেমন—কেন, কি বৃত্তান্ত, অনুসন্ধান না করিয়া প্রভুর আজ্ঞা বহন করে, তেমনি শাস্ত্রভক্ত ব্যক্তিরাও শাস্ত্রবাক্যে অচল বিশ্বাস ও ভক্তি থাকায়, কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে নিবৃত্ত থাকেন। তিথিতত্ত্বে দেখা যায়, "চতুর্দ্দশ্যষ্টমীচৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা। পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেবচ। স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্ব স্বেতেষুবৈপুমান। বিষ্মূত্র ভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ।" তজ্জন্য আমরা "পর্ব্বাণি-মাংসং নাশ্নীয়াৎ" এই নিষেধ-বাক্য মানিয়া থাকি। এইরূপ বিধি-নিষেধ বাক্যের অভাব নাই।

এক দিকে যেমন বিধি-নিষেধ বাক্য আছে সেইরূপ অন্য দিকে বিধি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যও অনেক আছে। উহাও দুই একটী বলা যাইতে পারে। যথা—

"মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া।
তস্যাং পূর্ব্বাহ্ন এবেহ কার্য্যঃ সরস্বতোৎসবঃ॥"

(তিথিতত্ত্বম্)

এই প্রমাণ অনুসারে "পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েৎ" এই বিধি আমরা পালন করিয়া থাকি।

একাদশ্যাং উপবসেৎ" এই বচনানুসারে আমাদের একাদশীর দিন উপবাস করা বিধেয়। তাহার প্রমাণ—

"একাদশী সদোপোষ্যা পুত্র পৌত্র বিবর্দ্ধিনী—"
ভুঙক্তে যো মানব মোহাদেকাদশ্যাং সপাপকৃৎ"

(তিথিতত্ত্বম্)

আমাদের অমাবস্যায় পিতৃশ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা আছে। তাহার কারণ "নিরাশাঃ পিতরো যান্তিশাপং দত্বা সুদারুণং" ইত্যাদি। এই জন্য "আমাবস্যাং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ" এই বিধি আমরা মানিয়া থাকি।

"রোচনার্থা ফলশ্রুতি"—প্রবৃত্তি বা রুচি জন্মানই ফলবাদের, এবং অরুচি বা নিবৃত্তি জন্মানই নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য।

"পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলুতে খণ্ডলড্ডুকম্।
পিত্রৈব মুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু।"

পুত্রের আরোগ্য-কামী পিতা যেমন প্রলোভন দেখাইয়া আপন শিশু সন্তানকে তিক্তাস্বাদ ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত করান,—প্রজাবর্গের কুশল-কামী শাস্ত্রও তেমনি অজ্ঞ প্রজাদিগকে ফলাফলের লোভ দেখাইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা পান। বালক মোদকের লোভে তিক্ত ভোজন করে; কিন্তু পিতা তাহাকে মোদক প্রদান করেন না। এইরূপ শাস্ত্রও যোপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠাতাকে যথোক্ত ফল প্রদান করেন না। পিতার ইচ্ছা, পুত্র অরোগী হউক। সেইরূপ শাস্ত্রেরও ইচ্ছা, প্রজা সকল প্রথমতঃ সুখ ও স্বাস্থ্যলাভ করুক, পরে শান্তিলাভ করুক। পিতার প্ররোচনায় তিক্তাস্বাদ ঔষধ সেবন করিলে, পুত্র যেমন কেবল আরোগ্যই লাভ করে, মোদক পায় না, সেইরূপ শাস্ত্রের প্ররোচনায় শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে অবস্থান করিলে, মনুষ্য স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক কুশল লাভ করেন, লোভনীয় ফল প্রাপ্ত হন্ না।

ঋষিরা স্থির বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞানের দ্বারা জনসাধারণের হিতার্থ যে সমস্ত বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যাহাতে সম্যক রূপে প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্যই শাসন-বাক্যের অবতারণা। এই সমস্ত শাস্ত্র কালে গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে প্রচলিত হইয়াছে।

উরাঁওদের কথা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ,

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ছোটনাগপুর বিভাগের পার্ব্বত্য জাতিদিগের বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে যাহা আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই ইংরাজীতে। এই সকল জাতি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী হইলেও, কোন ভারতীয় ভাষায় ইঁহাদিগের বিষয়ে বিশদ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে আলোচনা হয় নাই। তাই, আজ এই কৃষ্ণকায় জাতিদিগের বিষয় 'ভারতবর্ষে' আনিয়া উপস্থিত করিলাম।

আমরা, অর্থাৎ আর্য্যবংশধরেরা যে আদিম কাল হইতে ভারতবর্ষের অধিবাসী নহি, তাহা এমন ভাবেই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে সে, বিষয়ের পুনরালোচনা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। আমরা যাহাদিগের হস্ত হইতে তাহাদের পৈত্রিক সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া, তাহাদিগের বুকে বসিয়া, তাহাদের উপর শত অত্যাচার করিয়া, আর্য্য সভ্যতার দোহাই দিয়া আসিয়াছি, সেই সকল জাতির মধ্যে উরাঁও অন্যতম।

অনেকেই হয় ত দেখিয়াছেন যে, আজকাল আমাদের বাংলাদেশে, কোনও-কোনও সময়ে এক জাতীয় কৃষ্ণকায় হৃষ্টপুষ্ট লোক বাগানে, মাঠে, রাস্তায়, কোদাল হস্তে কার্য্য করিতেছে; বা কার্য্যের অনুসন্ধানে ফিরিতেছে। তাহারা প্রায় সকলেই ছোটনাগপুরের অধিবাসী। তাহারা প্রায় সকলেই বাংলায় 'ধাঙড়' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষীয় অনার্য্য জাতিদিগের একটি শাখা—কুরুখ।

তাহারা ছোটনাগপুরে ঠিক কোন সময়ে আসে, তাহা নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। তবে খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহুকাল পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা ছোটনাগপুরে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাদের বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহা একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে তাহারা কোথায় ছিল, এ বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন পণ্ডিতদিগের মত হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা দেখাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ (Philologists) জাতিতত্ত্বের অনেক গূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়া বিশ্বজগৎকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের আলোচ্য উরাঁওদিগের ভাষার সহিত

দাক্ষিণাত্যের তামিলী প্রভৃতি ভাষায় অনেক ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা দ্রাবিড় (Dravidian) জাতীয় সমস্ত ভাষাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ম দ্রাবিড়, ২য় অন্ধ্র এবং তৃতীয় এতদুভয়ের মাঝামাঝি একটি শ্রেণী। তেলুগু, কন্দ, কুই প্রভৃতি ভাষা অন্ধ্র শ্রেণীর অন্তর্গত। মধ্যশ্রেণীর মিশ্রভাষা মধ্য ভারতবর্ষ, বেরার প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায়। আর দ্রাবিড় শ্রেণীর মধ্যে প্রধান তামিলী, কানাড়ী প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত দ্রাবিড়শ্রেণীর মধ্যে আরও কয়েকটি ভাষা আছে; উরাঁওদিগের 'কুরুখ' ভাষা তাহাদের মধ্যে প্রধান। Census report নামক গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে আছে—The latest authoritative opinion classifies the Dravidian Family of languages into two groups called respectively the Andhra and the Dravid with a third group intermediate between them * * * * * The Dravid group......includes Tamil, Kanarise, Malayalam and Tulu. It also includes several other languages the chief of which are Kuruk in the Chota-nagpur plateau spoken by the Uraons who have tradition of emigration from the south.

দ্রাবিড় শ্রেণীর একটি ভাষা বেলুচিস্থানের কোনও-কোনও স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই সামান্য। (১) এই ব্যাপার হইতে কোনও-কোনও পণ্ডিত বলেন যে, উরাঁওরা আর্য্য অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া মুণ্ডাদিগের (২) সহিত উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে ছোটনাগপুরের বনসমাকীর্ণ পার্ব্বত্য অঞ্চলে আসিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু উরাঁও ও মুণ্ডা জাতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর। বিশেষতঃ উরাঁও ও মুণ্ডাদিগের মধ্যে প্রচলিত জাতীয় কাহিনী এ কথা বলে না। তা ছাড়া, দ্রাবিড় শ্রেণীর অধিকাংশ জাতিই দাক্ষিণাত্যবাসী। কাজেই উক্ত মত ঠিক বলিয়া মনে হয় না। উরাঁও ও মুণ্ডা উভয়ের জাতীয় কাহিনী 'হর্দ্দির্দনগর,' 'পীপরগড়" প্রভৃতি স্থানের নাম করে বটে, কিন্তু সেইটুকু প্রমাণ অবলম্বন করিয়া অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস গড়িয়া লওয়া যায় না। বিশেষতঃ, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উরাঁওরা যখন ছোটনাগপুরে প্রবেশ করে, তখন মুণ্ডারা ছোটনাগপুরের অধিবাসী। তবে বেলুচিস্থানের প্রদেশের মত দূর অঞ্চলে দ্রাবিড়ভাষায় কথা বলে, এরূপ লোক থাকাও 'ভাষাতত্ত্বের' এখনও অনাবিষ্কৃত রহস্য। "Existence (দ্রাবিড় জাতির) in that distant spot (বেলুচিস্থান) is one of the greatest riddles of Indian Philology" (৩)

কেহ-কেহ উরাঁও জাতির নামের ইতিবৃত্ত হইতে ইহাদের প্রাচীন বাসস্থানের নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। Colonel Daltonএর মতে উরাঁওরা বহুকালপূর্ব্বে 'কোন কান' নামক অঞ্চলে বাস করিত; এবং কালক্রমে 'কোনকান' নাম হইতে 'কুরুখ' নামের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, 'কোনকান' কথা হইতে 'কুরুখ' শব্দের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক নয়।

প্রাচীনকালে, সাহাবাদ ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল সমূহের নাম 'করুখ' দেশ ছিল। শ্রীযুক্ত Hamilton সাহেব বলেন—Another Daitya Karak of those remote times is said to have had possession of the country between the Son and Karmanasha, which was then called Karukh Dhesh, অর্থাৎ প্রাচীন যুগের অপর একটি দৈত্য 'করাখ' সোন ও কর্ম্মনাশা নদের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে রাজত্ব করিত। সেই অঞ্চলের নাম 'করুখদেশ' ছিল। উরাঁওদিগের বাস এক সময়ে করুখদেশে ছিল। তাহার অনেক প্রমাণ আছে। উরাঁওরা যে পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে বাস করিত, উক্ত মত হইতে এমন কিছু প্রমাণ না হইলেও—আমরা এই কথা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে, উরাঁওদিগের বাস সাহাবাদ অঞ্চলেও এক সময়ে ছিল।

সমস্ত দ্রাবিড় জাতির প্রাচীন ইতিহাস এতই অস্পষ্ট যে, তাহা হইতে বহু প্রাচীন কালের বিষয় সঠিক নির্ণয় করা যায় না। যাহারা বেলুচিস্থান অঞ্চলের দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষা-ভাষীদিগের বিষয় হইতে এই সিদ্ধান্ত করিতে চান যে, উরাঁও প্রভৃতি সকল দ্রাবিড় জাতিই ঐ অঞ্চলে প্রথমে বাস করিত, এবং ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে আসিতে আরম্ভ করে, এবং মধ্য ভারতবর্ষ হইতে দাক্ষিণাত্যে ও পূর্ব্বাঞ্চলে চলিয়া যায়, তাঁহারা ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্যভাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান সমূহে দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্ব না থাকার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করেন না। দ্রাবিড় জাতির ভারতের বাহির হইতে ভারতে প্রবেশের কোনও প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। আর উরাঁওদিগের জাতীয় কাহিনী—যাহা তাহাদের পূর্ব্বকালের বিষয় আলোচনা করিবার প্রধান অবলম্বন—তাহা হইতে ভারতবর্ষের বাহিরের নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না।

কোনও-কোনও শিক্ষিত উরাঁও বলিয়া থাকেন, যে, এই জাতি প্রাচীন কালে 'কুর্গ' নামক অঞ্চলে বাস করিত; এবং কুর্গ নাম হইতেই 'কুরুখ' নাম হইয়াছে।

কোনও-কোনও পণ্ডিত বলেন যে, আধুনিক উরাঁওরা খুব সম্ভব প্রাচীন কালের বানরদের বংশধর। রামায়ণে বর্ণিত বানরেরা যে সত্য-সত্যই লোম-লাঙ্গুল-বিশিষ্ট শাখামৃগ ছিল, এ কথা সত্য বলিয়া কাহারও মনে হওয়া সম্ভব নয়। আর্য্যগণ সভ্যতা গৌরবে পৃথিবীর সমস্ত জাতি অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেন। তাঁহারা অনার্য্যদিগকে রাক্ষস, দৈত্য, বানর প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন। ভারতীয় কবি আরও একটু অধিক অগ্রসর হইয়া তাহাদের (অনার্য্যদের) কাহারও 'দশমুণ্ড', 'বিকৃত বদন', 'লাঙ্গুলযুক্ত' প্রভৃতি বিশেষণে মণ্ডিত করিয়া, নিজেদের দেওয়া নামগুলির সার্থকতা প্রদর্শন ও রক্ষা

(১) Census Report of India, Vol. I.

(২) ছোটনাগপুরের বন্যজাতি Kolerian শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) Census Report, Vol. I.

করিতেন। ইয়োরোপবাসী আর্য্যগণ প্রাচীন কালে অন্যান্য সকল জাতিকেই Barbarians প্রভৃতি নাম দিয়া আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেন। কাজেই, অনার্য্য জাতির কোনও শ্রেণীকে 'বানর' নামে অভিহিত করা ভারতীয় আর্য্যগণের পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ বানরদিগের বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে সম্বক্ত', 'প্রিয় দর্শন' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। বানরেরা সত্য সত্যই যে সম্বক্তা বা প্রিয়দর্শন নয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

In the Ramayan the Vanaras are described as a dusky cloud-coloured people (Kiskindhya Kando XXXVII, 5; XVII, 1) with large teeth (XXII, 24; XXVI, 4) and their men and women are represented as addicted to drink (ib XXXIII 38 ff ; XXXVII; 45) and as taking a great delight in singing to the sound of Mridanga or Mandal (ib XXVII, 27 ff). All these characteristics are to be met with in the Oraons of Chotanagpur in common indeed with many other Dravidian jungle tribes. (8)

রামায়ণে বানরেরা ঘন মেঘবর্ণের ও দীর্ঘ দন্ত-বিশিষ্ট জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে মাদক-প্রিয়। মৃদঙ্গ বা মাদল সহযোগে নৃত্য গীত করিতে তাহারা খুব ভালবাসে। উক্ত সমস্ত বিশেষত্ব ছোটনাগপুরের অধিবাসী উরাঁওদিগের মধ্যে অন্যান্য দ্রাবিড় জাতীয় বন্যলোকদিগের মত বর্ত্তমান।

তাহাদের প্রধান বাসস্থান কিষ্কিন্ধ্যা অঞ্চলে ছিল। কিষ্কিন্ধ্যা আধুনিক দাক্ষিণাত্য প্রদেশের কোনও অংশে অবস্থিত ছিল। যদি বানরগণ ও উরাঁওরা এক জাতীয় ধরিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে ইহাও প্রমাণ হয় যে, উরাঁওরা অতি প্রাচীন কালে দাক্ষিণাত্যেরই অধিবাসী ছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতও তাই।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, উরাঁওরা বহুকাল পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বত ও বন সমাকীর্ণ অঞ্চলে বাস করিত। পরে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য বিজিত হইলে, আর্য্যদিগের সহিত উত্তর ভারতে আসিয়া তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করে; এবং কালক্রমে করুষদেশ নামক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করে; এবং বাসস্থানের নাম হইতে 'কুরুখ' নাম অর্জ্জন করে।

পরে আর্য্য সভ্যতার বিস্তারের ফলে, এবং আর্য্য বা অন্য অনার্য্য জাতির সহিত সংঘর্ষের ফলে, তাহারা আরও পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়া, রোহতাস অঞ্চলে আপনাদিগের বাসোপযোগী স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, ও দুর্ভেদ্য মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকে। এই স্থানে কিছুকাল বাস করিবার পর, একদিন তাহাদের জাতীয় উৎসব 'সেরহুলের' রাত্রে যখন সকলে মদ্যপানে বিভোর, তখন অকস্মাৎ তাহারা বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, নিশাযোগে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়; ও ঘুরিতে ঘুরিতে ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রবেশ করে। যাহারা রোহতাস হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি ঐ অঞ্চলেই বাস করিতেছে।

তাহারা নিজেদের রোহতাস হইতে পলায়ন ও ছোটনাগপুরে আসিবার বিবরণ এইরূপে বর্ণনা করে—যখন প্রাচীন কুরুখ জাতি রোহতাস অঞ্চল অধিকার করিয়া সেই প্রদেশেই বাস করিবার কল্পনা করে, তখন তাহারা এখনকার অপেক্ষা অধিক কার্য্যকুশল ছিল। রোহতাস অঞ্চলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের নিরাপদ রাখিবার জন্য তাহারা রোহতাসে দুর্ভেদ্য মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করে, এবং তাহারই মধ্যে বাস করিতে থাকে।

কিন্তু কিছুকাল পরে তাহাদের কোনও শত্রু রোহতাস আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু দুর্গ এমনই দৃঢ় ছিল যে, শত্রুদল প্রথমে নিরাশ হইয়া পড়ে; এবং আক্রমণে নিবৃত্ত হইয়া ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাহাদের রাজবাটীর গোয়ালিনী দুর্গের আভ্যন্তরিক অবস্থা সমস্তই অবগত ছিল। যখন উরাঁওদিগের শত্রুদল ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত, সেই সময় দৈবদুর্ব্বিপাকে রাজবাটীর গোয়ালিনীর সহিত তাহাদের পরিচয় হয়; এবং তাহারা গোয়ালিনীর শরণাপন্ন হইয়া তাহাকে উৎকোচে বশীভূত করে।

গোয়ালিনী তাহাদিগকে সংবাদ দেয় যে, দুর্গ অতি সতর্কতার সহিত সংরক্ষিত হইলেও, দুর্গে প্রবেশ করা একেবারে অসম্ভব নয়। কারণ, দুর্গ প্রবেশের গুপ্তদ্বার অনেক। কিন্তু সহজ অবস্থায় গুপ্তদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ অসম্ভব। 'সেরহুল' উৎসব সমীপবর্ত্তী। সেই সময় উরাঁওরা সকলেই মদ্যপান ও নৃত্যগীতে উন্মত্ত থাকিবে। যদি সেই সুযোগে দুর্গে প্রবেশ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের সহজেই পরাজিত করা যাইতে পারে।

শত্রুদল সেরহুল পর্ব্বের রাত্রে গোপবালাকে সম্মত করাইয়া, তাহাকে গুপ্তদ্বার দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। সেই রমণী দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া তোরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া নিজে পলায়ন করে। শত্রুগণ নৈশ অন্ধকার ও দুর্গাধিবাসীদিগের উৎসবানন্দের সুযোগে সদলে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে। তেমন অবস্থায় শত্রুর সম্মুখীন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বুঝিয়া, উরাঁওরা সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া পলায়ন করে। কথিত আছে যে, উরাঁও স্ত্রীলোকেরা শত্রুদিগকে যুদ্ধ দান করিয়াছিল। কিন্তু শত্রুদের প্রতিহত করিতে অসমর্থ হইয়া, সুড়ঙ্গ-পথে পলায়ন করিয়া অন্যান্য সকলের সহিত মিলিত হয়।

শত্রুগণ শূন্য পুরী অধিকার করিয়া উরাঁওদিগের অনেক অনুসন্ধান করে ও তাহাদের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই নৈশ কোন অন্ধকারে পথে যে তাহারা পলায়ন করে, তাহা কিছুতেই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই।

(৪) Mr. S. C. Roy M. A.—Oraons of Chotanagpur.

শত্রু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া উরাঁওরা নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে থাকে; এবং অবশেষে দুইটা দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্রতর দলটা গঙ্গানদীর তীরে-তীরে গিয়া রাজমহলের পার্ব্বত্য অঞ্চল আবিষ্কার করিয়া বাস করিতে থাকে; এবং কালক্রমে 'মালী' বা 'মালের' নামে পরিচিত হয়। বৃহত্তর দলটি উত্তর কোইল নদীর উপকূল ধরিয়া পালামৌ জেলার মধ্য দিয়া রাঁচী জেলার বন্য ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং কালে উরাঁও নাম ধারণ করে।

——o——

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-পরীক্ষা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় এম-এ

আমরা সাংসারিক নানা কাজে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা করিয়া লইতে বাধ্য হই। কখন বলি, লোকটা বোকা। কখনও বলি, লোকটা বোকাও নয়, খুব বুদ্ধিমানও নয়। আবার কখনও বলি, লোকটা বেশ বুদ্ধিমান। এ ছাড়া বোকা, বুদ্ধিমান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিবার সময় আবশ্যক মত ইহাদিগকে নানাপ্রকার বিশেষণে বিশেষিত করিয়া লইতেও আমাদের মোটেই আটকায় না। যখনই এইরূপ মতামত প্রকাশ করি, তখনই নিশ্চয় আমাদের মনে বুদ্ধিমত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকে। কিন্তু এই ধারণাটা কি, তাহা যদি অপর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে বেশ একটু গোলমাল বাধিয়া যায়। একই ব্যক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায়, ও বিভিন্ন আবেষ্টনের মধ্যে অনেক সময় ভিন্ন-ভিন্ন মত প্রকাশ করা, এবং একই ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে একই সময়ে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকার ধারণা,—আমরা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে করি না। এইরূপ নানা দিক দিয়া বিষয়টা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, সাধারণতঃ বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিরূপ অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, অনিশ্চিত, ও অনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এইরূপ অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট ধারণা লইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হয়, এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া লৌকিক ও সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অনেক সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। একটী উচ্চ পদের জন্য একজন কর্ম্মচারী আবশ্যক; এবং এই কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের উপর অনেক লোকের কল্যাণ নির্ভর করিতে পারে। নিয়োগকারী পদপ্রার্থীদিগকে নিজের সহিত দেখা করিতে বলিলেন। তাহাদের সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা সংগ্রহ করিলেন; এবং সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়া, একজনকে এই কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। বুদ্ধিমত্তা ভিন্ন অপরাপর গুণাবলীও এই পদের জন্য আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু যে ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যক্তিবিশেষকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, সেই ধারণাটী অনেক বিষয়ে অস্পষ্ট, অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু এরূপ অবস্থাতে এই ধারণার লৌকিক ও সামাজিক মূল্য কম নয়।

এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময়ে পরীক্ষার দ্বারাও নির্ব্বাচন-কার্য্য সম্পাদিত হয়, এবং পরীক্ষাই নির্ব্বাচনের উৎকৃষ্টতম প্রণালী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক মূল্যই বা কিরূপ, তাহার সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাউক। পরীক্ষা অনেক সময় অর্জ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা, এবং সকল সময় ভগবৎ-দত্ত স্বাভাবিক শক্তির পরীক্ষা নয়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অর্জ্জিত জ্ঞান স্বাভাবিক শক্তির উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে; কিন্তু পরীক্ষার ভিতর দিয়া অর্জ্জিত জ্ঞান ও স্বাভাবিক শক্তির অপব্যবহারের উপায়গুলি এত সুপরিচিত, যে, সে সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। বুদ্ধিমান ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগেরও অনেক সময় এরূপ অর্জ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষায় নিকৃষ্টবুদ্ধি বলিয়া বিবেচিত হওয়া অসাধারণ ব্যাপার নয়; এবং বিভিন্ন পরীক্ষকের নিকট, অথবা একই পরীক্ষকের নিকট বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায়, একই ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার ফল প্রদর্শন করাও একটা অদ্ভুতপূর্ব্ব দৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই সকল কারণে বেশ বুঝা যায় যে, পরীক্ষা দ্বারাই হৌক, আর ধারণার সাহায্যেই হৌক, বুদ্ধিমত্তার বিচার এখনও এরূপ ব্যক্তিগত মানসিক ব্যাপার যে, তাহাদের ফলাফলকে খুব বড় রকমের বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে প্রভূত আপত্তি বর্ত্তমান।

সাংসারিক নানা কাজে বুদ্ধিমত্তা ভিন্ন আরো অনেক বিষয়ে আমরা এরূপ ব্যক্তিগত ধারণার উপর নির্ভর করিয়া চলাই সুবিধাজনক মনে করি। কিন্তু এই ব্যক্তিগত ধারণাকে একটা বাহ্য আদর্শের সহিত মিলাইয়া লইবার উপায় ও অবসর অনেক ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান। বাজারে একটা বড় মাছ দেখিলাম। মৎস্যবিক্রেতা তাহার দাম চাহিল তিন টাকা। আমি আন্দাজ করিলাম, মাছটা ছয় সের হইবে, এবং তিন টাকায় ঠকা হইবে না। তাজা রুই মাছটীও আমার রন্ধনশালার সম্মুখে উপস্থিত হইল। এরূপ নানা কাজেই মানসিক ধারণাই আমাদের কর্ম্ম-পরিচালক। কিন্তু এরূপ ধারণার সত্যতাসত্যতা অনায়াসেই বাহ্য পরিমাণের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। গুরুত্বের পরীক্ষায় মণ সের, দৈর্ঘ্যের পরীক্ষায় মাইল গজ, ইত্যাদি, নানা বাহ্য পরিমাণক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল বিষয়ে ব্যক্তিগত মানসিক ধারণা এরূপ বাহ্য উপায়ে পরখ করিয়া লইবার সুবিধা থাকে, সেইখানে অনেক ক্ষেত্রে এই ধারণাই কর্ম্ম-পরিচালক হইলেও, বাহ্য আদর্শ বা পরিমাণই বিষয়গুলির সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ও নিশ্চিত মতামত গঠন করিবার শ্রেষ্ঠতম উপায়।

ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আমাদের মানসিক ধারণা যদি কোন উপায়ে একটা বাহ্য-নির্দ্দিষ্ট আদর্শের সহিত প্রয়োজন মত তুলনা করিবার ও মিলাইয়া লইবার উপায় হয়, তাহা হইলে এই ধারণাগুলির ব্যবহারিক সার্থকতা যে বর্দ্ধিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধিমত্তার এই ব্যক্তিগত ধারণা আমাদের জীবনে অনেক প্রয়োজনে আসে; এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এই ধারণাগুলির দ্বারা অনেক গুরুতর ব্যাপার পরিচালিত হয়। মানব-শিক্ষার দিকে

দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদিগের বুদ্ধিমত্তার যথার্থ ও নির্দ্দিষ্ট ধারণা কিরূপ প্রয়োজনের বস্তু। অধ্যাপনায় সিদ্ধিলাভের সর্ব্বপ্রথম কথা—শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের এবং তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্বের পরিচয় লাভ। যে ছাত্রটীকে আমি শিক্ষা দিতে যাইতেছি, তাহার সহিত আমি যদি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত না হই, তাহা হইলে আমার ও আমার ছাত্রটীর ভিতর ভাবের যথার্থ আদান-প্রদান সম্ভব হইবে না। ছাত্রটী সজ্ঞানে আমাকে শিক্ষক বলিয়া আমার স্নেহ ও সৎইচ্ছা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমাকে শ্রদ্ধা করিবে; এবং আমিও তাহাকে ভাল করিয়া জানিয়া তাহার শক্তি সামর্থ্যের সহিত পরিচিত হইয়া, কায়-মনোবাক্যে তাহার উপকারের চেষ্টা করিব,—আমাদের উভয়ের ভিতর যদি এই সম্বন্ধ স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে আমার অধ্যাপনা যতই উন্নত হৌক না, তাহা পরিপূর্ণ ফলপ্রদ হইবে না। শিক্ষকের দিক দিয়া শিক্ষককে বিশেষ ভাবে ছাত্রটীকে জানিতে হইবে। ছাত্রটীর বুদ্ধিমত্তা তাহার জীবনের পরিপূর্ণ অংশ না হইলেও, শিক্ষার যে এটী খুব আবশ্যক অংশ, এবং এই বুদ্ধিমত্তার সহিত যথার্থ পরিচয় যে তাহাকে জানার ষোল-আনা অংশ না হইলেও খুব একটী উৎকৃষ্ট অংশ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। বুদ্ধিমত্তার উপর মনুষ্য-জীবনের সকল অংশ নির্ভর না করিলেও, জীবনের অনেক শুভাশুভ, অনেক ভালমন্দ যে এই শক্তি উপর নির্ভর করে, তাহা একটী প্রমাণিত সত্য। এই কারণে এই বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে যদি একটী বাহ্য আদর্শের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট ধারণা গঠন করিয়া লইবার উপায় হয়, তাহা হইলে জীবনের নানা প্রয়োজনে, এবং বিশেষ ভাবে শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে যে একটী উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

জড়-জগতে এরূপ বাহ্য আদর্শ বিভিন্ন প্রকার পরিমাণ-ক্রম (measuring scale), এবং বিভিন্ন পরিমাণের একক (unit)। প্রাকৃতিক জগতে বিভিন্ন ভূতশক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলি স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইবার নিমিত্ত, এরূপ নানা প্রকার একক উদ্ভাবিত হয়। সংখ্যা, ভার, দৈর্ঘ্য, বিস্তার, গতি, ঘাত, প্রতিঘাত প্রভৃতি নানা প্রকার জড় ধর্ম্ম পরিমাণের জন্য আমরা ভিন্ন-ভিন্ন আদর্শের সাহায্য গ্রহণ করি। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী বুঝিবার সুবিধা হইবে। একটী বালির স্তূপে কত বালি রহিয়াছে, তাহা আন্দাজে বলা যায়। কিন্তু যে গাড়োয়ানেরা এই বালিগুলি বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহাদিগকে যখন পারিশ্রমিক প্রদান করিতে হয়, তখন বালির স্তূপটাতে কত মণ বালি আছে, অথবা এই স্তূপটার ঘনফল (cubic area) কত, তাহা যদি নির্দ্ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার নিজের ও গাড়োয়ানের বিশেষ সুবিধা হয়। ঘনত্ব ও গুরুত্বে এককই এখানে বাহ্য পরিমাণের সহায়। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটী বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে একটী পুষ্করিণীর জল ছেঁচিয়া ফেলিতে হইবে। এই সম্পর্কে এই যন্ত্রটীর অশ্ব-শক্তির (horse power) অঙ্কটী আমার জানা থাকিলেই, এই চুক্তি রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। আমি যদি জানি, এই বাষ্পীয় যন্ত্রটী সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া কাজ করিলে প্রতি মিনিটে ৩৩ কোটী ফুট পাউণ্ড (foot-pound) বল প্রয়োগ করিতে পারে, অর্থাৎ ইহার অশ্বশক্তির অঙ্ক দশ হাজার, তাহা হইলে আমি চেষ্টা করিয়া পুষ্করিণীর জল মাপিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত জল বাহির করা যাইতে পারে কি না, তাহা পূর্ব্বেই হিসাব করিয়া লইতে পারি। একজন পূর্ত্তকর্ম্ম-বিশারদকে (Engineer) যখন রেলগাড়ীর যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটী নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে হয়, তখন আরো একটী কঠিন প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁহার যদি গাড়ীগুলির ভার ও গতির পরিমাণ পূর্ব্বেই জানা থাকে, এবং লোহার কড়ি ইত্যাদি যে সকল কলকব্জা তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদের প্রতিঘাত শক্তির (resistance) সহিত তিনি যদি নির্দ্দিষ্ট ভাবে পরিচিত থাকেন, তাহা হইলে এই গুলি ও আনুষঙ্গিক অপরাপর সুনিশ্চিত ধারণার সাহায্যে একটী উপযুক্ত সেতু নির্ম্মাণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয় না। বল পরিমাণের জন্য তাঁহাকে ফুট-পাউণ্ডের সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে প্রাকৃতিক শক্তি ও গুণাবলীর জটিলতা ও অনির্দ্দিষ্টতা যতই বর্দ্ধিত হয়, ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তুতন্ত্র পরিমাণ-ক্রমগুলিও ততই জটিল ও ততই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ভোল্ট্ (Volt), আম্পিয়ার্ (Ampere), ওম্ (Ohm), কুলম্ (Coulomb), ফুট-পাউণ্ড, অশ্বশক্তি প্রভৃতি ভৌতিক ব্যাপারের এককগুলি সংখ্যা, দেশ, ও কালের সুপরিচিত পরিমাণক্রমগুলি হইতে অধিকতর জটিল। কিন্তু বিজ্ঞান ও মানবের প্রয়োজন তখনই উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইবার সুযোগ লাভ করে, যখন বিভিন্ন ভৌতিকশক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন পরিমাণ-ক্রমের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত ধারণা গঠন করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। বিজ্ঞান যখন অঙ্কশাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই তাহার চরম উন্নতির উপায় হয়, এবং তখনই বিজ্ঞান বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (exact science)।

কিন্তু বুদ্ধিকে কি এরূপ বাহ্য বস্তুতন্ত্র পরিমাণক্রমের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করা সম্ভব? পরিমাণক্রম কেবল ভৌতিকজগৎ ও ভৌতিক পদার্থের গুণ বিষয়েই প্রযুক্ত হয়। সেই কারণে প্রশ্ন উঠিবে, বুদ্ধিও কি এইরূপ ভৌতিক পদার্থ বা ভৌতিক ধর্ম্ম, যে, বস্তুতন্ত্র পরিমাণ-ক্রমের সহায়তায় ইহার স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব হইবে? বুদ্ধি জিনিষটী কি—এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের ভিতর বহু মতান্তর পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের মতে অন্তঃকরণ আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতের সাত্ত্বিক গুণের বিকার, এবং 'বুদ্ধি "নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি"। মনও এইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তি,—সঙ্কল্প বিকল্প, অর্থাৎ অনিশ্চয়তাই ইহার পরিচায়ক লক্ষণ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে বুদ্ধি মনের বৃত্তি এবং ইঁহাদের অনেকে মনকে মস্তিষ্কের ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে মন একটী জড় পদার্থ, এবং বুদ্ধি একটী জড়-ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় না।

পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের জড় পদার্থ আবার ভারতীয় দর্শনের জড় পদার্থ হইতে অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপ পৃথক। বুদ্ধির স্বরূপ, পরিচায়ক লক্ষণ, ও সংজ্ঞা সম্বন্ধেও এইরূপ প্রভূত মতভেদ বিদ্যমান। সেই কারণে একটী প্রশ্ন উঠিবে, যে, বুদ্ধি পদার্থটী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যখন স্পষ্ট নয়, তখন তাহার পরিমাণ করা কিরূপে সম্ভব হইবে? কিন্তু এরূপ প্রশ্নের ভিতর একটী পরিষ্কার যুক্তির ফাঁকি বর্ত্তমান। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত; এবং সেই কারণেই এই অনির্দ্দিষ্টতা দূরীকরণের জন্য বাহ্য পরিমাণ-ক্রমের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। বুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যদি স্পষ্ট হইত, তাহা হইলে ইহার স্বরূপ নির্ণয়ে এবং ইহার সংজ্ঞা প্রদানে আমাদিগকে বড় একটা বেগ পাইতে হইত না। তাপ, তাড়িত ইত্যাদি ভৌতিক শক্তি আমরা বেশ বুঝি; কিন্তু এরূপ বুঝা সত্ত্বেও, ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলি বেশ পরিষ্কার ও সুনির্দ্দিষ্ট নয় বলিয়া, ইহাদের স্বরূপ নির্ণয় ও সংজ্ঞা প্রদানও খুব সহজ ব্যাপার নয়। এরূপ বাধা সত্ত্বেও, তাপের একক এবং তড়িতের পরিমাণ (quantity), প্রবাহ (current), বল (force), ও প্রতিঘাত (resistance) মাপিয়া দেখিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; এরূপ চেষ্টার ফলেই এই ভৌতিক শক্তিগুলির অসম্পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিতেছে; এবং ইহাদের স্বরূপ ক্রমে-ক্রমে সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। ইহারই অনুরূপ কারণে, বুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান ও ধারণা খুব অসম্পূর্ণ হইলেও, এবং ইহা একটী ভৌতিক পদার্থ কি আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ইহা অনিশ্চিত থাকিলেও, ইহার একটী বাহ্য পরিমাণ-ক্রম উদ্ভাবনের চেষ্টা যদি সফল হয়, তাহা হইলেও বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও স্পষ্ট, নির্দ্দিষ্ট, ও সুনিশ্চিত হইবার উপায় হইবে।

বুদ্ধিমত্তা বাহ্য বিষয় নয়—ইহা অন্তরের বৃত্তি। ইহার স্বরূপ নির্ণয় দুই উপায়ে সম্ভব হইতে পারে। যাঁহার বুদ্ধি, তিনি নিজে আত্মাবলোকনের (introspection) সাহায্যে এই শক্তিটীর সহিত পরিচিত হইতে পারেন; এবং শক্তিটী যখন বাহিরে প্রকাশিত হয়, তখন অপরেও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া খুব নিরপেক্ষ ভাবে আত্মাবলোকনের দ্বারা শক্তিটীর যথার্থ পরিচয় লাভ আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাহার উপর, আমি যখন ধী-শক্তি পরিচালনা করিতেছি, তখনই আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে শক্তিটীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। অর্থাৎ আমার সমগ্র মানসিক সত্তাকে একই সময়ে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, সেই সময়েই দুইটী ভিন্ন-ভিন্ন মানসিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। এরূপ চেষ্টা প্রভূত শক্তিসম্পন্ন, বিশেষজ্ঞ, পারদর্শী মনোবৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। সেই কারণে ব্যক্তিগত আত্মাবলোকনের সহায়তায় বুদ্ধির বাহ্য পরিমাণ-ক্রম দূরের কথা, বুদ্ধির স্বরূপেরও যথার্থ, নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান একরূপ অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় বুদ্ধির স্বরূপ নিরূপণে, ইহার বাহ্য প্রকাশের উপর নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত। এই বাহ্য প্রকাশ ব্যক্তি-বিশেষের কর্ম্মেন্দ্রিয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির ভিতর দিয়াই সম্ভব হয়। এবং ব্যক্তির পারিপার্শ্বিকের উপরও ইহা নানা প্রকার প্রভাব বিস্তার করে। একটী লোকের কথা শুনিয়া, রচনা পড়িয়া, সৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, কর্ম্মশীলতার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া, এবং এমন কি তাহার মুখ, চোখ, ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব দেখিয়া, অনেক সময় লোকটীর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। অন্তরের বুদ্ধি যখন বাহিরে সাড়া দেয়, তখন তাহার সহিত কতকটা পরিচয় ঘটে। মানুষের মধ্যে সজ্ঞাবস্থাতেই এরূপ সাড়া পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানের সংযত, পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া, নিজের পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, নিরপেক্ষ ভাবে খুব সাবধানে শ্রদ্ধার সহিত জিজ্ঞাসু হইয়া, কেহ যখন বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতার বাহ্য প্রকাশগুলি পর্য্যবেক্ষণ করেন, তখনই তাহা বুদ্ধিমত্তার বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ; এবং এরূপ বস্তুতন্ত্র পর্য্যবেক্ষণের ফল (objective observation) সংগৃহীত হইয়া বিশ্লেষিত হইলে, বুদ্ধির যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট ধারণা লাভ করিবার উপায় হয়। ফ্রবেলের শিশু পর্য্যবেক্ষণে (child study) এরূপ কার্য্য প্রথম আরম্ভ হয়; এবং ষ্টান্‌লে হল্‌ প্রমুখ বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিতদিগের মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা এরূপ বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের শ্রেষ্ঠতম ফল।

কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের গতি সকল সময়েই বেশ একটু মন্থর, এবং ইহার ফলও হয় অনেকটা ঢিলে রকমের। পর্য্যবেক্ষণের উপযুক্ত ঘটনার (Phenomenon) জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, এবং অনেক সময়ে যেরূপ ঘটনাটীর প্রয়োজন, সেরূপ ঘটনা লাভ হয় না। বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ ঠিক প্রকৃতির রাজবাড়ীর সিংদরজায় দরোয়ানের কাছে চাকরির উমেদারীর মত। যদি একটী চাকরি খালি হয়, দরোয়ান প্রভু হয় যথাযথ খবর দিলেন না, না হয় যদি বা খবর পাওয়া গেল, চাকরিটী আমার মনোমত হইল না। এরূপ খেয়ালের উমেদারীর সাহায্যে, এরূপ নিষ্ক্রিয় (Passive) পর্য্যবেক্ষণের সহায়তায়, বুদ্ধিমত্তার বস্তুতন্ত্র পরিমাণক্রম গঠন করে দুরাশা মাত্র। সেই কারণে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বুদ্ধির সাড়া যখন নানা দিক দিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন বাহ্য উত্তেজকের (Stimulant) সৃষ্টি করিয়া, এরূপ সাড়া পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। অর্থাৎ বাহ্য সুনির্দ্দিষ্ট উত্তেজনার সাহায্যে, সুনিশ্চিত ক্ষেত্রে, বুদ্ধিমত্তার বাহ্য প্রকাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে, আমাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না।—এরূপ ঘটনা,—বুদ্ধিমত্তার বাহ্য প্রভাবের নিদর্শন,—যাহাতে অনায়াস-লভ্য হয়, তাহার পন্থা সুগম করিয়া লইতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী ঘটনা আয়ত্তাধীন করাই, বুদ্ধিমত্তার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের উৎকৃষ্টতম পন্থা।

প্রশ্নের সাহায্যে বুদ্ধিতে সাড়া উৎপাদন করাই বুদ্ধি-পরীক্ষার মামুলি ব্যবস্থা। শিক্ষক ছাত্রদিগকে এইরূপেই পরীক্ষা করেন,—বিশ্ববিদ্যালয়

এই প্রণালীর সহায়তায় ডিপ্লোমা প্রদান করে,—এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আরো অনেক ব্যাপারে বুদ্ধি-পরীক্ষার ইহাই প্রচলিত প্রণালী। কিন্তু এই পদ্ধতির পরীক্ষা যুগ-যুগ ধরিয়া প্রচলিত থাকিলেও, বুদ্ধির স্বরূপ ও ইহার বাহ্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ এই পরীক্ষা দ্বারা সম্ভব হয় নাই। সেই নিমিত্ত পরীক্ষা দ্বারা ও প্রশ্নের সাহায্যে বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উঠিবার কথা। আমরা এই প্রশ্নের সাহায্যে বুদ্ধি-পরীক্ষার সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত যে, ইহা ছাড়া যে একটা নূতন কিছু আবিষ্কৃত হইতে পারে, তাহা অনুমান করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। তাহার উপর পিতা, মাতা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী—সকলেই নিজ-নিজ অভিজ্ঞতার ফলে পুত্র-কন্যা ও ছাত্র ছাত্রীদিগের ধী-শক্তির সহিত অনেকটা সুপরিচিত। এরূপ জ্ঞান লাভের জন্য মনোবৈজ্ঞানিকদিগের শরণাপন্ন হওয়া তাঁহারা যে লজ্জার বিষয় মনে করিবেন, এটা খুব স্বাভাবিক। তার পর যে জিনিষটার সম্বন্ধে সকলেই কিছু-কিছু জানে, যাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা না থাকিলে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়, এরূপ বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ জ্ঞানের দাবী করেন, সমাজ শীঘ্রই তাঁহাদের দাবী শিরোধার্য করিয়া লইতে স্বীকৃত হয় না। যাঁহাদের পুত্র-কন্যাকে শিক্ষা দান্য করা আবশ্যক, তাঁহারা নিজেরাও শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু-কিছু খবর রাখেন; এবং সেই কারণেই শিক্ষকরা সমাজে তাঁহাদের কার্য্যের জন্য উপযুক্ত আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সাধারণতঃ অসমর্থ হন। কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় না, সেরূপ জ্ঞান সমাজে অতি সহজেই সমাদৃত হয়। জ্যোতিষী যখন পৃথিবী হইতে বৃহস্পতি গ্রহের দূরত্ব নিরূপণ করেন, তখন তাঁহার কথা সকলেই সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। কিন্তু সমাজে বুদ্ধিমত্তার স্থূল পার্থক্যগুলি সকলের নজরেই পড়ে; এবং এই কারণে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-পরীক্ষা একটা অসাধারণ ব্যাপার নয় বলিয়া, ইহার সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত প্রণালীও যথেষ্ট আদর ও সম্মান লাভ করে না। একটী নির্দ্দিষ্ট, সুগঠিত, ও সুনির্ব্বাচিত প্রশ্ন-ক্রমই বুদ্ধিমত্তার স্বরূপ নির্দ্ধারণের এবং বস্তুতন্ত্র পরিমাণের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। এরূপ প্রশ্নের দ্বারা শিশু, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া প্রভৃতি সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষের বুদ্ধি মাপা সম্ভব হইবে,—এই সিদ্ধান্তে একটু রসিকতার আস্বাদ পাওয়া খুব অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রথম চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই কতকটা এরূপ হাস্যাস্পদ ব্যাপার। একটী আপেলের পতন আহার-নিদ্রা পরিত্যাগের ব্যাপারে পরিণত হইলে, এবং একজন বিজ্ঞ লোককে মৃত ভেক-শাবক লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখিলে, হাস্য সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু এরূপ হাস্যাস্পদ ব্যাপার হইতেই ভৌতিক বিজ্ঞানের অনেক শাখাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। এবং বিনা-তারের সংবাদ প্রেরণ বিংশ শতাব্দীর নূতন ধ্যান-সম্পদ রূপে মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সংবাদ লাভ সম্ভব করিয়া দিয়াছে। সুতরাং বুদ্ধি-পরীক্ষার প্রথম চেষ্টা যতই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হউক না কেন, ইহা যদি যথার্থ বৈজ্ঞানিক লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ইহাও সেইরূপ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিব।—বিনে (Binet), সাইমন (Simon) বোবার্টাগ্ (Bobertag), গডার্ড্ (Goddard), কুলমান (Kuhlmann), মিয়মান (Meumann), টারমান (Terman) প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার ফলে এখনই শিক্ষাকে একটী বিশেষ বিজ্ঞানে পরিণত করিবার পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিতেছে। বিনে-সাইমনের উদ্ভাবিত এবং আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের ষ্টানফোর্ড্ (Stanford) বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত বুদ্ধি-পরীক্ষার প্রশ্নগুলিই বর্ত্তমান সময়ে বুদ্ধিমত্তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুতন্ত্র-পরিমাণ-ক্রম; এবং এই ক্রমটার আলোচনা করিলে, মানবের ধী-শক্তির অন্ততঃ একটী আংশিক স্বরূপ সুপরিজ্ঞাত হইবে।

জড়বুদ্ধি ও অসামান্য প্রতিভার ভিতর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেই, বুদ্ধির স্বরূপ জ্ঞান যথেষ্ট হয় না। বুদ্ধিমত্তার নানা প্রকার সূক্ষ্ম বিশেষত্বের জ্ঞান এবং এরূপ বিশেষত্বের কারণ নির্দ্দেশের শক্তি যথার্থ ভাবে অর্জ্জিত না হইলে, বুদ্ধিমত্তার জ্ঞান সার্থক হইবে না। একজন পালোয়ান ও একজন মুমূর্ষু ক্ষয়-রোগীর ভিতর পার্থক্য পরিদর্শন করিতে পারগ হইলেই চিকিৎসক হওয়া যায় না;—কোন ব্যাধির সহিত সাধারণ পরিচয়ই সেই ব্যাধি নিরাকরণের পক্ষে যথেষ্ট সামর্থ্য নয়। ব্যাধিটার কারণ, কোন বিশেষ অঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে, ব্যাধিটার গতি কিরূপ হইবে, ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থাতেও রুগ্ন ব্যক্তির কিরূপ পরিশ্রম করা সম্ভব হইবে, এবং ব্যাধিটা যদি কু-পোষণের (mal-nutrition) ফল হয়, তাহা হইলে তাহার রক্তের প্রত্যেক ঘন মিলিমিটারে (millimetre) লোহিত-কণিকার (red-corpuscles) সংখ্যা কত ও রক্তের রঞ্জক বস্তুর (haemoglobin) শতকরা পরিমাণ কিরূপ,—ব্যাধি সম্বন্ধে যাঁহার এই প্রশ্নগুলি সমাধান করিবার শক্তি ও অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তিনিই ব্যাধিটার চিকিৎসা করিবার উপযুক্ত। সেইরূপ, যে ছাত্রটী দুই-তিন বৎসরেও বর্গের পাঠ সমাপন করিতে পারে না, সে মন্দবুদ্ধি,—এইরূপ সাধারণ মত প্রকাশের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য অর্জ্জিত হইলেই, শিক্ষকতার উপযুক্ত শক্তি লাভ হয় না। ছাত্রটার বুদ্ধি-দৌর্ব্বল্যের যথার্থ ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ, তাহার মনের কোন-কোন শক্তি বিশেষ ভাবে দুর্ব্বল, এই দুর্ব্বলতা জন্মগত (innate) কি কোন শারীরিক ব্যাধি অথবা শিক্ষার কোন অসম্পূর্ণতা হইতে উৎপন্ন, এবং এই দুর্ব্বল শক্তি লইয়াই ছাত্রটী কিরূপ মানসিক পরিশ্রমের উপযুক্ত, ও এইরূপ পরিশ্রম করিয়া সে কতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে,—যিনি এই সকল প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক নামের যোগ্য। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্ন-ক্রমের সাহায্যে বুদ্ধি-পরিমাণের যে কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা উপরি উক্ত প্রশ্নগুলির সমাধান সম্ভব হয়। এই কারণে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে, এবং বিশেষ ভাবে শিক্ষক-সমাজে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-পরীক্ষার তত্ত্বগুলি সাগ্রহে সমাদৃত হইবার উপযুক্ত। *

* Lewis M. Terman's The Measurement of Intelligence (Harrap) Chap II—Pages 22-24.

পাট বনাম তূলা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এস সি

যখনই বাঙ্গলায় কার্পাস-শিল্পের মূল্যাধিক্য হইয়াছে, তখনই বাঙ্গলায় তূলার চাষের প্রবর্ত্তন করিবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ ও ব্যগ্রতা লক্ষিত হইয়াছে। গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা হইতে পাটের চাষ উঠাইয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে তূলার চাষ করিতে হইবে। সেই আন্দোলনের ফলে কেহ-কেহ তখন দুই-চারিটা তূলার গাছ কোথাও রোপণ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ! এবং বাঙ্গলা দেশের কোন জেলাতেই তূলার চাষের প্রসার বা উন্নতি যে কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হয় নাই, তাহা সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক সরকারি 'বিবরণী' দেখিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলেও বাঙ্গলাদেশে তূলার চাষ বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করিবে, এবং তাহা স্থায়ী হইবে, এরূপ কল্পনা আকাশ-কুসুম বলিয়াই মনে হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে বাঙ্গলা হইতে পাটের চাষ সমূলে উৎপাটিত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে তূলার চাষের প্রবর্ত্তন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও সচেষ্ট হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ সম্ভব হইবে কি না, সে বিষয়ে কেহ বিশেষ চিন্তা বা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। রাজনীতির আতসী কাচের মধ্য দিয়া দৃষ্টি পরিচালনা করিয়া, তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান দৈন্যের দিনে বিশেষ সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান কালের কৃষি বিষয়ক অর্থনীতির মধ্য দিয়া ঐ দৃষ্টিটার বিশেষ ভাবে সম্প্রাসরণ করিতে হইবে। আমরা অদ্যাবধি এই কারণেই তূলার চাষের প্রসারণ করিতে পারি নাই। অবশ্য, সকলে স্বীকার করেন যে, আমাদের নগ্ন দেহে আবরণ দিতে হইলে, আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র বাঙ্গলা দেশেই উৎপাদন করিতে হইবে; এবং তাহার জন্য যে তূলার আবশ্যক হইবে, তাহাও এই দেশে উৎপাদন করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি পাট অথবা অন্যান্য চাষ তুলিয়া দিলেই, সেই স্থানে তূলার আবাদ করা সম্ভব হইবে? অথবা ঐ সকল চাষ তুলিয়া দেওয়া বর্ত্তমানে সমীচীন বা সম্ভব হইবে কি? বাঙ্গলার কৃষি-বিষয়ক অর্থনীতির ভিতর দিয়া আমরা এ বিষয়ের কোন আলোচনা করি নাই বলিয়া, পূর্ব্বেকার আন্দোলনে কোন ফল হয় নাই, এবং বর্ত্তমান আন্দোলনও যে সেইরূপ নিষ্ফল হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

যদিও এবারে অনেক জায়গায়, এবং বোধ হয় প্রত্যেক জেলাতেই, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই-চারিজন তূলার আবাদ করিয়াছেন, এবং কেহ-কেহ বাড়ীর আঙ্গিনায় বা বাগানে দুই-চারিটা গাছ-কার্পাসও রোপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি বাঙ্গলার তূলা চাষের প্রসার বৃদ্ধি পাইবে, অথবা বাঙ্গলার বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হইবে?

স্বীকার করিলাম, বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে বাঙ্গলাদেশ হইতে বিদেশী কাপড়ের ব্যবহার উঠিয়াই গেল। কিন্তু তাই বলিয়া কি দুই-চারিজন দুই-পাঁচ কাঠা জমীতে কার্পাসের আবাদ করিয়া বা ভিটায় দুই-চারিটা কার্পাস গাছ লাগাইয়া,—সমগ্র বাঙ্গলার লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য যে বস্ত্রের প্রয়োজন হইবে, তাহার কাঁচামাল যোগাইতে সমর্থ হইবে? বাঙ্গলার কোন-কোন জেলাতে এখনও কিছু-কিছু তূলার আবাদ হয়; কিন্তু সেই তূলাতে কি সেই সকল জেলারই বস্ত্রাভাব দূর হইতে পারে? অথবা সেই তূলা কি উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুতের উপযোগী? কলের ও চরকার তূলার জন্য বাঙ্গলাকে যে অন্যান্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে, তাহা নিশ্চিত। এখন যে চরকার সূতার অধিক মূল্য পড়িতেছে, ও বাঙ্গলার কলসমূহ বোম্বাই, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মান্দ্রাজের কলসমূহের তুলনায় অতি সামান্য লভ্যাংশ দিতেছে,—অন্যান্য প্রদেশ হইতে তূলা ও সূতার আমদানিই কি তাহার কারণ নয়? বাঙ্গলা তূলার জন্য ব্যগ্র হওয়ায়, এখন একটাকা বা ততোধিক মূল্যে তূলার সের বিক্রয় হইতেছে। এত উচ্চ মূল্যে বীজসমেত তূলা কখনও বিক্রীত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ইহা হইতে ইহাই বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন দেশীয় কলওয়ালারা স্লোপ বুঝিয়া কোপ মারিতেছে, কাহারও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না, এবং বোধ হয় করিবেও না, তেমনি বাঙ্গলার তূলা-ব্যবসায়ীরা এখন যেরূপ উচ্চ মূল্যে তূলা বিক্রয় করিতেছে, বরাবরই তাহারা সেইরূপ উচ্চ মূল্যেই তূলা বিক্রয় করিতে থাকিবে। তূলার আমদানি ও তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কুঞ্চিকাটি যে ঐ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়েরই মুঠার মধ্যে। স্বদেশীতার যত বুলিই কেন তাহাদের কর্ণের নিকট উচ্চারণ করা যাউক না, তাহারা সুমেরুর মত অচল, অটল থাকিবেই থাকিবে। আর এইরূপ উচ্চ মূল্যে তূলা ক্রয় করিতে হইলে, বাঙ্গলা দেশে চরকা যে অচল হইবে, তাহাও নিশ্চিত। এখন এই তূলার চাষ করিবার জন্য যে উৎসাহের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, তাহাও নিবিয়া যাইবে। যদি বাস্তবিকই আমাদের তূলার সমস্যা দূর করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার সহিত রাজনীতির যে সম্বন্ধ আছে, তাহার আলোচনা না করিয়া অর্থনীতির দিক দিয়াই ইহা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। কাঁচা মালের যোগাড় করিতে না পারিলে যে শিল্পজাত বস্ত্র উৎপন্ন হইবেই না।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে, এই বস্ত্র-সমস্যার সমাধানের জন্য যে কাঁচামাল আবশ্যক, তাহার সম্পূর্ণটা আমরা স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারি কি না; এবং তাহা লাভজনক হইয়া বাহিরের আমদানির সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইবে কি না। এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াই তূলার চাষের প্রচলন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এই কাঁচামাল উপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইলে, এই আন্দোলনের উত্তেজনায় যে দুই-চারিজন দুই-চারিকাঠা জমিতে কার্পাসের চাষ করিতেছেন, তাহা যথেষ্ট মনে করিলে চলিবে না। যাহাদের কাজ তাহাদের হাতে দিতে হইবে। উক্তরূপে দুই-চারিজন চাষ করিয়া যাহা উৎপাদন করিবে, তাহা বিশাল সমুদ্রে গোষ্পদ-বারির মতই হইবে, এবং এই উত্তেজনা হ্রাস পাইবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের তূলার চাষের সখটাও মিটিয়া যাইবে।

কৃষকদিগের মধ্যে তূলার চাষের প্রচলন ও বিস্তার করিতে হইলে

বাঙ্গলার কৃষকেরা যে সকল ফসলের আবাদ করে, তাহা অপেক্ষা তুলার চাষ অধিক লাভজনক হইবে কি না,—অধিক লাভজনক না হইলে, অন্ত ফসলের মত আয় দিবে কি না, এবং তাহা অপেক্ষা অল্প শ্রমসাধ্য কি না, তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে। তুলা যদি অধিক লাভজনক এবং অল্প শ্রমসাধ্য না হয়, তাহা হইলে আমরা কৃষকদের দ্বারে যতই কেন মাথা কুটি ও স্বদেশ-প্রেমের দোহাই দিই, তাহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিবে না। বরাবর যাহা করিয়া আসিতেছে, এখনও তাহাই করিবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি বিহার প্রদেশের কয়েকটি জেলার ও পশ্চিম বঙ্গের কতকগুলি জেলার চাষীদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এইভাবে মিশিয়া দেখিয়াছি, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে তাহাদের যতই কেন উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া যাউক না, তাহারা সেই সকল উপদেশ কিছুতেই গ্রহণ করিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহাদের হাতে-কলমে বিশেষ ভাবে দেখান যায় যে, সেই উপদেশ গ্রহণের ফল অল্প ব্যয়সাধ্য ও বিশেষ লাভজনক; এবং গ্রহণ করিলেও, তাহারা সেগুলি একেবারে গ্রহণ না করিয়া, ক্রমে-ক্রমে অতি ধীরে-ধীরে গ্রহণ করিতে থাকে। এই বৎসরে আমার জনৈক জমীদার বন্ধু তাঁহার কয়েকজন চাষী প্রজাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তাহাদের প্রত্যেককে এক-এক বিঘা জমীতে তুলার চাষ করিতে হইবে; এবং ঐ তুলার বীজ তাহারা বিনামূল্যে তাঁহার নিকট হইতে পাইবে। এমন কি, ঐ সকল তুলার জমীর জন্য তাহাদিগকে বর্ত্তমান সনে কিছুই খাজনাও দিতে হইবে না। কিন্তু চাষের সময় কেহই তাঁহার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিল না! সকলেই যথাপূর্ব্ব তথাপর আপন ইচ্ছামত পাট প্রভৃতির আবাদ করিল। উক্ত বন্ধুটি এক-আধ বিঘা জমীতে তুলার চাষ করিলেন বটে, কিন্তু ঐরূপ আবাদ করিয়া যে তুলা উৎপন্ন হইবে, তাহাতে কি তাঁহার নিজের গ্রামেরই আবশ্যকীয় তুলার সঙ্কুলান হইবে?

কৃষকগণের মধ্যে তুলার প্রচলন করিতে হইলে, তাহা যে লাভজনক কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। কৃষকেরা বিস্তৃত ভাবে তুলার চাষ আরম্ভ না করিলে, তুলা-সমস্যার সমাধান হইবে না। সেই জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে, বিশেষ পরীক্ষা করিয়া, তুলার চাষ যে লাভজনক হইতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া চাষীদিগকে হাতে-কলমে শিখাইতে হইবে। এইরূপ পরীক্ষা প্রত্যেক জেলাতে করা আবশ্যক। কোন্ জেলায়, কোন্ জাতীয় তুলা, কোন্ সময়ে আবাদ করিলে লাভজনক হইতে পারে, তাহার বিস্তৃত পরীক্ষা অদ্যাবধি বাঙ্গলা দেশে হয় নাই। এই কার্য্যটির ভার শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বাঙ্গালার তুলার চাষ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, বাঙ্গালায় গাছকার্পাসের চাষ কর। কেহ বলিতেছেন, বাঙ্গালার ঢাকার ফেটি কার্পাসের আবাদ করিলে, সর্ব্বত্রই সুফল পাওয়া যাইবে। আবার কেহ-কেহ বা ইজিপ্ট ও "সি আইল্যাণ্ড" জাতীয় জাতীয় কার্পাস বাঙ্গলার প্রত্যেক জেলাতেই জন্মিবে,—কোন্ প্রমাণে তাঁহারা এইরূপ দৈববাণী করিতে পারেন? তাঁহারা কি বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলাতে তাহার বিস্তৃত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিতেছেন? ঐ প্রকারের দুই-একটি কার্পাসবৃক্ষ ভিটায় বা বাগানে লাগাইলে, হয় ত আশানুরূপ ফল ফলিতেও পারে; কিন্তু দেখা গিয়াছে, যখন মাঠে বিস্তৃত ভাবে আবাদ করা যায়, তখন উহার ফল সেরূপ হয় না। বুড়ি কার্পাস ভিটায় লাগাইলে গাছ ৭।৮ ফিট অথবা ততোধিক উচ্চ হয়, কিন্তু মাঠে চাষ হিসাবে আবাদ করিলে ঐ গাছ ৪।৫ ফিটের অধিক বড় হয় না; এবং সেরূপ ফলও পাওয়া যায় না। প্রত্যেক জাতীয় কার্পাসের এক একটা বিশেষত্ব আছে; এবং জল, বায়ু, মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার বিশিষ্টতার উপর তাহাদের ফলাফল নির্ভর করে। ফেটি কার্পাস হয় ত ঢাকায় ভাল জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহা বরিশাল বা খুলনা জেলায় সেইরূপভাবে জন্মিবে কি না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

তুলার চাষ যদি বাঙ্গলায় লাভজনক না হয়, এবং অন্যান্য লাভজনক ফসলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার চাষারা তাহা গ্রহণ করিবে না; এবং চাষীরা যদি গ্রহণ না করে, তবে বাঙ্গলায় বিস্তৃত ভাবে তুলার আবাদের প্রচলন করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার আশা নাই। পূর্ব্বে বাঙ্গলায় প্রচুর তুলা উৎপন্ন হইত সত্য, এবং সেই তুলা হইতে প্রস্তুত কাপড় বাঙ্গলার লজ্জা নিবারণে সমর্থ হইত বটে, কিন্তু তখন ম্যানচেষ্টারের কলও দেখা দেয় নাই, এবং বাঙ্গলায় পাটের চাষেরও প্রচলন হয় নাই। কিন্তু এখন ম্যানচেষ্টারের সস্তার কাপড়, ও পাটের নগদ মোটা টাকার লোভ সংবরণ করিয়া বাঙ্গলার চাষীরা যে তুলার আবাদ করিবে, ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। "বিদেশী বর্জ্জন কর", "পাটের চাষে দেশে ম্যালেরিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে" ইত্যাদি "ধর্ম্মের কাহিনীতে" তাহারা কর্ণপাতও করিবে না। তাই সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক যে, বাঙ্গলার পাট, ধান ও অন্যান্য ভাদুই ফসলের অনুরূপ আয় কার্পাস চাষেও হইতে পারে কি না। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে অন্য কোন উপায়ে কৃষকমহলে এই অত্যাবশ্যক চাষের প্রচলন করা যাইতে পারে কি না, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। অনেকে বলেন, বাঙ্গলায় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে কার্পাসের চাষ সুবিধাজনক। কিন্তু এই সময় পাট ও চাষের আবাদ পরিত্যাগ করিয়া চাষীরা কি কার্পাসের চাষ করিবে? এবং বিদেশী কার্পাস কি এই সময় উত্তমরূপ ফলিবে?

এখন বাঙ্গলার প্রধান ফসল ধান ও পাট। অন্যান্য ভাদুই ফসল অপেক্ষা পাট অধিক লাভজনক এবং মোট ভাদুই ফসলের আবাদি জমীর মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগেরও অধিক জমীতে প্রতি বৎসর পাটের চাষ হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গেই অধিক পরিমাণে পাটের চাষ হয়। এই দুই স্থানের মত এত অধিক পাটের আবাদি জমী আর কোথাও নাই। বঙ্গে যে সকল জেলায়

ফরিদপুর, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলিই প্রসিদ্ধ। উত্তরবঙ্গে পাবনা, বগুড়া, রংপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর জলপাইগুড়ি, দারজিলিং, মালদহ প্রভৃতি, এবং পশ্চিমবঙ্গে যশোহর, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, মুরশিদাবাদ, খুলনা, হাওড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলাগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে পাটের আবাদ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই পাটের আবাদ হয়।

এখন দেখিতে হইবে, কি প্রকার জমীতে পাটের আবাদ হয়, এবং তাহাতে লাভই বা কি প্রকার হয়; আর পাটের পরিবর্ত্তে ঐ সকল জমীতে তুলার চাষ করা সম্ভব কি না।

পাট সাধারণতঃ দুই জাতিতে বিভক্ত—বোগি ও তোষা। বোগি পাটের ফল লম্বা, তোষা পাটের ফল গোল। উচ্চ বা ডাঙ্গা জমীতে 'বোগি' এবং নীচু জমীতে 'তোষা' উৎপন্ন হয়। তোষা সাধারণতঃ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের এবং বোগি পশ্চিমবঙ্গের পাট। পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল জমীতে সাধারণতঃ তোষা পাটের চাষ করা হয়, সেই সকল জমীতে বর্ষাকালে পাট ভিন্ন অন্য কোন ফসলের আবাদ করা হয় না, এবং করা সম্ভবও নয়। এই সকল স্থানে চৈত্র ও বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই বীজ বপন করা হয়; এবং ভাদ্রমাসের প্রথমেই সকল জমী হইতে পাট উঠিয়া যায়। বর্ষাকালে বন্যার জলে এই সকল জমী ডুবিয়া যায়। সুতরাং অন্য কোন ফসলের আবাদ করা সম্ভব হয় না। পাট কাটিবার পর ঐ জমীতে যে বন্যার জল থাকে, তাহাতেই পাট পচাইতে দেওয়া হয়, এবং ঐ জলেই পাট কাচা হয়। পাটের ডাল, পালা, পাতা প্রভৃতি পচিয়া জমীতেই থাকিয়া যায়, এবং তাহা সারের কাজ করে। অধিকন্তু বন্যার জল আসায়, জমীর উর্ব্বরতাও অক্ষুণ্ণ থাকে। কার্ত্তিক মাসে বানের জল সরিয়া যাইলে, ঐ সকল জমীতে রবিশস্যের আবাদ করা হয়। ঐ সকল জায়গার মাট ও আবহাওয়া পাট চাষের পক্ষে এমনি উপযোগী যে, পাট ব্যতীত অন্য কোন ফসলের আবাদ করিলে, তাহা এমন লাভজনক হয় না। এবং এক জলি ধান ব্যতীত অন্য কোন ফসলও এই সকল জায়গায় জন্মিতে পারে না। অথচ ধানের আবাদ করিলেও, তাহাও এত ভাল জন্মে না; আর তাহাতে এত অধিক লাভও হয় না। এই সকল স্থানে পাটের ফলন অত্যন্ত অধিক; এবং যে পাট জন্মে, তাহাও অতি উৎকৃষ্ট জাতীয়। এই জন্য তাহা হইতে যে টাকা পাওয়া যায়, তাহা ধানের লাভের তুলনায় অনেক অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই সকল জমীতে পাটের পরিবর্ত্তে তুলার আবাদ করা সকল দিক দিয়াই সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ জমীতেই সাধারণতঃ বোগি পাটের চাষ হয়, এবং নীচু জমীতে সামান্য তোষা পাট জন্মে। নিম্ন জমীতে বর্ষাকালে জল জমে। এই কারণে ঐ সকল স্থান কার্পাস চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার উচ্চ জমীতে বোগি পাটের জমী কার্পাস আবাদের উপযোগী হইতে পারে; কিন্তু এই সকল জমীতে যে পাট জন্মে, তাহার মূল্যের সহিত ঐ জমীতে যে তুলা উৎপন্ন হইবে, তাহার মূল্যের তুলনা করা আবশ্যক। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের উৎকৃষ্ট জমী সমূহে সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ১০/ মণ করিয়া পাট জন্মে। এমন কি, কোন-কোন জমীতে ইহারও অধিক জন্মিতে দেখা যায়। এবং এই সকল স্থানের পাট অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। গড়পড়তায় প্রতিবিঘায় ৭/ মণ করিয়া ফলন ধরিলে এবং গড়ে ১০৲ টাকা মণ হিসাবে মূল্য ধরিলে, এক বিঘায় ৭০৲ টাকার পাট হয়। ১০৲ টাকা বিঘা প্রতি খরচ বাদ দিলে নিট ৬০৲ টাকা মুনফা থাকে। পাটের বাজার উচ্চ থাকিলে, অনেক জায়গায় বিঘা প্রতি ১০০৲ টাকা বা ততোঽধিক টাকার পাট বিক্রীত হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বিঘায় গড়ে ৪/ মণ করিয়া পাট ধরিলে, এবং ৮৲ টাকা করিয়া প্রতি মণের দাম ধরিলে, ৩২৲ টাকার পাট বিক্রয় হয়, এবং খরচ-খরচা বাদ দিয়া নিট লাভ ২২৲ টাকা থাকে। সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের পাট পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের পাট অপেক্ষা নিকৃষ্ট; এবং উহা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রীত হয়। মূল্যের হার উচ্চ থাকিলে, পশ্চিমবঙ্গে এক বিঘাতে ৫০৲।৬০৲ টাকার পর্য্যন্ত পাট উৎপন্ন হইতে পারে। বোগিপাটের জমিতে কার্পাস আবাদ করা যাইতে পারে; কিন্তু এই কার্পাসের ফলন বিঘা প্রতি সাধারণতঃ ২/ মণের অধিক হইবে না। ফলন খুব ভাল হইলে ৩/ মণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। তিন মণ ফলনে ২/ মণ বীজ বাদ যাইবে এবং একমণ (বীজ ছাড়ান) তুলা পাওয়া যাইবে। একমণ বীজ ছাড়ান তুলার মূল্য ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। বিঘা প্রতি ১০৲ খরচ বাদ দিলে, নিট লাভ থাকিবে ২০৲ টাকা।

তোষা ও বোগি পাট কাটিয়া লইবার পর, সেই সকল জমীতে শীতকালে নানাপ্রকার রবিশস্যের আবাদ করা হয়। কিন্তু বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে কার্পাস বপন করিলে, কার্ত্তিক মাসের শেষ বা অগ্রহায়ণ মাস হইতে কার্পাস ফুটিতে আরম্ভ করে; এবং পৌষ, মাঘ মাস পর্য্যন্ত ফুটিতে থাকে। সুতরাং কার্পাস আবাদ করিলে শীতকালে রবিশস্যের আবাদের আশা ত্যাগ করিতে হয়, এবং ঐ একটি ফসল লইয়াই বসিয়া থাকিতে হয়; কিন্তু পাটের চাষ করিলে, শীতকালে আর একটি ফসল পাওয়া যায়। অধিকন্তু পূজার পূর্ব্বেই পাট বিক্রীত হইয়া যাওয়ায়, চাষীরা পূজার বাজারে নগদ টাকাটা হাতে পায়। এই সময় তাহাদের টাকার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া, ইহাও একটি আনুষঙ্গিক প্রলোভন।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম ব্যতীত এত অধিক পাটের আবাদ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। এমন কি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশও বাঙ্গলার পাটের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ নয়। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের তন্তু-বিশেষজ্ঞ কিছুদিন হইল যুক্ত প্রদেশের কয়েক স্থানে পাটের চাষের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল স্থানে ঐ পরীক্ষা সফল হয় নাই। ভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিদেশের কথা ধরিলে দেখা যায় যে, কোন-কোন দেশে পাটের চাষের উপযোগী জমী পাওয়া যাইতে পারে; এবং সেই সকল দেশের আবহাওয়া পাটের চাষের অনুকূল হইতেও পারে; কিন্তু মজুরের পারিশ্রমিক এত অধিক যে, বাঙ্গলার সহিত প্রতিযোগিতা করা তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে একজন কৃষিতত্ত্ববিদ বাঙ্গালা দেশে আসিয়া-

ছিলেন। বাঙ্গলার পাটের আবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া, আমেরিকায় পাটের আবাদ প্রচলন করা সম্ভব কি না তাহা পরীক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নানারকম অনুসন্ধান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদিও আমেরিকার কোন-কোন অঞ্চলে পাটের আবাদের উপযোগী জমী আছে, কিন্তু বাঙ্গলার চাষীরা এত অল্প খরচে পাট উৎপাদন করে যে, আমেরিকার পক্ষে তাহা কদাচ সম্ভব হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলার চাষীরা নির্ব্বিবাদে পাটের চাষ করিতে পারিবে। অদূর-ভবিষ্যতে কুত্রাপি কেহ যে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। পাটের চাষ যদি লাভজনক না হইত, তাহা হইলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পাটের আবাদি জমীর পরিমাণ এত অধিক বাড়িয়া যাইত না। গত দুই বৎসর পাটের দর নামিয়া যাওয়াতেও পাটের আবাদ যে বিশেষ হ্রাস হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পুনরায় পাটের দর উঠিলে, পাটের আবাদ যে সেই সঙ্গে আরও বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে, এবং পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলার কোন-কোন অংশে এখনও কিছু-কিছু তুলা উৎপন্ন হয়। বাঁকুড়া ও চট্টগ্রাম জেলায় পাটের চাষ নাই; এবং ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলায় যে সকল উচ্চ জমীতে পাটের চাষ হয় না, কেবল সেই সকল জমীতেই তুলার আবাদ হয়। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় যে সামান্য পরিমাণে তুলার চাষ হয়, তাহা কেবল কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবেই হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সকল জেলায় পাট উৎপন্ন হয়, এবং যে সকল স্থানে পাট জন্মিতে পারে, সেই সকল স্থানে তুলার আবাদ নাই। পাটের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঢাকা, মালদহ, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় যে সকল স্থানে পূর্ব্বে তুলার আবাদ হইত, সেই সকল স্থান হইতে তুলার আবাদ সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, পাটের চাষের সহিত প্রতিযোগিতায় তুলার চাষ কোন রকমে টিকিতে পারে না, ভবিষ্যতেও পারিবে না।

এইবার আলোচনা করা যাউক, ধানের পরিবর্ত্তে কার্পাসের আবাদ করা যায় কি না। উচ্চ আউস ধানের জমী ব্যতীত অন্য কোন ধানের জমীতে কার্পাসের আবাদ হইবে না।

আউস ধান কাটিবার পর সেই জমীতে নানা প্রকার রবিশস্য, তরি তরকারী প্রভৃতির আবাদ হয়। কিন্তু তাহাতে তুলার চাষ করিলে, ঐ সকল আবাদ বন্ধ করিতে হইবে; সুতরাং প্রতিযোগিতা হিসাবে আউস ধানের সহিতও তুলা পারিয়া উঠিবে না। আউস ধান চাষীদের যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। আর ধানের পরিবর্ত্তে কেহ অন্য কোন ফসলের আবাদ করিতে পরামর্শও দিবে না।

তার পর বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও নদীয়া প্রভৃতি জেলার উচ্চ ভূমিখণ্ড সমূহে প্রচুর পরিমাণে তরি তরকারী, আখ, আলু, পটল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই সকল ফসল এত অধিক লাভজনক যে, ইহাদের সহিত অন্য কোনও আবাদের তুলনা করা যায় না। মোটের উপর বর্ষাকালে বিস্তৃত ভাবে তুলার চাষ বাঙ্গলা দেশে কোন প্রকারেই চলিতে পারে না। এখনও বাঙ্গলায় যে সকল জেলায় তুলার আবাদ হয় তন্মধ্যে কেবল চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চল ব্যতীত অন্য সকল স্থানে সাধারণতঃ শীতকালেই তুলার আবাদ হয়।

অধুনা বাঙ্গলার মধ্যে যে সকল জেলায় কার্পাসের আবাদ হয়, তাহারই বিস্তৃত আলোচনা করা যাউক। পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর; এবং পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ, জেলায় কিছু কিছু তুলায় আবাদ হয়। তন্মধ্যে, চট্টগ্রাম জেলার পার্ব্বত্য প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুলার চাষ হয়। ক্রমান্বয়ে বাঁকুড়া, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও মেদিনীপুর জেলায় ইহার আবাদ হয়। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা অত্যন্ত সেকেলে ও মামুলি ধরণে তুলার চাষ করে। এই স্থানের উৎপন্ন তুলা অত্যন্ত কর্কশ, এবং হ্রস্ব ও স্থূল-তন্তু। এই তুলা সাধারণতঃ পশুলোমের সহিত মিশ্রিত করা হয়; এবং জিনিষপত্র মুড়িয়া চালান দিবার জন্য প্যাকিং কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করা হয় না। বাজারে ইহা "কুমিল্লা" নামে খ্যাত। বাজারে ইহার মূল্যও সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় উচ্চভূমিখণ্ডে বিক্ষিপ্তভাবে এক জাতীয় তুলার চাষ হয়। ইহার মধ্যে "খেঁড়ো" নামক তুলা উল্লেখযোগ্য। বাজারে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার তুলা "বেঙ্গল সিন্দ" নামে প্রচলিত। এই তুলাও অত্যন্ত হ্রস্ব-তন্তু, তবে এই তুলা "কুমিল্লা" জাতীয় তুলার অপেক্ষা মসৃণ ও কোমল। ময়মনসিংহ জেলায় যে সামান্য তুলার চাষ হয়, তাহাও বাজারে 'বেঙ্গল সিন্দ' নামে অভিহিত। ত্রিপুরার তুলা "কুমিল্লা" তুলার পর্য্যায়ভুক্ত। অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলায় যে অতি সামান্যমাত্র তুলা উৎপন্ন হয়, তাহা বস্ত্রবয়নের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অপর্য্যাপ্ত।

যদি আমাদের বস্ত্র সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে হয়, এবং এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিমাণে তুলা উৎপন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে তুলার চাষ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য কতকগুলি উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। যে সকল জেলায় পাটের চাষ নাই এবং যে সকল জেলায় এখনও তুলার চাষ হইতেছে, সেই সকল জেলাতেই প্রথমে বিস্তৃত ভাবে তুলার চাষের প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় এখনও কার্পাসের চাষ প্রচলিত আছে। বীরভূম জেলায় পাটের চাষ হয় না। এই জেলাটির জমী বেশ উচ্চ; এইখানে উন্নত জাতীয় কার্পাসের বিস্তৃত চাষের চেষ্টা করা যাইতে পারে। বীরভূম জেলার পার্শ্বেই সাঁওতাল পরগণায় তুলার চাষ হয়। দুমকায় প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। বেহারের কৃষিবিভাগ এই স্থানে উন্নত জাতীয় কার্পাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন। বর্দ্ধমান জেলায় যেখানে-যেখানে পাটের চাষ হয় না, সেই সকল স্থানে কার্পাসের চাষ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলায় কিছু-কিছু পতিত জমী আছে। এই সকল জমীতেও তুলার আবাদ করিলে চেষ্টা সফল হওয়াই সম্ভব।

বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে অনেক জায়গায় জলাপা [illegible]

মিশ্র আবাদ করা হয়। বাঙ্গালা দেশে বর্ষাকালে তুলার আবাদ করিতে হইলে, তুলার সহিত ভুট্টা অড়হর, কলাই, উরিদ, ভাদুই, মুগ, শন, মেস্তাপাট, তিল, লঙ্কা প্রভৃতির মিশ্র আবাদ করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত লাভজনক হইবে। এইরূপ চাষের পরীক্ষা বাঙ্গালায় কখনও করা হয় নাই। এই পরীক্ষায় যদি সাফল্য লাভ করা যায়, তাহা হইলে বোগি পাটের উপযোগী উচ্চ জমীতে তুলার চাষ করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে।

কিন্তু বর্ষাকালে কার্পাসের আবাদ করা অপেক্ষা, বাঙ্গালায় শীতকালে কার্পাসের চাষ করা অধিক সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং অন্যান্য দেশে যেখানে অধিক কার্পাস জন্মে, সেই সকল স্থানে সংবৎসরে ৩৬″ ইঞ্চির অধিক বারিপাত হয় না। মাদ্রাজ প্রদেশেই এখন ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতন্তযুক্ত তুলা জন্মে। এই স্থানে শীতকালেই তুলার আবাদ হয়। কারণ, মাদ্রাজে বর্ষাকালে বারিপাতের পরিমাণ অধিক, এবং বর্ষাকালে চাষীরা ধান জোয়ার প্রভৃতি খাদ্য শস্য উৎপাদনে রত থাকে। 'ইজিপ্ট' অর্থাৎ মিশর দেশ তুলার জন্য বিখ্যাত। মিশরে বৃষ্টির অনুপাত খুবই কম। কেবল খাল হইতে জল সেচন করিয়া সেই স্থানে তুলার আবাদ হয়। মেসোপটেমিয়ায় বারিপাত হয় না বলিলেই চলে। এই স্থানে সম্প্রতি জমীতে জল সেচন করিয়া উৎকৃষ্ট ও অধিক পরিমাণে তুলা উৎপাদন করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বাৎসরিক বারিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। সকল জেলা একত্র করিয়া ধরিলে দেখা যায়, বৎসরে গড়ে প্রায় ৮০″ ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে। এত অধিক জলে উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিতেই পারে না।

পাট ও আউস ধান কাটা হইয়া গেলে, ঐ সকল জমীতে কার্পাসের আবাদ বেশ চলিতে পারে; এবং এইরূপ আবাদ বাঙ্গালার সকল জেলাতেই হইতে পারে। স্থান বিশেষে কেবলমাত্র কার্পাস আবাদ না করিয়া, ইহার সহিত মুগ, মটর, ছোলা, তিল, প্রভৃতির মিশ্র আবাদ করিলে, তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক লাভজনক হওয়াই সম্ভব। পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালায় তুলার চাষ হইত, তখন শীতকালে তুলার চাষই প্রধান ছিল। এবং এখনও বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের অধিকাংশ স্থলে শীতকালেই অধিক তুলার চাষ হয়। বর্ষাকালে ধান ও পাট চাষের জন্য মজুর অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়। ধান ও পাট কাটা শেষ হইলে, চাষী কার্পাসের তদ্বির করিবার যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর পাইবে।

বর্ষাকালে নানা জাতীয় পোকা মাকড় কার্পাস গাছের অনিষ্ট করে। তন্মধ্যে চুঙ্গিপোকা, মাজরাপোকা ও ফলে গুটী পোকা প্রধান। চুঙ্গি-পোকা বর্ষাকালে কার্পাস বৃক্ষের পাতা খাইয়া, ঐ পাতা গুটাইয়া তাহার মধ্যে থাকে। গাছ কার্পাস এই জাতীয় পোকা দ্বারা ব্যাপক ভাবে আক্রান্ত হইয়া নিস্তেজ ও দণ্ডসার হয়। কিন্তু শীতকালে এই পোকার উপদ্রব থাকে না। বর্ষার শেষে ফলের গুটিপোকা কার্পাস ফলগুলিকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। এই জাতীয় পোকা কার্পাসের অত্যন্ত ক্ষতি করে। মেঘলা হইলে ইহাদের আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু শীতকালে তুলা চাষ করিলে মাঘ, ফাল্গুন মাসে সেই কার্পাসের ফল হইবে। এই সময় ইহাদের আর বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্ষার শেষে বা শীতের প্রারম্ভে তুলা ফুটিতে থাকিলে, শীতকালের বৃষ্টির জলে ঐ তুলার তন্তর দৃঢ়তার হ্রাস হয় এবং তুলাও খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু ভাদুই ফসল কাটিবার পর প্রথম আশ্বিনে তুলার আবাদ করিতে পারিলে, মাঘ, ফাল্গুনে তুলা ফুটিতে থাকিবে, ও চৈত্র মাসের মধ্যে ফসল উঠিয়া যাইবে। তাহা হইলে পোকামাকড়ের উপদ্রবের হাত হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। এবং পুনরায় ধান্য, পাট প্রভৃতির আবাদ যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে থাকিবে।

কিন্তু শীতকালে কার্পাস চাষ করিলে, দুই-তিনটা সেচের আবশ্যক হয়। তবে সময় মত বীজ বপন করিতে পারিলে, শেষ আশ্বিনের এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসের বৃষ্টির জল পাইলে, আর সেচের আবশ্যক হইবে না। শীতকালে যদি বৃষ্টি না হয়, অথবা উপযুক্ত পরিমাণে জল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গে খাল বিল ও পুষ্করিণী হইতে অনায়াসে জল সেচিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এবং পশ্চিম বঙ্গে যেখানে এইরূপ খাল, বিল বা পুষ্করিণী নাই, সেই সকল স্থানে ১৫—২০ ফুট খুঁড়িয়া কাঁচা কূপ খনন করিয়া এই অসুবিধা দূর করা যাইতে পারে।

অতএব তুলাকে বাঙ্গলার প্রধান ফসল না করিয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর আবাদের মধ্যে পরিগণিত করিয়া চাষ করা ব্যতীত, ব্যাপক ভাবে ইহার প্রচলনের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা তুলার আবাদ করিতে যাই না কেন, তুলার চাষকে লাভজনক করাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তুলার চাষকে লাভজনক করিতে হইলে, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে হইবে, এবং উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘতন্ত জাতীয় কার্পাসের প্রচলন ও আবাদ বিস্তৃত ভাবে করিতে হইবে। উৎকৃষ্ট দীর্ঘতন্ত তুলা উৎপাদন করিতে না পারিলে, তুলার চাষে লাভবান হইবার আশা নাই। বস্তুতঃ এই প্রকার তুলা উৎপাদন করা বাঙ্গলায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

নায়েব মহাশয়

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণ কাল। সূর্য্যাস্তের আর অধিক বিলম্ব নাই। পশ্চিমাকাশ লোহিত বর্ণে সুরঞ্জিত। বায়ু-হিল্লোল ক্রমে শীতল হইয়া আসিতেছে। সমীরণ-প্রবাহে নদীর নিস্তরঙ্গ জলরাশি মৃদু-মৃদু কম্পিত হইতেছে। নদীর তীর দিয়া সুদীর্ঘ পথ প্রসারিত। অনেক ভদ্রলোক সেই পথে সায়ংকালে বায়ু সেবন করিতে আসেন। পথের ধারেই স্থানীয় ডাকঘর। ডাকঘরটি পল্লীগ্রামের 'ব্র্যাঞ্চ পোষ্ট আফিস' নহে, সব আফিস; সুতরাং ঘরখানি গোরুর গোয়ালের ন্যায় মনুষ্য-বাসের অযোগ্য নহে। উকীল ভবতোষ বাবু যে দিন মনিরুদ্দিন জোলার আর্জ্জি আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার পর কয়েক দিন অতীত হইয়াছে। এই কয়দিনে সেই আন্দোলন-কোলাহল নিবৃত্ত হইয়াছে। ভবতোষ বাবু এখন এই মামলা সম্বন্ধে আর কাহারও মুখে উচ্চবাচ্য শুনিতে পান না। মুন্সেফী আদালতের মামলা,—লম্বা দিন পড়িয়া গিয়াছে। আজ একটু সকালে কাজ শেষ হওয়ায়, ভবতোষ বাবু অপরাহ্ণে নদীতীরে বায়ু সেবন করিতে আসিয়াছেন। তিনি ধীর-পাদবিক্ষেপে ডাকঘরের দিকে আসিতেছেন। ডাকঘরের দশ-বার গজ দূরে থাকিতে, একটি মুসলমান কৃষক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

কৃষকটির মুখের দিকে চাহিয়া ভবতোষ বাবু বুঝিলেন, তাহার কিছু বলিবার আছে। তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে কি তোমার কোন দরকার আছে?"

কৃষক বলিল 'জি! আপনাকে একটা কথা পুছ্ কত্তে আল্যেম্, কর্ত্তা! আমার চাচা আজ পেরায় বছর দশেক গত্তো হয়েছে; চাচী একটা ছোট ছেলে নিয়ে নিকেয় বসেছে; কিন্তুক আমার সেই চাচাতো ভায়ের জোত-জমি আমাদের হাতেই আছে। আমার সেই চাচী তার নিকাতী সোয়ামীর কুপরামর্শ পেয়ে নাবালকের সম্পত্তিটুকুন বিচ্‌তে চাচ্ছে। চাচী কি আমাদের আইন মতোন সে সম্পত্তি বিচ্‌তে পারে? তাঁর সে ক্ষ্যামোতা আছে কি?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তোমার চাচী যখন নিকায় বসেছে, তখন, তোমাদের মুসলমানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আইন অনুসারে, তোমার চাচার সম্পত্তিতে তার নিজের যে অংশ ছিল, তাও নষ্ট হয়েছে। নাবালকের সম্পত্তিতে তার ত কোন অধিকারই নেই। তবে সে সেই নাবালকের ভরণপোষণের জন্য তা বিক্রয় করতে পারে বটে।"

কৃষক বলিল, "চাচী যে ঘরে নিকেয় বসেছে, তারা পয়সার মানুষ, হাঘরে নয়। চাচার নাবালক ছেলে ত তুশ্চু কথা—ত্যামোন ধারা দশটা ছেলে তারা প্রিতিপালোন কর্ত্তে পারে; তাদের ত ভাতের দুষ্‌খু নেই। ওটা চাচীর সেই নিকাতী সোয়ামীর চালাকী, সম্পত্তিটুকু বিক্রী করে' টাকা কটা সে নিজেই গেরাস্ করবে। আসল শয়তান!"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তোমার চাচী তোমার চাচার সেই নাবালক ছেলের অভিভাবক ত বটে। তার নিকাতী স্বামীর ঘরে ভাত আছে ব'লে তোমার চাচী নাবালকের জন্যে খোরাকী নিতে পারবে না—এ কি একটা কথা?"

কৃষক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি সেই নাবালকের খোরপোষের ভার নিই, তা হ'লে কি সম্পত্তিটুকু বিক্রী রদ হ'তে পারে না?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তা পারে বোধ হয়। তুমি কাল সকালে আমার কাছে যেও, আমি দেখে শুনে যা কর্ত্তব্য হয় তোমাকে বলে দেব।"

কৃষক বলিল, "হুজুর, আমার বাড়ী ভিন্ গাঁয়ে—সে এখান থেকে অনেক দূর! কাল আর আস্‌তে পারবো না, দুই-এক দিন পরে আসবো। সেলাম, কর্ত্তা।"

'সেলাম, তাই এসো' বলিয়া কথা শেষ করিয়া ভবতোষ বাবু তাঁহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার জন্য মুখ ফিরাই

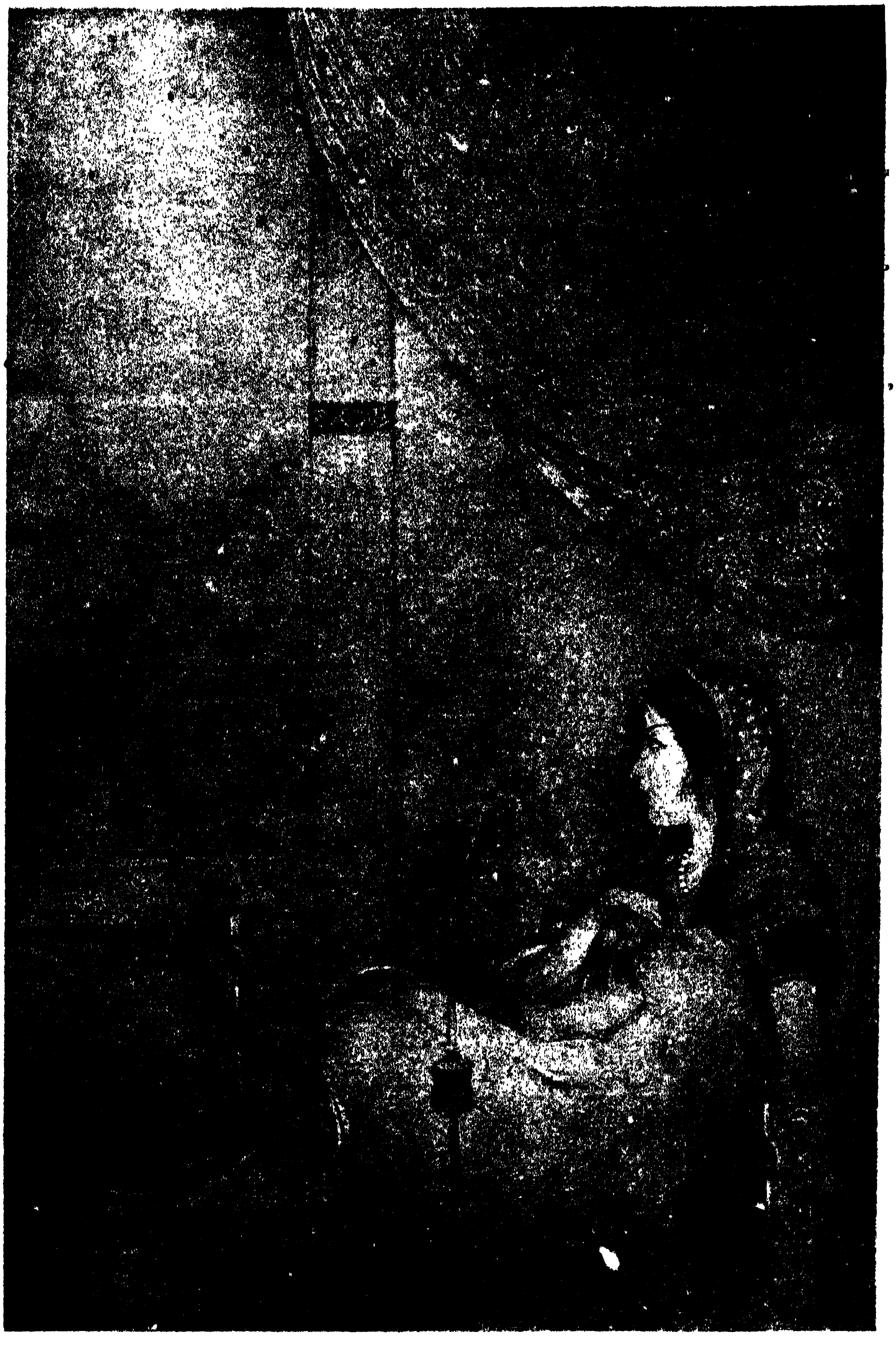

কৈশোর স্মৃতি

চিত্র-শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

পশ্চাতে থাকিয়া, তাহাকে দিয়া এই কায করাইয়াছে। আবশ্যক হইলে সে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অন্যায় কাজ করিবে।"

পোষ্টমাষ্টার কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কি জন্য এরূপ কাণ্ড হইল, তাহা জানিতে পারিয়াছেন কি ?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি মনিরুদ্দিন জোলা নামক একটি প্রজার পক্ষ হইতে আর্জ্জি দাখিল করিয়াছি। সেই মামলার প্রতিবাদী প্রকৃতপক্ষে মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের ম্যানেজার ও নায়েব।"

এই সময় ডাক্তার আসিয়া ভবতোষ বাবুর মস্তকের ক্ষত পরীক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আঘাত গুরুতর নয়, কেবল উপরের চামড়াটা ফাটিয়াছে (simple, skin broken) কিন্তু আঘাতটা অতি অল্পেই গুরুতর হইবার আশঙ্কা ছিল। আশা করি, শীঘ্রই সুস্থ হইতে পারিবেন। আপনি প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেলা এ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছেন, কথাটা প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। ব্যাপারখানা কি বলুন ত।"

পোষ্টমাষ্টার সংক্ষেপে সকল কথা ডাক্তারকে বলিলেন। ডাক্তার হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "মগের মুলুকেও লোকে এখানকার চেয়ে অধিক নিরাপদ। আজ কাল এ এলাকায় কিছুই অসম্ভব নয়। সাবধান থাকিবেন। নমুনাটা বড় সুবিধাজনক নহে।"

ডাক্তার ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলে, পোষ্টমাষ্টার ভবতোষ বাবুকে বলিলেন, "যে চাষাটা আপনার সঙ্গে আলাপ করিতেছিল, সে কি আপনার পরিচিত ?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "না, পূর্ব্বে তাহাকে এখানে দেখি নাই। সে বলিল, তাহার বাড়ী অনেক দূরে। হইতেও পারে। কিন্তু সে যে এখানে এই প্রথম আসিয়াছে, ইহাও মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, আবেদ হালসানা ও সে এক সঙ্গেই আসিয়াছিল; আমার গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যেই সে পথিমধ্যে আমার সঙ্গে বৈষয়িক কথা আরম্ভ করিয়াছিল।"

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "আপনার এরূপ সন্দেহের কি কোন কারণ আছে।"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "কারণ আছে বৈ কি। আমি আহত হইয়া মাটীতে পড়িবামাত্র, দুইজনেই দৌড়াইয়া পলাইল। কৃষকটা নিরপেক্ষ লোক হইলে, সে অবস্থায় আমাকে ফেলিয়া পলাইত না,—আততায়ীকে ধরিবারই চেষ্টা করিত; অন্ততঃ, আমাকে বিপন্ন দেখিয়া সাহায্য করিত। একদিকে পলাইলে পাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় দুইজন দুই দিকে দৌড়াইয়া ছিল; সম্ভবতঃ ইহা পূর্ব্ব পরামর্শের ফল।"

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "যাহারা আপনার আততায়ীকে ধরিতে গিয়াছে—বোধ হয় তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তবে কাল এ সম্বন্ধে হয় ত কোন-কোন কথা জানিতে পারিব; এ কলিকাতা সহর নয়। মফস্বলে এ সকল কাণ্ড সঙ্গে-সঙ্গে চাপা পড়ে না।"

পোষ্টমাষ্টার বাবু ভবতোষ বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে, ভবতোষ বাবুর স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে কক্ষান্তরে লইয়া চলিলেন। তিনি স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে শুষ্ক স্বরে বলিলেন, "আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। কেন তুমি এ কাজ করতে গলে ?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "কোন্ কাজ ? আমি ত কোন অন্যায় কাজ করি নি সরো !"

ভবতোষ বাবুর স্ত্রীর নাম সরোজিনী; তিনি বলিলেন, "তুমি কোন অন্যায় কাজ করেছ তা বল্‌ছি নে। কিন্তু যে কাজের ফলে জীবন বিপন্ন হতে পারে, অন্যায় কাজ না হলেও তা না করাই ভাল। তুমি কুঠীর বিরুদ্ধে মনিরদ্দীর মামলা হাতে নেওয়াতেই ত এই বিপদ! প্রাণে বেঁচে থাকলে অনেক পয়সা উপার্জ্জন করতে পারবে। এ লোভ না কল্লেই পারতে।"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তুমি কি মনে করেছ পয়সার লোভে আমি মনিরদ্দীর মামলা নিয়েছি ? এ তোমার বুঝ্‌বার ভুল, সরো ! মনিরদ্দী গরিব ব'লে জমীদার কোম্পানী তার উপর অত্যাচার আরম্ভ করেছে। গরীবের মুখের দিকে চাইতে কেউই নেই। প্রবলের ভয়ে দুর্ব্বলকে আশ্রয় দিতে কারও সাহস হয় না। কিন্তু এই দীন দুঃখী অনাথ দরিদ্রেরাই দেশের মেরুদণ্ড। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা উপার্জ্জন করে, তাই দেশের সম্পদ। কিন্তু তা তাদের ভোগে লাগে না,—ধনীরা ছলে, বলে, কৌশলে তাদের মুখের

গ্রাস কেড়ে নিয়ে, নিজেদের সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি করে। এই যে আমাদের দেশের এক-একজন টাকাওয়ালা লোক জমীদারী, তেজারতি, মহাজনী, চালানী কারবার করে লাখপতি হচ্ছে,—এ সকলেরই মূলে ঐ গরীব প্রজাগুলার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। তারা অনাহারে থাকে, তাদের পরিশ্রমের ফল অন্যে গ্রাস করেই লাখপতি হয়! তারা প্রবলের সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করছে; কিন্তু, তাতেও তাদের নিস্তার নেই; প্রবল জমীদার পক্ষ গায়ের জোরে তাদের একমাত্র অবলম্বন চাষের জমা-জমিটুকুও কেড়ে নিয়ে অর্থ লোভে অন্যের কাছে বিক্রয় করচে! মনিরুদ্দীর উপরও এই রকম অত্যাচার হওয়ায়, আমি তার পক্ষ সমর্থন করতে দাঁড়িয়েছি। গরিব প্রজারা বুঝবে, আর জমীদারও বুঝতে পারবে, ভগবান গরীবকে একেবারে ত্যাগ করেন নি,—ইংরাজের রাজ্যেও ইংরাজ জমীদারের অত্যাচারের প্রতিকার হয়।"

সরোজিনী বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোক,—ও সকল বড়-বড় কথা বুঝতে পারি নে। কিন্তু তুমি গরীবের পক্ষে দাঁড়িয়েছ বলে, তোমার উপর এ রকম অত্যাচার হলো। এর পরেও কি তুমি জমীদারের বিরুদ্ধে মামলা চালাবে?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই! এ মামলা ত চালাবোই,—এর পরও যদি অন্য কোন প্রজা এই ভাবে উৎপীড়িত হ'য়ে আমার সাহায্য চায়—তাকেও আমি যথাসাধ্য সাহায্য করবো। লেখাপড়া শিখেছি, ওকালতি করছি, এ কি কেবল নিজের সুখের জন্য? টাকা রোজগার ক'রে স্ত্রীর অলঙ্কার আর কোম্পানীর কাগজ কেনাই কি দুর্লভ মানব জন্মের চরম উদ্দেশ্য? আমরা যদি এতদূর স্বার্থপর না হ'য়ে, দেশের একটু মঙ্গলের চেষ্টা করতাম, গরীব-দুঃখীর মুখের দিকে চাইতাম, তা হ'লে আমাদের দেশের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হতো না;—প্রবল দুর্ব্বলকে দুই পায়ে থেঁৎলাতে সাহস করতো না। দেখ সরো, মার খাওয়ায় অপমান নেই, কামড়ানোই কুকুরের স্বভাব,—সুযোগ পেলেই সে কামড়াবে। কিন্তু সেই ভয়ে সৎ পথ ত্যাগ ক'রে স'রে দাঁড়ানোর চেয়ে অপমান আর কিছুই নেই। তা মানুষের কাজ নয়।"

সরোজিনী বলিলেন, "কিন্তু তোমার উপর এই যে অত্যাচার হলো, এর কি কোন প্রতিকার নেই?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "প্রতিকারের উপায় ত ফৌজদারীতে নালিশ করা? তাতে কোন ফল হবে না। নালিশ করতে গেলে সাক্ষীর দরকার; আমি কোন সাক্ষী পাব না। নায়েব তার পোষা গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে এই কাজ করেছে,—তা' সপ্রমাণ করা আরও শক্ত ব্যাপার! আর, একটা হালসানা বা পাইকের হাতে লাঠী খেয়ে তার-নামে নালিশ করতে যাওয়াও লজ্জার কথা। মনে কর একটা কুকুর যদি দৌড়ে এসে আমাকে কামড় দিয়ে যেত, তা হ'লে কি আমি তার নামে নালিশ কর্ত্তে যেতাম? কিন্তু পৃথিবীতে কোন অত্যাচারীই চিরদিন অত্যাচার করে নির্ব্বিঘ্নে সুখ ভোগ কর্ত্তে পারে না; তাদের স্বার্থ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। আমরা আর কতদিন বাঁচবো? বড় জোর দশ, পনের, কুড়ি বৎসর। কিন্তু এমন এক দিন আসবে, যে দিন এই পুঞ্জীভূত অত্যাচারের ফল বিধাতার বজ্র হ'য়ে অত্যাচারের বনিয়াদ পর্য্যন্ত চূর্ণ ক'রে দেবে। এই লক্ষ-লক্ষ উৎপীড়িত দরিদ্র প্রজা যে দিন এক মন, এক প্রাণ হ'য়ে নিজের ষোলআনা স্বার্থ বুঝে নেবার জন্যে রুখে দাঁড়াবে, যেদিন বলবে—'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'—সেদিন হামফ্রীর মত ম্যানেজার, সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেলের মত নায়েব হাজার গণ্ডা এক সঙ্গে হ'য়েও সে আগুন নিবোতে পারবে না।"

সরোজিনী বলিলেন, "সে ত পরের কথা। কিন্তু সেই আশায় তুমি এমন জল-জিয়ন্ত লাঠীটা হজম করবে? অন্যায়ের প্রতিকার করতে, অপরাধীকে ধরতে গবর্মেণ্ট ত দলে দলে পুলিশ পুষ্‌ছেন। তারা কি কেবল নিজের স্বার্থই দেখবে,—অত্যাচার দমন করবে না? এখানকার নলিনী দারোগার বৌ রমণীর সঙ্গে আমার ভাবশাব আছে।—তুমি যদি বল, তাকে দিয়ে তার স্বামীকে অনুরোধ করিয়ে দেখি।"

ভবতোষ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তবেই হয়েছে! 'মাছ মরেছে, বিড়াল কাঁদে, শাস্ত করলে বকে!' নলিনী মুচিবাড়িয়া কুঠীর তলপেটে;—তাকে হাত করেই এরা যা খুসী তাই করচে। এখানে আসার পর নলিনীর স্ত্রীর এক রাশি গহনা হয়েছে, আরও হবে। তোমার অনুরোধে সে পথ সে বন্ধ করবে? ওসকল কথায় আর দরকার নেই, সরো! পাখা করে-করে তোমার হাত ব্যথা হয়েছে! যাও, তুমি রান্নাঘরের কাজ শেষ করগে,—আমার আর কোন কষ্ট নেই। তুমি ভেবো না, আমি একটু ঘুমোই।"—সরোজিনী নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন।

নব যুগ—নারী-সমস্যা

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ

সমস্ত বিশ্বের খবর জানি নে,—কিন্তু আমাদের এই ছোটখাট পৃথিবীর উপর দিয়া যে একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে,—জাগিয়া থাকিয়া তাহাতে সন্দেহ করিবার অবসর নাই। সে পরিবর্ত্তনের স্রোত সর্ব্বতোমুখী। সব দিকে চাঞ্চল্য, সব দিকে পরিবর্ত্তন—এমনতর ঘটনা পৃথিবীতে, মানবেতিহাসের যুগে কয়বার ঘটিয়াছে, অথবা আদৌ ঘটিয়াছে কি না, তাহা বলা বড় শক্ত। এ শুধু একটা দেশের, একটা জাতির, বা কোন বিশিষ্ট সমাজ বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়,—সারা পৃথিবী জুড়িয়া একটা ওলট-পালটের সূচনা হইতেছে। এই বিভিন্নমুখীন স্রোতের মধ্যে একটা ঐক্য বিদ্যমান; সেই ঐক্যসূত্র—মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। রাষ্ট্রে সমাজে, ধর্ম্মে—সর্ব্ব বিষয়েই মানব মুক্তির জন্য একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছে। স্বাধীন বা পরাধীন কোন জাতিই আর তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। সমাজের বিধি-ব্যবস্থায়ও কেহ আর সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিতেছে না। একটা তীব্র, আকুল উন্মাদনা যেন ব্যক্তিকে, জাতিকে—সমগ্র মানবজাতিকে সম্মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। তার থামিবার যেন শক্তি নাই—তাকে যেন চলিতেই হইবে। মনে হয়, যেন সে চিন্তা করিবার,—চিন্তা করিয়া তাহার চরম উদ্দেশ্যকে বাছিয়া লইবার, শক্তি হারাইতে বসিয়াছে—এমনি উন্মাদনা। জগতের এই সমস্যার মধ্যে আজ একটা সমস্যা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে—সেটা নারী-সমস্যা। আজ তাহারই একটু আলোচনা করিব।

নারী-সমস্যা আজ আমাদিগকে বিশেষ ভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে সত্য, কিন্তু উহা আজিকারই সৃষ্টি নয়; যেদিন বিশ্বে পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইল, সেই দিনই এই সমস্যার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। নানা বিভিন্ন কারণের মধ্য দিয়া, আজ তাহা পুরুষ-সমস্যা না হইয়া, নারী-সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নারীদিগকে আজ তাহাদের মুক্তির জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে হইয়াছে বলিয়া আজ সেটা নারী-সমস্যা—নতুবা, তাহা পুরুষ-সমস্যাও হইতে পারিত।

আজ উহা যে আকারই ধারণ করুক না কেন, চিরদিনই উহা এ ভাবে ছিল না;—কিন্তু কোনও না কোন আকারে ছিল। এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য সমাজকর্ত্তারা সময়ে-সময়ে যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু চিরদিনের জন্য এ সমস্যার সমাধান হয় নাই—হইতে পারেও না। মানব-জাতির উৎপত্তির সহিত উহার উৎপত্তি,—মানব জাতির ধ্বংসে উহার সমাধান সম্ভব—নতুবা নয়। সুতরাং আজ যদি আমরা চিরদিনের জন্য নারী-সমস্যার সমাধান

করিতে যাই, তাহা হইলে যে শুধু বিফল-মনোরথ হইব, তাহা নয়, ভবিষ্যদ্বংশীয়দের নিকট হাস্যাস্পদও হইব। এই ভারতবর্ষে একদিন নারী-সমস্যার সমাধান হইয়াছিল; কিন্তু সেটাকে চিরদিনের জন্য গ্রহণ করিতে যাইয়া, আজ ভারত-সমাজের অবস্থা যে খুব আশাপ্রদ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা খুব প্রাচীনত্ব ভক্তও বোধ হয় বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন। তাই যাঁহারা সমাজে, পরিবারে, কর্ম্মক্ষেত্রে, চিরদিনের জন্য নারীদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের কাজ দেখিয়া হাসিও আসে। সমাজ জীবন্ত জিনিষ; সুতরাং চলন্তও বটে। সুতরাং তাহাকে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিতে যাওয়া যায়, তবে সে চেষ্টা বিফল হইবেই। নারী-সমস্যা কেন—সব সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। অন্য কথা ছাড়িয়া, আজ শুধু নারীদের কথারই আলোচনা করা যাউক। সমাজকর্ত্তারা সময়ে-সময়ে সমস্যাগুলির সমাধান করিয়াছিলেন। তখন তাহা সেই সমাজের উপযোগী ছিল বলিয়া, সমাজ তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সেই মান্ধাতার আমলের প্রথাগুলিকে নবীন, তরুণ সমাজের ঘাড়ের উপর চাপাইয়া দিলে, সে তার ভার সহিতে যাইবে কেন? আর সেই পুরাতন প্রথার দোষ-গুণের দোহাই দিয়া যাঁহারা সমাজকর্ত্তাদিগের জন্য স্বর্গে বা নরকে seat reserve করেন, তাঁহারা যতই বুদ্ধিমান হউন না কেন, তাঁহাদের অতীত বা ভবিষ্যৎকে দেখিবার উপযোগী কল্পনা-শক্তির অভাব ছিল,—এ কথা সহজেই মনে হয়। অতীতের আলোক লইয়া আমরা বর্ত্তমানে গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে পারি মাত্র।

এখন আমরা বর্ত্তমান সমস্যার দিকে আসিব। নারীদের প্রধান অভিযোগ এই যে, পুরুষ তাহাদের অধীন করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং তাহাদের ফলে তাহার শারীরিক ও মানসিক অবনতি হইয়াছে। দেখা যাউক, উহা কতদূর সত্য।

প্রথমেই তাঁহাদের এই অভিযোগ আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি যে, পুরুষ নারীকে কতকটা তাহার অধীন করিয়া রাখিয়াছে (সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে, নারী পুরুষকেও কতকটা তাঁহার মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছেন)। অনেক নারী এ অধীনতার যে অর্থ করেন, আমরা তাহা করিতে পারি না। এ অধীনতা বিজয়ী জাতির প্রতি বিজিতের বশ্যতা নয়। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে নারী তাহা সহ্য করিতেন না, এ কথা নিশ্চয়। এ অধীনতার অর্থ—পরস্কন্ধের উপর নির্ভরতা। এ ক্ষেত্রে পুরুষও অধীন, স্ত্রীও অধীন; কারণ, আত্যন্তিক স্বাধীনতা (Absolute freedom) বলিয়া কোন জিনিষ নরলোকে নাই। কিন্তু অনেক নারী এই অধীনতার অতি কদর্থ্য করেন। তাঁহারা কি বুঝিতে পারেন না যে, তাহার দ্বারা তাঁহাদের নিজের সম্মানেই আঘাত করা হয় মাত্র? এরূপ একটা কদর্থ্যের বিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় না। আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, মানুষ-পুরুষ না হয় স্বার্থপরই হইল; কিন্তু পশু-পুরুষও কি তাহাদের জ্ঞাতি-ভাই মানুষ-পুরুষের নিকট হইতে স্বার্থপরতা শিক্ষা করিয়া, পশু-স্ত্রীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে? অনেক নারীকেই দুর্ব্বলা বলিলে তাঁহারা ক্ষেপিয়া যান; অথচ তাঁহারাই আবার বলেন যে, পুরুষরা অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এ কথার অর্থ কি? দুর্ব্বলা ন'ন ত অন্যায় সহ্য করিলেন বা করেন কেন? অনেকে আবার বলেন, দুর্ব্বলতা অধীনতার ফল। তবে আগে কোনটা? দুর্ব্বলতা না অধীনতা? পশু-রাজ্য ও মানব-রাজ্যের নিয়ম একই কেন? বিড়াল ও বিড়ালী ত সমান স্বাধীন; তবে বিড়ালী দুর্ব্বল কেন? ইহা সেই বুড়া ঠাকুর্দ্দা ব্রহ্মা-ঠাকুরের কারসাজি! তিনি পুরুষ কি না; সুতরাং পুরুষের প্রতি তাঁহার একটু টান থাকিবে বই কি! আমরা এখানে নাচার। তবে নারীদের অধীনতার অভিযোগটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়াই নাচার নতুবা নয়। অবশ্য বিশেষ সমাজে, বিশেষ সময়ে, নারীর দুর্দ্দশা হয় নাই বা হইতেছে না,—এ কথা আমরা বলিতেছি না। অসহ্য পীড়ন, অমানুষিক অত্যাচারের স্রোত যে নারীর উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে না, সে কথা এক মনে-প্রাণে অন্ধ-বধির ব্যতীত আর কেহ বলিবে না। সে কথার আলোচনা পরে করিব।

আমাদের মনে হয় যে, একটা বিষয়ের প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই, এই সমস্যার সমাধান কতকটা হইতে পারে। সেটা হইতেছে, স্ত্রী-পুরুষের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র। ব্রহ্মা ঠাকুর আমাদের মত বুদ্ধিমান না হইলেও, নিরেট বোকা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে plan করে নরনারী

গড়েছিলেন, তাহার উপযোগী করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রেরও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার plan উল্টাইয়া দিতে চাহিতেছি বলিয়াই, তাঁহাকে বোকা বলিয়া মনে হইতেছে। আর লাভ হইতেছে এই যে, আমরা নর ও নারীর মধ্যে এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করিতেছি, যাহা মানবের চিরশত্রু শয়তানও করিতে সঙ্কুচিত হইত।

আমরা কর্ম্মক্ষেত্রের কথা বলিতেছিলাম। নর ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা তাহার ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের বিভিন্নতার ফল। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, মানুষ আদিম কালে সমাজ-বদ্ধ অবস্থায় ছিল না। যদি তাহা সত্য হয়, তবে এ কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই আদিম যুগে, সমাজ-সৃষ্টির পূর্ব্বে, নারীকে বাধ্য হইয়া পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল,—নারী তাঁহার ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের বোঝা একা বহন করিতে পারিতেছিলেন না—তাঁহার সহায় চাই, সঙ্গী চাই। তাই তাঁহাকে নিজের কতকটা স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াও পুরুষের আশ্রয় লইতে হইল। তার পুরস্কার কি? কিসের আশায়, কোন সুখের জন্য নারী তাঁহার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিলেন? সে কি পুরুষ তাঁহাকে সাহায্য করিবে, রক্ষা করিবে বলিয়া? না—তা মোটেই নয়। সে অতি তুচ্ছ কথা। নারী নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতেন। নারী তাঁহার স্বেচ্ছাদত্ত স্বাধীনতার বদলে পাইলেন—সৃষ্টির আনন্দ, মাতৃত্বের গৌরব। যাহার তুলনা জগতে কোথাও নাই। তাহার কাছে পুরুষের আশ্রয়-দানের আনন্দ কোথায় লাগে! এই গৌরবের কথা,—এই স্বর্গীয় আনন্দের কথা—এই অধীনতার কথা—শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া এই দিক দিয়া অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন (ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৯)। এই আনন্দের কথা যে মাতৃ-জাতিকে বুঝাইতে হয়, ইহাই সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয়। আজকাল অনেক লেখিকার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা যেন ঐ মাতৃত্বটাকে বড় সুনজরে দেখেন না। এ সম্বন্ধে আলোচনারও আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনেই করেন না। শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া যে এই কথাটুকু নারীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শুধু সৃষ্টি নয়,—পালনও তাঁহাকে করিতে হয়। তাঁহার শরীর ও মনের গঠনই এমনতর যে, ঐ পালন-কার্য্যে পুরুষ তাঁহার নিকটেই যাইতে পারে না। নবজাত অসহায় শিশুকে পালন করিতে হইলে, যে স্নেহ-কোমলতার দরকার, পুরুষের তাহা নাই;—সে স্বর্গের মন্দাকিনী-ধারা শুধু জগন্মাতা নারী-হৃদয়েই আছে। তাই তিনি তাঁহার যে কর্ত্তব্য বাছিয়া নিলেন, তাহার সাধন-ক্ষেত্র বাহিরে নয়,—ভিতরে। পুরুষ জোর করিয়া যে কিরূপে সমগ্র নারীজাতিকে খাঁচার ভিতর আবদ্ধ করিয়া ফেলিল, তাহা বুঝা কঠিন। তবে হয় ত এ কথা সত্য যে, পুরুষ সব ক্ষেত্রে নারীর অযাচিত আত্মদানের, স্নেহের মন্দিরে আত্ম-বিসর্জ্জনের সম্মান রক্ষা করিতে পারে নাই। আর পারে নাই বলিয়াই সম্ভবতঃ নারী-সমস্যা এত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষ নারীকে একান্ত ভাবে তাহার উপর নির্ভর করিতে দেখিয়া, নারীকে তাহার অবশ্য-রক্ষণীয়া বলিয়া মনে করিয়াছিল; এবং সঙ্গে-সঙ্গে যে একটু আত্মম্ভরিতারও উদয় হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। ক্রমশঃ সমাজ জটিল আকার ধারণ করিল,—পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক-পৃথক কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার প্রয়োজন হইল। নারীর প্রধান কাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য ঠিক হইল। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই সর্ব্বত্র একভাবে ঘটে,—এখানেও তাহাই হইল। নারীর ও পুরুষের কর্ত্তব্য পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই একরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহার আর একটা প্রধান কারণ, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক গঠন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নারীর যাহা গৌরবের সামগ্রী—তাঁহার মানসিক গুণ, তাহার উল্লেখ করিলে, আমাদের দেশের—(শুধু আমাদের কেন, নব্য অনেক দেশেরই) কোন-কোন নারী চটিয়া উঠেন। মানসিক কোমলতা না কি নারীর পক্ষে অপবাদের জিনিষ,—পুরুষের অত্যাচারের ফল,—নারীকে স্তোকবাক্যে ভুলাইবার কৌশল মাত্র। হরিবোল হরি!

স্বার্থপরতার জন্যই হউক, বা প্রেমের খাতিরেই হউক, পুরুষ নারীকে যে বাহিরে যাইবার পক্ষে বাধা দিয়াছিল, তাহা সত্য। জীবন-সংগ্রামের ভীষণতার মধ্যে নারীকে আনিতে পুরুষ অসম্মত ছিল। আর তাহারই ফলে নারীর কমনীয়তা আরও কমনীয়তর, এবং পুরুষের কঠোরতা আরও কঠোরতর হইয়া উঠিয়াছে। কোন-কোন নারী আমাদের

কথায় রাগ করিতে পারেন; কিন্তু কথাটা বৈজ্ঞানিক সত্য যে, নারীর শারীরিক ও মানসিক গঠন পুরুষোচিত কঠোর কর্ম্মের ঠিক উপযোগী নয়। পুরুষও নিশ্চয়ই নারী-জনোপযোগী কোমাল কর্ম্মের উপযোগী নয়। তবে দায়ে পড়িলে এক জন যে অন্য জনের কাজ করিতে পারেন না, তাহা নয়; কিন্তু সেটা আপদ্ধর্ম্ম। রাণী দুর্গাবতী, চাঁদবিবির দৃষ্টান্তই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তবে সব দিক বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, নারী যেমন ভাবে স্ত্রী-পুরুষ দুজনের কাজই একা করিতে পারেন, পুরুষ সেরূপ করিতে সমর্থ নয়। যাহা হউক, সমাজ-তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের দিক দিয়া আলোচনা করিলে, আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, ঘর ও বাহির নারী ও পুরুষের বিশেষ-বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। আমরা বলিয়াছি, ঘর নারীর ও বাহির পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র। ঘর অর্থে এখানে চন্দ্র-সূর্য্য-পবনের গমনাগমনশূন্য সপ্ত-প্রাচীর-বেষ্টিত অন্ধকূপ নয়। ঘরে ও বাহিরে নিত্য সম্বন্ধ। কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্ন নাম মাত্র ঘর ও বাহির। মাঝখানে চীনের প্রাচীর নাই। বাহিরের আলো, হাওয়া এ ঘরে ঢুকে! আর সে আলো-হাওয়া শুধু নারী-জীবন রক্ষার জন্য নয়, জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যও দরকার। জাতির সূতিকাগার ঐ নারীর স্নেহময় ক্রোড়। এখান হইতেই জীবন-ধারা প্রবাহিত হইয়া জাতির শিরায়-শিরায় সঞ্চারিত হয়। সুতরাং ঘরকে যদি অন্ধকূপে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে জাতিটাও যে অন্ধ ও পঙ্গু হইয়া পড়ে, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে না।

স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা লইয়াও আমাদিগকে তর্ক করিতে হইয়াছে; এবং এখন পর্য্যন্তও যে না করিতে হয়, তাহা নয়। ইহার অপেক্ষা দেশের ও জাতির দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে! মানবের শিক্ষা-দীক্ষার আরম্ভ—প্রকৃত মানব-জীবনের আরম্ভ হয় জননীর কোলে। সুতরাং সেই জননী শিক্ষিতা ও উন্নতমনা না হইলে যে সন্তান শিক্ষিত ও উন্নত হইতে পারে না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য দর্শন-বিজ্ঞান-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের সমাজ-জীবনের—পারিবারিক জীবনের অর্দ্ধেক স্থান জুড়িয়া আছেন নারী। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত,—মাতা, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি কোন-না-কোন আকারে সমাজকে নারীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সেই নারী শিক্ষিতা না হইলে যে পুরুষের জীবনটাও খুব সুখের হয় না, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ চেষ্টার দরকার হয় না। কিন্তু আমরা যে সূক্ষ্মদর্শী, আধ্যাত্মিক জাতি,—তাই সূক্ষ্ম দর্শন করিতে-করিতে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক স্ত্রী-শিক্ষা মৃদুমন্দ গতিতে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু উহা আদতেই নারী-দিগের উপযোগী ও সন্তোষজনক নয়। নারী ও পুরুষের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী তাহাদের ঠিক উপযোগী কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে, প্রত্যেকের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা প্রথমে দেখাইয়াছি যে, নারী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র। মানব-জাতি সুখের আশা করিলে, সে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা ভিন্ন উপায় নাই। প্রত্যেক কাজের যেমন বিভাগ আছে, এ ক্ষেত্রেও তাই—Division of labour দরকার। এখন দেখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা নারীদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য-পালনে উপযোগী করিয়া তুলে কি না। আমাদের দেশে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে পুরুষদেরও যে শিক্ষা ঠিক মত হইতেছে না, তাহা অভিজ্ঞদের মুখে সর্ব্বদাই শুনা যায়। আর শুনিবারই বা দরকার কি? এই অদ্ভুত শিক্ষার ফল ত প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। আবার তাহাই মেয়েদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা যে তাদের পক্ষে শুধু অনুপযোগী, তাহা নয়, অনিষ্টকর বটে।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হইতেছে, 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' লইয়া। 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' শব্দের অর্থ যাহাই হউক, আমরা এখন মোটামুটি এই বুঝি যে, নারীরাও সর্ব্ব বিষয়ে পুরুষদের সমান অধিকার চান। (সঙ্গীন কাঁধে পাহারা দেওয়া পর্য্যন্ত?) অবশ্য, নারী যদি দাবী করেন যে, আমি পুরুষের সমান অধিকার চাই—আমি স্বাতন্ত্র্য চাই,—তাহা হইলে পুরুষ বলিতে পারে না আমি তোমাকে তোমার ন্যায্য প্রাপ্য দিব না। অবশ্য সেই সঙ্গে নারীকে হয় ত পুরুষের সাহায্য ত্যাগ করিতে হইবে। এটা হইল চরমের কথা। এমনটা ঘটিলে নারী যে মুষড়িয়া পড়িবেন, আমরা তাহা বলিতেছি না। কেহ-কেহ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন—সুখের কথা সন্দেহ নাই।

কিন্তু আর একটা কথা আছে। তাহা এই যে, এই পৃথিবীটা শুধু যুক্তি-তর্কের জোরে চলে না। বার্ক যাহাকে

Metaphysical reasoning বলেছেন, তাহা দিয়া থিওরি তৈয়ার হইতে পারে, কিন্তু কাজ চালান মুস্কিল। ন্যায়-শাস্ত্রের বলে শুধু প্রমাণ করিলেই চলিবে না যে, ওটাতে আমার অধিকার। সে অধিকারটা গ্রহণ করিলে কাজ চলে কি না, তাহাও দেখা চাই। সমাজে থাকিতে হইলে যেমন নিজের ও সাধারণের স্বার্থের জন্য কিছু-কিছু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই। নারীকে তাঁহার নিজের মঙ্গলের জন্য, তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য, কিছু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হবে বই কি। পুরুষ তাঁহাকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করিবেন। তবে যেখানে সে ত্যাগ-স্বীকারের ফলে তাঁহার নারীত্বে, তাঁহার মনুষ্যত্বে আঘাত লাগিবে, সেখানে তাহা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে বই কি।

স্ত্রী-স্বাধীনতার সীমা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা এক কথায় নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহা অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে। তবে বাহিরে নারীর স্বাধীনতা পুরুষের চেয়ে কম, এবং ঘরে পুরুষের স্বাধীনতা নারীর চেয়ে কম হবে, এ পর্য্যন্ত বলা যায়। এবং বর্ত্তমানে এইরূপ ব্যবস্থাই কতকটা পরিমাণে চলিতেছে। সমাজের অবস্থার উপর পুরুষ বা নারীর অবস্থা নির্ভর করে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা যে খুব উন্নত নয়, তাহা বর্ত্তমান সমাজের অন্ধ ভক্ত ব্যতীত বোধ হয় আর সকলেই স্বীকার করিবেন। দোষ সকল সমাজে সকল সময়েই আছে ও থাকিবে। এখন পর্য্যন্ত দোষশূন্য সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষ তৈয়ার করিতে পারে নাই। কখনও যে পারিবে, এমনও মনে হয় না। তবে আমরা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া, যতদূর সম্ভব পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিব, এই পর্য্যন্ত! স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়ে অন্য জাতির অনুকরণ করিবার পূর্ব্বে, আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা হিতে বিপরীত হওয়াই সম্ভব। এখন মহিলারা পর্দ্দার বাহির হইলে, আমরা যেরূপ ভাবে মুখ ব্যাদান করিয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া থাকি, তাহাতে কেহ যদি আমাদিগকে ভূতগ্রস্ত বলিয়া মনে করে, তবে কিছু অন্যায় হইবে না। উহা যে খুব উচ্চ নৈতিক জীবনের পরিচায়ক, তাহা বোধ হয় কেহ বলিবেন না। এ অবস্থাটা আমাদের নিজের সৃষ্টি। আমাদিগকেই উহার প্রতীকার করিতে হইবে। অবশ্য স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে-সঙ্গে এই ভাবটা ক্রমশঃ কমিবে বলিয়া আশা করা যায়; কিন্তু সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধিত না হইলে, নারীদের পক্ষে মঙ্গলের কথা হইবে না, ইহা সত্য। নারীদের প্রতি আমাদের মনে সত্যিকার শ্রদ্ধা জাগাইতে হইবে। সেটা ইয়োরোপ হইতে ধার করা শ্রদ্ধা নয়। সেটা আমাদের নিজস্ব জিনিষ, যাহা হারাইয়া আমরা নিজে পতিত হইয়াছি।

কোন-কোন নারী এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোথাও যাইতে হইলে তাঁহাদিগকে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া যাইতে হয়। তিনি দরজা বন্ধ করিয়া পাল্কী শুদ্ধ গঙ্গায় চুবাইয়া আনার কথাটাও বলিতে পারিতেন! সত্য কথা বলিতে কি, এই সব আজগুবি ব্যবহারের অর্থ বুঝা শক্ত। আর সব সময়ে বুঝিতে চেষ্টা করিবার সাহসও থাকে না। কারণ, এই সব ব্যবহারের নিম্নে যে অশোভন মনোবৃত্তি আছে, তাহার নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া লজ্জায় ও ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে হয়। অবশ্য অনেক স্থলে সেরূপ কোন কু-ধারণা হয় ত থাকে না,—উহা শুধু গতানুগতিক ভাবে সামাজিক প্রথার অনুবর্ত্তন মাত্র। এরূপ প্রথার উৎপত্তির ভিতর হয় ত সদ্‌ভাবই ছিল; কিন্তু এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয়।

আমাদের কথা অনেকের নিকট তিক্ত বোধ হইবে, জানি। কিন্তু এটা সত্য যে, এই যুগ-পরিবর্ত্তনের সময়ে নারী-সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবেই। কেহই ইহার গতিরোধ করিতে পারিবেন না। বিশ্বের এই নব জাগরণের দিনে, যিনি এই নব ভাব-স্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন, তিনি যে শুধু বিফল-মনোরথ হইবেন, তাহা নয়,—দামোদরের বন্যার মুখে তৃণখণ্ডের মত তাঁহাকে ভাসিয়া যাইতে হইবে। ভারতের নারী—বাংলার নারী জাগিবেই—এখন ভারতের নারী-শক্তির উদ্বোধন আবশ্যক—এটা ভগবানের ইচ্ছা। আজ হয় ত নারী নিজের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল করিতে পারেন,—আজ হয় ত ভারত-নারী অসাড় ভাবে ঘুমাইয়া থাকিতে পারেন, কেহ বা ভুলের বশে পরের অনুকরণ করিতে যাইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা পূর্ণ শক্তিতে জাগিবেনই,—তাঁহাদের ভুলই তাঁহাদিগকে সত্যে পৌঁছিবার পথে সাহায্য করিবে।

শেষে এ সম্বন্ধে লেখিকাদের প্রতি একটা নিবেদন আছে। আজকাল লেখিকাদের মধ্যে অনেকে এমন ভাবে লেখনীর অপব্যবহার করেন যে, তাহা দেখিয়া মনে বড়ই ক্ষোভ জন্মে। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, যদি তাঁহাদের অবস্থা হীন হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের নিজের শক্তিতেই উন্নতি করিতে হইবে। মুক্তি কেহ দিতে পারে না। যাঁহারা জাগিয়াছেন, তাঁহারা অন্যকে জাগান। পুরুষকে গালাগালি দিয়া আর কোন ফল হইবে না, কেবল নিজের লঘু হইবেন মাত্র। তাঁহারা কি এই কথাটা বুঝিতে পারেন না যে, আকাশের গায়ে থুথু ফেলিলে, নিজের গায়েই পড়ে?—সে গালাগালি নিজের পিতা, পুত্র, স্বামী, ভ্রাতার উপরে পড়ে? গালাগালি (আর কি জঘন্য ভাষায়!) দেওয়া কি সুশিক্ষা ও সুরুচির পরিচায়ক? আবার অনেকের বিদ্যার দৌড় দেখে দুঃখও হয় হাসিও আসে। যিনি জগতে নারীতে আদ্যাশক্তির আবির্ভাব দেখিতেন, সেই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীর প্রতিও কটূক্তি! যে লেখিকা মহাশয়া 'কামিনী" বলিতে চটিয়া উঠিয়াছেন, তিনি সেই সঙ্গে কাঞ্চনটাও যোগ করিলেন না কেন? না, তাহা হইলে পুরুষদিগকে গালি দিতে অসুবিধা হয় যে!

নারীর অধিকারের কথা

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আজকাল পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকার লইয়া বাঙ্গালায় একটা মহা আন্দোলন চলিতেছে। মাতৃপদবাচ্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে গত মাসের ভারতবর্ষে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দুই-একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।নারীর অধিকার নারীর নিকট খুবই আদরণীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্কীর্ণমনা আমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না—সেই অধিকারের গণ্ডী কোন্‌খানে রেখাপাত করিয়া পুরুষের অধিকার হইতে পৃথক থাকিবে।

নারীজাতির মধ্যে আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যাইতেছে যে, "আমাদের মধ্যে যখন আত্মার অবাধ বিহার, তখন কেন আমরা পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন অধিকার গ্রহণ করিব।" এ কথার উত্তরে আমার মনে হয়, শ্রেষ্ঠই চিরকাল বেশী অধিকার লাভ করে। কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পুরুষ মাত্রেই কি নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? যদিও প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ পুরুষই নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যদিও আধুনিকের চক্ষে, নারীকে তার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করাতেই নারী তাহার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয়, তথাপি মূল কারণের অনুসন্ধান না করিয়া এ কথা মানিয়া লইতে পারা যায় না।

হ'তে পারে কোন এক সময়ে কোন এক আদি-জননী তাঁর অক্ষমতার জন্য বা যে কোন অবস্থান্তরের জন্য অবাধে স্বীয় অধিকার পুরুষকে প্রদান করিয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন; এবং সেই সময় হইতে এই বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই পুরাকালের সাময়িক অধিকার-ত্যক্তা স্ত্রী পুরুষকে স্বীয় অধিকার প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া, আজও যে অসন্তুষ্টা নারী সেই পুরাকালের কথা লইয়া আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন, এমন কোন বাধ্যতা নাই।

আবার এটাও হতে পারে, যে, পুরাকালে পুরুষেরা নারীর সর্ব্ব কর্ম্মে অক্ষমতা দেখিয়া, দয়াবশতঃ তাঁহাদিগকে (নারীকে) তাঁহাদের ক্ষমতাধীন উপযুক্ত কর্ম্ম প্রদান করেন।

যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়া নারী আজ তাঁর দেনা-পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করিয়া লইতে বসিয়াছেন, সেই পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে এটাও পাওয়া যায় যে, আদি-জননীই প্রথমে শয়তানের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া, একদিন তাঁর বিশেষ জ্ঞান হারাইয়া, সাধারণ জ্ঞানকে

অবলম্বন করিয়াছিলেন ; এবং তাঁর স্বামীকেও লুব্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গার্ডেন অফ ইডেনের কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে, এক কালে পুরুষ নারীর উপর নির্ভর করিত ; পরে সেই নির্ভরতার ভিত্তি দৃঢ় নয় জানিয়া, অন্যরূপ ব্যবস্থা করে ; এবং এই কাহিনী হইতে আরও জানা যায় যে, নারীর চিত্ত তরল। তখনকার নারী ও এখনকার নারীর পারদর্শিতা, দৃঢ়তা, বা ব্যক্তিত্ব ওজন করিবার কোন উপায় নাই বলিয়াই কি আমরা অতীতকে হীন বলিতে বাধ্য ?

স্ত্রী-স্বাধীনতা জিনিষটা কোন পণ্য দ্রব্য বা Experiment নয় ; নতুবা এর ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারত। ব্যক্তিবিশেষের অপকর্ষ লইয়া যেমন সকলের বিচার চলে না, তেমনি ব্যক্তিবিশেষের উৎকর্ষ লইয়া সকলকে সম স্তর দিতে পারা যায় না। এই নারী-ঘটিত আন্দোলনকে, সমাজ-বিপ্লব নামে অভিহিত করিতে সমাজ কুণ্ঠিত হচ্ছে না ; কারণ, সমাজের চক্ষে এ নূতন, অদ্ভুত ঠেকছে।

বোধ হয় স্ত্রী-পুরুষের এই পার্থক্য ভগবানের অভিপ্রেত। কারণ বৃহৎ অস্থি, দৃঢ় পেশী, কর্কশ চর্ম্ম প্রভৃতি উপাদান দিয়ে ভগবান এই কঠোর কর্ম্মীর সৃজন করিয়াছেন। অপর দিকে, কমনীয়তার আধার স্বল্প অস্থি, সুললিত চর্ম্ম, স্বল্প পেশী প্রভৃতি কমনীয় উপাদান দিয়ে নারীকে সৃজন করিয়াছেন। নারী যত বেশী পরিশ্রমই করুক না কেন, তার এই জন্মগত বিশেষত্ব কোন মতেই পরিবর্ত্তিত হয় না।

Alexander Dumas এক জায়গায় লিখেছেন, "The heart of a woman is so constituted that however bârren it may become under the influence of prejudice or exegencies of etiquette, there is always a tender spot which has been consecrated by God to maternal affection." কথাটি বোধ হয় খাঁটী।

নারীর সেই মূর্ত্তিটাই বোধ হয় সত্যিকার সুন্দর, যেটা কোমল অথচ স্থির ; সলজ্জ অথচ করুণ ; নম্র অথচ দৃঢ় ; দুর্ব্বল অথচ জ্ঞানবৃদ্ধ ; উদার অথচ গম্ভীর, পবিত্র। সর্পীর বিস্তারিত ফণারও সৌন্দর্য্য আছে ; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য ভীষণ।

কোন এক ইংরাজ কবি লিখেছেন, "The best virtues of a wife are truth, humanity and obedience." এই obedience (বাধ্যতা) যেখানে, সেইখানেই ত স্বাধীন বিহারের স্থান নাই। বাধ্যতা বর্ত্তমান থাকিলে তুল্য অধিকারের দাবী করিবার আবশ্যকতা থাকে না।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এক স্থানে লিখেছেন, "সমাজ যে বিবাহিতা নারীমাত্রকেই তাহার পতিকে দেবতা বলাইবে, ইহা আমি সমাজের দিক হইতে অন্যায় বলিয়া মনে করিব এবং করিও।" এই উক্তির মর্ম্ম হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, লেখিকার মতে সকল স্বামীরই দেবত্ব নাই। যদি পতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে হয়, ত দেখিয়া লইতে হইবে যে, পতি-বিগ্রহের অভ্যন্তরে দেবত্বের জাগ্রত অধিষ্ঠান আছে কি না ? যদি এইরূপই তাঁহাদের (নারীদের) বাসনা হয়, ত বিবাহের পূর্ব্বে পতি যাচাই করিয়া লউন না ! তাহা হইলে পরিণাম বেশ ভক্তিপূত হইবে। উপাসনাই কি উপাসকের কার্য্য নয় ? বিচার করিবেন বিচারক।

বিবাহ শব্দটা নারীর স্বাধীন অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর অভিধানে স্থান পাইয়াছে, না, তার পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু ইহার অর্থে ত স্ত্রীর স্বাধীনতা-লোপের কথাই প্রচারিত হয়।

"মাধবীলতার শ্যামলতা স্বর্ণলতার উজ্জলতায় পরিণত হয়েছে" সত্য ; কিন্তু মাধবীলতার যদি স্বভাবই থাকিত, তাহা হইলেও সে মহীরুহের সমপদবাচ্য হইত না। লতিকা চিরকালই বৃক্ষকে অবলম্বন করিবে।

নারীত্বের মূল্য এত অধিক যে, সে যতক্ষণ একত্বের মধ্যে পরিবেষ্টিত, ততক্ষণই ইহা সমাদৃত ; অন্যথা ঘৃণিত, লাঞ্ছিত। এই অধিকার-নাশই ইহার কারণ।

বার্ম্মা মুল্লুকের স্ত্রীরা স্বাধীন ; তাদের কাজও শুনেছি বিশ্রী। অবশ্য চাক্ষুষ প্রমাণ নাই। শরৎবাবু একটা পুস্তকে বার্ম্মা নারীর যে পৌরুষভাব দেখিয়েছেন, তাতে ত আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে যায়।

নারী যে শিক্ষা চায়, সেটা কি Calcutta Universityর অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক ? যে শিক্ষা আজকাল মনীষীদের বাঞ্ছনীয়, সেইটাই কি নারীরও বাঞ্ছনীয় ? ঘরে বসে কি শিক্ষা চলে না ? যে পিতা, ভ্রাতা, বা স্বামী কন্যা, ভগিনী,

বা স্ত্রীকে কলেজ পাঠিয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, তাঁরা কি বাড়ীতে শিক্ষক রেখে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন না ? না সে ব্যবস্থায় নারী সন্তুষ্ট নয় ?

স্ত্রীকে শুদ্ধ নারী ভাবে পেতে কোন স্বামীই চায় না। সংসার-ক্ষেত্রে মানবেরও ক্ষেত্র দুই—ঘর ও বাহির। পুরুষ নিজেকে বাহিরের কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া, নারীকে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত করিল। এতে দুই দিকই বজায় থাকিল। বাহিরের কঠোর কর্ম্ম পুরুষ লইল ; আর অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু প্রায় সমান কর্ম্মই নারীকে প্রদান করিল। ইহাতে নারীর অসন্তুষ্ট হইবার কারণ কিছুই নাই। যদি সম অধিকার লাভ করিয়া নারীও বাহিরের কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে ঘর দেখিবে কে ? ও ক্ষেত্রটী কি পড়িয়া থাকিবে, না উভয়েই গৃহকর্ম্ম করিবে ?

এইরূপ বিভাগ লইয়া কাড়াকাড়ি চলিলে, মনোমালিন্য স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। তাতে ভালবাসার মর্য্যাদা থাকে না। নারীও অধিকাংশ সময় বাহিরের কর্ম্ম করিতে পারেন না। কারণ, প্রায় প্রত্যেক বৎসরের মোটামুটি হিসাবে ৭।৮ মাস নারীকে প্রজনন-শক্তি রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে হয়। এই দীর্ঘ সময় কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিলে, কর্ম্ম চলে না। তার চলা পথে মরিচা ধরিয়া যায়। অফিসের ছুটীও অতদিন পাওয়া যায় না। প্রজনন-শক্তিও রক্ষা করা চাই ; নতুবা, বিপ্লব ত দূরের কথা, ধ্বংস আসিয়া পড়িবে।

সাঁওতাল, কোল ও ভীল নারীরা পুরুষের সহিত সম অধিকার ভোগ করে ; এবং তাদের ব্যবহারও কিরূপ শোভন, তাহা সকলেই জানেন।

আমাদের দেশে শিক্ষার যেরূপ বিস্তার, তাতে সামান্য চাষীর ছেলেরাও ম্যাট্রিক পাশ করে' না হোম না যজ্ঞ হয়ে বিড়ম্বনাময় জীবন যাপন করিতেছে। সেই স্বল্প-শিক্ষিত, উপার্জ্জনে অক্ষম ছোকরার স্ত্রীও যদি তারই মত শিক্ষিতা হন, তাহা হইলেই সোণায় সোহাগা।

যে জাগ্রত, সে যে ঘুমন্ত নয়, এটী ঠিক। কিন্তু যে ঘুমন্ত, তার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে লাভ কি ? যখন জাগবার সময় হবে, তখন সে জাগবেই। যাঁরা শিক্ষার আলোক পেয়েছেন, তাঁরা ত পেয়েছেনই। যারা পাবার, তাঁরাও পাবেন। মাঝ থেকে বিপ্লবের সূচনা আনা অনাবশ্যক। আপনারা (নারীরা) Revolution ছেড়ে দিয়ে evolutionএর পথ ধরুন।

কলিকাতা-সহরই গোটা বাংলা নয়। এখানকার জন কতক বড়লোকের বাড়ীর শিক্ষিতা মেয়েকে লক্ষ্য (ideal) করে নিয়ে, গোটা বাংলার নারীর ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা অবিধেয়। ডি, এল, রায় মহাশয় সাজাহানের মুখ দিয়ে জাঁহানারাকে উদ্দেশ করে বলেছেন, "জাঁহানারা, তুই এই ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বের মধ্যে যাস্ না, তোর এ কাজ নয়। তোর কাজ স্নেহ, ভক্তি, অনুকম্পা।" সত্য-সত্যই নারীর কাজ স্নেহ, ভক্তি, অনুকম্পা। কেহ হয় ত বলে বসবেন, শিক্ষিতা হলে কি নারী এ সব করবে না ? করবে না বলেই বোধ হয়। কারণ, কঠোর কর্ম্মে মনকে কঠিন করে' তার কোমল বৃত্তিগুলো খারাপ করে দেয়।

একত্ব যে সমাজের প্রধান লক্ষণ, সেটা নিশ্চিত। বিভাগ-বহুলত্ব বাঙ্গালীর বন্ধনকে শিথিল করে দিয়েছে, সন্দেহ নাই। আবার নূতন বিভাগ লইয়া স্বল্পাবশিষ্ট গ্রন্থিকে আরও দুর্ব্বল করিয়া তোলা এ সময় উচিত নয়। একটী দিকে আমাদিগকে অন্তরের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। সে একাগ্র চিন্তাকে দুই ভাগ করিয়া লাভ কি ? নূতন করে গেঁথে তোলা যখন ভবিষ্যতের গর্ভে, তখন যে মালাটী আছে,—যদিও তার ফুলগুলি শুষ্ক ! আছে মাত্রে শুধু ডোরটী—তবু সেই ডোরটী ছিন্ন করা সদ্বিবেচনার কাজ নয়। পুরুষ ক্ষমতাপন্ন হয়ে যে সব অনুষ্ঠান করিতেছে, নারী যদি সেই সব ক্ষমতা পাইতেন, তাহা হইলে তিনি যে এর থেকে কিছু ভাল করিতেন, তার প্রমাণ নাই। ক্ষমতার মোহিনী শক্তি মানুষকে অন্ধ করে।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ

একটি জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি সকল যদি নিজ-নিজ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে চালিত হয়, তাহা হইলে তাহারা যেমন পরস্পরের সহায়তা করিয়া জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে পারে, তেমনি আবার পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জাতির অবনতি সাধিত করিতেও পারে। এ জন্য সকল জাতির মধ্যেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগত আচরণ নিয়মিত করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন। সাধারণতঃ এই সকল নিয়ম পরাভিমর্ষণ, পরস্বাপহরণ, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু ঋষিগণ সামাজিক কল্যাণের জন্য এইরূপ নিয়মই যথেষ্ট বিবেচনা করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, জীবিকা ও বিবাহ বিষয়ে সমাজকে প্রণালীবদ্ধ না করিলে, সমাজে নানা-বিধ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে সকল নিয়মাবলি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নামে পরিচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আর একটি নাম জাতিভেদ। 'জাতিভেদ' নামকরণটি ঠিক হয় নাই; কারণ, আমরা পরে দেখিব যে, এই পদ্ধতি দ্বারা জাতিকে বিচ্ছিন্ন করা হয় নাই,—পরন্তু একতা-সূত্রে আবদ্ধ করা হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম জাতীয় উন্নতির প্রতিকূল, তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার পূর্ব্বক অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই বলিয়াআমাদের বিশ্বাস। এজন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কি বস্তু, এবং তাহার কি উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

একটা জাতির কল্যাণের জন্য কি বস্তুর প্রয়োজন, তাহা চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রথম প্রয়োজন ধর্ম্ম-ভাব,—লোকের যাহাতে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, এবং সেই বিশ্বাসের দ্বারা যাহাতে তাহাদের আচরণ নিয়মিত হয়। দ্বিতীয় প্রয়োজন, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে নিরাপদ রাখা। তৃতীয়তঃ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। চতুর্থতঃ সেবক ও ভৃত্য। সর্ব্বদা সকল সমাজের মধ্যে উক্ত অভাবগুলি বিদ্যমান। এই অভাবগুলিকে অবর্জ্জনীয় ও সাধারণ (essential and universal) বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অপর অভাব-গুলি অপেক্ষাকৃত লঘু।

হিন্দু ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন (নিষ্ঠাবান হিন্দুর বিশ্বাস শ্রীভগবান হিন্দুসমাজের কল্যাণের জন্য ঋষিগণকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে প্রণোদিত করিয়াছেন) যে, সমাজের বিভিন্ন লোক-সমষ্টির উপর এই চতুর্ব্বিধ দায়িত্ব সমর্পণ করা হইবে। এই চারি শ্রেণীর লোককে চতুর্ব্বর্ণ বলা হয়। প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত ব্যক্তিগণ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান থাকিবেন, এবং তাঁহাদের সন্তানগণ যাহাতে ভবিষ্যতে সে বিষয়ে যত্নবান হয়, এই ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন। সকল ব্যবস্থারই সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ উভয় পক্ষের যুক্তিসমূহ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার পূর্ব্বক দেখেন, মোটের উপর কোন পক্ষের যুক্তি-গুলি প্রবল; এবং তদনুসারে স্থির করেন, ব্যবস্থাটি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কি না। তাঁহারা জানেন, কোন ব্যবস্থাই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শুভফলপ্রসূ হইতে পারে না। এজন্য আমরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সপক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় পক্ষের যুক্তিগুলির সংক্ষেপে বিচার করিব।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সপক্ষে একটা প্রধান কথা এই যে, সচরাচর পিতার গুণ সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে, এবং পিতা পুত্রকে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী গঠিত করিবার যেরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন, বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী গঠিত করিবার ততদূর সুযোগ পান না। শান্ত-স্বভাব ব্রাহ্মণের পুত্র সচরাচর শান্ত-স্বভাব হইবে; সে শিশু বয়স হইতে দেখিবে, তাহার পিতা শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত, তাহার স্বাভা-বিক প্রবৃত্তিও তদনুরূপ হইবে। তাহার পিতা তাহাকে শাস্ত্রার্থ এবং ক্রিয়াকর্ম্ম যেরূপ বুঝাইতে পারিবেন, সামরিক কৌশল বা কৃষিকর্ম্ম সেরূপ বুঝাইতে পারিবেন না। এই ভাবে ক্ষত্রিয় যোদ্ধার পুত্র সচরাচর বলিষ্ঠ-দেহ এবং তেজস্বী হইবে,—সে তাহার পিতার নিকট সহজেই যুদ্ধ-কৌশল

শিখিবে। আপত্তি হইতে পারে যে, শান্ত-স্বভাব, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির পুত্রকে পাপিষ্ঠ হইতে দেখা গিয়াছে; রাজপুত্রকেও বৈরাগ্য-ভাবাপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা সত্য, কিন্তু এগুলি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইলে, সাধারণ নিয়মের উপরই তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। তাহাতে, দুই-চারিটা ব্যতিক্রম হইতে যে পরিমাণে অসুবিধা হইবে, তদপেক্ষা সুবিধা অনেক বেশী। এজন্য মোটের উপর এইরূপ ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে কল্যাণ-কর হইয়া থাকে।

পুত্রের স্বভাব যে পিতার অনুরূপ হয়, ইহা বর্ত্তমান Eugenics বা সুপ্রজনন-বিদ্যাতেও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তির চরিত্র প্রধানতঃ দুইটি বিষয় দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়—জন্মগত সংস্কার (heredity) এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environment)। বলা বাহুল্য heredity ও environment উভয় হেতুই পুত্রকে পিতার অনুরূপ করার অনুকূল। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এই সাধারণ নিয়মের সম্পূর্ণ সাহায্য পাইয়াছে। পুত্রের প্রকৃতিতে কখন-কখনও পিতা-মাতার অসদৃশ লক্ষণ পাওয়া যায়। ইহার কারণ Eugenics বিদ্যায় এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয় যে, এইরূপ লক্ষণ পিতা-মাতাতে অবর্ত্তমান থাকিলেও, কোনও পূর্ব্ব-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল; মধ্য-বর্ত্তী পুরুষে তাহা সুপ্ত (latent) থাকিয়া, বর্ত্তমান পুরুষে প্রকাশ পাইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া বংশ-পরম্পরায় একই স্বভাবের স্ত্রী-পুরুষের বিবাহের ফলে ঐ বংশে ভিন্ন স্বভাবের সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা ক্রমশঃ কমিয়া যায়। সুদূরবর্ত্তী ভিন্ন স্বভাবের পূর্ব্বপুরুষের লক্ষণ যদি দৈবাৎ কোন ব্যক্তিতে প্রকাশ পায়, তাহা হইলেও তাহার পুত্র-পৌত্র প্রভৃতির মধ্যে বংশের সাধারণ স্বভাব পুনরায় প্রকাশ পাইবে।

জন্ম দ্বারা জাতি নির্ণয় করার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ এই আপত্তি শোনা যায় যে, জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা (accident)। তাহার দ্বারা একটা মানুষের সমগ্র জীবনের আচরণ নিয়মিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে ইহার উত্তর এই যে, জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। পৃথিবীতে আকস্মিক ঘটনা ঘটে না। প্রত্যেক ঘটনারই যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কোন ব্যক্তিবিশেষ পৃথিবীতে কোটি-কোটি স্ত্রী-পুরুষ থাকিতে যে একটি বিশেষ স্ত্রী-পুরুষের সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিল, ইহার যথেষ্ট যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মই সেই কারণ। পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব অনেকে বিশ্বাস করেন না। এজন্য পূর্ব্ব-জন্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বিচার করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং জন্মান্তরবাদ—ইহারা পরস্পর সম্বদ্ধ। এই দুইটি দৃঢ় ভিত্তির উপর হিন্দুধর্ম্ম-সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দেহের বিনাশের সহিত আত্মার বিনাশ হয় না,—মৃত্যুর পরও আত্মা থাকে,—ইহা প্রায় সকল ধর্ম্মেরই বিশ্বাস। কিন্তু জন্মের পূর্ব্বে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক ধর্ম্ম কিছু বলেন না। বিচার করিলে বোধ হইবে যে, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব যেরূপ যুক্তিযুক্ত,জন্মের পূর্ব্বেও আত্মার অস্তিত্ব সেইরূপ যুক্তিযুক্ত। কারণ, আত্মা যখন দেহ হইতে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, তখন দেহের উৎপত্তি বা বিনাশের দ্বারা আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশনিয়মিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। বাস্তবিক,আত্মাকে অমর, অবিনাশী বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাকে অনাদি বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। যাহা কিছুর উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও থাকিবে। যেরূপ ঘটনার সমাবেশে তাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিপরীত ঘটনাতে তাহার বিনাশও কল্পনা করিতে হয়। অনাদি না হইলে অনন্ত হইতে পারে না। অতএব জন্মের পূর্ব্বেও আত্মা ছিল। কিন্তু কি অবস্থায়? হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম এ বিষয়ে নীরব (এখানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের শাখা বলিয়া ধরা হইতেছে)। হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াছে,অনন্ত কাল ধরিয়া জীব পুনঃ-পুনঃ দেহ গ্রহণ ও দেহত্যাগ করিয়া আসিতেছে—জীব অনাদি। যে সকল ধর্ম্ম মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহাদের মতে মৃত্যুর পর আত্মা কি ভাবে অবস্থান করে, তাহাও বিবেচনা করিবার বিষয়। সাধারণতঃ এই সকল ধর্ম্মের মতে, ইহজন্মের কর্ম্ম অনুসারে আত্মা স্বর্গ বা নরকে বাস করে। এ সকল মতে যখন পুনর্জ্জন্ম নাই, এবং আত্মা অবিনাশী, তখন কাজে-কাজেই স্বর্গ ও নরককে অনন্ত বলিয়া কল্পনা করিতে হয়। অর্থাৎ, ইহজন্মে যে পুণ্য কর্ম্ম করে, তাহার অনন্ত স্বর্গবাস হয়—যে পাপ করে, তাহার অনন্ত নরকবাস হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহজন্মে কৃত পাপ বা পুণ্যের সমষ্টি একটা সান্ত দ্রব্য (finite thing)। সান্ত দ্রব্যের ফল সান্ত-ই হওয়া উচিত,—অনন্ত হওয়া উচিত নহে। হিন্দুধর্ম্মে স্বর্গ ও নরক উভয়কেই সান্ত করিয়া, তাহার পর পুনরায় জন্ম কল্পনা করিয়া

ব্যাপারটিকে যুক্তিসঙ্গত করা হইয়াছে,—আত্মার অমরতাও ব্যাহত হয় নাই। তাহার পর অন্য ধর্ম্মে কর্ম্ম অনুসারে স্বর্গ ও নরকের ব্যবস্থা করিয়া প্রকারান্তরে কর্ম্মফলবাদ স্বীকার করিতেছে। এই কর্ম্মফলবাদ উত্তম রূপে আলোচনা করিলে, জন্মান্তরবাদও গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেক কর্ম্মের ফলস্বরূপ যদি সুখ-দুঃখ-ভোগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহজন্মে ভুক্ত সুখ-দুঃখেরও কারণ-ভূত কর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। ইহাই 'পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম। আমরা দেখিতে পাই, অনেকে এমন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে যে, জীবনে বেশী পরিমাণে দুঃখ পাইয়া থাকে ;—অনেকে বেশী সুখ পাইয়া থাকে। কিংবা যাহা আরও বড় কথা,—অনেকে এমন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে, যাহাতে শুভকর্ম্ম করা সহজ ও স্বাভাবিক হয় ;—অনেকে এমন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, যাহাতে অশুভ কর্ম্ম করা সহজ ও স্বাভাবিক হয়। জন্ম যদি আকস্মিক ঘটনা হয়, তাহা হইলে এ সকল তারতম্যের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জন্ম যদি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে এ সকল তারতম্যের সন্তোষজনক কারণ পাওয়া যায়।

অনেকে আপত্তি করেন যে, পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্ম যখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, তখন তাহার ফলে ইহজন্মে সুখ-দুঃখ ভোগ হওয়াতে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম যদি আমাদের স্মরণ থাকিত, আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, এইরূপ অন্যায় কর্ম্ম করিয়া এইরূপ কুফল পাইলাম, বা এইরূপ শুভকর্ম্ম করিয়া এই সুফল পাইলাম। তদনুসারে আমরা ভবিষ্যৎ আচরণ নিয়মিত করিতে পারিতাম। এ আপত্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। শাস্তির ভয়ে যে পাপ হইতে বিরত হয়, তাহার স্বভাবের উন্নতি হয় নাই। স্বভাবের উন্নতির উপায়—ভোগ ও জ্ঞান। ভোগের দ্বারা মানব দেখিতে পায়, সংসারে নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট। জ্ঞান লাভ হইলে মানুষ বুঝিতে পারে, সংসার অনিত্য—এখানে নিত্যসুখের আশা করা ভুল। এইভাবে মানব-মনে সংসার-সুখের প্রতি আসক্তি কমিয়া যায়। তখন সাংসারিক সুখের জন্য পাপ আচরণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি থাকে না,—তাহার স্বভাবের প্রকৃত উন্নতি হয়। নহিলে, পাপ করিলে শাস্তি পাইব, এই ভাবে যদিও কেহ পাপ হইতে বিরত হয়, তাহাতে তাহার স্বভাবের প্রকৃত উন্নতি হয় না।

হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ও প্রবৃত্তি অনুসারে মানব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি যে বংশে জন্মগ্রহণ করে, তাহার প্রবৃত্তি সেইরূপ,—সেই বংশানুরূপ শিক্ষা পাইবার পক্ষে তাহার অধিকতর সুযোগ বর্ত্তমান। আপত্তি হইতে পারে, যে ব্যক্তি নীচবংশে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে চিরজন্ম হেয় কর্ম্ম করিতে হইবে—এ ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম চারিবর্ণের অনুষ্ঠেয় কোন কর্ম্মই হেয় বলিয়া বিবেচনা করেন নাই,—যাহা সমাজ-রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হেয় হইতে পারে না। প্রত্যেক বর্ণের লোক বিবেচনা করিবে যে, তাহার যে কর্ম্ম, তাহা ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—কর্ত্তব্য বিবেচনায় সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিলে ভগবান প্রীত হইবেন।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণাতমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ গীতা ১৮।৪৬

প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করে, ভগবান তাহাকে সেইরূপ প্রবৃত্তি দিয়াছেন বলিয়াই সে করে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ভগবান বর্ত্তমান। সমাজের যে কোন উপায়ে সেবা করিলে, ভগবানেরই সেবা করা হইবে,—এই বুদ্ধিতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার বর্ণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। ব্রাহ্মণ সমাজকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া সেবা করিবে, ক্ষত্রিয় সমাজকে শত্রু হইতে রক্ষা করিয়া সেবা করিবে,—বৈশ্য গোপালন করিয়া, ধান্য উৎপাদন করিয়া সেবা করিবে,—শূদ্র ব্যক্তিগত ভাবে সেবা করিবে। আমার অর্থ নাই বা বিদ্যা নাই বলিয়া আমাকে বাধ্য হইয়া ভৃত্যের কর্ম্ম করিতে হইতেছে, এইরূপ ভাব অপেক্ষা, ভগবান সর্ব্বভূতে বিদ্যমান, এজন্য আমার প্রভুর মধ্যেও বিদ্যমান—ভগবানের ইচ্ছা এই ভাবেই আমি তাঁহার সেবা করিব—এই ভাব অধিকতর কল্যাণজনক। চিরজন্মই তাহাকে ভৃত্য ভাবে থাকিতে হইবে—তবে কি তাহার মনে কোন উচ্চ আশা থাকিবে না? থাকিবে বই কি। যে আশা প্রকৃত পক্ষে উচ্চ, সে আশা প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকিবে। সে আশা হইতেছে এই—ভগবানকে সন্তুষ্ট করিয়া অন্তিম কালে আমি তাঁহাকেই লাভ করিব। নহিলে বড়লোক হইব, ঐশ্বর্য্য সম্পদ ভোগ করিব, এ আকাঙ্ক্ষা হিন্দুকে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বলিয়া শেখান হয় নাই। তুমি

বড়লোক হও বা দরিদ্র হও, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; তোমার কর্ম্ম ভগবান তোমার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—তুমি তাহা যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবে, এবং সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ করিবে—ইহাই হিন্দুধর্ম্ম প্রত্যেক হিন্দুকে শিখাইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি লাভ করিবার সুযোগ বেশী পায় ইহা সত্য। কিন্তু ইহারই ফলে কি পাশ্চাত্য দেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি লাভই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না? পাশ্চাত্য দেশে যাহার ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি অধিক, তাহারই সম্মান অধিক। ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তির সম্মান আমাদের দেশেও আছে,—কিছু পরিমাণে এরূপ অবস্থা স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দ্বারা ইহাকে আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিয়া রাখা হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম জাতীয় ঐক্যের প্রতিকূল। ইহা যথার্থ নহে। প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর করিয়া, জাতীয় ঐক্যের একটা অন্তরায় দূর করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত ব্যক্তিসকল, ভিন্নবর্ণান্তর্গত ব্যক্তির সাহায্য অপরিহার্য্য বুঝিয়া, পরস্পর সৌহার্দ্দাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে। বিজাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার দ্বারা যে সকল গ্রামের শান্তি এখনও বিনষ্ট হয় নাই, সেখানে এখনও দেখা যায় যে, হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। ব্রাহ্মণ বালক শূদ্র জাতীয় স্ত্রী-পুরুষকে দাদা, বাবা, মাসী প্রভৃতি স্নেহের সম্বন্ধে অভিহিত করে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মধ্যে ঘৃণার ভাব আছে, এরূপ মনে করিবার একটা কারণ এই যে, ভিন্ন বর্ণের মধ্যে আহার বিষয়ে কতকগুলি বিধি-নিষেধ প্রচলিত আছে। কিন্তু এক ব্যক্তি অপরের সহিত বসিয়া না খাইলে, বা অপরের প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ না করিলে, তাহাকে যে ঘৃণা করা হয়, এ কথা যথার্থ নহে। বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পাখাটানা কুলির হাতে এক গ্লাস জল খাইতে কোন ইংরেজ আপত্তি করিবেন না; কিন্তু এমন ইংরেজ আছেন, যিনি, পাখাটানা বিষয়ে কুলি শিথিলতা প্রকাশ করিলে, তাহার প্লীহা ফাটাইতে পশ্চাৎপদ হন না। অতএব এক্ষেত্রে ইংরেজ কুলির হাতে জল খাইলেও, যাহারা জল না খায়, তাহাদের অপেক্ষা কুলিকে বেশী প্রীতি করেন না। এমন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু আছেন, যাঁহারা স্বপাক ভিন্ন আহার করেন না। তাঁহারা যে সকলকে ঘৃণা করেন, এরূপ মনে করা ভুল। বাস্তবিক, আহারের বিধি-নিষেধগুলি সংযম শিক্ষার একটি উপায়। সুস্বাদু দ্রব্যমাত্র যথেচ্ছ ভোজন করাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। হিন্দুধর্ম্ম-প্রণেতা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ বিষয়ে সংযম অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এ সকল নিয়ম সাধারণ অবস্থার জন্য,—অবস্থাবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে; শাস্ত্র তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি গল্প আছে। কুরুদেশে দুর্ভিক্ষ হইলে তত্ত্বজ্ঞানী উষস্তি ইভ্যগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় একজন মাহুত কুল্মাষ (কলাই) খাইতেছিল দেখিয়া, উষস্তি তাহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ ভিক্ষা করিয়া খাইলেন। মাহুত যখন তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট জল দিতে চাহিল, উষস্তি তাহা খাইলেন না। মাহুত বলিল, তুমি আমার উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ খাইলে,—জল খাইবে না কেন? উষস্তি কহিলেন, এই কুল্মাষ না খাইলে আমি বাঁচিতাম না; কিন্তু অন্যত্র জলপান করিয়া আমি বাঁচিতে পারিব। অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট ভোজন গর্হিত হইলেও, প্রাণসংশয় হইলে উচ্ছিষ্ট ভোজন করা যাইতে পারে।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মধ্যে ঘৃণার কোন স্থান হইতে পারে না। ভগবান বিভিন্ন বর্ণের যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সে কর্ম্ম করে বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করা যায় না। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ" এ কথা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের কথা নহে—ইহা হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা। নীচজাতীয় ব্যক্তির মধ্যেও ভগবৎ-প্রেম প্রকাশিত হইলে, হিন্দুসমাজ তাঁহাকে সম্মানিত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই।

মহীশূর-ভ্রমণ

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই

ষষ্ঠ প্রস্তাব

শ্রীরঙ্গপত্তনম্ বা সেরিঙ্গাপটাম্

সোমনাথপুরের মন্দির দর্শনানন্তর মহাপ্রতাপান্বিত টিপু সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনম্ বা সেরিঙ্গাপটাম দেখিবার জন্য বান্নুর হইতে মধ্যাহ্নে যাত্রা করা গেল। এই পথ দিয়াই পূর্ব্বে যাত্রা করিয়াছিলাম। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে নূতন কিছুই দেখিলাম না। বান্নুর ডাকবাঙ্গলো বা Traveller's Bungalowতে যে আমিনদার মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছিল,—আসিবার সময় দেখি যে, তিনি পথ-পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামে রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মোপলক্ষে কাছারী করিতেছেন; এবং চতুঃপার্শ্বস্থ নানা গ্রাম হইতে কৃষক, মহাজন, পঞ্চায়েত প্রভৃতি আসিয়া, যে কুটীরে বিচার-কার্য্য চলিতেছিল, তাহার বাহিরে বিশেষ জনতা বাধাইয়াছিল। আমাদের বঙ্গদেশেও একশত বা সার্দ্ধৈক শতমুদ্রা বেতনধারী "Your Honour" উপাধি ও অভিভাষণ-গর্ব্বিত রাজকর্ম্মচারী ও বিচারকদিগের পশ্চাতেও কৃষক হইতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত এইরূপ জনতা বাধাইয়া থাকে; জানি না, এই সকল বিচারকদিগের অন্তঃকরণে কি ভাবের সঞ্চার হয়। আমি ত এ অবস্থায় পড়িলে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম। আমাদের দেশে বিচারকদিগের প্রাপ্য সম্মান ভিন্ন, অনর্থক অপ্রাপ্য সম্মান প্রদান, ও মিথ্যা চাটুকারিতাপূর্ণ অভিভাষণ দ্বারা সন্তোষ উৎপাদনের চেষ্টা প্রভৃতির কথা ভাবিতে-ভাবিতে যাত্রা করিলাম। ভাবিলাম, কেন এরূপ হয়? প্রাচ্যখণ্ডের ইহাও কি এক বৈশিষ্ট্য? আমার স্মরণ আছে যে, একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, সাক্ষ্য দিবার জন্য আসিয়া, কোন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে "Your Honour, My Lord" বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন। আর একজন উকিল তাঁহাকে "My Lord" বলিয়া সম্বোধন করিতে গিয়া, তাঁহার নিকট হইতে মৃদু তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাকিম মহোদয়ের আত্মসম্মান-বোধ ছিল। তিনি উকিলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, "আপনি বিস্মৃত হইতেছেন,—এ আদালত হাইকোর্ট নহে।"

ঝট্‌কা সেই পরিচিত, বক্র, বিসর্পিত, দূরদূরান্তবাহী পথ দিয়া চলিতে লাগিল। পথটি পরিচিত হইলেও, প্রকৃতি আজ নব মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। কল্য প্রকৃতিকে বর্ষা-বারিপাতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল দেখিয়াছিলাম; আজ বোধ হইতেছিল যেন অম্লানোজ্জ্বল রবিকরে শ্যামতরঙ্গায়িত ওষধিভরা প্রশস্ত প্রান্তর হাসিতেছে। কল্য বোধ হইয়াছিল, যেন প্রকৃতি স্নেহস্তন্য দানে নীরস পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিতেছেন; তাঁহাকে নিখিলের জীবনধাত্রী রূপে দেখিয়াছিলাম; আর আজ আকাশতল বিহগ-বিরাবিত, ছায়া-শীতল উটজাঙ্গনগুলি স্নিগ্ধ রবিকিরণ-প্রদীপ্ত; আর অদূর প্রান্তরে রবিকরোজ্জ্বল ধান্যশীর্ষগুলি মধুরানিল-বীজিত হইয়া আপনার উন্মাদনায় আপনি অস্থির, আপনার চাঞ্চল্যে আপনি তরঙ্গায়িত। মাতার দিব্যানন তাই বুঝি আজ সস্মিত ও আনন্দে উৎফুল্ল; তাই বুঝি মুখে-চোখে কৌতুক উছলিয়া উঠিতেছিল।

অনেক দূর চলিয়া আমরা কাবেরী-তীরে আসিয়া পৌছিলাম। কাবেরীর কলোচ্ছ্বাসের বিরাম নাই। আজ তাহার উচ্ছ্বাস দূর হইতে শ্রুত হইল। বোধ হইল যেন সে আজি মর্ম্ম-বেদনা-সংক্ষুব্ধ। কাবেরীর ফেনিল মর্ম্মকাহিনী শুনিয়া আমারও হৃদয়ের দুই-একটি পুরাতন বেদনা জাগিয়া উঠিল; ও হৃদয় আবেগ বিহ্বল হইয়া পড়িল। কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলাম স্মরণ নাই; কিন্তু যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখি, কাবেরীর সেতুর নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছি। সেতুটির নাম Wellesley Bridge। ইহা ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল মার্কুইস্ অব ওয়েলেস্‌লির নামে উৎসর্গীকৃত;

এবং মহীশূর রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মহীশূর-রাজের আদেশে তাঁহার অমাত্য পূর্ণাইয়ার তত্ত্বাবধানে ১৮০৪ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহার সমস্ত অংশ প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং নির্ম্মাণ করিতে দুই বৎসর লাগে। ১৮০২ অব্দে আরম্ভ হইয়া কার্য্যটি ১৮০৪ অব্দে নিষ্পন্ন হয়। এই সেতুর উত্তর দিকে একটি স্মারক প্রস্তরে নির্ম্মাণের তারিখ, হেতু প্রভৃতি খোদিত আছে। লেখা আছে, মহীশূর-নৃপতি কৃষ্ণরাজ উদেয়ার বাহাদুর আপনার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ, এবং ওয়েলেস্‌লী বাহাদুর দেশ ও জনসাধারণের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই সেতুটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মহীশূর রাজের কৃতজ্ঞ হইবার কথা ; কেন না, টিপুসুলতানকে যুদ্ধে নিহত করিয়া ও তাঁহার বংশধরদিগকে বন্দী করিয়া ইংরাজবাহাদুর বর্ত্তমান রাজকুলের আদিপুরুষ কৃষ্ণরাজ উদেয়ারকে রাজসিংহাসনে স্থাপিত করেন। যাহা হউক, সেতুটী পার হইয়া আমরা Travellers' Bungalow সমীপে উপনীত হইলাম। ঝট্‌কাওয়ালাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। আপনার সুবিধা মত থাকিবার ঘরে জিনিষ পত্র গুছাইয়া লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এইখানে আসিয়া অবধি আমার মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছিল। এখানে রাত্রি কাটাইতে নিষেধ আছে ; লোকে আসিয়াই প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া যায়। এখানে রাত্রি কাটাইলেই প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইতে হয়, এইরূপ ধারণা সাধারণের মনে বদ্ধমূল। যাহা হউক, কফি পান করিয়া বাঙ্গ্‌লোর বাট্‌লার্ ডেভিড্‌কে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। ডেভিড্ লোকটি অতি নিরীহ। সে স্ত্রী-পুত্র লইয়া অতি কষ্টে বাঙ্গ্‌লোয় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। সে মাইসোরের বাঙ্গলোর বাট্‌লারের সহোদর ভ্রাতা এবং জাতিতে রোম্যান্ ক্যাথলিক ক্রিশ্চান। সে আমাকে সর্ব্ব প্রথমে টিপুসুলতানের গ্রীষ্মাবাস বা দরিয়া দৌলৎ দেখাইতে লইয়া গেল। ইহা একটি উদ্যান-প্রাসাদ। যে উদ্যানের মধ্যে এই প্রাসাদটি অবস্থিত, তাহার নাম দরিয়া দৌলৎবাগ্। উদ্যানটি অতি মনোরম, ও পরিপাটি ভাবে রক্ষিত। ইহাতে মৌসমী ফুলের যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলি রহিয়াছে, তাহা অতিশয় আদরে ও যত্নে বর্দ্ধিত হইতেছে। এখানকার রক্ষক একজন রোম্যান্ ক্যাথলিক ক্রিশ্চান, ডেভিডেরই আত্মীয়। সে আমাকে বিশেষ যত্ন করিয়া সমস্ত দেখাইল। পূর্ব্বে এ উদ্যানে ফোয়ারা ছিল ; এবং উদ্যানের এক প্রান্তস্থিত উচ্চ জলাধার হইতে ফোয়ারাগুলিতে জল যাইয়া প্রস্রবণের সৃষ্টি করিত। জলাধারে জল নাই, ফোয়ারাগুলিও যে নাতিপরিসর জল-প্রণালীর মধ্যে স্থাপিত, তাহাও জলশূন্য। প্রাসাদের মধ্যস্থ প্রকোষ্ঠটিতে তেমন আলোক প্রবেশ করে না বলিয়া, গ্রীষ্মকালের প্রখরোজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে চক্ষু উত্তেজিত হইবার পর, এখানে আসিলে এক স্নিগ্ধ ভাবের উদ্রেক হয়। পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠগুলি ঈষৎ আলোকিত। এক্ষণে ইহা য়ুরোপীয় নর-নারীর গ্রীষ্মকালের বিলাস-ভবন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। মহীশূর বা বাঙ্গালোর হইতে য়ুরোপীয় নরনারী মোটর-যানে এখানে আসিয়া সমস্ত দিন ক্রীড়া-কৌতুকে, পান-ভোজনে, বিলাস-ব্যসনে ব্যয়িত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিয়া যান। টিপু-সুলতানের সময় এখানে মদ্য প্রবেশ করিতে পাইত না ; কেন না তিনি মদ্য স্পর্শ করিতেন না। আর এখন ফেণিলোচ্ছল সুরাস্রোতে দরিয়াদৌলৎ ভাসিয়া যাইতেছে। দরিয়াদৌলতের অলিন্দস্থ প্রাচীরে উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে। কোনও স্থানে একটুও ফাঁক নাই। পশ্চিম-দিকের প্রাচীরে হায়দর আলি কর্ত্তৃক কর্ণেল বেলির অধীনস্থ ইংরাজ সৈন্যের পরাজয় কেমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত রহিয়াছে। পল্লিলোরের যুদ্ধে কর্ণেল বেলী পরাজিত ও আহত হইয়া পাল্‌কীতে যাইতেছেন, চিত্রিত হইয়াছে। হায়দর আলির অধীনে নিযুক্ত ফরাসী সৈন্যের চিত্রও বর্ত্তমান। টিপু-সুলতানের মৃত্যুর পূর্ব্বেই চিত্রগুলি বিবর্ণ ও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ইঁহার মৃত্যুর পর যখন কর্ণেল আর্থার ওয়েলেস্‌লি (পরে ডিউক্ অফ্ ওয়েলিংটন্) এখানে বাস করিতে থাকেন, তখন এগুলিকে পুনঃ চিত্রিত করেন। চূণকাম করিয়া পুনরায় এগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। বহুকাল পরে যখন লর্ড ডালহৌসি এ স্থান দেখিতে আইসেন, তখন এগুলির পুনরুদ্ধারের আদেশ করিয়া যান। তদবধি এগুলি চিত্রিত রহিয়াছে। আমি সমস্ত ভারতবর্ষের কোথাও এ প্রকারের চিত্র দর্শন করি নাই। অনেক শিল্প-সমালোচক বলেন যে, এ হিসাবে দরিয়াদৌলতকে দেখিলে, পারস্যের রাজধানী ইস্পাহানের কোন রাজপ্রাসাদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দরিয়াদৌলৎ দেখিয়া ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যা বন্দনাদি সারিয়া বহুদূরস্থ আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদিগকে পত্রাদি

লিখিলাম। সামান্য পাঠ ও আহারাদি করিয়া নিদ্রা যাইলাম।

প্রত্যূষে (৭-৯-১৫) পুনরায় ডেভিড্‌কে লইয়া টিপু ও হায়দর আলির সমাধি-হর্ম্ম্য দর্শন মানসে যাত্রা করিলাম। যে উদ্যানে সমাধি-হর্ম্ম্য স্থাপিত, তাহার নাম লালবাগ। ইহা সৌরিঙ্গপটামের উপকণ্ঠে স্থিত,—প্রায় দুই মাইল দূরে গঞ্জাম গ্রামে অবস্থিত। পথে যাইতে-যাইতে দেখিলাম যে, পল্লীগুলি জাতিবিশেষে বিভক্ত। কতকগুলি হিন্দুপল্লীর, কতক মুসলমানদিগের এবং কতকগুলি ক্রিশ্চানদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। লালবাগে যাইবার পথে উচ্চভূমির উপর কতিপয় স্মৃতিস্তম্ভ নয়নগোচর হয়। টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধে যে সকল ইংরাজ সৈনিক নিহত হয়, এগুলি তাহাদেরই স্মৃতিস্তম্ভ। লালবাগের সম্মুখে কর্ণেল বেলির সমাধি-স্তম্ভ রহিয়াছে। ১৭৮২ অব্দে টিপুসুলতান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বন্দী অবস্থায় ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লালবাগের তোরণটি একটু বিচিত্র ধরণের। ইহাকে দ্বিতল বলা যাইতে পারে। তলদেশের প্রকোষ্ঠগুলি খিলানে নির্ম্মিত। তোরণের খিলানটি "খাঁজদার" বা Cusped। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া তোরণ অতিক্রম করিয়া পুনরায় সিঁড়ি দিয়া উদ্যান মধ্যে অবতরণ করিতে হয়। সুতরাং ভিতরে যাইতে হইলে সকলকেই পদব্রজে যাইতে হইবে। এ নিয়মটি বেশ সুন্দর। উদ্যানে নানাপ্রকারের ফল-বৃক্ষ রহিয়াছে। বাতাপী লেবুর ন্যায় একপ্রকার বৃক্ষ দেখিলাম। নারিকেল বৃক্ষ অপর্য্যাপ্ত রহিয়াছে। সমাধি-হর্ম্ম্যটি এক উচ্চ চোবুতারার উপর অবস্থিত। উদ্যানের মধ্য দিয়া একটি পথ চোবুতরার দিকে গিয়াছে। ইহার দুই পার্শ্বে সাইপ্রেস্ ও নানাবিধ ফুলের বৃক্ষ রহিয়াছে। এই পথের দুই পার্শ্বে সমান্তরাল ভাবে দুইটি পথ গিয়াছে; লোকজনদিগকে ও তীর্থযাত্রীদিগকে এই পথদ্বয় দিয়া যাইতে হয়; মধ্যস্থ পথে কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় না। আমার বোধ হয় যে উদ্যানের মধ্য দিয়া যে জলাধার বা জলপ্রণালী বা "কারাঞ্জি" ছিল, তাহা ভরাট করিয়াই এই পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিয়দ্দুর যাইয়া চোবুতারায় পৌছিলাম। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে সমাধি-হর্ম্ম্যটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমে মস্‌জিদ ও উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আর দুইটি সমাধি রহিয়াছে। প্রথমটিতে টিপুর মহিষী ও ১১ বৎসর বয়স্ক পুত্রের, এবং শেষোক্তটিতে ফৌজ্‌দার প্রভৃতির কবর রহিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সুলতানার ও তাঁহার পুত্রের কবর অতি সামান্য ভাবে রক্ষিত ও টিপুর সমাধি-হর্ম্ম্যের বাহিরে অবস্থিত; কিন্তু টিপুর জামাতা, কন্যা, পালক মাতা বা ধাত্রী এবং অন্যান্য অমাত্যের কবর তাঁহার নিজ সমাধি-হর্ম্ম্যেরই বারাণ্ডায় যত্নের সহিত সংরক্ষিত। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে।

টিপুর সমাধি-হর্ম্ম্য চতুরস্র আকৃতির। ইহার চারিদিকে নাত্যুচ্চ পোতার উপর অলিন্দ বা বারাণ্ডা রহিয়াছে। এই বারাণ্ডার স্তম্ভগুলি দেখিবার জিনিষ। এগুলি অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ প্রস্তরে (Hornblende) নির্ম্মিত। ইহারা ছয়টি পলযুক্ত ও ইহাদের বেধ নিম্ন হইতে উপরদিকে ন্যূন হইয়া গিয়াছে। এই হর্ম্ম্যের বারাণ্ডায় অনেকগুলি কবর রহিয়াছে বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে টিপুর ধাত্রীর কবরটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার উপর কে গোলাপ পুষ্প ও বনতুলসীর পত্র রাখিয়া গিয়াছে। হায় ধাত্রী! তোমার পালিত সন্তানের শেষ রক্ষা হইল না!!

সমাধি-হর্ম্ম্যটি অতিশয় মনোজ্ঞ। ইহার বহিঃ ভিত্তি-গাত্রে যে সাতটি খাঁজযুক্ত খিলান ও দ্বার দেশের প্রতিকৃতি রহিয়াছে, তাহা আমার বিশেষ মনোহর বোধ হইল। বারাণ্ডার উপরের আলিসা, ও তাহার চারিকোণে চারিটি নাত্যুচ্চ মিনার রহিয়াছে। সমাধি-হর্ম্ম্যের আলিসার চারিধারে চারিটি সুন্দর মিনারেট রহিয়াছে; এই সকল মিনারেটের মধ্যে আলিসার উপরে যে অতিশয় ক্ষুদ্র মিনারাকৃতি অঙ্গ রহিয়াছে,—তাহা দ্বারা শোভার বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। এগুলিকে স্থানীয় লোকে "আণ্ডে" বলে। ইহার শীর্ষ অণ্ডাকৃতি বা গোলাকার বলিয়াই বোধ হয় এরূপ নামকরণ হইয়াছে। সমাধি-হর্ম্ম্যের শীর্ষদেশে যে গিল্টিকরা কলস রহিয়াছে, তাহা অতিশয় সুন্দর। এই কলসটির পাদমূলে গম্বুজটি এক প্রশস্ত পদ্মপত্রের প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত। কলসের উপরে মুসলমান ধর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকার অলঙ্কার রহিয়াছে। আলিসার গাত্রে যে কুলুঙ্গির সারি বিদ্যমান, তাহাতে সমাধিটির দিব্য শ্রী খুলিয়াছে। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি যে, সৌধে বা সমাধিতে কুলুঙ্গি যোজনা করা মুসলমান স্থাপত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ

উত্তর দিক ভিন্ন সমাধি-গৃহের তিন দিকে তিনটি দ্বার রহিয়াছে। এগুলি শিশু-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। তদুপরি হস্তিদন্তের কার্য্য করা। এ দ্বারগুলি লর্ড ডালহৌসী কর্ত্তৃক প্রদত্ত। উত্তরদিকে প্রস্তরের জালিযুক্ত জানালা রহিয়াছে। গৃহ-তলে সামান্য গালিচা আস্তীর্ণ। দরিয়াদৌলতের গালিচা ইহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। ইহা ত হইবার কথাই! ইহা যে এক্ষণে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও মহিলার বিলাস-ভবন। যাক্ সে সব কথা। গৃহের মধ্যে তিনটি কবর রহিয়াছে। ঠিক মধ্যস্থলেরটি হায়দর আলির। ইহার পূর্ব্বের কবরটি তাঁহার মহিষী বা টিপুসুলতানের জননীর, এবং পশ্চিম পার্শ্বের কবরটিতে টিপুসুলতান চিরনিদ্রায় নিমগ্ন। স্বামী-স্ত্রীর কবরদ্বয় জরির কার্য্যযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ রেসমী বস্ত্রে আবৃত, এবং পুত্রের কবরের উপর জরির কার্য্যযুক্ত রক্তবর্ণের রেসমী আবরণ রহিয়াছে। গৃহের মধ্যে জরির কার্য্যযুক্ত একটি রেসমী বস্ত্রের চন্দ্রাতপ রহিয়াছে। উপর হইতে জল পড়িয়া উহা স্থানে স্থানে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, মুসলমান রক্ষকটি উত্তর দিল যে, বৃষ্টির জল কবরের উপর পড়িবার জন্য উপরের ছাদে ইচ্ছা করিয়াই চারিটি গর্ত্ত রাখা হইয়াছে। এ যুক্তিটি আমার বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া বোধ হইল না; ছাদ ফাটিয়া গিয়া জল পড়ে বলিয়াই ধারণা হইল। যে তিনটি দ্বারের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাদের মধ্যে পশ্চিম দ্বারের দুই পার্শ্বে হায়দার আলি ও টিপুসুলতানের উদ্দেশে দুইখানি স্মৃতি-ফলক ভিত্তিগাত্রে গ্রথিত। টিপুর উদ্দেশে ক্ষোদিত ফলকে লিখিত আছে:—

"ইসলামের ও বিশ্বাসের আলোক পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। টিপু মহম্মদের ধর্ম্মের জন্য আত্মবলি দিয়াছেন। তরবারি-হস্ত হইয়া হায়দরের পুত্র নিজেকে পবিত্র বলি দিয়াছেন।" প্রকৃত পক্ষে টিপু একজন অতিশয় বিশ্বাসী, ভক্ত মুসলমান ছিলেন। সে সব কথা পরে বলিব। তাঁহার সমাধি-স্থান মুসলমানদিগের পবিত্র তীর্থ-স্থানে পরিণত হইয়াছে দেখিলাম। এমন কি, সুদূর বঙ্গদেশ হইতেও অনেক মুসলমান দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বা অন্য কোন শুভ কামনায় এখানে "মানত" দিতে আইসে। তীর্থযাত্রীদিগের জন্য চোবুতরার চারিদিকে চারিটি মুসাফের-খানা আছে। হায়দর আলি, তাঁহার স্ত্রী ও টিপুসুলতানের সমাধির উপর যাত্রীরা শর্করা, মিষ্টান্ন ও ফল "চড়ায়"; এবং দাক্ষিণাত্যের হিন্দুমন্দিরের রীত্যনুযায়ী সমাধিদ্বারের বাহিরে নারিকেল ভগ্ন করিয়া পূজা দেয়। ধনবান যাত্রীরা কবরের উপর নূতন আচ্ছাদন-বস্ত্র পরাইয়া দেয়। মুসলমান রক্ষক আমাকেও জিজ্ঞাসা করিল যে, আমি শর্করা, মিষ্টান্ন চড়াইব কি না, অথবা নারিকেল ভাঙ্গিব কি না। এসব কিছু না করিয়া, তাঁহাদের মৃত আত্মার উদ্দেশে কিছু প্রণামী দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

ফিরিবার সময় David ধরিয়া বসিল যে, নিকটবর্ত্তী রোমান্ ক্যাথলিক গির্জ্জাটি দেখিতে হইবে,—ইহা তাহার ভজনালয়। তাহার অনুরোধ এড়াইতে পারা গেল না। গির্জ্জাটির অভ্রভেদী চূড়া নাই; পূর্ব্বধারের গৃহভিত্তিটি একটু বিশেষ উচ্চ। প্রার্থনা-গৃহটি দুইটি aisle ও একটি nave দ্বারা বিভক্ত; মধ্যবর্ত্তী naveটি aisleদ্বয় হইতে একটু উচ্চ। এই গৃহের পশ্চিমদিকে তিনটি বেদী বা altar অবস্থিত। প্রত্যেক বেদীর উপর তিনটি করিয়া মূর্ত্তি স্থাপিত। মধ্যাংশে স্থিত অর্থাৎ নেভের সম্মুখে স্থিত বেদীর উপর যে তিনটি মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যেরটি ক্রাইষ্ট এবং ইহার বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে সেণ্ট ইগ্নেসিয়াস্ (St Ignetius) ও যিশুর শিশু-মূর্ত্তি ক্রোড়ে লইয়া সেণ্ট এণ্টনি (St Antony)। এই বেদীর উত্তরদিকের বেদীতে যে তিন মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার মধ্যস্থানে ক্রাইষ্টের পিতা যোশেফ্ ও তাঁহার বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে সেণ্ট এণ্টনি ও যিশু। দক্ষিণদিকের বেদীটিতে যে তিন মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার মধ্যস্থলে যিশুমাতা মেরী, ইহার বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে সেণ্টজন (St John) ও যিশুপিতা যোশেফ্।

বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, বেদীগুলিতে হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের চিহ্ন ওতঃপ্রোত ভাবে রহিয়াছে;—সেই আমলক, সেই প্রস্ফুটিত পদ্ম ও অর্দ্ধপদ্ম বিদ্যমান; হিন্দু স্তম্ভের সেই বৈচিত্র্যময় বোধিকা বা capital নয়ন গোচর হইল। ভজনালয়ের মধ্যে দুইখানা হাতলযুক্ত চেয়ার কেন রহিয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, উৎসবের সময় ক্রাইষ্ট ও মেরীর প্রতিমূর্ত্তি ইহাতে বসাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করান হয়; হিন্দুদিগের রথযাত্রার সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দাক্ষিণাত্যে আমি

দেখিয়াছি যে, ক্রিশ্চানই হউক, আর মুসলমানই হউক, তাহাদের মধ্যে জাতীয়ত্ব ভাবের তিরোধান হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তে ইহার ঠিক বিপরীত; ক্রিশ্চান হইলে একেবারে পুরা সাহেব। পরলোকগত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আমার অনেকবার আলোচনা হইয়াছিল। তিনিও আমার উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিতেন। আমি দেখিয়াছি, তিনি কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধিধারী ক্রিশ্চানকে উপবীত ধারণ করাইয়াছিলেন, ও হবিষ্য করাইতেন। তিনি বলিতেন, কাহারও ইষ্টদেবতা যিশু হইলেও, সে তাহার আচার-ব্যবহার ত্যাগ করিবে কেন? বাস্তবিক, ক্রিশ্চান হইয়াও তাঁহার মত আচারী, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী তথাকথিত হিন্দু সন্ন্যাসী-সমাজে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাইত না। যাউক সে সব কথা। এখানে ক্রিশ্চানদিগের জাতীয় ভাব দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইলাম। বাটলার ডেভিডের কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল দেখিলাম। গির্জ্জার সহিত একটি বিদ্যালয় সংলগ্ন। এই বিদ্যালয়েরই একজন শিক্ষক আমায় সমস্ত জানাইতেছিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, "আমরা প্রায় তিনশত বৎসর হইল ক্রিশ্চান হয়েছি।" কিন্তু ইঁহার মস্তকে দক্ষিণী ধরণের শিখা বা কেশগুচ্ছ, এবং ইহার সম্মুখ অংশ মুণ্ডিত দেখিলাম। উত্তরীয়ও দক্ষিণী ধরণের মত বিস্তৃত পাড়যুক্ত। ইনি বলিলেন, "আমাদের মধ্যে জাতিভেদ বিলক্ষণ প্রচলিত আছে; যাঁরা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও এখন ক্রিশ্চান হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের সমাজের ক্রিশ্চানদের সঙ্গে বিবাহাদি করবেন; আমাদের সঙ্গে ঐরূপ ক্রিশ্চানদের বিবাহাদি হবে না। আপনাদের ধারণা ভ্রান্ত; আমরা গো বা শূকর-খাদক নই।" আমরা গোভক্ষণের নামে যেমন ঘৃণাসূচক "থুঃ থুঃ" শব্দ করি, তিনিও তদপেক্ষা ঘৃণার সহিত এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার, বেশভূষা এ প্রকার যে, আমাকে বলিয়া না দিলে আমি তাঁহাকে ক্রিশ্চান বলিয়া কখনই অনুমান করিতে পারিতাম না। ইনি নিজে রোম্যান্ ক্যাথলিক বলিয়া প্রোটেষ্ট্যান্ট ক্রিশ্চানদের উপর একটু অসন্তুষ্ট; বলিলেন, "ইহাদের আছে কি? ইহারা যথেচ্ছাচারী।"

রোম্যান্ ক্যাথলিক গির্জ্জা দর্শনানন্তর আমরা বাঙ্গলোয় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর পুনরায় ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। এবার দুর্গমধ্যে টিপুর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইলাম। টিপুর পরাজয়ের পর ইংরাজ সরকার তাঁহার প্রাসাদের চিহ্নমাত্রও রাখেন নাই। সমস্ত তোপ দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতবড় বিশাল প্রাসাদের শুদ্ধ পোতাটি বর্ত্তমান। ইহার উপর দাঁড়াইয়া আমি টিপুর শেষ জীবনের কাহিনীটি চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইহা কি বিষাদপূর্ণ! ভারতবর্ষে চিরকাল যাহা হইয়া আসিয়াছে, এখানে তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখিলাম। অধীনস্থের বিশ্বাসঘাতকতা টিপুর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। এই বিষাদময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করিলে, মন শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। টিপুর সমসাময়িক মির্‌হোসেন্ আলিখাঁ কার্‌মানি তাঁহার "নেসানি হায়দারি" গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে ইহার বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা পাঠ করিতে-করিতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। তাঁহার দেওয়ান বা প্রধান অমাত্যের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই তাঁহাকে জীবন ও রাজ্য, দুই হারাইতে হয়। দেওয়ানই সুলতানকে ফরাসীদিগকে বিশ্বাস করিতে না দিয়া, তাহাদের হস্তে দুর্গরক্ষার ভার দিতে দেয় নাই। ফরাসীদের উপর ভার ন্যস্ত হইলে, আমার বিশ্বাস, দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ইতিহাসের ধারা অন্যরূপে বহিত। এই বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তেই পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের নেতা গাজিখাঁর প্রাণদণ্ড হয়। দুর্গ-প্রাচীর স্থানে-স্থানে ইংরাজ কর্ত্তৃক ভগ্ন হওয়ার সংবাদ কৌশল করিয়া টিপুকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। ১৭৯৯ অব্দের ৫ই মে টিপু যখন এ বিষয় শুনিলেন, তখন নিজেই অশ্বারোহণে তাদের সংস্কার করাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাচীর সন্দর্শন করিতে চলিলেন। সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া স্নান করিয়া আহার করিতে বসিবেন, এমন সময় অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল শুনিয়া অবগত হইলেন যে, প্রভুভক্ত বিশ্বাসী সেনাপতি সায়েদ গফুর নিহত হইয়াছেন। তাঁহার আর আহার করা হইল না; তখনই অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার স্থান পূরণ করিবার জন্য ছুটিলেন। এদিকে দুর্গ-প্রাচীর হইতে বিশ্বাসঘাতকেরা শুভ্র রুমাল ঘুরাইয়া বহিঃপ্রাচীরস্থ ইংরাজদিগকে সঙ্কেত দ্বারা সায়েদ গফুরের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাত করিল; এবং আক্রমণ করিবার সুযোগের কথা জানাইয়া দিল। ইংরাজ সেনারা জলপ্লাবনের মত ভগ্ন প্রাচীর বাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং টিপুর সৈন্য আসিবার পূর্ব্বেই

তাহারা দুর্গের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইল। এ অবস্থায় টিপুর সৈন্য আসিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। টিপু দ্বারদেশের নিকটে আসিয়া দেখেন যে, ভিতর হইতে ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ান নিজে এইদিকের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, দুর্গের অন্য দ্বার দিয়া পলাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। যাহাতে টিপু এ দ্বার দিয়া ভিতরে আশ্রয় না লইতে পারেন, সেইজন্য দেওয়ান চেষ্টা করিতেছিল যে, তাহার পলায়নের পরমুহূর্ত্তে যেন এ দ্বারও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যাহা হউক, টিপ্‌ দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য কিল্লাদারকে পুনঃপুনঃ আদেশ করিলেন; কিন্তু কেহই সে আদেশ গ্রাহ্য করিল না। ইতোমধ্যে আক্রমণকারীরা টিপুর নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। তিনি অতিশয় সাহস ও বীর্য্যের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। ক্ষুদ্র বন্দুক ও তরবারীর সাহায্যে দুই তিনজন আততায়ীর প্রাণ বিনাশ করিয়া, স্বয়ং সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। এ অবস্থায় একদল ইংরাজ সৈনিক তাঁহার মণিমাণিক্য-খচিত কটিবন্ধ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করায়, মুমূর্ষু অবস্থায়ও তাহাকে আহত করিয়া, নিজে তাহার গুলিতে হত হইলেন। গুলিটি তাঁহার মস্তক বিদ্ধ করিয়াছিল। ইংরাজ সৈন্য দুর্গাভ্যন্তরে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিয়া, সমস্ত লুণ্ঠন করিল। তখনও সুলতানের মৃতদেহ দুর্গের অন্তঃ-প্রাচীরের বাহিরে অরক্ষিত অবস্থায় পতিত আছে। ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষেরা অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহার মৃতদেহের সন্ধান পাইয়া বাহির করিলেন। ইহা এক সঙ্কীর্ণ পথের পার্শ্বে পতিত ছিল বলিয়া প্রথমে কেহ দেখিতে পায় নাই। মৃতদেহকে সেই রাত্রের জন্য পাল্‌কিতে স্থাপিত করিয়া সরকারী তোষাখানায় রাখা হইল। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার আত্মীয়স্বজন মৃতদেহ দেখিয়া যখন সুলতানেরই দেহ বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন, তখন পূর্ব্ববর্ণিত লালবাগ উদ্যানে তাঁহার পিতার সমাধির পার্শ্বে তাঁহাকেও সমাহিত করা হইল।

টিপুসুলতানকে অনেকে প্রতিহিংসাপরায়ণ, হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। যাঁহারা টিপুর নিন্দা করেন, আমার বিশ্বাস, তাঁহারা তাঁহার প্রকৃত চরিত্র-মহিমার কথা অবগত নহেন। তাঁহার দুই একটী গুণেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ চরিত্রবান্, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও একনিষ্ঠ সুলতান, নবাব বা রাজার কথা সচরাচর শুনা যায় না। টিপু কখনও বিলাসপরায়ণ ছিলেন না। নিজে শিক্ষিত ছিলেন বলিয়া, রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত সমস্ত সামান্য বিষয়গুলিও নিজে পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার দরবার প্রাতঃকালে বসিত ও গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত চলিত। ইনি প্রত্যহ প্রাতে নমাজ করিয়া কিয়ৎক্ষণ কোরাণ পাঠ করিতেন; এবং তাঁহার হস্তে সর্ব্বদা জপমালা থাকিত। তিনি মিতাহারী ছিলেন। দিন-রাত্রে দুইবারের অধিক আহার করিতেন না। ইহাও আবার দরবারস্থ সমস্ত আমীর ও রাজকর্ম্মচারীর সহিত। পরাজিত হইবার পর যে দিন তাঁহার লর্ড কর্ণওয়ালিসের সহিত সন্ধি হয় (অর্থাৎ ২৩শে এপ্রিল ১৭৯২), সেই দিন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কখনও শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করেন নাই। ভূমির উপর পালের ন্যায় এক প্রকার সামান্য আস্তরণ বিছাইয়া, তাহারই উপর শয়ন করিতেন। এই কঠিন ব্রত গ্রহণ বড় সামান্য কথা নহে। টিপুর ধর্ম্মান্ধতাই তাঁহাকে অন্য ধর্ম্মের উপর বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া, আপনার ও পিতৃস্থাপিত রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করে। এই হিসাবে তাঁহাকে আওরঙ্গজীবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু টিপুর আদর্শ চরিত্রের গৌরবে আমাদের বিশ্বাস-পঙ্কিল দুর্ব্বল হৃদয় ভক্তি ও বিস্ময়ে পূর্ণ না হইয়া যায় না। পাছে মন বিলাস-ব্যসনে অপদার্থ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় ইনি জীবনের শেষভাগে সাধারণতঃ রঞ্জিত বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিধান করিতেন না। ভ্রমণ বা যুদ্ধযাত্রা কালে অবশ্য তাঁহার বেশভূষা স্বতন্ত্র ছিল। এ সময়ে তিনি লোহিত বর্ণের ব্যাঘ্র-চিত্রিত জরির-কায্য-করা গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করিতেন। টিপু রাজ্যে বা নিজ পরিবারে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার সমসাময়িক ও জীবনী-লেখক মীর হোসেন আলি খাঁ বলেন যে, বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পদগ্রন্থি, মণিবন্ধ ও মুখমণ্ডল ভিন্ন কেহ কখনও তাঁহার অনাবৃত দেহ দর্শন করে নাই। বালাঘাট অঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগকে অনাবৃত বক্ষ ও মস্তকে দেখা যাইত বলিয়া, ইনি আদেশ প্রচার করিলেন যে কোন স্ত্রীলোক স্বীয় দেহ অনাচ্ছাদিত করিয়া ও মস্তকে অবগুণ্ঠন না দিয়া পথে ভ্রমণ করিতে পারিবে না।

প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দর্শনানন্তর, যাঁহার নামে শ্রীরঙ্গপত্তনের নাম, সেই শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর মন্দির দেখিতে

গেলাম। এ মন্দিরের এমন কিছুই বিশেষত্ব নাই, যাহা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়-কালান্তর্গত স্থাপত্যরীতিতে নির্ম্মিত মন্দিরে পূর্ব্বে নয়নগোচর করি নাই। শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ স্বামীর যে বিশাল মন্দির বর্ত্তমান,—একই নামধেয় হইলেও, এখানে তাহার শতাংশের একাংশ শিল্প-চাতুর্য্যও নয়নগোচর হয় না। এই দুই স্থানের দেবমূর্ত্তি একই আকৃতির, অর্থাৎ, অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণু। আর যতদূর স্মরণ আছে, আমার মনে হয়,এ স্থানের মূর্ত্তিটি অধিকতর সুন্দর বোধ হইয়াছিল। যাহা হউক, এ স্থানের প্রসিদ্ধির আর একটা কারণ এই যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য এ স্থানে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। শৈবদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করা অপরাধে ইনি কোন নরপতির ক্রোধে পতিত হন; এবং তাঁহার উৎপীড়নের ভয়ে মহীশূর রাজ্যে পলাইয়া আসিয়া, বল্লাল নরপতি বিষ্ণুবর্দ্ধনের আশ্রয় লয়েন। শুদ্ধ আশ্রয় লইয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। ইঁহাকে শৈব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করান। বিষ্ণুবর্দ্ধন শ্রীরামানুজাচার্য্যকে যে অষ্ট গ্রাম ভূখণ্ড দান করেন, সেরিঙ্গাপটাম তাহার অন্তর্গত।

এখানকার পুস্তকালয়, মস্‌জিদ প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া এ স্থান হইতে বাঙ্গলোয় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আলোক-তৃষ্ণা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস্‌সি

(১)

সে ছিল ভোরের শিশিরে ধোয়া গোলাপ কুঁড়িটির মতই শুভ্র, নিষ্পাপ, সুন্দর। কিন্তু একটা নিবিড় বিষণ্ণতার কালো ছায়া সেই মাধুরীকে ম্লান করে দিত,—পূর্ণিমার সোণালি জ্যোৎস্নাটুকু মেঘে যেমন আড়াল করে তেম্নি।

জ্ঞানের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সে যেন বুঝ্‌তে পেরেছিল, স্রষ্টার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ পাওয়াটি থেকেই সে বঞ্চিত। তার দুঃখটা বড় তীব্র হয়ে তার মর্ম্মে বাজ্‌ত তখন, যখন সমবয়সী ছেলের দল হাসির লহর তুলে ছোট্ট ঢেউ-শিশুগুলোর মতই তাদের অঙ্গনে অবাধ নৃত্য-চঞ্চল-ভঙ্গিমায় খেলা কর্ত্ত;—আর তার বঞ্চিত অন্তরে সেই আনন্দরোল একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ জাগিয়ে তুলত। তার ত সে খেলায় যোগদানের অধিকার ছিল না,—ছেলের দল তাকে খেলায় নিতে চাইত না। সে যে জন্মান্ধ! আকর্ণবিস্তৃত চোখ-দুটি তার দৃষ্টিহীন,—সাজানো বাগানে গন্ধহীন ফুলের মত।...দূরাগত সঙ্গীতরেশের মত ছেলেদের আনন্দরোল তার প্রাণের গোপন কন্দরে কোন্ স্বপ্নপুরের বার্ত্তা বয়ে আন্‌ত, আর সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবত, আহা! ঐ খেলার উল্লাসে ডুবে থাকায় না জানি কত আনন্দ!...

ভগবান মানুষের একটা ইন্দ্রিয় খাটো কল্লে, অপর ইন্দ্রিয়গুলো তীক্ষ্ণ করেন তার ক্ষতিপূরণ কর্ত্তে; কিন্তু তাতে মেঘের ব্যথার উপশম না হয়ে, তা যেন আরো তীব্র হয়েছিল। তার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাই সমবয়সীদের অবহেলাটা সে রূঢ় অপমান বলে বোধ কর্ত্ত। তা ছাড়া, তাকে সাহায্য কর্ব্বার জন্য বাড়ীর লোকের সদাজাগ্রত ভাবটা তার অন্তরের চোখকে এড়াত না; এবং এ সাহায্যে আনন্দের চেয়ে তার দুঃখ হত অপার—হায়! ভগবান তাকে এম্নি আতুর করেই পাঠিয়েছেন! কিন্তু চক্ষুষ্মান লোকে ত অন্ধের অন্তরের আকুল আর্ত্তনাদের খোঁজ রাখে না। এই অন্ধটিকে লয়ে সদাবিব্রত অবস্থার জন্য অনেক সময় পরমাত্মীয়দের কণ্ঠ থেকেও মৃদু গুঞ্জন জেগে উঠ্‌ত, যার প্রতিধ্বনি বালকের মর্ম্মে বজ্রের মত কঠিন হয়ে বাজ্‌ত। তাই সে অনুক্ষণ একটি কোণে চুপ করে বসে ভাবৃত, আর নিঃশ্বাস ফেল্‌ত।...

রেতের বেলা বোধ করি এই বঞ্চিতকে সান্ত্বনা দেবার জন্য জগতের সৌন্দর্য্যগুলো তাকে স্বপ্নরূপে দেখা দিত। ঐ মুহূর্ত্তগুলো তার কাছে মনে হত সার্থক বলে। স্বপ্নের

মাঝে সে বর্ণ-সমাবেশ, বিচিত্র মাধুরীমেলা যে দেখ্‌ত, সে জান্‌ত না তাদের কি নাম; কিন্তু তবু তাতে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ কর্ত্ত; এবং জেগে উঠে মায়ের কাছে সে সব বিবরণ বলে তার নামের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইত। মা সে সব সৌন্দর্য্যের ইতিহাস কহিতেন, বালক তা আগ্রহভরে শুন্‌ত, আর তার অন্তর ঠেলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস জাগত,—হায়! এই অপরূপ সৌন্দর্য্যময় জগৎটা শুধু তাকে ফাঁকিই দিয়েছে। তাই পূর্ণিমার রজত-জ্যোৎস্না, ফাগুনের ফুলের হাটের লাবণ্য উপভোগে সে বঞ্চিত। কত সুখী তারা, যাদের চোখে আলো তার সৌন্দর্য্য লয়ে প্রকাশ পায়,—আর আলোহীনতার কি তীব্র যাতনা!

এ ভাবেই তার আলোহীন দিনগুলো বয়ে যাচ্ছিল। তার পর হঠাৎ কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে তার আঁধারের মাঝে একটি আলোর শিখা জ্বলে উঠ্‌ল। তার অন্ধকারের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। সেদিনও ছেলের দল তাকে বঞ্চিত করে খেলায় মগ্ন ছিল। আর সে তাদের বারান্দায় চুপ্‌টি করে বসে, তাদের কলকণ্ঠ শুন্‌ছিল,—তার মুখে ছিল গভীর ম্লানিমা। পাতাঘেরা আধফোটা পদ্মকলিকার মত সুন্দর মুখের চার পাশে কাজুরী চুলের রাশ ছড়িয়ে যে মেয়েটি এ খেলায় সবেমাত্র সেদিন ভর্ত্তি হয়েছিল, নাম তার আলো। তার বাপ বোম্বে না কোথায় কাজ কর্ত্তেন,—বহুদিন পরে সপরিবারে দেশে ফিরে এসেছেন। মেয়েটী যেম্নি সুন্দরী, তেম্নি ভালো। তাই সমবয়সীদের সঙ্গে অল্প সময়ে তার ভাব হয়েছিল খুব। কিন্তু এই অন্ধ মেঘের কথা কেউ তাকে বলে নি,—সে যে উল্লেখযোগ্য, কেউ তা মনেও কর্ত্ত না।

সেদিনকার খেলা লুকোচুরি। আলো যে পাশটায় লুকিয়েছিল, তা ঠিক মেঘের পেছনে। বালিকা তার লুকানো যায়গা থেকে সমবয়সী মেঘকে ওরূপ নির্লিপ্ত ভাবে বসে থাক্‌তে দেখে অবাক হল। কারণ, এ বয়সে খেলা না করে থাকার চেয়ে অবাক হবার কিছু থাক্‌তে পারে, শিশুরা তা কল্পনা কর্ত্তে পারে না। আলো নিম্নস্বরে বল্‌লে, "তুমি খেলা না করে এক্‌লাটি বসে আছ,—তোমার কি অসুখ করেছে?"

মেঘ প্রথমটা যেন কিছুই বুঝতে পারুলে না। সমবয়সী-দের ব্যবহারে এ যাবৎ অনুগ্রহ ও অবজ্ঞার ঝঙ্কার ছাড়া সে আর কিছু পায় নি। কিন্তু আজকের সুরটা একেবারেই নতুন। সে তার বিষণ্ণ মুখখানি আলোর দিকে ফিরাতেই, আলো বল্লে, "ওরা তোমার সঙ্গে আড়ি করেছে বুঝি?" মেঘের স্বর কেঁপে উঠ্‌ল, "না, ওরা আমায় খেলায় নেয় না,—আমি যে অন্ধ।" কথাটা একটা আর্ত্তনাদের মত বালিকার মর্ম্ম স্পর্শ কর্ল্ল। এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ থেকে, একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বালিকা বল্‌ল "কেন নেয় না? আমি নোব, এসো আমার হাত ধরে।"

মেঘ মাথা নেড়ে বল্লে, "আমি চাই না কারু হাত ধরে খেল্‌তে। কাল্‌কে ঝগড়া হলে বল্‌বে, আমায় দয়া করে খেলায় নিয়েছিলে। তার চাইতে আমার এক্‌লাই ভালো।"

আলো যেন বুঝ্‌তে পারুল, মেঘের ব্যথা কোথায়; এবং সমবেদনায় তার কচি প্রাণখানি একেবারে উথলে উঠ্‌ল।

পায়ে চোট লাগার ফাঁকি দিয়ে খেলা ছেড়ে সে এসে বস্‌ল মেঘের পাশে; এবং তার হাত ধরে সুরু করে দিল নানারকম গল্প। কতটুকুই বা তার জ্ঞান—তবু তার মুখে পাহাড়, নদী, সমুদ্র, রেল, জাহাজ, পশু, পাখী এ সবের যে কাহিনী মেঘ শুন্‌ল, তাতেই তার চারপাশে যেন একটা নতুন জগতের সৃষ্টি হয়ে গেল। সেদিনকার সন্ধ্যাটা মেঘের মনে হল সার্থক বলে,—তার স্মৃতির ইতিহাসে এমন উজ্জ্বল পাতা একটিও ছিল না।

(২)

পরদিন উষা যখন আলোর সাড়ি পরে ফুলের পশরা লয়ে ধরার হাটে এসে দাঁড়াল, অন্ধ মেঘ তখন শয্যা ছেড়ে বারান্দায় এসে কার পদশব্দের প্রতীক্ষায় বসে রইল। দূরে ঈপ্সিত শব্দ পেয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। পরক্ষণেই তার কাণে বীণাধ্বনি এলো, "আমি এসেছি মেঘ-দা।" সে ধপ্ করে মেঘের পাশে বসে পড়ে, আঁচল থেকে একরাশ বকুল ফুল তার মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিল। মেঘ উৎফুল্ল হয়ে বল্লে, "বকুল ফুল বুঝি?"

আলো বল্লে "হাঁ, মেঘ-দা। মালা গাঁথব। তুমি গাঁথবে?"

মেঘ মলিন মুখে বল্লে, "আমি কি পার্ব্ব ভাই?"

প্রশ্নটা মেঘকে আঘাত করেছে মনে করে, আলো

অনুতপ্ত হল; এবং তৎক্ষণাৎ তা হাল্কা কর্ব্বার জন্য বল্লে, "ঈ, পার্ব্বে না,—খুব পার্ব্বে।"

সে ফুল আর সুতো মেঘের হাতে তুলে দিয়ে এম্নি ভাবেই দেখিয়ে দিল, যেন মেঘই গাঁথচে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। মেঘ যে মালাটি গাঁথল, বল্‌তে গেলে তা আলোরই গাঁথা। কিন্তু তাকে উৎসাহ দিয়ে আলো বল্লে, "বাঃ, দিব্বি মালা হয়েছে মেঘ-দা। আর তুমি বল্‌ছিলে তুমি জানোই না। আচ্ছা লোক তুমি।"

আলোর ব্যবহারে মেঘের সমস্ত সঙ্কোচ, ব্যথা কেটে গিয়েছিল। সে বল্‌লে, "এম্‌নি করে হাত ধরে গেঁথে দিলে যদি মালাগাঁথা হয়, তা হলে জানি না বল্‌বার উপায় নেই। কিন্তু ভাই, এতদিন ত এম্‌নি করে আমায় কেউ দেখিয়ে দেয় নি।"

আলো বল্‌লে, "সত্যি মেঘ-দা, ভারি সুন্দর হয়েছে মালাটি তোমার।"

মেঘ বল্‌লে, "তোমারটির চেয়ে নয়।"

"বিশ্বাস না হয় দেখ!"

মেঘ দুটি মালা লয়ে নাড়াচাড়া করে দেখ্‌ল। তার অন্ধ চোখ তাকে সৌন্দর্য্য পরখ কর্ব্বার শক্তি দেয় নি। সে পরীক্ষা কর্ল্ল স্পর্শ আর ঘ্রাণ দিয়ে। কিন্তু আলো তাকে সমস্ত তাজা টাট্‌কা ফুলগুলো দিয়েছিল,—কাজেই, অনুভবে তার মালাটিই ভাল বলে বোধ হল। নিজের অক্ষমতার গ্লানিতে যে বেচারা একেবারে মুসড়ে ছিল, তার মুখে একটু-খানি দীপ্তি দেখে আলো ভারি তৃপ্তি অনুভব কর্ল্ল।

ভোরের সোণালি কিরণগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অদূরে গাছের আড়াল থেকে পাখীরা গুঞ্জন সুরু করেছিল। মেঘ বল্‌লে, "চল ভাই, গাছতলায় বসে গল্প করি। ভোরের এই ঠাণ্ডা আলো ভারি মিষ্টি,—পাখীর ডাক তাকে আরো মিষ্টি মাখিয়ে দেয়।"

আলোর হাত ধরে মেঘ গাছের তলায় বস্‌ল। একটা কোকিল তার কণ্ঠ দিয়ে মধু ঢেলে দিচ্ছিল। মেঘ বল্লে, "যে পাখীটা ডাক্‌ছে, দেখ্‌তে হয় ত সে ভারি সুন্দর, নয়?"

আলো বল্‌লে, "ঠিক তার উল্টো মেঘ-দা। ওটা হদ্দ কুৎসিত। কিন্তু গুণ আছে বলে মিষ্টি লাগে। ভারি মিষ্টি স্বর।"

মেঘ বল্লে, "আমি কিন্তু গুণ দিয়ে রূপ ঠিক করি।"

আলো বুদ্ধিমতীর মত বল্লে, "হাঁ, গুণই ত আদত। আমি বইতেও পড়েছি, কোকিল যে কালো তাতে কিবা এসে যায়।"

মেঘ চোখ বিস্ফারিত করে বল্লে, "তুমি পড়তে পার?"

"হাঁ। না পড়্‌লে মা রাগ করেন।"

"অনেক বই পড়তে পার? বইতে ত অনেক খবর থাকে,—অনেক গল্প, অনেক দেশের কথা, অনেক জীবজন্তুর কথা। আমি শুনেছি বইতে এসব থাকে। কিন্তু ভাই কেউ ত আমায় পড়ে শোনায় না। আমি নিজে ত পড়তে পারিই-না, পার্‌বোও না কোন দিন।"

তার বেদনা জড়িত কণ্ঠস্বরে আলো ব্যথিত হল; বল্লে, "আচ্ছা, আমি তোমাকে পড়ে শোনাব মেঘ-দা। অনেক গল্পের বই আছে আমার কাছে,—বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর কথা, সাতভাই চম্পার কথা। ভারি সুন্দর গল্প সাত ভাই চম্পার। সাত ভাই চম্পা জাগো রে, কেন বোন্ পারুল ডাকো রে—।" আলো সাত ভাই চম্পার গল্প সুরু কর্‌ল, মেঘ নিবিষ্ট মনে শুন্‌তে লাগ্‌ল।

সেদিন থেকে আলো তার শিশুপাঠ্য বইগুলো মেঘের কাছে উজাড় করা সুরু কর্ল্ল; এবং তা শুনতে মেঘ যত আগ্রহ প্রকাশ কর্ল্ল, আলোর উৎসাহ তত বেড়ে চল্‌ল। এ ভাবে ধীরে-ধীরে অন্ধ মেঘ অনেক জ্ঞান লাভ কর্‌ল, এবং অল্পদিনের ভেতর সে শিখে ফেল্‌ল পর্টুগালের রাজধানীর নাম এবং ভারত-সমুদ্রে যতগুলো দ্বীপ আছে সবগুলোর বিবরণ; এবং এ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে, তার আনন্দের সঙ্গে আলোর প্রতি অনুরাগের মাত্রাও বেড়ে চল্‌ল,—অন্ধকে সে জগতের সন্ধান দিচ্ছে বলেই হয় ত।

আলোর সংসর্গে এ ভাবে মেঘের আলোহীন জীবনটা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। তার মনে হল, জগৎ তার সঙ্গে যে আদান-প্রদানের সম্পর্কটা ঘুচিয়ে ফেলেছিল, আলো তার সমস্তই পূর্ণ করে দিচ্ছে। এ ভাবে দিনগুলো তার বয়ে চল্‌ল স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিণী স্রোতস্বিনীর মতই তর্ তর্ করে।

(৩)

কিন্তু ফাগুনের দখিণ হাওয়া যেমন একদিন বয়ে এসে তার মধুর স্পর্শে কুঁড়িগুলোকে ফুটিয়ে তোলে, তেম্নি করে একদিন যৌবন এসে তাদের প্রাণের কুঁড়িটি ছুঁয়ে গেল।—

সেদিন দুজনেই একটা নতুনতর অনুভূতিতে চম্‌কে উঠ্‌ল। সেদিন নিত্যকার মলয়পরশ, পাখীর গুঞ্জন তাদের চারপাশে জাগিয়ে তুল্‌ল একটা অননুভূত শিহরণ। সেদিন কৃষ্ণচূড়ার থোকা-থোকা লাল; নীল, বেগুনি ফুলের স্তবক ফুটে উঠেছিল। নির্ম্মেঘ আকাশের বুকে বসেছিল বর্ণের মেলা, আর পাখীর কণ্ঠে জেগেছিল কোন্ হারানো গাথা। দুজনের শিরার রক্ত হঠাৎ যেন চঞ্চল আবেগে বয়ে গেল,—আর বুক কেঁপে উঠ্‌ল দুর্ দুর্ করে!

মেঘ বল্লে "পৃথিবী কি বদ্‌লে গেল আজ?"

আলো মুখ নীচু করে বল্লে "বসন্ত এলো!"

মেঘ বল্লে "তারা এসে যায় চিরদিন গোপনে, আমায় ফাঁকি দিয়ে। কিন্তু আজ কি অন্ধের কাছে ধরা দিতে এসেছে?" কিন্তু এ বসন্ত যে অন্তর পথ ধরে এসেছে, এ কথাটা অনুভব কর্ত্তেই আলো রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। তার বয়স তখন চৌদ্দ, মেঘের আঠার।—আলোর কাছে যে তত্ত্ব স্পষ্ট, মেঘের কাছে তখনো তা অস্পষ্ট। মেঘ বল্লে, "যারা আমায় ফাঁকি দিয়েই যাচ্ছে, তারা ধরা দিতে এলেও চাই না আমি ধর্ত্তে।"

আলোর হঠাৎ মনে পড়ল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে; এবং সে উঠ্‌বার উপক্রম কর্ল্লে। যৌবনের অতিথিটি যেন অতর্কিতে এসে কিশোরীটিকে স্পর্শ করে সহসা তার সঙ্কোচ, সরম জাগিয়ে দিল।

মেঘ বুঝ্‌ল না, বল্লে, "রোজ রাত অবধি থাক, আজ তাড়া কেন আলো? কি চমৎকার লাগ্‌ছে ভাই আজ,—প্রাণ যেন ভরাট হয়ে যাচ্ছে।"

মেঘ তার হাতদুটি ধর্ল্লে নিত্যকার মত তাকে অনুভব কর্ত্তে। এ অনুভবে কলুষ ছিল না,—এ মানুষ যেম্নি করে পুষ্পকে, চাঁদের স্নিগ্ধ পরশকে অনুভব করে, তেম্নি। সে ত জান্‌ত না তার বাইরের আকৃতি কেমন,—রূপের মোহান্ধতা তাতে ছিল না। সে শুধু জান্‌ত তার নির্ম্মল স্পর্শ, হাসি, আর কণ্ঠটিকে; এবং অন্তরের ভেতর দিয়ে সে সব অনুভব কর্ত্ত।

কিন্তু আলো শিউরে উঠে সরে গেল। মেঘ অবাক হয়ে বল্লে, "কি হয়েছে ভাই তোমার। তুমিও ভালোবাস না আমায়।"

আলো এ অভিমানের মর্য্যাদা রাখ্‌বার কথা ভুলে গেল,—তার নূতন সরম তাকে এম্নি বিব্রত করে তুলেছিল। সে হঠাৎ বলে ফেল্‌লে "বড্ড এ তুমি মেঘ-দা।" ভালোবাসা শব্দটায় এই প্রথম সে রাঙ্গা হতে শিখ্‌ল।

"আলো—"

আলো চোখ ফিরিয়ে দেখ্‌ল, অস্তরবির শেষ কিরণ তার সমস্ত সৌন্দর্য্য মেঘের সুগৌর মুখখানির ওপর নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে,—যৌবনের লালিমায় তা অনন্ত মাধুরীময়। সে চেয়েই চোখ নত কর্ল্লে। পুরুষের মুখ পানে চাইতে তার এই প্রথম সঙ্কোচ। সে নতমুখে বল্লে "কি?"

মেঘ কম্পিত স্বরে বল্‌লে, "ভাই, তোমাকেই জান্তাম একমাত্র আপনার।" তার চোখের কোণ থেকে টপ্-টপ্ করে মুক্তাধারা গড়িয়ে পড়্‌ল।

আলো তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার হাতটি ধরেই, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তা ছেড়ে দিয়ে বল্লে, "বড্ড খারাপ লাগছে মেঘ-দা, আজ আসি।" সে চলে গেল, মেঘ বুঝ্‌তে পারল না কি হয়েছে তার।

পরদিনও মেঘের কাছে যেতে আলোর যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল। তার যৌবন তার নারী-প্রকৃতির ওপর যে সরমের আবরণ ধীরে-ধীরে তার অজ্ঞাতে টেনে দিচ্ছিল, মেঘের সেদিনকার আচরণে সেটা যেন সহসা তাকে ঘিরে ফেলেছিল। সঙ্কোচের চেয়েও তার ভয় হচ্ছিল অধিক—যদি মেঘের আচরণ কারুর চোখে পড়ে যায়। কিন্তু মেঘের প্রতি তার মমতা একটুও কমে নি।

মেঘের সঙ্গে সে একটু ব্যবধান রাখ্‌তে চেষ্টা কর্ল্লে। মেঘ তার আগমনে উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লে, "তোমারি প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম আলো,—আমার অন্ধকারে তুমি যে আলো ভাই।" কিন্তু সে দেখ্‌তে পেল না, তরুণীর সুগৌর মুখ কতখানি আবির মেখে উঠেছিল।

আলোর মুখে কথা জোগাচ্ছিল না। সরমে তাকে বিব্রত করে তুলেছিল। মেঘ বল্লে, "বাঃ, লুকোচুরি হচ্ছে বুঝি?" জাম্‌রুল গাছে একটা পাখী ডেকে উঠ্‌ল "বৌ কথা কও।"

মেঘ হঠাৎ বলে ফেল্লে, "শোন দিকি, পাখী কি বলে।"

আলো আরো রাঙ্গা হয়ে বল্লে, "বড্ড বাজে বকা সুরু কল্লে, যাই চলে আমি—"

"বা রে, আজ ভ্রমরের অর্দ্ধেকটা পড়্‌বার কথা!" বলেই মেঘ হাত বাড়াল। আলোর আঁচলখানি তার মুঠির ভিতর

পড়ে টান লাগায়, আলোর বুকের কাপড় একটু খসে পড়্‌ল। সে তা দু'হাতে চেপে লজ্জায়, রাগে লাল হয়ে হঠাৎ বলে ফেল্‌লে, "ভারি অসভ্য তুমি,—অন্ধগুলো এম্নিই।" বলেই দুপ্‌ দাপ্‌ করে সে চলে গেল। মেঘ জান্তেও পার্‌লে না, কি অপরাধ সে করেছে। খালি আলোর নিষ্ঠুর ভর্ৎসনা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত তার বুকটা চৌচির করে কেটে দিল। যে আঁচল আবাল্য তার খেলবার আসন ছিল, যে আঁচলে কতদিন আলো তার চোখ মুছিয়ে দিয়েছে, সেই আঁচলখানি ধরায় এমন কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ সে করেছে—মেঘ ভেবে পেলে না। শ্রাবণের ধারার মত হুহু করে অশ্রুধারা তার চোখ বেয়ে পড়তে লাগল।—

তার পর কদিন আলোর সঙ্গে তার দেখা হয় নি। আলো আসে নি, মেঘও যেচে গিয়ে দেখা করে নি। কিন্তু অন্তরের ভেতর সে একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব কচ্ছিল। সে ভাবছিল, ভগবান যাকে বঞ্চিত করে পাঠিয়েছেন, মানুষ তাকে শুধু ঘৃণাই করে?

মানুষ দাতা, সে তাদের অনুগ্রহজীবী। তাদের পরস্পরে ত আদান-প্রদানের কারবার চল্‌তে পারে না। কিন্তু এটা ত সান্ত্বনা নয়,—এ অতি তীব্র আত্মানুশাসন। সংসারের মাঝে মানুষ ত মানুষের মুখ চেয়েই বেঁচে থাকে।

মানুষের কাছে কতখানি নিজের অজ্ঞাতেই সে চেয়েছিল, সে বুঝ্‌তে পারল সেদিন, যেদিন আলোর সম্বন্ধের কথা শুনে সে চম্‌কে উঠ্‌ল। অন্ধ সে, আলোর কতখানিই বা সে দেখেছে। অথচ এ সংবাদে তার বুকটা অমন তোলপাড় করে উঠ্‌ল কেন, সে ভেবে অবাক হল। বাইরের সমস্ত আলোক থেকে যে আজীবন বঞ্চিত, এ আলোর তৃষ্ণা কোন্‌ মুহূর্ত্তে কোন্‌ পথে তার অন্তরের ভেতর প্রবেশ করল?...

মেঘ ভাব্‌তে-ভাব্‌তে অনেকটা এগিয়ে পড়েছিল। লাঠির সাহায্যে সে পরিচিত পথ চিনে চল্‌তে পারত। হঠাৎ একটা লঘু পদশব্দ শুনে তার শ্রবণ সচেতন হয়ে উঠ্‌ল।

আলো স্নান সেরে এই পথেই বাড়ী যাচ্ছিল। ভাবী জীবনের সরমভরা উজ্জ্বল আলোর আভা তার সুন্দর মুখখানিকে দীপ্ত করে তুলেছিল। অন্তরের সঙ্গে আজ জগৎটাও তার লাগ্‌ছিল নতুন। সে পাশ কাটিয়ে গেল না,—আজ মনে হল, সেদিন বেচারাকে সে কঠিন কথা কয়েছিল। এ পরিপূর্ণতার দিনে কোনও গ্লানি তার ছিল না, তাই ইচ্ছা হচ্ছিল অপরের সব গ্লানি দূর করে দিতে। সে এগিয়ে এলো এবং মেঘের মুখপানে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো—তা একেবারে ভোরের জ্যোতিঃহীন চাঁদের মত পাণ্ডুর।

সে বল্লে, "ভারি রোগা হয়েছ মেঘ-দা। কি হয়েছে তোমার?"

যে ব্যথা অগ্নি-গুহাবদ্ধ জমাট জ্বালার মত বুকে লুকানে ছিল, মেঘের দুঃসাধ্য হল তা চেপে রাখা। সে ফিরে দ্রুতপদে ছুটল। দ্রুত ছুটতে গিয়ে কতবার হুমড়ি খেয়ে পড়্‌ল, শরীর কেটে গেল, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। বাড়ী ফিরে সে বিছানায় এলিয়ে পড়্‌ল। মা মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন, "কি হয়েছে বাপ?" সে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে শিশুর মত কাঁদতে লাগ্‌ল। পরদিন থেকে সে যেন আত্মনির্ব্বাসনব্রত ধারণ কর্ল্ল। কিন্তু ক'দিন পরে হঠাৎ একদিন আকাশ জ্যোৎস্নায় ভেসে গেল; এবং জগতের সমস্ত ব্যথার স্বর ডুবিয়ে দিয়ে নহবৎ বেজে উঠ্‌ল। মেঘ চম্‌কে বল্লে "কি ও?"

মা বল্লেন, "ও-বাড়ীর আলোর বে।"—

"কার?"—বলেই মেঘ সহসা উন্মনা হয়ে উঠ্‌ল।

মা ও বাড়ীর সবাই বে' দেখ্‌তে গেলেন,—গেল না শুধু মেঘ। তার না কি এম্‌নি ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু সবাই চলে যেতে, সে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বিয়ে-বাড়ী আলোতে আলোময়। সে আলোর ঢেউ এই দিকটাও আলোকিত করে তুলেছে,—করে নাই শুধু মেঘের অন্তর-বাহির। তার কাণে আস্‌ছিল শুধু উৎসবের আনন্দরোল অস্ফুট হাহাকার লয়ে। ব্যাণ্ড বাজতেই তার দেহ থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠ্‌ল। সে কল্পনায় দেখ্‌লে, আলোর জীবন-সূত্র চিরদিনের জন্য একজনের সঙ্গে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। তার পর সে চলে যাবে দূর-দূরান্তে! সঙ্গে-সঙ্গে কত কথাই তার মনে তাল পাকাতে লাগ্‌লো,—তার সমস্ত চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেল!...

দূরে শাঁখ বাজ্‌ল, উলু শোনা গেল। তার পর বহু লোকের কণ্ঠ—"বরের পানে চাও আলো, চাইতে হয়।" "ওরে আলো তুলে ধর।" "হাঁ হাঁ হয়েছে, এবার ঘরে তোল।"

মেঘ কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে বসে পড়ল...

মা যখন ফিরে এলেন, তখন একটা মেঘের চাপে

বাইরের জ্যোৎস্না ডুবে গিয়েছিল,—একটা ঝটকায় ঘরের বাতিটা নিবে গিয়েছিল। তিনি পা ধুতে-ধুতে বল্লেন, "দিব্বি বরটি হয়েছে,—যেম্‌নি আলো, তেম্‌নি কিরণ।" মেঘ ধড়মড়িয়ে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল, পাছে মার চোখে ধরা পড়ে যায়। কিন্তু ভারি আগ্রহ হচ্ছিল তার বরের আগাগোড়া শুন্‌তে। জগতে এতবড় সৌভাগ্য লয়ে যে এসেছে, না জানি সে কেমন! তাকে কেমনটি শুন্‌লে তৃপ্তি হয়, তা সে জান্‌ত না। তবু তাকে সে জান্‌তে চাচ্ছিল,—মানুষ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীকে জান্‌তে চায়, তেম্‌নি। পাছে তাকে নিদ্রিত ভেবে মা ঘুমিয়ে পড়েন, এই ভয়ে সে গা-ভেঙ্গে মাকে জানিয়ে দিল, এই মাত্র সে জেগেছে। মা বল্লেন, "ঘুমিয়েছিস্?" একটি হাই তুলে মেঘ বল্লে, "কখন এলে মা? কেমন দেখ্‌লে?" "দিব্বি বর হয়েছে—যেন কাত্তিকটি। এবার না কি এম্-এ পাশ করেছে।" মেঘ নিঃশ্বাস চেপে বল্লে, "খুব সুন্দর?" "যেম্‌নি রং, তেম্‌নি মুখ, তেম্‌নি চোখ।"—মেঘের বুকটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল। চোখ!—হায় রে! চোখ লয়ে সেও ত পৃথিবীতে এসেছিল,—কিন্তু তায় দৃষ্টি নেই। ঐ একটির অভাবেই সংসার মানুষকে সব থেকে বঞ্চিত করে। আঃ, ঐ যুবকের দৃষ্টি যদি সে পেত!...তার হৃদয়ের হাহাকার নূতন করে জাগ্‌লো—আলো, আলো! হায়! চোখ দুটো গর্ত্ত করেও যদি তা দিয়ে আলোর পথ করা যেত!... সে রোদন-জড়িত কণ্ঠে বল্লে, "সবাই খুব সুখী হয়েছে মা?" মা 'সবাইর' অর্থ বুঝ্‌লেন না, বল্লেন, "হবে না! অমন বর!" মেঘ পাশ ফিরে শুয়ে কত কি ভাব্‌তে লাগল। অন্তরে যে শিখাটির সন্ধান সে পেয়েছিল, তার ছেঁড়া আঁচল দিয়ে সে তা বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে না,—আলো তার অন্তরের বিপুল প্রয়াস বুঝ্‌ল না। তার অন্তর কেঁদে গড়াতে লাগ্‌ল—আলো, আলো, ওগো অন্ধের বড় কামনার ধন আলো!...মেঘমুক্ত চাঁদ আবার সোণার ধারা ছড়িয়ে দিলে। বিয়ে-বাড়ীর গোলমাল একেবারে থেমে যায় নি। মেঘ কম্পিত কণ্ঠে বল্লে, "কবে ওরা যাবে মা?" তার কণ্ঠে অশ্রুর সন্ধান পেয়ে মা বল্লেন, "পশু হয় ত। আলোকে কাল বল্‌ব আস্‌তে। একসঙ্গে খেলেচিস্ দুটিতে,—কষ্ট হচ্ছে? হবেই ত,—ভাই-বোনের মত তোরা দুটিতে।—" মেঘের অন্তর কেঁদে উঠ্‌ছিল, "একবার, ওগো একবারটি।" কিন্তু অন্তরে কে যেন ভয় দেখাল, "যা ছিঁড়ে গেছে, তা ত জোড়বার নয়।"...চাঁদ ডুবে গেল, কত তারা ফুটল, নিব্‌ল, কিন্তু মেঘ জেগে রইল। তার ভেতরের ঝড় তাকে উড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল কোন্ অসীম অকূলের মাঝে। রাত্রি শেষে সে তন্দ্রায় দেখ্‌লে "বাইরের আলোয় শুধু জ্বালা,—অন্তরের আলোয় তৃপ্তি। জীবনের সমস্ত আলো অন্তর্মুখী কল্লে প্রকৃত সুখ।" মেঘ জেগে মাকে বল্লে, "যাবার আগে আলোকে একবার দেখা কর্ত্তে বলো মা।" যেন তার জীবনে এইটিই চরম প্রার্থনা।—

(৪)

যাবার আগে যখন আলো এসে হাত ধরে বল্লে, "আজ যাচ্ছি ভাই মেঘ-দা।" অপরাধ যা করে থাকি, ক্ষমা করো।" মেঘ চমকে উঠ্‌ল। কিন্তু সেই ঈপ্সিত স্পর্শটুকুতে আগেকার পুলক বোধ কর্ল্লে না। মনে হল, এটা বিদায়ের একটা প্রাণহীন শিষ্টাচার মাত্র। সে স্পষ্ট বোধ কর্ল্লে, ঐ তরুণীটির জীবনস্রোত আজ ভেঙ্গে পড়েছে অপর তীরে,—এ পারে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস নেই তার। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়্‌ল এরই আগেকার পরশগুলো—সঙ্কোচহীন, অবাধ, প্রাণময়। তার প্রত্যেকটিতে ছিল ফুলের সৌরভ, কোমলতা, গন্ধ, যা তার সারা অনুভূতিটাকে সচেতন করে তুল্‌ত। ভোরের স্নিগ্ধ কিরণমালার মত আলোর শিশু অন্তরের ধারাগুলো তার প্রাণে জাগিয়ে তুলেছিল যে সুমধুর অনুভূতি, তা বাঁচিয়ে রাখবার মত রস সেই পরিণত অন্তরে এক ফোঁটাও যেন ছিল না। মেঘ এই পরিণত আলো থেকে শিশু আলোর দিকে পিছিয়ে গেল। ঐ শিশু আলোতে তার সাধ, আশা, তৃপ্তি—সব। তার প্রাণের ভেতর সহসা এই তত্ত্ব যেন প্রকাশ পেল, এবং তার প্রাণে নেমে এলো এমন সান্ত্বনা, যা চক্ষুষ্মানেরা সহস্র বছরের সাধনার ফলেও পায় না।—ভগবান যাকে কাঙ্গাল করেন, তাকে দানও করেন প্রচুর,—ঐখানেই তাঁর লীলা। মেঘ বুঝ্‌তে পার্‌ল জীবনটা অনুভবের জন্য,—উপভোগের জন্য নয়। অনুভবেই তৃপ্তি, সান্ত্বনা, সুখ; উপভোগে জ্বালা, হাহাকার, দুঃখ। যতদিন সে আলোকে অনুভব করেছিল, তার প্রাণে কোনও অভাবই ছিল না। সে স্থির কর্ল্লে, আজীবন এ ভাবেই সে

আলোকে অনুভব কর্ব্বে,—আলোর শিশু অন্তরের অনাবিল ধারাগুলোকে। অনুভূতিতে ত কালিমা, বিরহ, ব্যবধান কিছু নেই,—তা অন্তরের ভেতর একটা মধুর কিছুর প্রলেপ। ভগবান তাকে অন্ধ করেও যে আলোক-তৃষ্ণা দিয়েছেন, তা মেটাবার এর চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ উপায় নেই।...মেঘ যখন আলোর হাত ধরল, তখন তার মুখে ফুটেছিল তৃপ্তি ও পবিত্রতার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। সে মধুর কণ্ঠে বল্লে, "অপরাধ তুমি কর নি ভাই, আমিই করেছি। অন্ধকে জগৎ বঞ্চনা করে; কিন্তু সে আত্ম-প্রবঞ্চনা জানে না। আমি জানি আমি অপরাধী, আমায় ক্ষমা করো।" আলো বল্লে, "তোমার অপরাধ হতে পারে না মেঘ-দা, তুমি ফুলের মত নিষ্পাপ।" মেঘ ঈষৎ হেসে বল্লে, "ফুলই কি অকলঙ্ক ভাই? অনেক ফুলে যে কীট থাকে। যাক্, সে কথা, ক'দিন থাকবে তীর্থে।"

আলোর মুখ রাঙ্গা হল। সে বল্লে, "শিগ্গীর ফিরব হয় ত। ভারি কষ্ট হচ্ছে তোমাদের সবাইকে ছেড়ে যেতে।"

মেঘ বল্লে "নদীকেও ত তার জন্মস্থান পাহাড় ছেড়ে ছুটে যেতে হয় সাগরে। ওখানেই তার পরিণতি। অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয়ে জগতের এই ত চিরন্তন রীতি।" বাড়ী থেকে তাড়া এলো। আলো প্রণাম করে বল্লে, "আসি ভাই মেঘ-দা।" মেঘ এক মুহূর্ত্ত চোখ বুজে বল্লে "আলো, ভাই, একটি স্মৃতি আমায় দেবে?" আলো অবাক হয়ে তার পানে চাইল। কিন্তু তার মুখে পবিত্রতা ছাড়া কিছু ছিল না। আলো বল্লে, "কি?" মেঘ বল্লে, "একখানি ফটো তোমার।" "ফটো,—আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল একখানা তোলা হয়েছে।" মেঘ মাথা নেড়ে বল্লে, "না,—না, সেখানা চাই না। আমি চাই শিশু আলোকে,—যে রূপে প্রথম আমার অন্ধকারের মাঝে সে প্রকাশ পেয়েছিল, সেই স্নেহ, মাধুরী, কোমলতা, সারল্যের মূর্ত্তিটুকু—যা আমি আমার অন্তরের অন্তরে অনুভব করেছিলেম।—এইখানেই আমার তৃষ্ণা।"...আলো বাড়ী গিয়ে তার বাল্যের ফটোখানি পাঠিয়ে দিলে। সেখানা স্পর্শ করে মেঘের মনে হল, যেন তা থেকে স্নেহ-কোমলতার সহস্র আলো তার বুকের ভেতর তৃপ্তির পরশ বুলিয়ে দিলে,—জগতে তার কোনও অভাবই নেই।—

কৌতুকাঙ্কন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ষড়যন্ত্র!

শ্রীমতী (ফরাসী)।—এই বেলা হাঁসটাকে কেটে ফেলা যাক্ এসো!

শ্রীমান (ইংরেজ)।—আর দিনকতক যেতে দাও না, গায়ে একটু মাংস হো'ক্। এখন কাট্‌লে যে পেট ভর্‌বে না!

হংস (জার্ম্মানী)।—প্যাঁক্! প্যাঁক্!

(De Amsterdammer.)

গা ভিজ্‌লো না !

ওয়াশিংটন কনফারেন্সে শান্তির বৈঠক ফেঁসে যাওয়ার কারণ—লড়ায়ের ভূতকে শীতল করবার জন্যে সেখানে যে শান্তিজলের আয়োজন করা হ'য়েছিল, তা'তে সে প্রকাণ্ড ভূতের গা ভিজ্‌লো না ।

(De Notenkraker, Amsterdam.)

মাণিকজোড় !

লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যয় যেমন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, গভর্ণমেণ্টের দপ্তরের খরচাও তেমনি ক্রমশঃই মোটা হচ্ছে । কেরাণীর মাইনে বাড়লেও যেমন দেনা আর মেটে না, তেমনি যতই আয় বাড়ুক গভর্ণমেণ্টের দেনাও আর ফুরোয় না । অথচ দরজার কাছে দেশের লোক না খেতে পেয়ে ক্রমেই শুকিয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে—সেদিকে মাণিক জোড়ের ভ্রূক্ষেপ নেই ! (Detroit News.)

কোথায় পেলে ?

ইটলি । কি ভাই, তোমার জন্যে লড়ায়ে নেমে আমাদের এই হাড়ির হাল হ'য়েছে, অথচ তুমি এর মধ্যে নতুন পোষাক কোথায় পেলে ?

বেলজিয়ম । আমি তো আর তোমাদের মতন কন্‌ফারেন্স্ কমিটি ক'রে রাজনীতির বাজে বৈঠকে মাতি নি—আমি যে মুখ বুজে দেশের কাজে লেগে গেছলুম ।

(Il Travaso, Rome.)

নিক্‌ম্মা দোস্ত !

কর্ম্মচ্যুত 'রণমল্লকে বেকার 'মিউনিশান মেকার' (যুদ্ধোপকরণ-ব্যবসায়ী) বলিতেছেন, "তাই ত দাদা ! কি করা যায় এইবার ?"

(Detroit News.)

যে কথা পুরাণে নেই !

অস্ত্র সংবরণের জন্য য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের যে বৈঠক বসেছিল, এই ব্যঙ্গ-চিত্রে তার নিষ্ফলতায় বিদ্রূপ ক'রে বলা হ'য়েছে, এরকম অঘটন ব্যাপার যে কোনও কালে কখনও ঘটেছিল, এ রকম তো পুরাণে বা প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায় না !" (Central Press Assn., Cleveland.)

ক্ষেপ্‌লো না কি ?

নূতন শাসন-সংস্কার আইনের আফিম খাইয়েও সার্কাসের পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ ভারতবর্ষ ট্রিক্‌-খেলোয়াড় জনবুলের ইঙ্গিতে না খেলে উল্টে বেগ্‌ড়াচ্ছে দেখে, বুল সাহেব চিন্তিত হ'য়েছেন—তাই ত ! দেড়শো বছরের পোষা জানোয়ারটি শেষে ক্ষেপ্‌লো না কি ?

(New York Evening Mail.)

তৃষ্ণার্ত্ত !

সুদীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত আয়ার্ল্যাণ্ড আজ শান্তিজলের সন্ধান পেয়ে চার পা তুলে ছুটেছে,—ডি ভেলেরা আর তাকে রাশ টেনে রাখ্‌তে পার্চ্ছে না !

(New York Evening Mail.)

ফরাসী ডাক টিকিট

অষ্ট্রীয়া আর জার্ম্মানীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া কর্ব্বার জন্যে ফ্রান্স থেকে যে সব কড়া-কড়া চিঠি চাপাটি যাচ্ছে, তাতে যে বিদ্বেষের বিষাক্ত ফণার ফোঁস্‌ফোঁসানী রয়েছে, সেইটেকে লক্ষ্য ক'রেই এই বিদ্রূপ!

(Die Muskete, Vienna.)

খোকাদের বায়না!

আয়ার্ল্যাণ্ড, মিশর, ভারত তিন ছেলেই স্বায়ত্তশাসন-মধু খাবার বায়না ধরেছিল। কিন্তু উৎপাত কর্‌ছিল বেশি প্রথম ছেলেটা। তাই মধুর বদলে অন্ততঃ দুধের বোতলটাও ধ'রতে হয়েছে ধাইবুড়িকে তার মুখে। আর বাকি ছেলে দুটোকে ধম্‌কে চোখ রাঙিয়ে ঠাণ্ডা কর্ব্বার চেষ্টা ক'রছে!

(Chicago Tribune.)

জার্ম্মানী। "দাদা, বড়ই দুরবস্থা আমার। তুমি ত টাকার আণ্ডিলের ওপোর ব'সে আছো, কিছু সাহায্য কর না আমায়!"

আমেরিকা। তোমার দুর্দ্দশা দেখে সত্যই আমার প্রাণ কাঁদ্‌ছে। কি কর্ব্ব বল। নিছক সহানুভূতি ছাড়া একটা পয়সাও আমি দিতে পার্ব্ব না! আমাদের ব্যবসার নিয়ম যে অন্যরকম!

নিছক সহানুভূতি!

(Kladderadatsch, Berlin

ধোবা। যা বেটারা, যা পাচ্ছিস্ সোণা-মুখ ক'রে খা! বেশি কিছু চাইলেই চাবুকে দেবো।

গাধারা। তা—তা—না হয় খাচ্ছি,—কিন্তু কতকাল আর এই একঘেয়ে 'কথার খেলাপ' খেয়ে বাঁচ্‌বো? এর পর তোমারই বোঝা বইবার লোকাভাব হবে।

(Star, London.)

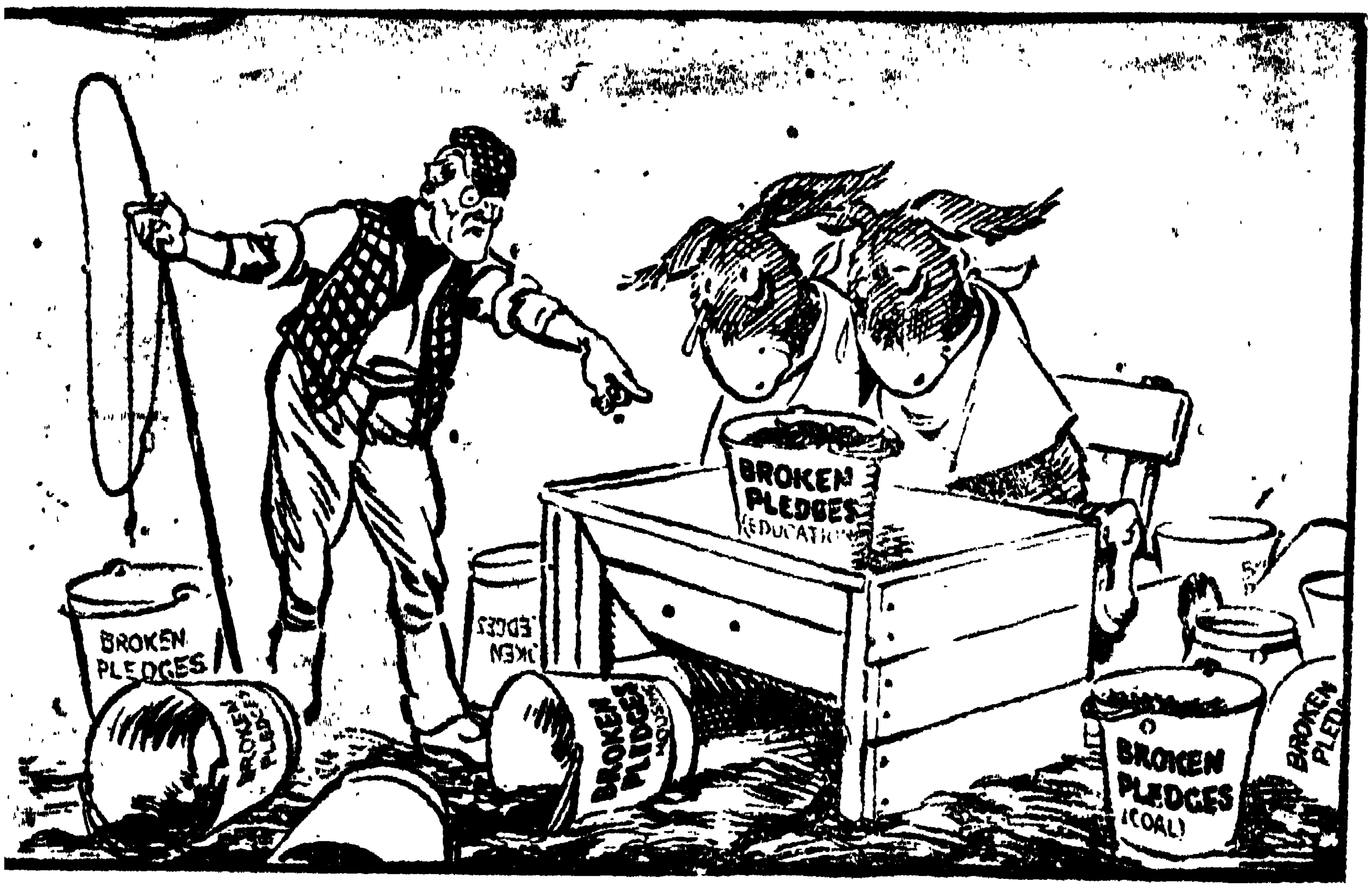

কথার খেলাপ

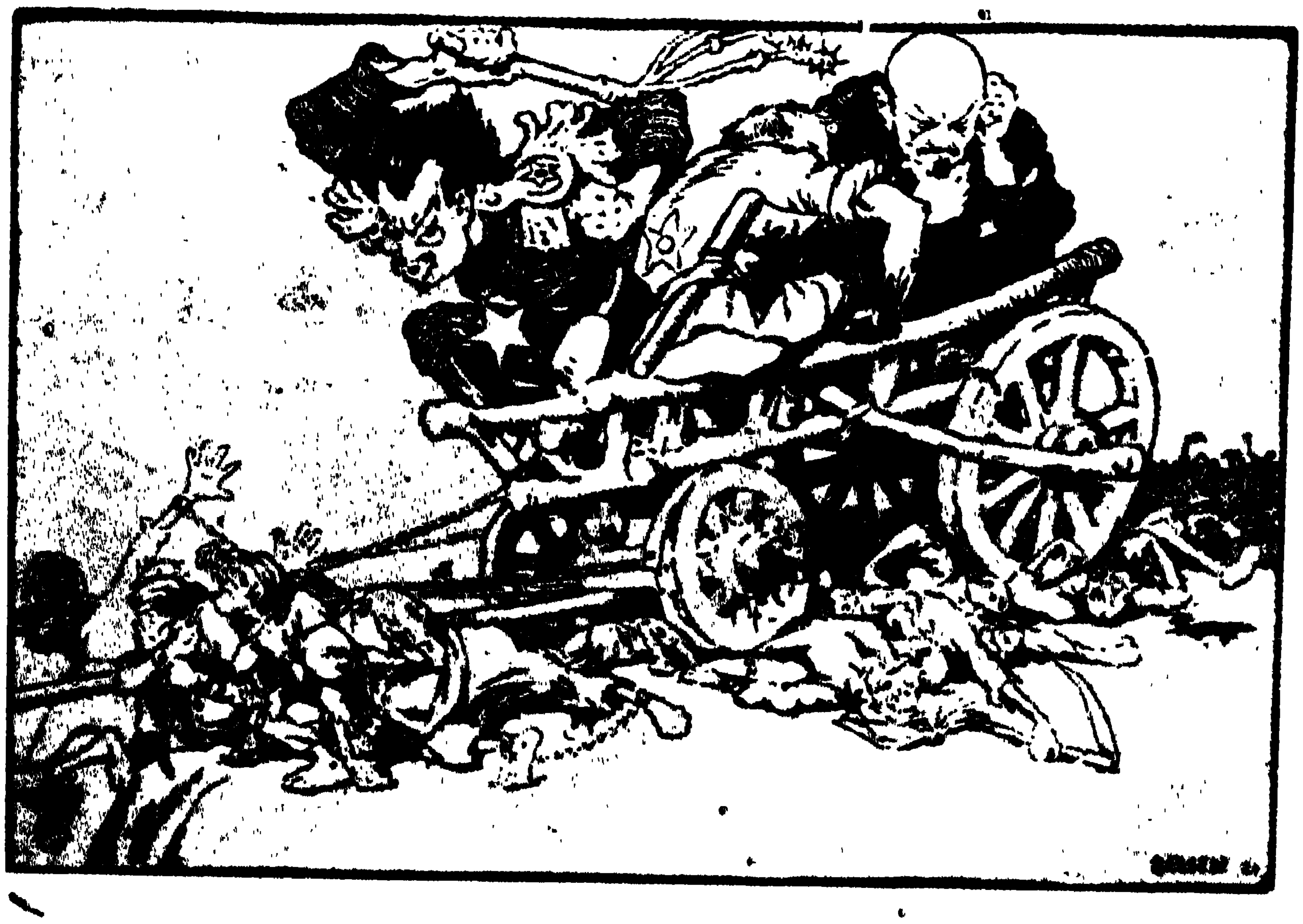

শাসন-চক্র!

রুষিয়ার বলশেভিক নেতা লেনিন্ ও ট্রট্‌স্কী সেখানে যে শাসন-নীতি প্রবর্ত্তন করেছেন, পাছে সেটা জার্ম্মানীতেও সংক্রামক হ'য়ে পড়ে, এই ভয়ে তার বিরুদ্ধে সাধারণের মনে একটা বিভীষিকা উৎপাদনের জন্য তাকে এম্‌নি ভয়াবহ, নিষ্ঠুর ও বীভৎস ক'রে তাদের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে!

(Wahre Jacob, Stuttgart.)

দেবীর সন্তোষ !

জিঘাংসা দেবীকে পরিতুষ্ট করবার জন্যেই যেন ফরাসী মন্ত্রী পয়কার বজ্রমুষ্টি আস্ফালন ক'রে বলছেন, জার্ম্মানীকে টাকা দিতেই হবে ! (De Notenkraeker, Amsterdam)

এক হাত খোলা !

শ্রমজীবীদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হ'য়েছে ; কেবল একটা হাত খোলা আছে। কেন ? মন্ত্রীদের ভোট দেবার জন্যে ! (The Labour, Washington)

জাগরণ !

পৃথিবীর কুলি-মজুর আজ তাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভেঙে উঠে বস্‌ছে। রাজনৈতিক মন্ত্রীরা, দোকানদার ব্যবসায়ীরা, কলকারখানার মালিকরা— এতদিন যার কাঁধে চড়ে নবাবী করছিল, তারা আজ তার ভয়ে ত্রস্ত ও সশঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে ! (The Labour, Washington)

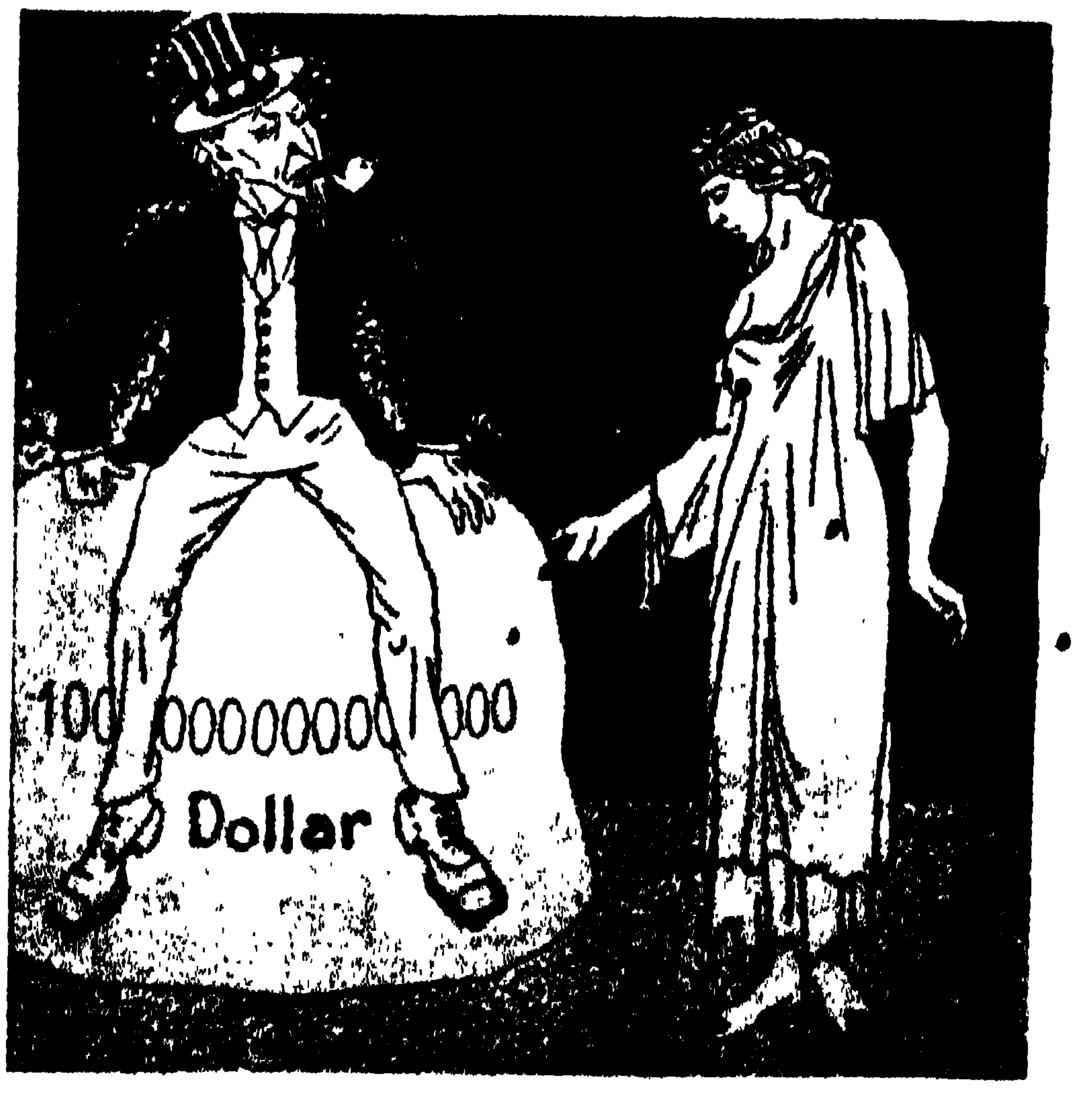

"জয় হোক বাবা, কিছু ভিক্ষে দাও !"

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে যারা যুদ্ধে গেছল, তারা আজ হাত পা ভেঙ্গে, চোখ কানা হ'য়ে দেশে ফিরে এসে খেতে পাচ্ছে না,—পেটের দায়ে তাদের আজ ভিক্ষে করতে বেরুতে হ'য়েছে ! (Sydney Bulletin)

ছদ্মবেশ বদ্‌লাও!

ইংরেজ।—সুন্দরী ফ্রান্স! তোমার ঐ ন্যায়-বিচারের ছদ্মবেশটা এইবার বদ্‌লাও, ওটা পুরোনো হ'য়ে এসেছে! এই জন্যে আন্তর্জাতিক সভায় তোমার সঙ্গে নাচ্‌বার আমার বড় অসুবিধা হচ্ছে। আমি কেমন সুবিধে মত বেশ বদ্‌লাই দেখ না?— (Le Rire, Paris)

জার্ম্মানীর বিপদ!

জার্ম্মানীর টাকার বাজার একেবারে ঝুলে পড়েছে। বিলিতি এক পাউণ্ডের সঙ্গে এখন জার্ম্মানীর পাঁচ-দশ হাজার মার্কের সমান। এই সুযোগে বিলিতি ব্যবসাদারেরা মাটির দরে জার্ম্মাণ মাল আমদানী করছে, মোটা লাভ খাবার লোভে। ফলে ইংরেজ কারিকরদের অন্ন

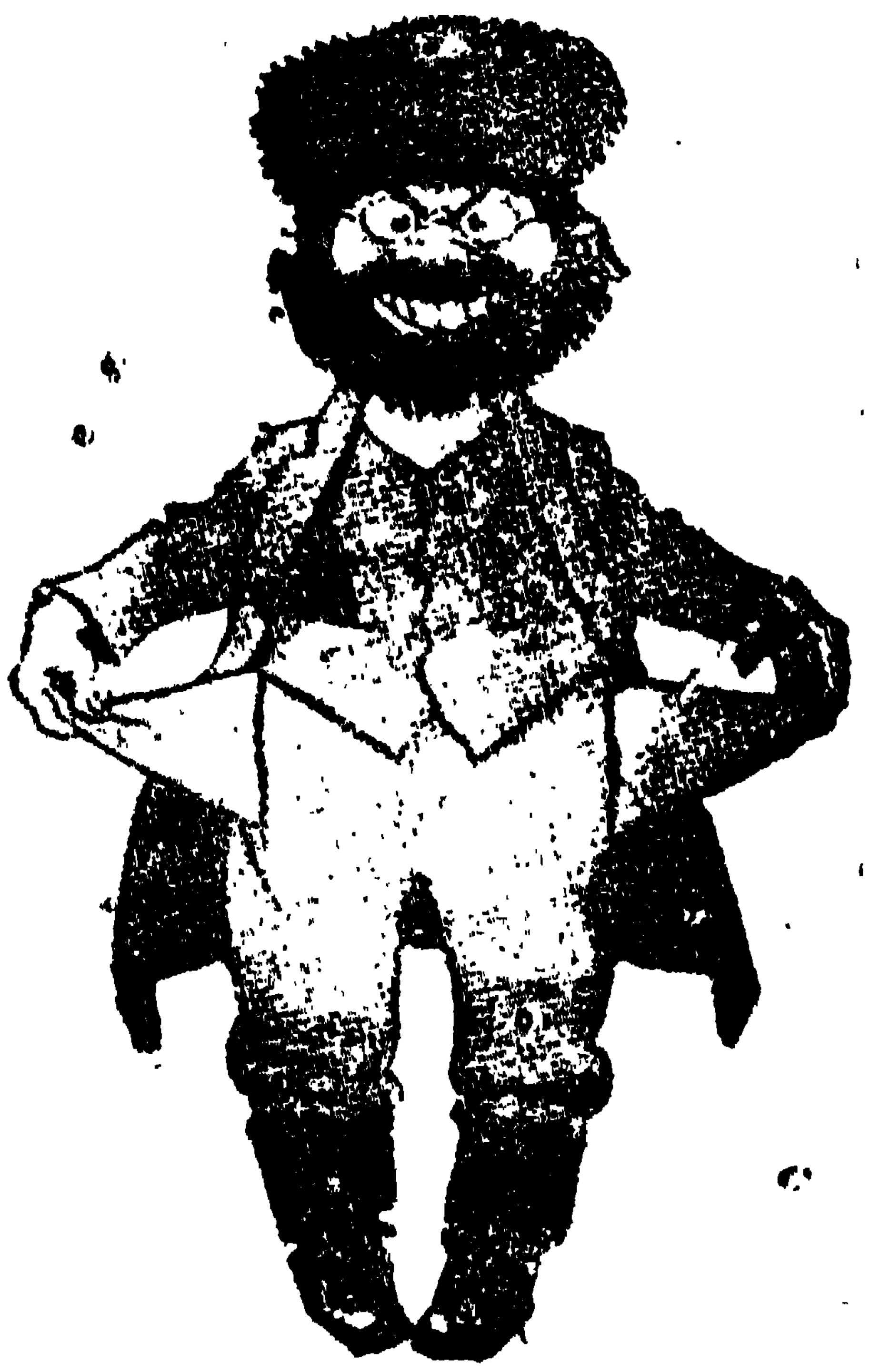

শিখণ্ডী!

জার্ম্মানী ব'লছে, লড়ায়ে কি তোমরা জিৎতে পারতে চাঁদ, যদি না কালা সৈন্যগুলোকে শিখণ্ডীর মত লেলিয়ে দিতে? আমাদের মারলে তো ঐ কালা সেপাইগুলোই! (Wahre Jacob, Stuttgart)

চাবুকের মাহাত্ম্য!

জার্ম্মানী আর সাইলেশিয়া দু'জনে দাঙ্গা চলছিল। কিন্তু হঠাৎ তাদের নজরে প'ড়ে গেল যে, এই সুযোগে তৃতীয় পক্ষরা তাদের উপর চাবুক চালাচ্ছে! অমনি তারা পরস্পরের মধ্যে মিটমাট করে ফেল্‌ছে।"

প্রলোভন!

আমেরিকা। সুন্দরি, আমিই হলুম এখন এই পৃথিবীর ধনকুবের! তোমার যখনই যত টাকার দরকার হবে, তুমি আমার কাছে পাবে, আমার যথাসর্ব্বস্বই তোমার হবে—যদি আমার কথায় রাজি হও!

অষ্ট্রেলিয়া। (স্বগত) পোড়া লোকলজ্জাই আমার কাল হ'ল দেখ্‌ছি!

(Sydney Bulletin.)

নিষ্ঠুর সত্য!

জার্ম্মানীর সোশ্যালিষ্ট সম্প্রদায় পৃথিবীতে আর যুদ্ধ হবে না বলে আনন্দে নৃত্য করছিল! তাদের বিদ্রূপ ক'রে এই চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, রণদেবতা তাঁর শূল হাতে ক'রে এসে বলছেন "মূর্খ! আর যুদ্ধ হবে না, তোমাদের কে বলেছে! ভার্সেলসের সন্ধিপত্রখানা ভাল করে দেখেছো কি! ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সমস্ত সত্ত্ব তাতে লিপিবদ্ধ করা আছে!

(Kladderadatsch, Berlin)

শান্তির স্বপ্ন!

সুযপ্ন। এই যে! বাঃ, কি রূপ! সুন্দরি, —তুমিই কি শান্তি দেবী?—হায়, আমরা তোমাকে কেউ চখেও দেখিনি কখনও। কিন্তু, প্রিয়তমে, তোমার কথাই এতকাল ধরে' আমরা ক'য়ে আসছি!

(Le Rire, Paris)

খদ্দের।"ওহে, এত দামের 'পুডিং দিলে কেন, এর খর্চ্চা তো আমি দিতে পার্ব্ব না!" হোটেলওলা। "তবে 'পুডিং চাই, পুডিং চাই' ব'লে অত চেঁচামেচি ক'রছিলেন কেন? যেমন বিস্কুট চিবু-চ্ছিলেন তাই চিবিয়ে যান না—!"

(Sydney Bulletin)

রিফম !

আমাদের কি লাভ ?

ফরাসী আহত সৈনিকেরা যুদ্ধের সময় দেশের কাছ থেকে যে সম্মান পেয়েছিল, যুদ্ধাবসানে আজ আর তাদের সে খাতির নেই। অবহেলায় পরিত্যক্ত এই কানা খোঁড়ার দল আজ জটলা বেঁধে পরস্পরে বলাবলি ক'রছে, লড়াই জেতার ফলে আমাদের কি লাভ হ'ল শুধু এই অকর্ম্মণ্য

ত্যাগের উপদেশ !

ধনী। দেখো মজুর—! তোমাদের সঙ্গে আমাদের এই যে ঝগড়া চল্‌ছে, এ কিছুতেই মিট্‌বে না, যতক্ষণ না আমাদের উভয় পক্ষের কেউ কিছু ত্যাগ করছে। তাই আমি বল্‌ছিলুম কি যে, তোমরা তো চিরকালে ঐ জিনিসটায় রপ্ত আছো। তা তোমরাই ওটা কর না কেন? কি জানো, আমরা হয় ত ওটা করতে পারতুম; কিন্তু একেবারেই

য়ুরোপে

রোলাঁর সহিত দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

১৬—৮—২২

Villeneuve, Switzerland.

মহাপ্রাণ রোলাঁ মহোদয়ের সঙ্গে ঠিক্ দুবছর বাদে দেখা। তাঁর সঙ্গে এইমাত্র ঘণ্টা চার-পাঁচ ধরে কথাবার্ত্তা কয়ে ফিরছি। তার সব প্রসঙ্গ আমার মনে থাকৃতে পারে না; তবে যতগুলি মনে থাকে, সে সব লিখে দেশে পাঠান মন্দ নয় ভেবে কলম ধরা গেছে। সত্যনিষ্ঠ হবার ইচ্ছা নিয়ে লিখ্‌তে বসেছি বটে, তবে একজনের চিন্তা অপরে কখনই হুবহু ধরতে পারে না। সে নিজের মত করে তাকে গ্রহণ করে বলে এ মতামতগুলিকে সম্পূর্ণ রোলাঁর মতামত বলে দাবী করা চল্‌বে না, এই সাবধান-বাক্যটুকু বোধ হয় বলে রাখা ভাল। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে রোলাঁর সহিত আলোচনায় আমার ব্যক্তি-গত মতামত যতদূর পারা যায় পশ্চাতে রেখেই লেখ্‌বার ইচ্ছে; তবে যেহেতু আমাদের অহমিকা বস্তুটি একটু বিশ্বাস-ঘাতক ও অনেক সময়েই অজ্ঞাতেও নিজেকে প্রকাশ করে বসে, সেহেতু এর মধ্যে যদি একটু নিজেকে স্ফুট করে তোলার ইচ্ছে কেউ লক্ষ্য করেন, তবে অন্ততঃ সেটা নিতান্ত মারাত্মক বলে আশা করি কেউ মনে কর্ব্বেন না।

বছর দুই আগে আমি রোলাঁর সম্বন্ধে নিতান্তই ওপর-ওপর কতকগুলি ব্যক্তিগত impression একটা প্রবন্ধে লিখে প্রকাশ করেছিলাম। এ যাত্রা আশা হয়, আমার ব্যক্তিগত impressionগুলি একটু বেশী গাঢ় বলে দৃষ্ট হবে; কারণ, এবার পূর্ব্ববারের চেয়ে অনেক মন খুলে ও স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা কইতে পেরেছিলাম।

রোলাঁর মতামত ব্যাখ্যার আগে, যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, তাঁদের জন্য এ অসাধারণ ব্যক্তিটির একটু বিবরণ দেওয়া বোধ হয় মন্দ নয়। য়ুরোপে অনেক খ্যাতনামা সমালোচকের বিশ্বাস যে, রোলাঁর চরিত্র মানব-চরিত্রের বিকাশের ইতিহাসে একটা ভারি সুন্দর ও মহিমময় বিকাশ। শুধু এত বড় কলাবিৎ বলে নয়, তার সঙ্গে এত বড় হৃদয় ও এত অগাধ শিক্ষার (culture) একত্র যোগাযোগ বর্ত্তমান জগতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বোধ হয় অন্য কারুর মধ্যে দৃষ্ট হয় না। ইনি সঙ্গীতের, চিত্রবিদ্যার ও ভাস্কর্য্যের একজন প্রথম শ্রেণীর সমজদার। ইনি পারিসে যখন "য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের" সম্বন্ধে ক্লাসে বক্তৃতা দিতেন, তখন এঁর ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা শুনতে নানা স্থান থেকে লোক আস্‌ত। সঙ্গীতের এত বড় উদার সমালোচক জগতে বোধ হয় আর নেই। ইনি একজন অত্যন্ত উচ্চদরের পিয়ানিষ্ট। অনেকের বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর মহত্তম উপন্যাস হচ্ছে এঁর বিশ্ববিশ্রুত Jean Christophe। টলষ্টয় ও ডষ্টয়েভস্কির পর এ রকম অভ্রভেদী ঔপন্যাসিক আর জন্ম-গ্রহণ করে নি বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু রোলাঁ মানুষটি তাঁর লেখার চেয়ে অনেক বড়। কলা, সেবা ও বিশ্বমানবের প্রতি উজ্জ্বল বিশ্বাসের ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর ঋত্বিক। বিশ্বমানবত্বের খাতিরে এঁর স্বদেশদ্রোহী অপবাদ পর্য্যন্ত সহ্য কর্ত্তে হয়েছে, ছোটখাট নির্য্যাতনের ত কথাই নেই। কলাবিৎরা সচরাচর সংসার থেকে একটু দূরে থাকে বলে অপবাদ—এ অপবাদের মূলে যে অনেক-খানি সত্য নিহিত নেই, এমন কথাও বলা চলে না। কিন্তু টলষ্টয় যেমন ভাবে এর সমাধান কর্ত্তে চেষ্টা করেছিলেন—অর্থাৎ জীবন থেকে আর্টকে আত্মসর্ব্বস্ব বলে ছেঁটে দিয়ে,—রোলাঁ তেমন ভাবে এর সমাধান করেন নি। ইনি সেবা ও কলার চর্চ্চা জীবনে একত্রে কর্ব্বার চেষ্টা পেয়েছেন। উদাহরণতঃ, ইনি Nobel Prizeএর সমস্ত টাকা রেড ক্রসের জন্য দান করেন, যদিও তখন এঁর অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না। এরূপ মহত্ত্ব আর্টিষ্টের মধ্যে বিরল। এঁর প্রশান্ত

মুখের উপর জীবনের এইরূপ পরস্পর বিরোধী সমস্যার সমাধানের একটা ছায়া পাওয়া যায়,—একটা harmonyর আভাষ, একটা সত্যদর্শনের আলোক, একটা মহত্তর তৃপ্তির বিদ্যমানতা।

আর্টের চর্চায় মানুষের চরিত্রে যে কতটা রস-সম্পদ আসতে পারে, তা রোলাঁর প্রতি ভঙ্গীতে, প্রতি হাসির ছটায়, প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। ইনি জন্মাবধি মানুষের সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের পুরোহিত ও উপাসক, অর্থাৎ কলার সেবক। ইনি নিজেই লিখেছেন:— J'aimais l'art avec passion; depuis l'enfance je me nourrissais d'art, surtout de musique; ji n'aurais pu m'en passer; je puis dire que la musique me semblait un aliment aussi indispensable à ma vie que le pain." অর্থাৎ,

"আমি কলাকে ভালবেসে এসেছি প্রাণমনের সহিত। শৈশব থেকেই আমি কলার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে এসেছি—বিশেষতঃ সঙ্গীত। তা বিনা আমার জীবন-পথে চলা অসম্ভব ছিল। এমন কি, আমি বল্‌তে পারি যে, সঙ্গীত আমার কাছে আহারের চেয়ে কম দরকারী বলে মনে হ'ত না।" এই সূত্রে মনে হয়, আমাদের দেশের লোকের আর্টের প্রতি outlookএর কথা। আমরা মনে করি, আর্ট একটা সখ মাত্র (সেদিন একজন শিক্ষিত ভারতীয় প্রফেসর আমার কাছে অম্লান বদনে এই মত প্রকাশ করেছিলেন)। এর কারণ, আমরা জানি না যে, আর্টের চর্চ্চায় একজন মহৎ লোকের জীবন কত মহত্তর, একজন মনোজ্ঞচরিত্র লোকের প্রকৃতি কত মনোজ্ঞতর, এমন কি একজন সেবা-সাধকের জীবনও কত গভীরতর হতে পারে। এই জন্য আমি মনে করি, রোলাঁর জীবন আমাদের দেশের লোকের জানা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে এঁর অনেকগুলি জীবন-চরিত প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান লেখক ও মনীষী Stephan Zweig মহোদয়ের লিখিত জীবনীই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ। তিনি তার ভূমিকায় এক স্থানে যা লিখেছেন তার ভাবার্থ এই:— "রোলাঁর সঙ্গে পরিচয় কেবল যে আমার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান্ অভিজ্ঞতা তা নয়; আরও অনেক মহত্তর লোকের ক্ষেত্রেও তাই। * * * য়ুরোপে বর্ত্তমান সময়ে যে কোনও লোক এত শুভ্র, ঋজু পবিত্র ও সাধকের জীবন যাপন কর্ত্তে পারে, এটা একটা মস্ত আশার কথা।" (১) প্রসঙ্গতঃ মনে হল, য়ুরোপের অপর মহাপ্রাণ মনীষী বার্টরাণ্ড রাসেলের কথা। তিনি আমাকে কথায় কথায় সেদিন বলেছিলেন "রোলাঁ! I admire him profoundly."

এত কথা লেখার উদ্দেশ্য শুধু বর্ত্তমান বিদ্বৎ-সমাজে রোলাঁর স্থান কোথায়, সেটা আমার দেশবাসীদের জানান। এখন আমি আমার বক্তব্য সুরু করাই শ্রেয়ঃ মনে করি, যেহেতু রোলাঁর জীবনী লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল রোলাঁর মতামতগুলি প্রকাশ করার আগে এইটুকু বলে রাখি যে, অধিকাংশ স্থলেই এর মধ্যে এক প্রসঙ্গের সহিত অন্য প্রসঙ্গের একটা যৌক্তিক সংযোগ থাকবে না; কারণ, এ সব আলোচনা বিশ্রম্ভালাপের ছলে হয়েছিল—সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের মামুলী চালে হয় নি। কোনও গভীরচিত্ত ভারতবাসী একদিন আমার কাছে বলেছিলেন, "আমরা এমন প্রতিভাকে বরণ কর্ব্ব যিনি ক্ষুদ্রতা ও eccentricityর কাছ দিয়েও যাবেন না।" রোলাঁকে দেখলে তিনি বোধ হয় সন্তুষ্ট হবেন যে, এটা সংসারে একেবারে অসম্ভব নয়।

* * *

রোলাঁ মহোদয় তাঁর পাঠাগারে ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত বইয়ের ফরাসী অনুবাদ দেখালেন। তাতে আমি তাঁকে বল্লাম, "আপনি যে ভারতীয় দর্শনাদির খবর রাখেন এটা সুখের কথা—বিশেষতঃ আমাদের কাছে—যেহেতু হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বড় বেশী লোকে বিশেষ কিছু জানে না, জানে কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে। তার কারণ হিন্দুধর্ম্ম, চিরকালই বহির্ম্মুখ হ'তে নারাজ হয়ে এসেছে, যেস্থলে বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল aggressive"।

রোলাঁ বল্লেন যে, ভারতীয় দর্শন-কলাদিতে তিনি এমন একটা সাড়া পান, যেটা বাস্তবিকই তাঁর কাছে অত্যন্ত ভাল লাগে। ভারতীয়দের সংস্রবও তাঁর ভাল লাগে।

কলার দৃশ্যতঃ আত্মসমাহিতত্ব সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন কর্ত্তে, তিনি বল্লেন, "আর্টের যা দেয়, তার কাছে তার বেশী প্রত্যাশা করা ভুল; কারণ, আর্টিষ্টকে কি অনেক সময়েই আর্টের জন্য অনেক ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট সহ্য কর্ত্তে দেখা যায় না?"—

(১) বইখানি আমার কাছে নেই, তাই ভাবার্থ মাত্র দিলাম। হয় ত ঠিক এই কথাগুলি বলেন নি।

কিন্তু জগতের দুঃখ-কষ্টের মাঝখানে আর্টিষ্টের স্বাতন্ত্র্য ও অনাসক্তি কি অনেক সময়ে একটু যেন শোভাযাত্রার সমর্থকতা স্বরূপ মনে হয় না? মানুষের দুঃখ কষ্টে অনেক সময়েই সে যেন সাড়া দেয় না—যেন দিতে পারে না বলেই; —নয় কি? এটা কি সৌখীন আর্টের চর্চ্চার দরুণই নয়?

রোলাঁ। তুমি কি মনে কর, জগতের দুঃখ-দৈন্য দূর কর্ত্তে আর্টিষ্টের সৃষ্টির দাম কম? আমি এক সময়ে গরীব ছিলাম, থিয়েটারে বহুদূরে গ্যালারীতে ছাড়া যেতে পার্ত্তাম না। তখন আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, সমস্ত দিনের শ্রমের পর শ্রান্ত, ক্লিষ্ট দুঃখী সঙ্গীতে কি রকম আনন্দ পেয়ে থাকে। বেতোভ্নের (২) একটা Symphonyর (৩) দাম একটা সামাজিক reformএর সমান বলে আমি মনে করি। তা'ছাড়া, সমাজের উন্নত অবস্থায় আর্টের যে দাম, মানুষের দুঃখ-কষ্টের বাহুল্যে আর্টের দাম তার চেয়ে কোনও মতেই কম নয়, বরং বেশী। কারণ, মানুষের বহির্জগতের পীড়নের দুঃখ যতই বেশী হয়, তার কাছে অন্তর্জগতের সান্ত্বনার দাম ততই বেড়েই ওঠে,—নয় কি? উদাহরণতঃ, জারের সময়ে রুষজাতির কথা নিলে দেখ্তে পাবে যে, সে অমানুষিক অত্যাচারে তাদের খেলনা, হস্তশিল্প, লোকসঙ্গীত প্রভৃতির উৎস যেন আরও ফুটে উঠেছিল,—লোপ পায় নি। কারণ, এ সময়ে বাইরের চাপে মানুষের অদম্য spirit স্বীয় সৃষ্টি দিয়ে তার গুরু ভার লাঘব কর্ত্তে চাইত। তা' ছাড়া, একজন লোক সব কর্ত্তে পারে না। তুমি কিছু একা নাবিক, রাজমিস্ত্রী, তন্তুবায় প্রভৃতি সব কাজ করে সমাজের হিত সাধন কর্ত্তে পার না। আর্টিষ্ট যা পারে, সে কেবল তারই জন্য সৃষ্ট হয়েছে। Beethoven যদি মানুষের দুঃখ-কষ্টের সমস্যায় আন্দোলিত হয়ে আমার মতামত জিজ্ঞাসা কর্ত্তে আস্তেন, আমি তাঁকে বল্তাম, "দোহাই তোমার, তুমি এসব চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। মানুষের জীবন ক্ষুদ্র। তোমার এর মধ্যে যা দেবার আছে দিয়ে দাও। শীঘ্র দাও, কারণ, তোমার আকস্মিক মরণে জগতের যা ক্ষতি হবে, সে ক্ষতি অপরকে দিয়ে পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই; কারণ, তুমি যেটা পার্বে, ঠিক সেটা অপর কারুকে দিয়েই হবে না।" সকল লোকের ক্ষেত্রেই এ কথা সমান খাটে।

বেতোভ্নের কথা বল্তে বল্তে তাঁর মুখ সর্ব্বদাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যেটা আমার কাছে ভারি ভাল লেগেছিল,—বিশেষতঃ বর্ত্তমান ফরাসীজাতির জার্ম্মাণ-বিদ্বেষের দৃশ্যের পর।

—আপনি কি মনে করেন না যে, আর্টের চর্চ্চা বিষয়ে গরীব-দুঃখীরও একটা বক্তব্য আছে? তারা কি এ কথা মনে কর্ত্তে পারে না যে, কেন সমাজের একটা হেয় ব্যবস্থার জন্য কেবল জনকতক লোক মাত্র এই তৃপ্তিকর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাক্বে, যেখানে তারা নিজের দেহের রক্ত জল করে এই মুষ্টিমেয় লোকের শিল্পসৃষ্টির জন্য অবসর ও স্বাচ্ছন্দ্য রূপ খোরাক যোগাবে? তারা কি একটা শ্রেষ্ঠতর সামাজিক ব্যবস্থা দাবী কর্ত্তে পারে না?

রোলাঁ। অবশ্য। যে সমাজের অত্যাচারে শত-শত প্রতিভা অনাহারে বা সুযোগ অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে, সে সমাজের একটা আমূল পরিবর্ত্তন তারা দাবী কর্ত্তে পারে নিশ্চয়ই; এবং সেজন্য প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীরই অবসর মত সাহায্য করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তা কখনই তার সৃষ্টির কাজ ছেড়ে নয়। একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর Carriere (এঁর নাম আমি কখনও শুনি নি) বল্তেন যে, সমাজের যে কোনও অত্যাচার তাঁর æsthetic senseকে আঘাত করে। কোনও বড় আর্টিষ্টই মানুষের সৃষ্ট অত্যাচারে আহত বোধ না করে থাকতে পারে না; অন্ততঃ তার থাকা উচিত নয়; কারণ, আর্টিষ্টের সৃষ্টির প্রেরণা হচ্ছে ঐক্যের অনুভূতিতে এবং অবিচার ও অত্যাচারের মূল অনৈক্য। তাই অবিচার, পীড়ন তাকে বেদনা দেবেই দেবে। কিন্তু তাকে তুমি কি কর্ত্তে বল? জগতে যে একটা শ্রেয়স্কর ব্যবস্থা আসা উচিত, যাতে সকলেই আত্মোৎকর্ষের অবকাশ পায়, এটা কে না স্বীকার কর্বে; এবং প্রত্যেক মানুষের কাছেই এ আত্মোৎকর্ষের অবসরটা শুধু যে দরকারী তাই নয়,—এটা তার কাছে sacre' অর্থাৎ পবিত্র। রোগের নিদান ও প্রতিকারের প্রয়োজনীয়ত্ব সম্বন্ধে সব আর্টিষ্টই ত এক মত; কিন্তু তারা বা আমরা প্রত্যেকেই কি উপায়ে মানুষকে সবচেয়ে দিতে পারি, এইটেই না সমস্যা? আমার মনে হয় যে, কলাবিতের প্রথম কর্ত্তব্য তার বাণীকে মূর্ত্ত করে চলা। অবশ্য তার পরে

(২) Beethoven জার্ম্মাণির ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রচয়িতা বলে খ্যাত।

(৩) Symphony প্রায় ৪০।৫০টি যন্ত্রের ঐকতান বাদ্য—য়ুরোপীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশ।

সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাতে মনোনিবেশের যদি তার সময় থাকে, তবে তার তা করা উচিত, যেমন Goethe কর্ত্তেন। তিনি যে সময়ে সৃষ্টির প্রেরণা পেতেন না, সে সময়টা তিনি নানারূপ সামাজিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু যখন সৃষ্টির প্রেরণা তাঁর মধ্যে আসত, তখন তাঁর কাছে এ সব কাজ নিয়ে মাথা ঘামান অসম্ভব হয়ে উঠত।

—কিন্তু আর্টিষ্ট যা সৃষ্টি করে, তা কয়জনের ভোগে আসে? মুষ্টিমেয় কয়জনের জন্য নয় কি?

রোলাঁ। না। তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার। অর্দ্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিতম্মন্য—এই দুই শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে উচ্চ আর্ট সাড়া পায় না; কারণ, একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কলের মত শিক্ষার চাপে তাদের হৃদয়ের রস-স্ফূর্ত্তির উৎস শুকিয়ে যায়। কিন্তু অশিক্ষিত ও সত্যকার উচ্চ শিক্ষিতের মনে আর্ট সর্ব্বদাই একটা অনুরাগ তোলে, যদিও তারা আর্টকে ভিন্ন ভিন্ন standpoint থেকে দেখে। অশিক্ষিতের মনে যে আর্টের অনুরাগের বীজ উপ্ত, এই কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। আমার নিজের ছেলে-বেলার কথা মনে আছে। আমি তখন নিতান্ত গ্রাম্য সঙ্গীত ভালবাসতাম; কিন্তু তাকে সেই উচ্চতম সঙ্গীতের সিংহাসনেই প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, যার পূজা আমি পরে প্রবুদ্ধ ভাবে কর্ত্তে শিখি। কিন্তু অশিক্ষিত অবস্থায় যে সঙ্গীতকে বরণ করেছিলাম, তাকে আমার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুভূতির রঙেই রাঙিয়ে আদর্শীভূত কর্ত্তাম। ঠিক সেই রকম অশিক্ষিতেরা হয় ত কোন্ আর্টের কি মূল্য তা সত্যকার শিক্ষা না পেলে যথাযথ নির্দ্ধারণ কর্ত্তে পার্ব্বে না; কিন্তু তা তাদের হৃদয়ে আর্টের অনুরাগের অভাবের জন্য নয়, তার অঙ্কুরকে বিকশিত করে তুলতে পারার সুযোগের অভাবের দরুণ। উচ্চশিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুই শ্রেণীর লোকই আর্টের পূজারী—কেবল অর্দ্ধশিক্ষিত হচ্ছে অরসিক। কেবল আমরা আর্টকে দুটো বিভিন্ন দিক্ দিয়ে দেখি। Nietzsche'র L'origine de la tragedie বইখানি ভারি সুন্দর—সেটা তোমার অতি অবশ্য পড়া উচিত। তাতে দেখতে পাবে, তিনি দুইটি অতিমানুষ, বা দেবতার শ্রেণী চিত্রিত করেছেন। একদল আপলিনারিয়ান, যাঁরা আপলোর ভক্ত সম্প্রদায়। এঁরা বিচার, বিবেক, স্থৈর্য্য, বুদ্ধির দিক্ দিয়ে জীবনকে উপভোগ কর্ত্তে চেষ্টা করেন। আর একদল দাইয়োনিসিয়ান, যাঁরা দায়োনিসুসের চেলা। এঁরা জীবনকে মানুষের আদিম বিরাট্ রাগ দিয়ে উপভোগ কর্ত্তে চেষ্টা করেন। (এ স্থলে রোলাঁ মহোদয় les forces de la terre কথার ব্যবহার করেছিলেন।) এঁরা দুজনেই ভুল। জীবনকে এই দুই বিভিন্ন point of view'র সামঞ্জস্য সাধন করে উপভোগ কর্ত্তে হবে। অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিতই আর্ট থেকে আপলিনারিয়ান সম্প্রদায়ের মতন রস গ্রহণ কর্ত্তে চান। এবং অশিক্ষিত দাইয়োনিসিয়ানের মত আর্ট উপভোগ করেন। মানুষের হৃদয়ে আর্টের প্রকৃত রসোপভোগ কেবল তখনই হওয়া সম্ভব, যখন সে বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে প্রাণের রাগের তারুণ্য বজায় রেখে আর্টকে গ্রহণ কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বে।

—এ সামঞ্জস্য কেমন করে করা সম্ভব?

রোলাঁ। সংসারে সব শ্রেষ্ঠদরের কলাবিতের মধ্যেই এই সামঞ্জস্য দেখতে পাবে। বেতোভেনের রচনার মধ্যে মানব-হৃদয়ের এই আদিম রাগের বিকাশের সঙ্গে বুদ্ধির উচ্চতম বিকাশের একটা চমৎকার সামঞ্জস্য দেখতে পাবে। সব শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টই সৃষ্টি করেন; কারণ, তাঁরা তা না করেই পারেন না। মোজার্ট তাঁর Persival নামক অনুপম অপেরাখানি ৬০ বৎসর বয়সে লিখেছিলেন। তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে, তাঁর মধ্যে এই আদিম রাগের উৎস ৬০ বৎসরেও শুকিয়ে যায় নি। বুদ্ধির ও রাগাত্মিকা প্রবৃত্তির (emotional faculties) এই সামঞ্জস্য আপনা থেকেই কর্ত্তে পারার ক্ষমতাই শ্রেষ্ঠতম কলাবিতের চিহ্ন।

জিজ্ঞাসা কর্লাম, টলষ্টয় আর্টকে আত্মসর্ব্বস্ব বলে যে নিন্দা করেছেন, তার সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?

রোলাঁ। (চিন্তিত ভাবে) কি জানো? টলষ্টয় ছিলেন একটা আশ্চর্য্য মানুষ। তাঁর জীবনে grandes passions'এর প্রতিক্রিয়াতে তিনি অনেক বাজে কথা বলে ফেলতেন। ফলে, এক এক সময়ে তিনি এমন জড়বাদীর মত কথা বলতেন যে, সহজে বিশ্বাস কর্ত্তে প্রবৃত্তি হয় না। উদাহরণতঃ, একবার তিনি লিখছেন, "আমাদের কর্ত্তব্য কেবল একান্ত আবশ্যক সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করা। আমাদের এ পৃথিবী-রূপ গ্রহের বাইরে কি আছে, সে জ্ঞানের চর্চ্চা ছেড়ে দেওয়া দরকার।" (Charles Baudoin প্রণীত Tolstoy Educateur বইখানিতে এটা আমি পড়েছিলাম

মনে হ'ল।) এরূপ utilitarianএর মত কথা যে টল্‌ষ্টয় বল্‌তে পেরেছিলেন, তার কারণ তিনি এই দাইয়োনিসিয়ান রাগনিচয় দ্বারা সময়ে-সময়ে একটু বেশী পীড়িত হয়ে পড়তেন। তাই টল্‌ষ্টয়ের আর্টের সম্বন্ধে অধিকাংশ মতামতকে একটু সাবধান ভাবে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

—আর্টের সম্বন্ধে আপনার অনেকগুলি মত ভারি ভাল লাগল। কেবল আপনার কি মনে হয় না যে, অনেক সময়ে আমরা যে আর্টকে বড় বলে মনে করি, সেটা আর্টের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের দরুণ নয়,—আমাদের নিজেদের এ থেকে স্বার্থপর interestএর উপরোধে? কারণ, আর্টের চর্চ্চায় জীবনটা কাটে মোটের ওপর সুখেই নয় কি? এ ক্ষেত্রে আমাদের কি কেবল এইটুকু ভেবে দেখা উচিত নয় যে, আমরা এ বিষয়ে কেবল নিছক আনন্দের খোঁজে ছুটেছি, না, কেবল আমাদের interestকে আগ্‌লে রাখ্‌বার চেষ্টা থেকে প্রণোদিত হয়ে চলেছি?

রোলাঁ। এ বিষয় নিয়ে আমি বড় বেশী মাথা ঘামাই না। প্রথমতঃ, আর্টের যে আনন্দ, তার একটা পরম সার্থকতা আছেই। মানুষের জীবনে পরসেবার আনন্দের সার্থকতাই যে চরম ও পরম সত্য তা নয়। এমন কি, আমাদের দাইয়োনিসিয়ান মূল রাগগুলিকেও অবজ্ঞা করা অবিধেয়। তাতে জীবন অসম্পূর্ণ থাকার দরুণ জীবনে সার্থকতা আসে না। দ্বিতীয়তঃ, জীবনে কোনও ব্যক্তিগত গভীর আনন্দই আত্মসমাহিত নয়। জীবন এ রকম আশ্চর্য্য ভাবে গড়া যে, আমার যাতে গভীর আনন্দ হয়, তাতে সকলের না হোক্, আরও অনেকের আনন্দ লাভ হয়ে থাকে। জীবনের মধ্যে একটা মিলনের সুর সর্ব্বদাই বাজে, দেখ্‌তে পাবে।

পরে তিনি আমাকে তাঁর পাঠাগারে নিয়ে গিয়ে নানান্ বই, স্মৃতিচিহ্ন প্রভৃতি দেখাতে লাগ্‌লেন। টল্‌ষ্টয় তাঁকে যে ১০।১২ পাতা একখানি চিঠি cher fre're (প্রিয় ভাই) বলে সম্বোধন করে লিখেছিলেন, সেটি দেখালেন। প্রসঙ্গতঃ আমি বল্লাম, টল্‌ষ্টয়ের সম্বন্ধে যেটা আমার কাছে খুব ভাল লাগে, সেটা হচ্ছে এই যে, টল্‌ষ্টয় স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস ও জগৎজোড়া সম্মানের সিংহাসনে বসেও, মানুষের দুঃখ-কষ্ট ভেবে এতটা ব্যথিত হয়েছিলেন, ও জীবনের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন, যে অবস্থায় হাজার-করা নশো নিরানব্বই জন নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকত।

রোলাঁ। তিনি যে একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন, তাতে সন্দেহ কি? তবে মানুষের দুঃখ-কষ্টে একটা ব্যথা বোধ করা যে কেবল টল্‌ষ্টয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল, তা নয়,—এটা রুষজাতি-সুলভ। এমন কি রুষের অভিজাত্যও সর্ব্বদা মানুষের দুঃখ-কষ্টে প্রায়ই এত ব্যথা বোধ করে যে, তার জন্য অনেক সময় কম স্বার্থত্যাগ স্বীকার করে না, যদিও অনেক সময় সেই অভিজাতগণই নানান্ হীন সুখে মগ্ন থাকে। কিন্তু রুষজাতি একটা মস্ত হৃদয়বান্ জাতি।

কথায়-কথায় প্রসঙ্গ উঠল যে, ভারতীয় ও রুষজাতির মধ্যে একটা ভারি সাদৃশ্য আছে। আমি বল্লাম, এটা আমি এর আগে অনেকবার অনুভব করেছি; এবং আমার অনেক রুষ বন্ধুও আমাকে এ কথা বলেছেন। এমন কি, পরশু দিন জেনেভাতে আদর্শবাদী Monsieur Birukoffও (ইনি মহামতি টল্‌ষ্টয়ের একজন পরম বন্ধু এবং জীবন-চরিত-লেখক) আমাকে বল্‌লেন যে, ভারতীয়দের সঙ্গে তিনি এমন একটা মনের মিল সহজেই খুঁজে পান, যেটা তিনি প্রতীচ্যের সঙ্গে তেমন পান না।

রোলাঁ একটু হেসে বল্লেন "আমিও"। মনটা ভারি খুসি হ'ল।

—একটা কথা। আমার দু'চারজন ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে আমার অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে; তাই আমি এ বিষয়ে আপনার অভিমত জান্‌তে চাই; কারণ, এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতার ও অন্তর্দৃষ্টির একটা দাম আছে। ব্যাপারটা এই, আমার দুচারজন বন্ধু বলেন যে, ইহুদী জাতটা হচ্ছে ব্যবসাদারের জাত, আদর্শবাদে তারা সাড়া দেয় না; কারণ, এটা তাদের জাতীয় লক্ষণ। আমি তাঁদের বলি যে, আমার মনে হয়, এটা য়ুরোপের খ্রীষ্টিয়ানদের ইহুদীবিদ্বেষ থেকে প্রসূত। একটা এতবড় জাতি সমগ্র ভাবে নিতান্ত জড়বাদী—এ কথা বিশ্বাস কর্ত্তে আমার মন সরে না।

রোলাঁ অবজ্ঞার সঙ্গে ফরাসী shrugএর সহিত বল্লেন, C'est absurd; অর্থাৎ এটা একান্ত বাজে কথা। সব দেশে revolutionএ তারা কি কম সাহায্য করেছে? এটাই কি একটা মস্ত প্রমাণ নয় যে, তারা আদর্শবাদে যথেষ্ট অগ্রগামী? তবে এটাও সত্য যে তাদের মধ্যে

একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা নিতান্ত ইহুদী-সুলভ।

কথায়-কথায় মহাত্মা গান্ধির কথা উঠ্‌ল। রোলাঁ মহোদয় বল্লেন, আমার মনে হয় যে, তিনি বাস্তবিকই একজন Saint, নয় কি?

আমারও তাই বোধ হয়; কারণ, আমার মনে হয় যে, সাধারণ মানবসুলভ দ্বিধা প্রলোভন তাঁকে বড় একটা বিচলিত কর্ত্তে পারে নি। ইনি যেন সর্ব্বদাই একটা সোজা পথ দেখ্‌তে পেয়েছেন, যেটা আমরা সাধারণ মানুষ প্রায়ই পাই না।

রোলাঁ। গান্ধি শুধু যে একজন idealist তা নয়। আমার মনে হয়, তিনি একজন অসাধারণ practicalistও বটেন। তাঁর অহিংসা, নির্ব্বিরোধিতা প্রভৃতির জন্য আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। কেবল এক বিষয়ে আমার তাঁর সঙ্গে মতের মিল হয় না। সেটা হচ্ছে যে, তিনি ঠিক internationalist নন্, nationalist.

—তিনি ঠিক nationalistও নন্, আপনি তাঁকে একটু ভুল বুঝেছেন—

রোলাঁ বাধা দিয়ে বল্লেন—না, না,—আমি জানি তুমি কি বল্‌তে চাচ্ছ। তুমি বল্‌তে চাচ্ছ এই ত যে, তিনি সঙ্কীর্ণ nationalist নন্, একজন উদার nationalist। আমি এ কথা খুব মানি; এবং শুধু তাই নয়, আমার মনে হয়, তিনি যে nationalismএর ঋত্বিক্, তার মধ্যে অপর কোনও জাতির প্রতি বিদ্বেষের লেশও নেই। তিনি nationalist, কারণ, তিনি মনে করেন যে, হিন্দুধর্ম্মের একটা মস্ত কিছু দেবার আছে, তাই হিন্দুর স্বীয় জাতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। হয় ত তিনি এ বিষয়ে সত্যদ্রষ্টা, আমি তাঁর এ মতের সমালোচনা এখন কর্চ্ছি না; কিন্তু আমি কেবল এইটুকু বল্‌তে চাই যে, Ce n'est pas internationalisme (অর্থাৎ এটা মানবতন্ত্রতা নয়)। পরে একটু হেসে বল্লেন, আস্‌ছে বছর তোমাদের দেশে গিয়ে আমিও হয় ত এই শ্রেণীর rationalist হয়ে পড়তে পারি, কে জানে?

—কিন্তু তিনি অপর সমস্ত জাতিকেই তার স্বীয় ধারার বিকাশ কর্ত্তে স্বাধীনতা দেবার সপক্ষে।

রোলাঁ। খুব মানি এবং এজন্য তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। বরং সকলে এরূপ nationalist হলে যে জগতের বর্ত্তমান দুঃখ-কষ্টের অশেষ লাঘব হবে, তাও স্বীকার করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বল্‌তে চাই মাত্র এই কথাটুকু যে, ce n'est pas internationalisme.

আমি একটু ভেবে বল্লাম যে, আমার মনে হয় যে,—মহাত্মা গান্ধি আপাততঃ জাতীয়ত্ব প্রচার কর্চ্ছেন সাময়িক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে। বোধ হয় ভারতের স্বাধীনতা পাবার পরে তিনি মানবতন্ত্রতারই প্রচার কর্বেন। কারণ, তিনি internationalismএর বিরুদ্ধে ত কোন কথাই বল্‌ছেন না।

রোলাঁ। si, si (অর্থাৎ না, না, কর্চ্ছেন, কর্চ্ছেন।) আমি সেদিন পড়ছিলাম, তিনি প্রকাশ্যে বল্‌ছেন, মহম্মদ আলি, সকৃআত আলি প্রভৃতি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'তে পারেন; এমন কি, সব মুসলমানই আমার ভাই; কিন্তু তথাপি, তাদের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, আমি এটা উচিত কি অনুচিত, তার বিচার কর্চ্ছি না; এবং আমি স্বীকার কর্ত্তে রাজী আছি যে, হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে এমন অজ্ঞাত তত্ত্ব থাক্‌তে পারে, যা আমরা জানি না, এবং যা আমাদের কোনও সত্যকার আলোক দেখাবে। এ সবই সম্ভব বলে আমি মেনে নিতে রাজী আছি। কিন্তু আমি কেবল বল্‌তে চাই, আমরা—যাঁরা মানবতন্ত্রতার উদ্‌যোক্তা—আমরা কেবল এই কথাটুকু মাত্র বল্‌তে চাই যে, ce n'est pas internationalisme.

—আর্টের মানুষের মনকে উন্নত করা না করার উপর তার গরিমা নির্ভর করে কি? আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, তা করা উচিত, যদিও Art for art's sake এর প্রচারকরা তা বলেন না। কিন্তু তবু একটা আনন্দ দেওয়াতেই কি আর্ট পর্য্যবসিত হবে?

রোলাঁ। প্রথমতঃ, এ আনন্দের দাম ঢের। তার ওপর দেখ্‌তে পাবে, যে-কোনও বড় আর্ট শুধু তার আনন্দের পরশেই আমাদের উন্নত করে তোলার পক্ষে সহায়তা করে। —কেবল এইটুকু ভুলে গেলে চল্‌বে না যে, শুধু একটা moral সম্বলিত কিছু হ'লেই সব সময়ে এ নৈতিক উন্নতি লাভ হয় না। উদাহরণতঃ, যে কোনও didactic অথচ নিম্নশ্রেণীর কলাবিতের লেখা নিলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তা পড়ার আগে আমরা যে রকম "stupide" ছিলাম, তা

পড়ার পরও ঠিক্ সমান "stupide"ই রয়েছি। পক্ষান্তরে যে-কোনও বড় কলাবিতের লেখা নেও, যাতে শুধু যে কোনও moral নেই তা নয়, বরং তার উল্টা আছে, যেমন শেক্সপীয়র। কিন্তু দেখ্‌তে পাবে যে, তা পড়ার পর নিজে যথেষ্ট উন্নত বোধ কর।......vo......বলে একজন মহৎ ও শ্রেষ্ঠ চরিত্রের মহিলা লিখেছেন (এঁর নামটা আমি ভুলে গেছি) যে, এক সময়ে বাস্তব দুঃখ-দৈন্যের মাঝে প্রায় তাঁর দিশাহারা হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। এ সময়ে তিনি লণ্ডনে একবার শেক্সপীয়রের Othelloর অভিনয় দেখ্‌তে যান। তা দেখার পর তিনি লিখ্‌ছেন যে, তাঁর মনে এমন একটা আলো ও ভরসার আশা দেখা যায় যে, তাঁর বিশ্বাস হয় যে, এ জীবনে সত্যকার আনন্দ ও সুখ আছে, তাই এ জীবনের দাম আছেই আছে। অথচ Othello ত শুধু মানুষের ছোট প্রবৃত্তির চিত্রনেই পর্য্যবসিত।

কথায় কথায় Bertrand Russel মহোদয়ের কথা হ'ল। আমি বল্‌লাম যে, Russelএর অদম্য আদর্শবাদ আমার কাছে ভারি ভাল লাগে; বিশেষতঃ যেহেতু তিনি সমাজের পীড়ন ও অত্যাচারকে শুধু দোষ দিয়েই ক্ষান্ত নন, —তাঁর অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এর একটা সুন্দর প্রতীকার বাহির কর্ত্তে চেষ্টা পেয়েছেন। এটা একটা মস্ত জিনিষ। কেবল তাঁর একটা মতের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না। তিনি গণিতবিৎ বলেই হোক্ বা না হোক্ সব জিনিষকেই চিন্তার দ্বারা বোধগম্য বলে মনে করেন। উদাহরণতঃ, তাঁর Analysis of Mind বইখানিতে এক স্থলে যা লিখেছেন, তার ভাবার্থ এই যে, জগতে রহস্যবাদ (mysticism) আনন্দদায়ক হলেও অগভীর; কারণ, অজ্ঞানতা হতেই তার উদ্ভব। জ্ঞানের আলোকে সব রহস্যেরই সমাধান হবে। আমার মনে হয়, কোনও hard and fast তর্ক দ্বারা জীবনের গভীরতম রহস্যের সমাধান হতে পারে না।

রোলাঁ একটু হেসে বল্লেন, শুধু তাই নয়, সেরূপ জগতে বাস করেই বা লাভ কি, যেখানে সমস্তই অত্যন্ত স্পষ্ট। রহস্যবাদ (বা অলোকপন্থা) জীবনে একটা শ্রেষ্ঠতম রসের রসদদার, তার অভাবে জীবনটা অত্যন্ত থেলো হয়ে পড়ে। তবে তুমি যে বল্‌ছ Russel গণিতবিৎ বলেই রহস্যবাদের বিপক্ষে, তা নয়। অনেক বিখ্যাত গণিতবিৎ (যেমন Poincaré) খুব রহস্যবাদী দেখ্‌তে পাবে।

১৭—৮—২২

আজ আবার রোলাঁ মহোদয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। আজও অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'ল।

—আপনি মানবতন্ত্রবাদী। মানবতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আপনার কাছে কি রকম বোধ হয়? আপনার কি মনে হয় যে, মানবতন্ত্রবাদ জগতে বিশেষ ভাবে প্রচার হবার এখনও অনেক দেরী আছে?

রোলাঁ। ঢের দেরী। এটা ক্ষোভের বিষয় ত বটেই; কিন্তু সত্য যখন, তখন অস্বীকার করে লাভ কি?

জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, তবে কি আপনার মনে হয় না যে, এ বিষয়ে জগতে মানুষের মন ক্রমে ক্রমে উদারতর হচ্ছে?

রোলাঁ সদুঃখে ঘাড় নেড়ে বল্লেন, না। কারণ, আন্তরিক মানবতন্ত্রবাদী খুবই কম। এমন মানবতন্ত্রবাদী বা শান্তিবাদী আছে, যারা অপরকে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে নিবৃত্ত হতে খুব গম্ভীর ভাবে উপদেশ দেয়। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের দেশ আক্রান্ত হলে বলে, স্বদেশ ও স্বজনকে আগে রক্ষা করা দরকার; যেমন সুইডেন বা নরওয়ের অনেক যুদ্ধবিরোধীর দল।

আমি বল্লাম, কিন্তু এটা ত বড়ই নিরাশার কথা যে, মানুষ একটা আইডিয়ার জন্য প্রাণপাত কর্চ্ছে, কিন্তু তাতে সে আইডিয়ার প্রচার বাড়ছে না।

রোলাঁ। (চিন্তিত ভাবে) কিন্তু তুমি কি বল্‌তে চাও? জাত উন্নতিশীল, এ কথা ত বলা যায় না; বরং ইতিহাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, মানুষের উন্নতি সমগতি (uniform) নয়। একবার সে ওঠে আবার সে পড়ে। সম্প্রতি পুরৈতিহাসিক মানবের আঁকা অতিকায় বাইসন প্রভৃতি পুরৈতিহাসিক জন্তুর ছবি পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায় যে সে জাত এ-কলায় অত্যন্ত উন্নত ছিল। কিন্তু তার পর হঠাৎ কোনও কারণে এই উন্নত জাতির ধ্বংস হয়ে যায়। তার পরে যারা এল, তাদের প্রায় বর্ব্বরতা থেকে ধীরে-ধীরে উঠ্‌তে হয়েছে। তবে এর মধ্যেও ত একটা মহিমা আছে যে, মানুষের spirit তার পাশবিক বাসনা, অজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রতার ও নিয়তির হিংস্র নিয়মহীন অপচয়ের প্রবৃত্তি সত্ত্বেও বারবার পড়েছে, কিন্তু বারবার

উঠেছে। বর্ত্তমান য়ুরোপে বিরাট ধ্বংস কোন হৃদয়বান্ লোক না অনুভব করেছে। গত যুদ্ধে যে আমরা কত অমূল্য সম্পৎ, মানুষের হৃদয়ের কত সচেষ্ট উৎকর্ষ হেলায় পদদলিত করেছি, তার কি ঠিকানা আছে? কিন্তু তবু মানুষ আবার উঠ্‌বে। শেষে কি হবে কে বল্‌তে পারে! কিন্তু শেষ যাই হোক্, উন্নতি বিবর্দ্ধমান হোক্ বা না হোক্, তা ভেবেই বা কি হবে। আমরা যেটুকু পারি, এসো সেই-টুকু করি। তার বেশী আর কি কর্ত্তে পারি?

—কিন্তু মানুষের ভবিষ্যতে যদি বিশ্বাস না করা যায়, তবে কেমন করে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাতে পারে? এ বিরাট্ শক্তির ও আকাঙ্ক্ষার, মানুষের সৃষ্টির বিরাট্ প্রেরণা, এ সবের যদি একটা গন্তব্য লক্ষ্য না থাকে, তবে এ সবে লাভ কি?

রোলাঁ একটু করুণ হেসে বল্লেন, মানুষের ভবিষ্যতে সরল ভাবে বিশ্বাস বজায় রাখতে পার্লে হয় ত কাজ বেশী করা যায়। হয় ত এটা সত্য যে যে-সব মহাপুরুষেরা এ বিশ্বাস বজায় রেখে জীবনে কোমর বেঁধে কাজে লেগেছেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত একটু বেশী কাজ কর্ত্তে পেরেছেন। কিন্তু তারই বা পরিমাণ কতটুকু? এবং তাঁদের জন্মের জন্য কটা লোক আজ প্রেরণা পাচ্ছে। বুদ্ধ বা খৃষ্টকে আজ কটা লোক বিশ্বাস করে?

আমি বল্লাম, কিন্তু তাঁরা যে একটা আলোক পেয়েছিলেন, এ কথা কি আপনি অস্বীকার করেন?

রোলাঁ তাঁর বিশিষ্ট উদাস-করুণ হাসি হেসে বল্লেন, তাই বা কে জানে? খৃষ্টের মনে কি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এসেছিল, তার ত কোনও সঠিক্ খবরই আমরা জানি না; এবং সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখি যে, ক্রুশবদ্ধ হয়ে মর্ব্বার সময় খৃষ্ট শেষ কথা যা বলেছেন, তাতে তিনি এই আক্ষেপে দেহত্যাগ করেছেন, "ঈশ্বর! কেন তুমি আমাকে শেষে পরিত্যাগ কর্লে?"

—তা হলে আপনি কি বল্‌তে চান?

রোলাঁ। কিছু না। আমি শুধু বলি, অন্যায় অবিচার, অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি এসো, পরে যা হবার হবে। আমি এটা ধ্রুব বলে বুঝি; কারণ, আমার অন্তর আমাকে বলে যে, একটা মানুষের দুঃখও আংশিক ভাবে মোচন করা একটা সৃষ্টি। সংগ্রামের জন্যই ত আমরা জন্মেছি।

আমি বল্লাম, কিন্তু যদি কাজ না এগোয়, তবে সন্দেহ নিরাকরণ হয় কেমন করে, কাজ কর্ব্বার প্রণোদনাই বা পাই কোথা থেকে?

রোলাঁ। কাজ এগুচ্ছে বলেই বা তুমি কি বল্‌তে চাও। আমরা কোথায় চলেছি, তাই বা কে জানে বা জান্‌তে পারে? সমাজের যে সব অবিচার, অত্যাচার আমরা আজ দেখ্‌ছি, তার নিরাকরণ যদি আজই আমাদের সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে ধর তা করে ফেল্‌ব, কেমন না? কিন্তু তার পর? তুমি কি বল্‌তে চাও যে, আজ আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'মানবপ্রেমিক'ও যতরকম অবিচার অত্যাচার কল্পনা করে ঠাহর কর্ত্তে পেরেছেন, তার আমূল নিরাকরণ হলেই আমাদের কাজ ফুরিয়ে যাবে? তা অসম্ভব। এ সৃষ্টির শেষ কোথাও সম্ভব নয়। আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু জানা, আরও জানা, তার পর আরও জানা; অসাম্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, আরও যুদ্ধ করা। উন্নতি? জগতের দুঃখ-কষ্টের নিরাকরণ? আমি এক এক সময়ে ত তা অসম্ভব বলে মনে করি—বিশেষতঃ যখন আমি দেখি যে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র প্রাণী পশু কীট পতঙ্গের যন্ত্রণা ও দাসত্বের উপর আমাদের বেঁচে থাক্‌তে হচ্ছে? এর সমাধান হবেই হবে, এ কথা কে বল্‌তে পারে? তাই আমি মনে করি, আমরা যতটুকু পারি, এসো ততটুকু করি—ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে? এটুকু ত জানি যে, নিজের নিজের বিশ্বাস মতে এটা অন্যায়, ওটা ভাল। তদনুসারে কাজ করা ছাড়া উপায় কি? সৃষ্টি সঙ্গীত, আর্ট—এতে আনন্দ পাই, এসো তার চর্চ্চা করি। জ্ঞানে তৃপ্তি পাই, এসো জানি। তার বেশী কি কর্ত্তে পারি। মানুষের সভ্যতা যদি বরাবর সমধারায় বিকাশ লাভ করে চল্‌তে থাকৃত, তবে আজ মানুষ কত মহত্তর গৌরবের শিখরে আসীন হ'ত, নয় কি? কিন্তু নিয়তির ও একটা অন্ধ নিয়মের দৃশ্যতঃ কাণ্ডজ্ঞানহীন অপচয়ের হাহাকারে যুগযুগ-সঞ্চিত সম্পৎ একটা আলোড়নে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় দেখা যায়। কিন্তু আমরা আবার গড়ি; কারণ, তাইতেই আমরা রস ও জীবন পাই। তাই আমার মনে হয়, উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে, চেষ্টার গরিমাই আসল।

আর একটা প্রসঙ্গে তিনি খুব ধীরে ধীরে বল্লেন, মানুষ কিসের খোঁজে চলেছে ও কেন বাঁচতে চায়? আমার মনে

হয়, সে তার নিজের জন্যও বাঁচে না, অপরের জন্যও কর্ম্মাসক্ত হয় না—সে এমন একটা কিছু চায়, যেটা তার নিজের ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে মহান্;—এমন একটা কিছু, যার মাত্র আভাষ আমরা মাঝে-মাঝে জীবনের পবিত্র মুহূর্ত্তে পাই—তর্কে পাই না।

—টুর্গেনিভকে আমার ভারি ভাল লাগে। আপনার কেমন মনে হয়?

রোলাঁ। টুর্গেনিভ ছিলেন একজন মস্ত আর্টিষ্ট ও ভারি চমৎকার stylist।

—আপনার কি মনে হয়, আর্টিষ্টের হিসেবে তিনি টলষ্টয়ের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর?

রোলাঁ। (চিন্তিত ভাবে) তা বলা শক্ত। টুর্গেনিভের মনটা ছিল আমাদের মনের খুব কাছে। টলষ্টয়ের মন বেশী রুগ্ন। টলষ্টয়ের ক্ষমতা ছিল টুর্গেনিভের চেয়ে ঢের বেশী,—তাঁর গভীরতা ছিল ঢের বেশী, তাঁর বল্‌বারও ছিল অনেক বেশী। টলষ্টয়ের প্রতিভা ছিল বিরাট্—এত বিরাট যে, তাঁর প্রবল demoniac দৈহিক আকাঙ্ক্ষাকেও সে জয় করে আর্টে নিজেকে ধরা দিয়ে গেছে। তাই আমার বোধ হয়, টলষ্টয় আর্টিষ্ট হিসেবে টুর্গেনিভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কারণ তিনি তাঁর ঢের দোষ সত্ত্বেও ছিলেন বিরাট্। টুর্গেনিভ—চমৎকার, বিরাট্ নন্।

—টুর্গেনিভ কিন্তু মনে-প্রাণে আর্টিষ্ট ছিলেন। Prince Kropatkinএর Memoir of a Revolutionistএ তিনি এক জায়গায় লিখ্‌ছেন যে, টুর্গেনিভ তাঁকে একদিন বলেছিলেন যে, তাঁর Fathers and Children বইখানির নায়ক Bazarovকে মেরে ফেলবার সময় তিনি অনেক কেঁদেছিলেন। এ ছোট্ট অথচ মনোজ্ঞ ঘটনাটিতে টুর্গেনিভের করুণ সহানুভূতির অনেকখানি ফুটে ওঠে, নয় কি?

রোলাঁ। বড় আর্টিষ্টের ক্ষেত্রে এটা প্রায়ই হয়। বাল্‌জাক—তাঁর লেখা তুমি কিছু পড়েছ কি?

—না।

রোলাঁ। বাল্‌জাক একদিন তাঁর এক বন্ধুকে রাস্তায় দেখে মহা উত্তেজিত ভাবে, সম্ভাষণ না করে, প্রথম কথা বলেন "অমুক (তিনি তখন একখানি উপন্যাস লিখ্‌তে ব্যস্ত ছিলেন, তার একটি চরিত্র) মারা গেছে (Il est mort)।"

—বাল্‌জাকের একটা ছোট জীবনীতে পড়েছি, তিনি না কি অসাধারণ খাট্‌তেন। তাঁর সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

রোলাঁ। (অল্প উত্তেজিত ভাবে)। বাল্‌জাক ছিলেন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বোধ হয় একটা অলোকসাধারণ লোক। তিনি আর্ট নিয়ে বড় মাথা ঘামাতেন না। তাঁর বল্‌বার এত ছিল যে, তা তাঁকে দুর্নিবার বেগে ঠেলে নিয়ে যেত। এরূপ সময়ে তিনি সমাজে যখন লোকের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তেন, তখনও মনোজগতে অন্য এক লোকে বিচরণ কর্ত্তেন। বাইরের কোনও ঘটনাই তাঁর মানসী প্রতিমাকে স্পর্শ কর্ত্তে পার্ত্ত না। তিনি লিখে যেতেন অদম্য প্রেরণায়। Zola ছিলেন ঠিক্ তাঁর উল্টো;—তিনি রোজ ৩০।৩২ পাতা করে নিয়মিত ভাবে লিখে যেতেন। বাল্‌জাক একটা উপন্যাস একদিনে অবিশ্রাম ২২।২৩ ঘণ্টা লিখে শেষ করেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত লোক।

—অনেক বড় আর্টিষ্টকে অনেক সময়ে এরূপ একটা প্রেরণা নিয়ে লিখতে দেখা যায় যে, তাঁরা কি ভাবে শেষ কর্ব্বেন তা প্রথম থেকে মোটেই ভেবে সুরু করেন না। রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর নিজের লেখার সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর উপন্যাস যখন আরম্ভ করেন, তখন তাকে কি ভাবে শেষ কর্ব্বেন সে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান না। কারণ, তিনি অনেক সময়েই জানেন না, তিনি কি ভাবে শেষ কর্ব্বেন। আমার এটা একটু আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল। কারণ আমার এর আগে কেন জানি না একটা ধারণা ছিল যে, আর্টিষ্ট সচরাচর denoumentটা আগে থাকতে অন্ততঃ অনেকটা ভেবে নিয়ে কলম ধরেন। আপনার নিজের কি রকম মনে হয়?

রোলাঁ। আমি জানি যে, এমন অনেক বড় আর্টিষ্ট আছেন যাঁরা denoumentকে মোটেই প্রয়োজনীয় মনে করেন না। তাঁরা একটা type দেখাবার জন্যই কলম ধরেন; এবং সেটা যথাযথ ভাবে দেখান হলেই, তাঁদের বক্তব্য বলা হয়ে গিয়েছে মনে করেন। যেমন Molière। তিনি একটু বেশী যেতেন—তিনি বল্‌তেন যে, denoument ভাবার মোটেই দরকার নেই।

একজন বর্ত্তমান খ্যাতনামা ফরাসী লেখকের কথা জিজ্ঞাসা কল্লাম।

রোলাঁ। আমার কাছে তিনি মৃত।

—তার মানে?

রোলাঁ। তিনি ছিলেন একজন ভাল আর্টিষ্ট। কিন্তু তাঁর উপর সমাজের তরলতা এতটা প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে যে, তিনি এখন society-man হয়ে গেছেন। ভেবে দেখ, তিনি পরনিন্দাপ্রিয় একটা কাগজের জন্য সাগ্রহে একটা করে mystic প্রবন্ধ লেখেন। কথায় আছে, "ঈশ্বর ও শয়তানকে তুমি একত্র তুষ্ট কর্ত্তে পার না। (৪)" একজন অলোকপন্থী (mystic) কখনও drawing-room সমাজের জন্য নিজেকে বিকোতে পারে না, পারে কি? তার উপর, তাঁর ওপর নানান সামাজিক স্ত্রীলোকের প্রভাব হয়ে পড়ল বড্ড বেশী। এ প্রভাবে গা ঢেলে দিলে একটা সুসম্বদ্ধ আর্ট তৈরী হতে পারে না। কারণ, বড় আর্ট তৈরী কর্ত্তে হলে নিজের যা সবচেয়ে সার, তারই দরকার। নিজের শক্তি এতে-ওতে ব্যয় করে যেটুকু থাকে, সেটুকুমাত্র দিলে বড় আর্ট সৃষ্ট হয় না। সমাজে মিশ্‌তে চাও, মেশো; কিন্তু নিজের সৃষ্টির কাজ ছেড়ে নয়। কারণ, এক সঙ্গে দুই-ই হয় না। সমাজের তরলশীলতা ও কাষ্ঠবদ্ধতার দাবী মনের অনেকটা vitality শুষে নেয়—এটা ভুললে চল্‌বে না।

রোলাঁ আস্‌ছে বছর ভারতবর্ষে যাবার আশা রাখেন। আশা করি, তিনি আমাদের দেশে সেই আদর ও সম্মান পাবেন, যা কৃতজ্ঞ মানুষ শিল্পীকে ও সাধককে দিয়ে, ও শুধু দিয়েই, আনন্দ পায়। (৫)

(৪) ইংরাজীতে যেখানে God and Mammon বলে, ফরাসীতে সেখানে Le Dieu et le diable বলে।

(৫) এ প্রবন্ধে রোলাঁর কোনও মতের সমালোচনাই আমি কর্ত্তে চেষ্টা করি নি: কারণ, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শুধু রোলাঁর ব্যক্তিত্বকে আমাদের লোক-সমাজে জ্ঞাপন করা—একটা তর্কের অবতারণা করা নয়। পরে আর্ট সম্বন্ধে হয় ত কখনও দুচারটি কথা লিখ্‌তে পারি। তবে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

কাশীতে বাঙ্গালী

অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

সেই স্মরণাতীত কাল হইতে এই পবিত্র মহাতীর্থ ভারতের সমগ্র জাতির মহামিলন-ক্ষেত্র। সমস্ত দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ, এই পুণ্যক্ষেত্রে সমাগত হইয়া একটা-না-একটা স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। কাশীতে বাঙ্গালীর কীর্ত্তিও কম দিনের নহে। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়েশ্বর মহীপাল এই বারাণসীতেই "ঈশানচিত্রঘণ্টাদিকীর্ত্তিরত্নশতানি" বিস্তার করিয়াছিলেন। বারাণসী এই সময়ে গৌড়রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং সম্ভবতঃ গৌড়ীয় সেনার প্রভাবেই এই পুণ্যভূমি মামুদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তার পর, দ্বাদশ শতাব্দীর আরম্ভ ভাগে গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেন, গাহড়বালবংশীয় নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়া বারাণসীতে সমরবিজয়-স্তম্ভ স্থাপিত করেন। কাজেই কাশীতে বাঙ্গালীর অভিযান সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব এই কাশীতে অদ্বৈতবাদী দার্শনিক প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বিচারে পরাজিত করিয়া, বাঙ্গালার অপূর্ব্ব গৌরব প্রেমভক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব্বদেশে বিখ্যাত অদ্বিতীয় বৈদান্তিক সন্দর্ভের রচয়িতা মধুসূদন সরস্বতীও এই কাশীধামে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া, পরম সম্মানের ভাজন হইয়াছিলেন। যতুঃষষ্টির বাড়ীতে যে ভদ্রকালীর মূর্ত্তি আছে, তাহা মহারাজ প্রতাপাদিত্যেরই কীর্ত্তি। মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাট এবং তাহার উপরিস্থিত মন্দির রাজা রাজবল্লভ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দশাশ্বমেধঘাটও রামানন্দ সরকারের কীর্ত্তি। অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানীর কীর্ত্তি ত কাশীকে সৌন্দর্য্য-

মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বহু দেব-দেবীর মন্দির, রাস্তা, কূপ, পুষ্করিণী, সেতু, ধর্ম্মশালা, উদ্যান ও বাটী রাণী ভবানীর ব্যয়ে কাশীতে নির্ম্মিত হয়। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিরাট্ অন্নসত্রের ক্ষীণ অবস্থা, তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত 'গোপাল'-বাটীতে এখনও কোনও রূপে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। "তীর্থমঙ্গলে" কবি বিজয়রাম লিখিয়াছেন,—

"যত বড়লোক আসে কাশীর ভিতরে।
ভবানীর সম কীর্ত্তি কেহ নাহি করে॥"

পঞ্চক্রোশী পরিক্রমণের ছায়া-সুশীতল বিস্তৃত পথ ও স্থানে-স্থানে বিশ্রামোপযোগী বৃহৎ পান্থ-নিকেতন অদ্যাপি রাণী ভবানীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কাশীর কারুকার্য্যময় দুর্গামন্দির ও দুর্গাকুণ্ডও রাণীর কীর্ত্তি। রাণী ভবানী তাঁহার কাশীর দেবালয়ে একবার আশ্বিন মাসে ও একবার চৈত্রমাসে যে দুর্গোৎসব করিতেন, তাহা মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের "কাশী-পরিক্রমা" পাঠে জানিতে পারা যায়। তাহাতে লিখিত আছে,"ছত্রবাটীগত দ্বিধা দুর্গোৎসব।" তবে ইহাই কাশীতে প্রথম দুর্গোৎসব নহে,—মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের আমলের একখানি প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিতে দেখিয়াছি, তখনও কাশীর খালিশপুরায় বাঙ্গালীর বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। এই পুঁথি কাশীর গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। রাণী ভবানী নানা সৎকর্ম্ম করিয়া এতই কীর্ত্তিশালিনী হইয়াছিলেন যে, "কাশীক্ষেত্রে খ্যাত অন্নপূর্ণা যার নাম।"

রাজসাহী জেলার পুঠিয়ার জমীদারদিগেরও কাশীতে দেবালয় ও অন্নসত্র আছে। দশাশ্বমেধঘাটের উত্তরাংশের বৃহৎ শিব-মন্দিরটী ও তন্নিম্নবর্ত্তী বাঁধান ঘাট পুঠিয়ার জমীদারদিগেরই কীর্ত্তি।

ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের কীর্ত্তিও কাশীতে সামান্য নহে। ১১৯৯ বঙ্গাব্দে (১৭৯২ খৃঃ) মহারাজ জয়নারায়ণ, পঞ্চগঙ্গাঘাটের উপরে কাশীবাস করিতেন। এই সময়ে তিনি কাশীখণ্ডের বাঙ্গালায় পদ্যানুবাদ প্রচার করেন। মহারাজের রচিত "কাশী-পরিক্রমা" কাশীর সেই প্রাচীন অবস্থার এক উজ্জ্বল চিত্র। দুর্গাবাড়ী যাইবার পথে 'গুরুধাম' নামক যে বিস্তৃত দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা মহারাজ জয়নারায়ণের গুরুভক্তির অপূর্ব্ব স্মৃতি-চিহ্ন। এই গুরুধাম বাঙ্গালা ১২৩৪ সালে (১৮২৭ খৃঃ) ১৯শে কার্ত্তিক শনিবার পূর্ণিমা তিথিতে স্থাপিত। মহারাজের দ্বিতীয় কীর্ত্তি—জয়নারায়ণ স্কুল। এই স্কুল ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। মহারাজ জয়নারায়ণের দ্বারাই যুক্ত-প্রদেশে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজ এই স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাসিক ২০০২ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। এই সময়ে চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটী কাশীতে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার করিতেছিলেন। মহারাজ এই সোসাইটীর রিপোর্ট পাঠে, এবং কাশীর তাৎকালিক রেভারেণ্ড ড্যানিয়াল করীর মুখে চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটীর কার্য্যকারিতাদির বিষয় জানিতে পারিয়া এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁহাদিগকেই জয়নারায়ণ স্কুলের ট্রষ্টী হইবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহারাও মহারাজের প্রস্তাবানুসারে স্কুলের পরিচালন-ভার, সাদরেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্কুলে প্রথম অবস্থায় সকল ছাত্রকেই বিনা বেতনে পড়ান হইত; তাহা ছাড়া, দরিদ্র বালকেরা আহার, বস্ত্র, কাগজ, পেন্সিল ও পাঠ্য পুস্তক পাইত। আরম্ভেই এই স্কুলে ১৫০ শত ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছিল। এবং তন্মধ্যে বাঙ্গালী ছাত্রই ৪০।৫০ জন ছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাজের চতুর্থ প্রপৌত্র রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর বর্ত্তমান স্কুল-গৃহটী ৫০০০২ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া দেন এবং স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ৬৫০০২ টাকা চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটীর হস্তে অর্পণ করেন।

কাশীর গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজেও প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই বাঙ্গালীর সংস্রব আছে। এই কলেজ ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর স্থাপিত হয়। কলেজের প্রথম আরম্ভ সময়েই ন্যায়শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই দুই প্রধান বিষয়ের অধ্যাপক-পদে বাঙ্গালী পণ্ডিতই নিযুক্ত ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র পড়াইতেন—রামপ্রসাদ তর্কালঙ্কার। ইঁহার বেতন ছিল—এক শত টাকা। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ১০৩ বৎসর বয়সে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের পদে শ্যামানন্দ ভট্টাচার্য্য এক শত টাকা বেতনে অধ্যাপনা করিতেন। রামপ্রসাদ তর্কালঙ্কার পেন্সন গ্রহণ করিলে, ন্যায়শাস্ত্রের পদে পুনর্ব্বার বাঙ্গালী অধ্যাপকই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম—চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন। চন্দ্রনারায়ণের অসাধারণ

মনীষা—অদ্বিতীয় প্রতিপত্তির কথা, আজও লোকে ভুলিতে পারে নাই। ইনি কাশীর পণ্ডিত-সমাজে বাঙ্গালীর একটা সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। ২০ বৎসর অধ্যাপনার পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে চন্দ্রনারায়ণ কাশী লাভ করিলে, তাঁহার পুত্র রাধাকান্ত শিরোমণি পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত কাশীর সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান পদে বাঙ্গালী অধ্যাপকই নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন।

অনেকের ধারণা, বাঙ্গালীরা সাংখ্য বেদান্ত জানিতেন না—ইদানীং কাশীতে আসিয়া কেহ কেহ বেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু "History of the Benares Sanskrit College" নামক পুস্তক পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে রাজীবলোচন ভট্টাচার্য্য নামক একজন বাঙ্গালী অধ্যাপকই নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইলে, কলিকাতার হিন্দু কলেজ হইতে গুরুচরণ মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র দে নামক দুইজন বাঙ্গালীকে আনিয়াই শিক্ষক করা হইয়াছিল। কলেজের ছাত্র-সমাজেও তৎকালে বাঙ্গালী ন্যূন ছিল না—সংস্কৃত বিভাগে রামকানাই নামক একজন বাঙ্গালী ছাত্র মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইত।

চৌখাম্বার মিত্র-পরিবার কাশীর বাঙ্গালীদের গৌরব। নানা সদনুষ্ঠানের জন্য রাজেন্দ্র মিত্রের নাম কাশীর আপামর সাধারণের নিকট পরিচিত। গভর্ণমেণ্ট, তাঁহার সৎকার্য্যের সম্মান-স্বরূপ বিবিধ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র মিত্রের তিন পুত্র—গুরুদাস মিত্র, সারদাদাস মিত্র ও বরদাদাস মিত্র। ইঁহারা সকলেই কাশীতে নানা লোকহিতকর কার্য্য করিয়া বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বরদাদাস মিত্রের পুত্র রায় প্রমদাদাস মিত্রবাহাদুর, স্বধর্ম্মপরতা ও লোকোত্তর পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিতে অদ্যাপি অমর হইয়া রহিয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রমদাদাস সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইঁহার অধ্যাপনা-প্রবৃত্তি এতই প্রবল ছিল যে, ধনীর সন্তান হইয়াও স্বেচ্ছায় কুইন্স কলেজের এংগ্লো-সংস্কৃত ডিপার্টমেণ্টে আসিষ্টাণ্ট প্রফেসারের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে ইনি কুইন্স কলেজে প্রিন্সিপাল হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার উপর অন্যান্য নানা কার্য্যের ভার থাকায়, সে পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কাশীতে প্রমদাদাসের এতই প্রতিপত্তি ছিল যে, ইঁহারই পরামর্শানুসারে কাশীনরেশ মহারাজ শ্রীমান প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর সেনট্রাল হিন্দু কলেজের জন্য ভূমি এবং অট্টালিকা দান করেন। প্রমদাদাস মিত্র সেনট্রাল হিন্দু কলেজের একজন ট্রষ্টী। আচারে ইনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ইঁহার রচিত সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিলে, ইঁহার সুন্দর কবিত্ব-শক্তি এবং অপূর্ব্ব শিবভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমদাদাস ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৬১ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। ইঁহার পুত্র কালীচরণ মিত্র বি-এ।

সারদাদাস মিত্রের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বি-এ, এল-এল-বি মহাশয়ও হিন্দুকলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাপক। কলেজ-পরিচালন-কার্য্যে ইনি শ্রীমতী এনি বেসাণ্টের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বি-এ মহাশয়ও হিন্দু কলেজের উন্নতিকল্পে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু অনেক দিন পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। সম্প্রতি ইনি হিন্দু ইউনিভার্সিটী কাউন্সিলের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

কাশীর বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুলও বাঙ্গালীদিগের কীর্ত্তি। ১৮৫৪ সালে এই স্কুল বাঙ্গালীদিগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠাপিত হয়।

বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এংগ্লো-বেঙ্গলী স্কুল স্থাপিত হয়। তখন যুক্ত-প্রদেশে বঙ্গভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। গভর্ণমেণ্ট এই স্কুলের কার্য্য-প্রণালীতে সন্তুষ্ট হইয়া মাসিক ৫০২৲ টাকা সাহায্য করিতেছেন। স্কুলের অনারারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমই এই স্কুলের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। ইনি প্রতি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিয়া স্কুলের গৃহ-নির্ম্মাণ-ভাণ্ডারে বিশ হাজার টাকার অধিক সংগ্রহ করিয়াছেন। আর দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে, অবশিষ্ট ত্রিশ হাজার টাকা গভর্ণমেণ্ট দিবেন। মাতৃভাষা শিক্ষার প্রসঙ্গে আর দুইজন বাঙ্গালীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মহামহোপাধ্যায় ৺আদিত্য

রাম ভট্টাচার্য্য এম-এ, ও রায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ, এল্ এল-বি মহোদয়ের চেষ্টাতেই এ প্রদেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বঙ্গভাষা পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়। পণ্ডিত আদিত্যরামের এ দেশে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা। মদন মোহন মালব্য প্রভৃতি ইঁহার ছাত্র ছিলেন। পণ্ডিত আদিত্যরাম শেষ বয়সে শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য সর্ব্বস্বার্থ পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার প্রিয় শিষ্য মালব্যের অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর-পদে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু পূর্ব্বে কাশীবিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন,—সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটীতে ভাইস্ চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে আর একজন মনীষীর উল্লেখ করিব। ইনি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে এম-এ। ইনি পূর্ব্বে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে অবৈতনিক ভাবে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন; সম্প্রতি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিনা বেতনে এই পদ গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই বলিয়া ইনি মাসিক এক টাকা বেতনরূপে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই মহাপ্রাণ মনীষী ৪০০০০৲ টাকা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডিং হাউসের নামে উইল করিয়াছেন। হিন্দু কলেজে আরও অনেক বাঙ্গালী অধ্যাপক কর্ম্ম করিতেছেন। এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধে তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ করিতে না পারায় দুঃখিত। হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম অধ্যাপক, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও শেষ ফার্ষ্টক্লাস ফার্ষ্ট ফিলসফির এম-এ। স্যর আশুতোষ ইঁহাকে কলিকাতায় লইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু মালব্য ছাড়িয়া দেন নাই। বাঙ্গালীদিগের আরও গৌরবের বিষয় এই যে, অনুকূলবাবু হিন্দু কলেজের ফিলসফীর প্রধান প্রফেসর শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম-এ মহাশয়েরই ছাত্র।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রেণীতেও বহুকাল হইতে কাশীতে অধ্যাপকদিগের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। কণাদসূত্র-বিবৃতির প্রণেতা, সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের বঙ্গভাষায় অনুবাদক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন মহাশয় শেষ জীবনে কাশীবাসী হন। বহু দণ্ডী সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত ইঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমুখ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ ইঁহার নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রেমচাদ তর্কবাগীশ ও তারানাথ বাচস্পতিও কর্ম্মাবস্থানকালে কাশীবাসী হইয়া অধ্যাপনাদির দ্বারা অশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন।

কাশীতে বাঙ্গালীদিগের শেষ গৌরবস্তম্ভ—মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা ১৩০০ সালে কাশীবাসী হন; এবং ১৩২১ সালের ৩০শে কার্ত্তিক কেদারঘাটে গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগ করেন। এই কয় বৎসরে কাশীতে তিনি এতই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যে, আমরা বাঙ্গালী সেই কথা স্মরণ করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠি। মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর, মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য, মহামহোপাধ্যায় সুধাকর প্রমুখ কাশীর দিক্‌পালের তুল্য পণ্ডিতবৃন্দ তাঁহার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিতেন। মহামান্য কাশীনরেশ মহারাজ শ্রীমান প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চরণে অর্ঘ্য দিয়াছিলেন। এতবড় সম্মানলাভ কাশীতে কোনও বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীবাস কালেই "অদ্বৈতবাদ খণ্ডন," "দীধিতি-রুনূনতাবাদ," "মায়াবাদ নিরাস", "বিবিধ বিচার" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়েরই কনিষ্ঠ সহোদর এবং প্রথম ছাত্র, প্রতিভাবতার তারাচরণ তর্করত্ন জ্যেষ্ঠের কাশী আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই কাশীনরেশের সভাপণ্ডিতরূপে অশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত কাশীবাস করিতেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রমুখ কাশীর খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ তর্করত্ন মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক দয়ানন্দের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে তর্করত্ন মহাশয় দিগন্ত-বিশ্রান্ত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহারই যোগ্য পুত্র মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এখনকার বিজয়া-সম্মিলনের সভাপতি। তর্কভূষণ মহাশয়ও প্রথম জীবনে পরম প্রখ্যাতির সহিত কাশীতেই অধ্যাপনা করিতেন। আবার কাশীবাসীর সৌভাগ্য-ক্রমে জীবনের শেষ ভাগও কাশীতে অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আর একজন সর্ব্বজনমান্য পণ্ডিত—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ও

এইবার স্থায়িভাবেই কাশীবাসী হইলেন। এই দুইজন পণ্ডিত-প্রকাণ্ডের শুভাগমনে পণ্ডিত-সমাজেও বাঙ্গালীর প্রাধান্য অটুট রহিল। চিরকালের ন্যায় আজও কাশীতে বাঙ্গালীরাই ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান পণ্ডিত। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন—এই তিনজনই কাশীতে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের ছাত্র; সম্প্রতি কাশীর সংস্কৃত কলেজে গুরু পদেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় কাশীর সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক পদে অতি সম্মানের সহিত বহুকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বার্দ্ধক্যাবস্থায় ইনি অবসর গ্রহণ করিতে চাহিলে, যুক্ত প্রদেশের তাৎকালিক ছোটলাট লাটুস সাহেব বলিয়াছিলেন, "আপনি পাল্কী করিয়া প্রাতঃকালে আসিয়া একবার বেড়াইয়া যাইবেন, তাহাতেই আমাদের কলেজের গৌরব—আপনি কলেজ ছাড়িতে পারিবেন না।"

* * *

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের প্রসঙ্গে আর দুইজন পরলোকগত পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম গদাধর শিরোমণি, দ্বিতীয় শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য তর্কপঞ্চানন। বর্ত্তমান কালের কাশীস্থ উদীয়মান অধিকাংশ বাঙ্গালী পণ্ডিতই ব্যাকরণ শাস্ত্রে গদাধর শিরোমণি মহাশয়ের ছাত্র। ইঁহার টোলের সরস্বতী-পূজা কাশীর এক প্রধান উৎসব ছিল। শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় পরদুঃখকাতর দাতা কাশীতে ছিলেন না বলিলেই হয়। কাশীতে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম স্থাপনের ইনি অন্যতম প্রধান উদ্‌যোগী। ইঁহার বাটীই কাশীস্থ বাঙ্গালী পণ্ডিতদিগের মিলন-মন্দির। কাশীর প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে ইঁহার যোগ ছিল। ইঁহার ন্যায় হৃদয়বান্ সাধু চরিত্রের লোক বর্ত্তমান যুগে দুর্লভ।

ব্যবসায়ের কথা

শ্রীহরিহর শেঠ

"ব্যবসা ও মূলধন" শীর্ষক আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি গত জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবার পর, কতিপয় স্কুল-কলেজের শিক্ষিত যুবক এবং কোন কোন অভিভাবক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও পত্রযোগে আমাকে ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অন্যান্য জিজ্ঞাস্যের মধ্যে সকলেরই প্রায় এই প্রশ্নটি আছে, 'কোথায় এবং কি উপায়ে শিখিব?' সদ্য বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া তরুণ যুবকগণের কেরাণীগিরী চাকুরীর সনাতন মায়া-মোহ ত্যাগ করিয়া আশা ও নিরাশা ভরা বুকে মাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মের জীবনে প্রবেশের জন্য সসঙ্কোচে এ হেন অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া মনোমধ্যে যেমন এক অব্যক্ত আনন্দ হয়, তেমনই তাহারা যেমন সোজা উত্তরটি শুনিতে পাইলে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, সেরূপ উত্তর দিতে না পারিয়া বা তেমন উত্তর দিবার উপায় না থাকায় বিষাদে হৃদয় ভরিয়া উঠে। তাহারা কলেজের শিক্ষার ন্যায় সব প্রামাণীকৃত সত্যের মত করিয়া পাইতে জানিতে চায়। কিন্তু হায়, জানিবার জন্য কোন্ স্থানে কাহার কাছে যাইবে, তেমন স্পষ্ট ভাবে এ উত্তর কোথায় পাইব? যাহা বলিতে যাই, বুঝাতে যাই, তাহাও কত সন্তর্পণে, কত সঙ্কোচে বলিতে হয়। মাকে ভক্তি করিও, পূজা করিও, গুরুকে দেবতা ভাবিও, এ উপদেশ দিতে ভাবিতে হয় না, কাহাকেও লুকাইতে হয় না। কিন্তু অনেক পিতার সাক্ষাতে তাহার পুত্রকে—দেশ-মাকে ভক্তি করিও, পূজা করিও,—অধুনা সময়গুণে এ কথা খোলসা করিয়া বলিতে, শিক্ষা দিতে যেমন একটা 'সঙ্কোচের ভাব স্বতঃই মনে আইসে, ইহাতেও তেমনই একটা ভাব উপস্থিত হয়। চাকুরীর সন্ধান দিতে কোথাও কোন সঙ্কোচ হয় না; বরং অভিভাবকের কাছে ধন্যবাদই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু

অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় পথের সন্ধান দিতে হইলে, যুবকদের অভিভাবকের কাছে যেন কেমন একটা ভয়ের মত আইসে,—যেন কি অন্যায়ই করা হইতেছে। গোপনে তাদের সঙ্গে এ সব কুকথা কহাই শ্রেয়ঃ মনে হয়। এমনই আমাদের অবস্থা, এমনই মনোবৃত্তি দাঁড়াইয়াছে।

আমার উক্ত প্রবন্ধটি যে সকল বন্ধু পড়িয়াছিলেন, তন্মধ্যে কলেজের উচ্চশিক্ষিত চাকুরীজীবী যে কয়জন বন্ধু ছিলেন, তন্মধ্যে একজনও উহা সমর্থন ত দূরের কথা, বিশ্বাস পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। হাতে টাকা না থাকিলে ব্যবসায় ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যে চলিতে পারে, এ তাঁহাদের মতে অসম্ভব আজগুবি কথা। মাত্র একজন বিজ্ঞ অধ্যাপক এই মাত্র বলিয়াছিলেন, "প্রবন্ধটি বেশ Encouraging হয়েছে।" কলেজের শিক্ষিতগণের কাছে আমার এ খুব সত্য কথাটা গৃহীত না হউক, ব্যবসার মূল সূত্র অবগত না থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা যে অবিশ্বাস করেন, ইহা অবশ্য পরিতাপের বিষয়। যাহা দিনরাত্রি অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়া ব্যথা পাই, যাহা দিব্য চক্ষে সাক্ষাৎ সত্য বলিয়া অহরহঃ দেখিতে পাই, এবং যাহা আমাদের তরুণ ভাইয়েদের পক্ষে এমন কিছু আয়াস-সাধ্য ব্যাপার নয় বলিয়া মনোমধ্যে স্থির বিশ্বাস আছে, সেই ব্যবসায় ঘটিত সত্য কথাগুলির যদি সহস্র কণ্ঠে প্রতিবাদ হয়, তথাপি বুঝাইয়া বলিবার ক্ষমতার দৈন্যতা হেতু হয় ত প্রতিবাদের যুক্তি খণ্ডন করিবার সামর্থ্য না আসিতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া তাহা মানিয়া লইতে পারিব না। যাঁহারা অগ্রাহ্য বা অবিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিকটে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। অনেক সত্য আছে, যাহা বড় মুখ দিয়া বড় গলায় বাহির না হইলে কেহ মানে না। আমার সে মুখ নাই, সে কণ্ঠ নাই; সুতরাং এ ক্ষীণ কণ্ঠের ছোট কথা না শুনা মোটেই বিচিত্র নয়। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে, যাহা সত্য মনে করি, তাহা আমাকে বলিতেই হইবে। তাহাতে যদি একজনেরও কোন উপকার হয়, তাহাই যথেষ্ট মনে করিব।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, ব্যবসায়ে টাকাই প্রথম মূলধন নহে; নিজেকে ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া লওয়াই প্রধানতঃ আবশ্যক। মূলধনের টাকা উহার পরে,—সে টাকা সহজেই আসিয়া থাকে। আমি আবার তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি। যাঁহারা উদাহরণের দিকে চাহিবেন না, অথচ যাহা সত্য, সংস্কারবশে তাহাও বিশ্বাস করিবেন না, তাঁহাদের আর কি বলিব। ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক, অর্থ-মূলধনহীন যুবকগণের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার কালে প্রথমে মূলধনের টাকার অভাবের কথা মনেও না আনাই উচিত। অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "ব্যাক করবার কেহ না থাকিলে, ব্যবসায় করা বা ব্যবসায় শিক্ষা করা সম্ভব নয়।" যুবকগণ কাহারও সহায়তা পাইলে সত্যই তাহাদের অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে সেরূপ সুযোগ নাই সেখানে সে প্রত্যাশা করা চলিতে পারে না। কিন্তু সে সাহায্য না পাইলে যে কেহ সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না, এমন কোন কথা নাই। অপরের সাহায্য পাইলে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু নিজের চেষ্টা, নিজের একাগ্রতাই সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। নিজে পথের সন্ধান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিলে, আত্মীয়-বন্ধুর কাছে শিক্ষানবীশি করার অপেক্ষা সফলতা লাভের সম্ভাবনা অধিক। যাহারা অর্থ সম্বন্ধে সম্পদশালী হইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই স্ব-স্ব চেষ্টা, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের গুণেই হইয়াছেন। সকলেই প্রায় প্রথমে অতি হীনাবস্থায় ছিলেন। ইয়োরোপ আমেরিকার কোটিপতিদের কথার উল্লেখ করিব না, এই সামান্য লেখক এইখানকার এমন অনেক স্থানীয় লোকের কথা জ্ঞাত আছেন, যাঁহারা রিক্তহস্তে নিতান্ত দীনভাবে বাহির হইয়া কেহ চট সেলাই, কেহ ওজন-সরকার, কেহ ফেরি-ওয়ালা রূপে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া, পরে বহু ধন ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

যাঁহাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আছে, যাঁহারা ব্যবসায় এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির সে বিষয়ে আগ্রহের অভাবের কথা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি কলিকাতার ভিন্ন-ভিন্ন বাজারে বা মফঃস্বলের বড়-বড় সহরে অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই অ-বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে সাফল্য দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করুন আর নাই করুন, বহু স্থানে তাহাদের দেখিয়া নিজ হইতেই বুঝিতে পারিবেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই কোনরূপ পুঁজি মাত্র না লইয়া, কেবল নিজ-নিজ স্পৃহা, ব্যাকুলতা এবং পরিশ্রম দ্বারা উন্নতি লাভ করিতেছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উত্তর অংশে মাণিকতলা পর্য্যন্ত, আর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট পার হইয়া উত্তর দিকে

যাইলে দেখিবেন, খোট্টাদিগের সারি-সারি পুরাতন লোহার দোকান সকল দিন-দিন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। গেঁড়াতলা, বেলেঘাটা, হাওড়া প্রভৃতি স্থানের এক-একজন গাড়োয়ান শ্রেণী হইতে উন্নীত এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের বিশ, পচিশ, এমন কি, পঞ্চাশ পঁচাত্তরখানিরও অধিক মহিষ বা গো গাড়ি আছে। কলিকাতার রাস্তায় ছোট-ছোট একটু ঘর লইয়া সরবৎ, চা, বা বিড়ির দোকান করিয়া এমন অনেক খোট্টা বসিয়া আছে, যাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ কলিকাতায় দুই-তিনখানি বাড়ীর অধিকারী। কাগজের ঠোঙ্গা বা লজেন্স্, বিস্কুট, খাবারের দোকান করিয়া কতলোক স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছে, ইহাও অলিতে-গলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের সকলেই প্রায় শুধুহাতে বাহির হইতে আসিয়া, প্রথমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিঠে করিয়া পুরান লোহা খরিদ বা গাড়োয়ানি করিয়া, বা মাথায় করিয়া ফিরি করিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে-করিতে পরে উন্নতি করিয়াছে। এক এক বাণ্ডিল ষ্টীলের চাদর ও লোহার শিক কিনিয়া লইয়া গিয়া ষ্টীল ট্রাঙ্কের কাজ, কতকগুলি চশমা, পুস্তক বা মনিহারী জিনিষ লইয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রতিমাসে ৪০৲ ৫০৲ টাকা উপায় করিতে অনেক লোককে দেখিয়াছি। রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বাগান হইতে কলা সংগ্রহ করিয়া পশ্চিমে চালান দিয়া, কিম্বা বাঁশের ব্যবসা, মাছের আবাদ করিয়া বা কতকগুলি মেষ মহিষ লইয়া চরাইয়া, ক্রমে এক-একজন বড় ব্যবসাদার হওয়ার উদাহরণও দেখিয়াছি।

কলিকাতার প্রত্যেক ব্যবসায়ী পল্লীতে গিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, প্রতি চারি কি পাঁচখানি দোকানের মধ্যে অন্ততঃ একখানির প্রতিষ্ঠাতা ঐ পল্লীতে প্রথমে পরের দোকানে সরকার গোমস্তার কাজ করিয়া পরে উন্নতি করিয়াছেন। উপরে যে সকল কাজের কথা লেখা হইল, কেহ হয় ত বলিবেন" এ সকল কাজ ভদ্রলোকের নহে,—এ কাজ করিলে হেয় হইতে হইবে। কাজ বহু প্রকার আছে। যাহার পক্ষে যাহা সুবিধাজনক, তিনি তাহাই বাছিয়া লইতে পারেন। কিন্তু এ কথার মধ্যে সারবত্তা কি আছে, তাহা বুঝিতে পারি না। অফিসে, মালগুদামে, জেটীতে বা কল কারখানায় চাকুরী করিয়া মাসে পঁচিশ ত্রিশ না হয় চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মাহিনা, অর্থাৎ বার আনা একটাকা না হয় পাঁচসিকা দেড় টাকা রোজ। ঝড় নাই, বাদল নাই, রৌদ্র নাই, শীত নাই—আটটা বা নয়টার সময় তাড়াতাড়ি দুটি ভাত মুখে দিয়া কর্ম্মস্থানে হাজির হইতেই হইবে। নিজের সুখ-অসুখ তুচ্ছ করিয়া, বিবেক-বিবেচনার মাথায় অনেক সময় পদাঘাত করিয়া, মনিব বা উপরিতন কর্ম্মচারীর মন যোগাইতে হইবে। ইহাতে ভদ্রতা থাকিবে, বাবু নামের সার্থকতা রক্ষা হইবে। আর স্বাধীন ভাবে নিজের বিবেক-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পুরান লোহা, সরবৎ, বিড়ি, কাগজের ঠোঙ্গা, গো মহিষের গাড়ি প্রভৃতির ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেই হেয় হইতে হইবে, এ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করা সহজ বুদ্ধির অগম্য। সাহেব, জাপানীদের কথা ছাড়িয়া দিই। মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, নাখোদারা বিদেশ হইতে আসিয়া এখানে ব্যবসা করিবে,—আর বাঙ্গালীরা তাহাদের কাছে চাকুরী পাইয়া, বা দালালি রূপ রূপাকণা লাভ করিয়া, বা খুব বড় আকাঙ্ক্ষা থাকে ত, মুচ্ছুদ্দির কাজ করিয়া, অর্থাৎ থলের পরিবর্ত্তে ছোবড়া লাভ করিয়া, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিবে—এর অপেক্ষা অধঃপতনই বা আর কি হইতে পারে! আমরা বিহার, আসাম, মধ্য-প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে রেলে, পোষ্টআফিসে সামান্য চাকুরীর জন্য পড়িয়া থাকিব,—আর সেখানকার ধনী নির্ধন যে কেহ এখানে আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য, অন্ততঃ পক্ষে মাথায় করিয়া আম কমলালেবু বিক্রি করিয়া অন্ন সংস্থান করিবে,—মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিবে। এই ত অবস্থা। অন্য দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই চাকুরীর মোহেই ডুবিয়া থাকিবেন। আবশ্যক মত চাকুরীর জয়গান করিবেন। ব্যবসায়ের কিছুমাত্র সংবাদ না রাখিলেও, বিরুদ্ধ সমালোচনায় গগন বিদীর্ণ করিতে ছাড়িবেন না। যখন তাহাতেও তৃপ্তি না হইবে, তখন মৎসদৃশ বিদ্যাহীনের কাছে শিক্ষার উপকারিতা বা অন্য বিষয় যেমন করিয়া হউক অবতারণা করিয়া কথা পরিবর্ত্তন দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিবেন। আমাদের এই সব প্রসঙ্গ নিরর্থক, এমন কি ছেলেদের পক্ষে হানিকর এ কথা বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। শিক্ষার বিড়ম্বনায় আমাদের মনোবৃত্তি এমনই বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছে। সমাজের বহুপ্রকার বাধার মধ্যে এই সব অতি ভয়ানক। ইহারা উন্নতি পথের কণ্টক বলিয়া মনে করি।

ব্যবসায়ের পথে যাইবার প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা,—যে সকল যুবকের মনে স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রকৃত আকুলতা আছে, এবং চাকুরীকে যাঁহারা যথার্থ ঘৃণা করেন, তাঁহারা বিদ্যালয় ত্যাগের পর অন্ততঃ একটি বৎসর কাল যদি ব্যবসায় শিক্ষার জন্য দিতে পারেন, অর্থাৎ এই সময় মধ্যে যদি কোন অসুবিধা বোধে ব্যবসায়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহা করিলেও সময় নষ্ট হওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষতি হইবে না মনে করেন, তাহা হইলে আমি বলি, নিজেদের অর্থ-মূলধন না থাকিলেও, আত্মীয়-বন্ধুদের ব্যবসায়-কার্য্য না থাকিলেও, এবং অন্যান্য কল্পিত বা সত্য ত্রুটি সকলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সততা ও একাগ্রতাকে সম্বল করিয়া, ধনোপার্জ্জনের জন্য উচ্চ আশা অন্তরে ধারণ করিয়া, ভগবানের নাম স্মরণপূর্ব্বক অচিরে তাঁহাদের নিজ-নিজ উপযোগী ক্ষেত্রান্বেষণে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই খানেই অনেকের প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে, কোথায় এবং কি উপায়ে অগ্রসর হইতে হইবে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বাঁধা-ধরা পথ ধরিয়া চলিতে-চলিতে একেবারে এমন একটা উন্মুক্ত বহুমুখী পথে পড়িয়া যুবকদের তরুণ মস্তিষ্কের মধ্যে কাহারও-কাহারও একটু ধাঁধার মত লাগা বিচিত্র নহে; সুতরাং তাঁহাদের এ প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক।

যাহাদের ব্যবসায়-কার্য্য শিখিবার উপযোগী কর্ম্মস্থল আছে, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাহাদের সে সুযোগ নাই, তাহাদের কথাই বলিতেছি। সাধু ভাবে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে,—যাহার পক্ষে যাহা সহজ মনে হইবে, এমন কোন পথ বাছিয়া লওয়া উচিত। যখন কলিকাতায় বা অন্য বড়-বড় সহরে নিত্য দেখা যাইতেছে যে, চেষ্টা দ্বারা কপর্দ্দকশূন্য নিঃসম্বল ব্যক্তিরাও কিছু দিনের মধ্যে ধনশালী হইয়া উঠিতেছেন, তখন স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে যে, অর্থ এমন ভাবে কোথাও না কোথাও থাকে, যে স্থান বাছিয়া বাহির করিতে এবং প্রকৃষ্ট উপায়ে সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহা লাভ করা যায়। অথবা এমন কিছু কাজ আছে যাহা করিতে পারিলে তৎপরিবর্ত্তে অপর এক বা বহুলোকে অর্থ আনিয়া সেই কাজ করিবার কর্ত্তাকে দিয়া যায়। এক্ষণে কথা হইতেছে, অর্থ কোথায় আছে বা কি করিলে তাহা পাওয়া যায়। তাহার অনুসন্ধানই সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কার্য্য। যে যত শীঘ্র এই কাজটি করিতে পারে, অর্থাৎ সন্ধান করিতে পারে, যদি তাহার মধ্যে সাধুতার অভাব না থাকে, তবে সে তাহাতে তত শীঘ্র সাফল্য লাভের অধিকারী হয়। এই অর্থের সন্ধান করিতে পারিলে, তৎপরে উহা লাভের উপায় চিন্তা করা আবশ্যক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোন সৎস্বভাব লোক অর্থ সংগ্রহের যথার্থ পথ দেখিতে পায়, তাহার পক্ষে উহা পাওয়া তত কঠিন নহে। অবশ্য অনেক সময় মূলধন আবশ্যক, কিন্তু সে মূলধন পাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। অনেক সময়, এমন কি প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই, বলা যাইতে পারে, উহা পাওয়া যায়। অনেক সময়ে অপরে আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের নিজ স্বার্থের জন্যই দিয়া থাকেন।

উদ্যানের মধ্যে কোন গাছের উচ্চ শাখায় বা কোথাও ঝোপের মধ্যে ফলটি লুকান আছে, বা জলাশয়ের কোন স্থানে মাছ আছে, ইহার সন্ধান পাইলে, গাছে উঠিবার মই বা মৎস্য ধরিবার জাল সংগ্রহ করা আদৌ কঠিন ব্যাপার নহে। মই বা জাল পাইবার জন্য তখন যাহা দরকার, তাহা ফল ও মৎস্য লাভের সঙ্গেই পাওয়া যায়। গাছ বা পুষ্করিণীর মালিক তখন নিজ হইতেই উহা দিয়া থাকেন, এবং সেই সঙ্গে কিছু-কিছু ফল ও মাছের অংশও দিয়া থাকেন, বা দিতে বাধ্য হন। এ বাধ্য হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, বহু ক্ষেত্রেই গাছের ফল পাড়িতে বা পুকুরের মাছ ধরিতে অধিকারীর ক্ষমতায় কুলায় না; অথচ তাহার উভয় সামগ্রীরই প্রয়োজন। গাছে ফল ও পুকুরে মাছ থাকাই যথেষ্ট নহে; সুতরাং তাহা পাইবার জন্য সাহায্য করে এমন লোক সর্ব্বদাই দরকার। আমি স্বীকার করি, এই মৎস্য বা ফলের সন্ধানের জন্য, বাগান বেওয়ারিশ না হইলে, যদি ঘেরা বাগান হয়, তবে উহাতে প্রবেশের জন্য একটা ছাড় অনেক সময় আবশ্যক। সেই ছাড়ের জন্যই কেহ সাহায্য করিলে একটু সুবিধা হয়। অপরের কাছে কিছু দিন শিক্ষানবীশি হইতেই এই ছাড় পাওয়ার উপযোগী হওয়া যায়। সামান্য একটি চাকুরী পাইতে হইলে অন্যের খোসামোদ, উমেদারী আবশ্যক। না হয় এজন্যও একটু তাহাই করিতে হইল। প্রথম সামান্য ছোকরা রূপে কোন দোকানে প্রবেশ করিয়াও নিজেকে যথেষ্ট কাজের লোক করিয়া লইতে পারা যায়।

অর্থ-মূলধনহীন যুবকগণের সর্ব্বদাই মনে রাখা দরকার যে যেমন ব্যবসায়ের জন্য তাহার টাকার প্রয়োজন, সেইরূপ ধনলিপ্সু এমন অনেক অর্থবান আছেন, যাঁহারা উপযুক্ত পাত্র পাইলে তাহাকে মূলধন সরবরাহ করিয়া নিজের অর্থ-বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। তদ্ভিন্ন ইহাও সত্য, বিনা বেতনে বা স্বল্প মাত্র পারিশ্রমিক দিয়া যদি কোন ব্যবসাদার কোন সচ্চরিত্র যুবককে পান, তবে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ নাই। যদি এক জায়গায় সুযোগ না পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যাইতে পারে। যদি কেহ বাজার-হাটে বা ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিজে সামান্য কিছু জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া, তৎপরে কোন ব্যবসাদারের দোকানে শিক্ষার্থ প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার পক্ষে কাজ করা খুব সহজ হয়। আর যে যুবক পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ধান সংগ্রহ করিয়া তৎপরে ব্যবসাদারের কাছে যাইয়া উহা তাহার গোচরে আনিতে পারে, তাহা হইলে ব্যবসাদার তাহাকে যে যত্ন করিয়াই ডাকিয়া লইবে, সে বিষয়ে সন্দেহই নাই।

দালাল, কণ্ট্রাক্টার, কমিশন এজেণ্ট, আড়তদার প্রভৃতির কাজে অনেক সময় টাকার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। হইলেও অল্প টাকার দরকার হয়। যদি তাহাদের কাজ শিখিতে পারা যায়, তাহা হইলেও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন যদি কেহ রীতিমত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেও অভিলাষী হন, তবে তিনিও ঐ স্থানে থাকিয়া সে সম্বন্ধে ইচ্ছা থাকিলে জ্ঞানার্জ্জনের যথেষ্ট সুবিধা পাইতে পারেন। যে যুবক বাহির হইয়া কোন পথই ঠিক করিতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে, তাহার অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার অভাব না হইলে, সে একজন সামান্য দালালের সঙ্গে ঘুরিয়াও নিজ পথ ঠিক করিয়া লইতে পারে।

অর্থ উপার্জ্জনের যাহা প্রকৃষ্ট পথ, সে সম্বন্ধে আমার যাহা জ্ঞান আছে, তাহার কথাই পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান প্রবন্ধে বলিলাম। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের যুবক বা তাহাদের অভিভাবকগণের দৃষ্টিতে ব্যবসায় অবলম্বন করা সচরাচর যত কঠিন ও অসম্ভব মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। সে পথ গ্রহণ করিতে হইলে যে দিক দিয়া যাইতে হয় বলিয়া আমার জানা আছে, তাহাও বলিলাম। সেটি প্রধানতঃ নিজে দেখিয়া শুনিয়া বা কোন ব্যবসাদারের কর্ম্মস্থলে কিছুদিন থাকিয়া শিখিয়া লওয়া। কাহার কাছে কে যাইবেন, তাহা বলিয়া দেওয়া আমার পক্ষে কতদূর সম্ভব, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারেন। এটর্নীদের কাছে আর্টিকেল ক্লার্ক থাকিতে হইলে, আজকাল শুনিতে পাই, অনেক টাকা, এমন কি দুই পাচ হাজার টাকাও সময়-সময় সেলামি না দিলে চলে না। অথচ যতদিন তাহার কাছে শিক্ষানবীশি করিবে, ততদিন এটর্নীর বহু প্রকারে উপকারই হইয়া থাকে। পরে এটর্নী-গিরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই না এই সেলামি দেওয়ার প্রয়োজন? অতএব যদি শিক্ষা-লাভ হইলে পরে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হয়, তাহা হইলে বিনা বেতনে অন্ততঃ দুই-এক বৎসরের জন্য কাহারও দোকান বা কারখানায় বা কোন দালাল, কণ্ট্রাক্টারের সহকারী রূপে কাজ শিখিবার চেষ্টা করা উচিত। এমন কি আমার মতে, যদি তাহাও অসম্ভব মনে হয়, তবে যদি একটা চাকরীর জন্য স্কুল কলেজে বহু ব্যয়ে লেখা পড়া শিক্ষায় আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কিছু অর্থব্যয় করিয়াও যদি কোথাও শিক্ষানবীশি করিতে ঢুকিতে হয়, তাহাও সম্ভব হইলে করা উচিত। যাহার আগ্রহ ও চেষ্টা আছে, সে পরে যে লাভ-বান হইতে পারিবে, তাহাতে ভবিষ্যতে সে ব্যয় অতি অকিঞ্চিৎকরই প্রমাণিত হইবে। কেবলমাত্র চেষ্টা, আগ্রহ, অধ্যবসায় থাকিলে ও পরিশ্রম-বিমুখতা না থাকিলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস শতকরা অন্ততঃ পচাত্তর জন সচ্চরিত্র যুবক কোন না কোন স্বাধীন কার্য্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। আমাদের ছেলেদের সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই, আছে উপযুক্ত সাধনার অভাব। সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভও হয় না।

ছবির খেয়াল

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

সমস্তদিন নানাকার্য্যে ঘুরিয়া যখন বাটী ফিরিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। বিশেষ ক্লান্তি বোধ হইতেছিল, বৈঠকখানায় না বসিয়া উপরে নিজের ঘরে আসিলাম। জুতা জামা ছাড়িয়া, দক্ষিণের জানালাটার ধারে ইজিচেয়ারখানা পাতিয়া বসিতে, বেশ আরাম বোধ হইতে লাগিল। অল্প অল্প বাতাস বহিতেছিল। ক্লান্তদেহে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থা, আবার মৃদু-মন্দ বাতাস—চক্ষু যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। সম্মুখের দেওয়ালে একখানি আবাঁধা ছবি টাঙ্গান ছিল; বাতাস লাগিয়া সেখানি ঈষৎ দুলিতেছিল। অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে সেখানির দিকে চাহিয়া ছিলাম। ছবিতে পুষ্পোদ্যানের মধ্যে সুন্দরী কিশোরী মালা হস্তে একাকিনী দণ্ডায়মানা; বোধ হয় প্রিয়জনের আগমনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। মনে হইতেছিল, যেন কিশোরী আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতেছে, আনন্দের আতিশয্যে তাহার সমস্ত দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

* * * * *

তোমায় কি বোলে ডাকবো?

কেন ছবি বোলে।

ছবি, এতদিন কেন আমায় ডাক নি?

সময় না হ'লে তুমি আস্‌বে কেন?

আস্‌তাম না, কি কোরে জানলে?

এ যে জানা কথা।

এই যে তবে আজ এসেছি।

আজ যে আসবার দিন, আসতেই হবে।

তা হলে তুমি জানতে আমি আস্‌বো?

নিশ্চয়ই, এই দেখছ না তোমার জন্যে মালা গেঁথে রেখেছি।

তবে দাও গলায় পরি।

বাঃ, তুমি বুঝি নিজে পরবে, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

দাও।

বাঃ, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!

কেন এতক্ষণ বুঝি খারাপ দেখাচ্ছিল?

যাও, আমি বুঝি তাই বলছি।

তুমি তো মালা দিলে, আমি কি দিই?

তোমার যা ইচ্ছে।

আচ্ছা এই নাও—

তুমি ভারী দুষ্টু!

কেন, জিনিষটা পছন্দ হোল না বুঝি?

চল, বেড়িয়ে আসি।

চল, কোন্ দিকে?

সামনের দিকে? দেখছ না কত আলো।

অত আলো কেন?

আমরা ওদিকে যাব বোলে।

চার ধারের শোভা তো বেশ, যেন বসন্তকাল।

এখানে যে সব সময় বসন্ত।

এত ফুল তো এক সঙ্গে ফুটতে দেখি নি।

এই তো ফোটবার সময়।

কোকিল ডাকছে।

শুনতে পাচ্ছি।

সামনে ওটা কি?

ওটা যে লতা-কুঞ্জ।

চল, ঐখানে যাই।

ঐখানেই তো যাচ্ছি।

অতি সুন্দর লতা তো।

এখানে তো সবই সুন্দর।

বা, বেশ বসবার জায়গা তো।

এস আমরা বসি।

পাতার ফাঁক দিয়ে আলো ঠিক তোমার মুখের ওপর পড়েছে।

তোমার মুখেও তো পড়েছে, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

এ মুখের কাছে তো নয়।

যাও!

ও কি চোখ বুজলে কেন?

ইচ্ছে হো'ল।

খুলবে না?

না।

তবে এই—শাস্তি।

তুমি ভারী দুষ্টু।

চোখ খুললে যে ?

ইচ্ছে হো'ল।

কতগুলো ফুল ঝরে পড়'ল, দেখ্‌ছ ?

দেখ্‌ছি।

তোমার চুলে সাজিয়ে দি।

দাও।

বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে।

যাও !

আবার চোখ বুজলে কেন ?

জানি না।

তবে এই আর একটা—

অত আস্তে চল'ছ কেন ?

রাস্তা যে ফুরিয়ে এলো।

আলো একটু কমে গেল নয় ?

তাই তো দেখছি।

এই যে আমরা এসে পড়েছি।

এত শিগ্‌গীর !

ছবি ?

কি ?

এইবার যেতে হবে।

এখনি যাবে ?

ছবি প্রসারিত বাহুদ্বয়ের মধ্যে ঢলিয়া পড়িল।

* * * * *

ঠাকুরপো, ও ঠাকুরপো—

[illegible] দিকে [illegible]মার ইচ্ছে।

চল, ঐ রাস্তাতেই ফিরি।

চল, তোমার যা ভাল লাগে।

আবার কোকিল ডাকছে।

ও তো বরাবরই ডাকছে।

তোমার মাথার ফুলগুলো বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

ও যে তুমি সাজিয়ে দিয়েছ।

[illegible], দুই বাহু মধ্যে ছবি বক্ষ-সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

বাতাসের জোরে ছবিখানা দেওয়ালের পেরেক হইতে খুলিয়া কখন যে আমার বক্ষের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই।

আমি বলিলাম—বৌদিদি, এ ছবির খেয়াল।

তাতো বটেই,—এ তোমার নয়, ছবিরই খেয়াল—বলিয়া বৌদিদি হাসিতে হাসিতে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

মহাপ্রয়াণ

(আচার্য্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের তিরোধান উপলক্ষে)

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

গত-যুগ-সাহিত্যের শ্রীচণ্ডীমণ্ডপে,
হে আচার্য্য ! ছিলে তুমি দীক্ষা-গুরু সম !
প্রেম-সাধনার সেই মহামন্ত্র জপে,
রচিলে অতুল্য কাব্য,—সুধা অনুপম।
কি সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছিল তোমার,
হেরিলে বিশ্বের শত সৌন্দর্য্য মহান্ ;
কত রত্ন-পূর্ণ তব জ্ঞানের ভাণ্ডার,
কে পারে করিতে বল তার পরিমাণ ?
ভাবুক, রসিক, কবি, হেন মহাপ্রাণ,
আর কি হেরিবে বঙ্গ ? দিব্য-প্রতিভার
সে উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম-চিত্র চির জ্যোতিষ্মান !
রহিবে অনন্তকাল—কীর্ত্তির সম্ভার—
বিধির বিধানে তব এ মহাপ্রস্থান ;
আসিছে নয়নে তবু অশ্রু অনিবার !

বিজ্ঞান ও দর্শন

ডক্টার শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ্-ডি, আই-ই-এস্

সে আজ প্রায় বিশ বৎসরের কথা। তখন আমি কলেজের ছাত্র। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের (তখন ছিল জেনারেল এসেম্ব্লিস্ ইনিষ্টিটিউশান) সংলগ্ন ডানডাস হোষ্টেলে একদিন সন্ধ্যার সময় একটা সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—"বিজ্ঞান বনাম দর্শন" (Science versus Philosophy)। আমি ঐ কলেজের ছাত্র না হইলেও ঐ সভায় বিজ্ঞানের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দর্শনের বিরুদ্ধে বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হই। দর্শনের সপক্ষে প্রধান যোদ্ধা ছিলেন শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাস্থলে এই দুই দলে ঘোর যুদ্ধ হইতে থাকে—উচ্চকণ্ঠের ঘোররবে সভাগৃহ প্রকম্পিত। বিজ্ঞানের নবীন ছাত্র আমরা—আমাদের দৃষ্টিশক্তি বিজ্ঞানের সুন্দর সুন্দর পরীক্ষার শোভাসৌন্দর্য্যে তখন মুগ্ধ। আমাদের দল বিজ্ঞানের জয়পতাকা উড়াইবার জন্য ভারি আগ্রহান্বিত ছিল। অপর পক্ষে, দর্শনের দল সপ্রমাণ করিতে ভারি উৎসাহিত ছিলেন যে, দর্শন বিজ্ঞানের চেয়ে ঢের—বড় জিনিস। দর্শন বড় কি বিজ্ঞান বড়—(অনেকটা "বর বড় কি কনে বড়"-রই মত প্রহেলিকা)—এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য আমাদের দুই নবীন দলের যে যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার চিত্র এই বিশ বৎসরেও স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় নাই। তবে বাক্‌যুদ্ধের ভারি সুবিধা এই যে, উহাতে কেহ হত বা আহত হন না; সেইজন্য যতদূর স্মরণ আছে, আমরা উভয়পক্ষের সকল যোদ্ধাই অক্ষত শরীরে (যদিও গভীর রাত্রিতে) বাটী ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। জয়-পরাজয় কোন্ দলের হইয়াছিল তাহা স্মরণ নাই,—বোধ হয় দুই পক্ষই আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, জয় দুই পক্ষেরই হইয়াছে।

জয়-পরাজয় যাহারই হউক, আমি আজ এই বহুকালের বাক্‌যুদ্ধের অপরিণামদর্শিতার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই এই প্রবন্ধটি লিখিতে বসিয়াছি। এখন বুঝিয়াছি যে, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে Versus Case আদৌ নাই। তখন বয়স ছিল নবীন, বিজ্ঞানের জ্ঞানও নিতান্ত অগভীর

ছিল। বয়সের বৃদ্ধির ও ভূয়োদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ের মোহ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। আমার মত বোধ হয় বহুলোকই আছেন, যাঁহারা এখনও নিয়ত তর্ক করিয়া থাকেন—বিজ্ঞান বড় কি দর্শন বড়। বিজ্ঞানের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা চলিতেছে; বোধ হয় বহুকাল চলিতে থাকিবেও। আমার যাহা বক্তব্য, তাহাই এখানে বলিতেছি।

আমার বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে Versus Case আদৌ নাই। উহারা মোকদ্দমার বাদী ফরিয়াদী নহে। উহারা একই বৃন্তের দুইটি ফুল, মানবের দুইটি চক্ষু। বিশাল জ্ঞানরাজ্যের মধ্যে উহারা উভয়েই সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে বদ্ধ—পাশাপাশি খণ্ডরাজ্য। ইহাদের —ভ্রাতৃভাব ফরাসীতে যাহাকে বলে' Entente Cordiale অচ্ছেদ্য; অভেদ্য। প্রকৃত সৌহার্দ্দ্য সমানে সমানেই হইয়া থাকে, সেইজন্য বলিতেছিলাম, উহাদের মধ্যে কে বড় কে ছোট, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না—উহারা উভয়েই বড়।

বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে এই entente কত ঘনীভূত, তাহা উহাদের ইংরাজী নামেতেই সুস্পষ্ট। রসায়নশাস্ত্রকে (Chemistry) অনেক সময়ে রাসায়নিক দর্শন (Chemical Philosophy) নামে অভিহিত করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক জন ডাল্টন যখন পরমাণুবাদ প্রচার করেন, তখন তাঁহার পুস্তকেরনাম দিয়াছিলেন—A new system of Chemical Philosophy। পদার্থ বিদ্যার (Physics) অনেক পুস্তকের নাম লেখা হয়—Natural Philosophy। অপর পক্ষে দর্শনের অন্তর্গত মনস্তত্ত্ববিদ্যা (Psychology) মনোবিজ্ঞান (Mental Science) নামে প্রায়ই অভিহিত হইয়া থাকে; Ethicsকে Moral Science বা নীতি বিজ্ঞান বলা হয় এবং Logicএর নাম তর্ক-বিজ্ঞান। এই 'Chemical philosophy', 'Natural philosophy', 'মনোবিজ্ঞান', 'Moral science', 'তর্কবিজ্ঞান' প্রভৃতি দর্শন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের নাম সোণার পাথর বাটীর মত নিরর্থক নহে; উহারা প্রচার করিতেছে যে দুই মিত্র রাজ্যের মধ্যে একের রাজা যদি অন্য রাজ্যে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে প্রথমোক্ত রাজ্যের রাজা শেষোক্ত রাজ্যের মাননীয় ব্যক্তিগণের (যথা Field Marshal, Admiral প্রভৃতির) পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজকীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রেও দর্শনের কোনও বিভাগ কর্ত্তৃক বিজ্ঞানের নাম রূপ পোষাক পরিধান এবং বিজ্ঞানের কোনও কোনও বিভাগ কর্ত্তৃক দর্শনের নাম ধারণ, বিজ্ঞান ও দর্শনের সৌহার্দ্দ্য ও মৈত্রীই ঘোষণা করিতেছে।

বাস্তবিক দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য একই। উভয় শাস্ত্রই এই বিশাল অনন্ত সৃষ্টির রহস্য উদ্ভেদের চেষ্টায় ব্যস্ত। এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-রহস্য অতি গূঢ়। এই রহস্য উদ্ঘাটনের কার্য্যে বিজ্ঞান ও দর্শনের যাবতীয় বিভাগই নিযুক্ত। যেমন রাজকীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য রাজদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ আছে; সেইরূপ এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের রহস্য উদ্ভেদ একের সাধ্যাতীত বলিয়া, এই কার্য্যের জন্য নানা বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। কোনও বিভাগ বৃক্ষলতাগুল্মের জন্মজরামৃত্যুর কারণ ও নিয়ম অনুসন্ধানে ব্যস্ত; সে বিভাগের নাম হইয়াছে উদ্ভিদ-বিদ্যা (Botany)। কোনও বিভাগ আবার পৃথিবীর যাবতীয় অসংখ্য প্রাণিবর্গের আহার-বিহার জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত। এইরূপে প্রাণিবিজ্ঞানের (Zoology) উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের ক্রিয়ার নিয়মাবলী সম্বলিত শাস্ত্রের নাম হইয়াছে পদার্থবিদ্যা (Physics), নভোমণ্ডলের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণে ব্যস্ত শাস্ত্রের নাম হইয়াছে জ্যোতিষ বা নভোবিজ্ঞান (Astronomy)। এইরূপে রসায়ন, ভূবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা বিভাগের উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে।

বিজ্ঞান যেমন সৃষ্টি-রহস্যের এক দেশ লইয়া কার্য্য করিতেছে, দর্শন সেইরূপ অপর আর এক অংশে সত্যানুসন্ধানে ব্যস্ত। দুইএর উদ্দেশ্য কিন্তু একই এবং দুইএর কার্য্যই মহৎ। বিজ্ঞান যেমন মূলতঃ—জড়জগতের কার্য্য-কারণের নিয়মাবলীর সন্ধান করিতেছে, দর্শন সেইরূপ মনোরাজ্যের ক্রিয়ার ধারা ও নিয়মের সন্ধান লইতেছে। মনের ক্রিয়া ও গতির নিয়মাবলীর অনুসন্ধানে নিয়োজিত দর্শনের নাম Psychology বা মনোবিজ্ঞান। নৈতিক জগতের নিয়মাবলীর সন্ধান লইতেছে নীতিজ্ঞান বা Ethics। সেইরূপ তর্কবিজ্ঞান বা ন্যায়শাস্ত্র (Logic) দর্শনের এক বিভাগ। অধ্যাত্ম-বিদ্যার আলোচনায় ব্যস্ত দর্শনের নাম

Metaphysics। পরজন্মে আত্মার কি গতি হয়, তাহার আলোচনা যে নবীন দর্শন বা বিজ্ঞান করিতেছে তাহাকে Psychical science বলা হয়। এইরূপে দর্শনের নানা বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, দর্শন ও বিজ্ঞান দুইএর উদ্দেশ্য এক এবং দুইএর কার্য্যও অতি মহৎ এবং সুবিস্তৃত। এখন এই দুইএর মধ্যে কোন্‌টি বড়, এইরূপ প্রশ্ন উঠিলে আগে উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোন্‌টি বড় কোনটি ছোট, তাহারই মীমাংসা করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বিজ্ঞান মূলতঃ জড়জগতের নিয়মাবলীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত; এবং দর্শন মনোরাজ্যের নিয়মাবলীর সন্ধান করিতেছে। এখন প্রশ্ন উঠিবে, জড় বড় না মন বড়। এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? জড়ের স্বরূপ কি আবিষ্কৃত হইয়াছে? মন কি পদার্থ, তাহা কি দার্শনিক জানিয়াছেন? এ বিষয়ে ইংরাজিতে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে, বলি শুনুন। একজন বৈজ্ঞানিক ও একজন দার্শনিকের পথিমধ্যে সাক্ষাৎ। সাদর সম্ভাষণের পর দার্শনিক বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"What is matter?" বৈজ্ঞানিক উত্তর করিলেন "Never mind"। পরে বৈজ্ঞানিক আবার দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"But what is mind?" দার্শনিক উত্তর দিলেন—"No matter"। পাঠক একটু প্রণিধান করিলে বুঝিবেন যে, এই গল্পের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, জগতকে জানান যে বৈজ্ঞানিকও জানেন না জড় বা matter কি, এবং দার্শনিকও জানেন না মন বা mind কি। দার্শনিকের বিদ্যার দৌড় হইতেছে—যাহা জড় নহে তাহাই মন; আর বৈজ্ঞানিকের বিদ্যার দৌড়ও এইরূপ—অর্থাৎ যাহা মানসিক জগতের নহে তাহাই জড়। যখন জড় ও মনের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন উহাদের কোন্‌টি বড়, এ প্রশ্নের কোনও মীমাংসা সম্ভবপর নহে; এবং সেইজন্য বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে কে বড়, এ প্রশ্নও চলে না।

অনেকে বলেন জড় স্থূল, মন সূক্ষ্ম; অতএব জড় অপেক্ষা মনই বড়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এরূপ যুক্তি কি ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত? এ যেন—স্থূলসূক্ষ্ম হিসাবে ব্যাঘ্র অপেক্ষা সর্পই বড় জন্তু, এইরূপ যুক্তিরই মত। ব্যাঘ্র ও সর্প দুইই হিংস্র জন্তু। তবে ব্যাঘ্রের কলেবর স্থূল, সর্পের দেহ সূক্ষ্ম। তবে কি প্রমাণ হইয়া গেল যে ব্যাঘ্র হইতে সর্পই বড় জন্তু? তা নয়। স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে ছোট বড়র মীমাংসা সকল স্থানে সম্ভবপর নহে। জড় স্থূল বলিয়া উহা ছোট বা ঘৃণিত নহে। জড়ের ও জড়শক্তির যেরূপ বিস্তৃতি, উহাদের ক্রিয়াবলী এত বিভিন্ন ও অদ্ভুত যে, জড়কে ক্ষুদ্র বলা একান্ত অন্যায় হইবে। জড় ও জড়শক্তির বিভিন্ন বিকাশের সন্ধানকল্পে বিজ্ঞানের যে কত বিভাগ, খণ্ড-বিভাগ, খণ্ড বিভাগের আবার বিভাগ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার ইয়ত্তাই নাই। তার পর আর একটা কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জড় সমষ্টিতে স্থূল হইলেও উহার উপাদান অতি সূক্ষ্ম। যিনি জড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই জানেন জড়ের অণু পরমাণু কত সূক্ষ্ম। আবার আধুনিক কালে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সূক্ষ্ম পরমাণুও স্থূল। প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রত্যেক পরমাণু অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইলেক্ট্রণ বা বিদ্যাদণুর সমষ্টি। এই সকল বিদ্যাদণু এত সূক্ষ্ম যে, একটি পরমাণুকে যদি কলিকাতার জেনারেল পোষ্ট আফিসের গম্বুজের মত ধরা যায়, তাহা হইলে ইলেক্ট্রণ বা বিদ্যাদণুগুলিকে উহার ভিতর এক ঝাঁক মশকের মত দেখাইবে।

যত গোল বাধিয়াছে বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্য নির্দ্ধারণের উপায় লইয়া। বিজ্ঞানের তথ্য পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও পরীক্ষা (experiment) এই দুইয়ের দ্বারা প্রাপ্ত; কিন্তু দর্শনের তথ্য প্রধানতঃ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারাই লব্ধ। বিজ্ঞানের গবেষণা জড় ও জড়শক্তি লইয়া। এই জড় ও জড়শক্তি দুইই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং এই দুইকেই পরিমাণ করা সম্ভব। সেই জন্য বিজ্ঞানে বহুবিধ পরীক্ষার সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু দর্শনের বিষয় হইতেছে—মন, আত্মা, প্রভৃতি। ইহাদের ক্রিয়াবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে সকল সত্য বা অনুমান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানে পরীক্ষার অবকাশ নাই—অন্ততঃ কিছুদিন আগে ছিল না। সেই জন্য সাধারণ লোকের ধারণা বিজ্ঞান ও দর্শন স্বতন্ত্র জিনিস।

কিন্তু দর্শন কোথায় শেষ হইয়াছে, আর বিজ্ঞান কোথায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ত বলা বড় শক্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন পরমাণুবাদ (Atomic theory)। প্রাচীন

ভারতের ষড়দর্শনের অন্যতম বৈশেষিক দর্শনে এই পরমাণু-বাদের সৃষ্টি। প্রাচীন গ্রীসে ডিমক্রাইটাস্ প্রভৃতি দার্শনিকগণও এই পরমাণুবাদ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, এই পরমাণুবাদ যতদিন দার্শনিক তথ্য ভাবে বর্ত্তমান ছিল, ততদিন উহা কেবল পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তিমূলক একটি স্থূল অনুমানরূপেই ছিল। কালক্রমে বহু শতাব্দীর বিজ্ঞানের পরীক্ষার উন্নতির সঙ্গে এই পরমাণুবাদ একটি পরিমাণাত্মক (quantitive) বৈজ্ঞানিক তথ্য বা অনুমানে পরিণত হয়। জন ডাল্টনের পর হইতে এই পরিমাণাত্মক পরমাণুবাদ নব্য রসায়নের প্রধান ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আধুনিক পরমাণুবাদ দার্শনিক না বৈজ্ঞানিক তথ্য? আমি বলি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বলিয়া পৃথক কোনও সত্যের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। সত্য এক এবং অদ্বিতীয়; সত্য আবিষ্কারের পন্থা বিভিন্ন হইতে পারে মাত্র। যতদিন কোনও সত্য কেবল পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তির সাহায্যে অনুভূত হয়, ততদিন উহাকে দার্শনিক সত্য বলিতে পারেন। তাহার পর উহা পরীক্ষার, বিশেষতঃ পরিমাণাত্মক পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইলে—উহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলা যাইতে পারে।

তবে সকল জায়গায় পরীক্ষাও চলে না। মন ও আত্মার উপর এতদিন কোনও পরীক্ষা চলিত না বলিয়া, উহারা দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে উহাদের উপরও পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে;—এইরূপ পরীক্ষা-মূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) এবং ভূতবিদ্যার (Psychical science) উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই পরীক্ষামূলক দর্শনগুলির এখনও শৈশব অবস্থা। কালক্রমে ইহাদের সবিশেষ উন্নতি হইলে কে জানে মন ও আত্মা বিজ্ঞানের অধিতব্য বিষয় না হইবে? তখন দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য থাকিবে কি?

ঈশ্বর আছেন কি নাই, থাকিলে তিনি সাকার কি নিরাকার—এই সকল বিষয় কতকটা দর্শনের আর কতকটা ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিতব্য বিষয়। কোনও দর্শন ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে, কোনও দর্শন (Atheism ও Agnosiscism) স্বীকার করে না। ধর্ম্মসংঘের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে; বৌদ্ধধর্ম্ম করে না। যে সকল ধর্ম্ম আবার ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাহাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্ম ভগবানকে নিরাকার বলে, হিন্দুধর্ম্ম সাকার বলে। ভগবান সম্বন্ধে এই মত-পার্থক্য মূলতঃ যুক্তি ও অনুমান সাপেক্ষ। এখানে পরীক্ষার অবকাশ নাই—কোনও কালে হইবে কি না জানি না। বৈজ্ঞানিক অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও গম্ভীরতা, প্রাকৃতিক শক্তির অদ্ভুত লীলা ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলি (laws) অচ্ছেদ্য ও অলঙ্ঘনীয় ক্রিয়া দর্শনে মুগ্ধ, বিস্ময়াবিষ্ট। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের এবং প্রাকৃতিক শক্তি ও নিয়মাবলীর নিয়ন্তা বলিয়া কেহ থাকাই সম্ভব। তাঁহাকে যে নামই দিন—প্রকৃতিই বলুন, আর ঈশ্বরই বলুন—তিনি মহান, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, ও সর্ব্ব-নিয়ন্তা।

সর্ব্বশেষে একটা বিষয়ের মীমাংসা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অনেকে বলেন যে; দর্শনের উন্নতি পুরাকালেই সম্ভবপর হইয়া গিয়াছে,—এই বৈজ্ঞানিক যুগে দর্শনের আর উন্নতি হইবে না। কথাটার মধ্যে সেই পুরান কথা—দর্শন ও বিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যের কথার—আভাস পাওয়া যাইতেছে। 'উন্নতি'র অর্থ যদি সত্যের আবিষ্কার হয়, তাহা হইলে আমি বলি কথাটা ঠিক উল্টাভাবেই সত্য। আমি বলি বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইবে, দর্শনের তথ্য ও অনুমানগুলি ততই অধিকতর সুস্পষ্ট ও সত্যমূলক হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবার ধরুন পরমাণুবাদ। প্রাচীনকালে উহা একটা স্থূল অনুমানমাত্র ছিল; কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে উহা একটি পরিমাণাত্মক তথ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। ক্রমবিবর্ত্তনবাদ (Theroy of Evolution) প্রাচীন দার্শনিক কাল হইতে অস্পষ্টভাবে প্রচলিত ছিল; উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা বিভাগের উন্নতির ফলে ডারুইন ও তৎপরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের হস্তে উহার বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আত্মা (soul) অবিনশ্বর কি না, উহা মৃত্যুর পরে আবার পৃথিবীতে আগমন করিতে পারে কি না, পারিলে কি ভাবে পারে,—এই সকল দার্শনিক বিষয় পূর্ব্বে কেবল দার্শনিকের অনুমান ও বহু তর্কের বিষয় ছিল। এখন সার উইলিয়াম ক্রুকস্, মিঃ ব্যালফোর, প্রভৃতি মনীষিগণ এ বিষয়ে যে সকল গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে এ বিষয়ের সত্যাসত্য ক্রমশঃ নির্দ্ধারিত

হইতে পারিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনোবিজ্ঞান এখন কেবলমাত্র যুক্তি ও কল্পনার বিষয় নহে। এখন বৈজ্ঞানিকগণ মনের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। * এখন যন্ত্রের সাহায্যে মানসিক ক্রিয়াবলির পরিমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। মোটকথা বিজ্ঞানের পরিমাণাত্মক ও পরীক্ষামূলক তথ্যগুলির সাহায্য পাইয়া দর্শনের উন্নতিই হইবে, অবনতি হইবে না। বাস্তবিক অনেক গবেষণাকারী জন্মিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক, তাহা বলাই শক্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন—হাক্সলে, টিণ্ডেল, জেভন্স, ক্রুক্স প্রভৃতি। ইঁহারা বৈজ্ঞানিক কি দার্শনিক, তাহা ঠিক করাই মুস্কিল। এক ব্যক্তি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে না; তাহা না হইলে বৈজ্ঞানিক যদি দার্শনিকের নানাপ্রকার অনুমান ও সিদ্ধান্ত, অদ্ভুত চিন্তা ও তর্কশক্তির আস্বাদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি করিতে সমর্থ হয়েন। অপর পক্ষে দার্শনিক আধুনিক বিজ্ঞানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলে, তিনি বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নানা সত্যের সাহায্যে দর্শনের নানা অনুমান ও সিদ্ধান্তকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন। † মোট কথা, দর্শন ও বিজ্ঞান বিরোধী নহে। এ সত্য স্বীকার করিয়া লইলে অনেক বৃথা বিরোধী ও মিথ্যা তর্ক নিবারিত হইবে।

* এ বৎসরের British Association শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞানের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে তাঁহার মতে মন স্নায়ু (nerves) নিচয়ের ক্রিয়াপরম্পরার অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ। অবশ্য এ মতটি এখনও সম্পূর্ণ অনুমান মাত্র।

† এই জন্য শ্রদ্ধাস্পদ দার্শনিক শ্রী: পি, কে, রায় মহাশয় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরীক্ষক ছিলেন, তখন তিনি I. A. ক্লাসে তর্ক বিজ্ঞান, বা Logicএর ছাত্রগণ যাহাতে বিজ্ঞানের কোন বিষয় পড়িবার সুবিধা পায়, তাহার জন্য বহু চেষ্টা করিতেন।

অলক্ষণ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌষমাসের সকাল বেলা। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতেই মা আমাকে বল্লেন, "ইন্দু, শুনেচিস্, ঝি সকালে খবর এনেচে, প্রভাকরের অসুখটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না। জ্বরের সঙ্গে কাশিটা একটু বেড়েছে। আহা, তার মায়ের ঐ একটি সন্তান। মনে হলেও বুক ফেটে যায়।"

খবরটা শুনে মার কাছে আর দাঁড়াতে পারলুম না। একটু পরেই ঘরের কাজ করতে গিয়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যেতে লাগ্‌ল। এই প্রভাকরদাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌ছি। আমাদের বাড়ীতে তাঁর প্রায়ই আসা-যাওয়া ছিল। বড় হয়ে মার সঙ্গে ওঁদের ওখানে দু'তিনবার গিয়াছি। তার পর থেকেই আমাদের বিয়ের কথাবার্ত্তা চল্‌ছিল।......যে কয়বার গিয়েছি, তাঁর মা আমাকে কত আশীর্ব্বাদই করেছেন; তার সঙ্গে ছেলের কথাও কত রকমে এসে পড়ত! বাল্যকালে পিতৃহীন হওয়ায় নিজের চেষ্টায় সংসার চালিয়ে কোন মতে তিনটা পাশ করেছিলেন। সত্যি, চরিত্রগুণে যদি কেউ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন, ত সে প্রভাকরদার মত মানুষ।

দিদি-মা এসে বল্লেন, "হাঁ লা ইন্দু, পূজোর ঘরটা এখনও পরিস্কার করে দিস্‌নি। আজ তোর কি হোল? ঝাঁটা হাতে নিয়ে বসে ভাবচিস্ কি?"

ও মা! তাই ত! আমার সমস্ত কাজই যে বাকি রয়েছে। মা ঠিকই বলেন, মেয়েছেলেকে ভাবতে নেই, কোন মতে কাজ-কর্ম্মে লেগে থাক্‌লেই হোল।

(২)

বিয়ের সব আয়োজন হচ্ছে। আজ বৈকালে আশীর্ব্বাদ। হারাণ ডাক্তারের বড় ছেলের সঙ্গে সব ঠিক হয়েছে। তিনিও নাকি বি, এ, পাশ করেছেন। এই পনেরোটি বৎসর যার ঘরে বোঝা হয়ে ছিলাম,—এখন যাঁদের ঘরে যাচ্ছি সেখানেও যে কি শোভা হ'ব তা'ত জানি না। হারাণবাবুরা একটি নিখুত মেয়ে খুঁজছিলেন। আমাকে তাঁদের পছন্দ হয়েছে।

আমাদের তরফ থেকে নগদ কিছু দিতে-থুতে হবে না। দিদি-মা ত আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে, আমাকে আদর যত্নে অস্থির করে তুলছে"।

আর প্রভাকরদা'? আজ তাঁদের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা। প্রভাকরদা'র মা সকাল থেকে উপবাস করে আছেন। মা'র আজকে একবার ওঁদের বাড়ী যাবার ইচ্ছা ছিল। দিদি-মা কিন্তু রেগেই আগুন। তিনি বল্লেন, "ও মা, ও কি অলুক্ষণে কথা। আজকে ইন্দুর আশীর্ব্বাদ। আজ ও-সব ব্যারামের যায়গায় কি যেতে আছে!"

মনে পড়ে গত বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজার সময় দিদি-মার কলেরার মতন হয়েছিল। মা তখন জ্বরে পড়ে। বাড়ীতে আর একটিও মানুষ নেই। তখন কোথা থেকে ঈশ্বরের করুণার মত প্রভাকরদা' এসে দেখা দিলেন। সে কি সেবা! এতটুকু ঘেন্নাপিত্তি নেই। আমার ত দিদি-মার ঘরে গেলে গা বমি-বমি করে উঠ্‌ত। কিন্তু প্রভাকরদা! সত্যি, তাঁকে যে দেখেছে, সে ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে না। মার খুব উচিত ছিল, তাঁকে একবার দেখে আসা। আমারও একটিবার যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু......আমি যে বিয়ের কনে।...অথচ এমন একদিন গিয়েছে, যখন প্রভাকরদা'কে ছাড়া আর কাহাকেও ভাবতেও পারতুম না।...

আশীর্ব্বাদের গোলমালের মধ্যে মনটা খুব খুসী হয়ে উঠেছিল। সকলের মুখে আহ্লাদ ফুটে বেরুচ্ছিল। আমাকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। বেশ ভাল লাগ্‌ল। হারাণ বাবুকে পূর্ব্বে দেখি নাই; কিন্তু আজ তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে খুব ভক্তি হোল। ওঁদের ঘরে আমাকে লক্ষ্মীঠাকরুণটির মত রাখ্‌বেন—এই রকম কি যেন একটা বল্লেন।...

ঝি রাত্রে খবর এনেছে, সত্যনারায়ণ কথার সময় প্রভাকরদা' একটু ভাল ছিলেন। আজ আমার মনটাকে ওদিক থেকে কোন মতেই সরাতে পারছি না।

(৩)

কাল বিয়ের দিন। আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভরে গিয়েছে। আমার মামাই কর্ত্তা হবেন। মার ত পরিশ্রমের অন্ত নেই। দিদি-মা সকলের খবর নিতেই ব্যস্ত। বাগানের ফুলগাছ-গুলো যেন কেমন নির্জ্জীব হয়ে গেছে; সে-দিকে কিন্তু কারও নজর নেই।

ফুলগাছগুলোর কাছে এসে দাঁড়ালেই প্রভাকরদাকে মনে পড়ে। আমাদের এই গাছগুলোর প্রতি তাঁর কত দরদ ছিল। সেবার বিজয়ার দিন যখন প্রণাম করলাম, তিনি মাকে বলেছিলেন, "মাসিমা, ইন্দু যে রকম ফুল ভালবাসে, দেখ্‌বেন ওর মনটি ফুলের মতই পবিত্র হবে। ওর সমস্ত কাজের মধ্যে একটা স্নেহের পারিপাট্য আছে।"

এ সব কথা যখনই মনে হয়, বুকের ভিতর কে যেন আমাকে ছুঁচ ফোটাতে থাকে।...যদি বাগানে ফুল হয়ে ফুটে থাকতাম, এত যন্ত্রণা থাকৃত না—ঝরে যেতাম—লোকে মাড়িয়ে যে'ত—সব ফুরিয়ে যেত।

সকাল থেকে রোসুনচৌকির বাজনা বাজছে। মা'র কিন্তু এ'তে মত ছিল না। তিনি দিদি-মাকে বলেছিলেন, "ও আমার অনেক দুঃখের মেয়ে। ওর বিয়েতে যারা বাজনার বন্দোবস্ত করবে কথা ছিল, তাদের কাউকেই ত খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর প্রভাকরের এত অসুখ। আর এই ত, দুখানা বাড়ীর পাশেই।" দিদি-মা ছাড়বার লোক ন'ন। তিনি বল্লেন, "তা'ও কি কখনও হয়। বাজনা না থাকলে বরযাত্রীদের মন উঠবে কেন?" বরযাত্রীরা সত্যই কি এমন নিষ্ঠুর? অপরের কষ্ট কি তা'রা বোঝে না?

লগ্ন সন্ধ্যার পরই ছিল। সম্প্রদান হয়ে গেলে বাসরঘরে মজলিস্ বসেছে। মনের মধ্যে বেশ একটা আরাম পেলাম। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কেউ জান্‌ল না—কেমন করে চোখ দুটি পূরে এল—সমস্ত অতীতটা যেন জুড়িয়ে গেল।

বাসর শেষ হলে শুনলাম, মা খানিকক্ষণের জন্য কোথায় গিয়েছেন। তবে কি প্রভাকরদা'র ওখানে?

রাত্রি গভীর। ষষ্ঠীর চাঁদ আকাশের কোণে মুখ লুকিয়েছে। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার কিন্তু ঘুম নেই। কাল এমন সময়ে আমি কতদূরে;—যাঁদের কখনও দেখি নাই, চিনি না, তাঁদের আশ্রিতা!

একটা গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। মা'কে কারা যেন পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সিঁড়ির ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। মা আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। বল্লেন, "উঃ, কি ভয়ানক যন্ত্রণা। প্রভাকরদের বাড়ী থেকে আসছি। এত যন্ত্রণা জীবনে কখনও দেখি নি। সাহেব ডাক্তার

. কয়দিন হোল বলে গিয়েছিলেন, সাবধানে থাক্‌লে কোন ভয় নেই; তবে সারতে একটু বিলম্ব হবে। কিন্তু আজ বিপিন ডাক্তার বলে গেলেন, অসুখটা সকাল থেকে হঠাৎ বেড়ে গেছে। কাশির সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখা দিয়েছে। প্রভাকরের মায়ের অবস্থাটা যদি দেখ্‌তিস্,—একেবারে পাগলের মত।"

মাথাটা কেমন ঘুরতে লাগ্‌ল, আর দাঁড়াতে পারলুম না। মা কাপড় ছাড়তে গেলেন! আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে পূজোর ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লাম; "ঠাকুর, আজকের দিনে মেয়েমানুষ কত কি চায়, আমি চাই প্রভাকরদা'কে আরাম করে দাও, সমস্ত জীবনে আর কিছু চাইব না। আমার বিয়ের বাজনা শুনে সে যে চলে যাবে, তা' হবে না। আজ তাকে বাঁচাতেই হবে।"

কতক্ষণ যে কেঁদেছিলাম জানি না। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীরের মধ্যে কেমন যেন কাঁপুনি লাগ্‌ল। ঘরে ফিরে এলাম। যাক্, ঘুম ভাঙ্গে নাই। তা' হলে কি মনে করতেন?

ভোরের দিকে উঠ্‌তে আমারই দেরী হয়ে গিয়েছিল। কি লজ্জা! তিনি আমার আগেই উঠেছিলেন। রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল কি না জিজ্ঞাসা করলেন। মাথা নেড়ে জানালাম, বেশ ঘুমিয়েছি। তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে মনের মধ্যে অনেকটা বল পেলাম।

বাসি-বিয়ের পর বিদায় নে'বার সময় এল। মা'র সে মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। আমাকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে দিলেন। শেষকালে দিদি-মা এসে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যা'ন।

বাহিরে ব্রুহাম গাড়ী প্রস্তুত ছিল। আমরা উঠে বসতেই গাড়ীটা দুলে উঠ্‌ল। বাপের বাড়ীর নিজস্ব দিনগুলো অতীতের স্বপ্নের মধ্যে ফেলে রেখে কোন্ অনিশ্চিতের মধ্যে ছুটে চল্লাম।

হাতের উপর তাঁর স্পর্শ পেলাম। সমস্ত শরীরটা সম্ভ্রমে নুইয়ে পড়ল। আজকের এই সুখস্বপ্নের অভিনব মুহূর্ত্তটুকু রমণীকুলের পুণ্যস্মৃতি জড়ানো। আর আমিও ত তাদেরই একজন।

মোড়ের মাথায় আমাদের গাড়ীটা হঠাৎ থেমে গেল। উনি একটু বিচলিত হয়ে উঠ্‌লেন। পথ দিয়ে ওরা কারা চীৎকার করে যায়—"বল হরি, হরি বোল্!" মুখ বাড়িয়ে দেখেই উনি বসে পড়লেন—"সঙ্গে যে প্রভাকরের জাঠতুতো ভাই। আজকেই শেষ হয়ে গেল। বেচারা!"

তাঁর পায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেও কূলকিনারা পেলাম না। বুকের ভিতরটা হু হু করে ভরে গেল। সকাল-বেলার রৌদ্রটাও চোখের উপর ঝিলিক্ মেরে গেল। ......জ্ঞান হতেই বোধ হোল, গহনাগুলো যেন সর্ব্বাঙ্গে কাঁটার মতন বিঁধছে। এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের মধ্যে আমার এই বাহিরের আভরণই একমাত্র সত্য হোল!......

গাড়ী একটা ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চোখদুটো ভাল করে মুছে নিলাম।

গাড়ী থেকে নাম্‌ছি—ঝিটা গাড়ীর পিছন থেকে বলে উঠ্‌ল, "ওমা কি অলুক্ষুণে ঘটনা! মরলি যদি, আজকের দিনেই কেন মরলি? শুভযাত্রায় মরামুখ দেখ্‌তে হোল!"

উপরতলা থেকে তখন ঘন ঘন শাঁক বাজ্‌ছে।

ইন্দিরা দেবী

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

স্বদেশ-বাসিনী মোর হে কবি-ভগিনি!
বঙ্গ-ভারতীর তুমি কণ্ঠ-রত্ন-হার;
অকালে যাবে যে চলি কভু তা ভাবিনি;
নিবায়ে জীবন-দীপ—ঘনায়ে আঁধার!
পূর্ব্ব-জনমের তব মহতী সাধনা,
ফলপ্রসূ এ জীবনে পূর্ণ-প্রতিভায়;
চরিত্র-চিত্রণে ছিলে সতত মগনা,
মাধুর্য্য-মণ্ডিত করি' কোমল ভাষায়।
লভেছিলা যে আদর্শ ভূদেব-শিক্ষায়,
বহিল সে পুণ্য-স্রোত তোমার জীবনে;
সংযমে মার্জ্জিত চিত্ত—উন্নত চিন্তায়,
বিশুদ্ধ ভাবের ধারা ঝরিছে লিখনে।
অন্তিম-শয্যায় রচি' ও প্রত্যাবর্ত্তন
হলে মৃত্যু-বিজয়িনী এ মর-ভুবনে।

রজনীগন্ধা

মহারাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

আমি সে রজনীগন্ধা—
নিশীথের বুকে ফুটিয়া উঠিগো নিখিল নয়নানন্দা !
দিবসের আলো হায়
বার বার ফিরে যায়—
কত সুরে তার প্রণয় জানায়ে—স্তব-গান শত-ছন্দা ,
আমি কোন সাড়া দিতে নাহি পারি—
আমি যে রজনীগন্ধা !

সন্ধ্যা আসিয়া যবে—
লক্ষ-প্রদীপ বর্ত্তিকা জ্বালে ধূম্র-ধূসর নভে ;
গ্রাম-বধূ সারে সারে
ধীরে চলে জল ধারে—
কলসের সাথে কঙ্কণ যবে কথা কয় কলরবে ,
আমি সেই ক্ষণে গন্ধ বিতরি রজনীর উৎসবে !

তুমি তো জান না হায়—
কাহার পরশে শিহরিয়া উঠি তিমির রজনী ছায় !
আমার হৃদয়পুরে,
কার বাণী বাজে সুরে—
দখিনের কোন্ দয়াহীন আসি চুম্বিয়া চলি যায় ;
বার-বার আমি নুয়ে পড়ি কার চির-চঞ্চল পায় !

অরুণ-আলোকে মোর—
নয়নের কোণে নেমে আসে শুধু শত-তন্দ্রার ঘোর ;
কোন্-সে নিঠুর লাগি,
দীর্ঘ রজনী জাগি
প্রভাতের কোলে ঘুমায়ে পড়িগো সিক্ত-নয়ন-লোর ;
নিশি-জাগরণ ব্যর্থ করে গো, কোন্-সে মরম-চোর ।

রজনীগন্ধা আমি—
তাই তো আঁধারে অন্ধ-বাসনা হৃদয়ে আসে গো নামি !
তাই তো আমার চিতে,
কি-মোহন সঙ্গীতে—
মূর্চ্ছিয়া উঠে কোন্-সে-মুরতি, মত্ত-দুরাশা-গামী ;
দিবসে যে মোর থাকে না চেতন, রজনীগন্ধা আমি !

তোমরা কিসের লাগি—
আজি এ প্রভাতে এসেছ হেথায় কোন্ ধন নিতে মাগি ;
তোমরা জান না হায়,
অজানা জনার পায়
সব-সম্পদ বিলায়ে দিয়েছি দীর্ঘ-যামিনী জাগি ;
কাল রজনীর ফুল-রাণী, আজ প্রভাতে মন্দ-ভাগী !

তবু, কোন খেদ নাই—
নিমিষে বিলাই ভাগ্যে আমার যখনি যা-কিছু পাই ;
নিশীথে গোপন বঁধু,
নিয়ে যায় সব মধু—
কুমারী-হিয়ার সব সুধারাশি দু-হাতে শুধু বিলাই ;
ফিরে যাও ওগো ফিরে যাও সবে, আজ মোর কিছু নাই !

কাল-রজনীর ছায়—
যা-কিছু অর্ঘ্য দিয়েছি আমার চপল বঁধুর পায় ;
গোপন গন্ধে তার,
থাকি-থাকি বার-বার—
বিকশি উঠিল বিচ্ছেদ-হত, লক্ষ-পরাণ হায় ;
আজ শুধু সেই স্বপনের স্মৃতি ধরণীরে শিহরায় ।

কোরো না মিথ্যা আশা—
কণ্ঠ আমার আছে গো কেবল, নাই তার কোন ভাষা ;
দেবতা, সে গেছে চলে,
প্রতিমা ডুবেছে জলে—
চারি দিকে আজ বেঁধেছে বাঁধন মরণ সর্ব্বনাশা !
ভাঙ্গা হাটে আজ এসেছ গো কেন—মিছে তোমাদের আসা ।

আমি সে রজনীগন্ধা—
নিশীথের বুকে ফুটিয়া উঠিগো, নিখিল নয়নানন্দা !
দিবসের আলো হায়—
বার বার ফিরে যায়—
কত সুরে তার প্রণয় জানায়ে-স্তব-গান শত-ছন্দা ;
আমি কোন সাড়া দিতে নাহি পারি—
আমি যে রজনীগন্ধা !

অস্কার ওয়াইল্ড্ বিরচিত সালমে

(একাঙ্কের বিয়োগনাটিকা)

(মূল ফরাসী হইতে বঙ্গানুবাদ)

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার

নাটিকার পাত্র-পাত্রিগণ

হেরদ আন্টিপাস	ইহুদার টেট্রার্ক।
ইওকানান	সিদ্ধপুরুষ।
সীরীয় যুবক	রক্ষীগণের নায়ক।
টিজেল্লিনুস্	জনৈক রোমান যুবক।
জনৈক কাপ্পাডোকীয়।	
জনৈক নিউবীয়।	
প্রথম সৈনিক।	
দ্বিতীয় সৈনিক।	
হেরদিআসের অনুচর।	
ইহুদীগণ, নাজারৎবাসীগণ, ইত্যাদি।	
একজন দাস।	
নামান	জল্লাদ।
হেরদিআস	টেট্রার্ক বনিতা।
সালমে	হেরদিআসের দুহিতা।
সালমের দাসগণ।	

দৃশ্য।—হেরদের প্রাসাদ। ভোজনাগারের সম্মুখে উচ্চে সজ্জিত বৃহৎ চত্বর। কয়েকজন সৈনিক অলিন্দের প্রাচীরের উপর ঝুঁকিয়া দণ্ডায়মান। দক্ষিণে সুপ্রশস্ত সোপানপথ। বামে, পশ্চাদ্ভাগে পিত্তলের হরিদ্বর্ণ প্রাচীর-বেষ্টিত একটা পুরাতন জলাধার। জ্যোৎস্না।

সীরীয় যুবক। এই নিশিথে রাজকুমারী সালমে কত সুন্দরী!

হেরদিআসের অনুচর। চাঁদের দিকে চেয়ে দেখ! চাঁদটাকে কি অদ্ভুত রকম বোধ হচ্চে! সে যেন একটা কবর থেকে ওঠা নারীর মত। সে যেন একটা মৃতা রমণী। তোমার মনে হবে যেন সে মৃত বস্তুর সন্ধানে ফিরচে।

সীরীয় যুবক। আশ্চর্য্য গোছের দেখাচ্চে। সে যেন রৌপ্যনির্ম্মিতপদদ্বয়যুক্তা হরিদ্রাভাবগুণ্ঠনবতী একটি ক্ষুদ্র রাজকুমারী। যেন তার পা দুখানি দুটি ক্ষুদ্র শ্বেত কপোতিকা। মনে হয় সে যেন নাচ্চে।

হেরদিআসের অনুচর। যে মৃতা নারীর মত। বড় ধীরে ধীরে চলেচে।

[ভোজনাগারে কোলাহল।]

প্রথম সৈনিক। কি গোলমাল! এ বুনো জানোয়ার-গুলো কারা—যারা অমন করে চেঁচাচ্চে?

দ্বিতীয় সৈনিক। ওরা ইহুদী। সব সময়েই ওরা ঐ রকম। তারা তাদের ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক করচে।

প্রথম সৈনিক। ওরা ধর্ম্ম নিয়ে তর্ক করে কেন?

দ্বিতীয় সৈনিক। তা ত বলতে পারিনা। ওরা সর্ব্বদাই ঐ রকম করে। এই ধর না ফারিসীরা বল্লে যে দেবদূতের অস্তিত্ব আছে—আর সদ্দুকীরা বল্লে যে না, তাদের অস্তিত্ব নেই।

প্রথম সৈনিক। আমার মনে হয় যে এ রকম তর্ক করা বড় হাস্যজনক।

সীরীয় যুবক। আজ এই নিশিথে রাজকুমারী সালমে কত সুন্দরী!

হেরদিআসের অনুচর। তুমি ক্রমাগত ওঁর দিকে চেয়ে আছ। তুমি ওঁর দিকে বড় বেশী তাকিয়ে আছ। কারও দিকে অমন করে চেয়ে থাকা বড় বিপজ্জনক। কোনও দারুণ ব্যাপার ঘট্তে পারে।

সীরীয় যুবক। আজ রাত্রিতে তাঁকে বড় সুন্দরী দেখাচ্চে।

প্রথম সৈনিক। টেট্রার্কের মুখখানা বড় বিষণ্ণ।

দ্বিতীয় সৈনিক। হাঁ, তাঁর মুখখানা বড় বিষণ্ণ।

প্রথম সৈনিক। তিনি কি দেখ্চেন।

দ্বিতীয় সৈনিক। কারও দিকে চেয়ে আছেন।

প্রথম সৈনিক। কাকে দেখ্‌চেন বল দেখি?

দ্বিতীয় সৈনিক। বল্‌তে পারিনা।

সীরীয় যুবক। রাজকুমারী আজ কি রকম বিবর্ণা! এত বিবর্ণা আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। তিনি একখানি রূপার আয়নায় সাদা গোলাপের ছায়ার মত।

হেরদিআসের অনুচর। তুমি ওঁর দিকে চেও না। তুমি ওঁকে বড় বেশী দেখ্‌চ।

প্রথম সৈনিক। হেরদিআস টেট্রার্কের পানপাত্র পূর্ণ করেচেন।

কাপ্পাডোকীয়। উনিই কি রাণী হেরদিআস, ঐ যিনি মুক্তাখচিত শিরশ্ছদ পরেচেন, আর যাঁর অলক নীলরেণু রঞ্জিত?

প্রথম সৈনিক। হাঁ, উনিই টেট্রার্ক পত্নী হেরদিআস।

দ্বিতীয় সৈনিক। টেট্রার্ক বড় মদ ভাল বাসেন। তিনি তিন রকম মদ খান। এক রকম সামোথ্রাস দ্বীপ * থেকে আনা হয়, তার রং সিজারের আংরাখার মত নীলাভ লোহিত।

কাপ্পাডোকীয়। আমি সিজারকে কখনও দেখি নি।

দ্বিতীয় সৈনিক। আর এক রকম সাইপ্রস নামে একটা নগর থেকে আসে, তার রং সোণার মত হরিদ্রাভ।

কাপ্পাডোকীয়। আমি সোণা বড় ভালবাসি।

দ্বিতীয় সৈনিক। আর তৃতীয় রকম হচ্চে সিসিলির মদ; এই মদটা রক্তের মত লাল।

নিউবীয়। আমাদের দেশের দেবতারা বড় রক্ত-প্রিয়। বৎসরে দুবার তাঁদের নিকট আমরা যুবক ও কুমারীদের বলি দিয়ে থাকি; পঞ্চাশ জন যুবক আর একশ জন কুমারী। কিন্তু আমরা বোধ হয় যথেষ্ট দি না, কারণ তাঁরা আমাদের প্রতি বড়ই নির্ম্মম।

কাপ্পাডোকীয়। আমার দেশে দেবতা আর রাখে নি। রোমানেরা তাঁদের সব তাড়িয়ে দিয়েচে। লোকে বলে যে তাঁরা পর্ব্বতে লুকিয়ে আছেন, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। তিন রাত্রি আমি পর্ব্বতে ছিলাম—সকল জায়গায় তাঁদের খুঁজেছিলাম। আমি তাঁদের দেখা ত পাই নি। শেষে তাঁদের নাম ধরে ডেকেছিলাম পর্য্যন্ত; কৈ তাঁরা ত এলেন না। আমার বোধ হয় তাঁরা মৃত।

প্রথম সৈনিক। ইহুদীরা যে দেবতার পূজা করে তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

কাপ্পাডোকীয়। এটা আমার কাছে বড় উপহাসাস্পদ বলে মনে হয়।

ইওকানানের স্বর। আমার পরে আর একজন আস্‌বেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিমান হবেন। আমি তাঁর জুতার বাঁধুনী খোল্‌বার উপযুক্ত নই। তিনি এলে জনহীন স্থান সকল উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌বে। তারা লিলির মত রঞ্জিত হয়ে উঠ্‌বে। অন্ধের চক্ষু দিনের আলো দেখ্‌বে, আর বধিরের কাণ উন্মুক্ত হবে। সেই সদ্যজাত শিশু অজগরের গর্ত্তে হাত দেবে, সিংহ সমূহের কেশর ধরে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় সৈনিক। ওকে থামাও। ও কেবল হাস্যজনক কথা বল্‌চে।

প্রথম সৈনিক। না হে, না, উনি একজন সাধুপুরুষ—বড় ভদ্র। আমি প্রত্যহ যখন ওঁকে খাবার দি, উনি আমাকে ধন্যবাদ দেন।

কাপ্পাডোকীয়। কে উনি?

প্রথম সৈনিক। একজন সিদ্ধ পুরুষ।

কাপ্পাডোকীয়। কি নাম ওঁর?

প্রথম সৈনিক। ইওকানান।

কাপ্পাডোকীয়। কোথা থেকে এসেছেন উনি?

প্রথম সৈনিক। মরুদেশ থেকে; সেখানে উনি ফড়িং আর বনের মধু খেয়ে বেঁচে থাক্‌তেন। উটের লোম পর্‌তেন, আর ওঁর কোমরে একটা চামড়ার কোমোরবাঁধ ছিল। দেখ্‌লে ওঁকে অত্যন্ত ভয় কর্‌ত। অনেক লোক ওঁর অনুসরণ কর্‌ত। ওঁর শিষ্যও ছিল।

কাপ্পাডোকীয়। উনি কি বিষয় সম্বন্ধে বল্‌চেন?

প্রথম সৈনিক। তা আমরা একেবারেই বল্‌তে পারি না। কখনও কখনও উনি ভীষণ কথা বলেন; কিন্তু উনি যা বলেন তা বুঝ্‌তে পারা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

কাপ্পাডোকীয়। কেউ কি ওঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারে?

* সাধারণ সৈনিকের ভৌগলিক জ্ঞান বড় বেশী নয়, অতএব এরূপ ভুল স্বাভাবিক।—অনুবাদক।

প্রথম সৈনিক। না, টেট্রার্কের সে বিষয়ে বারণ আছে।

সীরীয় যুবক। রাজকুমারী তাঁর পাখার আড়ালে মুখ লুকিয়েছেন। তাঁর ছোট ছোট্ট গৌরবর্ণ হাত দুখানি নীড়াভিমুখী কপোতিকার মত চঞ্চল। দুটি যেন শ্বেত প্রজাপতি—ঠিক যেন শ্বেত প্রজাপতি দুটি।

হেরদিআসের অনুচর। তাতে তোমার কি হল? তুমি ওঁর দিকে চেয়ে আছ কেন? তুমি ওঁর দিকে তাকিও না ...কোনও দারুণ ব্যাপার ঘট্‌তে পারে।

কাপ্পাডোকীয়। [জলাধার দেখাইয়া] কি অদ্ভুত কারাগার এটা!

দ্বিতীয় সৈনিক। এটা একটা পুরাতন জলাধার।

কাপ্পাডোকীয়। একটা পুরাতন জলাধার! নিশ্চয়ই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

দ্বিতীয় সৈনিক। আরে না! এই ধর না, টেট্রার্কের ভাই, তাঁর বড় ভাই, হেরদিআসের প্রথম স্বামী, এর মধ্যে বার বৎসর আবদ্ধ ছিলেন। তাতে তিনি মরেন নি। বার বৎসর পরে তাঁকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে হয়েছিল।

কাপ্পাডোকীয়। গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছিল? কে এই দুঃসাহসের কাজ করেছিল?

দ্বিতীয় সৈনিক। [জল্লাদরূপী একটা অতিকায় নিগ্রোকে দেখাইয়া] ঐ সেই লোকটা, ঐ নামান্।

কাপ্পাডোকীয়। ও ভীত হয় নি?

দ্বিতীয় সৈনিক। নাহে, না, টেট্রার্ক ওকে আংটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কাপ্পাডোকীয়। কি আংটি?

দ্বিতীয় সৈনিক। মৃত্যু-আংটি। সেই জন্যেই ত সে ভয় পায় নি।

কাপ্পাডোকীয়। তবুও রাজাকে গলা টিপে মারা বড় ভয়ানক।

প্রথম সৈনিক। কেন? রাজাদেরও ত অন্য লোকের মত একটা গলাই থাকে।

কাপ্পাডোকীয়। আমি এটা বড় ভীষণ ব্যাপার বলে মনে করি।

সীরীয় যুবক। রাজকুমারী উঠ্‌চেন। তিনি ভোজের মেজ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ওঁকে দেখে মনে হয় যেন উনি বড় ব্যথিতা। এই যে এই দিকেই আস্‌চেন। হাঁ, আমাদিকের দিকেই আস্‌চেন। কি রকম বিবর্ণা উনি! আমি কখনও ওঁকে এরকম বিবর্ণা দেখি নি।

হেরদিআসের অনুচর। ওঁর দিকে চেও না। আমি তোমাকে অনুনয় করে বল্‌চি—ওঁর দিকে চেও না।

সীরীয় যুবক। উনি একটি পথহারা কপোতিকার মত...উনি বায়ু-কম্পিত নার্সিসস ফুলের মত...উনি একটি রজত কুসুমের মত।

[সালমের প্রবেশ।]

সালমে। আমি থাক্‌ব না। আমি থাক্‌তে পারি না। টেট্রার্ক তাঁর কম্পিত চোখের পাতার নিচে থেকে ছুঁচোর মতন চোখ দুটি দিয়ে আমার পানে সমস্তক্ষণ চেয়ে আছেন কেন? আমার মার স্বামী যে আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকেন এটা বড় বিসদৃশ। এর মানে কি তা জানি না। বস্তুতঃ, হাঁ, তা জানি।

সীরীয় যুবক। আপনি কি এইমাত্র আনন্দোৎসব ত্যাগ করে আস্‌চেন, রাজকুমারি?

সালমে। এখানকার বাতাস বড় স্নিগ্ধ! এখানে তবু নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌তে পারি! ওখানে ঘরের ভিতরে আছে কতকগুলো জেরুসালেমের ইহুদী, তারা তাদের নির্ব্বোধ কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে পরস্পরকে নির্ম্মম নির্য্যাতন করচে, কতকগুলো বর্ব্বর ক্রমাগত মদ খাচ্চে, আর ঘরের মেঝেয় মদ ছড়াচ্চে, জনকতক স্মার্ণবাসী গ্রীক, তাদের আবার চোখে সুরমা আর গালে রং, তারা তাদের কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুলগুলি কুঞ্চিত করে পাকিয়ে দড়ির মত করে রেখেচে, কয়েকজন দীর্ঘ জেড সূচীধারী, লাল আংরাখা পরা স্বল্পভাষী ধূর্ত্ত মিশরবাসী, আর আছে কতকগুলো পশু-প্রকৃতি অসভ্য রোমান, তারা তাদের কর্কশ অপভাষায় গোলমাল করচে। আঃ! এই রোমানগুলোকে আমি বড় ঘৃণা করি। তারা অসভ্য ও ইতর, আর দেখায় যেন তারা এক একটি আমীর।

সীরীয় যুবক। আপনি বসবেন কি, রাজকুমারি?

হেরদিআসের অনুচর। কেন তুমি ওঁর সঙ্গে কথা কইচ? ওঁর দিকে চাইচ কেন? নিশ্চয়ই একটা দারুণ ব্যাপার ঘটবে।

[ক্রমশঃ]

শশিনাথ *

(সমালোচনা)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

এই পৃথিবীতে যত বিভিন্ন মানব-সমাজ বা সম্প্রদায় আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই হয় ত এক-একটা বিশেষত্ব আছে; আবার সমগ্র মনুষ্য-সমাজও অন্যান্য প্রাণী-সমাজ হইতে বিভিন্ন। কিন্তু কি মানবতার হিসাবে, কি সাম্প্রদায়িকতার হিসাবে—কোন দিক দিয়াই কোন মানব-সমাজই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ নহে। গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে সমাজ-গঠনের অনেক ত্রুটি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মানব-সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমাজের এই সকল দোষ-ত্রুটির সংশোধনের উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে নেশন বিল্ডিং, (nation building) অথবা নেশনরিবিল্ডিং (nation rebuilding) বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে। এই কথাটির আমাদের একটু প্রয়োজন হইবে; সেই জন্য কথাটি এখানে উত্থাপন করিয়া রাখিলাম।

শশিনাথ একখানি উপন্যাস। কিন্তু কেবল উপন্যাস বলিলেই বই-খানির সম্যক পরিচয় দেওয়া হইবে না। পূর্ব্বোক্ত 'নেশন বিল্ডিং' কথাটির সহিত বইখানির অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই জন্যই গোড়াতেই এই বহুলভাবে-আলোচিত কথাটি উত্থাপন করিয়া রাখিয়াছি। ঐ কথাটি মনে রাখিয়া বইখানি পড়িতে হইবে; তবে ইহার সম্যক পরিচয় উপলব্ধ হইবে। উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে এই বইখানি তাহাই।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে দুইটী সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। আমরা একে-একে তাহাদের পরিচয় দিতেছি। তাহা হইলেই পাঠক-পাঠিকারা বুঝিতে পারিবেন, প্রশ্ন দুইটী কিরূপ বড়—সমস্যা কিরূপ গুরু।

প্রকাশ একটী কায়স্থ যুবক, কৃতবিদ্য,—কলেজের প্রোফেসার। ইঁহাকে লইয়াই প্রথম সমস্যা। সে সমস্যার উৎপত্তি কিরূপে তাহা গ্রন্থকারের নিজের মুখেই শুনুন—"হরিচরণ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটারিয়েটে চাকরী করিতেন—দুই তিন মাস হইল ইনভ্যালিড্ পেন্সন্ লইয়া চব্বিশ পরগণার বিলাসপুরের বাড়ীতে আছেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার অবিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যাকে (সরযূ) একটী কায়স্থ যুবক (প্রকাশ) পড়াইত। পরে প্রকাশ পায় যে, অন্ধ অবুঝ প্রেম এই দুইটি তরুণ তরুণীকে গুরুশিষ্যার বন্ধন হইতে কখন মুক্ত করিয়া দৃঢ়তর-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলেটি সৎ এবং শিক্ষিত; এবং সমাজ সংস্কারের যূপকাষ্ঠে একমাত্র দুহিতার আনন্দ ও সুখকে বলি দিবেন না বলিয়া হরিচরণ বাবু সেই কায়স্থ যুবকের সঙ্গেই হিন্দু মতে কন্যার বিবাহ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা কিন্তু এই ব্যাপারে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। হরিচরণ বাবুকে একঘরে ত করিয়াছেই"—এমন কি, তাঁহার এবং তাঁহার কন্যা সরযূর জীবন বিপন্ন; জমিদারের হুকুমে কলিকাতায় আসিয়া নিরাপদ হইবার, নিজের পীড়ার চিকিৎসা করাইবার এবং কন্যার বিবাহ দিবার পথ বন্ধ।

গ্রন্থের নায়ক শশিনাথ সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে অত্যুগ্র উদার প্রকৃতির যুবক, এবং কিছু eccentric। হরিচরণ তাহার পিতৃবন্ধু। দাদা সোমনাথের মুখে সে হরিচরণ বাবুর এই বিপদবার্ত্তা পাইয়া, সমাজ-সংস্কারের একটা উৎকট দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল; এবং এই বিবাহ ঘটাইবার জন্য সে তাহার বন্ধু এবং আত্মীয় বরেনকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, বিলাসপুর হইতে হরিচরণ বাবু ও সরযূকে কলিকাতায় আনিয়া তাঁহাদিগকে তাহাদের এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থাপন করিল। কিন্তু শশিনাথের সদভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে, প্রকাশকে একটু খেলো এবং খাটো করিয়া, এই বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন—একটা বিপ্লব হইতে সমাজ রক্ষা পাইয়া গিয়াছে।

সমাজ এযাত্রা রক্ষা পাইলেও যে প্রশ্নটা উঠিয়াছে, তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। এই সামাজিক প্রশ্ন যে কেবল একলা বর্ত্তমান গ্রন্থকারের মনে উঠিয়াছে, তাহা নয়। দেশের কতক লোকও এইরূপ একটা প্রশ্নের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ মর্ম্মের একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করিয়া হিন্দুদিগের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ বৈধ অর্থাৎ সমাজ ও আইনসঙ্গত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ আইনের বিরুদ্ধে লোক-মত বড় প্রবল ছিল বলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি পাশ না হইয়া পরিত্যক্ত হয়।

তৎপরে মাননীয় মিঃ পেটেল এই ধরণের একটা আইন পাশ করা-ইবার চেষ্টা করেন, সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সম্প্রতি মাননীয় ডাক্তার গৌরের একটী বিবাহ বিল ব্যবস্থাপক সভায় বিচারাধীন রহিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধেও লোকমত বিলক্ষণ প্রতিকূল। সুতরাং গ্রন্থকার এই প্রশ্নটির সম্বন্ধে কোনরূপ চূড়ান্ত মীমাংসা না করিয়া, কৌশলে সরযূ ও প্রকাশের বিবাহ-প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া দিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। কাল সহকারে সমাজ স্বয়ং এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়া লইবেন।

---

* উপন্যাস; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আড়াই টাকা।

দ্বিতীয় সমস্যাটি অধিকতর ব্যাপক এবং গুরুতরও বটে।

বাপ-মা-মরা ঘাড়ে-পড়া মেয়ে লীলা শশিনাথের বউদিদি উর্ম্মিলার ছোট বোন।—স্ত্রীর সহোদরা পরিচয়ে, অন্য কোন আশ্রয় না থাকায়, সে সোমনাথের পরিবারভুক্তা হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। উর্ম্মিলার ইচ্ছা, দেবরের সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ দিয়া, দুই বোনে দুই 'জা' হইয়া চিরকাল এক পরিবারভুক্তা হইয়া একত্র থাকে। কিন্তু আজকালকার অনেক ডেঁপো ছেলেদের মতন (অবশ্য শশিনাথকে আমরা ডেঁপো বলিতেছি না) শশিনাথ বিবাহে নারাজ, এমন কি, সন্ন্যাসী হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিতে উদ্যত; কেবল বউদিদির হাতের রান্না খাইবার লোভ সামলাইতে না পারাতেই এখনও সে এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিতেছে না। [আমাদের এ কথা বলিবার কারণ আছে। প্রায়ই দেখিতে পাই, অনেক যুবক বিবাহের কথা উঠিলেই আপত্তি করিয়া বসে, এবং সন্ন্যাসী হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিবার ভয় দেখাইয়া স্নেহপ্রবণ পিতামাতার মনে কষ্ট দিতে কসুর করে না: অথচ দুই-চারি দিন পরে, বিবাহও করে, এবং ঘোর সংসারীও হইয়া উঠে।]

শশিনাথ লীলাকে সহোদরাধিক স্নেহ করে। সে তাহার নিজের অপেক্ষা রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, স্বভাব-চরিত্রে, ধনে, বিদ্যায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ পাত্র তাহার বন্ধু সুধীরের সঙ্গে লীলার বিবাহ দিল।

এই বিবাহ প্রস্তাব হইতে প্লটটি খুব জমাট বাঁধিয়াছে। লীলা আজ কালকার শিক্ষিতা মেয়ে; তাহার বয়স সতের বৎসর। হিন্দু পরিবার-ভুক্তা বলিয়া সে যতই লাজুক হউক না কেন, বর্ত্তমান কালের শিক্ষা তাহার উপর যে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, ইহা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই সে অসম্ভব ব্যাপারটা এক্ষেত্রে সম্ভব হয় নাই—লীলার একটা নিজের মতামত গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন যাহা কেবল তাহার মনের নিভৃত কোণে যবনিকার অন্তরালে গোপনে রক্ষিত ছিল, সুধীরের সহিত বিবাহ প্রস্তাবে তাহার স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া সকলের সমক্ষে দেখা দিল,—শশিনাথ, উর্ম্মিলা, এমন কি, নিতান্ত নিরীহ, নির্লিপ্ত সোমনাথ পর্য্যন্ত বিস্মিত, চকিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিল,—লীলা শশিনাথকে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসা এমন প্রগাঢ়, সে প্রেম এমন দুর্দ্দমনীয় যে, লীলা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল,—সুধীরের সঙ্গে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য অত্যন্ত ছেলেমানুষী আরম্ভ করিল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া, শশিনাথের উপর অভিমান করিয়া, নিতান্ত মোরিয়া হইয়াই যেন ঘটনা-স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিল। সুধীরের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

শশিনাথ যে eccentric, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা ছাড়া, তাহার অপর কয়েকটি অনন্যসাধারণ গুণও আছে। সর্ব্বোপরি, সে নিজের মন নিজেই জানে না। তাহার ধারণা ছিল, সে খুব সংযত-চরিত্র, দৃঢ়চিত্ত লোক; কিন্তু সে পদে-পদে অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচয় দিতে লাগিল। সে সকলের সঙ্গে তর্ক করিয়া বেড়াইত যে, কতক লোককে সমাজে বাস করিয়াই চিরকুমার সন্ন্যাসী থাকিয়া সমাজের মঙ্গল করা কর্ত্তব্য,—বিবাহ করিয়া গৃহী, সংসারী হইয়া পড়িলে, সমাজের উপকার করা যায় না। সে কখনও বিবাহ করিবে না, ইহাই তাহার সঙ্কল্প; অথচ তাই বলিয়া সে এমন আহাম্মকও নয় যে, শপথ করিয়া বলিবে যে, সে চিরকুমার সন্ন্যাসী থাকিবে—কখনও বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে না। তাহার বৌদিদি উর্ম্মিলা যখন তাহার বিবাহ দিবার জন্য চাপিয়া ধরিয়াছিল, তখন সে আজকালকার চতুর ছেলেদের মত বৌদিদিকে ঐ ধরণেরই জবাব দিয়াছিল—ধরা ছোঁয়া দেয় নাই।

এখন সে নিজে চেষ্টা করিয়া সুধীরের সঙ্গে লীলার বিবাহের প্রস্তাব পাকাপাকি করিয়া ফেলিবার পর তাহার নিজের মনের সন্ধান পাইল যে, সেও লীলাকে খুবই ভালবাসে। ইহা সহোদরা-স্নেহ নয়,—ইহা নর-নারীর প্রেম। লীলার প্রতি তাহার প্রেম এই যে ধরা পড়িয়া গেল, তাহার জন্য তাহার প্রতি লীলার অদম্য প্রেম যে কতখানি দায়ী তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, যতক্ষণ লীলা তাহার আয়ত্তাধীন ছিল, ততক্ষণ সে জানিত না যে সে লীলাকে ভালবাসে। কিন্তু চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—লীলা যখন প্রায় তাহার হাতের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে,—সুধীরের সঙ্গে লীলার বিবাহ যখন পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে,—একটা কেলেঙ্কারী না ঘটাইয়া ফিরিবার উপায় নাই,—তখন, —কেবল তখনই সে জানিতে পারিল যে, সে লীলাকে ভালবাসিয়াছে। কিন্তু তখন জানিলে আর কি হইবে! সে কথা প্রকাশ করিবার কি উপায় আছে? যখন সুসময় ছিল, যখন তাহার বউদিদি লীলাকে গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে সাধাসাধি করিতেছিল, তখন লীলাকে বারবার প্রত্যাখ্যান করিয়া, এখন লীলাকে বিবাহ করিতে রাজী হইলে, তাহার পৌরুষ গর্ব্বে আঘাত লাগিবে,...তাহাকে বউদিদির উপহাসের পাত্র হইতে হইবে। কাজেই সে তাহা পারিল না। সুধীরের সঙ্গে লীলার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পরদিনই কিন্তু আর এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। সুধীর এক বেনামী চিঠি পাইল যে, লীলা উর্ম্মিলার সহোদরা নহে। তাহারা একই পিতার ঔরসজাতা হইলেও, লীলা জারজ সন্তান। পতিতার গর্ভজাতা। সুধীর লীলাকে পরিত্যাগ করিল।

হিন্দু সমাজে পতিতার স্থান কোথায়? সমাজে তাহার স্থান নাই। কিন্তু পতিতার গর্ভজাত সন্তান,—যে নিজে কখনও কোন পাপ করে নাই—সেই নিষ্পাপ জারজ সন্তানের সমাজে স্থান কোথায়, গ্রন্থকার শশিনাথের মুখ দিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। শশিনাথ লীলাকে বিবাহ করিয়া দেখাইতে চায়,—সমাজে তাহার স্থান আছে; সমাজভুক্ত অপর সকল নর-নারীর ন্যায় সেও সমান। এ ক্ষেত্রেও গ্রন্থকার সুবিবেচনা পূর্ব্বক নিজে কোন মীমাংসা করেন নাই; তিনি শশিনাথের সহিত লীলার পরিণয় সংঘটন করেন নাই—মীমাংসার ভার সমাজের উপর দিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

'শশিনাথ' উপন্যাসে গ্রন্থকার যে দুইটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম। এরূপ

প্রশ্ন আরও অনেকের মনে উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারিত না, তখন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিবাহ হইতে পারে না, পতিতার সন্তান যে সমাজে অপাংক্তেয়—ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গৃহীত হইত। কিন্তু বাহিরের সভ্যতার সংস্রবে আসিয়া ভারতীয় হিন্দুগণের মতি-গতির একটু-আধটু পরিবর্ত্তন হইতেছে। এখন সমাজের অজ্ঞাতসারে সমাজে এমন সকল বিষয় চলিয়া যাইতেছে, শত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা সমাজ-বিগর্হিত ব্যাপার বলিয়াপরিগণিত হইত।

কিন্তু এরূপ সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নহে। কালই ইহার প্রকৃত মীমাংসক। এবং সে কালও দুই-চারি দিন নহে—শত-শত বৎসর। মীমাংসা একরূপ হইলেও, সে মীমাংসা ঠিক হইল কি না, তাহার পরীক্ষা হইতে আরও শত-শত বৎসর সময়ের দরকার। অতএব, এই সকল জটিল সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা ও পরীক্ষার ভার মহাকালের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আমরা গ্রন্থের অপরাপর চরিত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শশিনাথের বউদিদি উর্ম্মিলাকে আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। পিসিমা খুব পাকা জহুরী। তিনি একবারমাত্র দর্শনেই উর্ম্মিলাকে অমূল্য রত্ন বলিয়া চিনিতে পারিয়া, সযত্নে ঘরে তুলিয়া লইয়াছেন। উর্ম্মিলা সোমনাথের ন্যায় অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরের গৃহিণী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্তা। সে স্বামীর প্রতি যদ্রূপ প্রণয়-শালিনী, দেবর ও ভগিনীর প্রতি তেমনি স্নেহশীলা; আবার সুরসিকা, মিষ্টভাষিণী। তাহার তুলনা হয় না।

লীলার জন্মগত দোষ সত্ত্বেও, সে তেজস্বিনী, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্না রমণী। সুধীর যখন তাহাকে ত্যাগ করিল, তখন সে কোন আপত্তি করে নাই। কিন্তু সুধীর যখন কতকটা কর্ত্তব্য-বোধে, এবং প্রধানতঃ অনুকম্পাপরবশ হইয়া, লীলার নামে ২৫০০০৲ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে চাহিল, তখন লীলা লুব্ধা হয় নাই, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান হারায় নাই,—পরপুরুষের দান হেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,—আপনাকে অবমানিতা হইতে দেয় নাই। এমন কি, যখন সে বুঝিল সে উর্ম্মিলার সহোদরা নহে, সোমনাথের শ্যালিকা নহে,—শশিনাথের উপর তাহার কোন আত্মীয়তার দাবী নাই,—তখন সে শশিনাথের তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বরেনের মধ্যস্থতায় তাহার ভগিনীপতির সাহায্যে রেঙ্গুনে একশত টাকা মাহিনায় একটী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদে চাকুরী যোগাড় করিয়া অনায়াসে চলিয়া গেল—কেহই তাহাকে রাখিতে পারিল না।

এইবইখানির মধ্যে সরযূর অবস্থা অত্যন্ত delicate। সে বেচারী চিরদুঃখিনী। প্রথমতঃ প্রকাশ তাহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া হরিচরণের কাছে সরযূকে পাইবার প্রার্থনা করিল; তাহার সে প্রার্থনা পূর্ণও হইল; অথচ, শেষ-বরাবর সে সরযূকে বিবাহ করিল না। নারীর পক্ষে ইহা ঘোর অপমান। কিন্তু সরযূ বিধাতার দান বলিয়া এই অপমান মাথায় তুলিয়া লইল। প্রকাশ হরিচরণের কাছে তাহাকে প্রার্থনা করিলে, হরিচরণ মনে করিয়াছিলেন, সরযূও প্রকাশের প্রতি অনুরাগিণী। এই মনে করিয়াই তিনি বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক সরযূ প্রকাশের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। সে যেন প্রকাশের কাতরতা দেখিয়া, তাহার কষ্টের কথা ভাবিয়া, যেন কর্ত্তব্যপরায়ণা সন্তানের ন্যায় কেবল পিতার আদেশেই, আপনাকে বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তবু যখন প্রকাশ তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করিতে গেল, তখন সরযূর নারীত্ব-গর্ব্বে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল—তাহার দুঃখের সীমা রহিল না। কিন্তু পরম সহিষ্ণু ভাবে সে এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছে—একটুও কাতরতা প্রকাশ করে নাই। সরযূর চরিত্রের এই অংশটি কি সুন্দর! কি চমৎকার!

বিলাসপুরের বাটীতে প্রথম দর্শনেই বরেন সরযূকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু সরযূ তখন বাগ্‌দত্তা—বরেনের প্রণয় প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না। তাই সে আহারাদির ন্যায় তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া শশিনাথের সহিত কপট কলহ করিয়া, তাহার ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিল। তার পর যখন প্রকাশের সঙ্গে সরযূর বিবাহের প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আশায় তাহার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শশিনাথের কাছে তাহার মানসিক অবস্থা ধরা পড়িয়া গেল। কিন্তু এদিকে আর এক বিভ্রাট উপস্থিত! শশিনাথের সঙ্গে সরযূর বিবাহ স্থির! বরেনের পক্ষে এটা কি মর্ম্মান্তিক আঘাত! কিন্তু সে বীরের ন্যায় সহ্য করিয়াছে—বন্ধুত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

আঘাতের পর আঘাতে সরযূও কম পীড়িতা হয় নাই। তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া বোধ হয়, শশিনাথের প্রতি সে নিতান্ত বিমুখ ছিল না; বরং প্রায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শশিনাথের সহিত বিবাহ হইলে সে অসুখী হইত না। কিন্তু এটা যখন নিশ্চিত বুঝা গেল যে, শশিনাথ কোন ক্রমেই তাহাকে বিবাহ করিবে না—তখনকার তাহার মানসিক অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না; সে কেবল অনুভূতির জিনিস।

অবশেষে সরযূর কাছে ইঙ্গিতে সম্মতি পাইয়া বরেন যখন বুঝিল, সরযূ আর তাহার পক্ষে দুর্লভ নহে, তখন তাহার ন্যায় প্রকৃত সুখী আর কেহ ছিল না। আশা করি, বরেনের একনিষ্ঠ প্রেমের এই সার্থকতায়, তাহার এই সুখে পাঠক-পাঠিকারা ঈর্ষা করিবেন না! আহা বেচারী! সে তাহার ন্যায্য পুরস্কারই পাইয়াছে!

এইখানে একটা কথা উঠিতে পারে। অনেকে ভাবিতে পারেন, সরযূর এ কি ব্যাপার! তাহার প্রেম এ কি চঞ্চল! তাহার চিত্ত কি অব্যবস্থিত! কিন্তু না,—সেরূপ ভাবিবার কারণ নাই। সরযূ যে প্রকাশের প্রতি নিজে কখনও অনুরাগ প্রকাশ করে নাই,—পিতৃ আজ্ঞায় প্রকাশকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শশিনাথের সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায় যে, এ ক্ষেত্রেও শশিনাথের দয়া এবং পিতার আজ্ঞা সরযূর বিচার-শক্তিকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। শশিনাথ তাহাদের কি পর্য্যন্ত না উপকার করিয়াছে! সরযূ কি তাহা ভুলিতে পারে? এ ক্ষেত্রে শশিনাথের প্রতি কৃতজ্ঞ

থাকা তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এই কৃতজ্ঞতাকে সে প্রেম বলিয়া ভুল করিয়া থাকিতে পারে। তারপর মরণাহত পিতা তাহাকে শশিনাথের হাতে একপ্রকার সম্প্রদানই করিয়া গেলেন এবং শশিনাথও সরযূর সকল ভার গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। এই প্রতিশ্রুতিকে হরিচরণ, সরযূ লীলা, উর্ম্মিলা, সোমনাথ—সকলেই বিবাহের অঙ্গীকার বলিয়া ভুল করিয়া বসিল। শশিনাথ যখন সরযূকে বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করিল, তখন অসীম কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ সরযূর পক্ষে নিজ হৃদয়ে শশিনাথের প্রতি প্রেমের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিবার অবকাশই বা কোথায় এবং তাহার প্রয়োজনই বা কি? এরূপ অবস্থায় সরযূ যদি কৃতজ্ঞতাকেই প্রেম বলিয়া ভুল করিয়া থাকে, তবে তাহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। এবং এ স্থলে তাহার নিজেকে শশিনাথের ভাবী পত্নী বলিয়া মনে করা একটুও অস্বাভাবিক নহে। বস্তুতঃ, শশিনাথের সম্বন্ধে সরযূ নিজের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখে নাই, করা আবশ্যকও মনে করে নাই। সে শশিনাথকে বরাবর দেবতা বলিয়া ভাবিয়াছে, তাহাকে দেবতা বলিয়া দেখিয়াছে, এবং মুখেও তাহাই প্রকাশ করিয়াছে। দেবতার সঙ্গে কি প্রেম করা যায়? দেবতাকে শ্রদ্ধা করা যায়, ভক্তি করা যায়, তাহার পদের নির্ম্মাল্য হওয়া যায়। সরযূও তাহাই মনে করিয়াছে—ইহার অধিক আর কিছুই নহে।

কিন্তু যখন সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বরেনের প্রেম মূর্ত্ত হইয়া তাহার কাছে প্রকাশ পাইল, তখনই কেবল সরযূ তাহার নিজের হৃদয়ে বরেনের প্রতি প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পাইল,—বুঝিল, শশিনাথের সম্বন্ধে সে ভ্রান্ত হইয়াছিল। এ ভ্রম মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষ মাত্রেই পদে-পদে এইরূপ ভ্রম করিয়া থাকে। সেই জন্যই to err is human!

সমাজ-ঘটিত অথবা অন্য যে কোন প্রকার উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, উপন্যাস হিসাবে "শশিনাথ" অতি চমৎকার হইয়াছে। ঘটনার সংস্থান, চরিত্রের সমাবেশ, বর্ণনার ভঙ্গী—এ সকলই সুন্দর। সর্ব্বোপরি, বইখানির ভাষা অতি সুললিত,—সহজ, স্বচ্ছন্দ গতি এবং witty। ভাষার ভিতর দিয়া প্রীতির একটী মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়া পাঠকের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে। বাঙ্গলা ভাষার উপর গ্রন্থকারের অসাধারণ অধিকারের পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। ভাষার সরসতায় গ্রন্থখানি আরও উপাদেয় হইয়াছে।

সমালোচনা স্থলে একটা দোষ-পরিচ্ছেদের উল্লেখ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু আমি এ বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব না। কোন বইয়ের সমালোচনা করিতে বসিলে, শুনিতে পাই, একটী অনুবীক্ষণ যন্ত্র, অন্ততঃ একটা magnifying glass লইয়া বই পড়িতে বসিতে হয়, এবং বইখানি marginal noteএ ভরিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু আমি সমালোচনা করিব বলিয়া এই বইখানি পড়িতে বসি নাই। বইখানি সরল স্বাভাবিক ভাবে আমার হস্তগত হইয়াছিল; আমিও সাধারণ পাঠকেরই মত বইখানি পড়িতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু আরম্ভ করিবার পর পড়িতে এত ভাল লাগিল যে, আমি এক নিঃশ্বাসে বইখানি পড়িয়া ফেলিলাম—বই পড়িতে-পড়িতে criticise বা comment করিবার অবকাশ পাই নাই; বিশেষতঃ আমার কাছে সমালোচনার তোড়যোড়—অনুবীক্ষণ বা magnifying glass ছিল না। যেহেতু আমি critic নহি। প্রায় তিনশত পৃষ্ঠা ব্যাপী এত বড় বইখানি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইবে, ইহা কোন পাঠক বিশেষতঃ সমালোচক কখনই বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু আমি সমালোচক নই এবং সমালোচনা করিতে বসি নাই বলিয়া ঐ রকম কোন ত্রুটি যদি থাকে,—আমার চোখে পড়ে নাই। সুতরাং আমার এই লেখাটি এক-তরফা হইয়া গিয়াছে; এবং আর যাহাই হউক, ইহা সমালোচনা হয় নাই। অতএব এ যাত্রা পাঠকগণকে এই এক তরফা বিচারেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

বন্যার গতি

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(১)

ধর্ম্মপত্নী সুহাসিনী যখন ছোট্ট সেঁতসেঁতে একতলা বাড়ীর একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চোখের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে বিনিদ্র-রজনী যাপন করিতেছিল—স্বামী নরেশচন্দ্র তখন মদিরাবিভল-চক্ষে অধর্ম্মের সঙ্গিনী মালতীবালার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার কদর্য্য-সুশ্রী মুখের দিকে চাহিয়া আবেগ-ভরে বলিতেছিল—"এবার পূজোর গয়নার ফর্দ্দ কৈ মালতী?"

মালতী বিষপোরা কটাক্ষ হানিয়া পাতলা কৃষ্ণাভ গোলাপী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "ইস্! এবার যে বড় দয়া দেখ্‌ছি। হাতে কিছু জমেছে বুঝি।"

নরেশ ঢোক গিলিয়া বলিল—"জমেনি সত্যি—কিন্তু, আগে থেকেই যোগাড় তো করতে হবে! নইলে আরবারকার মত হবে তো!" আরবার পূজোর সময় সে একজোড়া আসল হীরার ব্রেস্‌লেট ও নেকলেশ চাহিয়াছিল।

কিন্তু নরেশ টাকার টানাটানিতে প্রথম নেকলেশটা দিতে পারে নাই। এই উপলক্ষে সে নরেশের কি দুর্দশা করিয়াছিল—তাহা মনে পড়িতেই মালতী হাসিয়া ফেলিল। অবশেষে স্ত্রীর অবশিষ্ট গহনা বিক্রয় করিয়া নেকলেশ কিনিয়া তবে নরেশ সেবারকার মত রক্ষা পাইয়াছিল।

মালতীবালা পানের ডিবা হইতে দুইটি পান লইয়া, নরেশের মুখে পুরিয়া দিয়া সুহাস্যবদনে বলিল—"এবার আর বেশী কিছু চাইনে—শুধু একছড়া আসল মুক্তোর মালা হলেই চল্‌বে। তবে, এত অল্পে যদি মন না ওঠে—তা'হলে অবিশ্যি আর যা ইচ্ছা তাই দিতে পার।"

নরেশ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—"তা বটেই তো—তা বটেই তো!"—কিন্তু মনে মনে ভাবিল, কিছুদিন হইল জমিদারী বাঁধা পড়িয়াছে—এবার বাস্তুভিটা না বাঁধা দিয়া আর উপায় নাই।

ইহার পর কথার স্রোত অন্যদিকে ঘুরিল। মালতী মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—"বলি আজকাল হাসির সাথে পীরিত চল্‌ছে কেমন? খুব চুটিয়ে তো?" নরেশ সন্দিগ্ধভাবে বলিল,—"কি রকম? হাসি আবার কে?"

মালতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—"নে নে রঙ্গ রাখ্—ন্যাকা আর কি? হাসিকে চিনিস্ নে? এই তো ঘরের—শুদ্ধ ভাষাতেই বলি—বউয়ের কথা জিজ্ঞেস করছি।"

নরেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"মাইরি, তুই কত ঢংই জানিস্! তা সে আবার হাসি হতে গেল কবে থেকে?" যখন ইহাদের আলাপ খুব জমিয়া যায়—তখন কথাবার্ত্তার স্রোত এই ভাবেই বহিয়া থাকে।

মালতী হাসিয়া বলিল—"হাসি না হয় সুহাসিনীই হ'লো। তোর বউ কিনা—তাই আমি আদর করে ওই নাম দিয়েছি।"

"তা বেশ করেছিস্। কিন্তু আমি তো তোর হাসির খবর কিছু রাখিনে মালতী। পনরো টাকা মাসিক বরাদ্দ করে, তাকে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছি—সে খবর তো জানিস্!"

"তা তো জানি—কিন্তু তার পরের খবর?"

"পরের খবর আর কি—বাড়ীর কাছেই একটা ঘর ভাড়া করে আছে।"

"আচ্ছা, বাড়ী থেকে তাকে দূর করে দিলি কেন বল্ তো?"

মুখভঙ্গী করিয়া নরেশ বলিল—"দূর করে আমি বেঁচেছি। সারাদিন ঘ্যান্‌ঘ্যান্ প্যান্‌প্যান্ কে সহ্য করে বল্‌তো? আর যার জন্যে তাকে রাখা তাও তো ফুরিয়ে এসেছিল। তার গয়নার দফা তো রফা—আর তাকে দিয়ে আমার লাভ?"

"তা বটে"—বলিয়াই হঠাৎ মালতী গম্ভীর হইয়া গেল। তাহার মনে হইল এক মুহূর্ত্তে তাহার গায়ের সমস্ত অলঙ্কার যেন এক বোঝা লোহার মত ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

পার্শ্বস্থিত বোতল হইতে রক্তবরণ পানীয় কাঁচের গ্লাসে ঢালিয়া কিছু নিজে পান করিয়া আর কিছু নরেশকে দিয়া বলিল—"আচ্ছা তুই যেমন আমার কাছে আসিস্—তেমনি তোর বউয়ের কাছে যদি আর কেউ যায়, তা'হলে কি হয় বল্‌তো?"

"ধ্যেৎ! তাই কি হয় রে!" কিন্তু তাহার বুকের মধ্যে টিপ্ করিয়া উঠিল।

মালতী ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—"কেন তা হয়না শুনি? নিজেদের বেলায় দোষ নেই, যত দোষ ওদের। কি 'আপ্তসুখী' তোরা—তাই ভাবি।"

নরেশ এ আলোচনায় মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল—"নে নে তোর লেক্‌চার থামা। ভর্ত্তি একগ্লাস দেতো দেখি—গাটা কেমন করছে যেন।" মালতী এক গ্লাস ঢালিয়া দিল—কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হইল না। উপর্য্যুপরি দুই তিন গ্লাস খাইয়াও তৃপ্ত না হইয়া সে রাগ করিয়া গ্লাসটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—"না কিছুতে জম্‌ছে না—আজ তবে আসি।"

মালতী মুচকি হাসিয়া বলিল—"হঠাৎ এ বিরাগ কেন?"

"মনটা কেমন বিগড়ে গ্যাছে, কিছুতে ভাল লাগ্‌ছে না।"

নরেশ চলিয়া গেল—মালতীও রক্ষা পাইল। কারণ নিজের অনিচ্ছায় পরের তুষ্টিসাধন করিতে যাদের দেহ উৎসর্গ করিতে হয়—এই ভাবে রেহাই পাওয়া যে কতখানি সৌভাগ্যের কথা—এ শুধু তাঁহারাই বুঝিতে পারে।

মালতী বুঝিতে পারিল—নরেশের মনে খট্‌কা লাগিয়াছে। সে শয্যায় অবশদেহ এলাইয়া দিয়া এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল—তাহাদের জীবন কলুষিত,

বটে—কিন্তু নরেশের মত পুরুষের মন যে কতখানি সঙ্কীর্ণ ও পূতিগন্ধময় তাহা বোধ করি তাহাদের মত পাপিষ্ঠারাও কল্পনায় আনিতে পারে না।

(২)

পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া মালতী তাহার দাসীটাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছিল—হঠাৎ রাস্তার পাশ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—"মা!" সম্বোধন শুনিয়া পাশ ফিরিয়া মালতী দেখিল, রাস্তার পাশে আসন পাতিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়া—সম্মুখে কয়েকখানি ছিন্নপুঁথি—সেই তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেছে। তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিল—"মা, তুমি বড় সুলক্ষণা।" মালতী আত্মপ্রশংসা শুনিয়া খুসী হইয়া বলিল—"তুমি সে কথা কি করে জান্‌লে ঠাকুর।" ঠাকুরটি হাসিয়া বলিল—"আমরা মুখ দেখ্‌লেই যে অনেকটা বুঝতে পারি মা। লোক চিনবার ক্ষমতা একটু একটু আমাদের আছে।"

"তাই নাকি! তাহ'লে হাত দেখ্‌তেও জ্ঞান বোধ হয় ঠাকুর।" ব্রাহ্মণ বলিল—"তা' একটু একটু পারি বৈ কি মা।" মালতী কৌতূহলী হইয়া জানু পাতিয়া বসিয়া বামহস্ত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"তবে দেখ তো আমার হাতটা।"

মালতীর দাসী কিন্তু এই অযথা বিলম্বে মনে মনে রাগিতেছিল—সে ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাহার কানে কানে বলিল—"এ সব বুজরুকি দিদিমণি—শুধু শুধু পয়সা আদায় করবার ফিকির।"

মালতী বিরক্ত হইয়া বলিল—"আঃ তুই থাম্ তো।"

ব্রাহ্মণ তাহার হাতখানি কিছুক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল—"যা বলেছি তাই ঠিক। তোমার মত এমন সুলক্ষণা মেয়ে আমি আর কোনও দিন দেখিনি মা।"

মালতী হাসিয়া বলিল—"সে তো শুনলুম—আর কিছু?" ব্রাহ্মণ তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "আর কি শুন্‌বার আছে মা—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার অংশে তোমার জন্ম—তুমি অনেকের অন্ন জোগাবে।"

দাসীটি আবার তাহার কাণে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—"এ আদত জোচ্চোর—দেখ্‌ছো না মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে পয়সা আদায়—।" মালতী তাহার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সে থামিয়া গেল। তারপর ব্রাহ্মণকে স্নিগ্ধভাবে মালতী বলিল—"কিন্তু এ কথা কি সত্যি? আমি কি তা যদি জান্তে ঠাকুর!" ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিল—"কিছুই আমার জান্তে বাকি নেই মা। তুমি যা তাও সত্যি, তুমি যা হবে তাও সত্যি,—আর আমি যা বল্‌ছি তাও সত্যি।" তারপর আর একবার তাহার হাতখানা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—"তুমি দান করে ফতুর হবে মা।"

বিস্ময়সূচক স্বরে মালতী বলিল—"আমি!"

স্নিগ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিল—"আমার কথা মিছে হয় না!" মালতী বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া থাকিল—তারপর বুকজোড়া গভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অঞ্চলের প্রান্ত হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া বলিল—"এই নেও তোমার দক্ষিণা ঠাকুর!"

ব্রাহ্মণ কোমলকণ্ঠে বলিল—"আমি তো ও চাইনি মা।"

অবাক্ হইয়া মালতী বলিল—"তুমি কি দক্ষিণা নেও না ঠাকুর?"

"অন্যের কথা, সে আলাদা মা। কিন্তু তোমার কাছে কিছু নিতে পারবো না তো।"

অতি বিস্ময়ে মালতী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"মায়ের কাছ থেকে সন্তান কি দক্ষিণা নিতে পারে মা?"

মালতী লজ্জিত হইয়া আধুলিটি পুনরায় অঞ্চলে বাঁধিয়া বলিল—"আজ তবে চল্লুম বাবা।" আঁচল গলায় দিয়া মালতী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। তাহার এই ভক্তির আতিশয্য দেখিয়া দাসী মুখে কাপড় দিয়া কোনও রকমে হাস্য সংবরণ করিতেছিল। বৃদ্ধের নিকট হইতে উঠিতেই মালতীর চোখে পড়িল—তাহাদের চতুর্দ্দিকে দস্তুরমত ভিড় জমিয়া গিয়াছে এবং হাত-গণনা দেখিবার উপলক্ষে সকলেই তাহার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অন্য দিন হইলে সে ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করিত না—কিন্তু আজ মনের কোণে নাকি একটা সঙ্কোচের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই দাসীকে তাড়া দিয়া বলিল—"একটু তাড়িতাড়ি চল্ না।" মালতী, সমস্ত রাস্তাটা কেমন অন্যমনস্ক হইয়া রহিল—হঠাৎ একবার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, উনি পয়সা নিলেন না কেন বল্ তো?" সে হাসিয়া উত্তর করিল—"এ আর বুঝ্‌লে না দিদিমণি, আর একদিন কিছু বেশী আদায় করবার ফন্দী।"

"হুঁ"—বলিয়া মালতী আবার গম্ভীর হইয়া গেল এবং বাড়ীর কাছে এক ভিক্ষুককে দেখিয়া তাহার হাতে সেই আঙুলিটি গুঁজিয়া দিয়া অনেকটা প্রসন্নভাবে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

সেদিন রাত্রে নরেশচন্দ্র মালতীকে বলিল—"তোর হাসিকে পাহারা দেবার বন্দোবস্ত করে এসেছি—এখন আমি নিশ্চিন্ত।"

মালতী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"প্যহারা দেবে কে শুনি?"

"এক ঝি—সেই হয়েছে আমার চর। তার কাছে থেকেই আমি সমস্ত খবরাখবর পাব।"

মালতী বিদ্রূপের সুরে বলিল—"তা হলেই তো স্বামীর কর্ত্তব্য শেষ—কি বল?"

নরেশ কথার খোঁচা ধরিতে না পারিয়া খুসী হইয়া তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল—"মাইরি, তোর কি বুদ্ধি মালতি!"

মালতী হাসিয়া বলিল—"তা তো হ'লো। এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে। এক গণক আমার হাত দেখে বলেছে,—আমি নাকি সব দান করে ফতুর হবো।"

সন্দিগ্ধ ভাবে নরেশ বলিল—"এ গণকটি আবার জুটল কোত্থেকে?"

তাহার মনের গতি বুঝিয়া মালতী হাসিয়া বলিল—"গঙ্গার ঘাটে। ভয় নেই—সে বাহাত্তুরে বুড়ো।" নরেশ হাসিয়া বলিল—"কলিকালে ও বুড়োটুড়োকেও বিশ্বেস নেই রে!" কথাটা খট করিয়া মালতীর বুকে আসিয়া বাজিল—সে বলিয়া উঠিল "ছিঃ ও কথা ব'লো না—সে যে আমাকে 'মা' বলেছে।" কথাটা বলিয়াই মালতী অসম্ভব গম্ভীর হইয়া গেল। নরেশ তাহাকে সুখী করিবার জন্য বলিল—"তা গণকঠাকুর ঠিকই বলেছে মালতী! আমাকে ঠাকুরটিকে দেখিয়ে দিস্‌তো—তাকে কিছু বক্‌শিস্ দেব।"

"বেশ!" বলিয়াই মালতী চুপ করিয়া গেল। তাহার ভাব দেখিয়া নরেশ ভাবিতে লাগিল হায় রে! আজকের রাতটাও বুঝি বৃথায় যায়।

(৩)

মহাষ্টমীর দিন প্রতিমাদর্শন করিয়া মালতী যখন গৃহে ফিরিল—তখন রাত বোধ করি নয়টা কি দশটা। আসিয়াই শুনিল—নরেশচন্দ্র অনেকক্ষণ হইল তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

শুভ্র গরদ পরিধানে মালতীকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নরেশচন্দ্র তাহার পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল—"একটু পাদদোক দেও ঠাকরুণ! যে ধর্ম্মকর্ম্মের বহর দেখ্‌ছি—তাতে তোমার পাদদোক খেলে আমি কেন—আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে।"

মালতী দু-পা পিছাইয়া বিরক্তির স্বরে ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—"আ!—কি যে কর!" এবং পরমুহূর্ত্তেই বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সাদাসিদে কাপড় পরিয়া সে নরেশের কাছে আসিয়া বসিল। মাতাল নরেশ একে অনেকক্ষণ তাহাকে না দেখিয়া চটিয়াছিল—তাহার পরে আবার এই অনাড়ম্বর বেশে আসিতে দেখিয়া আরও চটিয়া গেল। সে কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"বলি, মন কি আজকাল উড়ু উড়ু করছে। আর নাগর টাগর জুটেছে বুঝি?" মালতী এ অপবাদের কোনও জবাব দিল না—চুপ করিয়া রহিল।

বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে নরেশ বলিল—"এবার পূজোর আমোদটা একেবারে মাঠে মারা গেল। কোথায় একটু আমোদ আহ্লাদ করবো, তা নয়—হুঁ। বেশ আজ আমি যাচ্ছি। কিন্তু নিত্যি নিত্যি এমন চালাকি চল্‌বে না, সে কথাও বলে দিচ্ছি। আমার পয়সায় ধর্ম্ম করে যে আমাকেই দু'পা দিয়ে পিষবে—এ আমি বরদাস্ত করতে পারবো না—হ্যাঁ।"

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল; মালতী বলিল—"দাঁড়াও।" নরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ কোঁচকাইয়া বলিল—"কি?"

তাহার হাত ধরিয়া কোমলস্বরে মালতী বলিল—"আজ আমার একটা অনুরোধ রাখবে?" "কি অনুরোধ?" "আজ একবার ব—বউয়ের সাথে দেখা করবে, বল?" সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া নরেশ বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"বারে! এও যে আবার উপদেশ দেয়—এ্যাঁ! ইস্! মায়ের চেয়ে মাসীর দরজ যে দেখ্‌ছি বড়? নাকিসুর ভাঁজতে এও তো কম জানেনা দেখছি। 'ঘ্যান্‌ঘ্যান্ প্যান্‌প্যানে'র জাত কি না—তা ঘরেরই হোক, আর বাইরেরই হোক;—সুবিধে পেলে কেউই সুর ভাঁজতে কসুর করে

না।" সে বকবক করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। যেটুকু কথা মালতীর কর্ণ-গোচর হইল নরেশ বলিতেছে—"সেই ব্যাটা বিটলে বামুনের চক্র এ সব। কে জানে বুড়ো না ছোঁড়া। পেতুম তো জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দিতুম।"

মালতী শয্যায় শুইয়া পড়িল। আজ জগন্মাতাকে দর্শন করিয়া তাহার অশান্ত মন যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। মণ্ডপে উঠিয়া ভাল করিয়া দেখিবার যোগ্যতা তো তাহার নাই,—তবু সে দূর হইতে অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থ বধূগণের আনন্দোজ্জল মুখ দেখিয়া সে তৃপ্ত হইয়াছে। বঙ্গবধূগণের মুখেও যেন দেবী ভগবতীর মুখের আভাই ফুটিয়া রহিয়াছে। হায়! তাহাদের সমশ্রেণী হইয়া সেও যদি প্রতিমা দেখিতে পারিত! আজ আর তাহার নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না অল্পক্ষণ মধ্যেই সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

(৪)

কয়েকদিনের প্রবল বারিপাতে উত্তরবঙ্গে যে ভীষণ বন্যা হইয়াছে—তাহার কবলে পড়িয়া কত নরনারী ও পশু যে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে—তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব কতকটা নিবারণ করিবার জন্য সমস্ত দেশময় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দেশের অক্লান্ত কর্ম্মী মহাপুরুষগণ—চাঁদা আদায় করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া বন্যা-পীড়িত স্থলে পাঠানো হইতেছে।

কলিকাতায় প্রতিদিন দলেদলে যুবক ও বালক বাহির হইয়া সারা সহরময় গান গাহিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত দেশ দুস্থ পীড়িতের সাহায্যের জন্য একেবারে উন্মুখ ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। মালতীর কাণেও এই বন্যার খবর আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—তাহার সদ্যজাগ্রৎ নারীহৃদয় দুস্থ, পীড়িত, আর্ত্তের সেবার জন্য গুমরিয়া মরিতেছিল;—অথচ সে যে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতেছিল না। কে যে তাহার কাণে কাণে অতিমৃদুস্বরে গুঞ্জন করিয়া বলিতেছিল—"ওরে অবোধ নারী এই তোর মুক্তির সময়—এমন অবসর হেলায় হারাস্ না। চারিদিকে ক্ষুধার্ত্তের হাহাকার। এই ত তোর যথা সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ফতুর হবার সময়! সেই বুড়া ব্রাহ্মণের কথা কি ভুলে গেলি।"

সে বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল—হঠাৎ রাস্তায় গীতধ্বনি শুনিয়া তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাস্তার ধারের দোতলার বারান্দায় আসিয়া দেখিল—কতকগুলি যুবক ও বালক গান গায়িতে গায়িতে বন্যার সাহায্যের জন্য দোরে দোরে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছে। সেই গানের তালে তালে তাহারও বুকের ভিতর যেন দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—সেও এই দলের সহিত যোগ দিয়া এমনই করিয়া দ্বারে দ্বারে দুস্থের জন্য ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়।

"মা"—অতি বিস্ময়ে মালতী চাহিয়া দেখিল—একটি নয় দশ বছরের সুন্দর বালক ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বালকের কোমল মাতৃ-আহ্বানে এই নারীর সুপ্ত মাতৃত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিল—তাহার মনে হইল, সমস্ত আর্ত্ত-বিশ্ববাসী এই বালকের মূর্ত্তিতে তাহাকে জননীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাতৃস্নেহ প্রার্থনা করিতেছে। মালতী ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বাবা?"

"উত্তর-বঙ্গ-বন্যার জন্য কিছু সাহায্য চাই মা।"

"সাহায্য? দাঁড়াও বাবা।" সে দৃঢ়পদক্ষেপে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল এবং একে একে তাহার সমস্ত অলঙ্কার, পোষাক পরিচ্ছদ বাহির করিয়া দুয়ায়ের সম্মুখে জমা করিতে লাগিল। বহুমূল্য যাহা কিছু ছিল, সমস্ত স্তুপীকৃত করিয়া বালককে বলিল "বাবা, এইগুলো নিয়ে যাও।"

মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত বালক জিজ্ঞাসা করিল—"এ সবই কি দিচ্ছ মা?" স্নেহের হাসি হাসিয়া মালতী উত্তর করিল—"হাঁ বাবা। কিন্তু, তুমি তো একা নিয়ে যেতে পারবে না—ওদের একটু ডাক না!" বালকের সানন্দ-আহ্বানে দলের সকলেই উপরে আসিয়া এই মহীয়সী নারীর দানের মাত্রা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল এবং মহা উল্লাসে সমস্ত জিনিষ গুছাইয়া বাঁধিতে লাগিল। একে একে সমস্ত দ্রব্য বাহির করিয়া দিয়া যখন সে মাত্র একখানি সাদাপেড়ে মোটা কাপড় পরিয়া বাহিরে আসিল—তখন সকলেরই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল; সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "বন্দে মাতরম্।"

তখন এই দলের মধ্য হইতে একটি বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিয়া আনন্দোজ্জল কণ্ঠে ডাকিল—"মা!" মালতী চাহিয়া দেখিল—গঙ্গাতীরের সেই গণকঠাকুর।

বিস্মিত হইয়া সে বলিল—"তুমিও এখানে ঠাকুর!"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল—"দেশের কাজ—কি করি মা! শুধু 'হাত দেখ্‌লেই তো আর চলে না। কিন্তু, দেখ্‌লে মা—আমার কথা ঠিক কি না?'

মালতী কোনও উত্তর দিল না—শুধু আর একবার ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া সমস্ত মাথায় বুকে বুলাইয়া লইল।

সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া যখন তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে—সেই সময় নরেশ আসিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—"এ সব কি?" মালতী নরেশকে দেখিয়া তাহাদের যাইতে নিষেধ করিল এবং বিস্মিত নরেশের আংটি, চেন-ঘড়ি, এমন কি গায়ের জামা-চাদর পর্য্যন্ত নিজের হাতে খুলিয়া ভিক্ষাকারীদিগের হস্তে দিয়া বলিল—"এখন তোমরা যেতে পার বাবা।"

সকলে চলিয়া গেলে হতভম্ব নরেশের দিকে চাহিয়া বড় মধুর হাসি হাসিয়া মালতী বলিল—"এরা বন্যার সাহায্যের জন্য এসেছিল। আমার যা কিছু ছিল—সবই দিয়েছি। তোমার জিনিষগুলি এমনই ভাবে দেওয়া হয় ত ঠিক হয় নি—কিন্তু এতদিন একসাথে থাকার ফলে কি তোমার উপর আমার একটু অধিকারও জন্মেনি।"

"তা দিয়েছ বেশ করেছ—কিন্তু—।"

আবার সেই মোহন হাসি হাসিয়া মালতী বলিল—"আজ আর কোনও 'কিন্তু' নেই—সমস্ত 'কিন্তুর' আজ শেষ করে দিয়েছি যে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে আমাদের জীবনের ধারা বদলে যাক্—এখন থেকে কোন অশুভই যেন আমাদের স্পর্শ না করে।—"

নরেশচন্দ্র কিছুক্ষণ নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে থাকিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল—"তবে আমিও চল্লুম।"

মালতী ভক্তিভরে তাহাকে প্রণাম করিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল—"এসো। তুমিও পথ পেয়েছ।

'কি জানি'—বলিয়া একবস্ত্রসার নরেশচন্দ্র সেই গৃহের বাহির হইয়া গেল।

নরেশচন্দ্র স্ত্রীর দুঃখদারিদ্র্যের চিহ্নসংযুক্ত কক্ষখানির সম্মুখে আসিতেই—ভিতর হইতে কে যেন তাড়াতাড়ি কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।—নরেশচন্দ্র অবাক্ হইয়া দরজায় ধাক্কা দিবার উপক্রম করিতেই ঝি আসিয়া প্রথম বাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল—তার পর ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল—"ও ঘরে এখনই যেও না বাবু—মা যে গামছা পড়ে রয়েছেন!"

নরেশচন্দ্রকে বিস্মিত দেখিয়া ঝি বলিল—"মায়ের কাপড়-চোপড়ের মধ্যে তো ছিল মাত্র একখানা—সেখানাও আজ বন্যার সাহায্যে দিয়ে দিলেন কি না।"

নরেশচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে ভাবিয়া পাইল না—এই অপূর্ব্ব দানের সহিত আর কিসের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। আজ এই দুই মহিমামণ্ডিত নারীর দানের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়া—সমস্ত নারীজাতির প্রতি তাহার মন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। নিজের পরিধানের বস্ত্র হইতে অৰ্দ্ধেকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অশ্রুসজল-চক্ষে, ধরা গলায় বলিল—"আমার সমস্ত দোষ ক্রটি, অত্যাচার অবিচার ক্ষমা করে, দরজা খোল সুহাস। বিয়ের পর কোনও দিন তোমাকে হাতে তুলে কিছু দিই নি—আজ এই ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দিয়েই আমাদের দাম্পত্য জীবনের গ্রন্থিবদ্ধ হোক্।"

চিত্রশালা

বন্যা-চিত্র

বঙ্গীয় বন্যা সাহায্য সমিতির (Bengal Relief Committee) সৌজন্যে আমরা নিম্নে প্রকাশিত বন্যা-প্রপীড়িত স্থানগুলির আলোক চিত্র প্রাপ্ত হইয়াছি ; এজন্য আমরা উক্ত কমিটির অধিনায়কবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উক্ত কমিটির পক্ষ হইতে ৮০।৩ হারিসন রোডের ইলেক্‌ট্রো-ফটো-ষ্টোরের শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ মহাশয় স্বয়ং নিজের ব্যবসায়ের যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া, বন্যা-পীড়িত স্থানসমূহে গমনপূর্ব্বক, নানা কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিয়া এই সকল আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য তিনি দেশবাসী সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

বগুড়া-সান্তাহার রেলপথে আদমদিঘী ও নসরতপুরের মধ্যে তিন-পোয়া মাইল পথ জলমগ্ন।

আদমদিঘীর পশ্চিমদিকে একমাইল ভগ্ন রেলপথ।

বগুড়া চৈতনগায়ে ধ্বংস-লীলা।

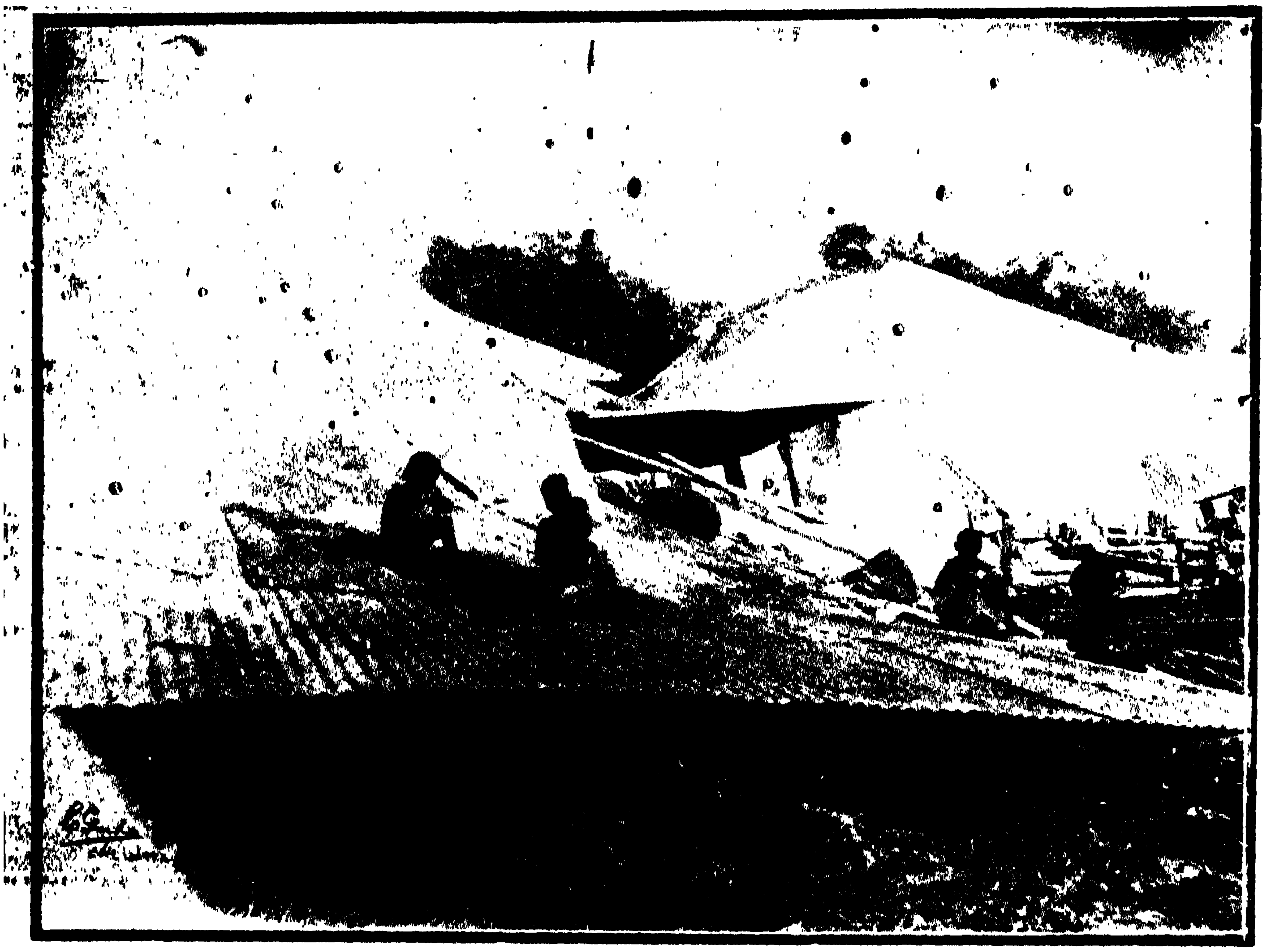

নসরতপুরে ব্রাহ্মণ জমিদারের গৃহের ভগ্নদশা।

একজন জমিদারের গৃহ-ভূমিসাৎ।

গৃহপালিত পশুগণের মৃতদেহ শকুনীরা ভক্ষণ করিতেছে

চৈতন্যগ্রামের সাহায্য-প্রার্থিনী অধিবাসিনীগণ।

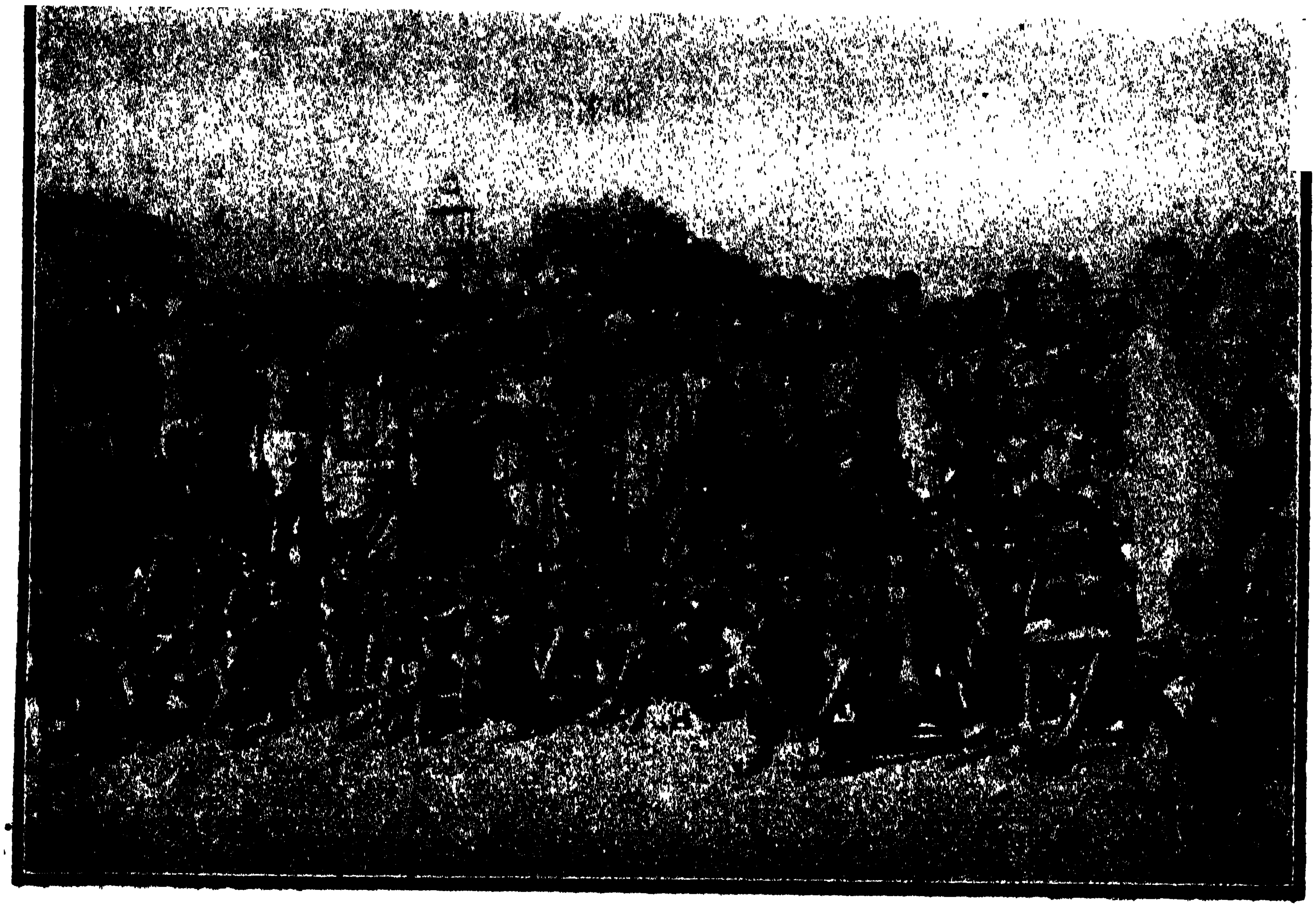

নসরতপুরের অধিবাসীরা সাহায্য লইতে আসিয়াছে।

অনশনক্লিষ্ট গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণ ও বস্ত্রহীন শিশুগণ।

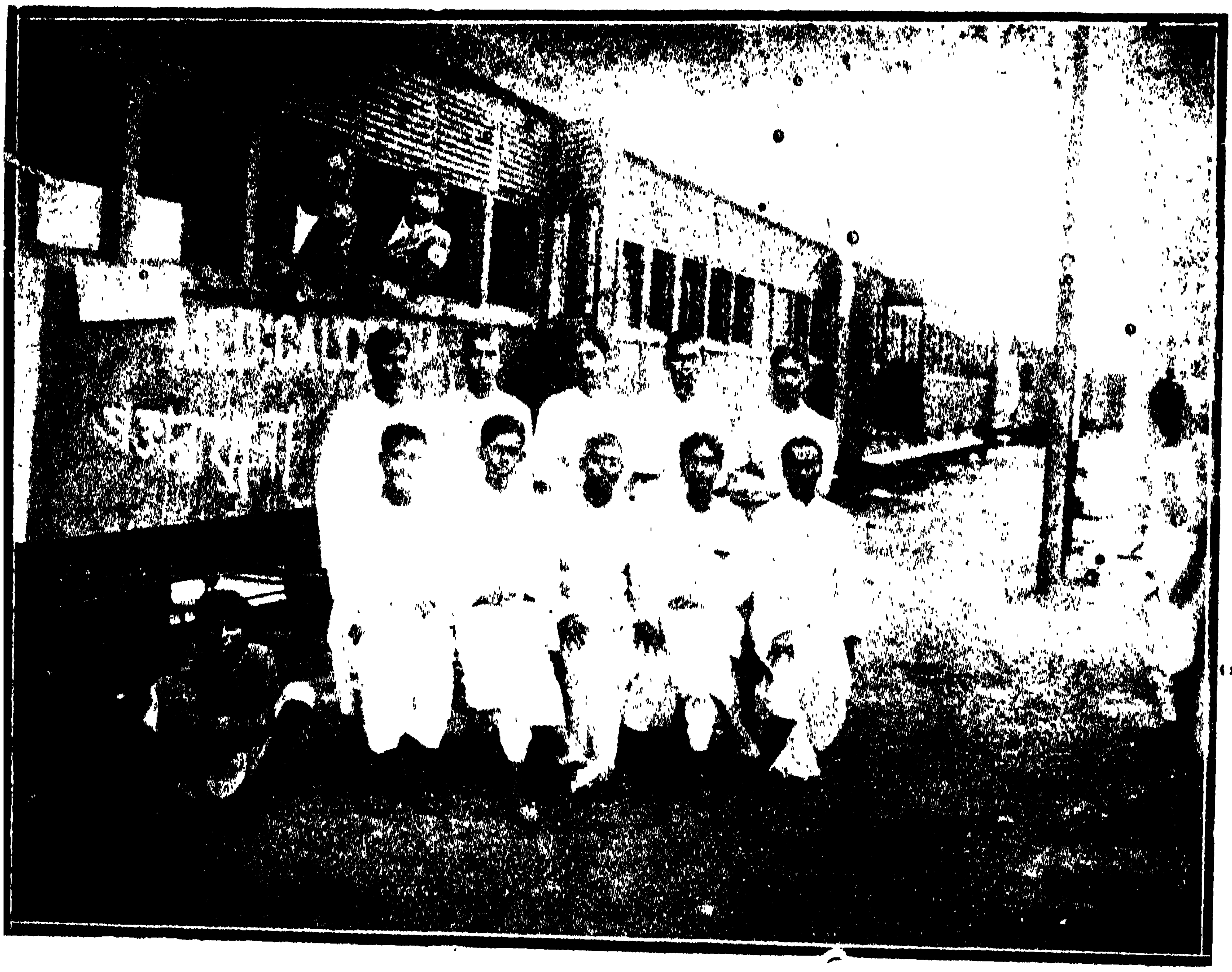

একখানি রেলগাড়ী বেঙ্গল রিলিফ কমিটির মেডিক্যাল ক্যাম্পে পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি—সান্তাহার।

চক্র

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

সহসা নিশীথ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া আমার
স্তব্ধতার বক্ষভেদি' ঘর্ঘর নিনাদ
পশিল শ্রবণে। মুক্ত প্রাঙ্গণ-মাঝার
দাঁড়াইনু আসি। নেত্রপথে অকস্মাৎ
কি অপূর্ব্ব দৃশ্য এক পড়িল অমনি।
গগনের দুগ্ধ-শুভ্র দূর ছায়া-লোকে
শুভ্র-বাসা জ্যোতির্ম্ময়ী কে ওই রমণী
ঘুরায়ে কিরণ-চক্র স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
রজত মৃণাল জিনি সূক্ষ্ম তন্তুদাম
অঙ্গুলী-পরশে মরি করিছে রচন?
তুলিছে ঘর্ঘর-রব চক্র অবিরাম
স্মিততার ওষ্ঠ-পুটে মধুর গুঞ্জন
মৃদু মৃদু। স্বাধীনতা আত্ম-নিমগনা
অদৃষ্টের যজ্ঞ-সূত্র করে কি রচনা?

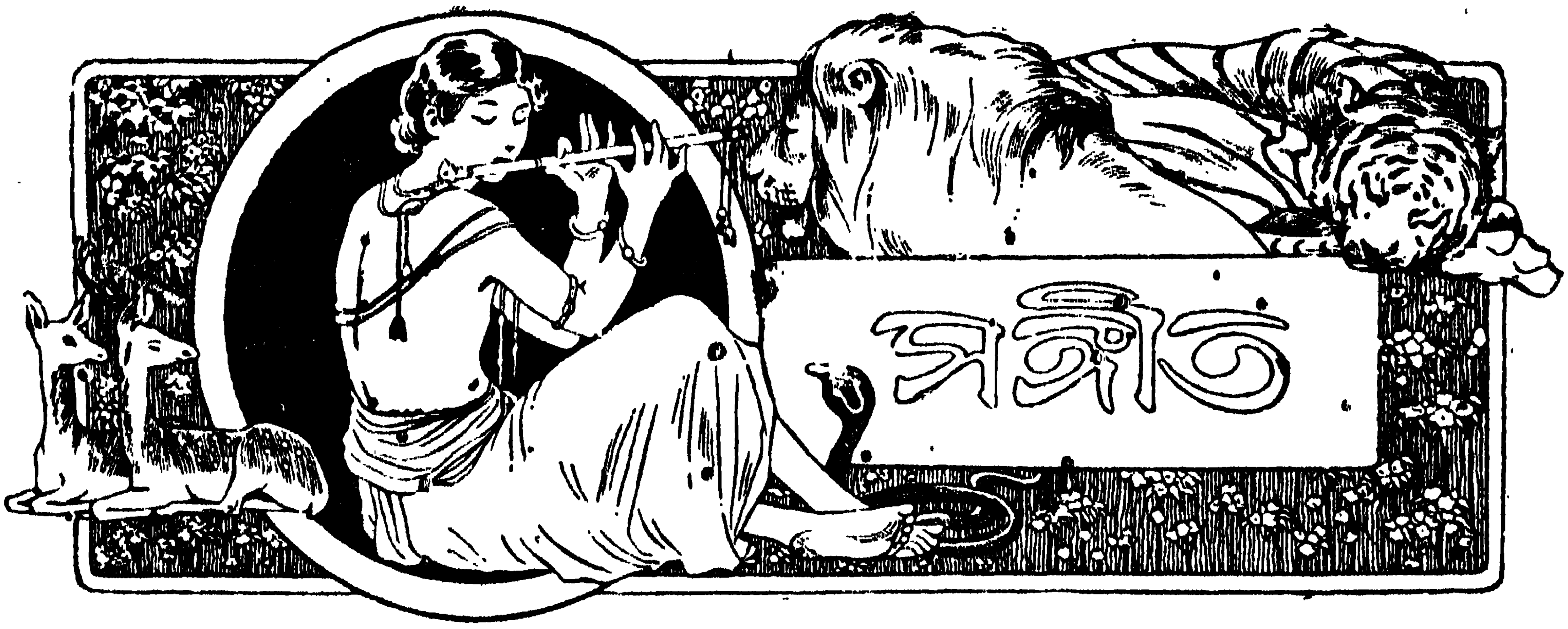

"সাজাহানে"র গান। *

সপ্তম গীত।

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

খাম্বাজ—একতালা।

চারণ-বালকগণ।

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;

ধুয়া :—

এমন দেশটী কোথায় খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে !
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে ;

ধুয়া :—

এমন দেশটী··························আমার জন্মভূমি।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !

ধুয়া :—

এমন দেশটী·······························আমার জন্মভূমি।

* "সাজাহানে"র গানের স্বরলিপি 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তগত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে। —লেখিকা।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী ;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তা'রা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ;
ধূয়া :—
এমন দেশটী..............................আমার জন্মভূমি।

ভা'য়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ !
—ওমা তোমার চরণ দুটী বক্ষে আমার ধরি,'
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
ধূয়া :—
এমন দেশটী..............................আমার জন্মভূমি ॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

২´ ৩ ০ ১
II সা সা -া | মা -া মা | মা -া মা | মা মা -া I
ধ ন ০ ধা ০ ন্য পু ষ্ প ভ রা ০

২´ ৩ ০ ১
I মা মা -া | মা৹ গমা -পা | পা পা -া | পা পা -া I
আ মা ০ দের এ০ ই ব সু ন্ ধ রা ০

২´ ৩ ০ ১
I মা গা -া | মা ধা -া | ধা পধা -ণা | ধা পমা -গা I
তা হা র্ মা ঝে ০ আ ছে০ ০ দেশ্ এ০ ক্

২´ ৩ ০ ১
I মা মা -া | ধা পধা -ণা | ণা ধা -া | -া ধা ধা I
স ক ল্ দে শে০ র্ সে রা ০ ০ ও সে

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া র্সা | ণা ণা -ধা | পা -ধা পা | মা গা -া I
স্ব প্ ন দি য়ে ০ তৈ ই রি সে দে শ্

২´ ৩ ০ ১
I সসা৹ গা -া | মা পা -ধপা | মগা মা -া | -া -া -া I
স্ম তি ০ দি য়ে ০০ ঘে০ রা ০ ০ ০ ০

II	সা	-া	সা |	মা	-া	মা |	মা	মা	-া |	মা	মা	-া	I
(১)	চ	ন্	দ্র	সূ	র্	য্য	গ্র	হ	০	তা	রা	০	
(৪)	অ	ত	০	গ্নি	গ্	ধ	ন	দী	০	কা	হা	র্	
(৭)	পু	ষ্	পে	পু	ষ্	পো	ভ	রা	০	শা	খী	০	
(১০)	ভা	য়ে০	র্	মা	য়ে	র্	এ	ত	০	স্নে	হ	০	

	২			৩			০			১			
I	মা	মা	-া |	মা	গমা	-পা |	পা	পা	-া |	পা	পা	-া	I
(১ক)	কো	থা	য়	উ	জ০	ল্	এ	ম	ন্	ধা	রা	০	
(৪ক)	কো	থা	য়	এ	ম০	ন্	ধূ	ম্র	০	পা	হা	ড়্	
(৭ক)	কু	ঞ্	জে	কু	ঞ্জে	০	গা	হে	০	পা	খী	০	
(১০ক)	কো	থা	য়	গে	লে০	০	পা	বে	০	কে	হ	০	

	২			৩			০			১			
I	মা	মা	-া |	ধা	ধা	-া |	ধর্সা	ণা	-া |	ধা	পমা	-গা	I
(২)	কো	থা	য়	এ	ম	ন্	খে০	লে	০	ত	ড়ি০	ৎ	
(৫)	কো	থা	য়	এ	ম	ন্	হ০	রি	ৎ	ক্ষে	ত্র০	০	
(৮)	গু	ঞ্	জ	রি	য়া	০	আ০	সে	০	অ	লি০	০	
(১১)	ও	মা	০	তো	মা	র	চ০	র	ণ	দু	টি০	০	

	২			৩			০			১			
I	মা	ধা	-া |	পা	পধা	ণা |	ণা	ধা	-া |	-া	ধা	-া	I
(২ক)	এ	ম	ন	কা	লো০	০	মে	ঘে	০	০	তা	র্	
(৫ক)	আ	কা	শ	ভ	রে০	০	মি	শে	০	০	এ	মন্	
(৮ক)	পু	ঞ্	জে	পু	ঞ্জে	০	ধে	য়ে	০	০	তা	রা	
(১১ক)	ব	ক্ষে	০	আ	মা০	র্	ধ	রি	০	০	আ	মার্	

	২			৩			০			১			
I	র্সা	সা	-া |	ণা	ণা	-ধা |	পা	ধা	পা |	মা	গা	-া	I
(৩)	পা	খী	র্	ডা	কে	০	ঘু	মি	য়ে	উ	ঠি	০	
(৬)	ধা	নে	র্	উ	প	র্	ঢে	উ	খে	লে	যা	য়	
(৯)	ফু	লে	র	উ	প	র	ঘু	মি	য়ে	প	ড়ে	০	
(১২)	এই	দে	০	শে	তে	০	জ	ন্	ম	যে	ন	০	

২´ ৩ ০ ১

I সা গা -া | মা পা -ধপা | মগা মা -া | -া -া -া I

(৩ক) পা খী র্ ডা কে ০০ জে০ গে ০ ০ ০ ০

(৬ক) বা তা স্ কা হা ০র্ দে০ শে ০ ০ ০ ০

(৯ক) ফু লে র্ ০ম ধু ০০ খে০ য়ে ০ ০ ০ ০

(১২ক) এই দে ০ শে তে ০০ ম০ রি ০ ০ ০ ০

ধুয়া ঃ——

(গান খানির প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট স্থানে, ধুয়া একবার করিয়া গেয়)।

২´ ৩ ০ ১

I র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা | র্রা র্সা -া | ণা ধা -া I

এ ম ন্ দে শ্ টী কো থা য় খু জে ০

২´ ৩ ০ ১

I পধা পা -া | ধা পধা -ণা | ণা ধা -া | -া -া -া I

পা০ বে ০ না ক০ ০ তু মি ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I র্রা র্সা -া | ণা ধা -া | পধা পা -া | মা গা -া I

স ক ল্ দে শে র্ রা০ ণী ০ সে যে ০

২ ৩ ০ ১

I মা মা -া | মা -া র্রা | র্রা র্রা -া | র্রা র্রা -া I

আ মা র্ জ ন্ ম ভূ মি ০ সে যে ০

২ ৩ ০ ১

I র্সা র্সা -া | ণা -া ণা | রা রা -া | রা গাঃ -রঃ I

আ মা র্ জ ন্ ম ভূ মি ০ সে যে ০

২´ ৩ ০ ১

I সা গা -া | রগা মা মা | -মা মা -া | -া -া -া II

আ মা র্ জ০ ন্ ম ভূ মি ০ ০ ০ ০

এ গানখানি বহুল-প্রচলিত গীত। কখন কখন মিশ্র কেদারা সুরেও গাওয়া হইয়া থাকে। ——লেখিকা।

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১। সিঁদুর পরিবার সময় নাকের ডগায় সিঁদুর পড়িলে, তাকে তার স্বামী ভালবাসে। ইহার কারণ কি?

২। লোকের খুব আনন্দ হইলে বলে—আহ্লাদে একেবারে আটখানা—ইহার তাৎপর্য্য কি?

৩। কোন কথা বলিবার সময় টিক্‌টিকি ডাকিলে, সে কথা সত্য হয়। এরূপ বিশ্বাসের হেতু কি? আবার কাশীর টিক্‌টিকি ডাকে না, মহাদেবের মানা আছে।

৪। দোয়াত, প্রদীপ মাটিতে রাখিতে নাই কেন?

৫। পূর্ব্ববঙ্গে অনেকে বলেন, ভাইয়ের বোন্ এক হাতে শাঁখা রাখে না—অর্থাৎ সেরূপ স্ত্রীলোকের দৈবাৎ এক হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ অপর এক গাছি পরিতে হইবে, কিংবা আস্ত গাছি খুলিয়া রাখিতে হইবে। শাস্ত্রে এরূপ নিষেধ আছে কি?

৬। ঘরের ছাতে শকুনী বসিলে অমঙ্গল-জনক, আর গৃধিনী বসিলে ভাল, এরূপ ধারণার কারণ কি?

৭। চৌকাঠে, ঢেঁকিতে ও শীলের উপর বসিতে নাই কেন?

শ্রীমুরলা দেবী।

৮। শরীরের কোন স্থান দগ্ধ হইবার পর আরোগ্য হইলে, ঐ দগ্ধ স্থানে একটা সাদা দাগ থাকিয়া যায়, উক্ত সাদা দাগ মিলাইবার কোন উপায় আছে কি না?—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

৯। বিগত ১৩২৬ সনের ৭ই আশ্বিন পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন স্থানে ভীষণ ঝড় হইয়াছিল। ঐ ঝড়ের পর হইতে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতির ঝড়-পীড়িত স্থানসমূহে আমের পোকা আর দেখা যাইতেছে না। ইতঃপূর্ব্বে দুই প্রকার পোকাই এ প্রদেশের আম্র বর্ত্তমান ছিল,—এক প্রকার পোকা গোল, কালো রঙ্গের, আর এক প্রকার সাদা, লম্বা। এখন কিন্তু কোন প্রকার পোকাই দৃষ্টিগোচর হয় না। পূর্ব্বে যেমন আম হইত, এখন কিন্তু আমের ফলনও বেশী হইয়াছে। যে সকল গাছ ঝড়ে মাটীতে ফেলিয়া গিয়াছে, তাহাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর আম হয়। ইহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি? শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ, এম্-আর-এ-এস্।

১০। শিশুদিগের মাথায় অকালে টাক পড়িলে কিসে ভাল হইবে বলিতে পারেন?

১১। চুলের আগায় দুই-তিনটা করিয়া মুখ হইলে, কি দিলে ভাল হইবে? শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবী—ভারতী।

১২। "চক পেনসিল" (chalk pencil) প্রস্তুত প্রণালী কেহ জানাইলে উপকৃত হইব।—শ্রীবরদাকান্ত রাহা।

১৩। ধুবড়ী টাউনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে গদাধর ও ব্রহ্মপুত্র-নদের সঙ্গম-স্থলে একটি বাঁধান ঘাটকে স্থানীয় লোকে মনসা-ভগিনী নেতাদেবীর ঘাট নামে অভিহিত করে। ইহার মূলে কোন পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক সত্য আছে কি? যদি থাকে, তবে ইহাই যে উক্ত দেবীর ঘাট, এতৎসম্বন্ধে প্রমাণ কি কি গ্রন্থে আছে?

শ্রীহেমাঙ্গ চক্রবর্ত্তী।

১৪। বিবাহের পরদিবস রাত্রিকে কালরাত্রি কহে। উক্ত রাত্রে বর-বধূর পরস্পর সন্দর্শন নিষেধ এবং অমঙ্গলজনক বলিয়া কথিত। ইহার হেতু কি? আমাদের শাস্ত্রে এই 'কালরাত্রি' সম্বন্ধে কিছু আছে কি? শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত।

উত্তর

শুভঙ্করের পরিচয়

অঙ্ক বিষয়ক পদাবলী রচয়িতা শুভঙ্করের প্রকৃত নাম জগন্নাথ বা ভৃগুরাম দাশ। তিনি জাতিতে বৈদ্য। তাঁহার গুণগ্রামে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ তাঁহাকে "শুভঙ্কর" উপাধি ও বিস্তর নিষ্কর ভূমি দান করেন। বাঁকুড়া জিলার রামপুর গ্রামে এখনও শুভঙ্করের সায়র (সাগর) ও বারহাজারী হইতে উক্ত সায়র পর্য্যন্ত ২০ মাইল দীর্ঘ শুভঙ্করী দাঁড়া, বিদ্যমান। তাঁহার দৌহিত্র বংশধরেরা এক্ষণে জিলা বাঁকুড়ার অন্তঃপাতী থানা ইন্দাশের তিন ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী কাসিড়া নামক গ্রামে এবং সোনামুখীর দক্ষিণ রামপুরে বসবাস করিতেছেন। এতদ্ বিষয়ে পণ্ডিত প্রবর শ্রীউমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রণীত "জাতি-তত্ত্ববারিধি" নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগ, ৬২—৬৫ পৃষ্ঠা ও "প্রবাসী" বৈশাখ—১৩২৮ বঙ্গাব্দের "বেতালের বৈঠক" মৎলিখিত ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য। শ্রীললিতমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ।

উকুনের ঔষধ

চাঁপাফুলের পাতার রস মস্তকে মাখিলে উকুন মরিয়া যায়, মাথার চুলও উঠে না। শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র চট্টরাজ।

নারিকেল তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া প্রত্যহ মাখিলে ১৫ দিনের মধ্যে উকুন ছাড়িয়া যাইবে এবং চুলও উঠিবে না, সেরকে ১৷৹ তোলা কর্পূর মিশাইতে হয়। শ্রীমতী সুকুমারী ঘোষ।

নারিকেল তৈলে কর্পূর দিয়া উত্তমরূপে মস্তকে মাখিয়া কলের জলের তোড়ে স্নান করিলে ১০।১২ দিনেই উকুন মরিয়া যায়, অথচ চুলও উঠে না। সুভাষিণী।

টোপা পানা বা নিমের বীচি (আঁটি) পানি দিয়া বাটিয়া মালিশ করিয়া চুল বাঁধিলে উকুন সম্পূর্ণরূপে মরিয়া যাইবে। বন্ধনটী দুই দিন পর্য্যন্ত রাখাই ভাল। মাথায় দুর্গন্ধ হইবে না। ইন্নারনেছা খাতুন।

ডালিমের পোকা

ডালিম যখন ছোট ছোট হয়, তখন তাহার নীচে যে ফুলটি থাকে, তাহা ডালিমের চামড়ার সমান করিয়া ছিঁড়িয়া দিতে হয়, যাহাতে ঐ ফুলের ভিতর কোন প্রকার পোকা বাস করিতে না পারে। সবগুলি রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেকটির ফুল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। দুই একটি ফুল থাকিলে অনেকগুলি ডালিম নষ্ট হইয়া যাইবে।

কালিদাসের বিবরণ

মহাকবি কালিদাসের সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। এক এক জনের এক এক প্রকার মত।

(ক) বল্লালসেন বিরচিত ভোজপ্রবন্ধ অনুসারে কালিদাস উজ্জয়িনীবাসী ভোজরাজের সভাসদ ছিলেন। (Journal Asiatique, Sept. 1844. P. 250).

(খ) জেকসন সাহেব কালিদাসের জ্যোতিষ শব্দ ধরিয়া নির্ণয় করেন যে, তিনি ৩৫০ খৃঃ পূর্ব্বের লোক হইতে পারেন না। এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত কেন, ভাওদাজী, মোক্ষমূলারের মতে কালিদাসের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

(গ) উজ্জয়িনীনাথ বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্ত নামে এক ব্যক্তিকে কাশ্মীরের রাজত্ব প্রদান করেন। এই মাতৃগুপ্তই কালিদাস। (Dr. Bhao Daji, Journal of the Royal Asiatic Society, Bombay, Vol. VIII. P. 294).

(ঘ) গ্রীক হোরা শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা কালিদাসকে ৪র্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

(ঙ) নাসিক হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একখানি শিলালিপি বাহির হইয়াছে, তাহাতে শকারি নাম দৃষ্ট হয়। বিক্রমাদিত্যের আর এক নাম শকারি এবং প্রবাদও আছে যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমকালীন। যদি প্রবাদের কোন অংশ সত্য হয়, তবে প্রথম শতাব্দীতে শকারির রাজত্বকালে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন।

(চ) মেঘদূতের ২৯ হইতে ৪৩ শ্লোক পর্য্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে কতকটা অনুমান করা যায় যে, কালিদাস উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন।

কালিদাসের বিষয় এযাবৎ এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে।

শুভঙ্করের পরিচয়।

শুভঙ্করের প্রকৃত নাম শ্রীগর্ভ আচার্য্য। পিতার নাম নরপতি ও মাতার নাম জাহ্নবী দেবী। শ্রীঅমূল্যগোবিন্দ মৈত্র।

হিন্দু বিধবা-আশ্রম

"ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী হিন্দুবিধবাগণের আদর্শ আশ্রমের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বিধবা এবং নিরাশ্রয়গণের নিরানন্দ জীবন শান্তিময় করিবার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসিনী শ্রীযুক্তা গৌরীমাতা বহু বৎসর হয় সাধারণের দানের উপর নির্ভর করিয়া একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা, চিরব্রহ্মচারিণী এবং দেশের মায়েদের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ভগবদারাধনা, সদাচার, সংযম পালন ব্যতীত আশ্রমে সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং অর্থকরী শিল্পশিক্ষাও দেওয়া হয়। বিস্তারিত খবর নীচের ঠিকানায় জানা যাইবে—"শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম"।

৫ বি রাধাকান্ত জীউ ষ্ট্রীট, উল্‌টাডাঙ্গা, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

শ্রীঅমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

অপূর্ব্ব অধ্যাপনা

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর

এর মানেটা বুঝলে না ক
বুঝলে না হে অর্থ এর ?
যা 'তা' নহে এ বাছাধন,
বিদ্যে এতে লাগবে ঢের।
কতই বা আর বয়স হলো,
কেমন কোরে বুঝবে বলো ?
ঐ কথাটা বুঝতে গিয়ে
চুল পাকিল আমাদের।

আমাদেরই মধ্যে আবার
এ কথাটা ক'জন বুঝে ?
পাবে না ক একটী লোকও—
দেশটা গোটাই এসো খুঁজে।
গূঢ় অর্থ অনেক আছে
ধৈর্য্য ধরো, বসো কাছে,
কি যে আছে, বুঝিয়ে দিলে
তবে তখন পাবে টের।

চালাকি নয়, ফক্কিকা নয়—
ভেতরে এর ঢুকতে হবে।
আজো এটা বুঝলে না ক
তবে আবার বুঝবে কবে ?
ব্যাপারটা আর এমন কি যে
বুঝতে, একটু ভাবলে নিজে
এ কথাটা হচ্ছে কি না
সেই কথাটার নিছক জের॥
অর্থ কি আর করব' ইহার
এ যে রতন সুদুর্ল্লভ,
এ যে রসের পায়স-পিঠে,
রসিক মনের মহোৎসব।
আ,-মরে' যাই—আ-মরে' যাই
লিখে গেছে কি লেখাটাই,
বোঝাব কি ? সর্ব্বনাশ! এ
করতে হবে অনুভব॥

বোঝাব কি, নাচব আমি,
নাচ' নাচ' বোঝ নিজে,
দেখছ না মোর দুলছে মাজা,
দেখছ না মোর দু'চোখ ভিজে ?
এই দেখ না আমার গা-টা
ঘন ঘন দিচ্ছে কাঁটা,
একটুখানি মজ্‌ব রসে
থামাও দেখি কলরব॥
দামটা ইহার হাজার টাকা—
হাজার কেন ? লক্ষ টাকা।
বালাই নিয়ে কোথায় পালাই
যাব' লাহোর মক্কা ঢাকা,
কি চমৎকার মরি, মরি
এ কি লীলা তোমার, হরি,
ডোবো ডোবো রসের ডোবায়,
বোঝান' যে অসম্ভব।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

হাব্‌সীর দেশে

কাফ্রিস্থানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের এই প্রাচীন পার্ব্বত্য মুল্লুকে প্রবেশ করলে, মনে হবে যেন সেই বাইবেলের যুগে ফিরে এসেছি! পথ বড় দুর্গম। আজকাল 'আদ্দীস্-আব্বাবা' পর্য্যন্ত রেল হয়েছে বটে, তবু এখনও আবিসিনীয়ার ভিতরে বেড়িয়ে আসা বিশেষ কষ্টকর। আদ্দীস্-আব্বাবা নামটা অনেকের পছন্দ না হ'তে পারে, কিন্তু ঐটেই হ'চ্ছে আবিসিনীয়ার রাজধানীর নাম। সহরের চারিদিকে মেটে বাড়ী। রাজপ্রাসাদ, বিচার-গৃহ— এ সবও মাটির তৈরি; তবে একটু জাঁকালো রকমের। রাজধানীর আশেপাশে কোনও গ্রাম নেই,—অনেক দূর এগিয়ে গেলে, তবে আর একটা সহর দেখতে পাওয়া যায়। সেটার নাম 'হাড়ার'। হাড়ারে মেটে বাড়ীর সঙ্গে কতক-গুলো প্রাচীনকালের পাথরের বাড়ীও আছে। সেগুলো মিশরীয় শাসন-যুগে তৈরি হয়েছিল। এ ছাড়া যতদূর যাও, একখানাও গ্রাম চখে প'ড়্‌বে না; কেবল আলখাল্লা-পরা, ঝুব্বি জোব্বা-গায়ে যেন বাইবেলী যুগের রাখালের দল এখনও তাদের গো-মেষাদি পশুপাল চরিয়ে বেড়াচ্ছে, দেখতে পাবে।

বিদেশী লোক দেখলেই সেখানকার দেশওয়ালীরা খুব খাতির করে তাকে অভ্যর্থনা করে; এবং তার সম্মানের জন্যে তাকে একটা ষাঁড় কিম্বা ভেড়া উপহার দেয়—কিন্তু বিনামূল্যে নয়। অসম্ভব বেশী দাম আদায় করবার উদ্দেশ্যেই তাদের এই খাতির! বিদেশী যদি সেটি না কেনে, তাহ'লে তার ভয়ানক অপরাধ করা হবে; আর সেদেশে তার মোটেই

খাতির থাকবে না, বিদেশী যদি নগদ টাকা দিতে না পারে, তাহ'লে তার কাছে দু'এক বোতল ভাল মদ কিম্বা অন্য

লাজ্ যাশ্।

কিছু পেলেও তারা খুসী হয়ে যায়। তবে কি না নগদ টাকাটাই তারা পছন্দ করে বেশী। তাদের দেনা-পাওনা,

তাইগ্রের তরুণী রূপসী।

কার-কারবার সমস্তই সেই জন্যে নগদ টাকাতেই চলে,——

নোট ফোটের তারা কেউ ধার ধারে না। জার্ম্মাণ যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত সে দেশে অষ্ট্রীয়ার তৈরি সেই মেরীয়া থেরেসা রাণীর

আবুনা।

আমলের পুরানো টাকাই চলিতেছিল। সম্প্রতি সম্রাট

নৃত্য-স্বয়ম্বর।

মেনেলেকের মুদ্রা 'তালারী' চালাবার চেষ্টা হ'চ্ছে। তা'ছাড়া, বন্দুকের টোটা আর নুনের বাটও বিনিময়ে জিনিস কেনবার পক্ষে টাকার মতই মূল্যবান বিবেচিত হয়। নুনের বাটগুলো সাধারণতঃ চার ইঞ্চি লম্বা আর আধ ইঞ্চি মোটা।

পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকগণের নৃত্যোপাসনা।

শিশুদের ধর্ম্ম-শিক্ষা।

তোমাকে 'ছাড়পত্র' নিতে হবে; নইলে কখন যে তোমাকে গ্রেপ্তার ক'রবে কিম্বা তাড়িয়ে দেবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আবিসিনীয়ার অধিবাসীরা নিজেদের 'এথিয়োপীয়ান্' বলেই পরিচয় দেয়। আবিসিনীয়ান অর্থে মিশ্র জাতি বোঝায় বো'লে, তারা 'আবিসিনীয়ান' নামটা মোটেই পছন্দ করে না; অথচ সেদেশের অধিবাসীদের মত মিশ্র জাতি বোধ হয় পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। মিশর, গ্রীস, সীরিয়া, হল্যাণ্ড, আরব, ভারত—

গাধার পিঠে চড়ে বেড়ানো সেদেশে মোটেই লজ্জাকর ব্যাপার নয়। গাধার পিঠে থলে বোঝাই নুনের বাট নিয়ে সেদেশের অনেক ধনী ঘুরে বেড়ায়; পথে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি এলেই তাদের এই ধনসম্পদ গলে গিয়ে, নিঃস্ব হবার সম্ভাবনাও থাকে খুব বেশী।

আবিসিনীয়ায় 'ছাড়পত্র' নিয়ে বিদেশীকে এত ভুগ্‌তে হয়, যেন ঠিক সেটা একটা কোনও আধুনিক সভ্য দেশ! সেখানে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ঢুকতে গেলেও

হাব্‌সি তাঁতি।

বীর-প্রসবিনী হাড়ার-রমণী।

ক্রীতদাসীরা রক্তাক্ত পশুমাংস তাদের সাম্‌নে এনে ধরে। মাংস খাবার আগে তারা একবার তরবারি উন্মোচন করে রাজাকে অভিবাদন করে নেয়। তার পর সেই ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীর আনীত কাঁচা মাংসে এক-একজন করে এক-একটি প্রচণ্ড কামড় দিয়ে যতখানি পারে কাঁচা মাংস দাঁতে কেটে নিয়ে ভোজন করে। এক-একটা এই রকম ভোজে এত কাঁচা মাংস খরচ হয় যে, শুন্‌লে আমাদের বিশ্বাস হবে না! কাঁচা মাংস ভোজনের দরুণ তাদের অনেকেই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়।

মদ খেতে ওরা খুবই ভালবাসে। মদ ওখানে মধু থেকেই তৈরী হয়। সে মদ খেতে তেমন ঝাঁঝালো নয়; কিন্তু খেতে-না-খেতেই চট্‌ করে নেশা ধ'রে যায়। নর-মাংস খাওয়ার প্রথা পূর্ব্বে ওখানে খুবই ছিল,—এখন উঠে গেছে বলে শোনা যায়। আবার এও শোনা যায় যে, রাজধানী থেকে অনেক তফাতে কোন-কোনও বর্ব্বর গাঁয়ে না কি এখনও এ খাদ্য অপ্রতুল হয় নি!

হাব্‌সি মেয়েরা খুব কর্ম্মিষ্ঠা। ভোর বেলা উঠে, স্বামীর শয্যা-ত্যাগের পূর্ব্বেই সমস্ত গৃহ-

সকল দেশের সংমিশ্রণে সেখানে এক বিরাট বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হয়েছে। নিগ্রোর চাইতে কালো, কাফ্রির চাইতে কুৎসিৎ চেহারা থেকে সুরু করে, সেদেশে কার্ত্তিকের চেয়ে সুশ্রী সুকান্ত ও কামদেবের মত সুন্দর সুপুরুষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমাদেরই মত, য়ুরোপীয়দের তারা যেন ঘৃণার সঙ্গে 'লালমুখো' বলে উল্লেখ করে,—ঠিক যেমন ইংরেজ দেখ্‌লে আগে বোয়াররা 'রক্ত-গ্রীব' (Red Necks) বলে উপহাস ক'রতো।

তাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে—কাঁচা মাংস। একটা কোনও আমোদ-প্রমোদ কি উৎসব উপলক্ষে, কম্বা রাজ-প্রাসাদে ভোজ-টোজ থাকলে, নিমন্ত্রিতেরা সকলে বাড়ীর উঠানে মেঝের উপর বিস্তৃত আসনে এসে বসে; আর

চারণ কবির দল।

(হাব্‌সি চারণ-কবিরা বীণা ও বল্লকীর সাহায্যে স্বদেশের কীর্ত্তি-গান গাইছেন)

কর্ম্ম শেষ করে ফেলে। তার পর স্বামীর সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করতে যায়। পরিবারের মধ্যে তাদের তেমন সম্মান নাই; বরং নারীর প্রতি সেখানে গৃহপালিত পশুর মতই আচরণ করা হয়। কোনও রকম আমোদ-আহ্লাদে তারা যোগ দিতে পায় না। তবে সাজ-গোজ, পোসাক-পরিচ্ছদের প্রতি তাদের খুব ঝোঁক। সকল দেশের নারীর মতই সেদেশের রমণীরাও কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা করে। হাতের ও পায়ের নখ তারা রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে রাখে। দাঁতগুলি মুক্তোর মত ঝক ঝক করবে বলে তারা দাঁতের মেড়েতে কালো রং লাগায়। ভ্রূদ্বয় কাজল দিয়ে এঁকে ধনুকের মত টানা ও সুন্দর করে রাখে। বক্ষস্থল, গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে উল্কী আঁকা থাকে। গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করবার তাদের খুব সখ।

চৌদ্দ পনেরো বছর বয়স হ'লেই তাদের বিবাহ হয়ে যায়। বাপ-মা কিছু টাকা পেলে কিম্বা গরু ভেড়া পেলেই তার পরিবর্ত্তে কন্যার পাণীপ্রার্থীকে মেয়ে বিক্রয় করে দেয়। পুরোহিতের সাহায্যে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী পতির সহিত সহবাস করা সেদেশের একটা ধর্ম্মানুমোদিত কল্যাণ প্রথা। ভাইয়ের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করা সেদেশে আইনসঙ্গত।

সেখানে মৃত ব্যক্তিদের কবর দেওয়া হয় ও শোক-চিহ্ন স্বরূপ তার আত্মীয়েরা মস্তক মুণ্ডন করে।

সামান্য লোক।

(হাবসির দেশে নিয়ম হচ্ছে, যার সঙ্গে যত বেশী অনুচরবর্গ থাকবে সে তত বেশী মাননীয় লোক। এ ক্ষেত্রে লোকটির মাত্র একজন অনুচর থাকায় সে একজন সামান্য লোক বলেই গণ্য।)

ঢেঁকি কোটা।

প্রতি বুধবার ও শুক্রবার ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা অনেকে উপবাস করে। চৈত্র ও বৈশাখ এই দুমাস ভোর তারা দিনে কিছু খায় না এবং উপাসনা ক'রে দিনাতিপাত করে।

আবিসিনীয়ার সীমান্ত প্রদেশে এক দুর্দ্দান্ত জাতের বাস আছে। তাদের পৌরুষের পরিচয় হ'চ্ছে, কে কটা মানুষ মারতে পেরেছে। যে যত বেশী মানুষ মারতে পারে, সে তত বড় বীর। প্রত্যেক খুনের জন্য তারা সর্দ্দারের কাছ থেকে তাদের সড়কীতে পরাবার জন্যে এক-একটা পেতলের আংটা পায়। সুরাহার মধ্যে এইটুকু যে, তারা স্ত্রীহত্যা না ক'রে কেবল পুরুষ মানুষই

মান্দর। তবে ছেলে-বুড়ো বাছে না কিন্তু! এমন কি, এ-ও শোনা গেছে যে, কখন-কখনও গর্ভিণীর গর্ভে পুংশিশু থাকতে পারে এই আশায় তারা কেউ-কেউ গর্ভবতী নারীকেও হত্যা করেছে!

হাতী কিম্বা সিংহ মারতে পারলেও হাবসিদের বংশ-মর্য্যাদা বেড়ে যায়। সিংহ কিন্তু সেদেশে নেহাৎ ভালমানুষ। পথে উটের গাড়ী বা ঘোড়া আসছে দেখলে, আস্তে-আস্তে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। তবে ওদেশের হাতীগুলো বটে ভারি চালাক। শুধু-হাতে কোনও লোক আসছে দেখলে গ্রাহ্যই করে না; কিন্তু বন্দুক-হাতে লোক দেখলেই টেনে দৌড় মারে।

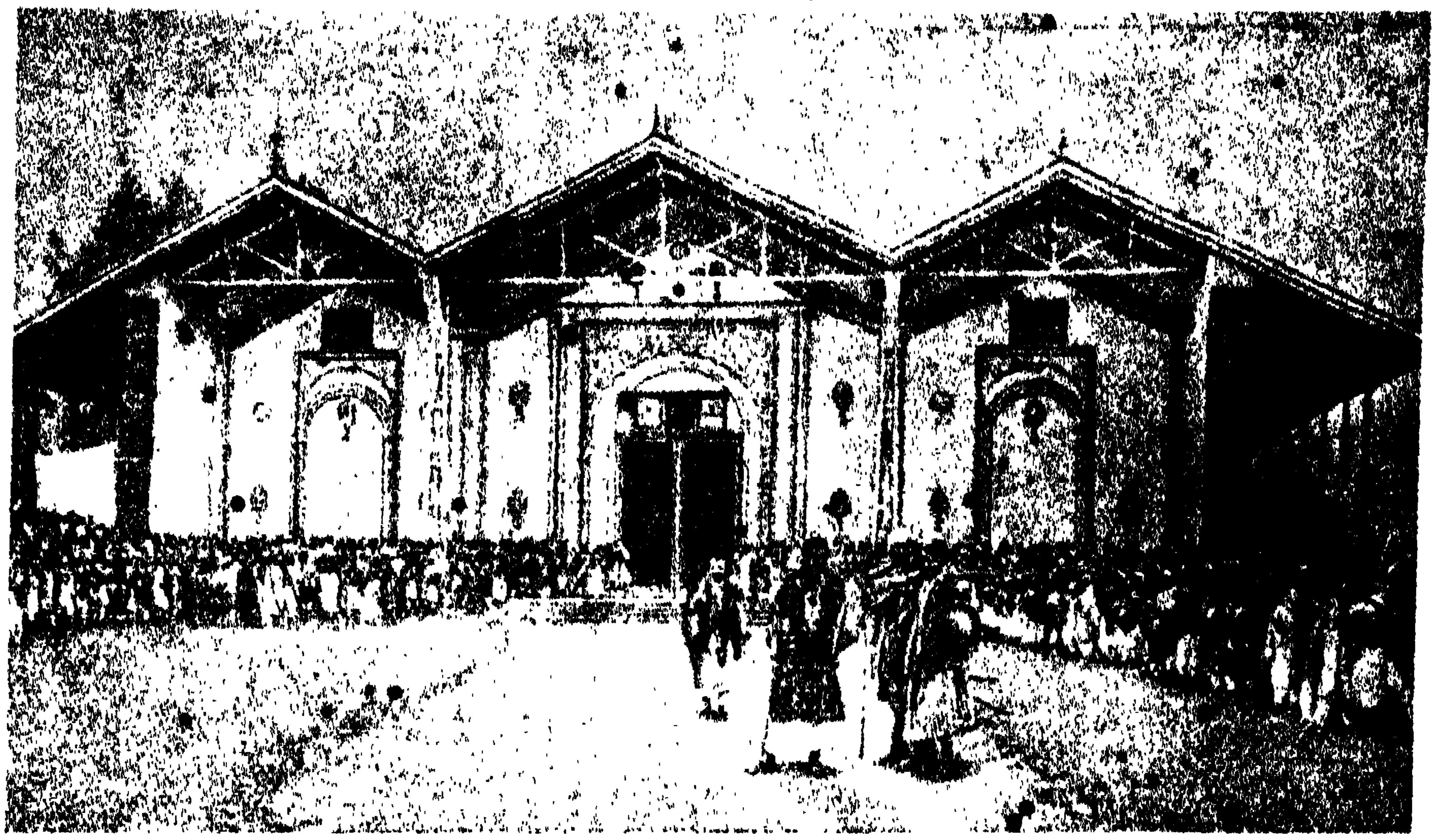

রাজপ্রাসাদে বিরাট ভোজ-উৎসব।

(এই ভোজে রাজার প্রায় চার হাজার সৈন্য নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছে। ঝুড়ি ক'রে রুটীর বোঝা, বড় বড় বার-কোষ ক'রে কাঁচা গো-মাংস এবং শৃঙ্গ-পাত্রে এদের মদ বিতরণ করা হবে। তিন ঘণ্টা ধরে এরা এই কাঁচা মাংস আর মদ খেয়ে মত্ত অবস্থায় গৃহে ফিরবে!)

হাবসিদের পোষাক।

(হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত ঝোলা পিরাণ, পায়জামা-পরা, গায়ে একখানা ক'রে 'শামা' [এক রকম লম্বা চওড়া মোটা আলোয়ান।] মাথায় টুপী নেই, পায়েও জুতো নেই।)

প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে বটে; কিন্তু তেমন একটা কোনও চিত্ত-বিস্ময়কারী শোভা নেই। কোথাও কেবল ধূ ধূ ক'রছে বালি। কোথাও চলেছে কেবল ঢেউ-খেলানো উঁচু-নীচু জমী। কোথাও শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্র, কোথাও বা বনরাজি-নীলা কাননভূমি। একটা পল্লী হয় ত পাহাড়ের কোলে সমতল ভূমির উপর; তার পরের পল্লীটাই হয় ত একেবারে পাহাড়ের মাথায় দশহাজার ফিট উঁচুতে! এই জন্যে দিনে-রাতে

হাব্‌সির পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকগণ

হাব্‌সিদের গীর্জ্জা বা উপাসনা-মন্দির।

হাবসি রমণী।

জেদীতু। বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞী।
(মেনেলেকের কন্যা। ইনি লীজ য়াশুকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে পিতার সিংহাসন অধিকার ক'রেছেন)

আসামী ও ফরিয়াদী।

(সমস্ত আবিসিনীয়ার মধ্যে একটা মাত্র জেল, কাজেই জেলে স্থানাভাব, সুতরাং আসামী পাছে পালায় এইজন্য নিয়ম হ'চ্ছে আসামীকে ফরিয়াদীর সঙ্গে এক চেনেই বেঁধে রাখা)।

গাল্লা-রমণী।

(হাবসি-গাল্লারা খৃষ্টান বটে; কিন্তু পুতুল পুজোও ক'রে। এরা স্ত্রী-পুরুষ খুব জোয়ান।)

(হাবসিদের দেড়শ' পরবের মধ্যে এই ক্রুশোৎসব পর্ব্বই সর্ব্বপ্রধান। এই দিন সমস্ত পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকেরা নূতন বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে রাজার সম্মুখে নৃত্য ক'রে।)

গোপনে আহার।

(পথিমধ্যে কোথাও ভোজন ক'রতে হলে হাবসিরা 'শামা' মুড়ি দিয়ে খায়, পাছে ডাইনেতে তাদের আহারে দৃষ্টি দেয়!)

ছেলের গলায় মাদুলী।

(আধি-ব্যাধি, মৃত্যু, দুর্ঘটনা, বিপদ ও অপদেবতার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তারা আমাদের দেশের মতই অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে ছোট ছেলে-মেয়েদের কবচ মাদুলী প্রভৃতি পরায়।)

ঘনঘন এদেশের আবহাওয়া বদ্‌লে যায়। দিনের বেলা যেদিন যেখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম বোধ হচ্ছিল, সেইদিনই সূর্য্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গে হয় ত সেখানে বরফের মত ঠাণ্ডা শীত। রাস্তা-ঘাট তেমন সুবিধের নয়। উটের গাড়ীর চলাফেরায় যে পথটুকু হ'য়েছে, তাই সেখানকার ভরসা। নদীর ওপোর কোথাও কোনও পোল বা সাঁকো বাঁধা নেই। নদীগুলো সমস্তই হেঁটে কিম্বা ঘোড়া বা উটের পিঠে চড়ে পার হ'তে হয়। প্রত্যেক নদীতেই

খৃষ্টীয় বারুণী উৎসব।

('শোয়া'-ধর্ম্মমন্দিরের প্রধান পুরোহিত এই দিন সমবেত সমস্ত যাত্রীদের জল মন্ত্রপূত ক'রে দেন। হাবসী খৃষ্টানদের বিশ্বাস দৈবশক্তিসম্পন্ন

হাবসী নরনারীর জনতা।

হাবসী ক্রীতদাসী।

ফুজাই উজী রমণী।

(এদের কেশ-প্রসাধনের এক অদ্ভুত বিশেষত্ব এই যে, প্রকাণ্ড এক হাল্কা কাঠামোর ওপোর আঠা দিয়া এরা মাথার চুলগুলো এঁটে একটা মস্ত টুপীর মত করে রাখে।)

হাবসী নিগ্রোর দল।

(এই অতিকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোর দল নীল নদের জঙ্গল থেকে তাদের দীর্ঘ তীক্ষ্ণ বর্ষার জোরে আবিসিনিয়ায় এসে ঢুকেছে। হাবসীর দেশে তাদের নাম হয়েছে জাম্বো!)

হাব্‌সি সৈনিক।

দীক্ষা-উৎসব

(কেউ সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ ক'রলে একটা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। সেই উৎসবে হাবসীরা ঢাল তরোয়াল বাজিয়ে পুরোহিতদের সঙ্গে নৃত্য করে।)

কুমীর, হিপোপোটামাস্, আর জোঁকের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব! এক-একটা নদী এমন খামখেয়ালী যে, অজানা লোকের পক্ষে সে নদী পার হ'তে যাওয়া মানে মৃত্যুর মুখে পা বাড়ানোর সঙ্গে সমান। এই দেখ্‌ছো হয় ত এমন একশ গজ চওড়া এক নদীর বুকে জলের বদলে কেবল বালির ফরাশ বিছানো রয়েছে; তারই একপাশ দিয়ে হয় ত সূতোর মত একটু জলের ধারা ঝির্ ঝির্ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে। তার পরক্ষণেই হঠাৎ একেবারে 'উত্তাল তরঙ্গময়ী ফেনিল' প্রবাহ মূর্ত্তি ধরে ছুটে এসে বড়-বড় গাছপালা, গরু, মেষ প্রভৃতি ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। বসন্ত কালটাতেই এই রকম ব্যাপার প্রায়ই ঘটে; এবং অনেক অনভিজ্ঞ যাত্রী নদীর এই অতর্কিত পাগলামীর মুখে প্রাণ হারায়!

একজন সামান্য হাব্‌সী সর্দ্দার।

(কারণ এর অনুচর মাত্র জন দশ-বারো! অন্ততঃ শতাধিক অনুচর সঙ্গে না থাকলে সে বড় সর্দ্দার হ'তে পারে না।)

জলের অভাবে সেখানে নীচু জমীতে চাষবাসের বিশেষ ক্ষতি হয়। স্থানে-স্থানে কূপ খোঁড়া আছে বটে; কিন্তু তাতে হয় ত যৎসামান্য লোণা জল থাকে,—তাও আবার উট কিম্বা ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট করা! কোন-কোনও কূপ হয় ত শুখিয়েই গেছে। সেখানে আবার হাতখানেক কি হাত দুয়েক বালি খুঁড়ে গর্ত্ত করলে, তবে ছটাকখানেক জল পাওয়া যাবে! পাহাড়ের ওপারের উচু জমীতে কিন্তু জলের কষ্ট একেবারেই নেই। সেখানে ছোটখাটো নদী আর ঝরণার একেবারে ছড়াছড়ি! এই জন্যে সেখানকার জমী এত উর্ব্বরা যে, বিনা পরিশ্রমেই সেখানে অপর্যাপ্ত ফসল ফলে! আবিসিনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে কফী, মক্কা প্রভৃতি আপনিই প্রচুর জন্মে। কাউকে চাষ করতে হয় না। এখান থেকে অনেক মাল সুডান আর এডেন বন্দরে চালান যায়।

গো, অশ্ব ও মেষ প্রভৃতি পশু এবং শস্য এখানে এত প্রচুর যে, কেউ তাদের বিশেষ যত্ন করে না। এখনও বুনো ঘোড়ার দল সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পথে যেতে-যেতে

কেশরী বিক্রম !

(ইনি অনেকগুলি সিংহ বধ করেছেন। কবি আর গায়কেরা এঁর যশঃ গানে পল্লীপথ মুখরিত ক'রে তোলে। এঁর মাথায় সিংহ-কেশরের মুকুট !)

সিংহজয়ী ও পুরুষবিনাশী বীর।

(এঁর হাতে স্বকরে নিহত সিংহের দু'টী শাবক রয়েছে। ইনি কিন্তু সিংহের চেয়ে পুরুষ বধ ক'রতেই ভালবাসেন।)

দু'... কত মরা উট, ঘোড়া প্রভৃতির কঙ্কাল পড়ে আছে, দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মাছির উৎপাত এখানে এত বেশী যে, আবিসিনিয়ায় একবার না গেলে সেটা কারুর ঠিক ধারণাতেই আস্‌বে না! সেখানে দু'টি বেলা খেতে বসা মানে মাছির সঙ্গে অবিশ্রাম লড়াই করা! একটা কোনও গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যাবার সময় যদি দেখো কোথাও জমীর ওপোর খানিকটা কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জমে আছে, তা হ'লে বুঝতে হবে যে, সেখানে নিশ্চয় ...দশ লোক দাঁড়িয়ে আছে! সেখানে প্রত্যেক লোকই মাথায় ...া মাখন মাখে। একটা কালো মাছির ঝাঁক নিয়ে বেড়াচ্ছে বলে মনে হবে! মাছির উৎ সেখানে কুচি ছেলেমেয়েদের প্রায়ই চোখে ব্যায়রামে ভুগ্‌তে হয়।

বিবাহ-প্রথা সেখানে রয়েছে বটে, কিন্তু সে এখনও সেই পৃথিবীর আদিম যুগের বর্ব্বর প্রথার মতই; অর্থাৎ মূল্য দিয়ে পত্নী সংগ্রহ ক'রতে হয়। কেউ বা নগদ টাকা দেয়, কেউ বা বধূর মান-মর্য্যাদা ও সৌন্দর্য্য অনুসারে গরু, ভেড়া প্রভৃতি পশু যৌতুক দিয়ে তবে পত্নী লাভ ক'রে। অনূঢ়া কন্যা কুলটাবৃত্তি ক'রছে, এরূপ ঘটনা সেখানে বিরল। কিন্তু বিবাহিতা নারীর সেখানে দ্বিচারিণী হওয়া যেন একেবারে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার! ওটাকে সে দেশের স্বামীরা কোনও অপরাধের মধ্যেই গণ্য করে না! তাদের কাছে স্ত্রী খুব কাজের লোক হ'লেই যথেষ্ট! ক্ষেতের যা কিছু খাটুনীর বোঝা, সে সমস্তই স্ত্রীকে বইতে হয়। ক্ষেতে অনেক সময় দেখা যায় যে, যার দুটো ঘোড়া জোটে নি, সে লাঙ্গলের একদিকে একটা ঘোড়া এবং আর একদিকে তার স্ত্রীকে যুতে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে চাবুক হাঁকড়ে জমী চাষ ক'রছে! কারুর স্ত্রী যদি অকর্ম্মণ্য বা স্বামীর মনের মত না হয়, তাহ'লে স্বামী তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে পরিত্যাগ করতে পারে; তবে সে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্ত্রীকে কিছু মোটা রকম টাকা দিতে হয়। সেদিনও পর্য্যন্ত হাব্‌সীর দেশ থেকে আরব ও তুর্কীর সহরে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর চালান যেতো;—সম্প্রতি সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গোপনে এখনও দাসদাসীর ক্রয়-বিক্রয় সেখানে চলে; এবং যারা এই ব্যবসা চালায়, তারা বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জ্জন করে।

মেনেলেক্ নামে আবিসিনিয়ায় যিনি ভূতপূর্ব্ব রাজা ছিলেন, তিনি নিজেকে এথিওপীয়ার রাজ-রাজেশ্বর ব'লে

সাক্ষাৎ বংশধর ব'লে নিজের পরিচয় দিতেন। মেনেলেকের মৃত্যুর পর তাঁর পোষ্যপুত্র লীজযাশু সম্রাট হয়েছিল। কিন্তু সে খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় অনেকের বিরাগভাজন হওয়াতে শীঘ্রই রাজ্যভ্রষ্ট হয়। এখন আবিসিনিয়ার এক-এক প্রদেশের এক-এক রাজা স্ব-স্ব-প্রধান হ'য়ে উঠেছে। তাদের শাসন যথেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র। প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ-হাঙ্গামা লেগেই আছে। অনেক লড়াই করে তবে মেনেলেকের মেয়ে জৌদীতু এখন সম্রাজ্ঞী হয়েছে। বাঘছাল পরে, ঘোড়ায় চড়ে তারা লড়াই করতে যায়। প্রত্যেক বিদেশীর কাছ থেকেই তারা কিছু কর আদায় করে। সিংহাসন আর রাজছত্রের সেখানে খুব সম্মান। একজন ফরাসী প্রতিনিধির সেখানে বিশেষ প্রতিপত্তি হয়েছিল; কারণ, তিনি বুদ্ধি করে একখানি সিংহাসন তৈয়ারী ক'রে রেখেছিলেন। যখনি কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আস্‌তো, তিনি সেই সিংহাসনে বসে তার সঙ্গে দেখা ক'রতেন। কাজেই তাঁর খাতিরটা খুব বেড়ে গেছ্‌ল।

ধর্ম্মমন্দিরের যিনি প্রধান পুরোহিত, তাঁকে সেদেশে 'আবুনা' বলে। তাঁরও সেখানে খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি। তিনি এক জমকালো পোষাক প'রে রাজার মত সিংহাসনে বসে থাকেন। তাঁর একহাতে মূল্যবান জহরতের মালা ও ধর্ম্ম-পুস্তক, এবং আর এক হাতে পাপ-পুণ্যের শাসনদণ্ড। পায়ের তলায় দামী পারস্য দেশ-জাত কার্পেট পাতা। গলায় হাতীর দাঁতের উপর সোণা-রূপোর কাজ-করা 'ক্রুশ-চিহ্ন'; কারণ, সেখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী। তাদের উপাসনা মানে গীর্জ্জের মধ্যে জড় হয়ে সকলে এক-সঙ্গে নৃত্য করা। নাচবার সময় পুরোহিতদের সকলের হাতে একগাছা ক'রে লম্বা ছড়ি থাকে! সেই যাদু-প্রভাবের উপর তারা এখনও খুব আস্থাবান।

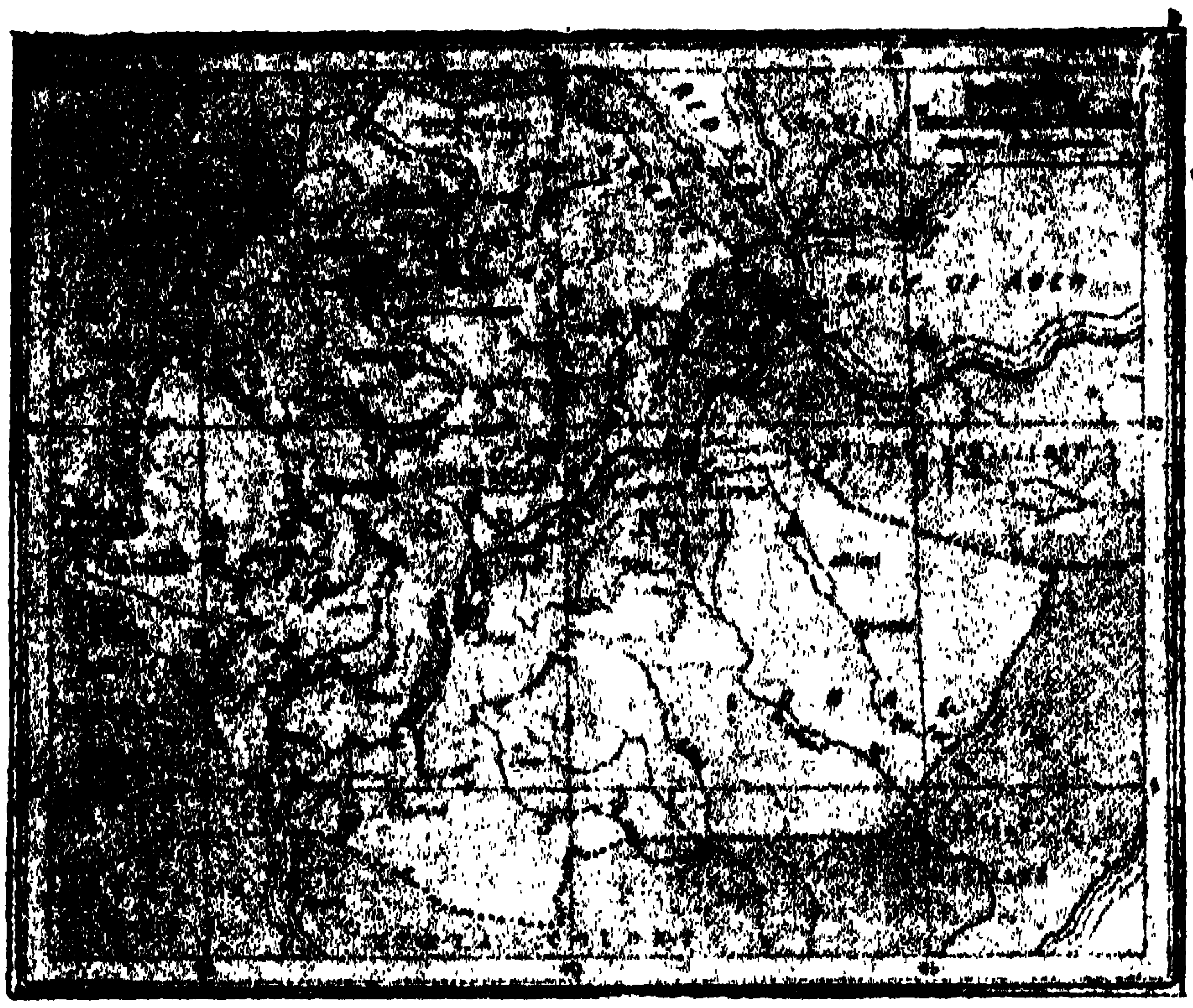

আবিসিনিয়ার মানচিত্র।

ছড়ি তারা নাচের তালে-তালে ক্রমাগত মাটিতে ঠোকে! নাচের সঙ্গে ঢোল আর বাঁশী বাজতে থাকে।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিল; কিন্তু পরে খৃষ্ট-ধর্ম্মের বিধি-নিয়ম পরিত্যাগ ক'রে তারা যথেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছিল। হাব্‌সীদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ও অনেক আছে। দীর্ঘকাল মুসলমান শক্তির অধীনে থাকায় এবং মিশরীয় সংস্পর্শের প্রভাবে তারা ঈজিপ্টের প্রাচীন কপ্ট জাতির ধর্ম্মানুশাসনের অনুসরণ ক'রে চ'লতে শিখেছিল। এখনও তাদের ধর্ম্মমন্দিরসমূহের প্রধান পুরোহিত মিশরীয় মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্য হ'তেই নির্ব্বাচিত হয়। তা ছাড়া, তাদের প্রতিবেশী নিগ্রোদের কতকগুলো অন্ধ কুসংস্কারও তাদের যেন একেবারে মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে পড়েছে। যদিও দেশের অধিবাসীদের প্রায় এক পঞ্চমাংশ সন্ন্যাসব্রতাবলম্বী, তা সত্ত্বেও তারা সেই আদিম যুগের মূর্ত্তি-পূজার অভ্যাস ছাড়তে পারে নি, এবং মন্ত্র-তন্ত্র ও এর ওপোর আবার ওদেশের খানিকটা দিনকতক য়িহুদী-প্রধান হয়ে উঠেছিল বলে যীশু ও যীহোবা উভয়েরই বিশ্রাম দিন তারা এখনও পর্য্যন্ত [illegible] চলে। আবার তাদের ছেলেদের 'সুন্নৎ'ও হয়; এবং তারা পশুপক্ষীর কোর্ব্বাণীও করে। বছরের মধ্যে তাদের প্রায় দেড়শো পর্ব্ব-দিন আছে; কাজেই সেখানকার লোকদের সারা বছর ধরে নাগাড়ে খাটতে হয় না। পুরোহিত বা ধর্ম্ম-যাজকেরা সকলেই বিবাহিত লোক। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিনীর দলও আছে যথেষ্ট। তারা সকলেই বিভিন্ন মঠে বা আশ্রমে বাস করে। এক-একটা মঠ বা আশ্রমের যে দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। তার আয়ও অনেক। শ্বেতাঙ্গ মিশনারীদের ওপোর তারা অত্যন্ত বিমুখ। তারা বলে যুরোপীয়েরা কোনও দেশ দখল

কর্ত্তার আগে, প্রথমে মিশনারী পাঠায়। তার পর তাদের প্রতিনিধি আসে। তার পরই তাদের সৈন্য-সামন্তরা এসে পৌঁছে। সেই জন্যে মিশনারী দেখলেই তারা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারের তারা ভারি খাতির করে; কারণ, তাদের দেশে ডাক্তারের একান্ত অভাব। আবিসিনীয়া ভ্রমণ করে আস্‌তে হ'লে, ডাক্তার সেজে যাওয়াই সব চেয়ে সুবিধে।

দেশ। আবিসিনিয়ার পরিমাপ তিনলক্ষ পঞ্চাশহাজার বর্গ মাইল। ন'টি প্রদেশে বিভক্ত—হাড়ার, ওল্লো, কাস্‌সা, মাসী, গোড়, তাইগ্রে, গোজাম, গোন্দাড়, জীম্মা। লোকসংখ্যা আশী লক্ষ। উল্লেখযোগ্য সহর ছ'টা, রাজধানী—আঙ্গীস্ আম্বাবা' হাড়ার, আক্‌সাথ, আপোয়া, গোন্দার, আঙ্কোবার।

রাজতন্ত্র। আবিসিনিয়ার মধ্যে তিনটি রাজ্য আছে, তাইগ্রে, আমহারা আর শোয়া। এই তিন রাজ্যের ওপোর আবার এক সম্রাট আছেন; তাঁর খেতাব হচ্ছে, 'নেগুস্-নেগুস্তী' অর্থাৎ রাজ-রাজেশ্বর। উপস্থিত শোয়া-রাই সেখানে প্রধান, তারাই এমন রাজরাজেশ্বরের জাত। শাসন-কার্য্য একমাত্র রাজতন্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

সৈন্যবল। শোয়ারা সকলেই বীরের জাত। যোদ্ধার কাজ ছাড়া অন্য কাজ করতে তারা ঘৃণা বোধ করে! উপস্থিত সৈন্যসংখ্যা প্রায় তিনলক্ষ হবে।

ব্যবসা বাণিজ্য। কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু তবু এখনও চাষের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয়নি। কফি আর তুলো সেখানে জঙ্গলের মত আপনা আপনিই অজস্র জন্মায়। আখ, খেজুর আর আঙ্গুরও সেখানে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। চামড়া, গম, বার্লী, তামাক পাতা প্রভৃতিরও ব্যবসা আছে।

আগম-নিগম। এডেন উপসাগরস্থ জীবুতি সহর থেকে আঙ্গীস্-আম্বাবা পর্য্যন্ত রেলপথ আছে। আঙ্গীস-আম্বাবার চতুঃপার্শ্বে কয়েক মাইল পাকা রাস্তা আছে। আসাব আর মাস্‌সাবা বলে ছ'টা বন্দর আছে। হাড়ার প্রভৃতি কয়েকটা বড় বড় সহরের সঙ্গে জীবুতি পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের যোগ আছে।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

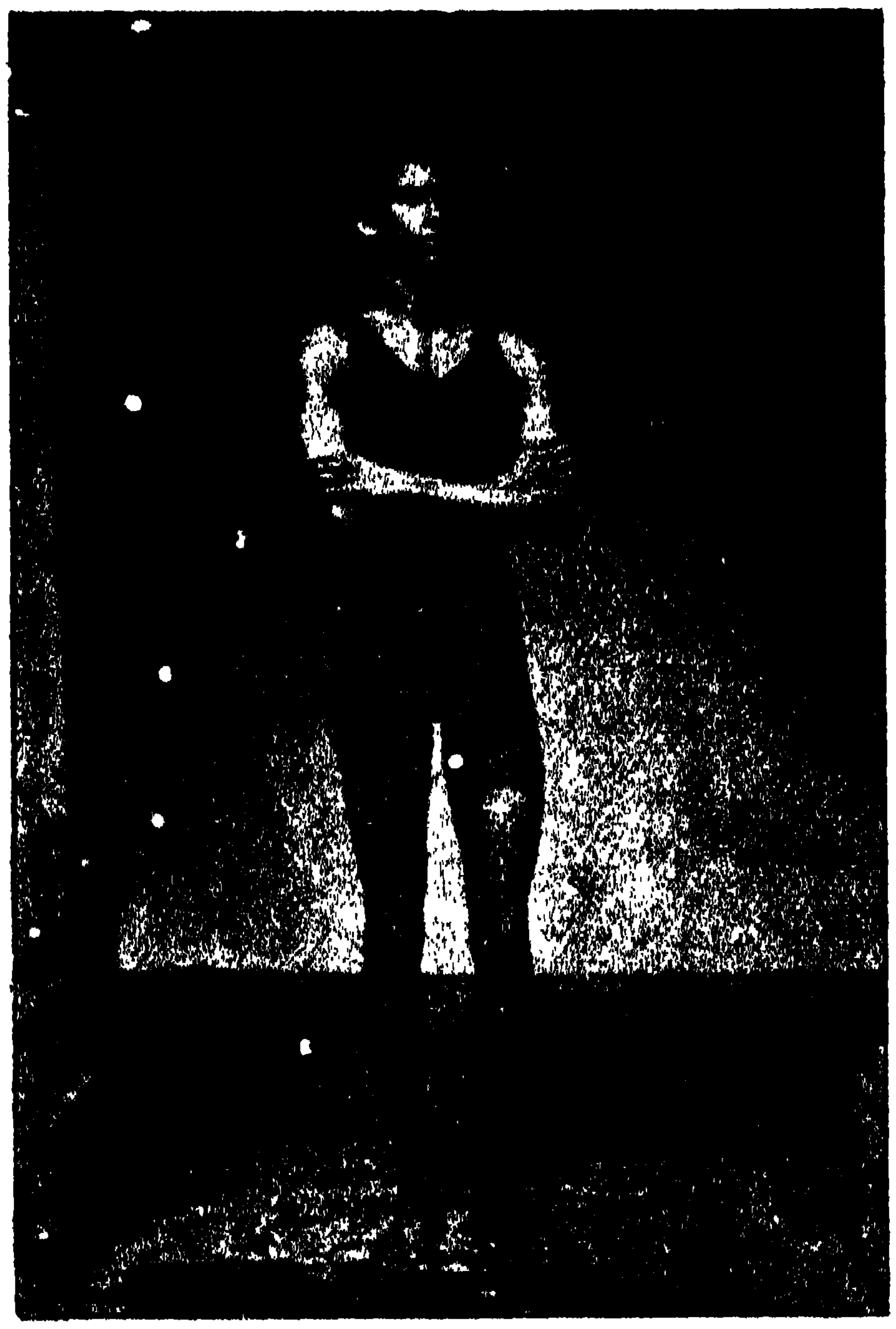

শ্রীমান [illegible]

[ইনি চন্দননগর হইতে আহীরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত ২২ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সাঁতার কাটিয়া এই ২২ মাইল পথ অতিক্রম করিতে তাঁহার ৪টা ২৪ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। শ্রীমানের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর।]

তৃপ্তি

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

নিল সরমের বাঁধ টুটি
মরমের চাঁদ, ঠাঁই—
আকাশে
ছিল প্রেমে মোর কোন্ ত্রুটি
বুকে ঢাকা নিধি তাই
রাকা সে।
তার হৃদয়ের সব আশা
মিটে যদি তারকার
স্বজনে
আর কাজ নাই ভালবাসা
থাক্ দূরে, দেখি শুধু
নয়নে।

সাইকেলে কলিকাতা হইতে কাশী

সাইকেল আরোহীবৃন্দ।

দণ্ডায়মান—বাম দিক হইতে—

শ্রীমান সৌরীন বসু (ক্যাপ্টেন) শ্রীমান কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীমান সত্যেন বসু ;
শ্রীমান মনোমোহন বসু ; শ্রীমান শৈলেন বসু ; শ্রীমান সত্যেন দে ।

উপবিষ্ট—বাম দিক হইতে—

শ্রীমান দেবব্রত চক্রবর্ত্তী ; শ্রীমান প্রকাশ দত্ত ; শ্রীমান নিম্মল দে ।

রোজনামচা

১১ই অক্টোবর। ভোর ৪টার সময় কলিকাতা হইতে যাত্রা। হাবড়ায় ৫—১৫ পর্য্যন্ত আটক। চুঁচুড়ায় প্রাতঃভোজন। বর্দ্ধমান সন্ধ্যা ৬টা। 'রায় সাহেব শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের বাটীতে নৈশ-ভোজন ও রাত্রিবাস।

১২ই অক্টোবর। বেলা ২টার সময় বর্দ্ধমান হইতে যাত্রা। সন্ধ্যা ৭টার সময় ফরিদপুর থানায় আগমন। সব-ইন্স্পেক্টর বাবু সঞ্জীবচন্দ্র মল্লিকের আতিথ্য গ্রহণ।

১৩ই অক্টোবর। ভোর ৫টার সময় ফরিদপুর হইতে যাত্রা। রাণীগঞ্জে বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু রাধারঞ্জন চক্রবর্ত্তী স্বেচ্ছায় সাইক্লিষ্টগণকে মিষ্টান্ন ও ফল-মূলাদি ভোজন করান। বেলা ১টার সময় কুল্‌টিতে উপস্থিতি। বি, আই এণ্ড কোম্পানীর প্রধান মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার এ, সি, রায় মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ। কলিকাতা হইতে দূরত্ব ১৪৭ মাইল।

১৪ই অক্টোবর। ভোর ৫টার সময় কুল্‌টি হইতে যাত্রা। বেলা ৮টার সময় ধানবাদে উপস্থিতি। ধানবাদ কোর্টের উকীল মিঃ এ, সি, মুখার্জ্জি, ও কয়েকজন ইয়োরোপীয়ান ভদ্রলোক সাইক্লিষ্টগণকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া চা ও প্রাতর্ভোজন সরবরাহ করেন। বেলা ২টার সময় ধানবাদ হইতে যাত্রা। সন্ধ্যা ৬টার সময় পার্শ্বনাথ পাহাড়ের কাছে তোপচাঁচি বাঙ্গলোয় পৌঁছান।

[ছবিতে যে নয়জন আছেন, তদ্ব্যতীত শ্রীমান ক্ষীরোদ মল্লিক—মোট এই দশজন যাত্রা করেন। তোপচাঁচি

পর্য্যন্ত আসিয়া শ্রীমান ক্ষীরোদ মল্লিক অসুস্থ হইয়া পড়ায় সেখান হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।]

১৫ই অক্টোবর। সকাল ছয়টার সময় তোপচাঁচি পরিত্যাগ। পথে একটা ঘন অরণ্য সামনে পড়িয়া যাওয়ায় বেলা তিন ঘটিকার সময় শঙ্কর ডাক-বাঙ্গলোয় গতিরোধ। এখানে মাইল ষ্টোন অনুসারে কলিকাতা হইতে দূরত্ব ২৩৮ মাইল।

১৬ই অক্টোবর। রাত তিনটায় (বাঙ্গালা হিসাবে ১৫ই অক্টোবর) যাত্রা। সন্ধ্যা ৫টার সময় ৩০১ মাইল-ষ্টোনের নিকটে আহমাস ডাক-বাঙ্গলোয় উপস্থিতি।

১৭ই অক্টোবর। রাত তিনটার সময় আহমাস হইতে যাত্রা। ভোর ছয়টার সময় আরঙ্গাবাদে পৌঁছিয়া চা পান। বেলা ৮টার সময় যাত্রা। বেলা ১০ টায় সোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক। বন্যার জলে গাড়ীর পথে অবস্থিত পোলটি ভাসিয়া যাওয়ায় নৌকাযোগে সাইকেল লইয়া নদী পার। বেলা তখন ১২-৩০। ২টার সময় আবার যাত্রা। সন্ধ্যা ৬টার সময় সাসেরামে চা পান। নৈশ-ভ্রমণের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাত্রি ৮টার সময় যাত্রা। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ। পথে দু'দশ মিনিটের জন্য দুই একবার বিশ্রাম। ভোরবেলা মোগলসরাই। সেখানকার ইউরোপীয়ান ও ভারতবাসীগণ কর্ত্তৃক সমাদরে অভ্যর্থনা। ৯টার সময় হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন এঞ্জিনীয়ারিং হোষ্টেলে পৌঁছান। ছাত্রগণ সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সাইক্লিষ্টগণকে প্রাতর্ভোজন করান।

এই সাইক্লিষ্টগণ একটী ক্লাবের সদস্য। ক্লাবের নাম "Seven Cyclists." ঠিকানা—কলিকাতা কালিদাস সিংহের গলি, মীর্জাপুর।

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

সুইট অয়েল

বাজারে সুইট অয়েল নামে একটী জিনিস পাওয়া যায়। ইহার অপর এক নাম ওয়াচ অয়েল। জিনিসটি বিলক্ষণ দামী; অনেক শিল্প-কার্য্যে লাগে। ট্যাক ঘড়ি, ক্লক ঘড়ি প্রভৃতির সূক্ষ্ম কলকব্জায় এই জিনিস ব্যবহৃত হয়। ইহা আপনারা তৈয়ার করিতে পারেন।

প্রায় সকল প্রকার তৈল ও চর্ব্বি (oils and fats) জাতীয় পদার্থকে রাসায়নিক ভাবে বিশ্লেষণ করিলে তিন জাতীয় যৌগিক উপাদান (compounds) পাওয়া যায়; যথা, oleine, stearine ও margarine। এই তিনটি পদার্থে তিন রকম অম্লধর্ম্মী উপাদান আছে। তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে, যথাক্রমে, oleic acid, stearic acid ও margaric acid, এই তিন প্রকার অম্ল ছাড়া, ঐ তিন পদার্থে একটী সাধারণ জিনিস থাকে; তাহার নাম glycerine। তৈলের এই ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্ষার সংযোগে সাবান ও অন্য নানা প্রকার জিনিস প্রস্তুত করা যায়। ক্ষার অম্লের সহিত মিলিত হইয়া সাবানে পরিণত হইলে গ্লিসারিন পৃথক হইয়া পড়ে। আজ আমরা কিন্তু সাবান প্রস্তুত করিব না; আজ আমাদের কাজ sweet oil বা watch oil প্রস্তুত করা। এই জিনিসটি তৈয়ার করিতে হইলে, তৈলের ঐ অম্লধর্ম্মী গুণটির কথা জানা দরকার; তাই সে কথার আগে উল্লেখ করিতে হইল।

ঘড়ির অধিকাংশ কলকব্জাই পিতলের, এবং কিছু ইস্পাতের। কিছুদিন কাজ করিবার পর ঘড়ির একটা অবসাদ আসে,—সে ঠিক মত কাজ করিতে—সময় নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তখন তাহার কিছু সময় বিশ্রাম ও চিকিৎসার দরকার হয়। সেইজন্য আপনি ঘড়িটিকে হাসপাতালে অর্থাৎ ঘড়ি মেরামতকারকের কাছে পাঠাইয়া দেন। তিনি উহার চিকিৎসা করেন। কেমন করিয়া? না, ঘড়িটিকে পরিষ্কার করিয়া, উহার কলকব্জা ঝাড়িয়া পুঁছিয়া, ধূলাবালি ফেলিয়া দিয়া 'অয়েল' করিয়া দেন। ঘড়ি অয়েল করাই ঘড়ির চিকিৎসা এবং সেই 'অয়েল' জিনিসটি ঘড়ির অবসাদ-পীড়ার ঔষধ। ঘড়িওয়ালাদের অভিধানে সেই ঔষধটির নাম ওয়াচ অয়েল বা সুইট অয়েল।

সুইট অয়েল প্রস্তুত করিতে হইলে জলপাইয়ের তৈল বা oilve oilই প্রশস্ত। তৈল জাতীয় পদার্থের সঙ্গে অধিকাংশ ধাতুর একটা রাসায়নিক সংযোগ হইয়া থাকে। আপনি কোন পিতল কিম্বা কাঁসার পাত্রে খানিকটা ঘৃত রাখিয়া দিন, দুই-তিন দিন পরে দেখিবেন, ঘৃতের রংটি সবুজ হইয়া গিয়াছে। চলতি কথায় ইহাকে বলা হয়, ঘি কলুঙ্কে (কলঙ্কিত হইয়া অর্থাৎ রাসায়নিক ভাষায় মর্চ্চা ধরিয়া) গিয়াছে। সাধারণ তেল দিয়া ঘড়ি প্রভৃতি 'অয়েল' করিলে ঘড়ির পিতলের কলকব্জার সংস্রবে আসিয়া তৈলটি কলঙ্কিয়া যাইবে, এবং কলকব্জাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তৈলটিকে যদি আগেই কোন ধাতু দ্রব্যের সহিত কিছুদিন রাখিয়া উহার কলঙ্ক ধরাইয়া লওয়া হয়, এবং তার পর তাহার কলঙ্কিত অংশ বাদ দিয়া তাহাকে ছাঁকিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে যে পরিষ্কার তেলটুকু পাওয়া যাইবে, তাহাতে আর নূতন করিয়া কলঙ্ক ধরিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তখন তৈলটি নিরাপদে ঘড়িতে ব্যবহার করিতে পারা যাইবে। তখন ঘড়ির কলকব্জার সঙ্গে তৈলের আর কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হইবে না। তখনই উহার নাম হইবে sweet oil বা watch oil।

একটা চওড়া-মুখ শিশির ভিতর খানিকটা জলপায়ের তৈল রাখুন। সেই তৈলের ভিতর কিছু সীসক চূর্ণ (filings) রাখিয়া দিন। সীসার গুঁড়া বেশী হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু কম হইলে তৈলের সমস্ত অম্লধর্ম্মটুকু নষ্ট হইবে না। সাধারণতঃ যতটা তৈল লইবেন, সীসার চূর্ণ তাহার অষ্টমাংশের কম যেন কিছুতেই না হয়, বরং কিছু বেশী হইলে ভালই হয়। এই শিশিটিকে কয়েক দিন রোদ্রে ও শিশিরে অনাবৃত ভাবে রাখিয়া দিন। তাহা হইলে রৌদ্র ও শিশিরের সাহায্যে সীসা ও তৈলের অম্লাংশের রাসায়নিক মিলন উত্তম রূপে সম্পন্ন হইবে। শিশিটির উপর লক্ষ্য রাখিলে আপনি দেখিবেন, তৈলের উপর একটা পাতলা সর (বা স্তর) পড়িতেছে। ক্রমে ঐ সর শিশির তলায় থিতাইয়া যাইবে। যখন দেখিবেন আর সর পড়িতেছে না, এবং শিশির তলায় সমস্ত সরটুকু জমিয়া গিয়া উপরে পরিষ্কার তেলটুকু ভাসিতেছে, তখনই বুঝিবেন, রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। তখন তৈলটি বিশুদ্ধ জলের মত স্বচ্ছ ও খুব পাতলা দেখাইবে। এই স্বচ্ছ তেলটুকুই সুইট অয়েল। উহা খুব সাবধানে—যেন তলার থিতানি আন্দোলিত হইয়া তৈলের সঙ্গে আবার মিশিয়া না যায়—পিচকারীর সাহায্যে উঠাইয়া লইয়া অন্য একটা পরিষ্কার শিশিতে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিবেন, যেন উহাতে ধুলোবালি না পড়ে। সুইট অয়েল প্রস্তুত করিবার ইহাই মোটামুটি প্রথা। কিন্তু ঘড়ির কলকব্জা যেমন সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, সেজন্য সুইট অয়েল প্রস্তুত করিতে আরও একটু সতর্ক হইতে হইবে, এবং সূক্ষ্মতর প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করিতে হইবে।

ট্যাঁক ঘড়ির মত সূক্ষ্ম কলকব্জার উপযোগী একটি তৈল আবিষ্কার করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা ভাবিতে বসিয়া গেলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, মনে-মনে অনেক বিচার-বিতর্ক করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, তৈলটি এমন হওয়া চাই, যাহা ঘন হইয়া যাইবে না, শুকাইয়া যাইবে না, কিম্বা শীতে জমিয়া যাইবে না। কিম্বা ইহার উপর বায়ুর অর্থাৎ বায়ুস্থিত অম্লজানের কোন ক্রিয়া হইবে না। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও স্বাভাবিক অবস্থায় এমন কোন উদ্ভিজ্জ তৈল বা জান্তব চর্ব্বি পাওয়া গেল না, যাহাতে একাধারে এই কয়টি গুণ বর্ত্তমান আছে।

বাদাম তৈল (Almond oil) অনেকটা শৈত্য সহ্য করিতে পারে বটে, কিন্তু উহা বড় শীঘ্র oxidized হইয়া যায়।

ঢেঁড়ি বা পোস্তদানার তৈলের (Poppyseed oil) শৈত্য সহ্য করিবার শক্তি আরও একটু বেশী আছে বটে, এবং উহার উপর অম্লজানের ক্রিয়া বেশী নয় বটে, কিন্তু উহা শুকাইয়া যায়; সুতরাং উহা ট্যাঁক ঘড়িতে ব্যবহার করা চলিতে পারে না।

কেবল জলপায়ের তৈল কতকটা ঐরূপ গুণবিশিষ্ট, দেখা গেল। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ নহে। ইহা শীঘ্র শক্ত হয় না, শুকাইয়া যায় না, ঘন হয় না, দীর্ঘকালেও ইহার উপর অম্লজানের ক্রিয়া বেশী হয় না, এবং ইহার শৈত্য সহ্য করিবার শক্তি অপর সকল প্রকার তৈল ও চর্ব্বির অপেক্ষা অনেক বেশী। বাকী যে ত্রুটিটুকু ইহার ছিল, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা রাসায়নিক উপায়ে দূর করিয়া লইতে পারিলেন। সেই রাসায়নিক উপায়টি এই—

এক আউন্স বিশুদ্ধ জলপায়ের তৈল একটি টাম্বলারে

বা কোন প্রশস্ত-মুখ কাচপাত্রে ঢালিয়া লউন। ৯৬° এ্যালকোহল, অর্থাৎ সুরাসারের দুই আউন্স লইয়া জলপাইয়ের তেলের সহিত মিশাইয়া দিয়া পাত্রটি উত্তমরূপে নাড়িয়া লউন, যেন সুরাসার জলপায়ের তেলের সঙ্গে উত্তমরূপে মিলিত হয়। তার পর পাত্রটিকে ২৪ ঘণ্টা কাল কিম্বা তাহার অপেক্ষাও কিছু বেশী সময় অন্ধকার স্থানে ঢাকা দিয়া স্থির ভাবে রাখিয়া দিন। তার পর একটা পরিষ্কার বোতলে ১০ আউন্স পরিশ্রুত জল (distilled water), অভাবে ঐ পরিমাণ পরিষ্কার বৃষ্টির জল রাখিয়া সেই বোতলে সুরাসার মিশ্রিত জলপায়ের তেলটুকু ঢালিয়া দিন। তৎপরে বোতলের মুখ ছিপি দিয়া উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কাল বোতলটি ঝাঁকানি দিয়া নাড়িতে থাকুন। পরে আধ ঘণ্টা কাল বোতলটিকে স্থির ভাবে রাখিয়া দিন। অনন্তর যেমন করিয়া কুল্পীবরফ তৈয়ার করে, সেই ভাবে লবণ সংযুক্ত বরফের সাহায্যে বোতলের মধ্যস্থ পদার্থটিকে জমাইয়া ফেলুন। তখন দেখিবেন, বোতলের পদার্থটা দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে, এবং নীচের অংশটি মাত্র জমিয়া গিয়াছে; আর উপরে জলের মত স্বচ্ছ ও তরল একটী পদার্থ ভাসিতেছে। ঐ তরল পদার্থটিই জলপায়ের তৈল বা watch oil। এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল। তবে সীসার গুঁড়ার সাহায্যে যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত করিলেও মন্দ হয় না।

ক্লক মেকার্স অয়েল।

ইহা ত গেল ওয়াচ অয়েল। বড় ঘড়ি বা clockও মধ্যে মধ্যে অয়েল করা দরকার হয়। তাহাতে ওয়াচ অয়েল করা যে চলে না, তাহা নয়। তবে clockএর কলকব্জা ওয়াচের কলকব্জা অপেক্ষা মোটা বলিয়া উহাতে ওয়াচ অয়েলের মত দামী জিনিস না দিলেও ক্ষতি হয় না। সেই জন্য ক্লক মেকার্স অয়েল বলিয়া আলাদা আর একটা জিনিস তৈয়ার করা হয়।

ইহা জলপাইয়ের তৈল এবং সরিষার তৈল—এই দুইপ্রকার তৈল হইতেই প্রস্তুত হইতে পারে। খুব refine করা সরিষার তৈল বা পরিষ্কার জলপাইয়ের তেল চাই। তৈলে যাহাতে একটুও অম্ল না থাকে সেই জন্য উহার ওজনের শতকরা এক অংশ কষ্টিক সোডা উহার সহিত মিশাইয়া, দিনের মধ্যে যত বেশীবার পারা যায় খুব উত্তম রূপে নাড়িয়া দিতে হইবে। এইরূপ দুই তিন দিন করিলেই তৈলটি সম্পূর্ণ রূপে অম্ল-রহিত হইবে। পরে উহার সহিত খুব বেশী পরিমাণে জল মিশাইলে কষ্টিক সোডা জলে দ্রব হইয়া যাইবে,—উপরে পরিষ্কার তৈল ভাসিয়া থাকিবে। কিন্তু উহা এখনও সম্পূর্ণ নির্ম্মল বা বর্ণশূন্য, স্বচ্ছ হইবে না। তৈলের রং নষ্ট করিয়া উহাকে বর্ণশূন্য, স্বচ্ছ, নির্ম্মল করিবার জন্য উহার সহিত কিছু উগ্র (strong) সুরাসার (alcohol) মিশাইয়া কয়েকবার নাড়িয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে তৈলের রঞ্জন পদার্থ ও অন্যান্য যাহা কিছু আছে, তাহা এ্যালকোহলের সহিত মিশিয়া গিয়া, তৈলটিকে স্বচ্ছ করিয়া তুলিবে। এ্যালকোহল দ্বারা তৈলকে বর্ণহীন করিবার প্রণালী এইরূপ—

একটী পরিষ্কার কাচের বোতল লউন। কিছু সুরাসার সংগ্রহ করুন। সুরাসারটি এমন উগ্র হওয়া চাই যে যেন তাহাতে অন্ততঃ শতকরা ৯০ অংশ এ্যালকোহল থাকে। বাকী অংশটা অবশ্য জল ও অন্য পদার্থ। যতখানি তৈল আছে, তাহার প্রতি দশ ভাগে দুই ভাগ, এইরূপ পরিমাণে এ্যালকোহল উহার সহিত মিশাইতে হইবে। এই সুরাসার মিশ্রিত তৈলের খানিকটা বোতলে ভরুন। বোতলটির দুই-তৃতীয়াংশ এই সুরাসার মিশ্রিত তৈলে পূর্ণ করিয়া এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখিতে হইবে। বোতলটি উত্তম রূপে ছিপিবন্ধ করিয়া ঝাঁকানি দিয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া দিন, যেন তৈল ও স্পিরিট বেশ মিশিয়া যায়। দিনের মধ্যে অনেকবার বোতলটি নাড়িতে হইবে এবং রৌদ্রে দিতে হইবে। খুব ভাল রকম রোদ পাইলে ১০।১২ দিনের মধ্যেই তৈলটি প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। তখন তেলের রং জলের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে, উহাতে রঞ্জন পদার্থের লেশ মাত্র থাকিবে না। এবং তৈলের রঙে সুরাসারটুকু রঞ্জিত হইয়া উপরে ভাসিতে থাকিবে। পরে তৈল ও স্পিরিট পৃথক করিয়া তেলটুকু অন্য শিশিতে ভরিয়া উত্তমরূপে ছিপিবন্ধ করি রাখিতে হইবে। এই শিশি সর্ব্বদা অন্ধকার ঠাণ্ডা যায়গায় রাখিতে হইবে। স্পিরিটটুকু চুয়াইয়া লইলে পরিষ্কার বর্ণহীন এ্যালকোহল আবার পাওয়া যাইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা আবার কাজ চলিতেও পারে।

গন্ধকদ্রাবকের সাহায্যে কিরূপে তৈলজাতীয় পদার্থ refine করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে বোধ হয় একবার

বুলিয়াছি। প্রয়োজন হইলে পরে আবার সে প্রথার বর্ণনা করা যাইবে। জলপাইয়ের তৈল হইতে ব্লকমেকার্স অয়েল প্রস্তুত করিতে হইলে তেলটিকে আগে সজল গন্ধকদ্রাবকের (diluted sulphuric acid) সাহায্যে refine করিয়া লইয়া তৎসহ অনুগ্র lye শতকরা দুই অংশ হিসাবে মিশাইয়া সম্পূর্ণরূপে অম্লরহিত করিতে হইবে। তৎপরে স্পিরিটের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বর্ণহীন করিয়া লইতে হইবে। তার পর যথারীতি বোতলে ভরিয়া ছিপি আঁটিয়া অন্ধকার ঠাণ্ডা যায়গায় যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিতে হইবে।

এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত বর্ণ ও গন্ধহীন, জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও তরল জলপাইয়ের তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈলে পরিণত করা যাইতে পারে। এই তৈলে ইচ্ছামত এক বা একাধিক মৃদু বা উগ্র আতর মিশাইয়া ইহাকে স্থায়ী ভাবে সুরভিত করা যাইতে পারে। কেশ তৈল হিসাবেও ইহাকে বর্ণহীন স্বচ্ছও রাখিতে পারা যায়, কিম্বা ইচ্ছামত যে কোন বর্ণে রঞ্জিতও করিতে পারা যায়। সাহেব বাড়ীতে যে refine করা সুরভিত castor oil পাওয়া যায়, তাহাও এই উপায়ে refine ও সুগন্ধযুক্ত করা হইয়া থাকে। সাহেবরা এই ক্যাষ্টর অয়েল প্রস্তুত করিবার সময় বিলক্ষণ যত্ন লইয়া থাকেন,—ফাঁকি দিবার মতলব করেন না। সেইজন্য তাঁহাদের জিনিসটিও ভাল হয়, এবং দামেও বিকায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশী যে কয়টি ক্যাষ্টর অয়েল হইয়াছে, তাহা তত refine করা নহে, কাজেই উৎকৃষ্টও নয়, তাহার গন্ধও তেমন ভাল নয়। তাহার কারণ, তাঁহারা তৈল প্রস্তুত করিবার সময় সাহেবদের মতন অতটা যত্ন বা পরিশ্রম করেন না—অনেকটা ব্যাগারঠেলা গোছের কাজ করিয়া থাকেন। অথচ বিজ্ঞাপনের খুব আড়ম্বর করিয়া, তৈলের দাম তাঁহারা সাহেবদের প্রায় সমানই লইয়া থাকেন। সেই কারণে খরিদদাররা সাহেবদের প্রস্তুত তৈলই বেশী পছন্দ করেন। দেশী কেশতৈল প্রস্তুত-কারকদের এই মোটা কথাটুকু সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, তৈলকে সর্ব্বাগ্রে বর্ণ ও গন্ধহীন, অম্লবিরহিত করিয়া না লইলে, তাঁহারা যত দামী ও যত উৎকৃষ্ট গন্ধ দ্রব্য উহার সহিত মিশান না কেন, স্থায়ী ভাবে তৈলকে সুরভিত করিতে পারিবেন না। আমি বাজারের কতগুলি দেশী কেশতৈল ব্যবহার করিয়াছি, তাহার একটাতেও সন্তোষজনক ফল পাই নাই; তাহাদের একটাও নিখুঁত ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশোধিত ও প্রস্তুত নহে।

সাইকেল অয়েল।

আমাদের দেশে এখন লক্ষ-লক্ষ লোকে সাইকেল ব্যবহার করিতেছেন। সাইকেলেও মধ্যে-মধ্যে তেল দিতে হয়। কোন তৈল সাইকেলের উপযোগী, কিরূপে তাহা প্রস্তুত করিতে ও ব্যবহার করিতে হয়, তাহা সম্ভবতঃ তাঁহারা জানেন। তবে যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের কিছু সুবিধা হইতে পারে বিবেচনায় এই সঙ্গে সাইকেল অয়েলের সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করিতেছি।

সাধারণতঃ স্পার্ম্ম অয়েল (sperm oil) এবং ভ্যাসলিন (vaseline) মিশাইয়া cycle oil প্রস্তুত হয়। তিন ভাগ স্পার্ম্ম অয়েলের সঙ্গে একভাগ ভ্যাসলিন মিশাইলেই যথেষ্ট হয়। ভ্যাসেলিনের ভাগ আরও বেশীও লওয়া যায়; তবে তাহাতে উহা কিছু বেশী ঘন হইয়া পড়ে। সেইজন্য উহার সহিত কিঞ্চিৎ খনিজ তৈল মিশাইয়া উহাকে যথোপযুক্তভাবে তরল করিয়া লইতে হয়।

সাইকেলের চেনে লাগাইবার জন্য কিছু চর্ব্বি (tallow) (রুষিয়া দেশজাত tallowই এ পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তবে তাহা আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়) গলাইয়া তাহার সঙ্গে খুব মিহি plumbago (graphite বা black lead) চূর্ণ এমন পরিমাণে মিশাইতে হইবে যে চর্ব্বি ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে মিশ্র পদার্থটি কঠিন আকার ধারণ করিবে। চেনে লাগাইবার সময় উহা তাপ সহযোগে তরল করিয়া চেনের খাঁজে খাঁজে লাগাইতে হয়। চেনটি সাইকেল হইতে খুলিয়া লইয়া, যে পাত্রে জিনিসটি গলানো হয়, সেই পাত্রে তরল জিনিষটির মধ্যে ডুবাইয়া লইতে পারিলে আরও ভাল হয়।

প্লম্বেগো চূর্ণ ও ভ্যাসেলিন একসঙ্গে মর্দ্দন করিয়া লইলেই একরকম cycle lubricant প্রস্তুত হইতে পারে। এই বস্তুটি ব্রাসের সাহায্যে লাগাইতে হয়।

ইহা ছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য আরও নানাপ্রকার lubricant আছে।

বন্যা-পীড়িত স্থান সকলের সংবাদ, বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি, মারোয়াড়ী সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য সেবক সম্প্রদায়ের কার্য্যাবলী 'ভারতবর্ষে'র পাঠকগণ সংবাদ-পত্রাদিতে প্রতিদিনই পাঠ করিতেছেন। তাহার বিবরণ আর লিপিবদ্ধ করিব না। আমরা সুধু বলিতে চাই, এখনও আরও সাহায্য চাই;—এ মরণ-বাঁচনের সমস্যা এখনও রহিয়াছে; উত্তর-বঙ্গের সম্মুখে ঘোর দুর্দ্দিন। গৃহ-হীনের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে, কৃষকের হালের গরু লাঙ্গল কিনিয়া দিতে হইবে, বীজ খাদ্য সরবরাহ করিতে হইবে। তাহার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। এ অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে। বন্যার জল সরিয়া গিয়াছে, তবে আর কি? এ কথা কেহই মনে করিবেন না। এখনই আরও বেশী টাকার দরকার, এ কথা কেহ ভুলিবেন না।

একটা ...রি কৌতুকজনক ব্যাপারের কথা বলিতে হইতেছে। আমাদের দেশের সকল প্রতিষ্ঠানেরই টাকার টানাটানি; খোদ সরকার বাহাদুরের যখন অনাটন, আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী, তখন মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা;—আর সকলেরও, সকল প্রতিষ্ঠানেরই অর্থ-সঙ্কট; সবাই বলে আয়ে কুলায় না। রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলের মুখে এই কথা—আয়ে কুলায় না। সুতরাং নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। আমাদের কলিকাতা মিউনিসিপালিটীও আয় কিসে বাড়ে, তাহার জন্য বিশেষ চিন্তা করিতেছেন। এই চিন্তার ফলে সেদিন একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ 'সহরের-পিতা'—ইংরাজীতে যাহাকে বলে City Father—বৃদ্ধ কমিসনর প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, গরু ভেড়া শিয়াল কুকুরের উপর ত ট্যাক্স হইয়া গিয়াছে, আমোদ-প্রমোদের উপরও ট্যাক্স হইয়াছে, এখন এক কাজ করা যাক,—এই খবরের কাগজের সম্পাদক, স্বত্বাধিকারীদিগের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপানো হউক। তিনি নজীর দেখান যে, মান্দ্রাজে না কি ঐ ট্যাক্স প্রচলিত আছে। অস্থায়ী চেয়ারম্যান বাহাদুর বলেন, "আহা, গরীব বেচারী এডিটারকে বাদ দিন না।" বৃদ্ধ কমিসনার বাহাদুর বলেন যে, তা কেন? এডিটাররা খুব মোটা বেতন পায়। বিশেষ ওরা dangerous (ভয়ানক!!) ওদের উপর কি দয়া করিতে আছে? সম্পাদকগণের পরম সৌভাগ্য যে, এমন শুভানুধ্যায়ীর সাধু প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই; এত বড় একটা আয়ের পথ বন্ধ হইয়া গেল!! আমরাও বৃদ্ধ কমিসনার মহাশয়ের পরাজয়ে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

কিন্তু, তিনি যে সম্পাদকদিগকে dangerous নামক বিশেষণে ভূষিত করিলেন, সেই কথাটাই বিশেষ চিন্তার বিষয়। এই dangerous লোকগুলাকে জব্দ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থাই ত আছে। গবর্ণমেণ্টের আইনে ত এই শ্রেণীর লোকদিগকে মুচলেকায় আবদ্ধ করিবার বিধান আছে। তাহা করিলেই ত গোল মিটিয়া যায়। তবে, তাহাতে মিউনিসিপালিটীর ত অর্থাগম হয় না। সুতরাং উক্ত বৃদ্ধ কমিসনার বাবুকে আর একটা প্রস্তাব আমরা বাতলাইয়া দিতেছি। তাহাতে লোকজনও রাখিতে হইবে না, আদায়-খরচাও নাই,—ষোল আনাই তহবিলে উঠিবে। বৃদ্ধ কমিসনার বাবু যেন আগামী সভায় প্রস্তাব করেন যে, আইন অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কলিকাতার অধিবাসীরা যখন সন্তানের জন্ম রেজেষ্টরী করিতে যাইবেন, তখন পুত্র হইলে কুড়ি টাকা ও কন্যা হইলে দশটাকা রেজেষ্টরী ফি দিতে হইবে। দেখিবেন, আমোদ-প্রমোদ, বা কুকুরের উপর ট্যাক্স অপেক্ষা কত বেশী টাকা আয় হইবে। কৃতজ্ঞ সম্পাদকগণ বোধ হয় কমিসনার বাবুকে এ বিষয়ে উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর আয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে পরম শুভানুধ্যায়ী একজন বন্ধু আর একটী প্রস্তাব করিয়াছেন। বৃদ্ধ কমিসনার মহাশয় এ প্রস্তাবটী সভায় উপস্থাপিত করিতে সঙ্কুচিত হইতে পারেন, কারণ, ইহার সহিত তাঁহার স্বার্থের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু করদাতৃগণ যে এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিবেন, সে বিষয়ে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রস্তাবটী এই যে, যাঁহারা মিউনিসিপালিটীর কমিসনর পদে নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদিগের যে ফি-য়ের বিল হয়, তাহা হইতে শতকরা পঁচিশ টাকা মিউনিসিপাল

তহবিলে জমা দিতে হইবে। এমন আশঙ্কা করিবেন না যে, এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে কেহ কমিসনর-পদপ্রার্থী হইবেন না; নির্ব্বাচনের সময় পদপ্রার্থীদিগের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহার তুলনায় ইহা অতি সামান্য। আমাদের সহৃদয় বৃদ্ধ কমিসনর মহোদয় এ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার কমিসনরী পদ যে কায়েম হইবে, এ আশ্বাস আমরা দিতে পারি।

আর একটা অনটনের করুণ কাহিনী বলি। আমাদের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভীষণ অর্থাভাব। বিগত বৎসরের শেষে জানিতে পারা গিয়াছিল, সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার অভাব। এ বৎসরের শেষে তাহা বোধ হয় সাত লক্ষে পা দিয়াছেন। অধ্যাপকেরা বেতন পাইতেছেন না; পরীক্ষকেরা পারিশ্রমিক পাইতেছেন না, নিত্য-নৈমিত্তিক আফিস-খরচের বিষম টানাটানি। এদিকে উৎকট দলাদলি; একদলে গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ও বঙ্গীয় প্রতিনিধি সভা, অপর পক্ষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ত একবার বলিয়াই ফেলিয়াছিলেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের টাকা যে ভাবে খরচ হইয়াছে, তাহাকে Criminal waste অর্থাৎ অপরাধ-জনক অপব্যয় বলা যাইতে পারে। প্রতিনিধি-সভার একদল সদস্য তাহা অপেক্ষাও কটু কথা বলিয়াছেন; সংবাদপত্রের অনেকে ত ব্যক্তিগত আক্রমণও করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতেও তাহার 'উত্তর' গাওয়া হইয়াছে। তাহার পর যে কারণেই হউক, সরকার তরফ কৃপা-পরবশ হইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বলিলেন "আচ্ছা, তোমাদের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত দেখিতেছি। তা, কি করা যায়; এত বড় জিনিষটা ত আর লালবাতি জ্বালিতে পারে না। বেশ, এই লও আড়াই লাখ টাকা। কিন্তু, টাকাটা এই এই ভাবে খরচ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তাঁহারা কয়েকটা সর্ত্ত দিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় বিশেষ বিপন্ন হইলেও এই সর্ত্তমূলক দান গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না; তাঁহাদের আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিয়াছে;—একে অশ্রদ্ধার দান, তাহাতে আবার সর্ত্ত। লেখালেখি, কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। এদিকে বেতন না পাইয়া, শুনিলাম, চল্লিশ জন অধ্যাপক চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন; আরও অনেকে সুযোগ খুঁজিতেছেন। এই ত অবস্থা! আমরা এতদিন কোন কথাই বলি নাই। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় আমাদেরই; ইহা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। অপব্যয় হইয়া থাকে তাহার প্রতীকার ত আমাদেরই হাতে। গলদ যে আছে, তাহা আমরাও অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু, এ সময়ে কি কর্ত্তব্য? এখন কর্ত্তব্য এই যে, সকলে মিলিয়া-মিশিয়া উপস্থিত ধারটা শোধ করিয়া দেও; তাহার পর যাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, Criminal waste of money না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। ইহাই এখন একমাত্র পথ। এ পথ অবলম্বন না করিয়া এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিলে পরে আমাদিগকেই অনুতাপ করিতে হইবে।

সারনাথে একটা নূতন বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মিত হইতে চলিল। সার হারকোর্ট বাট্‌লার সে দিন তার শিলা-বিন্যাস করিয়াছেন। এই উৎসবের অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটা বক্তৃতায় তিনি ভাবের আবেগে অনেক মধুর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি নিজে খৃষ্টান হইয়াও বৌদ্ধ বিহারের শিলা-স্থাপনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান তীর্থ বারাণসীর পাশেই সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ তীর্থ সারনাথ। পৃথিবীর দশ কোটী বৌদ্ধের তীর্থ সারনাথেই বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে উহা ঋষি-পত্তন নামে পরিচিত ছিল। সারনাথ হইতেই বুদ্ধদেবের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য-পঞ্চক পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থে প্রেরিত হন। সার হারকোর্ট বাট্‌লার আরও বলিলেন, শীঘ্রই তিনি বৌদ্ধপ্রধান ব্রহ্ম-দেশের লাট হইয়া যাইতেছেন তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মকে মনে মনে যেরূপ শ্রদ্ধা করে, ঘটনাচক্রও সেইরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও বৌদ্ধগণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে।

ভারতে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; তবে খুব ধীরে। ১৯১৯-২০ সালে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা ৪০০ ছিল ১৯২০-২১

সালে উহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪৯। পরিদর্শক ও গ্যারেন্টিং সোসাইটী ঐ দুই বৎসরে যথাক্রমে ৯৯৪ ও ১১৫০ ছিল। কৃষি-সমিতির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬৭১৬ ও ৪২৫৮২। আর কৃষি ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর সোসাইটীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৬৬২ ও ৩৩২২। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সোসাইটীর সংখ্যা ১৯১৯-২০ সালে ছিল ৪০৭৭২ এবং ১৯২০-২১ সালে ছিল ৪৭৫০৩। এই সকল সোসাইটীর মোট সদস্য সংখ্যা ১৯২০-২১ সালে কৃষক শ্রেণীর ১৩৬২৩৯১ ও অপর শ্রেণীর ৩৯০৫১৩; অর্থাৎ মোট ১৭৫২৯০৪। এই সকল ব্যাঙ্কে উক্ত বৎসর মূলধন স্বরূপ ৩৬৪২৯৫০০০ টাকা খাটিয়াছিল।

কলিকাতায় গুণ্ডার অত্যাচারে রাত্রিকালে, এমন কি দিবাভাগেও পথ চলা বিপদ্জনক হইয়াছে। পুলিশের গুণ্ডা-শাসন বিভাগ অনেক চেষ্টা করিয়াও এই উপদ্রব নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। সেইজন্য কাউন্সিলের আগামী অধিবেশনে গুণ্ডা-দমন সম্বন্ধে একটা আইনের প্রস্তাব হইবে। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস যে, এই সকল গুণ্ডা বাঙ্গলা দেশের বাহির হইতেই আসিয়া থাকে। তাই আইন হইতেছে যে, পুলিশের কমিসনর বাহাদুর বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যাহাদিগকে গুণ্ডা বলিয়া মনে করিবেন, তাহাদের সম্বন্ধে রিপোর্ট করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাঙ্গলাদেশের সীমানা হইতে বাহির করিয়া দিবেন, আর কখন প্রবেশ করিতে দিবেন না। ইহাতে যে উপদ্রব কিছু কমিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পশ্চিমদেশীয় লোক ব্যতীত বাঙ্গালীও যে গুণ্ডার দলে নাই, এ কথা বলা যায় না; তাহাদের সম্বন্ধে আইনে কোন বিধান করা সম্ভবপর হইবে না, কিন্তু এই শ্রেণীর বাঙ্গালী গুণ্ডাদিগকেও কঠোর শাসনে রাখার প্রয়োজন হইয়াছে। পুলিশের গুণ্ডা-শাসন বিভাগ যে এ বিষয়ে সচেষ্ট, তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতঃ কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষের' শোক সংবাদে পরলোকগতা ইন্দিরা দেবীকে স্বর্গীয় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পুত্রী' স্থলে 'পৌত্রী' ছাপা হইয়াছে; এজন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত নূতন পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক গীতিনাট্য 'সুদামা' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ॥০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্য লহরী সিরিজের 'বিলাতী বণিকের কীর্ত্তি' ও 'অদৃষ্টের পরীক্ষা' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য প্রত্যেকখানি ৸০ বার আনা।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, "রবীন্দ্রনাথের ছন্দ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ॥০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত 'কলঙ্কিনী' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৸০ বার আনা।

রাজস্থানের অনুবাদক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'কনকী' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ।৵০।

৺পান্নালাল শীল প্রণীত ভক্তিরসাত্মক নাটক 'উদ্ধারণঠাকুর' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲ এক টাকা।

॥০ আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ৮১ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত 'পুষ্পদল' প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'পরমহংসদেব' বহু চিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র বি-এ প্রণীত 'শিখগুরু' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্ প্রণীত, [illegible] গ্রন্থাবলীর [illegible] গ্রন্থ 'গৌড়পাণ্ডুয়া' বহু চিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য বার আনা।

Publisher—Sudhanshusekher Chatterjea,
of M. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatbarsa Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street CALCUTTA.